৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিকপত্র

সপ্তমবর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩২৬—জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

সম্পাদক—শ্রীজলধর সেন

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

সপ্তমবর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩২৬—জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচি

পৌষ

বহুবর্ণ চিত্র

সান্ত্বনা

শিল্পী- শ্রীঅসিতকুমার হালদার] [Blocks by BHARATVARSHA HALFTONE Works

পৌষ, ১৩২৬

দ্বিতীয় খণ্ড] সপ্তম বর্ষ [প্রথম সংখ্যা

সাকার ও নিরাকার পূজা

[অধ্যাপক শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ]

শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই যখন ধর্ম্মের প্রবাহে আত্ম সমর্পণ করিতে যা'ন, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা মনকে উত্যক্ত করিয়া তোলে। আমাদের দেশে সাকার ও নিরাকার উভয় রূপেই ঈশ্বরের পূজার বিধান রহিয়াছে। কোন্‌টা সবচেয়ে প্রাচীন, কোন্‌টা মানুষকে অধোগামী করিয়া রাখে, কোন্‌টা উর্দ্ধগামী করিয়া থাকে, এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডায় মনকে শান্ত করা যায় না। অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত বাঙ্গালী স্বদেশীয় ধর্ম্মভাবের সহিত নিজের মনকে ঐক্যতানে বাজাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলে কত বিরোধভাব জমিয়া উঠে;—হয় দেশের ধর্ম্ম তাঁর হৃদয়-মন্দিরে তেমন করিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠে না, নয় তাঁর নিজের মনই তর্কচিন্তার পাকে-পাকে আড়ষ্ট হইয়া আর সহজ ভাব ধারণ করিতে পারে না, ধর্ম্ম-সাধন হয় না। শুধু জনকয়েক মাত্র লোক এই মনঃযুদ্ধে জয়ী হইয়া দেশের মাটি ও নিজের বুকের ভাব মিলাইয়া লইয়া তাঁহাদের জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হ'ন।

তবু আমাদের এ সমস্যা ঘুচিল না। কাহার পূজা করিব? সাকার ঠাকুরের, না নির্গুণ পরমেশ্বরের? হিন্দুধর্ম্মে ত দুইরূপ পূজাই সঙ্গত বলিয়া মনোনীত রহিয়াছে!

কয়েক বৎসর হইল, রামমোহন-জীবনী-প্রণেতা ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। নিরাকার ব্রহ্মের পূজা তিনি বাহাল রাখিয়াছিলেন। তাঁর মীমাংসাগুলি শাস্ত্র-বচন দ্বারা অসিদ্ধ প্রমাণ করিবার জন্য, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় জবাবদিহি করিয়াছিলেন। কিন্তু তর্কে বহু দূর। প্রাণের ঠাকুরটি যে কোথায়, তাঁহাকে কিরূপে পূজা করিলে পাওয়া যায়, কেমন ভাবে পাওয়া যায়, তাহা কি বিচারে প্রতিপন্ন হইতে পারে? তবে জ্ঞানের আলোক মীমাংসার পক্ষে কিছু সাহায্য করে, তাহা মানি; এবং সেইজন্যই চিরদিনের সমস্যাটিকে লইয়া আমরাও অগ্রসর হইয়াছি।

যদি পূজা করেন, তাহা হইলেও তিনি সহ্য করিতে পারেন না। এইরূপে তিনি সারা বিশ্ব হইতে নিজের ঠাকুরকে সরাইয়া লইয়া, তাঁহার সংস্পর্শে নিজেকে পবিত্র জ্ঞান করেন। ইহাতে তাঁহার লাভ কি হইল? বিশ্বজগৎ ত ত্যাগ হইলই; উপরন্তু, নির্ব্বাক্ শিবলিঙ্গকে আশ্রয় করিলেন বলিয়া, তিনি এক প্রকার অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। ইহা যে আনন্দের শেষ সোপান, আমরা তাহা স্বীকার করি; কিন্তু ইহা নিরবয়ব, নিগুর্ণ, নিরাকার, দেবাদিদেব মহাদেবকে লাভ করা নহে কি? আমরা বাহির হইতে তাঁহার সাকার ঠাকুরকে দেখিয়া যতই বীতরাগ হই না কেন, তিনিই কিন্তু আসল নিরাকার পরমেশ্বরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন।

আবার দেখুন, যিনি নিগুর্ণ পরমেশ্বরের পূজায় লিপ্ত, তিনি যতই অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই যেন বিশ্বের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বাড়িতে থাকে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রকৃতির সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য তিনি পাগল হইয়া যা'ন। আবার দেখিতে পাই, দেশবিদেশের কবি, দার্শনিক ও ভক্তদিগের সংসর্গে বা তাঁহাদের কথা শ্রবণে বা পাঠে তিনি বিভোর হইয়া থাকেন; এবং এই প্রকারে অনেক সময়ে অবতারবাদ মানিয়া ল'ন। নিজের প্রিয়জনদিগকে কোলে করিয়া, বুকে করিয়া, তিনি গভীর ভাবে ঈশ্বর-প্রেমের আস্বাদ পাইয়া থাকেন। এইরূপে নিরাকারবাদী সাধকগণ পরমেশ্বরের জগৎব্যাপী সাকার রূপ দেখিতে পা'ন না কি? ইহাই কি শ্রেষ্ঠ সাকার ঠাকুর দর্শন নহে? আবার উপরিউক্ত পৌত্তলিক পূজারী যে নিরাকার পরমেশ্বরের সঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন, তাহাও কি দুর্লভ নহে? আমাদের মনে হয়, ইহার অপেক্ষা ঈশ্বরের মহিমার কথা আর নাই। তিনি নিরাকারবাদী ভক্তকে তাঁহার রূপের মধ্যে মজাইয়া রাখিয়াছেন; আবার সাকারবাদী পূজারীকেও সকল দিক হইতে টানিয়া লইয়া, তাঁহার নিগুর্ণ, অরূপ সত্তার পানে আকর্ষিত করিতেছেন। যদি তাঁহার লীলার কথাই তুলিলাম, তবে একবার জগতের সকল ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের দিকে চাহিলেই দেখিতে পাইব, যাঁহারা নিগুর্ণ পরমেশ্বরে বিশ্বাসী বলিয়া নিজেদের প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দেশ ধনধান্যে পূর্ণ, ঈশ্বরের সাকার রূপে চতুর্দ্দিক ভরা এবং এ দিকে তাঁহাদের নজরটাও কিছু তীক্ষ্ণ। আবার, যে দেশে বেশীর ভাগ লোকই সাকার ঠাকুরের পক্ষপাতী, তাঁহাদের দেশে ভগবান্ নিরাকার আনন্দরূপে তাঁহাদের হৃদয়-মনকে আচ্ছন্ন রাখিয়া, সকল প্রকার সাকার পদার্থ হইতে তাঁহাদের দৃষ্টি সরাইয়া লইতেছেন। ইহা কি জগতের ইতিহাসে কালে-কালে প্রতিপন্ন হয় নাই?

ঈশ্বরের কল্পনাটিকে (conception) বড়ই জড়াইয়া ফেলিলাম। আমার বিশ্বাস, একেবারে সাকার, বা একেবারে নিরাকার ঈশ্বরে মানুষ চিরকাল চিত্ত নিযুক্ত রাখিতে পারে না। ধর্ম্মজীবনের সোপানে-সোপানে ঈশ্বরের সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। Idolatry leads to Theism and Theism merges into Pantheism—অর্থাৎ পৌত্তলিকতা হইতে নিরাকার একেশ্বরবাদ এবং একেশ্বরবাদ হইতে সর্ব্বঘটে ভগবান বর্ত্তমান এইরূপ ভাব আসিয়া পড়ে।

ইহা সাধারণ মনুষ্যের জীবনে একটি গভীর সত্য। তথাপি ঘোর সাকারবাদী ও গোঁড়া নিরাকারবাদীর ভুল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম; কারণ, তাহা না করিলে সমকক্ষ ভাবে বুঝা যায় না। এইরূপ বিচারে যদি কাহাকেও না জানিয়া আঘাত করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাঁহার নিকটে করপুটে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি; কারণ কাহাকেও আঘাত করা আমাদের মোটেই উদ্দেশ্য নহে। যদি "পৌত্তলিক" কথাটি ব্যবহার করায় কেহ ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা নাচার; কারণ, ঐ অর্থে কোন তুল্য শব্দ খুঁজিয়া না পাওয়ায়, আমরা উহা ব্যবহার করিয়াছি; কাহাকেও ক্ষোভ দিবার জন্য নহে।

যদি নিরাকারবাদীর গভীর জ্ঞানের কথা কেহ অনুসন্ধান করিতে চা'ন, তাঁহাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী ও লেখা পড়িতে অনুরোধ করি। রাজা রামমোহন নিগুর্ণ ব্রহ্মের পূজা আমাদের দেশে পুনঃ-প্রচলিত করিয়া গিয়াছিলেন। নিগুর্ণ ব্রহ্মকে উপাসক-মণ্ডলীর মনে অধিষ্ঠিত করিতে হইলে, পৌত্তলিক ঠাকুরের সহিত বিবাদ না রাখিলে চলে না। সেই জন্য মহর্ষির জীবনে দেখিতে পাই, তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। [৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত বিজয়কৃষ্ণের জীবনী পৃঃ ২৯০—"একমাত্র পৌত্তলিকতা পরিহারের জন্যই এ

দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব এবং রামমোহন রায় হইতে এখনকার নবীন প্রচারক অবধি সকলের এত চেষ্টা ও যত্ন।" মহর্ষির পত্র হইতে উদ্ধৃত করিলাম।]

আবার, পাছে নিরাকার ব্রহ্মের পূজা করিতে-করিতে সাকার রূপে তাঁহাকে পাইয়া মন সন্তুষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি অবতারবাদ মানিলেন না (মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট, পৃঃ ৪৪, ৫২ দ্রষ্টব্য)। তবে প্রকৃতির মধ্যে তিনি প্রায়ই ডুবিয়া যাইতেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, নিরাকারবাদী ভক্তিমার্গের সাধকের প্রকৃতির মধ্যে যে ঈশ্বর-দর্শনের আভাস আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি, তাহার সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির মিলন-ভাব অন্য রকম। তিনি প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তিনি প্রকৃতিকে আপন সঙ্গিনী ভাবিতেন, পিতার দুয়ারে দুই জনে মিলিয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এক অবিরাম ব্যাকুল ভাব দেখিতে পাই। তিনি ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ; তাই উপনিষদের পরমপিতা ভিন্ন তাঁহার মন উঠিত না। সেই জন্যই তিনি প্রকৃতির সহিত নিজেকে এক সুরে বাঁধিতে চেষ্টা করিতেন। যাহাতে ব্যাকুলতা না কমিয়া যায়, হৃদয় যাহাতে দ্রবীভূত না হয়, অবিরাম ব্রহ্মনাম করিতে-করিতে প্রকৃতি-সতীর সহিত তালে-তালে জীবন-নৃত্যে অগ্রসর হইতে পারেন, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। অতএব আমরা বুঝিলাম, নিরাকারবাদী ভক্ত প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে পাইয়া বাঁচিয়া থাকেন। নিরাকারবাদী তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ প্রকৃতির সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া নিজেকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে ব্যস্ত। তাঁহার ঈশ্বর ক্রমে দূরে সরিয়া যান, তাঁহার নিজের মন ক্রমে বাড়িয়া যায়; এইরূপ আত্ম-প্রসারণ কার্য্যে বৈদিক ঋষিদিগের চরিতার্থতা দেখিতে পাই; এবং সেই জন্যই পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহাদের বংশধর বলিয়া জানিয়া আমরা "মহর্ষি" নামে তাঁহার পরিচয় দিয়া থাকি।

কিন্তু মহর্ষির মত অবিমিশ্র জ্ঞান-প্রাপ্তির অবস্থা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ উপাসকদিগকে (যাঁহারা ভক্তির পথে যাইবেন বা কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেন) পূর্ণ তৃপ্তি দিল না। সেই জন্যই আচার্য্য কেশবচন্দ্র অবতারবাদ প্রচার করিলেন, এবং প্রকৃতিকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলেন। শুধু তাহাই নহে। যে দেশে তেত্রিশ কোটি ঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে, সেই দেশের নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী উপাসক-মণ্ডলীকে উপদেশ রূপে তিনি বলিয়া গেলেন—"মনে করিও না যে তেত্রিশ কোটি একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা। তেত্রিশ কোটির অর্থ অসংখ্য। কি অসংখ্য? ঈশ্বর অসংখ্য? না। ঈশ্বর এক। এক ঈশ্বরের অসংখ্য ভাব। .... তোমার দেবতা এক; কিন্তু তাহার দৈবভাব তেত্রিশ কোটি।"

ভক্তের চক্ষে ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য সত্য। ইহা কথায় বুঝান যায় না; কিন্তু অন্তরে উপলব্ধি করিলে সকল গোল মিটিয়া যায়। ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী এইরূপ সমন্বয়ের ভাব হৃদয়ে সর্ব্বদা রাখিলে, তাঁহার নিজের এবং দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

পাগল

[ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল্]

(১)

রামগতি ভট্টাচার্য্য বিষয়ী লোক, অসাধারণ বুদ্ধিমান। তাঁহার ব্যবসায়-বুদ্ধি ও দূর-দৃষ্টি খুব বেশী ছিল। দশ টাকা মূলধন লইয়া কি উপায়ে দশ বৎসরে লক্ষপতি হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে অনেকগুলি 'স্কীম' তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে ছিল। সে সমুদায় কল্পনার দুই-চারিটা তিনি প্রয়োগও করিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্ট তো কাহারও হাত-ধরা নয়। ঠিক যেখানে যেটা না হওয়া উচিত, সেইখানে সেইটা এমন অসম্ভব নিশ্চয়তার সহিত হইতে লাগিল যে, দশ টাকার ব্যবসায়ে তিনি দশ হাজার টাকা ফেলিয়াও শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না—তাঁহাকে দেউলিয়া হইতে হইল। এখন তাঁহার সম্বন্ধে

তাঁহার স্ত্রীর যৎকিঞ্চিৎ স্ত্রীধন সম্পত্তি ;—তাহারই উপস্বত্ব হইতে কায়ক্লেশে গ্রামে বসিয়া তিনি জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অথচ—দেখ বিধাতার অবিচার—তাঁহারই কাছে বুদ্ধি লইয়া রামধন সাহা পাটের কারবারে দুই বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা লাভ করিয়া বসিল।

গ্রামে বসিয়া থাকিলেই তো তাঁর মত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ফন্দিবাজ লোকের মাথাটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। বরঞ্চ দারিদ্র্যের পীড়নেই আরও রাতারাতি বড়মানুষ হইবার ফন্দী খুব বেশী করিয়া মনটাকে তোলপাড় করিতে লাগিল। দুই একটা ছোটখাট চেষ্টাও তিনি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাজারে তাঁহার এত বদনাম পড়িয়া গিয়াছিল যে, তিনি কিছুতেই আর ভাগ্যলক্ষ্মীর হাতের ফলে দাঁত বসাইতে পারিলেন না।

তাঁহার নিজের সম্বলের মধ্যে এক স্ত্রী, আর এক কন্যা। স্ত্রীকে লোকে বড় ভয় করিত, তিনিও করিতেন। দজ্জাল বলিয়া তাঁহার একটা খ্যাতি তাঁহার গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া বহু দূরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। ভট্‌চায মহাশয়ও তাঁহাকে বিলক্ষণ ভয় করিতেন। দেউলিয়া হওয়ার পর তিনি একবার স্ত্রীর স্ত্রীধন বিক্রয় করিয়া নূতন করিয়া ব্যবসায় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই,—গৃহিণীর ঘূর্ণিত চক্ষু ও লোল জিহ্বার প্রকোপে তাঁহাকে তাহার পর তিন দিন গ্রাম-ছাড়া হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। অথচ এই গৃহিণীর গুণের অবধি ছিল না। ভোর হইতে রাত দুপুর পর্য্যন্ত বেচারী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া স্বামী ও কন্যাকে এতটা তোয়াজে রাখিত যে, অনেক বড়মানুষের ঘরে তেমন আরাম দুর্লভ। সে না জানিত এমন কাজ নাই, না করিত এমন কাজও বড় একটা নাই। রান্না করা, ঘর নিকান, ধানভানা তো তুচ্ছ কথা,—মেয়েমানুষের যা করিতে নাই, এমন কাজ সে অনেক করিত। কোদাল দিয়া মাটি কোপাইয়া সে নানা রকম দেশী-বিলাতী তরকারী তুলিত ;—আবার ওসমান মণ্ডলের বাড়ী সুদের তাগাদায়ও যাইত। সে যে টাকা লাগাইত, তার সুদ কখনও পড়িতে পাইত না। তাহার একটা কারণ এই যে, কাবুলীর লাঠির চেয়ে লোকে কাত্যায়নী ঠাকুরাণীর জিহ্বাকে বেশী ভয় করিত।

কন্যার নাম নারায়ণী,—বয়স বার-তের,—কিন্তু একটু বাড়ন্ত। মেয়েটি রূপসী,—কিন্তু তার রূপটা যেন অতিরিক্ত ধারাল গোছের। শান্ত, নিরীহ, গোবেচা- সকল কন্যা রূপলাবণ্যের জন্য সাধারণতঃ খ্যাতি লাভ থাকে, নারায়ণী তাদের মত নয়। সে চঞ্চল ; তার চ উজ্জ্বল ও স্পষ্ট। তাহার শরীরের মধ্যে কোনও খানে ভাসা আলগা ভাব নাই ;—সমস্ত জায়গায় যেন অ- রকমের দৃঢ়তা ও চঞ্চলতা আছে। সে আস্তে- কোমল কণ্ঠে কথা কয় না,—উচ্চ কণ্ঠে খুব দৃঢ়তার তাহার মত ব্যক্ত করে। তবে—মায়ের সঙ্গে এইখ তার তফাৎ—কথা সে কম কয়, ভাবে বেশী। ব কাছে সে যে অনেকটা বিষয়বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি লাভ করি- তাহা তাহার তের বৎসরের কথায়-বার্ত্তায়ই বেশ বুঝা য

ঘরে তের বৎসরের মেয়ে—পয়সার নামে অষ্টরম্ভা অবস্থায় লোকের চিন্তা হইবারই কথা। রামগতির যে হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু কিরূপে ক বিবাহ দিবে, এ চিন্তা এক দিনের তরেও রামগতিকে ছাড়ে নাই। রামগতি ভাবিতেছিল, এই মেয়েটার দিয়া কি-রকমে একটা কাজ করা যায়, যাহাকে বা ভাষায় বলে "দাঁও মারা"। একেই বলে পাকা ফন্দীর ছেলের বিবাহে দাঁও মারিবার চেষ্টা সবাই করে ; ফন্দীবাজী যার হাড়ে-হাড়ে, সে-ই কেবল মেয়ের বিবা মত নিছক লোকসানের কারবারেও দাঁও মারিবার ক করিতে পারে।

রামগতি বড় ঘোরা-ফেরা করিতে লাগিল ; গাঁয়ে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়াই দুর্ঘট। লোকে জিজ্ঞাসা করি বলে,—কন্যাদায়! অথচ গাঁয়ের মধ্যেই ভুবন মুখুয্যে ছেলের জন্যে মেয়েটিকে নিতে প্রস্তুত। কেবল মুখ ফু মেয়েটি চায় নাই ; কিন্তু সবাই জানে সে প্রস্তুত—রামগ জানে। ভুবন মুখুয্যের অবস্থা মন্দ নয় ; তার ছেলেও বি পড়ে, দেখিতেও মন্দ নয়। কিন্তু রামগতি সব বুঝিয় সে দিকে নজরই দেয় না।

অনেক দিন হাঁটাহাঁটির পর অবশেষে একদিন রামগ হাসি-মুখে ঘরে ফিরিল। সকলে জানিল, নারায়ণীর বড়লোকের ঘরে বিবাহ ঠিক,—কাল মেয়েকে আশীর্ব্ব করিতে আসিবে। লোকে তো অবাক্! দেখা না শুনা নাই, একেবারেই আশীর্ব্বাদ! তা হইলে কি

রের দিন সকালবেলায় সত্যসত্যই ভুলুয়ার লক্ষ্মীপতি শ্রীদার যোগেন্দ্রবাবু আসিয়া নারায়ণীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। রামগতি সত্যসত্যই দাঁও মারিল জানিয়া নিশ্চিন্ত মনে তামাক ফুঁকিতে ফুঁকিতে ফন্দী আঁটিতে লাগিল।

শুভ দিনে, শুভ ক্ষণে রামগতি কন্যাকে লইয়া ভুলুয়ায় গিয়া, শাঁখা ও সিঁদুর যৌতুক দিয়া কন্যা-সম্প্রদান করিয়া আসিলেন। দশদিন পর নারায়ণী বেনারসী সাড়ী পরিয়া গয়নার ভারে কতকটা নত হইয়া, পাল্কী হইতে পিত্রালয়ে নামিল।

ইতিমধ্যে গ্রামের লোকে খবর পাইয়াছিল—যোগেন্দ্র-বাবুর দুটি ছেলে; বড়র নাম সত্যেন, তাহার সঙ্গে নারায়ণীর বিবাহ হইয়াছিল। সে না কি একেবারে পাগল। এই শুভ সংবাদে গ্রামের লোকে অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

(২)

নারায়ণী যখন শ্বশুরবাড়ী হইতে ঘরে ফিরিল, তখন রাজ্যের মেয়েছেলে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। নারায়ণী বড় কাঁহারও সঙ্গে কথা কহিল না। যাহা নিতান্ত না কহিলে নয় তাই বলিয়া, তাড়াতাড়ি গহনা কাপড় ছাড়িয়া-গুছাইয়া গা ধুইতে গেল। কিশোরীরা বলিল, "ভারী দেমাক! তবু তো পাগল সোয়ামী!" বয়স্থারা বলিলেন, "আহা, বেচারা ছেলেমানুষ, ও কি বোঝে,—গয়না-পত্র, ধন-দৌলতে ভুলে আছে।" কথাটা নারায়ণীর কাণে গেল,—সে একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

তা'র পর যে যার চলিয়া গেল; কিন্তু কয়েকটি মেয়ে নাছোড়বান্দা—তাহারা বসিয়াই রহিল। নারায়ণী গা ধুইয়া ফিরিলে, পাশের বাড়ীর দত্ত-গৃহিনী বলিলেন, "হ্যাঁলা নারাণী, তোর সোয়ামী কি একেবারেই পাগল?"

নারায়ণী বেজায় চটিয়া গেল; ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উত্তর করিল, "কেন, পাগল হ'তে যাবে কেন?"

গৃহিনী বলিলেন, "তবে কি?"

"কি আর? মানুষ!"

"তবে এই যে সবাই ব'লছে"—

"সবাই ব'লছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করগে, আমি তা'র কি জানি!" বলিয়া সে বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল,—কণ্ঠে অশ্রু রুদ্ধ করিল।

নারায়ণী হৃদয়ে দারুণ ক্ষোভ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহার স্বামী সত্যেনকে সবাই "পাগলা" ছাড়া কিছুই বলিয়া ডাকে না। কিন্তু সে সত্য-সত্যই পাগল নয়; সে কেবল জড়বুদ্ধি—অত্যন্ত জড়বুদ্ধি—একেবারে হাবা। এ কথা নারায়ণী বেশ হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়াছিল; বুঝিয়াছিল যে, সে একদম ঠকিয়া গিয়াছে। তাহার বড় রাগ হইল বাপের উপর;—কি বলিয়া তিনি জানিয়া-শুনিয়া এমন একটা জড়ের হাতে টাকার লোভে তা'কে সমর্পণ করিলেন! মাঝে-মাঝে সে কিছুতেই কান্না আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিত না। সে কাঁদিত,—লোকে ভাবিত, বাপের বাড়ীর জন্য মন কেমন করে। কেবল অন্তর্যামী জানিতেন সে সকল সুখের মধ্যে কি দুঃখে সে কাঁদিত।

বাপের বাড়ী ফিরিল সে একটা দারুণ, ক্ষুব্ধ অভিমান লইয়া,—মা-বাপের উপর একটা আক্রোশ লইয়া। কিন্তু হিংসায় হউক, তাহার প্রতি সহানুভূতিপরবশ হইয়া হউক, যখন গাঁয়ের মেয়েছেলেরা তা'র কাছে এই প্রসঙ্গ বার-বার পাড়িতে লাগিল, তখন তাহার একটা নিদারুণ লজ্জা বোধ হইল। মায়ের দর্প তা'র রক্তের ফোঁটায়-ফোঁটায় ছিল। তাই সে স্থির করিল, লোকের কাছে এই লজ্জা ঢাকিয়া মান রাখিতে হইবে। তার স্বামী যে হাবা, এ কথা স্বীকার করিয়া কিছুতেই সে কাহারও কাছে হীন হইয়া থাকিবে না; কাহারও দয়া বা সহানুভূতি সে সহ্য করিতে পারিবে না। তাই সে সকলের সঙ্গে স্বামীর কথা লইয়া রীতিমত তর্ক, এমন কি ঝগড়া পর্য্যন্ত করিতে লাগিল।

সবচেয়ে বেশী অসহ্য হইল তা'র বাপ-মার ব্যবহার। নিরপরাধা মেয়েকে এমনি করিয়া জবাই করিয়া যে বাপের বিন্দুমাত্র লজ্জা বা অনুতাপ হয় নাই, তাহা সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল। তিনি যখন-তখন তাহাকে তাহার ধন-দৌলতের কথা বলিতেন; বলিতেন, "সোয়ামী পাগল তা'তে কি হ'ল রে বাপু! পায়ের উপর পা দিয়ে বড়মানুষী ক'রে জীবন কাটাবি—" ইত্যাদি। এই সব কথার প্রত্যেকটি তাহার গায়ে সূচের মত বিঁধিত। কাত্যায়নী মেয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, সমস্ত ব্যাপারটার দায়িত্ব নির্ব্বন্ধের ঘাড়ে চাপাইয়া, নারায়ণীর সন্তোষ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেন। নারায়ণী কিছুতে ভুলিত না,—কেবল কথাগুলি বিষের মত হইয়া তার গায়ে বসিয়া যাইত।

ছয়মাস না যাইতেই নারায়ণীর পিতৃগৃহ অসহ্য হইল,—সে শাশুড়ীকে চিঠি লিখিয়া শ্বশুরবাড়ী গেল। কাজটা অবশ্য সে খুব গোপনে করিয়াছিল; কিন্তু কথাটা চাপা রহিল না। যখন লোকে শুনিল, তখন সবাই গালে হাত দিয়া বলিল, "কালে-কালে হ'ল কি! তবু তো পাগল সোয়ামী!" একজন খুব নির্জ্জনে তা'র সখীকে এই কথা বলিতে-ছিল; কিন্তু পাশেই দরজার আড়ালে যে নারায়ণী ছিল, তাহা সে দেখিতে পায় নাই। নারায়ণী শুনিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, —"আমার সোয়ামী পাগল্ তা'তে তোর কি ব'য়ে গেল লো মাগী! তোর সোয়ামী যে ছাগল তাই ভাল।" মাগী! তার চেয়ে বয়সে কত বড়, সম্পর্কে বড়, তাকে "মাগী"! সকলে অবাক্! কিন্তু যাঁহাকে বলা হইল, কোঁদলে তাঁর হাত পাকা। তিনি খুব দু'কথা শুনাইয়া দিলেন। নারায়ণী পাল্টা গাইল। তা'র পর ক্রমেই বিবাদ ঘনীভূত হইল, অশ্রুর প্রস্রবণ ছুটিল। কাঁদিতে-কাঁদিতে, কাঁপিতে-কাঁপিতে, নারায়ণী পাল্কীতে উঠিয়া শ্বশুরবাড়ী চলিল। সে সঙ্কল্প করিয়া গেল যে, আর ফিরিবে না।

কিন্তু যে নারায়ণী অভিমান লইয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়া-ছিল, ঠিক সে নারায়ণী শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া গেল না। ছয় মাসে তাহার মনে তাহার অজ্ঞাতে একটা প্রগাঢ় পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। দিন-রাত তার নিজের মান বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে স্বামীর পক্ষে ওকালতী করিতে হইয়াছে। এই রকম করিতে করিতে সে মনে মনে সত্য-সত্যই স্বামীর ভয়ানক পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল। পাগল যে হাবা কি পাগল নয়, এই কথা সে লোকের কাছে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু কাহাকেও বুঝাইতে পারে নাই। কিন্তু এমনি করিতে-করিতে তা'র নিজের মনে সত্য-সত্যই একটা বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাহার স্বামী অল্পবুদ্ধি হউক, লোকে যত বলে তত নয়; সঙ্গে সঙ্গে বেচারার উপর তাহার ভারী মমতাও জন্মিয়া গিয়াছিল।

এমন প্রায় হয়। উকীলেরা আদালতে মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিতে চান; প্রায়ই দেখা যায় যে, তাঁরা মক্কেলের স্বপক্ষ কথা কেবল বলেন না, সত্য-সত্যই বিশ্বাস করিয়া বসেন। বিশ্বাস না থাকিলেও, সওয়াল-জবাব করিতে-করিতে অনেক সময় দেখা যায় যে, হাকিম যদি বেঁকিয়া বসেন, তবে উকীল বাবু তাঁহার সহিত ঝগড়া করিতে-করিতে পরিশেষে সত্যই বিশ্বাস করিয়া বসেন যে, তাঁর মক্কেলের পক্ষই ন্যায় পক্ষ। নারায়ণীর অনেকটা এই রকম হইয়াছিল।

কাজেই সে যখন শ্বশুরবাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মনটা ভারী মোলায়েম অবস্থায় ছিল। সে স্বামীকে, এবং স্বামীর সম্পর্কিত সকল লোক, সকল বস্তুকে প্রীতির চক্ষে দেখিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। যখন সে শ্বশুর-বাড়ীতে নামিল, তখনি সে নিজের মনের ভিতর এই আমূল পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারিল। শ্বশুরবাড়ীর ঘর-দুয়ার তাহার কাছে সুন্দর বোধ হইল; শ্বশুরকে দেখিয়া ভক্তি হইল; শাশুড়ীর কাছে মনটা প্রণত হইয়া পড়িল। আর, চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ার উপর বসিয়া যে বুদ্ধিহীন যুবক সলজ্জ দৃষ্টিতে দূর হইতে অদ্ভুতভাবে তাহাকে দেখিতেছিল, তাহার প্রতি তাহার হৃদয় স্নেহে ভরিয়া উঠিল।

একে তো তার মনটা শ্বশুরবাড়ীর দিকে উন্মুখ হইয়াই ছিল; তাহাতে আবার, সে এখানে আসিয়া এমন আদর পাইতে লাগিল, যাহা সে জন্মেও কখন কল্পনা করিতে পারে নাই। শ্বশুর ও শাশুড়ী তাহাকে যেন একটু বিশেষ করিয়াই স্নেহ করিতেন। সে যে স্বামী-ভাগ্যে বারোআনা বঞ্চিত, এই জন্যই তাঁহারা আদর দিয়া তাহাকে ভাসাইয়া দিতেন। স্নেহের অজস্র দানে তাহার জীবনের এই দারুণ অভাব পূরণ করিবার জন্য তাঁহারা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

নারায়ণী শ্বশুরের অতিশয় ভক্ত হইয়া উঠিল। নিজে হাতে শ্বশুরের জন্য রান্না করা, শয্যা-রচনা, পান সাজা প্রভৃতি সকল কাজ না করিয়া তাহার তৃপ্তি হইত না। অন্য কেহ কিছু করিতে গেলে তাহার রাগ হইত,—মনে হইত, যেন কিছু ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। তাহার সেবার সৌষ্ঠবে যোগেন্দ্র বাবু তৃপ্তি লাভ করিতেন; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের গভীর কন্দর হইতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িত। যোগেন্দ্র বাবু বুঝিয়াছিলেন, নারায়ণী তীক্ষ্ণধী—সে কর্ম্মপটু ও স্নেহপরায়ণ—মেয়ের মত মেয়ে। এমন মেয়েকে তিনি নিজের ছেলের জন্য জলে ভাসাইয়াছেন, এ কথা মনে করিতে তাঁহার দুঃখ হইত।

কিন্তু নারায়ণীর মনের যা কিছু গ্লানি অবশিষ্ট ছিল, অল্প দিনেই তাহা ধুইয়া-পুঁছিয়া গেল। তাহার গ্রামের

রেদের কথায় ও আচরণে সে বড় রাগ করিয়াছিল ; কিন্তু
হাদের সেই কথার ফলেই তার মনের মুখ একেবারে
ন্না গিয়াছিল। ভগবানের রাজ্যে এমন অদ্ভুত কাণ্ড রোজ
হইতেছে। যাহাকে অমঙ্গল বলিয়া দুই হাতে ঠেলিয়া
লিতে চাই, পারিলাম না বলিয়া কাঁদিয়া মরি,—সেই যে
বার তার রূঢ় স্পর্শে কি মঙ্গল প্রলেপে আমাদের জীবন
করিয়া দেয়, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। যাহাকে
প্রিয় মনে করি, সেও যেমন বিষ হয়,—যাহাকে বড়
প্রিয় বলিয়া জানি ; সেও তেমনি অনেক স্থলে মঙ্গলের
দান হয়। নারায়ণীর বেলায় তাহা খুব পুরাপুরিই
ইয়াছিল। স্বামীর প্রতি দারুণ অশ্রদ্ধা লইয়া সে পিত্রালয়ে
িয়াছিল, তাহার উপর অশেষ মমতা লইয়া ফিরিয়া
াসিয়াছিল। একটা অসহায় শিশুর মত তাহার স্বামী
াহার সমস্ত স্নেহ আকর্ষণ করিয়া লইল,—সে স্বেচ্ছায়
াহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিল। তাহার স্বামী নিজের
শ-ভূষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ;—নারায়ণী তাহাকে সদা-
র্বদা সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। স্বামীর
াহারের উপর তাহার সর্ব্বদা ব্যস্ত দৃষ্টি থাকিত,—ভাল
নিসটি তাহার জন্য সে বিশেষ করিয়া রাখিয়া দিত।
ামীর শরীর ভাল নহে,—তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সে
বা ও যত্ন করিত। সমস্ত দিন-রাত্রি এই অপদার্থ স্বামী
াহার চিন্তা, ধ্যান ও ধারণার বিষয় হইয়া উঠিল। ইহা
াহার কষ্টকর কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান ছিল না,—ইহাই হইয়া
ঠিয়াছিল তাহার আনন্দ। স্বামী যে একটা জড়পিণ্ড, সে
ক্ষোভের কণামাত্রও তাহার হৃদয়ে ছিল না।

যে দর্প ও যে অভিমান পিত্রালয়ে তাহাকে স্বামীর
াই গাহিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, তাহা যে এ সকলের
তরে একেবারে ছিল না, এ কথা বলা চলে না। বরং
ত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, প্রথমে যখন সে
ামীর ভার সম্পূর্ণ নিজের হাতে নেয়, তখন নারায়ণীর
ধ্য এই অভিমানের ভাবই প্রবল ছিল। তাহার মান
চাইবার জন্য তাহার চেষ্টা হইল, তাহার স্বামীকে লোকের
াছে দশজনের মত মানুষ বলিয়া দাঁড় করান। সেই
সে প্রথমে তাহার বাহ্যিক সংস্কার আরম্ভ করিল—
াহার বেশ-ভূষার উপর খর দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। তা'র
র তাহার কথাবার্ত্তা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিল।
সে সর্ব্বদা উৎকর্ণ হইয়া শুনিত, স্বামী কোথায় কি কথা
বলে। অন্য লোকে যখন তাহার কথা শুনিয়া হাসিত
নারায়ণীর মুখ তখন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত। তখনি
সে স্বামীকে গোপনে ডাকিয়া সংশোধন করিত ; বলিয়া
দিত, এমন কথা যেন সে কখনও না বলে। এই রকমে
তাহার কথাবার্ত্তা, হাবভাবের উপর সর্ব্বদা খর দৃষ্টি রাখিয়া
নারায়ণী সত্যেন্দ্রকে প্রায় মানুষের মত করিয়া তুলিয়াছিল।

সত্যেন্দ্রের যে কি এক আশ্চর্য্য মোহ হইয়াছিল, তাহা
বলা যায় না। এই ফুটফুটে, বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে দেখিলে
সে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইত,—তাহার কথাগুলি চোখ-
মুখ-কাণ দিয়া গিলিত ;—তাহার আদেশ পালন করিতে
পারিলে, তাহার কোনও একটা কাজে লাগিতে পারিলে
সে কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া যাইত। নারায়ণী যে কথা বলিত,
তাহা সে কখনও ভুলিত না; আর বেদ-বাক্যের অধিক
করিয়া সে তাহা পালন করিত। এই অপূর্ব্ব মোহের ফলে
তাহার বুদ্ধিও অসম্ভব রকম খুলিয়া গেল। যে কথা
গত বিশ বৎসরের মধ্যে তাহাকে মোটেই কেহ বুঝাইতে
পারে নাই, তাহা সে এখন অনায়াসে শিখিয়া ফেলিল।
এমন কি, দশ বৎসরের বিফল চেষ্টার পর যে লেখাপড়ার
চেষ্টা তাহার পিতা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন,—সেই
লেখাপড়াও সে এই নূতন পণ্ডিতের কাছে দুই দিনের
মধ্যে অনেকটা শিখিয়া ফেলিল। সে কখনও সংখ্যা
গুণিতে শেখে নাই,—নারায়ণীর কাছে সে অল্প দিনের
মধ্যেই অল্প-অল্প যোগ-বিয়োগ পর্য্যন্ত শিখিয়া ফেলিল।

এই একান্ত নির্ভরশীল, মুগ্ধ, শিশুপ্রতিম যুবকটাকে
এমনি করিয়া নারায়ণী মানুষ করিতে লাগিল। সে প্রথমে
এ কাজে লাগিয়াছিল আপনার মানের জন্য ;—কিন্তু ছয় মাস
না যাইতে, সেও মোহে পড়িয়া গেল। এই পাগল তাহার
নয়নের মণি হইয়া উঠিল। ইহার শুশ্রূষা, ইহার মঙ্গল-চেষ্টা,
ইহার শিক্ষা তাহার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিল।
অধিকক্ষণ ইহাকে না দেখিলে সে চঞ্চল হইয়া উঠিত,—ইহার
মাথা ধরিলে নারায়ণী পৃথিবী অন্ধকার দেখিত। কোথায়
গেল তার মান-অপমানের হিসাব, কোথায় বা রহিল
তাহার দর্প ;—নারায়ণী তাহার সমস্ত জীবন ওতপ্রোত ভাবে
এই জড় স্বামীর সহিত নিঃশেষ করিয়া মিশাইয়া দিল।

কয়েক মাসের শিক্ষার ফলেই, পাগল দিব্য কোঁচান ধুতি-

চাদর পরিয়া, পাম্প-শু পায় দিয়া, ছড়ি হাতে আর দশজনের মত বেড়াইতে যাইতে আরম্ভ করিল; আবার বেশভূষা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ঘরে ফিরিতেও লাগিল। কথাবার্ত্তায় সে আশ্চর্য্য-রকম সংযত হইয়া গেল। নিতান্ত পীড়ন না করিলে সে "হাঁ" "না" ছাড়া আর কোনও কথা বড় বলিত না। এটা ছিল নারায়ণীর আদেশ। যখন যে কথাবার্ত্তা হইত, সব কথা তাহাকে নারায়ণীর কাছে রিপোর্ট করিতে হইত। যদি কোনও কথা সে বোকার মত বলিয়াছে, এরূপ প্রকাশ পাইত, নারায়ণী তাহাকে সে কথা বলিতে বারণ করিয়া দিত। আর প্রাণ গেলেও সে সে কথা বলিত না। একদিন সে বেড়াইতে পুকুর ধারে গিয়া পুকুরে ঢিল ছুড়িতেছিল আর হাসিতেছিল। তার ছোট ভাই সুরেন্দ্র আসিয়া বলিল, "কি রে পাগলা, কি ক'রছিস?" এমনি ভাবেই সে জ্যেষ্ঠকে সম্ভাষণ করিত। পাগল একেবারে গম্ভীর হইয়া গেল। কিন্তু সুরেন্দ্র তাহাকে ভয়ানক জ্বালাতন করিত—তাহার পীড়নে তাহাকে বলিতে হইল, "ছি নি নি নি খেলছি।" সেইদিন রাত্রে নারায়ণী তাহাকে এমন করিতে বা বলিতে বারণ করিয়া দিল। পরে একদিন সুরেন তাহাকে পুকুর ধারে পাইয়া বলিল, "কি রে পাগলা, ছি নি নি নি খেলবি নে?"

পাগল কথা বলে না, গম্ভীর ভাবে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু খানিকক্ষণ জ্বালাতনের পর সে বলিল, "না, বৌ বারণ ক'রেছে।" সে দিন আবার নারায়ণী শিখাইয়া দিল যে, স্ত্রীর কাছে কোনও কথা শিখিয়াছে বা স্ত্রী কোনও কিছু করিতে বলিয়াছে—এ কথা যেন সে না বলে। পরে কোনও দিন পাগল আর এমন কথা বলে নাই।

এমনি করিয়া পাগলের শিক্ষা চলিতে লাগিল। এক বৎসর পর রামগতি কন্যাকে লইতে আসিলেন,—নারায়ণী যাইতে অস্বীকৃত হইল। তাহার সে নানা রকম কারণ দেখাইল; কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, সে তাহার পাগলকে এক দণ্ডও কাহারও হাতে রাখিয়া ভরসা পায় না। বাপের বাড়ী গেলে তাহাকে চোখে-চোখে রাখিতে পারিবে না—এই জন্যই সে বাপের বাড়ী গেল না। শেষে রফা হইল যে, জামাইষষ্ঠীর সময় সে স্বামীর সঙ্গে গিয়া দিন দুই থাকিয়া আসিবে। তাহাই হইল।

(৩)

বিবাহের পর পাঁচ বৎসর চলিয়া গেল,—রামগতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কেন, তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার।

রামগতি যে মেয়েকে রাজরাণী দেখিয়া নিঃস্বার্থ আনন্দ উপভোগের চেষ্টায় নারায়ণীর একটা পাগলের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিল, এমন মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এ বিবাহটা ছিল তা'র একটা ব্যবসার চাল। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, অনেক খোঁজ-তল্লাসের পর সে এই মনের মতন সম্বন্ধটা করিয়াছিল। তার মেয়ে ছিল, তার চোখে, একটা মূলধন,—তাহাকে দিয়া সে নিজে রাতারাতি বড়মানুষ হইবার ফন্দীতেই এ কার্য্য করিয়াছিল।

যোগেন্দ্রবাবু অবশ্য বৃদ্ধ নন,—তাঁর বয়স পঞ্চাশের বড় বেশী উপর হইবে না; কিন্তু রামগতি হিসাব করিলেন,—বড়লোকের ছেলে, খুব বেশীদিন বাঁচিবার সম্ভাবনা তাঁ'র অল্প। বিশেষ, তাঁর শরীরটাও বেশ একটু অসুস্থ। তিনি ফৌত হইলেই তো যোগেন্দ্রবাবুর অর্দ্ধেক সম্পত্তি রামগতির হাতে! আর, যত দিন না মরে, তত দিন মেয়ে যদি একটু বুঝিয়া-সুঝিয়া হাত চালাইতে পারে, তবে তাঁর অভাব থাকিবে না। হাবা জামাইটাকেও বশীভূত করিয়া কোন না দু'দশ টাকা তিনি খসাইতে পারিবেন। জামাইকে একটা বিপদে ফেলিয়া যোগেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার নানা ফন্দী রামগতির মনে তৈয়ার হইয়াছিল।

কিন্তু পাঁচ বছর চলিয়া গেল, কিছুই হাসিল হইল না। রামগতির স্কীম রামগতির মগজেই রহিয়া গেল। যোগেন্দ্রবাবুর মরার মোটেই গা দেখা গেল না; আর জামাইটাকে হাত করিয়া কিছু আদায়ের ফন্দীরও বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না। হতভাগা মেয়েটা তাহাকে এমন করিয়া আগ্‌লাইয়া রাখিয়াছে যে, শ্বশুরের তাহার ত্রিসীমানায়ও ভিড়িবার উপায় নাই। অদৃষ্টে দুর্গতি থাকিলে এমনি করিয়াই সব ফন্দী ওলট-পালট হইয়া যায়। আপনার মেয়ে,—সে-ই কার্য্যগতিকে শত্রু হইয়া দাঁড়ায়!

রামগতির কাজেই অসহ্য হইয়া উঠিল। লোকগুলার কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে সে চটিয়া গেল—সবার উপরে চটিয়া গেল। এমন সময়ে হঠাৎ এক দিন সংবাদ আসিল, যোগেন্দ্র

...বুর বাড়াবাড়ি অসুখ। রামগতি নাচিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একবার বেহাইর তত্ত্বতল্লাস করিবার ওজুহাতে ...য়া দেখিয়া আসিল, সত্যসত্যই এ অসুখটায় যোগেন্দ্রবাবুর ...চিবার সম্ভাবনা অল্প। সে এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘরে বসিয়া ...দী আঁটিতে লাগিল।

নারায়ণী অক্লান্ত চেষ্টায় শ্বশুরের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ...লেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; কিন্তু নারায়ণীর মত পরিশ্রম ...রিতেও কেহ পারিত না, কাজ করিতেও কেহ জানিত ...। দীর্ঘকাল শুশ্রূষার ফলে দাঁড়াইল এই যে, নারায়ণী ... হইলে যোগেন্দ্রবাবুর ঔষধ-পথ্য খাওয়া বা অন্য ...কানও রূপ শুশ্রূষাই হয় না।

যোগেন্দ্রবাবু নারায়ণীর সেবা-যত্নে যতই সন্তোষ লাভ ...রিতেন, ততই তাঁহার বুকের ভিতর বেদনা বোধ ...ইত। তাঁহার মনটা দারুণ ধিক্কারে পূর্ণ হইত যে, এমন ...য়েকে তিনি নিজের ছেলের জন্য জন্মের মত ...বাইয়াছেন। মাঝে-মাঝে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ...নি কাঁদিয়া ফেলিতেন,- সে কান্নার কারণ কেহ ...ঝিত না।

একদিন যোগেন্দ্রবাবু সকলকে গৃহ হইতে বিদায় দিয়া ...রায়ণীকে বলিলেন, "মা, আমি তোমার জন্মজন্মান্তরের ...ক্র; তাই তোমার জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছি। তুমি ...র বদলে আমাকে প্রাণভরা ভক্তি-শ্রদ্ধা দিয়েছ। তোমার ...পর যে অন্যায় আমি ক'রেছি, তা'র শাস্তি ভগবান আমায় ...বেন; কিন্তু তুমি মা আমায় ক্ষমা করো।" তাঁহার চক্ষু ...শ্রুসিক্ত হইল।

নারায়ণী এতদিন শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে নাই,—আজ ...রিতে হইল। সে বলিল, "ছি, অমন কথা ব'লবেন ...!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তা'র পর বলিল, "আপনি ... আমাকে শেখাবেন আমার স্বামীকে অশ্রদ্ধা ক'রতে?" ...র কিছু বলিল না।

"না মা, তুমি সতী-সাবিত্রী,—তোমাকে এমন কথা যে ...লবে, সে-ই আপনি জ্বলে ম'রবে। তুমি আমার পাগল ...লেকে যা' ক'রছো, স্বর্গের দেবতারা তা' দেখছেন,—আমি ...র কি বলবো? আমি যা' ক'রেছি, সে অপরাধ ...মি ধুয়ে-মুছে নিয়েছ।—তাই তোমাকে বলি,—আমার ...গলকে আমি তোমারই হাতে দিয়ে গেলাম। তুমি যে রকম বুদ্ধিমতী, তা'তে তুমি তা'কে রাখতে পারবে, তা'তে আমার সন্দেহ নাই।"

যোগেন্দ্রবাবু বালিসের তলা হইতে অতি কষ্টে একখানা কাগজ বাহির করিয়া নারায়ণীকে দিলেন। নারায়ণী দেখিল, সেখানা উইলের খসড়া। তাহার দুই চক্ষু জলে অন্ধকার হইয়া গেল।

সদর হইতে যোগেন্দ্রবাবুর এক উকীল-বন্ধু আসিয়াছিলেন, তাহা নারায়ণী জানিত। তিনি যে এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, এ কথা কেহ জানিত না। যোগেন্দ্রবাবুর আদেশে নারায়ণী পড়িয়া দেখিল যে, খসড়ায় লিখিত আছে, যোগেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি সমান তিন অংশে বিভক্ত হইয়া, এক অংশ তাঁহার স্ত্রী জীবিতকালতক ভোগ-দখলের স্বত্বে প্রাপ্ত হইবেন, এক অংশ কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ পাইবে, আর এক অংশ জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে ট্রাষ্টী স্বরূপে নারায়ণী পাইবে। নারায়ণী দেখিল, খসড়ায় যেখানে "সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে ট্রাষ্টী স্বরূপে" লেখা ছিল, সেখানটা কাটিয়া তাহার উপর কম্পিত হস্তে যোগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "নির্ব্যূঢ় স্বত্বে"। এই কথা লইয়া উকীল বন্ধুর সঙ্গে যোগেন্দ্রবাবুর একটু মতভেদ হইয়াছিল। উকীলবাবু বলেন যে, সত্যেনের স্ত্রীকে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে সম্পত্তি দিলে, সত্যেনকে যে পথে বসিতে হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমার বৌমার সম্বন্ধে এমন কথা মনে আনিলেও পাপ আছে—সে মানুষ নয় দেবতা!" উকীল বাবু বলিলেন, "বৌ-মা ইচ্ছা করে কিছু না করিতে পারেন; কিন্তু রামগতি তো তাঁর ঘাড়ের উপর নিশ্চয় চাপিবে! আর সে হতভাগা না করিতে পারে এমন দুষ্কার্য্য নাই।"

যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমি এই ক'বছর বৌমাকে দেখ্‌ছি। সে রামগতিকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে, এমন বুদ্ধি তা'র আছে।"

উকীল বাবু বলিলেন, "তা'ছাড়া আরও কত কি গোলযোগ হ'তে পারে। ধরুন, তিনি যদি হঠাৎ মারা যান, তখন উত্তরাধিকার নিয়ে রামগতি একটা খটকা বাধাতে পারে।"

যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "সে বিষয়ে আমি বৌমাকে পরামর্শ দিয়ে যাব যে, যেন তিনি আগে থেকে একটা

উইল ক'রে রেখে যান ; আর তাঁর বাপকে যেন এদিকে ভিড়তে না দেন।"

উকীল বাবু বলিলেন, "পরামর্শ তো দিলেন। তার পর কত কি হ'তে পারে। আমি বলি, ওর চেয়ে আইনে পাকা একটা কিছু ব্যবস্থা এমন করা উচিত, যা'তে সত্যেনের স্বার্থ বজায় থাকে।"

যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তাই ব'লে, ট্রাষ্টী ক'রে বৌমাকে একটা বিপদে ফেলে যাব! যদি সুরেনের এমন দুর্ম্মতি হয়, তবে সে যে-কোনও দিন সত্যেনের আসন্ন বন্ধু হ'য়ে, বৌমার নামে এক breach of trustএর মামলা ফেঁদে, তাকে হয়রাণ ক'রতে পারে। চাই কি, সাক্ষীর মার-পেঁচে মামলা দিতে বৌমার হাত থেকে সম্পত্তি বের ক'রেও নিতে পারে।"

উকীল বাবু বলিলেন, "তাহা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু তার সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমি একটু ভেবে দেখি,—এখনই আমি আপনাকে এই রকম উইল ক'রতে মত দিতে পারি না। অন্য কোনও একটা উপায় করা যেতে পারে কি না দেখি।"

উকীলবাবু বিবেচনার জন্য সময় নিলেন,—উইল মুলতবী রহিল।

নারায়ণী উইল পড়িয়া রাখিয়া দিল, কোনও কথা বলিল না। যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "হাঁ মা, পারবে তো আমার পাগলাকে আগলে রাখতে? তা'র নামে সম্পত্তি দিলাম না, তাই নিয়ে মামলা মোকদ্দমা হ'তে পারে ব'লে ;—কে কোথেকে এসে গার্জ্জিয়ান সেজে ব'সবেন তার ঠিকানা নেই। তুমি পারবে তো মা? তোমার বাপ যদি এসে কোনও ফন্দী ক'রে সম্পত্তি ঠকাতে বসেন, তুমি তাঁকে ফিরাতে পারবে তো? সুরেন যদি লড়াই করে, রাখতে পারবে তো?"

নারায়ণী দৃঢ় ভাবে বলিল, "আপনি আমাকে যা হুকুম ক'রবেন তাই পারবো। আপনি যে আমাকে সম্পত্তি দিচ্ছেন, এতে আপনি লিখুন বা নাই লিখুন, আমি জানবো যে এ সম্পত্তি আপনার ছেলেরই। তাঁর সম্পত্তি রক্ষা ক'রতে আমার যদি সব ছাড়তে হয় তাও পারবো।"

যোগেন্দ্রবাবু সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি নারায়ণীকে উইলের খসড়াখানা তাহার বাক্সে তুলিয়া রাখিতে বলিলেন, নারা তাহা রাখিয়া দিল।

—উকীলবাবু পরে আর একখানা নূতন রকমের খ করিয়া আনিলেন। তাহাতে নারায়ণীকে ট্রাষ্টী করি তার পর যত রকম আপদ-বিপদের আশঙ্কা আছে, সম্বন্ধে নানা রকম বিস্তারিত বন্দোবস্ত করিয়া দিলে তিনি অনেক কষ্ট করিয়া এই উইলখানি রচনা করি ছিলেন। যোগেন্দ্রবাবু আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিয়া বলিলে "এর অর্দ্ধেক কথা আমি ভাল ক'রে বুঝতে পারছি এমন গোলমেলে উইল ক'রে কি অবশেষে আমার অ সম্পত্তি উকীল ব্যারিষ্টারকে দিয়ে যাব। জান তোমার বড় উকীল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উইলের ক এই তো সে দিন আর এক বড় উকীল শ্রীনাথ দাসের উ নিয়ে কত মামলা হ'য়ে গেল। আমি বাবু অত গো যোগের ভিতর নেই। একটা সোজাসুজি কোনও ব্য ক'রতে পার ভাল,—না হয় আমি যা ব'লেছি ত থাকবে।"

উকীল বাবু বলিলেন, "আমি এখনো তাতে সম্মত হ' পারি না। আচ্ছা, আজ আমি বাড়ী যাই ; সেখান থে বইটইগুলো দেখে-শুনে, কোনও একটা উপায় বের ক' পরশু দিন এসে একটা যা হয় করা যাবে।"

তাহাই হইল।

কিন্তু "পরশু দিন" বড় ভীষণ ভাবে দেখা দিল। রাত্রে যোগেন্দ্রবাবুর অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হইতে আর হইল। সকাল বেলায় যেন একটু শান্ত ভাব দেখা দিল, কিন্তু ডাক্তার বাবুরা শঙ্কিত হইলেন। যোগেন্দ্র বাবুও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। নারায়ণীকে ইঙ্গিত করিয়া তি বলিলেন, "উইল।"

নারায়ণী চক্ষু মুছিতে-মুছিতে বাক্স হইতে খসড়া লইয়া আসিল। যোগেন্দ্রবাবু কালী কলম চাহিলেন নারায়ণী তাহাও বাক্স হইতে বাহির করিয়া দি তাহা পর তিনি কলম ও কাগজখানা হাতে ক লিখি চেষ্টা করিলেন,—হাত কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলেন ভয়ে তাঁহার চঞ্চলতা বাড়িয়া গেল। তিনি প্রচণ্ড করিয়া, পাশ ফিরিয়া, খসখস করিয়া সেই কাগজের [illegible]

হইয়া অবসাদে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "সাক্ষী!" দুইজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা তাড়াতাড়ি উইলখানা লইয়া স্বাক্ষর করিলেন। ততক্ষণ যোগেন্দ্রবাবু অসাড় হইয়া পড়িয়াছেন; দ্বিতীয় ডাক্তারের সই-করা তিনি দেখিতে পান নাই। ডাক্তারেরা তাড়াতাড়ি একটা ইনজেকসন দিতে, অল্পক্ষণ মধ্যে নাড়ীর গতি ফিরিল, কিন্তু জ্ঞান ফিরিল না। এই অবস্থায়ই ঘণ্টা-দুই-তিন বাদে তিনি চিরদিনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

নারায়ণী উইলের কাগজখানা ভাঁজ করিয়া তাহার বাক্সে উঠাইতে গেল; সুরেন সেই সময় খপ্ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল; বলিল, "চালাকী রাখ,—কি লিখিয়ে নিলে বাবাকে দিয়ে,—দেখতে দাও।"

নারায়ণীর তখন বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছে; সে বলিল, "ছি ঠাকুর-পো! এখন এ কথা কি? কি আছে, দেখো এখুনি।"

সুরেন বলিল, "শয়তানী ক'রো না, ভালমানুষের মত কাগজখানি আমাকে দাও দিকিনি।"

নারায়ণীর চক্ষু দিয়া আগুন ছুটিতেছিল। সে বলিল, "দেব না,—তোমার যা ইচ্ছা কর। বাপের এখনও নাভিশ্বাস! এখন তাঁর উইল নিয়ে কাড়াকাড়ি ক'রতে লজ্জা হয় না?"

সুরেন চীৎকার করিবার উপক্রম করিতেই, ডাক্তারবাবুদের একজন আসিয়া তাহাকে বাধা দিল। এই গোলমালের সময় উকীলবাবু ছুটিতে-ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণী তাঁহার হাতে উইলখানা দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। উকীলবাবু সমস্ত অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারবাবুদের জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও মতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও জ্ঞান ফিরাইয়া আনা যায় কি না। ডাক্তারবাবুরা জবাব দিতে তিনি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

(৪)

যোগেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর দুই দিন পরে উকীল যতীশবাবু নারায়ণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন,—বিশেষ দরকারী এবং গোপন পরামর্শ আছে বলিয়া। নারায়ণী সত্যেনকে লইয়া তাঁর নিকটে গেল। উকীলবাবু অন্যের অশ্রাব্য স্বরে বলিলেন, "যোগেন্দ্রবাবু যে উইলখানি সহী করিয়া গিয়াছেন, সেখানা আইনানুসারে একেবারে পণ্ড; কারণ, তিনি সাক্ষীদের সই করিতে দেখেন নাই। অথচ এই যে তাঁর প্রকৃত মনের মত উইল, তার সাক্ষী আমি। কিন্তু আইনের মার-পেঁচ এমনি যে, এ উইলকে বৈধ ব'লে দাঁড় করান একেবারেই অসম্ভব। উইলটা যে এমন ভাবে নষ্ট হ'ল তার জন্য আমিই একমাত্র দায়ী,—আমিই কেবল জেদ ক'রে এটাকে মুলতবী ক'রে রেখেছিলাম। কাজেই, যা'তে এ উইল টেঁকে,—যদি সম্ভব হয়, তা' ক'রতে আমি বাধ্য। আমি সেইজন্য সমস্ত অবস্থা ব্যক্ত ক'রে ডাক্তার-দুটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়েছিলাম। তাঁরা দু'জনেই সব কথা শুনে, উইলের সাক্ষী হ'য়ে আদালতে জবানবন্দী দিতে রাজী আছেন। তাঁরা যদি এখন কোর্টে গিয়ে বলেন যে, তাঁদের সই করবার সময় যোগেন্দ্রবাবু দেখেছিলেন, তবেই উইল টিঁকে যাবে। আমি খুব জোরের সঙ্গেই সাক্ষ্য দিতে পারবো। তা' ছাড়া, সে ঘরে যারা ছিল, তার মধ্যে কেবল তাঁরাই নিরপেক্ষ সাক্ষী। এ অবস্থায় কোনও আদালতেই এ উইল অবিশ্বাস ক'রবে না। আপনি যদি অনুমতি করেন তো অবিলম্বে প্রোবেটের দরখাস্ত ক'রে দি।"

নারায়ণী সমস্ত কথা খুব ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য তন্ন-তন্ন করিয়া প্রশ্ন করিল। সমস্ত কথা বুঝিয়া বলিল, "আচ্ছা, যদি উইল না টেঁকে, তবে কি হ'বে?"

উকীলবাবু বুঝাইলেন যে, তাহা হইলে সুরেন্দ্র ও সত্যেন্দ্র—প্রত্যেকে সম্পত্তির অর্দ্ধেকের মালিক হইবে। আর, তাহারা যদি সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লয়, তবে সম্পত্তি তিন ভাগ হইয়া, এক ভাগ সত্যেন, এক ভাগ সুরেন, আর এক ভাগ তাহাদের মাতা পাইবেন। মাতার অবর্ত্তমানে দুই পুত্র তাঁহার অংশ সমান ভাগে পাইবে। তবে কি না, সত্যেনের মানসিক অবস্থা লইয়া কথা উঠিতে পারে; সুরেন দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতে পারে যে, সে একেবারে জন্মাবধি জড় বা উন্মত্ত, এবং সে জন্য উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। যদি সেইরূপ সাব্যস্ত হয়, তবে সুরেনই ষোল আনা সম্পত্তি পাইবে,—মা, সত্যেন এবং নারায়ণী কেবল খোর-পোষ পাইবে।

মাথা নীচু করিয়া নখ খুঁটিতে-খুঁটিতে নারায়ণী বলিল, "আর যদি আমার ছেলে হয়?"

"যোগেনবাবু বেঁচে থাকতে যদি আপনার এক দোষ-

শুদ্ধ ছেলে হ'ত, তা' হ'লে, সত্যেন উত্তরাধিকারী নয় সাব্যস্ত হ'লেও, আপনার ছেলে সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশের মালিক হ'ত; কিন্তু এর পর যদি ছেলে হয়, তবে তা'র দরুণ কোনও অধিকার হ'বে না।"

নারায়ণী নখ খুঁটিতে লাগিল। উকীলবাবু বুঝিলেন, সে কি বলি-বলি করিয়া বলিতে পারিতেছে না। হঠাৎ একটা কথা মনে হইয়া তিনি বলিলেন, "তবে একটা কথা, —যোগেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর সময় যদি আপনার ছেলে গর্ভে থেকে থাকে, তবে সেও অধিকারী হ'বে।"

নারায়ণী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে বাস্তবিকই অন্তঃসত্বা। সত্যেন সে কথা জানিত; তাই সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হাঁ যতীশ বাবু, ওর প্লেটে ছেলে আছে।" যতীশ বাবু একটু লজ্জিত হইলেন, একটু বিস্মিত হইলেন। তবে কি এই হাবা সত্য-সত্যই জড় নয়? এ যদি সমস্ত কথা বুঝিতে পারিয়া থাকে, তবে ইহাকে জড় সাব্যস্ত করা যায় কিরূপে?

কিছুক্ষণ পরে যতীশবাবু বলিলেন, "তবে উইল সম্বন্ধে আপনার কি আদেশ?"

নারায়ণী বলিল, "আমার স্বামী পথে বসেন, এটা আমি কিছুতেই ইচ্ছা করি না; কিন্তু কোনও রকম জাল-জুয়াচুরী করে তাঁর জন্য কিছু ক'রলে, তাঁর ভাল হবে না,—এই আমার বিশ্বাস। তাই আমি পণ্ড উইলকে সত্য ব'লে দাঁড় করাতে পারবো না। আপনি আমার জন্য এত কষ্ট ক'রেছেন, তা'তে আপনার কাছে জন্মের মত ঋণী রইলাম; কিন্তু অধর্ম্ম ক'রে আমি স্বামীর সম্পদ চাই না।"

যতীশ বাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁর মনে পড়িল যোগেন্দ্র বাবুর সেই কথা, "আমার বউমার সম্বন্ধে এ সব কথা মনে ক'রলেও পাপ হয়।" যতীশ বাবু বুঝিলেন, যোগেন্দ্রবাবুর এ বিশ্বাস কতদূর সত্য। এই দৃঢ়চিত্ত বালিকার কাছে কোনও রকম নীচতা যে অগ্রসর হইতে পারে না, তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। যতীশ বাবু আরও বুঝিলেন যে, বালিকা হইলেও নারায়ণী অসাধারণ বুদ্ধিমতী। বালিকা হইলেও তাহার চরিত্র-বল অসাধারণ। এই প্রকাণ্ড ব্যাপার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে সে কাহারও পরামর্শের অপেক্ষা করিল না,—কাহারও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল না,—নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিল। আর সে বিবেচনা মূঢ়ের বিবেচনা নয়,—সে সমুদয় অবস্থা, সকল ফলাফল যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিল, তাহাতে যতীশ বাবু মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন।

আরও একটি বিষয় যতীশ বাবুকে মুগ্ধ করিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নারায়ণী কিরূপ সম্পূর্ণ ভাবে স্বামীগত-প্রাণা। সে যে অধর্ম্ম বলিয়া এ কার্য্য হইতে বিরত হইল তাহা নহে,—অধর্ম্মে তাহার স্বামীর অমঙ্গল হইবে, এই আশঙ্কায় সে নিবৃত্ত হইল। তাহার সকল ভাল-মন্দের কেন্দ্র যে তাহার স্বামী, স্বামীর হিতাহিত যে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মেরও প্রধান মানদণ্ড—এ কথা বুঝিতে যতীশ বাবুর বাকী রহিল না। যতীশ বাবু বিচক্ষণ ও প্রতিভাবান উকীল। লোক-চরিত্রে তাঁহার অসাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি। তিনি বুঝিলেন, নারায়ণীর মত নারী জগতে কোথাও খুব সুলভ নয়।

নারায়ণী যে ভাবে কথা বলিল, তাহাতে যতীশবাবু বুঝিলেন যে, এ বিষয়ে আর আলোচনার বিন্দুমাত্রও অবসর নাই। সে যে ইতিমধ্যে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। আর তাহার সিদ্ধান্ত যে উল্টাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই তাহাও তিনি বুঝিলেন। তাই তিনি আর বাক্যব্যয় করিলেন না। আর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বাঙ্নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না—তিনি নারায়ণীর কথা শুনিয়া এতই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি উইলখানা নারায়ণীকে দিয়া বলিলেন, "তবে এখানা আপনার কাছেই থাক। রেখে দেবেন, কি জানি, যদি কখনও সুরেনকে ভয় দেখাবার জন্য দরকার হয়। আমি তবে উঠি।" নারায়ণী কাগজখানা হাতে লইয়া বলিল, "আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—আপনি কি মনে করেন যে, আমার স্বামী আইন অনুসারে সত্য-সত্যই সম্পত্তিতে অনধিকারী? তাঁর মত লোককেই কি জড় বলা যায়?"

এখানে বলা আবশ্যক যে, স্বামীকে অন্য লোকে "পাগল" "হাবা" ইত্যাদি বলে বলিয়া নারায়ণী বড় কষ্ট পাইত। তাই সকলের উপর রাগ করিয়াই যে মনে-মনে সাব্যস্ত

করিয়াছিল যে, তাহার স্বামী বাস্তবিক "হাবা" বা জড় নয়, তবে কিছু অপরিণত-বুদ্ধি।

যতীশ বাবু বলিলেন, "সে কথা মা, বলা কঠিন। ঠিক কি রকম হ'লে পর আইনে জড় সাব্যস্ত হ'বে, সেটার একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম কিছু বলা যায় না। প্রত্যেক মামলায় বিচারককে সমস্ত অবস্থা বিবেচনা ক'রে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ক'রতে হয়। আমার তো মনে হয় যে, সত্যেনকে ঠিক জড় বা উন্মত্ত বলা চলে না। তবে বিচার হ'লে কি সাব্যস্ত হ'বে, তা' বিচারের আগে বলা একেবারেই অসম্ভব।"

যতীশ বাবু চলিয়া গেলে, নারায়ণী দেবর সুরেন্দ্রকে ডাকাইয়া তাহার হাতে উইলখানা দিয়া বলিল, "এই নেও ঠাকুর পো, তোমার উইল! উকীলেরা পরামর্শ দিয়েছেন যে, এ উইল পণ্ড, মিথ্যা সাক্ষ্য না দিলে এটা দাঁড় করান যা'বে না। এখন নিশ্চিন্ত হও—এখানা নিয়ে তুমি যা' ইচ্ছে তাই কর।"

সুরেন্দ্র তাড়াতাড়ি উইলখানা পড়িয়া ফেলিল। তাহার আইন-জ্ঞান খুব বেশী ছিল না,—সে ঠিক বুঝিল না, কি কারণে এই উইল পণ্ড। কাজেই, এ আপদ বিদায় করিয়া ফেলাই ভাল বলিয়া, সে ইহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল।

ইহার পর সংসার যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল,—কেবল প্রবীণ যোগেন্দ্রনাথের স্থলে বিশ বৎসরের বালক সুরেন্দ্রনাথ হইলেন ইহার মালিক। কাজে-কাজেই, একটু উচ্ছৃঙ্খলতা, একটু অত্যাচার, একটু গোলমাল হইতে লাগিল,—কিন্তু সে বড় বেশী কিছু নয়।

যথাসময়ে নারায়ণী একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিল। তাহার নাম হইল দুলাল। হাবা একেবারে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। দিনরাত সে তার ছেলেটি লইয়াই পড়িয়া থাকিত। কিন্তু বোধ হয় নারায়ণীর সমস্ত স্নেহ-যত্ন নিঃশেষরূপে একমাত্র সত্যেন্দ্রের উপরই নিবদ্ধ থাকা বিধাতার অভিপ্রায় ছিল;—তাই এক বৎসর হইতে না হইতে নারায়ণীর ক্রোড় শূন্য হইল। নারায়ণী দুঃখে অধীর হইল, কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণ। যখন সে সত্যেন্দ্রকে ছোট ছেলের মত ধূলায় পড়িয়া লুটোপুটী খাইতে দেখিল, তখন সে মনে করিল যে, পুত্রের মৃত্যুতে দুঃখ করিয়া সময় হরণ করিবার অবসর তাহার নাই। সে আপনার চক্ষু মুছিয়া আদর করিয়া সত্যেন্দ্রকে উঠাইয়া লইল,—দ্বিগুণ স্নেহ-যত্নে তাহার অন্তরের ক্ষত দূর করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সেবার ঐকান্তিকতা ও স্নেহের অনন্যাশ্রয়তা আরও দশগুণ বাড়িয়া গেল।

ঠিক এই সময় সুরেন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খলতা কিছু বাড়িয়া উঠিল। পিতার মৃত্যুর পর এক বৎসর পর্য্যন্ত সুরেন্দ্র পিতার ব্যবস্থা অনেকটা বজায় রাখিয়াছিল। নারায়ণীর যখন যাহা দরকার হইত, কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেই সে তাহা পাইত। কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতে সুরেন্দ্রের কতকগুলি পার্শ্বচর জুটিয়া গেল। তাহারা বুঝাইল যে, ইহা ঠিক হইতেছে না। তাহার একটি বন্ধু সাতবার এফ-এ ফেল করিয়া, এবং পাঁচবার মোক্তারী পরীক্ষায় বিফলকাম হইয়া, প্রকাণ্ড আইনজ্ঞ হইয়া আসিয়াছে। সে বুঝাইল যে, ইহাতে সত্যেন্দ্রের যে সম্পত্তিতে সমান অধিকার আছে, তাহাই সাব্যস্ত হইতেছে। তাহার পরামর্শে সুরেন্দ্র কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিল যে, সুরেন্দ্রের নিকট অনুমতি না লইয়া বড়বধূ বা সত্যেনকে কোনও জিনিস বা টাকা-কড়ি না দেওয়া হয়। ইহাতেও কিছু দিন কোনও ইতরবিশেষ হইল না; কারণ, প্রথম-প্রথম সুরেন্দ্রনাথ সব কথাতেই রাজী হইয়া হুকুম দিত। কিন্তু তাহার আইনজ্ঞ বন্ধু পরামর্শ দিল যে, মাঝে-মাঝে দু'-একটা জিনিস দিতে বারণ করিয়া না দিলে, ঠিক স্বত্বটাকে নষ্ট করা হয় না। সুরেন্দ্র একটু আপত্তি করিয়া বলিল, "কেন, তা'র কি দরকার,—নামজারী তো আমার একার নামেই হ'য়েছে, এখন আর কে তা'কে ওল্টায়।"

বন্ধু বলিল, "পাগল হ'য়েছ! যে-কোনও সময়ে সত্যেনের পক্ষে নামজারীর দরখাস্ত হ'তে পারে,—ওতে নিশ্চিন্ত থেকো না।" সুরেন কাজে-কাজেই স্থির করিল এইবার একটা কিছু না-মঞ্জুর করিতে হইবে।

নারায়ণী সেই দিনই ঝিয়ের জন্য একজোড়া সাড়ী আনিবার আদেশ দিল। খাজাঞ্চী আদেশের জন্য সুরেন্দ্রের কাছে রোকা লিখিয়া দিল। সুরেন্দ্র তাহার উপর লিখিয়া দিল "না"। মুখে বলিল, "এই সে দিন দু-জোড়া সাড়ী এসেছে আবার আজই কেন?"

যে খানসামা খাজাঞ্চীর কাছে গিয়াছিল, সে নারায়ণীর নিকটে গিয়া বলিল, "ছোটবাবু সাড়ী কিনতে বারণ ক'র্‌-

লেন।" নারায়ণী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল,—কিন্তু তখনও কিছু বলিল না। নিজের বাক্স হইতে টাকা দিয়া সাড়ী কিনিতে পাঠাইল।

তাহার পর এই রকম প্রায় হইতে লাগিল। নারায়ণী অন্তরে-অন্তরে জ্বলিতে লাগিল।

অত্যাচারের স্বভাব এই যে, ইহার মাত্রা ক্রমশঃই বাড়িয়া যায়। মদের নেশার মত ইহা প্রথমে একটু সসঙ্কোচে আত্মপ্রকাশ করে; কিন্তু বাধা না পাইলে, ইহা ক্রমশঃই প্রসার বর্দ্ধিত করিয়া, শেষে সমস্ত জীবন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সুরেন্দ্রের এই অত্যাচারের নেশা বাধা না পাইয়া ক্রমে এতই বাড়িয়া উঠিল যে, শেষে সে বৌদিদিকে অপমান করিবার কোনও সুযোগই ছাড়িতে পারিত না। এক দিন সত্যেন বৈঠকখানায় বসিয়া আছে,—প্রজারা সেখানে সুরেন্দ্রের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। তখন সুরেন্দ্র আসিয়া সত্যেনকে অযথা গালাগালি দিয়া বৈঠকখানা হইতে উঠাইয়া দিল; আর বলিয়া দিল, খবরদার, যেন সে বৈঠকখানায় না বসে।

এই কথা শুনিয়া নারায়ণী ক্ষেপিয়া উঠিল। অপমানিত স্বামীর কাছে সে রাগ প্রকাশ করিল না; বরং তাহাকে নানাপ্রকারে ভুলাইয়া শান্ত করিল। তাহার পর অনেক ক্ষণ ভাবিয়া, সে শাশুড়ীর কাছে গিয়া কথাটা পাড়িল। মায়ের প্রাণে কথাটা খট্ করিয়া বিঁধিল,—কিন্তু বধূ যে এই কথা লইয়া একটা কলহের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছে, এটা তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি তাই বলিলেন, "দেখ বৌমা, একটু-আধটু সহ্য ক'রে না নিলে কি সংসার চলে? এমনি অসহ্য হ'লেই তো ভায়ে-ভায়ে ঝগড়া বাধে,—আর তা'তে অনর্থ হয়। বৌয়েদেরই এটা বিশেষ ক'রে দেখতে হয় যে, ঝগড়া যাতে কিছুতে না হয়। বিশেষ, তোমার—তোমার হাবা, পাগল সোয়ামী,—তাকে তোমার ঠেকাতে হ'বে—" ইত্যাদি।

কথাগুলি নারায়ণীর প্রাণে বিষ ঢালিয়া দিল। সে যে এত দিন কি সহ্য করিয়াছে, তা' কি তার শাশুড়ী চোখের মাথা খাইয়া দেখে নাই! মা হ'য়ে ছেলেয়-ছেলেয় এমন তফাৎ! আমার সোয়ামী হাবা, পাগল! এই রকম কতকগুলি সম্পূর্ণ অসংলগ্ন বাক্যাংশ তাহার মনের ভিতর ফুঁপাইয়া উঠিতে লাগিল,—কিন্তু সে বিপুল চেষ্টায় সে সব চাপিয়া, কাঁপিতে-কাঁপিতে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ দেওয়ান গোবিন্দনাথকে সে ডাকাইয়া বলিল, "দেওয়ানজী, এ সব কি ভাল হচ্ছে?"

দেওয়ানজী অবশ্যই সব কথা বুঝিলেন, বলিলেন; "কি করবো মা, আমরা চাকর!"

নারায়ণী। কার চাকর? আমার স্বামী এ সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশের মালিক।

দেওয়ানজী। আজ্ঞে, তা'তে আর সন্দেহ কি?

নারায়ণী। তবে আপনারা তাঁর হুকুম বা আমার হুকুম অমান্য করেন কি সাহসে?

দেওয়ান একটু হাসিল। বলিল, "মা, আমি এই বাড়ীর তিন-পুরুষের পুরানো চাকর,—আমার প্রাণে কি কম লাগে এ সব কথায়? তবে কি করি মা? আপনি কিছু বলেন না তাই। আপনি যদি হুকুম দেন, তবে বড় বাবুর ন্যায্য পাওনা থেকে কে তাকে বঞ্চিত করে দেখি।"

এই কথা শুনিয়া নারায়ণী আশ্বস্ত হইল; এবং দেওয়ানজীর সঙ্গে দীর্ঘকাল পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিল। পরের দিন গোবিন্দনাথ সদরে চলিয়া গেল। এ দিকে নারায়ণী সত্যেনের মহলে বাহির-বাড়ী গুছাইয়া রীতিমত বৈঠকখানা সাজাইয়া লইল।

যোগেন্দ্র বাবু বাড়ীটি দুই ভাগ সমান করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, একটি মহল সত্যেন্দ্রের জন্য, আর একটি মহল সুরেন্দ্রের জন্য। সত্যেন্দ্রের মহলে আসবাবপত্র প্রায় সমান-সমানই ছিল; কিন্তু সে মহলের বৈঠকখানা কেহ দেখিত-শুনিত না। নারায়ণী নিজে গিয়া আজ সে সমুদয় সংস্কার করিয়া, বৈঠকখানা সাজাইয়া সত্যেন্দ্রকে সেখানে পাঠাইয়া দিল।

দুই দিন পরে দেওয়ানজী সদর হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

(৫)

ইহার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত বড়বউর তরফ হইতে কোনও জিনিসপত্রের জন্য সুরেন্দ্রের অনুমতি চাওয়া হয় নাই। সুরেন্দ্র ইহাতে বেশ খুসী হইল। ভাবিল, বউদিদি এইবার সায়েস্তা হইয়াছে। কিছুদিন বাদে দেখা গেল,

ত্যেনের আস্তাবলে একখানা মোটর গাড়ী আসিয়া পস্থিত হইল। সুরেন্দ্র খবর পাইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অনুসন্ধানে জানিল যে, সত্যেন্দ্র মোটরখানা কিনিয়াছে। ঠিক সেই সময়ে বড়বাবুর বৈঠকখানায় গ্রামোফোনের গান শুনা গেল।

সুরেন্দ্র ক্ষিপ্ত হইয়া খাজাঞ্চীকে ডাকাইয়া বলিল, "ঐ মোটর আর গ্রামোফোনের দাম তুমি দিয়াছ?"

খাজাঞ্চী বলিল, "আজ্ঞে না, বড়বউ ঠাকুরাণী দিয়াছেন।"

"বড় বউ ঠাকুরাণী!—কোথায় পেলে সে এত টাকা?"

খা। আজ্ঞে, আপনারা রাজা, আপনাদের টাকার অভাব কি?

সু। আমরা রাজা হ'তে পারি; কিন্তু ঐ ভিখারীর বেটী টাকা পায় কোথা থেকে? ওই পাগলটাই বা টাকা পায় কোত্থেকে?

খা। আজ্ঞে, আপনিও যেমন রাজা, বড়বাবুও তেমনি রাজা!

সু। খাজাঞ্চী, তুমি কি পাগল হ'লে না কি? সোজা কথার সোজা জবাব দেও,—তুমি ওদের ইদানীং টাকা দিয়েছ?

খা। আজ্ঞে হাঁ।

সু। হাঁ!—কার হুকুমে তুমি টাকা দিয়েছ?

খা। আজ্ঞে, বড়বাবু রোকা লিখে টাকা নিয়েছেন।

সু। বড়বাবু! বড়বাবু কে? তোমার এতবড় আস্পর্দ্ধা যে, আমার হুকুম অমান্য ক'রে ওদের টাকা দিয়েছ!

খা। আজ্ঞে, আমরা চাকর, আপনার হুকুমও যেমন, বড়বাবুর হুকুমও—

সু। চুপ রও বেকুব! এমন কথা মুখে আনবে তো তোমার দাঁত ভেঙ্গে দেব! তুমি বউঠাকুরুণের কাছে ঘুস খেয়ে বেইমানী আরম্ভ ক'রেছ! দূর হও তুমি এ বাড়ী থেকে। দেওয়ানজী, এর কাছ থেকে টাকা-কড়ি বুঝে নিন।

এই সময়ে একটা পেয়াদা আসিয়া সুরেন্দ্রের হাতে একখানা নোটিশ দিল। সুরেন্দ্র নোটিশ দেখিয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সত্যেন্দ্রের পক্ষে নামজারীর জন্য কালেক্টারীতে দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে; সেই জন্য সুরেন্দ্রের উপর এ নোটিশ জারী হইয়াছে। ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সুরেন্দ্র খাজাঞ্চীকে সামনের গোড়ায় পাইয়া লাথি মারিয়া বলিল, "বেইমান! হারামজাদ! আমার খাও আর আমার শত্রুতা কর! তলায়-তলায় এই সব করা হয়েছে! হারামজাদা! বেরোও আমার সামনে থেকে। দেওয়ানজী, এর কাজ বুঝে নিন।"

দেওয়ানজী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমারও কাজ বুঝে নেওয়া হ'ক। না-হ'ক, বুড়ো পদস্থ ভদ্রলোকের ছেলেকে তুমি লাথি মার্‌লে,—আমি এ-সব চোখে দেখ্‌তে পারব না। আমায় বিদায় দেও, আমি চ'ল্লাম। ওহে, তোমরা যে-যে ভদ্রলোকের ছেলে আছ, চ'লে এস আমার সঙ্গে বড় তরফে।" বলিয়া দেওয়ান চলিলেন; আর পঙ্গপালের মত কর্ম্মচারীর দল তাঁহার পশ্চাতে-পশ্চাতে সত্যেন্দ্রের বৈঠকখানায় গিয়া বসিল।

সুরেন্দ্র অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বরকন্দাজকে হুকুম দিল, উহাদিগকে মারিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতে। কিন্তু সুরেনের মোক্তারী-ফেল বন্ধুটি বলিল, "ওহে, ও-সব করো না,—একটা মস্ত হাঙ্গামা হবে; আমি এইমাত্র দেখে এলাম, ও-মহলের বৈঠকখানার উঠানে দুই-তিনশো লোক জমায়েত হ'য়ে আছে। তার চেয়ে, থানায় একটা এতেলা দিয়ে, ফৌজদারী দু-চার নম্বর লাগিয়ে দেও,—সব সায়েস্তা হ'য়ে যাবে।"

সুরেন্দ্র কথা কহিল না, কেবল রাগে কাঁপিতে লাগিল। খানিকক্ষণ বাদে তাহাই কর্ত্তব্য সাব্যস্ত করিয়া, মোক্তারী-ফেল বন্ধুটাকে দেওয়ানের পদে বাহাল করিয়া, থানায় পাঠাইল। নিজে অন্তঃপুরে নারায়ণীর সন্ধানে গেল। গিয়া দেখিল, নারায়ণী এ মহলে নাই; আর সত্যেন্দ্রের মহলে যাইবার দরজায় খিল এবং তালা পড়িয়াছে। সুরেন্দ্র অক্ষম রোষে ছট্‌ফট্ করিতে-করিতে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

গোবিন্দনাথ গোপনে-গোপনে সমস্ত আমলাদিগকে হস্তগত করিয়াছিলেন,—কেবল দুই-চারিটি অপদার্থ লোককে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি ঠিক জানিতেন যে, যে-দিন নোটিশ জারী হইবে, সেই দিন একটা হেস্তনেস্ত হইবার খুব সম্ভাবনা। তাই, তাহার পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক রাখিয়াছিলেন। তবে ঠিক যে এমন ধারা হইবে, তাহা তিনি কল্পনা করেন নাই। তিনি সমুদয় আবশ্যক

কাগজপত্র একপ্রস্থ নকল করাইয়া, তাহা সুরেন্দ্রের বৈঠকখানায় রাখিয়া, মূল কাগজপত্র সব সত্যেন্দ্রের বৈঠকখানায় সরাইয়াছিলেন। কতক দলিলপত্র খাজাঞ্চীখানায় রাখিয়া, তাহার চাবী খাজাঞ্চীর কাছে রাখিয়াছিলেন।

এখন সুরেন্দ্রের দুরভিসন্ধি যতই প্রবল হউক, তাহার বিষয়-বুদ্ধি খুব বেশী ছিল না। তাই, যদিও সে তাহার নিজের নামে ষোলআনা রকমে নামজারী করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু সমুদয় কাগজপত্রে ঠিক সেই সতর্কতা অবলম্বন করে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে সব কাগজপত্র সে কখনও দেখেও নাই। কাজেকাজেই দেওয়ান গোবিন্দনাথ সেই সব কাগজপত্রে আগাগোড়া সুরেন্দ্র ও সত্যেন্দ্র দুই জনের নাম চালাইয়া আসিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রের মোক্তারী-ফেল বন্ধু একবার তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিল যে, দাখিলাটা তাহার নামে দেওয়া উচিত। তাই সে দেওয়ানজীকে সেই রকম হুকুম দিয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দনাথ তাহাকে বুঝাইলেন যে, স্বর্গীয় কর্তার আমলের অনেকগুলি ছাপা দাখিলা রহিয়াছে; সেগুলি নষ্ট করার চেয়ে, সেই দাখিলা চালাইলেই সুবিধা হয়,—তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই।

কাজে-কাজেই নামজারীর মোকদ্দমায় সত্যেন্দ্রের অনায়াসে জিত হইয়া গেল। সুরেন্দ্র অবশ্য সকল রকম আপত্তিই উপস্থিত করিয়াছিল;—সত্যেন্দ্র আজন্ম-জড় বলিয়া উত্তরাধিকারে বঞ্চিত ইত্যাদি। কিন্তু নামজারীর হাকিম কাগজপত্র দৃষ্টে সত্যেন্দ্রের দখল দেখিয়া তাহার নামজারী করিয়া দিলেন; বলিলেন, স্বত্ব-সাব্যস্তের জন্য সুরেন্দ্র দেওয়ানী করিতে পারে।

ইহার পর দুই পক্ষে দুই-চারিশত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু হইয়া গেল। প্রত্যেক খাজনার মোকদ্দমায় অপর পক্ষ আপত্তি দিল। আর শেষ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্র এক স্বত্বের মোকদ্দমা দায়ের করিয়া দিল। উভয় পক্ষে প্রবল বেগে তদ্বির-তদারক হইতে লাগিল।

গোবিন্দনাথের সুনিপুণ তদ্বিরে সুরেন্দ্রের ফৌজদারী মামলাগুলি অনায়াসে ফাঁসিয়া গেল; তাহার লোকজনের নামে যে সকল মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহার কয়েকটীতে কয়েকজন আসামীর সাজা হইয়া গেল। দেওয়ানী মোকদ্দমার মধ্যে প্রধান হইল স্বত্বের মোকদ্দমা।

অনেক লিখন-পঠন, অনেক মুলতবী-তদ্বিরাদির পর মোকদ্দমার শুনানী আরম্ভ হইল,—ছয় মাস ধরিয়া সাক্ষীর জবানবন্দী হইল। কলিকাতা হইতে বড়-বড় উকীল ব্যারিষ্টার আসিল।

সুরেন্দ্রের পক্ষে দরখাস্ত করা হইল,—সত্যেন্দ্রকে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করান হউক,—সে বাস্তবিক জড় বা উন্মত্ত কি না; কারণ, সুরেন্দ্রের পক্ষে প্রধান বক্তব্যই এই যে জড় বলিয়া সত্যেন্দ্র উত্তরাধিকারে অনধিকারী। সবজজ এ দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন না; তিনি রায় দিলেন যে, সত্যেন্দ্র জড় কি না, এ কথা এ মোকদ্দমায় উঠে না। সুরেন্দ্রের পক্ষের কথা স্বীকার করিলেও, সে বাদীরূপে এ মোকদ্দমা চালাইতে পারে না। কারণ, সত্যেন্দ্র যদিও জড় হয়, তথাপি তাহার পুত্র যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে গর্ভে ছিল,—সে তাহার স্থলে ওয়ারিশ হইয়া সম্পত্তি পাইয়াছিল; এবং তাহার ওয়ারিশ-সূত্রে সত্যেন্দ্রই হউক বা নারায়ণীই হউক, কেহ সে সম্পত্তি পাইয়াছে,—সুতরাং সুরেন্দ্রের দাবী টিকিতে পারে না।

মোকদ্দমার হাইকোর্টে আপীল হইল; এবং তিন বৎসর পরে পুনর্ব্বিচারের জন্য নিম্ন আদালতে ফিরিয়া আসিল। হাইকোর্ট সাব্যস্ত করিলেন যে, সত্যেন্দ্র জড় কি না তাহা নির্ণয় হওয়া দরকার। সবজজ এবার সত্যেন্দ্রের জবানবন্দী করিলেন; এবং ডাক্তার দ্বারা তাহার পরীক্ষা করাইলেন। গোবিন্দনাথের তদ্বিরের ফলে এবং নারায়ণীর সুনিপুণ গুণে সত্যেন্দ্র সে পরীক্ষায় বিশেষ কিছু ঠকে নাই। তথাপি সদরালা রায় দিলেন যে, সত্যেন্দ্র যে জড় সেটা ঠিক; তবে সে যে জন্মাবধি জড়, সে বিষয়ে কোনও বিশেষ প্রমাণ নাই। আরও তিন বৎসর পরে হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হইল যে, সত্যেন্দ্রকে ঠিক সে রকম জড় বলা যায় না, যাহাতে সে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। সুতরাং সুরেন্দ্রের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইল। সুরেন্দ্র বিলাতে আপীল করিল।

(৫)

মামলা-মোকদ্দমায় এই প্রকারে দশ বৎসর কাটিয়া গেল,—তবু বিলাত-আপীল মুলতবী রহিল। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গেল। প্রথম, রামগতির অদৃষ্টের বৈগুণ্যের একটী নূতন পরিচয়।

যখন যোগেন্দ্র বাবুর মৃত্যু হইল, তখন রামগতি ব্যস্ত-

লক্ত হইয়া মেয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। নারায়ণী পিতার সহিত দেখা করিয়া তাহাকে মিষ্ট কথায় বিদায় করিল; কাজের কথা কিছু হইল না। রামগতি রকম-রকম বড় সুবিধা বুঝিল না। শেষে যখন নারায়ণী একেবারে পৃথক হইয়া সুরেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া লইল, তখন রামগতি হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে মেয়ের বাড়ী গিয়া উঠিল; বলিল, "কোনও চিন্তা নাই, আমি আছি; দেখি, সুরেন তোমার কি ক'রতে পারে।"

নারায়ণী পিতাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া বিশ্রাম করিতে দিল; তাহার পর বলিল, "আপনার জন্য গাড়ী প্রস্তুত; আপনি এখন আসুন।"

রামগতি প্রথমে কথাটা বুঝিতে পারিল না; ভাবিল, বুঝি কাত্যায়নীকে আনিবার জন্য নারায়ণী তাহাকে পাঠাইতে চাহিতেছে। তাই বলিল, "আমি তো এখন যাব না—"

নারায়ণী। আপনাকে এখনি যেতে হ'বে।

রাম। এ-দিকে একটা গোছগাছ না ক'রে দিয়ে যাই কেমন ক'রে?

নারায়ণী। এ-দিককার সব কাজ আমি ক'রতে পারবো,—আপনার কোনও সাহায্যের দরকার হবে না।

রামগতি অবাক্। কিন্তু সে নড়িল না। তাই নারায়ণী বলিল, "বাবা, টাকার লোভে মেয়েকে হাবার হাতে দিয়েছিলেন,—তখন তো মেয়ের দরদ এত দেখিনি। আজ মেয়ের ধন-দৌলত নাড়বার-চাড়বার আশায় মেয়ের জন্য বড় দরদ হ'য়েছে। সে দরদে আমার কাজ নেই। আমি আপনিই আপনার কাজ ক'রতে পারবো, আর কারও দরকার নাই। আমার এ পৃথিবীতে কেউ আপন নেই,—আপনার কাউকে আমার দরকার নেই। আমি আমার হাবা স্বামীকে নিয়ে একাই সংসার করতে পারবো। আপনি এখন আসুন।"

স্তব্ধ, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ রামগতি লাঙ্গুল গুটাইয়া রথে আরোহণ করিলেন।

যতীশ বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই দেওয়ান নামজারীর দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিল। নোটিশ বাহির হইবার পরই যতীশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যে, নামজারীর নোটিশ বাহির হইলে পর, তিনি সুরেনকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া একটা আপোষে বাটোয়ারা করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু আসিয়া দেখিলেন, ব্যাপার হঠাৎ অনেক দূর গড়াইয়া গিয়াছে। তবু একটা শেষ চেষ্টা করিবার জন্য প্রথমে নারায়ণীর কাছে গেলেন। আজ দেখিলেন, তার উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি। যে শান্ত, স্থিরবুদ্ধি বালিকাকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে মূর্ত্তি আর নাই। তা'র মুখ-চোখ আজ জ্বলিতেছে, জিহ্বায় ঝলকে-ঝলকে অগ্নি বাহির হইতেছে।

যতীশবাবু বলিলেন, "মা, আপনি এতদূর এগিয়ে প'ড়েছেন,—শেষ রক্ষে ক'রতে পারবেন কি? আমি বলি, আমি একবার আপোষের চেষ্টা ক'রে দেখি।"

"কার সঙ্গে আপোষ ক'রবো যতীশবাবু! ও পাপিষ্ঠের সঙ্গে আমি কিম্বা আমার হ'য়ে কেউ একটা কথা বলে, এ আমি ইচ্ছা করি না। আমি আমার স্বামীকে ভিক্ষে ক'রে খাওয়াতে হয় খাওয়াব, কিন্তু ওই কুকুরটার কাছে ভিক্ষে ক'রতে যাব না—কাউকে যেতে দেবও না।"

"ভিক্ষে নয় মা,—ধমকে যদি কাজ হাসিল হয়, তবে লড়াই ক'রে কি হ'বে। আমি দেখি, ধমক দিয়ে কিছু ক'রতে পারি কি না। সে উইলখানা আমায় দেবেন কি একবার?"

"সে উইল তো নেই।"

"নেই? কি হ'ল?"

"সে আমি ঠাকুরপোকে দিয়েছিলাম; সে তাকে পুড়িয়ে ফেলেছে। কেন, তাতে কি হবে?"

"তাই দেখিয়ে আমি তাকে ঠাণ্ডা ক'রতে পারতাম। উইলের মধ্যে যে গোল ছিল, সেটা তার ধরবার সাধ্য হ'তো না,—কাজেই তা'কে সে উইল থেকে বাঁচবার জন্য পথে আসতে হ'ত। সেখানা তাকে দিয়ে ভাল হয় নি মা!"

"কেন এ কথা ব'লছেন যতীশবাবু? যেটা মিথ্যা, যেটা জাল—সেটা দিয়ে ভয় দেখ্‌লেও পাপ। সেটা একটা নীচ কাজ হয়। যেটা সত্য, তা'র উপর দাঁড়িয়ে আমি প্রাণপণ ক'রে লড়তে রাজী আছি,—কোনও মিথ্যার আশ্রয় আমি নিতে চাই না। অন্যায় ক'রে আমি আমার স্বামীর অকল্যাণ ক'রতে চাই না।"

যতীশবাবু নীরব হইয়া রহিলেন। এই যে চরিত্রের তেজ, ইহার সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বেই পরিচয় হইয়াছিল। নারা-

য়ণী বলিল, "আপনি কেন এমন ব'লছেন ? আপনি কি মনে করেন যে, আমাদের মোকদ্দমার জোর হ'বে না ?"

যতীশ। আমি মোটেই তা মনে করি না। আইনের চক্ষে যে সত্যেন জড় সাব্যস্ত হবার যোগ্য, এমনও আমার বোধ হয় না। কিন্তু মা, এত দিন ওকালতী ক'রছি—কত লোকের সর্ব্বনাশ দেখেছি। ঘরোয়া বিবাদে যে বড়-বড় ঘরের কি দুর্দ্দশা হয়, তা আমরা যত জানি, আপনারা তত জানেন না। অল্পপায়ে যদি একটা মীমাংসা হয়, তবে মামলার ঘোরফেরে না যাওয়াই ভাল।

নারায়ণী বলিল, "বেশ, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য,—আপনি আপোষের চেষ্টা করুন। কিন্তু আমার কাছে দুইটি বিষয় প্রতিজ্ঞা করুন। এক, কোনও মিথ্যা ভয় দেখাবেন না ; আর, কোনও রকম দয়া, অনুগ্রহ বা স্নেহ ভিক্ষা,—আমার স্বামীর অবস্থার উল্লেখ ক'রে কোনও অনুরোধ, ক'রবেন না—তা'তে আমার মাথা কাটা যাবে।"

যতীশবাবু প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি সুরেনের বাড়ী গেলেন। তিনি সুরেনকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু সুরেনও রুখিয়া ছিল, সে বাঁকিল না।

যতীশ বাবু বলিলেন, "তুমি নিতান্ত মূর্খ, তাই তোমার বউদিদির সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে গিয়েছ। যদি তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চ'লতে, তবে তোমার যে কত উন্নতি হ'ত, তা তুমি জান না। সে মেয়ের যে বুদ্ধি আছে, তোমার মত দশটার ভিতর সে বুদ্ধি নেই। তার যে চরিত্রবল আছে, তুমি জন্ম-জন্ম তপস্যায় তা লাভ ক'রতে পারবে না। তা'র সঙ্গে লড়াই! কেবল আমার দোষে তোমার বাবার উইলখানা সই হ'ল না,—না হ'লে তুমি আজ কোথায় থাকতে। যে উইল হ'য়েছিল, তা' নিয়েও লড়াই ক'রলে, তুমি হিমসিম খেয়ে যেতে। কিন্তু আমার কাছে যেই শুনেছেন যে, সে উইল আইন অনুসারে ঠিক সিদ্ধ হয় নি; অমনি সেটা ফেলে দিয়েছেন তোমার বউদি। হায় রে হতভাগা, এ দেখেও তোমার চৈতন্য হ'ল না। এখনো তোমার উচিত, তোমার বউদির পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাওয়া।"

নিষ্ফল বক্তৃতা। সুরেন্দ্র সম্মুখে কিছু বলিল না,—যতীশ বাবু চলিয়া গেলে ভ্রূকুটি করিয়া উঠিল। সেই মোক্তারী-ফেল বন্ধুটি বলিল, "মোটা-মোটা ফিস পেলে উকীলদের কথার কোনও কমতি হয় না।" সুরেন্দ্র হাসিল।

ইহার পর সুরেন্দ্রের মা একবার আপোষের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেটা উল্টা দিকে। তিনি নারায়ণীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। কিন্তু সেইদিনকার সেই কথার পর নারায়ণীর মন তাঁহার উপর ভীষণ বিদ্বেষযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—সে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিল না। অন্দর দুয়ার তো সে বন্ধ করিয়াই দিয়াছিল। যখন শাশুড়ী সদর দুয়ার দিয়া আসিতে গেলেন, তখন নারায়ণী তাঁহাকে শুনাইয়া-শুনাইয়া দ্বারোয়ানকে বলিল, "ও-বাড়ীর কাউকে এ-বাড়ীর ফটক পার হ'তে দিও না,—ও-বাড়ীর বেড়াল কুকুরটাকে পর্য্যন্ত না।" শাশুড়ীকে কাজেই ফিরিতে হইল।

তিনি তখন সত্যেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন,—কিন্তু নারায়ণীর কড়া পাহাড়ার ফলে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাহাকে ভুলাইয়া সুরেনের বাড়ীর ভিতর আনিতে তাঁহার সাহস হইল না,—কি জানি, যদি সুরেন কিছু একটা করিয়া বসে। অনেক চেষ্টা করিয়া শেষে তিনি একদিন খবর পাইলেন যে, সত্যেন্দ্র গোবিন্দনাথের বাড়ী গিয়াছে। তিনি তখনি সেই বাড়ীতে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জাপটিয়া ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি তোকে পেটে ধরলাম,—আজ কি ঐ মাগীর কথায় তুই আমার গলায় ছুরি দিবি ?"

সত্যেন্দ্র ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। এ কথার তাৎপর্য্য ভেদ করে, এমন শক্তি সত্যেন্দ্রের ছিল না। সে তাই অবাক্ হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাতা বলিলেন, "হাঁ বাবা, তুই আমায় ভালবাসিস না ?"

সত্যেন্দ্র বলিল, "বাসি।"

"তবে তুই আমাকে ছেড়ে কেন ওই মাগীর কথায় আলাদা হ'য়ে আছিস্ ? আমার কাছে থাকবি বল্ ? ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করবি না ?"

সত্যেন্দ্র খানিকটা ভাবিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

সত্যেন্দ্রের মা ভাবিলেন, তখনি তাহাকে লইয়া বাড়ীতে চলিয়া যান। তাহা করিতে পারিলে নারায়ণীর বিরুদ্ধে খুব একটা পাকা চাল হইত। কারণ, নারায়ণী সত্যেন্দ্রকে

দ্ধার করিবার কোনও উপায়ই করিতে পারিত না। আদালতে গিয়া, যদি সে সত্যেন্দ্রকে পাগল বা জড় বলিয়া, তাহার গার্জ্জিয়ান স্বরূপে দরখাস্ত করিত, তবে তাহার সমস্ত মামলা ফাঁসিয়া যাইত। অথচ, তাহা না বলিলে সত্যেন্দ্রকে উদ্ধার করিবার অন্য কোন উপায়ই ছিল না।

কিন্তু মা ভরসা করিয়া সত্যেন্দ্রকে একেবারে বাড়ী লইয়া যাইতে পারিলেন না। সুরেনের গোঁয়ারতুমিকে তিনি নিজেই ভয় করিতেন; তাই একেবারে বাড়ী লইয়া না গিয়া, সত্যেন্দ্রকে তিনি পুরোহিত-বাড়ীতে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে সুরেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইচ্ছা, তাহার সঙ্গে বুঝাপড়া করিয়া, তাহার নিকট সত্যেন্দ্রের সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া তবে বাড়ী লইয়া যাইবেন। তিনি তাই সুরেনকে ডাকিয়া পাঠাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে নারায়ণীর কাছে সংবাদ গিয়াছিল যে, শাশুড়ী সত্যেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন। খবর পাইয়াই নারায়ণী ব্যস্ত হইয়া চারজন বরকন্দাজ সঙ্গে করিয়া বাহির হইল। গোবিন্দনাথের বাড়ী সংবাদ পাইয়া, সে ঝড়ের মত পুরোহিত-বাড়ীতে ঢুকিয়া, স্বামীকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। স্বামীকে হস্তগত করিয়া সে একবার কট-মট দৃষ্টিতে শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ধন্যি মা হ'য়েছিলে মা। নিজে ফাঁদ পেতে ছেলেকে ধরতে এসেছ, তা'কে খুন ক'রতে দেবে বলে। যমে তোমায় ভুলে র'য়েছে!" বলিয়াই সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। রোষে, দুঃখে সত্যেন্দ্রের মাতা মাটিতে গড়াগড়ি খাইতে লাগিলেন। সুরেন আসিয়া তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া, সমস্ত অবস্থা শুনিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল "বটে! বেটীর এত বড় আস্পর্দ্ধা! বরকন্দাজ এনে মাকে অপমান! ও হারামজাদীকে আমি মেথর দিয়ে চাবকাব, তবে আমার নাম সুরেন রায়।" বলিয়াই সে ছুটিয়া বাহির হইল নারায়ণীর সন্ধানে। যখন সে নারায়ণীর নাগাল পাইল, তখন সে তাহার বাড়ীর দেউড়ী হইতে পাঁচ-সাত হাত তফাতে। উন্মত্ত সুরেন একেবারে ঝাঁ করিয়া নারায়ণীর চুল ধরিয়া টান মারিয়া বলিল, "তবে রে হারামজাদী!"

সত্যেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে রাম সিং বরকন্দাজ সুরেনের পৃষ্ঠে এক প্রচণ্ড লাঠির ঘা লাগাইল,—সুরেন উল্টাইয়া পড়িল। একটু দূরে সুরেনের দেউড়ী,—সেখান হইতে তাহার বরকন্দাজেরা ছুটিয়া আসিল। সত্যেনের দেউড়ী হইতেও সকলে ছুটিয়া আসিল। ফাঁক পাইয়া নারায়ণী সত্যেন্দ্রকে লইয়া দেউড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। দুইপক্ষের বরকন্দাজে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া উঠিল। সুরেন পিঠে হাত বুলাইতে-বুলাইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল; দেখিয়া, তাহার বরকন্দাজেরাও আস্তে-আস্তে পিছু হটিল। দেউড়ী হইতে গোবিন্দনাথ তাঁহার পক্ষের বরকন্দাজদের ডাকিয়া বলিলেন, "খবরদার, তোমরা আপন দেউড়ী ছাড়িয়া যাইও না।" কাজেই ঝগড়া অল্পে মিটিয়া গেল,—মাত্র সত্যেন্দ্রের পক্ষে একটা ও সুরেনের পক্ষে একটা বরকন্দাজ গুরুতর জখম হইল।

দুই পক্ষে একটা মস্ত বড় ফৌজদারী মামলা বাধিয়া গেল। আদালতে উভয় পক্ষের নানা রকম সাক্ষী-সাবুদ দাখিল হইল। নারায়ণী নিজে পুলিসের কাছে এজাহারে আগাগোড়া সত্য কথা বলিল, এবং তাহার সাক্ষীরাও ঠিক সেই কথা বলিল,—দেউড়ীর সুমুখের ঝগড়া সম্বন্ধে। কিন্তু যাহা লইয়া ঝগড়ার সূত্রপাত—সেই পুরোহিত-বাড়ীর ব্যাপার, সে কথার কোনও পক্ষ হইতেই আদালতে উল্লেখ হইল না। নারায়ণীর পক্ষ হইতে সে কথা বলা হইল না;—কারণ, তাহা হইলে সত্যেন্দ্রের জড়ত্বের বেশ একটু প্রমাণ দাঁড়ায়। আর সুরেনের পক্ষ হইতে বলা হইল না,—কেন না, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে আর এক নম্বর অবৈধ প্রতিবন্ধকের চেষ্টার চার্জ্জ দাঁড়ায়। কাজেকাজেই হাকিম আসিয়া যখন দেখিলেন যে, দাঙ্গার স্থান সত্যেন্দ্রের দেউড়ীর নিকটে, তখন নারায়ণীর জিত হইল,—সুরেনের পক্ষের লোকের শাস্তি হইল। সত্যেন্দ্রের লোক আত্মরক্ষায় নিযুক্ত ছিল, বলিয়া মুক্তি পাইল।

ইহার পর হইতে নারায়ণীর চক্ষে শাশুড়ী একটা পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল; আর শাশুড়ীর চক্ষে নারায়ণী একটা ভীষণ ডাইনী রাক্ষসী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া গেল।

এইরূপে নারায়ণী ক্রমে সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। অর্জ্জুনের লক্ষ্য-বেধের সময়ে যেমন শকুন্ত তাহার চক্ষুর একমাত্র বিষয় হইয়াছিল,—এই প্রকারে সমস্ত জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া নারায়ণী তেমনি কেবল সত্যেন্দ্রনাথের উপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া রহিল। বাহিরের

লোকের সঙ্গে তাহার মোটে বনিত না। দেবরের সঙ্গে ঝগড়ার সূত্রপাত হইতেই, তাহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সকলকে সে সন্দেহের চক্ষে দেখিত; এবং অক্লেশে লোককে খুব কড়া-কড়া কথা শুনাইতে ত্রুটি করিত না। পাড়ার মেয়েরা তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিলে সর্ব্বদা সন্তর্পণে থাকিত,—কখন কি বেফাঁস কথা পাছে বলিয়া ফেলে। নারায়ণীও তেমনি সর্ব্বদা সন্দেহের দৃষ্টি উঁচাইয়া রাখিত। এ অবস্থায় হৃদ্যতা বা প্রাণ-খোলা আলাপ সম্ভবে না। তাই নিতান্ত যাহারা তাহার আশ্রিত, তাহারা ছাড়া অপর কেহ নারায়ণীর বাড়ী আসিত না। যাহারা আসিত, তাহারাও বিনা প্রয়োজনে বেশী ক্ষণ থাকিত না। অল্প দিনের মধ্যেই অবস্থা-গতিকে নারায়ণীর মায়েরই মত দজ্জাল বলিয়া নাম ছড়াইয়া পড়িল।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। লোকে ভাবিবে, এ বড় সুখের দিন কাটা নয়। কিন্তু নারায়ণী তাহা ভাবিত না। তাহার জীবনের সমস্ত সুখ সত্যেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিল। তাহার সেবায়, যত্নে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ,—তাহাকে আদর করিয়া সে স্বর্গসুখ পাইত। সেই হাবার পরম নির্ভর-শীল, সরল, কোমল হৃদয়ের প্রীতি পাইয়া সে পরিতৃপ্ত হইত। সারাদিন যদি সে সত্যেন্দ্রকে লইয়া পড়িয়া থাকিত, তবুও তাহার ক্লান্তি হইত না।

বাহিরে সত্যেন্দ্র কি কথা বলে বা কি করে তাহার বিষয়ে নারায়ণীর বিস্তারিত বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু তাহার নিজের কাছে তাহার কথার কোনও বাধা ছিল না। বরং সে তাহার মূঢ় চিত্তের সরল কথা যখন বলিয়া যাইত, নারায়ণী তখন তাহার সেই কথা অমৃতের প্রস্রবণ বোধে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া পান করিত। সে তাহাকে ক্ষেপাইয়া তাহার হাবার কথা বলাইত,—তাহাতেই সুখ বোধ করিত। তাহার একটা প্রধান ক্ষেপাইবার বিষয় ছিল, তাহার নিজের মরিবার কথা। সে প্রায়ই স্বামীকে ক্ষেপাইয়া বলিত, "আমি মরে যাব, তোমার আর একটি লাল টুকটুকে বউ আসবে, সে তোমাকে কত আদর ক'রবে।" এই কথা শুনিলেই সত্যেন্দ্র ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিত,—তাহাকে নানারূপ আদর করিয়া, নানা দিব্য দিয়া বলিত, সে কিছুতেই মরিতে পারিবে না। নারায়ণী হাসিত। এক-এক সময়ে সত্যই তাহার মনে হইত, সে মরিলে তাহার হাবার কি দশা হইবে! এ কথা ভাবিতে তাহার মনে নানা চিন্তা উঠিয়া মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিত। হাবা তাহাতে অস্থির হইয়া উঠিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া আদর করিত, আর নারায়ণী তাহার সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইত। ইহাই ছিল নারায়ণীর জীবনের আনন্দ,—ইহাই তাহার সুখ।

(৬)

যখন হাইকোর্ট হইতে মামলা পুনর্বিচারে আসিল, তখন সুরেনের বাড়ীতে মহা উৎসব হইল। সত্যেন্দ্রের দেউড়ীর সামনে, খানিকটা তফাতে, ঢোল-সহরতের ব্যবস্থা হইল। নারায়ণীর পক্ষের লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। কিন্তু নারায়ণী তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিল। নারায়ণীর ক্রোধে গভীরতা ছিল, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। সে ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে জানিত। যখন হাইকোর্টের শেষ বিচারে নারায়ণীর জিৎ হইল, তখন গোবিন্দনাথের ছেলে জেদ করিল যে, সুরেনের দেউড়ীতে ঢোল-সহরৎ করিতে হইবে। কিন্তু নারায়ণী তাহা বন্ধ করিল, মোকদ্দমা জিতিয়া সে কোনও রূপ আনন্দ প্রকাশ করিল না। কিন্তু সত্যেন্দ্র মহা আনন্দিত হইল। তাহার আনন্দের একমাত্র কারণ এই যে, নারায়ণী জিতিয়াছে। নারায়ণীর একটা কিছু ভাল হইলে, সে আনন্দে অধীর হইত। তাই যখন সে শুনিল যে, হাইকোর্টে নারায়ণী জিতিয়াছে, তখন যদিও সে জয়ের সম্পূর্ণ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, তবুও সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। রাত্রে যখন মোকদ্দমা জয়ের টেলিগ্রাম আসিল, তখন দেওয়ানজী বাড়ীতে। সত্যেন্দ্র ছুটিয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া সংবাদ দিল। তা'র পর ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সারা গ্রামে সংবাদ দিয়া অনেক রাত্রে ঘরে ফিরিল। পথে এক পশলা বৃষ্টি তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছিল—তাহা সে বুঝিতেই পারে নাই। বাড়ী ফিরিয়া সে ভিজা কাপড়েই বাহির-বাড়ীতে খানিকক্ষণ মজলিস করিল, এবং তাহার উদ্দাম কল্পনা মুক্ত করিয়া মোকদ্দমা জিতের উপলক্ষে নানা উৎসবের ফন্দী করিতে লাগিল।

নারায়ণী এই সংবাদ শুনিয়া কেমন যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। লোকে যখন একটা কোনও গুরুতর বিষয়ে

…পণ করিয়া লাগিয়া পড়ে, তখন, যতক্ষণ সে কাজের …শা থাকে, ততক্ষণ তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, …সাহের অন্ত থাকে না। কিন্তু কার্য্যটা ঠিক সম্পন্ন …য়া গেলে আসে অবসাদ। নারায়ণীরও হইয়াছিল …হাই। তাহার মনটা এমন ফাঁকা হইয়া গেল যে আর …হার নড়িতে-চড়িতে ইচ্ছা হইল না। স্বামী বাহির …য়া গেলে সে শুইয়া পড়িল; এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই গভীর …দ্রায় অভিভূত হইল।

যখন দাসী ভয়ে-ভয়ে নারায়ণীকে ডাকিয়া তুলিল, …খন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। তখনও সত্যেন্দ্র বাহির-বাড়ীতে …সিয়া আছে। দাসী সে সংবাদ নারায়ণীকে দিয়া বলিল …, খানসামা কিছুতেই তাঁহাকে ভিতরে আনিতে …ারিতেছে না।

নারায়ণীর ঘুম মুহূর্ত্তে দূর হইল। সে চট্ করিয়া উঠিয়া …বৈঠকখানায় গেল, এবং সেখান হইতে সত্যেন্দ্রকে ডাকিয়া …আনিল। তাহার গায়ে হাত দিতেই সে চমকিয়া উঠিয়া …বলিল, "এ কি, ভিজে কাপড়ে বসে এতক্ষণ র'য়েছ?"

সত্যেন্দ্রের তখন মনে পড়িল যে, সে বৃষ্টিতে ভিজিয়া-…ছিল বটে। নারায়ণী তাড়াতাড়ি তাহার কাপড়-চোপড় …ছাড়াইয়া, চা খাওয়াইয়া বিছানায় মুড়ি দিয়া শোয়াইয়া, খাওয়ার জোগাড় করিতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সত্যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আস্তে-আস্তে তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা রীতিমত গরম হইয়া উঠিয়াছে।

ঘোর দুশ্চিন্তায় নারায়ণীর মন অস্থির হইয়া উঠিল। কয়েকদিন হইতে তা'র মনটা যেন কেমন খাঁ-খাঁ করিতেছে, —যেন বুকের ভিতর হইতে কি একটা অজানা দুঃখ ঠেলিয়া উঠিতেছে। এই অহেতুক বিষাদকে তাহার এখন একটা ভয়ানক দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে হইল। মোকদ্দমা জিতিবার খবর পাইবামাত্র যেন তাহার মন কি রকম ফাঁকা-ফাঁকা,—কি রকম বিষাদাচ্ছন্ন বোধ হইতেছিল। সে মনে করিল, ইহা কেবলমাত্র একটা আগন্তুক বিপদের ছায়া। তা'র যেন কেবলি মনে হইতে লাগিল যে, যাহাকে সে মঙ্গল বলিয়া মনে করিয়া এত দিন যত্নের সহিত সাধনা করিয়াছে, তাই তাহার অমঙ্গল। তাই, যখন সাধনা পূর্ণ হইয়াছে, তখনই সেই অমঙ্গলের প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়া বাহির হইতে বসিয়াছে। কি জানি কেন, তাহার মনে হইতে লাগিল যে, মোকদ্দমাটা না জিতিলেই ছিল ভাল। অদৃষ্টের কূট-হিসাবের ভিতর এই লাভের অঙ্কের পাশে যে খুব একটা বড় রকমের লোকসান লেখা আছে, এই বিশ্বাস সে কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

সে জোর করিয়া এই সব অমঙ্গল-চিন্তা মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিল। ভাবিল, ছাই একটু জ্বর হ'য়েছে—তাই কি-সব অকল্যাণের কথা ভাবছি! দূর কর এ সব কথা? কিন্তু—কিছুতেই সে এ কথা মন হইতে দূর করিতে পারিল না। তাহার মন একেবারে বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

পরের দিন জ্বর খুব বেশী হইয়া দেখা দিল, সঙ্গে-সঙ্গে কাসি। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "হঠাৎ ঠাণ্ডাটা লেগেছে, কাসিটা ব'সে গেছে—কিছু সময় নেবে।" কিন্তু মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল যে, তিনি তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু আশঙ্কা করিতেছিলেন। তিনি খুব সাবধান থাকিবার উপদেশ দিলেন। সাবধানতার অভাব হইল না। কিন্তু নিউমোনিয়া স্পষ্ট ভাবে দেখা দিল, জ্বর খুব বাড়িয়া গেল, রোগী ভয়ানক ছটফট্ করিতে লাগিল। নারায়ণীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু সে কাঠ হইয়া বসিয়া, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল—দিন রাত্রি তাহার সেই চিরদয়িত মুখের উপর চক্ষু রাখিয়া সে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সেই মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার কত কথা মনে হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, তাহার সমস্ত বিবাহিত জীবনের ইতিহাসের কথা,—তাহার প্রেমের ইতিহাসের কথা,—তাহার অপূর্ব্ব মোহের কথা,—তাহার প্রেমাস্পদের জীবনের শত-শত তুচ্ছ ঘটনার কথা! মনে উঠিতে লাগিল, সেই ভীষণ বিচ্ছেদের আশঙ্কার কথা—যাহা মনে উঠিলে মন কাঁদিয়া উঠে, অসাড় হইয়া পড়ে। মনে হইল সাবিত্রীর কথা, বেহুলার কথা;—হায়, যদি সে-সব সম্ভব হইত! তখনই আবার জোর করিয়া সে এই অকল্যাণকর চিন্তা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিত। কিন্তু ঘুরিয়া-ফিরিয়া এই ভীষণ অকল্যাণের আশঙ্কায় তাহার চিত্তে নানা চিন্তার ধারা সঞ্চারিত করিতে লাগিল। এক-একবার মনে হইতে লাগিল, সে কি পাপ করিয়াছে, যাহাতে তাহার এমন শাস্তি হইবে? একান্ত চিত্তে স্বামীকে ভাল বাসিয়াছে, স্বামীর সেবা করিয়াছে,—সেই অপরাধে কি ভগবান

তাহাকে এ ভীষণ শাস্তি দিবেন? সে কখনও স্তায় ভিন্ন অন্যায়ের পথ অবলম্বন করে নাই,—ধর্ম্ম ছাড়িয়া, জ্ঞান সত্বে অধর্ম্মাচরণ করে নাই। তবে কেন ভগবান তাহাকে শাস্তি দিবেন? ইহা হইতেই পারে না। আবার মনে হইল, এ জগতে ধর্ম্মাধর্ম্মের, পাপ-পুণ্যের সত্য পুরস্কার বা নিগ্রহ হয় কই? তা যদি হইত, তবে সতী সাধ্বীরাই বা বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিবে কেন, আর নামজাদা অসতীরা পতিপুত্রবতী হইয়া সমৃদ্ধির সৌভাগ্য ভোগ করিবে কেন? ক্রমে মনে হইল, হয় তো বা সে সত্য-সত্যই পাপ করিয়াছে,—স্বামীর প্রতি স্নেহের আতিশয্যে হয় তো অপরের প্রতি অন্যায় করিয়াছে। হয় তো সে অপরাধ করিয়াছে,—মায়ের সঙ্গে ছেলের বিরোধ পুষ্ট করিয়া,—ভায়ের সঙ্গে ভায়ের ঝগড়া বাধাইয়া। এ কথা তাহার মনে উঠিতেই, তাহার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে পড়িল যে, সুরেন্দ্রের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় জয়লাভের সঙ্গে সত্যেন্দ্রের অসুখের সূত্রপাতের কি ঘনিষ্ট সম্পর্ক! এই জয়লাভই যে—মাতা ও ভ্রাতার প্রতি যে বিদ্বেষ সে এত দিন পুষ্ট করিয়া আসিয়াছে,—সেই বিদ্বেষের পূর্ণাহুতি—তাই ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। মায়ের ঘৃণা—তা' হ'ক না কেন সেটা যত অন্যায় মায়ের—সে তো সহজ কথা নয়।

নারায়ণীর মন স্বভাবতঃ খুব শক্ত। এই সকল ছোট-খাট কথায় কখনও তাহার বলিষ্ঠ চিত্তকে নড়চড় করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ এই ভীষণ বিপদের ছায়ার তলে তাহার চিত্ত সমস্ত সাহস ত্যাগ করিয়া,—ঠিক যে সমস্ত বিশ্বাসকে সে কুসংস্কার ও দুর্ব্বলতার ফল বলিয়া তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে, সেই সমুদয় বিশ্বাস ও সেই সমুদয় চিন্তার হাতে আত্মসমর্পণ করিল। সে মনে-মনে ভয়ানক ছটফট করিতে লাগিল; মনে-মনে ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা কুটিতে লাগিল; বলিল, "আমার দোষ হরি,—আমাকে শাস্তি দেও, আমাকে নরকে ডুবাও—আমার স্বামীকে রক্ষা কর।"

সদর হইতে তিনজন বড়-বড় ডাক্তার আসিলেন। কলিকাতায়ও টেলিগ্রাফ করা হইল বড় ডাক্তারের জন্য। জলের মত অর্থব্যয় করিয়া নারায়ণী সত্যেন্দ্রের চিকিৎসা করিতে লাগিল। কিন্তু রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া চলিল। শেষে যখন তাহার কণ্ঠরোধ হইল, যখন সে নারায়ণীর মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন বলিতে চাহিল, বলিতে পারিল না,—তখন নারায়ণীর পর্ব্বত-প্রমাণ ধৈর্য্য ভাসিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া পাশের ঘরে যাইয়া মাটিতে লুটাপুটী খাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া সে আবার সত্যেন্দ্রের কাছে ফিরিয়া আসিল। সত্যেন্দ্র তখন চক্ষু বুজিয়া আছে,—ঘুমাইতেছে কি না বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নারায়ণী রোগীর মুখ একাগ্রভাবে নিরীক্ষণ করিল,—তাহার চক্ষু আবার জলে ভরিয়া উঠিল। সে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইল।

তখন গভীর রাত্রি—অন্ধকার রাত্রি। নারায়ণী একা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

(৭)

ও-বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া তখন সবে মিটিয়াছে,—সুরেন্দ্র শয্যায় বসিয়া পান চিবাইতেছে,—পত্নী হেমলতা তার কাছে ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইতেছে। সুরেন্দ্র বলিল, "ও-বাড়ীতে বড় ঘটা!—শুনেছ?"

হেমলতা বলিল, "মরণ আর কি! ঘটা আবার কিসের? বড়ঠাকুর এখন-তখন! এখন আবার ঘটা কোথায় দেখলে!"

সু। বলি, ঐ তো ঘটা! খুব ঘটা ক'রে চিকিচ্ছে চলছে,—দশজন ডাক্তার এসে পৌঁচেছে,—কবরেজ আনতে লোক গেছে,—লাখখানেক টাকার গলায় দড়ি পড়ে গেছে। একেই তো বলে ঘটা! মাইরি, হাবাটা মরছে খুব ঘটা ক'রে! আমার অসুখ হ'লে তুমি অমনি ঘটা ক'রতে পারবে?

হেমলতা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "তুমি ব'লে তাই ঠাট্টা করছো! যাই হ'ক মার পেটের ভাই তো! লোকের মুখের দিকে তো তাকাতে হয়! তাঁকে নিয়ে দিদি একা মেয়েমানুষ এমন বিপদে পড়েছে,—তুমি কোন্ তার এক দিন তত্ত্বতল্লাস ক'রলে! তা' নয়, উল্টো আবার ঠাট্টা ক'রছো!"

সু। বলি, তোমার কি বিধবা হ'বার সাধ হ'য়েছে যে, তুমি আমায় বলছো ও-বাড়ী যেতে? গেলে কি আমার ঘাড়ে মাথা থাকবে? জান না কি বাঘিনী তোমার

দিই! আমি গেলে এক গ্রাসে আমার মাথাটি চিবিয়ে বে।"

পিছনে শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া সুরেন্দ্র দেখিল রায়ণী!—বাঘিনী নয়, সরল দুঃখ-ক্লিষ্টা সামান্যা রমণী—দিয়া-কাঁদিয়া তাহার চক্ষু ফুলিয়াছে, রাত্রি জাগিয়া মুখ কাইয়াছে। অবিন্যস্ত ঘন-কৃষ্ণ কেশ আলুথালু হইয়া রাঙ্গে ছড়াইয়া রহিয়াছে। আজ সে আর রাণী নয়, আজ ভিখারিণী;—সে তেজস্বিনী রণরঙ্গিণী নয়, করুণার বিস্ত মূর্ত্তি!

নারায়ণী ছুটিয়া আসিয়া সুরেন্দ্রের পা জড়াইয়া ধরিয়া লিল, "ঠাকুর-পো, তোমার দাদাকে রক্ষা কর!" আর কিছু লতে পারিল না,—কেবল পায়ের উপর মাথা গুঁজিয়া দুই তে সবলে পা চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে াগিল। এক মুহূর্ত্ত সুরেন্দ্র ও হেমলতা স্তব্ধ হইয়া রহিল। রে হেমলতা ছুটিয়া আসিয়া নারায়ণীকে ধরিল। সুরেন্দ্রও রল। দুই জনে জোর করিয়া তাহাকে উঠাইল। রায়ণী কাঁদিতে লাগিল,—হেমলতা ও সুরেন্দ্রের চক্ষুও জিয়া উঠিল। সুরেন্দ্র বলিল, "ছি বউদি, অত উতলা হ কেন, তুমি আমার গুরুজন হ'য়ে আমার পা ছুঁতে লে, ছি!" বলিয়া নারায়ণীর পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। াহার পর বলিল, "চল যাই, দেখি কি হয়েছে—ভাবনা সের?"

ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে নারায়ণী বলিল, "ঠাকুর পো, ভাই প কর,—আমার অপরাধ মাপ কর। এখন আর আমার পর রাগ করো না,—আমার মত দুঃখীর উপর কেউ রাগ রে না।"

সুরেন্দ্র ততক্ষণে উঠিয়া, ধুতির খুঁট গায়ে জড়াইয়া, ইবার জন্য প্রস্তুত হইল; বলিল, "সে সব কথা আর কেন দি! তোমার উপর আর আমার এক ফোঁটাও রাগ নেই, চল।" নারায়ণী বলিল, "মা কোথায়? মা একবার যাবেন?" হেমলতা নারায়ণীকে শাশুড়ীর কাছে লইয়া গেল। নি বিনিদ্র নয়নে কেবল তাহারই কথা ভাবিতেছিলেন। হার পুত্র এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়,—অথচ কেবল নারায়ণীর জন্যই তিনি তাহাকে দেখিতে পারিতেছেন না,— কথা ভাবিয়া তিনি এই ডাইনী মাগীকে মনে-মনে দিতেছিলেন। নারায়ণী ঘরে আসিতে তিনি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইলেন,—এতদিনের রুদ্ধ অভিমান বুকের ভিতর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

নারায়ণী তাঁহার পা ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিল, "মা, আমি অপরাধ ক'রেছি বলে কি তোমার ছেলেকে পায়ে ঠেলবে? তোমার ছেলে তুমি বাঁচিয়ে নেও মা, তা'র পর এই হতভাগীকে ঝাঁটা মেরে বিদায় ক'রে দিও। আজ আর রাগ ক'রে থেকো না, মা।" পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া নারায়ণী কাঁদিয়া শাশুড়ীর পা ভাসাইয়া দিল।

শাশুড়ীও কাঁদিলেন। তাঁহার বুক ঠেলিয়া, এত বৎসরের চাপা কান্না রুদ্ধ প্রস্রবণের ছাড়া-পাওয়া ধারার মত বেগে ছুটিয়া আসিল,—তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে তিনি নারায়ণীকে হাতে ধরিয়া তুলিলেন। তখন আর তাঁহার মনে কোনও গ্লানি রহিল না।

সুরেন্দ্র আসিয়া প্রাণপণে শুশ্রূষা করিল। হেমলতা সংসারের ভার গ্রহণ করিল। মাতা সত্যেন্দ্রের মাথা কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন। নারায়ণী কেবল রোগীর ঘরে ও বাহিরে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, সে আর কোনও কাজই করিতে পারিল না। কিন্তু সকলের চেষ্টা, সকলের প্রার্থনা ব্যর্থ করিয়া পাগল তাহার তুচ্ছ জীবন শেষ করিয়া চলিয়া গেল। যখন তাহার শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইল, নারায়ণী তখন নিশ্চল মূর্ত্তির মত তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পর মুহূর্ত্তে সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু নারায়ণী কাঁদিল না—সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

(৮)

যখন নারায়ণীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন তাহার খুব আরাম বোধ হইতে লাগিল। একটা সুখের স্বপ্নের ঘোরের ভিতর দিয়া তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। গত দুই সপ্তাহের যে যন্ত্রণা, যে উদ্বেগ, যে ক্লান্তি—সব যেন ধুইয়া পুঁছিয়া গিয়াছে। তাহার যেন কিছুই হয় নাই, এই ভাবে সে তাহার শান্ত নয়ন উন্মীলন করিল। ক্রমে ক্রমে সকল কথা তাহার স্মরণ হইল। সে তখন উঠিয়া বসিল। গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, কিন্তু কাঁদিল না। তাহার মনের ভিতর যেন কেমন শূন্য হইয়া গিয়াছিল,—সুখ, দুঃখ কোনও বোধই তখন তাহার ছিল না।

সে আশ্চর্য্য হইতেছিল যে, যে ভয়ানক ব্যাপারের কথা দু'দিন আগে কল্পনা করিতে তাহার বুক ফাটিয়া গিয়াছে, সে কথায় আজ তাহার একটুও বেদনা বোধ নাই। বরং বেশ শান্ত ভাবেই সে ভাবিতে লাগিল যে, মরণ তো সবারই এক দিন হইবেই—দু'দিন বাদে না হইয়া আজ হইয়াছে; তাহাতে এমন একটা বেশী কি, হইয়াছে!

যতক্ষণ সকলে নীরব ছিল, ততক্ষণ তাহার মনে এমনি বোধ হইতেছিল। কিন্তু যখন হেমলতা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া বলিল, "ও দিদি, তোমার কি হ'ল!" তখন তাহার মনের কোন্ গভীর কন্দর হইতে হঠাৎ যেন দুঃখের সাগর ফুটিয়া বাহির হইল; সে হেমলতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দিন-দুই-চার পরে নারায়ণীকে কিছু সুস্থ দেখিয়া দেওয়ান আসিয়া সসঙ্কোচে বলিলেন, "গোবিন্দপুরের সদর খাজনাটা এবার এখান থেকে পাঠিয়ে দিতে হ'চ্ছে।"

নারায়ণী শান্তভাবে বলিল, "ঠাকুরপোকে বলুন গে যান।" গোবিন্দনাথ অবাক্। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ছোট বাবুর বিলাত আপীলের শুনানীর তারিখ।—"

নারায়ণী বলিলেন, "আপনি ছোট বাবুকে সব বলুন গে।" গোবিন্দনাথ বুঝিলেন, কর্ত্রীর মন ভাল নাই। আর কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পরে সুরেন্দ্র আসিয়া নারায়ণীকে বলিল, "বৌদি, আমার বিলাত আপীল উঠিয়ে নিতে টেলিগ্রাম ক'রেছি। আর তোমার কোনও চিন্তা নাই।"

নারায়ণী বলিল, "হাঁ ভাই, আমার আর কোনও চিন্তা নাই। সব ভাবনা-চিন্তা একটি মানুষের সঙ্গে শেষ হ'য়ে গিয়েছে।"

সুরেন্দ্র বলিল, "গোবিন্দপুরে বড় গোলযোগ,—সেখানকার সদর খাজনার টাকাটা আমি এখান থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

নারায়ণী হাসিয়া বলিল, "এ সব কথা আমায় আর কেন বলছো ঠাকুর-পো?"

সু। ভালরে ভাল, তোমার বিষয় তোমাকে ব'লবো না তো কাকে ব'লবো।

নারায়ণী শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার বিষয়! আমার সব যে ঐখানে!" বলিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল।

পরদিন নারায়ণী উদ্যোগ করিয়া সমস্ত সম্পত্তির সম্বন্ধে সুরেন্দ্রের বরাবর ত্যাগপত্র রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

বর্ণ ও বিবাহ

[শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল]

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বর্ণ শারীর-ক্রিয়ার ফল। সুতরাং, বর্ণ বিভিন্ন হইলে, শারীর-ক্রিয়াও বিভিন্ন, বুঝিতে হইবে। শরীরের সহিত মনের যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহাতে শারীর-ক্রিয়া বিভিন্ন হইলে, মানসিক অবস্থাও বিভিন্ন হইবে; সুতরাং, স্বভাবও বিভিন্ন হইবে,—ইহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে।

অবনতি

ইউরোপিয়ান্‌দিগের সহিত ভারতীয়গণের বিবাহের ফলে যে সকল জাত হইয়াছে, এবং ইউরোপিয়ান্ ও নিগ্রোদিগের যৌন সম্বন্ধের ফলে যে সকল মুলেটো উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই দেহে ও মনে অবনত। তাহারা মেণ্ডেলের বিধান (১) মতে কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ শ্বেতবর্ণ, কেহ বা মাঝামাঝি বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে মেটে এবং কটাবর্ণের (২) ব্যক্তিগণ শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতায় পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় অপেক্ষাই বিশেষ ভাবে অযোগ্য হইয়াছে,

(১) ভারতবর্ষ, সপ্তম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ১৩২৬ আষাঢ়, ১৩০-১৩১ পৃঃ

(২) শ্বেতবর্ণের ব্যক্তিগণও অযোগ্য হয়, কিন্তু মেটে ও কটাদিগের ন্যায় নহে।

ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কুকুর ও শৃগালের যৌন-সম্বন্ধ-জাত, অথবা অশ্ব ও গর্দ্দভের যৌন-সম্বন্ধ-জাত অপত্যও পিতৃ-বংশ এবং মাতৃবংশ হইতে যোগ্যতায় হীন হইয়া থাকে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, অত্যন্ত বিভিন্ন ধাতুর নরনারীদিগের অপত্য যোগ্যতায় হীন হইয়া যায়। মানুষে মানুষে ধাতুতে (৩) ন্যূনাধিক বিভিন্নতা থাকিবেই। কিন্তু অতি অল্প বিভিন্নতা বিবাহ ব্যাপারে তাদৃশ অমঙ্গলজনক নহে। ধাতু শারীর-ক্রিয়ার ফল। সুতরাং, যাহাদিগের শারীর-ক্রিয়ার সমতা আছে, তাহাদিগের বর্ণ যেমন সম-শ্রেণীর হইয়া থাকে, তাহাদিগের অপত্যও তেমনই বিশেষ অবনত হয় না। শারীরিক ক্রিয়ার ফলে বর্ণ ও ধাতু উভয়ই নিয়মিত হয় (৪)। এই ক্রিয়ার সমতা, অথবা প্রায় সমতা থাকিলে, অপত্য তদনুরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু এই ক্রিয়ার গুরুতর প্রভেদ থাকিলে, [তাদৃশ নরনারীর] অপত্যের অবনত হওয়াই সাধারণ নিয়ম।

অন্তর্বিবাহ, বহির্বিবাহ (৫)

এক্ষণে, ধাতুর সমতা-অসমতা হইবার হেতু কি? তাহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। হেতু বহু-সংখ্যক আছে। তন্মধ্যে বিবাহ-প্রসঙ্গে যে দুইটি অতিশয় প্রয়োজনীয় কথা, তাহারই এস্থলে উল্লেখ করিব। এক রক্ত, এক মাংস যাহাদিগের, তাহাদিগের মধ্যে বিবাহ হইলে অন্তর্বিবাহ বলা যায়; বিভিন্ন রক্ত-মাংস যাহাদিগের, তাহাদিগের মধ্যে বিবাহ হইলে বহির্বিবাহ বলা যায়। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুইটি, এবং সগোত্র-বিবাহ ও অসগোত্র-বিবাহ সম্পূর্ণ পৃথক কথা। এক জাতি এবং এক গোত্র যেমন সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ, তেমনই অন্তর্বিবাহ অর্থাৎ অন্তর্জাতীয় বিবাহ এবং সগোত্র-বিবাহও পৃথক কথা।

দীর্ঘকাল অন্তর্জাতীয় বিবাহের ফলে যে সকল নর-নারী জাত হয়, তাহারা কালক্রমে দেহে ও মনে অবনত হইয়া যায়। ইহা প্রায় সত্য কথা। এ নিয়মের যে ব্যভিচার নাই, তাহা নহে; কিন্তু মানব-জাতির মধ্যে ইহার ব্যভিচার এত কম যে, ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিবেচনা করুন, রাম ও বিনোদিনীতে বিবাহ হইয়া ক্রমে পাঁচ-সাত-দশ পুরুষে বহু নরনারী জাত হইল। যদি এই সকল নরনারীর মধ্যেই দীর্ঘকাল বিবাহকার্য্য সীমাবদ্ধ থাকে, তবে কালক্রমে তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ হীনবীর্য্য ও অল্পায়ুঃ, এবং যোগ্যতাতেও অধঃপতিত হইয়া যাইবে। গো-পালক, মেষ-পালক ও অশ্ব-পালকগণ ইহা বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন। যে বংশে যে পীড়া বংশানুগত, যে বংশে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল, যে বংশে যে মানসিক অবস্থা অনুন্নত, তাহা সাধারণতঃ অন্তর্বিবাহের ফলে আরও স্থায়িত্ব লাভ করে। শারীর-ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়া অর্থাৎ "ধাতু" ঈদৃশ বিবাহে এতদূর স্থায়িত্ব লাভ করে যে, কালক্রমে অত্যন্ত সমতা প্রাপ্ত হয়। ইহারই অপর নাম জড়ত্ব। সুতরাং অন্তর্জাতীয় বিবাহ দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত হইলে, বংশানুক্রমে জড়ত্ব আনয়ন করে, এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। অন্তর্বিবাহের এই কুফল ডারুইন সম্পূর্ণ ভাবে অঙ্গীকার করেন নাই; তথাপি, ইহা এক্ষণে অস্বীকার করা যায় না।

যদি এই কথাই সত্য হইল, তবে জড়ত্ব হইতে মানবকে রক্ষা করিবার উপায় কি? উপায় নানাবিধ; কিন্তু এ স্থলে বহির্জাতীয় বিবাহের কথাই প্রাসঙ্গিক। দীর্ঘকাল এক রক্ত-মাংসের সংমিশ্রণে অপত্য উৎপন্ন হইতে-হইতে, বংশানুক্রমে যে জড়ত্ব উৎপন্ন হয়, তাহা বিভিন্ন রক্ত-মাংসের সংস্রবে অপনীত হইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় অথবা বিভিন্ন বংশীয় নরনারীর পরিণয় ফলে, জাতকের ধাতু পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে নব রক্তের সহিত নব শক্তি সঞ্চালিত হয়। সুতরাং, অন্তর্বিবাহের ফলে অপত্যে যে ধাতু-সাম্য অথবা জড়তা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বহির্বিবাহের ফলে অপনীত হইয়া, ধাতু-বৈষম্য উপস্থিত হইল। ইহাও সম্পূর্ণ মঙ্গলজনক নহে। দীর্ঘ কাল বহির্জাতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হইলে এতদূর ধাতু-বৈষম্য জাত হইতে পারে যে, তাহার ফলে অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, ভিন্নজাতীয় পীড়া ইত্যাদি বংশমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। এরূপ হইলে এতদ্দেশীয় ভাষায় তাহাকে "বায়ুজনিত ক্ষোভ" বলা যাইতে পারে। সমাজের পক্ষে ধাতু-সাম্য অর্থাৎ জড়তা যেরূপ দূষণীয়, ধাতু-বৈষম্য অর্থাৎ অতিমাত্র

---

(৩) Constitution, temperament.

(৪) এস্থলে জন্মান্তরবাদ বিবেচনা করা হইল না।

(৫) অন্তর্জাতীয় ও বহির্জাতীয় বিবাহকে সংক্ষেপে অন্তর্বিবাহ বহির্বিবাহ বলিয়াছি।

অস্থিরতাও তদ্রূপই। উভয়েরই পরিণামে সমাজ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং, দুর্ভাগ্য মানব কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে?

আত্মরক্ষা

প্রকৃতপক্ষে, মানবের আত্মরক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করা বোধ হয় অসম্ভব। মানবের সহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই এক দিন সেই অনাদি আদি-কারণে নিমজ্জিত হইবেই। সে যাহা হউক, ব্যাবহারিক জগতে সমাজ-রক্ষার, মানবজাতিকে রক্ষার নানাবিধ উপায়ের মধ্যে, বিবাহ-বিষয়ক উপায়, বোধ হয়, অন্তর্জাতীয় ও বহির্জাতীয় বিবাহ-প্রণালীর সংমিশ্রণ। অন্তর্জাতীয় বিবাহই এক্ষণে মানবগণের মধ্যে স্বাভাবিক ও অতিমাত্র ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহার কুফল দৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইলেই, বহির্জাতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কিছু কাল এই ভাব সমাজে প্রচলিত থাকিলে, কালক্রমে ইহারও কুফল-সকল দৃষ্টিগোচর হইতে আরম্ভ করিবে। তখন পুনরায় অন্তর্জাতীয় বিবাহ-প্রথা প্রবর্তিত করা সঙ্গত। এইরূপে একের পর অন্য অনুষ্ঠিত হইলে সমাজের মঙ্গল (৬); নচেৎ নিরবচ্ছেদে একই প্রথা আচরিত হইলে, মানব কাল-ক্রমে অবনত হইয়া যাইবেই (৭)।

হিন্দুসমাজ

বলিয়াছি, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, সকল মানবই অন্তর্জাতীয় বিবাহের পক্ষপাতী। কেহই আপন জাতি ত্যাগ করিয়া সহজে অন্য জাতি মধ্যে বিবাহ করিতে সচরাচর ইচ্ছা করেন না। সুতরাং, সকল সমাজই ন্যূনাধিক অবনত হইতেছে। এ সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের দশা অতি ভয়ানক। এই সমাজ নানা মেলে ও পটীতে বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গণ্ডীর সৃষ্টি করিয়াছে যে, বিবাহ-কার্য্য দীর্ঘকাল সেই সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকায়, অন্তর্বিবাহের কুফল-সকল বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে; ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ঈদৃশ দশা বহির্জাতীয় বিবাহ শনৈঃ-শনৈঃ প্রবর্তিত না হইলে, জাতীয় অধঃপতন অনিবার্য্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। এই সমাজের মঙ্গলকামিগণের কর্ত্তব্য যে, এখনও সময় থাকিতে ক্ষেত্র বিবেচনায় বহির্জাতীয় বিবাহের অনুষ্ঠান করেন। হিন্দুসমাজ যখন মানবসমাজের অগ্রণী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন সবর্ণ এবং অসবর্ণ উভয় প্রকার বিবাহই অনুষ্ঠিত হইত। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার বিধি তো আছেই, নিষেধ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

এক্ষণে স্মরণ করুন, এক রক্ত-মাংস হইতে পুনঃ পুনঃ বংশ গঠন করিলে, অন্তর্বিবাহের ফলে কালক্রমে সেইসকল বংশে ধাতু-সাম্য অথবা জড়ত্ব উৎপন্ন হয়। হিন্দুসমাজে তাহা হইতেছে। এ সমাজে কালক্রমে প্রত্যেক গণ্ডী অপর গণ্ডী হইতে ধাতুগত বৈষম্য ন্যূনাধিক প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এ বৈষম্যের মাত্রা অত্যন্ত অধিক নহে। ব্রাহ্মণ-বংশে অন্তর্বিবাহের ফলে যেরূপ ধাতুগত সমতা উৎপন্ন হইয়াছে, এবং কায়স্থ-বংশেও ঐ কারণে যেরূপ ধাতুগত সাম্য উপস্থিত হইয়াছে, এতদুভয় বিভিন্ন শ্রেণীর হইলেও, ইংরেজ, ফরাসী, কাফ্রি সমাজের ধাতুগত বৈষম্য অপেক্ষা অনেক ন্যূন। শেষোক্তগণের ধাতু-বৈষম্য ব্রাহ্মণ-সমাজের তুলনায় অত্যন্ত অধিক; কিন্তু ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ধাতু-বৈষম্য ততদূর নহে। এই কারণে বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণগণের সহিত কায়স্থগণের পরিণয়ে বিভিন্ন ধাতু ও বিভিন্ন রক্ত সংমিশ্রণের ফলে বর্ত্তমান জড়ত্ব দূর হইয়া মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-বংশের সহিত ইংরেজ, ফরাসীদিগের অতিমাত্র বিভিন্ন রক্ত সংমিশ্রিত হইলে অপত্য অধঃপতিত হইয়া যাইবেই।

বিবাহের গণ্ডী ক্ষুদ্র হইলে যোগ্য বর-কন্যা বাছিয়া লওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে, যোগ্য-অযোগ্য বিচার করিবার অবসর থাকে না। সুতরাং যা' তা' গ্রহণ করিতে

---

(৬) There seems much to be said for his (Reibmayr's) thesis that the establishment of a successful race or stock requires the alternation of periods of in-breeding in which characters are fixed, and periods of outbreeding in which, by the introduction of fresh blood, new variations are promoted.

—Thomson's Heredity (1908) page, 536.

(৭) এতদুভয় প্রকার বিবাহ যুগপৎ অনুষ্ঠিত হওয়াও মঙ্গলজনক। এক সময়েই সমাজের বিভিন্ন অংশে উহারা বিভিন্ন প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। প্রাচীনকালে এইরূপই ছিল।

এইভাবে যদৃচ্ছাক্রমে যেমন-তেমন নরনারীদিগকে করিতে-করিতে দীর্ঘ কালে বংশ অধঃপতিত যাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক, প্রায় নিশ্চিত উঠে।

রূপ স্থলে বিবেচনা পূর্ব্বক বহির্বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া য় মঙ্গলজনক। এ স্থলেও যোগ্যাযোগ্য বিচার কার্য্য করা সঙ্গত। অযোগ্য সর্ব্ব ক্ষেত্রেই য়। যোগ্য বরকন্যা যেখানেই পাওয়া যায়, সবর্ণে-র্ণে যেখানেই সুপ্রাপ্য হয়, তাহাই গ্রহণীয়।

বর্ণ ও যোগ্যতা

স্মরণ করুন, বর্ণভেদ ধাতুগত ভেদকে সূচনা করে। তরাং, যখন বিভিন্ন ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পরিণয় দ্বারা তীয় জড়ত্ব দূর করা আবশ্যক হয়, তখন বিভিন্ন বর্ণকে বাহিত করা সঙ্গত। এ কথা জাতি সম্বন্ধেও যতদূর ত্য, কোন নির্দ্দিষ্ট বংশ সম্বন্ধেও ততদূর সত্য। কিন্তু তিমাত্র বর্ণভেদবশতঃ যে ধাতুগত প্রবল বৈষম্য হইয়া থাকে, তাহা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিয়া এ স্থলেও কার্য্য করা উচিত। তদ্রূপ বিবাহ সঙ্গত নহে।

বর্ণ শারীর-ক্রিয়ার ফল; সুতরাং মানসিক অবস্থাও সূচনা করে। শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপরই ধাতু নির্ভর করে। যোগ্যতা অযোগ্যতা ধাতুগত, ইহা বলিলে অসঙ্গত হয় না। ধাতু ও বেষ্টনী (৮) উভয়ই যোগ্যতার নিয়ামক। সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে য, বর্ণ অনুসারে যোগ্যতা-অযোগ্যতা উপলব্ধি করা বহু ক্ষেত্রেই সম্ভব। বর্ণই যোগ্যতার একমাত্র জ্ঞাপক নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু বর্ণকে উপেক্ষা করা যায় না; বরং উহা যোগ্যতার অন্যতর সূচক, ইহাই অঙ্গীকার করিতে হয়। উত্তরবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে একটা প্রবাদ বাক্য আছে, "কাল বামণ, কটা (৯) শূদ্র; কোথা যাও নির্ব্বংশ্যার পুত্র।" যাঁহারা এই প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করেন, তাঁহারা তাহার সহিত স্বভাব-চরিত্রের যোগ থাকা বিশ্বাস করেন। যদি বা সর্ব্বস্থলেও বিশ্বাস না করেন, অন্ততঃ অধিকাংশ স্থলে বর্ণের সহিত স্বভাবের যোগ থাকা তাঁহারা অবশ্যই বিবেচনা করেন। নচেৎ ঈদৃশ বাক্য রচিত হইত না, এবং তাহা সাধারণ্যে প্রবাদ বলিয়া ব্যবহৃত হইত না।

অন্য পথে আলোচনা করিয়াও আমরা দেখিলাম, বর্ণ হইতে দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া, সুতরাং ধাতু উপলব্ধি করা অসঙ্গত নহে। ঠিক এই হেতুতেই ধাতু হইতে যোগ্যতা-অযোগ্যতাও অনুমিত হইতে পারে। আমার মনে হইতেছে, যেন মল্লিনাথ এক স্থলে বলিয়াছেন, "যত্র রূপং তত্র গুণাঃ।" এ বাক্য তিনিও অন্যত্র হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এইরূপ স্মরণ হয়। সুতরাং, ইহা অবশ্যই নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, এই বাক্যের এবং উপরে লিখিত প্রবাদ-বাক্যের মূল ভিত্তি স্বরূপে যুগ-যুগান্তরব্যাপী ভূয়োদর্শন বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান জীব-বিজ্ঞানও এ সকল বাক্যের সত্যতা অস্বীকার করে না। শাস্ত্রে জাতিভেদকে বর্ণভেদ বলা হইয়াছে; এবং বর্ণ "গুণ-কর্ম্ম" অনুসারে নিয়মিত হয়, ইহাও সূচিত হইয়াছে।

সাময়িক যোগ্যতা

পরিশেষে বিবেচনা করা আবশ্যক যে, বিবাহ ব্যক্তিগত প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় বলিয়া সভ্য-সমাজে আর স্বীকৃত হইতেছে না। পুত্রার্থ অর্থাৎ বংশ-পরম্পরায় সুযোগ্য সন্তান সন্ততি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হওয়া উচিত। সমাজ উন্নত করিতে এবং উন্নত রাখিতে হইলে, বিবেচনাপূর্ব্বক যোগ্য নরনারীদিগকে পরিণীত করিতে হয়, —এ পন্থা উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। যোগ্য নরনারী পরিণীত না হইলে সুযোগ্য অপত্য লাভের অন্য উপায় নাই, ইহা প্রায় (১০) সর্ব্ব স্থলেই স্বীকৃত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সুতরাং, বর্ণ যদি যোগ্যতার সূচক হয়, তবে ইহা বিবাহ কর্ম্মের আংশিক নিয়ামক রূপে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু যোগ্যতা কি? আমি বহুবার বুঝাইয়াছি, যে সমাজে, যে সময়ে, যে গুণের প্রয়োজন, সেই সমাজে সেই সময়ে সেই গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে যোগ্য বলা যায়। এই শব্দের অন্য কোন অর্থ নাই। সর্ব্ব সময়ে, সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্ব সমাজে এক প্রকার গুণশালী ব্যক্তিকে যোগ্য বলা যায় না।

(৮) পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

(৯) ফর্সা।

(১০) পণ্ডিতগণ যাহাকে sport বলেন, তাহা যোগ্য-অযোগ্য সকল স্থলেই উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা "গোবরে পদ্ম ফুলের" ন্যায় অতি বিরল।

অর্থাৎ, কোন নির্দ্দিষ্ট সমাজকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর জয়যুক্ত করিয়া পতিত অবস্থা হইতে উন্নত করিতে হইলে, সেই সমাজে যেরূপ গুণান্বিত ব্যক্তির প্রয়োজন, তদ্রূপ গুণান্বিত ব্যক্তি সেই অবস্থায় যোগ্য বিবেচিত হন। কোন ভীরু সমাজকে সাহসী করিতে হইবে; তখন যে সকল গুণের উপর সাহস নির্ভর করে, সেই সকল গুণের অধিকারী ব্যক্তিই যোগ্য; অর্থাৎ সে সমাজের পক্ষে তৎকালে উপযোগী। যোগ্য-অযোগ্য শব্দদ্বয় এই ভাবে বুঝিলে, তদনুরূপ গুণান্বিত নরনারীদিগকে যৌন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিতে হয়; তবেই সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

এই কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইলে, বিবাহ-কার্য্যে গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা চলে না। কারণ, গণ্ডীর মধ্যে তদ্রূপ গুণযুক্ত নরনারী না থাকিতে পারে; অথবা দুর্ল্লভ হইতে পারে। তখন পতিত সমাজকে উন্নত করিতে হইলে, বিবাহ ব্যাপারে সবর্ণা-অসবর্ণা বিচার করা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া গণ্য হয়। প্রাচীন কালে এরূপ বিচার করা হইতও না। যাহা হউক, এতদ্দেশে নানা কারণে উচ্চ-বর্ণের অর্থাৎ উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণই যোগ্যতায় নীচবর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখা যাইতেছে। সুতরাং, সাধারণতঃ, উচ্চবর্ণের নরনারীই বিবাহ-ক্ষেত্রে প্রশস্ত গণ্য হইতে পারে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণে অযোগ্য ব্যক্তি দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি গ্রহণীয় নহে; বরং, যদি নীচবর্ণ মধ্যে যোগ্য যোগ্যার সদ্ভাব থাকে, তবে বিবাহ ক্ষেত্রে তাহাই গ্রহণীয়। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি, ইহা আংশিক সত্য। বর যদি রত্ন হন, তাঁহাকেও দুষ্কুল হইতে গ্রহণ করিতে হয়। কারণ পুং-বীজ ও স্ত্রী-ডিম্ব (১১) মিলিত হইয়া উভয় ক্ষেত্রেই তুল্য ফল উৎপাদন করে। স্ত্রী-কোষ এবং পুং-কোষের মিশ্রণে যে যুক্ত কোষ (১২) গঠিত হয়, তাহা অনুলোম-প্রতিলোম উভয় স্থলেই তুল্যধর্ম্মী। সুতরাং, যোগ্য নরনারী যেখানে প্রাপ্য হয়, সেই স্থান হইতেই গ্রহণীয়। কেবল অত্যন্ত বিভিন্ন ও বৈষম্যযুক্ত ধাতুর নরনারী গ্রহণীয় নহে। অল্প প্রভেদযুক্ত নরনারীর বিবাহ মঙ্গলজনক। কিন্তু যথাক্রমে অথবা যুগপৎ, অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ-প্রথা অবলম্বনপূর্ব্বক সম-এবং কিঞ্চিৎ-অসম-ধাতুর নরনারীদিগকে পরিণীত করাই মানব-সমাজের বিশেষ কল্যাণকর। এ কথা বিস্মৃত হইলে কোন সমাজই অধঃপতন হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। আমি বলি, ইহাই পতিতোদ্ধারের মূল মন্ত্র।

(১১) Spermatozoon এবং ovum

(১২) Zygote.

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

২৮

অসীমার ভাবী-শ্বশুর হুগলী জজ-আদালতের একজন নামজাদা উকিল। তাঁর এই তৃতীয় পুত্রটী থার্ড ইয়ারের ছাত্র; বড় দুইটির একটিও বেশ রোজগারে। গায়ে-হলুদের তত্ত্ব লইয়া প্রায় জন-পঁচিশেক লোক ক'নের বাড়ী বেলা তিনটের সময় আসিয়া পৌছিল এবং কৈফিয়ৎ দিল যে, তাহাদের ট্রেণ ফেল হইয়াছিল বলিয়া এরূপ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। নাপিত অনায়াসেই হলুদটুকু ও হলুদমাথার সাড়িখানা হাতে করিয়া সেই সন্ধঃছাড়া চলন্ত গাড়ীতেই উঠিয়া পড়িতে পারিত; তা সেই 'অজবুক অথর্ব্ব মিন্‌ষে' হাবা গঙ্গারাম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—তা উহারা আর কি করিবে? তবু সকাল হইতে তাহাকে 'পই পই' করিয়া বলা হইয়াছিল যে, সে সবার আগে যেন বাহির হইয়া ষ্টেশনে চলিয়া যায়,—কথা কি কেহ কাহারও শোনে?

কনে একাদশবর্ষীয়া অসীমা ক্ষুধার তাড়নায় হাতাইয়া তখন শুইয়া পড়িয়াছে। কনের বাপ জগদিন্দ্র,—'এ কিরূপ আত্মগর্ব্বে অবিবেচক বৈবাহিক খুঁজিয়া জুটান হইল?' এই রূঢ় প্রশ্নের উত্তর প্রদানে নিজেকে একান্ত অসমর্থ বোধে, নিরুত্তরে মাথা চুলকাইয়া গড়গড়ায় 'তাওয়া' সাজার লোকাভাবে বিয়ে বাড়ীর একটা ডাবা হুঁকায় কোনমতে বিষণ্ণ চিত্তে তামাকু টানিতেছিলেন। ক'নের

তিক্ত-বিরক্ত চিত্তে সবারই ত্রুটি ধরিয়া ফিরিতে-ন। নিমন্ত্রিতাগণ বাড়ীর ভাবগতিক দেখিয়া, এখানে সিয়া পড়ায় যেন অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া চুপচাপ রিয়া বসিয়া কোথাও বা আপোষের মধ্যেই মৃদু-মৃদু স্বরে স্থিত সমস্যার বিষয়েই আলোচনা করিতেছিল; সঙ্গে-ঙ্গ এই রকম বিভ্রাট আর কোথায়-কোথায় ঘটিয়াছিল, াহার শতকরা হিসাবে নজীর জমা হইতেছিল। এমন য়ে শাঁখের শব্দে চকিত হইয়া, যে যেখানে ছিল ব্যস্ত-মস্ত হইয়া, সদর-অন্দরের সন্ধিস্থলে যেখানে ভিতর-বাটীর বেশ-দ্বার, সেইদিকেই ছুটিল, এবং আশ্বস্ত হইয়া দেখিল, সীমার গায়ে-হলুদের হলুদ ও আইবড়-ভাতের তত্ত্ব াসিয়াছে। যাহারা কুটুম্ব, তাহারা তত্ত্ব দেখিবার জন্য ব্যগ্র ইয়া, সেইখানেই দাঁড়াইয়া বা বসিয়া পড়িল; আর যাহারা াত্মীয় তাহারা মেয়ের কপালে হলুদ ছোঁয়াইবার জন্য নজেরা ব্যস্ত হইয়া এবং অপরকে তাগিদ দিয়া সোরগোল াধাইয়া তুলিল। এমনই হুলস্থুলের মধ্যে বাপের-বাড়ীতে মজ ভাইএর সেজ ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ সারিয়া াজরাণী ননদের মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিল।

অরুর মা অবশ্য পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন; তবে খুব কালে তিনিও আসিয়া পৌছিতে পারেন নাই; যেহেতু, সদিনকার তিথিটা ছিল দ্বাদশী, কাজেই দুইটা ভাত মুখে া দিয়া বিয়ে-বাড়ী আসা চলে না। তবে নাতিনীর গায়ে লুদ দেওয়া দেখার সাধ ছিল বলিয়া, তিনি খুব সকাল-কালই আসিয়াছিলেন। গায়ে হলুদের তখন কোথায় কি! ছলের দলে ভিড়িয়া গেলেও অজিতের এই সম্পূর্ণ অপরিচিত রাজ্যে বড় বেশি বাধো-বাধো ঠেকিতেছিল। নে-মনে অনেক যুক্তিতর্ক খাটাইয়াও সে তাহার পিসিমার রকে ঠিক আপন করিয়া লইতে পারিতেছিল না। কুণ্ঠায় ও লজ্জায় থাকিয়া-থাকিয়া সে কেমন যেন মুষড়িয়া যাইতে-ছিল। তার উপরে, মায়ের সহিত বিচ্ছেদটাও মন বেশিক্ষণ হ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। এই উৎসব-মুখরিত, কালাহলপূর্ণ, অপরিচিত রাজ্য ছাড়িয়া নিজেদের শান্ত, নিঃস্তব্ধ গৃহপ্রান্তে মায়ের কোলের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার ন্য অজিতের প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছিল। কিন্তু সুবোধ ালক সে কথা প্রকাশ করিয়া পিসিমার মনে ব্যথা দিতে কুচিত হইতেছিল। সে জানিত, সে বিবাহ না দেখিয়া ফিরিয়া গেলে, এই স্নেহময়ী পিসিমাটি অত্যন্ত দুঃখিতা হইবেন। তা ভিন্ন অজিত তো এখনও তাহার পিতাকে দেখে নাই! সেই লোভেই যে, সে এতদূরে মা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

এক সময় পিসিমাকে একা দেখিয়া সে তাহার কাছে আসিল। "অজু! তোর ভাই-বোনরা সব কোথা গেল রে? তুই একা-একা বেড়াচ্চিস যে!" "না ওদের কাছেই তো ছিলুম।—পিসিমা?" "বাবা?" অজিত ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। শরৎ আলমারি খুলিয়া তথা হইতে কি একটা আবশ্যক বস্তু খুঁজিতেছিল,—হঠাৎ সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া শিশুর দিকে চাহিল। অজিতের মুখ ঈষৎ ফিরানো,—ভাল দেখা যায় না; কিন্তু মানসোদ্বেগের ছায়া সে মুখে যে কতখানি ঘন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আভাষ পাওয়া যায়। শরৎ স্নেহে বিগলিত হইয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "কিরে অজুমণি! কি বল্‌বি বল্ না? কিছু দেখতে যাবি? জু আর মিউজিয়মে তো কাল সারা দিন ঘুরে এসেছিস্! আর কি? থিয়েটার?"

বালক—পিসিমা যে হাতটা তাহার মাথার উপর রাখিয়া-ছিল, সেই স্থূল হাতখানা দুই হাতে টানিয়া আনিয়া, তাহারই আশ্রয়ে মুখ লুকাইয়া ফেলিয়া, সবেগে ঘাড় নাড়িল। শরৎ হাসিয়া তাহার অর্দ্ধ-প্রকাশিত ললাটে চুমা খাইল— "তা'হলে কোথায় যেতে চাস্ বল্ দেখি? আমি হেরে গেলুম।" তথাপি সে জবাব না দিয়া, পিসিমার কাছে যখন আরও একটু ঘেঁষিয়া আসিল,—কুণ্ঠায় ও সঙ্কোচে তাহার হাতের আঙ্গুলগুলি কাঁপিতেছে, শরতের নজরে পড়িল। তখন ঘোরতর বিস্ময়ের সহিত সে শিশুকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিল,—"বাবা অজিত! কি হয়েছে বাবা? মায়ের জন্যে মন কেমন করচে? বাড়ী যাবে?"

এবারও লুকান মুখ না তুলিয়াই অজিত আবার তেমনি করিয়া ঘাড় নাড়িল। তার'পর অস্ফুট কণ্ঠে কহিয়া ফেলিল, "এখনও তো বাবাকে দেখা হয় নি, যাব কি করে?"

শরতের মুখ গম্ভীর হইয়া চোখ ছলছলিয়া উঠিল। চেষ্টা-রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস যথাসম্ভব সন্তর্পণে মোচন করিয়া, সে শিশুকে নিজের সমস্ত অন্তরের স্নেহ-প্রীতির নির্ঝর ঢালিয়া দিয়া যেন ভরাইয়া দিতে চাহিয়া কহিল, "দেখবে বই কি বাবাকে ধন, দেখবে বই কি। বিকেলে তোমার পিসেমশাই গিয়ে

ধরে আনবেন বলেছেন।" তার পর কতকটা আত্মগতই গজগজ করিয়া বলিল, "কালই তো রাত্রে নেমন্তন্ন করেছিলুম, তা' বাবুর আসা হলো কই? বলে পাঠালেন, জ্যেঠশ্বশুরের ছেলে বিলেত যাচ্চে, তার বিদায়-ভোজের নেমন্তন্নে না গেলে দুঃখ করবে। ঢের-ঢের ছেলে সংসারে আছে—এমন শ্বশুরবাড়ী-ভক্ত কিন্তু আর দুনিয়ার মধ্যে নেই!"

"আমিই তো সেখানে পিসেমশাইএর সঙ্গে যেতে পারি। পারিনে পিসি মা? যদি না,—যদি না বাবার আসবার সুবিধে হয়। যদি না আজও আসতে পারেন। আর হাবড়া সেই ইষ্টিশনের কাছেই তো? সেই বা কি এমন দূর, কারুকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটেও তো আমি সেখানে—"

"ওরে বাবা! সে কি তুই হেঁটে যেতে পারিস্ পাগল! আচ্ছা, আমি এক্ষুনি এই চট্ করে পৈতে ক'টা দিয়ে আসছি, দাঁড়া।" এই বলিয়া সত্য-মিথ্যার স্তোকে শিশুকে অর্দ্ধ-আশ্বস্ত করিয়াই, তাহার বিপন্ন পিসিমা এক প্রকার ছুটিয়া পলাইল।

উঃ, কেমন করিয়া সংসারের মসীরেখাহীন, সরল এই শিশুকে সে তাহার প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া দিয়া বলিবে, "সেখানে, সেই তোমার পরম পূজ্য পিতৃদেবের গৃহে তোমার স্থান নাই! এততেও যে আজও নিজের এত-বড় দুর্দ্দশায় অজ্ঞ রহিয়া মনের শান্তিটুকু এখনও হারাইয়া ফেলে নাই, দু'দিন মাত্র কাছে পাইয়া কাজ কি সাত-তাড়াতাড়ি—ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী—সেই মহাদুঃখের মধ্যে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলায়? যে কটা দিন এমন করিয়া কাটে কাটুক না। কিন্তু সেই পিতৃনামের অযোগ্য অকৃতজ্ঞের পায়ে ঢালা এ অকৃত্রিম পূজার অঞ্জলি,—এ যে আর সহ্য হয় না! সে কি ঐ জিনিস পাইবার উপযুক্ত? সবটাই যে এর চুরি!

একটা নির্জ্জন ঘরের মধ্যে মাকে আনিয়া, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তার পর, অজিতকে যখন ডাকিয়া আনা হইল, এবং সে ঠাকুমাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার চোখের-জলে-ভিজা কোলের মধ্যে স্থান পাইল,—তখন শরতের মনের পাথর এতটুকু যেন হাল্কা হইয়া নড়িয়া উঠিল। একটা কর্ত্তব্য সে সম্পন্ন করিয়াছে। মা আর ক'দিন? তাঁহার বংশধরের এই চাঁদ মুখখানি একবারও চোখে দেখা তাঁহার দরকার ছিল যে।

ব্রজরাণী বাড়ীতে পা দিয়াই দেখিল, যে ভয়ে সে ননদের রাগ মাথায় লইয়াও পূর্ব্বাহ্ণে আসা কাটাইবার জন্যই ভাইপোর অন্নপ্রাশনটাকে একটা অছিলার মত দাঁড় করাইয়াছিল, নইলে আজ সেখানে এমন বিশেষ ঘটা-পটা ছিল না যে, তাহার যাওয়া একান্তই আবশ্যকীয় হইয়া পড়ে, —এখনও সেই গায়ে হলুদের ব্যাপারটাই বাকি! মনে-মনে হাসিয়া সে ভাবিল, সেই যে কথায় বলে, 'যাহারে ডরাও তুমি, সেই দেবী আমি', আমার ভাগ্যে দেখছি ঠিক ঐটিই ঘটে। মনে করলুম, আমি থেকে যদি এদের মেয়ের আবার কোন অমঙ্গল-টল ঘটাই,—কাজ কি বাপু, আমি না হয় পরেই আসবো! 'তা' দুটো বাক্যি না শুনে তো আর আমার রাত হবে না, আমার জন্যেই বসে আছে!

ছোট-বৌ বীণার সঙ্গে ব্রজরাণীর একটু হৃদ্যতা ছিল। তাহাকে আজ ঘরে পাইবার আশা না থাকিলেও, সেই দিকেই যাইতে যাইতে রাণী দেখিল, আর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে কনে'র খুড়ি ও মাসি এক হাত করিয়া হলুদ মাখিয়া হাসিতে-হাসিতে আসিতেছে।

"ওগো কনে'র মামি! কুটুমের বেহদ্দ হয়েছ যে দেখ্‌ছি। বলি, আর একটু পরে, কর্ত্তাটিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে, একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে এলেই হতো।"

"তুই তো বল্লি ভালো! বরকে ঘুম পাড়ালেই বুঝি খুব নিশ্চিন্দি হওয়া যায়? শূন্য ঘরে ঘুম ভেঙ্গে যদি বর ডরিয়ে ওঠে, তখন?"

"যাঃ, এটা একেবারেই বেহায়া রে! এর সঙ্গে এঁটে ওঠ্‌বার যো নেই! নাও, তাহলে একটু হলুদ মাখো! তুমি সাঁজ জ্বেলে এসেছ বলেই তো আর আমাদের গায়ে-হলুদ ফুরোয়নি।" এই বলিয়া কনে'র কাকীমা নিজের হরিদ্রা-রঞ্জিত ছোট হাতখানি প্রদর্শন করিলেন।

ব্রজরাণী সভয়ে নিজের বেগুনফুলের রংয়ের উপর জরির আখপাতা ডুরে টানা পাতলা বেণারসীখানার দিকে চাহিয়া তিন পা পিছাইয়া গেল। যোড়হাত করিয়া বলিল, "দোহাই তোর! দিস্‌নে ভাই, মাটী হয়ে যাবে, সাড়ীখানা একেবারে নতুন!"

"তবে পরে এলে কেন? জানই তো, আজ কনে'র মামী-মাসীদের ভাল করে হলুদ মেখে নতুন করে নিজেদের বিয়ে ঝালাতে হয়, তা নৈলে কনেকে বর ভালবাসে না।"

ফুলিয়া উঠিল, "বাঃ! আবার আমায় জড়ান হচ্চে আমি তো দিদির কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে পেয়ে গেছি,—খোকার অসুখ, গা-টা ধোবার যো —রং মেখে কি সং হয়ে থাকবো?"

"না হয় তাই থাকলেই,—মেয়ের বর যদি তাতে কে ভালই বাসে—"

"তবে দাও ভাই, সাড়ীখানাই না হয় আমার গেল। ক তো ঠাকুরঝি আমায় কতই ভালবাসেন,—তার উপর দি শোনেন যে, আমি তাঁর মেয়ের কল্যাণ করিনি, তাহলে আমায় ঝাঁটা-পেটা করবেন!"

বীণা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, নিজের হাতের খান হলুদের ছোপটা আর কাহাকেও না দিয়া, নিজেরই আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা বাবু, তোমাদের অত বভীষিকা দেখবার দরকার নেই;—কনে'র কাকীমা আজকের দিনে হলুদ মাখলেই সর্ব্বসিদ্ধি হবে।"

তখন এই অতি চমৎকার সহজ পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ায়, ও কনে'র মাসী এবং মামী নিজেদের বস্ত্র সমস্যার হস্ত ইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মনের মধ্যে হাল্কা হইল। উষাও তখন নিজের হাতটা তাহারি পিঠের কাপড়ে মুছিয়া দিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল, "ঠিক বলেছ ছোট বৌ! মামী-মাসীরা শুধুই মেয়েকে ভালবাসাতেই পারে, কিন্তু কাকী ভিন্ন আর কেউ তো জামাইকে মেয়ের ভেঁড়া বানাতে পারে না বাপু।"

বীণা দুষ্টামির হাসি হাসিতে লাগিল, "দেখছিস্‌নে, তোর-আমার কাকী নেই বলে আমাদের বর আমাদের যে ভাল-বাসে না তা নয়; কিন্তু বৌদিদি আমাদের দাদামশাইকে যেমন "ভ্যা" করাচ্ছেন, তেমন কি আর আমরা পেরেছি?"

ব্রজরাণী সাদা মুখ রাঙা করিয়া বীণার বাহুমূলে একটা শক্ত চিম্‌টি কাটিল।

এমন সময় সসব্যস্ত কনে'র মা কি একটা দরকারী কাজে সেই পথ দিয়া যাইতে-যাইতে, এই তিনটি সমবয়সী যুবতীকে বিয়ে-বাড়ীর কাজ-কর্ম্মের সমস্ত দায়িত্ব বিসর্জ্জন দিয়া হাসিরঙ্গে মাতিয়া থাকিতে দেখিয়া, জ্বলিয়া উঠিয়া বলিয়া গেল, "ছোট বৌ, উষী! তোদের কাণ্ডখানা কি বল্ তো শুনি? মেয়েটাকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে চন্দন-টন্দন পরিয়ে দিবি, তত্ত্বর থালা-টালাগুলো আজাড় করবি, কুটুমবাড়ীর লোকেদের খেতে বসান হয়েছে, দেখে-শুনে তাদের বিদায়-টিদায় করতে হবে, নেমন্তন্নর মেয়েদের পাতা-টাতা করে বসাবি,—তা' না, নেমন্তন্নির মত নিজেরাই সেজে-গুজে আল্‌গা-আল্‌গা ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লি!"

সবার মুখেই হাসি মিলাইয়াছিল। অতঃপর উষাকে কনে সাজাইতে পাঠাইয়া, ব্রজরাণীকে লইয়া ছোট বৌ তত্ত্বর জিনিস-পত্র তুলিতে গেল। উষার চেয়ে ব্রজর চুল বাঁধা ও মুখে রং-চং লাগান অনেক পরিষ্কার হয়,—তাহাকেই এই কাজটার ভার সেই জন্য প্রথমেই দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কোন মতেই সে ইহাতে স্বীকৃতা হইল না। "আমায় কি করতে আছে?" বলিয়া সে পিছাইয়া দাঁড়াইল। "সে কি ভাই! কেন থাকবে না? তুমি কি?—ওঃ—তা আপনার লোক,—কিছু দোষ হয় না ওতে।" ব্রজ সদৃঢ় ভাবে ঘাড় নাড়িল, "না, আমি দোব না, তোমরা কেউ দাও গে যাও।" বলিয়া সে পিছন ফিরিল। চলিয়া যায় দেখিয়া, ছোট বৌ অগত্যা ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল, "তাহলে ছোড়দিই কনে সাজাক্,—তুমি ভাই তত্ত্ব আজাড় করবে এসো।"

"সে যদি আমায় ছুঁতে না থাকে?" ছোটবৌ রাগ করিয়া, তাহার গালে একটা ঠোনা মারিয়া, ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "নাঃ! তোমার কিছুই ছুঁতে নেই! কেন, আমার দাদা কি হাড়ি, আর তুমি হাড়ি-বৌ?" ব্রজরাণী হাসিয়া ফেলিয়া উত্তর করিল, "তা কেন, দাদা তোমার কুলীন কায়স্থ সন্তান; তাঁর তো কোন অপরাধ লাগে না,—তাঁরা যে পুরুষ। শাস্ত্রে বলে বলীয়সাং ন দোষায়। আমিই বাগ্‌দিনী।" "দাদা যদি কায়স্থ আর তুমি যদি বাগ্‌দিনী হও, তাহলে তোমার বুঝি আর একটি—" "দূর! তোর যা মুখ হচ্চে দিন-দিন আঁস্তাকুড়!" "আহা! উনি নিজেই বল্লেন,—এখন আমার মুখের হলো যত দোষ!" "মরণ! আমি যেন তাই বল্লুম!" "তবে কি বল্লি ভাই, তাই না হয় আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দে না। দাদা এক জাত, আর তুই অন্য জাত হ'লে তাতে কি করে যে—" "তোরা তো বেহায়া কম নোস্! আবার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ছ্যাব্‌লামী করতে লাগ্‌লি? ঐ দেখ, আবার দিদি এদিকে আস্‌চে! আমার অত বুকের পাটা নেই বাবু; আমি এই পালাই, তোরা বকুনি খেয়ে মর।"

(২৯)

ঠাকুরমার অনেক দিনের জমান, অনেক দুঃখ গলান চোখের জলে স্নান করিয়া বিস্মিত, ঈষৎ মাত্রায় ভীত ও অনেকখানি পুলকিত চিত্তে অজিতকুমার পিসিমার বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে যখন বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, তখন সে স্বপ্নেও যে সব দৃশ্য কল্পনা করে নাই, সেই সব দৃশ্যই সে চোখে দেখিয়া আসিল। ঈডেন গার্ডেন নামটা শুনিয়া তাহার মনে অবশ্য ইহার আদর্শটা খুব বড় হইয়াই উঠিয়াছিল। স্বর্গোদ্যান,—সে না জানি কেমন! আদম আর ইব, তারা ঐখানেই তো ছিল! আহা বেচারারা! —শুধু-শুধু সয়তানের হিংসায় পড়িয়া তাহাদের অতখানি দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইল।

গঙ্গাতীরের যে মূর্ত্তি সে হাবড়া পোলের উপর হইতে দেখিয়া আসিয়াছিল, এখানে আসিয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য চোখে দেখিয়া, এই বহুরূপিনীর রূপ-বৈচিত্র্যে তাহার শিশু-চিত্ত বিস্ময়-কৌতূহলে যেন মগ্ন হইয়া পড়িল। সাহেবদের ছোট ছেলেমেয়ে কদাচিৎ একটা দুইটা ইতঃপূর্ব্বে চোখে দেখিয়াছিল;—এখানে বিচিত্র পোষাকে সুসজ্জিত প্রজাপতির ঝাঁকের মত ঐ জাতীয় শিশুর প্রচুরতায় সে যেন দিশাহারা হইয়া উঠিল। কোথাও দলে-দলে ইউরোপীয়ান প্রেমিক-প্রেমিকার যুগল রূপ; কোথাও স্বদেশীয় অথচ ইহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত স্বাধীন সমাজের নরনারীর স্বচ্ছন্দ বিচরণ; এখানে গান, ওখানে বাজনা, সেখানে চক্ষুচমকিতকারী অপূর্ব্ব-দৃশ্য আলো,—এই নির্জ্জন পল্লীনিবাসী প্রায় নিঃসঙ্গ বালকটির ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন বিমোহিত করিয়া তুলিতেছিল। তার উপর যখন আবার বায়স্কোপে যাওয়া হইল,—সেখানে নির্ব্বাক অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের অত্যদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ শিশুরাজ্যের মন তো স্বভাবতঃই বিস্ময়-রসে পরিপ্লুত করিয়াই থাকে,—অজিত সে রসে যেন একেবারে ডুবিয়া গেল। এই কলিকাতা নগরী কি সুন্দর! ইহার মধ্যে বাস করিতে পাওয়া কত পুণ্যেরই না ফল! আঃ, ভাগ্যে তাহার পিসিমাটি ছিলেন!

রাত্রে বাহিরের নিমন্ত্রিতা মেয়েদের মধ্যে প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছে,—কিন্তু কর্ম্মবাড়ী তখনও বেশ সরগরম। একদিকে কাজকর্ম্ম, খাওয়া-দাওয়া চলিতেছে; এবং আর একদিকে তাহারই ফাঁকে-ফাঁকে নূতন কুটুম্বাড়ীর সমালোচনা মুখে-মুখে গজাইয়া ও পল্লবিত হইয়া উঠিতেছিল। তত্বের জিনিসপত্র যাচাই করিতে-করিতে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, উহাতে লোকের বহর যত বেশি, থালার বাহার যতখানি,—দ্রব্য-সামগ্রীর প্রাচুর্য্য তত নয়। ঐ সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া কেহ-কেহ ঠোঁট উল্টাইয়া মন্তব্য করিলেন, "অমন থালা সাজিয়ে তত্ত্ব করা আমরা পারিনে। একখানা করে বগি থালে ফাঁক করে-করে সাজিয়েছে দেখ না,—তাই নিয়ে একটা করে লোক,—এ খালি লোক বিদায় করিয়ে কুটুমের কাছে দাম আদায় কখা! মাগো! এমন ফিন্‌ফিনে ক্ষীরের ছাঁচ তুল্লে কি করে গো! দেখ্-দেখ্, পটলীর শাশুড়ীর হাতের তারিফ্ আছে। ফুঁ দিলে ঘুড়ি হয়ে আকাশে উড়ে যায়।" সমালোচিকাগণ তখনি-তখনি ঠিক্ করিয়া ফেলিলেন, অসীমার জন্য যে মুক্তার কণ্ঠি আসিয়াছে তেমন এ বাড়ীর কাহারও জন্য আসে নাই,—তাহার মুক্তাগুলি যেমন ছোট, তেমনি বাঁকা-চোরা; ফুলকাঁটা তিনটিতে তিন ভরিও ওজন নাই। কোন্ মেকরায় গড়িয়াছিল, জানিয়া রাখিলে কাজে লাগিবে। বীণা বলিল, "পার্শী সাড়ীখানা কিন্তু বেশী দাম দিয়ে কিনেছে। যদি রংটা অত ঘোরালো না হতো! পাড়াগাঁয়ে পছন্দ কি না!" ব্রজরাণী কহিল, "জামার রংটা দেখেছ, আরও ক্যাট্‌কোঁটে! সেমিজ, পেটিকোট, সাদা জামা সব চাঁদনির কেনা। দিয়েছে সবই,—কিন্তু কোনটারই ছিরি নেই।" আবার উহারই মধ্যে বিজ্ঞ দেখিয়া একজন আত্মীয়া সকলকে শান্ত করিতে চাহিয়া মন্তব্য করিয়া বসিলেন, "তা' বাবু, যা দিয়েছে বেশ দিয়েছে। আমাদের কুলীনের ঘরে এ-সবই বা ক'জন দিত। এখনই এত রকম হয়েছে। আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল, শুধু বরের কপালে ছোঁয়ান, হলুদটুকু আর এয়োদের হাতে কাটা—পঞ্চামৃত খাবার গোটাদশী সাড়ী যেমন হয় না—অমনি খাটো একটু হলুদ দিয়ে পাড় করা, আর তাতে একখাই রাঙা সুতো ছুঁচ দিয়ে পরানো; পাড়ও হতো না।"

"তোমাদের সে যে মান্ধাতার আমোল ঠান্‌দি, তখনকার কথা ছেড়ে দাও। তোমাদের তো নেবার বেলাও একছড়া পাঁচনলি আর দু'গাছা পৈচে ছাড়া চুড়ি-রুট, বাগদ দু হাজার এ-সব বালাই ছিল না।" "তা সত্যি ভাই, আমাদের সময় ও-সব কোথা? গণ-গণের সাড়ে সাত গণ্ডা

ক পুরো আট গণ্ডাই হ'লো ; আর কনে'র খুব ভাল দিলে তা একখানা বিউলি পোতের রাঙা বেণারসী,—নৈলে চারাচর বালুচরের একখানা চেলি, পায়ে চারগাছা দমদম কি সজ্‌না পাকের মল, কণ্ঠমালা,—কি খুব হলো তো, ঐ যা বলেছিস্‌,—পাটনলি আর পৈচে যবদানা মরদানা আকাঁঠি—এরই মধ্যে একটা কিছু। শ্বশুর দিলেন বৌভাতে—যদি বড় ঘর হলো তো একটা কড়ির ঝাঁপি, সিঁদূর-চুবড়ি, চেলি, নথ, মাটা-তাবিজ, আর 'খয়ে নো।' আর গরীব গেরস্ত হলে তো ওসব পাঠই নেই,—একগাছা নোয়া আর একটা ফাঁদি নথ—এই পর্য্যন্তই হয়ে গেল।"

"তোমায় কি দিয়েছিল ঠান্‌দি ?" "আমায় ভাই অনেক দিয়েছিল। জগতের ঠাকুর্দ্দা আমার শ্বশুর শ্রীরামপুরের সাহেবদের কুঠির দেওয়ান ছিলেন কি না,—আমাদের দুজনা'কেই তিনি গা-ভরা গয়না দিয়েছিলেন। আমাদের যা ছিল, তা রাজার বৌদের থাকে না। মাথায় সিঁতিপাটি, কানে ঢেঁড়ি ঝুম্‌কো চৌদানি, পিঠে পিঠ-ঝাঁপা, বাজু জশম বাউটি সুটের সবটি,—একা পায়েই ছিল যা দেখবে তোমার, গুজ্‌রী পঞ্চম বাঁক-মল, চরণ-পদ্ম, পাঁইজোড়—এই এতগুলি। তা ভাই রঙ্গ দেখ,—তখনকার কাল আমাদের এম্‌নি ছিল, বামুণ-কায়েতের ঘরে অত সজ্জা তখন এম্‌নি নিন্দের বিষয় ছিল যে, আমরা কোথাও গেলে, সবাই আমাদের দিকে চেয়ে মুখ-টেপাটিপি করে হাস্‌তো। বল্‌তো, এ কি গো! এঁরা সোনারবেণে না কি ?"

সকলে যখন সেই নিস্পৃহ, নিরাড়ম্বর অতীত কালের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে-করিতে ভোগ-বিলাস-আড়ম্বরে পরিপূর্ণ, অসন্তোষে-ভরা বর্ত্তমানকে বিস্মরণ হইয়া যাইবার জোগাড়ে ছিল, সেই সময়ে বাহিরে এক-সঙ্গে চটাচট-পটাপট করিয়া অনেকগুলা চঞ্চল জুতাপায়ের খবর দিয়া সুড়সুড় করিয়া কতকগুলি কিশোর এবং বালক সেই 'মেয়ে-মজলিসের মাঝ-খানে ঢুকিয়া পড়িয়া কলরব করিয়া বলিতে লাগিল, "আজকে যে বায়স্কোপের প্লে দেখে এলাম কাকীমা, তেমন-ধারা তোমরা দেখ নি।" "মামি-মা, তুমি তো নিত্যি যাও,—কি কি দেখেছ বল দেখি ? এটা নিশ্চয়ই দেখ নি,—এ একেবারে নতুন এসেছে।"* "কি রকম বল্‌ দেখিনি ?"

"ছুটো ছোট ছেলে খুব দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছিল,—তাদের মা তাদের একে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যেমন পিছন ফিরেছে, অমনি তারা উঠে দুজনে দুটো বালিস্‌ নিয়ে না…… নিয়ে না দুজনকে……" "যাঃ, হেসেই কুটিকুটি হলি তা বল্‌বি কি ! ছেলেরা তো দুষ্টুমি কিছুই জানে না,—তাই পয়সা দিয়ে রাত জেগে তাদের দুষ্টুমি শিখ্‌তে পাঠান।"

এমন সময়ে আর একটী ছোট ছেলে অগ্রবর্ত্তী দলের চেয়ে কিছু সঙ্কুচিত অথচ নূতন দৃশ্য দর্শনের আনন্দে উৎসাহ-দীপ্ত উৎফুল্ল মুখে গৃহে প্রবেশ করিয়াই বোধ করি চিরদিনের অভ্যাসানুযায়ীই—স্থান, কাল, পাত্র বিস্মৃত হইয়া একেবারে ছুটিয়া ব্রজরাণীর কোলের কাছটিতে আসিয়া পড়িল, "পিসিমা! পিসিমা! বায়স্কোপ! জিনিসটা ভারি মজার! আর তেম্‌নি হাসির! কিন্তু ভা—রি বিশ্রী মাসিমা! উঁহু পিসিমা! কেবল যত দুষ্টু ছেলেদের কাণ্ড!"

কোথাও কিছু দেখিয়া আসিয়া এম্‌নি করিয়া মায়ের কাছে সেটি নিবেদন করিয়া দেওয়া এই ছেলেটির জন্মাবচ্ছিন্ন অভ্যাস। আজ মায়ের বদলে পিসিমাই সেখানটিতে অধিষ্ঠিতা এইটুকু মনে আছে,—তদ্ভিন্ন আরও কোন কিছু ভাবনার দরকার আছে, এমন সন্দেহ একলা মায়ের ছেলে অজিতের মনেই উঠে নাই। সেখানে হয় মা, নয় দিদিমা, কি মাসিমাই বড় জোর তাহার বিস্ময় প্রকাশের পাত্রী। তা ওঁদের কারও কাছেই তো ইহার লজ্জা নাই। এখানেও যে ঠিক সে নীতি খাটিবে না,—সমস্ত দিন সে কথা স্মরণে থাকিলেও, এখনকার এই উৎসাহের বন্যায় সেই কথাটাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

যতক্ষণ বালক আপন মনে বকিয়া চলিয়াছিল, ততক্ষণের মধ্যে বিস্মিতা ব্রজরাণী তাহার কোলের-কাছে-ঠিক্‌রাইয়া-আসা, সেই অজ্ঞাত-পরিচয়, প্রিয়দর্শন শিশুটির মুখের দিকে নিজের দু'চোখ স্থির করিয়া দেখিয়া লইতে-ছিল! বসন্তকালের নবীন পত্র-পল্লবাচ্ছন্ন কচি চারাগাছটির মত চক্‌চকে ঝল্‌মলে সেই মুখখানির দিকে চাহিবামাত্র তাহার মনে হইল, তাহার দু'চোখের তারা দুইটা যেন সুধা-সাগরে ডুব দিয়া শীতল হইয়া জুড়াইয়া গেল। কি যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব মধুর বাৎসল্য-রসে সকল দেহ-মন কণ্টকিত হইয়া সে লোভাকুল গভীর দৃষ্টিতে খসিয়া-পড়া তারাটির মত উজ্জ্বল ও তেমনি সুন্দরতম শিশুটির মুখে চাহিয়াই

* বায়স্কোপ সে সময় হাটে মাঠে ঘাটে এমন ছড়াইয়া পড়ে নাই। সামান্য দিন মাত্র এ দেশে এসেছে।

রহিল। একবার এমনও ইচ্ছা হইল যে, আপনা হইতে তাহার এত কাছে যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার তরুণ ক্ষুদ্র দেহটি দু'হাতে জড়াইয়া, তাহাকে নিজের এই বুভুক্ষিত বুকের মধ্যে টানিয়া আনে। অন্তরের মধ্য হইতে সমুদয় নিদ্রিত বৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়া এতদিনকার সুপ্ত মায়ের প্রাণ আজ যেন এই যাদুকরের এতটুকু গায়ের গন্ধে, হাতের স্পর্শে, ঠোঁটের হাসিতে, গলার সুরে জাগিয়া উঠিয়া শুষ্ক নদীতে বর্ষার চন্দ্র-নামার মত হু-হু করিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহার শুষ্ক, রুক্ষ বন্ধ্যা-জীবনের মধ্যে আজ আকস্মিক মা জাগিয়া উঠিলেন। ছেলেটি এর ভিতরেই নিজের ভ্রম বুঝিয়া তটস্থ হইয়া পড়িয়া, একটুখানি অপ্রতিভের সলজ্জ হাসি হাসিয়া, অপরিচিতার সান্নিধ্য ছাড়াইবার চেষ্টায় দু-পা পিছু হাঁটিয়া তার পর পিছন ফিরিয়া, এক দৌড় দিবার মতলবে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছিল, ইতিমধ্যে তাহার পিছনে সমবয়সীর দল কৌতুকে হাততালি দিয়া হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে, "ওরে অজিতটা খুব ঠকেচে রে, খুব ঠকেচে,—মামীমাকে মা মনে করেছিল।"

"ধ্যাৎ! মামীমা ফরসা, লম্বা, অত গয়না-পরা,—বড় মামী মনে করবে কি করে রে! তবে হয় ত ওর নিজের মা-ই ভেবেছিল,—নারে অজি?"

ব্রজরাণী হঠাৎ কোন কিছু না ভাবিয়াই, শুধু সেই আকস্মিক, আগন্তুক ভাবোন্মাদনার আবেগে আবিষ্ট হইয়াই, ঝুঁকিয়া পড়িয়া, চলনোন্মুখ লজ্জিত বালকের ডান হাতটা নিজের হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ফেলিয়া তাহার গতি নিবারণ করিল। নিজের দিকে—হয় ত বা নিজের অজ্ঞাতেই তাহাকে ঈষৎ একটুখানি টানিয়া লইয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "নাই বা হলুম আমি তোমার পিসিমা,—বায়স্কোপের গল্প শুনতে আমিও কিন্তু খুব ভালবাসি। তুমি বল, আমি শুনবো।"

অজিত সচরাচর লজ্জা-সঙ্কোচ বড় একটা কাহাকেও করে না। কিন্তু এ যে একেবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাজ্য এবং ইহারা—সে রাজ্যের অধিবাসীরা তাহার অভিজ্ঞতার নিকটেও যেন অপরিচিত। ইহাদের কাছে সঙ্কোচ যে আপনিই দেখা দেয়। কিন্তু এখানে সে অনাহূত আসিয়া-পড়া অতিথি; ইনি তাহার নিজেরই দিকে;—ইহাকে মাপ করিয়া ইহারা যে নিমন্ত্রণ করিয়া কাছে ডাকিতেছে, সেখানে না যায়ই বা কেমন করিয়া? তাহাতে যে সেই পূর্ব্বকৃত ধৃষ্টতাই অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়া, যাহারা হাসিতেছে তাহাদের সেই হাসির মাত্রাটাকেই বৃদ্ধি করা হয়। দাঁড়াইয়া পড়িয়া, অরুণ-রাঙা লজ্জিত মুখে সে মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, "আপনি তো অনেক দেখেছেন।" "দেখেছি, তবে ওটা হয় ত দেখিনি। শুনছিলুম না কি নতুন এসেছে।" "তেমন তো নতুন নয়,—এটা ফোর্থ রাত্তির বল্লে বুঝি।" "তবে হয় ত দেখে থাকবো, তুমি বুঝি আর কখনও দেখ নি।"

ছেলেটী দুটি পদ্মের কুঁড়ির মত নতচোখ সুধীরে উপরে তুলিয়া, প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি কুণ্ঠার হাসি হাসিল। মুগ্ধা ব্রজরাণীর মনে হইল, গুমোট রাত্রির জমাট অন্ধকার ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া পলকের মধ্যে যেন দিনের আলো হিরণ্ময়ী ঊষা-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া উঠিল। সেই হাসির-আলোয়-ছোপান, পাতলা টুকটুকে-রাঙ্গা ঠোঁট দুখানির মধু নিঙড়াইয়া নিজের তৃষিত অন্তরে ভরিয়া লইবার জন্য মন তাহার মাতাল হইয়া উঠিলেও, সে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাকে সে কষ্টে রোধ করিল। এ বয়সের ছেলে—সচরাচর যে বয়সে হিন্দুঘরের মেয়ে বউ হয় ও মা হয়, সে বয়সে হইলে, তাহার যে না হইতে পারিত তা নয়;—তথাপি অপত্যহীনা ব্রজরাণীর পক্ষে অজানা অচেনা একটি বছর-দশেকের ছেলের উপর এ ধরণের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাওয়া যেন কতকটা অশোভন ও অনেকটা বাড়াবাড়ির মতই দেখায়। সে নেহাৎ কচি ছেলেকেও কখন খুব বেশি আদর করে না। এক উমার ছেলে, আর নিজেরই একটি ছোট ভাই, এই দুজনই তাহার কাছে যা একটু বেশি মাত্রায় আদর-যত্ন পায়। আজ হঠাৎ একেবারে এতটা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে যে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়। উঃ!—ছেলে না হওয়ার এত বুভুক্ষা!

সেই একটুখানি স্মিত-মধুর হাসি হাসিয়া ছেলেটী শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, না, সে ইতঃপূর্ব্বে বায়স্কোপ আর কখন দেখে নাই। ব্রজরাণী আগ্রহে, মমতায় পরিপূর্ণ হইয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় শরতের মেজ মেয়ে ন'বছরের সরলা ঘরে ঢুকিয়া বলিয়া উঠিল, "অজিত-দাদা, তোমাকে মা খেতে ডাকচেন।" আর একদিক হইতে শরতের ভাগিনেয়,—অজিতের আজিকার প্রধান না হয় ত দ্বিতীয় বন্ধু, মোহিতলাল তাড়াতাড়ি

ভিতের হইয়া ব্রজর কথায় জবাব গাহিয়া উঠিল—"ওদের মানে বুঝি ও-সব আছে, যে ও দেখবে! হুঃ, ও কিই বা খেছিল? জু', মিউজিয়াম, ঈডেন গার্ডেন, হাওড়ার াল, এসবেরও ও কিছুই তো আগে দেখেনি। তাই সেই তো মামী-মা বল্লেন—" আরও কি-কি কথা সে গড় করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, সে সব কিন্তু কোন জেই লাগিল না। পিসিমার আহ্বান পাইয়া অজিত মুহূর্ত্তে মুক্তির জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক সেই কই মুহূর্ত্তে ব্রজরাণীর হাতের আঙ্গুল কয়টা জ্বলন্ত আগুনে কা ঝলসান হাতের মত একটা প্রবলতর শিহরণের সঙ্গে-সেই সেই ছোট হাতখানির উপর হইতে শিথিল হইয়া ড়িল। সে চমকটা এত সুস্পষ্ট যে, ঐ ছেলেটীর কাছেও া অজ্ঞাত ছিল না। সে সাশ্চর্য্যে উহাঁর মুখের দিকে হিয়া, অর্দ্ধ মুহূর্ত্তকাল ভীত ও অভিভূতবৎ থাকিয়া, রক্ষণেই বালস্বভাবসুলভ চুঞ্চল হইয়া উঠিয়া ছুটিয়া লয়া গেল।

(৩০)

এই যে একটা আকস্মিক ব্যাপার ঘটিয়া গেল, ইহাতে রাণীর মনের ভিতর কি যে তুফান তুলিয়া দিয়া গেল, আন্দাজ আর কাহারও না থাক,—সেই প্রায় মধ্যরাত্রে ন 'কলিকে'র ভয়ানক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, ব্রজরাণী না ইয়া, কাহারও সহিত একটা সম্ভাষণ পর্য্যন্ত না করিয়া য়ের দ্বারা কর্ম্মবাড়ীতে কার্য্যে নিযুক্ত নিজেদের ামখানা দাঁড় করাইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল,—তখন তের আর কিছুই বুঝিতে বাকি থাকিল না। তবে ৎ কি হইল, কোন্ সূত্রে কাহার মুখে শুনিল--এ সব সেও জানিতে না পারায়, একটু বিস্মিত হইয়াই তাড়া-ড় আসিয়া, প্রস্থানোদ্যতা ভ্রাতৃজায়ার পথ আগলাইয়া ল, "সে কি বউ, এত রাত্রে যাবে কেন? শরীর না থাকে, কি হয়েছে বলো, ঘরে হোমিওপ্যাথি ওষুধ ছ, ঠাকুরপো বই দেখে বেশ দিতে পারে, তাই দিক। টা বিছানা ঠিক করে দিই, শুয়ে থাক না।"

"আমার যেতে হবে,—হোমিওপ্যাথিতে আমার কিছু না। তা'ছাড়া, রাত্রে আমার ফেরবারই কথা ছিল।"

া এলো না, তুমিও চলে যাবে—" ব্রজর ঠোঁটের কোণে ঈষৎ তী: হাস্য ফুটিয়া উঠিল, "তাতেও এ বাড়ীতে লোকের অভাব হবে না, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্চিনে,—" ব্রজরাণীর হাসি ও কথার ধরণে শরতের চট করিয়া রাগ আসিয়া পড়িল। একেই সে জ্যেষ্ঠের ব্যবহারে নিজের মনের মধ্যে আগুন হইয়া জ্বলিয়া আছে;—ধাঁ করিয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "দাঁড়াতে পার্ব্বে কি করে? তোমার যা হয়েছে, তা' কি আর আমি জানিনে! যাও, যাও,—আমার ভ্যাড়াকান্ত ভাইকে সাতখানি করে লাগিয়ে, তাকে ঘরের দোর এঁটে রেখে দাওগে। দেখো, কোন মতে বেন ছেড়ে দিও না,—তা'হলেই গুণ তুক্ সব ভেসে যাবে।"

"দেখ ঠাকুরঝি! ভায়ের বাড়ী বোসে যা' করো, তা' করো – কিছু আমি বলিনে, সয়ে যাই; তোমার নিজের ঘরে নেমন্তন্ন করে এনে আমায় এ-রকম করে অপমান করা তা'বলে তোমার উচিত হয় নি। আমি যেচে তোমার দোরে পাত পাততে আসিনি তো।" এই বলিয়া, আর কিছু না বলিয়া, রাগে, দুঃখে, অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিয়াই, নিজের সে পরাভবের লজ্জা গোপনার্থ, অত্যন্ত দ্রুতপদে খিড়কীর পথটুকু অতিক্রম করিয়া, ব্রজরাণী গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। এতবড় প্রচণ্ড রাগের জ্বালায় আপদ-মস্তক ধু-ধু করিয়া জ্বলিতে-জ্বলিতে, আততায়ীর সহিত কথা-কাটাকাটি করিতে তাহার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হইল না। সে বুদ্ধিমতী মেয়ে, জানিত, করিলে বড় বিষম ফল হইবে। অনেক কষ্টেই সে আত্মদমন করিল।

—ব্রজরাণী অমন করিয়া ঝঙ্কার তুলিয়া চলিয়া গেলে, শরৎ প্রথমটা খানিক হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উহার অনুযোগে সত্যের যে অংশ ছিল, সেটুকু তাহাকে একটুখানি খোঁচা দিল। তার পর এই বলিয়াই সে নিজেকে ভুলাইল, যে, 'অপমান ওকে এমন কিছু করা হয় নাই। চাঁদের মত সতীন-পোর মুখ দেখে ওঁর বুকের মধ্যে দাবানল জ্বলে উঠেছে; সেই হচ্চে আসল কথা! আমি আর কি বলেছি, যে, রাংয়ের রাধা গলে গেলেন'! ফিরিয়া আসিতে-আসিতে, ব্রজরাণীর বাড়ী যাওয়ার সংবাদে যে ভয় তাহার মনে প্রথমেই জাগিয়াছিল, সেই আসল কথাটাই আবার স্মরণ হইল। আসল কথা, ব্রজরাণী থাকুক, যাক্—তাহার জন্য ইহার কিছু আসে-যায় না। সে গিয়া পাছে অরবিন্দকে কালও না আসিতে দেয়, এইটাই ছিল তাহার মর্ম্মান্তিক

ভয়-ভাবনার বিষয়। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহার দাদা, ঘণ্টাখানেকের জন্য বেড়াইয়া গিয়াছেন ; তখন অজিতরা বাড়ী ছিল না। অনেক তোষামোদেও সে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। বালিগঞ্জে একটা নূতন বাগান-বাড়ী কেনা হইয়াছিল, সেইটা লইয়া না কি গোলমাল চলিতেছে, একজন বিধবা অংশীদার বাহির হইয়া মোকদ্দমা বাধাইয়াছে,—পরশু শুনানীর তারিখ,—কাল তো সময় হইবে না, আজও কাগজপত্র দেখাইতে হইবে ;—সে চলিয়া গেল। শরৎ মনে-মনে ক্ষুণ্ণ হইলেও, আশা করিয়াছিল যে, কাল নিশ্চয়ই পিতা-পুত্রে মিলন করাইয়া দিতে পারিবে। এখন ব্রজরাণীর ব্যাপারে সে যথার্থই ভয় পাইল। তবেই হইয়াছে! সে রায়বাঘিনী কি আর উহাঁকে ছাড়িয়া দিবে? একটু লজ্জাও হইল,—ব্যাপারটাকে এমন প্রকাশ্য উলঙ্গ করিয়া না ফেলিলেই হয় ত ভাল হইত। আবার মনকে সান্ত্বনা দিল, তাহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। নহিলে, পথের শত্রু যে মুখ দেখিলে ফিরিয়া চাহে, সেই মুখ দেখিয়া কি না উহার বুকে শূল-বেদনা ধরিয়া গেল!

হায় রে সংমা!

গাড়ীর অন্ধকারে নরম গদির মধ্যে ডুবিয়া গিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রজরাণী চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। মাথার মধ্যে গরম রক্ত তখনও চন্‌চন্ করিয়া উঠিতেছিল ;—উহারই গতি-প্রভাবে আগুনের মত দুই চোখ জ্বালা করিতেছিল ; এবং মনের মধ্যেও উন্মত্ত উত্তেজনাটা যেন একটা বিষাক্ত নেশার মতই তাহাকে সচেতন রাখিয়াও অচেতন অভিভূতবৎ করিয়া ফেলিয়াছিল। তার পর অল্পে-অল্পে একটু-একটু করিয়া সেই আকস্মিক ঘোর ঈর্ষা-জ্বালা-দিগ্ধ ক্রোধের মত্ততা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, পিছনের গদি-আঁটা তক্তা হইতে মাথা তুলিয়া সে শান্ত ভাবে উঠিয়া বসিল। দরজার কপাট ফাঁক ছিল ; দুইটা দরজাই টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া, পিছনেরও খড়খড়ি ফাঁক করিয়া দিল। তেজী ঘোড়া তালে-তালে পা ফেলিয়া কদমে চলিয়াছিল। মধ্য ফাল্গুনের মাঝ-রাত্রে গাড়ির গতিতে বেশ একটু ঠাণ্ডা হাওয়ার সৃজন করিতেছিল, ব্রজরাণীর মাথায়-ওঠা রক্ত-স্রোতের গতি সেই তাজা হাওয়ার স্পর্শে নিম্নাভিমুখী হইয়া আসিল। এতক্ষণ শুধুই একটা বিষম রাগের জ্বালায় সে জ্বলিয়াছে। এতক্ষণের পর তাহারই একটা সুস্পষ্ট অনুভূতি তাহার কাছে ধরা দিল। সেই অতবড় আক্রোশের ভিতরে দলিত-ফণা সর্পিণীর মতই সে যে কাহাকেও ভাল করিয়া ছোবল না দিয়াই মানে-মানে নিজের মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে কেমন করিয়া, তাই ভাবিয়াই সে বিস্ময় অনুভব করিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্রচণ্ড ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া সেই যজ্ঞিবাড়ীতেই সে একটা প্রবলতর "ছোটলোকী" কাণ্ড ঘটাইয়া ফেলে নাই,—এমন কি শরতের সেই অসময়ের কলহ-চেষ্টা সত্ত্বেও না ; বরঞ্চ, সে চেষ্টা প্রহত হইয়া শত ব্যক্তির মাঝখানে যে তাহাদের দুজনকারই ইজ্জত আজ বজায় রাখিয়াছে, সেও তাহারই জন্য।

এইবার নিজের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সে ইহার উল্টা দিকটায় চাহিল,—বস্তুতঃ, তাহার এতটা করিয়া তুলিবার প্রকৃত কোন কারণ বর্ত্তমান আছে কি না? অমনি হিংসার হলাহলে বুক পুড়িয়া গিয়া তাহার মনে হইল, আছে, নিশ্চয় আছে! ঐ ছেলেটাকে এই যে আনা হইয়াছে, ইহার মাঝখানের মতলবটা কি? এই জন্যই বুঝি আজ দুদিন ধরিয়া দাদার জন্য বোনের প্রাণের দরদ উছলিয়া পড়িতেছে? তা এতক্ষণ বুঝিতে পারা যায় নাই। আর হয় ত কর্ত্তাও এই ষড়যন্ত্রের ভিতর আছেন। তা সেই বা এমন বিচিত্র কি! এই যে ভাগিনীর বিবাহে একবার বোনের বাড়ী যাইবার ফুরসৎ নাই, এও হয় ত লোক-দেখান একটা চাতুরী,—হয় ত রায়স্কোপ ভারও কোথাও-কোথাও ছেলে লইয়া আমোদ চলিতেছে, তাই বা কে জানে? এইটাই সম্ভব কি! শুধুই ছেলে, না, আর কেহ আছে? আছে বই কি। ছেলে যখন আসিয়াছে, তখন মা-ই কি আর আসিতে বাকি আছে?

আবার অদম্য ক্রোধের মত্ততায় তাহার বুকের রক্ত ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল। মাথার মধ্যে ঢেউএর বেগে গরম রক্তের তোলাপাড়ায় মাথা ঘুরিয়া মূর্চ্ছা আসিবার উপক্রম হইল! তাহার হিষ্টিরিয়া ছিল, বেশি-বেশি রাগারাগি করিলে এখনও সেই রোগ ফিরিয়া আসে; নতুবা পূর্ব্বের তুলনায় এখন নাই বলিলেই হয়।

নিজের শোবার ঘরে ঢুকিয়া ব্রজরাণী দেখিল, ঘরটা অন্ধকার। দেওয়ালে একটা গ্যাস জ্বালিয়া লইয়া, সেই আলোয় দেখিতে পাইল, খাটের বিছানাটা এলোমেলো

ারিটা উপরে তোলা,—সে ঘরে অরবিন্দ আজ মোটেই ন করে নাই। অমনি বিদ্যুৎরেখার ন্যায় একটা তীব্র ষণ সন্দেহের ধারাল ছুরী তাহার বুকের ভিতরটায় মিয়া পড়িয়া হৃদ্‌পিণ্ডটাকে যেন কাটিয়া খানখান রিয়া দিল। তাহার সংশয় তো তাহা হইলে সংশয়মাত্র ন, পরন্তু অকাট্য সত্য! তাহার বিরুদ্ধে এই যে একটা ৎসিত চক্রান্ত আজ চলিতেছে, তাহার নায়ক তাহার মী ব্যতীত আর কেহই নয়! মনে পড়িল —ঠাকুরঝি জে বলিতে আসে নাই, অতএব তাহার বাড়ী যাইবে না—লিয়া ব্রজরাণী সেই যে একটা দুর্ব্বল আপত্তি তুলিতে য়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে কি রকম উত্তেজিত হইয়া ঠিয়া ঠাকুরঝির দাদা ইহার অসম্ভবতা নির্দ্দেশ করিয়া াহাকে সেখানে ঠেলিয়া পাঠাইলেন! মনের মধ্যে াহার যে এতখানিই ছিল, তাহা তখন কে জানিত?

দাঁড়া-আরসিতে সালঙ্কারা সুন্দরীর সর্ব্বাবয়বের ছবি স্বিত হইল। মুখের উপর দেওয়ালের অপর দিক হইতে ্যাসের আলোটা পূর্ণতেজে আসিয়া পড়িল; মুখখানা সে ালোতে স্পষ্ট দেখা গেল। এ কার মুখ? হিংসা কি র্ত্তি ধরিয়া আজ তাহাকেই দেখা দিতে আসিয়াছে না কি? ার সে আসিয়াছে তাহারই রূপ ধরিয়া! হঠাৎ নিজের লাভরা চোখ দুটাকে অন্য দিকে ফিরাইয়া লইয়া, ঘ রর একটা কোণে চলিয়া গেল। সেখানে একখানা ওপেট্রা কৌচ ছিল; সেইখানার উপর ধপ্‌ করিয়া শুইয়া ড়িয়া, সে একটু অন্ধকার লাভের আশায় চোক মুদিল। াৎ মনে হইতে লাগিল, এ সংসারে তাহার যেন আর ানও খানে কিছুই বাকি পড়িয়া নাই। এই যে কয়টি ন ধরিয়া সে নিজের সমস্ত বাছা-বাছা হীরা-মুক্তার নাগুলি গায়ে দিয়া, সবচেয়ে নূতন তৈরী জ্যাকেট-াতে সাজিয়া-গুজিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিল, এই সময়-র মত এমন দুঃসময় তাহার জীবনে আর কখন স নাই, এর পরেও হয় ত আর কখনও আসিবারও পাইবে না। এই অনতিদীর্ঘ কালটুকুর মধ্যে তাহার নের দৈন্য যেন চারিদিক দিয়া উথলাইয়া পড়িতে আরম্ভ য়াছে। ভিখারিণীর শত-ছিন্ন বসনের মত, নিজের দুর্দ্দশাকে লোক-চক্ষে ঢাকিয়া রাখিবার সঞ্চয় তাহারও আর কোথাও কিছু নাই। অতঃপর এই লাঞ্ছিত, খুলি-লুণ্ঠিত, দুঃসহ জীবন-ভার লইয়া সে বাঁচিবে কেমন করিয়া?

আদুরি-ঝি চোখ রগড়াইতে-রগড়াইতে আসিয়া তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাপড় ছাড়বে না বৌদিদি?" জবাব না পাইয়া আবার বলিল "বলি হ্যাগা, রাত যে পুইয়ে এলো, গয়না-গাঁটি খুলবে কখন?"

স্বপ্নাভিভূতের মত চোখ তুলিয়া ব্রজরাণী ক্লান্ত স্বরে কহিয়া উঠিল "তুই খুলে দে না।"

ওরে বাবা! এ সবের কলকব্জা কি আদুরীর সাত চৌদ্দপুরুষে কখনও জানিত, যে সে জানিবে! মাথার চুলের সঙ্গে কাপড়-আঁটা সেফটি-পিন খুলিতে গিয়া সে দামী সাড়ীখানাই ছিঁড়িয়া ফেলিল। গলার মুক্তার কলারের টিপ্‌-কল, খুলিতে গিয়া এমন টান মারিল যে সেই টানের চোটে সেটা ভাঙ্গিয়া হাতের মধ্যেই খসিয়া আসিল এবং সূতা-ছেঁড়া কতকগুলা মুক্তা ঝরিয়া পড়িয়া ঘরময় ছড়াছড়ি হইয়া গেল। ব্রজরাণী বাকিগুলা খুলিয়া হতশ্রদ্ধার সহিত কৌচের এক পাশে ফেলিতে-ফেলিতে তাচ্ছল্যভরে কহিয়া উঠিল, "যাক গে।"

(৩১)

ভোরের ঘুম অনেকটা বেলায় ভাঙ্গিলে, অনেকক্ষণ জাগিয়াই বিছানায় পড়িয়া থাকার পর, ব্রজরাণী যখন উঠিয়া বসিল, তখন গত রাত্রের সকল কথা তাহার মনের চারিপাশে যেন একটা শ্বাসরুদ্ধকর ভৌতিক কাহিনীর মত আবছায়া-আবছায়া উঁকিঝুঁকি মারিয়া বেড়াইতেছিল, যাহার সত্যতায় ঠিক যেন বিশ্বাস করা যায় না, আবার সংশয়ও জাগে। উঠিতে গিয়া সর্ব্বশরীরে এমন দৌর্ব্বল্য অনুভূত হইল যে, হঠাৎ তাহার মনে হইল, সে খুব কঠিন একটা ব্যারামে অনেক দিন যাবৎ ভুগিতেছে। সেই বড় আরসিখানার উপর নিজেরও অজ্ঞাতে একটা কটাক্ষপাত হইয়া গেল। কিন্তু বিস্ময় তখনি আর তাহাকে মুখ ফিরাইয়া লইতে দিল না। নিজের সেই জাগরণ-ক্লান্ত-শুষ্ক, শীর্ণ মুখের দিকে সে অবাক্‌ হইয়া তাকাইয়া রহিল,—তবু মুখের উপর গত রাত্রের সেই হিংস্র মূর্ত্তির ভীষণ লেখা না দেখিয়া মনে-মনে যথেষ্ট লঘু হইয়াই নিঃশ্বাস লইল।

রান্নাঘরের ঝি সারদা আসিয়া দোর খুলিল। "বলিল,

হইয়া উঠিল ;—কিন্তু তখন তো আর এতটুকু সংশোধন করিয়া লইবারও কোন উপায়ই তাহার হাতের মধ্যে নাই! তখন আবার উল্টা হাওয়ায় মনের মধ্যে এমনও মহত্ত্বের বাতাস বহিয়া গেল, যে, আহা! উহারাও তো একটিবার দেখিবার আশাতেই আসিয়াছিল। না হয় চোখেই একবার দেখিত। এমন কথাটাও একটিবারের জন্য মনে হইয়া গেল,—ইচ্ছা করিলে উহাদের গ্রহণ করা হইতে কি আর ব্রজরাণী স্বামীকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে? বাস্তবিক সে চেষ্টা তিনি তো কখনই করেন নাই। শুধু-শুধু একটা গণ্ডগোল পাকান, দুঃখ দেওয়া এবং পাওয়া এই হতভাগিনী ব্রজরাণীরই যেন একটা মহৎ রোগ! এই সত্য তথ্যটুকু সেদিনের সেই উদারতার হাওয়া তাহাকে দিয়া—অন্ততঃ নিজেরও কাছে একবারের জন্যও স্বীকার করাইয়া লইল।

'কুলিকে'র ব্যথা যথার্থ না ধরিলেও, ঈর্ষার যে শূলের ফলা গত রাত্রি হইতে তাহার মনের বুকে বিঁধিতেছিল, তাহারই বেদনা, আর সারারাত্রি-দিনের অনাহারে এমন দশা ঘটাইয়াছিল, যে, বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া একটু বসিবার শক্তিও ব্রজরাণীর শরীরে ছিল না। সন্ধ্যার সময় নিজেদের ঠাকুরঘরে যখন শাঁখ বাজিল, কাছের শীতলাতলায় আরতির ঘণ্টা কাঁশর মহা সোরগোল করিয়া বাজিয়া উঠিল, তখন মনটা হঠাৎ এমনি তাহার উতলা হইয়া উঠিতে লাগিল, যে, সে উদ্বেগ চাপিয়া চুপ করিয়া বিছানার মধ্যে পড়িয়া থাকাও আর সহ্য হইল না। বিছানা ছাড়িয়া জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সামনের বৈঠকখানার একটা ধার, তাহার সামনেই খানিকটা খোলা জমিতে গোটা কয়েক গাছ-পালার পরই নিজেদের দেউড়ির পারে সরকারী রাস্তার সরল রেখা চোখে পড়িয়া গেল। শরৎদের বাড়ীর বাহিরে এমনি যে রাজপথটি চলিয়া গিয়াছে, না-জানি ঠিক এমন সময় সেখানে কি হইতেছে? বর হয় ত আসিয়া পৌঁছিল, বাজি-বাজনা-আলোয় প্রতিবেশিনীরা শুদ্ধ নিজেদের বাড়ীর জানালায়-জানালায় জনতা করিতেছে, আর সে ক'নের মামী,—মেয়েটিকে একটু ভালও বাসে,—সে এই নির্জ্জন পুরীর মধ্যে একা নির্ব্বাসিতা! 'বরটি অসীমার কেমন হইল কে জানে? মনে পড়িল, আবার সেই ছেলেটিকে! সে যেদিন বর সাজিবে, কতই না সুন্দর সে বরকে মানাইবে! কোন্ ভাগ্যবতী তাহ[illegible] তপস্যা-করা মেয়ে লইয়া উহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, আজ কে-ই বা তা জানে?

তার পর মনে হইল, কাল যদি অমন করিয়া চলিয়া আসিত, তাহা হইলে সেই রূপসীর রূপখানা চোখে দেখি[illegible] একবার চক্ষুও তো সার্থক করিয়া লইতে পারিত। [illegible] রূপের ছটাটা একবার যে দেখিতে ইচ্ছা করে! আজ[illegible] কালকের অতগুলো মেয়ের মধ্যে কোনটি 'সে'? বাহিরে[illegible] নিমন্ত্রিতাদের ছাড়িয়া দিলে, তেমন সুন্দরী আর কে ছিল অনেক চেষ্টাতেও এই কথাটার মীমাংসা ব্রজরাণী [illegible] মতেই করিয়া উঠিতে পারিল না। একবার অবজ্ঞা [illegible] হাসিয়া মনকে আঁখি ঠারিতে গেল, যে, যতটা রটে, তত[illegible] সত্য নয়। কথায় বলে, 'যে মাছটা পালিয়ে যায়, সেইটে বড়।' কিন্তু এ সান্ত্বনাটা মনকে সে মানাইতে পারিল না। সেই যে খসিয়া-পড়া চাঁদের মত ছেলে, সে ছেলে যে মা[illegible] গর্ভকে আশ্রয় করিয়া জন্ম লইয়াছে, সে না কি আর[illegible] সুন্দরী না হইতেও পারে? কে জানে, কোথায় কে[illegible] করি লুকাইয়া বসিয়া ছিল! রাণী তাহাকে দেখে না[illegible] সে কিন্তু উহার সবটাই উল্টাইয়া দেখিয়া, মনে-মনে [illegible] জানি কত হাসিই হাসিয়া অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টাইয়াছে শাঁখের মত খানিকটা সাদা রং গায়ে থাকিলেই যে মা[illegible] সুন্দর হয় না, সে কথা যে ব্রজরাণী ভাল করিয়াই জানিত।

আচ্ছা, সে এখন কি করিতেছে? তা' তার অ[illegible] কাজের ভাবনা কি? এতক্ষণে কনে-সাজান শেষ করি[illegible] হয় ত বরণের যোগাড় করিয়া তুলিল। বরণও হয় সে-ই করিবে? তা না করিবে কেন? তাহার কপা[illegible] তো আর ব্রজরাণীর মত নয়। সে যে স্বামীর প্রথমা [illegible] ধর্ম্মপত্নী,—অপত্যবতী জননী তো সে-ই। ভগবান আ[illegible] মান-মর্য্যাদা যা, তা তাহাকেই দিয়া, এই পোড়াকপা[illegible] ব্রজরাণীর উপর কতকগুলা অপ্রয়োজনীয়, অযথা ধনর[illegible] ভার চাপাইয়া দিয়াছেন বৈ তো নয়! উহাকে হীরা[illegible] মুকুট পরাইয়া, তাহার জন্য বাকি রাখা হইয়াছে বি[illegible] পঞ্চাশ মণ ভারি কতকগুলা গিলটি-করা পিতলের গহনা সেগুলার কাজ তাহার সর্ব্বশরীরকে সর্ব্বদা পীড়ন করি[illegible] ধরিয়া, গায়ে কেবল কলঙ্কের কালি মাখান,—আর কিছু নয়। মুকুটের হীরা যেমন অন্ধকারেও জ্বলে,—সে তে[illegible] সে ঔজ্জ্বল্য ইহাদের মধ্যে কোথায়?

বঙ্গাল-কাব্যসাহিত্যে পাখীর কথা

[শ্রীসত্যচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্, এফ্-জেড্-এস্]

।য় অক্ষয়কুমার বড়াল-রচিত 'কনকাঞ্জলি'র মুখবন্ধে ক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সুবন্ধুর বাসবদত্তা হইতে টি পদ উদ্ধৃত করিয়া, তাহার কল্পিত রূপান্তর ও অর্থান্তর পবদ্ধ করিয়াছেন দেখিয়া, কাব্যরসপিপাসু বিহঙ্গতত্ত্ব-রাসুর মনে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা বোধ হয় সকলে জে অনুমান করিতে পারেন না। কিন্তু বাসবদত্তার কটি লাইনের যে দশা ঘটিয়াছিল, অনেক কাব্যের যে ই দশা ঘটিতে পারে, তাহা পণ্ডিত-সমাজে অথবা কবি-াজে কেহই বোধ হয় হিসাব করিয়া দেখেন না। "সা বত্তা বিহতা, নবকা বিলসন্তি, চরতি ন কং কঃ?" অতি জে রূপান্তরিত হইল—সারসবত্তা বিহতা, ন বকা বিল-ন্তি, চরতি ন কঙ্কঃ;—কবি বোধ হয় কখনও কল্পনা রেন নাই যে, তাঁহার এই রসাত্মক বাক্যটির মধ্যে কোনও ঠকের উৎকট পাণ্ডিত্য সারস, বক ও কঙ্কের সন্ধান াইবে। কিন্তু যাহা ভাবা যায় না, হয় ত তাহারই সন্ধানে াগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, আমরা বলিয়া থাকি যে, বস্ময়ের কিছু নাই; যে হেতু, ভিন্নরুচির্হিলোকাঃ। তাই ামি বড়াল-কবির শব্দধ্বনির মধ্যে বিহঙ্গ-কূজনের আভাস াইয়া মুগ্ধ হই; তাঁহার প্রভাত-বর্ণনার মধ্যে যেখানে াখীর কথাটি আছে, সেই দিকেই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট ই,—

> কোথা তুমি কত দূরে,
> কোন্ সুর-অন্তঃপুরে—
> স্বর্ণ-মেঘ ঘুরে'-ঘুরে' রাখে কি আড়ালে?
> ফুলে ছেয়ে দেছে দিক্
> গাছে-গাছে ডাকে পিক,
> কত শশী অনিমিখ চায় চক্রবালে!

দি তাঁহার মধ্যাহ্ন-বর্ণনার মধ্যে অন্য কিছুর প্রতি দৃক্‌পাত া করিয়া আমি মুগ্ধনেত্রে দেখি

> চাতক কাতরে ডাকে, চরে বক নদী-বাঁকে,
> ডাকে কুবো কুব্-কুব্ লুকায়ে কোথায়
> গাভী শুয়ে তরুতলে, হংসী ডুবে উঠে জলে,
> ডিঙ্গাখানি বেঁধে কূলে জেলে ঘরে যায়।

যদি তাঁহার চিত্রিত অপরাহ্নের বিপুল সমস্যা,

> এই যে নীরব প্রীতি—শারদ জ্যোৎস্নার স্মৃতি,
> আপন হৃদয়-ভারে ব্যথিত আপনি
>
> এই যে আকুল শ্বাসে—জগৎ মুদিয়া আসে,
> অথচ জানি না নিজে কি দুঃখে বিহ্বল—
> কিছু নয়—কিছু নয় তবে এ সকল?

এই সমস্যার কোনও উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া, পাখীর ডাকের রহস্যের কথা কবি যেখানে পাড়িয়াছেন, তাহা লইয়া বিচলিত হই

> বিহঙ্গম ডাকে যে প্রত্যূষে,
> ডাকে সে কি বৃথায়—বৃথায়
> ফুটে না কি প্রভাত-আলোক,
> সে ডাক কি শূন্যে ভেসে যায়!

কবি তাঁহার মানসী-প্রতিমার সন্ধানে "স্তব্ধ বনভূমি"র মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছেন, যেখানে "সোণালী মেঘের গায়ে, সুরভি শীতল বায়ে, শিথিল তটিনী-ভঙ্গে" তিনি লুকাইয়া আছেন কি না। যদি সে সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া, তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের প্রশ্নটি লইয়া কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়ি

> পিক-কণ্ঠে, মৃগ-নেত্রে, কম্পিত শ্যামল ক্ষেত্রে
> মুদ্রিত কমল-পত্রে রয়েছ কি ঘুমি'!

অথবা যদি তাঁহার সায়াহ্ন-বর্ণনার মধ্যে 'মৃদু-মৃদু' 'মলয় সমীরে' 'অধীর' না হইয়া, তন্ময়চিত্তে দেখিতে থাকি

> পূর্ণিমা রজনী,
> জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেছে সমস্ত ধরণী।
> অদূরে পুলকে পিক কুহরে
> ফুলে ফুলে তরুলতা শিহরে;

তাহা হইলে, কঠোর সমালোচক হয় ত সেই পূর্ব্ব-বর্ণিত 'সা রসবত্তা' ও 'সারসবত্তা'র উল্লেখ করিয়া কাব্যপ্রীতি অপেক্ষা পক্ষিপ্রীতির আধিক্যবশতঃ আমার পক্ষে রসসাহিত্য জীর্ণ করিবার ক্ষমতা বা অক্ষমতা সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে ভুলিবেন না। অথচ, বড়াল-কবির মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন-বর্ণনার মধ্যে কতকগুলি পাখী আসিয়া ছবিগুলিকে আমার চক্ষুর সমক্ষে এমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে, আমি রসজ্ঞতার বিশেষ দাবি না করিলেও, এইটুকু জোর করিয়া বলিতে পারি যে, অন্য কোনও উপায়ে অমন সুন্দর ভাবে প্রকৃতির ছবি ফুটিয়া উঠিতে পারিত না।

যে 'কনকাঞ্জলি'র ভূমিকা লইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, তাহা বড়াল-কবির গুরু কবিবর বিহারীলালের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। আমাদের মনে পড়ে, যখন 'সাধের আসন'-রচয়িতা বঙ্গসাহিত্যের কবিতার প্রস্রবণ ছুটাইয়া দিয়াছিলেন, তখন যে কয়জন মনীষী তাঁহার চরণ-প্রান্তে বসিয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার তাঁহাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভানির্ঝরের তখন সবেমাত্র স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছে। নবপ্রতিষ্ঠিত 'ভারতী' পত্রিকায় বিহারীলালের পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, নগেন্দ্রনাথ, অবিনাশচন্দ্র, অক্ষয়কুমার চৌধুরী প্রভৃতি অনেকগুলি নবীন কবি বঙ্গসাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যশোভাতি দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছে; অক্ষয়কুমারের শঙ্খধ্বনি নীরব হইল; কবিবর বিহারীলালের পুত্র অবিনাশচন্দ্র অনেক দিন পূর্ব্বে কাব্যকুঞ্জ হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন; নগেন্দ্রনাথ কিছুদিন বাঙ্গালা গদ্য রচনায় মন দিয়া, বঙ্গভাষার পরিচর্য্যা হইতে বিরত হইয়া, ইংরাজি-লিপিকুশলতায় খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; অক্ষয় চৌধুরী ভাল করিয়া মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে না করিতে ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। বিহারীলালের প্রতি বড়াল-কবির অগাধ শ্রদ্ধা কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। "জনমভূমির সে এক দরিদ্র কবি

> এসেছিলে সুধু গাহিতে প্রভাতী
> না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি—
> আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি,
> কুহরিল ধীরে ধীরে।

মৃত্যুর পরে সেই দরিদ্র কবি মহীয়ান্ হইয়া যেন বাণী চরণে অনন্ত স্বপনে জাগিয়া রহিয়াছেন—

> রাজহংস সম, চির কলস্বনে,
> পক্ষ দুটী প্রসারিয়া।

যাঁহাকে দেখিয়া প্রথম মনে হইয়াছিল যে, তিনি সুধু মুদু প্রভাতী সুরে কুহরণ করিবার জন্য বঙ্গ-সাহিত্য-কুঞ্জে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার চির-বিদায়ের পর তিনি যেন কলকণ্ঠ রাজহংসের মত বঙ্গ-বাণীর চরণে পক্ষ বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

এই কলকণ্ঠ রাজহংসের পশ্চাতে আমাদের কাব্য-কাননে অক্ষয়কুমার বড়াল নিজেকে মূর্চ্ছাতুর ছিন্নকণ্ঠ পিক বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

> কোথা পাব বাল্মীকির সে উদাত্ত স্বর?
> কোথা কালিদাস-কণ্ঠ ষড়জ-মধুর?
> কোথা ভবভূতি-ভাষ—গৈরিক নির্ঝর?
> ছিন্ন-কণ্ঠ পিক আমি, মরণ-আতুর।

তিনি ময়ূরের "ষড়জসংবাদিনী কেকা দ্বিধা ভিন্না" কোথায় পাইবেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। এমন কি, কলকণ্ঠ পিক হইবার স্পর্দ্ধা করেন না;—যদি পিক বলিতে হয় বলুন, কিন্তু 'ছিন্ন-কণ্ঠ পিক আমি, মরণ-আতুর'।

এমনি করিয়া বড়াল-কবির স্বরচিত কাব্যকুঞ্জের পত্রে-পত্রে বিভিন্ন জাতীয় পাখীর সাক্ষাৎলাভ করিয়া এই পত্রগুলির পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন কবির দিকে আমাদের মন স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। অরূপের সঙ্গে রূপের এই সংমিশ্রণ, বর্ণে গন্ধে ও গানে বিশ্বপ্রকৃতিকে ও মানবপ্রকৃতিকে এমন করিয়া সাজাইয়া তোলা, ইহাতে যে শিল্পচাতুর্য্য আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে যে কাব্য-সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যাইবে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কবির অন্তর্জ্জগতের সহিত বহির্জ্জগতকে মিলাইবার চেষ্টা করিলে, কবিপ্রতিভার নব-নব উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পাখীর কথায় কাব্যসৌন্দর্য্য নষ্ট হয় না,—বড়াল-কবির সম্বন্ধে এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ষায় সুপ্ত গ্রামের বর্ণনায় দেখিতে পাই

অদূরে মধয় বট, দূরে ত্রস্ত শিবা,
খসিছে হরিদ্র পত্র সিক্ত মৃত্তিকায় ;
এলায়ে পড়েছে লতা, সঙ্কুচিয়া গ্রীবা
ভিজিছে বায়স দুটী বসিয়া শাখায়।

ঐ দুটী সিক্ত বায়সকে বাদ দিলে কি ছবিটি অপূর্ণ থাকিত না ?

ক্ষীণা স্রস্বতী আজ দুই কূল ভরি
পড়ে আছে গতিহীনা হরিৎবরণা ;
ভাসিছে শৈবালদাম, ক্ষুদ্র তাল-তরী ;
বংশ-সেতু 'পরে ক্রৌঞ্চী মুদ্রিত-নয়না।

নদীর দুই কূল বর্ষার জলে ভরিয়া গিয়াছে ; বংশ-সেতুর উপরে ক্রৌঞ্চী নয়ন বুজিয়া বসিয়া আছে ; চিত্রের কোথাও কিছু ফাঁক রহিল কি ?

তীর বেণু-বনে উঠে ভেক-কণ্ঠস্বর ;
ডাকিছে চাতক দূরে আসার-পিপাসী।
সজল শ্যামল তৃণ, শ্যামল প্রান্তর ;
বৃতিপাশে শেফালিকা, মূলে পুষ্পরাশি।

ঐ দর্দ্দুরের কণ্ঠস্বর বর্ষার সঙ্গে মিলিয়াছে ভাল বটে ; কিন্তু যে পিপাসী চাতক দূরে ডাকিতেছে,—বর্ষাপ্রকৃতির চিত্রপ্রান্তে ঐ বিলীনপ্রায় বিহঙ্গটিও অনাদরের সামগ্রী নহে। বিশেষতঃ, বড়াল কবির কাছে সে ত অনাদরের সামগ্রী হইতেই পারে না। কবিজীবনের সফলতা ও সার্থকতার সম্বন্ধে হয় ত বিভিন্ন মত থাকিতে পারে ; কিন্তু বড়াল কবি মনে করেন—

সরল-হৃদয় কবি—
যেথানে মাধুরী-ছবি,
সেথানে আকুল।

প্রজাপতি, মৃগ-আঁখি,
ফুলে অলি, ডালে পাখী,
গাছে গাছে ফুল।
দুলে লতা তরু-বুকে
চকাচকি মুখে-মুখে—
দেখিলে ব্যাকুল।

বিহঙ্গ-প্রকৃতির সহিত বিশ্ব-প্রকৃতিকে তিনি এমন নিবিড়-সম্বন্ধ দেখিতেছেন যে, তাঁহার গীতি-কবিতায় তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে প্রচার করিয়াছেন

ক্ষুদ্র বিহগের সুরে
ষড়-ঋতু-চক্র ঘুরে।

ক্ষুদ্র-বিহঙ্গের সুরের সঙ্গে তাল মিলাইয়া বর্ষচক্রের লীলা-নর্ত্তনের সুধু ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই কবি ক্ষান্ত হন নাই। যে বঙ্গভূমিকে তিনি "ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার," বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, নববর্ষায় এবং বর্ষাপগমে ও পরিশেষে মধুমাসে তাহার বিচিত্র মাধুর্য্য উপভোগ করিতে হইলে চাতকী, শিখিনী, চকোর, পিক পর্য্যায়ক্রমে ঋতু-গুলির সঙ্গে-সঙ্গে আসিয়া পড়িবেই।—

নব-বরষার চূর্ণ-জলদ-কুন্তল,
উড়িয়ে—ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি';
চাতকী ডাকিছে দূরে, শিখিনী চঞ্চল,
মেঘমন্দ্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি'।

* * * * * * *

সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চন্দ্রমা!
বিভোর চকোর উড়ে নয়ন সোহাগে ;
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল সুষমা,
চরণ-অলক্তরাগ তড়াগে তড়াগে।

* * * * * * *

অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর,
পিককণ্ঠ কলতান উঠে দিকে দিকে ;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুত মন্থর,
এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে!

শ্রাবণে যখন "গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দোলে", তখন দেখিতে পাওয়া যায়, কেমন করিয়া "পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া" ; আবার

চাতক, ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক-জল
ছাড়ি' নীড়, উঠিছে আকাশে।

অথবা

তীরে নারিকেল-মূলে থল্-থল্ করে জল ;
ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে ;

সারি দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু দাম-ঝাঁকে।'

পুনশ্চ

পাড়ে পাড়ে চকাচকী বসে' আছে দুটি দুটী ;
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে।

অপিচ, হেমন্ত ঋতুতে "স্রোতস্বতী শীর্ণকায়া—হংসী নাহি ফুটে" দেখিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেন।

এইরূপে ছোট বড় পাখীগুলির গানের সঙ্গে তাল মিলাইয়া ষড়-ঋতু-চক্র ঘুরিতে থাকুক ; মানবের সাধারণ দৈনিন্দন জীবনেও পাখীর গানে গভীর বিষাদের মধ্যেও হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। আমাদের গৃহপালিত পাখীরা যাহার আদরে পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, তাহার অভাবে তাহাদের কি অবস্থা হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বড়াল-কবি শেষ জীবনে দুর্ভাগ্যক্রমে বিপত্নীক হইয়াছিলেন। যে

মুখর শুক
পাখায় ঢেকেছে মুখ,
আদর না পায় কারো—আদর না চায়।
সাধের শিখীটী তার
নাচে না নিকুঞ্জে আর

সেই শুক ও শিখী কবির নিজের জীবন-স্মৃতির সহিত কতটা জড়িত আছে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু পুরীতে যে sea-gull দেখিয়া 'এষা'র কবি লিখিয়াছেন—

দীপিছে কম্পিত আলো দূর-স্তম্ভচূড়ে ;
উড়িছে তির্য্যক্-পংক্তি সাগর-কপোত,—
এই জলে, এই স্থলে, এই কাছে—দূরে,
যেন শুভ্র চন্দ্র-কণা স্রোতে ওতপ্রোত

সেই পাখীকে এমন নিপুণ ভাবে সাগরচিত্রে সন্নিবেশিত করা বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মধ্যাহ্নে কেমন করিয়া "উড়ে' যায় চিল, ভেসে' যায় মেঘ," অথবা অন্ধকারে "পেচক ডাকিল দূরে, বাদুড় পলাল উড়ে" তাহা কবির চক্ষু এড়াইতে পারে নাই।

আশা করি, তাঁহার কাব্যসমালোচনার সময় এই সমস্ত পাখীগুলিও সমালোচকের চক্ষু এড়াইবে না। যে "ময়ূর ময়ূরী নাচে মণি প্রস্তরায়" সেই pavo cristatus জাতীয় বিহঙ্গের ব্যবহার কবির বর্ণনার সহিত মিলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে ক্ষতি কি? যে কোকিলের "অখিল-রব শীতের মরণে উঠে" বলিয়া কবি বর্ণনা করিয়াছেন, সেই Eudynamis honorata পাখীটি কি শিশিরাপগমে মুখর হইয়া উঠে? বিপত্নীকের শুক (Palæornis torquatus) ও শিখী কি মেঘদূতের পঞ্জরশুক ও ভবন-শিখীকে স্মরণ করাইয়া দেয় না? রাজহংস (flamingo) চকাচকী (ruddy sheldrake or Brahminy Duck), মরাল, ডাহুক ডাহুকী, কুবো প্রভৃতি জলচর পক্ষীদিগকে বিভিন্ন ঋতুপর্য্যায়ের মধ্যে যথাবিন্যস্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে কি না তাহা সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। বলাকা, চকোর ও চাতককে পক্ষিতত্ত্ববিৎ কোন্ কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত করিবেন? শ্যেন, চিল,—এই দুটি Raptores-পরিবারভুক্ত পাখীকে আমরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীস্থ পেচকের সঙ্গে কাব্যের মধ্যে দেখিতে পাই। যে ক্রৌঞ্চীটি বংশ-সেতুর উপর বসিয়া আছে, সেই বকজাতীয় পক্ষীটিকে উপেক্ষা করা চলে না। আর যে বায়স দুটী বর্ষায় ভিজিতেছে, তাহাদিগকে দেখিয়া মেঘদূতের গৃহবলিভুক্‌কে মনে পড়ে কি?

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনুসন্ধান

সত্বর বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া হরনারায়ণ অন্য পথে সদরে ফিরিয়া আসিলেন। হরিনারায়ণ তখন সতরঞ্চের গুটি সাজাইয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "ভট্‌চাজ্, আজ হাতীর দাঁতের সতরঞ্চ উঠাও,—আজ দুনিয়ার সতরঞ্চ-খেলায় দুইটা বড় চাল দিতে চাহি; মাথাটা ঠাণ্ডা করিয়া একটা পরামর্শ দাও দেখি?" বিদ্যালঙ্কার মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "দেখ, এ হাতীর দাঁতের সতরঞ্চের তুল্য আর জিনিস নাই। তুমি ইহার মর্ম্ম বুঝিয়াও বুঝিলে না,—অনিত্য সংসার-চিন্তায় দিন কাটাইলে; সংসারে তোমার আছে কে বল দেখি?"

"বাজে কথা রাখ। এই সংসারে যতক্ষণ আছি,—নিত্য হউক, অনিত্য হউক, এই সংসারের চিন্তা লইয়াই থাকিতে হইবে। দেখ বিদ্যালঙ্কার, আজ এক চালে জ্ঞাতি-শত্রু দুইটাকে গৃহত্যাগ করাইয়াছি।"

"কাজটা কি ভাল করিয়াছ ভাই? তোমার মাতৃ-গর্ভজাত না হইলেও, অসীম ও ভূপেন তোমার পিতার ঔরসজাত সন্তান। তুমি নিঃসন্তান,—তোমার সন্তান-লাভের আশা অতি অল্প। হরনারায়ণ! দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে,—হিসাব-নিকাশের সময় অতি নিকট,—অনাথ বালক দুইটীকে কেন তাড়াইলে?"

"আরে তুমি থাম হে! ভাল ধর্ম্মশাস্ত্রের বক্তৃতা জুড়িয়া দিলে। কথাটাই আগে শুন।"

"কি করিয়া তাড়াইলে?"

"কর্ত্তার আমলের সোণা-রূপার বাসন যাহা কিছু ছিল, তাহা ক্রমশঃ ঈশ্বরগঞ্জে সরাইতেছিলাম। একটা পাঁচশত ভরির সোণার বাটা কর্ত্তা ব্যবহার করিতেন,—আজ প্রাতঃকালে ভাণ্ডারীকে সেইটা ঈশ্বরগঞ্জে পাঠাইয়া দিতে বলিয়া গিয়াছিলাম। যখন যাহা ঈশ্বরগঞ্জে যায়, ভাণ্ডারী সে সংবাদটা অসীমকে দিয়া থাকে, তাহা আমার জানা ছিল। বক্রীটা গৃহিণীর কল্যাণে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অসীম ভূপেনকে লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে।"

"আহা! ভূপ একে অন্ধ, তাহাতে আবার কখনো বিদেশে যায় নাই! পৈতৃক তালুকের অংশটা দিবে ত?"

"তাহাই যদি দিব, তবে তোমার সহিত পরামর্শ করিতেছি কেন? দেখ, আলমগীর বাদশাহ ফৌৎ করিবার পরে তালুক-মুলুক রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিষয়ের অংশটা আমার নামে লিখাইয়া লইয়াছি।"

"এ কাজ কবে করিলে?"

"প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে।"

"অসীম যে লিখিয়া দিল?"

"তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, যে-রকম দিন-কাল পড়িয়াছে তাহাতে নাবালকের বিষয় রক্ষা হওয়া বড় কঠিন। বরঞ্চ, সমস্ত তালুকটা যদি আমার নামে থাকে, তাহা হইলে বাদশাহের কাননগোইএর খাতিরে কেহ কিছু অনিষ্ট না করিতেও পারে। বাদশাহের বয়স সত্তর বৎসরের অধিক,—তখ্‌ত লইয়া শীঘ্রই আবার একটা গজ-কচ্ছপের লড়াই বাধিবে। দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিলে, তোমাদের অংশ আবার তোমাদের ফিরাইয়া দিব। এই কথা বলায়, অসীম ও ভূপেন দুইজনেই পরগণে রোকনপুরের পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি অংশ আমার নামে লিখিয়া দিয়াছে।"

"হর! তুমি আমার বাল্যবন্ধু,—একটা কথা তোমাকে অনেক দিন ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি; কিন্তু তাহা ত কখনও কাণে তুলিলে না। দেখ, তোমার পিতার অন্নে এক দিন জাহাঙ্গীরনগরের অর্দ্ধেক লোক প্রতিপালিত হইত। তাঁহার তালুক পরগণে রোকনপুর একটা রাজার রাজ্য বলিলেও চলে। তাঁহার মত সোণা-রূপার আসবাব অনেক

আমীরের ঘরেও নাই। তুমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র,—তাঁহার পদ পাইয়াছ। তুমি হিন্দুস্থানের একজন আমীর, বাদশাহের মনসবদার, তোমার দর্শন লাভের জন্য বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার জমিদার মাত্রেই লালায়িত। তোমার অভাব কি? তুমি কিসের জন্য, কি অভাবের জন্য অসৎ পথ অবলম্বন কর? অসীম ও ভূপেন তোমার অবর্ত্তমানে এই বিশাল ধন-সম্পদের অধিকারী হইবে, দেশে ধর্ম্ম থাকিতে বা শাস্ত্র থাকিতে কেহ তাহাদিগকে অধিকারে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। তুমি আর কয়দিন? এই দুই-দিনের জন্য মিথ্যা, শঠতা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইয়া ভাই দুইটাকে কেন পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত করিলে? বিষয় তোমার কি হইবে?"

"আরে থাম ঠাকুর; ধর্ম্মশাস্ত্র একটু রাখ? বিষয়-বুদ্ধি ব্রাহ্মণের কখনও হয় না, হইবেও না। দেখ বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যা তোমার অলঙ্কার হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিটা তোমার নিতান্তই সুক্ষ্ম, একেবারে লোপ পাইয়াছে বলিলেই চলে। এই সংসারে কে কাহার, এই মাত্র সার আমি আমার। মাতাপিতা দারাসুত সমস্তই মিথ্যা, নিত্য কেবল আমি। আমার সুখ, ঐহিক পারত্রিক কায়িক মানসিক, ইহাই জগতের সার, এই সংসারে একমাত্র কাম্য বস্তু। দেখ ভট্টচাজ! পরগণে রোকনপুরের পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তির মালিক হইয়া সুখ নাই, ষোল আনার মালিক হওয়া চাই। একখানা কম্বলে দশজন ফকিরের স্থান অতি সহজেই হয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্রতম রাজ্যেও একাধিক রাজার স্থান হয় না। পাঁচশত সোনার পানদানে আমার একশত ছ'ষট্টি তোলা আছে বটে, কিন্তু তাহা লইয়া ত মন খুলিয়া পানদানটা ব্যবহার করা যায় না? এই জন্য ছলে কৌশলে জ্ঞাতি-শত্রুর অধিকার নষ্ট করিয়াছি।"

"তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

"একটু কারণ আছে, বড়ই দুঃসময় পড়িয়াছে। বাদশাহের মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই। যে রকম অবস্থা বুঝিতেছি তাহাতে শাহজাদা আজীম-উশ-শানের বাদশাহ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। দলীলখানা নবাবের সহি-মোহর করাইয়া লইয়াছি বটে, কিন্তু মুর্শিদকুলীর সহিত আজীম-উশ-শানের যে প্রেম, তাহা ত তোমার অবিদিত নাই। আজীম-উশ-শান্ বাদশাহ হইলে মুর্শিদকুলীর নবাবী যাইবে, বৃদ্ধ উজীর আসদ্ খাঁ এখনো জীবিত। তখন কি করিব?"

"লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, তখন মরিবে।"

"তাহার জন্য ত ভট্টাচার্য্যের পরামর্শের প্রয়োজন নাই, এখন কি করি বল দেখি?"

"আর একটা কথা ভাব নাই, ভাগীরথীর পরপারে আজীম-উশ্-শানের পুত্র বসিয়া আছে। আজ যদি বাদশাহের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কাল আজীম্-উশ-শান বাদশাহ হইবে, আসদ্-খাঁ রাজ-প্রতিনিধি হইবে, মহম্মদ করিম ময়ূর সিংহাসনের বামপার্শ্বে বসিবে, আর ফররুখ-সিয়ার তোমার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হইবে। আজ যদি অসীম ফররুখসিয়ারের দরবারে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাল তোমাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে।"

"ভট্টচাজ! এ কথা ত একেবারও মনে হয় নাই।"

"এখনই যাও, যেমন করিয়া পার তাহাদের ফিরাইয়া আন।"

হরনারায়ণ ডাকিলেন, "চোপদার!"

চোপদার আসিল; তিনি আদেশ করিলেন; "বড় ছিপ একদণ্ডের মধ্যে তৈয়ার করিতে বল।"

রজনীর তৃতীয় প্রহরে হরনারায়ণ রায় স্বকৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লালবাগ যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভাগীরথীর পশ্চিমপারে বিস্তৃত আম্রকানন। চিরদিন গৌড় দেশের এই অংশ সুস্বাদু আম্রের জন্য বিখ্যাত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে লাল খাঁ নামক জনৈক পাঠান ভাগীরথী-তীরে এক উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। শাহজাদা আজীম-উশ-শানের সঙ্গে বিবাদ করিয়া মুর্শিদকুলি খাঁ যখন জাহাঙ্গীরনগর পরিত্যাগ করেন, তখন ভাগীরথী-তীরস্থ আম্রকুঞ্জ-বেষ্টিত এই ক্ষুদ্র উদ্যান তাঁহার বড়ই রমণীয় বোধ হইয়াছিল এবং মুর্শিদাবাদ নগর নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে তিনি কিছুদিন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তখনও মুর্শিদকুলীর গৌরব-রবি উদিত হয় নাই; তিনি তখনও রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্মচারী মাত্র এবং সর্ব্বদা আজীম-উশ-শানের ভয়ে সশঙ্কিত।

ফররুখসিয়ার স্বয়ং ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া এইস্থানে

...র স্থাপন করিয়াছিলেন। লালখাঁর ক্ষুদ্র উদ্যান, তাহার ...দিকের আম্র-পনসের ঘন কুঞ্জ মুর্শিদাবাদের অতীত ...বের সহিত বহুকাল পূর্ব্বে ভাগীরথীর গর্ভে লীন ...ছে। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে লালখাঁর ক্ষুদ্র উদ্যান সহসা একটী ...ল প্রাসাদে পরিণত হইয়াছিল। চারিদিকে আম্রকানন- ...শত-শত ক্ষুদ্র-বৃহৎ বস্ত্রাবাস। সুবাদারের খাস সেনা- ...এই স্থানে বৎসরাধিক কাল বাস করিয়াছিল। আম্র- ...নের মধ্যভাগে সুরচিত পুষ্পোদ্যান। তাহার মধ্য- ...একটী ক্ষুদ্র গৃহ। আজীম্-উশ-শানের দ্বিতীয় পুত্র ...খ্‌সিয়ার সপরিবারে এই গৃহমধ্যে বাস করিতেন। ...রথী-তীরে বিস্তৃত সুনির্ম্মিত সোপান-শ্রেণীর উপরে ...াহের পৌত্রের জন্য বিলাস-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ...দিন সন্ধ্যাকালে কলকণ্ঠ গায়িকার সঙ্গীত-ধ্বনিতে ...রাশি-পরিশোভিত, গন্ধদীপ-সুবাসিত এই ক্ষুদ্র বিলাস- ...ও ইহার অধিবাসিগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিত।

সে দিন তখনও বিলাস-গৃহ নীরব,—গন্ধ-দীপসমূহ হীন- ...হইয়াছে,—বিলাস-গৃহ নির্জ্জন। ঘাটের স্বল্পকায়া ...রথী-বক্ষে নওয়ারার শতাধিক ছিপ পড়িয়া ছিল। ...তন সোপানের উপরে দুইজন মনুষ্য বসিয়া ছিল,— ...দিগের মধ্যে একজন হিন্দু অপর মুসলমান। হিন্দুর ...চ্ছদ দেখিয়া বোধ হয় সে ব্যক্তি রাজপুত্নাবাসী। ...র সঙ্গী মুসলমান; তাহার শুভ্র পরিচ্ছদ ও ক্ষুদ্র উষ্ণীষ ...খলে, সেকালের লোকে বুঝিত যে, সে বাদশাহ-বংশের ...য়াস্ বা পরিচারক। সে বলিতেছিল, "শেঠ সাহেব! ...লক্ষ টাকা কি হইবে? দুইজন পাঁচহাজারী মন্‌সবদারের ...এক হপ্তার খরচও কুলাইবে না। নগদ দশটী লক্ষ ...গুণিয়া দিও,—দুই মাস পরে টাকায় চারিআনা সুদ ...ও খাল্‌সা দপ্তরের উপরে হুকুমনামা পাইবে। তখন ...কে একটাকা হিসাবে পেশ্‌কশ্ দিলেই চলিবে।"

"আমি গরীব বণিয়া,—আমি অত টাকা কোথায় ...ব? তবে শাহজাদার হুকুম, তামিল না করিলে গর্দ্দান ...ব,—সেইজন্য চাহিয়া-চিন্তিয়া কাল সন্ধ্যা নাগাইত ...লক্ষ টাকা জোগাড় করিতে পারি।"

"দেখ শেঠ সাহেব! তুমি ছেলেমানুষের মত কথা ...তেছ। নিজের সুবিধা একেবারেই বুঝিতেছ না। ...াহ আর কয়দিন? আজীম্-উশ-শান বাদশাহ হইলে মুর্শিদকুলি খাঁকে, বাঙ্গালাদেশ ত্যাগ করিতেই হইবে। এখন যদি কিছু টাকা ধার দিয়া শাহজাদা ফর্‌রুখ্‌সিয়ারকে হাতে রাখিতে পার, তাহা হইলে তখন সুবা বাঙ্গালার রাজস্ব-বিভাগ তোমারই হাতে আসিবে।"

"খাঁ সাহেব! আপনি যাহা বলিতেছেন, সমস্তই ঠিক; কিন্তু অতটা টাকা,—আমি গরীব মানুষ।"

"শেঠ মাণিকচাঁদ! বণিয়ার হাল হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্রই সমান। তুমি কাল বর্দ্ধমানের রাজাকে পঁচিশ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছ; আর আজ শাহজাদা আজীম্-উশ্-শানকে দশ লক্ষ টাকা দিতে পার না? একথা কে বিশ্বাস করিবে?"

"আমি—অ্যাঁ—বর্দ্ধমানের রাজাকে—?"

"দেখ শেঠজি! ভাবিও না যে, শাহজাদা কোন খবর রাখেন না। আমারও ওয়াকীয়া-নবীশ সুবার প্রতি চাক্‌লায়-চাক্‌লায়, থানায়-থানায় আছে। তোমার কোন্ কুঠীর কত টাকা বর্দ্ধমানে গিয়াছে, এবং কোন্ কুঠীর কত টাকা সুদরে ইরশাল্ হইয়াছে, সে সমস্ত খবরই আমি রাখি। আমি সুলতান শাহজাদা আজীম্-উশ্-শানের নামে তোমার নিকট হইতে দশ লক্ষ টাকা চাহিতেছি,—তুমি দিবে কি না সাফ জবাব দাও।"

"আমি—আমি—আমি—?"

"শেঠ মাণিকচাঁদ! মনে যদি কোন মৎলব থাকে, তাহা খুলিয়া বল। দেখ, তুমি যাহা চাহ, তাহাও আমি শুনিয়াছি। মুর্শিদকুলি খাঁ যাহা তোমাকে দেয় নাই, তাহা সহজেই পাইতে পার। সুবা বাঙ্গালার তিন টাকশালের ও উড়িষ্যার এক টাকশালের ইজারা কল্য প্রভাতেই আমি তোমাকে দিতে পারি।"

অর্থলোলুপ বণিক আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া মুসলমানের হস্তদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া এবং অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া কহিল, "খাঁ সাহেব! তাহা হইলে আমি তোমাকে লাখ টাকা পেশ্‌কশ্ দিব।" খাওয়াস্ হাসিয়া কহিল, "বাজে কথায় আমি ভুলিব না শেঠ মাণিকচাঁদ! নাওয়ারার চারিখানি ছিপ লইয়া যাও,—রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বে নগদ দশলক্ষ টাকা আনিয়া হাজির কর; তাহা হইলে সুবা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সমস্ত টাকশালের ইজারা পাইবে।"

"জামিন?"

"সুবাদারের মোহরযুক্ত ফরমাণ্ আর শাহজাদার পঞ্জা-ওয়ালা রশীদ।"

"খাঁ সাহেব! টাকশাল কয়টার ইজারা যদি পাই, তাহা হইলে বিশেষ কিছু লোকসান হইবে না; কিন্তু সময় বড় মন্দ—"

"আমাকে দুই ঘণ্টা বাজে কথা না বলাইয়া যদি এই কথায় রাজী হইতে, তাহা হইলে এতক্ষণে অনেক কাজ করিয়া ফেলিতে পারিতাম। তুমি ছিপ লইয়া চলিয়া যাও, —আমি ফর্ম্মান্ ও রশীদের ব্যবস্থা করিতেছি। শাহজাদা এখনও ফিরিলেন না, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিবার কথা ছিল! তোমার সঙ্গে মোকাবেলা সর্ত্ত হইলেই ভাল হইত।"

"আর মোকাবেলায় কাজ নাই খাঁ সাহেব,—তাহা হইলে আরও দুই এক লাখ বাড়িয়া যাইবে। আপনি ছিপের হুকুম করিয়া দিন।"

"দেখিও শেঠ! আমার হিস্সাটা যেন ভুল না হয়। নগদ লাখ টাকা সেলামি,—আর খাজানা হইতে টাকা বাহির হইবার সময়ে দশলাখ টাকার উপরে শতকরা এক টাকা।"

"তাহাই হইবে।"

খাওয়াস্ বস্ত্রমধ্য হইতে রজত-নির্ম্মিত বংশী বাহির করিয়া তাহাতে ফুঁ দিল। বংশীধ্বনি শুনিয়া দুইজন হরকরা সোণার আশা লইয়া ছুটিয়া আসিল। খাওয়াস্ তাহাদিগকে কহিল, "পাঁচখানা ছিপ ও দুইশত আহদী মহিমাপুরে শেঠ মাণিকচাঁদের কুঠিতে এখনই যাইবে,—বখসী আমীন খাঁ ও রাজা স্বরূপ সিং সঙ্গে যাইবেন, দশলাখ সিক্কা-মহিমাপুর হইতে লালবাগে আসিবে। কিন্তু সাবধান! মুর্শিদাবাদের মাছিটা পর্য্যন্ত যেন সন্ধান না পায়।"

হরকরাদ্বয় অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। সহসা আম্রকাননে দামামা বাজিয়া উঠিল। বণিক চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল; "খাঁ সাহেব! ব্যাপার কি?" খাওয়াস্ হাসিয়া কহিল, "শেঠ সাহেব! এত দিন মুর্শিদাবাদে থাকিয়া ইহার অর্থ বুঝ নাই? বাদশাহ স্বয়ং অথবা শাহজাদারা সহরে আসিলে অথবা সহর পরিত্যাগ করিলে দামামা বাজিয়া থাকে। শাহাজাদা ফিরিয়াছেন, তুমি কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে?"

"না খাঁ সাহেব! একবার ত বলিয়াছি। আমার ফিরিতে বিলম্ব হইলে টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়া যাইবে। দশলাখ টাকা অনেক টাকা,—বাহির করিয়া ওজন করিতে দুই প্রহর সময় লাগিবে।"

"ভাল, তুমি যাও। মনে রাখিও, উষার আলো দেখা দিবার পূর্ব্বে ছিপ্ লালবাগের ঘাটে ফিরিয়া আসা চাই। আর মনে রাখিও যে, টাকার খবর যদি জাফরকুলিখাঁর কাণে পৌঁছে, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না।"

বণিক খাওয়াসের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল, এবং সেলাম করিয়া নৌকায় চলিয়া গেল। এই সময় বিলাস-গৃহের দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিল; এবং একজন হরকরা আসিয়া তাঁহাকে কহিল, "জনাব! শাহজাদা তলব করিয়াছেন।" তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রিতে! তিনি কোথায়?" হরকরা কহিল, "এখনই মজলিসে আসিবেন।"

"সঙ্গে আর কে আছে?"

"আফ্রা সিয়াব খাঁ, আহাম্মদ বেগ এবং গোলামালি খাঁ। লুৎফুল্লা খাঁর সহিত দুইজন হিন্দু আসিয়াছে। তাহাদের চেহারা দেখিলে আমীর বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সঙ্গে লোক-লস্কর নাই।"

"তুমি চল, আমি যাইতেছি।"

একে-একে বিলাস-গৃহের সকল আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিল; উদ্যান-পথের উভয় পার্শ্বে হরকরাগণ মশাল ধরিয়া দাঁড়াইল,—শাহাজাদা মজলিসে আসিবেন। তখন খাওয়াস্ ধীরে-ধীরে গিয়া বিলাসগৃহের দুয়ারে দাঁড়াইল। শাহজাদার মুখ অপ্রসন্ন। তাঁহার সম্মুখে রূপসী নর্ত্তকী মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুককে দেখিয়া ফররুখ্-সিয়ার বলিয়া উঠিলেন, "এবাদ্-উল্লা! তুমি কোন কাজ ভাল করিয়া করিতে শিখ নাই। দুই জন তাওয়াইফ্ হাজির আছে; কিন্তু সঙ্গতওয়ালা কই?" এবাদ্-উল্লা খাঁ লজ্জিত হইয়া কহিল, "জনাব! আপনি এত রাত্রিতে মজলিসে আসিবেন, তাহা আশা করি নাই।"

"তুমি কি করিতেছিলে?"

"শাহজাদার খিদ্‌মতেই নিযুক্ত ছিলাম,—মহিমাপুর হইতে শেঠ মাণিকচাঁদকে ডাকাইয়াছিলাম।"

"সে সকল কথা এখন আর শুনিতে চাহি না, কাল সকালে শুনিব।"

"জনাব! হুকুম-মত টাকার ব্যবস্থা হইয়াছে,—বণিয়া

পূ লইয়া টাকা আনিতে গিয়াছে। সুবা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা জাতের ইজারার একখানা ফর্ম্মাণ ও টাকার রশীদ খনই চাই। শাহজাদার হুকুম হইলে লিখিয়া আনি।"

"বলিয়াছি ত, এখন ও-সকল কথা শুনিব না।"

এই সময়ে একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ মুসলমান মজলিসে বেশ করিল; এবং শাহজাদাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, নাব! লুৎফুল্লাখাঁর তাম্বুতে একজন হিন্দু সুন্দর সঙ্গত রিতেছে,—তাহাকে ডাকিয়া আনিব কি?"

"হিন্দু? সে দেখিতে কেমন?"

"দেখিতে বড় সুন্দর; কিন্তু জনাব, সে অন্ধ।"

"সে হিন্দু সত্য সত্যই দেবদূত,—সন্ধ্যাকালে একবার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে, এখন মজলিসটা রক্ষা করিল। তাহাকে শীঘ্র ডাকিয়া আন।"

এই সময় এবাদ্-উল্লা খাঁ বলিলেন, "জনাব! ফর্ম্মাণ ও রসিদখানা লিখিয়া আনিব কি?"

হুকুম হইল, "আন।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে একজন ক্ষুদ্রকায় হিন্দু লালবাগের চারিদিকের আম্রকাননমধ্যে সেনানিবাসে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিল। তখন অধিকাংশ লোক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যে দুই-একজন জাগিয়া ছিল, হিন্দু তাহাদিগকে বলিতেছিল, আমাকে শাহজাদার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পার?" কহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অবশেষে এক-জন দয়াপরবশ হইয়া কহিল, "দেখ বাপু! তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে শাহজাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে এক গলিয়া আশরফি খরচ করিতে হইবে, পারিবে?" হিন্দু বিস্মিত না হইয়া কহিল; "পারি না পারি চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

"নগদ একখানি আশরফি যদি খরচ করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে লুৎফুল্লাখাঁর তাম্বুতে লইয়া যাইব। সেখানে পরামর্শ পাইতে পার, কিন্তু তাহার মূল্য অন্ততঃ পাঁচ আশরফি।"

"পাঁচ আশরফি দিয়া ত পরামর্শ লইব, লইয়া কি করিব?"

"দোস্ত! তোমার অদৃষ্টে আজ শাহজাদার সহিত সাক্ষাৎ নাই দেখিতেছি। তুমি একটা কাজ কর—নগদ একটা আশরফি খরচ করিয়া ফেল,—তাহা হইলে হয় ত হাত খুলিয়া যাইতে পারে।"

আগন্তুক বাক্যব্যয় না করিয়া একটা আশরফি সৈনিককে দিল। সৈনিক সেটাকে দীপালোকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দোস্ত! তোমার আশরফিটা জাল নহে ত?" হিন্দু হাসিয়া কহিল, "পরীক্ষা করিয়া ত দেখিলে, কি রকম বুঝিলে?"

"বিশেষ কিছু বুঝিলাম না; কারণ, শাহজাদা ফেরুখ-সিয়ার বণিয়া বলিলেও হয়। আমাদের লস্করে বক্সীরাই খাইতে পায় না, তা, আমরা ত আহদী। শাহজাদা আজীম্-উশ্-শান্ সত্য-সত্যই শাহজাদা ছিল, তাঁহার আমলে দুই-চারিটা আসল আশরফি দেখিতে পাওয়া যাইত।"

"ভাল, এখন কি করিব বল?"

"দেখ, ঐ সম্মুখের আম গাছের নীচে লুৎফুল্লাখাঁর তাম্বু,—সটান সেখানে চলিয়া যাও,—লম্বা একটা কুর্ণীস করিয়া পাঁচখানা মোহর নজর পেশ কর, আর বল যে, যেমন করিয়া হউক শাহজাদার সাক্ষাৎ মিলা চাই।"

"তাহার পর?"

"তাহার পর আর কি? যাইবার সময় আমাকে ভুলিও না।"

আগন্তুক সৈনিক-নির্দ্দিষ্ট শিবিরের দিকে অগ্রসর হইল,—দূর হইতে এস্রাজের আওয়াজ তাহার কাণে পৌঁছিল। সে নিকটে গিয়া দেখিল যে, তাম্বুর ভিতরে একজন দীর্ঘ-কায় মানুষ এস্রাজ বাজাইবার চেষ্টা করিতেছে। আগন্তুক বাহিরে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল এবং পাঁচখান মোহর এস্রাজের সম্মুখে রাখিল। সুবর্ণের মধুর নিক্বন শুনিয়া লুৎফুল্লাখাঁর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল,—খাঁ-সাহেব এস্রাজ নামাইয়া আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিল। সে কহিল, "আসুন, বসুন।" হিন্দু অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "সে কি কথা, এমন গোস্তাকী কি আমি করিতে পারি? আপনার সম্মুখে বসিব? তাহার পূর্ব্বে নিজের মাথাটাই নিজে কাটিয়া ফেলিব। আমি নিতান্ত নাচার হইয়া আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি।"

"কি করিতে হইবে বলুন?"

"যেমন করিয়া হউক একবার শাহজাদার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে হইবে।"

"কাজটা অত্যন্ত কঠিন,—আহমদবেগকে অন্ততঃ দশ আশরফি দিতে হইবে।"

আগন্তুক দশখানা মোহর বাহির করিয়া এস্রাজের পাশে রাখিল। লুৎফুল্লা আশরফি কয়খানা বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া কহিল, "আফ্রাসিয়ার খাঁও কি দশ আশরফির কমে ছাড়িবে?" আগন্তুক এইবার একটু হাসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "মোট কত খরচ হইবে খাঁ-সাহেব?" লুৎফুল্লা বহুক্ষণ ধরিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়া স্থির করিল যে, পঞ্চাশ-খানা মোহরের অধিক দাবী করিলে শিকার হাত-ছাড়া হইতে পারে; অতএব দশখান পাওয়া গিয়াছে, আরো চল্লিশ থান দাবী করা যাইতে পারে। সে প্রকাশ্যে বলিল, "আমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা ছাড়া আরো চল্লিশথান মোহর লাগিবে।" আগন্তুক কহিল, "দিতে স্বীকার আছি; কিন্তু অর্দ্ধেকের অধিক অগ্রিম দিতে পারিব না।"

"উত্তম কথা। আপনি এস্থানে অপেক্ষা করুন,—আমি শাহজাদার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতে চলিলাম।"

আগন্তুকের নিকট হইতে আরো দশখান মোহর লইয়া লুৎফুল্লা খাঁ হৃষ্টচিত্তে লালবাগে প্রবেশ করিল। আগন্তুক তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক গালিচায় উপবেশন করিল।

তখন রজনীর তৃতীয় প্রহর প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, —লালবাগের ভিতর মহলের আলো নিবিয়া গিয়াছে। কেবল ভাগীরথী-তীরে বিলাস-গৃহ আলোকোজ্জ্বল,—সুকণ্ঠী গায়িকার কলকণ্ঠোত্থিত মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি যেন দিগন্ত মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। লুৎফুল্লা খাঁ কক্ষে প্রবেশ করিয়া শাহ-জাদাকে অভিবাদন করিল; এবং আফ্রাসিয়ার খাঁর নিকটে গিয়া বসিল। আফ্রাসিয়ার খাঁ অত্যন্ত বিরক্ত হইল এবং সেই বিরক্তি জ্ঞাপন করিবার জন্য লুৎফুল্লা খাঁর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। লুৎফুল্লা তখন একখানি আশরফি বাহির করিয়া তাহা আফ্রাসিয়ার খাঁর ক্রোড়ে ফেলিয়া দিল। মজলিসের মধ্যে আহমদবেগ ও আফ্রাসিয়ার ব্যতীত আর কেহ আশরফি দেখিতে পাইল না। আফ্রাসিয়ার আশরফি পাইয়া একটু নরম হইল। তখন সুযোগ বুঝিয়া লুৎফুল্লা অতি ধীরে তাহার কর্ণমূলে কহিল, "জনাব! একবার বাহিরে আসিবেন কি?" আফ্রাসিয়ার খাঁ উঠিল, লুৎফুল্লাও তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিল, এবং একটী-একটী করিয়া আর নয়টী আশরফি আফ্রাসিয়ারের হাতে গণিয়া দিয়া কহিল, "জনাব আলি! গোলামের গোস্তাকী মাফ হয়, বিশেষ গরজ না থাকিলে আপনাকে এত তক্‌লিফ্ দিতাম না। একজন হিন্দু শাহজাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে।"

"কত দিবে বলিয়াছে?"

"দশ আশরফি।"

"তাহাতে হইবে না,—আহমদ আশরফি দেখিয়াছে।"

"তাহাকেও দশ আশরফি দেওয়াইব।"

আফ্রাসিয়ার খাঁ কক্ষে ফিরিয়া গেল এবং আহমদ বেগকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সেই সঙ্গে আর এক ব্যক্তি মজলিস হইতে উঠিয়া আসিল; কিন্তু তাঁহারা কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না।

রজনীর তৃতীয় প্রহর শেষ হইল,—আম্রকাননে অনেক গুলা পেঁচক ডাকিয়া উঠিল,—আহমদবেগ শিহরিয়া উঠিল তাহা দেখিয়া আফ্রাসিয়ার খাঁ হাসিয়া কহিল, "কি খাঁ সাহেব, ভয় পাইলে না কি?" খাঁ সাহেব ভূমিতে নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিয়া কহিল, "এই চিড়িয়াগুলি আমার দুষমন। সে কথা যাক, কি বলিতেছিলে বল?"

"একজন কাফের শাহজাদার সঙ্গে দেখা করিতে চাহে, —নগদ দশ আশরফি পেশ্‌কশ্।"

আহমদ অভ্যাসবশতঃ হাত পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কই?" তখন আফ্রাসিয়ার খাঁ লুৎফুল্লাখাঁকে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে আরো দশ আশরফি লইল এবং তাহা আহমদবেগকে দিল। আহমদবেগ প্রসন্ন হইয়া কহিল, "তোমার কাফেরকে ডাকিয়া আন, আমি জনাব আলিকে রাজী করিতেছি।" লুৎফুল্লাখাঁ উদ্যানের বাহিরে চলিয়া গেল এবং অপর দুইজন বিলাস-গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিল। যে অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকিয়া ইহাদিগের কথোপকথন শুনিতেছিল, সে বাহিরে আসিয়া একটা মশাল জ্বালিল; এবং তাহা একজন হরকরার হাতে দিয়া তাহাকে ঘাটের উপর দাঁড়াইতে আদেশ করিল; এবং বলিয়া দিল যে, কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে যেন বলে, সে শাহজাদার আদেশে দাঁড়াইয়া আছে।

সে ব্যক্তি যখন বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিল, তখন আহমদ বেগের অনুরোধে ফরুখ্‌সিয়ার হিন্দুকে দর্শন দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই সময়ে সেই ব্যক্তি শাহজাদার কর্ণমূলে অস্পষ্ট স্বরে কি কহিল। তাহা শুনিয়া শাহজাদা আহমদ বেগকে কহিলেন, "বেশ! ঘাটের উপরে চৌকি দিতে বল —সেইস্থানে হিন্দুর সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

শ্রী শ্রী লক্ষ্মী

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

Blocks by Bharatvarsha Halftone Works

উচ্চ শ্রেণীর

ইউরোপীয়

ধরণের

পোষাক

ও

সকল প্রকার

ধুতি ও

শাড়ী

সুলভ মূল্যে

বিক্রয় হয়।

মফস্বল-

বিক্রয়ে

বিশেষ

সুবন্দোবস্ত

আছে।

পল এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড,

(কাপড় ও পোষাক)

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।
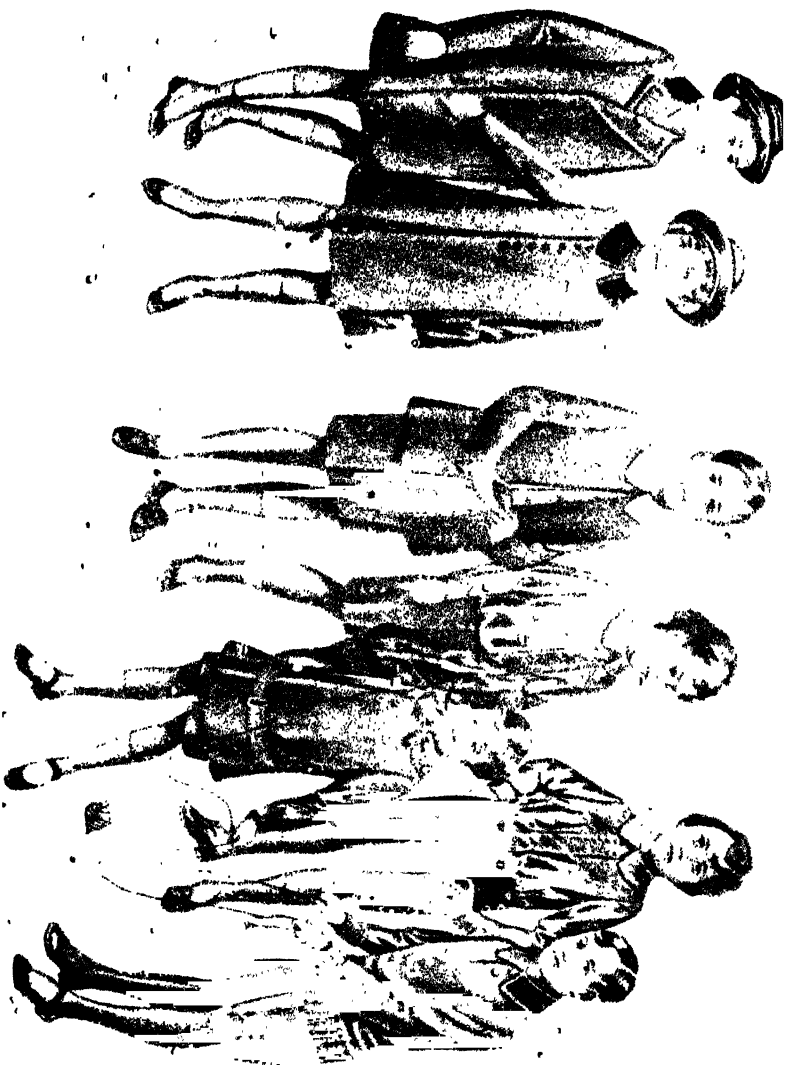
যুদ্ধ-ক্ষেত্রে

[শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ]

৪ঠা নভেম্বর প্রভাতে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন স্যাটোর বৃক্ষশাখায় বিহগ গান করিতেছে। আকাশে মেঘ বা বাতাসে কুজ্ঝটিকা নাই—দিবালোক বৃক্ষপত্রে ও স্যাটোর পরিখার জলে পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে আমরা সূর্য্যালোকেই অভ্যস্ত—বৎসরের মধ্যে সাত দিনও আমরা রৌদ্রলাভে বঞ্চিত হই না। উদয়াস্ত সূর্য্যের কিরণে আমাদের দিবারম্ভ ও দিনশেষ রঞ্জিত হয়। প্রভাতে উঠিয়াই আমরা পূর্ব্বদিক-চক্রবালে সূর্য্যোদয় দেখি। দিবসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে হিন্দু সূর্য্য-প্রণাম করেন—

"জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"

দিবাকরের দীপ্ত দ্যুতিতে আমাদের দিন উজ্জ্বল। তাই, যে দেশে দিনের পর দিন সূর্য্য হয় ম্লানজ্যোতিঃ, নহে ত অদৃশ্য, সে দেশ আমাদের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না। আমরা বর্ষার দিনকে "দুর্দ্দিন" বলি—য়ুরোপে সব দিনই প্রায় ধারাবর্ষ। তাই, কয়দিন পরে প্রভাতে উঠিয়া, মেঘমুক্ত গগনে সূর্য্যালোক দেখিয়া পরম পুলকিত হইলাম।

সকালে প্রাতরাশ শেষ করিয়াই আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে। চা পান করিয়া স্নানের আয়োজন করিলাম। অবশ্য স্নান সেই "কাক-স্নান।" তাহার পর আহারের গৃহে আসিয়া সকলে সমবেত হইলাম, এবং আহারের পর অপরাহ্নের জন্য আহার্য্য ও পানীয় সঙ্গে লইয়া কয়খানি মোটরে আরাসের (Arras) অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

পথে কয়খানি গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে হইল। এ সব গ্রামে ধ্বংস-চিহ্ন নাই; কৃষিকার্য্য চলিতেছে। তবে গ্রামে থাকিবার মধ্যে বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক—যুদ্ধক্ষম পুরুষ সকলেই স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছে। গ্রামে কোথাও আনন্দ-কোলাহল নাই;—হাস্য-কলরব—গীত-বাদ্যধ্বনি শ্রুত হয় না। বিপদের ছায়ায় সব অন্ধকার। বালকবালিকারাও যেন চাঞ্চল্য ভুলিয়া গিয়াছে—তাহাদেরও দৃষ্টিতে ভীতিভাব, মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য। মাঠে চাষের কাজ চলিতেছে। স্থানে-স্থানে যব—বিচালিসহ "পালা" দিয়া স্তূপাকারে রক্ষিত,—শস্য বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার লোক নাই। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারাও ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে। শালগম, গাজর প্রভৃতি তুলিয়া রাখিতেছে। অপেক্ষাকৃত শ্রমসাধ্য কার্য্য যুবতীরা করিতেছে। রেলের রাস্তার উপর গেট বন্ধ করা ও খুলিয়া দেওয়ার কাজ তাহারাই করিতেছে,—ঝুড়ীতে শাকশব্জী, মূল বহিয়া লইয়া যাইতেছে। এ সব দেশে কৃষিকার্য্যেও বিজ্ঞানের সাহায্য গৃহীত হয়; জমীতে ভাল করিয়া সার দিয়া তাহার ক্ষুণ্ণ উর্ব্বরতা পূর্ণ করিবার উপায় করা হয়,—যে ফসলের পর যে ফসল তুলিলে জমীর উপকার হয়, তাহার পর্য্যায় রক্ষিত হয় (Rotation of crops); বীজ বাছাই করিয়া লওয়া হয়—ইত্যাদি। আমাদের দেশে কৃষকের যেটুকু জ্ঞান সে অভিজ্ঞতালব্ধ;—তাহার দারিদ্র্য এবং তাহার অজ্ঞতা তাহার সর্ব্ববিধ উন্নতির পরিপন্থী হইয়া উঠে। কৃষিরও উন্নতি হয় না, কৃষকের অবস্থারও উন্নতি হয় না। য়ুরোপের সমস্যা—যে স্থানে একটি তৃণপত্র জন্মে, সেই স্থানে দুইটি উৎপন্ন করা। সে জন্য কত পরীক্ষা, কত আয়োজন! আর, আমাদের দেশে সবই সেই পুরাতন পদ্ধতিতে চলে—কোনরূপে দিন গুজরাণ করা, বা দিনগত পাপ ক্ষয় করা। কৃষি বিভাগের কার্য্যে কৃষক উপকৃত হয় না, কৃষকের কার্য্যে সমাজ উপকৃত হয় না। কৃষি-কার্য্য হইতে মার্কিন শিল্প-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আমাদের দেশে কৃষকের পেটে অন্ন নাই—সঞ্চয় ত পরের কথা; একবার পর্জ্জন্য বিমুখ হইলেই সে দুর্ভিক্ষে মরিতে বসে। এ দেশে শালগম, গাজর—সবই বড় বড়। অনেক মূল পশুর খাদ্য। গৃহ-পালিত পশুগুলিও বৃহদাকার। তাহাদেরও বংশোন্নতির জন্য চেষ্টার অন্ত নাই। যে দরে এ সব দেশে উৎকৃষ্ট গবী বা ষণ্ড, ঘোড়ী বা টঙ্গিন বিক্রয় হয়, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। ইহারা লাভ পায়—সুখে বাস করে, তাই সৌন্দর্য্যের দিকেও দৃষ্টি দিতে পারে—ক্ষেত্র পরিষ্কার,

ক্ষেত্রের বৃতি সরল ও সুরক্ষিত—আমাদের চিতার বা ভেরাণ্ডার আঁকাবাঁকা ভাঙ্গা বেড়ার মত নহে। এক হিসাবে প্রকৃতিও ইহাদিগের প্রতি প্রসন্ন। যখন-তখন মৃদু বর্ষণ হয়—ফসল জলে নষ্ট হয় না, কিন্তু জলাভাবেও শুকাইয়া যায় না। আবার, শীতপ্রধান দেশে লোক অধিক কায়িক শ্রম করিতে পারে—শ্রান্ত হয় না।

কিছুদূর অগ্রসর হইলে আবার চারিদিকে যুদ্ধের ধ্বংসের চিহ্ন, পরিত্যক্ত পল্লী, ভগ্নগৃহ—ভগ্নাবশেষ কারখানা। এক একটা বড় বড় কারখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোথাও কল ভাঙ্গিয়া—লোহা বাঁকিয়া রহিয়াছে, লক্ষ-লক্ষ টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পথের পার্শ্বে মাঠের মধ্যে ভগ্ন যান, ট্যাঙ্ক, কুণ্ডলীকৃত কাঁটাতার ইত্যাদি।

পথ উচুনীচু, কিন্তু সুগঠিত; পথ যে স্থানেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেই স্থানেই সংস্কৃত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে পথের উপর তক্তা পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্রমে দূরে আরাস যেন চিত্রপটে ফুটিয়া উঠিল। সব গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, তবে সবগুলিরই অঙ্গে আঘাতের চিহ্ন, স্থানে-স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। গৃহের চূড়া প্রায়ই ভাঙ্গিয়াছে।

সহরে লোক অধিক নাই, এখন ক্রমে ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু সহরের যে অবস্থা, তাহাতে অধিক লোকের বাসস্থান মিলিতে পারে না,—সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত অধিকাংশ গৃহই বাসের যোগ্য হইবে না। অথচ সংস্কার করিবার লোক নাই। যাহারা শ্রম করিতে পারে, তাহারা যুদ্ধে গিয়াছে বা যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত করিতেছে। প্রথমে আত্মরক্ষার উপায় করিতে হইবে, তাহার পর সহর সংস্কার। কত দিনে যে এই সব সহর সংস্কৃত করিয়া পূর্ব্বাবস্থ করা সম্ভব হইবে, তাহা কে বলিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, বিদেশ হইতে শ্রমজীবী না আনিলে লোকক্ষয়-দুর্ব্বল ফ্রান্সে অল্প দিনে সংস্কার কার্য্য সংসাধিত হইবে না। কেহ কেহ জার্ম্মাণদিগকে এই কার্য্যে বাধ্য করিবার কথাও বলিয়াছেন; তবে তাহা অবশ্য হইবে না। এখনই রাস্তাগুলির সংস্কার করিতে চীনাম্যান, ক্যাফার প্রভৃতি আনিতে হইয়াছে; স্থানে-স্থানে জার্ম্মাণ বন্দীরাও কাজ করিতেছে।

সহরে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলাম, রাস্তায় এক স্থানে জনতা। একখানি জীর্ণ ঘরের দ্বারে বসিয়া একজন লোক সংবাদপত্র বিক্রয় করিতেছে। সৈনিক, শ্রমজীবী, অধিবাসী সকলে সংবাদপত্র কিনিতে আসিয়াছে। এ সময় সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ কত প্রবল হয়, তাহা অবশ্য সহজেই অনুমেয়। দেখিতে-দেখিতে সংবাদপত্রগুলি ফুরাইয়া গেল, আমরা একখানিমাত্র সংগ্রহ করিতে পারিলাম। তাহার পর একজন উচ্চ স্বরে সংবাদ পাঠ করিতে লাগিল—তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া লোক শুনিতে লাগিল।

কতকগুলি লোক সহরে ফিরিয়া আসিয়াছে,—তাহাদের জন্য খাদ্যদ্রব্যের, শাকশব্জীর দোকান খোলা হইয়াছে। আর কোন দোকান নাই। আমরা সে সব দোকান অতিক্রম করিয়া গির্জ্জার সম্মুখে উপনীত হইলাম। গির্জ্জার ছাত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, প্রাচীরগুলিরও কতকাংশ ভগ্ন। গির্জ্জায় বহু মূর্ত্তি ও কারুকার্যখচিত স্তম্ভ ছিল। সে সবই গিয়াছে; বেদী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অজস্র গোলা বর্ষণেও দুইটি মূর্ত্তি—দুই জন ধর্ম্মাত্মার (saint) মূর্ত্তি আহত হয় নাই। কত লোক যে এই গির্জ্জা দেখিতে আসিয়াছে! লোক পাথরের টুকরায় আপনাদের নাম পেন্সিলে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। গির্জ্জা হইতে ভগ্নাংশ লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া ইস্তাহার দেওয়া হইয়াছে। জার্ম্মাণীর অত্যাচারের স্মৃতি চিহ্নরূপে ফরাসী-সরকার আরাসের এই অংশ ভগ্নাবস্থাতেই রাখিবেন। আমাদের দেশে সিপাহী-বিদ্রোহের স্মৃতি লক্ষ্ণৌ সহরে রেসিডেন্সীতে আছে। যখন জার্ম্মাণীর কামান অবিশ্রান্ত শেল বর্ষণ করে, তখন বহু লোক আরাসের এই গির্জ্জার সর্ব্বনিম্ন তলে—floorএর নিম্নে আশ্রয় লইয়াছিল।

গির্জ্জার সম্মুখে একটি অর্দ্ধভগ্ন গৃহে এক জন বৃদ্ধা ছিলেন। তিনি ও তাঁহার সমবয়স্কা আর একজন অগ্নি-বর্ষণের সময়ও আরাস ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা সহর ধ্বংসের সাক্ষী—তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে কত লোক হতাহত হইয়াছে। এই দুই জনের একজন অল্প দিন পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যিনি অবশিষ্ট, তিনি আমাদিগকে দেখিয়া গৃহ-দ্বারে আসিলেন, এবং আমাদিগকে সম্ভাষণ করিলেন।

গির্জ্জা দেখিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম—সহরের গৃহ-বেষ্টিত খোলা স্থানে (square) উপনীত হইলাম। যে সব গৃহ অবশিষ্ট আছে, তাহাতে স্পেনের স্থাপত্য-প্রভাব

সুস্পষ্ট। এক কালে ফ্রান্সের এই অংশে স্পেনের প্রভাব বড় অল্প ছিল না। আরাস হইতে আমরা কেম্ব্রাই (Cambrai) অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই পথের দুই পার্শ্বে যুদ্ধের চিহ্ন দেখিতে লাগিলাম। পথের পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষবীথির বৃক্ষগুলির কাণ্ডমাত্র অবশিষ্ট আছে। স্থানে-স্থানে সেই সব কাণ্ডে জাল ঝুলান রহিয়াছে,—সে সব জালে ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণের বস্ত্রখণ্ড সম্বদ্ধ। ইহাকেই ক্যামোফ্লাজ করা বলে। এইরূপে রঞ্জিত দ্রব্যাদি দূর হইতে দেখিতে পাইলেও, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। সেই জন্য সাবমেরিণকে প্রতারিত করিতে জলে জাহাজে, এবং পরিদর্শক এরোপ্লেনে বা বেলুনে আরোহীকে প্রতারিত করিবার জন্য বিমানগৃহে ও কামানে ক্যামোফ্লাজ করা; এমন কি, যে সব স্থানে সৈন্য সন্নিবেশ করা হয়, সে সব স্থানেও ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণের বস্ত্রখণ্ড ঝুলাইয়া ক্যামোফ্লাজ করা। আবার এমন প্রতারণা—এমন ক্যামোফ্লাজ যে যুদ্ধের বিবরণেও নাই, এমনও বলা যায় না। হতাহতের সংখ্যা কম করিয়া প্রকাশ করা, পরাজয়কে জয়ের বর্ণে রঞ্জিত করা, প্রত্যাবর্ত্তনকে স্থান-পরিবর্ত্তন বলা—এসবও ক্যামোফ্লাজ করা।

আমরা ভগ্ন-সেতু অতিক্রম করিলাম। জার্ম্মাণরা যে স্থানে সেতু পাইয়াছে, সেই স্থান হইতেই তাহার উপকরণ লইয়া গিয়াছে। আবার, যে দল যখন স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, সেই দলই পলায়ন-পথে—পশ্চাতের সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যাহাতে শত্রুর পক্ষে পশ্চাদ্ধাবন করা দুঃসাধ্য হয়। সেতুর পরই সহরে প্রবেশ করা গেল।

জার্ম্মাণরা অল্প দিন পূর্ব্বে ক্যাম্ব্রাই ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে অনেক দিন এ সহর তাহারাই অধিকার করিয়া ছিল—এ স্থানের অধিবাসীরা জার্ম্মাণ সেনার আগমন প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। কাজেই শেলে ক্যাম্ব্রাই তত ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; এমন কি, গির্জ্জাটিও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। সাধারণতঃ, গির্জ্জাই সহরের সর্ব্বোচ্চ গৃহ বলিয়া শত্রুর অগ্নিবর্ষণের লক্ষ্য হয়। এখনও সহরে অধিবাসীদিগকে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি প্রদান করা হয় নাই। সৈনিকরা সহরে পাহারা দিতেছে। সহরের পথের পার্শ্বে গৃহ-প্রাচীরে এখনও জার্ম্মাণদিগের কনসার্ট প্রভৃতির বিজ্ঞাপন-পত্র রহিয়াছে। সহরের অঙ্গে নানারূপে জার্ম্মাণ অধিকারের চিহ্ন সুপ্রকাশ।

আমাদের মোটরগুলি ক্যাম্ব্রাই সহরের মধ্যবর্ত্তী স্কোয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে গৃহাদিতে শেলের আঘাত-চিহ্ন। আমরা প্রথমেই গির্জ্জাটি দেখিতে গেলাম। এই সময়ে একজন ফরাসী সৈনিক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদের পরিচয় লইয়া তিনি বলিলেন, তিনি আমাদের সমব্যবসায়ী। তিনি সংবাদ-পত্র-সেবক ছিলেন—এখন সৈনিক হইয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, "এই সহরেই জার্ম্মাণদিগের বর্ব্বরতার পূর্ণ পরিচয় পাইবেন।" তিনি আমাদিগকে গির্জ্জার পশ্চাতে লইয়া গেলেন—সহরের সে অংশ অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "বর্ব্বররা যাইবার সময় নিষ্ফল ক্রোধে সহর পুড়াইয়া গিয়াছে। এই পৈশাচিক অত্যাচারের শাস্তি তাহাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে।" আমি বলিলাম, "কিন্তু তাহাদের পক্ষে কি বলিবার কিছুই নাই? পলায়ন কালে সৈনিকরা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ত ত্যক্ত স্থানে অগ্নিযোগ করিয়া যায়।" তিনি বলিলেন, "সে কথা বলিতে পারেন। কিন্তু যে-কোন গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, জার্ম্মাণদিগের বর্ব্বরতায় আর আপনার সন্দেহ থাকিবে না।"

গৃহগুলির অবস্থা শোচনীয়, পাছে কেহ কোন জিনিস লইয়া যায় বা গৃহে প্রবেশ করিয়া বিপন্ন হয়, সেই জন্য সে সব গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমাদিগকে যে-কোন গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিয়া ক্যাপ্টেন কেনেডী, লেফটেনাণ্ট ফ্যারার ও লেফটেনাণ্ট লং নিকটবর্ত্তী সামরিক শিবিরে গমন করিলেন।

বাস্তবিক যে-কোন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে জার্ম্মাণীর পদ্ধতিবদ্ধ নির্ম্মমতার নিদর্শনে বিরক্ত হইতে হয়। অধিকাংশ গৃহেই গৃহবাসীরা প্রথমে—সহর ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে গৃহের নিম্নতম অংশে (cellar) আশ্রয় লইয়াছিল। সেই অংশই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। শয্যা, আহারের পাত্র প্রভৃতি সেই অংশেই রহিয়াছে। তাহার পর জার্ম্মাণরা সে-সব গৃহ অধিকার করিয়াছিল। কোন গৃহের কোন চেয়ারের বা কৌচের গদিতে চামড়া নাই—তাহা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। যদি মনে করা যায়, জার্ম্মাণীতে চামড়ার

অভাব হইয়াছিল—সামরিক প্রয়োজনে সৈনিকেরা এ কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তবে টিকিনের বা ক্রেটনের গদির আবরণ-বস্ত্র কাটিয়া লইবার কারণ কি? ইহা নিতান্তই অকারণে দ্রব্যনাশ—কেবল প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থকরণ,—নিষ্ফল আক্রোশের হীন অভিব্যক্তি। আর এই কাজ সকল গৃহেই এমন পদ্ধতিবদ্ধ ভাবে করা হইয়াছে যে, সৈনিকেরা উপরিস্থিত কর্ম্মচারীর আদেশে যে এই কার্য্য করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

লোককে ভয় দেখানও জার্ম্মাণীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তাহার প্রমাণ আমরা স্যাটোতে রক্ষিত একখানি ইস্তাহারে পাইয়াছিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল—জার্ম্মাণদিগের সঙ্গে শত্রুতা করায় নিম্নলিখিত গ্রামগুলি দগ্ধ করা হইয়াছে;—সাবধান, যে তাহাদের সঙ্গে শত্রুতা করিবে, তাহাকেই শাস্তিভোগ করিতে হইবে। জার্ম্মাণ সেনাপতি এই ইস্তাহার প্রচার করিয়াছিলেন। অবশ্য এমন দৃষ্টান্ত অন্যত্রও বিরল নহে। ইংরাজ মেসোপোটেমিয়ায় উপনীত হইলে, বসরার নিকটে নদীর পরপারে কোন গ্রামের অধিবাসীরা কয়জন ইংরাজ সৈনিককে নিহত করায়, সে গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ক্যাম্বাই সহরে জার্ম্মাণদিগের অনাবশ্যক নির্ম্মমতার—wanton destructionএর যে দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, তাহার তুলনা নাই। গৃহবাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহারা যে-সব গৃহ অধিকার করিয়াছিল, যাইবার সময়ে সেই সব গৃহে একখানি দর্পণও অভগ্ন রাখিয়া যায় নাই। দর্পণ, তৈজস, পাত্রাদি সব ভাঙ্গিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহারা আলমারি ভাঙ্গিয়া মহিলাদিগের টুপী বাহির করিয়া পদাঘাতে নষ্ট করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে; আল্‌বাম হইতে ফটো ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কক্ষতলে ছড়াইয়া গিয়াছে। তাহার নমুনা আমি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় মানুষ এমন করিয়া মানুষের ক্ষতি করে—কেন? এই কার্য্য করিতে কি জার্ম্মাণদিগের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধার উদয় হয় নাই? সামরিক দীক্ষা কি তাহাদিগের হৃদয় হইতে মানবের সকল স্বাভাবিক ভাব একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছিল?

মোটরের আওয়াজ শুনিয়া আমরা একটি গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। ক্যাপ্টেন কেনেডী মোটর না থামিতেই চেঁচাইয়া বলিলেন, "২০ মাইল মাত্র দূরে যুদ্ধ চলিতেছে।" এই সংবাদে আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম,—তবে সত্য-সত্যই যুদ্ধ দেখা যাইবে। লেফটেনাণ্ট ফ্যারার মোটর হইতে নামিয়াই বলিলেন, "দেখিতে যাইবেন ত?" মিষ্টার স্যাগুব্রুক সর্ব্বাগ্রে বলিলেন, "তাহাতে আবার সন্দেহ থাকিতে পারে?" তখন ক্যাপ্টেন বলিলেন, "আজ কোন্ কোন্ স্থানে যাইতে হইবে, তাহার প্রোগ্রাম করা হইয়াছে। আপনারা যদি সে প্রোগ্রাম বাতিল করিতে বলেন, তবে আমি আপনাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইতে পারি। কিন্তু সে দায়িত্ব আপনাদের।" আমরা বলিলাম, "আমরা সব দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত আছি—যুদ্ধক্ষেত্রে চলুন।" তিনি বলিলেন, "আপনারা যখন সব দায়িত্ব লইতে সম্মত, তখন আর ভাবনা নাই—কারণ প্রোগ্রাম বাতিল করা ছাড়া আর একটা দায়িত্বও আছে। যদি শত্রুদিগের গোলায় আপনারা হত বা আহত হয়েন, তবে সে জন্য আমরা দায়ী হইব না। সে দায়িত্বও আপনাদিগকে লইতে হইবে।" আমরা স্বীকৃত হইলাম। আমি বলিলাম, "আমরা ভূমধ্য-সাগরে ডুবিয়া মরিলে বা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইলে আপনারা সে জন্য দায়ী হইবেন, আমরা ত এমন কোন সর্ত্ত করিয়া আসি নাই।"

নূতন অভিজ্ঞতা লাভাশার উৎসাহে আমরা উৎফুল্ল হইলাম। সঙ্গে যে খাবার ছিল, যত সত্বর সম্ভব সে সব শেষ করিয়া, আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তাহার পর মোটরগুলি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইল।

প্রথমে কিছু দূর যুদ্ধের কোন আয়োজন লক্ষ্য করিতে পারা গেল না। তাহার পর যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই সব আয়োজন লক্ষিত হইতে লাগিল—সেনাদল, কামান, সমর-সরঞ্জাম, আহতবাহী যান—সেই মৃত্যু-নাটকের অভিনয়ের সকল অভিনেতা প্রস্তুত হইয়া আছে। পথে একটি গ্রাম—তথায় সামরিক যানের অশ্ব, মোটর প্রভৃতি রাখিবার স্থান করা হইয়াছে। তথা হইতেই যুদ্ধক্ষেত্র আরম্ভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে; কেন না, সেই গ্রাম হইতে যুদ্ধক্ষেত্র পর্য্যন্ত যানগুলি অবিচ্ছিন্ন ভাবে যাইতেছে ও আসিতেছে। এক সারিতে সমর-সরঞ্জাম লইয়া অশ্ব-যান ও মোটর এবং রেডক্রশ-অঙ্কিত হতাহতবাহী যান অগ্রসর হইতেছে, আর এক সারিতে হতাহতবাহী যান দ্রুত প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে—মধ্য দিয়া মোটরগাড়ী ও

[মো]টর সাইকল-সংবাদাদির জন্য দ্রুত গতায়াত করিতেছে। [যে] সব গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ অনাবৃত, সে সকলে অল্প আহত [ব্য]ক্তিদিগকে লইয়া "ফিল্ড ড্রেসিং ষ্টেসনে" যাওয়া হইতেছে; যে সব গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগও আবৃত, সে সকলে অধিক [আ]হতদিগকে লইয়া যাওয়া হইতেছে। সে দৃশ্য ভুলিতে [পা]রা যায় না—দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত তাহা হৃদয়ে অস্বস্তির [উ]দ্রেক করে। কাহারও হাত উড়িয়া গিয়াছে, কাহারও [না]ক নাই, কাহারও মস্তকে আঘাত লাগিয়াছে—ব্যাণ্ডেজ [র]ক্তে সিক্ত হইয়াছে। সে দৃশ্য মানুষকে অবসন্ন করে। [ফি]রিবার সময় দেখিয়াছিলাম, একখানি ট্রেণ যাইতেছে—[ত]াহাতে কেবল আহত সৈনিক ও সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত [ব্য]ক্তিরা! এ যেন মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র—মৃত্যুর খেলা!

যাহারা সমর-সরঞ্জামের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছে—[মৃ]ত্যুর কবলে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও কেহ-[কে]হ প্রিয়পাত্র কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়াছে। তখনও মানুষের [কি] মায়া মমতা!

এইস্থানে কয়জন ভারতবাসীকে দেখিলাম। তাহারা [গ]াড়ীর কাজ করিতে—সহিস বা চালক হইয়া যুদ্ধের [প্র]থমেই ফ্রান্সে আসিয়াছিল—আজও দেশে ফিরিতে পাবে না। মিষ্টার ক্রেটন একজনকে ডাকিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি হিন্দুস্থান হইতে আসিতেছেন।" সে বিশ্বাস করিতেছে না দেখিয়া আমি মাথার হ্যাট খুলিয়া ফেলিলাম। তখন তাহার আর সন্দেহ রহিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাড়ী কোথায়?" আমি বলিলাম, "কলিকাতায়।" তখন সে বলিল, "বাবু সাহেব, এ বিপদের মধ্যেতেও আসিয়াছেন?" আমি দেখিতে আসিয়াছি বলিলে তাহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। সে কেবল বলিল—"দেখিবার জন্য!" তাহার বাড়ী পাঞ্জাবে জানিয়া, আমি তাহাকে আর একখানি মোটরে আমাদের সহযাত্রী পাঞ্জাবী, মৌলবী মাতুব আলেমের কাছে পাঠাইয়া দিলাম। যুদ্ধের বিরাট চিত্রে ইহারাও অঙ্কিত থাকিবে।

একটী বড় কামান দাগিবার ব্যবস্থা

অদূরে আকাশে বেলুন ও এরোপ্লেন দেখা গেল। সেই সকল বিমান হইতে শত্রুর অবস্থান ও গতি লক্ষ্য করিয়া সংবাদ দিলে, কামান হইতে শেল ছাড়া হইতেছে। পুরাতন যুদ্ধক্ষেত্রের উপর শকুনি উড়িবার বর্ণনা আছে। একালে বেলুন ও এরোপ্লেন তাহাদের স্থান লইয়াছে। মার্ণের যুদ্ধের পর এনের যুদ্ধে প্রথম এরোপ্লেন হইতে

শত্রুকে লক্ষ্য করা হয়। এখনও তাহাই প্রচলিত। শত্রুদিগের এরোপ্লেন নষ্ট করিবার জন্য অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট—কামানও হইয়াছে। জার্ম্মাণরা বৃটিশ এরোপ্লেন লক্ষ্য করিয়া শেল ছাড়িতেছে, দেখা গেল। এরোপ্লেন হইতে বিনাতারে সংবাদ দিলে—যুদ্ধক্ষেত্রে সে সংবাদ লইয়া কামানের গোলন্দাজের কাছে টেলিফোঁ করা হয়; সে তদনুসারে কামান ঠিক করিয়া শেল ছাড়ে। ৩ মিনিটের মধ্যে সব হইয়া যায়! সব সেন কলে হয়। শেলটি বাহির

মুখস (Gas mask) পড়িয়া আছে। আমরা কুড়াইয়া লইলাম;—টুপীগুলি এত ভারী যে, তাহা মাথায় দিয়া মানুষ কেমন করিয়া থাকে, তাহা শিরাবরণহীন বাঙ্গালী আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

আমরা কামানগুলির কাছে আসিলাম। ক্যাপ্টেন কেনেডী যাইয়া তথায় আমাদের অবতরণের আদেশ লইয়া আসিলেন। আমরা মাঠে নামিলাম। সে গ্রামের নাম—রুঁয়ে (Ruesnes)
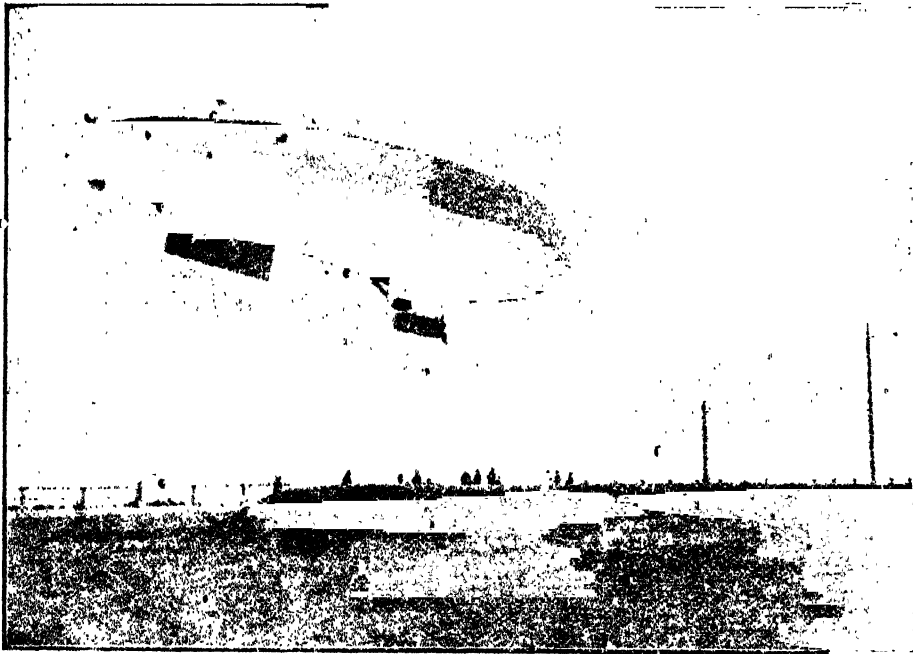
বৃটীশ বেলুন (Dirigible)

হইয়া যাইবার পর কামান আপনা-আপনি নত হইয়া পড়ে। বেলুনগুলি পাছে বাতাসে ভাসিয়া যায়, সেই জন্য তাহাতেও কল বসান হইয়াছে। এই সব বেলুনকে Dirigible বেলুন বলে। কামানেও কল আছে—অতি সহজে যে-কোন দিকে ফিরান—উঠান-নামান যায়।

আমরা যে স্থানে উপনীত হইলাম, তথায় সে-দিন সকালেও জার্ম্মাণরা ছিল। তখন তাহারা সরিয়া যাইতেছে—দূরে ধূম দেখিয়া বুঝা যায়, পলায়ন-পথে তাহারা গৃহে, গ্রামে অগ্নিসংযোগ করিতেছে। মাঠে জার্ম্মাণদিগের পরিত্যক্ত ধাতু-নির্ম্মিত টুপী ও বিষবাষ্প হইতে আত্মরক্ষার উপায়

যুদ্ধক্ষেত্রে! যে যুদ্ধ দেখিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বিপদসঙ্কুল পথে ভারতবর্ষ হইতে ফ্রান্সে আসিয়াছি,—কোন অসুবিধাই অসুবিধা বলিয়া মনে করি নাই, আজ সেই যুদ্ধ দেখিতে পাইলাম। যে স্থানে কামান বসান হইয়াছে, তাহা বেড়া দিয়া ঘেরা। কেহ কেহ কামানের কাছে যাইলে তাহার গর্জ্জন সহ্য করিতে পারে না—বধির হইয়া যায়। তাই আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আমরা কি বেড়ার ভিতরে যাইব? আমরা বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া বেড়ার ভিতরে গেলাম; কামানের পাশে যাইয়া দাঁড়াইলাম। উপরের এরোপ্লেন হইতে বিনাতারে সংবাদ
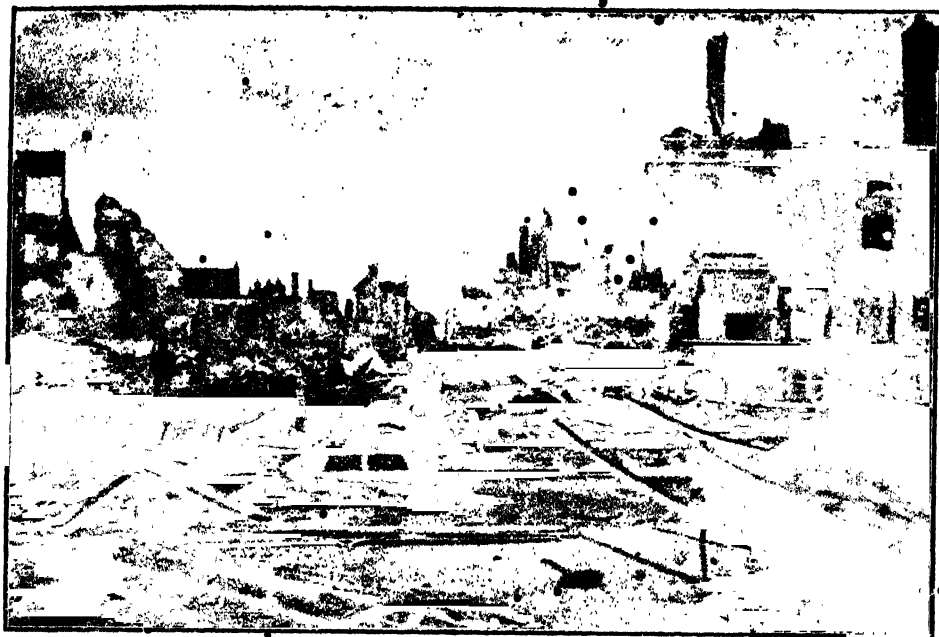
যুদ্ধক্ষেত্রের একটী সহরের ধ্বংসাবস্থা

বেলিউলের দৃশ্য

আসিতেছে—তাহা লইয়া গোলন্দাজকে টেলিফোঁ করা হইতেছে—সে তদনুসারে কামান হইতে শেল ছাড়িতেছে। দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। শেল এত দ্রুত যায় যে, একটি কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না।

আজকাল যুদ্ধ পুরাণেতিহাস-বর্ণিত যুদ্ধের মত নহে। সৈনিকরা রণবাদ্যের তালে-তালে পা ফেলিয়া যুদ্ধ করিতে যায়—সম্মুখ-সমর হয় না—বন্দুকের ব্যবহারেরও বড় প্রয়োজন হয় না। খাকী রং-করা পোষাক-পরা সৈনিকরা পরিখার মধ্যে থাকে—দূর হইতে তাহাদিগকে দেখা যায় না। কেবল সময়ে-সময়ে অপর পক্ষের পরিখা দখল করিবার জন্য তাহারা বাহির হয়; তখন সঙ্গীন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়—অস্ত্রে-অস্ত্রে সংঘর্ষ হয়। সেই পর্য্যন্ত সম্মুখ-সমর। নহিলে কেবল শেল-বর্ষণ—শব্দের মধ্যে কেবল কামানের গর্জ্জন। আকাশে কেবল কামানের অবিশ্রান্ত অগ্নিবৃষ্টি।

সম্মুখ পরিখা মধ্যে সৈনিক। বিপক্ষ দলের শেলে হতাহত হইতেছে। কিন্তু আমরা যে স্থানে ছিলাম, তথায় কোন শেল আসিতেছিল না। এ যুদ্ধে শেলই প্রধান উপকরণ; কেবলই শেল বর্ষিত হয়—শত্রুকে তিষ্ঠিতে দেয় না।

ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। কখন যে দুই ঘণ্টারও অধিক কাল কাটিয়া গিয়াছিল, জানিতে পারি নাই। ক্যাপ্টেন কেনেডী ঘড়ী দেখিয়া বলিলেন, আমাদিগকে ফিরিতে হইবে; এখন না ফিরিলে আহারের সময়ে স্যাটোয় পৌছিতে পারা যাইবে না।

ফিরিতে হইবে। কিন্তু ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। মৃত্যুর ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য আর দেখিতে পাইব না—এ অভিজ্ঞতা আর কখন লাভ করিতে পারিব না। তবুও ফিরিতে হইল। তাহার পর দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে স্যাটোয় ফিরিয়া আসিলাম।

ইমান্‌দার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দীর্ঘ দ্রুত চরণক্ষেপে, পাকা সাড়ে চার ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে ফৈজুর বেশী রাত্রি হইল না। তখন সবে মাত্র ধান কাটা হইয়া গিয়াছে,—কাযেই মেঠো পথ সে সময়টায় বেশ সরল-সুগম ছিল। ছুটাছুটি করিয়া পথ হাঁটিতে চিরদিনই ফৈজুর বড় আনন্দ! অক্লান্ত চিত্তে সমস্ত পথটা অতিক্রম করিয়া ফৈজু যখন সঙ্কটপুরে পৌছিল—তখন রাত্রি আটটা বাজে।

জমিদার-বাড়ীর সদর দুয়ারে পৌছিয়া ফৈজু দেখিল, দারবান সেখানে নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া, অগত্যা ফৈজু ভিতরে ঢুকিল। চক-মিলান সদরবাড়ীর একদিকে দুর্গা-পূজার দালান, অন্য দিকে রাসমঞ্চ,—দুই-ই অন্ধকারময়। অন্য দিকের বারেণ্ডা দুটি আলোকোজ্জ্বল। এক-দিকের বারেণ্ডায় মাদুর বিছাইয়া র‍্যাপার গায়ে দিয়া দুই জন লোক বসিয়া কথা কহিতেছে;—তাহাদের অদূরে, বারেণ্ডার থামের আড়ালে, শতছিন্ন মলিন বস্ত্রে অঙ্গ আবৃত করিয়া এক কঙ্কালসার প্রৌঢ়, জড় সড় হইয়া বসিয়া, শীতে হি হি করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার শীর্ণ, বিবর্ণ মুখের, ও স্তিমিত চক্ষুর সকরুণ ভাবটা কন্যাদায়গ্রস্ত অর্থহীন বাঙালী ভদ্রলোকের মত! তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই ফৈজু বুঝিল, লোকটা বাকী খাজনার দায়ে প্রপীড়িত গরীব প্রজা। অন্য লোক দুটি জমিদারী-সেরেস্তার—কেষ্ট-বিষ্টু-মহেশ্বর গোছের,—নায়েব-গোমস্তা-শ্রেণীর বলিয়াই মনে হইল। তাহাদের দিকে চাহিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া ফৈজু বলিল, "সেজবাবু বাটীতে আছেন?"

কথোপকথন-রত লোক দুইটী ফৈজুর দিকে ফিরিয়া চাহিল। একজন বলিল, "কোত্থেকে আসছ? কি দরকার?"

প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা বেমালুম চাপিয়া লইয়া, ফৈজু 'দরকারটা' ব্যক্ত করিল; বলিল, "সেজবাবুর মুলাকাৎ চাই, বড় জরুরী দরকার।"

প্রশ্নকর্ত্তাকে পুনশ্চ প্রশ্ন করিতে উদ্যত দেখিয়া, চতুর ফৈজু ফশ করিয়া উল্টা প্রশ্ন করিয়া কথায় বাধা দিল; বলিল, "জয়দেবপুরের নায়েব কোথা?"

লোক দুটি এবার একযোগে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কেন বল দেখি—কোথা থেকে আসছ তুমি?"

ফৈজু দেখিল, আর ঠেকাইতে গেলে উল্টা উৎপত্তির সম্ভাবনা। ধীর ভাবে বলিল, "আমি তেজপুরের সুনীল বাবুর বাড়ী থেকে আসছি—"কথাটা বলিয়াই ফৈজু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উভয়ের মুখপানে চাহিল; দেখিল, মুহূর্ত্তে দুজনের মুখেই ভাবান্তর আসিয়া পড়িয়াছে। তারমধ্যে একজনের মুখ উদ্বেগে বিবর্ণপ্রায়! চকিত দৃষ্টিতে ফৈজুর পানে একবার চাহিয়া, লোকটা কুণ্ঠিত ভাবে মাথা নীচু করিয়া, নিকটস্থ 'শেহা' খাতাখানা টানিয়া লইয়া—দেখিতে লাগিল।

ফৈজু তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া, লোকটার সামনে বসিয়া, তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "মশাই, আপনিই কি জয়দেবপুরের নূতন নায়েব?" নায়েবকে সে পূর্ব্বে দেখে নাই।

সে ব্যক্তি কোন উত্তর না দিয়া, অধিকতর সঙ্কুচিত ভাবে শেহার খাতাই দেখিতে লাগিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সেজবাবু ঐ দালানেই আছেন, এস, তাঁর কাছে।"

ফৈজু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "নায়েববাবু, আপনিও চলুন।"

লোকটা কুণ্ঠা-জড়িত স্বরে বলিল, "আমি গিয়া আর—"

দ্বিতীয় ব্যক্তি ব্যস্ত ভাবে বলিল, "উনি বাবুর ভাগ্নে।"

শেহা-পরিদর্শক মানুষটি এবার সাহস-ভরে মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি তো এঁদের নায়েব নই—আমি শুধু—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ফৈজু দৃঢ়স্বরে বলিল, "সে আমি আপনাকে চিন্তে পেরেছি,—না চিন্‌লে কি বল্‌তে পারি!—এখন জয়দেবপুরের প্রজাদের খবরটা কি বলুন দেখি? চৈত্র কিস্তির সব খাজনা আদায় হয়ে গেছে?"—ফৈজু আবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষে তাহার মুখ পানে চাহিল। সমস্তই আন্দাজী চাল!

ভয়ে, কুণ্ঠায় থতমত খাইয়া, লোকটা ফশ্ করিয়া বলিয়া ফেলিল,—"কই, সব তো এখনও আদায় হয় নি—"

একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল, "তাই তো নায়েব বাবু, এ যে বড় মুস্কিলের কথা হোল! খাজনা আদায় নাই, আর আপনি এই সময় এসে এখানে বসে রইলেন!—কাগজ-পত্র সব কোথা?"

ইতস্ততঃ করিয়া নায়েববাবু বলিলেন, "জয়দেবপুরে আছে।"

সন্দিগ্ধ স্বরে ফৈজু বলিল, "কথাটা কি ঠিক হোল নায়েববাবু! আমি তো শুনলাম, কাগজগুলা আপনি সবই এখানে নিয়ে এসেছেন।"

নায়েববাবু এবার আর কোন উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। ঘাড় হেঁট করিয়া নিজের পায়ের নখগুলি দেখিতে-দেখিতে, অস্ফুট স্বরে গোজ্-গোজ্ করিয়া—কি স্বগতঃ উক্তি করিলেন। ফৈজু পুনশ্চ প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল; কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি—যিনি ফৈজুকে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "কি হে, তুমি সেজ কর্ত্তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবে? না; কি মতলব?"

"এই যে—" বলিয়া ফৈজু উঠিয়া দাঁড়াইল। নায়েববাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি এইখানেই থাক্‌বেন? আচ্ছা, আমি এখনি আস্‌ছি,—অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

ফৈজু যদিও মুখে ঐ কথা বলিল, কিন্তু মনে-মনে নিশ্চয় জানিল, সে আশা বৃথা। অনিচ্ছুক ভাবে কয় পদ অগ্রসর হইয়া,—সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, ফৈজু বলিল, "আর একটা কথা বলে রাখি,—আপনাকে আমার সঙ্গে কাল সকালে তেজপুর যেতে হবে,—আপনার মা-ঠাকরুণ বলে দিয়েছেন,—বিশেষ কিছু দরকারী কায আছে তাঁর।"

অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি ফিরিয়া দাঁড়াইল,—প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "দাঁড়াও হে ছোকরা, আগে সেজকর্ত্তার সঙ্গে কথা কও, তার পর নায়েববাবুকে বোলো। তুমি যে ভয়ানক 'তেলিয়ে' উঠেছ দেখ্‌ছি—"

ফৈজু হাসি মুখে সবিনয়ে বলিল, "রাগ কর্‌বেন না বাবুজী, আমি গরীব তাঁবেদার আপনাদের।" মনে-মনে বলিল,—'জমিদারী আদব-কায়দাগুলো ভাল বুঝি না, তাই ভয়ে-ভয়ে সাবধানে চলি!'

ফৈজুর বিনয়ে বাবুজী মনে-মনে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইলেন। একটু ভারিক্কি ভঙ্গিতে পুনশ্চ চলিতে-চলিতে,

অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বলিলেন, "তুমি কি সুনীল বাবুদের, গোমস্তা?"

ধীর ভাবে ফৈজু বলিল, "আজ্ঞে না।"

বাবুজী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "তবে?"

বিপন্ন ভাবে হাসিয়া ফৈজু বলিল, "কি বলি?", মনে-মনে বলিল,—নায়েবকে ভাগ্নে-জামাই বলিয়া চালাইবার মত অগাধ বিদ্যা যে আমার নাই!

একটু থামিয়া প্রকাশ্যে পুনশ্চ বলিল, "আমি তো তাঁদের এস্‌টেটের কেউ নই এখন। তবে আমার বাবা তাঁদের এস্‌টেটের নগদী।"

তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড তাচ্ছল্যের স্বরে উত্তর হইল, "ওঃ! তুমি নগদীর ছেলে!"

অবিকৃত, শান্ত স্বরে ফৈজু উত্তর দিল, "জী—হাঁ।"

দুজনে আসিয়া—অন্য দিকের বারেণ্ডায় উঠিল। বারেণ্ডায় লোকজন কেহ ছিল না, কিন্তু তাহার পাশের ঘরে বহু-কণ্ঠের কলরব শুনা যাইতেছিল। সেই ঘরের দুয়ারের সামনে আসিয়া বাবুজী ডাকিল,—"সেজবাবু, সেজবাবু—তেজপুর থেকে লোক এসেছে।"

ঘরের সমস্ত কোলাহল অকস্মাৎ থামিয়া গেল। ভিতর হইতে প্রবল-গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কে এসেছে?"

একটু ব্যঙ্গ-স্বরে উত্তর হইল, "সুনীলবাবুর নগদীর ছেলে!"

বিকট তাচ্ছল্যভরা উৎকট উচ্চহাস্যে সমস্ত ঘর ভরিয়া গেল! কে একজন স্বভাব-কর্কশ কণ্ঠে, শ্লেষের স্বরে বলিয়া উঠিল, "বাপ্‌রে! নগদীর ছেলে! নিয়ে এস, নিয়ে এস,—দেখি সে কেমন অপরূপ জীব!"

ফৈজু অনেক দেশ ঘুরিয়া, অনেক রকমের ধনবান্ লোক দেখিয়াছিল! সে জানিত, এমন মহদন্তঃকরণ ধনবান্ খুব অল্পই আছেন, যাঁহারা দীনের প্রতি তাচ্ছল্য-দৃষ্টি হানিতে পরাঙ্মুখ! যাহাই হউক, আপাততঃ সম্মুখস্থ ধনবান্ মহাশয়ের মাৎসর্য্য-গর্ব্বের ঝাঁজটা অকাতরে শিরোধার্য্য করিয়া চলাই কর্ত্তব্য ভাবিয়া, ফৈজু প্রসন্ন মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি ঘরের ভেতরে যাব?"

পথ-প্রদর্শক মহাশয় ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিলেন, এস।"

ফৈজু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখিল, প্রকাণ্ড হলঘর জুড়িয়া বিরাট সভা বসিয়াছে! ফরাশের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়া, আলবোলার নল হাতে জমিদার-বাবু বসিয়া আছেন। ময়লা রং, দেহের আয়তন লম্বায়-চওড়ায় জমিদারী কারবারের উপযুক্ত, সুপ্রশস্ত। কাল মুখের মাঝে ভাঁটার মত গোল চক্ষু দুটি অনবরত লাটাইয়ের মত দ্রুত-বেগে ঘুরিতেছে। মোটা-মোটা ঠোঁট-দুখানি যেন দন্তের ভারে উল্টাইয়া পড়িতেছে। মুখের ভাবটা রূঢ়, কর্কশ, আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ। জমিদার-বাবুর বয়স বছর ছত্রিশ।

ফৈজু বুঝিল, ইনিই সেজবাবু; ইনিই বর্ত্তমান জমিদার। ইহাঁর বড় ভাই ও ভাজ অল্প বয়সে মারা গিয়াছেন, মেজ ভাজ দুটি ছোট মেয়ে লইয়া বিধবা হইয়া বাপের বাড়ীতে বাস করিতেছে। কাযেই দুই ভাইয়ের অংশ এক রকম নিষ্কণ্টকে তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। পিতৃমাতৃহীন ছোট ভাই একটা ছিল,—কিন্তু সে দাদাদের অবহেলা-দৃষ্টির আওতায় পড়িয়া, অল্প বয়স হইতেই লেখাপড়ার কাষ ছাড়িয়া—পাকা জমিদারী চালে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; এখন মদ খাইয়া, বদমাইসি করিয়া, সিগারেট পোড়াইয়া, ক্লারিওনেট বাজাইয়া,—রক্ত-উঠা ব্যায়রাম ধরাইয়াছে। সুতরাং তাহার অংশটাও সেজবাবুর ভাগেই কিছুদিন পরে পড়িবে। অতএব, সেজবাবুই এ মুল্লুকের একমাত্র জমিদার।

সেজবাবু যৌবনে ও বাল্যে—মা সরস্বতীর উপর কৃপা-শীল হইয়া অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যাবতীয় পদার্থ গলাধঃকরণ করিয়া শূরম্মহাশূর আখ্যা লাভ করিয়াছেন! এম-এ পাশের পর কিছুদিন একটা ছোট-খাট শ্রেণীর কলেজে প্রফেসারীও করিয়াছিলেন। তারপর কেন যে প্রফেসারী খসিল, তাহার সঠিক তত্ত্ব কেউ জানে না। তবে তিনি জমিদার-মানুষ,—কাযেই জমিদারী চালে সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন যে, ছেলে-পড়ান ও গরু-চরান একই কায। সুতরাং তাঁহার মত ভদ্রসন্তানের কি সে জঘন্য কায পোষায়! তাই তিনি ঘৃণা-ভরে প্রফেসারী ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন তিনি সরস্বতীর সঙ্গে আড়ি দিয়া, অন্য দেবদেবীর সঙ্গে 'ভাব' করিয়াছেন, সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ উহ্য থাকাই ভাল। সাধারণ লোক সকলেই তাঁহাকে ভয় করে। আর, যাহারা বেপরোয়া খাতির নদারৎ

তাহারা দুঃখিত চিত্তে তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তাকে ঘৃণাভরে ধিক্কার দিয়া থাকে!

ফৈজু সেজবাবুকে কখনো ভাল করিয়া দেখে নাই, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে শুনিয়াছিল অনেক কথা। সে শুনিয়াছিল, এই অসাধারণ মানুষটি এক অসাধারণতম গুণ-বিশেষণে বিভূষিত! তিনি না কি পণ্ডিতী সুরচ্ছন্দে খুব চমৎকার ভাবে, বীভৎস ও বিসদৃশ পরিহাস রচনা করিতে পারেন; এবং সেইজন্য না কি তাঁহার অনুগ্রহ-প্রার্থী পারিষদ্-বর্গ তাঁহাকে "বুদ্ধিতে বৃহস্পতি" আখ্যা দিয়াছেন! সুতরাং এ হেন বৃহস্পতির সামনে যথোচিত সমীহ ভাব প্রদর্শন করাই উচিত বলিয়া, ফৈজু মাথা নোয়াইয়া সেলাম করিয়া চিঠিখানি দিয়া বলিল, "ছোটবাবু নিজেই আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আস্‌তেন,—কিন্তু কাযে ব্যস্ত আছেন, তাই এখন আস্‌তে পারলেন না,—এর পর আস্‌বেন?"

ফৈজুর পথ-প্রদর্শক লোকটি চিঠিখানি লইয়া কর্ত্তার হাতে দিয়া, তাঁহার ফরাসের এক প্রান্তে আসন গ্রহণ করিল। সেজবাবু তাঁহার গোলাকৃতি বড়-বড় চোখের উদাস, অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি মাধুরী একবার ফৈজুর উপর বুলাইয়া, গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, আমি চিঠি দেখছি,—এখন রাখ—"

ঘরের প্রান্তে কতকগুলা ঘটি ও গ্লাশ লইয়া একটা চাকর ঠক্-ঠক্, ঘট্-ঘট্ শব্দে ব্যস্ত ভাবে কি কায করিতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া সেজবাবু অকস্মাৎ উগ্র-চীৎকারে ধমক দিয়া বলিলেন, "ব্যাটাচ্ছেলে! এক ছিলিম তামাক দিতে বললুম, গ্রাহ্য হোল না!"

চাকরটা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "এই যে হুজুর,—আর এক গ্লাশ সিদ্ধি আছে, এইটে দিয়ে তবে আমি যাচ্ছি।"

সভায় উপস্থিত দশ-বার-যোড়া লুব্ধ দৃষ্টি,—একযোগে ঘুরিয়া গিয়া সেই এক গ্লাশ সিদ্ধির উপর আপতিত হইল। চাকরটা সিদ্ধির গ্লাশ হাতে লইয়া নীরব কুণ্ঠায় সকলের মুখ পানে চাহিতে লাগিল,—বিশেষ করিয়া চাহিল, নবাগত দুই জনের পানে। ফৈজুর পথ-প্রদর্শক লোকটি বোধ হয় চক্ষুলজ্জার মায়ায় পড়িয়া, অনিচ্ছার সহিত মাথা নাড়িলেন। চাকরটা ফৈজুর দিকে চাহিয়া হাতের গ্লাশটা দেখাইয়া বলিল, "পিওগে?"

"নেহি—" ফৈজু ঘাড় নাড়িল।

সেজবাবু মোটা গলায় প্রবল তাচ্ছল্যের সহিত সদম্ভে হাসিয়া বলিলেন,—"আরে দে-দে,—ওই সমুদ্র-মন্থনোত্থিত হলাহল নীলকণ্ঠের কণ্ঠ ভিন্ন আর অন্য কোথাও ঠাঁই পাবে না,—আমায় দে ওটা!"

সভায় পাকা সিদ্ধিখোর দলের দুই-চারিজন সেই সিদ্ধির সরবৎটির উপর সসঙ্কোচে, লুব্ধ-করুণ দৃষ্টিতে এতক্ষণ চাহিতেছিল; কিন্তু এবার সূক্ষ্মদর্শী সেজবাবুর সুচারু সিদ্ধান্তের ধাক্কায়, সকলেরই মন আহত হইয়া নৈরাশ্য-নীলাম্বুতে ডুবিল! বাকী কয়জন লোক 'বাবুর' বাগাড়ম্বরের ঝাঁজে অভিভূত হইয়া, দীন নয়নে, ভক্তি গদ্-গদ্ প্রাণে, অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সেজবাবু ভোক্তাশূন্য, হতভাগা সিদ্ধির সরবৎটার চরম সদ্গতির বন্দোবস্তে চিত্ত নিয়োগ করিলেন।

ফৈজুর দুশ্চিন্তা-ব্যাকুল চক্ষু দুটি এতক্ষণের পর এবার নিঃশব্দ কৌতুকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! হাতের উপর চিবুক রাখিয়া, সামনে ঝুঁকিয়া বসিয়া, এক দৃষ্টে সে সেজবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল!

সেজবাবুর সামনে তাঁহার বারো বছরের ছেলে গণেশ-চন্দ্র বসিয়া ছিল। এই ছেলেটি তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একমাত্র পুত্র। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীও পরে-পরে গতায়ু হইয়াছে, এখন তাঁহার চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী—ঘরণী-গৃহিণী! প্রথম পক্ষের স্ত্রী এক মাসের শিশু রাখিয়া সন্দেহজনক মৃত্যুতে মরিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী একজন সূতিকাগারে আর একজন চার মাসের শিশু রাখিয়া, যথাক্রমে গলায় দড়ি দিয়া ও কূয়ায় ঝাঁপ দিয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে,—কারণ অপ্রকাশ!—ছেলে-গুলিও নানা অসুখের ছুতায় মারা গিয়াছে। এখন জীবিত আছে শুধু প্রথম পক্ষের এই বড় ছেলেটি। ছেলেটি স্কুলে পড়ে, আর পিতৃদেবের বজ্রকঠোর হুঙ্কার পরিপাক করিয়া, নিস্পন্দ-হৃদয়ে, নিরানন্দ-নিস্তেজ প্রাণটা বহিয়া বেড়ায়। পিতার প্রভুত্ব ও পাণ্ডিত্যের অপ্রতিহত প্রতাপে, আশ-পাশের লোকেরা যতটুকু জড়সড়, ছেলে তার চেয়ে বেশী জড়ীভূত। সে মজলিশের মাঝে বসিয়া নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, খুব খর চঞ্চল নয়নে সকলের মুখের পানে তাকাইতেছিল,—শুধু চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না নিজের পিতার মুখ পানে!

সিদ্ধির পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া নামাইয়া রাখি া, সেজ-বাবু বুকের উপর বাঁ হাতটা রাখিয়া, উচ্চ গম্ভীর নিনাদে কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া, এদিক-ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, সভাস্থ সকলের মুখ-ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইলেন; দেখিলেন, আগন্তুক ফৈজু অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ নয়নে তাঁহার মুখ-পানে চাহিয়া আছে। দম্ভে তাঁহার বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠিল। হঠাৎ পুত্রের দিকে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, "শোন হে গণেশচন্দর, এইখানে তোমায় একটা 'লেশন্' দেওয়া যাক্!"

পিতার সাদর সম্ভাষণে ঘুরন্ত-দৃষ্টি পুত্রের আকণ্ঠ আতঙ্কে শুকাইয়া গেল! সে অতি কষ্টে চক্ষু তুলিয়া, আড়ষ্ট হইয়া পিতার মুখ-পানে চাহিল। সভাস্থ সকলে ব্যগ্র-দৃষ্টিতে সেজ-বাবুর পানে চাহিতে লাগিল।

সেজবাবু আবার কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কথা আরম্ভ করিলেন, "এই যে সিদ্ধিটা আমি ফের খেলুম,—তুমি মনে কোরো না যে, খালি স্ফূর্ত্তি করবার জন্যে তোমার বাবা এটা খেয়েছে। এটা খেলুম কেন জানো? ভগবানের বিষয় ভাবতে মনে প্রকৃতিস্থতা আনবার জন্যে!—না হলে, গোস্বামীর শিষ্য আমি—বৈষ্ণব হয়ে কখনো মাদক-দ্রব্য স্পর্শ করি না, এটা জানো?"

পুত্র সেটার সঠিক সত্য সংবাদ জানুক আর নাই জানুক,—কিন্তু সে ঠিক জানিত যে, এই মজলিশে সমাগত তাষামোদকারী বর্ব্বর সম্প্রদায়কে উপদেশ বিলাইবার জন্য—পিতা তাহাকে উপলক্ষ্য স্বরূপ সামনে বসাইয়া রাখিয়াছেন! তাই সে তৎক্ষণাৎ কলের পুতুলের মত ঘাড় নাড়িয়া তাঁহার 'লেশন্' শিক্ষা সার্থক করিল।

পিতা গর্ব্বভরে তাঁহার ভক্তদলের প্রতি বিজয় গৌরব-উজ্জ্বল কটাক্ষক্ষেপ করিয়া—দম্ভভরে হাসিলেন! তার পর তাকিয়াটা একপাশ হইতে অন্য পাশে টানিয়া লইয়া, গম্ভারীচালে জাঁকিয়া বসিয়া, পুত্রকে তাহার স্কুলের পড়ার পরীক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন। পিতার প্রশ্নানুযায়ী পুত্র ইংরাজি বানান ও আবৃত্তি বলিয়া যাইতে লাগিল। সভায় স্তাবকদলের মধ্যে আপোষে গুঞ্জন সুরু হইল,—"উঃ, সেজবাবু আমাদের বিদ্যের জাহাজ! চার-চারটে পাশ! ছেলেও তেম্নি হবে! হাজার হোক বাপ্ কা বেটা!" ...ইত্যাদি।

ফৈজু দেখিল, এ বিদ্বানের সভায় তাহার মত মুর্খের বসিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ, তাহার ক্ষুদ্র চিঠিখানা পড়িবার ফুরসুৎ তো এই মহৎ ব্যক্তির এখন নাই! এ স্থলে চুপচাপ বসিয়া রঙ্গ দেখার চেয়ে, পূর্ব্বোক্ত নায়েবের কাছে গিয়া ভিতরের খবর জানিবার চেষ্টা করাই ভাল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া পথ-প্রদর্শক লোকটির দিকে চাহিয়া বলিল, "জী, আমি ঐখানে যাচ্ছি, দরকার হলে ডাক্‌বেন।"

সেজবাবু যদিও পুত্রের পরীক্ষা-কার্য্যে ব্যাপৃত, তবুও তাঁহার চোখ-কাণগুলি সকল দিকে সতর্ক ছিল! তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ওখানে একলা গিয়ে কি করবে? কেউ তো নাই ওখানে।"

ফৈজু সবিনয়ে বলিল, "আজ্ঞে জয়দেবপুরের নায়েব মশাই আছেন,—তাঁর কাছে—"

বিস্ময়-চকিত দৃষ্টি তুলিয়া, সেজবাবু উদ্ধত ভাবে বলিলেন, "কে আছেন?"

ফৈজু স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখ-পানে চাহিয়া, অবিচল কণ্ঠে উত্তর দিল, "জয়দেবপুরের নায়েব মশাই—"

সেজবাবু তাঁহার কর্ম্মচারী সেই পথ-প্রদর্শক লোকটির দিকে জ্বলন্ত অগ্নিবর্ষী কটাক্ষক্ষেপ করিয়া, বজ্ররূঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "হরিহর!"

হরিহর ভয়ে রুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া, তাড়াতাড়িতে তোৎলাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, আজ্ঞে—আমাদের রসিক জামাইবাবু—আপনার ভাগ্নে-জামাই ওখানে বসে আছেন, তা—তা তাকেই এ ছোক্‌রা নায়েব মনে করেছে। জয়দেবপুরের নায়েব কোথা এখানে!"

আশ্বস্ত হইয়া, প্রচণ্ড তাচ্ছল্যের সহিত গম্ভীর নিনাদে সেজবাবু বলিলেন, "তাই বল! জয়দেবপুরের নায়েব শুনে আমি অবাক্ হয়ে গেছি! জয়দেবপুরের নায়েব তো ফেরার! তাকে তুমি পাবে কোথা এখানে? কোন্ আহাম্মক তোমায় এমন খবর দিয়েছে?"

ফৈজুর ইচ্ছা হইল, স্পষ্টাস্পষ্টি কথা কহিয়া, এই ধূর্ত্ত, মিথ্যাবাদী বিদ্বান মানুষটির সহিত একটা হেস্ত-নেস্ত করিয়া লয়। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, সুমতি দেবীর একান্ত নিষেধ! দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ফৈজু নির্ব্বাক রহিল।

বাবু যদি থামিলেন, তো—বাবুর মোসাহেবের দল

স্বরে হল্লা করিয়া উঠিলেন!—"জয়দেবপুরের নায়েব খানে! কি ভয়ানক অসম্ভব কথা! নায়েবের প্রেতাত্মাটা খানে আসিয়াছে বলিলেও সোজা হইত! কিন্তু নায়েব আসিয়াছে—সশরীরে! কি সর্ব্বনাশের কথা! যে লোক ত বড় মিথ্যা কথা বলিতে পারে, সে লোক তো সব করিতে পারে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফৈজু সংযত-ধৈর্য্যে চুপ করিয়া সব শুনিল। মনে মনে স্থির হইয়া একবার ভাবিল,—ও দালানে ছুটিয়া গিয়া নায়েবের হাতটা ধরিয়া টানিয়া আনিয়া, ইহাদের সাম্‌নে তাহাকে দুই ঝাঁকুনিতে সোজা করিয়া, তাহার নিজমুখেই প্রকৃত পরিচয়টা ব্যক্ত করাইয়া দেয়। কিন্তু তখনই মনে ছিল, ইহাঁদের বিরাট মিথ্যা ষড়যন্ত্রের সামনে তাহার ক্ষুদ্র তা টিকিবে না,—ইহাঁরা গায়ের জোরে তাহাকে 'তুড়িতে উড়াইয়া' দিবেন!—অতএব এই ক্ষমতাশালী মিথ্যাবাদীদের সামনে এখন অক্ষমের মত চুপ করিয়া থাকাই উচিত।

মোসাহেব দলের মন্তব্য-স্রোত তুমুল তোড়ে চলিতে লাগিল! ওদিকে সেজবাবু ততক্ষণে চিঠির খাম ছিঁড়িয়া, চিঠিখানা পাঠ করিয়া ফেলিলেন! তার পর চিঠিখানা অবজ্ঞাভরে ছুড়িয়া ফেলিয়া, বিজ্ঞতার দম্ভে অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, "সেই যে একটা কথা আছে সে, much cry and little wool অর্থাৎ কি না বেশী আড়ম্বরের ফল কিছুই না'—এদের ঠিক সেই রোগে ধরেছে! কোথায় নায়েব তার ঠিক নাই, আমার কাছে চোর ধরতে লোক পাঠিয়েছে! হুঃ!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাঁ-পাশে উপবিষ্ট পারিষদটির মুখের কাছে হাত নাড়িয়া রসিকতার রস-সিঞ্চিত স্বরে বলিলেন, "এবার,—হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু পাকিয়া পাকল, এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল!' মন্দ নয় হে!"

আর যায় কোথা! এবার যেন তুবড়ীতে আগুন দিল! পারিষদবর্গ হা—হা, হো—হো রবে বিকট হাসি হাসিল, মুখে-মুখে বিদ্যাসুন্দরের প্রায় আদ্যোপান্ত সমস্ত আওড়াইয়া ফেলিল! সভাগৃহ জম্‌জমাইয়া উঠিল!

পড়ুয়া কিশোর বালকটি পিতার পারিষদবৃন্দের রহস্যের এক বিন্দুও বুঝিতে না পারিয়া, অবাক্ কৌতূহলী দৃষ্টিতে এর-ওর মুখপানে চাহিতে লাগিল। স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল! তাহার হাত দুইটা ভিতরে-ভিতরে যেন নিস্‌পিস্ করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, এই রসিক মোসাহেবগুলার গলা টিপিয়া ধরিয়া কণ্ঠ রোধ করিয়া দেয়! ইহাদের রসিকতার দাপট চিরদিনের মত ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারিলে, জগতে ক্ষতি যত বেশীই হউক—অন্ততঃ অনেকখানি স্বাস্থ্যের হাওয়া পাওয়া যাইবে।

রসিকতার তরঙ্গ-প্লাবন আর থামে না! ঢেউয়ের উপর ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল! অন্তরে-অন্তরে অত্যন্ত বিরক্ত, অসহিষ্ণু হইয়া ফৈজু অবশেষে খোদ মুরুব্বির দিকে চাহিয়া বলিল, "হুজুর, মেহেরবাণী করে যদি চিঠির জবাবটা লিখে দেন, তাহলে আমি এখনি বেরিয়ে পড়ি।"

মুরুব্বি একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে ফৈজুর মুখপানে চাহিয়া, মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিলেন। তারপর বলিলেন, "এখুনি বেরিয়ে পড়বে? সে কি! তেজপুর গিয়ে পৌঁছুবে আজই?"

ফৈজু বলিল, "জী, হাঁ।"

সেজবাবু ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তোমায় কি তাঁরা আজই ফিরে যেতে বলেছেন?"

"না।"

"তবে আজ থেকে যাও।"

"না জনাব, নায়েব বাবুর জন্যই আমি এসেছিলুম। তাঁকেই যখন পেলুম না, তখন অনর্থক কেন আর সময় নষ্ট করি?"

সভায় শ্লোক আওড়ান'র ঝড় তখন অনেকটা শান্ত হইয়াছে। সভার একপাশে ঘাড়ে-গর্দ্দানে সমান—একজন সুস্থূল আকৃতির প্রৌঢ় ব্যক্তি, কৌপীন-বহির্ব্বাস ও তিলক-ছাপায় সসজ্জ হইয়া মালা হাতে করিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি মালা ফিরাইতে-ফিরাইতে সভার সমস্ত আলোচনায় যোগদান করিতেছিলেন—মায় বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শ্লোক আবৃত্তিতে পর্য্যন্ত!—তিনি এবার ঘাড় উঁচাইয়া ফৈজুর পানে সদয় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি লেখা-পড়া জানো, নয় হে? তোমার বাড়ী কোথা, তেজপুরেই? তোমার নামটি কি বাপু?"

ফৈজু বলিল, "সৈয়দ ফয়জুদ্দীন আহমদ্।"

সভার আর এক প্রান্তে একজন আটাশ-ত্রিশ বছর বয়সের পাত্‌লা চেহারা, গৌরবর্ণ বাবু চশমা চোখে দিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি এতক্ষণ শুধু পা নাচাইতে-নাচাইতে

সুধাও আমাদের বেশ লেখাপড়া শিখেছে। বিয়ের পরও সে যাতে ভাল রকম শিখতে পারে, আমি তার বন্দোবস্ত করে দেব।"

দিদি হাস্তে হাস্তে বল্লেন, "সর্ব্বনাশ! তা হ'লেই মাটী করেছেন। ও বাই ওর ছাড়াতেই হবে। তা না হ'লে কি আর ও আমাদের থাকবে? আর আমার ঐ একটা সম্বল।" বাবা বলে উঠলেন, "পাগ্লি মা! সবাই কি আর বিলেত গেলেই অমনি পর হয়ে যায়? যে দিন-কাল পড়েছে, তাতে লেখাপড়া শিখে একবার ঘুরে আস্তে পারলে একটা মানুষের মত হবে।"

"তোমাদের ঐ এক কথা! আচ্ছা বাবা! আমাদের দেশে থেকে লেখাপড়া শিখ্লে কি মানুষ হয় না?—ঐ যে কি এক ভুল ধারণা তোমাদের আমি বুঝি না,—তাঁরও ঐ কথা!"

দিদি বাহিরে এসেই আমায় নিয়ে পড়লেন। চুল বাঁধতে, সাজগোজ কর্তেই বিকেল হয়ে গেল। সে দিন আমার সাজগোজের প্রতি দিদি যেন একটু বেশী মনোযোগী হয়ে পড়লেন। আমার চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন, হঠাৎ কি জানি কি ভেবে একটা টান মেরে আমার চুলগুলো খুলে দিয়ে পিঠের উপর ছড়িয়ে দিলেন, মাঝখানে শুধু একটা লাল রেশমী ফিতের ফাঁস্ দিয়ে দিলেন। সাবান দিয়ে মুখখানা ধুয়ে দিয়ে একটু ক্রীম, ঠোঁটে একটু রং দিয়ে দিলেন। আমি অবাক্ হয়ে দিদির মুখের পানে চেয়ে রইলুম। তিনি গম্ভীরভাবে একখানা বাদামী-রং-করা সাড়ী এনে আমায় পরতে বলে, একখানা বেশ বড় 'টিপ্' কপালে বসিয়ে দিয়ে, আমার চিবুকখানা তুলে ধরে হাস্তে-হাস্তে বল্লেন, "আজ ভাইমণির আমার মুণ্ডুটী ঘুরে যাবে!"—আমার ভারি লজ্জা করতে লাগল। দিদির গায়ে একটা ছোট্ট চিম্‌টী দিয়ে বল্লুম, "যাঃ! আমি এমনি সং সেজে সাম্নে বেরুব' কি না?"

"খবর্দ্দার! দুষ্টুমি কর্লে মর্‌বি!"

ঠিক্ সেই সময়ে "বৌদি! বৌদি!" বল্‌তে-বল্‌তে একেবারে তিনি নীচে নেমে আমাদের সাম্নে এসে দাঁড়ালেন। একবার অতি কষ্টে চোখ তুলে তাঁর মুখের পানে চেয়ে দেখলুম, তাঁর সুন্দর আয়ত চক্ষুদুটি আমারই মুখের উপর নিবদ্ধ। আর পিছনে দাঁড়িয়ে দিদি মুখ টিপে হাস্‌ছে। আমার ত' লজ্জায় মাটির মধ্যে মিশে যেতে ইচ্ছা হ'ল'!

(২)

নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেবদূতের মত একটী দিব্যি টুকটুকে খোকা এসে দিদির কোল ও আমাদের ঘর আলো করে দিলে। বাড়ীময় একটা আনন্দের সোরগোল পড়ে গেল। জামাইবাবু খোকাকে দেখে গেলেন। কিন্তু কি ছাই 'তাঁর' লেখাপড়া,—তিনি আর একদিন সময় করে এ আদরের খোকামণিকে দেখতে আসতে পারলেন না। আমার ত' ভারি রাগ হ'ত'। দিদিকে বল্‌লে তিনি কেবল মুখ টিপে হাসতেই থাকেন—হয় ত মনে ভাবেন আমার গরজ কিছু বেশী। কাজেই দিদির সামনে আর সে প্রসঙ্গের উত্থাপন করতুম না। খোকা হওয়ার পর তিনি দিদিকে প্রায়ই চিঠি দিতেন। দিদি সূতিকাগৃহে,—কাজেই, সে চিঠিগুলো পড়ে আমিই দিদিকে শোনাতেম। আরও লুকিয়ে অনেকবার পড়তুম, যেন পড়ে আশ মিটত না। প্রথম দু'তিনখানা চিঠিতে তিনি আমার নাম উল্লেখ করে কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সেই তাঁর হাতের লেখা দুটী অক্ষর 'সুধা'র মধ্যে কি যেন একটা মাদকতা লুকানো থাকতো,—আমি দেখ্‌তে-দেখ্‌তে বিভোর হয়ে যেতুম। বিশ্বজগতের সমস্ত মাধুর্য্য যেন সেই অক্ষর দুটীর মধ্যে জড় হয়ে বায়োস্কোপের ছবির মত আমার চোখের সামনে সদাই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠত। আমি অনেকবার ঠিক্ তেমনি ভাবে ঐ অক্ষর দুটী লেখে দিয়ে লেখবার চেষ্টা করতুম; কিন্তু তেমনটী যেন কিছুতেই হতে চাইত না। আমি মনে-মনে কত কল্পনার স্বপ্নজাল বুনতে-বুনতে চিঠিগুলো নাড়াচাড়া করতুম। সে ভাব, সে মাধুর্য্য রবিবাবুর কবিতার মধ্যেও খুঁজে পেতুম না। কিন্তু তার পরের চিঠিগুলো খুঁজে-খুঁজেও যখন তাদের সারা বুকের উপর ঐ ছোট্ট নামটী, সামান্য দুটী অক্ষর একত্র, একসঙ্গে দেখতে পেতুম না, তখন একটা অন্ধ অভিমান আমার সমস্ত অন্তরটা জুড়ে হাহা করে ঘুরে বেড়াত। আমার চোখদুটী জলে ভরে আসত'—মনে হত, নিষ্ঠুর দেবতা! এটুকু দিতেও এত কুণ্ঠিত!

বুকে-পিঠে করে যখন খোকাকে পাঁচ মাসেরটী করে

...লুম, সেই সময় একদিন হঠাৎ জামাই বাবুর কাছ ...ক দিদির তলব হল। উনি আসছেন দিদিকে ও ...কাকে নিতে। আমার দেবতার দর্শন ও খোকার ...চ্ছেদ, এই দুই আনন্দ ও ব্যথায় প্রাণটা ভরে উঠ্‌ল। ...কা তার কচি মোমের মত হাত-দুখানি দিয়ে আমার ...গুচ্ছ চুল ধরে টান্‌তে-টান্‌তে আমার মুখের পানে ...য়ে একগাল হেসে উঠ্‌ল; আমার চোখ-দুটো সহসা ভারি ...য় উঠে, খোকারি বুকের উপর টপ্‌টপ্‌ করে দু'ফোঁটা ...তু অশ্রু পড়ে গেল। খোকা যেন বিস্মিত আতঙ্কে ...মার মুখের পানে চেয়ে রৈল—তারি মুখের হাসিটুকু ...সে নিবে গেল। আমি অজস্র চুম্বনে খোকাকে আচ্ছন্ন ...রে দিলুম।

খোকাকে কোলে নিয়ে দিদি যখন গাড়ীতে উঠ্‌লেন, ...মার প্রাণটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেল। অজস্র ...রায় অশ্রু ঝরে পড়ে আমার গণ্ড প্লাবিত করে দিলে। ...নি গাড়ীতে ওঠবার সময় আমার হাত ধরে বল্লেন, ...য়া কি সুধা!—এই ও মাসে খোকার ভাতের সময় ...মাদের বাড়ী গিয়ে আবার তাকে দেখে আসবে।"—কি ...ধু সম্বোধন! কি প্রাণময় স্পর্শ! আমি তাঁর পাদমূলে ...নত হয়ে প্রণাম কল্লুম। তিনি হাসতে-হাসতে গাড়ীতে ...ঠে, খোকাকে কোলে নিয়ে বল্লেন,—"ছিঃ! পরের ...ছেলের উপর কি এত মায়া বসাতে আছে?"

খোকা বাবুও তাঁর চসমার পানে চেয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল।

(৩)

খোকার অন্নপ্রাশনের পর প্রায় দেড় বৎসর কেটে গেল। কতদিন খোকাকে দেখিনি! দিদি তাঁর সংসারে ...কা,—তাঁর এ-বাড়ী আসার বড়-একটা সুবিধা হয়ে ...ঠ্‌ত না। খোকার জন্যু আমার বড় মন কেমন ...রত;—ভাবতুম, সে এতদিনে কত বড়টী হয়েছে,— ...মনটী হয়েছে! আর ভাবতুম তাঁর কথা,—তাঁর ...মন তার কথা!—আমার জীবন-মরণের কথা! কেন ...ন হল?—কেন তিনি এত নিষ্ঠুর হয়ে আমার সযত্নে- ...া তাসের ঘরটী পায়ে ঠেলে ভেঙ্গে দিলেন? বিলাতই ...যান, তাঁর বিয়ে করে যেতে কি ক্ষতি ছিল? সেখান ... ফিরে এলে কি তাঁর মনের মত হতে পারতুম না? কেন তিনি বলে দিলেন না? কেন তিনি শিখিয়ে দিলেন না? তিনি যেমনটী শেখাতেন, আমি তেমনটা প্রাণপণে শিখতুম,—তাঁকে অদেয় ত' আমার কিছুই ছিল না। তবে কেন নিষ্ঠুর দেবতা!—তবে কেন আমায় দূরে ঠেলে ফেলে দিলে? তিনি গান ভালবাসেন,—তা আমি যেমন জানি, লজ্জাসরম ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাঁকে শুনিয়েছিলুম। কেন তিনি বল্লেন না,—আমি ভাল করে শিখতুম! তবে কি আমি তাঁর অযোগ্য? অযোগ্য ত' বটেই! পায়ের নীচে থাক্‌তে চেয়েছিলুম—দেবতার যোগ্য হবার স্পর্দ্ধা ত' কখন কোন দিন রাখিনি! কেন তবে আমায় এই আঁধারের মধ্যে ফেলে দিলেন?......এমনি একটা কালো নিরাশাভরা আকুলতায় আমার হৃদয় সদাই ভারি হয়ে উঠ্‌ত। আমার অজ্ঞাতে গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে, উপাধান সিক্ত করে দিত। একটা অখণ্ড, অবশ্যম্ভাবী বিপদের ভয়ে আমার ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না,—শ্রান্তির অবসন্নতার মত একটা ঘন কাল ছায়া যেন আমায় ঘিরে ফেলেছিল।

দিদির নিমন্ত্রণে আমি খোকাকে দেখতে গিয়েছিলুম। খোকাকে কাছে পেয়ে যেন আমার হৃদয়ের কালো ছায়াটুকু অপসৃত হয়ে গেল। সে বেশ হাঁট্‌তে এবং আধ-আধ কথা বলতে শিখেছিল। তার সঙ্গে খেলা-ধূলায়, আর নিষ্ঠুর দেবতার দর্শনের মধ্যে দিয়ে, আমার দিনগুলো বেশ সহজ ভাবেই কেটে যাচ্ছিল। খোকার কল্যাণে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতাটুকু দিন-দিন অলক্ষ্যে বেড়ে উঠ্‌ছিল। তাঁর সম্মুখে প্রাণপণ প্রয়াসে হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন ব্যথাটুকু গোপন করে, তাঁর রহস্যালাপে যোগ দিতুম; খোকাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে খেলা কর্তুম; সময়মত তাঁর অনেক ছোটখাট কাজও করে দিতুম। তিনি যখন আমার সেই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রসাধন-গুলির অনর্গল প্রশংসা করে যেতেন, তখন চোখ দুটো আমার ভারি হ'য়ে উঠত,—আমার মনে হ'ত, তাঁর পা দুখানার উপর আমার মাথাটা চেপে ধরে বলি, 'ওগো! আমার চির আকাঙ্ক্ষিত! ওগো আমার বাঞ্ছিত দেবতা! আমার অধিকার দাও, আমার লজ্জা নিবারণ কর!'—

(৪)

উপরের বারান্দায় পরিপূর্ণ জোৎস্নালোকে আমি খোকাকে নিয়ে গল্প করছিলুম। নক্ষত্রখচিত নির্ম্মল

আকাশে, গাছের মাথায়-মাথায় কে যেন রূপোলি তুলি বুলিয়ে দিয়েছিল। দূরে পাংশুবর্ণ খণ্ড-মেঘগুলো আকাশে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল। খোকা একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল, তার কুসুম-পেলব মুখে-চোখে জ্যোৎস্নার ধারা ঝরে পড়ছিল। আমার উন্মুক্ত কবরী হতে প্রস্ফুটিত বেলফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। উনি হঠাৎ সেখানে এসে খোকাকে আমার কোল হতে একেবারে বুকে তুলে নিলেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠে কাপড়খানা সংযত করে নিলুম। খোকা তাঁর মুখপানে চেয়ে হেসে বলে উঠল, "কাকাবাবু! দুষ্টু!"—তিনি আমার মুখের পানে চেয়ে, হাসতে হাসতে তার গালে-মুখে অজস্র চুম্বন দিয়ে, তাকে উত্যক্ত করে তুল্লেন। খোকার হাসির বেগ একটু উপশম হইতেই, কোল হতে নেমে পড়ে দুষ্টু ছেলে বলে উঠলো, "কাকা! মাসী চুমু!"—আমি লজ্জায় মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু এ কি?—সহসা তিনি আমায় আলিঙ্গনে বন্দিনী করে, আমার উত্তপ্ত ওষ্ঠের উপর তাঁর কম্পিত ওষ্ঠাধর দুখানি সংযত করে দিলেন। আমার নিস্পন্দ ওষ্ঠ-দুখানির মধ্য দিয়ে সর্ব্ব শরীরে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটে গেল। উপরে আকাশে নক্ষত্রগুলো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে উঠল,—একটা গন্ধামোদিত দমকা বাতাস ছুটে এসে আমায় আকুল করে তুলল। একটা স্ফুরিত জ্যোৎস্নালোক আমার মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল। আবেশে আমার চক্ষুদুটী মুদে এল। আবেগে কাঁপতে-কাঁপতে আমি নিথর হ'য়ে তাঁর শীতল বক্ষের উপর আচ্ছন্নের মত ঢলে পড়লুম—তিনি আমায় বেষ্টন করে বুকের মাঝে চেপে ধরলেন। সহসা খোকার হাস্যধ্বনিতে আমার চমক ভাঙ্গতেই, আমি তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলে নিলেম,—তিনি ঝড়ের মত বেগে তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

* * * *

ধরার বুকে সেদিন কি অপরূপ সৌন্দর্য্যই ঝরে প'ড়েছিল। তরল রজত জ্যোৎস্নার বন্যায় ধরাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল! সে মাধুর্য্য, সে সৌন্দর্য্য যেন ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। আমি পরিপূর্ণ ভাবে সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার জন্যই যেন, সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজের সমস্ত সত্তা ডুবিয়ে দিয়ে, উপরে নক্ষত্র-খচিত সীমাহীন নীলিমার পানে চেয়ে রইলুম। অলক্ষ্যে কোথা হতে একটীর পর একটী করে, কত নদী, নালা, খানা ডিঙ্গিয়ে রাশিরাশি চিন্তা ছুটে এসে আমার ভাবপ্রবণ হৃদয় মধ্যে আছাড় পড়তে লাগল। কি সে তৃপ্তি! কি সে মাদকতা! কি সে উন্মাদনা! আমার কেবলই মনে হতে লাগল,—

"—লুটিয়া সর্ব্বস্ব মোর,
দিলে মোরে ধন্য করে—"

* * * *

খোকা তার মায়ের কাছে যাবার বায়না ধরতেই, আমি তাকে নিয়ে নীচে দিদির কাছে নেমে গেলুম। খোকা একেবারে একগাল হেসে তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু কি দুষ্টু ছেলে গো! বলে কি? সে দিদির চিবুকখানি ধরে হাসতে-হাসতে বলে উঠলো, "মা, কাকা আমা চুমু,—মাসি চুমু" আমার ইচ্ছা হল, হাত দিয়ে খোকার মুখখানা চেপে ধরি! কিন্তু সে যে তখন তার মার কোল অধিকার করে বসেছিল। দিদি হেসে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কি হয়েছে খোকন? কাকা তোমার কার চুমু খেয়েছে?" ছিঃ! ছিঃ! কি লজ্জা! দুষ্টু ছেলে একেবারে পেয়ে বসেছে! সে আবার আমার মুখে হাত দিয়ে বলে উঠল, "কাকা আমা চুমু-মাসি চুমু,—না মাসি?"

হঠাৎ দিদির মুখের হাসিটুকু নিবে গেল। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন। আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলুম না,—আমার ভারি কান্না আসতে লাগল। আমি ঝড়ের মত বেগে সেখান থেকে পালিয়ে গেলুম। ... ...

* * * *

পরদিন প্রভাতে দিদি আমাকে বরণ করে এ-বাড়ীর বধূর আসনে প্রতিষ্ঠার মানসে একেবারে শুভ-দিন স্থির করে বাবাকে চিঠি লিখলেন। দেবতা নিজে এসে ধরা দিয়েছিলেন,—তার পর আর যে তাঁর কোন পথই ছিল না; —তিনি যে আমার ওষ্ঠপল্লব দুখানির মাঝে অমৃতের ধারা ঢেলে দিয়ে, নিতান্ত আপনার করে নিয়ে, তাঁর অভয় বুকে আমায় স্থান দিয়েছিলেন। খোকার কল্যাণে আমার নারী-জীবন সার্থক হলো ভেবে, আমি তাকে প্রগাঢ় হর্ষে ও

স্নেহে বুকের মাঝে নিষ্পেষিত করে, অজস্র চুম্বনে আচ্ছন্ন করে ফেললুম।

(৫)

সে যেন শুধু এইটুকুর জন্যই দেবতার আশীর্ব্বাদের মত আমাদের দুজনার মধ্যে ঝরে পড়েছিল। আমার দেবতার মন্দিরে আমার প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন সেই দেবদূতের মত শিশুটী স্বর্গ হতে আমাদের গৃহতলে খসে পড়েছিল;—তাই কাজ শেষ করেই বাছা আমার দেবলোকে ফিরে গেল। স্বর্গের ফুল, স্বর্গ থেকে ঝরে পড়ে ধরার মাঝে শুধু তার গন্ধটুকু রেখে চলে গেল।

আজ পাঁচ বৎসর আমি এই গৃহতলে বধূর আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি,—কিন্তু এই দীর্ঘ দিনের এমন একটী দিনও যায়নি, যে দিন না একবার সেই রাঙ্গা মুখখানি আমার মনের মাঝে ভেসে উঠেছে। সে যে ভোলবার জিনিস নয় গো! তাকে কি ভোলা যায়? আমার স্নেহময়ী দিদির মুখের অম্লান জ্যোৎস্নার মত সেই পরিপূর্ণ হাসিটুকু যেন সে কোন্ সীমাহীন আঁধারের গর্ভে ডুবিয়ে দিয়ে চলে গেছে! তাঁর মুখে যেন শ্মশানযাত্রীর মত সদাই একটা বিরাট নির্লিপ্ততা!

দিদির আর কোন সন্তান-সন্ততি হয় নি। আমার একটী খোকা। আমার খোকাকে কোলে পেয়ে অবধি দিদির সে নির্লিপ্ত ভাবটুকু যেন ক্রমে-ক্রমে কেটে যাচ্ছিল; কিন্তু আজও আমার খোকাকে দিদির কোলে দেখলে,—আজও যখন উনি আদালতে যাবার সময় আমায় আবেগে আলিঙ্গন করে, তাঁর সেই 'নিত্যকার অভ্যাস'টুকুর লোভ সংবরণ কর্ত্তে পারেন না—তখনি একখানি ছোট্ট কচি মুখের ঝাপ্‌সা আলো ফুটে উঠে বুকের নীচে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে।

পশ্চিম-তরঙ্গ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

কৃষি-কার্য্যের সৌকর্য্য

আমাদের দেশে এখনও সেই বৈদিকযুগের প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারেই ভূমি-কর্ষণ ও হলচালন প্রভৃতি চলিতেছে; কিন্তু পশ্চিম-জগৎ কৃষি-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও অনুসরণ করিয়া, নিত্য নব-নব ক্ষেত্রোৎকর্ষবিধায়ক যন্ত্রাদির উদ্ভাবনার দ্বারা কৃষি-কার্য্যে আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং অগ্রসর। নানাবিধ যন্ত্র ও বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহারা আজ ক্ষেত্রের প্রভূত উৎকর্ষ-বিধান ও কৃষি-কার্য্যের বহু ভাগে সৌকর্য্য-সাধন করিয়াছে। এ দেশের হতভাগ্য সম্প্রদায়ের মত তাহারা কেহই অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও হীন নহে। সেখানে অন্যায়, অপরিমিত সুদগ্রাহী মহাজনের করাল কবলে তাহাদের সারা-জীবন ব্যাপী পরিশ্রমের ফল চিরকালের জন্য আবদ্ধ হয় না। ব্যসনাসক্ত জমীদারবর্গের অমিতব্যয় সরবরাহের জন্য অসৎ ও দুর্দ্দান্ত দেওয়ান কিম্বা নায়েবগণের অত্যাচার ও উৎপীড়ন তাহাদিগকে নিঃসহায়ের মত সহ্য করিতে হয় না। সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ ও ভূস্বামিগণ চাষীদের প্রধান সহায় ও অবলম্বন; এতদ্ব্যতীত তাহাদের অনেকগুলি 'কৃষক-সম্মিলনীও' আছে। এইরূপ সম্মিলনীভুক্ত হওয়ায়, তাহাদের পরস্পরের বিশেষ সুবিধা ও সহায়তা লাভ ঘটে। তাহাদের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল; এমন কি, অনেককে ধনী ও সম্পদশালী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃষকের প্রয়োজনীয় ও ক্ষেত্র-কর্ম্মোপযোগী অসংখ্য কল-কব্জা ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হওয়ায়, তাহাদের চাষের পরিশ্রম অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া গিয়াছে। উক্ত কল-কব্জা ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহারা এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে অনেকটা পরিমাণ জমীতে চাস করিতে পারিতেছে। বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক পরীক্ষায় উদ্ভাবিত বিবিধ নূতন-নূতন উদ্ভিদ-বর্দ্ধক সার ব্যবহার করিয়া তাহারা এক্ষণে অল্প জমীতে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্টতর ফসল উৎপাদন করিতে সমর্থ।

আমাদের দেশে অদ্যাপি-প্রচলিত কাঠের বা লোহার
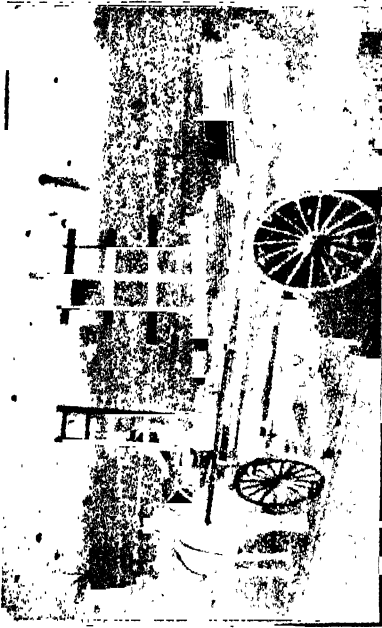
খড় বোঝাই করিবার "মাচাগাড়ী"

"মাচাগাড়ীর" সাহায্যে একজন লোকের একলা খড় বোঝাই করা
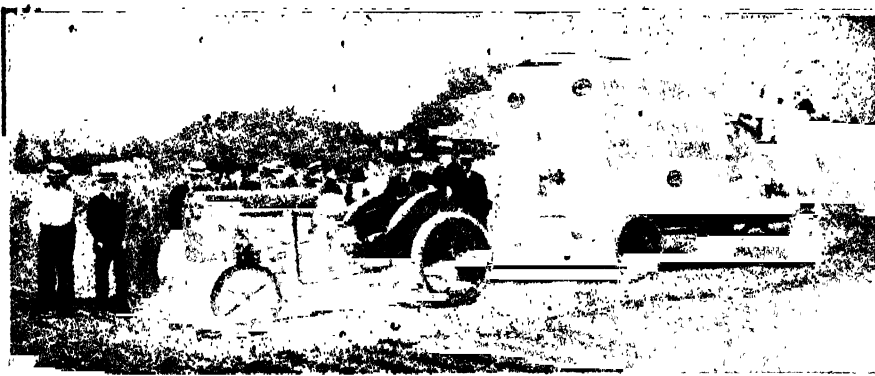
"মাচাগাড়ীর" সাহায্যে একজন লোকের একলা খড় বোঝাই করা

ক্ষেত্রবাহন (farm tractor)

ইট নামাইবার কৌশল

ইট লইয়া যাইবার গাড়ী

(এই গাড়ী এরূপ কৌশলে নির্মিত যে, এক গাড়ী ইট একেবারে এক সঙ্গে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেওয়া যায় অথচ একখানও ইট নষ্ট হয় না)

মাছ মাংস টাটকা অবস্থায় লইয়া যাইবার গাড়ী

কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল পথে বালি ছড়াইবার গাড়ী
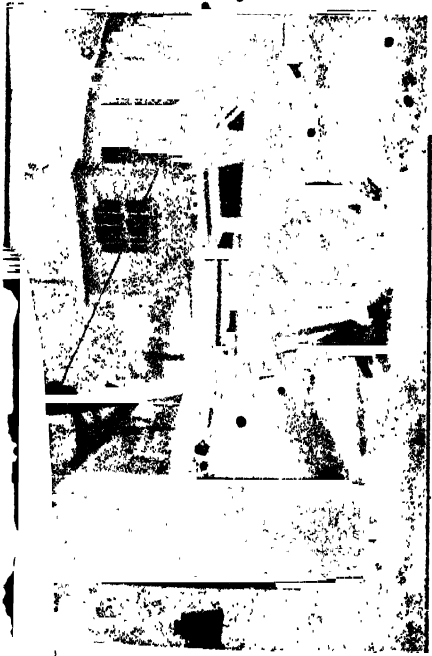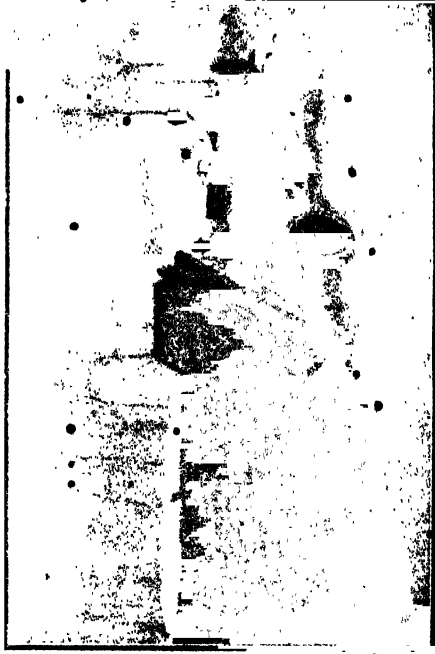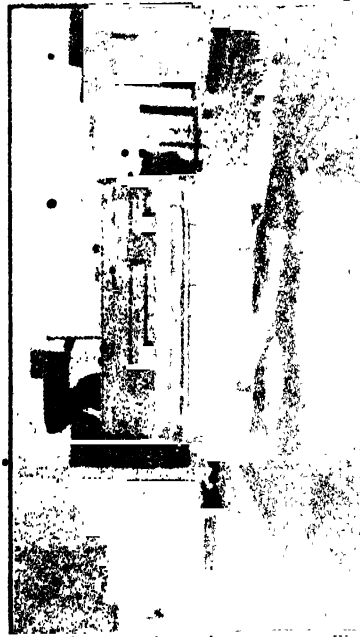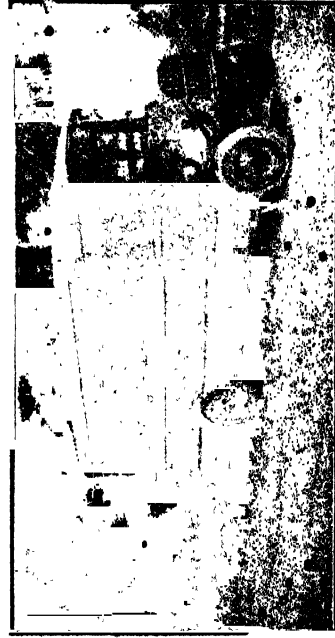
জাঁতাকল
(যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ; এই গাড়ীর দুই পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগ খুলিয়া দিয়া কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রসর স্থান করা হইয়াছে)

অগ্নি নির্ব্বাপক গাড়ী
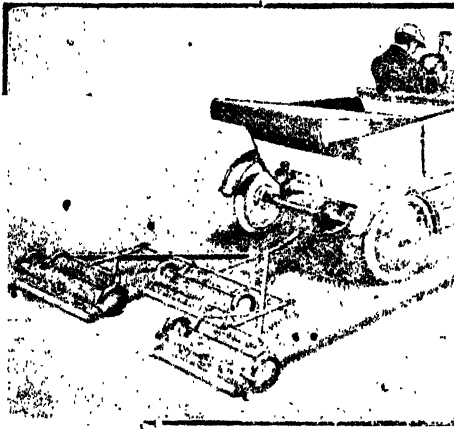
ঘাস-ছাঁটা
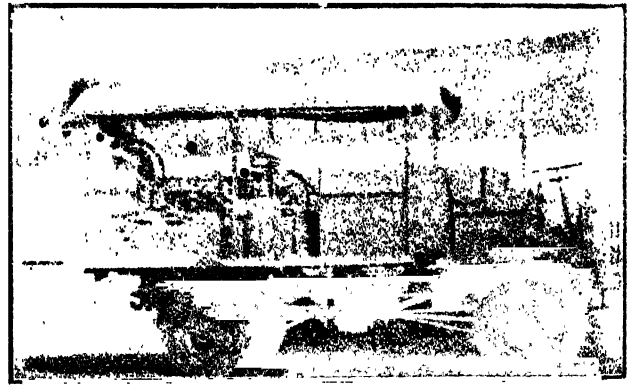
যন্ত্রবাহী গাড়ী
(যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ; এই গাড়ীতে মিস্ত্রীদের যাবতীয় আবশ্যক যন্ত্রাদি সুসজ্জিত থাকে)

ছেন। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে মোটর গাড়ী নানা ভাবে নানা বিভাগে বহুবিধ সাহায্য করিয়া রণজয়ে অসীম আনুকূল্য করিয়াছে। পশ্চিম-জগৎ এই মোটর গাড়ীর নিকট হইতে যে পরিমাণে কাজ আদায় করিয়া লইতেছে, আমাদের দেশ এখনও তাহার শতাংশের এক অংশও গ্রহণ করিতে পারে নাই। এখানে আমরা দেখিতে পাই, কেবল কয়েকখানি মালগাড়ী (Motor Lorries), ডাক গাড়ী (Postal Vans), আহতবাহী (Ambulance Car), অগ্নিদমনকারী (Fire Brigade) যাত্রীবাহী (Taxi or Omnibus) ও বর্ম্মাচ্ছাদিত যুদ্ধযান (Armoured Car), এতদ্ব্যতীত মোটর গাড়ীকে আমরা এখানে উপস্থিত আর কোনও কাজ করিতে দেখি না। তবে সম্প্রতি সহরে
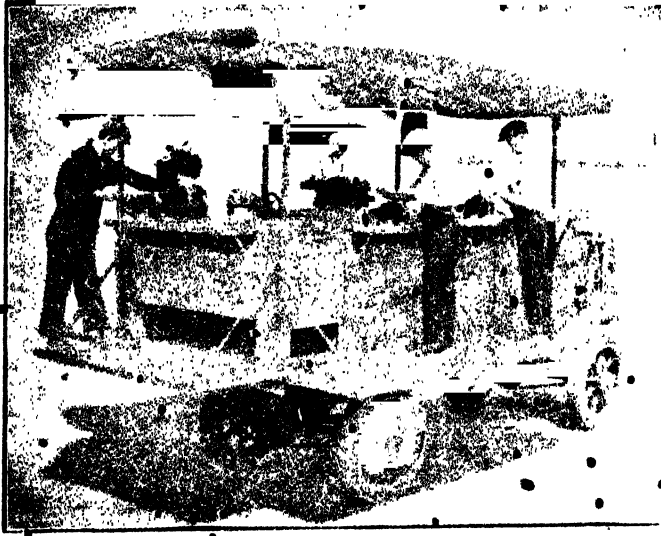
মিস্ত্রীখানা

(যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ; এই গাড়ীতে একটা ক্ষুদ্র কর্ম্মশালা আছে এখানে মেসিন গান্‌ ও অন্যান্য ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র মেরামত এবং ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম, জিন, লাগাম প্রভৃতি প্রস্তুত হয়)

লোহার পাত প্রস্তুত ও ছিদ্র করিবার যন্ত্র-সংযুক্ত গাড়ী

(যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য)

সংবাদপত্র বিলি করিবার জন্য কোনও বিখ্যাত কাগজ-ওয়ালাকে, খাদ্য সরবরাহ করিবার জন্য কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোটেলওয়ালাকে, রাস্তা "টারম্যাকাডাম" করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে এবং ট্রামের তার মেরামত করিবার জন্য ট্রামওয়ে কোম্পানীকে এই মোটর গাড়ীর সাহায্য লইতে দেখিয়া, আশা হয় যে, অদূর-ভবিষ্যতে এ দেশও মোটর গাড়ীর উপযোগিতা বুঝিয়া, তাহার নিকট হইতে উপযুক্ত কার্য্য আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, পাশ্চত্য কৃষি-বক্ষে ভূমি-কর্ষণ, বীজ-বপন, ধান্য-রোপণ, শস্য-আহরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রোপযোগী অসংখ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য এক্ষণে মোটর-চালিত যন্ত্র ও যানাদির সাহায্যে সম্পন্ন করিতেছে। এইবার বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদর্শিত চিত্র হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, মোটর গাড়ী এখানে যে সকল কাজ করিতেছে, তাহা ভিন্ন উহার আরও কতকগুলি উপযোগিতা আছে ; যথা—গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ইঁট, চূণ, সুরকী, বালি
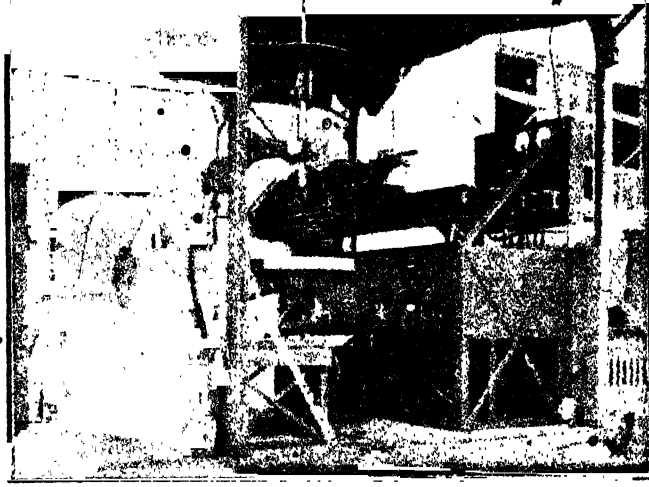
কামান মেরামত করিবার গাড়ী

(যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ; এই গাড়ীখানিতে যে বৃহৎ কারখানা সন্নিবিষ্ট আছে তাহার কিয়দংশ মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে !)

কামারশালা।
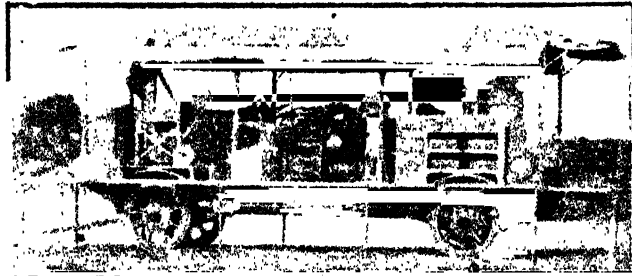
(যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ; এই গাড়ীতে লৌহ গালাই, ঢালাই, ও কাটাই হয়।)

প্রভৃতি লইয়া যাওয়া, সহরের বড়-বড় রাস্তা তৈয়ারি ও মেরামত করা—রাস্তায় জল দেওয়া, ঝাঁট দেওয়া, বর্ষাকালে রাস্তা কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হইলে উহাতে বালি ছড়াইয়া দেওয়া, রেল লাইন হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে সত্বর টাট্‌কা মাছ, মাংস ও তরিতরকারী প্রভৃতি লইয়া যাওয়া, রাজপথে যে সকল পুলিশ প্রহরী রাস্তা চৌকী দিবার জন্য আহার করিতে যাইবার অবকাশ পায় না, তাহাদের আহার্য্য সরবরাহ করা, খেলিবার ময়দানের ঘাসগুলি সমান করিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া, নিয়ত ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্য—সর্ব্বদা ভ্রমণশীল সার্কাস, থিয়েটার বা বায়োস্কোপওয়ালাদের মালপত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও লোক-লস্কর সত্বর স্থানান্তরিত করা, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলি, তোপ-বারুদ, রসদ ইত্যাদি যাবতীয় রণ-সম্ভার বহন ব্যতীত ইহা যে, আরও অন্যান্য কতকগুলি অত্যাবশ্যক কার্য্যের ভার লইয়াছিল, তাহাও জানিতে পারা যাইবে।

(Scientific American.)

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহাকবি বাণ

[ব্রহ্মচারী শ্রীসূর্য্যেন্দুপ্রসাদ সরস্বতী]

…ৃত গদ্য সাহিত্যে মহাকবি বাণভট্টের স্থান সর্ব্বোচ্চে। "বাণোচ্ছিষ্টং …ং জগৎ" বলিয়া কিম্বদন্তীও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বাণভট্টের …ান কৃতিত্ব তাঁহার 'কাদম্বরী'। কাদম্বরীর সহিত 'বাসবদত্তা'র …তক তুলনা হইতে পারে; কিন্তু বাসবদত্তার শ্লেষাধিক্য, শব্দ-কাঠিন্য কথা-সংক্ষেপে কাদম্বরীর ন্যায় বাসবদত্তায় ভাবের অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হয় নাই। বাণ কাদম্বরীর প্রারম্ভে "বভূব বাৎস্যায়ন বংশ …বো দ্বিজো জগদ্গীতেহিগ্রণীঃ সতাং" ইত্যাদি দশটি শ্লোকে নিজ …শ-কীর্ত্তন করিয়াছেন; যথা—
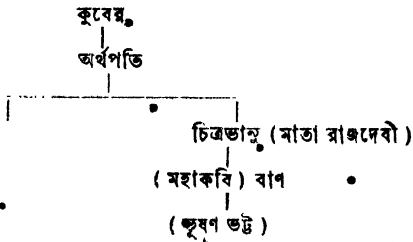
বাণের হর্ষ চরিত পাঠে বুঝা যায়, 'শোণ নদে'র পশ্চিমে 'প্রীতিকূট' …ামে তাঁহার জন্মভূমি। শৈশবেই পিতৃমাতৃ বিয়োগ ঘটিলে, চতুর্দ্দশ …ৎসর বয়সে তিনি ভট্টনারায়ণ, ঈশান ও ময়ূরক এই তিনজন মিত্রের …হিত বিদেশ যাত্রা করিয়া পরে কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষ-বর্দ্ধনের আশ্রয় …য়েন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন বাণের কবিত্ব-শক্তি ও অন্যান্য সদ্‌গুণে মুগ্ধ …ইয়া বাণের সহিত মিত্রতা করেন। সাহিত্য রত্নাবলীর রাজশেখর …করণে—

"শ্রীহর্ষস্যাভবৎসভ্যঃ সমোবাণ ময়ূরয়ো" ইহা দ্বারা শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের …ভায় বাণ প্রধান পণ্ডিতের আসন পাইয়াছিলেন, জানা যায়।

হর্ষবর্দ্ধনের প্রধান সভাস্তার হইয়াই বাণ অতি সুললিত গদ্য-কাব্য …হর্ষ-চরিত' প্রণয়ন করেন।

হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী "হুয়েনসাঙ্গ" পরিব্রাজক …ংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য চীন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া ষোড়শ …ান্তে চীনে গিয়া চীন ভাষায় তাৎকালিক দেশ কাল-রাজ্যাদির বিবরণ …নিজের ভারতবর্ষ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। 'বীল' সাহেব …হোদয়ের সেই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ পাঠে এই বিবরণ সবিশেষ …ানিতে পারা যায়। সেই গ্রন্থে হুয়েনসাঙ্গ শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যকাল …১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খৃঃ পর্য্যন্ত নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীহর্ষবর্দ্ধন যে …বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, এ কথা পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্গ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। এই মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনই "রত্নাবলী" প্রণয়ন করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন স্বীয় নাগানন্দ নাটকের প্রারম্ভে বৌদ্ধ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাকে বৌদ্ধ বলিয়া বুঝিলেও, পরে তিনি শৈব হইয়াছিলেন। কারণ, রত্নাবলীর প্রারম্ভে তিনি পার্ব্বতী স্তোত্র দ্বারাই মঙ্গলাচরণ সমাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাজ্যবর্দ্ধন বৌদ্ধই ছিলেন,—তাহা তাঁহার দান-পত্রেই জানিতে পারা যায়। (Archaeological Survey of India, pp, 72-73)

পূর্ব্বোল্লিখিত হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল ৬১০ খৃঃ—৬৫০ খৃঃ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হওয়ায়, মহাকবি বাণ ঠিক এই সময়েই সভাপণ্ডিত ছিলেন, ইহা বেশ বুঝা যায়। বাণ সর্ব্বপ্রথমেই 'হর্ষ চরিত' প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু তাহা তিনি অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ বোধ হয়, হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পূর্ব্বেই বাণের জীবিতাবসান হইয়াছিল। এই হর্ষ-চরিতের শঙ্কর প্রণীত 'সংকেত টীকা' প্রথমে কাশ্মীর নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

মহাকবি বাণ স্বীয় হর্ষ চরিতের প্রারম্ভে ৭টি শ্লোকে তাঁহার সমসাময়িক ও পূর্ব্বের কয়েকটি কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও তাঁহাদের দু' একজন কবির নাম, এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না—

ঐ কবিদিগের মধ্যে বাসবদত্তাকার মহাকবি "সুবন্ধু"র "নিবন্ধ-শৈলীম্" গ্রন্থ পাঠ করিয়াই বাণ হর্ষ-চরিত প্রণয়ন করেন। এই মহাকবি সুবন্ধু ষষ্ঠ শতাব্দের অন্তিমে জীবিত ছিলেন—ইহা বাসবদত্তার ভূমিকায় 'হাল' সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। হস্তলিখিত প্রাচীন বাসবদত্তার প্রকরণের শেষে "ইতি শ্রীবররুচি ভাগিনেয় সুবন্ধু বিরচিতা বাসবদত্তা আখ্যায়িকা সমাপ্তা" ইহা লেখা আছে। এই বররুচি কাত্যায়ন বা অন্য কেহ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার রামদাস সেন স্বীয় গ্রন্থে, দুইজন বররুচি ছিলেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। একজন বররুচি জগৎ-প্রসিদ্ধ; অপর একজন বররুচির কথা জৈন কবি রাজশেখর উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

"ভাসোরামিল, সৌমিল্লৌ, বররুচিঃ শ্রীসাহসাঙ্কঃ কবির্মেণ্ঠো ভারবি কালিদাস তরলা, স্কন্ধঃ সুবন্ধুশ্চ যঃ"। এই শ্লোকে লিখিত বররুচি "প্রাকৃত প্রকাশ" নামক প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। ভট্ট মোক্ষমূলর কিন্তু পাণিনি সূত্রের বার্ত্তিককার ও বৈদিক কল্পসূত্র-প্রণেতা এক মাত্র বররুচির অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

সুবন্ধু ভিন্ন আরও তিন জন প্রসিদ্ধ কবির নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে "ভট্টার হরিচন্দ্র" সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সঠিক প্রমাণ উদ্ধার করা যাইতে পারে না;—নানা মুনির নানা মতই এ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। "ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয়" নামক কাব্যমালা গ্রন্থের প্রণেতা হরিচন্দ্র বটেন; কিন্তু তিনি ভট্টার হরিচন্দ্র নহেন।

সাতবাহন—ইনি অন্ধ্রভৃত্য-বংশীয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। মহারাষ্ট্র প্রদেশীয় গোদাবরী-তীরস্থ প্রতিষ্ঠান নগরে ইনি জন্মগ্রহণ ও বসতি করিয়াছেন। হেমচন্দ্র দেশী নামমালায় শালিবাহন, সাতবাহন, সাল, হাল, ইত্যাদি এক ব্যক্তিরই নামান্তর মাত্র দেখাইয়াছেন। প্রাকৃত ভাষায় সাতবাহনই বিপর্য্যয়ে শালিবাহন দাঁড়াইয়াছে। ইঁহারই নামানুসারে শকাব্দা—যাহা সর্ব্বত্র বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে।

এই শালিবাহনের জন্ম সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী ডাক্তার ভাণ্ডারকর স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহারই মর্ম্মার্থ এ স্থলে প্রদত্ত হইল:—

"প্রতিষ্ঠান নগরে কোন কুম্ভকারের গৃহে একটি বালিকা তাঁহার দুইটি ভ্রাতা লইয়া থাকিতেন। একদিন ঐ কন্যা গোদাবরীতে স্নানে গেলে 'শেষ' নাগ তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্য রূপ ধারণ পূর্ব্বক ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে শালিবাহনের জন্ম। এই কিম্বদন্তী 'কথা-সরিৎ-সাগরে' আছে। জিনেন্দ্র প্রভসূরির "সংস্কৃত কল্প প্রদীপে"ও এই কথা লিখিত হইয়াছে। শালিবাহন জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। "গাথা সপ্তশতী" নামক যে গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় দুর্গা-প্রসাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শালিবাহনেরই সংগ্রহ-পুস্তক। উক্ত 'গাথা সপ্তশতী'তে প্রাকৃত গাথা, ও শৃঙ্গার রস প্রধান আছে। হর্ষ চরিতে মহাকবি বাণ এই শালিবাহনের স্তুতি করিয়াছেন। শালিবাহনের প্রাকৃত গাথা, দশরূপক, সরস্বতী কণ্ঠাভরণ ও কাব্য প্রকাশাদি অলঙ্কার শাস্ত্রে উদাহরণ স্বরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। কাব্য প্রকাশে দ্বিতীয় উল্লাসে "উঅণি অল নিপ্পন্দা" উদাহরণে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবন্ধ-চিন্তামণির চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধে গাথা সপ্তশতীর প্রশংসা আছে। কিন্তু জর্ম্মণ দেশীয় পণ্ডিত বেবর সাহেব ইঁহার প্রণেতা বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করেন। ডাক্তার পীটার্সন নিজের রিপোর্টে লিখিয়াছেন, On the Saptasatakam of Hall. (See Dr. Peterson's Report for 1882-83; p. 113)।

রাজ তরঙ্গিণীতে কাশ্মীরের রাজ্য-শাসক প্রবর সেন দুইজন ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবর সেন প্রাকৃত ভাষায় সেতুবন্ধ কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু সেতুবন্ধ কাব্যের টীকাকার রামদাস "যশ্চক্রে কালিদাসঃ কবিমুকুটবিধুঃ * * * সেতু নাম প্রবন্ধম্" বলিয়া উহা কালিদাসের প্রণীত, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন কথায় জানা যায় বিক্রমাদিত্যের পর প্রবর সেনই রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। ডাক্তার বুলর সাহেব বলেন, সেতুবন্ধ কাব্য প্রবর সেনেরই রচনা (Indian Antiquary, Vol. XIIII p. 243)।

গুণাঢ্য,—ইনি "বৃহৎ কথা" প্রণেতা। ইনিও সাতবাহনের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। এই 'বৃহৎ কথা' পিশাচ ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছিল। কাব্যাদর্শে দণ্ডিপাদ বলিয়াছেন "ভূত ভাষা ময়ীং প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহৎ কথাং"। ডাক্তার ভাণ্ডারকর প্রভৃতি বলেন, পিশাচ ভাষা প্রাকৃতেরই রূপান্তর বিশেষ। জার্ম্মণ ভাষায় বিরচিত 'পিস্কেল ব্যাকরণে' পৈশাচী ভাষাকে কাশ্মীর ভাষার নামান্তর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। ডাক্তার বুলর গুণাঢ্যের সময় নিরূপণ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন:—("Gunadhya's Vrihatkatha goes back the first or second century. See his Kashmir Report, p. 47); বেবর সাহেব গুণাঢ্যের সময় ষষ্ঠ শতাব্দে নির্ণয় করিয়াছেন; কিন্তু মহামহোপাধ্যায় দুর্গাপ্রসাদ তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।

বাণ কবিপ্রবর ময়ূরের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাণের প্রিয়তমা বধূ প্রগলভা বিদুষী ছিলেন। প্রায় প্রত্যহই বাণের সহিত তাঁহার স্ত্রীর কবিত্ববিষয়ক বিবাদ হইত। একদিন প্রিয়ার সহিত বিবাদে মহাকবি বাণ নিম্নোক্ত শ্লোক দ্বারা মানভঞ্জন করিয়াছিলেন:—

> গতপ্রায়া রাত্রিঃ কৃশতনু শশী শীর্য্যত ইব,
> প্রদীপোঽয়ং নিদ্রাবশমুপগতো ঘূর্ণত ইব।
> প্রণামান্তোমানস্ত্যজসি ন তথাপি ক্রুধমহো—*

শ্রমণী-সঙ্ঘ

[শ্রীহিরণকুমার রায়চৌধুরী, বি-এ]

সুবিশাল বৌদ্ধ-যুগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, বৌদ্ধ সঙ্ঘের আদিমাবস্থায় নারীজাতি সেবক-দল হইতে অপসারিত ছিল। নারীসঙ্গ ধর্ম্ম সাধনের অন্তরায়। নারীসঙ্ঘের সেবিকা-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে দারুণ অমঙ্গল সাধিত হইবে—ইহাই ছিল বোধিসত্ত্বের একমাত্র আশঙ্কা।

শোক-তাপ-জর্জ্জরিত মানব যখন ধর্ম্মের অপূর্ব্ব মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া, বিমুগ্ধ চিত্তে মুক্তির নব বার্ত্তা লাভের নিমিত্ত দলে-দলে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণে রত হইল, এবং সুদূর কপিলাবস্তু নগরীর শোক-বিক্ষুব্ধ বিশাল প্রাসাদ-তটে জন-মণ্ডলীর গভীর হর্ষ-তরঙ্গ উদ্বেলিয়া উঠিল, তখন ব্যাকুল হৃদয়ে গৌতমের মাতৃকল্পা পুণ্যময়ী মহাপ্রজাপতি গৌতমী সঙ্ঘের সেবিকা হইবার বাসনা বুদ্ধদেবের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। সংসার সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন বুদ্ধদেব গৌতমীর কাতর প্রার্থনায় অসম্মত হইলেন।

আবার, ধর্ম্মগত-প্রাণ, কীর্ত্তিযশা, সঙ্ঘের অন্যতম অবলম্বন, মহাথেরো আনন্দ যখন নারীজাতির কল্যাণ-কামনায় অনুপ্রাণিত

---

* শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের আখ্যায়িকা হইতে এই প্রবন্ধের দু' একটি প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

।, কৃতাঞ্জলিপুটে অমিতাভের চরণে তাহাদিগের প্রবেশাধিকার
না করিলেন, তখন উত্তর হইল, "আনন্দ, স্ত্রীজাতি এই অধিকার
ত বঞ্চিতা হইলে সঙ্ঘের সমূহ কল্যাণ:—ধর্ম্ম সহস্র বৎসর
হিত থাকিবে। কিন্তু অধিকার দানে কেবল যে ধর্ম্মের পবিত্রতা
ন হইয়া যাইবে তাহা নহে, উহা অল্পকালে বিনষ্ট হইবে।"

অবশেষে শাক্যগণ যখন একে-একে নবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ
রিলেন, এবং কপিলাবস্তু নগরী অনাথা-আলয়ে রূপান্তরিত হইল,
ন সন্তান-স্নেহ-বিগলিতা অঙ্গন-রাজকুমারী গৌতমীর একাগ্র
র্থনায় বুদ্ধদেব সঙ্ঘমধ্যে নারীর অধিকার উন্মুক্ত করিয়া এই
মময়ী রমণীকে সঙ্ঘের নেত্রী-পদে অভিষিক্ত করিলেন।

করুণাময়ী পুতশীলা গৌতমীও কপিলাবস্তুর অগাধ ভোগৈশ্বর্য্য তুচ্ছ
ণ্বৎ দূরে পরিহার করিয়া, অথণ্ড চিত্তে সর্ব্ব রমণীগণের চরিত্র-
ন ও উন্নতিকল্পে রত হইলেন।

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত-মহিলাগণ যেরূপ জ্ঞানের বিমল
লোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন, জগতের ইতিহাস পাঠে আমরা
রূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাই না।

যে সকল মহিলা গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তথাগতের চরণে আশ্রয়
ত করেন, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিতা ছিলেন। ইঁহাদের রচিত
বময়ী গাথাগুলি কেবল যে আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে তাহা নহে,
ই সকল রচনাবলী দৃষ্টে আমরা সে-সময়কার গৃহস্থ রমণীগণের
ভাবধারার পরিচয় প্রাপ্ত হই, এবং তৎসঙ্গে প্রচলিত সামাজিক প্রথার
কটা সুস্পষ্ট মনোরম চিত্র আমাদের মানস-নয়নে প্রতিভাত
য়া উঠে।

বিদ্যালাভ যে শুধু ভদ্র মহিলা-মণ্ডলীতে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে;
চজাতীয়া স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও ইহা প্রসার লাভ করিয়াছিল।
ই সকল স্ত্রীলোক সুশিক্ষিতা হইয়া অমিতাভের চরণে শরণ গ্রহণ
রিয়া নির্ব্বাণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

মন্তাবতী রাজ কোঞ্চের অগ্রমহিষী গর্ভজাত দুহিতা সুমেধা প্রথম
বনেই শীলবতী, সুবক্ত্রী এবং বহুশাস্ত্রজ্ঞানসমন্বিতা ছিলেন।
যুত ধনৈশ্বর্য্যশালী করুণাবতী-নাথ অনিকর্ত্ত ইঁহার পাণি-প্রার্থী
লেন। কিন্তু সুমেধা বুদ্ধের প্রতি একান্ত অনুরাগবশতঃ জনক-
নীকে সংসারের অনিত্যতা এবং সেই হেতু প্রব্রজ্যা গ্রহণের স্থির
ল্প প্রকাশ করিলেন।

ব্যথিতা জননী প্রব্রজ্যার কঠোরতা বর্ণনা করিয়া নিত্য সাংসারিক
-কথায় তনয়াকে মুগ্ধ করিতে চাহিলেন। সুমেধা অসার ভোগ-
লাসকে হেয় জ্ঞানে মমতাময়ী জননীর কাতর অশ্রুজল, স্নেহময়
কের ম্লান দৃষ্টি ও করুণাবতী-রাজের সানুনয় কৃতাঞ্জলি উপেক্ষা
রিয়া, রাজ-প্রাসাদ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি সুগতের
তুল চরণ-ছায়ে শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করিয়া অবশেষে পরিনির্ব্বাণ
প্তা হন।

জীবনেই সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তিনি যৌবনে ধর্ম্মকথা শ্রবণে কাম-
ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া উৎপলবর্ণার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; এবং
বৃক্ষমূলে ধ্যানে নিরতা হইয়া পরম শান্তি লাভ করেন। ইঁহার কৃচ্ছ্র
সাধনা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও নিষ্ঠা জনমণ্ডলীকে ভক্তিতে অভিভূত করে।

থেরীগণ বিদ্যার অত্যুজ্জ্বল আভায় সর্ব্বলোকমধ্যে অসীম প্রভাব-
সম্পন্না ছিলেন। তাঁহারা এক নিপাত—এক শ্লোকের রচনা হইতে
আরম্ভ করিয়া মহানিপাত অর্থাৎ বহুশ্লোকাবলীসমন্বিত রচনা দ্বারা
আপনাদের জীবন-কাহিনী এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিকাশের কথা ভাব-
ময়ী কবিতায় অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

বৈশালির অপূর্ব্ব যৌবনশ্রীভূষিতা, অতুল ধনরত্নশালিনী পতিতা
রমণী অম্বপালী, তাঁহার বিস্তৃত আম্র-কাননে সশিষ্য বুদ্ধদেবের উপস্থিতি
শ্রবণে, দর্শনপ্রার্থিনী হইয়া আগমন করিলেন। ভগবান তথাগতের
স্নিগ্ধ-মধুর ধর্ম্মদেশনা তাঁহার নিভৃত হৃদয়ের সমস্ত দৈন্য ও মলিনতা
ধৌত করিয়া জীবনে যেন বিলম্বিত নবরাগময় প্রভাত আনিয়া দিল।
তাঁহার শুষ্ক উষর হৃদয় কাহার অমৃত-সরস স্পর্শে যেন কণ্টকিত হইয়া
উঠিল। ভক্তি-আর্দ্র হৃদয়ে বারনারী সশিষ্য বুদ্ধদেবকে পরদিন
মধ্যাহ্নে স্বীয় গৃহে আতিথ্য গ্রহণ নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলেন। মৌনী
গৌতম তাঁহার আহ্বানে সম্মতি দান করিলেন।

অল্পকাল পরে লিচ্ছবিবংশীয় বৈশালির অধীশ্বরও সপারিষদ
বুদ্ধদেবকে রাজপ্রাসাদে আহ্বানের জন্য আগমন করিলেন। অম্বপালী-
সমীপে প্রতিশ্রুত বুদ্ধদেব রাজ-আতিথ্যে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।
তখন বিফল-মনোরথ নরপতি অম্বপালীর শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু
সমগ্র রাজ-ভাণ্ডারের বিনিময়েও অম্বপালী তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান
করিলেন না।

তৎপর দিবস শিষ্যমণ্ডলী-পরিবৃত বুদ্ধদেব পতিতা কামিনীর গৃহে
মধ্যাহ্ন-ভোজন করিলেন। আহার-ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে যুক্ত-পাণি
অম্বপালী নিবেদন করিলেন, তাঁহার বিশাল ভবন ও বিপুল ধনরাজি
একটী বিহার স্থাপন ও সংরক্ষণের নিমিত্ত অদ্য হইতে উৎসর্গীকৃত
হইল।

কুসুমিত-যৌবনা, অতুল-বিত্তবতী বিলাসিনী নারী জগতের সমস্ত
আকর্ষণ ও প্রলোভন দূরে পরিহার করিয়া পবিত্র নির্ব্বাণ-ধর্ম্মে দীক্ষা
গ্রহণ করিলেন।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ লাভের পর বহুকাল পর্য্যন্ত অম্বপালী
সঙ্ঘ-সেবিকা ছিলেন। জীবন-সন্ধ্যায় জরা আসিয়া যখন তাঁহার সমস্ত
দেহকে বিশীর্ণ ও মথিত করিল, তখন অম্বপালী সুমধুর গাথায় হাস্যময়
যৌবনের চঞ্চল রূপ-গরিমাকে অসার প্রতিপাদন করিয়া, বিংশতি
শ্লোক রচনা করিয়া বুদ্ধ-মহিমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিলেন।

"এমন ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাজি, তুলিকা-অঙ্কিত ভ্রূ-যুগল, সুনীল
আয়ত আঁখি, দেহ-গৌরব বর্ত্তুল অর্গল বাহু দুটি—সমস্তই জরায় ভাঙ্গিয়া
গিয়াছে। তাঁহার কোকিলের ন্যায় সুস্বরে নিত্য উপবন ঝঙ্কৃত হইত—

এত মায়া কেন? প্রাচীর-স্খলিত জীর্ণ প্রলেপের ভার এই রূপ-দীপ্তি ঝরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভগবান অমিতাভের স্নিগ্ধ সত্যবাণী শাশ্বত ও অনাহত।

কত যুগ পূর্ব্বে এক পতিতা পল্লীনারী সুশিক্ষিতা হইয়া এমন মধুময়ী শ্লোকাবলী রচনা করিয়াছিলেন; তাহা ভাবিতে গেলে সত্যই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হয়।

শ্রাবস্তী-পুরীর শ্রেষ্ঠি-কন্যা পটাচারা কোন ধনী বণিক-পুত্রসহ উদ্বাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, এক দরিদ্র যুবকের প্রেম-প্রার্থিনী হইয়া, গোপনে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেন। দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া পটাচারা স্বামীর সহিত দূরদেশে উপস্থিত হইলেন। বহুদিন প্রবাস-যাপনের পর স্বজন-বিধুরা রমণী শ্রাবস্তী নগরীতে পুনরাগমনের জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা-নিবন্ধন এ অনুরোধ উপেক্ষিত হইল। একদিন কাষ্ঠ আনয়নার্থ জঙ্গলে গমন করিয়া যুবকের সর্প-দংশনে মৃত্যু হইল। পতিহারা অসহায়া পটাচারা জীবনের অনন্ত-অবলম্বন দুইটী শিশু পুত্রকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন। নিষ্ঠুর নিয়তি-বিধানে অভাগিনী শ্রাবস্তীর অনতি-দূরে এক-একটী করিয়া পুত্রদ্বয়কে হারাইলেন। উন্মাদিনী, বিবশা রমণী শ্রাবস্তীতে আসিয়া জানিলেন, প্রবল ঝঞ্ঝা তাঁহাদের গৃহ ভূমিসাৎ করিয়া স্নেহময় ভ্রাতা ও জনক জননীকে চিরদিনের জন্য প্রোথিত করিয়াছে।

প্রলাপবাদিনী, আত্মহারা নারী আপনার হাহাকারে পথিক-জন-চিত্ত ভারাক্রান্ত করিয়া শ্রাবস্তী-নগরীর রাজবর্ত্ম মাঝে বিচ্ছিন্ন মনে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পটাচারার সুকৃতিবলে ভগবান সিদ্ধার্থের আগমনে সে সময়ে শ্রাবস্তীপুরী পবিত্র হইয়াছিল। প্রতিনিয়ত নির্ব্বাণ-কামী শ্রাবস্তীবাসিগণ আকুল অন্তরে ধর্ম্ম-সুধা লাভের নিমিত্ত সর্ব্বদুঃখ-নিবারণ বুদ্ধের চরণতলে সমবেত হইতেছিলেন। সংসার-সংগ্রাম-বিধ্বস্তা, সর্ব্বস্বহারা রমণী নরদেবতার পাদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন। করুণা-পারাবার গৌতম স্নিগ্ধ-মধুর উপদেশে তাঁহার শোক-তাপ দূরীভূত করিয়া তাঁহাকে নবধর্ম্মে দীক্ষা দান করিলেন।

এই পটাচারা শিক্ষা ও জ্ঞানে এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, কোন সময়ে এক কালে পঞ্চশত রমণীকে ধর্ম্ম-মহিমা-গানে মুগ্ধা করিয়া দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। বিশ্ব-ইতিহাসে ইহা অতুলন নহে কি?

অতীত ভারতে অবরোধ-প্রথার কঠোরতা নারীকে সামাজিক আন্দোলন হইতে বঞ্চিতা করে নাই। সমাজের প্রতি স্পন্দনে নারীর সজীবতা অনুভূত হইত এবং তাঁহাদের অসংখ্য অনুষ্ঠান তাঁহাদিগকে চিরবরণীয়া ও স্মরণীয়া করিয়া রাখিয়াছে।

সৌভাগ্যবতী সাধ্বী বিশাখা গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম সংরক্ষণ ও মাঙ্গলিক কর্ম্মানুষ্ঠানে সতত যত্নবতী ছিলেন। এই দানশীলা পুণ্যবতী মহিলা ভিক্ষু ও আশ্রয়হীন পরিব্রাজকগণকে অন্নপানাদি দানে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত এক অন্নছত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিদিন অসংখ্য সদ্ধর্ম্ম-সেবক স্বেচ্ছাহার ও বিশ্রামে তৃপ্ত হইয়া সানন্দ চিত্তে স্বীয় গন্তব্য পথে প্র[illegible] করিত। জীর্ণবস্ত্রধারিণী ভিক্ষুণীগণ অচিরাবতী নদীতে স্নানকালে নির্লজ্জা, হাস্য-কৌতুকময়ী বারবিলাসিনীদিগের দ্বারা উপহসিত হইত; ভিক্ষুণীগণের বসন-দৈন্য নির্দ্দেশ করিয়া এই সকল বারাঙ্গনা তাঁহাদিগকে পঙ্কিল পাপ-পথে প্রলোভিত করিত। ভিক্ষুণীগণ তাঁহাদিগের অভাব বিমোচনের কোন পন্থাই বিচার করিতে অসমর্থ হইয়া সলজ্জ বদনে অধোমুখী রহিতেন। করুণাময়ী বিশাখা তাঁহাদিগকে স্নান-বস্ত্র দান করিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন। সত্য-পুণ্য-জড়িত বৌদ্ধ সঙ্ঘের সহিত বিশাখার নাম বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট; তিনি নিরন্তর পুণ্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এই নারী-সঙ্ঘের সমূহ উপকার সাধন করেন। বেশালির রমণীর "পূর্ব্বারাম" উদ্যানটী এই মহিমামণ্ডিত রমণীর দর্শনের অন্যতম নিদর্শন।

যে সকল মহিলা সংসারে বিগতস্পৃহ হইয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শান্ত, সুশীতল আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মাত্র ত্রিসপ্ততি থেরীর জীবন-কাহিনী এবং তাঁহাদের রচিত গাথা প্রচলিত আছে। কালমাহাত্ম্যে যদিও শত-শত থেরী-কাহিনী ও তাঁহাদিগের অমৃত নিস্যন্দিনী শ্লোকাবলী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমরা অতীত যুগে নারী-শিক্ষা ও স্বাধীনতার সুস্পষ্ট আভাষ প্রাপ্ত হই। এই সকল প্রতিষ্ঠাবতী ললনা ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, তথা সাহিত্য-গঠনে অশেষ আত্মনির্ভর ও দূরদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃতই তাহা প্রাচীন ভারতের গৌরবের বিষয়।

সিপ্রাতটবর্ত্তিনী বৈভবশালিনী উজ্জয়িনী পুরীর শ্রেষ্ঠি কন্যা ইসিদাসীর জীবনে তিনবার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অভাগিনী তৃতীয় বার স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া পিতামাতার নিকট দুর্বহ জীবন পরিত্যাগ অথবা প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। এমন সময় সহসা একদিন জিন দত্তা শ্রেষ্ঠির গৃহে পদার্পণ করিলেন। অতিথি-সৎকার শেষে ইসিদাসী জনক-জননীর পাদ-বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন। অপূর্ব্ব সাধন-বলে পূর্ব্ব কর্ম্মডোর তাঁহার মানস নেত্রে ফুটিয়া উঠিল। পূর্ণব্রত হইয়া পরিতৃপ্তা রমণী সর্ব্ব দুঃখ অন্তে নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। ইসিদাসী সমগ্র কাহিনী চতুস্ত্রিংশৎ গাথায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রমণী-সঙ্ঘের বিশুদ্ধি রক্ষা হেতু বুদ্ধদেব কঠোর নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের একই বিহারে বাসাধিকার ছিল না। কামনা-পরিহীনা হইয়া নির্জ্জন ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত রহিয়া বিনয় ও নম্রতার সহিত ভিক্ষুণীগণকে জীবন যাপন করিতে হইত।

এই সকল থেরীর জীবন-বৃত্তান্ত পাঠে স্বতঃই মনে হয়, প্রাচীন ভারত-ললনাগণ আমাদের নয়ন-সমক্ষে কি মহিমময় আদর্শই না স্থাপন করিয়া গিয়াছেন! সমাজের প্রতিস্তর জ্ঞান ও শিক্ষার সম্যক বিকাশে কি গরিমোজ্জ্বল সফলতাই না লাভ করিয়াছিল। নারী—মাতা, কন্যা, ধর্ম্মোপদেশিকা; নারী—বিদ্যাবুদ্ধিশালিনী ও সমাজে প্রতিষ্ঠাবতী; নারী—বিচার-শক্তিতে পুরুষ-যশঃ-প্রার্থিনী, স্বার্থ-

স্বরবিহীন ভক্তি-অবদানভরে নমিতা ও নিখিলের কল্যাণ-কামনায় রত নিযুক্তা।

আজি বৌদ্ধধর্ম হইতে শ্রমণী-সঙ্ঘ বিলুপ্ত হইয়াছে সত্য, তথাপি অতীত যুগ গৌরব রমণীগণের স্মৃতি ছন্দ-ঝঙ্কৃত শ্লোকরাশিতে অটুট রহিয়াছে।

পাটলীপুত্র এবং জগৎশেঠ-বংশ। *

[শ্রীরামলাল সিংহ বি-এল্]

পূত-সলিলা ভাগীরথী-পাদ-বিধৌত পাটলীপুত্র, চির-শস্য-শ্যামলা মগধের প্রাচীন রাজধানী পাটলীপুত্র—অতীতের শত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া এখনও বিরাজিত। পাটলীপুত্রের ভগ্ন অট্টালিকায়, বিধ্বস্ত দেবালয়ে, পরিত্যক্ত সমাধি-মন্দিরে বিনষ্ট স্তূপরাশি মধ্যে, বিভিন্ন পল্লীর নামাবলীতে, জনসাধারণের আচার-ব্যবহারে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু অতীত কাহিনী, বহু প্রত্ন তত্ত্ব-কথা জড়িত আছে। সে সকল কথা যথাসাধ্য ক্রমান্বয়ে বলিবার আমাদের ইচ্ছা আছে।

আজি আমরা বহুদিনের পুরাতন কথা বলিব না। আজি আমরা ভারত-বিখ্যাত জগৎশেঠ বংশের পাটলীপুত্রের সহিত সম্বন্ধ এবং তথায় তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্নের কথাই সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করিব।

অনেকের ধারণা "জগৎশেঠ" কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম, এবং তিনি বাঙ্গালী। অন্ততঃ নবীনবাবুর "পলাশির যুদ্ধ" পাঠ করিলে তাহাই মনে হয়। নবীনবাবু লিখিয়াছেন :—

"অমনি জগৎশেঠ তুলিয়া বদন,
বলিতে লাগিল দর্পে সজীব বচন।
'মন্ত্রীবর!
সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির পরাধীন?
সাধে কি বিদেশী আসি দলি পদভরে,
কেড়ে লয় সিংহাসন?"

কিন্তু উপরিউক্ত দুইটী ধারণাই ভ্রান্তিমূলক। "জগৎশেঠ" কাহারও নাম নয়। উহা মুসলমান সম্রাটগণ-প্রদত্ত উপাধিমাত্র। "শেঠ" কথাটি সংস্কৃত 'শ্রেষ্ঠী' শব্দের অপভ্রংশ। 'জগৎশেঠ' শব্দের অর্থ জগৎ-বিখ্যাত শেঠ, বা বণিক্। আর তিনি বাঙ্গালীও ন'ন্।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে যখন বঙ্গের উজ্জ্বল সিংহাসনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা আসীন, সে সময়ে যে জগৎশেঠের কথা শুনিতে পাই, নবীন বাবুর 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে যে 'জগৎশেঠে'র পরিচয় পাই, তাঁহার নাম মহতাব (বা মহাতাপ) রায় জগৎশেঠ।

মহতাব রায় জগৎশেঠের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস রাজপুতানার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত নাগর গ্রামে। তাঁহারা শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহারা মারওয়াড়ী, বৈশ্য বণিক্।

হীরানন্দ সাহ।

পলাশির যুদ্ধের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে, ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে, জগৎশেঠ বংশের পূর্ব্বপুরুষ হীরানন্দ সাহ পাটনা নগরে আসিয়া বাস করেন। তখন মোগল সম্রাট শাজাহান দিল্লীর সিংহাসনে আসীন। তাঁহার মধ্যম পুত্র শাহ সুজা বঙ্গ-বিহারের সুবাদার। পাটলীপুত্র তখন ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ। পাটলীপুত্র তখন উত্তর ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্য-স্থান। ইংরেজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বণিকগণ তথায় আপনাদের বাণিজ্য-বিস্তারের প্রয়াস পাইতেছেন। হীরানন্দ সাহ পাটলীপুত্রের ধন-গৌরবের কথা শ্রবণ করিয়া, সুদূর মরুপ্রদেশ হইতে আসিয়া পাটলীপুত্রে ভাগীরথীর তীরে বাস করিলেন; এবং ধীরে ধীরে মহাজনী ব্যবসায় বিস্তার করিতে লাগিলেন। হীরানন্দ সাহ অচিরে ধনী মান্য-গণ্য লোক হইয়া উঠিলেন।

হীরানন্দ সাহের সাত পুত্র। তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেন। উঁহাদের মধ্যে মাণিকচন্দ সাহ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। হীরানন্দ সাহ মোগল সম্রাটদিগের নিকট কোন উপাধি পান নাই। তাঁহার পুত্র মাণিকচন্দ সাহ ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "শেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন।

স্মৃতিচিহ্ন।

বর্ত্তমান কালে পাটলীপুত্রের জনসাধারণ জগৎশেঠ-বংশের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে। হীরানন্দ সাহ কে ছিল, মাণিকচাঁদ সাহ কে, জগৎশেঠই বা কাহার উপাধি ছিল, তাহা তাঁহারা কিছুই বলিতে পারে না। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া পাটলীপুত্রের এবং তন্নিকটস্থ স্থানের নিম্নলিখিত স্মৃতিচিহ্নগুলির কথা অবগত হইয়াছি :—

(১) "জগৎশেঠের বাটী"—পাটনার চকের উত্তরে গঙ্গার ধারে শেঠবংশের প্রাচীন বাটী।

(২) "কুচা হীরানন্দ"—যে গলিতে জগৎশেঠ বংশের বাটী অবস্থিত তাহার নাম 'কুচা হীরানন্দ'।

(৩) "বাগ জগৎশেঠ" বা পাটনায় জগৎশেঠ বংশের আম-বাগান।

(৪) মৌজা হীরানন্দপুর—পাটনার পূর্ব্ব দক্ষিণে একটি মৌজার নাম।

আমরা জগৎশেঠের বাটী এবং আম-বাগানের সবিস্তার বিবরণ 'জগৎশেঠ মহতাব রায়' প্রবন্ধে দিব; এ প্রবন্ধে শুধু "কুচা হীরানন্দ" এবং মৌজা হীরানন্দপুরের কথাই বলিব।

"কুচা হীরানন্দ"—বাঁকিপুরের "গোলঘর" (অর্থাৎ ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত উচ্চকায় গোলাকার ইষ্টক-রচিত গোলাঘর) হইতে ছয় মাইল অর্দ্ধ ফর্লং অর্থাৎ প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্বদিকে পাটনার চকের

---

* বাঁকিপুর সুহৃদ্ পরিষদে পঠিত।

রাজপথের উত্তর পার্শ্বে যে গলিটি উত্তরদিকে গঙ্গার ধার অবধি গিয়াছে, তাহার নাম "কুচা হীরানন্দ"। কুচা অর্থে গলি। এই গলিটি পাটলীপুত্রের অন্যান্য গলির ন্যায় অপ্রশস্ত। এই গলিটি উত্তর দিকে যেখানে গঙ্গার ধারে গিয়া শেষ হইয়াছে, তাহার পশ্চিম ধারে জগৎশেঠ বংশের প্রাচীন বাটী।

"মৌজা হীরানন্দপুর":—পাটনার কলেক্টরীর রেজিষ্টারী-ভুক্ত মহাল "নীরন্দর্মপুর ক্ষরৌণীয়ার" (অর্থাৎ ক্ষৌরিণী গর্ভজাত নরেন্দ্রের পুরের বা মৌযাগচন্দ্রগুপ্তপুরের) অন্তর্ভুক্ত প্রায় ২১৯ বিঘার "হীরানন্দ পুর" নামে একটি দাখলি মৌজা দেখিতে পাওয়া যায়। মৌজা হীরানন্দপুর পাটনা সহরের পূর্ব্বস্থ বাঙ্কাঘাট ষ্টেসনের প্রায় চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। নামের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, উহা বুঝি কোন কালে আমাদের হীরানন্দ সাহের জমিদারী ছিল; এবং তাঁহার নাম হইতেই "হীরানন্দপুর" নাম হইয়াছে। কিন্তু হীরানন্দ নাম জৈন ও বৈশ্যদিগের মধ্যেই কেবল প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। হীরানন্দপুরের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী পাটনার চৌধুরীটোলার অম্বিকা প্রসাদ প্রভৃতি চৌধুরী বাবুরা। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ মৌজা সাইরুল মোতাক্ষরীণের গ্রন্থকর্তা গোলাম হোসেনের ভ্রাতা নবাব নকি খাঁর নিকট ক্রয় করেন। নবাব নকি খাঁ কিরূপে ঐ মৌজা লাভ করেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

হীরানন্দ সাহ কেন রাজপুতানার মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া পাটলীপুত্রে আসিলেন? কেন স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মমতা বিসর্জ্জন দিয়া সুদূর প্রবাসে আসিয়া বাস করিলেন? তাহা বুঝিতে হইলে পাটলীপুত্রের তৎকালীন অবস্থা অবগত হওয়া আবশ্যক। নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি হইতে অনুমিত হইবে যে, হীরানন্দ সাহের পাটনায় আসিবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই পাটনা উত্তর-ভারতের এক প্রধান বাণিজ্য-স্থান বলিয়া দেশ-বিদেশে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। হীরানন্দ সাহের পাটনায় অবস্থানকালে পাটলী-পুত্র নিজ বাণিজ্য-গৌরব-গরিমা হারায় নাই। মারওয়াড়ী জাতি চিরদিন বাণিজ্য-প্রিয়। তাই, মরুদেশ ত্যাগ করিয়া হীরানন্দ সাহ বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল পাটলীপুত্রে আগমন করিলেন; এবং অচিরে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেন।

পাটলীপুত্র সম্বন্ধীয় হীরানন্দ সাহের সম-সাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি কালক্রমানুসারে প্রদত্ত হইল।

১৬২০ খৃষ্টাব্দ। ভারতবর্ষীয় ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় পাটলীপুত্রের বাণিজ্য-গৌরবে আকৃষ্ট হইয়া ১৬২০ খৃষ্টাব্দে হিউজ এবং পার্কার নামক দুইজন ইংরেজকে আগ্রা হইতে পাটনায় কাপড় খরিদ করিতে, এবং তথায় কুঠি স্থাপনের জন্য প্রেরণ করেন। পাটনা হইতে আগ্রা এবং তথা হইতে সুরাটে স্থল-পথে কাপড় লইয়া যাওয়া বহু ব্যয়সাধ্য দেখিয়া, এক বৎসর পরে পাটনার ইংরেজ-কুঠি তুলিয়া দেওয়া হয়। (১)

(১) ওমালির পাটনার গেজেটিয়ার, পৃঃ ২৭।

আকজল খাঁ তখন পাটনার সুবাদার। (২) পর্ত্তুগীজেরা হুগলীতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া প্রবল প্রতাপান্বিত। (৩) তাঁহারা পাটনায় ব্যবসায় করিতেন। (৪)

১৬২৪ খৃষ্টাব্দ—ডচ্ বা ওলন্দাজদিগের বঙ্গে পদার্পণ। (৫)

১৬৩২ খৃষ্টাব্দ—সুরাটের ইংরেজ বণিক্ সম্প্রদায় পিটারমণ্ডি নামক জনৈক ইংরেজসহ আটটি গাড়ীতে পিপে-ভরা পারা এবং সিন্দুর পাটনায় বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন; এবং পাটনার বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ এবং তথায় ব্যবসা করিলে ইংরেজদিগের লাভ হইতে পারে কি না, তাহারও তদন্ত করিবার ভার পিটারমণ্ডির উপর অর্পণ করেন। পিটারমণ্ডি পাটনায় কেবল একমাস কাল অবস্থিতি করিয়া রিপোর্ট করেন যে, পাটনায় বাণিজ্য করিলে ইংরেজের লাভ হইবার সুবিধা নাই। (৬)

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ—শাজাহান কর্ত্তৃক ইংরেজদিগকে কেবল বালেশ্বরের নিকটে পিপ্‌পলী বন্দরে নৌ-বাণিজ্যের অধিকার প্রদান। (৭)

১৬৫০ খৃষ্টাব্দ—১৬৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ডচরা পাটনায় সোরা এবং চিনির ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। কারণ, ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী যে আদেশ প্রচার করেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, বালেশ্বর হইতে হুগলীতে নবাগত কতিপয় ইংরেজের প্রতি এই আদেশ প্রচারিত হয় যে, পাটনা সর্ব্ববাদিসম্মত সোরা সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ স্থান;—তাঁহাদের উচিত, পাটনায় কিরূপে সোরা সংগ্রহ হইতে পারে তাহার তদন্ত করা। এবং ইহাও আদেশ হয় যে, গোপনীয় ভাবে ইহা অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, পাটনায় ডচরা কখন, কোথায় এবং কিরূপে চিনি সংগ্রহ করেন; এবং যে উপায়ে সোরা সংগ্রহ হইবে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া কিছু চিনিও সংগ্রহ করিতে হইবে। কারণ ডচরা সম্প্রতি পাটনায় যে চিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিল। (৮)

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দ। হীরানন্দ সাহের পাটনায় আগমন। (৯)

১৬৫০—৫৭ খৃষ্টাব্দ। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরেই বোধ হয় ইংরেজগণ পাটনায় একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকিবেন।

(২) চার্লস ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালার ইতিহাস (বঙ্গবাসী—সংস্করণ) পৃঃ ২৫১।

(৩) চার্লস ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালার ইতিহাস (বঙ্গবাসী সংস্করণ) পৃঃ ২৫৫।

(৪) ওমালির পাটনার গেজেটিয়ার পৃঃ ২৫।

(৫) চার্লস ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালার ইতিহাস (বঙ্গবাসী সংস্করণ) পৃঃ ৩৪১।

(৬) ওমালির পাটনার গেজেটিয়ার, পৃঃ ২৭।

(৭) ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ২৭৫।

(৮) ওমালির পাটনার গেজেটিয়ার, পৃ ২৮।

(৯) হণ্টারের মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার।

…৭ ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে পাটনার কুঠি হুগলির কুঠির অধীন বলিয়া বর্ণিত …াছে। ইংরেজ বণিকগণ যখন প্রথমে পাটনায় আসেন, তখন …রা ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের সোরার …পাটনার অপর পারে, হাজিপুর হইতে প্রায় ১০ মাইল উত্তরে …ঙ্কয়া গ্রামে স্থাপিত করেন। কারণ, তন্নিকটস্থ স্থানে সোরা …র্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। পাটনা হইতে দূরে থাকিলে, …দারের বাধা এবং তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীদিগের নির্যাতন হইতে …াহতি পাইবার সম্ভাবনা ছিল। (১০)

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ। শাহিজাহান কারারুদ্ধ এবং ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন …রোহণ। (১১)

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ। ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক পরাজিত সুলতান সুজার পাটনায় …শ্রয় গ্রহণ। ঔরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদের পাটনায় বাগ জাফর খাঁয় …গমন এবং মিরজুমলার সহিত সাক্ষাৎ। (১২)

১৬৬০ খৃষ্টাব্দ। মিরজুমলা কর্ত্তৃক ইংরেজদিগের সোরার নৌকার …তায়াত বন্ধ, এবং তাহাতে ইংরেজদিগের পাটনার ব্যবসায়ের সমূহ …তি। (১৩)

১৬৬১ খৃষ্টাব্দ। ইংরাজ বণিকগণের পাটনার ব্যবসায়ের রিপোর্ট। …রোপে বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য সোরার আবশ্যক হওয়ায়, …রেজরা এবং ডাচেরা পাটনায় প্রধানতঃ সোরার ব্যবসায় করিতেন। …রেজদিগের সোরা বোঝাই-করা শত শত নৌকা ভাগীরথী বক্ষে …চরাচর গমনাগমন করিত। পাটনায় তিব্বৎ হইতে আনীত মৃগনাভি …হইয়া পারস্যে এবং ভেনিস্ নগরে প্রেরিত হইত। চীনের …পাটনায় আসিত। অহিফেন বহু পরিমাণে পাটনায় বিক্রীত …ইত। লাক্ষা বহু মূল্যে বিক্রীত হইত। পাটনায় তাফ্ তী (রেশমের …পড়) কাশিম্‌বাজারের তাফ্ তা হইতে উৎকৃষ্ট হইত। পাটনায় …জারে ইংরেজি কাপড়ও বিক্রয় হইত। (১৪)

১৬৬৩-৬৪। মীরজুমলার মৃত্যু। সায়েস্তা খাঁ বঙ্গ বিহারের সুবাদার …যুক্ত হন। (১৫)

১৬৬৪। টেভরনিয়ার (ফরাসি মণিকার) এবং বর্ণিয়ার নামক …যটকদ্বয়ের পাটনা পরিদর্শন। পাটনায় ওলন্দাজদিগের সোরার …ঠি দর্শন। তাঁহাদের ছাপরা হইতে আনীত সোরার বিবরণ। …ভরনিয়র পাটনাকে বঙ্গদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নগর এবং বাণিজ্যের …স্থ সুপ্রসিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি তৎকালে পাটনায় ডেণ্টজিক্ দেশীয় আর্ম্মানি বণিক এবং ত্রিপুরার ব্যবসায়ীদিগকেও দেখিয়াছিলেন। পাটনার বাজারে তিনি ২৩০০০৲ টাকার তিব্বৎ-দেশীয় মৃগনাভি খরিদ করেন। পাটনার এবং তিব্বতের মধ্যে রীতি-মত ব্যবসায়-বাণিজ্যও চলিত। প্রতি বৎসর পাটনা হইতে তিব্বতে বণিকেরা গমন করিতেন। তিব্বতীয় ব্যবসায়ীরাও প্রতি বৎসর পাটনায় প্রবাল, তৃণমণিঃ (এম্বার) এবং পাটনার প্রসিদ্ধ কূর্ম্ম-শুল্ক-নির্ম্মিত বলয় ক্রয় করিবার জন্য আসিতেন। (১৬)

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ। জব চার্ণক ইংরেজদিগের পাটনায় কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। (১৭)

১৬৭২ খৃষ্টাব্দ। সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে ইংরেজগণকে বিনা শুল্কে বালেশ্বর এবং তন্নিকটস্থ সমুদ্র উপ-কূলস্থ স্থলে, হুগলীতে কাশিমবাজারে, পাটনায় এবং অন্যান্য স্থানে বাণিজ্যদ্রব্য যথেচ্ছ আমদানি এবং পাটনা হইতে সোরা এবং অন্যান্য পণ্য দ্রব্য যথেচ্ছ রপ্তানি করিবার ফরমান প্রদান। (১৮)

১৬৭৭ খৃষ্টাব্দ। সায়েস্তা খাঁর বঙ্গের সুবাদারী পদ ত্যাগ। (১৯)

১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ। ঔরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান আজিম পাটনায় সুবাদার নিযুক্ত হন। (২০)

১৬৮০ খৃষ্টাব্দ জব চার্ণক পাটনার ইংরাজ কুঠি পরিত্যাগ করিয়া কাশিমবাজারে গমন করেন। সায়েস্তা খাঁ পুনরায় বঙ্গের সুবাদারী পদে অভিষিক্ত হন। (২১)

১৬৮২ খৃষ্টাব্দ। পাটনায় অন্তর্বিপ্লবের সূচনা। আরাকান হইতে পলায়িত সুজার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া জনৈক মুসলমান যুবক পাটনাবাসিগণকে বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করেন। পরে বিহারের সুবাদার সয়েফ খাঁ তাহাকে কারারুদ্ধ করেন। বিহারের বিদ্রোহী জমিদার গঙ্গারাম বিহার নগর লুণ্ঠন করিয়া পাটনায় আগমন করিলে, ভগ্ন-প্রাকার-রক্ষিত পাটনার জনগণ ভীত হইলেন। নবাব দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্যবসায়ীরা মূল্যবান দ্রব্যাদি স্থানান্ত-রিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মিষ্টার পিকক্ প্রমুখ ইংরেজ বণিকগণ পাটনার অপর পারে হাজিপুর হইতে ১০ মাইল উত্তরে সিঙ্কিয়া গ্রামে নিজেদের সোরা গুদামে নীরবে বাস করিতেছিলেন। সায়েস্তা খাঁ ইংরেজদিগের এই নিভৃত বাসে ভীত হইয়া ভাবিলেন, ইংরেজেরা বুঝি বিদ্রোহীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তাই তিনি ইংরাজ বণিকগণ কর্ত্তৃক পাটনায় সোরা খরিদ একেবারে বন্ধ

(১০) ওমা, পা-গে, পৃ ২৮।

(১১) শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস, …খণ্ড, পৃ ৭৮।

(১২) শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস, পৃ ২০১।

(১৩) ষ্টুয়াটের বাঃ ইঃ পৃ ৩২৩।

(১৪) ওমা পা গেঃ পৃ ২৮।

(১৫) ষ্টু বা ই পৃ ৩২৩ এবং ৩৩৩।

(১৬) ওমা পা গে পৃঃ ২৫ এবং ২৮।

(১৭) ঐ পৃ ২৮।

(১৮) ষ্টু বা ই পৃ ৩৪০।

(১৯) ঐ পৃ ৩৪১।

(২০) ঐ পৃ ৩৪২।

(২১) ওমা পা গে পৃঃ ২৯

করিয়া দিলেন, মিষ্টার পিকক্ সাহেবকে কারারুদ্ধ করিলেন, এবং ইংরেজদিগের সকল রূপ পণ্য দ্রব্যের উপর শতকরা ৩।০ টাকা হারে শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। (২২)

১৬৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দ। ইংরেজের প্রতি সায়েস্তা খাঁর বিরাগ। তাঁহার অনুযোগে ঔরঙ্গজেবের মনে ক্রোধ-সঞ্চার। ইংরেজ-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি। পণ্য-শূন্য-বাণিজ্য-জাহাজের ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন। দ্বিতীয় জেমস্ কর্ত্তৃক সায়েস্তা খাঁ এবং ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সজ্জিত আক্রমী প্রেরণ। ইংরেজদিগকে মোগল সাম্রাজ্য হইতে বহিষ্করণ এবং তাহাদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠনের জন্য ঔরঙ্গজেবের আজ্ঞা প্রচার। সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক পাটনা, মালদহ, ঢাকা এবং কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি সকল বাজেয়াপ্ত করন এবং ইংরেজদিগকে নিষ্কাষণ করিবার জন্য হুগলীতে সৈন্য প্রেরণ। (২৩)

১৬৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দ। সায়েস্তা খাঁর সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি। তাঁহাদের কুঠি সকল প্রত্যর্পণ। ৩।০ টাকা হারের শুল্ক প্রভৃতির প্রত্যাহার। (২৪)

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ। সায়েস্তা খাঁর পদত্যাগ, ইব্রাহিম খাঁর সুবাদারী পদ গ্রহণ। (২৫)

১৬৯০ খৃষ্টাব্দ। ঔরঙ্গজেবের নিকটে ইংরেজদিগের সন্ধি-দূত প্রেরণ। ইংরেজদিগকে বঙ্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইব্রাহিম খাঁর প্রতি ঔরঙ্গজেবের আদেশ। ইব্রাহিম্ খাঁ কর্ত্তৃক ইংরেজ এজেণ্টগণের কারামুক্তি। (২৬)

১৬৯১ খৃষ্টাব্দ। ইব্রাহিম খাঁ কর্ত্তৃক জব চার্ণক সাহেবকে ঔরঙ্গজেবের "হসবুল হুকুম্" বা আজ্ঞা-পত্র প্রদান। কেবল ৩০০০ কর লইয়া অবাধ বাণিজ্যের অধিকার প্রদান। (২৭)

১৬৯২ খৃষ্টাব্দ। তুর্কীস্থানের সুলতানের ঔরঙ্গজেবের নিকট অভিযোগ যে খৃষ্টান জাতি ভারতবর্ষ হইতে সোরা লইয়া গিয়া য়ুরোপে বারুদ প্রস্তুত করিয়া মুসলমান জাতিকে ধ্বংস করিতেছেন। ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বঙ্গ ও বিহারে ইংরাজদিগের সোরা প্রস্তুত বা ক্রয়ের নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার। (২৮)

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দ। ইংরেজ বণিকদিগের প্রতি ইব্রাহিম্ খাঁর সুদৃষ্টি। তাঁহাদিগকে জাতিগত স্বাধীনতা প্রদান ও শুল্ক ভাবে ব্যবসা করিবার অনুমতি প্রদান। (২৯)

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দ। ঔরঙ্গজেবের পৌত্র (বাহাদুর শাহের মধ্যম পুত্র) আজিমুশ্বানের বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যার সুবাদারী পদ প্রাপ্তি। (৩০)

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দ—মে। আজিমুশ্বানের পাটনায় আগমন। (৩১)

১৬৯৮-৯৯। ইংলণ্ডেশ্বর উইলিয়াম্ কর্ত্তৃক ঔরঙ্গজেবের নিকট অবাধ বাণিজ্যের ফরমান পাইবার মানসে উইলিয়ম নরিসকে দূত স্বরূপ প্রেরণ। (৩২)

১৭০০ খৃষ্টাব্দ। অবাধ বাণিজ্যের ফরমান প্রাপ্তি। (৩৩)

১৭০০-০২ খৃষ্টাব্দ। য়ুরোপীয় এবং অন্য বিদেশীয় পণ্য দ্রব্যের একমাত্র ব্যবসায়ী হইবার মানসে আজিমুশ্বান কর্ত্তৃক "সওদাএ আম" এবং "সওদাএ খাস"—(অর্থাৎ বন্দরে বন্দরে নিজ লোক পাঠাইয়া অল্প মূল্যে তাহা বিক্রয়) নামক নব ব্যবসায়-পদ্ধতির প্রচার। উহাতে ঔরঙ্গজেবের বিরক্তি। (৩৪)

১৭০২-০৩। আজিমুশ্বানের এবং মুর্শিদকুলী খাঁর মধ্যে মনোমালিন্য। (৩৫) মুর্শিদকুলি খাঁর ঔরঙ্গজেবের নিকট অভিযোগ। (৩৬) ঔরঙ্গজেবের বিরক্তি। আজিমুশ্বানকে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিহারে বাস করিবার আজ্ঞা প্রচার। (৩৭)

১৭০২ খৃষ্টাব্দ। উইলিয়াম নরিসের ভারতবর্ষ পরিত্যাগ। য়ুরোপীয় জলদস্যুদিগের অবিশ্রান্ত উপদ্রব। ঔরঙ্গজেবের বিরক্তি। মোগল সাম্রাজ্যস্থ প্রত্যেক য়ুরোপীয়কে ধৃত এবং কারারুদ্ধ করিবার আজ্ঞা প্রচার। পাটনায় ইংরেজগণ ধৃত এবং কারারুদ্ধ এবং ৫০ দিন কারাবাসের পর মুক্তি। (৩৮)

১৭০৪ খৃষ্টাব্দ। পাটনায় আজিমুশ্বানের আগমন। (৩৯) এবং পাটনার "আজিমাবাদ" নামকরণ। পাটনার দুর্গের সংস্কার। (৪০)

---

(২২) ষ্টু বা ই পৃ ৩৪৯-৫১, ও ওমালির পা গে পৃ ২৯।

(২৩) ষ্টু বা ই পৃ ৩৫৩ এবং ৩৬৪।

(২৪) ঐ পৃ ৩৫৯।

(২৫) ঐ পৃ ৩৬৬।

(২৬) ঐ পৃ ৩৬৬-৬৭

(২৭) ষ্টু বা ই পৃ ৩৬৮।

(২৮) ঐ পৃ ৩৬৯।

(২৯) ঐ পৃ ৩৭০

(৩০) ষ্টু বা ই পৃঃ ৩৭৭ ও ৩৮৩।

(৩১) ঐ পৃঃ ৩৯৪-৯৫।

(৩২) ঐ পৃঃ ৩৯৪-৯৫।

(৩৩) ঐ পৃঃ ৩৯৬।

(৩৪) ষ্টুয়াটের বঙ্গ ইতিহাস পৃঃ ৩১৩-৯৪

(৩৫) ঐ পৃঃ ৪০১।

(৩৬) ঐ পৃঃ ৪০৩।

(৩৭) ঐ পৃঃ ৪০৪।

(৩৮) ওমালির পা গে পৃঃ ২৬

(৩৯) ষ্টু বা ই পৃঃ ৪০৪।

(৪০) ওমালির গেজেটিয়ার পৃঃ ২৬।

নারীর অধীনতা

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এস্‌সি]

সভ্যতা ও নারীর অবস্থা

অধিকাংশ অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য সমাজেই নারীজাতির পরাধীনতা দেখা যায়। অনেক তথাকথিত সভ্য-সমাজেও এ প্রথা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত। অনেকের মতে নারীজাতির সামাজিক অবস্থা সেই সমাজের উন্নতির বা সভ্যতার পরিমাপক। এই উক্তি কতক পরিমাণে সত্য হইলেও, অত্যন্ত নিম্নস্তর শ্রেণীর মানব-সমাজে ইহার কিছু-কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। আণ্ডামান দ্বীপের আদিম অধিবাসী, বা দক্ষিণ আফ্রিকার বুসম্যান জাতিকে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মানব-সমাজের অতি নিম্নস্তরভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত উভয় জাতির মধ্যে নারীর অবস্থা পুরুষাপেক্ষা হীন নহে। নারীর প্রতি পুরুষের অসম্মান, অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার মুখ্য কারণগুলি এস্থলে একে-একে পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

(১)

মাতৃতন্ত্রে নারীর অবস্থা

মানব-সমাজে নারীর অবস্থা চিরকালই হীন ছিল না। বর্ত্তমান যুগে অধিকাংশ সমাজেই পিতৃতন্ত্র বা Patriarchate প্রচলিত দেখা যায়। (অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই সংসারের বা বংশের শাসনকর্ত্তা হইয়া থাকেন; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—সকলকেই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিতে হয়, এবং কর্ত্তার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পৈত্রিক বিষয় ও সংসারের কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।) এ প্রথা কিন্তু সনাতন নহে। আদিম সমাজে মাতৃতন্ত্রেরই Mutterrecht, Matriarchate) সমধিক প্রচলন ছিল। (অর্থাৎ, রমণীই সংসারের কর্ত্রী ছিলেন; পুত্র, কন্যা, স্বামী বা জামাতাকে তাঁহার শাসনাধীন থাকিতে হইত। কন্যার বংশ উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইত। এই প্রথা এখনও দক্ষিণ ভারতে নেয়ারগণের মধ্যে ও অন্যান্য কতিপয় দেশে প্রচলিত আছে।) কালক্রমে যখন মাতৃতন্ত্রের পরিবর্ত্তে পিতৃতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, তখন হইতেই সমাজে নারীর স্বাধীনতা বহু পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। (১) পুরুষ সাংসারিক সকল বিষয়ের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া, নারীকে অবজ্ঞা করাও পুরুষোচিত বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিল।

(২)

পিতৃতন্ত্রে নারীর অবস্থা

পিতৃতন্ত্র প্রচলিত হইলে, পিতা স্বীয় পুত্র-কন্যার উপর একাধিপত্য লাভ করিলেন; এমন কি কোন-কোন সমাজে পিতা ইচ্ছা করিলে পুত্র কন্যাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। "And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt.—Genesis XXXIX, 21। (পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় মাতার প্রাণবধ করিয়াছিলেন। ইহা পিতৃআজ্ঞা পালনের চরম সীমা বলা যাইতে পারে।) পুত্র-কন্যার বিবাহ সম্পূর্ণরূপে পিতার ইচ্ছাতেই সম্পাদিত হইত। এ বিষয়ে তাহাদিগের ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া বিবেচিত হইত না। পিতা পাত্রের নিকট হইতে যৌতুক (Bride price) গ্রহণ করিয়া কন্যাদান করিতেন (ইহা একরূপ বিক্রয়েরই নামান্তর)। সেজন্য পিতার অনূঢ়া কন্যার উপর যে অপরিসীম ক্ষমতা (Patria potestas) ছিল, তাহা বিবাহের পর স্বামীতে ন্যস্ত হইত। (২) পিতার, কন্যার উপর অসীম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, বাৎসল্য স্নেহবশতঃ কার্য্যতঃ সচরাচর সে ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা হইত না। অসভ্য সমাজে, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের স্নেহ বা প্রেম অধিকাংশ স্থলেই যৌবন-সম্বন্ধাশ্রিত বলিয়া দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় নাই। অনেক সমাজে পুরুষের বহুপত্নীত্ব প্রচলিত থাকায়, বিগত-যৌবনা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কিছুমাত্র মায়া-মমতা থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা কোন অংশে ক্রীতদাসীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে। দৈনিক উদরান্নের বিনিময়ে স্বামীর সংসারের যাবতীয় কষ্টসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করাই তখন তাহার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

আসুরিক বিবাহ

কোন কোন দেশে বিবাহার্থী পুরুষকে, কন্যার পিতাকে কন্যার মূল্য প্রদান করিয়া বিবাহ করিতে হইত (আসুরিক বিবাহ), এবং এই প্রথা হইতেই স্বামী স্বীয় স্ত্রী বিক্রয়ের অধিকার পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল। (৩)

---

(১) এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, সকল সমাজেই পিতৃতন্ত্র প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে মাতৃতন্ত্র প্রচলিত ছিল কি না, তাহা এখনও নিশ্চিত রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। (Hartland—Primitive Paternity দ্রষ্টব্য।)

(২) "যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥"
[মনুসংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়, ১৫১।

(৩) প্রাচীন ভারতেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল,—
"ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।
এবং ধর্ম্মং বিজানীমঃ প্রাক্ প্রজাপতি নির্ম্মিতম্॥"
[মনুসংহিতা, নবম অধ্যায়, ৪৬।

প্রাচীন ভারতে, বৈদিক যুগে নারীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল, কিন্তু বেদে অতি স্বল্পসংখ্যক দেবীরই উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাও পুরুষ-প্রাধান্যের পরিচায়ক।

(৮)

নারীর অপবিত্রতা

বহু সংখ্যক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে নারী গর্ভাবস্থায়, প্রসবের পর, বা রজোদর্শনকালে অশুচি বা অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা আদিম মানবের প্রকৃতিগত শোণিতাতঙ্ক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানকালে বঙ্গসমাজেও শুচিবায়ুগ্রস্তা প্রাচীনাগণ তাঁহাদের আচার নিয়ম পালনের কঠোরতা পুরুষের পক্ষে অনেকটা লাঘব করিয়া থাকেন। ইহার মূলেও নারী যে পুরুষের অপেক্ষা স্বভাবতঃই অধিকতর অশুচিসম্পন্না, এই বিশ্বাস নিহিত আছে।

"তুঁহুকা কোন্ মিঠি?"*

[শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্-এ]

(১)

অকপট পী-ই-রিতি, সেহ রসা-আ-ল মেরি,
বিরহেরি দগ্ধ পরাণ।
মরণহি,—সেহ মিঠি; করতহি সকল রে
হৃদয় জ্বালা অবসান॥
তুঁহুকা কোন্ মিঠি,—তু সখি, কহলো বিচারি!

(২)

অব মিঠি পী-ই-রিতি? মেরি সো ভৈ খরণহি
কঠিন তিক্ত কঠো-ও-র।
পীরিতি গরল তুঁহু —তাঁথ তুঁহু মরণ রে,
অমিয় মধুরহি মোর॥
(প্রণয় রে) মরণ মধুর হি, দেহ তু সে হি হামা-আ-রি!

(৩)

মধুর রে পী-ই-রিতি, আজু তু ন শুখাওবি,
ইথি মেরি লোয় পরাণে।
মধুর মরণ তুঁহু, প্রণয়ে টুটা-আ-ওবি,
লোয়বি মাট্টী সমা-আ-নে॥
—তুঁহুকা কোন্ মিঠি, তু সখি কহলো বিচারি!

(৪)

"হিয়া" মেরি বো-ও-লত, "চলহ প্রণয় সাথ",
অব নেহি হোয়ত সেহি।
"নিয়তি" ডাকত আজু,— চলনু মরণ সাথ;
হাম্ কালো ডাকত ওহি॥
(ডাকত) তেঁহি অব চলনু, আহ মরণ হামা-আ-রি!

* টেনিসনের "Sweet is true Love, though given in vain, in vain." শীর্ষক কবিতা দ্রষ্টব্য।—লেখ্‌সংহিতা,
হ পরিহাস

অর্থ-বিজ্ঞান

[শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্]

ভোগ-ব্যবহার (Consumption)

মানুষের মধ্যে যে তাহার স্বাভাবিক প্রাণৈষণা,—প্রাণরক্ষা করিবার জন্য একটা প্রবল বিচেষ্টা বর্ত্তমান আছে, তাহা হইতেই ধনৈষণার অভ্যুদয় হইয়াছে। উদ্ভিদ ও ইতর শ্রেণীর মধ্যেও এই বিচেষ্টার বর্ত্তমানতা উপলব্ধ হইয়া থাকে। প্রাণের ধর্ম্মই এই যে, সে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা হইতে আপনার প্রতিকূল ঘটনাবলীকে নিরস্ত ও পরাভূত করিয়া, অনুকূল উপচারসকল সংগ্রহ করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া আত্মতৃপ্তি ও আত্মবিকাশ সাধন করিবে। প্রাণের এই স্বাভাবিক ধর্ম্মই তাহার প্রাণতা; এবং এই প্রাণতার প্রেরণাকেই তাহার ইচ্ছা ও অন্বেষণ কহে; এবং তাহারই কর্ম্মচেষ্টা ও কর্ম্মানুষ্ঠানে ইহা অভিব্যক্ত হয়। আপনাকে বড় করিয়া বিকাশ ও প্রকাশ করিবার জন্য যে প্রাণের এই স্বাভাবিক এষণা বা অন্বেষণ ইচ্ছা, তাহাই মানব-সমাজে অভাব (want) নামে অভিহিত হয়। মানসিক ও আধ্যাত্মিক অন্বেষণ তখন তাহার সাহচর্য্য করিয়া তাহারই অনুকূলতা করে বলিয়া, কর্ম্ম করিয়া এ সকল অভাবেরও পরিতৃপ্তি সাধন করিতে হয়। আর এই সকল বিভিন্ন অভাব-পূরণ-যোগ্য বস্তুই ধন-পদবাচ্য। এই ধনের আত্মসাৎ বা ব্যবহার করাকেই ভোগ বা ব্যবহার কহে। আবার, এই ভোগ্য বস্তুর উপভোগে ভোক্তার যে অভাব-বোধের প্রশমন হয়, তাহাকেই তৃপ্তি (satisfaction) বা পরিতৃপ্তি কহে।

বর্ত্তমান সভ্য-সমাজের ব্যবহার অনুসারে কোন মানুষই প্রায় আপনার অভাবসকল সাক্ষাৎ কর্ম্মচেষ্টা বা কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরিতৃপ্ত করে না। অধিকাংশ লোকই কর্ম্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে এবং উপার্জ্জিত অর্থের বিনিময়ে আপন-আপন প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া অভাব মোচন করে। যদি বা কেহ সাক্ষাৎ শ্রমলব্ধ বস্তুর কিয়দংশ ব্যবহার করে, তাহার পরিমাণ এমন সামান্য যে, তাহা উপেক্ষা করা যায়; আর বিশেষ তেমন লোকও নিজ ব্যয়িত অংশের উদ্বৃত্ত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া, সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করে।

শ্রমলব্ধ বস্তুর দ্বারাও মানুষের প্রাণ-ধারণের সম্ভবতা হয়। ঐ সকল বস্তু প্রকৃতির অযাচিত দান। ভূমির বিস্তৃতিই সর্ব্বজীবের সংস্থিতি-হেতু। ভূমির এই স্বাভাবিক শক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কোন জীবই এক মুহূর্ত্তকাল তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। তেমন শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার জন্য বায়ু খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। অশ্রমলব্ধ দ্রব্যের জন্য কোন অন্বেষণ নাই বলিয়া তাহা ধন-পদবাচ্য নহে।

আমাদের ভাষায় সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ ব্যবহারকেই ভোগ বা উপভোগ কহে। অন্নাদির ব্যবহার সাক্ষাৎ ভাবে হয় বলিয়া, তাহাকে ভোগ বলা হয়। আবার কোন-কোন সাক্ষাৎ ভোগকে, যথা যন্ত্রাদির ব্যবহারকে, প্রায়শঃ ভোগ বা উপভোগ না বলিয়া ব্যবহার বলিয়া থাকি। আর উৎপাদন ব্যাপারে উপাদানের নিয়োগকে ব্যবহার মাত্র বলা হয়। ইংরাজীতে এ সকল ব্যবহারকে একযোগে consumption বলা হয়।

সুতরাং ভোগ-ব্যবহার-তত্ত্বে নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক।

১। অভাব, তাহার তৃপ্তিসাধক বস্তু ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ।

২। আয়-ব্যয়ের নিয়ম ও সম্বন্ধ।

৩। কর্ম্মচেষ্টা, অভিষ্ট বস্তু ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ।

অভাব

মানুষের অভাব অসংখ্য। তাহাকে সাধারণ ভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—এক স্বাভাবিক ও আর এক বস্তুজন্য। এই বস্তুজন্য অভাবও কতক স্বাভাবিক কারণ-উদ্ভূত হয়, আর কতক অতি কৃত্রিম উপায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

স্বাভাবিক অভাব

মানুষ অপূর্ণ জীব, তাহার সকল শক্তিই পরিমিত। তাহার এই সকল পরিমিত শক্তির সংস্থিতি ও বৃদ্ধির জন্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভীতি প্রভৃতি প্রাথমিক অভাব ও বাসনার অনুভূতি হইয়া মানুষকে কর্ম্মে নিয়োজিত করে। এই সকলই তাহার স্বাভাবিক অভাব।

এই স্বাভাবিক অভাবও কোন না কোন প্রাকৃতিক বস্তু দ্বারা প্রশমিত ও পরিতৃপ্ত করিতে হয়। এই সকল প্রাকৃতিক বস্তুর নির্ব্বাচন হয় কিসে? প্রকৃতির অযাচিত দানে যে সকল অভাবের স্বাভাবিক নিবৃত্তি হয়, তাহা অর্থ-বিজ্ঞানে বিবেচ্য নহে। কর্ম্মচেষ্টা ও কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে সকল ভোগ্য-বস্তুর সংগ্রহ করিতে হয়, সেই সকল বস্তুর পরিচয় হয় কিসে, তাহাই জিজ্ঞাস্য। মনুষ্যেতর ইতর জীবের মধ্যেও ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি স্বাভাবিক ও প্রাথমিক অভাব-বোধ বর্ত্তমান আছে। তবে মানুষ ও ইতর সাধারণ জীবের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ইহারা স্বাভাবিক ও সহজ-সংস্কার (Instinct) প্রভাবে শৈশবাবস্থায়ই তাহাদের আহারীয় বস্তু অনায়াসে চিনিয়া লইয়া, তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু মানব-শিশুর সে শক্তি অতি ক্ষীণ, এমন কি, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানব-শিশু যেন একখণ্ড জড়পিণ্ডের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হয়; তখন তাহার আহারীয় বস্তু চিনিয়া লইবার কোন ক্ষমতাই থাকে না; এমন কি, সে মাতৃক্রোড়ে থাকিয়াও জননীর স্তনযুগল নিঃসৃত ক্ষীরধারা তুলিয়া মুখে লইতে পারে না। আর, ধেনু-বৎস ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতৃস্তন চিনিয়া লয়। জীব-রাজ্যে মানব-শিশুর ন্যায় এমন অসহায় জীব আর নাই। সে যে একদিন এ রাজ্যে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে, তাহার যে এ রাজ্যে রাজত্ব করিবার জন্যই জন্ম হইয়াছে, এ কথা তখন বিশ্বাস করিতে মনে লয় না। সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনেক পরে পরের সাহায্যে ধীরে-ধীরে আপনার আহার চিনিয়া লয় এবং অভ্যাসবশতঃ ক্রমে তাহার সংস্কার সকল গড়িয়া উঠে।

বস্তুজন্য অভাব

এই সকল স্বাভাবিক অভাব পূরণ করিবার জন্যই মানুষকে কর্ম্মচেষ্টা ও কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। প্রথমে মাতাপিতা তাহার হইয়া তাহা করিয়া থাকেন; সময়ে তাহাকেই সে চেষ্টা করিতে হয়। স্বাভাবিক অভাব পূরণ করিবার জন্য কোন বস্তুর পুনঃপুনঃ ব্যবহার হইলে, অভ্যাস-বশতঃ সেই অভাব ও তৎপূরণযোগ্য বস্তুর মধ্যে একটা স্থায়ী সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। পুনরায় সেই অভাব-বোধ জন্মিলেই, তাহার প্রশমন-যোগ্য বস্তুর অভাব-বোধ জাগ্রৎ হইয়া উঠে। মানুষ কর্ম্মচেষ্টা করিয়া একদিকে যেমন নানা বস্তুর আবিষ্কার করিতেছে, তদ্রূপ অন্যদিকে তাহাদের ব্যবহার-ফলে, ঐ সকল নবাবিষ্কৃত বস্তুর জন্য অভিনব অভাবের সৃষ্টি হইতেছে। Necessity is the mother of invention—অভাবই নবনবোদ্ভাবনের প্রসূতিস্বরূপ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি প্রাথমিক অভাব পূরণ করিবার জন্য কত শত-সহস্র বস্তুর যে আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; এবং এই সকল বিভিন্ন বস্তুর ব্যবহারের সঙ্গে-সঙ্গে অভ্যাসবশতঃ তাহাদের জন্যও অভাব-বোধ জাগ্রত হইয়া থাকে। মানুষের কর্ম্মচেষ্টা ও কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিক্রিয়া স্বরূপে নিত্য-নিত্য যে সকল অভিনব অভাবের অভ্যুদয় হয়, তাহারা সকলই বস্তুজন্য অভাব। ক্ষুধাজনিত কষ্ট অন্ন ভক্ষণে নিবারিত হয়, আর অন্ন-বস্তুর জন্য যে অভাব-বোধ, তাহা তাহার অধিকার লাভে প্রশমিত হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অভাব পূরণ করিবার জন্য তৎপ্রশমন-যোগ্য বস্তুর প্রয়োজন হইলেও, ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য বর্ত্তমান আয়োজন বস্তুজন্য বটে। এই সকল বস্তুর ব্যবহারের সময়ে কোন না কোন স্বাভাবিক অভাব পূরণ হইবে, এই মাত্র তাহাদের বর্ত্তমান প্রয়োজন।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি বস্তুজন্য অভাব আছে, যাহা একান্ত কৃত্রিম। স্বাভাবিক কোন অভাব পূরণ জন্য যে সকল বস্তুর প্রয়োজন-বোধ হয় না, তাহাদের অধিকাংশই বিলাস-সামগ্রী। কোন-কোন বিদেশী অর্থ বিজ্ঞানবিদ্ এ সকলেরও স্বাভাবিক কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সেগুলি এত দূরবর্ত্তী যে, আমরা তাহা পরিহার করিলাম। সম্প্রতি বিলাস-দ্রব্যকে আমরা কৃত্রিম অভাব মধ্যেই গণ্য করিব।

ক্রমবিকাশ ও অভাবের পর-পরতা

আমরা বলিয়াছি যে, মানব-শিশু অতি নিরাশ্রয় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে; এবং ক্রমে অভ্যাসবশতঃ তাহার উন্মেষ

বিকাশ হইতে থাকে। মানবের আদিম অবস্থার কোন প্রামাণ্য ইতিহাস নাই। অদ্যাপি পৃথিবীর নানা স্থানে অনেক অসভ্য-জাতির বাস আছে। তাহাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে, মানব-জাতির ক্রমবিকাশের একটা তত্ত্ব অনুভূত হইতে পারে। আদিম অবস্থায় মানুষের অভাব-বোধ অতি কম ছিল, এরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে। অসভ্য-জাতির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, আদিমকালে পর-পর ভাবে চারিটি বস্তুর জন্য অভাব-বোধ জাগ্রৎ হইয়া থাকিবে।

প্রথমতঃ, আহারীয় বস্তুর জন্য অভাব-বোধ। বাঁচিতে হইলে জীবমাত্রকেই আহারান্বেষণ করিতেই হয়। উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর মধ্যেও এই প্রয়োজন থাকা দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহাদের সে বস্তুর মধ্যে কোন বৈচিত্র্য ঘটে না ও ঘটিতে পারে না। যে জাতীয় প্রাণী যে আহারে অভ্যস্ত, তাহাই সে যুগযুগান্ত ধরিয়া ব্যবহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছে,—তাহাতে কদাপি কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। কিন্তু মানুষ তাহার আহার্য্য বস্তুর অনন্ত বিচিত্রতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, জীবন সংগ্রাম বড় একটা বিচিত্র ব্যাপার। সকল প্রাণীই আত্মরক্ষা, আত্মবিবর্দ্ধন ও আত্মচরিতার্থতা লাভের জন্য তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার সহিত নিয়ত সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে। "জড়কে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণপদার্থে পরিণত করিবার ভারটা মুখ্যতঃ উদ্ভিদের উপর পড়িয়াছে। আমাদের এই ভূপৃষ্ঠে প্রত্যেক উদ্ভিদ স্বস্থানে গাট্ট করিয়া বসিয়া, অর্ব্বুদ মাইল দূরে অবস্থিত সূর্য্যের দিকে পত্র-পল্লবরূপী হাজার পেট পাতিয়া দিয়া, সূর্য্যের আলো ও উত্তাপ হইতে বল সংগ্রহ করিয়া, বায়ুরাশি হইতে কয়লা আত্মসাৎ করিতেছে; এবং ভূমির মধ্যে শিকড়মুখী সরু মুখ চালাইয়া দিয়া মৃত্তিকা হইতে জল সংগ্রহ করিতেছে এবং সেই কয়লা ও লোনা জলের সহিত এটা ওটা সেটা মিশাইয়া প্রাণিপদার্থ অর্থাৎ Protoplasm তৈয়ার করিতেছে। এইরূপে জড়কে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণী-পদার্থে পরিণত করিবার ভার লইয়াছে উদ্ভিদ। আর একটা দল জন্তু। উহারা জড় পদার্থকে আত্মসাৎ করিতে পারে না; কিন্তু উদ্ভিদকে আত্মসাৎ করিয়া উদ্ভিদের প্রস্তুত প্রাণীপদার্থকে হজম করিয়া আপনার দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। মনে রাখিবেন, উদ্ভিদ ও জন্তু উভয়কেই আমি প্রাণীর মধ্যে ফেলিয়াছি। উদ্ভিদেরা ধীর, স্থির, সঞ্চয়ী, গম্ভীর। উদ্ভিদেরা আপনার নৈপুণ্যের বলে এবং মিতব্যয়িতার বলে সারা জীবন ধরিয়া যাহা সঞ্চয় করে, জন্তুগুলি অবলীলাক্রমে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা অপহরণ করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। প্রাণী পদার্থ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা জন্তুর নাই, সে পটুতা আছে উদ্ভিদের। জন্তুরা জোর করিয়া পরের দ্রব্য লইয়া স্ফূর্ত্তি করিতেই মজবুত। এই যে স্ফূর্ত্তি, ইহা প্রাণের স্ফূর্ত্তি। উদ্ভিদের তুলনায় জন্তুর মধ্যে এই প্রাণের স্ফূর্ত্তি উৎকটভাবে দেখা যায়।

জন্তুর মধ্যে আবার সকলের উদ্ভিদ-ভোজনের প্রবৃত্তি নাই। ছাগল ঘাস খায় বটে, কিন্তু বাঘ ঘাস হজমের পরিশ্রমটুকু স্বীকার করিতে নারাজ। সে আস্ত ছাগলটাকেই আত্মস্থ করিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত বিচরণ করে। এখানে জন্তুর সহিত বিরোধ জন্তুর। গোড়ায় বিরোধ প্রাণের সহিত জড়ের; তাহার উপরে বিরোধ প্রাণীর সহিত প্রাণীর। তাহার মধ্যে বিরোধ উদ্ভিদের সহিত জন্তুর এবং জন্তুর সহিত জন্তুর। এই যে বিরোধ ইহাও আবার মোটা বিরোধ; ইহার চেয়েও সূক্ষ্মতর আর একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। বাঘের সহিত ছাগলের বিরোধ আছে বলিয়া মনে করিবেন না, বাঘেদের মধ্যে পরস্পরে পরম সম্প্রীতি রহিয়াছে। পৃথিবীতে ছাগলের সংখ্যা এত অধিক নহে, যাহাতে যাবতীয় বাঘ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পাইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে। সকল বাঘের উচিত মত আহার যোগাইতে হইলে পৃথিবীর ছাগলে কুলায় না, ছাগলের উপর গরু, ঘোড়া প্রভৃতি যোগ করিলেও কুলায় না। ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। এই কথাটার উপর ডারুইন (Darwin) বিশেষ ভাবে জোর দিয়াছেন। কুলায় না বলিয়াই বাঘের সহিত বাঘের বিরোধ। ছলে বলে কৌশলে যে বাঘ তাহার আহার সংগ্রহ করিতে পারে, সেই টিকিয়া যায়, জিতিয়া যায় এবং তাহারই বংশ থাকে। অন্যে অকালে মরিয়া যায়, এবং বংশ রাখিতে পারে না।" * ইহারই নাম জীবন-সংগ্রাম।

* স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত "প্রাণের কাহিনী" হইতে উদ্ধৃত। ভারতবর্ষ, ১৩২৪, আষাঢ়, ১৩৫ পৃষ্ঠা।

প্রাণি-রাজ্যের এই সংগ্রামে মানুষেরও স্থান আছে। উদ্ভিদ হইতে অনেক জন্তুই তাহার বধ্য এবং সেও অনেক জন্তুর বধ্য ও আহার সামগ্রী। এই বিরোধে আত্মরক্ষা করিতে মানুষ একান্ত অসহায় জীব। অধিকাংশ জন্তুর স্বাভাবিক অস্ত্র আছে; প্রকৃতিদেবী তাহাদিগকে অস্ত্র দিয়া সজ্জিত করিয়া এই সংগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু মানুষের কোন স্বাভাবিক অস্ত্র নাই। বাঁচিতে হইলে তাহার রক্ষাকবচ নিজে প্রস্তুত করিয়া লইতে-হইবে। সুতরাং অস্ত্রের অভাব অতি প্রাচীনকাল হইতেই অনুভূত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যায়।

তৃতীয়তঃ, শীতাতপ হইতে দেহ-রক্ষা করিবার জন্য প্রাণীমাত্রেরই একটু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই চাই। অনেক ইতর প্রাণীর মধ্যেও বাসগৃহ নির্ম্মাণের অদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। অনেক প্রাণীই ভূগর্ভে বিচিত্র আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করে। আর, কোন-কোন পক্ষীর বাসা অতি বিচিত্র। তাহারা সহজ সংস্কারবশে এই সকল বিচিত্র কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। মানুষকে তাহার এই অভাব জ্ঞানবলে দূর করিতে হয়। বাসগৃহের অভাবও মানুষের প্রাথমিক অভাব মধ্যে পরিগণিত।

চতুর্থতঃ, দেহ-রঞ্জন ও অলঙ্কার ধারণ অতি অসভ্য-জাতির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল অসভ্য-জাতি নগ্নাবস্থায় বনে জঙ্গলে বিচরণ করে, তাহাদের মধ্যেও এই দেহরঞ্জন ও কোন প্রকার অলঙ্কার-ধারণের বাসনা অতি প্রবল ভাবে থাকা দৃষ্ট হয়। এই সকল বাসনা চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তি (esthetic taste) হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকিবে। সুতরাং পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, বাসনার অভাব-বোধের পূর্ব্বে এই অভাব জাগরিত হইয়া থাকিবে।

এই সীমার পরই সভ্যাবস্থার উন্মেষ হইয়াছে। তখন ধর্ম্ম-সংস্কার, দেহাবরণ, রঞ্জন, বিলাস-বিভ্রম, যান-বাহনের আবিষ্কার ইত্যাদি বহু অভাবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। এই সকল অনন্ত অভাব পূরণ-যোগ্য বস্তুর আয়োজন করাই সভ্যাবস্থার প্রধান ও মুখ্য কার্য্য। ইহারই আয়োজন করিবার জন্য মানুষকে তাহার দৈনন্দিন জীবনের অতি উৎকৃষ্ট সময় অতিবাহিত করিতে হয়। যে জাতি কি সম্প্রদায় যে পরিমাণে এই কার্য্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে, সেই জাতি বা সম্প্রদায় সভ্য বলিয়া গণ্য হয়; এবং জীবন-সংগ্রামে সেই বাঁচিয়া যায়, তাহার বংশই রক্ষা পায়। ইহাই বর্ত্তমান সভ্যতার শেষ কথা।

অভাবের প্রকৃতি

অভাবের নিজস্ব কতকগুলি বিশিষ্ট প্রকৃতি বা গুণ আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া এই বিজ্ঞান-বিস্তার অনেক তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রথমতঃ, আমরা দেখিয়াছি, স্বাভাবিক অভাব মানুষকে কর্ম্মে নিয়োজিত করে; এবং তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপে নানা বস্তুর জন্য অভাব বোধ জাগ্রৎ হইয়াও পুনরায় সে কর্ম্মচেষ্টা ও কর্ম্মানুষ্ঠান অনুপ্রাণিত হয়। এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, ঘাত ও প্রতিঘাতই মানুষের অভাবের পরিধির অনন্ত বিস্তার সাধন করে। কোন অভাবই সাক্ষাৎ ভাবে অপর কোন অভাবের সৃষ্টি করিতে পারে না। পরোক্ষ ভাবে মানুষের কর্ম্ম চেষ্টার ফলস্বরূপে মাত্র নূতন অভাবের সৃষ্টি হয় ও হইতে পারে। বর্ত্তমানে দেশ বিদেশের মধ্যে আদান-প্রদানের এমন সুবিধা হইয়াছে যে, যে কোন স্থানে যে কোন জিনিসের উদ্ভাবন হইতেছে, তাহাই সমগ্র পৃথিবীতে জাতি-নির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; কেন না কোন জিনিস কাহাকেও কোন কৌশলে একবার ব্যবহার করাইয়া উঠিতে পারিলে, পরক্ষণেই সেই বস্তুর জন্য তাহার মনে অভাব-বোধ জাগ্রৎ হইয়া থাকে। সুতরাং বর্ত্তমান সভ্য সমাজে কোন পণ্য দ্রব্যেরই কাট্‌তির সীমা-রেখা নাই। তাহার ব্যবহার একবার চল করাইয়া দিতে পারিলেই, তাহার কাট্‌তিও দিন-দিন বাড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমান ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই তত্ত্বের উপরেই Dumping, Canvassing প্রভৃতির প্রতিক্রিয়ার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর, কাহাকেও সভ্য করা যে কথা, তাহার উত্তরোত্তর অভাব-সৃষ্টি করাও সেই কথা। কোন জাতি বা সম্প্রদায়কে সভ্য করিতে হইলে, তাহার অভাবের মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া চাই। To civilize a people is to increase its wants. (Principle of Political, Economy by C. Gide. Vidilz's Edition p. 41.) ইহাই অর্থ-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা।

নেশা

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ এম-এ, বি-এল্‌]

মানুষ নেশা-খোরের জাত। নেশা ছাড়া সে থাক্‌তে পারে না। বালক, যুবক, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ—সকলেরই নেশা আছে। অবস্থা ও প্রকৃতি-ভেদে নেশার রকমে তারতম্য ঘটে; কিন্তু নেশা করে সকলেই।

সব সময়ে যে মানুষ নেশা করে, তা' নয়; অনেক সময়ে নেশা তাকে পেয়ে বসে। পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে কি যে মাদকতা আছে, তা' জানি না; কিন্তু ঐখান থেকেই মানুষের প্রাণে নেশার ছোঁয়াচ লাগে। সে তখন চেয়ে দেখে, সূর্য্যের আলো পৃথিবীর কর্ম্মশালার উপর অকারণে টল্‌মল্‌ করে নাচ্‌ছে;—জ্যোৎস্না একটা নীরব সঙ্গীতের মত সুখ-স্বপ্ন ধরণীর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে; আর গাছপালা সব যেন তাকে আলিঙ্গন দিতে হাত তুলে ডাক্‌ছে।

এই নেশায় ভোর হয়ে সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, একটি অর্দ্ধ-পরিচিতা কিশোরী তার সলজ্জ হাতটি তারই দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সে সেই হাতটি তুলে ধরতেই, তার সমস্ত শরীরে শিহরণ জেগে উঠ্‌ল,—তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙ্গতেই শুনতে পেল, গাছের ডালে একটা পাখী গান গাচ্ছে; আর তার হৃদ্‌পিণ্ডটা সেই গানের সঙ্গে তাল দিচ্ছে।

তার পর স্বপ্নের রাণীর সঙ্গে, তার মুখোমুখি পরিচয়। রাণী জিজ্ঞাসা করে, "তুমি এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলে, পথিক?" পথিক বলে, "তোমারি অন্তরের ভিতর দিয়ে যে পথটি চলে গেছে, তারই পাশে একটা নিভৃত কুঞ্জবনে।" রাণী হেসে পথিককে টেনে কাছে নিল্‌; নেশার ঘোরে পথিকের চোথ-ছুটি রক্তজবার মত লাল হয়ে উঠ্‌ল। সে চেয়ে দেখ্‌ল—পৃথিবীতে একটা গোলাপী আলো এসে পড়েছে। সেই আলোর ভিতর দিয়ে সে সব জিনিসকেই রঙিন্‌ দেখে ভাবল—পৃথিবী কি সুন্দর, জীবন কি মিষ্টি, মানুষ কি মহৎ! তার মনে হ'ল, এই যে সংসারের আনাগোনা, এর ওপর একটা আদর্শ সুখের বেষ্টন রয়েছে; সেই বেষ্টনই ত সংসারকে আগ্‌লে ধরে আছে; এটি না থাক্‌লে সংসার যে ছারখার হয়ে যেত।

পথিক বল্‌লে, "রাণি, সংসার যে এমন মিষ্টি, তা' ত জানতুম না। তুমি আজ আমার চোথ খুলে দিয়েছ। তোমাকে আমি কি দিব জানি না।" রাণী বল্‌লে, "আমি আর কিছু চাই না, শুধু তোমাকেই চাই।" পথিক বল্‌লে, "আমাকে ত তোমার পায় নিবেদন করেই দিয়েছি।"—এই বলে পথিক রাণীর পদতলে লুটিয়ে পড়তে চাইল। রাণী তাকে বুকে টেনে নিল।

পথিক একদিন জিজ্ঞেস্‌ করলে, "রাণি, সংসারে যে গোলাপী আলো ছিল, সেটি গেল কোথা?" রাণী বল্‌লে, "আমি কি জানি?" বলেই, সেথান থেকে চলে গেল। পথিক বিমর্ষ হয়ে সেখানে বসে রইল। তার মনে পড়ল সেই স্বপ্নের কথা—যেদিন কিশোরী তার কম্পিত হাতটি তারই দিকে প্রসারিত করে দিয়েছিল। সেই কি এই?

পথিক একদিন বল্‌লে, "রাণি, আমার কিছু ভাল লাগে না।" রাণী জিজ্ঞেস করলে, "কেন?", পথিক বল্‌লে, "জানি না। বোধ হয় নেশা ছুটে যাচ্ছে, তাই।" রাণী ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌লে, "নেশা ছুটে যাচ্ছে, তা' আমি কি করব? শুঁড়ির দোকানে গিয়ে নেশা করলেই হয়।" এই বলে বিদ্যুতের মত রাণী সেখান থেকে চলে গেল। পথিক ভাবলে,—"তাই ত, তুমি কি করবে! সে গোলাপী আলোটা গেল কোথায়? এ যে দেখছি সব সাদা।"

এমন সময়ে একটী ফুটফুটে মেয়ে এসে, তাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লে, "বাবা!" পথিক চম্‌কে উঠে জিজ্ঞেস্‌ করলে, "কে রে তুই?" মেয়েটি বল্‌লে, "আমি মায়া।" পথিক বল্‌লে, "ও, মায়া—কি চাস্‌?" মায়া বল্‌লে, "আমাকে একটা রং-দেশলাই কিনে দাও। কালী-পূজো হবে কি না, তখন জাল্‌ব।" পিতা বল্‌লেন, "রং-বাতি জেলে আর কি হবে? পূজোর সময় কত ভাল-ভাল আলো জ্বলবে—

দেখ্‌বি'খন।" মায়া একটুখানি আহ্লাদের সুরে বল্‌লে; "দূর, তা কি হয়? সে সব আলো যে সাদা। আমি লাল-নীল আলো জ্বাল্‌ব,—সেই আলোর ভেতর দিয়ে সব্বাইকে কেমন সুন্দর দেখাবে। সত্যি দেখ্‌বে তখন কি রকম মজা হয়।"

পথিক আপন মনে বল্‌লে, "তাই ত, সে সব আলো যে সাদা; রঙিন্ আলো না হ'লে কি সুন্দর দেখায়!!" তার পর মেয়েকে ডেকে বল্‌লে, "আচ্ছা মা'মা, পূজোর সময় সব যদি রঙিন্ আলো জেলে দি', তবে কেমন হয়?" চিন্তামাত্র না করে মায়া বল্‌লে, "একটুও ভাল হয় না। চোখ ঝল্‌সে যাবে যে! রঙিন্ আলো কি বেশিক্ষণ ভাল? অল্পক্ষণ বেশ লাগে।"

পথিক ভাব্‌লে, "তাই ত, এই মেয়েটা যা জানে, আমি তা' জানিনে!"

কাঁধের ওপর চাদর ফেলে পথিক রাণীকে ডেকে বল্‌লে, "ওগো, আমার নেশার নেশা ছুটে গেছে। তোমার মেয়ের জন্যে আমি রং-দেশ্‌লাই আন্‌তে যাচ্ছি।" রাণী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল, স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে বেরিয়ে এল; এসে ঐ কথা শুনে, থম্‌কে দাঁড়িয়ে মুখ মুচ্‌কে হাস্‌তে লাগ্‌ল। সেই হাসি দেখে পথিকেরও হাসি পেল। সে হেসে বাড়ী থেকে বের হয়ে গেল। পথে যেতে-যেতে তার মনে হ'ল, সংসারের এই সাদা রোদটা কি সুন্দর! প্রাণের এই প্রচুর আনন্দ কি মধুর!—তা'তে মাদকতা আছে, অথচ নেশা নেই।

আক্‌বরের গুজরাট্ অভিযান

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

১। গুজরাট্; গুজরাট্-জয়ের হেতু

মের্ত্তা, চিতোর, রণ্‌তম্ভোর ও কালঞ্জর—এই দুর্গচতুষ্টয় বিজিত; হিন্দুস্থানের উপর মোগলরাজের আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠা এক্ষণে দৃঢ়মূল—অবিসংবাদী বলিলেও চলে। এইবার সমুদ্র পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তৃতির আশায়—'আসমুদ্র ক্ষিতিশানাং' আধিপত্যের বাসনায় আক্‌বর আগ্রহান্বিত হইলেন। তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি প্রথমে নিপতিত হইল পশ্চিম দিকে;—সুদূর সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গ-বিজয় আপাততঃ ভবিষ্যৎ কল্পনার করে ন্যস্ত রাখিয়া তিনি পশ্চিম-বিজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মালব ও আরব-সাগরের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ গুজরাট্ নামে অভিহিত। বাদ্‌শাহ্ হুমায়ূন্ এক সময়ে এই গুজরাট্ প্রদেশ স্বীয় শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন; পরে ভাগ্য-বিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ইহা তাঁহার অধিকার-চ্যুত হয়। সুতরাং বর্ত্তমানে পিতৃ হস্তচ্যুত গুজরাট্ প্রদেশের পুনরুদ্ধারই আক্‌বরের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বিবেচিত হইল। আবুল্-ফজলের মতে—'গুজরাট্‌বাসীদিগকে অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষাকল্পে আক্‌বর গুজরাট্ জয় করিয়াছিলেন।' কিন্তু এ কৈফিয়ৎ ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। গুজরাটের তৎ-সাময়িক অরাজক অবস্থা আক্‌বরের নিকট অনুকূল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। গুজরাট্ এই সময় নির্দ্দিষ্ট শাসনতন্ত্রবিহীন —সাতটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্যে বিভক্ত। এই সামন্ত-রাজগণ আবার সর্ব্বদা আপনাপন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার বা বৃদ্ধি করিবার জন্য আত্মবিগ্রহে উন্মত্ত। তৃতীয় মুজফ্‌ফর তখন নামমাত্র গুজরাটের অধিপতি,—এই সকল পরাক্রান্ত সামন্তগণের শক্তি সংযত ও প্রতিহত করিবার ক্ষমতা তাঁহার একেবারেই ছিল না। গুজরাটে তখন অন্তর্বিপ্লবের একটা প্রবল তরঙ্গ গুপ্তভাবে প্রবহমান। গৃহবিবাদে গুজরাটের প্রভুশক্তি যখন ক্ষীণবল ও বিপন্ন, সেই সময় আরও এক সুযোগ আক্‌বরের সম্মুখে উপস্থিত; ইতিমাদ্ খাঁ নামক একজন সামন্তরাজ তাঁহাকে গুজরাট্-অধিকারে আহ্বান করিলেন। ইতিমাদ্ এক সময়ে কুরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, নাথু (ওরফে মুজফ্‌ফর) শেষ গুজরাট্-সুলতানের অবিসংবাদী বংশধর; এক্ষণে মুজফ্‌ফর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বিপক্ষে যোগদান করায় তিনি অম্লানবদনে প্রচার করিয়া দিলেন —মুজফ্‌ফর শেষ সম্রাটের ঔরস পুত্র নহেন,—সুতরাং

তাঁহাকে রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।

আলী মুহম্মদ্ 'মিরাৎ-ই-আহ্মদী' গ্রন্থে গুজরাটের তৎকালীন অবস্থা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:—"সুধী ও চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, বহুকালাগত সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের অবনতির এক প্রধান কারণ সম্ভ্রান্তদিগের মধ্যে মনোমালিন্য ও তাহার সহিত বিদ্রোহভাবাপন্ন প্রজাদিগের যোগদান। এই সমস্ত লোকের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের চেষ্টা অবশেষে তাহাদিগকেই বিপন্ন করিয়া থাকে; তাহাদিগের কোন ইষ্টই সাধিত হয় না। অবশেষে কোন ভাগ্যবান্ তৃতীয় পক্ষ রঙ্গস্থলে আবির্ভূত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। গুজরাটের সম্রাট্ ও সম্ভ্রান্তদিগের পরিণামেও এই ঐতিহাসিক সত্যের পুনরভিনয় হইয়াছিল। গুজরাট্-রাজ্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সেই জন্য দেশের প্রধানগণ বিদ্রোহে লিপ্ত, ন্যায়ানুমোদিত পবিত্র বন্ধন বিচ্ছিন্ন—ফলে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ। তাহার শেষ পরিণতি—এই সমস্ত দল অপসৃত হইয়া, রাজাশাসনরশ্মি তৈমুরের সুযোগ্য বংশধর জলাল্-উদ্দীন্ মুহম্মদ্ আক্‌বরের করতলগত।"*

গুজরাটের বাণিজ্য-সম্পদ্, পোতাধিষ্ঠান সমূহের সুবিধাজনক অবস্থা এবং বাণিজ্যদ্রব্যসম্ভারপূর্ণ অসংখ্য বন্দর, অব্যবহিত কারণরূপে আক্‌বরকে গুজরাট্-জয়ে প্রলুব্ধ করিয়াছিল;—একমাত্র ইতিমাদ্ খাঁর আহ্বানই তাঁহার অভিযানের প্রধান কারণ নহে। গুজরাটের তৎকালীন রাজধানী আহ্মদাবাদ ৩৮০টী পুরা বা পাড়ায় বিভক্ত; প্রত্যেক পুরা এক একটী নগরীর সমতুল্য। আহ্মদাবাদের ঐশ্বর্য্য তখন ভারতবিশ্রুত; শহরের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়! লবণ, বস্ত্র, কাগজ প্রভৃতি অনেক স্থানেই প্রধান বাণিজ্যরূপে প্রস্তুত হইত। এ হেন মনোহর স্থান যে চির-স্বাধীনতা ভোগ করিবে, আক্‌বরের ন্যায় সম্রাট্—বিজয়-লালসা ও সাম্রাজ্য-লোভ আমরণ যাঁহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে—তাহা সহ্য করিতে পারেন না;—তিনি ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ঠা জুলাই সসৈন্য সীক্‌রী হইতে গুজরাট্ যাত্রা করিলেন।

* *Mirat-i-Ahmadi*, in Bird, *History of Gujrat*, p. 301.

২। প্রথম গুজরাট্-অভিযান—সারনাল-সঙ্ঘর্ষ

আক্‌বর বেশ বুঝিয়াছিলেন, গুজরাটের সামন্তরাজগণ দ্বারা মোগল-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই; তথাপি রণনীতিকুশল সম্রাট্ উপযুক্ত সামরিক আয়োজনের কোন ত্রুটিই করেন নাই। যোধপুর (মাড়ওয়ার) প্রদেশ হইতে যাহাতে কোন বাধা উপস্থিত না হয়, তৎসম্বন্ধেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বাগ্রে খান্-ই-কলান্ মীর মুহম্মদ্ খাঁ আট্‌কার অধীনে দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। সেনাদল সিরোহীতে পৌঁছিলে চৌহান্-বংশীয় একদল রাজপুত তাহাদের পথরোধ করে; ইহার ফলে দেড়শত রাজপুত নিহত হয় ও অবশিষ্ট রণে ভঙ্গ দেয়।

নভেম্বর মাসে (১৫৭২) সম্রাট্ আহ্মদাবাদের নিকটবর্ত্তী হইলে, গুজরাটের নামাবশেষ সম্রাট্ মুজফ্‌ফর শাহ্ প্রাণভয়ে চোটনার (see Blochmann, 518) সন্নিকটে এক শস্যক্ষেত্রে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ধানে চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল। এক শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে গুজরাটপতির রাজছত্র ও চাঁদোয়া পাওয়া গেল; অল্প অনুসন্ধানের পরেই ক্ষেত্রমধ্যে লুক্কায়িত মুজফ্‌ফর মোগলহস্তে বন্দী হইলেন। এরূপ শত্রু মারাত্মক হইতে পারে না; বন্দী মুজফ্‌ফর আক্‌বরের বশ্যতা স্বীকার করিলে সম্রাট্ কৃপাপরবশে, সামান্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে আগ্রায় পাঠাইয়া দিলেন।

ক্রীড়াপুত্তল মুজফ্‌ফরের অপসারণে, আক্‌বর বিনা আয়াসে গুজরাটের অধিপতি হইলেন। একে একে তৎপ্রদেশস্থ সামন্তরাজবৃন্দ আসিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে লাগিল। এই সময় একদল কুচক্রী প্রচার করিয়া দিল, 'সম্রাটের আদেশ, গুজরাটীদিগের শিবির লুঠ কর।' এই গোলমালে একদল অনুচর, সম্রাটের স্বপক্ষভুক্ত গুজরাটীগণের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে। তাঁহারই সান্নিধ্যে এরূপ অত্যাচারের অনুষ্ঠানে সম্রাট্ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। লুণ্ঠনকারীরা অবিলম্বে ধৃত হইল। ন্যায়পরায়ণ সম্রাট্ তাহাদিগকে হস্তিপদতলে বিমর্দ্দনের আদেশ দিয়া কঠোর সুবিচারের পরিচয় প্রদান করিলেন। গুজরাটীরা তাঁহাদিগের অপহৃত দ্রব্যাদি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। এইস্থলে

এক বিরাট্ দরবারের অনুষ্ঠান হয়। উচ্চনীচ সকলেই সভায় সমাদরে স্থান পাইয়াছিল। সম্রাট্ গুজরাটবাসিগণকে এই দরবারে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন,—তিনি তাহাদের জন্য সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, অত্যাচারের তিনি ঘোর বিরোধী। ২০এ নভেম্বর (১৫৭২) আক্‌বর আহ্‌মদাবাদে পৌছিলেন। সম্রাটের দুধ-ভাই (ধাত্রীপুত্র) মীর্জ্জা অজীজ্ কোকা আহ্‌মদাবাদ ও মাহী নদীর দক্ষিণ তীরদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের শাসনকর্ত্তৃত্ব-পদ প্রাপ্ত হইলেন।

রাজধানী প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে, ডিসেম্বরের প্রারম্ভে, সম্রাট্ আহ্‌মদাবাদ ত্যাগ করিয়া, সমুদ্র দর্শনাভিলাষে কাম্বে শহরে উপস্থিত হ'ন। সমৃদ্ধিশালী বন্দর ও বাণিজ্য-নগরী বলিয়া সে সময় কাম্বের খ্যাতি ছিল। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও সমুদ্র-দর্শন সম্রাটের ভাগ্যে ঘটে নাই। এক ক্ষুদ্র অর্ণবপোতাশ্রয়ে তিনি সমুদ্রবক্ষে, কাম্বের উপকূল পরিভ্রমণ করেন। কাম্বে অবস্থিতিকালে গোয়ার পর্ত্তুগীজ-বণিকগণ বিজয়ী বাদ্‌শাহ্‌কে সম্মান-প্রদর্শনার্থ তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করে। আক্‌বরের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের ইহাই প্রথম পরিচয়।

১৮ই ডিসেম্বর আক্‌বর বরোদা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; নগরীর সমীপবর্ত্তী হইলে, তিনি শাহ্‌বাজ্ খাঁ, কাসিম খাঁ, বাজ্ বহাদুর খাঁ প্রভৃতির সহিত একদল সৈন্য বিদ্রোহী মীর্জ্জাদিগের হস্ত হইতে সুরাট্ দুর্গ জয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাপ্তি নদীর মোহানায় এই সুরাট বন্দর তখন মীর্জ্জাগণের প্রধান আশ্রয়স্থল। ২৩এ নভেম্বর (১৫৭২) রাত্রিকালে বরোচ্ হইতে সম্রাট্ সংবাদ পাইলেন, তাঁহার আত্মীয়, বিদ্রোহী ইব্রাহীম্ হুসেন মীর্জ্জা, * রুস্তম্ খাঁ রুমী নামক জনৈক নামজাদা প্রধানকে হত্যা করিয়া সম্রাটের অনিষ্ট-চিন্তায় বরোচ্ হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদে 'রাজক্রোধ উদ্দীপিত হইল'; সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ অল্প-সংখ্যক সৈন্যসহ দুঃসাহসী, দুর্ব্বৃত্ত ইব্রাহীম্‌কে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য অভিযান করিলেন। যে সৈন্যদল ইতঃপূর্ব্বে সুরাট অভিমুখে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে সম্রাটের সহিত পথিমধ্যে মিলিত হইবার জন্য দ্রুত-সংবাদ প্রেরিত হইল। পাছে বিপুল বাহিনী দেখিয়া মীর্জ্জা ভয়ে পলায়ন করে, এই ভাবিয়া সম্রাট্ মিত্রবর্গের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, সঙ্গে অনধিক দুই তিন সহস্র সৈন্য লইলেন।

একজন স্থানীয় পথ-প্রদর্শকের সহায়তায় আক্‌বর সেই রাত্রি, ও পরদিন দিবাভাগ পর্য্যন্ত অবিরাম দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে লাগিলেন; অতি দ্রুত-গমনের ফলে যখন তিনি সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে মাহী নদীর তীরে উপস্থিত, তখন তাঁহার সহিত ৪০ জন মাত্র অশ্বারোহী। পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণের নিকট সম্রাট্ সংবাদ পাইলেন, ইব্রাহীম্ হুসেন মীর্জ্জা মাহীর পরপারে, এক নিম্নপর্ব্বতোপরি অবস্থিত ক্ষুদ্র নগরী সারনালে ** প্রবল সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। এই সংবাদে, আক্‌বরের পাত্রমিত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন,—'আমাদের সৈন্য-সংখ্যা শত্রুর তুলনায় অল্প। অতর্কিতভাবে রাত্রিযোগে শত্রুদলকে আক্রমণ করাই সমীচীন।' আবার কেহ কেহ বলিলেন,—'আমাদের সাহায্যার্থ পশ্চাতের সেনাদলের আগমন অপেক্ষা করিয়া, সমবেত-বাহিনীসহ শত্রুদের আক্রমণ করাই শ্রেয়ঃ।' কিন্তু আক্‌বর নৈশাক্রমণে আদৌ সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—'রাত্রিযোগে নিদ্রিত শত্রুকে আক্রমণ করা বড়ই অপমানজনক। এখনও সন্ধ্যার বিলম্ব আছে। আমি এই মুষ্টিমেয় সেনা-সহায়ে এখনই সারনাল আক্রমণ করিব।' সম্রাটের এই মন্তব্য প্রতিবাদ করিতে কাহারও সাহস হইল না। সুখের বিষয়, এই সময়ে আক্‌বরের সুরাট্-প্রেরিত সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত। সমবেত সেনাদলের সংখ্যা এক্ষণে ন্যূনাধিক দুই শত; সম্রাট্ সসৈন্য নদী উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদে পরপারে পৌছিলেন। ইতিমধ্যে ইব্রাহীম্ হুসেন মীর্জ্জা মোগলের আগমন-সংবাদে, শহর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক উচ্চস্থানে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অল্পায়াসেই সারনালের

* ইব্রাহীম্ সম্রাটের পিতৃব্য কামরাণের কন্যা গুলরুখ্‌কে বিবাহ করেন।

** বেভারিজ সারনালের স্থান-নির্ণয় করিতে সমর্থ হ'ন নাই (*A. N.* iii. 19*n*)। থাস্‌রার ৫ মাইল পূর্ব্বে, কায়রা জিলায় ক্ষুদ্র নগরী সারনাল অদ্যাপি বিদ্যমান। *Bombay Gazetteer* (1896) এ ভ্রমক্রমে সারনাল ও থাস্‌রা অভিন্ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (i. pt. i, p. 265)।

নদীতীরবর্ত্তী তোরণে প্রবেশলাভ করিয়া দেখিলেন, শহরের পথ-ঘাট সঙ্কীর্ণ,—কণ্টকবৃক্ষ-সমাকীর্ণ ; তাহার উপর শত্রুর উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতিতে পথ পরিপূর্ণ। এরূপ স্থানে অশ্বারোহী-সেনার অবাধ গমনাগমন বড়ই অসুবিধাকর—এক প্রকার অসম্ভব।

আক্‌বরের ধমনীতে বীর পূর্ব্বপুরুষগণের উষ্ণ শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইল। তাতারেরা যেরূপ বল্লম বা তরবারি-সঞ্চালনে উত্তেজিত অশ্বপৃষ্ঠে অসম-শত্রুপরি পতিত হইয়া, তাহাদের দ্বিখণ্ডিত বা পিষ্ট করে, অল্পসংখ্যক সেনাসহ চগ্‌তাই আক্‌বর সেইরূপ, মূর্চ্ছিতপ্রায় অশ্বে কশাঘাত করিয়া ধাবিত হইলেন। রাজ-তরবারি বিদ্যুৎ-চমকপ্রায় জ্বলিয়া উঠিয়া সম্মুখীন শত্রুকে আলিঙ্গন করিল। বাবা খাঁ কাক্‌শাল ও তাঁহার তীরন্দাজগণ শত্রু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলেন ; বিহারী মলের পুত্র ভূপৎ সিংহ প্রবল-বেগে শত্রুর উপর পতিত হইলেন বটে, কিন্তু শত্রুর অব্যর্থ তরবারি তাঁহাকে ভূপতিত করিল। সম্রাট্-বাহিনী বিচলিত হইয়া উঠিল। এদিকে প্রতিপক্ষ সাফল্যলাভে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া মোগলদের আক্রমণ করিল। তুমুল দ্বন্দযুদ্ধ আরম্ভ হইল ; জীবন পণ করিয়া যোদ্ধৃবৃন্দ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ ;—নিরাশার শেষ উদ্যম অপ্রতিহত ! যাহারা যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারা সংখ্যায় বেশী নহে ; সুতরাং ইহাকে ঠিক যুদ্ধ বলা যায় না। রণক্ষেত্র অভিজাত-রক্তে প্লাবিত হইল : কারণ মনসবদারগণ সাধারণ-সৈন্যের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মুহম্মদ্ খাঁ বর্‌হা, মানসিংহ ও তাঁহার পালক-পিতা ভগবান দাস, সুর্জ্জন্ সিংহ হাড়ার পুত্র ভোজ, প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা হিন্দু ও মুসলমান-প্রধান রণচালনা করিতেছিলেন ; তথাপি মোগলপক্ষে জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই দৃষ্ট হইল না। হঠাৎ দেখা গেল, পলাতকের ন্যায় একজন চগ্‌তাই ও জনৈক রাজপুত পাশা-পাশি বেগে অশ্বচালনা করিয়া এক কণ্টকাকীর্ণ পথে শত্রুর দিকে ধাবমান। অশ্বারোহীদ্বয় আর কেহই নহেন—আক্‌বর ও ভগবান দাস। তিনজন শত্রু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল ; একজন ভগবান দাসকে লক্ষ্য করিয়া, বল্লম্ নিক্ষেপ করিল ; রাজপুত-বীর সে আঘাত ব্যর্থ করিয়া, অব্যর্থ-লক্ষ্যে শত্রুকে ভল্লাঘাতে ভূপাতিত করিলেন। এই সময়ে অপর দুইজন শত্রু সম্রাট্‌কে আক্রমণ করিল। আক্‌বর প্রবলবেগে তাহাদের উপর পতিত হইলেন ;—আক্রমণকারীদ্বয় প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। মোগলেরা যখন সম্রাটের এই বীরত্ব ও বিপদ দেখিল, তখন তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইল। আবার তরবারি জ্বলিয়া উঠিল, অস্ত্রের ঝনঝনা শ্রুত হইল। মীর্জ্জা পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন ; সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার সৈন্যবর্গও প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। মোগলেরা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল ; কিন্তু 'পলায়নকারিগণের ভাগ্যাপেক্ষাও গভীর অন্ধকারময়ী রজনী' তাহাদের বহু দূর অনুসরণ-গতির প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করিল। রণজয়ী মোগল সে রাত্রি সসৈন্য সারনালেই অতিবাহিত করিলেন। এই দুই ঘণ্টার ভীষণ যুদ্ধে ধাহারা বিশেষভাবে সম্রাটের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যথাযোগ্যভাবে পুরস্কৃত হইলেন। এই ব্যাপারে রাজা ভগবান দাস সম্মান-চিহ্নরূপে পতাকা ও জয়ডঙ্কা প্রাপ্ত হ'ন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোন হিন্দুই সম্রাটের নিকট হইতে এই গৌরব-সূচক অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হ'ন নাই। ২৪শে ডিসেম্বর সম্রাট্ তাঁহার শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

৩। সুরাট্-অবরোধ

সুরাট-দুর্গের শক্তি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে টোডর মল্ প্রেরিত হইলেন। তাঁহার অনুকূল মন্তব্যে সম্রাট্ ডিসেম্বরের শেষ দিনে বরোদা হইতে সুরাট্ যাত্রা করিলেন।

দরবারী-লেখক আবুল্-ফজলের মতে (iii. 37) 'অবরোধের প্রথমাবস্থায় গোয়ার একদল পর্ত্তুগীজ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যৌগদান করে ; বোধ হয় তাহারা স্থির করিয়াছিল, সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত মোগল-অধিকার বিস্তৃত হইলে, তাহাদের স্বার্থহানির যথেষ্ট সম্ভাবনা। কিন্তু পরে ধীরবিচারে যখন তাহারা বুঝিল, আক্‌বরের সৈন্যগণ সমরে অজেয়,—তাহাদের বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম বড়ই সাংঘাতিক হইবে, তখন তাহারা সম্রাট্‌কে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বহুবিধ উপহার লইয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য আক্‌বর শাহ্ তাহাদের সাদরে গ্রহণ করিলেন।' কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার অন্যরূপ বলিয়া মনে হয়। আক্‌বর সন্ধান পাইয়াছিলেন, পর্ত্তুগীজ নৌ-বাহিনী কর্ত্তৃক তিনি আক্রান্ত হইতে পারেন। কূটবুদ্ধি সম্রাট্ পর্ত্তুগীজদিগকে হস্তগত

করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের শাসনকর্ত্তা ডম্ এনুটনিও নোরোন্‌হার সহিত একটু অধিকমাত্রায় আত্মীয়তা দেখাইয়া, তাঁহ'র নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। নোরোন্‌হা মোগল-দূতের সহিত স্বীয় প্রতিনিধি এন্‌টনিও ক্যাব্রাল্‌কে সম্রাট্-সকাশে পাঠাইলেন। এই ব্যক্তির সহায়তায় উভয় পক্ষের মধ্যে সুবিধাজনক সন্ধি স্থাপিত হয়।* কাম্বে নগরীতে আক্‌বরের সহিত পর্ত্তুগীজের যে প্রথম পরিচয় হয়, তাঁহার ভিত্তিমূল এক্ষণে দৃঢ়তর হইল। বিদেশীগণের সহিত বন্ধুত্ব-নিবন্ধন আক্‌বরের একটা বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল,—তিনি মুসলমানগণের মক্কাগমন-পথ নিরাপদ করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময় সম্রাট্ মক্কা-যাত্রিগণকে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিতেন, এবং প্রতিবৎসর জনৈক যোগ্যব্যক্তিকে অধিনায়ক মনোনীত করিয়া যাত্রীদলের পাথেয় প্রভৃতির জন্য তাহার হস্তে অর্থ ও বহুল দ্রব্যসম্ভার দিতেন। কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে মক্কা যাইতে হইলে, পর্ত্তুগীজগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইত। মোগল-সম্রাট্-গণের কোন উল্লেখযোগ্য নৌবাহিনী ছিল না;—তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। এইজন্য তাঁহাদের উপকূল সমূহ ও নিকটবর্ত্তী সাগরে গমনাগমন পর্ত্তুগীজগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত;—তাহারাও ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা-পরিচালনে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না।

সুরাট-অবরোধের পরিণাম আক্‌বরের পক্ষে শুভ-ফলপ্রদ হইল। দেড় মাসকাল অবরোধের পর দুর্গ আত্মসমর্পণ করে (২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৫৭৩)। হাম্‌জাবান্ প্রতিপক্ষের দুর্গাধ্যক্ষ;—এক সময়ে হুমায়ুনের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন; তিনি প্রাণে বাঁচিলেন বটে, কিন্তু সম্রাটের বিরুদ্ধে নানা অসংযত বাণী উচ্চারণের অপরাধে তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদের আদেশ হইল।

* Hosten, quoting authorities, *J. & Proc. A. S. B.* 1912, p. 217*n*. See also *Bombay Gazetteer* (1896), vol. i. pt. i, p. 265. ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ডম্ এনুটনিও দা নোরোন্‌হা (একাদশ) শাসনকর্ত্তার পদাভিষিক্ত ছিলেন। (See Fonseca, *Sketch of the City of Goa*, 1878, p. 90.)

৪। সম্রাটের রাজধানী প্রত্যাগমন; ইব্রাহীম্ হুসেন মীর্জ্জার পরিণাম

রাজধানী-প্রত্যাগমন বাসনায় ১৩ই এপ্রিল যাত্রা করিয়া সিরোহীতে উপনীত হইলে, বন্দী ইব্রাহীম্ হুসেনের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আক্‌বর আনন্দিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সারনাল-সঙ্ঘর্ষের পর ইব্রাহীম্ প্রথমে পঞ্জাবে প্রবেশ করেন; তৎপরে মুলতানে উপস্থিত হইলে বন্দী হ'ন, এবং এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইব্রাহীমের ভ্রাতা মাসুদ মীর্জ্জাও পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হুসেন কুলী খাঁ কর্ত্তৃক ধৃত হ'ন। একজন পরলোকগত—আর একজন বন্দীকৃত, আক্‌বর অনেকটা স্বস্তি বোধ করিলেন। তৎপরে সম্রাট্ সাধু সন্দর্শনে আজমীরের দরগায় উপস্থিত হইলেন। ৩রা জুন সীক্‌রীতে পৌছিলে যে সমস্ত প্রধান ব্যক্তি তাঁহার অভ্যর্থনাকল্পে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে আবুল্ ফজলের পিতা শেখ্ মুবারক অন্যতম। মুবারক এই সন্দর্শনকালে আক্‌বরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, সুযোগ্যতা ও লোকশাসনগুণে সম্রাট্ কালে ধর্ম্মজগতের নায়ক হইবেন বলিয়া তিনি আশা করেন। এই উক্তি শ্রবণে সম্রাট্ প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি ইহা বিস্মৃত হ'ন নাই, এবং ৬ বৎসর পরে (১৫৭৯) ইহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ রাজধানী উপনীত হইলে, হুসেন কুলী খাঁ (খান্ জহান্) বন্দীবৃন্দ লইয়া উপস্থিত হইলেন। মাসুদ মীর্জ্জার চক্ষুর্দ্বয় আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সম্রাট্ আক্‌বর তাহা উন্মোচনের আদেশ দিয়া দয়াশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশিষ্ট প্রায় ৩০০ বন্দীর মুখমণ্ডল গর্দ্দভ, কুকুর ও শূকরের চর্ম্মে আবৃত করিয়া আনা হইয়াছিল। মাসুদ মীর্জ্জা ও অনেকে মুক্তি পাইল; কয়েকজন বন্দী প্রাণদানে দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিল। কিন্তু কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াও, আক্‌বর মীর্জ্জা-বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করিতে পারেন নাই;—অনতিবিলম্বে গুজরাটে পুনরায় বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল।

৫। নগরকোট বা কাংগ্রার ব্যর্থ-অভিযান

হিমালয়ের পাদদেশে শৈলমালার মধ্যে নগরকোট বা কাংগ্রার বিখ্যাত দুর্গ অবস্থিত। দুর্গজয়ে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন, এই দৃঢ়বিশ্বাসে হুসেন কুলী অভিযানের কর্ত্তৃত্বভার

গ্রহণ করেন। তিনি তখন নগরীর বহির্ভাগ অধিকার করিয়াছেন,—ভিতরের দুর্গ তখনও অপরাজেয় ছিল; এমন সময় সম্রাটের আদেশে কাংগ্রা-অবরোধে-নিয়োজিত সৈন্যসামন্তদিগকে লইয়া, তাঁহাকে মীর্জ্জাদিগের অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। কাংগ্রারাজের সহিত মোগলের সন্ধি হইয়া গেল। স্থির হইল, রাজা সম্রাটের অধীনতা-স্বীকার, মোগলকে কন্যাদান ও যথারীতি কর দিবেন। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে জহাঙ্গীরের কর্ম্মচারিবৃন্দ কাংগ্রা দুর্গ জয়লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

৬। গুজরাটে বিদ্রোহ;

আক্‌বরের অতর্কিত অভিযান

যুদ্ধাবসানে আক্‌বর নবাধিকৃত গুজরাট্‌-সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার ব্যবস্থাতেই সুচারুভাবে কাজ চলিয়া যাইবে; কিন্তু নূতন ঘটনাচক্রে তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল। আক্‌বর স্বনিয়োজিত শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন, দুর্দ্ধর্ষ মুহম্মদ্‌ হুসেন মীর্জ্জা ও ইখ্‌তিয়ার-উল্‌-মুল্ক নামক জনৈক প্রধান বাদ্‌শাহ্‌র বিরুদ্ধে পুনরায় বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জালিত করিয়াছে। গুজরাটের শাসনকর্ত্তা সম্রাটের নিকট এই বিদ্রোহ-সংবাদ প্রেরণ-উপলক্ষে নিবেদন করিলেন, বিদ্রোহীদল যথেষ্ট শক্তি-সঞ্চয় করিয়াছে। তাঁহার এমন শক্তি নাই যে তিনি তাহাদের বিধ্বস্ত করিয়া পুনরায় গুজরাটে শান্তি-সংস্থাপন করিতে পারেন।

আহ্‌মদাবাদ শত্রুহস্তে পতিত হইলে কেবল গুজরাটের উপরই মোগল-সরকারের প্রভাব লোপ পাইবে না; পরন্তু বিদ্রোহীরা নিকটবর্ত্তী মালব প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইয়া শত্রুতাসাধন করিবে। এই কারণে যখন দূতের পর দূত দুঃসংবাদ বহন করিয়া আসিতে লাগিল, তখন আক্‌বর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল;—তিনি স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিবেন। কিন্তু যথোপযুক্ত সৈন্যের একান্ত অভাব; পূর্ব্ব অভিযানে তাঁহার বহু সৈন্যক্ষয় হইয়াছে। পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিতে হইলে নূতন সেনাদল গঠন আবশ্যক। সৈন্য-সংগ্রহ ও সামরিক আয়োজনের জন্য সম্রাট্‌ রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন; যে সমস্ত আমীর ও জাগীরদার অনতিপূর্ব্বে গৃহে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় সৈন্যসামন্ত লইয়া অবিলম্বে আসিবার আদেশ প্রেরিত হইল। রাজ পরিবার-বর্গসহ ভগবান্‌ দাস সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইলেন। আক্‌বর প্রচার করিয়া দিলেন, সহস্র কার্য্য উপেক্ষা করিয়া তিনি স্বয়ং সর্ব্বপ্রথমে শত্রুর সম্মুখীন হইবেন। একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—'ভগবানের অনুগ্রহের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাসবান্‌ হইলেও, যুদ্ধে জয়লাভের কোনরূপ আয়োজনেরই তিনি ত্রুটি করিতেন না।'* প্রচুর অর্থ, পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি এবং সহজাত সামরিক বুদ্ধির সহায়তায়, সম্রাট্‌ অনতিবিলম্বে নূতন সৈন্যদল গড়িয়া তুলিলেন।

নবীন সম্রাটের বয়ঃক্রম তখন একত্রিশ,—শারীরিক ও মানসিক উভয় শক্তিই তিন পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতেছেন;—তাঁহার কথার যে কোনরূপ ব্যত্যয় হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ অক্টোবর তিনি প্রস্তত; সসৈন্যে রাজধানী ত্যাগ করিয়া কখনও উষ্ট্রপৃষ্ঠে, কখনও অশ্বারোহণে রাজপুতানার মধ্য দিয়া গুজরাটের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন; কোনস্থানে কুচ্‌ না না করিয়া, সেই ভীষণ রৌদ্রতাপের মধ্যে প্রতিদিন ২৫ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কি দুর্দ্দম উৎসাহ! কি অপূর্ব্ব শ্রমসহিষ্ণুতা!

এইভাবে বাহিনী চালনা করিয়া, আজমীর, ঝালোর, দীসা এবং গুর্জরাটের প্রাচীন রাজধানী পাটান্‌ বা অন্‌হিল্‌-ওয়ারার মধ্য দিয়া সম্রাট্‌ আহ্‌মদাবাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন; রাজধানী হইতে এইস্থান প্রায় ৩০০ ক্রোশ দূরস্থিত; এই সুদীর্ঘ পথ সম্রাট্‌ প্রকৃতপক্ষে মাত্র ৯ দিনে, বা সর্ব্বসমেত ১১ দিনে, অতিবাহন করিয়াছেন। পাটান্‌ ও আহ্‌মদাবাদের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র নগরী বালিসানায় সম্রাট্‌ কুচ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র বাহিনী পরিদর্শন করেন। তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা ত্রিসহস্র অশ্বারোহীর অধিক ছিল না।

আক্‌বর সংবাদ পাইলেন, শত্রুসৈন্য সংখ্যায় বিংশ সহস্র। কেবলমাত্র নিজ প্রয়োজনে একশত সুদক্ষ শরীর-রক্ষী সেনা রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্য মধ্য, দক্ষিণ ও বাম এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়া, সজ্জিত করিলেন। সম্মান-সূচক মধ্যভাগের সেনাপতি হইলেন,—সম্রাটের ভূতপূর্ব্ব

---

* *Tabakat*, in E. & D., v. 364.

অভিভাবক বয়রাম্ খাঁর ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র আবদুর রহীম্ খাঁ। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে বয়রাম্ খাঁ মক্কা-গমনোদ্দেশে সপরিবারে গুজরাটে উপনীত হইলে গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হ'ন। দয়াশীল সম্রাট্ অভিভাবকের নিকট ঋণের কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার পরিবার-বর্গকে উদ্ধারপূর্ব্বক স্বয়ং শিশু রহীমের লালন-পালন ও সুশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। এক্ষণে আকবর প্রবীণ রণপণ্ডিতগণের সহায়তায়, রহীম্‌কে সমরক্ষেত্রে সুনাম অর্জ্জন করিবার অবসর দিয়াছিলেন। উত্তরকালে আবদুর-রহীম্ রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সম্ভ্রান্তরূপে পরিগণিত হ'ন।

আহ্‌মদাবাদ হইতে কয়েক মাইল দূরে সম্রাট্ সাবরমতী নদীতীরে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা খান্-ই-আজম্ মীর্জ্জা অজীজ কোকার সেনাদলের সহিত মিলনোদ্দেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহীরা রাজসৈন্যের তূর্য্য নিনাদ-শ্রবণে নিজ নিজ কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না; তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল,—'আমাদের গুপ্তচরেরা এক পক্ষ পূর্ব্বে সম্রাটের রাজধানীতে অবস্থানের সংবাদ দিয়াছে; কেমন করিয়া তিনি এত অল্প সময়ে এখানে উপস্থিত হইতে পারেন? আর কোথাই বা তাঁহার রণহস্তী সমূহ যাহা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা গমন করিয়া থাকে?' প্রকৃত কথা বলিতে কি, প্রতিপক্ষ আদৌ আশা করে নাই যে, সম্রাট্ এত অল্পদিনে আহ্‌মদাবাদ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিবেন। বিদ্রোহীরা আত্মপ্রাণরক্ষার্থ রণসাজে সজ্জিত হইতে বাধ্য হইল।

৭। আহ্‌মদাবাদের যুদ্ধ—২রা সেপ্টেম্বর, ১৫৭৩

ইখ্‌তিয়ার-উল-মুল্ক যখন দেখিলেন, আকবর সসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত, তখন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল, শাসনকর্ত্তা খান্-ই-আজম্‌কে আকবরের সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা। এই উদ্দেশ্যে তিনি আহ্‌মদাবাদের তোরণ-দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। মুহম্মদ্ হুসেন মীর্জ্জা দেড় সহস্র ভীমকায় মোগল-সেনা লইয়া সম্রাট-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। আকবরের সতর্ক পরামর্শদাতৃগণ তাঁহাকে বুঝাইলেন, খান্-ই-আজমের সেনাদল না আসা পর্য্যন্ত আমাদের স্থিরভাবে অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু বীরবর আকবর ক্রোধভরে এই ভীরুতা-প্রসূত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া তখনই শত্রুদলকে আক্রমণ করিতে সেনাদের আদেশ দিলেন। তিনি স্বয়ং স্বাভাবিক অসমসাহসে অশ্বে কশাঘাত করিয়া, নদী উত্তীর্ণ হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। কখনও বা মোগল-পক্ষ জয়ী হইতে লাগিল—আবার কখনও বা শত্রুপক্ষ বল-সঞ্চয় করিতে লাগিল। যেখানে সম্রাট-সৈন্যের দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হইতেছে, অসমসাহসী আকবর তথায় শতমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত! একস্থলে আকবর মাত্র দুইটী সৈন্য লইয়া যুঝিতেছিলেন। তাঁহার অশ্ব ক্ষত বিক্ষত। হঠাৎ জনরব উঠিল—এই ভীষণ যুদ্ধে আকবর শাহ্ দেহত্যাগ করিয়াছেন। মোগলেরা যখন দেখিল, জনরব অমূলক, সম্রাট্ নিরাপদ, তখন তাহারা নবোৎসাহে ত্বরায় প্রতিপক্ষকে বিতাড়িত করিল—সম্রাট্ আকবর যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

এই পরাজয়ের এক ঘণ্টা পরে ইখ্‌তিয়ার-উল-মুল্ক পাঁচ হাজার সেনা লইয়া সম্রাট্ সৈন্য আক্রমণ করেন। কিন্তু মোগল-সেনার সমর-শক্তি দেখিয়া ইখ্‌তিয়ারের সেনাদল এরূপ ভীত হইয়াছিল যে, 'পলায়নকালে তাহাদেরই তূনীর হইতে শর লইয়া সম্রাট্-সৈন্য তাহাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছিল।' ইখতিয়ার যুদ্ধে হত, এবং মুহম্মদ্ হুসেন মীর্জ্জা বন্দী হইলেন। ভবিষ্যৎ অনিষ্টাশঙ্কা হইতে অব্যাহতি-লাভের আশায় রাজকর্ম্মচারীরা, মুহম্মদ্ হুসেনের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞার জন্য সম্রাট্‌কে অনুরোধ করিতে লাগিল। হুসেন মীর্জ্জা মস্তকদানে স্বীয় দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। গুজরাটের শাসনকর্ত্তা, খান্-ই-আজম্ যুদ্ধজয়ের পূর্ব্বে সম্রাট্-সেনার সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই। সেই যুগের বীভৎস প্রথানুসারে দ্বিসহস্র বিদ্রোহীর নরকপাল পিরা-মিডের আকারে সাজাইয়া এই ভীষণ যুদ্ধের জয়স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। মীর্জ্জা বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ হইল।

পথের দূরত্ব বিবেচনা করিলে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, আকবরের দ্বিতীয় গুজরাট্-অভিযানের ন্যায় দ্রুত অভিযান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বড় একটা পরিলক্ষিত হয় না। গুজরাটে পুনরায় বিজয়-নিশান উড্ডীয়মান করিয়া, তিন সপ্তাহের পর (অভিযান কাল হইতে ৪৩ দিনের মধ্যে) বল্লম্ হস্তে সম্রাট্ বিজয়গর্ব্বে রাজধানী প্রত্যাবৃত হইলেন (৫ অক্টোবর, ১৫৭৩)। এই অভিযান স্মরণীয়

আক্‌বর হস্তী-আরোহণে সেতু পার হইতেছেন

সিংহাসনে উপবিষ্ট আকবর

গোয়ার বাজারের দৃশ্য

গোয়ায় পর্ত্তুগীজ ভদ্রলোক
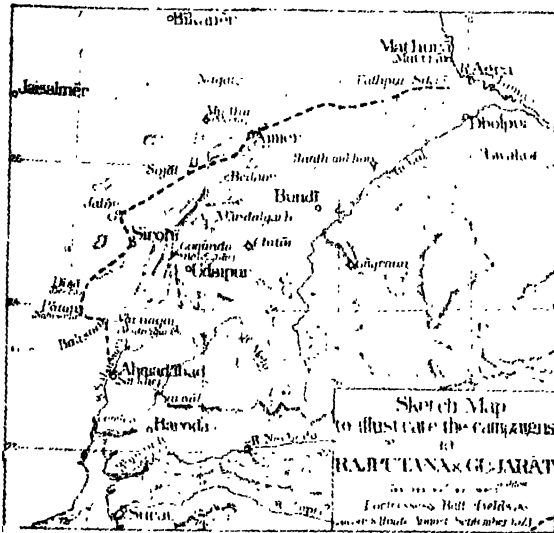
রাজপুতানা ও গুজরাট অভিযানের মানচিত্র

নরমুণ্ডের স্তম্ভ
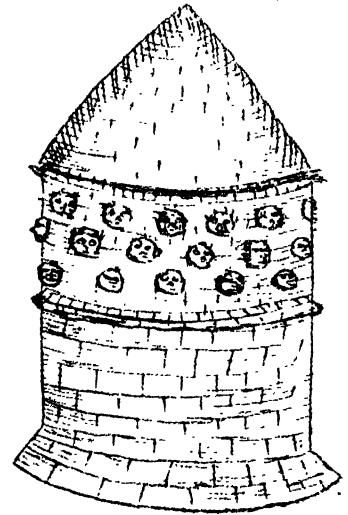
করিবার জন্য তিনি রাজধানী 'সীক্‌রীর' সহিত 'ফতেপুর' ('বিজয়-নগরী') নাম সংযোগ করিয়া দিলেন। *

৮। গুজরাটের রাজস্ব-বন্দোবস্ত ; শাসন-সংস্কার

গুজরাটে অশান্তি হেতু রাজস্ব নিয়মিতরূপে রাজকোষে না আসায়, ধনাগমের সুবন্দোবস্ত করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল—সুযোগ্য রাজা টোডরমলের উপর। তিনি মালগুজারীর (Land Revenue) 'বন্দোবস্ত' ও ছয়মাস কালের মধ্যে গুজরাটের অধিকাংশ জমির জরিপ-কার্য্য

* গুজরাট-অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য :—Abul-Fazl, ii, iii ; Nizamuddin Ahmad, Elliot v. 339, 370 ; Firishta, Briggs ii. 235 *et seq.* and iv. 155 *et seq.* ; Ali Muhammad, Bird 301 48.

সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শাসন-সংক্রান্ত ব্যয় ছাড়িয়া দিলেও পুনর্ব্যবস্থাপিত গুজরাট্‌ হইতে, রাজকোষে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষের অধিক মুদ্রা আমদানী হইত। +

জহাঙ্গীর বাদশাহ

আকবরের শাসন-পদ্ধতি গুজরাট্‌-বিজয়ের অব্যবহিত পরেই, ১৫৭৩ বা ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্দ্ধারিতরূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। রাজা টোডরমলের সাহচর্য্যে, সম্রাট্‌-নিম্নরূপ শাসন-প্রণালী প্রচলনের সঙ্কল্প করেন ;—

(১) দাগ-প্রথা ('দাগ ও মহল্লী')—আলা উদ্দীন্‌ খিল্‌জী ও শের শাহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, ভবিষ্যতে প্রতারণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় স্থির হইল, সমস্ত সরকারী অশ্ব অতঃপর চিহ্নিত হইবে। কিন্তু এই নবানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চারিদিক্‌ হইতে প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল।

(২) সমস্ত সরকারী ভূভাগ অতঃপর খাস-মহাল ('খাল্‌সা শরাফা') রূপে পরিগণিত হইবে ; অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে আমীর উম্‌রাহ্‌দিগকে যে সমস্ত মহাল্‌ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে এই সর্ত্ত ছিল—আমীরগণ উহার যথেচ্ছা শাসন সংরক্ষণ, ও রাজস্ব আদায় করিবেন ;—এই সকল মহাল ভোগের জন্য বাদ্‌শাহ্‌কে যুদ্ধবিগ্রহের সময় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য সাহায্য করিতে হইবে। এক্ষণে সে ব্যবস্থা রদ হইল ; ভবিষ্যতে এই সকল মহালের শাসন-সংরক্ষণ ও রাজস্ব-আদায় সরকারী কর্ম্মচারীরাই করিবেন ;—আমীর-উমরাহ্‌গণের এ বিষয়ে কোন হাত থাকিবে না।

(৩) আমীর ও মন্‌সব্‌দার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের শ্রেণী-বিভাগ।

বিহারের যুদ্ধ, উপরিউক্ত শাসন-প্রণালী কার্য্যে পরিণত করিতে বাধা দিয়াছিল সন্দেহ নাই ;—১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পুনঃপ্রবর্ত্তন হয়।

+ *Mirat i Ahmadi*, in Bayley, History of Gujrat (1886), pp. 20, 22. ২০৮৯১০৩৪২ দাম,—ইহাকে ৪০ দিয়া ভাগ করিলে ৫২,৫০০৮ টাকা হয়।

প্রকাশ

[শ্রীলীলা দেবী]

শুক্তির মাঝে মুকুতা যেমন,
নক্তের মাঝে দিন,—
দুখের মাঝারে সুখের আলোক
যেমন গোপন লীন,—

মন্দের গাঢ় কালো আবরণ,
ভালোর শুভ্র হাস-
তেমনি সবেতে গূঢ়, প্রচ্ছন্ন
ব্রহ্মের পরকাশ !!

ভাব-ব্যঞ্জনা

[প্রফেসর টি, এন, বাগ্‌চী]

করতাল-বাদক
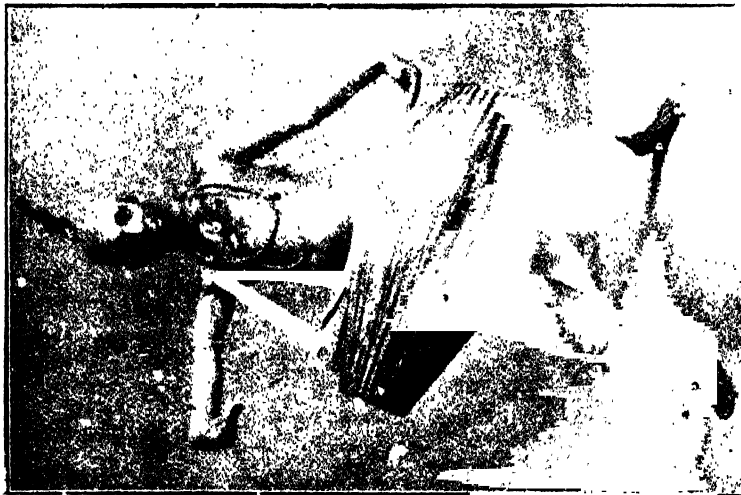
খোল-বাদক

হারমোনিয়াম্ বাদক
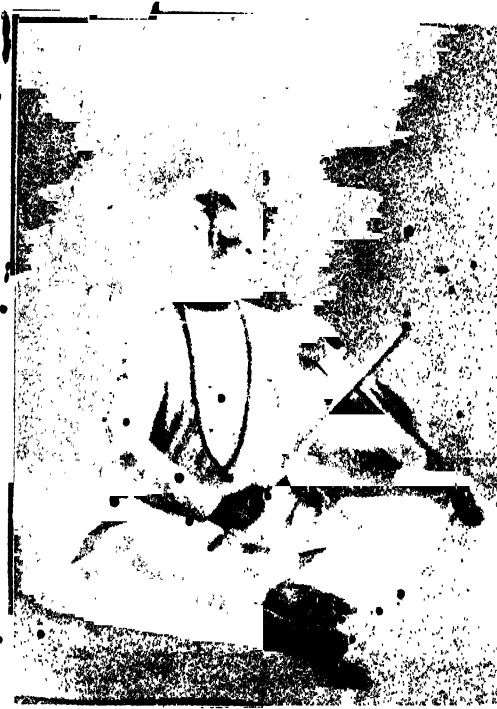
বেহালা-বাদক

কীর্ত্তন-ওয়ালী

কীর্ত্তনগানের শ্রোতা

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়]

উড়ে-বেহারা

বঙ্গ-বীর

জুয়ারী

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ]

কেশগুলি তার শুভ্র হয়েছে,
নাহি আর দেহে বল,
তারার মতন উজ্জ্বল আঁখি
আজি ম্লান ছলছল।

শুনেছি তাহার ছিল ধন-ধান,
বড়-বড় জমিদারী ;
এখন তাহার কিছু নাহি আর,—
আছে এক ভাঙ্গা বাড়ী।

বিসূচিকা দিল উজাড়ি' ভবন,
যেখানে যে ছিল খুঁজি,
কন্যার এক বালিকা কন্যা
এখন তাহার পুঁজি।
ভাঙ্গা সে বিজন ভবনের মত
হৃদয়খানিও তার,
বুকের ফাটাল ধরিয়া উঠিছে
মমতাটা বালিকার।
অতীতের দেনা উসুল হয়েছে,
রাঙা দাগ টানা প্রাণে,
ভবিষ্যতের জবর দাবী যে
দারুণ বেদনা হানে।
পাঁচ বছরের হয়েছে নাতিনী,
নামটা রেখেছে রাণী,
প্রাসাদে যেমন পণ-কুটীর
কহে কত ধনী জ্ঞানী।
হেরি বালিকারে জাগে বুকে তার
কার মুখখানি নত,
ভিজা পাষাণেতে গিরি-গোলাপের
ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ছায়ামত।
সব খোয়াইয়া ছিল বুড়া ভাল,
এক পেয়ে সব গোল,
ভাঙ্গা দেউলের দেবতার কাণে
নব অভিষেক-রোল।
থাকে বালিকাটী ঠাকুরদাদার
সম-বয়সীর মত,
দুইজনে মিলে ভাগাভাগি করে'
করে গৃহকাজ যত।
কভু বালিকারে কোলে লয়ে বুড়া
আঁখি-জলে দেয় চুমা,
নিশায় কাঁদিলে বলে রাণী হবি,
ঘুমা দিদি, তুই ঘুমা।
মনে-মনে তার প্রবল ধারণা
প্রচুর অর্থ বিনে,
যেমনে হউক রাণীর লাগিয়া
জমিদারী দিবে কিনে।

ঘুড়ি-খেলা সংবাদ পেলে
পাঠাইয়া দেয় টাকা,
জুয়া খেলিবারে দূর গ্রামে যায়
গভীর নিশীথে একা।
তার দুরাশার বিফল স্বপ্নে
বিশ্বাস দেয় কায়া,
অলীকে জানায় প্রবল সত্তা,
এমনি দারুণ মায়া।
হাসি-হাসি মুখে চাহে যবে রাণী
বুড়ার মুখের পানে,
বিগত তাহার হীরা-জহরৎ
সব যেন ফিরে আনে।
যবে সে বুড়ার গলাটা জড়ায়ে
চুপি-চুপি কথা কহে,
মরুভূমি দিয়া যেন রে শীতল
মৌসুমি বায়ু বহে।
ঘুড়ি-খেলায় ঋণ দিন-দিন
সুদে-সুদে গেল বাড়ি,
শেষ আশ্রয় ভাঙ্গা বাড়ীখান
কা'ল দিতে হবে ছাড়ি।
হাসি-আলোহীন আঁধার ভবন
কিছুই ছিল না সুখ,
তবু বিষাদের ছোট মেঘখানি
ঢাকিল রাণীর বুক।
জানালার পাশে পেয়ারার গাছ
মেঠো-কুমড়ার লতা,
পুকুরে যাবার সরু বাঁকা পথ
সবারি মুখেতে কথা।
বুড়া উদাসীন কভু আন-মনে
আকাশের পানে চায়,—
দেখে, মেঘগুলি কোথা থেকে এসে
কোন্ দিকে উড়ে যায়।
কভু ধীর মনে দেয়ালের গায়ে
দেখে পিপীলিকা-সারি,
ডিমগুলি লয়ে কোথায় যেতেছে,—
ভাবনাটা যেন তারি।

কথা, মাথা তার দুই যে বেঠিক,
আন-মনে বলে কভু,
ঘরেতে রয়েছে রাণী যে আমার,
কেন দুখ করি তবু।
দুইজনে মিলি চিন্তা করিয়া
ঠিক হল,—কাল ভোরে
যেমনে হউক দূর-দেশে যাবে,
গ্রাম, বাড়ী, ঘর ছেড়ে।
বুড়া বলে, যেথা রাজা মোর আছে,
সেই দিকে যেতে হবে,—
শুধু মিছামিছি কেন চিরদিন
ঘুরিয়া মরিব ভবে।
ভোরে-ভোরে উঠি চলে দুইজনে,—
আট বছরের মেয়ে;
দুপুরে বসিল তরুর তলায়
রোদ্র দারুণ পেয়ে।
ঘামে-ভেজা মুখ; আবার চলেছে,—
পড়েছে তখন বেলা;
দীঘির পাড়েতে বড় বট-গাছে
বসেছে কাকের মেলা।
ডাকি ডাকি বক উড়ে যায় মেঘে;—
রাণী বলে ক্ষীণ স্বরে,—
"দাদা, ওরা সব ফিরিয়া যেতেছে,
গাছে, উহাদের ঘরে?"
হাঁটিতে হাঁটিতে পঁহুছিল সাঁঝে
আসি ছোট এক গাঁয়ে;
হঠাৎ কি এক আঘাত লাগিল
রাণীর কোমল পায়ে।
দাদারে ধরিয়া চলে খোঁড়াইয়া,—
দেখিয়া কৃষক-বধূ,
ঘোমটাটা তার আধেক তুলিয়া,
আস্তে বলিল শুধু,—
"শোন ওগো খুঁকু অনেক হেঁটেছ,
পায়েতে লেগেছে ভারী,
রহিবে গো, চল, দুই জনে আজ,
চল আমাদের বাড়ী।

সাথে-সাথে তার চলে দুইজনে;
কৃষক-গৃহিণী আসি
বলে, "ওমা এ যে পদ্ম-করবী,
এ কি গো মিষ্টি হাসি!"
গরম জলেতে পা-দুটী ধোয়ায়ে
তেল দিয়া দিল পায়ে;
যতন করিয়া মিটিছে না আশা,
—ধরিয়া রাখিতে চাহে।
প্রাতে দোঁহে যবে বিদায় মাগিল,
আঁখি গেল জলে ভরি;
কৃষাণ-কৃষাণী কাঁদিতে লাগিল
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি।
লাজুক বধূটি ক্ষীর দিয়া হাতে
বলে চুপে,—"রাণী খেয়ো,
এই পথে বোন, এসো যদি কভু,
দেখা দিয়ে যেন যেয়ো।"
পরদিন হাটে কৃষকের হ'ল
দ্বিগুণ-ত্রিগুণ লাভ,—
বুঝিল, ঘরেতে হয়েছিল ঠিক
দেবীর আবির্ভাব।
হাতটী ধরিয়া বালিকা চলেছে
বুড়া সাথে কথা কয়ে,
সুকৃতি যেন রে চপল মনেরে
সুপথে যেতেছে লয়ে।
বহু-বহু দেশ ঘুরিয়া-ঘুরিয়া
বহু নদ-নদী-পারে,—
আজিকে দুজনে আসিয়া দাঁড়াল
রাজার সিংহদ্বারে।
"কে তুমি?" যখন দ্বারবান বলে,
বুড়া বলে কথা সাদা,
"তুমি দ্বারোয়ান, চেন না আমারে
আমি যে রাণীর দাদা।"
রাজাও ছিলেন দূরে দাঁড়াইয়া;—
ভদ্র অতিথি হেরি,
প্রবেশ করিতে দিলেন হুকুম
তিলেক না করি দেরী।

শ্রান্ত-চরণা বালিকারে দেখি,
পরম আদর-স্নেহে
বলিলেন দোঁহে, "থাক দুই দিন
আমাদের এই গৃহে।"
বুড়া বলে, "শুধু দুই দিন কেন,
আর কোথা যাব ছাড়ি,—
বহু খুঁজে-খুঁজে এসেছি হেথায়,—
এই ত দিদির বাড়ী।"
বুঝিলেন রাজা, বহু ব্যথা পেয়ে
হয়েছে খারাপ মন;
সান্ত্বনা, আর শুশ্রূষা তার,
কিছুদিন প্রয়োজন।

পরদিন প্রাতে দেখিলেন রাজা,—
চলে যায় যবে রাণী,—
মনে হয় যেন, ঘুরিছে, ফিরিছে,
সজীব কুসুমখানি।
গোপনে মহিষী হেরি বালিকারে,
অন্দরে ডাকি তাঁর,—
মুখ মুছাইয়া কত কথা ক'ন,
কোলে ল'ন্ বারবার।
নয়নে তাঁহার রাণীর মূরতি
এতই লেগেছে ভাল,—
বলেন, "এ বার বধূ হবে, তার
রূপে-গুণে ঘর আলো।"
রাজার বাড়ীতে বুড়ার কাহিনী
সদাই সবার মুখে,
সম্ভ্রমে সবে উঠিয়া দাঁড়ায়
হাসি চেপে রাখি বুকে।
হাতের হুঁকাটা খেতে খেতে সবে
লুকাইয়া রাখে পাছে,—
কেমনে এমনি বেয়াদবি করে
রাণীর দাদার কাছে।
রাজা হাসি হাসি বৃদ্ধেরে ডাকি
পরিচয় তার লন;
বলেন হাসিয়া, "স্বজাতি আপনি,
কুলেতেও খাটো নন।

সত্যই যদি, নাতিনীরে তব
করিতে চাহেন রাণী,—
কতগুলি টাকা যৌতুক পাবে,
বলুন তাহাই শুনি।"
বৃদ্ধ বলিল, "বেশী কোথা পাব,
সেদিন আমার নাই,—
লক্ষ টাকার যৌতুক দিব,
করিয়াছি মনে তাই।"
হাসি-হাসি রাজা বলিলেন "বেশ,
তাহাতেই খুব হবে,—
আজ হতে আমি রাজ-কুমারের
খোঁজ করে ফিরি তবে।"
আট বছরের বালিকার সাথে
মহা সমারোহ করি,
তের বছরের কুমারের বিয়ে
রাণী ত দিলেন ধরি।
হেরিয়া যুগল পারিজাত-কলি
মোহিত যে রাজা রাণী;
বুড়া আনন্দে দেখে আর কাঁদে,—
মুখেতে সরে না বাণী।
পর দিন প্রাতে পাকা শীল করা
নূতন ধরণ খামে
কোথা হতে এক দরকারী চিঠি
আসিল বুড়ার নামে।
বোম্বায়ে সেই ঘুড়ি খেলায়
পাঠাইয়াছিল টাকা;
এবার তাহার সুফল ফলেছে—
যায় নি নেহাৎ ফাঁকা।
লক্ষ মুদ্রা জিনিয়াছে বুড়া;
সত্য হয়েছে বাণী,—
স্তম্ভিত শুনি গৃহ-পরিজন,
বিস্মিত রাজারাণী।
হাসি, হাত ধরি বলিল বৃদ্ধ,
"ওরে ভাই বন্ধু-বর,
বিধাতার-দেওয়া এই যৌতুক
বৃদ্ধ দিতেছে ধর।
আমি ত জুয়ায় হারায়েছি সব,
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে মেলা,—
আজি যে পেলাম, সে কেবল সেই
বড় 'জুয়ারীর' খেলা।"

ভারতবর্ষীয় মহিলা-বিদ্যাপীঠ

[অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-আর-এস্]

আমরা অন্যান্য প্রদেশের খবর খুব কম রাখি। ইহার কারণ, কতকটা অন্যান্য প্রদেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার অভাব। অথচ, নানা বিষয়েই বাঙ্গালা যে অন্যান্য প্রদেশের কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্র পুণায় কতকগুলি প্রতিষ্ঠান দেখিয়া আমার কেবলই মনে হইয়াছে, বাঙ্গালায় ইহা অসম্ভব। পুণার ফারগুসন কলেজের কথা অনেকেই জানেন; কারণ, পরলোকগত মাননীয় গোখলে এবং লোকমান্য তিলকের সহিত এই কলেজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ফারগুসন কলেজের অধ্যাপকবর্গের আত্মোৎসর্গের কথাও কোন শিক্ষিত বাঙ্গালীর অবিদিত নাই। কিন্তু ঠিক এইরূপ চির-দারিদ্র্য স্বীকার করিয়াই যে আর একদল তরুণ পণ্ডিত পুণায় আর একটি কলেজ (New Poona College) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অল্প লোকই জানেন। এই কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মিঃ শাহ গত বৎসর কেম্ব্রিজে গণিত-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইহার সহাধ্যায়িগণ বলেন যে, পূর্ব্বের নিয়ম প্রচলিত থাকিলে, মাননীয় রঘুনাথ পারাঞ্জপের ন্যায় ইনিও সিনিয়র র‍্যাঙ্গ্লারের গৌরব লাভ করিতে পারিতেন। এই প্রকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোন বাঙ্গালী যুবক চিরজীবন ১০০৲ বেতনে দেশে শিক্ষা প্রচার-কার্য্যে সকল শক্তির নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। ফারগুসন কলেজ ও নিউ পুণা কলেজের অধ্যাপকগণ ১০০৲ মাত্র বেতন গ্রহণ করেন; কিন্তু পুণার আর একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ ইহা অপেক্ষাও অল্প বেতনে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারকল্পে চিরজীবন কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন!

পুণা হইতে চারি-পাঁচ মাইল দূরে হিঙ্গণে নামক একটী ছোট পল্লী আছে। এইখানে প্রধানতঃ অধ্যাপক কার্ব্বের চেষ্টায় হিন্দু-বিধবা-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লীর বাহিরে নির্জ্জন শৈলমূলে সুন্দর আশ্রমটি। আমাদের বিধবাগণের ব্যর্থ জীবনের বিবিধ বেদনার কাহিনী কাহারও অজ্ঞাত নহে। তাহাদের কষ্ট অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করিবার জন্য অধ্যাপক কার্ব্বে হিন্দু-বিধবা আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমের কার্য্য করিতে করিতেই কার্ব্বে মহোদয়ের মনে আর একটি কল্পনার উদয় হয়। তিনি দেখিলেন যে, বিধবাদিগের ব্যর্থ জীবনের গতি ফিরাইয়া দিতে হইলে, শিক্ষার প্রয়োজন; এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী মহিলাদিগের সর্ব্বথা উপযোগী নহে। কবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহার অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া, অধ্যাপক কার্ব্বে নিখিল ভারতের জন্য একটী মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী সনন্দ পায় নাই, বোধ হয় পাইবেও না; সুতরাং কাশীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের মত রাজা মহারাজা ও অন্যান্য উপাধিধারী কমলার বরপুত্রগণের কৃপা ভারতবর্ষীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বর্ষিত হয় নাই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা কখনও হইবে না বলিয়াই, অধ্যাপক কার্ব্বে এমন এক দল ত্যাগী শিক্ষক চাহিলেন, যাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষার জন্য চিরজীবন দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। তাঁহার আহ্বান নিষ্ফল হয় নাই; বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নয়জন অধ্যাপকই কৃতবিদ্য পুরুষ। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি লাভ করিয়াছেন; এবং একজন আমেরিকায় শিক্ষিত। অধ্যাপক দিবেকর এলাহাবাদের মুর-সেণ্ট্রাল কলেজের উচ্চ বেতনের সরকারী চাকরী ত্যাগ করিয়া এই বিদ্যালয়ের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন! ইঁহারা মাসিক ৭৫৲ মাত্র বেতনে একাদিক্রমে বিশ বৎসর কাল মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিবেন! এখনও বিশ্ব বিদ্যালয়ের আশানুরূপ অর্থাগম হইতেছে না বলিয়া, ইঁহারা কেহই ৬০৲র অধিক গ্রহণ করেন না। ভারতবর্ষের আর কোথাও স্বার্থত্যাগের এইরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সুলভ কি না, জানি না।

পুণার মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডার অধ্যাপক কার্ব্বের ভিক্ষা লব্ধ অর্থে পুষ্ট। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া বৃদ্ধ অধ্যাপক না গিয়াছেন ভারতবর্ষে এমন প্রদেশ নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায়ও আসিয়াছিলেন। বলিতে লজ্জা হয় যে, বাঙ্গালার দানের পরিমাণ যেমন কম, প্রতিকূল সমালোচনার পরিমাণ তেমনই বেশী। এখানকার একজন খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতা গোলদীঘির পারে, সেনেটের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া, প্রকাশ্য সভায় কার্ব্বে মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে—মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় করিয়া কি হইবে? যুবতীদিগকে লজ্জাহীনতা (ইংরেজীতে যে শব্দটা বলিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রতিশব্দ দিতে পারিলাম না) ও উঁচু-গোড়ালিওয়ালা বুট পরিতে শিখাইবেন,—এই ত? কিন্তু বাঙ্গালার জনসাধারণ স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে ইহার বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং এই প্রবন্ধে মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-নীতি ও কার্য্যের বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ দুইটি। প্রথম, তাহার প্রদত্ত শিক্ষা সর্ব্বথা ভারতীয় মহিলাদিগের উপযোগী হইবে। দ্বিতীয়—তাহার শিক্ষার বাহন হইবে শিক্ষার্থিনীদিগেরই মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় অধীত বিষয় সহজে আয়ত্ত হয় বলিয়া, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ পাঁচ বৎসর বয়সে পাঠশালার শিক্ষা আরম্ভ করিয়া, ১৪ বৎসরে প্রবেশিকা ও ১৭ বৎসর বয়সে উপাধি-পরীক্ষা পাশ করিতে পারেন। সুতরাং প্রত্যেক বালিকারই বিবাহের পূর্ব্বে অন্ততঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুবিধা হয়। অথচ লব্ধ জ্ঞানের তুলনায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীরা ভারতীয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমশ্রেণীর ছাত্র বা ছাত্রীরা অপেক্ষা কোন ক্রমেই অপকৃষ্ট নহেন। উপাধি-পরীক্ষার নিমিত্ত মাতৃভাষা, ইংরেজী সাহিত্য, সমাজ-তত্ত্ব (Sociology) মনস্তত্ত্ব ও শিশুর মন, এই চারিটি বিষয় অবশ্য পাঠ্য; এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক শিক্ষার্থিনীকেই সংস্কৃত অথবা রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যায় পাশ করিতে হয়। প্রবেশিকায় মাতৃভাষা, ইংরেজী, ইতিহাস, পাটীগণিত, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অবশ্য-পাঠ্য; এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি বিষয়ে পাশ করিতে হয়। পরীক্ষার্থিনীগণ ইচ্ছা করিলে, সূচী-শিল্প, চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতেও পরীক্ষা দিতে পারেন। রন্ধন ও গৃহ কর্ম্মের কোন পরীক্ষা নাই, কিন্তু এই দুইটি বিষয় তাহাদিগকে হাতে কলমে শিখিতে হয়। আশ্রমে দাস দাসী রাখিবার রীতি নাই, প্রয়োজনও হয় না। আশ্রমবাসিনীরাই বাসন-মাজা, কাপড়-ধোয়া হইতে পালা করিয়া রন্ধন করা পর্য্যন্ত সমস্ত কায করেন। ইঁহাদের জীবন সরল ও অনাড়ম্বর। মহারাষ্ট্র রমণীদিগের মধ্যে জুতা পরা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। প্রাচীন তন্ত্রের অশিক্ষিতা রমণীরাও রাস্তায় বাহির হইবার সময় জুতা পরিয়া বাহির হন। কিন্তু মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের মধ্যে উঁচু-গোড়ালিওয়ালা জুতা ত দেখিলামই না, মারাঠা চটিরও প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইল না। সেই পাহাড়ের দেশের কঙ্করময় পথেও ইঁহারা নগ্ন পদেই ভ্রমণ করেন। বিলাসের নাম-গন্ধ এখানে নাই।

এখন মহিলা-পাঠশালার প্রায় সকল শিক্ষকই পুরুষ; কারণ, উচ্চশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী এ দেশে বেশী নাই, এবং অল্প বেতনে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ ক্রমশঃ তাঁহাদের শিক্ষকদিগের স্বার্থত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতেছেন। মহিলা-বিদ্যাপীঠের প্রথম গ্র্যাজুয়েট শ্রীমতী বড়ুবাই শিওরে মহিলা-পাঠশালার আজীবন-সভ্য (life member) হইয়া চিরজীবন অল্প বেতনে অধ্যাপনা করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটী বিধবা ছাত্রী শ্রীমতী কমলা বাই দেশপাণ্ডে এখানকার শিক্ষা শেষ করিয়া সাতারায় একটী বালিকা-বিদ্যালয় খুলিবেন স্থির করিয়াছেন। সুতরাং আশা করা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কার্য্য মহিলারাই করিবেন।

বর্ত্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মাত্র তিনটি বিদ্যালয় আছে। এই তিনটি বিদ্যালয়ই হিঙ্গণের হিন্দু-বিধবা-আশ্রমের ব্যয়ে পরিচালিত। এতদ্ব্যতীত, পুণা সহরে ও অমরাবতীতে দুইটি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই বিদ্যালয় দুইটিতে প্রবেশিকা-শ্রেণী পর্য্যন্ত আছে। বিধবা-আশ্রমের পরিচালিত বিদ্যালয় তিনটির মধ্যে একটী উচ্চ শ্রেণীর কলেজ ও একটী নর্ম্মাল বিদ্যালয়। যাহারা ইংরেজী পড়িতে একেবারে অনিচ্ছুক, তাহাদেরও শিক্ষার বন্দোবস্ত এই বিদ্যালয়গুলিতে আছে। বলা বাহুল্য, এই বিদ্যালয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে বার্ষিক সাহায্য মাত্র পাইয়া থাকেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও হিন্দু-বিধবা-

আশ্রমের ও আশ্রম-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির ভাণ্ডার সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিদ্যালয় কয়টিই মহারাষ্ট্র দেশে বলিয়া বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় মারাঠী ব্যতীত অপর কোন প্রাদেশিক ভাষায় অধ্যাপনার বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের যে-কোন প্রদেশের, যে-কোন বর্ণের, যে-কোন শ্রেণীর, যে-কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মহিলাই, কোন বিদ্যালয়ের সংস্রবে না থাকিয়াও, উপযুক্ত ফি দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোন পরীক্ষা স্বীয় মাতৃভাষায় দিতে পারেন। গত বৎসর গোয়ালিয়র হইতে একটী মহিলা হিন্দীতে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য ইতিহাসের পাঠ্য অংশেরও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। সাধারণতঃ মারাঠা জাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হয়। কিন্তু কোন বঙ্গ মহিলা পরীক্ষার্থিনী হইলে, তাঁহার জন্য বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস পাঠ্য করা হইবে। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, কোন বাঙ্গালী মহিলা ভারতবর্ষীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে চাহিলে, তাঁহার সুবিধামত স্থানে পরীক্ষা-কেন্দ্র খুলিবার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ও পরীক্ষা সম্বন্ধীয় সকল সংবাদও আমার নিকটে পত্র লিখিলেই পাওয়া যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় যাঁহার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কেবল মহারাষ্ট্রের বা কেবল হিন্দুর নহে,—ইহা নিখিল ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। তাই সেনেটের ৬০ জন সদস্যই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমাদের বাঙ্গালা দেশও বাদ যায় নাই। পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী ফেলো ছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণীও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার স্যর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহিলা-বিদ্যাপীঠের প্রথম চ্যান্সেলর, ও ফারগুসন কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় রঘুনাথ পুরুষোত্তম পারাঞ্জপে ভাইস-চ্যান্সেলর। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক কার্ব্বে আশা করেন যে, অনতিকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই অন্ততঃ এক-একটী কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের কলেজেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে সমান দাবী থাকিবে; এবং প্রয়োজন হইলে পুণা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র অন্য কোন নগরে স্থানান্তরিত করা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ভাণ্ডারে এখন মাত্র সওয়া লক্ষ টাকা আছে, এবং ইহার বর্ত্তমান বার্ষিক আয় মাত্র ১০ হাজার টাকা। সুতরাং পুণার ভারতবর্ষীয় মহিলা-বিদ্যাপীঠই যে পৃথিবীর দরিদ্রতম বিশ্ববিদ্যালয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সাধারণ এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিকে যেরূপ সহানুভূতির চক্ষে দেখিতেছেন, তাহাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ গৌরব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার এখনও আশানুরূপ হয় নাই। তাহার কারণও অনেক আছে। অল্প বয়সে বিবাহ, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি প্রাচীন তন্ত্রের লোকদিগের অশ্রদ্ধা, ইংরেজীর সাহায্যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে সময় ও শক্তির অপব্যয়, ইহার অন্যতম। ভারতবর্ষীয় মহিলা-বিদ্যাপীঠ এই সমস্ত অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়াই আপনাদের পাঠ্য-তালিকা প্রস্তুত ও পরীক্ষার কাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং বাঙ্গালী পিতামাতাদিগেরও এই সুযোগ অবহেলা করা উচিত নহে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ও সরকারী সাহায্যের আকর্ষণ এখনও কিছুদিন প্রবল থাকিবে। সুতরাং কোন প্রদেশেরই বালিকা-বিদ্যালয়গুলি একেবারে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারিবে না। কিন্তু, তাহা না করিয়াও তাঁহারা ছাত্রীগণকে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে পাঠাইতে পারেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন অবশ্য মহিলাদিগের জন্য তাঁহাদের প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু ভারত-সরকার ঐ উপদেশ গ্রহণ করিবেন কি না, অথবা, কতটা গ্রহণ করিবেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়কে কোন বিষয়ের জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বদেশী প্রতিষ্ঠান। সুতরাং কেবল শিক্ষার উন্নতির দিকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিবে। এইখানে আমাদের জাতীয় আদর্শ ও জাতীয় প্রয়োজনানুরূপ স্ত্রী-শিক্ষার আয়োজন করিতে পারিব। সুতরাং বঙ্গদেশেরও, দক্ষিণের এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করা উচিত।

শিক্ষার অধিকারে বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার *

[শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্]

ামাদের দেশের লোকে ইংরাজী ভাষাকে দুই রকমে হণ করিতে পারেন ও করিয়াছেন। এক, সাহিত্যিক াদর্শের ভাষা; আর এক, ব্যবহার-মূলক প্রয়োজনীয় াষা। প্রথম ভাবে, যে ইংরাজীর দ্বারা আমাদের মোটের পর প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহার অন্য বিচার করিয়া, আমাদের সাহিত্যের শিরোভূষণ মাইকেল, ঙ্কমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—এই তিনজন মহাত্মার নাম উল্লেখ রিলেই যথেষ্ট হইবে। দ্বিতীয় ভাবেও আমরা ইংরাজীর ফল ব্যবহার করিতেছি এবং অবস্থাধীনে করিতে হইবে। স্তু ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলের লোক যেমন হার-ব্যবহারে, সহজ-স্বচ্ছন্দ ভাবে ইংরাজী প্রয়োগ করে, ধারণতঃ সে ভাবে ইংরাজী আয়ত্ত করিতে আমরা চেষ্টা রি নাই, হয় ত করা আবশ্যকও হয় নাই। ইহার রণ অনুসন্ধান এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। ইহাও বলা কার যে, ইংরাজীকে প্রয়োজনীয় ভাষা রূপে ব্যবহার রিবার যাহা মূল সার্থকতা, অর্থাৎ ইংরাজী হইতে নানা বহারিক বৃত্তিগত তথ্য সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে ই শিক্ষা, সেই জ্ঞান বহুল ভাবে প্রচার করা—সে ভাবেও রাজীর চর্চ্চা আমাদের মধ্যে এখনও তেমন ফলপ্রদ হয় ই। না হইবার কারণ আছে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে ইংরাজীর বহুল প্রচলন বিশেষ বে উচ্চ শিক্ষার সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ফল। পূর্ব্বেই য়াছি, ইহার সুফল ঢের হইয়াছে, কিন্তু কুফলও অনেক। াতে কুফলের নিরাকরণ হয় এবং যথোচিত প্রতিবিধান তাহার আশু চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া ড়য়াছে।

এমন লোক আছেন, যাঁহারা দুই বা ততোহধিক া সমান ভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন; এবং সেই ল ভাষায় স্বচ্ছন্দে লিখিতে ও বলিতে পারেন; ন্তু তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা নিশ্চয় অতি অল্পই ব। সকল লোকের ভাষা অধিকারে এমন একটা বিশেষ শক্তি থাকে না, থাকিবার দরকারও নাই, আর থাকিলে বোধ হয় সমাজের আরও মূল প্রয়োজনের হানি হইত। অথচ, শিক্ষাগম্য সমস্ত বিষয়ই ইংরাজীর ভিতর দিয়া শিখিতে হইবে; এমন কি, ইংরাজী ভাষায় সেই-সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিতে হইবে। এত বড় বিরুদ্ধ ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? ইহাতে যে কি পরিমাণ মানসিক শক্তির অপচয় হইতেছে, তাহা মনে করিলে যথার্থই মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। প্রায়ই দেখা যায়, যে সকল ছাত্রের ভাষা-শিক্ষায় তেমন মেধা নাই, তাহাদের অন্য একটা না একটা বিষয়ে বেশ বুদ্ধি খোলে; আর না হয় ত, ব্যবহারিক বা বাস্তিক শিক্ষায় বিলক্ষণ পটুতা জন্মে। কিন্তু আমাদের এমনই শিক্ষার সুব্যবস্থা যে, যে বালক ইংরাজী ব্যাকরণ মনে করিতে না পারিল, তাহার জীবনই যে একরকম ব্যর্থ, তাহাই যেন আমরা স্বতঃ-পরতঃ প্রমাণ করিতে সচেষ্ট রহিয়াছি। ফলে, আমরা বেশীর ভাগ শিখিতেছি কেবল কথার ব্যাপার। স্বল্পবিত্ত ভদ্রলোকের ন্যায় বাহিরের ঠাট বজায় করিয়া আমরা নিয়তই পেটের উপর বাণিজ্য করিতেছি।

একাধিক ভাষা প্রয়োগ করিতে পারায় দোষ নাই; কিন্তু ভেজাল বা খিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করা অশিক্ষিত বা অৰ্দ্ধশিক্ষিতের লক্ষণ। আমাদের শিক্ষার দোষে আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই লক্ষণই অতি সমাদরে আমাদের শিরোপা করিয়া লইয়াছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে কোন আদালতে একজন সাক্ষী নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছিল "আমার Father সম্প্রতি late হয়েছেন"! দৃষ্টান্ত কিছু অতিবেশী হইলেও ইহা প্রায় শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রের সম্বন্ধেই অল্প বিস্তর খাটে।

বাস্তবিক, শিক্ষিত বাঙ্গালী দোতরফা তর্জ্জমা করিতে-করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। একদফা, বাঙ্গলা হইতে ইংরাজীতে তরজমা করা; আর একদফা, ইংরাজী হইতে

* নিমতলা বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসবে পঠিত।

বাঙ্গালায় তরজমা। এই জন্যই আমাদের ইংরাজী ও বাঙ্গালায় অনেক সময় এতটা কৃত্রিমতা ও কষ্টকল্পনা প্রকাশ পায়।

তরজমায় কোন হানি নাই। প্রত্যুত, আমাদের অবস্থায় ইংরাজী সাহিত্যের সহিত ব্যবহার-প্রসঙ্গে আমাদের ভাষার একটা উন্নতি হইয়াছে এবং আরও উন্নতির আশা আছে। কিন্তু শিক্ষার অবস্থায় তরজমার চাপে মানসিক যন্ত্রকে বিকল ও বিকৃত করা কোন রকমেই সঙ্গত নহে। ইহাতে, মনের পশ্চাতে যে একটা ভাবময় শরীর আছে, তাহার উপর প্রতিনিয়ত আঘাত পড়িতেছে।

বাঙ্গালা সর্ব্বপ্রকার অর্থ ও ভাব-প্রকাশক নয় বলিয়া আমরা যে সন্দিহান হই, উপরিউক্ত কারণও তাহার অন্যতম। আমরা ইংরাজীর প্রত্যেক পেঁচ, প্রত্যেক ছাঁদ, প্রত্যেক লিড়টি পর্য্যন্ত অবিকল বাঙ্গলায় ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করি; সেই জন্যই বাঙ্গালা আমাদের হাতে অনেক সময় আনাড়ীর হাতের অস্ত্রের ন্যায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক ভাষারই একটা অন্তর্নিহিত মূল ভাব, একটা সূক্ষ্ম-সঞ্চারিণী চিৎ-শক্তি আছে। সর্ব্ববিধ অনুশীলনের দ্বারা এই মূল ভাব, এই চিৎ-শক্তির সহিত সর্ব্ববিধ জাতীয় ভাব, বুদ্ধি ও প্রচেষ্টার উত্তরোত্তর গভীরতর, নিগূঢ়তর ও ব্যাপকতর সংযোগ-স্থাপন করিতে পারিলেই ভাষারও মঙ্গল, জাতিরও মঙ্গল; নচেৎ ভাষা ও জাতির মধ্যে নিগূঢ় প্রাণের সামঞ্জস্য যাহা, তাহাতে বা লাগে। আমরা হুবহু ইংরাজী ভাব বাঙ্গলা ভাষার পরিচ্ছদে সাজাইয়া বাহির করিতে চাই বলিয়াই এত বিড়ম্বিত হই। অনেক সময়ে ভাবও তেমন খোলে না, পরিচ্ছদও শোভন হয় না। ইহা নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী শিক্ষার একটা কুফল, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। এইরূপ একদেশী ইংরাজী-চর্চ্চায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের জমি বা শাস ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যাইতেছে। এই মহৎ অনিষ্ট নিবারণের জন্যই বাঙ্গালা ভাষা উচ্চশিক্ষার সাধন-স্বরূপ যথাসম্ভব শীঘ্র অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষার দ্যোতক শক্তির অভাব আছে ইহা মানিয়া লইবার পূর্ব্বে, ইহা কি আমাদের উচিত নয় যে, ভাষাটাকে সে ভাবে পরীক্ষা করিবার একটা যথোচিত সুযোগ ও অবসর দিই। আমাদের বিশ্বাস যে, আমরা বাঙ্গালা ভাষাকে যথার্থ সে সুযোগ, সে অবসর দিই নাই। আমাদের আরও বিশ্বাস যে, সাহস করিয়া বাঙ্গালা ভাষা নিরবলম্ব ভাবে উচ্চশিক্ষার অধিকারে গ্রহণ করিতে না পারিলে, যথার্থ সে সুযোগ, সে অবসর দেওয়া হইবে না। আমরা যেরূপ আবশ্যক অনাবশ্যক ভাবে ইংরাজীর সহিত বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালার সহিত ইংরাজী মিশাইয়া কাজ সারিয়া লই, ইহাতে কথঞ্চিত বাক্‌চাতুর্য্য প্রকাশ পাইলেও, মানসিক কার্য্যকারিতা শক্তির অপরিচালনায় ক্রমশঃই জড়ত্বেরই প্রশ্রয় দিতেছি। বাঙ্গলা ভাষা স্বল্পান্বয়ী সরল বাক্য-পরম্পরার সমষ্টি লইয়া গঠিত। এই মূল লক্ষণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সরল সংযত ভাবে চেষ্টা করিলে, কোন বিষয়েরই ব্যাখ্যান বা বিবৃতি বাঙ্গালা ভাষায় অসাধ্য হইবে না। উচ্চশিক্ষা একটা অনাপেক্ষিক, স্বয়ংসিদ্ধ জিনিস নয়। প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষা ইহার মূল ভিত্তি। তার পর, এক দিকে বৃত্তি ও ব্যাবহারিক শিক্ষা, অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় অধিকারগত শিক্ষার সহিত ইহার বিশেষ সংশ্রব। সাধারণ বৃত্তি-শিক্ষা বা কর্ম্মিক শিক্ষা বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত না হইলে, তেমন ব্যাপকরূপে ফলপ্রসূ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অন্য দিকে, রাষ্ট্রীয় শিক্ষার মূলে, রাষ্ট্রীয় কার্য্যে যথাসম্ভব বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাস্তবিক, উচ্চশিক্ষা সাধারণতঃ ইংরাজী শিক্ষার সামর্থ্যসূচক হওয়ার জন্যই কি আমাদের এই নানা-সম্প্রদায়-খণ্ডিত দেশে আর একটা অবান্তর ভেদ-বুদ্ধির সৃষ্টি হয় নাই? সর্ব্ববিধ শিক্ষা মাতৃ-ভাষাগম্য হইলে ক্রমশঃ এই ভেদবুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া সমবায়ী ভাবে বিকাশের অন্ততঃ কতকটা সহায়তা করিবে, এরূপ আশা করা কি নিতান্তই অসঙ্গত হইবে? যথোচিত শ্রম ও চেষ্টা করিলে বাঙ্গালা ভাষায় কথার অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালার জননী-স্থানীয়া। হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি নানা প্রাদেশিক ভাষা বাঙ্গালার সহচর। নিজ বাঙ্গালা ভাষারও শব্দ-সম্পদ নিতান্ত হীন নয়। এত সুযোগ থাকিতেও যদি বাঙ্গালা ভাষায় কথার অভাব হয়, তাহা হইলে উহা আমাদেরই অক্ষমতার পরিচায়ক হইবে। কথা নানা ভাবে ভাষায় আসে। তাহার মধ্যে প্রধানতঃ আসে বিষয় বা বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়-মূলে। বাড়ীর মেয়েদের মুখে Thermometer অর্থে "জ্বরকাঠি";

)il-cloth অর্থে "তৈল-চাদর" বলিতে শুনিয়াছি। ামাদের কর্ম্মিকদের মুখে power-house অর্থে "বিজলী র", Key-stone অর্থে "খিলানের চাবি" শুনা যায়। ামাদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাব আমাদের ভাষার াষ নহে; উহার মূল কারণ বিজ্ঞানের বস্তু বা বিষয়ের হিত আমাদের সাক্ষাৎ বা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব। ার্ম্মিক ও বাস্তিক শিক্ষার প্রসারে ও জীবনের কার-ারবারে বৈজ্ঞানিক উপকরণের উত্তরোত্তর অধিকতর চলনের সঙ্গে-সঙ্গে সে অভাব ক্রমশঃ ঘুচিয়া যাইবে; এবং াষাও তদনুক্রমে স্বাভাবিক ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে। .চৎ ইংরাজী হইতে তরজমা বিশেষজ্ঞের পুঁথিগত থাকিলে, াটরাবদ্ধ পোষাকী কাপড়ের ন্যায় ক্রমশঃ পোকায় াটিয়াই জীর্ণ হইতে থাকিবে,—কোনদিনই আমাদের ড়গড় হইবে না। সাধারণ শিক্ষায় এই সকল জিনিসের ছন্দ ও অবাধ ব্যবহার দরকার।

কথা ব্যবহারেই সুপরিচিত ও শ্রুতি-কোমল হইয়া ঠ; নচেৎ, Cinematografh বা Aeroplane প্রভৃতি ব্দর এমন কোন প্রাকৃতিক বিশেষত্ব নাই যে, ইহারা ন্ম হইতেই ইংরাজের রসনায় মাতৃ-স্তন্যের ন্যায় াচনীয় হইয়া আসে। পদের অর্থ ব্যবহার-গুণে, লক্ষণায়, ঞ্জনায়, সাদৃশ্যে, সাযুজ্যে, নানাভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। ক্ষতব্য বিষয়ের সহিত শিক্ষিতের মনের মাতৃভাষার গে সাযুজ্য স্থাপিত হউক। তাহা হইলেই মানুষের শব্দ-াবনী শক্তি স্বয়ংক্রিয় ভাবেই আপনার কর্ত্তব্য-সাধন রবে; এবং অবশ্য-প্রযুজ্য নূতন শব্দমালা অনুশীলন-ণই উজ্জ্বল, মসৃণ ও অর্থগর্ভ হইয়া উঠিবে।

অর্থ ও পদের সহিত নিত্য সম্বন্ধের যে একটা স্বাভাবিক ণতি আছে, তাহা সহজে এড়াইয়া যাইবার উপায় ই। যে প্রক্রিয়া দ্বারা বস্তুর জ্ঞান ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়, ঠিক তাহারই ফলে ভাষাও ক্রমশঃ মার্জ্জিত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। একটা ছোট-খাট দৃষ্টান্ত দ্বারা াটা পরিষ্কার হইবে।

এই ধরুন না, bicycle জিনিসটা এখন আমাদের রিচিত, প্রায় নিত্য-ব্যবহার্য্যের মধ্যে। নামটাও অন্ততঃ le এই সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের কাছে বেশ ায়েম ও সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু এই যন্ত্রটির উদ্ভাবন ও ক্রমোন্নতির প্রসঙ্গে ইহার যে কতগুলি নাম ক্রমশঃ উদ্ভাবিত, পরীক্ষিত ও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কতক বাদ-সাদ দিয়া আমি এই সকল নামের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা টুকিয়া আনিয়াছি; তাহা নিশ্চয়ই বিলক্ষণ কৌতুকাবহ বোধ হইবে। কাল-ক্রমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, মোটের উপর এই তালিকাটি কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়—velocipede, patent accelerator, pedestrian's accelarator, pedestrian's curricle, celeripede, bicepedes, bivector, এবং অবশেষে ব্যঙ্গ নাম bone-shakes, এবং তৎসহচর সাধু শব্দ bicycle। ইহাতে কি প্রমাণ হয়? এই প্রমাণ হয় যে, এ সব ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান যতই বহু-বিস্তৃত ও ক্রিয়া-সিদ্ধ হইবে, ততই ভাষা মার্জ্জিত, ঋজু ও অন্বর্থ হইয়া উঠিবে। সুতরাং প্রাকৃত, বা ফলিত-বিজ্ঞানের নূতন পরিকল্পিত শব্দমালা প্রথম-প্রথম কিছু উদ্ভট ও "কটমট" বোধ হইলেও, বিশেষ অনুৎসাহের কারণ নাই।

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে উৎসাহী কর্ম্মীর অভাব নাই, অথবা হওয়া উচিত নয়। মৌলিক রচনায় অতি-প্রবৃত্তি সাময়িক ভাবে প্রশমিত করিয়া, উৎসাহের সহিত এই শব্দ-সংগ্রহ-কার্য্যে দল বাঁধিয়া লাগিয়া যান। সাহিত্যের হাটে এখন কিছুদিন আমাদের মজুরদারী করার দরকার হইয়াছে। এ কার্য্য নীরস বলিয়া মনে করিবেন না।

সহানুভূতি থাকিলে ইহাতে যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি, আনন্দ এবং বিচার ও পরিকল্পনী শক্তির পরিচালনার সুযোগ আছে; এবং ইহাতে সাহিত্যেরও মহদুপকার সাধিত হইবে। চলিত ভাষায় কত সুন্দর প্রাণবন্ত শব্দ, কত সুতীক্ষ্ণ দ্যোতক প্রত্যয় শুদ্ধ অবহেলার কারণ ধূলি-ধূসরিত হইতেছে। সেগুলি যত্নে কুড়াইয়া, মাজিয়া-ঘষিয়া সাহিত্যের ব্যবহারে লাগান। অনেক পারিভাষিক শব্দের সহজবোধ্য প্রতিশব্দ এইরূপ ভাবে সংগৃহীত হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, অনেক সহজ বৈজ্ঞানিক শব্দ আমরা দুই প্রস্ত সঙ্কলন করিতে পারি। এক প্রস্ত সংস্কৃত নিষ্পন্ন, এক প্রস্ত চলিত-ভাষা-নিষ্পন্ন। যেমন thermometer অর্থে "তাপকাঠি" ও "তাপমান"। সাধারণ সংজ্ঞাজ্ঞাপক, কি সাধারণ ভাবার্থক শব্দ অনেক স্থলে সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ না হইলে

চলিবে না; এ বিষয়ে সংস্কৃত ব্যুৎপত্তির অসীম আকর। সংস্কৃত আমাদের যেরূপ সহজে আয়ত্ত হইতে পারে, গ্রীক ল্যাটিন ইংরাজীর পক্ষে অবশ্য কোন অংশেই সেরূপ নয়। পরন্তু, নানা ব্যাবহারিক বস্তুবাচক শব্দ, চলিত ভাষা হইতেই কিছু-কিছু পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া সঙ্কলন করা যাইতে পারে। যে সকল ইংরাজী শব্দ কথ্য ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে, রূঢ় হইয়াছে, বাঙ্গালার সহিত উচ্চারণ-সঙ্গতি রাখিয়া সে সকলও আমরা সাহিত্যের অধিকারে গ্রহণ করিতে পারি। ইহাতে কোন হানি নাই, প্রত্যুত লাভই আছে। এইরূপ করিয়াই নূতন নূতন অবস্থা ও অভিজ্ঞতার সংযোগে ভাষার পরিণতি সাধিত হয়। বস্তু বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় অনেক নামবাচক পদ আমরা এইরূপে পাইতে পারি। অথবা এক প্রস্ত এইরূপ শব্দের সহিত আর এক প্রস্ত বাঙ্গালা প্রতিশব্দও প্রণয়ন করা যাইতে পারে। তার পর ব্যবহারের প্রতিযোগিতায় যে শব্দ জয়ী হইবে, সেই শব্দই ভাষায় স্থায়ী স্থান পাইবে। ব্যবহার-গুণে সুপরিচিত বস্তুবাচক শব্দ আত্মসাৎ করায় ভাষার তেমন দোষ হইবে না; দোষ হয় অকারণে বা অল্প কারণে ভাষার অন্বয় ও গঠন প্রণালী ঘটিত নানারূপ রূপান্তর করায়। যাহা হউক, সে সম্বন্ধে এখন মাথা ঘামাইবার তেমন দরকার নাই। যথার্থ শক্তিশালী ও শিল্পকুশল লেখকেরাই সে সম্বন্ধে সাহিত্যের মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। উপস্থিত আমরা, যতদূর পর্য্যন্ত ভাষায় পরিপাক পাইতে পারে,—নূতন উপাদান সংগ্রহ ও পুরাতন উপাদানের নূতন অর্থ বিনিশ্চয় করিতে থাকি। এই শব্দ-সঙ্কলন ব্যাপারে অনেক সঙ্কর বা মিশ্র শব্দের উদ্ভব হইবে, মানি। কিন্তু ইহাতে বিশেষ চিন্তার কারণ দেখি না। এরূপ কথা বাঙ্গালায় অনেক চলিয়াছে, ও ক্রমশঃ চলিবে, এবং চলা দরকারও মনে করি। বাঙ্গালীর জীবন নানা দিকে কুণ্ঠিত। এই সাহিত্য-ক্ষেত্রেই যা কিছু একটু প্রাণের হিল্লোল আছে। এটি আমাদের জাতীয় শ্রীক্ষেত্র। এখানে আর ভেদবুদ্ধি, পংক্তিবুদ্ধি তুলিতে দিবেন না। ব্যাকরণের শুচ্যশুচি জ্ঞান এখানে একটু খর্ব্ব করিতে হইবে। যাহাতে বাঙ্গালার মূল প্রকৃতিটিতে আঘাত না লাগে, যাহাতে বাঙ্গালার ডৌলটি খারাপ না হয়, মাত্র সেইটুকু লক্ষ্য করিয়া, যত পারেন শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি করিতে থাকুন। শব্দ সাহস করিয়া, স্ফূর্ত্তি করিয়া চালাইলেই চলিবে। ভাষা ধনের ন্যায় ব্যবহারেই বাড়ে। এই ধরুন না, আদালতের ভাষা। ইহা ত সঙ্কর ভাষার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রুচিবাগীশের মামুলী উপহাস ও নাসিকা-কুঞ্চনস্থলীয় হইয়া রহিয়াছে। আদালতের ভাষায় যথেষ্ট দোষ ত্রুটি আছে স্বীকার করি,—আর থাকিবার কারণও আছে। অল্প-শিক্ষিত বা শিক্ষিত হইয়াও ভাষার বিষয়ে অনবধান লোকের হাতে ইহা যেমন-তেমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, সাক্ষাৎ প্রয়োজন-মুখে উদ্ভিন্ন এই ভাষার যতটা কোমরে বল আছে মনে হয়, এখনকার অনেক পসারওয়ালা কলাসাহিত্যে তাহার অর্দ্ধেক থাকিলেও ভাল হইত। মনে হয় সৌখীন তুলালী রচনার অত্যধিক অনুশীলনে আমাদের কাণ ও ও রুচি খারাপ করিয়া ফেলিতেছি। এই দোষের প্রতিকার হইতেছে—শিক্ষার অন্তর্ভূত সমস্ত সারবান বিষয় বাঙ্গালায় আলোচনা করা। আমাদের মনে করা উচিত যে, জীবন-ব্যাপারের যে অংশ বাঙ্গালায় আলোচনা না করিব, সেই অংশই অচিরে আমাদের ভাষার করতল ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে; এবং ঠিক সেই পরিমাণেই আমাদের জাতীয় জীবনের পরিধি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে। পরিভাষা অশন-বসনের ভাষার ন্যায় তরল, স্বতঃবোধ্য বা মুখরোচক হয় না। অথচ অনুশীলনের গুণেই উহা স্বস্থানোচিত ও সুষ্ঠু শুনায়। এই ধরুন না, ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র, সঙ্গীত-শাস্ত্র বা বৈদ্যক শাস্ত্রের আলাপে আমরা আমাদের নিজস্ব পরিভাষা এখনও অনেক শুনিতে পাই। কিন্তু, সেগুলি ত কাণে বেসুরা বা বেলয় লাগে না,—পরন্তু, অতি যথাসঙ্গত বলিয়াই শুনায়। কিন্তু দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধিক প্রচার ও প্রতিপত্তির সহিত রোগের নাম, নিদান ও লক্ষণ বর্ণনায় আমরা ক্রমশঃই ইংরাজী ভাষার শরণাপন্ন হইয়া পড়িতেছি। আজ-কাল বড় কাহারও "মন্দাগ্নি" বা "অজীর্ণ" হইতে শুনা যায় না। অবশ্য, যদি কথার সঙ্গে রোগের পাটটাও দেশ হইতে চলিয়া যাইত, তাহা হইলে মন্দ ছিল না। কিন্তু, তাহা দূরে থাকুক, রোগ ত বিলাতী dyspepsia নামে আরও প্রকট হইয়া বসিয়াছে; অথচ, dyspepsia কি বাঙ্গালীর কাণে কোন আভ্যন্তরীণ অর্থ সূচিত করে? ইংরাজের কাণেই বা কি যৌগিক অর্থ সূচিত করে, জানিতে কৌতূহল হয়। অথচ, জিজ্ঞাসা

রিলেই উত্তর পাইবেন, বাঙ্গালা কথাটা "কেমন কেমন কে"। এই "কেমন কেমন ঠেকা"—এই ত হইয়াছে গের মূল। মাতৃভাষার সম্বন্ধে আমাদের এত চক্ষুলজ্জা ন? শুধু অব্যবহারেই এমনটি হয়। কথা-বার্ত্তায়, সমিতিতে, এবং সর্ব্বোপরি শিক্ষামন্দিরে, বাঙ্গালার ন্দ-প্রচলন দরকার। তাহা হইলেই সব দোষ, সব বাধা টিয়া যাইবে। উপস্থিত শিক্ষা-সমস্যা-সমাধানের আদ্য-, মধ্য-কথা, অন্ত্য-কথা হইতেছে—বাঙ্গালার ব্যবহার, হার, ব্যবহার। সম্ভবতঃ আপত্তি হইতে পারে, এখনও ত ছকাল ধরিয়া তরজমা-পুস্তকের সাহায্যে পঠন পাঠন গত্যন্তর নাই। নাই বা থাকিল! কৃতবিদ্য লোকের জমা-পুস্তক কেন না সুপাঠ্য হইবে? খোদ ইংরাজী ত্যের ইতিহাস ত টেইনের ফরাসী গ্রন্থের অনুবাদের াহায্যে এম-এ ক্লাসে পড়ান হইতেছে; অথবা এতকাল ়া আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিজ্ঞানের অনেক াই ত অনুবাদ-গ্রন্থ। আর, যদি তরজমাই করিতে হয়, ব, দুই-চারিজন অভিজ্ঞ লোকের করাই ভাল, না, শত- ত তরুণমতি শিক্ষার্থীকে তরজমার কলে নিষ্পিষ্ট করিয়া, াদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে নির্জীব করিয়া ফেলাই ভাল? যতঃ, উচ্চশিক্ষার্থীরা ইংরাজীর সাহায্যে স্ব-স্ব অধীতব্য য়ের ইচ্ছানুরূপ আলোচনা করিতে পারিবেনই। াণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের ফলে ইংরাজী ার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান ত থাকিবেই। তা ছাড়া, াদের পক্ষে ইংরাজী সাহিত্য পাশ্চাত্য জ্ঞান-ভাণ্ডারে বশের একমাত্র দ্বার। বর্ত্তমান যুগে সর্ব্ব-ভারতীয় সমন্বয় ব্যাপারেও ইংরাজী ভাষা জাতীয় বুদ্ধির অন্যতম ন পরিপোষক। এই সকল কারণে ইংরাজী অবশ্য- অন্যতর ভাষা রূপে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা করিতে ব। আমাদের বক্তব্য এই যে, ইংরাজীকে আমরা বিধ শিক্ষার সাধন স্বরূপে নিয়োজিত করিয়া, ইংরাজী শিক্ষাকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছি। এই ম ভার মোচন হইলে, এবং এখনকার সুচিন্তিত লীতে ৭।৮ বৎসর শিক্ষা দিলে, ভবিষ্যতের শিক্ষার্থীদের াজী ভাষার অধিকার এখনকার চেয়ে কম ত হইবেই পরন্তু কোন-কোন অংশে ভাল হওয়ারই কথা।

ইংরাজীর আমি অবশ্য অনাদর করিতেছি না। আজ তিনচারি পুরুষ ধরিয়া বাঙ্গালী প্রাণপাত করিয়া ইংরাজীর চর্চ্চা করিতেছে। ইংরাজী ভাষার গুণও যে অনেক, তাহা অস্বীকার করি না। স্ফুরৎ-প্রভাময়ী, তেজোময়ী, বলদৃপ্তা, নানা তথ্যমালিনী, স্বাধীন চেতসী, ঋজু-বক্র-কুটিল-আবর্ত্তিত বিচিত্র গতিশালিনী, হাবে-ভাবে-বিলাসে-লাস্যে ভঙ্গিমায়িত, এই সুন্দরীর নেশা বাঙ্গালীর কিরূপ হাড়ে হাড়ে লাগিয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু এই নেশার ঝোঁক বাঙ্গালী না কাটাইতে পারিলে, বাঙ্গালীর ভদ্রস্থতা নাই। এই নেশার ঝোঁকেই আমরা মাতৃভাষার প্রতি নাড়ীর টান ভুলিয়াছি—আমাদের মাতৃস্তন্যের পীযূষ-ধারা—আমাদের শিশুকণ্ঠের সেই আদ্যস্ফোট, আহার-ব্যবহার, প্রীতির, সৌজন্যের, বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ পল্লী ও গৃহ-জীবনের ভাষা—যাহাতে কত ভক্তির কথা, কত ভাবের কথা, কত প্রেমের কথা, কত ক্ষেমের কথা, কত ঐহিক-পারত্রিক, জন্ম-মরণের কথা, শিষ্ট-মধুর ছন্দে উচ্চারিত হইয়াছে—এবং যাহা আজিও বর্ত্তমান-যুগোচিত শিল্প-কলা, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বুদ্ধি-সিদ্ধ নানা তথ্য বাঙ্গালীর জীবনে স্বতঃ প্রকাশিত করিবার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় আবেগে বাঙ্গালার প্রত্যেক সহৃদয় মনীষী, সাধক ও উদ্যোগী পুরুষের হৃদয় প্রত্যাসন্ন এক মহা দৈববাণীর ন্যায় আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছে—সেই ভাষার প্রতি অমনোযোগী হইয়াছি। এই মাতৃভাষাকে ন্যায্য অধিকার দিয়া, বিদ্যা-মন্দিরের স্বর্ণপীঠে বসাইয়া ইংরাজীর যতদূর চর্চ্চাই করুন, সমস্তই ফলোপধায়ক হইবে। নচেৎ আমরা ইংরাজী বিদ্যার ভারবাহী মাত্র থাকিব, ইহার মন্ত্র কখন প্রয়োগ করিতে পারিব না।

অবশ্য শিক্ষা-বিভাগে নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করা কিছু সময়সাপেক্ষ। এই অবসরে আমাদের যথাসম্ভব বিধি-ব্যবস্থা নিরূপণ করা এবং সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করা দরকার। কতকগুলি অন্ততঃ কাজ-চালান যোগ্য পাঠ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করা আবশ্যক। ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সাধারণ পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন প্রভৃতি উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করা শ্রমসাধ্য হইলেও অসাধ্য নয়। যদি উচ্চতর গণিত বিজ্ঞানের পাঠ্যগ্রন্থ সদ্য সদ্যই প্রণয়ন করা সম্ভব না হইয়া উঠে, তাহা হইলে কিছুদিন ইংরাজীর সাহায্যেই ঐ-ঐ বিষয়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চালাইতে হইবে। তবে ব্যাখ্যান ও বিবৃতি অধ্যাপনাকালে যথা-

সম্ভব বাঙ্গালায় করিলে ঐ সকল বিষয়ের 'আদরা' বা আকৃতি ক্রমশঃ বাঙ্গলা ভাষায়ও ফুটিয়া উঠিবে। তখন পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করা সহজ হইবে। তবে এই পাঠ্যপুস্তক ...নের সঙ্গে-সঙ্গে এবং তৎকল্পে আর একটা অবশ্য-প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য আছে। যেহেতু ইংরাজীকে সব বিষয়ে ভাষার আদর্শ ও মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করিতে আমাদের একটা প্রবৃত্তি হইয়াছে; অতএব আবশ্যক ইংরাজী ভাষার সহিত সমন্বয় করিয়া প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙ্গালা শব্দমালা ও শব্দার্থের বিচারমূলক বহুবিস্তৃত ও ধারাবাহিক আলোচনা করা। এই সূত্রে অভিধান সঙ্কলন বিষয়ে—অর্থাৎ খাস বাঙ্গলার অভিধান এবং ইংরাজী-বাঙ্গলা অভিধান উভয় দিকই—যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইতেছে, তাহাতে প্রত্যেক সহৃদয় বাঙ্গালীর প্রাণ পুলকিত না হইয়া যায় না। আর একখানি পারিভাষিক অভিধান একাধারে বা খণ্ডশঃ প্রণয়ন করাও আবশ্যক। এরূপ গ্রন্থ বা তাহার উপকরণ বিক্ষিপ্ত আকারে রহিয়াছে সত্য, কিন্তু এই সকলের সমন্বয় করিয়া দুই-একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারিলে, শিক্ষাদানের ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের প্রচুর আনুকূল্য হইবে। এ বিষয়ে বাঙ্গালার সুধী আচার্য্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এবং বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিষৎ অনেক কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু ইহা একমাত্র তাঁহাদেরই কাজ মনে করা ঠিক নয়। সাহিত্যের সহিত যাঁহারা কোনরূপ সংশ্রব রাখেন, এমন সকলেরই কিছু না কিছু মেহনত করিবার, সাহায্য করিবার অবসর আছে, স্থান আছে। এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালার প্রধান-প্রধান মাসিকপত্রগুলি প্রতি সংখ্যায় অন্ততঃ দুই-তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া পাঠক ও সংগ্রাহক সাধারণের জন্য শব্দ সংগ্রহ ও শব্দের অর্থ বিচারকল্পে উন্মুক্ত রাখেন, তাহা হইলে অনেক সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

শিক্ষা বাস্তবিক এক অনুপম সৃজনী শক্তি। শিক্ষক ও শিক্ষিতের সহযোগে অধীত বিদ্যা নিত্য নানা নব নব উন্মেষ লাভ করিবে; এবং শিক্ষক ও শিক্ষিতের সমবেত চেষ্টায় ও অনুশীলন-গুণে আমাদের উচ্চ শিক্ষার পরকীয় ভাব দূর হইয়া উহা স্বকীয় ভাব লাভ করিবে; এবং জাতীয় জীবনের যথার্থ বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিসাধক হইবে।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাঙ্গালার প্রবর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য,—এই সুমহৎ উদ্দেশ্য বা আদর্শ হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া, সকলে একযোগে যাহার যেরূপ ভাবে সম্ভব, নিজ-নিজ শক্তি-সাধ্যের মধ্যে, উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিধিমতে সচেষ্ট হউন।

যৌতুক

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্]

মোহনপুর গ্রামে দুইঘর বুনিয়াদি জমিদার ছিলেন—মুকুন্দ মুখুজ্যে এবং গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে। নবাবী আমলের সনন্দের উপর ইঁহাদের জমিদারীর ভিত্তি স্থাপিত; সুতরাং মর্য্যাদায় ইঁহারা হালের রাজা-মহারাজা হইতে আপনাদিগকে ...াংশেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন।

গ্রামের দুই দিকে দুই বৃহৎ গোষ্ঠী দুইটি বিসুবিয়সের ...ত কেমন করিয়া যে এতদিন কাটাইয়া দিল, বিস্ময়ের ...ষয় ছিল সেইটিই। কারণ, অগ্ন্যুৎপাতই ছিল ইঁহাদের ...ধারণ ধর্ম্ম, এবং তাহার অভাব হইলেই গ্রামবাসী প্রমাদ ...ণিত। লাঠি এবং সড়কি যখন পরস্পরের মধ্যে চলিত, ...খন প্রজাকুল নির্ভয়ে জীবন-যাপন করিত; কিন্তু যখন তাহারা সেই মহান লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইত, তখন প্রজারা তাহাদের মাথা এবং জীবন লইয়া কিছু বিপদে পড়িত।

নবাবী আমল হইতে মধ্য-ইংরাজ আমল পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ভাবে এই ধারায় কাজ চলিয়া আসিতেছে। তাহার পর একটা ঘোরতর হাঙ্গামার ফলে, মুকুন্দ মুখুয্যের জনৈক পিতৃপুরুষ কালাপানির পারে যাওয়ার পর হইতে, দুই পক্ষই কতকটা নিরস্ত হইয়া গেছেন। তাহার পর যাহা হইয়াছে তাহা গৃহ-বিবাদমাত্র।

(২)

যাহাদের বংশ-প্রীতির ইতিহাস এমনি, বিধাতার দুর্জ্ঞেয় বিধানে তাহাদেরই বংশে একটা অভিনব কাণ্ড ঘটিল।

ন্দ মুখুজ্যের পুত্র সুরেশ, গোবিন্দ বাঁড়ুয্যের কন্যা লাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

রেলের গাড়ীতে প্রথম পরিচয়। অত্যন্ত গ্রীষ্মের দিনে রেশ গরমের ছুটি পাইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। কাহার াহ উপলক্ষে কমলা কলিকাতায় গিয়াছিল,– সেও তাহার :-এর সঙ্গে একই গাড়ীতে ফিরিতেছিল। যেমন গরম, াীতে তেমনি ভিড়;—কিন্তু কমলার অকর্ম্মণ্য ভাইটি ানি নিরুপায়। গাড়ী ছাড়িবার পর সামান্য জলের কমলা তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া উঠিল; কিন্তু জলের কোন স্থাই নাই। কমলা তাহার ভাইকে বলিল, দাদা, জল পেলে আর যে বাঁচি না। সেই গাড়ীরই এক পার্শ্বে রেশ বসিয়া ছিল,—সে তাহার পাত্র হইতে এক-গ্লাস তল জল লইয়া গিয়া কমলাকে দিল। তখন বিচার-াচারের সময় ছিল না,—কমলা কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহা পান রল।

এই সামান্য উপলক্ষটুকু আশ্রয় করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রীতি জাগিয়া উঠিল, তাহা অসামান্য। স্রোত যেখানে কাল উপলখণ্ডে আবদ্ধ আছে, সেখানে কোনও উপায়ে সে এতটুকু পথ করিয়া লয়, ত' তাহার ধারা যেমন ল হয়, তেমনি এই প্রেম দুই কুল ছাপাইয়া ল।

কথাটা কাণাকাণি হইতে-হইতে মুকুন্দ মুখুজ্যে এবং বিন্দ বাঁড়ুয্যেরও কাণে গেল। গোড়ায় তাঁহারা বালক বালিকার এই অর্ব্বাচীনতাকে হাসিয়া উড়াইয়া ার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যেহেতু বিংশ শতাব্দী বী আমল নহে, সেই হেতু কথাটা এত সহজে ল না।

ব্যাপার কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে; এবং এই দুই-ার মিলনও যে সর্ব্বাংশেই বাঞ্ছনীয়, তাহা দুইজনেই লেন। সুরেশ বুদ্ধিমান, বিনয়ী, এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের -উপাধিধারী। সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষ-পড়া তেছিল। কমলা রূপে এবং গুণে সর্ব্বাংশেই তাহার াা। অর্থেরও অভাব কোন পক্ষেরই ছিল না।

কিন্তু দুই বংশের ইতিহাস,—মর্য্যাদা পথ রোধ করিয়া াইল। যে মুখুয্যে-গোষ্ঠী বাঁড়ুয্যে-গোষ্ঠীর বিশটা মাথা াছে, এবং বাঁড়ুয্যে-গোষ্ঠী মুখুয্যে-গোষ্ঠীর পঁচিশটা মাথা ওয়ার কাহিনীতে গৌরবান্বিত, তাহাদের মধ্যে অবংশোচিত এই ব্যাপার!

শক্তি এবং মর্য্যাদায় এমনি করিয়া কিছু দিন যুদ্ধ চলিল; তাহার পর দুই পক্ষই যেন কতকটা রাজী হইলেন। তাহার কতকটা কারণ, হাতের কাছে কিছু করিতে পারার সুখ; একেবারে নিশ্চেষ্ট ভাবে কত দিন বসিয়া থাকা চলে? বিংশ শতাব্দীর আইনে যদি মাথা-ফাটান নিষিদ্ধই হইল, তাহা হইলে অন্ততঃ বিবাহ না দিলেই বা চলে কি করিয়া? বিশেষ, যখন বিংশ শতাব্দীর নারীরা এমনি অযৌক্তিক যে, এত বড় বংশ-মর্য্যাদা সত্ত্বেও মুখুয্যে এবং বাঁড়ুয্যে পরিবারের পুরুষদের জীবন বক্তৃতার প্রবাহে প্রায় দুর্ব্বহ করিয়া তুলিল।

সুতরাং দীর্ঘ-সুপ্ত অজগরের নিদ্রাভঙ্গের মত, এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আবার একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। পুরাতন গৃহের জীর্ণ-সংস্কার আরম্ভ হইল, পুরোহিতের ডাক পড়িল, এবং প্রাচীন বাস-স্থান হইতে পাঁজি-পুঁথি নামিতে আরম্ভ করিল।

(৩)

শরতের স্বচ্ছ সৌন্দর্য্যের আভাষ সবেমাত্র পাওয়া যাইতেছে। নদীর ধার কাশ-ফুলে সাদা হইয়া উঠিতেছে, আকাশের মেঘ লঘু হইয়া গেছে, এবং শিউলি ফুলের গন্ধে উষাকাল মধুর উপভোগ্য হইয়া উঠিতেছে।

দীর্ঘ কালের শত্রু দুই-পরিবারের মিলন-সূচনার সময় বটে! দুটা তিনটা মাস কোনও রকমে কাটিলে হয়!

* * *

হঠাৎ শুনা গেল, মুখুয্যে ও বাঁড়ুয্যের জমিদারীর মাঝামাঝি একটা জায়গায় পদ্মায় বৃহৎ চর পড়িয়াছে!

দুই শান্ত বিসুবিয়সে আবার চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা দিল! মুখুয্যে বলিল, ও চর আমার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত, বাঁড়ুয্যে বলিল আমার!

পুরাতন বংশ-মর্য্যাদা আবার নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিল। পাঁজি-পুঁথি যথাস্থানে ফিরিল, গৃহ-সংস্কার অর্দ্ধ-পথে থামিয়া গেল, এবং দারোয়ানরা লাঠি-সোঁটা তৈল-সিক্ত করিতে লাগিল।

তাহার পর উকীলের ঘরে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হইল।

দুই পক্ষ বাছিয়া-বাছিয়া চোখা-চোখা উকীল নিযুক্ত করিতে লাগিলেন, এবং ভবিষ্যৎ মামলার জন্য যথা-রীতি দুই পক্ষেই সংখ্যাতীত সাক্ষী তৈয়ার করার ধুম পড়িয়া গেল।

পদ্মার ধারে যেখানে চর উঠিয়াছিল, তাহার কাছা-কাছি ক্ষেত্রবাবু বলিয়া একজন মাঝারি-গোছ জমিদার ছিলেন। তিনি উভয় পক্ষেরই হিতৈষী;—সে অঞ্চলের তত্ত্বাবধান তিনিই করিতেন, এবং প্রয়োজনীয় সংবাদাদিও দিতেন। তিনি লিখিলেন, "তোমাদের দুই পরিবারের মধ্যে বৈরি-ভাব ঘুচিয়া গিয়া মিলনের সংবাদে বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু আবার বিবাদের সূত্রপাত দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। চরটা সমভাগে ভাগ করিয়া লইলে হয় না? তাহা হইলে অনেক অনর্থক মনঃকষ্ট ও অর্থনাশ হইতে পরিত্রাণ পাও।"

গোবিন্দ বাড়ুয্যে চোখ পাকাইয়া বলিলেন, "কখন না,—সব যায়, তাও সই।"

মুকুন্দ মুখুয্যে বলিলেন, "আলবৎ নয়!"

(৪)

ক্ষেত্রবাবুর পুত্র যোগেশ সুরেশের বন্ধু,—একসঙ্গেই কলিকাতায় পড়ে। যোগেশ পূর্ব্বেই বিবাহের কথা শুনিয়াছিল,—তাহার সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য সুরেশকে লিখিয়াছিল। সুরেশ তাহার উত্তর দিল, "ভাই যোগেশ, পদ্মার কোথায় না কি একটা চর উঠে সর্ব্বনাশ ক'রেছে। দুই পরিবারই তাকে দাবী করছেন। সেই পুরাতন ভাব আবার জেগে উঠেছে। বিবাহের কোন ভরসা দেখি না। জানি না, জীবন কোন্ পথে যাবে! সংসারের ওপর স্পৃহা আর এতটুকু নেই। তোমার সুরেশ।"

* * * *

কয়েকদিন ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি হইয়াছে ও বাতাস বহিয়াছে। শুনা যাইতেছে যে, সমুদ্রে মহা ঝটিকা হইতেছে। সকলেই আসন্ন উৎপাতের ভয়ে বিপন্ন। সংবাদ আসিয়াছে যে, হঠাৎ পদ্মার জল বাড়িয়া বহু ব্যক্তি গৃহ-হীন ও বিপদ্-গ্রস্ত হইয়াছে। আরও বিপদের কথা এই যে, এ ঝড় এবার অপ্রত্যাশিত ভাবে অসময়ে হইয়াছে,—সময়ে বিশেষ কোন উৎপাত হয় নাই।

বাদল তখনও ছাড়ে নাই। মামলার তদ্বির কয়েক দিনের জন্য স্থগিত আছে। এমন সময়ে ক্ষেত্রবাবুর নিকট হইতে গোবিন্দ ও মুকুন্দ বাবুর নিকটে চিঠি আসিল—

"তোমাদের বিবাদীয় চর আর নাই। হঠাৎ পদ্মার জল বাড়িয়া তাহাকে একরাত্রে কাটিয়া দিয়াছে। চিহ্ন-মাত্র নাই। বোধ হয় মঙ্গলময়ের বিধান। কারণ, এই চর উপলক্ষ্য করিয়া তোমাদের বৈরি-ভাব আবার জাগিয়া উঠিতেছিল। আমার বিশ্বাস, এ বিবাহ ভগবানের অভিপ্রেত; তাই তিনি এমনি করিয়া তোমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন। অতঃপর এ বিবাহ যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া ফেলা উচিত।"

সংবাদ শুনিয়া দুই পক্ষই ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। এমন একটা বড়-গোছের কাজ হাতের কাছে আসিয়া অকারণ হারাইয়া গেল! এখন কি করা যায়! কাজ ত চাই! তাহার উপর এমনি করিয়া হঠাৎ চর কাটিয়া যাওয়াটা কোন পক্ষেরই শুভ বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং, আবার বিবাহের কাজেই মনোনিবেশ করিতে হইল,—আবার সংস্কার আরম্ভ হইল,—আবার পাঁজি-পুঁথি আসিল।

(৫)

বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শত্রুতা যেমন আড়ম্বরের সহিত চলিয়াছিল, বিবাহেও তেমনি ধুম হইয়াছে। এত বড় আড়ম্বরের বিবাহ যাহারা অতি বৃদ্ধ তাঁহারাও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

বিবাহের পরদিন বর ও কন্যাপক্ষ একত্র বসিয়াছিলেন;—ক্ষেত্রবাবু ও যোগেশও আসিয়াছিল। কথায়-কথায় মুকুন্দ বলিলেন—"চরটা এক রাত্তিরে কেটে গেল হে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, "কোন্ চর?"

মুকুন্দ কহিলেন "বিবাদীয় চরটা!"

ক্ষেত্রবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, "কই, সে ত কাটেনি, তেমনই আছে।"

মুকুন্দ ও গোবিন্দ সমস্বরে কহিলেন, "কাটেনি—এঁ্যা! লিখেছিলে যে!"

ক্ষেত্রবাবু কহিলেন "কৈ, আমি এমন কথা লিখ্‌ব কেন?"

মুকুন্দ কহিলেন "কি রকম? চিঠি রয়েছে যে—"

নতমুখে যোগেশ আসিয়া কহিল, "মাপ করবেন, ও আমি লিখেছিলাম।"

সমস্বরে গোবিন্দ ও মুকুন্দ কহিলেন, "তুমি? কেন এমন মিছে কথা লিখেছিলে?"

যোগেশ কহিল, "ভেবে দেখলাম, তা নইলে বিয়েটা হয় না,—চর ত' রইলই।"

ক্রুদ্ধ পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত নিস্ফল আক্রোশে দুইজনে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। তাহার পর ধীরে-ধীরে গোবিন্দের দৃষ্টি কোমল হইয়া আসিল। যোগেশের দিকে সজল চক্ষে চাহিয়া কহিলেন, "বেশ করেছ বাবা! দীর্ঘজীবী হও। ও চরটায় আমার অংশে যেমন করে হোক দু'তিন হাজার টাকা আয় হোত,—আমি আমার সমস্ত স্বত্ব তোমাকে দিলাম।"

মুকুন্দও মন্ত্র-চালিতের মত কহিলেন, "আমিও দিলাম। বড় ভাল কাজ করেছো বাবা, বড় ভাল।"

যোগেশ শান্ত ভাবে হাসিয়া কহিল, "তা হলে আমি সমস্ত চরটাই এই বিবাহের যৌতুক স্বরূপ নব-দম্পতিকে দিলাম।"

দুইখানি পুস্তক

মনোবিজ্ঞান*

[অধ্যাপক শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, এম্-এস্-সি, এম্-বি]

নাটক-নভেল প্লাবিত বাঙ্গলা দেশে চারুবাবু বাঙ্গলা ভাষায় 'মনোবিজ্ঞান' রচনা করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় অপর কোন পুস্তক নাই। পাশ্চাত্যদেশে মনোবিজ্ঞান, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞান শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত।

পুরাকালে আমাদের দেশে মনোবিজ্ঞান নামে কোন পৃথক শাস্ত্র ছিল না। দর্শনশাস্ত্র মধ্যেই মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহের বিচার করা হইত। সাংখ্য-দর্শনে মনোবিজ্ঞানের অনেক জটিল রহস্যের মীমাংসা আছে। যদিও চারুবাবুর পুস্তকে শাস্ত্রোক্ত কোন বিষয়ের বিচার নাই; তথাপি, তিনি পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অনেক বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন এবং নানা কবিতা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টি সরস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সকল স্থানেই চারুবাবুর বর্ণনা যে সরল হইয়াছে, এ কথা আমরা বলিতে পারিলাম না। তিনি ইংরাজী technical terms এর যে সকল প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই শ্রুতিকঠোর হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, তাঁহার স্বরচিত বা প্রবর্ত্তিত প্রতিশব্দগুলির সহিত তাহাদের ইংরাজী নামগুলি দেওয়া উচিত ছিল। চারুবাবুর পুস্তক হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিলে এই ত্রুটি উপলব্ধ হইবে।

"শ্রুতি-বিবরের প্রথমাংশ উপাস্থিময়; কিন্তু ইহার ভিতর দিকে অস্থিময় প্রাচীর আছে। এই নলপথটী পার্শ্বকপালাস্থিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পটহ-ঝিল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া বাদামী গবাক্ষ পর্য্যন্ত প্রদেশকে মধ্যকর্ণ বা পটহ-গহ্বর বলা হয়। এই পটহ-গহ্বরে তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি আছে; যথা,—মুদ্গরাস্থি, নেহাই অস্থি এবং রেকাব অস্থি।" পৃঃ ১১৩।১১৪।

পুস্তকে চিত্রদ্বারা উপরিউক্ত বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা থাকিলেও, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দের অভাবে যে-কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণাই অনেক সময়ে কষ্টকর হইয়া পড়ে, একথা সত্য; কিন্তু চারুবাবু বাঙ্গালা ভাষায় মনোবিজ্ঞানের প্রথম পথ-প্রদর্শক; তিনি যে সকল terms ব্যবহার করিবেন, পরিণামে তাহা স্থায়ীভাবে প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এজন্য আমাদের অনুরোধ, যেন তিনি পরবর্ত্তী সংস্করণে এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হন। মনোবিজ্ঞানে শারীর-তত্ত্বের অনেক terms-এর ব্যবহার দেখা যায়। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় শারীর-তত্ত্বের অনেক পরিভাষা নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বাচিত শব্দগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা এ দিকে চারুবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। চারুবাবুর সাধারণ বিষয়ের বর্ণনাও অনেক স্থলে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; যথা,—

"সত্যজ্ঞান-উদ্দীপ্ত ভাবকে সত্য-রস বলা হয়। বস্তুনিচয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় হইতে এই ভাবের উদ্রেক হয় বলিয়া, ইহাকে বিজ্ঞান-রস বলা হয়; আবার জ্ঞানের আলোচনায় এই রসের উদ্রেক হয় বলিয়া, ইহাকে জ্ঞান-রসও বলা হইয়া থাকে। অতএব এই রসের নাম—

---

* পাটনা কলেজের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ, এম-এ প্রণীত; মূল্য তিন টাকা মাত্র। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

সত্য-রস
জ্ঞান-রস
বিজ্ঞান-রস ৩৮। পৃঃ।

গ্রন্থকারের বক্তব্য এই বর্ণনায় বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। আমাদের মনে হয়, চারুবাবু তাঁহার পুস্তক "অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকের" আদর্শে লিখিয়াছেন;—এই জন্যই বর্ণনা অনেক স্থলেই চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

৩৮।৩৫ পৃষ্ঠায় চারুবাবু দুইটী চিত্র দিয়াছেন; পাঠকগণ এই চিত্রে কি দেখিবেন তাহার কোনই বর্ণনা নাই। "চিত্রখানি এক চক্ষুর দ্বারা দেখিলে, কিম্বা কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া দেখিলে, অবধানের চাঞ্চল্য আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।" এই "অবধানের চাঞ্চল্য" যে কি, তাহা পাঠক সহজে বুঝিবেন না। কবিতার পরিমাণ কিছু কমাইয়া এই সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ দিলে, গ্রন্থখানি সুখ-পাঠ্য হইত এবং অযথা ইহার কলেবর বৃদ্ধি পাইত না।

পাশ্চাত্য দেশেও অনেক দিন পর্য্যন্ত মনোবিজ্ঞান দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল; এবং তজ্জন্য ইহার সবিশেষ উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। অধুনা Wundt প্রমুখ পণ্ডিতগণের চেষ্টায় মনোবিজ্ঞানের পৃথক আলোচনা হইতেছে। ২০ বৎসরের পূর্ব্বের মনোবিজ্ঞান ও আধুনিক মনোবিজ্ঞানে অনেক বিষয়েই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। চারুবাবু দর্শনের অধ্যাপক; তিনি পুরাতন দার্শনিকদের দৃষ্টান্তেই তাঁহার পুস্তক লিখিয়াছেন। মনোবিজ্ঞানের অনেক আধুনিক তত্ত্বের তিনি সন্ধান রাখেন নাই।

...৭৭ পৃষ্ঠায় চারুবাবু লিখিয়াছেন, "এক হইতে সপ্তম বর্ষ পর্য্যন্ত মানুষের মন অবস্থার দাস, পারিপার্শ্বিক শক্তির ক্রীড়নক মাত্র। এখন মন এক প্রকার নিষ্ক্রিয়। এখনও চিন্তার উন্মেষ হয় নাই। ভূতের পা তালগাছের" মত ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে চারুবাবু মনোবিকাশের যে পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা একেবারেই ভ্রান্ত। অবশ্য পূর্ব্বেকার মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের ধারণা এই প্রকারই ছিল; কিন্তু, Darwin, Preyer, Kirkpatrick, Barnes, Stanley Hall, Helmuth প্রভৃতি আধুনিক বিশেষজ্ঞগণের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের।

৮ বিদ্যাসাগর মহাশয় বোধোদয়ে লিখিয়াছিলেন "স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র।" চারুবাবুও তাঁহার পুস্তকে ২৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "স্বপ্ন নিশ্চেষ্ট কল্পনা মাত্র। অতএব স্বপ্ন ১। চালক-বিহীন, ২। উদ্দেশ্য-বিহীন, ৩। অমূলকতা দ্রষ্টা, ৪। কল্পিত চিত্রে বাস্তব জ্ঞান, ৫। স্মরণ অসাধ্য।" স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে চারুবাবু কোন আধুনিক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এখন আর স্বপ্নকে অমূলক চিন্তা বা নিশ্চেষ্ট কল্পনা বলিয়া মনে করেন না। স্বপ্নের অনেক রহস্যই এখন উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আমরা চারুবাবুকে Friend's "Interpretation of Dreams" পড়িতে অনুরোধ করি।

গ্রন্থের অন্যান্য স্থানে আরও অনেকগুলি সামান্য সামান্য ভুল রহিয়াছে। ৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে "গন্তব্য পথ স্থির হইলে, প্রলোভন সহজেই পরাভূত হইবে, প্রমাদ অন্তর্হিত হইবে, বাসনার তৃপ্তি হইবে, এবং কৃতকার্য্যতা পুরস্কার হইবে।" প্রলোভনের পরাভব অধিকাংশ স্থলেই গন্তব্য পথ নির্ণয়ের উপর নির্ভর করে না। চারুবাবুর পুস্তকে স্থানে স্থানে প্রলোভন, ক্রোধ, আত্মসংযম, সৌন্দর্য্য-বোধ, ঘৃণা বিবেকের অনুজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে; এই সকল মানসিক ভাব সম্বন্ধে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকগণ নানাবিধ নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন; চারুবাবুর পুস্তকে তাহার কোনই উল্লেখ নাই। ১০৭ পৃষ্ঠায় চারুবাবু "ইন্দ্রিয়ের পরাক্রম" সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও ভ্রম-প্রমাদশূন্য নহে। তিনি "স্বার্থ" ও 'ইন্দ্রিয় পরাক্রমে' গোলমাল করিয়াছেন। ২৩০ পৃষ্ঠায় চারুবাবু উদাহরণ দিতেছেন "শিক্ষক মহাশয় একটী পাত্রে অম্লজান নামক বাষ্প রাখিয়া তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ছাত্রেরা দেখিল যে বাষ্প জ্বলিয়া উঠিল;" অম্লজান বাষ্প নিজে জ্বলে না।

আমরা আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে চারু বাবু তাঁহার পুস্তকখানি অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করিতে সচেষ্ট হইবেন—সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিও সন্নিবেশিত করিবেন। তিনি এই পুস্তক সঙ্কলনে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম মনোবিজ্ঞান প্রণয়ন করিয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

পদচারণ *

[শ্রীজলধর সেন]

নামটা দেখলেই মনে হয় যে, বইখানা নিতান্ত dilletentic, নিতান্ত সৌখীন রচনা। এ ধারণার জন্য কবি নিজেই কতকটা দায়ী। প্রমথ বাবুর পাকা হাতের পরিচয় আমরা এ যাবৎ গদ্যসাহিত্যের ভিতর দিয়েই পেয়েছি; কিন্তু সেই পাকা হাত হাল্কা ক'রে নিয়ে যে তিনি পদ্য সাহিত্যের উপবনেও অপূর্ব্ব কুসুম চয়ন ক'রতে পারেন, তার পরিচয় 'পদচারণের' পূর্ব্বে এক 'সনেট পঞ্চাশৎ' ছাড়া আর কোথাও পাইনি। বছর কয়েক পূর্ব্বে 'সনেট, পঞ্চাশৎ' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মনে একটা বিশেষ স্ফূর্ত্তি অনুভব ক'রেছিলুম এই কারণে, যে, এতদিন বাদে এমন কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত হ'য়েছে, যাতে কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের প্রভাব মোটেই লক্ষিত হয় না, যা ছন্দাংশে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এবং কাব্যাংশে একটা বিশিষ্টতার ছাপ-মারা। তার পর প্রমথ বাবু গদ্য রচনায় এমন মেতে গেলেন যে, এক 'পদচারণ' ছাড়া কাব্য সাহিত্যে আর তিনি কিছুই দিতে পারলেন না।

---

* শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

কিন্তু তিনি যা' দিয়েছেন, তার জন্তে আমরা কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রীয় যুগে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ব্যতীত এতটা অনন্সতন্ত্রতা অন্ত অনেক কবির রচনায় দেখা যায় না।

মাইকেলের আমল থেকে আমরা চতুর্দ্দশপদী কবিতার সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু সনেট-জিনিষটা চতুর্দ্দশপদী হ'লেও তার চেয়ে আরো কিছু বেশী। ইতালীয় বা ফরাসী ধরণের (এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ খুব কম) সনেট লেখা যে কত কঠিন ব্যাপার, তা' ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। দক্ষ শিল্পী ব্যতীত সনেটে নিজের গুণপনার পরিচয় কেহই দিতে পারেন না—তার কারণ, "এ পাত্রে যায় না ঢালা একগঙ্গা রস।" এমন কঠিন বন্ধনে সনেট বাঁধা যে, একমাত্র "শিল্পী তাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।" এই সনেট রচনায় প্রমথ বাবু সিদ্ধহস্ত। বিদেশ থেকে আহরণ ক'রে তিনি যে সনেটের চারা আমাদের দেশে বুনেছেন, তা' যে বাংলা দেশের আব-হাওয়াতে কালে পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

'পদচারণে'ও অনেকগুলি সনেট আছে; এবং আছে আরও দুটী কঠিন বিদেশী ছন্দ—ফরাসী Triolet ও ইতালীয় Terza Rima। Triolet বা তেপাটীর একটী নমুনা দিই; তাই থেকে বোঝা যাবে যে, এ ছন্দটীও বাংলা ভাষায় কেমন অসঙ্কোচে নিজের আসন অধিকার ক'রে নিয়েছে—

জান সখি কেন ভালবাসি
ওই তব ফোটা মুখখানি,
ওই তব চোখভরা হাসি
জান সখি কেন ভালবাসি?
যবে আমি তোমা কাছে আসি,
ঠোঁটে মোর ফোটে দিব্য বাণী।
তাই সখি আমি ভালবাসি
ওই তব গোটা মুখখানি।

একই চরণের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়েও কতটা কবিত্বের বিকাশ সম্ভব, কবি তা' দেখিয়েছেন। Terza Rima ছন্দের একটু নমুনা দিই—

যৌবনে বাসনা ছিল দুনিয়ার ছবি,
আঁকিতে উজ্জ্বল ক'রে সাহিত্যের পত্রে,
বর্ণের স্বর্ণের লাগি পুজিতাম রবি।

কলাতে সঙ্কল্প ছিল মোর প্রতি ছত্রে,
আকাশের নীল আর অরুণের লাল,—
এ দুটী বিরোধী বর্ণ মিলিয়ে একত্রে।

দলিত অঞ্জন কিম্বা আবির গুলাল
অথচ ছিল না বেশী অন্তরের ঘটে,—
এ কলি ছিল না কভু বাণীর দুলাল। ইত্যাদি।

এই terza rima ছন্দেই দান্তের মহাকাব্য রচিত। এর স্ক্রু-এর প্যাঁচের মত মিল এবং তিন চরণে ভাবের সমাপ্তি উল্লেখযোগ্য। এ সূত্রে রবীন্দ্রবাবুর একটা কথা মনে প'ড়ছে। সে হ'চ্ছে এই যে, "বাংলা কাব্য-ভাষার শক্তি এখন এত বেড়ে উঠেচে যে, অন্ত ভাষার কাব্যের লীলা-অংশও এতে প্রকাশ করা সম্ভব।"

এ তিনটী ছন্দ ব্যতীত পরিচিত অপরিচিত অনেক ছন্দে অনেক-গুলি কবিতা 'পদচারণে' স্থান পেয়েছে; তাঁর পাকা হাতের পিছনে যে একটা সবুজ-কাঁচা হৃদয় আছে, তা' সেগুলি থেকে বোঝা যায়।

বসন্ত কাল, ফুলের ফসলে পৃথিবী এখন মঞ্জুল। এ সময়ে—

ও কি কথা? কার ভয়ে হও তুমি ভীতু?
সুরাপানে পাপ হবে? হোক্ না, তাই বা।
জীবনে ক'দিন আসে কুসুমের ঋতু;
ফস্লে গুল্‌মে ছি ছি মধুপে তৌবা?

এখন তোমার "তৌবা" থাকুক, সংসারের বিজ্ঞতা এখন তোলা থাক্, সে অন্ত ঋতুতে দেখা যাবে, এখন বসন্তের সমস্ত সুধা এক নিঃশ্বাসে পান করা যাক্। পূর্ণিমা রাতে—

আমি আছি, তুমি আছ, আর আছে চন্দ্র,
পাত্রে ঢালো পোস্তরাজ,
কোলে তুলে এসরাজ,
সুরা আর সুরে মিশ্রে গাও গীত মন্দ্র।
এ রাতে কে কার মানে শাসন বারণ?
তুমি আমি নিশিচোর
থাকিব নেশায় ভোর—
বারোমাস উপবাস, আজিকে পারণ!

'পদচারণে'র সব কবিতাগুলিই—বিশেষতঃ সনেটগুলি, The Book of Tea, পত্র, বর্ষা, খেয়ালের জন্ম, প্রভৃতি এবং দুয়ানিগুলি (দু'লাইনের কবিতা) উল্লেখযোগ্য। স্থানাভাবে আমরা সেগুলি তুলে দিতে পারলুম না। তবে "ভারতবর্ষে"র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের উপর লিখিত সনেটটী উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ ক'রতে পারলুম না।

দ্বিজেন্দ্রলাল।

উদার আঁধার মাঝে বিদ্যুতের মত
উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিপ্র, তীব্র হাসি,
ঘনঘোর মেঘে ঘেরা দিগন্ত উদ্ভাসি;
দেখায়েছ বাহিরের উদারতা কত।

গভীর অরণ্য মাঝে ক্রন্দনের মত
উঠেছিল বেজে তব মন্ত্র-মন্দ্র বাণী,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুরে সুরে বেদনা উচ্ছ্বাসি;
বুঝায়েছ অন্তরের গভীরতা কত।

সে আলো হারিয়ে গেছে এ বিশ্ব ভুবনে,
সে সুর হারিয়ে গেছে এ স্পন্দনে;
যে আলো দিয়েছ তুমি সহাস্তে বিলিয়ে,
যে সুরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়া,
মনের আকাশে কভু যাবেনা মিলিয়ে—
রহিবে সেথায় চির তার ধূপছায়া।

কারখানায় চোয়ানো রংকরা কাব্য-মদিরা পানে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। এ সময় প্রমথবাবু যে "পোখরাজী" রংএর সুধা তাঁদের সামনে ধরেছেন, তার অম্ল-কষায়-মধুর স্বাদে তাঁদের প্রাণ সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠবে, আশা করা যায়;—কেননা এ সুধা প্রতিভার নিজস্ব chat aute তে চোয়ানো; এতে ভেজাল নাই।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

ভারতীয় বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে ১৯১৮-১৯ অব্দের রিপোর্টের উপর সরকারী মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৎসরে বাণিজ্যের আনুষঙ্গিক কতকগুলি অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়াছিল; যথা, রৌপ্য-সমস্যা, অর্থাৎ রৌপ্যের অসদ্ভাব ও তাহার মূল্য বৃদ্ধি; এবং তাহার ফলে এক্সচেঞ্জের হার-বৃদ্ধি; ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী; বৃষ্টির অভাব; যুদ্ধ-বিরাম প্রভৃতি। এই সকল ঘটনা ভারতের বহির্বাণিজ্যের উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ইহা সত্ত্বেও ভারতের সহিত আলোচ্য বর্ষে অন্যান্য দেশের যে বাণিজ্য চলিয়াছিল, তাহার পরিমাণ হইয়াছিল ৪২৩০০০০০০০ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরে ভারতীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল, ৩৯৩০০০০০০০ এবং যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বার্ষিক গড় ছিল ৩৭০০০০০০০০ টাকা। ১৯১৭—১৮ অব্দে ভারতে বিদেশ হইতে যত টাকায় মাল আসিয়াছিল, ১৯১৮—১৯ অব্দে তদপেক্ষা শতকরা ১২ টাকা হিসাবে বেশী মাল আমদানী হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় হিসাব ধরিলে ১৯১৮—১৯ অব্দের আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ১৬ টাকা বেশী দাঁড়ায়। আমদানী ও রপ্তানী উভয়ত্রই টাকার অঙ্কে এই যে বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, ইহা মালের পরিমাণ বৃদ্ধির দরুণ ততটা ঘটে নাই, যতটা ঘটিয়াছে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দরুণ; অর্থাৎ, কম মাল আনাইয়াই বেশী দাম দিতে হইয়াছে এবং কম মাল রপ্তানী করিয়াই বেশী টাকা পাওয়া গিয়াছে। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে, একটু হিসাব করা দরকার। ১৯১৮ অব্দে বিদেশ হইতে ভারতে ১৬৯০০০০০০০ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল। ১৯১৭—১৮ অব্দে, টাকার হিসাবে, পরবর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ১৯ কোটী টাকার কম মাল আসিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৭—১৮ অব্দে যে মালের যে দাম ছিল, ১৯১৮—১৯ অব্দের মাল সকলের সেই দাম ধরিলে টাকার পরিমাণ ১৪০০০০০০০০ টাকা হয়। অর্থাৎ ১৯১৭—১৮ অব্দের দামের হিসাবে ১৯১৮—১৯ অব্দে ১০ কোটী টাকার কম মাল আসিয়াছিল বলিতে হইবে। অর্থাৎ কেবল মালের মূল্য বৃদ্ধির দরুণ ১৯১৮—১৯ অব্দে ২৯ কোটী টাকা বেশী দিতে হইয়াছে। রপ্তানী-বাণিজ্যের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। আলোচ্য বর্ষে মোট ২৩৯ কোটী টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে বটে, কিন্তু ১৯১৭—১৮ অব্দের দামে সেই মাল ছাড়িতে হইলে তাহার দরুণ ১৯৬ কোটী টাকার বেশী পাওয়া যাইত না। এই হিসাবে কেবল মালের মূল্য-বৃদ্ধির দরুণ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩৩ কোটী টাকা বা শতকরা ২২ টাকা হিসাবে বেশী পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মালের হিসাবে আগের বৎসর অপেক্ষা ৩৭ কোটী টাকার কম মাল রপ্তানী হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পাটের বহির্বাণিজ্য খুব ভাল রকম চলিয়াছিল। অর্থাৎ, ঐ বৎসর ৩৫০০০০৮০ পাউণ্ড মূল্যের পাটজাত মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। আর যুদ্ধের পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল মাত্র ১২০০০০০০ পাউণ্ড। এই হিসাব এবং ইহার পরবর্ত্তী হিসাবগুলি পাউণ্ডেই দিতে হইতেছে। টাকায় ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করা কঠিন; কারণ, বৎসরের সকল সময়ে এক্সচেঞ্জের অবস্থা সমান ছিল না, এবং সরকারী হিসাবটাও পাউণ্ডেই হইয়া থাকে। ঐ বৎসর চা ১২০০০০০০ পাউণ্ড; (যুদ্ধের পূর্ব্বে ৯০০০০০০), এবং পাইট করা পাকা চামড়া ৫০০০০০০ পাউণ্ড (যুদ্ধের পূর্ব্বে ১০০০০০০ পাউণ্ড) মূল্যের রপ্তানী হয়। আর খাদ্য শস্য যুদ্ধের পূর্ব্বে ৩০০০০০০০ পাউণ্ড মূল্যের রপ্তানী হইত, আলোচ্য বর্ষে ২৭০০০০০০ পাউণ্ড মূল্যের বিদেশে চালান হয়। খাদ্যশস্য রপ্তানীর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন একেবারে বৃথা হয় নাই; এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কম থাকাতেও বোধ হয় শস্য কম রপ্তানী হইয়াছে।

ভারত হইতে যে সকল মাল বিদেশে গিয়াছে, তার মধ্যে ১৩২ কোটী টাকার মাল কেবল ইউনাইটেড কিংডমে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই চালান গিয়াছে; এবং আমাদের মিত্র-রাজগণের দেশে গিয়াছে ৮৭ কোটী টাকার। তন্মধ্যে পাট খুব বেশী রপ্তানী হইয়াছে। আর আমদানী পণ্যের মধ্যে তুলাজাত দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়াছে।

তুলাজাত মাল যাহা আসিয়াছে, তাহা প্রধানতঃ জাপান হইতে আসিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপান হইতে কোরা কাপড় ও সূতা শতকরা ২ অংশ মাত্র আসিত; কিন্তু আলোচ্য বর্ষে শতকরা ৩৫-৪ অংশ আসিয়াছে; অথচ, কয়েকবর্ষ মাত্র পূর্ব্বে ভারত হইতে জাপানে বহু টাকার কাপড়, সূতা প্রভৃতি রপ্তানী হইত, আমরা জানি। জাপান শনৈঃ শনৈঃ কি উন্নতিই না লাভ করিতেছে!

সুদীর্ঘ কাল সবুর করিবার পর মেওয়া ফলিবার উপক্রম হইয়াছে; ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট যে ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে; ভারতবর্ষকে আংশিক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন দিবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তদনুসারে কার্য্য হইতে চলিয়াছে। আংশিক স্বায়ত্ত শাসন এখন আর আমাদের পক্ষে "প্রাংশুলভ্য ফল" নহে; এবং আমরাও লোভপরবশ "উদ্বাহুরিব বামনঃ" নহি। ভারতবাসী কিয়ৎ পরিমাণে স্বায়ত্ত শাসন পাইবে, ইহা অতি সত্য কথা। এই আশা এখন আর ভারতবাসীর পক্ষে (লর্ড মর্লির) আকাশের চাঁদ হাতে পাইবার আশা নহে।

অনেক জল্পনা-কল্পনা, অনেক আন্দোলন-আলোচনা, অনেক বাদানুবাদের পর, বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ষে আংশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তন মূলক একটী আইনের পাণ্ডুলিপি বিরচিত হইয়া পার্লামেণ্টে পেশ হয়। কমন্স সভায় দুইবার পঠিত হইবার পর, ঐ খসড়া আইনটি বিচার-বিবেচনার জন্য কমন্স ও লর্ডস সভার জনকয়েক সদস্য কর্ত্তৃক গঠিত একটী জয়েণ্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হয়। কমিটি আইনটীর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন; ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় বহু ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করেন; ভারতের ও বিলাতের অনেক সভাসমিতির সহিত পরামর্শ করেন। তাহার ফলে তাঁহারা, প্রস্তাবিত আইনের সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া, উহা পাশ হইবার যোগ্য বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। অতঃপর পার্লামেণ্ট উহার সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করিবেন। কমন্স সভায় উহা আর একবার পঠিত হইবে। তাহার ফলে যদি উহার আবার আলোচনা হয়, এবং কোন পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হয়, তাহা হইলে, তাহাও হইতে পারে। তার পর লর্ড-সভায় উহা খসড়া-আইনের সম্বন্ধে কিছু বেশী রকমের আলোচনা হইবার সম্ভাবনা। অন্ততঃ, কলিকাতায় এ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রগুলির, বিশেষতঃ, ইংলিশম্যানের লেখা পড়িলে তাহাই মনে হয়। তাহা হইলে, লর্ড-সভায় উহার কিছু গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

জয়েণ্ট-কমিটি দ্বৈত-শাসন-প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ শাসনভার কতকটা দেশের লোকের হাতে দেওয়া হইবে। এই দ্বৈত-শাসন-পদ্ধতির নাম হইবে Responsible Government। প্রত্যেক প্রদেশে এখন যেমন একটী করিয়া Executive Council আছে, তাহা থাকিবে; কিন্তু তাঁহাদের যে সকল কাজ করিতে হয়, তাহার কিছু-কিছু তাঁহাদের হাত হইতে লইয়া দুইজন ভারতবাসী মন্ত্রীর (Ministers) হাতে দেওয়া হইবে। এই মন্ত্রী দুইজন স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিনিধিত্ব করিবেন। তাঁহারা একজিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের সমান বেতন পাইবেন। পার্লামেণ্টের গণ-সভা ও অভিজাত সভার কয়েকজন করিয়া সদস্য লইয়া একটি স্থায়ীয় কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটি ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত সকল সংবাদ রাখিবেন। (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান জয়েণ্ট কমিটিই পাকা হইয়া যাইবেন।) পার্লামেণ্ট এই কমিটির সহায়তায় ভারত সংক্রান্ত সংবাদ রাখিবেন; এবং ভারত শাসন ব্যাপারে এখন যতটা উদাসীন আছেন, তদপেক্ষা কিছু বেশী মনোযোগী হইবেন।

প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তৃগণ শাসন-যন্ত্রের শীর্ষ স্থানে থাকিয়া একজিকিউটিভ কমিটি ও দেশীয় মন্ত্রীগণের সাহায্যে এবং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজ-নিজ প্রদেশ শাসন করিবেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় সরকারের হাতে থাকিবে; আর বর্ত্তমান শিক্ষা-বিভাগ দেশীয় মন্ত্রীদের হাতে যাইবে। তাঁহারা শিল্পোন্নতির ভারও পাইবেন। মন্ত্রীগণ এবং একজিকিউটিভ কাউন্সিল পরস্পর পরামর্শ করিয়া সকল কার্য্য করিবেন; গবর্ণর এপক্ষে সকল রকম সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং ভারত-গবর্ণমেণ্টের সহিত পার্লামেণ্টের তথা, ভারত-সচিবের বর্ত্তমানে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা বর্ত্তমান থাকিবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের তহবিল একটা মাত্র থাকিবে। তাহা হইতে উভয় বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। তবে খরচপত্র লইয়া যদি একজিকিউটিভ বিভাগের সহিত মন্ত্রী-বিভাগের মতভেদ হয়, তবে গবর্ণর তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন; অর্থাৎ, কোন্ কার্য্যের জন্য কত ব্যয় করা হইবে, তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। বিলাতের ব্যবস্থা এই যে, কোনও মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রাহ্য না হইলে তিনি পদত্যাগ করিয়া থাকেন। নূতন আইনে প্রাদেশিক মন্ত্রীরাও সেই ভাবে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। আবার, কোন মন্ত্রী ব্যবস্থাপক সভার বিরোধী কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে, বা তাঁহার অনুসৃত নীতি ভ্রান্ত হইলে, গবর্ণর তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন। কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রীরা কার্য্যে ভুল করিলে গবর্ণর সেই ভুল দেখাইয়া দিবেন। মন্ত্রীরা গবর্ণরের উপদেশে ভ্রম সংশোধন করিয়া লইতে পারেন ভালই; তাহা না পারিলে, অথবা গবর্ণরের উপদেশ গ্রহণ করিতে না চাহিলে, গবর্ণর সাধারণতঃ তাঁহাদের কার্য্যে বাধা দিবেন না। এ ক্ষেত্রে ভুলের ফল দর্শন করিয়া মন্ত্রীদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইবে; তাঁহারা দেখিয়া, শুনিয়া শিখিতে না পারিলে অন্ততঃ ঠেকিয়া শিখিবার অবসর পাইবেন। এইরূপে দেশবাসী স্বায়ত্ত-শাসন শিক্ষা করিবেন। প্রত্যেক প্রদেশে দুইজন করিয়া মন্ত্রী থাকিবেন; এবং

একজিকিউটিভ কাউন্সিলে দুইজন করিয়া সদস্য থাকিবেন। এই দুইজন সদস্যই কোন ক্ষেত্রে ইউরোপীয়ান হইয়া পড়িলে, দুইজন বেসরকারী ভারতবাসীকে কাউন্সিলের অতিরিক্ত সদস্য স্বরূপ নিযুক্ত করা হইবে।

স্বায়ত্ত-শাসন পূর্ণাঙ্গ হইতে গেলে ব্যবস্থাপক সভাসমূহে দেশের জনগণের প্রতিনিধি অধিক পরিমাণে থাকা চাই। সে ব্যবস্থাও হইতেছে। ভারত-গবর্ণমেণ্ট এমন ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, যাহাতে গ্রাম্য লোকেরা অধিক সংখ্যায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে। মান্দ্রাজের ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় কতকগুলি আসন স্বতন্ত্রভাবে মজুত রাখা হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য-সংখ্যা যতদূর সম্ভব সমান রাখিবার চেষ্টা করা হইবে। অর্থাৎ যে প্রদেশের সদস্য-সংখ্যা কম, তাহা বরং বাড়াইয়া সংখ্যায় সাম্য স্থাপনের চেষ্টা করা হইবে। মান্দ্রাজের অব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বোম্বায়ের মারাঠা সম্প্রদায়ের জন্যও কতকগুলি সিট ব্যবস্থাপক সভায় রিজার্ভ থাকিবে।

বোম্বাই অঞ্চলের মহিলা সমাজ, এবং তাঁহাদের দেখাদেখি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কতক নারী সমাজ ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচন কালে ভোট দিবার অধিকার প্রার্থনা করিয়াছেলেন। তাঁহাদের প্রার্থনা সেলবোর্ণ কমিটি আংশিক ভাবে গ্রাহ্য করিয়াছেন। কমিটি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের উপর এই বিষয়ের মীমাংসার ভার অর্পণ করিয়াছেন, এবং নারীগণকে নির্ব্বাচনাধিকার দান করা সঙ্গত বিবেচিত হইলে তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়নে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় জমিদার সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতিনিধি থাকা উচিত কি না, ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা স্থির করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার, সাত বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ভোগ করিতেছেন, এমন গ্রাজুয়েটমাত্রেই পাইবেন। বাঙ্গলা ছাড়া, অন্য সকল প্রদেশের য়ুরোপীয়ান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের প্রার্থনা কমিটি মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট পরামর্শ করিয়া বাঙ্গলার য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবেন। দেশীয় রাজগণ অথবা তাঁহাদের প্রজারা ভোট দিতে বা সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে চাহিলে, প্রত্যেক প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট নিজ-নিজ প্রদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া দিবেন। সরকারী কার্য্য হইতে পদচ্যুত ব্যক্তিদের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। যাহারা ছয় মাসের অধিক কাল ফৌজদারী অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে, তাহাদের দণ্ড ভোগের কাল অতীত হইবার পর পাঁচ বৎসর কাল অতিক্রম না করিলে তাহারা সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না। কেহ যাহাতে অবৈধ উপায়ে নির্ব্বাচিত হইতে না পারে, গোড়া হইতে কঠোর আইন করিয়া তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হইবে। সংস্কৃত আইন অনুসারে প্রথম যে নির্ব্বাচন হইবে, তৎপূর্ব্বেই নির্ব্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভাসমূহের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচনের ব্যাপারে সেলবোর্ণ কমিটি বিশেষ অবহিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। গোড়া হইতে যাহাতে বিলাতী পার্লামেণ্টের নীতি অনুসৃত হয়, কমিটির ইহাই পরামর্শ।

কর স্থাপন সম্বন্ধে সরকারের খাস মজলিস এবং মন্ত্রিগণ একমত হইয়া কার্য্য করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। উভয় পক্ষ একমত হইয়া যে সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইবে, এবং তদনুসারে কার্য্য হইবে। শাসন সংস্কারের প্রস্তাব হইবামাত্র য়ুরোপীয় সিবিলিয়ান সম্প্রদায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, এমন শাসন-ব্যবস্থার অধীন হইয়া তাঁহারা চাকুরী করিতে পারিবেন না। সেলবোর্ণ কমিটি সিবিলিয়ান সম্প্রদায়ের বক্তব্য শুনিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে সুবিবেচনাও করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, যে সকল সিবিলিয়ান সংস্কৃত শাসন ব্যবস্থায় অধীন হইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন না, গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগকে অন্য কোনরূপ চাকুরী জুটাইয়া দিতে পারেন ভালই; অথবা তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন, পদত্যাগ করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের কার্য্য-কালের অনুপাতে উপযুক্ত পেন্শন দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিবেন। ইণ্ডিয়া কাউন্সিল তুলিয়া দিবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। কাউন্সিল থাকিবে; তবে উহাতে অধিক সংখ্যক ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হইবে; এবং উহার ব্যয়ভার ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড ভাগাভাগি করিয়া বহন করিবেন। বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন ভারতবাসী থাকিবেন।

ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু এবং ভারতের বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড পরামর্শ করিয়া যে শাসন-ব্যবস্থার খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেলবোর্ণ কমিটি তাহা যতদূর সম্ভব বজায় রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু, সম্পূর্ণরূপে একতরফা সিদ্ধান্ত করেন নাই;—ভারতীয় প্রতিনিধিগণের মতামতেও তাঁহারা কর্ণপাত করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের প্রস্তাবও কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংশোধিত শাসন প্রস্তাব পার্লামেণ্টে যে আকারে আইনে পরিণত হইবে, তাহার পরমায়ু আপাততঃ দশ বৎসর। এই দশ বৎসর ভারতবাসীদের স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষমতার পরীক্ষার কাল। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে,

শাসন কার্য্যে ভারতবাসী যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে, দশ বৎসর পরে ইহার বিচার করিবার জন্ম যে কমিশন্ নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা ভারতবাসীকে আরও বেশী পরিমাণে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়ার সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন। অন্যথা, যেটুকু অধিকার এখন পাওয়া যাইতেছে, তাহাও হস্তচ্যুত হইতে পারে। আবার, কেবল যোগ্যতাই যথেষ্ট হইবে না। সহজ অবস্থায় ভারতীয় মন্ত্রীরা যোগ্য হইলেও, তাঁহাদিগকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। য়ুরোপীয় সিবিলিয়ানরা ত সংস্কৃত শাসন-ব্যবস্থায় একেবারে কাজ করিতে পারিবেন না বলিয়াই জবাব দিয়াছিলেন। তা' ছাড়া, বেসরকারী শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ও গোড়া হইতেই শাসন-সংস্কারের বিরোধী। এই দশ বৎসর যে তাঁহারা নিস্ক্রিয় ভাবে বসিয়া-বসিয়া, ভারতবাসীরা কিরূপ ভাবে দেশ শাসন করিতে পারেন, তাহাই দেখিয়া যাইবেন, এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। অতএব, যতটা যোগ্যতা লইয়া ভারতবাসী মন্ত্রীরা সহজ অবস্থায় কার্য্য করিতে পারিতেন, তাহার দ্বিগুণ যোগ্যতা লইয়া তাঁহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। বস্তুতঃ মনে হয়, এই দশ বৎসর কাল সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতবাসীদের শাসন-কার্য্য-দক্ষতা দেখিবার জন্ম উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া থাকিবেন। ইহা বড় সহজ কথা নহে।

প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না। মোটের উপর, শাসন-সংস্কার-প্রস্তাব মন্দ হইতেছে না। আপাততঃ শিক্ষা এবং শিল্প-বিভাগের যে ভার ভারতবাসীরা পাইতেছেন, তাঁহারা যাহাতে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, ব্যবহারের দোষে প্রাপ্ত অধিকার যাহাতে হাতছাড়া না হয়, ইহা দেখাই এখন ভারতবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য যাহাতে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়, ভারতবাসী এখন সেই ব্যবস্থা করুন।

য়ুরোপ-আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা কিরূপে নূতন-নূতন সূত্র হইতে অভিনব উপায়ে শক্তি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার সামান্য মাত্র আভাষ পূর্ব্বে একবার দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার আরও একটু দিবার চেষ্টা করিব। সমুদ্র-তরঙ্গ প্রচণ্ড শক্তির আধার। এই শক্তিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে। জোয়ারের সময় জল-স্রোত নদীর মোহানায় প্রবেশ করে এবং ভাটার সময় উহা আবার বাহির হইয়া সমুদ্রে ফিরিয়া যায়। জলের এই যাতায়াতের পথে তাহার দ্বারা কল চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। স্কটলণ্ডের গ্লাসগো সহরের মিঃ জে, স্মিথ নামক একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার সেভার্ণ নদী, ডী নদী এবং মার্সি নদীতে কল বসাইয়া বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিবার মতলব করিয়াছেন। জোয়ারের জল সেভারণ নদীতে প্রবেশ করিবার সময় ৩৪ ফিট উঁচু হইয়া আসে। জলের নদীতে প্রবেশের মুখে টারবাইন বসানো হইবে। সেই টারবাইনের গায়ে কতকগুলি পাখা এমনভাবে বসানো থাকিবে যে, জোয়ারের জল নদীতে প্রবেশ করিবার সময় টারবাইন যে মুখে ঘুরিবে, ভাটার জল বাহির হইবার সময়েও টারবাইন ঠিক সেই মুখেই ঘুরিবে। এইরূপে টারবাইন এক ভাবে এক মুখেই ঘুরিতে থাকিবে, এবং তৎসংলগ্ন বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কল চলিতে থাকিবে। সেভারণ নদীর জোয়ারের জলের পূর্ণ উচ্চতার সাহায্য লওয়া হইবে না,—মাত্র অর্দ্ধেক--১৭ ফিটের সাহায্য লওয়া হইবে। ডী নদীর জল ১৪ ফিট, মেনাই প্রণালীর জল ১৪ ফিট এবং মার্সি নদীর জল ১৩ ফিট উচ্চ হইয়া আসে। ইহাদের পূর্ণ উচ্চতার সহায়তা লওয়া হইবে। জোয়ার ও ভাটা যখন পূর্ণ হইয়া আসে, তখন তাহাদের স্রোতের বেগও কমিয়া আসে। তখন ত আর স্রোতের শক্তিতে কল চলিতে পারে না। সেইজন্য দরজা বসাইয়া জলের আনাগোনা নিয়ন্ত্রিত করিয়া, টারবাইনের ঘূর্ণন যেন একবারও বন্ধ না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। তবে একটী নদীর জলের স্রোতের সাহায্যে ইহা সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, যখন সেভারণ নদীতে পূর্ণ জোয়ার, তখন অন্য নদীগুলিতে অর্দ্ধেক জোয়ার। এই ভাবে কতক সময় সেভারণ নদীর জল কল চালাইবে, বাকী সময় অন্য নদীর জল কল চালাইতে পারিবে। মিঃ স্মিথ বলিতেছেন, এই উপায়ে ৫৫ লক্ষ ঘোড়ার জোর শক্তি পাওয়া যাইবে। 'ভারতবর্ষে'র পাঠক পাঠিকাগণ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম" প্রবন্ধে বৈদ্যুতিক শক্তির 'ইউনিটে'র পরিচয় পাইয়াছেন। মিঃ স্মিথ বলেন, তাঁহার কল্পিত উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে প্রতি ইউনিটে যাহা খরচ পড়িবে, তাহাতে এক পেনীর (প্রায় এক আনা) ত্রিশ ভাগের এক ভাগ মূল্যে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে পারা যাইবে। Scientific American হইতে এই বিবরণটুকু সংগ্রহ করিয়া আমরা 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে নিবেদন করিলাম।

মালাবার-প্রসঙ্গ

শ্রীরমামোহন ঘোষ বি-এল

কেরল-মাহাত্ম্য

পুরাণের মতে, কেরলদেশ 'পরশুরাম-ক্ষেত্র'। এক-বিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া, পরশুরাম বিরাট অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; এবং যজ্ঞান্তে সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণাস্বরূপ কশ্যপ মুনিকে দান করেন। হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, মহর্ষি কশ্যপ তখন পরশুরামকে পৃথিবীর সীমানার বাহিরে, দক্ষিণ সমুদ্রতীরে গমন করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে, পরশুরাম সাগরের নিকট যাইয়া ভূমি যাচ্ঞা করিলে, সাগর সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের পশ্চিমে, অপসৃত হইয়া, একখণ্ড ভূমি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ঐ ভূমির একাংশই কেরলদেশ। পরশুরাম এই ভূমিখণ্ডকে 'কর্ম্মভূমি' নামে অভিহিত করেন; এবং উত্তরদেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া এই নূতন দেশে স্থাপিত করেন। এই প্রবাদের মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে কি না, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রমাণ পাইয়াছেন যে, অতি প্রাচীন কালে আরব সমুদ্র পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার পাদদেশে পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; পরে কোন নৈসর্গিক বিপ্লবে সমুদ্র-গর্ভস্থ ভূপৃষ্ঠ উত্থিত হওয়ায়, মালাবার উপকূল গঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

মালাবারের হিন্দুসমাজে আজ পর্য্যন্ত যে সকল অদ্ভুত ও নীতিবিরুদ্ধ প্রথা প্রচলিত আছে, তজ্জন্য পরশুরামকেই দায়ী করা হয়। ব্রাহ্মণগণের তুষ্টি সাধনার্থ পরশুরাম না কি এই ব্যবস্থা করেন যে, তাঁহার নবস্থাপিত রাজ্যে 'সামন্ত' (উপবীতহীন ক্ষত্রিয়) ও শূদ্র-জাতীয়া স্ত্রীগণ ব্রাহ্মণ-ভোগ্যা হইবে; তাহারা উরসের আবরণ বর্জ্জন করিবে এবং সতীধর্ম্ম পালন করিবে না। সেইজন্য নায়ার জাতির মধ্যে বিবাহ একটা ধর্ম্ম-সংস্কার নহে। 'নাম্বুদিরি' ব্রাহ্মণগণ এই কদাচারের শাস্ত্রীয়তা প্রদর্শনার্থ 'কেরল-মাহাত্ম্যম্' নামক একখানি উপপুরাণের উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই পুস্তকে লিখিত আছে, পরশুরাম ইন্দ্রের অমরাবতী হইতে তিনজন সুন্দরী তাঁহার কেরল-রাজ্যে লইয়া আসিয়াছিলেন;—একজন দেব কন্যা, একজন গন্ধর্ব্ব-কন্যা ও অপরজন রাক্ষস-কন্যা। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছয়জন করিয়া সখী ছিল। পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে এই সকল নারী যথেচ্ছ উপভোগের অধিকার দান করেন। এই নারীগণই 'নায়ার'-জাতির জননী। 'কেরল-মাহাত্ম্যম্' পুরাণ-খানির প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অনেকে মনে করেন, উহা গত দেড়শত অথবা দুইশত বৎসরের মধ্যে কোন 'নাম্বুদিরি' ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। কিন্তু 'নায়ার' জাতি যে আর্য্য ও দ্রাবিড়জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে

নায়ার রমণী

কোন সন্দেহ নাই। এবার মালাবারের 'নাম্বুদিরি' ও 'নায়ার'দের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথা লিখিতেছি।

আচার ও অনাচার

'নাম্বুদিরি'-ব্রাহ্মণ একাধারে মালাবারের 'ভূ-দেবতা' ও ভূস্বামী। তাঁহারা বলেন, পরশুরাম সমগ্র কেরলভূমি তাঁহাদিগকেই দান করিয়াছিলেন। ইঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ। ক্রীড়া', আহার—'অমৃতাস্বাদন', এমন কি, নাম্বুদিরির পয়সা—'টাকা'। এ যেন কতকটা, কথোপকথন কালে অপরের গৃহকে 'দৌলতখানা' ও নিজের বাসগৃহকে 'গরীবখানা' বলিবার রীতির চরম পরিণতি।

আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব এ পর্য্যন্ত নাম্বুদিরি-সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। চাকুরী অথবা বাণিজ্য-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন ইহাঁদের কাম্য নহে। যথাবিহিত আচার-নিয়ম পালন, এবং

নায়ার-বালিকাগণের ধান-ভানা

'নাম্বুদিরি' (অথবা 'নাম্বুতিরি') উপাধির অর্থ "পবিত্র"; কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মালাবারের হিন্দুসমাজে, ইঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অসীম। অন্য জাতির স্পর্শ ইঁহারা অশুচি মনে করেন; এমন কি, নায়ার অপেক্ষা নিম্ন জাতীয় কেহ ইঁহাদের কাছাকাছি আসিলেও ইঁহাদের শুচিতা নষ্ট হয়। 'নাম্বুদিরি' ব্রাহ্মণের সম্মুখে আসিতে হইলে, নিম্নজাতীয় লোকের মস্তক হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত অনাবৃত করিতে হয়। তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবারও একটা বিশেষ রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে। 'নাম্বুদিরি'র সম্পর্কিত কোন বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইলেই, তাঁহার অপার্থিব গৌরব, এবং বক্তার নিজের সম্বন্ধে কোন বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইলে, একান্ত দীনতা প্রকাশ করিতে হইবে। নায়ার, নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণের নিকট আপনাকে 'শ্রীচরণের দাস' বলিয়া উল্লেখ করিবে। নাম্বুদিরির স্নান—'জল-

পূজার্চ্চনা ও শাস্ত্রপাঠে কালযাপন ইহাদের জীবনের লক্ষ্য। প্রত্যেক নাম্বুদিরি বালককে কয়েক বৎসর কাল বেদ অধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয়। পন্নানী নদীতীর-বর্ত্তী তিরুণাবায়ীর প্রসিদ্ধ মঠে শতাধিক নাম্বুদিরি ছাত্রের বেদ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের নানাস্থান হইতে নাম্বুদিরি বিদ্যার্থিগণ এই মঠে সমাগত হইয়া, ১২ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকে। নাম্বুদিরি-সমাজে, প্রতি পরিবারে, একাধিক ভ্রাতা রীতিমত বিবাহ করে না; অনেকেই পরিবার-প্রতিপালনের দায় হইতে মুক্ত। এইজন্য তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তিও বংশ-পরম্পরায় অবিভক্ত থাকিয়া যায়।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত কালাদি নামক পল্লীগ্রামে নাম্বুদিরি-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি কেরলদেশে ৬৪টি 'অনাচার' প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। এই 'অনাচারের' অনেকগুলি বাস্তবিক 'সদাচার'; যথা, ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না, সন্ন্যাসী স্ত্রী-মুখ দর্শন করিবে না, ইত্যাদি। ইহাদিগকে 'অনাচার' বলিবার কারণ এই যে, এই সকল আচার অন্যত্র পালিত হয় না— "অন্যত্রাচরণাভাবাৎ অনাচারাঃ।" একটী 'অনাচার' এই,— জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিবে;—"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৃহী ভবেৎ।" নাম্বুদিরিগণ এই বিধানের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভিন্ন অন্যান্য ভ্রাতাদের পক্ষে সজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ; কিন্তু তাহারা কেরল-থাকে। তথাপি, বর অভাবে অনেক কুমারীর আদৌ বিবাহ হয় না। নাম্বুদিরি সমাজে কন্যার বিবাহ বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ইহাতে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হয়। সচরাচর যৌবনারম্ভে নাম্বুদিরি-বালিকার বিবাহ দেওয়া হয়; একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতে হইবে, এরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। যাহারা চিরজীবন কুমারী থাকে, মৃত্যুর পরে তাহাদের শবদেহে বিবাহের আনুষঙ্গিক "তালি-বন্ধন" অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হয়।

নাম্বুদিরি-সমাজে নারীদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত। দাক্ষিণাত্যে অন্য কোন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে এই

নায়ারদিগের গৃহ

প্রথা বর্ত্তমান নাই। কখনও বাহিরে যাইতে হইলে, নাম্বুদিরি-মহিলার সঙ্গে একজন নায়ারবংশীয়া পরিচারিকা থাকা আবশ্যক। পথে চলিবার সময়, যাহাতে কোন পুরুষ মুখ দেখিতে না পায়; এই উদ্দেশ্যে ইঁহারা তালপত্রের নির্ম্মিত ছাতা ব্যবহার করেন। নাম্বুদিরি-নারী রঙীন বসন পরিধান এবং বহু ভূষণ ধারণ করেন না। ইঁহাদের মধ্যে, অলঙ্কার ধারণের জন্য নাসা-বেধ নিষিদ্ধ।

ব্রাহ্মণের সনাতন অধিকার অনুসারে, যদৃচ্ছাক্রমে নায়ার জাতীয়া নারীদিগের সঙ্গে 'পতি-পত্নী-সম্বন্ধ' স্থাপন করিতে পারে। এইরূপ সম্বন্ধজাত পুত্রকন্যা মাতৃকুলেই প্রতিপালিত হয়; নাম্বুদিরি পিতার তাহাদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র দায়িত্ব নাই। তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে, তাঁহাকে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়।

প্রতি গৃহস্থের একাধিক পুত্রের সজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিবার অধিকার না থাকিলেও, নাম্বুদিরি-সমাজে পুত্র অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা কম হইবার কোন কারণ নাই। নাম্বুদিরি-কন্যার ভিন্ন বর্ণের পুরুষের সঙ্গে পরিণয় হইতে পারে না। এইরূপ অবস্থায়, নাম্বুদিরি গৃহস্থের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বাঙ্গালার কুলীন-ব্রাহ্মণের ন্যায়, প্রায়ই বহুবিবাহ করিয়া

ভাগিনেয় উত্তরাধিকার

'নায়ার' সংস্কৃত নায়ক শব্দের রূপান্তর। সম্ভবতঃ, এক কালে ইহা ব্যক্তিগত উপাধি রূপে ব্যবহৃত হইত; পরে জাতিবাচক সংজ্ঞায় পরিণত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের

ন্যায়, যুদ্ধই নায়ারদিগের জাতীয় বৃত্তি ছিল ; কিন্তু কাল-ক্রমে বৈশ্য ও শূদ্র-ধর্ম্মাবলম্বী অনেক উপজাতি নায়ার নাম গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং নায়ার জাতির মধ্যে উচ্চ-নিম্ন নানা শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে মালাবারে নায়ার জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও উন্নতিশীল।

একান্নবর্ত্তী নায়ার-পরিবার অথবা 'গোষ্ঠী'র নাম "তারোয়াড।" তারোয়াডের মূল-প্রতিষ্ঠাত্রী—জননী ; মাতা হইতে কন্যা-অনুক্রমে বংশের ধারা চলিয়া থাকে। সাধারণতঃ, মাতা, পুত্র-কন্যা ও কন্যার সন্তানবর্গ লইয়া একটা "তারোয়াড।" মাতার ভ্রাতা ও ভগিনী এবং ভগিনীর সন্তানও ঐ সঙ্গে থাকিতে পারে। বিবাহিতা হইলেও কন্যা স্বামীর তারোয়াড়-ভুক্তা হয় না। যদি কাহারও স্বামী স্বোপার্জ্জিত অর্থে স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে এই নূতন 'সংসার' মূল তারোয়াডের শাখারূপে গণ্য হয়। এই শাখাও ক্রমে পুত্র পৌত্রাদির পরিবর্ত্তে কন্যা-দৌহিত্রী অবলম্বনে বিস্তৃতি লাভ করে। তারোয়াডের বিষয়-সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা হইতে পারে না। পুরুষদিগের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি ইহার "কর্ণাবন" অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা। তারোয়াডে যে পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে পারিবারিক সম্পত্তির উপস্বত্বভোগী, কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারী তাহার ভগিনী। এই ব্যবস্থার নাম "মারু মাক্কতায়ম্"—অর্থাৎ ভাগিনেয়-উত্তরাধিকার। নায়ারদিগের অনুকরণে মালাবারে অন্য কোন-কোন জাতির মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

পুরাকালে নায়ারগণ আজীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত ; বিবাহ করিয়া গৃহধর্ম্ম পালনের অবসর তাহাদের ছিল না। পরে এক স্ত্রীর বহু-পতি-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায়, সন্তানের পিতৃ-নিরূপণ সম্ভব ছিল না ; মাতা অথবা মাতুলের আশ্রয়েই সন্তান প্রতিপালিত হইত। ইহাই "মারু-মাক্কতায়ম্" ব্যবস্থা প্রচলনের মূল কারণ। ইদানীং কালপ্রভাবে নায়ার-নারীর বহু-পতি-গ্রহণ-প্রথা লুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

শাস্ত্রসম্মত বিবাহ না থাকিলেও, নায়ার-সমাজে বিবাহের অনুকল্প দুইটি অনুষ্ঠান আছে। (১) "তালি-কেত্তু-কল্যাণম্"—অর্থাৎ 'তালি'-বন্ধন বিবাহ এবং (২) "সম্বন্ধম্"—অর্থাৎ পতি-পত্নী সম্বন্ধ স্থাপন।

তালি বন্ধন

'তালি-বন্ধন' মালাবারে বিবাহ-অনুষ্ঠানের একটা অপরি-হার্য্য অঙ্গ। 'তালি'—অশ্বত্থপত্রাকৃতি ক্ষুদ্র সোণার চাকতি। ইহা কন্যার গলদেশে বাঁধিয়া দিতে হয়। ব্রাহ্মণেরাও কন্যা-সম্প্রদানের পূর্ব্বে তাহার তালি-বন্ধন সম্পন্ন করিয়া থাকেন। নায়ার-সমাজে তালি-বন্ধন নকল বিবাহ অথবা বিবাহের অভিনয় বলা যাইতে পারে। ১১ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক নায়ার-বালিকার তালি-বন্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন একান্ত আবশ্যক। ব্যয়-সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে এক পরিবারস্থ সমস্ত বালিকার 'তালি-বন্ধন' এক-যোগে একজন 'বর' দ্বারা সম্পন্ন করিয়া লওয়া হয় ; 'বর' অবশ্যই প্রতি কন্যার জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে দক্ষিণা পাইয়া থাকে।

তালি-বন্ধনের 'বর' সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ অথবা সামন্ত জাতি হইতে নির্ব্বাচিত হয়। শুভদিনে, 'বর' যথোচিত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া কন্যার গৃহে আগমন করে। গৃহদ্বারে, পুরনারীবৃন্দ পুষ্প ও প্রদীপ দ্বারা তাহাকে বরণ করিয়া লয়; এবং কন্যার কোন আত্মীয় তাহার পদ-প্রক্ষালন করিয়া দেয়। বিবাহ-মণ্ডপে সালঙ্কারা কন্যার দক্ষিণ পার্শ্বে 'বর' আসন গ্রহণ করে। কন্যার এক হস্তে "দর্পণ" ও অন্য হস্তে "তীর" থাকে। লগ্নাচার্য্য শুভ লগ্ন ঘোষণা করিলে কন্যার পিতা অথবা কুলপুরোহিত 'বরে'র হস্তে 'তালি' অর্পণ করে, এবং 'বর' 'কন্যা'র কণ্ঠে উহা বাঁধিয়া দেয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারে এই 'বিবাহ'-উৎসব চারিদিন ধরিয়া চলে। শেষ দিনে, 'বর-কন্যা' মহা সমারোহে কোন দেব-মন্দিরে গিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা দিয়া আসে। 'ইতর' জন অবশ্যই মিষ্টান্ন-স্বাদে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু ইহার পর তালি-বন্ধনের "বর ও কন্যা"র মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকে না। কোন-কোন স্থানে এই সম্বন্ধচ্ছেদের বাহ্য নিদর্শন স্বরূপ, উৎসবান্তে বিবাহ-মণ্ডপে একখানি বস্ত্র ছিন্ন করিয়া একাংশ 'বর'ও অপরাংশ 'কন্যা'কে দেওয়া হয়।

এক কালে তালি-বন্ধনের যাহাই উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে ইহা একটা অর্থ-হীন অথচ অবশ্য-কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষিত নায়ারগণ

মনে করেন, তালি-বন্ধন, অন্নপ্রাশন নামকরণ ইত্যাদির ন্যায় একটা 'সংস্কার'। ব্রাহ্মণ-কুমারের গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বনের পূর্ব্বে যেমন 'সমাবর্ত্তন'-ক্রিয়া আবশ্যক, নায়ার-বালিকার পক্ষে 'তালি-বন্ধন' কতকটা সেইরূপ। তালি-বন্ধন সম্পন্ন হইবার পর বালিকা 'আম্মা' অর্থাৎ মহিলা পদবীতে উন্নীত হয়, এবং তখন তাহার পতি গ্রহণের অধিকার জন্মে। নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে কোন বালিকার তালি-বন্ধন না হইলে সমস্ত পরিবারকে সামাজিক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। নিতান্ত দরিদ্র পরিবারে, মাতা কোন দেব-মন্দিরের সম্মুখে, অথবা মৃৎ-পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে, স্বয়ং কন্যার গলায় তালি বাঁধিয়া দেয়।

বস্ত্রদান-বিবাহ

নায়ার-সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃত বিবাহ, অর্থাৎ দাম্পত্য-সম্বন্ধ স্থাপন ব্যাপারের নাম 'সম্বন্ধম্'। ইহাকে 'বস্ত্রদান-বিবাহ' বলা যাইতে পারে। এই বিবাহ-পদ্ধতি অতি সরল। ইহাতে মন্ত্র, পুরোহিতের সম্পর্ক নাই, এবং তালি-কেত্তু কল্যাণের' ন্যায় আড়ম্বর করিতে হয় না। অনুলোম বিবাহের নিয়মানুসারে, নায়ার নারীর সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর বর্ণের পুরুষের 'সম্বন্ধম্' হইতে পারে।

উভয় পক্ষের কথা-বার্ত্তা স্থির হইলে, নির্দ্দিষ্ট দিনে বর বন্ধু-বান্ধব সহ সন্ধ্যার পরে কন্যার বাসভবনে উপস্থিত হয়। বরপক্ষ সমবেত ব্যক্তিদিগের মধ্যে পান-সুপারি বিতরণ করে। কোন-কোন স্থলে নিমন্ত্রিতদিগের চিত্ত-বিনোদনের জন্য সঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকে। গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত কক্ষে বরের জন্য আসন স্থাপন করিয়া, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি প্রদীপ ও ধান্যপূর্ণ পাত্র ("নীরা পারা") রাখা হয়। লগ্ন উপস্থিত হইলে, বর গিয়া সেই কক্ষে উপস্থিত গুরুজনকে প্রণাম পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করে। কন্যার কোন বর্ষীয়সী আত্মীয়া তখন কন্যাকে বরের সম্মুখে লইয়া আসে। কন্যা নতশিরে গুরুজন-মণ্ডলীকে বন্দনা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বর একখানি থালায় সজ্জিত বস্ত্রোপহার তাহার হস্তে অর্পণ করে। কন্যা ছোট একটী নমস্কার করিয়া ঐ থালা গ্রহণ করে। এই সময়ে সমবেত পুরনারীদের হুলুধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হয়। কক্ষান্তরে গিয়া কন্যা বরের উপহৃত বস্ত্র পরিধান করে। তাহার পর আনন্দ-ভোজনে মিলনোৎসব শেষ হইয়া থাকে। নব্য-তন্ত্রের নায়ারদিগের মধ্যে, অন্যান্য সমাজের অনুকরণে, বস্ত্রের সঙ্গে কন্যাকে অঙ্গুরীয় প্রদান, এবং কন্যা কর্ত্তৃক বরের কণ্ঠে মাল্য অর্পণ ইত্যাদি দুই-একটি নূতন প্রথা প্রচলিত হইতেছে।

স্বামী অথবা স্ত্রী ইচ্ছা করিলে, যে-কোন সময়ে এই সম্বন্ধ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে,—তজ্জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। কিন্তু সচরাচর ইহাদের দাম্পত্য-সম্বন্ধ আজীবন স্থায়ী হইতেই দেখা যায়;—বিবাহচ্ছেদের দৃষ্টান্ত বিরল। বাস্তবিক, বিবাহ-সম্বন্ধ মন্ত্রপূত না হইলেও, নায়ার-পত্নী পাতিব্রত্য-গৌরবে অন্য সমাজের নারী অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।*

"সম্বন্ধম্" সমাজানুমোদিত হইলেও, মান্দ্রাজ হাইকোর্টে বৈধ বিবাহ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। এইজন্য, শ্রীযুক্ত সার শঙ্করণ্ নায়ার প্রমুখ পদস্থ মালয়ালীগণের চেষ্টায়, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে "মালাবার বিবাহ আইন" গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে 'সম্বন্ধম্' রেজিষ্টারী করা হইলে, উহা আদালতে বিবাহ রূপে গণ্য হইবে। এইরূপ স্থলে, বিবাহকারী পুরুষ স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ করিতে বাধ্য, এবং বিবাহ-সম্বন্ধ-ছেদন আদালতের আদেশ-সাপেক্ষ। কিন্তু আইনের সাহায্যে 'সম্বন্ধ'-বন্ধন দৃঢ় করিয়া লইবার জন্য নায়ারদিগের কোন আগ্রহ দেখা যায় না। এ পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর পাঁচটি মাত্র 'সম্বন্ধম্' রেজেষ্টারী করা হইয়াছে।

---

* এই সম্বন্ধে মালাবারের, একজন ইংরেজ কলেক্টর যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

Nowhere is the marriage-tie, albeit informal, more rigidly observed or respected, nowhere is it more jealously guarded or its neglect more savagely avenged. The very looseness of the law makes the individual observance closer; for, people have more watchful care over the things they are most liable to lose,··· Nayar women are as chaste and faithful as their neighbours, just as modest as their neighbours although their national costume does not include some of the details required by conventional notions of modesty.—*Malabar Manual.*

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

মৃণাল উঠিয়া গেল, কিন্তু, কেদারবাবু সে দিকে আর যেন লক্ষ্যই করিলেন না। কেবল নিজের কথার সুরেই মগ্ন থাকিয়া আপন মনে কহিতে লাগিলেন, আমি বাঁচিলাম! আমি বাঁচিলাম! মা, আমাকে তুমি বাঁচাইয়া দিলে। দুর্গতির দুর্গম অরণ্যে যখন দুচক্ষু আঁধা, মৃত্যু ভিন্ন আর যখন আমার সমস্তই রুদ্ধ, তখন হাতের পাশেই যে মুক্তির এতবড় রাজ-পথ উন্মুক্ত ছিল, এ খবর তুমি ছাড়া আর কে দিতে পারিত! ক্ষমার কথা ত কখনো ভাবিতেই পারি নাই। যদি কখনো মনে হইয়াছে তখনি তাহাকে দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়া সজোরে, সগর্ব্বে ইহাই বলিয়াছি, না, কদাচ না! মেয়ে হইয়া এতবড় অপরাধ যে করিতে পারিল, বাপ হইয়া এতবড় দান তাহাকে কোনমতেই দিতে পারি না! কিন্তু, ওরে অন্ধ, ওরে মূঢ়, ওরে কৃপণ, পিতা হইয়াও যাহা তুই দিতে পারিস্ না,—অপরে তাহা দিবে কি করিয়া? আর, সে তোর কতটুকুই বা লইয়া যাইবে? তোর ক্ষমার সবটুকুই যে তোর আপন ঘরেই ফিরিয়া আসিবে। তোর মৃণাল মায়ের এই তত্ত্বটাকে একবার দুচক্ষু মেলিয়া দেখ্! এই বলিয়া তিনি ঠিক যেন কিছু একটা দেখিবার জন্যই দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মেঘলা আকাশের পানে চাহিয়া মনেমনে প্রাণপণ-বলে কহিতে লাগিলেন, আমি ক্ষমা করিলাম,—আমি ক্ষমা করিলাম! সুরেশ, তোমাকে ক্ষমা করিলাম! অচলা, তোমাকেও ক্ষমা করিলাম! পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ যে কেহ যেখানে আছো, আজ আমি সকলকে ক্ষমা করিলাম! আজ হইতে কাহারো বিরুদ্ধে আমার কোন অভিমান কোন নালিশ নাই,—আজ আমি মুক্ত, আজ আমি স্বাধীন, আজ আমি পরমানন্দময়! বলিতে বলিতেই অনির্ব্বচনীয় করুণায় তাঁহার দু' চক্ষু মুদিয়া আসিল, এবং হাতদুটি একত্র করিয়া ধীরে ধীরে ক্রোড়ের উপর রাখিতেই সেই নিমিলিত নেত্র-প্রান্ত হইতে পিতৃস্নেহ যেন অজস্র অশ্রু-ধারায় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আর কি[illegible] কাঁপিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিতে লাগিল, মা! মা! তুই কোথায় আছিস্—একবার কেবল ফিরিয়া আয়। আমি তোকে পৃথিবীতে আনিয়াছি, আমি তোকে বুকে করিয়া বড় করিয়াছি,—মা তোর সমস্ত অপরাধ, সমস্ত অপমান, সকল লাঞ্ছনা লইয়াই আর একবার পিতৃ-ক্রোড়ে ফিরিয়া আয় অচলা, আমি বুক দিয়া তোর সকল ক্ষত, সকল জ্বালা মুছিয়া লইয়া আবার তেম্‌নি করিয়াই মানুষ করিব। আমরা লোকালয়ে আসিব না, ঘরের বাহির হইব না,—শুধু তুই আর আমি—

বাবা?

বৃদ্ধ মুখ ফিরিয়া মৃণালের মুখের পানে চাহিলেন, বোধ করি একবার আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টাও করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বালকের মত আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন,—মা, মা! আমার বুক যে ফেটে গেল! সবাই তাকে কত দুঃখ, কত ব্যথাই না দিচ্চে! আর যে আমি পারি না!

মৃণাল কিছুই বলিল না, শুধু কাছে আসিয়া তাঁহার ভূলুণ্ঠিত মাথাটি নীরবে কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। তাহার নিজের দুচোখ বাহিয়াও জল পড়িতে লাগিল।

প্রথম ফাল্গুনের এই মেঘে-ঢাকা দিনটি হয়ত এম্‌নি ভাবেই শেষ হইয়া যাইত, কিন্তু হঠাৎ কেদারবাবু চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, মৃণাল, মহিমকে চিঠি লিখ্‌লে কি জবাব পাওয়া যাবে না?

কেন যাবে না বাবা? আমার ত মনে হয় কাল পরশুর মধ্যেই তাঁর উত্তর পাবো।

তুমি কি তাঁকে কিছু লিখেছ?

মৃণাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

চিঠিতে কি লেখা হইয়াছে এ কথা বৃদ্ধ সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা

করিলেন না। বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এখনো খানিক বেলা আছে, আমি একটু ঘুরে আসি। এই বলিয়া তিনি গায়ের কাপড়খানি টানিয়া লইয়া লাঠিটি হাতে করিলেন, কিন্তু দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কিন্তু দেখ মা—

কি বাবা?

আমি ভয় করচি,—না, ভয় ঠিক নয়,—কিন্তু, আমি ভাব্‌চি যে—

কিসের বাবা?

কি জানো মা, আমি ভাব্‌চি,—আচ্ছা, তুমি কি মনে কর মৃণাল, আমরা যেতে চাইলে মহিম আপত্তি করবে?

এ ভয় এবং ভাবনা দুইই মৃণালের যথেষ্ট ছিল, এবং মনে মনে ইহার জবাবটাও সে একপ্রকার ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল; তাই তৎক্ষণাৎ কহিল, এখন সে খোঁজে আমাদের কাজ কি বাবা? তাঁর ঠিকানা জান্‌লেই আমরা চলে যাবো,—তার পরে, সেজ্‌দা যখন আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন, তখন দুনিয়ায় জানবার মত অনেক কথা আপনিই জানা যাবে বাবা। সে আর কাউকে প্রশ্ন করতে হবে না।

কেদারবাবু মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, তাহলে সত্যিই তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

মৃণাল কহিল, সত্যি। কিন্তু, আমি ত তোমার সঙ্গে যাবো না বাবা, বরঞ্চ, তুমিই আমার সঙ্গে যাবে।

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ আবার কি একটা বলিতে গেলেন, কিন্তু কেবলমাত্র ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

ঠিক এম্‌নি এক ফাল্গুনের অপরাহ্ণ-বেলায় এই বাঙ্‌লা দেশের বাহিরে আরও দুটি নর-নারীর চোখের জল সেদিন এম্‌নি অসম্বরণীয় হইয়া উঠিতেছিল; সুরেশ যখন শিল-মোহর করা বড় খামখানি অচলার হাতে দিয়া কহিল, এতদিন দিই-দিই করেও এ কাগজখানি তোমার হাতে দিতে আমার সাহস হয় নি,—কিন্তু আজ আমার আর না দিলেই নয়।

অচলা খামখানি হাতে লইয়া দ্বিধাভরে কহিল, তার মানে?

সুরেশ একটু হাসিয়া বলিল, দুনিয়ায় আমার সাহস হয় না এমন ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য বস্তু আবার কি ছিল এই ত তুমি ভাব্‌চো? ভাব্‌তে পারো,—আমিও অনেক ভেবেচি। এর মানে যদি কিছু থাকে, একদিন তা' প্রকাশ পাবেই। কিন্তু অনেক অপমান অনেক দুঃখের বোঝাই ত সংসারে তুমি আমার কাছে অর্থ না বুঝেই নিয়েচ;—একেও তেম্‌নি নাও অচলা।

অচলা শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এর মধ্যে কি আছে?

সুরেশ হাত জোড় করিয়া কহিল, এতদিন যা' কিছু তোমার কাছে পেয়েছি ডাকাতের মত জোর করেই পেয়েছি। কিন্তু আজ শুধু একটি জিনিস ভিক্ষে চাইচি,—এ কথা তুমি জান্‌তে চেয়ো না।

অচলা চুপ করিয়া রহিল, ইহার পরে কি বলিবে হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না।

বাহিরে পর্দার অন্তরাল হইতে বেহারা ডাকিয়া কহিল, বাবুজী, একাওয়ালা বল্‌চে আর দেরি করলে পৌছুতে রাত্রি হয়ে যাবে। পথে হয় ত ঝড়-বৃষ্টিও হতে পারে।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, আজ আবার তুমি কোথায় যাবে? এমন সময়ে?

সুরেশ হাসিমুখে সংশোধন করিয়া কহিল, অর্থাৎ এমন অসময়ে। যাচ্চি ওই মাঝুলিতেই। প্লেগের ডাক্তার কিছুতে পাওয়া যাচ্চে' না,—অথচ গ্রামগুলো একেবারে শ্মশান হয়ে পড়চে। এবার পাঁচ-সাত দিন থাক্‌তে হবে,—আর, কে জানে, হয় ত একেবারেই বা থেকে যেতে হবে। বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

অচলা স্থির হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে নিজেও কিছু কিছু সম্বাদ জানিত। সাত-আট ক্রোশ দূরে কতকগুলা গ্রাম যে সত্যই এ বৎসর প্লেগে শ্মশান হইয়া যাইতেছে, এ খবর সে শুনিয়াছিল। সহর হইতে এত দূরে এই ভীষণ মহামারীতে দরিদ্রের চিকিৎসা করিতে যে চিকিৎসকের অভাব ঘটিবে, ইহাও বিচিত্র নয়। সুরেশ বহু টাকার ঔষধ-পথ্য যে গোপনে দিকে দিকে প্রেরণ করিতেছে, ইহাও সে টের পাইয়াছিল; এবং নিজেও প্রায়ই ভোরে উঠিয়া কোথায়-না-কোথায় চলিয়া যায়, ফিরিতে কখনো সন্ধ্যা, কখনো রাত্রি হয়,—পরন্তু ত আসিতেই পারে নাই,—কিন্তু সে যে বাড়ী ছাড়িয়া তাহাকে ছাড়িয়া, একেবারে কিছুদিনের মত সেই মরণের মাঝখানে গিয়া বাস করিবার সঙ্কল্প করিবে, ইহা সে কল্পনাও করে

নাই। তাই, কথাটা শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য সে কেবল নিঃশব্দে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। এই যে মহাপাপিষ্ঠ, যে ভগবান মানে না, পাপপুণ্য মানে না, যে একমাত্র বন্ধু ও তাহার নিরপরাধা স্ত্রীর এতবড় সর্ব্বনাশ অবলীলাক্রমে সাধিয়া বসিল, কোন বাধা মানিল না—তাহার মুখের প্রতি সে যখনই চাহিয়াছে তখনই সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় বিষ হইয়া গেছে, কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে তাহারই পানে চাহিয়া সমস্ত অন্তর তাহার বিষে নয়, অকস্মাৎ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ওই লোকটির ওষ্ঠের কোনে তখনও একটুখানি হাসির রেখা ছিল—অত্যন্ত ক্ষীণ,—কিন্তু সেইটুকু হাসির মধ্যেই যেন অচলা বিশ্বের সমস্ত বৈরাগ্য ভরা দেখিতে পাইল। মুখে তাহার উদ্বেগ নাই উত্তেজনা নাই,—এই যে মৃত্যুর মধ্যে গিয়া নামিয়া দাঁড়াইতে যাত্রা করিয়াছে—তথাপি মুখের উপর শঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই। তবে এই নিরীশ্বর ঘোর স্বার্থপরের কাছেও কি তাহার নিজের প্রাণটা এতই সস্তা! সংসারে ভোগ ছাড়া যে লোক আর কিছুই বুঝে না,—ভোগের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে মগ্ন রহিয়াও কি বাঁচিয়া থাকাটা তাহার এম্‌নি অকিঞ্চিৎকর, এম্‌নি অবহেলার বস্তু যে এতই সহজে সমস্ত ছাড়িয়া যাইতে এক নিমিষে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল! হয়ত না ফিরিতেও পারি! ইহা আর যাহাই হোক পরিহাস নয়। কিন্তু কথাটা কি এতই সহজে বলিবার!

অকস্মাৎ ভিতরের ধাক্কায় সে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, হাতের কাগজখানা দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, এটা কি তবে তোমার উইল?

সুরেশও প্রশ্ন করিল, যা এই মাত্র ভিক্ষে দিলে অচলা, তাই কি তবে ফিরে নিতে চাও?

অচলা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা আমি জানতে চাইনে। কিন্তু আমি তোমাকে যেতে দিতে পারবো না।

কেন?

প্রত্যুত্তরে অচলা সেই খামখানাই পুনরায় নাড়াচাড়া করিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তুমি আমার যাই কেন না করে থাকো, আমার জন্যে তোমাকে আমি মরতে দেব না।

সুরেশ জবাব দিল না। অচলা নিজের কথায় একটু লজ্জা পাইয়া কথাটাকে হাল্কা করিবার জন্য পুনশ্চ কহিল, তুমি বল্‌বে তোমার জন্যে মরতে যাবো কোন্ দুঃখে, আমি যাচ্চি গরীবদের জন্যে প্রাণ দিতে। বেশ, তাও আমি দেব না।

কথাটা শুনিয়াই দপ্ করিয়া সুরেশের মহিমকে মনে পড়িল। এবং বুকের ভিতর হইতে একটা গভীর নিঃশ্বাস উত্থিত হইয়া স্তব্ধ ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। কারণ, জীবনের মমতা যে তাহার কত তুচ্ছ, এবং কতই না সহজে ইহাকে সে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার একটি মাত্র সাক্ষী আজও আছে, সে কেবল ওই লোকটি। আজিকার এই যাত্রাই যদি তাহার মহাযাত্রা হয়, ত, সেই সঙ্গীহীন একান্ত নীরব মানুষটিই কেবল মনে মনে বুঝিবে সুরেশ লোভে নয়, ক্ষোভে নয়, দুঃখে নয়, ঘৃণায় নয়,—ইহকাল পরকাল কোন কিছুর আশাতেই প্রাণ দেয় নাই, সে মরিয়াছে শুধু কেবল মরণটা আসিয়াছিল বলিয়াই।

চোখ দুটা তাহার জলে ভরিয়া আসিতে চাহিল, কিন্তু সম্বরণ করিয়া ফেলিল। বরঞ্চ মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, আমি কারও জন্যেই মরতে চাইনে অচলা! চুপ করে নিরর্থক বসে বসে আর ভাল লাগে না, তাই যাচ্চি একটু ঘুরে বেড়াতে। মরব কেন অচলা, আমি মরব না।

তবে এ উইল কিসের জন্যে?

কিন্তু এটা যে উইল সে তো প্রমাণ হয় নি।

না হোক, কিন্তু আমাকে একলা ফেলে তুমি চলে যাবে?

চলেই যে যাবো, আর যে ফিরব না সেও ত স্থির হয়ে যায়নি।

যায়নি বই কি! এই বিদেশে আমাকে একেবারে নিরাশ্রয় করে তুমি—বলিয়াই অচলা কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরেশ উঠিতে গিয়াও বসিয়া পড়িল। একটা অদম্য আবেগ জীবনে আজ সে এই প্রথম সংযত করিয়া লইয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, অচলা, আমি ত তোমার সঙ্গী নই। আজও তুমি একা, আর সেদিন যদি সত্যই এসে পড়ে, ত তখনও এর চেয়ে তোমাকে বেশি নিরাশ্রয় হতে হবে না।

অচলার চোখ দিয়া জল পড়িতেই ছিল, সেই অশ্রুভরা দুই চক্ষু তুলিয়া সুরেশের মুখের প্রতি নিবদ্ধ করিল, কিন্তু, ওষ্ঠাধর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তারপরে দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া সেই কম্পন নিবারণ করিতে গিয়া অকস্মাৎ ভগ্নকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল,—আমার কাছে আর তুমি কি চাও? আর আমার কি আছে? এবং বলিতে বলিতেই মুখে আঁচল গুঁজিয়া পাশের দ্বার দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, একাওয়ালা—

আচ্ছা, আচ্ছা, তাকে সবুর করতে বল্!

অনতিবিলম্বে সহিস আসিয়া জানাইল যে গাড়ী তৈরি হইয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে।

গাড়ী কেন?

সহিস যাহা কহিল তাহাতে বুঝা গেল মাইজী ও-বাড়ীতে বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া হুকুম দিয়াছিলেন, কিন্তু, দাসী বলিতেছে ঘরের দরজা বন্ধ এবং অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। ঘোড়া খুলিয়া দেওয়া হইবে কি না ইহাই সে জানিতে চায়।

আচ্ছা, সবুর কর্।

এ ঘরের ভিতরের দিকের কবাটটা খোলাই ছিল, ইহারই পর্দ্দা সরাইয়া সুরেশ নিঃশব্দে তাহাদের শয়ন-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং তেম্‌নি নিঃশব্দে অদূরে একটা চৌকির উপর উপবেশন করিল। এ কক্ষ তাহাদের দুজনের, এখানে সে অনধিকার প্রবেশ করে নাই, কিন্তু ওই যে প্রশস্ত, শুভ্র-সুন্দর শয্যার উপর সুন্দরী নারী উপুড় হইয়া কাঁদিতেছে, উহার কোনটাই আজ তাহার মনকে সম্মুখে আকর্ষণ করিল না, বরঞ্চ পীড়ন করিয়া পিছনে ঠেলিতে লাগিল। তাহার আগমন অচলা টের পায় নাই, সে কাঁদিতেই লাগিল, এবং তাহারই প্রতি নিষ্পলক দৃষ্টি রাখিয়া সুরেশ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুদিন হইতেই নিজের ভুল তাহার কাছে ধরা পড়িতেছিল, কিন্তু ওই লুণ্ঠিত দেহলতা, ওই বেদনা—ইহার সম্মিলিত মাধুর্য্য তাহার চোখের ঠুলিটাকে যেন এক নিমিষে ঘুচাইয়া দিল। তাহার মনে হইল প্রভাত-রবিকরে পল্লব-প্রান্তে যে শিশিরবিন্দু দুলিতে থাকে, তাহার অপরূপ অফুরন্ত সৌন্দর্য্যকে যে লোভী হাতে লইয়া উপভোগ করিতে চায়, ভুলটা সে ঠিক তেম্‌নি করিয়াছে। সে নাস্তিক, সে আত্মা মানে না; যে প্রস্রবণ বাহিয়া অনন্ত সৌন্দর্য্য নিরন্তর ঝরিতেছে, সেই অসীম তাহার কাছে মিথ্যা; তাই স্থূলের প্রতিই সমস্ত দৃষ্টি একাগ্র করিয়া সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল ওই সুন্দর দেহটাকে দখল করার মধ্যেই তাহার পাওয়াটা আপনা-আপনিই সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে; কিন্তু আজ তাহার আকাশ-স্পর্শী ভুলের প্রাসাদ এক মুহূর্ত্তে চূর্ণ হইয়া গেল। প্রাপ্তির সেই অদৃশ্য ধারা হইতে বিচ্যুত করিয়া পাওয়াটা যে কতবড় বোঝা, এ যে কতবড় ভ্রান্তি, এ তথ্য আজ তাহার মর্ম্মস্থলে গিয়া বিঁধিল। শিশির-বিন্দু মুঠার মধ্যে যে কি করিয়া এক-ফোঁটা জলের মত দেখিতে-দেখিতে শুকাইয়া উঠে, অচলার পানে চাহিয়া চাহিয়া সে কেবল এই সত্যটাই দেখিতে লাগিল। হায় রে! পল্লব-প্রান্তটুকুই যাহার ভগবানের দেওয়া স্থান, ঐশ্বর্য্যের এই মরুভূমিতে আনিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে সে কি করিয়া?

অজ্ঞাতসারে তাহার চোখের কোলে জল আসিয়া পড়িল, মুছিয়া ফেলিয়া ডাকিল, অচলা?

অচলা চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তেম্‌নি নীরবে পড়িয়া রহিল। সুরেশ বলিল, তোমার গাড়ী তৈরি, আজ তুমি রামবাবুদের ওখানে বেড়াতে যাবে?

তথাপি সাড়া না পাইয়া বলিল, যদি ইচ্ছে না থাকে ত আজ না হয় ঘোড়া খুলে দিক। আমিও বোধ হয় আজ আর বার হতে পারব না। একা ফিরিয়ে দিতে বলে দিইগে। এই বলিয়া সে বসিবার ঘরে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

তথায় দশ-পনের মিনিট সে যে কি ভাবিতেছিল তাহা নিজেই জানে না; হঠাৎ শাড়ীর খস্‌খসে শব্দে সচেতন হইয়া সুমুখেই দেখিল অচলা। সে চোখের রক্তিমা যতদূর সম্ভব জল দিয়া ধুইয়া ধনী-গৃহিণীর উপযুক্ত সজ্জায় একেবারে সজ্জিত হইয়াই আসিয়াছিল, কহিল, ওঁদের ওখানে আজ একবার যাওয়া চাই-ই।

এই সাজ-সজ্জা যে তাহার নিজের জন্য নয়, ইহা যে তথাকার আগন্তুক রাজ-অতিথিদের উপলক্ষ করিয়া, এ কথা সুরেশ বুঝিল, তথাপি এই মণি-মুক্ত-খচিত রত্নালঙ্কার-ভূষিত সুন্দরী নারী ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহাকে মুগ্ধ

করিয়া ফেলিল। বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, চাই-ই? কেন?

রাক্ষুসী জ্বর নিয়েই কলকাতা থেকে ফিরেছে,—খবর পেলুম জ্যাঠামশাই নিজেও নাকি কাল থেকে জ্বরে পড়েছেন।

আসা পর্য্যন্ত তুমি কি একদিনও তাঁদের বাড়ী যাওনি?

না।

তাঁরাও কেউ আসেন নি?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না।

রামবাবু নিজেও আসেন নি?

না।

এ বাটীতে আসিয়া পর্য্যন্ত সুরেশ রোগ লইয়া আপনাকে এমনি ব্যাপৃত রাখিয়াছিল যে গৃহস্থালী ও আত্মীয়তার এই সকল ছোট-খাটো ত্রুটি সে লক্ষ্যই করে নাই। তাই, কথা শুনিয়া যথার্থই বিস্ময়ভরে কহিল, আশ্চর্য্য। আচ্ছা, যাও।

অচলা বলিল। আশ্চর্য্য তাঁদের তত নয় যত আমাদের। একজনের জ্বর, একজন নিজে অসুখে না পড়া পর্য্যন্ত আত্মীয়দের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছিলেন। উচিত ছিল আমাদেরই যাওয়া।

আচ্ছা, যাও। একটু সকাল সকাল ফিরো।

অচলা এক-মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তুমিও সঙ্গে চল।

আমাকে কেন?

অচলা মনে মনে রাগ করিয়া কহিল, নিজের অসুখের কথা মনে করতে না পারো, অন্ততঃ ডাক্তার বলেও চল।

আচ্ছা, চল, বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কাপড় ছাড়িতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

একাওয়ালা বেচারা কোন কিছু হুকুম না পাইয়া তখনও অপেক্ষা করিয়াছিল। নীচে নামিয়া তাহাকে দেখিয়াই অচলা খামকা রাগিয়া উঠিয়া বেহারাকে তাহার কৈফিয়ৎ চাহিল, এবং ভাড়া দিয়া তৎক্ষণাৎ বিদায় দিতে আদেশ করিল। সে সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কাল—

অচলাই তাহার জবাব দিল, কহিল, না। বাবুর যাওয়া হবে না, একার দরকার নেই।

গাড়ীতে উঠিয়া সুরেশ সম্মুখের আসনে বসিতে যাইতেছিল, আজ অচলা সহসা তাহার জামার খুঁট ধরিয়া টানিয়া পাশে বসিতে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করিল। গাড়ী চলিতে লাগিল, কেহই কোন কথা কহিল না, পাশাপাশি বসিয়া দুজনেই দুই দিকের খোলা জানালা দিয়া কেবল বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাগানের গেট পার হইয়া গাড়ী যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িল, তখন সুরেশ আস্তে আস্তে ডাকিল, অচলা?

কেন?

আজ কাল আমি কি ভাবি জানো?

না।

এতকাল যা' ভেবে এসেছি ঠিক তার উল্টো। তখন ভাবতুম কি কোরে তোমাকে পাবো, এখন অহর্নিশি চিন্তা করি কি উপায়ে তোমাকে মুক্তি দেব। তোমার ভার যেন আমি আর বইতে পারিনে।

এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ও একান্ত নির্ম্মম আঘাতের গুরুত্বে ক্ষণকালের জন্য অচলার সমস্ত দেহ মন একেবারে অসাড় হইয়া গেল। ঠিক যে বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাও নয়, তথাপি অভিভূতের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া অবশেষে অস্ফুট স্বরে কহিল, আমি জানতুম। কিন্তু এ যে—

সুরেশ বলিল, হাঁ, আমারই ভুল। তোমরা যাকে বল পাপের বল। কিন্তু তবুও কথাটা সত্য। মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা যে এমন অসহ্য ভারী এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

অচলা চোখ তুলিয়া কহিল, তুমি কি আমাকে ফেলে চলে যাবে?

সুরেশ লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া জবাব দিল; বেশ, ধর তাই।

এই নিঃসঙ্কোচ উত্তর শুনিয়া অচলা একেবারে নীরব হইয়া গেল। তাহার বদ্ধ হৃদয় মথিত করিয়া কেবল এই কথাটাই চারিদিকে মাথা কুটিয়া ফিরিতে লাগিল, এ সেই সুরেশ। এ সেই সুরেশ। আজ ইহারই কাছে সে দুঃসহ বোঝা, আজ সেই তাহাকে ফেলিয়া যাইতে চাহে! কথাটা মুখের উপর উচ্চারণ করিতেও আজ তাহার কোথাও বাধিল না।

অথচ, পরমাশ্চর্য্য এই যে, এই লোকটিই তাহার

সীমাহীন দুঃখের মূল! কাল পর্য্যন্তও ইহারি বাতাসে তাহার সমস্ত দেহ বিষে ভরিয়া গেছে!

মেঘাবৃত অপরাহ্ণ আকাশ-তলে নির্জ্জন রাজ-পথ প্রতিধ্বনিত করিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে,—তাহারই মধ্যে বসিয়া এই দুটি নর-নারী একেবারে নির্ব্বাক। সুরেশ কি ভাবিতেছিল সেই জানে, কিন্তু তাহার উচ্চারিত বাক্যের কল্পনাতীত নিষ্ঠুরতাকে অতিক্রম করিয়াও অকস্মাৎ একটা নূতন ভয়ে অচলার সমস্ত মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুরেশ নাই,—সে একা। এই একাকীত্ব যে কত বৃহৎ, কিরূপ অকূল, তাহা চক্ষের নিমিষে বিদ্যুদ্বেগে তাহার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় যে তরণী বাহিয়া সে সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়াছে, সে যে ভগ্ন, সে যে অনিবার্য্য মৃত্যুর মধ্যেই তিল-তিল করিয়া ডুবিতেছে, ইহা তাহার চেয়ে বেশি কেহ জানে না, তথাপি সেই সুপরিচিত ভয়ঙ্কর আশ্রয় ছাড়িয়া আজ সে দিক-চিহ্নহীন সমুদ্রে ভাসিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়াই তাহার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল। আর তাহার কেহ নাই;—তাহাকে ভালবাসিতে, তাহাকে ঘৃণা করিতে, তাহাকে রক্ষা করিতে, তাহাকে হত্যা করিতে কোথাও কেহ নাই;—সংসারে সে একেবারেই সঙ্গবিহীন! এই কথা মনে করিয়া তাহার যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সহসা তাহার অশক্ত অবশ ডান হাতখানি ধপ্ করিয়া সুরেশের ক্রোড়ের উপর পড়িতেই সে চমকিয়া চাহিল। অচলা নিরুদ্ধকণ্ঠ প্রাণপণে পরিষ্কার করিয়া কহিল, আর কি আমাকে তুমি ভালবাসো না?

সুরেশ হাতখানি তাহার সযত্নে নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিল, কিন্তু উত্তর দিল, এ প্রশ্নের জবাব তেমন নিঃসংশয়ে আর দিতে পারিনে অচলা। মনে হয়,—সে যাই হোক, এ কথা সত্য যে, এই ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াবার আর আমার শক্তি নেই।

অচলা আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া অত্যন্ত মৃদু, করুণকণ্ঠে কহিল, তুমি আর কোথাও আমাকে নিয়ে চল—

যেখানে কোন বাঙালী নেই?

হাঁ। যেখানে লজ্জা আমাকে প্রতিনিয়ত বিঁধবে না—

সেখানে কি আমাকে তুমি ভালবাসতে পারবে?

অচলা এ কি সত্য? বলিতে বলিতেই আকস্মিক আবেগে সে তাহার মাথাটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া ওষ্ঠাধর চুম্বন করিল।

অপমানে আজও অচলার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, ঠোঁট দুটি ঠিক তেমনি বিছার কামড়ের মত জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তবুও সে ঘাড় নাড়িয়া চুপি-চুপি বলিল, হাঁ। এক সময়ে তোমাকেও আমি ভালবাসতুম। না না,—ছি—কেউ দেখতে পাবে। এই বলিয়া সে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিল। কিন্তু হাতখানি যাহার মুঠার মধ্যে ধরাই রহিল, সে তাহারি উপর পরম স্নেহে একটুখানি চাপ দিয়া কেবল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

গাড়ী বড় রাস্তা ছাড়িয়া রামবাবুর বাঙ্লো-সংলগ্ন উদ্যানের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং সেই বিরাট্ ওয়েলার-যুগল-বাহিত বিপুল-ভার অশ্ব-যান সমস্ত গৃহ প্রকম্পিত করিয়া দেখিতে-দেখিতে গাড়ী-বারান্দার নীচে আসিয়া থামিল।

জমকালো নূতন-পোষাকপরা সহিসেরা গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল, এবং সুরেশ নিজে নামিয়া হাত ধরিয়া অচলাকে অবতারণ করাইল। অচলার দৃষ্টি ছিল উপরের বারান্দায়। তথায় অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে রাক্ষুসীও বিছানা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; বহুদিনের পর চোখে-চোখে দুই সখীর মুখেই হাসি ফুটিয়া উঠিল। রামবাবু নীচেই ছিলেন, তিনি গায়ের বালাপোষখানা ফেলিয়া দিয়া সানন্দে, সস্নেহে আহ্বান করিলেন, এসো, এসো, আমার মা এসো।

এই পরিচিত কণ্ঠস্বরের ব্যগ্র-ব্যাকুল আবাহনে তাহার হাসিমাখা চোখের দৃষ্টি মুহূর্ত্তে নামিয়া আসিয়া বৃদ্ধের উপর নিপতিত হইল;—কিন্তু তাঁহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আজ মহিম,—তাহারই প্রতি চাহিয়া যেন পাথর হইয়া গেছে! চোখে-চোখে মিলিল, কিন্তু সে চোখে আর পলক পড়িল না। সর্ব্বাঙ্গের মণি-মুক্তা অচলার তেমনি ঝলসিতে লাগিল, হীরা-মাণিকের দীপ্তি লেশমাত্র নিষ্প্রভ হইল না,—কিন্তু তাহাদেরই মাঝখানে প্রস্ফুটিত কমল যেন চক্ষের নিমিষে মরিয়া গেল।

কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে বৃদ্ধের ভুল হইল।

অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে তাহাকে সহসা লজ্জায় ম্লান ও বিপন্ন কল্পনা করিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া অচলার আনত ললাট দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, থাক্, থাক্ মা, আর তোমাকে পায়ের ধুলো নিতে হবে না, তুমি ওপরে যাও—

অচলা কিছুই বলিল না, টলিতে-টলিতে চলিয়া গেল।

রামবাবু কহিলেন, সুরেশবাবু, ইনি—"

সুরেশ কহিল, বিলক্ষণ! আমরা যে এক ক্লাসের,—ছেলেবেলা থেকে দুজনে আমরা—বলিয়া সহসা হাসির চেষ্টায় মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, কি মহিম, হঠাৎ তুমি যে—"

কিন্তু কথাটা আর শেষ হইতে পারিল না। মহিম মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

হতবুদ্ধি বৃদ্ধ সুরেশের মুখের প্রতি চাহিলেন, এবং সুরেশও প্রত্যুত্তরে আর একটা হাসির প্রয়াস করিতে গেল, কিন্তু, তাহাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না। উপরে যাইবার কাঠের সিঁড়িতে অকস্মাৎ গুরুতর শব্দ শুনিয়া দুজনেই স্তব্ধ হইয়া গেলেন। একটা গোলমাল উঠিল; রামবাবু ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, অচলা উপুড় হইয়া পড়িয়া। সে দুই তিনটা ধাপ উঠিতে পারিয়াছিল মাত্র, তাহার পরেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেছে।

পুস্তক-পরিচয়।

পোকা-মাকড়

শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা

বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় অদ্বিতীয়। তিনি যেমন দুরূহ বিষয় গম্ভীরভাবে আলোচনা করিতে পারেন, তেমনই জলের মত বুঝাইয়াও দিতে পারেন। এই 'পোকা-মাকড়' বইখানিই তাহার প্রমাণ দিতেছে। ছোট ছেলে-মেয়েদের পোকা-মাকড় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মাইবার জন্য বইখানি লিখিত হইয়াছে; কিন্তু, আমরা অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের অভিভাবকগণও এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অনেক কথা শিখিলাম। কারণ, বাঙ্গালা ভাষায় এ রকম বই লিখিবার চেষ্টা ত আর কেহ করেন নাই,—এই প্রথম। এই বইখানি পড়িয়া শ্রীযুক্ত স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় লেখককে লিখিয়াছেন—"বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব সকল সাধারণের এমন কি বালক-বালিকাদেরও বোধগম্য করিয়া লিখিবার ক্ষমতা আপনার অসাধারণ। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। আমি আজ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আক্ষেপ করিয়াছিলাম যে, উদ্ভিদ ও প্রাণি-বিদ্যা লিখিবার সুবিধা সত্ত্বেও এ দেশে ইহা উপেক্ষিত হইতেছে। এই পুস্তকে আপনার পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতারও পরিচয় পাওয়া যায়। আশা করি, এই পুস্তক ঘরে-ঘরে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় স্থান পাইবে।" আমরা বলি, এই বইখানি স্কুলপাঠ্য হওয়া চাই। এমন সুন্দর, সুলিখিত, তথ্যপূর্ণ পুস্তকখানি যদি বাঙ্গালী সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ না করে, তাহা হইলে আমাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

মনে মনে

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৷৹ আনা

"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।" নির্ব্বিকার চিত্তের এই যে প্রথম বিকার, ইহারই নাম ভাব। আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়িলে এই ভাবের প্রবাহ পাঠককে আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়। যাহাকে আশ্রয় করিয়া রসধারা লীলায়িত হইয়া উঠে, অলঙ্কার-শাস্ত্রে এই রসোদ্‌গমের হেতুকে 'আলম্বন' কহে এবং যে রসে যে ভাব ও বস্তুর সম্মেলন ঐ রসের পরিপোষক, সেই ভাব ও বস্তুগুলিকে 'উদ্দীপন' কহে। 'মনে মনে'র আলম্বন ও উদ্দীপন অতি সুন্দর। এই ভাব-রস পাঠকের বোধগম্য করিয়া দেওয়ার কৌশলই Art। 'এ-পিঠে'র কথাগুলি চির-পুরুষের এবং 'ও-পিঠে'র কথাগুলি চির-নারীর চিরন্তন অনুভূতি। উভয়ে মিলিয়া পাঠকের মনের দোলা দোলাইয়া দিয়া যায়। অপরিচিতাকে আপন করিয়া লইবার জন্য আকুলতা, জীবনের শুভ্র-শুক-তারাটির অস্ত যাওয়ায় বিদায়-ব্যথা প্রভৃতির চিত্রণ, প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈচিত্র্য, ব্যঞ্জনার বৈশিষ্ট্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে, এ কথা অত্যুক্তি নহে। বইখানি গদ্য ছন্দে লিখিত কবিতা। এক অপরিচিতার মুখের হাঁসি, চোখের চাহনি, গলার সুর, নিঃশ্বাসের উচ্ছ্বাস, অলকের স্পর্শ, দাঁড়ানোর ভঙ্গী, চলার হিল্লোল, খোলা চুলের খেলা তাহার মনের মধুরতার সহিত মিলিয়া পাঠকের চোখের সম্মুখে যেন লুকোচুরি খেলিতে থাকে। 'এ-পিঠে'র চিঠিগুলিতে রস উছলিয়া-উছলিয়া উঠিতেছে। মনস্তত্ত্বের এরূপ নিপুণ বিশ্লেষণ খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। রসগ্রাহিগণ 'মনে মনে' পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

গান

শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্তৃক প্রণীত, মূল্য আট আনা

'বঙ্গবাসী'র রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত; তাঁহার গানও অনেকে শুনিয়াছেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার গানের প্রথম উচ্ছ্বাস প্রচার করিয়াছিলেন, এখন এই দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস বাহির হইল। ইহাতে ভক্তিমূলক অনেকগুলি গান আছে। প্রথম উচ্ছ্বাসের ন্যায় এখানিও আদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

উপনিষৎ,—ঈশ, কেন

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক অনুবাদিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত; এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রবিড় কর্তৃক সংশোধিত। মূল্য ছয় আনা, বাঁধানো আট আনা। বইখানির আকার ডবল ক্রাউন ৩২ পৃষ্ঠা হিসাবে ১৫২ পৃষ্ঠা; স্বচ্ছন্দে পকেটে বহন করা যায়; সুতরাং ইহাকে পকেট সংস্করণ বলা চলে। উপনিষদের এই সংস্করণের প্রথম ভাগে ঈশ ও কেন এই দুইখানি উপনিষৎ আছে। গ্রন্থখানির আগাগোড়া বঙ্গাক্ষরে ছাপা। অতএব সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকগণের বেশ উপযোগী হইয়াছে। প্রথমে মূল শ্লোক, তৎপরে অন্বয়, তৎপরে অক্ষরার্থ, তাহার পর তাৎপর্য্য এবং তৎসহ শঙ্করার্চনা,—এই ভাবে গ্রন্থখানির বিন্যাস সাধিত হইয়াছে। অক্ষরার্থ মূলেরই প্রতিশব্দের প্রতিশব্দ, অন্বয়ের অনুসরণে বিন্যস্ত। তাৎপর্য্যের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল—সর্ব্বসাধারণের সুবোধগম্য। শঙ্করার্চনা অংশ উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্য হইতে বিচারাংশ বাদে অন্বয় মুখে সাজাইয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থ শেষে মূল শ্লোকগুলি একসঙ্গে পুনরায় সন্নিবিষ্ট হওয়ায় পাঠার্থীর কণ্ঠস্থ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়।

দগ্ধ-হৃদয়

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত, মূল্য দেড়টাকা।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত অনেক উপন্যাস বাঙ্গালী পাঠক বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। এই 'দগ্ধ-হৃদয়'ও তাঁহার সে যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল লেখকের নিকট হইতে আমরা এই প্রকার উপন্যাসই আশা করি। তিনি একটী অতি সুন্দর একান্নবর্ত্তী পরিবারের চিত্র দিয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালা দেশে আমরা আর কি সে চিত্র দেখিতে পাইব। বিকাশের দগ্ধ-হৃদয়ের কথা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। তাহার পর মঞ্জরীর চরিত্র এই পুস্তকের মধ্যে আনিয়া লেখক মহাশয় একটি অতি কঠিন সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছেন; তাহার মীমাংসা আমরা হেমেন্দ্র বাবুর নিকট আশা করিয়াছিলাম; তিনি কিন্তু সমস্যাটীর মামুলী পরিসমাপ্তি করিয়াছেন—মঞ্জরীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

সাহিত্য-সংবাদ

এই মাসে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন অঙ্কিত 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মী' শীর্ষক যে বহুবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইল, সেখানি 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফারমাসিউটিক্যাল কোম্পানী'র ডিরেক্টরের শিরোভূষণ ভাবে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত কোম্পানীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় উক্ত চিত্র আমাদিগকে প্রকাশিত করিতে দিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীমান ব্রজমোহন দাসের 'বিয়ের কণে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। মূল্য পূর্ব্ববৎ পাঁচসিকাই রহিল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, প্রণীত নূতন উপন্যাস "বেনের মেয়ে" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲।

॥০ আনা সংস্করণের ৪৬ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি-এ প্রণীত "প্রত্যাবর্ত্তন" ও ৪৭ সংখ্যক গ্রন্থ ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন এম এ ডিএল প্রণীত "দ্বিতীয় পক্ষ" প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত উপন্যাস "বৈরাগ যোগ" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।০

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের 'Aurangjib IV' ও 'Studies in Mughal India' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য যথাক্রমে ৩॥০ ও ২৲ টাকা মাত্র।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

[illegible]

(Royalists Seeking Safety)

[শিল্পী—Marcus Stone R. A.]

[Blocks by BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

Emerald Printing Works

মাঘ, ১৩২৬

দ্বিতীয় খণ্ড] সপ্তম বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

বেদ ও বিজ্ঞান *

[অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ]

যেটা আমরা অপরের মুখে শুনিয়া প্রভৃতি, অথবা অনুমান করিয়া লই, সেটার সম্বন্ধে আমরা একেবারে নিঃসংশয় কখনই হই না। বৈজ্ঞানিকের মুখে শুনিলাম, অথবা নিজেই কতকগুলি আকার-ইঙ্গিত দেখিয়া অনুমান করিয়া লইলাম যে, মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিমান জীব বাস করে; এ ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বলবত্তর প্রমাণ না পাইতেছি, ততক্ষণ আমার মন হইতে সকল সংশয় দূর করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে ত পারি না। পরের মুখে শোনা, অনুমান প্রভৃতি আমাদের ভিতরে বস্তু-সম্বন্ধে পরোক্ষজ্ঞানমাত্র জন্মাইয়া থাকে—পূর্ব্বের দৃষ্টান্তে যেরূপ। পরোক্ষজ্ঞান লইয়া মানুষের বুদ্ধি সুস্থির থাকিতে পারে না; যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে সাক্ষাৎ-জ্ঞান বা অপরোক্ষজ্ঞানের পরীক্ষায় অনুমান প্রভৃতিকে যাচাই করিয়া লইতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার সংশয়ের বিলয় বা চিন্তার বিশ্রাম নাই। গুরুমুখে ও শাস্ত্রে বরাবর শুনিয়া আসিতেছি যে, দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ নাই; জন্মান্তরে জীর্ণ বাস পরিহার করিয়া নূতন বাস পরিধান করার মত, আত্মা, এক জীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নবীন কলেবর ধারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখাৎ "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" শুনিয়া লইলেও, আমার বিশ্বাস ত কৈ ধ্রুব পদবীর ছায়াও স্পর্শ করে নাই; বরং জীবন-সংগ্রামে, চতুর্দ্দিকে উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি আরব্যোপন্যাসের সেই ধীবরের জাল-সমাকৃষ্ট দানবটার মত "ঘন হ'য়ে যখন ঘিরিয়া আসে" তখন আমি ত লোকায়ত মতেরই একজন হইয়া, মুখ ফুটিয়া না হউক, অন্তরের নিরালা ও নীরস প্রদেশ হইতে বলিয়া উঠি,—"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" যে দেহটা চিতায়

* জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ—জ্ঞান-প্রচার-সমিতির চতুর্বিংশতিতম অধিবেশনে পঠিত।

উঠিয়া ভস্মত্ব পাইল, ঠিক সেই দেহটারই অবশ্য আর পুনরাগমন নাই, এবং যে আত্মা নিজেকে খাঁটি করিয়া জানিল, তাহার সম্বন্ধেও শ্রুতি অবশ্য ঠিকই বলিয়াছেন,—"ন স পুনরাবর্ত্ততে"। কিন্তু অনাদি অবিদ্যা-সংস্কার যতক্ষণ পর্য্যন্ত এড়াইয়া যাইতে না পারিতেছি, নটীর মত নিজের রঙ্গ দেখাইয়া প্রকৃতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুরুষের সঙ্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভবের টানা-প'ড়েনে আমাকে, তন্তুবায়ের মাকুটার মত, বাসনাসূত্র অবলম্বনে এক বিচিত্র কর্ম্মজাল জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বুনিয়া যাইতে হইতেছে,—এ রহস্য গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে আমি পুনঃপুনঃ শুনিয়াছি; কিন্তু শুনিয়াও, ঐ যা বলিলাম; আমার বিশ্বাস দৃঢ় ও সুস্থির হয় নাই।। জৈগীষব্যের মত দশমহা-কল্পের না হউক দুটো একটা অতীত জন্মের ঠিক স্মরণ হইলে হয় ত বিশ্বাস অটল হইত; পশ্চিম দেশের Psychic Research Society যে সকল mediumএর সাহায্যে প্রেতলোকের সন্দেশ আমাদের কাছে বহন করিয়া আনিতেছেন, সেই রকম একটা mediumএর লক্ষণ নিজের মধ্যে দেখিতে পাইলেও Sir Oliver Lodge-প্রমুখ বৈজ্ঞানিক ধুরন্ধরের কাছে না হয় একখানা আরজি পাঠাইয়া দিতাম; কিন্তু পরের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়া, অথবা অপ্রতিষ্ঠিত-স্বভাব দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া, আমি ত আত্মার স্বরূপ ও জন্ম হইতে জন্মান্তরে পর্য্যটন সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে ছিন্ন সংশয় হইতে পারি নাই। সেই যম-নচিকেতাঃ-সংবাদ, সেই প্রাচীন পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, গীতায় সেই আত্মার প্রয়াণ কালে প্রস্থান-ভেদ—এ সকল সংবাদের মত আত্মীয় সংবাদ, মর্ম্মের কথা, আমার আর কিছুই নাই; কারণ, ইহা যে আমি কি ছিলাম, কি হইব—ইহারই জিজ্ঞাসা; এ জিজ্ঞাসা অপেক্ষা আর কোনও জিজ্ঞাসা—"বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে?" এ প্রশ্নের চেয়ে আর কোনও প্রশ্ন ত—প্রাণের একেবারে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হয় না; কিন্তু জিজ্ঞাসা অন্তরের যে স্তর হইতেই উত্থিত হউক, বক্তৃতা শুনিয়া, পড়া-শুনা করিয়া, অথবা বিচার-মনন করিয়া, সে জিজ্ঞাসা এখনও তৃপ্ত হইতে পারে নাই। বিবেকানন্দ যেমন পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বর, ঈশ্বর করিতেছ; ঈশ্বর আমায় দেখাইয়া দিতে পার?"—তেমনি গুরু ও শাস্ত্রকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—"পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম করিতেছ; আমায় দেখাইয়া দিতে পার?" এ দেশের গুরু ও শাস্ত্র না কি ইহাতে পেছপাও নহেন; তাঁহারাই না কি জোর করিয়া অধ্যাত্মশাস্ত্রে বলিয়াছেন, "নৈষামতিস্তর্কেণাপনীয়া" দর্শনশাস্ত্রের তর্কপাদের বাক্-বিতণ্ডার মধ্যেও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, বিশ্বাসের সুস্থিরতার জন্য, যথার্থ জ্ঞানের আশ্রয় স্বরূপ, যে ভূমি আমাকে পাইতে হয়, তাহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান, অপরোক্ষানুভূতি direct experience, অনুমান প্রভৃতি অপর সকল জ্ঞানের কষ্টিপাথর ও বিরামস্থান এই অপরোক্ষ-জ্ঞান। শুধু আত্মা সম্বন্ধে নয়, নিখিল বস্তুজাত সম্বন্ধেই আমাদের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন যতক্ষণ পর্য্যন্ত দর্শন বা সাক্ষাৎকারে গিয়া পরিসমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সংশয়ের হাত হইতে আমাদের অব্যাহতি নাই, এবং ছুটিও নাই। বিজ্ঞান বা Scienceএর কাছে আমরা যে মাথা নোয়াইয়া থাকি, তাহাতে মানবাত্মার সম্বর্দ্ধনা বই অবমাননা হয় না; কারণ, শ্রুতি প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়াছেন; এবং বিজ্ঞান অনেক বিষয়ে আমাদিগকে যে অপরোক্ষ-জ্ঞান (direct experience based on observation and experiment) দিবার আয়োজন করিয়াছে, তাহাতে সে প্রকারান্তরে আমাদের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেরই পথ করিয়া দিতেছে; পথটা অবশ্য ঠিক সিধা পথ নয়, হয় ত বন্ধুর ও বিঘ্ন-সঙ্কুল। এ পথে হাঁটিতে গেলেও আমাদের সম্মুখে যে লক্ষ্য তাহা সেই ভূমা—সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানরাশি যাহাকে ঋষিরা ব্রহ্ম-জ্ঞান বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জড়বিজ্ঞান যে মার্গ অনুসরণ করিয়া চলিতেছে, তাহাতে গোলক-ধাঁধার মধ্যে পথ হারাইয়া খণ্ডিত, কৃপণ ও কুণ্ঠিত জ্ঞানেই আবদ্ধ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা বিলক্ষণ আছে। হয় ত একটা পিপীলিকার পদ অথবা একটা ধূলি-রেণুর গঠন পরীক্ষা করিতে-করিতেই 'জনম'টা কাটিয়া গেল। ইহাতে একদিকে লাভ নিশ্চয়ই আছে;—ক্ষুদ্রেই হউক, আর বিরাটেই হউক, অণুতেই হউক আর মহানেই হউক, সাম্না-সাম্নি দেখিয়া-শুনিয়া, পরিচয় করিয়া লইবার যে একটা স্পৃহা মানবাত্মার মধ্যে চিরজাগরূক, সে স্পৃহার কতকটা তৃপ্তি পিপীলিকাপদসেবী বৈজ্ঞানিকের অবশ্যই

হইয়াছে ; অপিচ, সেই তুচ্ছ পরীক্ষার ভিতরে জীবপ্রকৃতির কোনও একটা বিরাট তথ্য হয় ত ইঙ্গিতে আপনার অবস্থিতি জানাইয়া দিয়াছে ;—পিপীলিকার পদ লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে-দেখিতে হয় ত এমন একটা বড় নিয়ম ও ব্যবস্থা ধরিয়া ফেলিলাম, যেটা হয় ত নিখিল জীবজগতের একটা গোড়ার কথা ; পিপীলিকার পদের সেবা করিতে যাইয়া এমন একটা পদের হয় ত সন্ধান পাইলাম, যে পদ স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল আক্রমণ করিয়াও সমাপ্ত হয় নাই ; যে পদের নিম্নে ভক্তকে তাঁহার মাথা পাতিয়া দিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, যে বিশ্বাত্মা বামন হইয়া, ক্ষুদ্র হইয়া, তাঁহার দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি পাতিয়াছিলেন, সে বিশ্বাত্মা স্বয়ং বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী ; আমি যেখানে তাঁহাকে "অণোরণীয়ান্" দেখিতেছি, বামন ভাবিতেছি, সেখানে তিনি "মহতো মহীয়ান্" ত্রিবিক্রম ; আমি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিব কি, তিনি আমার মস্তকে পদ রাখিয়া আমায় বুঝাইয়া দিলেন যে, আমার সকল ধীবৃত্তিকে শুভাশুভ বাসনায় বিনিয়োগ করিয়াও তিনি ধীবৃত্তির দ্বারা অধৃষ্য ও অগ্রাহ্য—অবাঙ্-মনসগোচর। হয় ত হইতে পারে যে, বৈজ্ঞানিক পিপীলিকার পদে অথবা ধূলি রেণুতে বামনের সেই বিশ্বরূপেরই আভাস ইঙ্গিত পাইয়া মুগ্ধ, আত্মহারা হইয়া থাকেন—সেই সহস্র-শীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ পুরুষেরই সন্ধান পান, যিনি সকল ভূমি সর্ব্বতোভাবে স্পৃষ্ট করিয়াও "অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্"। বৈজ্ঞানিকের এ সৌভাগ্য কদাচিৎ যে না হইয়াছে এমন নহে ; বিশেষভাবে নাম করিয়া কি হইবে, নিউটন, ফ্যারাডের মত কোন-কোন ভাগ্যবান্ বৈজ্ঞানিক চিনিয়া ফেলিয়াছেন, আমাদের সেই বামন ঠাকুরটিকে যিনি বিরাট হইয়াও ক্ষুদ্রের সাজে, অপরিচ্ছিন্ন হইলেও পরিচ্ছিন্নের মত, আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ও বুদ্ধির দ্বারে ভিখারীর মত আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। ছোটর মধ্যে বড়র সন্ধান ও আবিষ্কার বিজ্ঞান সময়-সময় যে না করিতে পারিয়াছে এমন নয় ; কিন্তু অনেক সময়েই আমরা ছোটকে লইয়া ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে প্রায় কূপমণ্ডূকই হইয়া পড়ি—বড়র কথা এক রকম ভুলিয়াই যাই। বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথে এই এক বিপদ্ ;—টুক্‌রা-টুক্‌রা জ্ঞানগুলি কুড়াইয়া সংগ্রহ করিতে-করিতে অনেক সময় ভুলিয়াই যাই যে এক সীমাহীন মহাসিন্ধু নিগূঢ়-উচ্ছ্বাসে বেলাভূমির উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া দু'চারখানা চকচকে ঝিনুক ও পাথর ছড়াইয়া দিতেছে বটে, কিন্তু তার গভীর ও বিপুল কুক্ষিতলে যে মাণিক স্তরে-স্তরে সাজান আছে, তার একখানা কোনও মতে আমার হাতে আসিলেই আমি "সাত রাজার ধন" পাইয়া বসিতাম। শ্রুতি তাই আমাদের এমন একটা কিছু জানিতে বলিয়াছেন, যেটা জানিলে "সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি"। বৈজ্ঞানিক তথ্যান্বেষণ সময়ে-সময়ে আমাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিয়া একটা সীমাহীন, অফুরন্ত গোলক-ধাঁধায় ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া মারিবার ব্যবস্থা করিলেও, তাহার মূল্য ও প্রয়োজন বড় সাধারণ নহে। পরীক্ষা দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান পাইবার জন্যই বিজ্ঞানের আগ্রহ এবং লক্ষ্য বজায় রাখিয়া পথটাকে সোজা করিয়া লইলেই ইহা বেদ ও ব্রহ্মজ্ঞানের পথ। বেদ ও বিজ্ঞানের মধ্যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠ রকমের আত্মীয়তা আছে, এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না।

বেদের অপর একটা নাম শ্রুতি হইলেও, যাহারা বেদকে শোনা কথা ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রাচীনদের অভিপ্রায় মোটেই বুঝেন নাই। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের, তৃতীয় পাদের, আটাশ সূত্রে ব্যাস বেদকে প্রত্যক্ষ ও স্মৃতিকে অনুমান বলিতেছেন ; শঙ্করাচার্য্য সূত্রের উপর ভাষ্য করিতে যাইয়া লিখিতেছেন—"প্রত্যক্ষং হি শ্রুতিঃ প্রামাণ্যং প্রতি অনপেক্ষত্বাৎ। অনুমানং হি স্মৃতিঃ প্রামাণ্যং প্রতি সাপেক্ষত্বাৎ।" আবার, অন্যত্র লিখিতেছেন—"বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপ-বিষয়ে।" চোখে দেখিলে, অথবা কাণে শুনিলে, অথবা স্পর্শাদি করিয়া দেখিলে আমরা বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হই, এবং সে সব ক্ষেত্রে অন্য প্রমাণের আর অপেক্ষা থাকে না। অনুমান প্রভৃতিতে যতই আস্থা স্থাপন করি না কেন, মনের সংশয় একেবারে দূর হয় না, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের কষ্টিপাথরে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইবার একটা অপেক্ষা রহিয়া যায়। প্রত্যক্ষ অসন্দিগ্ধ ও নিরপেক্ষ প্রমাণ। একটা পাত্রে দুইটা গ্যাস মিশ্রিত করিয়া তাড়িত-প্রবাহে চঞ্চল করিয়া দিলাম ; ফলে পাইলাম খানিকটা জল। আমার বুদ্ধি-বিবেচনায়, তাড়িত-শক্তির আলোড়নে গ্যাস যুগলের এক-বারে জল না হইয়া অগ্নিশর্ম্মা হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হইতেছে ; কিন্তু চোখে যখন দেখিতেছি জল, তখন শত যুক্তিতর্ক

এবং গাড়ি-গাড়ি অনুমান-খণ্ড সে জংকে আগুন করিয়া দিতে পারিবে না। প্রত্যক্ষজ্ঞান রূপকথার সেই রাজ-পুত্র,—কাহারও কাছে ঘাড় হেঁট করিতে জানে না; বুদ্ধি-বিবেচনাকে প্রত্যক্ষের (আমার দেখা-শোনা প্রভৃতির) মন যোগাইয়া চলিতে হয়; অনুমান প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষের অনুগত হইয়াই থাকিতে হয়। এইজন্য দর্শন-শাস্ত্রকারেরা প্রত্যক্ষকে জ্যেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া থাকেন। সংক্ষেপে আমরা পাইলাম যে, প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান বিস্পষ্ট, অসংদিগ্ধ ও নিরপেক্ষ। আমরা যে জ্ঞানরাশিকে বেদ বলিয়া মানিয়া থাকি, সেই জ্ঞানরাশিতেও না কি এই লক্ষণগুলি আছে; আছে বলিয়াই, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে প্রত্যক্ষ বলিয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন। অথচ, আমরা আপাততঃ দেখিতেছি যে, বেদ শোনা কথা; আমার মত অধম ম্লেচ্ছ-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী হয় ত রমেশ দত্ত বা মোক্ষমূলারের পাতা উল্টাইয়া বেদের খবর লইয়াছে, পণ্ডিত মহাশয়দের মধ্যে কেহ-কেহ (অনেকেই নহেন) কাশীতে গিয়া বেদজ্ঞ আচার্য্যের অন্তেবাসী হইয়া শিক্ষা-কল্প প্রভৃতি অঙ্গের সহিত বেদ শুনিয়াছেন ও শিখিয়া আসিয়াছেন। উভয় স্থলেই, বেদের যেটুকু পরিচয় আমরা পাইতেছি, তাহা পড়িয়া-শুনিয়া। আবার হালের পণ্ডিতদের যে বৈদিক গবেষণা, তাহাতে না কি বেদ পড়িবার বা শুনিবার প্রয়োজনও বড় একটা নাই—পাণিনি, যাস্ক প্রভৃতির ধার দিয়া না গিয়াও, একখানা বিলাতী বৈদিক সূচীপত্র অথবা Indexএর মাহাত্ম্যে, প্রাচীন অর্ব্বাচীন সকল প্রকার সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও কর্ম্মকুশলতায়, জড়বুদ্ধিগণের অনতিক্রমণীয় বেদ-বারিধির পারগ অনায়াসেই হইয়া থাকেন। ইঁহাদের অঘটনঘটনপটিয়সী কর্ম্মকুশলতা এবংবিধ স্বাধ্যায়-যজ্ঞ হইতে যে কাঞ্চন-মূল্য দক্ষিণা রূপে দোহন করিয়া থাকেন, তাহা আমরা, অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট শিক্ষকের দলও, দূর হইতে সভয়ে লোলুপ-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী চাকুরির মায়া ছাড়িয়াও আমাদের সংশয় প্রকাশ করিতে হইতেছে—গবেষণাপন্থী হালের পণ্ডিতদের পণ্ডা কতদূর বেদগ্রাহিণী এবং বেদবিদ্যা কি পরিমাণে প্রত্যক্ষ। আসল কথা, যে জিনিসটা আমাদের কাছে বেদ বলিয়া পরিচিত (অবশ্য পরিচয় অতি সামান্যই) সেটা প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে, শোনা-কথা বা পড়া-কথা। মানিয়া লওয়া বা না লওয়ার কথা বাদ দিলে, সে শোনা-কথা বা পড়া-কথায়, প্রত্যক্ষের পূর্ব্বোক্ত কোন লক্ষণই আবার দেখিতে পাই না। বেদ শুনিয়া আমার যে জ্ঞান হইতেছে তাহা বিস্পষ্ট, অসংদিগ্ধ ও নিরপেক্ষ নহে। এ স্বীকারোক্তিতে আস্তিক ব্যক্তির হয় ত মনে ক্ষোভ হইবে; কিন্তু কথাটা খুবই সত্য নহে কি? এ সত্য আবার মর্ম্মান্তিক সত্য; যে বেদকে মূল কাণ্ড রূপে আশ্রয় করিয়া নিখিল হিন্দু সভ্যতা একটা মহামহীরুহের মত নানাদিকে নানা শাখাপ্রশাখা ছড়াইয়া দিয়া কালের সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেই বেদ "শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা"র মত আমাদের অনেকেরই কাছে কাণে-শোনা একটা শব্দ হইয়া আছে; যাঁহারা আবার অনুসন্ধিৎসু হইয়া একটু-আধটু ঘাঁটিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞানও এ সম্বন্ধে অস্পষ্ট, এলোমেলো, সংশয়াকুল, সামঞ্জস্যবিহীন। শুনিলাম "স্বর্গকামো যজেত।" আক্ষরিক মানেটা যদি কোন গতিকে বুঝিলাম ত, মনে নানা প্রশ্ন ও সংশয়ের উদয় হইল—স্বর্গ কি এবং কোথায়? আমি দ্বিপদ, পক্ষবিহীন জীবরূপে ইহসংসারে আসিয়া যে দুঃখ-কষ্টের বোঝা বহিতেছি, তাহা আমার পদনিম্নে ধরিত্রী সর্ব্বংসহা বলিয়াই বোধ হয় কোন রকমে সহিয়া যাইতেছেন; আমার নরকভোগ ত প্রতিনিয়তই হইতেছে—স্বর্গের ছবিটা "ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে" একটীবার মাত্র দেখিতে পাই, যখন সারা মাস মিল-স্পেন্সার কাণ্ট-হেগেলের ঘানি ঘুরাইয়া, আমি মাসান্তে দুই-এক-টুক্‌রা কাগজে মাহিনা-সুন্দরীর আলেখ্যখানি চিত্রিত দেখিতে পাই। ইহা ছাড়া অন্য কোনও প্রকার স্বর্গ-নরক আছে কি? যদি বা থাকে, আমার এই নশ্বর জীব-জন্মের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? আমি মরিয়া কি হইব? কোথায় কিরূপে যাইব? ভস্মে না হউক, অগ্নিতে ঘি ঢালিয়া আমি স্বর্গের উর্ব্বশী-মেনকার নৃত্য-সভায় একটা 'বক্‌স' কিরূপে যে রিজার্ভ করিয়া ফেলিলাম, তাহা ত সাদাসিধা বুদ্ধিতে কোন ক্রমেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যজ্ঞের সহিত আত্মার পারলৌকিক কল্যাণের কি সম্বন্ধ? মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্রের যথাবিহিত বিনিয়োগ করিয়া আমি যজ্ঞে বা হোমে, দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে যে হবিঃ উৎসৃষ্ট করিয়া থাকি, তাহাতে না কি তাঁহাদের তৃপ্তি হইয়া থাকে। মনে সংশয় উঠে—পোড়া মনের দোষ

বস্তুর—দেবগণ ও পিতৃগণ কি সত্য-সত্যই অলক্ষিত ভাবে খাচ্ছেন? অথবা চার্ব্বাক-শিষ্যগণের সঙ্গে বলিয়া উঠিব —ও সব দক্ষিণা-লোভী ভণ্ড পুরোহিতবর্গের বুজ্‌রুকি; মৃত গাভীকে আবার ঘাস খাওয়ানর ব্যবস্থা? একটা দৃষ্টান্ত লইলাম। কিন্তু দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ:—যে বেদ আমরা পড়িতেছি বা শুনিতেছি, তাহার অনেকটা বুঝি না; যেটুকু বা বুঝি, সেটুকুও বড়ই গোলমেলে ভাবে; নানা প্রশ্ন, নানা সংশয় মনটাকে আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে—বেদে আস্তিক্য বজায় রাখা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। অধিকন্তু, পড়িয়া-শুনিয়া যে জ্ঞান পাই, সে জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অপরোক্ষ জ্ঞান ত নয়ই, বরং নিজে ভাবিয়া-চিন্তিয়া, অনুমান করিয়া যে সকল জ্ঞান আমরা পাইয়া থাকি, সে সকল জ্ঞানের মত আপেক্ষিক সুস্থিরতাও আমাদের বেদ-বিদ্যার নাই। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিয়া ফেলিলাম, এবং বহ্নি মিলিবে এইটা নিশ্চয় করিয়াই তদভিমুখে যাত্রা করিলাম; কিন্তু "স্বর্গকামো যজেত" এ বাক্য শুনিয়া মনে ত কৈ এতদূর দৃঢ় প্রত্যয় হয় না যে, পারলৌকিক স্বর্গ-সুখের প্রত্যাশায় ঐহিক জঠর-জ্বালায় ঘৃত নিঃক্ষেপ কথঞ্চিৎ বন্ধ করিয়া আহবনীয় প্রভৃতি যজ্ঞীয় অগ্নিতে হবন করিবার জন্য "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং" সংগ্রহ করিব! অতএব স্বর্গ-নরক, যাগ-হোম, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির কথা শুনিয়া আমার তেমন দৃঢ় প্রত্যয় হইতেছে কোথায়? অথচ, শাস্ত্রকারেরা বলিয়া ফেলিলেন যে বেদ প্রত্যক্ষ; "রবেরিব রূপবিষয়ে" ইহার প্রামাণ্য। কাজেই মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতেছে—আসল ব্যাপারটা কি? এ সমস্ত কি পরবর্ত্তী দর্শনকার ও মীমাংসকদের একটা গোঁজামিল দেবার চেষ্টা, না অপর কিছু? কথাটা পরিষ্কার করিয়া ধরিতে গেলে, আগে আমাদের জানিয়া লইতে হয় ঠিক কি ভাবে তাঁহারা বেদকে দেখিয়াছেন। ঋক্, সাম প্রভৃতি খান-কয়েক পুঁথিমাত্র কি, যাহার আসল মূল পড়া আমরা আজিকালি বাজে পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করি, এবং যে সম্বন্ধে জর্ম্মাণি, সেন্টপিটার্সবার্গ প্রভৃতি স্থানের ম্লেচ্ছ পণ্ডিত-গণের সঙ্কলিত এক আধখানা অভিধান বা সূচীপত্র দেখিতে পাইলেই আমরা চরিতার্থ ও পণ্ডিতম্মন্য হই? ইহাই কি বেদ? ফল কথা, সংক্ষেপে বেদের একটা পরিভাষা আমাদের করিয়া লইতে হইতেছে। বেদ ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ লইয়া আলোচনা, এই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলিতে যখন আমাদের করিতে হইতেছে, তখন কথা দুইটারই, অন্ততঃ প্রথমটার একটা পরিষ্কার অর্থ আদৌ স্থির করিয়া লওয়া আবশ্যক।

বেদ প্রত্যক্ষ, এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয় ত এইরূপ কৈফিয়ৎ দিবেন;—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ লইয়া বেদ; ঋষিরা মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ এতদুভয়ই দর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; অতএব এই প্রকারে বেদ প্রত্যক্ষ হইতেছে। কথাটা হয় ত ঠিক; কিন্তু এ কথা শুনিয়া আমাদের সাধারণ লৌকিক প্রত্যক্ষের সঙ্গে এ জাতীয় ঋষি-প্রত্যক্ষের সম্পর্কটা ঠিক বোঝা গেল না। হয় ত ঋষিরা কোনও অবস্থায় কোন একটা কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তোমার-আমার সে বিষয়ে কোনও প্রত্যক্ষ নাই, এমন কি হয় ত বিপরীত প্রত্যক্ষ হইতেছে। এ দৃষ্টান্তে দুই প্রত্যক্ষের—ঋষি প্রত্যক্ষের ও অস্মৎ-প্রত্যক্ষের—সমানতা নাই, হয় ত বিরোধ রহিয়াছে। প্রমাণ কোন্‌টা? কোন্‌টা মানিব? শাস্ত্র, না অস্মৎ প্রত্যক্ষ? গুরু বলিতেছেন, শাস্ত্রই প্রমাণ। কিসের জোরে? শাস্ত্র মানেই হইতেছে এমন একটা কিছু মাপকাটি বা কষ্টিপাথর, যাহার দ্বারা আমার নিজস্ব প্রত্যক্ষাদি, জ্ঞানগুলিকে, বুদ্ধি বিবেচনাকে, পরীক্ষা করিয়া, শাসন করিয়া, কষিয়া মাজিয়া লইতে হয়। বেদই না কি এই শাস্ত্র। কেন? আমার প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানগুলির অপরাধ কি? কৃপণতা ও ব্যভিচার কোথায় যে তাহাদিগকে শাসন করিয়া, কষিয়া-মাজিয়া লইতে হইবে? আমার অনুমান, কল্পনা জল্পনা, হিসাব আন্দাজ প্রভৃতিকে শাসন সংশোধন করিয়া লইবার জন্য রহিয়াছে এক নৈসর্গিক শাস্ত্র—ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-জন্য প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। এ শাস্ত্রকে আবার শাস্ত্রান্তর দ্বারা শাসন-সংশোধন করিয়া লইতে হইতেছে কেন? এ প্রশ্নের কতকটা সমাধান না হইলে আমরা বুঝিব না কেন বা কিরূপে বেদ শ্রুতি হইয়াও প্রত্যক্ষ হইলেন, এবং কোন্ খানে ও কি ভাবে এই আর্যজ্ঞানরাশির সঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানের সম্পর্ক।

শবর স্বামী জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-পরীক্ষা স্থলে বলিতেছেন যে, "ব্যভিচারাৎ পরীক্ষিতব্যম্" আমাদের সাধারণ প্রত্যক্ষাদির ভুলভ্রান্তি আছে, কুণ্ঠা-কৃপণতা

আছে এবং ব্যভিচার আছে ; সুতরাং সেগুলি নির্বিচারে, বিনা পরীক্ষায় আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। আপাততঃ মনে হইয়াছিল প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুঝি সর্ব্বতোভাবে সুস্থির, নিরপেক্ষ ও অসংদিগ্ধ। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাই, সর্ব্বতোভাবে ও নিয়ত ভাবে নহে। রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত প্রভৃতি মামুলি দৃষ্টান্ত আপনাদের সকলেরই জানা আছে। আমাদের দেখা-শোনা প্রভৃতির আবরণ ও বিক্ষেপ (non-observation ও mal-observation) এই দুই প্রকার ত্রুটিই আছে। সকল প্রকার জিনিস দেখিবার বা শুনিবার সামর্থ্য আমার চক্ষুর বা কর্ণের নাই। সাদা চোখে যাহা দেখিতে পাই না, অণুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র-সাহায্যে তাহা আমায় দেখিতে হয়। যন্ত্র-সাহায্যে যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাই অবশ্য চরম নহে ;—আমার দেখার সীমার বাহিরে যে কত সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বিষয় রহিয়াছে, তাহার হিসাব দিবে কে ? মহা-সাগরের তটে দাঁড়াইয়া দিক্‌চক্রবালের পরিচ্ছেদের মধ্যে লবণাম্বুরাশির বিপুলতা কতটুকুই বা ধরিতে পারি ? মহৎ-পরিমাণ বস্তু খানিক দূর বই আর আমি চোখে দেখিতে পাই না ; হ্রস্ব পরিমাণ বস্তুও বেশী হ্রস্ব হইলে আর আমার দৃষ্টিশক্তিতে কুলায় না। অতএব আমার চোখের একটা স্বাভাবিক পরদা রহিয়াছে, যন্ত্র সহায়তায় সে পরদা খানিকটা সরাইয়া দিতে পারিলেও, সে পরদা থাকিয়াই যায় ; আমার দৃষ্টি-সামর্থ্য নিরতিশয় হয় না—আমার দৃষ্টি সেই বেদের "দিবীব চক্ষু রাততম্" হয় না। এই পরদা আমার দৃষ্টিশক্তির আবরণ-দোষ। আবার, যে স্থলে দেখিতে পাইতেছি, সে স্থলেও হয় ত এক দেখিতে আর কিছু দেখিয়া ফেলিলাম,—চন্দ্রকিরণে ইতস্ততঃ আন্দোলিত কদলী-পত্রের ছায়াকে হয় ত দেখিলাম প্রেত-সুন্দরী। এ ক্ষেত্রে আমার চোখের দেখার উপর আরোপ বা অধ্যাস হইয়াছে। দার্শনিক ব্যাখ্যা যাহাই হউক, আমার দেখার ভুল হইয়াছে ; এইটি বিক্ষেপ-দোষ। শুধু চক্ষু নয়,—কর্ণ প্রভৃতি অপরাপর ইন্দ্রিয়ও আমাদিগকে যে জ্ঞান দিয়া থাকে, তাহাতেও এই দ্বিবিধ দোষের সম্ভাবনা আছে। কর্ণের দোষ বা কর্ণমলকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া মধুকৈটভের উপাখ্যান যে প্রকারে হইয়াছে, তাহার আলোচনা আমরা মন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনায় মোটামুটি করিয়াছি। সাধারণ ভাবে, চিত্তমল, কর্ণমল, রসনামল প্রভৃতি আমাদের জ্ঞানের করণগুলিতে যে ত্রুটি রহিয়াছে, যে ত্রুটি থাকাতে আমাদের জ্ঞান পূর্ণ ও নিরতিশয় হয় না ; এবং যে ত্রুটির সর্ব্বথা অপগম হইলে, আমাদের ভিতরকার যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন বিষ্ণু প্রজাপতি রূপে অভিব্যক্ত হন, সেই ত্রুটিরই নাম দেওয়া হইয়াছে মধুকৈটভ—আবরণ ও বিক্ষেপ। এই মধুকৈটভের সংহার না হইলে প্রজাপতির ধ্যানে নিখিল জ্ঞান অথবা বেদ যথাযথ আবির্ভূত হইতে পারে না। কথাটা উপাখ্যানচ্ছলে বলা হইলেও সোজা কথা। আমাদের জ্ঞান অল্প ও মলিন ; ইহাকে ভূমা ও বিশুদ্ধ হইতে হইলে, সকল প্রকার আবরণ ঠেলিয়া ফেলিতে হয় এবং সকল প্রকার বিক্ষেপের হেতু দূর করিয়া দিতে হয়। কথাটা ইহাই।

শুধু আবার ইন্দ্রিয়ের দোষ দেখিলেই চলিবে না। আমাদের ভিতরে জ্ঞানের যে করণ (instrument) রহিয়াছে, তাহা অন্তঃকরণ—মন ও বুদ্ধি ; সেই অন্তঃকরণে রাগদ্বেষ প্রভৃতি ময়লা থাকিলেও যথার্থ জ্ঞান হইবে না। ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ আমার ভিতরে যে জ্ঞান জন্মাইতে প্রয়াস পাইতেছে, তাহার সহিত মনঃসংযোগ হওয়া চাই,—মনে তৎকালে প্রতিকূল বা বিরোধী সংস্কার প্রবল থাকিলে, আমার বস্তু-সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হইবে না। আমি যে সময়ে তদ্‌গত-চিত্তে শরদ বা সুরবাহারের আলাপ শুনিতেছি, সে সময়ে আমার কাণের কাছে ঘড়ি বাজিয়া গেলে আমি শুনিতে পাই না। দৃষ্টান্ত অনেকই পড়িয়া আছে—কথাটা সোজা কথা। তড়াগের জল নির্ম্মল ও সুস্থির না হইলে, তাহাতে জ্যোতিষ্কপুঞ্জের ও চারিধারের বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব ঠিক ভাবে পড়িবে কি ?

অতএব কথাটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান মোটা-মুটি ভাবে, কাজ-চলা ভাবে বা ব্যাবহারিক ভাবে অসংদিগ্ধ ও নিরপেক্ষ প্রমাণ হইলেও, নিরতিশয় ভাবে বা পারমার্থিক ভাবে নহে। শুধু চোখে-কাণে দেখিয়া-শুনিয়াই আমার ছুটি নাই ; আমার দেখা-শোনা প্রভৃতিকে পরীক্ষা করিয়া, যাচাই করিয়া লওয়ার আবশ্যকতা আছে। আমার সাধারণ প্রত্যক্ষের জন্য কষ্টিপাথরের দরকার, একটা আদর্শের দরকার। আন্দাজ অনুমান, কল্পনা জল্পনা প্রভৃতির কষ্টিপাথর বা আদর্শ (standard) প্রত্যক্ষ জ্ঞান ; কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানও সঙ্কীর্ণ, বিকৃত ও ভ্রান্ত

ইতে পারে; সুতরাং তাহারও কষ্টিপাথর বা আদর্শ চাই। াবার তোমায়-আমায় দেখা-শোনার মধ্যেও মোটামুটি মিল াকিলেও, সর্ব্বতোভাবে মিল নাই, থাকিতে পারে না; ারণ, আমাদের জ্ঞানের কারণ ঠিক একরূপ নহে, সংস্কার- ুলিও ঠিক সমান নহে। অথচ, তোমার-আমার মধ্যে ালিশি করিবার জন্য একজন বিচারক চাই, একটা নিয়ম- াবস্থা চাই;—কার প্রত্যক্ষ কতটা বস্তুতন্ত্র হইয়াছে, তাহা রূপণ করিবার জন্য একটা আদর্শ সম্মুখে উপস্থিত পাওয়া াই। কোথায় সে আদর্শ?

যদি ভাবিয়া লই যে, একটা জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা-ভূমি াছে;—আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক বা অভিজ্ঞ াক্তির জ্ঞান, ঋষির জ্ঞান,—এ সকল জ্ঞানেরই নিরতিশয়তা । পরাকাষ্ঠাস্বরূপ এক জ্ঞানের আধার পুরুষবিশেষ াছে—যত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজম্"—তবে অবশ্য যে রম আদর্শ খুঁজিতেছিলাম, তাহাই পাইলাম। আমাদের ক্ষণানুসারে ঐশ্বর্য্য এমন একটা পদবী, পরমেশ্বরের জ্ঞান মন একটা জ্ঞান, যাহার কাছে অপর সকল নিম্নভূমির ানকে নিজের মাপ ও হিসাব দিতে হয়। আমার প্রত্যক্ষ ত বালকের প্রত্যক্ষকে সংশোধন করিয়া দিবে; আমি ইলাম বালকের কাছে আদর্শ। আমার প্রত্যক্ষকে সারিয়া ইবার জন্য বৈজ্ঞানিক বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ রহিয়াছে; ামার কাছে তিনি হইলেন আদর্শ। বৈজ্ঞানিক ও যোগীর াত্যক্ষেরও আবার নানা ভূমি, ইতরবিশেষ রহিয়াছে; ুতরাং সেখানেও আদর্শের অন্বেষণ করিতে হয়। এখন, দি বিশ্বাস করিয়া লই যে, একটা সর্ব্বোচ্চ ভূমি, পরাকাষ্ঠার ান আছে, তবে তাহাই অবশ্য অন্য সকলের পক্ষেই চরম াদর্শ (Standard in the limit) হইবে। এবং এই র্ব্বোচ্চ ভূমিতে যে নিরতিশয়রূপে পূর্ণ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান, াহাই হইল চরম বেদ (Veda in the limit)। যিনি এই রম আদর্শকে কল্পিত অনাদর্শমাত্র মনে করিতেছেন, াঁহাকে এই মুহূর্ত্তে ভক্ত ও বিশ্বাসী বানাইয়া লইতে পারি, মন যাদুবিদ্যা আমি শিখি নাই। তবে আদর্শ কল্পিতই ুউক আর বাস্তবই হউক, লক্ষণানুসারে, তাহাই যে নিখিল ীব-প্রত্যয়ের স্বত্ব-সাব্যস্ত করিবার ও বিবাদ মিটাইবার রম আদালত, এ পক্ষে আর সন্দেহ আছে কি? ভাল থা। কিন্তু মুস্কিল এই যে, আদর্শ পারমার্থিক হইলেও, এমন কি পারমার্থিক বলিয়াই, আমরা সচরাচর ইহাকে কাজে লাগাইতে পারি না; ইহা ব্যবহারযোগ্য নহে। যখনই আমার নিজের জ্ঞানে সংশয় হইবে এবং সে সংশয়ের নিরাকরণ করিতে বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি হার মানিবেন, তখনই কি সরাসরি ভগবানের কাছে আপীল করিব এবং তাঁহার রায় শুনিয়া লইব? যে জন ইহা করিতে পারিল, তার অবশ্য ভাগ্যের সীমা নাই; কিন্তু আমাদের মত অকিঞ্চন, অভাজন যাহারা, তাহাদের সেই শেষ আদালতে, প্রিভি-কাউন্সিলে, আরজি আপীল করিয়া একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলিবার কড়ি কোথায়? অতএব আমার বুদ্ধি-বিবেচনা, প্রত্যক্ষ প্রভৃতিকে নিঃসংশয় রূপে কষিয়া-মাজিয়া লইবার জন্য যে কষ্টিপাথরখানি ভাবিয়া-চিন্তিয়া লইলাম, সে পাথরখানি স্বয়ং পরশপাথর হইলেও, আমার এই ঐহিক জন্মের তুচ্ছ, নশ্বর ধূলিমুষ্টি তাহার সংস্পর্শের আশা ত করিতে পারিল না!

কাজ চালাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকের শরণাপন্ন হইব কি? আমার যে ঘটির জলে পান করিতে সঙ্কোচ বোধ হইতেছে, সে জল পরীক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিকের হাতে দিলাম; তিনি অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিলেন, সে জল সদোষ কি নির্দ্দোষ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-প্রত্যক্ষ আমার সাধারণ প্রত্যক্ষের কষ্টিপাথর মোটামুটি ভাবে হইলেও, তাহাকে সর্ব্ব সময়ে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া থাকা যায় না; এবং তাহাকে লইয়া সুস্থির হওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এবং তন্ত্র (অর্থাৎ পরীক্ষার উপায়-পদ্ধতি-গুলি) বদলাইয়া যাইতেছে; কা'ল যেটা প্রত্যক্ষের বিষয় ছিল না, আজ তাহা হইতেছে; কা'ল যেখানে অন্ধকার দেখিয়াছি বা ফাঁকা দেখিয়াছি, আজ সেখানে Sir William Crookes Radiant Matter বা Matter in the fourth state দেখিবার ব্যবস্থা আমাদের করিয়া দিলেন; আজ এই হাতের চামড়ার নীচে আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, কা'ল হয়ত X-raysএর কল্যাণে হাড়গোড়ের সংস্থান ও বিন্যাস সবই দেখিতে পাইব। অতএব বৈজ্ঞানিকের দেখা-শোনা প্রভৃতি প্রতিনিয়ত বদলাইয়া যাইতেছে; ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত, সংশোধিত এবং পরিবর্জ্জিতও হইতেছে। হইবারই কথা। পরীক্ষার করণ ও উপায়-(অর্থাৎ যন্ত্র ও তন্ত্র) যে সমান থাকিতেছে না।

নানাজনের পরীক্ষার মধ্যেও সব সময়ে যে সর্ব্বতোভাবে মিল আছে, এমনও নহে। তাহার কারণ, নানা পরীক্ষকের মনে নানারূপ সংস্কার রহিয়াছে, মাথায় নানা রকম বদ্ধমূল ধারণা বা মতবাদ (theory) রহিয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের দেখা শোনা ঠিক এক ভাবে হয় না। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" —যিনি যেরূপ দেখিবার প্রত্যাশা করেন, অথবা দেখিতে চান, তিনি অনেকটা সেইরূপই দেখিয়া থাকেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নহে। বিশেষতঃ, আজকাল পাশ্চাত্যদেশে মিডিয়াম্ (medium) প্রভৃতি লইয়া অধ্যাত্ম বিষয়ে ও পারলৌকিক বিষয়ে যে সব পরীক্ষা চলিতেছে, সেই সব পরীক্ষায় সংস্কার ও খেয়ালের অত্যাচার বেশী পরিমাণে হওয়ার কথা। ফল কথা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ হইতে গেলে, দুইটি সর্ত্ত আমাদের প্রতিপালন করিতে হয়। প্রথমতঃ, পরীক্ষার যন্ত্র ও তন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ ও চরম হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষককে সম্পূর্ণ রূপে পক্ষপাতশূন্য হইতে হয়। পরীক্ষার জন্য বাহিরে যে যন্ত্র পাতিয়া বসি, সেইটাই শুধু চরম হইলেই নিস্তার নাই; তোমার-আমার দেখা-শোনার এক-একটা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব (idiosyncracy) আছে, সেটার সমীকরণ না হইলে তোমার দেখা ও আমার দেখা ঠিক একরূপ হইতে পারে না। এ সব মুস্কিলের কথা বৈজ্ঞানিকেরা যে জানেন না, এমন নহে। তাঁহারা বলেন যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা উপযুক্ত যন্ত্র সাহায্যে ও নির্দ্দিষ্ট উপায়ে কোন "মাঝারি মানুষের" দ্বারা করাইয়া, তবে ফলে আস্থা স্থাপন করিতে হইবে। রাস্তা হইতে মাঝারি মানুষকে ডাকিয়া আমায় বলিতে হইবে "এই যন্ত্রে এমনি করিয়া দেখ এবং দেখিয়া আমায় বল ঠিক কি দেখিতেছ।" আমার নিজের উপর আমার প্রত্যয় নাই; কারণ, আমার মাথায় হয় ত পরীক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে নানান্ থিওরি গজ্‌গজ্ করিতেছে। আবার আমার চোখ-কাণ প্রভৃতিও হয় ত ঠিক সুস্থ অবস্থায় নাই। অতএব মাঝারি মানুষকে ডাকিবার ব্যবস্থা। কিন্তু এই মাঝারি মানুষটি কে? মনের মানুষের মত এই মাঝারি মানুষও কি বৈজ্ঞানিকের মনের একটা খেয়াল নহে? এই "mean man" বা "average man" একটা কল্পিত জীব। তুমি, আমি, রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি সকল মানুষের একটা গড় লইয়া এই মাঝারি মানুষের সৃষ্টি—ভারতবর্ষের প্রত্যেক লোকের গড়ে আয় যেমন ২০৲ বা ৩০৲। মাঝারি মানুষ বৈজ্ঞানিকের মানসপুত্র। তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে যন্ত্র গুঁজিয়া দিতে হইবে এবং তাঁহার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লইতে হইবে। ফলতঃ, দুই কারণে বৈজ্ঞানিক-প্রত্যক্ষে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথমতঃ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও তন্ত্র সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ নহে—প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। দ্বিতীয়তঃ, যে প্রকার রাগদ্বেষরাহিত্য এবং পক্ষপাতশূন্যতা থাকিলে পরীক্ষা যথার্থ হইত, সে প্রকার একটা অক্ষুব্ধ, নির্লিপ্ত অবস্থা তোমার, আমার বা বৈজ্ঞানিকের মধ্যে নাই; মাঝারি মানুষে লক্ষণমত আছে, কিন্তু তিনি সত্যই একটা কল্পিত জীব—সাক্ষাৎ ধ্রুবলোকের নিম্নে তিনি বোধ হয় বিচরণ করেন না। এই দুই কারণে বৈজ্ঞানিকদের সভাও অনেকটা আমাদের সেকেলে অধ্যাপকবর্গের বিচার-সভার মত বাগ্‌বিতণ্ডা ও আস্ফালনে নাদাপূরিত, সত্যসত্যই একটা ঐকতান বাদ্যের স্বরহিল্লোলে আবেশে বিভোর ও শান্ত নহে। অণুগুলার স্বরূপ কি, তারা কি ভাবে গঠিত, আলোকরশ্মি সত্যসত্যই জিনিসটা কি, প্রাণিজাতির উৎপত্তি ও বিকাশ হইল কিরূপে, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্র ঠিক কতটুকু, একটা রোগের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ঠিক কি কারণে কি ভাবে হইতেছে—এবংবিধ বিজ্ঞানের সকল বিষয়েই মতবাদের বৈষম্য, এমন কি পরীক্ষার ফলের অনৈক্য রহিয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিজ্ঞান আমায় এমন কিছু দিতেছে না, যাহাকে পাইয়া সুস্থির হইয়া ঘর করিব, যাহাকে লইয়া নিশ্চিন্ত মনে কারবার করিব। তাই বলিয়া বিজ্ঞান ফেলিয়া দিতে হইবে, এমন নহে। মোটামুটি ভাবে, অনেক স্থলে, আমার চলিত প্রত্যক্ষগুলিকে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় কষিয়া-মাজিয়া লইলে লাভ বই লোকসান নাই। বাঁকা পথ হইলেও বিজ্ঞানের পথ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের পথ—যদি পথিমধ্যে প্রকৃতির কুহকে ভুলিয়া, মায়ার বাগুরায় আবদ্ধ হইয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট ও কৃপণ-স্বভাব না হইয়া পড়ি। তবে বিজ্ঞানের রাজ্যেও অব্যবস্থা দেখিয়া, আমাদের মত নিরীহ, শান্তিপ্রিয় লোককে ভয়ে পলাইয়া আসিতে হইতেছে। যাঁহাদের মেরুদণ্ডে জোর বেশী, তাঁহারা বিজ্ঞানের মায়াপুরীর সকল

...ব ও ভাঙ্গাচোরার মধ্যে একটা শৃঙ্খলার কেন্দ্র আবিষ্কার করিয়া লইয়া, তাহার চারিধারে, আমাদের আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের মত একটা সুন্দর, সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যলোক গড়িয়া তুলুন। আমরা আনাড়ীর দল, দূর হইতে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতেছি।

কষ্টি-পাথরের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলাম। বিজ্ঞানাগার হইতে বাহির হইয়া তপোবনে বা সিদ্ধাশ্রমে গিয়া কষ্টিপাথরের খোঁজ পাইব কি? নক্রকদলের হাত এড়াইয়া কোন রকমে সিদ্ধাশ্রমে গিয়া হয়.ত পৌঁছিলাম। দেখি সিদ্ধগণ ধ্যানস্তিমিত লোচন হইয়া সকলেই আমার সেই কষ্টিপাথর, পরশমাণিকের অন্বেষণ করিতেছেন। এখানে অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ নাই; আছে, সংযম অর্থাৎ ধারণা-ধ্যান-সমাধি দ্বারা প্রস্ফুটিত, অব্যাহত, অনাবিল অন্তর্দৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টি। এও এক প্রকার বিজ্ঞান—মন্ত্র-তন্ত্রের সন্নিপাত ও বিনিয়োগ। বেকন হইতে সুরু করিয়া হক্সলি পর্য্যন্ত পশ্চিমদেশের বিজ্ঞানাচার্য্যগণ এই দিব্যদৃষ্টিকে ভূয়া ও ফাঁকা বলিতে কসুর করেন নাই। অবশ্য তাঁহারা এ রসের রসিক ছিলেন না। কিন্তু আবার হালের যে কয়েক জন বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিক শক্তিতে (Psychic powers এ), বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা হক্সলি, কেল্‌ভিনের মত, বিজ্ঞানকেশরী যদি বা নাও হয়েন, তথাপি, অন্ততঃ পক্ষে, বিজ্ঞান-শার্দ্দূল না হইয়া যান না। বিজ্ঞান-মহাকাব্যের কত না সর্গ ইঁহাদের শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে গ্রথিত ও ঝঙ্কারিত হইয়াছে! বিলাত-প্রত্যাগত কোন বিশিষ্ট বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, লর্ড কেল্‌ভিন না কি স্যার অলিভার লজ্ সম্বন্ধে বলিতেন, "A great scientist gone mad"। কিন্তু প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়—এই সকল অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন, প্রমাণ-পরীক্ষা-কুশল, প্রমাণ-প্রয়োগ নিপুণ, বিশ্ববন্দিত বৈজ্ঞানিক সহসা বুড়াবয়সে ভূতাবিষ্ট হইলেন কিরূপে? এখনও বিলাতের Philosophical Magazine নামক বুনিয়াদি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইয়া দেখি, (Sir Oliver Lodge) স্যার অলিভার লজ্ বেশ দক্ষতার সহিত ইলেক্‌ট্রন থিওরি (Electron Theory)র গবেষণা আলোচনা করিতেছেন; তাঁহার মনীষা কৈ একটুও ক্ষুণ্ণ অথবা নিষ্প্রভ হইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। তবে গোঁড়া বৈজ্ঞানিকেরা পরস্পরের বসবাসের জন্য পর্দ্দা দিয়া ঘিরিয়া একরূপ জেনানা তৈয়ারী করিয়া লন; সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়া সত্যের একটা বিশিষ্ট ধাঁজধরণকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসেন, এবং কাজে কাজেই সাত কাণার হাতী দেখার অভিনয় অনেকটা করিয়া ফেলেন। ইহাই সেই প্রকৃতির কুহক, মায়ার বাগুরা, সত্যলোক যাত্রীকে, যাহা এড়াইয়া চলিতে হইবে। বিজ্ঞানের মন-গড়া জেনানায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে নারাজ হইয়া সেই আমি পর্দ্দা একটু ফাঁক করিলাম, চকিত-দৃষ্টিতে দেখিয়া লইলাম, আমার হিসাবের বাহিরে, এই আজব কার-খানাটার আরও কত অচিন্তিতপূর্ব্ব আড়গলি রহিয়াছে,—সেই আমার সহযোগী বৈজ্ঞানিকের দল টেষ্ট-টিউব ফেলিয়া হৈ হৈ করিয়া উঠিলেন—"দাও ওটাকে দল হইতে তাড়াইয়া; পাগলা গারোদই উহার উপযুক্ত স্থান।" বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যেখানে অসহিষ্ণু, সেই মহাদেশের কবি কিন্তু সেখানে উদার "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy" যাহাই হউক, বিজ্ঞানাগার ও সিদ্ধাশ্রম, বাহ্যদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি লইয়া আবহমান কাল যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহা আপাততঃ মুলতুবি রাখাই স্থির করিলাম—তর্ক মীমাংসা করিতে আজ আর প্রয়াস পাইব না। মোট কথা, বিজ্ঞানাগারে আমার কষ্টিপাথর পাই নাই। সিদ্ধাশ্রমে তাহা মিলিবে কি? যেমন তেমন, কাজ-চলা গোছ একটা কিছু আমার হাতে ফেলিয়া দিলে চলিবে না; কারণ, কাজের মতন কাজ হাতে তাহাত চলে না বলিয়াই, আমি আমার ঘর আঙ্গিনা ছাড়িয়া, বিজ্ঞানাগার ছাড়িয়া, এতদূরে সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছি। বিজ্ঞানাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"মরিলেই আমার সব শেষ হইল?" তিনি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "ওটার পরীক্ষায় কোনই সিদ্ধান্ত এখনও খাড়া করিতে পারি নাই; তবে যতদূর দেখা যাইতেছে, আত্মা সম্ভবতঃ মস্তিষ্কের (Brain এর) একটা অবস্থা (function) নয়; কাজেই দেহের বিনাশে আত্মা থাকিলেও থাকিতে পারে।" একে ত কথাটা আন্দাজি, তার উপর সকল বৈজ্ঞানিকের আন্দাজও আবার একরূপ নহে; এরূপ আন্দাজি ও সন্দিগ্ধ কথায় আমার কাজ চলে না বলিয়াই, আমি

আসিয়াছি সিদ্ধাশ্রমে। সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া বেশী হল্লা করিলে ভাল দেখাইবে না। সংক্ষেপতঃ এখানে আসিয়াও আমার অভীষ্ট আদর্শ ঠিক পাইলাম বলিয়া বোধ হইল না। যাঁহারা 'যোগী' এই নাম শুনিয়াই মনে করেন একজন সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ, তাঁহারা বুঝিবার ভুল করেন। যোগশাস্ত্রে নানা থাকের, স্তরের, নানাপ্রকারের সমাধির কথা আছে। একজন যোগী যে ভূমিতে রহিয়াছেন, অপর একজন হয় ত তাঁর চেয়ে উপরের ভূমিতে বা নীচের ভূমিতে রহিয়াছেন; দুইজন যোগীর 'অভিজ্ঞতা' সুতরাং এক প্রকারের হইবে না। একজন তত্ত্বের যতটা সন্ধান পাইয়াছেন, অপরজন তাঁর চেয়ে হয় ত বেশী বা কম সন্ধান পাইয়াছেন। কাজেই সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াও সকলের মুখে একই কথা শুনিবার আশা করিতে পারি না। কেহ বলিতেছেন তত্ত্ব এক, কেহ বলিতেছেন তত্ত্ব দুই। কোন্‌টা যথার্থ? যদি কোন যোগী, ঋষি হইয়া, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সাক্ষ্যকে আমরা চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি সন্দেহ নাই; কিন্তু কিরূপে জানিব কে ব্রহ্মজ্ঞ, কে ব্রহ্মজ্ঞ ন'ন? ব্রহ্মজ্ঞ অর্থে সর্ব্বজ্ঞ, এ কথা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। সাধারণতঃ যে সকল যোগী নিম্নভূমিতে বিচরণ করিতেছেন, সর্ব্বোচ্চ পদবী লাভ করেন নাই, তাঁহাদের সাক্ষ্য চরম বলিয়া গ্রহণ করিলে দোষের সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। বিজ্ঞানাগারে ঢুকিয়া যে মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম, তপোবনে আসিয়াও প্রায় সেই মুস্কিলেই পড়িলাম। একটা নিয়ত, অব্যভিচারী, সুস্থির আদর্শ এখানেও পাইলাম না। এখানেও যাহার যতদূর দৌড়, তিনি ততদূরের খবর আমায় দিতেছেন। আচার্য্য স্বয়ং ব্রহ্মদর্শী হইয়াও, শিষ্যের অধিকার বুঝিয়া অনেক সময়ে নিম্নভূমির উপযোগী উপদেশ দিয়া থাকেন বটে; "অন্নং ব্রহ্ম", "প্রাণো ব্রহ্ম", "মনঃ ব্রহ্ম" প্রভৃতি বিভিন্ন অধিকারের উপদেশ দিয়া গুরু, শিষ্যের অধ্যাত্মদৃষ্টি প্রস্ফুটিত করিয়া লইয়া, চরমে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি নিম্ন অধিকারী, কিরূপে নির্ব্বাচন করিয়া লইব কোন্‌টা চরম উপদেশ, কোন্‌টাই বা প্রতীক উপদেশ, কোন্‌টা স্বরূপ লক্ষণ, কোন্‌টাই বা তটস্থ লক্ষণ? পাকা গুরুর হাতে পড়িলে আমার অবশ্য চিন্তিত হইবার কোনই কারণ নাই; কিন্তু জ্ঞানের দিক হইতে যে কষ্টি-পাথর আমি খুঁজিতেছিলাম, তাহা নানা মুনির নানা মত শুনিয়া আপাততঃ আমি পাইলাম না। কপিল মুনির শরণাপন্ন হইলাম; তিনি বলিলেন, তত্ত্ব দুইটা; পুরুষ ও প্রধান। ব্যাস বলিলেন—তত্ত্ব একটি বই দুইটি নয়—আত্মা বা ব্রহ্ম। কোন্‌টা যথার্থ? কে ঠিক বলিলেন? যদি ভাবি, যিনি যেরূপ দেখিয়াছেন সেইরূপ বলিয়াছেন, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে—কার দেখা ঠিক দেখা? যদি ভাবি, উভয়েই ব্রহ্মদর্শী, তবে শিষ্যের অধিকার বুঝিয়া প্রস্থান ভেদ করিতেছেন, আলাহিদা ব্যবস্থাপত্র দিতেছেন; তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠে—কোন্‌টা উচ্চতর অধিকারের কথা? গুরুর নির্দ্দেশ মত সাধনে বসিয়া গেলে হয় ত এ সকল প্রশ্নের উত্তর আপনা হইতেই জুটিয়া যাইবে; কিন্তু সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাধ্য বিষয়ে একটা সামঞ্জস্যের সূত্র, একটা সুব্যবস্থার আভাষ দেখিতে ইচ্ছা করে; নহিলে গোলকধাঁধায় সহসা পা বাড়াইতে দিতে ভরসা হয় না। পুরী যাইবার হয় ত নানা পথ রহিয়াছে; রুচি ও সামর্থ্যের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তি হয় ত বিভিন্ন পথ ধরিয়া তীর্থযাত্রা করিবে। কিন্তু তীর্থযাত্রী পথে বাহির হইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ এইটুকু ভরসা মনে পাইতে চায় যে, পথগুলি বিভিন্ন হইলেও গোড়া হইতেই তাহাদের মধ্যে একটা মিলনের ইঙ্গিত রহিয়াছে, এক-লক্ষ্যাভিমুখিতা রহিয়াছে এমনভাবে যে, পরিণামে সকল পথই নানা দিক হইতে আসিয়া একই সফলতার মধ্যে সম্মিলিত ও পরিসমাপ্ত হইয়া যাইবে। ঋজু-কুটিল নানা পথ ধরিয়া আসিয়া নানা সরিৎ যেমন মহার্ণবে আসিয়াই মিলিত ও পরিসমাপ্ত হয়, সেইরূপ। তবেই, সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াও আমাদের, নানা মতবাদ শুনিয়া, একটু বোঝাপড়া করিয়া লওয়ার দরকার আছে। নাই কি?

কৈলাসে স্বয়ং যোগেশ্বর মহাদেবের শরণাগত হইব কি? আমার আগমন বুঝিয়া যদি ভৃঙ্গীজী ঠাকুরের ভাঙ্গের পয়সা চুরি করিয়া রাখেন তবেই রক্ষা। নইলে, ভূমানন্দে বিভোর হইয়া থাকিলে, হয় ত আশুতোষ নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিবেন এবং নন্দীঠাকুর আমাকে কাছে ঘেঁসিতেই দিবেন না; নয় ত নেশার ঘোরে এমন সব আগম-নিগম তিনি পঞ্চমুখে বলিয়া যাইবেন যে, তার আমি কূল-কিনারাই

পাইব না। আমি আসিয়াছি চরম আদর্শ—কষ্টিপাথরের অন্বেষণে। আমি মূঢ়; বিজ্ঞান আমার বুদ্ধিকে সংশয়াকুল করিয়া দিয়াছে,—প্রায় অবিশ্বাসী নাস্তিক করিয়া দিয়াছে; সিদ্ধান্তভ্রমে আমিও দিশেহারা হইয়াছি—এখন, হে দেবাদিদেব! তুমি অন্ধকারে ধ্রুবজ্যোতিঃর মত ফুটিয়া উঠিয়া আমায় দেখাইয়া দাও সেই সনাতন বেদমার্গ—যে পথ ছাড়া অয়নের অন্য পন্থা নাই—এবং যে পথ অবলম্বন করিলে জীব "অতিমৃত্যুমেতি" মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যায়। আমার প্রার্থনা ফলিল; মহাদেবের পিঙ্গলাভ জটা-জালের মধ্যে বেদময়ী গঙ্গার অপ্রকটিত ভাবে, নিগূঢ় ভাবে অবস্থান আমি দেখিলাম। যে আদর্শের অন্বেষণ এতক্ষণ আমি করিতেছিলাম, বিষ্ণুপাদোদ্ভবা সুর-শৈবলিনীর মর্ত্ত্যে অবতরণ আখ্যায়িকার মধ্যে তাহারই সন্ধান পাইলাম। পূর্ব্বে এক সময় আমরা গঙ্গাজীর ভূতলে অবতরণ আখ্যায়িকাটির বেদপক্ষে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছি—ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থিতি, হরজটাজালে অবগুণ্ঠন, জহ্নু মুনি কর্তৃক পান, ভস্মপ্রাপ্ত সগর-সন্ততিগণের উদ্ধার—এ সকল কথাই যে বেদধারার আবির্ভাবের সঙ্কেত বা প্রতীক, তাহা আমরা পূর্ব্বেই একরূপ খোলসা করিয়া আলোচনা করিয়াছি। ইহাই আবার গীতার সেই "ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ মশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং", যাহাকে জানিলে বেদকে জানা হয় (যস্তং বেদ স বেদবিৎ)।

এই বেদধারা কি? পরমেশ্বরের নিরতিশয় জ্ঞানরাশি যদি গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে আমাদের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছিবার কোনও ব্যবস্থা থাকে, তবে তাহাই বেদধারা এবং তাহাই লক্ষণানুসারে আমাদের জ্ঞানের আদর্শ বা কষ্টিপাথর। পরমেশ্বর আদিগুরু—"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালে নাবচ্ছেদাৎ"। সেই আদিগুরু হইতে জ্ঞানরাশি তাঁহার আদিশিষ্য পাইলেন। অবশ্য আদিশিষ্য আনিতে গিয়া সে জ্ঞানরাশি আর ঠিক নিরতিশয় বা বিশুদ্ধ রহিল না। আদিশিষ্য আবার তাঁহার শিষ্যকে সেই জ্ঞানরাশি দান করিলেন। এখানে আসিতে গিয়া পাত্রের দোষে সে জ্ঞানরাশি হয় ত আরও সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত হইল। এইরূপ পদ্ধতিতে অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়-প্রবাহে সে জ্ঞানরাশি অবশেষে হয় ত তোমার-আমার কাছেও আসিয়া উপনীত হইল। তুমি-আমি যেটাকে বেদ রূপে গুরুমুখে শুনিতেছি, সেটা অবশ্য নিরতিশয় বিশুদ্ধ বেদ (Veda in the limit) নহে; কিন্তু তাহা না হইলেও সেটা এমন একটা জ্ঞান-ধারা, যেটাকে আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া আদর্শ রূপে গ্রহণ করিতে পারি। কারণ, ইহার একটা ব্যবস্থা আছে, ইহাকে আমরা আমাদের খোসখেয়ালমত বদলাইয়া লইতে পারি না। প্রত্যেক গুরুই যথাযথভাবে নিজের শব্দসম্পৎ ও জ্ঞানসম্পৎ শিষ্যকে দান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং প্রত্যেক শিষ্যই তাহা যথাযথভাবে গুরুর নিকট হইতে পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টার ফলে আদিম বেদের শব্দ ও অর্থ যতটা সম্ভব কম বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ হইয়া আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে। বেদবিষয়ে ধ্বনি, ছন্দঃ, ঋষি, দেবতা, বিনিয়োগ প্রভৃতি ঠিক বাহাল রাখার দিকে কত না দৃষ্টি। এইজন্য মনে হয়, এই ব্যবহার-ফলে, অল্পবিস্তর ভেজাল সত্ত্বেও সেই আসল খাঁটি জিনিসও কতক পরিমাণে আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পৌঁছিয়াছে বলিয়াই ইহা আমাদের জ্ঞানের একরূপ standard বা আদর্শ ভাবে গৃহীত হইতে পারে। 'একরূপ' বলিতেছি, কেন না, খাঁটি আদর্শ সেই পরমেশ্বরের জ্ঞান ছাড়া লক্ষণানুসারে আর কিছু হয় না। তবে, ব্যবহারিক ভাবে, আমার নিজের সাক্ষ্য, বিজ্ঞানের সাক্ষ্য, এমন কি বোধাদের সাক্ষ্য সমস্তই এই বেদের দ্বারা পরীক্ষা (test) করিয়া লইতে হয়। হইতে পারে, বিজ্ঞানে যেরূপ কতকগুলি classical experiments (নির্দ্দিষ্ট বিশিষ্ট পরীক্ষা) আছে, বেদও যেন অনেকটা সেইরূপ। ইহা যেন classics of experience (উপলব্ধ বিশেষ বিশেষ তত্ত্বসমূহের ধারা)। তোমার-আমার সকল জ্ঞানকেই এই কষ্টিপাথরে কষিয়া মাজিয়া লইতে হইবে। প্রতি গুরুশিষ্যই নিজস্ব অনুভব, বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা এই বেদকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন;—কতকটা পারিয়াছেন, সবটা হয় ত মিলাইতে পারেন নাই; কিন্তু সবটা মিলাইতে পারুন আর নাই পারুন, তিনি সেই আপ্তবাক্য বা বেদকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণভাবে সম্প্রদায়ক্রমে বহাইয়া দিয়াছেন। এই বেদধারায় সেইজন্য ব্যক্তিগত ভ্রমপ্রমাদ বা খেয়ালের অবকাশ অল্পই হইয়াছে।

ইহাই বেদবিশ্বাসী আস্তিকদের কথা। কিন্তু কথাটায় গোল মিটে না। আমি গুরুমুখে যাহা শুনিলাম, তাহাই যে আদিম বেদ বা তাহারই অংশ, ইহার প্রমাণ কি? মুসল-

মানের কোরাণ ও খৃষ্টানের বাইবেল তবে কি? আমাদের কপালগুণে, যে বেদ আমরা পাইতেছি, তাহা শব্দে ও অর্থে নিশ্চয়ই বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে; এ খণ্ডিত, বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ বেদকে আদর্শ রূপে মানিতেছি কেন? তাহাকে আমার, বিজ্ঞানের ও যোগীদের অভিজ্ঞতার উপরে আসন দিতেছি কেন? বেদের অনেকটাই বুঝি না; যাহা বুঝি তাঁহা অনেক সময় তুচ্ছার্থ, অস্পষ্টার্থ ও বিরুদ্ধার্থ। এমন বেদকে ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপাইতেছি কেন? বেদের ব্যাখ্যাও আবার কত প্রকারের! যাস্কের সময়েই ত দেখিতে পাই, বেদের অর্থ লইয়া গোল হইয়াছিল। ইত্যাকার নানা প্রশ্ন ও সংশয় মনটাকে আকুল করিয়া দেয়। ফল কথা, এটা বেদে আছে বলিলেই নিস্তার নাই—পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। আমার বা বিজ্ঞানের পরীক্ষায় না মিলিলেই বেদকে ফেলিয়া দিতে হইবে এমন সাহস আমি করি না; তবে বেদশব্দের যথার্থ গ্রহণ এবং বেদার্থের যথার্থ উপলব্ধির জন্যই মনন, সাধনা, এমন কি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষারও আবশ্যকতা আছে। বেদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ঠিক চলিবে না; বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছেলেখেলাও নহে। বিজ্ঞান স্বয়ং অসিদ্ধ; সে বেদকে সাধিবেই বা কিরূপে? তবে বিজ্ঞানের পরীক্ষার সঙ্গে তুলনা করিয়া হয় ত বেদের অনেক অস্পষ্ট ও আপাত বিরুদ্ধ অংশে আলোক-রেখাপাত ও সামঞ্জস্যের সূচনা পাইতে পারিব। আর, ঠিক বিজ্ঞানের প্রাণ লইয়াই বৈদিক আলোচনায় আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। ইহাতে কল্যাণ বই অকল্যাণ নাই। তামসিক আস্তিক্য টিকিবে না। সাত্ত্বিক আস্তিক্য চক্ষুষ্মান্—সে দেখিয়া-শুনিয়া চলিবে; তার ভয় নাই। আমরা বেদের পাঁচ প্রকার অর্থ আলোচনা করিয়াছিলাম—

(১) অনুভবমাত্রই—যত্র জীব তত্র বেদ;
(২) প্রত্যক্ষমাত্রই
(৩) বৈজ্ঞানিক ও যোগজ প্রত্যক্ষ
(৪) গুরুশিষ্য সম্প্রদায়ক্রমে প্রাপ্ত জ্ঞানরাশি
(৫) পরমেশ্বরের জ্ঞান।

ইহার মধ্যে (৪)টিই শিষ্য পরিগৃহীত বেদ; আমরা ইহাকে এবং ইহার সঙ্গে অবিরোধী বৈজ্ঞানিক ও যোগজ প্রত্যক্ষগুলিকে 'বেদ' বলিয়া গ্রহণ করিব।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(৩২)

সকালবেলা কণ্ঠী-তিলক সেবা করা পাড়ার সর্ব্ব-পরিচিত বৈরাগী ঠাকুর করতাল বাজাইয়া গান গাহিতেছিল, "ও তুই জহুরী হয়ে জহর চিন্‌লি না,—ভক্ দেখে নিলি পেতল, তেজ্য করে গেলি সোণা।"

মনোরমা মুষ্টি-ভিক্ষা আনিয়া দিতে গেলে, ভিক্ষাজীবী জিভ কাটিয়া বলিল, "বালগোপালের হাতের নৈলে তো নিইনে মাঠান্! আমার নিতাই দাদা কোথায় গা?"

মনো নিবেদিত ভিক্ষা-মুষ্টি, ফিরাইয়া রাখিয়া, অপ্রতিভ মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিল, "সে কলকাতায় পিসির বাড়ী গেছে,—আজ আস্‌বার কথা।"

"তাহলে কাল সকালে এসে তেনাকে দেখে যাব, আর চাল ক'টা তেনার হস্ত থেকে নিয়ে যাব। গড় হই—"

ঘর-বা'র করিতে-করিতে মনোরমার পা-দুখানা যখন ভারিয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে একখানা গাড়ি গড়গড় করিয়া আসিয়া দ্বারের সম্মুখে থামিল।

অজিত গাড়ী হইতে নামিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া মাকে দু হাতে জড়াইয়া ধরিল—"মাগো! মামণি! তুমি এই ক'দিন বুঝি সমস্ত ক্ষণ ধরে বাইরের ঘরটাতেই দাঁড়িয়ে আছ? তবে কেন আমার সঙ্গে গেলে না তুমি?"

মনোরমা ছেলেকে বুকে লইয়া, তাহার মাথায় মুখে প্রায় হাজারটা চুমা খাইয়া, অশ্রুভরা হাসিমুখে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মন কেমন করতো বুঝি তোর ?"

ছেলেও মায়ের মুখ চুম্বনে ভরাইয়া দিয়া লজ্জাস্মিত হাস্যে মুখ লুকাইয়া জবাব দিল, "হাঁ মা।"

মাতা-পুত্রের বিচ্ছেদ-ব্যথা প্রশমিত হইয়া আসিল।

"অসীমার কেমন বরটি হলো রে ?" "বেশ হয়েছে মামণি! অনু'র চাইতে অনেক ফরসা।"

"অসীমা তোর পিসিমার মত, না পিসে-মশাইয়ের মত হয়েছে ?" "মা, তুমি পিসেমশাইকে তো দেখনি, কি করে জান্‌লে যে তিনি পিসিমার চাইতে সুন্দর ?"

মনোরমা ঈষৎ হাসিল, "তোমার পিসে-মশাইকে আমি দেখেছি বই কি। কতবার দেখেছি।" কথা শেষে তাহার একটা নিঃশ্বাস পড়িল।

এই সময়ে একটা কিসের শব্দ হইল, দেখিতে-দেখিতে সেই জগুয়া চাকরটা প্রকাণ্ড একটা সন্দেশের হাণ্ডা কাঁধে লইয়া, ভাড়াটে গাড়ির সহিসের মাথায় একটা ট্রাঙ্ক চাপাইয়া প্রবেশ করিল।

"এ কি রে! কার এ তোরঙ্গ ?" "পিসিমা আমায় এই ট্রাঙ্কটা কিনে দিলেন মা; আমি বারণ করেছিলুম, শুনলেন না।"

কুলীকে বিদায় দিয়া, যথাস্থানে জিনিসগুলা সন্নিবেশিত করিয়া আসিয়া, মামীমাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক জগুয়া হাত-পা ধুইতে পূর্ব্বদৃষ্ট পুকুর-ঘাটে চলিয়া গেল। মনোরমা ও অজিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছেলেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মনোর বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতেছিল; কিন্তু কোথা হইতে একটা সঙ্কোচ আসিয়া মুখ তাহার যেন জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল। পুনঃ-পুনঃ ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া, স্ফীতবক্ষ তাহার যেন গুটাইয়া এতটুকু ছোট হইয়া আসিল। এই তিন দিনের অদর্শনেই কি ছেলের বয়স বাড়িয়া গিয়াছে না কি ? কেন তেমন করিয়া সব কথা বলিতে বাধা পাইতেছে ? "হাতে মুখে জল দিয়ে নিয়ে, কিছু খা' না অজিত।" "খাবো কি মা, ঠিক বেরুবার আগেই পিসিমা যে পেট ভরে কত কি-ই খাইয়ে দিলেন। পিসিমা কি সব দিয়েছেন, তোমায় সব দেখাই এসো না।"

"দেখব পরে, তুই এখন—" "না, তুমি এক্ষণি দেখবে।" এই বলিয়া সোৎসাহে অজিত মায়ের হাত ধরিয়া তাহাকে প্রায় টানিয়া ট্রাঙ্কের কাছে লইয়া আসিল। "এই দেখ আমার চাবি।"—গোলাপী সিল্কের পাঞ্জাবির পকেট হইতে রেশমী রুমালে বাঁধা ঝক্‌ঝকে একটি ছোট্ট রিংয়ে পরাণ চকচকে দুইটি চাবি সে বাহির করিয়া দেখাইল এবং তাহারি একটি দিয়া সেই নূতন ষ্টীল ট্রাঙ্কটা খুলিয়া ফেলিয়া, হাসি-হাসি মুখে মায়ের দিকে চাহিল।

"ওরে, তোর পিসিমা এ কি কাণ্ড করেছে! সমস্ত কলকেতা সহরটাই যে এর মধ্যে ভরে দিয়েছে! এত কেন ?"

"শুধু পিসিমাই না মা, আমার ঠাকুমা ওখানে আছেন কি না, তিনিও ঢের জিনিস দিয়েছেন। তাঁর কাছেই আমি রাত্রে শুতুম। ঠাকুমা, মা, এত কাঁদেন! যতক্ষণ আমি কাছে থাকতুম, সমস্ত ক্ষণই তিনি কাঁদতেন, আর এত আদর আমায় করতেন, ছেলেদের সব্বাইকার সাম্‌নে,—আমার এমন লজ্জা করতো।"

মনোরমার দুই চোখ অকস্মাৎ জলভারে ছলছল করিয়া আসিল। তপ্ত অশ্রুর আকস্মিক আবির্ভাবে নাক, চোখ জ্বালা করিতে লাগিল; মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া, অনেক কষ্টে সে, পতনোন্মুখ উদ্গত অশ্রু-প্রবাহ দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ততক্ষণে প্রদর্শনী সুরু হইয়া গিয়াছে।

"এই দেখ, কতগুলি বই পেয়ে গেছি। রামায়ণ, মহাভারত, দুবছরের সখা, সাথী, আর সখা-সাথী। এখানা 'ফেয়ারি টেল্‌স'; এখানার নাম 'রবিনসন ক্রুসো'। এই দেখ, ওখানকার সরকার মশাইকে দিয়ে ঠাকুমা এই সব খেলনা আমায় আনিয়ে দিয়েছেন; সাদা আর লাল ঘোড়া, স্প্রিংএর সাইকেল, কলের ইঞ্জিন জাহাজ, ম্যাজিক লাটু,—বেরালটা কেমন দৌড়োয় দেখ্‌বে ? এই সব দেখে আমার এমন হাসি পেয়েছিল মামণি, সে তোমায় কি বল্‌বো! ওঁরা সব্বাই ভাবেন, সরলা বেলা মন্টু নন্তুর মতন আমিও বুঝি ভারি ছেলেমানুষ, না মা ? তবু আমি বল্লুম যে, এগুলো ওদেরই দিয়ে দিই, ওরা তবু খেলা করবে, আমি নিয়ে কি করবো ? তা পিসিমা শুনে এক তাড়া লাগিয়ে দিলেন; বল্লেন 'কেন, তোর না কি খেলার বয়েস চলে

গেছে? দেখি, চুল পেকেছে বুঝি ?' উল্টে আবার দিদি তার শ্বশুরবাড়ীর খেলনা থেকে এই বড় 'ডল'টা দিয়ে দিলে। কেমন চোক বুজিয়ে ঘুমুচ্ছে দেখছো তো? এই দেখ, দাঁড় করিয়েছি, অম্নি চোক চেয়েছে। এটা কিন্তু মা আমি নিতাই মামার খুকিকে দেবো।"

মনোরমা সেই দুচোখ-ভরা জল ও অধরপ্রান্তে এতটুকু একটুখানি সলিলাদ্র হাসি লইয়া পুত্রৈশ্বর্য্য দেখিতেছিল। এসব দেখিয়া তাহার নিজের গায়ে-হলুদের-তত্ত্বে-পাওয়া খেলনা পত্রের কথা স্মরণ হইল। ফুলশয্যার ফেরৎ দেওয়া সেসব জিনিষের কিছুই সে সঙ্গে আনে নাই, শুধু সাড়ি প্রভৃতি যা সঙ্গে ছিল। তাও এ দশ বৎসর বাক্সবন্দী পড়িয়াই আছে।

"এই দেখ মা, সিল্কের সার্ট। শীত মোটে নেই; তবু শুধু-শুধু ঐই একটা পাতলা গরমের, এগুলো ছিটের, এই কটা পাঞ্জাবী, এদুটো গরদের, এটা সার্জ্জের, এটা আল্‌পাকার, এই আর একটা খুব দামী সিল্কের কোট। মাগো! জরিপাড় ধুতীই তো দেখছি চারখানা দিয়েছেন। তাছাড়া এ সব দুজোড়া, তিনজোড়া। এত সব কি হবে মা? দুজোড়া জুতো দিয়েছেন দেখ্‌চো তো? মোজাও এই এতগুলি! বাবারে বাবা! কলকেতায় এত জিনিস, আর এত কেনা; সে দেখলে, সত্যি বল্‌চি মামণি! তুমি অবাক্ হয়ে যাবে। সুধী মন্ত ওদের, জানো মা, একো-জনের তিনজোড়া, চারজোড়া করে জুতোই আছে। আমি বল্লুম আমার অত কিছু দরকার হয় না। তা ওঁরা শুন্‌তেই চান না। এই দেখ না, দিদির দেওয়া ভাইফোঁটার তিন বছরের জামা কাপড় সবই তো আমার রয়েছে। কিছুই তো ছিঁড়িনি। দেখে ওরা সব্বাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল!"

"অজু! ওখানে গিয়ে কোথায়-কোথায় গেছলি রে? ঠাকুরমার সঙ্গে কোন্‌খানে দেখা হলো?" "কেন পিসি-মার বাড়ীতে। তিনি ঐখানেই তো ক'দিন ছিলেন। কোথায় কোথায় শুন্‌বে? সে অনেক জায়গায়—জু, মিউজিয়ম, ইডেন গার্ডেন, বায়স্কোপ, গোলদীঘি, গড়ের মাঠ, প্রেসিডেন্সী কলেজ—মামণি! বড় হয়ে আমি কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বো, এখানে পড়বো না। সে কিন্তু এখন থেকে বলে রাখছি।" মনোরমা উদ্বেগের মধ্যে হাসিয়া ফেলিল, "আগে বড়ই তো হ'।" "সে আর কদ্দিন? তিন বচ্ছর বৈতো না! দিদিমা! এতক্ষণে তুমি বুঝি বাড়ী ফিরলে? জানো তো আজ আমি আস্‌লো।"

"এসো, দাদু ধন আমার এসো; বাড়ী অন্ধকার করে গেছ, আমি যে টেকঁতে পারিনে। বিয়ে হয়ে গেল? কেমন ভগ্নিপতি হলো?" "বেশ, আমার ঠাকুমা এই সব দিয়েছেন, দেখ না তুমি।" "মাকে দেখাও," বলিয়া গভীর তাচ্ছিল্যভরে দুর্গাসুন্দরী মুখ ঘুরাইয়া লইয়া একদিকে চলিয়া গেলেন। মনোরমা ভয়ে-ভয়ে আড়-চোখে দেখিয়া লইল, মায়ের মুখখানার অবস্থা ভাল নহে। ভগ্ন আশার গভীর কালো মেঘে যেন আকাশ অন্ধকার। মা যে, অনেক দিন পরে আবার ছেলেকে কাছে পাইয়া যদি জামাতার মতি বদল হয়, যদি সেও উহার সঙ্গে একবার দেখা দিতে আসে, অথবা এম্নি কিছু প্রত্যাশা করিয়া বসিয়াছিলেন, সে মনের খবর মনোও পায় নাই; তাই সে, কিসের এ বিরক্তি, বুঝিতে না পারিয়া সঙ্কুচিত হইয়া রহিল।

"ওমো! একটা মস্ত জিনিসই যে তোমাকে দেখানো হয়নি। এই সাবানের বাক্সটায় কি আছে বলো দেখি? বল্‌তে পারলে না? এই দেখ, তোমার জন্যে সোণার চুড়ি আর হার। এ কেন? তা কি জানি। পিসিমা ঠাকুমার কাছে বলছিলেন, 'বৌ হাতে কাঁচের চুড়ি পরে আছে।' তাই শুনে ঠাকুমা খুব কাঁদতে লাগলেন, আর তক্ষুণি পিসেমশাইকে ডেকে এইগুলো কিনে আন্‌তে বলে দিলেন। তোমার জন্যেও তো এই পাঁচ-ছ'খানা কাপড়, সেমিজ, সিঁদুর, আল্‌তা, আরও সব কি-কি দিয়ে-ছেন। আমায় কতকগুলো নোট আর এই ঘড়িটা দিয়েছেন—আমি গুণে দেখিনি যে কত।"

এত সব খবরে ও প্রাপ্তিতেও, যে সংবাদটার জন্য মনো-রমা ছটফট করিয়া মরিয়া যাইতেছিল, তৎসম্বন্ধে কোন কিছুরই আভাষ পাওয়া গেল না। ও-বাড়ীর কার্ত্তিকে চাকর পাঁচটা এবং শাশুড়ীর ঝি কদম চারটে টাকা দিয়া "খোকা বাবুর" মুখ দেখিয়াছে। "ওখানে লোকগুলো কি রকম যে বোকা! আমি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছি,—আমায় বলে তারা খোঁকা!"—

পুরনো সরকার মশাই গুটী-কয়েক্ সস্তার খেলানা,

একজোড়া ধোয়া মিলের ধুতী ও দুটি টাকা দিয়াছেন। খবর মন্দ নয়।—কিন্তু গৃহের যিনি স্বামী,—তিনি? তিনি কি কিছুই করেন নাই? পিসিমার ঠাকুরপো শুদ্ধ কি বলিয়া আদর জানাইয়াছিলেন,—নিবের বাক্স, বাহারে কালির দোয়াত, কোহিনুর পেন্‌সিল ইত্যাদি কিনিয়া দিয়াছেন, সে কথাও তো জানা গেল। আর কোথাও হইতে—আরও যদি অনেকখানি—আর সেই তো তার যথার্থ পাওয়া,—সে পাওনা মিটাইয়া পাইলে সে খবর এতক্ষণ কি উহ্য থাকিত? তবে কি তিনি,—এও কি সম্ভব? মনোরমার সে যে জাগ্রত দেবতা। মূর্ত্তি তো তাঁহার শিলাময় নয়! পরিত্যক্তা মনোরমাকেই তাঁহার চাহিয়া দেখিবার অধিকার নাই, এবং তার জন্য মনোরমা কি কোন দিন নিজের পাওনা আদায়ের নালিশ করিতে গিয়াছে? পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তিনি যদি তাহাকে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সে নিজেই কি আর এমন দেবতার আদর্শে তাঁহাকে বুকের মাঝখানে আসন পাতিয়া বসাইয়া রাখিতে পারিত? হয় ত মানস-প্রতিমাকে মনোরাজ্য হইতে বিসর্জ্জন দিয়া, মাটির সংসারে মর্ত্ত্য মানবের মূর্ত্তিতেই তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিতে মনও তাহার খর্ব্ব হইয়া যাইত। আজ আর কিছুই তাহার না থাক, স্বামী-গৌরব তাহার পূর্ণমাত্রায়ই তো বজায় আছে। স্বামীকে সে যে রামচন্দ্রের সঙ্গেই কত দিন উপমিত করিয়াছে। কিন্তু সেই তাহার আদর্শ, ভগবান রামচন্দ্রও তো নিজ সন্তানের অবমাননা করিতে পারেন নাই! দুষ্মন্তও পরিত্যক্তা শকুন্তলার গর্ভজাত শত্রুদমনকে দূর হইতে দেখিয়া বাৎসল্য-মোহে আত্মহারা হইয়াছিলেন। শ্বশুর রাগ করিয়া যা-ই বলুন,—তিনি পূজনীয় গুরুজন,—সবই বলিলে সাজে, কিন্তু অজিতের পিতা কি তাঁহার নিজের সন্তান চেনেন না? এতটুকু সঞ্চয়, এতটুকু একটুখানি পাথেয়, এই একটি বিন্দু শিশিরের কণা এ গরীব ভিখারীকে দান করিলেও কি তিনি নিঃস্ব হইয়া যাইতেন? অথবা সেটুকু দিবার অধিকারও বুঝি তাঁহার হাতে নাই? বৃথাই এ পরিবেদনা।

"এটা কি রে? পাতলা কাগজ-মোড়া?" "ভুলে গেছি, ভুলে গেছি মা,—আচ্ছা কি বলুন তো?" কল-ঝঙ্কারী পাপিয়ার মত কলকণ্ঠে এই কথাগুলি বলিতে-বলিতে অজিত সেই সূক্ষ্ম আবরণটুকু সরাইয়া সেই কার্ডে আঁটা ছবিখানা মায়ের হাতে তুলিয়া দিল। ইহার উপর নেত্রপাত করিয়াই মনোরমা চমকিয়া উঠিয়া আগ্রহে শত-চক্ষু হইয়া আবার ভাল করিয়া চাহিল। চাহিল তো চাহিয়াই রহিল। সে ছবি তাহার স্বামীর। খুব আধুনিক না হইলেও, সম্ভবতঃ অনেক দিন পূর্ব্বেরও নয়। তবু মনোরমা কি বয়সের পরিবর্ত্তনে সে মুখের ছবি ভুলিতে পারে?

"তাঁর চেহারার সঙ্গে খুব মেলে, না অজিত?"

"আমি তো তাঁকে দেখিনি মা!"

"দেখনি!"

এমনি বিস্ময়ের সহিত এই প্রশ্নটা মনোরমার মুখ হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল, যে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় যথেষ্ট থাকিলেও এতখানি যে ছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বে দুজনকার কাহার মনেও হয় নাই। মনে করিয়া অজিতও যেন তখনি-তখনি ঘোরতর বিস্ময়াভিহত হইয়া গেল। সেই জন্যই সম্ভবতঃ সে আর এ কথার জবাব দিল না।

"বিয়ের দিন, বিয়ের সভায়,—সে দিনও কি তিনি—?"

অজিত ঘাড় নাড়িল।

হঠাৎ মনোরমার মুখের কালি অধিকতর কালো হইয়া গেল। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তাহার কাঁপিয়া স্থির হইয়া গেল। "তিনি,—তিনি ভাল আছেন তো? কারু কাছে কিছুই কি শুনিস্ নি? না আমায় তুই লুকুচ্ছিস? ওরে, তুই বল্ অজিত!"

অজিতের মনের মধ্যে পিতৃসম্বন্ধীয় এতদিনের পূর্ণ আশ্বাসের মধ্যে কোথায় যেন কি একটা গলদ ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। বিশেষতঃ, আপনা হইতে যা' না হইত, ওখানে পাঁচজনের মুখে পাঁচ রকম ইঙ্গিত শুনিয়া সেটা যেন ঈষৎ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মাকে যখন সে বলিল "অসুখ তো করেনি মা, ভালই তো আছেন,—কি না কি মোকর্দ্দমার জন্য হঠাৎ ভাগলপুর যেতে হলো, তাই আসেন নি।" তখন এই কথাটা সে নিজের বিশ্বাসেরই অনুযায়ী আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু বলার সময়েই মনে পড়িয়া গেল, যখন ও-বাড়ী হইতে কার্ত্তিক সরকার মশাই, সারদা, হরির মা, চতুরিয়া, ছোটু সিংহ প্রভৃতি ঝি-চাকরদের দল এ বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়া, অজিতের পিসিমার প্রশ্নের উত্তরে জানাইল, তাহাদের গৃহিণী অসুস্থ এবং বাবু দেশ ছাড়িয়া গিয়াছেন,

পিসিমার তখনকার সেই নির্ব্বাক, স্তব্ধ মূর্ত্তি এবং পারিপার্শ্বিকগণের বিস্ময়পূর্ণ সমালোচনা। তার পর পিসিমার ভাগিনেয় মোহিত যে তাহাকে একসময়ে জনান্তিকে জানাইয়া দিয়াছিল যে, তাহার পিতা তাহার সহিত সাক্ষাতের ভয়েই আজ এমন অসময়ে দেশত্যাগী হইয়াছেন, অপর কোনই কারণ নাই। তখন এ কথাটা সে আদৌ বিশ্বাস না করিয়া উপরন্তু নূতন বন্ধু মোহিতের 'পরে ক্রুদ্ধ হইয়াই উঠিয়াছিল; এবং পিতার প্রতি আরোপিত এই কলঙ্ক জোরের সঙ্গে অস্বীকার করিয়া সবেগে বলিয়া উঠিয়াছিল, "কক্ষনই তা নয়, বাবার মোকদ্দমা আছে, তাই জন্যে আসতে পারেন নি, নৈলে—কি আর আমায় একবারটিও তিনি দেখতে আসতেন না?"

মোহিত যদিও এই অল্প কয়দিনের মধ্যেই অজিতের বন্ধু হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি তাহার সত্য সংবাদের বিরুদ্ধে অতখানি মিথ্যা প্রতিবাদ তাহার সহ্য হইল না; এবং অজ্ঞ অজিতের চোখ ফুটাইয়া দিলেও, না ফুটিয়া মুখ ফোটাতে, বিরক্ত হইয়া সে কহিয়াছিল, "ওঃ! তোর জন্যে তোর বাবার তো ঘুম হচ্চে না রে! দেখতেই যদি আসতেন, তো ওখানেই বা দেখতে যান না কেন?" "কি করে যাবেন? তাঁর কত কাজ।" "দূর্ হাবা! কাজ থাকলে বুঝি আর মানুষ ছেলেপিলেকে দেখতে যেতে পারেন না? আর ওঁর কাজটাই বা কি শুনি? একটা চাকরি করতেন, তাও তো বছর দুই হলো ছেড়ে দিয়ে স্রেফ ঘরে বসে আছেন। এ দেশে, সে দেশে নিত্যি বেড়াতে যাচ্চেন। তাতো নয়, তোর সৎমা—"

সুধীন্দ্র আসিয়া পড়িয়াছিল,—সে চোখ পাকাইয়া মোহিতের দিকে চাহিল। "মেজ-দা! মা সব্বাইকে কি বলে দিয়েচে? মাকে বলে দোব?" "না—না, বলিস্ নে ভাই, বলিস্ নে। অজিতেটা এত উঁচু ক্লাশে যে কি করে পড়ে আমি তো কিছুই বুঝতে পারি নে! ভারি বোকা হচ্চে কিন্তু এ-দিকে। তুই যে আমার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ছিস বল্লি—আচ্ছা মুখে মুখে এই একাট্টা কস দেখিন্। একটা ট্রায়াঙ্গেলের তিনটে মিডিয়ান এক পয়েণ্টে 'মিট' করে। দেখি তো কেমন পারিস?"

তার পর তাহাকে নীরব, বিমনা দেখিয়া, একটুখানি বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া, আপনিই মীমাংসা করিয়া লইল যে, "হ্যাঃ! তা' আর পারতে হয় না! সেকেণ্ড ক্লাশে উঠেচে না কচু করেচে। মোটে এগার বছর তো বয়েস হচ্চে। আমি তো এমন ভাল ছেলে, ইস্কুলে বরাবরই তো ফার্ষ্ট কি সেকেণ্ড থাকি, তা আমিই তো এই চৌদ্দ বছরের।"

তখন ভাল করিয়া বিশ্বাস না করিলেও, গত কল্য হইতে এই সব কথাই অনেকবার ফিরিয়া-ফিরিয়া তাহার মনে হইয়াছে। যে যখনই 'কনে'র মামার অনুপস্থিতি লইয়া আলোচনা করিয়াছে, অমনি মোহিতলালের সেই মুচ্‌কি হাসি ও সেই কয়টা কথাই তাহার কাণের তারে ঝঙ্কার দিয়া দিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। "দেখ্‌তেই যদি আসতেন, তো ওখানেই বা দেখতে যান না কেন? কাজ আছে? সবার বাবারই ত কাজ থাকে।"

মনোরমা কিন্তু এ কথা শোনার পর একেবারে নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়া, হাঁফ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "রক্ষে হোক! তা' নৈলে,—ভাগনীর বিয়ে, তিনি একজন অত বড় মামা—শুধু শুধু কি আর বিয়ের সময় না দাঁড়িয়ে সরে থাকতেন। বিশেষ, বড় ঠাকুরঝি আর তার ছেলেমেয়েরা যে তাঁর প্রাণ। তোর সঙ্গে দেখা হয় নি শুনে প্রাণটা আমার এম্‌নি করে উঠেছিল।"

নিঃশব্দে যে ব্যথাটা পুঞ্জীভূত হইতেছিল, নিমেষে তাহা ঝরিয়া পড়িয়া মনের মধ্যে প্রচুরতর হইয়া রহিল শুধু নূতন দৃশ্য দর্শনের আনন্দ।

(৩৩)

অসীমার বিবাহের পর শরৎ আর হাবড়ার বাড়ীতে আসে নাই, অরবিন্দও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায় নাই। কিন্তু গৃহ-বাস যেন তাহার পক্ষে অরণ্যবাসের বাড়া হইয়াছিল। যে শরতের সৌহার্দ্দ, তাহার মায়া-মমতা, কলহ-আবদারই অরবিন্দের জীবনের শান্তি এবং আরামের স্থল, আজ সেই সে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। প্রথম যৌবনে, বসন্তের প্রথম উৎসব যখন সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে,—নিদারুণ ঝড়ের হাওয়ায় সে দিনের সেই যৌবন-নিকুঞ্জ তাহার ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেও বুঝি এতবড় অকরুণ নয়। অরবিন্দের মনে হইল, শরতের সেই সর্ব্ব-প্রথমকার সন্তান, যার জন্ম তাহার মামীমার সাক্ষাতে, তাহারই কোলে-কোলে, বুকে-বুকে যে সর্ব্বপ্রথম বাড়িয়া

উঠিয়াছিল, যার কথা তাহাদের প্রথম যৌবনের তপ্ত অনুরাগে-ভরা লিপিগুলির কতখানি স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে,—সেই 'মামাবাবু'র একান্ত অনুগত সেই স্নেহ পুত্তলীটিকে সে যখন জীবনের সর্ব্বপ্রধান শুভক্ষণে আশীর্ব্বাদ করিতে পারে নাই,—তখনই তাহাদের গৃহের দ্বার তাহার সম্মুখে জন্মের মত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শরৎ এ জীবনে আর তাহাকে ক্ষমা করিবে না,—সেই বা ক্ষমা চাহিবে কোন্ মুখে? তার পর মা। মা ই কি পুত্র ও বধূর এতবড় ধৃষ্ট-স্বেচ্ছাচারিতা ক্ষমা করিতে পারিয়াছেন? সেই যে বিবাহ-বাড়ী হইতে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন, সেই পর্য্যন্ত বধূ ও ছেলে কাহারও সহিত একটি কথা পর্য্যন্ত কহেন নাই। সারি-ঝির মুখে ব্রজরাণী আসল খবর পাইয়াছিল। সতীন নয়, শুধু সতীন-পো। এ খবরে একদিকে যেমন তাহার চিত্ত ত্রাস-বিমুক্ত হইল, তেম্নি একটু আত্মগ্লানিরও উদয় না হইল তা-ও নয়। অতটুকু একটুখানি ছেলের জন্য সে অতখানি করিয়া বসিল? অতটা না করিলেও হয় ত চলিত। একদিন মনের এই চিন্তাটাই সে স্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিল; বলিল, "তোমার সকলি বাড়াবাড়ি। আমি না হয় রাগের মাথায় একটা কথা বলেই ছিলুম। তা বলে তোমায় দেশত্যাগী হ'তে তো আর আমি বলিনি।"

অরবিন্দ কহিল, "ওঃ! তা'হলে সেই গরীবের ছেলের মাথা খাওয়াটাই তোমার ইচ্ছা ছিল বুঝতে পারিনি—"

নির্ম্মম আঘাত! দীপ্তশিখা অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া ব্রজরাণী কহিল, "আমি যদি কাউকে খুন করতে বলি তো তুমি তাই করবে?"

মা বাড়ী ফিরিয়া অবধি মৌনী থাকিবার পর, হঠাৎ একদিন কি মনে করিয়া, ছেলেকে ডাকাইয়া আনাইয়া, কোন রকম প্রস্তাবনা না করিয়াই, এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, "কর্ত্তার উপার্জ্জিত ধন-সম্পত্তিতে আমারও তো কিছু ভাগ আছে?"

কিছু দুর্দ্দৈবেরই প্রত্যাশা বক্ষে লইয়া অরবিন্দ মাতৃ-সন্দর্শনে আসিয়াছিল; উত্তরে বলিল, "আছে বৈ কি। আইন-মতে বাবার সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেকই তো তোমার।"

"এতে আমার দান-বিক্রীর অধিকার আছে? তোমাদের আইনে কি বলে?"

মার মুখের দিকে অপলকে চাহিয়া থাকিয়া পুত্র জবাব দিল, "আইনে যা বলে বলুক না, মা, দান বিক্রীর অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে।"

মা বলিলেন, "না বাবা, আমি তোমাদের অনুগ্রহ চাইনে। যদি যথার্থ আমার ব'লে পৃথিবীতে কিছু থাকে, তো সেই ক্ষুদ-কুঁড়োটুকুই আমায় তুমি হাতে তুলে দিও,—তার চাইতে বেশির কিছু দরকার নেই।"

যে মায়ের মুখে জীবনে কখনও একটা পরুষ বাক্য অরু শুনে নাই, এ কি তাহার সেই মা? কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, অবশেষে কণ্ঠোত্থিত একটা অত্যন্ত সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসকে সাবধানে চাপিয়া ফেলিয়া, পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "সবটাই কি তুমি নগদ নেবে, না বাড়ী রাখবে?" "যাতে তোমার সুবিধে হয়, সেইমতই আমার নামে তুমি লেখাপড়া করিয়ে রেখো,- আমার সুবিধে মতন আমি নোব।"

দুদিন পরেই হঠাৎ একদিন শরতের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, সরকারকে দিয়া ছেলেকে বলিয়া পাঠাইলেন, জামাইএর মুখে তিনি শুনিয়াছেন, বিষয়ে তাঁহার কোনই অংশ নাই। তিনি দয়া ভিক্ষা করিতে চাহেন না,—তাঁহার গায়ের যে গহনা আছে, সেই যথেষ্ট। আর কিছুর দরকার নাই।

স্টীলট্রাঙ্ক, হাতব্যাগ, বিছানা ও বিলাতী চাকরকে সঙ্গে লইয়া অরবিন্দ দার্জ্জিলিং যাওয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনবেলা উপোসী থাকিয়া ব্রজরাণী তাহার সঙ্গ লইয়া তবে ছাড়িল।

গৃহের বাহিরে নগাধিরাজ হিমালয়ের শোভা সম্পদের মাঝখানে বাস করিয়া, এমন কে ভিখারী আছে, যাহার প্রাণের দৈন্য বিমোচিত হয় না? অরবিন্দের অশান্ত হৃদয়ের আভ্যন্তরিক বহ্নি তাপ এই তুষার-পুরীর তুষার-শীতল বাতাসে জুড়াইয়া আসিল। কিন্তু হায়, তবু কি—

(১৪)

অসীমার বিবাহোপলক্ষে ভাই-বোনের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতেই চির-বিচ্ছেদের যবনিকা নিক্ষেপ করিয়া, শেষ বৈশাখের এক গ্রীষ্ম-অধ্যুষিত শ্রান্ত সন্ধ্যায় শরৎশশীর ক্লান্ত-করুণ দুটি চোখের তারা পৃথিবীর শেষ আলোক রেখা হইতে চির-নিমীলিত হইয়া গেল।

রোগের প্রথম বা দ্বিতীয়াবস্থাতেও, না চিকিৎসক, না গৃহস্থ—কেহই মৃত্যুর ছায়া দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তাই অরবিন্দ দার্জ্জিলিংয়ে বসিয়া যখন খবর পাইল, তখন তাহার প্রাণপ্রিয় ভগিনীটির জীবনদীপ নির্ব্বাণের কাল বিলম্বিত নয়।

শরতের অম্লান পূর্ণশশী তৎক্ষণে ত্রিপাদগ্রাসী গ্রহণে রাহুগ্রাসে পতিত হইয়াছে,—সে শরৎ বলিয়া ইহাকে চিনিতে পারা কঠিন।

"দাদা এলে কি?" "দিদিমণি আমার! এমন করে চিরকালের জন্য আমার বুকে শেল বিঁধে রেখে গেলি?"

মরিতে বসিয়াও স্বভাব যায় না! বিদ্রূপ হাস্যে শীর্ণ অধর রঞ্জিত করিয়া, দুষ্ট মেয়ে এই জবাব দিল,"কেন, ঝগড়া করো না আমার সঙ্গে!"

রোগীর মুখের উপর যে কথা প্রকাশ করা অনুচিত, মনের বিকলতায় তেমন কথাও গোপন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। গত কল্য হইতে চিকিৎসকগণ চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। নিশ্চেষ্ট বসিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা আত্মজনের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া কবিরাজ ডাকা হয়। তিনি নিদানের শেষ কর্ত্তব্য মৃগনাভি মকরধ্বজ দিয়াছেন। প্রথম একবারের জন্য উপকারের আশা দিয়াই পরক্ষণে সমুদয় জাগতিক শক্তিকে উপহাস করিয়া রোগীর অবস্থা মন্দের চেয়েও মন্দ হইতেছিল।

সেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদের পর সুদীর্ঘ তিন মাস অন্তে অতদূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া, এতবড় নিদারুণ দৃশ্য, অতখানি সহ্য-শক্তি লইয়াও অরবিন্দ যেন কোনমতেই সহিতে পারিতে-ছিল না। ভগিনীর প্রায় নিশ্চল বুকের উপর সে হাহাকার করিয়া লুটাইয়া পড়িল। নিজের অতি দুর্ব্বল শরীরের উপর অত বড় পুরুষটার সেই অদম্য কান্নার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন শরতের হৃদ্‌পিণ্ডের মন্থর গতি অবসাদে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার চক্ষের নির্জ্জীবতা লক্ষ্য করিয়া, জগদিন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া অরবিন্দের হাত ধরিয়া তাহাকে বলিল, "ছোট বাবু! ছোট বাবু! ঠাণ্ডা হও—এখন রোগীর কথা ভাবো।"

"স্বর্গ মানো, না ছেড়ে দিয়েছ?" "মানি বই কি।" "তবে আবার অত কান্নাকাটি কিসের?"

শরতের আকস্মিক ও অকাল-মৃত্যুতে সকলেই শোকে মুহ্যমান হইল। ব্রজরাণীর সহিত যদিও উহার কিছুমাত্র প্রীতি সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু তথাপি সে আজ সে কথা স্মরণে রাখিতে পারিল না। তাহাদের মধ্যে যতই অসদ্ভাব থাক, সে যে তাহার স্বামীর বড় প্রিয়। স্বামীর মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়া সেও তাই মর্ম্মাহত হইল।

শরতের মৃত্যুর পর, গভীর শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস একটুখানি মন্দীভূত হইলে, যখন পরস্পরে কথা কহিবার শক্তি ফিরিয়া আসিল, তখন অরবিন্দ জগদিন্দ্রকে কহিল, "আগে কেন আমায় খবর দিলে না?" জগদিন্দ্র যেন আত্ম-বিস্মৃত, বিহ্বল, কেমন যেন পাগলের মত। শোকের সর্ব্ব-প্রথম ধাক্কায় সেই যে সে বলিয়া উঠিয়াছিল, "ছোট বাবু! তোমাদের কাছ থেকে যে লক্ষ্মীকে আমি ঘরে এনেছিলুম, আজ তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমি যে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছি!" তা, তাহার মুখে-চোখে এবং সাজে পোষাকে তাহাকে সেই 'লক্ষ্মীছাড়া'র মতই দেখাইতেছিল। সংসারে যে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ছিল, ঝড়ের আঘাত তাহাকেই লাগে বেশি। অরবিন্দের অনুযোগের কৈফিয়ৎমাত্র না দিয়াই সে নিজের চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়া প্রায় আত্মগতই বলিয়া উঠিল, "ডাক্তারটা প্রথম থেকে কিছু বুঝ্‌তে পারলে না, না কি? এত শীঘ্রই বা অমন হয়ে বেড়ে গেল কি করে?—প্লেগের হিড়িকটায়ও অনেকখান কষ্ট গেল, তাতেই কি—"

অরবিন্দ কহিল, "সেই জন্যই তো বলচি, আমায় তোমার খবর দেওয়া উচিত ছিল।"

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দুঃখার্ত্ত বিপত্নীক কহিল, "কি করে তখন জান্‌বো যে এমন হবে! যখনই অসুখ বেশি বোঝা গেল, দয়াল সোমকে আনালুম, মেয়েদের ডাক্তার অমন তো আর একজনও নেই।"

"তখনও কেন আমায় লিখলে না? সেও কি আমায় একবার খোঁজে নি?" "না, কি করে খুঁজবে? বড়-বৌ-ঠাকরুণ যে অজিতকে নিয়ে তাঁর অসুখের খবর পাবামাত্র চলে এসেছিলেন। তাঁদের সাম্‌নে তো আর তোমায় আস্‌তে বল্‌তে পারে না। কাজেই খবর দেওয়া হয়নি।"

অরবিন্দ চুপ করিয়া রহিল। জগদিন্দ্র বলিতে লাগিল, "তা সেবা যতদূর কর্‌তে হয়, বড়-বৌ-ঠাকরুণ্ তা করেছেন। ডাক্তারেরাই বলে গেছে, যে, ছুটো

ইউরোপিয়ান নার্সেও অমন পারতো না। বরাবরই তো ছিলেন। এই পরশু সকালে নিতাই ঘোষ এসে নিয়ে গেল। মায়ের না কি কলেরার মতন হয়েছিল। ঘরেও তো কেউ নেই। লক্ষ্মী, আহা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দুটি! তা একটি তো চলেই গেলেন, যেখানকার যোগ্য সেইখানেই গেলেন,-- তবে আমার দফা একেবারেই সেরে দিয়ে গেছেন, এই যা!"

বলিতে-বলিতে দুটি গাল বহিয়া টস্-টস্ করিয়া বুকের উপর চোখের জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সেটাকে লুকাইবার জন্য সেইক্ষণে দাসীর কোলে আগত ক্রন্দন-পরায়ণ কোলের মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি টানিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল।

ইতঃপূর্ব্বে ছেলেমেয়ের কোন ঝোঁক সে কোন দিনই পোহায় নাই; পারে না জানিয়া শরৎও তাহার উপর উহাদের কোন আবদার অত্যাচার কখন ফেলিতে দিত না।

মহীশূর

(শ্রবণ বেলগোলার পথে)

[শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-সি-ই]

চারি বৎসর পূর্ব্বে কয়েক মাস ধরিয়া দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিবার সুবিধা হইয়াছিল। যে সব স্থান দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে মহীশূর রাজ্যান্তর্গত অনেকগুলি সামান্য সামান্য গ্রাম আমার নিকট বিশেষ প্রিয়। সেগুলি প্রাচীন চালুক্য ও হৈমন বল্লাল নৃপতিদিগের কীর্ত্তি-কলাপে পূর্ণ। এই প্রবন্ধে যে স্থানের বর্ণনা করিব, তাহা জৈনদিগের এক প্রধান তীর্থস্থান। জৈনদিগের তীর্থস্থান ত বটেই, কিন্তু জৈনধর্ম্মান্তর্গত দিগম্বর শাখার ইহা বিশেষ পবিত্র তীর্থ। আমার বোধ হয় সমস্ত দাক্ষিণাত্যে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে ইঁহাদের ইহা অপেক্ষা পবিত্রতর তীর্থস্থান নাই। বহু বর্ষ পূর্ব্বে আমার পিতৃদেবের এক শ্বেতাম্বরীয় জৈন শিষ্যের মুখে এই কথা শুনিয়া আমার ইহা দেখিবার ইচ্ছা বিশেষ বলবতী হইয়াছিল। যাঁহারা পুরাতত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এ স্থানের নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করেন নাই, ইহা আমি তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি। কিন্তু মহীশূর রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ও মহীশূর গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী রাইস্ সাহেব (Mr. Rice) ১৮০৯ অব্দে 'Inscription at Sravan Belgola' নামে একখানি অতি উপাদেয় পুস্তক প্রচারিত করেন। ইহাতে যে ১৪৪টি অনুশাসন লিপিবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায়, কিন্তু কানাড়ি অক্ষরে লিখিত; কয়েকটি আবার কানাড়ি ভাষায়ও লিখিত। এই সকল অনুশাসনের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। গঙ্গাবংশ, রাষ্ট্রকূট নরপতি, হৈমন বল্লাল নরপতি ও বিজয়নগর রাজ্যের অনেক আবশ্যক জ্ঞাতব্য তথ্য এই সকল অনুশাসন পাঠ করিলে জ্ঞাত হওয়া যায়।

শ্রীরঙ্গপত্তনম্ বা সেরিঙ্গাপটামে হায়দার ও টিপুর সমাধি-হর্ম্ম্য, দুর্গের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া গোযানে শ্রবণ বেলগোলার উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। পুলিশ কোতোয়াল আমার যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে, যদিও আইনানুসারে মাইল-প্রতি গো-যানের ভাড়া দেড়-আনা, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য বিশেষ মহার্ঘ হওয়ায় গোযান-চালককে যেন দুই আনা হারে ভাড়া দেওয়া হয়। সেরিঙ্গাপটমের ডাক্‌বাঙ্‌লো বা Travellers' Bunglow হইতে অপরাহ্ণ ৪টার সময় যাত্রা করা গেল। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় ১২ মাইল দূরস্থিত চিল্‌কুরলি বাঙ্গলোর পার্শ্বে বৃষদ্বয়কে বিশ্রাম দেওয়া হইল। সে রাত্রি যে কি প্রকার অন্ধতমসাচ্ছন্ন, তাহা আমার চিরকাল স্মরণে থাকিবে। গো-যান-চালক তাহার বৃষদ্বয়কে আহার করাইয়া লইল, এবং নিজেও আহার করিয়া লইল। যেখানে আমাদের গোযান রক্ষিত হইল, ইহার সন্নিকটে দুই-একটি সামান্য দোকান থাকিলেও, আমাদের অভ্যস্ত কোন আহার্য্য মিলিল না।

আমি ক্ষুৎক্ষাম হইয়া সামান্য একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, বিশেষ চঞ্চল করিয়াছিল দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কোথায় আসিয়াছি ও কোন্ দিকে যাইব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। অন্যান্য গো-যান চালকেরা খড় ও পত্র জ্বালাইয়া মাঝে মাঝে যে অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়াছিল, তাহাতে অন্ধকারকে আরও ভীষণতর দেখাইতেছিল। আমি যান হইতে অবতরণ করিয়া চারিদিক ও বাজারটি দেখিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু দেখিবার জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। এখানে ত দর্শনযোগ্য কিছুই নাই; তদ্ভিন্ন, নিরাশ্রয় কুক্কুরদিগের চীৎকারে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। আমি ধীরে-ধীরে স্বীয় শকটে আসিয়া বসিলাম। আমার সঙ্গে যে উড়িয়া ভৃত্যটি ছিল, সে ত ভয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন চিত্তে বসিয়া ছিল। সে ত কেবল ভয় দেখাইতেছিল, "বাবু, এমন জানিলে কখনই আসিতাম না; এখানে হত্যা করিলেও কেহ জানিতেও পারিবে না।"

পরদিন প্রাতে ৮টার সময় ৩১ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কিক্কোরির বাঙ্গলোয় উপস্থিত হইলাম। এই স্থান হইতে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে হাসানের ডেপুটি কমিশনার চলিয়া গিয়াছেন। ইনি কল্য রাত্রে এখানে বাস করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বাঙ্গলোটি আম্রপত্রে সুশোভিত করা হইয়াছে। আসিবার সময় পথে অশ্বপৃষ্ঠে পুলিশ কর্ম্মচারী দেখিলাম। ইনি ডেপুটি কমিশনারকে বিদায় দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। এ বাঙ্গলোটি আয়তনে সামান্য; এবং যে জমির উপর ইহা অবস্থিত, তাহা এক ঊষর পতিত জমি; তবে পূর্ব্বদিকে প্রশস্ত হ্রদ রহিয়াছে বলিয়া দিবা শোভার বিকাশ হইয়াছে, সূর্য্যোদয়-কালে বড় সুন্দর। আসিবার সময় পথে একজন কানাড়ী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইল; ইনি আমার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলো পর্য্যন্ত আসিলেন। ইঁহার বাস এই গ্রামে। ইনি জাতিতে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ এবং পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ কোন ন্যাসানাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানির এজেণ্ট ছিলেন; সম্প্রতি চাকুরির মায়া পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্ম করিতেছেন। ইঁহার ১৫ একর বা ৪৫ বিঘা জমি, ৪টি বৃষ ও একটি মহিষ আছে; আমি তাঁহাকে নগণ্য চাকুরি না করিয়া কৃষি-কর্ম্ম দ্বারা নিজের উন্নতি সাধন করিতে উপদেশ দিলাম। শুনিলাম, ডেপুটি কমিশনার মহাশয়ও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। বলিবারই ত কথা; কেন না, এখন মহীশূর রাজ্যে কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, যৌথকারবার প্রভৃতির উন্নতির জন্য এক দেশ-ব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে এবং তাহার প্রমাণও দেখিয়াছি। লোকটির কিন্তু চাকুরির দিকে বেশী টান দেখা গেল,—ইহা বোধ হয় কলিকাতার জলহাওয়ার গুণে।

কিক্কোরি গ্রামটি তন্তুবায়-বহুল; এই সামান্য গ্রামে পাঁচশত মাকু চলিতেছে ও এখানকার বস্ত্র প্রসিদ্ধ। তন্তুবায়-পল্লী দেখিলাম। এখানে গ্রাম্য-সমিতি বা village union আছে; সেই জন্যই রাস্তা-ঘাটগুলির উপর প্রস্তর দিয়া বা Kirb দিয়া মণ্ডিত হইবার ব্যবস্থা দেখিলাম। আমাদের কলিকাতার প্রস্তরগুলি খালুপাথরের, এগুলি গ্রানাইট; ফুট করা দাম প্রায় উভয়েরই সমান।

এই গ্রামটিতে চালুক্যগণ কর্তৃক নির্ম্মিত এক শিব মন্দির অবস্থিত, এবং তজ্জন্য ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি। বিগ্রহটির নাম ব্রহ্মেশ্বর। ইহা একটি শিবলিঙ্গ। ব্রহ্মেশ্বর নামে শিবের মন্দির সচরাচর দৃষ্ট হয়। উড়িষ্যান্তর্গত ভুবনেশ্বরে এই নামে যে মন্দির আছে, তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধ। চালুক্যরীতি-নির্ম্মিত মন্দিরগুলির অনেকগুলি বৈচিত্র্য আছে; এখানেও সেগুলি বর্ত্তমান। চালুক্যরীতিটি কি,—এক কথায় চিত্র ব্যতিরেকে বুঝাইয়া বলা কঠিন। আমি ইহা বুঝিবার জন্য হাইদ্রাবাদ ও মহীশূর রাজ্যের গ্রামে-গ্রামে, অরণ্যে-অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছি; হাইদ্রাবাদ রাজ্যের এক স্থানে এত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি যে, এখন চিন্তা করিলে সে সমস্ত কথা অলীক বলিয়া বোধ হয়। সে সব কথা যাউক। চালুক্য-রীতির দুই-একটি বৈশিষ্ট্য বুঝিবার পূর্ব্বে বলিয়া রাখি যে, এ রীতি দ্রাবিড়-রীতি হইতে উদ্ভূত না বলিলেও ইহাতে পূর্ব্বোক্ত রীতির প্রভাব বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান। ইহাতে আর্য্যাবর্ত্ত-রীতিরও সুন্দর সংমিশ্রণ দেখা যায়। চালুক্য-রীতির একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাতে সাধারণতঃ একের অধিক, প্রায়শঃ তিনটি বিমান বা গর্ভগৃহ পাশাপাশি ভাবে এক মণ্ডপের তিন ধারে অবস্থিত। এই মণ্ডপটির নাম অর্দ্ধমণ্ডপ। গর্ভগৃহ ও অর্দ্ধমণ্ডপের মধ্যস্থ স্থানের নাম অন্তরাল। ইহাকে স্থানীয় লোকেরা শুকমারী বলে। অর্দ্ধমণ্ডপের সংলগ্ন ও ইহার বাহিরে যে স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপটি থাকে, তাহার নাম মহা-মণ্ডপ। দ্রাবিড়-রীতিতেও গর্ভ-গৃহ, অন্তরাল, অর্দ্ধমণ্ডপ ও মহামণ্ডপের ব্যবস্থা থাকিলেও, একের অধিক গর্ভ-গৃহের

ব্যবস্থার জন্য ও বিচিত্র ভাবে অবস্থানের জন্য দ্রাবিড়-রীতি হইতে চালুক্যরীতি বিভিন্ন। চালুক্যরীতিতে নির্ম্মিত মন্দির-গুলির ভূমির উপর পত্তন দেখিতে ক্রিশ্চান ক্রশের ন্যায়। কোন নৈয়ায়িক সমালোচকের সমালোচনার আশঙ্কায় বলিয়া রাখি যে, তুঙ্গভদ্রা নদীতীরবর্ত্তী প্রদেশে ও অন্যান্য স্থানে কতিপয় চালুক্যরীতি-নির্ম্মিত মন্দিরে একের অধিক গর্ভগৃহ নাই। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হালোবিডস্থ ঈশ্বরেশ্বর মন্দিরেও তিনটি গর্ভগৃহ দৃষ্ট হয় না। যে তিনটি গর্ভগৃহ বিদ্যমান থাকে, তাহার মধ্যস্থটিতে, যে দেবতার নামে মন্দির উৎসর্গীকৃত, তাঁহার মূর্ত্তি অবস্থিত থাকে; এস্থানে লক্ষেশ্বরের মূর্ত্তি (শিবলিঙ্গ) বিদ্যমান। অন্য দুইটিতে প্রধান মূর্ত্তিটির অন্যান্য দুইটি ভিন্ন আকৃতি বা নামধেয় মূর্ত্তি বিরাজ করে। উদাহরণ স্বরূপ সোমনাথপুরস্থ বৈষ্ণব মন্দিরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা বিষ্ণুর নামান্তর কেশবের মন্দির; স্থানীয় ভাষায় এ মন্দির নাম "প্রসন্ন চেন্ন কেশব।" মধ্যস্থ গর্ভগৃহে কেশবের মূর্ত্তি স্থাপিত; পার্শ্বস্থ দুইটি গৃহে গোপাল ও জনার্দ্দনের মূর্ত্তি রহিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে, তিনটি করিয়া গর্ভগৃহ যোজনা করিবার মূলে জৈন প্রভাব দৃষ্ট হয়।

চালুক্যরীতির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাহার তল-পত্তনের আকৃতি তারকাসদৃশ; তারকার কোণাগ্রগুলিকে এক বৃত্তরেখার উপর কল্পনা করা যাইতে পারে। অনেক চালুক্য-মন্দিরে পূর্ব্বোক্ত কোণাগ্র দৃষ্ট হয় না। সোমনাথপুর, বেলুড়, হালোবিড প্রভৃতি স্থানে তারকাকৃতি তল-পত্তন দেখিয়াছি।

স্তম্ভ দেখিয়াও চালুক্যরীতি কি দ্রাবিড়রীতিতে মন্দির নির্ম্মিত, বুঝিতে পারা যায়। ইহার কারুকার্য্য এমন বৈচিত্র্য-যুক্ত যে, দেখিলে অনায়াসেই অবধারণ করিতে পারা যায় যে, ইহার শিল্পী চালুক্য না হইয়া যায় না। আমি সুদূর পেশোয়ার ও কাশ্মীর হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া, এ প্রকার স্তম্ভ চালুক্যদেশ বা তৎবিজিত রাজ্য ভিন্ন কুত্রাপি দর্শন করি নাই। স্তম্ভগুলির এই বৈচিত্র্য—ইহার মসৃণত্ব; ইহার সম্মুখে দাঁড়াইলে নিজের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি হায়দ্রাবাদ রাজ্যস্থিত হোনামকুণ্ডা গ্রামে যখন চালুক্যস্তম্ভ প্রথম সন্দর্শন করি, তখন ইহার মসৃণত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে এগুলি সাধারণতঃ নির্ম্মিত, তাহা এক শ্রেণীর pot-stone; স্থানীয় ভাষায় ইহাকে "বাড়াপা" প্রস্তর কহে। ইহার কারুকার্য্য ইহার দ্বিতীয় বৈচিত্র্য; অল্পবেধযুক্ত moulding দ্বারা স্তম্ভটী পূর্ণ; ইহার প্রত্যেক বরগাটীতে এত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে যে, তাহা ভাবিলে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। এগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, কোন প্রকার অধুনা অজ্ঞাত কোঁদাই যন্ত্রদ্বারা এগুলিকে প্রস্তুত করা হইয়াছে। অধুনা স্বর্ণকারেরা এখানকার শিল্পকার্য্যের অনুকরণে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করে। এস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করি যে, অন্ধ্র-দেশস্থ সিংহাচলম গিরিস্থিত নরসিংহ মন্দিরেও চালুক্যরীতি-নির্ম্মিত বাড়াপা প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভ দেখিয়াছি।

চালুক্যরীতির আর একটা বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ-যোগ্য; তাহা মন্দিরগুলির "জালি"যুক্ত জানালা। এ "জালি" দ্রাবিড়-স্থাপত্যেও দৃষ্ট হয়; কিন্তু চালুক্য-জালিতে যত সূক্ষ্ম কার্য্য আছে, এমন কোথাও নাই।

চালুক্য-প্রণালীতে নির্ম্মিত মন্দিরগুলির পৃষ্ঠদেশের চারিধারে যে ভাস্কর্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা অতুলনীয়; ভারতবর্ষের কুত্রাপি এরূপ দৃষ্ট হয় না। ইহাতেও ইহাদের বিশিষ্টতা। শুদ্ধ ভাস্কর্য্য হিসাবে এগুলি দর্শন করিতে যাওয়া উচিত। হালোবিড মন্দির বর্ণনার সময় ইহার বিশেষ পরিচয় দিবার চেষ্টা করা যাইবে। এগুলিতে যেমন মার্জ্জিত শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি সাধারণের শিক্ষার পক্ষেও এগুলি বিশেষ উপযোগী। হালোবিডের গাত্রে রামায়ণের চিত্রগুলি কেমন সুন্দরভাবে খোদিত করা হইয়াছে; ইহার তুলনা আর্য্যাবর্ত্তে ত নাই-ই,—দ্রাবিড়-স্থাপত্যেও ইহার অনুরূপ কিছু দর্শন করি নাই।

চালুক্য-মন্দিরগুলির শেখর দ্রাবিড়-স্থাপত্যানুযায়ী নহে। মিষ্টার রিয়ে (Mr. A. Rea) ইহাতে দ্রাবিড় স্থাপত্যানুযায়ী অঙ্গের প্রাচুর্য্য দেখিয়াছেন। প্রাচীন চালুক্য-মন্দিরগুলি সম্বন্ধে ইহা কতক পরিমাণে প্রযোজ্য হইলেও, উত্তরকালের মন্দির সম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। উত্তর-কালীন মন্দিরসমূহে আমি আর্য্যাবর্ত্ত রীতির বিশেষ প্রভাব দেখি। শেখরই বল, বা তন্নিম্নস্থ আয়তাকার বা চতুরস্রাকার অংশই বল, কিংবা চতুরস্রাকার ক্ষেত্রের সর্ব্ব-নিম্নভাগে স্থিত "পঞ্চকর্ম্ম" বা পঞ্চাঙ্গযুক্ত "জঙ্ঘা"ই বল—

সর্ব্বত্র আর্য্যাবর্ত্ত-রীতির (Indo-Aryan style) প্রভাব দেখি। প্রকৃত পক্ষে কিকোরীর ব্রহ্মেশ্বরের মন্দিরের বহির্দ্দেশে আমি আর্য্যাবর্ত্তরীতির মিশ্রণ বা প্রভাব দেখিয়া ত বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলাম।

উত্তরকালীন চালুক্য-রীতির আর একটি বৈচিত্র্যের কথা বলিয়া আমরা অন্য বিষয়ের কথা বলিব। মহামণ্ডপ ও অৰ্দ্ধমণ্ডপের চতুর্দ্দিকের পোতার উপর একটি রকের মত স্থান আছে; এবং তাহার পার্শ্বে এক ক্রমনিম্ন আলিসা দেখা যায়। এই আলিসার বহির্দ্দেশ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে চিত্রিত থাকে।

আর্য্যাবর্ত্ত রীতিতে শেখর গাত্রে যে "রথ"-সংজ্ঞক অংশগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও তাহা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির প্রকৃত পক্ষে একটি "ত্রিরথ" মন্দির। আমি উড়িষ্যায় বিশুদ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত-রীতিতে নির্ম্মিত মন্দিরগুলি কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছি যে, যেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মের প্রভাব দৃষ্ট হয় না, সেখানে শেখরের আকৃতি "ত্রিরথ" নহে। যেখানেই বৌদ্ধধর্ম্ম বা অন্য ধর্ম্মের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেইখানেই ত্রিরথ আকৃতি নয়নগোচর হয়। ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির যে ত্রিরথ, তাহার কারণ এই যে চালুক্যরীতি জৈন প্রভাবান্বিত। আমি দেখিয়াছি যে, মৎকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এই প্রমাণটি দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেতর অন্য ধর্ম্মের প্রভাব অতি সহজে বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব্বে সোমনাথপুরের কেশব মন্দির দেখিয়া কিকোরীস্থ ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির বিচিত্র বলিয়া বোধ হইল না; কিন্তু কয়েকটি সামান্য-সামান্য বিষয় আমার নিকট বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। দ্রাবিড়-স্থাপত্যে দ্বারপালের যে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহার এক পদ জানুর উপর সমতলভাবে অবস্থিত। ইহা সমস্ত দ্রাবিড়-মন্দিরের বিশেষত্ব। এখানে (অৰ্দ্ধমণ্ডপের নিকটবর্ত্তী) তাহার ব্যতিক্রম দেখি। এখানকার অৰ্দ্ধমণ্ডপ প্রাচীরের পার্শ্বে জালি দেওয়াল দেখা যায় না; সম্মুখদেশেই দৃষ্ট হয়।

এই মন্দিরে কয়েকটি দেবমূর্ত্তি পরীক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা পাইলাম; যাহা দেখিলাম তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

গণেশ :—চতুর্হস্ত আসীন মূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্তে ও ভগ্নদন্ত এবং বামহস্তে সর্পবেষ্টিত পদ্ম এবং লাড্ডুক। মূর্ত্তিটির শুণ্ডে এক বৃক্ষ-শাখা এবং সর্প উদর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

তাণ্ডবগণেশ :—চতুর্হস্ত, মূষিকের পৃষ্ঠে নৃত্যশীল। দক্ষিণহস্তে কুঠার ও ভগ্নদন্ত এবং উৰ্দ্ধ বাম হস্ত নৃত্য করিবার মুদ্রায় মস্তকোপরি ধৃত; নিম্ন বামহস্তে লাড্ডুক।

আর্য্যাবর্ত্তের কোন দেব-মন্দিরে পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের গণপতির মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি নাই। আমার যতদূর পড়া আছে, কোন পুরাণে এ প্রকার বর্ণনাও দেখি নাই। তাণ্ডব-গণপতি বা গণেশের অনেক প্রকার ক্রম দেখিয়াছি,—কিন্তু এ প্রকার দেখি নাই। কলিকাতার যাদুঘরে এরূপ মূর্ত্তি একটিও নাই।

ব্রহ্মা—সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত হংসের উপর আসীন ও চতুর্হস্ত। দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা, ও এক প্রকারের পক্ষী; বাম হস্তে ত্রিশূল ও সনুস্খপাত্র,—বোধ হয় কমণ্ডলু।

কালিকা-পুরাণে ব্রহ্মার যে স্তব পাওয়া যায়, তাহার সহিত ইহার লক্ষণগুলি মিলে না।

শিব—চতুর্হস্ত, পার্শ্বে গণেশ ও নন্দী বা কার্ত্তিক; মূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান। দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ও অক্ষমালা; বাম হস্তে গদা ও চক্র।

তাণ্ডব শিব—অন্ধকাসুরোপরি দণ্ডায়মান ও নর্ত্তনশীল; চতুর্হস্ত। দক্ষিণ হস্তে ডমরু ও অভয়; উৰ্দ্ধ বাম হস্ত নৃত্য-ভাবব্যঞ্জক; নিম্নবামহস্ত বরপ্রদ।

এ প্রকারের শিবের ধ্যান কোথায়ও পাঠ করি নাই এবং এরূপ মূর্ত্তিও কোথায় সন্দর্শন করি নাই।

অৰ্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি—চতুর্হস্ত দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ও অক্ষমালা; বাম হস্তে পদ্মোপরি শিবলিঙ্গ ও ঘট সহিত ধান্যগুচ্ছ।

বিষ্ণু—চতুর্হস্ত দণ্ডায়মান মূর্ত্তি; ইহার পার্শ্বে গরুড়-মূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্তে পদ্ম ও শঙ্খ; বাম হস্তে গদা ও চক্র। বিষ্ণুর যে চতুর্ব্বিংশতি বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে, ইহা তাহারই অন্তর্গত নারায়ণের মূর্ত্তি।

বিষ্ণুর বিভিন্ন মূর্ত্তির পরিচয় সম্বন্ধে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে বিরোধ বা মতান্তর দৃষ্ট হয় না।

হালোবিড যাইবার পথে বেলুড় গ্রামে কেশবের মন্দিরস্থ পুরোহিত মহাশয়ের নিকট "পঞ্চরাত্রাগমঃ" হইতে যে পরিচয় লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহার সহিত অগ্নি-পুরাণ বা পদ্ম-পুরাণের বর্ণনার কোন অনৈক্য নাই।

বিশ্বরূপ মূর্ত্তি—ষড়্‌হস্ত, দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্তে যথাক্রমে পদ্ম, ত্রিশূল ও দীর্ঘ দণ্ড (গদাবিশেষ); বাম হস্তে শঙ্খ, ডমরু ও পদ্ম। গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা।

সূর্য্য—দ্বিহস্ত দণ্ডায়মান মূর্ত্তি; দুই পার্শ্বে শর-নিক্ষেপোদ্যত দুইটি স্ত্রী-মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহারা বোধ হয় উষা এবং প্রত্যুষার মূর্ত্তি। ইঁহারা শর দ্বারা যেন অন্ধকার দূর করিতেছেন। ইলোরা গুহায় সূর্য্যের এই প্রকার মূর্ত্তির প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়। কাহার-কাহারও মতে সূর্য্যের পার্শ্বস্থ স্ত্রী-মূর্ত্তি দুটী নিক্ষুভা এবং রাজ্ঞীর মূর্ত্তি। সূর্য্য-মূর্ত্তিটির দুই হস্তে মুকুল-পরিবেষ্টিত প্রস্ফুটিত পদ্ম বিদ্যমান। মূর্ত্তিটির পাদপীঠের সম্মুখাংশে ৭টি অশ্বের প্রতিকৃতি খোদিত। ইহাদের মধ্যটির উপর একজন বসিয়া আছে; ইহা বোধ হয় অরুণের মূর্ত্তি। অরুণের এ প্রকার মূর্ত্তি সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির দেখিয়া আসিয়া বাঙ্গ্‌লোয় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বিশেষ বিলম্ব হইয়া গেল। স্মার্ত্তব্রাহ্মণ সহচরটি বলিলেন, "দেখিবেন, যেন আপনার পুস্তকে আমাদের গ্রামের উল্লেখ থাকে।" শকটচালক বিলম্ব হইতেছে বলিয়া এদিকে বিরক্ত করিতেছিল; তাহার ভয় হইতেছিল যে, পথ অনেক দূর বলিয়া পাছে সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রবণ বেল-গোলা পৌঁছিতে না পারে। সংক্ষেপে স্নানাহার করিয়া, বাঙ্গলো-বাসের প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া, আমরা শ্রবণ বেলগোলা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ইমানদার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষ-জায়া]

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বদরুদ্দীনের বাড়ীতে যথাসময়ে আহারের ডাক পাইয়া ফৈজু আহার করিতে গেল। সেজবাবুর ইঙ্গিতে একজন চাকর তটস্থ হইয়া আলো দেখাইয়া সঙ্গে গেল। আহারের আয়োজনে বেশ পারিপাট্য ছিল; গৃহকর্ত্তার যত্নের আড়ম্বরও যথেষ্ট। আহারান্তে সসৌজন্যে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, ফৈজু আবার জমিদার-বাড়ীতে ফিরিল।

পূর্ব্বোক্ত সভাগৃহ তখন নিস্তব্ধ, অন্ধকারময়। বারেণ্ডায় সেই হরিহরবাবু বসিয়া ছিলেন;—ফৈজুকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওহে, সেজবাবু অন্দরে চলে গেছেন। আজ অনেক রাত হয়েছে বলে, তিনি চিঠি লিখ্‌তে পার্‌লেন না,—কাল সকালে চিঠি লিখে দেবেন।"

ক্ষুণ্ণ হইয়া ফৈজু বলিল, "চিঠিখানা দিয়ে রাখ্‌লে আমি বেশ ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়্‌তে পার্‌তাম্‌। আচ্ছা, বাবু সাহেব কত বেলায় ওঠেন?"

হরিহর উত্তর করিলেন, "সাড়ে-সাতটা, আট্‌টা। তিনি বার-বার করে বলে গেলেন যে, তেজপুরের লোকটিকে বোলো, যেন চিঠি না নিয়ে না যায়! বুঝ্‌লে, তুমি যেন অম্নি চলে যেও না!" চাকরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঐ ঘরে কম্বল আর বালিশ দিয়ে বিছানা করে দে।"

ফৈজু গুম্‌ হইয়া রহিল। কৃপাশীল জমিদার-বাবুদের কৃপায় সে উদরে যথেষ্ট পরিতোষজনক পদার্থ লাভ করিল বটে, কিন্তু মন যে তাহার ক্ষুব্ধ-গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিল! জানিয়া-শুনিয়া বোকা সাজিয়া, হাতের সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে, এ দুঃখ অনেক দিন থাকিবে!—অন্ততঃ, যতদিন না দুর্ব্বৃত্ত নায়েবকে ধরিয়া তাহার যোগ্য পুরস্কার দিতে পারিতেছে, ততদিন এ আপশোষ্‌ কিছুতেই যাইবে না।

ফৈজুকে নিঝুম দেখিয়া, হরিবাবু আজে-বাজে নানা কথা এবং তাঁহাদের জমিদারীর বহর ও সম্মানের প্রতাপ সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া, শেষে বলিলেন, "আমাদের সেরেস্তায় একটি গোমস্তার কায খালি আছে,—একটা ভাল লোক দেখে দিতে পার?"

ফৈজু অন্যমনস্ক ছিল, কথাটায় কাণে দিল না। প্রশ্ন-কর্ত্তা উত্তর প্রত্যাশায় ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া, পুনশ্চ বলিলেন, "আমরা এমন একটি লোক চাই—যে কায কর্ম্ম সব তো বুঝ্‌বেই,—আর দরকার হলে লাঠিও ধরতে পারবে! তুমি জমিদারী-সেরেস্তার কায জানো, নয়?"

সংক্ষেপে "হুঁ" বলিয়া ফৈজু আবার পূর্ব্ব চিন্তায় মনোনিবেশ করিল। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "এস না, আমাদের সেরেস্তায় ঢুকে পড় না,—আমাদের এখানে বেশ পাওনা আছে।"

ফৈজু একটু আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিল। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফৈজুর পানে চাহিয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ওপর সেজকর্ত্তার নজর পড়েছে,—তুমি একটু চেষ্টা করলেই এখানে ঢুকে পড়তে পার। তার পর তেমন কায দেখাতে পার যদি, তো আখেরে ভাল হবে হে!"

কুণ্ঠিত হইয়া ফৈজু বলিল, "আমায় তিনি কাযের লোক মনে করেন? কেন? আমি জমিদারীর কায এমন ত কিছু জানি না!"

বিজ্ঞভাবে হাসিয়া তিনি বলিলেন, "শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারা যায়! তুমি বাপু ভাল-ভাল জায়গায় কায করে এসেছো—অনেকগুলো দেশও বেড়িয়েছ,—এদিককার কায তোমায় বলতে কইতে হবে না। তা'ছাড়া, তুমি চালাক লোক, এই আর কি! ছ্যাখো, তোমার মত আছে?"

মনে-মনে কি একটা স্বগত উক্তি করিয়া ফৈজু মুখে একটু হাসিয়া বলিল, "মতের মালিক আমার বাবা,—মাথার ওপর তিনি আছেন,—তাঁকে না জিজ্ঞাসা করে জবাব দিতে পারি না।"

বাধা দিয়া অসহিষ্ণু ভাবে তিনি বলিলেন, "আহা, তুমি যদি রাজী হও, তা'হলে তোমার বাবা কি অমত করতে পারেন? আর, তুমি তো এখন বেকার বসে আছ বাপু—"

ফৈজু সবিনয় হাস্যে বলিল, "আমার সম্বন্ধে আপনারা অনেক খবরই রাখেন দেখছি! আমি যে এখন বেকার বসে আছি, এ খবরটি এর মধ্যে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিলে কে?"

একটু থতমত খাইয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ফৈজুর পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "তবে কি তুমি সুনীলবাবুদের এষ্টেটে ঢুকেছ?"

কথাটা খট্ করিয়া ফৈজুর কাণে লাগিল! পাড়াগাঁয়ের লোকেরা সরলতায় অভ্যস্ত। কিন্তু তাহার মধ্যে কেউ-কেউ যখন ধূর্ত্ততার চাতুরী দেখাইতে যায়, তখন তাহাদের অভ্যস্ত সরলতা অনেক সময়ই বোকামির আকারে আত্ম-প্রকাশ করিয়া বসে! লোকটির চোখ মুখ দেখিয়া ফৈজু বুঝিল—ইহাঁর প্রশ্নগুলি শুধু মাত্র অনাবশ্যক কৌতূহল নয়,—ইহার মধ্যে গুপ্ত রহস্য কিছু আছে!

ফৈজু উঠিয়া দাঁড়াইল, হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া, একটু উদাসভাবে বলিল, "এখনো ঢুকি নি, তবে বোধ হয় শীগ্গী ঢুকতে হবে। ঘুম পেয়েছে, হুকুম দেন তো শুয়ে পড়ি।"

একটু ব্যগ্রভাবে তিনি বলিলেন, "দাঁড়াও, আর একটি কথা শোন। আচ্ছা—সুনীলবাবুদের এষ্টেটে তুমি ঊর্দ্ধসংখ্যা কত পর্য্যন্ত পাবে বল দেখি?"

ফৈজু উদাস্য ভাব ছাড়িয়া, ঈষৎ ব্যগ্র হইয়া এবার বলিল, "কেন বলুন দেখি?"

হরিহরবাবু থতমত খাইয়া বলিলেন, "কিছু না,—কথার কথা জিজ্ঞাসা করছি। বল না, কত পর্য্যন্ত পেতে পারো?"

ঘরের দিকে যাইতে-যাইতে ফৈজু বলিল, "তাঁদের কাছে শুধু পয়সার খাতিরে গোলামী করি না। পয়সা তাঁরা যা দেবেন, তাই আমার ঢের।" বলিয়াই ঘরের ভিতর গিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া সে শুইয়া পড়িল। সৌজন্যের অনুরোধে আর অপেক্ষা করিল না।

বিদ্বেষপূর্ণ ক্রূর কটাক্ষে ফৈজুর পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া, দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ, তাই বল! ওদের ষ্টেট্ ছেড়ে তুমি অন্য কোথাও কায করবে না!—আচ্ছা!" বলিয়াই ঠোঁট উল্টাইয়া একটা তাচ্ছল্য ব্যঞ্জক ভঙ্গী করিয়া, তিনি দ্রুতপদে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ফৈজু পড়িয়া-পড়িয়া মনে-মনে হাসিতে লাগিল। প্রবল-প্রতাপ জমিদার মহাশয়দের জমিদারী কায়দার খুরে দণ্ডবৎ! ইহাঁরা গায়ের জোরে জুলুমবাজীটা বেশ বোঝেন!—কিন্তু

বাধা পাইলেই আগুন হইয়া ওঠেন! আর প্রভুর মনোরঞ্জন চেষ্টায় ব্যস্ত বেতনভুক্‌গণ তো 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' প্রবাদের জাজ্বল্যমান উদাহরণ!

অনেকক্ষণ পরে তিনি আবার চটি জুতা ফটাং ফটাং করিয়া আসিলেন; নিকটস্থ একটা চাকরকে ডাকিয়া, কি চুপি চুপি বলিয়া, বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। চাকরেরা সদর দেউড়ীতে চাবি লাগাইয়া আসিয়া, হেথা-হোথা শয়ন করিতে গেল। ফৈজুর ঘরের মধ্যেও তিনজন শুইল; এবং অনেক রাত্রি অবধি যাত্রার গান ও মহাভারতের গল্প আবৃত্তিতে তাহারা মাতিয়া রহিল। ফৈজু সে কোলাহলে ঘুমাইতে পারিল না। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হইবার ভয়ে সে কোন প্রতিবাদ শব্দ উচ্চারণ করিল না। প্রথমটা যখন তাহারা ঘরে ঢুকিয়া, হাসির ছটায় গল্পের ঘটায় এই নবাগত নিদ্রাতুরের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিল, তখন ফৈজুরও একটু লোভ হইয়াছিল যে, ইহাদের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গতা স্থাপন করিয়া, নায়েবের খবরের জন্য একটুখানি চেষ্টা দেখে। কিন্তু তখনি মনে পড়িয়া গেল, সেজবাবুর সেই রুক্ষ-কঠোর মুখ-ভঙ্গিমা এবং তাঁহার কর্ম্মতৎপর কর্ম্মচারীটির ভীতি-কাতর দৃষ্টি ও শুষ্ক কণ্ঠের কৈফিয়ৎ! তার পর চাকরদের উপর যে উপরওলার গোপন সঙ্কেত ইতিমধ্যে বর্ষিত হয় নাই, ইহা কখনই সম্ভব নয়; স্থতরাং এ ক্ষেত্রে পুনর্ব্বার ফৈজু সেই নায়েবের কথা তুলিলে ইহারা হয় তো তাহাকে পাগলা-গারদে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিবে! বড়লোকের মেজাজ,—আশ্চর্য্য তো কিছুই নাই!

নানা কথা ভাবিয়া ফৈজু নিঝুম-মারিয়া পড়িয়া রহিল। অনেক রাত্রি অবধি গল্প-গুজব করিয়া চাকরেরা ঘুমাইলে ফৈজুও একটু ঘুমাইল।

সকাল হইলে চাকরেরা দেউড়ীর চাবি খুলিয়া প্রাতঃ-কৃত্য সম্পাদনের জন্য বাহির হইল। ফৈজুও সঙ্গে চলিল। অদূরেই নদী। সকলে যথাসময়ে নদীতে হাত-মুখ ধুইয়া বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইল। ফৈজু ততক্ষণে একটা পাথর বাছিয়া লইয়া তাহার বর্শার মালিন্য-মোচনে প্রবৃত্ত হইল। সঙ্গীরা বলিল, "বাড়ী চল।"

ফৈজু বলিল, "তোমরা চল, আমি এটা সাফ করে নিয়ে যাচ্ছি।"

তাহারা একটু থমকিয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। ফৈজু হাসিয়া বলিল, "সন্দেহ হচ্ছে না কি? পাছে না বলে পালাই?"

অপ্রস্তুতে পড়িয়া তাহারা সমস্বরে প্রতিবাদ করিল,—এমন অন্যায় সন্দেহ তাহারা কখনই করিতে পারে না! ফৈজু খুব খুশীর ভাব দেখাইয়া বলিল, "তবে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে এখন অস্ত্রটা শানাই,—তোমরা বাড়ী যাও। কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গলে আমায় খবর দিও,—চিঠিখানা নিয়ে তবে আমি যাব।"

তাহারা এবার দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। তবে সকলেই ঠিক বাড়ীতে গেল কি না,—সে সংবাদ ফৈজু জানিতে পারিল না;—সে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া বর্শাই শানাইতে লাগিল। খুব আস্তেই তাহার কাজ চলিতেছিল। বর্শার সেই সামান্য মরিচাটুকু পরিষ্কার হইতে অনেক বিলম্ব হইল,—প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সহসা দূরে রাস্তার উপর হইতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কে ডাকিল, "ফৈজু না?"

চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া ফৈজু দেখিল—সসজ্জ বেশে পিতা! সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মাথা নোয়াইয়া ফৈজু সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি! আবার তুমি কেন এলে বাবা?"

পিতা নিকটে আসিয়া, আর একখানা পাথরের উপর বসিয়া পড়িয়া, ক্লান্তভাবে নিঃশ্বাস টানিয়া বলিলেন, "বাপ্!"

ফৈজুর বুকটা সজোরে স্পন্দিত হইয়া উঠিল! পিতা, তাহারই জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন বুঝি? ক্ষণিকের জন্য নীরব থাকিয়া, ক্ষুব্ধভাবে ফৈজু বলিল, "এমন করে ছুটে আস্‌বার দরকার কিছুই ছিল না। সেজবাবু চিঠির জবাব এখনো লিখে দেন-নি তাই,—না হলে জবাব পেলে আমি এতক্ষণ অর্দ্ধেক রাস্তা পার হয়ে চলে যেতুম।"

পিতা সে কথার কোন সায়-উত্তর না দিয়া বলিলেন, "এখন খবর কি বল্,—নায়েবের সন্ধান পেলি?"

ফৈজু সতর্ক দৃষ্টিতে একবার এদিক ওদিক চাহিল; সহসা দেখিল—অদূরে ঝোপের আড়াল হইতে জমিদার-বাড়ীর সেই চাকরদলের একজন গুটি-গুটি বাহির হইয়া জমিদার বাড়ীর দিকে চলিয়া যাইতেছে! ফৈজু হাসিয়া বলিল, "ঐ ছাখো, একজন ওৎ পেতে ওখানে বসেছিল।"

পিতা লোকটার দিকে চাহিয়া, ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "তোর ওপর পাহারা বসেছে যে! ব্যাপার কি?"

ফৈজু নিম্ন কণ্ঠে বলিল "তোমার তরোয়ালখানা দাও,—বসে শান দিতে দিতে কথাগুলো আস্তে বলি,—কি জানি, আবার যদি কেউ ওঁৎ পেতে কোথাও বসে থাকে!"

বৃদ্ধ কোষ হইতে অসি খুলিয়া পুত্রের হাতে দিয়া, বেশ একটু উঁচু গলায় বলিলেন, "তরোয়ালটা শানিয়ে দে তো বাচ্চা!"

ফৈজু অস্ত্র শানাইতে-শানাইতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত মৃদুস্বরে বলিয়া গেল। বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ-বিরক্ত ভাবে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া বলিলেন, "আঃ! হাতে পেয়ে ছাড়্লি রে!" পরক্ষণেই একটু প্রসন্ন ভাবে বলিলেন, "ভালই করেছিস্—যা বাবুদের মেজাজ! চল্ তো এখন বাবুকে,—না, তিনি ওঠেন নি বোধ হয়?"

ফৈজু বলিল, "বোধ হয় আটটার কম উঠবেন না।"

বৃদ্ধ আলস্য ভাঙ্গিয়া বলিলেন, "রাস্তায় আসতে আসতে জয়দেবপুরের দুজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল,—তারা নায়েবকে ধরবার জন্যে এই দিকে আসছিল।"

ফৈজু সাগ্রহে বলিল, "গেল কোথায়? পিছনে আসছে বুঝি?"

পিতা বলিলেন, "না,—আমি তাদের তেজপুরে পাঠিয়ে দিলুম। এখানকার বাবুরা বড়ই জবরদস্তী জুড়ে দিয়েছেন! এখানকার দেউড়ীর বিশ্বাসী দরোয়ান,—কি বল্লে, তালেবর-সিং বুঝি তার নাম—তাকে সেখানকার কাছারী-বাড়ী আগ্‌লাতে পাঠিয়েছেন,—সে লোকটা প্রজাদের ওপর ভারী জুলুমবাজী জুড়ে দিয়েছে। একজন গরীব প্রজার একটি গাই কেড়ে নিয়েছে,—একজনের পাটা কেড়ে নিয়ে খেয়েছে,—দোকানদারদের কাছে জোর করে জিনিস নিচ্ছে—এম্নি সব অনেক কথাই বল্লে। তাই তারা নায়েববাবুর কাছে দরবার করতে আস্‌ছে—আমি তেজপুরে নালিশ শুনিয়ে, তারপর এখানে আসবার জন্যে বলে দিলুম।"

মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া ভাবিয়া ফৈজু বলিল,—"তার চেয়ে এখানে আগে আন্‌লেই ভাল হোত না? আমাদের সামনে তারা যখন নায়েব কই বলে চেঁচাত—তখন বাবুরা কি জবাব দিতেন, সেটা একবার দেখ্‌তে পেলে বেশ হোত।"

পুত্রের মন্তব্য শুনিয়া, পিতা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছিস,—আমার ওটা খেয়ালেই আসে নি!—কিন্তু তারা আর ঘণ্টা-দুই পরেই এখানে এসে পৌঁছুবে বোধ হয়। হ্যাঁরে ফৈজু আমাদের মোহন্ত মহাশয়ের মত কে একজন লোক যাচ্ছে না?"

ফৈজু দূরে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তাই তো দেখ্‌ছি,—মোহন্ত আর নজিরুদ্দীন। ঐ যে মোহন্ত! চোখোচোখি হতেই মোহন্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন—নজরু আস্‌ছে;—বোধ হয় আমাদের চিন্‌তে পেরেছে।"

পিতা সে কথায় মনোযোগ না দিয়া—একটু চিন্তিত ভাবে বলিলেন—"মোহন্ত মশাই কি মতলবে আজ এখানে এলেন বল্ দেখি?"

ফৈজু মৃদুস্বরে বলিল, "সেজবাবুর সঙ্গে ওঁর খুব বন্ধুত্ব আছে শুনেছি,—সেই সম্পর্কেই বোধ হয়। সঙ্গে নজরু রয়েছে, হয় তো ওঁদের থিয়েটারের জন্যে কোন কথা নিয়েও এসে থাকবেন। ঐ যে উনি জমিদার-বাড়ীর দিকেই চল্‌লেন।"

বৃদ্ধ অপ্রসন্ন ভাবে বলিলেন "তৌবা!—নাচ-তামাসার হুজুগেই যদি মাতবার ইচ্ছে—তবে—"

ফৈজু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "ও কথায় আমাদের কায নাই বাবা। মিছামিছি গণ্ডগোল বাঁধিয়ে কৈফিয়তের দায়ী হওয়া।"

"তা বটে!" বলিয়া বিরক্ত ভাবে বৃদ্ধ অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

নজিরুদ্দীন সৌখীন ফ্যাসানে হেলিয়া-দুলিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "বাপ-ব্যাটায় এখানে চুপ চাপ বসে কেন? হাতে যে হেতের পর্য্যন্ত রয়েছে,—মতলব কি? কারুর গর্দ্দান নেবে?"—বলিয়াই সে এদিকে-ওদিকে হেলিয়া-দুলিয়া, রঙ্গভরে হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল। ফৈজুর পিতা যদিও গ্রাম-সম্পর্কে তাহার পিতৃব্য-কিন্তু নিজের রস-পাণ্ডিত্য-পরিচয় প্রকাশের ক্ষেত্রে নজিরুদ্দীন 'অমন-সব' গুরুজনের সম্মান,—অবহেলায় ডিগ্‌বাজী খাইয়া ডিঙাইয়া চলিত! না হইলে, তাহার রসিকতার রম্যচ্ছটার বিকাশ হইত না!

পিতাপুত্র দুইজনেই ভিন্ন-ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিল। নজিরুদ্দীন তাহাদের মুখ দেখিতে

পাইল না। তাহার ভিতরের উচ্ছ্বসিত পরিহাস-উদ্যমের বেগটা সহসা মন্দীভূত হইয়া গেল।—নিকটে আসিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত সৌহৃদ্যের সহিত ফৈজুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "কাল কত রাত্তে এসে পৌছুলি দাদা?"

ফৈজু একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, "বেশী রাত হয় নি। তুমি এ গাঁয়ে আজ কি কর্‌তে এলে?"

নজিরুদ্দীন বড়মানুষী চালে, লম্বা সুরে উত্তর দিল—"এই এলুম বেড়াতে!"

ফৈজুর পিতা দৃষ্টি ফিরাইয়া চাহিয়া—একটু শুষ্ক ভাবে বলিলেন, "মোহন্ত মশাইও কি বেড়াতে এসেছেন না কি?"

নজিরুদ্দীন মাথা চুলকাইয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কি জানি চাচা, ওর কাযের খবর কে রাখে? তুমি বুঝি ফৈজুর জন্যে আজ সকালে ছুটে এসেছো?"

"হুঁ—"বলিয়া বৃদ্ধ মুহূর্ত্তের জন্য নীরব রহিলেন; তার পর ঈষৎ তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, "দুজনে এতটা পথ এক সঙ্গে এসেছ,—অথচ কে কি কাযের জন্যে এসেছ, কেউ জানো না? তাজ্জব!"

শ্লেষটা নজিরুদ্দীনের গায়ে বিঁধিল। ঈষৎ রুক্ষ ভাবে সে বলিল—"অত পরের খবর রাখ্‌তে পারি না। কি দায় পড়েছে?—আমার অমন 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' হওয়া পোষায় না! নিজে খাই দাই কাঁশি বাজাই, ব্যস্‌!"

ফৈজুর পিতা বিরক্ত ভাবে কি একটা কথা বলিতে গিয়া থামিলেন। দূরে জন-তিন মানুষ আসিতেছিল,—তাহাদের দিকে চাহিয়া, বিস্মিত ভাবে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

পিতার দৃষ্টি-লক্ষ্যে ফৈজুও চোখ ফিরাইয়া চাহিল; দেখিল,—সেজবাবু ও সেই হরিহরবাবু এদিকে আসিতেছেন। তাঁহাদের পাশে-পাশে মোহন্ত মশাইও কি বলিতে-বলিতে আসিতেছেন।

হরিহর বাবু চটি-জুতা ফটাংফটাং করিতে-করিতে—একটু খর-চরণে, সকলের আগে আসিয়া, ব্যস্ত ভাবে তড়্‌ তড়্‌ করিয়া বলিলেন "তেজপুর থেকে আবার কে মুড়ুলি কর্‌তে এসেছে? এই,—এই লোকটা? কি হে, কি খবর? তুমি আর একবার এসেছিলে না? সেই গেলবারে গোমস্তার সঙ্গে?"

বৃদ্ধ সংযত-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "জী হাঁ।"

হরিহর ব্যস্ত ভাবে পুনশ্চ বলিলেন, "আজ আবার নতুন কিছু খবর আছে না কি?"

লোকটির অনাবশ্যক ব্যস্ততা দেখিয়া বৃদ্ধ মনে-মনে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন বোধ হয়; তাই অত্যন্ত নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলেন "নতুন খবর আর কি থাক্‌বে? যা সেখানে বসে আমরা শুনেছি, তাই রাস্তায় আস্‌তে-আসতেও আজ এখুনি শুনলুম,—নায়েব তো এই গাঁয়েই এসে কোথায় লুকিয়ে আছে!"

হরিহর লাফাইয়া উঠিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "এই গাঁয়ে! কোথা,—কোথা?—কোথা গো?"

হরিহরের ভঙ্গী দেখিয়া ফৈজুর ভারী হাসি পাইল! ইচ্ছা হইল, সেও তেমনি সুরে ব্যঙ্গ-প্রতিধ্বনি করিয়া উত্তর দেয় 'এই হেথা! হেথা! হেথা গো'—কিন্তু সেটাতে নিতান্ত অশোভন চপলতা প্রকাশ করা হইবে ভাবিয়া সামলাইয়া লইল। একটু হাসিয়া বলিল, "আহা, আপনি অমন করে লাফাচ্ছেন কেন বাবু সাহেব? এটা কি হতে পারে না, যে, হয় তো আপনারা জানেন না,—এই গাঁয়েই কোথাও নায়েব মশাই এসে লুকিয়ে আছেন?"

হরিহর হতবুদ্ধি নির্ব্বাক্ ভাবে খানিকক্ষণ ফৈজুর পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। তার পর ঔদ্ধত্যপূর্ণ শ্লেষের স্বরে বলিল, "তোমরা কি শিয়াল খেয়ে ক্ষেপেছ না কি হে? যা মুখে আস্‌ছে, তাই বল্‌ছ যে! রকম কি?"

ফৈজু সে কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সেজবাবু নিকটে আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গী মোহন্ত মশাই নিকটে না আসিয়া—হাত কুড়িক দূরে একটা গাছের গোড়ায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া, উৎসুক আগ্রহে তাঁহাদের পানে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হইল, তিনি যেন অচিরাৎ কিছু একটা ঘটিবার সম্ভাবনায়, কৌতূহল-ভরে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সেজবাবু নিকটে আসিতেই, নজিরুদ্দীন ও ফৈজুর পিতা সেলাম করিল। বাবু তাচ্ছল্যের সহিত কপালে হাত ঠেকাইয়া—বক্ররূঢ় কটাক্ষে একবার ফৈজুর পানে চাহিয়া, হরিহরকে প্রশ্ন করিলেন, "কি, হয়েছে কি?"

বাবুকে নিকটে দেখিয়া হরিহরের সেই উত্তেজনা

প্রকাশের উদ্যমটা সহসা পঁয়তাল্লিশ গুণ বাড়িয়া গেল! অধীর ক্রোধে ঠোঁট কাঁপাইয়া, গলার শিরা ফুলাইয়া, চীৎকার করিয়া—হাত দুইটা সজোরে আস্ফালন করিয়া, তিনি বলিলেন "এই তেজপুরের লোকগুলো মশাই! ওদের সকলেরই 'ভীমরতি' ধরেছে!—মুখের ওপর ওরা বল্‌ছে কি না যে—আমরা জয়দেবপুরের নায়েবকে লুকিয়ে রেখেছি! উঃ! কি আস্পর্দ্ধা গো! আমরা নায়েবকে—"

ভ্রূকুটি করিয়া বৃদ্ধ তীব্র স্বরে বলিলেন, "দ্যাখো বাবু—কথা কইছ তো ভাল করে কথা কও,—মেছোহাটের মেয়েদের মত অত-করে হাত পা নেড়ে চেঁচিও না। আর অমন করে উল্টো চাপ দিচ্ছ কেন? তোমরা নায়েবকে লুকিয়ে রেখেছ কি না, তোমরা জানো,—আমি সে কথার এক হরফও বলিনি!—তুমি মিছে কথা কইছ কেন?"

গর্জ্জন করিয়া হরিহর বলিলেন, "আমি মিছে কথা বলছি! এত বড় কথা বলিস্ তুই! দেখ্‌বি তবে 'হারা—' নেড়ে!"—তিনি মুষ্টি পাকাইয়া বৃদ্ধের দিকে সদর্পে এক পা অগ্রসর হইলেন।

বৃদ্ধের দুই চোখে আগুন ছুটিল! কোলের উপরকার কোষবদ্ধ তরবারিখানা সড়াৎ করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া পুত্রের হাতে দিয়া,—শূন্য খাপখানা লইয়া দৃপ্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এস না—"

"ওরে বাপ! খুন করবে!" বলিয়া এক লাফে হরিহর গিয়া সেজবাবুর পিছনে দাঁড়াইলেন! ভয়ে তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না!—নজিরুদ্দীন এবং সেজবাবু নিজেদের অজ্ঞাতেই সভয়ে কয়েক পা পিছাইয়া গেলেন।

রূঢ় স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "ভেমো গয়লা! দুধ-ঘি খেয়ে গায়ে বহুৎ জোর জমিয়েছ না? এস না,—দ্যাখো দেখি, করে—এই বুড়ো নেড়েকে ক' ঘা দিতে পারো?—এগিয়ে এস,—না, কি বল, তোমার মত মুখ ছুটিয়ে বাপ দাদার নাম তুলে গাল দিয়ে ডাক্‌ব?"

ক্রোধের উত্তাপে ফৈজুর মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল! তবুও সে নিঃশব্দে আত্মদমন করিয়া এতক্ষণ গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; এইবার পিতার পাশে আসিয়া তরবারির খাপখানা ধরিয়া, অস্ফুট স্বরে বলিল, "যেতে দাও বাবা,—আর এগিও না,—তুমি নিজের মুখ ছোট কোর না।" পিতার হাত হইতে সেটা টানিয়া লইয়া ফৈজু তরবারি খাপে পুরিল। তার পর সেজবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "চিঠির জবাবটা বাবু?"

সেজবাবু যেন ইন্দ্রজাল-স্তম্ভিতের মত এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন;—ফৈজুর কথায় এবার যেন তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিল!—উৎকণ্ঠিত ভাবে ফৈজুর হাতের বর্শা ও তাহার পিতার তরবারির দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, ব্যাকুল দৃষ্টিতে পিছনে চাহিয়া, তিনি যেন কাহাকে খুঁজিলেন। কিন্তু অদূরে গাছের গোড়ায় ভয়-কুণ্ঠিত মুখে দণ্ডায়মান একমাত্র মোহন্ত মশাই ছাড়া আর কাহারো মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। নিরুপায় ভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া, অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "চিঠির জবাব ডাকে পাঠাব—তোমরা যাও।"

"সেলাম"—বলিয়া পিতা-পুত্র তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া অগ্রসর হইল। পিছনের মানুষ কয়টির বুকের উপর হইতে যেন জগদ্দল পাথর নামিয়া গেল;—এতক্ষণের পর তাহারা সহজ ভাবে নিঃশ্বাস ফেলিবার শক্তি ফিরিয়া পাইল।

ক্রমে পিছনে গুঞ্জন আরম্ভ হইল! ফৈজু পিতার পিছু-পিছু যতই বেশী দূর যাইতে লাগিল, পিছনে গুঞ্জনের মাত্রাও তত বেশী উচ্চে উঠিতে লাগিল! ফৈজু দৃক্‌পাত করিল না,—যেমন চলিতেছিল, চলিতে লাগিল।

যখন তাহারা প্রায় এক রশি পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তখন হঠাৎ পিছন হইতে সরোষে চীৎকার করিয়া সেজবাবু বলিলেন, "সে আমি জানি,—জানি। যেখানে মেয়ে মানুষ কর্ত্তা, সেইখানেই যত গলদ্!—ভাইয়ের বাড়ীতে বসে হুকুম চালানো হচ্ছে! উঃ! বিষয় নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে লড়াই করবেন্! করুক দেখি, কত ক্ষমতা! ভ্রষ্টা মেয়েদের ধরণই ঐ!"

ফৈজুর বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ডটা ধ্বক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া,—যেন বুকের হাড়ের উপর অধীর-উত্তেজনায় আছড়াইয়া পড়িল! তীব্র বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, তীব্র স্বরে বলিল, "কি! কি বল্লেন আপনি!"

মোহন্ত মশাই তখন আগাইয়া আসিয়া, সেজবাবুর পাশে দাঁড়াইয়া বিড়্-বিড়্ করিয়া কি বলিতে-বলিতে ক্রুদ্ধ-

কটাক্ষে ফৈজুর পানে চাহিতেছিলেন; হঠাৎ ফৈজুকে দৃপ্ত বিদ্রোহের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তির মত ফিরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া, তাঁহার চক্ষু আতঙ্কে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল! তাড়াতাড়ি সেজবাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি টানিয়া লইয়া চলিলেন। সেজবাবু কি বলিতে গিয়া বলিতে পারিলেন না,—টানের চোটে ফিরিয়া চলিলেন। দশ পা গিয়া, ঘাড় ফিরাইয়া, ঘুসি দেখাইয়া, দাঁত খিঁচাইয়া, চীৎকার করিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, 'আচ্ছা! আজকের মত জান নিয়ে ফিরে যা; মনে রাখিস্, জুতিয়ে তোদের মুখ ভেঙ্গে আমি জীয়ন্ত কবর দেব এক দিন,—দেব-ই!'

সেজবাবু বলিবার কথা আর কিছু না পাইয়া, তাহাদের সদ্গতির ভাবনায় ব্যস্ত হইয়া, বর্ত্তমানকে ছাড়িয়া ভবিষ্যতের উপর ভর দিলেন দেখিয়া, ফৈজুর একটু হাসি পাইল। কিন্তু সেজবাবুর মুখের যে কুৎসিত বাক্যটার বিষাক্ত দংশন তাহার মর্ম্মে বাজিয়াছিল, সেটার জ্বলনে ফৈজুর মন তখন বিক্ষিপ্ত, উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না! এতক্ষণের পর এইবার সুমতিদেবীর নিষেধ ভুলিয়া, কঠোর অবজ্ঞার দৃষ্টি হানিয়া, ঘৃণার স্বরে বলিল, "আমার মনীবের কুটুম আপনি,—তাই খাতির রেখে চল্লুম; না হলে, আপনার মুখের জুতো এইখানে দাঁড়িয়ে,—আপনার ঐ মুখের ওপর ফেরত দিয়ে, তবে আমি অন্য কথা কইতুম!" ফৈজু ফিরিয়া পিতার দিকে চাহিয়া ধীর-গম্ভীর স্বরে বলিল, "চল বাবা!"

সেজবাবু সাঙ্গোপাঙ্গে বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন! তাঁহার কোন কথা আর শুনিতে পাওয়া গেল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দিনকতক পরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, মাতব্বরগণের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে সহরের আদালত পর্য্যন্ত, তুমুল আন্দোলন জাগিয়া উঠিল যে, সঙ্কটপুরের জমিদার নীলকণ্ঠ বাবুর নামে জয়দেবপুরের চৌদ্দআনা জমিদারীর মালিক সুমতি দেবী নালিশ করিয়াছেন! জয়দেবপুরের দুইআনার অংশীদার নীলকণ্ঠ বাবু—ষোল আনা জমিদারীর উপরেই ন্যায়-বিগর্হিত প্রথায় এমন ভাবে স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে শুধু তাঁহার সরিকদারের স্বার্থহানি হইয়াই থামিবে না,—জমিদারীর প্রজাগণ শুদ্ধ বিপন্ন হইয়াছে, এবং আরো বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা বাড়িতেছে। অতএব বিধবা সুমতি দেবী নিজের স্বত্ব ও প্রজার স্বার্থ অব্যাহত রাখিবার জন্য রাজদ্বারে বিচার-প্রার্থিনী।

পল্লীগ্রামে জমিদারদের গৃহে সরিকান বিবাদ বাধিলেই, আশ পাশের ইতর-সাধারণের দল হুজুগের আনন্দে মাতিয়া উঠে! কাজেই, কথাটা যে শুনিল, সেই—আসল কথাটার পিছনে বিরাট সমালোচনা জুড়িয়া,—বিস্তর শাখা প্রশাখায় পল্লবিত করিয়া, সেটা তাড়াতাড়ি অন্যকে শুনাইয়া আসিল! চারিদিকে কোলাহলের অন্ত ও কলরবের সীমা রহিল না! তবে বাদী ও প্রতিবাদীপক্ষকে যাহারা একটু ভাল রকমে চিনিত, তাহারা অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত স্বীকার করিল যে, মানুষের কাহার মনে যে কি আছে, তাহা বাহির হইতে কেহ কিছুই বুঝিতে পারে না! না হইলে, সুনীল বাবুর ভগিনীর মত মানুষ যে অমন ক্ষমতা প্রতিপত্তিশালী দেবরের হঠকারিতার বিরুদ্ধে এমন নির্লজ্জ দুঃসাহসিক ভাবে অভিযোগ ঘোষণা করিতে পারেন, ইহা তো স্বপ্নের অগোচর!

বহুদর্শী প্রাচীন ও বিজ্ঞের দল খুব গম্ভীর ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, একে মেয়েমানুষ, তায় বিধবা, সুতরাং সম্পত্তির স্বত্ব লইয়া অন্যের সহিত ঝগড়া করা তাহার পক্ষে তো একান্তই অনধিকার চর্চ্চা! ভালমানুষী করিয়া, নিজের খাইবার-পরিবার মত কিঞ্চিৎ মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, দেবরের হাতে-পায়ে ধরিয়া সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলেই তো গোল মিটিয়া যাইত! তা নয়,—উনি আবার ফণা তুলিয়া দাঁড়াইলেন!—উৎসন্ন যাইবার লক্ষণ আর কি! বাছাধন, এইবার নাজেহাল-পেশেহাল হইবেন,—সেজবাবু সোজা পাত্র নহেন! তিনি কি শিক্ষা দেন, দেখ!

সকলেই শিক্ষার ফল দেখিবার জন্য উৎসুক ভাবে চোখ-কাণ খুলিয়া রাখিল। যাহারা ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় অতক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে নারাজ, তাহারা পাটী-গণিত-পাণ্ডিত্যের বলে, চোখ বুজিয়া ভবিষ্যৎ ফলের অঙ্ক কসিয়া, সোজা বলিয়া দিল,—"তেজপুরের বাবুদের গোটা জমিদারীখানা বিকিয়ে গেলেও, সঙ্কটপুরের বাবুদের এক-গাছি 'কেশ' ছিঁড়তেও পারবে না! তেজপুরের বাবুদের ভিটেয় এবার ঘুঘু চরবে,—তারই বন্দোবস্ত হচ্ছে!"

তার পর, কোন্ দিন সঙ্কটপুরের বাবুদের লাঠিয়ালের লাঠির ঘায়ে তেজপুরের বাবুদের কর্ম্মচারীবৃন্দের কাঁচা মাথা ফাটে—সেই নিশ্চিত-সম্ভাব্য ব্যাপারটা দেখিবার প্রতীক্ষায়, মদন-গোপাল ঠাকুরের বাড়ীর নৈশ সভায়, ও নবীনদের থিয়েটারের আড্ডায়, গোপন বক্তৃতা-গুঞ্জন খুব উল্লাসের সহিত চলিতে লাগিল! ক্রমে চারিদিকে প্রবাদ রটিয়া শেষে জমিদার-বাড়ীতে সকলের কাণে গিয়া খবর পৌছিল যে, সঙ্কটপুরের বাবুরা কাশী ও লক্ষ্ণৌ হইতে পঞ্চাশজন বাছা-বাছা গুণ্ডা আনাইয়াছেন, তেজপুরের বাবুদের সমস্ত আশ্রিত, অনুগত কর্ম্মচারীদের—বিশেষ করিয়া ঐ মামলা-তদ্বিরকারী কর্ম্মচারীদের, কাচা মাথা লইয়া, তবে তাহারা দেশে ফিরিবে!

সংবাদ শুনিয়া পিসিমা তো আতঙ্কে অস্থির! তার পর যত পারিলেন সুনীল ও ফৈজুকে বকিলেন; কেন না, সুনীলের সশব্দ উত্তেজনা ও ফৈজুর নিঃশব্দ উদ্যমই এই মামলার গোড়া-পত্তনের হেতু! তিরস্কার শুনিয়া ফৈজু সবিনয়ে বলিল, "ও সব তামাসা পিসিমা,—আমি নিশ্চয় বলছি, ওর মধ্যে এক ফোঁটাও সত্যি নাই।"

সুনীল হাসিয়া বলিল, "আহা, দিদির দেওর তিনি,—আমাদের কুটুম মানুষ! তিনি যদি রসিকতা করে আমাদের মাথা নিতে লোক পাঠান,—আমরা কি আর তাতে আপত্তি করব? মাথা পাঠিয়ে দেব, কিন্তু বিষয় দেব না পিসিমা,—বিষয় সমস্ত গবর্ণমেণ্টকে উইল করে দিয়ে যাব, যেন দেশের গরীব-দুঃখীরা খেতে-পরতে পায়। কি বল পিসিমা, উইলটা আজই করে ফেলি?"

পিসিমা সে পরামর্শের কোন সদুত্তর না দিয়া, একালের ছেলেদের ইংরেজি লেখাপড়ার উদ্দেশে অনেক কটু কাটব্য বর্ষণ করিয়া, রাগভরে সেখান হইতে সরিয়া গেলেন। সুমতি দেবী নীরবে সব শুনিয়া, একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া, আহ্নিকের ঘরে উঠিয়া গেলেন। সুনীল ফৈজুকে সঙ্গে লইয়া, মিত্র মহাশয়ের কাছে গিয়া, মামলার সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে বসিল।

সুনীল প্রত্যেক শনিবারে কলিকাতা হইতে আসিয়া মামলা সম্বন্ধে খোঁজ লইতে লাগিল। ফৈজু পূর্ব্বে যে উকীলের কাছে মুহুরীগিরি করিয়াছিল, তাঁহাকে ধরিয়া পরামর্শ লইয়া, মামলার পিছনে একান্ত সংলগ্ন হইয়া পড়িল। মিত্র মহাশয় ও মোড়ল মশাই ফৈজুর সাহায্য করিতে লাগিলেন। জয়দেবপুরের উৎপীড়ন-ত্যক্ত প্রধান-প্রধান প্রজারা আসিয়া ফৈজুর দলপুষ্টি করিল। সেজবাবুর অনুচরেরা প্রচণ্ড উদ্যমে নিজেদের পক্ষ সামলাইবার চেষ্টা করিয়া, আক্রোশ-ভরে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—"আচ্ছা, দেখা যাক্!"

জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়া সেজবাবু মিথ্যা-সাক্ষী তৈরী করিলেন। সাক্ষীরা "বাবুর" খরচে পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া, সহর হইতে ফুল-কপি, কমলা লেবু ও নারকুলে কুল কিনিয়া—এক-এক বোঝা হাতে লইয়া গাঁয়ে ফিরিয়া—মহামহিম সেজবাবুর সুনিশ্চিত জয় ঘোষণা করিল! সেজবাবুর উকীল কিন্তু গোপনে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, "হাকিম বেঁকে গেছেন; বলা যায় না!"

পূরা তিন মাস মামলা চলিবার পর, মোকদ্দমা শেষ হইল। বিধবা ও নাবালকগণের সম্পত্তি সুবিধামত আত্ম-সাৎ করিবার লোভে যাহারা নীতি ও বিবেকের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জোর-কলমে লিখিয়া, ব্যয় মামলা-খরচ সাড়ে-আটহাজার টাকা,—যাহা সুমতি দেবীর অংশে খাজনা আদায় হইয়া সেজবাবুর ভাণ্ডারে উঠিয়াছিল,—তাহা সুমতি দেবীকে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া ফেরত দিবার জন্য হাকিম রায় দিলেন। আর প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচারের জন্য নায়েব দিন-কতকের জন্য শ্রীঘরে প্রেরিত হইল। তবে এ ব্যাপারে সেজবাবুর কোন ইঙ্গিত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গেল না,—কাযেই তিনি মানে-মানে আদালত হইতে বিদায় পাইলেন।

উচ্চ আদালতে আপীল করিবেন বলিয়া সেজবাবু প্রথমটা খুব ঘটা-পটা জুড়িয়া দিলেন; কিন্তু উকীলের পরামর্শ লইয়া তাহাতে হিতে বিপরীত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা জানিয়া—হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তার পর যথা-নির্দ্দিষ্ট দিনে সেজবাবুর অনুচরগণ আদালতে সুমতি দেবীর প্রাপ্য টাকা জমা দিয়া আসিল।

মামলা বাধিবার খবর শুনিয়া যদি দশখানা গ্রামের লোক বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিয়াছিল,—তবে এবার মামলাটা এ-হেন রূপে মিটিবার খবর শুনিয়া, বিশখানা গ্রামের লোক

আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িল! সেজবাবুর মত তেজস্বী বিদ্বান্ লোক যে ঐ আটহাজার টাকার জন্য বত্রিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া বিলাত পর্য্যন্ত গিয়া লড়িলেন না, ইহা সকলেই একটা অভাবনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করিল! অনেক তর্ক-বিতর্কের পর অনেকেই ঠিক করিল, এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা শুধু হাকিমের দোষেই ঘটিল! কেহ-কেহ ফৈজুকেও সন্দেহ করিল! তার পর সকলেই গোপনে কাণা-ঘুসা করিতে লাগিল,—ফৈজুর দিন এবার নিশ্চয়ই সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে!

মদন-গোপালের বাড়ীর মোহন্ত মহাশয় প্রকাশ্যতঃ আজকাল জমিদার-বাড়ীর ঘটনায় সম্পূর্ণরূপ অনাস্থা ও উপেক্ষা ভাব প্রদর্শন করিয়া চলিতেছেন,—তাঁহার যা কিছু মৈত্রী ও করুণা সে শুধু থিয়েটার পার্টির ছেলেদের উপর! মামলার গোলে পড়িয়া সুনীল প্রভৃতি তাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। ফৈজু তো সেজবাবুর সহিত ঝগড়া করিয়া সঙ্কটপুরের সামা ডিঙাইবার সঙ্গে-সঙ্গেই, মোহন্ত মশায়ের সম্বন্ধে যত কিছু দুর্ভাবনা—সব মন হইতে বিসর্জ্জন দিয়াছিল। কেন না, আসন্ন মামলার চিন্তায় তাহার মন তখন নিদারুণ উৎকণ্ঠিত! কিন্তু ফৈজুর পিতার সে সব বালাই ছিল না। কাযেই মোহন্ত মশাই তার পর দিন সঙ্কটপুর হইতে আসিয়া গ্রামে পা দিতেই, ফৈজুর পিতা মিত্র মহাশয়ের দ্বারা তাঁহাকে 'তলব' করিয়াছিলেন। মোহন্ত মশাই কৈফিয়ত দিয়াছিলেন যে, তিনি সন্ন্যাসী-বৈষ্ণব মানুষ; শিষ্য সেবকবর্গের বাড়ীতে 'পায়ের ধূলা' দিবার উদ্দেশ্যেই তিনি মাঝে মাঝে এ-দিক ও-দিকে যান। তাই সঙ্কটপুরে এক শিষ্যের বাড়ী যাইবার পথে—তাঁহার 'গুরু ভাই' জমিদার মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এই মাত্র! কিন্তু শারীরিক কুশল-প্রশ্ন ও দেবতা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা ছাড়া, বৈষয়িক ব্যাপারের এক অক্ষরও তাঁহাদের মধ্যে আলোচিত হয় নাই। কেনই বা হইবে? তিনি তো আর ব্যবসাদার বণিক্ নহেন,—অথবা সুনীল বাবুর জমিদারী কারবারের বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী নহেন, যে, সেজবাবু তাঁহার সহিত সে সম্বন্ধে কথা কহিবেন! তিনি তেমন কাঁচা লোকই নহেন! ......ইত্যাদি!

কথাটা যুক্তিযুক্ত হইলেও বিশ্বাসযোগ্য কি না, সে বিষয়ে সুনীলের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু সুমতি দেবী বিরক্ত হইয়া উঠায়, ব্যাপারটা লইয়া সে আর নাড়া-চাড়া করিতে পারে নাই। বিষয় লইয়া দেবরের সহিত যে বিবাদ অনিবার্য্য হইয়াছে, সেটাকে সামলাইতেই সুমতি দেবীর প্রাণ কাতর হইয়া পড়িয়াছিল,—তার উপর এই সব 'উপুরি উপদ্রব' লইয়া 'ছিঁচ্‌কাঁদুনে-পনা' সহিতে তিনি একান্তই বিরূপ। দিদির ভয়ে সুনীল সেইখানেই থামিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাতে মদন-গোপালের বাড়ীর নৈশ-সভার গোপন-গুঞ্জন অত্যন্ত অধিক মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল!

কিন্তু সেই অবধি মোহন্ত মশাই শিষ্য সেবকবর্গের বাড়ীতে 'পায়ের ধূলা' বিতরণ ব্যাপারে একেবারেই নিরস্ত হইয়া গিয়াছিলেন! কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, গভীর ঔদাস্যের সহিত সকলকে শুনাইয়া, সনিঃশ্বাসে উত্তর দিতেন, "চারিদিকেই শত্রু, কে এখনি মিথ্যে করে কি বদনাম রটিয়ে, বাবুদের কাণ ভারী করবে! বিশ্বাস নাই,—সাবধানই ভাল......" ইত্যাদি ইত্যাদি!

বাহিরের সকলেই সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে লাগিলেন যে 'অমিত-প্রতাপ মোহন্ত মশাই' আজকাল খুব অভিমান ভরেই—তাঁহার সমস্ত প্রতাপ সংবরণ করিয়া লইয়াছেন! মোহন্ত মশাইয়ের এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে গ্রামের ছোট ছেলের দল ভারী খুসী হইয়া উঠিয়াছিল,—শ্যামল তো সকলের আগে!

মামলায় সেজবাবুর পরাজয় ও অর্থদণ্ডের সংবাদ যে দিন গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল, সে দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া মোহন্ত মশাই হঠাৎ গ্রাম ছাড়িয়া অন্তর্ধান করিলেন! তিন দিন তাঁহাকে গ্রামে কেহ দেখিতে পাইল না! চার দিন পরে গ্রামে ফিরিয়া, মহা সমারোহে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া, ভক্তবৃন্দকে মালপো ও নারকেল-নাড়ু বিতরণ করিয়া তিনি জানাইলেন যে, অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ দর্শন করিয়া পুণ্য অর্জ্জনান্তে শুদ্ধদেহ হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি আবার শ্রীবৃন্দাবনধাম যাত্রা করিবেন।

পরদিন দুপুরবেলায় সুমতি দেবী যখন চৈতন্য-ভাগবত পড়িয়া পিসিমা ও গ্রামস্থ দু-চারজন বর্ষীয়সীকে গৌরাঙ্গ-দেবের কাহিনী শুনাইতেছিলেন, তখন মোক্ষদা-দিদি

পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া নূতন সংবাদ ঘোষণা করিলেন যে, ঠাকুরবাড়ীর 'মোহন্ত মশাই' 'মোহন্ত গিরি' ত্যাগ করিয়া যাইবেন; তাই বাবুদের 'নূতন মোহান্ত' খুঁজিতে বলিয়াছেন।

সুমতি দেবী মোক্ষদা দিদির কাছে নিত্য-নব গুজব শুনিয়া শুনিয়া, তিক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; মোক্ষদা-দিদির কথায় আজকাল বড় একটা সায়-উত্তর দিতেন না। আজও চুপ করিয়া রহিলেন।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, মোহন্ত মশাইয়ের কি এখানে অসুবিধে হচ্ছে?"

ঠোঁট উল্টাইয়া, মুখ বাঁকাইয়া, মোক্ষদা-দিদি বলিলেন, "গোবিন্দ জানে! মোহন্ত কি আমার কোন কথা বলেছে? পাড়া ঘরে কথাটা শুন্লু, তাই বল্‌ছি।"

প্রকারান্তরে প্রসঙ্গটায় বাধা দিবার জন্য সুমতি দেবী পুনশ্চ চৈতন্য-ভাগবত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ভক্ত হরিদাস যবনের অতুলনীয় প্রেম-ভক্তি ও অপূর্ব্ব সুন্দর জিতেন্দ্রিয়তার বর্ণনা চলিতে লাগিল। মোক্ষদা-দিদি কাণ পাতিয়া দুই মুহূর্ত্ত ভাগবত শুনিয়া দুই শত মুহূর্ত্ত ধরিয়া মনে-মনে কি একটা কথার আলোচনা করিলেন। তার পর হঠাৎ পাঠিকা ও শ্রোত্রীবর্গের চমক ভাঙ্গাইয়া, শ্লেষের স্বরে সজোরে বলিয়া উঠিলেন, "না হবেই বা কেন? ও তো আর 'য়ানে-ত্যানো' গোঁসাই-বষ্টুম নয় যে, বারে-বারে অপমান সয়ে, ঘাড় গুঁজে এইখেনে পড়ে থাক্‌বে! ওর বংশে কত মান, কত সম্ভোম্! কত বড়-বড় বামুন-পণ্ডিত ওর পায়ের ধুলোর জন্যে 'বিয়াকুল'! ও কি শুধু মুচুরমানের অপমান সইবার জন্যে এখানে পড়ে থাক্‌বে? কি গরজ ওর? হ্যাঁ গো রায়-পিসি, তুমিই বল না বাছা? কাল সন্দেবেলায় তোমার সামনেই তো কথা হোল,—মোহন্ত মশাই কত দুঃখু করলে,—কর্‌লে না?"

বুড়ী রায়-পিসি একটু গো-বেচারা গোছের মানুষ,—ঝগড়া-ঝাঁটির ব্যাপারে বিশেষ কিছু উৎসাহ প্রকাশ করেন না; তিনি মাথা চুল্‌কাইয়া, কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "হেঁ, বল্লে বটে! তা মোহন্ত মশাইয়ের ওটুকু রাগ না কর্‌লেই হোত। যা হয়ে গেছে, তা বয়ে গেছে,—আর কেন সে কথা বাপু?"

চোখ-মুখ ঘুরাইয়া, ঝঙ্কার দিয়া মোক্ষদা-দিদি বলিলেন, "অমন তেলবুলুনি কথা কয়ে, সাউখুড়ি-পনা কোর না বাছা, হক্ কথা বল। তিন কাল গিয়ে তোমার এককালে ঠেকেছে—"

ঈষৎ তীব্রস্বরে সুমতি দেবী বলিলেন, "থাম মোক্ষদা-দিদি, মোহন্ত মশাইয়ের জন্য তুমি ওকালতী কোর না। তাঁর কথা তিনিই বল্‌বেন; তুমি থামকা চেঁচিও না।"

বর্ষীয়সীদের মধ্যে দুই-তিনজন তৎক্ষণাৎ দারুণ অপ্রসন্ন ভাবে বলিলেন, "তাই তো বটে বাছা, মোক্ষদা, তোমার অত আঁত-করকরাণি কেন, তুমি থাম না।"

মোক্ষদা-দিদি গুম্ হইয়া গেলেন। ভাগবত-পাঠ আবার চলিতে লাগিল।

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

বৎসর-কয়েক পূর্ব্বে একবার একটী মনোহারী দোকানে এক সেট সার্টের বোতাম কিনিতে গিয়াছিলাম। কয়েক প্রকার বোতাম দেখিবার পর এক সেট তাম্রের বোতাম পছন্দ হইল। তাহার পালিস অতি সুন্দর;—বোধ হয় সোণালী গিল্টী ছিল। কথা উঠিল, ঐ পালিস কত দিন থাকিবে। তার পর প্রশ্ন উঠিল, পালিস মলিন হইয়া গেলে, তাহার পুনরুদ্ধারের উপায় কি? আবার গিল্টী করানো যাইতে পারে। কিন্তু তাহার খরচার হিসাব করিয়া দেখা গেল, ঢাকের দায়ে মনসা বিকাইয়া যায়। অবশেষে দোকানদার একটী টীনের ক্ষুদ্র কৌটা বাহির করিয়া দেখাইলেন; বলিলেন, এইটী (ষ্টোভ পালিস কি মেটাল পালিস) লইয়া যান; ইহাতে, ঠিক গিল্টীর মত না দেখা-

ইলেও, তামা যতখানি উজ্জ্বল হইতে পারে, তাহা হইবে। আমি তখন "একঠো কৌপীন কা ওয়াস্তে"র গল্পটি বলিয়া বোতাম ও পালিস কিনিয়া আনিলাম।

যথাসময়ে দুই-এক দিন পালিসটি ব্যবহার করিবার পর মনে-মনে কৌতূহল জন্মিল,—জিনিসটি কি, এবং কোন্-কোন্ উপাদানে প্রস্তুত? কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করিতেই উপাদানগুলি একে-একে ধরা পড়িতে লাগিল। দেখিলাম, পালিসটিতে অতি সূক্ষ্ম মিহি কাচ-চূর্ণ; এবং সামান্য পরিমাণ ভেসেলিন (vaselin) ও মোম আছে। কাচ চূর্ণই অবশ্য প্রধান উপাদান; তবে তাহার প্রকৃতি গোপনার্থ কিম্বা ব্যবহারের সুবিধার্থ, যতটুকু ভেসেলিন ও মোম মিশাইলে তাহা ঘন কাদার মত হয়, ততটুকু ঐ দুইটী জিনিস মিশানো হইয়াছে। ইহাই ষ্টোভ পালিস, বা মেটাল পালিস। অবশ্য কৌটাটি বেশ সুদৃশ্য, এবং কৌটার উপর জিনিসটির নাম, 'আবিষ্কারকে'র নাম ও অন্যান্য বিবরণ ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত।

অন্ন-সমস্যা বর্ত্তমান কালে বিষম সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে; এবং দিন-দিন এই সমস্যা আরও গুরুতর হইতে চলিয়াছে। এমন কি, যিনি চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বিজ্ঞানকেই জীবনের একমাত্র উপাস্য রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই আজন্ম-বৈজ্ঞানিক, সন্ন্যাসী সার ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ও এই অন্ন-সমস্যার কথা চিন্তা করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, এবং তাহার উপায় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ছেলেরা উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিতেছে; দলে-দলে বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়া, হৃদয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছে; কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের কোন উপায় দেখিতে পাইতেছে না। বাঙ্গালী-জীবনের একমাত্র কাম্য যে চাকুরী, তাহাও জুটিতেছে না। কাজেই, তাহারা দুই চক্ষে কেবল সরিষার ফুল দেখিতেছে; আর, জীবনে হতাশ হইয়া পড়িতেছে। পিতামাতাও কৃতবিদ্য সন্তানের উপর অনেক আশা-ভরসা স্থাপন করিয়া আসিতেছিলেন; কষ্টে সংসার চালাইয়া পুত্রের উচ্চ-শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু গতিক দেখিয়া তাঁহারাও হতাশ হইয়া পড়িতেছেন এবং মনে-মনে উচ্চ-শিক্ষাকে অভিশপ্ত করিতেছেন। তাহার উপর, কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করিবার বহুকাল পূর্ব্বেই, কন্যাদায়গ্রস্ত-পিতৃ-বহুল দেশের এই সকল যুবকের অধিকাংশই কৃতদার; এবং হয় ত দুই-একটী পুত্র-কন্যারও জনক। এই স্ত্রী-পুত্রাদির পালন-পোষণের উপদ্রবের কথা আর নাই বা বলিলাম।

দারিদ্র্য আমাদের দেশে এখন প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকই কি আমরা দরিদ্র? আমার ত তা' মনে হয় না। আমাদের দেশের টাকায় কত দেশ ধনী হইয়া গেল এবং এখনও হইতেছে। টাকা আমাদের দেশে পথে-ঘাটে ছড়ান বলিলেই হয়। কেবল কুড়াইয়া লইতে পারিলেই হয়। যাহাদের বুদ্ধি আছে, চক্ষু আছে, (অথচ চক্ষু লজ্জা নাই) সে-ই আমাদের দেশ হইতে টাকা রোজগার করিয়া লইয়া যাইতেছে। কাপড় এবং লোহা-লক্কড়ের কথা না হয় নাই বলিলাম। কিন্তু বাজারে ষ্টোভ পালিসের মত কত তুচ্ছ জিনিস ছদ্মবেশ ধরিয়া আসিয়া আমাদের দেশ হইতে অর্থ আহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। ষ্টোভ পালিসের কৌটাটির মূল্য বোধ হয় তখন ছয় পয়সা ছিল। উহা বিদেশের আমদানী। উহা তৈয়ার করিতে কিছু খরচ পড়িয়াছে; উহার দরুণ জাহাজ-ভাড়া লাগিয়াছে; উহার নির্ম্মাতা, এবং এ দেশের দুই তরফা ব্যবসায়ী (পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা) উহা হইতে লাভ বাহির করিয়া লইয়াছে। সুতরাং উহার মূল্য ছয় পয়সা হইলেও, উহা নিতান্ত নগণ্য জিনিস নহে। আর নগণ্য হইবেই বা কেন? উহা যখন বিদেশ হইতে পণ্যরূপে এতদূরে আসিয়াছে, তখন উহার মর্য্যাদা আছে নিশ্চয়ই। আমি বলি, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখা-পড়া শেষ করিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা এই রকম দুই-চারিটা ছোটখাট জিনিস তৈয়ার করিয়া কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন না কেন? ইহাতে কি তাঁহাদের dignityর কিছু হানি হইবে? সামান্য বলিয়া উহাদের উপেক্ষা করা চলে কি? বিশ্ববিদ্যার উপযুক্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অবশ্য ইহাতে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু, অন্যদিকেও ত সে আশা পূর্ণ হইতেছে না! বেকার বসিয়া থাকার অপেক্ষা কি ইহা ভাল নহে? আমাদের পাঠকদের মধ্যে কেহ যদি এ বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ

করেন, তাহা হইলে আমরা এমন অনেক ছোটখাট জিনিসের সন্ধান দিতে পারি, যাহা বিদেশ হইতে আমদানী হয়, এবং এদেশেও রীতিমত কেনা-বেচা চলে। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া যে সব জিনিস এদেশে বিক্রীত হইতে আসে, তাহা আপাত-দৃষ্টিতে যতই নগণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, honestly ব্যবসায় করিয়া কিছু-কিছু উপার্জ্জনের ইচ্ছা যাহাদের আছে, এবং যাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে এরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। পাঠকগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমরা আরও দুই-চারিটা জিনিসের উল্লেখ করিতেছি। এই সকল জিনিস প্রথমে সামান্য বলিয়া মনে হইলেও একবারে উপেক্ষনীয় নহে। কেন না, এগুলি বিদেশ হইতে আমদানী হয়, এবং যাহারা ইহা তৈয়ার করে ও ইহাদের ব্যবসায় করে, তাহারা সকলেই কিছু না কিছু লাভ পায়।

এই ধরুন শিরিশ-কাগজ। এ জিনিসটিও অতি সামান্য; তৈয়ার করাও কঠিন নহে। এই কলিকাতা সহরে অসংখ্য 'ক্যাবিনেটে'র (কাঠের আসবাবের) কারখানা আছে। সেই সকল কারখানায় প্রচুর পরিমাণে শিরিশ-কাগজ ব্যবহৃত হয়। সৌখিন কাঠের কাজ মাত্রেই শিরিশ-কাগজের সাহায্যে পালিস করা হয়। শিরিশ-কাগজ অন্যান্য অনেক কাজেও লাগে। এই সামান্য জিনিসটিও বিদেশ হইতে আমদানী হয়; কেহই এখনও ইহা তৈয়ার করেন নাই। হয় ত সামান্য বলিয়া ইহা উপেক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ দেশে উপেক্ষিত হইলেও, উহা বিদেশে উপেক্ষিত নহে। এবং বিদেশ হইতে আমদানী হয় বলিয়াই বোধ হয় এ দেশে ক্যাবিনেট-মেকারদের কাছে উহার আদর। বিদেশী ব্যবসায়ীরা যে উহাকে উপেক্ষা করে না, তাহার সাক্ষ্য, তাহারা উহা এ দেশে রপ্তানী করে, এবং কিছু লাভও পায়। এই শিরিশ-কাগজও অতি সহজেই তৈয়ারী হইতে পারে। সূক্ষ্ম কাচ-চূর্ণ, শিরিশ, ও কাগজ ইহার প্রধান উপাদান। কাচ গুঁড়া করিবার জন্য যন্ত্র—হামানদিস্তা, শিল-নোড়া হইতে grinding machine পর্য্যন্ত; শিরিশ গলাইবার পাত্র; কাচের গুঁড়া ছাঁকিয়া লইবার জন্য পিতলের তারের জালের চালুনী; কাগজের উপর শিরিশ মাখাইবার ব্রাস; আর রবার-ষ্টাম্প—এই সকল ইহার যন্ত্র-তন্ত্র।

ছেলেবেলায় যাঁহারা ঘুঁড়ি উড়ানো উপলক্ষে সূতায় মাঞ্জা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই শিরিশ-কাগজের কথা বুঝাইতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। তবু, কেহ যদি seriously ইহার ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন, সেই জন্য বলিতেছি। সরু-মোটা ভেদে শিরিশ-কাগজ ভিন্ন ভিন্ন রকমের আছে। তবে উপাদান, এবং প্রস্তুত করিবার প্রণালী সকলেরই এক। ভিন্ন-ভিন্ন রকমের শিরিশ-কাগজের ১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমে নম্বর দিয়া উহাদের প্রভেদ করা হয়। এই প্রভেদ কাচ-চূর্ণের দানার সরু-মোটা অনুসারে হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নম্বরের তারের জালের চালুনীর ভিতর দিয়া চালিয়া লইলেই ভিন্ন-ভিন্ন দানার কাচ-চূর্ণ পাওয়া যাইতে পারে। বড়বাজারে মনোহর দাসের চকে লোহা-লক্কড়ের যন্ত্র-তন্ত্রাদির দোকানে অনুসন্ধান করিলেই ভিন্ন-ভিন্ন নম্বরের চালুনী পাইবেন। চালুনী না পান, বিভিন্ন নম্বরের তারের জাল পাইবেন; তাহা হইতে চালুনী তৈয়ার করিয়া লইবেন। সেই সকল বিভিন্ন নম্বরের চালুনী দিয়া ছাঁকিয়া লইলে যে ভিন্ন ভিন্ন দানায় কাঁচচূর্ণ পাওয়া যাইবে, তাহা আলাদা-আলাদা পাত্রে রাখিতে হইবে।

একটী উপকরণের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, দ্বিতীয় উপকরণ প্রস্তুত করিতে হইবে। শিরিশ আমাদের দেশের নিজস্ব জিনিস। (উহা কিরূপে তৈয়ার করিতে হয়, তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বিষয় নহে; প্রয়োজন হইলে স্বতন্ত্র প্রস্তাবে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারিবে। বাজারে শিরিশ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়; আপাততঃ বাজার হইতে সংগ্রহ করিয়া লইলেই চলিবে।) সামান্য পরিমাণ জল দিয়া শিরিশগুলিকে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। জল কি পরিমাণ দিতে হইবে, তাহা দুই-একবার করিয়া নিজেই বুঝিয়া লইতে হইবে। কয়েক ঘণ্টা ভিজিবার পর শিরিশ ফুলিয়া উঠিয়া আয়তনে বাড়িয়া যাইবে। পরে এই জিনিসটিকে গলাইয়া লইতে হইবে। ইহা গলাইবার একটু বিশেষত্ব আছে। প্রত্যক্ষ আগুনে উহা গলাইতে হয় না; vapour bathএ গলাইয়া লইতে হয়। একটী পাত্রে জল রাখিয়া তাহা উনানে গরম করিতে হইবে। সেই পাত্রের উপর শিরিশের পাত্র রাখিলে

কিছুক্ষণ পরে শিরিশ গলিয়া তরল হইয়া যাইবে। যে তাপে জল ফুটিয়া উঠে, শিরিশ গলাইতে সেই পরিমাণ তাপই যথেষ্ট। এই জন্যই vapour bathএর ব্যবস্থা। শিরিশ কিরূপে গলাইতে হয়, তাহা যে-কোন ছাপাখানার প্রেসম্যান বা জমাদারের নিকট হইতে জানা যাইতে পারে; অথবা সেখানে যখন রুল ঢালিবার জন্য শিরিশ গলানো হয়, তখন তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই শিরিশের আটা কিরূপ ঘন হইবে, তাহা স্থির করা অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। আঠাটিকে কাগজে মাখাইয়া তাহার উপর কাচ-চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে চূর্ণগুলি আঠায় লাগিয়া আট্‌কাইয়া থাকিবে; ইহাই শিরিশের আঠার প্রধান কাজ। সুতরাং দুই-একবার তৈয়ার করিতে-করিতে কি রকম ঘন আঠা চাই, তাহা বুঝা যাইবে, এবং জল দিয়া শিরিশ ভিজাইয়া লইবার সময় জলের পরিমাণ আন্দাজ করিয়া লইতে হইবে।

তৃতীয় উপকরণ কাগজ। আমাদের দেশে এখনও যদিও প্রচুর পরিমাণে কাগজ উৎপন্ন হইতেছে না, তথাপি, শিরিশ-কাগজ তৈয়ার করিবার উপযোগী কাগজ বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে। তবে সে কাগজ একটু দেখিয়া-শুনিয়া নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে।

প্রথমে কাগজ কিনিয়া আনিয়া তাহা, যে আকারের শিরিশ-কাগজ এখন বাজারে পাওয়া যায়, সেই আকারের কাটিয়া হাতের কাছে রাখিয়া দিতে হইবে। শিরিশ গলাইয়া ব্রাসের সাহায্যে তাহা কাগজের উপর উপযুক্ত পরিমাণে মাখাইয়া লইয়া, তাহার উপর পূর্ব্ব-প্রস্তুত কাচ-চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া কাগজগুলিকে শুকাইয়া লইলেই, শিরিশ-কাগজ তৈয়ার হইয়া যাইবে। তার পর, তাহার পিছনে রবার ষ্ট্যাম্প দ্বারা ট্রেড-মার্ক চিহ্নিত করিয়া লইলেই উহা বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী হইল।

আমরা এই যে শিরিশ-কাগজ প্রস্তুত প্রণালী বলিলাম, তাহা সামান্য পরিমাণে তৈয়ার করিবার জন্য। বেশী পরিমাণে তৈয়ার করিতে হইলে, অবশ্য কেবল হস্ত সাহায্যে হইবে না,—কল-কব্জা চাই। তবে প্রথমে অল্প পরিমাণে কাজ আরম্ভ করিয়া, ক্রমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ও বাজারের অবস্থা বুঝিয়া কল-কব্জার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

আমাদের এই প্রস্তাবটি পড়িয়া অনেকেই হয় ত বলিবেন, ইহা এমন আর কি নূতন কথা হইল? ইহা ত সকলেই জানে। আমরাও তাহা মানি। কিন্তু কেবল জানিলেই ত যথেষ্ট হইল না। কই, এই জানা জিনিসটিও ত কেহ তৈয়ার করিতেছেন না! ইহাও ত বিদেশ হইতে আসিতেছে, এবং কিছু-কিছু টাকা এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে। এই টাকাটি ত (সামান্য হইলেও) কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না! এমন কি, কাহাকেও সে চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতে দেখিতেছি না ত! ইহাতে কি কিছু অর্থাগম হইতে পারে না? সামান্য চাকুরী এবং তার সহ অপমান অপেক্ষা, স্বাধীন ভাবে এইরূপ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন কি অধিকতর প্রার্থনীয় নহে?

এই ধরণের এক-একটা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে হয় ত একজনের না চলিতে পারে। কিন্তু, এইরূপে এক একটা বিষয় ধরিয়া কাজ ত আরম্ভ করা যাইতে পারে, এবং ক্রমে ক্রমে সেই বিষয়ের আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবসায়ে হাত দেওয়া যাইতে পারে। এই শিরিশ কাগজই ধরুন। ইহা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবার পর, কৃতকার্য্য হইলে, কাঠের উপর মাখাইবার নানা রকম পালিস তৈয়ার করা যাইতে পারে। এইরূপে এক-একটা বিষয়ের অনেকগুলি আনুষঙ্গিক বিষয় নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

পাঠকগণের মধ্যে কাহারও যদি এই সকল বিষয়ে আগ্রহ দেখি, তাহা হইলে আমরা অনেক সন্ধান দিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি, কেহ এরূপ কোন কারবার স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়া আমাদের পরামর্শ চাহিলে, we are always at his service.

পেশবাদিগের রাজ্য-শাসন-পদ্ধতি

গ্রাম্য-সমিতি

[অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, পি-আর-এস]

(৪)

পদমর্য্যাদায় পাটীলের পরেই কুলকর্ণীর স্থান। পাটীল সাধারণতঃ জাতিতে মারাঠা। কোন কোন গ্রামে মুসলমান পাটীলও ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ পাটীলের কথা প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। কুলকর্ণী ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন জাতীয় কুলকর্ণী ছিল না। গ্রামের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা তাঁহার কাম; এতদ্ব্যতীত, গ্রাম্য-সমিতির অন্য সকল প্রকারের দলীলও তিনি লিখিতেন ও রাখিতেন। এক কথায়, গ্রামের দলীল-দস্তাবেজের দপ্তরখানার তিনিই লেখক ও রক্ষক। অতি প্রাচীন দলীল পত্রে কুলকর্ণীকে কখন-কখনও গ্রাম্য লেখক বলা হইয়াছে। দলীল ও হিসাব লিখিয়াই কিন্তু কুলকর্ণীর দায়িত্ব শেষ হইত না। রাজস্ব আদায় না হইলে, অথবা যথাসময়ে পেশবার কর্ম্মচারীর নিকট না পৌঁছিলে, পাটীলের সঙ্গে-সঙ্গে কুলকর্ণীকেও দণ্ড ভোগ করিতে হইত। খুলদদেন পরগণার অন্তর্গত কিনগাও মৌজার পাটীল ও কুলকর্ণী দেয় রাজস্বের মধ্যে ১৯২৫ টাকা আদায় করিতে না পারায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন; এবং বাকী রাজস্বের মধ্যে ১৬০০৲ টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের কারামুক্তি হয় নাই। পেশবা-সরকার অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে বাকী ৩২৫৲ টাকা মাপ করিয়াছিলেন। (Peshwas' Diaries দেখুন) রাজনৈতিক অশান্তির সময়েও পাটীলের সঙ্গে সঙ্গে কুলকর্ণীকে তাঁহাদের এলাকার প্রজাগণের ব্যবহারের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইত। পেশবা দ্বিতীয় মাধবরাও, নরসিঙ্গরাও জনার্দ্দনকে লিখিয়াছিলেন যে—"তোমার অধীন তালুকে আরও শিলেদার থাকিলে, তাহাদের গ্রামের পাটীল ও কুলকর্ণীর নিকট হইতে জামিন লইবে,—যেন তাহারা বিদ্রোহী সর্দ্দারদিগের সঙ্গে যোগ দিতে না পারে।" (বআণখী শিলেদার তুমচে তালুক্যাত রাহত অসতীল ত্যাচুনী ফিতুরী সরদারাকড়ে চাকরীস জাউ নীয় যে বিশী ত্যাস গাঁ রচে পাটীল কুলকর্ণী জামীন ঘেনে—Peswas' Diaries—Sawai Madhava Rao)।

দায়িত্ব প্রায় সমান হইলেও কুলকর্ণীর "মান পান ও হক্ক" পাটীলের চেয়ে অনেক কম।

এই 'মান পান হক্কের' তালিকা পুন্নর সরকারের অন্তর্গত নিম্বগাঁও ও নাগা গ্রামের অর্দ্ধেক কুলকর্ণী ও জ্যোতিষী বতনের মালিক রঘুনাথের বিধবা মহালশাবাঈ সম্পাদিত ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের একখানি বিক্রয়পত্রে পাওয়া যাইবে। মহালশাবাঈর পুত্র অথবা পতিকুলের কোন নিকট আত্মীয় ছিল না। পতির পরিত্যক্ত ঋণ পরিশোধ ও দানধ্যান করিয়া পারলৌকিক মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত তিনি আপন সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ২০০০৲ টাকা মূল্যে পুন্নরনিবাসী বাজী যশবন্ত ও গঙ্গাধর যশবন্ত চন্দ্রচূড়ের নিকটে বিক্রয় করিয়া, তাহাদিগকে যথারীতি বিক্রয়-পত্র লিখিয়া দেন। এই বিক্রয়-পত্রে কুলকর্ণীর "মান পান হক্কের" নিম্নলিখিত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। (মূল দলীলের জন্য Peshwas' Diariaries, Vol. I. দেখুন।)

১। সরকারী শিরোপা পাটীলের পরে কুলকর্ণী পাইবে।

২। দীপালী ও দসরা উৎসব উপলক্ষে পাটীলের বাড়ীতে বাজনা হইবার পরে কুলকর্ণীর বাড়ীতে বাজনা হইবে।

৩। প্রত্যেক তৈলিকের দোকান হইতে প্রত্যহ ৯ টাক তৈল কুলকর্ণীর পাওনা।

৪। পাটীলের পরে শাকের দোকান হইতে প্রাচীন প্রথানুযায়ী শাকের ভাগ কুলকর্ণী পাইবে।

৫। প্রত্যেক চামারের নিকট হইতে প্রতি বৎসর এক যোড়া জুতা।

৬। পাটীলের বাড়ীতে জল দিবার পর কোলী কুলকর্ণীর বাড়ীতে জল জোগাইবে।

৭। প্রত্যেক উৎসব উপলক্ষ্যে এক-এক বোঝা জ্বালানি কাষ্ঠ।

৮। গ্রামের লোকেরা কালি তৈয়ার করিবার জন্য তৈল ও দপ্তর বাঁধিবার জন্য একখণ্ড কাপড় দিবে।

৯। পানের দোকান হইতে পাটীলের প্রাপ্য পানের অর্দ্ধেক পান।

এতদ্ব্যতীত গ্রাম্য দেবতা শ্রীমার্ত্তণ্ডের মন্দির হইতে

১০। পূর্ণিমা মেলার সময় ২৫০ টকা।

১১। পাটীলের পরে প্রসাদ।

১২। আশ্বিন মাসের এক রবিবার, পাটীলের ধুপ লওয়া হইলে কুলকর্ণী মন্দির হইতে ধুপ পাইবেন।

১৩। আশ্বিন পূর্ণিমার মেলার সময় পাটীল যে পরিমাণ মিঠাই লইবেন, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ মিঠাই কুলকর্ণী লইবেন।

এতদ্ব্যতীত মহালশবাঙ্গ মোশাহিরা বাবদ নগদ ২৪৲ ও ৩ খণ্ডি শস্য পাইতেন (১ খণ্ডি ২০ মণ)।

কুলকর্ণীর সহকারী চৌগুলা। চৌগুলা দলীল দস্তাবেজ রক্ষা বিষয়ে কুলকর্ণীর সাহায্য করিতেন; আবার রাজস্ব আদায়ের কার্য্যে পাটীলের সহযোগিতা করিতেন। পরলোকগত অধ্যাপক হরিগোবিন্দ লীময়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, মহারাষ্ট্রে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, পাটীলের জারজ পুত্র অথবা পাটীলের কোন পূর্ব্বপুরুষের জারজ পুত্রের বংশধর চৌগুলার পদ পাইতেন। মহারাষ্ট্র দেশে অব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জারজ পুত্র অন্য সন্তান অবর্ত্তমানে পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইত না। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাদজী সিন্ধিয়া তাঁহার পিতা রণোজীর জারজ পুত্র ছিলেন। কসবী মুকীব নিবাসী শাহাজী পাটীলের মৃত্যুর পর তাঁহার জারজ পুত্র শান্তাজী ঠাকুরই পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

গ্রাম্য-সমিতির কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে পদ-মর্য্যাদায় ও জাতি হিসাবে মহারের স্থান সকলের নীচে। কিন্তু গ্রামের মঙ্গলজনক সকল কাযেই মহারের সাহায্যের প্রয়োজন হইত। রাজস্ব আদায়ের সময়ে সকল গ্রামবাসীকে মহারই ডাকিয়া আনিয়া পাটীলের নিকটে গ্রামের "চবড়ী" ঘরে হাজির করিত। রাত্রিতে গ্রামের পথে-পথে ঘুরিয়া পাহারা দিয়া মহারই অসতর্ক গ্রামবাসিগণের সম্পত্তি তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা করিত। গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সমস্ত আবর্জ্জনা মহারই পরিষ্কার করিত। এই কার্য্যের জন্য গ্রামের সমস্ত মৃত পশুর চর্ম্ম মহারের পাওনা ছিল। স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর অনুমান করেন যে, এই শেষোক্ত কৌলিক বৃত্তি হইতে মহার নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহার মতে 'মহার' সংস্কৃত 'মৃতহরের' অপভ্রংশ। ত্রিম্বক-নারায়ণ আত্রে বলেন যে, সংস্কৃত 'মা' ও হর শব্দের যোগে মহার হইয়াছে। 'মা' শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। হিন্দুরা গরুকেও লক্ষ্মী বলেন। সুতরাং 'মা' শব্দটী গরু অর্থেও প্রযোজ্য। মহারেরা মৃত গরুর চর্ম্ম গ্রহণ করে, সুতরাং তাহারা 'মা-হর' অথবা মহার। মোলস্‌ওয়ার্থ সাহেবের মতে মহারেরাই মহারাষ্ট্রদেশের আদিম অধিবাসী এবং মহারের দেশ বা রাষ্ট্র বলিয়া এই প্রদেশের নাম মহার-রাষ্ট্র বা মহারাষ্ট্র হইয়াছে।

পাটীল ও কুলকর্ণীর মান পান হক্কের তালিকা আমরা দুইখানি বিক্রয়-পত্রে পাইয়াছি। মহারের মান পান হক্কের তালিকা সম্বলিত কোন বিক্রয়-পত্র এ পর্য্যন্ত আমাদের হাতে পড়ে নাই। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পারণের পরগণার অন্তর্গত ইসলক গ্রামের মহার ও মঙ্গদিগের মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন অধিকার লইয়া একটা দেওয়ানী মোকদ্দমা হয়। এই মামলার 'সারাংশ' বা সংক্ষিপ্ত বিবরণে বাদী দেবনাক প্রদত্ত মহারদিগের প্রাচীন অধিকারের নিম্নলিখিত তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

১। লাঙ্গলের বলদ ব্যতীত অপর সকল মৃত পশুর চর্ম্ম তাহাদিগের প্রাপ্য।

২। দসরার দিন 'মঙ্গেরা' * প্রত্যেক গৃহ হইতে এক-একখানি নৈবেদ্য পাইয়া থাকে। তন্মধ্যে পাঁচখানি নৈবেদ্য ও পাঁচটী পয়সা মহারের প্রাপ্য।

৩। পোলা উৎসবের বৃষভের নৈবেদ্য মহারের প্রাপ্য।

৪। মঙ্গদিগের গৃহের মৃত পশুও মহারের প্রাপ্য।

৫। দসরার দিন বলির মহিষের গলায় এক ঠোঙ্গা মিঠাই বাঁধিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হয়। ঐ মহিষ ও

* মঙ্গেরাও মৃত পশুর চর্ম্ম সংগ্রহ করিত। তাহাদের কৌলিক বৃত্তি কতকটা চর্ম্মকারের বৃত্তির ন্যায়।

মিঠাই মহারের প্রাপ্য। মঙ্গেরা অন্যায় করিয়া ঐ মিঠাইর অংশ দাবী করে।

৬। 'জরী মরী'র (কলেরার দেবী) নৈবেদ্য মহারের প্রাপ্য।

৭। প্রাচীন প্রথা অনুসারে মহারদিগের বর অশ্ব-পৃষ্ঠে চড়িয়া ও মঙ্গদিগের বর বৃষে আরোহণ করিয়া আসিবে। কিন্তু মঙ্গেরা এই প্রথার অন্যথা করিয়া তাঁহাদের বর অশ্ব পৃষ্ঠে আনয়ন করিতেছে।

হয় ত মহারদিগের আরও অনেক অধিকার, আরও অনেক পাওনা ছিল। কেবল যে কয়টি অধিকার লইয়া বিবাদ হইয়াছিল, মামলার সারাংশে সেই কয়েকটিরই উল্লেখ করা হইয়াছে; বাকীগুলি স্বভাবতঃই বাদ পড়িয়াছে। গ্রামের বলুতা হিসাবে মহারও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মঙ্গের ন্যায় নিশ্চয়ই ফসল উঠিলে প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতেই কিছু-কিছু শস্য পাইত।

গ্রাম্য-সমিতির পঞ্চম কর্ম্মচারী পোতদার। ইহার কার্য্য রাজস্ব আদায়ের সময় মুদ্রাগুলি পরীক্ষা করা। সেকালে কোন মুদ্রারই নির্দ্দিষ্ট মূল্য ছিল না—প্রত্যেক মুদ্রারই ওজন ও ধাতুর উৎকর্ষ অনুসারে দাম হিসাব করা হইত। পোতদার জাতিতে সোণার; সুতরাং মুদ্রা-পরীক্ষায় তাহাদের কৌলিক পারদর্শিতা থাকিত। অনেক সময়ে কিন্তু একই ব্যক্তি বিভিন্ন গ্রামের পোতদারের কার্য্য করিতেন। ১৭৪০ সালের একখানি দলিলে লিখিত আছে যে, বালাজী রুদ্র, কেসো রুদ্র ও মোরো রুদ্র শেন বৈ নামক তিন ভ্রাতা একটী সমগ্র তরফের পোতদারী করিতেন। এক-একটি তরফের অধীন চারি-পাচটি বা ততোঽধিক গ্রাম থাকিত। (কিত্তা পত্রে চিটনিশী বালাজী রুদ্র ব কেসোরুদ্র ব মোরোরুদ্র শেন বৈ পোতদার তর্ফ রাজাপুর নালী হুজুর শাহুনগর নজীরা কিল্লে সাতারচে মুক্কামী স্বামী সনিধ য়েজন বিনতী কেলী কী তর্ফ মজকুরচে পোতদারীচে বতন আপলে আপণ উপযোগ করীত আসা) ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের একখানি দলীলে দৃষ্ট হয় যে, ঘনশেট সোণার নামক এক ব্যক্তি সাকসে ও কর্ণালে নামক দুই-দুইটি বিভিন্ন পরগণার পোতদারী করিত; এবং এই কার্য্যের জন্য আদায়ী রাজস্বের প্রতি টাকায় এক দামরী হিসাবে পারিশ্রমিক পাইত (৪ দামরী = ১ পয়সা)।

এই কয়েকখানি দলীল হইতেই সপ্রমাণ হইবে যে, পোতদারের কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন ছিল না। ভিন্ন-ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন-ভিন্ন পরগণায় তাহাদিগের পারিশ্রমিক বিভিন্ন হারে দেওয়া হইত। ইহার আর একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। ১৭৬৫ সালের একখানি দলীলে দেখা যায় যে, নেবাসে পরগণার পোতদার লক্ষ্মণ সোণার সরকারী তহবীল হইতে মাসিক ৪৲ বেতন পাইতেন এবং প্রত্যেক বড় গ্রাম হইতে ২৲ ও প্রত্যেক ছোট গ্রাম হইতে ১৲ হিসাবে পারিশ্রমিক পাইতেন। বোধ হয় পোতদারের কার্য্য পেশবা সরকারেরই বেশী উপকার সাধন করিত বলিয়া এই সরকারী বেতনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

গ্রাম্য সমিতির কর্ম্মচারিগণের তালিকা এইখানেই শেষ হইল। বারান্তরে মারাঠা পল্লী সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

সন্তী-তীর্থ

[শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্-এ]

সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন বৌদ্ধরাজা কল্যাণাদিত্য সমুদ্রতুঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত;—বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর। বর্ত্তমান আরাকান রাজ্য, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন চট্টলের সীমান্ত-প্রদেশ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল ও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; এই রাজ্যের নাম ছিল সমুদ্রতুঙ্গ। চট্টল সীমান্ত-প্রদেশের স্থানীয় রাজধানীর নাম ছিল মেঘাম্বর,—কর্ণফুলী-নদীর উত্তর বিভাগে বর্ত্তমান রাউজানের অন্তর্গত পাহাড়তলীর নিকট-বর্ত্তী স্থান।

এই সীমান্ত প্রদেশ অপেক্ষাকৃত অল্পদিন হইল সমুদ্রতুঙ্গ

রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়া থাকিলেও, দস্যুপতি অজয়কেতু ব্যতীত তথায় অশান্তি সৃষ্টি করিবার আর কেহ ছিল না। মহারাজ কল্যাণাদিত্য তাঁহার শাসিত সমগ্র বৌদ্ধরাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধান করিয়াছেন; কেবল অজয়কেতুকে আয়ত্তাধীন করিতে পারেন নাই। অজয়কেতুকে যে ব্যক্তি ধরাইয়া দিতে পারিবে, অথবা তাহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় আনিয়া দিতে পারিবে, মহারাজ সেই ব্যক্তিকে সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন,—এ কথা সমগ্র রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জীবিত অবস্থায় তাহাকে পাওয়া গেলে, তাহার রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত শির ভূমিতে লুণ্ঠিত হইবে, তাহার রুধির ধরণীবক্ষ প্লাবিত করিবে।

মহারাজ কল্যাণাদিত্য নববিজিত সীমান্ত-প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন। স্বনামধন্য মগধের বৌদ্ধ মহারাজ অশোকবর্দ্ধনের নির্দ্দিষ্ট আদর্শে তিনিও তাঁহার শাসিত এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের সর্ব্বত্র চিকিৎসালয়, পান্থনিবাস, শিক্ষালয়, ধর্ম্মমন্দির, বিচারালয় স্থাপিত করিয়াছেন; সে সমস্ত স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন; সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করেন।

চৈত্র-সংক্রান্তি আগত-প্রায়। আজ মহারাজ মেঘাম্বর দুর্গের সেনানিবাস পরিদর্শন করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সূর্য্যদেব তখনও অস্ত যান নাই।

পার্ব্বত্য জনপদের নিকটবর্ত্তী পথের ধারে পার্ব্বত্য ঝরণা। কৃষক-কন্যা অরুণা ধেনু লইয়া গৃহে ফিরিতেছে। তাহার বয়স ষোড়শ বৎসর। ঝরণার ধারে, অরুণা দেখিল, এক ক্লান্ত পথিক অশ্ব সহ বিশ্রাম করিতেছে। পথিকের বয়স প্রায় চতুর্ব্বিংশ বৎসর; পথিক যোদ্ধ-বেশে সজ্জিত,—দীর্ঘ অবয়ব, প্রতিভাদীপ্ত মূর্ত্তি। অরুণা দেখিল—কি দৃঢ়তাব্যঞ্জক সতেজ দৃষ্টি! পথিক অরুণাকে দেখিল,—কি সরল, স্থির মূর্ত্তি!

"কে তুমি?"

"আমি পথিক।"

"তুমি কোথায় যাবে?"

"পর্ব্বত-গুহায়।"

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম?—আচ্ছা, তোমার জানায় ক্ষতি নাই,—আমি,—অজয়কেতু! তুমি বোধ হয় মহারাজ কল্যাণাদিত্যের প্রজাকন্যা, ইচ্ছা হয় এ সংবাদ তোমাদের মহারাজকে দিতে পার।"

মৃদু হাস্য করিয়া অজয়কেতু শেষ কথা কয়টী বলিল।

অরুণা স্থির নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—"তুমি অজয়কেতু! শীঘ্র পলাও। ছিঃ! দস্যুবৃত্তি করিতে নাই।"

অজয়কেতু বিস্মিত হইল; চিন্তিত মনে অশ্বারোহণ করিল। তার পর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। কৃষক-কন্যা দেখিল,—দস্যু দৃষ্টির অন্তরাল হইয়াছে।

তখনও সূর্য্যদেব অস্তমিত হন নাই। বালিকা গৃহে ফিরিবে, অথবা আর কি করিবে, ভাবিতেছে। আবার এক পথিক সেই পথে পদব্রজে চলিতেছেন। অল্প পশ্চাতে তাঁহার সঙ্গিগণ। পথিকের বয়স অনুমান চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর; দীর্ঘ অবয়ব; প্রশান্ত ললাট। অস্তাচল-উন্মুখ অরুণদেবের রঙ্গীন রশ্মিতে অরুণা দেখিল,—কি উদার, প্রশান্ত মূর্ত্তি; সত্যধর্ম্ম বুঝি মনুষ্যরূপ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। পথিক দেখিলেন, কেমন সরল দৃষ্টি কৃষক-কন্যা। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি?" বালিকা বলিল,—"আমি অরুণা।" সম্ভ্রমে বালিকার শির নত হইল, কে যেন তাহার ভিতর হইতে বলিয়া দিল,—"মহারাজ কল্যাণাদিত্য!"

একজন পারিষদ বলিল,—"কোন্ দিক গেল? বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয় না?"

মহারাজ বলিলেন,—"কৃষক-বালিকা কি করিয়া জানিবে? জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক।"

অরুণা বড় সমস্যায় আজ পরিত্রাণ পাইল।

মহারাজ ভাবিলেন,—এই কৃষক-বালিকার জীবন কেমন চিন্তা-ক্লেশ-শূন্য, কত সুখের।

সেই দিন রাত্রিতে অজয়কেতু পর্ব্বতগুহায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিল।

চতুর্ব্বিংশ বৎসরের যুবক দস্যু। তাহার অধীনে পাঁচশত প্রবীণ যোদ্ধা, সকলেই দস্যু। গুহার নিম্নে প্রস্তর-খোদিত প্রকাণ্ড গৃহ, অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, কত লুণ্ঠিত ধনরত্নে পরিপূর্ণ।

অর্দ্ধরাত্রি। অধীনস্থ দস্যুগণ নিদ্রিত; আবার কখন্ কোন্ দিকে "কার্য্যে" ব্রতী হইতে হইবে জানা নাই,—

"সেনাপতির" ভেরী বাজিলেই উঠিতে হইবে। দস্যু-পতিকে তাহারা "সেনাপতি" বলিত।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর দস্যুবৃত্তির পর, আজ গভীর রাত্রিতে অজয়কেতুর এ কি চিন্তা! কৃষক-বালিকা আজ বলিয়াছে, "ছিঃ দস্যুবৃত্তি করিতে নাই।" এমন সহজ, স্পষ্ট নিষেধ আজ্ঞা তো কেহ তাহাকে কখনও দেয় নাই। পাঁচ বৎসর দস্যুতার পর আজ তাহার সর্ব্বপ্রথম মনে হইল,—কত নরহত্যা সে করিয়াছে, কত হৃদয়বিদারক দৃশ্য চোখের উপর দেখিয়াছে; কত গৃহ সে ভস্মীভূত করিয়াছে, কত জনপদ অরণ্যে পরিণত করিয়াছে। এত ধনরত্ন তার গৃহে সঞ্চিত রাখিয়া সে আজ লুক্কায়িত, অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতেছে। তার চেয়ে পর্ব্বত-প্রান্তে কুটীরবাসী ঐ দীন কৃষক কত সুখী,—সে নিরপরাধ, নির্ভীক, ধার্ম্মিক। হায়, যদি আজ আবার জীবন-যাত্রা প্রথম হইতে আরম্ভ করা যাইত! সে তাহা হইলে অমনি ধর্ম্মশীল কৃষক হইয়া পর্ণ-কুটীরে বাস করিত, দারিদ্র্যের মহত্বে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিত। আর তাহার পর্ণকুটীরে, স্বয়ং গৃহস্বামী হইয়া, দরিদ্রা কৃষক-কন্যার——এ কি চিন্তা! না, থাক্; এ আর ভাবা হইবে না। সে কোনও দিন ভগবানের নাম লয় নাই; আজ প্রথম সে ভাবিল, ভগবান যদি তাহাকে এই মুহূর্ত্ত হইতে দরিদ্র কৃষক করিয়া জীবন যাপন করিতে দিতেন, তবে সে কত সুখী হইত।

দস্যুতালব্ধ ধনরত্ন আজ সহস্র প্রপীড়িত নরনারীর তপ্ত নিঃশ্বাসের এবং আর্ত্তনাদের স্মৃতি জাগাইয়া দিল।

"ছিঃ, দস্যুবৃত্তি করিতে নাই।"

তখন রাত্রি প্রভাত হইবার এক প্রহর বিলম্ব আছে। "সেনাপতির" ভেরী আবার বাজিয়া উঠিল, পাঁচ শত দস্যু-বীর সজ্জিত হইয়া "সেনাপতির" সম্মুখে উপস্থিত। আজ কোন "কার্য্যের" আদেশ নাই; দস্যুপতি স্থির, অচঞ্চল।

স্বহস্তে সমস্ত সঞ্চিত ধনরত্ন অধীনস্থ দস্যুগণকে বিতরণ করিয়া দিয়া অজয়কেতু বলিলেন,—"ভ্রাতৃগণ, আমাকে আজ বিদায় দাও। তোমরা আমার আদেশ কখনও লঙ্ঘন কর নাই, আজও করিও না। আমার অনুরোধ, আমার আদেশ,—তোমরা এই সব ধনরত্ন লইয়া যাহার যেখানে ইচ্ছা যাও, জীবনের গতি বিভিন্ন দিকে পরিচালিত কর। আমি আজ দারিদ্র্যের মহত্ব অনুভব করিবার চেষ্টা করিব। আজ দস্যুপতি অজয়কেতুর গর্ব্বিত শির ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে, তাহার রক্তে ধরণী প্লাবিত হইবে। আমি আজ সূর্য্যোদয়ের পর মহারাজ কল্যাণাদিত্যের শিবিরে আত্ম-সমর্পণ করিব।"

পাঁচশত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—"আমরাও সেনাপতির নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিব, আমরাও আত্মসমর্পণ করিব।"

"ছিঃ, আমার আদেশ,—ভ্রাতৃগণ, আমাকে নির্জ্জনতা, আমাকে দারিদ্র্য ভিক্ষা দাও।"

বিদায়-অশ্রুতে অজয়কেতুর চক্ষু রুদ্ধ হইল, সহস্র চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইল। এই অশ্রু কি তীর্থ-বারি? আজ এ কি নূতন জীবন।

অর্দ্ধ প্রহর মধ্যে সমস্ত অরণ্যপ্রদেশ জনশূন্য হইল।

অজয়কেতু নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন; তারপর কি এক নবীন বলে বলীয়ান্ হইলেন, পাঁচশত যোদ্ধার সাহচর্য্যেও কখন তাহার পরিচয় পান নাই।

তখন বেলা এক প্রহর। মেঘাম্বর দুর্গের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে ছায়া মণ্ডপের নীচে রাজসিংহাসন। তথায় মহারাজ কল্যাণাদিত্য বসিয়াছেন। সভামণ্ডপে ও তাহার চতুঃপার্শ্বে সহস্র সহস্র প্রজাবৃন্দ। মহারাজ রাজকার্য্য করিতেছেন।

প্রতিহারী আসিয়া যোড় হস্তে নিবেদন করিল,—'মহারাজের জয় হোক; এক ভিক্ষুক মহারাজের দর্শন-প্রার্থী।"

"স সম্ভ্রমে লইয়া আইস।"

দীর্ঘকেশ শ্মশ্রুধারী এক অপরিচিত মূর্ত্তি সভাস্থলে প্রবেশ করিল।

মহারাজ ভাবিলেন, এ তো বৌদ্ধ ভিক্ষুর মূর্ত্তি নয়! না জানি কোন্ বিদেশী পথিক আশ্রয়প্রার্থী। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি আবশ্যক?"

ভিক্ষুকের দীপ্ত চক্ষু, নির্ভীক দৃষ্টি। বলিল,—"মহারাজ, আমি দস্যুপতি অজয়কেতুর সংবাদ দিতে পারি। মহারাজ, আমি পুরস্কার বা ভিক্ষার প্রার্থী নই।"

"আপনার কথার সত্যতার পরিচয় কি দিতে পারেন?"

সহসা ভিক্ষুক বস্ত্রাচ্ছাদন ও ছদ্ম শ্মশ্রু-কেশ পরিত্যাগ করিল; স্থির গর্ব্বিত দৃষ্টিতে মহারাজের সম্মুখে নিজ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইল,—এ কি বীরমূর্ত্তি!

আগন্তুক বলিল,—"মহারাজ, আমার কথার পরিচয় আমিই। আমিই দস্যুপতি অজয়কেতু।"

সহস্র-সহস্র দৃষ্টি দস্যুপতির উপর নিপতিত হইল।

মহারাজ ভাবিলেন,—"এ ব্যক্তি যদি আমার মেঘাম্বর দুর্গের সেনাপতি হইত!"

"মহারাজ, আমার কথায় অবিশ্বাস করিলেন?"

"আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিলাম।"

"মহারাজ, আমার বিচার করুন। আমার অর্জ্জিত স্বর্ণ মুদ্রা আজ দরিদ্রের জন্য বিতরণ করুন। আমার রক্তে ধরণী প্লাবিত হউক।"

"দরিদ্রের চিন্তা আমার নিজের,—আমার প্রচারিত স্বর্ণ মুদ্রা তাহাদিগকে বিতরণ করিব। কিন্তু আমি তোমাকে বিনা বিচারে দণ্ডিত করিব না। তুমি এখন উত্তেজিত; আগামী কল্য তোমার বিচার হইবে। তুমি ইচ্ছা করিলে নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে পার। আপাততঃ তুমি কারাবদ্ধ।"

শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দস্যুবীর কারাগারে নীত হইল; সমস্ত প্রদেশে জন-কোলাহল ধ্বনিত হইল,—দস্যুপতি আত্মসমর্পণ করিয়াছে!

আজ চৈত্র-সংক্রান্তি; আজ আবার রাজ-সভা; মেঘাম্বরের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ আবার জনাকীর্ণ।

দস্যুপতি বিচার-সভায় আনীত হইল; বিচারকালে তাহার শৃঙ্খল মোচন করা হইল।

রাজ-সিংহাসনে বসিয়া মহারাজ মনে-মনে প্রার্থনা করিলেন,—"ভগবন্ বুদ্ধদেব, আমার হৃদয়ে বল দাও; আমি যেন ন্যায় বিচার করিতে পারি; ক্রোধ দ্বেষ সংস্পর্শে যেন আমার বিচারকার্য্য কলুষিত না হয়।"

তার পর মহারাজ বলিলেন,—"বন্দি, তোমার স্বপক্ষে কি বলিবার আছে?"

বন্দী বলিল,—"মহারাজ, আমি অবিজিত! আমি স্বেচ্ছায় আসিয়া অপরাধ স্বীকার করিতেছি। আমি দণ্ড প্রার্থনা করি, আমার আত্মসমর্থনের কিছু নাই।"

"তোমার স্বপক্ষে কোন কথাই কি নাই? তুমি কেন দস্যুবৃত্তি করিতে?"

"মহারাজ, সে কথা বলিয়া আপনার ধৈর্য্য-ক্লান্তি করিতে চাই না; আমি ধর্ম্মবিশ্বাসহীন ছিলাম,—খালি আত্ম-বিশ্বাস করিতাম। আমি এই পার্ব্বত্য সীমান্ত-প্রদেশে নিজ ইচ্ছানুরূপ রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলাম। কারণ অনুসন্ধান অনাবশ্যক;—মহারাজ, আমি সেই কার্য্যে অক্ষম হইয়াছি।"

মহারাজ ভাবিলেন, দস্যুর বোধ হয় এমন কোন গুপ্ত কথা আছে, যাহা সে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। তিনি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু এমন কি কিছু নাই, যাহার জন্য তিনি তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারেন?

প্রকাশ্যে বলিলেন,—"দস্যুবীর, তোমার অপরাধে প্রাণদণ্ড-ব্যবস্থা আবশ্যক, কিন্তু এমন কি কিছু আছে যাহাতে—"

সহসা বালিকা-কণ্ঠে উচ্চারিত হইল,—"মহারাজ! আছে। এমন কিছু আছে যাহাতে—"

চকিত দৃষ্টি মহারাজ ও সভাসদগণ দেখিলেন, এক কৃষক-বালিকা সিংহাসনের নিকট নত-শিরে দাঁড়াইয়া আছে। মহারাজ ও দস্যুবীর একসঙ্গে দেখিলেন,—অরুণা!

অরুণা বলিল,—"মহারাজের জয় হোক। এই দস্যু-বীরের প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে আমায় প্রাণদণ্ড ভিক্ষা দিন। জীবন-বিনিময়ে কি জীবন-দান হয় না?"

গম্ভীর স্বরে মহারাজ কল্যাণাদিত্য বলিলেন,—"অরুণা, তোমার অনুরোধ বিচারে গ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রাণ-দণ্ডের বিনিময় হয় না।"

"কিন্তু মহারাজ,—"

"কিন্তু অরুণা,—"

দস্যুবীর স্থির। সভাসদগণ ও সমগ্র জনতা নিস্তব্ধ!

"অরুণা, তুমি কি এই দস্যুপতির প্রাণ-ভিক্ষা চাও?"

"হাঁ মহারাজ, আমার প্রাণের বিনিময়ে।"

"বিনিময় হয় না।" মহারাজ আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন,—চিন্তা করিলেন, এই কৃষক-কন্যা যদি রাজ-সিংহাসনে বসিত তবে,—

প্রকাশ্যে বলিলেন,—"বালিকা, তুমি রাজ-পত্নী হইবার উপযুক্তা। তুমি কি—"

দশ সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হইল,—"সাধু, সাধু! মহা-রাজের জয় হোক! অরুণাদেবীর জয় হোক!"

অরুণা ধীরে মহারাজের সিংহাসন-তলে বসিল;

বস্ত্রাঞ্চল গললগ্ন ক'রিয়া বলিল,—"মহারাজ, আপনি ধরণীর অধীশ্বর; দরিদ্রা কৃষক কুমারীকে এত বড় লোভ দেখাবেন না। যে দেশে ভগবান্ বুদ্ধদেব রাজ-সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই দেশের সামান্যা নারী আমি,—আমাকে ত্যাগের শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা করিবেন না। রাজ সম্পদে আমার আবশ্যক নাই; আমি তাহার অযোগ্যা। তার চেয়ে, মহারাজ, আমি যদি পারি এই দস্যুবীরের পত্নী হইয়া দরিদ্র কৃষকের পর্ণকুটীরে বাস করিব। দেখিবেন, এই দরিদ্র কৃষক-দম্পতি অপেক্ষা অধিকতর রাজভক্ত প্রজা মহারাজের অল্পই আছে। এই দস্যুর জীবন হইতে আমার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই যে, আমি মহারাজকে তাহার স্বামীত্বে বরণ করিতে পারি।"

মহারাজের চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত।

বালিকা অশ্রু-প্লাবিত নেত্রে আবার বলিল,—"মহারাজ, আমাকে ভিক্ষা দিন্; আমার নিজকে আমায় ভিক্ষা দিন্। হৃদয় যাহার দস্যুবীরের নিকট পূর্ব্বেই প্রদত্ত, তাহার তুচ্ছ অলীক দেহ গ্রহণ করিলে মহারাজ কল্যাণাদিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে না।"

মহারাজ কল্যাণাদিত্য আজ বালিকার কথায় চিন্তা করিলেন,—"আমারও তো ত্যাগ-ধর্ম্মের শিক্ষা হয় নাই!"

তার পর বলিলেন,—"ধন্য দস্যুবীর, তুমি মুক্ত। এই বালিকাকে সহধর্ম্মিণী করিও। তোমার যেথানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার,—তুমি স্বাধীন।"

আবার দশ সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—"সাধু! সাধু! মহারাজের জয় হোক্, অরুণাদেবীর জয় হোক!"

দস্যুবীর স্থির, নিস্তব্ধ। ধীরে সিংহাসন-সংশ্লিষ্ট ভূমিতে জানু স্থাপিত করিয়া অবনত শিরে বলিলেন,—"মহারাজ, আজ সত্যই আমি বিজিত। আপনি আমাকে জয় করিয়াছেন, কিন্তু আমি জীবন-দান গ্রহণ করিব না—এই বালিকার জন্যও না।"

মহারাজ বলিলেন,—"বীরবর, যদি আপনি বিজিত, তবে আমার আদেশ গ্রহণ করুন।"

স্থির, বিনীত ভাবে দস্যুবীর বলিলেন,—"মহারাজের আদেশ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু মহারাজই তো আমাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন! আমার তো ত্যাগের শিক্ষা হয় নাই; মহারাজ, আমি ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে ত্যাগের স্বাধীনতা দিন। আমার কলুষিত জীবনের সঙ্গে এই বালিকার পবিত্র জীবন মিলিত হইলে, তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না। আজ বলিতেছি, ভগবান্ জানেন, আমার সেই কল্পিত স্বর্গ আজ আমার করায়ত্ত,—এ আমার কত বড় প্রলোভন! কিন্তু মহারাজ, যে দেশে রাজপুত্র স্বেচ্ছায় ভিখারী হইয়াছে, সে দেশে ত্যাগ-ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলে জীবন ধারণ ভারবহ কার্য্য হইবে। মহারাজ, আমি আবার মিনতি করি, আমাকে ত্যাগের স্বাধীনতা দিন,—জীবন ত্যাগের!"—

মহারাজ কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিলেন!

সহসা দস্যুবীর শেষ বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই ক্ষিপ্র-হস্তে বস্ত্র মধ্য হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া তাহা নিজ বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন।

বীরদেহ ভূমিতে পতিত হইল, রক্ত-স্রোতে ধরণী-বক্ষ প্লাবিত হইল। দস্যু সম্বন্ধে রাজার ঘোষণা-বাক্য আজ কার্য্যে পরিণত হইল।

বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া নিমেষের মধ্যে মহারাজ কল্যাণাদিত্য সমগ্র জন কোলাহল নিস্তব্ধ করিলেন।

স্বয়ং উভয় হস্তে ভূলুণ্ঠিত দস্যুশির ধারণ করিয়া ভূমিতে বসিলেন।

অজয়কেতুর দেহ তখন প্রাণহীন।

সহসা দস্যুবীরের পদপ্রান্তে দেখিলেন, কৃষক-কুমারী মৃতের পদদ্বয় সযত্নে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছে,—তাহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধে স্থির-সংবদ্ধ। বালিকা প্রস্তর মূর্ত্তিতুল্য; সকলে দেখিল,—বালিকা সহমৃতা!

বালিকার আত্মা পার্থিব জীবনের পরপারে আত্ম-নির্ব্বাচিত পতির আত্মার সহিত মিলিত হইয়া কোন্ অজ্ঞাত ধামে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার আজ মহা সমাপ্তি—আজ নির্ব্বাণ-মন্ত্রে তাহাদের মহা-পরিণয়!

মহারাজ কল্যাণাদিত্য জীবনে বিবাহ করেন নাই। রাজকার্য্য যথানুরূপ করিতেন, কিন্তু নিজে মুনিবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই পুণ্য-ভূমিতে ত্যাগ-ধর্ম্মের শিক্ষাদাতা মহামুনি গৌতম-বুদ্ধের স্বর্ণ-মূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন,—সেই স্থান "সতী-তীর্থ" হইল, আর সেই জনপদের নাম হইল—"মহামুনি।"

সহস্রাধিক বৎসর পরে আজও "মহামুনি" জনপদে চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে বাৎসরিক মেলা হয়,—তথায় শত-শত ত্যাগী সন্ন্যাসী পর্ব্বত-কন্দর হইতে নির্গত হইয়া একত্র সম্মিলিত হন। আজও শত-শত সাধ্বী নারী "সতী-তীর্থে"র পবিত্র ধূলি মস্তকে ধারণ করেন।

এ কি এ করেছ জননি!

[শ্রীগুরুদাস হালদার]

এ কি এ করেছ জননি!
স্বামীর অঙ্গে সমর ভঙ্গে
দিয়েছ চরণ পাষাণি!

কোথায় গিয়েছে সমর-রঙ্গ, কোথায় মৃত্যু-লীলা,
কোথায় তোমার ভীষণ মূর্ত্তি, কোথায় রক্তখেলা?
সরমে জননি, উঠেছ শিহরি,
তুলিয়া কৃপাণ রাখিয়াছ ধরি,—
হারায়েছ মা কি জ্ঞান?
পাষাণের প্রায় নহে কেন হায়,
কেন মা, এমন ম্লান?

বদনে তোমার লিপ্ত জননি, কি যেন শান্ত রেখা,
আনত নয়ন স্পষ্ট যেন বা লজ্জা-সোহাগে মাথা;
দেহেতে তোমার নাহিক চেতনা—
দেবী হয়ে কেন এমন মলিনা,
পাষাণ-সদৃশা কেন?

কি তুমি শেখাতে স্বামীর বুকেতে
নিশ্চলা মাগো হেন?
নাথের অঙ্গে চরণ স্থাপিয়া ভুলেছ দ্বন্দ্ব যদি,
সরমে জিহ্বা কেটেছ যদি বা, কম্পিত যদি হৃদি,—
নিখিল ভুবনে পতির মতন
কে তবে নারীর প্রধান এমন,
তাঁর অপমানে আর
দেবী তুমি যদি শিহর এমতি,
অন্য রমণী ছার!

মহেশ! এমন শান্ত সরল গম্ভীরে তুমি পড়ি'
শান্তিপূর্ণ মুদিতেক্ষণ রয়েছ কি কথা স্মরি'?
রাখিতে ধরণী ঘরণীর পদ
ধরিতে নহ গো পশ্চাৎপদ;—
শিখক পুরুষ তবে,
পরের কারণে মান বলিদানে
কতই গরব ভবে!

প্রেমের কথা

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্-এ]

তৃতীয় প্রকার

দ্বিতীয় প্রকারের প্রণয়-সঞ্চারের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, রোগীর শুশ্রূষা-স্থলে অনেক দিন ধরিয়া উভয় পক্ষের সাহচর্য্যে এক পক্ষে কৃতজ্ঞতা ও অপর পক্ষে করুণা ঘনীভূত হইয়া ক্রমে প্রণয়ে পরিণত হয়। সেবা-শুশ্রূষার ব্যাপার না থাকিলেও শুধু অনেক দিন ধরিয়া পরস্পরের সাহচর্য্যে ক্রমশঃ প্রণয় জন্মিতে পারে; যৌবনকালে কোনও কারণে নব-পরিচিত যুবক-যুবতীর ঘন ঘন দেখাশুনায় পরস্পরের গুণের পরিচয় পাইয়া ক্রমে অন্যোন্যানুরাগ জন্মে।(১) 'প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিগৃহীত

(১) বিলাতী সমাজের কোর্টশিপে কতকটা এই তত্ত্ব নিহিত। তবে সে ক্ষেত্রে পূর্ব্বেই প্রণয়-সঞ্চার হয়, সেই সূত্রেই কোর্টশিপ চলে। এই কোর্টশিপে হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় ঘটে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ। কেননা উভয়েই উভয়ের মনোরঞ্জনে সচেষ্ট থাকে, অনেক স্থলে কিঞ্চিৎ কপটতারও আশ্রয় লওয়া হয়।

হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল, সহৃদয়তা। এই যথার্থ প্রণয়।...প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা; আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়...আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি।' [হরদেব ঘোষালের পত্র, 'বিষবৃক্ষ' ২২শ পরিচ্ছেদ।] আবার, বাল্যকাল হইতে একত্র বাস, একত্র ক্রীড়া কৌতুক, একত্র আমোদ-প্রমোদ, ইত্যাদিরূপ নিরন্তর সাহচর্য্যে যেমন বালকে-বালকে সৌহার্দ্দ জন্মে, বা বালিকায়-বালিকায় সখিত্ব জন্মে, তেমনি বালক-বালিকায় প্রণয় জন্মে। আমাদের বাল্যবিবাহের দেশে দাম্পত্যপ্রণয়ও অনেকটা এইরূপে যুবক বা কিশোর স্বামী ও বালিকা স্ত্রীর হৃদয়ে ক্রমশঃ সঞ্চারিত হয়। যাক্ দাম্পত্য প্রণয়ের কথা বলিতেছি না। অনূঢ়-অনূঢ়ার হৃদয়ে প্রণয় এই ভাবে ক্রমশঃ সঞ্চারিত হয়; ঠিক কোন্ মুহূর্ত্তে এই প্রণয়ের উদ্ভব হয় তাহা ধরিতে পারা যায় না। ইহাই তৃতীয় প্রকারের প্রণয় সম্ভব। তবে ইহা এক মুহূর্ত্তে হৃদয় আচ্ছন্ন করে না, ক্রমে ক্রমে জন্মে, এই জন্য ইহাকে পূর্ব্বরাগ না বলিয়া যদি ক্রমরাগ বলিতে হয় বলুন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন— 'প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয় না বল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা। বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না। বালকমাত্রেই কোন সময়ে না কোন সময়ে অনুভূত করিয়াছে যে ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর—উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহার পথের ধারে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভাল বাসিয়াছে।'(২) ['চন্দ্রশেখর,' উপক্রমণিকা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।] বাল্যকালের এইরূপ ভালবাসা বয়োবৃদ্ধির সহিত সুদৃঢ় হয়, ইহা হৃদয়ক্ষেত্রে অনেকদূর পর্য্যন্ত শিকড় গাড়ে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী' ১ম পর্ব্বের রাজলক্ষ্মী বনাম পিয়ারী বলিতেছে— 'ছেলেবেলায় একবার যাকে ভালবাসা যায়, তাকে কি কখনো ভোলা যায়?' (১১৬ পৃঃ) তবে একত্রবাস-জনিত এইরূপ গভীর প্রণয় অবশ্য ঘটে না, ঘটিলে কিন্তু তাহা সর্ব্বগ্রাসী হইয়া দাঁড়ায়। টেনিসনের কথাগুলি এই প্রসঙ্গে অনুধাবনীয়।

> How should Love
> Whom the cross-lightnings of four chance-met eyes
> Flash into fiery life from nothing, follow
> Such dear familiarities of the dawn?
> Seldom, but when he does, Master of all.
> —Aylmer's Field.

(২) ধর্ম্মাত্মা ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'আত্ম-চরিতে' দেখা যায় যে তাঁহার নিজের জীবনে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। অতএব ইহা কল্পনাপ্রবণ কবির উক্তি বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহা অনেকের জীবনে পরীক্ষিত সত্য। 'এই দশ এগার বৎসর বয়সের আর একটী কৌতুকজনক ঘটনা স্মরণ হয়। আমাদের স্কুলের সন্নিকটের গলিতে একটী বালিকা ছিল। সে আমার সমবয়স্কা, দেখিতে যে খুব সুন্দরী ছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহার মুখখানি আমার বেশ লাগিত। সে তাহাদের বাড়ীর উঠানে খেলা করিত। আমি আর একটী বালকের সঙ্গে রোজ তাহাকে দেখিতে যাইতাম। সে তার মার ভয়ে পথের বালকের সহিত বড় বেশী কথা বলিত না; কিন্তু সে জানিত যে আমরা তাহাকে দেখিতে ও তাহার সঙ্গে কথা কহিতে ভালবাসি, তাই সে আমাদের কণ্ঠস্বর শুনিলেই বাহিরে আসিত ও এটা-ওটা যাহা দিতাম গোপনে লইত। আমি বোনের মত তাহাকে কাছে চাহিতাম, কিন্তু তাদের বাড়ীর লোকে তাহা দিত না। বহুবাজার পাড়া হইতে কলেজ উঠিয়া গেলে আমরা তাহাকে হারাইলাম।' (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৭২ পৃঃ]। ইহা অপেক্ষাও অল্প বয়সে আর একটী মেয়ের প্রতি ভালবাসার বিবরণ আছে। (প্রথম পরিচ্ছেদ, ৩১ পৃঃ) 'সেকালের আর একটী কথা মনে আছে। একটী সুন্দর ফুটফুটে গৌরবর্ণ মেয়ে আমাদের পাশের বাড়ীতে তার মাসীর কাছে আসিত। সে আমার সমবয়স্ক। ঐ মেয়ে আসিলেই আমার খেলাধূলা লেখাপড়া, ঘুচিয়া যাইত। আমি তার পায়ে-পায়ে বেড়াইতাম। খেলায় ঘটনাচক্রে যদি আমি তাহার সঙ্গে একদলে না পড়িতাম আমার অসুখের সীমা থাকিত না।...ঐ বালিকার বাড়ী আমাদের স্কুলের পথে ছিল। আমি স্কুল হইতে আসিবার সময় তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া একটু খেলা করিয়া আসিতাম।' ইত্যাদি। অবশ্য এ দুইটী দৃষ্টান্ত নভেলী প্রণয়ের নহে, বালিকার প্রতি বালকের কিরূপ ভালবাসার টান, মধুর আকর্ষণ হয়, তাহারই প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম।

এণ্ড কোং
ও
গাড়ী
মফস্বল-
বিক্রয়ের
বিশেষ
আছে।

এই প্রণয়ে 'ধীরে ধীরে নীরবে' সমগ্র হৃদয় অধিকার করে। অনেক সময় প্রণয়িযুগলও ইহার অস্তিত্ব অনুভব করে না, পরে বিচ্ছেদ ঘটিলে বা অন্যে প্রণয়বাঞ্ছা করিলে (বা অন্যত্র বিবাহ-সম্বন্ধ হইলে) হৃদয়ে অশান্তি অনুভূত হয় এবং তখন অন্তরের ব্যথা, অন্তরের কথা ধরা পড়ে। ('দেবদাস' ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ২৬ পৃঃ ও Aylmer's Field দ্রষ্টব্য।)

শৈশব হইতে একত্রবাস, নিরন্তর সাহচর্য্য সহোদর সহোদরায়, একান্নবর্ত্তী পরিবারে খুড়তুত-জেঠতুত, মামাত, পিসতুত, মাসতুত প্রভৃতি ভাই ভগিনীদিগের অর্থাৎ cousinদিগের, এবং পাড়াপড়শীর সমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের ঘটিয়া থাকে। বিখ্যাত কবি ও সমালোচক কোলরিজ শেক্সপীয়র সম্বন্ধীয় সমালোচনা গ্রন্থে গম্ভীর দার্শনিক প্রণালীতে বুঝাইয়াছেন যে, সহোদর-সহোদরার মধ্যে প্রেমের উদ্ভব হইতে পারে না। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে সহোদর সহোদরার প্রেমের বীভৎস চিত্র রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের একখানি বিয়োগান্ত নাটকে—(ফোর্ডের Brother and Sister, ইহার আর একটি নাম আছে, তাহা একেবারেই অশ্রাব্য) চিত্রিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এরূপ সৃষ্টিছাড়া ব্যাপারে যে নাটকের আখ্যানবস্তু, কোন কোন সমালোচকের মতে তাহারও প্রশংসা ধরে না। হিন্দুসমাজে Cousin সহোদর-সহোদরা হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে, সুতরাং Cousin এ Cousinএ বিবাহ নিষিদ্ধ। এরূপ নিকট সম্পর্কে বিবাহ-নিষেধ নাকি শরীরতত্ত্ব ও সুপ্রজনন-বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু পূর্ব্বকালে মামাত পিসতুত ভাইবোনে বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিত। ভদ্রার্জ্জুন ইহার সুবিদিত দৃষ্টান্ত; যদুবংশে আরও অনেকগুলি এইরূপ বিবাহ হইয়াছিল, শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে। ভাসের 'অবি-মারকে' অবিমারক (বিষ্বক্‌সেন) মাতুলকন্যা কুরঙ্গীকে বিবাহ করিয়াছেন। তবে এ সব স্থলে সাহচর্য্যে প্রণয়সঞ্চার সংস্কৃত-সাহিত্যে বর্ণিত হয় নাই। যাহা হউক, কলিতে ইহা নিষিদ্ধ। আর খুড়তুত জেঠতুত ভাই বোনে অর্থাৎ সগোত্রা বিবাহ একেবারে হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপ-শৈবলিনীর শৈশব হইতে প্রণয় হইলেও বিবাহ অসম্ভব ইহাই বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—'শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি।' ['চন্দ্রশেখর,' উপক্রমণিকা ২য় পরিচ্ছেদ।] শৈবলিনী ছেলেমানুষ বলিয়া তখন এটুকু বুঝিত না। (শৈবলিনী যদি সোণার মার প্রকৃতির হইত, তাহা হইলে বলিত, 'খৃষ্টান-মুসলমানের বেলায় চলে, হিঁদুর বেলায় যত দোষ!')

পক্ষান্তরে খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজে এরূপ বিবাহে বাধা নাই। সুতরাং শুধু ইংরেজী কাব্য নাটকে কেন, ইংরেজ কবিদিগের জীবন চরিতেও Cousinএ Cousinএ প্রণয়ের বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন ড্রাইডেন, কুপার, শেলি, বায়রন, লে হণ্ট, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ইঁহারা সকলেই Cousinদের প্রেমে পড়িয়াছিলেন; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন, তিনি Cousinএর পাণিগ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিয়াছিলেন, অন্য সকলে হতাশ প্রণয়ী। টেনিসনের 'ডোরা' ও 'লক্‌স্‌লী হল' এইরূপ প্রণয়ের ব্যাপার আছে; তবে 'ডোরা'য় একতরফা; ডোরা উইলিয়ামের

(৩) হালের ইংরেজী-সাহিত্য পাঠে যেন বোধ হয় এ প্রথায় বিলাতী সমাজে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। এন্টনি ট্রোলোপের 'The Small House at Allington' আখ্যায়িকার Bernard Dale ও Bell Dale এই খুড়তুত-জেঠতুত ভাই ভগিনীর প্রস্তাবিত বিবাহ-সম্বন্ধে একজন বক্তা বলিতেছেন—"I am not quite sure that it's a good thing for cousins to marry," আর একজন বক্তা উত্তর করিতেছেন—"They do, you know, very often; and it suits some family arrangements." (Ch. 20). [শেষ মন্তব্যটি প্রণয়ের দিক্ হইতে নহে, পারিবারিক সুবিধার দিক্ হইতে।] এ ক্ষেত্রে নায়িকা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত। আয়েষার কথা স্মর্ত্তব্য। আবার টমাস্ হার্ডির 'Jude the Obscure' আখ্যায়িকায় Jude Fawley এবং Sue Bridehead এই Cousinদিগের প্রণয়-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার নায়কের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন:—'It was not well for cousins to fall in love even when circumstances seemed to favour the passion.' (Part II, Chapter II) এবং নায়িকার মুখ দিয়াও বলাইয়াছেন:—'We are cousins and it is bad for cousins to marry.' (Part III, Chapter vi.) Cousinদের বিবাহের ফল শুভ হয় না, এরূপ বিশ্বাস যেন ইউরোপে ভিতরে-ভিতরে আছে। ইতিহাস প্রথিত রাজ্ঞী (স্কটলণ্ডের) মেরীর Cousin Darnleyর সহিত বিবাহে অত্যন্ত অশুভ ফল হইয়াছিল। একজন ইংরেজ লেখক এইরূপ আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ারও Cousin এর সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তবে এই বিবাহ সুখের হইয়াছিল।

অনুরক্তা ছিল, কিন্তু উইলিয়াম সে প্রেমের প্রতিদান করে নাই।

Cousinএর সহিত প্রণয় ও পরিণয়ের ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রথম দৃষ্টান্ত বোধ হয় Tatiusএর "Clitophon and Leucippe' নামক গ্রীক রোমান্সে। তবে এ ক্ষেত্রে সাহচর্য্যে প্রণয়-সঞ্চার নহে, নায়কের গৃহে নায়িকা আশ্রয় লইয়াছিলেন, প্রথম-দর্শনে প্রেমের উদ্ভব। (*Dunlop: History of Fiction*, ch. I.)

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ-সমাজের এই বিশিষ্টতাটুকু বজায় রাখিবার জন্য লরেন্স ফষ্টার 'মেরি ফষ্টারের প্রণয়ে বাল্যকালে অভিভূত' ছিল, এই টিপ্পনী করিয়াছেন ('চন্দ্রশেখর,' ১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ)। মুসলমান-সমাজেও এই প্রথা বর্ত্তমান থাকাতে ওসমানকে পিতৃব্যকন্যা আয়েষার অনুরাগী করিয়াছেন, আয়েষা কিন্তু কেবল 'স্নেহপরায়ণা ভগিনী'—টেনিসনের 'ডোরা'র ঠিক উল্টা।

যাক্ Cousinএর কথা ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে সাধারণভাবে এই শ্রেণীর প্রণয়ের আলোচনা করি।

এই প্রণয়ে আকস্মিকতা নাই, ইহা চমকপ্রদ নহে, এক কথায় ইহাতে রোমান্টিক কিছুই নাই, সুতরাং চমৎকারিত্ব নাই, বোধ হয় সেই কারণেই সংস্কৃত সাহিত্যে কবি ও আলঙ্কারিকগণ এই শ্রেণীর প্রণয়কে আমলে আনেন নাই। এক মহাভারতোক্ত কচ-দেবযানীর উপাখ্যানে (আদিপর্ব্ব ৭৬শ ও ৭৭শ অধ্যায়) ইহার ঈষৎ একটু আঁচ পাওয়া যায়। তাহাও একতরফা। যুবক কচ শুক্রাচার্য্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিয়া প্রাপ্তযৌবনা গুরুকন্যা দেবযানীর সংস্পর্শে আসিলেন। যুবক-যুবতী বহু বৎসর ধরিয়া পরস্পরের পরিচর্য্যা করিতে, পরিতোষ জন্মাইতে লাগিলেন, (কচের আচরণে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা ছিল), ফলে দেবযানী কচের প্রতি প্রণয়বতী হইলেন; দৈত্যেরা কচকে বারবার নিহত করিলে দেবযানীর উক্তি "কচ আমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। কচ ব্যতীত জীবন-ধারণ করিতে পারিব না।" এবং কচের বিদ্যালাভের পরে বিদায়কালে দেবযানীর বিবাহ প্রার্থনা—"আমি তোমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা,...... অসুরেরা তোমাকে বারংবার নষ্ট করিয়াছিল। সেই অবধি আমি তোমাতে একান্ত অনুরক্তা হইয়াছি।(৪) তোমার প্রতি আমি যেরূপ ভক্তি, সৌহার্দ্দ ও অনুরাগ করিয়া থাকি, তাহার কিছুই তোমার অবিদিত নহে, অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! এখন তুমি এই নিরপরাধিনীকে পরিত্যাগ করিও না।"(৫) ইত্যাদি বাক্য ইহার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ। পক্ষান্তরে কচ তাঁহাকে গুরুপুত্রী অতএব ধর্ম্মতঃ ভগিনী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। তবে এই ধর্ম্মভীরুতার অচ্ছাদনেও 'আমাকে এক একবার স্মরণ করিও' এই সুসংযত বাক্যের অন্তরালে যদি কৃতজ্ঞতা অপেক্ষা গভীরতর কোন মনোভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, ঋষিকার তাহা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 'বিদায়-অভিশাপ'-নামক খণ্ড-কাব্যে এই পৌরাণিক কাহিনীতে নূতন ভাব ও কাব্য-কলার সমাবেশ করিয়া যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেবযানীর পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে সংযত বাক্ কচকে অনিচ্ছায় মর্ম্মকথা প্রকাশ করাইয়াছেন :—

"আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখি! বহে যাহা মর্ম্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব?......

* * *

হা অভিমানিনী নারী!
সত্য শুনে কি হইবে সুখ? .... ছিল মনে
কল্পনা সে কথা। ফল কি হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা। ভালবাসি কিনা আজ
সে তর্কে কি ফল?"(৬)

(৪) বোধ হয় করুণার প্রভাবও এ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান। 'Pity melts the mind to love.'

(৫) ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

(৬) সমগ্র কবিতাটিতে কবি প্রণয়িযুগলের যে অপূর্ব্ব সংযম ও প্রণয়-বৃত্তির সমন্বয় দেখাইয়াছেন, ধাপে ধাপে উঠিয়া climaxএ পৌঁছিয়াছেন এবং কচের মুখ হইতে প্রতিশাপের পরিবর্ত্তে বিপুল গৌরবের বর দান করিয়াছেন, তাহা শ্রেষ্ঠ কবিশক্তির পরিচায়ক। তবে আমাদের বক্তব্য বিষয় হইতে দূরে যাইবার অধিকার নাই, সুতরাং এই কবিতার সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ করিতে ক্ষান্ত হইলাম। আমরা পাঠকবর্গকে সমগ্র কবিতাটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চারের অজস্র উদাহরণ মিলিলেও এবং ইংরেজ-সমাজে যৌবন-বিবাহের ব্যবস্থা থাকিলেও, উক্ত সাহিত্যে তৃতীয় প্রকারের প্রণয়-সঞ্চারের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। শ্রেষ্ঠ কবি শেক্‌স্‌পীয়ারের 'সিম্বেলিন' নাটকে দেখা যায় Posthumus ও Imogen আশৈশব পরস্পরের খেলার সাথী ছিলেন, একত্রাবস্থান-হেতু অন্যোন্যানুরাগ জন্মিয়াছিল। [Imogen পিতাকে বলিতেছেন :—"It is your fault that I have loved Posthumus; you bred him as my play-fellow." *Cymbeline*, Act I, Sc. i.] All's Well That Ends Well নাটকে অভিজাত Bertramএর পিতৃগৃহে Helena শৈশব হইতে বাস করিত, একত্রাবস্থান-হেতু হেলেনার হৃদয় বার্টরামের প্রতি প্রণয়ে ভরপুর হইয়াছিল, কিন্তু আভিজাত্য-গর্ব্বিত নায়কের হৃদয়ে ভিষগ্-দুহিতা হেলেনার স্থান হয় নাই। ওথেলো ডেস্‌ডেমোনার বেলায় ঠিক এই প্রকারের নহে। ডেস্‌ডেমোনার যৌবন-সঞ্চারের পরে ওথেলো তাঁহার নয়নপথগামী হইয়াছিলেন; এক মুহূর্ত্তে প্রণয়োদয় হয় নাই, ওথেলোর বীরত্বকাহিনী, বিপৎসঙ্কুল জীবনকাহিনী অনেক দিন ধরিয়া শুনিতে-শুনিতে করুণা ও শ্রদ্ধায় ডেস্‌ডেমোনার মনঃপ্রাণ ভরিয়া গিয়াছিল, ক্রমে ইহা প্রণয়ে পরিণত হয়। অতএব এক্ষেত্রে সাহচর্য্য, করুণা, শ্রদ্ধা, তিনের সমবায়ে প্রণয়ের উদ্ভব। অট্‌ওয়ের 'Orphan'-নামক বিয়োগান্ত নাটকে মনিমিয়া (Monimia) এক অভিজাত-গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, গৃহস্বামীর যমজ পুত্রদ্বয়ের সহিত একত্রাবস্থান-হেতু উভয় পুত্রই তাহাকে ভালবাসিল। মনিমিয়া একজনের প্রণয়ের প্রতিদান করিল।

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে (৭) স্কটের 'আইভান্‌হো'তে আইভানহো ও রাওয়েনা (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), থ্যাকারের 'পেণ্ডেনিসে' আর্থার পেণ্ডেনিস্ ও লরা, 'ভ্যানিটি ফেয়ারে' George Osborne ও Amelia Sedley (চতুর্থ পরিচ্ছেদ), জর্জ্জ এলিয়টের 'সাইলাস্ মার্নারে' Aaron ও Eppie, এইরূপ শৈশবাবধি পরস্পরের খেলার সাথী, প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে এক গৃহবাসী, ফলে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিয়াছে। ('পেণ্ডেনিসে' আর্থার যৌবনসুলভ চপলতা প্রযুক্ত একাধিক নারীর প্রণয়ে পড়িয়াছিলেন, শেষে লরার একনিষ্ঠ অকৃত্রিম প্রণয়ের মূল্য বুঝিয়াছিলেন।) টেনিসনের Aylmer's Field ও বিশেষতঃ Enoch Arden এ (Dora ও Locksley Hall এর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।) এই বাল্যের প্রণয়ের মধুরতম, সুন্দরতম দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় এবং 'বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির মর্ম্মভেদী প্রমাণ পাওয়া যায়।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত অফুরন্ত। রাধাকৃষ্ণের প্রেম প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আদিম প্রেম, 'ছুহুক পেম নাহি তুল।' সে ক্ষেত্রে নামশ্রবণ, বংশী-ধ্বনিশ্রবণ, স্বপ্নে, চিত্রে ও সাক্ষাৎ দর্শন—এ সকলগুলির সমবায়ে প্রণয় সঞ্চারের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; (ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২৬) আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন আমরা যে প্রকারের প্রণয় সঞ্চারের আলোচনা করিতেছি, তাহার কথাও এই রাধাকৃষ্ণের প্রেম-প্রসঙ্গে মহাজন পদাবলীতে দেখা যায়। যথা—

শিশুকাল হইতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে লেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গড়িল ভিন-ভিন করি দেহা॥
(জ্ঞানদাস)

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হতাশের আক্ষেপ' আধুনিক বাঙ্গালা কবিতায় এই শ্রেণীর প্রণয়কাহিনীর করুণতম বিকাশ।

৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'সবিতা-সুদর্শনে' কচ ও দেবযানীর ন্যায় শিষ্য ও গুরুকন্যার সাহচর্য্যে প্রণয়ের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সুদর্শন ছদ্মবেশী ফৈজী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বীরেন্দ্রসিংহ ও বিমলার ব্যাপারও এই শ্রেণীর, তবে যৌবনের সাহচর্য্য, বাল্যের নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে ইহার কয়েকটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। তন্মধ্যে প্রতাপ-শৈবলিনীর 'বাল্যের প্রণয়' সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী। 'উপক্রমণিকার'

(৭) এইরূপ সাহচর্য্যে হৃদয়ের পরিচয়ে প্রণয়-সঞ্চারের চেষ্টায় মুরের Lalla Rookh এ উক্তনাম্নী বাদশাজাদীর পাণিপ্রার্থী সুলতান কবি ও গায়কের ছদ্মবেশে দিল্লী হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত সমস্ত পথ তাঁহার মনোরঞ্জনে ব্রতী হয়েন। তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। সাহচর্য্যে প্রণয়-সঞ্চারের ইহা একটী উৎকৃষ্ট নমুনা। তবে ইহা আবাল্য সাহচর্য্য নহে।

প্রথম পরিচ্ছেদে বাল্য-সাহচর্য্যের যে চিত্র আছে তাহা অতুলনীয়। আমরা পাঠক-মহাশয়কে সমগ্র পরিচ্ছেদটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বাস্তবিকই ইহারা 'এক বোঁটায় দুইটি ফল'। [চন্দ্রশেখর, ষষ্ঠ খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] আবার 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' পুরন্দর হিরণ্ময়ীর প্রণয় ও 'আনন্দমঠে' জীবানন্দ-শান্তির প্রণয় এই শ্রেণীর। 'হিরণ্ময়ী যখন চারি বৎসরের বালিকা, তখন এই যুবার বয়ঃক্রম আট বৎসর।—প্রতিবাসী, একজন্য উভয়ে একত্র বাল্যক্রীড়া করিতেন। হয় শচীসুতের গৃহে, নয় ধনদাসের গৃহে একত্র সহবাস করিতেন। এক্ষণে যুবতীর বয়স ষোড়শ, যুবার বয়স বিংশতি বৎসর, তথাপি উভয়ের সেই বাল্যসখিত্ব সম্বন্ধই আছে।' ['যুগলাঙ্গুরীয়', প্রথম পরিচ্ছেদ।] জীবানন্দ শান্তির বেলায় কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলা নাই, 'আনন্দমঠে'র ২য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদ হইতে অনুমেয়। রাধারাণীরও বাল্যের প্রণয়, তবে ইহা সাহচর্য্যবশতঃ নহে, প্রথমদর্শন জনিত এবং বিপদুদ্ধারও আছে।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র আখ্যানদ্বয়ে ('সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়') সাহচর্য্যে প্রণয়-সঞ্চার, তবে যুবক-যুবতীর ঘন ঘন দেখাশুনায়, বাল্যাবধি সাহচর্য্যে নহে। 'প্রধান মন্ত্রীকে সর্ব্বদাই রাজ-বাটীর অভ্যন্তরে গমন করিতে হইত। সেই সকল সময়ে রাজকন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ কথোপকথন হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের উভয়েরই মানসে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল এবং দিনে দিন উভয়েই উভয়ের গুণ পরিচিত হইয়া পরস্পর অধিকতর নৈকট্য বাসনা করিতে লাগিলেন।' [সফল স্বপ্ন, তৃতীয় অধ্যায়।] (বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভে উদ্ধৃত হরদেব ঘোষালের পত্রাংশ তুলনীয়।) 'রোসিনারা সেইস্থানে কিছুকাল বাস করিতে করিতে ক্রমে শিবজীর যত্নে এবং মাধুর্য্যভাবে বশীভূতা হইলেন।' ['অঙ্গুরীয়-বিনিময়,' দ্বিতীয় অধ্যায়।] তবে এক্ষেত্রে পক্ষে রোসিনারা আহত শিবজীর শুশ্রূষা করাতে প্রণয় আরও দৃঢ় হইয়াছিল। 'রোসিনারা তৎপ্রতি নিরন্তর সমবেদনা খ্যাপন করত তাঁহার সহিত মিলিতমন এবং বদ্ধপ্রণয় হইলেন'। (২য় অধ্যায়।) একথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি।

৺দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'তে আবাল্য প্রণয়ের একটি উজ্জ্বল চিত্র আছে। লীলাবতীর কবিতাটি (২য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক) পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।—'সাত বৎসরের কালে।—লীলার লোচন-পথে ললিতমোহন। সুন্দর সুধীর শিশু সুশীলতাময়।—নবম বরষে আসি হলেন পথিক।—তদবধি কত ভাল বেসেছি ললিতে। বলিতে পারিনে সই, বাসুকির মুখে।' ইত্যাদি—

৺তারকনাথ গাঙ্গুলির 'স্বর্ণলতা'য় 'গোপালদাদা' ও স্বর্ণলতার প্রণয়ও এইভাবে জন্মিয়াছিল, তবে এক্ষেত্রে শৈশব হইতে একত্র বাস নহে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী নাটকে' পৃথ্বিরাজ ও মালিনার, ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হিরণ্ময়ী' ও 'কিরণময়ী' আখ্যায়িকাদ্বয়ে উভয় ভগিনীর ও তাহাদের পিতৃগৃহে আশ্রয়প্রাপ্ত ধীরেন্দ্রের, ৺উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী,' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকদ্বয়ের নায়ক নায়িকার প্রণয়, ইত্যাদি বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

৺রমেশচন্দ্র দত্তের আখ্যায়িকাবলিতে ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আছে। 'মাধবীকঙ্কণে' শ্রীশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ ও হেমলতার বাল্যলীলা স্পষ্টতঃ টেনিসনের Enoch Arden ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরে' অঙ্কিত চিত্রের অনুকরণ হইলেও, অতি সুন্দর হইয়াছে (১ম পরিচ্ছেদ)। ইহা আবাল্য প্রণয়ের একটি উজ্জ্বল ও মনোরম চিত্র। নরেন্দ্রনাথ ও হেমলতার বাল্যপ্রণয় কতদূর শিকড় গাড়িয়াছিল, উপহারীকৃত মাধবীকঙ্কণ শুকাইলেও এই প্রণয়তরু কেমন চিরহরিৎ ছিল, তাহা সমগ্র আখ্যায়িকাটি পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়।

আবার 'বঙ্গবিজেতা'য় ইন্দ্রনাথ ও সরলার প্রণয় এই শ্রেণীর। গ্রন্থকার ইন্দ্রনাথের (সুরেন্দ্রনাথ) প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—'ইচ্ছামতী-তীরে কতবার তিনি বালিকাকে খেলা দিয়াছেন, কতবার তাহাকে গল্প বলিয়াছেন,—এইরূপে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রনাথ ও সরলার মধ্যে সোদর-সোদরার প্রেম জন্মিয়াছিল। তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভাব অন্তরে উদয় হইয়াছে, তাহা অদ্যকার এই পূর্ণিমা-রজনীর পূর্ব্বে কেহই জানিতে পারে নাই।' (৫ম পরিচ্ছেদ।) আবার গ্রন্থকার সরলার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—'বাল্যকালে ইচ্ছামতী-তীরে যাহার পার্শ্বে বসিয়া গল্প শুনিত, গল্প শুনিত আর একদৃষ্টে সেই মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত; যৌবনের প্রারম্ভে যে-প্রেমময় মুখখানির কথা

সদাই ভাবিত, ভাবিত আবার সেই মুখখানি দেখিয়া হৃদয় শীতল করিত' ইত্যাদি (৩১শ পরিচ্ছেদ)। বাল্যকালে ক্রীড়াচ্ছলে সরলা 'একটি পুষ্পমাল্য লইয়া সুরেন্দ্রনাথের গলে পরাইয়া দিল' তাহা দেখিয়া উভয়ের পিতা উভয়কে সত্য-সত্যই পরিণয়-পাশে বদ্ধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, গ্রন্থকার একস্থলে ইহাও বলিয়াছেন। (১৯শ পরিচ্ছেদ)।

আবার 'সংসারে' শরৎ ও সুধার প্রণয়-সঞ্চার এই-ভাবেই হইয়াছিল। সুধা বাল্যকালের কথা বলিতেছেন, 'শরৎবাবু আমাকে কোলে করে পেয়ারা পেড়ে খাওয়াতেন', (৭ম পরিচ্ছেদ), 'ছেলেবেলায় তোমাদের বাড়ীতে আসিতাম, তখন এই পেয়ারা গাছের পেয়ারা তুমি আমাকে পাড়িয়া দিতে, তাই মনে করিতেছিলাম' শরৎ তদুত্তরে হাস্য করিয়া বলিলেন, 'সেই আমাদের প্রথম প্রণয় এখনও ভুলিতে পার নাই?' (৩০শ পরিচ্ছেদ)। আবার যৌবনোদয়ে বালবিধবা সুধা বলিতেছেন, 'শরৎবাবু রোজ সন্ধ্যার সময় ত আমাদের বাড়ীতে আসেন, কত গল্প করেন—সে গল্প শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।' (১শ পরিচ্ছেদ)। আর একস্থানে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'বালিকা সুধা নিদ্রা ভুলিয়া যাইত, একাগ্রচিত্তে সেই যুবকের দীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া থাকিত ও তাহার অমৃত ভাষা শ্রবণ করিত। শরতের তেজঃপূর্ণ গল্পগুলি শুনিয়া বালিকার হৃদয় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইত, শরতের দুঃখকাহিনী শুনিয়া বালিকার চক্ষু জলে ছল্ ছল্ করিত।' (১২শ পরিচ্ছেদ) এ যেন ওথেলো-ডেস্‌ডেমোনার বাঙ্গালী গার্হস্থ্য সংস্করণ। এই বাল্যপ্রণয়, সুধার কঠিন রোগের সময় শরতের অক্লান্ত শুশ্রূষায়, উভয়ের হৃদয়ে প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছিল, সে কথা দ্বিতীয় প্রকারের প্রণয়-সঞ্চারের আলোচনা-কালে পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। যাহা হউক, এই দুইটি চিত্র 'মাধবীকঙ্কণে'র চিত্রের ন্যায় তেমন উজ্জ্বল নহে।

আজকালকার বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট বড় মাঝারী গল্পে ও কবিতায় ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'বাগ্‌দত্তা'য় সত্য ও গৌরী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাসে' দেবদাস ও পার্ব্বতী, 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী'তে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী, 'স্বামী'তে যুবা নরেন ও সৌদামিনী, 'পরিণীতায়' যুবা শেখরনাথ ও ললিতা (শিক্ষক ও ছাত্রী), 'পল্লীসমাজে' রমেশ ও রমা, শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'বিধিলিপি'তে মহেন্দ্র ও কাত্যায়নী—সবগুলিই সাহচর্য্যে প্রণয়ের দৃষ্টান্ত। 'অরক্ষণীয়া'য় যুব অতুল ও জ্ঞানদার বেলায় সাহচর্য্যও আছে, রোগে সেবাও আছে। ইহার মধ্যে সত্য ও গৌরী এবং দেবদাস ও পার্ব্বতীর বাল্য-সাহচর্য্যের চিত্র অতি উজ্জ্বল ও মনোরম। সম্প্রতি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত (বৈশাখ ১৩২৬) 'রেণু' কবিতায় বাল্য-প্রণয়ের একটি করুণ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

বারান্তরে এই শ্রেণীর প্রণয় সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিব।

শ্রদ্ধাহোম

[শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

(অহং শ্রদ্ধাং জুহোমি।—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)

প্রভাতের দিব্যালোকে ওগো জ্যোতির্ম্ময়!
বিশ্ব-করে তোমা আজি করি সমর্পণ;—
তপন পবন নভঃ বিহঙ্গ-কূজন
তরু লতা পত্র পুষ্প ধূলিরেণুচয়
সকলি হইয়া পূর্ণ তোমারি সত্তায়
প্রকাশ করুক তব দীপ্ত মহিমায়!

সন্ধ্যার স্তিমিতালোকে হে বিশ্ব শরণ!
তব করে অর্পিতেছি শ্রান্ত বসুধায়;—
অনন্ত কর্ম্মের স্রোতে উন্মত্তের প্রায়
আশা-মরীচিকা-পদে লুণ্ঠিত ভুবন।
দিনান্তে নিমগ্ন হয়ে তব করুণায়
জুড়াক লভিয়া প্রাণে প্রাণেশ তোমায়!

এ মহান্ বিশ্ব-যজ্ঞে ক্ষুদ্র আমি হায়,
শ্রদ্ধাই আহুতি শুধু সঁপি রাঙ্গা পায়!

যুদ্ধ-বন্দীর আত্মকাহিনী

[শ্রীআশুতোষ রায়]

দ্বিতীয় পর্ব্ব

বসোরা হইতে তুর্কীরা বিতাড়িত হইবার পর দেখা গেল, আফিস ইত্যাদি যেমন ভাবে সজ্জিত থাকিতে হয়, সেইরূপেই আছে; যেখানকার যে জিনিষ, সেখানে তাহা সেইভাবেই পড়িয়া আছে। টেবিলগুলির দেরাজ বন্ধ। চাবির গোছা দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছে। দেরাজগুলি খুলিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে ৫।৭টি করিয়া শীলমোহর এবং আফিস-সংক্রান্ত শিরোনামা-ছাপা কাগজপত্র,—অবশ্য সবগুলিই তুর্কী ভাষায় মুদ্রিত। তাড়াতাড়িতে তুর্কীরা সব ফেলিয়া পলাইয়াছে। গুদামগুলিতে নানাপ্রকার জিনিস রাশীকৃত সাজান রহিয়াছে, কিছুই লইয়া যাইবার অবসর পায় নাই। আরব, আরমাণি এবং ইহুদী ছাড়া তুর্কীরা প্রায় সকলেই সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। আরবদের মুখে শোনা গেল, ২০।২৫ জন তুর্কী সহরে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিচরণ করিতেছে। ধনী আর্ম্মাণীরা আমাদের সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে লাগিল এবং জেনারল্ সাহেবকে স্ব স্ব গৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদের সৌজন্য হয় ত মৌখিক নাও হইতে পারে; কারণ, তুর্কীর আচরণে তাহারা অতিষ্ঠ হইয়াছিল,—তাই ইংরাজকে পাইয়া খুব আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। ঘুড়ি-গাড়ী লইয়া অনেকে জেনারল্ সাহেবকে লইয়া যাইবার জন্য আসিল; জেনারল্ সাহেবও সকলকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া কোন-কোন বিশিষ্ট লোকের বাড়ীতে গিয়া তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া আসিলেন; কিন্তু তাহাদের চা, পানি কিংবা কোনরূপ ফলমূল উপঢৌকন গ্রহণ করেন নাই; করাও যুক্তিসঙ্গত ছিল না। শত্রুর দেশ, কে কি ভাবের লোক জানা নাই,—খাদ্যাদির সঙ্গে কোনরূপ বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া জীবনহানি ঘটাইবার সম্ভাবনা আশ্চর্য্য নহে। সব চুপ-চাপ হইয়া গেলেও সন্ধ্যার পর সহরের মধ্যে ভ্রমণ কিছুকাল নিরাপদ ছিল না। রাত্রিকালে অনেক বাটীর ছাত হইতে কিংবা অন্ধকার গলির মধ্য হইতে গুলি চলিত; সুতরাং ৬টার পর সহরের মধ্যে কাহারও যাইবার হুকুম ছিল না। এইরূপ অবস্থায় বৃটিশরাজের প্রথম কাজ হইল অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লওয়া। অতএব স্থানীয় অধিবাসীদিগকে নোটিশ দিয়া জানাইয়া দেওয়া হইল যে, ১৫ দিনের মধ্যে সকলকেই বন্দুকগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে জমা দিতে হইবে,—ঐ সময়ের পর কাহারও গৃহে বন্দুক পাওয়া গেলে তাহার ফাঁসি

যুদ্ধ-বন্দী শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়

হইবে। কথানুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে চলিল। সহরের মধ্যে ফাঁকা একটী প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসী-কাষ্ঠ দণ্ডায়মান হইল। আশ-পাশে পাহারার বন্দোবস্ত হইল। প্রত্যহ শত-শত বন্দুক জমা হইতে লাগিল। ক্রমে ওয়াদার দিন ফুরাইয়া গেল। ১৫ দিন পরে খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। যাহাদের নিকট হইতে লুক্কায়িত বন্দুক বাহির হইল, সামরিক আইন অনুসারে তাহাদের ফাঁসি হইয়া গেল। সহরবাসী সকলেই বিশেষ সশঙ্কিত হইল; কাহারও নিকট আর ২।১টী

বন্দুক লুক্কায়িত থাকিলেও, তাহার আর তাহা বাহির করিবার সাহস রহিল না। সহরবাসীর উপর কোন সিপাহী যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না করে, তাহার ব্যবস্থা হইল। সামরিক পুলিস সহরে সদাসর্ব্বদা ঘুরিতে লাগিল—পাস ব্যতীত কাহাকেও সহরে যাইতে দেওয়া হইত না। বসোরা সহরটী নদীতীর হইতে প্রায় ১॥ মাইল। সাটেল্ আরব (Shat-el-Arab) হইতে একটী নালা (Creek) বসোরা সহরের নীচে দিয়া গিয়াছে; নৌকায় অথবা ফিটনে

আরব স্ত্রী-পুরুষ

যাওয়া যায়। সহরটী আমাদের দেশের একটা জেলার মত। দোকানগুলি বেশ সাজান। বাজারের রাস্তাগুলির উপরিভাগ টালী দ্বারা আবৃত; বৃষ্টিতে ভিজিতে হয় না। ভিন্ন-ভিন্ন জিনিসের ভিন্ন-ভিন্ন পটী (row) ছাড়া সেই জিনিস অন্য স্থানে পাওয়া যায় না। সাটেল্ আরব হইতে যে নালা বসোরা সহরের দিকে গিয়াছে, তাহার প্রবেশের মুখে আর একটী বাজার আছে; তাহাকে "আসার" (Ashar) বলে। এখানে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস এবং বাজারটীও নিতান্ত ছোট নয়। এই নালায় এবং বড় নদীতে আমাদের দেশের ছিপ্ নৌকার মত, কিন্তু আকৃতিতে কিছু ছোট, এক প্রকার নৌকা আছে; তাহাকে "মাহেলা" (Mahella) কহে। দ্রুত গমনের জন্য ইহার সমধিক প্রচলন। নদীতে ভ্রমণের জন্য অবস্থাপন্ন প্রায় সকল ভদ্রলোকেরই এই 'মাহেলা' এক-একখানি আছে, এখানে "কাওয়াখানা" (Coffee-shop) বা কাফির দোকান প্রায় প্রত্যেক গলিতে আছে; আমাদের দেশের গরম চার দোকানের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, আমাদের দেশে শুধু সকাল-সন্ধ্যায় চা-পায়ীদের ভিড়; সেখানে সমস্ত দিন কাফিখোরদের ভিড় লাগিয়া আছে। আর্ম্মাণী এবং আরব পুরুষদের সহিষ্ণুতায় বলিহারি যাই যে, ঠায় একস্থানে বসিয়া থাকে, কোনরূপ নড়ন-চড়ন নাই। কি করিয়া থাকিতে পারে, ইহাই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতাম। কেহ-কেহ বাটীতে আহারাদি পর্য্যন্ত করিতে যায় না, বাজার হইতে ৪।৫ খানা "খবুজ" (loaf) এবং কিছু মাংস কিনিয়া খাইয়াই দিন কাটাইয়া দেয়। রুটীকে আরবীতে "খবুজ" বলে। এখানে হোটেলের অভাব নাই। ইহারা কাফি খুব গাঢ় করিয়া, এক টুক্‌রা চিনি দিয়া, ক্ষুদ্র একটী পেয়ালায় রাখিয়া পান করে। কাফির রং ঘন কৃষ্ণবর্ণ এবং তিক্তস্বাদযুক্ত। উক্ত পেয়ালায় ডেজার্ট চামচের (Dessert Spoon—that is about 2 fluid Drachms) দুই চামচের অধিক কাফি ধরে না। 'খবুজ'গুলি মোটা রুটির মত তৈয়ারী করিয়া "তন্দুরের" (oven) মধ্যে সেঁকিয়া লওয়া হয়।

আরবেরা সাধারণতঃ বেশ বলিষ্ঠ; মাঝারী গড়ন, মুখশ্রী বীরত্বব্যঞ্জক; কিন্তু ক্রূরমতি। রং কৃষ্ণ-গৌরের সংমিশ্রণ। উপযুক্ত লোকের হাতে গঠিত হইলে, এই জাতি বীর জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণী আছে; তাহাদিগকে "বেদুইন" (Bedouin) বা চলিত ভাষায় "বদ্দু আরব" বলা গিয়া থাকে। ইহারা অসভ্য; বেশীর ভাগ লুটপাট করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ, উট, ঘোড়া ও গাধা পালন করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা আছে। ইহাদের থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই,—কাল কম্বল তাঁবুর আকারে খাটাইয়া এক স্থানে ২।৩ মাস বাস করে। আমাদের দেশের বেদেরা যেরূপ ভাবে

জীবন যাপন করে, তাহারাও তদ্রূপ; প্রভেদের মধ্যে এই যে, এদেশে উলঙ্গ থাকে না। বদ্দুরা আপাদকণ্ঠ একখানা চাদর ব্যবহার করে; তাহাও অত্যন্ত শিথিল ভাবে শরীরের উপর বিন্যস্ত করে। তদভাবে তাহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। সহরের নিকটবর্ত্তী বদ্দু আরবেরা আজকাল বস্ত্র ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। আলেপ্পো সহরের বদ্দু আরবের ছবি প্রদত্ত হইল; তাহা দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। উহাদের স্ত্রীলোকেরা অবশ্য লজ্জানিবারণোপযোগী বস্ত্রাদি ব্যবহার করে। অসভ্য হইলে কি হয়, অলঙ্কারপ্রিয়তা পৃথিবীর সমস্ত সভ্য-অসভ্য জাতির স্ত্রীলোকের মধ্যে সর্ব্বকালে বিদ্যমান। ইহারা শঙ্খের নানাবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করে। কণ্ঠদেশে প্রবালের মালাও পরিয়া থাকে। আমাদের দেশের ন্যায় নাসিকা ও কর্ণ বিদ্ধ করিয়াও অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়। বদ্দু আরবেরা অত্যন্ত হিংস্র,—বিনা কারণে ইহারা প্রাণ-নাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অপর শ্রেণীকে খদ্দি আরব বলে। ইহারা দেখিতে সুশ্রী এবং সবলকায়। একটি চৌদ্দ বৎসরের বালককে চারি মণ বোঝা লইয়া অনায়াসে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছি। আমাদের দেশের বলিষ্ঠকায় কোন মুটে বোধ হয় এত ভারি বোঝা লইয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। ইহারা বদ্দু জাতির মত হিংসাপরায়ণ নহে। ইহাদের ভাষার সহিত আমাদের ভাষার কিছু কিছু সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, যেমন 'জানি না' কথাকে তাহারা 'না জানে' বলে। গণনা এক হইতে দশ পর্য্যন্ত একই প্রকার; শুধু উচ্চারণে কিছু তারতম্য আছে। ইহাদের ভাষা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সাধারণতঃ আরব জাতি শঠতায় পরিপূর্ণ। ইহাদের সহিত ব্যবহারে সরলতা আশা করা যায় না। এওয়াজের (Ahwaz) দিকে ফুফ্র-যাত্রার সময়ের একটি ঘটনার কথা বলিলেই পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবেন। সৈন্যগণ কোন একটি আরব-পল্লীর নিকট দিয়া গমন করিতেছিল। আরবেরা মনে করিল, সৈন্যেরা বোধ হয় তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। সুতরাং তাহারা সাদা নিশান উড়াইয়া দিল। ইহার অর্থ, তাহারা শত্রুপক্ষীয় লোক নহে, বা তাহাদের মনে শত্রুভাব নাই; বরং তাহারা ইংরাজের অনুগত। ২।৩টি আরব শ্বেত পতাকা হস্তে লইয়া সৈন্যদের নিকট আসিয়া বলিল, তাহারা ইংরাজের বন্ধু; এবং কোন জিনিসের প্রয়োজন হইলে তাহারা সন্তোষের সহিত সরবরাহ করিবে। দোভাষী (Interpreter) এই সকল কথা সৈন্যাধ্যক্ষকে বুঝাইয়া দিলে, তিনি দুই তিনটি সিপাহী সঙ্গে দিয়া দুই জন কর্ম্মচারীকে কিছু আবশ্যক খাদ্য-দ্রব্য আনিতে পাঠাইলেন।

তাঁহারা গ্রামের দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে, গ্রামের লোকে এরূপ ভাবে গুলি চালাইতে লাগিল

সহরের নিকটবর্ত্তী বদ্দু আরব

যে, তাঁহারা বাধ্য হইয়া ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু হায়! তাঁহাদের আর ফিরিতে হইল না। বন্দুকের গুলিতে সকলেই ধরাশায়ী হইলেন,—আত্মরক্ষার সুবিধাও পাইলেন না। সেনাপতি মহাশয় তাহা দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ একটি বড় তোপ দাগিবার আদেশ দিলেন এবং গাঁ-টিকে উজাড় করিয়া দিতে বলিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে একটা গোলা যমদূতের মত গিয়া পল্লীর উপর পড়িয়া ফাটিয়া শতধা বিক্ষিপ্ত হইল,—সঙ্গে সঙ্গে ২।৩ খানা বাড়ী ভূমিসাৎ হইল।

বন্দুকের আওয়াজ থামিয়া গেল, আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল। স্ত্রীলোকের ক্রন্দন এবং বালকের আর্ত্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল। মুহুর্মুহু অগ্নিরাশি উদ্গীরণ করিয়া গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। ক্রমে পল্লীটি নিস্তব্ধ হইল ; আর কোথাও কিছু নাই। দেখা গেল গ্রামটি সমভূম হইয়া গিয়াছে। গোলা চলিবার প্রারম্ভেই কতকগুলি আরব-পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং বালকদিগকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়া "যঃ পলায়তি স জীবতি" দৃষ্টান্তের সাফল্য প্রমাণ করিয়াছিল। এই ঘটনার পর আরবেরা আর এরূপ কার্য্যের পুনরভিনয় করিতে সাহসী হয় নাই। ইংরাজও ইহার পর হইতে আরবদের সহিত ব্যবহারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। তথাপি আর একবার ইংরাজকে ইহাদের হাতে ধোকা খাইতে হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিব।

বসোরা সহরে যথেষ্ট বাগবাগিচা আছে। আরমাণিরা খুব বন-ভোজনের পক্ষপাতী। প্রতি শনিবারে তাহারা স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া কোন বাগানে গিয়া আমোদ-আহ্লাদ সহকারে বন-ভোজন করিয়া থাকে। আরমাণিরা দেখিতে যেমন সুশ্রী, মন তেমন সরল নয় এবং স্বাধীন জাতির ন্যায় নির্ভীকও নহে। তাহাদের ব্যবহার কাপট্যপূর্ণ। অনেক সময় মুখের ভাব হৃদয়ের পরিচায়ক ; কিন্তু এই জাতির মধ্যে তাহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। তজ্জন্যই ইহারা তুর্কীর নিকট পদে-পদে লাঞ্ছিত ও বিধ্বস্ত হয়,—সামান্য সুযোগ পাইলেই তুর্কীরা ইহাদের উপর অত্যাচার করে। নতুবা এই জাতি যেমন অধ্যবসায়ী, শ্রমশীল, বিদ্বান এবং ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহাতে ইহারা খুব উন্নত জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারিত; কিন্তু ব্যবহার-দোষে কেহই ইহাদিগকে বিশ্বাস করে না। এখানে ইহারাই আমাদের দোভাষীর কাজ করিত। ইহাদের আহার-বিহার, পরণ-পরিচ্ছদ তুর্কী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। মেওয়া ইত্যাদি পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু ফল ইহারাই অধিক ব্যবহার করে। বসোরায় আঙুর, ডালিম, নাসপাতী, খেজুর, কিসমিস, ডুমুর এবং তুঁত অপর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ডুমুর, খেজুর বিদেশে যথেষ্ট রপ্তানি হয়। ভেড়ার লোমও রপ্তানি জিনিসের মধ্যে একতম। *পারস্য দেশজাত* অতি সুন্দর-সুন্দর মূল্যবান গালিচাও যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে। এখানকার স্বনামধন্য বসরাই গোলাপ বিখ্যাত। স্থানের নাম হইতে এই গোলাপের নামকরণ হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সাতেল্ আরব নদীতে নানাবিধ মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শাক সব্জিও প্রায় সকল রকমই জন্মে। গ্রীষ্মকালে এখানে গরম অসহ্য। মশা মাছির উপদ্রব অতি ভয়ানক। গরমের সময় অনেক রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইতে হয়। অনেকেই ছাতের উপর মশারি খাটাইয়া রাত্রি যাপন করে। এক প্রকার ছোট কাল পোকার উপদ্রব আরও বেশি। ইহাকে পিশু বলে। এই জীবকে সহজে ধরিতে পারা যায় না,—পিছলাইয়া যায়। ১৪টি গাত্রবস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেই যথেষ্ট ; আর তিষ্ঠাইতে হয় না। তাহার উপর দু'দশ গণ্ডা যদি করেন, তবে ত আর দেখিতেই হয় না,—দংশনের জ্বালায় পাগলপারা হইতে হয়। মশারি দ্বারা মশা মাছির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় ; কিন্তু ইহার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া বড়ই দুষ্কর। এই পোকা আমাদের দেশে বিড়াল কুকুরের গায়ে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ইহার জ্বালায় অতিষ্ঠ হইতাম ; কিন্তু ধন্য তত্রত্য অধিবাসীদের সহিষ্ণুতা এবং চর্ম্মের স্থূলতা! তাহারা নির্বিকার চিত্তে ইহার দংশন-জ্বালা সহ্য করিত। অথবা এটি তাহাদের স্বদেশী বলিয়া, ইহার মধুর আবদারে তাহারা ভ্রূক্ষেপ করিত না।

পুরানো কথা—কলিকাতার অদূরে

[শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছিলাম ; এ দিকে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গাড়ী ছাড়িয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরে বন্দেলে আসিয়া উপস্থিত হইল, আমরাও নামিয়া পড়িলাম। সেবার হুগলীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ও পরম শ্রদ্ধাভাজন মাননীয় মহারাজা স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতি মহাশয়, তাঁহাদের অভিভাষণে বলিয়াছিলেন যে, "বাংলার পূর্ব্ব-গৌরব অদূরবর্ত্তী সপ্তগ্রাম—সপ্ত ঋষি তপস্যা করায় ঐ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিছু দূরে সিঙ্গুর—যে সিঙ্গুর হইতে সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ সাতশত মাত্র সেনা সমভিব্যাহারে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করেন,—'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।' সিংহবাহুর নাম হইতে সিংহগড় ও ক্রমে সিঙ্গুর নামের উৎপত্তি। নিকটেই বংশবাটীর প্রাচীন হংসেশ্বরী মন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া ও বাংলার খৃষ্টান মিশনারীগণের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গির্জ্জা পরিদৃশ্যমান। আর এই যে, "গ্যাসালোকোদ্ভাসিত, ইঞ্জিন-বংশীরব-মুখরিত প্রকাণ্ড বন্দেল জংশন—ইহা পর্ত্তুগীজদিগের সময়ে একটী বৃহৎ বন্দর ছিল, বন্দর ক্রমে বন্দেলে পরিণত হইয়াছে।"

হুগলী ইমামবারা

নদীতীর হইতে ইমামবারার দৃশ্য

তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমরা নামিয়া পড়িলাম। ষ্টেসন হইতে বাহিরে আসিয়া একখানি গাড়ীর আশ্রয় লইলাম। সন্দেহ-শঙ্কাকুলচিত্তে পক্ষীরাজ ঘোটকদ্বয়কে দেখিতে লাগিলাম—পাছে পশুক্লেশনিবারণী সভার কেহ আসিয়া উপস্থিত হন ; কিন্তু ইহাও মনে হইতে লাগিল যে, বৃষ্টি-সিক্ত হওয়া অপেক্ষা এ আশ্রয় অনেক ভাল।

নিকটবর্ত্তী ২।১টী ষ্টেসন গঙ্গাতীর হইতে কিছুদূরে, কিন্তু এদিকের পল্লী বা সহরগুলি ঠিক গঙ্গাতীর হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ষ্টেসনগুলির দূরত্বের কারণ, ইংরাজের সহিত ফরাসীর পূর্ব্ব-বিবাদ উপলক্ষে ফরাসীগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের নিকট দিয়া রেল পথ বসাইবার অনুমতি না দেওয়া। প্রথমতঃ আমরা বাংলার প্রাচীনতম খৃষ্টান গির্জ্জা দেখিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। গৃহগুলি সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত ; এবং সহরটীকে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বোধ হইল। কয়েকটী নূতন ও পুরাতন নিদর্শন অতিক্রম করিয়া আমরা গির্জ্জায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এখনকার গঙ্গাতীরের দৃশ্য অতীব মনোমুগ্ধকর। ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম ভাগে ওয়ারেণ হেষ্টিংস-প্রমুখ রাজপুরুষগণের এই স্থান বিশ্রাম-নিবাস ছিল। কোলাহলময় কলিকাতা হইতে বিশ্রাম-সুখ উপভোগের জন্য তাঁহারা বড়-বড় বজ্‌রা-যোগে এই স্থানে সমবেত হইতেন। বন্দেল সে সময়ে—"সুইট্ ব্যাণ্ডেল" নামে অভিহিত হইত ও রাজ-কর্ম্মচারিগণের নিকট—সিমলা, দার্জ্জিলিং, মুসৌরী,

নাইনিতাল, পুরী, রাঁচী, উতকামন্দ ইত্যাদি শৈল বা বিশ্রাম-নিবাসের স্থান অধিকার করিত।

গঙ্গার তীরে এই পুরাতন সুদৃশ্য গির্জ্জা অবস্থিত। সকল পুরাতন স্থানের ন্যায় এ স্থানেও নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। গির্জ্জার অভ্যন্তরে এক স্থানে "Blessed Lady of Happy Voyage" নামে একটী মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিটীর এই স্থানে আগমন সম্বন্ধে কথিত হয় যে, পূর্ব্বে উহা হুগলীর পর্ত্তুগীজ ফ্যাক্টরীর গির্জ্জায় রক্ষিত ছিল।

প্রধান প্রবেশদ্বার

গির্জ্জার পুরোহিত মূর্ত্তিটীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং প্রতিদিন বহুক্ষণ তাহার সন্নিকটে বসিয়া উপাসনাদি করিতেন। তাঁহার একজন পর্ত্তুগীজ সওদাগর বন্ধুও তাঁহার ন্যায় মূর্ত্তিটীকে বিশেষ ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন; এবং কোন কার্য্যারম্ভের প্রারম্ভে প্রথমতঃ তথায় উপাসনাদি করিতেন। সাজাহানের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক হুগলীর পর্ত্তুগীজ দুর্গ ও গির্জ্জা ইত্যাদির ধ্বংস সময়ে এই গির্জ্জাও একেবারে অব্যাহতি পায় নাই। সওদাগর সৈন্যগণের হস্ত হইতে মূর্ত্তিটীকে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন এবং সুযোগ বুঝিয়া মূর্ত্তিসহ অপর পারে যাইবার উদ্দেশ্যে গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করেন। তদবধি আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। গির্জ্জার পুরোহিত সৈন্যগণের হস্তে বন্দী হন; তিনি তাঁহার বন্ধুর কার্য্যাকলাপে মুগ্ধ হইয়া ভগবানের নিকট উভয়ের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতে থাকেন।

এই ঘটনার অনেক দিন পরে ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার সংস্কার আরম্ভ হয়। একদা রজনীতে পুরোহিত অনিমেষ লোচনে গবাক্ষ-পথে চাহিয়া আছেন। জ্যোৎস্না প্লাবিত গঙ্গা-বক্ষ হইতে জলের অতি সুমধুর কল্লোল-ধ্বনি শুনা যাইতেছিল; তদ্ভিন্ন চারিদিকে নিস্তব্ধতা। সহসা এই নিস্তব্ধতা কোথায় মিলাইয়া গেল; চারিদিক ঘোর অন্ধকারময় হইয়া গেল; নদীর কল্লোল ক্রমে গর্জ্জনে পরিণত হইয়া চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। গঙ্গা যেন গির্জ্জাটিকে তাঁহার অতল সলিলে নিমজ্জিত করিতে অগ্রসর হইলেন। ঘোর রবে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া বায়ু বহিতে লাগিল। সেই ভীষণ গর্জ্জনে পুরোহিত চমকিত হইলেন, তাঁহার তন্দ্রা দূর হইল। তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, এমন সময়ে পরিচিত গম্ভীর অথচ সুমিষ্ট স্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, যেন তাঁহার সেই পুরাতন সওদাগর বন্ধু বলিতেছেন, "এস, এস, দেখ, তোমারই কল্যাণে আমরা জয়লাভ করিয়াছি! বন্ধু, ওঠ, সকলের মঙ্গল প্রার্থনা কর!" (*"Salve! Salve! Salve! a nossa senhora de Boa Viagem que deu nos esta victoria. Levante, Levante, o padre o orai por todos nos."*)

পুরোহিত গবাক্ষের অতি নিকটে আসিয়া দেখিলেন, গঙ্গা-বক্ষের কিয়দংশ অত্যুজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত। পরক্ষণেই সেই আলোক কোথায় মিলাইয়া গিয়া নদীর উপর ঘোর অন্ধকারের বিকট ছায়া আসিয়া পড়িল; এবং চারিদিকে পুনরায় গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। চিন্তাকুল পুরোহিত শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

প্রত্যূষে ফটকের নিকট কয়েকটী লোকের চীৎকার ও জটলায় ভৃত্যবর্গ তথায় উপস্থিত হইল; এবং তাহাদের সেই পরিচিত মূর্ত্তি তথায় দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। তাহারা ত্বরিতপদে গির্জ্জার অধ্যক্ষের নিদ্রাভঙ্গ করতঃ এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিল। পাদ্রী এই সংবাদ শ্রবণে পূর্ব্ব রজনীর কথা স্মরণ করিলেন এবং বুঝিলেন যে, তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহা স্বপ্ন নহে, সম্পূর্ণ সত্য। অবিলম্বে প্রসাধন সমাপনান্তে ফটকে

উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেই আরাধ্য মূর্ত্তি—যাহাকে তিনি আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, দেখিতে পাইলেন। দর-বিগলিত ধারে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে ভূমি স্পর্শ করিয়া সাষ্টাঙ্গে মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন; এবং বহুক্ষণ ধরাবিলুণ্ঠিত অবস্থায় সেই স্থানে কাটাইলেন। ইহার পর তিনি মহা আড়ম্বর সহকারে সেটাকে গির্জ্জাভ্যন্তরে স্থাপন করেন ও এতদুপলক্ষে কয়েক দিন ধরিয়া উৎসব চলিতে থাকে। পরে উহা স্থানান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান স্থানে রক্ষিত হয়।

বন্দেল গির্জ্জা

গির্জ্জার সম্মুখভাগে এক স্থানে জাহাজের একটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মাস্তুল মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ সম্বন্ধেও একটী গল্প প্রচলিত আছে। গির্জ্জায় যখন উপরোক্ত উৎসব চলিতেছিল, সেই সময় একদিন সকলেই দেখিল, একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ বন্দেল অভিমুখে আসিতেছে। জাহাজ তথায় পহুঁছিলে সকলে অধিকতর বিস্মিত হইল; কারণ ঐ জাহাজের তথায় আসিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কাপ্তান গির্জ্জায় আগমন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার জাহাজ বঙ্গোপসাগরে অকস্মাৎ ভীষণ ঝটিকা মধ্যে পতিত হয়। পর্ব্বতাকৃতি সাগর-তরঙ্গ একটীর পর একটী করিয়া জাহাজকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই তিনি পোত সহ সলিল-সমাধির চির-আশ্রয়ে যাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঝড়ের বেগে জাহাজ তখন এরূপ স্থানে গিয়া পড়িয়াছে, যেখান হইতে তীর বহুদূরে—দৃষ্টিপথে কেবল সমুদ্রের অকূল বারি-রাশি। হতাশ কাপ্তান ভগবানকে স্মরণ করিয়া শপথ করিলেন যে, তিনি উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলে, Blessed Virginএর নিকটে এরূপ কোন নিদর্শন উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিবেন, যাহাতে এই রক্ষার বিষয় চিরদিন সকলের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকে। ক্রমে ঝটিকা কমিয়া আসিল; সাগর পুনরায় স্থির হইল; অনুকূল বায়ু বহিয়া জাহাজকে অচিরে বন্দেলে লইয়া আসিল। Blessed Ladyর মূর্ত্তির পুনঃপ্রাপ্তি এবং ঝটিকা হইতে নাবিকের জাহাজ-রক্ষা—এই দুইটী ব্যাপার প্রায় একই সময়ে সংঘটিত হয়—ইহা আশ্চর্য্য-জনক সন্দেহ নাই।

হর্ষোৎফুল্ল নাবিকগণ কাপ্তানের আদেশ মত জাহাজের একটী মাস্তুল খুলিয়া আনিয়া গির্জ্জা-প্রাঙ্গণে স্থাপনান্তর উৎসবে যোগদান করিল। তদবধি আজ কিঞ্চিদধিক তিনশত বৎসর কাল সেই কাষ্ঠময় মাস্তুল তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া বিজয়ী বীরের ন্যায় কালের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিতেছে। প্রায় তিনশত শীত-আতপ-বর্ষা উপর দিয়া বহিয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহাতে কালের কিছুমাত্র ছাপ পড়ে নাই। নিকটবর্ত্তী অশিক্ষিত লোক-জন দেবতার সামগ্রী বলিয়া ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিলেও ইহা যে কাষ্ঠের উৎ-কৃষ্টতার পরিচায়ক তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

১৬৪৬ খৃঃ সা-সুজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত ৭৭৭ বিঘা জমির মধ্যে অধুনা ৩০০ বিঘা এই গির্জ্জার অধিকারভুক্ত রহিয়াছে। গির্জ্জাটী এরূপ পুরাতন হইলেও বেশ যত্ন সহকারে রক্ষিত হইতেছে; এ জন্য গৃহগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চূড়ায় উঠিবার সোপানের নিকট Blessed Lady of Happy Voyageএর মূর্ত্তিটী সংরক্ষিত। মূর্ত্তিটা দেখিয়া বোধ হয়
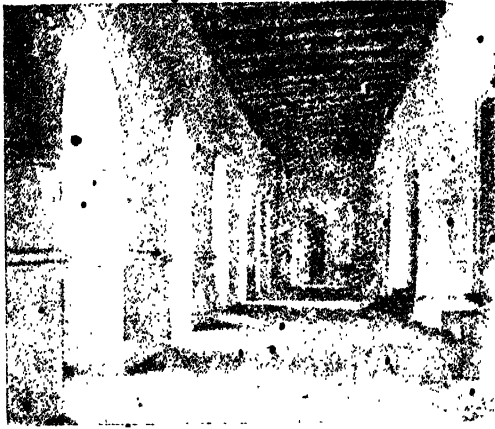
গির্জ্জার অভ্যন্তরভাগ

গির্জ্জার উদ্যান

না যে, তাহা প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাগর্ভে অধিষ্ঠান করিতেছিল; বরং তাহা অপেক্ষা কিছু আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়। তাহার সন্নিকটে একখানি প্রস্তর-ফলকে লিখিত আছে—"Dedicated to our Blessed Lady of Happy Voyage by Her devout client Mrs. Daisy Jeminia Hill, Lady Patroness, Bandel Church."

অপর একটী প্রাচীর-গাত্রস্থিত একখানি প্রস্তরে ১৫৯৯ তারিখটী খোদিত রহিয়াছে। অনুমান হয় ঐ বৎসর গির্জ্জার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৬৩২ খৃঃ সাজাহান কর্ত্তৃক পর্ত্তুগীজ-হুগলীর আক্রমণ উপলক্ষে ইহারও অল্প বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। গেজেটীয়ারের মতে ইহা একেবারে ভূমিসাৎ হয়; কিন্তু ১৮৯৯ খৃঃ তদানীন্তন গির্জ্জাধ্যক্ষ Fr. Rodrigueএর লিখিত বন্দেল গির্জ্জা সম্বন্ধীয় পুস্তিকায় প্রকাশ যে, উহার আংশিক ক্ষতি হইয়াছিল মাত্র। ১৬৬০ খৃঃ মোগল সরকার হইতে পর্ত্তুগীজগণ পুনরায় ইহার অধি-

একজন নৌ সেনাপতির অর্ঘ্য (একটী মাস্তুল)
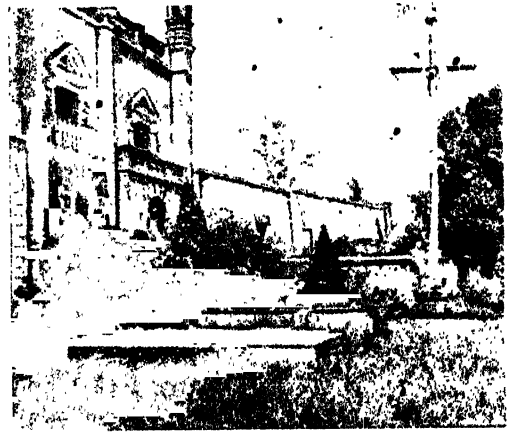
কার প্রাপ্ত হন এবং আবশ্যক মত সংস্কারাদি করেন। কথিত আছে তদানীন্তন অধ্যক্ষ Fr. Joas da Cruz কোন কারণ বশতঃ আগ্রায় সম্রাট সাজাহানের কোপে পতিত হওয়ায়, হস্তী-পদতলে তাঁহার ও তাঁহার সহযোগী খৃষ্টানদিগের নিষ্পেষণের আদেশ প্রচারিত হয়। মত্ত হস্তী তাহার কার্য্যসাধন করিতে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ তাহাতে বিরত হয়। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার এই কার্য্যে প্রবৃত্ত না হওয়ায়, সম্রাট এরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হন যে, তাঁহাদের মুক্তির ও গির্জ্জা প্রত্যর্পণের আদেশ প্রদান করেন। এই রূপে কয়েকজন আদর্শ খৃষ্টান পাদ্রীর কার্য্যকলাপে বাংলার প্রাচীনতম গির্জ্জা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।(১)

(১) পুরাতন কাগজপত্র হইতে সংগৃহীত।

বহুদূর হইতেই হুগ্‌লীর সুবিখ্যাত ইমামবাড়ীর প্রবেশ-পথের উপরিস্থ সু উচ্চ ও সুদৃশ্য মিনারগুলি দর্শকের দৃষ্টি-পথে পতিত হয়—গির্জ্জা হইতে সে দৃশ্য সুস্পষ্ট।

মহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসীন কর্তৃক প্রদত্ত (১৮০৬) বিষয়ের আয় হইতে এই সুদৃশ্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয়। প্রথমতঃ এই স্থানে মহসীনের পুরাতন গৃহ অবস্থিত ছিল। ১৮৪১ খৃঃ ইমামবাড়ীর প্রস্তুত-কার্য্য আরম্ভ হয় ও ১৮৬১ খৃঃ ইহা বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হয়। প্রবেশ-পথের উপরিস্থিত মিনার দুইটার উচ্চতা প্রায় ৮০ ফিট। উভয়ের মধ্যস্থলে একটা বহুমূল্য ঘড়ি রক্ষিত আছে। ঘড়িটা বহু অর্থব্যয়ে বিলাত হইতে আনীত হইয়াছিল। যখন বাজিতে আরম্ভ করে, তখন উহা হইতে অতি মিঠা আওয়াজ বাহির হয়।

ইমামবাড়ীর অভ্যন্তরে চতুর্দ্দিকে সুদৃশ্য গৃহবেষ্টিত একটা প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ চাতাল; তাহার মধ্যস্থলে কয়েকটা সুন্দর ফোয়ারা, ও ক্ষুদ্র পুষ্করিণী-বিশেষ একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা। নানা জাতীয় সুবর্ণমৎস্য তাহাতে ক্রীড়া করিতেছে। উত্তরে প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রস্তুত সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত মস্‌জিদ; অদূরে অধ্যাপন গৃহ ও ছাত্রাবাস। মুসলমান সমাজের কোহিনূর এই মহম্মদ মহসীনের স্বর্গে আজ আমাদের দেশের শত-সহস্র মুসলমান ছাত্র যে কিরূপ উপকৃত হইতে-ছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

আজ এই পর্য্যন্ত। সময়ান্তরে ইহার সম্বন্ধে আরও দু'-একটা পুরাতন কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।(২)

(২) ছবিগুলি পুরাতন কাগজপত্র হইতে সংগৃহীত।

প্রত্যাখ্যান

[কবিরাজ শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত]

সভাতলে দাঁড়াইলা শকুন্তলা আসি
ঋষি-পুত্রদ্বয়-সহ। কিবা রূপরাশি!
চমকিল সভাবৃন্দ; ভাবিল বিস্ময়ে,—
ধর্ম্ম, তেজঃ আইলা কি পরা-বিদ্যালয়ে?
অথবা কি জগতের সুষমানিচয়
যোগবলে মূর্ত্তি গড়ি ঋষি-পুত্রদ্বয়,
আনিল কি মহারাজে দিতে উপহার?
বিস্মিত দুষ্মন্ত চাহি; হৃদয়ে তাহার
বহিল চিন্তার স্রোত;—কভু হেন রূপ
দেখিয়াছি! অসম্ভব, অপূর্ব্ব এ রূপ!
এ তরল জ্যোতিঃ নহে ঐশ্বর্য্য ধরার,
ধরারে করিতে ধন্য শোভা অমরার
পূর্ণমূর্ত্তি হয়ে এল;—মানস-প্রতিমা
অথবা কি ঋষিদের যোগের মহিমা
প্রচারিতে! কিম্বা দুই দেব-শিশু সাথে
ছদ্মবেশে বসন্তের প্রথম প্রভাতে,
স্বপ্নদেবী আইলা কি ধরারে দেখিতে,
নিদ্রায় মানব নেত্রে সুষমা আঁকিতে?
রাজার এ রাজদণ্ড তুলাদণ্ড নহে
রমণীর রূপ পরিমাণে। সদা বহে
দোষীর দুর্নীতি দণ্ড কত পরিমাণ।
ঋষি পুত্রদ্বয়ে ধীরে করিয়া আহ্বান
জিজ্ঞাসিলা মহারাজ, "কি কারণে বল,
পবিত্রিলা পদরজে এই সভাস্থল?"
উত্তরিলা শার্ঙ্গরব গম্ভীর বচনে
"আসি নাই মহারাজ! বিনা প্রয়োজনে,
কণ্বের পালিতা কন্যা নাম শকুন্তলা,
শিখেনি সংসার-ধর্ম্ম এ মুগ্ধা সরলা;
শিখিতে সংসার-ধর্ম্ম, পতিগৃহে আজ
পশিতে আশ্রম-কন্যা ওহে মহারাজ!
সঙ্গে আনিয়াছে দোঁহে।" কহিলা নৃমণি
রুদ্ধকণ্ঠে "উপেক্ষিতা হায় কি রমণী?
তাই কি বিচারপ্রার্থী।" "না—না মহারাজ!"
উচ্চারিল ঋষিকণ্ঠ।—"তবে কিবা কাজ?"
কহে রাজা।—"কিবা কাজ?" কহে ঋষিদ্বয়—
"সত্যই কি রাজধর্ম্ম কূটনীতিময়!
দোষী প্রজা প্রতি শুধু দণ্ডের বিধান!
দোষী রাজা প্রতি মৌন দণ্ড অভিধান!"

"আমি দোষী!" "তুমি দোষী!" হইল উত্তর
ঋষির গম্ভীর কণ্ঠে। উঠে উচ্চ স্বর,—
"রাজ্যের সম্রাজ্ঞী আজ রাজ-সভাতলে!
উপেক্ষিছ মহারাজ! কোন্ বিধি-বলে?
মনে কর মহারাজ, মৃগয়া-সন্ধান!
'ন হন্তব্যঃ' উঠেছিল নিষিদ্ধ আহ্বান
বৈখানস মুখে করিয়া উদ্রেক দয়া।
করেছিলে মহারাজ! অপূর্ব্ব মৃগয়া!
অপূর্ব্ব আতিথ্য লভি হৃষ্ট হলে তুমি,
বান্ধিলে প্রীতির ডোরে তপোবন-ভূমি।
ভবিষ্য এ সিংহাসন আসন যাহার,
তার ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে জঠরে উহার।"
রাজেন্দ্র কহিলা ক্ষোভে "সম্বর রসনা।
বেদ-মন্ত্র-পূত জিহ্বা, কি লজ্জা, ছলনা
ঢালি দিল ক্রম নাশি! সুধা-প্রবাহিনী
বিষ-দিগ্ধ তিক্ত আজ! পূত মন্দাকিনী
বহিল যে নরকের পঙ্কিল সলিল!
কি তীব্র উষ্ণতা বহে মলয় অনিল!
হেন অশ্রদ্ধার বাণী কভু না সম্ভবে
ঋষিমুখে,—তত্ত্বদর্শী যারা এই ভবে।
আশ্রমের প্রতি বন, প্রতি তরুলতা
শিখায় যাদের শুধু সংযমের কথা,
তারা আজ অসংযত নারী-চিত্তখানি
রাজকোষে দিতে চায় উপহার আনি।
সত্য বটে, রাজনীতি সুকৌশলময়ী
কিন্তু রাজা চিরদিন ইন্দ্রিয়-বিজয়ী।"
রোষে শার্ঙ্গরব কহে "ধিক্ মহারাজ!
সত্যেরে নাশিতে চাহ দিয়ে মিথ্যা সাজ!
বুঝেছ কি মহারাজ, স্বপনের দ্বারে
দাঁড়ায়েছে জাগরণ বুঝাতে তোমারে;—
শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য, হায়, গান্ধর্ব্ব-মিলনে
উপেক্ষা করিতে চাও জানি না কেমনে
এই তব ধর্ম্মপত্নী জানিহ রাজন!
ইচ্ছা হয় কর ত্যাগ অথবা গ্রহণ।"
ক্রোধে ঋষিদ্বয় চলে সভাতল ছাড়ি;
সসম্ভ্রমে ছাড়ে দ্বার শাস্ত্রী প্রতিহারী।
খুলিয়া গুণ্ঠন নিজ দেবী শকুন্তলা,
চাহিয়া রাজার পানে হইয়া বিহ্বলা,
কহিলা দীপক রাগে,—"ওহে মহারাজ!
অসংযতা আমি! হায়, রমণী-সমাজ
অসংযত! পাপগন্ধী সুতীব্র নিঃশ্বাস
পুরুষের বহে যবে,—নরক নিবাস
হয় ধরা, রমণীর অঙ্গ স্পর্শ করি।
রমণীর রুদ্ধদ্বারে সমাজ প্রহরী।
পুরুষের ডাকে মুক্ত সমাজের দ্বার;
দুর্ব্বলা অবলা পায় সহস্র ধিক্কার!
আদ্যাশক্তি জননীর অংশ যে আমরা,
অনাহুতা আসি নাই দিতে নিজে ধরা!
আমি পত্নী তব, তুমি মৃগয়া-সন্ধানে
বেঁধেছিলে এ হৃদয় গান্ধর্ব-বিধানে।
স্বার্থনিষ্ঠ পুরুষের যেরূপ বিধান,—
পুরুষ যেরূপে করে সমাজ কল্যাণ,—
করিয়াছ মহারাজ! দেখিনু বিচারি,
লজ্জার কঠিন ঘায়ে রাজশক্তি মরি
সঙ্কোচিতা! শক্তিমতী আমরা রমণী,
সত্য যাহা বুঝি তাহা শুনুক অবনী।
পৃথ্বী ছাড়ি স্বর্গ পথে উঠুক এ রব,—
'পত্নী ত্যাগী তুমি' আমি ধর্ম্মপত্নী তব।'
'পত্নীত্যাগী মহারাজ' উঠিল ধ্বনিয়া;
নামিল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ অম্বর ভেদিয়া।
অন্তর্হিতা শকুন্তলা তেজ মধ্যে পশি;—
দীপ্ত সৌরকরে যেন লুকাইল শশী।

দেশ ও কাল

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ]

বাহ্য-জগতের পরিচয় দিতে যাইয়া বিজ্ঞান মানবের ইন্দ্রিয়-সমূহকে যথাসম্ভব জবাব দিতে চলিয়াছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ দ্বারা প্রকৃতির পরিচয় লওয়া একজন সাধারণ লোকের চলে, বৈজ্ঞানিকের চলে না। কাণা, কালা পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকের কথা ছাড়িয়া দাও, সাধারণ সুস্থ সবল লোকের ইন্দ্রিয়জনিত অনুভূতি যে একেবারে হুবহু মিলে, বিজ্ঞান তাহা স্বীকার করিতে পারিল না। সে দেখিল, —খাঁদা নাক, চেপ্টা মুখ পৃথিবীর এক জায়গাকার লোকের কাছে সৌন্দর্য্যের খনি, অপর স্থানের লোকের নিকট উহা কুৎসিৎ, কদাকার; রসগোল্লা মিষ্ট বটে কিন্তু থালা-ভরা রসগোল্লা ফেলিয়া অম্বুরি তামাক-সাজা সট্‌কায় মুখ দেওয়া কাহারো-কাহারো কাছে অধিক লোভনীয়; রুমালে ল্যাভেণ্ডারের গন্ধের চাইতে গোলা হাঁড়ির গোবরের গন্ধ অনেক দিদিমার কাছে বেশী মিঠে; মলয়ানিল কাহারও পক্ষে অতি শীতল, কাহারও পক্ষে দার্জ্জিলিং সিমলা যাইবার নিমিত্ত-কারণ মাত্র; এবং শ্রেণী বিশেষের চীৎকার শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু'দিগের নিকট সঙ্গীত। তাহার পর, বিভিন্ন ব্যক্তির একই ইন্দ্রিয় কিরূপে তুলনা করা যাইতে পারে? রক্ত-জবাকে তুমিও লাল বলিতেছ, আমিও লাল বলিতেছি; তাহাতে কিন্তু এ দাঁড়ায় না যে, তুমি ইহার যে রং দেখিতেছ, আমিও ঠিক সেই রংটা দেখিতেছি; এমনও হইতে পারে, আমি লাল দেখিতেছি, আর তুমি সম্পূর্ণ একটা পৃথক রং দেখিতেছ। তবে তুমি যে লাল বলিতেছ, তাহার কারণ তোমার যখন আধ-আধ কথা ফোটে, তখন ঐ জবাকে লাল বলিতে আমি শিখাইয়াছি; তাই বরাবরই তুমি উহাকে লাল বলিয়া আসিতেছ; কিন্তু যাহা দেখিতেছ, তাহা আমি যাহা দেখিতেছি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শুধু এই নয়, একই জিনিষ, একই লোকের কাছে অবস্থা-ভেদে রকম-রকম ঠেকে। বাঁ হাতটা বরফ-জলে এবং ডান হাতটা গরম-জলে খানিকক্ষণ রাখিয়া কলসীর জল পরীক্ষা কর, বাঁ হাত দিয়া ছুঁইলে কলসীর জল খুব গরম ঠেকিবে এবং ডান হাত দিয়া ছুইলে সেই একই জল সেই একই লোকের কাছে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইবে। বিজ্ঞান ঠকিতে চায় না, তাহার কারবার সূক্ষ্ম হিসাব লইয়া;—অতএব সে ঠিক করিল, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে সে যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া চলিবে। কবি যেখানে বিধাতার আদ্যা সৃষ্টি বর্ণনা করিবে —তন্বীশ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, বৈজ্ঞানিক তাহার পরিচয় দিতে যাইয়া বলিবে যে, তন্বীর মানে কিছু হয় না, তবে উহার ওজন এত, শরীরের দৈর্ঘ্য এত, প্রস্থ এত, শ্যামা বলিতে 'শীতে সুখোষ্ণ সর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা' কি না জানি না, তবে উহার গায়ে কোন বিশিষ্ট তাপমান যন্ত্র লাগাইলে যন্ত্রের পারা এতটা সরিয়া যাইবে; এবং উনি যে অলসগমনা তাহার অর্থ, এক সেকেণ্ড সময়ে এতটা পথ অতিক্রম করেন। বৈজ্ঞানিকের এই ব্যাখ্যায় কবি অবশ্য হাসিবেন; বৈজ্ঞানিক কিন্তু উত্তরে বলিবেন, আচ্ছা, পৃথিবীর সব কবিদের একত্র করিয়া তোমরা ঐ তন্বীকে দাঁড় করাও কোন কবি বলিবেন ইনি স্থূলাঙ্গী, কেহ বলিবেন, না, ইনি কৃশাঙ্গী—ঠোঁটটা কেহ বলিবেন, তেলাকুচোর মত, কেহ বলিবেন, টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত। এইরূপে কবির লড়াই চলিতে থাকিবে। কিন্তু যে কোন বৈজ্ঞানিককে ডাক, প্রত্যেকেই ঐ একই জিনিষের একই বর্ণনা করিবে।

একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিকের এই বর্ণনায় মাত্র তিনটী কথা আছে—length, time ও mass; এবং শুধু এই তন্বী কেন, ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার—যাবতীয় ইন্দ্রিগ্রাহ্য ঘটনা মাত্র এই তিন কথায় সে প্রকাশ করিতেছে। হেলির ধূমকেতু আসিল বা উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিল—মাত্র এই তিনটী কথায় বিজ্ঞান উহা প্রকাশ করিবে।

এখন এই যে তিনটী মূল কথা, যাহার সমাবেশে বিজ্ঞান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় দেয়, সেই কথা তিনটী সম্বন্ধে বিজ্ঞানের ধারণা কিরূপ, দেখা যাউক।

প্রথম ধরিয়া লওয়া হইল যে, এই তিনটী ব্যাপার সম্পূর্ণ বিভিন্ন,—কেহ কাহারো ধার ধারে না,—কেহ কাহারো তোয়াক্কা রাখে না, যে যার স্ব-স্ব-প্রধান; lengthএর সঙ্গে timeএর কোন সম্পর্ক নাই;—mass, length timeএর একতার রাখে না। এই তিনটার এক-একটা unit ধরা হইল এবং সব জিনিষ এই unitএর তুলনায় প্রকাশিত হইতে লাগিল; এবং এই তিনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া Newton এক বিরাট গতিশাস্ত্র খাড়া করিলেন। এই গতিশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ ঠকিল না; বরং যত দিন যাইতে লাগিল, এই শাস্ত্রের উপর আস্থা লোকের বাড়িতে লাগিল। একবার একটা ঘটনায় যেন মনে হইল, এ সব ভুয়া কারণ; দেখা গেল Uranus নামক গ্রহ Newton-প্রবর্ত্তিত অঙ্কশাস্ত্রের হিসাব-অনুযায়ী চলে না; কেহ কেহ মনে করিলেন নিকটবর্ত্তী অজ্ঞাত কোন গ্রহের আকর্ষণ-ফলে এইরূপ ঘটিতেছে।—সেই গ্রহের অনুসন্ধান চলিল। অল্পদিনের মধ্যেই Neptune গ্রহ আবিষ্কৃত হইল; Newtonএর মতের জয়জয়কার হইল।

একটা কথা কিন্তু কেহ তলাইয়া দেখিল না;—এই length, time, mass সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণাটা কি। এবং কি ভাবেই বা আমরা এই সব মাপি। ধর—গজকাঠিটা আমাদের unit—রামে রাম, দুই-এ দুই, তিন-এ তিন—ঠিক মিলিয়া গেল; আমরা বলিলাম ইহা তিন গজ; কিন্তু কথাটা এই, ঐ গজকাঠিটা যখন এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় সরাইয়া লওয়া হইল, তখনও যে উহাকে ঠিক সেই এক গজ থাকিতে হইবে—উহা যে বাড়িবে না কমিবে না, তাহার দিব্য দেওয়া কোথায়? বলিবে, এ যে এক উদ্ভট, আজগুবি চিন্তা;—গজকাঠিটা বৌ বাজার হইতে বড়-বাজারে লইয়া যাইলে উহা কি আর গজ থাকিবে না; এ তো আর বরফের গজ-কাঠি নয় যে গলে যাবে, বা কর্পূরের গজকাঠি নয় যে উপে যাবে;—এ যে আস্ত নিরেট শক্ত লোহার গজ; উহা কিরূপে ছোট হইবে? অবশ্য ছোট বা বড় যে হইতেই হইবে তাহা বলিতেছি না; কিন্তু ছোট বড় যে হইবেই না, তাহা তুমি বুকে হাত দিয়া, চূণের ঘরে তামা-তুলসী-গঙ্গাজল লইয়া কি করিয়া বলিতে পার? বলিবে, গজকাঠিটা ঠিক থাকে ধরিয়াই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি এবং কখনও ঠকি নাই। অবশ্য ঠক না, কারণ তোমার দৃষ্টিটা স্থূল ছিল; এই দেখ, দৃষ্টি বেশ সূক্ষ্ম করিয়া দিতেছি, জ্ঞানাঞ্জন পরাইয়া দিতেছি, দেখ—দেখিবে তুমি ঠকিয়াছ, ভুল করিয়াছ। কিন্তু সে কথা পরে।

তার পর 'সময়'এর কথা কিরূপে ভাব? Uniform গতি ভিন্ন সময় কল্পনা করা যায় কি, তা সে uniform গতিটা সূর্য্যেরই হউক বা ঘড়ির কাঁটারই হৌক। এখন এই uniform গতিটা কি?, না, যাহা সমান পথ একই সময়ে যায়। কিন্তু এ কি দাঁড়াইল! সময়ের সংজ্ঞা দিতেছ uniform motion দিয়া;—আর uniform motionএর সংজ্ঞা দিতেছ 'সময়' দিয়া—এ যেন ঠিক 'পঞ্চম স্বর কিরূপ, না কোকিলের স্বরের ন্যায়, আর কোকিলের স্বর কিরূপ, না পঞ্চম স্বরের ন্যায়'।

এইবার mass। Newtonএর গতিশাস্ত্র অনুসারে mass আমরা মাপি এইরূপে;—খ-এর উপর ক-এর একটা আকর্ষণ আছে এবং গ-এর উপরও ঠিক সেই পরিমাণ আকর্ষণ আছে;—(accelerationএর অর্থে এখানে আকর্ষণ ব্যবহৃত হইয়াছে) এই সমান আকর্ষণ দেখিয়াই আমরা বলি খ-এর ও গ-এর mass এক; ক ধরি সাধারণতঃ এই পৃথিবীটাকে; সুতরাং দেখি যদি এই পৃথিবীর আকর্ষণ দুইটা জিনিসের উপর এক, তবে বলি ঐ দুইটা পদার্থের mass সমান। এখানে গলদ—এক নম্বর, আকর্ষণ মাপি length ও time দিয়া, সুতরাং length ও timeএর যাহা গলদ, তাহা সম্পূর্ণ এখানে বর্ত্তাইয়াছে। দুই নম্বর,—খ-এর ও গ-এর উপর ক-এর সমান টান দেখিয়া কি করিয়া ফস্ করিয়া বলিয়া বসি যে, খ-এর আর গ-এর পরস্পরের টান হুবহু এক। হইতেও তো পারে যে, খ-এর উপর ক-এর টান শুধু মুখের টান এবং গ-এর উপর টান নাড়ীর টান। অবশ্য হইবেই, আমি জোর করিয়া বলিতেছি না; তবে একেবারে হইতেই যে পারে না, তাহা তুমি বুক ঠুকিয়া কি করিয়া বল?

Length, time ও massএর কল্পনায় তর্কশাস্ত্রের এই সব কচ্‌কচি উঠিতে পারিত;—তবে উঠে নাই তাহার কারণ length, time ও mass যে যার স্বাধীন, এই কল্পনা করিয়া Newton যে গতিশাস্ত্র রচনা করিলেন,

তাহার উপর নির্ভর করিয়া মানব ঠকিল না,—প্রাকৃতিক ব্যাপারে কোন গরমিল দেখিতে পাইল না।

এইরূপই চলিতেছিল। এদিকে বিজ্ঞানের নানা দিগ্ব্যাপী উন্নতি আরম্ভ হইল। এক সময় একটা বিষয় লইয়া গোল ঠেকিতে লাগিল। একটু গোড়া হইতে বলা দরকার। এখানে একটা আলো জ্বালিলাম, ওখানকার একজনের চোখ ঝলসাইল। এখানকার একটু বিদ্যুৎ ঐ দূরের একটা চুম্বক বা বিদ্যুতের সহিত টানাটানি ঠেলাঠেলি করিল। এখান ও ওখানের মাঝখানের জায়গায় কি কিছু হইল? মাঝে কিছু হইতেছে না শুনিলে মনটা খুসী হয় না। এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, অন্য গাঁয়ে মাথা ধরে, এটা সহজ-বুদ্ধিতে আনা যায় না। সাধারণতঃ, শক্তি কিরূপে স্থান হইতে স্থানান্তরে চালিত হইতে দেখা যায়! মনে কর, নদীর উপর একখানা নৌকা স্থির হইয়া ভাসিতেছে। তীরে দাঁড়াইয়া তুমি উহাকে কিরূপে নাড়াইতে পার? এক উপায়, প্রকাণ্ড একটা বাঁশ দিয়া ঠেল—উহা নড়িবে; আর এক কাজ কর, একখানা থান ইট উহার গায়ে ছুড়িয়া মার—উহা নড়িবে। এ ছাড়া আরও একটা উপায় আছে; —ঐ নৌকা যাহার মধ্যে আছে, সেই জলে বা বাতাসে ঢেউ তোল, সেই ঢেউ উহার গায়ে লাগিয়া উহাকে নাড়িবে। সূর্য্য হইতে আলো পৃথিবীতে আসিতেছে। কিরূপে আসিতেছে? Newton কল্পনা করিলেন সূর্য্য হইতে ছোট-ছোট কণা ভীমবেগে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের চোখের পর্দ্দায় লাগিতেছে,—ঠিক যেন ইট ছুড়িয়া নৌকা দোলান হইতেছে। এই মত অনেক দিন চলিল। পরে এ মতের অনেক গলদ বাহির হইল। Young, Fresnel প্রভৃতি দেখাইলেন যে, না, ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা আলো পরিচালিত হইতে পারে না। তাঁহারা কল্পনা করিলেন, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে একটা পদার্থ—একটা medium আছে—যাহার তরঙ্গ উৎপাদিত হইতেছে; সেই তরঙ্গ দ্রুত বেগে চারিদিকে ধাবিত হইয়া আমাদের চোখে লাগিয়া আলোকের অনুভূতি দিতেছে। mediumটা কি? অবশ্য বাতাস নয়; বাতাসশূন্য স্থান দিয়াও আলো যায়। এ mediumটার নাম দেওয়া হইল ether। কল্পিত হইল, নিখিল চরাচর স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, জল, স্থল, আকাশ পরিব্যাপ্ত হইয়া এই ether বিদ্যমান। এই etherএর কতকগুলি ঢেউ মাত্র আমাদের চক্ষুতে আলোকের অনুভূতি দেয়। Faraday বলিলেন, তড়িৎ ও চুম্বকের ক্রিয়ার জন্যও একটা medium দরকার। Maxwell বলিলেন, আলোকের ঢেউ পরিচালনের জন্য যে medium কল্পিত হইয়াছে, সেই medium—সেই etherই এই electro-magnetic ঢেউ সঞ্চালিত করিতে পারিবে। Hertz আসিয়া সেই ঢেউ চালাইলেন,—পৃথিবীতে বিনা তারে telegraph চলিল। দেখা গেল, etherএর এই আলোক-ঢেউ, আর electro magnetic ঢেউ, ইহাদের যে পার্থক্য তাহা শুধু বর্ণগত, জাতিগত নয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উঠিল, এই ether তো প্রতি পদার্থের মধ্যেই রহিয়াছে; তাহা হইল পদার্থ যখন ছোটে, তখন সে কি তাহার নিজের ether সঙ্গে লইয়া যায়? বা জলের মধ্যে জাল লইয়া যাইলে যেরূপ হয়,—যেখানকার ether সেই-খানেই পড়িয়া থাকে? পৃথিবী ভীম গতিতে ছুটিতেছে,—সে কি তাহার ether সঙ্গে লইয়া ছুটিতেছে? অনেক পরীক্ষা হইল; Arago, Stokes, Lodge পরীক্ষা করিলেন; দাঁড়াইল, পৃথিবী তাহার ether সঙ্গে লইয়া যাইতেছে না,—যেখানকার ether, প্রায় সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে। বিষয়টার যেন একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল বলিয়া মনে হইল; কিন্তু ঠিক ইহার উল্টা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল Michelson ও Morbyর পরীক্ষায়। সে পরীক্ষায় মিল রাখিতে গেলে ধরিতে হয় যে, পৃথিবী তাহার ether লইয়াই দৌড়িতেছে। Michelson-Morbyর পরীক্ষাটা একটু তলাইয়া দেখা যাউক; ধরা যাউক যে, এই ether-সমুদ্র স্থির নিশ্চল;—চলন্ত দ্রব্যের সহিত সে দৌড়িতেছে না,—তা হইলে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়ায়। পৃথিবী ঘুরিতেছে—পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ঘুরিতেছে; পশ্চিমের এ ঘরে আলো জ্বালিলাম—আমার পূবের ঘরে ঐ আলো পৌছিতে সময় লাগিবে;—যতই কম হউক না কেন, তবু একটু সময় তো লাগিবেই। ইহার মধ্যে কিন্তু পৃথিবীর সহিত আমার পূবের ঘর আরও পূবে খানিকটা সরিয়াছে; সুতরাং পৃথিবীর সঙ্গে-সঙ্গে etherটা যদি না সরিয়া থাকে, তো, ঐ পূবের ঘরে আলো পৌছিতে কিছু বেশী সময় লাগিবে। আবার ধর, ঐ পূবের ঘরে আলো জ্বলিল; ঐ আলো ও-ঘরে জ্বলা, এবং এ ঘরে আমার কাছে পৌছানর মধ্যে আমি খানিকটা

ও দিকে সরিয়া গিয়াছি ; সুতরাং ও-ঘরের আলো এ-ঘরে পৌছিতে কিছু কম সময় লাগিবে। পৃথিবীর গায়ের ether যদি পৃথিবীর গায়ের বাতাসের ন্যায় পৃথিবীর সঙ্গে-সঙ্গে ছুটিত, তাহা হইলে আলোর পশ্চিম ঘর হইতে পূবের ঘর ও পূবের ঘর হইতে পশ্চিমের ঘরে যাতায়াতের সময়ের কোন পার্থক্য থাকিত না। পৃথিবীর চলার জন্য সময়ের এই পার্থক্য আছে কি না; Michelson ও Morby তাঁহাদের সূক্ষ্ম যন্ত্রে তাহা ধরিবার চেষ্টা করিলেন ; কোন তারতম্য দেখা গেল না। তাঁহারা দেখিলেন, আলোর পশ্চিম হইতে পূবে যাইতে যে সময় লাগে, পূর্ব হইতে পশ্চিমে যাইতে সেই একই সময়ই লাগে ; এবং সেই সময়ের কোনই ব্যতিক্রম ঘটে না, যদি আলো দক্ষিণ হইতে উত্তর বা উত্তর হইতে দক্ষিণ যায়। ফলতঃ, তাঁহারা দেখিলেন যে, কোন দিকেই আলোর বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। তাহা হইলে উপায়! ওদিকে এক দাড়াইল ;—এদিকে তাহার উল্টা কথায় দাড়াইল। এদিকে এক Michelson-Morbyর, ওদিকে অনেক লোকের অনেক রকমের পরীক্ষা। এ সমস্যার সমাধান হইবে কিরূপে? Fitz-Gerald বলিলেন, আমি ইহার মীমাংসা করিতেছি। Michelson-Morbyর পরীক্ষায় তুমি যে এই আলোর বেগ মাপিতেছ, কি দিয়া মাপিতেছ? গজ-কাঠি দিয়া তো? এই গজ-কাঠি উত্তর-দক্ষিণে শোয়ান আছে ; যেই তুমি ইহাকে তুলিয়া পূব-পশ্চিম করিয়া ধরিতেছ, অমনি উহা ছোট হইয়া যাইতেছে। আগের পরীক্ষায় ether যে স্থির প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাই ঠিক। এই পরীক্ষায় যে উল্টা সিদ্ধান্তে আসিতেছ, তাহার কারণ, মাপিবার সময় তোমার গজ-কাঠিটা যেমন ঘুরাইয়া ধরিতেছ, অমনি উহা আর লম্বায় ঠিক থাকিতেছে না ; তোমার মাপাতেই ভুল হইয়া যাইতেছে। এক সমস্যা মিটাইতে Fitz Gerald আর এক গভীর সমস্যা খাড়া করিলেন। এই লাঠিগাছটা উত্তর-পশ্চিমে শোয়াইলাম,—উহা তিন ফিট দশ ইঞ্চি; ঘুরাইয়া পূব-পশ্চিম করিয়া শোয়াইলাম,—বস্! আর উহা তিন ফিট দশ ইঞ্চি থাকিবে না! কিন্তু এই তো চোখের উপর দেখিতেছি—সেই তিন ফিট দশ ইঞ্চি আছে। Fitz-Gerald বলিবেন, আরে দেখিতেছ তো! কিন্তু মাপিতেছ কি দিয়া,—তোমার গজ-কাঠি দিয়া তো? ভূত যে সরিষার মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। সে গজ-কাঠিটাও তো সঙ্গে সঙ্গে বিগড়াইয়া যাইতেছে, সে কথা ভাবিতেছ কি? অবশ্য এ কথায় একেবারে নাচার। কিন্তু উত্তর এই, এর প্রমাণ কৈ? শুধু গায়ের জোরে বলিলেই তো হইবে না! আর জোক কমিয়া প্রমাণ নিয়া হাজির হইলেন Lorentz। তিনি পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। কোন স্থানে খানিকটা তড়িৎ থাকিলে, তাহার পারিপার্শ্বিক স্থানের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা ঠিক করিবার জন্য Maxwell কতকগুলি অঙ্ক বসাইয়াছিলেন। Lorentz দেখিলেন যে, তড়িৎ চুম্বক সম্বন্ধীয় ঐ সকল ঘটনা পৃথিবীতে বসিয়া না দেখিয়া, পৃথিবীর সহিত তুলনায় চলন্ত কোন স্থান হইতে—কোন গ্রহ-উপগ্রহে বসিয়া যদি দেখা যায়, তাহা হইলে এটা যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, তড়িৎ-সম্বন্ধীয় ঘটনা-সমূহে প্রাকৃতিক নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না, তবে ঐ ঘটনা প্রকাশ করিবার জন্য Maxwellএর অঙ্কগুলিতে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তিনি দেখাইলেন যে, তাহা হইলে ধরিতে হইবে, পৃথিবীর গজ ঐ চলন্ত গ্রহবাসীর নিকট আর গজ থাকিবে না,—উহা ছোট হইবে ; এবং কতটা ছোট হইবে, তাহা নির্ভর করিবে, পৃথিবীর তুলনায় ঐ চলন্ত গ্রহের বেগের উপর ; এবং যদি এই বেগ কখন আলোর বেগের সমান হয়, তো ঐ গজ-কাঠির দৈর্ঘ্য একেবারে শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। Fitz-Geraldএর সহিত Lorentzও, length কমিতেছে-বাড়িতেছে, এই কৈফিয়ৎ দিয়া, Michelson-Morbyর পরীক্ষার গোল মিটাইয়া দিলেন। Lorentz এই সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথার আলোচনা করিলেন। এইবার Einstein আসিলেন। তিনি এই তত্ত্বকে একটু নূতন ছাঁচে ঢালিলেন। Lorentzও এতদিন etherকে বজায় রাখিয়াছিলেন ; Einstein বলিলেন, দরকার নাই এই etherকে। তিনি দুইটা কথা ধরিয়া লইলেন,—এক, ব্রহ্মাণ্ডে প্রাকৃতিক নিয়মের ধারার কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না,—ইহার রূপ ঠিক সমানই আছে ; আর এক, যে অবস্থায় যেরূপে মাপ না কেন, আকাশে আলোর বেগের কোন তফাৎ নাই। এই ধরিয়া, গতিশাস্ত্র তিনি নূতন করিয়া গড়িতে লাগিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, 'সময়ে'র ধারণা আমাদিগকে এইরূপে করিতে হয়। দুইটা ঘটনা যে ঠিক

একই সময়ে ঘটিল, তাহা আমরা কিরূপে ঠিক করি? মনে কর, হাওড়া ষ্টেসনের ঘড়িতে যেই ১২টা বাজিল, অমনি লাট সাহেব আসিলেন; প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘড়ির ঠিক সেই ১২টায় কলেজ বন্ধ হইল। ইহা হইতে আমরা কি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, লাট সাহেবের আসা ও প্রেসিডেন্সি কলেজ বন্ধ হওয়া ঠিক একই সময় হইল। অবশ্য একই সময় হইত, যদি হাওড়ার ঘড়ি ও প্রেসিডেন্সির ঘড়ির হুবহু মিল থাকিত; কিন্তু মিল আছে কি না, কি করিয়া জানিব? এবং যদি না থাকে, তো কি করিয়া ঘড়ি দুইটা মিলাইব? ধরা যাউক, প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘড়ির কাছে একজন লোক বসিয়া আছে, এবং হাওড়া ষ্টেসনের ঘড়ির কাছে আর এক-জন বসিয়া আছে। প্রেসিডেন্সির ঘড়িতে যেই ১২টা বাজিল, লোকটা অমনি একটা আলোর সঙ্কেত করিল। সেই সঙ্কেত হাওড়ায় পৌছিল। পৌছিতে অবশ্য একটু সময় লাগিবে,—তা সে সময় যতই কম হউক না কেন। মনে করা যাউক, হাওড়ায় পৌছিতে ১০ অনুপল লাগিল (এখানে অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, এই অনুপলকে ধরা হইতেছে সেকেণ্ডের অতিশয় ক্ষুদ্র একটা ভগ্নাংশরূপে)। হাওড়ার লোক সেই সংবাদ পাইবামাত্রই, সেই মুহূর্ত্তেই আর একটা আলোর সঙ্কেত দিয়া প্রেসিডেন্সির লোককে সেই সংবাদ জানাইল। প্রেসিডেন্সির লোক তাহা হইলে ১২টা ২০ অনুপলের সময় সেই সংবাদ পাইল। এখন, হাওড়ার আর প্রেসিডেন্সির ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় মিল থাকিবে, যদি হাওড়ার লোক হাওড়ার ঘড়ির ঠিক ১২টা ১০ অনুপলের সময় সঙ্কেত পাইয়া থাকে; অর্থাৎ দুইটা ঘড়ি অনুসারে আলোর যাইতে এবং আসিতে যদি একই সময় লাগে। Einstein বলিলেন, দুইটা স্থানের দুইটা ঘড়ির মিল আছে তখনই বলিব, যখন দেখিব, ঘড়ি দুইটা অনুসারে আলোর যাইতে এবং ফিরিয়া আসিতে ঠিক একই সময় লাগিতেছে। ধর, হাওড়ার ঘড়ি এক অনুপল ফাষ্ট আছে। তাহা হইলে হাওড়ার লোক তাহার ঘড়ির ১২টা ১১ অনুপলের সময় সঙ্কেত পাইবে; প্রেসিডেন্সির লোক কিন্তু তাহার ঘড়ির আলোকের ঠিক সেই ১২টা ২০ অনুপলের সময় সেই সঙ্কেত ফিরাইয়া পাইবে। ফলে, দুইটা ঘড়ি অনুসারে আলোর যাইতে সময় লাগিল ১১ অনুপল, ফিরিয়া আসিতে সময় লাগিল ৯ অনুপল; সুতরাং Einsteinএর সংজ্ঞা অনুসারে ঘড়ি দুইটার গরমিল ধরা পড়িল। কিন্তু সবুর কর,—আমরা কি এইরূপ আলোর সঙ্কেতে ঘড়ি মিলাই? আমরা তো ঘড়ি মিলাই পৃথিবীর গতি দেখিয়া। কিন্তু পৃথিবীর এই গতি, কাহার সম্পর্কের গতি? পৃথিবীর তুলনায় নিশ্চল কোন তারকার সহিত এই গতি মাপিতেছ? কিন্তু মাপিতেছ কি দিয়া? ঐ তারকা হইতে যে আলো আসিতেছে, সেই আলো দিয়া তো? সুতরাং সেই তো আলোর সঙ্কেত ব্যবহার করিতেছ? এ ছাড়া আর গতি কি? এইবার ধর তিনটা মিল ঘড়ি; একটা আছে প্রেসিডেন্সি কলেজে; একটা প্রেসিডেন্সির পশ্চিম হাওড়ায়; আর একটা প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ White-away Laidlawএর দেয়ালের গায়ে। Lorentzএর হিসাব অনুসারে এই দাঁড়াইত যে, পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূবে ঘোরার জন্য আলোর সঙ্কেত প্রেসিডেন্সি হইতে হাওড়ায় যাইতে যে সময় লাগিবে, হাওড়া হইতে প্রেসিডেন্সি আসিতে ঠিক সেই সময় লাগিবে না; কিন্তু প্রেসিডেন্সি হইতে Laidlawর দোকানে যাইতে আসিতে ঠিক একই সময় লাগিবে। কিন্তু Michelson-Morleyর পরীক্ষায় দেখা যায় যে, উত্তর-দক্ষিণ বা পূব-পশ্চিম, যে দিকেই হউক, আলোর যাইতে এবং আসিতে ঠিক একই সময় লাগিতেছে। অতএব খোলে-বোলে মিল রাখিবার জন্য Lorentz বলিলেন, আলোর সময়ের যেমন তফাৎ হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গজকাঠিটা তেমনি ছোট বড় হইতেছে,—কাটাকুটি হইয়া কিছু ধরা পড়িতেছে না। Einstein বলিলেন, অত-সব হাঙ্গামায় দরকার নাই,—শুধু ধরিয়া লও, পৃথিবী ঘুরুক, আর নাই ঘুরুক—পূব-পশ্চিমে ঘুরুক বা উত্তর-দক্ষিণ ঘুরুক এই পৃথিবীবাসীর নিকট আলোর বেগের কোন তারতম্য নাই। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, পরস্পরের নিকট গতিবিহীন দুইটা স্থানের মধ্যে আলোর বেগ একই। সমস্ত ব্যাপারটা অন্য ভাবে ধরা যাউক। একখানা ট্রেণ খুব দ্রুতবেগে চলি-য়াছে,—গাড়ীর দরজা-জানলা সব বন্ধ,—কোন ঝাঁকানিও নাই। গাড়ীর আরোহিগণ কিছুতে বুঝিতে পারিবে না, তাহারা চলিয়াছে কি স্থির হইয়া আছে। Newton বলিলেন, গাড়ীতে বসিয়া যে কোন পরীক্ষা কর—লাফাও, দৌড়াও, কিল মার, ঘুসি ছোড়,—কিছুতেই ধরিতে পারিবে না যে, গাড়ী চলিতেছে। ঐ প্রক্রিয়াগুলি মাটিতে দাঁড়াইয়া করিলে যেরূপ হইত, গাড়ীর ভিতরও অবিকল সেইরূপ

হইবে। পরে এক দল যখন বলিলেন, যে, স্থির ether-সমুদ্র ভেদ করিয়া পদার্থ সকল ছুটিতেছে, তখন কথা হইল যে, তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে, গার্ডের নিকট হইতে ড্রাইভারের নিকটে আলোর যাওয়া এবং ড্রাইভারের কাছ হইতে গার্ডের নিকটে আলোর আসা—এই সময় দুইটার পার্থক্য হইবে কি না তাহা নির্ভর করিবে—গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে বা কোন্ দিকে ছুটিতেছে,—তাহার উপর। সেই একই গাড়ী দক্ষিণে ডায়মণ্ড-হারবারে গেলে একরূপ হইবে, পূবে খুলনায় গেলে আর একরূপ হইবে। সুতরাং গাড়ীর ভিতরে বসিয়াই এই আলোর সঙ্কেত দিয়া ধরা যাইবে যে, গাড়ী ছুটিতেছে কি স্থির আছে, এবং কোন্ দিকে চলিয়াছে। Michelson-Morby এইরূপ ধরণের পরীক্ষা করিলেন : এ তফাৎ কিন্তু ধরা পড়িল না ; আলোর যাতায়াতের সময়ের তফাৎ হইতেছে ; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে গজকাঠির ছোট বড় হইতেছে—এই কৈফিয়ৎ দিয়া Lorentz সারিলেন। Einstein বলিলেন, তফাৎ হইতেছে অথচ তফাৎ ধরা পড়িতেছে না, এ কষ্ট-কল্পনার দরকার কি? সোজাসুজি ধরিয়া লও না, তফাৎ হইতেছেই না। এই হইল মোটামুটি ব্যাপারটা। Einsteinএর এই কল্পনা হইতে অনেক নূতন কথা আসিল। দু'একটা বলিতেছি। ধর, রেল কোম্পানীর যেখানে যত ঘড়ি আছে, সব মিল আছে—হাওড়া, বালি, হুগলি, বৰ্দ্ধমান ষ্টেসনের সব ঘড়ি—ড্রাইভারের ঘড়ি, গার্ডের ঘড়ি—সব কাঁটায় কাঁটায় মিল। গাড়ী যখন হাওড়ায় দাঁড়াইয়া, তখন হাওড়ার ষ্টেসন মাষ্টার দেখিল, তাহার ঘড়ি, ড্রাইভার-গার্ডের ঘড়ি সব মিল আছে। গাড়ী ছাড়িল—মেল গাড়ী একেবারে বৰ্দ্ধমানে থামিবে। বালি, শ্রীরামপুর, হুগলির মাষ্টারদের ঘড়ির সঙ্গে কিন্তু আর ড্রাইভার গার্ডের ঘড়ির মিল থাকিবে না। গাড়ী বৰ্দ্ধমানে থামিল ; বৰ্দ্ধমানের ষ্টেসন-মাষ্টার দেখিল যে, না, ঠিক মিল তো সব আছে। এ দিকে ড্রাইভার গার্ড কিন্তু বরাবরই দেখিয়া আসিয়াছে, গাড়ী থামুক আর চলুক, তাহাদের ঘড়ির কখন গরমিল হয় নাই। এ দিকে সব ষ্টেসনের মাষ্টাররাও দেখিয়াছে, তাহাদের ঘড়িও বরাবর ঠিক আছে। আর এক কথা আসিল। ধর, এই গাড়ীখানি লম্বায় ১০০ ফিট এবং হাওড়া হইতে বৰ্দ্ধমান পর্য্যন্ত প্রতি ষ্টেসনে দুইটা করিয়া সিগনাল (signal) আছে,—একটা সামনে একটা পিছনে। প্রতি স্থানেই কিন্তু সিগ্‌নাল দুটার দূরত্ব ঐ ঠিক ১০০ ফিট। ষ্টেসন-মাষ্টার যেমন একটা হাতল টানে, অমনি signal দুটা এক সঙ্গে ডাউন হয়। হাওড়ায় গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে ; ড্রাইভার ও গার্ড ট্রেণের দুই শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া। হাওড়ার ষ্টেসন-মাষ্টার হাতলটি টানিলেন। সামনের signalটি যদি ড্রাইভারের মাথায় পড়ে, তো পিছনের signalটি গার্ডের মাথায় পড়িবে ; কারণ signal দুটার দূরত্বও ১০০ ফিট, গাড়ীও লম্বায় ১০০ ফিট। গাড়ী এবার ছুটিল—বালিতে থামিবে না—বালির ষ্টেসন-মাষ্টার কিন্তু ট্রেণটা যেই ষ্টেসন দিয়া যাইবে অমনি হাতলটা টানিল ; signal দুটা এক সঙ্গে পড়িল ; সামনেরটা ড্রাইভারের মাথার উপর পড়িল। ষ্টেসন-মাষ্টার কিন্তু দেখিল, গার্ডের মাথা বাঁচিয়া গিয়াছে পিছনেরটা যদিও সামনেটার সহিত এক সঙ্গে নামিল, গার্ড কিন্তু উহা পড়িবার পূর্ব্বেই উহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। বালির ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট সুতরাং গাড়ীর দৈর্ঘ্য আর একশ ফিট নয়, কমিয়াছে ;—কত কমিয়াছে, সেটা নির্ভর করিবে ঐ গাড়ী কত জোরে ছুটিতেছে তাহার উপর। যদি এটা সম্ভব হইত—অবশ্য সেটা একেবারেই অসম্ভব—কিন্তু যদির কথা—যদি গাড়ী আলোর বেগের সহিত দৌড়িতে পারিত, সেকেণ্ডে যদি এক লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে যাইত,—তবে কিন্তু আর গার্ডের মাথা বাঁচিত না,—ঐ সামনের সিগ্‌নালটা একই সঙ্গে ড্রাইভার ও গার্ডের মাথার উপর পড়িত,—বালির ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট গাড়ীটা মিলাইয়া যাইত ;—উহা লম্বায় হইত শূন্য। কিন্তু, এত বেগ না থাকিলেও একটু বেগ থাকিলেও, উহা ষ্টেসন-মাষ্টারের নিকট লম্বায় ছোট হইত। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে গার্ড ও ড্রাইভার কি বলে শুনা যাউক। তাহারা বলিবে, ষ্টেসন-মাষ্টার যে বলিতেছে তাহার signal এক সঙ্গে পড়িল, উহা মিছে কথা। আমাদের সঙ্গে ট্রেণে চল,—এই দেখ আমাদের ঘড়িতে দেখাইয়া দিতেছি সিগ্‌নাল দুইটা এক সঙ্গে পড়িল না,—প্রথমটা পড়িবার একটু পরে দ্বিতীয়টা পড়িল—তাই গার্ড পাস কাটাইয়া সরিয়া আসিয়াছে। ষ্টেসন-মাষ্টার বলিবে, দেখ, আমার কাছে দাঁড়াইয়া দেখ,—ঐ দেখ, সিগ্‌নাল দুটা ঠিক এক সঙ্গেই পড়িল,—গার্ড পাশ-কাটাইয়া গেল ; কারণ ট্রেণটা আর ১০০ ফিট নাই, ছোট হইয়াছে। এ ঝগড়া চলিতেই থাকিবে ; এবং এর মীমাংসা কস্মিন্ কালেও হইবে না। ট্রেণে চাপিয়া দেখ, দেখিবে ড্রাইভার,

গার্ড ঠিক চলিতেছে। আবার ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া দেখ, দেখিবে ষ্টেসন-মাষ্টারের কথাও বাজে নয়। চলন্ত ট্রেণের বদলে চলন্ত গজকাঠি ধর। গজ যদি দাঁড়াইয়া থাকে, তো আমার কাছে উহা গজ,—চলিলে উহা আর গজ নয়; গজক্ষয়। কথাটা উল্টাইয়া ধরিতে পার। গজকাটির তুলনায় আমি যদি দৌড়াই, তো উহা আমার পক্ষে আর পূরা গজ নয়; তফাৎ হইয়াছে। Ross Smith এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় উড়িয়া আসিলেন; কলিকাতা-এলাহাবাদের গজ উঁহার নিকট ঠিক গজ। কিন্তু Patna Laboratoryর Standard গজ উঁহার কাছে আর Standard নাই। সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ ঘুরিতেছে। সূর্য্য আবার তাহার সৌর জগৎ লইয়া কোন্ দিকে কত বেগে ঘুরিতেছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে? বুধগ্রহবাসীর নিকট পৃথিবীর গজকাঠি একরূপ বেগে ছুটিতেছে; বৃহস্পতির নিকট আর এক রকম। আবার এই সৌরজগৎ ছাড়া অন্য কোন সৌর-জগৎবাসীর নিকট ইহার বেগ যে কি, কে তাহা বলিবে? বিভিন্ন গ্রহবাসীর নিকট গজকাঠির বেগ বিভিন্ন। এই বেগের উপর ইহার দৈর্ঘ্য সংশ্লিষ্ট;—অতএব এই গজকাঠির দৈর্ঘ্য যে স্থির, অপরিবর্ত্তনশীল,—এ সব কথার আর মানে রহিল না; rigid বলিয়া আর পদার্থ রহিল না। কিন্তু, এত কথা চোখের উপর ধরিয়া দেখাইবার তো উপায় নাই; এ সব প্রমাণিত হইল অন্য দিক দিয়া। এই সকল সূক্ষ্ম কথা হিসাবের মধ্যে আনিয়া Einstein গতি-শাস্ত্রের অনেক কথার আলোচনা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত Newton-প্রবর্ত্তিত গতিশাস্ত্রের ফলাফলের সহিত আর হুবহু মিলিতে লাগিল না। একটা উদাহরণ দিতেছি। একটা নক্ষত্র পৃথিবীর তুলনায় সেকেণ্ডে একলক্ষ মাইল বেগে দৌড়িতেছে; এবং পৃথিবী আর একটা নক্ষত্রের তুলনায় সেই একই দিকে একলক্ষ মাইল বেগে ছুটিতেছে। অতএব Newtonএর অঙ্কশাস্ত্র অনুসারে প্রথম নক্ষত্র দ্বিতীয় নক্ষত্রের তুলনায় সেকেণ্ডে—একে একে দুই—দুইলক্ষ মাইল বেগে দৌড়িতেছে। Einstein বলিলেন, তাহা হইবে না; একে একে দুই হইবে না—যতই যোগ কর না কেন, যোগফল কখন ১ লক্ষ ৮৬ হাজারের বেশী হইবে না,—আলোর বেগের উপরে উঠিতে পারিবে না। সংসারে আলোর বেগই সব চেয়ে বেশী বেগ।

এই সব গরমিল তো চলিতে লাগিল। কিন্তু আমরা সাধারণ জীব—আমরা কোন পঞ্জিকা মতে চলিব? মাভৈঃ,—Newtonএর গতিশাস্ত্র আর Einsteinএর গতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের পার্থক্য এতই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে, আমাদের সাধারণ কাজকর্ম্মে তাহা ধরাই পড়িবে না। তবে যদি বল যে, না, আমি ঐ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গণনাই করিব, তাহা হইলে অবশ্য দেখিতে হইবে,—পরীক্ষায় দেখিতে হইবে, কোন্ মতটা অভ্রান্ত। সেই পরীক্ষা চলিতে লাগিল।

কোন পদার্থের mass—ওজন নহে উহার inertia—উহার জড়ত্ব—উহার তন্মাত্র জোরে বা আস্তে যাইবার উহার প্রবৃত্তি—এই mass সেই পদার্থের মজ্জাগত,—বাহিরের ঘটনায় উহার কোন তারতম্য নাই; ঐ পদার্থ দাঁড়াইয়া থাকুক বা ছুটিয়া যাউক, উহার mass সেই একই থাকিবে—এইটাই ছিল Newtonএর গতিশাস্ত্রের একটা মূল কল্পনা। Einstein এর হিসাবে কিন্তু দাঁড়াইল যে, পদার্থের এই massএর সহিত উহার বেগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উহা যত জোরে দৌড়িবে, উহার জড়ত্ব তত বেশী হইবে; এবং আলোর বেগের সহিত যদি উহা দৌড়িতে সমর্থ হয়, তো উহার mass হইবে অনন্ত। কত বেগ হইলে mass কত হইবে, Einstein তাহারও নির্দ্দেশ করিলেন। Newton বলিলেন এক, Einstein বলিলেন আর এক। এবার কিন্তু কথাটা পরীক্ষায় মীমাংসিত হওয়া সম্ভব হইল। একটু গোড়া হইতে বলা যাউক। পদার্থকে ক্রমাগত ভাঙ্গিতে-ভাঙ্গিতে চলিলে, শেষে উহা এমন অবস্থায় পৌছে, যখন আর উহাকে ভাগ করা চলে না;—ইহাকে বলে atom। একটী hydrogen atom অপেক্ষা ছোট কিছু যে আর থাকিতে পারে না, এইটাই বরাবর কল্পনা করা হইত। শেষে একদিন দেখা গেল যে, পদার্থের গঠন এতটা সোজা নয়। সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ সব ঘুরিতেছে এবং এই সমস্ত লইয়া যেমন সৌরজগৎ, সেইরূপ একটা atomএর মধ্যে সংযোগ-তড়িৎযুক্ত একটা কণিকাকে বেষ্টন করিয়া বিয়োগ-তড়িৎ-যুক্ত রাশি-রাশি অতি ক্ষুদ্র পদার্থ ভীষণ বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের নাম দেওয়া হইল electron। Radiumএর atom আপনা-আপনি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং তাহা হইতে electron সব ভীম বেগে ছুটিয়া বাহির

হইতেছে। ইহাদের বেগ হরেক রকমের ;—কাহারও কম, কাহারও বেশী ; আলোর বেগের হেরাহেরি প্রায়। একটা দ্রুতগামী electron যেমন বাতাস ভেদ করিয়া যাইতেছে, অমনি ইহার বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। J. J. Thomas পূর্ব্বেই electronদের জড়ত্ব মাপিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। Kaufmann দেখিলেন, electronদের বেগ অনুসারে তাহাদের জড়ত্বের তারতম্য হইতেছে ; এবং বেগ কিরূপ ভাবে কমিলে তাহার জড়ত্ব কি ভাবে কমে, তাহা তিনি পরীক্ষায় নিরূপণ করিলেন। Kaufmannএর পর Bucherer ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণও এই পরীক্ষা করিলেন। দেখা গেল, Lorentz ও Einsteinএর হিসাব অনুসারে বেগের সঙ্গে জড়ত্ব যে ভাবে বদলায়, পরীক্ষায় অবিকল তাহাই হইতেছে। সুতরাং পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইল, mass বেগের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। কিন্তু বেগ তো length আর time লইয়া ; অতএব mass যে length ও timeএর তোয়াক্কা রাখে না, এ কথা বলা চলিল না। Newtonএর হার হইল।

আর একটা ব্যাপারেও এতদিন একটু গোল ছিল। Newton-প্রবর্ত্তিত গতিশাস্ত্র অনুসারে বুধগ্রহের যে পথে চলা উচিত, বরাবরই দেখা যাইতেছিল, ঐ গ্রহ অবিকল সেই পথে চলে না, একটু ব্যতিক্রম হয়। অবশ্য এই তফাৎটা খুবই সামান্য—সূক্ষ্ম যন্ত্র ভিন্ন ধরাই পড়ে না। কিন্তু তবু এ গরমিলের কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না ; Lodge একটা কারণ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেটা তেমন সন্তোষজনক হয় নাই। Einsteinএর হিসাবে কিন্তু আগেকার ঐ সামান্য গরমিলটুকুও আর রহিল না।

Einsteinএর সহিত এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, Minkowski। এতদিন অঙ্কশাস্ত্রের কারবার ছিল তিন dimension লইয়া ; Minkowski আর একটা বাড়াইলেন। বোঝার উপর এই শাকের আঁটা চাপাইবার প্রয়োজনও হইল। মনে কর, কোন দেশে, অথবা এই আকাশের মধ্যে, আমি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়াছি। আমি যেখানে ছিলাম, সেখান হইতে তিনটা সরল রেখা টান—একটা সাম্‌নে-পিছনে, একটা আশে-পাশে, একটা উপর-নীচু ; ইহাদের প্রত্যেকটা যেন অপর দুটার উপর (perpendicular) সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহা হইলে, আমার পথ,—আমার গন্তব্য স্থান, এই লাইন তিনটা হইতে দূরত্ব দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এইরূপ হিসাবই চলিয়া আসিতেছিল ; Minkowski বলিলেন—এতে আর চলিবে না ; 'দেশে'র সহিত 'কাল' জড়িত, এই তিনটা লাইন তো শুধু 'দেশ' সূচিত করিতেছে ;—অতএব আর একটা টান, যাহা 'কাল'কে নির্দ্দেশ করিবে ; এবং এইরূপে টান, যাহাতে আগেকার তিনটা লাইনের প্রত্যেকটার উপর এটা সোজা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু কিরূপে তাহা টানিব ? এ যে একেবারে অসম্ভব ; এ কল্পনাই বা কিরূপে করিব ? নাই বা পারিলে কল্পনায় আনিতে ? তোমার ইন্দ্রিয় স্থূল ; তাই তুমি কল্পনা করিতে পারিতেছ না। ভাবিয়া লও—এইরূপ একটা লাইন থাকা সম্ভব। তোমার আকাশ ভ্রমণের পথ-বর্ণনায় শুধু আগেকার তিনটা লাইন নয়—এই 'সময়ে'র লাইনটাও হিসাবে আন। তোমার অঙ্কশাস্ত্র এই অনুসারে বদলাও ; —সেইটাই হইবে খাঁটী অঙ্কশাস্ত্র ; প্রচলিত অঙ্কশাস্ত্র সব ভুল। Minkowski এইরূপে চার dimension-ওয়ালা ব্রহ্মাণ্ড খাড়া করিলেন।

Einsteinএর কল্পনা-স্রোত কিন্তু আর থামিতে চাহে না। তিনি তাঁহার আলোচ্য তত্ত্বের সীমা বাড়াইয়া দিলেন ; মাধ্যাকর্ষণ ব্যাপারটা এখন ইহাতে স্থান পাইল। আপেল ফল পড়িতে দেখিয়া Newton বলিয়াছিলেন, পৃথিবী আপেলকে টানিতেছে, আপেলও পৃথিবীকে টানিতেছে ; কিন্তু এই যে টানাটানি, ঠেলাঠেলি—এর মাঝে দড়ি দড়া কৈ ? সে দড়িদড়ার সন্ধান মিলিল না। তড়িৎ-চুম্বকের আকর্ষণ-বিকর্ষণ দেখিতে গিয়া Faraday তাঁহার মনশ্চক্ষুতে কতকগুলি দড়িদড়া—কতকগুলি lines of force দেখিয়াছিলেন ; সে lines of force দিয়া অনেক জিনিষই মীমাংসিত হইতেছিল। এদিকে Euclidএর জ্যামিতি-শাস্ত্রটা একেবারে ঢালিয়া সাজার চেষ্টা চলিতেছিল। Euclidএর একটা সরল রেখা—একটা straight line ঠিক সেইরূপ আর একটা সরল রেখার উপর ফেলিয়া দাও ; উহারা ঠিক মিলিয়া যাইবে। Euclidএর একটা ত্রিকোণ ঠিক সেই হাত ও কোণ-যুক্ত আর একটা ত্রিকোণের উপর ফেলিয়া দাও, দুইটি সব জায়গায়ই গায়ে গায়ে মিশিয়া যাইবে।

একটা কমলা লেবুর গা হইতে কিন্তু একটা ত্রিকোণ তুলিয়া লইয়া একটা ফুটবলের উপর বসাইলে সেখানে আর উহারা গায়ে গায়ে মিলিবে না। সমাকার স্থানে একটা সরল রেখা আর একটা সরল রেখার সহিত মিলে,—একটা ত্রিকোণ আর একটা ত্রিকোণের সহিত মিলে; কিন্তু বিভিন্ন প্রকার বক্রাকার স্থানে উহারা মিলে না। আমাদের এই যে আকাশ, ইহা সমাকার না চক্রাকার? Euclid যে (Space) আকাশের কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সমাকার আকাশ। এবং তাহাই লোকে এতদিন ধরিয়া আসিয়াছে, এবং তাহাতে কাজ আটকায় নাই। এখন দেখা যাইতেছে, কাজ মাঝে-মাঝে আটকাইবার উপক্রম হইতেছে। এই দেখ, আকাশকে বক্রাকৃতি দিতেছি;—সেই বক্রতা কোথাও কমিতেছে, কোথাও বাড়িতেছে। সেই বক্রাকৃতি কল্পনা করিয়া কাজ চালাইতেছি এবং আগেকার চাইতে ভাল করিয়াই কাজ চালাইতেছি। সুতরাং আকাশ যে সমাকার, আর তাহা মানিব না। কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ কৈ? আচ্ছা, এইরূপে তো পরীক্ষা করা যাইতে পারে! দেখা গিয়াছে, সমাকার স্থানের একটা ত্রিকোণের তিনটা কোণ মিলিয়া ১৮০ ডিগ্রী হইবে, বিষমাকার স্থানে তাহা হইবে না। আকাশে খুব দূর-দূর তিনটী নক্ষত্র লইয়া ত্রিকোণ কর। উহাদের কোণ-গুলি মাপ; মাপিয়া দেখ মোট ১৮০ ডিগ্রী হয় কি না। এইরূপে তো প্রমাণ হইতে পারে। কিন্তু আবার Einstein-এর সেই কথা—মাপিবে কি দিয়া? তোমার মাপার গলদ কি দূর করিতে পারিয়াছ? তাহা তো পার নাই। Einstein কিন্তু আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত আকাশকে বিষমাকার ধরিয়া লইলেন; এবং সেই বক্র আকাশে মাধ্যাকর্ষণের ধারাটা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আলোচনায় একটা সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইল যে, আলোকরশ্মিও মাধ্যাকর্ষণের হাত এড়াইতে পারে না; পৃথিবীর পাশ দিয়া যে আলোকরশ্মিটা যাইতেছে, পৃথিবী উহাকে টানিতেছে; তবে এই টানটা এতই কম যে, উহাকে ধরা যায় না। আচ্ছা, পৃথিবী ছাড়িয়া অন্য পদার্থ ধর, যাহা পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশী ভারি,—যেখানকার আকর্ষণ এই পৃথিবীর আকর্ষণ অপেক্ষা অনেক বেশী প্রবল; যেমন সূর্য্য। সূর্য্যের কাছ দিয়া আসিলে এই টানটার দরুণ রশ্মির এই বাঁকটা তো আর একটু বেশী হইবে! Einstein হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে, কোন নক্ষত্র হইতে আলো যদি সূর্য্যের খুব কাছ দিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পৌঁছায়, তবে সূর্য্যের আকর্ষণের দরুণ যে বাঁকটা হইবে, তাহার পরিমাণ হইবে প্রায় দুই সেকেণ্ড—এক ডিগ্রীর প্রায় দুই হাজার ভাগের এক ভাগ;—খুব কম হইলেও সূক্ষ্ম যন্ত্রে উহা ধরা পড়িতে পারে। Einsteinএর সিদ্ধান্তগুলি পরীক্ষা করিবার এই তো উত্তম উপায়! কিন্তু একটা মুস্কিল এই যে, সূর্য্যের খুব কাছ দিয়া যে আলো আসিতেছে, তাহাকে তো দেখিতে হইবে সূর্য্য যখন হাজির—দিনের বেলায়! কিন্তু দিনের আলোয় দেখিব কিরূপে? তবে উপায়? এক উপায় আছে; সূর্য্য-গ্রহণ - পূর্ণগ্রাস। সূর্য্যের আলো তখন নক্ষত্রের আলোকে ঢাকিয়া দিতেছে না। তখন দেখ,—পূর্ণগ্রাসের সেই কয় মিনিটের মধ্যে দেখিয়া লও—নক্ষত্রের আলো সূর্য্যের কাছে বেঁকতেছে কি না? এই পরীক্ষাতেই যাচাই হইবে Einsteinএর এই কল্পনার, তাঁহার এই সিদ্ধান্তের মূল্য কি?

এই শুভ মুহূর্ত্ত আসিল গত ২৯শে মে তারিখে। জার্ম্মান ও ইংরাজে তো যুদ্ধ চলিতেছিল; এদিকে Germanyবাসী Einsteinএর এই সব গবেষণা বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছিলেন Englandবাসী Eddington। তিনি দেখিলেন, ২৯শে মে তারিখে Africaর নিকটবর্ত্তী একটা দ্বীপে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস হইবে; আর সেই সময় সূর্য্য আকাশের যে অংশে থাকিবে, সেখানে অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র থাকিবে। তিনি যন্ত্রপাতি তোড়জোড় লইয়া তথায় হাজির হইলেন। যথাসময়ে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস হইল। Eddington ভিন্ন-ভিন্ন ক্যামেরা দিয়া নক্ষত্রদের ফটোগ্রাফ লইলেন; পরে Cambridgeএ আসিয়া ফটোগ্রাফগুলি হইতে নিরূপণ করিতে লাগিয়া গেলেন—নক্ষত্র হইতে নির্গত রশ্মি সূর্য্য দ্বারা বাঁকিয়া গিয়াছে কি না। তাঁহার এই পরীক্ষার ফলাফল জানিবার জন্য পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকসকল উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। গত ৭ই নভেম্বর তারিখে রুটারের তারের সংবাদ আসিল, রয়াল সোসাইটীর সভায়—বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকটে Eddington তাঁহার পরীক্ষার ফল জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, নক্ষত্রের আলো সূর্য্যের নিকট দিয়া আসিতে-আসিতে সত্যই বাঁকিয়া গিয়াছিল—Einstein যতটা বলিয়াছিলেন ঠিক ততটাই বাঁকিয়াছিল।

Einstein এর সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইল; সুতরাং তাঁহার এই সিদ্ধান্ত যে সকল কল্পনা-প্রসূত, তাহাও স্বীকৃত হইল। বিশ্বের এই আকাশের আর অনন্ত প্রসার নাই; ইহাকে আর সমাকার বলিলে চলিবে না, ইহা বক্রাকার। এই আকাশস্থিত কোন সরল রেখাকে আর Euclidএর সরল রেখার সংজ্ঞা দিলে চলিবে না। ত্রিকোণের তিনটি কোণ আর ১৮০ ডিগ্রী নয়; circleএর radiusগুলি আর সমান নয়; parallel straight lines যে একেবারে মিলে না, তাহা নয়। দেখা গেল, 'দেশে'র সহিত 'কাল' বিশেষভাবে জড়িত; mass, দেশ ও কালের সহিত সংশ্লিষ্ট। Euclidও গেল, Newtonএর প্রবর্ত্তিত অঙ্কশাস্ত্রও অতল তলে ডুবিল।

তবে কি কা'ল হইতে এই অঙ্কশাস্ত্র বাতিল করিতে হইবে? আর কি ইহা মানবের কোন কাজে আসিবে না? ছেলের হাত হইতে Euclidএর জ্যামিতি ফেলিয়া দিতে হইবে?—বর্ত্তমান Mechanics পড়া বি-এ, এম্-এর ডিগ্রি কাড়িয়া লইতে হইবে? অঙ্কশাস্ত্রের এই সমস্ত বই পুড়াইয়া ফেলিয়া আবার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া নূতন পাঠ লইতে হইবে? তিষ্ঠ! ব্যাপারটা অত গুরুতর দাঁড়ায় নাই। কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া হলপ লওয়াইয়া কমলাকান্তকে যখন বয়স জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তখন সে বৎসর ছাড়িয়া মাস—দিন—ঘণ্টা—মিনিটের হিসাব দিতে যাইতেছিল,—হলপ লইয়াছে কিনা সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিবে না। কিন্তু আদালতের কাজ ঐ বৎসরেই চলিয়া যাইত। আমাদের যদি সেইরূপ হলপ লইয়া বলিতে হয় কাহার গণনা ঠিক, Newtonএর, না Einsteinএর। আমাদের অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে Newtonএর হিসাব ভুল, Einsteinএর হিসাবই ঠিক, এবং রয়াল সোসাইটীর সভাপতি সার J. J Thomsonএর সহিত বলিতে হইবে যে, ইহা "One of the greatest of achievements in the history of human thought"। কিন্তু এই দুই মতের সিদ্ধান্তগুলির পার্থক্য এত কম যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য, বিজ্ঞানের সাধারণ হিসাবের জন্য—Newtonই যথেষ্ট; ফেলিতে হইবে না Newtonএর Mechanics—পোড়াইতে হইবে না Euclidএর জ্যামিতি।

উপসংহার

ধৈর্য্য ধারণ করিয়া এই প্রবন্ধটা আগাগোড়া পড়িয়া যদি কোন পাঠক বলেন যে ব্যাপারটা কিন্তু কিছুই বুঝা গেল না, তবে তাঁহাকে সেদিনকার রয়টারের তারের একটা কথা নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি; রয়টার জানাইতেছে যে, বিষয়টাকে জটিল আঁক জোক না দিয়া সাদা কথায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কেরোসিনের কালিমা-প্রক্ষালন

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

রোগ কঠিন। প্রতিকার সহজ নহে। বাংলার অন্তঃপুরে বাঙ্গালীর মেয়ের সাড়ীর আঁচল ঘেরিয়া যে আগুন জ্বলিয়া উঠিবার পথ পাইয়াছে, সে শিখার লকলক জিহ্বা যদি উৰ্দ্ধমুখী হয়—সমাজ-প্রতিষ্ঠানের গৃহচূড় স্পর্শ করিলেও করিতে পারে। সে আশঙ্কা—সত্য বলিতে দোষ কি—আমি করিতেছি না এমন নহে। সমাজ-নেতৃবর্গ যে পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা ঠিক না হওয়াই সম্ভব। কাঁথা চাপা দিলে আগুন নিবে না, তাহা নহে বটে; কিন্তু আগুন নিবাইতে গিয়া কাঁথাটাও ধরিয়া যাওয়া স্বাভাবিক।

...প্রথম যে দিন স্নেহলতা নামে মেয়েটা কন্যাদায়গ্রস্ত অক্ষম পিতার বাসবাটীটি বাঁচাইবে ভাবিয়া কেরোসিনে আত্মহত্যা করিয়াছিল, সে দিন ভাব-প্রবণ বাঙ্গালীজাতির মনে হঠাৎ একটা উচ্ছ্বাসের বন্যা ডাকিয়া উঠিয়াছিল। তাহার কার্য্যের অন্ধকার দিকটাকে উপেক্ষা করিয়া উজ্জ্বল দিকটার পূজা করিবার ক্ষণিক উন্মত্ত প্রবৃত্তি জাগিল। কয়েকটা সভাসমিতিও হইল। কয়েকটা স্তুতিবাদের কবিতাও যে ছাপা হইল না, এমন নহে।

তার পর যখন দেখা গেল, দেবী, মানবী, দানবী—রাক্ষসী, পিশাচী,

সকল চরিত্রের স্ত্রীলোকগুলির ভিতরে কেমন একটা স্তম্ভিত, মরিয়া ভাব বহুদিন হইতেই, যেন দাহ্য বায়বীয় পদার্থে জাতিটার ভিতরটা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল ; এই ক্ষুদ্র অগ্নিকণাটুকুই যথেষ্ট,—ইহাকেই আদর্শ করিয়া, একে-একে, দুই, তিন, চারি, উচিত, অনুচিত, অসম্ভব ক্ষেত্রেও এমনি আত্মহত্যার ঘটনা ক্রমান্বয়ে ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে,—তখন সেই উন্মত্ত ভাবের সমুদ্র যেমন সহসা গর্জিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি সহসা শুকাইয়া একেবারে চড়া পড়িয়া গেল।

পিতাকে বাঁচাইতে কন্যা আত্মবলি দিয়াছে—এ যে মহা সম্ভ্রমেরই বস্তু। যে জাতি পূজা করিতে জানে, সে জাতি ইহার পূজা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারই যে আর একটা দিক ছিল,—তাহারই পশ্চাতে যে এক অভিমানিনী কন্যার আত্মগ্লানির সকরুণ বেদনা ছিল,—সে প্রচ্ছন্ন দিকটা উচ্ছ্বাসের মুখে কাহারও চক্ষে পড়ে নাই। তাহার প্রাপ্য ভালবাসায় দিতে হয় ;—সে প্রাপ্যের যখন দাবী আসিল, তখন,—যে জাতি ভালবাসিতে বুঝি বা এখনও শিখে নাই, সে জাতিকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইল।

এ দিকে সরিয়া দাঁড়াইলেই পার পাওয়া যায় কৈ? ক্ষণিক উৎসব-মোহে যে অনর্থ বাধিয়া বসিল, সেটার ব্যবস্থা যে না করিলেই নয়!

করা যাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহারা প্রত্যক্ষ দিক হইতে কি করিতে হইবে তাহার আবিষ্কারে অসমর্থ হইয়া, পরোক্ষ প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হায়! বড়ই সামান্য সে চেষ্টা ;—তাহা ঔদাসীন্য ও জড়তায় এমটা পরিপূর্ণ যে, তাহাকে চেষ্টার অভাব বলিলেও অপ্রতিভ হইবার কারণ নাই।

তাঁহারা প্রথমতঃ আত্মহত্যা প্রবৃত্তিটার নিন্দা করিয়া, তাহার অনুষ্ঠিত কাজটাকে ধর্ম্ম হিসাবে ও লৌকিক হিসাবে অকর্ত্তব্য জানাইয়া দিলেন। তার পর অপরাধিনীদের যন্ত্রণায় ঔদাস্য ও মৃত্যুতে উপেক্ষা দেখাইয়া—এই শোচনীয় ঘটনাগুলির গুরুত্বকে অস্বীকার করিয়া যাইতে লাগিলেন। বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারা মুখ ফিরাইয়া লইয়া এমনি করিয়া চোখ বুজিয়া থাকিলে, যাহারা এমন কাজ করিতেছে, তাহারা নিজ-নিজ চেষ্টা নিষ্ফল জানিবে ও সচেতন হইয়া যাইবে ; এমন বোকামীর কাজ আর করিবে না। আমি এই বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্তকেই আগুনকে কাঁথা চাপা দেওয়া বলিয়া অভিহিত করিতেছি।

যাঁহারা হিন্দুসমাজের কর্ণধার, তাঁহারা কেমন করিয়া এ কথা ভুলিতে পারেন যে, যাহারা পুড়িয়া মরিতেছে, তাহারা হিন্দুর মেয়ে। সতীদাহে আগুনে পোড়াইয়া—কৌলিন্য ও ব্রাহ্মণ্য প্রথায় অন্তরে পোড়াইয়া, পুড়িয়া-মরা কাজটুকু হতভাগিনীদের দেশাচার সে দিন অবধিই ভাল করিয়া তালিম দিয়া আসিয়াছে : উপেক্ষায় নিরুৎসাহ হইবার পাত্রী বলিয়া তাহাদের মনে করি না। মানুষ কোন্ অবস্থায় উপস্থিত হইলে জীবনটাকে অবধি অবাধে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে? সে অবস্থাটা কি? ঠিক কল্পনায় সেটাকে আয়ত্ত করিতে গিয়া আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেছে। তাহা হইলে কি হয়, তাহা স্বপক্ষে কোনও কথা বলিবার অধিকার মানুষের নাই। "যে জন্যই হউক, যে ভাবের উত্তেজনাতেই হউক,—যে গ্লানির তিক্ততাতেই হউক, আপনার দেহেই হউক আর পরের দেহেই হউক ইহা "হত্যা", শুধু পাপ নহে—crimeও বটে।" কিন্তু তথাপি স্থির হইতে পারিতেছি না। পাশ্চাত্য সাহিত্যরস কর্য়োটী-কটাহে সমস্ত মস্তিষ্কটাকে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটাইয়া দিতেছে। বিখ্যাত রুষ ট্র্যাজিক ঔপন্যাসিক Fedor Dostoieffskyর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের স্মরণীয় কথাগুলি অন্তরের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিতে চায় "—The next class, however, consists exclusively of men who break the law, or strive, according to their capacity or power to do so. Their crimes are naturally relative ones, and of varied gravity. Most of these insist upon destruction of what exsists in the name of what ought to exist." অর্থাৎ—"অপর শ্রেণীটা বিশ্ব-শৃঙ্খলার বাহিরের মানুষ-গুলির—সে মানুষ অনবরত আঘাত করিতেছে,—হয় কোথাও ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতেছে, নয় ত, চেষ্টার সাধনায় আপন-আপন সাধ্য সাধন নিযুক্ত করিয়া পড়িয়া আছে। লোকচক্ষে তাহাদের কাজ পাপে অভিশপ্ত, অপরাধে ঘৃণিত। কিন্তু সে সব অপরাধের মূল ত তাহাদের আপনার মধ্যে নাই। কত দিকের কত বিভিন্ন ঘটনার গুরুত্বের চাপে আবির্ভূত হইতেছে। অধিকাংশ অপরাধীর অভীষ্ট এই ; তাহারা চাহিতেছে,—ভাঙ্গো, ভাঙ্গো, যাহা স্বাভাবিক তাহারি স্থান জুড়িয়া যে অস্বাভাবিক রাজত্ব করিতেছে, তাহাকে ভাঙ্গো।" এই সব দুর্দ্ধর্ষ অপরাধীর সহিত আমাদের গৃহকোণের লজ্জাহীনা অপরাধিনীদের কোনও খানে যদি সাদৃশ্য থাকে, তবে ইহার অধিক দুশ্চিন্তার কারণ আর কিছু আমাদের দেশে নাই, তাহা স্পষ্ট বলিতেছি। উহারা যেমন বৈষয়িক কোনও শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার জন্য হাত-পা আছড়াই-তেছে, ইহারাও কি তেমনি মানসিক শৃঙ্খলের কোনও বাঁধন মুক্ত করিতে চায়?

এ যদি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে নিশ্চয়ই বলিব, ঐ সব অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র জীবনের অধিকারিণীগণ যে সমাজে এমন অপরাধ করিয়াছে, যে দেশে সকলের সহিত নিঃশ্বাস-বায়ু গ্রহণ করিয়াছে, সেই সমাজ ও দেশের সকলকেই একদিন নিঃশব্দে ও নতশিরে মাথা পাতিয়া লইতে হইবেই—এই crimeএর punishment.

পুরুষের মনোবৃত্তির তারে বিভিন্ন ঘটনার সংঘর্ষ কোন্-কোন্ সুরে বাজিয়া উঠে, তাঁহারাই তাহার বিচার করুন। মেয়েদের প্রাণের তারের নিহিত সুর তাঁহারা যে ঠিক ধরিতে পারেন না, সে ঘরকন্নার মধ্যে বেশই বুঝিতে পারি। অবশ্য কৈফিয়ৎ সোজা দিয়া রাখিয়াছেন, "—নারীচরিত্র পরম তত্ত্বজ্ঞেরও অজ্ঞাত।" জিনিসটা সত্য-সত্যই কোনও অপূর্ব্ব তত্ত্বাতীত পদার্থ হইলে, তাহা না হয় স্বীকার করিতাম। কিন্তু তাহা ত নহে। তত্ত্বজ্ঞান বুঝাইবার সময়েও তত্ত্বজ্ঞেরা তাহার

উপমার ছড়াছড়ি করেন। আর এই পরম অজ্ঞাত বস্তুটাই দেখিতে পাই, জ্ঞান, ভাব ও চেতনার এতটা স্থান জুড়িয়া আছে যে, কাব্য, নাটক, গীতিকবিতায় তাহাকেই যেন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা।

হিন্দু সাহিত্যে এমন দিন ছিল, যে দিন এই বিশ্লেষণ সরল হইত, সোজা হইত। কবিরা যে ভাবময়ী প্রতিমা গড়িতেন, সে প্রতিমা সজীব হইত। মনে হইত, তাহার মধ্যে নারীর হৃদয়, নারীর প্রাণ সমস্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে,—যেন জীবন্ত। কবে, কোন্ অজ্ঞাত সময়ে জাতির অদৃষ্ট-গগনে দুষ্ট গ্রহের সঞ্চার হইয়াছিল;—সে দিনের মানুষ বদলাইয়া গেল। মহা পরিবর্ত্তন, বিপ্লব আসিল। জয়দেবের ললিত কোমল-কান্ত পদাবলী সেই দুরবস্থার চরম যুগের বাঙ্গালীচরিত্র দেখিবার দর্পণ। এ দর্পণে আজও আমরা আত্মপ্রতিকৃতি দেখিতেছি,—অনন্ত কাল দেখিব।

"...মুসলমান বিজেতার লৌহময় অতিকঠোর পাদুকার চাপে যখন বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বের অপচয় ঘটিতে আরম্ভ করে, তখনই গীতগোবিন্দের প্রচার হয়।"

"—তাহার অনুপম ভাষা ও চমৎকার ভাব আলেখ্য কেবল কামের সন্ধুক্ষণ ঘটায়, মানুষকে কেবল রক্তমাংসের উপদ্রবের প্রতি যেন জোর করিয়া টানিয়া ধরে। দুর্ব্বল, স্থবির, কর্ম্মহীন জাতি যেমন কামকলা বিলাসে সুখবোধ করে, তেমনি সে জাতির কবিও সে সুখলিপ্সার মুখে অপূর্ব্ব ভাষায় অপূর্ব্ব কামকাব্যের ইন্ধন যোগাইয়াছেন।"

উপরিউক্ত অংশ আমি সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। বঙ্গসাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক এইখানেই চুপ করেন নাই; যে প্রবন্ধের অংশ আমি উদ্ধৃত করিতেছি, সে প্রবন্ধে আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। বৈষ্ণব-কবিগণের কাব্যের অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ভাব যাহারা লইবার অধিকারী নহে, তাহারা এই অমৃতকেই বিষ রূপে ভক্ষণ করিয়া কেমন জরাজীর্ণ হইয়াছিল,—ভাবুকের সাহিত্য লোকসাহিত্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইয়া জাতির কি সর্ব্বনাশ করিতেছিল, তাহা তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তার পর দেখাইয়াছেন, এ নির্লজ্জতার ক্রমশঃই ব্যাপ্তি হইয়াছিল; ক্রমে ধর্ম্মের রূপকেরও আর প্রয়োজন হয় নাই। ভারতচন্দ্র, কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা কেহই আর নূতন সুরের মধ্যে প্রতিষ্ঠার পথ অন্বেষণ করেন নাই। এমন ভাবের কথা মানুষকে শিখাইতে কেহই অবতীর্ণ হন নাই, যাহার প্রভাবে মনুষ্য-জীবন ধন্য হয়, মনুষ্যনীতি উন্নত হয়। অবশেষে, ইহার কারণ কি, তাহাও তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলিতেছেন "—কর্ম্মশূন্যতা, চিত্তের ও চরিত্রের জড়তা, সদ্ধর্ম্মসাধক পদ্ধতির অভাব, এই কয়টী মিলিয়া মিশিয়া বাঙ্গালীর কামকলা-গন্ধ-পরিব্যাপ্ত কোমল কামিনী সুলভ পদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।"

বৈষ্ণব সাহিত্যের যে অংশ চৈতন্যযুগে প্রচারিত, যে অংশে বাঙ্গালী সেই সর্ব্বপ্রথম ঠাকুর দেবতাকে ছাড়িয়া মানুষের চরিত্রে আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছে, সেই অংশকে অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিয়া অনেকে বুদ্ধিবৃত্তির ও তর্কশক্তির পরিচয় দিবার উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠিতে পারেন; কিন্তু আমরাও স্বীকার করিতেছি, পতনের সেই পঙ্কিল দিনেও অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা দেশে একেবারে ছিল না, তাহা নহে। আর সেই সঙ্গে এই কথা বলিতে চাই সত্য কোনও দিনই বুদ্ধির কাছে ধরা দেয় না। সে বিবিধ রসপর্য্যায়ের মধ্যে হৃদয়ে তলে-তলে বিকশিত হইয়া উঠিতে থাকে।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে বাঙ্গালীর মর্ম্ম, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য সমস্তই ভালয়-মন্দয় মিশামিশি হইয়া আছে।—বাঙ্গালীকে গড়িবার জন্য নহে, চিনিবার জন্য সেই সাহিত্য মন্থন করিতে হইবে। আমরা ক্রমশঃই দেখিতে পাইব, কোমলতা ভাবুকতা যতই থাকুক, সরলতা ও দৃঢ়তার অভাবে সে সকল গুণ,—লতা কোনও বৃক্ষকে আশ্রয় করিতে না পাইলে যে দশায় পৌঁছায়, সেই দশা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

আজ সূর্য্যালোক চাই-ই। আজ বাঙ্গালী-চরিত্রকে এক নূতন, সরল, বেগবান, সংহত মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতেই হইবে।

এ প্রকাশ প্রথমতঃ মনের মধ্যেই হইবে। কিন্তু এই অর্দ্ধ-শতাব্দীর শিক্ষা ও সাহিত্য এখনও কেন মনকে গড়িতে পারে নাই? কেন এখনও ভাগীরথী প্রপাতের মত ভাবের মন্দাকিনী নামিয়া আসে নাই, যাহাতে মরা গাঙ্গে জোয়ার ছুটে, শুষ্ক হৃদয়গুলা অভিষিক্ত হইয়া নববীজ অঙ্কুরিত হইবার উপযোগী অবস্থা হয়? আমার ধারণা, ইহার কারণ এই যে, আজ কেমন এক যেন গোলযোগ বাধিয়া রহিয়াছে; মানসিক জড়তার আবহাওয়ায় দেশটা আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই অতীত যুগের কবি-কীর্ত্তন-মুখরিত কামকলা-বিতানে বসিয়া জাতি যে চিত্তের জড়তা অভ্যাস করিয়াছিল, সেই জড়তা হইতে তাহাকে মুক্ত হইতে হইবে। তাহাকে বুঝিতে হইবে হৃদয় বলিয়া একটা জিনিস আছে;—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মত সেটার নিয়মিত প্রসার স্বাস্থ্য সুখের পরিবর্দ্ধক। তাহাকে আরও বুঝিতে হইবে, নারী বলিয়া একটা জাতি আছে, সে কাহারও সেবাদাসী নহে।

এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, এই যে বারবার "জাতি" কথাটার উল্লেখ করিতেছি, এ কেবল পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া নহে,—সমবেত পুরুষ ও নারী উভয় শক্তি-সংগঠিত, অধুনাতন দেশকাল-প্রচলিত বিধিব্যবস্থা অনুসরণকারী এই এক প্রকৃতি-সম্পন্ন সকলেই আমার লক্ষ্য।

দোষাদোষ-বিচারে কাল-ব্যয়ের প্রয়োজন দেখি না। নারীর দুর্গতি অনেক ক্ষেত্রে নারীর হস্তেই হইয়া থাকে,—কেরোসিন ট্রাজেডির নায়িকাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপন-আপন স্বজাতির—নারী অভিভাবিকাদের দুর্ব্বার অত্যাচারেই অতিষ্ঠ হইয়াছে জানি।—বাড়ীর কর্ত্তাও নির্দ্দোষী নহেন। তাঁহাদের শৈথিল্য না থাকিলে দুর্ঘটনা ঘটিতেই পারে না। তথাপি তাঁহাদের উপর সহানুভূতির হেতু আছে। বাহিরের জগতের নির্ম্মমতার পেষণ, দারিদ্র্য ও অক্ষমতার অপমান—এ সমস্ত ব্যাধির মত দিনরাত তাঁহাদের আচ্ছন্ন করিয়া থাকে।

তাঁহাদের মধ্যে মধ্যে অপ্রকৃতিস্থ হইতে দেখিলেও আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই।

—কিন্তু স্ত্রীলোক? এমন গুরুত্ব ত' কোনও ঘটনা বা ব্যবস্থায় দেখি নাই, যাহার পেষণ তাহাদের পরস্পরকে আক্রোশে, ঈর্ষায় জর্জ্জরিত করিতেছে! বাহিরের জগৎ তাহাদের উপর নির্ম্মম কি সদয়, সে কথা অনুভব করিবার তাহাদের কোনও উপলক্ষ্য উপস্থিত হয় না। তাঁহারা কিসের উত্তাপে পরস্পরের উপর নির্ম্মম, হিংস্র হইয়া উঠিতে থাকে?

কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না। কারণ আছেই।

হায়! কে এই জাতিটাকে তাহাদেরই দিক হইতে একবার বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করিবে? রক্ত মাংসের ভিতর দিয়া যে সমস্ত উপদ্রব ইহাদের দুর্ব্বোধ্য করিয়া রাখে; কাহার, জীবন-সাধনায় জীবন দেবতা এমন প্রসন্ন মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিবেন যে, সে-সব উপদ্রব এড়াইয়া গিয়া, সরল দৃষ্টি ইহাদের অন্তরের দ্বারে স্থাপিত করিতে পারিবে? কাহার প্রাণে সত্যকার প্রেম জাগিয়া উঠিবে? কে আনন্দরসের উৎসেকে ইহাদের শীতল করিতে পারিবে? যে-সব সমস্যা আপনার মধ্যে ইহারা দেখিতে পাইতেছে, কেহ কি তাহার সমাধান সরল করিয়া দিতে জন্মগ্রহণ করে নাই? বাহির হইতে দান না পাইলে ইহাদের ত্রাণ হইবে না। ইহাদের অনুভব বুদ্ধি বিচার-শক্তির অধীন হইতে জানে না। ইহাদের উদ্‌গ্র প্রবৃত্তি আপনার ভাষা আপনি সৃষ্টি করিয়া লইতে অক্ষম। ইহারা অদ্ভুত জীব।

হিন্দু যেদিন হইতে আপনার মহিমার ধারা হারাইয়াছে, হিন্দু নারীর জীবনধারা সেই দিন হইতে বিলুপ্ত। অত সুদূর অতীতের স্মৃতি চিহ্ন-মধ্য হইতে কি আর তাহাকে বাহির করা যাইবে? দেশ দেশান্তরে যেখানে সে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা কি উপেক্ষা করিব? এখানে যত দেখি, তত যেন মনে হয়, নারী নারী নহে—আপনার দৈহিক সৌন্দর্য্য অনুভূতির জ্ঞান, আর কতকগুলা সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। তাহারাও যে মনুষ্যত্বের একটা দিক,—তাহাদেরও যে প্রাণ মন বিবেক আছে,—আশা, ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা, বীরত্ব তাহাদের চিত্তবৃত্তি মধ্যে উদ্রেকের চির-সম্ভাবনা, এ সব চেতনা কোথায় গেল!—এ কি পক্ষাঘাত! হিন্দুর একটা অঙ্গ এমন করিয়া চিরতরে পড়িয়া গেল! কি ভয়ানক!

জানানা ত' এইখানেই। তুচ্ছ যে অন্তঃপুরের অল্পপরিসর সঙ্কীর্ণ কক্ষ-কারাগার!—পাষাণ প্রাচীর, লৌহদ্বারেও এমন করিয়া আবদ্ধ রাখা সম্ভবে না। আপনার মনের মধ্যেই ত' ইহারা আবদ্ধ। আজ হিন্দু-নারীই কেবল অবরোধ মধ্যে বিশ্ব হইতে অবরুদ্ধ হইয়া আছে তাহা নহে,—তাহাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয় গাঢ় অসাড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া বিশ্বকেও তাহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বের সহিত যোগ অনুভব করিলে যে প্রেমরস-পুষ্ট জীবনের দ্বারা সে সহায় হইতে পারিত, শক্তি দিতে পারিত,—বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সেই জীবন-সঞ্চার অসম্ভব হওয়াতে, সে অসহায় ভারবাহী করিয়া রাখিয়াছে। পুরুষদের আত্মশক্তিকেও প্রতিদিন স্তিমিত ও ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিতেছে।

এখন চাই এমন কতকগুলি শক্তির ডাইনামো,—সংস্কার মুক্ত কতকগুলি শুধু প্রেমের জন্যই-সর্ব্বত্যাগী, সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বী, যাঁহারা আপন আপন অন্তরের হোমানলে উদ্দীপ্ত হইয়া হৃদয় হইতে হৃদয়ে আগুন জ্বালিতে ঘুরিয়া বেড়াইবেন। চাই মহাপ্রাণতা, যাহার কাছে ক্ষুদ্র প্রাণের সংকীর্ণতা প্রতিদিন ক্ষুণ্ণ হইতে থাকিবে। সে দিন কি আসিবে না, যে দিন তাঁহাদের সাহসে অনুপ্রাণিত হইয়া এই ভীরুর দল কল্পিত ভয়ের সর্ব্বসন্দেহ ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিবে?—বিশ্ব তাহাদের আপনার হইবে?

সংস্কারে যাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে মুক্ত করিবার সরল পথ কি,—যাঁহারা পথ খুঁজিতেছেন, সেটা তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই। ইহার কারণ, দেশে সংস্কার মুক্ত লোকের সত্যই অভাব। এই সংস্কারটা এমন কি জিনিস যে, যাইয়াও যাইতে চায় না। লাভালাভ, ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম—যে দিক দিয়া যতই বোঝাও না কেন, এ অন্ধ প্রবৃত্তির অন্ধ অনুরাগ অন্ধ ভাবেই সঙ্গে লাগিয়া থাকে। জ্ঞানের বোঝায় চাপা পড়িয়া অদৃশ্য হয়, অপসারিত হয় না। কিন্তু যায় না তাহাও নহে। যখন যায়, তখন পূর্ব্ব অস্তিত্বের চিহ্নটুকু পর্য্যন্তও না কি মুছিয়া লইয়া চলিয়া যায়। ভিতরে ঘা শুকাইলে, উপরের মড়মড়ি খসিয়া পড়ার মত—ভিতরের চরিত্র সুগঠিত হইয়া গেলে, ইহা আপনিই নিঃশব্দে খসিয়া পড়ে।

এই চরিত্র-গঠনের উপায় কি? শিক্ষা?—দেশে ছেলেদের শিক্ষা ব্যাপারে শিক্ষা-সমস্যার অনেক গোলেমালেই ত আমাদের দিন কাটাইতে হইতেছে। স্ত্রী শিক্ষা বলিতে এমনি আর একটা বোঝা এই স্থবির সমাজ-প্রতিষ্ঠানের মাথায় চাপাইতে সকলেই হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয়। শিক্ষা বলিয়া এমন একটা জিনিস দেওয়া, যেটা জীবনে কোনও কাজেই লাগিবার নয়,—মিথ্যার অনুকরণ মাত্র,—যাঁহারা জাতির মস্তিষ্ক, তাঁহারা সেটা বুঝিয়াছেন। দেখিতে পাইতেছি, হিন্দু-সমাজে স্থির বুদ্ধি একদল লোক সেই জন্যই স্ত্রী-শিক্ষার গোড়া হইতে ঐরূপ কোনও প্রমাদ না ঢোকে, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহারা নিজেরাও প্রমাদ-মুক্ত নহেন।

তাঁহাদের চেষ্টা যে পদ্ধতির প্রচলন করিতেছে, তাহা রাঁধা-বাড়া, সীবনকর্ম্ম, শিবপূজা, স্তোত্র-পাঠ,—আর চিঠিপত্র হিসাব রাখাতেই সম্পূর্ণ। অবশ্য তাঁহারা যদি বলেন, এটুকু প্রাইমারি মাত্র, উচ্চাঙ্গ-টুকুও আমরা প্রচলন করিব, তাহা হইলে তাঁহাদের ধন্যবাদ দিয়া সেটুকু কি, দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু কেন যে অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। অধিকন্তু, এই কথাটা বলিবার ঔৎসুক্য আসে যে, তোমরা, মেয়েদের লইয়া তাহাদেরই শৈশবের খেলাঘরটা পাকাঘরে উঠাইয়া আনিয়া খেলা করিতে বসিয়াছ মাত্র।

শিক্ষা তাহাই, যাহা দ্বারা জীবন বিস্তৃত হয়;—ইংরাজিতে যাহাকে বলে scope, সেইটা তৈরী করিয়া লইবার ক্ষমতা জন্মে।

সেই জন্যই স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ হইতেছে শুনিলেই, জানিবার কৌতূহল হয়, উদ্যোগী কাহারা ?

কথা অনেক। একটা প্রবন্ধের মধ্যে অবান্তর মন্তব্য আনিয়া স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে আমার চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। মোটের উপর কথা এই যে, স্ত্রী-শিক্ষার যেমনতর প্রচলনটা প্রয়োজন হইয়াছে, সেটার সত্য পদ্ধতি নিরূপণ করিয়া কার্য্যে প্রচলিত করা কেবল মাত্র পুরুষ বা কেবলমাত্র স্ত্রীলোকের সাধ্য নহে। কোন্ সাধনায় তাহা সাধিত হইবে, সে কথা স্থানান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বাল্যকালে পাঠ করিয়াছিলাম—"বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং, ক্ষীণা জনা নিষ্করুণা ভবন্তি।" সেই কথাটা আজও ভুলিতে পারি নাই। এদেশের মেয়েদের ক্ষীণতা কেহই অস্বীকার করিবেন না। জানি। এই ক্ষীণতার হেতুকে যদি বুভুক্ষা বলিতে চেষ্টা করি, বোধ হয় তাহা রুচিসঙ্গত হইবে না। সুতরাং বুভুক্ষা আছে, এটা স্পষ্ট না বলিয়া, কথাটা ঘুরাইয়া বলিব। বলিব—"তাহাদের মধ্যে বুভুক্ষা আছে কি না, সেটা আজ অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হইয়াছে। ওগো, তোমাদের মনুষ্যত্বের দোহাই, - তোমরা তাহার খোঁজ লও। আমার মনে ধাঁধা লাগিয়াছে, এটা ভাঙ্গিয়া দাও। আমি, কেন জানি না, আজ যেন ভাবিতেছি, মেয়েরা তাহাদের অল্প পরিসর জীবন-গণ্ডীর মধ্যে অনেকখানি আকাঙ্ক্ষার তাড়না অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চলিতে, ফিরিতে, নড়িতে তাহাদের অল্প পরিসর পিঞ্জর কেবলি তাহাদের অঙ্গে বাজিতেছে। কিসের বেদনা না জানুক, বেদনাটা বড়ই তীব্র।"

কিন্তু দেখিতে বলিব কি তাঁহাও নির্ভয়ে বলিতে পারি না। উপন্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ পর্য্যন্ত একটা বিরেট স্তর আমার চোখে পড়িতেছে। সেটা বৃহদাকার ; সুতরাং তাঁহার পশ্চাতে শক্তিশালী দল আছে নিঃসন্দেহ। তাঁহারা না কি আদর্শবাদী (idealistic school)। তাঁহাদের হাতে যে সব আদর্শ নারীচরিত্র কল্পিত হইয়াছে, সেগুলির তাঁহাদেরই কামনার রঙ্গে রং ফলান—তাঁহাদেরই একক প্রয়োজনের ফরমাসে আদরা টানা। তাঁহারা যেমন নারী চান, তাহাই তাঁহাদের মনোজগতের নারীমূর্ত্তি। কিন্তু সত্য কি সেইখানে? নারীত্ব যেমনটী হইয়া উঠিতে চাহিতেছে, তাহাই কি নারীর সত্য মূর্ত্তি নহে ?

এই আদর্শবাদীর অনুসন্ধানটী কেমন হইবে ? বিলাতের বণিকদের লইয়া যদি ভারত-বাসীর বাণিজ্য-বিস্তার-সুযোগ অনুসন্ধানের এক কমিশন বসে, তবে তাহাতে যে ফল হইবার সম্ভাবনা, তাহা যাঁহারা বুঝেন, এ কথা আর তাঁহাদের বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

হায় রে ! খোঁজ লওয়ার পথে অনেক কাঁটা !

এ খোঁজ লওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন নহে। যাঁহারা খোঁজ লইবার মানুষ, তাঁহাদের অনুযোগ করিয়া জাগাইতে হইবে না। তাঁহারা ইহার জন্যই জগতে আসিবেন। হয় ত নীরবে নিভৃতে আপন কাজ একক আপন মনেই শেষ করিয়া, অলক্ষিতেই জগৎ হইতে বিদায় লাভ করিবেন। তাঁহাদের বিপুল সাধনা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়া সমীরণে মিশিয়া গিয়া জাতির চিত্তবৃত্তি শুদ্ধ করিতে থাকিবে।

এখন যে যুগ আসিয়াছে, এটা universal emancipationএর যুগ। এ যুগে মধ্য এসিয়া বা আফ্রিকার মধ্যেও মানুষের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র নহে। হিন্দুর মেয়েদের প্রাণে যদি কোনও চাঞ্চল্য জাগে, মাত্র সেইটাই কি বিচিত্র হইবে ? যদি সেটা স্বাভাবিক হয়, তবে এমন কি হইতে পারে না যে, অবস্থা বুঝিবার পূর্ব্ব-লক্ষণটা অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে আসিয়াছে ? হয় ত তাহারা বুঝিতে পারিতেছে যে, যে ভাবে মাত্র একখানি ছাঁচে তাহাদের জীবনগুলি ঢালাই করা হয়, সেটা প্রকৃতির উপর মানুষের কলমবাজি। হয় ত বা প্রকৃতিই স্বয়ং সচেতন হইয়াছেন। না, কথাটা গুরুতর হইয়া উঠিতেছে ; এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না।

সত্যই আমি বিরোধের দিক হইতে কোনও কথা বলিতে আসি নাই। আমিও স্বীকার করি যে, ইংরাজ বা ব্রাহ্ম লেখকে জানানায় রন্ধ্রহীন প্রাচীরের মধ্যে যে বিভীষিকার কল্পনা করেন, তাহার অস্তিত্ব নাই। ত্রি-সত্য করিয়াও বলিতে প্রস্তুত আছি যে, সে অন্ধকার বায়ুহীন প্রদেশে সহস্র-সহস্র ভূত প্রেত বিলিবিলি করিয়া বেড়াইতেছে না। কিন্তু তাহার মধ্যে স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা আছে ; অস্বাস্থ্যকরতার প্রচুর হেতু আছে। সেখানকার অধিবাসিনীদের জীবনে ক্ষয়রোগ জন্মিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এ কথা অস্বীকার করিতে কেমন করিয়া পারি ?

নারীর জীবনের ক্ষেত্র প্রসারিত করিতেই হইবে। নারীর জন্য কিংবা শ্রেণীবিশেষের পুরুষের জন্য বলিতেছি না,—সমাজের জন্যই বলিতেছি,—তাহার সময় আসিয়াছে। কারণ, শুধু এক এই কেরোসিনের কালিমা নহে, অনেক কালিমাই সমাজ-অঙ্গে পাথরের দাগের মত বসিয়া গিয়াছে ; এমন বসিয়া গিয়াছে যে, আর white-washএ ঢাকিবার নহে। কাটিয়া তোলা চাই। এই কথাটাই আর এক প্রকারে বলা চলে—"সংস্কার অপরিহার্য্য।"

আর, স্ত্রীলোকেরা আপনারাই সংঘবদ্ধ হইয়া আপনার পায়ে দাঁড়াক, তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য তাহারাই যুদ্ধ-ঘোষণা করুন,—এ কথা বলিতেও কেমন বাধ-বাধ বোধ হয়। আপনার স্বদেশ ও সমাজে এ ভাবটার আমদানী সত্যই ভয় করি। ভয়ের মূলে অবশ্য কোনও ভ্রূকুটী বা তর্জ্জনী-শাসনের কল্পিত মূর্ত্তি নাই। নারীর অভিভাবক পুরুষের প্রীতি-অপ্রীতির কথা মনে রাখিয়া, নারীর জীবন-সমস্যার কথা লিখিতে বসি নাই। তাঁহাদের সমস্ত অস্তিত্বটাই এখন আমার চৈতন্য হইতে চলিয়া গিয়াছে। আমি ভাবিতেছি, সমবেত জাতির কথা। এই সমবায়ের পুরুষ ও নারীরূপী দুইটী বিভিন্ন অংশে স্বাতন্ত্র্য একের সহিত অপরের সমান নহে। পুরুষ নারীকে এড়াইয়া আপনার উন্নতি, নারীকে বঞ্চিত করিয়া আপনার অধিকার, নারীকে ক্ষুণ্ণ করিয়া আপনার গৌরব, সমস্তই এতদিন নির্ব্বিকার চিত্তে প্রতিষ্ঠিত

করিয়া আসিয়াছে। সে অবিচার এবং পেষণ ও দলনে নারী মরে নাই। নারীর হাহাকারে আকাশও বিদীর্ণ হয় নাই।

কিন্তু এই সমস্তের সহিত যদি "বোঝার উপর শাকের আঁটি"টা চাপাইবার চেষ্টাও তাহাদের উপর হইয়া থাকে সমাজে তাহাদের অপমান এবং অবজ্ঞা যথেষ্ট পরিমাণ হইয়া আসিতেছে প্রকাশ পায়, তবে তাহারা ভাঙিয়া পড়িবে, তাহাদের দীর্ঘশ্বাসও যে উত্থিত হইবে না, এমন নহে।

নারী স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন না করিয়া যে পুরুষের নিম্নের স্থানেই পরিতুষ্ট আছে, সে আত্মরক্ষার্থ নহে,—সৃষ্টির স্বার্থে। তাহাদের অধীনতা যদি পুরুষের স্বার্থের জন্য ব্যবহৃত হয়,—তাহারা যে ছোট তাহার কারণ তাহারা পুরুষ অপেক্ষা হীন—এমনি সংস্কার যদি জাতির মধ্যে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তাহারা এতদিন অপমানিত হইয়া আসিতেছে। এই অপমান-বোধ উদ্দীপ্ত হইয়া পৃথিবীর অনেক স্বাধীন দেশের নারী প্রতিবিধিৎসায় অধীর হইয়াছে। পরাধীন দেশে পরাধীন নারী প্রতিবিধিৎসায় সাহসী হইবে না স্বীকার করি; আত্ম-গ্লানিতে জীবন্মৃত হইতে ত' পারে।

আজ বুঝি বা তাহাই হইয়াছে। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্য,—সেই জরাশিথিল পঙ্গুত্ব পর্য্যন্ত, ভাব দেখি তাহাদের অবস্থা! ভাব দেখি, তাহাদের দীর্ঘশ্বাসে বাঙ্গালীর দেশে—বাঙ্গালায় গগন-পবন উত্তপ্ত কি না! অনাথের মত সে অবস্থার বর্ণনা কি শুনিতে চাও? না, তাহা শুনাইব না। যে বোঝা, সে আপনা হইতেই অনুভব করিতেছে।

শিশুর ওজন

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য বিশারদ]

শিশু যখন মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় থাকে, তখন তাহার ওজনের কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একটি ২৮ দিনের ভ্রূণের ওজন ২০ গ্রেণ মাত্র। ৫৬ দিনে ভ্রূণ দুই হইতে পাঁচ ড্রাম ভারি হয়। পরে ৮৪ দিনে সে ১ হইতে ২ আউন্স; ১১২ দিনে ২ হইতে ৩ আউন্স; ১৪০ দিনে ৫ হইতে ৭ আউন্স; ১৬৮ দিনে ১ পাউণ্ড; ১৯৬ দিনে ২ হইতে ৩ পাউণ্ড; ২২৪ দিনে ৩ হইতে ৫ পাউণ্ড এবং ২৮০ দিনে বা গর্ভবাসের শেষ সপ্তাহে একেবারে ৬ হইতে ৯ পাউণ্ড ভারি হইয়া পড়ে।

পাঠক দেখিবেন, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শুধু যকৃতের ওজন ৬০ আউন্স। তাহার বক্ষঃগহ্বরস্থ ফুস্‌ফুস দুইটিও প্রায় ৩ পাউণ্ডের কম নহে। সে মাথার মধ্যে যে মস্তিষ্কটুকু ধারণ করে, তাহাও ওজনে ৫০ আউন্স হইবে। অতি ক্ষুদ্র ভ্রূণ দেহের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন!

কখন-কখন জননী-জঠরে ভ্রূণ অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ডাক্তার Taylor একটি ১২½ পাউণ্ড ওজনের নব-কুমার দেখিয়াছিলেন। Owensও একটি সদ্যঃপ্রসূত শিশুর কথা লিখিয়াছেন। তাহার ওজন প্রায় ১৮ পাউণ্ড। Davies বলেন তিনি এক সময়ে একটি অতি পুষ্ট আঁতুড়ে শিশু দেখিতে পান। বোধ হয় সেরূপ গুরুভার নব-কুমার কেহ কখন দেখেন নাই। শিশুটি ওজনে ১৯ পাউণ্ড ২ আউন্স ছিল; অর্থাৎ আমাদের বাঙ্গালা প্রায় সাড়ে নয় সের। কিন্তু এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল।

যোগ্য-কাল-জাত সুপুষ্ট নব শিশুর ওজন গড়ে ৬.৮ (ছয় দশমিক আট) পাউণ্ড; কিন্তু ইংরাজ মনীষীদিগের মতে উহা ৭½ পাউণ্ড। ফল কথা, দেশ ও অবস্থা ভেদে এই ওজনের অল্পাধিক পার্থক্য দেখা যায়। একবার ওয়ার্টেম্‌বার্গের ডাক্তার Elsoaesser ঐরূপ অনেকগুলি শিশুর ওজন লইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছেন, ৫০০ শিশুর মধ্যে ১৩টির ওজন ৪ হইতে ৫ পাউণ্ড; ৫৮টির ৫ হইতে ৬ পাউণ্ড; ১৭টির ৬ হইতে ৭ পাউণ্ড; ৩১৮টির ৭ হইতে ৮ পাউণ্ড; ৮৩টির ৮ হইতে ৯ পাউণ্ড এবং ১১টির ৯ হইতে ১০ পাউণ্ড ছিল।

Roederer বলেন, জার্ম্মাণিতে নবজাত শিশুর ওজন ৭ হইতে ৮ পাউণ্ড।

ডাবলিন্ হাসপাতালের ডাক্তার Joseph Clarke দেখিয়াছেন, তথাকার আঁতুড়ে শিশু ওজনে প্রায় ৭ পাউণ্ড হইবে।

ফ্রান্সে ঐরূপ শিশুর ওজন আরও কম; Camusএর মতে উহা ৬½ পাউণ্ড মাত্র।

ব্রুসেল্‌সে ক্ষুদ্র শিশুর ওজন প্রায় ৬½ পাউণ্ড; কিন্তু মস্কৌতে ৯ পাউণ্ডেরও কিঞ্চিদধিক।

সুবিখ্যাত Beck আমেরিকার কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, তথাকার সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ওজনও গড়ে ৭ পাউণ্ডের কিছু বেশী হইতে পারে।

ডাক্তার Mathews Duncan প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভূয়োদর্শন দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শিশুর ওজন তাহার মাতার বয়সের উপর অনেকটা নির্ভর করে। জননীর ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ওজনে অপেক্ষাকৃত অধিক ভারি হয়; কিন্তু ২৯ বৎসর বয়সের পর শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, শিশুর দৈহিক ভারেরও ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে।

সাধারণতঃ জন্মের পর ৩ দিবস পর্য্যন্ত সকল শিশুই ওজনে কিঞ্চিৎ লঘু হইয়া যায়। তাহার পর সপ্তম দিবসাবধি একই অবস্থায় থাকিয়া ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিতে থাকে।

মাসে-মাসে সুস্থ শিশু কি হারে বর্দ্ধিত হয়, তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে;—

জন্ম সময়ের ওজন	৬.৮ পাউণ্ড।
১ মাস বয়সের "	৭.৪ "
২ মাস বয়সের "	৮.৪ "
৩ মাস বয়সের "	৯.৬ "

৪ মাস বয়সের „	১০.৮ „
৫ মাস বয়সের „	১১.৮ „
৬ মাস বয়সের „	১২.৪ „
৭ মাস বয়সের „	১৩.৪ „
৮ মাস বয়সের „	১৪৪ „
৯ মাস বয়সের „	১৫.৮ „
১০ মাস বয়সের „	১৬.৮ „
১১ মাস বয়সের „	১৭.৮ „
১২ মাস বয়সের „	১৮.৮ „

সকল দেশেই পুত্র অপেক্ষা কন্যার ওজন কিছু কম। বোষ্টনের ডাক্তার Storer ২২২টি নবকুমার ও ১৮৪টি নবকুমারীর ওজন লইয়াছিলেন। পুত্রগুলি গড়ে ৭১/৫ এবং কন্যাগুলি ৭১/২ পাউণ্ড ভারি হইয়াছিল।

পণ্ডিত Queteletও অনেক শিশুর ওজন-তালিকা সংগ্রহ করেন। তিনি দেখিয়াছেন, জন্ম সময়ে পুত্রগুলি গড়ে ৩.২০ এবং কন্যাগুলি ২.৯১ কিলোগ্রাম * ভারি ছিল।

সমবয়স্ক মেয়ের ওজন ছেলের ওজন অপেক্ষা চিরদিনই কম। তবে দ্বাদশ বৎসর বয়সে উভয়ের ওজন প্রায় সমান হয়; এবং সাড়ে বার হইতে সাড়ে পনর বৎসর বয়সে একবার মেয়েরা ছেলেদের অপেক্ষা ওজনে ভারি হইয়া যায়; তৎপরে আবার যথারীতি ছেলেরাই গুরুভার হইয়া পড়ে।

গ্রীষ্ম অপেক্ষা শীতকালেই শিশুর ওজন বাড়ে। পূর্ণ বয়সে শিশু, জন্মকালীন ওজনের কুড়িগুণ অধিক ভারি হয়।

ছেলেরা ৪০ বৎসর এবং মেয়েরা ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ওজনে বাড়িতে থাকে। তাহার পর ক্রমশঃ হ্রাসেরই সময়। Queteletএর মতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই ক্রমহ্রাসের পরিমাণ ৬ হইতে ৭ কিলোগ্রাম।

প্রাচীন বিষ্ণুপুর ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

[শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দে]

আজি হইতে ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ও পলাশীর যুদ্ধের ১৩ বৎসর পরে বাঙ্গালাদেশে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; তাহারই নাম "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।" বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এই সর্ব্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ বঙ্গদেশে দেখা দেয় বলিয়া, লোকে ইহার ছিয়াত্তরের বা ছিয়াত্তর সালের দুর্ভিক্ষ নাম দিয়াছে। ১১৭৬ সাল বাঙ্গলার অতি দুর্দ্দিন; কিন্তু তারই কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার নবাব সুজাউদ্দিনের সময়ে টাকায় আট মণ দরে চাউল বিক্রীত হইয়াছিল; এবং আরও কিছুদিন পূর্ব্বে সায়েস্তা খাঁর সময়েও বঙ্গদেশে চাউলের ঐ দর ছিল। ১১৭৬ সালে, শুনিয়াছি, মুষ্টিমেয় চাউলের জন্য কত নরহত্যা পর্য্যন্ত হইয়াছে; এবং চতুর্গুণ সুবর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়েও অনেকে মুষ্টিমেয় চাউলও প্রাণরক্ষার জন্য যোগাড় করিতে পারে নাই।

বাঙ্গলা ১১৭৬ সাল ইংরাজী ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দের সমকাল। ইংরাজগণ তখন এদেশে শাসননীতি সংস্থাপন ও দৃঢ়ীভূত করিতেছিলেন। মারহাট্টাগণ সমস্ত ভারতবর্ষের উপর মার মার কাট কাট রবে ছুটাছুটি করিতেছিল; ক্ষুদ্র বৃহৎ, হিন্দু-মুসলমান সমস্ত রাজা তাহাদের চক্রান্তে ও তাহাদের ভয়ে ত্রস্ত ও শশব্যস্ত। বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তের সমস্ত জেলাগুলি তাহাদের প্রবল ও দুর্ব্বহ অত্যাচারে একেবারে হীনবীর্য্য ও লুণ্ঠিত। মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মানভূম, রাজমহল ও মুরশিদাবাদ প্রভৃতি (এতগুলি জেলা বঙ্গের কতটা অংশ ভৌগোলিক পণ্ডিত অনায়াসে তাহার বিচার করিয়া লইবেন) কোন জেলার মধ্যে অর্থ, শস্যভাণ্ডার ও বীর্য্যবান ব্যক্তি—মারহাট্টার অত্যাচারে সে সময় কিছুই ছিল না। ইংরাজের ন্যায় সুশাসক ও সুদক্ষ রাজা সে সময় বঙ্গদেশে না দেখা দিলে, বাঙ্গলার অদৃষ্ট-তরী আরও ভীষণ দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হইত। বিষ্ণুপুরের খ্যাতনামা শেষ রাজা চৈতন্য সিংহ তখন প্রাচীন মল্লভূমির দুর্ব্বল সিংহাসনে অধিরূঢ়। ঘোর দুর্ভিক্ষ সেই সময়ে উপস্থিত। ইতিহাস বলে, এই দুর্ভিক্ষ এক বৎসরের অনাবৃষ্টিতে সংঘটিত হইয়াছিল; বলিতে পারি না ইতিহাসের কথা কতটা সত্য?

দুর্ভিক্ষ চিরকালই এ দেশে সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। আজকাল সংবাদপত্রের আন্দোলনে, ও লোকের অসচ্ছলতায়, দুর্ভিক্ষের কথা প্রায় প্রতি বৎসরই লোকের কর্ণগোচর হয় বলিয়া, যদি কাহারও এরূপ ধারণা থাকে যে, ইংরাজ রাজত্ব ভিন্ন অন্য কোনও কালে দুর্ভিক্ষ হয় নাই, তবে তাহা নিতান্তই ভুল। প্রাচীন কালের দুর্ভিক্ষের তুলনায়, এই সুসভ্য পৃথিবীর সুবন্দোবস্তের আমলে যে দুই-একটা দুর্ভিক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা কিছুই নহে বলিয়াই বোধ হয়। সুগম রাস্তা, সুবিস্তৃত রেলপথ, বিদেশীয় শস্যসম্ভারপূর্ণ বাষ্পীয়-পোত প্রভৃতি দুর্ভিক্ষ-দমনের প্রবল ও প্রধান উপায়সমূহের সেকালে কিছুই ছিল না, সুতরাং দুর্ভিক্ষ তখন অতি ভীষণ আকার ধারণ করিত। সেই সকল দুর্ভিক্ষের মধ্যে ছিয়াত্তর সালের দুর্ভিক্ষ আরও ভীষণ। এই জন্য উহা মন্বন্তর নামে অভিহিত হইয়াছে। লিখিত আছে, বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ লোক এই দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করে। তখন আদম-সুমারিও ছিল না, এবং পুলিসের কৌতি বহিও ছিল না। সুতরাং ঠিক কত লোক মরিয়াছিল, এখন তাহা বলিবার উপায় নাই। সমগ্র বঙ্গদেশে গড়ে এক-তৃতীয়াংশ হইতে পারে, কিন্তু বিষ্ণুপুর বিভাগের সংখ্যা এতদপেক্ষা বহুগুণ অধিক। দুর্ভিক্ষের পরে, মন্বন্তরের

---

* এক কিলোগ্রাম প্রায় ইংরাজী ২১/৫ পাউণ্ড।

সময়ে যে কয়জন প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা এই দুর্ঘটনাকে মন্বন্তরের মতই বোধ করিয়া থাকিবে। সমগ্র বিষ্ণুপুর বিভাগের বারো আনা অংশ এই দুর্ভিক্ষের পর জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল।

ইতিহাসে লিখিত আছে, দেবতার কুদৃষ্টিই এই দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ। প্রয়োজন মত বৃষ্টি না হওয়াতেই, বঙ্গদেশে এই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনকালে বঙ্গদেশের মধ্যে অনেক দুর্ভিক্ষ দেখিলাম; কিন্তু এক বৎসরের অনাবৃষ্টিতে কোন সময়ে এরূপ মহামারী হইতে দেখি নাই। সে কালে দেশের এরূপ অবস্থা যে, টাকায় আট মণ, চারি মণ বা দুই মণ চাউলও বিক্রীত হইত। ধান চাউলের বড়-বড় মহাজন এবং অধিকাংশ গৃহস্থের ধান্যের গোলা ও মরাই যে না ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারা যায় না। তখনকার কালে এত চাকুরী ছিল না; এবং লোকে চাকুরীরও তেমন প্রয়াস করিত না। পল্লীগ্রামের কৃষিজীবী লোকের ধান্যই অর্থ; সুতরাং নগদ টাকা ও সোণা রূপার পরিবর্তে ধান্যের ভাণ্ডার যে অধিকাংশ লোকের খুব প্রচুর পরিমাণে থাকা সম্ভব, ইহা বেশ বুঝা যায়। সেকালের মত তত অধিক শস্য আজকাল-উৎপন্ন হয় না; কিন্তু, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায়, প্রতি জেলায়, প্রতি পল্লীগ্রামেই দুই-চারিজন করিয়া বড়-বড় মহাজন অথবা গৃহস্থের ভাণ্ডারে দুই-তিন বৎসরেরও খাদ্য মজুত থাকে। তদ্ব্যতীত, তখনকার দিনে শস্য অপেক্ষা অন্যান্য দ্রব্যও প্রচুর সস্তা ছিল। টাকায় তিন-চারি সের ঘী, পাঁচ-ছয় সের তেল, এক মণ দুধ, আট-দশটা পাঁঠা, চল্লিশটা মুরগী,—এ সকলের পরিচয় আইন-ই-আকবরীর সময় হইতে হেষ্টিংসের সময় পর্যন্ত অনেক কাগজেই কিছু-কিছু উল্লিখিত আছে। ঐতিহাসিক বিবরণের প্রয়োজন নাই; প্রতি পল্লীগ্রামের দুই-একজন বৃদ্ধকে এ সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাদের জীবনকালেরই যে সকল পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহাও আমাদিগের নিকটে আরব্য উপন্যাসের স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইবে। পয়সায় এক কুড়ি আম, দুই কুড়ি বেগুণ, দুইটা কাঁঠাল, ইহার ইতিহাস সঙ্গে-সঙ্গেই পাওয়া যাইতে পারে। অনেকের বিশ্বাস যে, যদি সুগম রাস্তা, রেলপথ ও ষ্টীমার প্রভৃতি না থাকিত, যদি ডাক বিভাগ, টেলিগ্রাফ ও সংবাদপত্র ঐ সকলের সহায়তা না করিত, তবে আজিও বহুস্থানে ঐ সকল দ্রব্যের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যাইত; এবং মূল্যও তখনকার দিনের মত না হউক; তদনুরূপ সস্তা হইত।*

প্রয়োজন-মত বৃষ্টি না হওয়াতেই বঙ্গদেশে ছিয়াত্তর সালের দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, ইতিহাসের সাধারণ প্রবাদ ইহাই। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, একটা গ্রামে বড়-বড় গৃহস্থের ও মহাজনের বাড়ীতে যে পরিমাণ শস্য মজুত থাকে, তাহাতে অন্ততঃ এক বৎসর সমগ্র গ্রাম-বাসীর বেশ চলে। এপ্রকার অবস্থা মন্বন্তরের পূর্ব্বে না থাকিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু বিষ্ণুপুর বিভাগে এই অবস্থার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম বহু পূর্ব্ব হইতেই দেখা গিয়াছিল। সেখানে এক বৎসরের অনাবৃষ্টিই দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ নহে।

এই দুর্ভিক্ষ বঙ্গদেশের মধ্যে কিরূপ ভাবে কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক কোন ইতিহাস নাই; কিন্তু বিষ্ণুপুর বিভাগে যে এই দুর্ভিক্ষ সর্ব্বব্যাপী হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার কতক-কতক ঐতিহাসিক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইংরাজ তখন সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে, সুশাসনের সুদৃঢ় ব্যবস্থা বিস্তার করিতে পারেন নাই; জেলায়-জেলায় এখনকার মত কালেক্টর নিযুক্ত হয় নাই; এবং কোথাও-কোথাও হইয়া থাকিলেও, আজকালিকার মত সর্ব্ব-বিষয়ক তত্ত্বাবধারণ ও তদ্বিষয়ক রিপোর্ট লিপিবদ্ধ হইয়া উপরওয়ালার নিকট প্রেরিত হইবার উপায় ছিল না। এখনকার দিনে প্রতিদিনের বারিপতন, প্রতি সপ্তাহের শস্যের অবস্থা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত জেলাতেই প্রতিদিন লিপিবদ্ধ হইয়া

---

* লোকে বলে য়ুরোপ প্রভৃতি স্থানে চালান যায় বলিয়াই জিনিস এত দুর্ম্মূল্য, ও লোকের এত কষ্ট। এ কথার উত্তরে এই বলিতে পারা যায় যে, কোন-কোন জিনিস বিদেশে রপ্তানী হয় বটে, কিন্তু শাক, বেগুন, পটল, মাছ যাহা দেশেই থাকে, তাহাও এত মহার্ঘ কেন? রাজকীয় রাস্তা ও রেল প্রভৃতি দিন-দিন প্রসারিত হইয়া, এক জেলার জিনিস অন্য জেলায় যায় বলিয়া, আমাদিগেরই দেশের লোকের অভাব বিদূরিত হইতেছে। পটল, মালদহে আম, ইলিশ মৎস্য সকল জেলায় উৎপন্ন হয় না; কিন্তু সময়ে অধিকাংশ স্থানের লোকই ইহার স্বাদ লাভ করে। অবশ্য চালান দেওয়া না দেওয়া স্থানীয় লোক, স্থানীয় জমিদার বা রাজকর্ম্মচারী, অথবা স্থানীয় সমিতির কার্য্য। রেল প্রভৃতির বিস্তারে জিনিসের দর দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই সমান, দুর্ভিক্ষের সময়ও একই রূপ। আজ মৈমনসিং হইতে রাঁচি পর্য্যন্ত দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পয়সায় ক্ষুদ্র একটা রসগোল্লা, চারি খিলি পান, বা ৬।৭টী সুপারির অধিক কেহ দিতে পারে না। পাঁচ আনা গুড়ের সের, নয় সিকা ঘীয়ের সের, দশ আনা চিনির সের—ইহা প্রায় সকল জেলাতেই একরূপ; কেবল স্থান ও স্থানের দূরত্ব-বিশেষে উনিশ-বিশ প্রভেদ মাত্র। টাকায় চার সের বা পাঁচ সের চাউলও ঐরূপ। রাজপথ, রেলপথ ও নদীপথে সকল জেলাকে সমান করিয়া দিয়াছে। এইজন্য এখনকার দুর্ভিক্ষে তখনকার মত তত লোক মরে না; এবং দুর্ভিক্ষ তখনকার মত তেমন প্রবল পরাক্রম ধারণ করিতে পারে না। রেল প্রভৃতি ব্যতীত, দুর্ভিক্ষ দমনের আরও বহু উপায় আজকালিকার উন্নত রাজ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। Irrigation canal, rain report, relief work প্রভৃতি বহু প্রকার হিতকর কার্য্যের সৃষ্টি একালে হইয়াছে। তখন এ সকলের কিছুই ছিল না। সুতরাং বিদেশে রপ্তানিই বোধ হয় সকল অনিষ্টের মূল নহে। আজকাল কোন-কোন খাদ্যদ্রব্য যদিও বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, কিন্তু যে সময় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হইয়াছিল, তখন কোন খাদ্য দ্রব্যই বিদেশে যাইত না।

থাকিতেছে। তখন এ সকলের কিছুই ছিল না ; সুতরাং দুর্ভিক্ষ কোন্-কোন্ স্থানে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। সাধারণ কথা এই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, রাজার খাজনা নিয়মিত ভাবে সংগৃহীত হয় নাই,—অজন্মা ও তজ্জনিত হাহাকারই তাহার একমাত্র কারণ। এই বর্ণনা কোন-কোন স্থানে সুস্পষ্ট ; এবং কোথাও কোথাও ইঙ্গিতমাত্রেই পরিসমাপ্ত।

প্রাচীন বিষ্ণুপুর বা সমগ্র বঙ্গভূমির সাধারণ উৎপন্ন দ্রব্য ধান্য। রবিশস্য বিষ্ণুপুরে উৎপন্ন হইত না, এবং এখনও হয় না। সুতরাং যে দেশ বা যে জাতিকে একটী মাত্র ফসলের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, দুর্ভিক্ষ সেই দেশ বা সেই জাতির উপর অত্যধিক প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। এক বৎসর বা দুই বৎসরের অনাবৃষ্টিতে মনুষ্যের কষ্ট হয় বটে, কিন্তু একেবারে এক-তৃতীয়াংশ বা তৎপরিমাণ লোক হানি হইবার সবিশেষ কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বা দেশের বারো আনা অংশ মনুষ্যশূন্য হইয়া জঙ্গলেও পরিণত হয় না।

ইতিহাসজ্ঞ অবগত আছেন গোপাল সিংহের সময় মারহাট্টাগণ বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল ; কিন্তু অন্যান্য রাজ্য যেমন ইঙ্গিত-মাত্রেই মারহাট্টাদিগের কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া তাহাদের অধীনস্থ হইয়াছিল, বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে তাহা হয় নাই। মারহাট্টারা বিষ্ণুপুরের দ্বারে আসিয়া পরাজিত ও অপমানিত হইয়া, সেখান হইতে পলায়নপর হইয়াছিল। এ প্রকার ক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্ত রাজ্য অপেক্ষা বিষ্ণুপুরের উপর তাহাদের ক্রোধের পরিমাণ যে অধিক হইবে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

বঙ্গের পলিমাটীময় ভূভাগ তাহাদের ঘোড়সওয়ার সৈন্যের পক্ষে নিতান্ত অসুবিধাজনক হওয়ায়, তাহারা শক্ত মৃত্তিকাময় দেশে আসিয়া ছাউনি গাড়িয়াছিল ; এবং এই কারণে, তাহারা সেই দেশে কুড়ি বৎসরেরও অধিক কাল অবস্থিতি করিয়া, এবং সে দেশের রক্তমাংসমজ্জা সমস্তই শোষণ করিয়া লইয়া, তবে সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। দেশ পরিত্যাগ করিলেও, মারহাট্টা-ভীতি লোকের মনের মধ্যে বহুকাল পর্য্যন্ত জাগরূক ছিল। কেহ টাকার সিন্দুক ঘরে রাখিত না, ধান্যের গোলায় প্রাঙ্গণ শোভিত করিত না। মিথ্যা করিয়াও লোকে যদি বলিত; মারাহাট্টা আসিতেছে, অমনি স্ত্রী-পুরুষ দেশ ছাড়িয়া পলাইত ; এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি মাথায় কালো হাঁড়ি কিম্বা টোকা লইয়া পচা পুকুরের জলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত।

কুড়ি বৎসরের অধিককাল মারহাট্টারা ছাউনি গাড়িয়া সে দেশে বাস করিয়াছিল ; এবং তাহার পরেও মাঝে-মাঝে যখনই মনে করিয়াছিল দেশের মধ্যে ধনরত্ন কিছু জমিয়াছে, তখনই স্বদেশ হইতে আসিয়া পুনরায় আক্রমণ করিয়া বিষ্ণুপুর লুণ্ঠিত করিয়াছিল। আমরা সম্যক ধারণা করিয়া লইতে পারি যে, বিষ্ণুপুরের রাজাদের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে আর তাহারা কখনও অগ্রসর না হউক, কিন্তু তাহারা সুবিস্তৃত বিষ্ণুপুর রাজ্য উক্ত বিংশ বর্ষ ও তৎপরবর্ত্তী সময়ের মধ্যে বহুবার আক্রমণ করিয়া, প্রজার যথেষ্ট সর্ব্বনাশ সংসাধিত করিয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শুধু তাহাই নহে,—বিষ্ণুপুর যাহাতে আর মাথা তুলিতে না পারে, তাহার জন্য যে স্থানের উপর দিয়া তাহারা গমন করিয়াছে, সেই স্থানের সর্ব্বত্র আগুন লাগাইয়া, শস্য নষ্ট করিয়া, মনুষ্যের ইজ্জৎ ও প্রাণহানি করিয়া, যে প্রকারে হউক, চিরদিনের জন্য বিপর্য্যস্ত ও বিনষ্ট করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মারহাট্টারা কেমন করিয়া কোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেবীর নিকট ৬০ জন লোক বলি দিয়াছিল, অর্থ দিতে অপারগ গ্রামের প্রধানকে কেমন করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, বিষ্ণুপুর ও মানভূম জেলার বহু পল্লীগ্রামের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ এখনও সেই কাহিনী বলিয়া বালকবালিকা ও আগন্তুক লোকের মনে ভীতি উৎপাদন করে।

যাঁহারা মারহাট্টা গৌরবের পক্ষপাতী, যাঁহারা মারহাট্টাদিগের জাতীয় অভ্যুত্থানের চির-প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা মারহাট্টার সমস্তই ভাল দেখিবেন সন্দেহ নাই। মারাহাট্টা কীর্ত্তি ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে মহিমময় কি তৎবিপরীত, সে বিচারে আমি প্রবৃত্ত নহি ; কিন্তু মারহাট্টার সহিত বঙ্গদেশের যতটুকু সম্বন্ধ, আমাদিগের ততটুকু প্রয়োজনের মধ্যে দেখিতে পাই যে, বঙ্গদেশে মারহাট্টা অত্যাচার অত্যন্ত প্রকট হইয়াছিল। মারহাট্টার পীড়নে দেশ যখন এই ভাবে একেবারে লুণ্ঠিত-সর্ব্বস্ব, তখন বিষ্ণুপুরের রাজ সংসার গৃহ-বিবাদে পরিপূর্ণ। রাজা হরিভক্তি-রসাস্বাদে একেবারে নিশ্চেষ্ট ও লুপ্তবীর্য্য। দেওয়ান রাজ্যের কর্ণধার। পুলিস হীনবল। রাজ্যের সকল বিভাগই যথেষ্ট আলগা। অরাজকতা বোধ হয় ইহারই নাম। আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির দিকেই কর্ম্মচারী-দিগের মনোযোগ অধিক। সকল বিভাগের প্রায় সকল কর্ম্মচারীই স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী রাজকার্য্যের ক্ষতি করিয়া নিজের স্বার্থেই অধিক মনোযোগ দিতেছিল। এ দিকে আবার রাজ-ভাণ্ডার অর্থশূন্য, এবং অর্থের প্রয়োজনীয়তাও এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কাজেই আন অর্থ, আন অর্থ করিয়া প্রজার নিকট হইতে মাগন, জবরদস্তি, কূরবুদ্ধি প্রভৃতি যত প্রকার পন্থা হইতে পারে, সকল পন্থাই অনুসৃত হইয়াছিল। শুধু ইহাই নহে—দামোদর সিংহ হয় ত অর্থে বশীভূত করিয়া রাজ-দরবার হইতে নিজের নামে রাজ্য বন্দোবস্ত করাইয়া আনিয়া ও আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচিত করিয়া প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিতে লাগিল ; চৈতন্য সিংহ হয় ত তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কিম্বা অন্য কোন উপায়ে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া, সেই সকল প্রজার নিকট হইতেই দোকর আদায় করিতে লাগিল। যে প্রজা একদিন মল্লারসী নাথ নামে রাজার উদ্দেশে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করিয়া প্রতিদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিত, সেই প্রজাই অত্যাচার-প্রপীড়িত হইয়া গ্রাম শূন্য করিয়া সেই মল্লারসী নাথকে গালি দিতে-দিতে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।

বিষ্ণুপুর রাজ্য এই ভাবে মারহাট্টার অত্যাচার ও রাজবংশের

অত্যাচারে ঘোর অরাজকতার মধ্যে আহত জন্তুর স্থায় মৃতপ্রায় অবস্থায় ছটফট করিতেছিল। তার পর ১১৭৬ সাল। ১১৭৬ সালে সেই লুণ্ঠিত-সর্ব্বস্ব প্রজার উপর ঘোর দুর্ভিক্ষ আসিয়া পড়িল। সেই ঘোর দুর্ভিক্ষ বিষ্ণুপুর রাজ্যের আহত শরীরের অবসন্নপ্রায় মস্তকে এক ঘা বসাইয়া দিয়া, যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সব সমাপ্ত করিয়া চলিয়া গেল। রাজ্য মারহাট্টার অত্যাচারে পূর্ব্ব হইতেই জনশূন্য হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে একেবারে শূন্য হইয়া গেল। সমৃদ্ধিশালী পল্লীগ্রামসমূহ ধ্বংস হইল; বড়-বড় মহাজন, যাহারা মারহাট্টা-প্রপীড়নের পরও অবস্থা গুছাইয়া তুলিয়াছিল, তাহারা, হয় দেশ ছাড়িয়া পলাইল, না হয় বিনষ্ট হইল। শস্যের ক্ষেত্র অনাবাদে পরিণত হইল এবং রাজ্যের ভাল-ভাল বিপুল অংশ অরণ্যে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

রাজ্যের পৃষ্ঠবল ও গৌরবস্বরূপ শান্ত-প্রকৃতি প্রজার সমৃদ্ধি নষ্ট হইতে দেখিয়া, ভবিষ্যৎকালে মারহাট্টা শত্রু বিষ্ণুপুরের দিকে আর অধিক মনোযোগ দেয় নাই; কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর সময় বুঝিয়া রাজত্বের মধ্যে আর এক শ্রেণীর দস্যুর আবির্ভাব হইল। তাহারা দেশীয় লোক। অরাজকতা ও দেশের দুঃখের সময়ে এই শ্রেণীর দস্যু প্রায় সর্ব্বত্রই মাথা তুলিয়া থাকে। দলে-দলে লুণ্ঠন করিয়া, তাহারা সমগ্র বিষ্ণুপুর ও বীরভূমির সর্ব্বাংশেই আপনাদিগের দল যথেষ্ট পুষ্ট করিয়া, দেশের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। পাঁচশত, ছয়শত ও হাজার লোক এক-এক দলে সমবেত করিয়া, এই সকল দস্যু গ্রাম-নগর লুঠ করিয়া, হাট-বাজার জ্বালাইয়া দিয়া বিষ্ণুপুরের যেটুকু আশা হয় ত তখনও অবশিষ্ট ছিল, তাহাও চিরদিনের জন্য বিনষ্ট করিয়া দিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বিভাগ সম্রাট শাহ আলম ইংরাজদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ইংরাজগণই তখন সে দেশের শাসনকর্ত্তা। স্থানীয় কোন হেড কোয়ার্টার্সের বন্দোবস্ত না থাকায়, ইংরাজেরা তখন বীরভূমি ও বিষ্ণুপুর মুরশিদাবাদ হইতে শাসন করিতেন। মন্বন্তরের পর অরাজকতা এইরূপ ভাবে আরও বর্দ্ধিত হওয়ায়, দূরবর্ত্তী মুরশিদাবাদ হইতে এই সকল প্রদেশ শাসন করা দুরূহ হইল। এই জন্য ইংরাজদিগের প্রথম বন্দোবস্তানুসারে বীরভূমিতে একজন ও বিষ্ণুপুরে একজন করিয়া কালেক্টর নিযুক্ত হইল; এরূপ বন্দোবস্তেও সুবিধা না হওয়ায়, লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় দুইটী জেলা এক হইয়া একটী সংযুক্ত জেলায় পরিণত হয়; এবং উভয়ের উপর একজন কালেক্টর নিযুক্ত হয়েন। হেড কোয়ার্টার্স কখনও শিউড়ি ও কখনও বিষ্ণুপুর। এই সংযুক্ত জেলার উপর Pye, Sherbourne ও Keating প্রভৃতি যে সকল কালেক্টার সর্ব্বপ্রথম নিযুক্ত হইয়াছিলেন, দেশের মধ্যে দস্যুর অত্যাচার ও মন্বন্তর-ঘটিত অরাজকতা নিবারণ করিতেই তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যকাল ব্যয়িত হইয়াছিল; তথাপি সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। মন্বন্তরের পর প্রায় কুড়ি বৎসর কাল দেশের মধ্যে এইরূপ ঘোর অত্যাচার ও অরাজকতা বিরাজ করিয়াছিল। তার কিছুকাল পরে বোধ হয় শান্তির শীতল ছায়া দেখা দেয়। কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজ্য আর মাথা তুলিতে পারে নাই।

প্রজার সুখ সমৃদ্ধিই বিষ্ণুপুর রাজ্যকে উন্নতির উচ্চমঞ্চে অধিরোহণ করাইয়াছিল; আবার প্রজার অধঃপতনই তাহাকে চিরদিনের জন্য মাটীতে মিশাইয়া গেল।

নদীয়ায় নীল

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস]

কিছুদিন পূর্ব্বে অমৃতবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺শিশির-কুমার ঘোষ মহাশয়ের Indian Sketches নামক পুস্তকে 'A Story of Patriotism in Bengal' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। প্রবন্ধটী পাঠের পর ঐ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য আমার ইচ্ছা হয়। মহাত্মা কেন্ (Caine) সাহেব উক্ত পুস্তকের মুখবন্ধ (Preface) লিখিয়াছেন। শিশিরবাবু ইংরাজী ও বঙ্গসাহিত্যে সুপণ্ডিত। সুতরাং তাঁহার পুস্তকের ভাষা ও রচনা সম্বন্ধে বলা নিষ্প্রয়োজন। মাননীয় সি. ই. বক্‌লণ্ড (C. E. Buckland) প্রমুখ যে সকল মনস্বিগণ (১) নীল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন্ তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া, নদীয়ার নীল-সংঘর্ষের যে ঘটনাটীর শিশিরবাবু উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার যথাযথ ইতিহাস এইখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শিশির বাবুর প্রবন্ধটী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দুই-একটা স্থানে প্রমাদ থাকিলেও, অমৃত-বাজারের প্রবন্ধটীর নিমিত্ত সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শিশিরবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। সমগ্র বঙ্গদেশে নীলসংঘর্ষ উপলক্ষে যে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার মূলে দুইজন মাত্র বাঙ্গালী ছিলেন। প্রথম ব্যক্তি পোড়াগাছানিবাসী ৺দিগম্বর বিশ্বাস ও অপর ব্যক্তি চৌগাছা নিবাসী ৺বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস। ইঁহারা উভয়েই জাতিতে কৃষিকৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) ছিলেন (২)।

---

(১) নীলদর্পণ-রচয়িতা স্বর্গীয় দীনবন্ধু বাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম-এ মহাশয় তদীয় 'History of Indigo Disturbance in Bengal' নামক পুস্তকে শিশিরবাবুর A Story of Patriotism in Bengal প্রবন্ধটীর একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন।

(২) শিশির বাবু এই দুইজনকেই নীল-সংঘর্ষের নেতা বলিয়াছেন। নদীয়ার অনেকের নিকট শুনা যায় যে, দিগম্বরই নীল-সংঘর্ষের প্রকৃত নেতা ছিলেন। ঐ কারণে তাঁহাকে অশেষবিধ আর্থিক ক্লেশ ও

পোড়াগাছা গ্রাম কৃষ্ণনগর হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। চৌগাছা কৃষ্ণনগর হইতে কিঞ্চিত দূরে। শিশির বাবু ইঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"They were both men of some property......they were not acquainted with English language, but they were men of indomitable perseverance and courage. They were besides men of heart and had large share of that intelligence which generally characterises a Bengali gentleman."

দিগম্বরের ছোট ছোট কয়েকখানি জমিদারী ও কতকগুলি গোলাবাড়ী ছিল। ঐ সকল গোলাবাড়ী হইতে প্রজাদিগকে ধান্য 'দাদন' করা হইত এবং প্রজাদিগের সুবিধামত ধান্য আদায় করিয়া লওয়া হইত। বিষ্ণুচরণেরও মহাজনী ও ধান্যের 'কারবার' ছিল। উভয়েই প্রথমে নীলকুঠির দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। নদীয়া জেলায় অনেকগুলি নীলের কুঠি ছিল। তাহাদের মধ্যে বাঁশবেড়িয়া, কাথুলি, নিশ্চিন্তিপুর ও কাচিকাটা কুঠিই প্রধান ছিল।

প্রবল-প্রতাপান্বিত জেমস্ হিল (James Hill) নিশ্চিন্তিপুর কুঠির অধ্যক্ষ ও জন হোয়াইট (John White) নামক জনৈক শান্ত, প্রজারঞ্জক সাহেব বাঁশবেড়িয়া কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। দিগম্বর বিশ্বাস, জয়নারায়ণ বিশ্বাস, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সরকার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ জন হোয়াইটের (John White) অধীনে কার্য্য করিতেন। নীলের চাষে নদীয়া তৎকালে সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান ছিল। (৩) অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি হইলে নদীয়া সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথমে উহার প্রতিবাদ করে।

জন হোয়াইট বৃদ্ধ হওয়াতে উঁহার জনৈক আত্মীয় জেমস্ স্মিথ (James Smith) সেই সময়ে বাঁশবেড়িয়ার কুঠিতে আসেন এবং বাঁশবেড়িয়া কুঠির অধ্যক্ষ হন। বাঁশবেড়িয়াতে অবস্থিতি করিবার কালে তিনি নিজে কাথুলির কুঠি খরিদ করেন। নদীয়ার কোন কুঠিয়াল সাহেব জন হোয়াইটের (John White) পুত্র উইলিয়ম হোয়াইটকে (William White) জেমস্ স্মিথের (James Smith) বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে পত্র লিখেন। ঐ পত্রে লেখা ছিল যে, তাঁহার পিতার সম্পত্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছে, ইংলণ্ড হইতে না আসিলে সম্পত্তির আর কিছু থাকিবে না। উইলিয়ম হোয়াইট (William White) এই পত্র পাইয়া সত্বর এ দেশে চলিয়া আসেন। তিনি দিগম্বর, জয়নারায়ণ প্রভৃতিকে, জেমস্ স্মিথের (James Smith) বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ হইয়াছিল, তাহা যথার্থ কি না, জিজ্ঞাসা করেন। দুই-একজন কর্ম্মচারী জেমস্ স্মিথের (James Smith) বিরুদ্ধে বলেন। দিগম্বরকে জিজ্ঞাসা করিলে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কেবল গোবিন্দপুরের সংঘর্ষে বিষ্ণুচরণ বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার নাম প্রায় শুনা যায় না। শিশির বাবুর পুস্তক পড়িলে বোধ হয়, তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; কিন্তু উভয়ে স্বজাতীয় হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না।

(৩) "Nadia District was the principal scene of the Indigo riots of 1860 which occasioned so much excitement throughout Bengal proper." Vide Imperial Gazetteer XVIII. p. 273.

Except in Nadia, the Indigo Act was not worked to any very great extent.

Bengal under L. G.—C. E. Buckland.

নদীয়ার organisation সম্বন্ধে স্বয়ং বঙ্গেশ্বর সার জে. পি. গ্রাণ্ট (Sir J. P. Grant) যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল :—

"On my return a few days afterwards along the same two rivers, from dawn to dusk, as I steamed along these 2 rivers for 60 or 70 miles, both banks were literally lined with crowds of villagers, claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves; the males who stood at and between the river-side villages in little crowds must have collected from all the villages at a great distance on either side. I do not know that it ever fell to the lot of any Indian officer to steam for 14 hours through a continued double street of suppliants for justice; all were most respectful and orderly, but also were plainly in earnest. It would be folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people, men, women, and children has no deep meaning. The organisation and capacity for combined and simultaneous action in the cause, which this remarkable demonstration over so large an extent of country proved, are subjects worthy of much consideration."

Vide Sir J. P. Grant's Minute of 17th Sept 1860.

ইঁহাদের organisation সম্বন্ধে শিশির বাবু লিখিয়াছেন :—

"It is a mystery to them as to how a combination of the apathetic Bengali rayots, a combination in which about five millions of men took part, was brought about so secretly and so suddenly without the authorities knowing anything about it."

Indian Sketches by Late Sisirkumar Ghosh.

করিল। অল্পকাল মধ্যেই নীলকরগণের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইল; অনেকের কুঠি ও ভূসম্পত্তি বিক্রীত হইয়া গেল (৯)।

৺দিগম্বর বিশ্বাস মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট শুনিয়াছি যে, ইহাতে তাঁহাদের প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু ঐ অর্থ তাঁহাদিগের ন্যায় মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে অধিক হইলেও যে মহৎ কার্য্য তাঁহারা সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহার তুলনায় যৎসামান্য বলিতে হইবে। এই ঘটনার পর হইতে পোড়াগাছার বিশ্বাস মহাশয়দিগের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে।

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলই নশ্বর। কালের প্রভাবে নীলের অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে। অধুনা যে সমস্ত নীলকর সাহেব নীলকুঠির পরিবর্ত্তে জমীদারী করিতেছেন, তাঁহাদের অধীনে প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। দিগম্বর ও বিষ্ণুচরণ ইহজগতে আর নাই; কিন্তু তাঁহাদের অলৌকিক আত্মত্যাগের কাহিনী আজও নদীয়ার অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাদের স্মৃতি নানা উপায়ে রক্ষিত হইত; ও তাঁহারা দাস-প্রথা রহিতকারী উইলবরফোর্সের ন্যায় সম্মান পাইতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের এই দ্বেষহিংসা-জর্জ্জরিত দেশে ও সমাজে সে আশা কোথায়?

"A fatal blow had been dealt to indigo cultivation in the district, from which it never altogether recovered."

(৯) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

দীক্ষা

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য, বি-এ]

(১)

আষাঢ়ের এক আসন্ন সন্ধ্যায় একটী সুসজ্জিত বাংলোর সম্মুখে এক সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া একটি প্রৌঢ়া বিধবার সহিত কথা কহিতেছিলেন। সন্ন্যাসীর গুম্ফশ্মশ্রুযুক্ত মুখ-মণ্ডলে শান্তির এক পবিত্র ভাব দীপ্যমান্। ভক্তির বিমল আভায় বিধবার মুখশ্রী উদ্ভাসিত।

সন্ন্যাসী বলিতেছিলেন, "ছেলের জন্য তোমার কোন ভয় নেই মা! ছেলের মঙ্গলের জন্য তুমি যে পথ নিয়েছ, তার চেয়ে ভাল পথ তো আর-নেই। ভগবান্ তাঁর মঙ্গল কর্‌বেন্‌ই করবেন্।"

বিধবা বলিলেন, "নারায়ণ আমার আর কোন ক্ষোভ রাখেন নি। কিন্তু ছেলের কথা ভেবে আমি মনে শান্তি পাইনে। তাঁর দয়ার ওপর নির্ভর করেই পড়ে আছি; তবু সময়ে সময়ে কেমন যেন একটা অস্থিরতা আসে। ছেলের অনেক গুণই আছে; কিন্তু ঐ এক মস্ত দোষ—ঠাকুর দেবতা কি সন্ন্যাসীর নামে একেবারে জ্বলে ওঠে। গরীবের ছেলে পড়্‌তে পাচ্ছে না, তাতে সে খরচ কর্‌বে; কিন্তু ধর্ম্মের নামে একটি পয়সা সে প্রাণ গেলেও দেবে না।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "ধর্ম্ম আর কারে বলে মা! তাঁর কাজ কল্লেই তিনি খুসী হবেন; তাঁর ওপর রাগ কল্লে তিনি বিরূপ হবেন না। চোখের একটা আবরণ তোমার ছেলের কাটে নি;—তাও শীগ্‌গির কেটে যাবে, তখন সব পরিষ্কার হবে।"

বিধবা আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, "তাই যেন হয় বাবা! আজ আপনাকে দেখে পর্য্যন্ত একটীবার পায়ের ধুলো নেবার জন্যে বড্ড মন ছট্‌ফট্ কচ্ছিল। আর ছেলে মফঃস্বলে বেরিয়েছে, তাই তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি; নইলে পাছে সে অসন্তুষ্ট হয় বা মনে ব্যথা পায়, এ জন্যে আমি এ সব মনে-মনেই রাখি বাবা।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি প্রকৃত মায়ের মতই কাজ করেছ মা। তাঁর মতের উপর তোমাকে শ্রদ্ধা রাখ্‌তে দেখ্‌লে, তোমার মতকেও সে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা কর্‌তে বাধ্য হবে। ভগবান্‌কে মনে-মনে ডেকে নীরবে সুসময়ের অপেক্ষা করাই এ সব ক্ষেত্রে বুদ্ধির কাজ। মাটি ভিজে নরম না হলে তো তাতে বীজ বোনা যায় না মা!"

এমন সময়ে দীর্ঘাকৃতি, হ্যাটকোট-পরিহিত এক পুরুষকে বাংলোর সম্মুখে দেখা গেল। বিধবা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে ও আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ইনিই তাঁহার সেই ধর্ম্মদ্বেষী পুত্র, যাঁহার আজ মফঃস্বলে বাস করিবার কথা ছিল। নিজের জন্য বিধবার কিছুমাত্র উদ্বেগ বা আশঙ্কা ছিল না; কিন্তু পাছে তাঁহার পুত্র এই দেবোপম

সন্ন্যাসীকে কোনরূপ অবমাননা করিয়া আপনার অকল্যাণ আনিয়া ফেলে, এই চিন্তায় তাঁহার উদ্বেগের অন্ত রহিল না।

হ্যাট-কোট-পরিহিত পুরুষটি কাহাকেও কিছু না বলিয়া বারান্দার উপর উঠিয়া আসিলেন। মায়ের পানে একবার মাত্র তাকাইয়া, সন্ন্যাসীর দিকে একটা ভ্রূকুটী-কুটিল কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেই সৌম্য-দর্শন সন্ন্যাসী তাঁহার প্রশান্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নবাগতের পানে চাহিলেন। বিধবা মনে-মনে প্রমাদ গণিলেন। সন্ন্যাসীর সেই দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না, কিন্তু বলিষ্ঠ পুরুষটি একটু পরেই দৃষ্টি নত করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে বাংলোর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

মাতা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া 'অপরাধ নেবেন না বাবা' বলিয়া তিনি পুত্রের অনুসরণ করিলেন। মৃদু হাসিয়া সন্ন্যাসী ধীরে-ধীরে সেথান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

অপরাহ্ণ হইতে পশ্চিমাকাশে মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারের সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ মেঘ-গর্জ্জন ও প্রবল বায়ুর সহিত বৃষ্টিধারা ধরাতল প্লাবিত করিতে লাগিল।

(২)

হেমেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি বড়গাঁয়ের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—সব-ডিবিসনের কর্ত্তা। যখন ইংরাজী শিক্ষা প্রচণ্ড মাদক দ্রব্যের মত উদরস্থ হইয়াই মস্তিষ্কে ভীষণ ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিত, তিনি সেই সময়ের লোক। যৌবনে বি-এ পড়িবার সময়ে, পিতামহীর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ হস্তগত করিয়া, তিনি একবার বিলাতে পলাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এক বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে, বোম্বাই পৌঁছিয়া জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বেই, পিতা ও পিতামহীর হস্তে বন্দী হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। কিন্তু সেই সময়ে বোম্বাই হইতে যেটুকু বিলাতী হাওয়া তাঁহার গায়ে লাগিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার চাল-চলন ও মেজাজ যথেষ্টই বিলাতী হইয়া উঠিয়াছিল। হয় ত বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে এতটা না হইতেও পারিত। বি-এ পাশ করার সঙ্গে-সঙ্গেই দুটি বন্ধনে যুগপৎ বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সাগর-পারে যাইবার সংকল্প বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। উক্ত বন্ধন দুটির একটী তাহার পত্নী, অপরটি তাঁহার চাকুরী।

তাঁহার পিতা ত্রিলোচন বাবু উচ্চ রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আহারাদি সম্বন্ধে তাঁহারও বিশেষ কিছু বাছবিচার ছিল না।—পুত্র ক্রমশঃ পিতার এই আদর্শকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিলোচন বাবু পেন্সন লইয়া ও পুত্রকে রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া অবধি জীবনের গতি একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রতি-ঘাতটা একটু অধিক পরিমাণেই হইয়াছিল।

ত্রিলোচন বাবু 'মনুনিষিদ্ধ পক্ষী' হইতে সবেগে একেবারে হবিষ্যান্নে আসিয়া পড়িয়াছিলেন; এবং "হরিদ্বোয়ার"-প্রত্যাগত এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসীকে গুরু করিয়া সোৎসাহে হঠযোগ ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত সন্ন্যাসীপ্রবর যোগক্রিয়া অপেক্ষা 'গঞ্জিকা' ও কারণ প্রক্রিয়াই সমধিক অবগত ছিলেন; এবং প্রিয় শিষ্যের বহু অর্থ 'ধ্বংস ও বারিসাৎ' করিয়া, তাঁহাকে একেবারে উন্মাদমার্গে পৌঁছাইয়া দেন। এই অবস্থাতেই ত্রিলোচন বাবুর মৃত্যু হয়।

পিতার মৃত্যুর দু'এক দিন আগে হেমেন্দ্রনাথ ছুটি পাইয়া বাড়ী আসেন। পিতার যোগ-রহস্যের বিষয় তিনি কিঞ্চিৎ অবগত ছিলেন। গৃহে আসিয়া সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া সন্ন্যাসীর উপর তিনি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সন্ন্যাসীকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু হেমেন্দ্রবাবুর শত চেষ্টা সত্ত্বেও সন্ন্যাসীর কোন শাস্তি হইল না। সেই অবধি তিনি ধর্ম্মের নামে খড়্গহস্ত হইতেন; সন্ন্যাসী দেখিলে তাহাকে এক-আধ দিন হাজতে বাস না করাইয়া ছাড়িতেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই গঞ্জিকানন্দ সম্প্রদায়ের ব্যবসাই হইতেছে লোককে প্রবঞ্চনা করা; এবং এমন কোন অপকর্ম্ম নাই যাহা ইহাদের করণীয় নহে।

হেমেন্দ্রনাথের জননী ছিলেন ইঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথম হইতেই তাঁহার নিষ্ঠা, ধর্ম্মশীলতা ও সেবাপরায়ণতা তাঁহার চরিত্রকে অভিনব মাধুর্য্য দান করিয়াছিল। তাঁহার বিশেষত্ব ছিল এই যে, কিছুতেই তিনি স্বামী বা পুত্রের প্রতিকূলাচরণ করেন নাই। নিজে নিরামিষাশিনী হইয়াও স্বামীর জন্য যে কোন মাংস রাঁধিয়া

দিতে কখনও কোন আপত্তি করেন নাই। স্বামী যখন বাবুর্চ্চি রাখিয়া রন্ধন করাইতেন, তখনও তাহাতে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। নারায়ণ ভুল ভাঙ্গিয়া না দিলে কাহারও ভুল ভাঙ্গে না, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

পুত্র যখন অনাচারে পিতাকেও ছাড়াইয়া উঠিল, তখনও তিনি একটা কথা বলেন নাই। তাঁহার পুত্রবধূ এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, তাঁহাকে বুঝাইতেন—'স্রোতের মুখে বালির বাঁধে কোন ফল হবে না; ভগবান্‌কে ডাক, তিনিই সুমতি দেবেন।'

পুত্র হেমেন্দ্রনাথের নিকটে তিনি বড় একটা থাকিতেন না। তিনি দেশের বাড়ীতে আপনার ধর্ম্মকার্য্যে মগ্ন রহিতেন। বড়গাঁ গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রাম বলিয়া এখানে তিনি মাত্র মাসখানেকের জন্য আসিয়াছিলেন।

(৩)

সন্ন্যাসী বিদায় গ্রহণ করিবার পর হইতে বৃষ্টির আর বিরাম ছিল না। গভীর অন্ধকার ও উদ্দাম বায়ুর সহিত মিশিয়া আষাঢ়ের জলধারা নরনারীর বক্ষে কারণে-অকারণে একটা বেদনা জাগাইয়া তুলিতেছিল। রাত্রি ১০টার মধ্যেই হেমেন্দ্র বাবুর বাসার লোকজনের আহারাদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাচক-ভৃত্যাদিও সমস্ত দিবসের কার্য্যশেষে শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। বাংলোখানি এখন নিস্তব্ধ।

কেবল একটি কক্ষে হেমেন্দ্রের জননী কিছুতেই ঘুমাইতে পারিতেছিলেন না। সেই যে আসন্ন-বর্ষণ সন্ধ্যায় সন্ন্যাসীকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পরে তাঁহার কোন সন্ধান আর লওয়া হয় নাই। নিকটে তো কোন গৃহস্থ-বাড়ী নাই যে সন্ন্যাসী সেখানে আশ্রয় লইবেন। নূতন স্থানে আসিয়া মাঠের মধ্যে এই অবিশ্রান্ত জলধারা মাথায় করিয়া তিনি কি বিপদেই পড়িয়াছেন! এই সকল চিন্তা তাঁহার চক্ষু হইতে সমস্ত নিদ্রা হরণ করিয়া লইয়াছিল। সন্ন্যাসীর সেই প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও মধুর আশ্বাস বাণী তাঁহার কেবলি মনে হইতে লাগিল। তিনি কখন পুত্রের প্রতিকূলাচরণ করেন নাই, আজ প্রথম সেই জন্য তাঁহার চিত্তে অনুশোচনা জন্মিল। সেই নির্লোভ সন্ন্যাসী, যিনি হাস্যমুখে তাঁহার দত্ত প্রণামী প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি এই দুর্য্যোগে এক রাত্রির জন্য আশ্রয়ও দিতে পারিলেন না!

ভাবিতে-ভাবিতে শয্যা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বাতাসের শব্দের সহিত যেন সন্ন্যাসীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে। তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। ক্রমে গৃহের ভিতর নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকা কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, —হেম এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমাইয়াছে; হরিকে একবার ডাকিয়া দিই, সে ছাতা মাথায় দিয়া একটীবার সন্ন্যাসী ঠাকুরকে খুঁজিয়া আনুক্। এই ঝড়-জলে তিনি নিশ্চয়ই দূরে যাইতে পারেন নাই,—নিকটেই কোন গাছতলায় বোধ হয় আশ্রয় লইয়াছেন। হরি যদি তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিতে পারে, অন্ততঃ বারান্দায় তিনি রাত্রিটা কাটাইতে পারিবেন। তাহাতেও আমার মন অনেকটা সুস্থির হইবে।

ইহা ভাবিয়া তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া স্তিমিতালোক লণ্ঠনটি উজ্জ্বল করিয়া দিলেন; এবং সেটি হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাবধানে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি ভৃত্যদের ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহাদের ঘরে যাইতে হইলে হেমেন্দ্রের শয়ন-কক্ষের সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়।

অতি সন্তর্পণে যখন তিনি পুত্রের শয়ন-কক্ষের সম্মুখ-ভাগ অতিক্রম করিতেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া হেমেন্দ্র বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন; এবং মাতাকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে মা?"

এইবার তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবার আর আশা নাই। তখন সংকল্প দৃঢ় করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আজ সন্ধেবেলা আস্‌বার সময় যে সন্ন্যাসীকে দেখিছিলি বাবা, তাঁকে ঝড়-জলের মধ্যে বিদায় দিয়ে পর্য্যন্ত আমি কিছুতে সোয়াস্তি পাচ্ছিনে। সেই থেকে একটীবার চোখের পাতা বুজতে পারিনি। তাঁর ওপর আমার বড় ভক্তি হয়েছে। কাছাকাছি কোথাও হয় ত তিনি জলে ভিজছেন্; তাই হরিকে ডাক্‌তে যাচ্ছিলাম, তাঁকে একবার খুঁজে দেখ্‌বে—যদি দেখা পায়।"

বলিয়া মাতা বারুদ-স্তূপ হইতে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের মত পুত্রের প্রচণ্ড ক্রোধের অভিব্যক্তির অপেক্ষায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হেমেন্দ্র ধীরে-ধীরে বলিলেন, "মা, আমার জীবনে যা কখনও হয়নি, আজ তাই হয়েছে। আমিও আজ সেই থেকে ঘুমুতে পাচ্ছিনে। সন্ন্যাসীর জন্য আমারও বড় মন কেমন কচ্ছে। আমায় আলোটা দাও, আমিই দেখে আস্‌ছি।"

বলিয়া মাতার হাত হইতে লণ্ঠনটি লইয়া, ছাতা মাথায় দিয়া, আজন্ম সন্ন্যাসীদ্বেষী পুত্র নগ্নপদে সন্ন্যাসীর উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলেন।

জননী পুত্রের এই অসম্ভব পরিবর্ত্তনে প্রথমটা একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর সমস্ত বুঝিয়া তাঁহার বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। নারায়ণ এতদিনে বুঝি তাঁহার নীরব প্রার্থনা শুনিয়াছেন! সেই অন্ধকারে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া, বারবার তিনি তাঁহার দেবতাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন; তাঁহার দুটি চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

(৪)

সেই গভীর রাত্রিতে বৃষ্টির মধ্যে একখানি ধুতি মাত্র-পরিহিত সাহেবী মেজাজের ডেপুটি হেমেন্দ্র বাবুকে নগ্নপদে নিজহস্তে ছাতি ও লণ্ঠন লইয়া ব্যস্তভাবে একাকী হাঁটিয়া যাইতে দেখিলে, বড়গাঁয়ের লোকের বিস্ময়ের ইয়ত্তা থাকিত না। হেমেন্দ্রনাথের প্রাণের ভিতর কাহার যেন একটা আহ্বান জাগিতেছিল; সন্ন্যাসীর সেই প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহা সূচিত হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল, যেন সেই আহ্বানেরই অনুসরণে তিনি চলিতেছিলেন।

বাংলোর সম্মুখে যে প্রকাণ্ড মাঠ, তাহা অতিক্রম করিয়া হেমেন্দ্রনাথ রাজপথে আসিয়া পড়িলেন। যাইতে-যাইতে বামপার্শ্বের প্রকাণ্ড অশ্বত্থ-বৃক্ষের তলে যেন কাহাকে লক্ষ্য করিলেন। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, বৃক্ষের মূলদেশে কি একটা বিছাইয়া, সন্ন্যাসী স্থির ভাবে বসিয়া আছেন। মুখে তাঁহার সেই প্রশান্ত হাসিটুকু লাগিয়া আছে!

হেমেন্দ্রনাথকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া সন্ন্যাসী স্নেহস্বরে কহিলেন, "হেমেন্দ্র, এত রাত্রে কেন বাবা?"

হেমেন্দ্র বলিলেন, "আপনাকে ঝড়-জলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে মা বড় অস্থির হয়ে পড়েছেন। আপনি চলুন, বাসায় থাক্‌বেন।"

হেমেন্দ্রের কণ্ঠস্বর অতি বিনীত। তাঁহার এই চিরপরিচিতের মত আহ্বান সন্ন্যাসীর উদ্বেলিত চিত্তকে স্পর্শ করিল।

সন্ন্যাসী শান্তমুখে কহিলেন, "মাকে বোলো, আমার এখানে কোন কষ্ট হচ্ছে না,—আমি নারায়ণের চরণ তলে আছি। তুমি ফিরে যাও! কাল সকালে আমি তোমার বাসায় যাব। তোমার জন্যেই তো আমি এসেছি বাবা!"

হেমেন্দ্রনাথের আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিবার সাহস হইল না; তিনি ধীরে-ধীরে বাসার দিকে ফিরিলেন। ফিরিবার পথে সন্ন্যাসীর শেষ কথা 'তোমার জন্যেই তো আমি এসেছি বাবা'—মনে করিয়া অননুভূতপূর্ব্ব এক পুলকে তাঁহার সর্ব্বশরীর বারবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

* * * *

পরদিন বড়গাঁয়ের অধিবাসিগণ অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী ও হেমেন্দ্র বাবুর অদ্ভুত দীক্ষাগ্রহণের কথা মুগ্ধচিত্তে শুনিল। কি করিয়া অসম্ভব সম্ভব হইয়া উঠিল, তাহা তাহারা ভাবিয়া কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। কিছু-দিন বাদেই যখন হেমেন্দ্রবাবু সহসা সরকারী কার্য্য ত্যাগ করিয়া, সর্ব্ববিধ ভোগবিলাস বিসর্জ্জনান্তে গৈরিক বসন ধারণ করিয়া, বারাণসী ধামে গুরু-সকাশে আপনার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার জন্য গমন করিলেন, তখন দেশবাসী সকলে অগাধ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্‌ হইয়া রহিল।

বামড়া—দেবগড় (২)

[শ্রীজলধর সেন]

এবার আর আমার পুত্র শ্রীমান্ অজয়কুমারের দিনলিপি হইতে বামড়ার কথা উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না;—আমার অনবধানতার দোষে অনাবশ্যক কাগজপত্রের সঙ্গে সেই অত্যাবশ্যক কাগজ কয়খানিও অগ্নিমুখে সমর্পিত হইয়াছে। এখন স্মৃতির সাহায্যেই বামড়া-ভ্রমণের কথা বলিতে হইতেছে। আমি কিন্তু দেখিতেছি, স্মৃতি এ ক্ষেত্রে আমাকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। এই সুদীর্ঘ জীবন-কালের অনেক কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি;—অনেক দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলিয়াছি, অনেক শোক-তাপ, অসংখ্য বিয়োগ-বেদনা ভুলিয়াছি;—অনেকের অপকারের কথা, লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়াছি,—অনেকের উপকারের কথাও ভুলিয়াছি; কিন্তু জীবনে দুইটী কথা ভুলি নাই। এক, সেই নগাধিরাজ হিমালয়ের কথা, আর এই সেদিনকার ঘটনা বামড়ার কথা। হিমালয়ের প্রত্যেক দৃশ্য যেমন আমার হৃদয়পটে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে, বামড়ার দৃশ্যাবলীও ঠিক তেমনই দৃঢ়ভাবে আমার হৃদয়পট অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং আমি আমার বামড়া-ভ্রমণের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিতে ভুল করিব না। তবে সুন্দর করিয়া মনোরম করিয়া বলিতে পারিব না; সে সকল দৃশ্যের বর্ণনা করিবার জন্য যে লিপি-কুশলতার প্রয়োজন, তাহাতে আমি বঞ্চিত; তাহার প্রমাণ পাঠক-পাঠিকাগণ পূর্ব্ববর্ত্তী কাহিনীতেই সকলে পাইয়াছেন। তাহা হইলেও, এ ভ্রমণ-কথা এমন স্থানে ফেলিয়া রাখিতে পারিলাম না।

বুধবার—১৬ই জুলাই।—আজ প্রাতঃকালের আমাদের 'প্রোগ্রাম' টারবাইন (Turbine) দর্শন। 'টারবাইন' জিনিসটা কি, তাহা অনেকেই জানেন; তবুও কথাটার একটু ব্যাখ্যা দিই। কলিকাতায় বা অন্যান্য অনেক স্থানে যে এখন বৈদ্যুতিক আলো পথে-ঘাটে, ঘরে-ঘরে জ্বলিয়া অন্ধকার দূর করিতেছে, এ বিদ্যুৎকে আকাশের মেঘ হইতে জবরদস্তী করিয়া টানিয়া আনিয়া আমাদের যান-বাহন ও অন্ধকার নিবারণের কাজে লাগান হয় না। আকাশে যে কারণে বিদ্যুৎ জন্মে, আমাদের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, আমাদের যে পাঁচটা ভূত আছে, তাহাদের দুই একটা'কে বেগার ধরিয়া বেশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। আর যাবে কোথায়,—আকাশের সৌদামিনী বৈজ্ঞানিকের ফাঁদে পড়িয়া গেলেন। পাথুরে কয়লার সাহায্যে যন্ত্রের মারফৎ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইলেন; তিনি ঘরে-ঘরে আলো দিলেন, পথ ঘাটের অন্ধকার দূর করিলেন; ট্রামগাড়ী চালাইলেন, মোটর বাইক চালাইলেন, বাবুদের নৈশ-অভিসারের হাত-লণ্ঠনের বাতি পর্য্যন্ত জোগাইলেন। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না। বৈজ্ঞানিকগণ আবার বিদ্যুতের কোষ্ঠীপত্র লইয়া বসিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল, খরস্রোতা তটিনী ও নির্ঝরিণীর উপর। হায়, হায়! এত বৈদ্যুতিক শক্তি সুধু জলধারায় পর্য্যবসিত হইতেছে। তাহা হইবে না, বাঁধো জলের স্রোতকে। তাহার শক্তিকে লাগাও কাজে। সে কাজটা হইল, ঐ রাস্তাঘাটে আলো দেওয়া ইত্যাদি। জলস্রোতের এই বৈদ্যুতি-আকর্ষণের যন্ত্রের নামই টারবাইন। জলের খরস্রোতকে যন্ত্রের মধ্যে পাকড়াও করিয়া, তাহা হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে জবরদস্তী কাড়িয়া লইয়া তারের মারফৎ পাঠাও দূরবর্ত্তী সহরের অন্ধকার দূর করিতে। আমাদের বামড়ার স্বর্গীয় নৃপতি দেখিলেন যে, বহুদূর হইতে কয়লা আনিয়া এ কার্য্য করা বহুব্যয়-সাধ্য; তিনি সে পথে গেলেন না। তাঁহার অধিকারভুক্ত পাহাড়ের একটা প্রবল প্রতাপ ঝরণাকে ত তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে জল সরবরাহ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে বেচারীর উপর আর অত্যাচার করা প্রজা-বৎসল নৃপতির পক্ষে সম্ভবপর হইল না। তিনি তখন রাজধানী দেবগড়ের নিকটবর্ত্তী ঝরণা সকলের উৎপত্তি-স্থানগুলি পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদের শক্তি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; নানা স্থানে ছুটিতে লাগিলেন। অবশেষে

দেবগড় হইতে কয়েক মাইল দূরে কয়েকটী ছোট-বড় নির্ঝর পাইলেন। রাজা সচ্চিদানন্দ তাহাদের শক্তি পরীক্ষা করিলেন; সেগুলি হইতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে, তাহা অদূরবর্ত্তী রাজধানীতে নীত হইলে তাহার দ্বারা রাজধানীর সদর-অন্দর আলোক-মালায় বিভূষিত হইতে পারে কি না, তাহার হিসাব-নিকাশ করিলেন। তাহার পর সাহেব-কোম্পানীর উপর টারবাইন যন্ত্রের অর্ডার দিলেন এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহার প্রিয় রাজধানীতে সৌদামিনীর আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই চির-জ্যোতির্ম্ময় ধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দেহাবসানের পর, তাঁহারই ব্যবস্থা ও প্ল্যান-মত দেবগড়ের অদূরে নির্জ্জন পর্ব্বতগাত্রে নির্ঝর-পার্শ্বে টারবাইন যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল; দেবগড় আলোকের হার গলায় পরিলেন—আর দেবলোক হইতে দেবগড়াধিপতি তাহা দর্শন করিলেন। এই টারবাইন দেখিবার জন্য সেদিন প্রাতঃকালে যোগেশবাবুর সঙ্গে আমরা গিয়াছিলাম। হু-হু করিয়া যন্ত্র চলিতেছে, হুড়-হুড় করিয়া জল আসিতেছে, যন্ত্র-গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে,—তাহার পর লৌহ-কারাগারের মধ্যে পড়িয়া সলিল মহাশয় কি করিলেন না করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, বুঝিবার চেষ্টাও করিলাম না। তাহার পর দেখিলাম, গৃহের পার্শ্বস্থ একটা প্রণালী বহিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে-করিতে জলধারা বাহির হইতেছে; ঠিক যেন হায়রাণ হইবার পর পুনরায় বন্ধন-ভয়ে ভীত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে। আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া এই জলের খেলা দেখিয়া অবশেষে এক কথায় রায় দিলাম—'বাঃ বেশ!' এত বড় একটা আয়োজনের এই পুরস্কার! তখন ত ভাবিলাম না যে, রাজা সচ্চিদানন্দ দেবকে এই একটা ব্যাপারের জন্য কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, কত মাথা খাটাইতে হইয়াছিল। পাহাড়ের একটা ঝরণার সাধ্য কি যে, এত বৈদ্যুতিক শক্তি যোগায়! রাজা বাহাদুর পাহাড়ের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কয়েকটী ঝরণাকে টানিয়া একত্র সম্বদ্ধ করিয়া, তবে এই খরস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার পর যাহাকে-তাহাকে টানিলেই হইবে না—হিসাব ঠিক রাখিয়া ধরিয়া আনিতে হইবে; কারণ কোন ঝরণা হয় ত 'একৃষ্ট্রিমিষ্ট,' কেহ হয় ত 'মডারেট,' কেহ হয় ত 'ন্যাসনালিষ্ট,' কেহ হয় ত 'হোমরুলার'; এই সব বিভিন্ন মতাবলম্বী, বিভিন্ন পরিমাণ বিদ্যুত-উৎপাদন-শক্তি-সম্পন্ন ধারাকে একত্র মিলিত করিয়া শাসন-যন্ত্র পরিচালন করা, দেশকে আলোকোজ্জ্বল করা কি কম হিসাবের কাজ—সাধারণ কারিগরের কাজ! রাজা সচ্চিদানন্দ অনন্যসাধারণ পুরুষ ছিলেন; তিনি লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ ছিলেন না,—তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তাঁহার ভিতর অদম্য বৈদ্যুতিক শক্তি ছিল, তাই তিনি এই টারবাইন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন—এই হাইড্রো-ইলেকট্রিক ব্যাপারে সংঘটন করিতে পারিয়াছিলেন। আমরা এক কথায় 'বাঃ বেশ' বলিয়া তাঁহাকে একেবারে কৃতার্থ করিয়া আসিলাম। যাক্, বুধবারের প্রাতঃকালটা এই টারবাইনেই কাটিয়া গেল।

অপরাহ্ণ তিনটার পর স্থির হইল, পুরাতন রাজবাড়ী দেখিতে যাইতে হইবে। এই পুরাতন রাজবাড়ী বর্ত্তমান দেবগড় হইতে মাইলখানেক দূরে। সেখানে এখন আর রাজবাড়ী নাই, আছেন শুধু জগন্নাথদেব। রাজধানী, রাজপরিবার দেবগড়ে আসিয়াছেন; কিন্তু রাজ গৃহদেবতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিতে নাই; তাই তিনি সেই পরিত্যক্ত রাজধানীতেই বিরাজ করিতেছেন। আমরা দল বাঁধিয়া সেই রাজবাড়ী দেখিবার জন্য মোটর বাহনে যাত্রা করিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নূতন রাজবাড়ী হইতে পুরাতন রাজবাড়ী বেশী দূর নহে,—এক মাইলের একটু উপর। আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, চারিদিকে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। একটা রাস্তা ধরিয়া খানিকটা গিয়াই একস্থানে গাড়ী থামিল। সেটী জগন্নাথ-মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখ-ভাগ। আমরা সেখানে নামিয়াই দেখিলাম, বামদিকে একটী পুষ্করিণী। তাহার চারিদিকে বাঁধা ঘাট; এক-দিকের ঘাট দেওয়ালে বেষ্টিত এবং তাহার সীমার উপরও ছাদ দেওয়া। বুঝিতে পারা গেল যে, রাজান্তঃপুরবাসিনী-বৃন্দ এই অসূর্য্যম্পশ্য ঘাটেই অবগাহন করিতেন। পুষ্করিণীর জলের বর্ণ এমন কালো যে, দেখিলেই ভয় হয়—স্পর্শ করা ত দূরের কথা। শুনিলাম, এ জল এখন আর কেহ

ব্যবহার করেন না—করিবার প্রয়োজনও হয় না ; স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের প্রসাদাৎ এখন এখানেও কলের জল আসিয়াছে।

আমরা যে দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, তাহা মন্দির-প্রাঙ্গণের সিংহদ্বার—বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত। সেই দ্বারের বাহিরে জুতা রাখিয়া আমরা মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। রাজবাড়ী পরিত্যক্ত হইলেও, এই জগন্নাথের মন্দির পরিত্যক্ত হয় নাই ;—প্রাঙ্গণ বেশ পরিচ্ছন্ন ; মন্দিরের পরিচর্য্যার জন্য এবং দেবতার পূজার যথোচিত ব্যবস্থা পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সেকেলে নাট-মন্দির এবং সেই নাট-মন্দিরের সঙ্গেই লাগা প্রকাণ্ড মন্দির। শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন কবি হইলেও, এখানে আসিয়া প্রচণ্ড প্রত্নতাত্ত্বিক হইয়া বসিলেন ; শ্রীমান্দ্বয় ও সহযাত্রী ভদ্র-যুবকগণও সেই গবেষণায় যোগদান করিলেন। তাঁহারা মন্দিরের জন্মকোষ্ঠী ও গোত্র-নিরূপণের জন্য মহা আলোচনা আরম্ভ করিলেন। 'ও রসে বঞ্চিত দাস গোবিন্দ'—আমি তাঁহাদিগকে বৌদ্ধযুগ ও পৌরাণিক যুগের মধ্যে অবাধে বিচরণ করিতে দিয়া, প্রাঙ্গণের পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষাদি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। শ্রীমান্দের ঐতিহাসিক আলোচনা সবেগে চলিতে লাগিল।

একটু পরেই মন্দিরের একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে,—আমরা দর্শন করিতে যাইতে পারি। তখন শ্রীমান্দিগের গবেষণা মধ্যপথে বন্ধ করিয়া দিয়া, নাট মন্দির পার হইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাপ রে! কি অন্ধকার! সেই অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া আমরা দেবতার দ্বারের সম্মুখে গেলাম। মন্দিরের মধ্যে অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। পুরোহিত মহাশয় যে মৃৎ-প্রদীপটী দেবতার পার্শ্বে স্থাপিত করিলেন, তাহার মৃদু আলোকে সেই জমাট অন্ধকার যেন আরও গভীর হইয়া উঠিল। সেই অন্ধকারের মধ্যেই আমাদের দেব-দর্শন হইল ; কি যে দেখিলাম, তাহা বলিতে পারি না ; তবে মন্দিরের মধ্যে সিংহাসনের উপর কেহ যে আছেন, ইহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তখন সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেবতার উদ্দেশে দ্বারপ্রান্তে প্রণাম করিয়া আমরা তাড়াতাড়ি মুক্ত বাতাসে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

দেবতার অসম্মান করিতেছি না, কিন্তু একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই সুদীর্ঘ জীবন-কালে ভারতবর্ষের নানা স্থানে অসংখ্য পুরাতন দেব-মন্দির দেখিয়াছি, বামড়াতেও এই পুরাতন মন্দির দেখিলাম। সকল স্থানেই সেই এক ব্যবস্থা। যেখানে যিনি দেবতার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তিনিই নির্ম্মাণকারীদিগকে আদেশ করিয়াছেন—"দেখ, উপর দিকে যতখানি পার, মন্দিরের চূড়া চালাও, তা কে বা জানে একশত হস্ত, কে বা জানে দুইশত হস্ত। মন্দির অভ্রভেদী কর, তাহাতেও আপত্তি নাই ; কিন্তু সাবধান, মন্দিরের ভিতর যেন কোন দিকে পাঁচ ছয় হাতের বেশী স্থান না থাকে ; আর খবরদার, মন্দিরে যেন একটী মাত্র দ্বার থাকে,—একের অধিক দুয়ার যেন না থাকে।" অসংখ্য দেবমন্দির দেখিয়া আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। আমাদের দেবমূর্ত্তি সকল ধাতু বা প্রস্তর-নির্ম্মিত ; তাই তাঁহারা বিনা বাক্যব্যয়ে, এই আলোক ও বায়ু-প্রবেশের অণুমাত্র সম্ভাবনাহীন, এই সকল মন্দিরের চির-অন্ধকারের মধ্যে বাস করিয়া আমাদের সেবা গ্রহণ করিতেছেন ; কিন্তু যাঁহারা এই সকল দেবতার পূজক, তাঁহারা বোধ হয় এমন স্থানে বসিয়া অনেকক্ষণ একাগ্র-চিত্তে পূজা করিতে পারেন না—বাতাসের অভাবে এবং অন্ধকারে হাঁপাইয়া উঠেন। আমি কিন্তু এই প্রকার মন্দির নির্ম্মাণের তাৎপর্য্য এত দিনেও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহার যদি কোন শাস্ত্রসঙ্গত ব্যাখ্যা থাকে, তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। দেবতার সম্মুখে যাইয়া কিছুক্ষণ যদি বসিতেই না পারিলাম, সংযত-চিত্ত হইতেই না পারিলাম,—বাহির হইতে পারিলেই নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি ভাবই যদি মনে হয়, তাহা হইলে দেব-দর্শনের কি ফল হইল, তাহা ত ভাবিয়া পাই না। কথাটা অনেক মন্দির দেখিয়াই ভাবিয়াছি,—আজ এই বামড়ার মন্দিরের কথা উপলক্ষ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম।

শ্রীমানেরা এদিকে অনেক গবেষণা করিয়া স্থির করিলেন যে, এই মধ্য-প্রদেশে ও উড়িষ্যায় এক সময়ে বৌদ্ধ-প্রভাব বেশী হইয়াছিল ; এই সকল মন্দির তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কবিবর শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন তখন মন্দিরের বাহিরের কারুকার্য্য বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে

বরকতের প্যালেস
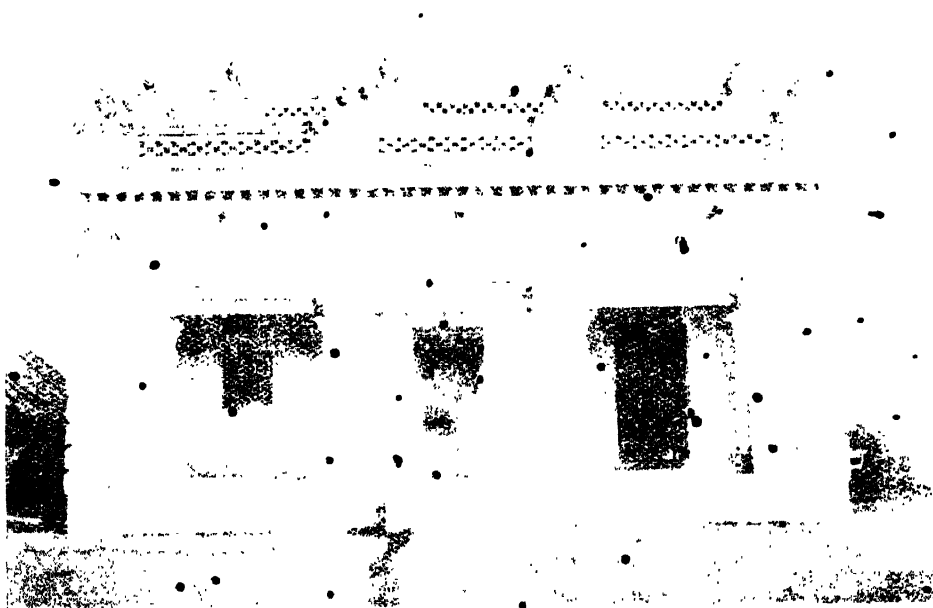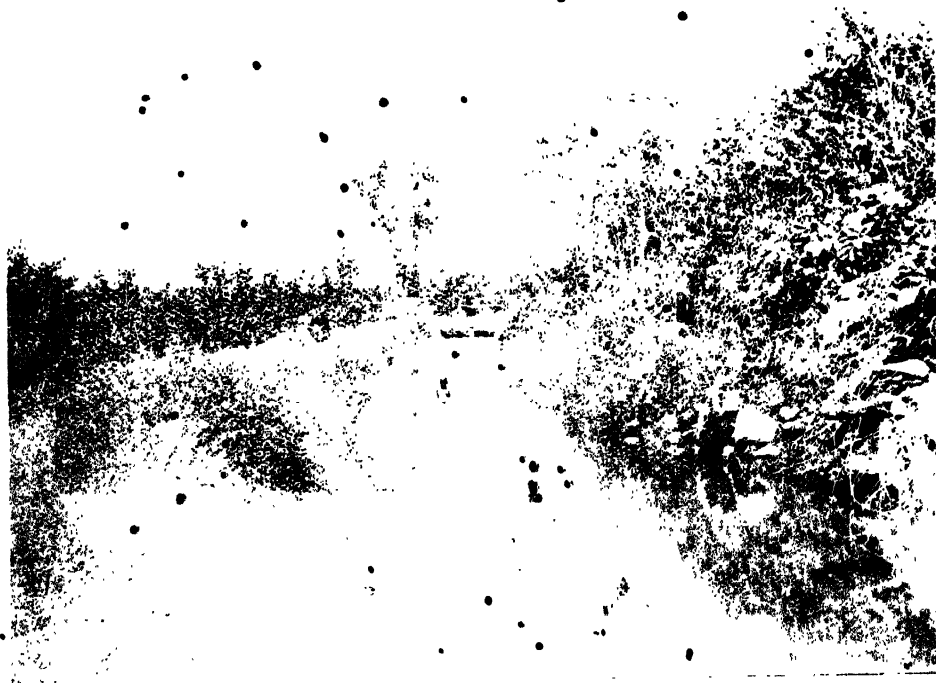
বরকত পয়ঃপ্রণালী (canal)

দেবগড়ের দরবার-ভবন (এক পার্শ্বের দৃশ্য)

দেবগড়ের দরবার ভবন (অভ্যন্তর ভাগের দৃশ্য)

পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি বর্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া, সুদূর অতীতের মনোমোহন চিত্র মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। সে সময়ে তাঁহার সম্মুখে কাগজ-পেন্সিল ধরিয়া দিতে পারিলে খুব ভাল রকমের একটা কবিতা পাওয়া যাইত।

সে যাহা হউক, আমাদের দ্রষ্টব্য আর কিছু সেখানে না থাকায়, আমরা সেস্থান হইতে যাত্রা করিলাম। দেবগড়ের দিকে একটু অগ্রসর হইতেই, রাস্তার দক্ষিণ দিকে দূরবিস্তর প্রান্তরের মধ্যে দুইখানি কাষ্ঠখণ্ড প্রোথিত দেখিলাম। সঙ্গী শ্রীযুক্ত জীবনপ্রদীপ বাবুকে জিজ্ঞাসা

দরবার-ভবন (অন্য পার্শ্বের দৃশ্য)
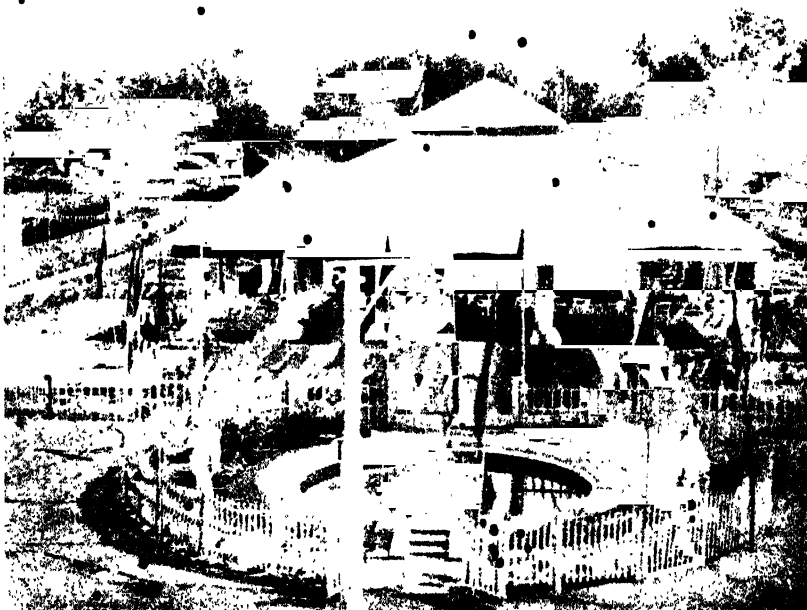
দরবার-ভবন (বাহিরের দৃশ্য)

রায় তিনি বলিলেন যে, প্রান্তরের ঐ স্থানে পূর্ব্বে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদিগের ফাঁসী দেওয়া হইত; এখন বামড়া-রাজ প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রদানের অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন; সে কার্য্যের ভার বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন; সোজা কথায় বামড়া রাজ্যে এখন আর ফাঁসী দেওয়া হয় না, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই বিহিত হইয়া থাকে। দ্বীপান্তর-বাসের দণ্ডও বামড়া-রাজ প্রদান করেন না। আমি সভয়ে সেই প্রান্তর-মধ্যস্থ কাষ্ঠদণ্ডের দিকে

চাহিলাম; সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, সমস্ত প্রান্তর জুড়িয়া একখানি কৃষ্ণ যবনিকা পড়িতেছিল। আমার মনে হইল, যেন সেই প্রান্তরের মধ্যে, সেই সন্ধ্যার সময় শত শত মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। মনে হইল যেন—রাম বল! এ যে বিষম কাণ্ড হইতে চলিল! চালাও মোটর জোরসে! আর ভাবিয়া কাজ নাই। বামচার কথা বলিতে গিয়া কি শেষে কবি-অখ্যাতি অর্জ্জন করিব!

বেণী মণ্ডপ (ঢাকার কারিগরের নির্ম্মিত)

মোটর চালক বলিলেন, "আর একটু ঘুরিবেন কি"? আমাদের তাহাতে অণুমাত্র আপত্তি ছিল না। গ্রীষ্মকাল, ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছিল; এ সময় একটু স্বাধীন ভাবে পথে-পথে ঘুরিতে, বিশেষতঃ মোটর-যানে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে যাহার আপত্তি হইতে পারে, তাহার জন্য অবশ্য ঐ দেবগড়ের কারাগারই উপযুক্ত স্থান।
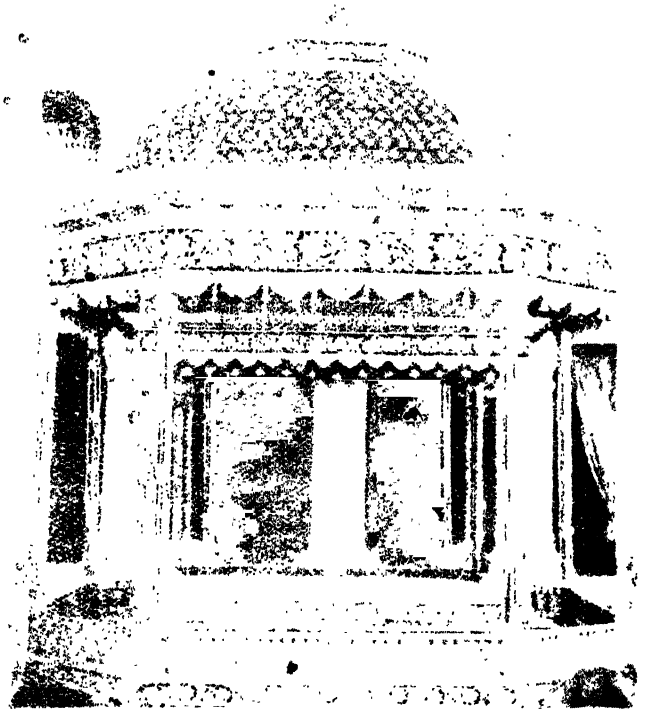
দেবগড়ের রাজভবন

আমরা কিছুক্ষণ পথে পথে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। যোগেশ বাবু বলিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে আমাদের বলম্ নামক স্থানে গমন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজাবাহাদুর আমাদের আগামী তিন দিনের জন্য মফস্বল-ভ্রমণের বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়াছেন এবং তদনুরূপ আদেশও মফস্বলের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। আমরা রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিলাম। বন্ধু-

বলমের শস্যের গোলা।

রস্তাই পয়ঃপ্রণালী (canal)

বান্ধবগণের সহিত গল্প-গুজবে, আমোদ-আনন্দে রাত্রি প্রায় বারটা বাজিয়া গেল, আমরাও বিশ্রাম করিলাম।

মফস্বল-ভ্রমণের বিস্তৃত কাহিনী এবার বর্ণনা করা সম্ভবপর হইবে না; বারান্তরে সে সকল কথা বলিবার বাসনা রহিল,—পাঠকের ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করিতেছে না, এ কথা যদি বুঝিতে পারি, তবেই।

বিদ্রূপ চিত্র !

মায়ার খেলা !

জার্ম্মাণ সম্রাট কৈসরের অপরাধের শাস্তি বিধানের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীর প্রজা-সঙ্ঘের আপত্তি প্রকাশ এই ব্যঙ্গ-চিত্রে প্রদর্শিত হইতেছে।

(Westerman in the Columbus Ohio State Journal).
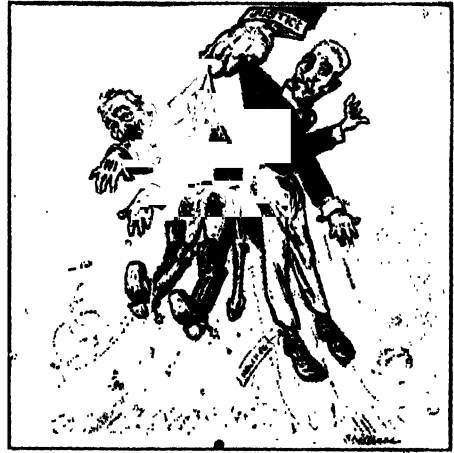
দু'জনকেই ধ'রো !

শান্তি-সভার অধিবেশনে যখন ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ সম্রাটের বিচার হওয়াই সাব্যস্ত হইয়া গেল, তখন কৈসরের প্রধান মন্ত্রী ভন্ বেথম্যান হলওয়েগ রাজার অপরাধ আপন স্কন্ধে লইয়া সম্রাটের পরিবর্ত্তে স্বয়ং বিচারার্থে উপস্থিত হইবেন প্রস্তাব করেন।

(Chase in the Providence Journal).

১৮৭১ খৃঃ অব্দে !

ফ্রান্সকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া জার্ম্মাণী বলপূর্ব্বক অন্যায় সন্ধি-সর্ত্তে তাহার নিকট হইতে আলসেস্ লোরেন্ প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল ও বহু কোটী মুদ্রা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এই চিত্রে পরাজিত ফরাসী কুক্কুটকে ধরিয়া জার্ম্মাণী যেন বলিতেছে, "এই সন্ধি-সর্ত্তই তোমাকে গলধঃকরণ করিতেই হইবে, নতুবা তোমাকে হত্যা করিব !"

(Lustize Bilder Kalender in 1872).

১৯১৯ খৃঃ অব্দে !

জার্ম্মাণী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সন্ধিসর্ত্তানুসারে আলসেস্ লোরেন্ প্রদেশ ফ্রান্সকে প্রত্যর্পণ করিয়াছে ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বহু অর্থ প্রদান করিতেও স্বীকৃত হইয়াছে। এই সর্ত্তে স্বাক্ষর করিবার কালে জার্ম্মাণী যেন 'বিসমার্ক' প্রভৃতি ১৮৭১ সালের যুদ্ধের প্রধান নায়কত্রয়ের প্রেতাত্মা সন্দর্শন করিতেছে।

(Punch, London).

দুর্ভিক্ষের আদেশ।

যুদ্ধের শেষভাগে জার্ম্মাণীতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। জার্ম্মাণী যে এই দুর্ভিক্ষের পীড়নেই এরূপ অপমানজনক সন্ধিসর্ত্তে সহি করিতে বাধ্য হইয়াছে, এই ব্যঙ্গ-চিত্রে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। মূর্ত্তিমান্ দুর্ভিক্ষ তাহার কঙ্কালময় অঙ্গুলি-হেলনে জার্ম্মাণীকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে যেন কঠিন আজ্ঞা করিতেছে। ("Ulk" Berlin).

সিঁধেল চোর।

মৃতদেহকে শবাধারে বদ্ধ করার মত, শান্তি-সভা কঠিন সন্ধিসর্ত্তে জার্ম্মাণীকে আবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; কিন্তু এই চিত্রে দেখান হইয়াছে যে, জার্ম্মাণী যেন বলিতেছে "দেখ, আমি তোমাদের এ 'কফিন' কেটে বেরিয়ে পড়তে পারি কি না?"

(Evans in the Baltimore American).

যুদ্ধের পরিণাম।

শান্তিস্থাপনের পর পরিত্যক্ত রণক্ষেত্র হইতে যেন 'দুর্ভিক্ষ' 'বিদ্রোহ' ও 'মহামারী' রূপ তিনটী প্রেত-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইতেছে।

(Harding in the "Brooklyn Eagle").

এ যুদ্ধের শান্তি হইবে কবে?

খাদ্য-দ্রব্য, কয়লা, বস্ত্র ও বাসাভাড়া প্রভৃতি প্রতিদিন মহার্ঘ্য হইয়া উঠিতেছে, এবং অল্প আয় ও ক্ষুদ্র পুঁজি মধ্যবিত্তগণের সহিত এই দারুণ মহার্ঘ্যতার নিরত দ্বন্দ্ব চলিতেছে; দেশের শাসন-বিভাগ সাক্ষী-স্বরূপ দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছেন; এই বিষয়টিই এই ব্যঙ্গ-চিত্রের লক্ষ্য। (Thomas in the "Detroit News").

"হাত সরাও বলছি!"

এ চিত্রখানি কিছুদিন হইল জার্ম্মানীর Illustrirte Zeitung এ প্রকাশিত হইয়াছিল। মিত্রশক্তি সেনা এখনও পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর 'রাইন' প্রদেশ অধিকার করিয়া আছে বলিয়া রোষদপ্ত জার্ম্মানী যেন রক্তনেত্রে হুঙ্কার দিয়া ঐ কথা বলিতেছে।

কি করলে এ সব ছেলে মানুষ হ'তে না পারে?

চীনের [illegible] কচি শিশু ককিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। জাপান তাহাকে কিছুতেই ভুলাইতে না পারিয়া যেন বিরক্ত হইয়া ঐ কথা বলিতেছে! ("Tij -Shimpo" Tokyo, Japan).
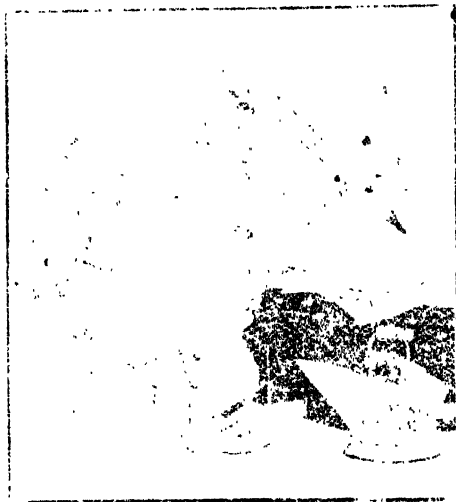
[illegible]!

সন্ধি-সর্ত্তে জার্ম্মানীর অঙ্গীকার মঞ্জুর করিয়া লণ্ডনের [illegible] যোগ্য নহে বলিয়া এই চিত্রে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। কারণ সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে 'স্কাপার' নৌবাহিনী মিত্র-শক্তিপুঞ্জকে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইবার পরও জার্ম্মানী তাহা জলমগ্ন করিয়া দিয়াছিল!

("Evening News" London).

দাসখত

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

ভক্তবীর বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীমতীর নিকট গোবিন্দকে দিয়া দাসখত লিখাইয়া প্রেম-পুলকাবেশে রোমাঞ্চিত হইয়াছিলেন! হইবারই কথা; কারণ, সে প্রেমের দাসত্ব মধুর আনন্দময় নিখিল ভক্তজনের চির-বাঞ্ছিত অবস্থা! মাধব এ পেশায় এমনিই পটু ছিলেন যে, তাঁহার মহাজন স্বয়ং একদিন আপন-সেবক সেই ভাগ্যবান শ্রীভগবানের চরণে ধরিয়া অনুরাগ-বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"আমি তনু মন হিয়া সব সমর্পিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী!"—ইত্যাদি। আমরা কিন্তু আজ যে দাসখতের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, ইহা প্রেমের দায়ে লিখিত নহে—ঋণের দায়ে! ইহা মধুরও নহে, আনন্দময়ও নহে; এবং প্রেমিক ও অপ্রেমিক উভয়েরই অনাকাঙ্ক্ষিত!

সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, প্রাচীন ক্রীতদাসযুগে, মহাজনের নিকট কর্জ্জ লইয়া, এরূপ দাসখত লিখিয়া দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল বটে; কিন্তু সভ্যতার ক্রম-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে, বিগত অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ রূপে দাসত্বপ্রথা সহিত ও সেবা-খতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অভ্যন্তরে, আজ এই সমুন্নত সভ্যতার যুগেও, সামান্য ঋণের বিনিময়ে মানুষের নিকট
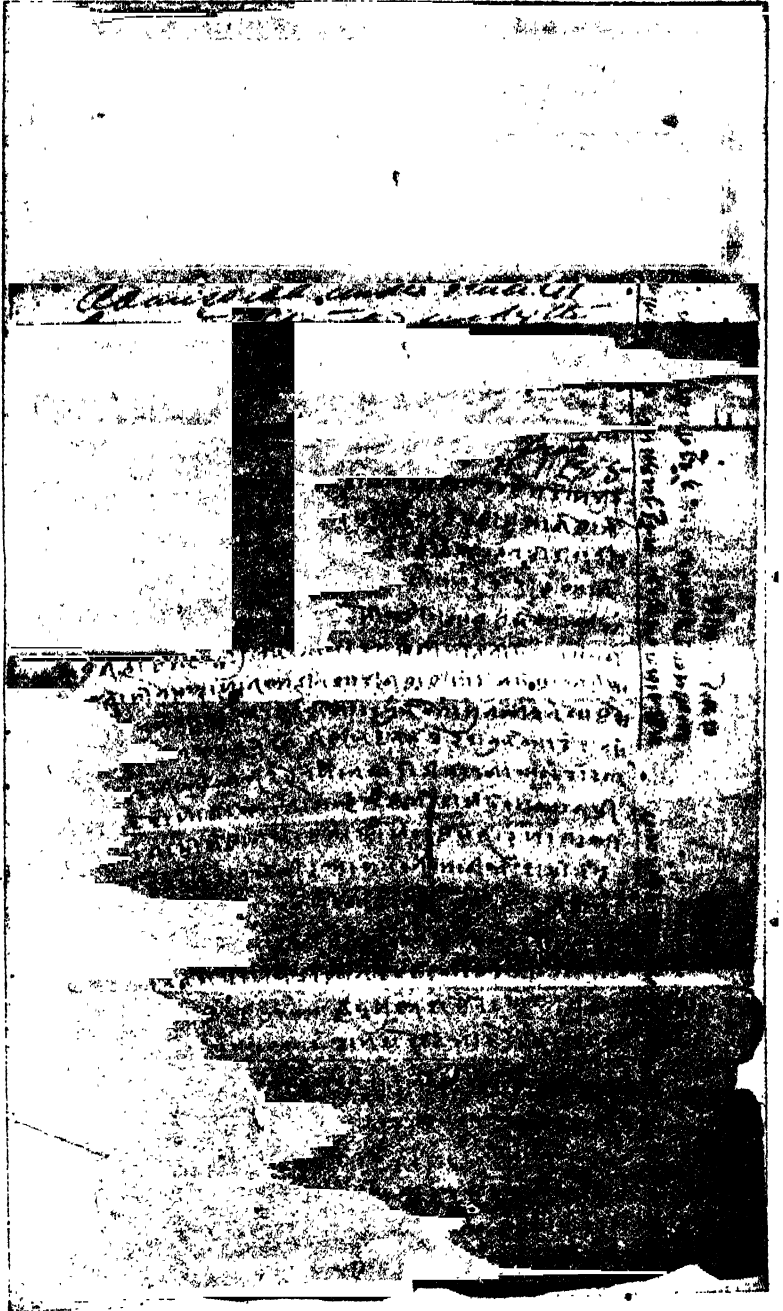
দাসখত

মানুষ যে দাসত্বের দলীল দস্তখত করিয়া দিয়া থাকে, তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর ব্যাপার!

চিত্রে প্রদর্শিত দলিলখানিতে জনৈক মজুর মাত্র ১২৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া, যতদিন না উহা পরিশোধ করিতে পারে, ততকাল ঋণদাতা মহাজনের নিকট গৃহীত ঋণের সুদ হিসাবে, বিনা বেতনে দাসত্ব করিবার কঠোর সর্ত্তে চুক্তি-বদ্ধ হইয়াছিল। দাসত্বের যুগে এরূপ চুক্তি-পত্র বরং সম্ভবপর ছিল; কারণ, সেকালের মহাজনবর্গ প্রদত্ত ঋণের সুদ হিসাবে খাতকের নিকট হইতে কায়িক পরিশ্রম দাবী করিয়া উপযুক্ত খৎ সহি করাইয়া লইতেন। কিন্তু এই সেদিনে - মাত্র ১৯০৫ খৃষ্টাব্দেও যে বঙ্গের এক প্রান্ত-দেশে উক্ত প্রকারের 'দাসখত' ইংরাজি ষ্ট্যাম্প কাগজের উপর বিধিমতে লিখিত ও মায় ইসাদী পুরা-দস্তর দস্তখত ও সহী সাবুদ হইয়া আধুনিক ইংরাজী আদালতেই আইনানুসারে রেজেষ্টারী কৃত হইয়াছিল, ইহা সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়!

দলীলের মর্ম্মানুবাদ—

"এতদ্দ্বারা আমি উক্ত মহাজনের নিকট মজুরী কার্য্য করিতে চুক্তিবদ্ধ হইলাম। মাটি খোঁড়া, জমীতে কোদাল পাড়া, কাঠ কাটা, জল তোলা, চিঠিপত্র ও খবরাখবর লইয়া যাওয়া,- গৃহপালিত পশুপক্ষীর পরিচর্য্যা করা, জঙ্গল হইতে গাছ কাটিয়া আনা প্রভৃতি গৃহস্থের সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদন করিতে আমি আইনানুসারে বাধ্য রহিলাম। আমি আরও অঙ্গীকার করিতেছি এই যে, উক্ত কার্য্যাদির জন্য আমি কখনও কোনও পারিশ্রমিক বা বেতন দাবী করিতে পারিব না—সওয়ায় আহারার্থ নিকটস্থ পল্লীহাটে প্রাপ্য মোটা চাউলের মূল্য স্বরূপ নির্দ্ধারিত বৃত্তিমাত্র! গৃহীত ঋণ আমি যেদিন সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে পারিব, সেদিন হইতে আমি উক্ত মহাজনের নিকট মজুরী কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইব; এবং উক্ত মহাজন আমার নিকট হইতে কোন প্রকার সুদের টাকার দাবী দাওয়া করিতে পারিবেন না। ঋণ পরিশোধ না করিয়া যদি আমি উক্ত মহাজনের নিকট মজুরী করিতে অপারগ হই, বা এস্থান হইতে বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করি, তবে উক্ত মহাজন আমাকে যে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন, উহা সুদ সমেত আমার নিকট হইতে আদায় উসুল করিতে স্বত্ববান্ থাকিবেন। কিম্বা যদি উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু ঘটে, তবে আমার উত্তরাধিকারী ও ওয়ারিশনগণ ঐ দেনা উপরি উক্ত চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী পরিশোধ করিতে দায়ী থাকিবেন। এতদ্‌সর্ত্তে আমি অদ্য তারিখে সুস্থ শরীরে, স্বইচ্ছায়, স্বীয় স্বাধীন সম্মতি-ক্রমে কাহারও অন্যায় ভয় প্রদর্শন বা অনুরোধ আনুকূল্য ব্যতীত অত্র চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া দিলাম। ইতি তাং ইং ১১ই জানুয়ারী ১৯০৫ সাল।"

এই ১৯০৫ সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখ হইতে প্রায় সার্দ্ধ আট বৎসর কাল উক্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী হত ভাগ্যকে, তাহার গৃহীত ঋণের দ্বাদশ মুদ্রা পরিশোধ করিতে না-পারায়, সুদের বাবদ কঠোর কায়িক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তৎপরে ১৯১৩ সালের ২৯শে মে তারিখে, আসাম প্রদেশস্থ চা-বাগানের জনৈক কুলি-সরবরাহকারী তাহার পক্ষ হইয়া, মহাজনের ঋণের টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়া, তাহাকে মুক্ত করিয়া আনে; এবং স্বাধীন জীবিকার প্রলোভন দেখাইয়া চা-বাগানের কুলি করিয়া চালান দেয়। যাহা হউক, সদাশয় গভর্মেণ্ট সম্প্রতি উক্ত প্রকারের দলীল-পত্রাদী আইনমতে অসিদ্ধ, এবং বিনা বেতনের এই 'দাসখত'-প্রথা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া দিয়াছেন; এবং যাহাতে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণে ঈদৃশ চুক্তিপত্রের অবৈধতা অবগত হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন। "Young men of India" পত্রের সম্পাদক মহাশয় বলেন, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে এখনও অসংখ্য লোক এইরূপ অবৈধ চুক্তিপত্রের বলে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা জানে না যে, তাহাদের ঐ দাসত্ব-স্বীকার জগতের সমস্ত সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের বিরোধী; এবং কোন দেশের আইনেই উহা বিধিসঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য নহে। তিনি Social service Leagueএর সভ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বেচারীদের মুক্তিলাভে সাহায্য করিতে আহ্বান করিয়াছেন।—(Young men of India.)

আষাঢ়ে

[শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ]

প্রথমেই ব'লে রাখি, আমরা যাঁকে লেডি অ্যাবেস্ ব'লে সম্বোধন ক'রতুম, তিনি ছিলেন একালেরি একজন বঙ্গ-মহিলা; এবং তাঁর যে বাংলা নামটা ছিল, সেটা মর্ম্মস্পর্শী না হ'লেও শ্রুতিমধুর বটে। তবুও যে কেন তিনি ওই বিদেশী আখ্যায় অভিহিত হ'তেন, সে কথা ব'লতে গেলে আর একটা গল্পের অবতারণা ক'রতে হয়। সে চেষ্টা আর এক দিন করা যাবে।

যে দিনের কথা ব'লছি, সে দিনটা অ্যাবেস্ মহোদয়ার জন্মদিন, কি তাঁর আদুরে বিড়ালটার মৃত্যুদিন—তা' এখন ঠিক মনে প'ড়ছে না। তবে সেটা যে ওই রকম একটা-কিছু স্মরণীয় দিন ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেদিন আমাদের মধ্যে একটা বন-ভোজনের উদ্যোগ চ'লছিল; এবং মনে আছে, সেটা ওই রকম কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষ ক'রেই।

উৎসবের কারণটা মনে না থাক্‌লেও, উৎসবের দিনটা আমার বেশ মনে আছে। সেদিন প্রথমেই আমার ভবিষ্যদ্বাণী বিফল ক'রে দিয়ে, প্রাতঃসূর্য্য খাবার ঘরের পর্দ্দার ফাঁকে দেখা দিলেন; এবং আমি ছাড়া সকলেই তাতে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লেন ব'লে মনে হ'ল। পাহাড়ের কোলে আষাঢ়ের দিনটা এরকম ক'রে ফুটে ওঠা যে নিতান্তই একটা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ব্যাপার—তা' কারুর খেয়ালেই এল না। তাই ক্ষুণ্ণ মনে বল্‌লুম -এই তো কলির সন্ধ্যা—অর্থাৎ সকাল। এখনও সমস্ত দিনটা প'ড়ে আছে -মেঘ আসতে কতক্ষণ? ভগবান তো আছেন!

ভগবানের নামটা প্রাণের আবেগেই বেরিয়ে গিছ্‌ল; কিন্তু বুঝলুম, সেটা ঠিক জায়গায় গিয়ে লাগেনি। কেন না সেটা শুনেই অ্যাবেস মহোদয়া একেবারে সপ্তমে চ'ড়ে আমায় জানিয়ে দিলেন যে, সেই নির্গুণ দেবতাটীর নাম আমার মুখে শোভা পায় না,—যা' শোভা পায় তা' হ'চ্ছে, আগুন।

এটাতে আমার চুরুটাগ্নির প্রতি কটাক্ষ করা হ'ল, কি আমার মুখাগ্নির ব্যবস্থা করা হ'ল—তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। অতএব চুপ ক'রে রইলুম।

(২)

বিকেলের দিকে প্রস্পেক্ট্ পাহাড়ের উপর কামনা-দেবীর মন্দিরের ছায়ায় ঘাস-বিছানো একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজে নিয়ে আমরা ক'জনে বসলুম। আমাদের দলে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সকলের পরিচয় দেবার দরকার নেই, কেননা অনেকেই অ-পরিচয়ে শোভা পান ভাল—বিশেষতঃ বিদেশ-বিভূঁয়ে। 'অ্যাবেস্ মহোদয়াই' অবশ্য ছিলেন এই পিক্‌নিক্ চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কার্ত্তিকেয় ছিলেন তাঁর স্বামী এবং তত্ত্বধারক, এবং আমি ছিলেম—তান্ত্রিক ভাষায় কি বলে জানি না—তবে চলিত কথায় তাকে বলে ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো।

প্রবাদ আছে, সিমলা পাহাড়ের এই চূড়োটা থেকে শতদ্রু নদী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যখন একান্ত মনে এই প্রবাদটার সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করছিলুম, তখন হঠাৎ আমাদের দূরবীণের লক্ষ্যটা বন্ধ হয়ে গেল। চোখ ফিরিয়ে দেখি একটা ঘন-কুয়াসার পর্দ্দায় আমাদের চারপাশ ঘিরে ফেলেছে। পরক্ষণেই বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল।

আমার ভবিষ্যদ্বাণীর এই আংশিক সফলতা দেখে মনটাতে একটু স্ফূর্ত্তি আনবার চেষ্টা ক'রছি, এমন সময় অ্যাবেস্ মহোদয়ার দিকে দৃষ্টি প'ড়তেই মনটা জ'মে পাথর হ'য়ে গেল। তিনি আমার দিকে এমনভাবে চেয়ে রইলেন যেন সমস্ত দোষটা আমারই। কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌লুম—এতে আমার কোন হাত নেই, এবং যাঁর হাত আছে তাঁর নামও আমার মুখে আনা বারণ। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, এবং আমার গায়ে-প'ড়ে ঝগড়া কর্‌বার অভ্যাসটার প্রতি তীব্র কটাক্ষ ক'রে ব'ললেন—কে তোমায় দোষ দিচ্ছে শুনি?

আশ্বস্ত হবার কথা;—কিন্তু আশ্বস্ত হ'তে পার্‌লুম না।

লেডি অ্যাবেস্‌র রাগটা তো শুধু কথাতেই ক্ষান্ত থাক্‌ত না—চা-য়ে নুনের সাযুজ্যে এবং পানে চুণের প্রাচুর্য্যে সেটা বেশ তীব্র ভাবেই প্রকাশ পেত। তাই একটু ভাব করবার মতন সুরে বল্লুম—এখন এই মন্দিরের চাতালে আশ্রয় নিলে মন্দ হয় না? কিন্তু লেডি সাহেবের এ পরামর্শটা পছন্দ হ'ল না—বোধ হয় জুতো খুল্‌তে হবে ব'লে।

যাই হোক, অবশেষে সেই মন্দিরের চাতালেই আশ্রয় নিতে হ'ল।

বৃষ্টি তখন বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে।

(৩)

সেখানে গিয়েই অ্যাবেস্ মহোদয়ার ফরমাস হ'ল—গল্প বল্‌তে হবে। কিন্তু গল্প এখানে পাব কোথায়? যত সম্ভব রকম ভূতের গল্প সবই তাঁকে শুনিয়েছি, এবং যত অসম্ভব রকম মানুষের গল্প সবই তিনি পড়েছেন। বিশেষতঃ, এটা যে সিমলা পাহাড়ের মন্দির-শোভিত একটা চূড়া। এটা তো আমাদের চিমনি-শোভিত খাবার-ঘর নয়—যেখানে ভূতের গল্প মানুষে শোনে, এবং মানুষের গল্প ভূতেরাও যে অলক্ষ্যে না শোনে তা' নয়।

বন্ধু কার্ত্তিকেয় আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রলেন। এই যে মন্দিরের পূজারী—ওর ওই আশী বছরের দাড়ীর পাকে-পাকে অনেক গল্প জড়ান আছে নিশ্চয়—সেইগুলো শুন্‌লে হয় না?

অ্যাবেস্ মহোদয়া কিছু বল্‌বার আগেই বৃদ্ধ স্বয়ং প্রসাদী বাতাসা হাতে নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হ'ল। তাকে ধ'রে ব'লতেই সে একেবারে গল্প সুরু ক'রে দিলে—যেন সে গল্প বল্‌বার জন্যেই প্রস্তুত হ'য়ে এসেছে। আশ্চর্য্য নেই—বৃদ্ধেরা একবার গল্প বল্‌বার সুযোগ পেলে হয়—তখন তাদের ঠেকিয়ে রাখা মুস্কিল।

বৃদ্ধের গল্প শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম বটে, কিন্তু তার পরিচয়টা আমাদের সকলকেই অবাক্ ক'রে দিলে, বন্ধু কার্ত্তিকেয় ছাড়া। পরিচয়টা তাঁর বোধ হয় কানের ভিতর পৌছলেও মর্ম্মে গিয়ে পৌছয়নি। কে মনে ভেবেছিল যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সিপাহী বিদ্রোহের এক জলজ্যান্ত অভিনেতাকে সিমলা পাহাড়ের কামনা-দেবীর মন্দিরের পূজারীরূপে দেখ্‌তে পাব! আমাদের সৌভাগ্য ব'ল্‌তে হবে। ভূতের গল্প না হ'লেও তার চেয়ে চানকের পূরবিয়া পল্টনের ভূতপূর্ব্ব সুবাদার নওলপ্রসাদের গল্পটা যে কম জমবে তা' বলে মনে হ'ল না।

গল্পের প্রারম্ভেই নওলপ্রসাদ পাত্রাপাত্রীর পরিচয় দিয়ে দিলে। তাদের পল্টনে একটা খৃষ্টান ডাক্তার ছিল। তার নামটা বিদেশী ধরণের হ'লেও রংটা ছিল স্বদেশীর চেয়েও কালো, এবং ব্যবহারটা ছিল স্বদেশী-বিদেশী কিছুরই মতন নয়: এই লোকটারি কুব্যবহারে সে অবশেষে বিদ্রোহে যোগ দিতে বাধ্য হ'য়েছিল। গোড়াতেই যে দেয়নি সে কেবল এই লোকটার বাঙ্গালী স্ত্রীর খাতিরে। সেই বাঙ্গালী নারী হাঁসপাতালে একবার সেবাশুশ্রূষা দ্বারা নওলপ্রসাদকে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, এবং সেই অবধিই নওল প্রসাদ তাঁর কেনা গোলাম হ'য়ে গিছল।

নওলপ্রসাদ বল্‌লে, "তিনি ত সামান্যা নারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেবী"—যদিও তাঁর নামটা ম্লেচ্ছ ধরণের ছিল, এবং পোষাক পর্‌তেন মেম সাহেবদের মতই।

গল্পটা তো সত্য ব'লেই বোধ হ'তে লাগল। সে সময়কার বাঙ্গালী খৃষ্টান মহিলারা তো আজকালকার মতন সাড়ী প'রতেন না—তাঁরা প'রতেন সেই সে-যুগের বেলুনের মত ফোলা ক্রিনোলীন। সেই ক্রিনোলীন-পরিহিত বাঙ্গালী দেবী মূর্ত্তির ধ্যানে মনটাকে একটু সরস ক'রে নিলুম।

(৪)

গল্পও চ'ল্‌তে লাগল, তার সঙ্গে আমাদের মুখও চ'ল্‌তে লাগল। অ্যাবেস্ মহোদয়াকে ধন্যবাদ—আমাদের ভিতরকার মানুষটীর তুষ্টির জন্য কোনরূপ আয়োজনের ক্রটী হয়নি! সুতরাং সমস্ত গল্পটা শোনা আমাদের সকলকার ভাগে হ'য়ে ওঠেনি। তবে রক্ষা এই যে নওলপ্রসাদ গল্পটা বিশেষ ক'রে তার "মাইজি"কেই সম্বোধন ক'রে ব'লছিল। তার বিদ্রোহে যোগ দেবার পর থেকে কানপুর যাওয়া পর্য্যন্ত যে-সব লোমহর্ষণ ঘটনা ঘ'টেছিল, সে তার কিছুই বাদ দেয় নি, কিন্তু সে-সব খুঁটি-নাটি এখন আর আমার কিছুই মনে নেই। তবে কানপুরে পৌছে সে যে নানা সাহেবের দলে যোগ দিয়েছিল—এটা ঠিক। তারপর কি হ'ল তার নিজের ভাষাতেই বলা যেতে পারে।—

"সে সময় আমার ভিতর একটা সয়তান জেগে উঠেছিল,

মাইজি! আর সেই বাংলা মুলুকের দেবীমূর্ত্তি মন থেকে একেবারেই মুছে গিছল। তাই নানা সাহেব যখন বন্দীদের মেরে ফেলবার প্রস্তাব ক'রলে, তখন আমিই প্রথম তলওয়ারের আগা বাড়িয়ে গেলুম। গিয়ে কিন্তু দেখলুম কি? গারদখানার দরজা খুলেই দেখি—সেই দেবী মূর্ত্তি, তাঁর ছোট মেয়েটীকে কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন!"

তখন তাঁর ক্রিনোলীন পরা ছিল কিনা নওলপ্রসাদ তা' বল্‌তে পার্‌লে না। বোধ হয় স্তম্ভিত হ'য়ে গিছল ব'লে অতটা লক্ষ্য করেনি। যাই হোক, সে নিজেকে সাম্‌লে নেবার আগেই তিনি কিন্তু নওলপ্রসাদকে চিনে ফেললেন এবং আশ্চর্য্য হয়ে ব'ললেন,—'নওলপ্রসাদ তুমি!"

বাঃ—এই না হ'লে গল্প! নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম। এইবার গল্পটা জম্‌বে ভাল। নির্ভেজাল বীর-রস কি সহ্য হয়? তার সঙ্গে একটু আদিরসের মিশ্রণ না হ'লে ভাল শোনাবে কেন? মুখেও বলে ফেল্‌লুম,—"এই যে প্রাণের একটা প্রচ্ছন্ন টান—নওলপ্রসাদের দেশের ফল্গু নদীরই মত। এইটেকে আর একটু ফেনিয়ে তুল্‌তে পারলেই—"

আমার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে অ্যাবেস্ মহোদয়া ব'ললেন "তুমি থাম, আইবড় কার্ত্তিক।"

আমি আইবড় ছিলুম সত্য, কিন্তু কার্ত্তিক ব'লে আমায় কেউ কখন ভুল করেনি। বন্ধুরাও নয়—শত্রুরা তো নয়ই। আমি নিজে একবার ভুল করিছিলুম বটে, কিন্তু সে গল্প আজ আর নয়। বুঝলুম এটা নিতান্তই পরিহাস।

নওলপ্রসাদের গল্প ইতিমধ্যে অনেকটা অগ্রসর হ'য়েছিল। নানা সাহেবের কাজে ইস্তফা দেবার পরেই এবং আর কেউ সে কাজটার ভার গ্রহণ করবার আগেই সে যে কি কৌশলে সেই অসহায়া বঙ্গনারীকে গারদখানা থেকে উদ্ধার ক'রে, ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে, মাঠের পর মাঠ পার হ'য়ে, এলাহাবাদের ইংরেজ বারিকে নিরাপদে পৌছে দিলে—সেই সব কাহিনী সবিস্তারে ব'লে যেতে লাগল। এই রোমান্সটুকু ছিল ব'লেই রক্ষা। রোমান্সবর্জ্জিত বীরত্ব—সে তো গুণ্ডামি!

ব্যাপারখানা একবার মানস-নেত্রে ভাল ক'রে ফুটিয়ে তুললুম। এই পূরবিয়া বীর যখন তার আরাধ্যা দেবীকে বুকের কাছে নিয়ে, গভীর রাত্রে তেপান্তর মাঠের শেষে এক নিরুদ্দেশ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছিল, তখন ঋতুটা জুৎসই গোছের না হ'লেও রাত্রিটা যে জ্যোৎস্নাময়ী ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।........সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনী; কণ্ঠে মৃণাল ভুজের বন্ধন; বক্ষে যৌবন-গীতির স্পন্দনতাল; অমৃতের পাত্র মুখের এত কাছে তবু এত দূরে··· হঠাৎ আমার কল্পনাটা প্রতিহত হ'ল—সেই কোলের মেয়েটীর কথা মনে প'ড়ে। নওলপ্রসাদ তো তার আরাধ্যা দেবীকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে ছুট দিলে, এবং তিনিও প'ড়ে যাবার ভয়ে দু'হাতে নওলপ্রসাদের গলা জড়িয়ে ধ'রলেন। কিন্তু সে অবস্থার কোলের মেয়েটীকে কি ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'ল—তা' নওলপ্রসাদও কিছু ব'ললে না, এবং আমিও রসভঙ্গের ভয়ে জিজ্ঞাসা ক'রতে সাহস ক'রলুম না।

(৫)

নওলপ্রসাদের গল্প শেষ হ'য়ে এল। বিদায় নেবার সময় তার আরাধ্যা দেবী আবার দেখা হবে ব'লে আশা দিয়েছিলেন, এবং সে তাঁরই প্রতীক্ষায় অতদিন ধ'রে জীর্ণ শরীরটাকে কোন রকমে ঠেকিয়ে রেখেছিল। আহা বেচারা!

অ্যাবেস্ মহোদয়া করুণার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলেন। দেখা হয়েছে কি?

বৃদ্ধ বল্‌লে—দেখা হ'য়েছে, না-ও হ'য়েছে।

সে বুঝিয়ে দেবার পর বুঝ্‌লুম যে অ্যাবেস্ মহোদয়ার কণ্ঠস্বরে তার পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠেছিল, তবে দৃষ্টিক্ষীণতার দরুণ চেহারাটা ঠিক মালুম ক'রতে পারেনি।

গল্পটা যে ঠিক এ রকম পরিণতি নেবে, সেটা আমরা কেউ আশা করিনি; অতএব সকলেই একটু অসোয়াস্তি বোধ ক'রতে লাগলুম—বন্ধু কার্ত্তিকেয় ছাড়া। এই হাস্য-করুণরস বর্জ্জিত মানুষটীর তুলনা পাওয়া ভার।

কিন্তু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে পারলুম না—অ্যাবেস্ মহোদয়ার মুখের দিকে চেয়ে। তাঁর মুখের রং একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে গিছল। তাঁর পূর্ব্ব কথা মনে প'ড়ছিল কি না কে জানে। নিরুদ্দেশ পিতা, শৈশবে মাতার মৃত্যু, মিশন-গৃহে প্রতিপালিত অবস্থা—এ সবের সঙ্গে কি এই

কামনা দেবীর মন্দিরের বৃদ্ধ পূজারীর কোনরূপ যোগ থাকা সম্ভব ?

তাঁর মুখের ভাবটা এবং মনের প্রশ্নটা তাঁর স্বামীর চক্ষু এড়ায়নি। তাই বোধ হয় তিনি বাড়ী যাবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে বৃষ্টিও থেমে গিছল, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল; এবং রিক্‌শ-কুলিরাও বাড়ী ফের্‌বার জন্যে তাগাদা দিচ্ছিল।

বৃদ্ধকে বাড়ীতে আসবার নিমন্ত্রণ ক'রে অ্যাবেস্ মহোদয়াও তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

(৬)

বাড়ী ফের্‌বার পথে ব্যাপারখানা বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। নীরবতার অবতার বন্ধু কার্ত্তিকেয়ের ভিতর যে এত ছিল, তাতো জানতুম না। আদুরে বিড়ালটার মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রীর যে পরিমাণে দুঃখ হ'য়েছিল, তাঁর নিজের ঠিক সেই পরিমাণেই স্ফূর্ত্তি হ'য়েছিল। সেই স্ফূর্ত্তিটা ভাল ক'রে অনুভব করবার জন্যে এবং পরোক্ষভাবে স্ত্রীর দুঃখটা লাঘব করবার জন্যে তিনি এই গল্পটা বানিয়েছিলেন, এবং আগের দিনে বৃদ্ধ পূজারীকে বকশিষ দিয়ে তার নামেই বেনামি ক'রে চালাবার বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন।

বন্ধুর সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। কিন্তু সেটা জ্ঞাপন কর্‌বার সময় জান্‌তে পারিনি যে, অ্যাবেস্ মহোদয়া ঠিক আমাদের পিছনের রিক্‌শতেই আছেন। তিনি আমাদের কথাবার্ত্তা সবটা শুন্‌তে পান্‌নি, তবে যতটুকু শুন্‌তে পেয়েছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট—এবং আমার পক্ষেও বটে; কেননা ধরা পড়বার সময় বন্ধু কার্ত্তিকেয় সমস্ত দোষটা আমার স্কন্ধে বেমালুম চাপিয়ে দিলেন। শাস্ত্রকারেরা ভুল ক'রেছিলেন—"বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং— এরপরে—"স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" না বসিয়ে "স্ত্রীষু স্বামীষু চ" বসান উচিত ছিল।

ফলে এই দাঁড়াল যে, তারপর যতদিন সিমলায় ছিলুম, আত্মরক্ষার জন্য আমি চা ও পান খাওয়া বন্ধ ক'রেছিলুম, এবং জেদ্ রক্ষার জন্য অ্যাবেস্ মহোদয়াও আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া বন্ধ ক'রেছিলেন।

পশ্চিম তরঙ্গ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

১। সঙ্গীতারাম

সুমধুর গীতবাদ্য যুদ্ধে আহত সৈনিকগণকে সুস্থ করিবার একটী প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সুললিত সুর-তানের নিয়মিত অনুষ্ঠানের দ্বারা অনেকগুলি আরোগ্য-নিবাসে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে; বিশেষতঃ, রণ-ক্ষেত্রে অসংখ্য লোমহর্ষণ দৃশ্য দর্শনে যাহাদের স্নায়ু-বিকার ঘটিয়াছে, অথবা অবিরাম গোলাবর্ষণের মধ্যে নিয়ত অবস্থান করায় দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর নিদারুণ বিভীষিকা সন্দর্শনে যাহাদের দেহ-মন একেবারে বিকল হইয়া গিয়াছে, সেই সকল অসুস্থ ব্যক্তির নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে গীতবাদ্য আশাতীতরূপে সাহায্য করিয়াছে।

স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম ও ক্রীড়া-কৌতুক যেমন মানুষের শক্তি ও স্ফূর্ত্তির বিকাশে অশেষ প্রকারে সহায়তা করিয়া থাকে, সেইরূপ সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত দেহ-মনকে যদি সুকুমার গীতবাদ্যের মনোরম আনন্দের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যও অবসর দেওয়া হয়, তবে দিনান্তের সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদ অপনোদন করিতে মানুষকে উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে পারে। যে কোনও শ্রেণীর বা যে-কোনও অবস্থার লোকই সে হউক না কেন, সুযন্ত্রীর মোহন কলাপ-ঝঙ্কার ও সুকণ্ঠের বিনোদ সঙ্গীত-সুর সকলের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া তাহাদের চিত্ত মুগ্ধ করিতে পারে। এমন কি, বনের পশু-পক্ষীও যে এ রসের আস্বাদনে মোহিত হইয়া পড়ে, এ সংবাদও বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।

গীতবাদ্যের এই ঐন্দ্রজালিক শক্তিটুকুকে আধুনিক

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান উপেক্ষা করিতে পারে নাই। সে তাহাকে আজ মানবের মহা হিতে বিনিয়োগ করিয়াছে। প্রত্যেক যুদ্ধ-হাসপাতালের আহত সৈনিকগণকে তাহাদের ক্ষত-যন্ত্রণা হইতে কিছুক্ষণের জন্য ভুলাইয়া রাখিতে,—দীর্ঘ দিন একই স্থানে আবদ্ধ ও শয্যাশায়ী থাকিয়া যে সকল তরুণ যোদ্ধৃ যুবক অন্তরে-বাহিরে বিরক্ত ও কাতর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সেই অধীর ও অশান্ত অন্তর আনন্দের অমৃত-ধারা বর্ষণে কিয়ৎকালের জন্য সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে, অনেকগুলি উদারমনা, স্বদেশবৎসল অভিনেতা ও অভিনেত্রী, সুদক্ষ যন্ত্রী, নিপুণা গায়িকা জনপ্রিয় বক্তা ও যশস্বী কথক (reader) এবং হাস্যরস-রসিক ভাঁড়েরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহাদের মনোরঞ্জনী বিদ্যা বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের হাসি-গানের এই সামান্য দানে যে কত মৃতপ্রায় প্রাণে পুনরায় নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। একবার একটা যুদ্ধ-হাসপাতালের জনৈক রোগীর মস্তিষ্ক-বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। চিকিৎসকেরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারেন নাই। সে ক্রমাগতই, যেন কিসের একটা বিরাট হিসাব মিলাইতে বসিয়াছে, এই ভাবে একান্ত মনোযোগের সহিত দিবারাত্রি প্রচণ্ড বেগে তাহার করাঙ্গুলীর প্রত্যেক পর্ব্বের সংখ্যা গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই উন্মত্ততা হইতে কোন উপায়েই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারা যায় নাই। বাদক, অভিনেতা, হাস্যরসিক, কথক, সকলেই নানা চেষ্টা করিয়া কিছুতেই যখন সে উন্মাদগ্রস্তকে তাহার কাল্পনিক হিসাব হইতে বিরত করিতে পারিল না, তখন একজন গায়িকাকে আহ্বান করিয়া আনা হইল। গায়িকার কোকিল-কণ্ঠ হইতে যেমনই বীণাবিনিন্দিত সুস্বর-লহরী ধ্বনিত হইয়া উঠিল, হিসাব-রত উন্মাদের মনোযোগ অমনি সহসা উহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল; এবং যে অনন্ত সংখ্যা-গণনার উন্মাদনা হইতে তাহাকে পরিত্রাণ করিবার জন্য এতদিন ধরিয়া নানা চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, সেদিন সুললিত সঙ্গীতের সম্মোহিনী-শক্তি সেই অসাধ্য সাধন করিয়া দিল। উন্মাদ তাহার হিসাব ভুলিয়া, গণনা বন্ধ করিয়া, তন্ময় চিত্তে সঙ্গীত-সুধার রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইল; এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ধীরে-ধীরে সম্পূর্ণ নিরাময় ও প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল।

আর একটী তরুণ বয়স্ক রোগীর জীবনের আশায় যখন চিকিৎসকগণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়ে হাসপাতালে একদিন তিনটী পাহাড়ীয়া বালক 'ব্যাঞ্জো' বাজাইয়া গান শুনাইতে আসিয়াছিল। মরণোন্মুখ তরুণ রোগীর নির্জ্জীব প্রাণ সেদিন সেই শিশুকণ্ঠের কলগান শ্রবণে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনটী ক্ষুদ্র 'ব্যাঞ্জো'র মিলিত তাল-ঝঙ্কার সেই নিষ্প্রভ জীবন-দীপটাকে সেদিন উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে দেখিয়া, উহাদিগকে কয়েক দিন উপর্য্যুপরি ডাকিয়া আনিয়া, রোগীকে তাহাদের গীতবাদ্য শোনান হইতে লাগিল; এবং যে রোগীর জীবনের আশায় অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণেরও আর কিছুমাত্র ভরসা ছিল না, সেই মৃত্যু-চিহ্নিত হতাশ জীবনটা ধীরে-ধীরে আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে সজীব হইয়া উঠিতে লাগিল। তার পর রোগীর একান্ত ইচ্ছা অনুসারে তাহাকেও যখন একখানি 'ব্যাঞ্জো' কিনিয়া দেওয়া হইল, তখন স্বাস্থ্যের অনুকূল বাতাস যেন ঝড়ের মত বেগে তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিল। বাজনা শুনিতে শুনিতে বাজাইবার একটা আকুল আগ্রহ তাহাকে যেন মৃত্যুর আঁধার গহ্বর হইতে জীবনের পুষ্পিত আঙিনায় ফিরাইয়া আনিল।

বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত সৈনিকের চিকিৎসা অপেক্ষা, যাহারা কোনও অদৃশ্য ও অজ্ঞাত আঘাতে অন্তরে আহত হইয়াছে, তাহাদের আরোগ্য করাই দুরূহ ব্যাপার। গীতবাদ্যই কেবল ইহাদের অনেককে আরাম করিতে সফলকাম হইয়াছে। ওদিকে অস্ত্রাঘাতে আহত ব্যক্তিগণকে সম্পূর্ণ সক্ষম করিতে শিল্পকার্য্যও বিশেষ সহায়তা করিতেছে। যাহার দক্ষিণ হস্তখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বাম হস্তটাকে কার্য্যোপযোগী করিয়া দিতে, যাহারা কোনও একটা পা হারাইয়াছে—তাহাদিগকে অপর চরণের সদ্ব্যবহার শিখাইতে, যাহাদের চক্ষু গিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টি-শক্তির অভাব পূরণ করিতে, নানা বিচিত্র শিল্প ও শিল্প-যন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে; তন্মধ্যে দারু-শিল্প, সূত্রধরের কাজ ও ঝুড়ি-চিয়াড়ি প্রভৃতি ডোম সজ্জাই প্রধান।

অস্ত্র-চিকিৎসার পর অনেকেরই হাত-পায়ের খিল সহজে সারে না। কেহ হয় ত মুড়িতে পারে কিন্তু সোজা করিতে পারে না;—কেহ আবার মুড়িতেই পারে না, কেবল সোজা হইয়াই থাকে। কাহারও বা হাতের আঙুল

আর নড়ে না, 'কব্জী' খেলে না—এবং হাত মুঠা করিতে পারে না। ইহাদের সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ করিবার জন্য বিবিধ শিল্পকার্য্যের সাহায্য লওয়া হয়,—যেমন, অলঙ্কার-নির্ম্মাণ, লিপিযন্ত্র (Typewriter), মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ, বস্ত্র-বয়ন, চিত্রাঙ্কণ, নক্সার কাজ, সেলাইয়ের কাজ, ছাপাখানার ও অন্যান্য কলকারখানার কাজ ইত্যাদি। এই সকল শ্রম-শিল্পের অভ্যাস করিতে-করিতে ক্রমে-ক্রমে তাহাদের আহত অঙ্গের মাংসপেশীগুলি দৃঢ় ও সবল হইয়া উঠে, এবং উহাদের স্বাভাবিক গতি-শক্তিও ফিরিয়া আসে।

(The Literary Digest.)

২। লুণ্ঠিত রত্নোদ্ধার

সন্ধিপত্রের সর্ত্তানুসারে জার্ম্মাণীকে, ইটালী, ফ্রান্স ও বেলজিয়মের সমস্ত অপহৃত চিত্রকলা ও শিল্প-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, কথা আছে। কিন্তু বেলজিয়মের পক্ষে তাহার সমস্ত লুণ্ঠিত রত্ন ফিরিয়া পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব; কারণ, তাহার অধিকাংশই জার্ম্মাণ কামানের প্রচণ্ড আক্রমণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল যেগুলি জার্ম্মাণরা যত্ন পূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিয়াছিল, মাত্র সেইগুলিই ফেরত পাওয়া যাইবে মনে হয়। যেমন 'লুভেঁ' ও 'ঘেণ্ট' সহরে অগ্নি-সংযোগ করিবার পূর্ব্বে জার্ম্মাণরা লুঁভের 'সেণ্ট্ পীর্‌রে' গীর্জ্জা ও ঘেণ্টের 'সেণ্টব্যাভন্' গীর্জ্জার যে কয়েকখানি বিখ্যাত চিত্র খুলিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাই পাওয়া যাইতে পারে, অন্যগুলি চিরদিনের জন্য লেলিহান অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। উক্ত চিত্রগুলির মধ্যে তিনখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম 'ডায়েরিক্ বুটসের' অঙ্কিত "অন্তিম-ভোজ" (Last supper) নামক চিত্র। ইহা লুভেঁর 'সেণ্টপীর্‌রে গীর্জ্জার একটা প্রধান গৌরবের বস্তু ছিল। দ্বিতীয়—'ভ্যান আইক্‌সদের অঙ্কিত 'সেণ্ট ব্যাভন' গীর্জ্জার পবিত্র বেদীর কয়েকখানি পার্শ্বচিত্র; এবং তৃতীয় ঐ ভ্যান আইকস্ ভ্রাতাদেরই অঙ্কিত "মেষমঞ্চ" (The Altar of the Lamb.) নামক আর একখানি বৃহৎ চিত্র। এই চিত্রখানি 'সেণ্টব্যাভন' গীর্জ্জার পবিত্র বেদীর সম্মুখ দিকের মধ্যচিত্ররূপে অঙ্কিত হইয়াছিল।

'ভ্যানআইকস্' ভ্রাতাদের অঙ্কিত উক্ত 'সেণ্টব্যাভন' গীর্জ্জার পবিত্র বেদীর পার্শ্বচিত্রগুলির মধ্যে কয়েকখানি বহুদিন পূর্ব্বেই জার্ম্মাণগণ হস্তগত করিয়াছিল; এবং উহা এতদিন বার্লিনের 'কৈসার ফ্রেডরিক্ মিউজিয়মের' শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। 'সঙ্গীতকারিণী দেববালাগণ' ও 'বাদ্য-কারিণী দেববালাগণে'র চিত্র দুইখানি উহাদেরই অন্যতম। সন্ধিপত্রে জার্ম্মাণী এ ছবিগুলিও ফেরত দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

(The Literary Digest.)

৩। প্রাচীন পুঁথির মূল্য

প্রসিদ্ধ চিত্রকরগণের অঙ্কিত প্রাচীন চিত্রপট সংগ্রহ করিবার আগ্রহ পাশ্চাত্য ধনকুবেরগণের মধ্যে এত প্রবল যে, তাঁহারা একখানি ছবির জন্য লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হ'ন না। কয়েক মাস পূর্ব্বে সার্ যোশুয়া রেনল্ডস কর্ত্তৃক অঙ্কিত করুণ সুরের প্রতিমারূপিণী শ্রীমতী সীদনের আলেখ্যখানি লণ্ডনে নিলাম হইয়াছিল। ওয়েষ্টমিনষ্টারের ডিউক উক্ত চিত্রখানি ৫২০০০ ৲ পাউণ্ডে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। চিত্রের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, হস্ত-লিখিত পুঁথি ও দুর্লভ শিল্পদ্রব্যও সেখানে ধন-গর্ব্বিত সৌখীন গ্রাহকগণের প্রতিযোগিতায় অসম্ভব অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। 'গ্যামার গটনের ছুঁচ' শীর্ষক একখানি অতি তুচ্ছ ও অপাঠ্য নাটক সেদিন ৩০০০০ ৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। ক্রেতা একজন আমেরিকান। তিনি, উক্ত পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষায় সর্ব্ব-প্রথম মুদ্রিত নাটক বলিয়া গ্রন্থ পরিচয়ে উহার যে একটা উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থান আছে, সেইটুকু সম্মানিত সম্পদের গর্ব্বিত অধিকারী হইবার জন্য ৩০০০০ ৲ টাকা ব্যয় করা কিছুই নয় বলিয়া করেন। সম্প্রতি 'কালের গ্রন্থ' (Book of Hours) শীর্ষক মধ্যযুগের একখানি পুঁথি ১১৮০০ ৲ শত পাউণ্ডে বিক্রীত হইয়াছে। ১৪৮৩ খৃঃ অব্দে রচিত আরিষ্টট্‌লের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলিখানি ২৯০০ পাউণ্ডে বিক্রীত হইয়াছে। পুস্তকখানির প্রচ্ছদপটে দার্শনিক পণ্ডিত আরিষ্টট্‌লের একখানি চিত্র আছে। কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণীষ-মস্তক, দীর্ঘ শ্বেত অঙ্গরাখায় আবৃত-দেহ, মহাজ্ঞানী অমর আরিষ্টট্‌ল তদীয় শিষ্য 'কর্দোভান্ আভার্হো'কে (Cordovan Averrhoe) উপদেশ দিতেছেন। ১৩৩৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৩৪৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে রচিত 'নাস্তের

"এই সেই হাসিরূপ গান,
সঞ্জীবিত যাহে মৃতপ্রাণ।"

আহত সৈনিকগণের ঐক্যতান-বাদন।

ছিন্নহস্ত ও আহতগণের কার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি
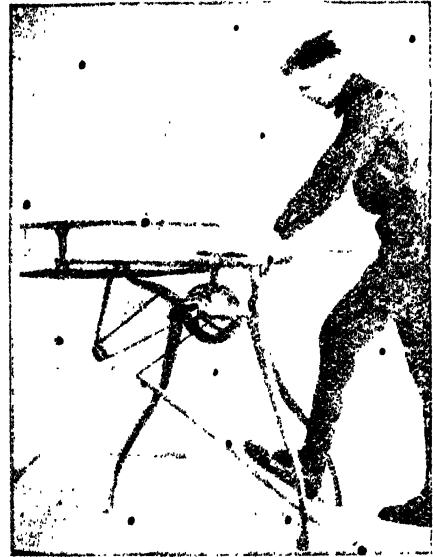
শিল্প-সাহায্যে বদ্ধজানুর চিকিৎসা

রাণী দ্বিতীয় জেনীর জীবন কাল" শীর্ষক আর একখানি পুঁথিও ১১৮০০৲ পাউণ্ডে বিক্রীত হইয়াছে। ইহাতে ৭৮ খানি ছোট-ছোট চিত্র আছে। নমুনা স্বরূপ যে চিত্রখানি এই প্রবন্ধের সহিত প্রদর্শিত হইল, উহাতে একাদশবর্ষীয় সেণ্ট লুইয়ের রাজ্যাভিষেকের উপলক্ষে রীমস্ যাত্রা সূচিত হইয়াছে। শিশু নৃপতি সেণ্ট লুই তদীয় জননীর সহিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া রীমস্ অভিমুখে চলিয়াছেন; সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার রাজ্যের সম্ভ্রান্ত সামন্তগণ রহিয়াছেন। ১৪১০ খৃঃ অব্দে দিগ্বিজয়ী সম্রাট তৈমুর লঙ্গের পৌত্রকে উপহার দিবার জন্য সোমারখান্দে যে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, উহা ৫০০০৲ পাউণ্ডে বিক্রীত হইয়াছে। উহাতে পারস্য দেশীয় চিত্রশিল্পিগণের অঙ্কিত কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। তন্মধ্যে 'পোলো' খেলার একখানি ছবি এই প্রবন্ধের সহিত প্রদত্ত হইয়াছে। এই অদ্ভুত চিত্রখানি হইতে ইহা নিঃসন্দেহ অনুমান করা যাইতে পারে যে, ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বেও পারস্যে যখন এই 'পোলো খেলা' প্রচলিত ছিল, তখন প্রাচ্য জগতেই বোধ হয় ঐ

সঙ্গীতকারিণী দেববালাগণ বিশ্বপিতা জগদীশ্বর বাদ্যবাদিনী দেববালাগণ

'মেশ-মঞ্চ'
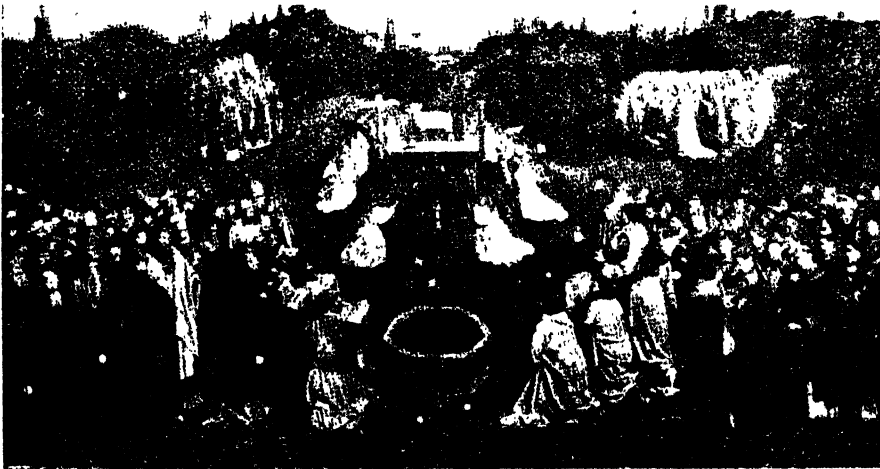
খেলার প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল। (The Literary Digest.)

শান্তি।

শান্তি উৎসবের সুদীর্ঘ আনন্দ-উচ্ছ্বাস গদ্যে এবং পদ্যে নানা ভাবে অসংখ্য সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে লণ্ডনের 'ওয়েষ্টমিনষ্টার গেজেটে' যে মাত্র চার লাইনের একটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইটাই অধিকাংশ লোকের সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী বলিয়া মনে লাগিয়াছিল। সে কবিতাটী এই—

"The peace is won. The Allied peoples cry
Aloud in joy, singing the soldiers go.
In Flanders and the Somme the dead men lie
Who greeted peace with silence long ago."

J. A. Williams.

"প্রতিষ্ঠিত শান্তি আজি। সৈনিক ফিরিছে গাহি গান।
মিত্রশক্তি উচ্চকণ্ঠে করিছে আনন্দ কলরব।
শায়িত সমর-ক্ষেত্রে মৃতবীর যত—নীরবে তাহারা
বরিয়াছে বহু পূর্ব্বে শান্তির উৎসব।"

(The Literary Digest.)

'অন্তিম ভোজ'

শিশু সেণ্টলুইয়ের রাজ্যাভিষেকে যাত্রা

আরিষ্টটলের গ্রন্থাবলী

পারস্তের প্রাচীন 'পোলো' খেলা

মিয়া-শোরী

খাম্বাজ—মধ্যমান

[স্বরলিপি—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

অভাব ও অভিযোগ *

[শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম্-এ]

জগতে প্রয়োজন ক্রমাগত আয়োজনকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে। প্রয়োজনকে কোনরূপেই মিটানো যায় না; অথচ ইহাকে মিটাইবার চেষ্টা না করিলেও চলে না। এই চেষ্টাই জীবন, এবং চেষ্টার সমাপ্তিতে মৃত্যু। যে জাতি যতই আয়োজনকে সম্পূর্ণতর এবং প্রয়োজনের অন্তঃসীমাকে সঙ্কীর্ণতর করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, সে জাতির জীবনীশক্তি ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। শক্তির সঞ্চয়ে স্বাস্থ্য এবং প্রকাশে সভ্যতা।

প্রাণ আপনার শক্তিতে চির-চঞ্চল। তাই সে ক্ষুধার সৃষ্টি করিয়া আপনিই খাদ্য আহরণ করিতেছে—প্রয়োজনের সৃষ্টি করিয়া আপনিই আয়োজনে লাগিয়া গিয়াছে। এই প্রয়োজনের ক্ষুধা নানারূপে, নানাভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। দেহের মধ্যে সে অন্নের জন্য, আরামের জন্য, সুখের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য—আত্মার মধ্যে সে শান্তির জন্য, সৌন্দর্য্যের জন্য, জ্ঞানের জন্য, প্রেমের জন্য হাহাকার করিতেছে। ক্ষুধা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "চাই, চাই, চাই", "যাহা ছিল তাহা চাই, যাহা আছে তাহা চাই, যাহা নাই তাহাও চাই।" ইহাই ত অভাব-বোধ।

প্রত্যেক জাতি আপনার ভাবে এই অভাবকে পূর্ণ করিবার জন্য সচেষ্ট। কেহ বিজ্ঞান, কেহ ধর্ম্ম, কেহ সাহিত্য, কেহ অর্থ, কেহ বা কেবল ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট মানুষের জীবন দিয়া এই ক্ষুধার ব্যাকুলতা, এই অভাবের তাড়নাকে শান্ত করিবার জন্য যত্ন করিতেছে। অভাব যখনই প্রবল হইয়া উঠে, দুর্দ্দম হইয়া উঠে,—তখনই যুদ্ধ, তখনই বিপ্লব। অভাব যখন আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে না, তখনই ক্ষয়, তখনই মৃত্যু।

বাঙ্গালাদেশ সৃষ্টি-ছাড়া নয়—তারও অভাব-বোধ আছে। প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নর-নারীর অশ্রান্ত ক্রন্দনে তাহার দৈহিক ক্ষুধা আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নীরব অক্ষরে তাহার স্বাস্থ্যের অভাবের বাণী মৃত্যুর খাতায় লিখিয়া চলিয়াছে। সেন্সাসের খাতা তাহার শিক্ষা-রাহিত্যের কথা উচ্চ স্বরে ঘোষণা করিতেছে। অভাব—অভাব—অভাব! এই বিরাট অভাব-রাশির পেষণে পড়িয়া বাঙ্গালা মুমূর্ষু—বাঙ্গালী, a dying race।

বাঙ্গালার জীবনীশক্তি এত ক্ষীণ হইয়া আসিল কেন? তাহার শক্তির সঞ্চয় কি করিয়া ফুরাইয়া যাইবার দিকে চলিয়াছে? আজ বড়-বড় ডাক্তার তাই ভাবিতে বসিয়া

* Rainbow Club এর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে পঠিত।

গিয়াছেন,—বাঙ্গালার নাড়ীর গতি কেমন করিয়া এমন মন্থর হইয়া আসিল? এ রোগের নিদান কি? বৈজ্ঞানিক বলিলেন, বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার; রাজনৈতিক বলিলেন—আত্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার অল্পতা; কবি বলিলেন—অন্তরে ও বাহিরে সৌন্দর্যাচর্চা ও সামঞ্জস্য-বোধের অভাব; বলী বলিলেন,—স্বাস্থ্যানুশীলনে অমনোযোগ; ধনী বলিলেন—শ্রমের দুর্মূল্যতা; কৃষক বলিল দুর্ভিক্ষ; অদৃষ্টবাদী বলিল—দুর্ভাগ্য!

জাভার আগ্নেয় গিরি—নিতান্তই নির্বিরোধ, ভালমানুষের মত দাঁড়াইয়া ছিল। দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া হয় ঘুমাইতেছিল, নয় ঝিমাইতেছিল। হাজার বছরের পর সহসা তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; দৃষ্য রাঙা হইয়া গেল, ক্ষেত্র ধূসর হইয়া গেল, দিকে দিকে গলিত ধাতুর স্রোত বহিয়া গেল, মুমূর্ষুর আর্তনাদে দিগ দিগন্ত ভরিয়া গেল; রাক্ষস বহ্নি-জিহ্বা বিস্তার করিয়া অর্দ্ধেকটা দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিল। জাভা হইতে কেবল চিনি আসিত; কে জানিত, সেই মিষ্টের দেশে ওই ভয়ঙ্কর দৈত্য সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে! য়ুরোপ হইতে literature আসিত; science আসিত, politics আসিত; কিন্তু কে জানিত, সংগ্রাম রাক্ষসী শান্তির শ্বেত-আচ্ছাদন মুড়ি দিয়া, আল্পস্ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত পা ছড়াইয়া, ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া আছে! একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখা গেল, রাক্ষসীর নিঃশ্বাসের স্পর্শে য়ুরোপ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। সিংহাসনের পর সিংহাসন সেই আগুনে পুড়িয়া, ছাই হইয়া, বাতাসে মিশাইয়া গেল। না রহিল রাজতন্ত্র, না রহিল গণ-তন্ত্র, না রহিল ন্যায়, না রহিল বিচার; কেবল সেই শ্মশানের চিতাগ্নির চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া নৃত্য করিতে থাকিল—প্রতীচ্য 'কাল্চারের' বিকট প্রেতমূর্ত্তি।

আগুনের তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে মাত্র,—ধূমায়িত বহ্নি আজও নির্ব্বাপিত হয় নাই। সেই আগুনের তাপে বাতাসের বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—ঝটিকার সৃষ্টি হইয়াছে। সে ঝড় আমাদের উপর দিয়াও বহিয়া গেছে,—সে তাপ ভারতবর্ষে আসিয়াও লাগিয়াছে।

জাগিয়া বসিয়া সবে চক্ষু মুছিতে আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময় ঝটিকার বেগে আমাদের ছিন্ন কন্থা এবং জীর্ণ চীর কোথায় উড়িয়া গেল। জ্ঞান হইল, কমল-বিলাসীর দল আমরা,—তন্দ্রার ঘোরে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলাম মাত্র। আলনাস্কারের মত স্বপ্ন দেখিতেছিলাম,—মণ্টেগু আসিয়া আমাদের হাতে স্বায়ত্ত-শাসনের ভার সঁপিয়া দিয়া গেলেন; দেখিতে-দেখিতে ধন ধান্যে ভাণ্ডার উপছিয়া উঠিল;—ভারতে প্রস্তুত পণ্য লইয়া সাগরে-সাগরে আমাদের বাণিজ্য-তরী ছুটিল;—ভারতের সঙ্গে বঙ্গের নাম দেশে-দেশে ধ্বনিত হইতে লাগিল। মূঢ়, মূঢ়!

বাণিজ্যপোত পণ্যে ভরাইবার সময়ে সহসা চৈতন্য হইল,—দুর্ভিক্ষের দেশে আমাদের সম্বল মাত্র চাল, আর গম, আর পাট, আর তুলা। চাল, গম, পাট, তুলা ভরিয়া লইয়া বিদেশের তরী বিদেশে যাইবে,—কিন্তু আসিবার সময় তরী লইয়া আসিবে পরিবার কাপড়, লিখিবার কাগজ, চড়িবার গাড়ী, মাখিবার এসেন্স, শুনিবার গ্রামোফোঁ, দেখিবার সিনেমা। এবং আর আর যাহা, অর্থাৎ ছুরি, কাঁচি, মোজা, গেঞ্জি, সাবান, তোয়ালে, চিরুণি, আর্শি, পেন্সিল, নিব, ঔষধ, পথ্য, পুতুল, খেল্না, দিয়াশলাই, বাতি, ইঞ্জিন, মোটর ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্তই বিবৃতিতে উহ্য রহিল।

প্রবন্ধে থাকুক,—দুঃখ এই, দেশেও এই সমস্ত জিনিস উহ্য থাকিয়া গেল। প্রয়োজন অধিক, আয়োজন অল্প। বহুকাল হইল অভাব সীমাকে অতিক্রম করিয়া গেছে। গ্রামে-গ্রামে, সহরে সহরে তাই এই রোদনের রোল উঠিয়াছে।

এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত অভাব, এত হাহাকার;—তবু উপায় মিলিল না, মিলিল না।

গোলাটাকে যেখানেই রাখিয়া দেওয়া যাক্, সেইখানেই সে স্থির হইয়া থাকিবে,—না নড়াইলে কোন মতেই নড়িবে না। গড়াইয়া দিলে কিন্তু যেদিকে গতি দেওয়া গেল, ঠিক সেইদিকেই চলিবে,—বাধা না পাইলে কোনরূপেই থামিবে না। এই এক জড়ের লক্ষণ। বিজ্ঞানে ইহাকে বলে inertia। বাঙ্গালীজাতি জীবন্ত মানুষের সমষ্টি; কিন্তু তার মধ্যে এই জড়ত্ব পূর্ণ ভাবে প্রকটিত। বাঙ্গালী না নড়াইলে নড়ে না, পথ না দেখাইয়া দিলে চলে না, এবং যে দিকে ঠেলা দেওয়া যায়, ঠিক সেইদিকেই চলিতে থাকে,—তার একটু এপাশেও নয়, ওপাশেও নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঠেলা বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ হয় ওকালতী, নয় ডাক্তারি, নয় মাষ্টারি, না হয় কেরাণীগিরির গর্ত্তের অভিমুখে

সটান চলিয়াছে,—একটু ভাবনা-চিন্তা নাই। হঠাৎ যদি আর এক দিক হইতে আর একটা ঠেলা আর একটু জোরে কোন রকমে ধাক্কা মারে, ত বাঙ্গালী ঠিক সেইদিকে সেই বেগে গড়াইয়া যাইবে,—সেও না ভাবিয়া চিন্তিয়া।

বাঙ্গালী জড়ধর্ম্মী—জড় ত নয়! তাই সে নিজের অবস্থা বুঝিয়া হায়-হায় করিতেছে; পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত কেবলই ভয় পাইতেছে,—অথচ আগন্তুক কোন বিভীষিকাকে নিবারণ করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। কেহ আবহাওয়া, কেহ রাষ্ট্র-তন্ত্রের দোহাই দিয়া এই চেষ্টাহীন কর্ম্মবিমুখতা, এই চিন্তাহীন জড়তাকে জাতিগত লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছে। হয় ত ইহার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে, কিন্তু ইহাই ত সম্পূর্ণ সত্য নয়।

একদিক দিয়া বাঙ্গালীর শিক্ষার অভাব, আর এক দিক দিয়া তাহার স্বাস্থ্যের অভাব; একদিকে তাহার দৈহিক অবনতি, আর একদিকে তাহার মানসিক অপ্রবহমানতা। এবং ইহাদের সহিত সামাজিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক কারণ মিশাইয়া বাঙ্গালীর বিংশ শতাব্দীর জীবন-সমস্যা সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে।

একবার বাঙ্গালার জন্ম-মৃত্যুর হিসাবটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। ১৯০৫ সালে হাজার-করা জন্মের হার ৩৪ এবং মৃত্যুর হার প্রায় ৩০। ১৯০৬ সালে হাজার-করা জন্ম ৩৭ ও ৩৮এর মাঝামাঝি, মৃত্যু ৩৬। ১৯১৩ সালে হাজারে জন্ম ৩৪, মৃত্যু প্রায় ৩০। ১৯১৪ সালেও হাজার-করা জন্মের হার ৩৪, মৃত্যু প্রায় ৩২।

একবার বিলাতের দিকে চোখ ফিরানো যাক। ১৯১০ সালে England ও Walesএ হাজার-করা জন্ম ২৫ এবং মৃত্যু ১৩ ও ১৪র মাঝামাঝি। ১৯১৫ সালে হাজার-করা জন্ম ২৪এর কাছাকাছি এবং মৃত্যু ১৪। ১৯১৫ সালে হাজার-করা জন্ম ২৩এর কিছু উপর এবং মৃত্যু ১৬র কিছু নীচে।

বিলাতে জন্ম-মৃত্যুর raceএ জীবন মৃত্যুকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালায় জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে যেন fox-huntingএর খেলা চলিতেছে—মৃত্যু জীবনের টুঁটি চাপিয়া ধরিল বলিয়া।

উপরে ত পাওয়া গেল জন্ম-মৃত্যুর একটা মোটামুটি হিসাব। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে শিশু-মৃত্যুর কথা ভাবিলে শুধুই স্তম্ভিত হইয়া পড়িতে হয়। তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা ৩৩টি শিশু সূতিকাগৃহেই ইহলীলা সম্বরণ করে। যাহা কোন দেশেই সম্ভব নহে, বাঙ্গালায় তাহাই সম্ভবপর হইয়া উঠে। বিচিত্র-জাতীয় সম্ভাবনা লইয়া বাঙ্গালার শিশুর দল অকালে চলিয়া যায়,—আমরা কেবল চোখের জল ফেলি, এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি। তেত্রিশটি গিয়া যে সাতষট্টিটি বাঁচিয়া থাকে, তাহারাই কি মানুষের মত বাঁচিয়া থাকে? জীবিত ও মৃতের সংখ্যা দেওয়া গেল—জীবন্মৃতের সংখ্যা কে গণিয়া উঠিতে পারে? যাহারা মরণের হাত কোন মতে এড়াইয়া গেল, তাহারা পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া এবং সহরের ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার প্রজা-রূপে গণ্য হইয়া পড়িল।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভোগে ত যাহাদিগকে আমরা ভদ্রলোক বলি। বাঙ্গালার নিম্ন শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত এড়াইতে পারিলে কোন শ্রমসাধ্য কাজ করিতে চায় না;—'শিল-কাটাবে-গো,' 'পুরানো-লোহা-বিক্রী,' মুটে, মজুর, ফেরি-ওয়ালা,—কেউ বাঙ্গালী নয়। যুদ্ধের কাযে উড়িয়া, কাঠের কাযে চীনাম্যান, কলের কুলিগিরিতে পশ্চিমে মুসলমান। রাজের কায বাঙ্গালী মুসলমান করে বটে, বাঙ্গালী হিন্দু করে না। এই সকলের মধ্যে যে গোপন সত্যটুকু নিহিত আছে, তাহাতে শঙ্কিতই হইতে হয়। এই শ্রমবিমুখতা বাঙ্গালীর শারীরিক শক্তিহীনতার পরিচায়ক।

স্বাস্থ্যাভাব ও নির্জ্জীবতা বাঙ্গালীর চারিত্রিক জড়-ধর্ম্মিতার কারণও বটে, ফলও বটে। একদিক দিয়া অসুস্থ শরীর তাহাকে নিরুদ্যম, নিশ্চেষ্ট ও শিথিল করিয়া তুলিয়াছে;—অন্যদিকে উদাসীন স্থিতিপ্রবণতা স্বাস্থ্য ও উন্নতি লাভের চেষ্টা হইতে তাহাকে নিরস্ত রাখিয়াছে।

আমাদের সমস্ত সমস্যা একত্র ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। কেবলমাত্র বাহিরের কারণ আমাদের অসুস্থ ও প্রাণহীন করিয়া রাখে নাই। আভ্যন্তরিক কারণ খুঁজিতে হইলে সমাজের প্রতি চাহিতে হইবে। যতটা প্রাণশক্তি লইয়া জন্মানো দরকার, বাঙ্গালার শিশু তাহার অংশমাত্র লইয়া পৃথিবীতে আসে। সংসার-অনভিজ্ঞা বালিকা মাতার সন্তান সেই resisting power, সেই

প্রতিরোধিনী শক্তি পাইবে কোথায়,—যাহা লইয়া সে বাহিরের বাধা ও প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবে। শৈশবে প্রাণের যে মূলধন লইয়া বাঙ্গালী জীবনের কারবার আরম্ভ করে, বাহিরের বিঘ্ন বিপত্তি এড়াইয়া যৌবনে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাহা ফুরাইয়া যাইবার দিকেই ঝোঁক ধরে। অথচ তাহার স্থিতিশীল প্রকৃতি চিরাচরিত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে কিছুতেই দাঁড়াইবে না। যাহার ভাঙ্গিবার শক্তি নাই, সে গড়িতেও পারে না। ত্যাগ করিবার মত বুকের পাটা যাহার নাই, অর্জ্জন করিবার সামর্থ্য তাহার অল্প বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

ইহা ত গেল বাঙ্গালী জাতির ভিতরের অবস্থা। তাহার বাহিরের দুর্দ্দশা আরও ভয়ানক। অর্দ্ধাহার ও অনাহারকে সঙ্গী করিয়া সে বাঙ্গালার শস্যশ্যামল মরুপথ অতিবাহন করিয়া চলিয়াছে। এমনও হয়, যেখানে বনে ফুল আপনিই ফুটে, গাছে ফল আপনিই ধরে, ক্ষেত্রে তৃণ আপনিই গজাইয়া উঠে—সেখানেও নিত্য দুর্ভিক্ষ। বন্যা, জলপ্লাবন, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি বলিলেই কি ইহার সব কারণ বলা হইয়া গেল?

খাদ্যাভাবের সহিত স্বাস্থ্যাভাবের সম্পর্ক অতি নিকট। 'মোহমুদ্গর,' বা 'বৈরাগ্যশতক' যাহা বলে বলুক, আহার জিনিসটা মুনি ঋষিদের পক্ষেও প্রয়োজনীয় ছিল, এবং প্রাকৃত জনের পক্ষে আজও অপ্রয়োজনীয় হয় নাই। কয়লা না দিলে ইঞ্জিন চলে না,—এত অল্প খাইয়া এত বড় জাতটা এতদিন চলিল বলিয়া কি চিরদিন চলিবে? যে বাঙ্গালী পরকে ১,২৬,১৬,০০০ টাকার চাল যোগাইতে পারে, সে না খাইতে পাইয়া মরে কেন? যেখানে শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিজীবী, সেখানে অন্নাভাব ঘটে, অথচ, যেখানে শতকরা ২০ জনও চাষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, সেখানে কোন দিন অন্নের জন্য হাহাকার উঠে না। অর্থের উপর নহে—ইহার প্রতিকার নির্ভর করে আমাদের চেষ্টা, উদ্যম এবং আন্তরিক ইচ্ছার উপরে। ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া চাষ বাস করুক—প্রতিকারের উপায় ইহা নহে; যাহারা চাষ-বাস করে, তাহারা লেখা-পড়া শিখিয়া কৃষি সম্বন্ধীয় নূতন-নূতন তথ্যের জ্ঞান লাভ করুক—এ সমস্যার ইহাই সমাধান। কেবল নদীর উপরে নহে, দেবতার উপরে নহে,—কৃষককে আপনার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে শিখাইতে হইবে। পুষার একটিমাত্র কৃষি-কলেজে পোষাইবে না। লেখা-পড়া শিখাইয়া নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায়ের মনকে উন্নত কৃষি-পদ্ধতি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। Government যদি বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত করেন, সে ত আরো সুখের কথা।

স্বাস্থ্যাভাবের বাহিরের কারণ কতকটা খাদ্যাভাব এবং কতকটা আমাদের খাদ্য-সংগ্রহে অসামর্থ্য। এই অর্থ-নৈতিক সমস্যার বিচার পরে করা হইবে।

তার পর রোগ। রোগ ত স্বাস্থ্যের শত্রু বটেই। কিন্তু যে রোগ আমাদের দেশ ভোগ-দখল করিবার কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, শুধু রোগ বলিলে তাহার অপমান করা হয়। ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার বুকের উপর অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া দুঃস্বপ্নের মত বিরাজ করিতেছে। বাঙ্গালীও নড়ে না, বাঙ্গালার রোগও নড়ে না,—উভয়েই রক্ষণশীল; বোধ হয় বাঙ্গালার মাটির গুণে।

জাতীয় স্বাস্থ্যোৎকর্ষের এক প্রধান উপায় পল্লীর উন্নতি। পুকুরে পাক, বাড়ীর পাশে ডোবা, গাঁয়ের মাঝে জঙ্গল, খালে পাট-পচা, জল-নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত নাই, চলিবার ভাল পথ নাই, নিশ্বাস লইবার ভাল বাতাস নাই—এই ত বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম। ইহাতে যদি ম্যালেরিয়া মৌরুসি পাট্টা লইয়া বসে, সে কি ম্যালেরিয়ার দোষ?

গ্রামে গিয়া দেখা যাক—যায়গা পড়িয়া আছে অল্প নহে, অথচ ভূমি অসূর্য্যম্পশ্যা। আওতায় বাড়িতেছে আগাছা, এবং জন্মিতেছে বিবিধ প্রকারের কীট-পতঙ্গ। গলিত পত্রের গন্ধে বাতাস গুরুভার। আবর্জ্জনা ও অন্ধকার বাঁশঝাড়ের তলায় বাসা বাঁধিয়াছে। সবুজ পানার আচ্ছাদনের নীচে পুকুরের জল লুকাইয়া আছে। তারপর জলে স্থলে মশক-চমূ "কর্ণে কলং কিমপি রৌতি বিচিত্রং।" ইহার প্রতিবিধানের বরাত কি গভর্ণমেণ্ট এবং অদৃষ্টের উপর দিয়া বসিয়া থাকিব?

অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, স্বস্তির অভাব—অভাবের ত আর শেষ নাই; ইহার উপর যদি অভাব দূর করিবার প্রবৃত্তির অভাব দেখা যায়, তা হইলে যে সে অভাব মিটাইবার কোনও উপায়ই আর মেলে না! বাড়ীর সংলগ্ন জমীটুকু পর্য্যন্ত পরিষ্কার রাখিবার আগ্রহ

নাই যেখানে, পানীয় জলটুকু পর্য্যন্ত নির্ম্মল রাখিবার প্রয়োজন-বোধ নাই যেথায়,—সেখানে যদি দাবা, পাশা ও তাস খেলার সহিত প্রাভাতিক কম্পজ্বরে লেপমুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকাটা নিত্য-কর্ম্ম বলিয়াই গণ্য হয়, ত তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার বেশী কিছু থাকে না বটে, কিন্তু দুঃখ ও নৈরাশ্যের কারণ থাকে অনেক। যে অসীম ঔদাসীন্য বাঙ্গালার পল্লী ও প্রান্তরের উপর এক বিরাট কালো ছায়ার মত নিবিড় হইয়া জুড়িয়া বসিয়া আছে, তাহাকে অপসারণ করিবার কাযই বর্ত্তমানের প্রথম এবং ভবিষ্যতের প্রধান কায।

হয় ত ধীরে-ধীরে সবই সারিয়া যাইতে পারিত, যদি না কি দেশের মধ্যে থাকিত প্রচুর অর্থ এবং প্রবল ইচ্ছা। ইচ্ছা অন্তরের জিনিস এবং অর্থ বাহিরের জিনিস। অথচ এই দুইটি বিষম-প্রকৃতির শক্তি একত্র মিলিয়া ভাঙ্গিতেও পারে অনেক কীর্ত্তি এবং গড়িতেও পারে অনেক বিস্ময়।

মাঝে-মাঝে এমন এক-একটা যুগ আসে, যখন, পক্ষী-শাবক যেমন ডিম্বের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া মুক্ত আকাশে বহির্গত হয়, তেমনি করিয়া জাতীয় ইচ্ছাশক্তি সমস্ত জড়তা এবং সমস্ত স্থানুত্বকে চূর্ণ করিয়া বিরাট-কলেবর ঐক্যতানের মত আত্ম-প্রকাশ করে। য়ুরোপে এমনি কাণ্ড ঘটিয়াছিল দুইবার—একবার Renaissanceএর যুগে এবং আর একবার French Revolutionএর সময়। এই সেদিন মাত্র জাপানও প্রবুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির বলে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিল।

জাতীয় ইচ্ছাশক্তির জাগরণ একটা আকস্মিক ঘটনা নহে। বহুদিন ধরিয়া ইহার জন্য জাতিকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়। যুগযুগান্তর ধরিয়া জাতির অন্তরে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবে বিচিত্র আকাঙ্ক্ষারাশি সঞ্চিত হইতে থাকে। তারপর একদিন অনুকূল অবস্থার সাহচর্য্যে সংহত হইয়া সেই আকাঙ্ক্ষারাশি এক বিরাট শক্তির আকারে অভিব্যক্ত হইয়া জাতীয় জীবনকে নূতন গতি প্রদান করে।

অন্য সমস্ত দেশ যদি সন্ন্যাসী হইত, আমরাও না হয় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বলিতে পারিতাম—অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং। কিন্তু যখন সাগর-পারের অন্য সব দেশ পণ্যের পরিবর্ত্তে রীতিমত জাহাজ-বোঝাই সোণা-দানা লইয়া ঘরে ফেরে, তখন হাজার-বার অর্থকে অনর্থ মনে করিলেও, মন কেবলই গাহিতে থাকে, "আহা, ঐ দেড়শো কোটি টাকা যদি দেশেই থাকিয়া যাইত!" যখন বার টাকা মণ চাল দেখিয়া বায়ু ভোজী এবং ছ'টাকা জোড়া কাপড় দেখিয়া দিগম্বর হইবার লোভ হয়, তখন অর্থ অনর্থের কারণ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু নিত্য ভাবনার বিষয় হইয়া উঠে—শূন্য সিন্দুকে কেমন করিয়া কিঞ্চিৎ অনর্থ-মূল সঞ্চিত হইয়া উঠে। অতএব যতদিন পর্য্যন্ত না এ বিচিত্র সংসারের সমস্ত লোক মায়াবাদী হইয়া উঠে, ততদিন পর্য্যন্ত অর্থকে অবহেলা করিলে কোনমতে চলিবে না—এমন কি চৈতন্যের দেশ বঙ্গেও না।

সুতরাং একদিক দিয়া যেমন প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া জাতীয় চরিত্রকে সুন্দর এবং সবল করিয়া তুলিতে হইবে, অন্য দিক দিয়া তেমনি বিপুল উদ্যমে বিদেশের অর্থ দেশে আনিয়া, এবং দেশের অর্থ দেশে সঞ্চিত রাখিয়া জাতিকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। ধনবলের সহিত মনোবল যে বাড়িয়া যাইবে, ইতিহাস ইহার বিপরীত কথা বলে না। চিরন্তন দারিদ্র্য বাঙ্গালার প্রতিভাকে চাপিয়া রাখিয়াছে, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যকে জীর্ণ করিয়াছে, এবং বাঙ্গালার সম্মান-জ্ঞানকে খর্ব্ব করিয়াছে। এই দারিদ্র্য দূর করিতে পারিলে, বাঙ্গালী আপনাকে ফিরাইয়া পাইবে।

বাণিজ্য দূরে থাক, ব্যবসায় পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। লক্ষ্মীকে তুলিয়া দিয়াছি আমরা প্রতীচ্যের হাতে। আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উপছাইয়া যে বিপুল অর্থ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে—ব্যবসায়ী মাড়োয়াড়ী এবং দিল্লীওয়ালা তাহা মহাহর্ষে কুড়াইয়া লোহার সিন্দুকে জড় করিতেছে; এবং অসীম বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বাঙ্গালী কেবল চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতেছে।

অন্নপূর্ণার অন্নসত্রের দ্বার বিশ্বজনের কাছে অবারিত। যে দীন সেই অন্নরাশির প্রতি লুব্ধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু কাছে আসিবার সাহসও করে না, উদ্যোগও করে না, দরিদ্র বলিয়াই সে কৃপার পাত্র নহে—সে কৃপার পাত্র ভীরু বলিয়া। অর্থের স্বচ্ছলতা চাই, তবেই স্বাচ্ছন্দ্য আসিবে। সেই পরিশ্রম চাই, যাহা বিশ্রামের অবসর আনিয়া দিবে।

আমাদের শুভ, আমাদের সমৃদ্ধি—চাকরী ও দাসত্বের মধ্য দিয়া নহে—ব্যবসায়ের মধ্য দিয়া।

শুধু ব্যবসায়ী হইলেই চলিবে না। কারখানা খুলিতে হইবে, জিনিস তৈয়ারি করিতে হইবে—manufacture করিতে হইবে। এক সময়ে যাহা স্বপ্নের মত কল্পনার কথা বলিয়া মনে হইত, তাহাও ত কর্ম্মের মধ্য দিয়া সার্থক হইতে চলিল। Tata Iron and Steel Works—ইস্পাতের খানিকটা অভাব ত মিটাইতে পারিয়াছে। Bengal Chemical and Pharmaceutical Works কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য ত সরবরাহ করিতে পারিতেছে। সাবানের কলও খোলা হইয়াছে। পাটের কল এবং কাগজের কলও আছে—কিন্তু সাহেবদের হাতে।

অতএব এখন অকূলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে না। কিন্তু তা বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে, কিছু অর্থ ও আমাদের অশিক্ষিত-পটুত্ব লইয়া একদা প্রভাতে আমরা বড়-বড় ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য হইয়া পড়িব। একে-একে এবং ধীরে-ধীরে সমস্তই শিখিতে হইবে। ব্যবসায়ের খুঁটি-নাটি এবং মার-প্যাঁচ আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে। শরীরকে কষ্টসহ এবং চিত্তকে ভয়হীন করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে দুঃসাহসিক আর একদিকে স্থির-প্রকৃতি হইতে হইবে।

দেশ কৃষি-প্রধান। কাজেই raw materialsএর রপ্তানি বন্ধ করিবার উপায়ও নাই এবং তাহা আমাদের পক্ষে শ্রেয়ও নহে। কিন্তু যখন কাঁচা মাল পাকা হইয়া এদেশেই ফিরিয়া আসে, এবং আমরা তুলার বদলে কাপড় ও চামড়ার বদলে জুতা পাই, তখন তাহা নাকুর বদলে নরুন পাওয়ার মতই আমাদের সান্ত্বনা প্রদান করে। সে দিকেও দৃষ্টি পড়িয়াছে—tannery ও cotton mill বাঙ্গালার নিকট আর তত অপরিচিত নহে। দেশলাই এবং পেনসিলের কারখানা মাঝে-মাঝে খোলা হইয়াছে। ভাল কাঠের অভাবে সে সকল সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে পারে নাই। একদিন হইবে এবং সেদিন অধিক দূরও নহে; কেন না বৃক্ষের ঐশ্বর্য্যে যে দেশ চির-মহিমময়, সেই ভারতবর্ষে উপযুক্ত কাঠ খুঁজিয়া না পাওয়াটা বিশেষ চেষ্টার অভাবেরই দ্যোতনা করে—কাষ্ঠের অভাবের নহে।

ইচ্ছা, উদ্যম এবং চেষ্টার প্রয়োজন। মূলধনের অভাব না হইতেও পারে। নানা রূপ বাধা ও বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। ভয় পাইলে চলিবে না। পেন্‌সিলের কাঠ প্রথম-প্রথম না মেলে ত South Africa হইতে কাঠ আমদানী করিয়া চালাইয়া লওয়া যাইতে পারে। একজন বিশেষজ্ঞের নিকট শুনিয়াছিলাম, পাকাটি হইতে কাগজের উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। শুনিতেছি, দিয়াশলায়ের জন্য খ্যাংরা-কাটি ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না।

সে-দিন বিজ্ঞাপন দেখিলাম, কোন এক American Company যে-কোন রকমের কাঁচা মাল গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। ভয় ত ঐখানেই। আজ এই ভাঙ্গা-গড়ার দিনে বাঙ্গালী যদি কিছু গড়িয়া তুলিতে পারে, জগতের জাতি-সভায় প্রবেশ-পত্র তবেই সে পাইয়া গেল। কিন্তু গড়নের বরাত যদি পরের উপর দিয়া এখন সে আফিসের লেজর বুকে আঁচড় পাড়ে এবং বাড়ীতে আসিয়া ঝিমায়, তাহা হইলে আরও অন্ততঃ শত বৎসর ধরিয়া তাহার মাথা তুলিবার শক্তি থাকিবে না। আজিকার ভুলে যদি অনুকূল তিথি বহিয়া যায়, তৃষাকুল প্রাণ তাহা হইলে চিরকাল জ্বলিতে থাকিবে।

অর্থের অভাব হয় না—হইলে কি শরতের শ্যামা পোকার মত এত Limited Company চতুর্দ্দিক হইতে আবির্ভূত হইতে পারিত? ইহা শুভ লক্ষণ নহে, এমন কথা বলা কাহারও পক্ষে সাজে না। যাহা দুদিনের, তাহা দুদিনেই আপনার কায করিয়া যাইবে; কিন্তু যাহার মধ্যে সত্য আছে, প্রাণ আছে, তাহা দেশের স্থায়ী মঙ্গলের নিদর্শন স্বরূপ হইয়া বিরাজ করিবে।

যৌথ কারবারের অন্যান্য গুণের মধ্যে একটা বড় গুণ এই যে, যাহা কেবল বড়-মানুষের পক্ষে সাধ্য ছিল, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা আর অসাধ্য থাকিয়া যায় না। এবং যুক্ত মূলধনের বলে ছোট কারবারকে বড় করিয়া তোলাও কঠিন হইয়া উঠে না।

আজ এই নব-নব শ্রম-শিল্পের প্রবর্ত্তনা এবং কারখানা প্রতিষ্ঠার দিনে, প্রতীচ্য ধন ও শ্রম-সমস্যার কথাটাও একবার ভাবিয়া লইতে হয়। ইহার দুই মীমাংসা পাওয়া যায়;—প্রথমতঃ, বড় ব্যবসায়ের পক্ষে সমবায়, দ্বিতীয়তঃ ছোট-ছোট ব্যবসায়ের পক্ষে উটজ শিল্পে উৎসাহ।

সংবাদপত্র পাঠকের নিকট আজকালকার nationalization জিনিসটা অপরিচিত নহে। একটা দেশের পক্ষে যাহা nationalization বা socialization, একটা পল্লী বা একটা সঙ্ঘের নিকট তাহা সমবায়। ইহাতে লাভ এই যে, জিনিস যাহারা তৈয়ারী করে এবং জিনিস যাহারা ব্যবহার করে,—উভয়ের মধ্যে তাহাদের ব্যবধান আর থাকে না, যাহারা শুধু লাভ করে। মাঝখান হইতে middle man বাদ সরিয়া যায়, সেটা দরিদ্রের পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের কারণ নহে।

অন্য দিকে উটজ শিল্পের উন্নতিতে দেশময় দেশের অর্থ ছড়াইয়া পড়ে—ধন কেবল ধনীর গৃহেই সংহত হইয়া স্তূপীকৃত হইয়া উঠে না। উৎসাহের অভাবে এবং অবহেলায় বাঙ্গালা দেশ হইতে অনেক উটজ শিল্পের উচ্ছেদ হইয়াছে। আজ যখন জীবন-সমস্যা বলিতে জীবিকা-সমস্যার কথাই ভাবিতে হয়, তখন উটজ শিল্পের উন্নতি চেষ্টা সম্বন্ধে কোন প্রকার অন্যথা বিলম্বই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

আমাদের সমস্ত সমস্যা এমনিই অঙ্গাঙ্গি ভাবে বিজড়িত হইয়া আছে যে, একসঙ্গে সবগুলির মীমাংসা করিয়া উঠিতে না পারিলে, বিচ্ছিন্ন ভাবে কোনটারই সমাধান মিলিবে না। স্বাস্থ্য, অর্থ, শিল্প, শিক্ষা, সামাজিক আচার এবং রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতির মধ্যে এমন একটা বিচ্ছেদহীন যোগ রহিয়াছে যে, একটার কথা বলিতে গেলে আর একটা আসিয়া পড়িবেই। অতএব আর্থিক এবং শারীরিক দুর্দ্দশার কথা বলিতে গেলে, যাহা আমাদিগকে প্রাণহীন এবং উদাসীন করিয়া রাখিয়াছে, সেই সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক কারণগুলির কথা যদি কোথাও উল্লিখিত হইয়া থাকে, ইহলোকের শ্রেয়ের কথা বিবেচনা করিয়া, আশা করি সুধীগণ তাহা ক্ষমা করিতেও পারেন।

জাতীয় জীবনে চরিতার্থতা লাভ করিতে হইলে কেবল তুরীয় ভাবে মগ্ন থাকিলেও চলে না, এবং পার্থিবতার পায়ে সমস্তই সঁপিয়া দিলে এক বিরাট অস্বাভাবিকতাকেই বরণ করিয়া লওয়া হয়।

Give us this day our daily bread, ইহা সামান্য প্রার্থনা নহে। এই প্রার্থনার কাতর আর্ত্তনাদে বাঙ্গালার আকাশ যখন মুখরিত, তখন বুঝিতে হইবে জাতীয় জীবনে অভাব বুঝি চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিল। অভিযোগ যদি করিতে হয় ত সে আমাদের চেষ্টাহীন, চিন্তাহীন, তেজোহীন, বলহীন হৃদয়ের উপর। আপনার দোষে যখন দেশের বুকে অভাবের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া কপালে হাত দিয়া বসিয়া আছি, তখন শুধু বলিতে পারি, "আমি স্ব-খাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"—তখন পরের উপর অভিযোগ করিতে পারি না, —অভিমান হয় ত কিছু করিতে পারি। জাতীয় জীবনকে সার্থক করিতে হইলে ব্যক্তির জীবনকে সুস্থ, সবল এবং নিশ্চিন্ত করিয়া তুলিতে হইবে - ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ নাই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ভারতী-বন্দনা

[শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

রক্ত-চরণতল চুম্বিত শতদল মত্ত মধুপকুল গুঞ্জে,
বিশ্ববিজয়ী নব আসন ঝলমল কাঞ্চন-মরকত-পুঞ্জে।
জনমন-নন্দিত পিককুলকাকলী গুঞ্জন-রত অলি পাশে,
রঞ্জিত ফুলদল-পরিমলঅঞ্জলি অর্পণ রত মধুবাসে।
যুগযুগবন্দন-নন্দিতজনগণ আকুল অঞ্জলি হস্তে,
দেবী সরস্বতী বাঙ্ময়ী ভারতী নমঃ নমঃ মাতঃ নমস্তে।

বৈষ্ণবকবিকুলকান্তকান্তপদাবলী ঝরি' পড়ে নিরঝর-ছন্দে,
দেবমনুজকুল রঞ্জিত করি দিল আসন চন্দন-গন্ধে।
পুণ্যপুরাঙ্গনা-মধুকরচর্চ্চিতা অম্বরে নবযুগভাতি,
নবনবরাগিণীমূর্চ্ছনার বিস্তরশব্দবিপুল চিরসাথী।
যুগযুগবন্দন নন্দিতজনগণ আকুল অঞ্জলি হস্তে,
দেবী সরস্বতী বাঙ্ময়ী ভারতী নমঃ নমঃ মাতঃ নমস্তে।

মন্দিরবংশী তব কুঞ্জে নিনাদিত পুলকিত শত পথযাত্রী,
ত্রিংশকোটী নর সম্ভ্রমনতশির লুণ্ঠিত পদে দিবারাত্রি।
ভাবগঙ্গা হৃদি ছন্দকোলাহল উত্তালকলকলভাষে,
বিজ্ঞানরবিঘনতামস অপসরি' অভিনব কিরণ বিকাশে।
যুগযুগবন্দন-নন্দিতজনগণ আকুল অঞ্জলি হস্তে,
দেবী সরস্বতী বাঙ্ময়ী ভারতী নমঃ নমঃ মাতঃ নমস্তে।

নিযুতরাজধনরত্নমুকুটমণি সর্ব্বলোকবুধনম্যা,
জ্ঞানতীর্থশতমন্দিরতল তব ভক্তহৃদয় অভিগম্যা।
নিখিলবন্দ্যকবিরবিকরসজ্জিত রাজরাজেশ্বরী সাজে,
শান্তি আনন্দেরি মঙ্গলমন্ত্র গো বিশ্ব মুখর করি বাজে।
যুগযুগবন্দন-নন্দিতজনগণ আকুল অঞ্জলি হস্তে,
দেবী সরস্বতী বাঙ্ময়ী ভারতী নমঃ নমঃ মাতঃ নমস্তে।

পুস্তক-পরিচয়

শুভেন্দুর কলঙ্ক

শ্রীমুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত, মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত, একথা যিনি তাঁহার 'নবীনের সংসার' 'জলপ্লাবন' 'দেশের বড়দা' প্রভৃতি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। এই 'শুভেন্দুর কলঙ্ক' পুস্তকখানিতেও সেই সিদ্ধহস্তের পরিচয় আছে। এই পুস্তকে তিনটী গল্প আছে—শুভেন্দুর কলঙ্ক, ব্যর্থপ্রেম ও হারাধন; প্রথম গল্পের নামেই পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। তিনটী গল্পই সুন্দর হইয়াছে; যেমন লিখন ভঙ্গী, তেমনই রচনা চাতুর্য্য। শুভেন্দুর কলঙ্কে শশধর ও রামকমলের চরিত্র অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। গল্পটী পড়িয়াই বুঝিতে পারা যায়, লেখক মহাশয় পল্লীজীবনের সুখ দুঃখের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত। বইখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট।

অমিয়-উৎস

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য আট আনা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার চতুশ্চত্বারিংশ গ্রন্থ যোগেন্দ্রবাবুর এই অমিয়-উৎস। যোগেন্দ্রবাবু অনেক দিন পরে আবার উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বহু দিন পূর্ব্বে তাঁহার 'জামাই বাঙ্গাল' 'আগন্তুক' প্রভৃতি পাঠ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক সমাজ একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই 'অমিয়-উৎস' তাঁহার সে যশঃ অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। তাঁহার মিঃ রে, অর্থাৎ হরনাথ রায়, বাঙ্গালী সিবিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের কার্য্যকলাপ বিলাতী আলোক-প্রাপ্ত মহাত্মগণের অনুকরণীয়। সুলেখক যোগেন্দ্র-বাবু যে উদ্দেশ্যে মিঃ রে মহাশয়ের স্থায় চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সফল হইলে সকলেই আনন্দিত হইবেন। তাঁহার স্থায় পাকা লেখকের রচনাকৌশলের প্রশংসা করাই বাহুল্য। আমরা এই পুস্তক-খানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি।

ভবানী

৺নিত্যকৃষ্ণ বসু প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ত্রিচত্বারিংশ গ্রন্থ। ইহাতে ভবানী, উন্মাদিনী ও অভিভাবক এই তিনটী গল্প আছে। যাঁহারা বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যের সহিত পরিচিত, তাঁহারা পরলোকগত কবিবর নিত্যকৃষ্ণ বসুর নাম এখনও বিস্মৃত হন নাই; তাঁহার কবিতার ঝঙ্কার এখনও আমাদের কাণে লাগিয়া আছে। স্বর্গীয় নিত্যকৃষ্ণ বাবু কবিতাই বেশী লিখিতেন। উপরিলিখিত তিনটী ব্যতীত তিনি আর গল্প লেখেন নাই, কিন্তু এই তিনটী গল্প যখন 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন আমরা মুক্তকণ্ঠে তাহাদের প্রশংসা করিয়াছিলাম। অকালে পরলোকগত না হইলে নিত্যবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে কত অমূল্য রত্ন দান করিতে পারিতেন, এই তিনটী গল্পই তাহার সাক্ষী। নিত্যবাবুর এই গল্প তিনটী একত্র করিয়া সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হওয়ায়, আমরা আনন্দিত হইয়াছি এবং পাঠকগণও এই 'ভবানী' পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিবেন।

পরিণাম

শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অষ্টত্রিংশ গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুকে আমরা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্বিক বলিয়াই জানিতাম; এখন দেখিতেছি, গল্প-রচনায়ও তাঁহার কৃতিত্ব কম নহে। তিনি যে বেশ মিঠে হাতে লেখেন, তাঁহার দৃষ্টি যে সামান্য খুঁটিনাটিও এড়ায় না, এই পরিণাম পুস্তকখানি পাঠ করিলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার ভাষাও বেশ সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী। রামপ্রসন্নের চরিত্র-চিত্রণে গ্রন্থকার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বাঙ্গালার ঔপন্যাসিক দলে তাঁহাকে দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি।

অপরিচিতা

শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত, মূল্য আট আনা।

আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার পঞ্চচত্বারিংশ গ্রন্থ। ইহাতে অপরিচিতা, স্নেহময়ী, শেষ পত্র, রাজার ডাকে, দুফোঁটা জল, অপ্রকাশ, অরন্ধনের দিনে ও অদ্ভুত ডাক্তারী, এই আটটী ছোট গল্প আছে। গল্পগুলি ছোটও বটে, গল্পও বটে। বেশ সাজাইয়া-গুছাইয়া এই গল্প কয়টী লিখিত হইয়াছে। সব কয়টীই বেশ, তবুও তাহার মধ্যে রাজার ডাকে ও অরন্ধনের দিনে আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে। শ্রীমান্ পান্নালাল এই কয়েকটী ছোট গল্পে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে আশা হয় ভবিষ্যতে তিনি এই ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। আমরা গল্প কয়টী পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি।

দ্বিতীয় পক্ষ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত, মূল্য আট আনা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত গ্রন্থমালার সপ্তচত্বারিংশ গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত নরেশবাবুর পরিচয় দিতে হইবে না, তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলি মাসিক পত্রের পাঠকমাত্রেই পাঠ করিয়াছেন। 'দ্বিতীয় পক্ষ'ই বোধ হয় তাঁহার প্রথম গল্প-রচনা। এই দ্বিতীয় পক্ষ আমাদের 'ভারতবর্ষে'ই প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু তখন নরেশ বাবু কিছুতেই তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে দেন নাই। সে সময় সকলেই গল্পটীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখন লেখকের নাম সম্বলিত 'দ্বিতীয় পক্ষ' গল্প পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইলাম; এবং যাঁহারা পূর্ব্বে এ গল্পটী পড়েন নাই, তাঁহারা এখন পড়িলে যে বিশেষ প্রীতি লাভ করিবেন, এ কথা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। এই 'দ্বিতীয় পক্ষে'র সহিত 'ঠানদিদি' ও 'ঝি'কে দিয়া তিনি গৃহস্থালী সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

মরুর কুসুম

শ্রীযুক্ত শাহাদাৎ হোসেন প্রণীত, মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

আমরা বড়ই আনন্দের সহিত এই উপন্যাসখানির পরিচয় দিতেছি। লেখক মহাশয় মুসলমান; তিনি অতি সুন্দর, সুললিত ভাষায় উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন, এই জন্যই আমাদের এত আনন্দ। তাহার পর, ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা বড়ই কঠিন ব্যাপার; বিশেষতঃ 'মরুর কুসুম' বলিয়া যে মহিলার কথা বলিতেছেন, সেই আনার কলির জীবন-কথা বড়ই বিচিত্র। লেখক মহাশয় যথাসম্ভব ঐতিহাসিকতা রক্ষা করিয়াই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি। সোফিয়ার চরিত্র-চিত্রণেও তিনি সফলকাম হইয়াছেন। আমরা এই সুলেখককে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এই 'প্রত্যাবর্ত্তন' উপন্যাসখানি আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ষট্‌চত্বারিংশ গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ। 'প্রত্যাবর্ত্তন' হেমেন্দ্রবাবুর ওস্তাদি হাতের লেখা, কোনখানে একটু খুঁত বা একটু ত্রুটী নাই। তিনি বিধাত্রী-দেবীকে আদর্শ মহিলারূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। এমন উচ্চ আদর্শ সম্মুখে থাকিলে সংসারে কেহই পথভ্রষ্ট হইতে পারে না, হেমেন্দ্রবাবু এই উপন্যাসের প্রত্যেক ঘটনায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুশীলকেও তিনি অতি উচ্চ আদর্শে গঠিত করিয়াছেন। যে পরিবারে বিধাত্রীদেবীর ন্যায় দেবী বর্ত্তমান, সে পরিবার জয়যুক্তই হইয়া থাকে, সে পরিবারে মেঘের সঞ্চার হইলেও তাহা অনতিবিলম্বে কাটিয়া যায়, এই গ্রন্থে তাহা বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি যে যথেষ্ট জনাদর লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গোপীচন্দ্র

শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত, মূল্য একটাকা চারি আনা। ময়নামতির গান একসময়ে বাঙ্গালা দেশ প্লাবিত করিয়াছিল। রাজা মাণিকচন্দ্র ও রাণী ময়নামতির পুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের বর্ণনা শুনিয়া সেকালের লোক অশ্রু-বর্ষণ করিতেন। তাহার পর কেমন করিয়া যেন ঐ সব ডুবিয়া গিয়াছিল। এখন আবার সুবাতাস বহিয়াছে; আমাদের সাহিত্যরথীবৃন্দের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইয়াছে। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়দ্বয় ময়নামতির গানের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। আবার শ্রীযুক্ত শিবরতন বাবু এই পুস্তকে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের বিবরণ অতি সরল ভাষায় বিবৃত করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইলেন। গোপীচন্দ্রের জীবন কথা আগাগোড়া অলৌকিক, অতি-প্রাকৃত ঘটনাপূর্ণ; তাহা হইলেও বিশেষ মনোজ্ঞ। শিবরতন বাবু সমস্ত বিবরণ গদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অকৃত্রিম সাহিত্য-সেবকের এই চেষ্টা যে সুফল প্রসব করিবে, তাহা আমরা বলিতে পারি। অতঃপর তিনি লাউসেনের বিবরণ লিখিবেন বলিয়াছেন; আমরা সেই গ্রন্থ দেখিবার জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি।

গৃহ-শিক্ষা

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত প্রণীত। মূল্য ১৷০।

কথোপকথনচ্ছলে, সহজ ভাষায়, স্বাস্থ্য, নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় পরম উপাদেয় গ্রন্থ। এই পুস্তকখানিতে চিত্র আছে এবং গ্রন্থকারের অসাধারণ চিত্তাকর্ষক লিখনভঙ্গীও আছে। গৃহপঞ্জিকার ন্যায় ঘরে ঘরে এই পুস্তকখানি অধীত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের মধ্যে ইহা পরম আদরণীয় হইবার উপযুক্ত।

ইলেক্‌ট্রো-আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসা সার

কবিরাজ শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত, মূল্য বার আনা।

গণেশবাবু ইলেকট্রো-আয়ুর্ব্বেদ নামক ঔষধাবলীর আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং ইলেকট্রো আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে তিনি ঐ সকল ঔষধের গুণ, প্রয়োগ-বিধি, এবং চিকিৎসা-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গণেশ-বাবু বলিতেছেন, সেকালের পল্লী-বৃদ্ধারা যে সকল গৃহ-প্রাঙ্গণস্থিত সহজ-প্রাপ্য এবং পরীক্ষিত-গুণ গাছ-গাছড়ার সাহায্যে নানাবিধ জটিল রোগ আরোগ্য করিতেন, তিনিও সেই সকল গাছ-গাছড়া অবলম্বন করিয়া ঐ সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। ঔষধগুলি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ন্যায় তরল, এবং জলের সহিত মিশাইয়া সেব্য। যাঁহাদের এই চিকিৎসা-প্রণালীতে বিশ্বাস আছে, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি হইতে অনেক উপদেশ পাইতে পারিবেন।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, মূল্য আট আনা।

ইংরেজ আমাদের রাজা, আমরা তাঁহাদের প্রজা। এ অবস্থায় তাঁহাদের রাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা দরকার। কিন্তু এতদিন কেহ আমাদের সে জ্ঞানলাভে সাহায্য করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় কোন পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন নাই; বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাসই নাই বলিলে হয়, রাষ্ট্র-নীতি ত দূরের কথা। তাই আমরা রায় ভ্রাতৃযুগলের লিখিত এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। ছোট হইলেও ইহাতে ব্রিটিশ রাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে মোটা-মুটি সমস্ত কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বইখানি আমাদের পড়া উচিত, ছেলেদের পড়া উচিত। 'হিতবাদী'র কর্ত্তৃপক্ষ এখানিকে তাঁহাদের উপহার তালিকায় স্থান দিয়া ভাল কাজ করিয়াছেন; ইহাতে এই রাষ্ট্র-নীতি প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিবে।

জলের আল্পনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত, দাম দেড় টাকা।

এই 'জলের আল্পনা' যখন মাসিক পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে, তখনই আমরা পড়িয়াছিলাম; এখন ইহা ভাল কাগজে উৎকৃষ্ট প্রচ্ছদপটে সজ্জিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আমরা হেমেন্দ্রবাবুর রচনা-ভঙ্গী, ভাব-বিশ্লেষণ ও বর্ণনা-কৌশলের পক্ষপাতী; তাঁহার পূর্ব্ব-প্রকাশিত অনেক পুস্তকের পরিচয় উপলক্ষে আমরা এ কথা বলিয়াছি। বর্ত্তমান উপন্যাসে তাঁহার সে যশঃ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তিনি যে কয়েকটি চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার সবগুলিই সুন্দর হইয়াছে, কোথাও অতিরঞ্জনের চিহ্নমাত্রও নাই। ভজহরি চরিত্রের মাধুর্য্যে আমরা সত্য সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি। এই পুস্তকখানি যে যথেষ্ট আদর লাভ করিবে, এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

ভারত-বিহিত উপদেশমালা

শ্রীপশুপতি ঘোষ প্রণীত, মূল্য দুই টাকা।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়-অনূদিত অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত হইতে ৭০২টী উপদেশ রত্ন সংগৃহীত হইয়া এই মালা গ্রথিত হইয়াছে। এক কথায়, গ্রন্থখানি বাঙ্গালা মহাভারতের সার সঙ্কলন। মহা-ভারতের উপাখ্যান ভাগ বাদ দিয়া কেবল উপদেশগুলি সংগৃহীত হওয়ায় গ্রন্থখানি যদিও নিতান্ত রসসম্পর্কবিহীন, কঠোর হইয়াছে, তথাপি, যাঁহারা কেবল মহাভারতের উপদেশগুলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, সেই সকল পাঠক এই গ্রন্থ হইতে প্রভূত উপকার পাইবেন, মনে হয়। সমগ্র মহাভারত পড়িয়া তাহা হইতে কেবল উপদেশগুলি বাছিয়া লইতে তাঁহাদিগকে যে আয়াস স্বীকার করিতে হইত, সে পরিশ্রম হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইবেন। তবে যাঁহারা উপদেশের সহিত ইতিহাস ও উপাখ্যান পাঠের আনন্দ লাভ করিতে চাহিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য এই গ্রন্থখানি তেমন প্রীতিকর হইবে না।

চাকুরী

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল]

(১)

বেলা দশটা হইতে খাটিতে-খাটিতে এই সাতটায় অবশেষে ছুটি হইল। মার্চ্চেন্ট আপিসে কাজ করি, চা'য়ের রপ্তানী বাড়াতে আমাদের পরিশ্রমের পরিমাণও বাড়িয়াছে, কিন্তু আয়ের পরিমাণ বাড়িবার কোনও লক্ষণ নাই।

রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম, গ্যাস জ্বলিয়াছে। আপিসের বাবুর দল বেশী ভাগই ইহার পূর্ব্বেই ছুটি পাইয়াছেন, আমাদের মত মার্চ্চেন্ট-আপিসের দুর্ভাগার দল অপেক্ষাকৃত কম। ছাতার প্রয়োজনের সময় অতিবাহিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে বগলে করিয়া শ্রান্ত দেহটাকে কোনও রকমে টানিয়া লইয়া চলিলাম।

দেহ যতদূর শ্রান্ত, মন তাহা অপেক্ষাও বেশী, কারণ এই দীর্ঘ দিবসের ক্লান্তি অপনোদন করিতে হইবে একটা বারান্দা-ঝুলিয়া-পড়া আধভাঙ্গা আপিসারের মেসে। পঞ্চাশটা টাকা মাহিয়ানা, বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, বৃদ্ধা মাতা এবং ছুটি ভাই, সুতরাং এই হতভাগা মেসে ছাড়া আর উপায় কি?

রাস্তায় আলোর মেলা, দোকানে আলো, চারিদিকে আলোয়-আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। আমার মনে পড়িতে লাগিল আমাদের মেসের সরকারী ল্যাম্পটি, যাঁহা আলোর চেয়ে ঢের বেশী আঁধার বিকীরণ করে।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া হাতড়াইতে-হাতড়াইতে উঠিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিলাম। তাহার পর কোনও রকম করিয়া আপিসের পোষাকী বস্ত্র ত্যাগ করিয়া সকল শ্রান্তি-হরা শয্যা আশ্রয় করিলাম। আপিসের বাবুদের এ শয্যা সনাতন; এ ওঠে না, একে পাড়িতে হয় না, এ চিরদিন আপিসের বাবুদের আশ্রয় দিবার জন্য বুক পাতিয়াই আছে। শয্যা গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় ক্লান্তি হরার কথা মনে পড়িলে, ডাকিলাম, "ঝি, একটু তামাক দে।"

আপিসের সকল বাবুদের সব সময়ে তামাক দিতে গেলে ঝি-এর চলে না এবং তাহার এ কাজও নয়। কিন্তু ঝিও নাকি মেয়ে মানুষ; তাই সময়ে তাহারও অন্তরে স্নেহের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহারই প্ররোচনায় সম্ভবতঃ সে দীর্ঘ-শ্রম-ক্লান্ত বাবুদের আপিসের পর তামাকের প্রার্থনা নিঃশব্দে পালন করে। কলিকায় অবিলম্বে ফুঁ দিতে-দিতে আসিয়া ঝি তাহাকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া কহিল, "বাবু, আপনার একটা তার আছে?"

শুনিয়াই মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, কারণ নিদান অবস্থা নহিলে তারের চলন আমাদের মধ্যে বড় নাই। তাড়াতাড়ি খুলিয়া লম্পের আলোয় পড়িয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে চক্ষুস্থির। স্ত্রীর কঠিন বিসূচিকা—অবিলম্বে যাইতে হইবে।

(২)

যাইতে ত হইবে, কিন্তু যাই কি করিয়া! কঠিন রোগ, অবিলম্বে না বাহির হইলে হয়ত দেখাই হইবে না! রাত্রি দশটার ট্রেণ, ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম আটটা বাজিয়া গিয়াছে। কিন্তু ছুটি লইতে হইবে, বাহিরে যাইবার অনুমতি লইতে হইবে। সাহেবের বাড়ী যাইব কি? বাড়ী ত জানি না; জানিলেও এই অসময়ে তাঁহার কাছ হইতে ছুটি লইয়া আসিয়া ট্রেণ ধরা অসম্ভব। ছুটি না লইয়া গেলে শাস্তি - চাকুরী পর্য্যন্ত যাইতে পারে!

পীড়িত স্ত্রীর মুখ মনে পড়িয়া প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কত দিন দেখা হয় নাই, কিন্তু কবে ছুটি পাইব, কবে দেখা হইবে, সেই আশায় সে নিঃশব্দে সংসারের ভার বহন করিয়া আসিতেছে; আজ হয় ত মাঝ-পথে সব হঠাৎ বাধিয়া গেল! আর দেখা হয় কি না হয় স্থির নাই, দীর্ঘ পনর বৎসরের বিবাহিত জীবনের হয় ত বা শেষ দিনে দেখাও হইবে না!

পঞ্চাশ টাকার মোহ পিছন হইতে টানিতেছিল। এতগুলি ছেলেপুলে লইয়া কি পথে বসিব? বাঙ্গলাদেশে স্ত্রী গেলে স্ত্রী আবার হয়, কিন্তু চাকুরী গেলে আবার চাকুরী পাওয়া কঠিন।

কিন্তু তাহার সেই মুখ—রোগ-পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ! তাহার ক্লিষ্ট চোখ দুটি পীড়ার মধ্যেও হয় ত আমারই জন্য প্রতীক্ষায় বারবার চাহিয়া দেখিতেছে, হয় ত সমস্ত প্রাণমন লইয়া আমারই অপেক্ষা সে করিতেছে! প্রাণের চেয়ে কি চাকুরী বড়?

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম নয়টা। আর দেরী করা চলে না। যাইবারও আর সময় নাই। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গায়ের একটা কাপড় টানিয়া লইয়া বাহির হইতেছি, ঝি বলিল, "বাবু, খবর ভাল ত? কোথায় যাও বাবু?"

আমি কহিলাম, "খবর ভাল নয়—বড় অসুখ বাড়ীতে। আমি দেশে চল্লাম।"

ঝি কহিল, "চারটি খেয়ে—"

আমি সিঁড়ি হইতে নামিতে-নামিতে কহিলাম, "সময় নেই—"

সমস্ত রাস্তাটা কেমন যেন অভিভূতের মত আসিয়া যখন ষ্টেশনে পৌছিলাম, তখন গাড়ী ছাড়িতে আর বড় বেশী দেরী নাই। গাড়ীতে চড়িয়া বসিয়া মনে হইল, সন্ধ্যা হইতে তখন পর্য্যন্ত এই ঘণ্টা দুই তিন, যেন দুই তিন বৎসরের মত বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ এবং তাহারই মত দীর্ঘ।

(৩)

ভোরের আলো তখন ভাল করিয়া ফুটে নাই। গ্রামের আলো-ছায়াময় পথ বাহিয়া বাড়ী আসিয়া যখন পৌছিলাম, তখন বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল।

ঘরের দরজা খুলিতেই কমলার শ্রান্ত চোখ দুটি আমার মুখের উপর পড়িয়া যেন এক অপূর্ব্ব প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যা হোক দেখা হইয়াছে।

ডাক্তার বলিলেন, "সঙ্কটের সময়টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর বিশেষ ভয় নাই। আপনি আসিয়াছেন, খুবই ভাল হইয়াছে। উনি আপনার জন্য অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং এ অবস্থায় অতটা উৎকণ্ঠা ঠিক নয়।"

তাহার নিঃশব্দভাষী চোখ দুটি দ্বারা সে যেন আমাকে আহ্বান করিল। আস্তে-আস্তে তাহার কাছে বসিতেই ঝরঝর করিয়া দু-চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। প্রাণের সমস্ত উৎকণ্ঠা, আকাঙ্ক্ষা যেন অশ্রুরূপে বিগলিত হইয়া পড়িল। আমি তাহার মুখে চোখে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলাম, "আর ভয় নেই, এইবার সেরে উঠ্‌বে কমল।"

কমলা অস্ফুটে কহিল, "বাঁচলাম, তুমি এলে।"

* * * *

ভাল করিয়া সারিয়া উঠিয়া পথ্য পাইতে দশ দিন গেল। প্রাণের সেই দেবতা যিনি ছুটির অপেক্ষা না করিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছিলেন, তিনিই এই দশ দিন আমাকে আট্‌কাইয়া রাখিলেন। পঞ্চাশ টাকার মোহ মাঝে-মাঝে বিদেশের পথে টানিতেছিল সত্য, কিন্তু সে আর তেমন প্রবল নয়।

এগার দিনের সন্ধ্যাবেলায় কমলার অশ্রু-অভিষিক্ত হইয়া, ঝাপসা চোখে সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ালোকময় পথে, আবার বিদেশে ফিরিলাম।

(৪)

পরদিন আপিসে যাইতেই সাহেবের কামরায় ডাক পড়িল।

গিয়া দেখিলাম, সাহেবের স্বভাবতঃ লাল মুখ আরও লাল হইয়া উঠিয়াছে। যাইতেই ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "আজ যে বড় দয়া ক'রে এলে।"

আমি কহিলাম, "সার, স্ত্রীর বড় কঠিন কলেরার সংবাদ পেয়ে আমাকে বেরিয়ে যেতে হয়, ছুটি নিয়ে যাবার সময় পাইনি, আমাকে মাপ করা হোক্।"

সাহেব দৃঢ় কঠিন স্বরে কহিলেন, "আপিসের এক নিয়ম। যেতে হ'লে ছুটি নিয়ে যেতে হয়, না হয় চাকুরী যায়। স্ত্রীর ব্যারামে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে না। তুমি ছুটি নিয়ে যাওনি সুতরাং তোমার চাকুরী গেল।"

চোখে প্রায় আঁধার দেখিলাম, সাহেব-শুদ্ধ সাহেবের কামরা যেন বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। আমি মিনতির স্বরে কহিলাম, "সাহেব, বড় দরিদ্র, ছেলেপুলে অনেকগুলি—দয়া—"

তাহার উত্তরে যে মেঘগর্জ্জন হইল, তাহার অনুবাদ করিতে গেলে ভাষায় কুলায় না, কিন্তু ভাব সম্যক্ বোধগম্য হয়। তাহার পর ফিরিয়া আসাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

* * * *

মেসের বাসায় ফিরিয়া ডাকিলাম, "ঝি !"

ঝি আসিয়া কহিল, "বাবু যে ! এমন অসময়ে ! শরীর খারাপ না কি ?"

মনের অবস্থা তখন এমনি শোচনীয়, এবং আমার এই দুঃখের অংশী পাইবার জন্য মন এমনি ব্যাকুল যে, খানিকটা দ্বিধা করিয়া ঝিকেই বলিয়া ফেলিলাম, "না, আমার চাকুরী গেল !"

দুই চোখ কপালে তুলিয়া, তালু এবং জিহ্বায় একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া ঝি কহিল, "আহা—হা, কেন গো বাবু !"

আমি কহিলাম, "সেই যে ছুটি-না-নিয়ে বাড়ীর অসুখের খবর পেয়ে চলে যেতে হ'লো, সেই জন্য সাহেব বরখাস্ত করেছে !"

ঝি ঝঙ্কার করিয়া কহিল, "মরণ আর কি মুখ পোড়ার ! ওর কি ই-স্ত্রী নেই ? তার কি ব্যামো কখনও হয় নি ? ও কি বুঝতে পারে না —আহা—হা ! বাবু তুমি ভেবো না। যে এমন করে, তার ভাল হবে না বলছি। তোমার ভাবনা কি বাবু ? চাকুরী কি আর দুনিয়ায় নেই ? তুমি এই-খানে থেকে চাকুরীর চেষ্টা করো, আমি বলছি পাবেই। আহা ! বাবু, তামাক আনবো কি ?"

তামাকের জন্যই ঝিকে ডাকা, কিন্তু এতক্ষণ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। কহিলাম, "হাঁ, একবার তামাক দে।"

আমি ভাবিতে লাগিলাম, আশ্চর্য্য এই দুনিয়া ! যে সহজ কথাটা এই তিন টাকা মাহিনার ঝি এত জলের মত বুঝিয়াছে, সেই কথাটা অতবড় বুদ্ধিমান সাহেবের অনুভূতিতেই আসিল না !

(৫)

ঝির পরামর্শই শুনিলাম। তাহার পরদিন হইতেই চাকরীর উমেদারিতে বাহির হইলাম।

মার্চ্চেণ্ট আপিস, সওদাগরি হৌসে, কোথাও আর বাকি রাখিলাম না। লাভ কিছুই হইল না, শুধু পুরাতন জুতা জোড়াটির সংস্কার প্রয়োজন হইল।

এ কথা বাড়ীতে লিখি নাই ; কেন না, এত বড় গুরুতর পীড়ার পর এই দুঃসংবাদ হয় ত নূতন পীড়ার উৎপত্তি করিতে পারে। ভগবানের উপর ভরসা করিয়া দিন কাটিতে লাগিল।

দশদিন কাটিয়াছে। গত রাত্রে একটা চাকুরীর সন্ধান হইয়াছে। মাড়ওয়ারীর দোকানে ;— সকাল ৯টায় যাইতে হইবে, এবং রাত্রে কখন অবসর হইবে তাহার স্থিরতা নাই, —আটটাও হইতে পারে, ন'টাও হইতে পারে। মাহিনা পঁচিশটি মুদ্রা।

খাইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে ঝি কহিল, "কোথায় যাচ্ছ বাবু ?"

আমি একটু হাসিয়া কহিলাম —"একটা চাকুরী পেয়েছি —ভাল নয় তেমন।"

ঝি কহিল, "কি রকম ?"

আজ কাল ঝিই আমার সুখের দুঃখের পরামর্শদাতা দাঁড়াইয়াছিল ; তাহাকে সবই বলিলাম।

শুনিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, "পঁচিশ টাকায় কি হবে বাবু ? ওটা দু'চার দিন হাতে রাখলে চলে না ? আরও একটু সন্ধান ক'রে যদি ভাল গোছের পাও। ওতে ঢুকলে ত আর সময় পাবে না।"

আমি কহিলাম, "চাকুরীটা আমারও তেমন ভাল ঠেকচে না। কিন্তু করি কি ? চাকুরীর বাজার ত তুই জানিসনে। দেখছিস না, এই দশদিন এত খেটে খুটেও কিছুই করতে পারলাম না। বসে কত দিনই বা থাকি !"

ঝি বলিল, "আমার মন বলচে, তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। আর মাঝে-মাঝে দেখেছি, আমার মন সত্যি কথাই বলে। ওটা তুমি নিয়ো না।"

আমি কহিলাম, "তুই বুঝিস্‌নে—"

এমন সময় সিঁড়ির গোড়ায় গম্ভীর কণ্ঠে আওয়াজ হইল, "বাবু চিটি !"

ঝি চিঠি আনিলে দেখিলাম, আমাদের সেই মার্চ্চেণ্ট আপিসের মোহরাঙ্কিত। কম্পিত-হস্তে খুলিয়া দেখিলাম, সাহেব অবিলম্বে তলব করিয়াছেন।

আবার সাহেব, আবার তলব ! এবার কি তহবিল তছরুপ না কি ? যাই হোক, যাইতেই হইবে।

* * *

আপিসে পৌছিয়া সাহেবের খাস-কামরায় গেলাম। যথারীতি অভিবাদন করিয়া আরও কোন অমঙ্গল সংবাদের আশঙ্কায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিন্তু আজ সাহেবের মুখ অনেকটা কোমল বোধ হইল; চোখ-দুটা লাল,—যেন কতকটা করুণ-ও।

সাহেব আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। যন্ত্র-চালিতের মত বসিয়া পড়িলাম।

খানিকটা থামিয়া অত্যন্ত ভারী কণ্ঠে সাহেব বলিলেন, "চ্যাটার্যি, আমি অন্যায় ক'রেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম দুনিয়াটা একটা নিছক মস্ত কল। কিন্তু এখন দেখছি, এর সবটাই কল নয়। মাঝে মাঝে মানুষও আছে, তার হৃদয়ও আছে। ভগবানের এই আদিম সনাতন সৃষ্টি মানুষের হৃদয়কে আমরা কল-কব্জা, আইন-কানুনের কঠিন ভারে চাপা দিতে চাই; বোধ হয় অনেক সময়ে পারি-ও; কিন্তু সকল সময়ে যে এ দুটি খাপ খায় না, তা ভুলে যাই। তাই সময়ে-সময়ে যখন তাদের সংঘর্ষ হয়, তখন সে এক করুণ ব্যাপার। তখন আর্ত, মথিত হৃদয় বেদনায় ভ'রে ওঠে, রক্ত ঝুঁঝিয়ে প'ড়তে থাকে। ওইখানে মানুষের হার! চ্যাটার্যি, আমাকে মাপ করো, তোমাকে আবার আমি চাকুরী দিচ্ছি। তোমার জায়গায় লোক বাহাল ক'রেছি; কিন্তু একটা ৮০৲ টাকার পদ খালি হয়েছে,—তার লোক বোম্বাই-এ আমাদের হেড আপিসে কাল গেছে। সেইটে তোমাকে দিলাম। যাও—গুড-মর্ণি।"

এ কি! আমার চোখের সম্মুখে পৃথিবী যেন ঘুরিতে লাগিল! এ সব সত্য, না অলীক!

* * *

বাহিরে আসিতেই বড়-বাবু আমাকে টিফিন-রুমে লইয়া গেলেন। সেখানে রীতিমত মজ্‌লিস বসিয়াছিল।

আমি কহিলাম, "বড় বাবু, কিছুই বুঝতে পারছিনে যে!"

বড়বাবু হুঁকায় খুব একটা বড় টান দিয়া, হুঁকা রাখিতে-রাখিতে কহিলেন, "ভগবান যখন রাখেন, সাধ্যি কি মানুষ বুঝে! শোন বলছি; আশ্চর্যি, আশ্চর্যি! তোমাকে বরখাস্ত করার পরদিনই ঠিক তোমার ঘটনার পুনরাবৃত্তি! অর্থাৎ বেলা তিনটা আন্দাজ—সাহেবের নামে এক টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত যে, সাহেবের মেম দার্জ্জিলিংএ মরণাপন্ন পীড়িত; আর অবিলম্বে না গেলে দেখা হয় কি না সন্দেহ! তোমার বরখাস্তের দিনই বড়-বড় মোটা হরফে সাহেব সার্কুলার দিয়েছিলেন যে, এক ঘণ্টার জন্যও ছুটি কেউ উপরি-ওয়ালার বিনা অনুমতিতে নিতে পারবে না। এই মোটা-হরফের সার্কুলার রূপী দম্ভই হোল সাহেবের বিপদ, তারই নাগপাশে তিনিই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। সাহেবেরও বড়সাহেব আছেন বোম্বাই হেড্-আপিসে,—তাঁর অনুমতি না নিয়ে সাহেব কি ক'রে যান। তখনই আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম গেল বোম্বাই-এ,—ভরসা, যদি পাঁচটার দার্জ্জিলিং মেলের আগে জবাব আসে! টেলিগ্রাফ আফিসে লোক ব'সে রইল,—আপিসের সামনে মোটর দাঁড়িয়ে রৈল,—জবাব এলেই সাহেব যাবেন। কিন্তু তাঁর চক্র,—জবাব এলো তার পরদিন বেলা দেড়টায়,—এই আপিসে! এতক্ষণ সাহেব কাটা কৈ-এর মত উত্তেজনায়, উৎকণ্ঠায় ছট্‌ফট্ ক'রেছেন। তার পর সাহেবও চলে গেলেন। আজ ফিরে এসে আমার ডাক পড়লো। গিয়ে দেখ্‌লাম, সাহেব রুমাল মুখে দিয়ে, ছোট ছেলের মত কাঁদচেন। আমাকে দেখে বল্লেন, 'ঘোষ, দেখা হয়নি; আমার যাবার আগেই সে চলে গেছে।' তার পর কান্না যদি দেখতে! মনে করেছিলাম, সাহেব বুঝি শুধু মাংস আর চামড়ার একটি বিরাট সমষ্টি;—কিন্তু না, আজ দেখলাম, ভেতরে মস্ত একটা হৃদয় আছে—বোধ হয় এতদিন চাপা পড়ে ছিল। আমিও কেঁদে ফেল্লাম। তারপর, খানিক পরে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বল্লেন, 'হৃদয়ের আহ্বান যে ছুটির চেয়ে জরুরি, একথা চ্যাটার্জ্জি বুঝেছিল। আমি তার ওপর অন্যায় করেছি। এই এত বড় একটা সত্যের মর্য্যাদায় আঘাত ক'রেছি, তাই বুঝি এত বড় শাস্তি। ভগবান, যদি একটিবার দেখাও হোত! তাও না,—এত কঠিন সাজা!' তার পর কহিলেন, 'চ্যাটার্জ্জিকে ডেকে পাঠাও,—আমি আবার তাকে চাকুরী দোব'। তার পর তোমাকে ডাকিয়ে চাকুরী দিয়েছেন—আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সব শুনেছি! চাটুয্যে, এ সব কি? এ শাস্তি, না আর কিছু? গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে, চাটুয্যে!"

মনোবিজ্ঞান

(আলোচনা)

[অধ্যাপক শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু, এম-এ]

বাঙ্গালীর শিক্ষা মাত্র মাতৃভাষার দ্বারাই সম্পন্ন হয়, ইহা সকল বাঙ্গালীই ইচ্ছা করেন। জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ অধিকৃত করিবার উপায় বঙ্গ ভাষাতে হয়, ইহা সকলেরই আকাঙ্ক্ষা। "ভারতবর্ষে" যখন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের "মনোবিজ্ঞান" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন বড়ই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। নিবন্ধগুলি আদ্যোপান্ত পড়িবার সুবিধা ও সময় হয় নাই। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে পরও সময়াভাবে তাহা আগাগোড়া পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু স্থূলভাবে পুস্তক সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট পরিচয় লাভ করিয়াছি।

১৩২৬ সালের পৌষ সংখ্যক "ভারতবর্ষে" চারুবাবুর "মনোবিজ্ঞানে"র একটী সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচনা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। সমালোচনাতে গ্রন্থকারের প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করা হইয়াছে; তাহা শোধন করা উচিত মনে করিয়া এই উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মনোবিজ্ঞান দুরূহ বিষয়। শিক্ষকের সহায়তা ব্যতীত কেবল গ্রন্থ সাহায্যে যে-কোন বিজ্ঞানেরই বিশেষ জ্ঞান লাভ করা কঠিন। "মনোবিজ্ঞান" সম্বন্ধে একথা বিশেষ রূপে খাটে। চারুবাবু যে মনস্তত্ত্বের কথা সহজ করিয়া বলিতে পারিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। গ্রন্থের স্থানে-স্থানে যে জটিলতা দৃষ্ট হয়, তাহার জন্য শুধু গ্রন্থকারই দায়ী নহেন; বঙ্গভাষার দৈন্য এবং বিষয়ের দুরূহতা তাহাকে কিছু অক্ষম করিয়াছে।

সমালোচক গ্রন্থকারের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারে দোষ দেখাইয়াছেন; ইংরাজী terms দিলে ভাল হইত, শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয়ের পরিভাষা গ্রহণ করা যাইত, ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ইংরাজী বা সংস্কৃত কোন পারিভাষিক শব্দই প্রকৃতপক্ষে বিষয়-বোধের সহায়তা করিত না। নানা কথায়, নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে—"বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা" করিয়া পরে পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করাই নিয়ম,—বিষয়-বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত পরিভাষা নিরর্থক। পরিভাষা নির্দ্ধারিত হইলে উত্তরকালে সমালোচনার সহায়তা হয়, এই জন্য পরিভাষা প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থে ইংরাজি পারিভাষিক শব্দ দিয়া কোন লাভ হইত না। সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে কিছু পরিমাণ পরিভাষা গ্রহণ করা যায়; কিন্তু সেগুলিও বাঙ্গালায় প্রচলিত নহে বলিয়া বিষয়-বোধের সহায়তা করিতে পারিত না। এরূপ স্থলে চারুবাবু যদি নিজের রচিত কতকগুলি শব্দ দিয়া থাকেন, তাহাতে দোষ কি? উপযুক্ত হইলে ভাষা সেগুলিকে স্থায়ী করিবে, না হইলে সেগুলি বর্জ্জিত হইবে। ইংরাজী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষাতেও ত এইরূপ হইয়াছে। উপযুক্ত কি না পূর্ব্ব হইতে কে তাহার মীমাংসা করিবার অধিকারী?

"সাংখ্য দর্শনে মনোবিজ্ঞানের অনেক জটিল রহস্যের মীমাংসা আছে" ত বটেই, যোগশাস্ত্রে—ব্যাস ভাষ্যে বোধ হয় অধিকতর আছে, আবার বৌদ্ধ দর্শন-শাস্ত্রাদিতে আরো অধিক আছে। কিন্তু এই সকল শাস্ত্রের সহিত যত গভীরতর পরিচয় হয়, ততই বুঝা যায় তাহাদের পারিভাষিক শব্দ দ্বারা ইউরোপীয় Empirical Psychology বুঝাইবার প্রয়াস বৃথা।

সমালোচক বলেন যে, "চারুবাবু যে, তাঁহার পুস্তক 'অনুমোদিত ও পাঠ্য পুস্তকে'র আদর্শে লিখিয়াছেন—এই জন্যই বর্ণনা অনেকস্থলে চিত্তাকর্ষক হয় নাই।" গ্রন্থকার পাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছেন, কাহারো অনুমোদনের প্রত্যাশা করিয়াছেন—এরূপ কোন লক্ষণ ত গ্রন্থে প্রকাশ পাইতেছে না—ইংরাজীতে "চিত্তাকর্ষক" Text Book of Psychology বাজারে কয়খানি পাওয়া যায়?

সমালোচক গ্রন্থের কয়েকটি অভাব এবং ভ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, অধুনা Wundt প্রমুখ পণ্ডিতগণের……রাখেন না—"। "মনোবিজ্ঞানে"র আলোচনায় নবীন ও প্রবীণ রীতির পার্থক্য অবশ্য আছে। কিন্তু এই "আধুনিকের" জীবন "২০ বৎসরের" অনেক অধিক। Wundtকেই যদি ধরা যায়—তাঁহার বিখ্যাত Lectures on Human and Animal Psychology, যাহা মনস্তত্ত্বের আলোচনায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল,—৬০ বৎসর পূর্ব্বে বিবৃত হয়। তাঁহার Physiological Psychology ১৮৭৪ সনে প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া Weber এবং Fetchnerএর নাম উল্লেখ করা যায়। Herbert Spencerএর Psychologyর প্রথম খণ্ড ১৮৭০ সনে বাহির হয়। সুতরাং মূলে এই "আধুনিকের" বয়স প্রায় ৫০।৬০ বৎসর। তবে পল্লবে (detailsএ) নিত্য নূতন চিন্তা, পরীক্ষা প্রভৃতি চলিতেছে। চারুবাবু স্থূল বিষয়ে আধুনিকতম মতের আলোচনা করেন নাই, সুতরাং "আধুনিক তত্ত্বের সন্ধান রাখেন নাই" —বলায় তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। এই ৬০ বৎসরের ভিতর মূল ভিত্তির বাস্তবিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। আর শাখা পল্লবের (detailsএর) স্থান পাঠ্য-পুস্তকে হয় নাই।

মনোবিকাশ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে লিখিয়াছেন, "এক হইতে সপ্তম

বর্ষ পর্যান্ত মানুষের মন অবস্থার দাস"......এখন মন এক প্রকার নিস্ক্রিয়।" ইহাতে যদি ভুল থাকে তবে তাহা অপরের (Spiller—The Mind of Man, 1902, pp. 108, 409, 426)। এই প্রসঙ্গে সমালোচক কতকগুলি বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য প্রকটিত করিলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হইত। বোধ হয় তিনি ontegenetic এবং Phylogenetic development এর ভিন্নতা উত্তমরূপে না বিবেচনা করিয়া গোলে পড়িয়াছেন।

স্বপ্ন সম্বন্ধেও গ্রন্থকারের বিশেষ "ভ্রান্তি" দেখিতেছি না। স্বপ্ন সম্বন্ধে Psychology এবং Philosophy of mind উভয় দিক হইতেই অনেক আলোচনা সম্ভব এবং আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু চারুবাবু একখানি Empirical Psychology লিখিয়াছেন; তিনি স্বপ্ন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত Empirical Psychologyর Text Bookএ তাহার অধিক বলা হয় নাই; কারণ, যে সকল কথার নূতন অবতারণা হইয়াছে, তাহা এখনও অবিসম্বাদিত রূপে গৃহীত হয় নাই। পূজনীয় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় মূর্খতায় সাগর হইতে পারেন, কিন্তু Baldwinকে ত অস্বীকার করা যায় না।

Baldwin—Elementary Psychology, 1907, p 128.

প্রলোভন, আত্মসংযম, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে "ভ্রম প্রমাদ" চারুবাবুর নয়। যদি ভ্রান্তি থাকে তবে তাহা "আধুনিক পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদগণের"; কারণ, চারুবাবু Wundt, Baldwin, Fetchener, Stout প্রভৃতির অনুসরণ করিয়াছেন দেখিতেছি।

চারুবাবু লিখিয়াছেন, "শিক্ষক মহাশয় একটি পাত্রে অম্লজান নামক বাষ্প রাখিয়া তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন।" ছাত্রেরা দেখিল যে বাষ্প জ্বলিয়া উঠিল। সমালোচক বলিলেন, "অম্লজান বাষ্প নিজে জ্বলে না।" উদাহরণটি যদি রাসায়নিক ব্যাপার বুঝাইবার উদ্দেশ্যে দেওয়া হইত, তবে সমালোচকের কথা ঠিক হইত। কিন্তু একটি ভৌতিক ব্যাপারের সাহায্যে একটি মানসিক ক্রিয়া বুঝান হইতেছে। "বাষ্প জ্বলিয়া উঠিল" বলিয়া মারাত্মক কোন দোষ হয় নাই।

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

একচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

ফিরিবার পথে গাড়ীর কোনে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া অচলা এই কথাটাই ভাবিতেছিল আজিকার এই মূর্চ্ছাটা যদি আর না ভাঙিত। নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করিবার বীভৎসতাকে সে মনে স্থান দিতেও পারেনা, কিন্তু এমনি কোন শান্ত স্বাভাবিক মৃত্যু। হঠাৎ জ্ঞান হারাইয়া ঘুমাইয়া পড়া,—তারপরে আর না জাগিতে হয়। মরণকে এমন সহজে পাইবার কি কোন পথ নাই? কেউ কি জানেনা?

সুরেশ তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিল, তুমি যে আর কোথাও যেতে চেয়েছিলে, যাবে?

চল।

এর পরে কাল ত এখানে আর মুখ দেখানো যাবেনা।

কিন্তু, তিনি ত কোন কথাই কাউকে বলবেন না।

সুরেশের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, না। মহিমকে আমি জানি, সে ঘৃণায় আমাদের দুর্নামটা পর্য্যন্ত মুখে আনতে চাইবেনা।

কথাটা সুরেশ সহজেই কহিল, কিন্তু শুনিয়া অচলার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তারপরে যতক্ষণ না গাড়ী গৃহে আসিয়া থামিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নির্ব্বাক হইয়া রহিল। সুরেশ তাহাকে সযত্নে, সাবধানে নামাইয়া দিয়া কহিল, তুমি একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা করগে অচলা, আমার কতকগুলো জরুরি চিঠি-পত্র লেখবার আছে। এই বলিয়া সে নিজের পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল।

শয্যায় শুইয়া অচলা ভাবিতেছিল, এই ত তাহার একুশ বৎসর বয়স, ইহার মধ্যে এমন অপরাধ কাহার কাছে সে কি করিয়াছে যে জন্য এতবড় দুর্গতি তাহার ভাগ্যে ঘটিল। এ চিন্তা নূতন নয়, যখন-তখন ইহাই সে আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিত, এবং শিশুকাল হইতে যতদূর স্মরণ হয় মনে করিবার চেষ্টা করিত। আজ অকস্মাৎ মৃণালের একদিনের

তর্কের কথাগুলি তাহার মনে পড়িল, এবং তাহারই সূত্র ধরিয়া সমস্ত আলোচনাই সে একটির পর একটি করিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিয়া গেল। নিজের বিবাহিত জীবনটা স্বামীর সহিত একপ্রকার তাহার বিরোধের মধ্যে দিয়াই কাটিয়াছে। কেবল শেষ কয়টি দিন তাঁহার রুগ্নশয্যায় স্বামীকে সে বড় আপনার করিয়া পাইয়াছিল। তাঁহার জীবনের যখন আর কোন শঙ্কা নাই, মন যখন নিশ্চিন্ত নির্ভয় হইয়াছে, তখনকার সেই স্নিগ্ধ, সহজ ও নির্ম্মল আনন্দের মাঝে অপরের দুর্ভাগ্য ও বেদনা যখন তাহার বড় বেশি বাজিত, তখন একদিন মৃণালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিয়াছিল, ঠাকুরঝি, তুমি যদি আমাদের সমাজের আমাদের মতের হতে, কিছুতে তোমার সমস্ত জীবনটাকে আমি ব্যর্থ হতে দিতুম না।

মৃণাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কি করতে সেজদি, আমার আবার একটা বিয়ে দিতে?

অচলা কহিয়াছিল, নয় কেন? কিন্তু থামো ঠাকুরঝি, তোমার পায়ে পড়ি, আর শাস্ত্রের দোহাই দিয়োনা। ও নিয়ে যুদ্ধ এত হয়ে গেছে যে হবে শুনলেও আমার ভয় করে।

মৃণাল তেমনি সহাস্যে বলিয়াছিল, ভয় করবার কথাই বটে। কারণ, তাঁদের ছুঁড়োমুড়িটা যে কখন্ কোন্ দিকে চেপে আস্‌বে তার কিছুই বলবার যো নেই। কিন্তু একটা কথা তুমি ভাবোনি সেজদি, যে, তাঁরা যুদ্ধ করেন কেবল ঐ ব্যবসা বলে, কেবল গায়ে জোর, আর হাতে অস্ত্র থাকে বলে। তাই তাঁদের জিত-হার শুধু তাঁদেরই, তাতে আমাদের যায় আসেনা। আমাদের ত কোন পক্ষই কোন কথা জিজ্ঞেসা করেন না।

অচলা প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু করলে কি হোতো?

মৃণাল বলিয়াছিল, সে ঠিক জানিনে ভাই। হয়ত তোমারি মত ভাব্‌তে শিখতুম, হয়ত তোমার প্রস্তাবেই রাজী হতুম, একটা পাত্রও হয়ত এতদিন জুটে যেতে পারত। বলিয়া সে হাসিয়াছিল।

এই হাসিতে অচলা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তর দিয়াছিল, আমাদের সমাজের সম্বন্ধে কথা উঠ্‌লেই তুমি অবজ্ঞার সঙ্গে বল, সে আমি জানি। কিন্তু আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দাও, যাঁরাই এই নিয়ে যুদ্ধ করেন তাঁরা কি সবাই ব্যবসায়ী? কেউ কি সত্যিকার দরদ নিয়ে লড়াই করেন না?

মৃণাল জিভ কাটিয়া বলিয়াছিল, অমন কথা মুখে আন্‌লে এই জিভ্‌টা আমার খসে যাবে। কিন্তু তা নয় ভাই। কাল সকালেই ত আমি চলে যাচ্ছি, আবার কবে দেখা হবে জানিনে,—কিন্তু যাবার আগে একটা তামাসাও কি করতে পারবনা? বলিতে বলিতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সামলাইয়া লইয়া পরে গম্ভীর হইয়া কহিয়াছিল, কিন্তু তুমি ত আমার সকল কথা বুঝ্‌তে পারবেনা ভাই। বিয়ে জিনিসটি তোমাদের কাছে শুধু একটা সামাজিক বিধান। তাই তার সম্বন্ধে ভাল-মন্দ বিচার চলে, তার মতামত যুক্তিতর্কে বদলায়। কিন্তু আমাদের কাছে এ ধর্ম্ম। স্বামীকে আমরা ছেলেবেলা থেকে এই রূপেতেই গ্রহণ করে আসি। এ বস্তুটি যে ভাই সকল বিচার বিতর্কের বাইরে। বিস্মিত অচলা প্রশ্ন করিয়াছিল বেশ, তাও যদি হয়, ধর্ম্ম কি মানুষের বদলায়না ঠাকুরঝি?

মৃণাল কহিয়াছিল, ধর্ম্মের মতামত বদলায় কিন্তু আসল জিনিসটি কই আর বদলায় ভাই সেজদি? তাই এত লড়াই-ঝগড়ার মধ্যেও সেই মূল জিনিসটি আজও সকল জাতিরই এক হয়ে রয়েছে। স্বামীর দোষ-গুণের আমরাও বিচার করি, তাঁর সম্বন্ধে মতামত আমাদেরও বদলায়,—আমরাও ত ভাই মানুষ। কিন্তু স্বামী জিনিসটি আমাদের কাছে ধর্ম্ম, তাই তিনি নিত্য! জীবনেও নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য! তাঁকে আর আমরা বদ্‌লাতে পারিনে।

অচলা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিয়াছিল, এই যদি সত্যি, তবে এত অনাচার আছে কেন?

মৃণাল বলিয়াছিল, ওটা থাক্‌বে বলেই আছে। ধর্ম্ম যখন থাক্‌বেনা তখন ওটাও থাক্‌বেনা। বেড়াল কুকুরের ত ভাই অনাচার নেই!

অচলা হঠাৎ কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, এই যদি তোমাদের সমাজের শিক্ষা, তবে শিক্ষা যাঁরা দেন তাঁদের এত সন্দেহ এত সাবধান হওয়া কিসের জন্য? এত পর্দ্দা, এত বাঁধাবাঁধি—সমস্ত দুনিয়া থেকে আড়াল করে লুকিয়ে রাখ্‌বার এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন? এই জোর-করা সতীত্বের দাম বুঝ্‌তুম পরীক্ষার অবকাশ থাক্‌লে!

তাহার উত্তাপ দেখিয়া মৃণাল মুচকিয়া হাসিয়া কহিয়াছিল,

এ বিধি ব্যবস্থা যাঁরা করে গেছেন উত্তর জিজ্ঞাসা করগে ভাই তাঁদের। আমরা শুধু বাপ মায়ের কাছে যা শিখেচি, তাই কেবল পালন করে আস্‌চি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জোর করে বল্‌তে পারি সেজদি, স্বামীকে ধর্ম্মের ব্যাপার পরকালের ব্যাপার বলে যে যথার্থই নিতে পেরেচে তার পায়ের বেড়ি বেঁধেই দাও আর কেটেই দাও, তার সতীত্ব আপনা-আপনি যাচাই হয়ে গেছে!

এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া ধীরে ধীরে বলিয়াছিল, আমার স্বামীকে ত তুমি দেখেচ? তিনি বুড়ো মানুষ ছিলেন, সংসারে তিনি দরিদ্র, রূপ-গুণও তাঁর সাধারণ পাঁচজনের বেশি ছিলনা; কিন্তু তিনিই আমার ইহকাল, তিনিই আমার পরকাল! এই বলিয়া সে চোখ বুজিয়া পলকের জন্য বোধ করি বা তাঁহাকেই অন্তরের মধ্যে দেখিয়া লইল, তারপরে চাহিয়া একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, উপমাটা হয়ত ঠিক হবেনা, সেজদি, কিন্তু এটা মিথ্যা নয় যে বাপ তাঁর কাণা-খোঁড়া ছেলেটির উপরেই সমস্ত স্নেহ ঢেলে দেন। অপরের সুন্দর সুরূপ ছেলে মুহূর্ত্তের তরে হয়ত তাঁর মনে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি করে, কিন্তু পিতৃধর্ম্ম তাতে লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। যাবার সময় তাঁর সর্ব্বস্ব তিনি কোথায় রেখে যান এ তো তুমি জানো? কিন্তু নিজের পিতৃত্বের প্রতি সংশয়ে যদি কখনো তাঁর পিতৃধর্ম্ম ভেঙ্গে যায়, তখন এই স্নেহের বাষ্পও কোথাও খুঁজে মেলে না। কিন্তু আমাদের শিক্ষা সংস্কার ও চিন্তার ধারা আলাদা, ভাই, আমার এই উপমাটা ও কথাগুলো তুমি হয়ত ঠিক বুঝ্‌তে পারবেনা, কিন্তু, এ কথা আমার তুমি ভুলেও অবিশ্বাস কোরোনা, যে, স্বামীকে যে-স্ত্রী ধর্ম্ম বলে অন্তরের মধ্যে ভাব্‌তে শেখেনি, তার পায়ের শৃঙ্খল চিরদিন বদ্ধই থাক, আর মুক্তই থাক, এবং নিজের সতীত্বের জাহাজটাকে সে যত বড় বৃহৎই কল্পনা করুক, পরীক্ষার চোরাবালিতে ধরা পড়লে তা'কে ডুবতেই হবে। সে পর্দ্দার ভিতরেও ডুব্‌বে, বাইরেও ডুব্‌বে।

তাহাই ত হইল। তখন এ সত্য অচলা উপলব্ধি করে নাই, কিন্তু আজ মৃণালের সেই চোরা-বালি যখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া অহরহ রসাতলের পানে টানিতেছে, তখন বুঝিতে আর বাকি নাই সেদিন কি কথাটা সে অত করিয়া তাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল। নিরবরুদ্ধ সমাজের অবাধ স্বাধীনতায় চোখ-কান খোলা রাখিয়াই সে বড় হইয়াছে, নিজের জীবনটাকে সে নিজে বাছিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এই ছিল তার গর্ব্ব, কিন্তু পরীক্ষার একান্ত দুঃসময়ে এ সকল তাহার কোন কাজে লাগিলনা। তাহার বিপদ আসিল অত্যন্ত সঙ্গোপনে, বন্ধুর বেশে; সে আসিল জ্যাঠামশায়ের স্নেহ ও শ্রদ্ধার ছদ্ম রূপ ধরিয়া। এই একান্ত শুভানুধ্যায়ী স্নেহশীল বৃদ্ধের পুনঃ পুনঃ ও নির্ব্বন্ধাতিশয্যে যে দুর্য্যোগের রাত্রে সে সুরেশের শয্যায় গিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিল, সেদিন একমাত্র যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত, সে তাহার অত্যজ্য সতীধর্ম্ম! মৃণাল যাহাকে জীবনে মরণে অদ্বিতীয় ও নিত্য বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সেদিন তাহার বাহিরের খোলসটাই বড় হইয়া তাহার ধর্ম্মকে পরাভূত করিয়া দিল। তাহাদের আজন্ম শিক্ষা ও সংস্কার ভিতরটাকে তুচ্ছ করিয়া, কারাগার ভাবিয়া বাহিরের জগৎটাকেই চিরদিন সকলের উপরে স্থান দিয়াছে; যে ধর্ম্ম গুপ্ত, যে ধর্ম্ম গুহাশায়ী, সেই অন্তরের অব্যক্ত ধর্ম্ম কোনদিন তাহার কাছে সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই, বাহিরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সেদিনও সে ভদ্রমহিলার সম্ভ্রমের বহির্বাসটাকেই লজ্জায় আঁকড়াইয়া রহিল, "এই মোহ কাটাইয়া কিছুতে বলিতে পারিলনা, জ্যাঠামশাই, আমি জানি, আমার এতদিনের পর্ব্বতপ্রমাণ মিথ্যার পরে আজ আমার সত্যকে সত্য বলিয়া জগতে কেহই বিশ্বাস করিবেনা; জানি, কাল তুমি ঘৃণায় আর আমার মুখ দেখিবেনা, তোমার সতী-সাধ্বী পুত্রবধূর ঘরের দ্বারও কাল আমার মুখের উপর রুদ্ধ হইয়া লাঞ্ছনা আমার জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে;—সে সমস্তই সহিবে, কিন্তু তোমার আজিকার এই ভয়ঙ্কর স্নেহ আমার সহিবেনা! বরঞ্চ, এই আশীর্ব্বাদ আমাকে তুমি কর জ্যাঠামশাই, আমার এতদিনের সতী-নামের বদলে তোমাদের কাছে আজিকার কলঙ্কই যেন আমার অক্ষয় হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু হায় রে! এ কথা তাহার মুখ দিয়া সেদিন কিছুতে বাহির হইতে পায় নাই!

আজ নিষ্ফল অভিমান ও প্রচণ্ড বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ তাহার বারম্বার রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, এবং এই অখণ্ড বেদনাকে মহিমের সেই স্তব্ধ নিষ্ঠুর দৃষ্টি যেন ছুরি দিয়া চিরিতে লাগিল।

এমনি করিয়া প্রায় অর্দ্ধেক রাত্রি কাটিল। কিন্তু সকল দুঃখেরই নাকি একটা বিশ্রাম আছে, তাই, অশ্রু-উৎসও একসময়ে শুকাইল, এবং আর্দ্র চক্ষুপল্লব দুটিও নিদ্রায় মুদিত হইয়া গেল।

এই ঘুম যখন ভাঙিল তখন বেলা হইয়াছে। সুরেশের জন্য দ্বার খোলাই ছিল, কিন্তু সে ঘরে আসিয়াছিল কি না ঠিক বুঝা গেলনা। বাহিরে আসিতে বেহারা জানাইল, বাবুজী অতি প্রত্যূষেই একা করিয়া মাঝুলি চলিয়া গেছেন।

কেউ সঙ্গে গেছে?

না। আমি যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি নিলেন না। বললেন, প্লেগে মরতে চাস্ ত চল্।

তাই তুমি নিজে গেলেনা, কেবল দয়া করে একা ডেকে এনে দিলে? আমাকে জাগালিনে কেন?

বেহারা চুপ করিয়া রহিল। অচলা নিজেও একটু চুপ করিয়া প্রশ্ন করিল, একা ডেকে আন্‌লে কে? তুই?

বেহারা নতমুখে জানাইল, ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন ছিলনা; কাল তাহাকে বিদায় দিবার সময় আজ প্রত্যূষেই হাজির হইতে বাবু নিজেই গোপনে হুকুম দিয়াছিলেন।

শুনিয়া অচলা স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়। কাল সন্ধ্যার ঘটনার সহিত ইহার সংস্রব নাই। না ঘটিলেও যাইত,—যাওয়ার সংকল্প সে ত্যাগ করে নাই, শুধু তাহারি ভয়ে কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখিয়াছিল মাত্র।

জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কবে ফিরবেন কিছু বলে গেছেন?

সে সানন্দে মাথা নাড়িয়া জানাইল, খুব শীঘ্র। পরশু কিম্বা তরশু, নয় তার পরের দিন নিশ্চয়।

অচলা আর কোন প্রশ্ন করিলনা। কাল সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়া আঘাত কত লাগিয়াছিল ঠিক ঠাহর হয় নাই, আজ আগাগোড়া দেহটা ব্যথায় যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই উপর রামবাবুর তত্ত্ব লইতে আসার আশঙ্কায় সমস্ত মনটাও যেন অনুক্ষণ কাঁটা হইয়া রহিল। মহিম কোন কথাই যে প্রকাশ করিবে না ইহা সুরেশের অপেক্ষা সে কম জানিত না, তবুও সর্ব্বপ্রকার দৈবাতের ভয়ে অত্যন্ত ব্যথার স্থানটাকে আগলাইয়া সমস্ত চিত্ত যেমন হুঁসিয়ার হইয়া থাকে, তেমনি করিয়াই তাহার সকল ইন্দ্রিয় বাহিরের দরজায় পাহারা দিয়া বসিয়া রহিল। এমনি করিয়া সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধ্যা গেল। রাত্রে আর তাঁহার আগমনের সম্ভাবনা নাই জানিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইয়া এইবার সে শয্যা আশ্রয় করিল। পাশের টিপয়ে শূন্য ফুলদানি চাপা দেওয়া কোথাকার এক কবিরাজী ঔষধালয়ের সুবৃহৎ তালিকা পুস্তক ছিল, টানিয়া লইয়া তাহারই পাতার মধ্যে শ্রান্ত চোখ দুটি মেলিয়া হঠাৎ একসময়ে সে নিজের দুঃখ ভুলিয়া কোন্ এক শ্রীমন্মহারাজাধিরাজের রোগ শান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বামুনঘাটি মাইনর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের প্লীহা-যকৃৎ আরোগ্য হওয়ার বিবরণ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িল।

দ্বিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

বেহারা বলিয়াছিল, বাবু ফিরিবেন পরশু কিম্বা তরশু কিম্বা তাহার পরের দিন নিশ্চয়। কিন্তু এই তাহার পরের দিনের নিশ্চয়তাকে সমস্ত দিন ধরিয়া পরীক্ষা করিবার মত শক্তি আর অচলার ছিলনা। এই তিন দিনের মধ্যে রামবাবু একদিনও আসেন নাই। তাঁহার আসাটাকে সে সর্ব্বান্তঃকরণে ভয় করিয়াছে, অথচ, এই না-আসার নিহিত অর্থকে কল্পনা করিয়াও তাহার দেহ কাঠ হইয়া গেছে। তিনি অসুস্থ ছিলেন, এবং ইতিমধ্যে পীড়া যে বাড়িতেও পারে এ কথা তাহার মনেও উদয় হয় নাই। কেবল আজ সকালে ও বাড়ীর দরওয়ান আসিয়াছিল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে পাঁড়েজীর নিকট হইতেই বিদায় লইয়া ফিরিয়া গেছে। সে কেন আসিয়াছিল, কি খবর লইয়া গেল, কোন কথা অচলা ভয়ে কাহাকেও জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিতে পারিলনা, কিন্তু তাহার পরে হইতেই এই বাড়ী এই ঘর-দ্বার এই সব লোকজন সমস্ত হইতে ছুটিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে, তাহার এমনি মনে হইতে লাগিল।

বেহারাকে ডাকিয়া কহিল, রঘুবীর, তোমার বাড়ী ত এই দিকেই, তুমি মাঝুলি গ্রামটা জানো?

সে কহিল, অনেক কাল পূর্ব্বে একবার বরিয়াত গিয়েছিলাম মাইজী।

কতদূর হবে বল্‌তে পারো?

রঘুবীর এ দেশের লোক হইলেও বহুদিন বাঙালীর বাড়ী কাজ করিয়াছে, তাহার অনেকটা হিসাব বোধ ছিল; সে মনে মনে আন্দাজ করিয়া কহিল, ক্রোশ ছয় সাতের কম নয়।

আজ তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারো?

রঘুবীর ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি যাবে মাইজী? সেখানে যে ভারি পিলেগের বেমারী?

অচলা কহিল, তুমি না যেতে পারো, আর কোন চাকরকে রাজী করিয়ে দিতে পারো? সে যা বখ্‌শিস্ চায় আমি দেবো।

রঘুবীর ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, মাইজী তুমি যেতে পারবে, আর আমি পারবনা? কিন্তু রাস্তা নেই, আমাদের ভারি গাড়ী ত যাবে না। এক্কা কিম্বা খাটুলি,—তার কোনটাতেই ত তুমি যেতে পারবে না মাইজী।

অচলা কহিল, যা জোটে আমি তাতেই যেতে পারবো। কিন্তু আর ত দেরি করলে চল্‌বে না, রঘুবীর। তুমি যা' পাও একটা নিয়ে এসো।

রঘুবীর আর তর্ক না করিয়া অল্পকালের মধ্যেই একটা খাটুলি সংগ্রহ করিয়া আনিল, এবং নিজের লোটা-কম্বল লাঠিতে ঝুলাইয়া সেটা কাঁধে ফেলিয়া বীরের মতই পদব্রজে সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। বাড়ীর খবরদারির ভার দরওয়ান ও অন্যান্য ভৃত্যদের উপরে দিয়া কোন্ এক অজানা মাঝুলির পথে অচলা যখন একমাত্র সুরেশকেই লক্ষ্য করিয়া আজ গৃহের বাহির হইল, তখন, সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার নিজের কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত স্বপ্নের মত ঠেকিতে লাগিল। তাহার বার বার মনে হইল এই বিচিত্র জগতে এমন ঘটনাও একদিন ঘটিবে এ কথা কে ভাবিতে পারিত!

ধুলা বালির কাঁচা পথ একটা আছে। কিন্তু কখনও তাহা সুবিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে অস্পষ্ট, কখনও বা ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে লুপ্ত, অবরুদ্ধ। গৃহস্থের সুবিধা ও মর্জ্জি মত তাহার আয়তন ও উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া কখনো বা নদীর ধার দিয়া, কখনো বা গৃহ-প্রাঙ্গণের উপর দিয়াই সে গ্রামান্তরে চলিয়া গেছে। প্রথম কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহার কৌতূহল মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া উঠিতেছিল। একটা মৃতদেহ একখণ্ড বাঁশে বাঁধিয়া কয়েকজন লোককে নিকট দিয়া বহন করিয়া যাইতে দেখিয়া সংক্রমণের ভয়ে তাহার দেহ সঙ্কুচিত হইয়াছিল, ইচ্ছা করিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিয়া লয় কিসে মরিয়াছে, ইহার বয়স কত, এবং কে-কে আছে। কিন্তু পথের দূরত্ব যত বাড়িয়া চলিতে লাগিল, বেলা যত পড়িয়া আসিতে লাগিল এবং কাছে ও দূরে গ্রামের মধ্যে হইতে কান্নার রোল যত তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল, ততই সমস্ত মন যেন কি একপ্রকার জড়তায় ঝিমাইয়া পড়িতে লাগিল। বহুক্ষণ হইতে তাহার তৃষ্ণা বোধ হইয়াছিল, এইখানে কতকটা পথ নদীর উচ্চ পাড়ের উপর দিয়া যাইতে দেখিতে একটা ঘাটের কাছে আসিয়া সে ডুলি থামাইয়া অবতরণ করিল, এবং হাত-মুখ ধুইয়া জল খাইবার জন্য নীচে নামিতেই তাহার চোখে পড়িল গোটা দুই অর্দ্ধ গলিত শব অনতিদূরে আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। ইহাদের বীভৎস বিকৃতি তাহার মনের উপর এখন কোন আঘাতই করিলনা। অত্যন্ত সহজেই সে হাত-মুখ ধুইয়া জল খাইয়া ধীরে ধীরে গিয়া তাহার খাটুলিতে বসিল। কোন অবস্থাতেই ইহা যে তাহার পক্ষে সম্ভবপর, কিছুকাল পূর্ব্বে এ কথা বোধ করি সে চিন্তাও করিতে পারিতনা।

ইহার পর হইতে প্রায় গ্রামগুলাই পরিত্যক্ত, শূন্য; কদাচিৎ কোন অত্যন্ত দুঃসাহসী ব্যক্তি ভিন্ন যে যেথায় পারিয়াছে পলায়ন করিয়াছে। কোথাও শব্দ নাই, সাড়া নাই, ঘরদ্বার রুদ্ধ অপরিচ্ছন্ন,—মনে হয় যেন এই কুটীরগুলা পর্য্যন্ত মরণকে অনিবার্য্য জানিয়া চোখ বুজিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। এই মৃত্যু শাসিত নির্জ্জন পল্লীগুলার ভিতর দিয়া চলিতে রঘুবীর ও বাহকদিগের চাপা গলা এবং ত্রস্ত ভীত পদক্ষেপ প্রতি মুহূর্ত্তেই অচলাকে বিপদের বার্ত্তা জানাইতে লাগিল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার ভয়ই হইল না, ইহার সহিত তাহার যেন কোন্ আজন্ম পরিচয় আছে, সমস্ত অন্তঃকরণ এম্‌নি নির্বিকার হইয়া রহিল।

এই ভাবে বাকি পথটা অতিবাহিত করিয়া ইহারা যখন মাঝুলিতে উপস্থিত হইল তখন বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে। অচলার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাহাদের পথের দুঃখ পৌঁছানোর সঙ্গেসঙ্গেই অবসান হইবে। গ্রামের কৃতজ্ঞ নর-নারী ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়া ডাক্তার সাহেবের দরবারে লইয়া যাইবে,—তথায় রোগী ও তাহাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের আনাগোনায়, ঔষধ ও পথ্যের বিতরণের ঘটায় সমস্ত স্থানটা ব্যাপিয়া যে সমারোহ চলিতেছে তাহার মধ্যে অচলার নিজের স্থানটা যে কোথায় হইবে ইহার চিত্রটা সে একপ্রকার কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আসিয়া দেখিল তাহার কল্পনা কেবল নিছক

কল্পনাই। তাহার সহিত ইহার কোথাও কোন অংশে মিল নাই, বরঞ্চ যে চিত্র পথের দুই ধারে দেখিতে দেখিতে সে আসিয়াছে এখানেও সেই ছবি। এখানেও পথে লোক নাই, বাড়ী-ঘর-দ্বার রুদ্ধ, ইহার কোথায় কোন্ পল্লীতে যে সুরেশ বাসা করিয়াছে, খুঁজিয়া পাওয়াই যেন কঠিন।

এই গ্রামে প্রত্যহ একটা হাট আজও বসে বটে, এবং অন্য সময়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পুরা দমে চলিতেও থাকে সত্য, কিন্তু, এখন দুর্দ্দিনের বেচা-কেনা সারিয়া লোকজন অপরাহ্নের বহুপূর্ব্বেই পলাইয়াছে,—ভাঙা হাটের স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন পড়িয়া আছে মাত্র।

রঘুবীর খোঁজাখুঁজি করিয়া একটা দোকান বাহির করিল। বৃদ্ধ দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করিতেছিল, সে কহিল তাহার ছেলে-মেয়েরা সবাই স্থানান্তরে গিয়াছে, কেবল তাহারা দুইজন বুড়া-বুড়ী দোকানের মায়া কাটাইয়া আজিও যাইতে পারে নাই। সুরেশের সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র সন্ধান দিতে পারিল যে, ডাক্তারবাবু নন্দপাড়ের নিমতলার ঘরে এতদিন ছিলেন বটে, কিন্তু এখনও আছেন, কিম্বা মামুদপুরে চলিয়া গেছেন সে অবগত নয়।

মামুদপুর কোথায়?

সিধা ক্রোশ দুই দক্ষিণে।

নন্দপাড়ের বাড়ীটা কোন্ দিকে?

বৃদ্ধ বাহির হইয়া দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একটা বিপুল নিমগাছ দেখাইয়া দিয়া কহিল, এই পথে গেলেই দেখা যাইবে।

অনতিকাল পরে ভীত পরিশ্রান্ত বাহকেরা যখন নিমতলায় আসিয়া খাটুলি নামাইল তখন সূর্য্য অস্ত গেছে। বাড়ীটা বড়; পিছনের দিকে দুই একটা পুরাতন ইঁটের ঘর দেখা যায়; কিন্তু অধিকাংশই খোলার। সম্মুখে প্রাচীর নাই,—চমৎকার ফাঁকা। গৃহস্বামীকে দরিদ্র বলিয়াও মনে হয়না, কিন্তু একটা লোকও বাহির হইয়া আসিল না। কেবল প্রাঙ্গণের একধারে বাঁধা একটা টাটু ঘোড়া ক্ষুৎপিপাসার নিবেদন জানাইয়া অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে অতিথিদের অভ্যর্থনা করিল।

সদর দরজা খোলা ছিল, রঘুবীর সাহস করিয়া ভিতরে পা বাড়াইতেই দেখিতে পাইল পাশের বারান্দায় চারপাইয়ের উপর সুরেশ শুইয়া আছে, এবং কাছেই খুঁটিতে ঠেস দিয়া একজন অতিবৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে।

বাবুজী?

সুরেশ চোখ মেলিয়া চাহিল, এবং কনুয়ের ভর দিয়া মাথা তুলিয়া ক্ষণকাল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল, কে বেয়ারা? রঘুবীর?

রঘুবীর সেলাম করিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু প্রভুর রক্ত-চক্ষুর প্রতি চাহিয়া তাহার মুখে কথা সরিলনা।

তুই এখানে?

রঘুবীর পুনরায় সেলাম করিল, এবং বাহিরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া শুধু কেবল বলিল, মাইজী—

এবার সুরেশ বিস্ময়ে সোজা উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোকে পাঠিয়েছেন?

রঘুবীর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না, তিনি নিজেই আসিয়াছেন।

জবাব শুনিয়া সুরেশ এমন করিয়া তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল, যেন কথাটাকে ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহার বিলম্ব হইতেছে। তার পরে চোখ বুজিয়া ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল,—কিছুই বলিলনা।

অচলা আসিয়া যখন নীরবে খাটিয়ার একধারে তাহার পায়ের কাছেই উপবেশন করিল, তখন কিছুক্ষণের নিমিত্ত সে তেমনই নিমিলিত-নেত্রে মৌন হইয়া রহিল, ভদ্রতা রক্ষা করিতে সামান্য একটা এসো, বলিয়াও ডাকিতে পারিলনা। শিশুকাল হইতে চিরদিন অত্যধিক যত্ন-আদরে লালিত-পালিত হইয়া আবেগ ও প্রবৃত্তির বশেই সে চলিয়াছে, ইহাদের সংযত করার শিক্ষা তাহার কোন কালে হয় নাই। এই শিক্ষা জীবনে সে প্রথম পাইয়াছিল কেবল সেই দিন, যে দিন তাহার মুখের হাসিকে পদাঘাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া মহিম ঘরে চলিয়া গেল। সে দিন এক নিমিষে তাহার বুকের মধ্যে যে কি বিপ্লব নীরবে বহিয়া গেল সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিয়াছিলেন, এবং আজও কেবল তিনিই দেখিতে লাগিলেন ওই শান্ত অচঞ্চল দেহটার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া কত বড় ঝড় প্রবাহিত হইতেছে। সেদিনও মহিমের আঘাতকে সে যেমন করিয়া সহ্য করিয়াছিল, আজও তেমনি করিয়াই সে তাহার উন্মত্ত আবেগের সহিত

নিঃশব্দে লড়াই করিতে লাগিল,—তাহার লেশমাত্র আক্ষেপ প্রকাশ পাইতে দিলনা।

এমন করিয়া যে কতক্ষণ কাটিত বলা যায়না, কিন্তু বাহকদের আহ্বানে রঘুবীর বাহিরে চলিয়া গেলে সেই পদশব্দে সুরেশ ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল। কহিল, তুমি আমার চিঠি পেয়েছ ?

অচলা মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, না।

সুরেশ একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, চিঠি না পেয়েই এসেছ,—আশ্চর্য্য! যাই হোক্, এ ভালই হল যে, একবার দেখা হল। বলিয়া একটা কথার জন্য তাহার আনত মুখের প্রতি এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া নিজেই কহিল, আমার জন্যে তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হ'ল—খুব সম্ভব, যতদিন বাঁচবে এর জের মিটবেনা,—কিন্তু মস্ত ভুল হয়েছিল এই যে, মহিমকে তুমি যে এতটা বেশি ভালবাসতে তা আমিও বুঝিনি, বোধ হয় তুমিও কোনদিন বুঝতে পারোনি! না?

কিন্তু অচলা তেমনি অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল দেখিয়া সে আবার বলিল, তাছাড়া, আমার বিশ্বাস মানুষের মন বলে স্বতন্ত্র কোন একটা বস্তু নেই। যা আছে সে এই দেহটারই ধর্ম্ম। ভালবাসাও তাই। ভেবেছিলাম তোমার দেহটাকে কোনমতে পেলে মনটাও পাবো, তোমার ভালবাসাও দুষ্প্রাপ্য হবেনা—কে জানে, হয়ত, সত্যিই কোনদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ত—হয়ত, যা সর্ব্বস্ব দিয়ে এমন করে চেয়েছিলাম তাই তুমি একদিন নিজের ইচ্ছেয় আমাকে ভিক্ষে দিতে! কিন্তু আর তার সময় নেই;—আমি অপেক্ষা করবার অবসর পেলাম না। এই বলিয়া সে পুনরায় কনুয়ে ভর দিয়া মাথা তুলিল, এবং, সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকের মধ্যে নিজের দুই চক্ষের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করিয়া অচলার আনত মুখের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

একজনের এই একাগ্র দৃষ্টি আর একজনের সন্নত দৃষ্টিকে যেন আকর্ষণ করিয়া তুলিল,—কিন্তু পলক মাত্র। অচলা তৎক্ষণাৎ চোখ নামাইয়া লইয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে অত্যন্ত লজ্জার সহিত কহিল, এ দেশ থেকে ত সবাই পালিয়েছে—এখানকার কাজ যদি তোমার শেষ হয়ে থাকে ত বাড়ী,—কিম্বা আরও ত কত দেশ আছে,—তুমি চল, ডিহরীতে আমি আর একদণ্ড টিকতে পাচ্চিনে।

সে আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে? এই বলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুরেশ বালিশে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল, এবং কিছুক্ষণ নিঃশব্দে স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, অনেক কষ্টে আজ সকালে দুখানা চিঠি পাঠাতে পেরেছি। একখানা তোমাকে আর একখানা মহিমকে। সে যদি না এর মধ্যে চলে গিয়ে থাকে ত নিশ্চয় আসবে আমি জানি।

শুনিয়া অচলা ভয়ে, বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল, কহিল, তাঁকে কেন?

সুরেশ তেমনি ধীরে ধীরে বলিল, এখন তাকেই আমার একমাত্র প্রয়োজন। ছেলেবেলা থেকে সংসারের মধ্যে অনেকদিন অনেক গ্রন্থিই পাকিয়েচি, আর তাদের খোলবার জন্যে এই মানুষটিকে চিরদিন আবশ্যক হয়েছে। তাই আজও তাকেই আমার ডাক দিতে হয়েছে। এত ধৈর্য্য পৃথিবীতে আর ত কারও নেই!

অচলার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল, কিন্তু সে অধোমুখে স্থির হইয়াই শুনিতে লাগিল। সুরেশ বলিল, আমার চিঠির মধ্যে প্রায় সব কথাই লেখা আছে,—পড়লেই টের পাবে। সেদিন তোমার হাতে আমার সমস্ত সম্পত্তির পাকা উইলখানাই দিয়েছি। ইচ্ছে করলে তার অনেক জিনিসই তুমি নিতে পারো,—কিন্তু আমি বলি, নিয়ে কাজ নেই। বরঞ্চ আমি বেঁচে থাকলেও যেমন গরীব দুঃখীরাই সমস্ত পেতো, আমার মরণের পরেও যেন তারাই পায়। আমার কিছুর সঙ্গেই আর তুমি নিজেকে জড়িয়ে রেখোনা, অচলা,—তুমি নিশ্চিন্ত হও, নির্ব্বিঘ্ন হও,—আমার সমস্ত সংস্রব থেকে তুমি নিজেকে যেন সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন করতে পারো! চেষ্টা করলে পৃথিবীতে অনেক দুঃখই সহা যায়,—আমার দেওয়া দুঃখও যেন একদিন তুমি অনায়াসে সইতে পারো।

তাহার আচরণে ও কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে অচলার মনের মধ্যে আসিয়া পর্য্যন্তই কেমন যেন ভয়-ভয় করিতেছিল, এই শেষের কথাটায় সে যথার্থই ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি এসব কথা তুলচ কেন? উঠে বোসোনা! যাতে আমরা এখনি বার-হয়ে পড়তে পারি, তার উদ্যোগ করে দাওনা।

তাহার আশঙ্কা ও উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়াও সুরেশ কোন উত্তর দিল না। যে বৃদ্ধা খুঁটি ঠেস দিয়া ঝিমাইতেছিল, সে, সজাগ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু এখন ঘরের মধ্যে যাইবেন, না, আলোটা বাহিরেই আনিয়া দিবে, —তাহারও কোন জবাব দিলনা; মনে হইতে লাগিল সহসা যেন সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। উদ্বিগ্ন অচলা তাহার পূর্ব্ব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিতে যাইতেছিল, সুরেশ চোখ মেলিয়া অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, এখনও তোমাকে আমার আসল কথাটাই বলা হয়নি, অচলা, আমি মরতে বসেছি,—আমার বাঁচবার বোধ করি আর কোন সম্ভাবনাই নেই।

প্রত্যুত্তরে শুধু একটা অস্ফুট, অব্যক্ত কণ্ঠস্বর অচলার গলা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তার পরেই সে মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুরেশ বলিতে লাগিল, আগে থেকেই আমি উইল করে রেখেচি বটে, কিন্তু কেউ যদি মনে করে আমি ইচ্ছে করে মরচি, সে অন্যায়, সে মিথ্যা—সে আমার মরার বেশি ব্যথা হবে। আমি সতর্কতার এতটুকু ত্রুটি করিনি,—কিন্তু কাজে লাগ্‌লনা। যদি কখনো তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, তাদের তুমি এই কথাটা বোলো যে,—সংসারে আরও পাঁচজনের যেমন মৃত্যু হয়, তাঁরও মৃত্যু তেম্‌নি হয়েছে—মরণকে কেবল এড়াতে পারেননি বলেই মরেছেন, নইলে মরবার ইচ্ছে তাঁর ছিলনা।—মরণের মধ্যে আমার কোন হাত, কোন বিশেষত্ব ছিল, এই অপবাদটা আমাকে যেন কেউ না দেয়!

অচলা কিছুই বলিল না। কথা কহিবার শক্তি যে তাহার শুকাইয়া গিয়াছিল এ কথা সেই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে তাহার ভয়ার্ত্ত পাণ্ডুর মুখের প্রতি চাহিয়া সুরেশ ধরিতে পারিলনা। ক্ষণকাল আপনাকে সে সম্বরণ করিয়া লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আমি না এসে থাক্‌তে পারিনে বলেই তোমাকে লুকিয়ে সেদিন ভোরবেলায় পালিয়ে এসেছিলুম। এসে দেখি গ্রাম প্রায় শূন্য। এ বাড়ীতে একটা চাকর মরেছে, এবং তার কোন গতি না করেই বাড়ীশুদ্ধ সবাই পালাতে উদ্যত হয়েছে। তাদের নিরস্ত করতে পারলুম না বটে, কিন্তু মড়াটার একটা উপায় হল। ফিরে এসে ভাবলুম আমিও বাড়ী চলে যাই; কিন্তু দুপুরবেলায় মামুদপুর থেকে একটা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে এসে জানালে তার মায়ের অসুখ। তাকে অস্ত্র করতে গিয়েই নিজের এই বিপদ ঘটালুম। এমন অনেক ত করেছি, আমি সাবধানও কম নয়, কিন্তু এবার দুর্ভাগ্য এম্‌নি যে একার চাকায় বুড়ো আঙুলের পিছনটা যে ঘসে গিয়েছিল সেটা কেবল চোখে পড়ল হাতের রক্ত ধুতে গিয়ে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে যা করবার সমস্তই করলুম, বাড়ী যাবার উপায় থাক্‌লে আমি চলেই যেতুম, কিছুতেই থাক্‌তুমনা, কিন্তু কোন উপায় করতে পারলুম না।' কাল রাত্রে জ্বর বোধ হ'ল,—এ যে কিসের জ্বর, সে যখন বুঝতে আর বাকি রইলনা, তখন অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় একটা লোক দিয়ে তোমাদের দুজনকে দুখানা চিঠি লিখে পাঠিয়েছি।

অচলা অশ্রু-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কিন্তু এখন ত উপায় আছে,—আমার ডুলিতে নিয়ে তোমাকে এখনি আমি বেরিয়ে পড়ব—আর একমুহূর্ত্ত থাক্‌তে দেবনা।

কিন্তু তুমি?

আমি হেঁটে যাবো,—যেমন করে পারি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবো,—আমার কথা তুমি কিছুতে ভাব্‌তে পাবেনা।

হেঁটে যাবে? এতটা পথ?

তোমার পায়ে পড়ি তুমি আর বাধা দিয়োনা,—বলিতে বলিতেই অচলা কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরেশ পলকমাত্র মৌন হইয়া রহিল, তার পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা, তাই চল। কিন্তু বোধ হয় এর আর প্রয়োজন ছিলনা।

অচলা বাহিরে আসিয়া দেখিল গাছতলায় বসিয়া রঘুবীর নীরবে চনা-ভাজা চর্ব্বণ করিতেছে। কহিল, রঘুবীর, বাবুর বড় অসুখ, তাঁকে এখখুনি নিয়ে যেতে হবে। ডুলি-ওয়ালাদের বল তারা যত টাকা চায় আমি তার ঢের বেশি দেব—কিন্তু আর এক মিনিটও দেরি নয়।

প্রভু-পত্নীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে রঘুবীর চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কিন্তু তারা ত দুজনকে বইতে পারবেনা মাইজী!

না না, দুজনকে নয়, দুজনকে নয়। আমি হেঁটে যাবো,—কিন্তু আর এক মিনিটও দেরি চল্‌বে না রঘুবীর, তুমি শীগ্‌গীর যাও,—কোথায় তারা?

রঘুবীর কহিল, ভাড়ার টাকা নিয়ে তারা দোকানে গেছে খাবার কিনতে। আমি এখুনি ডেকে আনচি মাইজী—বলিয়া সে অভুক্ত চানাভাজা গাত্রবস্ত্রের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে একপ্রকার ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া অচলা সুরেশের শিয়রে বসিল, এবং হাত দিয়া তাহার কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মুনিয়ার মা কেরোসিনের ডিপা জ্বালিয়া অনতিদূরে মেঝের উপর রাখিয়া গিয়াছিল, তাহার অপর্য্যাপ্ত ধূমে সমস্ত স্থানটা কলুষিত হইয়া উঠিতেছিল, সেইটা সরাইতে গিয়া একটা ঔষধের শিশি অচলার চোখে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, এ কি তোমার ওষুধ?

সুরেশ বলিল, হাঁ, আমারই। কাল নিজেই তৈরি করেছিলুম, কিন্তু খাওয়া হয়নি। দাও—

কথাটা অচলাকে তীব্র আঘাত করিল, কিন্তু না খাওয়ার হেতু লইয়াও আর সে কথা বাড়াইতে ইচ্ছা করিলনা। ঔষধ দিয়া শিয়রে আসিয়া সে আবার তেমনি নীরবে উপবেশন করিল। অনেকক্ষণ হইতেই সুরেশ মৌন হইয়া ছিল, কিন্তু সে যে নিঃশব্দে কতবড় যাতনা সহিতেছে ইহাই উপলব্ধি করিয়া অচলার বুক ফাটিতে লাগিল।

বিলম্ব হইতেছে,—রঘুবীরের দেখা নাই। মাঝে মাঝে সে পা টিপিয়া উঠিয়া গিয়া দরজায় মুখ বাড়াইয়া অন্ধকারে যতদূর দেখা যায় দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও কাহারও সাড়া নাই। অথচ, পাছে এই উৎকণ্ঠা তাহার কোনমতে সুরেশের কাছে ধরা পড়িয়া যায় এই ভয়েও সে ব্যাকুল হইয়া রহিল।

রাত্রি বাড়িয়া যাইতে লাগিল, খুঁটির কাছে মুনিয়ার মায়ের নাসিকা ডাকিয়া উঠিল,—এমন সময়ে ক্ষুধিত পথশ্রান্ত রঘুবীর ভগ্নদূতের ন্যায় উপস্থিত হইয়া ম্লান মুখে জানাইল, বেহারারা ডুলি লইয়া বহুক্ষণ চলিয়া গেছে, কোথাও তাহাদের সন্ধান মিলিলনা।

অচলা সমস্ত ভুলিয়া বিকৃত-কণ্ঠে বারম্বার প্রশ্ন করিতে লাগিল, তাহারা কখন্ গেল? কোন্ পথে গেল? এবং কি জন্য গেল? আমাদের যা' কিছু আছে সমস্ত দিলেও কি আর একখানা সংগ্রহ করা যায় না?

রঘুবীর অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। এই নিদারুণ বিপত্তি তাহারই অবিবেচনায় ঘটিয়াছে ইহা সে জানিত তাই, সে তাহার প্রাণপণ চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া তবেং ফিরিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু আরও একজন তাহারি মত নিঃশব্দে স্থির হইয়া শয্যার পরে পড়িয়া রহিল। এই চঞ্চলতার লেশমাত্রও যেন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। রঘুবীর চলিয়া গেলে সে আস্তে আস্তে বলিল, ব্যস্ত হয়ে কি হবে অচলা, তাদের পেলেও কোন লাভ হোতনা। এই ভাল,—আমার এই ভাল।

আর অচলা কথা কহিলনা, কেবল সেই অনন্ত পথ-যাত্রীর তপ্ত ললাটে ডান হাতখানি রাখিয়া পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় স্থির হইয়া রহিল।

তাহার চারিদিকে জনহীন পুরী মৃত্যুর মত নির্ব্বাক হইয়া আছে, বাহিরে গভীর রাত্রি গভীরতর হইয়া চলিয়াছে, চোখের উপর কালো আকাশ গাঢ় হইয়া উঠিতেছে,—সেইদিকে চাহিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ইহার কি প্রয়োজন ছিল! ইহার কি প্রয়োজন ছিল!

এই যে তাহার জীবন-কুরুক্ষেত্র ঘেরিয়া এতবড় একটা কদর্য্য সংগ্রাম চলিয়াছে, সংসারে ইহার কি আবশ্যক ছিল? দুনিয়ার সমস্ত জ্বালা, সমস্ত হীনতা, সকল স্বার্থ মিটাইয়া সে কি ওই রাত্রির মত আজই শেষ হইয়া যাইবে? তারপরে সমস্ত জীবনটা কি তাহার কুরুক্ষেত্রের মত কেবল শ্মশান হইয়াই যুগ-যুগ পড়িয়া রহিবে? এখানে কি চিতার দাহ-চিহ্ন কোনদিন মিলাইবে না? পৃথিবীতে ইহাও কি প্রয়োজনের মধ্যে?

কিন্তু এ কুরুক্ষেত্র কেন বাধিল? কে বাধাইল? এই যে মানুষটি তাহার সকল ঐশ্বর্য্য, সকল সম্পদ, সকল আত্মীয়-পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এমন একান্ত নিরুপায়ের মরণ মরিতে বসিয়াছে, এই কি কেবল এতবড় বিপ্লব একা ঘটাইয়াছে? আর কি কাহারও মনের মধ্যে লুকাইয়া কোন লোভ, কোন মোহ ছিল না? কোথাও কোন পাপ কি আর কেহ করে নাই?

কিন্তু সহসা চিন্তাটাকে সে যেন সজোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া একটুখানি নড়িয়া চড়িয়া উঠিল।—কে যেন দুইহাতে চাপিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিতে বসিয়াছিল। সেই সময় সুরেশও

জল চাহিল। হেঁট হইয়া মুখে তাহার জল দিয়া আবার অচলা স্থির হইয়া বসিল। তাহার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, —চোখ হইতে নিদ্রার আভাসটুকু পর্য্যন্ত যেন তিরোহিত হইয়া গেছে। সেই দুটি শুষ্ক চোখ মেলিয়া আবার সে নীরব আকাশের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। বহুদিন পূর্ব্বে অনেক "যত্ন" করিয়া সে মহাভারতখানি শেষ করিয়াছিল,—আজ তাহারই শেষ সর্ব্বনাশ যেন তাহারই মনের মধ্যে ছায়াবাজির ন্যায় প্রবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। সেখানে যেন কত রক্ত ছুটিতেছে, কত অজানা লোক মিলিয়া কাটা-কাটি মারা-মারি করিয়া মরিতেছে,—কত শত-সহস্র চিতা জ্বলিতেছে নিবিতেছে,—তাহার ধূমে ধূমে সমস্ত স্বর্গ-মর্ত্ত একেবারে যেন আচ্ছন্ন-একাকার হইয়া গেছে!

কিছুক্ষণের জন্য সুরেশ বোধ হয় তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার সাড়া ছিলনা। কিন্তু এমন করিয়া যে কতক্ষণ গেল, কি করিয়া বাহিরে যে সময় কাটিতে লাগিল, কি করিয়া যে রাত্রি প্রভাতের পথে অগ্রসর হইতেছিল, সে দিকেও অচলার চৈতন্য ছিলনা। তাহার নিমিলিত চক্ষের কোন বহিয়া জল পড়িতেছিল, যুক্ত হাত দুটি সুরেশের বালিশের উপর পড়িয়া,—সে একান্ত মনে বলিতেছিল, হে ঈশ্বর! আমি অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা পাইয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখ সকল ব্যথার পরিবর্ত্তে এঁকে তুমি ক্ষমা করিয়া কোলে তুলিয়া লও! আমার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্বামী নাই,—এতবড় লজ্জা লইয়া কোথাও আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমি কত যে সহিয়াছি সে তো তুমি জানো,—আর আমাকে বাঁচিতে দিয়োনা, প্রভো! আমাকেও তোমার কাছে টানিয়া লও!

কথাগুলি সে যে কত ভাবে, কত রকমে মনে মনে আবৃত্তি করিল তাহার অবধি নাই,—অশ্রুজলও যে কত ঝরিয়া পড়িল তাহারও সীমা নাই।

মাইজী?

তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে, অচলা চমকিয়া দেখিল রঘুবীর কাহার যেন প্রবেশের অপেক্ষায় সদর দরজা উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কি রঘুবীর? বলিয়াই যাহার সহিত তাহার চোখে-চোখে দেখা হইয়া গেল সে মহিম। একবার সে কাঁপিয়া উঠিয়াই দৃষ্টি অবনত করিল। দ্বারের কাছে মুহূর্ত্তের জন্য মহিমেরও পা উঠিল না, এখানে এমন করিয়া যে আবার তাহার সহিত দেখা হইবে ইহা সে প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু পরক্ষণেই ধীরে ধীরে সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এখন সুরেশ কেমন আছে?

অচলা মুখ তুলিলনা, কথা কহিলনা, শুধু মাথা নাড়িয়া বোধ হয় ইহাই জানাইতে চাহিল, সে ইহার কিছুই জানেনা।

মিনিট খানেক স্থির থাকিয়া মহিম সুরেশের ললাট স্পর্শ করিতেই সে চোখ মেলিয়া চাহিল। সেই জ্যোতিহীন রক্তনেত্রের প্রতি চাহিয়া মহিমের গলা দিয়া সহসা স্বর ফুটিলনা। তার পরে কহিল, কেমন আছ সুরেশ?

ভাল না,—চল্লুম। তুমি আস্‌বে আমি জানি,—আমার সুমুখে এসে বোস। মহিম উঠিয়া গিয়া শয্যার একাংশে তাহার পায়ের কাছে বসিল। বলিল, ডিহিরিতে ডাক্তার আছে, আমার একান্ত কোন মতে—

সুরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আর টানা-টানি করো না,—মজুরি পোষাবে না। আমাকে quietly যেতে দাও।

কিন্তু এখনো ত—

হাঁ, এখনো হুঁস আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল হচ্চে। আমার জীবনটা গরীব-দুঃখীর কাজে লাগাতে পারলুমনা, কিন্তু সম্পত্তিটা যেন তাদের কাজে লাগে, মহিম। তাই কষ্ট দিয়ে এত দূরে তোমাকে টেনে এনেছি, নইলে, মৃত্যুকালে ক্ষমা চেয়ে কাব্য করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

মহিম নীরব হইয়া রহিল। সুরেশ বলিতে লাগিল, ও-সব আমি বিশ্বাসও করিনে, ভালও বাসিনে। একটা দিনের ক্ষমার প্রতি আমার লোভও নেই। ভাল কথা, একটা উইল আছে। অচলাকে আমি কিছুই দিইনি,—আর তাকে অপমান করতে আমার হাত উঠ্‌লনা। তবে, দরকার বোঝ ত সামান্য কিছু দিয়ো।

মহিম ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, আর আমাকে কেন এর মধ্যে জড়াচ্চো সুরেশ?

সুরেশ বলিল, ঠিক এই জন্যেই যে তোমাকে জড়ানো

যায় না। যার লোভ নেই, যার ন্যায়ান্যায়ের বিচার—হঠাৎ উপরের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া কহিল, কিন্তু সারারাত তুমি বসে আছ অচলা,—যাও, হাত-মুখ ধোওগে। মুনিয়ার মা সমস্ত দেখিয়ে দেবে,—যাও—

সে উঠিয়া গেলে কহিল, কেবল একটা জিনিসের জন্যে আমার ভারি দুঃখ হয়। অচলা যে তোমাকে কত ভালবাসত সে আমিও বুঝিনি, তুমিও বোঝোনি,—ও নিজেও বুঝতে পারেনি। সেটা তোমার দারিদ্র্যের সঙ্গে এম্নি ঘুলিয়ে উঠল যে,—থাক্। এমন সুন্দর জিনিসটি মাটি করে ফেল্‌লুম,—না পেলুম নিজে, না পেতে দিলুম অপরকে। কিন্তু কি আর করা যাবে! পিসিমাকে একটু দেখো,—শোকটা তাঁর ভারি লাগ্‌বে।

বৃদ্ধা মুনিয়ার মা ঔষধের শিশি লইয়া কাছে দাঁড়াইতেই সে উত্যক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, না না, আর ওষুধ নয়। একটু জল দে। একটা নাটক লিখ্‌তে আরম্ভ করেছিলুম, মহিম, আমার ড্রয়ারে আছে,—পার ত পোড়ো।

মহিম তাহার মুখের পানে চাহিতে পারিতেছিলনা, অধোমুখে শুনিতেছিল,—এইবার চোখ তুলিয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সুরেশ থামাইয়া দিয়া বলিল, আর না, মহিম, একটু ঘুমুই। খাবার-দাবার সমস্ত জোগাড় আছে, কিন্তু সে তো তোমাদের ভাল লাগ্‌বে না—বলিয়া সে চোখ বুজিল।

মহিম ক্ষণকাল চুপ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমার শেষ অনুরোধ একটা রাখ্‌বে সুরেশ?

কি?

তুমি ভগবানকে কোন দিন ভাবোনি, তাঁর কথা—

ও আমার ভাল লাগেনা। বলিয়া সুরেশ মুখখানা বিকৃত করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। মহিম প্রাণপণে একটা অদম্য দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

ত্রিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

রামবাবু বাড়ী ছিলেন না। পরদিন বক্সার হইতে ফিরিয়া মহিমের চিঠি পড়িয়া বাহির হইতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলেন না। সমস্ত পথ ঘোড়াটাকে নির্ম্মম ছুটাইয়া আধমরা করিয়া তুলিয়া যখন মাঝুলিতে পৌছিলেন, তখন বেলা অবসান হইতেছে। পুলিশের দারোগা ভাবিয়া বুড়া দোকানী স্বয়ং পথ দেখাইয়া নন্দ পাঁড়ের নিমতলায় আনিয়া উপস্থিত করিল, এবং একা হইতে অবতরণকালে সসম্মানে ঘোড়ার লাগাম ধরিল। ইহারই কাছে খবর পাইয়া জানিলেন অচলাও আসিয়াছে। সদর দরজা খোলা ছিল, ভিতরে পা দিয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে বাকি রহিল না। ঘণ্টা-দুই হইল সুরেশের মৃত্যু হইয়াছে। খাটিয়ার উপরে তাহার মৃতদেহ আপাদ-মস্তক চাপা দেওয়া, এবং অনতিদূরে পায়ের কাছে অচলা চুপ করিয়া বসিয়া।

অকস্মাৎ এই দৃশ্য বৃদ্ধ সহিতে পারিলেননা, মা গো! বলিয়া উচ্ছ্বসিত শোকে কাঁদিয়া উঠিলেন। অচলা মুখ তুলিয়া একবার চাহিল মাত্র, তারপরে তেম্নি অধোমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। এই আর্ত্ত কণ্ঠ যেন শুধু তাহার কানে গেল, কিন্তু ভিতরে পৌছিলনা।

মহিম বাটীর মধ্যে কাঠের সন্ধান করিতেছিল, ক্রন্দনের শব্দে বাহির হইয়া আসিল। কহিল, সুরেশ এই কতক্ষণ মারা গেল রামবাবু। আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, নইলে একলা বড় অসুবিধে হোতো।

রামবাবু নীরবে চোখ মুছিতে লাগিলেন। তিনি কি করিবেন, কি বলিবেন, কি করিয়া ওই মেয়েটার চোখের উপর এই ভীষণ নিদারুণ কার্য্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন তাহার কুল-কিনারা ভাবিয়া পাইলেন না।

মহিম কহিল, নদী দূরে নয়, রঘুবীর কিছু কিছু কাঠ বয়ে নিয়ে গেছে, আরও কিছু কাঠ পাওয়া গেছে,—সেইটে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা তিন জনেই ওকে নিয়ে যেতে পারবো। নইলে গ্রামে আর লোকও নেই, থাক্‌লেও বোধ হয় কেউ বাঙালীর মড়া ছোঁবেনা।

রামবাবু তাহা জানিতেন। অচলার অগোচরে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা দু'জন, আর কে?

মহিম বলিল, রঘুবীরও হয়ত সাহায্য করতে পারে।

শুনিয়া বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, না না, সে কিছুতেই হলে চল্‌বেনা। ব্রাহ্মণের শব আর কাকেও আমি ছুঁতে দিতে পারবনা। নদী যখন দূরে নয়, তখন আমাদের দু'জনকেই যেমন করে হোক্ নিয়ে যেতে হবে।

বেশ, তাই—বলিয়া মহিম পুনরায় ভিতরে গিয়া কাঠ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল; রামবাবু সেই বারান্দার এক প্রান্তে মুখ ফিরাইয়া খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তাঁহার বয়স হইয়াছে; এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে অনেক মৃত্যু দেখিয়াছেন, অনেক গভীর শোকের মধ্যে দিয়াও তাহাকে ধীরে ধীরে পথ চলিতে হইয়াছে। সুদুঃসহ দুঃখের যে করুণ সুর একে একে তাঁহার হৃদয়-বীণায় বাঁধা হইয়া গেছে, আজিকার এই ব্যাপারটা সেই তারে ঘা দিয়া যেন কেবলি বেসুরা বাজিতে লাগিল। একদিন এই সুরমাই জ্যাঠামশাই বলিয়া তাঁহার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিল,—সে ছবি তিনি ভুলেন নাই। আজিও তাঁহার পিতৃ-স্নেহ যেন সেই বস্তুটার লোভেই ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া মরিতে লাগিল। তাহাকে কি সান্ত্বনা দিবেন তিনি জানেননা, তাহাকে প্রবোধ দিবার মত সংসারে কোথায় কি আছে তাহাও তিনি অবগত নন, তবুও তাঁহার শোকাতুর মন যেন কেবলি চাহিতে লাগিল, একবার মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলেন, ভয় কি মা! আজও যে আমি বাঁচিয়া আছি!

কিন্তু, সে সুর বাজিল কই! তাঁহার সে তৃষ্ণা মিটাইতে কেহ ত একপদ অগ্রসর হইয়া আসিলনা! সুরমা যে তেমনি নীরবে, তেমনি দূরতম অনাত্মীয়ের ব্যবধান দিয়া আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিয়া দিল!

দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে, ইহাদের অনেক দুর্জ্জেয় বেদনা, নির্ব্বাক মর্ম্ম-পীড়ার পাশ দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে, প্রচ্ছন্ন রহস্যের ইঙ্গিত মাঝে মাঝে তাঁহাকে খোঁচা দিয়া গেছে,—কিন্তু, কোন দিন আপনাকে আহত হইতে দেন নাই,—সমস্ত সংশয় স্নেহের আবরণে চাপা দিয়া, বাহিরের আকাশ নির্ম্মল মেঘমুক্ত রাখিয়াছেন; কিন্তু আজ, সদ্য-বিধবার ওই একান্ত অপরিচিত নিষ্ঠুর ধৈর্য্য তাঁহার এত দিনের আড়াল-করা স্নেহের গা চিরিয়া কলুষের বাষ্পে হৃদয় যেন ভরিয়া দিতে লাগিল।

সূর্য্য অস্ত গেল। মহিম ও-দিকের কাজ একপ্রকার শেষ করিয়া কাছে আসিয়া কহিল, রামবাবু, এইবার ত ওকে নিয়ে যেতে হয়। অচলার দিকে ফিরিয়া বলিল, আলোটা জ্বেলে দিয়েছি,—তুমি মুনিয়ার মা'র কাছে বসে থাকো, আমাদের ফিরতে বোধ হয় খুব বিলম্ব হবেনা।

অচলা কোন কথাই বলিলনা। রামবাবু আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মাথা নাড়িলেন। অচলার আনত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রুদ্ধ স্বর পরিষ্কার করিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, মা, এ কথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু স্ত্রীর শেষ কর্ত্তব্য ত তোমাকেই করতে হবে। তোমাকেই ত মুখাগ্নি—বলিতে বলিতেই তিনি হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অচলা শুষ্কমুখ, এবং ততোঽধিক শুষ্ক চোখ দুটি বৃদ্ধের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া রহিল, তারপরে শান্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল, মুখাগ্নির আবশ্যক হয় ত, আমি করতে পারি। কিন্তু, হিন্দুধর্ম্মে এর যদি কোন সত্যকার ফল থাকে ত, আর আমি ব্যর্থ করতে চাইনে। আমি তাঁর স্ত্রী নয়।

রামবাবু বজ্রাহতের ন্যায় পলকহীন চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে আস্তে আস্তে বলিলেন, তুমি সুরেশের স্ত্রী নও?

অচলা তেমনি অবিচলিত স্বরে বলিল, না, উনি আমার স্বামী নয়।

চক্ষের নিমিষে রামবাবুর সমস্ত ঘটনা স্মরণ হইয়া গেল। তাঁহার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করা হইতে আরম্ভ করিয়া সে দিনের সেই মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার বিদ্যুদ্বেগে বারবার তাঁহার মনের মধ্যে আবর্ত্তিত হইয়া সংশয়ের ছায়ামাত্রও কোথাও অবশিষ্ট রহিলনা। এ কে, কার মেয়ে, কি জাত,—হয়ত বা বেশ্যা,—ইহাকে মা বলিয়াছেন, ইহার ছোঁয়া খাইয়াছেন,—ইহার হাতের অন্ন তাঁহার ঠাকুরকে পর্য্যন্ত নিবেদন করিয়া দিয়াছেন! কথাগুলা মনে করিয়া ঘৃণায় যেন সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার ক্লেদসিক্ত হইয়া গেল। এবং যে স্নেহ এতদিন তাঁহাকে শ্রদ্ধায়, মাধুর্য্যে, করুণায় অভিষিক্ত রাখিয়াছিল, মরুভূমির জলকণার ন্যায় সে যে কোথায় অন্তর্হিত হইল তাহার আভাস পর্য্যন্ত রহিলনা।

কিন্তু কেবল তিনিই নয়, মহিমও স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল, সে চকিত হইয়া কহিল, সে যখন হবার যো নেই রামবাবু, চলুন আমরা নিয়ে যাই।

চলুন, বলিয়া বৃদ্ধ স্বপ্ন-চালিতের ন্যায় অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিজের দুর্ঘটনার কাছে আর সমস্ত দুর্ঘটনাই একেবারে ছায়ার মত ম্লান হইয়া গেছে,—তাঁহার দুই কান জুড়িয়া কেবলি বাজিতেছে,—জাতি গেল, ধর্ম্ম গেল, এই মানব জন্মটাই যেন ব্যর্থ, বৃথা হইয়া গেল।

সুরেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেমন-তেমন করিয়া সমাধা করিতে অধিক সময় লাগিলনা। সমস্তক্ষণ রামবাবু একটা কথাও কহিলেননা, এবং ফিরিয়া আসিয়া সোজা এক্কা প্রস্তুত করিতে হুকুম দিলেন।

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি এখুনি যাচ্চেন?

রামবাবু বলিলেন, হাঁ। আমাকে ভোরের ট্রেনে কাশী যেতে হবে, এখন না বেরোলে সময়ে পৌছতে পারবনা।

তাঁহার মনের ভাব মহিমের অবিদিত ছিলনা। এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্যই যে তিনি কাশী ছুটিতেছেন ইহাও সে বুঝিয়াছিল, তাই অতিশয় সঙ্কোচের সহিত কহিল, আমি বিদেশী লোক এদিকের কিছুই জানিনে। দয়া করে যদি এঁর কোন যাবার ব্যবস্থা—কথাটা শেষ হইতে পাইলনা। অচলাকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাবে বৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন,—দয়া? আপনি কি ক্ষেপে গেলেন মহিমবাবু?

মহিম এ প্রশ্নের প্রতিবাদ করিলনা; সভয়ে, সবিনয়ে কহিল, বোধ হয় দু'তিনদিন ওঁর খাওয়াও হয়নি। এই মৃত্যুপুরীর মধ্যে ভয়ানক অসহায় অবস্থায় ফেলে যাওয়া—

তাহার এ কথাও শেষ করিবার সময় মিলিলনা। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের জন্মগত সংস্কার আঘাত খাইয়া প্রতিহিংসায় ক্রূর হইয়া উঠিয়াছিল; তাই তীব্র শ্লেষে বলিয়া উঠিলেন, ওঃ—আপনিও যে ব্রাহ্ম সেটা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু, মশাই যত বড় ব্রহ্ম-জ্ঞানীই হোন্ আমার সর্ব্বনাশের পরিমাণ বুঝ্‌লে ওই কুলটার সম্বন্ধে দয়া-মায়া মুখেও আন্‌তেননা। এই বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, যাক্, ব্রহ্মজ্ঞানে আর কাজ নেই,—প্রাণ বাঁচাতে চান ত উঠে বসুন,—যায়গা হবে।

মহিম নিঃশব্দে নমস্কার করিল। সর্ব্বনাশের পরিমাণ লইয়াও তর্ক তুলিলনা, প্রাণ বাঁচাইবার নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিলনা। তিনি চলিয়া গেলে শুধু তাহার বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল মাত্র।

ভিতরে বসিয়া গাড়ীর শব্দে অচলাও ইহা অনুভব করিল। কেন তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেননা, একটা কথা পর্য্যন্ত বলিয়া গেলেননা তাহাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এতক্ষণ সুরেশের অনিবার্য্য মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া একটা অন্তরাল রচিয়াছিল, তাহাও নাই;—এইবার মহিম অত্যন্ত সম্মুখে অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইবে,—কিন্তু আর তাহার মন কিছুতেই সাড়া দিতে চাহিলনা। নিজের জন্য লজ্জা বোধ করিতেও সে যেন ক্লান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

মহিম আসিয়া দেখিল সে কেরোসিনের আলোটা সুমুখে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কহিল, এখন তুমি কি করবে?

আমি? বলিয়া অচলা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কত কি যেন ভাবিতে লাগিল; শেষে বলিল, আমি ত ভেবে পাইনে। তুমি যা' হুকুম করবে আমি তাই কোর্‌ব।

এই অপ্রত্যাশিত বাক্য ও ব্যবহারে মহিম বিস্মিত হইল, শঙ্কিত হইল। এমন করিয়া সে একবারও চাহে নাই। এ দৃষ্টি যেমন সোজা, তেম্‌নি স্বচ্ছ। ইহার ভিতর দিয়া তাহার বুকের অনেকখানি যেন বড় স্পষ্ট দেখা গেল। সেখানে ভয় নাই, ভাবনা নাই, কামনা নাই, কল্পনা নাই,—যতদূর দেখা যায় ভবিষ্যতের আকাশ শুধু ধূ ধূ করিতেছে। তাহার রঙ্ নাই, মূর্ত্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই,—একেবারে নির্ব্বিকার, একেবারে একান্ত শূন্য!

উপদ্রুত, অবমানিত, ক্ষত-বিক্ষত নারী-হৃদয়ের এই চরম বৈরাগ্যকে সে চিনিতে পারিলনা। একের অভাব অপরের হৃদয়কে এমন নিঃস্ব করিয়াছে কল্পনা করিয়া তাহার সমস্ত মন তিক্ততায় পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু নিজের দুঃখ দিয়া জগতের দুঃখের ভার সে কোনদিন বাড়াইতে চাহেনা, তাই, আপনাকে আপনার মধ্যে ধরিয়া রাখাই তাহার চিরদিনের অভ্যাস। পাছে, এই বক্ষ-ভরা তিক্ততা তাহার কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এই ভয়ে সে অন্যত্র চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তারপরে সহজ গলায় বলিল, আমি কেন তোমাকে হুকুম দেব, অচলা, আর তুমিই বা তা শুন্‌তে বাধ্য হবে কিসের জন্যে!

কিন্তু তুমি ছাড়া আর যে কেউ নেই,—কেউ ত আমার সঙ্গে আর কথা কবে না! এই বলিয়া অচলা তেম্‌নি এক ভাবেই মহিমের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মহিম কহিল, এই কি আমার কাছে তুমি প্রত্যাশা কর?

বোধ হয় প্রশ্নটা অচলার কাণেই গেলনা। সে নিজের কথার রেশ ধরিয়া যেন আপনাকে আপনিই বলিতে লাগিল, তোমাকে হারিয়ে পর্য্যন্ত ভগবানকে আমি কত জানাচ্চি, হে ঈশ্বর! আমি আর পারিনে,—আমাকে তুমি নাও! কিন্তু তিনিও শুনলেননা, তুমিও শুনতে চাওনা! আমি আর কি কোরব।

মহিম কোন জবাব না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল, কিন্তু এই নৈরাশ্যের কণ্ঠস্বর, এই নিরভিমান, নিঃসঙ্কোচ, নির্লজ্জ উক্তি আবার তাহার চিত্তকে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া তুলিল। এই সুর কাণের মধ্যে লইয়া সে বাহিরের প্রাঙ্গণে বেড়াইতে বেড়াইতে ইহাই ভাবিতে লাগিল, কি করা যায়! আপনার ভারে সে আপনি ভারাক্রান্ত, আবার তাহারি মাথায় সুরেশ যে তাহার সুকৃতি ও দুষ্কৃতির গুরুভার চাপাইয়া এইমাত্র কোথায় সরিয়া গেল, এ বোঝাই বা সে কোথায় গিয়া কি করিয়া নামাইবে!

রঘুবীর অনেক পরিশ্রমে খবর লইয়া আসিল যে ডিহরীর পথে ক্রোশ তিনেক দূরে কাল সকালেই একটা হাট বসিবে, চেষ্টা করিলে সেখানে গো শকট পাওয়া যাইতে পারে।

মহিমকে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিতে দেখিয়া সে সঙ্কোচের সহিত জানাইল, নিজে সে এখনি যাইতে পারে, কিন্তু এ গ্রামে বোধ হয় কেহ তাঁয়ে আসিতে চাহিবেনা। কিন্তু মাইজী যদি এই পথ টুকু—

অচলা শুনিয়া বলিল, চল। এবং তৎক্ষণাৎ উঠিতে গিয়া সে পা' টলিয়া পড়িতেছিল, মহিম হাত বাড়াইতেই সজোরে চাপিয়া ধরিয়া নিজেকে স্থির করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু লজ্জায়, বিতৃষ্ণায় মহিমের সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত হইতে লাগিল, নিজের হাতটা সে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল, আজ না হয়, থাক্।

কেন? এই যে তুমি বললে এখানে থাকা উচিত নয়। আর ডিহরী থেকে গাড়ী আনিয়ে যেতেও কালকের দিন কেটে যাবে?

কিন্তু তুমি যে বড় দুর্ব্বল—

অচলা হাত ছাড়ে নাই, সে হাত ছাড়িলনা। শুধু মাথা নাড়িয়া কহিল, না, চল। আর আমি দুর্ব্বল নয়, তোমার হাত ধরে যতদূরে যেতে বল যেতে পারব।

চল, বলিয়া মহিম রঘুবীরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাত্রা করিল। সে মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলিয়া আপনাকে আপনি সহস্রবার প্রশ্ন করিতে লাগিল, ইহার শেষ হইবে কোথায়? এ যাত্রা থামিবে কখন, এবং কি করিয়া?

চতুশ্চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

ডিহরীর বাটীতে পৌঁছিয়া অচলা সেই মোটা খামখানি বাহির করিয়া বলিল, এই তাঁর উইল। মহিম হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। তাহার মনে পড়িল ইহার মধ্যেই সুরেশের চিঠি আছে। সে পত্রে কোন্ অচিন্তনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে, কোন্ দুর্গম রহস্যের পথের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে তাঁদণ্ডেই জানিবার জন্য মনের মধ্যে তাহার ঝড় বহিতে লাগিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড ইচ্ছাকে সে শান্ত মুখে দমন করিয়া কাগজখানি পকেটে রাখিয়া দিল।

অচলা কহিল, তুমি কি আজই ডিহরী থেকে চলে যাবে?

হাঁ, এখানে থাকবার আর আমার সুবিধে হবেনা।

আমাকে কি চিরকাল এখানেই থাকতে হবে?

মহিম একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তুমি কি আর কোথাও যেতে চাও?

অচলা বলিল, কাল থেকে আমি তাই কেবল ভাবচি। শুনেচি বিলেত অঞ্চলে আমার মত হতভাগিনীদের জন্যে আশ্রম আছে, সেখানে কি হয় আমি জানিনে, কিন্তু এ দেশে কি তেমন কিছু— বলিতে বলিতেই তাহার বড় বড় চোখ দুটি জলে টল্ টল্ করিতে লাগিল। এই প্রথম তাহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

মহিমের বুকে করুণার তীর বিঁধিল, কিন্তু সে কেবল ধীরে ধীরে উত্তর দিল, আমিও জানিনে, তবে খোঁজ নিতে পারি।

কখনো তোমাকে চিঠি লিখলে কি তুমি তার জবাব দেবেনা?

প্রয়োজন থাকলে দিতে পারি। কিন্তু আমার গুছিয়ে নিয়ে বার হতে দেরী হবে,—আমি চললুম।

অচলা মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সেইখানেই প্রণাম করিল; এবং মহিম বাহির হইয়া গেলে চৌকাট ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পথে চলিতে চলিতে মহিম ভাবিতেছিল, রামবাবুর

বাটীতে আর একমুহূর্ত্তও থাকা চলেনা, অথচ, এই সহরের মধ্যে আর কোথাও একটা দিনের জন্যও আশ্রয় লওয়া অসম্ভব। যেমন করিয়াই হৌক এদেশ হইতে আজ তাহাকে বাহির হইতেই হইবে। তা'ছাড়া নিজের জন্যও তাহার এমন একটা নিরালা যায়গার প্রয়োজন যেখানে দু দণ্ড স্থির হইয়া বসিয়া শুধু কেবল এই থামখানার ভিতরে কি আছে তাই নয়, আপনাকে আপনি চোখ মেলিয়া দেখিবার একটুখানি অবকাশ মিলিবে।

অচলাকে তিল তিল করিয়া ভালবাসিবার প্রথম ইতিহাস তাহার কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু এই মেয়েটিকেই কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবনের উপর দিয়া যাহা বহিয়া গেছে তাহা প্রলয়ের মত অসীম, তেম্‌নি উপমা-বিহীন। আবার নিঃশব্দ সহিষ্ণুতার শক্তিও বিধাতা তাহাকে হিসাব করিয়া দেন নাই। তাই তাহার গৃহ যখন বাহিরে এবং ভিতরে হইতে জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে ঐখানে দাঁড়াইয়াই ভস্মসাৎ হইল,—এতটুকু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংসারে ছড়াইতে পাইলনা। কিন্তু আজ তাহার শক্তির ডাক কেবল সহিবার জন্য পড়ে নাই,—সামঞ্জস্য করিবার জন্য পড়িয়াছে! আজ একবার তাহার জমা-খরচের খাতাখানা না মিলাইয়া দেখিলে আর চলিবে-না।—কোথাও একটু নির্জ্জন স্থান তাহার আজ চাইই চাই!

বাটীতে পৌছিয়া নিজের জিনিস-পত্রগুলা সে তাড়াতাড়ি গুছাইয়া লইল, পাঁচটার ট্রেণের আর ঘণ্টা খানেক মাত্র সময় আছে। রামবাবুর কাশী হইতে ফিরিতে সম্ভবতঃ বিলম্ব হইবে, কারণ, যথার্থ ই তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়াছেন এবং তাহার পূর্ব্বে জলস্পর্শ করিবেন না বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বিদায় লওয়া চলেনা। এই কর্ত্তব্যটা একটা সংক্ষিপ্ত পত্রে শেষ করিয়া দিতে সে কাগজ কলম লইয়া বসিল। দুই এক ছত্র লিখিয়াই তাঁহার সেই ক্রুদ্ধ মুখের উগ্র উত্তপ্ত বিদ্রূপগুলাই তাহার স্মরণ হইতে লাগিল। এবং, ইঁহারই সহিত আর একজনের অশ্রুজলে অস্পষ্ট অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরের শেষ নিবেদনও তাহার কাণে আসিয়া পৌছিল। তন্দ্রার মধ্যে বেদনার ন্যায় এতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা তাহার চৈতন্যকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করিয়াও রাখে নাই, ঘুমাইয়া পড়িতেও দেয় নাই,—কিন্তু রামবাবুর সেই কথাগুলা যেন ধাক্কা মারিয়া চমক্ ভাঙিয়া দিল।

এই প্রাচীন ব্যক্তিটির সহিত তাহার পরিচয় বেশি দিনের নয়, কিন্তু ইঁহার দয়া, ইঁহার দাক্ষিণ্য, ইঁহার ভদ্রতা, ইঁহার অকপট ভগবদ্ভক্তি ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠার অনেক কাহিনী সে শুনিয়াছে,—এই গুলিই এখন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাহার রুদ্ধ চক্ষুকে যেন একটা সম্পূর্ণ অপরিদৃষ্ট দিক নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

এই বৃদ্ধ অচলাকে তাঁহার সুরমা-মা বলিয়া, কন্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই মেয়েটি ভিন্ন তিনি কখনো কোন পরগোত্রীয়ার হাতের অন্ন স্পর্শ করেন নাই ইহাও মহিমের কাছে স্নেহচ্ছলে গল্প করিয়াছেন, সুতরাং, সর্ব্বনাশটা যে তাঁহার কোন্ দিক দিয়া পৌছিয়াছিল ইহা অনুমান করা মহিমের কঠিন নয়; কিন্তু এখন এই কথাটাই সে মনে মনে বলিতে লাগিল, অচলার অপরাধের বিচার না হয় পরে চিন্তা করিব, কিন্তু এই আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের এই ধর্ম্ম কোন্ সত্যকার ধর্ম্ম যাহা সামান্য একটা মেয়ের প্রতারণায় এক নিমিষে 'ধূলিসাৎ হইয়া' গেল! যে ধর্ম্ম অত্যাচারীর আঘাত হইতে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করিতে পারেনা, বরঞ্চ, তাহাকেই মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে সমস্ত শক্তি অহরহ উদ্যত রাখিতে হয়, সে কিসের ধর্ম্ম, এবং মানব-জীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা কোন্ খানে? যে ধর্ম্ম 'স্নেহের' মর্য্যাদা রাখিতে দিলনা, নিঃসহায় আর্ত্ত নারীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া যাইতে এতটুকু দ্বিধা-বোধ করিলনা, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম্ম এতবড় স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চঞ্চল প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম্ম? ইহাকে যে স্বীকার করিয়াছে সে কোন্ সত্য বস্তু বহন করিতেছে! যাহা ধর্ম্ম সে তো বর্ম্মের মত আঘাত সহিবার জন্যই! সেই ত তার শেষ পরীক্ষা!

তাহার সহসা মনে হইল, তবে কি তাহার নিজের পলায়নটাও—— কিন্তু-চিন্তাটাকেও সে তেম্‌নি সহসা দুই-হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া কলমটা তুলিয়া লইল, এবং ক্ষুদ্র পত্র অবিলম্বে শেষ করিয়া ষ্টেসনের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

ট্রেণ আসিলে যে কামরাটার দ্বার খুলিয়া মহিম ভিতরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিল, সেই পথেই একজন বৃদ্ধ-গোছের ভদ্রলোক একটি বিধবা মেয়ের হাত ধরিয়া নীচে নামিয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ কহিলেন, এ কি মহিম?

মৃণাল পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, সেজদা, যাচ্চো কোথায়? বলিয়া উভয়েই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিল মহিম গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে।

মহিম কহিল, আমি কলকাতায় যাচ্চি। সুরেশবাবুর বাড়ী বল্‌লেই গাড়োয়ান ঠিক যায়গায় নিয়ে যাবে। সেখানে অচলা আছে।

কেদারবাবু আচ্ছন্নের মত একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, মহিম বলিল, সুরেশের মৃত্যু হয়েছে। অচলা আমাকে একটা আশ্রমের কথা জিজ্ঞেসা করেছিল মৃণাল, কিন্তু আমি তার জবাব দিতে পারিনি। তোমার কাছে হয়ত সে একটা উত্তর পেতেও পারে।

মৃণাল তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শুধু কহিল, "পাবে বৈ কি সেজ্‌দা। কিন্তু আমার সকল শিক্ষা ত তোমারি কাছে। আশ্রমই বল আর আশ্রয়ই বল, সে যে তার কোথায়, এ খবর সেজ্‌দি'কে আমি দিতে পারব, কিন্তু সে ত তোমারই দেওয়া হবে।"

মহিম কথা কহিল না। বোধ হয় নিজেকে সে এই তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রমণীর কাছ হইতে গোপন করিবার জন্যই মুখ ফিরাইয়া লইল।

গাড়ীর বাঁশি বাজিয়া উঠিল; মৃণাল বৃদ্ধের স্খলিত ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, চল বাবা, আমরা যাই।

(সমাপ্ত)

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। লালবাগে ঘাটের উপরে হরকরা তখনও মশাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘাটের নীচে নাওয়েরার ছিপে পূর্ব্বদেশের নাবিকেরা অনুচ্চ স্বরে কথা কহিতেছে। শাহজাদা ফর্‌রুখশিয়ার চন্দন-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বিস্তৃত আসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন খর্ব্বাকৃতি হিন্দু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। সহসা একজন নাবিক কিঞ্চিৎ উচ্চ স্বরে কথা কহিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ হরকরা হাঁকিল, 'সুমসাম্'। একজন খাওয়াস্ দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

শাহজাদা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "তোমার নাম কি?"

হিন্দু কহিল, "আমার নাম হরনারায়ণ রায়।"

"তোমার কি পেশা?"

"আমরা পুরুষানুক্রমে বাদশাহের গোলাম। স্বর্গগত শাহজহান্ বাদশাহের আমল হইতে আমরা রাজস্ব বিভাগে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি।"

"তুমি কি কাজ কর?"

"আমি সুবা বাঙ্গলার কাননগই।"

এই সময়ে পাঁচখানি ছিপ আসিয়া ঘাটের নীচে লাগিল। যে খাওয়াস্ নীচে নামিয়া গিয়াছিল, সে তাহার একখানিতে উঠিয়া অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "শেঠ মাণিকচাঁদ কোথায়?" শেঠ অন্য একখানি ছিপে ছিলেন; তিনি কহিলেন, "আমি এখানে,—কাঁটা কি নৌকাতেই লাগাইব না কি?" খাওয়াস্ তাহার নিকটে গিয়া কহিল, "চুপ শেঠজি! ঐ লোকটা কে বলিতে পার?" যে ক্ষুদ্রকায় হিন্দু শাহজাদার সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল, দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া মাণিকচাঁদের মুখ শুকাইল, "সর্ব্বনাশ! খাঁসাহেব, উহাকে চিন না?" খাওয়াস্ বিস্মিত হইয়া কহিল, "না।"

"মুর্শিদকুলির বিশ্বস্ত অনুচর, দেওয়ানী সেরেস্তার প্রধান কর্ম্মচারী এবং আমার প্রধান শত্রু কাননগই হরনারায়ণ রায়!"

"দেখ শেঠজি, রাত্রি বলিয়া প্রথমে লোকটাকে চিনিতে পারি নাই। লোকটা একদিন শাহজাদার দরবারে আসিয়াছিল বটে। কি মৎলবে আসিয়াছে বলিতে পার?"

"নিশ্চয় টাকার সন্ধান পাইয়াছে।"

"তোমরা টাকার কথাটাই পূর্ব্বে ভাব, কিন্তু সামান্য টাকার জন্য কাননগইএর মত পদস্থ ব্যক্তি এত রাত্রিতে শাহজাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবে কেন? দেওয়ানের পেস্কার তোমাকে ডাকিয়া আনিলেই পারিত; এবং তোমাকে নিষেধ করিয়া দিলেই তোমার হাত বন্ধ হইয়া যাইত। এ ব্যক্তি নিশ্চয় অন্য কোন মৎলবে আসিয়াছে।"

এই সময়ে গঙ্গাবক্ষে আর একখানি ছিপ্ হইতে একজন পূর্ব্বদেশীয় মাল্লা হাঁকিল, "ইলাকা শাহান্‌শাহী নাওয়ারা,—ছিফ্‌তফাৎ।" অন্ধকারে আর একখানি ছিপ্ অতি দ্রুতবেগে আসিতেছিল,—তাহা হইতে একজন উত্তর দিল, "আমল্ শাহান্‌শাহী পথ ছাড়।" তৎক্ষণাৎ বহু নাবিক একত্র হইয়া ছিপের জন্য পথ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ছিপখানি ঘাটে আসিয়া লাগিল। খাওয়াস্ মাণিকচাঁদকে কহিল, "তুমি অন্ধকারে লুকাইয়া থাক,—ব্যাপারটা কি জানিয়া আসি।" ছিপ্ ঘাটে লাগিলে সে কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছিপ্ কোথাকার?" কর্ণধার কহিল, "বিহারের সুবাদারের; খাস্ দরবার হইতে রোকা আসিয়াছে।" একজন দীর্ঘাকার তুরাণী ছিপ্ হইতে উঠিয়া কহিল, "দিন দুনিয়ার মালেক হিন্দুস্থানের বাদশাহ শাহআলাম বহাদর শাহের জয় হউক।" খাওয়াস্ কহিল, "কে, রৌশন্ খাঁ?"

"হাঁ জনাব, মেহেরবান্ সাহেবজাদাকে এখনই এত্তালা দিতে হইবে।"

"এত্তালা দিতেছি, শাহজাদা এখনো শয়ন করেন নাই।"

"বাঁচিলাম! এক মাসে লাহোর হইতে আসিয়াছি। শাহজাদার হুকুম, সাহেবজাদা যেখানেই থাকেন, সেইখানেই তাঁহাকে রোকা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।"

"রোকা বড়ই জরুরি দেখিতেছি?"

"অনেক কথা আছে, পরে জানাইব।"

খাওয়াস্ ঘাটের উপরে উঠিয়া একজন চোপদারকে ডাকিল। চোপদার দশ-বারজন হরকরা লইয়া ঘাটের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন খাওয়াস্ ফরুখশিয়ারকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "জনাব! জঁহাপনা শাহান্‌শাহের হুকুম লাহোর হইতে শাহান্‌শাহী আহদী রৌশনে দুনিয়ার হুকুমনামা লইয়া আসিয়াছে।"

ফরুখশিয়ার তাহা শুনিয়া কহিলেন, "হরনারায়ণ! তোমার সহিত কথা কহিয়া অত্যন্ত সুপ্রীত হইলাম। তোমার যদি কিছু আরজী থাকে, তাহা অন্য সময় শুনিব। রাত্রি অধিক হইয়াছে, পিতার নিকট হইতে জরুরী সংবাদ আসিয়াছে। এখন হইতে তুমি যখনই আসিবে, তখনই আমার সাক্ষাৎ পাইবে।"

হরনারায়ণ এতক্ষণ মিষ্ট কথায় শাহজাদাকে তুষ্ট করিতেছিলেন, তাই দুইটীর কথা তুলিবার সময় পান নাই। শাহজাদার কথা শুনিয়া দুঃখিত মনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। লাহোর হইতে যে আহদী পত্র লইয়া আসিয়াছিল, সে দূরে অপেক্ষা করিতেছিল। হরনারায়ণ দূরে চলিয়া গেলে, সে নিকটে আসিল, এবং অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। খাওয়াস্ রূপার থালায় করিয়া পত্র লইয়া ফরুখশিয়ারের সম্মুখে ধরিল। তখন তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন।

পত্রপাঠ করিয়া ফরুখশিয়ারের মুখ শুকাইল। তিনি বিকৃত কণ্ঠে খাওয়াস্‌কে কহিলেন, "আহমদ বেগকে ডাকিয়া আন।" আহমদ বেগ আসিলে ফরুখশিয়ার তাঁহাকে কহিলেন, "সংবাদ অশুভ, শাহজাদার শরীরের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতেছে। পিতা আমাকে এখনই দিল্লী যাইতে আদেশ করিয়াছেন।"

আহমদবেগ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিল্লী যাইতে হইবে, এখনই?" পাত্রবাহক আহদী কহিল, "জনাব! শাহজাদার হুকুম, আপনি বিলম্ব না করিয়া সমস্ত ফৌজ লইয়া দিল্লী যাইবেন।"

আহমদ। সমস্ত ফৌজ লইয়া যাইতে হইলে অনেক টাকার প্রয়োজন।

ফরুখশিয়ার। কত টাকা প্রয়োজন?

আহমদ। হিসাব করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। বখ্‌শীকে ডাকিব কি?

ফরুখশিয়ার। বখ্‌শীকে ডাকিয়া কি হইবে, আন্দাজ করিয়া বলিতে পার না?

আহমদ। শাহজাদা! এত বিদ্যা থাকিলে এতদিন সুবাদার হইতাম। আসদ খাঁ অনুগ্রহ করিয়া বখ্‌শী

করিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু বিত্তার দৌড় দেখিয়া জুল্‌ফিকার খাঁ তাড়াইয়া দিয়াছিল।

খাওয়াস্। জনাব! গোলামের গোস্তাকী মাফ হয়, সমস্ত সুবাদার ফৌজ দিল্লী লইয়া যাইতে হইলে সর্ব্বসমেত অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

ফর্‌রুখশিয়ার। সমস্ত ফৌজ লইয়া গেলে চলিবে কেন?

আহমদ। তবে কত ফৌজ লইয়া যাইবেন?

ফর্‌রুখশিয়ার। অর্দ্ধেক।

আহমদ। তাহা হইলে পঁচিশ লাখ টাকা।

ফর্‌রুখশিয়ার। তহবিলে কত টাকা আছে?

খাওয়াস্। দুই তিন হাজারের অধিক নহে। তবে শেঠ মাণিকচাঁদ বোধ হয় সমস্ত টাকাই আনিয়াছে।

ফর্‌রুখশিয়ার। দশ লক্ষ?

খাওয়াস। জনাব।

ফর্‌রুখশিয়ার। আহমদ বেগ! এখন উপায়?

আহমদ। চিন্তা কি জনাব? যে টাকা আসিয়াছে তাহা লইয়া এলাহাবাদ পৌঁছিতে পারিব, সেখানে সৈয়দ হোসন আলি আছেন, ছাবেলরাম নাগর আছে, ইটাবাতে আলি আস্‌গর খাঁ আছে। পথে টাকার প্রয়োজন হয় পাটনায় হোসেন আলি খাঁ আছেন।

ফর্‌রুখশিয়ার। আহমদবেগ! তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারে লোপ পায় নাই দেখিতেছি। আমি এখনই যাত্রা করিব, তুমি কুচের হুকুম জারি কর।

রাত্রিশেষে লালবাগের চারিদিকে আম্রকাননে দামামা বাজিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া চারিদিকের গ্রামবাসী গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল, কারণ বাদশাহী আমলের মোগল সেনা যে পথে চলিত, সে পথে চারিদিকে এক ক্রোশের মধ্যে লোকের মানসম্ভ্রম রক্ষা করা অসম্ভব হইত। চারিদিকে হাজার-হাজার মশাল জ্বালিয়া, সেনাগণ তাম্বু নামাইয়া বাঁধিতে আরম্ভ করিল, আহদীগণ গরুর গাড়ীর সন্ধানে বাহির হইল, শকটচালক প্রহার হজম করিয়া বলদ খুঁজিতে গেল, তখন শাহজাদা ফর্‌রুখশিয়ার বিলাসকক্ষে প্রবেশ করিয়া নর্ত্তকীগণকে বিদায় দিলেন, এবং অসীম ও তাহার ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি এখনই মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিব, তোমরা কোথায় যাইবে?" উভয়ে কহিল, "শাহজাদার অনুমতি হইলে আমরা দিল্লী যাইব।"

"তবে আমার সহিত চল, আমিও দিল্লী যাইব। অনেক দূর একসঙ্গে যাইব, তোমাদের মত গুণবান সঙ্গী পাইলে গীতবাদ্যে আনন্দে দিন কাটিয়া যাইবে।"

পরদিন প্রভাতে সুবা বাঙ্গালার রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ নূতন নগরে প্রাসাদের বাতায়ন পথে দেখিলেন, যে সুবাদারী ফৌজ বাদশাহী নাকারা বাজাইয়া উত্তর দিকে চলিয়াছে।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত "The Medical Critic and Guide" নামক একখানি সাময়িক পত্রে, (মার্চ্চ, ১৯১৯) সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিম্নলিখিত ইংরেজীটুকু বাহির হইয়াছে :—

"What to do with the Lying Newspapers.

"Our editorial, 'Cocaine, Morphine and Newspaper Fiends,' in the February issue has attracted some attention. A number of our subscribers inquired if in order to avoid making newspaper fiends I would employ the same methods that we are employing to prevent cocaine and morphine fiends, namely, would I prohibit newspapers. Of course not. One who really believes, and not merely professes to believe, in free press, would not think of adopting such measures.

"But I would make deliberate lying, deliberate misleading of the people, a punishable offence I would establish a tribunal of the press such as exists in at least one country in Europe, and any paper that would indulge in deliberate lying, particularly for the purpose of exciting hatred, fanning blood-lust,

etc., would be called before such a tribunal and given a chance to explain its actions. If it should persist in its anti-social actions, it would run the danger of being suppressed. For poisoning the people's minds is as great an offence as poisoning wells. And, *en passant*, I wonder, with the existence of such a tribunal how long The New york Times, Tribune and Herald would last.

"Another remedy would be to establish a great paper whose special province should be the relentless exposing, day after day, of the malicious lies, deliberate falsehoods, stupidities and brutalities of all papers guilty of such things. With such a paper, the high-mindedness and truthfulness of which would be beyond suspicion, the vicious, corrupt, prostituted press would have a hard time to keep up, and in self-preservation would have to change its ways.

"Mind you, there would be no interference what ever with *opinions*. Every paper would be free to express its opinions, to pursue any editorial policy it wanted, no matter how vicious, how pervert. But deliberate lying, deliberate perversion of *facts*, deliberate assassination of character, would not be permitted to go unchallenged and unpunished."

ইহার মর্ম্ম এই যে, যে সকল সংবাদপত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক জানিয়া-শুনিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া মিথ্যা কথা লিখিয়া লোকের মন বিগড়াইয়া দেয়, পাঠকগণকে বিপথে পরিচালন করে, তাহাদিগকে দমন করিবার উপায় কি? Medical Critic and Guideএর সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করেন, এইরূপ মিথ্যাবাদী সংবাদপত্রের আচরণের বিচারার্থ একটা স্বতন্ত্র বিচারালয় থাকা আবশ্যক, এবং কোন সংবাদপত্র দোষী সাব্যস্ত হইলে, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার থাকা খুবই উচিত বটে, কিন্তু অনৃত বচনের প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। এই ধরণের অনৃতবাদী সংবাদপত্র দমনের আর একটা উপায়, একখানি বড় গোছের কাগজ বাহির করিয়া, সাধারণের সমীপে ইহাদের মিথ্যা কথা ধরাইয়া দেওয়া। ক্রমাগত ইহাদের মুখোস খুলিয়া দিতে থাকিলে ক্রমশঃ ইহারা শায়েস্তা হইয়া যাইতে পারে।

পাঠকেরা দেখুন, আমেরিকা এখন সভ্যজগতের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। নিউইয়র্ক সেই আমেরিকার অন্যতম প্রধান নগর। সেই নিউইয়র্কের সংবাদপত্রের অবস্থা কিরূপ! সে যাউক,—উহা পরের কথা। এখন আমাদের ঘরের কথা কি? এখানেও কি কোন কোন সংবাদপত্র কখনও কখনও দলাদলির খাতিরে, বা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সত্য গোপন এবং মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন না? সংবাদপত্রে যাহা লেখা হয়, অনেক নিরীহ পাঠক তাহা ধ্রুব সত্য—বেদবাক্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। সত্য মিথ্যার বিচার করিয়া, মিথ্যা বর্জ্জন করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিতে, হংসের ন্যায় নীর পরিত্যাগ করিয়া কেবল ক্ষীরটুকু গ্রহণ করিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ অসমর্থ। এরূপ স্থলে উপায় কি? আমেরিকার ন্যায় সভ্য স্বাধীন দেশের সম্পাদক স্বচ্ছন্দে special tribunal স্থাপনের পরামর্শ দিলেন। এ দেশে ত তাহা সহজে সম্ভবপর নহে। আর মিথ্যা ধরাইয়া দিয়া সত্য সংবাদ প্রচারের জন্য একখানি স্বতন্ত্র সংবাদপত্র স্থাপন করার আশাও এ দেশে সুদূর-পরাহত। অতএব, এতদ্দেশের সংবাদপত্রসকল যিনি যখন যাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে শুনাইবেন, তাহাই বেদবাক্য বলিয়া মনে করা, সকল সংবাদ-পত্রকেই যুধিষ্ঠির বিবেচনা করা ছাড়া আর ত কোন উপায় দেখিতেছি না।

আজকাল পৃথিবী জুড়িয়া বিশ্বশুদ্ধ লোকে নিজ-নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যাকুল, স্ব-স্ব অধিকারের সীমানির্দ্দেশে ব্যস্ত এবং self determinationএর জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। সে হিসাবে বিজ্ঞানের যে একটা রাজ্য আছে, তাহার যে একটা জগৎ আছে, তাহার যে একটা অধিকার আছে—এ সকলের সীমা কোথায়, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলে বেশ মজা পাওয়া যায়; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মাথাও ঘুরিয়া যায়।

বিজ্ঞান অনেক করিয়াছে, কিন্তু তাহার অনেক করিতে বাকীও রহিয়াছে। বিজ্ঞানের সেই কার্যক্ষেত্র অসীম, অনন্ত। বিজ্ঞানের যাহা করিতে বাকী আছে,—সেই অনন্ত কার্য্যক্ষেত্রের সন্ধান লওয়া অসম্ভব। আপাততঃ বিজ্ঞান যাহা করিয়াছে, মানুষকে যাহা দিয়াছে, তাহারই কথা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

বিজ্ঞান যে সকল জিনিস আবিষ্কার করিয়া মানুষকে ব্যবহার করিতে দিয়াছে, তাহাদের সকলগুলি নিখুঁত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। সে সকল জিনিসের আরও উন্নতি চাই; তাহাদের আরও perfection হওয়া দরকার।

এই যেমন ধরুন কাচ। কাচ জিনিসটি মানুষের খুব কাজে লাগিয়াছে। ইহার কয়েকটা এমন গুণ আছে, যাহা অন্য কোন জিনিসের নাই, এবং সেই গুণেই কাচের এত আদর। তন্মধ্যে প্রধান দুইটা গুণ এই যে কাচ স্বচ্ছ, আর কাচের সঙ্গে হাইড্রোফ্লোরিক য়্যাসিড ছাড়া আর কোন জিনিসের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হয় না। এই দুই গুণে কাচ সভ্য জগতের এত আদরণীয় হইলেও, উহার একটা বড় মারাত্মক দোষও আছে। সে দোষটা উহার ভঙ্গপ্রবণতা। বিজ্ঞান আমাদিগকে কাচ গড়িয়া দিয়াছে, কাচ আমাদের খুব কাজে লাগিতেছে, কিন্তু তাহার ঐ একটু খুঁত রহিয়াছে। সুতরাং কাচের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ নিখুঁত হয় নাই। [illegible]

বিজ্ঞানকে এখনও আরও কিছু মাথা খাটাইতে হইবে। মাথা খাটাইয়া করিতে হইবে কি? না, কাচের স্বচ্ছতা ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া-বিমুখতা গুণ দুইটী বজায় রাখিয়া, উহার ভঙ্গপ্রবণতা দোষটীর সংশোধন করিতে হইবে। বিজ্ঞানকে এমন ভাবে কাচ (বা অন্য নাম দিয়া ঐ ধরণের অন্য কোন জিনিস) তৈয়ার করিতে হইবে, যাহা স্বচ্ছ হইবে, অন্য কোন জিনিসের সঙ্গে যাহার রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগ ঘটিবে না; অথচ, যাহা পিতল, কাঁসা, লোহা প্রভৃতির ন্যায় পড়িলে সহজে ভাঙ্গিবে না। বিজ্ঞানের এই কাযটি করিতে বাকী রহিয়াছে।

আর একটা দৃষ্টান্ত ধরুন। বিজ্ঞান বিনা-তারে সংবাদ আদান-প্রদানের উপায় বাহির করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও একটু ক্রটি থাকিয়া গিয়াছে। এই ক্রটিও সংশোধিত না হইলে, এ ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সে ক্রটিটা কি? কোন-খানে একটা বিনা-তারে সংবাদ পাঠাইবার যন্ত্র বসাইয়া কোন সংবাদ পাঠাইতে লাগিলাম। আমার এক বন্ধু খুব দূরে আর একটা ঐ রকম বেতার সংবাদের যন্ত্র বসাইয়া আমার নিকট হইতে জরুরি খবর পাইবার জন্য বসিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার আর আমার মধ্যে যে সংবাদ চালানো যাইতেছে, সেটা গোপনীয়;—তিনি ও আমি ছাড়া আর কাহারও সে খবরটা না জানিলেই ভাল হয়। বেতার সংবাদের যন্ত্রে সেটুক হইবার যো নাই। আমাদের একজন শত্রু আমাদের এই গুপ্ত সংবাদটুকু জানিবার জন্য আর এক সেট ঐ রকম বেতার যন্ত্র লইয়া এক জায়গায় লুকাইয়া বসিয়া আছেন। আমি আমার বন্ধুকে যাহা কিছু বলিতেছি, আমার বন্ধু জবাবে যাহা কিছু বলিতে-ছেন—সে সকল কথাই আমাদের ঐ শত্রুটি জানিয়া লইতেছে। কেবল শত্রু কেন, নির্দ্দিষ্ট পরিধির মধ্যে যতগুলা বেতার যন্ত্র আছে সবগুলাতেই কথাগুলা ধরা পড়িয়া যাইতেছে। অতএব বেতার যন্ত্রের সাহায্যে এমন কোন খবর পাঠাইবার যো নাই; যাহা শত্রুপক্ষ জানিতে পারিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। তবে বেতার যন্ত্রের সাহায্যে যে জগতের অনেক মঙ্গল হইয়াছে, তাহা সহস্রবার স্বীকার্য্য। তবু ঐ খুঁতটুকু না থাকিলেই যেন ভাল হইত। বিজ্ঞানকে ঐ দোষটুকু সংশোধন করিয়া দিতে হইবে।

শোক-সংবাদ

মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম

বাঙ্গালার পণ্ডিতকুলের মুকুটমণি মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় দেহ-রক্ষা করিয়াছেন। ভট্টপল্লী যাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া গৌরব বোধ করিতেন, সমস্ত বাঙ্গালা দেশ যাঁহার নাম স্মরণ করিয়া নতশির হইতেন, সেই নৈয়ায়িকপ্রবর সার্ব্বভৌম মহাশয় এতকাল পরে চলিয়া গেলেন; মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজ অন্ধকারাবৃত হইল। বাঙ্গালা-দেশের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের আসন অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উপযুক্ত ছাত্র ছিলেন; এখনকার খ্যাতনামা অনেক অধ্যাপক সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ছাত্র। তিনি চলিয়া গেলেন; কিন্তু যতদিন ভট্টপল্লীর পাণ্ডিত্য-গৌরব থাকিবে, ততদিন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নাম সকলে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করিবে।

হিন্দুকুলচূড়ামণি, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। এমন আচারনিষ্ঠা, এমন শিষ্টতা, এমন মিষ্টভাষিতা, এমন মহানুভব, প্রজারঞ্জক জমিদার, এমন সর্ব্বকার্য্যে উৎসাহশীল মহোদয়কে অকালে হারাইয়া বাঙ্গালা-দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহার কি আর পূরণ হইবে? ধনী দরিদ্র সকলকেই মহারাজ বাহাদুর সমভাবে আদর করিতেন; তাঁহার রাজভবনের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল; তাঁহার মুখে সর্ব্বদা হাসি লাগিয়াই থাকিত। তিনি বাঙ্গালার জমিদারকুলের অলঙ্কার ছিলেন। মহারাজ আদর্শ বৈষ্ণব ছিলেন; যিনি একবার তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন, তিনি কখন তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। আমরা মহারাজ-কুমার বাহাদুরের এই গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি; ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি মহারাজ-কুমার বাহাদুর পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দিনাজপুর-রাজগৌরব অধিকতর উজ্জ্বল করুন।

মহারাজা সার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর

দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুর সার গিরিজানাথ রায় আর ইহলোকে নাই; গত ৫ই পৌষ কলিকাতায় গঙ্গাতীরে

৺কিশোরীলাল সরকার

কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য উকিল, দেশমাতার একনিষ্ঠ সেবক, সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক কিশোরীলাল

সরকার মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিশোরী বাবু হৈ চৈ ভালবাসিতেন না, তিনি নীরবে কাজ করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা জানিতেন যে কিশোরী বাবু সুপ্রসিদ্ধ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পরিচালনে আগাগোড়া স্বর্গীয় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি প্রাণ দিয়া অমৃতবাজার পত্রিকার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেক বৃহৎ গ্রন্থাদি লেখেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার রচিত ইংরাজী ভাষায় লিখিত যে অল্প কয়েকখানি গ্রন্থ আছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি সাহিত্য-দর্শন, কি ব্যবহার-শাস্ত্র, সর্ব্ববিষয়েই তাহার অসীম ক্ষমতা ছিল। এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত সন্তানগণ ও আত্মীয়বৃন্দের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ প্রণীত নূতন উপন্যাস "গুহামুখে" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৸০।

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, নূতন প্রহসন "ওলট পালট" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ।৵০।

শ্রীভেঙ্কটরাম মুদেলিয়র-অনুবাদিত, অস্কার ওয়ালডি প্রণীত "সালোমে" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৷০।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর ঠাকুর প্রণীত নূতন উপন্যাস, "অনাথ আশ্রম" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৸০।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত নূতন উপন্যাস "ত্যাজ্যপুত্র" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৷৹।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ।৵০।

সোহংস্বামী প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতগীতার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২৲।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "নিরুদ্দেশ রহস্য" প্রকাশিত হইল; মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস প্রণীত "পৌণ্ড্র বর্দ্ধন ও করতোয়া" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "পতিপ্রাণা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "অঞ্জলি" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা সোম প্রণীত "সতী সোহাগ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৷০।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত নূতন গীতি-নাট্য "প্রেমের প্রেমারা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ।৵০।

ভারতী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত সামাজিক প্রহসন "পঞ্চশর" এত দিন পরে প্রকাশিত হইল। মূল্য পঞ্চ আনা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

পথ-ভিখারী

BY COURTESY OF 'PHOTO TEMPLE.'

BLOCKS BY BHARATVARSHA HALFTONE W

ফাল্গুন, ১৩২৬

দ্বিতীয় খণ্ড] সপ্তম বর্ষ [তৃতীয় সংখ্যা

শক্তিপূজা

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ]

বাতায়নিকের পত্রে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শক্তি-পূজার যে আলোচনা করিয়াছিলেন, কার্ত্তিকের 'প্রবাসী'তে সে সম্বন্ধে তিনি আরও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "শক্তির যে শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আমি তা' স্বীকার করে নিচ্চি। কিন্তু বাঙ্গলা মঙ্গল-কাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েচে সে লৌকিক এবং তার ভাব অন্যরূপ।" প্রথমতঃ শক্তির "শাস্ত্রিক ও দার্শনিক" ব্যাখ্যা কি তাহাই দেখা যাউক। শাস্ত্রে যে শক্তিপূজার বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহা পরমেশ্বরের শক্তি। দর্শনের অদ্বৈতবাদ অনুসারে শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, যেমন অগ্নি (শক্তিমান) আর তার দাহিকা-শক্তি; অতএব পরমেশ্বরের শক্তি পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন। শাস্ত্রের বিধান ও দর্শনের সিদ্ধান্ত একত্র করিয়া পাওয়া যাইতেছে যে, যে শক্তির পূজা, সে শক্তি পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন। ইহাই শক্তির "শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা"।

মঙ্গল-কাব্যেও যেখানে শক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেখানে অবিকল এই কথাই পাওয়া যায়। অন্নদা মঙ্গলে শক্তিকে বলা হইয়াছে,

ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর
পরমেশা পরম পুরুষ পরাৎপর।

পুনশ্চঃ—

তুমি সর্ব্বময় তোমা হৈতে হয়
সৃজন পালন লয়
কত মায়া কর কত মায়া ধর
বেদের গোচর নয়

অন্যত্র,—

অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা আপনা আপনি সমা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রকৃতি॥
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।

কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি ॥

উপনিষদে পরমেশ্বরের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এখানে আমরা সেই সকল লক্ষণ দেখিতে পাই। যথা উপনিষদে,

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥
যস্মাৎ ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তৎবিজিজ্ঞাসস্ব তৎব্রহ্ম ॥
ইন্দ্রো* মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ॥
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ॥
অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ॥

এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে। এষ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যঃ লোকেভ্যঃ অধোনিনীষতে ॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন, আদিদেব ভগবান সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, ("তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়") তখন তাঁহার শরীর হইতে আদ্যা-শক্তি মহা-মায়ার উৎপত্তি হইল। এই আদ্যাশক্তি সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন।

আদিদেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ পুরাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলেন মহামতি
সৃজনের উপায় কারণ ॥

* * * * *

চিন্তিতে এমন কাজ একচিত্তে দেবরাজ
তনু হৈতে নির্গত প্রকৃতি।

* * * * *

আদি দেব নিত্য শক্তি ভুবন-মোহন মূর্ত্তি
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী ॥

অতএব উভয় মঙ্গল-কাব্যে শক্তির স্বরূপ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শক্তির শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অনুরূপ। মঙ্গল-কাব্যগুলির আখ্যান-ভাগেও এই ব্যাখ্যার মর্য্যাদাকে ন্যূন করা হয় নাই। কারণ ধনপতি সদাগর ও চাঁদ সদাগরকে, দুঃখ ও বিপদে ফেলিবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁহারা যেন দর্প ও অহঙ্কার হইতে মুক্ত হন, এবং বিশ্বপিতা ও জগজ্জননীকে অভিন্ন জানিয়া পূজা করিতে শিক্ষা করেন। ভাদ্রের 'ভারতবর্ষে' ইহা দেখান হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোন ধর্ম্ম-সঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্চে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকে সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েচে এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই সকল মঙ্গল-কাব্যের প্রেরণা।" হিন্দু পূর্ব্বজন্ম এবং কর্ম্মফল বিশ্বাস করে। সংসারে মানব যত দুঃখ কষ্ট পায়, সকলই তাহার ইহ-জন্মের বা পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মের ফল, ইহাই সে মনে করে। দরিদ্র নিরক্ষর সকলেই এই তত্ত্বের সহিত সুপরিচিত; তাহাদের বিশ্বাস শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা বোধ হয় দৃঢ়তর। সুতরাং সংসারে যখন বড় বেশী দুঃখ কষ্ট পাইতে হয়, অথচ তাহার কোন "ধর্ম্ম-সঙ্গত কারণ" দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন তাহারা বিনা দোষে নির্ব্বাসিতা সীতা দেবীর ন্যায় বলে,—

মমৈব জন্মান্তর পাতকানাং
বিপাক বিস্ফূর্জথুর প্রসহ্যঃ।

যাহাদের পূর্ব্বজন্মে ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস নাই, তাহাদের জন্য দুঃখকষ্টের কারণ স্বরূপ "স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধ" কল্পনা করা প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু কর্ম্মফলে বিশ্বাসযুক্ত হিন্দুর এ কল্পনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও অস্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে "শক্তিপূজার যে অর্থ লৌকিক বিশ্বাসের সহিত জড়িত" সে অর্থ "শাস্ত্রে নিগূঢ়" অর্থ হইতে ভিন্ন। "সাধারণ লোকের মনে পূজার সঙ্গে একটা নিদারুণতার ভাব; নিজের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বল পূর্ব্বক দুর্ব্বলকে বলি দেবার ভাব সঙ্গত হয়ে আছে।" বাঙ্গলা দেশে শক্তি-পূজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রচলিত ও সুপরিচিত রূপ হইতেছে দুর্গা-পূজা। এত বড় পূজা বাঙ্গালীর আর নাই। সর্ব্ব-সাধারণের হৃদয়ান্দোলক এরূপ ধর্ম্ম-বিষয়ক উৎসব অন্য কোন জাতির মধ্যে আছে কি না জানি না। দুর্গা-পূজার সময় বাঙ্গালী কি মনে করে যে, দুর্গা-পূজার উদ্দেশ্য

* এখানে অর্থ ব্রহ্ম।

"স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধ" প্রশমিত করা, "ঈর্ষা-পরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করা"? আমাদের ত মনে হয়, অনন্ত করুণা ও অসীম শক্তির আধার ভগবানকেই বাঙ্গালী জগজ্জননী দুর্গা রূপে পূজা করে। অসুর-বিনাশিনী রূপে বাঙ্গালী দুর্গার প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। দুর্গা যদি স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তি, ঈর্ষা-পরায়ণা শক্তি হইলেন, তাহা হইলে অসুর কোন্ শক্তির প্রতিরূপ হইবে? দুর্গার উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী কন্যা রূপে শোভা পান। ইঁহারা কি নিষ্ঠুর শক্তি হইতে উৎপন্ন ও নিষ্ঠুর শক্তির সহায়কারিণী? দুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশ যে আগমনী-সঙ্গীতে প্লাবিত হয়; তাহা কি নিষ্ঠুর ঈর্ষা-পরায়ণা শক্তিকে প্রসন্ন করিবার স্তব, না স্নেহময়ী জননীকে বরণ করিবার গাথা? বহুকাল পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন,

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে

অন্যায়কারিণী, ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তিকে আনন্দময়ী বলা যায় কি না সন্দেহ; যদি বা কড়া শাসনের বিধানে নিষ্ঠুর শক্তিকে সকলে আনন্দময়ী বলিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলেও তাঁহার আগমনে দেশ আনন্দে ছাইয়া যায় না,—ভয়ে স্তব্ধ হইয়া থাকে। এই সেদিন বিজয়া-দশমী তিথিতে লক্ষ-লক্ষ বাঙ্গালী অঞ্জলি-হস্তে প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাকে বিদায় দিবার সময় আবেগ-স্খলিত কণ্ঠে মন্ত্র পড়িয়াছিল,

সর্ব্ব মঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমস্তুতে

তখন তাহারা কি নিষ্ঠুর শক্তির কথা ভাবিতেছিল,—না তাহাদের হৃদয়ে নিখিল জগতের কল্যাণ-বিধায়িনী মাতৃ-মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল? "সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে" এই মন্ত্র প্রত্যেক হিন্দু উচ্চারণ করিয়াছে। নিরক্ষর নর-নারী বালক-বালিকা পর্য্যন্ত ইহার সরল অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ। ইহা "শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ" নহে।

যে শক্তিকে রবীন্দ্রনাথ অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী স্বেচ্ছাচারিণী ঈর্ষা-পরায়ণা নিষ্ঠুর প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, যে শক্তিকে তিনি শিবের ঘোরতর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন মনে করিয়াছেন এবং কল্পনার নেত্রে যাঁহাকে তিনি শিবের সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য অশোভন ভাবে উদ্যত দেখিয়াছেন, সেই শক্তি সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কিরূপ কাহিনী প্রচলিত? প্রথম-জন্মে ইঁহার নাম সতী; ইনি শিবের পত্নী, পিতৃ-মুখে স্বামীর নিন্দা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন (সতী-ই কালী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন)। দেহত্যাগের পর ইনি মেনকার কন্যা গৌরী বা দুর্গা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুর কল্পনায় যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু পবিত্র, স্নেহ-প্রেম-করুণার উৎকর্ষ রূপে হিন্দু যাহা কল্পনা করিতে পারিয়াছে, সকলই "গৌরী" এই নামের সহিত বিজড়িত। মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য আমরা গৌরীকে কঠোর তপস্যায় নিরত দেখিতে পাই; সে তপশ্চরণ এত কঠোর যে,

তপস্বিনা মপ্যপদেশতাং গতং।

বিবাহের পূর্ব্বেও তিনি মহাদেবের নামে এরূপ তদ্গত-চিত্ত যে,

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলেক্ষ্যবাক্
অসত্য কণ্ঠার্পিত বাহুবন্ধনা॥

গৌরী পিতার নয়নের মণি। গৌরী পিত্রালয়ে আসিতেছে শুনিয়া মেনকা আনন্দে দিশেহারা। গৌরী স্বামীর আদরের পত্নী, স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী। শক্তি বা মহামায়া সম্বন্ধে এই কাহিনী প্রচলিত। ইহা শাস্ত্রিক ব্যাখ্যা বা পুরাণের কথা বলিয়া অবহেলা করা যায় না। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী উভয় গ্রন্থেই এই কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দু-নরনারী এই কাহিনীর সহিত সুপরিচিত।

"উলঙ্গ নিদারুণতা" উল্লেখ করিয়া সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ কালীমূর্ত্তিকেই লক্ষ্য করিতেছেন; কিন্তু মঙ্গলকাব্যে কালী-পূজার কথা বিশেষ কিছু নাই, দুর্গাপূজার প্রচারই মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য। কালীমূর্ত্তির মধ্যে অবশ্য ভয়ঙ্কর ভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট—যদিও কালীর সেই ভয়ানক ভাবের মধ্যেও তাঁহার দুই হস্ত সন্তানকে বর ও অভয় প্রদান করিবার জন্য প্রসারিত থাকে। ভগবানের মধ্যে যেমন অনন্ত করুণা আছে, সেইরূপ অতি ভয়ানক ভাবও

নিহিত আছে। ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুদগারণ, ভীষণ সমরক্ষেত্র, এই সকল প্রলয়ঙ্করী লীলার মধ্যে ভগবানের ভয়ানক রূপ পরিস্ফুট হয়,—আবার প্রলয়ের পর নূতন সৌন্দর্য্যে সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠে। একদিন ভেসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে যে সকল সমৃদ্ধিশালী নগর বিনষ্ট হইল, অসংখ্য নরনারী বালক-বালিকা দুগ্ধপোষ্য শিশু যাহাতে জীবন্ত সমাহিত হইল, সেই স্থানেই আবার কালের আশ্চর্য্য ক্রীড়ায় নূতন গ্রাম নূতন নগরের আবির্ভাব হইল; আবার মানব গৃহ, উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রীপুত্র-পরিবার লইয়া পরম নিশ্চিন্তমনে বসবাস করিতে লাগিল—শিশুর কলহাস্যে গৃহ-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইল। ইহারই মধ্যে হয় ত পুনরায় অকস্মাৎ অগ্ন্যুৎপাত হইয়া নগরবাসিগণের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, —নগর আবার শ্মশান-সদৃশ হইল। পরম মঙ্গলময় ভগবানের বিধানে কেন যে ইহা হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। হয় ত তিনি দেখাইতে চাহেন, দেখ, আমার করুণা অনন্ত, আমার সৌন্দর্য্য অনন্ত,—প্রলয়েও তাহা ফুরাইয়া যায় নাই। হয় ত তিনি দেখাইতে চাহেন যে, তাঁহার মধ্যে যে অসীম আনন্দ নিহিত আছে, তাহা সাংসারিক সুখ-দুঃখের অতীত; সংসারের সুখদুঃখ তাহা স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার উদ্দেশ্য তিনিই জানেন, কিন্তু তিনি যে মধ্যে মধ্যে

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ

এই রূপ ধারণ করেন, তাহা নিশ্চিত; তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং ভগবানের সম্বন্ধে শুধু—

মধুরং মধুরাং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং
মধুগন্ধি মধুস্মিত মেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং

—বলিয়াই ক্ষান্ত থাকা যায় না; বলিতে হয়, তিনি "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং।"

উপনিষদ ব্রহ্মকে "উদ্যত বজ্রের" ন্যায় ভয়ানক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন;

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজাত নিঃসৃতং
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং চ এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি

"এই জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সেই প্রাণ কম্পন করিলে নিঃসৃত হয় (উৎপন্ন হয়), সেই প্রাণ উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক, তাহাকে যাহারা জানে তাহারা অমৃত হয়। [এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, অন্য অর্থ হইতে পারে না—"কম্পনাৎ" এই সূত্রের ভাষ্য দেখুন, ব্রহ্মসূত্র ১ম অধ্যায়, ৩য় পাদ, ৩৯ সূত্র, শঙ্কর ভাষ্য]।

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥

এই লোমহর্ষকর ভয়ানক চিত্র কোন শাক্ত-কবি অঙ্কিত করেন নাই, ইহা পরম-ভাগবত বৈষ্ণব কবির অঙ্কিত চিত্র। কালী-মূর্ত্তিতে ভগবানের এই ভয়ানক ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহাতে শুধু ভয়ানক ভাবই ফুটিয়া উঠে নাই, কালীর দুই হস্তে যেমন খড়্গ ও নরমুণ্ড, সেইরূপ অপর দুই হস্তে তিনি বর ও অভয় দান করিতেছেন। কালী-মূর্ত্তির মধ্যে ভয়ানক ভাব আছে সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন অন্যায়-কারিণীর ভাব নাই। এবং সাধক ও ভক্তগণ যে কালীর এই ভয়ানক মূর্ত্তির মধ্যে অসীম স্নেহশালিনী জননীর সন্ধান পাইয়াছেন, ইহা বাঙ্গলার সর্ব্বসাধারণের নিকট সুবিদিত। হিন্দু কালীকে জননী বলিয়া সম্বোধন করে। সে বলে "আমার জননী যতই ভয়ানক রূপ ধারণ করুন, তাহাতে আমার ভয় কি? সন্তান কেন জননীর নিকট ভয় পাইবে? আমার স্নেহশালিনী জননী ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছেন এজন্য, যাহাতে জরা মৃত্যু বিপদ প্রভৃতি সাংসারিক ভয় নিকটে আসিতে না পারে। আমি যখন এমন মায়ের সন্তান, তখন সংসারের কোন দুঃখ বা বিপদকে আমি ভয় করিব না। আমি সকল ভয়ের অতীত হইয়া জননীর শ্রীচরণে আমার অভয় প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইব।"

"ওরে শমন, কি ভয় দেখাও মিছে
তুমি যে পদে ওপদ পেয়েছ সে মোরে অভয় দিয়েছে।
অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আমি আর কি শমন-ভয় রেখেছি
কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।"

প্রভৃতি গানে রামপ্রসাদ এইরূপ ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন; এবং এই সকল গান বাঙ্গলার পথে ঘাটে গীত হইয়া থাকে; কৃষক মজুর মুদি প্রভৃতিও ইহা শুনে এবং ইহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করে।* যে মূর্ত্তি সাধনা করিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংস, রামপ্রসাদ, বামা ক্ষেপা প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অধ্যাত্ম জগতের উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন, আমার অক্ষম লেখনীর দ্বারা সে মূর্ত্তির উপযোগিতা স্থাপন করিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস অনার্য্যদের দেবতাকে একদিন আর্য্য ভাবের দ্বারা শোধন করে স্বীকার করে নেবার সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময়ে যে সব দেবতা ভারতবর্ষের সাধু সমাজে প্রবেশ লাভ করেছিলেন তাদের চরিত্রে অসঙ্গতি একেবারে দূর হতে পারে নি, তাদের মধ্যে আজও আর্য্য অনার্য্য দুই ধারা মিশ্রিত হয়ে আছে এবং লৌকিক ব্যবহারে সেই অনার্য্য ধারারই প্রবলতা অধিক।" অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও খৃষ্টান পাদ্রির মত এইরূপ, তাহা আমরা জানি। অনার্য্যদের নিকট হইতে কোন পূজা গ্রহণ করা অন্যায় বা লজ্জাকর, আমরা তাহা বলিতে চাহি না। ভগবানের পূজা যাহারাই করুক, সে পূজা ভক্তির সহিত নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। তবে এই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আর্য্যরা ভারতবর্ষে আসিয়া অনার্য্যদের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়াছিল; আর্য্যদের হস্তে অনার্য্যদের লাঞ্ছনার আর সীমা ছিল না; আর্য্যরা অনার্য্যদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত; দস্যু তস্কর রাক্ষস ব্যতীত তাহাদের নাম উল্লেখ করিত না। তাহাদের নিকট আর্য্যরা পূজা গ্রহণ করিবে ইহা কি সঙ্গত? আর যেমন-তেমন পূজা নহে। শিব-পূজা ও শক্তি-পূজা সকল প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে ততদূর প্রচলিত নহে। বস্তুতঃ, অনার্য্যদের নিকট হইতে গৃহীত বলিলে হিন্দুর দেব-দেবী পূজা নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়, এই ধারণাতেই কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন। ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই এবং ইহাতে যে তাঁহাদের অপর একটা মতের সহিত অসঙ্গতি হয়, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই। বেদে রুদ্রদেবের উপাসনার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যায় "ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলং ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ" এই বৈদিক মন্ত্রে রুদ্রদেবকে পরব্রহ্ম রূপে পূজা করিয়া থাকে। কেনোপনিষদে "হৈমবতী উমার" উল্লেখ রহিয়াছে। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, শিবপূজা ও শক্তিপূজা অনার্য্যদের নিকট হইতে আর্য্যরা গ্রহণ করিয়াছিল।

আর ইহাই বা অনার্য্যদের প্রতি কিরূপ সুবিচার যে, শিব পূজা ও শক্তি-পূজার মধ্যে যাহা কিছু গর্হিত, তাহার জন্য অনার্য্যরাই দায়ী? অনার্য্যদের এই অপবাদ আর্য্যরা করিতেছেন না; যাঁহারা সর্ব্বদা অনার্য্যদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া আর্য্যদের নিন্দা করেন, তাঁহারা করিতেছেন। আর্য্যরা বলিতেছেন, আমাদের ধর্ম্মে যাহা কিছু দোষের আছে, তাহার জন্য আমরাই দায়ী, অনার্য্যদিগকে মিথ্যা অপবাদ দিতেছ। দেবতাদের নিকট পশু-বলি বেদে বিহিত আছে; তাহাতে যত কিছু দোষ থাকে (হিন্দু বেদে বিশ্বাস করে, আমার মতে বেদ-বিহিত কার্য্যে দোষ থাকিতে পারে না) সে দোষ আর্য্যেরই, অনার্য্যদের নিকট হইতে আর্য্যরা পশু-বলি শিখিয়াছে, এরূপ কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমাদের দেশে শিব এবং শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক আর একটিকে লৌকিক বলা যেতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতী বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল। বাংলা মঙ্গল-কাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই।" শাস্ত্রিক ও লৌকিক শক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে পার্থক্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা যেমন কাল্পনিক, শাস্ত্রিক ও লৌকিক শিবের পার্থক্যও সেইরূপ

---

* উপনিষদে এইরূপ ভাবের মূল দেখিতে পাওয়া যায়—

ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

এই কথাই আবার,—

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষা উদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদ্ অগ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

এখানে অন্যান্য দেবতার ন্যায় মৃত্যুও ব্রহ্মের ভয়ে নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন বলা হইয়াছে। এই "উদ্যত বজ্রের" ন্যায় ভয়ানক ব্রহ্মকে জানিলে অমৃতত্ব হয়,—

মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

কাল্পনিক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, শাস্ত্রিক শিব যতী বৈরাগী, লৌকিক শিব উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুধর্ম্মে শিবের যেরূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে তপস্যা ও বৈরাগ্যের সহিত উন্মত্তবৎ আচরণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়; সে আচরণ বাস্তবিক উন্মত্তের আচরণ নহে, কিন্তু বিধি-নিষেধের অতীত অবস্থার আচরণ বলিয়া সাধারণ লোকের পক্ষে উন্মত্তবৎ প্রতীয়মান হয়। শাস্ত্রে শিবকে যে কেবল যতী ও বৈরাগী ভাবে দেখান হইয়াছে তাহা নহে; শাস্ত্রে তাঁহার দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসকারী ক্রুদ্ধ প্রলয়ঙ্কর রূপও দেখান হইয়াছে; আবার তাঁহাকে সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া পত্নী-বিয়োগবিধুর অসহ্য শোকাহত উন্মত্তের ন্যায় দেখান হইয়াছে। সে সকল চিত্র যতী বৈরাগীর চরিত্র-অনুযায়ী নহে। অন্য দিকে মঙ্গল-কাব্যে ও বহু স্থানে শিবের কঠোর তপস্যার উল্লেখ দেখা যায়। আমরা অন্নদামঙ্গলে দেখিতে পাই, আদ্যাশক্তি মহামায়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তপস্যা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মহাদেবের তপস্যাই প্রগাঢ়তম। ভারতচন্দ্র শিবকে লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছেন,

যোগীর অগম্য হয়ে সদা থাক যোগ লয়ে
কি জানি কাহার কর ধ্যান।
অনাদি অনন্ত মায়া দেহ যারে পদছায়া
সেই পায় চতুর্ব্বর্গ দান।
মায়ামুক্ত তুমি শিব মায়ামুক্ত তুমি জীব
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।
অজ্ঞান তাহার যায় অনায়াসে জ্ঞান পায়
যারে তুমি দেহ পদছায়া।

অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠার সময় শিবকে পুনরায় কঠোর তপস্যা-নিরত দেখিতে পাই।

এইরূপে তপস্যায় গেল কত কাল।
শরীরে জন্মিল শাল পিয়াল তমাল॥

যে সকল বিভিন্ন গুণ সাধারণ মানবের চরিত্রে বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, শিবের মহিমময় চরিত্রে তাহারা আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে, ইহাই শিবের কল্পনার মূল তত্ত্ব। তপোবনের প্রভাবে বনের পশুগণ যেমন পরস্পর বিরোধ পরিত্যাগ করে, সমুদ্রে আসিয়া সকল নদ-নদীর বিভিন্ন রস বিভিন্ন গতি যেমন এক হইয়া যায়, সেইরূপ মহাদেবের লোকাতীত চরিত্রে বৈরাগ্য ও ভোগ, ক্ষমা ও ক্রোধ প্রশান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তাই তিনি মঙ্গলস্বরূপ হইলেও শ্মশানে তাঁহার অবস্থান, সর্প ও নরকপাল তাঁহার ভূষণ, ভূতগণ তাঁহার অনুচর, চিতা-ভস্ম তাঁহার অঙ্গরাগ।* এ সকলই ত উন্মত্তবৎ আচরণ। এজন্য যখন ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারী তপস্যা-নিরত গৌরীর নিকট শিবের নিন্দা করিয়াছিলেন, তখন রোষ-পরবশা গৌরী ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,

ন বেৎসি নূনং যত এবমাথ মাং।
অলোকসামান্য অচিন্ত্যহেতুকং
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মানাং॥

শ্মশান-চিতা-ভস্ম ও নর-কপাল, সর্প ও বিষ, লোকে যাহা কিছু অশুভ ও অমঙ্গলজনক মনে করে, সকলের মধ্যেই যে ভগবানের মঙ্গলস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত, এই তত্ত্বই শিবের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া দেখান হইয়াছে। শিবের বর্ণনা শাস্ত্রে যেরূপ, কুমারসম্ভবে কালিদাস যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, মঙ্গল-কাব্যের কবির বর্ণনাও সেইরূপ, সাধারণ লোকের ধারণাও তাহা হইতে ভিন্ন নহে। একই বিষয় বিভিন্ন কবি বর্ণনা করিলে সেই সকল বর্ণনার মধ্যে যে অল্প-বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়, পুরাণে, সংস্কৃত কাব্যে ও মঙ্গল-কাব্যে শিবের যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাদের মধ্যে তদপেক্ষা বেশী পার্থক্য নাই। শাস্ত্রের যে মূল তত্ত্ব, তাহা সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুর শাস্ত্র ও দর্শনের তত্ত্বগুলি মাত্র কয়েকজন পণ্ডিতের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। কবি সেই তত্ত্বগুলি অবলম্বন করিয়া কাব্য নাটক প্রভৃতি রচনা

* The serpents whom all the world hates and refuses come to Kailash, and Mahadev finds room for them in His Great Heart. And the tired beasts come, for He is the Refuge of animals—and one of them, a shabby old bull, He specially loves and rides upon. And last of all, come the spirits of all those men and women who are turbulent and troublesome and queer,—the bad boys and girls of the grown up world you know.—Sister Nivedita (Modern Review, September 1919).

করেন, যাত্রা ও কথকতাচ্ছলে দরিদ্র নিরক্ষর সকলের মধ্যে তাহা প্রচারিত হয়; শিল্পী মন্দির-গাত্রে তাহা উৎকীর্ণ করে; গায়ক সেই সকল বিষয়ে গীতি গাহিয়া বেড়ায়; ফলতঃ সর্ব্বসাধারণের নিকট সেই সকল মূল্যবান্ তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য সকলেই নিজ নিজ প্রতিভা প্রয়োগ করে। ইহার ফলে, ভারতের নিরক্ষর কৃষকের নিকট যেরূপ প্রগাঢ় জ্ঞান ও গভীর ভক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে, সেরূপ অন্য কোন দেশে সম্ভব কি না সন্দেহ। পাশ্চাত্য জগতে দর্শনের তত্ত্ব পণ্ডিতদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। সাধারণে তাহা বোঝে না, সাধারণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার ফলে পাশ্চাত্য-দর্শন অত্যধিক মাত্রায় পারিভাষিক (full of technicality) হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই পরিমাণে তাহার প্রকৃত মূল্য কমিয়া যাইতেছে। দর্শনের তত্ত্বগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করার যদি ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে এরূপ হইতে পারিত না। সাধারণ লোকের মধ্যে এরূপ একটী সহজ জ্ঞান আছে যে, তাহারা খাঁটি জিনিষ হইতে বাজে জিনিষ অনায়াসে পৃথক করিয়া দিতে পারে। মনে করুন, কোন ব্যক্তি এক-নিরীশ্বর দার্শনিক মত প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে এত সূক্ষ্ম বিচার, এমন কৌশলের সহিত বাক্যবিন্যাস থাকিতে পারে যে, বিদ্বৎসমাজে ঐ মতের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের নিকট তাহার প্রতিষ্ঠা হওয়া দুরূহ, কারণ সাধারণ লোক সে সকল সূক্ষ্ম তর্কে ভুলিবে না; তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে এই মতের মূল তত্ত্ব কি? এবং মূল-তত্ত্বে নিরীশ্বরবাদ দেখিতে পাইয়া সকল সূক্ষ্ম তর্ক সত্ত্বেও তাহাতে আস্থা স্থাপন করিবে না। পাশ্চাত্য জগতে দার্শনিক তত্ত্বের উপর সর্ব্বসাধারণের এই প্রভাবটি নাই বলিয়াই সেখানে নাস্তিকতা (Atheism), স্বার্থপরতা (Utilitarianism) ভোগাসক্তি (Materialism) পরজাতিদ্রোহ (তথাকথিত "patriotism") পাণ্ডিত্যের মুখোস পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পরন্তু, ভারতবর্ষে কতকটা সাধারণের স্বাস্থ্যকর প্রভাবের ফলে চার্ব্বাকপ্রমুখ পণ্ডিতদের মত প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃত স্বরূপ নিরীশ্বরবাদ। কিন্তু সেভাবে তাহা সাধারণের নিকট আদর পায় নাই। যতক্ষণ না এই সাংখ্যদর্শনের সহিত ঈশ্বরবাদ মিলিত হইয়াছিল (যেমন ভগবদ্গীতাতে) ততদিন সাধারণের নিকট তাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই।

শক্তি-পূজার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "একটী কথা মনে রাখতে হবে, দস্যুর উপাস্য দেবতা শক্তি, ঠগীর উপাস্য দেবতা শক্তি, কাপালিকের উপাস্য দেবতা শক্তি। আরো একটী ভাববার কথা আছে, পশুবলি বা নিজের রক্তপাত এমন কি নরবলি স্বীকার করে মানৎ দেবার প্রথা শক্তিপূজায় প্রচলিত। মিথ্যা মামলার জয় থেকে সুরু করে জ্ঞাতি-শত্রুর বিনাশকামনা পর্য্যন্ত সকল প্রকার প্রার্থনাই শক্তি-পূজায় স্থান পায়।" চোর বা কলহপ্রিয় ব্যক্তি তাহার মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য ভগবানের নাম গ্রহণ করিলে তাহাতে ভগবানের নাম খারাপ হইয়া যায় না। যতদিন জগতে চোর থাকিবে, মিথ্যা মামলাবাজ লোক থাকিবে, ততদিন তাহারা অনেকেই চুরি করিবার জন্য বা মিথ্যা মামলার জন্য ভগবানকে ডাকিবে। প্রদীপের আলোতে কেহ ভাগবত পড়ে, কেহ নোট জাল করে (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।) প্রদীপকে কি তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে? না, সেজন্য আইন হইবে, কেহ প্রদীপ জ্বালিবে না? মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, চোর, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে নাই? যদি কেহ মনে করেন কালীর মূর্ত্তি ভয়ানক বলিয়াই দস্যু ও ঠগী ভাবে যে, তাঁহার ভয়ানক কার্য্যে কালী সাহায্য করিবেন, তাহা হইলে এরূপ আপত্তিও তোলা যাইতে পারে, কেহ যেন প্রচার না করেন যে ভগবানের অসীম করুণা, কারণ তাহা হইলে পাপী ভাবিবে, "এখন ত যত ইচ্ছা পাপ করিয়া যাই। শেষকালে একবার ভগবানকে ডাকিলেই হইবে; তাঁহার যখন অসীম করুণা, তখন নিশ্চয়ই দয়া করিবেন।" বাস্তবিক পক্ষে, সকল প্রকার শুভ তত্ত্বই দুষ্ট লোকের দ্বারা বিকৃত হইতে পারে; তাহাতে লোকের দুষ্ট প্রকৃতি প্রমাণিত হয়, তত্ত্বটি খারাপ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। সাধারণ লোকে শক্তিপূজার সময় দস্যু ও ঠগীর কথা ভাবে না, রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস কেমন করিয়া পূজা করিতেন, তাহাই ভাবে।

রবীন্দ্রনাথ উপসংহার কালে বলিয়াছেন, "কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করা উচিত যে, কোন ধর্ম্ম-সাধনার উচ্চ

অর্থ যদি দেশের কোন বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যে কথিত বা জীবিত থাকে, তবে তাকে সম্মান করা কর্ত্তব্য। এমন কি ভূরিপরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকেই বড় বলে জানা চাই।" কিন্তু বাতায়নিকের পত্রে শক্তি-পূজার তিনি যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে শক্তিপূজার এই উচ্চ অর্থটি তিনি বড় বা ছোট কোন ভাবেই স্বীকার করেন নাই। অধিকন্তু ইহা যথার্থ নহে (এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি) যে শক্তিপূজার উচ্চ অর্থ কোন বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যেই নিহিত আছে। শাস্ত্র ও সাধক যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন কাব্য, গান, কথার মধ্য দিয়া সেই অর্থই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। অন্য সকল শুভ অনুষ্ঠান যেমন স্থানে-স্থানে লোক দ্বারা বিকৃত হয়, শক্তিপূজাও সেইরূপ কোথাও-কোথাও বিকৃত হইয়াছে মাত্র। হিন্দুরা বড় বেশী শাস্ত্র মানিয়া চলে। বহুকাল পূর্ব্বে শাস্ত্রে যাহা লেখা হইয়াছিল, আজও হিন্দু তাহা ধরিয়া অচল হইয়া বসিয়া আছে, কিছুতেই নড়িতে চাহে না, ইহা রবীন্দ্রনাথেরই অভিযোগ; ধর্ম্ম-বিষয়ে হিন্দুরা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অর্থের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

বসন্তে

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

তোমরা বলিয়াছিলে তোমাদের আছে নাকি
হৃদয়ের বড় বেশী বল,
তোমাদের ধৈর্য্য নাকি মর্ম্মর-প্রতিমা সম
চিরদিন অচল, অটল;
তোমাদের মরমের পাষাণ-কারার মাঝে,
করিয়াছ গর্ব্ব অনিবার,
তুচ্ছ এই প্রকৃতির তুচ্ছতম ঘটনার
প্রবেশের নাহি অধিকার;
কিন্তু আজ বিকশিত নব পত্র পল্লবের
শ্যাম ওষ্ঠ করিয়া চুম্বন,
তোমাদের দিল যেই মৃদু প্রেম-আলিঙ্গন
মধুময় মলয়-পবন,
তোমরা গলিয়া গেলে নিমেষে অমনি হায়!
ছি ছি! প্রাণ এতই দুর্ব্বল,
বিশ্বভরা আনন্দের উচ্ছ্বসিত প্রীতি-সিন্ধু
তোমাদের গ্রাসিল সকল।

* * * *

সরল মানব আমি বুঝিনাক তোমাদের
কবিত্বের নিগূঢ় বারতা,
বহিল দখিণ হাওয়া, বুঝিনাক কেন তাহে
তোমাদের এত চঞ্চলতা;
আজি জ্যোৎস্না তটিনীর চির আঁখি-অভিরাম
অনাবিল রজত-ধারায়,
পুষ্পভার-অবনম্রা জানি আমি বসুন্ধরা
মূর্ত্তিমতী, কুঞ্জবন ছায়;
জানি তার রম্য করে তমাললতার আজি
ফুটে ধীরে মোহিনী মঞ্জরী,
ভ্রমরের কিবা তাহে? সে যে সুধু নিশিদিন
আশে পাশে ফিরিছে গুঞ্জরি?
কলিকার কাণে কাণে এত কিবা কথা তার
আমি তার বুঝিনাত লেশ,
এত কি অধর দাহ? অবিরাম চুমি রেণু
তৃষা তার হয় না নিঃশেষ?
কোথা চূত-মুকুলের সুধাগন্ধে মুগ্ধপ্রাণ
মধুদূত উঠিল কুহরি,
তোমাদের চিত্তমাঝে অমনি পড়িল সাড়া
স্তব্ধ বুক উঠিল শিহরি,
কোথা কোন্ নিকুঞ্জের কিশলয়-অন্তরালে
পাপিয়া সে উঠিল গাহিয়া,
তোমরা হইলে মত্ত, প্রতি তপ্ত ধমনীতে
রক্তস্রোত উঠিল নাচিয়া,

কোথা কোন্ তরুশিরে পল্লব গুণ্ঠনে ঢাকা
ডাকে পাখী 'বউ-কথা-কও',
তোমরা উঠিলে বলি সুরে সুর মিলাইয়া
"কহ কথা, পাষাণ তো নও,"
আমি তো দেখিনা কিছু, তোমরা যে বল সবে
ঊর্দ্ধে ওই ছায়াপথে লেখা
দেবেন্দ্রের চিরবাঞ্ছা চারু অভিসারিকার
চরণের অলক্তক-রেখা।

* * * *

আমি ভাবি তোমাদের এই দিব্য অনুভূতি
সকলি কি কল্পনার খেলা,
কে গড়ে? কেন বা গড়ে? এই সারা বিশ্বমাঝে
আনন্দের এ অনন্ত মেলা;
মলয়ের মৃদুস্পর্শে কেন কুঞ্জে ফোটে ফুল
কেন পিক মধুকণ্ঠে গাহে,
তৃষিত চকোর কেন চিরদিন এত প্রেমে
চন্দ্রমার মুখপানে চাহে;
আমি মূর্খ, রসহীন কিছুই বুঝি না বলি
বলিব কি সবি প্রতারণা,
এই হর্ষ, এই প্রীতি, এই চির-ব্যাকুলতা
কবিত্বের এই উন্মাদনা?
কে জানে এ ভালবাসা জাগিল প্রথম কবে
সৃজনের কোন শুভক্ষণে,
বিজয়-কেতন যার উড়ে আজি সমারোহে
বসন্তের গগন-প্রাঙ্গণে।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(৩৫)

অরবিন্দের মা জীবনের পৌনে-চার ভাগ সুখের কোলে কাটাইয়া, হঠাৎ অবশিষ্ট কয়েকটা দিনের জন্য দুঃখের যে পরিচয়টুকু প্রাপ্ত হইলেন, সেও নেহাৎ সামান্য নয়। বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের কন্যা অবস্থাপন্ন ঘরে পড়িয়াছিলেন; তারপর 'স্ত্রী-ভাগ্যে ধন' এই হিসাবে ধরিলে, ভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপার তো অন্তই হয় না! কিন্তু দুঃখের খাতক যখন নিজের বাকি দেনা মিটাইতে আসিল, তখন কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করিয়াই দিল। স্বামীর মৃত্যুতেই তাঁহাকে সংসারে অনেকখানি নিস্পৃহ করিয়াছিল। একমাত্র পুত্র ও বধূ লইয়া তিনি বেশ সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার সংসারকে যে অকল্যাণে ঘেরিয়া ফেলিতেছে, পরিত্যক্তা সতীর উষ্ণ শ্বাসকেই তাহার মূল বলিয়া ধরিয়া লইয়া তিনি সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া আছেন; অথচ, স্বামী-পুত্রের দ্বারা ইহার প্রতিবিধান করাও তাঁহার সাধ্যাতীত। তার পর যখন শরৎ-শশী, স্বামী, সন্তান, ঘর-সংসার সমুদায় ভাসাইয়া দিয়া চির-অস্তমিত হইল, সে শেল মায়ের বুকে বড় ভীষণ হইয়াই বাজিল। মায়ের নিকটে সকল সন্তানই সমান; কিন্তু বাধ্যতা ও মাতৃবৎসলতা গুণে এই মেয়েটিই তাঁহার বিশেষ একটু প্রিয় ছিল। তদ্ভিন্ন, মাতৃ-পরিত্যক্ত শিশুগুলির, এবং সংসারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ শোক-বিহ্বল জামাতার দুঃখে তাঁহাকে সমধিক কাতর করিয়াছিল। নিজের বাড়ীতে অতিষ্ঠ হইয়া দিন-কতক বাপের বাড়ীতে ভাইয়ের কাছে জুড়াইবার আশায় চলিয়া গেলেন; কিন্তু সমাগত মন্দ ভাগ্যকে ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। সেখানকার জমিতে পা দিতে না দিতে, যে ভাই যত্ন করিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিল, সেই বংশের মধ্যে একটী মাত্র উপার্জ্জন-ক্ষম সকলের ছোট ভাইটি হঠাৎ দুদিনের অসুখে মারা পড়িল।

তখন সেখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া, কাঁদিয়া তিনি ছেলেকে বলিলেন, "সংসারে আর আমি থাকবো না অরু! আমায় তুই কাশী পাঠিয়ে দে।"

মায়ের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই টলাইতে না পারিয়া কাশী-বাসের বন্দোবস্ত করা হইল। যাত্রার পূর্ব্বে ব্রজরাণীকে

নিজের তল্পী বাঁধিতে দেখিয়া, অরবিন্দ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"এ আবার কি?" ব্রজরাণী উত্তর দিয়াছিল, "আমিও যে মায়ের সঙ্গে যাব।" "মাকে বলেছ?" "বলে কি হবে? মাকে এই অবস্থায় একা পাঠিয়ে দেওয়া কি উচিত হচ্ছে?"

অরবিন্দ এ কথার জবাব না দিয়া, শুধুই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিল। স্ত্রীর এ কর্ত্তব্য-বোধটুকু তাহাকে সন্তুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট করিল, সে নিঃশ্বাসটা হইতে ইহার সঠিক খবর পাওয়া গেল না। যাই হোক, ছেলে-বৌ সঙ্গে করিয়াই তাঁহাকে কাশী যাইতে হইল। আর সঙ্গে গেল শরতের মাতৃহীনা কোলের সেই ছোট মেয়েটা। অনেক করিয়া নন্দায়ের কাছ হইতে সেটিকে মেয়ের মামী চাহিয়া লইয়াছিল। বীণা প্রথমে মেয়ে দিতে রাজী হয় নাই। শেষে, নিজের কচি ছেলে লইয়া তেমন যত্ন হয় না, অসীমা শুদ্ধ ঘর করিতে শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল, তার উপর পুত্রহীনা ব্রজরাণীর হাতে মানুষ হইলে মেয়েটার সকল দিকেই মঙ্গল বুঝিয়া, মেয়েটাকে সে মেয়ের মামীর হাতেই সঁপিয়া দিল। শাশুড়ী বধূর আচরণে সব দিকেই খুসী হইলেন।

কাশী আসিয়া শোকাকুলা অরুর মা একটুখানি যেন শান্তি লাভ করিতে পারিলেন বলিয়া অন্যের সহিত তাঁহার নিজেরও মনে হইল। সেখানে উহাঁদের কুলগুরুর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। ঠাকুর-দেবতা দেখা, গুরুর নিকট শাস্ত্র শ্রবণ ইত্যাদিতে মাস আষ্টেক কাটাইয়া, প্রায় মাসখানেকের অসুখে অরবিন্দের জননীর ৺কাশী-প্রাপ্তি ঘটিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে অরু ও ব্রজরাণী দুজনেই কাছে ছিল। মধ্যে মাস-দুয়েকের জন্য পূজার সময় বাড়ী গেলেও, মায়ের অসুখের সংবাদে দুজনেই আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। রোগের সময় শাশুড়ীর সেবাও যেমন করিতে হয়, সে করিয়াছে। কিন্তু কদমের মুখে একটা সংবাদ শুনিয়া, মনটা তাহার শাশুড়ীর উপর আবার একটু ভার হইয়া উঠিয়াছিল। পূজার ছুটীতে, গৃহিণীর বারম্বার অনুরোধে ও আগ্রহে, খোকা বাবুকে সঙ্গে লইয়া দুই মায়ে-ঝিয়ে কাশী আসিয়াছিলেন। বেয়ান ঠাকুরুণ কোনমতেই বাড়ী ঢুকেন নাই;—তাঁহার কোন্ দেশের লোক নারদ-ঘাটে থাকেন, সেইখানেই তিনি উঠিয়াছিলেন। বউএর সঙ্গে মা এক দিন দেখা করিতে যান,—কদমও তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। তা' সেই ভরা দুপুরেও তাঁ'র তখনও পুজো-পাঠ সারাই হয় নাই। আধ ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া, উঁহারা যেমন মুখে গিয়াছিলেন, তেম্নি ফিরিলেন। 'মাগী একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখিলও না। তা' বউমা বেচারী তা'তে যেন অপ্রস্তুতের একশেষ! ওনার অতশত কিছুই নেই। কি যত্ন, কি আত্তি,—শাশুড়ীকে যেন ঠাকুর-ঘরে বসিয়ে রেখে সেবা করেচে। মুখে হাঁসিটুকুন্ তো লেগেই আছে। যেন এক-খানি দেবী পিরতিমে। মনিষ্যি আর নয়।'

ব্রজরাণী হিংসায় কালি হইয়া গিয়া, একদিকে চাহিয়া রহিল। ইহার পর শাশুড়ীর সেবা যখনি করিতে গিয়াছে, প্রত্যেকবারই তাহার মনে হইয়াছে, 'অত করিয়া ঠাকুর সেবা পাইয়া আমার সেবা কি আর ওর ভাল লাগিতেছে?' মনটাও অমনি হাতের সহিত পিছাইয়াছে। সেই আনন্দময় মূর্ত্তি, উজ্জ্বল মঙ্গল গ্রহের মত অনিন্দ্য কান্তি শিশুটির সম্বন্ধে ব্রজরাণী নিজের মনকে একটা অযথা কৌতূহল হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। এটাকে যতই সে নিজের দুর্ব্বলতা মনে করিয়া মন হইতে বিদায় দিতে চায়, ততই যেন সে জোর করিয়া চাপিয়া ধরে। মনে-মনে উৎসুক হইয়া উঠিলেও, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। কিন্তু জিজ্ঞাসা না করিয়াও কিছু-কিছু খবর সে জানিতে পারিল। 'মায়ের মন ছিল যে বউ আর নাতিকে নিজের কাছেই রাখেন। কিন্তু খোকা বাবুর পড়ার গোলমাল হবার ভয়ে তানারাই রাজী হলো না। যে দিন সব চলে গেল, মাটিতে আছাড়ে পড়ে মাগীর কি কান্না! আহা! তা কান্‌বে না গা? দেখেনি তো দেখেনি! কি সামগ্রী বলো দেখি? কথায় বলে, টাকার চাইতে টাকার সুদে মায়া বেশি হয়! তা' বারমাস কাছে থাকতো, কি ঘরে আর একটা থাকতো, তো সে এক রকম হতো। সোয়ামী-শ্বশুরের বংশে আর তো নেই। আবার ছেলে বলে ছেলে! যাকে বলে, ছেলের মতন ছেলে!'

কদম আপনার মনে বকিয়া চলিল। বলা শেষে উঠিয়াও চলিয়া গেল। গভীর অন্যমনস্কতা প্রযুক্ত ব্রজরাণী তাহা লক্ষ্যও করিল না। তাহার দুই কাণের ভিতর দিয়া, সেই ভিন্ন জাতি, ভিন্ন গোত্র, নিরক্ষর মূর্খ দাসীর বংশ-গৌরব-সম্ভূত সেই কথা-কয়টি যেন মর্ম্মের মাঝখানে প্রবিষ্ট হইয়া,

সেখানে একটা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল—'স্বামী-শ্বশুরের বংশে আর নাই!'

মাতৃকৃত্য সমাধা করিয়া অরবিন্দ সেই অবধি এখান-সেখান করিয়াই বেড়াইতে লাগিল। কিছু দিন কাশীতে থাকিয়া, পরে বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, অযোধ্যা—এমনি কয়েকটা তীর্থে, কোথাও দু-এক হপ্তা, কোথাও পাঁচসাত দিন—এমন করিয়াই ঘুরিয়া, ফিরিতে লাগিল। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন, শরতের যে মা-মরা ছোট মেয়েটাকে আপনার করিয়া লইবার লোভে ব্রজরাণী মানুষ করিতে-ছিল, সেটিও সামান্য সর্দ্দি লাগিয়া, শীতের প্রারম্ভে, শাশুড়ীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, নিউমোনিয়া রোগে মারা পড়িয়া-ছিল। এই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব স্নেহের বাধায় ব্রজরাণী শোকে, দুঃখে, অনুতাপে এমনই অধীর হইয়াছিল যে, সেই অবধি একটা জায়গায় স্থির হইয়াই সে তিষ্ঠিতে পারে নাই। খুকির রূপ, খুকির গুণ, খুকির কথা, খুকির হাসি,—সবচেয়ে খুকির মুখের সেই আধ-আধ 'মা' ডাক, তাহাকে যেন মোহের আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ব্রজরাণী মাতৃত্বের এই প্রবল বাসনার হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার এমনও মনে হইয়াছিল যে, ঐ এতটুকু খুকিটির সঙ্গে-সঙ্গে তাহার সব সুখই যেন জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষের যে মন, সে বড় আশা-প্রবণ এবং লোভী। নূতন কিছু পাইলেই সে পুরান শোক চাপা দিবার জন্য নিজের সহিত বুঝা-পড়া করিতে বসে। মনকে সে এই বলিয়া বুঝায় যে, তাহাকে তো কখনই ভুলিতে পারিব না; কিন্তু কাঁদিয়া-কাটিয়া যখন কোনই ফল নাই, তখন বৃথা পরলোকে তাহার শান্তির ব্যাঘাত জন্মাই কেন? আর, এখনও যেটুকু পাওয়া যায়, তাহা-দেরই না দেখি কেন? তথাপি, মনের মধ্যে যে শূন্যতাটা হায় হায় করিয়া ফিরে, তাহা কি কোন সদ্-যুক্তির বশ?

(৩৬)

এবারের পূজার আনন্দ-সমারোহ কিছুই ছিল না। ঠিক বোধনের পূর্ব্বে কর্ত্তা ও কর্ত্রী সেই নিরানন্দ, পরিত্যক্ত গৃহে ফিরিয়া আসিল। ব্রজরাণীর এক দরিদ্রা বাল্য-সখীর সহিত এলাহাবাদে তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। সখী মিলনের মেয়েটী বড় সুন্দরী। ব্রজর শূন্য বুক তাহাকে বক্ষে চাপিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য জুড়াইয়াছিল।

বাড়ী ফিরিয়া তাহার জন্য পূজার পোষাক ও এক-জোড়া সোণার চুড়ি পাঠাইয়া সে সেখান হইতে অনুযোগ-পূর্ণ পত্র পাইল। দরিদ্র দম্পতি নিজেদের অযোগ্য মিলনের কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিতে চাহিয়া-ছিলেন। ইহার উত্তরে ব্রজরাণী এইরূপ জবাব দিল—

"প্রিয় মিলন!

বুঝিলাম, সংসারে স্নেহ-ভালবাসার কোনই মূল্য নাই। আছে শুধু ব্যবহার শাস্ত্রের অমোঘ নীতি। আর সংসারে আজ সেইটাই এর সব জায়গাটা জুড়িয়া বসিয়া আছে। তোমায়-আমায় প্রভেদ কোন্‌খানে? তুমি ভদ্র কায়স্থ-কন্যা, আমিও তাই। তোমার স্বামীর পদবী দত্ত, ইঁহারা বোস। ঠিক আমার বাপেদের সমান ঘর। (এ কথা তোমায় অনেকবার বলিয়াছি; এবং তা না হইলে, তোমার মেয়েটির আমার ছোট ভাইটির সহিত বিবাহ দিতাম, তাও বলিয়াছি।) জাতি কুল এবং সামাজিক মর্য্যাদায় তোমরা আমাদের নীচে নও। অতএব তুমি যে আমাদের অযোগ্য মিলনের জন্য সহস্রবার কুণ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ, সেটা তোমার মনঃ-কল্পিত। তোমার সঙ্গে আমার প্রভেদ শুধু টাকায়। এইটাই তোমরা এত বড় করিয়া ধরিতেছ কেন? দেখিতেছি, সংসারে যার টাকা আছে, সেই মস্ত অপরাধী। কাহারও সহানুভূতির পাত্র সে নয়। যেহেতু লোকে জানে তার টাকা আছে, অতএব, তার জীবনে আর কোন অভাব থাকিতেই পারে না। শিকল গাছটা সোণার হইলেই যে অভাগা মানুষ ভাগ্যবান হইয়া উঠে না, এ কথা বুঝাই কাহাকে?

আজ যদি আমার গর্ভে ভগবান সন্তান দিতেন, আমি যদি তোমার মানসীকে বউ করিতাম, তুমি ঐ দুগাছা ছাই চুড়ির খোঁটা আমায় দিতে পারিতে? যাকে নিজের গায়ের আর আমার সাধ্যের অসাধ্যের সমুদয় হীরা-মাণিকে সাজালেও তৃপ্তি হয় না, তাকে ঐটুকু দেবার একটা ফোঁটা তৃপ্তি নেবার অধিকার আজ তিনি দেননি বলেই না তোমরাও দিতে সঙ্কোচ করচো! কি বলবো? যা ভাল মনে হয় করো। ঈশ্বর যাকে মেরেছেন, মানুষে তাকে মারবে সে আর এমন

বিচিত্র কি ? আজ যদি খুকিটাও আমার থাকতো ? এত বড় শূন্যতা প্রাণে নিয়ে মানুষ বাঁচে কদ্দিন ?"

পূজার পঞ্চমীর দিনে বাড়ীর ও প্রতিবেশী দু একজন যাহাদের সহিত কিছু না কিছু বাধা-বাধকতা আছে, সেই সব লোককে যথারীতি নূতন কাপড় বাঁটিয়া দিল। বাপের বাড়ী, শরতের বাড়ী, ও উষার শ্বশুরবাড়ী তত্ত্ব পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছে, এমন সময়ে ঝিয়ের কোলে ছেলে দিয়া উষা আসিয়া উপস্থিত হইল। "এসেছিস, এই তোকে এখনি আনতে পাঠাচ্ছিলুম।"

উষা মনটা একটু ভার করিয়া আসিয়াছিল। তত্ত্বের সামগ্রীগুলো নজর পড়ায় অসন্তোষ চলিয়া গেল; সোৎসাহে কহিয়া উঠিল, "দেখি দেখি, ওখানা কি কাপড়! সোণালি জরির শাড়ি, কপার ঝাড়। ভারি চমৎকার তো? এর দাম কত বৌদি? দেড়শো-দুশোর তো কম হবেই না। জ্যাকেট-পিসটা অমনি রেখেছ কেন? জ্যাকেটটা তৈরি করিয়ে দিলে বিজয়ার দিন পরতুম।"

"কাশীতে কিনেছিলুম কি না, সেই অবধি ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে আর তৈরি করান হয়ে ওঠে নি। খোকার এই ভেলভেটের গেঞ্জি কাশীতেই করিয়েছি; দেখ দেখি, বেশী বড় হবে কি ?"

"তা' ও সব দামী জিনিস একটু বড়ই ভাল। দিদির ছোট খোকারও বুঝি এই রকম? অসীমার সাড়ীখানা তো আমারই মতন। ওমা! কত টাকাই খরচ করেছিস্ বৌদি! দাদা রাগ করে না?" ব্রজরাণী ননদের মন্তব্যে মুখ ভার করিয়া জবাব দিল, "রাগ করে কি করবে? আমাদের টাকা আর কার জন্য? আমরা—আমি কিসের জন্য পুঁজি করে রাখবো ?"

এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায়, কিছুক্ষণ দুজনেই কথার খেই-হারা হইয়া গিয়া নীরব রহিল। নিজে মাতৃত্বের স্বাদ পাইয়া অবধি উষা ব্রজরাণীর মর্ম্মবেদনা আজকাল সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে এবং বেদনা পায়। বিশেষ করিয়া ব্রজরাণীর অবস্থায় সে ব্যথা যে কতখানি বেশী হওয়া স্বাভাবিক, ইহাও সে অনুমান করিত।

অল্পক্ষণ পরে নিজেরই আহৃত এই আকস্মিক গাম্ভীর্য্যে ঈষৎ লজ্জাবোধ করিয়া জোর করিয়া, নিজেকে নিজের সেই বেদনা হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়া, ব্রজরাণী একটুখানি হাসিয়া কহিল, "আর সবই তো এক রকম করে তুলেছি। গুরু, পুরুত,—পূজোর আর যার যেমন হয়, ফর্দ্দ মিলিয়ে সবই হয়েছে, তোমার, আমার আর বড় ঠাকুরঝির যেমন বরাবর এক রকম হয়,—এবার তাঁর বদলে তাঁর মেয়েকে সেইটে দিয়েছি। কিন্তু একটা কথা ভেবে কোন ঠিকানায় পৌছুতে পারিনি—" এই বলিয়া কথাটা শেষ না করিয়াই ব্রজরাণী চুপ করিয়া গেল এবং ঈষৎ হাসিল।

উষা কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বৌদি ?"

ব্রজরাণী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, "বর্দ্ধমানের কাপড় পাঠানর কি রকমটা হবে?" উষা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "বর্দ্ধমানের কাপড় পাঠানর কথা কি বল্‌চো? কাকে পাঠাবে কাপড় ?" "বর্দ্ধমানে তোমাদের আপনার জন কেউ নেই ?" "আমাদের! আপনার জন! কই, কে আছে ?"

ব্রজরাণী ঈষৎ উষ্ণ হইয়া কহিল, "কেন ন্যাকামী করিস বল্ তো? ভাইপো আর তার মা বর্দ্ধমানে থাকে না? তুই জানিস্ না ?"

উষা দুই ভুরু শুদ্ধ চোখ কপালের উপর টানিয়া তুলিয়া, ঘাড় কাত করিয়া, অবাক হইয়া গিয়া কহিল, "অভাগা! আমার আবার ভাইপো কোথায়! তাদের কথা যা বল্‌চো, তা আমি বুঝবো কি করে ?"

ব্রজরাণীর মনটা দ্বিগুণ তাতিয়া উঠিল। অকারণেই সে গরম স্বরে কহিয়া উঠিল, "কেন গো, তোমার দিদি বরাবর মেয়ে দিয়ে ভাইফোঁটা দেওয়াতেন; গেল বছর তোমার মা বৌ-নাতিকে নিজের কাছে এনে আদর করে গেছেন। তুমিই বা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করলে চল্‌বে কেন? সেও যেমন পিসি ছিল, তুমিও তো তাই।"

"সে যেমন বাবার নিষেধ না মেনে পাপ করলে, তার জন্যে তার হয়েও তো গেল; সব্বাই তো আর সে রকম নয়। আমি কক্ষনো তাদের দিকে হয়েছি তুমি দেখেছ, যে আমায় শোনাচ্চো আজ ?" উষারও মেজাজ গরম হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে করিল, দিদির ও মার কাজের খোঁটা, তাঁহাদের নাগাল না পাওয়াতেই, বৌদি তাহার উপর ঝাড়িয়া লইতেছে। ব্রজরাণীও রাগিয়া গেল; বলিল—

"দেখ্ উষি! মরা মানুষের সমালোচনা করিস্ নে বল্‌ছি!

এক ফোঁটা মেয়ে, সব্বার চাইতেই তুই 'যেন বেশী বুঝিস্। তোদের সে ভাইপো কি নয়, সে তোরা বুঝগে যা; আমার তা'তে কি এসে যায়? তোমার মা দিদি দিতেন, তোমারও সাধ সখ যায়, তাই ধর্ম্ম ভেবে মনে করিয়ে দিচ্ছিলুম বই ত না; নৈলে আমার গরজ কিসের বল্ তো শুনি?"

বাস্তবিকই, ব্রজরাণীর কোন 'গরজ'ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঊষা উহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া নিজে একটুখানি নরম হইলেও, মনের ভিতরটা—তাহার, বকুনি খাইয়া, বেশ একটু গরমই রহিয়া গেল। চড়া সুরেই জবাব দিল—"অত সখ আমার নেই গো নেই।"—বলিয়া খানিকক্ষণ মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিয়া, হঠাৎ কি একটা ভাবিয়া লইয়া, ব্যাপারটাকে হাসি-তামাসার বিষয়ে পরিণত করিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তোর যদি সখ হ'য়ে থাকে, তুই-ই কেন দে'না।"

ব্রজরাণীর উত্তেজনায়-ঈষদারক্ত মুখ অকস্মাৎ এই কথায় বিবর্ণ পাণ্ডুর হইয়া আসিল। সে স্বল্পকাল নীরব হইয়া থাকিয়া, সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমি কোন্ সুবাদে পাঠাতে যাব?"

"খুব বড় সুবাদেই। তুই বরঞ্চ মা।" ব্রজরাণী এমনি করিয়া চম্‌কাইয়া উঠিয়া, লোভাতুর ব্যাকুল চক্ষে ঊষার মুখের দিকে চাহিল যে, সে দৃষ্টিতে মস্ত বড় একটা কিছু আছে;—কিন্তু সেটা যে কি, তাহার কল্পনামাত্র করিতে না পারায়, ঊষা উহাকে ভুল করিয়া ফেলিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। এমন অনেক দিনের কথাই তাহার স্মরণে আছে, যে দিন সতীন ও সতীনপো সম্বন্ধীয় আলোচনার মধ্যে ব্রজরাণী এম্‌নি উন্মত্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে যে, ঊষা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়া পলাইবার পথ খুঁজিয়াছে।

তাহারই বা ভ্রমে পড়ার দোষ ধরিলে আজ চলিবে কেন? যে উৎসাহিত আশায় অকস্মাৎ চন্দ্রকিরণোজ্জল নদীর জলের ঢেউএর মত ব্রজরাণীর মুখ-চোখ চকচকে হইয়া উঠিয়াছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে সে তরঙ্গ নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়া, সে মুখ যেন মেঘ-ঢাকা চাঁদের মত রহস্যময় ও আঁধারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মনের মধ্যে এই এতটুকু সময়ের ভিতর একটা যে তাড়িতের তীব্র প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল, খুব অসহ্য একটা যন্ত্রণার প্রবাহের মতই সেটা ক্ষণমধ্যে তাহাকে অবসাদ-ক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল করিয়া দিয়া গেল। সে বলিল, "হ্যাঃ, সৎমা আবার মা! গোষ্পদ যেমন নদী, তেমনি সৎমাও মা, আর কি!" নিজের ঐ কথাটা নিজেকে কি ঊষাকে, কাহাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য, তা' কে জানে—বলিয়াই সে জোর করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সেই হাসির সুরটা এবং যেখান হইতে সেটা উৎপন্ন হইয়াছিল—তাহার সেই মুখখানা—এতদুভয়েই সে হাসিটা হাসির চাইতে কান্নার ভাবেই মানাইল বেশী। তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া, পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া, আঁচলের খুঁটে চোখ রগড়ানটা যতটা পারে অন্যের চক্ষে অদৃশ্য রাখার চেষ্টা করিতে করিতে, বলিয়া উঠিল—"মজা দেখ! কি বাজে কথায় সময় কাটাচ্চি! চারদিকে কত কাজ বাকি পড়ে আছে। আয় দেখি, বাসন বার করিগে। ছিরি বরণডালা সবই যে এখনও বাকি।"

তা' এ প্রসঙ্গ এইখানেই মিটিল না। তখনকার মতন চাপা পড়িলেও, পরদিন ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভে যখন পূজার বাজনা বাজিয়া উঠিল, ঘরের ও পরের ছেলেরা নূতন-নূতন পোষাকে সাজিয়া পূজাবাড়ীর শোভাবর্দ্ধন করিতে জড় হইল; প্রতিবেশীর অঙ্গনে, রাস্তায়, সর্ব্বত্র ছেলেবুড়ার অঙ্গে সাধ্যানুযায়ী নূতন কাপড়ের নিশান,—বাঙ্গালী ঘরের সব-চেয়ে বড় আনন্দোৎসবের সমাচার ঘোষণা করিতে লাগিল, তখন আর ব্রজরাণী নিজের মনের দ্বিধার দ্বন্দ্বে নিজেকে জয়ী রাখিতে পারিল না। আপনার কাছে হার স্বীকারের দীনতা স্বীকার করিয়া, সে স্বামীর সহিত সাক্ষাতের জন্য ভিতরে-বাহিরে ছটফট করিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীও কি ছাই সেদিন তেম্‌নি দুর্ল্লভ হইয়া পড়িলেন! তাঁহার আর সেদিন টিকিটিও দেখা গেল না।

এদিকে ভবানীপুর হইতে প্রত্যেকবারের মতই জাঁকাল পূজার তত্ত্ব আসিল। ব্রজরাণীর বাপ কয় বৎসর হইল স্বর্গগত হইয়াছেন; কিন্তু মায়ের হাতে টাকাকড়ি যথেষ্ট। একমাত্র কন্যা-জামাতার বাৎসরিক পাওনা তিনি কিছুই কমান নাই। আজ কোন কিছুতেই কিন্তু ব্রজরাণীর চঞ্চল চিত্ত সুস্থির করিতে পারিতেছিল না। সে সে-সব চাহিয়াও দেখিল না। শেষকালে খবর লইয়া-লইয়া, বাহিরের ঘরে বাহিরের কোন লোক উপস্থিত নাই সংবাদ পাইয়া, নিজেই সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। অরবিন্দ একলা একটা ইজি চেয়ারে পড়িয়া কি একটা বই পড়িতেছিল; সে তাহার

আগমন জানিতে পারিয়া চোখ তুলিবার পূর্ব্বেই, কোন রকম ভূমিকা না করিয়াই, বারবার-করিয়া-মনে-করা, সঙ্কোচ-সরান নিজেরই সৌখীন বুলিটা সে গড়গড় করিয়া কলটেপা আগিনের মত আওড়াইয়া গেল, "দেখ, আর সব তো আমি এক রকম করেছি। কেবল বর্দ্ধমানে যদি কিছু পাঠানর দরকার থাকে, সেইটেই শুধু হয়নি। তা' তুমি সেটা না হয় সরকার মশাইকে বলে দাও—আজও তো রেজেষ্ট্রী নেবে, আজই তাহলে দিয়ে দিক্।"

অরবিন্দ অকস্মাৎ এইভাবে সম্ভাষিত হইয়া, একটুক্ষণ চোখের সামনে বই রাখিয়া, নিজের স্বাভাবিক সংযত স্বরেই কহিল, "কই, কিছু পাঠাবার তো দরকার নেই।" বলিয়া আবার বই পড়িবার উপক্রম করিল দেখিয়া, ব্রজরাণী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।

"দরকার নেই তো? তা'হলেই হলো। আমার কাজ মনে করে দেওয়া, আমি তো করলুম। তার পর তোমাদের যা কর্ত্তব্য, তোমরা তাই করবে। আমার আর তাতে কি? আমায় না কেউ দুষ্‌লেই হলো।"

"তোমায় এই চৌদ্দ বৎসর যদি না কেউ দুষে থাকে, আজকের এ বৎসরেও দুষবে না। কিন্তু আজকের দিনে কে কখন এসে পড়ে তার কোন হিসেব নেই। আজ যদি তুমি এ ঘরে এ বেশে এসে দাঁড়িয়ে থাক, তা'হলে লোকে তোমায় বেহায়া বলে নিন্দে করবে এটা ঠিক।" "বয়ে গেল,—নিন্দেকে আমি ভয় তো বড্ডই করি। তুমি যে ঐ চৌদ্দ বৎসরের কথাটা বল্লে, তা সে চৌদ্দ বৎসর তো আর আমার দায়িত্বে কাটেনি। সে দিনের দায়ী ছিলেন আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী। কিন্তু এই বছরটা না কি আমার হাতের, তাই আমায় এত করে এটার জন্যেই ভাবতে হচ্চে। কাপড়-চোপড় সবই আছে। যদি ইচ্ছে থাকে, সরকারকে বল্লেই, সে পাঠিয়ে দেবে।—"

"কোন দরকার নেই। তুমি ভেতরে যাও রাণি, অমর মিত্তিরের এখনি আস্‌বার কথা আছে। কি রে চতুরিয়া, বাবুলোগ কই আয়া?"

"জি"—বলিয়া চতুরিয়া, প্রবেশদ্বারের দুদিকে দুই বাহু দিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া, হতভম্বের মত 'বহুজীর' মুখের দিকে চাহিল। তখন আর কাহাকেও না পাইয়া, অগত্যাই চতুরিয়া এবং তাহার পশ্চাতে অবস্থিত 'অমর মিত্রের' প্রতিই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া, মনে-মনে ইহাদের প্রতি এমন একটা কটু মন্তব্য প্রকাশ করিতে-করিতে সে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিল যে, উহা মনে-মনেই বলা চলে, মুখে প্রকাশ করিতে গেলে ভদ্রতা রক্ষা পায় না। তার পর উত্যক্ত চিত্তে কর্ম্মবাড়ীর কার্য্য-নিরত পরিজনবর্গের কাজের খুঁৎ কাড়িয়া টিক্‌টিক্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিজে অসচ্ছন্দ এবং সকলে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল; আর কোনই লাভ দেখা গেল না।

(৩৭)

শরতের অকাল-মৃত্যু সংসারে যে কয়টি প্রাণীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল, স্বজন-পরিত্যক্ত শিশু ও তাহার জননী ইহাদের অন্যতম। এই সুকুমারমতি শিশুটি জীবনের যে প্রধান অংশটায় চিরবঞ্চিত হইয়া পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সেই তাহার অপ্রত্যাশিত কুয়াসাচ্ছন্ন ভাগটায়, সহসা একদিন, কক্ষে অমৃতভাণ্ড ধারণ করিয়া সিন্ধু-সলিলোত্থিতা মা-লক্ষ্মীর মতই, তাহার এই পিতৃস্বসাটির আগমন ঘটিয়াছিল। ইঁহার পায়ের রেণুতে দীনের ভগ্ন কুটীর নবীন হইয়া উঠিয়াছে, ইঁহার হাতের স্পর্শে চিরসঞ্চিত অনেক বেদনা ঝরিয়া পড়িয়াছে। অজ্ঞতার গুহাশায়ী অন্ধকার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পলায়ন করিয়াছে। অপরিচয়ের ব্যাকুল তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির আনন্দে পর্য্যবসিত করিয়া দিয়াছে। এক কথায়, ভাল হোক, মন্দ হোক, সংসারে আসিয়া যা অবশ্য-প্রাপ্য, তারই কিছু সে এইখানেই পাইয়াছে। তাই, যে দিন খবর আসিল যে, সেই পিসিমা আর ইহলোকে নাই, বালক হইলেও অজিতের দুঃখ সে দিন অসহনীয় বোধ হইয়াছিল। মনোরমা সে দারুণ শোকে একটা ফোঁটা চোখের জলের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিল না,—অজিত যে এই একটীমাত্র আত্মজনের বিয়োগ-বাথায় ঝটিকা-বিপর্য্যস্ত চারা গাছটির মতই লুটাইয়া পড়িয়াছে।

পূজার সময়ে অজিতের ঠাকুর-মার নিকট হইতে আহ্বান আসিলে, মনোরমা সেখানে না যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। অজিতকে বলিল, "লিখে দে, একজামিনের পড়া শক্ত হয়ে আস্‌ছে, ছুটীতেও পড়তে হবে।"

যুক্তিটা অজিতের মনঃপুত হইল না। জীবনের যে অনাস্বাদিত সুধাটুকুর স্বাদ সে লাভ করিতেছে, তার এতটুকুও সে ছাড়িতে প্রস্তুত নয়। মায়ের কথায় মৃদু

প্রতিবাদ করিল, "পড়া তো আমার তৈরী হ'তে কিছুই বাকী নেই মা-মণি! ছুটীর সময় আবার মানুষে' বুঝি পড়ে!" দিদিমাকে গিয়া বলিল, "দিদিমণি! চল না, তোমায় তীর্থ করিয়ে আনিগে।" এ লোভটুকু সংসার-নির্লিপ্তা দুর্গাসুন্দরীর মনের নিভৃত প্রান্তে কোথায় বুঝি বাসা বাঁধিয়া বসিয়াছিল,—ডাক পড়িতেই বেশ বড়-গলা করিয়া সাড়া দিল; বলিলেন, "যেতে তো সাধ যায় ভাই,—তা সবই তো টাকার খেলা।"

শুনিয়া মনো বলিল, "টাকা তো অনেকগুলা রয়েছে মা! পার-বছর অসীমার বিয়ের সময় আমার শাশুড়ী অজিতকে যে পাঁচশো টাকা দিয়েছিলেন, সেই টাকাটা তো সবই রয়েছে।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে বাড়ী মেরামত করলে কি দিয়ে?"

মনোরমা কহিল, "সে হাজার টাকা যে ঠাকুরঝির অসুখের সময় গহনা বিক্রী করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন আরও কিছু অজিতকে তিনি দেবেন। তা সেই—"

"কিন্তু বাছা, ওঁদের টাকায় তোমার এ বাড়ী রক্ষে করা ভাল হয়নি। যেতো না হয় যাদের এ ভিটে, তাদের সঙ্গে-সঙ্গে এ মাটিই হয়ে যেতো।"

ব্যথা-সজল নেত্রে চাহিয়া মনু কহিল, "অজিত তা'হলে কোথায় দাঁড়াত মা?"

মেয়ের মুখের সত্যবাণী মায়ের মুখকে নীরব করিয়া দিল। সত্যই তো, এবারের এই ভীষণ বর্ষায় যদি না আমূল সংস্কৃত হইত, তো, দুর্গাসুন্দরীর দাদাশ্বশুরের এই ভিটা কি আজও মাথা খাড়া রাখিতে পারিত?

কাশী আসিয়া সন্তপ্ত অজিত শোকাকুলা ঠাকুর-মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া পিসিমার জন্য বড় কান্নাটাই কাঁদিল। প্রথম-প্রথম পিসিমার অভাবে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়াই রহিল। তার পর বাল-স্বভাববশতঃ ক্রমশঃই আবার একটু শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল। দুর্গাসুন্দরী গ্রাম-সুবাদে এক আত্মীয়ের গৃহে উঠিয়াছিলেন,—দু' পাঁচজন সঙ্গী জুটাইয়া নিকটবর্ত্তী তীর্থগুলি সারিয়া লইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। মেয়াদ মাত্র এক মাসের,— অজিতের ছুটী পর্য্যন্ত।

সন্ধ্যার সময় আহ্নিক সারিয়া আসিয়া চিরপ্রথামত অরুর মা ছাদে কিম্বা দ্বিতলের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসেন। অজিত সাম্‌নে আলো রাখিয়া ততক্ষণ অভ্যাস-মত একটু বই লইয়া পড়িতে বসে, এবং বারে-বারে বই হইতে চোখ তুলিয়া ঠাকুরমার পথ চায়। বারান্দার প্রান্ত-ভাগে যেমন তাঁহার শুভ্র বসনের প্রান্তটুকু দেখা দেয়, অম্‌নি চট্‌পট বই তুলিয়া রাখিয়া, আলো সরাইয়া, এক-লাফে তাঁহার গা-ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়ে। কখনও বা কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া, দু' হাত দিয়া তাঁহার চর্ম্মলুলিত কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া ধরে। অতীতের দুঃখে, ভবিষ্যতের ব্যথায় বর্ত্তমানের এতবড় সুখকেও বেদনাময় ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়া, ঠাকুর-মায়ের মথিত বক্ষ রুদ্ধ-শ্বাসের ভারে ফুলিয়া উঠে। চোখের জলের দরবিগলিত ধারায় অন্ধ হইয়া গিয়া, কখনও মৃত পতিকে উদ্দেশ করিয়া মনে-মনে তিনি কাতর হইয়া বলেন, "কি করে গেলে গো! ওগো, এ তুমি শুধু-শুধু কি করে রেখে গেলে! ওরে আমার তপস্যার ধন রে! কার শাপে তুই আজ আমার পথের কাঙ্গাল হয়ে রইলি?" প্রকাশ্যে শিশুর ক্ষুদ্র মস্তকটির উপর নিজের বুকের সমস্ত মঙ্গলকামনাময় আশীর্ব্বাদের পসরাখানি উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া, তাহার চিরজীবনের সমুদয় বাধা-বিঘ্ন, বিপদ-বিপত্তি যেন নিজের সেই শীর্ণ হাত-খানিতে মুছিয়া লইয়া, ঘন-ঘন তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কম্পিত অধরে উচ্চারিত হইতে থাকে, বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ! সেই বিপুল স্নেহের বেগ নিজের শরীর-মনে উপলব্ধি করিয়া, ইহাকে ভাল করিয়া উপভোগ করিবার লোভে, অজিত হাসিমুখে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। উভয়েরই হৃদয়-ভাবের বার্ত্তা পাইয়া শ্বশ্রুর পদসেবা-নিরতা মনোরমার দুই চোখ ছলছল করিয়া উঠে।

এম্‌নি করিয়া দুঃখের দিনে অরবিন্দের মা সুখের যে নৈবেদ্য উপহার পাইতেছিলেন, তাঁহার জীবনের শেষ অংশে, অনেক অতীত বৎসরেই ইহা তাঁহার স্বপ্নাতীত। বিশেষ, এতদিনের দীর্ঘ জীবনেও এ আনন্দ তাঁহার এই নূতন পাওয়া। শরতের ছেলে-মেয়ে, উষার সন্তান লইয়া তিনি অনেক সন্ধ্যা, অনেক মধ্যাহ্ন যাপন করিয়াছেন বটে, তা'দের মধ্যে দুএকজন তাঁহার হৃদয়ে যথেষ্ট অধিকারও বিস্তৃত করিয়াছিল ইহাও সত্য; কিন্তু, এ সব সত্ত্বেও, যখনই তিনি উহাদের ভিতর-বাহিরের কোন পাওনা দিতে গিয়াছেন, তখনি একটা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন না

করিয়া তাহা দিতে পারেন নাই। আবার সেইক্ষণেই মনে-মনে সাতবার মা-যষ্ঠীকে স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়া আত্মগতই বলিয়াছেন, আহা! বেঁচে থাক মায়ের বাছারা! আমি কি ওদের হিংসে করচি, তা তো নয়। ওরাও তো আমারই। তবে কি না, মরে গেলে একটা গণ্ডুষ জল সেই তো আমায় দেবে? তা' যার কাছে অতবড় দাবী, দেবার বেলায় তাকেই কি না বঞ্চনা করে গেলুম। এ আপশোস কাটাই কি করে?—আজ এত দিনে সেই চির সঞ্চিত দেনা তিনি তাই সুদ শুদ্ধ মিটাইতে বসিয়াছেন।

কোন দিন দ্বৈপ্রহরিক বিশ্রাম-শয্যায়, কোন দিন বা সন্ধ্যাতেই, অজিত ঠাকুরমাকে মহাভারত বা ভাগবত পড়িয়া শুনাইত। বেশীর ভাগ নিজের পাঠ্য-অপাঠ্য পুস্তকের বিবিধ অভিজ্ঞতা সে তাহার এই বিমুগ্ধ শ্রোতার উদ্দেশে উৎসারিত করিয়া দিয়া অনর্গল বকিতে থাকিত। ইতঃপূর্ব্বে এমন শ্রোতা সে একটাও খুঁজিয়া পায় নাই। দিদি-মা নেহাৎ ছোটবেলায় সেই যা একটু শুনিতেন,—এখন তো তাঁহার নাগাল পাওয়াই ভার! মা খানিকক্ষণ হাসিমুখে শোনেন বটে; কিন্তু বেশিক্ষণ ধরিয়া শুনিবার ধৈর্য্য বা সময় তাঁহার দুইই কম। একটু পরেই, 'মিছে কতকগুলো বকিস্‌নে বাবু, ও সব কি ছাই আমি বুঝ্‌তে পারি?' বলিয়া হাসিয়া উঠিয়া যান। সে হয় ত তখন মহা উৎসাহে আলজেব্‌রার ফ্যাকটারর্স আজকে সার কি রকম খুব সহজে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তা' এ ঠাকুরমার সঙ্গে জিওমেট্রী, অ্যালজেবরা, জিওগ্রাফি—পৃথিবীর যত কিছু সমস্ত লইয়াই আলোচনা চলিতে পারে। আলোচ্য যাই হোক না কেন, উৎসাহ উভয় পক্ষেরই কোথাও বাধিত হয় না। এই সব আগড়ম-বাগড়ম শুনিতে-শুনিতে বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া গিয়া, পিতামহী পৌত্রের মাথায় চুম্বন দিয়া উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠেন, "এই বয়সে এত সব শিখ্‌লি কখন দাদা?" তার পর আবার উচ্ছ্বাসের বেগ একটুখানি সংযত করিয়া লইয়া বলেন "তা' তোর বাপও ঐ রকম ছিল! সেও ছোট্ট থেকে অনেক সব শিখেছিল।"

উহার পিতৃ-পরিচয় যে সাবধানে এড়াইয়া চলিয়া থাকেন, উৎসাহের মুখে সে কথাটাও প্রায় এ সময় স্মৃতি-পথচ্যুত হইয়া যায়। অজিতও যেন এই আলোচনাটির প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া থাকিত। কথায় কথায় এই প্রসঙ্গটা উঠিয়া পড়িলেই, তাহার উৎসাহ প্রায় বাঁধ ছাপাইয়া ছুটিয়া বাহির হইত। তখন দুজনের কথাবার্ত্তা প্রায় এইরূপই হইত, "আমার বাবা কত বছর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করেছিলেন, ঠাকু'মা?"

"কত বছর?—পনের বছরে। তুমি তার চাইতে এক বছর আগেই পাশ করবে, দাদামণি!" "আচ্ছা ঠাকুমা! বাবা তো এণ্ট্রান্সে কুড়ি, এফ-এতে পঁচিশ, আর বি-এ পাশ করে পঞ্চাশ টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিলেন? বি-এতে ফার্ষ্ট হয়ে তিনটে সোণার মেডেল পেয়েছিলেন; এম-এতে সেকেণ্ড হয়েছিলেন। তবে ল'তেই বা তিন তিন বার ফেল হয়ে গেলেন কেন? আইন বুঝি তাঁর ভাল লাগতো না? আইন-পড়া বড় বিশ্রী, না? আমিও আইন পড়্‌চিনে, আমি কি ঠিক করেছি জানো? এম এ দিয়ে পি-আর এস (P. R. S.) হবার চেষ্টা করবো, কেমন? সে বেশ হবে, না? অনেক টাকা পাওয়া যাবে, আর নামও হবে। আচ্ছা ঠাকুমা, বাবা অত ভাল ছেলে ছিলেন, উনিও কেন পি-আর এস হবার চেষ্টা করলেন না? করলে নিশ্চয়ই পারতেন। না ঠাকুমা! পারতেন না? আইনটাই না ভাল লাগার জন্যে—"

ঠাকুমা একটু ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিতেন "হ্যাঁ ভাই, তা পারবে না কেন? বাবা তোমার বরাবর সেই এত্তটুকু বেলা থেকে ইস্কুলের ফাষ্টো থেকেচে। ঐতেই কি আর ফেল হতো? একবারই না হয় হয়েছিল। দুবারের বার ওকে ফেল করে কে? ভগবান মারলেন।"

'ভগবানে'র এই 'মারে'র সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া, একদিন কয়েক ফোঁটা চোখের জলে মাত্র ইহার জবাব পাইয়া, এতৎ সম্বন্ধে সে আর কোন দিনই পুনঃ প্রশ্ন করে নাই। ইহার পর, তাহার বাবার কোন্‌ মেডেলটা কত বড়? ওজন উহাদের আন্দাজীতে কতখানি? স্কুলের প্রাইজে বাবা কি কি বই পাইয়াছিলেন?' প্রথমবারের স্কলারশিপের টাকা কোন্‌ কোন্‌ দাতব্য ফণ্ডে বা দেব-অতিথি সেবায় খরচ করা হইয়াছিল? সেরূপ কিছুই হয় নাই শুনিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া সে ভবিষ্যতে নিজের ঐরূপ প্রাপ্তি ঘটিলে তদ্দ্বারা কি সব মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহারই একটা তালিকা তৈরি করিতে বসিয়া যায়।

কিন্তু ইহাদের এই সব অবাধ মুক্ত আলোচনারও মাঝখানে কিসের একটা কণ্টক, অতি সূক্ষ্ম কাঁটার মত বিঁধিতে থাকে,—কাহার একখানা লৌহময় হস্ত মধ্যভাগে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়,—সেটুকু সেই সংসার-জ্ঞানের সম্পূর্ণ অতীত সরল শিশুও বুঝিতে পারে। আর যতই সরল হোক, অজিত বুদ্ধিমান ছেলে; বুদ্ধির অভিজ্ঞতা তাহার কে ঠেকাইতে পারিবে? পিত্রালয়ের সহিত যতই পরিচয়ে আসিতেছিল, ততই সেখানকার অজ্ঞাত রহস্যটা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। অস্ফুট সন্দেহ উত্তরোত্তর নিষ্ঠুর সত্য-বিশ্বাসে পরিণত হইয়া, এমন কি অনেক সময়ে তাহার শিশু চিত্তের শান্তিভঙ্গ করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। ভক্তিমতী জননীর স্বতন্ত্র শিক্ষা, নিজের মনেরও অপরিসীম শ্রদ্ধাজাত অপরিচিত পিতার প্রতি বিশ্বাস সে হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছে। আর বুঝি তাহাকে জীয়াইয়া রাখা যায় না।

একদিন প্রথম সন্ধ্যায় অসমবয়সী দুই বন্ধুতে ছাদে উঠিয়াছিল। সিঁড়ি ভাঙ্গা ক্লেশকর হইলেও অজিতের পিতামহী নিজের এ অক্ষমতা পৌত্রের নিকট প্রকাশ করিয়া তাহার চিত্তে আশা-ভঙ্গের বেদনা দানে কুণ্ঠিত হইতেন। তিথি সেদিন শুক্লা ত্রয়োদশী; প্রায় পরিণত পূর্ণচন্দ্র অনেকখানি দীপ্তিশূন্য ভাবে আশে-পাশের সোণালী-রঞ্জিত খণ্ড-খণ্ড সাদা মেঘের একটা খণ্ডের মতই একটা মন্দির-চূড়ার স্বর্ণপতাকার পাশ দিয়া দেখা যাইতেছে। ছাদের চৌদিক বেড়িয়া কাশীর সৌধ-মন্দির-মালা। এদিকে চাহিলে বর্ষা-বারিপরিপূরিতাঙ্গী দেবী জাহ্নবীর প্রশস্ত সলিল-রেখা চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা বিপুল আনন্দ প্রদান করিতে থাকে। তবে এক্ষণে তাঁহার সেই বিমল মূর্ত্তি ধবল-পারা নয়। বিশ্বনাথের চরণতলে কলকল নাদে প্রবাহিতা উক্তা দেবী এক্ষণে গৈরিক-বসনা তপস্বিনী। অজরামর স্বামী বিদ্যমানে তাঁহারই আলয়ে আসিয়া এমন বৈধব্যাচারপরায়ণা কেন হইয়াছেন? ইহার তথ্যানুসন্ধান করিতে গেলে, কাল-ধর্ম্মেরই দোহাই পাড়িতে হয়। এখনকার অনেক মেয়ে যেমন সখ করিয়া বিবি সাজার খাতিরে নিজেদের চিরন্তন সিঁদুর লোহা ঘুচাইয়া ফেলেন, কেহ বা রাগ করিয়া হাত শুধু করেন—ইঁহারও বোধ করি তেমনি সুন্দর দেখাইবার লোভে অথবা স্বামীর সহিত কলহে, সন্ন্যাসিনী-সজ্জার প্রতি তৃষ্ণা জন্মিয়াছে। তাই বুঝি গেরুয়া পরিয়া, তরঙ্গে-তরঙ্গে মণিকর্ণিকার ছাই ধুইয়া নিজের অঙ্গে লেপন করিতে বসিয়া গিয়াছেন।

অজিত এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎ এক সময় কি কথার মধ্যে কোন্ কথা আনিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল "আচ্ছা ঠাকুমা! আমার বাবা কি সত্য-সত্যই আমাদের ত্যাগ করেছেন?" এই বলিয়াই জিজ্ঞাসু নেত্রে মুখের দিকে উৎকণ্ঠিত হইয়া চাহিয়া সে দুই হাত দিয়া ঠাকুরমাকে জড়াইয়া ধরিল।

এই নির্ঘাত সত্য-জিজ্ঞাসার অব্যর্থ শেল বুকে বিঁধিয়া বৃদ্ধা ঠাকুমা প্রথমটা পতনোন্মুখীই হইতেছিলেন, অজিত বাহুপাশে তাঁহাকে দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া না রাখিলে এতক্ষণ কি হইত বলা যায় না। অল্পকালের মধ্যে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া শুনিতে পাইলেন, অজিত অত্যন্ত ভয় পাইয়া তাঁহার ব্যাতান অবসন্ন দেহ নাড়া দিতে-দিতে রুদ্ধশ্বাসে ডাকিতেছে—"ঠাকুমা! ও ঠাকুমা! ঠাকুমা!" "দাদা আমার! মাণিক আমার! সৃষ্টিধর আমার!" বলিতে-বলিতে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছোট্ট একটী অবোধ মেয়ের মত, বর্ষাজল-কলঙ্কিত ছাদের মেঝের উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তার পর পাগলের মত নিজের কপালে ঘা মারিতে-মারিতে দ্বিগুণ আবেগে কাঁদিয়া-কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—"ওগো, তোমার মতন আমিও যদি যেতে পারতুম গো!—হে বিশ্বনাথ! এ কথার জবাব দেওয়াবার আগে তুমি আমায় একটুখানি স্থান দিলে না কেন?"

অজিত তাহার অবিমৃষ্যকারিতার এই অপ্রত্যাশিত পরিণাম দেখিয়া আড়ষ্ট আকাট হইয়া গেল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার সেই ব্যগ্রতাপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরটা যেন তাহার লজ্জা-বেদনাকে আহত করিয়া ফেলিয়া প্রকাণ্ড একটা ক্ষুধিত অজগরের হাঁ-করা মুখের মত তাহার সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল।

সৌরজগৎ

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাসগুপ্ত এম-এ]

"ওই যে প্রাচীতে হাসিতে হাসিতে উদয় অরুণ উষার সহ" এই বলিয়া কবি লাবণ্যময়ী উষার নিত্য-সহচর কনক-কান্তি অংশুমালীর অভ্যুদয়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ এই অংশুমালীই সময়ের কর্ত্তা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগতাত্মা, অণিমাদিগুণ বিশিষ্ট ও সর্ব্বাত্মা ; এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই আশ্রিত। ইঁহারই অভিব্যক্তি ও তেজোময় শক্তিমত্তা বুঝাইতে সূর্য্যসিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন—

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম তন্মূর্ত্তিঃ পুরুষঃ পরঃ।
অব্যক্তো নির্গুণঃ শান্তঃ পঞ্চবিংশাৎ পরোঽব্যয়ঃ॥
প্রকৃত্যন্তর্গতো দেবো বহিরন্তশ্চ সর্ব্বগঃ।
সঙ্কর্ষণোঽপঃ সৃষ্ট্বাদৌ তাসু বীর্য্যমবাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সর্ব্বত্র তমসাবৃতম্।
তত্রানিরুদ্ধঃ প্রথমং ব্যক্তীভূতঃ সনাতনঃ॥
হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষ ছন্দসি পঠ্যতে।
আদিত্যো হ্যাদিভূতত্বাৎ প্রসূত্যা সূর্য্য উচ্যতে॥
পরং জ্যোতিস্তমঃ পারে সূর্য্যোঽয়ং সবিতেতি চ।
পর্য্যেতি ভুবনান্যেব ভাবয়ন্ ভূতভাবনঃ॥
প্রকাশাত্মা তমোহন্তা মহানিত্যেষ বিশ্রুতঃ।
ঋচোঽস্য মণ্ডলং সামান্যস্রা মূর্ত্তির্যজূংষি চ॥

বাসুদেব পরমব্রহ্ম, তন্মূর্ত্তি পরম পুরুষ, অব্যক্ত নির্গুণ, শান্ত অব্যয় ও পঞ্চবিংশতি বস্তুর অতীত। এই বহিরন্ত সর্ব্বব্যাপী পুরুষ সঙ্কর্ষণ নামে প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া সৃষ্টির আদিতে কারণ-বারিতে স্বীয় বীর্য্য নিক্ষেপ করেন। সেই জল অন্ধকারাবৃত সুবর্ণ অণ্ডরূপে পরিণত হইল। তন্মধ্যে সনাতন অনিরুদ্ধ প্রথমে ব্যক্ত হয়েন। ইঁহাকেই বেদে হিরণ্যগর্ভ বলে, আদিতে ছিলেন বলিয়া আদিত্য এবং সৃষ্টির জন্য সূর্য্য। এই অনিরুদ্ধই পরম জ্যোতিষ্মান্ সবিতা। অন্ধকার নাশ করিয়া ভূতভাবন সূর্য্য কিরণ দিয়া ভুবনসকল পর্য্যটন করেন অর্থাৎ ভুবন-সকলকে আলোকিত করেন। সূর্য্যই প্রকাশরূপ, তমোনাশক ও মহান্ শব্দে খ্যাত। ঋগ্বেদ ইঁহার মণ্ডল, সামবেদ ইঁহার কিরণ ও যজুর্ব্বেদ ইঁহার মূর্ত্তি। এই ত্রয়ী বেদমূর্ত্তি সর্ব্বশক্তিমান্ অনিরুদ্ধই কালস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

এইরূপ সূর্য্য-প্রশস্তি জ্যোতিষ-গ্রন্থে অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক শুনাইলেও, আমাদিগের ইহা অবশ্যই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, মানব-সভ্যতার সর্ব্বপ্রথম বিকাশের সময়ে যখন জ্ঞান রবির উষার ছটা সবেমাত্র দেখা দিতেছিল, তখনও এই সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের মহিমময় বর্ণ-বৈচিত্র্য ও গগনপটের স্বপ্নমাখা শোভা-সমৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষণকারীর মনেই একটা নির্ব্বাক বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া তত্ত্ব জিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল। ঋগ্বেদের সূর্য্য ও উষার স্তুতি সম্ভবতঃ এই অসীম নভোমণ্ডলের পরম বৈচিত্র্য ভাষায় প্রকাশ করিবার সেই প্রাচীনতম মানবজাতির অস্ফুট চেষ্টামাত্র। এইরূপে যখন তাঁহারা সেই মহা-বৈচিত্র্যের রহস্যজাল উদ্ঘাটিত করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহারা এই জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মধ্যে সূর্য্যের একটা বিশিষ্ট প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান বিজ্ঞানেও যখন সূর্য্যকে সকল তেজঃ ও শক্তির আধার-স্বরূপ এবং পৃথিবীস্থ জীবের স্থিতি-বিধাতৃ রূপে কল্পিত করে, তখন সূর্য্য-সিদ্ধান্তের প্রশস্তিকে আমরা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারি না।

বিজ্ঞানের শৈশবে গগন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া পরিদর্শকগণ মনে করিতেন—বুঝি পৃথিবী স্থির, বুঝি বা সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী একটীর উপর আর একটী এইরূপ পৃথক্-পৃথক্ ব্যোমে সংলগ্ন রহিয়াছে,—যেন একটী চন্দ্রের ব্যোমকক্ষা, একটী বুধের ব্যোমকক্ষা, একটী বৃহস্পতির ব্যোমকক্ষা—এইরূপে পৃথক্-পৃথক্ ব্যোমকক্ষায়—চন্দ্র বুধ ও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণ অবস্থান করিতেছে, এবং নিজ-নিজ পথে পরিভ্রমণ করিয়া বৃত্তমার্গ অঙ্কিত করিতেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম অবস্থায় এই ধারণাটিই তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পরিধির্ব্যোমকক্ষাভিধীয়তে।
তন্মধ্যে ভ্রমণং ভানামধোঽধঃ ক্রমশস্তথা॥
মন্দামরেজ্যভূপুত্র সূর্য্য শুক্রেন্দুজেন্দবঃ।
পরিভ্রমন্ত্যধোঽধস্থাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরা ঘনাঃ॥
মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য ভূগোলে ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।
বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাত্মিকাম্॥

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য-পরিধির নাম ব্যোমকক্ষা; তাহাতে নক্ষত্রগণের ভ্রমণ। তন্নিম্নে ক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহার নিম্নে সিদ্ধ বিদ্যাধরগণ এবং সর্ব্বনিম্নে মেঘসকল অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব-প্রদেশের ব্যোম ভূলোককে বেষ্টন করিয়া আছে। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-শিরোমণির কথায়—"রবি, চন্দ্র, পঞ্চ তারাগ্রহ, ইহাদিগের অনুচর উপগ্রহ সকল ভূমি ভৌমের অন্তর্গত খ-মেখেলার রত্নীভূত নবাবিষ্কৃত দ্বিশতাধিক ক্ষুদ্র গ্রহ, অসীম শ্যামসাগরে ভাসমান বিকট ধূমকেতুরূপী সৌর-জগতে অপ্রতিম অতিথিগণ এবং অতত্ত্বদর্শীর নেত্রে ইন্দ্রালয়ের কৃতসংস্কার বর্ত্তিকার জ্বলন্ত দশারূপে প্রতিভাত খধূপ প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ আকাশ-পথে বিচরণ করিতেছে এবং তজ্জন্যই এই সমস্ত খেটপদ বাচ্য।"

ক্রমে যখন জ্যোতিষের অল্পমাত্র উন্নতি সাধিত হইল, তখনই পর্য্যবেক্ষণের উপযোগিতা অনুভূত হইল; এবং শীঘ্রই ইহা প্রতীয়মান হইল যে, যদিও এরূপ একটা সহজ কারণ নির্দ্ধারণের দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর; তথাপি এত সহজে গ্রহগণের জটিল গতি-সমস্যার মীমাংসা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উহাদের গতি নিরূপণ করিতে গিয়া স্থির করিলেন, সূর্য্য ও চন্দ্র নিশ্চল ভূলোককে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, আর সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহগণ পরিক্রমণ করিতেছে। কিন্তু, ইহাতেও একটা অসঙ্গতি দেখা দিল। অবশ্য, যদি গ্রহকক্ষা বাস্তবিক বৃত্তাকার হইত এবং ভূকক্ষার সহিত একই তলভাগে অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে ঐরূপ মীমাংসা অনেকটা নির্ভুলরূপেই গ্রহগণের গতি নির্দ্দেশ করিতে পারিত। কিন্তু গ্রহকক্ষার প্রকৃতি অতটা সরল নহে। এই জন্যই বিবিধ জটিলতা-পূর্ণ নীচোচ্চবৃত্ত ও প্রতিবৃত্তের (epicycles and eccentrics) প্রবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। ইহাতেও বড় সুবিধা হইল না; কাজেই পৃথিবী যে স্থির, এই ধারণাটি চির-বিসর্জ্জিত হইল।

পৃথিবীর এই যে গতি, ইহা এক্ষণে বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট ধ্রুব সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই স্থলে আমরা ঐ গতি-তত্ত্বের একটা সরল বিশ্লেষণের উল্লেখ করিব। আমরা যদি এমন একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের কেন্দ্র-ভূমিতে দণ্ডায়মান হই, যেখান হইতে আকাশের চতুষ্পার্শ্ব সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, ২৩শে মার্চ্চ তারিখে সূর্য্য ঠিক পূর্ব্ব দিগ্‌প্রান্তে উদিত হইয়া পশ্চিম দিগ্‌প্রান্তে অস্তাচল-অবলম্বী হইবে। তার পর যতই দিনের পর দিন আমরা সূর্য্যের উদয়াস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিব, ততই দেখা যাইবে, কয়েক দিনের মধ্যে সূর্য্যের উদয় ও অস্তের স্থল কিছু উত্তরে সরিয়া গিয়াছে; এবং ঐ উভয় স্থলের সংযোজক সরল-রেখা পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্ত নির্দ্দেশক সরল-রেখার সমান্তরাল; পূর্ব্বোক্ত সরল-রেখাটি ২২শে জুন পর্য্যন্ত কেবলই উত্তর দিকে ক্রমশঃ সরিতে-সরিতে দূর হইতে দূরতর হইতে থাকিবে। ইহার পর ২২শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত—উহা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগ্‌প্রান্ত নির্দ্দেশক সরল-রেখার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে এবং ঐ তারিখে সূর্য্যের উদয় ঠিক্ পূর্ব্ব-দিগ্‌প্রান্তে এবং সূর্য্যের অস্ত পশ্চিম-দিগ্‌প্রান্তে দেখা যাইবে। আবার ঐ উদয়াস্ত-স্থলের সংযোজক রেখা ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে হটিতে থাকিবে এবং ইহার পর আবার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগ্-প্রান্ত নির্দ্দেশক রেখার দিকে অগ্রসর হইবে। এই পর্য্য-বেক্ষণের ফলে আমরা বুঝিতে পারিলাম, বৎসরে কেবল দুই দিন মাত্র সূর্য্য পূর্ব্বপ্রান্তে উদিত হয় এবং পশ্চিমপ্রান্তে অস্ত-গামী হয়। এইরূপে শূন্যদেশে সৌরমার্গের একটা দৈনন্দিন-হিসাব লইলে বুঝিতে পারিব যে, উহা মোটামুটি ব্যোমে অবস্থিত একটা নির্দ্দিষ্ট সরল রেখার উপর ঋজুভাবে দণ্ডায়-মান, কতকগুলি সমান্তরালবর্ত্তী বৃত্তের সমষ্টি। উহাই পৃথিবীর আবর্ত্তনের অক্ষরেখা। অপর পক্ষে, যদি একটী তারকার দৈনিক গতিমার্গের পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, উহা পৃথিবীর ধ্রুবরেখার উপর ঋজু-ভাবে দণ্ডায়মান একটি নির্দ্দিষ্ট বৃত্ত। ইহা হইতে আমরা এই অনুমান করিতে পারি, সূর্য্যের যে দৈনিক গতি আমরা লক্ষ্য করি, তাহা সৌরজগতের গ্রহ-জ্যোতিষ্কগণের গতির

সাপেক্ষিক অভিব্যক্তি মাত্র ; আর তারকা-পুঞ্জের অবস্থিতির তুলনায় সূর্য্যের যে গতি, তাহা উহার নিজ কক্ষায় বার্ষিক গতি।

সূর্য্যের এই আহ্নিক-গতি সম্বন্ধে প্রাচীন জ্যোতিষিগণ প্রায় সকলেই স্থির করিয়াছিলেন যে, ব্যোমকক্ষার আবর্ত্তনের নিমিত্তই এই দৈনিক গতি। সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিতেছে—

ভচক্রং ধ্রুবয়োর্বদ্ধমাক্ষিপ্তং প্রবহানিলৈঃ।
পর্য্যেত্যজস্রং তন্নদ্ধা গ্রহকক্ষা যথাক্রমম্॥
সকৃদুদ্গতমব্দার্দ্ধং পশ্যন্ত্যর্কং সুরাসুরাঃ।
পিতরঃ শশিগাঃ পক্ষং স্বদিনঞ্চ নরাভুবি॥

ধ্রুবদ্বয়ে বদ্ধ ভচক্র প্রবহ বায়ু দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া পর্য্যটন করে এবং ক্রমানুসারে তাহাতে বদ্ধগ্রহ কক্ষা ভচক্রের সহিত চলিতে থাকে। সুর (অর্থাৎ উত্তর মেরুবাসী) ও অসুরগণ (দক্ষিণ মেরুবাসী) যেমন একবার উদিত সূর্য্যকে ছয়মাস ধরিয়া দেখেন, পিতৃগণ চন্দ্রস্থিত বলিয়া একপক্ষ ধরিয়া পৃথিবীস্থ নরগণ সমস্ত দিন ধরিয়া সূর্য্যকে দেখেন। এবং—

সব্যং ভ্রমতি দেবানামপসব্যং সুরদ্বিষাম্।
উপরিষ্টাদ্ভগোলোঽয়ং ব্যক্ষে পশ্চান্মুখঃ সদা॥

অর্থাৎ এই যে ভচক্র (নক্ষত্রগোল) দেবদিগের নিকট সব্যদিকে (দক্ষিণ হইতে বামে) ও অসুরদিগের অপসব্যদিকে (উত্তর হইতে পশ্চিমে) এবং নিরক্ষ ব্যক্তিদিগের নিকট মস্তকোর্দ্ধ মধ্যভাগে পশ্চিমদিকে পরিভ্রমণ করে। আমরা যদি স্বীকার করিয়া লই যে, নক্ষত্রগণ ভচক্রে স্থির সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তেই আহ্নিক-গতির নির্দ্ধারণ পক্ষে যথেষ্ট হইবে। কিন্তু পরেই ইহা অবশ্য লক্ষীভূত হইয়া থাকিবে যে, পৃথিবীই একটা নির্দ্দিষ্ট অক্ষের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে এমন অনুমান করিলে, আহ্নিক গতির একটা সুষ্ঠু ও সঙ্গত হেতু পাওয়া যাইবে, এবং বাস্তবিকই এই ভূ-ভ্রমণবাদ মানিয়া লইলে দৃঢ় সংলগ্ন ভচক্র সমস্তটা কঠিন বন্ধনে এক হইয়া আবর্ত্তিত হইতেছে, এরূপ ধারণার অপেক্ষা জ্যোতিষিক ঘটনাসমূহের একটা সরল ও অনায়াসে বোধগম্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আমাদের মনে হয় যে, ভূভ্রমবাদ সর্ব্বপ্রথম আর্য্যভট্টই জ্যোতিষের ক্ষেত্রে প্রচার করেন। পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ডে পৃথিবীর গতির বিষয় সর্ব্বপ্রথম কোপারনিকসই স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেন (পাইথাগোরাশ ইহার সঙ্কেত দিয়াছিলেন মাত্র)। কোপারনিকসের আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। আর চতুর্দ্দশ শত বর্ষেরও বহুকাল পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যভট্ট যে পৃথিবীর গতি নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মতত্ত্বের টীকাকার পৃথুদক স্বামী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বচন হইতে বেশ প্রমাণিত হয়—

ভূপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্॥

নক্ষত্রমণ্ডল স্থির রহিয়াছে; কেবল পৃথিবীর আবৃত্তি অর্থাৎ পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহনক্ষত্রের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত হইয়া থাকে। হিন্দু মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এবং পাশ্চাত্য মতে খ্রীষ্ট পরে প্রথম শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট জীবিত ছিলেন। বস্তুতঃ, ইহাই অনুমান করা সঙ্গত যে, হিন্দুগণের সিদ্ধান্ত-প্রস্রবণ গ্রীস দেশের মধ্য দিয়া অন্তঃসলিল প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া—য়ুরোপে বেগবতী স্রোতস্বতী রূপে পরিণত হইয়াছে। গ্রীস দেশের প্লেটো বা এরিষ্টটলও সূর্য্য-সিদ্ধান্তের ন্যায় স্থির করিয়াছিলেন যে, ভচক্রই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে ভ্রমণ করিতেছে। এমন কি, এরিষ্টটলের সময়েও গ্রীসদেশে তেমন বৈজ্ঞানিক নিয়মে জ্যোতিষিক প্রমাণের বিচার-পদ্ধতি প্রচলিত হয় নাই। সূর্য্যের দৈনিক গতির প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখী গতিই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানজনক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রহ সূর্য্য অবশ্যই ঐ গতি অবলম্বন করিবেন। গ্রীসদেশের সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্ব্বিদ টলেমিও ভূভ্রমবাদ স্বীকার করেন নাই। বাস্তবিক তিনিও প্রচার করেন,—পৃথিবী নিশ্চল, সৌরজগতের গ্রহগণ পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। টলেমি বলেন, গ্রহতারকা আগ্নেয় প্রকৃতিবিশিষ্ট, আর পৃথিবী কঠিন পদার্থের সমষ্টি; সুতরাং পৃথিবী অপেক্ষা গ্রহতারকারই একটা গতি থাকা অধিকতর সম্ভবপর; এবং ইহাও অনুমান করা স্বাভাবিক যে, পৃথিবীর যদি একটা গতি থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতটা অনভিজ্ঞ হইব কেন? সাধারণ জনমতের উপর কিন্তু টলেমির এই সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বস্তুতঃ যে পর্য্যন্ত না জ্ঞানোন্নতির পুনরুন্মেষে বিজ্ঞানের দীপ্ত কিরণে পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ড উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কোপারনিকস আপনার

নূতন-নূতন জ্যোতিষিক তথ্য লইয়া জ্ঞানের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, সে পর্য্যন্ত টলেমির সিদ্ধান্তই এ বিষয়ে চরম বলিয়া স্থিরীকৃত হইত। কোপারনিকস টলেমির প্রমাদপূর্ণ ও অনৈসর্গিক মতবাদের খণ্ডন করিয়া এই অভিনব তত্ত্ব প্রচার করিলেন যে, সূর্য্য স্থির, রাশিচক্রের মধ্যস্থানে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু ভূভ্রমণবাদ সম্বন্ধে টাইকোব্রাহি কোপারনিকসের মত অগ্রাহ্য করেন। তিনি উহার যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"যদি পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আবর্ত্তন করিতেছে, তবে ঊর্দ্ধ হইতে পতিত লোষ্ট্র পশ্চিমদিকে পড়িতে দেখা যায় না কেন?" ভারতেও ইহার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভট্টের পরবর্ত্তী জ্যোতিষিগণ তাঁহার ভূভ্রমণবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। লল্ল আর্য্যভট্টের শিষ্য হইয়াও লিখিতেছেন,—"যদি পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে, তবে পক্ষীসমূহ বিমানমার্গে উড্ডীন হইয়া কিরূপে স্ব স্ব কুলায়ে প্রত্যাগমন করিতে পারে? আকাশাভিমুখে প্রক্ষিপ্ত বাণ পশ্চিম দিকে পতিত হইতে দেখা যায় না কেন? মেঘসমূহকে কেবল পশ্চিমদিকেই গমন করিতে দেখা যায় না কেন? যদি বল, পৃথিবী মন্দ-মন্দ গতিতে চলিতেছে বলিয়া এ সকল সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা হইলে একদিনে উহার কিরূপে একবার আবর্ত্তন ঘটে? বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত উভয়েই ঐ সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আর্য্যভট্টের মতবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা বস্তুতঃ বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সহস্র বৎসর পরেও যখন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ টাইকোব্রাহি কোপারনিকসের ভূভ্রমণবাদের বিরোধী হইয়াছিলেন, যখন খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-শতাব্দীতেও পাশ্চাত্য দেশে কোন-কোন জ্যোতিষী এই তর্কের মীমাংসা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, তখন ভারতের অতি প্রাচীন জ্যোতিষিগণের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে যে তাঁহারা আর্য্যভট্টের ভূভ্রমণবাদ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, ইহা বোধ হয় তেমন আশ্চর্য্যের কথা নহে। এই সকল আপত্তির খণ্ডনে বলা যায় যে, পৃথিবীর সহিত বায়ুরাশিও প্রায় তুল্য বেগে বিঘূর্ণিত হইতেছে। পক্ষী বা কোন উচ্ছ্রিত বস্তু যখন পৃথিবীর তলভাগ হইতে বিচ্যুত হয়, তখন ইহার গতি বায়ুর গতি ও তাহার নিজের গতির সমষ্টি। কিন্তু বায়ুর গতি পৃথিবীর গতির সমান। সুতরাং পক্ষী বা উচ্ছ্রিত বস্তুর আপেক্ষিক গতি (Relatively with the earth) ইহার নিজেরই বেগবল। আবার বায়ুর গতি যখন আমরা মানিয়া লই, সেই সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বিচার-প্রণালী অনুসারে পৃথিবীর তুল্য গতি স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। আর্য্যভট্টের মতবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত ব্রহ্মগুপ্ত একটি আপত্তি তুলিয়াছিলেন—"আবর্ত্তন মুর্বাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রায়াঃ কস্মাৎ"—পৃথিবীর যদি আবর্ত্তনই থাকিবে, তবে সমুচ্ছ্রিত বস্তু পড়িবে না কেন? টীকাকার পৃথুদক স্বামী উত্তর দিয়াছিলেন—"পৃথিবীর আবর্ত্তন হইলে উচ্চস্থিত বস্তু পড়িবে কোথায়? কারণ ঊর্দ্ধও যাহা, নিম্নও তাহা; বস্তুতঃ দ্রষ্টার অবস্থিতি অনুসারে ঊর্দ্ধাধঃ প্রভেদ হইয়া থাকে। সূর্য্যসিদ্ধান্তেও ঠিক এই কথাই আছে—

সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতম্।
মন্যন্তে যে যতো গোলস্তস্য কোর্দ্ধং কবাপাধঃ॥

আধুনিক যুগে আমরা আমাদিগের সুপ্রতিষ্ঠিত বেধালয় ও সুগঠিত মানযন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যের অথবা অন্য কোন জ্যোতিষ্কের দৈনিক অবস্থিতি নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ; কিন্তু প্রাচীনকালের জ্যোতিষ-আলোচনাকারীদিগের এই সুবিধার কণামাত্র ছিল না। আমরা সূর্য্যসিদ্ধান্তে দেখিতে পাই যে, অতি পূর্ব্বেই হিন্দুরা স্থির করিয়াছিলেন, বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ একটি অদৃশ্য শৃঙ্খল দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া নভোমণ্ডলে যেন দৃঢ় সংলগ্ন রহিয়াছে; এবং ঐ সমগ্র নভোমণ্ডলটি ব্যোমস্থ একটি নির্দ্দিষ্ট অক্ষের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ব্যোমমণ্ডলের সমগ্র স্থানটি অধিকার করিয়া বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, এবং এই ব্যোমের মধ্য দিয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগুলি স্বমার্গে গমন করিতেছেন। সুতরাং এই নক্ষত্রপুঞ্জ সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতির দৈনিক গতি ও অবস্থিতির নির্দ্দেশক হইয়া দাঁড়াইল। আমরা জানি, ব্যোমপথে রবিমার্গটি বৃত্তাকার। ঐ রবিমার্গকে যদি দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এক একটি বিভাগ নক্ষত্রপুঞ্জের দ্বারা অধিকৃত রহিয়াছে; ইহাকেই রাশিচক্রের বিভাগ কহে। যে কোন সময় হইতে আরম্ভ করিলে (সাধারণতঃ বিষুববিন্দুতে সূর্য্যের

অবস্থিতির সময় হইতে আরম্ভ করা হয়) দেখিতে পাই, এক-একটি বিভাগ অতিক্রম করিতে সূর্য্যের প্রায় একমাস ব্যয়িত হয় ; এবং এই কারণে, যে-কোনও সময়ে সূর্য্যের গতি নির্দ্দেশ করিবার একটি উপায় হইবে সূর্য্য যে বিভাগে আছে সেই বিভাগটির নাম করা ; এবং সূর্য্য সেই বিভাগের কোন স্থলে আছে তাহা স্থির করা। এই যে রাশিচক্রের প্রবর্ত্তন, যাহার দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্য দিন বা মাস নিরূপণ করিতে সহায়তা করিতেছে, তাহা যে সেই প্রাচীন যুগের জ্যোতিষের একটা উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অবশ্য এই জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি ব্যবহারের যুগে সূর্য্যের নয়নঝলসান আলোক পর্য্যবেক্ষণের আদৌ পরিপন্থী হইতে পারে নাই। কারণ, এক্ষণে আমরা ঘটিকাযন্ত্রের সাহায্য পাইয়া থাকি। ঠিক যে সময়ে বিষুববিন্দু মেরুবৃত্ত (meridian circle) অতিক্রম করে, সেই সময় হইতে ইহার সময় আরম্ভ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের সহিত আপেক্ষিক অর্থাৎ নাক্ষত্রিক সময়ই ইহাতে সূচিত হইয়া থাকে। যে কোনও সময়ে মেরুবৃত্ত হইতে বিষুববিন্দুর যে কৌণিক দূরত্ব, তাহাই ঐ ঘটিকাযন্ত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টাপ্রতি ১৫ ডিগ্রীর গুণফল। ইহার পর সূর্য্যের মেরুবৃত্তকে অতিক্রম করিবার নাক্ষত্রিক সময় পর্য্যবেক্ষণ করিলে, পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট সময়ের দ্বারা বিষুব-বিন্দু হইতে সূর্য্যের কৌণিক দূরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ইহাই নিরক্ষবৃত্তে বিষুববিন্দু হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ; এবং যখন সূর্য্য মেরুবৃত্ত অতিক্রম করে, তখন ইহার অবস্থিতি নিরক্ষবৃত্ত হইতে ইহার কৌণিক দূরত্ব নির্ণয় করে। এইরূপে প্রত্যেকবার মেরুবৃত্ত অতিক্রম করিবার সময়ে সূর্য্যের অবস্থিতি লক্ষ্য করিতে-করিতে আমরা নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থানের তুলনায় সূর্য্যের বার্ষিক মার্গ নির্দ্ধারিত করিতে পারি। এই পর্য্যবেক্ষণে আমরা একই মেরুবৃত্ত গ্রহণ করি বলিয়া দৈনিক গতি গণনার কোনও প্রয়োজন হয় না।

এইরূপে ভচক্রে সূর্য্যের মার্গ নির্দ্দিষ্ট হইলে শূন্যপথে সূর্য্যের মার্গ নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর হই। সূর্য্যের কৌণিক ব্যাস (angular diameter) ইহার দূরত্ব বিপর্য্যয়ের (inverse distance) অনুযায়ী, এইরূপ প্রতিদিন সূর্য্যের কৌণিক ব্যাস নিরূপণ করিয়া এবং একটা বিশেষ ভুজাংশের তুলনায় ইহাকে কেন্দ্র হইতে অঙ্কিত দূরতা ধরিয়া লইলে (অবশ্য একটা উপযোগী মানযন্ত্রে) আমরা নভোমণ্ডলে সূর্য্যের গতিমার্গ নির্দ্ধারণ করিতে পারি। অধিকন্তু সূর্য্য বা পৃথিবী যে কোনটাই স্থির থাকুক না কেন, কৌণিক দূরত্ব (angular distance) ও কেন্দ্র হইতে অঙ্কিত দূরতার কিছুমাত্র প্রভেদ হইবে না ; সুতরাং সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর মার্গও ঠিক এইরূপ হইবে, কেবল পৃথিবীর গতি সূর্য্যের গতির বিপরীত দিকে হইবে। উভয় স্থলেই মার্গটি একটি বৃত্তাভাস এবং স্থির জ্যোতিষ্কটি বৃত্তাভাসক্ষেত্রের ব্যাসস্থিত বিন্দুদ্বয়ের একটিতে অবস্থিত।

বর্ত্তমান যুগের জ্যোতিষে কেপ্‌লারের দ্বারাই এই গতি সমস্যার চরম মীমাংসা সাধিত হইল। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে টাইকোব্রাহির পর কেপ্‌লারের আবির্ভাব জ্যোতিষের ক্রমিক উন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাসে একটা প্রকাণ্ড অসঙ্গতি, অথচ নূতন আবিষ্কারের মাহেন্দ্রযুগ বলিয়া সূচিত হইয়াছে। টাইকোব্রাহির দীর্ঘকালব্যাপী নির্ভুল পর্য্যবেক্ষণাবলীর সাহায্য লইয়া কেপ্‌লার গ্রহমণ্ডলের প্রকৃত গতি নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমেই পৃথিবীকে নিশ্চল ধরিয়া গ্রহগণের পরিলক্ষিত গতির নির্দ্ধারণ-প্রয়াসই স্বাভাবিক ; কিন্তু এইরূপ ধারণার উপর নির্ভর করিয়া গ্রহগণের গতির একটা সুসংলগ্ন বিবরণ দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসদেশে প্লেটো স্থির করিয়াছিলেন যে, গ্রহগণের বৃত্তাকার কক্ষায় ভ্রমণই সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সুসঙ্গত। প্রায় দুই সহস্র বৎসর যাবৎ পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই মতবাদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া প্রতিবৃত্ত ও নীচোচ্চবৃত্তের সাহায্যে গ্রহসমূহের গতির একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। টলেমির সময় পর্য্যন্ত গণিত জ্যোতিষের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, কতকগুলি বৃত্ত কল্পনা করিয়া উহাদের সমবায়ে পরিলক্ষিত গ্রহগণের গতির একটা সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এইরূপ চেষ্টা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। কারণ, একে ত ঐরূপ উপায়ে গতির নির্দ্দেশ তেমন সর্ব্বতোভাবে নির্ভুল হইত না ; তাহার উপর ঐ অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাটি এমন জটিল হইল যে, উহার দ্বারা জ্যোতিষের উন্নতি চেষ্টা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। ঠিক এই সময়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেপ্‌লারের আবির্ভাব হয়।

কেপ্‌লার টাইকোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অধ্যাপকের মৃত্যুর পর তাঁহার অগাধ পর্য্যবেক্ষণলব্ধ গবেষণার উত্তরাধিকারী হইলেন। কয়েক বৎসর এই সকল গবেষণার সাহায্যে প্রাচীন নীচোচ্চবৃত্ত পদ্ধতির (epicyclical machinary) উপর নির্ভর করিয়া গ্রহগণের গতিবিষয়ে নূতন তথ্য উদ্ভাবন করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারিলেন না। তখন তিনি পৃথিবী যে নিশ্চল, এই মতবাদটি পরিত্যাগ করিলেন; এবং তৎপরিবর্ত্তে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। কেপ্‌লার সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে সূর্য্যকে স্থিরভাবে স্থাপন করিলেন, এবং টাইকোর পর্য্যবেক্ষণপ্রসূত ফলসমূহের বিশিষ্ট আলোচনার দ্বারা স্থির করিলেন, গ্রহগণের কক্ষা ঠিক বৃত্তাকার নহে, পরন্তু দুই পার্শ্বে চাপা অঙ্গুরীয়কের (ellipse) ন্যায়; এবং ঐ অঙ্গুরীয়ক বা বৃত্তাভাস ক্ষেত্রের ব্যাসস্থিত বিন্দুদ্বয়ের একটিতে সূর্য্য নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। এই সকল পর্য্যবেক্ষণ হইতে কেপ্‌লার তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ তিনটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন—

(১) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তনকালে প্রত্যেক গ্রহ সমান-সমান সময়ে সমান-সমান ক্ষেত্রাংশ অঙ্কিত করে।

(২) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহকক্ষাটি একটা অঙ্গুরীয়কের ন্যায় এবং ঐ অঙ্গুরীয়ক-ক্ষেত্রের ব্যাসস্থিত বিন্দুদ্বয়ের একটিতে সূর্য্য নিশ্চলভাবে অবস্থিত।

(৩) গ্রহের পূর্ণ আবর্ত্তন সময়ের বর্গফল (square of the periodic time) অঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক-কক্ষার মধ্য দূরত্বের ঘন-ফলের অনুবর্ত্তী (varies as the cube of the mean distance).

বর্ত্তমান সময়ে Bradley সাহেবের আলোকগতি-বিষয়ক গবেষণার দ্বারা কেপ্‌লারের সিদ্ধান্তগুলির প্রত্যক্ষ মীমাংসা পাওয়া গিয়াছে। Bradley সাহেব লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, নক্ষত্রসমূহের অবস্থিতি কিছুকাল পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্থির করা যায়, ক্রান্তিবৃত্তের সমান্তরালবর্ত্তী ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বৃত্তাভাসে উহারা ভ্রমণ করিতেছে, এবং একটা পূর্ণ ভ্রমণের সময় এক বৎসরকাল। সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় যে, এই পর্য্যবেক্ষিত গতি নক্ষত্রগণের নিজের গতি নহে, কেবল সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে বলিয়া দর্শকের গতিই ইহাদের উপর আরোপিত হইয়া দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়াছে। বাস্তবিক, যদি পৃথিবী নিশ্চল হইত, তাহা হইলে নক্ষত্রদিগের আলোক সকল সময়ে ঠিক একই বেগে আসিতে থাকিত, এবং আলোক বহির্গমনের পর যে দিগভিমুখে আসিতেছিল, সেই দিকটা লক্ষ্য করিয়াই সমস্ত পথ চলিয়া আসিত। কিন্তু দর্শকের গতি স্বীকার করিয়া লইলে নক্ষত্রের আলোক যে দিক দিয়া আসিতে দেখা যাইবে, সেই দিকেই নক্ষত্রটিও লক্ষিত হইবে। আমাদের সাধারণ জ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে আমরা বলিতে পারি—যেমন একজন পথে চলিতে থাকিলে, বৃষ্টির ধারা ঋজুভাবে পড়িলেও তাহার নিকট বক্রভাবে পড়িতেছে বলিয়া লক্ষিত হইবে; ঠিক সেইরূপ দর্শকের গতির নিমিত্ত নক্ষত্রালোকের দিগ্‌ভ্রম ঘটিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ গণনার দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, দিগ্‌বৈষম্যের ইহাই একমাত্র কারণ; সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, আলোকগতি বৈষম্য (aberration of light) পৃথিবীর গতির একটা চাক্ষুষ প্রমাণ।

এইবার সৌরজগতের গতি বিষয়ে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মটি প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইলে, গণিত জ্যোতিষের বিশিষ্ট উন্নতি সাধিত হইল। এই প্রসঙ্গে আমরা সূর্য্য-সিদ্ধান্তের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি—

মহত্ত্বান্মণ্ডলস্যার্কঃ স্বল্পমেবাপকৃষ্যতে।
মণ্ডলাল্পতয়া চন্দ্রস্ততো বহ্বপকৃষ্যতে॥

সূর্য্যমণ্ডলের গুরুতা প্রযুক্ত সূর্য্য অতি অল্প পরিমাণে আকৃষ্ট হয়, এবং চন্দ্রমণ্ডলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত লঘু, এই নিমিত্ত চন্দ্র অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমাদিগের মনে হয় মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সহিত এই শ্লোকটির বিশেষ কিছু সম্বন্ধ আছে। বস্তুতঃ ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, প্রাচীন চিন্তাশীল জ্যোতির্বিদগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কে ইহার একটা আবছায়া কল্পনাও জাগিয়া উঠিয়াছিল। এমন কি, ইহা যে অঙ্কুর অবস্থায় ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মনে স্থান পাইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বরাহমিহির লিখিয়াছেন—পৃথিবী কেন্দ্রের দিকে সকল বস্তু আকর্ষণ করিতেছে। ব্রহ্মগুপ্ত আর একটু বিশদ করিয়া বলিয়াছেন—প্রকৃতির নিয়মে সকল বস্তুই পৃথিবীর অভিমুখে পতিত হয়; কারণ পৃথিবীর

প্রকৃতিই আকর্ষণ ও ধারণ করা;—যেমন জলের প্রকৃতি বহিয়া যাওয়া, অগ্নির প্রকৃতি দগ্ধ করা ও বায়ুর প্রকৃতি গতির সৃষ্টি করা। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি বলিতেছেন—

আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ
স্বস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি।

পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি আছে। পৃথিবী সেই আকর্ষণ শক্তি বলে গুরু-দ্রব্য স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। আকর্ষণ সময়ে পতনের ন্যায় উপলব্ধি হয়।

...যদিও মাধ্যাকর্ষণের তথ্যটি অঙ্কুর অবস্থায় প্রচলিত ছিল, এবং যদিও কেপ্‌লার ইহার উপযোগিতার বিষয়ে সবিশেষ অবগত ছিলেন, তথাপি ইহা পরিণতির অভাবে ফলপ্রদ হইতে পারে নাই। জ্যোতিষের ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ তথ্যের প্রবর্ত্তন, বিস্তৃতি ও ব্যবহার নিউটনের অলোক-সামান্য প্রতিভার অপেক্ষা করিতেছিল। গেলিলেয়ো কেপ্‌লার প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহসমূহের গতি সম্বন্ধে যে সকল মূল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সমস্তকে ভিত্তি করিয়া তিনি দেখাইলেন, কেপ্‌লারের নিয়ম তিনটি মাধ্যাকর্ষণের একটিমাত্র তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই তথ্যটি এই—সূর্য্য স্বীয় কেন্দ্রের দিকে গ্রহগণকে আকর্ষণ করিতেছে। নিউটনের কথায় মাধ্যাকর্ষণের নিয়মটি এইরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়—"জড় পদার্থদ্বয় তত্তৎ বস্তুর পরিমাণানুসারে এবং তাহাদের দূরত্বের বর্গবিপর্য্যয়ে (inverse square) পরস্পরের অভিমুখে সরল পথে আকৃষ্ট হইতেছে।" এই মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপার হইতে নিউটন যে তিনটি সর্ব্বজনবিদিত নিয়ম উদ্ভাবন করিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

১। কোনও দ্রব্যের অচল অবস্থা বা সরল পথে সমগতিত্ব অপর শক্তি দ্বারা প্রহৃত না হইলে পরিবর্ত্তিত হয় না।

২। অবস্থা পরিবর্ত্তন অপর শক্তির অনুপাতে ও অভিমুখে সংঘটিত হয়।

৩। প্রতি দুই পদার্থের সম্বন্ধ ঘাত-প্রতিঘাতাত্মক। এই তিনটি গতিই সৌরজগতের স্বভাব। জগতে প্রতি পদার্থ অপর পদার্থকে স্ব-স্ব পরিমাণানুসারে ও পরস্পরের দূরত্বের বর্গ-বিপর্য্যয়ের অনুপাতে (inverce square of the distance) আকর্ষণ করে। এই নিয়মের সাহায্যে নিউটন দেখাইলেন, পৃথিবীর অংশগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া এবং সেই অবস্থায় পৃথিবী স্বীয় অক্ষের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া পৃথিবীর আকার ঠিক গোলকের ন্যায় নহে।

বাস্তবিক সৌরজগতের জন্ম, বৃদ্ধি এবং বোধ হয় ধ্বংসও ঐ একমাত্র মাধ্যাকর্ষণের তথ্যটির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত না মাধ্যাকর্ষণের আদ্যন্ত কারণ অবগত হওয়া যায়, ততদিন ঐ বিভিন্ন কক্ষা-বিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি বিজ্ঞান যে এক গভীর রহস্যজালে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার উন্মোচনের পক্ষে জ্যোতিষ বড় বেশী অগ্রসর হইয়াছে, এ কথা আমরা বলিতে পারিব না। তবে (Halley) হেলি যখন এই মাধ্যাকর্ষণ তথ্যটির অবলম্বনে স্বনামপ্রসিদ্ধ ধূম-কেতুটির পুনরাবির্ভাবের সময় নির্দ্দেশ করিলেন এবং উহাও যখন তাঁহার নির্দ্দেশিত সময়ে পুনরায় বিমানে আবির্ভূত হইল, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের চূড়ান্ত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। আরও যখন এডেমস্ (Adams) ও ল্যাভেরিয়ার (Leverrier) এই মাধ্যাকর্ষণ নিয়মটির অবলম্বনে ইউরেনাস (Uranus) গ্রহের অবস্থিতি সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হইলেন এবং যখন তাঁহাদিগের এই ধারণা বিশিষ্ট পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা নেপচুন (Neptune) গ্রহের আবিষ্কারে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়া পর্য্যবেক্ষণ রাজ্যে জ্যোতিষের একটা প্রকাণ্ড বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত করিয়া দিল, তখন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তথ্যটিকে বিজ্ঞানের ধ্রুবসত্য রূপে গ্রহণ করিতে কাহারও বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকিতে পারে না।

এইবার আমরা সৌরজগতের উৎপত্তি ও গঠন সম্বন্ধে কিছু বলিব। নিউটন দেখাইয়াছেন যে, কোনও উচ্ছৃত বস্তুর প্রক্ষেপ বেগের projective velocity অনুযায়ী উহার গতিমার্গের গঠন হইয়া থাকে। সুতরাং স্বভাবতঃই এরূপ প্রশ্ন মনে জাগিতে পারে যে, সৌরজগতের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিমার্গের গঠন করিতে কতটা ও কিরূপ প্রক্ষেপ-বেগের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই অসীম ব্যোমে অসংখ্য পদার্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; ইহাদের পরস্পরের আকর্ষণ-শক্তির বলে একত্রীকৃত হইয়া এই তেজোময় সৌরমণ্ডলে

পরিণত হইয়াছে, এবং ইহার অন্তর্গত কুঞ্চনশক্তিই বাহ্য তেজোবিকিরণের নিদানীভূত কারণ।

এখন প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, সূর্য্যের অবয়ব বা বিম্ব কিরূপ। অবশ্য ইহা প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা জানিবার কোনও উপায় নাই। সূর্য্যের মধ্য-ভাগমাত্র সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয়। একটু বিশেষ লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই, সূর্য্যের এই উজ্জ্বল বিম্বের উপর কতকগুলি কলঙ্করেখা রহিয়াছে। উহাদিগকে আমরা সৌর-কলঙ্ক বলিয়া থাকি। ইহাদিগের বাহ্য দৃশ্যে আমাদের মনে হয়, ইহা সূর্য্যমণ্ডলে ছোট বড় গহ্বর, এবং উহাদিগের দিকে একটু ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় আমরা সূর্য্যের অন্তঃস্থল দেখিতে পাইতেছি। ঐ অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ সূর্য্যের উপরিভাগ হইতে অনেকটা নিম্নস্তরে। এই সৌরকলঙ্কগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহারা সূর্য্যমণ্ডলে ঝটিকা-জনিত বিদীর্ণ গহ্বরদেশ। আবার কেহ কেহ বলেন, উহারা সূর্য্যবিম্বাবলম্বী ঘন কৃষ্ণ মেঘসমূহের দৃঢ়-বদ্ধ সমষ্টি। বস্তুতঃ, ইহাদের প্রকৃতি যাহাই হউক, ইহাদের এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যাহাতে স্বতঃই ইহারা পর্য্যবেক্ষণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ ইহাদের কেবল বিষুবরেখাবর্ত্তী প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহাদের আবির্ভাব লক্ষিত হয়; এবং ইহাদের আগমনে পৃথিবীর উপর তাড়িত-প্রবাহজনিত ঝটিকার সঞ্চার হয়। ইহা হইতে একটা বিশেষ ব্যাপারের উপলব্ধি হইতে পারে; যেহেতু ইহাদিগের আবির্ভাব ও তিরোধানের সময় সমান, ইহা হইতে মনে হয় যে, সূর্য্য যখন নিজ অক্ষের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তখন ইহারাও সঙ্গে সঙ্গে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মোটামুটি ইহাই সৌরজগতের ইতিহাস।

বস্তুতঃ, এই নানাবর্ণবিশিষ্ট বহুবিধ রত্নসন্নিভ দীপ্তিময়ী তারকাদি জ্যোতিষ্ক-প্রত্যুপ্ত সুশোভন বাসব সভা বিতানের বিন্যাসভঙ্গী কি চিরকাল সমভাবে রহিয়াছে? ঐ গগনাঙ্গণার কলহাররূপিনী দুগ্ধফেনসম স্বচ্ছতোয়া মন্দাকিনী-কূলে সিকতাস্থলে স্তূপীকৃত হীরককণা কি পূর্ব্বাপর সমভাবে সজ্জীভূত রহিয়াছে? এবং উত্তরকালেও কি এইরূপই থাকিবে? কে বলিতে পারে, কে জানে! অন্ততঃ বিজ্ঞানের এই বিশেষ উন্নতির দিনেও আমরা ইহার সুস্পষ্ট উত্তর পাই না। সত্যই ইহা কি মনে হয় না, এই আকাশ-গঙ্গার বেলাবস্থিত প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক গ্রহগণ এক অখণ্ড নিয়মের অধীন হইয়া কোন্ সাধনার পথে নিরন্তর ছুটিয়াছে —কাহার সন্ধানে? কে জানে!

আমন্ত্রণ

[শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী]

কোকিল এসে ডাক দিয়ে কয়—
"আয় না কবি,
'বসন্তে এই বিরাট্ খেলায়
মত্ত হ'বি!
'ছিন্ন করে' বন্ধ-বাধা,
অখিল ভবে
'সবাই যে আজ বিভোর রে, এই
মহোৎসবে!
'পান করে' কার প্রেম-মদিরা
মন-মধুপে
'উচ্ছ্বসি' দেখ্ ফুট্‌ল কেমন
নানান্ রূপে!

'বিশ্ব-মনের উল্লাসের আজ
সীমাই নাহি,—
'জলে স্থলে শূন্যে সে ঐ
যায় প্রবাহি'!
'মৃণ্ময়ী-মা'র ভাণ্ডার-দ্বার
পড়্‌ল খুলি'!
'উথ্‌লে ওঠে বুকে ফুলের
ফোয়ারাগুলি!
'বিহঙ্গমের হর্ষ-গানের
উৎসরাশি,
'আনন্দের এই অসীম মেলায়
মিল্‌ছে আসি'।

'ছন্দে, রূপে, গন্ধে, গানে
উদ্‌ভাসিয়া,
'উন্মেষি' আজ ফুট্‌ল বিরাট্‌
বিশ্ব-হিয়া!
'আপ্‌না-হারা সবাই যে আজ
পাগলপানা ;—
'নাইক কিছুর কোনই হিসাব
ঠিক-ঠিকানা!
' অন্তবিহীন সুখ-সায়রে
মগন সবি!
'এমন দিনেও তুই কি অবোধ,
বাঁধাই র'বি?

সম্মুখে তোর প্রকাশরূপী
পাথারটিরে,
'সুখের আবেগ দোলায় যে ঐ
রোমাঞ্চি'রে!

'চুকিয়ে দিয়ে সব 'ল্যাঠা' আজ
তার মাঝারে
'আয় না ধেয়ে উধাও বেগে,
ঝাঁপ দে নারে!
'ও কবি, ও বন্ধু মোদের,
সময় যে যায়!
'দল বেঁধে সব র'য়েছি বসে'—
"আয়, চলে' আয়!"

* * *

বিরাম নাহি, এম্‌নি কোকিল
কেবল সাধে।
বন্দী কবি, সে ডাক শুনে
শুধুই কাঁদে।
বাঁধন হারা নদীর বুকে
জ্বল্‌ছে রবি।
কুটীর-তলে নয়ন-জলে
লুটায় কবি!

ইমান্‌দার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শুক্লা সপ্তমীর সন্ধ্যা। সে দিন বেশ গরম পড়িয়া গিয়াছে। রোয়াকের উপর মাদুর বিছাইয়া, বৃদ্ধ সর্দ্দার শুইয়া ছিলেন; অদূরে প্রদীপের আলোর কাছে বসিয়া জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ রহিমা রেশমের সূতায় ঘুন্‌সী বিনাইতেছিল, কনিষ্ঠা শ্বশুরের পায়ের পাশে বসিয়া, পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে,—শ্বশুরের কাছে গল্প শুনিতেছিল। ভুত, প্রেত, পরী, জিন্‌ হইতে, পুরাতন যুগের নবাব, বাদশা, আমীর ওমরাওদের কীর্ত্তিকলাপ, ভালমন্দ খেয়ালের পরিণাম, পাপপুণ্যের ফলাফল শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিচয়-কীর্ত্তনই সে গল্পগুলির প্রাণ ছিল। প্রতি অবসর-সন্ধ্যায় বৃদ্ধ পুত্র-বধূদের গল্প শুনাইতেন,—বিশেষ করিয়া ছোটটিকে! সন্ধ্যাবেলা শ্বশুরের পদসেবা করিতে-করিতে গল্প শোনা টিয়ার পক্ষে আজকাল বেশ একটা নেশার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। যেদিন সন্ধ্যায় শ্বশুর বাড়ীতে আসিবার অবকাশ পাইতেন না, সে দিন টিয়ার অস্বস্তির সীমা থাকিত না।

মামলার হাঙ্গাম লইয়া ফৈজু আজকাল শহরে বাস করিতেছে। দশ-পনের দিন অন্তর দুই একদিনের জন্য গ্রামে আসে, কোনবারে সদ্যঃ আসিয়া সদ্যঃই চলিয়া যায়। পুত্রহীন গৃহটা বৃদ্ধের আদৌ ভাল লাগিত না; তবুও প্রতি সন্ধ্যায় পুত্রবধূদের শোনাইবার জন্য তিনি প্রায় নিয়মিত হাজিরা দিতেন। তারপর রাত্রি বাড়িলে, জমিদার-বাড়ী গিয়া চারিদিক দেখিয়া-শুনিয়া, দেউড়ীতে চাবি বন্ধ করাইয়া তবে বাড়ী ফিরিয়া খাইয়া ঘুমাইতেন। পুত্র যেদিন

বাড়ী আসিত, সেদিন তিনি জমিদার-বাড়ীতে শয়ন করিতে যাইতেন; রহিমাও সে সময় প্রায় নানীর বাড়ী গিয়া শয়ন করিত।

আজ সুনীল কলিকাতা হইতে শহরে আসিয়া আদালত হইতে সেজবাবুর জমা দেওয়া সেই টাকা তুলিয়া লইয়া ফৈজুর সঙ্গে বাড়ী আসিবে। ভোরের গাড়ীতে মণ্ডল মশাই শহরে গিয়াছে, রাত্রি সাতটা আটটার মধ্যেই তাহারা গ্রামে আসিবে।

গল্প বলিতে-বলিতে বৃদ্ধ ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে গল্প বন্ধ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "তাদের আস্‌বার সময় হয়েছে, আমি একবার ওবাড়ী থেকে ঘুরে আসি, দেখি কেউ এলো কি না।"

পুত্রবধূর মাথায় হাত দিয়া চুমা খাইয়া, তিনি পা টানিয়া লইলেন। টিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া সংযত মৃদু কণ্ঠে বলিল "গল্পটা শেষ হোল না,---"

স্নেহময় কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন "কাল হবে মা, আজ আমার মন লাগ্‌ছে না, ছেলেটা বাড়ী আস্‌ছে—" বলিয়াই বৃদ্ধ অজ্ঞাতে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সহসা চুপ করিলেন। টিয়া বিচলিত হইয়া নতমুখে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে একটা স্থান টিপিয়া ধরিয়া বলিল "এখানটা কি হয়েছে? এতখানি ফুলে রয়েছে কেন বাপজি—"

বৃদ্ধ নির্দ্দিষ্ট স্থানটায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "তাইতো, বোধ হয় কাঁটা ফুটে থাক্‌বে,—ব্যথাও হয়েছে এই যে, একটু—"

রহিমা ঘুন্‌সী বিনানো বন্ধ রাখিয়া,—মাথা তুলিয়া চাহিয়া বলিল "কাঁটা ফুটেই আছে না কি? বার করে দেব?"

টিয়া সোৎসুক হইয়া বলিল "দাও না দিদি, আমি আলো দেখাচ্ছি এস—" সে আলোটা তুলিয়া লইয়া আসিল, রহিমা সূতার বাণ্ডিল হইতে সূঁচ খুলিয়া নিকটে আসিয়া বসিল।

বৃদ্ধ আপত্তি করিতে লাগিলেন, আজ কাঁটা তুলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু পুত্রবধূদ্বয় ততক্ষণে দুই দিক হইতে পায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে,—কাযেই আপত্তি টিকিল না। রহিমা কাঁটার সন্ধানে চারিদিকে সূঁচটা সাবধানে সঞ্চালন করিতেছে, এমন সময় দুয়ার ঠেলিয়া একজন বাড়ী ঢুকিল। উৎসুক দৃষ্টিতে দুয়ারের দিকে চাহিয়া টিয়া ত্রস্তে ঘোমটা টানিল, বৃদ্ধ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"কে, ফৈজু?—"

"জী—" বলিয়া ফৈজু অদূরে আসিয়া রোয়াকের উপর হাতের ক্যাম্বিশের ব্যাগ রাখিয়া বসিতে গেল, কিন্তু বৃদ্ধ নিজের কাছে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "এইখানে আয়!"

ফৈজু অত্যন্ত বিপন্ন হইল; পিতার দুই পাশে দুই পুত্রবধূ বসিয়া আছে; তার মাঝে সে যে কোথায় স্থান গ্রহণ করিবে, ভাবিয়া পাইল না! মাথা চুলকাইয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "আমি ব্যাগটা রাখ্‌তে এসেছি, এখনি ওবাড়ী যাব, এখনো দিদিমণির সঙ্গে দেখা হয় নি।"

পিতা বলিলেন "যাবি এখন, এই এলি, একটু বোস্‌। ছোটবাবু এসেছেন তো?"

ফৈজু বলিল "এসেছেন। ওঁরা বাড়ী গেলেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন "তবে আর কি, ছোটমা খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন, দেখা কাল সকালে করলেও চল্‌বে। তুই বোস্‌ এখন—" তিনি আবার নিজের সামনে স্থান দেখাইলেন।

পিতার নির্দ্দিষ্ট স্থানটির পাশেই তাঁহার কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বসিয়া আছে দেখিয়া ফৈজু ঘুরিয়া আসিয়া রহিমার পাশে দাঁড়াইল। রহিমা সূঁচ হাতে লইয়াই এতক্ষণ নীরবে ফৈজুর দিকে চাহিয়া ছিল; এইবার নিকটে পাইয়া ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত ভাবে বলিল "এত রোগা হয়ে গেছ কেন ফৈজু?"

"কে আমি?" বলিয়া নিজের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল "রোগা হয়ে গেছি? তা হবে। তোমার শরীরটা এখন ভাল যাচ্ছে তো খলিফা? নানীরা ভাল আছে?"

ফৈজুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে পিতা বলিলেন "তাই তো বটে, মুখখানা যে তোর শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে ফৈজু,—আজ খাস্‌ নি বুঝি?"

ফৈজু বলিল "নাঃ, এই তো ষ্টেশন থেকে আবার জল-খাবার খেয়ে এলুম আমরা। শুকন দেখাচ্ছে ওটা রাস্তার কষ্ট; তাছাড়া মামলার খরচের হিসেব তৈরী করতে কদিন

একটু খাটুনী গেছে। ও কি হচ্ছে খলিফা,—” ফৈজুও পিতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

রহিমা তৎক্ষণাৎ সরিয়া বসিয়া, তাহার হাতে সুঁচটা দিয়া বলিল “বার করতো কাঁটাটা, তোমার চোখ ভাল, শীগ্রী দেখ্‌তে পাবে—”

ফৈজু সুঁচ লইয়া হেঁট হইয়া দেখিতে লাগিল; টিয়া ঘোমটা উত্তরোত্তর বেশী করিয়া টানিয়া, সসঙ্কোচে পিছু হটিয়া বসিল। আলোটা ভাল দেখা গেল না দেখিয়া ফৈজু কুণ্ঠিত ভাবে দুই একবার টিয়ার দিকে চাহিল, কিন্তু টিয়া নিজেই চোখ ঢাকিয়া হেঁটমুখে বসিয়া আছে; সে ইঙ্গিত দেখে কে? অগত্যা ঘাড় তুলিয়া রহিমার দিকে চাহিয়া ফৈজু বলিল “আলোটা তুমি ধরো খলিফা,—আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না।”

মুখরা রহিমা তৎক্ষণাৎ বলিল “অমন করে আলো দেখাচ্ছে, তাও দেখ্‌তে পাও না? তুমি এম্নিই ‘তালকাণা’ বটে! হুঁ!” রহিমা আলোটা ধরিল! পরিত্রাণ পাইয়া টিয়া নিঃশব্দে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

কাঁটা বাহির হইল। ক্ষতস্থানে চূণ লাগাইয়া রহিমা রান্নাঘরের কাযের জন্য উঠিয়া গেল।

পিতা-পুত্রে কিছুক্ষণ মামলা-সম্পর্কীয় কথা কহিলেন। রহিমা পূর্ব্বাহ্নেই রান্না প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। রাত হইতেছে দেখিয়া শ্বশুরের অনুমতি লইয়া ভাত বাড়িয়া দুজনকে ধরিয়া দিল। খাইতে খাইতে পিতা বলিলেন “শহরের সব কায শেষ হয়ে গেছে তো ফৈজু, আর তোকে এখন যেতে হবে না?”

ফৈজু বলিল “শহরে যেতে হবে না, তবে পর্শুদিন ছোটবাবুদের নিয়ে জয়দেবপুর যেতে হবে বোধ হয়। দিদিমণি কি মত করবেন জানি না, এখন একবার ওবাড়ী গেলে খবরটা জান্‌তে পারা যেত।”

পিতা বলিলেন “আমি তো ঐখানে শুতে যাচ্ছি, খবর নেব। কিন্তু—জয়দেবপুরে আবার তোকেই যেতে হবে রে? তাই তো—”

ঘোরতর অসন্তোষের সহিত রহিমা বলিল “যেতে হবে বল্লেই আমি যাওয়া হয় না কি? ঘর-সংসার ভাসিয়ে দিয়ে, বারমাসই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মোকদ্দমার ফ্যাসাদ নিয়ে হেথা-সেথা ঘুরে বেড়ানো,—আর তো কায নেই! না ধাপজি, ফৈজুকে আর যেতে দেওয়া হবে না।”

একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল “তার পর?”

রহিমা রাগিয়া বলিল “তার পর আবার কি? ওম্নি করে দুস্‌মন্ বাড়িয়ে শেষে খুনের দায়ে জান্ খোয়াতে হবে না?”

পিতার অলক্ষ্যে ঘাড় নাড়িয়া ব্যঙ্গ-সমর্থন জানাইয়া, ফৈজু নীরবে হাসিতে লাগিল। রহিমা অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল “ফৈজুর মতলব ভাল নয় বাপজি, তুমি ওর যাওয়া বন্ধ কর। ফৈজু সব করতে পারে, ওকে আর কোথাও যেতে দেওয়া হবে না।”

একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, “না না, সে সব ভাবি না; তবে ফৈজু যে বাড়ী এসে দু-দশদিন থাক্‌তে পাচ্ছে না, এই হয়েছে মুস্কিল।” ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, “ফৈজুকে আটকানো একটা কথার ওয়াস্তা, কিন্তু আমি বেইমানি করি কি করে? এ যে সুমতি মা'র কায,—তাঁর কাজে তো নিমকহারামী করতে পারি না।” বৃদ্ধ চুপ করিলেন, ফৈজুও গুম্ হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। রহিমা “ঘর সংসার ভাসিয়া যাওয়া” সম্বন্ধে আরো দুকথা কহিল। কিন্তু ফৈজু এবার কোন উত্তর দিল না।

আহার শেষ হইল। বৃদ্ধ রোয়াকে বসিয়া তামাক টানিতে-টানিতে পুত্রের সঙ্গে অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। বধূদ্বয় রান্নঘরে আহার করিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে পান-দোক্তা ও রেশমের গুটি হাতে লইয়া রহিমা নিকটে আসিয়া বলিল, “চল বাপজি, আমায় নানীর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে, তুমি—”

ফৈজু অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, “কেন? বাড়ীতে তো দুখানা ঘর রয়েছে, শোবার জায়গা পাও না?”

ঘাড় বাঁকাইয়া শ্বশুরের অলক্ষিতে,—গোপন ভ্রূকুটি করিয়া রহিমা সজোরে বলিল, “না! বাড়ীতে আমি থাক্‌ব না, আমি নানীর বাড়ী যাব। তোমার কি? তুমি সকল-তাতে মুরুব্বিয়ানা কোর না, থামো তো—”

ফৈজু বলিল “না, তোমার যাওয়া হবে না, তুমি বাড়ীতে থাক, দুপুর রাত্রে টংটং করে পরের বাড়ীতে যাওয়া—ও আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না।”

অত্যন্ত চটিয়া রহিমা বলিল, "তা পারবে কেন? আমার তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, বুড়ী হয়ে মরতে চলেছি, এখন আমার টং টং করে পরের বাড়ী যাওয়া—"

অপ্রস্তুতে পড়িয়া, ফৈজু বাধা দিয়া বলিল "আমি সেজন্য বলছি কি? ঝগড়া ওম্নি কর্‌তে পার্‌লেই হোল!—" একটু থামিয়া কুণ্ঠিত হাস্যে বলিল, "বাড়ী ছেড়ে পরের দোরে যাওয়া কেন? লোকে বল্‌বে কি?"

রহিমা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, ফৈজুকে কি একটা উত্তর দিতে গেল, কিন্তু তখনই শ্বশুরের পানে চাহিয়া—কথাটা সামলাইয়া লইল। একটু থামিয়া স্মিত হাস্যে বলিল, "লোকে তো আর তোমার মত বোকা নয় যে এর জন্যে কথা কইতে যাবে! কথা কয়, তখন তার জবাব দেব আমি। তোমার ভাবনা কি?"

ফৈজু মাথা চুলকাইয়া—ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"বাড়ীতেই থাক না খলিফা—"

রহিমা হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "মুচির আর কোন কাম্, নায় খায় ছোঁয় চাম্; তবু সেই এক কথা! তোমার দু-একটা ছেলে-মেয়ে হোক, তখন তাদের ফেলে, বাড়ী ছেড়ে কোথাও আমি বেরুই তো বোলো। এখন তুমি কোন কথা কইতে পাবে না।"

ফৈজু নীরবে হেঁট হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। পুত্র ও পুত্রবধূর দ্বন্দ্বের মাঝে পিতা এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া খুব উদাসীন ভাবে হুঁকাই টানিয়া যাইতেছিলেন। এই-বার হুঁকাটি রাখিয়া, দুয়ারের পাশ হইতে লাঠি-গাছটি কাঁধে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"চল মাজি, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। ফৈজু, তুই দুয়ারটা বন্ধ করে দিবি আয়।"

ফৈজু উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পিতার পানে চাহিয়া বলিল, —"দিদিমণির সঙ্গে যদি দেখা হয়, তবে বলো, কাল সকালেই ফৈজু এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে।"

রহিমা ত্রস্তে বলিল, "তাই বলে বৌটিকে একলা বাড়ীতে রেখে চলে যেও না, আমি যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ থেকো।"

ফৈজু কোন উত্তর দিল না। তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর বাহিরে আসিল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পিতা বলিলেন, "তুই আর আসিস্ না, ফৈজু, বাড়ী যা—"

"যাই—" বলিয়া ফৈজু ফিরিয়া দাঁড়াইল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিল, "দিদিমণির সঙ্গে আজ দেখা হোল না, তিনি কি-যে মনে করবেন্; একবার যেতে পারলে হোত—"

ব্যস্ত হইয়া রহিমা বলিল, "আজ আর নয়। বাড়ী যাও এখন। সে ছেলে মানুষ, একলাটি রয়েছে, একটু আক্কেল নাই!"

একটু হাসিয়া ফৈজু বাড়ী ফিরিল। দুয়ার বন্ধ করিয়া আসিয়া দেখিল রোয়াকে সেই মাদুরের উপর একটি বালিশ লইয়া টিয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

কেহ কোথাও নাই, তবুও অভ্যাসবশে একবার চারিদিক চাহিয়া, মৃদুকণ্ঠে ফৈজু বলিল, "কেমন আছ?"

টিয়াও বোধ হয় একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেল—অনভ্যাসের সঙ্কোচ, বড় দারুণ সঙ্কোচ! এতক্ষণ গুরুজনের সামনে যে দূরত্বের ব্যবধানটা সতর্কভাবে বজায় রাখিয়া চলিতে হইতেছিল, সেটা হঠাৎ ঠেলিয়া সরাইতে তাহারও ভারী কুণ্ঠা বোধ হইল! মুখের উপর হাত আড়াল দিয়া, ততোধিক মৃদুকণ্ঠে সে উত্তর দিল—"ভাল আছি। তুমি?"

"মন্দ নয়" বলিয়া ফৈজু আসিয়া পাশে বসিল। তারপর বলিবার কথা বোধ হয় আর কিছু মনে না পড়ায়, নীরবে গোঁফে তা দিতে-দিতে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল;—তারপর হঠাৎ ফৈজু বলিয়া উঠিল—"এম্নি ফুট্‌ফুটে চাঁদনী রাতে, আগা সাহেবের সঙ্গে একদিন হজরৎ জহান্ আরার কবর দেখ্‌তে গেছলুম্! আহা, সে রাতটির কথা আমি কখনো ভুল্‌ব না; জ্যোৎস্না দেখ্‌লেই আমার সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে সেই কবরের গায়েই লেখা আছে—আহা চমৎকার—

"বঘা এর সাব্‌জা ন পোশদ কসে মজারে মরা
কে কবর পোশে গরীবাঁ, হঁমী গিয়া বসন্ত।"

তার মানে এই যে, আমার কবরে দামী ঘেরাটোপ্ দিও না, ঘাসের পোষাকই দীনাত্মার কবরের সবচেয়ে সুন্দর পোষাক!" একটু থামিয়া গভীর উচ্ছ্বাসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া ধীর কণ্ঠে ফৈজু পুনশ্চ বলিল, "কিন্তু দুনীয়ার লোক জানে, তিনি দুনীয়ার বাদশাহের আদরের কন্যা ছিলেন!"

তাহার সুদীর্ঘ ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনার সময় একথাগুলা

আর একবার ফৈজু, টিয়াকে বলিয়াছিল,—আজ নূতন নয়! উৎসাহের ঝোঁকে কত স্থানের বর্ণনা প্রসঙ্গে সে এমন কত কি উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিল, টিয়াও উৎসুক ভাবে কাণ পাতিয়া শুনিয়াছিল। ফৈজুর কথা শুনিতেই তাহার ভাল লাগে; ফৈজু কি বলিতেছে, সেদিকে বড় একটা মনোযোগ দেয় না, আজও দিল না, শুধু শুনিল মাত্র। কিন্তু এত কথা শুনিয়া, আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়, যা-হোক একটা কিছু বলা চাই,—তাই বিচলিত ভাবে একটু সরিয়া শুইয়া,—মুখের উপর হাত আড়াল রাখিয়াই মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "কাল এমন সময় জ্যোৎস্নার আলোয় সেখানে তুমি কি করছিলে?"

ফিরিয়া চাহিয়া ফৈজু একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার কি আন্দাজ হয় বল দেখি? কোন কবর-স্থানে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিলুম?"

সলজ্জ হাস্যে টিয়া বলিল, "তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য তো কিছুই নাই, তুমি যা মানুষ, তুমি সব পারো!"

"সব!" বলিয়া হাসিয়া ফৈজু তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, হাত দুটা টানিয়া সরাইয়া সুকোমল অনুরোধপূর্ণ স্বরে বলিল, "বল, বল, যা বল্‌ছ ভাল করে শুন্‌তে দাও আমায়—বল—"

লজ্জা-বিব্রত টিয়া ব্যস্তভাবে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না,—উল্টা স্বামীর আকর্ষণে আরো সরিয়া আসিতে বাধ্য হইল! তারপর উপর্য্যুপরি প্রশ্নে লজ্জারক্ত হইয়া, প্রাণপণে চোখ বুজিয়া, হাসিমুখে চুপি-চুপি বলিল, "কিছু না, কিছু না,—আমি শুধু বল্‌ছি যে, তুমি যে চাঁদনী রাতটা এত ভালবাস, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তুম্ না।"

হাসি মুখে ঘাড় নাড়িয়া ফৈজু বলিল, "তোমার বুঝি সন্দেহ ছিল যে, আমি অমাবস্যার অন্ধকারটাই খুব পছন্দ করি?"

দুহাতে মুখ ঢাকিয়া, সলজ্জ হাস্যে টিয়া বলিল—"শুধু সন্দেহ কেন? বেশ বিশ্বাসও করি।"

হাসিমুখে ফৈজু বলিল, "বটে! আমার অপরাধ? বল, কি অপরাধ?"

নির্ব্বোধের মত টিয়াও হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা আমি অত জানি না। আচ্ছা—" বলিয়াই সে কথা চাপা দিয়া উৎসুক ভাবে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "আবার তুমি জয়দেবপুর যাবে সত্যি? আমিও কিন্তু এবার বাপের বাড়ী যাব, তা বলে রাখছি। হাসি নয়, সত্যি সত্যি। আমার বাবা নিয়ে যাবার জন্যে চিঠি লিখেছেন,—আমি দিদিকে বলে-কয়ে ঠিক করে রেখেছি, এবার তুমি বাপজীর মত করিয়ে দাও।"

হাসিয়া ফৈজু বলিল, "বাঃ! মন্দ নয়! আমি বাপজীর মত করিয়ে দেব,—আর আমার বুঝি নিজের মতামত বলে একটা জিনিস নাই!"

সবিস্ময়ে চাহিয়া টিয়া বলিল "ওমা! তুমি বুঝি অমত করবে এতে? কেন, আমি তো তোমার কিছু অনিষ্ট করি নি,—তুমি কিসের জন্যে আমার সঙ্গে—" টিয়ার চক্ষু ছল্‌ছল্ হইয়া উঠিল!

সাদরে তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া ফৈজু সুকোমল কণ্ঠে বলিল, "আহা, রাগ কর কেন? বাপের বাড়ী যাবেই তো; কিন্তু যাক না দুদিন। এই তো সবে সেদিন এসেছ!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া টিয়া বলিল "এই সবে সেদিন এসেছি হোল! আমি যে চার মাস হোল এসেছি!"

"চা—র—মা—স! সে কি!" ফৈজুও আশ্চর্য্য হইয়া গেল!

টিয়া ততোঽধিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "হোল না? হিসেব কর দেখি।"

ফৈজু অবাক্ হইয়া গেল। মনে-মনে বুঝিয়া দেখিল, টিয়ার কথা বাস্তবিকই কিছুমাত্র মিথ্যা নয়! কিন্তু হায়, কি অবহেলাভরেই এই অমূল্য সুযোগ সে হারাইয়া ফেলিয়াছে! কখন সুযোগ আসিয়াছিল, সেটা একবার মাত্র ঝাপ্সা চোখে চাহিয়া, অনুভব করিয়া লইয়াছিল, ভাল করিয়া চাহিবার সময় পায় নাই। আজ একেবারে সুযোগের সমস্ত জমা-খরচটা যে গভীর আক্ষেপের মূর্ত্তি ধরিয়া, চোখের উপর হঠাৎ জীবন্ত হইয়া দাঁড়াইল! এ কি অদ্ভুত পরিতাপ!

এতক্ষণ ফৈজু বসিয়া ছিল,—এইবার ধীরে-ধীরে শুইয়া পড়িল। টিয়া চাহিয়া দেখিল; তার পর একটু হাসিয়া বলিল, "ঘুম এসে পড়্‌ল না কি?"

হাসির ছলে উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস চাপিয়া লইয়া ফৈজু বলিল,—"ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না। হঠাৎ ঘুম এসে পড়্‌ল,

কি আচম্‌কা ঘুম থেকে জেগে উঠ্‌লুম্, সেটা সম্‌জানো এখন শক্ত! আহা, এই চার-চার মাস সময়টা —” হঠাৎ ফৈজুর গলা ধরিয়া গেল, আর কথা কহিতে পারিল না! দপ্‌ করিয়া মনে পড়িল সুমতি দেবীর কথা! সেজবাবুর বৈষয়িক জুয়াচুরীর জারিজুরী ভাঙ্গিবার জন্য অমন ভাবে রুখিয়া উঠিয়া, বিদ্রোহে মাতিয়া ফৈজু যে নিজের অস্তিত্বটা পর্য্যন্ত এতদিন ভুলিয়া গিয়াছিল, সে শুধু সুমতি দেবীর বিষয়-রক্ষার জন্য নহে! বিষয় তো আইনের সাহায্যে ধীরে-সুস্থে সুমতি দেবী ফিরিয়া পাইতেন-ই! তাহার জন্য ফৈজুর অত লাফাইবার কিছু প্রয়োজন ছিল না! কিন্তু সুমতি দেবীর সম্বন্ধে সেজবাবুর সেই ঘৃণিত কটূক্তি;—সেটা ফৈজুর বুকে যে তীব্র প্রতিহিংসার আগুণ জ্বালাইয়া দিয়াছিল! তাহার ঝাঁজেই ফৈজু নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ-সুবিধার চিন্তাগুলা পুড়াইয়া-ঝুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া-ই না প্রতিশোধ লইবার জন্য মোরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল? অবশ্য ভদ্রলোকের (?) সে ইতর বাক্য-দংশনে, শুদ্ধাচারিণী সুমতি দেবীর পায়ের ধূলিকণাটিও অপবিত্র হয় নাই, তাহা ঠিক;—কিন্তু তাই বলিয়া, সুমতি দেবীর অন্যায্য অপমান ফৈজু যদি নির্লিপ্ত-উদাসীন ভাবে সহিত, তার কৃতঘ্নতার বিষে তাহার শরীরের প্রতি রক্ত-কণিকাটি যে বিষময় হইয়া উঠিত! সে ফৈজুর অসহ্য! গলাবাজী করিয়া ফৈজু কাহাকেও কিছু বলিতে পারে নাই, সুনীলকেও না,—সুমতি দেবীকে তো নয়ই! কিন্তু তাহার মর্ম্ম-নিহিত প্রচ্ছন্ন আগুণ তাহার ক্ষুদ্র ক্ষমতার সমস্ত দৈন্য দগ্ধ করিয়া তাহাকে আজ উজ্জ্বল জয়শ্রী দিয়াছে। যে বিষয়ের লোভে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া সেজবাবু অমন নীচ আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে বিষয়টা হাতে-হাতে কাড়িয়া লইয়া, তাঁহার নীচতাপূর্ণ প্রতারণা-চেষ্টা আজ দশের সমক্ষে পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া, ফৈজুর প্রতিশোধ-স্পৃহা কতকটা চরিতার্থ হইয়াছে; কিন্তু সুমতি দেবীর সস্নেহ-কৃতজ্ঞ দৃষ্টির নীচে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে তবুও আজ ফৈজুর দুঃখ হইতেছে! তাই সে ব্যাগ রাখিবার অছিলা করিয়া, পথ হইতে সুনীলের কাছে বিদায় লইয়া সটান্ বাড়ী চলিয়া আসিয়াছে। একান্ত ইচ্ছা সত্বেও সুমতি দেবীকে অভিবাদন করিতে যায় নাই! এখনো যে ব্যথার ঘা তাহার বুকের ভিতর শুকায় নাই!

একে-একে অনেক কথাই ফৈজুর মনে বিদ্যুদ্বেগে বহিয়া যাইতে লাগিল! মনে পড়িল, সঙ্কটপুর হইতে ফিরিয়া, সেইদিন হইতে কি অসহনীয় উত্তেজনায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, সে আপনাকে ঐ মামলার পিছনে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল! আইন-আদালতের কিছুই জানা নাই, প্রতি-পদে ভুল-চুক ঘটিবার সম্ভাবনা;—তাই প্রাণপণ চেষ্টায় সতর্ক হইয়া, মামলার প্রত্যেক বিষয়ের প্রত্যেক কথার প্রতি অক্ষরটি পর্য্যন্ত মুখস্থ রাখিয়া চলিতে হইয়াছিল! নির্দ্দয় তাচ্ছিল্যে সংসারের সমস্ত খবর মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল;—ক্ষীণস্বাস্থ্য স্ত্রীর জন্য যে অত ভাবনা—তাও সে তখন ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছিল! শুধু শহর হইতে যেদিন ফিরিত—সেদিন বাড়ী ঢুকিবার সময় একবার তাহার বুক কাঁপিত; ভয় হইত, যদি গিয়া দেখে, টিয়া অসুখে পড়িয়াছে! কিন্তু বাড়ী ঢুকিয়া, সুস্থ-স্বচ্ছন্দ স্ত্রীর পানে একবার চাহিয়া, সে তৎক্ষণাৎ এমন নিশ্চিন্ত হইয়া যাইত, যে, স্ত্রীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই তাহার আর মনে থাকিত না। তার পর গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জমিদার-বাড়ীর সদরে বসিয়া, মিত্র মহাশয়কে মামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুনাইয়া, উকীল-মোক্তারের প্রত্যেক মতামতটি জানাইয়া, কত-শত পরামর্শ লইয়া, চিন্তা-পীড়িত মস্তিষ্কে, ক্লান্ত দেহে কোন দিন বাড়ী ফিরিত, কোন দিন সেইখানেই পড়িয়া ঘুমাইত। কোন দিন বা গভীর রাত্রে বাড়ী আসিয়া, পিতাকে নিদ্রিত দেখিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইত। যে দিন পিতা স্বয়ং জমিদার-বাড়ী গিয়া তাহাকে জোর করিয়া বাড়ী পাঠাইতেন, সেদিনও সেই এক ব্যবস্থা! তত রাত্রে টিয়া ঘুমাইয়া পড়িত। নিদ্রিতা স্ত্রীর শান্ত মুখের পানে শান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া, সন্তুষ্ট-চিত্তে সেও ঘুমাইত। অহরহঃ কর্ম্মব্যস্ত মনে কোন আক্ষেপ, কোন অসন্তোষ ছিল না!

আর আজ? নিষ্কর্ম্মা হইয়া স্ত্রীর পাশে বসিয়াছে, কি, অমি সমস্ত অন্তঃকরণ কাল্পনিক খেয়ালে, করুণ-ব্যাকুলতায়, নিজের পাওনা-গণ্ডার হিসাব লইয়া, নাকিসুরে আপশোষের কান্না জুড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে! এ কি দুর্ব্বলতা! ধিক্ এ আত্মপরায়ণতায়!

হঠাৎ তীব্রবেগে উঠিয়া বসিয়া ফৈজু সজোরে বলিল, “জাহান্নামে যাক্! ত্যাখো টিয়া, ছোটবাবু দিদিমণির কাছে জয়দেবপুর মহল ইজারা করে নিয়ে, আমায় সেখানকার

তহশীলদারী করতে পাঠাচ্ছেন,—আমি কালই ওখানে যাব।"

টিয়া চমকিয়া মাথা তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল "তাই ভাল! যা করে তেড়ে উঠেছ, যেন এখুনি খুনোখুনি করতে চলেছ —ঘুমাবার পর্য্যন্ত তর্ সইবে না! মা গো, কি ছট্‌ফটে মানুষ তুমি!"

প্রবল চেষ্টায় আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া ফৈজু সহজ ভাবে হাসিয়া বলিল, "ওঠো, ওঠো;—আর এ ঠাণ্ডায় তোমার থাকা হবে না। আবার কাল অসুখ বাধিয়ে বোসো তো' আমার সকল দিক মাটী হয়ে যাবে! ওঠো তুমি, ঘরে চল।"

একটু হাসিয়া টিয়া বলিল "সাধে বলি, তোমার পছন্দ শুধু অন্ধকার!"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

সকালে উঠিয়া ফৈজু বাড়ী হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় টিয়া আসিয়া ধরিয়া বসিল উচুঁ সাঙার উপর হইতে বিছানা-মাদুর ও অন্যান্য জিনিসগুলা নামাইয়া দিতে হইবে; কারণ, বিছানাগুলা সে রৌদ্রে দিবে।

ফৈজু যদিও তাড়াতাড়ি বাহির হইতেছিল, কিন্তু এত সকালে সুমতি দেবী যে পূজাহ্নিক লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন, সেটাও বেশ মনে পড়িতেছিল। কাযেই, টিয়ার প্রস্তাব শুনিবামাত্র তখনি ফিরিয়া বলিল, "চল।"

কিন্তু সাঙার উপর হইতে জিনিস নামাইতে গিয়া ফৈজু বড় গোলে পড়িল। ঘরে বাস করিলেও এতদিন লক্ষ্য করে নাই,—আজ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, ঘরের ছাদের কড়ি-বরগায় স্থানে-স্থানে 'উই' ধরিয়াছে, কোণে-কোণে ঝুল জমিয়াছে,—কাঁচে ও ফ্রেমে আঁটা দু'চারখানা তস্‌বীর যাহা আছে, সেগুলা ধূলার দাপটে নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন, মলিন! এম্নিতর টুকি-টাকি আরো কত কি গৃহস্থালীর ত্রুটি! চাহিয়া-চাহিয়া সমস্ত দেখিয়া নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ফৈজু বলিল, "দাঁড়াও, আজ সব সাফ্ করছি।"

আগা সাহেবের সহিত নানাস্থানে ঘুরিয়া পরিচ্ছন্নতা-বোধটা ফৈজুর বেশ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল! নিজেদের ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র ত্রুটি একবার যদি চোখে পড়িল, তবে তৎক্ষণাৎ সেটা অসহনীয় বিশ্রী-কদর্য্যতা বলিয়াই মনে ঠেকিল! সে উই পরিষ্কার করিয়া ঘরের ঝুল ঝাড়িতে লাগিয়া গেল;—বাড়ী হইতে বাহির হইবার উৎসাহ কোথায় চলিয়া গেল, তার খোঁজ পাওয়া গেল না। টিয়া হাসিয়া বলিল, "ঈস্! ঘরকন্নার উপর যে ভারী দরদ! রকম কি?"

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া, নিজের কাযের দিকে চোখ রাখিয়া ফৈজু নীরবে একটু হাসিল, কোন উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ পরে রহিমা আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। ফৈজু তখন মহা ব্যস্ততায় ঘরকন্নার জিনিসপত্র ওলট্-পালট্ করিয়া ঘোর উৎসাহে হুটোপাটী জুড়িয়া দিয়াছে! রহিমা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "তোমার এ গেরো কেন?"

ফৈজু কায করিতে-করিতেই উত্তর দিল, "আজ দুপুরবেলা বরগাগুলোয় আলকাৎরা মাখাতে হবে,—বাড়ীতে আলকাৎরা আছে তো?'

রহিমা বলিল, "তা যেন আছে। কিন্তু আজ এখুনি এত তাড়াতাড়ি কেন?"

কপালের ঘাম মুছিয়া ফৈজু বলিল, "কাযের আবার এখন-তখন কি? যা বাকী আছে, তা চট্‌পট্ সেরে ফেলে নিশ্চিন্ত হওয়াই ভাল। তুমি আলকাৎরা বার কর খলিফা, আমি এখুনি বরগায় লাগিয়ে ফেলি।"

খলিফা অনেক আপত্তি করিল; কিন্তু ফৈজু নিরস্ত হইবার পাত্র নয়। সে আলকাৎরা লইয়া বরগায় মাখাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। রহিমা বলিল; "দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে গেলে না?"

ফৈজু পরম নিশ্চিন্ত ভাবে উত্তর দিল, "হবে এখন।"

ঘণ্টা-খানেক পরে আলকাৎরার কায শেষ করিয়া, মৈ'এর উপর হইতে নামিয়া আসিয়া ফৈজু হাত পরিষ্কার করিতেছে, এমন সময়ে বহির্দ্বার হইতে শ্যামল চীৎকার করিয়া ডাকিল—"ফৈজু মামু, বাড়ীতে আছ ভাই?"

ফৈজু হাসিয়া বলিল, "আছি ভাই, ভেতরে এস।"

শ্যামল দুয়ারের পাশ হইতে মুখ বাড়াইয়া সলজ্জ হাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ছোট মামী রয়েছে ভাই, আমি আর বাড়ী মধ্যে যাব না, তুমি বেরিয়ে এস।"

ফৈজু উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "হোক্, হোক্,—তোমায় কেউ লজ্জা করবে না; বাড়ীর ছেলে তুমি, আদরের ভাগ্নে-টি, তুমি বাড়ীতে এস।"

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া শ্যামল বলিল, "নাঃ, মা আমায় বারণ করে দিয়েছেন,—আমি বাড়ীতে যাব না, তুমি এস"।

হাত মুছিতে-মুছিতে অগ্রসর হইয়া ফৈজু বলিল, "কেন মা বারণ করেছে? এতো ভারী অন্যায়, তুমি ছেলে-মানুষ—"

বাধা দিয়া শ্যামল চুপি-চুপি বলিল, "মামীও ছেলেমানুষ বৌটি কি না, তাই মা বলে দিলেন, 'তুমি যেন আগের মত হঠাৎ বাড়ীতে ঢুকো না,—বৌমানুষ কোন কাযে ব্যস্ত থাকে তো, সামনে পড়ে গেলে লজ্জায় জড়-সড় হবে'—তাই—"

যুক্তিটা অকাট্য,—অত্যন্ত সমীচীন! কোন প্রতিবাদ না করিয়া, এদিক-ওদিক চাহিয়া হাসিমুখে ফৈজু বলিল, "ওরা রান্না-ঘরে আছে, তুমি উঠানে এস,—বল, কি খবর?"

শ্যামল অগত্যা এবার অগ্রসর হইয়া আসিল। তার পর ফৈজুর হাতের দিকে চাহিয়া, জিজ্ঞাসিত 'খবরের' উত্তর দিতে ভুলিয়া কৌতূহলী ভাবে বলিল, "তুমি আলকাৎরা নিয়ে কি কর্‌ছিলে ফৈজু মামু?"

ফৈজু সংক্ষেপে বলিল, "ঘরের বরগায় লাগাচ্ছিলুম। তোমার কি দরকার বল দেখি?"

নিকটস্থ আলকাৎরার হাঁড়িটার উপর ঝুঁকিয়া, ফশ্ করিয়া তার মধ্যে হাত ডুবাইয়া, স্বচ্ছন্দে নিজের দু' গালে দুই পোঁচ লাগাইয়া, শ্যামল ফৈজুর পানে চাহিয়া বলিল, "কেমন মানিয়েছে বল তো, ফৈজু মামু? ঠিক যেন যাত্রার হনুমান টি, নয়?"

ফৈজু হা—হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি ছেলেই হয়েছ তুমি শ্যামল! নিজে-নিজেই হনুমান! কোন দুখ-দরদ্ নেই! বাঃ"!

শ্যামল এদিক-ওদিক চাহিয়া, চুপি-চুপি বলিল "কাউকে বল্‌বে না বল, একটা ভারী মজার কথা আছে।"

ফৈজু উৎসুক হইয়া বলিল, "কি, কি?"

শ্যামল খুব সঙ্গোপনে, চুপি-চুপি বলিল, "মামলায় মার জিৎ হয়েছে না। মা তাই এবার আমার সোণার তাগা গড়িয়ে দেবেন। আর মামাবাবু—" খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া, চোখ মিটিমিটি করিয়া, ঘাড় দুলাইয়া শ্যামল বলিল, "মামাবাবু এবার আমার বিয়ে দেবার মতলব্ করেছেন! শুন্‌লে মজা! আমি কিন্তু তাহলে—ঠিক এম্নি করে মুখে আলকাৎরা মেখে বর সাজ্‌ব, ফৈজু মামু! তাহলেই খাসা মানাবে। এ্যাঁ!"

শ্যামলের ভঙ্গী দেখিয়া, উচ্ছ্বসিত হাসিতে অধীর হইয়া, ফৈজু দু'হাতে পেট চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। শ্যামল সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল "না—না, ছিঃ, অমন করে হেসো না, মামীরা শুন্‌তে পাবে! বল্‌বে এমন হতভাগা ভাগ্নে! ওঠো ফৈজু মামু, ও কি ভাই, ওঠো।"

অনেক কষ্টে হাসি সামলাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফৈজু বলিল, "দাঁড়াও ভাই, যে রঙ্গ জুড়েছ তুমি।—চল, আজ তোমার মার কাছে,—আমি আজ ঠিক বল্‌ব।"

অকস্মাৎ কি মনে পড়ায়, লাফাইয়া উঠিয়া, ফৈজুর কাপড় চাপিয়া ধরিয়া, শ্যামল সজোরে বলিল, "চল মামাবাবু, তোমায় ধরে নিয়ে যেতে বলেছে,—আমি ঠিক ধরে-ধরে নিয়ে যাব, চল শীগ্‌গী।"

ফৈজু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোথায় জী, কোথায়? কি দরকার?"

মাথা নাড়িয়া শ্যামল গম্ভীর মুখে বলিল, "তা আমি কি করে জানব? মামাবাবু শুধু আমায় বলে দিলেন, 'যাও শ্যামল, ফৈজুকে ধরে নিয়ে এস।' চল, আমি ধরেই নিয়ে যাব!"

শ্যামলের আলকাৎরা-মাথা হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া ফৈজু বলিল,—"চল, আমি যাচ্ছি। মামাবাবু বাড়ীতেই আছেন তো? দিদিমণির আহ্নিক-পূজো হয়েছে?"

শ্যামল দীর্ঘচ্ছন্দে বলিল; "কো—ন্ ভোরে! তোমার জন্যে সবাই বসে আছেন, মোড়ল মশাই শুদ্ধ আছেন, চল শীগ্‌গী—"

"চল—" বলিয়া ফৈজু অগ্রসর হইল। শ্যামল তাহার কাপড় ধরিয়া আগে-আগে চলিল।

রাস্তায় চলিতে-চলিতে আজে-বাজে আরো দু'চার কথা হইতে লাগিল। তাহারা জমিদার-বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াছে, এমন সময়ে মোক্ষদা ঠাকুরাণী, এক হাতে চালের ধুঁচুনি, অন্যহাতে শাকের 'পেতে' লইয়া, ঘোমটা-মাথায়, পান চিবাইতে-চিবাইতে বাহিরে আসিলেন। সঙ্গে ঝি এক গোছা বাসন হাতে লইয়া আসিতেছিল। দু'জনে পুকুরের উদ্দেশে চলিয়াছেন। ফৈজু শ্যামলকে টানিয়া লইয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

মোক্ষদা চলিতে-চলিতে, উভয়ের পানে একবার তীব্র দৃষ্টি হানিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঠোঁট বাঁকাইলেন।

তার পর ঝিকে লক্ষ্য করিয়া, যেন শ্লেষের প্যাঁচে পাকাইয়া-পাকাইয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "মহন্ত মশাই বলে ঠিক লো, বলে ঠিক! সেই যে সেই ইংরিজি শোলোক্—'মনি মনি মনি—বেইটার দান্ স্নুইটার দান হনি!—' ঠিক্ লো ঠিক!"

তার পর কয়েক পদ গিয়া, হাসিয়া ঝিএর গায়ের উপর প্রায় ঢলিয়া পড়িয়া, শুনাইয়া-শুনাইয়া বলিলেন—"এবার কত সুরে নানাই-ধানাই, কত ঢংএ সোহাগ গাওয়াই হবে লো—কত ঢংএ সোহাগ গাওয়াই হবে! চল্—চল্, শুন্‌বি চ, জন্মটা সাথ্যক কর্‌বি চ'—"

কথাগুলা এমন তীব্র শ্লেষের সহিত চিবাইয়া-চিবাইয়া বলা হইল যে, সেটা যে, শুধুমাত্র সখী-সংবাদের অন্তর্গত কোন সরল কৌতুক-পরিহাসমাত্র নয়, বেশ পরিষ্কার রূপেই বুঝা গেল! শ্যামল ঘাড় বাঁকাইয়া তাহাদের পানে চাহিয়া, ক্রুদ্ধ ভাবে বলিল, "এই মেনীর-মা রাক্ষুসীটা ভারী বজ্জাত! হাড় বজ্জাত! একেবারে রাস্তার মাঝে হাসির ছটা ছ্যাখো।"

ফৈজু সন্ত্রস্ত হইয়া চুপি-চুপি বলিল "চুপ্! চুপ্! মেয়ে-মানুষদের ও-সব হাসি-তামাসায় কি চোখ-কাণ দিতে আছে? চল, চল।"

চলিতে-চলিতে শ্যামল বলিল, "কে চোক-কাণ দিতে চায়। কিন্তু জোর করে যেগুলো নিজে থেকেই কাণে ঢুকে পড়ে, সেগুল্লোয় যে রাগ ধরে!"

শ্যামল সরল বালক, তাই অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়া দিল। কিন্তু ফৈজুর বয়স হইয়াছে, এত অসঙ্কোচে অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করা এখন তাহার সাধ্যাতীত,—ইচ্ছা-বিরুদ্ধও বটে! বিশেষতঃ, কিছু প্রকাশ হউক আর না হউক,—একটা বিশ্রী রকম ইতরমী তো যথেষ্ট পরিমাণেই প্রকাশ হইবে! তাই উদাসীন ভাবে বলিল, "পরের সম্বন্ধে ও-রকম রাগ নিয়ে চেঁচামেচি করার নামই পর-কুৎসা! ওতে অন্য কারুর কিচ্ছু লাভ নাই, কিন্তু তোমার নিজের লোকসান ঢের হবে। নিজের দোষ খুঁজ্‌তে চেষ্টা কর কিছু?"

শ্যামল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কিছু না! কিন্তু সত্যি ফৈজু মামু, ওই মেনীর মা-টা দিন-সন্ধ্যেবেলায় ঠাকুরবাড়ীতে আরতি দেখ্‌তে গিয়ে মোন্তি মশাইকে নিয়ে এম্নি যাচ্ছে-তাই হাসি-তামাসা করে যে দেখ্‌লে ইচ্ছে হয়, চুলের ঝুঁটি ধরে দুই থাপ্পড় বসাই!"

ফৈজুর মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল! অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তুমি অমন চাষাড়ে-গোঁয়ার্ত্তমী কোর না শ্যামল, ছিঃ, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার ওসব কথায় কায কি—আমার কাছে বল্লে, বল্লে,—আর কারুর কাছে খবর্দ্দার এসব কথা বোল না।"

থতমত খাইয়া শ্যামল বলিল, "আমি মাকে সব বলে ফেলেছি যে!"

চমকিয়া ফৈজু বলিল, "দিদিমণিকে? ছিঃ!" ফৈজুর মুখে যেন কে সহসা কালি ছড়াইয়া দিল! সে মাথা হেঁট করিয়া চলিতে লাগিল।

শ্যামল মৃদুস্বরে, যেন নিজ মনেই বলিল, "মা বল্লেন, দোষ নাই, ঘাট নাই, খামকা আমি কি বলে মানুষটাকে ছাড়িয়ে দিই—নইলে, মোক্ষদা দিদিকে আর একদণ্ডও বাড়ীতে রাখ্‌তে নাই!"

ফৈজু কোন উত্তর না দিয়া সদর দেউড়ী পার হইল। চিন্তাকুল মুখে সে মাথা হেঁট করিয়াই চলিতেছিল। অকস্মাৎ সামনে হইতে কে তরল কৌতুক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই যে, এত ভোরে কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্‌ল তাহলে! এর মধ্যে খোঁয়ারি গেল?"

ফৈজু মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, অদূরে সহাস্য মুখে মোড়ল মশায়! ভিতরে আত্ম-দমন করিয়া লইয়া প্রকাশ্যে হাসি মুখে বলিল, "ঘুম বহুক্ষণই ভেঙ্গেছে,—তোমার মত নেশাখোর তো নই, যে—খোঁয়ারি ভাঙ্‌তে বেলা যাবে!"

আপাঙ্গ ঠারে শাসাইয়া মোড়ল মশাই বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা - তোমায় আমি দেখ্‌ছি দাঁড়াও—এস—"

মোড়ল মশাই ফিরিয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিল। শ্যামল ফৈজুকে টানিয়া লইয়া পিছু-পিছু ছুটিল! অন্তঃপুরের চৌকাঠ পার হইয়া, মোড়ল মশাই এদিক-ওদিক চাহিয়া, পাশ কাটাইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। শ্যামল ফৈজুকে টানিয়া লইয়া, ভিতরে ঢুকিয়া উৎসাহ-প্রমত্ত কণ্ঠে চেঁচাইল, "মামাবাবু, ফৈজু মামুকে ধরে-ধরেই নিয়ে এসেছি, এই নিন।"

মণ্ডল ততক্ষণে হাঁটু পর্য্যন্ত নুইয়া, সাড়ম্বরে সেলাম ঠুকিয়া বলিল, "সেই কাল রাত্রি আট্টা থেকে আজ বেলা ন' টা - এই পাক্কা তেরো ঘণ্টা সময়, - কর্ত্তা বাড়ীতে ব্যাগ রেখে এই এখুনি আস্‌ছেন্! ব্যাগ রাখা হোল?"

ফৈজু খোঁচা খাইয়া লজ্জারক্ত মুখে চারিদিক চাহিল। সামনেই রোয়াকের উপর সুনীল দাঁড়াইয়া, মুখ টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতেছিল। যদিও সুনীল অনেক বিষয়ে ফৈজুকে ঠাট্টা করিয়া আমোদ পাইত, কিন্তু নিজে অবিবাহিত বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, বধূর প্রসঙ্গ লইয়া ফৈজুকে কথনো বিদ্রূপ করিত না—আজও করিল না, শুধু হাসিতে লাগিল।

লজ্জায় ফৈজুর কাণ দুটা গরম আগুণ হইয়া উঠিল। মণ্ডলের উদ্দেশ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "আঃ!"

সুনীলের দিকে চাহিয়া মণ্ডল ততক্ষণে পুনশ্চ বলিতে আরম্ভ করিল,—"এই আমি—আমি তখুনি বলেছি কাল, যে ফৈজু আবার বাড়ী থেকে ফিরছে! দেখুন, আমার কথাই ঠিক হোল!—ফৈজুর এখন বাড়ীর ওপর টান্ পড়েছে,—ওর দ্বারা আর আমাদের কোন কায হয় তো—বুঝ্লেন্ ছোটবাবু, আমি বলে রাখ্ছি,—আমি কাণ কেটে ফেল্ব!"

পিছন হইতে আসিয়া ফৈজু তাহার কাঁধের উপর এক মুষ্ট্যাঘাত বসাইয়া বলিল, "বহুৎ খুব! থাম, দিদিমণি আস্ছেন।"

সত্যই সুমতি দেবীকে উপর হইতে নামিয়া আসিতে দেখা গেল। মাথার কাপড়ের উপর দিয়া, হরিনামের মালাটি গ্রীবা বেষ্টন করিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। গৌরোজ্জ্বল মুখখানি, শান্ত-শ্রী উদ্ভাসিত। ফৈজু মাথা নোয়াইয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

নিকটে আসিয়া স্বভাব-কোমল স্নিগ্ধ কণ্ঠে সুমতি দেবী বলিলেন, "মামলার সঙ্গে যুদ্ধ করে ফৈজু যে ভারী কাহিল হয়ে গেছ দেখছি।" পরক্ষণে শ্যামলের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সবিস্ময়ে বলিলেন, "ও কি! শ্যামল আবার কোত্থেকে হাঁড়ি খেয়ে এলে?"

ঐ যাঃ! মুখে যে আলকাৎরা মাখান আছে, সেটা তো শ্যামলের মনেই ছিল না! তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া হাঁটুর কাপড়ে মুখ মুছিতে-মুছিতে ঢোক গিলিয়া শ্যামল বলিল, "ফৈজু মামুর—বাড়ীতে—এই—"

আর যায় কোথা! ছিদ্র পাইয়া, সুনীল খপ্ করিয়া বলিল, "এ্যা! ফৈজুর বাড়ীতে হাঁড়ি খেয়ে এলে! দিদি, হয়েছে তবে। তোমার ছেলে এবার 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মের' দলে মিশে পড়্ল! আর রক্ষে নেই!"

রগড়াইয়া মুখ লাল করিয়া শ্যামল বলিল, "নেই বই কি! ফৈজু মামুকে জিজ্ঞেসা করুন,—আমি হাঁড়ি খেয়েছি বই কি! ওটা বলে, আলকাৎরা—হাঁ ফৈজু মামু—নয়?"

সুনীলের দিকে চাহিয়া, একটু ইঙ্গিত করিয়া ফৈজু হাসিমুখে বলিল, "হাঁ আল্কাৎরাই বটে, আপনি শ্যামলের বিয়ে দিচ্ছেন, নয়? তাই ও বাসর জাগবার জন্যে—আসর জাঁকাবার জন্যে, আল্কাৎরা মেখে বরসজ্জা করছে।"

গুপ্ত কথা ফাঁশ হইয়া যাওয়ায়, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্যামল বলিল, "এ্যা! ফৈজু মামু!"

শ্যামলের পিঠ চাপ্ড়াইয়া সান্ত্বনা দিয়া ফৈজু বলিল, "আহা! তাতে আর লজ্জা কি! দেখবেন ছোটবাবু, এসব ঘরের কথা কারুর কাছে ফাঁশ করবেন না!"

সুনীল হাস্যাবেগে অধীর হইয়া ছুম্ড়াইয়া পড়িল। মণ্ডল সশব্দে হাসিতে লাগিল। সুমতি দেবী মুখ নত করিয়া গলা হইতে মালা খুলিতে-খুলিতে বলিলেন, "শ্যামলের অদ্ভুত বিক্রম, সকল তাতেই অদ্ভুত হয়ে প্রকাশ পায়! কোথাও কাঁটা-খোঁচা নাই। বিয়ে দিবি বটে সুনীল, কিন্তু বৌমা আমার কোন্ কচু-বনে বসে যে তপস্যা করছেন, তা জানি না।"

এক ত সকলের হাসি,—তার উপর সুমতি দেবীর এই টিপ্পনী! ক্ষোভে ফুলিতে-ফুলিতে শ্যামল রোয়াকের এক কোণে বসিয়া পড়িয়া, সজোরে দু'হাতে মুখে ঘসিতে লাগিল। তার পর হঠাৎ সুমতি দেবীর উদ্দেশে চেঁচাইয়া বলিল, "আমি এবার ফৈজু মামুদের সঙ্গে জয়দেবপুর যাব,—নিশ্চয় যাব। এবার যদি আমায় না যেতে দেন, তবে নিশ্চয় এবার যেখানে হোক পালিয়ে যাব,—আর এখানে কিছুতেই থাকব না।"

সুনীলের দিকে চাহিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "প্রতিশোধ নেওয়ার ঘটা দেখছিস্?"

ফোঁশ্-ফোঁশ্ করিয়া, হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিয়া শ্যামল বলিল, "নেবে না তো কি করবে? মা হয়েছিলেন কেন?"

একটু হাসিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "ঝকুমারী আমার!"

শ্যামল উঠিয়া ঠক্‌-ঠক্‌ করিয়া বাহিরের দিকে চলিল। ফৈজু ধরিতে গেল, কিন্তু পারিল না,—সে ছুটিয়া পলাইল।

সুমতি দেবী চাহিয়া দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "থাক্‌—থাক্‌, ও রাগ বেশীক্ষণের নয়।"

সুনীল বলিল, "আচ্ছা—না, সত্যি দিদি, শ্যামলকে আমাদের সঙ্গে জয়দেবপুরে নিয়ে গেলে কি রকম হয়? তোমার মত কি?"

সুমতি দেবী সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন। একটু থামিয়া বলিলেন, "রান্নাটা চালাতে পারবে; তবে একটু সামলে নিয়ে চলা চাই—"

সুনীল বলিল, "ফৈজু যখন যাচ্ছে, তখন শ্যামলের জন্যে ভাবনা নাই। ফৈজু শ্যামলকে ঠিক নিয়ে চালাবে—শ্যামল ফৈজুকে খুব খাতির করে।"

মণ্ডল সজোরে ঘাড় নাড়িয়া সুনীলের বাক্য সমর্থন করিয়া বলিলেন, "তা করে, খুবই খাতির করে!"

সুমতি দেবী কাণের পিছন দিকটা চুল্‌কাইয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া, দ্বিধাপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"তা যেন হোল; কিন্তু—আবার ফৈজুকেই নিয়ে যাবি তোরা?"

সুনীল কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মণ্ডল ফৈজুকে কনুয়ের ঠেলা দিয়া বলিল, "কি ফৈজু, তুমি আর যাবে না?"

ফৈজু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "বাঃ, আমি যাব না? নিশ্চয় যাব। জয়দেবপুরের জন্যে এত কাট-খড় মিছে-মিছি পোড়ান হোল-বুঝি? এখন সবাই মিলে গিয়ে মহলটা না বাগালে 'বিল্‌কুল্‌' বরবাদ্‌ হয়ে যাবে না? হ্যাঁ ছোটবাবু?"

সুনীল কোন উত্তর না দিয়া সুমতি দেবীর মুখপানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সুমতি দেবী কেমন একটু অস্বস্তি-পূর্ণ চিত্তেই যেন, সসঙ্কোচে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। পুনরায় ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তা'হলে সর্দ্দারের মত নিয়ে, মিত্তির মশাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে, যা-হয় কর,—আমি আর কি বল্‌ব?"

মামলা করিয়া অবধি সুমতি দেবী যে কেমন এক অস্বাভাবিক রকম বিষণ্ণ-গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছেন, সেটা সকলেই লক্ষ্য করিতেছিল। মামলা বাধানো আর চালানো, এ দুই ব্যাপারই যে তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা-বিরুদ্ধ, সেটা সকলেই বুঝিয়াছিল; তবুও সুনীল যে সেটুকু উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, সে শুধু বিষয়টা রক্ষা করিবার জন্য। সেজ-বাবুর অন্যায় জবরদস্তীর তাড়নায় বিষয় ছাড়িয়া দেওয়া,—শুধু সুনীলের কেন, অন্য কাহারও ভাল লাগে নাই। কাযেই বাধ্য হইয়া সুমতি দেবী উদাসীন ভাবে একটু পাশ কাটাইয়া চলিতেছিলেন; এবং বাহিরের দিকে যদিও তিনি সংযত, গম্ভীর হইয়াছিলেন, তবুও ভিতরের দিকে যে একটা প্রচ্ছন্ন-বিরক্তির পীড়ন তাঁহাকে ভোগ করিতে হইতেছিল, সেটা আর কেহ না বুঝিলেও সুনীল বেশ-একটু বুঝিতে পারিয়াছিল। সেইজন্য মামলা সম্পর্কীয় কথা কহিবার সময় দিদির কাছে আজকাল সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত।

সুমতি দেবীর উত্তর শুনিয়া সুনীল চুপ করিয়া রহিল। ফৈজু একটু ধোঁকায় পড়িয়া, কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "দিদিমণি কি আমায় যেতে বারণ করছেন?"

দ্বিধার সহিত একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুমতি দেবী বলিলেন "না, ওই নিয়ে তোমরা যখন এতটা এগিয়েছ, আর বারণ করা চলে না। যাক এবারটা অমনি চলুক। কিন্তু তোমরা লোক ঠিক কর ফৈজু, আমি মহলটা হয় বিক্রী করব, নয় ইজারা দেব।"

ফৈজু সুনীলের মুখপানে চাহিল। সুনীল সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া, ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, 'কি করব?' দিদি আমায় ইজারা দেবে না। দিদি বল্‌ছে, ঐ মাটী নিয়ে শত্রু বাড়িয়ে হাঙ্গাম করতে হবে না।"

মণ্ডল মাথা চুলকাইয়া বলিল,—"বিষয় রাখ্‌তে গেলেই হাঙ্গাম—"

দাঁতে ঠোঁট কাম্‌ড়াইয়া ক্ষণিকের জন্য নীরব থাকিয়া সুমতি দেবী ঈষৎ তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন, "হাঙ্গামের ইতর-বিশেষও আছে মোড়ল মশাই। যে বিষয় রাখ্‌তে গেলে কথায়-কথায় মাথা ফাটাফাটি, খুন-জখম, দৈত্য-দানবের মত হুঙ্কার-ঝঙ্কার না করলে নিস্তার নাই,—সে বিষয় ছেড়ে দেওয়াই ভাল।" তার পর হঠাৎ ফৈজুর দিকে চাহিয়া স্মিত হাস্যে বলিলেন, "তুমি অসন্তুষ্ট হচ্ছ ফৈজু, সে আমি বুঝেছি। তোমার ছোটবাবুও যে মনে-মনে আমার মুণ্ডুপাত

করছে, তাও আমি বেশ জানি। কিন্তু তা'হলেও এ ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে তোমাদের এগিয়ে যেতে দেওয়ার আমার সাহস নাই আর। যতদূর এগিয়েছ তোমরা, এই যথেষ্ট ভাবনার কারণ হয়ে রয়েছে,—আর তোমরা এগিও না।"

সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। কথাটা যে কাহারো মনঃপূত হয় নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ কোন প্রতিবাদ-বাক্য উচ্চারণ করিল না।

মণ্ডলের দিকে চাহিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "আপনারা বল্‌ছেন, অন্ততঃ এক কিস্তি খাজনা আমার নামে আদায় হওয়া চাই। বেশ তাই হোক। কিন্তু এই গোলটুকু মিটিয়েই—"

সুনীল বলিল, "এই গোলটুকু মিট্‌লেই, তার পরের রাস্তা সহজ হওয়াই সম্ভব দিদি;—একবার কায়দা করে নিতে পার্‌লে—"

বাধা দিয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "হাঁ। তার পর অংশীদারদের সঙ্গে ঠিকির্‌-মিকির্‌ চলুক,—প্রজারা যো পেয়ে দলাদলি জুড়ে দিক্‌,—আবার ধর্ম্মঘট করুক,—আবার যে নায়েব আস্‌বে, তাকে নিয়ে টানাটানি পড়ুক!"

ফৈজু হঠাৎ দৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া, দৃঢ়স্বরে বলিল, "সব দায় আমার! আমি জেল খাটুতে রাজী আছি,—সকল রকম 'হায়রাণী' সইতে রাজী আছি,—আপনি হুকুম দেন,—এক বছরের মধ্যে ও-মহল আমি বাগাব। এই ক'দিনে আমি আপনার মাতব্বর প্রজাদের ভালরকমই চিনে নিয়েছি। তারা সেজবাবুর লোকেদের অত্যাচারে হাড়ে-হাড়ে জ্বালাতন হয়ে গেছে। তারা স্পষ্টই বল্লে আমায়—" বলিয়াই ফৈজু সহসা উত্তেজনা-সম্বরণ করিয়া থামিল; সুনীলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনাকে সবই বলেছি ছোটবাবু, এ মহল কি এখন যার-তার হাতে দিতে আছে?" ফৈজুর শেষ কথাটা নিগূঢ় ক্ষোভের সহিত উচ্চারিত হইল,—যেন অভিমান-ভরা স্নেহের অনুযোগ!

ঠিক সেই সময়ে মোক্ষদা-ঠাকুরাণী চালের ধুচুনি ও শাকের 'পেতে' লইয়া বাড়ী ঢুকিয়া, তীব্র দৃষ্টিতে একবার সকলের পানে চাহিলেন। তার পর অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভাবে মুখ বাঁকাইয়া, মাথায় কাপড় টানিয়া রান্না-ঘরে চলিয়া গেলেন।

সুমতি দেবী সেটা দেখিয়াও দেখিলেন না। ফৈজুর দিকে চাহিয়া সনিঃশ্বাসে, দুঃখিত ভাবে একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা যতই যা বল ফৈজু, ও-মহলটার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখা আমার ইচ্ছে নয়। আমি স্পষ্ট বুঝছি, ওকে শাসন করা বড় শক্ত কায—প্রজাদের ঠাণ্ডা করে রাখা বিড়ম্বনা।"

বাধা দিয়া ফৈজু, উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল, "কিন্তু, আমি যদি তাদের ঠাণ্ডা করে রাখ্‌তে পারি? সেজবাবুর তরফের লোকেরা যতই পেছু লাগুক, আমি যদি তাদের খুসী করে, নিজের হাতের মধ্যে রাখ্‌তে পারি, তাহলে, দিদিমণি?"

"তা হ'লে—" বলিয়া কুণ্ঠিত ভাবে থামিয়া সুমতি দেবী কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। সুনীল মনে-মনে উল্লসিত হইয়া উৎফুল্ল মুখে ফৈজুর দিকে একবার চাহিল। তার পর সোৎসাহে বলিল, "বল, তা'হলে ও মহল তুমি ছাড়্‌বে না?"

ফৈজু বলিল, "অন্ততঃ বলুন, ছোটবাবু ছাড়া আর কাউকে ও মহল ইজারা দেবেন না?"

ক্ষুণ্ণ ভাবে হাসিয়া, মণ্ডলের দিকে চাহিয়া, সুমতি দেবী বলিলেন, "এরা আমায় কি বিপদে ফেল্লে দেখুন তো মোড়ল-মশাই। আপনি মিত্তির মশাইকে ডাকুন,—তিনি এসে, যা বল্‌তে হয় বলে, থামান এদের।"

"মিত্তির মশাইকে ডাকৃতে হবে না মা, আমি নিজেই এসেছি।" বলিতে বলিতে প্রবীণ মিত্র মহাশয় মাথার টাকের উপর হাত বুলাইতে-বুলাইতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ফৈজু সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সুমতি দেবী ঘরের ভিতর হইতে আসন আনিয়া স্বহস্তে পাতিয়া দিলেন। পিতার বহু দিনের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী মিত্র-মহাশয়কে শুধু বয়সের খাতিরে বাহ্য সম্মান মাত্র নয়, সুমতি দেবী অন্তরেও তাঁহাকে সম্মান করিয়া চলিতেন। তবে তিনি একটু বেশী হিসাব-প্রিয়, এবং সকল তাতেই বিবেচনা-শক্তিটাকে অযথা পরিমাণে বেশী করিয়া খাটাইতেন বলিয়া, সুনীল সময়-বিশেষে মনে-মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। তবে বাহিরে কখনো অবহেলার ভাব দেখাইত না।

আসন গ্রহণ করিয়া, ফৈজুর দিকে চাহিয়া মিত্র-মহাশয় সরস পরিহাসে বলিলেন,—"এই যে, আমাদের জয়রাম সিং এসে হাজির হয়েছে! কি হে, এবার সেজবাবুর সেই

হরিহর গয়লা কি বল্লে? আমাদের জাহান্নাম-টাহান্নাম পাঠাবে কবে?"

হাসিমুখে ফৈজু সসম্ভ্রমে বলিল, "এবার আর কথাটি কয় নি। পশু দেখা হোল,—অম্নি ঘাড় বেঁকিয়ে পাশের রাস্তায় ঢুকেই দে ছুট্!"

হাসিয়া উঠিয়া মিত্র-মহাশয় বলিলেন, "তুমিও অম্নি সঙ্গে-সঙ্গে ছুট্‌তে পার্‌লে না? যাক্, ও-তরফের আর কারুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল? খোদ কর্ত্তা আজ-কাল সহরে যান-টান, জানো?"

মাথা নাড়িয়া ফৈজু বলিল, "আমি তো কাউকে দেখ্‌তে পাই-নি। সেজবাবু এর মধ্যে বোধ হয় সহরে যান নি।"

মিত্র-মহাশয় বলিলেন, "আমি তো খবর পেলুম, মামলায় হার হয়ে অবধি তিনি বাড়ী ছেড়ে বেরুনো পর্য্যন্ত বন্ধ করেছেন,—সত্যি-মিথ্যে জানি না। যাক, এখন তোমাদের কি কথা হচ্ছিল?"

মণ্ডল সংক্ষেপেই সমস্ত বলিয়া গেল, ফৈজুর মন্তব্যও ব্যক্ত করিল।

কথাটা লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলিল। সুমতি দেবী মালাজপ বন্ধ করিয়া ম্লান মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; কোন কথা কহিলেন না।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মিত্র মহাশয় সুমতি দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বেশ তো মা, জল না দেখেই কাপড় তোলবার দরকার কি? আগে দু'-এক কিস্তি খাজনা আদায় করে দেখা যাক না। না সুবিধে হয়, তখন ছেড়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যাবে,—এখন থেকে তাড়াতাড়ি করা কেন?"

সুমতি দেবী চুপ করিয়া রহিলেন। মিত্র মহাশয় পুনশ্চ বলিলেন, "আমিও তো যাচ্চি এদের সঙ্গে,—দেখি না সঙ্কটপুরের বাবুদের লোকেরা কেমন ভাবে কায করতে চায়। তার পর—সব রোগের ওষুদ তো জানা আছে,—কি বল ফৈজু?"

মিত্র মহাশয় হাসিতে লাগিলেন। অন্য সকলেও হাসিল। মণ্ডল মহাশয় সব চেয়ে বেশী হাসিল।

যাত্রার আয়োজন করিতে বলিয়া, এবং সমভিব্যাহারী লোকজনদের প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়া, মিত্র মহাশয় স্নানাহার করিতে বাড়ী চলিয়া গেলেন। ফৈজু ও মণ্ডল তাঁহার পিছু-পিছু বাহির হইয়া, যে যার নিজের বাড়ীর দিকে চলিল।

রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত গিয়া, হঠাৎ কি মনে পড়াতে, মণ্ডল সবেগে ফিরিয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ফৈজু, দাঁড়াও-দাঁড়াও,—দুটো জরুরী কথা আছে।"

ফৈজু অন্য পথ ধরিয়া চলিয়া যাইতেছিল,—থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি, জী? আবার কি বল্‌ছ?"

মণ্ডল এদিক-ওদিক চাহিয়া, ধর চরণে নিকটে আসিয়া, সহাস্য মুখে বলিল, "এই বলছি কি,—আমার উচিত হচ্ছে, আজকের দিনে গেরস্থালী সম্বন্ধে তোমায় গোটা-দুই সদুপদেশ দেওয়া।"

ফৈজু সলজ্জ-স্মিত মুখে বলিল, "দোহাই দাদা, মিছে-মিছি বাজে খরচ কোর না,—তোমাদের 'উচিত হচ্ছে'র মানে এ গরীব এক পয়সাও বুঝ্‌বে না।"

মণ্ডল সজোরে বলিল, "বুঝ্‌তে হবে! তোমার মামুলী গৎ রাখো তো হে ছোকরা! আহা-হা, সে কবিতাটা ভুলে গেলুম যে, কি বলে—দাঁড়াও, সেই যে—'যদি যাও কোন খানে, বাড়ীপানে মন টানে, পরিজন মমতার ডোর'—"

উচ্ছ্বসিত হাস্যে ফৈজু বলিল, "ও তো বহুৎ পুরোনো, মামুলী গৎ! ওটা অত করে ভাল-বাংলায় বলতে হবে না; যোড় হাত করছি, ও সুর থামাও—বাঙালীর মন যে ঘর পানে, প্রাণ-বিট্‌কেল টানে রাতদিনই টান্‌ছে, সে দেখে-আমার চোখও ক্ষয়ে গেছে, দিক্‌ও ধরে গেছে,—ওকে আর রসান্ দিয়ে ঝালিয়ে তুলো না, আর কি বল্‌ছ বল।"

মণ্ডল মাথা চাপড়াইয়া বলিল, "হায়! হায়! হায়! ভাবের মাথায় মুগুর পড়ে গেল, আর বল্‌ব কি! নাঃ, ফৈজু তোমায় আর কিছু বলবার নেই।"

হাসিমুখে সবিনয়ে ফৈজু বলিল, "তবে বাড়ী যাও দাদা, আর বলাবলিতে কায নাই।"

„কব্ তুঁহু আওবি ?”

[শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম-এ]

(১)

কব্ তুঁহু আওবি কা-লা ?—
তুঁহুকা পথ চাহি দিবস গোঙায়নু,
তুঁহু কভু আ-ওলি না ;
তুঁহুকা লাগি এহ- জনম টুটায়নু,—
তুঁহু ফিরি চা-ওলি না।
দোলয়িতে গলয়ে,— গাঁথনু ফুলহার,
—শুখায়ল সৈ-ফুল মা-লা।
ফিরি নাহি আওলি কা-লা !

(২)

তুঁহু নাহি আওবি কা-লা ?
“আওহি”,—বলি সেহ কথি গেলি চকিতে,
নিমিখে ছোড়ি হামা-রে !
—আঁখ-সলিল মাঝ বরখ বহয়ি গেল !
তু রলি কো-অভিসারে ?
তুঝ পদ-যুগলে ডারি দিনু সকলি,—
যো-উ-বন, জীবন,—ডা-লা।
—তুঁহু নাহি আওলি কা-লা !

(৩)

ফিরি কি রে আওবি কা-লা ?—
আওল ঋতুপতি, ডা-আ-কল পাপিয়া,
তু বঁধু গা-আ-ওলি না !
বাদর বরখয়ি, বহি গেল চলয়ি,—
তুঁহু ইথি ধা-ওলি না !
তুঝ প্রেম লাগয়ি পরাণ বিকায়নু,—
মাতুয়ালা পা-গলী বালা।
ফিরি তু না আওলি কা-লা !

(৪)

কব্ তুঁহু আওবি কা-লা ? –
তুঝ পথ চাহয়ি লো-ও-চন লোরে রে,
লোচন কা লিম ভেল !
শ্যাম্, তুয়া লাগি রে জীবন বাঁধি বাঁধি,
জীবন শু-খয়ি গেল !
(হাম্) নীল-যমুনা-নীরে ডারিব রে পরাণি,—
পাসরিব বি-রহ জ্বা-লা !
—তব্ তুঁহু আওবি কা-লা !!

প্রেমের কথা

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম-এ]

কারণ-সঙ্কর

এই ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলিতে বুঝাইয়াছি যে প্রণয়-সঞ্চারের মোটামুটি তিন প্রকার প্রণালী আছে, যথা (১) শ্রবণাৎ বা দর্শনাৎ, (২) বিপদ্ উদ্ধার বা রোগে সেবা, (৩) বহুদিনের সাহচর্য্য ; ‘দর্শনাৎ’ আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনম্। কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে সকল সময় এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে এই সকল প্রণালীর দুই, তিন বা ততোধিকেরও একত্র মিশ্রণ হয়। ইহাকেই কারণ-সঙ্কর বলিতেছি। যেমন জ্বরের নিদান-নির্ণয়ে দেখা যায় যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে typhoid ও malariaর সঙ্কর typho-malaria সংঘটিত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে pleurisy ও pneumoniaর সঙ্কর, বা bronchitis ও pneumoniaর সঙ্কর, অথবা বৈদ্যক-শাস্ত্রে কোথাও বা বাতশ্লেষ্মা-বিকার, কোথাও বা ত্রিদোষজ, সেইরূপ প্রেম-জ্বরের নিদান-নির্ণয়েও কোথাও ‘শ্রবণাৎ’ ‘দর্শনাৎ’ উভয়ের সঙ্কর, কোথাও ‘দর্শনাৎ’ শ্রেণীর ‘স্বপ্নে’ ‘চিত্রে’ উভয়ের

সঙ্কর, কোথাও বিপদ্ উদ্ধার ও রোগে সেবা উভয়ের সঙ্কর, কোথাও নিরন্তর সাহচর্য্য ও রোগে সেবা উভয়ের সঙ্কর ইত্যাদি। প্রবন্ধের স্থানে স্থানে এরূপ মিশ্র-ধরণের (mixed type) দৃষ্টান্ত দিয়াছি। আবার সেগুলির পুনরুল্লেখ করিয়া তত্বটী পরিস্ফুট করিতেছি।

শ্রীরাধার বেলায় দেখিয়াছি, প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নাম-শ্রবণ, পরে বংশীধ্বনি-শ্রবণ, পরে পটে দর্শন, পরে সাক্ষাদ্ দর্শন, এতগুলির (cumulative effect) সমবায়-গত শক্তি অমোঘ হইয়াছিল। বিদ্যা ও সুন্দরের রূপগুণ-বর্ণনা-শ্রবণ ও পরে সাক্ষাদ্ দর্শন; 'রাজসিংহে' চঞ্চল-কুমারীর আগে রাজসিংহের বীরত্বকাহিনী-শ্রবণ (অনুমেয়), পরে পটে দর্শন; 'বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা'য় স্বপ্নে, চিত্রে ও দারুময়ী মূর্ত্তিতে এবং সাক্ষাদ্ দর্শন; 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' ও 'রত্নাবলি'তে অগ্রে চিত্রে, পরে সাক্ষাদ্ দর্শন। শেক্স্পীয়ারের রোজ্যালিণ্ডের হৃদয়ে অর্লাণ্ডোকে বিপন্ন মনে করিয়া তাহার প্রতি করুণা, তাহার বীরত্ব-দর্শনে শ্রদ্ধা এবং সাক্ষাদ্ দর্শনে প্রণয়, তিনেরই প্রায় সমকালে উদ্ভব হইয়াছে। মিরাণ্ডার হৃদয়েও করুণা ও প্রণয়ের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ৺রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা'র বিমলার বেলায় সাক্ষাদ্ দর্শন, পরে ইন্দ্রনাথের বিপদ্ উদ্ধার ও শুশ্রূষা, পরে আবার বন্দী ইন্দ্রনাথের সেবা ও কৌশলে তাঁহাকে মুক্তি-দান—একেবারে ত্রিদোষজ। মৃণালিনীর বেলায় বিপদ্ উদ্ধার ও শুশ্রূষা এবং তিন দিনের সাহচর্য্য; অমরনাথের বেলায় অমরনাথ কর্ত্তৃক রজনীর বিপদ্ উদ্ধার ও (অনুমান হয়) রজনী কর্ত্তৃক অমরনাথের শুশ্রূষা; নবকুমারের বেলায় প্রথম দর্শন ও পুনঃ পুনঃ কপালকুণ্ডলা কর্ত্তৃক বিপদ্ উদ্ধার। রোহিণী ও গোবিন্দলালের বেলায় নানা কারণের সমবায় পুর্ব্বে বুঝাইয়াছি। রেবেকার বেলায় পিতার বিপদ্ উদ্ধারের জন্য নায়কের প্রতি কৃতজ্ঞতা, পরে তাঁহার বীরত্ব-দর্শনে শ্রদ্ধা, পরে তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়ে' সাহচর্য্য ও শুশ্রূষা উভয়ই বর্ত্তমান; ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসারে' শরৎবাবু ও সুধার বেলায়ও তদ্রূপ। শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি'তে অমর ও চারুর বেলায় প্রথম দর্শন, রোগে সেবা, সাহচর্য্য (চারুর মাতার বাগ্ দান) সব রকমই আছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অরক্ষণীয়া'য় বালিকা জ্ঞানদা অতুলকে প্রাণপণে রোগে সেবা করিয়াছিল। অতুল সাংঘাতিক রোগে যখন মরণাপন্ন, তখন এই মুখখানাকেই সে ভাল বাসিয়াছিল।' কিন্তু বালিকা জ্ঞানদার হৃদয়ে বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই সাহচর্য্যে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাই সে 'যমের সঙ্গে দিবারাত্রি লড়াই কোরে, তাকে ফিরিয়ে এনেছি'ল।

বাল্যে প্রণয়ের সম্ভাব্যতা-বিচার

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে আলোচিত তৃতীয় প্রকারের প্রণয়-সঞ্চারের, অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে নিরন্তর সাহচর্য্যে প্রণয়-সঞ্চারের প্রসঙ্গে কেহ কেহ একটা বিষম আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন, প্রণয় যৌবনের ধর্ম্ম; বালক-বালিকার পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মমতা, একটা ভালবাসার টান, একটা মধুর আকর্ষণ, জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রণয় বলিতে আমরা যে তীব্র অনুভূতির কথা বুঝি, তাহা বাল্যে জন্মিতে পারে না; বাল্যের ভালবাসা বড় মধুর, বড় কোমল, বড় স্নিগ্ধ, ইহাতে উগ্রতা উদ্দামতা তীব্রতা নাই। সুতরাং যে সকল কবি বালক-বালিকার হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চারের আখ্যান রচনা করেন, তাঁহারা অস্বাভাবিক, অসম্ভব, অলৌকিক কথা লেখেন। এই শ্রেণীর আখ্যান অসম্ভব বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যোগ্য, অথবা প্রকৃত হইলে এরূপ বালক-বালিকাকে অস্বাভাবিক ও অকালপক্ক বলিতে হইবে। একটি ছোট গল্পের নায়ক টিটকারী দিয়াছেন, "বালিকার প্রেম, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মেয়ের পূর্ব্বরাগ, ও সব বঙ্কিম বাবুর গাঁজাখুরি।"(১) জানি না, ইহা খোদ গল্পলেখকেরও মত কি না। বঙ্কিমচন্দ্রও দুইটি স্থলে যেন এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। 'রাধারাণী'র প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 'এগার বৎসরের বালিকার উপর এত অনুরাগ?' ['রাধারাণী' ৭ম পরিচ্ছেদ।] আবার প্রতাপ-শৈবলিনীর বেলায় বলিয়াছেন, 'প্রণয় বলিতে হয়, বল, না বলিতে হয়, না বল। ষোল বৎসরের নায়ক, আট বৎসরের নায়িকা।' ['চন্দ্রশেখর', উপক্রমণিকা ২য় পরিচ্ছেদ]।

(১) কোনও কোনও লেখক জিনিসটাকে উপহাসাস্পদ করিবার জন্য স্কুলের পড়ুয়া বা কালেজী যুবককে বালিকার প্রণয়প্রার্থী করিয়াছেন। বালিকা কিন্তু একেবারেও রস বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথের 'নব-বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ' কবিতায় ইহার চূড়ান্ত। তবে এ ক্ষেত্রে বালিকা যুবকের নববধূ, কুমারী প্রতিবেশি-কন্তা নহে।

কিন্তু পরবর্ত্তী বাক্যেই তিনি বলিয়াছেন, 'বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।' যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়টি স্থলে বাল্যের প্রণয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, সে কয়টি স্থলেই যৌবনারম্ভে প্রণয়ের উদ্দামতা বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে নহে। যথা, 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' আবাল্য সংসর্গে কিরূপে পুরন্দর-হিরণ্ময়ীর ভালবাসা জন্মিল অল্প কথায় তাহার উল্লেখ করিয়া, তিনি যখন প্রণয়িযুগলের গোপনে সাক্ষাৎকারের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তখন তাহারা বালক-বালিকা নহে, 'যুবতীর বয়স ষোড়শ, যুবার বয়স বিংশতি বৎসর।' আবার 'রাধারাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র যখন রাধারাণীর প্রণয়ের কথা (বসন্তকুমারী ও তাঁহার পিতা কামাখ্যাবাবুর কথোপকথনে) অবতারণা করিয়াছেন, তখন রাধারাণী 'পরম সুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী।' তবে রাধারাণী এগার বৎসর বয়স হইতেই 'রুক্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া, আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে।' প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যের প্রণয়ের চিত্র (উপক্রমণিকার ১ম পরিচ্ছেদে) অতি উজ্জ্বল ও মনোরম, কিন্তু তাহারা যখন নিরাশ-প্রণয়ে গঙ্গায় ডুবিতে চাহিল, তখন তাহারা বালক-বালিকা নহে, শৈবলিনীর 'সৌন্দর্য্যের ষোল কলা পূরিতে লাগিল', তাহার 'জ্ঞান জন্মিতে লাগিল', অর্থাৎ যৌবনারম্ভ হইয়াছে। [উপক্রমণিকা, ২য় পরিচ্ছেদ।] আর আসল 'আখ্যায়িকা আরম্ভ' 'বিবাহের আট বৎসর পরে', তখন শৈবলিনী পূর্ণ যুবতী। জীবানন্দ-শান্তির যখন যৌবনকাল, তখন পুষ্পধন্বা 'হঠাৎ দুইটা ফুলবাণ অপব্যয় করিলেন। একটা আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল, আর একটা আসিয়া শান্তির বুকে পড়িয়া প্রথম শান্তিকে জানাইল' ইত্যাদি। ['আনন্দমঠ', ২য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।]

যে সকল আখ্যায়িকা-কার বাল্যের প্রণয়ের সম্ভাব্যতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা স্বপ্রণীত আখ্যায়িকায় বাল্যের স্নেহ-মমতা কিরূপে যৌবনাগমে প্রণয়ে পরিণত হয়, তরল স্নেহ কিরূপে গাঢ় প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়, তাহার একটা বিবরণ দিয়া ব্যাপারটা সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছেন। ৺তারকনাথ গাঙ্গুলির 'স্বর্ণলতা'য় এই (transmutation) পরিবর্ত্তন সুন্দর-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩২শ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, 'স্বর্ণলতা গোপালকে "গোপাল দাদা" বলিয়া ডাকেন। গোপাল দাদা না পড়াইলে স্বর্ণলতার পড়া হয় না। কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে গোপাল দাদার কাছে যান। গোপাল যেন যথার্থ স্বর্ণের সহোদর।...স্বর্ণ গোপালের হস্ত ধরিয়া টানিলেন, গোপাল হাসিতে হাসিতে স্বর্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।' বুঝা গেল, এখনও স্বর্ণের মনে লজ্জা-সঙ্কোচ কিছু নাই, স্বর্ণ গোপালকে ভগিনীর মত ভালবাসে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে পরিবর্ত্তনের সূচনা হইতেছে। 'স্বর্ণের চক্ষু পুস্তকে নাই। তিনি একদৃষ্টে গোপালের মুখপানে চাহিয়া আছেন।' যাহা হউক, তখন পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে স্নেহময়ী ভগিনীর মত স্বর্ণ গোপালের বাড়ীর কথা, মা-বাপের কথা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ছেলেমানুষি ভাব পূরামাত্রায় বিদ্যমান। পর-পরিচ্ছেদে কিন্তু 'নূতন নূতন ভাব' স্বর্ণলতার হৃদয়ে জন্মিল, 'এই অবধি স্বর্ণলতার সহিত গোপালের এক গোপনীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।...

যে দিবস গোপাল ও স্বর্ণলতার পূর্ব্ব প্রকাশিত কথোপকথন হইয়া যায়, সেই অবধি স্বর্ণলতারও অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। সে কোন্ ভাব? স্বর্ণলতা বলিতে পারেনা সে কোন্ ভাব। গোপালকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আর গোপালের কাছে যাইতে পারেন না। আর পূর্ব্বের মতন তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিবার ক্ষমতা হয় না।...স্বর্ণলতা যেন হঠাৎ বালিকাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে অধিরূঢ়া হইলেন।' ইহাই মহাজন-পদাবলীর বয়ঃসন্ধিকালোচিত পরিবর্ত্তন। প্রেমের প্রভাবে এরূপ পরিবর্ত্তন বঙ্কিমচন্দ্রের তিলোত্তমা ও শেক্‌স্‌পীয়ারের জুলিয়েটের বেলায়ও দেখা যায়। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাসে' (৫ম পরিচ্ছেদে) বয়ঃসন্ধিকালে পার্ব্বতীর হৃদয়েও এই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। ইহাকেই বিখ্যাত সমালোচক কোল্‌রিজ বলেন, 'long and deep affections suddenly, in one moment flash-transmuted into love?' আবার ৩৪শ পরিচ্ছেদে গোপালের শ্রীঅঙ্গ যে চাদরে শোভা করিয়াছিল সেখানি লইয়া স্বর্ণলতা গায়ে দিলেন, (২) বুঝা গেল প্রেমোন্মাদ ঘটিয়াছে।

---

(২) "তারকবাবু বলিতেন, স্বর্ণলতার ৩৩।৩৪ পরিচ্ছেদে বর্ণিত 'নূতন নূতন ভাব' ও স্বর্ণলতা কর্ত্তৃক গোপালের চাদরখানি গায়ে দেওয়া

৺দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'তে ঠিক এই ভাবে পরিবর্ত্তনের ইতিহাস না থাকিলেও অনুমান করা যায়। ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা'য় ঠিক এইভাবে পরিবর্ত্তনের আভাস আছে, 'সংসারে' বিস্তারিত ইতিহাস আছে। যথা বঙ্গবিজেতায় 'সরলা আর বালিকা নাই, তাহার হৃদয়-কোরকে প্রণয়কীট প্রবেশ করিয়াছে।' (১৬শ পরিচ্ছেদ।) পূর্ব্বপ্রবন্ধে উদ্ধৃত প্রথম ও দ্বিতীয় অংশও ইহার প্রমাণ। 'সংসারে' দেখা যায় বাল্যে সাহচর্য্যের পরে নয় বৎসর শরৎ ও সুধার দেখাশুনা ছিল না, যখন দেখা হইল তখন শরৎ যুবা, সুধা ত্রয়োদশবর্ষীয়া ও বিধবা। (৭ম পরিচ্ছেদ।)। এক্ষণে যৌবনে নূতন করিয়া সাহচর্য্য আরম্ভ হইল। 'শরৎবাবু রোজ সন্ধ্যার সময় কত গল্প করেন,' 'সুধার সে গল্প শুনতে বড় ভাল লাগে।' (১১শ পরিচ্ছেদ।) তাহার পর, সুধার কঠিন পীড়ায় শরতের অক্লান্ত শুশ্রূষা। (১৪শ পরিচ্ছেদ।) আরোগ্যের পরও সুধা অনেকদিন বল পায় নাই, 'ছাদে গিয়া শরৎ অনেকক্ষণ অবধি সুধাকে অনেক গল্প শুনাইতেন।... সুধাও একাগ্রচিত্তে সেই মধুর কথাগুলি শুনিত, শরতের প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। রোগে বা শোকে যখন আমাদিগের শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ ক্ষীণ হয়, তখনই আমরা প্রকৃত বন্ধুর দয়া ও স্নেহের সম্পূর্ণ মহিমা অনুভব করিতে পারি।...সেই স্নেহে আমাদিগের হৃদয় সিক্ত হয়, কেননা হৃদয় তখন দুর্ব্বল, স্নেহের বারি প্রত্যাশা করে। লতা যেরূপ সবল বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে, সুধা শরতের অমৃতবর্ষণে সেইরূপ শান্তি লাভ করিত।...যত্নের সহিত শরতেরও স্নেহ বাড়িতে লাগিল।' (১৫শ পরিচ্ছেদ।) পরে শরতের আত্ম-কাহিনী, 'যেদিন সুধাকে তালপুকুরে দেখলেম সেইদিন আমার মন বিচলিত হল।...ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকাকে দেখে আমি হৃদয়ে অননুভূত ভাব অনুভব করলেম।' তাহার পর, সাহচর্য্যে ও শুশ্রূষায় তাহা কিরূপে বর্দ্ধিত হইল, শরৎ সে কথা বুঝাইয়াছেন। (২০শ পরিচ্ছেদ।)

প্রভৃতির বর্ণনায় তিনি যে বৎসামান্ত নায়িকার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন, অনূঢ়া বঙ্গকুমারীর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।" (মানসী ও মর্ম্মবাণী—ভাদ্র ১৩২৩)

আর সুধার মনোভাব ২৩শ ও ২৪শ পরিচ্ছেদে সবিস্তারে বর্ণিত। বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পার্ব্বতী, ললিতা, সৌদামিনী প্রভৃতির বেলায়ও এই বয়ঃসন্ধিকালোচিত প্রণয়ের গাঢ়তার আভাস পাওয়া যায়।

কচ-দেবযানীর উপাখ্যান, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আখ্যানদ্বয়, প্রভৃতি স্থলে সাহচর্য্যে প্রণয় হইলেও যুবক-যুবতীর ব্যাপার, সুতরাং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আপত্তি এ সকল স্থলে খাটে না।

কিন্তু এই আপত্তি-সম্বন্ধে একটি কথা বলিবার আছে। সত্য-সত্যই কি বাল্যে প্রণয় অসম্ভব, অস্বাভাবিক ব্যাপার? বাল্যের ভালবাসায় তীব্রতা, উগ্রতা, উদ্দামতা থাকে না ইহা সত্য, কিন্তু ইহা তাই বলিয়া গভীর ও অকৃত্রিম নহে কি? যে সমাজে উভয় পক্ষের পূর্ণ যৌবনের পূর্ব্বে বিবাহ হয় না, সুতরাং আমাদের সমাজের মত বালক বর ও বালিকা বধূকে প্রণয়চর্চ্চার প্রয়াস করিতে হয় না, সে সমাজেও ত এরূপ বাল্যের প্রণয় বিরল নহে। সাহিত্যের চিত্র হইলে না হয় কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যাইত, কিন্তু বাস্তবজীবনেও যে ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা তাহার (record) দলিল আছে। বিখ্যাত ইতালীয় কবি দান্তে নবমবর্ষ বয়সে সমবয়স্কা Beatriceকে দেখিয়াছিলেন এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছিলেন, যোল বৎসর পরে Beatriceএর মৃত্যু হইলেও এই ভালবাসা দান্তের হৃদয় হইতে বিলীন হয় নাই, ইহা চিরজাগরূক ছিল—তিনি নিজে এসব কথা বলিয়া গিয়াছেন। রুসোর আত্মজীবনেও বাল্যে প্রণয়ের কথা আছে। প্রেমিক-প্রবর বায়রণ আট বৎসর বয়সে প্রথমে প্রেমে পড়েন, আবার ১৫ বৎসর বয়সে আর একটি প্রতিবেশিনী বালিকার প্রেমে পড়েন। Leigh Huntএর আত্মজীবনেও এরূপ দুইটি ব্যাপার দেখা যায়।

ইহাকে ইংরেজীতে calf-love অর্থাৎ বাছুর অবস্থায় (!) ভালবাসা বলে। ইউরোপের নভেল-নাটকেও এই সব সত্য ঘটনার আদর্শে বালকের হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চারের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যে ডিস্‌রেলির Contarini Flemingএ ইহার চূড়ান্ত নমুনা আছে। আটবৎসর বয়স না হইতেই বালক নায়ক নিজের অপেক্ষা আটবৎসরের বড় যৌবনোন্মুখী Christianaকে দেখিবামাত্র প্রেমে পড়িল।

মেটারলিঙ্কের Monna Vana নামক নাটকে দ্বাদশ বৎসর বয়সের বালক আটবৎসরের বালিকার প্রেমে পড়িয়াছিলেন, সারাজীবনে সে ভালবাসা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। এই প্রেমের প্রভাবে পরিণত বয়সে উক্ত বালকের চরিত্রের অপূর্ব্ব বিকাশ নাটকের আখ্যান-বস্তু।

যে সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই, সে সমাজেই যখন ইহা সম্ভবপর, তখন যে সমাজে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে নারী সন্তান-জননী হয়েন, সে সমাজে ৮।৯।১০ বৎসরের বালিকার হৃদয়ে ক্রীড়াসঙ্গীর প্রতি প্রণয়ের সঞ্চার হওয়া বিচিত্র কি, (৩) অকালপক্কতাই যে আমাদের সমাজে বালক-বালিকার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা (normal condition) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাল-বিধবার বয়োবৃদ্ধি হইলে স্বামিস্মৃতিতে তন্ময় হইয়া যাওয়ার চিত্র যাঁহারা অঙ্কিত করেন, তাঁহারাও প্রকারান্তরে বাল্যের প্রণয়ের গুরুত্ব স্বীকার করেন না কি? এইভাবে দেখিলে শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি'তে ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া চারুর অমর অন্য বর স্থির করিলে 'আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না, তা হলে আমি মরে যাব' এই উচ্ছ্বাস (৩য় পরিচ্ছেদ)। সপত্নী-সত্ত্বেও অমরকে বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষা, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবদাসে (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে) চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া পার্ব্বতীর উপযাচিকা হইয়া গভীর রাত্রে দেবদাসের সহিত সাক্ষাৎকার ও 'পরিণীতা'য় ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া ললিতার মাল্যদান-ঘটিত কাণ্ড, 'অরক্ষণীয়া'য় ১২।১৩ বৎসরের মেয়ে জ্ঞানদার অতুলের পায়ের উপর মাথা কোটা, (৪) তাহার পায়ে একটু স্থান পাইবার জন্য আকুল প্রার্থনা, নিতান্ত অস্বাভাবিক বলা চলে না।

এই তর্কের পরেও যদি বিজ্ঞমণ্ডলী 'Not proven' বলিয়া রায় দেন, তাহা হইলে আর একটা কথা বলিব, তাহা হইলে বোধ হয় সকল বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সংস্কৃত সাহিত্যে ও ইউরোপীয় সাহিত্যে যুবক যুবতীর প্রণয়ের চিত্র আছে, কেননা ইউরোপীয় সমাজে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত, প্রাচীন ভারতেও তাহাই ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে কাব্য-নাটক-কারদিগের উভয়-সঙ্কট। তাঁহারা যদি বাল্যে প্রণয়ের চিত্র অঙ্কিত করেন (বাল্যবিবাহের দেশে ইহা ছাড়া উপায় কি?) তাহা হইলে বিজ্ঞমণ্ডলী 'স্বভাববিরুদ্ধ' বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। আবার যদি তাঁহারা অনূঢ়া যুবক-যুবতীর প্রণয়ের চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা হইলে আবার বিজ্ঞ-মণ্ডলী 'সমাজবিরুদ্ধ' বলিয়া ধিক্কার দিবেন। প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল স্থলে অনূঢ় যুবক যুবতীর প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, সে সকল স্থলে যুবতীর অনূঢ়া থাকার সঙ্গত কারণ দেখাইয়া তবে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ফলতঃ হয় কুলীনকুমারী অনূঢ়া অবলা লইয়া নায়িকা সাজাইলে দোষস্খালন হয়, না হয় এখনকার বরপণের চাপে কন্যার বয়স বাড়িয়া যাইতেছে এই অছিলায় অনূঢ়া যুবতীকে নায়িকা করা চলে। কিন্তু এ সব স্থলেও রীতিমত প্রেমে পড়া, প্রণয়সাক্ষ্য প্রণয়খ্যাপন (declar-ation of love) ইত্যাদি আমাদের সমাজবিরুদ্ধ। অনেকে আবার বালবিধবাকে যৌবনাগমে অতৃপ্তবাসনা প্রণয়াকুলা চিত্রিত করিয়া প্রণয়বতী যুবতী নায়িকার সাধ পুরান, তাহারও ইহাই অন্যতম কারণ। এইজন্যই অনেক আখ্যায়িকাকার হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান ইঙ্গবঙ্গ ও বষ্টম-বৈরাগী সমাজ হইতে নায়িকা বা প্রতিনায়িকা সংগ্রহ করিতেছেন; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা', শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পণ্ডিত মশাই' 'দত্তা' ও 'গৃহদাহ,' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা' শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'স্পর্শমণি', শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'জ্যোতিহারা', শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সিন্দুর-কৌটা', শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অশ্রু', শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়ার 'নমিতা' ইহার উদাহরণ।

এই কারণেই আমার মনে হয়, যে সমাজে যুবক-যুবতীর পূর্ব্বরাগের অবসর নাই, অবসর ঘটিলেও কুলে-শীলে মিল না হইলে সে পূর্ব্বরাগ সমাজবিধ্বংসী এবং

---

(৩) এক সময়ে ইউরোপে প্রায় এইরূপ অবস্থা ছিল। মিরাণ্ডা ও জুলিয়েট উভয় প্রেমিকারই বয়স চৌদ্দ বছর পূর্ণ হয় নাই। জুলিয়েটের জননী ঠিক আমাদের দেশের ঘরণী-গৃহিণীদিগের মতই বলিয়াছেন, এ বয়সে কত মেয়ে সন্তানজননী হইয়াছে এবং তিনি নিজেও হইয়া-ছিলেন।

(৪) প্রতিকূল সমালোচক হয় ত স্বর্ণ ঠাকুরাণের কথার প্রতিধ্বনি তুলিবেন—'এক কোঁটা মেয়ে,—এ কি ঘোর কলি।' অথবা শেখর-নাথের সঙ্গে-সঙ্গে ভাবিবেন,—'সেদিনকার এক ফোঁটা ললিতা, এত কথা শিখিল কিরূপে?'

অভিভাবকদিগের কর্তৃত্বে বাল্যবিবাহ সামাজিক ব্যবস্থা, সে সমাজে বালক-বালিকার সাহচর্য্যবশতঃ প্রণয় সঞ্চার অনেকটা স্বাভাবিক ও শোভন। তবে এক্ষেত্রেও কুলে শীলে মিল না হইলে ইহার ফল বিষময়। (৫) সেরূপ মিল হইলে ইহা সমাজ-স্থিতির অনুকূল এবং আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই বুঝিয়াই আজকাল অনেক লেখক এইদিকে ঝুঁকিয়াছেন। আমার বিবেচনায় এই পথই আমাদের সমাজের কাব্য নাটকে অবলম্বনীয়। অবশ্য দাম্পত্য-প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিলে কোন দিক্ হইতেই কিছু আপত্তি করিবার থাকে না। কিন্তু প্রথম প্রবন্ধেই বলিয়াছি, কবিগণ চিরদিনই দাম্পত্য-প্রেম অপেক্ষা বিবাহের পূর্ব্বের প্রেমের বর্ণনায় পক্ষপাতী।

এতদূরে 'প্রেমের কথা'র এই সুদীর্ঘ আলোচনা শেষ হইল। হয়ত গম্ভীর-প্রকৃতি পাঠকগণ এই তরল বিষয়ের আলোচনার জন্য এত সময় ব্যয়, মসীক্ষয় ও লেখনী-চালনা অধ্যাপনানিরত প্রবীণ লেখকের বিদ্যা-বুদ্ধি ও সময়ের অপব্যবহার বলিয়া টিটকারী দিবেন; কিন্তু যে লেখককে নিজ অবলম্বিত ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া নিরন্তর প্রণয়-কাহিনীময় নাটক-নভেলের পঠন-পাঠন করিতে হয়, তাঁহার পক্ষে এ বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনা করা, ধারাবাহিক ভাবে এ বিষয়ের বিচার করা, কি নিতান্ত অন্যায্য ও অকার্য্য? যাহা হউক, আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য আর পুঁথি না বাড়াইয়া আমরা কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দেবযানীর কথায় উপসংহার করি, 'হায়! বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায় এতই সুলভ'?

(৫) এই প্রসঙ্গে পাঠকবর্গকে বর্ত্তমান লেখকের পূর্ব্ব-প্রকাশিত (ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩২৪) 'চক্ষুচিকিৎসা' প্রবন্ধটি আর একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

অগ্নি-সংস্কার

[ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল]

প্রথম পরিচ্ছেদ

সতোশ তখন এম-এ পড়ে। সে তখন একটা প্রকাণ্ড হিতসাধন-সমিতির মেম্বর ও স্বেচ্ছা-সেবক। সেই সমিতির চাঁদা আদায় করিবার জন্য সে বালিগঞ্জে সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার চ্যাটার্জী সাহেবের বাড়ী গিয়াছিল।

বেয়ারার কাছে কার্ড দিয়া সে গাড়ী-বারান্দায় পায়চারী করিতেছিল; বেয়ারা তাহাকে কোনও খানে বসিতে বলা আবশ্যক মনে করে নাই—তাহারা বড় করেও না। আয়া একটা ছোট্ট ফুট-ফুটে মেয়েকে পেরাম্বুলেটারে করিয়া সেই বারান্দায় একটু নাড়া-চাড়া করিতেছিল। বেলা তখন ৯টা।

হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল—একটা মেয়ে। সে কি শুধু একটি মেয়ে! সতোশ দেখিল একটা অপ্সরা—একরাশ বেল-ফুলের উপর একটা চমৎকার পদ্ম—এমনি আরও কত কিছু। কিন্তু লোকের চোখে সে কেবল একটী মেয়ে। বয়স ১৪।১৫; রং ফুটফুটে। মুখখানি ঢলঢলে। চোখ-দুটা বড়, শান্ত, নম্র, উজ্জ্বল। পরনে তার লাল-পেড়ে সাদা আট-পৌরে সাড়ী, সাদা ব্লাউজ। পায় একজোড়া জাপানী চটী। পিঠ ছাইয়া ঘন কাল সদ্য-স্নাত চুলের রাশ ছড়াইয়া রহিয়াছে। মেয়েটীর বাঁ-হাতে এক-খানা বই; তাহার যেখানটা সে পড়িতেছিল, সেখানে তার একটি পুষ্ট, স্বচ্ছ, চাঁপার কলির মত আঙ্গুল ঢুকাইয়া বইখানা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ডান-হাতে পেনসিল,—সেই পেন্‌সিলের গোড়াটা দিয়া সে তা'র টকটকে লাল ঠোঁট-দুটীকে বেশ একটু জোরেই টিপিয়া ধরিয়াছে। এই অবস্থায় মেয়েটী আসিয়া গাড়ী-বারান্দার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ ছিল সেই পেরাম্বুলেটারের ভিতরকার ছোট্ট মেয়েটির দিকে; কিন্তু স্পষ্টই সে তাহাকে দেখিতেছিল না।

আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে এই ছবিটি আঁকিয়া দিলাম; কেন না, এই ছবিখানাই নানা রকম উজ্জ্বল রঙ্গে রঙ্গিন হইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত বেচারা সতোশের মনের

ভিতর ভয়ানক তোল-পাড় করিয়াছিল। মেয়েটীর হঠাৎ এখানে এই ভাবে দাঁড়াইবার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে, স্কুলের পড়া তৈয়ার করিতে-করিতে তাহার মন চাহিল একবার ছোট বোনটির সঙ্গে একটু খেলা করিতে। সেই উদ্দেশ্যে সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। কিন্তু সম্মুখে একটী অপরিচিত যুবককে দেখিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল। অবশ্য তাহার সম্মুখে গিয়া বোনের সঙ্গে খেলা করা অসম্ভব; অথচ তাহাকে দেখিয়াই অমনি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করাও ঠিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। ঐই অবস্থায় সে যে প্রকারে রহিল, তাহার বর্ণনায় কালিদাস লিখিয়াছেন—ন যযৌ ন তস্থৌ।

মেয়েটী এই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যেন সে সত্যেশকে দেখিতেই পায় নাই, এই ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু স্পষ্টই বুঝা গেল যে, সে সত্যেশকে দেখিয়াছে এবং তাহাতেই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে,—তাহার বোনকে সে দেখিতেই পায় নাই। এই রকম কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিবার পর, খানসামা খবর দিল, খানা তৈয়ার। মিসিবাবা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, ছুটিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সত্যেশও বাঁচিল; কারণ, সে এক মুহূর্ত্তমাত্র মেয়েটীকে দেখিয়াছিল; তার পরই ভদ্রতার খাতিরে অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইয়া ছিল। কিন্তু থাকিলে কি হয়, তাহার চক্ষে সে সেই মূর্ত্তিই দেখিতেছিল; এবং সমস্ত শরীর দিয়া সে তাহার সান্নিধ্য অনুভব করিতেছিল; আর, মাঝে-মাঝে অতি সন্তর্পণে চক্ষু ঘুরাইয়া সে যে আরও এক-আধবার ক্ষণিক দৃষ্টিতে সেই মূর্ত্তিটী না দেখিয়াছিল, এ কথা হলপ্ করিয়া বলিতে পারি না।

যতক্ষণ সত্যেশকে সেই গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল, তাহাকে অন্য সময় হইলে সে খুব অনেকক্ষণ বলিয়াই মনে করিত। কারণ, বেয়ারা যখন কার্ড লইয়া যায়, তখন সাহেব গোসলখানায় ছিলেন। তিনি বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত সত্যেশকে সেই গাড়ী-বারান্দায়ই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই অনেকক্ষণটা সত্যেশের মোটেই বেশীক্ষণ বলিয়া মনে হয় নাই। সেই মেয়েটীর আবির্ভাবে তাহার মনের ভিতর যে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে সময়ের হিসাবটা একেবারে ওলট-পালট খাইয়া গিয়াছিল। যতক্ষণ সে মেয়েটী ছিল, ততক্ষণ তাহার এক মুহূর্ত্ত!—আর, যখন সে চলিয়া গেল, তখন তাহার মানস-প্রতিমা তার স্থান জুড়িয়া বসিয়া, অনেকটা সময়কে এক মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত করিতে লাগিল।

যখন বেয়ারা আসিয়া ডাকিল, তখন সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। বেয়ারা যখন তাহাকে ভিতরে লইয়া বসাইল, তখনও সে স্বপ্নই দেখিতে লাগিল। সেই ঘরে সে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। খানা শেষ হইলে তবে চ্যাটার্জ্জী সাহেব আসিলেন। কিন্তু সত্যেশের এমন মনে হইল না যে, তাহাকে খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। যদি তাহার সে রকম মনে হইত, তবে সে হয় তো চটিত; কারণ, সে কাহারও কাছে কোনও রকম ঔদ্ধত্য, অবহেলা, বা অপমান বরদাস্ত করিতে তখনও শেখে নাই।

চ্যাটার্জ্জী সাহেব আসিয়া হাসিমুখে সত্যেশের করমর্দ্দন করিলেন। সত্যেশ সন্ত্রস্ত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চ্যাটার্জ্জী সাহেব তাহাকে তাঁহার পাশে বসাইয়া বলিলেন,—অবশ্য ইংরাজীতে—"আমি শুনেছি, তুমি এই সমিতির একজন উৎসাহী সভ্য; এর সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা ক'রতে চাই, তাই তোমাকে একটু বসিয়ে রেখেছি। আশা করি, তা'তে তুমি কিছু মনে ক'রবে না।"

সত্যেশ অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, সে কি কথা!"

চ্যাটার্জ্জী সাহেব বেশ একটু প্রফুল্ল মুখে সত্যেশের সুন্দর কচি-কচি মুখখানার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি এখন পড়?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কি পড়?"

"এম্-এ।"

"কোন্ বিষয়ে?"

"ফিজিক্সে।"

"বেশ, বেশ! আমি ভেবেছিলাম, তুমি বোধ হয় ব'লবে যে, তুমি ইংরাজীতে এম-এ, পড়। অনেক ছেলে তাই পড়ে। এর চেয়ে সময়ের অপব্যয় আর হতে পারে না। বি-এতে তোমার অবশ্য ঐ বিষয়ে অনার ছিল?"

"আজ্ঞে হাঁ।" তার পর একটু লাল হইয়া, আমতা-আমতা করিয়া "আমি ফিজিক্সে প্রথম বিভাগে প্রথম হ'য়েছি।"

এখানে বলিয়া রাখি—এসব সে-কালের কথা; তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন রেগুলেশনের পরীক্ষা আরম্ভ হয় নাই।

"বেশ! শুনে খুব খুসী হ'লাম। তোমার বাড়ী কোথায়?"

"বিক্রমপুর।"

"তোমার বাবা কি করেন?"

"আমার বাবা এখন এডিশন্যাল সেসন্স্ জজ্।"

"ও! কি নাম তাঁর?" চ্যাটার্জ্জী সাহেবের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

"শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়।"

"ওঃ, তুমি মিষ্টার মুখার্জির ছেলে, তাই বল। তোমার বাবা সদরালা থাকতে, আমি তাঁর কাছে তিন-চারবার মকদ্দমা ক'রতে গিয়েছি। তিনি তো এখন পূর্ণিয়ায়, না?"

"আজ্ঞে না, তিনি এখন ফরিদপুরে বদলী হ'য়েছেন।"

"ও! ভারী খুসী হ'লাম তোমায় দেখে। আশা করি, তোমাকে মাঝে মাঝে দেখতে পাবো। তুমি কি ক'রবে মনে ক'রেছ?"

"আমার ইচ্ছা ইঞ্জিনিয়ার হ'বার। কিন্তু বাবার ভারী ঝোঁক আমাকে মুনসেফ ক'রবার। আমি কিন্তু উকীল কিছুতেই হ'ব না, আর যাই হই।"

"বিলাত যাবার ইচ্ছা আছে, এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে?"

"আমার ইচ্ছা আছে, কিন্তু—"

"বাবার বুঝি মত নেই? তিনি তো খুব গোঁড়া ন'ন, তবে তাঁর মত নেই কেন?"

"তিনি বলেন, কতকগুলো টাকা খরচ ক'রে বিলেত গিয়ে অবশেষে একটা বাঁদর ব্যারি—" জিভ কাটিয়া সত্যেশ থামিয়া গেল।

চ্যাটার্জ্জীর সমস্তটা মুখ লাল হইয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তে তিনি হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তোমার বাবা ঠিক ব'লেছেন; বিলাত থেকে অনেকেই কেবল বাঁদর হ'য়ে ফেরে, সেটা ঠিক; বিশেষ, যা'রা অন্য কিছু না পেরে ব্যারিষ্টার হ'য়ে ফেরে। কিন্তু সবাই বাঁদর হয় না—তোমার মত ছেলের বাঁদর হ'য়ে ফিরবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। তুমি তোমার বাবাকে বলো, আমি এ কথা ব'লেছি।"

বলিয়াই চ্যাটার্জ্জী সাহেব ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আমার কাছারী যাবার সময় হ'ল,—এখন তোমাকে আমায় বিদায় দিতে হ'চ্ছে। তুমি আর একদিন এসো, তোমাদের সমিতির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে;—ধর, এই সামনের শনিবারে—বিকেলে আমার এখানে চা' খাবে?"

"আজ্ঞে, আচ্ছা" বলিয়া নমস্কার করিয়া সত্যেশ উঠিল। চ্যাটার্জ্জী উঠিয়া একটা ড্রয়ার হইতে চেক-বই বাহির করিয়া একখানা চেক লিখিয়া তাহাকে দিলেন।

সত্যেশ যতক্ষণ না বাড়ীর কম্পাউণ্ড ছাড়াইয়া গেল, ততক্ষণ চ্যাটার্জ্জী তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর টেবিলের কাছে বসিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া তৎক্ষণাৎ ডাকে পাঠাইয়া দিলেন। চিঠি গেল তাঁহার ফরিদপুরের এক উকীল বন্ধুর নিকটে।

চ্যাটার্জ্জী সাহেবের বয়স পঞ্চাশের উপর। তিনি কলিকাতার একজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি। কলিকাতার বা দেশের কোনও বড় কাজই তাঁর সহায়তা ছাড়া হয় না। তিনি যে স্বদেশ হিতৈষী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি যে পূরাপূরী সাহেব, সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নাই। তিনি যখন বিলাত যান, সে সময়ে পূরাপূরী সাহেব হওয়াটা একটা সাধনার বিষয় ছিল। আহার-বিহার, চলন-ফেরণ, কথা-বার্ত্তা সকল বিষয়ে ঠিক পূরাদস্তর সাহেব বলিয়া পরিগণিত হওয়া অনেকের পক্ষে জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া, চ্যাটার্জ্জী সাহেব বিলাত হইতে ফিরিয়া পূরা সাহেব বনিয়া গিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করায় অর্থের তাঁহার অভাব ছিল না; কাজেই সাহেবীতে তাঁহার কোথাও কোনও ত্রুটি ছিল না।

কিন্তু, ইদানীং তাঁহার মনে একটা অনুশোচনার ভাব আসিয়াছিল। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কতকগুলি যুবকের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাঁহারও চোখে বাধ-বাধ ঠেকিত, আর, সে কথা তিনি মুখ ফুটিয়া বলিতেন। সে সমাজের দোষ-ত্রুটির তাঁহা অপেক্ষা তীব্র সমালোচক আর ছিল না। যখনই এ বিষয়ে কথা উঠিত, তখনই তিনি বিলাত-ফেরত সমাজকে তীব্র কষাঘাত করিতেন; আর আমাদের দেশের লোকের আড়ম্বর-শূন্য জীবনের প্রশংসা করিতেন। তাঁহার ভাষার ঝাঁজ অত্যন্ত অধিক ছিল; এবং সব সময়েই তিনি যে খুব ন্যায়সঙ্গত ভাবে সমালোচনা করিতেন, তাহাও বলা

যায় না; কিন্তু যাহা তিনি বলিতেন, তাহা অন্তরের সহিত অনুভব করিতেন।

কিন্তু, তিনি সমালোচনা যতই করুন, তাঁহার বাড়ীতে সাহেবিয়ানা পুরা দমে চলিতে লাগিল। যে সমস্ত ব্যাপারের তীব্র সমালোচনা তিনি করিতেন, সেই সব ব্যাপার তাঁহার বাড়ীতে নিয়তই হইতে থাকিল। দীর্ঘ জীবনের অভ্যাস বুড়া বয়সে ছাড়া সহজ নয়। তাহা ছাড়া 'পঞ্চাশোর্দ্ধে' ঘরে থাকিলেও, ঘরের কর্ত্তা হইয়া থাকা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যুবকদের বিশ্বাস, বসুন্ধরা যুবা-ভোগ্যা। যাঁহাদের যৌবন অতীত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে বাহিরে যতই সমিহ করুক, অন্তরে-অন্তরে তাঁহাদিগকে সকল বিষয়ে মানিয়া চলিতে কোনও যুবকই চায় না। যদি বাড়ীর কর্ত্তার খুব শক্তি থাকে, তবে তিনি যুবক-যুবতীদের দমন করিয়া রাখিতে পারেন; নচেৎ, যুবক-যুবতীরাই প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ায়। চ্যাটার্জী সাহেবের কথা যতই তীব্র হউক, তাঁহার মনের বল খুব বেশী ছিল না; আর, স্নেহ অতিরিক্ত রকম প্রবল ছিল। কাজেই, তাঁহার বাড়ীর কর্ত্তৃত্ব ছিল তাঁহার যুবা ছেলে-মেয়েদের হাতে; আর তাহাদিগকে তিনি প্রায়ই "গোরা" "এংলো ইণ্ডিয়ান" প্রভৃতি বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। তাঁহার প্রথম জীবনের সাহেবী নেশার ভিতর তাহারা মানুষ হইয়াছিল; কাজেই, তাহারা পুরা সাহেব।

চ্যাটার্জী সাহেব সবচেয়ে না-পছন্দ করিতেন কোর্টসিপ। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "মেয়েদের খাঁচায় পুরে রাখতে আমি চাইনে; কচি-কচি মেয়েদের বিয়ের নামে বলি দিতেও চাই না; কিন্তু তাই ব'লে, আমার মেয়ে যে আমায় এসে ব'লবে—'বাবা আমি 'লবে' প'ড়েছি'—তা' আমি বরদাস্ত ক'রতে রাজী নই।" কিন্তু বিধাতার এমন বিধান যে, তাঁহার বড় মেয়ে লীলা সত্য-সত্যই 'লবে পড়িল'; এবং তাঁ'র পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ধরিয়া বসিল যে, ব্যারিষ্টার মিষ্টার ঘোষকে সে বিবাহ করিবেই। চ্যাটার্জী সাহেব এ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ একেবারে ছাড়িবার সংকল্প কথনই করেন নাই; তাই এই অব্রাহ্মণ যুবকটীকে জামাই করিয়া লইতে তাঁহার গুরুতর আপত্তি ছিল। তাহা ছাড়া, ঘোষ ছোকরাটীকে তিনি পছন্দও করিতেন না। কাজেই, লীলাকে অবশেষে ঘোষের সঙ্গে 'ইলোপ' করিয়া এলাহাবাদে,—সেখানে ঘোষ থাকিতেন,—গিয়া বিবাহ করিতে হইল।

এই ব্যাপারে চ্যাটার্জী সাহেবের যেন মাথা কাটা গেল; কিন্তু ইহার জন্য তিনি মেয়েকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারিলেন না; কেন না, তিনি জানিতেন যে, ঘোষ ব্যারিষ্টারের অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নহে। তাঁহার মানের মাথা খাইয়া, তিনি মেয়ে-জামাইকে এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আনাইয়া, তাঁহারই একটা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।

মেয়ের মতন ছেলেরাও চ্যাটার্জী সাহেবকে দুঃখ দিতে ক্রুটী করে নাই। যাহার নাম তিনি আদর করিয়া রাখিয়াছিলেন সুবোধ, তাহাকে প্রায়ই দ্বিপ্রহর রাত্রে যে অবস্থায় বাড়ী ফিরিতে দেখা যাইত, তাহাতে গরিব লোক বা নেটিভ সমাজে হইলে তাহাকে মাতাল বলিত। সে বিলাতে গিয়া, সকল পরীক্ষায় ফেল হইয়া, অবশেষে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছে। তাহার ছোট যাহারা, তাহারা বুদ্ধিমান, বলবান, দৃঢ়-চিত্ত, কিন্তু সাহেবী সমাজের সমস্ত দোষে পরিপুষ্ট হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাও চ্যাটার্জী সাহেব দেখিতে পাইতেন; কিন্তু স্নেহপরায়ণ চ্যাটার্জী সাহেব তাহাদিগকে তাড়নার দ্বারা নিরস্ত করিতে পারিতেন না। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ন্যায়পরায়ণতা এ সকল দোষের জন্য সর্ব্বদা নিজেকেই দায়ী করিত;—তিনি মনে করিতেন, আমি আপনার হাতে যে বীজ বুনিয়াছি, তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। তাই, তিনি ছেলে-মেয়েদের উপর কড়া হইতে পারিতেন না।

তাঁহার তৃতীয়া কন্যা ইলা। দ্বিতীয়া কন্যা শৈশবেই তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। ইলার স্বভাব তাহার ভাই-ভগিনীদের মত নহে দেখিয়া, চ্যাটার্জী সাহেব বড় প্রীতি-লাভ করিতেন। ইলা শান্ত—উদ্ধত নহে। চঞ্চলতার চেয়ে ধীরতাই তাহার মধ্যে বেশী দেখা যাইত। বেশভূষা ও তুচ্ছ আমোদে সে বড় থাকিত না; তাহার বিশেষ ঝোঁক ছিল পড়া-শুনায়। সকল বিষয়েই সে চ্যাটার্জী সাহেবের মনের মত মেয়ে।

চ্যাটার্জী সাহেবের মনে-মনে ইচ্ছা ছিল, এই মেয়েটীর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে হিন্দুমতে বিবাহ দিবেন। সেজন্য তিনি একটু চেষ্টা-চরিত্রও করিতেছিলেন; কিন্তু বাড়ীতে

কাহারও কাছে সে কথা প্রকাশ করেন নাই,—মনের মত পাত্র খুঁজিয়া পান নাই বলিয়াই কাহাকেও বলেন নাই। আজ যখন তিনি গোসলখানার জানালা হইতে সত্যেশকে দেখিলেন, তখন তাহার চেহারা দেখিয়াই তাঁহার ছেলেটীকে ভাল লাগিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ইলা আসিয়া গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইলে, দু'জনকে দেখিয়া তাঁহার কেবলই মনে হইল, এই দুটীতে জোড় মানাইবে ভাল। তখন তিনি সত্যেশকে চেনেন না; কিন্তু সভা-সমিতিতে তাহাকে অগ্রণী হইতে দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ হইল।

গোসলখানা হইতে বাহির হইয়া যখন তিনি সত্যেশের কার্ড দেখিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, এটা নিতান্তই অলীক কল্পনা নাও হইতে পারে। সত্যেশের নাম তিনি অন্য লোকের কাছে শুনিয়াছিলেন,—দেশহিতকর কার্য্যে যে সে একজন অগ্রণী, তাহা তিনি জানিতেন।

সত্যেশের কাছে তাহার আত্মবিবরণ শুনিয়া চ্যাটার্জী সাহেব উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ফরিদপুরের একটা বন্ধুর। কাটে এ সম্বন্ধে চিঠি লিখিলেন। চিঠি ডাকে পাঠাইবার পর মিসেস্ চ্যাটার্জী তাঁহার ঘরে আসিলেন। মিসেস্ চ্যাটার্জীর নাম মালতী। যৌবনে তিনি একটা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও বিদুষী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। চ্যাটার্জী যখন তাঁহাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি একটা খুব বড় রকমের বাজী মারিয়াছেন বলিয়া দেশময় রটনা হইয়া গিয়াছিল। সে আজ ৩০ বৎসরের কথা। কিন্তু এখনও মালতী দেবী পরমা সুন্দরী। তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা শান্ত, গম্ভীর সৌন্দর্য্য সর্ব্বদা বিরাজিত থাকিত; আর, যখন তাহা হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, তখন তাহা বাস্তবিকই মধুর দেখাইত।

চ্যাটার্জী বলিলেন, "ওগো, ঐ ছেলেটীকে দেখেছো?"

"কে? এই যে গেল? হাঁ! কেন?"

"ছেলেটা দেখ্‌তে কেমন?"

"বেশ! কেন বল দিকিন?"

"জামাই ক'রবার মত নয়?"

"জামাই! তুমি পাগল হ'য়েছ? কার জামাই?"

"ওগো তোমার! আমি মনে ক'রছি, ও'র সঙ্গে ইলার বিয়ে দেব।"

"তুমি ক্ষেপেছ! এখনি ইলার বিয়ে কি? আসছে বার সবে এণ্ট্রান্স দেবে! ওকে পড়া ছাড়িয়ে দেবে?"

"দোষ কি? পড়ে-শুনে যদি মানুষ না হয়, তো, পড়িয়ে কি হ'বে। এক মেয়ে তো পড়ে-শুনে শেষ ক'রেছে। তা'র যা বিদ্যে, তা'র চেয়ে তোমার বাঙ্গালী ঘরের নিরক্ষর বউ ঢের ভাল।"

কথাটায় মালতী দেবীর আঁতে ঘা লাগিল। যদিও চ্যাটার্জী সাহেব কন্যা এবং জামাতাকে কোনও রূপ তাড়না না করিয়া সম্পূর্ণ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবু তিনি তাহাদের দোষ সম্বন্ধে সমালোচনায় জিহ্বাকে সংযত করিতেন না। অবশ্য এই সমালোচনা মেয়ের সাক্ষাতে পরিহাসের ভাবে হইত; কিন্তু মালতী দেবী জানিতেন যে, সে সমালোচনা তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে আসিত। চ্যাটার্জী সাহেবের অপেক্ষা তিনি যে কন্যাকে অধিক স্নেহ করিতেন, তাঁহার এরূপ মনে করিবার বাস্তবিক কোনও হেতু ছিল না; কিন্তু এরূপ সমালোচনার জন্য তিনি স্বামীর উপর অন্তরে-অন্তরে অত্যন্ত চটিয়াছিলেন। এ কথা লইয়া তাঁহাদের বাগ্‌বিতণ্ডা অনেক হইয়া গিয়াছে।

"তোমার মেয়ের দোষের কথা কেবল তোমার কাছেই শুনি; দেশ-শুদ্ধ লোকের মুখে তা'র প্রশংসা ধরে না; আর, তুমি তা'র বাপ হ'য়ে দিন-রাত তা'র খুঁত ধরছ! ধন্যি বাপ হ'য়েছিলে!"

"বাইরের লোক সুখ্যাত ক'রবে না কেন? সে তো তা'দের পাকা ধানে মই দেয়নি। তা' ছাড়া, জান তো, 'Tis distance lends enchantment to the view."

"আর, তোমার বুঝি সে পাকা ধানে মই দিয়েছে!"

"দুশো বার! যখন কচি মেয়ে—প্রথম মেয়েটী—নিয়ে আদর ক'রেছি, তখন মনের ভিতর কত স্বপ্ন, কত আশা! মনে ভেবেছি, এমন মেয়ে বুঝি দুনিয়ায় নেই। কত স্নেহ দিয়ে তা'কে পালন করেছি; আর, কত আশা তার উপর ক'রেছি! সেই মেয়ে,—এত আদরের এত আশার মেয়ে যে চার হাত-পায়ে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিঁড়ে-খুঁড়ে একটা নিতান্ত বাজে স্ত্রীলোকের মত নিতান্ত তুচ্ছ ভাবে জীবন কাটাচ্ছে, এ দেখলে প্রাণে যে ব্যথা লাগে, পাকা ধানে মই দেওয়া কি তা'র কাছে দুঃখ? লীলা রোজ-রোজ তিল-তিল ক'রে আমার প্রাণের ভিতর আগুন

জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমাকে যে কি দুঃখ সে দিচ্ছে, তা' তুমি বুঝতে পার না; কেন না—থাক্, সে সব কথায় আর কাজ নাই।"

মালতী দেবীর মুখখানা একেবারে অন্ধকার হইয়া উঠিল। চ্যাটার্জ্জী যে কথা বলিলেন না, তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনিও যে সেই পথেরই পথিক, এই কথা বলাই স্বামীর অভিপ্রায় ছিল, তাহা তিনি বুঝিলেন। মনের ভিতর দারুণ অভিমান গজ্জিয়া উঠিল। খুব কতকগুলি শক্ত কথা জিভের ডগায় আসিল; কিন্তু তিনি আত্মসম্বরণ করিলেন। বলিলেন, "আমিও তাই বলি, থাক্। লীলার কথা তোমায়-আমায় না হওয়াই ভাল।" বলিয়া খুব জোরের সঙ্গে মুখ ফিরাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

চ্যাটার্জ্জী একবার মুখ ফিরাইয়া স্ত্রীর দিকে চাহিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছিল, ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছিল, কিন্তু তিনি কিছুই বলিলেন না। দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ তিনি এই ভাবেই রহিলেন।

তাঁহার মনের ভিতর নানা চিন্তার যে ঝড় বহিতেছিল, তাহা বেশ গুছাইয়া বলা অসম্ভব। খুব গভীর অন্ধকার ঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশের চারিদিকে বিদ্যুতের রেখা যখন ঝক্‌মক করিতে থাকে, কখনও বা এক-একটা রেখা ভীষণ গর্জ্জনে পৃথিবী কাঁপাইয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন প্রকৃতির যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হয়, তেমনি ভয়ঙ্কর, তেমনি অন্ধকার, তেমনি চঞ্চল বিক্ষিপ্ত জ্বালাময় চিন্তা-বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল এই ব্যথিত মানুষটীর হৃদয়। অতীত জীবনের গুপ্ত নিভৃত কন্দর হইতে কত কথা তাঁহার মনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; কত ব্যর্থ বিচূর্ণিত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিত্তকে তীব্র কষাঘাত করিতে লাগিল; দারুণ বেদনা, আকুল আকাঙ্ক্ষা, আর্ত্ত তৃষ্ণা তাঁহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিতে লাগিল তাহা কথায় কে বুঝাইবে? তিনি জীবনে, লোকে যেমন চায়, তেমন সফলতা প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন; লোকের চক্ষে তাঁহার সৌভাগ্যের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু, তাঁহার অন্তরে-অন্তরে তিনি বুঝিতেছিলেন, তিনি কিছুই পান নাই; তাঁহার সমস্ত জীবন একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতা, একটা প্রচণ্ড হতাশা! না হইবে কেন? সুখ ত বাহির হইতে দেখিবার জিনিস নয়! আমার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া ত আমার সুখের পরিমাণ হয় না। আমার সুখের মানদণ্ড আমার মনের আশা আকাঙ্ক্ষা! সেই মানদণ্ডে মাপ করিয়া চ্যাটার্জ্জী সাহেব দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার মত দুঃখী জগতে নাই। তাঁহার সুখের সকল আশা ব্যর্থ হইয়াছে, তাঁহার কল্পনা সমস্ত চূর্ণ হইয়াছে; যে সকল পাত্র তিনি পাঁজড়ের হাড় দিয়া রচনা করিয়াছিলেন, স্বর্গের সুধা পান করিবার জন্য, তাহা আজ গরলে পূর্ণ হইয়া তাঁহার সমগ্র জীবন তুষানলে ভরিয়া দিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী! তাঁহার যৌবনের আশা, প্রাণের প্রেয়সী—যাঁহাকে হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথিয়া সমস্ত জীবনটা তিনি সুখের তরঙ্গের চূড়ায়-চূড়ায় ঘুরিয়া যাপন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন—সেই স্ত্রী—সে আজ তাঁহা হইতে কত দূরে; তাঁহার আদর্শ তাঁহার চিন্তা তাঁ'র কল্পনারও বহির্ভূত। তাঁহার কাছে প্রীতির চেয়ে বিদ্বেষই তিনি এখন খুব বেশী পান।

অনেকক্ষণ হাতের ভিতর মাথা গুঁজিয়া তিনি পড়িয়া রহিলেন। তারপর পিছন হইতে অতি সন্তর্পণে তাঁহার ছোট মেয়ে ইলা আসিয়া বলিল "বাবা, গাড়ী তৈয়ার হ'য়েছে।"

চ্যাটার্জ্জী সাহেব কাছারী যাইবার রাস্তায় মেয়েকে স্কুলে পৌঁছাইয়া যান। তাই ইলা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া শেষে তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল।

চ্যাটার্জ্জী সাহেব একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁহার মনের বোঝাটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইলা আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ইংরাজীতে বলিল, "বাবা, তোমার কি হ'য়েছে? তোমাকে বড় দুঃখিত দেখাচ্ছে।"

চ্যাটার্জ্জী সাহেব বাঙ্গালায় বলিলেন, "মা, আমি বড় দুঃখী!" ইলা এবার বাঙ্গালা বলিল। বাঙ্গালায় কথা বলা ছেলে-মেয়েদের রেওয়াজ ছিল না; কিন্তু ইলা বুঝিয়াছিল যে, তাহার পিতা বাঙ্গালা কথাই বেশী পছন্দ করেন; তাই এখন সে বাঙ্গালায় বলিল, "তোমার কি হ'য়েছে বাবা, আমাকে ব'লবে না!"

চ্যাটার্জ্জী সাহেব কেবল একদৃষ্টে খানিকক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তা'র পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "বিশেষ কিছু না।"

ইলা যেন তাঁহার মনের ভিতরটা তাঁহার চোখের ভিতর দিয়া দেখিয়া ফেলিল; সে বলিয়া ফেলিল, "বাবা, আমি তোমায় কোনও দিন দুঃখ দেব না।" তাহার দুই চক্ষু, কি জানি কেন জলে ভরিয়া উঠিল।

চ্যাটার্জ্জী সাহেব ইলাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া, বাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিলেন, "তবে মা, আমার কোনই দুঃখ নেই। কিন্তু মনে থাকে যেন মা!"

ইলা বলিল, "যদি না থাকে, তবে সেই দিন যেন আমি মরি।"

চ্যাটার্জ্জী সাহেব হাসিয়া তাহাকে আবার চুম্বন করিলেন, তা'র পর দু'জনে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সে সপ্তাহের বাকী কয়টা দিন সত্যেশের স্বপ্নের ভিতর দিয়া কাটিল। স্বপ্ন নানা রকমের; কিন্তু তার মধ্যে একটা চিত্র সর্ব্বদাই ছিল, সেটা সেই পেন্‌সিল ও বই হাতে কিশোরীটীর। সত্যেশ কি লভে পড়িয়াছিল? সে কথা বলা যায় না। কারণ তাহার বয়সে কিশোরী সুন্দরীকে দেখিয়া যে মোহ হয়, তাহাকে যদি প্রেম বলা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক যুবক বোধ হয় দিনে গড়ে অন্ততঃ দশ পনেরো বার করিয়া প্রেমে পড়ে। তবে, তাহার মনে যে চিন্তাটা হইতেছিল, তাহার যে প্রেমের সঙ্গে জ্ঞাতি-সম্পর্ক আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সে স্বপ্ন দেখিতেছিল—ঐ মেয়েটীকে যদি সে বিবাহ করিতে পারিত, তবে সে ধন্য হইয়া যাইত। পরক্ষণেই তাহার মনে হইল যে, সে একেবারেই অসম্ভব! চ্যাটার্জ্জী সাহেব—পাকা সাহেব; কলিকাতার বিলাত-ফেরত সমাজের মাথার মণি। তাঁর মেয়ে যে বিবাহ করিবে, সেও সেই সমাজের মুকুট-মণি অবশ্যই হইবে। আর সে যে মেয়ে, তাহাকে পাইলে যে কেহ ধন্য হইয়া যাইবে। কাজেই তাঁহাদের কাছে নিতান্ত গ্রাম্যভাবাপন্ন যুবক সত্যেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কখনও কামনার বস্তু হইতে পারে না। সবই সত্য; কিন্তু যদি তাহা হইত, তবে কি চমৎকার হইত!

তারপর সে ভাবিল যে চ্যাটার্জ্জী সাহেবের মেয়ে একটী নামজাদা মেয়ে—তা'কে অনেকেই দেখিয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হয়তো তাহার মত দশ বিশ জন যুবক ঠিক তাহারই মত মিস চ্যাটার্জ্জীকে ধ্যান করিতেছে। সেই দশ বিশ জনের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ সাত জনের হয়তো সে মেয়ের সঙ্গে নিত্য দেখা-শুনা হয়—তারা হয়তো চ্যাটার্জ্জী সাহেবের নিতান্ত অন্তরঙ্গ; তা'রা থাকিতে অজ্ঞাত দূরবর্ত্তী সত্যেশ মুখুয্যে,—যাক্, এ সব কল্পনাই পাগলামী!

তবু পাগলামী সে করিতে লাগিল,—কিছুতেই না করিয়া পারিল না। ফলে সে শনিবা'র বৈকালটাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আর সেই দিনের সম্বন্ধে কত অসম্ভব কল্পনা করিতে লাগিল, তাহা বলিবার নহে। সে কখনও বিলাত-ফেরত সমাজে মেশে নাই; তাহাদের আদব-কায়দা ধরণ-ধারণ কিছুই জানে না। চা'র নিমন্ত্রণ মানে কি, তাহা ভাবিতে লাগিল। অবশ্য তাহার প্রথম প্রশ্ন হইল যে, সেই চা খাওয়ার মধ্যে ইলা থাকিবে কি না, অন্য মেয়েরা থাকিবে কি না? যদি থাকে, তবে—ভাবিতে প্রাণ নাচিয়া উঠিল,—কাঁপিয়াও উঠিল; কেন না স্বাধীন বাঙ্গালীর মেয়ের সংস্পর্শে সে কখনও আসে নাই; তাহাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করিতে হয়, তাও সে জানে না। মোটের উপর, সে সাব্যস্ত করিল ইলা না থাকিলেই ভাল হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশা করিতে লাগিল যে, হয় তো মেয়েদের সঙ্গেই চা' খাওয়া হইবে।

শনিবার আসিল। চা পার্টি সম্বন্ধে তা'র কল্পনাগুলি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ভাঙ্গিয়া গেল। সে দেখিল, চ্যাটার্জ্জী সাহেবের পড়িবার ঘরে সাহেব তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। সে আসিবামাত্র বেয়ারা একটা বেতের টিপায় আনিয়া তাহার উপর ট্রে সাজাইয়া দিয়া গেল। চ্যাটার্জ্জী সাহেব তাহাকে চা ঢালিয়া দিলেন ও কেক বাড়াইয়া দিলেন, নিজেও লইলেন। চা পান করিতে-করিতে গল্প চলিতে লাগিল।

সমস্ত বাড়ীটা তাহার নিকট অত্যন্ত স্তব্ধ বোধ হইতে লাগিল; বাড়ীতে কোনও লোক আছে, এমনও বোধ হইল না। সত্যেশ বেশ একটু নিরাশ হইল।

সত্যসত্যই বাড়ীতে লোক ছিল না। চ্যাটার্জ্জী সাহেব ইচ্ছা করিয়াই সে দিন ছেলে-মেয়েদের এবং স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন লীলার বাড়ীতে। সেখান হইতে

চা খাইয়া তাহাদের সার্কাসে যাইবার কথা। এই ছেলেটিকে লইয়া তাঁহার পরিবারের সঙ্গে তাঁহার কোনও রকম সংঘর্ষ হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

সত্যেশ দেখিল যে কথা-বার্ত্তা যাহা কিছু হইল, সমস্তই সত্যেশকে কেন্দ্র করিয়া। যে সমিতির কথা আলোচনা করিবার জন্য সত্যেশকে চ্যাটার্জ্জী সাহেব ডাকিয়াছিলেন, তাহার কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হইল। তিনি প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন, বিক্রমপুরের কথা। বলিলেন, "তোমা'র বিক্রমপুরে জন্ম বলে নিশ্চয়ই তুমি খুব গর্ব্ব বোধ কর।"

সত্যেশ বলিল "আমার জন্ম বিক্রমপুরে নয়. পুরুলিয়ায়। বিক্রমপুরে কদাচিৎ গিয়েছি. কিন্তু বিক্রমপুর অবশ্যই খুব ভাল লাগে আমার।"

"বর্ষাকালেও, যখন চারিদিক জলে থৈ থৈ করতে থাকে।"

"বর্ষাকালেই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। তখন দেখতেও ভাল, আর আমোদও খুব হয়।"

"কি রকম আমোদ?"

"ও সে চমৎকার! চারিদিকে জল, তা'র মধ্যে বাড়ীগুলো গাছ-পালা সুদ্ধ এক-একটা সবুজ দ্বীপের মতন! দেখতে বড্ড ভাল লাগে! আর তারপর সাঁতার-কাটা আর গামলা, ভেলা, নৌকা যা কিছু চ'ড়ে সেই জলের রাশের উপর ঘোরা- সে একটা ভারি sport."

"দেখেছি বটে, তোমাদের দেশ একবার বর্ষাকালে। যা' বল্লে, দেখতে বেশ! আর লোকগুলোকেও ফূর্ত্তিবাজ বলে মনে হ'ল! তারা যেন জলের পোকা, এমন আনন্দে তারা জলের উপর ভেসে বেড়ায়! তোমাদের দেশের লোকগুলো মোটের উপর 'more lively, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

তা'র পর বিক্রমপুরের পূর্ব্ব গৌরবের কথা, কীর্ত্তিনাশার কীর্ত্তির কথা, সেখানকার খাওয়া-দাওয়ার সুবিধার কথা, অসুখ-বিসুখের কথা হইয়া শেষে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকারের কথা. সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের কথা ইত্যাদি নানা কথা হইল। চ্যাটার্জ্জী কহিলেন, "আসল কথা হ'চ্ছে, লোকেদের প্রাণ নেই, জীবনী শক্তি প্রবল নেই—সেটা থাকতে হ'লে প্রথম কথা হ'চ্ছে তা'দের খেতে পাওয়া চাই—ঘরে পয়সা থাকা চাই।"

ইহা হইতে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির কথা আসিয়া পড়িল। চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "এই যে হাজার-হাজার ছেলে ইউনিভারসিটি থেকে বছর-বছর বেরুচ্ছে, এরা কেবল চাকরী আর ওকালতী ছাড়া কিছুই বোঝে না। যা' কিছু একটা ব্যবসা বা শিল্প নিয়ে খুব ছোট ক'রে যদি এরা আরম্ভ করে. তবে ফলে এরা বড়মানুষ হ'তে পারে;—কিন্তু সেই ঝুঁকিটা নেবার সাহস শতকরা কি হাজারকরা একটা ছোকরারও নেই।"

সত্যেশ বলিল. "বেশীর ভাগ ছেলেদের কলেজ থেকে বেরবার সময় এতটা বোঝা ঘাড়ে প'ড়ে যে ঝুঁকি নেবার মত অবস্থাই তা'দের থাকে না। একটা প্রকাণ্ড পরিবার হয় তো তা'র পাশ ক'রেই উপার্জ্জন ক'রবার প্রতীক্ষায় বসে র'য়েছে।"

"সে কথা কতকটা সত্য; কিন্তু সুধু তাই বল্লে চলবে না। এ কথাও স্বীকার ক'রতে হবে যে, তাদের ভিতর উৎসাহেরও যথেষ্ট অভাব আছে।"

"আমার মনে হয়, সেজন্য আমাদের সমাজের ব্যবস্থা অনেকটা দায়ী। আমরা ছেলেবেলা থেকে বাঁধা থাকার জন্যই আমাদের যত কিছু উৎসাহ, তাকে উচ্ছৃঙ্খলতা নাম দিয়ে বিধিমতে টিপে মারা হয়। তাইতেই তো আমরা এতটা উৎসাহশূন্য হ'য়ে উঠি। আমাদের মধ্যে স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভর পুষ্ট করবার কোনও চেষ্টাই করা হয় না।"

"তোমার কথা যে কতকটা সত্য, সে কথা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু আমার মনে হয় যে, অপর পক্ষেও বলবার অনেক কথা আছে। স্বাধীনতার নাম দিয়ে যে উচ্ছৃঙ্খলতা পুষ্ট হ'য়ে সমাজের কত অনিষ্ট করে, সেটাও একটা ভাববার কথা।"

এমনি নানা কথার ভিতর দিয়া তাঁহারা শেষে সত্যেশের ভবিষ্যতের আলোচনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "আমার পরামর্শ এই যে, তুমি বিলাত যাও। সেখান থেকে কোনও একটা শিল্প শিখে এসো। খুব পাকা ক'রে শিখে এসে এখানে সেই শিল্প প্রতিষ্ঠা কর। তোমার সম্বন্ধে আমি একথা বেশ আশা করি, যে তুমি সফলকাম হ'তে পারবে।"

কথায়-কথায় প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। একখানা গাড়ী আসিয়া দুয়ারে থামিল; তারপর লীলা ঝড়ের মত আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

চ্যাটার্জী জিজ্ঞাসা করিলেন, "লীলা যে! তুমি সার্কাসে গেলে না?"

"না, আমরা আজ এম্পায়ারে যাব Charlie's Aunt দেখতে; তাই গেলাম না। তোমার কাছে একটু দরকারে এসেছি।" বলিয়া সে সত্যেশের দিকে চাহিল।

দরকারটা যে কি, তাহা চ্যাটার্জী বুঝিলেন—ঘোষ-জায়ার সদা-সর্ব্বদাই টাকার দরকারে বাপের কাছে আসিতে হইত।

সত্যেশের তখন উঠিয়া বিদায় চাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু এই সব বিলাতী-সমাজের আদব-কায়দা তাহার জানা ছিল না। সে এ ইঙ্গিত বুঝিল না, বসিয়া রহিল।

চ্যাটার্জী বলিলেন, "আচ্ছা, বস তুমি, তোমার এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই তো।"

"ভয়ানক তাড়াতাড়ি। আমার এখন অনেক জায়গায় যেতে হ'বে।"

চ্যাটার্জী একটু বিরক্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসপ্রিয়তায় বিরক্তি ঢাকিয়া বলিলেন, "Then you ought to have come a-riding!"

লীলা বলিল, "কেন?" এ' রহস্যটা তাহার বোধগম্য হইল না। চ্যাটার্জী বলিলেন, "জান না, বাঙ্গলায় যে বলে যেন ঘোড়ায় চড়ে' এসেছেন?"

লীলা অপ্রসন্নভাবে বলিল "ওঃ!" চ্যাটার্জী সত্যেশকে বলিলেন, "তা' হ'লে সত্যেশ, তোমাকে আর আটকে রাখবো না। তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে আমি বড় সুখী হ'লাম। আশা করি আবার তোমার সঙ্গে দেখা হ'বে।" বলিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন; সত্যেশ করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইতে উদ্যত হইল।

লীলা বলিল, "Ah, this is your chosen groom। আমার সঙ্গে introduce ক'রে দিলে না? Good evening Mr.—"

চ্যাটার্জী বলিলেন "মুখার্জী। সত্যেশ, এটী আমার মেয়ে লীলা ঘোষ।"

সত্যেশ প্রতি-নমস্কার করিয়াই বিদায় হইল। সে দরজার বাহির না হইতেই শুনিতে পাইল, লীলা বলিল "He looks very much a groom" বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সত্যেশের মাথার ভিতর ঝড় বহিতে লাগিল! "chosen groom!" তবে কি চ্যাটার্জী সাহেব তাহাকে জামাতা করিবার জন্য তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছেন? এমন অসম্ভব কি সম্ভব হইতে পারে? তা'র পরেই মনে হইল—যদি তাই হয়, তবে কোন্ মেয়ের জন্য? তার মানস-প্রতিমা—না ওই শ্রীমতী লীলার আর কোনও যোগ্যা ভগিনী? কথাটা বিশেষ বিবেচনার বিষয়! কেন না, এক-মুহূর্ত্তের পরিচয়েই সত্যেশের মনে শ্রীমতী লীলা সম্বন্ধে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার 'সে' যে এই লীলার মত নয়, সেটা সে স্বতঃসিদ্ধ রূপে ধরিয়া লইয়াছিল। কিন্তু যদি লীলার মত চ্যাটার্জী সাহেবের আর কোনও কন্যা থাকে, তবে? ভাবিতে-ভাবিতে সত্যেশ বাড়ী গেল।

চ্যাটার্জী সাহেব লীলার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; কিন্তু পরিহাস করিয়া বলিলেন, "When are you going to step out of your cradle."

লীলা সূক্ষ্ম রহস্য বুঝিতে কিছুতেই পারিত না, তাই বলিল, "তার মানে?"

"মানে এই যে, এখন তোর বেবীর মা হ'বার বয়স হ'য়েছে; এখন আর বেবীর মত থাকলে চলে না। ঈসপের সেই গল্পটা পড়েছ তো, যে, গাধা কুকুরের মত লাফালাফি ক'রতে গিয়ে বিপদে প'ড়েছিল।"

লীলা অত-শত বুঝিল না, সে মোটা কথাটা বুঝিয়া তাহারই জবাব দিল; বলিল, "আশা করি আমি কখনই বেবীর মা হব না, মা হ'বার আমার মোটেই ইচ্ছা নেই।" বলিয়া খুব খানিক হাসিল।

আজ চ্যাটার্জী সাহেব লীলার উপর অত্যন্ত চটিয়াছিলেন; তাহার প্রত্যেক কথায়ই তাঁহার অসন্তোষ বাড়িয়া যাইতেছিল; তাহা আর ঠাট্টার আবরণে ঢাকিয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। তাই তিনি বলিলেন, "Never mind baby, এখন তোমার কি চাই বল।"

"দুশো টাকা না হ'লে আজ আমার চলছে না।"

"দুশো টাকা তো আমার কাছে নেই, তোমার মা না এলে তো দিতে পারছি না। আমি চেক দিতে পারি।"

লীলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "চেক? আচ্ছা তাই দাও, আমি আর অপেক্ষা ক'রতে পারি না।"

চ্যাটার্জ্জী নির্ব্বিবাদে চেক লিখিয়া দিলেন; লীলা "Thank you dear" বলিয়া বিদায় হইল।

মালতী দেবী বাড়ী ফিরিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "লীলা এসেছিল?"

চ্যাটার্জ্জী বলিলেন "হাঁ, সে একখানা চেক নিয়ে গেছে, আমার কাছে টাকা ছিল না।"

মালতী বলিলেন "তা'কে তুমি কিছু বল নি তো, রাগ কর নি তো?"

চ্যাটার্জ্জী ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার উপর এই যে অবিচার করিলেন, তাহাতে তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। লীলা ও তাহার স্বামী যে তাঁহার মুখাপেক্ষী, ইহাতে পাছে লীলা কখনও কোনও বেদনা পায়, এজন্য তিনি সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন; কোনও কথায়-বার্ত্তায় কোনও প্রকারে যদি লীলা অন্যায় ভাবেও মনে করে যে, তিনি তাহার পরাধীনতার জন্য তাহাকে অশ্রদ্ধা বা অনাদর করিয়াছেন, তবে তাঁহার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। সেইজন্য সর্ব্বদাই তিনি লীলার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করিতেন; খুব অসন্তোষের কারণ হইলেও ঠাট্টা করা ছাড়া কোনও অপ্রিয় কথা বলিতেন না। মালতী যে এ কথা জানেন না, এমন নহে। তবে তিনি লীলাকে রূঢ় কথা বলিবেন, এমন সন্দেহ করিবার মালতীর কি কারণ আছে? তাই স্ত্রীর উপর তাঁহার বড় রাগ হইল; একটু উষ্ণ ভাবেই বলিলেন "বলিনি কিছু, কিন্তু আজ যেমন কড়া কথা ব'লবার ইচ্ছা হ'য়েছিল, তেমন কখনো হয় নি। অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ ক'রেছি।"

মালতী বিষণ্ণভাবে বলিলেন "ভেবে দেখ, ও যদি ছেলে হ'ত, তবে তোমার সব টাকার উপর ওর অধিকার হ'ত। তাই ভেবে"—

"Hang your money! টাকার জন্য আমি এক ফোঁটাও ভাবি কোনও দিন! কিন্তু, সে আজ এখানে এসে যা ব্যবহার ক'রেছে, একটা বাঁদরও বোধ হয় তা' ক'রতে লজ্জিত হ'ত।"

সত্যেশকে শুনাইয়া সে যে কথা বলিয়াছে, চ্যাটার্জ্জী তাহাই বলিয়া বলিলেন "এত লেখাপড়া শিখে আমার মেয়ে হ'য়ে যে সে এখনও ভব্যতার ক খ শিখ্তে পারলো না, এটা কি কম দুঃখের কথা?"

মালতী ধীরভাবে বলিলেন "সে রাগের মাথায় একটা অভদ্রতা ক'রে ফেলেছে, তার জন্যে তুমি রাগ ক'রো না;—সে আজ আমার কাছে এই কথা শুনে তো একেবারে তেলে-বেগুনে জলে উঠেছিল। ঠিক তা'র পরেই তোমার কাছে এসে তা'কে দেখে রাগ সামলাতে পারেনি।"

চ্যাটার্জ্জী ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন "তাই না কি! এই কথা নিয়ে মায়ে-মেয়েয় জটলা করা হচ্ছে; বোধ হয় সমস্ত ক'লকাতাময় আমার নিন্দে শীগগিরই বেরিয়ে যাবে? What a pretty confidant I have had! তোমার কি এতটুকুও জ্ঞান হ'ল না যে, এ সম্বন্ধে কোনও কথা না হ'তেই তার আলোচনায় কতদূর অনিষ্ট হ'তে পারে? কিন্তু আমি তোমাদের মুখ বোঁচা করছি! তোমরা টুঁ শব্দটীও করবার আগে আমি ইলার বিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বো।"

চ্যাটার্জ্জী-গৃহিণী একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। স্বামী-স্ত্রীতে এমন একটা ঝগড়া হইয়া গেল, যাহা জন্মে কখনও হয় নাই। গৃহিণী কাঁপিতে-কাঁপিতে আপনার ঘরে গেলেন। চ্যাটার্জ্জীও কাঁপিতে-কাঁপিতে পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া পড়িলেন; পত্রখানি তাঁহার ফরিদপুরের বন্ধুর। তাহার পর টেলিগ্রামের ফরম সামনে লইয়া বন্ধুর নামে একখানা টেলিগ্রাম লিখিয়া বেয়ারাকে ডাকিলেন। বেয়ারা আসিলে তাহার হাতে টেলিগ্রামখানি দিতে গিয়া থমকিয়া বলিলেন "আচ্ছা, ইলা বাবাকো বোলাও।"

ইলা বাপমার ঝগড়া শুনিয়া আপনার পড়িবার ঘরে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। পিতার আহ্বানে সে তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। চ্যাটার্জ্জী তখন একখানা ইজি-চেয়ারে হাত-পা ছড়াইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিলেন। ইলা আসিলে তাহাকে টানিয়া ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর বসাইয়া বলিলেন, "মা, তোমার মার সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হ'য়ে গেছে, তা' শুনেছ? তার কারণ, আমি তোমার বিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রছি। সে দিন যে ছেলেটী আমার কাছে এসেছিল, সুন্দর মত, চশমা চোখে, সেই যে গাড়ী-বারান্দায়

দাঁড়িয়ে ছিল, তুমি তখন সেখানে গিয়ে প'ড়েছিলে, মনে আছে ?"

ইলার মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। ইলা দেখিয়াছিল, তাহার মনেও ছিল; আর কি জানি কেন, তাহার কথা স্বীকার করিতে তাহার একটু লজ্জাও করিতেছিল। তাই সে মুখ লাল করিয়া আয়ত চক্ষু দুইটী ভূমিতে নিবদ্ধ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আছে।"

"সে ছেলেটী ফিজিক্সে এম, এ পড়ে; বি.এ.তে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হ'য়েছে। তা'র বাপ এডিশনাল সেসন্স্ জজ। সে বিলাত যাবে এঞ্জিনীয়ার হ'তে। আমি তা'র সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখেছি, আর খবরও জেনেছি, ছেলেটী সচ্চরিত্র, আর একটী খাঁটি মানুষ। আমার খুব ইচ্ছা, তোমাকে ঐ ছেলেটীর সঙ্গে বিয়ে দি। আমার ইচ্ছার একমাত্র কারণ এই যে, আমি মনে করি এতে তোমার মঙ্গল হ'বে। কিন্তু, তোমার যদি অমত থাকে, তবে আমি এ কাজে অগ্রসর হব না। তুমি যদি স্বচ্ছন্দ চিত্তে এতে সম্মত হও, তবেই আমি এ কাজে হাত দেবো। আমার মন-রক্ষার জন্য আমি তোমাকে কোনও কথা বলতে বারণ ক'রছি। যা' তুমি স্বচ্ছন্দভাবে বলতে পার, তাই বল। এই বিয়ের চেষ্টা ক'রবো কি ?"

ইলা খানিকক্ষণ খুব লাল হইয়া রহিল। চ্যাটার্জী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে ইলা বলিল, "আচ্ছা।"

চ্যাটার্জী ইলার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "বেশ, খুব খুসী হ'লাম। তবে এই বিয়েই হ'বে। আর, তুমি তোমার পড়া শুনার জন্য ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি ছেলের বাপের কাছে কথা তুলিয়েছিলাম, তিনি আমার প্রস্তাবে রাজী আছেন। তাঁর ছেলে বিয়ের পরই বিলাত যাবে, ৪।৫ বৎসরের আগে ফিরতে পারবে না। কাজেই তোমার লেখাপড়ার কোনও ব্যাঘাতই হ'বে না।"

চ্যাটার্জী সাহেব যদি এই সব কথা এমনি করিয়া বুঝাইয়া স্ত্রীকে বলিতেন, তবে কোনও গোলোযোগ হইত না; কিন্তু স্ত্রী যেমন খোঁচা দিয়া কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার রাগ চড়িয়া গেল। তাঁহার সঙ্গে এসব কথার আলোচনা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

টেলিগ্রাম ফরিদপুরে চলিয়া গেল। দুই দিন পরে সত্যেশের পিতা সত্যেশকে লইয়া মেয়ে দেখিতে আসিলেন। মালতীকে একবারও জিজ্ঞাসা না করিয়া চ্যাটার্জী সাহেব বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। আয়োজন চলিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ হইয়া গেল। কথাটা যত সহজ লেখা গেল, কাজটা অবশ্য মোটেই তা'র মত সহজে হইল না। হিন্দু-মতে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা খুব কঠিনই হইয়াছিল। একে চ্যাটার্জী সাহেব বিলাত-ফেরত এবং ষোল আনা সাহেব; তাহাতে আবার তাঁহার বড় মেয়ের কায়স্থের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে। কাজেই বিবাহ নির্ব্বাহ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রভৃতি সংগ্রহ করা, সমাজের লোককে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে রাজী করা, এ সব বড় সহজ হয় নাই। বিলাত-ফেরতের কথা ছাড়িয়া লীলার বিবাহের কথাটাই খুব বেশী করিয়া উঠিল। এ কথা সত্য যে, চ্যাটার্জী সাহেবের সে বিবাহে কোনও হাত ছিল না; কিন্তু সেইটাই আরও দোষের কথা হইয়া দাঁড়াইল। অনেক আন্দোলন, অনেক আলোচনা হইল, অনেক হাঁটাহাঁটি দৌড়াদৌড়ি হইল; চ্যাটার্জী সাহেবকে অনেক কড়া কথা শুনিতে হইল; তাঁহার বন্ধুদের অনেকে, এবং স্ত্রী মালতী তাঁহার অপমানের মাত্রা দেখিয়া বলিলেন, "দূর হ'ক গে ছাই, হিন্দুমতে বিয়ের কথা ছেড়ে দাও! তিন আইনে বিয়ে দেও, নির্ঝঞ্ঝাটে হ'য়ে যাবে।" কিন্তু চ্যাটার্জী কিছুতেই ছাড়িলেন না; তিন আইনের বিবাহে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অনেক দৌড়াদৌড়ি, হাঁটাহাঁটি, অনেক অর্থব্যয়ের পর তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলে কতক লোক তাঁহার দলে আসিল, পণ্ডিত ও পুরোহিত স্বপ্নের অতীত দক্ষিণা লইয়া হাজির হইলেন; কুটুম্বের মধ্যে কেহ-কেহ আসিলেন, কিন্তু বেশীর ভাগ না খাইয়া জাত বজায় রাখিলেন। মোটের উপর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

যে সকল বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার জন্য চ্যাটার্জী সাহেব সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন; তাহাতে তিনি চঞ্চল হন নাই। বরং আর একদিক হইতে তিনি যে অশান্তির আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা না হওয়ায় তিনি মনে অত্যন্ত আত্মপ্রসাদই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার

সব চেয়ে বেশী আশঙ্কার কথা ছিল গৃহবিচ্ছেদ। লীলা যে চটিবে, সুবোধ যে ক্ষেপিবে, তাহাতে তিনি কিছু চিন্তিত ছিলেন না, কিন্তু মালতী খুব বেশী বাঁকিয়া বসিবেন এবং এ বিবাহ একেবারেই যোগ দিবেন না এবং জামাই-মেয়েকে একেবারে গ্রহণ করিবেন না, এই আশঙ্কাই তাঁহাকে খুব বেশী পীড়িত করিয়াছিল। কিন্তু এ কথা মনে করিয়া চ্যাটার্জ্জী সাহেব মালতীর উপর অবিচার করিয়াছিলেন। সেই দিন রাত্রে মালতী খুব রাগিয়াছিলেন এবং অনেকক্ষণ পড়িয়া-পড়িয়া কাঁদিয়াছিলেন, সে কথা সত্য। কিন্তু সেই-দিনকার ঝগড়ার ফলে তাঁহার মন অনেকটা শান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাগের বেগ কমিয়া আসিলে তিনি বেশ অনুভব করিলেন যে, স্বামীকে তিনি অন্যায় ভাবে অনেকগুলি অত্যন্ত শক্ত কথা বলিয়াছেন। এই কথা মনে হইতেই তাঁর মন অনেকটা নরম হইয়া আসিল। স্বামীর উপর তাঁহার ভালবাসা অত্যন্ত গভীর ছিল; ক্রোধের পূর্ণাহুতি হইবামাত্রই সেই গভীর প্রেম আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিল এবং তিনি স্বামীকে কষ্ট দিতেছেন ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। স্বামীও যে তাঁর উপর অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন, একথাটা অবশ্য বরাবরই মনে ছিল; কিন্তু নিজের দোষটাই তিনি এখন খুব বেশী স্পষ্ট ভাবে দেখিতে লাগিলেন। পরের দিন প্রাতঃকালে যখন তিনি বিছানা হইতে উঠিলেন, তখন তাঁহার মন সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। অভিমান মনে আছে বটে; স্বামী যে তাঁহার এতদিনকার প্রেমের অপমান করিয়াছেন, সে কথা মনে হইতেছে বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মনের ভিতর একটা প্রবল আত্ম-বলিদানের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি সংকল্প করিয়াছেন, তিনি তাঁহার স্বামীর অভিপ্রায়ের পথে কাঁটা হইয়া তাঁহাকে শেষ বয়সে কষ্ট দিবেন না। নিজেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়াও স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি যে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলায় রাগারাগি করিয়া নিজেকে অত্যন্ত খেলো করিয়াছেন, এই লজ্জা তাঁহাকে একেবারে নত করিয়া ফেলিয়াছে।

সেদিন সকালে কোনও কথাবার্ত্তাই হয় নাই। দ্বিপ্রহরে সুবোধ কোর্ট হইতে হঠাৎ লীলা ও তাহার স্বামীকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। মালতী তখন ড্রইংরুমে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিলেন। তাহারা তিনজনে আসিয়া গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকিতে মালতী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "কি রে, তোরা হঠাৎ এ সময়? নলিন শুদ্ধ এসেছ, ব্যাপার কি?"

সুবোধ বলিল, "ব্যাপার গুরুতর! কাল রাত্রেই বাবা ফরিদপুরের সেই মুন্সেফ বাবুকে টেলিগ্রাম ক'রেছিলেন, এই মাত্র দেখে এলাম তাঁ'দের জবাব এসেছে—কথাবার্ত্তা একেবারে ঠিকঠাকই হ'য়ে গেছে বোধ হ'ল; তবে পরশু দিন তাঁরা একবার দেখতে আসবেন, এই পর্য্যন্ত।"

মালতী চোখে চশমাটা ভাল করিয়া আঁটিয়া প্রথমে ছেলের মুখের দিকে, তারপর মেয়ের দিকে, তারপর নলিনের দিকে চাহিলেন। তারপর বলিলেন, "তাই না কি?"

লীলা গর্জ্জিয়া উঠিল, "তাই কি! Mammy, don't be a fool. এ বিয়ে কিছুতেই হ'তে দেওয়া হ'বে না।"

মালতী বলিলেন "কেমন ক'রে?"

সুবোধ। সেই কথাই তো ব'লতে এসেছি। আমি আর নলিন এ বিষয়ে পরামর্শ ঠিক ক'রেছি। ইলার চৌদ্দবছরের উপর বয়স হ'য়েছে, সে এখন বাবার সম্মতি না নিয়েই বিয়ে ক'রতে পারে। আমাদের বারের যতীশ মিত্তির—a fine chap, তাকে ব'লে আমি রাজি ক'রেছি। আমি খুব গোপনে তাঁ'র সঙ্গে ইলার সিভিল ম্যারেজ দিয়ে ফেলবো। তা হ'লেই বাবা একেবারে বোকা বনে যাবে।"

মালতীর বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই ছেলে এবং এই মেয়ের উপর যে তাঁহার স্বামী সন্তুষ্ট নন, তাহার আর বিচিত্র কি? ছেলে এবং মেয়ের কথায় তিনি আজ মর্ম্মাহত হইলেন; তাঁহার স্বামীর মনের ভিতরকার দুঃখটা আজ তিনি প্রথম আয়ত্ত করিতে পারিলেন। তবু তিনি শান্ত ভাবে বলিলেন, "তোমরা অবশ্য জান, তোমাদের বাবা তা'তে কি ভয়ানক অসন্তুষ্ট হবেন?"

সুবোধ বলিল, "অসন্তুষ্ট হ'বেন দু'চার দিন, তার পর সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

মালতী। কিন্তু, যদি ঠিক না হ'য়ে যায়, যদি তিনি এই অপমানের পর আমাদের সবশুদ্ধ বাড়ী থেকে বের ক'রেই দেন, তবে কি হ'বে—

লীলা বলিল, "Nonsense, বাবার যদি তেমন রাগ থাকতো, তবে আজ আমরা ভিখারী হ'য়ে না খেয়ে ম'রতাম—সে ভয় ক'রো না মা!"

মালতীর রাগ আরও বাড়িয়া চলিল; তিনি বলিলেন, "একবার মাফ ক'রেছেন ব'লেই যে বার বার মাফ করবেন, এমন কি কথা আছে? তা ছাড়া সব দিক দেখা দরকার? ধর, যদিই বের করে দেন—চাই কি যদি ১০০৲ কি ২০০৲ টাকা মাসহারা দিয়েই দেন, তবে কি উপায় হবে বল?"

নলিন এতক্ষণে কথা বলিল, "দেখুন, অত ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে এ সব তাড়াতাড়ির কাজে চলে না। এ বিপদ কেটে গেলে সে সব কথা পরে ভাবা যাবে এখন।"

মালতী বলিলেন, "সময় থাকবে কি? আর তা' ছাড়া তিনি না হয় শাস্তি নাই দিলেন, তাঁর মনে যে এতে খুবই কষ্ট হ'বে সেটা তো বুঝতে পারছো। সেটা কি করা উচিত হ'বে?"

লীলা হাসিয়া উঠিল; বলিল "মা, তুমি দেখছি ভীষণ Sentimental হ'য়ে উঠ্‌লে!"

মালতী একবার কঠোর দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিলেন, তার পর শান্ত ভাবে বলিলেন, "তোমরাই বা কম সেন্টিমেণ্টাল কিসে। কি বিয়ে হয়ে হ'চ্ছে, জামাই কেমন, কিছু জান না শোন না, অমনি ইলার দুঃখে তোমাদের প্রাণ কেঁদে অস্থির হ'য়ে উঠলো। ছেলেটা কি করে, খোঁজ নিয়েছ কি?"

সুবোধ বলিল, "যাই করুক না কেন, সে তো মুন্সেফের ছেলে! তোমার ইলা কি মুন্সেফের বাড়ী গিয়ে হাঁড়ি ঠেলবার যোগ্য!"

মালতী শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এই হাতে আমিও হাঁড়ি ঠেলেছি; তোমার বাবা চিরদিনই বড়লোক ছিলেন না। আর তা ছাড়া মুন্সেফের বাড়ী হ'লে হাঁড়ি ঠেলতে হ'বে কে বল্লে? আর সে ছেলের বাবা যে মুন্সেফ, তা' ঠিক জান কি?"

"ওঃ সে নিশ্চয়! আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি" বলিয়া পিতার বসিবার ঘরে গিয়া সুবোধ একখানা সিভিল লিষ্ট লইয়া আসিল। কিন্তু সিভিল লিষ্ট খুঁজিয়া দেখা গেল কালীভূষণ মুখার্জ্জি এডিশন্যাল জজ।

মালতী হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "যা'ক, মুন্সেফ তো এডিশন্যাল জজে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ছেলেটি কি করে জান কি?"

লীলা বলিল "ছেলেটা শুনেছি পড়ে। বি,এ বোধ হয় পাশ ক'রে থাকবে। দেখ না সুবোধ একবার ক্যালেণ্ডারখানা।" সুবোধ ছুটিয়া গিয়া ইউনিভারসিটি ক্যালেণ্ডার লইয়া আসিল। কিন্তু কাহারও মনে হইল না ছেলেটার কি নাম। তখন লীলা বুদ্ধি করিয়া তাহার পিতার টেবিলের উপর হইতে একখানা ভিজিটিং কার্ড আনিয়া বলিল, "সতোশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

তখন ক্যালেণ্ডার খোঁজা আরম্ভ হইল। দেখা গেল এফ-এ, পরীক্ষায় সে দ্বিতীয় আর বি-এ, ফিজিক্সে প্রথম হইয়াছে। মালতীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সুবোধ ও নলিন মাথা চুলকাইতে লাগিল।

মালতী বলিলেন, "মিত্তির না এখান থেকে বি-এ, ফেল ক'রে বিলাত গিয়েছিল? তার বাপ না ডেপুটী ছিল?"

সুবোধ মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে বলিল, "তা' হ'লে কি হয়, বারে সে বেশ উন্নতি ক'রছে, আর সে fine fellow."

লীলা বলিল, "আর তোমাদের সতোশ না কি, তা'কে আমি দেখেছি—awkward, গাঁওয়ার, একেবারে একটা জন্তু।"

নলিন বলিল, "তা' ছাড়া যতীশ আমাদের setএর। ইলার যদি আমাদের সেটের বাইরে বিয়ে হয়, তবে সে like a fish out of water বোধ ক'রবে।"

মালতী বলিলেন, "সে কথা মানি। কিন্তু একটা কথা ভেবেছ কি? ইলার মতটা একটা ভাববার কথা নয় কি?"

সুবোধ বলিল, "কেন, ইলার কি এ বিয়েতে মত আছে না কি?"

মালতী বলিলেন, "জানি না; কিন্তু সেটা একবার তা'কে জিজ্ঞাসা করাও দরকার তো? তার যে খুব কষ্ট হবেই, এ কথা তোমরা মেনে নিচ্ছ—তার চেয়ে তা'কে একবার জিজ্ঞাসা ক'রলে ভাল হয় না?"

সেই সময় ইলা স্কুল হইতে ফিরিতেছিল, তাহার পায়ের শব্দ শুনিয়াই মালতী এ কথা বলিয়াছিলেন। মালতী

তখন তাহাকে ডাকিলেন। সে ঘরে আসিতেই মালতী তাহাকে নিজের পাশে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইলা, তোর বিয়ের কথা হচ্ছে জানিস্, সত্যেশ মুখুয্যে ব'লে একটি ছেলের সঙ্গে"—

ইলা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "জানি।" মালতী বলিলেন, "জানিস্; কে বল্লে তোকে?" ইলা বলিল, "বাবা।"

সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। ইলা মায়ের হাত ধরিয়া বলিল, "মা, তুমি আমার উপর রাগ করো না, আমি বাবাকে আমার সম্মতি দিয়েছি।"

মালতী তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন, বলিলেন, "মোটেই রাগ করি নি মা, বরং সুখী হ'য়েছি।"

লীলা চটিয়া উঠিল; বলিল, "মা তোমরা কি সবই ক্ষেপে উঠলে না কি? ইলা ছেলেমানুষ, ও কি বোঝে? হাঁরে নেকী, বড় যে বিয়ে ক'রতে চাচ্ছিস, দেখেছিস সে হাঁদারামকে?"

ইলা, শান্ত গম্ভীর চক্ষু দুটী ভগিনীর দিকে ফিরাইল, তাহার উপর ভ্রূকুটির একটা ক্ষীণ রেখা ছিল। কিন্তু সুধু শান্ত ভাবে বলিল "দেখেছি।"

"দেখেছিস্, তবু ব'লছিল বিয়ে ক'রবি, সেটা যে একটা আস্ত জন্তু।"

ইলা খুব শান্ত ভাবে বলিল, "কেন? তিনি দেখতে তো মিষ্টার ঘোষের চেয়ে কুৎসিৎ নন।" সে তা'র বুকের ভিতর একটা তীব্র জ্বালা বোধ করিতেছিল।

লীলা গর্জ্জিয়া উঠিল;—কেন না নলিন যে কদাকার এবং সত্যেশ যে সুপুরুষ, তাহা অত্যন্ত সত্য। কিন্তু সুবোধ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "দেখ্ ইলা, তুই ছেলেমানুষ, কিছু বুঝিস না; এ বিয়ে হ'লে তোর কি ক'রতে হ'বে জানিস?" ইলা বলিল "আমি না জানতে পারি, কিন্তু বাবা তোমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন।"

সুবোধ। বাবার কথা ছেড়ে দে। তিনি তো দিন-রাত এখন আমাদের নিন্দা ক'রতেই আছেন। তুই রান্না ক'রতে পারবি? রান্নাঘর গোবর দিয়ে নিকিয়ে সেই গোবরের উপর কলাপাতা রেখে ভাত খেতে পারবি? শ্বশুরের ঘাঁটা ভাত-তরকারী তা'র পাতে ব'সে খেতে পারবি? অন্দরে বন্ধ হ'য়ে সাত হাত ঘোমটা টেনে ব'সে থাকতে পারবি? ক্ষেপী, ঝোঁকের মাথায় বিয়ে ক'রবো ব'ললেই তো হ'ল না, এ বিয়ের মানেটা কি একবার ভেবে দেখতে হয়?

ইলা একটু হাসিয়া বলিল, "পারি না পারি দেখে নিও!" তা'র পর বলিল, "হাঁ দাদা, তোমায় কে খবর দিলে যে আমার এই সব ক'রতে হবে?"

সুবোধ। হবে না? হিঁদুর বাড়ীতে ঘরে-ঘরে এই সব ক'রতে হয়। তায় আবার সে সদরালার জাত—কৃপণের শেষ!"

ইলা। তোমরাও তো হিঁদু, তবে না হয় বিলেত ঘুরে একটু শুদ্ধ হ'য়ে এসেছ। বিয়ে হ'লে না হয় আমার স্বামীটিকেও শুদ্ধ ক'রে নেওয়া যাবে এখন!

সুবোধ। হ'য়েছে! সে মুন্সেফ বাবু ছেলেকে বিলেত পাঠালে কিনা?

ইলা। আর যদি তিনি নিজেই পাঠাবার প্রস্তাব ক'রে থাকেন?

মালতী বলিলেন, "তাই না কি?"

ইলা বলিল, "হাঁ মা, তিনি বিলেত যাবার জন্যে প্রস্তুত, কেবল—" বলিয়া মাথা নীচু করিল।

সুবোধ একটা সিগারেট লইয়া এতক্ষণ নাড়াচাড়া করিতেছিল; এইবারে সেটায় আগুন ধরাইল, তার পর হাত-পা ছড়াইয়া ধূমোদ্গীরণ করিতে লাগিল। ঘোষ সাহেব উঠিয়া তাহার কাছে আসিলেন, সুবোধ তাহার সিগারেট কেসটি খুলিয়া ধরিল। মিঃ ঘোষ দুইটি সিগারেট লইয়া একটি নিজের মুখে পুরিলেন, একটি লীলাকে দিলেন। তিনজনে নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিলেন। মালতী ইলাকে উপরে পাঠাইয়া দিলেন, নিজেও কাপড় ছাড়িতে গেলেন।

ঘোষ বলিলেন, "I say Subodh, that's a knock-down blow."

সুবোধ। যাই হ'ক, আমি এটা মোটেই পছন্দ ক'রতে পারছি না। আর, তা' ছাড়া it was unspeakably mean of dad to let us down like this. এত ভাল যদি ছেলে, এত সব বন্দোবস্ত হ'য়েছে, তবে আমাদের সে কথা বল্লে দোষ ছিল কি?"

লীলা বলিল, "It is mean. তা' ছাড়া যতই যা

বল, আমি কিছুতেই তা'কে পছন্দ ক'রতে পারবো না। আমি যে দেখেছি, সে একটা অদ্ভুত জানোয়ার!"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় সিগারেট নিঃশেষিত হইলে সকলে খাইবার ঘরে গিয়া বসিল। সেখানে মালতী ও ইলা আসিলে খানসামা চা দিয়া গেল।

মালতী বলিলেন, "তাই তো সুবোধ, তোমার প্লটটা মাঠে মারা গেল!' এখন যতীশ মিত্তিরকে কি ব'লে বোঝাবে বল? বেচারার হৃদয় ভেঙ্গে যাবে না তো?"

সুবোধ বেশ একটু চটিয়া বলিল, "He won't care a two-pence for a silly girl like that!"

এমন সময় চ্যাটার্জ্জী সাহেবের গাড়ীর ঘণ্টা শুনা গেল। তিনি আজ খুব সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিয়া সটান খানার ঘরে গিয়া বলিলেন, "তোমরা সবাই এখানে আছ, ভালই হ'য়েছে! ইলার বিয়ে সতোশ মুখুয্যের সঙ্গে ঠিক হ'য়ে গেছে। দিন দশেক মাত্র সময় আছে, এর ভিতর সব বন্দোবস্ত ক'রতে হ'বে। তোমরা হয় তো কেউ এ বিয়ে পছন্দ ক'রবে না, ইলা ছাড়া; কিন্তু যদি তা' না কর, তবে স্পষ্ট বল। আমাকে একাই সমস্ত কাজ ক'রবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'বে। আমি তোমাদের কাছে, তা হ'লে শুধু এই অনুরোধ ক'রবো যে, বিয়েটা না হ'য়ে যাওয়া পর্য্যন্ত তোমরা গিয়ে দার্জ্জিলিঙ্গে থেকো।"

মালতী মাথা নীচু করিয়া চা খাইতে লাগিলেন। তাঁহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। ইলা তাঁহার দিকে চাহিয়া বুঝিল; সে বাবাকে বলিল, "বাবা, এই মাত্র সেই কথা হচ্ছিল, মা ব'লছিলেন তিনি ভারী খুসী হ'য়েছেন।"

চ্যাটার্জ্জী সাহেব এক মুহূর্ত্ত অবাক্ হইয়া রহিলেন; তার পর মালতীর পাশের চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, "তাই না কি মালতী?"

মালতী আর পারিলেন না, টেবিলের ভিতর মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতে সুরু করিলেন। চ্যাটার্জ্জী আদর করিয়া তাঁহার মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আমি তোমার উপর অন্যায় ক'রেছি মালতী, আমাকে ক্ষমা করো।"

মালতী চুপ করিয়া রহিলেন। চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "নলিন, লীলা, বিয়েটা না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের একটু গা ঢাকা দিতে হ'বে; কারণ, তোমাদের সঙ্গে বেশী মাখামাখি হ'লে হিন্দুমতে বিয়ে হওয়াটা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াবে। আমি বলি, তোমরা মাসখানেক দার্জ্জিলিঙ্গে গিয়ে থাকো। আর সুবোধ, তুমি কি চাও, তুমি আমাকে সাহায্য ক'রতে প্রস্তুত আছ?"

সুবোধ। আছি।

(ক্রমশঃ)

বিসূচিকা ও শিশুমড়ক *

[শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম্-বি,]

হিমালয়ের উত্তরে কর্কটী নামে একটা ভয়ঙ্কর রাক্ষসী ছিল। তার পা দুটো ছিল তমালগাছের মতন, নখ কুলোর মতন, আর রং কাজলের মতন। লম্বা-লম্বা হাত দুটো যখন উঁচু করত, মনে হত সূর্য্যকে খেয়ে ফেল্‌বে; মানুষের হাড়ের মালা পরে বেতালদের সঙ্গে যখন নাচ্‌ত, মনে হত পৃথিবীটা বুঝি রসাতলে যাবে। তার ক্ষিদে রাত্রিদিন জল্‌ত 'যেমন রাবণ রাজার চুলি'। ক্ষিদের নিবৃত্তি কিছুতেই হত না। একদিন তার এত ক্ষিদে পেয়েছিল, সে বসে-বসে ভাব্‌লে যে, সমুদ্র যেমন নদীগুলোকে গ্রাস করে, এই জম্বুদ্বীপের সমস্ত জীবগুলোকে এক নিঃশ্বাসে তেমনি যদি গ্রাস করি, তা হলে বোধ হয় ক্ষিদের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হতে পারে। কিন্তু এককালে সকল জীব খেয়ে ফেলাও ত সম্ভব নয়? যারা নানা রকম ঔষধ, মন্ত্র-তন্ত্র, সদাচার সদ্ব্যবহার জানে, তাদের ত খেতে পারি না। যারা অনাচারী, তাদের খেতে পারি, কিন্তু আমাকে দেখ্‌লেই ত তারা পালাবে। কি করি? তপস্যা করা যাক্; তপস্যায় কি না পাওয়া যায়? সেকালে তপস্যা করে যে যা চাইত, দেবতারা তাই দিতেন। কর্কটীর হাজার বছর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা যখন বর

* ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাসের স্ত্রী কর্ত্তৃক মহিলা উদ্যানে প্রবন্ধ পঠিত এবং ছবি প্রদর্শিত।

দিতে উপস্থিত, সে প্রার্থনা করলে, "আমি যেন সূক্ষ্ম অদৃশ্য ছুঁচ হয়ে মানুষের ভিতর ঢুকে তাকে গ্রাস করে ফেলতে পারি"। ব্রহ্মা বললেন্ "তাই হোক্। তুমি অতি সূক্ষ্ম ছুঁচ হয়ে, যারা খারাপ জিনিস খায়, খারাপ কাজ করে, খারাপ দেশে থাকে, তাদের ভিতরে ঢুকে তাদের নাশ করবে।" তারা তোমায় দেখতে পাবে না; কিন্তু তুমি তাদের শরীরে ঢুকবার পর বিসূচিকা প্রভৃতি নানা রকম রোগে তাদের কাবু করে ফেলবে; তখন তুমি অনায়াসে সব গিলে ফেলতে পারবে। কিন্তু যারা শুদ্ধাচারে থাকবে, তাদের কিছুই করতে পারবে না। আজ হতে তোমার নাম হল বিসূচিকা।" এই কথা বলবামাত্র কর্কটীর বিন্ধ্য পর্ব্বতের মতন বিশাল দেহটা ক্ষীণ হয়ে-হয়ে একটা ছুঁচের মতন হয়ে গেল; এত ছোট হল যে, চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। এই সূক্ষ্ম দেহ পেয়ে সে বেড়াবার উপযুক্ত স্থান খুঁজতে লাগল। যে সব জায়গায় নদী শুকিয়ে গিয়েছে, ছোট-ছোট নদী-নালা আছে, পুকুরের জল দুর্গন্ধ হয়েছে, বাতাস নানারকম দুর্গন্ধ বয়ে নিয়ে আসচে, মাছিতে-মাছিতে ঘর ভরে গিয়েছে, সেই সব দেশে তার অনেক শিকার যুটেছিল। এই মায়াবী রাক্ষসী খুব সূক্ষ্ম পরমাণু হয়ে কখনও শ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়ে, কখনও খাবারের সঙ্গে মুখ দিয়ে, কখনও বা অন্য পথ দিয়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে নানারকম রোগ জন্মালে; আর যাকে ইংরাজীতে বলে হার্ট, সেই হৃদ্‌পদ্মকে জখম করে হাজারে-হাজারে মানুষ নষ্ট করতে আরম্ভ করলে। রাক্ষসীকে কেউ চোকে দেখে না, কিন্তু তার গ্রাসে পড়তে লাগল এক সঙ্গে হাজার হাজার। এই রকমে মহামারীর সূত্রপাত।

মহামারী কাকে বলে? এক সময়ে অনেক লোক কোন একটী রোগে মারা গেলে তাকে বলে মহামারী। যে সব রোগে এই রকম মড়ক হয়, সে সব রোগ ছোঁয়াচে। একজনের থেকে আর একজনের শরীরে ছোঁয়াচে রোগ কেমন করে ঢোকে? রোগের একটা যদি বড় আকার থাকত, যেমন মস্ত বড় আব কি ফোড়া, তা হলে লোক আগে থাকতে সাবধান হয়ে তার চিকিৎসা করায়। সাপের কামড়ে, বাঘ বা ডাকাতের হাতে মরণ হতে পারে; তাই মানুষ ঐ সব থেকে দুশো হাত দূরে থাকে। কিন্তু যাদের দরুণ ভয়ঙ্কর মড়ক হয়, তারা ঐ কর্কটী রাক্ষসীর মতন এত সূক্ষ্ম যে, তাদের কেউ চোখে দেখতে পায় না, কিন্তু এমন ভাবে শরীরে ঢুকে পড়ে, যাতে মরণের হাত থেকে মানুষ প্রায়ই নিস্তার পায় না। ব্রহ্মা জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, আবার যারা তাঁর বিধি মেনে চলে না, বোধ হয় তাদের নাশ বা সাবধান করবার জন্য ঐ রোগগুলিকে কর্কটীর মতন সূক্ষ্ম করে দিয়েছেন, যাতে তারা সহজে অবাধে শরীরে ঢুকতে পারে।

রোগের এই সূক্ষ্ম বীজগুলি শরীরে ঢুকে রক্তবীজের মতন বাড়তে থাকে। এদের শাদা চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ (একরকম দুরবীণ) যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয়। এরা যখন পোয়াতিকে ধরে, প্রায়ই ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জ্জন দিতে হয়; পোয়াতি বাঁচলেও ছেলে পেটেই মারা যায়।

ওলাউঠা, যাকে কবিরাজেরা ঐ বিসূচিকা রাক্ষসীর নাম থেকেই বিসূচিকা বলেন, সেই রোগও এক রকম মহামারী। এই রোগে বাঙ্গালা দেশে ১৯১৬ সালে সত্তর হাজারের বেশি লোক মারা গিয়েছে। তার ভিতর প্রায় তেত্রিশ হাজার স্ত্রীলোক। এদের ভিতর ক'হাজার পোয়াতি ছিল, আর ক' হাজার ছেলে নষ্ট হয়েছে, তার কি কেউ খোঁজ নিয়েছে? আহা, মনে পড়চে সেই ঝামাপুকুরের ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী। পোনর বছরের কথা। মেয়েটী সাত মাসের পোয়াতি। বাপ-মায়ের কত সাধ-আহ্লাদ দুমাস পরে সাধ দেবে, নাতীর মুখ দেখবে। হঠাৎ কোথা থেকে বিসূচিকা রাক্ষসী এসে তাকে ধরলে। আজকাল শিরা কেটে ওষুধ ঢুকিয়ে যেমন তড়ি-ঘড়ি ভাল করা হয়, সে চিকিৎসা তখনও সকলে ভাল রকম জানত না। রাত বারোটার সময় মেয়েটা মারা গেল। আমাদের দেশের নিয়ম পোড়াবার আগে দুজনকে দু-ঠাঁই করা দরকার। শ্মশানে নিয়েও পেট কেটে ছেলে বার করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার ডাকলেন, ছেলে বের করে নিয়ে আসবার জন্য। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! মেয়েটী নীল হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু গা গরম। চারিদিকে কান্নার রোল। ডাক্তার হাত দিয়ে ছেলে টেনে নিয়ে এলেন। ছেলে অনেক আগে মরে গিয়ে শক্ত-মক্ত হয়েছিল।

এই রকমে বিসূচিকা-রাক্ষসীর পেটে বছর-বছর কত পোয়াতি আর ছেলে যে যায়, তা কে বলতে পারে? অথচ

এই রাক্ষসীকে মারবার অস্ত্র সকলের কাছেই আছে, আর সহজে পাওয়াও যায়।

বিসূচিকা রাক্ষসীর আকার বাস্তবিকই ছুঁচের মতন, তবে ডাক্তারি ছুঁচ।
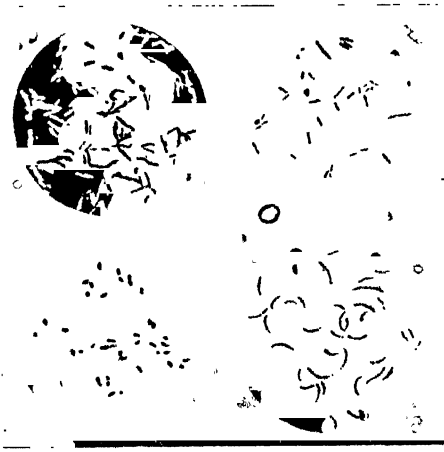
বিসূচিকার জীবাণু

ঐ দেখুন প্রথম ছবি। কলিকাতার কৃষ্ণবাগান খুব বড় বস্তি। আগে ছিল মাঝখানে প্রকাণ্ড পুকুর, আর চারিদিকে অনেক খোলার ঘর। অনেকগুলি শ্বেতখানা ছিল, যার ময়লা জল এসে পুকুরে পড়ত। প্রত্যেক বছর সে বস্তির কোন লোক কোন মেলায় গিয়ে সেখান থেকে ওলাউঠা নিয়ে আসত। তার ময়লা কাপড়-চোপড় ঐ পুকুরে কাচা হত। সেই জলে মুখ ধুয়ে, স্নান করে, বা বাসন ধুয়ে, সেই বাসনে ভাত খেয়ে কত লোকের ওলাউঠা হত। এই রকমে পুকুরের চারিধারে ঘরে-ঘরে ওলাউঠা রোগীর চীৎকার, আর হরিসংকীর্ত্তনের ধুম। কিছুতেই ওলাউঠা থামত না। ডাক্তার সেই পুকুরের জল পরীক্ষা করে তার ভিতর ঐ ছুঁচের মতন বিসূচিকা রাক্ষসীকে দেখতে পেলেন। কৃষ্ণবাগানে স্নান করার জন্য যে জলের হাউস্ ছিল, সেই জলে ঐ ছবির মতন ওলাউঠার বীজ পেয়ে মিউনিসিপালিটীর হেল্থ অফিসারকে লিখলেন যাতে পুকুরটী বুজিয়ে দেওয়া হয়, আর জলের হাউসে যাতে কাপড় না কাচতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। দমকল দিয়ে পুকুরের জল তুলে ফেলে, পুকুর বুজিয়ে দেওয়া হল; সেই থেকে আর কৃষ্ণবাগানে বিসূচিকা রাক্ষসীর কোন উপদ্রব নাই। সঙ্গে-সঙ্গে রোগীদের ময়লা কাপড়-চোপড় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; আর যে সব জায়গায় রোগীর ময়লা পড়েছিল, সে সব জায়গায় ফিনাইল, রস-কর্পূর প্রভৃতি বিষ-নাশক ঔষধ ঢেলে দেওয়া হয়েছিল; তাইতে আর মড়ক বাড়্তে পায় নাই।

১৯০৮ সালে যে বছর অর্দ্ধোদয় যোগ হয়, কলিকাতায় লক্ষ লক্ষ লোক বাহিরে থেকে এসেছিল; কিন্তু জলের ও বাসার ভাল ব্যবস্থা করে দেওয়াতে সে বছরে মোটেই মড়ক হয় নাই। তার আগে অর্দ্ধোদয় যোগের সময় কলিকাতায় প্রায় সতর শ লোক ওলাউঠায় মারা গিয়েছিল।

এ রকম দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যেতে পারে। বিসূচিকা রাক্ষসীকে মারবার প্রধান অস্ত্র ৩টী আগুন, আর ঔষধ। যে সময় গ্রামে মড়ক হয়, জল ফুটিয়ে খেলে আর রাক্ষসীর সাধ্য নাই কোন অত্যাচার করে। আগুনে লক্ষ লক্ষ রাক্ষস-রাক্ষসী এক সঙ্গে পুড়ে মারা যায়। রোগীর ময়লা কাপড়-চোপড়গুলি পুড়িয়ে ফেল্তে হয়; রোগী বেঁচে থাক্তে কাপড়-পোড়ান অলক্ষণ বলে; কাপড় জলে আধ ঘণ্টা ধরে ফুটিয়ে নিলেও চলে। আর যে যায়গায় ময়লা পড়ে, সেখানে ফিনাইল কি রসকর্পূরের জল ঢেলে দিলেই রাক্ষসী মারা যায়। ডাক্তারখানায় রসকর্পূরের চাক্তি পাওয়া যায়। এক পাইণ্ট (আড়াই পোয়া) জলে এক চাক্তি গলালে ঐ জল সব রকম বিষ নষ্ট করে। কিন্তু সাবধান, কারো মুখে যেন যায় না, গেলে মারা যেতে পারে; আর বাসনে যেন লাগে না, লাগ্লে বাসন নষ্ট হয়।

কত পুকুরে ওলাউঠা বিষ থাকে; সেই জল গোয়ালারা দুধের সঙ্গে যদি মেশায়, সেই দুধে হাত দিয়ে সেই হাত মুখে দিলে কলেরা হয়। ঐ বিষ-মাখান ছানা দিয়ে যে সন্দেশ তৈয়ার হয়, সেই সন্দেশ খেয়ে কত লোকের ওলাউঠা হয়েছে। সেই জন্য ওলাউঠা-মড়কের সময় বাজারের মিঠাই খাওয়া নিষেধ।

সকলে চেষ্টা করলে গ্রামে এমন একটা পুকুর বা দীঘী রাখা যায়, যাতে কেউ স্নান করবে না, কাপড় কাচ্বে না। পঞ্চাশ ফুটের ভিতর শ্বেতখানা রাখ্বে না। সেই জল কেবল খাবার জন্য ব্যবহার হবে।

ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী যেমন মশার আশ্রয় নিয়ে রোগ ছড়ায়, তেমনি বিসূচিকা-রাক্ষসী মাছির পদসেবা করে নিজের আশ্রয় জোটায়। একটী ছেলেকে ঝিনুক বা পল্‌তে দিয়ে দুধ খাইয়ে খানিকটে দুধ মাটিতে রেখে দিয়েছে। পাশের বাড়ীতে একটা কলেরা রোগী। তার ময়লাতে যে সব মাছি বসেছিল, তারা এসে ঐ ছেলের দুধের বাটীতে আর ছেলের মুখে বসেছে। মাছি পায়ে করে ওলাউঠার বীজ নিয়ে এসেছে, ছেলে জিভ্ দিয়ে ঐ মাছি তাড়াচ্চে, আর মায়ের দেওয়া ঐ বিষের বাটী থেকেও ছেলেকে দুধ খাওয়ান হচ্চে। একদিন পরেই ছেলেটাকে বিসূচিকা রাক্ষসী গ্রাস করবে। হায় হায়! মা যদি জানত, ঐ বাটীতে বিষ রয়েছে, তা হলে কি আর নিজ হাতে ছেলেকে বিষ খাওয়াত? তাই বলি, মাছি যাতে খাবারে না বসে, সে বিষয়ে সাবধান। ময়রাদের দোকানে মাছি নিবারণের জন্য কাঁচের আল্‌মারি থাকে বটে, কিন্তু ক'জনই বা খাবার তাতে রাখে। আর কেই বা দেখে, ভাল রকম করে সব খাবার আলমারিতে রাখে কি না? ঘর-দোর এমন পরিষ্কার রাখা উচিত যাতে মাছির উপদ্রব না থাকে।

যা হোক্, বিসূচিকা-রাক্ষসীকে মারা খুব সহজ। জল আর খাবার সম্বন্ধে সাবধান হলেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে মুখের ভিতর দিয়ে ঢোকে, হাওয়ায় চল্‌তে পারে না। যদি মড়কের সময় জল ফুটিয়ে খাওয়া যায়, বাজারের খাবার বাড়ীতে আন্‌তে না দেওয়া হয়, রোগীকে সেবা করে সেই হাত রসকর্পূরে না ধুয়ে কিছু খাওয়া না হয়, ময়লা কাপড় পুকুরে না কেচে জলে সিদ্ধ করা হয় কি ঔষধে ডুবিয়ে রাখা হয়, মাছি খাবারে বা মুখে বস্‌তে না দেওয়া হয়, নর্দ্দমায় খেতখানায় ফিনাইল ঢালা হয়, তা হলে বিসূচিকা-রাক্ষসী পোয়াতি আর শিশুদের ত্রিসীমায়ও আস্‌তে পায় না।

আপনারা গ্রামে গিয়ে প্রথমেই ভাল জলের ব্যবস্থা করবেন। গ্রামে-গ্রামে যাতে একটা ভাল পুকুর ভাল অবস্থায় থাকে, তার চেষ্টা করবেন। ওলাউঠার ঠাকুর ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডী। হিন্দু মুসলমান এক হয়ে তাঁর পূজা করে থাকেন। আশা করি হিন্দু মুসলমান এক হয়ে দেশ থেকে ওলাউঠা দূর করবেন।

অর্থ-বিজ্ঞান

[শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত এম-এ বি-এল]

(২)

অভাবের প্রকৃতি।

ব্যষ্টি-ভাব মানুষের অভাবসকল সীমাবিশিষ্ট এবং কোন না কোন পরিমিত সামগ্রীর ভোগ-ব্যবহারেই তাহাদের নিবৃত্তি হয়। এই তত্ত্বের প্রকৃত অর্থ কি, তাহার আলোচনা পশ্চাৎ হইবে।

মানুষের বিভিন্ন অভাবের এবং তাহার পরিতৃপ্তি-সাধক বস্তুর পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহা হয় প্রতিযোগী (Compititive) সম্বন্ধ; না হয় সমবায়ী বা সহযোগী (co-existing) বা পূরক (complementary)

(ক) কোন বস্তু-বিশেষের জন্য চিত্তে অভাব বোধ জন্মিলে, অপর কোন বস্তুর দর্শন বা স্মরণে পূর্ব্ব অভাব দূর হইয়া এই অভিনব বস্তু পাইবার বাসনা জাগ্রৎ হইয়া পড়ে। পরস্পর দুই অভাবের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ থাকিলে,

তাহাকে প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী সম্বন্ধ বলা যায়। এইরূপ প্রতিযোগী অভাবের একটী অপরটীকে হয় নষ্ট করে, না হয়, তাহাদের উভয়েরই কতক-কতক থাকিয়া যায়। কেহ থিয়েটার দেখিতে রওয়ানা হইয়া পথে বায়স্কোপের খেলা দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। বালক পয়সা লইয়া কমলা আনিবার জন্য বাজারে যাইয়া কুল দেখিয়া, হয় তাহা, না হয় ত উভয়েই কিছু কিছু লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যেমন এরূপ সম্বন্ধযুক্ত অভাবকে প্রতিযোগী বলা হয়, তেমন যে যে বস্তুর মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী বস্তু বলা যায়।

(খ) আবার এমনও কতকগুলি বস্তু আছে যে, তাহাদের একটার অভাব-বোধ জাগ্রৎ হইলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সহযোগী ও সমবায়ী অন্যান্য বস্তুর অভাব বোধেরও অভ্যুদয় হয়। একখানি গাড়ী খরিদ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ও তাহার অন্যান্য আসবাব-পত্রের অভাবানুভূতি জন্মে; কেন না ঘোড়া ও তাহার আসবাব পত্র ছাড়া গাড়ী অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তেমন মোটার গাড়ীর সঙ্গে-সঙ্গে পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির অভাবও অনুভূত হয়। এইরূপ বিভিন্ন অভাবের সহযোগিতাকে সহযোগী বা সমবায়ী সম্বন্ধ বলা যায় এবং যে যে বস্তুর মধ্যে এইরূপ সহযোগিতা থাকে, তাহাদিগকে সহযোগী বস্তু বলা হয়।

(গ) কোন কোন অভাবের মধ্যে এমনও সম্বন্ধ আছে যে, তাহাদের প্রশমনযোগ্য কোন একটা বস্তুবিশেষ দ্বারা তাহাদের সম্পূর্ণ তৃপ্তি সাধিত হয় না; আরো কোন কোন বস্তুর অভাব-বোধ থাকিয়া যায়। যেমন এক প্যায়ালা চার সঙ্গে একটু দুধ, একটু চিনি না হইলে তাহার স্বাদ ও তৃপ্তি পূর্ণ হয় না। উহারা পরস্পর-পরস্পরের অভাব পূর্ণ করে বলিয়া তাহাদিগকে পূরক-সম্বন্ধযুক্ত বলা হয়। যে যে বস্তুর মধ্যে এইরূপ পূরক (complementary) সম্বন্ধ থাকে, তাহাদিগকে পূরক বস্তু বলা যায়।

আমরা এই যে বস্তু ও অভাবের মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধের উল্লেখ করিলাম, তাহা বস্তু বা অভাবের পরস্পরের মধ্যগত প্রাকৃতিক কোন গুণ বা সম্বন্ধ নহে। মানুষের ব্যক্তিগত রুচি, অভ্যাস, শিক্ষা, দীক্ষা, সামাজিক প্রথা ও নিয়ম অনুসারে তাহাদের ব্যবহারের ফলে এই সকল বিভিন্ন সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। আমরা যে যে বস্তু যে ভাবে ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হই, সেই সেই বস্তুর জন্য আমাদের যে সকল সংস্কার গড়িয়া উঠে, তাহাকেই ঐ সকল বিভিন্ন সম্বন্ধ প্রকাশে শ্রেণীভেদ করা যায়। আমাদের ব্যবহার ও সংস্কারের ফলে এই সকল সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়; বস্তুর নিজস্ব কোন গুণের জন্য সেই সকল সম্বন্ধের অভ্যুদয় হয় না! আর দেশ, কাল, পাত্র এবং সামাজিক প্রথা ও নিয়ম ভেদে বহু জিনিসের বিভিন্ন সমবায় বা সংযোগে এই সকল সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্বন্ধ ও সম্প্রদায়-ভেদে তাহাদের বহু বিচিত্রতা লাভ হয়।

অভাব-পূরণযোগ্য বস্তুর প্রকার ভেদ, এ পর্য্যন্ত আমরা বিশেষ ভাবে অভাবের দিক লক্ষ্য করিয়াই আলোচনা করিয়াছি; সম্প্রতি বস্তুর দিক ধরিয়া তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ করিতে চেষ্টা করিব। অসভ্য জাতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা যে অভাবসমূহের পর-পরতা প্রদর্শন করিয়াছি, তদ্দ্বারা সমাজ-বিবর্ত্তনের ক্রম ও মানুষের প্রাথমিক অভাব কি কি, তাহাই মাত্র উপলক্ষিত হয়; কিন্তু অভাবের কোন শ্রেণী-বিভাগ হয় না এবং হইতে পারে না। সমাজ-বিবর্ত্তনের ধারার ক্রম আমাদের এই প্রবন্ধের বিশেষ আলোচ্য নহে। বর্ত্তমান সভ্যাবস্থায় মানুষের যে অনন্ত অভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাই আমাদের বিশেষ আলোচ্য; কিন্তু তাহাদিগকে কোন শ্রেণী-ভেদে বিভক্ত করা সম্ভবপর নহে। বিশেষ এই বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রয়োজনে সেরূপ কোন শ্রেণী-বিভাগেরও বিশেষ প্রয়োজন নাই। অভাব-পূরণযোগ্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; সুতরাং সকল বস্তুর একটা শ্রেণী-বিভাগ হওয়া আবশ্যক। Prof Chapman মোটামুটি ভাবে নিম্নলিখিত রূপ শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। আমরা তাহারই অনুসরণ করিলাম।

প্রথমতঃ, জীবন-ধারণযোগ্য বস্তু। আমাদের নিত্য ব্যবহারের জন্য কতগুলি এমন সামগ্রীর আবশ্যক হয় যে, তাহা না হইলে আমরা প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। মানব-জীবন অন্নগত—অন্নগতপ্রাণাঃ। প্রাণে বাঁচিতে হইলে নিত্য পরিমিত কতকগুলি অন্ন ভক্ষণ করিতেই হয়। জীবন-ধারণযোগ্য বহু জিনিসের আবিষ্কার হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাদের সকলগুলিই যে ব্যবহার

করিতে হইবে, তাহার কোন কথা নাই এবং বাস্তব জীবনে কেহ করেও না। তবে স্থান, কাল ও অবস্থা বিবেচনায় তাহাদের পরিমিত কতকগুলির ব্যবহার করিতেই হয়। এই সকল সামগ্রীকে জীবন-যোগ্য অত্যাবশ্যক বস্তু বলা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, বলকারক বস্তু। কেবল প্রাণে-প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলেই যে হয়, তাহা নহে; দেহের বল-বীর্য্য, কান্তি-পুষ্টি এবং কর্ম্মকরী শক্তি রক্ষা করা এবং উত্তরোত্তর তাহার পরিপুষ্টি সাধন করা একান্ত আবশ্যক। বলকারক বস্তুর ব্যবহার ভিন্ন মানব-দেহের কর্ম্মকরী শক্তি ও কর্ম্মক্ষমতা রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয় না। মানুষের শারীরিক ও মানসিক বল-বীর্য্যই তাহার উন্নতির একমাত্র নিদান। যাহাতে এই শক্তির উপচয় ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আহারাদি করা আবশ্যক।

এই দুই শ্রেণীর বস্তুকেই একযোগে ইংরেজীতে necessities of life বলে। আমাদের ভাষায় তাহাদিগকে জীবনধারণোপযোগী বস্তু বলা যায়।

তৃতীয়তঃ, আরামদায়ক বস্তু। মানবদেহকে নীরোগ ও সুস্থ রাখিতে হইলে, কিছু আরামদায়ক সামগ্রীরও ব্যবহার করার আবশ্যক হয়। কষ্টে বাস করিলে দেহ কষ্ট-সহিষ্ণু ও দৃঢ়বদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু সময়বিশেষ শীতাতপের আতিশয্য হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার কিম্বা তাহাদের প্রভাবে যে সকল ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে, সে সম্ভাবনা নিরস্ত করিবার জন্য, সময়ে সময়ে আরামপ্রদ সামগ্রীর ব্যবহার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর রোগাদির আক্রমণের সময়ে এইরূপ জিনিসের প্রয়োজন স্বতঃই উপস্থিত হয়। দেখা যায় যে, সাধারণ গরীব-দুঃখী লোক সামান্য ব্যারামেও অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, এমন কি সময়ে সময়ে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। তাহারা তাহাদের কঠোর দারিদ্র্যের জন্য কোন প্রকার একটু আরামে থাকিবার সংস্থান করিয়া উঠিতে পারে না। আরামে থাকায় বিশেষ উপকার এই যে, তদ্দ্বারা দেহের বল-বীর্য্য রক্ষিত ও কর্ম্মকরী শক্তির স্ফূর্ত্তি লাভ হয়। তবে এ কথাও ঠিক যে, আরামদায়ক সামগ্রীগুলি তাহাদের মূল্যের অনুপাতে কম ফলপ্রসূ। জীবনধারণ-যোগ্য বস্তুগুলি তাহাদের মূল্যের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা এবং বলকর বস্তুগুলির মূল্য এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী।

চতুর্থতঃ, বিলাস-সামগ্রী (Luxuries of life)। সমাজে এই সকল সামগ্রীর ব্যবহার কৃত্রিম অভাব-বোধের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে ঐই সকল বস্তুর ব্যবহারে কোন প্রকার স্বাভাবিক অভাব পূরণ হয় না। মানুষের জীবন-ধারণ, স্বাস্থ্য ও কর্ম্মকরী শক্তি রক্ষা করার প্রয়োজনে যে সকল সামগ্রীর ব্যবহার হয় না, তাহাদিগকেই বিলাস সামগ্রী বলা যায়। আমরা দেখিয়াছি যে, কোন স্বাভাবিক অভাব পূরণ জন্য যে সকল সামগ্রীর অভ্যুদয় হয়, ব্যবহারে অভ্যাস জন্মিলে, সেই সকল বস্তুর জন্যও অভাব-বোধ জন্মিতে পারে। এই বস্তু-জন্য অভাব-বোধ স্বাভাবিক হয় বলিয়া, কোন কৃত্রিম উপায়ে বিলাস-সামগ্রীর জন্যও অভাব-বোধের সৃষ্টি করা যায় ও করা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন লোকমত আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া সমাজের উপরে আধিপত্য বিস্তার করার একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা মানব-চিত্তকে নিয়ত অভিভূত করিয়া রাখে। এই পদমর্য্যাদা লাভ করিবার জন্য মানুষ তাহার ধনদৌলতের আতিশয্য প্রদর্শন করিবার জন্য নিয়ত ব্যস্ত থাকে। আর সমাজও এই সকল বিভূতি দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া ধন-দৌলতের বশ্যতা স্বীকার করে। মানব-চরিত্রের এই সকল দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় করিয়াই লৌকিক ব্যবহারে অযথা পারিপাট্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। তাহার ফলে সমাজে অনন্ত বিলাস-সামগ্রীর উদ্ভাবন হইয়াছে। ইহাদের মূল ভিত্তি কৃত্রিম বলিয়া তাহাদের স্থায়িত্বের কোন স্থিরতা নাই। এই সকল সামগ্রীর ব্যবহার সর্ব্বথা লোক-মতের উপর নির্ভর করে এবং সেই মত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের বর্ত্তমান প্রচলন দেখিতে-দেখিতে অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। সমাজের এই অস্থির ব্যবহারই ফ্যাসান (fashion) নামে অভিহিত হয়। এই ফ্যাসান নিত্য নব-নব সাজে আপনার বিভূতি বিকাশ করিবার জন্য চেষ্টা ও যত্ন করে এবং অল্পমতি লোক তাহার সেই নূতনত্বে অভিভূত হইয়া পড়ে। ফ্যাসানের যেমন অনুকরণ হয়, আর কিছুরই তেমন হয় না। ইহার ভিত্তি কৃত্রিম হইলেও মানব-চিত্তে ইহার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। মানব-চরিত্রের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া ব্যবসায় চালাইতে পারিলে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করা যায়।

বিলাস-সামগ্রীর ব্যবহারে মানুষের কর্ম্মকরী শক্তির কোন উপচয় হয় না, বরং কোন কোন বিলাস-দ্রব্যের ব্যবহারে বিশেষ অপচয়ই ঘটিয়া থাকে। কোন কোন অর্থবিদ্ পণ্ডিত মনে করেন যে, বিলাস-সামগ্রীর ব্যবহারে শ্রমজীবীদিগের মধ্যে পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকিবার অভ্যাস জন্মিয়া তাহাদের চিত্তের প্রসন্নতা ও কর্ম্ম-চেষ্টার স্ফূর্ত্তি লাভ হয়। তাঁহাদের এই মত সমীচীন বলিয়া অনুমিত হয় না। দেহের ও বসন-ভূষণের নির্ম্মলতা ও পরিচ্ছন্নতায় চিত্তের প্রফুল্লতা ও প্রসন্নতা সম্পাদিত হয় সত্য; কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও বিলাসিতা এক নহে। বিশেষ আরামদায়ক বস্তুগুলিকে necessities of life বা জীবনধারণোপযোগী সামগ্রীর মধ্যে গণ্য করিলেও পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে বিলাস-সামগ্রীগুলিকে Conventional necessities বা কৃত্রিম প্রয়োজন মধ্যে গণনা করিয়াছেন। এই সকল সামগ্রীর দূরবর্ত্তী কোন উপকারিতা থাকিলেও বিলাস-পরতন্ত্রতা বাসনাসক্তিতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নিয়তই বর্ত্তমান আছে। কোমলমতি বালক বালিকা ও শ্রমজীবিগণের বিলাস-প্রবণতা বাসনাসক্তিতে পরিণত হয় কি না, তাহাই বিশেষ চিন্তনীয়। এইরূপ ভীতি একান্ত অলীক, এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। বিশেষ, যে সকল শ্রমজীবীর আহার-সামগ্রীই প্রচুর পরিমাণে জুটিয়া উঠে না, তাহাদের পক্ষে কোন প্রকার বিলাস বা বাসন-প্রবণতা উপেক্ষার বস্তু নহে। এই সকল লোকের পক্ষে বিলাস-সামগ্রীর ব্যবহারে কর্ম্মতৎপরতার আনুকূল্য ঘটিবে, এইরূপ কল্পনা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, কোন কোন বিলাস-দ্রব্যের ব্যবহারে দেহের কোন প্রকার অপচয় ঘটে না, কিন্তু মদ্যাদি বিলাস-সামগ্রী ত উপেক্ষণীয় নহে! তাহাদের ব্যবহারে মানসিক ও শারীরিক প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হয়। আর, যাহারা বিলাসাসক্ত, তাহারা অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর বিনিময়ে এই সকল সামগ্রী অর্জ্জন করিতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না। এই সকল বিভিন্ন দিকের প্রতি লক্ষ্য করিলে, স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে, বিলাস-সামগ্রী দ্বারা আমাদের কোন না কোন কৃত্রিম অভাবই পূর্ণ হয়; তাহাদের দূরবর্ত্তী কোন উপকারিতা থাকিলেও তাহা এমনই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহা উপেক্ষা করিয়া তাহারা যে কেবল কৃত্রিম অভাবই পূর্ণ করে, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

কেহ কেহ মনে করেন যে, বিলাস-দ্রব্যের ব্যবহারে দেশের কর্ম্ম সৃষ্টি হয়। এই সকল সামগ্রীর ব্যবহার উঠিয়া গেলে অনেক লোকের কর্ম্ম-হানি হইবে। ফলতঃ এইরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। যে অর্থ বিলাস-সামগ্রীর জন্য ব্যয়িত হয়, তাহাই গরীব-দুঃখীকে ভোজন করাইয়া ব্যয় করিলে দেশে অনেক আহারীয় সামগ্রীর আয়োজন করার প্রয়োজন হইবে। যাহারা এখন বিলাস-সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহারা এই সকল আহারীয় দ্রব্যোৎপাদন করিয়া অনায়াসে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। বিলাস-সামগ্রীর ব্যবহারের অনুকূলে এই সকল যুক্তির কোন মূল ভিত্তি নাই। বিশেষতঃ, বিলাস সামগ্রীগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূল্যে বিক্রয় হয়। তাহাদের ব্যবহারের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হয়। কোন জাতিকে পরদেশ হইতে বিলাস-সামগ্রী আনিয়া ব্যবহার করিতে হইলে তাহাকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। এই সকল কৃত্রিম দ্রব্যের অভাব পূরণ করিবার জন্য যদি তাহাকে তাহার আহারীয় সামগ্রীর একাংশ ব্যয় করিতে হয়, তবে তাহা ত জাতির পক্ষে একান্ত উপেক্ষার বস্তু নহে। আর যদি দেশের লোক অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া এই সকল বিলাস-সামগ্রীর আয়োজন করে, তবে তাহা অতি দূষণীয় হয়। বিলাস-দ্রব্য-সকলের মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া অতি প্রয়োজনীয় অল্প মূল্যের সামগ্রীর বিনিময়ে তাহা সরবরাহ করিয়া জাতিকে দ্বিগুণ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক এইরূপ কি না, তাহা চিন্তনীয়। তবে, বিলাস-দ্রব্যের বিনিময়ে বিলাসদ্রব্য লইলে তেমন ক্ষতি হয় না। প্রয়োজনীয় বস্তুর বিনিময়ে বিলাস-সামগ্রী সরবরাহ করিলে জাতির কর্ম্মশক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে; সুতরাং কোন হিসাবেই বিলাস-সামগ্রীর ব্যবহার কোন জাতির পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে।

বেলুচিস্থানের দৃশ্য

[শ্রীসত্যভূষণ সেন]

একদিন শরতের প্রভাতে ভারতের সীমান্ত ছাড়িয়া বেলুচিস্থানে প্রবেশ করিলাম। দিল্লী হইতে এ পথে আসিতে হইলে সুপরিচিত রাজপুতানার উত্তরাংশে অবস্থিত ভাওয়ালপুর স্বাধীন রাজ্যের সমস্তটা দৈর্ঘ্য অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। পূর্ব্বদিন রাত্রির গাড়ীতে দিল্লী ছাড়িয়া ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিবার আগেই পাটিয়ালা স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভাটিণ্ডা (Bhatinda) ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিলাম। দিল্লীতে অবকাশের অভাব বশতঃ কুতব-মিনার, হুমায়ুনের সমাধি সৌধ ইত্যাদি দেখিবার উদ্দেশ্যে সমস্তটা দুপুর বেলা পা-গাড়ীতে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া শরীর ক্লান্ত এবং অসুস্থও করিয়া ফেলিয়াছিলাম। অগত্যা আজকার দিনটার জন্য স্বেচ্ছায়ই উপবাস-ব্রত গ্রহণ করিলাম--এমন কি ষ্টেসনের ওয়েটিংরুমে বোম্বাই প্রদেশীয় এক সহযাত্রীর রিফ্রেশমেণ্ট রুমে (Refreshment Room) আশ্রয় গ্রহণের সাধু দৃষ্টান্তও অগ্রাহ্য করিলাম। বেলা প্রায় ৮টার সময় আবার গাড়ীতে উঠিলাম। ভাটিণ্ডা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তটা পথ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে, কিন্তু রাত্রিযোগে আমাতে সেটা মোটেই অনুভূত হয় নাই। এখান হইতেও আবার মরুপথেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

এই মরুপ্রদেশে পথের দুইধারে লোক-বসতির চিহ্ন প্রায় দেখা যায় না, কেবলই শুষ্ক প্রান্তর। এই বিজন প্রদেশে রেলপথের উপরে এক-একটি ষ্টেসন যেন সূত্র-গ্রথিত মণিখণ্ডের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া মরুভূমির ওপারে লোকালয়ের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে চলিয়াছে। পূর্ব্বদিকে দূর দিগন্তে চাহিয়া রহিলাম--ভাবিতে লাগিলাম--এই ত স্বাধীনতার মহাতীর্থ রাজস্থানের মাতৃভূমি--তাঁহার প্রাণের চিতোর--ভারতের ইতিহাস-বক্ষে একখণ্ড উজ্জ্বল মণিখণ্ডের ন্যায় দীপ্তিমান্ রহিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আসিতেছে। এককালে এই রাজস্থানেরই শত শত জনপদে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে, পথে পথে, আরাবল্লীর শিখরে-শিখরে দেশের চারণগণ স্বাধীনতার গীত গায়িয়া-গায়িয়া দেশের প্রাণশক্তিকে অব্যাহত রাখিয়াছিল। স্বাধীনতার ইতিহাসে সেই পবিত্র যুগের গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিয়া ক্ষীণপ্রাণ ধমনীতেও শোণিত-সঞ্চার হয়।

ক্রমে যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, আকাশ ধরণী যেন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। দুইধারে মরুভূমির দৃশ্য দেখিতে-দেখিতে চলিয়াছি--অন্তহীন বালুকাময় প্রান্তর দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বালুভূমির উপরে প্রায় সমস্ত দৃশ্য আবৃত করিয়া ঝাউজাতীয় এক প্রকার ছোট ছোট গাছ। তারই মধ্যে মরুভূমির আদিম অধিবাসী উষ্ট্রসমূহ এবং বোধ হয় প্রবাসী ছাগল এবং খচ্চরগুলি চরিয়া বেড়াইতেছে। কদাচিৎ দুটি-একটি সামান্য কুটীর এই বিজন প্রদেশে বিরল জনবসতির পরিচয় দিতেছে; তাহারই মধ্যে কেহ কেহ স্থানে স্থানে উষ্ট্রদিগের অভিভাবক স্বরূপ দেখা দিতেছে। লোকালয়ের বাহিরে মরুভূমির এই নিঃশব্দ দৃশ্য বড়ই ভয়ানক। তপ্ত বালুকার রুদ্রমূর্ত্তি, শুষ্ক প্রান্তরের পর প্রান্তরের নিরবচ্ছিন্ন বিস্তৃতি,--জনমানবের বা জীবজন্তুর প্রায় চিহ্নমাত্র নাই। নদনদী জলাশয়ের ঠিকানা নাই, আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি নাই, সজীবতার উল্লাসমাত্র নাই;--নৈসর্গিক জগতের শত বিচিত্রতার মধ্যে যেন উদ্দেশ্যহীন একটা উৎকট বিশিষ্টতার দৃশ্য। এরূপ নীরস, নিঃসঙ্গ দৃশ্য প্রাণের মধ্যে হাহাকার জাগাইয়া তোলে; তার উপরে তখন মার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্নতাপে সমস্ত দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। সে দৃশ্য বড়ই ভীষণ--ইহাই মরুভূমির পূর্ণ প্রকট-মূর্ত্তি। রবিকরের প্রখর তেজে আশ্বিনেই চৈত্রের খর-তাপ বিকীর্ণ হইতে লাগিল, তাহারই জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে সমস্ত ভুবন আকুল হইয়া উঠিল। আতপ-তপ্ত ধরণী কিসের আশায় উর্দ্ধমুখ হইয়া যেন কাহার প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। মনুষ্য-প্রাণ এরূপ ভয়াবহ দৃশ্য বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারে না। কেবলই মনে হইতেছিল--প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস--হে প্রভু, তোমার এ রুদ্রমূর্ত্তি সংবরণ কর।

সন্ধ্যার সময় সাম্‌সাট্টা (Samsatta) ষ্টেসনে গাড়ী বদল করিয়া করাচী মেল ট্রেণে (Lahore—Karachi Mail Train) উঠিয়া পড়িলাম। মধ্য রাত্রিতে রোঢ়ী (Rohri) ষ্টেসনে আবার গাড়ী বদল করিতে হইল ;—তবে সৌভাগ্য বশতঃ ইহার মধ্যে একখানা কোয়েটার গাড়ী থাকাতে সেইখানাতেই উঠিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। রোঢ়ী ছাড়িয়াই পুলের উপর দিয়া সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলাম। এখানে নদের মাঝখানে একটা পর্ব্বতখণ্ড থাকাতে পুল তৈয়ার করিতে খুবই সুবিধা হইয়াছে ;—দৃশ্যটিও বেশ মনোরম বোধ হইল।

ভোরে উঠিয়া দেখিলাম, দুধারেই দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর—বেশ সমতলভূমি,—মাঝে-মাঝে ঘাসের আস্তরণে ঢাকা। এদিকে-ওদিকে দুটি-একটি উট চরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে শিবি (Sibi) ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিলাম। এখান হইতেই বিচিত্র-দৃশ্য মরু-পর্ব্বতের আরম্ভ। চারিদিকেই পর্ব্বতের উচ্চতা বেশ দেখা যাইতেছে, কিন্তু পর্ব্বতগাত্রে শ্যামলতার চিহ্নমাত্র নাই ; তৎপরিবর্ত্তে গৈরিক ধূলিজালে সমস্ত পর্ব্বতগুলি যেন আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশির সম্প্রসারণে শুধু পর্ব্বতগাত্র নয়, সমস্ত প্রকৃতিই যেন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে—দূরের দৃশ্য ত প্রায়ই অদৃশ্য, যেটুকু দেখা গেল, তাহাও অস্পষ্ট।

ক্রমে ধূলির রাজ্য ছাড়িয়া কঠিন প্রস্তর রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। এখানে চারিদিককার সমস্ত দৃশ্য ব্যাপিয়া কেবলই পর্ব্বতের নিরবচ্ছিন্ন বিস্তার। কোন জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই—এই প্রস্তরের ভীষণ দৃশ্যে বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে আর কোন অবান্তর পদার্থও নাই। মনে হইল, যেন সৃষ্টি এখানে কত যুগযুগান্তরের শত বৈচিত্র্যে তাহার চরম সার্থকতা সম্পাদন করিতে করিতে নিজকে নিঃশেষ করিয়া এখন এই পাষাণ-স্তূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ক্রমে আরও অগ্রসর হইলে বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতগুলি যেন দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। এইখানেই সুপ্রসিদ্ধ গিরিবর্ত্ম Bolan passএর আরম্ভ। দুইদিকে সু-উচ্চ পর্ব্বত-প্রাকার, মাঝখানে একটা নির্ঝরের প্রবাহ-পথ চলিয়া গিয়াছে। তারই ধারে-ধারে আমরা রেলপথে চলিয়াছি। নির্ঝরের শূন্য গর্ভে এখন শুধু অগণন উপলখণ্ডের মধ্যে একটা পথের নিদর্শন দেখা যাইতেছে। তাহারই উপর দিয়া এক একটি যাযাবর পরিবার তাহাদের উষ্ট্র-সম্পদ এবং যথাসর্ব্বস্ব লইয়া চলিয়াছে—দেখিলাম ; মনে হইল আবহমান কাল হইতে কত জনস্রোত এই পথেই চলিয়াছে। কত শতাব্দী অতীত হইল ম্যাসিডনের (Macedon) মহাপুরুষ সেকেন্দর শা (Alexander the Great) তাঁহার বিপুল অভিযান লইয়া এই পথেই আসিয়া ভারতের রঙ্গভূমে এক নবযুগের সূচনা করিলেন। বহু শতাব্দী পরে পারস্যের কীর্ত্তিমান্ নাদির শাহও (Nadir Shah) মোগলের ধনরত্ন লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে এই পথেই তাঁহার সেনাবাহিনী চালনা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়—শুধু অভিযান আর সেনাচালনা নয়,—প্রাচীন কাল হইতে পশ্চিম দুনিয়ার সঙ্গে ভারতের যে একটা আদান-প্রদানের সম্বন্ধ বা যোগাযোগের নিদর্শন ইতিহাসে দেখা যায়, তাহাও প্রধানতঃ এই পথেই চালিত হইয়াছিল।

এই পর্ব্বত-প্রদেশে আমরা ক্রমেই উপরে উঠিতে লাগিলাম। মচ্ (Mach) নামে একটা ষ্টেসনে Refreshment Roomএ খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে নামিয়া দেখিলাম, চারিদিকেই কঙ্কালসার পাহাড়ের দৃশ্য। হিরক (Hirok) ষ্টেসনে Quarantineএর পরীক্ষা। আগে থাকিতেই তৃতীয় শ্রেণী এবং মধ্যম শ্রেণীর সমস্ত গাড়ী বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। ষ্টেসনে গাড়ী আসিলেই পুলিশ আসিয়া 'উতরো' 'উতরো' করিয়া সকলকে নামাইয়া দিল ; বলা বাহুল্য, উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের সম্বন্ধে স্বয়ং পুলিশও কোন উচ্চবাচ্য করে না। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া ষ্টেসনের বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাহারা কেহই এ গাড়ীতে যাইবার আশা রাখে না। আমি নিজে গিয়া ডাক্তার সাহেবের সম্মুখে হাজির হওয়াতে দুইচার কথা জিজ্ঞাসাবাদের পর মুক্তি পাইলাম। এখানকার ডাক্তার টিকেট পাশ করিয়া না দিলে পরের কোন ষ্টেসনেই টিকেট গ্রাহ্য হয় না—যাত্রীকে আবার এইখানেই ফিরিয়া আসিতে হয়। পার্ব্বত্য-পথে যেমন হইয়া থাকে, এখানেও আমরা অনেক পুল এবং সুড়ঙ্গ-পথ (Tunnel) পার হইয়া আসিলাম। কোলপুর (Kolpur) ষ্টেসনে আসিয়া দেখিলাম, কাষ্ঠফলকে লেখা আছে—উচ্চতা ৫৮৭৬ ফিট্। এই লাইনে কোলপুরই উচ্চতম স্থান। অন্যান্য অনেক

স্থানের তুলনায় ইহার উচ্চতা খুব বেশী না হইলেও, ভারতের আর কোন লাইনে এখানকার মত বড় গাড়ী (Broad Gauge) এতখানি উপরে উঠান হয় নাই। হিরকের পর হইতে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল। তখন অক্টোবর মাস—এদিকে রীতিমত শীত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আবার দুইধারের পাহাড়গুলি ক্রমশঃ দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল,—ক্রমে ক্রমে যেন আমরা একটা অধিত্যকার উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। এইরূপে বেলা প্রায় ৩টার সময় কোয়েটাতে (Quetta) আসিয়া হাজির হইলাম। ষ্টেসনের কাষ্ঠফলকে দেখিলাম—উচ্চতা ৫৫০০ ফিট্—আমাদের দেশে কার্সিয়ং এবং শিলংএর উচ্চতা প্রায় ৫,০০০ ফিট্।

বেলুচিস্থান প্রাকৃতিক হিসাবে তিনভাগে বিভক্ত। উত্তরে বনরাজিমণ্ডিত পার্ব্বত্য প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে পাহাড় পর্ব্বত, অধিত্যকা উপত্যকা এবং সমতলভূমির বিচিত্র সংমিশ্রণ। এই প্রদেশের সাধারণ নাম খোরাসান (Khorasan)। দক্ষিণে মেক্রানের (Makran) মরুভূমি আরব সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরের পার্ব্বত্যভূমি প্রাকৃতিক হিসাবে আফগানিস্থানেরই অংশবিশেষ। এখানকার পর্ব্বত হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দেশের লোকেরা ঘর-বাড়ী তৈয়ার করে এবং অন্যান্য কাজে লাগায়। মধ্য-প্রদেশের পাহাড়-পর্ব্বতগুলি প্রায়ই মরু-পর্ব্বত। বৃক্ষ-তৃণ-পরিশূন্য প্রস্তরস্তূপ—যেন পর্ব্বতের কঙ্কাল। কিন্তু কোন কোন পাহাড়ে এবং নীচেও গাছ-পালা যে একেবারে নাই এমন নয়। এই খোরাসানে এবং উত্তর প্রদেশেও অনেক প্রকার ফলফলাদি জন্মে এবং ফলের চাষ আবাদও হয়, যথা, আখ্‌রোট, পেস্তা, বাদাম, পীচ, আঙুর, আনার ইত্যাদি। দক্ষিণের মেক্রানভূমিতে বেশ ভাল খেজুর উৎপন্ন হয়—উৎকৃষ্টতায় ইহার কাছে আরব দেশের খেজুরও কোন কোন সময় হার মানে।

এদেশে নদনদী নাই বলিলেই চলে। ভূগোল খুঁজিলে হয় ত দুটি একটি নদীর নাম পাওয়া যায়, কিন্তু সে নাম মাত্রই। দেশের বিবরণে পাওয়া যায়, যব নদী (Zhob) বেলুচিস্থানের মধ্যে সব চেয়ে বড়; কিন্তু এই সব-চেয়ে বড়র মানে যে কি, তাহা সে দেশের লোকেই বোঝে ভাল। এ দেশে জল-বৃষ্টিও হয় অতি সামান্য। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, Necessity is the mother of invention,—ইহারাও অভাবে পড়িয়া জল সরবরাহ করিবার এক অভিনব উপায় বাহির করিয়াছে। ইহারা স্থানে-স্থানে পাহাড়ের পাদদেশে অতি গভীর কূপ খনন করে; পরে সেখান হইতে নালা কাটিয়া মাটীর নীচে নীচে জলের স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া লইয়া যায়। ক্রমে যাইতে-যাইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে পৌছিলে জলের ধারা স্বভাবতঃই জমির উপরে আসিয়া হাজির হয়। তখন তাহারই চারিদিকে গ্রাম-জনপদ গড়িয়া উঠে। কিছুকাল পরে একস্থানে জল সরবরাহ নিঃশেষ হইয়া আসিলে আবার উহাঁরা স্থানান্তরে চলিয়া যায়। এইরূপে ইহারা এ দেশের "কঠিন পাষাণ ক্রোড়ে তীব্র হিম পরে" একরূপ যাযাবর অবস্থায়ই মানুষ হইয়া আসিয়াছে। দেশের এমনই উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা ছিল যে, কেহ চাষ-আবাদ করিলে সে যে যথাসময়ে তাহার ফল ভোগ করিতে পারিবে, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। কাজেই কৃষিকার্য্য তখন অতি হীন অবস্থায়ই ছিল, পশুপালনই ছিল জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। আর যেখানে কোন লোক সকালে বাহির হইয়া সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়া আসিতে না পারিলে বন্ধু-বান্ধবেরা তাহার আশা ছাড়িয়া দিত, সে দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের আশাও সুদূর-পরাহত। বর্ত্তমানে ব্রিটিশ শাসনের সুবন্দোবস্তে দেশের লোকে নিরাবিল শান্তি উপভোগ করিতেছে। এখন উহারা ব্যবসায়-বাণিজ্যেও মন দিতেছে, দেশে কৃষিকার্য্যও বাড়িয়া উঠিতেছে। আর এক কথা—দেশটা মরুভূমির সামিল হইলেও এখানকার জমি খুবই উর্ব্বর; উপযুক্ত জলের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে উহাতে সোণা ফলান যায়। আজকাল দেশের পাহাড়ে এবং নীচেও নানাপ্রকার শস্য, ফলমূল, শাকসব্জী সবই উৎপন্ন হইতেছে; যথা—ধান, যব, সরিষা, তামাক, আখরোট, পেস্তা, বাদাম, আঙুর, আনার, তরমুজ, সরদা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি।

বেলুচিস্থানের রাজধানী কোয়েটা খোরাসান প্রদেশের এক বিস্তৃত অধিত্যকার উপরে প্রতিষ্ঠিত;—এই অধিত্যকার পরিমাণ ফল প্রায় ১২৫ বর্গ মাইল। ইহার চারিদিকেই উচ্চ পর্ব্বতমালা—যেন মরুভূমিরই অপর পৃষ্ঠায়

দৃশ্য। যাঁহারা কোন দিন মরুপর্ব্বত দেখেন নাই, তাঁহারা এ দৃশ্য হঠাৎ দেখিলে চমকিয়া উঠিবেন, যে—এ আবার কি! এই মরুরাজ্যে কোয়েটাও এক বিস্তৃত প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এখানে বর্ত্তমান নগর প্রতিষ্ঠা অতি অল্পদিনের কথা। সেই সময় কান্দাহার এবং অন্যান্য স্থান হইতে নানাপ্রকারের বৃক্ষাদি আনিয়া এখানে রোপণ করা হয়। তাহার ফলে এখন নগরের কেন্দ্রস্থল ব্যতীতও এদিকে-ওদিকে অনেক জায়গায় বৃক্ষলতা এবং বাগানের সজ্জা দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এখানে মনে হয়, বৃক্ষ রোপণ করাও বড়লোকদের পক্ষে একটা সখের কাজ। একস্থলে দেখিলাম, কয়েকটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া একখণ্ড টিনের পাতে লেখা রহিয়াছে—This was planted by H. E. Lady Minto (অথবা lady Hardinge—ঠিক মনে পড়িতেছে না)। কিন্তু সেই Thisএর কোন সজীব নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই নাই। সেই This যে Lady Mintoর সঙ্গে সাগর-পারে বিলাত যাত্রা করিয়াছে, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। তার চেয়ে বরং বেশী সম্ভাবনা এই যে, সেগুলি Lady Mintoকেও ছাড়াইয়া একেবারে পরপারে যাত্রা করিয়াছে।

কোয়েটাতে কোন নদী বা জলাশয় নাই। সহর হইতে ৮২ মাইল দূরে উরক (Urak) হ্রদ হইতে জলের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। শুধু যে পানীয় জলই সরবরাহ হয় তা নয়; ঐ হ্রদের জল নালা কাটিয়া আনিয়া সহরের নানা দিকে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে; এই নালার সঙ্গে সহরের সমস্ত বাগানের সংযোগ-প্রণালী আছে। এখানে সাহেবদের থাকিবার যত বাড়ী--সংখ্যায়ও তাহারা অসংখ্য —সকলই সরকারের খরচে নির্ম্মিত এবং রক্ষিত। এই সকল বাড়ীর বাগানের জন্যও প্রণালী হইতে জল দেওয়া হয়। কাজেই জলের স্বল্পতার দরুণ মিতব্যয়ী হইতে হইয়াছে। সপ্তাহের এক এক দিনে এক এক দিককার বাগানের জল সরবরাহ হয়। এইরূপে প্রত্যেক বাগানই সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করিয়াও জল পাইয়া থাকে। এত ব্যবস্থা করিয়া এবং বিদেশ হইতে গাছ-পালা আনাইয়া তবে বাগানের সৃষ্টি হইয়াছে। সহরে এখন ফুল গাছ ছাড়া নানা রকমের ফলের গাছ এবং অন্যান্য বড় বড় গাছও যথেষ্ট আছে। কোয়েটার মত বড় সহরে যত গাছপালা আছে, এত বোধ হয় অনেক জায়গায়ই নাই। কিন্তু শীত-সমাগমে গাছপালা ও বাগানের এত সাজসজ্জা একেবারেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ সবুজপত্রের সজীবতা মলিন হইয়া শীর্ণ ধূসরবর্ণে পরিণত হয়। পরে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক পত্রগুলি আরও শীর্ণ হইতে-হইতে একেবারে নিঃশেষে ঝরিয়া পড়ে; অবশেষে সমস্ত সহরটা একটা দাবদগ্ধ বনভূমির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকে। তখন এত বড় আভিজাত্যাভিমানী ইংরেজ পুরুষদের বাড়ীর আব্রুও ঠিক থাকে না।

এখানে শীতও পড়ে অতি প্রচণ্ড। শীতের ২।৩ মাস রাত্রিতে টেম্পারেচার Freezing pointএর নীচে যায়ই; তুষার-পাতের সময় বেলা দ্বিপ্রহরেও টেম্পারেচার Freezing pointএর নীচে ৮।১০ ডিগ্রি নামিতে দেখিয়াছি। বাস্তবিক শীতকালে যখন হু হু করিয়া হাওয়া চলিতে থাকে –বিশেষ তুষার-পাতের সময় এবং তাহার অব্যবহিত পরে—তখন সমস্ত বহিরাবরণ ভেদ করিয়া যেন প্রাণের ভিতরেও কম্পন জাগাইয়া তোলে। আমাদের মত গরীবের পক্ষে এসব দেশে থাকা বিশেষ বিড়ম্বনা। রাস্তার দুইধারে নালার জল জমিয়া বরফ হইয়া পড়িয়া থাকে। কলের নীচে জল পড়িয়া পড়িয়া স্তূপাকার বরফ জমিয়া উঠে। সহরের ৪ মাইল দূরে একটি হ্রদ আছে (Hanna Lake); সেখানে একদিন গিয়া দেখি, হ্রদের জলের উপরে বেশ পুরু এক স্তর বরফ জমিয়া আছে। তুষার-পাতে চারিদিকের সমস্ত দৃশ্য একেবারেই বদ্‌লাইয়া যায়। মাঠ-ঘাট, গাছপালা, বাগান, বাড়ী সব সাদা হইয়া যায়—যেন সৃষ্টি রাজ্যে একটা নূতন অঙ্ক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে অন্য একটী দৃশ্যপট নামাইয়া দেওয়া হইল। পর্ব্বতের উপর অনেক আগে হইতেই তুষারপাত আরম্ভ হয়—সমস্ত শীতকাল ভরিয়াই পাহাড়গুলি "শুভ্র-তুষার কিরীটিনী" হইয়া থাকে। পূরা শীতের সময় যখন এক-একদিন নূতন করিয়া তুষার পড়িতে আরম্ভ হয়, তখন কোন দিকের পাহাড়ের দৃশ্য এমন দেখায়—বিশেষ দূরবীণ্ দিয়া দেখিলে—যেন সে একটা তুষার পর্ব্বত নয়,—সেখানে যেন একটা তুষারের রাজ্য পড়িয়া রহিয়াছে—যাহার বিস্তৃতির বিশালতায় স্বতঃই মনে একটা অসীমের ভাব জাগাইয়া তোলে।

বসন্ত-সমাগমে প্রকৃতিতে আবার নবজীবনের সাড়া

জাগিয়া উঠে। বৃক্ষে-বৃক্ষে দিকে-দিকে পত্রপুষ্পের শোভা বিকশিত হয়। এখানে আবার বৈচিত্র্য আছে; কোন-কোন স্থলে শুষ্ক বৃক্ষশাখায় প্রথমে ফুল ফুটিয়া উঠে, পরে ফুলের বাহার নিঃশেষ হইয়া গেলে, তখন নবপত্রের উদ্গম হয়। "ফোটে ফুল শুকনো ডালে, দেখ্‌বি যদি আয়" এসব কথা একদিন নাটকে-উপন্যাসেই শুনিয়া আসিয়াছি; এখানে আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ হইল। এইরূপে সেই দাবদগ্ধ বনভূমি আবার সবুজপত্রের আভরণে সজ্জিত হইয়া আপন মহিমায় আপনিই বিকশিত হইয়া উঠে। তখন আবার বাগানে-বাগানে ফুলের সজ্জা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজীতে যেগুলিকে Season flowers বলে, এখানে তাহাই বেশী। এসব ফুলের বিশেষত্ব এই যে, একবার ফুটিতে আরম্ভ করিলে, প্রায় মাসাবধিকাল বাগানটাকে সাজাইয়া রাখে। এত রকম বিদেশী ফুল থাকা সত্ত্বেও গোলাপফুলই সবচেয়ে বেশী। গোলাপফুল এখানে ফোটেও অজস্র—এক-একটি গাছে ২০।৩০।৪০ করিয়া। এক-এক বাগানে হাজার হাজার গোলাপফুল এখানে ত অতি সাধারণ দৃশ্য। বাস্তবিক, বাগানে-বাগানে পথে-ঘাটে এত গোলাপের ছড়াছড়ি আমাদের বাংলাদেশে দূরে থাকুক, ভারতের আর কোথাও আছে কি না সন্দেহের বিষয়—অন্ততঃ আধুনিক যুগে। আমার মনে হয়, এই বেলুচিস্থান হইতেই গোলাপফুলের চাষ আরম্ভ হইয়া ক্রমে পারস্যদেশে এবং সর্ব্বশেষে বসোরাতে (Basrah) গিয়া চরম পরিণতি লাভ করিয়া 'বসোরার গোলাপ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এইরূপ শীতের পরে বসন্তের আগমনে পত্রপুষ্পের সজীবতায় এবং ঋতুর পরিবর্ত্তনে এদেশে প্রকৃতির রাজ্যে এবং মানুষের প্রাণেও যে একটা উল্লাস এবং সজীবতার ভাব জাগিয়া উঠে, বাংলাদেশে তাহার তুলনা কোথায়!—আর বাংলাদেশে আজকাল বুঝি বা উৎসবের দিনও ফুরাইয়া আসিয়াছে!

কোয়েটা নূতন প্রতিষ্ঠিত নগর। ইংরেজেরা এস্থান অধিকার করিয়া পুরাতন দুর্গের সংস্কার করিয়া বর্ত্তমান দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন; পরে আস্তে-আস্তে নগর গড়িয়া উঠে। সহরে স্থানীয় লোক খুবই কম; এমন কি, আমরা যে বেলুচিস্থানে আছি, একথাও মনে হয় না। এখানকার অধিকাংশ লোকই পাঞ্জাবী। বড় বড় দোকান প্রায় সবই বোম্বাই এবং সিন্ধু প্রদেশের লোকদের স্থাপিত। বাজারে শাক-সব্জী, ফলমূল এবং মাছ-মাংসের দোকান স্থানীয় লোকের হাতে আছে বটে। সরকারী কার্য্য উপলক্ষে বঙ্গ, উৎকল, মান্দ্রাজ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, বোম্বাই, রাজপুতানা, গুজরাট প্রভৃতি সকল দেশের লোকই এখানে আছে। লোক থাকিলেই তাহাদের সমাজ, তাহাদের মন্দির সবই থাকে। এখানেও সবই আছে—সনাতন ধর্ম্মসভা, আর্য্যসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, পার্শীদের উপাসনা-মন্দির (Parsi Fire Temple) থিওসফিকেল হল (Theosophical Hall), মুসলমানদের মস্‌জিদ। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের ত কথাই নাই—সমস্ত খৃষ্টীয় সমাজেরই বিভিন্ন উপাসনালয় আছে।

সহরে ষ্টেসনের ধারেই সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি সরাই আছে। বেশ প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী—দেখিতেও ভদ্রলোকের বাসের উপযুক্ত স্থান বলিয়াই বোধ হয়। এখানে থাকিতে হইলে নীচে এক-একটি কামরার ভাড়া দৈনিক চার আনা, উপরে আট আনা—রান্নাঘর ইত্যাদি ঐ সঙ্গেই পাওয়া যায়। তবে বাৎসরিক দরবার উপলক্ষে মফঃস্বলের সরদারদের আসিবার সময় হইলে সর্ব্বসাধারণের তখন আর সেখানে বাসের অধিকার থাকে না; তাহাদিগকে তখন সরাই ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হয়।

স্যাণ্ডিম্যান পার্ক ও স্যাণ্ডিম্যান হল—Sandeman Parkএর ভিতর Sandeman Hall—এই হল এখানকার দরবার-গৃহ। এই গৃহের গঠন-নৈপুণ্য বড়ই সুন্দর, হঠাৎ দেখিলে তাজমহলের কথাই অনেকটা মনে করিয়া দেয়। পশ্চিম দিক হইতে দেখিতে প্রথমে ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডের বেদী (Bandstand) তার পরে হল—দুইদিকে ছোট ছোট 'পাইন' (Pine) গাছ—যেমন তাজমহলের বেদীতে উঠিতে রাস্তার দুই ধারে আছে আর পশ্চাতে Murdar Hillএর উচ্চ প্রাকার। এই সব মিলিয়া এমন একটি দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে যে, দেখিলেই চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। যে কৃতী পুরুষ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বেলুচিস্থানে বিষম অরাজকতার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন—যাঁহার চরিত্রগুণে এবং কর্ম্মদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তাহাদের শাসনভার স্বেচ্ছায়

স্যাণ্ডিম্যান হল—পশ্চিমদিকের দৃশ্য

রবার্ট রোড—কোয়েটা

স্যাণ্ডিম্যান হল—পূর্ব্বদিকের দৃশ্য

একটী পথের দৃশ্য—কোয়েটা
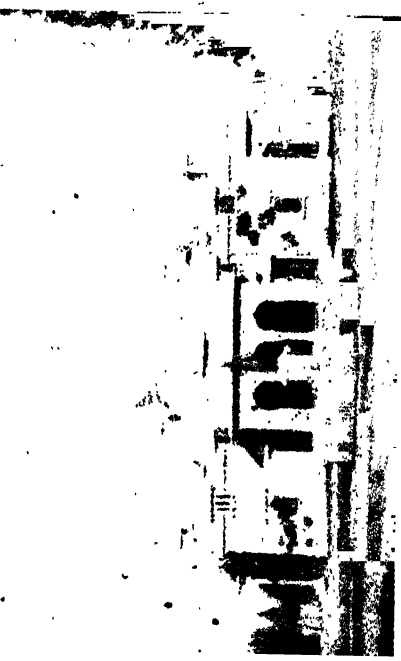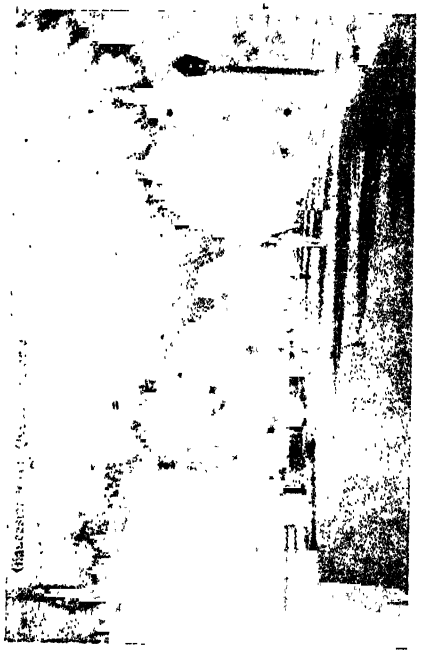
তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, সেই Sandeman সাহেবের নামেই এই উদ্যান ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। দেশ ইংরেজদের অধিকারে আসিলে, এই Sandeman সাহেবই (Sir Robert Sandeman) এখানকার প্রথম শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হন—Agent to the Governor General and Chief Commissioner of Baluchistan।

Sandeman Parkএর সহিত সংলগ্ন আর একটি বাগানে Mac Mohan Museumএর লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীর পুস্তকাগার বেশ সমৃদ্ধ; ইংরেজী পুস্তকই অবশ্য সব চেয়ে বেশী; তা ছাড়া উর্দ্দূ, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী পুস্তকও আছে, বাংলা বই একখানাও নাই। পড়িবার ঘর দুটিও বেশ সুন্দর।

Museumএর একটী কামরায় Agricultural and Economic Section। এই ঘরে কৃষিকার্য্যের সরঞ্জাম, নানা প্রকার শস্যকণা, বন্দুক, বর্ম্ম, তরবারি ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র, জুতা জামা ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আছে। তা ছাড়া একটি কামান, দুইটি ব্যোমযানের নমুনা, একটী এই দেশীয় ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি, আর কতকগুলি এই দেশীয় বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তিও আছে। এই পুতুলগুলি এমন সুন্দর তৈয়ারী হইয়াছে যে, আমার ত মনে হয় যে, আমাদের দেশের কৃষ্ণনগরের পুতুলের চেয়ে এগুলি কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

দ্বিতীয় কামরায় Biological Section—এখানে নানা-প্রকার পশু পক্ষী এবং মৎস্য সরীসৃপের দেহাবশেষ ইত্যাদি রক্ষিত। উপরে একটি কামরায় বিবিধ রকমের খনিজ দ্রব্য এবং কাষ্ঠের নমুনা। মোটের উপর Museumএর সংগ্রহ মন্দ নয়। এই MacMohan সাহেবও এক সময়ে এ দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সহরের অপর প্রান্তে MacMohan Park ইঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত।

একটী 'বালোচ' পরিবার—কোয়েটা

ভূমিকর্ষণের দৃশ্য—কোয়েটা

গোরাবারিকে Staff College সৈনিক বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারীদের সামরিক শিক্ষার স্থান। যুদ্ধের সময় এই Staff Collegeই Cadet Collegeএ পরিণত হইয়া-

বোলান গিরিবর্ত্মের একটী দৃশ্য

ষ্টাফ্ কলেজ—কোয়েটা

ওয়াইলি রোডে তুষার—কোয়েটা

ব্রাহুই সর্দ্দার—বেলুচিস্থান

ছিল; এখন আবার Staff College করা হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে আর একটি মাত্র Staff College আছে ওয়েলিংটনে।

বেলুচিস্থানের উত্তরে আফগানিস্থান, দক্ষিণে আরব সাগর, পশ্চিমে পারস্য দেশ, পূর্ব্বে ভারতের সিন্ধু প্রদেশ। আফগানিস্থানের মরু পর্ব্বতের দৃশ্য এবং তুষার-বাত্যার পরিচয় বেলুচিস্থানে যথেষ্ট আছে। দক্ষিণে যে মরুভূমি আরবসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা পূর্ব্ব সীমানায় সিন্ধু

প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে পারস্যদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে; এবং পূর্ব্ব সীমানায় সিন্ধু প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে পারস্য দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বোলান গিরিসঙ্কটের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তার উপরে এখন বৃহৎ— দৈর্ঘে আড়াই মাইলেরও বেশী। এই রেলপথের আর এক শাখা দলবন্দীন্ (Dalbandin), নুষকি (Nushki) হইয়া পারস্যের সীমা ইন্জা (Inzzah) এবং অধুনা দুজদাপ্ (Duzdáp) পর্য্যন্ত গিয়াছে।

মরুভূমিতে কূপ হইতে জল তুলিবার দৃশ্য

রেল-ষ্টেশন—কোয়েটা

আবার রেলপথের বিস্তৃতি হইয়া স্থানের প্রসার বাড়িয়া গিয়াছে। নর্থ ওয়েষ্টারণ রেলপথের যে শাখা কোয়েটা পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তাহাই আফগানিস্থানের অভিমুখে চামান্ (Chaman) পর্য্যন্ত গিয়াছে। চামান আফগানিস্থানের খুবই নিকটে। শুনিয়াছি, সেখান হইতে না কি কান্দাহারের (Kandahar) দুর্গ দেখা যায়। এই পথের একটি সুরঙপথ (Tunnel) ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা এখন আমাদের দেশ হইতে রওনা হইয়া শুধু রেলপথে চলিয়া কয়েক দিনের মধ্যে পারস্যদেশের সীমা স্পর্শ করিয়া আসা যায়। কালে হয় ত এই পথই উত্তরে মেসেদ (Meshed) ও আস্কবাদের (Askabad) পথে মধ্য-এসিয়ায় এবং পশ্চিমে বুসায়ার (Bushire), বসোরা (Basrah) হইয়া ইউরোপের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিবে।

স্বাগতম্

বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন রাইট অনারেবল শ্রীযুক্ত লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়দ্বয়কে 'ভারতবর্ষ' শ্রদ্ধাভরে অভ্যর্থনা করিতেছে

শ্রীযুক্ত লর্ড সিংহ (রাইপুর)

('বেঙ্গলী' পত্রের সৌজন্যে)

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু

('বেঙ্গলী' পত্রের সৌজন্যে)

হিলুয়া ষ্টেসনে শ্রীযুক্ত লর্ড সিংহ ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু

(মিঃ বিভূতি মল্লিক মহাশয়ের অনুমতি-অনুসারে)

পশ্চিম-তরঙ্গ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

১। ডাননজীয়ো।
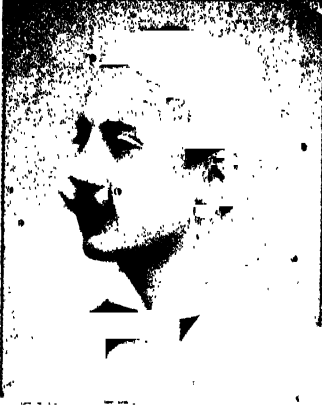
প্রথম যৌবনে কবি ডা'ননজীয়ো (D'annunzio)

সংসার-উত্যক্ত আত্মহত্যাভিলাষী প্রৌঢ়সাহিত্যিক ডা'ননজীয়ো
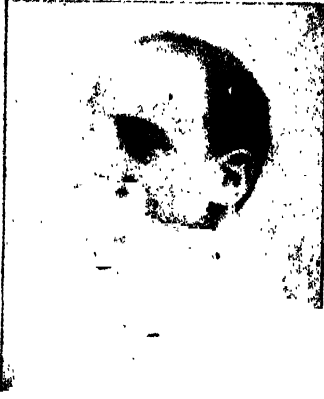
পরিণত যৌবনে সৌন্দর্য্য-পিপাসু প্রেমিক
বিলাসলালসাতৃপ্ত ডাননজীয়ো

খপোত সৈনিক, রণোন্মত্ত, বিজয়ী বিমান-আক্রমণকারী
কবি-যোদ্ধা ডা'ননজীয়ো

ইটালির বিশ্ববিশ্রুত মহাকবি গেব্রিএল ডা'ননজীয়ো (Gobriele D'Annunzio) ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে যখন তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Primo Vere' প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র। তাঁহার সেই বাল্যরচনা ইটালির সাহিত্য-কলাবিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং সেই বয়সেই তাঁহাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত করিয়া দিয়াছিল। ইহার তিন বৎসর পরে যখন তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'Conto Nuovo' প্রকাশিত হইল, তখন তাঁহার দেশবাসিগণ

তাঁহাকে Carducci প্রভৃতি ইটালির শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য-রচয়িতাগণের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। সময়ে তিনি যে একজন সুর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিগণিত হইবেন, ইটালীর তদানীন্তন সমালোচকগণের এই ভাবষ্যদ্বাণী কিশোর কবি ডা'নন্‌জীয়োর যৌবনকালে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল।

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'It Piacere' (বিলাসের দুলাল) প্রকাশিত হইল, সমালোচকগণ তখন 'বাল্জাক্' ও 'গী দে মোঁপাসার' অনেক উচ্চে তাঁহার আসন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে যখন তাঁহার 'Il Trionfo della Morte' ('মরণের জয়') শীর্ষক পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, তখন ডানন্‌জীয়োর সমুজ্জ্বল যশোভাতি ইটালি অতিক্রম করিয়া বিশ্ব সাহিত্যিকগণকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

অনলপ্রজ্বলিত তৈলকুণ্ড

ইহার পর হইতে ইটালির এই ক্ষণজন্মা কবি ও ঔপন্যাসিকের যাবতীয় রচনা বিশ্বের লোক সাগ্রহে পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

১৯০০ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত ডা'নন্‌জীয়োর 'Fuoco' (জীবন-শিখা) শীর্ষক পুস্তকখানি সাহিত্য-শিল্পের দিক দিয়া সম্ভবতঃ তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলাকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। এই সময় হইতে তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হ'ন; কিন্তু এই নূতন ক্ষেত্রে তিনি অনিবিশেষে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার 'La Nave' ও 'Fedra' নাটক দুইখানিই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল এবং 'La Citta Morta' La Gioconda', 'La Gloria' ও 'Francesca de Rimini'—এই কয়খানি নাটক যে সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অনেকে বলেন, তাহার প্রধান কারণ এই যে, সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা "স্যালাভাইনী" ও অমরী অভিনেত্রী শ্রীমতী 'এলিওনেরা ডিউজ' এই সকল নাটকের নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া। সে যাহা হউক, প্রায় সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাল তিনি নাটক, রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের উৎকর্ষতার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রোমের অনতিদূরে 'আল্‌বেনো' হ্রদতটে তিনি একটী আদর্শ রঙ্গালয় স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সেখানে কেবলমাত্র বসন্তকালে নাট্যাভিনয় হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল, কারণ ডানন্‌জীয়ো বলিতেন বসন্তকালই বৎসরের 'কাব্য-ঋতু'! ভুবনবিদিত মহাকবির এই আদর্শ-নাট্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকল্পে আমেরিকার দুইটী কাব্য-প্রিয়া কুমারী শ্রীমতী মর্‌গান ও শ্রীমতী রুজ্‌ভেল্ট স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত
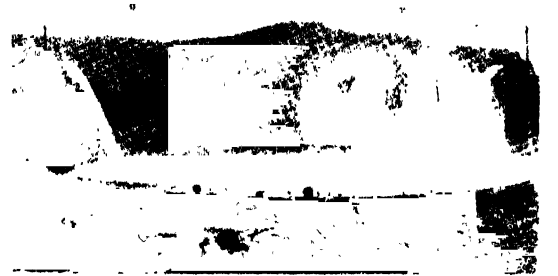
নির্ব্বাপিতাগ্নি প্রশান্ত তৈলকুণ্ড

হইয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণের উৎসাহ না পাওয়ায় এবং নিজের নানা বৈষয়িক গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

ইটালীয় দৃশ্য-কাব্যের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের সেই অপূর্ব্ব করুণ রসধারা পুনঃপ্রবাহিত করিবার জন্য তিনি যে বিপুল প্রয়াস করিয়াছিলেন, দেশের লোক যখন তাঁহার সে সাধু চেষ্টার গুণ সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহার রচিত নাটকগুলি অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও অসহ্য কষ্টকর বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল, ডা'নন্‌জীয়ো তখন লেখনী বন্ধ করিয়া দিলেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার কোনও উল্লেখযোগ্য রচনা আর বাহির হয় নাই। লেখনী বন্ধ করিয়া তিনি এই শেষ কয়েক বৎসর কেবল মানবজীবনের সর্ব্বপ্রকার

সুখ-স্বচ্ছন্দতা নিঃশেষে উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই অপরিমিত বিলাস-লালসালিপ্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের ফলে শীঘ্রই তিনি প্রভূত ঋণ-জালে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। ১৯১০ সালে তাঁহার ঋণের পরিমাণ যখন প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার উর্দ্ধে গিয়া দাঁড়াইল, পাওনাদারেরা তখন তাঁহার আসবাবপত্র ও অগাধ শিল্পসম্ভার সমুদয় ক্রোক করিয়া বসিল। কবি সেইদিন হইতে দেশত্যাগী হইয়া ফ্রান্সে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ইটালীর যোগদান

'তরুণী শ্বেতবালা' (The little white girl)

করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ফ্রান্সের ভার্সেল নগরে ও মধ্যে-মধ্যে প্যারি সহরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে ভার্সেলে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার শেষ নাটক 'The Martyrdom of St. Sebastian," রচনা করেন এবং ১৯১২ সালে উহা মহাসমারোহে প্যারীর শ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। এই সময় প্যারীর প্রধান ধর্ম্মযাজক (Archbishop of Paris) উক্ত নাটকের ঘোরতর নিন্দা ও অপবাদ করিয়া উহা ঘৃণিত ও দণ্ডনীয় বলিয়া ধর্ম্মের নামে ক্রিশ্চিয়ান-জগতের নিকট এক বিজ্ঞাপনপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। জীবনের পথে ও সাহিত্যক্ষেত্রে, তিনি এই ভাবে একাধিকবার শাসিত হইয়াছিলেন। ১৯০৩ সালে তাঁহার "Laus Vitae" শীর্ষক পুস্তকখানি সাধারণের পাঠাগারসমূহে অপাঠ্য গ্রন্থাবলীর তালিকাভুক্ত করা হইয়াছিল, কারণ উক্ত পুস্তকে তিনি ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্ত্তিকে খানায় ফেলিয়া দেওয়া হউক এবং যীশুর জননী অক্ষতযোনি কুমারী মেরী কুজ্ঝটিকার মত শূন্যে বিলীন হইয়া যাউক, ইত্যাদি নাস্তিক্যভাব প্রচার করিয়াছিলেন।

তাঁহার শেষ কবিতাগুচ্ছ "Laude" প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরেই ইটালীকে রণরঙ্গে উদ্দীপিত করিবার জন্য তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যান। যুদ্ধের প্রারম্ভে এই অসীম প্রতিভাশালী অথচ অতীব চঞ্চলমতি

চিত্রকর হুইস্লার (Whitsler)

অসাধারণ কবি নন্দনের নব-সুরভি সুবাস প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত ছিলেন। জম্বীর (citronella) আরবা (amber) ও মিনিয়নেট পুষ্প (mignonette) সংযোগে একপ্রকার গন্ধদ্রব্য আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি কিছুদিন হইতে বিবিধ রাসায়নিক পরীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আর মাত্র একবৎসর কাল তিনি জীবিত থাকিবেন। তারপর তিনি এমন এক আশ্চর্য্য উপায়ে আত্মহত্যা করিবেন যে, তাঁহার দেহের—কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকিবে না। বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাপনে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া, জগতের মূঢ়তায় আন্তরিক বিরক্ত হইয়া তিনি যখন স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে

আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত, সেই সময় অকস্মাৎ য়ুরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল, ডা'নন্‌জীয়োরও আর মরণকে বরণ করা হইল না; বিশ্বের বিরাট ইতিহাসের কোন যুগের কোন পৃষ্ঠায়ই তখন পর্যন্ত এতবড় মহাসমরের কোন সংবাদ ছিল না। ডা'নন্‌জীয়ো এই সমগ্র সসাগরা-ধরণী-পরিব্যাপ্ত মহাযুদ্ধের ব্যাপারে যেন মাতিয়া উঠিলেন। জীবনের সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদ বিস্মৃত হইয়া এই অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক প্রচণ্ড আহবে যোগদান করিতে অনন্ত বৈচিত্র্য-প্রয়াসী কবির অন্তর একেবারে উন্মুখ হইয়া উঠিল।

আশাতীত সাফল্য ও কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিলেন। এই বিপদ-সঙ্কুল আকাশ-যুদ্ধে তিনি অনেকবার আহত হইয়াছিলেন। সামান্য সৈনিক হইতে তিনি অতি সত্বর লেফ্‌টেনান্ট্‌ কর্ণেলের পদে উন্নীত ও অসংখ্য সম্মানের পদকে ও গৌরবের নিশানায় ভূষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পর শান্তি-সভার অধিবেশনে যখন "ফিউম" (Fiure) শত্রুকে প্রত্যর্পণ করাই স্থির হইল, মহাকবি 'ড'নন্‌জীয়ো' তখন সর্ব্বপ্রথম প্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে তাহাতে ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ করিলেন; কিন্তু

হুইস্‌লারের অঙ্কিত 'পুরাতন সেতু' (The old Battersen bridge)
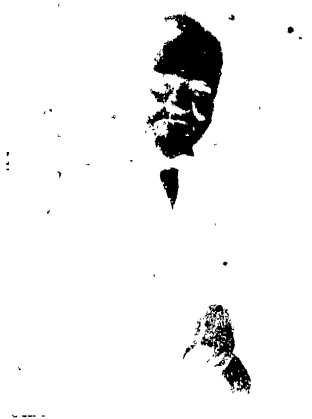
পাশ্চাত্য দানবীর কার্ণেজী

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যসংগের একজন মুকুটমণি, ভোগ-বিলাসের অপরিমিত উপাসক, রঙীন রেশমী কিংখাপ ও জরীদার পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার একান্ত পক্ষপাতি, চারুচিত্র ও সূক্ষ্ম শিল্পকলার পরম ভক্ত, সতত সুরভি সুবাস কুসুম-গন্ধের অন্ধ অনুরাগী, নিয়ত শত পরকীয়া প্রণয়িনীর প্রিয়তম পাত্র, এই চূড়ান্ত সৌখীন কবি—যুদ্ধ-ঘোষণার প্রথম দিনেই বিশ্বের লোককে বিস্মিত করিয়া ইটালীর সৈন্যদলে সর্ব্বপ্রথম নাম লিখাইয়া আসিলেন। অসাধারণ প্রতিভা ও অসীম মনীষা সম্পন্ন এই নূতন কর্ব্ব-সৈনিক শীঘ্রই সামরিক খ'পোতবিভাগে অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাইতে লাগিলেন। অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে বারংবার বিমান আক্রমণের অভিযানে যাত্রা করিয়া

গভমেণ্ট পক্ষ সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না দেখিয়া তিনি শাসন-বিভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অসংখ্য অনুচর সংগ্রহ করিয়া দুর্দ্দণ্ড সাহসের সহিত বিপুল বিক্রমে 'ফিউম' পুনরধিকার করিয়া বসিলেন।

অসংখ্য সুসজ্জিত বাহিনী লইয়া তিনি যেদিন প্রচণ্ডবেগে ফিউমের তোরণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজকীয় পক্ষের সেনাধ্যক্ষ 'পিট্টালুগা' (Pittaluga) সদলে আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিলেন। কবিকে সম্বোধন করিয়া সেনাপতি কহিলেন "হে কবি! তুমি এ কি করিতেছ? তোমার জন্য কি শেষে ইটালির সর্ব্বনাশ হইবে?' কবি জলদগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করিলেন "সেনাপতি, যাহারা অধিকৃত দেশ শত্রুর

কবলে প্রত্যর্পণ করে, দেশের সর্ব্বনাশ ত সেই সকল কাপুরুষের দ্বারাই সাধিত হয়!" সেনাপতি সলজ্জভাবে উত্তর করিলেন "আমি রাজভৃত্য; আদেশ প্রতিপালন করিতেছি মাত্র!" কবি কহিলেন "উত্তম, তবে এস সেনাপতি, তোমার ভা'য়েদের বুকে অস্ত্রাঘাত কর,—সর্ব্বাগ্রে আমায় হত্যা কর।" এই বলিয়া কবি যখন অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় বক্ষবাস উন্মুক্ত করিয়া নগ্ন বক্ষ বিস্তৃত করিয়া দিলেন, সেনাপতি তখন কবিকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চকণ্ঠে আনন্দধ্বনি করিলেন "জয় হ'ক কবি! তোমারই জয় হ'ক! ইটালি অমর হ'ক!"

(Literary Digest.)

২। অগ্নি নির্ব্বাপনের সহজ উপায়।

কোথাও অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে দম্‌কলে জল ঢালিয়া তাহা নির্ব্বাপন করিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু সকল স্থানে সত্বর কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না; বিশেষতঃ—কেরোসিন পেট্রল প্রভৃতি দাহ্য (highly inflammable) তৈলের কারখানায় যখন একবার আগুন জ্বলিয়া উঠে, দম্‌কলের সহস্র ধারায় বারি-বর্ষণ করিলেও উহা নির্ব্বাপিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অগ্নি আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ে; কারণ, তৈলের একটা প্রধান গুণই এই যে, উহা জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। এরূপ স্থলে অঙ্গারজান বাষ্প (Carbonic Acid Gas) প্রয়োগেও কোন সুফল পাওয়া যায় না; কারণ ঐ সময়ে বায়ু-প্রবাহের উর্দ্ধগতি প্রভৃতি অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ে আকাশমণ্ডলের অতি-ব্যাপকতা উপস্থিত হয়। সম্প্রতি এই উভয়বিধ অসুবিধা সত্ত্বেও তৈল-সম্পর্কীয় অগ্নি নির্ব্বাপনের এক সহজ উপায় বাহির হইয়াছে। অঙ্গারজান-পূর্ণ বুদ্বুদ সংযুক্ত একটা ফেনময় আবরণ ঐ সকল প্রজ্বলিত তৈলকুণ্ডের উপর বিস্তৃত করিয়া দিতে পারিলে আশ্চর্য্য সুফল পাওয়া যায়। কারণ ঐ অঙ্গারজানযুক্ত বুদ্বুদবিশিষ্ট ফেনাবরণটি জ্বলন্ত তৈলোত্থিত বাষ্পরাশিকে কেন্দ্রগত করিয়া ফেলে, এবং এই উপায়ে লেলিহান অগ্নিশিখা এমন কি উহার ধূম ও স্ফুলিঙ্গ পর্য্যন্ত নিঃশেষে নির্ম্মূল করিয়া দেয়।

উক্ত ফেনাকৃতি অঙ্গারজানযুক্ত আবরণের সাহায্যে অগ্নি নির্ব্বাপন করিবার আরও একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, উহা জলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক শুষ্ক এবং উহার সম্পর্কে কোনও পদার্থই একেবারে সিক্ত হইয়া উঠে না। সুতরাং, জলের সাহায্যে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য মূল্যবান জিনিস জলে ভিজিয়া যাওয়ায় পূর্ব্বে যে ক্ষতিটা হইত, এখন ইহার সাহায্যে আগুন নিভাইয়া আর কাহাকেও সে ক্ষতিটুকু সহ্য করিতে হইবে না।

প্রচণ্ড অনল-নির্ব্বাপক এই রাসায়নিক পদার্থ অধুনা জগতের চতুর্দ্দিকেই ব্যবহৃত হইতেছে। উহাই গর্ভে ধারণ করিয়া অসংখ্য অগ্নি-দমন-পিচ্‌কারী (Fire extinguisher) আজ ভারতবর্ষেরও অনেক সহরের মাল-গুদামে ও সাধারণ প্রমোদ-ভবনসমূহে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ভারতের প্রত্যেক পল্লীতে ইহার সংস্থান বাঞ্ছনীয়!

(Literary Digest)

৩। একালের তুলনায় সেকালের চিত্রশিল্প

একদল বর্ত্তমান চিত্র-সমালোচক সেকালের চিত্র-শিল্পের মধ্যে সূক্ষ্ম কলা-কৌশলের অনেক অভাব ও খুঁত আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; বিশেষতঃ, আদ্য, মধ্য, ও অন্ত্য ভিক্টোরীয় যুগের চিত্রকলার প্রতি তাঁহারা অতিরিক্ত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্য একদল সমালোচকও আছেন, যাঁহারা কেবল প্রাচীন চিত্রকলার মধ্যেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিল্প-চাতুর্য্যের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পান; এবং পূর্ব্ব দলের মতে চিত্রবিদ্যা যে ক্রমশঃ অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিয়া, নবীন চিত্র-শিল্পের পক্ষপাতিগণকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, তোমরা আজ যেরূপ প্রাচীন চিত্রকলার দোষ-ত্রুটির আবিষ্কার করিয়া উহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছ—চিত্রকলার ভবিষ্যৎ সমালোচকগণও সেইরূপ তোমাদের এই বর্ত্তমান যুগের চিত্র-শিল্পের প্রতি যে ততোঽধিক অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন না, সে বিষয়ে তোমরা কৃতনিশ্চয় হইতেছ কিরূপে?—তাঁহাদের এই আশঙ্কার স্বপক্ষে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ "হুইস্‌লারের" (Whistler) নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলেন যে, ভিক্টোরীয় যুগের এই দেশ-বিখ্যাত চিত্রকর তাঁহার সহযোগিগণকে নিতান্ত সেকেলে ও একেবারে

নিরুপায় ভাবে প্রাচীন-পন্থী বলিয়া উপহাস করিতেন, এবং আপনাকে সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন কলার প্রভাবমুক্ত নূতন-পন্থী বলিয়া সগর্ব্বে প্রচার করিতেন। কিন্তু আজ যদি সেই উনবিংশ শতাব্দীর স্বনামখ্যাত চিত্রকর জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে, লণ্ডনের 'জাতীয় চিত্রমঞ্চে' (National Art Gallery) ১৮৬৫ সালে অঙ্কিত তাঁহার দুইখানি প্রধান ছবি প্রাচীন শিল্প-বিভাগে রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া, নিশ্চয়ই দুঃখিত হইতেন। অথচ তাঁহার এই দুইখানি চিত্রের মধ্যে 'তরুণী শ্বেতবালা' (The Little White Girl) ছবিখানি দেখিয়া, অনেক আধুনিক সমালোচক সবিস্ময়ে বলিয়া উঠেন, "কি আশ্চর্য্য! এমন স্নিগ্ধ কমনীয় চারু চিত্রকলার অপূর্ব্ব নিদর্শনখানিকে ১৮৬৪ সালের চিত্রশিল্প-সমালোচকগণ কি হিসাবে 'জঘন্য' হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন?"

আধুনিক চিত্র-সমালোচকগণ যাহাই বলুন না কেন, প্রাচীন চিত্রের প্রতি সাধারণের এখনও যথেষ্ট অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। শুধু যে তাহাদের প্রাচীনত্বের মর্য্যাদার জন্যই সেগুলি লোকের নিকট সম্মানিত তাহা নহে; উহাদের সুন্দর সুকুমার চিত্রকলার পরাকাষ্ঠার জন্যই সেগুলি এখনও সকলের নিকট বিশেষ ভাবে সমাদৃত।

(Literary Digest.)

৪। পাশ্চাত্য দানবীর কার্নেজী!

আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুত ধনী, দয়া-দাক্ষিণ্য ও পরোপকারের আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি এণ্ড্রু কার্নেজী (Andrew Carnegi) সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। আপনার অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও যত্নে, অবিরত পরিশ্রমে ও অসীম অধ্যবসায়ের গুণে তিনি একজন সামান্য সংবাদ-বাহকের অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রোরপতিতে পরিণত হইয়াছিলেন ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে স্কটল্যাণ্ডের এক দরিদ্র তন্তুবায়-গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে পিতা-মাতার সহিত তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর আমেরিকায় আসিয়াছিলেন। আমেরিকায় এক তাঁতের কলে তিনি বাল্যাবস্থাতেই সপ্তাহে ৩৷৶০ মজুরীতে প্রথম কার্য্য আরম্ভ করেন। এখানে তিনি চর্‌কা তৈয়ার করিতে শিক্ষা করেন এবং পরে একটি চরকার দোকানে সপ্তাহে ৯৲ টাকা মজুরীতে নিযুক্ত হ'ন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সবে ১৪ বৎসর মাত্র। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি সংবাদ-বাহকের কার্য্য গ্রহণ করেন এবং ক্রমে তার-যোগে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করাও শিখিয়া লইয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তিনি রেলওয়ে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ মিঃ স্কটের নিকট মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতে আসেন এবং স্কট সাহেবের বিশেষ আনুকূল্যে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে যখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ২৮ বৎসর, তখন তিনিও মিঃ স্কটের ন্যায় রেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ প্রাপ্ত হ'ন। রেলে কর্ম্ম করিবার সময়ে তিনি অনেকগুলি লাভজনক কারবারে টাকা খাটাইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি মিঃ উড্রফ্‌ ও মিঃ স্কটের সহিত একত্র রেলে ঘুমাইবার গাড়ী (Sleeping Car) উদ্ভাবন করিলেন, তখন হইতে তাঁহার অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল! তার পর লৌহের কারখানা প্রভৃতি বড়-বড় ব্যবসায়ে তিনি ক্রমে ক্রোরপতি হইয়া উঠিলেন। তিনি জীবনে প্রায় দেড়শত কোটী টাকার অধিক উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; এবং বিবিধ দান ও সৎকার্য্যে একশত-পাঁচ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৪ বৎসর হইয়াছিল। (Review of Reviews)

নিখিল ভারতবর্ষীয় প্রাচ্য-বিদ্যা-বিষয়িণী সম্মিলনী

[অধ্যাপক ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-আর-এস, পিএইচ-ডি]

বিগত ৫ই নবেম্বর তারিখে পুণা নগরীতে এই সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্যারী সহরে প্রাচ্য-বিদ্যাবিষয়ক আলোচনার জন্য "International Congress of the Orientalists" নামক একটী মহৎ অনুষ্ঠান আরব্ধ হয়। তৎপরে লণ্ডন, ভিয়েনা, লিডেন প্রভৃতি য়ূরোপের কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ সহরে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে। ইহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পুণা নগরীর "ভাণ্ডারকর পুরাতত্ত্ব-অনুসন্ধান-সমিতি" ভারতবর্ষে এইরূপ সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করেন। তাঁহাদের অশেষ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে সম্প্রতি এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

সম্মিলনীর আহ্বানকারিগণ গত জুলাই মাসে মুদ্রিত পত্র প্রেরণ করিয়া, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যাঁহারা প্রাচ্যবিদ্যার আলোচনায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করেন; এবং যাহাতে তাঁহারা সকলেই স্ব-স্ব গবেষণার ফল প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া এই সম্মিলনীতে প্রেরণ করেন, তাহার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। এইরূপ প্রবন্ধ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত হ'ন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও কারমাইকেল অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর বাঙ্গালা দেশের জন্য এইরূপ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, পুরাতত্ত্বসমিতি, ও অন্যান্য প্রাচ্য-বিদ্যাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান-সমূহের নিকটে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, ১০ই অক্টোবরের পূর্ব্বে এই সমুদয় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে; কারণ, আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁহারা প্রত্যেক প্রবন্ধের সারাংশ মুদ্রিত করিয়া, সম্মিলনীর অধিবেশনের পূর্ব্বেই, প্রত্যেক সদস্যের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এইরূপ সুব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ পুণা সহরে সমাগত হন। সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষ সমুদায় প্রতিনিধির আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভাণ্ডারকর ইনষ্টিটিউটের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বৃহৎ সামিয়ানার তলে সভার জায়গা করা হইয়াছিল। ৫ই নবেম্বর বেলা ১১টার সময় সভার প্রথম অধিবেশন হয়। বোম্বাই প্রদেশের লাট সাহেব সার জর্জ্জ লয়েড সভাস্থলে উপস্থিত হইলে, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ভি, পি, বৈদ্য অভ্যাগত মণ্ডলীকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া একটী সুন্দর, নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপরে সার জর্জ্জ লয়েড তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এবং বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হিসাবে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত বিদ্বন্মণ্ডলীকে বোম্বাইর পক্ষ হইতে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর অধ্যাপক উলনার (পঞ্জাব) প্রস্তাব করেন যে, ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরকে এই সম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হউক। শ্রীযুক্ত কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী (মান্দ্রাজ), খোদাবক্স, এবং তুকারাম লাড্ডু (কাশী) এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। এই প্রসঙ্গে ইঁহারা সকলেই সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহোদয়ের পাণ্ডিত্যের আলোচনা ও তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, কিন্তু বিশেষ দুঃখের বিষয়, শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ অশীতিপর বৃদ্ধ ভাণ্ডারকর মহোদয় সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মুদ্রিত অভিভাষণ অন্য একজন পাঠ করেন। ইহার সারমর্ম্ম নিম্নে সংকলিত হইল।

'অদ্য এই সভাস্থলে যাহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষিত পণ্ডিত, এবং আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে সাহিত্য, শিলালেখ প্রভৃতির আলোচনাকারী প্রত্নতাত্ত্বিক। প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ দুইটি শাস্ত্র সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেন,—ব্যাকরণ এবং ন্যায়। ব্যাকরণ বিভাগে প্রধানতঃ ভট্টোজী দীক্ষিতের সিদ্ধান্ত-কৌমুদী ও

মনোরমা, নগোজীভট্ট প্রণীত পরিভাষেন্দুশেখর ও শব্দেন্দুশেখরের কিয়দংশ এবং পতঞ্জলি মহাভাষ্যের অঙ্গাধিকার অংশ অধীত হয়। এই বিষয়ে আমার প্রস্তাব এই যে, মহাভাষ্য যে প্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও তথ্য-বহুল গ্রন্থ, তাহাতে ইহার সমগ্র অংশেরই পঠন-পাঠন প্রচলিত করা উচিত। নগোজী ভট্টের ন্যায় বৈয়াকরণিকও মহাভাষ্যের অংশ-বিশেষের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং আমি তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা নিরূপণ করিয়া প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছি (এস্থলে উল্লিখিত মন্তব্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহাভাষ্যের অংশ-বিশেষের আলোচনা করেন)। ন্যায় বিভাগে, বঙ্গদেশীয় গঙ্গেশোপাধ্যায়-বিরচিত তত্ত্ব-চিন্তামণি, এবং রঘুনাথ ভট্ট শিরোমণির দীধিতি হইতে আরম্ভ করিয়া জগদীশ ভট্টাচার্য্যের জাগদীশী, ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের গাদাধরী অবধি যে সকল দুরূহ ও জটিল টিপ্পনী প্রণীত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের সাহায্যে নব্য ন্যায়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়। এই সমুদায়ের আলোচনায় এক প্রকার কৃত্রিম পাণ্ডিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে*, এবং ইহাতে ধীশক্তি তীক্ষ্ণতা লাভ করিলেও, তাহা সাধারণ বিষয়ে বড় একটা কাজে লাগে না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, গৌতম-প্রবর্ত্তিত তর্ক ও ন্যায় শাস্ত্রের পঠন-পাঠন বন্ধ হইয়া এক্ষণে কেবল মাত্র নব্য ন্যায়ের আলোচনা হইতেছে। কারণ, যে সময়ে বাৎস্যায়ণ গৌতম-প্রণীত ন্যায়-শাস্ত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন, ঠিক সেই সময়েই বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে; এবং এই দুই দলের মধ্যে যে বিচার-বিতর্ক হয়, তাহা পাঠ করিলে, মানুষের চিন্তাশক্তি কি প্রণালীতে উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করে, তৎসম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। বৌদ্ধ আচার্য্য দিঙ্‌নাগ প্রভৃতির উত্তরে বাচস্পতি উদ্যোত নামক গ্রন্থ এবং 'বার্ত্তিক তাৎপর্য্যটীকা' নামে তাহার টিপ্পনী প্রণয়ন করেন। উদয়ন 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' নামে এই শেষোক্ত গ্রন্থের টিপ্পনী লেখেন। এই সমুদায় গ্রন্থে মহাযান বৌদ্ধের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণগণের যুক্তিতর্ক নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এবং ইহা পাঠ করিলে শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই লাভ করা যায়। কিন্তু কৃত্রিম ও জটিল নব্য ন্যায়ের আলোচনার ফলে এই সমুদয় গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা একেবারে রহিত হইয়া গিয়াছে। তবে শুনিয়াছি, মিথিলায় না কি ইহার কোন-কোন গ্রন্থ এখনও পঠিত হয়।

ব্যাকরণ ও ন্যায় ব্যতীত, প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষিত পণ্ডিতগণ অপর কয়েকটি বিষয়ও অধ্যয়ন করেন; যেমন (১) সাহিত্য (২) আয়ুর্ব্বেদ ও (৩) জ্যোতিষ। সাহিত্য-বিভাগে সাধারণতঃ কাব্য, নাটক ও কুবলয়ানন্দ, কাব্য-প্রকাশ ও রসগঙ্গাধর প্রভৃতি অলঙ্কার-গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে অন্যান্য যে সমুদায় পুস্তকের উল্লেখ আছে, তাহার কতক-কতক এই বিভাগের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিলে ভাল হয়। অন্য দুইটি বিভাগ সম্বন্ধে আমার বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। আমাদের দেশে মীমাংসা-শাস্ত্র অধীত হয় কি না আমি জানি না; কিন্তু ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যার জন্য মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হইবে। আর ধর্ম্মশাস্ত্র ও মীমাংসার সঙ্গে-সঙ্গে শবর স্বামীর ভাষ্য ও কুমারিল ভট্টের বার্ত্তিকের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ নিয়মিতরূপে পঠিত হওয়া উচিত।

প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষিত পণ্ডিত-সম্প্রদায় ব্যতীত এই সভাস্থলে উপস্থিত, অধুনাতন বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর অনুসরণকারী দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্বন্মণ্ডলীর সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, উক্ত প্রণালী অবলম্বনে, প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস উদ্ধারের নিমিত্ত, প্রাচীন সাহিত্য, শিলালিপি প্রভৃতির অধ্যয়ন প্রধানতঃ একটী য়ুরোপায় বিদ্যা। সুতরাং য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী যে পদ্ধতি অনুসারে অধ্যয়ন করেন, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া, আমাদের নবোন্মেষিত বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে, তাহার মধ্যে যাহা-যাহা ভাল মনে হয়, তাহাই গ্রহণ করা উচিত। ভারতবাসী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের একযোগে কার্য্য করা উচিত; একের প্রতি অন্যের অবজ্ঞার ভাব পোষণ করা উচিত নহে। কারণ, আমাদের সকলেরই এক উদ্দেশ্য,—সত্যের আবিষ্কার। এ কথা সত্য যে, উভয়েরই কতকগুলি স্বভাবজাত সংস্কার আছে; এবং তাহার ফলে, একই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উভয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অর্থাৎ উভয়ের মানসিক গতি একটু ভিন্ন রকমের। ভারতবাসীরা সাধারণতঃ তাঁহাদের প্রাচীন সভ্যতার উপর বিদেশীয় প্রভাব অস্বীকার

* "The whole bearing has become extremely artificial."

করেন; এবং তাঁহাদের দেশীয় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির অধিকতর প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে যত্নবান হ'ন। অপর পক্ষে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতবর্ষের যাহা কিছু বিশেষত্ব, তাহার মূলে গ্রীক, রোমক অথবা খ্রীষ্টীয় প্রভাবের আরোপ করেন, এবং ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক ঘটনাবলীর আধুনিকত্ব প্রতিপাদন করিবার প্রয়াসী হ'ন। এই জন্যই ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলির কাল নির্ণয় লইয়া পণ্ডিতগণের মতভেদ। কাহারও মতে ইহা খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দী, আবার কাহারও মতে ইহা কলিযুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। তবে অনেক বিষয়ে বাদানুবাদের ফলে সত্য নির্দ্ধারিত হয়, এবং উভয় পক্ষই তাহা স্বীকার করেন।

যে সমুদয় বিষয় এরূপ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে অধ্যয়ন করা আবশ্যক, তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়। এযাবৎ কেবল য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণই এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, ভারতবাসীরা বিশেষ কিছুই করেন নাই। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতগণের এবিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া বিশেষ আবশ্যক; কারণ, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক সময়ে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না; এমন কি কেহ-কেহ নিরপেক্ষ বিচার পূর্ব্বক ইহার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ধার করিতে চেষ্টা না করিয়া, ইহার অসারত্ব প্রতিপাদন করিতে বদ্ধপরিকর হ'ন। অবশ্য এ সকল দোষ সত্ত্বেও য়ুরোপীয় পাণ্ডিত্য নানা কারণে সম্মানার্হ। কিন্তু তথাপি, বেদাদি শাস্ত্রের বিশেষ ভাবে অনুশীলন করা ভারতবাসী পণ্ডিতগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তবে তাঁহারা যদি য়ুরোপীয় নীতি অনুসরণ পূর্ব্বক, অথবা য়ুরোপীয় পণ্ডিতের অধীনে শিক্ষালাভ করিয়া বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী আয়ত্ত করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা নানারূপ ভুলভ্রান্তি করিবেন এবং তাঁহাদের যুক্তি-তর্ক অসার হইয়া পড়িবে।

য়ুরোপের বেদান্তচর্চ্চা অধ্যাপক ডয়সনের মত দ্বারা অনুপ্রাণিত। ডয়সন শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ও একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ কথাটি কেহ তলাইয়া বুঝেন নাই যে, উপনিষদসমূহের সিদ্ধান্তগুলি এক ও অভিন্ন নহে; পরন্তু ভিন্ন-ভিন্ন ও পরস্পর-বিরুদ্ধ। ন্যায়-শাস্ত্র-চর্চ্চার প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ ও মহাযান বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায়ের বিচার-বিতর্কের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। বাৎস্যায়ন ও ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ-পক্ষ এবং দিঙ্নাগ ও অন্যান্য আচার্য্যেরা বৌদ্ধপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এই বিচার-বিতর্ক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আলোচিত হওয়া উচিত; অসম্ভব নহে যে, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ বৌদ্ধ শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রাচীন লিপি একটি বিশেষভাবে শিক্ষণীয় বিষয়। প্রস্তর অথবা তাম্রফলকে উৎকীর্ণ বহুসংখ্যক প্রাচীন লেখ ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহাতে নানা প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আলোচনা করিলে, ইহা হইতে বহু প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস ও অন্যান্য অনেক ঘটনার বিষয় জানিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে কণিষ্কের শিলালিপি অতিশয় দুরূহ ও জটিল। এই রাজবংশের সমস্ত লিপি ও এতৎ সম্বন্ধীয় যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সঙ্কলন করিয়া এই বংশের রাজ্যকাল নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় ব্যাপৃত হওয়া অবধি আমাকে বহু বিচার বিতর্ক করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে নবাবিষ্কৃত কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র লইয়া পণ্ডিত সমাজে বিষম আন্দোলন চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াই আমার এই অভিভাষণ সমাপ্ত করিব। অধ্যাপক য়্যাকোবির মতে এই গ্রন্থের রচয়িতা চাণক্য অথবা বিষ্ণুগুপ্ত, যিনি নন্দবংশ ধ্বংসপূর্ব্বক মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক হিলেব্রাণ্ডের মতে ইহার গ্রন্থকার কৌটিল্য স্বয়ং নহেন, তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত অপর কেহ। আমি কেবলমাত্র এই বিষয়টি প্রতিপন্ন করিতে চাই যে, এই গ্রন্থখানি মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন নহে, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে লিখিত। বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে সর্ব্বপ্রথম এই গ্রন্থের উল্লেখ করেন। তৎপরে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কামন্দক, ষষ্ঠ শতাব্দীতে দণ্ডী এবং সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে পারিপার্শ্বিক নানা ঘটনার ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যের নানা বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু

তিনি কৌটিল্য অথবা তৎপ্রণীত অর্থশাস্ত্রের কোন উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ, বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামসূত্র অপেক্ষা প্রাচীনতর কোন গ্রন্থেই কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কামসূত্রে সাতবাহনরাজ কুণ্ডল শাতকর্ণির উল্লেখ আছে। ইনি খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। সুতরাং বাৎস্যায়ন প্রথম অথবা দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্রকে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন বলা যায় না। তন্ত্রযুক্তি অধ্যায়ের উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে

যেন শাস্ত্রং চ শস্ত্রং চ নন্দরাজগতা চ ভূঃ।
অমর্ষেণোদ্ধৃতান্যাশু তেন শাস্ত্রমিদং কৃতম্॥

এই শ্লোকের শেষ চরণের 'শাস্ত্র' এই শব্দটি দ্বারা 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থখানি সূচিত হইয়াছে, এবং প্রথম শ্লোকার্দ্ধের 'শাস্ত্র' শব্দটি, উক্ত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা ও তাঁহার উৎপত্তি প্রভৃতি সূচিত করিতেছে।—কিম্বদন্তী অনুসারে কৌটিল্যের মস্তিষ্কেই এই প্রকার ধারণার উৎপত্তি হয়; সেই জন্যই তিনি অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

পার্শীগণের ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তার আলোচনা সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক অনুশীলনের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। কারণ, আবেস্তার ভাষা ও বৈদিক সংস্কৃতে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আঁকেতি দুপেরোঁ নামক ফরাসী পণ্ডিত অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবেস্তিক সাহিত্যের আবিষ্কার করেন। তৎপরে য়ুরোপে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইহার চর্চ্চা আরম্ভ হয় এবং মার্টিন হগ প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইহার আলোচনায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন। পরলোকগত কে, আর, কামা ভারতবর্ষে এই চর্চ্চার সূত্রপাত করেন। তৎপরে কয়েকজন পার্শী পণ্ডিত এই কার্য্যে ব্যাপৃত হ'ন। ডাক্তার জীবনজী জেমসেটজী মোদী তন্মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রতিভাসম্পন্ন পার্শীগণ আরও অধিক সংখ্যান এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম ও সংস্কার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বড়ই ভাল হয়।

আরব ও পারশ্য দেশীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করিলে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারা যাইবে; কারণ, অলবেরুণীর ন্যায় অনেক প্রাচীন আরব ও পারশ্যদেশীয় লেখক ভারতবর্ষের সমসাময়িক ইতিহাস, ধর্ম্ম-সংস্কার ও আচার-ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান প্রাদেশিক ভাষা-সমূহ এই সমুদায় সাহিত্যের নিকট বিশেষভাবে ঋণী; এবং এতৎ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি ভাষাগত সমস্যা আরব ও পারশ্য দেশীয় সাহিত্যের সাহায্য ব্যতীত সমাধান করা যায় না। আশা করি পণ্ডিতগণ অধিকতর উৎসাহের সহিত এই সমুদায় এবং চীন দেশীয় ও অন্যান্য সাহিত্যের অনুশীলন করিবেন; নচেৎ, আমাদের প্রাচ্য দেশীয় বিদ্যা অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী হইবে।"

ভদ্রমহোদয়গণ আমি আমার অভিভাষণ শেষ করিলাম। বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুমোদিত আলোচনা দেশে সমধিক প্রসার লাভ করিতেছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। সম্প্রতি বিশেষভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক গবেষণার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করেন নাই। তথাপি, এই বিশ্বাস লইয়া আমি আমার কর্ম্মজীবনের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি যে, আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক রীতি অনুযায়ী আলোচনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; এবং নিন্দা ও আক্রমণ সহ্য করিয়াও ইহা টিঁকিয়া থাকিবে। আমাদের এই সম্মিলনে বহুসংখ্যক প্রবন্ধ পঠিত হইবে—এবং তাহার মধ্যে অনেকগুলি বিশেষ মূল্যবান—ইহা অতি আনন্দের বিষয়। আমি আশা করি, আমাদের অদ্যকার এই সম্মিলনী প্রাচ্য বিদ্যার উন্নতির ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।"

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ সমাপ্ত হইলে, সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করার জন্য দুইজন সহকারী নির্ব্বাচনের প্রস্তাব হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়ের প্রস্তাব মতে অধ্যাপক উলনার ও মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এই পদে বৃত হইলেন। অনন্তর এই সম্মিলনীর নিয়ম প্রণালী বিধিবদ্ধ করিবার জন্য, এবং নানা স্থান হইতে পণ্ডিতগণ যে সমুদয় প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার আলোচনার নিমিত্ত, একটি সমিতি গঠিত হয়। অতঃপর শ্রীমন্ত বালসাহেব পান্ত প্রতিনিধি লাট ও লাট-পত্নীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীমন্ত বাবা সাহেব পান্ত সচিব

এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। ইহার পর পানসুপারি বিতরণান্তে প্রায় ১টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

অপরাহ্নে প্রায় তিনটার সময় দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধ্যাপক উলনার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরদিন যে সমুদায় শাখা সমিতির অধিবেশন হইবে তাহার সভাপতি স্থিরীকৃত হয়। অতঃপর, পুণার ভাণ্ডারকর-অনুসন্ধান-সমিতি যে মহাভারতের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিবার আয়োজন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়। অধুনা ভারতবর্ষে মহাভারতের যে সমুদয় পাঠ প্রচলিত আছে, তাহার তুলনা করিয়া মহাভারতের সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করাই এই নূতন সংস্করণের উদ্দেশ্য। প্রকাশকগণ এই সংস্করণে কয়েকখানি চিত্র সংযুক্ত করার ইচ্ছা করিয়াছেন ; এক্ষণে এই সমুদায় চিত্রে মহাভারতোক্ত নায়ক-নায়িকাগণের পরিচ্ছদাদি কি প্রকার হইবে, প্রকাশকগণ তদ্বিষয়ে সমাগত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মত জানিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এতদুপলক্ষে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়।

তার পর প্রবন্ধ পাঠের পালা। প্রবন্ধগুলি দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। কতকগুলি প্রথম ও তৃতীয় দিন সাধারণ অধিবেশনে এবং অবশিষ্টগুলি দ্বিতীয় দিন ভিন্ন-ভিন্ন শাখা সমিতিতে পঠিত হয়। প্রথম দিন দ্বিতীয় অধিবেশনে, নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল।—

প্রবন্ধের নাম।	লেখকের নাম।
১। ভারতীয় লিপির উৎপত্তি.	অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর (কলিকাতা)।
২। শাহনামায় উত্থহরণ	পি, বি, দেশাই (বোম্বাই)।
৩। ভারত ও প্রাচীন জগৎ	ডাক্তার গৌরাঙ্গনাথ ব্যানার্জী।
৪। ভারতীয় সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব	অধ্যাপক এম্, হিরিয়ন্ন (মহীশূর)।
৫। বরুণের প্রতিনিধি অহুর মজদা	এস্, কে হোদিওয়ালা (বোম্বাই)।
৬। ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা গৌতমের ঈশ্বরবাদ	ডাক্তার গঙ্গানাথ ঝা (বারাণসী)।
নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দুইটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল—	
৭। আরবী ভাষা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য	শামসুলউলামা সৈয়দ মহম্মদ আমিন (জব্বলপুর)।
৮। 'পরিবর্ত্তন' সম্বন্ধে বৌদ্ধ-দার্শনিক অভিমত	মং সোয়ে জন অং (রেঙ্গুন)।

পরদিন ৬ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার কেবল শাখা-সভাগুলির অধিবেশন হয়। প্রাতঃকালে ৮॥০ হইতে ১০॥০টা মধ্যে ও বৈকালে ২॥০টা হইতে ৫॥০টা মধ্যে সভামণ্ডপের বিভিন্ন কক্ষে নিম্নলিখিত পৃথক-পৃথক সভাপতির অধীনে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সভার অধিবেশন হইল—

সময়	শাখা সভার নাম	সভাপতি
প্রাতঃকাল	১। বেদ ও আবেস্তা	ডাক্তার আর জিমারম্যান এবং ডাক্তার জে, জে মোদি
"	২। সংস্কৃত সাহিত্য ও বর্ত্তমান প্রাদেশিক ভাষা	অধ্যাপক এস্, কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী
"	৩। পারস্য ও আরবদেশীয় জাতিতত্ত্ব ও লোক সাহিত্য (folk-lore)	ডাক্তার মোদি
"	৪। শিল্পবিজ্ঞান	জে, আর, কে
"	৫। প্রত্ন-তত্ত্ব	অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর

বৈকাল	৬।	দর্শন	ডাক্তার গঙ্গানাথ ঝা
„	৭।	বৌদ্ধধর্ম্ম	ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
„	৮।	প্রাচীন ইতিহাস	অধ্যাপক কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার
„	৯।	ভাষাতত্ত্ব ও প্রাকৃত	অধ্যাপক ভি, কে, রাজওয়াড়ে

আমি সকালে 'প্রত্নতত্ত্ব' ও বৈকালে 'প্রাচীন ইতিহাস' এই দুই শাখা-সভায় যোগদান করিয়াছিলাম। সুতরাং কেবলমাত্র এতৎ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়—

	প্রবন্ধের নাম	লেখক
১।	ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থানসমূহ এবং তাহা খনন করিবার প্রণালী	ভি, নটেশ আয়ার
২।	সংস্কৃত পুঁথি এবং তাহার অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ	আর, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী
৩।	ভারতীয় প্রাচীন শিল্প-বিদ্যা পাঠের ভূমিকা	এম, এ, অনন্দলওয়ার
৪।	প্রাচীন স্থাপত্য পদ্ধতি	ওয়াই আর, গুপ্তে
৫।	প্রাচীন কলচুরি এবং তাহাদের তাম্রশাসনের লিপি	ঐ
৬।	দাক্ষিণাত্যের গুহায় উৎকীর্ণ ব্রাহ্মীলিপি	এইচ, কৃষ্ণশাস্ত্রী
৭।	জৈন-পুঁথি	জে, এস্, কুদলকার
৮।	পরমার রাজ-ভোজের তিলকওয়াড়া তাম্রশাসন	
৯।	অশোকানুশাসনের সময়-নিরূপণ	টি, কে লাড্ডু
১০।	রাজতরঙ্গিণী ও কাশ্মীরের প্রত্নানুসন্ধান	দয়ারাম সাহনি
১১।	কয়েকটী বলভি মুদ্রা সম্বন্ধে মন্তব্য	জি, পি, টেলর
১২।	সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাভূত আর্য্যাবর্ত্তের রাজন্যবৃন্দ	কে, এল দীক্ষিত

নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দুইটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল—

১৩।	দাক্ষিণাত্যের শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ মন্দির	জি, জে, দুব্রেইল
১৪।	সাঁচি	বি, ঘোষাল

প্রাচীন ইতিহাস বিভাগে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল—

১।	প্রাচীন ভারতেতিহাসের কালনিরূপণে মূলগত ভ্রান্তি	এম, কে আচার্য্য
২।	কর্ণাটক এবং ভারতেতিহাসে ইহার স্থান	ভি, বি, আলুর
৩।	কঙ্কণের প্রাচীন ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে মন্তব্য	পি, ভি, কাণে
৪।	রাবণের লঙ্কা কোথায়	এম্, ভি, কিবে
৫।	শাম্ব আখ্যান এবং প্রাচীন জোরোষ্ট্রীয়গণের ভারতে আগমন	কে, এন, সীতারাম
৬।	কর্ণাটক দেশ ও কানাড়ী ভাষা	আর, নরসিংহ চর
৭।	গৌপ্তাব্দ	কে, বি, পাঠক
৮।	জঙ্গল দেশ ও ইহার রাজধানী অহিছত্রপুর	হরবিলাস সরদা
৯।	গৌপ্তাব্দ	এইচ, এ, সাহ
১০।	মধ্যযুগের দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	এ, ভি, ভেঙ্কটরামায়ার
১১।	বজ্জিদেশ ও পাবার মল্লগণ	৺ এইচ, পাণ্ডে

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল—

১২।	মহাপদ্মের রাজ্যাভিষেক কাল	হারীতকৃষ্ণ দেব
১৩।	প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে রাজশক্তির হস্তক্ষেপ	নরেন্দ্রনাথ লাহা
১৪।	আমাদের প্রাচীন অর্থনীতি বিষয়ক ভূগোলের এক অধ্যায়	রাধাকমল মুখোপাধ্যায়
১৫।	দঙ্গারপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা	গৌরীশঙ্কর ওঝা
১৬।	সুঙ্গ কাণ্ব ও অন্ধ্র বংশের কালনিরূপণ	এস্, ডি, ভেঙ্কটেশ্বর আয়ার

সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর সভাপতি মহাশয় তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদের অবসর প্রদান করিয়াছিলেন। পঠিত প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ তথ্যপূর্ণ ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী কয়েকটী প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিলেন;—এ যাবৎ কেহ তাহার সন্তোষজনক পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই লিপিগুলি অশোকলিপি অপেক্ষা প্রাচীন কি না, তাহা লইয়া আলোচনা হইল। আবার কোন কোন প্রবন্ধ নিতান্ত হাস্যজনক হইয়াছিল। এম, কে আচার্য্যের প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে, মেগাস্থিনীস্ যে Sandra Cottusএর বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত নহেন, গুপ্তবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। এইচ, এ, সাহের মতে গৌপ্তাব্দের আরম্ভ ২০০ খৃঃ অব্দ। রাবণের লঙ্কা কোথায় শীর্ষক প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে কৌতূহলোদ্দীপক। গ্রন্থকারের মতে নর্ম্মদানদীর উৎপত্তিস্থান অমরকণ্টকের নিকটবর্ত্তী জলাভূমি পরিবেষ্টিত কোন গিরিশীর্ষে প্রাচীন লঙ্কাপুরী অবস্থিত ছিল; এবং বর্ত্তমানকালের রেওয়া রাজ্যই প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা।

তৃতীয়দিন অর্থাৎ ৭ই নবেম্বর সকালে ৮॥০ হইতে ১০॥০টা পর্য্যন্ত পুনরায় সম্মিলনীর সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়।

	প্রবন্ধের নাম	লেখক
১।	মহাভারতের নূতন সংস্করণ	এন্, বি, উৎসিকার
২।	ভাষা-তত্ত্বের সাহায্যে ঋগ্বেদের কাল-নির্ণয়	অধ্যাপক উলনার (লাহোর)
৩।	নক্ষত্র ও অয়নগতি	জে, আর, কে (সিমলা)
৪।	আকবর ও সংস্কৃত-গ্রন্থের পারশী অনুবাদ	জে, জে, মোদি (বোম্বাই)
৫।	অরিয়ানা বয়েজো অথবা প্রাচীন ইণ্ডোআর্য্য সভ্যতার জন্মস্থান	জে, ডি, নাদিরসাহ („)
৬।	ঋগ্বেদের 'অসুরস্য মজ্ঞমায়া'	ভি, কে, রাজওয়াড়ে (পুণা)

৭। এতদ্ব্যতীত এই অধিবেশনে গুর্জ্জর জাতির প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৮।	প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষের সহিত পাশ্চাত্য দেশের সম্বন্ধ	পঞ্চানন মিত্র
৯।	উপনিষদে বিদ্যাশিক্ষাদানের ব্যবস্থা	রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়
১০।	নাগার্জ্জুন	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
১১।	মাগধী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা	এন্, সহিদুল্লা।

এইদিন অপরাহ্ণে সম্মিলনীর শেষ অধিবেশন হয়। প্রথম দিন যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার মন্তব্য পাঠান্তে সম্মিলনীর নিয়মাবলী সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে লিপ্যন্তর প্রণালী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর প্রায় ৫টার সময় লাট ও লাট-পত্নীর সহিত সমবেত প্রতিনিধি-বর্গের ফটো তোলা হয়।

সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ ভাণ্ডারকর অনুসন্ধান-সমিতির গৃহে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন মিউজিয়াম, ও অন্যান্য স্থান হইতে প্রাচীন শিলালিপি, তাহার প্রতিকৃতি, প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রা, প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যবহৃত প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, মধ্যযুগের চিত্র ও অন্যান্য শিল্প-নিদর্শন প্রভৃতি একত্র সংগৃহীত হইয়াছিল।

প্লানচেট্

[অধ্যাপক শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

হেমেন্দ্র পশ্চিমের এক স্কুলে কাজ করে। কিছুদিন হোল সে বিবাহ করে বেশ স্থিতি. হয়েছে। সম্প্রতি শ্বশুর মহাশয়ও তার কাছে বেড়াতে এসেছেন। কিন্তু দেশের মায়া সে এখনও কাটাতে পারে নাই। সেই চির-পরিচিত স্থানগুলি, সে কি সহজে ভোলা যায়?

সেদিন শনিবার। একটু বেলা থাকতেই ছুটী হোল। ছেলেদের হট্টগোল থেকে হেমেন্দ্র নিজেকে তফাৎ রেখে স্কুলের বাহির হয়ে পড়ল। বাড়ী ফেরবার পথে বড় কিছু চোখে পড়ে না; কিন্তু আজ যেন সে নিরর্থকই পথের মাঝে থেমে গেল। পাজামা-পরা, ওড়নায়-ঢাকা একটি ফুট্‌ফুটে বালিকার দিকে সে চেয়ে দাঁড়িয়ে গেল; পর-মুহূর্ত্তেই দেখল সেই রকম মুখ, সেই রকম চোখ একটি নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্র লাফাইতে-লাফাইতে ছুটে এসে বোনটির ছোট হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে সুর করে-করে গাইতে লাগ্‌ল—"কাল স্কুলমে নেহি আয়েঙ্গে, কাল ছুট্টি হায়।" তাহার সুরের কিছু মাধুর্য্য ছিল কি না ঠিক জানি না; কিন্তু হেমেন্দ্রের চোখের সামনে বাল্যকালের পরিপূর্ণ সুখের দিনগুলি তাদের ঝরঝরে আনন্দের প্রবাহ নিয়ে উজান বেয়ে ফিরে এল। তাহারও ত কাল ছুটি—কিন্তু ঐরূপ আনন্দ কোথায়? হায় রে বাল্যকালের স্মৃতি! শৈশবের সেই কয়েকটি ভাই-বোনের মেলা, সেই একটুখানি উঠান, সামান্য বাগান, কতটুকু স্কুলঘর! তবু তারই মধ্যে যত আনন্দ ভরা ছিল, আজ সারা বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য্যেও বোধ করি তার আস্বাদ পাওয়া যায় না!

হেমেন্দ্রের ক্ষুধা পেয়েছিল; সেই-সঙ্গে স্নেহের ক্ষুধাটুকুও তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। তার দিদি এখন কতদূরে! এবারে ভাই-ফোঁটার স্নেহস্পর্শ টুকুও সে পায় নাই।

চিন্তা স্রোত বরাবর একদিকে বহে না; বহিলে চিন্তার সঙ্গে মানুষের জীবনের পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়ে যেত। কিন্তু প্রতিদিনকার অভ্যাসমত সন্ধ্যাবেলাই আহারাদি সাঙ্গ করে যখন শ্বশুর-মহাশয়ের কাছে এসে হেমেন্দ্র চুপ করে বসল, তখন দুপুর-বেলার সেই অজানা মেয়েটির অস্পষ্ট মুখখানি তাহাকে বাঙলার এক পুরাতন জনহীন সহরে টেনে নিয়ে চলল। সেখানে সে দেখল, তার দিদি তুলসী-তলায় প্রদীপ রেখে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণত হলেন। তাঁর ঠোঁট-দুটি নড়ে গেল, চোখের কোণে কয়েক-ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল! এ সবটাই কি হেমেন্দ্রের কল্পনা? কিন্তু সে যে এইরূপ চিরদিন দেখে এসেছে; সে যে একদিন দিদিকে ঐ অবস্থায় দেখে বলেছিল, "দিদি, ওখানে তুমি কি চাও? তুমি অমন কাতর হও কেন?" দিদি তার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, "তুই জানিস্ না? যে আমাকে সবচেয়ে ভালবাসে আমি তারই—"। আর বলতে হোল না। হেমেন্দ্র দিদির বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলেছিল, "আমি তা' জানি দিদি। তুমি যে ছোট্ট-বেলা থেকে আমার নিজের দিদি!" সন্ধ্যাবেলার ম্লান আলোকে বাল্যকালের সেই সামান্য ঘটনাটি হেমেন্দ্রকে কতদিন আকুল করে তুলেছে। তার পর আজকে যে ঐ দিকেই বিশেষ করে টান পড়েছে!

সংসারে এক-একজন আছে, যাঁরা জোয়ার যে কখন আস্‌বে তা' পূর্ব্বে থেকেই বুঝতে পারে। হেমেন্দ্রের স্ত্রী নীহার সেই প্রকৃতির মানুষ। আজন্ম পিতার অসীম স্নেহে সে পালিত; এবং এ কয়েক দিনের একত্রবাসে তার বিবাহিত-জীবনের প্রথম সঙ্কোচটুকুও অনেকটা ক'মে এসেছিল। তাই ঘরে ঢুকেই সে হেমেন্দ্রকে বলিল, "দেখ, তোমার শরীরটা আজ কেমন ঠেকছে, না?"

হেমেন্দ্র মাথা নীচু করে বলল, "না, এমন কিছু নয়।" কিন্তু স্ত্রীর কাছে সে গোপন করতে পারল না। তা' কি সে কখনও পারে?

একটু ইতস্ততঃ করে হেমেন্দ্র বলল, "দিদিদের অনেক দিন খবর পাই নি। কে জানে তারা সব কেমন আছে।"

নীহার অনেকটা সান্ত্বনার সুরে বলল, "বিদেশেই মানুষের ভয়। তাঁরা যখন দেশে আছেন, সেখানে আর ভাবনা কি? বিপদ-আপদ হলেও পাঁচজন দেখ্‌বার ত থাকে।"

হেমেন্দ্র কিছু বলল না। তাহার গম্ভীর-প্রকৃতি শ্বশুর মহাশয় তাহা লক্ষ্য করলেন। এতক্ষণ তিনি চুপ-করে ছিলেন। এক্ষণে তিনি বললেন, "তা', বাবাজী, যদি তেমন ভাবনা হয়ে থাকে, তা' হলে একটা 'তার' করে দিলেই ত নিশ্চিন্ত হতে পা'রো।"

নীহার প্রমাদ গণিল। মিছামিছি কষ্ট করা তার স্বভাব নহে। সে বলল, "বাবা, ওঁর যদি এতই ভাবনা হয়ে থাকে, উনি ত প্লান্‌চেট্ ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই পারেন।"

হেমেন্দ্রের এই একটা বাই আছে। সে মাঝে-মাঝে প্লানচেট্ করে বটে; প্লানচেটের উপর তার বিশ্বাসও যথেষ্ট।

হেমেন্দ্রের শ্বশুর-মহাশয়ের কিন্তু কথাটা মনে লাগল না। তিনি বৃদ্ধ ব্যক্তি। ভূত-প্রেত প্রভৃতিকে তিনি একটু ভয় করে থাকেন। তিনি বল্লেন, "না বাবাজী, তাঁদের মিছে কষ্ট দিয়ে কাজ কি? তার পর ভূত-প্রেতেরা যে ঠিক খবরটাই দে'বে, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?"

হেমেন্দ্র একটু অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল।

বৃদ্ধ বললেন, "দেখ বাবাজী, ভগবান্ বলে একজন আছেন ত? তাঁর উপর কারচুপি করে মানুষ যে মরে গিয়েই তাঁর লীলাখেলা ধরে ফেলতে পারে, আবার জগতের মানুষকে তা জানিয়েও দিতে পারে, তা'ত আমার মনে হয় না।"

হেমেন্দ্রের এতক্ষণে কথা ফুটিল। তাহার অনভিজ্ঞ শ্বশুর মহাশয়কে সে বুঝাইল, "এ'তো ভূত-প্রেতকে ডাকা নয়। এ যে পরলোক-বাসী আত্মাদিগের সাহায্য লওয়া। তাঁরা সাহায্য করবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং তাঁদের সহায়তায় বিলাতের এবং এদেশের অনেক বিদ্বান্ ভক্তিমান্ ব্যক্তিরা বিস্তর বিষয় শিখিতেছেন। সব বিষয় তাঁরা সম্পূর্ণ না জান্‌লেও মানুষের চেয়ে যে তাঁরা অনেক বেশী জান্‌তে পারেন, এ'টাও ত ঠিক?"

নীহারও সময় কাটাতে চায়। তাই বৃদ্ধ পিতাকে শেষে স্বীকৃত হতে হল। টেবিল আনিয়া তিনজনে প্লানচেটে মগ্ন হলেন।

অনেকক্ষণ পরে খট্‌খট্ করে শব্দ হোল।

"কে আপনি?"

নীহারের হাতে কলম ছিল, লেখা বাহির হোল—

"মধুসূদন।"

"কো'ন্ মধুসূদন?"

"মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রের পিতামহ।"

নীহারের হাতটা কাঁপিয়া গেল।

হেমেন্দ্র উৎফুল্ল হয়ে বলল, "ঠাকুরদাদা মহাশয়, আপনি ওখানে কেমন আছেন?"

"তেমন ভাল নয়।"

"কেন? আমাদের জন্য মন কেমন করে?"

"হাঁ।"

হেমেন্দ্র একটু ব্যথা পাইল। সে এবার প্রশ্ন করল, "আচ্ছা দাদু, নাত-বৌ তোমার পছন্দ হয়েছে ত?"

নীহার অস্ফুট স্বরে বলল, "ও-কথা কেন?"

হেমেন্দ্র বলল, "আহা, চুপ করে শোনই না।"

উত্তর আসিল—"হাঁ"।

তার পর আরও কয়েকটি জিজ্ঞাসাবাদ হইল। শেষে হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করল—

"দাদু, আমাদের বড় মন কেমন করছে; বল্‌তে পারো কুমু-দিদি কেমন আছে?"

"এখন ভালই আছে।"

"তাদের বাড়ীর সব ভাল ত ?"

প্লানচেটের লেখা পড়া গেল না। হেমেন্দ্র বিব্রত হয়ে পড়ল। অনেক কষ্টে লেখা বাহির হইল—

"ফণীবাবু মারা গিয়াছেন।"

ফণীবাবু হেমেন্দ্রের ভগিনীপতি। হেমেন্দ্র কেমন স্তব্ধ হয়ে উঠ্‌ল। সকল চিন্তা ঠেলে রেখে সে অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করল—"কেমন করে ?"

"ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে।"

হেমেন্দ্রের দুই চোখ ব'য়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। এমন জানলে নীহার প্লানচেট্ ডাকতে বলত না। বৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয় অভিভূত হইয়া বলিলেন—"থাক্ বাবাজী, আজকে ওসব থাক্ !"

নীহার জানিত পরলোক-বাসী আত্মাকে যখন ডাকা হয়েছে, তখন তাহাকে ভদ্রভাবে বিদায় না দিলে অকল্যাণ হয়। তাই সে সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করল—"আচ্ছা, আপনার কি এখন কষ্ট হচ্ছে ? আপনি কি এখন যেতে চা'ন ?"

উত্তর—"না।"

প্রশ্ন—"তবে কি আমাদের কাছে থাক্‌বেন ?"

উত্তর—"হাঁ।"

প্রশ্ন—"আপনার কি কিছু জানিবার আছে ?"

উত্তর—"না।"

প্রশ্ন—"তবে কি আমরা আপনাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করব ?"

বড় অসন্তুষ্ট উত্তর আসিল—"করিতে পারো।"

নীহারের বড় ভয় হোল। সে বেচারী কি জিজ্ঞাসা করবে ? অথচ বৃদ্ধ দাদাশ্বশুরের কথা ত অমান্য করা যায় না। হেমেন্দ্র এতক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে। সে বলল, "দাদু, তুমি বড় গান শুনতে ভালবাস্‌তে। তুমি গান শুনবে ?

"হাঁ।"

তখন সেই নির্জ্জন গৃহখানি হেমেন্দ্রের শোকার্ত্ত স্বরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন শুনাইতে-শুনাইতে সে নিজের কষ্ট, ভগিনীর চিন্তা সমস্তই ভুলিয়া গেল। সেদিন এমনি ভাবে কাটিল।

পরের দিন সকালে উঠেই হেমেন্দ্র এক জরুরি তার দিল—"Please wire how is Phani Babu"। তারখানি প্রিপেড্ করে দিল। তার পর অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে সারাদিন কাটাল। কিন্তু বিকালেও তারের কোন জবাব আসিল না। আহা! এমন বিপদে তারের উত্তর দেবেই বা কে ? হেমেন্দ্রের ভ্রাতৃ-হৃদয় উছলিয়া উঠিল। ক্রমে সন্ধ্যা হোল, রাত্রি এল, কোন তারের পিওন কিন্তু গৃহদ্বারে আসিয়া উঠল না। হেমেন্দ্র চুপ করে নিঝুমে বসিয়া আছে।

"ওগো, অমন করে বসে আছ কেন ? তোমরা পুরুষ মানুষ এত কাতর হলে আমরা কোথায় যাব ?"

"কি করব ?"

"করবার কিছু নেই, তাই ত বল্‌ছি। তুমি ত তা বুঝছ না।"

"সত্যি নীহার, করবার কি কিছু নেই ? তোমার ভগিনীপতির যদি এই রকম হোত, তুমি চুপ করে বসে থাক্‌তে পারতে ?"

"ওগো, না গো, না,—আমি সে কথা বল্‌ছি না। তুমি আমার কথাই বুঝতে পারলে না।"

হেমেন্দ্রের অধিক বাক্যব্যয় করবার মত তখন মনের অবস্থা ছিল না। সে চুপ করিল।

তাহার ভাব দেখিয়া বৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয় চিন্তিত হইলেন। তিনি প্লানচেট্ ডাকা জীবনে এ'র পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই। কালকে দেখিয়া-শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। বিশেষ সেই কীর্ত্তনের সময়টায় তাঁর চক্ষে জল আসিয়াছিল। আজকে তিনি ভাবিয়া-চিন্তিয়া একটা উপায় বাহির করিলেন। শেষে তাঁরই আদেশমত, তারের যখন কোন উত্তর আসিল না, তখন অগত্যা হেমেন্দ্র সকলকে লইয়া আবার প্লানচেট্ ডাকিল। আজ কেহই আসিতে চায় না। অনেক কষ্টে হেমেন্দ্রের এক দূর-সম্পর্কীয়া জ্যাঠাইমা উপস্থিত হইলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে ত সকলের চক্ষুস্থির। তিনি লিখিলেন—"হেমেন্দ্রের শীঘ্রই সেখানে যাওয়া উচিত।" হেমেন্দ্র বলিল, "আর নয়! জ্যাঠাইমাকে বিদায় দিই।"

নীহারের ঘাড়ে দুষ্ট বুদ্ধি চাপিয়াছিল। সে বলিল, "দেখ, ফণীবাবুর আত্মাকে ডাক্‌লে হয় না ? তাঁর উপদেশটা একবার নিলে ভাল হয় না কি ?"

হেমেন্দ্র স্ত্রীর দিকে ভ্রূকুটি করে বলল—"তুমি বল কি? কালপরশু যে মারা গিয়াছে, তাকে ডাকবার কথা আমি ত মনে আন্‌তেও পারতুম না।"

অগত্যা সেদিন প্লান্‌চেট্ বন্ধ হল।

রাত্রিটা বড় কষ্টে গেল। নীহার অনেক কাঁদিল; কিন্তু স্বামীকে বুঝাইতে পারিল না। অনর্থক গিয়া কোন লাভ নাই, বরং কিছু টাকা পাঠাইলেই চলিবে, ইত্যাদি। হেমেন্দ্রের বুক তখন বর্ষার ভরানদীর মত, কূলহারা নিস্তব্ধ; আপন স্রোতে প্রবাহিত।

সোমবার প্রভাতেই স্কুলের কাজে ছুটি নিয়ে, স্ত্রীকে শ্বশুর মহাশয়ের জিম্মায় রেখে হেমেন্দ্র দেশের দিকে রওনা হইল। সেই খোট্টা ছেলেটার সুর তার কাণে বাজতে লাগল, "কাল ছুট্টি হ্যায়। কাল স্কুলমে নেহি আয়েঙ্গে।"

(২)

পথ যতই ফুরিয়ে আসে, ভাবনা ততই বাড়ে। হেমেন্দ্রেরও তাহাই হইল। ষ্টেশনে নেমে গাড়ী করে দিদির বাড়ী অবধি সে আস্‌তে পারল না। কিছু দূরে গাড়ী ছেড়ে দিয়ে সে পদব্রজেই চলল।

তখন্ বেলা ১২টা হবে। নদীর ধারের মাঠটি পার হয়ে গেলেই হয়। অল্প-অল্প বাতাসে শুকনো পাতাগুলি তা'র পায়ের কাছে নেচে-নেচে বেড়াতে লাগ্‌ল। হেমেন্দ্র কিছু অন্যমনস্ক। তার লক্ষ্য স্থির।

ঐ ত বাড়ী! বুক কাঁপিতেছে! হেমেন্দ্র দেখল তার ভাগ্‌নী বিমলা গালে হাত দিয়ে বারাণ্ডায় ইজি চেয়ারে বসে আছে। কেন, ওই বা এত বিষণ্ণ কেন? হেমেন্দ্র টলিতে-টলিতে অগ্রসর হতে লাগল।

বিমলার মন আজ একটুও ভাল ছিল না। তার সময় কিছুতেই কাটছিল না।

হেমেন্দ্রকে দেখিয়া সে একটু অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হয়ে বলল—"মামা, তুমি এসেছ? তা' বেশ করেছ। আমরা তোমাকে খবর দিতে পারি নাই।"

হেমেন্দ্রের কথা কহিবার শক্তি ছিল না। হাতে ব্যাগটি নিয়ে সে ভিতরে চলল। উঠানে এসে দেখল বিমলার ঠাকুরমা রৌদ্রে পা রেখে, একটা চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন। তাঁর চোখ দুটো কেমন রাঙা হয়ে উঠেছে। মুখখানাও ভারী। হেমেন্দ্রের বুকে ক্রন্দনের রোল উঠল। তার দিদি কোথায়? সে পাগলের মত সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলল।

বিমলা পশ্চাৎ হতে চীৎকার করে বলল, "মামা, উপরে যেও না, উপরে মা আছেন।"

হেমেন্দ্র তত্ক্ষণে উপরে পৌঁছিল।

"দিদি, তুমি কোথায় দিদি?"

সত্যই কুমুদিনীর চেহারা দেখিলে কেহই চিনিতে পারিবে না। বিছানায় পড়ে বেচারা যেন অধীর হইয়া উঠিতেছিল।

হেমেন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিল। সে পথের কাপড়ে ঘরে ঢুকতে পারল না, চৌকাটে দাঁড়াইয়া বলল—"দিদি, আমাকে কেন খবর দিলে না?"

"আয় ভাই, আয়! খবর দিইনি, তা'তে আর কি হয়েছে? তুই ত এসেছিস্ ভাই?"

"দিদি, তোমার শেষকালে—"

হেমেন্দ্র বালকের মত আবার কাঁদিয়া ফেলিল। কুমুদিনী একটু বিপন্ন বোধ করিল। কৈ, পুরুষ মানুষ ত কেহই তার সঙ্গে এমন করে সহানুভূতি করে নাই? সে ধীরে ধীরে বলিল—"ছিঃ ভাই, কাঁদতে নেই। তোকে দেখে আমি কোথায় সান্ত্বনা পাব"—অলক্ষ্যে কুমুদিনীর চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল বালিসের উপর গড়াইয়া পড়িল।

"দিদি, কেমন করে এমন হোল?"—হেমেন্দ্রের স্বরটা কেমন যেন আশঙ্কায় পূর্ণ।

"কি হোল রে?"

"মুখুজ্জে মশায়ের"—

"তাঁর আবার কি হবে?"

হেমেন্দ্রের গলা ধরিয়া আসিয়াছিল—"কেন, তাঁকে ত দেখ্‌ছি না?"

"কেমন করে দেখ্‌বি ভাই, তিনি যে অফিসে গেছেন!"

হেমেন্দ্র বিহ্বলের ন্যায় দু'হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে, একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল,—"আঃ—আর আমার কষ্ট নেই।" একবার জানলার দিকে দেখে আবার বলল—"কিন্তু দিদি, তুমি কেন অমন করে শু'য়ে আছ?" গভীর বেদনাযুক্ত মর্ম্মস্পর্শী গাথা ফুরাইবার পর ব্যথাভরা

প্রাণের ছোট করুণ রাগিনীটিও বড় মিটা লাগে—অন্ততঃ দুই-ই যখন নিজের হৃদয়ের রক্তের সঙ্গে জড়িত। তাই হেমেন্দ্র সব ভুলিল।

"পরে বলব। এখন তুই হাত পা ধু'য়ে খাওয়া-দাওয়া করগে যা।" কুমুদিনীর কেমন শ্রান্তি বোধ হইতেছিল।

সন্ধ্যাবেলা ফণীবাবু অফিস হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই হেমেন্দ্র দিদির মুখে সমস্তটা শুনে নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে পড়েছিল। তার ভগিনীপতির কিছুই হয় নাই। তিনি বেশ ভালই আছেন। তবে কুমুদিনীর কয়েকদিন হইল—একটা সুন্দর খোকা পৃথিবীতে এসে, নিজে এক ফোঁটা না কেঁদে, মা'য়ের কয়েকবিন্দু অশ্রু নিয়ে চলে গিয়েছিল। সেই সময় কুমুদিনীর বড় বিপদ গিয়াছে। তাহারই মধ্যে হেমেন্দ্রের টেলিগ্রামখানি পেয়ে ফণীবাবু স্ত্রীকে দেখিয়ে একটু হেসে বলেছিলেন—"তুমি ভাল হও, তার পর এ টেলিগ্রামের জবাব দিলেই হবে।"

হেমেন্দ্র বলল, "আচ্ছা দিদি, বিমলা অত গম্ভীর হয়ে কেন বসেছিল?"

"মা তাকে আমার কাছে আস্‌তে মানা করেছেন; আর ও ছেলে মানুষ, কত কি আশঙ্কায়—"

"তা' না হয় হোল। কিন্তু তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণ অমন হয়ে গেছেন কেন?"

"কি যে তুই বলিস্। এ বিপদে উনি যেমন করেছেন, এমন আর কেউ করতে পারে না। অনেক পুণ্যফলে তবে অমন শাশুড়ী পাওয়া যায়।"

হেমেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। এবার কুমুদিনী আরম্ভ করল—"হাঁরে হেমেন, তুই ওসব মরা লোককে ডাকিস্ কেন? মনে আছে, ঠাকুর-দাদামহাশয় কত মানা করতেন?"

হেমেন্দ্র কি ভাবছিল—সে অন্যমনস্ক ভাবে বলল—"হুঁ:, কি বল্‌তেন?"

"তিনি বল্‌তেন, মরা মানুষকে অত করে ডাকলে, তাঁরা না এসে আর কি করেন। কিন্তু জবাবগুলো যা' আসে, সেগুলো, যারা ডাকে, তাদের মনগড়া উত্তর।"

হেমেন্দ্র মিনতির স্বরে বলল, "দিদি, আমি ত মুখুজ্জে মশায়ের অমন ধারা ভাবতে পারি না।"

"তুই না পারলেও তোদের মধ্যে আর কেউ ভেবে থাকবেন।"

"হাঁ দিদি, আমি কিন্তু ওঁর ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার কথা ভেবেছিলাম। ওঁকে যে রকম মফঃস্বলে যেতে হয়। তুমিও ত ওঁর ঘোড়ার দুষ্টুমির গল্প আমাকে একবার লিখেছিলে!"

"তবে দ্যাখ ভাই, এ সবটাই তোর নিজের, বউএর, ও তোর শ্বশুর মহাশয়ের কল্পনা থেকে তৈরী হয়েছে। লক্ষ্মী ভাইটি আমার, আর ওসব করিস্ না। ওতে মরা লোকেদের নিছক কষ্ট দেওয়া হয় বই ত নয়।"

হেমেন্দ্র চুপ করল। ফণীবাবু বাড়ী ফিরে হেমেনকে দেখে প্রথমে একটুখানি অবাক্ হয়ে গেলেন। কুমুদিনী স্বামীকে সকল কথাই বলিয়া দিল। ফণীবাবুর হৃদয়টুকু আনন্দে ভরা। তিনি স্মিত হাস্যে বল্লেন, "বেশ, আমি না থাকলে হেমেন যে তার দিদির ভারটা নে'বে, তার একটা প্রমাণ পাওয়া গেল।"

কুমুদিনী কি বল্‌তে যাচ্ছিল, হেমেন খুব জোরের সঙ্গে বলে উঠল—"না দিদি, তুমি আর কিছু ব'লো না। আমার নিজের বোন্, আমার নিজের ভগিনীপতিকে প্লেন্‌চেট্ যত আপন করে দিয়ে গেছে, আর কোন বিপদ আপদের দরকার হবে না। তবে, তোমরা আমাকে যেমন চিরদিন ক্ষমা করে এসেছ, আজও আমি তোমাদের কাছে, কেবল সেইটুকুই চাই।"

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

চিম্‌নীর আলো আজকাল আমাদের ঘরে-ঘরে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু চিম্‌নীগুলি অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ, এইজন্য গৃহস্থকে অত্যন্ত লোকসান সহ্য করিতে হয়। আজকাল আবার চিম্‌নীর দাম এত বেশী যে, ভাঙ্গিলে সে লোকসান একেবারে অসহ্য। অথচ, চিম্‌নীর আলো ব্যবহারে আমরা এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, উহা ত্যাগ করিতেও পারি না। ইহার প্রতিকারের একটা উপায় সম্প্রতি একখানি বিলাতী বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে বাহির হইয়াছে। একটা পাত্রে খানিকটা ঠাণ্ডা জল লইয়া তাহাতে কিছু লবণ মিশাইয়া দিতে হইবে। পরে ঐ লবণাক্ত জলের মধ্যে চিম্‌নীটি রাখিয়া পাত্রটি আগুনের উপর স্থাপন করিয়া ধীরে-ধীরে জল গরম করিতে হইবে। জল ফুটিয়া উঠিলে পাত্রটি উনুন হইতে নামাইয়া ধীরে-ধীরে ঠাণ্ডা হইতে দিতে হইবে। তার পর চিম্‌নীটি জল হইতে উঠাইয়া লইতে হইবে। এই উপায়ে চিম্‌নী কম ভাঙ্গিবে।

হাতীর দাঁতের ছড়ি বা হাতীর দাঁতের বাঁটের ছড়ি অথবা হাতীর দাঁতের অন্য প্রকারের সৌখিন জিনিস অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই সকল জিনিসের উপর নিজ-নিজ নাম বা অন্য কিছু লিখিয়া রাখিবার সাধ অনেকেরই যাইতে পারে। বিশেষতঃ কাহাকেও হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত কোন জিনিস উপহার দিতে হইলে, যাঁহাকে উপহার দেওয়া হইতেছে, তাঁহার নামের সঙ্গে, যিনি উপহার দিতেছেন তাঁহার নাম লিখিয়া দিতে পারিলে বড় সুন্দর দেখায়। এই হস্তীদন্তের উপর লিখিবার কালী কিরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার একটা উপায় বলিয়া দিতেছি। পরে হয় ত আরও দুই একটা দিতে পারিব।

এই কালীর উপকরণ—তিনভাগ নাইট্রেট অব সিলভার (কাষ্ঠকি—ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়), ২০ ভাগ আরবী গঁদ, ৩০ভাগ পরিস্রুত (distilled) জল। ২০ ভাগ জলে ২০ ভাগ গঁদ ভিজাইয়া লইতে হইবে। বাকী দশ ভাগ জলে ৩ ভাগ নাইট্রেট অব সিলভার গলাইতে হইবে। তারপর এই দুইটী দ্রব একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে যে কোন রং মিশাইবেন, সেই রঙ্গের কালী প্রস্তুত হইবে। এই কালী দিয়া হস্তীদন্তের উপর যাহা লিখিবেন, তাহা চিরস্থায়ী হইবে, কখনও উঠিয়া যাইবে না।

বড় বড় জুতা-প্রস্তুতকারক কোম্পানীরা, বিশেষতঃ বিলাতী—তাঁহাদের জুতার বিজ্ঞাপনে প্রায় এই কথাটি লেখেন—all-leather boots and shoes. ইহার অর্থ, জুতায় আজকাল অত্যন্ত জুয়াচুরি থাকে। অর্থাৎ, চামড়ার বদলে শুকতলায় পিজবোট দিয়া কাজ সারা হয়। ইহাতে জুতা বেশী দিন টিকে না; অথচ, দামও সমানই দিতে হয়। এই পিজবোটের ভেজাল যাচাই করিয়া লইবার উপায় নাই। চামড়ার অপেক্ষা পিজবোটের দাম খুব কম; ফলে, জুয়াচোর জুতা-প্রস্তুতকারকেরা খুব লাভ করে। কিন্তু, আমাদের অনুমান হয়, আজ যাহা ভেজাল এবং জুয়াচুরির উপকরণ, একটু চেষ্টা করিলে তাহাকেই আসলের অপেক্ষা বেশী কাজের জিনিসে পরিণত করা যায়। (এক্ষেত্রে আমরা কেবল অনুমানের কথা বলিতেছি, কারণ, ইহা আমাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উপায় নাই।) কথাটা এই;—পিজবোটের প্রধান দোষ উহা জলে ভিজিয়া শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়; কাজেই পিজবোটের ভেজাল-দেওয়া জুতাও বেশী দিন টিঁকে না। তাহার উপর চলাফেরা করিতে-করিতে শীঘ্রই চূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু পিজবোটের এই দুইটী দোষই সংশোধন করা যাইতে পারে। কেমন করিয়া, তাহা বলিতেছি। ইহা অনেকেই ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

কিছু পুরাতন পিজবোট সংগ্রহ করুন। পাঁচ-সাত সের হইলেই কাজ চলিবে। সেইগুলিকে একটা পাত্রে ভিজাইয়া রাখুন। ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যে পিজবোটগুলি ভিজিয়া খুব নরম হইয়া যাইবে। সেগুলিকে চটকাইয়া কাদার মত করিয়া ফেলুন—পিজবোটের আকার যেন না থাকে। খানিকক্ষণ সিদ্ধ করিয়া লইলে আরও ভাল হয়।

এই যে মণ্ড প্রস্তুত হইল, তাহা একটী চালুনীর উপর রাখিয়া উহার জল ঝরাইয়া ফেলুন; কিন্তু যেন শুকাইয়া না যায়।

তার পর, এক ভাগ সোহাগা ও পাঁচ ভাগ পাত-গালা পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া লউন। এক কোয়ার্ট জল লইলে দুই আউন্স সোহাগা ও দশ আউন্স পাত-গালা লইতে হইবে। তাপ বেশী দিবার দরকার নাই; জল গরম হইয়া উঠিলেই সোহাগা জলে গলিয়া যাইবে: সেই সোহাগা-দ্রব ক্রমে-ক্রমে পাত গালাকেও গলাইয়া ফেলিবে। এই যে পাত-গালার দ্রব প্রস্তুত হইল, ইহা অনেক কাজে লাগে। সে কথা সময়ান্তরে হইবে। আপাততঃ পিজবোটের কথাই হউক। এই দ্রবটি একটা পাত্রে পূর্ব্বোক্ত পিজবোটের তালের সঙ্গে বেশ করিয়া মিশাইয়া লউন; যেন সমস্ত তালটিতে গালা-দ্রব উত্তমরূপে মিশিয়া যায়। অতিরিক্ত দ্রব অবশ্য ঝরাইয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ তালটি পাতলা (½ ইঞ্চি) পিজবোটের আকারে বেলিয়া শুকাইয়া লউন। আধ-শুকনা হইলে ক্রমাগত বেলুন বা রুল দিয়া উহা বেলিতে থাকুন। ক্রমে দেখিবেন, উহা যত পাতলা হইতেছে, ততই শক্ত হইয়া উঠিতেছে। হাতের কাছে,—সেকরারা যে যন্ত্রের ভিতর দিয়া সোনার পাত প্রস্তুত করে, সেইরূপ কোন যন্ত্র যদি থাকে, তবে দুই চারিবার ঐ পিজবোটটি সেই লোহার রুল দুইটার ভিতর দিয়া পিশিয়া লইলে, উহা জমাট বাঁধিয়া এমন শক্ত হইয়া উঠিবে যে, চামড়ার অপেক্ষা বহুগুণ মজবুত হইবে। গালা দ্রবের গুণে পিজবোট water proof হইয়া গেল; এবং পেষণ গুণে উহা সহজে ক্ষইয়া যাইবে না। এই পর্য্যন্ত আমাদের পরীক্ষাসিদ্ধ। ঐ পিজবোট জুতার শুকতলারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না, তাহার পরীক্ষা করা আমাদের সুবিধার বহির্ভূত। সেইজন্য, এটুকু গোড়ায় আমরা অনুমান করিয়া রাখিয়াছি। আর, জুতার শুকতলা না হইলেও, এই পিজবোট যে সাধারণ পিজবোট অপেক্ষা বহুগুণে মজবুত, সে পক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। দামী বই, কি অন্য যে সব কাজে পিজবোট ব্যবহৃত হয়, অথচ জিনিসটি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেই সকল কাজে এই পিজবোট স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হইতে পারে।

আমরা কেবল পরীক্ষা করিবার উপায় বলিয়া দিলাম। ব্যবসায়ের হিসাবে করিতে হইলে কল না হইলে চলিবে না। যাঁহারা পিজবোট তৈয়ার করার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা বেলেঘাটায় খালের ধারে গিয়া পিজবোটের কল দেখিয়া আসিতে পারেন (যদি অনুমতি পান!); সেখানে রেলওয়ে টিকিট তৈয়ারীর জন্য পিজবোটের কল আছে।

এই ওয়াটার-প্রুফ পিজবোট যদি জুতার শুকতলারূপে ব্যবহার করিয়া ভাল রকম ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলে জুতার বাজারে একটা revolution হইয়া যাইতে পারে: জুতা সস্তা ত হইবেই; অধিকন্তু অনেক নিরীহ জীবের প্রাণ বাঁচিয়া যাইতে পারে। কোন ধনী লোক পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন না কি?

সাইকেল আজকাল প্রায় ঘরে-ঘরে। মোটরও অসংখ্য। এই সাইকেল ও মোটরের টায়ার ছিঁড়িয়া গেলে কি করেন? ফেলিয়া দেন নিশ্চয়ই। কিন্তু ঐ ছেঁড়া রবার হইতে কত কাজ করা যায় দেখুন। রবারটিকে দ্রব করিয়া লইতে পারিলেই উহাকে আবার কাজে লাগানো যায়। রবারের টায়ার একটু ফুটা হইয়া গেলে, সেই ফুটার উপর রবার সলিউসন মাখাইয়া তাহার উপর এক টুকরা রবারের তালি লাগাইয়া টায়ার মেরামত করা হয়। ঐ রবার সলিউসন সীসা বা দস্তার শিশির ভিতরে করিয়া বিক্রীত হয়। প্রায় বেনজোল, ন্যাপ্থা কিংবা তারপিন তৈলের সাহায্যে রবার গলাইয়া ঐ সলিউসনগুলি তৈয়ার হইয়া থাকে। এই তিনটি জিনিসই খুব দামী। রবার সলিউসন প্রস্তুত করিবার পক্ষে এই তিনটি জিনিস ব্যবহার করিবার কারণ, উহারা খুব উদ্বায়ী তৈল। অর্থাৎ হাওয়ায় অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দিলে উহার অণুগুলি হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া উপিয়া যায়—অবশেষ কিছুই থাকে না। স্পিরিটের এই ধর্ম্ম আছে। স্পিরিটেরও রবারকে গলাইবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু ইহাও খুব মূল্যবান। ইহাদের সকলের অপেক্ষা সস্তা এবং সহজপ্রাপ্য কেরোসিন, পেট্রোল বা মেটে তৈলের সাহায্যেও রবার গলান যায় এবং সেই রবার-দ্রবেও মোটামুটি রকমের অনেক কাজ হইতে পারে। একটা পাত্রে কেরোসিনের ভিতরে রবারের টুক্‌রাগুলি দুই-এক দিন ভিজাইয়া রাখিলে উহা খুব ফুলিয়া উঠিবে। ঐ পাত্রের তলায় খুব সামান্য তাপ দিলে রবার গলিয়া তরল

হইয়া যাইবে। এই কাজটি খুব সাবধানে করিতে হয়। তাপ খুব সামান্য ভাবে প্রয়োগ করা চাই। টিকের আগুন কিম্বা কাঠ কয়লার আগুন হইলেই যথেষ্ট হইবে। অতটা তাপেরও দরকার হয় না। কেরোসিন তৈলে-ভিজিয়া-ফুলিয়া-উঠা রবারগুলিকে কোন কিছুর সাহায্যে মন্থন করিয়া লইলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাতেও উহা গলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেজন্য যন্ত্র আবশ্যক। যন্ত্রের সুবিধা না থাকিলে সামান্য তাপ প্রয়োগ করিয়াই কাজ চালাইয়া লইতে হইবে। আর একটী কথা। কেরোসিন উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে যে ধূম নির্গত হইবে, সেটা যেন কোনরূপে আগুনের সংস্পর্শে আসিতে না পারে। কারণ, সেটা খুবই দাহ্য পদার্থ,—সামান্য অগ্নির সংস্পর্শে আসিলেও উহা জ্বলিয়া উঠিতে পারে। বেশী পরিমাণে এবং নিত্য তৈয়ার করিতে হইলে চিমনীর ভিতর দিয়া ধোঁয়াটা দূরে পাঠাইয়া দেওয়াই নিরাপদ। অথবা বক যন্ত্রের সাহায্যে ধোঁয়াটা জলপূর্ণ পাত্রের ভিতর আনিয়া শীতল করিয়া লইলে তাহা হইতে ন্যাপ্‌থা প্রভৃতির ন্যায় খুব উদ্বায়ী কোন-কোন জিনিস পাওয়া যাইতে পারে। যাক্, সে অন্য কথা। এখন রবার দ্রবের কথা হইতেছে। এইরূপ রবার-দ্রব প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে কি কি কাজ করিতে পারিবেন দেখুন। সব বেশী তৈল মিশাইয়া দ্রবটিকে খুব পাতলা করিয়া লইয়া তাহাতে কাপড় ভিজাইয়া সেই কাপড় নিঙড়াইয়া লইলে, রবারের কণাগুলি কাপড়ের ছিদ্রগুলির ভিতর আটকাইয়া থাকিবে। এই কাপড়টি water-tight এবং air-tight হইবে। একবার ভিজাইয়া লইলে যদি সব ছিদ্রগুলি বন্ধ না হইয়া যায়, তাহা হইলে আরও দুই-একবার ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। এই কাপড় হইতে সাঁতার কাটিবার যন্ত্র, air cushion বা বায়ুপূর্ণ বালিস প্রভৃতি নানা জিনিস তৈয়ার করিতে পারিবেন। খুব পাতলা কিন্তু খুব ঘন-বুনুনির এবং খুব শক্ত রেশমী বস্ত্রের উপর এই সলিউসন পাতলা করিয়া মাখাইয়া লইয়া ছেলেদের খেলিবার বেলুন তৈয়ার করিতে পারিবেন। সলিউসন ঘন রাখিয়া উহা কাপড়ের উপর পুরু করিয়া মাখাইয়া লইলে oil clothএর মত রবার ক্লথ তৈয়ার হইয়া যাইবে। এমন কি, তাহাতে বর্ষাতি জামাও তৈয়ার হইতে পারিবে। এ সম্বন্ধে কেহ যদি আরও কিছু জানিতে চান, আমাদিগকে পত্র লিখিলেই সকল সংবাদ পাইবেন।

* গত মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" "ইঙ্গিতে"র প্রথম কিস্তী প্রকাশিত হইবার পর বহুসংখ্যক পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এবং প্রত্যহই দুই চারিখানি করিয়া পত্র আসিতেছে। তন্মধ্যে জরুরি কতকগুলি পত্রের উত্তর দিয়াছি, আরও কতকগুলি পত্রের উত্তর ক্রমে ক্রমে দিব। পত্র-লেখকেরা উত্তর পাইতে বিলম্ব হইলে একটু অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন; কারণ, অবসর খুবই সংক্ষিপ্ত। যাঁহারা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করিয়াও পত্রের উত্তরে পত্র পাইবেন না, তাঁহারা একটু অপেক্ষা করিলে "ইঙ্গিতে"র মধ্যেই তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর পাইবেন; কারণ, তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরগুলি ইঙ্গিতের অপর পাঠকগণেরও জানা দরকার।

যে সকল ভদ্রলোকের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছি, তন্মধ্যে অনেকেরই, বিশেষতঃ কয়েকটি উচ্চশিক্ষিত যুবকের এইরূপ ব্যবসায়ে আগ্রহ দেখিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি,—'ইঙ্গিত' লেখা সার্থক বলিয়া মনে হইতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহাদের মধ্যে দুই চারিজন নিশ্চয়ই কোন না কোন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিবেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের উপযোগী এক একটী বিষয় নির্ব্বাচনের চেষ্টায় রহিলাম।

অভাগী

[শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়]

(১)

টেবিলটার উপর মস্ত একটা আলো জ্বেলে আফিসের ফাইলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া কচ্ছিলুম। সুবিমল একটা সোফায় বসে তার হাতের সেতারটার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেবার চেষ্টা কচ্ছিল। আমার মনটা তখন বোধ করি কতকটা সেই নীরস ফাইলগুলোর এবং কতকটা সেতারের সুরগুলোর ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এক দিকে কর্ত্তব্যের বোঝা মনটাকে যেমন নুইয়ে দিচ্ছিল, অপর দিকে সেতারের এক-একটা ঝঙ্কায় এসে আমার মনটাকে সেইরূপই হাল্কা করে দিচ্ছিল।

হাতের সেতারটা হঠাৎ দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিয়ে সুবিমল বল্লে, "যোগীন, এই আসচে পুজোর ছুটাটায় দার্জ্জিলিঙ্গ গেলে হয় না?"

আমি বল্লুম, "মন্দ কি, আর কটা দিন বই ত নয়!"

সুবিমল বল্লে, "বেশ; কিন্তু শেষকালে তুমি যেন 'যাব না' বলে সব পণ্ড করে দিও না।"

যে রকম করে সে ধরে বসল, আমি আর 'না' বলতে পাল্লুম না। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হয়ে গেল যে, যে দিন আমার আফিস বন্ধ হবে সেই দিনই আমরা হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়ব।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শিয়ালদহ ষ্টেসনে এসে দেখি, সুবিমলের নামগন্ধও নেই। লোকটা নিশ্চয়ই বড়-রকম খাম-খেয়ালী। এত জল্পনা-কল্পনা ক'রে শেষে কি না সব ওলট-পালট করে দিলে। সুবিমলের অপেক্ষায় আর আমি থাকতে পাল্লুম না। বাড়ী থেকে যখন সেজে-গুজে বেরিয়ে এসেছি, তখন আমায় যেমন করেই হোক যেতেই হবে। তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট করে নিলুম। ভীড় অবশ্য সে দিন একটু বেশীই ছিল। সুবিমলের জন্যে অপেক্ষা কর্ত্তে গেলে, হয় ত সে দিন আমার যাওয়া হোত না, নয় ত সারা পথটা দাঁড়িয়ে কিংবা বিছানাটার উপর বসেই কাটিয়ে দিতে হোত।

গাড়ী ছাড়তে মিনিট কয়েক বাকী, এমন সময়ে সুবিমল এসে একখানা গাড়ীতে লাফিয়ে উঠে পড়ল। যাক্, তবু ভাল,—পরের ষ্টেসনে আবার একত্র হওয়া যাবে।

সেবার আমাদের দার্জ্জিলিঙ্গএর tripটা মন্দ লাগলো না। তখন বেশ একটু শীত পড়ে গিয়েছিল; কুয়াসার পর্দ্দা ঠেলে হিমালয়ের বেরিয়ে আসতে বেশ একটু দেরী হোত; যেন কোন দেশের কত কালের রাজা সোণার মুকুট মাথায় দিয়ে অন্তঃপুর ছেড়ে সভার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছেন।

একদিন সুবিমলকে বল্লুম "কি হে, কেমন লাগ্‌চে বল দিকি?"

"মন্দ নয়। আর কিছুদিন থেকে গেলে হয় না?"

আমি বল্লুম, "না, আমার থাকা চ'লবে না; জান ত পরের চাকর। তোমার কথা অবশ্য আলাদা। ভাল কথা, তোমার মহিলা বন্ধুটির খবর কি? তিনি বোধ হয় আরও কিছু দিন আছেন?" সুবিমল বল্লে, "হাঁ, বোধ হয় আরও হপ্তা-দুই থাকবেন।" আমি বল্লুম, "শীতের তাড়াটা না খেয়ে আর নাববেন না বুঝি?"

আমি আর বেশী দিন থাকতে পার্ল্লুম না। কি করি, উপায় ছিল না। সরকার বাহাদুরের রূপোর চাকতির মোহে স্বাধীনতাটুকু হারিয়ে বসেছিলুম।

সুবিমল কিন্তু এল না।

(২)

মাসখানেক পরে একদিন হঠাৎ দেখি, সুবিমল এসে হাজির। কি বিশ্রী তার চেহারা হ'য়ে গেছে! কে বলবে, এই লোকটা এতদিন দার্জ্জিলিঙ্গে কাটিয়ে এসেছে!

"সুবিমল যে! ব্যাপার কি? দার্জ্জিলিঙ্গে কবে থেকে ম্যালেরিয়া সুরু হ'ল?"

"ম্যালেরিয়া নয়, 'ইনফুলুয়েঞ্জা'। এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেছি, এই ভাগ্যি।" এই বলে সুবিমল, দেওয়াল থেকে তার সেতারটা পেড়ে, সুর বাঁধতে লেগে গেল।

এমন সময়ে টেলিফোঁর ঘণ্টাটা বেজে উঠ্‌লো। Receiverটা হাতে তুলে নিলুম।

"হ্যালো!"

"কে, সেন?"

"হাঁ, আমি। কি চাই?"

সাহেব বল্লেন, "আমি আজই দার্জ্জিলিঙ্গে যাব ভাবচি। আমার প্রাইভেট চিঠিগুলো সেখানেই পাঠিয়ে দিও। হাঁ, ভাল কথা, তোমাকেও বোধ হয় একবার যেতে হবে। আর দেখ, সে কেসটা এখন গবর্ণমেণ্টের কাছে পাঠিও না।"

সুবিমল বল্লে, "কি ব্যাপার হে? বড় জবরদস্ত আওয়াজ।"

"হাঁ, কেরাণীকুলের বৈতরণীর কাণ্ডারী। তা, সাহেবটা লোক মন্দ নয়। নিজে ত যাবেই, সঙ্গে-সঙ্গে আমারও একবার দার্জ্জিলিঙ্গ বেড়াবার ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল।"

সুবিমল বল্লে, "ত, মন্দ নয়। কিন্তু এখন সেখানে বড় শীত। মাস দুই আগে হোলে বোধ হয় ভাল হোত। তার পর, কবে যাবে ভাবচ?"

আমি হেসে বল্লুম, "বোধ হয় এই সপ্তাহেই। কেন, তুমিও আবার যাবে না কি?"

"আমি? না,—না, আমি গিয়ে কি করব!"

আমি বল্লুম, "আর কিছু না হোক, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবে।"

সুবিমল আমার পানে চেয়ে রইল। কি উদাস, কি করুণ দৃষ্টি তার! কিন্তু কেন?

বিকেল বেলা দেখি, মোটর নিয়ে সুবিমল এসে হাজির। আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম, "কিহে, ব্যাপারখানা কি-বল ত?"

সুবিমল বল্লে, "দাদার গাড়ীখানা আজ চেয়ে এনেছি। চল, আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক। আর কিছু কাজও আছে, বুঝলে।"

* * * *

সন্ধ্যা তখন প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের গাড়ীখানা তখন চিৎপুর রোডের সেই অসম্ভব ভীড়ের ভেতর নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছিল। দু'ধারে মানুষের ঢেউ আর উপরে পাপের বীভৎস নগ্ন মূর্ত্তি মনটাকে কেমন একটা সঙ্কোচের গণ্ডীর ভিতর টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

আমি আর থাক্‌তে না পেরে বল্লুম, "সুবিমল, ছিঃ,— কলকাতা সহরে কি বেড়াবার জায়গা পেলে না?"

সুবিমল বল্লে, "কেন, কি অন্যায় হয়েছে?"

আমি বল্লুম, "এই দিনের আলোতে--"

বাধা দিয়ে, বিপরীত অর্থ করে, সুবিমল বল্লে, "একটা সেক্রেটারীয়েটের সুপারিণ্টেনডেণ্টকে চিনে নেওয়া খুবই সহজ, তা জানি। কিন্তু ভয় কর্ত্তে যাব কেন? বরঞ্চ—"

আমার খুবই রাগ হচ্ছিল; বল্লুম, "বরঞ্চ তোমার মাথা আর মুণ্ডু, একটা পাপের রাজ্য—"

সুবিমল বল্লে, "পাপ! না যোগীন, সে দোষটা দিতে গেলে তার অন্ততঃ অর্দ্ধেকটা আমাদের ঘাড় পেতে নিতেই হবে। কাদের জন্যে এরা পাপ করে জান? আমাদেরই জন্যে। আমরা আকণ্ঠ লালসা নিয়ে ওদের কাছে ছুটে যাই, আর বেচারারা ক্ষুধার তাড়নায় আমাদের কাছে ছুটে আসে। এখানকার বাতাস পর্য্যন্ত একটা করুণ গানে ভরা। ঐ রংকরা পোষাকগুলোর নীচে যে বুকগুলো লুকানো আছে—সেগুলোকে চিরে ফেল, দেখবে, সেখানে জীবন-ভরা ব্যর্থতা জড় হয়ে আছে। না জানি, বিধাতার কোন্ নিষ্ঠুর অভিশাপে সেগুলো মরুর মত শূন্য হয়ে গেছে।"

দেখলুম, সুবিমলের চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা জল টলটল কচ্ছে।

গাড়ীখানা হঠাৎ একটা জাক (jark) দিয়ে মোড়ের উপর থেমে গেল। সুবিমল গাড়ী থেকে নেমে বল্লে, "তুমি বাড়ী যাও যোগীন, আমি—"আর বলবার অবসর হ'লো না। গাড়ীখানা আমায় নিয়ে বাসার দিকে বেরিয়ে প'ড়ল।

(৩)

উতকামন্দ।

২রা অক্টোবর।

ভাই যোগীন,

তুমি দার্জ্জিলিঙ্গ থেকে ফিরে এসেছ, বোধ হয়।

আমায় বোধ হয় দিন কত খুঁজতে বেরিয়েছিলে; বোধ হয় বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে শুনেছিলে যে সুবিমল হতভাগাটা একটা বেশ্যা নিয়ে কলকাতা ছেড়ে গিয়েছে। তোমারও বোধ হয় ঘৃণা হচ্ছে? হওয়াটাই বোধ হয় স্বাভাবিক। কিন্তু যাক্। সে সব কথা নিয়ে আমি তোমায় চিঠি লিখ্‌তে বসিনি। তুমি বাড়ী গিয়ে আমার ড্রয়ার থেকে চেক্ বুক্‌টা পাঠিয়ে দেবে। সেটাকে তাড়াতাড়ি আনতে পারিনি। কেউ না জান্‌তে পারে, বুঝলে। ইতি

তোমার সুবিমল।

কলিকাতা

৭ই অক্টোবর।

প্রিয় সুবিমল,

আজ তোমার চেক্-বুক্‌টা পাঠিয়ে দিলুম, পৌছান সংবাদটা দিও।

তোমায় নিন্দা বা সহানুভূতি করবার মত কিছুই নাই। মানুষের ভুল-ভ্রান্তি হয়ই জানি। কিন্তু তবু কেন এমন ভুল করলে ভাই? সারা জীবনে যে এ ভুল আর শোধরাতে পারবে না। ইতি

তোমার ব্যথিত যোগীন।

নাইনিতাল

১০ই নভেম্বর।

ভাই যোগীন,

তোমার চিঠি পেয়ে যে কতদূর সুখী হয়েছি, তা বল্‌তে পারি না। সব চেয়ে বেশী সুখ যে তুমি আমায় ঘৃণা করে দূরে রাখ্‌তে চাওনি।

তোমার 'কেন'র জবাব দিতে পারব না। ইতি

তোমার গুণমুগ্ধ

সুবিমল।

কলিকাতা

২০শে ফেব্রুয়ারী।

সুবিমল,

তোমার কি হ'ল বল দিকি। আজ প্রায় ছমাস কোন খবরই নেই। অনেক কষ্টে তোমার ব্যাঙ্ক থেকে ঠিকানাটা জানতে পেরেছি। শুধু এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়ালে মনের আগুন ত নিব্‌বে না ভাই! আমি বলি স্নিগ্ধ শ্যামল বাংলা তোমার বোধ হয় অনেকখানি উপকার করবে। একবার দেখ না কেন?

যোগীন।

মুসৌরী

২৭শে ফেব্রুয়ারী।

ভাই যোগীন,

তোমার চিঠি এইমাত্র পেলুম। বাংলা মায়ের সাদর আহ্বান আমি এখান থেকেও অনুভব কচ্ছি। আর তুমিও ফিরে যেতে বলছ। কিন্তু আমি কেন যে যেতে পাচ্ছি না তা বোধ হয় জান না।

দোষ আমার যাই হোক না কেন, জানি তোমার উদার বুকে একটু স্থান পাবই। কিন্তু সে স্থানটুকু জোর করে নাই বা নিলুম।

সুবিমল।

কলিকাতা

৫ই মার্চ।

সুবিমল,

ভাই, তুমি আমার কাছে চিরদিন প্রহেলিকা হয়ে থাকবে?

তোমার কি অপরাধ তা জানি। কিন্তু যত বড় অপরাধ, তার তত বড় ক্ষমাও আছে। আমি উদাহরণ দেখাতে চাই না; কিন্তু দেখ, ক'টা লোক নিজেদের ভুলের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে? আর মানুষের যে কোথায় ভুল হচ্ছে না, তাও জানি না।

আর কিছু বলব না। ভগবান তোমাকে শান্তি এনে দিন।

তোমার যোগীন।

দার্জ্জিলিঙ্গ

১১ই সেপ্টেম্বর।

যোগীন,

আবার সেই দার্জ্জিলিঙ্গে এসে পড়েছি ভাই! পারত একবার এস।

তোমারই সুবিমল।
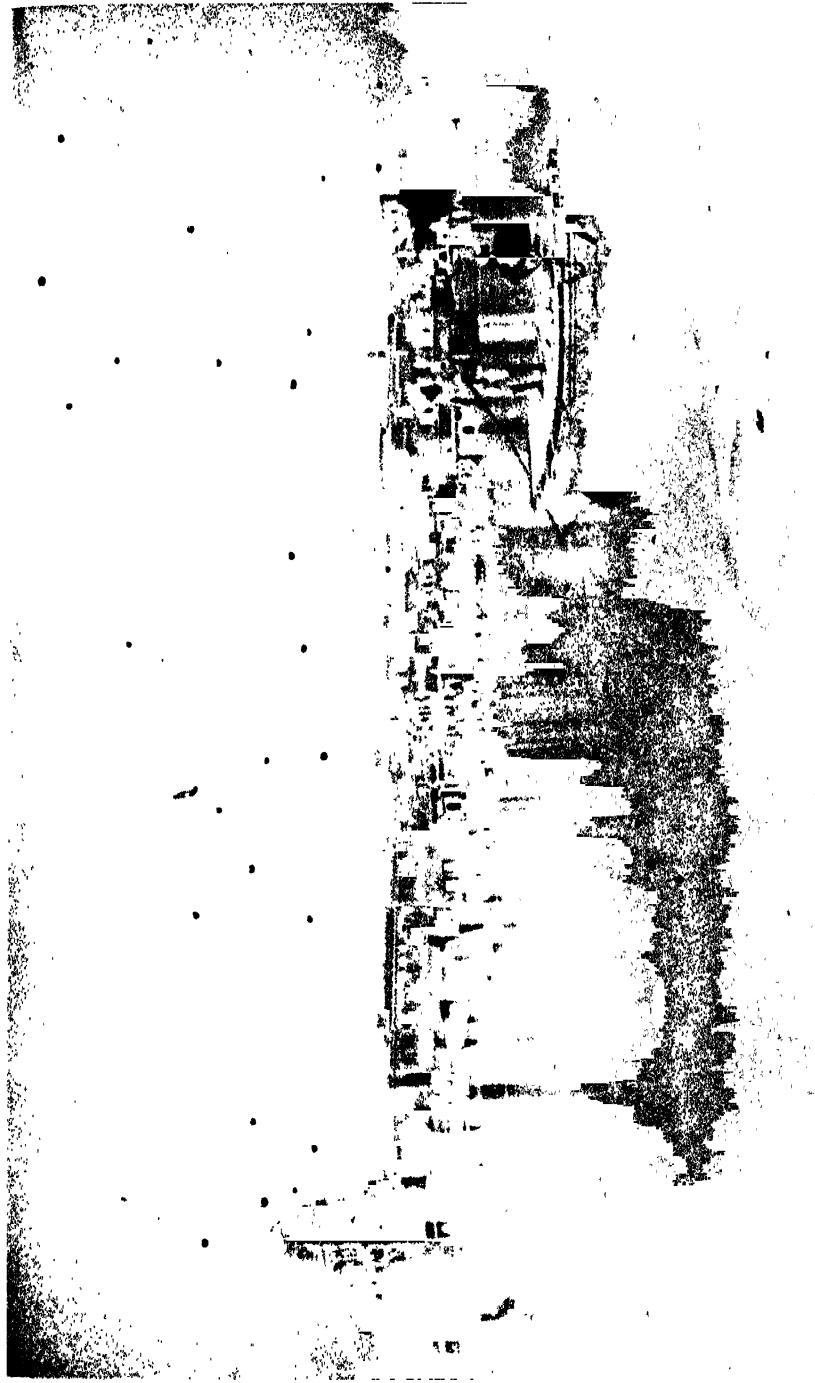
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

(৪)

ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলুম, তখনও প্রথম ট্রেনটা ধরবার যথেষ্ট সময় রয়েছে। তাড়াতাড়ি কয়েকটা জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে সাহেবকে টেলিফোনে খবর দিলুম যে, আপাততঃ এক সপ্তাহের ছুটিতে আমি দার্জ্জিলিঙ্গে যাচ্ছি; এবং দরকার হোলে সেখানে আরো কিছু দিন থেকে যাবো।

সুবিমলের চিঠি পেয়ে অবধি মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আহা, বেচারী তার জীবনের একটা ভুলের জন্যে কত যাতনায় না পুড়ে মরছে। কিন্তু এ অসম্ভব ভুলটা কেন সে করে বসেছিল, তা'ত জানি না। ভগবান, মানুষকে তুমি এত দুর্ব্বল করে কেন গড় প্রভু! তার চারিদিকে প্রলোভনের জিনিস সাজিয়ে রেখেছ; কিন্তু সেই প্রলোভনটা জয় করবার শক্তি দাওনি কেন? শুধু সুবিমল নয়, তার মত অনেক অভাগা নিদারুণ মনস্তাপে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে।

দার্জ্জিলিঙ্গ এসে পড়লুম। সুবিমলকে খুঁজে বার করতে বেশী দেরী হলো না।

সুবিমল বল্লে, "যোগীন, এস ভাই, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। আজ দু'দিন হলো আমার সব কর্ত্তব্যের শেষ হয়ে গেছে। এইখানেই তাকে একদিন বিধাতার আশীর্ব্বাদী ফুলটির মত বুকে তুলে নিয়েছিলুম, আর এই-খানেই তাকে জীবনের মত ছেড়ে যেতে হলো।"

দার্জ্জিলিঙ্গের কোলাহল ছাড়িয়ে আমরা তখন ঢের উপরে উঠে গিয়েছিলুম। নীচে পাহাড়ীদের ঘরগুলো থেকে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া উপরে উঠবার ব্যর্থ প্রয়াসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। আর দু'একটা ছোট মেঘের টুক্‌রো হিমালয়ের কোলের উপর নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আমরা একটা ছোট টিলার ধারে বসে পড়েছিলুম। চঞ্চল বাতাস আমাদের কাণে পার্ব্বত্য রাগিণীর গান গেয়ে যাচ্ছিল।

সুবিমল বল্লে, "যোগীন, যা এতদিন শুধু আমাতেই লুকিয়ে ছিল, আজ তার কতকটা আমায় প্রকাশ করে দিতে হবে। আমার দোষ হোক, ভুল হোক, যাই হোক না কেন, আমি তখন তাকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলুম। একটা দিনের জন্যও আমার সে জন্যে অনুতাপ করতে হয়নি। শুধু দুঃখ এই, পৃথিবীর চোখে তাকে সগর্ব্বে প্রকাশ করতে পাল্লুম না।

"একদিন, বুঝলে, এই কাঞ্চনজঙ্ঘার বুকের উপর শেষ আলো যখন দূর পাহাড়ের কোলে মিশিয়ে গেল, তখন আমি ঠিক এই জায়গাতেই বসেছিলুম। আর তোমার সাম্‌নের এই গাছগুলো ঠিক এম্‌নি ভাবেই সে দিন নির্ব্বাক হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

"যাক্। কতকগুলো বাজে কথা আর বলব না। এইখানেই আমাদের প্রথম আলাপ হয়েছিল। সেদিন তাকে যেমনটি দেখেছিলুম,—আর আজ, এই দু'দিন হোল, তাকে আগুনের হাতে সঁপে দিয়ে এসেছি; কিন্তু আজও তার মুখখানা আমি তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এত সুন্দর মুখ বোধ হয় মানুষের হোতে পারে না। বোধ হয় পৃথিবীর সব আদর্শগুলো এক সঙ্গে জড়িয়ে ভগবান তাকে গোড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু কেন যে সে আদর্শকে ভগবান একেবারে একটা নিষ্ঠুর ছাপ মেরে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তা ত জানি না। সে কি ছিল জান? এক পতিতার মেয়ে! আর শুধু সেই জন্যেই সে পৃথিবীর কাছে ছোট হয়ে গিয়েছিল। তার পর এই দার্জ্জিলিঙ্গে যেদিন 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হোলো, সেদিন সেই ফুলের মত কোমল, শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক মেয়েটি আমায় কেমন কোরে যে বাঁচিয়ে তুল্লে, তা আমিই জানি না।

"ভাবলুম—তার কি দোষ? অন্যের দোষের বোঝা ঘাড়ে কোরে কেন সে তার জীবনটা কাটিয়ে দেবে? আমি তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করেছিলুম; কিন্তু সে কি বলেছিল জান? সে বল্লে যে সে শুধু আমার বোন, আর আমি তার ভাই।

"সেদিন থেকে আমরা ভাই-বোন। পৃথিবীর চোখে এটা বড় বিসদৃশ দেখতে। কিন্তু ভগবান সাক্ষী, আমি সত্যি বলছি, তার কাছে আমি এত স্নেহ পেয়েছিলুম, এত নিঃস্বার্থ ভালবাসা পেয়েছিলুম, তা বুঝি বিশ্বভুবন আমায় দিতে পারতো না।

"তার পর শুনলুম, ভীষণ যক্ষ্মা রোগ তাকে ধরে ফেলেছে। তাকে অনেক বুঝিয়ে হাওয়া বদলাবার জন্যে

বেরিয়ে পড়লুম। আমার নামে একটা কুৎসিৎ কলঙ্ক রটে গেল।

"তা যাক্‌। তা'তে আমার কোন দুঃখ নেই। তার জীবনের শেষ:কটা দিন যখন এগিয়ে এল, তখন এই দার্জ্জিলিঙ্গে তাকে নিয়ে এলুম। একদিন সে বল্লে, 'সুবিমল দা, আমায় একবার সেখানে সেই পাথরটার কাছে নিয়ে যেতে পারবে?'

"আমি তাকে বুঝিয়ে বল্লুম যে, তার শরীরটা ভাল হোলেই, একদিন তাকে সেখানে নিয়ে যাব।

"কিন্তু অভাগীর সে সাধ আর পূরলো না।

"তার পর আর একদিন সে বল্লে, 'সুবিমল দা, আজ কি তিথি জান?'

"আমি বল্লুম, 'তা' ত জানি না বোন। পুরুষ মানুষ, অত খবর ত রাখি না।'

"সে বল্লে, 'আজ ভাই-ফোঁটা। তোমার পায়ের ধুলো দাও না একটু।'

তার পর জোর করে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে তার মাথায় দিলে। আমার এক ফোঁটা চোখের জল কখন যে তার ক্ষীণ হাড়টির উপর পড়েছিল, তা' জানি না।

'তুমি কাঁদছ সুবিমল দা? ছিঃ ভাই, মেয়ে-মানুষের জন্যে কি কাঁদতে আছে। কই, তুমি ত আমায় আশীর্ব্বাদ করলে না?'

"আমি চুপ করে রইলুম। অভাগী, তাকে আশীর্ব্বাদ করবার মত ত কিছুই ছিল না।

"বল্লে, 'সুবিমল দা, একটা কথা রাখবে ভাই? দেখ, আমার মা অনেক টাকা আমায় দিয়ে গিয়েছিলো। সে সব আমি তোমায় দিচ্ছি। সব তোমার। আর একটা কথা, তুমি বিয়ে কোরো ভাই।'

"তার পর, যোগীন, আরো দু'দিন সে বেঁচে ছিল, তার পর সব শেষ।"

খানিক চুপ করে থেকে সুবিমল বল্লে, "এই নাও তার দানপত্র। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর হবে। কালকের প্রথম ডাকেই তুমি এটা 'গভর্মেণ্টের' কাছে পাঠিয়ে দেবে, আর জানাবে যে, এ টাকা যেন দেশের অভাগী পতিতা নারীদের জন্যে খরচ হয়।"

* * * *

সন্ধ্যার আলো হিমালয়ের বুকে তখন বেশ জমাট বেধে উঠেছিল। আমরা ধীরে-ধীরে নেমে পড়লুম।

ভারতে মাতৃ-শক্তির উদ্বোধন

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

বর্ত্তমান সমাজ-প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া আমি আজ যে শক্তির উদ্বোধন করিতে চাহিতেছি, সেই মাতৃ শক্তি এই হিন্দুর মধ্যে আছে কি না তাহাই আজ সমস্যা। যদি না থাকে, তবে, যে নাই, যে মৃত,—উদ্ভব-স্থান সংযোগচ্ছিন্না, লুপ্ত-ধারা নদীর মত যাহা অস্তিত্ববিহীন নামমাত্র—কেবল স্মৃতিতে জাগিতেছে, তাহারই জন্য এই রোদন, তাহাকে ডাকিয়া-ডাকিয়া এই মর্ম্ম-বিদারী বিলাপোক্তি,—এ সঙ্গত কি না বুঝিতে পারিতেছি না, চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিতেছে। বুঝি না বুঝি, নিরুপায়! অন্তর্যামীর অলঙ্ঘ্য প্রেরণা, —আমায় ডাকিতেই হইবে। এমন সাধ্য কি, স্তব্ধ হই! হায় রে! ইহার অধিক দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?

একটা কথা! মাতৃনাম উচ্চারণ ত' ব্যর্থ হইবার নহে! সে ত কখনও অন্ততঃ করুণার উদ্রেকে অকৃতকার্য্য হয় নাই! তবে, মাতৃ-জাতি যখন হিন্দুর জাতীয় অবয়বে এখনও সারবান প্রবল অঙ্গ, তখন কি আমার এই 'মা' বলিয়া কাঁদা নিষ্ফল হইতে পারে? বোধ হয় ত' নয়! মাতৃ-শক্তি আছে কি না, সে মীমাংসা আমার কেন;—মাতৃজাতি বিদ্যমান,—তাঁহাদেরই নিকট আমার আবেদন উপস্থিত করিব। তাঁহারা মা,—তাঁহাদের দেখাইব, জাতির মাতৃত্ব, মায়ের সন্তান-ধারণ-পালন ব্যর্থ, অপমানিত হইতেছে। মায়েরা প্রসূতি মাত্র! আমি সন্তানের দিক হইতে নৈরাশ্য বহন করিতেছি না,—মায়ের দিক হইতে তাঁহাদেরও বক্ষ জর্জ্জর হইয়া উঠিয়াছে! যাহা লুপ্ত, তাহা আবার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিবে! তাঁহারা নিজের দায়িত্ব বুঝিলেই

সব হইল। শক্তির সমাবেশ নিজেরাই করিয়া লইবেন। মাতৃজাতি আবার জাগিয়া উঠিবে।

কেন এই প্রয়াস? দিব্য আরামে ত দিন কাটিতেছে, আমার না হউক। অপর সকলেই ত' বেশ নিরুদ্বেগে আছে।—কেন এই একটা অস্থিরতা জাগাইবার চেষ্টা?

নিজে অস্থির হইয়াছি বলিয়া। নিজের শান্তি নাই বলিয়া। হৃদয়ের সমস্ত ধৈর্য্য টুটিয়া গিয়াছে বলিয়া।

হে ভারত, তোমার বর্ত্তমান অবস্থাতেই ত আমার জন্ম। যে নরকে আমি আসিয়াছি, তাহারই কৃমিকীট গড়িয়া আমায় প্রেরণ করিলে না কেন? একি এ প্লাবনের বারি উত্তাল কলরোলে আমার মধ্যে সিন্ধুর মত নাচাইয়া তুলিয়াছ? লহরে-লহরে বিক্ষোভিত উদ্বেলিত হইয়া এ কিসের অগাধ সলিল এমন করিয়া আমার হৃদয়-বেলায় প্রতিনিয়ত আছাড়িয়া পড়িতেছে! আমায় যে মথিত করিয়া তুলিল?—পঞ্জর-পিঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া সে যখন আসিবে, আমায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াই ত আসিবে—তখন সে আয়ত্তের অতীত।—হৃদয়োচ্ছ্বাস অবরুদ্ধ থাকে কই?—যদি সাধ্য থাকিত, সম্ভব হইত—এই স্বদেশ, এই জন্মভূমি হইতে উধাও হইয়া দূরান্তে বিলীন হইতাম,—নিদ্রিত আত্ম-বিস্মৃত জাতিকে, এত উন্মত্ত, অধীর ঝঙ্কারে সচকিত করিতাম না। আমার সংগ্রাম আমার আপনার মধ্যেই দাবিয়া রাখিতাম।

ওই যে দেখিতেছি। চক্ষের উপর প্রত্যক্ষ ফুটিয়া উঠিতে দেখিতেছি আমার প্রাচীন ভারত! অনাদি যুগের অনন্ত গরিমার আকর সেই মহাভারত। যে ভারতে গগনোন্নত, তুষার-মণ্ডিত-শীর্ষ হিমাচল-পাদমূলে মহা তপস্বিনী জননীর আশ্রম-পীঠ-প্রান্তে,—নীল-গগন-বক্ষে, অনন্ত নীরবতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া, মেঘমন্দ্রে, প্রজ্বলিত বিজলী-দামের জ্বালা-মালা স্ফুরণের মত বেদের বিকাশ, উপনিষদের আবির্ভাব। আবার সাংখ্যের যোগের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের সহিত, বুদ্ধের প্রেম, শঙ্করের বজ্রের ঈশ্বর-ঝাঙ্কিত সংমিশ্রণ। যুগে-যুগে আনীত বিচিত্র সমারোহমালা! বিশ্বের সকলের রাজকর-পরিপূর্ণ বিশ্বরাণীর ভাণ্ডার! জীবিতের জন্য জীবন সত্যের পরিপূর্ণ অমৃত মূর্ত্তি, জীবন-রহস্যের সফল সমাধান!

এই ভারত সেই ধর্ম্মভূমি, যেখানে, সমগ্র জগতের মধ্যে মাত্র যেখানে, মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণ মানুষ জাগিয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে। আর কোনও দেশেই এমন সাধন-শক্তি নাই, এমন শিক্ষা-পদ্ধতি নাই—যাহা অবলম্বন করিয়া, স্বার্থ হইতে, পশুত্ব হইতে, অজ্ঞান জড়ত্ব হইতে, মানুষ আপনাকে চিনিয়া আপনাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অবতার আর কোথায় হয়?

যে শক্তি এই ভারত দেখাইয়াছে, সে যে অতুলনীয়। বাহ্য আড়ম্বরে পরিপূর্ণ, চাকচিক্যময়ী কত সভ্যতা চোখের উপর ত দেখিলাম। কৈ, আর কে দেখাইতে পারে সভ্যতার অন্তর্নিহিত সেই বজ্রশক্তি, যে শক্তি সমগ্র এক-একটা জাতিকে পর্য্যন্ত নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে? ইয়োরোপ? শুনিলে হাসি পায়। তাহার জড়-ঐশ্বর্য্য-বিমণ্ডিত ভবনে ভোগের নিমন্ত্রণ লইতে অনেকানেক জাতি আজ লুব্ধ; তাহাদের অনেক আচার-ব্যবহার উহারই অনুকরণে পুনর্গঠিত। সব সত্য! কিন্তু এইটুকুর জন্য বিশ্ব-মানব-সভায় দম্ভ সাজে না। এমন কথা বলিবার সে অধিকার পায় নাই যে, তাহার প্রকাশ, তাহার স্বাতন্ত্র্য এমন সম্পূর্ণ, যাহার সংঘর্ষে অপরের প্রকাশ বা স্বাতন্ত্র্য অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। তাহার বল অধিক, সে অপরের অস্তিত্বকে চূর্ণ করিয়াছে—দৃষ্টান্ত মিলিবে। কোনও সভ্যতাকে গ্রাস করিয়া তাহার প্রকাশ বা স্বাতন্ত্র্যকে লজ্জিত করিয়া আপন সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লইয়াছে—এ দৃষ্টান্ত নাই। কিন্তু আমার স্বদেশের ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি, এই ভারতের বক্ষে, তাহার ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট, সভ্যতায় বিমোহিত হইয়া, পরাজিত বিদলিত জাতি নহে,—কত দুর্দ্ধর্ষ, রক্ত-লোলুপ, লুণ্ঠন-পর বিজেতৃ জাতি পর্য্যন্ত নিজেদের বৈশিষ্ট্য-স্বাতন্ত্র্য সমর্পণ করিয়াছে; আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়া, ইহারই অগাধ জন-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া কোথায় মিশিয়া গিয়াছে। হুণ, শক, জাঠ, সিথিয়—কত জাতি ত রণবাদ্য বাজাইয়া, দুর্ব্বার পরাক্রমে ছুটিয়া আসিয়াছিল—তাহারা ত ফিরিয়া গেল না। এমন করিয়া অস্ত্রবলে হারিয়াও কোন্ বল প্রকাশে ভারতবর্ষ তাহাদের নিশ্চিহ্ন করিয়া আপন অঙ্গে সাপটিয়া লইয়াছিল? কিসে তা সম্ভব হইল? সে সোজা কথা সোজা চোখে দেখিলেই সোজা হইয়া যায়। মহা-ভারতের নাগরিক সেই পিতৃজাতি এমন এক অসীম জীবনে উচ্ছ্বসিত ছিলেন, যাহার বলে তাঁহারা আপনার সম্বন্ধে কোনও ভয়ই পোষণ করিতেন না। তাঁহাদের উদার হৃদয় যতই বৈচিত্র্যের মধ্যে আসিয়া পড়িত, ততই

আরো—আরো উদার হইয়া যাইত। সঙ্কীর্ণতা তাঁহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।—তাঁহাদের সভ্যতা এমনি চিত্ত-বিমোহিনী,—তাঁহাদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার পথগুলি এত সুন্দর, এত সরল যে, হৃদয় তাহার কাছে অভিভূত না হইয়া যায় না। তাই মাথার উপর উদ্যত অস্ত্র সংবরণ করিয়া, সহসা-চমকিত তাহারা সেই প্রসন্ন-মুখ স্নিগ্ধ-দৃষ্টি তপস্বীর চরণ-তলে সকল হিংস্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দিল, নতজানু হইল। তাঁহাদের যজ্ঞশালার চারিজাতির উন্মুক্ত দ্বারপথে অবাধ-প্রবেশ তখন কোনও অভ্যাগতের কাছে নিষিদ্ধ ছিল না। ভারতের মন্ত্ররূপী অধ্যাত্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিকে মহাভারতের অঙ্গ বলিতে কেহই অস্বীকার করিত না। সে দিন আত্মিক-বলে ভারতও বলীয়ান ছিল,—সে বল সর্ব্ব বলকে স্তিমিত করিয়া দিয়া, আপন প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখিত। এখন কালের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে প্রভাবের কণাংশও অবশিষ্ট নাই। সে সর্ব্বশোষী, সর্ব্বগ্রাহী অমিত মানসিক বল-সম্পন্ন ব্রাহ্মণত্ব আজ রূপান্তরিত ;—সে আজ ধর্ম্ম নহে, কৌলিক অধিকার। চারিটি জাতি আর চারিটি দ্বার নহে —চারিটী প্রাচীর। সে দিনের সঙ্গে সে মনুষ্যত্ব ভারত হারাইয়াছে।—সে দম্ভ আর এ মুখে শোভা পাইবে না। আজ ইয়োরোপের দিকে চাহিয়া, জগতের দিকে চাহিয়া, তাই গুমরিয়া-গুমরিয়া মনের অনলে দগ্ধ হইতেছি। ভাবিতেছি, চেতনা বিলুপ্ত হউক।

এসিয়ার মহা-সাম্রাজ্য চীন সেই মহাভারতের শিষ্য। সেদিন সে ভারতের পাদমূলে বসিয়া ধন্য হইয়াছিল। শুধু এসিয়া তো নয়,—ইয়োরোপের মুকুটমণি গ্রীস, মিশর—সেথায়ও যে মহাভারত হইতে সভ্যতা-জ্যোতিঃ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল—তাহাও বিস্মৃতির গর্ভে লুকায় নাই। জ্ঞানে-শিল্পে ভারতবর্ষ সে দিন সমুন্নত।

অতীতের সেই ভারতবর্ষ, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে আজি আর দেখি না,—সে কি প্রহেলিকা! সেই স্বর্গের খনি প্রবাহিত ক্ষীরধারা মধুময় সুখস্থান! আপন সন্তানকে অমৃত-স্তন্যে অমর করিয়া জগতের জীবন রক্ষা করিতেন—, কোথায় আজ সেই অন্নপূর্ণা? মা আজ কোথায় অন্তর্হিত? মোগল-রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে দাঁড়াইয়াও দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাস গৃহ-প্রাচীরে পারস্য-ভাষায় উৎকীর্ণ বর্ণমালা পাঠ করিয়াছি—"যদি জগতে কোথাও বেহেস্ত থাকে, সে হেথায়, হেথায়, হেথায়?" সে দিনও ছিল! তবে মিথ্যা কেমন করিয়া বলিব? স্বপ্নও ত' বলিতে পারিব না! এ সত্য! মোগলেও দেখিয়া গিয়াছে। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে জন্মিলে আমিও দেখিতাম। আজি আর ভরসা নাই।

সে যে চিরদিনের মত অন্তর্হিত,—আর তাহাকে কখনও দেখিব না,—কেন তাহার জন্য মিথ্যা বিলাপ করিয়া শোক-স্বর তুলিব! যাহা আছে, যাহা দেখিতেছি, তাহাকে বুঝিতে দাও—তন্ন-তন্ন করিয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে দাও। কল্পনা বিলুপ্ত হউক। হৃদয়োচ্ছাস স্তব্ধ হউক। এস নিষ্ঠুর সত্য, বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত দিনের মত প্রখর বৈরাগ্য আমার মধ্যে জ্বালিয়া দাও। যাহা হারাইয়াছি তাহার স্বপ্ন, যাহা আঁকড়িয়া ধরিয়া আছি তাহার মোহ, সমস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি সরিয়া দাঁড়াই। যাহা হইবে, তাহারই ধ্যান চাই, তারই জন্য তপস্যা চাই!

আজ কি দেখিতেছি? দেখিতেছি, যেখানে স্বর্গ ছিল, সেখানে পড়িয়া আছে শ্মশান। শ্মশান নহে—নরক! যে দেশে দেবতা বাস করিত, যে তপোবনে মুনি-ঋষি বিচরণ করিত, সেখানে আজ ভ্রমণ করিতেছে কাহারা? —নিজের ভাষায় বলিব না। জীবন-সংগ্রামে পৃথিবীর যে সকল জাতি আজ জয়ী, তাহাদেরই ভাষায় সে কথা উচ্চারণ করি,—আমার ক্ষীণ কণ্ঠ অপেক্ষা তাহার ঝঙ্কার উচ্চতর শুনাইবে। "Gentoos, Hondus, Indos," আরও শুনিতে চাহ? শুন—"Natives."

আর তাহাদের দুর্দ্দশা—না, সে সব লেখনী-মুখে ফুটাইবার প্রয়োজন নাই। পারিবও না।

সে জাতিকে ঘৃণায় সঙ্কুচিত ম্লেচ্ছ ঐতিহাসিক—সেও অস্বীকার করিতে পারে নাই ; বলিয়াছে, ইহারাও সেই আর্য্যজাতির বংশ,—যে আর্য্যজাতি হইতে গ্রীক, রোমক জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতি জন্মিয়াছে, ইহারা তাহারই Indo-Aryan Family। সে জাতির বাঁচিয়া থাকিবার দাবীকে আজ যে সমগ্র পৃথিবী স্বীকার করিয়া লইবার পূর্ব্বে এত দ্বিধা উপলব্ধি করিতেছে, ইহার হেতু কি?—যেখানে একদিন অতখানি শক্তির তড়িৎ-হিল্লোল খেলিয়া গিয়াছিল, সেখানে এমন নির্জ্জীবতা, নিশ্চেষ্টতা আসিল কেন? মাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, প্রাণ-ধারণোপযোগী অন্নমুষ্টিও পরের প্রতি-যোগিতা হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, বিশ্বের

বিচার-সভায় কেন আজ তাহাদের করুণা উদ্রেকের আবেদন হস্তে দাঁড়াইতে হইয়াছে? কি সে পাপ, যাহাতে জর্জ্জরিত হইয়া, তাহার সমস্ত অঙ্গসন্ধি এমন করিয়া শিথিল হইয়া গেল? তোমরা বলিবে আচার-শৈথিল্য; কিন্তু অতটুকুতে আমি সন্তুষ্ট নহি;—আমি বলিতে চাই কদাচার। তোমরা বলিবে জীবনের অভাব—আমি আরো বেশী বলিতে চাই;—আমি বলিব, আত্মহত্যা।

হে মহাভারতের সন্তান! হে হিন্দু, হে বৌদ্ধ, হে মুসলমান, হে খৃষ্টান, হে পার্শি, জৈন, শিখ, আজ সকলকেই আহ্বান করিতেছি; সকলকেই বলিতেছি, একই পাপে আমরা জর্জ্জরিত—একই কদাচারে আমরা আক্রান্ত। আজ সমবেত হইয়া আত্মশোধন করিতে হইবে—এক লক্ষ্য হইয়া আত্মগঠন করিতে হইবে। হৃদয় যখন আজ খণ্ড ভারতে সন্তুষ্ট নহে, তখন সকল খণ্ডতার উপরে উঠিয়া মহামানবের সমকক্ষতা লাভ করিতে চেষ্টা পাইব;—আবার আমরা মহাভারত হইয়া উঠিব।

চাই গঠন। আজ দেশের অন্তর্নিহিত তপঃশক্তি ঊর্দ্ধমুখ যুক্তকর হইয়া প্রার্থনা করিতেছে,—রুদ্ধশ্বাসে আকর্ষণ করিতেছে ভগবানের সেই ইচ্ছা, যে ইচ্ছায় গড়িয়া উঠিবে; সকল খণ্ডতা একত্র হইবে; বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলি আপনার মধ্যে একের সত্তা অনুভব করিবে।

এই গঠন যাঁহারা সুগঠিত না হইলে কোনও দিনই আরম্ভ হইবে না, তাঁহাদের গড়িয়া তুলিব—ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য। হৃদয় সমস্তে তৃপ্ত হইয়াছে। জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া প্রাণের পাত্র পরিপূর্ণ করিতে—এই তৃপ্তি-ক্ষান্তির অধীশ্বরত্ব পাইতে,ঋণের দায়ে আমি বিশ্বের কাছে বিকাইয়া গেছি। এ ঋণ শোধ না করিলে আমার মুক্তি নাই; তাই আমার এত আগ্রহ। দুঃখাতীত করিতে দুঃখ ভীত জগতকে রহস্য-ভাণ্ডারের চাবিটা ডাকিয়া হাতে সঁপিয়া দিতেই হইবে! আর সকল বোঝা বিলি হইয়া গিয়াছে, আছে এই একটা বোঝা!—এ বোঝা এইবার বিলি করিব। পারের মাঝি অপেক্ষা করিতেছে।—সময় নাই।

দেবত্বের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে, পশুবল-দৃপ্ত জগতের শোণিত-তৃষ্ণা তৃপ্তিতে মোক্ষিত-রুধির, ক্ষীণবল মুমূর্ষু দেবজাতি—একবার ক্ষণেকের মত উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াও। তোমার ঘর, তোমার বক্ষ, তোমার দেশের গগন-পবন বিলাপে মুখরিত। ব্যাজার ত' দিবানিশিই হইতেছে—একবারমাত্র এই প্রলাপ বাক্যে কর্ণপাত কর? তোমার প্রাণের তার যদি অকম্পিত থাকে, তুমি চলিয়া যাইয়ো। শুধু একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দুটো কথা—তাও এই কথার হাট বাঙ্গালায় শুনিতে বলিতেছি।—অন্যায় অনুরোধ নহে।

বলিতেছি, এত দুর্দ্দশা-দারিদ্র্যের জীবন—ইহার মধ্যেও ত তোমার প্রচুর অবকাশ আছে। সেই অবকাশের একটুখানি সময় একাকী নিভৃতে বসিয়া, এই ভারতবর্ষের ইতিহাসখানি লইয়া নাড়াচাড়া করিও। আর গৃহভিত্তিতে ভারতেরই মানচিত্রখানি লম্বিত করিয়া, স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া-চাহিয়া দেখিও। দেখিও, সেই সিন্ধুর অববাহিকা, সেই পঞ্চনদ-বিধৌত প্রদেশ হইতে সতৃষ্ণ নয়ন ক্রমে ক্রমে অপসারিত করিয়া, গঙ্গার রেখা চিহ্ন-পথে বাঙ্গালার সাগর-কূলে আনিয়া স্থাপিত করিও। তার পর চাহিয়া-চাহিয়া দেখিয়ো দাক্ষিণাত্যের উভয় উপকূল। তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ত্তব্য, তোমার জীবনের লক্ষ্য সমস্তই পরিস্ফুট হইয়া যাইবে। তারপর তোমার অস্থিসার শিশুর প্রাণ-সাক্ষী ক্রন্দনটুকু আছে, তোমার হরিদাভ-মুখমণ্ডল, শুষ্ক-তাম্র-সপ্রশ্ন, দৃষ্টি নিত্য-রোগ-জর্জ্জরিত পরিজন আছে, তোমার নিজের ন্যুব্জপৃষ্ঠ প্রকটিত-পঞ্জর শীর্ণ চরণ সমেত আপনার দেহখানি আছে।—এমনি করিয়া ক্রমান্বয়ে উভয়ের প্রতি চাহিতে থাকিয়ো। এখন আর পূজা-পাঠ নয়, আরাধনা-ভজন-ধ্যান সমস্তের ফল ইহাতেই পাইবে।

এই অস্তিত্বের শেষ অবস্থা হইতে ফিরাইয়া, জাতিকে বিকশিত করিয়া তুলিতে, যাঁহাদের আবির্ভাব সমস্ত দেশ প্রতীক্ষা করিতেছে, সেই তাঁহাদেরই বিকশিত করিয়া তুলিতে আজ প্রয়োজন হইয়াছে তোমাদের—মা! এবার সরিয়া দাঁড়াইবার অন্তরাল নাই,—সঙ্কোচের অবকাশ নাই। আজ আবার সৃষ্টির সেই প্রথম দিনের মত, জল, স্থল, পবন সমস্ত অনাবৃত। তোমাদেরো উন্মুক্ত স্বরূপ এই শুভক্ষণে উন্মুক্ত দিক আশ্রয় করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে ঝলসিয়া উঠুক। আজ চারিদিক শূন্য। সমস্ত যে তোমাদেরই প্রতীক্ষায় নীরব। জাতির ভগবান রুদ্র সংহার-মূর্ত্তির তাথৈঃ তাথৈঃ থিয়া নৃত্য-তাণ্ডবে পদভরে সব চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া

দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার নূতন কল্পনা তোমাদেরি ইচ্ছার মধ্যে মূর্ত্তির প্রথম অবস্থা লাভ করিবে। যেখানে ধরণী নিষ্ফলা, সেইখানেই মরুভূমি। তোমরা ধরণীর প্রতিরূপা মা, কত-কাল অন্ধকারে অনুর্ব্বর থাকিয়া তোমার দেশের মানবত্বকে নিষ্ফল নির্জ্জীব রাখিতে চাও? কানন-কুন্তলে পরিশোভিতা হইয়া ধরণী যেমন হাসিতেছেন, তোমরাও হাস মা! কীর্ত্তি-সম্পদে গরিমায় বীরপুত্রমালা-বিভূষিতা তোমরাও হাস! অন্তরের পাষাণ-ভার, চারিদিকের সহস্র আবরণ দূর করিয়া দিয়া সূর্য্যালোকের সংস্পর্শে এস! নিজের জন্য চাহ না ত, জগতের জন্য এস। জগত তোমাকে চাহিতেছে। তোমায় পশ্চাতে রাখিয়া জগতের হাটে তোমার দেশ প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়াছে। তোমার সংযোগবিহীন হইলে তাহার মূল্য নাই, এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে। তোমাদেরই হৃদয়ের গভীর স্তরে অমৃত এখনো সঞ্চিত আছে; তাহাকে টানিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া, উপরের স্তরকে অভিষিক্ত না করিলে, উপরের উদ্ভিদ-বিকাশের মত জাতির বিকাশ অসম্ভব। সত্যের, জ্ঞানের জ্বলন্ত তপন ঐ সহস্র জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া দিতেছে,—তোমরা পাষাণ আবরণ সরাইয়া দাও। স্বভাবকোমলার এ কাঠিন্য-সংবর আর কেন?

আজ তুমি কুলাঙ্গনারূপে লজ্জাভূষণ-নম্রা। তোমার প্রাণের ধারা নিম্নের স্তরে প্রবাহিত, সে লোক-লোচনের বস্তু নহে। যেমন আছ, তাহার মধ্যে যতখানি সৌন্দর্য্য, শুদ্ধতা,—সে গণ্ডীটুকু আমার ভাবোচ্ছ্বাসের মুখে আদর্শের রোথে মুছিতে চাহিব—সে আমার উদ্দেশ্য নহে। তুমি যে এই আশ্রয়-প্রতিষ্ঠানের সঙ্কীর্ণ পরিসর সহ্য করিয়া লইয়াছ, তাহার কারণ, সে তোমার কাছে পরিচিত, সে তোমার কাছে নিশ্চিত। হৃদয়ে যতখানি বেগ সঞ্চিত হইলে সে নূতনের অনিশ্চিত পথ ধরিয়া অভিযানে বাহির হয়, শঙ্কা করে না, ততটা বেগ তোমাতে নাই। কিন্তু মা, জানিও—বেগ দোষের নহে।

আর আমিও কি তোমার কাছে পরিচিত, নিশ্চিত নহি? তোমার-আমার মধ্যে কি এমন হৃদ্যতার দান-প্রতিদান চলিতে পারে না, যাহার ফলে অনন্ত বিশ্বাস আসিয়া উভয়কে এক লক্ষ্যে পরিচালিত করে? তোমার মাতৃ রূপ, আমার সন্তান-রূপ, এ দুয়ের মত এত নিকটতর আর কি আছে? এ প্রাণ কি তোমারি উপাদান লইয়া গঠিত নহে? এ চক্ষু তো তোমারই ঐ মাতৃরূপা মূর্ত্তির পানে জগতে সর্ব্ব-প্রথম চাহিয়াছে! এ মুখের হাসি ত তোমারই মুখপানে চাহিয়া সর্ব্বপ্রথম উৎসারিত হইয়াছে। কোন্ জাতির আদর সম্ভাষণে এ প্রাণের দ্বার সর্ব্বপ্রথম খুলিয়াছিল মা—এ প্রাণের আকুলি-বিকুলি সর্ব্বপ্রথম কোন্ জাতির প্রাণে বাজিয়াছিল? যুগ-যুগান্তের প্রতিষ্ঠিত নিশ্চিতের সিংহাসন এই পায়ের চাপে গুঁড়া করিতে পারি ত, সে তোমারই অপমানের প্রতিবিধিৎসার জন্য পারিব।—তুমিও ঐ আবহমান কাল যাহার ভিত্তি সংলগ্ন হইয়া, দিনে-দিনে পাষাণে পরিণত হইয়াছ, তাহার মায়া যদি পরিত্যাগ কর, সে এই আমার মায়াতেই পারিবে। এখন শুধু ভগবান অপেক্ষা করিতেছেন—কেমন করিয়া উভয়ে আমরা স্পষ্টতর হইয়া উঠিব। নারী-নর উভয় জাতির মধ্যে মাত্র তাঁহার উদ্দেশ্যটা জাগিয়া থাকিবে, আর সকল অন্তরাল সরিয়া যাইবে।

চরাচর-ধরিত্রী ধরণী—যিনি রত্নগর্ভা, তিনিও শ্যাম শোভার আবরণে পল্লবকুসুমদামের অন্তরালেই আপন শোভার সার্থকতা অনুভব করিতেছেন। অবিরত অগ্ন্যুত্তমের মত অভ্যন্তর-লীন বেগরাশিকে বিস্ফুরিত করিয়া, বিদীর্ণ, উৎক্ষেপ বিশৃঙ্খল রূপে, বিশ্বজগৎ ত্রস্ত সন্ত্রস্ত করিয়া সেই মণিময় স্তরের আলো-জ্যোতির্ম্ময় রূপ চিরদিনের জন্য বাহিরে মেলিয়া ধরা—এ তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূল। জানি মা! যে ইচ্ছা তোমারও মহাশক্তি-রূপকে লজ্জার আবরণে ধরিয়া রাখিতে চায়, সে ইচ্ছার স্বরূপ জানি। কর মা, জড়ত্বের আবরণ উন্মোচন কর,—তোমার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে না, তোমার মহিমাই দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। এই জড়ধর্ম্মী জাতিকে অসীম বেগবান জীবনের পথে প্রবাহিত করিতে তোমারও কর্ত্তব্য আছে। সে আহ্বান সঙ্গীতে তোমারও কণ্ঠস্বর মিশিবে।

বিশ্ব-স্রষ্টার উদ্দেশ্যের মধ্যে তোমার যে সিদ্ধ রূপ বিরাজমান, তাহাকে বিকৃত করিয়া দেখিয়ো না, দেখাইয়ো না। যত দিন সে রূপের বিকাশ সত্য রূপ ধরিয়া ধরায় না নামিয়া আসিবে, ততদিন তোমারও দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। জাতীয় চরিত্রের বিকৃতিও দূরীভূত হইবে না। মুক্তি নাই, স্বাধীনতা আকাশ-কুসুম। আর কত দিন সহ্য হয়! পাষাণে যদি দুঃখ-বোধ থাকিত, তবে বিকৃত জগতের অস্বাভাবিক

জীবন-যাপনের ধারা এতকাল তোমায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। রুদ্ররূপা প্রকৃতির শিশু আমি—আমার প্রাণ যে দেশের আলোকপাতে আজ জ্ঞানের প্রভায় বিচ্ছুরিত, প্রেমের প্লাবনে অভিষিক্ত,—সে কি এমন কোনও জ্যোতিষ্ক হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছি, যাহার প্রতি তোমার নয়ন-পাত হইবার নয়! তোমাদেরই হৃদয়-বেলা-অভিমুখে যে তরণী ভাসাইলাম, সে কি তবে বিপরীত মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে! তরণী যে দিকেই যাক্‌, আমার লক্ষ্য আমাতেই অটল। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি—তোমাদেরই যাহা, যে অধিকার বিশ্ব স্রষ্টা তোমাদের দিবেন বলিয়া একান্তে রাখিয়াছেন, সে ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভ যাহারই স্পৃহা করিতে পারে, কিন্তু লোভ করা পাওয়ার অমোঘ পথ নহে। অপরে হাত পাতিয়া সে কখনই তাঁহার হস্তচ্যুত করিতে পারিবে না। তিনি নীরবে তোমারি প্রতীক্ষা করিতেছেন। যে দিন তোমাদের শতদল-কোমল করপুটগুলি সংযুক্ত হইয়া তাঁহার আসন-তলে বিস্তৃত হইবে, সে দিন তিনি এমন কিছু দিবেন—যে পাওয়াটুকুর উপর সমস্ত জাতীয় জীবনের উদ্বোধন নির্ভর করিতেছে।

বঙ্গরাণী

[শ্রীগুরুদাস হালদার]

রজত ভূধর কিরীট কাহার, চরণে অম্বুরাশি,
ভুবন মোহন প্রকৃতি-বদন, জ্যোৎস্না কাহার হাসি,
তপন-কিরণ দৃষ্টি কাহার, বিহগ-কূজন বাণী?
—জগৎ-মাঝারে অতুলনা সে যে জননী বঙ্গরাণী।

প্রভাত কাহার মধুময় অতি, সন্ধ্যা মাধুরী-মাখা,
গভীর রাত্রে আঁধারে আলোকে অতি অপরূপ লেখা,
প'রে প'রে কা'র ষড়ঋতু দেয় সুখের উৎস আনি?
—জগৎ মাঝারে অতুলনা সে যে জননী বঙ্গরাণী।

কাহার কাননে কুসুম আননে গুঞ্জে কাহার অলি,
কাহার স্নিগ্ধ সমীর পরশে কম্পে কাহার কলি,
বরষে কাহার জলদপুঞ্জ কাহার করুণা আনি?
—জগৎ মাঝারে অতুলনা সে যে জননী বঙ্গরাণী।

ধুইয়া ধূসর বালুকাপুঞ্জ দূর গিরিমূল থেকে
এসেছে কাহার ছইটি কন্যা মিলিতে কাহার বুকে?
—অমল হাসিনী, অতুলা জননী, অতুল-বিভব রাণী
জগৎ মাঝারে অতুলনা সে যে জননী বঙ্গরাণী।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ,]

নবম পরিচ্ছেদ

শীতের প্রারম্ভ; শিশিরের ঘন আবরণে শ্যামল দূর্ব্বাদল শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই; প্রথম উষার ক্ষীণ শুভ্রালোকে মুর্শিদাবাদের পরপারে ভাগীরথী-তীরে এক শুভ্রবসনা শ্যামাঙ্গী রমণী দেব-পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। উদ্যানের নিম্নে ক্ষীণকায়া ভাগীরথী প্রবাহিতা। একটী-দুইটী করিয়া স্নানার্থিনী কুললনাগণ গঙ্গাতীরে আসিতেছিলেন। রমণীর মন সেদিকে ছিল না; তিনি একাগ্রচিত্তে কুসুমচয়নে নিযুক্ত ছিলেন। এক দীর্ঘকায়া রমণী বহুমূল্যের শালে অঙ্গ গোপন করিয়া গঙ্গাতীরে যাইতেছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত রমণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?" প্রথমা প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। প্রশ্নকর্ত্রী পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, বিদ্যালঙ্কার ঠাকুরের মেয়ে দুর্গা! তুমি এই শেষ রাত্রিতে কি করিতেছ বাছা?" প্রথমা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,

"শেষ রাত্রি কি জেঠাই-মা? সূর্য্য উঠিতে কি আর বিলম্ব আছে? ঐ দেখ, ইহারই মধ্যে আম-গাছের উপরের ডালে রৌদ্রের আভা পড়িয়াছে।"

"ওমা, তাই বুঝি! আমি ভাবিতেছি, সবে চারি প্রহর শেষ হইয়াছে। আহা! কাল রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিস্ নাই বুঝি?"

"কেন ঘুমাইতে পারিব না জেঠাই-মা?"

"এই নানান রকম দুর্ভাবনায়, দুশ্চিন্তায় আর কি?"

"কিসের দুর্ভাবনা,—দুর্ভাবনা শত্রুর হউক।"

"তোর এই বয়স,—এখন সাধ-আহ্লাদ করিবার সময়; তাহার বদলে ভগবান তোকে কি করিয়া রাখিয়াছেন বল্ দেখি?"

"সকলের অদৃষ্ট কি এক রকম জেঠাই-মা? আর-জন্মে যাহা করিয়াছি, এই জন্মে তাহার ফল পাইতেছি,—তাহার জন্য দুঃখ কি? ভগবান দাদার সংসার বজায় রাখুন, তাহা হইলেই আমার সব দিক বজায় থাকিবে।"

"তা ত বটেই, তা ত বটেই! তবুও আমাদের মন কি বুঝে মা?" এই বলিয়া রমণী বহুমূল্য শালের কোণ নয়ন-কোণে দিয়া শুষ্কনেত্র মার্জ্জনা করিলেন। পরক্ষণেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি, হাঁ দুর্গা?"

"কি বল না, জেঠাই-মা?"

"রায়-গৃহিণী ছোট রায়কে না কি বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে।"

"তাড়াইয়া দেয় নাই। তবে দাদা বড় বদরাগী মানুষ;—তিনি কোন কথা সহ্য করিতে পারেন না, রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

"তোদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছে ত?"

"কেন করিয়া যাইবে না? সন্ধ্যাবেলা দাদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া সকলকে বলিয়া গিয়াছেন। দাদার সঙ্গে ভূপও গিয়াছে।"

"আহা তোর প্রাণে বড় লাগিয়াছে না?"

"লাগিবে না জেঠাই-মা? তোমার পোষা বিড়ালটী হারাইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তুমি তিন মাস গ্রামের পথে-পথে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলে, সে কথা মনে আছে? আর ভূপ আমার কে? বিধবা হইয়া যে-দিন পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসি, সেইদিন এক বৎসরের শিশু আমার কোলে তুলিয়া দিয়া, বড় জেঠাই-মা স্বর্গে গিয়াছেন, আমি যে তাহাকে সতের বৎসর বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছি জেঠাই-মা?" দুর্গা-ঠাকুরাণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া জেঠাই-মা বলিয়া উঠিলেন, "তা বটেই ত, তা বটেই ত। আহা ছেলেমানুষ। অসীম নিজে গেল গেল,—ভূপেনকে লইয়া গেল কেন?"

"কি জানি জেঠাই-মা,—পরের কথা কেমন করিয়া বলিব।"

"অসীমও তোর বয়সী।"

"ছেলেখেলার খেলার সাথী।"

"তাহার জন্য মন কেমন করিতেছে না দুর্গা?"

"বড়-দাদা পুরুষ মানুষ,—এখন বয়স হইয়াছে,—তাহার জন্য মন-কেমন করিতে যাইবে কেন? এত দিন বড় দাদা ত বিদেশে যাইতেন, কেবল ভূপুর মুখ চাহিয়া সকল যন্ত্রণা, অত্যাচার, লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন। জেঠাই-মা, ভূপু যে আমার অন্ধ।"

রমণীর গলা ধরিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া জেঠাই মা দ্বিতীয়বার বহুমূল্য শালের কোণ নয়নে উঠাইলেন; এবং কথাটা উল্টাইয়া লইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বাছা, কাল রাত্রিতে কি তোর সহিত নবীনের দেখা হইয়াছিল?"

দুর্গাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ নবীন, জেঠাই-মা?"

"নবীন নাপিত।"

"হইয়াছিল।"

"কোথায়?"

"ষষ্ঠীতলার মাঠে।"

"কত রাত্রিতে?"

"এই প্রথম প্রহরের শেষে।"

"এত রাত্রিতে একা ষষ্ঠীতলার মাঠে কেন গিয়াছিলি বাছা?"

দুর্গা প্রশ্ন শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি যখন মোহরের থলিয়া লইয়া একাকিনী রাত্রিতে নির্জ্জন প্রান্তরে অসীমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন সমাজের কথা, লোক-নিন্দার কথা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ভূপেনকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহে পালন করিয়াছেন। সে

যে অর্থাভাবে, এমন কি অন্নাভাবে কষ্ট পাইবে, এই দুশ্চিন্তা অপর চিন্তাকে সহৃদয়া ব্রাহ্মণ-কন্যার মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল। তাঁহাকে বিব্রত দেখিয়া প্রৌঢ়ার নয়নদ্বয় উল্লাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দুর্গা তাহা দেখিয়া জেঠাই-মার আকস্মিক স্নেহের কারণ বুঝিতে পারিলেন; এবং ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে কথা পরে বলিব জেঠাই-মা,—সে বড় গোপন কথা,—সময় হইলে আপনা হইতেই জানিতে পারিবে।" প্রৌঢ়া আর কথা না কহিয়া ঘাটে নামিলেন। দুর্গা পুষ্প-চয়ন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় পূজায় বসিবার উপক্রম করিতেছিলেন; এবং পুষ্পের অভাব দেখিয়া পুত্রবধূকে কন্যার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। এমন সময় দুর্গা আসিয়া ঠাকুর-ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কন্যার মুখ দেখিয়া পিতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে মা, মুখখানা মেঘের মত গম্ভীর কেন?" দুর্গা ক্ষিপ্রহস্তে পূজার সজ্জা করিতে-করিতে কহিলেন, "কিছু না, বাবা।" হরিনারায়ণ হাসিয়া কহিলেন, "মা, আমি বুড়া হইয়াছি বটে, কিন্তু তথাপি আমি তোমার পিতা। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার সহ্যশক্তি অসাধারণ। আমি স্বয়ং তোমাকে শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছি! কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া তোমার হৃদয়ের ভাব আমি যে পুঁথির মত পড়িতে পারি মা! কি হইয়াছে বল।"

"পূজার পরে বলিব।"

"না, তুমি এখনই বল। বিশেষ কারণ না হইলে, তোমার জগজ্জননীর মত সুন্দর শান্ত মুখখানি সহসা গম্ভীর হইয়া উঠে না। ফুল আনিতে বিলম্ব হইল কেন?"

"গঙ্গার ঘাটে ঘোষেদের বাড়ীর বড় জেঠাই-মার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল।"

"ভাল। বিলম্ব করিলে কেন?"

"তিনি কতকগুলা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।"

"সেটা ত একটা মহাপাতক। তাহার সঙ্গে এত কি কথা মা? বড়-বৌ উত্তর রাঢ়ীকুলের কলঙ্ক।"

"বাবা, আমি জীবনে আপনার কাছে কোন কথা লুকাই নাই, আজিও লুকাইব না। আমি বোধ হয় মনের আবেগে একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছি।"

"সেইজন্যই ত বলিতেছি, কি হইয়াছে আমাকে বল।"

"বাবা, কাল রাত্রিতে বড়-দাদা ও ভূপু জন্মের মত রায়-বাড়ী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।"

"তাহা শুনিয়াছি।"

"গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা দাদার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বড়-দাদা দাদাকে বলিলেন যে, তিনি বিশেষ কাজের জন্য দিল্লী যাইতেছেন, এবং শীঘ্রই ফিরিবেন। দাদাও তাহাই বুঝিলেন। কিন্তু বাবা, মানুষের মুখ দেখিলে মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়,—সে কথা পুরুষ মানুষে ভুলিয়া যায়; আর সে ভাব আমরা যত সহজে বুঝিতে পারি, তত সহজে পুরুষে পারে না। বড়-দাদা ও ভূপেন্দ্রের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম যে, তাহারা জন্মের মত রায়-বাড়ী ও গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছে এবং সহজে ফিরিবে না।"

"সে কথা সত্য।"

"যে-দিন স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া আপনার সঙ্গে চলিয়া আসি, তাহার পর-দিন বড় জেঠাই মা ভূপুকে আমার কোলে দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। ভগবান আমাকে সন্তান দেন নাই; কিন্তু ভূপুকে পাইয়া আমি সে অভাব অনুভব করি নাই। সতর বৎসর তাহাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছি। বাবা! কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন তাহার দৃষ্টিহীন চোখ দুইটাতে বিদায়ের আভাস দেখিতে পাইয়াছিলাম, তখন আমার আর জ্ঞান ছিল না। দুই ভাইয়ের পথের সম্বল যে কি আছে, তাহা আমি জানি। আমার মনে হইল যে, হয় ত কালই ভূপ অন্নাভাবে কষ্ট পাইবে। যে মাতৃহীন শিশুকে এতদিন পুত্রাধিক যত্নে ও স্নেহে পালন করিয়াছি, সে যে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিবে, এই চিন্তা আমাকে মুহূর্ত্তের জন্য পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময় স্বামীর ঘর হইতে যাহা কিছু আনিয়াছিলাম,—সমাজ-শাসন ও লোক-লজ্জা ভুলিয়া গিয়া,—ত্রিপুরার মহারাজা তাঁহাকে যে মোহরগুলি দিয়াছিলেন, সেইগুলি লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি জানিতাম, তাহাদিগকে ঘুরিয়া আসিয়া ষষ্ঠীতলার মাঠ পার হইতে হইবে, অথচ আমাদের খিড়কীর দুয়ারের পরেই ষষ্ঠীতলা; সেই জন্য খিড়কীর দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া তাহাদের ধরিলাম। মোহরগুলি দিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছি, তখন কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কি চাও?' বড়-দাদা বলিলেন, 'কেন?' সে আমার ও বড়-দাদার মুখের দিকে চাহিয়া

বলিল, 'কে, ছোট হুজুর? অন্ধকারে চিনিতে পার নাই। আমি নবীন।"

"নবীন নাপিত! মা, তাহার সহিত ঘোষ-গৃহিণীর কি সম্পর্ক জান?"

"জানি।"

"মা দুর্গা! যাহা করিয়াছ, ভালই করিয়াছ;—নিজের সম্পত্তি পালিত পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গল-কামনায় দান করিয়াছ, উত্তম করিয়াছ। তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত।"

"বাবা! তুমি যে তখন রায়-বাড়ী।"

দশম পরিচ্ছেদ।

সেইদিন তুইদণ্ড বেলায় অক্ষয় গাঙ্গুলীর চণ্ডীমণ্ডপে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। গৃহস্বামী মহাকুলীন, এবং তিনি বহু কুলীন-কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ-সমাজে স্বীয় প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিয়াছিলেন। গ্রামের মধ্যে বিদ্যালঙ্কারের পরেই তিনি সম্পন্ন গৃহস্থ; কিন্তু তাঁহাতে ও হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারে একটা বিষম প্রভেদ ছিল। কিশোর বয়স হইতে অসংখ্য কুলীনের কুলরক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়ায় গাঙ্গুলী মহাশয় সরস্বতীর প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিবার অবসর পান নাই। অদ্য তাঁহার আহ্বানে তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম-সমূহের ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়াছেন। অক্ষয় স্বয়ং সে সভার সভাপতি। তিনি বলিতেছেন, "ওহে রামচন্দ্র! কেবল বিদ্যা থাকিলেই হয় না, কুলমর্য্যাদার বিশেষ প্রয়োজন।" তাহা শুনিয়া বৃদ্ধ হরিকেশব চট্টোপাধ্যায় কহিলেন, "তা ত বটেই,—কুলমর্য্যাদা থাকিলেই যথেষ্ট,—বিদ্যা থাকে কি না থাকে, তাহাতে কি আসে-যায়। দেখ, হরিনারায়ণের যদি বিদ্যা না থাকিয়া কুলমর্য্যাদা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার ঘরে এমন ঘটনা কখনই ঘটিত না।"

চণ্ডীমণ্ডপের একপ্রান্তে একখানি কুশাসনের উপরে এক বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হরিকেশব! নিজের ঘরের কথাটা ভুলিও না।" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, চট্টোপাধ্যায়-কুল-পুঙ্গব গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "আমার ঘরের কথা? এত বড় স্পর্দ্ধা! তোর যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা?"

উভয় বৃদ্ধকে মল্লযুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া, গৃহস্বামী তাঁহাদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "সকল সামাজিক কাজেই তোমরা তুইজন বিবাদ বাধাইয়া কর্ম্ম পণ্ড করিয়া থাক। আজি কিন্তু তাহা হইবে না। থাম, স্থির হও।" উভয়ে আসন গ্রহণ করিলে গাঙ্গুলী মহাশয় কহিলেন, "দেখ, এত বড় একটা পাপ ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে গোপন রাখিলে দেশের সর্ব্বনাশ, সমাজের সর্ব্বনাশ এবং সকলেরই সর্ব্বনাশ হইবে। সুতরাং এখনই ইহার একটা প্রতিকার করা আবশ্যক।" হরিকেশব কহিলেন, "কথাটা উচিত কথা অক্ষয়; কিন্তু পারিয়া উঠিবে কি? হিন্দু রাজার রাজ্য ত নয়, দেশ এখন মুসলমানের। নবাবের প্রিয়পাত্র হরনারায়ণ স্বয়ং বিদ্যালঙ্কারের সহায়। হরিনারায়ণের কি কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে?"

"ধর্ম্ম আছেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এখনও ধর্ম্ম আছেন; এখনও দিন-রাত্রি হইতেছে, চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হইতেছে। সুতরাং পাপ কখনও গোপন থাকে না। এ কথা রায়-গৃহিণীর কর্ণে উঠিয়াছে। তিনি পুণ্যশীলা, দেবদ্বিজে ভক্তিমতী। তিনি কখনও পাপকে আশ্রয় দিতে পারেন? তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, যেমন করিয়া হউক, এই তুইজন মহাপাতকীর শাস্তি দিতে হইবে।"

"হরনারায়ণ রায়-গৃহিণীর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র হইলেও, একেবারে যে তাঁহার করতলগত, তাহা নহে; সুতরাং কাননগই নিজে না বলিলে বিদ্যালঙ্কারের কথায় আমি নাই।"

"দেখ হরিকেশব খুড়া, তোমার যখন জাতি যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন এই অক্ষয় গাঙ্গুলী বুক দিয়া পড়িয়া তোমার মুখ রক্ষা করিয়াছিল,—আজি তাহার প্রতিদান কর। হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার আমার চিরশত্রু,—আজীবন আমায় অপমান করিয়াছে। বিদ্যার অহঙ্কারে সে বলিয়া বেড়ায় যে, কুলীনের পুত্র হইলেই কুলীন হয় না; নবধা কুললক্ষণ ব্যতীত কুলীনপুত্র ব্রাহ্মণই নয়। সে আমাকে অব্রাহ্মণ বলিয়াছে,—সুতরাং প্রকারান্তরে জারজ বলিয়াছে। কাননগই হরনারায়ণের ভয়ে এত দিন তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারি নাই। আজি বিধাতা প্রসন্ন হইয়াছেন।"

"সত্যি না কি? এ কথা পূর্ব্বে বলিতে হয়!"

"তোমরা বলিবার অবসর দেও কই?"

"না না, তুমি বল বল। বড়ই মিষ্ট লাগিতেছে। হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের মুণ্ডটা চিবাইয়া খাইব, এ'আশা অনেক দিন ধরিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি।"

"রায়-গৃহিণী বলিয়া পাঠাইয়াছেন,—কথাটা অবশ্য গোপনীয়,—যে, বন্ধুত্বের খাতিরে কর্ত্তা যদি এই পাপকে প্রশ্রয় দেন, তাহা হইলে তিনি পিত্রালয়ে যাইবেন।"

"বটে! তাহা হইলে ত ব্যাপার গুরুতর,—কি বল রামচন্দ্র?"

রাম। দেখুন, হরিকেশব খুড়া, ব্রাহ্মণের জাতিপাত, অতি গুরুতর কথা। সাক্ষীসাবুদ সমস্ত ঠিক আছে ত?

হরি। হরে রাম! তুই সেইদিনকার ছেলে, তোকে সেদিন জন্মিতে দেখিলাম,—আর তুই কি না আমায় মিথ্যাবাদী বলিস্?

অক্ষয়। রাগ কর কেন খুড়া? রামচন্দ্রকে কথাটা শেষ করিতে দেও? সাক্ষীসাবুদ সমস্ত মজুত আছে রামচন্দ্র। এই নবীন নাপিত নিজের চোখে দেখিয়াছে,—কাল একপ্রহর রাত্রিতে বিদ্যালঙ্কারের বিধবা কন্যা একা ষষ্ঠীতলার মাঠে অসীম রায়ের নিকট গিয়াছিল। কি বল নরসুন্দর?

নবীন। দাদাঠাকুর! আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি মিথ্যা হইবার উপায় আছে?

হরি। ওহে অক্ষয়! ওহে রাম! এ যে বড় কঠিন সমস্যায় ফেলিলে। অসীম রায় ছোট রায়,—কাননগই হরনারায়ণ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অপর কেহ হইলে এতক্ষণ তাহার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করিতাম। এ যে বড় কঠিন কথা।

অক্ষয়। খুড়ামহাশয়! ধর্ম্ম আছেন, ধর্ম্ম আছেন! ভগবান সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়া দিয়াছেন। কল্য রাত্রিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া পাপিষ্ঠ অসীম গৃহত্যাগ করিয়াছে। হরনারায়ণ একরূপ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন বলিলেই চলে।

রাম। এটা ত নূতন কথা অক্ষয়। ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ, বিশেষতঃ যখন ভ্রাতৃবধূ ইহার মধ্যে আছেন, তখন সহজে মিটিবে না। কি হে নবীন, দেখিতে ভুল কর নাই ত?

নবীন। আজ্ঞে, সে কি কথা দেবতা। আপনারা এতগুলি সাক্ষাৎ দেবতা এখানে উপস্থিত, এখানে কি আমি, সামান্য নরকীট হইয়া, বেফাঁস্ কথা বলিতে পারি? আমি যদি মিথ্যা কহিয়া থাকি, তবে যেন আমার চৌদ্দপুরুষ—

রাম। আহা, কর কি নাপিতের পো। বলি, ঠাহর করিয়া দেখিয়াছিলে যে, লোক দুইটা কে?

নবীন। আজ্ঞে দেবতা, ঘোর কলি,—তাহার উপর সামান্য নরচক্ষু;—ভরসা করিয়া কি বলিতে পারি। আপনারা দেবতা, আপনারা ইচ্ছা করিলে দিনকে রাত্রি করিতে পারেন, রাত্রিকে দিন করিতে পারেন—

রাম। বাজে বক্তৃতা রাখ। লোকটা ছোট রায় কি না, তাহা ঠাহর করিয়া দেখিয়াছিলে?

নবীন। দেখিব কি দেবতা, কথা কহিয়াছিলাম, প্রণাম করিয়াছিলাম।

রাম। ভাল কথা। স্ত্রীলোকটী যে, দুর্গাঠাকুরাণী, তাহা কি করিয়া চিনিলে?

নবীন। দাদাঠাকুর! গ্রামের স্ত্রীলোক, দুইকুড়ি বৎসর এই গ্রামে কাটিয়া গেল, চলন দেখিলে বলিতে পারি কোন্ বাড়ীর মেয়ে।

রাম। দেখ নবীন! কথাটা সামান্য নহে,—গ্রামের একজন প্রধান ব্রাহ্মণের জাতিপাতের কথা। অন্ধকার রাত্রি; তাহার উপর ষষ্ঠীতলার মাঠ, তুমি কি সে স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়াছিলে?

নবীন। আজ্ঞে না। দেবতার অবিদিত কিছুই নাই। আমি আর কি বলিব, ও সকল স্ত্রীলোক কি কথা কহিয়া থাকে।

রাম। সে যে হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের কন্যা দুর্গা-ঠাকুরাণী, তাহা নিশ্চয় চিনিয়াছিলে?

নবীন। আজ্ঞে হাঁ দাদাঠাকুর, কিরীটেশ্বরীর মার দিব্য।

এই সময়ে চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্ত হইতে সেই বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ রাম! নবীনের কথায় বিশ্বাস করিয়া একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে জাতিচ্যুত করা উচিত নহে।"

নবীন। কেন বল ত ঠাকুর? আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়াছি না কি? নবীন জাতিতে নরসুন্দর বটে, কিন্তু তাহার কথার মূল্য আছে,—নরসুন্দর সমাজে

তাহার খাতির আছে। গাঙ্গুলী ঠাকুর ডাকিয়াছিলেন সেই জন্য আসিয়াছি; নতুবা নবীন সাধিয়া কাহারও ঘরে যায় না।

অক্ষয়। থাম নবীন, চটিও না। দেখ হরিকেশব খুড়া, নবীনকে আমরা সকলেই চিনি, সে সহজে মিথ্যা কথা কহে না। হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের বিধবা কন্যা দুর্গা একপ্রহর রাত্রিতে একাকিনী অসীম রায়ের সহিত ষষ্ঠীতলার মাঠে কিছু হরি-সংকীর্ত্তন করিতে যায় নাই। এখন সমাজ-রক্ষার জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা করিবেন করুন।

হরি। ব্যবস্থা কি তাহা তুমিই কর অক্ষয়।

অক্ষয়। নিমন্ত্রণ বন্ধ, রজক নাপিত বন্ধ, অন্য সমাজে হরিনারায়ণের নিমন্ত্রণ হইলে আমাদের গ্রামের কেহ যাইবে না।

হরি। অতি উত্তম কথা।

রাম। একটা কিন্তু গোল রহিয়া গেল খুড়া, স্ত্রীলোকটা দুর্গা কি অপর কেহ তাহা প্রমাণ হইল না।

এই সময়ে চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্ত হইতে সেই বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ রাম! এই কি রাঢ়ীয় কুলীন সমাজ? হরিকেশবের সধবা কন্যা স্বামীগৃহ হইতে মুসলমানের সহিত কুলত্যাগ করিল, তাহার প্রতিকার হইল না; অথচ প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও হরিনারায়ণের জাতিনাশের ব্যবস্থা হইল।" বৃদ্ধ হরিকেশব কম্পিত-কলেবরে উঠিতে-উঠিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার কন্যা কুলত্যাগ করিয়াছিল, তাহাতে তোর কি?" উভয়ে বচসা আরম্ভ হইল। ক্রমে মল্ল-যুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া, অন্য সকলে তাহাদিগকে ধরিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেল। বিষম গোলযোগ আরম্ভ হইল। সভা ভঙ্গ হইল।

"সকলে ক্রমে-ক্রমে গৃহে ফিরিতেছে দেখিয়া, রামচন্দ্র অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অক্ষয় দাদা, স্থির হইল কি?" অক্ষয় হাসিয়া কহিলেন, "আবার কি, আমি যাহা বলিলাম তাহাই।"

"ভাল করিলে না অক্ষয় দাদা। বড় ঘরের কথা, প্রমাণটা নিতান্ত অল্প। কি জান বড়'র পিরীতি বালির বাঁধ।"

"ধর্ম্ম আছেন রামচন্দ্র, ধর্ম্ম আছেন।"

"সে কথাটা তুমিও ভুলিও না। বিদ্যালঙ্কার দুর্ম্মুখ বটে, কিন্তু সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ। দুর্গাকে আমি চিনি, সে কুলটা নহে।"

দুঃখবরণ

[শ্রীসুরেন্দ্রবিজয় দে]

যে কয়টা দিন দুখে কাটে
সেই তো আমার পরম ভালো,
দুখের গহন কানন-পথে
মিলনের দীপ তুমিই জ্বালো।
যদি দুখের কাঁটা ফুটে পায়,
চরণ ধূলো রাঙিয়ে যায়—
চোখের জলে আসবে ভেসে
হারানো সে পথের আলো।
যদি দুঃখ দিলে আমার
দাও আরো দাও!
সুখের নেশা চোখের জলে
ধু'য়ে মুছে নাও।

হৃদয় আকাশ ফেলুক ছেয়ে
দুখের নীরদ গভীর কালো।

ভারত-শাসন-সংস্কারক

ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু

ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমসফোর্ড

মডারেট কনফারেন্সের নেতৃবৃন্দ
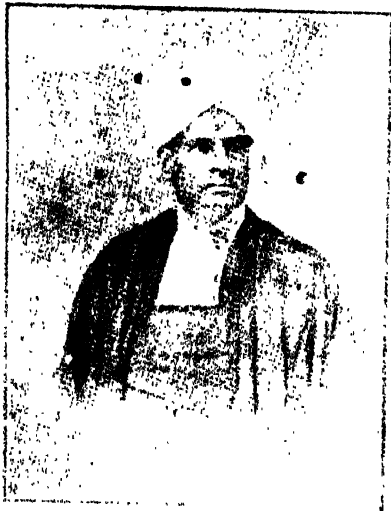
কনফারেন্সের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত শিবস্বামী আয়ার
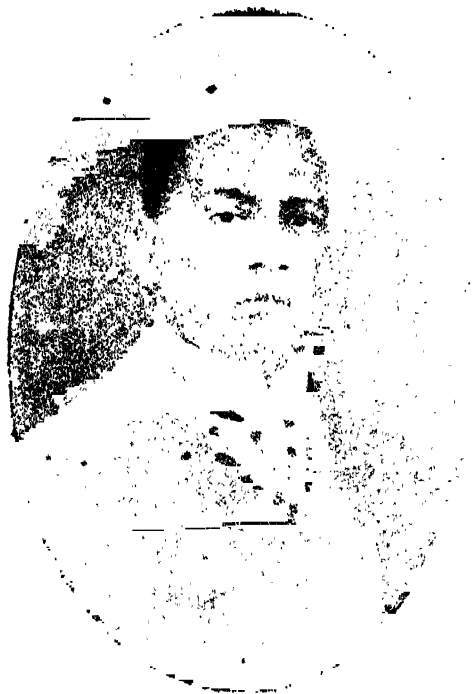
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সার শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র মিত্র

মডারেট-নেতা মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃতসর জাতীয় মহাসমিতির নেতৃবৃন্দ

মধ্যস্থলে—মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু

নিম্নে দক্ষিণ কোণ হইতে ক্রমান্বয়ে বামদিকে—

(১) মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয়, (২) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, (৩) শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি, (৪) শ্রীযুক্ত সত্যপাল, (৫) লালা দুনীচাঁদ, (৬) লালা হরকিষণলাল, (৭) পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরী, (৮) মিঃ সয়ফুদ্দীন কীচলু, (৯) শ্রীযুক্ত হাফেজ মহম্মদ রসিদ।

জালিয়ানওয়ালা বাগ (দূর হইতে)
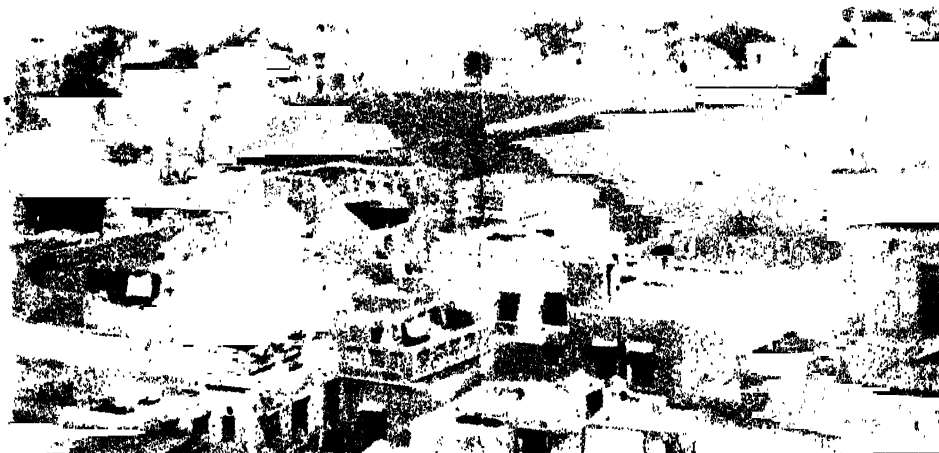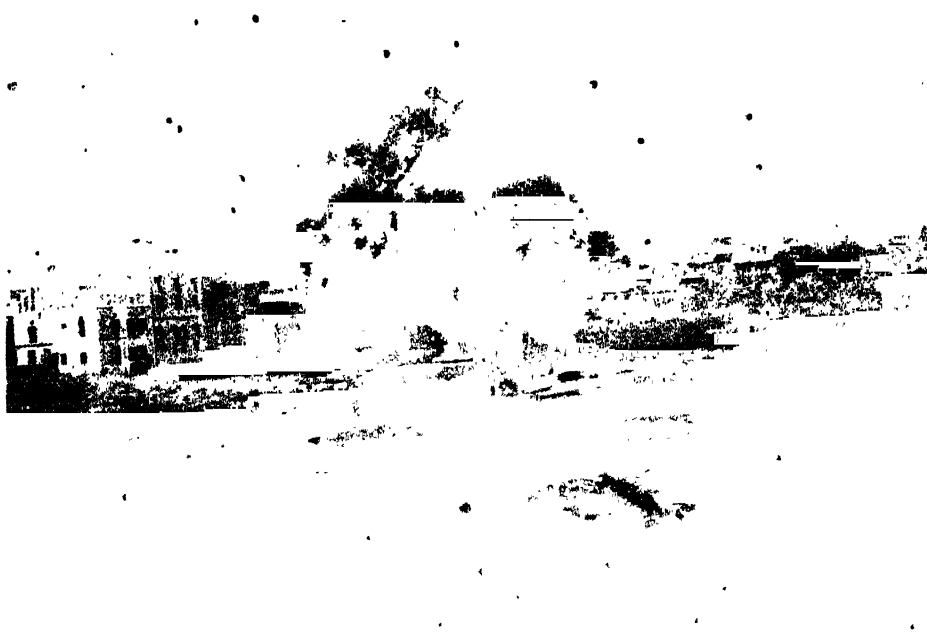
জালিয়ানওয়ালা বাগ (মধ্যস্থল)
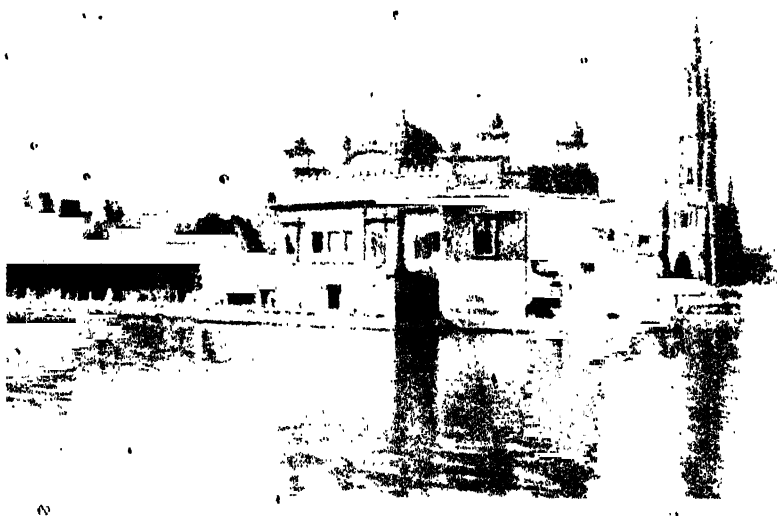
মৃতসর— গুরু দরবার (স্বর্ণ-মন্দির)
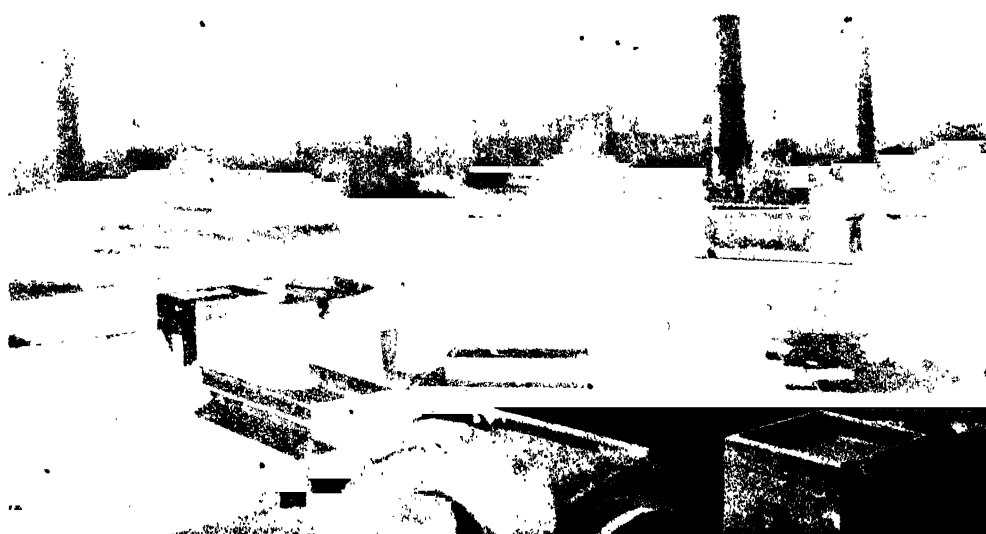
লাহোর দুর্গস্থিত প্রাসাদ হইতে নগরের দৃশ্য
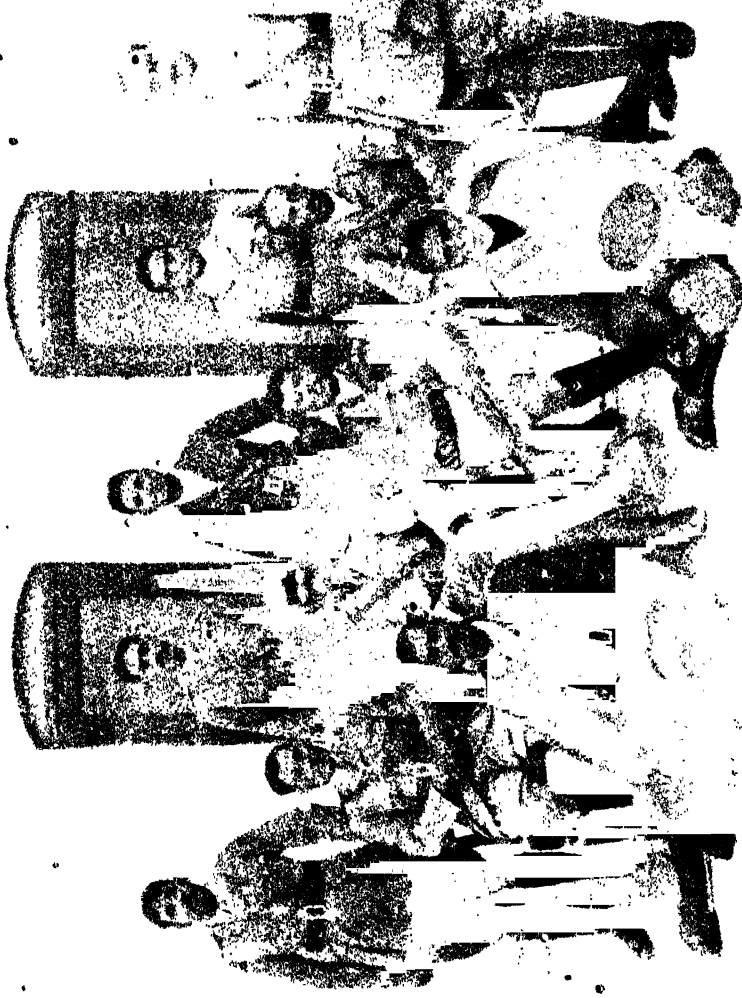
জালিয়ানওয়ালা বাগে নিহত বালক

মদনমোহন

শান্তি-প্রার্থনা

আফগান যুদ্ধে আই-এম্-এস্ অফিসারগণ

সম্মুখের সারিতে মেঝের উপবিষ্ট—কাপ্তেন সেন গুপ্ত, কাপ্তেন তারাপুর

চেয়ারে উপবিষ্ট—কাপ্তেন চক্রবর্ত্তী, কাপ্তেন হাবি পামানি, কাপ্তেন পি. গাঙ্গুলী, কাপ্তেন প্রভাকর

দণ্ডায়মান—লেফ্টেন্যান্ট দাস, লেফ্টেন্যান্ট রায় চৌধুরী, লেফ্টেন্যান্ট বসু, লেফ্টেন্যান্ট আয়ার, কাপ্তেন থোরা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বর্ষফল

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্য-বিশারদ]

(Report on Sanitation in Bengal for the Year 1918 অবলম্বনে লিখিত)

ইংরাজী ১৯১৮ সালটি বাঙ্গালার পক্ষে বিশেষ অশুভ বৎসর গিয়াছে। এই সালে সারা বঙ্গে শিশু জন্মিয়াছে ১৪৮৯১৩৫টি। ইহার পূর্ব্ব বৎসর জন্মের সংখ্যা ছিল ১৬২৭৮৭৩টি; সুতরাং এবার বঙ্গজননী প্রায় দেড় লক্ষ সন্তান কম পাইয়াছেন।

সকল বিভাগেই এবার পুত্রের সংখ্যা বেশী; কন্যা কম।

বর্দ্ধমান বিভাগ

	পুত্র	কন্যা	সমষ্টি
বর্দ্ধমান	২২৯৯৩	২১৫৯৩	৪৪৫৮৬
বীরভূম	১৬৬৭১	১৫৬৬৭	৩২৩৩৮
বাঁকুড়া	১৮৯৮২	১৮২৩৭	৩৭২১৯
মেদিনীপুর	৪০১৫১	৩৮০৫৫	৭৮২০৭
হুগলি	১৪৫২৪	১৩৪৭১	২৭৯৯৫
হাওড়া	১৪১২১	১৩১২১	২৭২৪২

প্রেসিডেন্সি বিভাগ

	পুত্র	কন্যা	সমষ্টি
২৪পরগণা	৩৪৬৫৮	৩১৩৫১	৬৬০০৯
কলিকাতা	৯৭৬৭	৮৩৯৯	১৮১৬৬
নদীয়া	২৫৭১১	২৩৯৮৭	৪৯৬৯৮
মুর্শিদাবাদ	২৫৭০৯	২৪৫৪০	৫০২৪৯
যশোহর	২২৯৯৫	২০৭৫৭	৪৩৭৫২
খুলনা	২৬৯৪০	২৩৩৫৮	৫০২৯৮

রাজসাহি বিভাগ

	পুত্র	কন্যা	সমষ্টি
রাজসাহি	২৭১১১	২৬২০৭	৫৩৩১৮
দিনাজপুর	৩১৯৭৬	৩০৬৭১	৬২৬৪৭
জলপাইগুড়ি	১৫৯২৮	১৪৯১৪	৩০৮৪২
দার্জিলিং	৪৬৫২	৪২৩১	৮৮৮৩
রংপুর	৪৫১৯৪	৪২৫১৭	৮৭৭১১
বগুড়া	১৭১৬৭	১৫৮৭৯	৩৩০৪৬
পাবনা	১৯৫৬৭	১৮১৪৪	৩৭৭১১
মালদহ	১৭৭১৮	১৬৬২২	৩৪৩৪০

ঢাকা বিভাগ

	পুত্র	কন্যা	সমষ্টি
ঢাকা	৫৫৮৫৬	৫২৪৯৮	১০৮৩৫৪
ময়মনসিংহ	৭৭৮৬৪	৭২০০৬	১৪৯৮৭০
ফরিদপুর	৩৯০৭৪	৩৭১৫৬	৭৬২৩০
বাখরগঞ্জ	৪৬৭৭৭	৪৩৪৯০	৯০২৬৭

চট্টগ্রাম বিভাগ

	পুত্র	কন্যা	সমষ্টি
চট্টগ্রাম	২৯১০০	২৬২৭২	৫৫৩৭২
নোয়াখালি	২৫৪৬৭	২৩৫০১	৪৮৯৬৮
ত্রিপুরা	৪৪৬৪০	৪১১৭৮	৮৫৮১৮

এ বৎসর বাখরগঞ্জ, খুলনা, ত্রিপুরা ও বাঁকুড়া জেলা ভিন্ন আর সকল জেলাতেই জন্মের হার কমিয়াছে। নোয়াখালি জেলার হার ৪০·৩ হইতে ৩৭·৬৪ নামিয়াছে।

কলিকাতা প্রায় পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় হার বজায় রাখিয়া সর্ব্ব নিম্নেই দাঁড়াইয়া আছে। যশোহর কলিকাতার ঠিক উপরেই স্থান পাইয়াছে।

এইবার মৃত্যুর হিসাব দেখুন।

আলোচ্য বর্ষে সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে ১৭২৭০৩১ জন আসামী কৃতান্ত-ভবনে প্রেরিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববৎসর প্রেরিত আসামীর সংখ্যা ছিল ১১৮৭৫০৯; সুতরাং এবার যমের দৌরাত্ম্যও অনেক বেশী বলিতে হইবে।

এই সালে এক বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুর মৃত্যু-সংখ্যা ৩৩৯৬৪৯। ১—৪ বৎসর বয়স্কের মৃত্যু হইয়াছে ২২৭৪১৭। আর ৫—৯ বৎসর বয়স্ক মরিয়াছে ১৩২৭৪৬; ১০—১৪ বৎসর বয়স্ক ৭৯৪৮১; ১৫—১৯ বৎসর বয়স্ক ১১২৯৮৮; ২০—২৯ বৎসর বয়স্ক ২৩৮৫১৭; ৩০—৩৯ বৎসর বয়স্ক ১৮৯৪২০; ৪০—৪৯ বৎসর বয়স্ক ১৩৫০৯০; ৫০—৫৯ বৎসর বয়স্ক ১১০২৯১ এবং ৬০ হইতে তদূর্দ্ধ বৎসর বয়স্ক ১৬১৭৩২ জন মাত্র।

এখন কোন্ বিভাগ হইতে কত লোক মহাপ্রয়াণ করিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাই বা কত তাহাও বলিতেছি।

বৰ্দ্ধমান বিভাগ

	পুরুষ	স্ত্রী	সমষ্টি
বৰ্দ্ধমান	৪১৭০৮	৩৭৯৮১	৭৯৬৮৯
বীরভূম	২৪০৭৯	২২৩৩৯	৪৬৪,৮
বাঁকুড়া	২৯৫৮১	২৭৪০০	৫৬৯৮১
মেদিনীপুর	৫৬৫২৭	৫০৮৫৮	১০৭৩৮৫
হুগলি	২৭২৬১	২৪১৯৮	৫১৪৫৯
হাওড়া	১৬৬৮১	১৩৬৮৮	৩০৩৬৯

প্রেসিডেন্সি বিভাগ

	পুরুষ	স্ত্রী	সমষ্টি
২৪পরগণা	৩৭৪৪১	৩১৫৫৯	৬৯০০১
কলিকাতা	১৮৬৫২	১২৭১৯	৩১৩৭১
নদীয়া	৪৪৪৭৩	৪১৮২৪	৮৬২৯৭
মুর্শিদাবাদ	৪০৯১১	৩৯০৪৯	৭৯৯৬০
যশোহর	২৮৬৫৮	২৪০৬৪	৫২৭২২
খুলনা	২৩৮২৩	২১৯২৭	৪৫৭৫০

রাজসাহি বিভাগ

	পুরুষ	স্ত্রী	সমষ্টি
রাজসাহি	৩১৬২৯	২৮৩৪৭	৫৯৯৭৬
দিনাজপুর	৩৮২২৭	৩১২৯১	৬৯৫১৮
জলপাইগুড়ি	২৫২৪২	২০৫৪১	৪৫৭৮৩
দারজিলিং	৭৪২২	৬৬৮৮	১৪১১০
রংপুর	৪৮০৬১	৩৯৬৫৯	৮৭৭২০
বগুড়া	১৬৪৮৪	১৪৬২৪	৩১১০৮
পাবনা	২৮৬১০	২৪৯৩৩	৫৩৫৪৩
মালদহ	২৩২৫২	২০২১৬	৪৩৪৬৮

ঢাকা বিভাগ

	পুরুষ	স্ত্রী	সমষ্টি
ঢাকা	৫১২৬০	৪৭০২৩	৯৮২৮৩
ময়মনসিংহ	৭৪৬৬০	৬৬৫১৫	১৪১১৭৫
ফরিদপুর	৩৬৫১১	৩২৫৬২	৬৯০৭৩
বাখরগঞ্জ	৪২৫৭১	৩৭৭৬২	৮০৩৩৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

	পুরুষ	স্ত্রী	সমষ্টি
চট্টগ্রাম	৩৩২৮৪	৩৩১৬৬	৬৬৪৫০
নোয়াখালি	২৭৭৮৩	২৭৯৪০	৫৫৭২৩
ত্রিপুরা	৩৮০৪৬	৩৫৬২০	৭৩৬৬৬

জ্বরই বাঙ্গালার প্রধান শত্রু। এ বৎসর ১৩৫৭৯০৩ জন আসামী জ্বরাক্রান্ত হইয়া যমালয়ে গিয়াছে। ঐ সকল আসামীর মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার লোকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জেলা হিসাবে বিচার করিলে নদীয়া, বীরভূম, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান ও দার্জ্জিলিং পর্য্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

দিনাজপুর ও রাজসাহি জেলা হইতে গত বৎসর জ্বর রোগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক মারা গিয়াছিল; কিন্তু এ বৎসর ঐ দুই জেলা অষ্টম ও দ্বাদশ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিকাতা সর্ব্ব নিম্নেই পড়িয়া আছে।

এ বৎসর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আসিয়া যোগ দেওয়ায় জ্বরের আসামী সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ ৩৬৫১৫৮ জন কেবল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই নবাগত ব্যাধি রেল ও ষ্টীমার পথ বাহিয়া বাঙ্গলার ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এজন্য ডক্, রেল ও ডাক বিভাগের কর্ম্মচারী এবং ব্যবসাদার শ্রেণীর লোকেরাই ইহার দ্বারা সর্ব্ব প্রথমে আক্রান্ত হয়। কলিকাতা সহরেও ইহার দৌরাত্ম্য বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল।

প্লেগ এবার সমস্ত বাঙ্গলা হইতে ২৮৯ জন মাত্র লইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কলিকাতা সহরের লোকই ২১০ জন। অবশিষ্ট ৭৯ জনের মধ্যে ২৪ পরগণার অধিবাসী ৩৫, বাখরগঞ্জ জেলার অধিবাসী ২২, ফরিদপুর জেলার অধিবাসী ১০, ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী ৫, হাওড়া জেলার অধিবাসী ২ এবং বীরভূম, হুগলি, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বগুড়া জেলার অধিবাসী যথাক্রমে ১ জন হিসাবে ৫ জন মাত্র।

কলিকাতার বাহিরের কোন লোকই এবার প্লেগের টিকা গ্রহণ করেন নাই। কেবল মাত্র ১১ জন কলিকাতাবাসী ঐ টিকা লইয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই স্বচ্ছন্দে ছিলেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল।

মূষিকের সহিত প্লেগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে জানিয়া, সরকার প্রজা-রক্ষার জন্য মূষিক-হন্তাকারিগণকে প্রতি বৎসর পারিতোষিক দিয়া আসিতেছেন। ইহার পূর্ব্ব বৎসর প্রায় ৬৫০০০ হাজার ইন্দুর মারিয়া লোকে ১০০০০ দশ হাজারেরও কিঞ্চিদধিক টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। এ বৎসর কিন্তু কোন স্থানেই মূষিক-বংশ ধ্বংসের চেষ্টা হয় নাই।

ওলাউঠার প্রেরিত আসামীর সংখ্যা এবার খুবই বেশী—৮২৩৭৯ জন। ইহার মধ্যে নোয়াখালি জেলার লোকই অধিক। চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, ময়মনসিংহ, হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলাগুলি যথাক্রমে এই রোগের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল।

কলিকাতার লোক-সংখ্যা গত ১৯১১ সালের আদম সুমারি অনুসারে ৮৯৬০৬৭; তন্মধ্যে এ বৎসর ১৫২৩ জন এই রোগে প্রাণ হারাইয়াছে।

আমাশয় ও উদরাময় ২৯১৫০ জন বঙ্গবাসীকে গ্রাস করিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর এই রোগ গ্রাস করিয়াছিল ২৫০০০ পঁচিশ হাজার মাত্র। সুতরাং আলোচ্য বর্ষে এই পীড়াতেও মৃত্যু-সংখ্যা অনেক বেশী।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় এবার ২০৯০১ জন জবের খেলা সাঙ্গ করিয়াছে।

ইহার মধ্যে সহরবাসী ১৫৮১৫; মফঃস্বলবাসী ৫০৮৬ জন মাত্র। মূল কথা—যতদিন এ দেশের লোক খাঁচায় পোষা পাখীর মত সহরে বসতি করিবে, ততদিন এই রোগের হস্ত হইতে একেবারে নিস্তার পাইবে না।

সারা বাঙ্গালা হইতে এই সালে বসন্ত কর্ত্তৃক ৮৫১৬ জন আসামী যমের সদনে প্রেরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সহরের লোক ৭৭০ জন মাত্র; আর সবই মফঃস্বলবাসী। অজ্ঞ পল্লীবাসীরা টিকা-গ্রহণ করিতে চাহে না; এজন্য ঐ সকল ব্যক্তি অতি সহজেই এই রোগে আক্রান্ত হয়। কৃতান্তের অন্যান্য অনুচরেরা এ বৎসর বাঙ্গালা হইতে মোট ২০৯২৭৬ জন আসামী প্রেরণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও যাত্রীর সংখ্যা ১০৬২৯; সর্প ও অন্যান্য জন্তুদষ্টযাত্রী ৬৬০০; ক্ষিপ্ত—শৃগালকুকুরদষ্ট ১১৯ এবং আত্মঘাতী ৩৪১৭ জন মাত্র।

চাষ-বাস

[বালিগঞ্জ এরিকা হাউস নার্শারি হইতে প্রকাশিত]

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"। আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে চাষ-বাসের আদর বরাবরই চলিয়া আসিতেছিল। যাঁহাদের বিপুল অর্থ ছিল, তাঁহারা সওদাগরি বা বাণিজ্য করিতেন, তদ্ব্যতীত বাকী প্রায় সকলেই চাষ-আবাদ করিতেন, চাকুরি অতি অল্প লোকেই করিত। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে এই সকল প্রথা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ইংরাজি পড়িয়া আমাদিগের চাষ-বাস অতি হেয় কাজ বলিয়া জ্ঞান ও ধারণা হওয়ায়, আমাদিগের দেশের অবস্থা ক্রমান্বয়ে অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, এমন কি আমাদিগের যাঁহার যাঁহা জাতি-ব্যবসা (Trade craft) তাঁহাদিগের তাহা করিতেও লজ্জাবোধ হয়। এমন কি সময়ে অনেকেই (অবশ্য নিম্ন জাতির লোকে) জাতির পরিচয় দিতে লজ্জিত হইয়া থাকেন।

মহাত্মা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ধন ধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" গানটি আজকাল আবাল-বৃদ্ধ সকলেই জানেন। তাহা জানিয়া শুনিয়াও কেহ একবার সে দিকে লক্ষ্য করেন না। সকলেই আপনাদিগের সন্তানদের দু-পাতা ইংরাজি শিখাইয়া ছেলেদের যাহাতে দশ, বিশ, টাকার চাকরী হয়, তজ্জন্য লালায়িত, কিন্তু যে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমরা অনুকরণ করিতেছি, সেই পাশ্চাত্য সভ্যদিগের মধ্যে যদিও অনেকেই ভারতে ও অন্যান্য স্থানে মান্য-গণ্য লোক বলিয়া বিদিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের genealogy খুঁজিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদের মধ্যে অনেকেই farming বা কৃষিকার্য্যে রত ছিলেন। এবং তাহা দ্বারাই তাঁহারা মূল্যবান ভূ-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আজকাল দেখা যায়, আমাদের দেশের বাবুরা, এমন কি বাজারে যাইয়া সামান্য জিনিষপত্র খরিদ করিয়া নিজ হাতে বহন করিয়া আনিতে লজ্জিত হন; এবং সেই দুই চারি আনার শাক সবজি খরিদ করিয়া দুই আনা মুটে-ভাড়া দিতেও কুণ্ঠিত হন না। বিলাতে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এখনও নিজের farm এ কৃষি বা চাষ-বাস করিয়া থাকেন, ও আবশ্যক মত দ্রব্যাদি স্বহস্তে বহন করিয়া আনিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন না।

পুরাকালে আমাদের দেশে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, পাত্রের পিতা-মাতার অবস্থা কিরূপ এবং বাটিতে কয়টি মরাই (গোলা) ও কত ধান জমি ইত্যাদি আছে, কন্যার পিতা বা অভিভাবক প্রথমতঃ তাহা জানিয়া (পাত্রের ভবিষ্যৎ অবস্থা বুঝিয়া) কন্যার বিবাহ দিতেন; কিন্তু অধুনা সে সকল আর দেখা-শুনা হয় না। এখন পাত্র কতদূর পড়িয়াছে ও কত টাকা বেতনের চাকরী করিতেছে, ইহাই কেবল দেখা হয়। যদি পাত্রটি ৩০৲ টাকা মাহিনা পান, তাহা হইলে পাত্র-পক্ষ অমনি ৫০৲ টাকা মাহিনা পায় বলিয়া ছেলের দর বাড়াইয়া কন্যা-পক্ষকে ঠকাইয়া বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন না। কন্যা-পক্ষও ছেলে ৫০৲ টাকা মাহিনার চাকরী করে শুনিয়া ভাবেন যে, "চাঁদ হাতে পাইলাম;" কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, হঠাৎ যদি পাত্রের কোন রকমে চাকুরী যায়, তাহা হইলে কন্যার অবস্থা কি হইবে। কথায় বলে— "চাকরী তাল পাতার ছাউনী, আজ আছে, কাল নেই।"—দুঃখের বিষয় এই যে এত দেখিয়া-শুনিয়াও আমাদের দেশের লোকেদের চক্ষু উন্মীলিত হয় না। চাকরী-চাকরী করিয়াই সকলেই লালায়িত। দেশের লোকের সংখ্যার অনুপাতে হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোকদিগের সাংসারিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, সেরূপ অন্য আর কোন দেশেই নয়।

কোন আফিসে একটি চাকরী খালি হইলে, সহস্র সহস্র আবেদন-পত্র গিয়া পড়ে; কিন্তু দিন মজুরের আবশ্যক হইলে, সময়ে তাহা মিলে না। ইহাতে বেশ বোঝা যায় যে, বেতনজীবী চাকুরে বাবুদের অপেক্ষা দিন-মজুরদের স্বাধীনতা, উপার্জ্জন ও সঞ্চয় ঢের বেশী। বাড়ীতে অসুখ হইলে বাবুরা চাকুরীর মায়ায় ও মনিবের ভয়ে আবশ্যক হইলে আফিস কামাই করিয়া রোগীর শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না। কিন্তু এ সম্বন্ধে দিন-মজুরেরাও বেতনজীবী অপেক্ষা স্বাধীন ও সুখী। তাহারা ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্মে যাইতে বা না যাইতে পারে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বেতনজীবী অপেক্ষা কর্ম্মজীবী এ সংসারে স্বাধীন ও সুখী। গবর্ণমেণ্ট চাষ বাসের নিমিত্ত অনেক উৎসাহ দিয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের সভ্য মহোদয়গণ তাহার আদৌ অনুমোদন করেন না। Government নানাস্থানে Agricultural department খুলিয়াছেন ও তাহার জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেছেন; এবং চাষ-বাস যাহাতে বৃদ্ধি পায় ও দেশে ধন সঞ্চয় হয়, খাদ্যদ্রব্য সুলভ হয়,—তাহার জন্য নানা স্থানে Co Operative Credit Society খুলিয়া গরিব চাষাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু তত্রাচ আমাদের দেশের জমিদারগণ বা

সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় কেহই ওরূপ সৎকার্য্যে সাহায্য বা যোগদান করেন না। কেহ-কেহ একাই রাতারাতি বড়-লোক হইব ভাবিয়া কারবারে ব্রতী হন বটে, কিন্তু অনভিজ্ঞতার দোষে টাকা-কড়ি নষ্ট করিয়া দরিদ্রতার ক্রোড়ে আশ্রয় লন ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে ভয়াবহ ব্যাপার বিবেচনা করেন। কথিত আছে যে, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি"। অবশ্য বাণিজ্য করিতে হইলে বেশী মূল-ধনের আবশ্যক; কিন্তু কৃষি কার্য্য করিতে হইলে অল্প পুঁজিতেই চলিতে পারে। তবে ইহা একটু পরিশ্রম-সাপেক্ষ। কিন্তু সে পরিশ্রম পরে সার্থক হয় ও শারীরিক অবস্থা তাহাতে ভালই হইয়া থাকে। সে পরিশ্রমে বরং শারীরিক বল ও উৎসাহ বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। সামান্য পরিশ্রমের বিনিময়ে যখন বাগ-বাগিচা আবাদ ফসলে পরিপূর্ণ হয়, তখন মনে যে কি একটা আনন্দ-লহরী খেলিতে থাকে, তাহা যাহারা চাষ বাস করিয়া থাকে, তাহারাই অনুভব করে। স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষের ফল ও শাক-সব্জি কতই নয়নানন্দদায়ক, কতই মুখ-রোচক, কতই তৃপ্তিকর, কতই স্বাস্থ্য-প্রদ, তাহা যাঁহারা নিজে গাছ পালা রোপণ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন।

পল্লীগ্রামে সকলেরই প্রায় দু-দশ বিঘা জমি আছেই; কিন্তু কলিকাতায়, দেখিতে গেলে, অনেকেরই এখানে মাথা গুঁজিবার স্থানও নাই,—উপার্জ্জনের অধিকাংশ টাকাই বাড়ী-ভাড়ায় চলিয়া যায়। তাঁহাদিগের অনেকেরই দেশে যৎকিঞ্চিৎ জায়গা জমি আছে; কিন্তু তাহার বেশীর ভাগই জঙ্গলে পরিণত। সে সকল জমি, বলিতে গেলে, বেওয়ারিশ অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। তাহার উদ্ধারের জন্য, কিম্বা সে সকল জমি হইতে আয় বাহির করিবার জন্য অতি কম লোককেই মনোযোগ দিতে দেখা যায়। বাস্তবিক পক্ষে অল্পমাত্র খরচ করিয়া সেই সকল জমিতে যদি চাষ-আবাদ করা ও ফলকর বৃক্ষাদি বসান যায়, তাহা হইলে ২।১ বৎসর পরেই বোধ হয় আর ৫০৲, ৬০৲ টাকার চাকুরীর জন্য দেশ-ভুঁই ছাড়িয়া আপনার স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া সহরে বাস করিতে হয় না। সুখ-স্বচ্ছন্দে স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া নিজ-নিজ গ্রামের উন্নতি সাধন ও সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

অনেকেই পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া বলিয়া বাস করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সে ম্যালেরিয়া দেশ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য কাহাকেও চেষ্টা করিতে দেখা যায় না। যদ্যপি সকলেই আপন-আপন গ্রামের Municipality কিম্বা District Boardএর Chairmanকে সাহায্য করেন ও দেশের Sanitation বা স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে দেশের জল বায়ু ক্রমশঃ ভালই হইতে পারে। যে ম্যালেরিয়ার ভয়ে অনেকেই দেশ ছাড়িয়া প্রবাসী হইয়া আছেন, সে ম্যালেরিয়া বিষ পরিষ্কৃত সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংস্কৃত পল্লী হইতে অল্পদিনেই বিদূরিত হইতে পারে।

কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে বিবাহ উপলক্ষে ভদ্র-মহোদয়গণকে অনেক টাকা Procession, বাজ-বাজনায় বা নাচ তামাসায় অপব্যয় করিতে দেখা যায়। যদি তাঁহারা সেই সকল টাকা নষ্ট না করিয়া পল্লীগ্রামের District Board বা Municipalityর হস্তে প্রয়োজনীয় পুষ্করিণী খনন বা অন্য কোন সৎকার্য্যের জন্য অর্পণ করেন, তাহা হইলে আমাদের মফঃস্বলের অবস্থা কি পুনরায় অল্প-দিনেই পূর্ব্ববৎ হইয়া উঠে না? এই সকল সদনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে আজ যে দরিদ্রতা বঙ্গবাসীকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, সে দরিদ্রতা অল্প-দিনের মধ্যেই সুদূরে পলায়ন করিবে ও বঙ্গ-লক্ষ্মী আবার বঙ্গ-বাসীর গৃহে-গৃহে বিরাজ করিবেন। আমাদের বঙ্গভূমি রত্ন-প্রসবিনী, শ্যামল-শস্যক্ষেত্রে তাঁহার আবাস। যেখানে শস্য সেইখানে তিনি বিরাজমানা। তাই বলি বঙ্গবাসিগণ, এস, আমরা একমনে, এক-প্রাণে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ও কৃষিক্ষেত্রে সেই মহালক্ষ্মীর আবাহন ও আরাধনা করিয়া আমাদের নিজের হিতের জন্য ও দেশের মঙ্গলের জন্য পুনরায় ফল-মূল ও শস্য উৎপাদনের চেষ্টায় ব্রতী হই। আমাদিগের অর্থ, যত্ন ও পরিশ্রম কখনই বৃথায় যাইবে না; কেন না, আমাদের সোনা-ফলা দেশ;—দেশের কথায় আছে; "চাষ কল্লে ফলে সোণা"।

পূর্ব্ববঙ্গে ভীষণ ঝটিকা

[শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সাহু]

প্রায় প্রতি বৎসরই আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে পূর্ব্ববঙ্গে ভীষণ ঝটিকার প্রলয়-তাণ্ডব পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু বিগত ৭ই আশ্বিন বঙ্গোপসাগর হইতে যে বাত্যা সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব বঙ্গের ৮০০০ হাজার বর্গমাইল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসাম অঞ্চলস্থিত পর্ব্বতে বাধা-প্রাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় যে ক্ষতি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। বিরাট জলপ্লাবনে কত জনপদ কোথায় মিশিয়া গিয়াছে, কত অট্টালিকা বিধ্বস্ত হইয়াছে, কত পুরাতন বৃক্ষ মূলোৎপাটিত হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। ভীষণ জলরাশি লক্ষ ফণা উত্তোলন করিয়া অসংখ্য নরনারী ও পশু-পক্ষীকে করাল কবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। গলিত শবদেহের পূতি-গন্ধে কোন-কোন স্থান দুরধিগম্য হইয়াছিল। কোথাও বা নগ্ন নরনারী মৃত্যুর ভীষণ ছায়া সন্নিকট দর্শন করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে, কোথাও বা পিতামাতা সন্তান-সন্ততিকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং ভ্রাতা ভগিনীকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে শেষ শান্তি—মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যিনি এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য-সমূহ একবার দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন, জীবনে তিনি তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। এই ভীষণ ঝটিকা পীড়নে পূর্ব্ববঙ্গে যে সমস্ত বিপদ সংঘটিত হইয়াছিল, বঙ্গের ইতিহাসে তৎসমুদয় চিরকাল মসীময় রেখায় অঙ্কিত থাকিবে।

বাগেরহাটের ভাঙ্গা ঘর

বাগেরহাটের ভগ্ন হরিসভা

এই সময়ে কি ধনবান, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র সকলেরই অবস্থা একপ্রকার সমস্তরে আসিয়া মিশিয়াছিল। সমাজ-সম্ভ্রমের গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া ধনী ও মধ্যবিত্তগণ ভিক্ষা গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন; অথচ সাধারণের সাহায্য না পাইলে তাঁহারা অনন্যোপায়; এবং ভিক্ষুকগণের পক্ষেও ভিক্ষালাভ অসম্ভব। কেহ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন, কেহ বা হাহাকারে শ্রুতি বধির করিতে লাগিলেন। শ্রমজীবী ও কৃষকগণের কষ্টের ইয়ত্তা নাই। বিশেষতঃ দীর্ঘ পঞ্চবর্ষ ব্যাপী মহাসমরের ফলে সকলের অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই অবচ্ছন্ন ছিল; তাহার উপর প্রকৃতির এই পৈশাচিক লীলায় তাহারা অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও গৃহহীন। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে কোন্ পাষাণ প্রাণ দ্রবীভূত না হয়!

নর-নারীগণের এই অসীম দুঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়ে পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত "ভারত সেবক সমিতি" (The Servant of India Society), "The Bengal Social Service Lea[gue]" Ramkrishna Mission, ব্রাহ্ম সমাজ ও "Bengal Relief Committee" অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে যে করিয়াছেন তাহা ধন্যবাদার্হ। অধিকন্তু সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট উ[ক্ত] সমিতিসমূহের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে রিলিফ কার্য্য[ে] উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য ভারতবাসী তাঁ[হাদের] নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বর্ত্তমানে কেবল "ভারত সেবক সমিতি"র নিকট হইতে যে অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল

পূর্ব্ববঙ্গের এই শোচনীয় অবস্থার কথা শ্রুতি গোচর হই[লে] "ভারত সেবক সমিতির স্বনামধন্য সভ্য কর্ম্মবীর মিঃ এ, ভি মহোদয়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ঠক্কর মহোদয় তখন জেমে[স] অবস্থান পূর্ব্বক Welfare work Departmentএর কার্য্য পা[লন]

আটাপাড়া ইউনিয়ন

মুন্সীগঞ্জের একটী পরিবার

রতেছিলেন। উক্ত বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ (Cashier) ডবলিউ, কে, রায়, বি, এসসি মহাশয় এই মহৎ উদ্দেশ্য র পোষণ করতঃ ঠকর মহোদয়ের অনুমত্যানুসারে "ভারত ক সমিতি"র অন্যতম সুযোগ্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সভ্য মিঃ এল, সাহু, এ, বিদ্যানিধি মহোদয়ের সমভিব্যাহারে ঝটিকা-পীড়িত স্থানসমূহ দর্শন মানসে বিগত ২রা অক্টোবর তারিখে যাত্রা করেন। রা Bengal Social Service Leagueএর প্রতিনিধি র নিশিকান্ত বসু মহাশয়ের সৌজন্যে ও সহায়তায় বাত্যা-প্রপীড়িত সমূহের পরিদর্শন-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আসেন। মহাশয়, Bengal Social Service Leagueএর পক্ষ হইতে "সেবক সমিতি"কে যে সাহায্য দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি তঁর আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

তাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে ফরিদপুর এবং তৎপরে ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, বিক্রমপুর, লৌহজঙ্গ, বরিশাল, খুলনা ও বাগেরহাট পরিদর্শন করেন। সর্ব্বত্রই প্রকৃতির ধ্বংস-লীলা সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল। বিশেষতঃ ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ ও বাগেরহাটের দৃশ্য, হৃদয়-বিদারক ও বর্ণনাতীত। অসংখ্য মূলোৎপাটিত বৃক্ষ, ভূলুণ্ঠিত প্রাসাদ ও কুটীর, ভগ্ন ও মগ্ন জলযান এবং মৃত পশ্বাদির প্রবমান দেহ দর্শনে, তাঁহারা ঝটিকার ভীষণ ভাব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে মিঃ রায় ও মিঃ সাহু পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া পড়েন। রায় মহাশয় লৌহজঙ্গ পরিদর্শনে গমন করেন। তিনি চরভূমি পরিদর্শন পূর্ব্বক বাত্যা-পীড়িত স্থানের মৃত্যু-সংখ্যা নির্ণয় করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অনুমানের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, লৌহজঙ্গের প্রায় অর্দ্ধেক লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। লৌহজঙ্গ পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত। ঝটিকা কালে উক্ত নদীর জল স্ফীত হইয়া অসংখ্য গৃহ, পশু ও মনুষ্যকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। মিঃ রায় এই অবস্থা দর্শন

করিয়া সত্বর কলিকাতা যাত্রা করেন, এবং এই ভীষণ ঘটনা লোক মধ্যে প্রচার করেন। অন্যদিকে মিঃ সাহু ও ডাক্তার বসু খুলনা ও বরিশালে পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

১২ই অক্টোবর তারিখে তাঁহাদের অনুসন্ধান কার্য্য শেষ হইয়া যায়। এই সমস্ত ঘটনা সংবাদপত্রে সত্বর প্রকাশিত হয়। তাঁহারা এ সংবাদ কলিকাতা ও বোম্বাইবাসী বন্ধুবর্গের মধ্যে জ্ঞাপন করেন। এদিকে মিঃ ঠক্কর জেমশেদপুরের অধিবাসীবৃন্দকে এ কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য উদ্বোধিত করেন। ঠক্কর মহোদয়ের অক্লান্ত উৎসাহ ও যত্নে জেমশেদপুরবাসিগণ অর্থ ও লোক সাহায্যে বাত্যা-প্রপীড়িত স্থানসমূহে যথাসাধ্য সহায়তা দানে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা বঙ্গীয় ভ্রাতৃবৃন্দের দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া অকাতরে অর্থদান করেন। তাঁহারা এই শুভ সঙ্কল্প সাধনে এরূপ যত্নবান্ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা তথায় থিয়েটারের টিকিট বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক রিলিফ ফণ্ডে দান করেন। যাঁহারা রিলিফ কার্য্যে সাহায্য দান কল্পে স্বেচ্ছা-সেবক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই বেতনের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। এই কার্য্যে ভারতবর্ষীয় ও ইয়োরোপীয় সমভাবে ব্রতী হন। কতিপয় বোম্বাইবাসী বণিক বহুসংখ্যক বস্ত্র দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণের জন্য দান করেন। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ওয়ারধা নগর-বাসী রায় বাহাদুর জমালাল বাচ্চারাজ মহোদয় যে এক সহস্র মুদ্রা রিলিফ ফণ্ডে এককালীন দান করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই ভাবে রিলিফ কার্য্য পূর্ণ-মাত্রায় চলিতে থাকে। ভারত-সেবক সমিতির সভ্যগণের অক্লান্ত চেষ্টায় অন্ন, বস্ত্র, অর্থ সংগৃহীত ও বলের কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। যে সমস্ত দরিদ্র ব্যক্তি গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তাহা পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। দ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চাউল ও বস্ত্র বিনামূল্যে বিতরিত ও মধ্যবিত্তগ যথাসম্ভব অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। পীড়িত ও বৃদ্ধগণকে বস্ত্র ও গেঞ্জি এবং দরিদ্রগণের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য রজ্জু বিত হইয়াছিল।

কলিকাতার "উৎকল সমাজ" রিলিফ ফণ্ডে অর্থ দান এবং রুগ্ন ব্যা চিকিৎসার জন্য তিনজন মেডিক্যাল ভলান্টিয়ার্স প্রেরণ কে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় বিধ উপায়ে চিকিৎসা কার্য্য হইয়াছিল। বিসূচিকা ও আমাশয় রোগের আশু প্রতীকা অনেক স্থলে শরীরে বিষ-প্রয়োগের (Injection) ব্যবস্থা করা বহুসংখ্যক নিউমোনিয়া (Pneumonia) রোগাক্রান্ত ব্যা বহু লোক চিকিৎসিত হইয়াছিল। সর্ব্ব সাকল্যে তাঁহারা সহস্রাধিক রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসা করেন।

মুন্সীগঞ্জ চরকেয়ার কেন্দ্রে বস্ত্র বিতরণ

রিলিফ কার্য্যের আর এক বিশেষত্ব এই যে, "ভারত সেব সমিতি"র শুভদৃষ্টি বিদ্যালয়ের দরিদ্র বালকগণের প্রতি আ হইয়াছিল। দুরন্ত শীতের প্রকোপ দূরীকরণ মানসে সমিতির সভ্যগণ প্রায় তিনশত দরিদ্র বালককে গেঞ্জি বিতরণ এবং কতি নিঃস্ব বালকের বিদ্যালয়ের বেতন সাহায্য করেন।

বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত পাটলীখালী নামক গ্রামের বহুসংখ্য গ্রামবাসীকে যথার্থই সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় দর্শন করিয়া, সমিতি উ গ্রামের অধিবাসী নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের মধ্যে ২০০খণ্ড বস্ত্র (৭ হা ধুতি) বিতরণ করিয়া তাহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

বাগেরহাট রিলিফ কার্য্যে সমিতি যে ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১)	বিনামূল্যে বিতরিত চাউলের ব্যয়	১০০০৲
(২)	স্বল্প মূল্যে বিক্রীত চাউলের ক্ষতি	২০০৲
(৩)	ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যয়	৩০০৲
(৪)	গৃহ নির্ম্মাণ ব্যয়	৩০০৲
(৫)	বস্ত্র বিতরণের ব্যয়	৭০০৲
(৬)	গেঞ্জি ও কম্বল বিতরণের ব্যয়	৫০০
		৩০০০

পূর্ব্ববঙ্গের যে সকল দুরধিগম্য স্থানে রিলিফ কার্য্য একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, স্বেচ্ছাসেবকগণ অদম্য উৎসাহে সেই স্থানসমূহে গমনপূর্ব্বক জলময় ও কর্দ্দমাক্ত পথ অতিক্রম করতঃ ক্ষুধার্ত্ত রুগ্ন অধিবাসীবৃন্দকে চাউল ও ঔষধ বিতরণ করিয়া, সহৃদয়তা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ প্রশংসনীয়।

"ভারত সেবক সমিতি"র এবম্প্রকার অদ্ভুত কার্য্যকারিতা ও ঐকান্তিক উৎসাহ ও যত্ন দর্শনে বাগেরহাটের স্থানীয় সংবাদপত্র যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, Servants of India Society"র পক্ষ হইতে বাগেরহাটের কয়েকটী ইউনিয়নে রিলিফ কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রূপে সম্পন্ন হইতেছে। এই সোসাইটীর পক্ষ হইতে বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু বি-এ গুরুতর পরিশ্রম করিয়া সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কয়েকজন মেডিক্যাল ভলাণ্টিয়ার প্রতি গৃহ পরিদর্শন করিয়া আবশ্যক মত ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিতেছেন। এই সোসাইটীর পক্ষ হইতে বিনামূল্যে চাউল, বস্ত্র, গেঞ্জী, কাতা, ঔষধ, পথ্য দান ও নগদ অর্থ-সাহায্য ছাড়া স্বল্পমূল্যে (বাজার দর অপেক্ষা প্রতি মণে ১৷০ কম) চাউলও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাগেরহাট রেলওয়ের স্থানীয় সুযোগ্য ষ্টেশন মাষ্টার বাবু রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় রিলিফ কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। এই পরোপকার ব্রতের জন্য উক্ত সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্ম্মচারিগণ ও রজনীবাবু আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।"—'জাগরণ' ৩০শে কার্ত্তিক ১৩২৬ সাল।

যদিও পূর্ব্ব-বঙ্গে বিভিন্ন সমিতি দ্বারা এই রিলিফ কার্য্য এক-প্রকার শেষ হইয়াছে, তথাপি সেখানকার দীন-হীন নিরাশ্রয়ের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন কেন্দ্রে এক-একটী করিয়া অনাথ-আশ্রম (Orphanage) ও দরিদ্রাশ্রম (Poor-house) স্থাপনের বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি-বর্গের নৈতিক জীবনের অধঃপতন যে কত সহজে হইতে পারে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অনেক পিতামাতা অভাবে পড়িয়া তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণকে কুপথে পরিচালিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পক্ষান্তরে, দুঃস্থ পিতামাতা বরং অন্ন-বস্ত্রের অভাবে সহস্র কষ্ট সহ্য করিবেন, তথাপি আপন সন্তান-সন্ততিগণকে দূরদেশস্থ অনাথ আশ্রমে প্রেরণ করিতে তাঁহাদের প্রাণ চাহিবে না। তজ্জন্য ভিন্ন-ভিন্ন কেন্দ্রে দরিদ্র ও অনাথ-আশ্রম স্থাপন করিতে পারিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। দরিদ্রগণ দরিদ্রাশ্রমে থাকিয়া তাহাদের সন্তানগণকে অনাথ-আশ্রমে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। দরিদ্র শিশুগণ অনাথ আশ্রমে থাকিয়া নৈতিক জীবনের উন্নতি করতঃ সাধুপথে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে। তজ্জন্য সর্ব্ব-সাধারণের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে, পূর্ব্ব-বঙ্গের বাত্যা-প্রপীড়িত স্থান-সমূহের ভিন্ন-ভিন্ন কেন্দ্রে যাহাতে অনাথ ও দরিদ্রাশ্রম স্থাপিত হয়, তাহার জন্য যত্নবান হইয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি

গ্রাম্য সংস্থা

[অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-আর-এস]

(৫)

কেবল পাটীল, কুলকর্ণী, চৌগোলা, মহার ও পোতদার লইয়া গ্রামের কায চলে না। পেশবা সরকারকে প্রতি বৎসর রাজস্ব দেওয়া যেমন দরকার, গ্রামের শান্তিরক্ষা যেমন দরকার, পল্লীসংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা যেমন আবশ্যক, সেইরূপ পল্লীবাসীর জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহও অত্যন্ত দরকার। অথচ মহারাষ্ট্রের পল্লীগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন,—শত্রু-ভয়ে প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। আর পথঘাট এখনকার মত নিরাপদ ত নয়ই, সুগমও ছিল না। তাই প্রত্যেক গ্রামেই কতকগুলি শিল্পী থাকিত, ইহাদের সাধারণ নাম বলুতা। বলুতারা সংখ্যায় বারো,—মহার, সুতার, লোহার, চাম্ভার, পরীথ বা রজক, কুম্ভার, হাবী বা নাপিত, মঙ্গ, কুলকর্ণী,

জোশী, গুরব ও পোতদার। মহারের পাওনা সম্পর্কে আমরা ইতঃপূর্ব্বেই একবার মঙ্গের পরিচয় পাইয়াছি। তাহাদের কৌলিক বৃত্তি কতকটা মহারের ও চর্ম্মকারের অনুরূপ। কুলকর্ণী গ্রাম্য সমাজের আয়-ব্যয় রাখিত; আবার সময়ে-সময়ে দরকার হইলে গ্রামবাসিগণের দলীল-দস্তাবেজও লিখিয়া দিত। এইজন্য বলুতা শ্রেণীতে তাহারও স্থান হইয়াছে। জোশী সংস্কৃত জ্যোতিষীর অপভ্রংশ। প্রত্যেক গ্রামেই একজন বা ততোধিক জোশী থাকা আবশ্যক, তাহা না হইলে পঞ্চাঙ্গ বা পাঁজি দেখিয়াই বা দেয় কে, আর স্বপ্নের ব্যাখ্যা—সুলক্ষণ বা অলক্ষণ নির্ণয়, ও শুভাশুভ মুহূর্ত্তই বা ঠিক করিয়া দেয় কে? শিবাজী মহারাজ পর্য্যন্ত জোশীদিগকে খুব সম্মান করিতেন। তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা অনেক জোশীকে ভবিষ্যৎ গণনার জন্য বহু ইনাম জমি দিয়া গিয়াছেন। অনেক সময়ে একই ব্যক্তি কুলকর্ণী ও জোশীর কার্য্য করিত। কুলকর্ণী বতনের "আন পান হকের" তালিকা আমরা বিধবা মহালসা বাইর বিক্রয় পত্রে পাইয়াছি। জোশী বতনের পাওনার একটা তালিকাও ঐ দলীলখানিতেই পাওয়া যায়; কারণ, মহালসা বাইর পরলোকগত স্বামী ছিলেন তাঁহার গ্রামের অর্দ্ধ জোশী বতনের মালিক। নিম্বগাঁওর জোশী গুরবের সমান 'বলুতা' পাইতেন। গ্রাম্য দেবমন্দির হইতে প্রথম শ্রেণীর বলুতার সমান প্রসাদ পাইতেন। আর পাইতেন ২৫ বিঘা ইনাম জমি। আমরা দেখিয়াছি যে, পাটীলের পুত্র-সন্তান না থাকিলে, তাহার জারজ সন্তানেরাও পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইত। জোশীদিগের বেলায় কিন্তু এ নিয়ম খাটিত না। মহুলার S. W. নামক একব্যক্তি তাহার খুল্লতাতের জারজ পুত্র সুভানা দাসী-পুত্রের বিরুদ্ধে জোশী বতন সম্বন্ধে যে মামলা করিয়াছিলেন, তাঁহাতে ইহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। গুরব পল্লী-দেবমন্দিরের সেবক। প্রত্যেক পল্লীতেই এক-একটী মন্দির থাকিত; সুতরাং দেবমন্দিরের কার্য্য পরিচালনার জন্য গুরবেরও প্রয়োজন। মহার, সুতার, লোহার, চামার, কুমার, রজক, ও ক্ষৌরকারের কথা বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক।

প্রত্যেক গ্রামেই আবার বারোজন 'বলুতার' সঙ্গে-সঙ্গে তেরোজন করিয়া 'আলুতা' থাকিত। 'বলুতা ও আলুতা'-দিগের অপর নাম 'কারু' ও 'নারু'। বোধ হয় প্রাচীন কালে মহারাষ্ট্রের পল্লীগুলিতে আলুতা ও বলুতা ছিল। পণ্ডিতপ্রবর ফ্লিট সম্পাদিত, কানারিজ ভাষায় লিখিত যদব রাজগণের একখানি প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপিতে গ্রাম্য শিল্পিগণের (কারু কাইনাদির) পাওনার উল্লেখ দেখা যায়।* সুতরাং ইহাদিগের কারু নামই প্রাচীন ও বলুতা নাম আধুনিক। প্রতি বৎসরই ফসলের সময় ইহারা প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতে কিছু শস্য পাইত। এই 'পাওনা'র সাধারণ নাম 'বলুতা' ও গ্রাম্য শিল্পীরা 'বলুতা' পাইত বলিয়া প্রথমে 'বলুতাদার' ও পরে 'বলুতা' বলিয়া অভিহিত হইত।

বার্ষিক শস্য প্রাপ্তিই বলুতাদিগের বাস-গ্রামের প্রতি একমাত্র আকর্ষণ নহে। গ্রামবাসিগণ তাহাদিগকে এই শস্য দিত তাহাদিগের কার্য্যের বিনিময়ে। ধোবা নাপিত প্রভৃতি বলুতা না হইলে তাহাদের চলে না; তাই তাহাদের এই পারিশ্রমিক। বলুতা গ্রাম্য সমাজের অনুগ্রহ-প্রদত্ত দান নহে। সুতরাং বলুতাদারগণ যাহাতে গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র না চলিয়া যায়, সে দিকে গ্রামবাসিগণকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত। বলুতাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট হইলে তাহারা চলিয়া যাইবে; এইজন্য গ্রামে কোন নবাগত শিল্পীকে তাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া হইত না। ফলে, প্রত্যেক বলুতার নিজ-নিজ গ্রামে নিজ-নিজ ব্যবসায়ে বংশানুক্রমিক একাধিকার জন্মিত। এই অধিকার তাহারা সহজে বা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিত না। কোন কারণে কোন বলুতা বা আলুতা গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে, তাহার বংশধরগণ ৩০।৪০ এমন কি ৬০ বৎসর অনুপস্থিতির পরেও, গ্রামে আসিয়া পিতা বা পিতামহের ত্যক্ত স্বত্বে দাবী করিত; এবং তাহাদের সে দাবী কখনও অগ্রাহ্য হইত না। এই প্রকার বিবাদের সময় গ্রামবৃদ্ধগণ গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস ও বলুতাদারগণের বংশাবলীর সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিত, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রঘোজী ও সতবাজী খণ্ডকে নামক দুই ব্যক্তি কসবা পুণার ক্ষৌরকার বতন দাবী করিয়া সনদ প্রার্থনা করে। তাহাদের আবেদনে লিখিত আছে যে, দুর্ভিক্ষের তাড়নায় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ কসবা ত্যাগ করার

* J. B. Br. R. A. S. VOL. XII. P49.

পর অন্য একজন ক্ষৌরকার গ্রামবাসিগণের সেবা করে। মূল বতনদারদের বংশধরেরা পূর্ব্বপুরুষের গ্রামে ফিরিয়া আসিলে, উভয় পরিবারের মধ্যে বতন সমভাগে বিভক্ত হয়। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে নিবাসে পরগণার অন্তঃপাতী চিঞ্চোভি গ্রামের স্থায়ী বতনে জঘোজী ও বমাজী নামক দুই ভ্রাতা দুইপুরুষ কাল অনুপস্থিতির পর আপনাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করে। তাহাদের পিতামহ দুর্ভিক্ষের সময় চিঞ্চোভি ছাড়িয়া গিয়াছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে শিবাজী, বিসাজী, দারকোজী, ও নিম্বাজী নামক চারিভ্রাতা জুন্নর প্রান্তের অন্তর্গত কহডাড় গ্রামের লোহকার বতন দাবী করে। তাহাদের পিতৃব্য সন্তাজী পল্লীবাসিগণের উপর রাগ করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছিল, এবং তাহাদের পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও ফিরিয়া আসে নাই; তথাপি পল্লী দরবারে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের দাবী অগ্রাহ্য হয় নাই। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে লোনিখণ্ড গ্রামের স্বর্ণকার বতনও মূল বতনদারের বংশধরদিগকে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর পুনর্ব্বার দেওয়া হয়। এইরূপ পাটীল, কুলকর্ণী, মহার, পোতদার, চৌগুলা প্রভৃতি পল্লীসেবকগণের বংশধরেরাও দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পরেও পূর্ব্বপুরুষের বতন দাবী করিতে পারিত।

পাটীল প্রভৃতি কর্ম্মচারী, ও বলুতা-আলুতার সমবায়ে গঠিত মহারাষ্ট্রের পল্লী-সমাজগুলি যে সর্ব্বপ্রকারেই এক-একটী সম্পূর্ণ রাষ্ট্র, তাহা আমরা এতক্ষণে দেখিতে পাইলাম। কোন কারণেই কোন পল্লী-সমাজকে অপর কোন পল্লী-সমাজের দ্বারস্থ হইতে হইত না। তাহাদের যাবতীয় অভাব মোচনের উপায় তাহাদিগের নিজের হাতেই ছিল। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ ও চৌর্য্য নিবারণ পর্য্যন্ত শাসন সম্পর্কীয় কার্য্য পল্লীসমাজের কর্ম্মচারীরা করিত; আর মন্দির-সংস্কার, ভূমি-কর্ষণ ও গৃহ-নির্ম্মাণের যাবতীয় উপাদান গ্রামের ভিতরেই গ্রামবাসিগণের আলুতা-বলুতাগণের সমবেত চেষ্টায় উৎপন্ন হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রামের শাদা জমির উপর ঘর-বাড়ী তৈয়ারি হইত; আর কাল জমি চাষ করা হইত। এই প্রথা হইতেই মারাঠী পণ্ঢেরী শব্দটী দলীল-পত্রে একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইত। পণ্ঢেরী মানে শাদা; সুতরাং দলিল-দস্তাবেজে পণ্ঢেরী শব্দের অর্থ ছিল—শাদা জমির বা গ্রামের অধিবাসী, আর—কালী পণ্ঢেরী মানে গ্রামবাসী ও গ্রামের জমির চাষী। সমস্ত গ্রামবাসী কিন্তু গ্রাম্য প্রাচীরের ভিতরে বাস করিতে পাইত না। রাখোশী ও ভীলদিগের কৌলিক বৃত্তি চুরি-ডাকাতি বলিয়া, ইহারা প্রাচীরের বাহিরে বাস করিত। বোধ হয় ইহারা বাড়ীর কাছে সকল রকম আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল জড় করিয়া রাখে বলিয়া, স্বাস্থ্যনীতির অনুরোধেও ইহাদিগের বাসস্থান পল্লী-প্রাচীরের বাহিরে নির্দ্দিষ্ট হইত। আগেই বলিয়াছি, গ্রাম্য পুলিসের কায এই চৌর্য্য-ব্যবসায়ী ভীল রাখোশীদিগকেই করিতে হইত। ইহাদের এক-একজন 'নায়ক' বা বাঙ্গালাদেশের ধোপা-নাপিত সমাজের ভাষায় মণ্ডল থাকিত। গ্রামে কোন চুরি হইলে, তাহার দায়িত্ব পড়িত ভীল ও রাখোশীদিগের স্কন্ধে। যদি ইহারা চোর ধরিয়া দিতে বা চুরির মাল বাহির করিয়া দিতে না পারিত, তবে ইহাদিগের নিকট হইতে অপহৃত দ্রব্যের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইত। যদি গ্রামের রাখোশী বা ভীল চোরদের পায়ের দাগ বা অপর কোন চিহ্ন অন্য গ্রামের সীমানা পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে পারিত, তবে তাহারা ক্ষতিপূরণের দায় হইতে অব্যাহতি পাইত; আর চোর ধরিবার বা চোরাই মাল বাহির করিবার ভার পড়িত সেই গ্রামের রাখোশীদের উপর। এই প্রথাটি ভারতবর্ষের পল্লীতে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। এমন কি কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্র ও বৌধায়ণ ও নারদ-সংহিতার মত প্রাচীন গ্রন্থেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরলোকগত অধ্যাপক হরি গোবিন্দ লীময়ের নিকট শুনিয়াছি যে, রাখোশীরা কখনও নিজের গ্রামে চুরি করিত না। ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দূর চলিয়া যাইতে পারিত; অথচ, বাঙ্গালা-দেশের ডাকাতদের মত ইহাদের রণপা বা অন্য কিছুর দরকার হইত না। কখন-কখনও রাখোশীরা ২০।২৫ মাইল দূরের কোন গ্রামে চুরি করিয়া আবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিত। চুরি করিবার সকল রকম ফন্দি প্রত্যেক রাখোশীরই ভাল করিয়া জানা থাকিত বলিয়া, রাখোশীরাই সহজে চোরাই মাল বাহির করিতে ও চোর ধরিয়া দিতে পারিত। প্রাচীন কালে কিন্তু অপহৃত দ্রব্যের জন্য ক্ষতিপূরণ করিতে হইত রাজাকে অথবা গ্রামনি বা পল্লী-সমাজের প্রধানকে। মারাঠা যুগে এই

দায়িত্ব বেচারা রাখোশীর কাঁধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহার স্বভাবের দোষ।

মারাঠী পল্লীর চাষীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। মিরাসদার বা মিরাসী ও উপরি। মিরাসীরা গ্রামেরই লোক, গ্রামের জমি চাষ করিত। সে জমিতে তাঁহাদের একটী স্থায়ী স্বত্ব থাকিত। খাজনা বাকী না ফেলিলে কাহারও অধিকার ছিল না যে তাহাদের জমি কাড়িয়া লয়। বাকী খাজানার দায়ে জমি হস্তান্তর হইলেও কিন্তু তাহাতে মিরাসীর স্বত্ব একেবারে লুপ্ত হইত না। ৩০।৪০, এমন কি, ৬০ বৎসর পরেও বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিলেই, মিরাসী তাহার জমি ফিরিয়া পাইত। বতন-দারেরা যেমন নিজেদের বতন বিক্রয় করিতে পারিত, মিরাসীরও সেইরূপ নিজ-নিজ মিরাসজমি দান-বিক্রয়ের অধিকার ছিল। উপরিরা অন্য গ্রামের লোক—দুইচারি বৎসরের জন্য সরকারী জমি অল্প জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইত। মেয়াদ ফুরাইলে আর সে জমিতে তাহাদের কোন অধিকার থাকিত না। মিরাসীদের খাজানার হার ছিল উপরিদের চেয়ে অনেক বেশী। আবার অন্য প্রকারের দায়িত্বও তাহাদের নিতান্ত কম ছিল না। কোন মিরাসীর খাজানা বাকী পড়িলে, তাহা সকল মিরাসী মিলিয়া পরিশোধ করিতে হইত। গ্রাম্য সমাজের বিবিধ প্রকারের ব্যয়-ভারের অধিকাংশ তাহাদিগকেই বহন করিতে হইত। কেহ কেহ মনে করেন, পূর্ব্বে মারাঠী পল্লীতে মোটেই উপরি চাষী ছিল না। মিরাসীরা গ্রাম-প্রতিষ্ঠাতাদিগেরই বংশধর। মনুর বিধান অনুসারে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই গ্রাম্য জমীর মালিকী স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে কোন-কোন মিরাসী পৈত্রিক সম্পত্তি হারাইলে, তাহাদের জমি উপরিদিগের নিকট পত্ত করা হয়। এই অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন নহে। এখনও মারাঠা কৃষকদিগের মধ্যে উপরি অপেক্ষা মিরাসীদিগের সংখ্যা অনেক বেশী।

পল্লী-সমাজের কর্ম্মচারী, আলুতা, বলুতা রাখোশী ও ভীল, মিরাসী ও উপরির কথার আলোচনা করা হইয়াছে; এইবার মারাঠা পল্লীর রাজস্বের কথার আলোচনা করা যাউক। অবশ্য পেশবা সরকারের বার্ষিক কর প্রত্যেক গ্রাম্য সমিতির প্রধান ও প্রথম দেয়। এই করের হার পেশবা সরকারের কর্ম্মচারিগণ পাটীলের সঙ্গে একত্র হইয়া, গ্রামের জমি ও চাষের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া স্থির করিতেন। কিন্তু সরকারী খাজানা ছাড়াও প্রত্যেক গ্রামের কতকগুলি ছোট-বড় খরচ ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই এক-একটী দেব-মন্দির থাকিত। সেই মন্দির সংস্কারের জন্য ও মন্দিরের ঠাকুরের পূজার জন্য খরচের প্রয়োজন হইত। গ্রাম্য সমিতি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে দক্ষিণা দিতেন, বৃত্তি দিতেন, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতেন; প্রতি বৎসর নানা প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করিতেন। ইহার প্রত্যেক কাযের জন্যই টাকা পয়সার দরকার হইত। এই টাকা গ্রামবাসিগণের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তোলা হইত। এই সকল খরচ বার্ষিক ব্যাপার, প্রত্যেক বৎসরই করিতে হইত। বার্ষিক খরচের জন্য নির্দ্দিষ্ট ট্যাক্সের নাম 'সালা বাদ'। এতদ্ব্যতীত অনেক আকস্মিক ব্যয়ও গ্রাম্য সমিতিকে করিতে হইত। মনে করুন, গ্রামের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যুদ্ধ-বিগ্রহের কাল; সর্ব্বদা শত্রু-ভয়; প্রাচীর-সংস্কার আশু না করিলে চলে না। এমন অবস্থায় অবশ্য পেশবা সরকার কখন-কখনও যে রাজ-ভাণ্ডার হইতে গ্রাম্য সমিতিকে সাহায্য না করিতেন এমন নহে। কিন্তু সকল সময়ে সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইত না; অথবা তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকাও চলিত না। অথবা মনে করুন, শত্রুসেনা গ্রাম বেড়িয়া বসিয়া আছে। বাহুবলে তাহাদিগকে প্রতিহত করা অসম্ভব। তাহারা গ্রামে অগ্নি-সংযোগ করিবে,—গ্রামের প্রত্যেক গৃহ লুণ্ঠন করিয়া গ্রাম ভূমিসাৎ করিয়া চলিয়া যাইবে। গ্রাম-রক্ষার একমাত্র উপায়—তাহা-দিগকে প্রচুর পরিমাণে নিষ্ক্রয় প্রদান করা। এরূপ অবস্থায়ও পেশবা সরকার দেয় রাজস্ব কিছু-কিছু রেহাই করিতেন। কিন্তু তাহাতে গ্রামবাসীদিগের সম্যক ক্ষতি-পূরণ হইত না। এই সকল খরচের পরিমাণ অল্প হইলে, ট্যাক্স বসাইয়া টাকা তোলা হইত। (এই ট্যাক্সের নাম সদর ওয়ারিদ পল্লী)। আর খরচের পরিমাণ অধিক হইলে, গ্রাম্য সমিতির কর্জ্জ করা ভিন্ন আর উপায় থাকিত না। এই গ্রাম্য ঋণ পরিশোধের দ্বিবিধ উপায় ছিল। কখন-কখনও সদর ওয়ারিদ পল্লীর আয় হইতে প্রত্যেক বৎসর কিস্তি বন্দীর হিসাবে ঋণ পরিশোধ করা হইত। আবার কখন-কখনও উত্তমর্ণকে দেয় ঋণের পরিবর্ত্তে

নিষ্কর জমি দেওয়া হইত। জমির পরিমাণ অল্প হইলে করের কথা উঠিতই না। জমির পরিমাণ অধিক হইলে, তাহার কর সকল গ্রামবাসী মিলিয়া হারাহারি করিয়া দিতে হইত। এইরূপ নিষ্কর জমিকে মারাঠীতে 'গাঁও নিসবত ইনাম' বলে। সুতরাং আর্থিক ব্যাপারেও মহারাষ্ট্রের গ্রাম্য সমিতিগুলির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। খাজানা দেওয়া লইয়া তাহাদের পেশবা সরকারের সহিত সম্পর্ক। নিজেদের, দেবমন্দিরের, উৎসবাদির, ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গ্রাম্য সমিতি ইচ্ছামত কর আদায় করিতেন, ঋণ করিতেন, ঋণ পরিশোধের জন্য ছোট-বড় ইনাম জমি উত্তমর্ণকে দিতেন। ইহার জন্য পেশবা সরকারের অনুমতির অপেক্ষা রাখিতেন না; অথবা পেশবা সরকারও গ্রামের এই সকল আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। এক কথায়, আজকালকার ভাষায় বলিতে গেলে, মারাঠী পল্লীগুলির সম্পূর্ণ Financial Autonomy ছিল। আবার পল্লী-সমাজের কর্ম্মচারিগণ গ্রামবাসিগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত না হইলেও, পেশবা সরকারের বেতনভোগী ভৃত্যও ছিলেন না। তাঁহাদের যত কিছু পাওনা তাঁহাদের গ্রাম হইতে। গ্রামবাসিগণ তাঁহাদের আপনার লোক; সুতরাং গ্রাম্য সাধারণের মত উপেক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না। পেশবার কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন বটে, কিন্তু সে নাম মাত্র। সুতরাং মারাঠী পল্লীগুলিকে মারাঠী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কতকগুলি ছোট-ছোট স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারসম্পন্ন গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র বলা মোটেই অসঙ্গত নহে।

(৬)

দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে

পাটীল ও কুলকর্ণী যেমন গ্রামের কর্ত্তা ছিলেন, সেইরূপ শিবাজীর পূর্ব্বে দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে পরগণার কর্ত্তা ছিলেন;—পার্থক্য এই যে পাটীল কুলকর্ণী গ্রামবাসীদের উপরে বড় সহজে জুলুম করিতে পারিতেন না—আর পরগণার প্রত্যেক গ্রামের উপর জুলুম করাই ছিল দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য শিবাজী ইহাদের হাত হইতে রাজস্ব আদায়ের অধিকার কাড়িয়া লইলেন; কিন্তু ইহাদের পুরুষানুক্রমিক পাওনা হইতে ইহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন না। কারণ সহসা দরিদ্র অবস্থায় পড়িলে ইহারা দেশে নানা প্রকার অরাজকতার সৃষ্টি করিতে পারিত। পেশবাগণ শিবাজীর নীতির অনুসরণ করিয়া পরগণায় সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেরা পেশবাদিগের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বেই আপনাদের প্রাচীন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। অথচ ইংরেজ ঐতিহাসিক মাউণ্ট ষ্টুয়ার্ট, এল্‌ফিনষ্টোন সে জন্য দায়ী করিয়াছেন ব্রাহ্মণ পেশবাদিগকে। তিনি এই পরিবর্ত্তনের মূলে—the policy and avarice of the Brahmins—ব্রাহ্মণদিগের কূটনীতি ও অর্থপিপাসা দেখিতে পাইয়াছেন। অবশ্য যে এলফিনষ্টোন পেশবাদিগের নিকট হইতে নববিজিত রাজ্য সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন, তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেতনভোগী ভৃত্য। সুতরাং অল্প দিন পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার খিড়কীর বাড়ী আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি তাঁহার একটু বিদ্বেষ থাকিবারই কথা। যদি ইতিহাস লিখিতে বসিতেন, তবে হয় ত পেশবাদিগের অযথা নিন্দা করিবার পূর্ব্বে একটু স্থিরভাবে বিচার করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেন। রিপোর্ট ইতিহাস নহে, সরকারী দপ্তরের কাগজমাত্র। যাহা হউক, একটু পরেই ভালই হইয়াছিল—"The change was attended with beneficial effects as delivering the people from the oppression and exaction of the Zemindars."

শিবাজীর সময়ে যে দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেরা প্রজাপীড়ক ছিলেন, পেশবাযুগে তাঁহারাই হইয়াছিলেন প্রজার বন্ধু; কারণ, শিবাজীর নীতির ফলে প্রজার সহিত আর তাহাদের স্বার্থের বিরোধ ছিল না। তাই পেশবাযুগে প্রজার দুঃখকষ্টের আবেদন লইয়া পাটীলের সহিত দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেও পুণা দরবারে উপস্থিত হইতেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের একখানি প্রাচীন দলীলে দেখিতে পাই যে, প্রান্তরাজপুরীর জমিদারেরা (দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেগণকেই মহারাষ্ট্রে জমিদার বলিত) খোত ও পাটীলগণের সঙ্গে, সিদ্দীর উপদ্রবে সর্ব্বস্বান্ত প্রজাগণের দুঃখ কষ্টের কথা, এবং অশান্তি ও অরাজকতার কালে পরিত্যক্ত জমির অবস্থা জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পুণায় গিয়াছিলেন। (প্রান্ত

রাজাপুরী যেথীল রায়ত শামালাচে দংগামূলে তজারজা জালী আহে। বয়তেচী কীর্দ হোউন পাবলী নাহী .নিত্য উঠোন দংগচে আহে। যাস্তব স্বামীনী কৃপালূ হোউন প্রান্ত মজকুরচী পহানী করুন পহানী প্রমাণে সলে মজকুরী বমুল খ্যাবা হুণেনি জমিদার ব খেতে পাটীল যানী হুজুর পুণ্যাচে মুক্কামী খেউন বিদিত কোল) ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে জুন্নর প্রান্তের দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেগণ পেশবা সরকারকে জানাইয়াছিলেন যে, মোগল আক্রমণে জুন্নর প্রান্তের গ্রাম-সমূহ দগ্ধ ও লুণ্ঠিত হইয়াছে; সুতরাং কৃষকগণকে রাজস্ব বিষয়ে অনুগ্রহ দেখান সরকারের কর্ত্তব্য। (ভিকাজী বিশ্বনাথ হবালদার তর্ফ খে চাকণ ব দেশমুখ ব দেশপাণ্ডে সরকার জুন্নর থানী হুজুর খেউন বিদিত কোল (কী) প্রান্ত জুন্নরচে গঁবে মোগলাঁচ্যা দংগামুলে জরালে ব লুটলে, পায়মল্লী থালী আলে। তাঁস সুভা জাউন কেটল করার খেউন লাবনী করাবী।)

দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেরা রাজস্ব আদায়ের কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে পেশবা সরকারের কোন কার্য্যেই আসিতেন না এমন নহে। সমস্ত বতনের স্বত্ব-বিষয়ক দলীলের নকল তাঁহাদের নিকটে থাকিত। প্রত্যেক নূতন দলীল দেশমুখের নিকটে রেজিষ্টারী করা হইত। আবার সরকারী রাজস্ব সরকারী কর্ম্মচারীর নিকটে দাখিল করিবার সময় পাটীল তাহার একপ্রস্থ হিসাব দেশমুখের নিকটে পাঠাইয়া দিতেন। পরগণার কর্ম্মচারী যখন পেশবা সরকারে হিসাব দাখিল করিতেন, তখন দেশমুখের হিসাবের সহিত তাহার হিসাব মিলাইয়া লওয়া হইত। ইহাতে মামলতদার বা কামাবিসদারের পক্ষে সরকারী টাকা আত্মসাৎ করা একটু কঠিন হইত। এলফিনষ্টোন লিখিয়াছেন যে,—Long after the Zemindars ceased to be the principal agents, they were still made use of as a check on the Mamlatdar; and no account were passed, unless corroborated by corresponding accounts from them." দলীল-দস্তাবেজ রেজিষ্টারী করিবার জন্য দেশমুখের নিকট শিক্কা মোহর থাকিত। দেশমুখী বতনের একাধিক মালিক থাকিলে, যাঁহার জ্যেষ্ঠাধিকার, শিক্কা মোহর তাঁহারই হেপাজতে থাকিত। বতনের সকল কায তিনিই করিতেন। অপর সকলে কেবল ইনাম জমি ও বতনের আয় ভোগ করিতেন। দেশমুখী বতনের আয়ের তালিকা আগামী বারে দিব।

সাময়িকী

সর্ব্বাগ্রে আমরা বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন, দেশমাতার সুসন্তান শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দ্বয়কে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। বাঙ্গালার এই দুইজন কৃতী সন্তানের পরিচয় প্রদান করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; দেশে এমন কে আছেন, যিনি তাঁহাদের নাম জানেন না, তাঁহাদের কার্য্যের সহিত পরিচিত নহেন? সিংহ ও বসু মহাশয় অল্প দিনের জন্যই দেশে আসিয়াছেন; মাস তিন-চার পরেই পুনরায় বিলাতে গমন করিবেন। ভগবানের নিকট আমরা তাঁহাদের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শ্রীযুক্ত লর্ড সিংহ ও শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। বোম্বাইয়ে জাহাজ হইতে নামিলে তাঁহারা পরম সমাদরে গৃহীত হন; কলিকাতাতেও তাঁহাদের অভ্যর্থনার বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত লর্ড সিংহ মহাশয় বোম্বাইয়ের এবং কলিকাতার অভ্যর্থনা সভায় বর্ত্তমান ভারত-শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহারই দুই একটী অংশ আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।

বোম্বাইয়ে অভ্যর্থনার উত্তরে শ্রীযুক্ত লর্ড সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন—

"স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই কয়টী বিভাগ হস্তান্তরিত হইবে, ইহা আমি ধরিয়া লইতে পারি। এ গুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। এই সকল বিষয়ের দায়িত্ব ভার বহন করিতে আমাদিগকে যথেষ্ট শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। এ সকলের উপর দেশের

আইন ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের পরিচালনাধিকার দাবী করিবার পূর্ব্বে স্থানীয়-স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্য্যনীতি নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শেষোক্ত বিষয়সমূহের ব্যয় নির্ব্বাহ আমরা কিরূপে করিব? কোন্ দিকে উহাদের বিস্তৃতি হইতে পারে? প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ এযাবৎ যাহা করিয়াছেন তদুপরি আমূল আলোচনা হয় ত প্রয়োজন হইতে পারে। আগামী বর্ষের প্রথম হইতেই আমাদিগকে সেই নীতি ধরিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন্ কার্য্যনীতি আমরা স্থির করিয়াছি? বোধ হয় করি নাই। সুতরাং এ সময়ে আইন ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ের পরিচালনাধিকার পাইবার জন্য আন্দোলনে মাতিলে আমাদের পক্ষে শক্তির অপব্যবহার করা হইবে। এ কয়টী আমি শুধু উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিলাম। এরূপ অন্যান্য উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেশবাসীর প্রতি ইহাই আমার বাণী। আসুন, আমরা কাজে লাগি। কাজই আমাদের আন্দোলন, কথা কহিবার আর সময় নাই। শুধু কথা কহিলে কোন কাজ হইবে না; বরং তাহাতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

"আর একটী কথা আমি এখানে উল্লেখ করিব। ভারতীয় শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে মিঃ মণ্টেগুর মহত্ত্ব এদেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকে স্বীকার করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিয়া আমি অতীব আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু এই আনন্দের সময়ে যেন আমরা লর্ড চেমসফোর্ডের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতার কথা ভুলিয়া না যাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখের বহু পূর্ব্বে ভারতীয় শাসন-সংস্কারের জন্য লর্ড চেমসফোর্ড কি করিয়াছিলেন, ইহা যখন ভারতের জনসাধারণ জানিতে পারিবে, তখন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহারা আমারই মত মুক্তকণ্ঠে কহিবে যে, মিঃ মণ্টেগুর নিম্নে লর্ড চেমসফোর্ডই ভারতীয় শাসন-সংস্কারের জন্য কৃতজ্ঞতার পাত্র!

উপসংহারে আমি দেশবাসী জনসাধারণকে সম্রাটের ঘোষণার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তিনি সকলকে পরস্পরের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। পরস্পরের সহকারিতা ব্যতীত শাসন-সংস্কার আইনটী ব্যর্থ হইবে এবং আমাদের শেষ সঙ্কল্প আরও দূরে গিয়া পড়িবে। দশ বৎসর পরে পার্লামেণ্টের নিযুক্ত কমিশন কর্ত্তৃক ভারতীয় শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে আমূল তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট কোন পরিবর্ত্তনের অনুকূলে মত দিবেন না, ইহা আমি জানি। যদি আমাদিগকে পূরা দশ বৎসরই অপেক্ষা করিতে হয়, তবে সেটা জাতির বয়স হিসাবে খুব দীর্ঘকাল নহে। সারা পৃথিবীর অধিবাসিগণ আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিবে। আমরা যে শাসনাধিকার পাইয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার কতদূর করিতে পারি ইহা তাহারা উৎসুক ভাবে লক্ষ্য করিবে। আমরা যদি নূতন আইন কাজে লাগান অপেক্ষা অতিরিক্ত যোগ্যতা দেখাইতে না পারি, তাহা হইলে যাঁহারা আমাদিগকে এ পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সকলের না হউক অনেকের সহানুভূতি আমরা আর পাইব না।"

কলিকাতায় তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুগণ শ্রীযুক্ত লর্ড সিংহ মহাশয়কে যে অভিনন্দন প্রদান করেন, তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—

"You have been pleased to refer to the official positions which I have held and to the dignities which have been conferred on me from time to time. In all and each one of those occasions I have felt, as I feel at the present moment, that I was but a humble instrument by whom and through whom the status of my country and my countrymen in general has been advanced one stage further towards the attainment of that goal which I for one have ever believed to be the goal of British rule in India and which happily for us now has received Parliamentary and Statutory recognition. On each one of these occasions my first thought has been one of personal insufficiency for the duties which I ventured to assume and my next thought was a prayerful hope that I may be succeeded in turn by a more worthy representative of my country. Any sense of personal loss, discomfort, or inconvenience has been far from my mind on those occasions and if sacrifice there has been, the recognition, the generous appreciation, by all classes of the community of my services have been to me more than ample compensation for any sacrifice that I may have made and I am confident that such generous appreciation will prove the greatest incentive and encouragement to those who have already

succeeded me in some of those positions and who will in future, I hope, succeed to the other positions which I have held and to higher positions I hope.

উপরি উদ্ধৃত ইংরাজী অংশের সার মর্ম্ম এই যে, আপনারা আমার সম্মান ও উচ্চপদ লাভের কথা বলিয়াছেন। আমার সর্ব্বদাই মনে হইয়াছে যে, ইংরাজ জাতির ভারত-শাসনের যে মূল মন্ত্র এবং আমরা ভারত-শাসন সম্বন্ধে যে বাসনা ও কামনা হৃদয়ে পোষণ করি তাহারই সংসাধনের জন্য চেষ্টা করিবার জন্য ভগবান্ আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে এই মহৎ উদ্দেশ্যের কিঞ্চিৎ সহায়তার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। বড়ই সুখের কথা যে, ইংরাজ-রাজ আমাদের আশা পূর্ণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি যে সামান্য পরিশ্রম বা ক্ষতি স্বীকার করিয়াছি, ইহার সাফল্যে তাহার বহু গুণে ক্ষতিপূরণ হইয়া গিয়াছে। আপনারা আজ আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে আমার পরবর্ত্তী মহাশয়গণকে আরও অধিক উৎসাহিত করিবে এবং তাঁহারা আমার অপেক্ষাও উচ্চতর সম্মান ও পদ অলঙ্কৃত করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন।

ভারত-শাসন-সংস্কার আইনের কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। তাহা হইতেই পাঠকগণ এই শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে মূল কথা জানিতে পারিয়াছেন। এবার ভারত-ব্যবস্থাপক-সভার গঠন সম্বন্ধে কি স্থির হইয়াছে তাহাই পাঠকগণের গোচর করিতেছি। ভারত-ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য-সংখ্যা হইবে ১৪০। এই সংখ্যার ১০০ জন হইবেন জন-সাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত, ও বাকী ৪০ জন হইবেন মনোনীত। বড়লাট বাহাদুরের শাসন-পরিষদের সভ্যগণও এই সভার সভ্য থাকিবেন। প্রথম চারি বৎসরের জন্য এই সভার সভাপতি বড়লাট বাহাদুর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। সভাপতি ব্যতিরেকে এই সভায় আর একজন ডেপুটি সভাপতি থাকিবেন। ইনি সভাপতির অনুপস্থিতিতে এই সভার সভাপতির কার্য্য করিবেন। ইনি এই সভার সভ্যগণ কর্তৃক ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। বড়লাট বাহাদুর কর্তৃক নিযুক্ত সভাপতির মাহিয়ানা বড়লাট বাহাদুর নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। নির্ব্বাচিত ডেপুটি সভাপতির মাহিয়ানা ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যগণ ভোটের দ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। যিনি এই ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য হইবেন, তিনি একই কালে ষ্টেট মন্ত্রণা সমিতি বা প্রাদেশিক সমিতির সভ্য থাকিতে পারিবেন না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভার কোন সভ্যের স্থান কোনও কারণে খালি হইলে, সে জন্য এই সভার কার্য্য বন্ধ থাকিবে না। এই সভার অধিবেশনের স্থান বড়লাট বাহাদুর স্থির করিবেন। সভাপতি মহাশয় প্রয়োজন বোধ করিলে এই সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারিবেন। যে সমস্ত বিষয় পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত হইবে না, সভার কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত করিবার জন্য সেই সমস্ত বিষয় ভারত-ব্যবস্থাপক-সভা ভোটের দ্বারা স্থির করিয়া লইতে পারিবেন।

এই যে ভারত-শাসন সম্বন্ধে আইন প্রচলিত হইতে চলিল, এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে দুইটী দল হইয়াছে। আমাদের মহামান্য ভারত-সম্রাট্ এই আইন পাশ করিবার সময়ে যে অতুলনীয় ঘোষণা-বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের শাসন সম্বন্ধে এখন দেশবাসীদিগকে যতখানি অধিকার দেওয়া হইল, ক্রমে ইহার সম্প্রসারণ হইবে, এবং কালে ভারতবাসী সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার লাভ করিবে। আমাদের দেশে যে দুই দল হইয়াছে, তাহাও এই কথা লইয়াই। এক দল অর্থাৎ মডারেট দল বলিতেছেন যে, এই আইনে আমাদের যতখানি অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট; আমরা এই অধিকারের যথাযোগ্য সাফল্য দেখাইতে পারিলে, দশ বৎসর পরে অবশিষ্ট সমস্ত অধিকার লাভ করিতে পারিব; অতএব, এখন যাহা পাওয়া গেল, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সকলে মিলিয়া তাহার সাফল্যের জন্য চেষ্টা করি। অপর দল অর্থাৎ একৃষ্ট্রিমিষ্ট বা গরম দল বলিতেছেন যে, এই আইন অনুসারে যে অধিকার পাওয়া গেল, তাহা নগণ্য; আমরা যাহা চাহি, তাহার কিছুই পাইলাম না;—এ আইন একেবারে disappointing। তবে, আইন যখন পাশ হইয়া গিয়াছে, তখন এই মন্দর-ভাল যাহা পাওয়া গেল, আমরা তাহার সাফল্যের জন্য চেষ্টা করিতে বাধ্য। আমরা সেইটুকু মাত্র নিতান্ত অসন্তুষ্ট চিত্তে

করিব; এবং অধিকতর অধিকার অর্থাৎ সম্পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা লাভের জন্য আরও বেশী আন্দোলন করিতে বিরত হইব না। কথাটা কিন্তু দাঁড়াইতেছে একই স্থানে; নূতন আইনের সাফল্যের জন্য নরম-গরম দুই দলই চেষ্টা করিবেন; দুই দলই ভোট সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন, দুই দলই সদস্য-নির্ব্বাচনে অগ্রসর হইবেন। তবে, একদল পরম উৎসাহে, অপর দল অসন্তুষ্ট চিত্তে। এক দল আপাততঃ আন্দোলন করিবেন না, অপর দল আন্দোলন ছাড়িবেন না। এইটুকু মতভেদের জন্যই অমৃতসরে গরম দলের কন্‌গ্রেস হইল, আর কলিকাতায় নরম দলের কনফারেন্স হইল; নতুবা অন্যান্য সব বিষয়ে—তা পঞ্জাব হাঙ্গামাই হউক, আর আফ্রিকায় ভারতবাসীর দুরবস্থার কথাই হউক—সব বিষয়ে দুই দল একমত। বোধ হয়, সেই জন্য রহস্যপ্রিয় ইংরাজ সংবাদ-পত্র সম্পাদকগণ যখন-তখনই বলিয়া থাকেন—"Scratch a moderate and you will find an extremist."

শাসন-সংস্কারের সম্বন্ধে এবার আর কিছু বলিব না। বিগত বৎসরে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা-বিভাগে কি হইয়াছে না হইয়াছে, তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এবারকার সাময়িকী শেষ করিব। আমরা 'এডুকেশন গেজেট' হইতে এই সংক্ষিপ্ত -সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

———

১৯১৮-১৯ অব্দে বাঙ্গালার শিক্ষালয়ের সংখ্যা ৫০,৮৩৭ হইতে ৫১,৭০১ হয়; কিন্তু ছাত্র-সংখ্যা ১৯ লক্ষ ৬৫ হাজার হইতে ১৯ লক্ষ ৩১ হাজার হইয়া যায়। ডিরেক্টর বলেন ইহার কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা, দুর্ম্মূল্য এবং শস্যোৎপত্তির কমি।

———

মোট খরচ হয় ২ কোটি ৭৭৷৷০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেওয়া হয় ৮৩ লক্ষ; মিউনিসিপ্যালিটি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতি (প্রধানতঃ তাঁহাদের গবর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট হইতে) দেন ১৫৷৷০ লক্ষ; ১ কোটি ২৬৷৷০ লক্ষ ছাত্র দত্ত বেতন হইতে এবং ৪৯৷৷০ সাধারণের চাঁদা হইতে আইসে। সুতরাং ১ কোটি ১৷৷০ লক্ষ সরকার এবং মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি দেন এবং জনসাধারণে সমবেত ভাবে খাজনা টেকস দ্বারা ঐ পরিমিত টাকা দেওয়া ছাড়া ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ফি ও চাঁদায় দিয়াছে! অপর কোন প্রদেশে ছাত্রদত্ত বেতন এরূপ আদায় হয় না। বাঙ্গালীর অনেকটা নিম্নস্তর পর্য্যন্ত শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ বরাবরই আছে।

———

আর্টস্ কলেজ ৩১ হইতে ৩০ হইয়াছে। ফরিদপুর এবং বাগেরহাটে নূতন স্থাপিত। এই ৩৩টীর মধ্যে ৭টী গবর্ণমেণ্টের, ১টী মিউনিসিপ্যাল। ১২টী গবর্ণমেণ্ট সাহায্য-প্রাপ্ত। ১৩টী সাহায্য পায় না। ছাত্র সংখ্যা ২০ হাজার ৩ শত ছিল। তিন শত বাড়িয়াছে। খরচ ১৯৷০ লক্ষ। ইহার তৃতীয়াংশ প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে প্রদত্ত। উচ্চ ইংরাজী মধ্য ইংরাজী এবং মধ্য বাঙ্গালা স্কুলের সংখ্যা প্রায় সওয়া চৌদ্দ শত। ইহাদের উন্নতি জন্য গবর্ণমেণ্ট মোট ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

আহার্য্য দুর্ম্মূল্য হওয়ায় এবং রোগের প্রকোপে নিম্ন শিক্ষার স্কুলে (অপার এবং লোয়ার প্রাইমারি (ছাত্র প্রায় ৩০ হাজার কমিয়াছিল। তন্মধ্যে মুসলমান সংখ্যা শতকরা ২·৩ কমে; হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৪·৩ হারে কমিয়া যায়। নিম্ন শিক্ষার উন্নতি জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য ৫৷৷০ লক্ষ টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১১৯টী বালকদিগের জন্য এবং ৪০টী বালিকাদের জন্য নূতন প্রাইমারি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ক্রমশঃ প্রত্যেক পঞ্চায়েত ইউনিয়নে একটা স্কুল যাহাতে থাকে তাহার ব্যবস্থা হইবে। সাহায্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি করিয়া এখন নিম্নশ্রেণীর খরচের অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্ট দিতেছেন। ৭ বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গ প্রদেশ নূতন ভাবে গঠিত হয়, তখন মোট নিম্ন শিক্ষার খরচের এক তৃতীয়াংশ মাত্র গবর্ণমেণ্ট দিতেছিলেন।

———

শিক্ষক প্রস্তুত জন্য ১২৫টী স্কুল আছে। ২টী ট্রেনিং কলেজ (ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে এখন অনেক উন্নতি করা হইয়াছে), ৬টী নর্ম্মাল স্কুল, ২১৭টী গুরু ও মৌলবী ট্রেনিং স্কুল আছে। ১৩৪ জন শিক্ষক কলেজ ও নর্ম্মাল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হন; ৯৫৪ জন গুরু ট্রেনিং হইতে।

আইন শিক্ষাতেই কলেজের অধিক ছাত্র যায়। ৩১৪৯ জন আইন পড়িতেছে। ১১৩১ জন আইন পরীক্ষা দেয়। ৭৪৩ জন পাস হয়।

———

দেশে ভাল কারিকরের প্রয়োজন বাড়ায় কাঁচরাপাড়ার রেলওয়ে কারখানার এপ্রেন্টিস্‌দিগকে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে শিক্ষক পাঠাইয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ওভারসিয়ার ক্লাশ খোলা হইয়াছে। খনি সম্বন্ধীয় শিক্ষা জন্য মাজন মাটিতে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। বস্ত্রের দাম বাড়ায় তাঁতের প্রচলন বাড়ানর চেষ্টা হয়—এবং গবর্ণমেণ্ট ছয়টী কেন্দ্রে বয়ন শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন।

———

মুসলমানদিগের মধ্যে বালিকাদিগের শিক্ষা বাড়িতেছে। ৭ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু বালিকা ছাত্রীর সংখ্যা ৪০ হাজার অধিক ছিল। এই সময় মধ্যে মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা ৭০ হাজার বাড়িয়াছে। ১০ হাজার ইয়োরোপীয় এবং ইউরেশীয় (অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান) শিক্ষা পাইতেছে। ইঁহাদের জন্য বৃত্তি স্থাপন উদ্দেশ্যে কলিকাতার একজন ইয়োরোপীয় ধনী গবর্ণমেণ্টের হস্তে দশ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। প্রত্যেক ইয়োরোপীয় ছাত্র প্রতি গবর্ণমেণ্টের কত খরচ হয়—রিপোর্টের চুম্বক হইতে জানা গেল না।

মুসলমান শিক্ষার বৃদ্ধি জন্য মক্তবে সাহায্য দিতে পারার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডদিগকে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য বাড়াইয়া দেওয়া হয়। মক্তবের সংখ্যা ১৬০০ এবং ছাত্র ৩৬ হাজার বাড়িয়াছে।

আগ্নেয় রথ

[শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম-এ]

পরাগল খাঁর একমাত্র কন্যা সফিয়ন্‌নেসা সর্ব্বশাস্ত্রে বিদুষী।

সে আজ প্রায় চারিশত বৎসরের কথা। তখন বঙ্গদেশের পাঠান রাজা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বঙ্গের অধীশ্বর তখন ভারতের সর্ব্বপ্রধান নৃপতি।

চট্টলপ্রদেশ নামতঃ পাঠান সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও, সুদূর গৌড় হইতে রাজ্যের সর্ব্বস্থান, তৎকালের গতায়াতের অসুবিধার দিনে, ভাল করিয়া সচরাচর পর্য্যবেক্ষণ করা ঘটিয়া উঠিত না। তখন একদিকে আরাকানের রাজা, অপর দিকে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার অধীশ্বর, উভয়ের মধ্যে চট্টগ্রাম প্রদেশের অধিকার লইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের অভাব ছিল না,—পাঠান রাজার অধিকার কেবল নামতঃই থাকিত।

চট্টগ্রামের ভারত-বিখ্যাত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া, এবং চট্টলের সমুদ্র-সৈকত হইতে বিদেশ-বাণিজ্যের অসামান্য সম্ভাবনার বিষয় বুঝিতে পারিয়া, বঙ্গের দূরদর্শী পাঠান-নরপতি নিজ অনুপস্থিতিতে এই রাজ্যাংশ যাহাতে অধিকারচ্যুত না হয় তজ্জন্য সচেষ্ট হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইলেন সৈন্যসহ সেনাপতি পরাগল খাঁকে,—তিনি হইলেন চট্টল প্রদেশের সামরিক শাসনকর্ত্তা। তাঁহার রাজধানী পরাগলপুর,—'ডিঙ্গনিয়া' মৌজা ও বর্ত্তমান 'ধূম' রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী স্থান।

পরাগল খাঁ বীরপুরুষ; যেমন যোদ্ধা, তেমনি উদার, মহৎ অন্তঃকরণ; যেমন বীর, তেমনি পণ্ডিত। তিনি একদিকে সামরিক শাসন, অপর দিকে জনহিতকর অনেক কার্য্য, সুশৃঙ্খলামত প্রবর্ত্তিত করিলেন। তিনি আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষা তো জানিতেনই,—তার উপর নিজে পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র বিংশ বর্ষীয় ছুটিখাঁ ও একমাত্র কন্যা ষোড়শবর্ষীয়া সফিয়ন্‌নেসাকেও তদ্রূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন।

কোরাণ-শাস্ত্রবিহিত ইস্‌লামের উদার ধর্ম্মোপদেশের সঙ্গে হিন্দুর সনাতন সাহিত্য, পুরাণ ও দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা এই সামরিক শাসনকর্ত্তার গৃহের পারিবারিক জীবনকে এক অপূর্ব্ব গৌরব-প্রভায় মণ্ডিত করিয়াছিল।

শাসনকর্ত্তার গৃহে সমগ্র উৎসুক প্রজামণ্ডলী জাতিধর্ম্ম-

নির্ব্বিশেষে প্রত্যহ অপরাহ্নে কোরাণ-শাস্ত্র-বর্ণিত ধর্ম্মোপদেশ,—এবং সন্ধ্যার পর রামায়ণ মহাভারতের * যুদ্ধ-কাহিনী ও নৈতিক উপদেশ শ্রবণ করিত।

পরাগল খাঁ স্বয়ং পুত্রসহ সেই সভায় উপস্থিত থাকিতেন। তিনি বিপত্নীক,—অন্তঃপুরের কর্ত্রী তাঁহার কন্যা সফিয়ন্‌নেসা। কুমারী সফিয়ন্‌নেসা মহিলাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে অন্তরাল হইতে হিন্দু ও মুসলমান মহিলাগণসহ সেই উপদেশাবলী নিত্য শ্রবণ করিতেন।

সে যেন এক স্বপ্ন রাজ্যের কথা।

(২)

পণ্ডিত রাজীবলোচন বেদতীর্থ ছিলেন পরাগল খাঁর পরিবারে সংস্কৃতের অধ্যাপক।

হিন্দুর সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী এই নিষ্কাম, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে শাসনকর্ত্তার পরিবারস্থ সকলেই আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন।

পণ্ডিত বেদতীর্থ পরাগল খাঁকে জাতিধর্ম্মের উচ্চস্তরে রাজপদে অধিষ্ঠিত জানিতেন,—তাঁহাকে ও তৎকালীন বঙ্গদেশের পাঠান রাজাকে তিনি দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন।

সেই তো হিন্দুর রাজভক্তির চিরন্তন আদর্শ!

বেদতীর্থের একমাত্র সন্তান তাঁহার পুত্র ভবানীশঙ্কর; বয়স ২১ বৎসর; তিনি ইতিমধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত।

ভবানীশঙ্কর শাসনকর্ত্তার গৃহে প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বিবৃত করিতেন।

সফিয়ন্‌-নেসা বেদতীর্থের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিলেও ভবানীশঙ্করের সম্মুখে বড় বাহির হইতেন না। ভবানী তাঁহাকে কখনও ভাল করিয়া দেখেন নাই,—কিন্তু তাঁহার সুশিক্ষা ও সদ্গুণের বিষয় সম্পূর্ণই জানিতেন। সফিয়ন্‌নেসা নিত্য সন্ধ্যায় ভবানীর মুখ-নিঃসৃত রামায়ণ ও মহাভারতের "কথা" শুনিতেন,—আর তাঁহার অন্তঃকরণ ভক্তি-শ্রদ্ধায় নত হইত।

পরাগল খাঁ ভবানীকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার পুত্র ছুটি খাঁ ও ভবানী উভয়ের মধ্যে খুব সৌহার্দ্দ।

(৩)

সেদিন প্রভাতে ভবানীশঙ্কর শাসক-ভবন-সংলগ্ন সুবিস্তৃত পরাগল-দীঘিতে স্নান-আহ্নিক সমাধা করিয়া সিক্ত বস্ত্রে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছেন।

শুভ্র যজ্ঞোপবীত-শোভিত, অনাবৃত গৌরবর্ণ দেহ, নগ্ন পদ, ব্রাহ্মণকুমার অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে যোড়-করে দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে দাঁড়াইয়া উদীয়মান ভাস্করদেবকে প্রণাম করিলেন,—

জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥'

তার পর গৃহে যাইতে-যাইতে চণ্ডীমাহাত্ম্য আবৃত্তি করিতেছিলেন,—

'তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজান্ পুত্রানিবৌরসান্।'

সেই সময়ে নবোদিত সূর্য্যের সুবর্ণ-রশ্মি ভবানীশঙ্করের মুখে পতিত হইয়া তাঁহার বদনশ্রীতে এক নবীন ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিতেছিল।

কুমারী সফিয়ন্‌-নেসা গৃহ-কার্য্য-মধ্যে প্রাসাদ-গবাক্ষ হইতে সেই মূর্ত্তি দেখিলেন।

তখন তাঁহার বোধ হইল, যেন এ কোন্ এক স্বর্গরাজ্য,—যেখানে জাতি-ধর্ম্ম-পার্থক্য নাই; কোন্ এক অতীত-গর্ভ-নিহিত ধর্ম্মজীবন, যেখানে বিশ্বপতির স্বকীয় আদর্শে গঠিত 'মানব' তাহার মানবীয় শক্তির আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে সৃষ্টিকর্ত্তাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার অনন্ত সত্তা আত্ম-জীবনে অনুভব করিত!

তার পর কুমারী গৃহ-কার্য্যে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিলেন। ভবানীশঙ্কর এ বিষয়ের কিছুই জানিলেন না; নিশ্চিন্ত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

(৪)

সেদিন সন্ধ্যায় যখন ভবানীশঙ্কর নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণিত বিষয় বিবৃত করিতেছিলেন,

* পরাগল খাঁর সময়ে বঙ্গভাষায় বিরচিত "পরাগলী মহাভারতের" পাণ্ডুলিপি 'ধূমের' জমীদার ৺গোলকনাথ রায় রায় বাহাদুরের গৃহে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, এই গ্রন্থ গৃহে থাকিলে না কি অগ্নি-দাহ নিবারণ হয়।—লেখক।

তখন তাঁহার বাক্য-ধ্বনি কুমারী সফিয়ন্-নেসার কর্ণে কি এক নূতন মন্ত্রে বাজিয়া উঠিল।

সেদিন মহাভারতে উল্লিখিত সাবিত্রী আখ্যায়িকা গ্রন্থ-বর্ণিত সত্যবানের আদর্শে এক জীবন্ত সত্যবান্-মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে সংস্থাপিত করিল।

সেদিন রামায়ণে কৌশল্যার বিবৃত "সত্যধর্ম্মের" 'কথা' তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল,...

'সত্য প্রতিজ্ঞা নৃপতি রাজানাং সত্যবাদিনাম্।
পথিভিঃ খলু গন্তব্যং তৈর্গতা যৈঃ পিতামহাঃ॥'

(৫)

সেই দিন রাত্রিতে সফিয়ন্-সেনা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রামায়ণে সত্যধর্ম্মকেই যদি কবি প্রতিষ্ঠা ক'রতে চাইলেন, তবে আবার কেন বল্‌ছেন,—'পথিভিঃ খলু গন্তব্যং তৈর্গতা যৈঃ পিতামহাঃ' ?—পিতৃ-পিতামহের নির্দ্দিষ্ট পথকেই কেন সেই 'সত্য পথ' ব'লে উল্লেখ করা হ'লো? যা' 'সত্য' তা' যে পূর্ব্বপুরুষের ব্যবহার-প্রণালীর অপেক্ষাই করবে তার কি অর্থ আছে ?"

পিতা বলিলেন,—"যেখানে কৌশল্যা এ কথার উল্লেখ করেছেন, সেখানে তিনি দশরথকে 'সত্য'-ভঙ্গের অনুযোগ দিচ্ছেন। রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্য প্রদান বিষয়ে পূর্ব্বে অঙ্গীকার ক'রে, তার পর সেই 'সত্য' রক্ষা করা হয় নি, এই কথা কৌশল্যা বল্‌ছেন; আর তিনি দেখাচ্ছেন যে, এই 'সত্য'-ভঙ্গ কার্য্যটী দশরথের পক্ষে তাঁর পিতৃপুরুষের নির্দ্দিষ্ট আদর্শের অনুরূপ হয় নি। পূর্ব্ব শ্লোকেই আছে,—

'ইক্ষ্বাকূণাং মহান্ বংশঃ সত্যবাক্ প্রথিতঃ ক্ষিতৌ।
তত্র ত্বয়া যৌবরাজ্যং প্রতিজ্ঞায়ানৃতং কৃতম্॥"

কন্যা বলিলেন,—"তা' বুঝ্‌লেম্; কিন্তু যে ক্ষেত্রে 'সত্য'-পথ পূর্ব্ব রীতিকে অনুসরণ করে না, সেখানে তো সত্যকেই অবলম্বন করতে হবে ?"

"নিশ্চয়; কিন্তু অবস্থা বিশেষে মানুষ যে-টীকে 'সত্য' পথ ব'লে স্থির করছে, সেইটেই বাস্তবিক 'সত্য' কি-না তার মীমাংসা সহজ নয়। সে মীমাংসা বড় উচ্চ সাধনা আর সংযম-সাপেক্ষ। অনেক সময়ে 'সত্য' ভ্রমে মিথ্যাকে অবলম্বন করাই সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ হ'য়ে পড়ে।"

সে দিন এ প্রসঙ্গ এই স্থানেই সমাপ্ত হইল।

কন্যার প্রশ্নে পিতা একটু চিন্তান্বিত হইলেন।

কন্যা সর্ব্বদাই পিতার সহিত অবাধে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে আলোচনা করিতেন। আজ কিন্তু পিতা দেখিলেন, কন্যার প্রশ্ন ও মীমাংসার আকাঙ্ক্ষা চিন্তা ক্লান্তি শূন্য নয়।

(৬)

তার পর দিন সফিয়ন্-সেনা সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিতেছেন; পিতা আসিয়া সেখানে বসিলেন।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বেদতীর্থ এলে তার কাছে, তোমার গত কল্যের প্রশ্নের কথা তুল্‌লে হয় না ?"

কন্যার মুখ আরক্ত হইল; তিনি বলিলেন,—"তাঁর কাছে এ প্রসঙ্গের আলোচনা করতে আমার বড় লজ্জা হবে।"

এ কথায় পিতা একটু গম্ভীর হইতেই, কন্যা আবার বলিলেন, "তিনি হয় তো ভাব্‌বেন, আমি সামাজিক মত-পার্থক্যের কথা তুলে' তাঁকে বেদনা দিচ্ছি।"

বড় চেষ্টায় সফিয়ন্-সেনা এই কথা বলিলেন;—কিন্তু কন্যার এই স্বেচ্ছা-প্রদত্ত আত্ম-বর্ণনা তাঁহার উদার হৃদয় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক হইলেও, পিতা তাহাতে আরো একটু চিন্তিত হইলেন।

কন্যাও তখন একটু বিব্রতা বোধ করিলেন।

এদিকে সেই মুহূর্ত্তে সহাস্য বদনে বৃদ্ধ পণ্ডিত বেদতীর্থ আসিয়া উপস্থিত; তিনি বালিকার শেষোক্ত বাক্যের কিয়দংশ শুনিয়াছিলেন।

পরাগল খাঁকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া বেদতীর্থ সস্নেহে কুমারীকে বলিলেন,—"হাঁ, মা! সামাজিক কি-বিষয়ের মত-পার্থক্যের কথা তুলে' কা-কে বেদনা দেবার কথা হচ্ছিল? আমার কাছেও কি তা' বল্‌তে নেই মা ?"

বেদতীর্থ জানিতেন তাঁহার এই ছাত্রীটী কোনও প্রসঙ্গের প্রশ্নই তাঁহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে বাধা বোধ করিতেন না।

এবার প্রত্যুৎপন্নমতি কুমারী বলিলেন,—"আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

তখন পরাগল খাঁ একটু হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ, আমার কন্যার উপযুক্ত উত্তর হ'য়েছে।"

তার পর একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া পরাগল খাঁ আবার সহাস্যে বলিলেন,—"এই কথা হ'চ্ছিল, যে, কৌশল্যার উক্তিতে রামায়ণ-নির্দ্দিষ্ট 'সত্য' পথ অবলম্বনের প্রসঙ্গে পূর্ব্বপুরুষের অনুসরণের বিষয় কেন উল্লিখিত হ'লো ? 'সত্য' নিজেই তো সমস্ত মানবের অবলম্বনীয়।"

বেদতীর্থ সহজ ভাবেই বলিলেন,—"হাঁ, আমার ছাত্রীর উপযুক্ত প্রশ্ন হ'য়েছে। আমি এ প্রশ্নে সন্তুষ্ট হ'য়েছি। আপনি এর উত্তর—"

পরাগল খাঁ নিজ অভিমত তখনই জ্ঞাপন না করিয়া বলিলেন,—"আমিও তো আপনার উত্তরের অপেক্ষা কর্‌ছি।"

বেদতীর্থ বলিলেন,—"বেশ ; আমার মতে 'সত্য' নিজেই মানবের অবলম্বনীয়—"

"তবে রামায়ণে—"

"যে অংশে রামায়ণে পিতৃপুরুষের উল্লেখ হ'য়েছে, সে অংশে দশরথের 'সত্য' ভঙ্গের কার্য্য দেখানো হ'য়েছে,—অথচ তাঁর বংশে পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্বদাই 'সত্য' পালন করেছেন।"

তখন পরাগল খাঁ বলিলেন,—"যদি ব্যক্তিবিশেষ 'সত্য' বিবেচনা ক'রে ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করে ?"

বেদতীর্থ বলিলেন,—"তা' বড়ই স্বাভাবিক ; সেই জন্য স্থির 'সত্য' নির্দ্ধারণ উচ্চ সাধনা ও সংযম-সাপেক্ষ।"

কুমারী দেখিলেন, বেদতীর্থ ও পিতা বস্তুতঃ একই মীমাংসায় আসিতেছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর উত্তরের পরও তো অনেক প্রশ্ন উঠিতে পারে।

সফিয়ন্‌-নেসা আরও কি জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন ;—কিন্তু সহস্র চেষ্টায়ও তাঁহার মুখ দিয়া আর একটী প্রশ্নও নির্গত হইল না।

স্নেহময় পিতা ও শুভানুধ্যায়ী বেদতীর্থ উভয়েই তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া বিমর্ষ হইলেন।

পিতা চলিয়া গেলেন।

তখন অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার জন্য কুমারী পুস্তক আনিতে গেলেন।

আবার তাঁহার মনে পড়িল, সেই উদীয়মান্ ভাস্কর-দেবকে প্রণামকালীন ভবানীশঙ্করের মূর্ত্তি,—দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সেই গৌরবান্বিত ভাস্কর-তুল্য 'মানব-দেবতা'।

কুমারী ভাবিলেন,—উচ্চ সাধনা ও সংযম ভিন্ন স্থির সত্য-নির্দ্ধারণ হইতে পারে না ; অন্ততঃ এই পর্য্যন্ত 'সত্য জ্ঞান তিনি আজ লাভ করিয়াছেন।

* * * * *

তার পর যথারীতি পাঠ-কার্য্য সমাধা করিলেন।

(৭)

তার পর দিন ভবানীশঙ্কর এই আলোচনার বিষয় জানিতে পারিলেন।

কথাচ্ছলে তাঁহার পিতৃদেব এ বিষয়ের উত্থাপন করিয়াছিলেন। বেদতীর্থ তো আর জানিতেন না, কি জন্য তাঁহার ছাত্রী সে দিন ঐ সব প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কাজেই প্রশ্ন ও মীমাংসার চেষ্টার কথার উল্লেখকালে বেদতীর্থ অতি সহজ ভাবেই পরাগল খাঁ ও তাঁহার কন্যার প্রসঙ্গও উত্থাপন করিলেন।

আবার একদিন প্রাসাদের বহিঃ-প্রাঙ্গণে পরাগল খাঁ ও বেদতীর্থ এই সম্বন্ধে সমালোচনা করেন। তখন সেখানে ছুটি খাঁ ও ভবানীশঙ্কর উপস্থিত ছিলেন। কথায়-কথায় সেদিন জাতিধর্ম্মের গণ্ডী নির্দ্দেশের বিষয় উঠিল।

সরল প্রকৃতি ছুটি খাঁ বলিলেন,—"যদি জাতিধর্ম্মের এতদূর দৃঢ়-নিবদ্ধ গণ্ডী না থাকিত, তবে আমি বড় আনন্দের সহিত ভবানীর সঙ্গে আমার ভগিনীর বিবাহ দিতাম।"

বড় কঠিন একটা কথা অতি সহজ ভাবেই বালক ছুটিখাঁ বলিয়া ফেলিলেন।

এক সঙ্গে পরাগল খাঁ ও বেদতীর্থ বলিলেন,—"ওঃ, তা-ও কি কখনো হয় ?"

কুমারী এ বিষয়ে কিছুই জানিলেন না।

(৮)

আরও প্রায় দুই মাস চলিয়া গিয়াছে। সফিয়ন্‌-নেসা আত্ম-সংযম ও সাধনা অভ্যাসের চেষ্টা করিতেছেন।

তাঁহার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রে কি এক ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে,—জাতি-ধর্ম্মের বহুদূর বহির্দেশ হইতে কোন এক মহা প্রেরণা তাঁহার সমস্ত অস্তিত্বকে জাগাইয়া তুলিয়াছে,—কি যেন এক কঠোর ব্রতানুষ্ঠান-বাসনা তাঁহার সমস্ত

পার্থিব শক্তিকে সচেতন করিয়াছে,—তাহার প্রকৃত সত্তা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেছেন না।

তাঁহার মনে পড়িত, সাবিত্রীর মৃত পতি-পদ-প্রান্তে বসিয়া সেই মহা প্রার্থনা,—যে প্রার্থনায় যমরাজও ভীত হইয়াছিলেন; তাঁহার মনে পড়িত, সেই কৈলাসবাসিনী পার্ব্বতীর রুদ্র আরাধনা,—যে আরাধনায় স্বয়ং সর্ব্বত্যাগী মহাদেব শঙ্কর "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া অঞ্জলি পাতিয়া আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন।

এ-ও কি 'মানবীয়' প্রার্থনায় সম্ভব? প্রাণান্তেও যে এ কথা জন-প্রাণীকেও জানান যায় না! আবার, ভবানীশঙ্করের কাণে যদি এ কথা কোনও দিন ওঠে!—তার চেয়ে শত সহস্রবার মৃত্যুও যে অধিকতর বাঞ্ছনীয়!

আবার কুমারীর মনে হইত, সেই দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব-কোণ, সেই যে তাঁহার পীঠস্থান; সেই স্থানেই যে তাঁহার সাধনার প্রথম সূত্র। কিন্তু সেই সূত্র অবলম্বনে সাধনা-পথ অনুসরণ করিলে, তিনি কোন্ সিদ্ধিতে উপনীতা হইতে পারিবেন? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন্ রাজ্যে তাঁহার সেই সাধনার সিদ্ধি-ক্ষেত্র?

কাহাকেও কিছুই জিজ্ঞাসা করা চলে না,—পিতাকেও না, বেদতীর্থকেও না,—সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ক্লেশ।

(৯)

মাতৃহীনা কন্যার পিতৃ মাতৃ স্থলে অধিষ্ঠিত স্নেহশীল পিতা বুঝিলেন,—কন্যা এক অজ্ঞাত ক্লেশ হৃদয়ে বহন করিতেছেন। কন্যার শত হাস্য-চেষ্টায়ও তাহার চিহ্ন আচ্ছাদিত হইল না। সরল হৃদয় বেদতীর্থও এইরূপ আশঙ্কা করিতেছিলেন।

ওদিকে ছটির্খাঁর সেই বালক-সুলভ সরল উক্তির পর ভবানীশঙ্কর আর অবাধে পুরাণ-কাহিনীর বিবৃতি করিতে পারেন না; কি যেন একটা দৃঢ় চেষ্টা ব্যতীত তাঁহার বাক্য-প্রকাশ হয় না।

বেদতীর্থ ও পরাগল খাঁ উভয়েই তাহা লক্ষ্য করিলেন,—কিন্তু এ প্রসঙ্গের আলোচনা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

আবার দৈনন্দিন নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ভবানীশঙ্কর তাঁহার উপর এক অদৃশ্য মহাশক্তির অদম্য প্রভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই শক্তির বিষয় তাঁহাকে কেহ কখন বাক্যে প্রকাশ করিয়া কিছুই বলে নাই। সে শক্তির কথা তিনি প্রাণান্তে কাহাকেও কিছু বলিতে অসমর্থ। তিনি অনুভব করিতেন, যেন তিলে-তিলে, পলে-পলে,—কোন্ সুদূর প্রভঞ্জন তাঁহাকে কম্পিত করিয়া তুলিতেছে; কোন্ বেগবতী প্রবাহিনী তাঁহাকে কোন্ এক অজ্ঞাত প্রদেশে,—জাতিধর্ম্মের লৌহ গণ্ডীর বহু দূরস্থিত এক অভিনব মহা-জগতের কেন্দ্রস্থলে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে।

সেই অদৃশ্য শক্তি যেন আবার তাঁহাকেও কি-এক কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত করিতেছে; তাঁহার সমস্ত মানবীয় ক্ষমতাকে কি-এক অসাধ্য ব্রতের অসম্ভব ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য নিয়োজিত করিতেছে।

তিনি জানেন না, কি সে অপ্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য; কোন্ ক্ষেত্রে সে উৎকট সাধনার সিদ্ধিস্থল।

এ বিষয়ে যে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা চলে না, এই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ক্লেশ।

(১০)

ক্লেশ? ক্লেশের চক্র অতিক্রম করিলে কি আনন্দ-রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না?

পার্থিব ব্যবধানের বহির্ভাগে কি অপার্থিব দেশ নাই?

এই তো সেই সাধনার সিদ্ধিক্ষেত্র!

একদিন কুমারী ও ভবানী, উভয়েরই মনে একই সময়ে এই কথার উদয় হইল।

(১১)

তার পর প্রায় ৩।৪ দিন চলিয়া গিয়াছে।

একদিন প্রাতে বেদতীর্থ চঞ্চল ভাবে প্রাসাদে আসিলেন। তখন পরাগল খাঁও ব্যস্ত ভাবে চিকিৎসকের জন্য লোক পাঠাইতেছিলেন।

বেদতীর্থ বলিলেন,—"ভবানী সাংঘাতিক জ্বরে পীড়িত, বিকার অবস্থা।"

পরাগল খাঁ বলিলেন,—"আমার কন্যারও সাংঘাতিক জ্বর, সম্পূর্ণ বিকার অবস্থা।"

উভয়ের কথায় জানা গেল,—ভবানী ও সফিয়ন্-নেসার গত রাত্রিতে ঠিক একই সময়ে জ্বর হইয়াছে! কুমারী

বিকার অবস্থায় বলিতেছেন,—"আমার মৃত্যু হ'লে আমার দেহ যেন দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সমাহিত করা হয়।"

একটা তমসাচ্ছন্ন যবনিকা পরাগল খাঁ ও বেদতীর্থ উভয়ের চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত হইল।

(১২)

সেই দিন ও রাত্রি কুমারী ও ভবানীর সম্পূর্ণ বেগে জ্বর চলিল। যথাসাধ্য চিকিৎসায়ও কোনও ফল হইল না।

পরদিন যখন প্রভাত-ভাস্কর 'পরাগল দীঘির' সন্নিহিত প্রদেশটী সুবর্ণ-রশ্মিতে উদ্ভাসিত করিতেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে উভয়ের আত্মা পার্থিব দেহ হইতে মহাপ্রস্থান করিল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে, রাত্রিশেষে,—উভয়েই বিভিন্ন গৃহে একই সময়ে বলিয়াছিলেন,—"ঐ দেখ, 'আগ্নেয় রথ'!"

সে-দিন পূর্ণিমা তিথি।

* * * * *

কুমারীর ইচ্ছামত তাঁহার পবিত্র দেহ দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সমাহিত করা হইল।

আর সেই একই সময়ে দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্ত সংলগ্ন ভূমিতে বেদতীর্থের একমাত্র পুত্রের পবিত্র দেহ অগ্নি-প্রদাহে ভস্মীভূত করা হইল।

* * * * *

জাতিধর্ম্মগত সমস্ত ব্যবধানের চূড়ান্ত মীমাংসার পর পরাগল খাঁ ও বেদতীর্থ উভয়ে আজ আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া একত্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

তখন সৎকারার্থ সম্মিলিত সমস্ত জনমণ্ডলী সবিস্ময়ে দেখিলেন,—যেন এক 'আগ্নেয় রথ' ভবানীশঙ্করের চিতা-বহ্নি-শিখার উপর হইতে উত্থিত হইয়া কুমারীর সমাধিস্থানের উপরিভাগে বিচরণ করিতে করিতে বায়ু-পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাশ্রুনয়নে বেদতীর্থ বলিলেন,—

"মৃত্যুকাল-বশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্।"

পরাগল খাঁ তখনও তাঁহার সহিত আলিঙ্গন-বদ্ধ। উভয়েরই ঊর্দ্ধ দৃষ্টি!

* * * * *

আজ প্রায় চারিশত বৎসরের পর এখনও পূর্ণিমা রাত্রিতে সেই "আগ্নেয় রথ" "পরাগল দীঘির" দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের উপরিস্থিত বায়ু-মণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায় কি না, জানি না; তবে বিস্তীর্ণ প্রাচীন দীঘিকার সর্ব্বস্থানের জল গুল্মাচ্ছাদিত হইলেও, দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ আজও আশ্চর্য্যরূপ পরিচ্ছন্ন।

ভূগর্ভস্থ কোন্ প্রচ্ছন্ন প্রদাহ বুঝি সেই অংশের সলিল-নিয়স্থ মৃত্তিকায় সতর্ক প্রহরী থাকিয়া আজও তথায় জল-গুল্মের প্রাদুর্ভাব নিবারণ করিতেছে!

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

কুমারী ব্রিজকুমারী সারগা বি-এ কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। কাশী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তিনি গত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে স্বীয় বস্ত্রে কেরোসিন ঢালিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। লোকে অনুমান করিতেছে, temporary fit of insanityর (অল্পকাল স্থায়ী উন্মত্ততা রোগের) দরুণ তিনি এই কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার উন্মত্ততা রোগ উপস্থিত হইল কেন, তাহার কারণ অনুমান করিতেও লোকে বাকী রাখে নাই। অর্থাৎ তিনি বি-এ ডিগ্রি পাইবার পর ছয় মাসের মধ্যেই এম-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এই অতিরিক্ত মানসিক শ্রম তাঁহার সহ্য হইল না। লোকের অনুমান-শক্তির বাহাদুরী আছে, সে কথা অস্বীকার করিব না। কিন্তু তাহাতে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। সংবাদপত্রে এই সংবাদটি পড়িয়া অবধি আমাদের মনে নানা কথার উদয় হইতেছে।

———

স্নেহলতার কেরোসিনে পুড়িয়া মরা অবধি এবং সেই ঘটনাটিকে খবরের কাগজে ঢাক বাজাইয়া খুব বড় করিয়া তোলা অবধি, মেয়েদের কেরোসিনে পুড়িয়া মরিবার একটা পথ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন সহজ পন্থা সর্ব্বদা হাতের কাছে থাকাতে সামান্য মাত্র উত্তেজনার কারণ ঘটিলেই মেয়েরা পরনের কাপড়ে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। নচেৎ, এত ঘন ঘন কেরোসিনে পুড়িয়া মরার

খবর শুনিয়া শুনিয়া লোকের কাণ ঝালাপালা হইয়া উঠিত না। এই নিত্য এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য সুলভ জিনিসটার এমন একটা সুমহৎ গুণের পরিচয় পাইয়া কেবল কি মেয়েরাই পুড়িয়া মরিতেছে? শুনিতে পাই, দুই একটা পুরুষও তাহাদের পৌরুষে জলাঞ্জলি দিয়া এই মেয়েলী ঢংয়ে পুড়িয়া মরিয়াছে। এইরূপে আন্দোলনের ক্ষেত্র 'প্রস্তুত' (create, কারণ, ইহা স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন হয় নাই) করিয়া, একদল লেখক হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—হিন্দুর সমাজ বন্ধন এবং সমাজ গঠন প্রণালীকে এই সকল ব্যাপারের জন্য দায়ী করিতেছেন। এরূপ দায়ী করা যে কতটা সঙ্গত তাহা বিবেচনার স্থল। তন্মধ্যে প্রথম কথা এই যে, স্নেহলতার বিয়ে হইল না বলিয়া সে পুড়িয়া মরিল,—তাহার বাপের টাকা ছিল না বলিয়া বিয়ে হইল না,—ছেলের বাপ টাকা না পাইলে ছেলের বিয়ে দিবেন না। এই সকল ব্যাপারের জন্য সমাজ দায়ী কিসে? ছেলের বাপ যে মেয়ের বাপের নিকট হইতে টাকা না পাইলে ছেলের বিয়ে দিতে চাহিতেছে না, ইহা কি সমাজ গঠন প্রণালীর ত্রুটিতে ঘটিতেছে? ইহা ত বর্ত্তমান শিক্ষার কুফল! আর কতকটা সময়ের গুণে স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিতেছে! সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রসাতলে পাঠাইলেও কি লোকের অর্থ পিপাসা মিটিবে, না, লোকের অর্থলোভ সংযত হইবে? তাহা হইলে ত যে সকল জুয়াচোর ব্যবসায়ী জিনিস-পত্রে নানারূপ ভেজাল দিয়া চড়াদামে বেচিতেছে, তাহাদের পাপের জন্যও হিন্দুর সামাজিক আচার ব্যবহারকেই দায়ী করিতে হয়! সে যাহা হউক, এখন কথা এই যে, যে কোন মেয়ে—তা সে কুমারী হউক, সধবা হউক, বিধবা হউক,—কেরোসিনে পুড়িয়া মরিলেই, সেজন্য সমাজকে দায়ী করা ঠিক নয়। আচ্ছা, এই যে মেয়েটি—বিদুষী কুমারী কেরোসিনে পুড়িয়া মরিল, ইহার জন্য হিন্দু সমাজ বন্ধন প্রণালীকে দায়ী করা চলে না কি? দায়ী করিবার সকল লক্ষণই ত রহিয়াছে! ইনি কুমারী। সুতরাং পিতাকে কন্যাদায়-মুক্ত করিবার জন্য ইনি কি পুড়িয়া মরিতে পারেন না? এবং সে জন্য হিন্দু সমাজ কি দায়ী নহে?

এইবার আমরা আর একটা দিক দিয়া এই বিদুষী মহিলার শোচনীয় আত্মহত্যার কাহিনীর আলোচনা করিব। ইনি কুমারী হইলেও, এম-এ পরীক্ষা যখন দিয়াছেন; তখন নিতান্ত ছেলেমানুষটি নহেন। তার পর, ইনি যখন শিক্ষার ক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, তখন ইনি যে নিতান্ত গোঁড়া হিন্দু পরিবার ভুক্তা নহেন, ইনি যে খুব progressive party, সে কথাও বেশ বুঝা যায়। তথাপি ইঁহার এই পরিণাম ঘটিল কেন? এখানে প্রশ্ন উঠিতেছে, বর্ত্তমান কালে আমাদের মেয়েদের শিক্ষালাভের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা তাঁহাদের পক্ষে কতখানি উপযোগী? গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনে বর্ত্তমান ব্যবস্থার স্ত্রীশিক্ষায় মেয়েদের যে কোনই উপকার হয় না, একথা এখন প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তবে এই উচ্চ শিক্ষা লাভের অপর কি সার্থকতা থাকিতে পারে? তার পর, কন্যাটির আত্মহত্যার কারণ বলিয়া যাহা শুনা যাইতেছে, তাহা সত্য হইলে ত বড় ভয়ানক কথা। ইহা ত জানিয়া শুনিয়া মেয়েটিকে হত্যা করা—(deliberate murder)। আমাদের সাধারণ বিশ্বাস মতে স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ কোমলা। এই সাধারণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এই যে তাঁহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য উৎসাহিত, উত্তেজিত করা হইতেছে, ইহা কতদূর সঙ্গত? আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহি, ঘোর পক্ষপাতী। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী এবং শিক্ষনীয় বিষয়গুলি মেয়েদের সম্যক উপযোগী নহে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এমন কি বর্ত্তমান শিক্ষা আমাদের ছেলেদেরও উপযোগী কি না, সে পক্ষেও এখন অনেকের মনে ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছে। অতএব এই শিক্ষা যে মেয়েদের কতখানি উপকারী হইতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। আমরা চাই যে, মেয়েদের শিক্ষার কথাটা একবার ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা হউক, এবং তাঁহাদের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। যাহাতে তাঁহাদের শিক্ষা তাঁহাদের জীবনে ফলপ্রদ হয়, যাহাতে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক স্ফুরণ হয়, উচ্চ শিক্ষার লোভে তাঁহাদিগকে স্বাস্থ্য-ধনে বঞ্চিত হইতে না হয়, এমন ভাবে শিক্ষা-প্রণালী ও শিক্ষণীয় বিষয় নির্দ্ধারিত করা হউক।

তার পর, আরও একটী গুরুতর কথা। এই মেয়েটির অকাল মৃত্যু কেবল তাঁহার temporary insanityর ফল বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না,—যাঁহারা এখন মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহারা দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। স্কুলে কলেজে ছেলেদের স্বাস্থ্য কখন কেমন থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কি স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য নহে? ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষায় পাশ করাইবার জন্য তাহাদিগকে খুব উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা দিবার উপযোগী অবস্থায় আছে কি না, সেটা দেখা কি কাহারও কর্ত্তব্য নহে? এ বিষয়ে অবশ্য ছাত্র ছাত্রীর পিতা, মাতা, বা অন্য অভিভাবক প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ দায়ী হইলেও, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরও এ বিষয়ে একটা দায়িত্ব আছে। আর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা। শুনিতে পাই, বিলাতী স্কুল কলেজে ঘন ঘন ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমান সভ্য জগতে অধুনা ঘৃণিত জার্ম্মাণী—হুনেরা, আবার এ বিষয়ে অধিকতর অগ্রসর। এইরূপে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকায় তাহাদের শরীরের অবস্থায় যাহা সহ্য হয়, এই পরিমাণ শিক্ষাই তাহাদিগকে দেওয়া হয়। এদেশের স্কুল কলেজের ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রথা কেন প্রবর্ত্তিত হইবে না তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা দেশের মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণকে এই বিষয়টি একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

"দিল্লী নগরে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা" শীর্ষক একখানি একশিট কাগজ কোন রকমে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কাগজখানি পড়িয়া বিশেষ

উপকৃত হইলাম। দিল্লী-প্রবাসী কতকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ইহার কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। বাঙ্গলা দেশের বাহিরে হঠাৎ কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক গিয়া পড়িলে অন্য কোথাও যদি আশ্রয় না পান, তবে এইরূপ কালীবাড়ী এবং তদনুরূপ ধর্ম্মভবনে তাঁহার আশ্রয় মিলিতে পারে। ইহা কম সুবিধার কথা নহে। দিল্লীর কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতৃবর্গ বলিতেছেন যে, তাঁহারা এইরূপ বিপন্ন অতিথিকে তিন দিন আশ্রয় ও আহার্য্য দিয়া থাকেন। এই তিন দিনের মধ্যে অতিথি নিশ্চয়ই অপর কোন বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন। এই সৎ অনুষ্ঠানের জন্য দিল্লী প্রবাসী বঙ্গবাসী ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু শুধু ধন্যবাদ দিলেই আমাদের এ পক্ষের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হয় না। এই অনুষ্ঠানটি কিছু অর্থব্যয় সাপেক্ষ। কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য ২৫০০০ টাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে ৩০০০ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে। আর প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছে কিছু কম ছয় হাজার। বাকী টাকাটা চাই। সুতরাং আশা করি, প্রবাসী বাঙ্গালীগণের এই সদনুষ্ঠানে সাহায্য করিবার কথাটা গৃহবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। দিল্লীর জুম্মা মসজিদের নিকটে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এল-এম-এস মহাশয় বাস করেন; তিনিই কালীবাড়ী নির্ম্মাণ সমিতির সভাপতি। দাতৃবর্গ ইঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গল্পের বই "ছবি" আট আনা সংস্করণ গ্রন্থাবলী-ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইল।

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "হিন্দুবীর" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "মান রক্ষা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২৲।

গত ১২ই মাঘ সরস্বতী পূজার দিবসে মাইকেল মধুসূদনের জন্ম ভূমি সাগরদাঁড়ীতে মধুসূদনের স্মৃতি পূজা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে একটী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সভায় মধুস্মৃতি-রচয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। সভার কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

হরিসাধন বাবুর "রঙ্গমহল কাহিনী সিরিজের" তৃতীয় উপন্যাস "দেওয়ানা" বাহির হইয়াছে। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত উমাপদ রায় সঙ্কলিত "মহাবীর গারফীল্ড" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য সাধারণ সংস্করণ ৸৹, রাজ সংস্করণ ১৷৹ মাত্র।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত দুই অঙ্কে সমাপ্ত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত নাটক "বৈবাহিক" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আট আনা।

শ্রীসাহাজী প্রণীত "শীতল" প্রকাশিত হইল। দাম চারি আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রণীত "কবিকথা" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মহাকবি ভাসের নাটকাবলী কথাকারে লিখিত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ভাসের সমস্ত গ্রন্থের অনুবাদ হয় নাই। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ মহাশয়ের "ফোয়ারা"র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চারিটী নূতন প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য পাঁচ সিকা।

Publisher- Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

পল্লী-প্রান্তে

"কত কথা তারে ছিল বলিতে—
চোখে চোখে দেখা হ'ল পথ চলিতে।"

রবীন্দ্রনাথ।

শিল্পী—সার আরনেষ্ট এ. ওয়াটারলো, আর এ.

BLOCKS by BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

চৈত্র, ১৩২৬

দ্বিতীয় খণ্ড] সপ্তম বর্ষ [চতুর্থ সংখ্যা

মুঘল-ভারতেতিহাসের লুপ্ত-উপাদান *

[অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্-এ, পি-আর্-এস্, আই-ই-এস্]

আক্‌বর হইতে প্রথম বহাদুর শাহ্‌ পর্য্যন্ত, মুঘল-সম্রাট্‌গণের প্রায় দেড়শত বৎসরাধিক কালব্যাপী সরকারী ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সকল ফার্সী ইতিহাস দিল্লীর রাজদপ্তরখানায় রক্ষিত সরকারী চিঠিপত্র, সংবাদ-লিপি, সন্ধিপত্র, ফর্ম্মান্‌ ও রাজস্ব-বিবরণীর সাহায্যে সম্রাটের আদেশে সঙ্কলিত হইত। স্থান, কাল, এবং পাত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও যথাযথ বিবরণ দেওয়া আছে বলিয়া এই সকল ইতিহাস মূল্যবান্‌।

সত্য বটে, সরকারী ইতিহাসগুলিতে সাহিত্য-রসের সম্পূর্ণ অভাব; কেন না, ইহাদের বর্ণিত বিষয়গুলি কেবল কালানুক্রমে লিপিবদ্ধ;—একাধারে গভর্মেণ্ট গেজেট ও পুলিস রিপোর্টের মত কেবল নাম ও ঘটনার নীরস তালিকা মাত্র। কিন্তু, ঐতিহাসিকের নিকট এই শ্রেণীর বিবরণ অতি মূল্যবান্‌। সম্রাটের পড়িবার জন্য এবং সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে, স্বয়ং বাদশাহ্‌ অথবা তাঁহার উজীর কর্ত্তৃক সংশোধিত হইলেও, এই সকল রাজকীয় ইতিহাস রাজসৈন্যের পরাজয়, অথবা রাজ্যের কোন অংশে প্রাকৃতিক-বিপ্লবের কথা, অধিকাংশ স্থলেই গোপন করে নাই। অনেক স্থলে দেখা যায় বটে, রাজকর্ম্মচারিগণের কীর্ত্তিকলাপ সম্রাটের নামে আরোপিত হইয়া সরকারী ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু তাহা কিছু নূতন ব্যাপার নহে,—রাজকীয় ইতিহাসের ধারাই এইরূপ। ফরাসী সংবাদপত্র *Moniteur* নেপোলিয়ন্‌ কর্ত্তৃক জেনার যুদ্ধজয়ই প্রুসিয়ার পতনের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু ঐ একই দিনে Auerstadt যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার জনৈক সেনাপতি ফরাসী-সৈন্যের অপর বিভাগ লইয়া, তদপেক্ষা কঠিন যুদ্ধ করিয়া, অনেক বেশী ফলপ্রদ যে বিজয়লাভ করিয়াছিল, তাহার উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

* লাহোর Indian Records Commissionএ পঠিত।

মুঘল সরকারী ইতিহাসগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থাকায় বিশেষ সুবিধা এই যে, কোন তারিখ বা নামের ভুল হইলে, পূর্ব্বাপর অসামঞ্জস্য দৃষ্টে অনায়াসে তাহা সংশোধন করা যায়। এই শ্রেণীর ইতিহাস-সাহায্যে রাজ-অভিযান ও রাজসৈন্যের কোন স্থান হইতে স্থানান্তরে দৈনিক গতিবিধির সঠিক সংবাদ আমরা জানিতে পারি। আক্‌বরের মন্ত্রী আবুল্‌-ফজল্‌ লিখিত 'আক্‌বরনামা' হইতে সরকারী ইতিহাস লেখার সূত্রপাত, এবং সেই সময় হইতে প্রথম বহাদুর শাহ্‌র দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্ক পর্য্যন্ত পর-পর প্রতি সম্রাটের ইতিহাস এইরূপে লিখিত হইয়াছে। *

দুঃখের বিষয়, ১৫৫৬-১৭০৯;—এই সমগ্র ১৫৩ বৎসরের ইতিহাস সর্ব্বত্রই সমভাবে বর্ণিত হয় নাই। আওরংজীবের রাজত্বের শেষ ৪০ বৎসরের ইতিহাস একখানি স্বল্পায়তন গ্রন্থমধ্যে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে; অন্যান্য মুঘল-সম্রাট্‌, অথবা আওরংজীবের প্রথম দশ বৎসরের ইতিহাস, যেরূপ বিস্তৃতি এবং ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, এই ৪০ বৎসরের ইতিহাসে তাহার দশমাংশমাত্র স্থান দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল দরবারী-ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে সঙ্কলনমাত্র। আধুনিক ঐতিহাসিক ইহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। যে মূল উপাদান-অবলম্বনে এই ইতিহাসগুলির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, বর্ত্তমান ঐতিহাসিক তাহারই সন্ধান করেন। এইরূপ মূল উপাদানগুলিকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—

(১) চিঠিপত্র

যেমন, বাদ্‌শাহ্‌র নিকট প্রেরিত কর্ম্মচারী অথবা কুমারগণের পত্রাবলী—নাম আর্জদাশ্‌ৎ; প্রতি যুদ্ধের পর বিজয়ী সেনাপতি কর্ত্তৃক সম্রাটের নিকট প্রেরিত বিবরণ—'ফৎহ্‌নামা'; প্রাদেশিক কর্ম্মচারী অথবা সেনাপতিদিগকে বাদ্‌শাহ্‌ স্বয়ং যে-সব চিঠি লিখিতেন—(ফর্ম্মান্‌ শুক্কা বা মন্‌শুর) অথবা উজীর বা মন্ত্রীকে দিয়া লিখাইতেন—(হস্‌ব্‌-উল্‌-হুকুম্‌ অর্থাৎ By order.); রাজকুমারগণ সম্রাট্‌ ভিন্ন অপর সমস্ত ব্যক্তিকে যে সব পত্র লিখিতেন—(নিশান্‌); রাজকর্ম্মচারীবর্গের মধ্যে যে-সকল পত্র-বিনিময় হইত (রুকাৎ বা ইন্‌শা), এবং বেতনভোগী সংবাদ-দাতার পত্র—(ওকাএ)। বাদ্‌শাহী-শাসনকালে প্রত্যেক প্রদেশে, প্রত্যেক রাজপুত্রের সভায়, এবং প্রত্যেক সামরিক অভিযানের সঙ্গে এক-একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত। সে তথাকার ঘটনাগুলি নিয়মিতরূপে বাদ্‌শাহ্‌র নিকট পাঠাইত; এই চিঠিগুলি 'ওকাএ' এবং ইহার লেখক 'ওকাএনবিস্‌' নামে পরিচিত। এই শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলি (ওকাএ) একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।

(২) রাজস্ব এবং অন্যান্য Statistics সংক্রান্ত বিবরণ

আক্‌বরের রাজ্যকালে রাজা ও অমাত্যবর্গের মন সকল প্রকার সত্যের দিকে উন্মুক্ত ছিল; তাঁহাদের আশ্চর্য্য জ্ঞানস্পৃহা ছিল। তাহার ফলে বাদ্‌শাহ্‌র আজ্ঞায় প্রত্যেক প্রদেশ হইতে বিবরণ ও Statistics সংগ্রহ করিয়া সে যুগের স্যর্‌ উইলিয়াম্‌ হণ্টার 'আইন্‌-ই-আক্‌বরী' নামক *Imperial Gazetteer* বাহির করেন। এই আদর্শে পরবর্ত্তী যুগে কয়েকখানি সংক্ষিপ্ত দেশবর্ণনার বহি এবং অনেকগুলি Statistics-সংগ্রহ ('দস্তুর-উল্‌-আম্‌ল'—স্থল-বিশেষে 'জাওয়াবিৎ' নামে) ফার্সীতে সঙ্কলন করা হয়; কিন্তু এ গুলির কোনখানিই 'আইন্‌-ই-আক্‌বরীর' মত পূর্ণাঙ্গ নহে।

(৩) বাদ্‌শাহী-দরবারের দৈনন্দিন-বিবরণ

'আখ্‌বরাৎ-ই-দরবার-ই-মুয়াল্লা'। প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা, দূরে অবস্থিত রাজকুমার অথবা মিত্ররাজগণের উকীল বা প্রতিনিধিরা দরবারে উপস্থিত থাকিয়া নিত্যনিয়মিতরূপে

---

* জহাঙ্গীরের রাজত্বের 'মাসির-ই-জহাঙ্গীরী' এবং বাদ্‌শাহের সুদীর্ঘ আত্মজীবনী—'তুজুক্‌ ই জহাঙ্গীরী।'

শাহ্‌জহানের প্রথম ২০ বৎসরের ইতিহাস আব্‌দুল্‌ হমীদ্‌ লাহোরী লিখিত—'পাদিশাহ্‌নামা।'

২১ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ওয়ারিস্‌-লিখিত 'পাদিশাহ্‌নামা।'

৩১শ বৎসরের ইতিহাস মুহম্মদ্‌ সালিহ্‌-লিখিত।

মুহম্মদ্‌ কাজীম্‌ লিখিত আওরংজীবের প্রথম দশ বৎসরের ইতিহাস—'আলমগীরনামা।'

আওরংজীবের সম্পূর্ণ রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—মুহম্মদ্‌ সাকী মুস্তদ্‌ খাঁ-রচিত—'মাসির-ই-আলমগীরী।'

নিয়ামৎ খাঁ (ওরফে দানিশ্‌মন্দ খাঁ) রচিত—'বহাদুরশাহ্‌-নামা।

এইরূপ সংবাদের চিঠি তাঁহাদের প্রভুদের নিকট পাঠাই-তেন। প্রায় "১০ × ৪" একখণ্ড এখনকার বালির কাগজের মত কাগজে এই প্রাত্যহিক বিবরণ অতি সংক্ষেপে লিখিত হইত। আখ্‌বরাৎ হইতে আমরা জানিতে পারি,—কোন একটী দিনে, ঠিক কত প্রহর, কত দণ্ডের সময় দরবারের আরম্ভ, এবং কখনই বা তাহা ভঙ্গ হইল; কোন্ কোন্ ব্যক্তি সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন এবং তাঁহারা সম্রাট্‌কে কি কি নজর দিলেন; এতদ্ব্যতীত রাজ-কর্ম্মে নিয়োগ ও পদোন্নতির সংবাদ, সম্রাটের বদান্যতা; প্রাদেশিক কর্ম্মচারী ও যুদ্ধে নিয়োজিত সৈনাপতিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সরকারী-পত্রের সারমর্ম্ম (প্রকাশ্যভাবে পঠিত হইলে) ও সম্রাটের লিখিত তাহার উত্তর; যুদ্ধাভিযান ও মৃগয়াকালে স্থানে স্থানে সম্রাটের শিবির সন্নিবেশ; সম্রাট্ স্বয়ং যে যুদ্ধ বা দুর্গ-অবরোধ-কার্য্য পরিচালন করিতেন, তাহার সূক্ষ্ম বিবরণ; এবং রাজ-দরবারে উল্লেখযোগ্য ঘটনা-সংক্রান্ত সম্রাটের কার্য্যকলাপ ও উক্তির বিবরণ।

ইতিহাসের প্রধান কর্ত্তব্য, অতীতকে বর্ত্তমান যুগের লোকদিগের সম্মুখে জীবন্ত করিয়া উপস্থিত করা—ইংরাজীতে যাহাকে বলে to visualise the past, তাহা মুসলমান ইতিহাসে অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়; পাঠককে হিন্দুযুগের ইতিহাস-আলোচনায় অনেক স্থলে যে প্রকার কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, ইহাতে সেরূপ প্রয়োজন হয় না। উপরিলিখিত তিন শ্রেণীর উপাদানের মধ্যে শেষোক্ত 'আখ্‌বরাৎ'-সাহায্যে আমরা জীবন্ত বর্ণনা পাই। শুধু তাহাই নহে,—ইহা সে যুগের লোকজন ও আচার-ব্যবহারের উপর যে আলোকপাত করে, তাহা অতীব বিস্ময়কর। যেমন শিবাজীর লুণ্ঠন-উপদ্রবের সংবাদে আওরংজীবের একবার মৌনভাব-অবলম্বন, এবং অন্যবার সেই শ্রেণীর অপর একটী ব্যাপারে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ,—'শিবাজী এত অধিক লোকের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে যে, তাহাদের সকলকে সাহায্যদান রাজকোষের সাধ্যাতীত'; প্রদেশ-বিশেষের কোন দুঃসংবাদের পত্র উজীর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলে, নীরবে পাঠান্তে আওরংজীবের তাহা পকেটস্থ-করন; বিশালগড় অবরোধকালে (১৭০২) মহারাষ্ট্র দুর্গাধিপতির সন্ধিসর্ত্ত-প্রার্থনাপত্র পাঠান্তে, অসহ্য ক্রোধে বাদশাহ্ কর্ত্তৃক তাহা ছিন্ন-করন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের ইতিহাস-সংক্রান্ত এইরূপ কয়েকখানি আখ্‌বরাৎ বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিস ও ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে; কিন্তু তাহাদের উপকারিতা যৎসামান্য; কারণ এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থ হইতে অধিকতর মূল্যবান্ বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দী-সংক্রান্ত দরবারের যে সমস্ত দৈনন্দিন-লিপি বিদ্যমান আছে, তাহা আওরংজীবের রাজত্বকালের; এগুলি লণ্ডনের Royal Asiatic Societyতে রক্ষিত হইয়াছে। খুব সম্ভব, জয়পুর বা অন্য কোন রাজপুত-দরবার হইতে, 'রাজস্থান'-প্রণেতা জেম্‌স্ টড্ (James Tod) সংগ্রহ করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, আওরংজীবের দরবারের এই দৈনন্দিন-লিপিগুলি বড়ই অসম্পূর্ণ। ২৩ বৎসরের একখানি লিপিও নাই; ৮ বৎসরের মধ্যে প্রতি বর্ষের ১০ খানিরও কম, এক বৎসরের ১০১ খানি, এবং কেবলমাত্র ৭ বৎসরের বার্ষিক দুই শতের অধিক লিপি পাওয়া গিয়াছে। আওরংজীবের রাজত্বকালের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত তমসাচ্ছন্ন; কারণ উপাদানের বড়ই অভাব। আখ্‌বরাতের সাহায্য ঠিক এই সময়ের জন্যই আবশ্যক, অথচ ঠিক এই ৩০ বৎসরের 'আখ্‌বরাৎ' নাই বলিলেই হয়। আওরংজীবের প্রথম ও পঞ্চম দশকের ইতিহাস বিষয়ক প্রচুর উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা, আওরংজীবের প্রথম দশ বৎসরের ঘটনামূলক এক সুবৃহৎ সরকারী ইতিহাস—নাম 'আলমগীরনামা'; মুন্সীগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত বৃহৎ চারি বালুম পত্র; উমারাদিগের বহু পত্র; এবং কোন কোন সমসাময়িক ব্যক্তির রচিত বে-সরকারী ফার্সী ইতিহাস।

রাজপুত-রাজ্যের দপ্তরখানাগুলি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা হইলে, সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতেতিহাস লেখকগণ সবিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই; কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেখানে এইরূপ আখ্‌বরাৎ অনেক আছে। এই সমস্ত 'আখ্‌বরাৎ' আবিষ্কৃত হইলে, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা পরীক্ষা করান আবশ্যক। তাহার ফলে, আওরংজীবের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিতে হইবে।

আওরংজীবের রাজত্বের অন্ধকারপূর্ণ উক্ত তিন দশকের

ইতিহাস সংক্রান্ত ফার্সী ভাষায় লিখিত খুব অল্প-সংখ্যক পত্রই আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; কিন্তু উহার ১০ বৎসর পূর্ব্বের ও ১০ বৎসর পরের প্রায় তিন সহস্র ঐতিহাসিক-পত্র আমি সংগ্রহ করিয়াছি। বহু স্থানে বহু লোকের সমবেত-চেষ্টার ফলে এই সকল লুপ্ত-উপকরণ আবিষ্কৃত হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম বহাদুর শাহ্‌র দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্ক পর্য্যন্ত (১৭০৯) মুঘল-সম্রাট্‌গণের বিস্তৃত সরকারী ইতিহাস বিদ্যমান আছে। ইহার পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস-সম্বন্ধে অনেক আত্মজীবন-চরিত, প্রতি রাজ্যাঙ্কের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার, এবং কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর নগণ্য চিঠিপত্রের সংগ্রহ-পুস্তক পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীকালের (অর্থাৎ আক্‌বর হইতে বহাদুর শাহ্‌র দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্ক পর্য্যন্ত) সরকারী ইতিহাসগুলির ন্যায় এই সকল উপকরণ হইতে ঘটনার তারিখ, স্থান ও লোকের নাম, এবং বিশুদ্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাইবার উপায় নাই। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মুঘল-সাম্রাজ্য দেউলিয়া হয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে ভাঙ্গন ধরে,—যদিও জনসাধারণ ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই; অবশেষে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ্ এই 'তাসে-গড়া ঘর' ভাঙ্গিয়া দিয়া, সে কথা সাধারণকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। সুতরাং ঐ কালের কোন বিস্তীর্ণ সরকারী ইতিহাস রচিত হয় নাই;—সরকারী চিঠিপত্র ও রাজস্ব-বিবরণী নিয়মিতরূপে রাজ দরবারে পৌঁছিত না, এবং এ সময়ে কোন রাজদপ্তরখানা যত্ন-সহকারে সংরক্ষিত হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ-সংক্রান্ত যে সমস্ত ফার্সী ইতিহাস রচিত হইয়াছিল, তাহার কোনখানিই হারাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; এই কারণে ভারতেতিহাসের এই অংশ সম্বন্ধে, একমাত্র চিঠিপত্রের সন্ধান ব্যতীত, অন্য কোন অনুসন্ধান-কার্য্যের আবশ্যকতা নাই।

ঠিক এই সময়ে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক-রঙ্গমঞ্চে এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হইল। ইহারা মারাঠা জাতি। প্রথমে সম্রাটের বন্ধুরূপে আসিয়া, শেষে শত্রুরূপে প্রকট হইয়াছিল। মারাঠারা তখন ক্ষমতার উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত; সুতরাং মুঘল-রাজত্বের অবনতি, দারিদ্র্য ও ইতিহাস-রচনার অভাবের ফলে ১৭১৮ হইতে ১৭৫০ পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতেতিহাসের অন্ধকারময় স্থানগুলি আলোকিত করিবার একমাত্র উপায়—মারাঠী রাজকীয় কাগজপত্র। টিউডর ইংলণ্ডের ইতিহাসের পক্ষে ভিনিসীয় দূতের চিঠিপত্রগুলি যেরূপ অত্যাবশ্যক, মুঘল ইতিহাসের পক্ষে মারাঠী সরকারী চিঠিপত্রও সেইরূপ বহু বিষয়ে মূল্যবান্।

কিন্তু এখানেও আমাদের বিপদ। ঠিক যেখানটায় ইতিহাসে (অর্থাৎ ১৭১৮-৫০) এই অমূল্য মারাঠী উপাদানের সাহায্য অত্যন্ত আবশ্যক, সেইখানেই উপকরণের অভাব। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে দিল্লী ও উত্তর ভারতে অবস্থিত মারাঠা-প্রতিনিধি ও সেনাপতিগণের লিখিত মারাঠী-সরকারী চিঠিপত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে রাও বহাদুর দ-ব-পারস্‌নিস্ (D. B. Parasnis) দিল্লীর মারাঠা-দূতগণের যে-সমস্ত পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা ১৭৮০ হইতে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত; এদিকে হোল্‌কারের দরবার হইতে পুনায় লিখিত সরকারী পত্রগুলির সময় ১৭৭৯ হইতে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। বাসুদেব বামন খরে নামক জনৈক স্কুল-পণ্ডিত প্রভূত যত্ন, ঐকান্তিক অনুরাগ ও বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের পটবর্দ্ধন্ রাজ-পরিবারের ঐতিহাসিক-পত্রের যে বিপুল সমষ্টি (৯ বালুম) প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার অতীত। খরে মহাশয়ের পত্রগুলির তারিখ ১৭৬১-১৮০৩; কেবলমাত্র দুইখানি পত্র ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত। বহু মারাঠী-পণ্ডিত, দীর্ঘকালব্যাপী সমবেত-অনুসন্ধানের ফলে যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহা সামান্য; এই জন্য মনে হয়, ১৭১৮ হইতে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত দিল্লী-সংক্রান্ত ব্যাপারের প্রচুর মারাঠী দলিল-দস্তাবেজ ভবিষ্যতে ভারতের কোথাও যে আবিষ্কৃত হইবে, তাহার সম্ভাবনা খুব কম।

নাগপুরের মারাঠা-নরপতিরা (অর্থাৎ ভোঁসলা রাজবংশ) হয় ইতিহাস-বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, অথবা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের ফলে তাঁহাদের সরকারী-কাগজপত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে;—আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। পুনার মারাঠা অধিপতিগণের (পেশ্‌বা) যথেষ্ট সাহিত্যানুরাগ ছিল,—ফলে তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ বহু লিখিত-কাগজপত্র রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এগুলি সাধারণতঃ ইংরেজ-যুগের, অর্থাৎ

১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে। নাগপুর-কর-মারাঠারা নবাব আলিবর্দ্দীর সময়ে বঙ্গ ও উড়িষ্যায় বহু অভিযান করিয়াছিলেন; এ অভিযানগুলির কোন সমসাময়িক মারাঠী বিবরণ নাই; এ সম্বন্ধে ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত,—তাহাতে তারিখের অভাব; আবার ইংরেজ-কুঠির কাগজপত্রও এসম্বন্ধে একপ্রকার নীরব। নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হইয়া ভারতেতিহাসের এই অন্ধকারময় অংশ কোন দিন যে আলোকিত হইবে, তাহা মনে হয় না।

১৬৫৮ হইতে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতেতিহাসের লুপ্ত-উপাদানের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল। আশা করি, যাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, কোনদিন যদি তাঁহারা ফার্সী, হিন্দী, অথবা মারাঠী সরকারী-কাগজপত্রের সংশ্রবে আসেন, তাহা হইলে ইতিহাসের কোন্ অংশের জন্য বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

অগ্নি-সংস্কার

[ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের এক মাস পর সত্যেশ বিলাত গেল; কিন্তু ইহার মধ্যেই বেশ এক-পত্তন গোলযোগ হইয়া গেল। তাহার ফলে, বিলাত-যাত্রার সময়ে সত্যেশ অনুভব করিল যে, সংসারে সে এবং ইলা সম্পূর্ণ একা!

কালীভূষণ বাবু পুত্রকে বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন, সখ করিয়া। কিন্তু না জানি কোন্ অশুভ মুহূর্ত্তে তিনি ইলাকে দেখিয়াছিলেন—তিনি তাহাকে কিছুতেই পছন্দ করিতে পারিলেন না। তাহার ধরণ-ধারণ যে অনেকটা মেমসাহেবী গোছের হইবে, তাহা তিনি আন্দাজ করিয়াছিলেন, এবং তাহার জন্য প্রস্তুতও ছিলেন; কিন্তু, তার কার্য্যকলাপ যে তাঁর চক্ষে এতটা বিঁধিবে, তাহা তিনি হিসাব করেন নাই।

কালীভূষণ বাবু বিপত্নীক, আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার সংসারে চাকর বামণ ছাড়া কেহই নাই। একটি মেয়ে আছে, সে মাঝে-মাঝে আসিয়া দুই-এক মাস থাকে। এই বিবাহে তাহাকে তাহার স্বামী আসিতে দেয় নাই। পত্নী-বিয়োগের পর হইতে কাজেই কালীভূষণ ও তাঁহার পুত্রের ভিতর যতটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, পিতা-পুত্রে ততটা ঘনিষ্ঠতা সচরাচর হয় না।

বিবাহের উৎসব মিটিয়া যাইবার পর প্রায় ১৫ দিন সত্যেশ ফরিদপুরে ছিল। ইহার মধ্যেই পিতা-পুত্রের সে ঘনিষ্ঠতা দূর হইয়া বেশ একটু অনাত্মীয়তার ভাব দাঁড়াইয়া গেল।

কালীভূষণের ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহার কাছে ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া যে, সে খট্-খট্ করিয়া আসিয়া একঘর লোকের সামনে তাঁহার সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড করিবে, এতটা তিনি কল্পনা করেন নাই। ইলা যখন শ্বশুরকে এইরূপে অভিবাদন করিতে আসিল, তখন কালীভূষণ জোর করিয়া হাসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণে শঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

ইলার হৃদয় অত্যন্ত নরম; তা' ছাড়া, সে সত্যেশকে সত্য-সত্যই ভালবাসিয়াছিল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে সত্যেশের সংশ্লিষ্ট সকলের উপরই সে সহজেই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কালীভূষণ বাবুকে সে ঠিক তা'র নিজের বাপের মত ভালবাসিয়া ফেলিল; এবং তাঁহার কাছে সকল লজ্জা-সঙ্কোচ দূর করিয়া, দুই-চারিদিনেই ঠিক মেয়ের মত আদর-আব্দার জুড়িয়া দিল। পুত্রবধূর এই আদরের ধাক্কা কালীভূষণের ভাল লাগিল না। ইলার ভালবাসা বাঙ্গালীর ঘরের কুলবধূর মত নীরব সেবায় পরিস্ফুট হইত না; তাহা যেন অত্যন্ত গায়ে-পড়া ভাবে প্রকাশ পাইত। সেবা যে ইলা করিত না তাহা নহে; কিন্তু—কেমন যেন কালীভূষণ বাবুর বাধ-বাধ ঠেকিত।

কালীভূষণ বাবু কাছারী হইতে আসিবামাত্র ইলা ছুটিয়া তাঁহার কাছে যাইত,—বাহিরের ঘরে এতটা ছুটিয়া আসা কালীভূষণের চক্ষে বাধিত। তাঁহার ইজি চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া ফস্ করিয়া তাঁহার হাত হইতে পাখাখানা কাড়িয়া লইয়া ইলা তাঁহাকে বাতাস করিত; সঙ্গে-সঙ্গে ফড়ফড় করিয়া ঠাট্টা-তামাসা করিয়া যাইত। একদিন কালীভূষণ সাহস করিয়া কি একটা কথায় একটু নম্রভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইলা সেটাকে ঠাট্টা মনে করিয়া, পাখা দিয়া তাঁহার গালে ঠোনা মারিয়া বলিল, "Now, now, old boy, don't be naughty, will you ?"

কালীভূষণের আর সহ্য হইল না। তিনি মুখ কাল করিয়া উঠিয়া পড়িলেন,—আর পুত্রবধূর সঙ্গে কোনও কথা বলিলেন না। ইলা ব্যথিত হইল, কিন্তু বুঝিল না সে কি অপরাধ করিয়াছে। সে সত্যেশের কাছে ছুটিয়া গেল, এবং তাহার কাছে সকল কথা বলিল। সত্যেশ বুঝিল, কিন্তু স্ত্রীকে কিছু বলিতে পারিল না। পিতার উপরও কিছু অসন্তুষ্ট হইল,—তিনি ইলার স্বচ্ছ হৃদয় দেখিতে না পাইয়া কেবল বাহিরের কথাটা ধরিয়া রাগ করিলেন বলিয়া। সত্যেশ দেখিল, ইলা দুঃখিত হইয়াছে; তাহার উপর আবার তাহাকে অপ্রিয় উপদেশ দিয়া আরও কষ্ট দিতে তাহার ক্লেশ বোধ হইল। তাই সে মোটের উপর বলিল যে, তাহার পিতার সহিত অতটা ঘনিষ্ঠতা করিবার দরকার নাই।

ইলা তাহার প্রাণপূর্ণ স্নেহ লইয়া শ্বশুরের কাছে যে ধাক্কা খাইল, তাহাতে সে একটু মুশড়িয়া গেল। তাহার পর আর শ্বশুরের কাছে সে ঘড় যাইত না। কিন্তু সে সর্ব্বদাই সত্যেশের সঙ্গে-সঙ্গে থাকিত; সব সময়ে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা, হাসি-তামাসা, খেলা-ধূলা প্রভৃতি প্রেমের অভিনয় লাগিয়াই থাকিত। তাহাও কালীভূষণ বাবুর চক্ষে ভাল লাগিত না। এতটা বেহায়াপনা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তিনি হয় তো সত্যেশকে ডাকিলেন একটা কথা বলিবার জন্য; সত্যেশ আসিয়া দাঁড়াইতেই, হয় তো ইলা তাহার পিছু-পিছু আসিয়া সত্যেশের হাত ধরিয়া; কখনো বা কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইল;—তাঁহার সম্মুখেই স্বামীর সঙ্গে এমন সব বিষয়ে হাস্য-পরিহাস আরম্ভ করিল, যাহা খুব অগ্রসর হিন্দুর ঘরেও শ্বশুর সহসা বরদাস্ত করিতে পারেন না।

পনেরো দিন না যাইতেই কালীভূষণ বুঝিলেন যে, এ বউ লইয়া তাঁহার ঘর করা চলিবে না। বধূও বুঝিল, শ্বশুরের সঙ্গে তাহার বনিবে না। পুত্র দুঃখিত হইল, কিন্তু চটিল বেশী বাপের উপর; কেন না, ইলা ছেলেমানুষ, যে সমাজে মানুষ হইয়াছে, সেই সমাজের হাবভাব আচার-ব্যবহার তাহার মধ্যে দেখা যায় বলিয়া তাহার উপর রাগ করিবার কিছু নাই। যখন ইলার হৃদয় এত মধুর, তখন তাহার পিতার সেই খাতিরে তাহার ব্যবহারের ত্রুটি অগ্রাহ্য করা উচিত ছিল।

পনেরো দিন পরে ইলাকে লইয়া সত্যেশ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। এখানে আসিয়া দেখিল, এখানে তাহার কাহারও সঙ্গে বনে না।

লীলার প্রতি প্রথম দর্শনেই তাহার একটা বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল; সে বিদ্বেষ গেল না, বরং বাড়িয়া গেল। লীলা যে তাহাকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত, তাহা তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। তামাসার ছলে সে অত্যন্ত কড়া-কড়া কথা বলিত, তাহা হজম করা সত্যেশের পক্ষে কঠিন হইত। ইলাকে সে প্রায়ই তাহার সম্মুখে "বাঁদরের গলায় মুক্তাহার" বলিয়া ডাকিত; এবং কথাবার্ত্তায় এটা খুব স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দিত যে, সামাজিক হিসাবে সত্যেশ তাহাদের অনেক নীচে,—তাহারা কেবল অনুগ্রহ করিয়া সত্যেশকে জাতে তুলিয়া লইয়াছে। এই সব কথাবার্ত্তায় সত্যেশের মুখ লাল হইয়া উঠিত, কিন্তু সে কিছু বলিত না। ইলাও এ সব কথায় শঙ্কিত হইয়া উঠিত, এবং ফাঁক পাইলেই সে স্বামীর হাত ধরিয়া করুণ স্বরে বলিত, "তুমি রাগ করবে না বল? দিদির কথা কাণে তোলে কে? এ তো কেবল দু'দিনের জন্য। তুমি ফিরে এলে আমরা তো সম্পূর্ণ স্বাধীন হ'তে পারবো।" ইত্যাদি নানা কথায় সে সত্যেশকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিত।

মালতীর যে কোনও ব্যক্তিত্ব আছে, তাহার পরিচয় সত্যেশ পায় নাই। তাঁহার সঙ্গে সত্যেশের সামান্যই কথাবার্ত্তা হয়; তাহাতে স্নেহের চেয়ে সৌজন্যের ভাবই বেশী প্রকাশ পায়। মালতী দেবীর সৌজন্যের অভাব ছিল না, কিন্তু সহৃদয়তা অন্ততঃ সত্যেশের উপর প্রকাশ পায় নাই।

সুবোধ ও অন্যান্য ছেলেরা সকলই এক প্রকার। তাহাদের সত্যেশের উপর লীলার মত কোনও আক্রোশ ছিল না। তবে তাহারা যে সত্যেশের চেয়ে ঢের উঁচুদরের লোক, এ বিশ্বাস তাহারা কিরূপে দূর করিবে? সুবোধ সত্যেশকে অনুগ্রহ করিতে, তাহার প্রতি বেশ একটু সহৃদয়তা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক ছিল না; কিন্তু সত্যেশ সে গর্ব্বের দান গ্রহণ করিতে মোটেই উন্মুখ ছিল না। সত্যেশের চক্ষুলজ্জায় অনেক সময়ে শক্ত সত্য কথাটা বলিতে মুখে ঠেকিত; কিন্তু মনে-মনে সে নিজেকে দুনিয়ার কাহারও চেয়ে খাটো মনে করিত না। তাই, যেখানে সহৃদয়তা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অনুগ্রহ বিতরণ করিতে চায়, সেখানে সত্যেশ কিছুতেই হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইতে পারিত না।

চ্যাটার্জ্জী সাহেবের সঙ্গে সত্যেশের দেখাশুনা অত্যন্ত কম হইত। তাঁর কাজ-কর্ম্ম এত বেশী যে, তিনি পরিবারের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার বড় বেশী অবসর পাইতেন না। যতটুকু দেখাশুনা সত্যেশের হইয়াছিল, তাহাতে তাহার শ্বশুরকে মন্দ লাগে নাই; কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, তাঁহার কথায় ও কাজে অনেক তফাৎ। তাঁহার সকল বিষয় সম্বন্ধেই বেশ স্পষ্ট এবং দৃঢ় মতামত ছিল। যে কোনও বিষয় হউক না কেন, তিনি তাহা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতেন; এবং অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তাহার সম্বন্ধে নানা মতামত প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তাঁহার আদালতের কাজের বাহিরে অন্য কোনও কাজেই তিনি নিজেকে লাগাইতে পারিতেন না। মত যাই হউক, তাহাকে কাজে লাগাইবার জন্য যে উৎসাহ ও উদ্যমের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার মোটেই ছিল না। মতের অনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহার ইচ্ছার অভাব ছিল না; এমন কি প্রায় মাসে একবার তিনি তাঁহার সমস্ত জীবনের আমূল সংস্কারের জন্য সঙ্কল্প করিতেন;—কিন্তু খুব একটা প্রচণ্ড ঝোঁকের মাথায় যদি বা কদাচিৎ একটা-আধটা কাজ আরম্ভ করিয়া বসিতেন, সে কাজ খুব বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিত না,—একটা দারুণ আলস্য ও উদাসীনতা প্রত্যেক উদ্যমকে নিঃশেষে গ্রাস করিয়া বসিত।

ইলার বিবাহটা চ্যাটার্জ্জী সাহেবের জীবনের একটা খুব বড় কাজ, যাহাতে তিনি তাঁহার মত বাহাল রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ হইয়া যাইবার পরই, তিনি পূর্ব্ববৎ অচল হইয়া ব্রীফ্ ঘাঁটিতে এবং ডিনার টেবিলে তীব্র সমালোচনা ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন,—তাঁহার সংসারের সঙ্গে তাঁহার অন্য সকল সম্পর্ক ছুটিয়া গেল। এমন কি, যে সত্যেশের সম্বন্ধে বিবাহের পূর্ব্বে তিনি এত উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন যে, চাই কি তাহার জন্য পরিবারের সকলকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন,—বিবাহ হইয়া গেলে তাহার সম্বন্ধেও বিশেষ কোনও চিন্তা বা আগ্রহের পরিচয় তিনি দেন নাই।

সুতরাং শ্বশুরবাড়ীতে এমন কেহ ছিল না, যাহার প্রতি সত্যেশ বিশেষ আকৃষ্ট হইতে পারে। তাই বিবাহের পরই সত্যেশ দেখিতে পাইল যে, এই সংসারে সে এবং ইলা বড় একা। এ সময়ে এ চিন্তা বিশেষ কষ্টকর হয় নাই; কেন না, জীবনের এই সময়ে লোকে এমনি একা হওয়াটা বরঞ্চ একটা কামনার বিষয় বলিয়াই মনে করে। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ঝোঁকে তাহাদের কাছে সমস্ত বিশ্বসংসার একটা অনাবশ্যক বাধা বলিয়া বোধ হয়। কোনও কিছু না থাকে—অনন্ত শূন্যের মধ্যে শুধু দুইটি প্রাণ—তাহা হইলেই বেশ ভাল বোধ হয়। তাই সত্যেশ বেশী পীড়িত হইল না; সে ইলাকে আরও বেশী করিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইল, আরও একটু প্রগাঢ় ভাবে চুম্বন করিল; মনে-মনে ভাবিল, সেই ভাল,—আমি আর তুমি—আমরা একাই আমাদের জীবনতরী কালের সাগরে ভাসাইব। উপস্থিত সে অত্যন্ত একা তরী ভাসাইয়া বিলাত যাত্রা করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সত্যেশ বিলাত হইতে গোঁফশুদ্ধই ফিরিয়া আসিল। এ কথাটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার যোগ্য; কারণ ইহার ভিতর একটা তথ্য নিহিত আছে। বিলাতে গেলে গোঁফ কামানটাই রেওয়াজ; কেন না, সেখানে চারিদিকে কামান গোঁফের মাঝখানে নিজেকে কতকটা হংস মধ্যে বক গোছ মনে করিয়া, লোকে শেষে গোঁফ কামাইয়া ফেলে। যে এই গড্ডলিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া না দিয়া গোঁফ লইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া আসে, তার ভিতর আর কিছু থাকুক

না থাকুক, একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা ব্যক্তিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সত্যেশের যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ছিল।

সে ফিরিয়াছিল বেশ একটু প্রতিষ্ঠা লইয়া। ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় গিয়া, একটা প্রকাণ্ড যন্ত্রের কারখানায় দুই বৎসর চাকরী করিয়া, সে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সেই কারখানার কলিকাতায় একটি ব্রাঞ্চ ছিল। তাহাতে ভাল কাজ হইতেছিল না। কারখানার কর্তৃপক্ষ স্থির করিলেন যে, কেবলমাত্র দোকানদার দিয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না,—কলিকাতায় একটা রীতিমত শাখা কারখানা ও বড় রকমের আফিস করিয়া কারবার আরম্ভ করিতে হইবে। ম্যানেজার সাহেব সত্যেশের কাযে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; তাই তিনি সত্যেশকেই কয়েক মাস শিক্ষা দিয়া, কোম্পানীর এই শাখা কারবারের ডিরেক্টার রূপে পাঠাইয়া দিলেন; সঙ্গে আরও অনেক কর্ম্মচারী আসিল। অল্প দিনের মধ্যেই ম্যাসাচুসেট্‌স্ মেসিনারী লিমিটেডের ব্যবসায় ভারতবর্ষে ফাঁপিয়া উঠিল,—কারখানাও ক্রমশঃ বিরাট আকার ধারণ করিতে লাগিল। কিন্তু সে পরের কথা।

যখন সত্যেশের ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া লাগিল, তখন তাহাকে আনিতে গিয়াছিলেন তাহার পিতা, তাহার শ্বশুর, শ্যালী এবং ইলা। মালতী দেবী বৎসর দুই পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সত্যেশ জেটীতে নামিয়াই পিতা ও শ্বশুরের পাদবন্দনা করিল, এবং হাসিমুখে তাঁহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিল। ততক্ষণ ইলা তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ভরিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার আভা তাহার সমস্ত মুখ লাল করিয়া দিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই লীলা আসিয়া পিতাকে বলিল, "বাবা, তুমি ওকে একচেটে করে (monopolise) রাখলে চ'লবে কেন? তুমি ছাড়া আরও অন্য লোকে ওকে রিসীভ ক'রতে এসেছে।" বলিয়া আড় চোখে ইলার দিকে চাহিয়া সত্যেশকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। চ্যাটার্জ্জী হাসিলেন। কালীভূষণও হাসিলেন; কিন্তু সে হাসি তাঁহার ওষ্ঠাধরের নীচে আর ঢুকিল না,—বরং মুখটা তাহাতে যেন একটু অন্ধকারই হইয়া উঠিল। সত্যেশকে বগলদাবা করিয়া ইলার কাছে হাজির করিয়া লীলা বলিল, "এই নেও তোমার আসামী!"

ইলা ঈষৎ লজ্জিত ভাবে সত্যেশের বুকের কাছে অগ্রসর হইয়া মুখ বাড়াইয়া দিল। সত্যেশ ভয়ানক লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু লজ্জার মাথা খাইয়া তাহাকে সেই একহাট লোকের সামনে ইলাকে চুম্বন করিতে হইল। চুম্বন করিয়াই সে ব্যস্ত ভাবে তাহার লগেজ দেখিতে লাগিল। তার পর সমান ব্যস্ত ভাবে, আর কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া, সটান গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

"Stop thief" বলিয়া হাসিতে-হাসিতে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, লীলা ইলাকে কুক্ষিগত করিয়া সেই গাড়ীর ভিতর উঠিয়া প'ড়িল। চ্যাটার্জ্জী ও কালীভূষণ বাবু ভিন্ন-ভিন্ন গাড়ীতে গেলেন। স্ত্রী ও শ্যালীর কাছে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে সত্যেশ বসিয়া রহিল। সে সঙ্কোচ কাটিল যখন নিরিবিলি ইলার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল।

তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। চ্যাটার্জ্জী সাহেবের বাড়ীতেই একটি সুসজ্জিত শয়ন-গৃহে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। সত্যেশের জন্য বালীগঞ্জে একটা স্বতন্ত্র বাড়ী লওয়া হইয়াছে; এবং ইলা নিজে গিয়া তাহা আসবাব দিয়া তাহার মনের মত সাজাইয়াছে; কিন্তু আজকার মত তাহাদের এইখানেই থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সত্যেশ সেই বৈকাল বেলা হইতে সমস্ত সময় মনে-মনে কথা গাঁথিয়াছে; কেমন করিয়া ইলাকে তাহার বিলাতী বেহায়াপনা হইতে নিবৃত্ত করিবে তাহার সব কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইলা যখন বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তখন সে-সব কথা এলোমেলো হইয়া গেল; আরও নিবিড় ভাবে তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহাকে অনর্গল চুম্বন করা ছাড়া তাহার অন্য উপায় রহিল না।

অনেকক্ষণ পর সত্যেশ ইলার মুখখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কাঁদছ কেন পাগল?"

ইলা হাসিয়া বলিল, "আমি কি ছাই জানি? আজ তোমাকে সত্যি-সত্যি আমার কাছে পেয়ে কেবলি আমার কান্না পাচ্ছে। যেন বিশ্বাস ক'রতে পারছি না যে, এটা সত্যি।"

এ কথার একমাত্র উত্তর যাহা সম্ভব, সত্যেশকে তাহাই দিতে হইল।

সত্যেশ বলিল, "তুমি কি আমার জন্য এতই পাগল

হ'য়েছিলে? আমি তো ভেবেছিলাম বুঝি তোমার আমার জন্য কোনও ভাবনাই হয় নাই। আমি তোমার কাছে নেই, অথচ তুমি টক্-টক্ ক'রে বি-এ, এম-এ পাশ ক'রে গেলে দেখে, আমি তো রাগই ক'রে ফেলেছিলাম। বিরহে এ রকমটা হওয়া তো কোন কাব্যশাস্ত্রের অনুমোদিত নয়!"

ইলা। তা' ব'লবে বই কি? আর মশায় কি ক'রছিলেন ততক্ষণ? এতগুলো একজামিন পাশ ক'রলেন, তা'তে হ'ল না; আবার আমেরিকায় গেলেন চাকরী ক'রতে! আমি তো ভেবেছিলুম যে, আমার আর কোনও দরকারই নেই,—বিলাতী রূপসীদের ঘূর্ণীবায়ে এই বাঙ্গালী পেত্নীর মূর্ত্তি বুঝি ধুয়ে-পুঁছে গেছে।

"ওঃ! তাই তো, বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে!" বলিয়া সত্যেশ মহা ব্যস্ততার ভান করিল। ইলা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি ভুল হ'য়ে গেছে?"

সত্যেশ। বিলাত যাবার সময় অনেকগুলি প্ল্যান ক'রে গিয়েছিলাম,—তার মধ্যে একটি ছিল, বিলাতী সুন্দরীদের চর্চ্চা করা। আহা হা! বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে,—কাজের ভিড়ে কথাটা মনেই ছিল না।

ইলা হাসিয়া বলিল, "বুঝা গেছে গো, বুঝা গেছে; you protest too much."

সত্যেশ। কেন protest ক'রতে যাব। এটা তো আর লজ্জার কথা নয় যে, সত্যি হ'লে অস্বীকার ক'রবো—এতো একটা গর্ব্বের কথা! বিশ্বাস না কর, তোমার দাদাকে কি ঘোষকে—"

ইলা তাহার ছোট্ট হাতখানি সত্যেশের মুখের উপর দিয়া বলিল, "রাখ, এখন ঝগড়া বাধাতে হ'বে না। আমি এত দিন যে এই দিনটির আশায় পথ চেয়ে ব'সে আছি, সে কি ঝগড়া করবার জন্যে?"

সব গোল মিটিয়া গেল। ইলা জিতিল, সত্যেশের বক্তৃতা মুলতুবী রহিল।

তিন-চার দিন পরে সত্যেশ ঢাকায় পিতার কাছে গেল। গিয়া দেখিল, না গেলেই ছিল ভাল। কালীভূষণের মন পুত্রের উপর সম্পূর্ণ বিরূপ হইয়াই ছিল। যেদিন সে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসে, সে দিন পুরাতন স্নেহ একটু চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেইদিন জাহাজ-ঘাটের বিসদৃশ সাহেবিয়ানার পর ছেলের সঙ্গে আর তাঁহার কোনও রকম সংশ্রব রাখার ইচ্ছা রহিল না। সত্যেশ বেদনা লইয়া পিতার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল। কলিকাতায় আসিয়া তাহার আপন গৃহে ইলার বক্ষে আশ্রয় লাভ করিয়া তাহার তপ্ত হৃদয় শান্ত হইল।

ইহার পর সত্যেশকে কয়েক মাস হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে হইল। এক বৎসরকাল দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সে কারখানাটীকে দাঁড় করাইল এবং ব্যবসায়ের বিস্তার করিল। ম্যাসাচুসেটস্ মেশিনারী লিমিটেডের প্রকাণ্ড কারখানা এবং তাহাদের যন্ত্রপাতির সৌন্দর্য্য ও উপযোগিতা অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের নাম ভারতবর্ষে সুপরিচিত করিয়া তুলিল। কিন্তু এতটা দাঁড় করাইতে সত্যেশকে এক বৎসর দিন-রাত খাটিতে হইয়াছিল। প্রায় দিনই দিবারাত্রি তাহাকে কারখানায়ই থাকিতে হইত,—বালিগঞ্জে ফিরিবার সুবিধা হইত না।

এ এক বৎসর সত্যেশ বাড়ী সম্বন্ধে কোনও খোঁজ-খবরই রাখিত না। যখন বাড়ী ফিরিত, তখন প্রায়ই গভীর রাত্রি। কোন মতে দুটো খাইয়া গভীর নিদ্রা দিয়া ভোরে উঠিয়াই আবার তাহাকে কারখানায় যাইতে হইত। ইলা বড় ক্ষুব্ধ হইত; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিত না। একদিন সে বলিল, "কারখানায় তোমার quarters করে নাও না,—তা হ'লে তো বেশ হয়। এত খাটুনির উপর এই চার মাইল রাস্তা দু'বেলা দৌড়াদৌড়ি সইবে কি?"

সত্যেশ হাসিয়া বলিল, "রক্ষা কর! সমস্ত দিন কলের মাঝখানে থেকে, অন্ততঃ রাত্রিটাতে একটু ধারণা ক'রতে চাই যে, আমি মানুষ। কারখানার ভিতর বাস ক'রলে হয় তো ক্রমে আমিও একটা কল হ'য়ে যাব।"

মাঝে-মাঝে সত্যেশ ইলাকে কারখানায় লইয়া যাইত—সেদিন কারখানার কাজটা একটা Pic-nic গোছের হইয়া উঠিত। কিন্তু সে কালে-ভদ্রে। বেশীর ভাগ সময় ইলার সঙ্গে তাহার দেখা-শুনাই হইত না।

কারখানাটা যখন গড়িয়া উঠিল এবং কারবার যখন বেশ জমিয়া উঠিল, তখন সত্যেশ একটু সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিতে লাগিল, এবং বাড়ীর চারিদিকে একটু দৃষ্টি দিতে পারিল। তখন যাহা তাহার নজরে পড়িল, তাহাতে সে প্রীতি লাভ করিল না।

বিকাল-বেলায় বাড়ী ফিরিয়া সে দেখিতে পাইত যে, বাড়ীতে বিলাত-ফেরত সমাজের অকর্ম্মণ্য ছোকরাদের বাজার বসিয়া গিয়াছে। টেনিস খেলার উপলক্ষ করিয়া ইহারা রোজ আসিত; এবং প্রায় সমস্তটা সন্ধ্যাকাল বাজে গল্পগুজবে কাটাইয়া যাইত; এবং কেহ-কেহ ডিনার পর্য্যন্তও থাকিয়া যাইত। সত্যেশের ইহা ভাল লাগিত না, তাহার অনেক কারণ। প্রথমতঃ, তাহার কর্ম্মের এই স্নিগ্ধ অবসরটুকু সে সম্পূর্ণরূপে ইলাকে দিয়া ভরিয়া রাখিতে চাহিত; কিন্তু এই সব বন্ধুর অত্যাচারে সে ইলাকে পাইতই না। বাড়ীতে অতিথি থাকিলে অবশ্য স্ত্রী স্বামীর দিকে নজর দিতে পারে না! তা' ছাড়া, এই যে কতকগুলি অকর্ম্মণ্য যুবকের সঙ্গে নিত্য-নৈমিত্তিক এতটা মেলামেশা,—ইহা সত্যেশের মোটেই ভাল লাগিত না। সত্যেশের ইহাতে রাগ হইত; মনে হইত যে, ইলা তাহাকে বাস্তবিক যথেষ্ট ভালবাসে না,—তার প্রাণটা ঠিক ষোলআনা তাহার উপর বসিয়া নাই। কোনও প্রেমমুগ্ধ যুবকই এ চিন্তায় স্বস্তি বোধ করিতে পারে না। বিশেষতঃ, এই অতিমাত্র বিলাতী দলের কথাবার্ত্তা, ধরণ-ধারণ সত্যেশের মোটেই পছন্দ হইত না। ইহাদের সঙ্গে কথা কহিতেই সে ভালবাসিত না,—অথচ তাহার স্ত্রী কি না এইগুলাকেই বাড়ীর ভিতর আনিয়া ভিড় করে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী রাগের কারণ এই যে, শিক্ষিতা স্ত্রীর সাহচর্য্যের যে আদর্শ সত্যেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল, এই দলের ভিড়ে সে আদর্শ মাথা তুলিতে পারিত না। সারা বৎসরের মধ্যে একটা দিনও সত্যেশ তাহার স্ত্রীর সঙ্গে বসিয়া একখানা বই পড়িতে পারে নাই—অন্য প্রকার সাহিত্য-আলোচনা তো দূরের কথা। অথচ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের আলোচনাই ছিল সত্যেশের জীবনের প্রধান আনন্দ।

সত্যেশ বিরক্ত হইত, কিন্তু কিছু বলিত না। ইলার সঙ্গে এ সম্বন্ধে একটা বোঝা-পড়া করিবার ইচ্ছা তাহার অনেকবার হইয়াছে; কিন্তু বলি-বলি করিয়াও কথাটা বলা হয় নাই। যেটুকু সময় দিনের মধ্যে দুইজনে নিরিবিলি থাকিতে পারিত, ততক্ষণ ইলা এমন ভাবে সত্যেশের নিকট আদর কাড়িয়া লইত যে, সত্যেশের কিছু বলা হইত না। সে এমন সম্পূর্ণ ভাবে সত্যেশের কাছে আত্মসমর্পণ করিত, এবং সেই আত্মসমর্পণে তাহার হৃদয় এত স্পষ্টভাবে কৃতার্থতায় ভরিয়া উঠিত যে, তখন সামান্য বিরোধের ক[illegible] তুলিয়া তাহাকে দুঃখ দিতে সত্যেশের মন সরিত না কাজেই, মনের বিরাগ মনেই থাকিয়া যাইত; এবং যে ক[illegible] হয় তো একদিনকার মৃদু আপত্তিতে জন্মের মত নিষ্প[illegible] হইতে পারিত, সে কথা মনের ভিতর ঘুঁটের আগুনের ম[illegible] বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, তত নূতন-নূতন বিরক্তির কারণ ঘটিতে লাগিল,—ততই ইলা প্রতি সত্যেশের প্রেম ক্রমে বিদ্বেষে পরিণত হইতে লাগিল ইলার প্রত্যেক কাজে সত্যেশ ত্রুটি দেখিতে লাগিল;—তাহার দোষগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল; গুণ তাহার চক্ষে ধর পড়া বন্ধ হইল।

ইলা স্বামীর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে নাই এমন নহে সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, সত্যেশ আর পূর্ব্বের মত হাসে না খুব গম্ভীর হইয়া থাকে। তাহার চোখে-মুখে একটা শ্রান্ত ক্লান্ত ভাব,—যেন জগতের কিছুই তাহার কাছে আনন্দদায়ক হইতে পারে না। ইলা ভাবিল, বুঝি কাজের ভিড়ে এই রকম হইয়াছে। সে একদিন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া স্বামীকে বলিল, "দেখ, তুমি মাস-খানেক ছুটি নাও; চল, দার্জ্জিলিঙ্গ কি কোথাও যাওয়া যা'ক।"

কথাটায় যেন সত্যেশ একটু উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই পূর্ব্ববৎ শ্রান্ত ভাবে সে কপালের উপরকার বড় বড় চুলগুলি বাঁহাত দিয়া ঠেলিয়া বলিল, "কি হ'বে? তা' ছাড়া দার্জ্জিলিঙ্গে যে ভিড়!"

এখন আর সত্যেশ এমনি ছোট ছোট কথা বই বলিত না।

ইলা কিন্তু ছাড়িল না। দার্জ্জিলিঙ্গ না পছন্দ হয় তো শিলং কি সিমলা কি অন্য কোথাও যাওয়া যাইবে। সত্যেশ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে বলিল, "খুব নির্জ্জন একটা জায়গায় সমুদ্রের ধারে গেলে বোধ হয় মন্দ হয় না। ধর, কক্স্-বাজার।"

ইলা বলিল, "বেশ, তবে সেইখানেই চল।"

"আমি যেতে পারি, কিন্তু তুমি যাবে কি? সেখানে মোটেই society নেই, তোমার ভারি নির্জ্জন লাগবে।"

ইলা কথা বলিল না, খানিকক্ষণ নীরবে কেক কাটিতে লাগিল। তাহার মুখ একটু লাল হইয়া উঠিল; চোখের

কোণে ক্রমে একটু জল দেখা দিল,—সে মুখ ফিরাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সত্যেশ ভেবা-চেকা খাইয়া গেল। সে কথাটা একটু খোঁচা দিবার উদ্দেশ্যেই বলিয়াছিল, এবং মনে বেশ একটু ইচ্ছা ছিল যে, কথাটা যখন উঠিয়াছেই, তখন একটা এস্পার-ওস্পার হইয়া যা'ক। ইলা যদি কোনও একটা জবাব দিত, তাহা হইলে হয় তো সবটা খোলাখুলি হইয়া গিয়া যা হউক একট হইয়া যাইত। কিন্তু, স্ত্রীজাতির অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ইলা সত্যেশের আক্রমণের সব প্ল্যান এলোমেলো করিয়া দিল। সত্যেশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ভাল রে ভাল, এতে কান্না কিসের জন্যে—সত্যি-সত্যি তোমার সে জায়গা ভাল লাগবে না, তাই বলেছি। তা না হয় তুমিও চল না, দেখতে পাবে।"

ইলা অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "না থাক্।"

সত্যেশ বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার প্ল্যান ছিল, সে-ই অভিমান করিবে, রাগ করিবে,—তার উপর ইলার যত অত্যাচার, ইলার যত অন্যায় তাই লইয়া খুব দু'কথা শুনাইবে। কিন্তু সব উল্টা হইয়া গেল। চোখের জল ফেলিয়া ইলা টেক্কা দিয়া গেল, সত্যেশকেই সাধাসাধি করিতে হইল। অনেকক্ষণ পরে অভিমানের পালা মিটিল, দু'জনের কক্সবাজার যাওয়াই ঠিক হইল। আয়োজন হইতে লাগিল,—পরের সপ্তাহেই তাহারা রওনা হইবে।

পরের দিন বিকালের মজ্‌লিসে কথাটা পাড়া হইতেই, লীলা ও মিঃ ঘোষ এবং সুবোধ ইলার সঙ্গী হইবার প্রস্তাব করিল। চ্যাটার্জ্জী সাহেবের এক মক্কেলের কাছে চিঠি লেখা হইল। লীলা গিয়া আরও সঙ্গী জুটাইল,—একটা প্রকাণ্ড পিক্‌নিক্ পার্টি ইহাদের সঙ্গে জুটিয়া গেল।

সত্যেশ সেদিন আফিস হইতে একটু দেরীতে ফিরিল। ডিনারের সময় ইলা বলিল, "কক্সবাজার আমার কাছে নির্জ্জন হ'বে বলে তুমি ভয় পাচ্ছিলে,—সে ভয় আর নেই।"

সত্যেশ একটু চমকিত হইয়া বলিল, "কেন?"

ইলা হাসিয়া বলিল, "দাদা, দিদি, নলিন, যতীশ মিত্তির আর সতীশ বোস এরা সবাই আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। আরও দু'একজন হ'তে পারে।" এক মুহূর্ত্তের জন্য সত্যেশের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে সে হাসিয়া বলিল, "খুব খুসী হ'লাম। তা' হ'লে তোমার কোনও চিন্তাই নাই।"

ইলার মুখে যেন একটু ছায়া পড়িল। সে একটু ক্ষুব্ধ ভাবে বলিল, "আহা, আমার যেন চিন্তায় আর ঘুম হচ্ছিল না। তুমি নিশ্চয় মনে কর যে, আমি তোমার চেয়ে এই সব সঙ্গীদের জন্য বড় বেশী ব্যস্ত। না?"

সত্যেশের মনে সেই কথাই হইতেছিল; কিন্তু সে কথা বলিয়া আবার ঠকিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না; তাই সে একটু চেষ্টা করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "What a silly girl! তোমার সঙ্গে কথা কওয়া ভার! সোজা কথা এত বেঁকা ক'রতে কতদিন থেকে শিখেছ বল দিকিনি?"

ইলা আর কথা কহিল না, ডিনার শেষ করিয়া উঠিল। তার পর ড্রইং রুমে বসিয়া বলিল, "এক বছরে যে আমি এত পুরোনো হ'য়ে যা'ব তা' জানতাম না।" বলিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তখন সত্যেশকে বাধ্য হইয়া নানা রকমে আদর করিয়া তাহার মান ভাঙ্গাইতে হইল।

এ সম্বন্ধে সে সপ্তাহের মধ্যে সত্যেশ আর কোনও কথা বলিল না। কলিকাতা হইতে বহুদূরে গিয়া এই দঙ্গলের হাত এড়াইয়া কয়েকটা দিন নির্জ্জনে ইলার সঙ্গে কাটাইবার আশায় সে বেশ একটু উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, ইলার নানা আচরণে তাহার উপর যতই অসন্তুষ্ট হউক না কেন, সত্যেশ ইলাকে ঠিক পূর্ব্বের মতই ভালবাসিত এবং তাহার সমস্ত সত্তা ইলাকে একান্ত ভাবে কামনা করিত। ইলার উপর যে সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কারণে বিরক্তি জন্মিতেছিল, তাহার মূল কারণ কেবল ইহাই যে, সে ঠিক যেমন করিয়া সম্পূর্ণরূপে ইলাকে পাইতে চাহিত, তাহাকে তেমন করিয়া সে পাইত না। তাই এই অবসরের জন্য সে বেশ তৃষিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিতে পাইল যে, ইলার যাওয়ার কথা উঠিতেই সঙ্গে এক দঙ্গল জুটিয়াছে, তখন ইহাতেই তাহার কক্সবাজার যাইবার সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। কিন্তু সে কথা সে ইলাকে বলিল না।

শনিবার দিন তাহাদের রওনা হইবার কথা। শুক্রবার দিন সন্ধ্যা-বেলায় আফিস হইতে ফিরিয়া সত্যেশ দেখিল,

বেশ রীতিমত মজ্‌লিস জমিয়া গিয়াছে। ইলা হাস্যমুখে সত্যেশকে সম্ভাষণ করিয়া জানাইল যে, একটা মস্ত বড় পার্টি জুটিয়াছে; তাহার বাবার এক মক্কেলের একটা ষ্টীমার সেখানে তাদের হাতে থাকবে,—তাহাতে তাহারা বেশীর ভাগ সময় জলে-জলেই কাটাইতে পারিবে। ক্রমে সত্যেশ জানিতে পারিল যে, এই সন্ধ্যার আলোচনার বিষয় কক্স-বাজারের একমাসব্যাপী উৎসবের প্রোগ্রাম স্থির করা। সত্যেশ কিছু না বলিয়া সব কথাতেই মৃদু হাস্যের সহিত সম্মতি দিয়া গেল। রাত্রি আটটার পর সমস্ত লোক চলিয়া গেলে, সত্যেশ ইলাকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল, "তোমাদের এত সব আনন্দের ফোয়ারার মধ্যে আমি আমার দুঃখের কথাটা পাড়তে পারলাম না; সবাইকে নিরাশ ক'রতে বড় কষ্ট হয়!"

ইলা ব্যস্ত হইয়া সত্যেশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি হ'য়েছে?"

সত্যেশ বলিল, "আমার ছুটি নেওয়া হ'ল না। Mc-Crindleকে রেখে আমি যাব মনে ক'রেছিলাম; কিন্তু কালকেই আমার তাকে মহীশূরে পাঠাতে হচ্ছে;—সেখানকার Hydro-electric plant নিয়ে একটা মস্ত গোলমাল উপস্থিত হ'য়েছে। আমি কিম্বা Mc-Crindle না গেলেই নয়।"

ইলার মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। এই এক মাসের আনন্দ-প্রবাসের যে ছবি তাহার মনে আঁকিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর কে যেন একরাশ কালি ঢালিয়া দিল। কিছুক্ষণ পর সে বলিল, "তা বেশ, Mc-Crindle ফিরে এলেই যাওয়া যাবে।"

সত্যেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সে হ'বার জো নেই। আর দু'মাসের ভিতর আমি যে কোথাও বেরুতে পারবো, সে সম্ভাবনা নেই। তাই আমি বন্দোবস্ত ক'রেছি যে সাতদিনের ছুটি নিয়ে তোমাদের সব পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবো।"

ইলা বসিয়া পড়িল। তাহার বুকের ভিতর কি একটা যেন ঠেলিয়া উঠিতেছিল। তাহার বড় কান্না পাইতেছিল। সে কেবল বলিল, "সে হ'তেই পারে না।"

সত্যেশ হাসিয়া বলিল, "কি হ'তে পারে না? এ ছাড়া কোনও উপায়ই নেই। এ সব বন্দোবস্ত ক্যানসেল করা এখন অসম্ভব। এতগুলি লোককে বলা হ'য়েছে তা'রা তোমার guest; তা'দের তুমি কিছুতেই এ মুহূর্ত্তে নিরাশ ক'রতে পার না।"

ইলা বলিল, "আমার guest কেন হ'তে যা'বে তারা তারা সব বাবার guest হ'চ্ছে। বাবা যাচ্ছেন সেখানে তিনি সব বন্দোবস্ত ক'রছেন, তা' বুঝি জান না?"

সত্যেশ বলিল, "যাই হ'ক, এখন যদি আমরা না যাই সে মোটেই ভাল হ'বে না। কাজেই যেতে আমাদের হবেই। তার পর দু'দিন বাদে আমি সুড়ুৎ করে পালিয়ে আসবো; তা'তে কারো কিছু আসবে যাবে না।"

ইলা বক্র দৃষ্টি সত্যেশের উপর ফিরাইয়া বলিল "কারো না? এই কি তোমার বিশ্বাস?"

দৃষ্টি দেখিয়া সত্যেশ আশঙ্কা করিল যে, এখনি ঝড় বৃষ্টি এক-সঙ্গে আরম্ভ হইবে। সে তাড়াতাড়ি ইলাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "কেউ মানে অবশ্য তুমি ছাড়া কেউ! তোমার যে কষ্ট হ'বে, তা'র জন্যে আমিই কি কম দুঃখিত?"

ইলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, "না; এ ভাবে আমাদের যাওয়া ভাল হয় না। আমি কাল সবাইকে জানিয়ে দেবো যে, আমরা যেতে পারলাম না। যাতে কোনও গোলযোগ না হয়, তাই ক'রবো—সেজন্য চিন্তা করো না। কিন্তু একটা কাজ কর না কেন? Mc-Crindleএর ক'দিন থাকতে হ'বে?"

সত্যেশ বলিল, "বিশ-পঁচিশ দিন,—চাই কি একমাসও হ'তে পারে।"

ইলা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "বেশ কথা, Mc-Crindleকে এখানে রেখে তুমিই মহীশূরে চল না কেন? তা' হ'লে আমাদের একটা লম্বা বেড়ান হ'বে। চাই কি ওখান থেকে অমনি রামেশ্বর পর্য্যন্ত ঘুরে ফেরা যাবে। তোমার কাজও হ'বে, শরীরও হয় তো সারবে।"

ইলার মুখে এ প্রস্তাব শুনিয়া সত্যেশ যে আনন্দিত হইল, তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। সে হাসিয়া বলিল, "তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে না কি?"

ইলা একবার গম্ভীর ভাবে ভারী-ভারী চোখ দুটি সত্যেশের মুখের দিকে ফিরাইয়া বলিল, "তুমি যদি না ইচ্ছা কর, তবে যেতে চাই না।"

কাজেই সত্যেশকে হার মানিতে হইল।

কক্সবাজারে যে আনন্দ-সম্মিলন হইল, ইলা বা সত্যেশ তাহার মধ্যে ছিল না। কিন্তু একমাসকাল তাহারা মহীশূরে যে আনন্দে কাটাইল, সত্যেশ বা ইলা তাহাদের বিবাহিত জীবনে এত আনন্দ কখনও পায় নাই। এই একমাসের প্রবাসে সত্যেশের প্রেমের শিথিলায়মান মূল আবার দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিল। এই একমাসকাল নিঃশেষ রূপে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইয়া তাহারা পরস্পরের কাছে আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। যে মেঘ সত্যেশের মনের উপর বাসা করিয়াছিল, তাহা অনেকটা কাটিয়া গেল,—সত্যেশ ইলার প্রকৃত মধুময় হৃদয়ের আস্বাদ পাইয়া তাহার সকল অসন্তোষ ভুলিয়া গেল। দক্ষিণাপথের নানাস্থান ঘুরিয়া যখন তাহারা বালিগঞ্জের বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন সে মেঘের ছায়ামাত্রও অবশিষ্ট রহিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই একমাসের "মধুচন্দ্রিকায়" যে সত্যেশ ও ইলা পরস্পরের কাছে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্যেশ একটা ভুল করিয়াছিল। সে যদি এই আনন্দের সময় মনের সব ক্লেদ ঘুচাইয়া লইত, মনটার আনাচে-কানাচে যত ময়লা আছে সব বাহির করিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া লইত, তবে জন্মের মত গোল মিটিয়া যাইত। কিন্তু সত্যেশ অতীতের কথা তুলিয়া নিষ্ঠুরভাবে বর্ত্তমানের আনন্দ-স্বপ্ন ভাঙ্গিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাহার মনে হইতেছিল যে, অতীত একেবারেই মরিয়া গিয়াছে—সে যেন আর ফিরিয়া আসিবে না।

ফলে হইল এই যে, গোলমালের বীজ মনের কোণে রহিয়া গেল। ইলা তাহার স্বামীকে বুঝিয়াও বুঝিল না। তাহার স্বামী যে তাহার কাছে কি আশা করে, সে কথা কোনও দিন সত্যেশ তাহাকে মুখ ফুটিয়া বলে নাই; ইলারও এতটা অন্তর্দৃষ্টি ছিল না যে, সে তাহা না বলিলেও অনুভব করে। দুজনে এই সব বিষয়ে বোঝা-পড়া হইল না।

কাজটা ভাল হইল না। কারণ, ইলার অপরাধ যাহা কিছু, তাহার জন্য ইলার স্বভাবের চেয়ে তার অনভিজ্ঞতাই বেশী দায়ী। যাহাকে তাহার সমাজে "সোসায়িটী" বলে, তাহাতে সে যে বড় বেশী আনন্দ অনুভব করিত, তাহা নহে। সে সমাজে মিশিত এবং সমাজ তাহার কাছে যাহা প্রত্যাশা করিত তাহা সে করিত,—কেবল দশজনের মতের বিরুদ্ধে কোন কথা ভাবিবার বা কায করিবার অভ্যাস বা শক্তি তাহার ছিল না বলিয়া। সে সত্যেশকে প্রাণের অধিক ভালবাসিত। সত্যেশ যতক্ষণ কাছে থাকিত, ততক্ষণ তাহার জগৎ আলোয় ভরিয়া থাকিত; সত্যেশ আড়ালে গেলেই সে জগৎ অন্ধকার হইয়া যাইত। কিন্তু সে কথা স্বীকার করিতে সে কুণ্ঠিত হইত। পাছে তাহার প্রেমের আবেগে সে এমন কিছু করিয়া ফেলে, যাহা সমাজের চক্ষে বাড়াবাড়ি বলিয়া গণ্য হয়, সেই ভয়ে সে লোকের সামনে নিজেকে খুব বেশী করিয়া চাপিয়া রাখিত। স্ত্রীর স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার লোকে পছন্দ করে, তাহার আদর্শ সে দেখিত তাহার দিদির ব্যবহারে—আর তা'র দিদিকে সোসায়িটীতে কে না ভালবাসে? লীলার স্বামী অবশ্য নিতান্ত নেংটার মত লীলার সঙ্গে-সঙ্গে সর্ব্বদাই থাকে; কিন্তু লীলা অন্য লোকের সংসর্গে তাহার অস্তিত্বটা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া চলে। এ রকম করা ইলার স্বভাববিরুদ্ধ; দশজনের মাঝখানেও সে তাহার চক্ষু সত্যেশের দিক্ হইতে ফিরাইতে পারিত না। সত্যেশের কথা শুনিবার জন্য তাহার কর্ণ এতটা সজাগ হইয়া থাকিত যে, অন্য লোকের কথা প্রায় সে শুনিতেই পাইত না। দশজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বসিয়া বেশ গল্প-সল্প আমোদ-আহ্লাদ হইতেছে, এমন সময় যদি সত্যেশ আসিয়া পড়িত, তবে ইলার সব কথাবার্ত্তা এলোমেলো হইয়া যাইত। তাহার সমস্তটা মন সত্যেশের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে, সে কথা সকলেই লক্ষ্য করিত।

প্রথম-প্রথম তাহার এই ভাব লইয়া অনেক কথা হইয়াছিল। তাহার দাদা সুবোধ, দিদি লীলা প্রভৃতি তাহাকে খুব ঠাট্টা করিত। অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবও তাহাদের সাহায্য করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "সত্যেশ যে বিয়ে ক'রেছে বলে ইলাকে এমন ক'রে monopolise ক'রবে, এটা ভাল নয়।"

ইলাকে কাজেই জবাব দিতে হইত। সত্যেশের যে একচেটিয়া করিবার অধিকার আছে, এবং তাহা করাই যে স্বাভাবিক, এ কথা বলিবার মত বেহায়াপনা (?) এবং সাহস ইলার ছিল না। এ কথা হয় তো তাহার মনেও ওঠে নাই; কেন না, কি উচিত, কি অনুচিত সে সম্বন্ধে তাহার চারি-

দিককার দশজনের মতকে অন্ধ ভাবে স্বীকার করিয়া লওয়াই তাহার অভ্যাস ছিল। যদি কেহ তাহার সম্মুখে দৃঢ়ভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইত, তবে ইলা তাহার নেতৃত্বে বিদ্রোহের দলে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইত না।—তাই যখন তাহার পিতা সমস্ত পরিবারের মতের বিরুদ্ধে তাহার বিবাহের আয়োজন করিলেন, তখন সে অনায়াসে পিতার নেতৃত্বে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। কিন্তু নিজের জোরে আপনার পায়ে দাঁড়াইয়া সে দশজনের গৃহীত মতামতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিত না।

তাই এ কথার উত্তরে সে দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিত যে, সত্যেশ তাহাকে monopolise করিয়াছে; এবং আচার-ব্যবহার দ্বারা সে দেখাইতে চেষ্টা করিত যে, সে এবং সত্যেশ চলিত আদর্শের বিরুদ্ধাচারী নয়। পাছে লোকে মনে করে যে, তাহারা অতিরিক্ত রকম পরস্পরকে লইয়া মত্ত, সেই জন্য সে অতিরিক্ত রূপে বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশিত। এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই সে বৈকালে একপাল লোককে টেনিস খেলার নিমন্ত্রণ করিত এবং তাহাদের লইয়া সন্ধ্যাটা কাটাইত।

সত্যেশ আসিলে ইলার মনটা যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া যাইত, তাহা ইলা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিত না। এ কথা লইয়া বন্ধু-মহলে খুব ঠাট্টা হইত। সত্যেশ আসিয়া পৌছিলে বন্ধুরা বলিত, "হ'য়েছে,—ইলার এখন বুদ্ধি-শুদ্ধি সব এলিয়ে যাবে।"

ইলা এই পরিহাসে আনন্দিত না হইয়া প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইত যে, সত্যেশের আসা-না-আসায় তাহার কিছু আসে-যায় না। সেই জন্য সে বিশেষ চেষ্টা করিয়া দিদির স্বামীর প্রতি ব্যবহারের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত।

সত্যেশ এ সমাজে ভাল করিয়া মিশিতে পারিত না। তাহার কারণ, প্রথমতঃ তাহার কাজ অনেক,—এসব লঘুত্বের অবসর তা'র অল্প। তাহা ছাড়া, সে মোটেই হাল্কা স্বভাবের লোক নয়। সে পরিহাসপ্রিয়, এবং মজলিস-শুদ্ধ লোক হাসাইতে তাহার মত দ্বিতীয় কেহ ছিল না; কিন্তু দিন-রাত সে এক হাসির উপর থাকিতে ভালবাসিত না। পড়াশুনা করা তা'র একটা রোগের মধ্যে ছিল। কাজেই সে এ দলের চক্ষের বিষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার স্বামী যে সমাজের দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই, তাহাতে ইলা লজ্জিত হইত; তাই তাহাঃ প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য আরও বেশী করিয়া নিজেকে দশ-জনের মনের মত করিয়া চালাইত।

মহীশূর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইলা শুনিল যে, তাহার ও তাহার স্বামীর বড় নিন্দা হইয়াছে। কাজের ওজুহাত যে মিথ্যা এবং বন্ধুদের এড়াইয়া একান্তে স্ত্রীকে লইয়া আমোদ করিবার চেষ্টায়ই যে সত্যেশ এ কাণ্ডটা করিয়াছে, সে বিষয়ে ইলার বন্ধু-মহলে কোনও মতভেদ ছিল না। সুবোধ এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ হাজির করিয়াছিল; Mc-Crindle তাহাকে বলিয়াছে যে, সত্যেশ অনায়াসে ১৫ দিন কি এক মাসের ছুটি লইতে পারিতেন।—বাস্তবিক কথাটা সত্য। সত্যেশ যে ইচ্ছা করিয়া একটা কাজ জুটাইয়া কামাই করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইলা তর্ক করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত যে, কথাটা আগাগোড়া মিথ্যা। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ইলা দেখিল যে, বন্ধু-সমাজে তাহাদের প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে হইলে, ইলাকে আরও বিশেষ ভাবে তাহাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। সে বুঝিতে পারিল না যে, এই চেষ্টায় সে ক্রমেই সত্যেশের বিরাগের কারণ হইতেছে; কেন না সত্যেশ কখনও তাহাকে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে নাই।

একদিন দ্বিপ্রহরে বন্ধুর দল আসিয়া প্রস্তাব করিল, বোটানিকেল গার্ডেনে যাইবার পাঁচটা পুরুষ ও চারিটি মহিলা জুটিয়াছেন,—সে গেলেই দল পূর্ণ হয়। ইলা বলিল, "আমার আজ বড্ড কাজ—"

মিস মিত্র নামে একটা ছোট্ট সুন্দরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি বলি নি? ইলা কখ্‌খনো যাবে না। তার বরটিকে সঙ্গে না মিলে কি সে যেতে পারে?"

সবাই হাসিয়া উঠিল।

ইলা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না, সত্যি—"

লীলা বলিল, "সত্যি নয় তো কি মিথ্যে? যেমন কক্স-বাজার যাবার সময় মহীশূরের দরকার!"

ইলা বড় লজ্জিত হইয়া পড়িল। "না দিদি, সত্যি আমায় আজ একটা খুব জরুরী কাগজের প্রুফ দেখে রাখতে হ'বে,—সেটা কাল ছাপা হওয়াই চাই,—উনি আজ বিশেষ ক'রে—"

বলিতেই সুন্দর ও সুন্দরীবর্গ হাসিয়া উঠিল—সেই "উনি",—ইলাও লজ্জিত হইয়া লাল হইয়া উঠিল।

মিষ্টার বসু—ইনি বিলাত হইতে journalism শিখিয়া আসিয়াছেন—বলিলেন, "দিন আপনার proof আমাকে, —আমি ষ্টীমারে সবটা দেখে শেষ ক'রে দেবো।"

ইলা অবশ্য এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল; কিন্তু এ অবস্থায় তাহার আর যাইতে অস্বীকার করিবার উপায় রহিল না। সে একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে কে যাচ্ছে?"

মিস মিত্র বলিল—"সে জন্য ভয় পেয়ো না; খুব proper party হ'বে। তোমার মা আছেন, বুড়ো মিসেস ব্যানার্জ্জী আছেন—তাঁরা দু'জনে খাওয়া-দাওয়াটার ভার নিয়েছেন।"

লীলা বলিল, "দূর কর ছাই, এত কথার দরকার কি? তুই টেলিফোন ক'রে হুকুম এনে নে। না হয় আমিই তোর হ'য়ে ব'লে দিচ্ছি। বিনা হুকুমে যে তুই যেতে পারবি না তা' আমি জানি।"

"ইস!" বলিয়া ইলা উঠিল, "আমি কারো হুকুমের নোকর নই।" শেষে তাহাকে যাইতেই হইল—প্রুফ সে সঙ্গে লইয়া গেল।

যখন সত্যেশ বাড়ী ফিরিল, ইলারা তখনও ফিরিয়া আসে নাই। ইলাকে বাড়ীতে না দেখিয়া সত্যেশ দুঃখিত হইল। পরে যখন বেয়ারার কাছে শুনিল যে, সে দ্বিপ্রহরে সত্যেশের নিতান্ত অপ্রিয় একদল লোকের সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছে, তখন সে সত্য-সত্যই রাগিয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া, সে নিঃশব্দে চা খাইয়া, একখানা বই লইয়া lawnএ বসিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল। এমন সময়ে চ্যাটার্জ্জী সাহেবের নূতন মোটরখানা আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ইলা, লীলা, মিষ্টার ঘোষ ও বুড়ো মিষ্টার ব্যানার্জী বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহারা হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া সত্যেশের দিকে আসিলেন; কেবল ইলা, "Excuse me" বলিয়া ছুটিয়া ঘরের ভিতর গেল।

ব্যানার্জী মহাশয় বিশেষ রসিক বলিয়া বন্ধু-মহলে খ্যাত। তাঁহার রসিকতার মধ্যে বারোআনাই যে আদিরসাশ্রিত, অশ্লীল—সেজন্য তাঁহার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল বই কমিয়াছিল না। তিনি ব্যারিষ্টার; এককালে পশার মন্দ ছিল না। কিন্তু এখন তিনি ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে সবাই ঠাকুর্দ্দা বলিয়া তামাসা করিত।

ব্যানার্জী খুব হাসিয়া সত্যেশের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ওরে শালা, দিব্য নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে পড়ছিস্ কি? আমি যে এদিকে তোর অসাক্ষাতে তোর মাগকে নিয়ে ইলোপ করেছিলাম, সে খবর জানিস?"

কথাটায়, কি জানি কেন, সত্যেশের প্রাণের ভিতরটায় ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে ভাল করিয়া হাসিতে পারিল না, কিন্তু অপর শ্রোতারা হাসিয়া উঠিল। ব্যানার্জী বলিলেন, "বাবা, দুপুরে ডাকাতি! সত্যেশের সাত-রাজার ধন মাণিক, তার উপর দিন-রাত সত্যেশ কড়া পাহারা দিচ্ছে;—তা'র ভেতর থেকে চুরি! ওহে, সে বোসটা গেল কোথায়—এ নিয়ে একটা বেশ sensational paragraph লেখা চলবে।"

এই রসিকতার স্রোত থামাইবার জন্য সত্যেশ বলিল, "বসুন না ঠাকুর্দ্দা—এক পেয়ালা চা খাবেন না?"

এ প্রস্তাবে সকলে ঘোরতর আপত্তি করায়, এবং শীঘ্র বাড়ী যাইতে ব্যস্ত হওয়ায়, ব্যানার্জীকে অস্বীকার করিতে হইল। সবাই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন,—তবু সত্য-সত্য যাইতে আরও ১৫ মিনিট দেরী হইল। ব্যানার্জী picnic-partyর বেশ রং-চড়ান একটা বর্ণনা না দিয়া নড়িতে পারিলেন না।

তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া সত্যেশ ঘরে ঢুকিল। খুব রাগ করিয়া রাগ দেখাইবার জন্যই ঢুকিল। সে ভাবিয়াছিল, ইলা কাপড় ছাড়িয়া মুখ-হাত ধুইতে গিয়াছে। কিন্তু ইলার ড্রেসিং রুমের বাহির হইতে দেখিতে পাইল যে, তাহার কাপড় ছাড়া হয় নাই। ইলা ড্রেসিং টেবিলের কাছে একটা চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্ট মনে কি দেখিতেছে। আরসীর ভিতর তাহার মুখে বেদনা ও ব্যস্ততার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। সত্যেশ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। আরসীর ভিতর সেই সুন্দর উদ্বিগ্ন মুখ দেখিয়া সে নড়িতে পারিল না। ইলা যে বাস্তবিক অনুতপ্ত, সে কথা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। কিন্তু সে করিতেছে কি?

অল্পক্ষণ বাদে ইলা মাথা তুলিয়া, হাতে করিয়া কয়েকখানা কাগজ তুলিয়া লইল। সত্যেশ দেখিল, তাহারই সেই প্রুফ। ইলা সে প্রুফ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল; কিন্তু

নিন্দায় ভয়ে বেশী কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বাড়ী আসিয়াই সে কাজটা শেষ করিতে বসিয়াছে।

বেচারার উপর সত্যেশের বড় দয়া হইল; সে ঘরে প্রবেশ করিল। ইলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার অনুতপ্ত চক্ষু স্বামীর মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "আমি বড় দোষ করেছি—কিন্তু তোমার প্রুফ আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ ক'রে দিচ্ছি।"

সত্যেশ বলিল, "কিচ্ছু দরকার নেই। তুমি ক্লান্ত হ'য়েছ, কাপড়-চোপড় ছাড়, বাকীটুকু আমি দেখে দিচ্ছি।" বলিয়া প্রুফের দিকে হাত বাড়াইল।

ইলা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না, আমাকেই এটা শেষ ক'রতে দাও—লক্ষ্মীটি আমার, আমার উপর রাগ করো না।"

সত্যেশ হাসিয়া, ইলাকে বুকের কাছে টানিয়া, তাহার কপালে চুম্বন করিল; বলিল, "পাগল, রাগ ক'রে বলছি না, তোমার জন্যেই বলছি। এখন যাও, কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম কর। এটুকু কাল দেখলেও চলবে।"

এমনি করিয়া এ দিন কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু মেঘ এমনি করিয়া দিনের পর দিন আবার জমিতে লাগিল। একদিন সত্যেশ যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে দেখিল যে, লনে ইলা ও লীলা বসিয়া পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে সমানে সিগারেট খাইতেছে! লীলার এ দোষ তাহার জানা ছিল,—কিন্তু ইলা যে এতটা বেহায়া হইবে—যেটা খুব বাড়াবাড়ি নব্যা ছাড়া ইংরাজ সমাজেও মহিলারা খুব সঙ্গত মনে করে না, ইলা যে তাই করিয়া বসিতে পারে, এটা সত্যেশ কল্পনা করিতে পারে নাই। দেখিয়া সত্যেশ ক্ষেপিয়া উঠিল; কিন্তু ইলাকে কিছু বলিল না। দিন-পাঁচ-সাত সে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া রহিল, ইলার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বড় বেশী কহিল না।

ইলা সত্য-সত্য সিগারেট খাইত না। কিন্তু সে দিন স্ত্রীলোকের সিগারেট খাওয়ার কথা লইয়া আলোচনায় ইলা দেখিল, সকলেই লীলার পক্ষে। নব্যা মহিলার পক্ষে যে সিগারেট খাওয়া খুব উচিত, সে সম্বন্ধে নানা বক্তৃতা শুনিল। সে আপত্তি করিল, ধূমপানের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি উপস্থিত করিল। অবশ্য সেকালে যেমন ধূমপানটা একটা নৈতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, এখন সে কথা বলা চলে না;— তবে ধূমপানে, বিশেষতঃ নারীর পক্ষে, নানা শারীরিক দোষের সৃষ্টি হয়।

একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল, "তুমি তো এ কথা বলবেই। সত্যেশ যখন চুরুট পর্য্যন্তও খায় না, তখন সেটা তোমায় সমর্থন ক'রতেই হ'বে।"

ইলা উষ্ণ ভাবে বলিল, "কখ্খনো না, তাঁ'র মতের অপেক্ষা ক'রে আমি মত তৈয়ার করি না। আমার নিজের একটা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, সে কথা তোমরা স্বীকার ক'রতে চাও না কেন?"

আর একজন বলিল, "সেটা প্রমাণ কর। নিজের বুদ্ধিতে তুমি চুরুটকে দোষের জিনিষ ব'লে সাব্যস্ত ক'রলে কি ক'রে? কখনো একটান খেয়ে দেখেছ?"

ইলা। না, তা' দেখিনি—

হো হো করিয়া সবাই হাসিয়া উঠিল। লীলা বলিল, "আচ্ছা, তুই একটা খেয়ে দেখ। এতে ভাল হয়, না মন্দ হয়, তা'র পর বলিস।"

এক বন্ধু বলিলেন, "তাই করুন মিসেস মুখার্জ্জী—তা হ'লেই আর কোনও কথা থাকবে না।"

আর এক বন্ধু বলিলেন, "ওর সাধ্য হ'লে তো! সত্যেশ তা' হলে কি ভাববে?"

ইলা বলিল, "সিগারেট সম্বন্ধে মত প্রকাশ ক'রতে হ'লে খেতেই হবে, তা'র কি মানে আছে—"

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "আছে বই কি! তুমি যে কেবল সত্যেশের কাছ থেকে ধার-করা প্রেজুডিস থেকে কথাটা ব'লছো না, নিজের কনভিক্‌শন থেকে ব'লছো, অভিজ্ঞতা থেকে বলছো, সেটা প্রমাণ হ'লে তোমার কথা শোনবার যোগ্য হবে।"

আর এক বন্ধু বলিলেন, "ব্রাভো! এর পর আর কিছু বলবার নেই মিসেস মুখার্জ্জী! আপনি একটা খেয়ে দেখান যে, কিছু প্রেজুডিস নেই।" বলিয়া সে তাহার সিগারেট কেসটী ইলার সামনে ধরিল। ইলা ধন্যবাদ দিয়া অস্বীকার করিল। মিষ্টার ঘোষ তখন তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন; বলিলেন, "তুমি সিগারেট খেয়ে দেখতে অস্বীকার করছো কেন, সেটা বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। এতে কোনও নৈতিক অপরাধ হয় না, তা' তুমি স্বীকার কর?" "হাঁ।"

"স্ত্রীলোকের পক্ষে indelicate বলে তুমি এটা মনে কর না?"

"অন্ততঃ সেটা আমার আপত্তির কারণ নয়।"

"তোমার মতে সিগারেট খাওয়া অন্যায়; কেন না শরীরের তা'তে নানা রকম ক্ষতি হয়?"

"নিশ্চয়! বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, যাদের আর—"

"আচ্ছা থাক্; কিন্তু জন্মের ভিতর যদি একটা সিগারেট কেউ খায়, তা'তে তার শরীর মাটী হ'তে কিছুতেই পারে না?"

"হাঁ—তা নয় —তবে—"

"এর 'তবে' কিছুই নেই, এটা খাঁটি কথা।"

"আচ্ছা স্বীকার ক'রলাম।"

"তবে জীবনের মধ্যে কেবল একটীমাত্র সিগারেটের এক-চতুর্থাংশ খেতে তোমার আপত্তি এ কারণে থাকতে পারে না।"

"তা নয়। তবে কুদৃষ্টান্ত দেখানটা উচিত নয়।"

এক বন্ধু বলিলেন, "আমাদের কাউকে আপনি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে নষ্ট ক'রতে পারবেন না—কোনও ভয় নেই—fire away।"

মিষ্টার ঘোষ। তবেই দাঁড়ায় এই যে, তুমি কেবল সত্যেশের মুখ চেয়ে এই পরীক্ষাটায় রাজী হচ্ছ না।

"নিশ্চয়ই না। এই যদি তোমাদের কথা হয়, তবে না হয় আমি দু'টান খেয়ে দেখিয়েই দিচ্ছি যে, তা' নয়।" বলিয়াই ইলা সিগারেট ধরাইল। ঠিক সেই সময় সত্যেশের মোটর আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল। ইলা সত্যেশকে দেখাইয়াই সিগারেট টানিয়া, খুব খানিকটা ধূমোদ্গীরণ করিয়া তাহা ফেলিয়া দিল।

ইলার গলায় ধোঁয়া ধরিয়া সে খানিকটা কাশিল। তার পর তাহার মাথাটা একটু ঘুরিয়া উঠিল। অল্পেই সে সামলাইয়া গেল। তার পর সে বলিল, "ওঃ! ঐ যে সদ্য বিষ! তোমরা এ খাও কেমন করে!" ইহার পর এ তর্ক আর চলিল না।

ইহাই ইলার সিগারেট খাওয়ার ইতিহাস। সত্যেশ এত কথা জানিত না, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করাও আবশ্যক বোধ করে নাই। কিন্তু এ কথাটা তাহার মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া গেল যে, ইলা সিগারেট খায়। এমনি করিয়া দিনের পর দিন; ইলার দুর্ব্বলতার ফলে, তাহার উপর সত্যেশের রাগ বাড়িয়া চলিল। (ক্রমশঃ)

বেদ ও বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

(২)

(জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ—জ্ঞানপ্রচার সমিতির পঞ্চবিংশতিতম অধিবেশনে পঠিত)

গতবারে আমরা আমাদের জ্ঞানের কষ্টি-পাথরের অন্বেষণে বাহির হইয়া, দেবর্ষি নারদের মত প্রায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডটা ঘুরিয়া আসিয়াছি। বিজ্ঞানাগার হইতে আরম্ভ করিয়া তপোবন, সিদ্ধাশ্রম, কৈলাস পর্ব্বত—কোথাও যাইতে বাকি রাখি নাই। ভ্রমণটা অবশ্য একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। ব্যতিরেকমুখে, নেতি-নেতি করিয়া, শেষকালে কষ্টিপাথর বা আদর্শের একটা আভাস পাইয়াছিলাম। প্রত্যক্ষজ্ঞান বা অপরোক্ষজ্ঞানকে যদি বেদ আখ্যা দেওয়া যায়, তবে আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে, সুতরাং যথার্থ বেদ নহে। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান সঙ্কীর্ণ এবং অল্প-বিস্তর পরিমাণে দোষদুষ্ট। ইহার ব্যভিচার আছে, সুতরাং পরীক্ষা করিয়া লইবার আবশ্যকতা আছে। বিজ্ঞানাগারে যন্ত্র-তন্ত্র সাহায্যে যে প্রত্যক্ষগুলি আমরা পাই, সেগুলিও দোষ ও ব্যভিচারের সীমা একেবারে অতিক্রম করিয়া যায় না। কাজেই সেখানেও আমরা যথার্থ বেদের সন্ধান পাই নাই। আমাদের সাধারণ প্রত্যক্ষগুলির পরীক্ষা দিতে হয় বিজ্ঞানাগারে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষগুলিও আবার পরীক্ষা না দিয়া পার পান না। তপোবনে গিয়াও আমাদের গোল মিটে নাই, আমরা সুস্থির হইতে পারি নাই। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যোগজ-প্রত্যক্ষগুলি সব সমানভাবে বিশুদ্ধ ও যথার্থ নহে; সুতরাং নানা মুনির নানা মতের সম্ভাবনা সত্য-সত্যই কতকটা আছে। শেষকালে কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া দেবাদিদেব মহেশ্বরের নিকটে বেদের আর দুইটি মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম। পরমেশ্-

য়ের যে পূর্ণ ও নিরতিশয় জ্ঞান, তাহাই চরমবেদ—Veda in the limit, এবং তাহাই আমাদের সকল প্রকার জ্ঞানের চরম আদর্শ—Standard in the limit. ইহাই বেদের ঐকান্তিক রূপ। আবার, বেদের অপর এক রূপ মহাদেবের জটাজালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে দেখিয়াছি। লোকে ও পুরাণে ইহাকে বলিয়াছে গঙ্গা; আমরা ইহাকে চিনিয়াছি, বেদধারা রূপে। গীতা ইহাকে আমাদের চিনাইয়া দিয়াছেন, একটা ঊর্দ্ধমূল, অধঃশাখ, অব্যয় অশ্বত্থবৃক্ষরূপে—"ছন্দাংসি যস্য পত্রাণি" পরমেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া, সেই "পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ"কে মূল উৎস করিয়া একটা শব্দ-অর্থ-প্রত্যয়ের ত্রিধারা বেদ-রূপে গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে আমাদের জ্ঞানের দ্বারে পৌঁছিয়াছে; আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব অনুভূতিগুলিকে মিলাইয়া লইবার আদর্শ রূপে ইহা আমাদের কাছে হাজির আছে। প্রাচীনদের কাছেও ছিল। ব্যাস-বশিষ্ঠাদি সকলেই এই আদর্শের দ্বারা নিজ-নিজ জ্ঞানগুলি পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। যিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়াছেন; তাঁহার অভিজ্ঞতা সর্ব্বজ্ঞতা; সুতরাং তাঁহার বেদ চরমবেদ। কিন্তু নিম্নভূমিতে জ্ঞানগুলি পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য একটা সুব্যবস্থিত, বিশ্বস্ত ও শিষ্ট-পরিগৃহীত আদর্শ আমাদের পাওয়া দরকার। আস্তিকেরা বলেন, গুরুশিষ্য-পরম্পরাগত শব্দধারা ও জ্ঞানধারাই এই বিশ্বস্ত আদর্শ। কারণ, ইহার মূল স্বয়ং প্রজাপতি; এবং সেই মূল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক গুরুই যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ভাবে এই শব্দধারা ও জ্ঞানধারাকে শিষ্যের মধ্যে বহাইয়া দিতে সচেষ্ট আছেন; এবং প্রত্যেক শিষ্যও যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ভাবে ইহা নিজের মধ্যে পাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই চেষ্টা, সাধনা ও ব্যবস্থার ফলে, ধারা দুইটির যতটা সঙ্কর ও বিকার হইবার সম্ভাবনা ছিল, ততটা অবশ্য হইতে পারে নাই। ধরুন, কোন মন্ত্র-বিশেষের ধ্বনি ও ছন্দঃ। ইহাদের সম্বন্ধে কত বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা। গুরু ধ্বনি ও ছন্দঃ ঠিক যে ভাবে নিজে পাইয়াছেন, ঠিক সেই ভাবে শিষ্যের মধ্যে আদায় করিয়া ল'ন। সঙ্গীতের তাল ওস্তাদেরা শিষ্যের মধ্যে সুরগুলি ও রাগরাগিণীগুলি যথাযথভাবে আদায় না করিয়া যেরূপ ছাড়েন না, সেইরূপ। ব্যক্তিগত খোসখেয়ালের অবকাশ কাজেই বড় একটা হইতে পারে নাই। ধ্বনি, ছন্দঃ, দেবতা, বিনিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে একটা পুরুষ-পরম্পরাগত শিষ্ট-পরিগৃহীত ব্যবস্থা বাহাল রহিয়া গিয়াছে। মন্ত্রের ধ্বনি, ছন্দঃ প্রভৃতিও আবার অবান্তর বিষয় নহে। পূর্ব্বে দু'টো-একটা বক্তৃতায় যুক্তি প্রয়োগ করিয়া আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মন্ত্রের ধ্বনি, ছন্দঃ প্রভৃতি রীতিমত হইলে, সে মন্ত্রের শক্তি অনেক অঘটন-ঘটন-পটিয়সী হইতে পারে। বিজ্ঞানের দিক্ হইতে পরীক্ষা করিলে মন্ত্রশক্তিতে দেবতাদির তৈজস-মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ, সমিধ্-প্রজ্বলন, পর্জ্জন্য-সৃষ্টি প্রভৃতি অনেক অসাধারণ ব্যাপারও সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতে পারে। বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া এ সকল কথার বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন আমাদের ভবিষ্যতে হইবে। ফল কথা, বিজ্ঞান আজকাল নিজে অনেক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়া আমাদের তাক্ লাগাইয়া দিতেছে; অলৌকিক কিছু দেখিলেই বিনা পরীক্ষায় সেটাকে বুজ্‌রুকি বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে, এমন কথা বলার বুকের পাটা আর কাহারও নাই। শুধু জড়ের রাজ্যে নয়, অধ্যাত্ম রাজ্যেও (Psychic and spiritual matters) বিজ্ঞান গম্ভীর, তদ্‌গত ভাবে প্রমাণ সংগ্রহ, প্রমাণ পরীক্ষা এবং বিচার-মনন সুরু করিয়া দিয়াছেন; এবং অসন্দিগ্ধ ভাবে যে সকল তথ্য তাঁহার পাকা-খাতায় তুলিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার কতক-কতক আমাদের সাধারণ হিসাবের বাহিরে, আমাদের আটপৌরে ধারণার অতীত। মন্ত্রশক্তির কাণ্ডকারখানাগুলা অলৌকিক শুনিতেছি বলিয়াই সেগুলিকে আমাদের পরীক্ষা ও বিচারের আমলে মোটেই আনিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যাঁহারা বিজ্ঞের মত বসিয়া আছেন, তাঁহারা বিজ্ঞান-ব্যবসায়ী হইলেও বিজ্ঞানের চিনির বলদ। পরীক্ষা ও বিচারের ফল যাহাই হউক, তাহার জন্য চিন্তিত হইয়া লাভ নাই। এ ক্ষেত্রে সত্যসত্যই ফলাভিসন্ধি শূন্য হইয়া নহে, ফলে নির্ম্মম হইয়া আমাদের পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সে যাহাই হউক, গুরু-পরম্পরাগত যে শব্দধারা ও প্রত্যয়ধারা, তাহাকে বেদ-রূপে, শাস্ত্র-রূপে, আমাদের নিজস্ব জ্ঞানগুলির আদর্শ-রূপে (Classics of experienceরূপে) গ্রহণ করার একটা কথা আমরা শুনিতেছি। চরম বা নিরতিশয় বেদ প্রাংশুলভ্য ফল; বামদেব, শুকদেবের মত দুই-একজন উত্তমশ্লোক হয় ত সে ফলের আস্বাদ পাইয়াছেন; কিন্তু

আমি বামন, সে ফললাভ-প্রত্যাশায় উদ্‌বাহু হইয়া কেনই বা "গমিষ্যামুপহাস্যতাম্‌" ? তবে, এদিকে আবার বাড়ীর পাশে ভক্তশিরোমণি রামপ্রসাদের নিমন্ত্রণ পাইয়াছি, কালী-কল্পতরুর মূলে বেড়াইতে যাইবার ; নিমন্ত্রণ আমার নহে, মনের। মনকে ত আঁটিয়া উঠিতে পারি না, সে বড়ই বেয়াড়া! তাহাকে যদি কখনও বাগ মানাইতে পারি, তবে না হয় চতুর্ব্বর্গের মধ্যে বাছিয়া সেই ফলটিই কুড়াইয়া আনিব, যে ফলটার আস্বাদ লইলে, এই সংসার-পাদপের শাখায়-শাখায় জন্মজন্মান্তর ধরিয়া স্বাদু-কষায়, তিক্ত-মধুর ফল আর খাইয়া মরিতে হইবে না। কিন্তু, এই কর্ম্মভূমিতে আর্য্যকুলে, দ্বিজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমায় যে বলিতে হইতেছে, আমি তেমন ভাগ্য করিয়া আসি নাই। চরম বা নিরতিশয় বেদে আমার অধিকার নাই। এমন কি, ইহাকে একটা কল্পিত আদর্শ—Veda in the limit—ভাবিয়াই আমায় ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। যেন ইহা একটা গণিতের পরিভাষা—Mathematical concept ; ম্যাক্স-ওয়েলের বৈজ্ঞানিক-ভূত (Sorting Demon) এর জ্যেষ্ঠ-তাত যেন আমার প্রজাপতি মহাশয় ; শুভ-বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রে শ্রীযুগ্মসমন্বিত হইয়া ইহাঁকে একটা নমস্কারের ভাগ পাইতে দেখিয়াছি, এবং কদাচিৎ বা পক্ষযুগল ও পদশ্রেণী বিস্তার করিতেও দেখিয়াছি। এ ছাড়া, অন্য কোনও রূপ প্রত্যক্ষ প্রজাপতি সম্বন্ধে এ অধমের হয় নাই। সুতরাং চরম বা নিরতিশয় বেদের থাকা-না-থাকা আমার কাছে সমান হইয়া রহিয়াছে।

গুরু-পরম্পরাগত শিষ্ট-পরিগৃহীত যে বেদ, তাহা লক্ষণ-মত বেশ সুন্দর কষ্টিপাথর সন্দেহ নাই ; তবে, পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া রাখিয়াছি যে, এ ক্ষেত্রেও মন নানা সংশয়ে আচ্ছন্ন ও আন্দোলিত হইয়া থাকে। এখানেও দেখিতেছি, আমি 'শূদ্রত্বমাপন্ন' হইয়াছি। আস্তিকেরা বেদধারার অবতরণ সম্বন্ধে যে বিবরণ দিলেন, তাহা না হয় মানিয়া লইলাম। কিন্তু যে ধারাটি আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা যে অল্প-বিস্তর পরিমাণে খণ্ডিত, সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত হইয়া আসিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বেদ-বিপ্লব, বেদোদ্ধার, বেদ-বিভাগ, বেদ-সংস্কার—এ সকল কথা বারবার স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। পরমেশ্বরের অসীম জ্ঞানরাশি তোমার-আমার মত জীবের বুদ্ধিতে প্রবাহিত হইয়া আসিতে গেলেই, তাহাকে অবশ্যই অল্প, কৃপণ ও কুণ্ঠিত হইয়া আসিতে হয়। মহাসাগরের সবটুকু জল আর মেঘরূপে আকাশে ঘনীভূত হয় না ; সবটুকু জল কখনও জোয়ারের উচ্ছ্বাসে বেলা-ভূমিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে না। এইজন্য, তুমি-আমি যে জিনিসটাকে ঋক্‌ যজুঃ প্রভৃতি রূপে শুনিতেছি ও বুঝিতেছি, তাহা সেই চরমবেদ বা বেদপরাকাষ্ঠা নহে। ইহা খণ্ডিত ও সঙ্কীর্ণ বেদ—ব্যাবহারিক, পারমার্থিক নহে। যে ব্রাহ্মণ পূর্ণবেদের সন্ধান পাইয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, সেই "বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য" আর নানা অল্প-স্বল্প বেদে প্রয়োজন থাকে না ;—যেমন সকল স্থান সলিলে আপ্লুত হইলে, ছোটখাট খানা-ডোবা, নদী-নালার আর প্রয়োজন থাকে না। এ কথা গীতার কথা। আরও মুস্কিলের কথা এই যে, যে জিনিসটাকে আমরা বেদ বলিয়া ব্যবহার করিতেছি, তাহা আপাততঃ অনেকাংশে তুচ্ছার্থ, অস্পষ্টার্থ ও বিরুদ্ধার্থ। অপরা-বিদ্যার কথা ছাড়িয়া, "যয়া তদক্ষরমধি-গম্যতে" সেই পরাবিদ্যাতেও আমাদের মত অনধিকারী পাঠকের ও বিচারকের গোল যথেষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি, দর্শনশাস্ত্রকারেরা, যে উদ্দেশ্যেই হউক, শ্রুতিবাক্যগুলির ব্যাখ্যা, সব সময়ে ঠিক একই রূপ দেন নাই। অথচ, মূলদর্শনকার ও ভাষ্যকারদের মধ্যে অনেকেই অধ্যাত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন ও ভগবৎ-পদ-বাচ্য। এ সমস্ত সংশয় ও আপত্তির কথা বেশী করিয়া ফেনাইয়া বলার প্রয়োজন নাই। আমাদের অনেকেরই মনে এ সকল সংশয় জাগিয়াছে ; বিশেষতঃ, আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ বেদপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া, বিধর্ম্মীর দল ও নাস্তিকের দল একেবারে গোড়া ধরিয়া টান মারিতে কসুর করেন নাই। আজকালকার বিলাতী পণ্ডিত ও তাঁহাদের দেশী শিষ্যের দল যেভাবে বেদের আলোচনা-গবেষণা করিতেছেন, তাহাতে সাবেক আস্তিকের দলকে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতে হইয়াছে। 'নাস্তিক' কথাটা শুনিয়া চটিবার কোনই হেতু নাই। যিনি আমাদের পূর্ব্ব-ব্যাখ্যাত গুরুপরম্পরাগত শব্দধারা ও জ্ঞানধারাকে মানিতে ও স্বকীয় জ্ঞান-বিশ্বাসের কষ্টিপাথর রূপে গ্রহণ করিতে নারাজ, তিনিই নাস্তিক। পারমার্থিক ভাবে কষ্টি-পাথর কি না, ইহা প্রশ্ন নহে ; কারণ, সে প্রশ্নের দুইটা উত্তর নাই। ব্যাবহারিক ভাবে ক পাথর কি না, ইহাই

প্রশ্ন। যিনি উত্তর দিলেন, হাঁ,—তিনি আস্তিক; যিনি উত্তর দিলেন, না,—তিনি নাস্তিক।

আমি নাস্তিকের খাতায় নাম লিখাই নাই; কিন্তু ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন খপর রাখেন যে, বেদশব্দ ও বেদার্থ সম্বন্ধে কতটা মূঢ়তা আমার অন্তরটাকে মলিন করিয়া রাখিয়াছে, এবং কত-না সংশয় আমার চিত্তকে চঞ্চল-পীড়িত করিয়া দিয়াছে। আমরা এখানে সকলেই এক গোত্র; সুতরাং এ পাপ কথা আর লুকাইব কার কাছে? পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং আজও বলিতেছি যে, "বেদে আছে" এই কথা শুনিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না; কথাটাকে একটুখানি নাড়িয়া-চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দুষ্প্রবৃত্তি আমাদের মনে জাগিতেছে। যে প্রাচীনেরা শুনিবার পর মনন নিদিধ্যাসন করিয়া শেষ-কালে দর্শনে সেই শোনা কথাটিকে মিলাইয়া দেখিবার পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে বেদ সম্বন্ধে একটা অন্ধ-বিশ্বাসকেই পাকা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এমন ত মনে হয় না। তবে প্রাচীনদের ছিল- জীবনই বেদ,—বেদকে উপলব্ধি করাই ছিল জীবন; সকলের না হউক, কাহার-কাহারও ত বটেই। পশ্চিমদেশের বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের তথ্য-সিদ্ধান্ত পরীক্ষায় না মিলাইতে পারিলে, নিশ্চিন্ত সুস্থির হইতে পারিতেছেন না; দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ, বিজ্ঞানাগারে অথবা নিসর্গ-মন্দিরে তাঁহাদের পরীক্ষার ধ্যান-সমাধিকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর এবং ক্রমশঃ সার্থক করিয়া দিতেছে। এই নবীনদের জীবনই বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের উপলব্ধি করাই জীবন। আমরা না এ-দিকে, না ও-দিকে। তর্ক করিতে বিলক্ষণ শিখিয়াছি, কিন্তু প্রাচীনদের নিদিধ্যাসন সাক্ষাৎকারের দিকে ভিড়িতে নারাজ; বিজ্ঞানাগারে অবসর-মত উঁকি-ঝুঁকি মারিতে এবং সময়ে-সময়ে জেরা কাটিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে আমরা জানি; কিন্তু যোগীর মত তদ্‌গত চিত্তে পরীক্ষার পাত্র ও টিউব লইয়া কিছুদিন পড়িয়া থাকিবার বল আমাদের নাই; মাক্‌সওয়েল, লর্ড কেল্‌ভিন বা আয়েনষ্টাইনের মত মাথার মধ্যে বড় রকম একটা থিওরি ফাঁদিয়া, অপূর্ব্ব কৌশলে সেটাকে গড়িয়া তুলিবার মত মনীষা ও একনিষ্ঠাই বা আমাদের ভিতরে তেমন দেখিতে পাইতেছি কোথায়? সর্ব্বনাশের রাস্তা দুইটি; এবং দুইটিকেই আমাদের বর্জ্জন করিয়া সোজাসুজি ধীরপদক্ষেপে, অকুতোভয় হইয়া লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। লক্ষ্য সেদিনকার সেই সত্যলোক—যেখানে কষ্টিপাথরের খোঁজে আসিয়া পরেশ-মাণিক পাইয়া বসিব। বর্জ্জনীয় পথ—একদিকে যেমন অন্ধ, তামসিক আস্তিক্য, অন্যদিকে সেইরূপ অন্তঃসার-শূন্য, নিষ্ফল সংশয়বাদ। প্রশ্ন হইল—মন্ত্রশক্তি সত্য-সত্যই কি আছে? একজন বলিয়া উঠিলেন—নিশ্চয়ই আছে; শাস্ত্র কি মিছা বলিতেছেন? নিজের জীবনে কোনও রূপ পরীক্ষা করার প্রবৃত্তি নাই, নিজের সাধনায় কষিয়া-মাজিয়া দেখার কোনই আগ্রহ নাই; কথাটা শুনিলাম, আর স্বচ্ছন্দে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলাম। এ একটা ব্যাধি—আফ্রিকাদেশে না কি একপ্রকার sleeping sickness—নিদ্রারোগ আছে, এটা তার চেয়েও মারাত্মক। দিল্‌কো সাচ্চা রাখিয়া যে জন রাম রহিম জুদা না করিল, তার বিশ্বাসের মাহাত্ম্যের অবশ্য অবধি নাই; এবং সে বিশ্বাস জীবনে আসিলে, আর কিছুর অপেক্ষাও নাই। কিন্তু দিল্‌কো সাচ্চা রাখিতে বলিতে হইতেছে আমার মত মিথ্যাচার জীবকে, যার জীবনটা "শ্যাম রাখি কি কূল রাখি" করিতে-করিতে অকূলে বান্‌চাল হইবার দাখিল হইয়াছে! মনে সংশয় গজ্‌গজ করিতেছে, মুখে শাস্ত্রের দোহাই দিলে মিথ্যাচার হয়। এবং এই মিথ্যাচারের ফলে, আমি যখন "মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে" নিপতিত হইতেছি, তখন না রাম না রহিম আমায় ধরিয়া ফেলিয়া বাঁচাইয়া দিতেছেন। এ প্রকার তামসিক আস্তিক্যের কোনই দাম নাই। ইহা আত্মার অবসাদই সূচিত করে। পক্ষান্তরে, একপ্রকার সর্ব্বনেশে সংশয়বাদও আছে। এই সংশয়বাদের পাণ্ডারা সবজান্তা পুরুষ;—খবরের কাগজের লিডারেট্‌ রাইটারেরা এবং মাসিক পত্রের সমালোচকের দল ইঁহাদের কাছে হারি মানিয়া যান। মন্ত্রশক্তি সত্য কি?—প্রশ্ন হইল। ইঁহারা বিনা পরীক্ষায়, বিনা বিচারে একতরফা ডিক্রি দিলেন—ও-সব বুজরুকি, "প্রমাণাভাবাৎ"। হণ্টার কমিশনে বন্দী নেতৃবৃন্দকে পুলিশের পাহারায় বিচার কক্ষে এক-আধদিন হাজির হইতে দিতে সরকার বাহাদুরের আপত্তি ছিল না; কিন্তু এই সর্ব্বজ্ঞ বিচারকের দল মন্ত্রপক্ষের উকিলমহাশয়দের যে দু'একখানা ছেঁড়া-খোঁড়া পুরানো দলিল বা অন্য যা একটু-আধটু প্রমাণ আছে, তাহার দিকে একবার করুণা-

কটাক্ষপাত করাটাও নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়া মনে করেন; উকিল বেশী চাপিয়া ধরিলে মেজাজ হারাইয়া Contempt of Courtএর proceedings সুরু করিয়া দেন! ইঁহারা একটা হেতুও দর্শাইয়া থাকেন—প্রমাণাভাবাৎ। কিন্তু ইঁহারা অজগরবৃত্তি ধরিয়া বসিয়া থাকিবেন, আর প্রমাণ বেচারী পশুপক্ষীর মত ছুটিয়া আসিয়া ইঁহাদের মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট হইবে, এরূপ আশা করা কি সঙ্গত হইবে? রেডিয়াম সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রমাণ, তাহা কি এমনি করিয়াই বৈজ্ঞানিকের হাতের কাছে উপনীত হইয়াছিল? বিজ্ঞানে কোন কোনও বড় তথ্য অতর্কিতভাবে আসিয়া আমাদের কাছে ধরা দিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাকে পাকা সিদ্ধান্ত রূপে খাড়া করিতে, নানা দিক হইতে নানা রূপ প্রমাণের দ্বারা পরীক্ষা করিতে, কত বৈজ্ঞানিক আচার্য্যকে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ করিতে হইয়াছে। ঘাসের উপর যে নীহার-বিন্দুটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, অথবা পদতলে যে ধূলি-রেণুগুলি সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে-করিতেই হয় ত দু'চারজন টিণ্ডাল পার হইয়া গেলেন। একটা নূতন গ্রহ আবিষ্কার করিতে কত গণাগাঁথা, কত ভূয়োদর্শন পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। আকাশের একস্থানে একটুকু নীহারিকা লইয়া একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ হয় ত সারাজীবনটা এমনি বিভোর হইয়া আছেন যে, আমার মত একজন আনাড়ী 'নীহারিকা' নামটা শুনিয়া ভাবিবে, এটা নিশ্চয়ই জ্যোতিষী মহাশয়ের প্রিয়তমা প্রণয়িনীর নাম! দৃষ্টান্ত গাড়ী-গাড়ী উপনীত করা যাইতে পারে। কথাটা এই যে, 'প্রমাণাভাবাৎ' এই হেতুটি দেখাইবার পূর্ব্বে প্রমাণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরীক্ষাটা সারিয়া লওয়া দরকার। হয় ত হইতে পারে, কোন-কোনও বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহাদি করিবার গরজ আমার নাই; আমি দার্শনিক বা গণিতবিৎ,—রসায়নশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রমাণের অনুসন্ধান ও পরীক্ষা আমি হয় ত আমার এলাকার বাহিরে ভাবিতে পারি। আমি কিন্তু এসব ক্ষেত্রে রায় দিবার অধিকারী নহি। রসায়নশাস্ত্রের প্রসঙ্গ উঠিলে আমার চুপ করিয়া থাকা বা সরিয়া পড়াই কর্ত্তব্য। যেটা নিজে দেখি নাই, অপরে দেখিয়াছে বলিতেছে,—কিন্তু তাহার সাক্ষ্য কতদূর বিশ্বাস-যোগ্য তাহা পরীক্ষা করিয়া লইবার প্রবৃত্তি বা অবসর যেখানে আমার নাই; সেখানে কথা না কওয়াই ঠিক। যাঁহার মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে প্রমাণ পর্য্যালোচনা করার প্রবৃত্তি বা অবসর নাই, তাঁহার ও-সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য না করাই শ্রেয়ঃ। যিনি কতকদূর পর্য্যন্ত প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া মনের কবাট বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত নয়। নিজে তাঁহাকে নূতন প্রমাণের খোঁজ লইতে হইবে; অপর কাহারও দ্বারা বা দৈবাৎ নূতন প্রমাণ তাঁহার সম্মুখে প্রেরিত হইলে তিনি অপক্ষপাতে তাহাকে তুলিয়া লইয়া পরখ করিয়া দেখিবেন; যে ধারণা তাঁহার মধ্যে হইয়া রহিয়াছে, তাহার অনুকূল হইলেই প্রমাণটা গ্রাহ্য, আর প্রতিকূল হইলেই হেয়,—প্রমাণই নহে,—এমনটা ভাবিলে চলিবে না। এ কথাগুলা বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের "সদা সত্য কথা কহিবে" প্রভৃতি নীতিবাক্যের মত সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। বিজ্ঞান শিখিতে গিয়া এ কথাগুলি কেহই ভুলে না; বুড়া বয়সে যাঁহারা বিজ্ঞানের গণ্ডী একটু-আধটু অতিক্রম করিয়া অধ্যাত্ম-বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারাও এ কথাগুলি ভুলিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু আমাদের সবজান্তা সংশয়বাদীরা কোন আসরেই চুপ করিয়া হটিয়া আসিবার পাত্র নহেন। বেদ বা শাস্ত্রে তাঁহারা সাক্ষাৎ 'জননী' হইলে কি হইবে, বেদ সম্বন্ধে তাঁহাদের জেরা আপত্তি প্রভৃতির বহর ও ঘটা দেখিলে, স্বয়ং সগরসন্ততিগণের প্রসূতিকেও লজ্জা পাইতে হইত। বেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা, তাহা একান্তই বাজে আলোচনা, তাহার দ্বারা বর্ত্তমানে আমাদের কোনই উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই, এইরূপ ভাবিলেও সত্যের অপলাপ করা হইবে। এখনও ভারতবর্ষে কোটি কোটি নরনারীর জ্ঞানধারা ও কর্ম্মধারা মুখ্যতঃ বেদ-নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতেই প্রবাহিত হইতেছে; এখনও আমাদের ছোট বড় সকল রকম অনুষ্ঠানে মন্ত্র ও তন্ত্রের আধিপত্য খুবই বেশী। ভাল হউক, মন্দ হউক, ইহাদের পরীক্ষা একান্ত আবশ্যক। আমাদের জাতীয় জীবনে এতটা স্থান ইহারা জুড়িয়া বসিয়া আছে; কিন্তু এতটা স্থান অধিকার করিয়া থাকিবার যোগ্য কি ইহারা? ইহারা কি একটা চিরন্তন সত্যের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, সনাতন? অথবা, প্রাচীন যুগে ইহাদের যতই সার্থকতা থাকুক না কেন, বর্ত্তমান যুগে ইহারা অনাবশ্যক জঞ্জাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—

আমাদের বর্ত্তমান জীবনধারাকে অযথা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছে; সুতরাং যত সত্বর আমরা এই আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারি, ততই ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের পক্ষে মঙ্গল। অথবা ভাবিব যে, ইহাদের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অপগত হয় নাই; ইহাদিগকে দেশের ও যুগের ঠিক উপযোগী করিয়া লইতে পারিলে ইহাদের প্রয়োজন এখনও বড় কম হইবে না। এ সমস্ত প্রশ্নের গুরুত্ব নিতান্ত সাধারণ নহে; কারণ, আমাদের বেদ প্রভৃতি মিশর ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের ভূস্তরে প্রোথিত প্রাচীন যুগের নিদর্শনগুলির মত বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সকল সজীব সম্পর্ক হারাইয়া বিলীন হইয়া নাই। অনেকাংশে আগাছা পরগাছার প্রাদুর্ভাব হইলেও, বেদ-মহীরুহ এখনও সজীব এবং এখনও তাহার শাখা-প্রশাখার বিপুল আলিঙ্গনের মধ্যে সমগ্র আর্য্য-সভ্যতা ও হিন্দুসমাজ বিরাজ করিতেছে। ইহা কি সত্যসত্যই বিষবৃক্ষ যে, ইহার আওতায় থাকিয়া এবং ইহার ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া এত বড় জাতিটা অবসন্ন, মৃতকল্প হইয়া গেল; ছায়ার তলে অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিতে-থাকিতে ভুলিয়া গেল যে, একটা উদার, ভাস্বর, মুক্তাম্বর তলে বিশ্বমানবের জীবনের ভাব ও সাধনাগুলি মহাপারাবারের উর্ম্মিরাশির মত মুক্তির আনন্দে ও স্বাধীনতার গর্ব্বে কাঁপিয়া উঠিতেছে? অথবা বেদ সত্যসত্যই অমৃত ফল প্রসব করিতে সমর্থ—এমন একটা শান্তি ও অভয় নিজের পুণ্য-কলেবরের নিম্নে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে যে, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও, ঐ অকূল ভবজলধির ঝড়-তুফানের মধ্য হইতে মানবাত্মা আশ্বস্ত ও সুস্থির হইতে পারে? এ সমস্যার একটা বিহিত সমাধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রাচীন ভাব ও সাধনাগুলির সঙ্গে নবীন ভাব ও সাধনাগুলির, বেদের সহিত বিজ্ঞানের একটা বোঝাপড়া হওয়া খুবই দরকার। কারণ, আমাদের এই ভারতবর্ষে প্রাচীন যে শুধুই পুরাতত্ত্ব বা প্রত্নতত্ত্ব হইয়া যায় নাই; প্রাচীনে ও নবীনে, সেকালে ও একালে, এমনধারা মাথামাথি অন্য কোনও দেশে এমন ভাবে হইয়াছে কি না, আমার জানা নাই। প্রাচীন ভাব ও কর্ম্মবিধিগুলি প্রাচীন হইয়া একেবারে ইজিপ্সিয়ান মমির মত পুরাতত্ত্বের সামিল হইয়া পড়িলে গোল থাকিত না; মমিকে তার নীরব, অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন সমাধি-কক্ষ হইতে বাহির করিয়া যাদুঘরে লোক-চক্ষুর পরীক্ষার সম্মুখে হাজির কর, বিজ্ঞানাগারে লইয়া ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা কর, সে কথা কহিবে না। কাণে শুনিবার মতন করিয়া আত্ম-কাহিনী বলার দিন তার কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের বেদ, তন্ত্র প্রভৃতি যে পুরাতন হইয়াও নূতন; এখনও গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরীর পুণ্যোদক-শীকর-সংস্পর্শে স্নিগ্ধ-মধুর, প্রসন্ন-গম্ভীর বেদমন্ত্র ও পৌরাণিক স্তব-গাথা-গুলি শত সহস্র নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া, সেই সামগান ঝঙ্কারিত প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তকে আমাদের পরিচয় ও মমতার মধ্যে সজীব ও সজাগ করিয়া রাখিয়াছে; এখনও দৈন্যপীড়িত রোগক্লিষ্ট ভারতের পল্লীবাসের মাথার উপর সেই ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যকের আকাশে 'বাতাঃ' পূর্ব্বের মত ঠিক মধু ক্ষরণ না করিলেও, হোমযজ্ঞের ধূমগন্ধ-রেণুগুলি বহন কখন-কখনও করিয়া থাকে; এখনও ভারতের গ্রামে-গ্রামে, প্রান্তরে-প্রান্তরে 'পন্থানঃ' ঠিক 'শিবাঃ' না হইলেও, মন্দির ও দেবায়তনগুলি ঠিক সুন্দর ও সযত্ন রক্ষিত না হইলেও, বেদপন্থী সমাজের চরণ অঙ্ক সহস্রশঃ ধারণ করিতেছে এবং তীর্থযাত্রীর অবনত মস্তক-স্পর্শে নিজেদের সঞ্চিত মালিন্য কতকটা মুছাইয়া লইতেছে। আমি হয় ত বিজাতীয় ভাবের ও কর্ম্মের আবর্ত্তে পড়িয়া পাক খাইতেছি, দিশেহারা হইয়াছি; কিন্তু তথাপি কেমন করিয়া ভুলিব, হে এয়ি সনাতনি! তোমার ঐ বিশ্বরূপ-ভারতের কোটি-কোটি নরনারীর হৃদয়ে পাতা তোমার সিংহাসন; কেমন করিয়া ভুলিব, বর্ত্তমানের উপর তোমার সংযত শাসন ও প্রভাব, এবং ভবিষ্যতের দিকে তোমার শান্ত অভিযান! তাই বলিতেছিলাম, বেদ জিনিসটা উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া রাখিবার জিনিস নয়—ভারতীয় জীবন যাহাকে অবলম্বন করিয়া পুষ্ট, বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এবং এখনও অশেষ দৈন্য ও গ্লানির মধ্যেও যাহাকে আশ্রয় করিয়া মুখ্যতঃ টিকিয়া আছে, সে জিনিসটা উপেক্ষার জিনিস নয়। তাহার একটা নূতন করিয়া পরিচয় লওয়া, হিসাব-পরিমাণ লওয়া, সওয়াল-জবাব লওয়া, বড় কাজ বই বাজে কাজ নয়। সওয়াল-জবাব করিয়া যদি তৃপ্তি না পাই, তবে না হয়, বেদ এতটা বাহাল থাকিলেও, তাহাকে ক্রমশঃ আস্তা-

দের-চিন্তা ও কর্ম্মরাশি হইতে সরাইয়া বাতিল করিয়া দিব। প্রয়োজন বুঝিলে আমরা না হয় সকলে সেই ইজিপ্সিয়ান মমির মত বেদের ও তন্ত্রের পুঁথি কয়খানাকে ভূগহ্বরে আঁধার সমাধির মধ্যে যাহাতে কীটভুক্ত হইয়া পঞ্চত্ব না পাইতে পারে, এমন ভাবে না হয় আবদ্ধ করিয়া রাখিব। কিন্তু সে প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে কি ?. প্রশ্নটার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিয়াছি, কারণ, আমরা কটাক্ষে একবার বিশ্বরূপটি দেখিয়া লইয়াছি। এখন, প্রশ্নের জবাব পাইতে হইলে আমাদের কি করিতে হইবে? প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, বেদমত ও বেদবিধি কি পরিমাণে সত্যের উপর স্থাপিত, কতটা যথার্থ? বেদমন্ত্রদ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিব। ভাল; কিন্তু দেবতা ও পিতৃগণের সত্তা কোথায় ও কি ভাবে? মন্ত্রের সঙ্গে তাঁহাদের সত্তার সম্পর্ক কিরূপ? এ অনুষ্ঠানের কতটাই বা যাথার্থ্যানুমোদিত, কতটাই বা কল্পিত, রূপক বা প্রতীক? সাহেব পণ্ডিতেরা সভ্যসমাজের অনেক ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠানকে পূর্ব্বতন বর্ব্বর সমাজের অনুষ্ঠান প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ, অনুবৃত্তি অথবা প্রতীক মনে করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে হয় ত তাহাই বটে; কিন্তু আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়েও তাহাই কি না? বৈদিক যজ্ঞ ও মন্ত্র কি সেই বর্ব্বরযুগের মোহকলিল ইন্দ্রজাল (ম্যাজিক), যাহা সর্ব্বথা না হউক, অনেকাংশেই নিস্ফল ও অর্থহীন আড়ম্বর মাত্র? সামান্য animism বা ঐ রকম একটা সূত্র অবলম্বন করিয়া সেই বর্ব্বর-সমাজের বুজরুকি ও তুক্‌তাক্‌গুলি ক্রমশঃ দানা বাঁধিয়া জটীল ও বিশাল হইয়াছিল; সিন্ধু-সরস্বতী-তীরে আসিয়া আমরা সেই প্রাচীনতর বুজরুকিগুলারই আবার মাথা-তোলা survival দেখিতে পাইতেছি; ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই; এবং এগুলা অত গুরুগম্ভীরভাবে নেবার মত জিনিসও নহে। আমরা ত বেজায় সভ্য হইয়াছি, কিন্তু আমাদের বিবাহ-বিধির বরযাত্রা, স্ত্রী-আচার প্রভৃতি অনেক অনুষ্ঠানে কি আমরা সেই প্রাচীন বর্ব্বরসমাজের বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ, ইন্দ্রজাল প্রভৃতির সুস্পষ্ট নিদর্শন আবিষ্কার করিতে পারি না? বেদ ও তন্ত্রের আসল ব্যাপারগুলার এই রকম একটা ব্যাখ্যা বিলাতী পণ্ডিতেরা দিয়াছেন, এবং সে ব্যাখ্যা আমাদের অনেকের কাছেও বেশ মুখরোচক হইয়াছে। কিন্তু সত্যসত্যই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—আসল ব্যাপারখানা কি? ঐ সমস্ত বেদমত ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের মূলে কি কোন সত্য নিহিত আছে, পুরাতত্ত্ব ছাড়া? বেদমত শুনিয়া আপনারা বিস্মিত হইবেন না। পরাবিদ্যা বা উপনিষংগুলিতে জগতের যেমন হউক একটা কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা ত আছেই; পরন্তু বেদের যে ভাষাটাকে অপরা বিদ্যা বলিয়া আমরা সম্প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই ক্রিয়াকাণ্ড স্বরূপ সংহিতা ও ব্রাহ্মণেও মতবাদ অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। উষা লাল বা সোমরস তেজস্কর এই রকম কতকগুলি তথ্য বিবৃতি (statements of facts) লইয়াই বেদ নহে। যেই বেদ বলিলেন, দেবতার উদ্দেশে স্বর্গকামকে যজন করিতে, অমনি নানা প্রশ্ন ও মতবাদের মধ্যে আমরা গিয়া পড়িলাম। দেবতা কাহারা? কি স্বরূপ তাঁহাদের? তাঁহাদের কি মন্ত্রাত্মক শরীর, না ভৌতিক কোন প্রকার শরীর বা বিগ্রহ আছে? স্বর্গ কি ও কোথায়? আমার যজন অনুষ্ঠানের সহিত দেবতা ও স্বর্গের সম্পর্ক কিরূপ? মরণকালে আত্মার সত্তা থাকে কি না? প্রেতলোকে প্রয়াণ আছে কি না? এই সকল মতবাদ ঐ একটুখানি বৈদিক ব্যবস্থার অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এখন বিলাতী পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিয়া এই কথাটা জোর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে—এ সকল মতবাদের মূলে কি পরিমাণে সত্য রহিয়াছে? স্বর্গ, দেবতা, মন্ত্র, আত্মার জন্মান্তরপ্রাপ্তি,—এ সকল কথা কি পরিমাণে যথার্থ? কষ্টিপাথরে কষিয়া-মাজিয়া এ কথাগুলির পরখ করিয়া লইতে ইচ্ছা করে। আর, নানা বিপ্লব ও রূপান্তর সত্ত্বেও, আমরা যখন এখনও মুখ্যতঃ বেদশাসিত ও বেদানুবর্ত্তী, তখন শুধু প্রত্নতত্ত্ব করিলে আমাদের চলিবে না; পরীক্ষা ও বিচার করিয়া আমাদের দেখিতে হইবে, এই বেদের কোন্ অংশই বা উপাদেয় এবং কোন্ অংশই বা হেয়। এইরূপ পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা শুধু বেশী নহে, ঐকান্তিক হইয়া পড়িয়াছে; কারণ, জাতি-হিসাবে, একটা বিশিষ্ট প্রাচীন সভ্যতা-হিসাবে আমরা বাঁচিব কি মরিব, ইহারই সমস্যা আমাদের সাম্‌নে উৎকটভাবে দেখা দিয়াছে। ইহাকে যেমন একদিকে অস্বীকার করার উপায় নাই, তেমনি অন্যদিকে নিশ্চিন্তভাবে ধামা-চাপা দিয়া ফেলিয়া রাখারও উপায় নাই। আর, এই সমস্যার সত্য-সত্যই একটা সমাধান আমাদের পাইতে হইলে, শুধু ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী

বা ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কীটদষ্ট পুঁথিগুলার ধূলি ঝাড়িয়া প্রত্নতত্ত্ব করিলে চলিবে না ;—আবার সেই বিজ্ঞানাগারে আমাদের ঢুকিতে হইবে ;—দেখিতে হইবে, নূতন বিজ্ঞানের রেডিয়াম, ইলেক্‌ট্রন্, রঞ্জন-রে প্রভৃতির মধ্যে সেই প্রাচীন বেদ-বিজ্ঞানের সত্যতার কোনরূপ আভাষ ইঙ্গিত ধরা পড়িতেছে কি না। আবার সেই তপোবন-সিদ্ধাশ্রমের দিকে আমাদের যাত্রা করিতে হইবে ;—দেখিতে হইবে, যোগজ-প্রত্যক্ষের কোরকগুলি, পাপড়িগুলি ধীরে-ধীরে খুলিয়া তাহার মধ্যে স্যার অলিভার্ লজ্, স্যার আর্থার্ কোনান্ ডইল প্রভৃতির মনীষা দৃষ্টির সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া দিয়া অচিন্তিত-পূর্ব্ব বাস্তব ইন্দ্রজাল, সুস্থির হইয়া জাগিয়া বসিয়া আছে কি না। পরীক্ষার পরিসর ও গভীরতা এতদূর পর্য্যন্ত না হইলে, শুধু পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বে কুলাইবে না।

বেদের অংশবিশেষ উপাদেয় এবং অংশবিশেষ হেয় ; এবং তাহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে,—এ কথা শুনিয়া ক্ষোভের বা ভয়ের কোনই কারণ নাই। আমরা অনেকেই মুখে বেদবাক্যে সায় দিই। বেদের যেটুকু বুঝি এবং নিজের জীবনে বরণ উদ্‌যাপন করিয়া লইতে প্রস্তুত হই, সেইটুকুই আমার কাছে উপাদেয় অংশ ; আর যে অংশ বুঝি না বা ভুল বুঝি, অথবা বুঝিলেও, নিজের জীবনে স্বীকার করিয়া লইয়া, নিজের ভাবসাধনা ও কর্ম্মসাধনার মধ্যে সাকার করিয়া তুলিতে প্রস্তুত হই না, সে অংশে আমি মুখে গোলে-হরিবোল দেওয়ার মত সায় দিয়া গেলেও, সেটা আমার কাছে প্রকৃত প্রস্তাবে হেয়। আমি তাহাকে না-বোঝার মধ্যে, ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে, অবজ্ঞার মধ্যে বনবাস দিয়া রাখিয়াছি। আমাদের অনেকেরই বেদবিশ্বাস বা আস্তিক্য এই জাতীয়। ইহাকে ঠিক আস্তিক্য বলে না। বেদ জীবনবেদ না হইলে আস্তিক্য ভুয়ামাল হইয়া থাকে। আমাদের অনেকের ঈশ্বরে বিশ্বাস সেরূপ। ব্রহ্মদর্শী ঋষি না হওয়া পর্য্যন্ত, চরমবেদ সাক্ষাৎ করা না পর্য্যন্ত, বিশ্বাস ও আস্তিক্যে কিছু-না-কিছু ভেজাল থাকিবেই ; এবং যে ব্যক্তি ভেজাল ধরিয়া দিল, তাহার মাথা লইবার হুকুম দিলে সত্যের অপলাপই করা হইয়া থাকে,—তাহাতে বিশ্বাস ও আস্তিক্যের বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হয় না। ভাবের ঘরে চুরি করার চেয়ে আত্মঘাত আর নাই ; এবং আত্মঘাতীর চেয়ে বড় অবিশ্বাসী ও নাস্তিক কে? "আত্মানাং বিদ্ধি" ইহাই বেদ—আত্মাই সব এবং এই সবটাকে জানিলেই চরমবেদ জানা হইল। অতএব হেয় ও উপাদেয়, এই কথা দু'টি শুনিয়া ক্ষোভ করিলে চলিবে না। জ্ঞানের মধ্যে, উপলব্ধির মধ্যে যেট'কে সুস্থির ভাবে ধরিতে পারিয়াছি, তাহাকেই আমি স্বীকার, অঙ্গীকার করিয়াছি ; আর, যেটাতে আমার সংশয়, প্রমাদ, কুণ্ঠা ও কৃপণতা, সেটা স্বয়ং বেদ হইলেও আমার দূরে, বাহিরে, অস্বীকৃত, অনাত্মীয় হইয়া পড়িয়া আছে। মুখে "বসুধৈব কুটুম্বকম্" বলিলে কি হইবে, কথায় কথায় "বেদ শব্দব্রহ্ম" আওড়াইলে কি হইবে,—যতক্ষণ কায়মনোবাক্যের মিল না হইতেছে, ততক্ষণ কেহ বা আমার অরি, কেহ বা মিত্র,—কোনটা আমার উপাদেয়, কোনটা আমার হেয়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে এ কথা শুনিয়া, কেহ-কেহ হয় ত বেদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অথবা অশ্বডৈম্বিক ব্যাখ্যা, এইরূপ একটা অপরূপ সামগ্রী দেখিবার প্রত্যাশা করিতেছেন। আপনাদের আশাভঙ্গ করিতে চাহি না,—হালের বিজ্ঞানের তরফ হইতে আমাদের পুরা'ন ঘরওয়া কথাগুলির পরীক্ষা করিয়া লওয়ার দুরভিসন্ধি এ অধম লেখকের একটু আধটু আছে। তাহার পরিচয় আপনারা ক্রমশঃ পাইবেন। মন্ত্রশক্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, আমাকে পূর্ব্বে দুই-এক দিন বিজ্ঞানের রেডিয়াম্, ইলেকট্রণ প্রভৃতি লইয়া এমন হাতসাফাই এবং অসাধ্যসাধন-নিপুণতা দেখাইতে হইয়াছিল যে, আমার কোন-কোন বিশিষ্ট বন্ধু আমার বৈদিক-রেডিয়ামকে অশ্বডিম্বেরই মাসতুত ভাই বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অনুযোগ করিবার উপায় আপাততঃ দেখিতেছি না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া তিনটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ না রাখিলে আমাদের গোলে পড়িবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিব মনে করিলেই অমনি দেওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও বিচারে অতি সতর্কতা সহকারে প্রমাণ সংগ্রহ, প্রমাণ বিশ্লেষণ, প্রমাণ সমালোচন করিতে হয়। যাঁহারা বিজ্ঞানাগারে ঢুকিয়া দেখিয়াছেন, অথবা বৈজ্ঞানিকদের লেখা পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর এ কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ফল কথা, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছেলেখেলা নহে। পক্ষান্তরে, যতক্ষণ

পর্য্যন্ত না পূরাপুরিভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চোখ-কাণ বুজিয়া বসিয়া থাকিব, বেদের কথায় কাণে আঙ্গুল দিব,—এরূপ পণ করিয়া থাকাটাও সঙ্গত হইবে না। বিজ্ঞান যাহাকে প্রমাণ বা demonstration বলে, সেটা ঘটিবার পূর্ব্বে, অনেক সময়ে অনেক তথ্যের পূর্ব্বাভাষ আমরা প্রকারান্তরে পাইয়া থাকি। পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের অবস্থা-বিষয়ে কোন-কোনও অংশে সৌসাদৃশ্য (analogy) দেখিয়া আমরা আন্দাজ করি, হয় ত মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিমান্ জীব বাস করিয়া থাকে। এ আন্দাজটাকে প্রমাণিত সত্য বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে। কিন্তু আবার, আন্দাজটাকে "একেবারে তুচ্ছ, হেয় করিয়া দিলেও, প্রমাণসংগ্রহ ও প্রমাণ-ব্যবস্থার পথটাকে রুদ্ধ বা সঙ্কীর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে। Analogy বা উপমানের কদর বিজ্ঞানে নিতান্ত কম নয়। জলে ঢেলা ফেলিয়া তরঙ্গ-সৃষ্টি দেখিয়া লইলাম; অথবা একগাছা দড়ি বা তারকে কাঁপাইয়া তরঙ্গের হিসাব লইলাম। এই দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া, এবং এই দৃষ্টান্তের উপমানে বায়ু, ঈথারে কত-না তরঙ্গ-সৃষ্টি ভাবিয়া লইয়া, বৈজ্ঞানিকের মাথা বড়-বড় সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া তুলিতেছে। লাটিম আমরা অনেকেই ঘুরাই, এবং চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলাকারে ঊর্দ্ধগতি আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু হেল্‌ম-হোল্‌জ এবং লর্ড কেল্‌ভিনের মাথা ঈথারে যে লাটিম ঘুরাইয়া দিয়াছে, সেটাকে ছেলেখেলা বলিবে কে? ঈথারে চুরুটের ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকান যে সকল অণুর সৃষ্টি করিয়াছে, সে-গুলিকে বিশুদ্ধ গঞ্জিকা-ধূম-প্রসূত বলিবার সাহস কাহার? হঠাৎ একটা-কিছু সাদৃশ্য দেখিয়া অনেক বড় থিওরিই বৈজ্ঞানিকদের মাথায় গজাইয়া উঠিয়াছে। নজির আর কত দেখাইব? অতএব যাঁহারা মনে করেন, হয় বিজ্ঞানের নির্ম্মম অগ্নি-পরীক্ষায় এখনই শ্রুতিকে একদম উত্তীর্ণ হইতে হইবে, নয় সে প্রাচীনা তপস্বিনীর বেশে আমাদের সাম্‌নে উপস্থিত হইলেও তাহাকে পাকা অসতী বলিয়া পত্রপাঠ বিদায় দিতে হইবে,—যাঁহারা এই সরাসরি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতাগুলি আর একবার উল্‌টাইয়া দেখিলে ভাল হয়। নিউটন্ শিষ্ট বৈজ্ঞানিক, কিন্তু এ্যাল্‌কেমিতে বিশ্বাস করিতেন; তাঁহার সেই এ্যাল্‌কেমি, প্রাচীন পণ্ডিতদের সেই Philosopher's Stone গত দুই-আড়াই শতাব্দী ধরিয়া গোঁড়া বৈজ্ঞানিক-দের কত বিদ্রূপই না সহিয়া মরমে মরিয়া রহিয়াছে! কিন্তু, বিজ্ঞানেরও বোধ হয় ভাগ্যবিধাতা পুরুষ কেহ আছেন; তোমার-আমার, এমন কি, স্পেন্‌সার-হাক্সলির ভোট গ্রাহ্য না করিয়াই তিনি বোধ হয় বিশ্বমানবের দৃষ্টিকে সময়ে-সময়ে নূতন দিকে ফিরাইয়া দেন, বুদ্ধি ও সংস্কারগুলিকে সময়ে-সময়ে একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া দেন। এই বিংশ-শতাব্দীর পূর্ব্বাহ্ণেই বিজ্ঞানে এই প্রকার একটা যুগ-বিপর্য্যয় সূচিত হইয়া গিয়াছে। এ্যাল্‌কেমি আর খ-পুষ্প অথবা নরশৃঙ্গবৎ একটা নিতান্ত আজ্‌গবি কোন ব্যাপার নহে। রসায়নশাস্ত্রের অণু (Atoms) গুলার স্বত্ব যে দলিলের উপর, সে দলিল কায়েমি বা পাকা নহে। অণু ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যাইতে পারে, যাইতেছে; একজাতীয় অণু অন্যজাতীয় অণুতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; থোরিয়াম রাদার্‌ফোর্ড সাহেবের পরিভাষা মত থোরিয়াম x নামক অভিনব পদার্থে বিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের মিলিয়াছে। রূপার চাকৃতি বা সোণার চাকৃতি বা কাগজের টুক্‌রা যে মুহূর্ত্তে শূন্যে মিলাইয়া গিয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণের নির্ব্বাণ পদবী লাভ করে, ইহা আমাদের মত গরীব মাষ্টার-কেরাণীর দল, যাঁহাদের ব্যাঙ্কে খাতা আরম্ভ করিবার সৌভাগ্য এ জন্মে কস্মিন্‌কালে হইবে না, প্রতিক্ষণেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু এক মুঠা ধূলি লইয়া বৈজ্ঞানিকের কাছে উপনীত হইলে, তিনি যে তাহাকে বনমানুষের হাড় ছোঁয়াইয়া এক মুঠা সোণা করিয়া দিতে পারেন, অন্ততঃ ভবিষ্যতে পারিবেন, এমন কল্পনা আবার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—এ কথাটা আমি কিছুদিন হইতে শুনিতেছি। কথাটা শুনিলেও, কথাটা ভাঙ্গা সকলের পক্ষে সর্ব্বথা নিরাপদ নহে; বিশেষতঃ, যাঁহাদের গৃহিনী গহনাপত্রের জন্য বায়না-আব্‌দার এখনও করিতে ছাড়েন না। সে যাহাই হউক, একদিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার গুরুত্ব যেমন আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, তেমনি অন্যদিকে আবার সতত সজাগ থাকিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে, কোথায় কোন্ সৃষ্টিকৌশলের ও মানব-প্রকৃতির মহারহস্য ইঙ্গিতে কতকগুলি চিহ্ন বা সঙ্কেত মাত্র পাঠাইয়া, নিজের অবস্থিতি আমাদের জ্ঞাপন করিয়া দিতে চাহিতেছে, নিজের অর্থ আমাদের কাছে উন্মোচন করার উপক্রম করিতেছে। এবংবিধ সঙ্কেতগুলি

(analogics) দিগ্‌দর্শনের মত তথ্যের বর্ত্ম আমাদের বিভ্রান্ত দৃষ্টিকে ধরাইয়া দেয়। সাদৃশ্য ও সঙ্কেতে শুধু যে প্রেমের রাজ্যে পূর্ব্বরাগ সূচিত হয় এমন নহে; জ্ঞানের রাজ্যেও সাদৃশ্য দেখিয়া এবং সঙ্কেত বুঝিয়াই আমরা সত্যালোকের একটা হদিশ পাই।

গগন-সীমান্তে সাগরের নীলজলের ঢেউয়ের চপল বাহু ছিনাইয়া ভানু তাড়াতাড়ি প্রকাণ্ড একটা বহ্নি গোলকের মত কখন উঠিয়া পড়িবেন দেখিতে বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়াছি; তপনদেব ভারিখি দেবতা; তাঁহার "বরেণ্যং ভর্গঃ"; তাঁহার কি আর অত বেলা পর্য্যন্ত সাগরের লহরীপাশের মধ্যে পড়িয়া থাকা ভাল দেখায়? তাই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িতেছেন। কিন্তু তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হইলে কি হইবে, উষার অরুণরাগ অনেক আগেই জানাইয়া রাখিয়াছিল, তাঁহার বিপুল, বরণীয় দেবকান্তি নীলসিন্ধু জলে কোথায় কি ভাবে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমি দার্শনিক, শুষ্ক তর্ক-ব্যবসায়ী,—কবিত্ব আমার আসে না; তবে কথাটা এই যে, সত্যের নির্ম্মল প্রভাতের সূচনা হইয়া থাকে অনেক স্থলেই উষার অস্পষ্ট আলোছায়ার মধ্যে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের এ কথাটা ভুলিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ইহাই আমাদের প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সত্যের চরম, এমন কি, সুব্যবস্থিত কষ্টিপাথর নহে। এ কথাটা আমরা গতবারে খোলসা করিয়া বলিয়াছি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উৎরাইলেই পাকা সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, এবং না উৎরাইলেই পচিয়া গেল,—এরূপ মনে করিলে গোঁড়ামি হইবে। বিজ্ঞান স্বয়ং অসিদ্ধ; প্রতিনিয়ত তার মতবাদ (theories), এমন কি পরীক্ষালব্ধ ফলাফল পর্য্যন্ত বদ্‌লাইতেছে; কদাচিৎ বা ডিগ্‌বাজি খাইতেছে। সুতরাং এই শিথিল ভিত্তির উপর কোনও পাকা এমারৎ তুলিতে গেলে আহাম্মুকি হইবে। "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" তাবৎ কোনও জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত কি না তাহা জানি না; যাহাকে আমরা বিজ্ঞান বা (science) বলিতেছি, তাহা যে কোন অংশেই সে প্রকার নহে, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। বিজ্ঞানের অন্য আইন-কানুন ত বদ্‌লাইতেই পারে; কিন্তু যে গণিতের ভিত্তির উপর নিউটন, লাপ্লাস্, লাগ্রাঞ্জ, গাউস প্রভৃতি মহাশিল্পিগণ বিজ্ঞানের মায়াপুরী গত দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া তুলিয়া বিশ্বামিত্রের মত ভাবিতে ছিলেন, আমরা এক-একজন ব্রহ্মা,—আজ সেই মায়াপুরী যে ভোজবাজী, তাহা বৈজ্ঞানিকেরাই কবুল করিতেছেন ডাক্তার Bertrand Russel Newtonian Dyanamic সম্বন্ধে বলিতেছেন—ইহা "first rough sketch of th ways of Nature"—প্রকৃতি-রাজ্যের ব্যবস্থার একটা প্রাথমিক মোটামুটি নক্সা মাত্র,—প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্য ধারাপাত বই আর কিছুই নহে। অথচ বিশ পঁচিশ বর্ষ পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিকেরা এই ধারাপাতখান হাতে করিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেন। ম্যাক্ পৌয়াকারে, কার্‌ল পিয়ার্সন প্রভৃতি পাণ্ডিতগণ বিজ্ঞানের গোঁড়ামিতে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেছিলেন এবং নানা রকম জেরা কাটিতেছিলেন পূর্ব্ব হইতেই; কিন্তু আইনষ্টাইন্ মিন্‌কভ্‌স্কী প্রভৃতি নবীনেরা দেশ ও কালের (Space and Timeএর) যে অপরূপ খিঁচুড়ি বানাইয়া, আমাদের মতন অবৈজ্ঞানিক হইতে সুরু করিয়া রয়েল সোসাইটি পর্য্যন্ত সকলের পাতে পরিবেশন করিতেছেন, তাহাতে ভয় হয়, সে গুরুভোজন শীঘ্রই আমাদের মগজে উঠিয়া অচিরাৎ আমাদের fourth dimension of spaceএর একটা অপরোক্ষ জ্ঞান দিয়া ফেলিবে! ফল কথা, সবই ওলট পালট হইয়া যাইতেছে; দুই আর দু'ইএ যে চার হয়, এ কথাটা বলিতে গেলেও কোন্ দিন বা হালের পণ্ডিত মুখ চাপিয়া ধরেন! ভরসা কিছুই নাই। বিজ্ঞানে যখন এই প্রকার "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা" অবস্থা, তখন তাহার থিওরিগুলিকে একান্ত ভাবে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে, তাহার পরীক্ষালব্ধ ফলাফলগুলিকে হালের অভ্রান্ত বেদ ভাবিতে আমরা নারাজ। তাই বলিয়া বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও বিচার অকেজো—এ কথা কেহই বলিবে না। আংশিক ভাবে হউক, সন্দিগ্ধ ভাবে হউক, সাপেক্ষ ভাবে হউক,—এ প্রকার পরীক্ষা ও বিচারও তথ্য-নির্ণায়ক হইয়া থাকে; একেবারে নিশ্চিন্ত ও নিঃসংশয় না করিয়া দিলেও, দৃষ্টিকে প্রসারিত, বিচারশক্তিকে সাহসপ্রাপ্ত ও জ্ঞানকে পুষ্ট করিয়া দেয়। এই জন্য বেদ প্রভৃতিকেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় মিলাইতে আপত্তি নাই। কিন্তু এখনই মিলাইতে অসমর্থ হইলেই যে বেদ পত্রপাঠ বুজ্‌রুকিতে পরিণত হইল, এমন নহে। বিজ্ঞানের দ্বারা যতটুকু বুঝি তাই ভাল। যেখানে

বুঝিতেছি না, সেখানে কোনও রূপ সঙ্কেতসূত্র (suggestive analogies) আছে কি না, তাহাও দেখা দরকার। যেখানে তাহাও পাইতেছি না, হয় ত বিরোধই দেখিতেছি, সেখানে Goetheএর মত "more light"এর জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে; সরাসরি বেদ-পক্ষে বা বিজ্ঞানপক্ষে রায় দিয়া ফেলিলে হঠকারিতা হইবে, সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করা হইবে।

সে দিন বলিয়াছিলাম এবং আজ আবার বলিতেছি, এইরূপ পরীক্ষায় আস্তিকের ভয়ের কোন কারণ নাই। আমরা সাধারণতঃ যে ভাবে বেদে বা শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া থাকি, তাহাকে বিশ্বাস বলে না; তাহা বিশ্বাসের অভিনয় মাত্র। বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাতে পর্ব্বত টলিয়া থাকে সন্দেহ নাই; কিন্তু যে বিশ্বাস আমার ভিতরে থাকিয়া জীবনকে নূতন ভাবে গড়িয়া দিল না, সে বিশ্বাস অশক্ত, তাহার বোঝা বহিয়া আমি কেবল একটা মিথ্যার বোঝা, ভূতের বোঝা বহিতেছি। "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"—কিন্তু ভক্তি যদি ভান মাত্রই হয়, তবে শত শতবার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়া যাইলেও, সে ভক্তি দ্বারা কৃষ্ণ মিলিবে না। আস্তিক্যের দিক হইতে আশঙ্কা আছে,—যদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা মানে শুধুই থিওরি ও শুষ্ক তর্কের গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া মরা হয়। অপরোক্ষ জ্ঞান সাক্ষাৎ ব্রহ্ম—যে মূর্ত্তিতেই অপরোক্ষ জ্ঞান আমাদের কাছে উপনীত হউক না কেন;—বিজ্ঞানাগার হইতেই আসুক, আর সিদ্ধাশ্রম হইতেই প্রেরিত হউক। এই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করিলেও ক্রমে বাপেতভী, নির্ভয় হইবার কথা। এইজন্য সত্যকার বিজ্ঞান হইতে ভয় নাই। সত্যকার বিজ্ঞান হইতেছে—ভূয়োদর্শন, বিশিষ্ট দর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ। ভয় আছে বিজ্ঞানের ছলাকলার কাছে; বিদ্যার নামে একটা অবিদ্যা আসিয়া আমাদের স্কন্ধে অনেক সময়ে চাপিয়া বসে;—সে জেরা কাটিবে, তর্ক করিবে, এলোমেলো ভাবে কল্পনা-জল্পনা করিবে, কিন্তু পরীক্ষার নামে সাক্ষাৎ জড়ভরত হইয়া বসিবে। এই প্রকার বিজ্ঞানাভাসকে আমরা দূর হইতে নমস্কার করিতেছি। তাল পড়িয়া ঢিপ করে, না, ঢিপ করিয়া তাল পড়ে—এই মহারহস্যের আলোচনা করিতে-করিতে কিছুদিন বাঙ্গালী মস্তিষ্কের হয় ত অপব্যবহার হইয়া থাকিবে; কিন্তু পশ্চিমদেশেও বৈজ্ঞানিক-মহলে এ জাতীয় মস্তিষ্কের অপব্যবহার যে অজ্ঞাত, তাহা মনে হয় না। জেরার মুখে তর্কের টানে কত বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে পথভ্রান্ত হইয়া আবর্ত্তে ঘুরিয়া মরিতে হইয়াছে—এ কথা বিজ্ঞানের ইতিহাসের অনেক নিষ্ফল পরিচ্ছেদ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আমাদের জানাইয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত আজ আর দিব না। ফল কথা, বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞান হইলে তাহার কাছে ভয় থাকে না। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বেদকে মিলাইতে গিয়া আমাদের সাবধান হইবারও প্রয়োজন আছে, আবার আশ্বস্ত হইবারও হেতু আছে। এ সম্বন্ধে ইহাই আমাদের দ্বিতীয় কথা।

—তৃতীয়তঃ, আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাই তত্ত্বব্যবস্থার পক্ষে যথেষ্ট নহে; চরম কষ্টিপাথর নহে। অনুবীক্ষণ বা ঐরূপ যন্ত্র-সাহায্যে হয় ত ধরিতে পারিলাম না—কিসের গুণে গঙ্গোদক অনেক মারাত্মক রোগের বীজাণু ধ্বংস করিতে সমর্থ। এ ক্ষেত্রে হতাশ্বাস না হইয়া আমাদের প্রকৃষ্টতর উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। পশ্চিমদেশের পণ্ডিতেরা বাথ ও ব্যাক্সটন্ নামক স্থানের জলে ভৈষজ শক্তি (medicinal property) আবিষ্কার করিয়াছেন। খবরের কাগজের চটকদার সংবাদ নহে—আধুনিক বিজ্ঞানের প্রামাণিক (standard) গ্রন্থে পড়িয়াছি; ঐ জল যে রেডিও অ্যাক্টিভ্, তাহাও আমরা জানিতে পারিয়াছি। এই রেডিও-activityর দরুণই কি ঐ ভৈষজশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে? যে বস্তু স্বতঃই বিভিন্ন ভাবে তাড়িতশক্তি (α, β, γ rays) বিকিরণ (radiate) করিতে সমর্থ, তাহাকে আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাষায়, আমরা radio-active body বলিয়া থাকি। হয় ত অল্পাধিক পরিমাণে নিখিল বস্তুই এই শক্তিসম্পন্ন। এ সামর্থ্যে বস্তুর দানাগুলার মধ্যে কি ব্যাপার যে সূচিত হয়, তাহার আলোচনা আগামী বারে বেদের জড়তত্ত্বের আলোচনা স্থলে আমাদিগকে বিশেষ ভাবে করিতে হইবে। আপাততঃ radio-activityর একটা মোটা লক্ষণ দিয়াই আমরা ছাড়িয়া দিলাম। এখন প্রশ্ন এই—রেডিয়াম, থোরিয়াম, পলোনিয়াম বা অপর যে সকল বস্তুতে এই তাড়িত-অণু-বিকিরণ-সামর্থ্য বিশেষ ভাবে আছে, সেগুলিকে কিরূপ পরীক্ষায় আমরা ধরিয়া ফেলিতেছি? আদৌ কেমন করিয়া জানিতেছি যে, এই বস্তুসকল তাড়িত-

অণুপুঞ্জ মহাবেগে নিজেদের ভিতর হইতে ছুট্‌কাইয়া দিতেছে? এটা ধরিয়া ফেলিতে সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষা হার মানিয়াছে; যে spectroscopeএর সাহায্যে আমরা বহুদূরবর্ত্তী গ্রহনক্ষত্রগুলির নির্ম্মাণের মালমসলা জানিতে পারিতেছি, সে যন্ত্রও এখানে পরাস্ত। এক ফটোগ্রাফিক মেথড্, আর এক ইলেক্‌ট্রিক্ মেথড্,—এই দুই উপায়ে আমরা বস্তুজাতের এই অত্যদ্ভুত শক্তির সন্ধান পাইয়াছি, এবং সন্ধান পাইয়া জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই বিশ বছরের মধ্যে একেবারে বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছি। সাপের হাঁচি বেদেয় চিনিতে পারে—radio-activity ধরা পড়িলেন, তাড়িতশক্তি পরিমাপের সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম হিসাবী যন্ত্রের কাছে। এখন এই কথাটি মনে রাখিয়া গঙ্গোদক লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার মধ্যে radio-activity আছে কি না; যদি থাকে, তবে তাহাই তাহার বীজাণু ধ্বংস-শক্তির মূল কি না। পশ্চিমের সখের আড্ডায়, জল-মাটি লইয়া পরীক্ষা করিতে Sir J. J. Thomsonএর মত বৈজ্ঞানিকও লজ্জা পান না; আর আমরা গঙ্গাজল লইয়া পরীক্ষা করার প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপন করিলে সেটা বেজায় কুসংস্কার হইয়া গেল,—বামুনাইর গোলামি হইয়া গেল, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের স্কন্ধে যে বিলাতী ভূত চাপিয়াছে, সেটা 'গঙ্গা' নামে ছাড়িয়া পলাইল না,—তাই অগত্যা খাস শ্বেতদ্বীপের বাথ ও ব্যাক্সটন নামক স্থানের তীর্থোদক ছড়াইয়া ইঁহাদের ভূতাপসরণের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। সে যাহাই হউক, অণুবীক্ষণ হার মানিলেই পরীক্ষা ছাড়িয়া দিতে হইবে এমন নহে; সূক্ষ্মতর যন্ত্র-সহায়তায় প্রকৃষ্টতর উপায়ে পরীক্ষা জুড়িয়া দিতে হইবে; radio active bodies সম্বন্ধে আজিকালি যেরূপ হইয়াছে। আবার, electric method পর্য্যন্ত যেখানে পরাভূত হইল, সেখানে আমরা পরীক্ষার চরম হইয়াছে বলিয়া ছাড়িয়া দিব কি? এইখানে বিজ্ঞানাগার হইতে বাহির হইয়া সিদ্ধাশ্রমের অভিমুখে যাত্রা করিব কি না, এটা আমাকে বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। সিদ্ধাশ্রম মানেই বুজরুকির আড্ডা, ইহা স্থির করিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কারবার নাই; পক্ষান্তরে সিদ্ধাশ্রমমাত্রেই ব্রহ্মলোক—সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্ব-শক্তিমত্তার ভূমি—এইরূপ যাহারা ভাবিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গেও আমাদের কারবার নাই। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বলিয়া সত্য-সত্যই যদি একটা কিছু থাকে, তবে তাহার প্রামাণ্য কি, দৌড়ই বা কতদূর,—এটা আমাদের পরীক্ষা করিয়া হেস্তনেস্ত করিয়া লইতে হইবে। যেখানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি হার মানিল, সেখানে সংযম অর্থাৎ ধারণা-ধ্যান-সমাধি তত্ত্বনির্ণয় করিবে? করে কি না ইহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। সিদ্ধাশ্রম এই পরীক্ষাটা না কি করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন; বিনা বিচারে তোমাকে সে দাবী গ্রাহ্য করিতে আমি পরামর্শ দিই না; কিন্তু বিনা বিচারে তাহাকে অগ্রাহ্যই বা করিবে কি ব্যবস্থার বলে? ফল কথা, বিজ্ঞানাগারের উপরে একটা সিদ্ধাশ্রম থাকিলেও থাকিতে পারে; বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষকে যাচাই করিয়া লইবার মত একটা প্রকৃষ্টতর অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব হইতে পারে; এ কথাটা গোলদীঘিতে দাঁড়াইয়া বলিলে আমার শ্রোতৃবৃন্দ সহিষ্ণু রহিতেন কি না বলিতে পারি না; কিন্তু এই তত্ত্ববিজ্ঞানসমিতির গৃহে, মঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া, চারিধারে 'মহাত্মা'গণের আশ্বাস-দৃষ্টির নিম্নে এ কথা বলিতে আমি সঙ্কুচিত হইলাম না। শেষ পর্য্যন্ত দেখিলাম, বেদের বৈজ্ঞানিক আলোচনা নিতান্ত সহজ নয় ও নিরাপদ নয়; তবে স্কন্ধে নিতান্তই দুষ্ট সরস্বতী ভর না করিলে, এ আলোচনা চক্ষুতে জ্ঞানাঞ্জন লেপিয়াই দেয়,—ঠুলি বাঁধিয়া দেয় না বা ভেল্কি লাগাইয়া দেয় না; প্রাণে অভয়ই আনিয়া দেয়, সংশয় অবিশ্বাসে পীড়িত ও অবসন্ন করিয়া দেয় না। আমরা বেদের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে ভাবে সম্পর্ক পাতাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম, সেই ভাবে না লইলে গোল পাকাইয়া আরও জমাট হইতে পারে। বেদপন্থীদের গোঁড়ামি আছে এবং তাহা ভয়ানক সন্দেহ নাই; কিন্তু বিজ্ঞান-নবিশদের গোঁড়ামি যে নাই, এমন নয় এবং সে গোঁড়ামি সাক্ষাৎ 'বুদ্ধিভ্রংশ'—যাহা হইলে, গীতা বলিতেছেন, 'প্রণশ্যতি'।

আধুনিক বিজ্ঞানের মহাতীর্থ পশ্চিমদেশ। সেখানকার তীর্থের পাণ্ডা মহাশয়েরা নিতান্ত মন্দ লোক ন'ন। তাঁহাদের নূতন দিক্ হইতে ভাবিবার-চিন্তিবার প্রবৃত্তি আছে; প্রয়োজন হইলে তৈয়ারি ধারণা সংস্কারগুলিকে একেবারে ঢালিয়া সাজিবার সাহসও আছে। সে দেশে 'বেদ' নাম না দিয়া হউক, বস্তুতঃ মানবের প্রাচীন জ্ঞান-বিশ্বাসগুলির

(তা ভূত-প্রেত সম্বন্ধেই হউক আর অধ্যাত্মশক্তি সম্বন্ধেই হউক) একটা সত্যকার পরীক্ষার বেশ মরশুম জমিয়া গিয়াছে। কিন্তু পাণ্ডা মহাশয়দের এদেশী 'ছড়িদার'-পুঙ্গবগণকে আমরা আঁটিয়া উঠিতে পারিব কি? ইঁহারা বিজ্ঞানের পক্ষে কোমর বাঁধিয়া কতকটা বাজে গোল পাকাইয়া থাকেন; এ গোল থামাইয়া দিবার জন্য তাঁহাদের বিজ্ঞান-দুর্য্যোধনের উরুটা দেখাইয়া না দিলে আমাদের চলিবে না। ম্যাক্ পোয়াকারে প্রভৃতি যাঁহাদের নাম পূর্ব্বেই করিয়াছি, তাঁহারা উরুর ভঙ্গুরতার সংবাদ খুবই রাখেন এবং সাবধানে কথাবার্ত্তা কহেন। নিউটনের মানসপুত্র যে Dynamical science, তাহার উরু ইতিমধ্যে আইন্‌ষ্টাইন প্রভৃতির গদাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।" কিন্তু নিউটনের হয়ত এত বড় মনীষা ছিল যে আইন্‌ষ্টাইন্‌কে সাম্‌না সাম্‌নি পাইলে তাঁহার সকল পাণ্ডিত্যাভিমান তিনি অবলীলাক্রমে চূর্ণ করিয়া দিতে পারিতেন। এ রহস্যটা আগামীবারে একটু খোলসা করিয়া বলিতে হইবে।

শেষ কথা, চাই ফিরিয়া উপনিষদের সেই দিন, যখন পরীক্ষা দ্বারা তত্ত্ব সাক্ষাৎকার না করিলে কেহ নিজেকে চরিতার্থ মনে করিত না। পরীক্ষা বিজ্ঞানাগারে যতটা চলিতে পারে চলুক, সিদ্ধাশ্রমে গিয়া যতটা পরিসমাপ্ত হইতে পারে তাহাও হউক। আমাদের মধ্যে জ্ঞানবিশিষ্ট, বিশ্বাস অকুতোভয় এবং সাধনা একনিষ্ঠ ও সুস্থির করিবার জন্য প্রাচীন বেদের সঙ্গে নবীন বেদের বা বিজ্ঞানের একটা বোঝাপড়া করার প্রয়োজন খুবই হইয়াছে। এ বোঝাপড়াটা না হইলে পুরাতনেও আমাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকিবে না, নূতনেও অনুরাগ ও অধ্যবসায় হইবে না। পরীক্ষার মত পরীক্ষা হইলে—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

"কব্ মুঝু ডাকল?"

[শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্-এ]

(১)

কব্ মুঝু ডাকল রাধা?—
মেরি সাধয়ি তেঁহারি নাম,—ভণয়ি, জপয়ি কত,
কো-ও-টী জীবন ভেল ভোরা;
"রা-আ-ধা, রা-আধা" ড্যাকি,—
'আধ' নাহি মি-ই-লয়ি,
'কা-আ-লিম' ভেল তনু ঘোরা;
মেরি জনম-মরণ-ভর রাধিকা সাধা;
তবহুঁ না আজু হাম্ পেখনু রাধা!

(২)

মেরে লাগি কাঁদল রাধা?—
হাম্ রা-আ-ধা লাগয়ি রোয়ি,—লা-অ-খ লা-আখ যুগ,
জা-আ-গত নিদে হেরি তেঁহে;
রাধিকা-প্রণয়-ডোরে,—আজহুঁ বাঁধয়ি রয়ি,
হে-এ-রয়ি দিবানিশি গেহে;
হাম্ তবহুঁ না বু-উ-ঝনু আদি সমাধা।
—জনম-মরণ-ভর পেখয়ি রাধা!

(৩)

আজহুঁ না-চিননু রাধা!
মেরি "আঁ আঁখ যুগল জুরি,—রা-আ-ধিকা দিঠি-আলা,
প্রা-আণ বহুন-বায় সেহি,—
নিখিল-ভুবন ভর,— করুণা-দরিয়া-ধারা,
'অমর' করত 'মরে' তেঁহি!
হাম্ কৈছনে আজু-অব জানব রাধা?
—আর-ত লাখ-যুগ না-করয়ি সাধা!

(৪)

তব্-তো মু' চি-নব রাধা,—
যব্ কো-ও-টী জনম আরু,— গোকুল-কুল-তটে
বাঁশরী ফুকারি গল-রোধা;
আঁখ-যুগল-আলা, জীবন-বহন বায়ে
ডারয়ি দিব ঋণ শোধা;—
যব্ সুরয কিরণ ডারি ভৈ যাবে আঁধা;
—তবহুঁ নয়ন-ভর পেখব রাধা!

মা

[অনুরূপা দেবী]

(৩৮)

ভাইফোঁটার পর বাড়া ঘরের একরকম বিলি-বন্দোবস্ত সারিয়া অরবিন্দ ও ব্রজরাণী আর একচোট বেড়াইতে বাহির হইল। বেলা মেয়েটী দেখিতে মন্দ নয়,—রংটাও তাহার একটু ফরসা,—সেইটিকেই সে এবারে চাহিয়া লইল। পরের ছেলে আর কখন লইবে না প্রতিজ্ঞা থাকিলেও, সে সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিল না। একটা কাহাকেও অবলম্বন না পাইলে যে থাকিতে পারে না!

কাশী আসিতেই এবার গোধূলিয়ার কাছাকাছি বড় রাস্তার উপরেই বেশ একখানা ভাল বাড়ী জুটিয়া গেল। ঠিক তাহার সাম্‌নাসাম্‌নি আর একখানা প্রায় তত বড়ই বাড়ী। সেখানে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তক্ষণই লোকের ভিড় লাগিয়া থাকে। প্রথমে উকিলের, তৎপরে দ্বিপ্রহরেও জনসমাগম দেখিয়া, ডাক্তারের আন্দাজ করিয়া, শেষকালে দিন দুত্তিন পরে খবর লইয়া ব্রজরাণী জানিতে পারিল যে, উহা কোন্ একজন পণ্ডিতের। উক্ত পণ্ডিতটি বুঝি জ্যোতিষী।

আবার দু'চারদিন গত হইলে, একদিন খবর পাওয়া গেল, ঐ জ্যোতিষী লোকটির নিজের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বড়-একটা অধিকার নাই,—অল্পসল্প একটুখানি অক্ষর পরিচয় আছে মাত্র। ইনি যে শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাহার নাম ভৃগু-সংহিতা। কোন্ সে পুরাকালে,—যে যুগে মানুষ নিজের বিদ্যার পরিচয় নিজেই জাহির করিয়া বেড়ানর পরিবর্ত্তে, তাহা চির-রহস্য-যবনিকার তলদেশে সযত্নে লুক্কায়িত রাখিতে চাহিয়া,—যাঁহা হইতে উত্তরাধিকারিত্বে বুদ্ধি, বিদ্যা, বিবেক সমস্তই ধারাবাহিক ভাবে পাইয়া আসিয়াছেন,—সেই গোত্রপতি, বংশপতি ঋষি নামেই নিজের পরিচয়কে মিলাইয়া দিতেন, সেই যুগেরই কোন 'ভার্গব' এই শাস্ত্রের প্রণেতা। জ্যোতিষ এবং ত্রিকালজ্ঞের দিব্যদৃষ্টি—এই দুইয়ে মিলাইয়া ভৃগু-সংহিতার এই 'কুণ্ডল্যাধ্যায়' বিরচিত। সম্পূর্ণ শাস্ত্র পাওয়া যায় নাই। ভারতের অধিকাংশ রত্ন-সম্ভারের মতই উহাও বৈদেশিক শাসন যন্ত্রের তলে দলিত হইয়া গিয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্রকে শ্রদ্ধা দিয়া জীয়াইয়া রাখিবার লোকের দৈন্য সেই সুদূর অতীত বৌদ্ধযুগ হইতেই যে আরম্ভ হইয়াছিল। এই লুপ্ত রত্নোদ্ধার হইয়াছে নেপাল রাজ্য হইতে। অল্প দিনের কথা,—বিগত মিউটিনির সময় এই প্রদেশেরই এক ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষীয় অত্যাচারের ভয়ে দেশত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান,—ভৃগু-সংহিতা তাঁহারই সম্পত্তি ছিল। পলায়ন কালে কিছু খোয়া গিয়াছে, বাকি যাহা ছিল, পুত্র ও জামাতাকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইনি সেই জামাতা, ইহার অংশে শুনা যায় না কি,—চারি লক্ষ কুণ্ডলী আছে। নিজের গৃহে রক্ষিত জন্ম-পত্রিকা হইতে রাশিচক্রটি ছকিয়া লইয়া গিয়া উঁহাকে দিলে, প্রত্যেক লগ্নচক্রের সূচীপত্র মিলাইয়া ঠিক উহারই প্রতিরূপ আর একটী রাশিচক্র সেই বহুপুরাতন অতীত যুগের লক্ষ লক্ষ কুণ্ডলীর মধ্য হইতে পাওয়া যাইবে। তাহারই সহিত সুললিত শ্লোকচ্ছন্দে সেই ভাগ্যচক্রের অধিকারীর ভাগ্যফল-লিখিত পূর্ণ কুণ্ডলীও পাওয়া যায়। অতীতের কথা ইহাতে সংক্ষিপ্ত। মাত্র বিশেষ-বিশেষ ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকুই প্রদত্ত থাকে; নতুবা নিশানা হইবে কেমন করিয়া? বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎই ইহার লক্ষ্য। মানব-জীবনের ভাল-মন্দ, ঘাত-প্রতিঘাতের প্রত্যেক সমাচারটুকু, কোন্ স্থলে কোন্ গ্রহের অবস্থানজনিত কি ফল, কোন্ দুঃখই বা অপ্রতিবিধেয়, কিসেরই বা প্রতিবিধান সম্ভব, সে প্রতিকার কি? এ সকল কথাই শরণাগতের জন্য ঋষিদ্বয়,—ভৃগু শুক্র পরস্পর কথোপকথনচ্ছলে জানাইয়া দিতেছেন। অতীত জীবনের কোন মহা ভ্রান্তি ইহ-জীবনের এই সমাগত অশান্তিকে বরণ করিয়া আনিয়াছে, কি উপায়েই বা সহজে লঘুচিত্ত, মানব জীবনের সেই ভুল-ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত সমাধা হইয়া অতীত পাপের ক্ষালন

হইতে পারে, এইটিকেও ইহাঁরা কৃপা-কটাক্ষ করিতে ভুলিয়া যান নাই। পরিশেষে এই জীবনান্তে কোন্ গতি লাভ হইবে, তাহারও আভাষ দিয়াছেন। আরও একটা কথা,—ভৃগুঋষি জন্মান্তরের মহাপাতক বলিয়া যে পাপের উল্লেখ করিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, সে পাপ পূর্ব্ব জন্মের কি না জানি না, কতকটা এজন্মের তো বটে।

ব্রজরাণী পথে-ঘাটে ভবঘুরে গণৎকারদের হাত দেখাইয়া অনেক পয়সা খরচ করিয়াছে,—কিন্তু ভাল জ্যোতিষীর খবর এ পর্য্যন্ত পায় নাই। একবার কলিকাতাতেই একজন নামজাদা ভাগ্য-ব্যবসায়ীর শুভাগমন হইয়াছিল। সাহেবী ধরণে ঘড়ী ধরিয়া তিনি ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন। হাত দেখিয়া ব্রজরাণীকে তিনি তাহার বন্ধ্যাত্ব-মোচনার্থ কবচ প্রদান করেন। পাঁচ সাত শত টাকা তাহারই যাগ-যজ্ঞে খরচ হয়। কিন্তু ফল? যেমন সাত্বিক ধর্ম্ম, ফলও তো তারই অনুরূপ হইবে। এবার এই অভিনব ব্যাপারের সন্ধান পাইয়া পরম পুলকিত হইয়া ব্রজরাণী পত্র লিখিয়া মায়ের নিকট হইতে কোষ্ঠি আনাইল; এবং অরবিন্দকেও তাহার খানার জন্য ধরিয়া পড়িল। অরবিন্দ প্রথমে উপেক্ষায় কাটাইয়া, শেষে নাছোড়বান্দা দেখিয়া কহিল,—"কেন ও-সবের মধ্যে যাচ্চো!—কি বল্‌তে কি বল্‌বে,—শেষে কেঁদে-কেটে খুন হবে। না হয় তো শাস্ত্রটার উপরেই শ্রদ্ধা হারাবে;—কাজ কি!"

ব্রজরাণী কহিল, "আমি শ্রদ্ধা হারালে আমিই হারাবো,—শাস্ত্র তো আর তাতে খোঁড়া হয়ে যাবে না। তুমি লিখে দাও।"

"মুখের উপর কি লিখে দেবে, তার কি কিছু ঠিক আছে?"

ব্রজরাণী অপ্রসন্ন ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "কি-ই বা আর এমন বল্‌বেন?"

অরবিন্দ রহস্য করিয়া বলিল, "ভৃগু ঋষি তো আর অরবিন্দ বোস ন'ন। শ্রীমতী ব্রজরাণীকে তাঁর ভয় কিসের? যদি কিছু বল্‌বার থাকে, না বলবেনই বা কেন?"

ব্রজরাণী ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমান-ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, "যদি কিছু বল্‌বার থাকে, বলবেন। সেটা শোন্‌বার সৎসাহস আমার আছে। তাই যদি না সইতে পারবো, তা'হলে ওঁর দোরে যাচ্চিই বা কেন? সংসারে যারা মন রেখে কথা কয়, সে রকম লোকের তো 'আকাল' পড়ে নি।"

অরবিন্দ একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া বলিয়া গেল, "তবে তুমিই উচিত কথা শুনে নাও। আমার ঢের শোনা হয়ে গিয়েছে।"

প্রথমে সংক্ষেপে শুনিয়া, নিজের কি না যাচাই করিতে হয়। তাহাই লিখিয়া আনা হইল। তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ,—"উচ্চ-কুলোদ্ভব কায়স্থ-কন্যা, পিতা ধনী, স্বামী মহাধনী। পিতা মৃত, মাতা ও তিন ভ্রাতা বর্ত্তমান। এক ভ্রাতা কৃতী। শ্বশুর-শ্বশ্রূ মৃত। পুত্রহীনা। স্বামী বিদ্বান্, সচ্চরিত্র; কিন্তু তথাপি ইনি একাকী পতিপ্রিয়া নহেন। স্বামীর পুত্র বিদ্যমান। জন্মান্তরের মহাপাপের ফলে ইনি নিজে পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত। প্রতিকার? আছে; কিন্তু প্রায় অপ্রতিবিধেয়। কি পাপ? নকল নহিলে জানা যাইবে না। নকলের জন্য বলা হইল।"

জীবন-রহস্যের এই ইঙ্গিতটুকু ব্রজরাণী বারবার করিয়া পাঠ করিল। যতবারই পড়িল, ততবারই ভিতরটা তাহার লজ্জায়, ভয়ে চমক খাইয়া খাইয়া উঠিল। অভিমান, অপমানের উষ্ণতাও মনের মধ্যে দেখা না দিল যে, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। 'একক পতিপ্রিয়া নহেন!' সে তো ব্রজরাণী সেই বিবাহের দিন হইতেই জানে। এ আর নূতন কথা কি তিনি জানাইয়াছেন? মনোরমা সুন্দরীই যে পতির ধ্যানের কেন্দ্র, প্রেমের উৎস, উহাঁকে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দিয়াই যে স্বামী তাহার আজ হৃত-সর্ব্বস্ব। সেই রিক্ত অন্তরের বিরাট শূন্যতার ফাঁকটা দিয়া আজ এই দীর্ঘকালেও যে হতভাগী ব্রজরাণী তাঁহার কাছেও পৌঁছিতে পারে নাই, সে কি বুঝিতে কিছু বাকী থাকে? এই দুঃখটাই যে নারী-জীবনের চরম দুঃখ, সে না কি সেই সহৃদয় ঋষি-বুদ্ধির অগোচর? স্বামী যে বাহিরে উহাঁর সম্বন্ধে অত বড় নির্লিপ্ত, ইহাতে জগৎ ভোলে ভুলুক, রাণীও কখনও ভুলে নাই, আর যাঁদের চোখে ধূলা দেওয়া যায় না, তাঁরাও ভুল করেন না।

কিন্তু এ লইয়া নালিশ-মোকর্দ্দমা চলে না। অপ্রিয়-সত্য সহ্য করিবার সাহস দেখাইয়া এ অশান্তি নিজেই সে কিনিয়াছে! নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল,

যে, এতদিনে ত যখন উহাঁর প্রিয়তমকে উনি পূজা করিতে ছাড়িলেন না, তখন আমি কাঁদিতে বসিলেই কি আর উহাঁর মন্ত্র-বিস্মৃতি ঘটিবে? তার পর সহসা কৌতূহলী হইয়া উঠিয়া এই কথা মনে-মনে ভাবিতে লাগিল, 'আচ্ছা, সত্যিই যদি উনি তাকেই অত ভালই বাসেন, তা'হলে এতটা কাল ধরে কি করে এমন নিঃসম্পর্ক হয়ে রয়েছেন? যাকে ভালবাসবো, দুঃখে তাকে ডুবিয়ে রাখবো,—এ আবার কেমন ধারা ভালবাসা রে বাপু? দণ্ডবৎ করি অমন ভালবাসার পায়ে। বিধাতাকে আমায় পতির প্রিয়া না করে অপ্রিয়া করেছেন, যে রক্ষে করেছেন!"

(৩৯)

এত সাধের ভৃগু-সংহিতা,—এ সংহিতা পাঠ করিতে-করিতে ব্রজরাণী স্তম্ভিত হইয়া রহিল,—লজ্জায় মাটিতে মিশিতে চাহিল। শত-শত অতীত বর্ষের কীটদষ্ট, পুরাতন জীর্ণ পুঁথির পাতায় এই যে এক মানব-জীবনের ফলাফল,—কোন্ সে অজ্ঞাত লেখক লিখিয়া গিয়াছেন,—বহু শতাব্দী অন্তে, এই বর্ত্তমান যুগের এই বঙ্গদেশীয়া ব্রজরাণীর জীবন-কথার সহিত কেমন করিয়া এ সম্মিলন সাধন করিল? এ কি শুধু জ্যোতিষ গণনা? অথবা, ত্রিকালজ্ঞের ত্রিলোক-বিজ্ঞাত জ্ঞাননেত্রে উদ্ভাসিত ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের, ইহ-পর সমস্ত লোকের চির যুগ এবং এবং যুগান্তরের গর্ভমায়া সমুদায় মানব ও মানবীর জীবন-রহস্য আলেখ্য লেখনের ন্যায় চিত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন! স্থূল প্রত্যক্ষ দর্শনেও এ শাস্ত্রের অপূর্ব্বত্ব যে অস্বীকার করিবার নহে! যদি শুদ্ধ মাত্র জ্যোতিষ-বিদ্যারই এ ফল হয়, তবে যাঁদের হস্তে গণনা-বিদ্যার এত বড় উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁদের শক্তিকে প্রণিপাত! ইহার আরম্ভ ভৃগু শুক্রের কথোপকথনচ্ছলে। পূর্ব্বজন্মে ইহাঁরা রাজা-রাণী ছিলেন। সপত্নী সন্তানের প্রতি অত্যাচরণের ফলে এজন্মে ইহাঁর মহাবন্ধ্যাত্ব-প্রাপ্তি! কৃচ্ছ্রসাধ্য পূজাজপাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা সন্তান লাভ ঘটিলেও, তাহার জীবিত থাকা কোন মতেই সম্ভব নয়। এমন কি, পোষ্য সন্তানের পর্য্যন্ত ইহাঁর সংস্পর্শে আয়ুক্ষয় সম্ভাবনা।'

ব্রজরাণীর শিথিল মুষ্টি হইতে বিচ্যুত হইয়া ধর্ম্মাধিকরণের মহা-বিচারকের বিচারের রায় লেখা দণ্ডপত্রখানা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। নিজে সে যেন কোন্ সুদূর জন্মজন্মান্তরের পরপার হইতে ভাসিয়া-আসা কোন্ সে এক অজ্ঞাত জীবনের বিস্মৃতির অতল তলে তলায়িত অতীতের অন্ধকারের নিবিড়-তায় ডুবিয়া যেন তাহারই তলায় তলাইয়া যাইতে লাগিল। কবেকার সে যুগ? ইতিহাসের কোন্ অঙ্কে তাহার স্থান? কোথাকার সে এক ক্ষুদ্র রাজ্য, অথবা বৃহৎ সাম্রাজ্য? গত জীবনে কোন্ প্রদেশে তাহার জন্ম হইয়াছিল? যে মহারাষ্ট্রীয় মেয়েদের নিজস্ব পুত্রী-পরিচ্ছদ সুন্দর স্বাধীন ভাব ও নির্ব্বিকার শান্ত মুখের দিকে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যায়, দেশের গৌরব বলিয়া মনে গর্ব্ব আসে, যে সব উৎকল নারীর হরিদ্রারঞ্জিত বদন ও নির্লজ্জ কাপড় পরা, পথের মধ্যে চোখে পড়িলে লজ্জায় শরীর কুঞ্চিত হইয়া যায়, 'তকি ঝুমকওয়ালি, পাটিসাঁটা, টিকলি আঁটা' বেহার প্রদেশীয়া অথবা দোষে-গুণে, পরানুকরণে নিজের নিজস্ব পর্য্যন্ত বর্জ্জনোন্মুখী বঙ্গ-বধূই সে আগের জন্মেও ছিল? কি ছিল? কোথায় ছিল? হিন্দু না মুসলমান, পার্শী, জৈনী, শিখ অথবা খৃষ্টীয়ান? কোন্ জাতি, কোন্ গোত্র, কোন্ ধর্ম্মী, কোথায় বাস? তার পর আবার সে ভাবিতে লাগিল, 'আচ্ছা সে জীবনেও কি ইনিই সেই রাজা ছিলেন? আমরা কি সে দিনেও এম্নি দুই সতীন ছিলাম না কি? সে বারে নিশ্চয়ই আমি দো-রাণী ছিলাম? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই! তা' না হইলে এজন্মেও উনি আমাকেই ভালবাসিতেন। তবে জন্মান্তরে বোধ করি সো-রাণী মনোরমা আমায় স্বামী ও স্বামীর ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেই সর্ব্বস্ব ভোগ করিয়াছিল,—তাই এ জন্মে আমাকেই তার সর্ব্বনাশের হেতু হইতে হইয়াছে। 'দো' হইলেও ঢেঁকিশালের মহলটা দখল করিতে হয় নাই বটে, কিন্তু মহারাজের মনটা? সেটা আর আমি কেমন করিয়া পাইব? দেখ, এই জন্যই কথায় বলে যে, 'স্বভাব যায় না মলে!' যে যার প্রিয় থাকে, তা সে একজন্ম পরেও থাকে। আচ্ছা, তবে যে 'পরপুত্র'-পীড়নের পাপটা ভৃগুমুনি আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন, তা আমি যদি দুর্দ্দশাপন্ন 'দো' রাণীই ছিলুম, তো সতীনের ছেলের পীড়ন কেমন করে আমি করতে গেলুম শুনি? হিংসে,—তা হয় ত মনে-মনে করে থাকতে পারি। এ-জন্মেও তো অনেক সময়—দূর হোক গে, এ-জন্মের কথা আবার এর ভিতর টেনেটুনে আনি কেন? এ-জন্মে এমন কিছু মহাপাতক আমি করি নি, যার জন্যে নিজের ছেলে দূরের কথা,—

পরের-ছেলেকেও আমার ছোঁয়াচে মরে যেতে হয়। আমার জন্মান্তরের পাপের ভোগ রয়েছে বলেই হয় ত আমাকেই এরা জোর করে এদের এই অশান্তির মধ্যে টেনে এনেছে। সে অপরাধ তো আর আমার নয়। আমি তো আর স্বয়ম্বর-সভায় দাঁড়িয়ে আমার জন্মান্তরের রাজার গলায় জোর করে স্বয়ম্বরের মালা পরিয়ে দিই নি।

"উঃ জন্মান্তর ধরে এই সতীনের জ্বালা! আবার আস্‌ছে জন্মেও এম্‌নি তাল ঠোকাঠুকি চলবে না কি? ভয় করে যে! আমি তা হোলে এবার মরে ভূতই হবো, মানুষ না হয় আর হবো না। ভৃগু ঋষি এত বল্‌তে পারেন, আর কি করলে মেয়েমানুষ জন্মটা ঘুচে গিয়ে আসছে জন্মে পুরুষ হ'য়ে জন্মাতে পারা যায়, এই কথাটাই কি বল্‌তে পারেন না? আমি তা হলে ভাল করে জেনে নিতুম যে!"

(৪০)

অজিত যে-দিন বাল্য-চপলতার বশে চারিদিকের কাণা-ঘুষা হইতে জাত সন্দেহটাকে ঠাকুরমার মুখ হইতে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া লইবার বড় আশাতেই তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া ছাদে তুলিয়াছিল, সে-দিন তাহার কাঁচা সোণার মত কচি প্রাণে এতটুকু সন্দেহ থাকিলে হয় ত সেই মিথ্যা ও সত্যকে সে মাটি-খোঁড়া করিয়া বাহির করিতে যাইত না। কিন্তু জ্ঞাতে হোক, অজ্ঞাতে হোক,—অজগরের ঘাড়ে পা পড়িয়াছে, আর কি রক্ষা থাকে? সাপের বিষ-দাঁতের চিহ্ন শোণিতের ঝলকে নিস্বন হইয়া উঠিতে ছাড়িবে কেন?

সে প্রথমে খানিকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। তার পর হঠাৎ,—ছাদের যে দিক্‌টায় দিনের আলো চলিয়া গিয়াছে,—অথচ জ্যোৎস্নার আলো তখনও নামিতে সময় পায় নাই বলিয়া অন্ধকার ছায়া করিয়া আছে,- সেইদিকে চলিয়া গেল। উঁচু আলিসার একটা কোণ ঘেঁসিয়া একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ নীচের দিক্ হইতে উঠিয়া আসিয়া আকাশের দিকে মাথা তুলিয়াছে, তাহারই উপর সে উপুড় হইয়া পড়িল। তার পর অনেকক্ষণ তাহার কোন সাড়া-শব্দই রহিল না। নিজের কোন কথাই তাহার মনে তখন স্থান পাইতেছিল না। শুধু এইটুকুই মনে রহিল যে, সে যেন কেমন করিয়া আজ তাহার পায়ের হারাইয়া ফেলিয়াছে! সমস্ত বুক জুড়িয়া অত্যন্ত কঠিন একটা বেদনা সমুদায় প্রাণটাকে মোচড় দিতে লাগিল। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই সে যেন তাহার ভিতর-বাহিরের সমস্ত চেতনাটাকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অসাড়তার একটা সূক্ষ্ম আবরণ তাহার উপর চাপা পড়িয়া যেন তাহার চোখের দৃষ্টি, কাণের শোনা এবং ত্বকের স্পর্শ পর্য্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য তাহার অনুভূতির অতীত করিয়া দিল। তার পর যখন সে আচ্ছন্ন-ভাবটা দূর হইল, তখনও তাহার মনে হইল, ক্লান্তি একটা ভারের মত তাহার সমস্ত শরীরটাকে চাপিয়া ধরিয়া আছে। মাথার উপরে তখন সাদা মেঘের পুঞ্জ খণ্ড-খণ্ড হইয়া দূরে দূরে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। হাপরে-পোড়া সোণার মলিন পাতের মত দীপ্তিহীন চাঁদের উপরে যেন স্বর্ণকারের হাতের চক্‌চকে শাণ-পালিস পড়িয়া তাহাকে নূতন-তৈরী গহনার মত উজ্জ্বল দেখাইতেছে। চাঁদকে বেড়িয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা চন্দ্রমণ্ডল পড়িয়াছে, রামধনুর মত সেটার বর্ণচ্ছটা চাঁদের ঔজ্জ্বল্যের আশে-পাশে ঠিক যেন পালিস-পাতের 'ব্রেস্‌লেটের' গায়ে চুণি পান্না-বসানর মত মনে হইতেছে। আকাশের গায়ে শতাবলী হারের মত স্তবকে-স্তবকে নক্ষত্রমালা ঝুলিয়া আছে। ছাদের মাটির উপরে সেইদিকে চাহিয়া অজিত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দূরের-অদূরের মন্দিরের মঙ্গল-আরতির বাদ্যধ্বনি পৃথিবীর বুক চিরিয়া-চিরিয়া একটা কাতর কান্নার মত যেন সেই চন্দ্র নক্ষত্রে বিভাসিত আকা-শের বুকের দিকেই ঠেলিয়া-ঠেলিয়া উঠিয়া আসিতে লাগিল।

পড়া-শোনায় অজিতের অখণ্ড মনোযোগ। এই ক্ষুদ্র পণ্ডিতটি এ-পাড়ার ছোট বড় সকলের আদরে-আদরেই আজ এত-বড়টি হইয়া উঠিলেও, এখন বিদ্যার খাতিরে সে সবার কাছেই সম্ভ্রমের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণও ক্ষুদ্র শিশুর এত অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ ও অবাক্ হইয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসেন যে, এই বয়সে এত বিদ্যা হইলে, বাঁচিবে সে কোন্ অবিদ্যার জোরে? সেই অজিত এবার বাড়ী ফিরিয়া অবধি আসন্ন পরীক্ষার কথা যেন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কোলের উপর বই রাখিয়া সে জানালার বাহিরে কোথায় কোন্ অনির্দ্দেশ্যের অভিমুখে চাহিয়া থাকে। তাই বলিয়াই কি সে সেই শেওলা-ধরা, পাড়-ধসা, আধমজা পুকুরে কলমীদলের মধ্যে পানকৌড়ির ডোবা-ওঠা,

অথবা কলমীশাকের বুকের মাঝখানে ডাঁটা তুলিয়া একটা যে ঐ রক্ত কহ্লার পুষ্প সবুজ শাড়ীর আধ ঘোমটা দেওয়া পল্লীবধূর নোলক চুম্বিত বাঙ্গা ঠোঁটের একটী ফোটা সরস হাসির মত ফুলিয়া উঠিয়াছে, উহারই নাচন কোদন এ সব কিছু দেখিতে পায়? কিছু না। জানালার ফাঁকে ঐ যে শীতকালের ফ্যাকাসে আকাশের খানিকটা দেখা যাইতেছে, এই বালকটির মনের মাঝ থানে যে আকাশটা আছে, সেটাও ঠিক এমনধারাই শূন্য এবং বিবসতার ধূসর রংয়ে এই রকমই রঞ্জিত। তা এমন মনের ফাঁকে যেখানে আপনার গরজের উপরেই ফাঁকি চলিতেছিল, সেখানে চোখের তারা দু'টা যে ফাঁকা মাত্রই দেখিবে, সে আর বিচিত্র কি? এম্‌নি ব্যথা জড, নিরুদ্যম চিত্ত লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া জীবনের সব চেয়ে অমূল্য সুযোগকে সে প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিল।

সেদিন জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে স্কুলের ছুটী ছিল। বাড়ী মেরামতের পর অন্দর বাহিরের মধ্যস্থ এই ঘরটা অজিতের পড়িবার ঘর হইয়াছিল। মনোরমা ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তক্তাপোষের উপর বই ছড়াইয়া এবং তাহারই মধ্যে দুই পা ছড়াইয়া দিয়া অজিত বসিয়া জানুর উপর 'হিষ্ট্রী অব্‌ ইংল্যাণ্ড' খানা খুলিয়া রাখিয়া অন্যমনে একদিকে চাহিয়া আছে।

মনোরমা ডাকিল, "অজিত।"

অজিত প্রথমটা একটু চমকাইয়া উঠিয়াছিল। তার পর যেন নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া, ইতিহাসের নোট লেখা খাতা ও পেন্সিল টানিয়া লইল, এবং পরিত্যক্ত বই খানা পড়িবার উপক্রম করিয়া, মুখ তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিল। সেই মুখ আর হাসি দেখিয়া মনোরমার বুকের ভিতরের রক্তটা ছলাৎ করিয়া উঠিল। কি বিষণ্ণ ও শুষ্ক সে মুখ। আর কত করুণ সেই হাসিটুকু। সে হাসি যেন শুকতারার মত উজ্জ্বল, আবার শিশিরের মতই নির্ম্মল। সে হাসিতে মনোর চোখে বিশ্বের আলো ফুটিয়া উঠিত, ঝঙ্কারে পাখীর কলকাকলী, বীণার সুর, কর্ণের তারে তারে ঝঙ্কার দিত। শুধু এই হাসির আলোটুকুতেই যে সে তাহার প্রাণের অন্ধকারকে বহুদূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। সে চাঁদ যদি রাহুগ্রাসে আজ পতিত হয়, তবে এই হতভাগিনী মা বাঁচে কি দেখিয়া?

ছেলের কাছে তক্তাপোষের একধারে বসিয়া-পড়িয়া মনোরমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "কাশীর চিঠিপত্র কিছু এলো রে?" অজিত কথা না কহিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, আসে নাই। কিছু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া মা কহিল, "তোর ঠাকুরমায়ের অসুখ দেখে এলেম, তার পর চিঠিতেও অসুখ বাড়ার খবর পাওয়া গেল, আর তো কোন খবরই নেই। কেমন আছেন, কে জানে।" অজিত কিছুই না বলিয়া ইতিহাসের বইখানা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া পড়ায় মন দিল। কিন্তু তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখা না গেলেও, মনোরমার সন্দেহ হইল, তাহার সব মুখখানাই রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, এবং চোখ দুইটা জলে ছল ছল করিতেছে।

তখন মনোরমার হঠাৎ মনে হইল, হয় ত ঠাকুরমার অসুখের খবর অজিতের এই চলচ্চিত্ততার কারণ। ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ভালই আছেন হয় ত। তুইতো তার চিঠিখানার জবাব দিয়েছিলি?" অজিত জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিল, তার পর ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—'না।" নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া মনোরমা কহিল, "সে কি রে, ঠাকুরমার চিঠির জবাব দিসনি! ভুলে গিয়েছিলি বুঝি? তা' কাল একখান মনে ক'রে লিখে দিস।"

অজিতের নিকট হইতে বাক্যে বা ইঙ্গিতে কোনই উত্তর না পাইয়া, মনোরমা অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া, অজিতের মুখপানে চাহিয়া দেখিল, সে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া স্থির, নিশ্চল দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া আছে। অগ্রাণের এই শীতের হাওয়ায়ও তাহার কপালে বড় বড় ঘামের ফোটা জমিয়া উঠিয়াছে।

এইটুকু ছেলের পক্ষে এতবড় অসম্ভব আত্মদমনের প্রয়াস মনোরমার বিস্ময়কে যেন কতকটা বেদনায় ও কতকটা বিরক্তির দিকে টানিয়া আনিল। সে তখন কাছে আসিয়া, নিজের আচল দিয়া কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতে দিতে একটুখানি অপ্রসন্ন স্বরে বলিয়া ফেলিল, "চব্বিশ ঘণ্টাই যে অমন ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকিস, তোর হয়েছে কি অজিত? পড়াশোনা পর্য্যন্ত ত ছেড়ে দিচ্ছিস দেখ্‌তে পাচ্চি।"

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গায়ে এতটুকু বাতাসের দম্‌কা লাগি

লেই যেমন বৃষ্টি আসে, তেমনি মায়ের কথায় অজিতের চোখ দিয়া নিঃশব্দে বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অশ্রুগোপন-চেষ্টায় আবার সে নোট-লেখা এক্‌সারসাইজ বুকখানা মুখের কাছে খুব উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া, তাহারই আড়ালে মুখ লুকাইল। কিন্তু চোকের জল যে থামাইতে পারে নাই, বইয়ের আড়াল হইতে যে বড়বড় জলের ফোঁটা বুকের উপর ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল, সাক্ষ্য দিতে লাগিল। শিলাবৃষ্টির শিলার মতই তাহা মনোরমার হৃদ্‌পিণ্ডে এক-টা করিয়া ঘা দিয়া-দিয়া পড়িতেছিল।

"অজিত!—অজিত, এই বয়সে এমন মনগুমোটে ছেলে তুই কেমন করে হ'লি বল দেখি? যদি কিছু দুঃখ-কষ্ট মনের মধ্যে হয়েই থাকে, সে কথা খুলে বল্লেও তো হয়।"

এবার বইখানা নামাইয়া ফেলিয়া অজিত একবার উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিয়াই, তৎক্ষণাৎ আবার প্রাণ-পণ বলে সে আবেগ নিরোধের চেষ্টা করিতে-করিতে কর-তলের উল্টা পিঠে চোক ঢাকা দিল। চেষ্টাটা চোখের জল মুছিবার জন্যই বোধ করি করা হইল, কিন্তু—

মনোরমা আঁচল দিয়া নিজের অবাধ্য চোখ দুইটাকে মুছিয়া লইল। তার পর ছেলের চোখের উপর হইতে হাতের আবরণ খসাইয়া দিয়া, তাহাকে বরাবরের মতই বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল।

"অজি, মানিক আমার, চুপ কর।" মায়ের বুকে কিছু-ক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া-শেষকালে ছেলে চুপ করিল বটে, কিন্তু আভ্যন্তরিক কান্নার রুদ্ধ উৎস তখনও মধ্যে-মধ্যে তাহার শরীরটাকে গভীররূপে কুঞ্চিত করিয়া তুলিতে ছাড়িল না।

"ঠাকুমার জন্যে মন কেমন করে?"

ক্ষণকালমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া, যেন আত্ম-পরীক্ষা করিয়া লইয়াই সে সবেগে মাথা নাড়িল,—না। "কাশী যেতে ইচ্ছে হয় না? ঠাকুমা বলেছেন আবার গ্রীষ্মের ছুটীতে আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন।"

ছোট ছেলে ভূতের ভয়ে যেমন করিয়া মাকে জড়াইয়া ধরে, তেমনি করিয়া মার বুকে লুকাইয়া ভয়ত্রস্তস্বরে অজিত বলিয়া উঠিল, "না, মা, ওঁদের কাছে আর আমরা যাবো না।"

"কেন অজিত?" মনোরমার কণ্ঠে বিস্ময়ের সহিত উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইল। "কেন যাবিনে?"

আবার কিয়ৎক্ষণ দ্বিধায় ইতস্ততঃ করিয়া, অকস্মাৎ সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া ফেলিয়া, অত্যন্ত দ্রুতকণ্ঠে অজিত বলিয়া ফেলিল, "ঠাকুমা আমাদের ভালবাসেন,—কিন্তু ও'ও তো বাবার বাড়ী।" স্বরে তাহার নিদারুণ অভিমান ধ্বনিত হইল। ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। কর্ণমূল অবধি সমস্ত মুখখানা সূর্য্যরশ্মি-বিভাষিত অপরাহ্ণ বেলার পশ্চিম আকাশের মত সমুজ্জ্বল লালের আভায় জ্বলিতে লাগিল।

মনোরমা ক্ষণকাল মূঢ়ের মত অবাক্ হইয়া থাকিয়া, তেম্‌নি বিমূঢ়ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "এ কথা বল্‌ছিস কেন? এঁর বাড়ী, তা—কি হয়েছে?"

"বাবা আমাদের ত্যাগ করেন নি?" বলিতে-বলিতেই মুখ ফিরাইয়া লইয়া অজিত সবেগে উঠিতে গেল; কিন্তু মনোরমা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ছিল,—তাই পারিল না। নিজের এই আকস্মিক আঘাতের সমুদয় বিস্ময়-বিহ্বলতা ও বেদনা এক নিমেষের মধ্যে কাটাইয়া ফেলিয়া সে সহজ গম্ভীর গলায় ডাকিল "অজিত!"

এ কণ্ঠকে অজিত চিনিত,—মনে-মনে ইহাকে সে অত্যন্ত সঙ্কোচ করিত। যতদূর তাহার পক্ষে সম্ভব, সংযত হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াই মায়ের পায়ের উপর নজর রাখিয়া জবাব দিল, "মা!"

"আমি বল্‌চি, তিনি আমাদের ত্যাগ করেন নি। বাপের আদেশ পালন কর্‌বার জন্য শুধু দূরে রেখেছেন। এ কথা তোমার বিশ্বাস হয়?"

ধীরে-ধীরে—ভোরের শিশিরে আর্দ্র শুভ্র শেফালির ন্যায় অশ্রু-ধৌত নির্ম্মলতায় অজিতের শোণিতার্দ্র কাতর চিত্ত একটী মুহূর্ত্তেই জুড়াইয়া স্নিগ্ধ হইয়া গেল। বিদ্রোহী অন্তঃকরণ নিজের অপরাধের গুরুত্ব সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব করিয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। মায়ের দুই পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া অজিত মাকে প্রণাম করিল। এই মায়ের কথায় যে দিন অবিশ্বাস আসিবে, সে দিনের পূর্ব্বে এ পৃথিবীর আলো বায়ু অজিতকে যেন গ্রহণ করিতে না হয়। ঠিক এই কথাটিই বালক-অজিতের মুখে বা মনে না আসিলেও, ঠিক এই কথাটিই মানুষ-অজিতের বুকের মধ্যে ছিল, এ কথা জোর করিয়াই বলা যায়। (ক্রমশঃ)

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মূলানুসন্ধান *

[শ্রীবিপিনবিহারী সেন বি-এল্ বিদ্যাভূষণ]

কবি লোক-শিক্ষক। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় কেবল শিক্ষিত সমাজের জন্য তাঁহার কাব্য রচনা করেন নাই। নিরক্ষর জনসাধারণের জন্যও তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দীন-হীন কাঙ্গালের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চণ্ডী কাব্য রচনার উদ্দেশ্য নিরক্ষর জনসাধারণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার,-- তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি শিক্ষা দেওয়া। তাই তিনি সমুদায় শাস্ত্র হইতে তিল তিল করিয়া সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এই কাব্য-তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই কাব্যে তিনি কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহারও অবিদিত নাই। আমার বোধ হয়, যাঁহারা চণ্ডী-কাব্যের মধ্যে কেবল মৌলিকতার অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা কবির গৌরবের হানি করেন। ধরিতে গেলে, তাঁহার কাব্যে বিরাট্ হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ অতি সরলভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে বেদ আছে, উপনিষদ আছে, দর্শন আছে, পুরাণ আছে, ইতিহাস আছে, স্মৃতিশাস্ত্র আছে, এমন কি, তন্ত্রশাস্ত্রের মারণ-বশীকরণের পর্য্যন্ত অভাব নাই। তিনি নিজে বলিয়াছেন,

"গুণি রাজা মিশ্র সুত সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামুন্যা নগর বাসী সঙ্গীত অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥"

এই অনেক পুরাণের মধ্যে, কোন্ স্থান হইতে তাঁহার কাব্যের কোন্ অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয়ের চেষ্টার জন্যই এই সামান্য প্রসঙ্গের অবতারণা। এইরূপ প্রবন্ধ সঙ্কলনের উপযুক্ত শক্তি, শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি আমার কিছুই নাই; সুতরাং পদে পদে অক্ষমতা লক্ষিত হইবে। তবে ইহা কবিকঙ্কণ-চণ্ডী সম্পাদনরূপ বিরাট্ ব্যাপারে কাষ্ঠ-মার্জ্জারের সামান্য সহায়তা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, এইমাত্র ভরসা।

"ব্রহ্মার সমান পুত্র হইলা চারিজন" হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টি-প্রকরণ রচনায় কবিকঙ্কণ শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধের সৃষ্টি-বর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থলগুলি তুলনায় সমালোচনার যোগ্য --

ব্রহ্মার মানস পুত্র হৈলা চারিজন।
সনৎ কুমার আর সনক সনাতন॥
সনন্দ হইলা তথা চারির পুরাণ।

ইহার মূল—

"ভগবদ্ধ্যান পূতেন মনসান্যাং স্ততোঽসৃজৎ। ৩
সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতন মাথাত্মভূ।
সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধরেতসঃ॥ ৪।

চারি পুত্র ত্যজেন বাপের অনুরোধ।
বিধাতার হৃদয়ে বাড়িল বড় ক্রোধ॥
সেই ক্রোধ হৃদয়ে রহিল বিধাতার।
তথি জন্ম হৈলা নীললোহিত কুমার॥
বাল্য ভাবে মহাদেব করেন রোদন।
নাম ধাম জায়া মোর কর নিযোজন॥

ইহার মূল—

সোঽবধ্যাতঃ সুতৈরেবং প্রত্যাখ্যাতোঽনুশাসনৈঃ।
ক্রোধং দুর্ব্বিষহং জাতং নিয়ন্তুমুপচক্রমে॥ ৬
ধিয়া নিগৃহ্য মাণোঽপি ভ্রুবোর্ম্মধ্যাৎ প্রজাপতেঃ।
সদ্যোঽজায়ত তন্মন্যুঃ কুমারো নীললোহিতঃ॥ ৭।
সবৈরুরোদ দেবানাং পূর্ব্বজো ভগবান্ ভবঃ।
নামানি কুরুমে ধাতঃ স্থানানিচ জগদ্গুরো॥ ৮।

আপনার তনু ধাতা কৈল দুইখান।
বাম ভাগে হইল নারী দক্ষিণে পুমান॥
শতরূপা নারী হইল রুচিবর তনু।
পুরুষ হইল স্বায়ম্ভুব নামে মনু॥

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

হার মূল—

এবং যুক্তকৃতস্তস্মদৈবশ্চ বেক্ষতস্তদা।
কস্তরূপমভূদ্দ্বিধা যৎ কায় মভিচক্ষতে॥ ৫১।
তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত॥ ৫২।
যস্তু তত্র পুমান্ সোঽভূন্মনু স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্।
স্ত্রীয়াসীচ্ছত রূপাখ্যা মহিষ্যস্ত মহাত্মনঃ॥ ৫৩।
গুণ ভেদে এক দেব হইলা তিন জন।
রজোগুণে হৈলা বিধি মরালবাহন॥
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে করেন পালন।
তমোগুণে মহাদেব বিনাশ কারণ॥

সৃষ্টিপ্রকরণের এইস্থলে মুকুন্দরাম বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের সাহায্য লইয়াছেন।

সংক্রান্তায়াং সিসৃক্ষায়াং পুরুষে তত্র তাদৃশে।
শক্তিমান্ পুরুষোঽভূতস্ত্রিবিধশ্চ গুণৈস্ত্রিভিঃ॥৯৬।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চাপি রজঃ সত্ত্ব তমোময়াঃ।
ত্রীনেতান্ পুরুষান্ জাতান্ দদর্শ পরমা জাতা।
পরমোপাধয়ো ভূতাস্তদা তে পুরুষাস্ত্রয়॥ ৯৭।

বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ মধ্যখণ্ড ৬ অধ্যায়

ভগবানের বরাহ রূপ ধারণ ও জলমগ্না ধরিত্রীর উদ্ধার পবন্ধ রচনায় কবি শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ১৩শ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন।

"মনুর প্রজা-সৃষ্টি" শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের ৫৪, ৫৫, ও ৫৬ শ্লোক অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। শ্লোক তিনটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তদা মিথুন ধর্ম্মেণ প্রজাহ্যেষাং বভূবিবে॥৫৪।
সচাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যান্যজীজনৎ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ তিস্রঃ কন্যাশ্চ ভারত।
আকুতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি সত্তম॥ ৫৫।
আকূতিং রুচয়ে প্রদাৎ কর্দ্দমায়তু মধ্যমাম্।
দক্ষায়াদাৎ প্রসূতিঞ্চ যত আপূরিতং জগৎ॥ ৫৬।

"ভৃগু মুনির যজ্ঞ" রচনায় কবিকঙ্কণ শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ হইতে ৮ম শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন। ভাগবতকার যে ঘটনা পাঁচটী মাত্র শ্লোকে, বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই সরল ভাষায় পল্লবিত আকারে এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

কবি শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯ম হইতে ১৭শ শ্লোক অবলম্বন করিয়া তাঁহার "দক্ষের শিব-নিন্দা" রচনা করিয়াছেন। এস্থলেও তিনি মূল ঘটনা বজায় রাখিয়া বর্ণনা পল্লবিত করিয়াছেন।

দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ প্রবন্ধের

"এমন শুনিয়া নন্দী দক্ষের বচন।
কোপে কম্পমান তনু লোহিতলোচন॥
দক্ষে শাপ দিতে নন্দী জল নৈল হাতে।
না হইবে দক্ষ তোর গতি মুক্তিপথে॥
মহাদেবে দক্ষ যেন বল কুবচন।
অচিরাতে হবে তোর ছাগল-বদন॥

ভাগবতের যে দুইটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া এই অংশ রচিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

বিজ্ঞায় শাপং গিরিশানুগাগ্রণী-
র্নন্দীশ্বরো রোষ কষায় দূষিতঃ।
দক্ষায় শাপং বিসসর্জ্জ দারুণং
যে চান্বমোদং স্তদবাচ্যতাং দ্বিজাঃ॥ ১৯
বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্ত মুখোঽচিরাৎ॥ ২২

শ্রীমদ্ভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়।

"পরস্পরে দুইজনে হৈব প্রতিকূল।
জামাতা শ্বশুরে যেন ভুজঙ্গনকুল॥

হইতে আরম্ভ করিয়া "দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপে"র অবশিষ্টাংশ এবং "শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনা" শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধের উমারুদ্র সংবাদ নামক তৃতীয় অধ্যায় অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। কবি এ স্থলে অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনাদি করিয়াছেন। যে স্থলে ভাগবতকারের সতী বলিতেছেন, "যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে চলুন আমরা সকলেই গমন করি।" সেই স্থলে মুকুন্দ-রামের সতী দক্ষালয়ে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া কেবলমাত্র বলিতেছেন—

"তুমি আজ্ঞা দিলে নাথ যাই পিতৃবাসে।"

ভাগবতকারের শিব যে স্থলে বলিয়াছেন, "যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া তুমি তথায় গমন কর তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির স্বজন-সন্নিধানে পরাভব সদ্যই মরণের নিমিত্ত কল্পিত হয়।"

যদি ব্রজিস্বতি হায় মদ্বচো
ভদ্রং ভব্যতা ন ততো ভবিষ্যতি।
সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎ পরাভবো
যদা স সদ্যো মরণায় কল্পতে ॥ ২৫।

কবিকঙ্কণের শিব এতদূর অগ্রসর হন নাই, তিনি এক কথায় বলিয়াছেন—

"বাপ ঘরে যদি চল, তবে নাহি হবে ভাল,
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন।"

কবিকঙ্কণের শিবের কথার মধ্যে আমরা ভাগবতকারের শিবের কথার ন্যায় ভবিষ্যতের আভাষ পাই না।

"গৌরীর দক্ষালয়ে গমন" "দক্ষের প্রতি গৌরীর নিবেদন" এবং "সতীর দেহত্যাগ" প্রবন্ধের শেষ অংশ, অর্থাৎ

"হৃদয় সরোজে বান্ধি শিবের চরণ।
দৃঢ় করি ভগবতী পরিল বসন॥'
যোগেতে ছাড়িল তনু জগতের মাতা।"

শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায় অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। এ স্থলেও কবি মূল আখ্যায়িকার স্থানে-স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনাদি করিয়াছেন। ভাগবতকারের সতী শিবের অনুমতি না পাইয়া বন্ধু দর্শন বাসনায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া একবার ঘর একবার বাহির এইরূপ করিতে থাকেন এবং স্নেহবশতঃ রোদন করিতে-করিতে অশ্রুধারায় ব্যাকুল হইয়া শিবের প্রতি সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিকঙ্কণের সতী অনুমতি না পাইয়াই কোপবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। উক্ত ৪র্থ অধ্যায়ের ৩১ হইতে ৩৪ শ্লোক এবং চতুর্থ স্কন্ধের "দক্ষযজ্ঞ বিধ্বংস" নামক পঞ্চম অধ্যায় অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম তাঁহার "দক্ষযজ্ঞনাশে শিবদূতের গমন ও "দক্ষ যজ্ঞ ভঙ্গ" রচনা করিয়াছেন। উভয়ের উপাখ্যান-ভাগ এক হইলেও বর্ণনায় পার্থক্য আছে। বীরভদ্র কর্ত্তৃক দক্ষের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া যজ্ঞকুণ্ডে ফেলিবার কথা উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষের ছাগ-মুণ্ড, বীরভদ্রের কৈলাস গমন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শিবের স্তব, ও দক্ষের জীবন লাভ প্রভৃতি বিষয়গুলি ভাগবতকারের পরিকল্পিত হইলেও, উহার বর্ণনাভঙ্গী, আভ্যন্তরীণ খুটিনাটি' (detail) গুলি কবিকঙ্কণের নিজের। উহার জন্য তিনি কাহারও নিকট ঋণী নহেন।

"শিব নিন্দা শ্রবণের করিব প্রতিকার।
তোমার অঙ্গজ তনু না রাখিব আর॥"

ইত্যাদির কল্পনা ভাগবতকারের নহে। কবি এ স্থলে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের পরিকল্পনার সাহায্য লইয়াছেন;—অবশ্য কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের সতী দক্ষালয়ে গমনোপলক্ষে বলিতেছেন—

"যদি শ্রোষ্যামি তে নিন্দাং তদা ত্যক্ষ্যাম্যহং তনুং।
কথ্যতে ভবতাপ্যেবং মন্নিন্দা শ্রোষ্যতে ত্বয়া॥
যত্র ত্বয়া ন গন্তব্যং তজ্জাতাহং নতে প্রিয়া।
অতএব ময়া তজ্যং দেহঞ্চোভয়থা শিব॥
দর্ক্ষজেন শরীরেণ নাহং তে নিকটোচিতা।
ইতি কৃত্বা কিয়দ্দেহং শরীরং বিহিতং ময়া॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্য-খণ্ড, ৬ অধ্যায় ৮৬, ৮৭ ও ৮৮ শ্লোক।

শ্রীমদ্ভাগবতকার সতীর দেহত্যাগের পর হিমালয়ের গৃহে জন্ম ও শিবের সহিত বিবাহের কথা দুইটী মাত্র শ্লোকে শেষ করিয়াছেন—

এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্ব্বকলেবরম্।
জজ্ঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রুম॥
তমেব দয়িতং ভূয় আবৃঙ্‌ক্তে পতিমম্বিকা।
অনন্য ভাবৈক গতিং শক্তিঃ সুপ্তেব পুরুষম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায় ৫৫ ও ৫৬ শ্লোক।

"সতী স্কন্ধে শিবের ভ্রমণ" বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্য খণ্ড দশম অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক অবলম্বনে রচিত হইয়াছে—

এবং বিলপ্য বহুধা হর প্রাকৃত লোকবৎ।
বাহুভ্যাং তাং পরিষ্যজ্য জগ্রাহ শিরসা পিতাম্॥১৭
গৃহীত্বা শিরসা কালীং দেবীং দাক্ষায়ণীং শিবঃ।
পরানং মোদমাপন্নো জগদাত্মানমাত্মনা॥১৮
কদাচিচ্ছিরসাধায় কদাচিদ্বামপাণিতঃ।
কদাচিদ্দক্ষিণে হস্তে ধৃত্বা দাক্ষায়ণীং শিবঃ॥
ননর্ত্ত ধরণীখণ্ডে মহা তাণ্ডব পণ্ডিত॥২১
তত্রোপায়ং বিনিশ্চিত্য বিষ্ণু পালন পণ্ডিতঃ।
সতী দেহং মহাদেব শিরস্থং ভীত ভীতবৎ।
সুদর্শনেন চক্রেণ চিচ্ছেদ খণ্ডশঃ শনৈঃ॥২৯
চক্রেণ বিষ্ণুণাচ্ছিন্না দেব্যা অবয়বাস্ততে।
নিপেতুর্ধরণৌ বিপ্র সা সা পুণ্যতরা ক্ষিতি॥৩১
কচিৎ পাদৌ কচিজ্জঙ্ঘে কচিজ্জিহ্বা কচিন্মুখম্।

কচিৎস্তনৌ কচিদ্বক্ষঃ কচিদ্বাহু কচিৎ করৌ ॥
কচিৎ পার্শ্বে কচিদ্ যোনি পপাত শিবমস্তকাৎ ॥৩৫
যত্র যত্র সতী দেহ ভাগাঃ পেতুঃ সুদর্শনাৎ ॥
তে তে দেশা ধরাভাগা মহাভাগাঃ কিলাভবন্ ॥৩০
তেতু পুণ্যতমা দেশা নিত্যং দেব্যাহ্যধিষ্ঠিতা।
সিদ্ধপীঠাঃ সমাখ্যাতা দেবানামপি দুর্লভাঃ।
মহাতীর্থানি তান্যাসন্ মুক্তিক্ষেত্রানি ভূতলে ॥৩৪

কিন্তু হিংলাজ, জ্বালামুখী, "ক্ষীরগ্রাম" বারাণসী ও "কামাখ্যা" ব্যতীত কবিকঙ্কণের পীঠস্থানগুলি তন্ত্রের পীঠস্থান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাতেও আবার তিনি হিংলাজে ব্রহ্ম-রন্ধ্রের পরিবর্ত্তে নাভিস্থল, জ্বালামুখীতে জিহ্বার পরিবর্ত্তে বক্ষঃস্থল ও ক্ষীরগ্রামে দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠের পরিবর্ত্তে পৃষ্ঠদেশ ফেলিয়াছেন।

"হিমালয়ের প্রতি নারদোপদেশ" "ইন্দ্রের প্রতি ব্রহ্মবাক্য" ও "হর কোপানলে মদন ভস্ম" রচনায় মুকুন্দরাম বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ মধ্য খণ্ড ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন। তুলনায় সমালোচনার জন্য নিম্নলিখিত স্থলগুলি উদ্ধৃত হইল।

কৃতাঞ্জলি দ্বিজবরে জিজ্ঞাসেন গিরি।
কোন বরে বিভা দিব মোর কন্যা গৌরী ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে —

হিমালয় উবাচ—

প্রভো ত্বমেক তত্ত্বজ্ঞো দুহিতুর্মে বরং বদ।
কস্মৈ দেয়া চ মে কন্যা কং প্রাপ্য সুখিনী ভবেৎ।১৫

যে স্থলে চণ্ডী-কাব্যে আছে—

হেমন্তের কথা শুনি বলেন নারদ।
গৌরী হইতে বাড়িবেক অনেক সম্পদ
অচিরাতে হবে গৌরী হরের ঘরণী।

সে স্থলে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে—

নারদ উবাচ—

অস্তি যোগ্য পতিঃ শৈল দুহিতুস্তবনান্যথা।
যং প্রাপ্তুং যততে পুত্রী তব জানাম্যহং ভুতম্।
কৈলাসে বসতিস্তস্য ত্বয্য প্যেষ চ তিষ্ঠতি ॥১৬
স্বয়মাত্মা মহাবাহুঃ কুবের যস্য কিঙ্করঃ।
তস্মৈ দেহি সুতাং কন্যামর্চ্চনীয়ায় দৈবতৈঃ ॥ ১৭ ॥

যে স্থলে চণ্ডী-কাব্যে আছে—

এমন সময়ে হর তপস্যা কারণে।
গঙ্গার নিকটে গেলা হিমালয়-বনে ॥
হর দেখি আনন্দিত হইল হিমালয়।
অঞ্জলি করিয়া নিবেদয়ে সবিনয় ॥
আমার আশ্রম আজি হইল পুণ্যশালী।
সংযোগ হইল যাহে তব পদধূলি ॥
আমার কামনা নাথ করহ সফল।
মোর কন্যা নিত্য দিবে কুশ পুষ্প জল ॥
হেমন্তের বচন শুনিয়া পশুপতি।
গৌরীকে করিতে পূজা দিল অনুমতি ॥
নানা উপহারে গৌরী পুজেন শঙ্করে।

সে স্থলে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে—

"ইত্যুক্তলস্তর্দধে শম্ভুরুমা পিত্রালয়ং যযৌ।
তদা নারদবাক্যেন জ্ঞাত্বা শৈলেশ্বর শিবম্।
শিবস্য পরিচর্য্যায়ৈ উমাং পুত্রীং দিদেশ হ ॥৩৮
পিত্রাজ্ঞয়া স্বাভিমতঃ সিষেবে যত্নতঃ শিবম্ ॥"

চণ্ডী কাব্যের যে স্থলে আছে—

ইন্দ্রের বচনে কাম হয়্যা ত্বরা যুত।
সঙ্গে নিল সহচর বসন্ত মারুত ॥
ফুলময় ধনু ফুলময় পঞ্চ বাণ।
মধুকর কোকিল করয়ে কল-গান।
ধেয়ানে আছেন হর অজিন আসনে।
ঝারি হাতে পার্ব্বতী আছেন সন্নিধানে ॥
সম্মোহন বাণ বীর পূরিল সত্বরে।
ঈষৎ চঞ্চল হর হইল অন্তরে ॥
ধেয়ান ভাঙ্গিয়া হর চারিদিকে চান।
সম্মুখে দেখিল চাপধারী পঞ্চ বাণ ॥
কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইলা মদন ॥
কন্দর্পস্তু সমাগত্য পুষ্পধন্বা স্ত্রিয়ান্বিতঃ।
সন্দধে পুষ্প ধনুষি মোহনাদিনি জৈমিনে ॥৪১
মূর্ত্তস্তত্র বসন্তোঽভুদ্ বিলসৎ পুষ্প সঞ্চয়ঃ।
তদ্দৃষ্ট্বা তু মহাদেবো বচন্যারম্ভমাত্মনঃ ॥৪২
তৎ কারণং মৃগ্যমাণো মণ্ডলীকৃত কার্ম্মুকম্।
কামং দদর্শ পার্শ্বস্থং দৃক্‌পাতাৎ ভস্ম চাকরোৎ ॥৪৩

এ স্থলে কুমারসম্ভবে আছে—

অথেন্দ্রিয় ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ
পুণর্বশিত্বাৎ বাক বন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতো বিকৃতেদিদৃক্ষু-
র্দিশামুপান্তেষু বিসসর্জ্জদৃষ্টিম্ ॥৩.৬৯

কালিদাসের মহাদেব তখন

"দদর্শ চক্রীকৃত চারুচাপং
প্রহর্ত্তুমভ্যুগুতমাত্মযোনিম্।" কুমারসম্ভব।

"রতির খেদ" রচনায় দু' এক স্থলে কালিদাসের কুমার-সম্ভবের সাহায্য লইলেও অধিকাংশই মুকুন্দরামের মৌলিক। যে স্থলে কবিকঙ্কণের রতি বলিতেছেন—

"তোমা বিনে প্রাণপতি তিলেক না জিয়ে রতি।"

সে স্থলে কালিদাসের রতি বলিতেছেন—

মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ
ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতিমে।
বচনীয় মিদং ব্যবস্থিতং
রমণ ত্বামনুযামি যগুপি ॥

যে স্থলে মুকুন্দরামের রতি বলিতেছেন—

বসন্ত স্বামীর সখা
মোরে আসি দাও দেখা
কুণ্ড কুড়ি জালহ অনল।

সে স্থলে কালিদাসের রতি বলিতেছেন—

কুরু সম্প্রতি তাবদাশুমে
প্রণিপাতাঞ্জলি যাচিতশ্চিতাম্ ॥

এক স্থলে মুকুন্দরামের রতি বলিয়াছেন—

"মোর পরমায়ু লয়া চিরকাল থাক জীয়া
আমি মরি তোমার বদলে।"

এ কল্পনা কবির নিজের; তাঁহার এ চিত্রের তুলনা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৫৫ অধ্যায়ের ১ম–১৭ শ্লোক অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ তাঁহার "রতির প্রতি দৈব বাণী" রচনা করিয়াছেন; এবং মৎস্য পুরাণ ১৫৪ অধ্যায়ের ৩০৮—৩১০ শ্লোক অবলম্বন করিয়া তাঁহার গৌরীর তপস্যা রচনা করিয়াছেন।

"শঙ্করের ছলনা" ও "হরগৌরীর কথোপকথন" রচনায় কবিকঙ্কণ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্য খণ্ড ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের ২৬শ হইতে ৩৬শ শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন।

চণ্ডী-কাব্যের শিব বিবাহের পুরোহিত ব্রহ্মা।

"ব্রহ্মা পুরোহিত হৈলা বাকের বিধান।
হিমালয় আনন্দে করেন কন্যা দান॥" ইত্যাদি

মৎস্য-পুরাণে দেখিতে পাই—

প্রণতেনাচলেন্দ্রেণ পূজিতোঽহম্ চতুর্ম্মুখঃ।
চকার বিধিনা সর্ব্বং বিধি মন্ত্র পুরঃসরম্ ॥৪৮৩
সর্ব্বেণ পাণিগ্রহনমগ্নিসাক্ষিকমক্ষতম্।
দাতা মহীভৃতাং নাথো হোতা দেব চতুর্ম্মুখঃ ।৪৮৪
বর পশুপতিঃ সাক্ষাৎ কন্যা বিশ্বারণি স্তথা।
চরাচরাণি ভূতানি সুরাসুর বরানিচ ॥৪৮৫
মৎস্য-পুরাণ ১৫৪ অধ্যায়।

শিবের বর-বেশ, বিবাহ-যাত্রা, নারীগণের বর দর্শনার্থ ঔৎসুক্য ও কথোপকথন উভয় গ্রন্থেই আছে; কিন্তু উভয়ের মধ্যে ঘটনা এক থাকিলেও, বর্ণনার যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইবে।

কদাচিদ্গন্ধতৈলেন গাত্র মভ্যজ্য শৈলজা।
চূর্ণৈরুদ্বর্ত্তয়ামাস মলিনান্তরিতাং তনুম্।
তদুদ্বর্ত্তনকং গৃহ্য রজশ্চক্রে গজাননম্।
মৎস্য-পুরাণ ১৫৪ অধ্যায় ৫০২ শ্লোক।

কবি মৎস্য-পুরাণের এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া তাঁহার "গণেশের জন্ম" লিখিয়াছেন। মৎস্য-পুরাণকার পুতুলটিকে গজানন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ তাহাকে মস্তকহীন করিয়া সৃষ্টি করতঃ তাহার স্কন্ধে সদ্যঃছিন্ন গজমস্তক যোজনা করিয়া তাহার দেহে জীবন-সঞ্চার করাইয়াছেন। এই গজমস্তক যোজনের পরিকল্পনা তিনি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, গণেশ-খণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায় হইতে কি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্য খণ্ড ৩০শ অধ্যায় হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলা কঠিন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে, নন্দী উত্তর-শীর্ষ-শয়ান ঐরাবতের মস্তক ছেদন করিয়া শিবের নিকট আনিয়া দেন; এবং শিব সানন্দে ঐ গজমুণ্ড গণেশের স্কন্ধে যোজনা করিবামাত্র উহা একটি সুন্দর স্থূল গজেন্দ্র-বদন বালকে পরিণত হইয়াছিল।

"শির যোজনমাত্রেণ বালসোঽভ্যতি সুন্দর।
খর্ব্ব স্থূলতরো দেবো গজেন্দ্রবদনাম্বুজঃ ॥৭৬
স্থানভ্রষ্টং শিবঃ শুক্রং তত্যাজ পৃথিবীতলে।
তৎ সর্ব্ব ব্যাপকং ভূতমগ্নিঃ সংজগৃহেতেতৎ ॥৫৪

অগ্নিস্তু সর্ব্বদেবানাং সম্মতে নচ তৎ কিয়ৎ।
গঙ্গায়ৈধারয়ামাস সাতু গঙ্গা সুদুর্দ্ধরম্।
শৈবং তেজস্তু তত্যাজ কৈলাসে শিবকাননে॥৫৫
তস্মাৎ প্রণী সমুত্তস্থৌ সেনানী দীর্ঘলোচনঃ।
মহাবলো মহাসত্ত্বঃ শিবপুত্রঃ মহাভুজঃ॥৫৬
কৃত্তিকাদি গবাং যল্লাং মাতৃণাং স পয়ঃ পপৌ।
তেনাসৌ কার্ত্তিকেয়াদি নামকো গুহনাদ্ গুহঃ॥৫৮
ষড়্‌ভির্বক্ত্রৈ পপৌ দুগ্ধং তেন ষড়্‌বক্ত্র উচ্যতে।
দদুঃ শিবাদয় স্তস্মৈ শস্ত্রকান্ত্রাদি বাহনম্॥৫৯

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্য খণ্ড ২৩ অধ্যায়।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই পাঁচটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম তাঁহার "কার্ত্তিকেয়ের জন্ম"-কথা লিখিয়াছেন। মূল গ্রন্থের আখ্যান ভাগের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া পল্লবিত বর্ণনা দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইয়াছেন।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে কালকেতুর বরলাভ, মঙ্গলচণ্ডীর গোধিকা-রূপ ধারণ, কমলে-কামিনী শালবাহন রাজা ও বণিকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্বং কালকেতু বরদা চ্ছল গোধিকাসি
যাত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডীকাখ্যা।
শ্রীশালবাহন নৃপাদ্ বণিজঃ সসূনো
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড ৪৫ শ্লোক।

এই শ্লোকটিতে কালকেতু, ধনপতি ও কমলে-কামিনীর কথা উপলক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, ঐ পুরাণ-রচনার সময় এই উপাখ্যানগুলি জনসমাজে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। উহা অবলম্বন করিয়া দ্বিজ জনার্দ্দন তাঁহার মঙ্গল-চণ্ডীর ব্রত-কথা রচনা করেন। উহাতে কালকেতুর উপাখ্যান ও ধনপতির উপাখ্যান অল্প কথায় বর্ণিত আছে। এই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত-কথা অবলম্বন করিয়া, বলরাম, কবিকঙ্কণ, মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি তাঁহাদের চণ্ডী-কাব্য রচনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম তাঁহার দিক্-বন্দনা কবিতায়, বলরামকে "গীতের গুরু" বলিয়া বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রথম সর্গ ৫ম হইতে ১৪শ শ্লোক, অর্থাৎ জয়দেব-কৃত দশ অবতারের স্তব অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ তাঁহার "বিশ্বকর্ম্মার দশ অবতার লিখন" রচনা করিয়াছেন। জয়দেবের বর্ণনা অপেক্ষা মুকুন্দরামের বর্ণনা কিছু অধিক পল্লবিত; কিন্তু উভয়েই বুদ্ধদেবকে নারায়ণের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণাবতার ও কৃষ্ণ-লীলা জয়দেবের কবিতায় নাই,—কবিকঙ্কণের কবিতায় আছে।

"মাণ্ডব্য মুনির শূলের কথা" ও বেদবতীর উপাখ্যান" রচনায় কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৬ অধ্যায়ের ১৪—৮৫ শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন; কিন্তু বেদবতী, শতশিরা ও লক্ষহীরা এই নামগুলি মার্কণ্ডেয় পুরাণে নাই। এ স্থলে মুকুন্দরাম মূল ঘটনার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই।

মহাভারত বনপর্ব্বের পতিব্রতা-মাহাত্ম্য পর্ব্বাধ্যায়ের সাহায্য লইয়া কবিকঙ্কণ তাঁহার "সতী সাবিত্রী উপাখ্যান" রচনা করিয়াছেন; এবং উপাখ্যান ভাগের কোন হানি না করিয়া, তিনি অতি সংক্ষেপে সাবিত্রীর উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতকার যাহাতে ৭টি অধ্যায় লাগাইয়াছেন, কবিকঙ্কণ তাহা চতুর্দ্দশটি মাত্র ত্রিপদী শ্লোকে শেষ করিয়াছেন। ইহা কম ক্ষমতার কথা নহে।

মুকুন্দরাম কালিকা-পুরাণের দুর্গার ধ্যান অবলম্বন করিয়া তাঁহার "মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধারণ" শীর্ষক কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। তুলনা করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত কয়েকটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

সিংহ পৃষ্ঠে আরোপিন দক্ষিণ চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোপন॥

এ স্থলে মূলে আছে

দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
বাম করে মহিষাসুরের ধরি চুল।
ডানি করে তার বুকে আঘাতিল শূল॥

মূলে আছে—

শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্র বিভূষিতম্॥
* * * *
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটী ভীষণাননম্।
সপাশ বাম হস্তেন ধৃত কেশঞ্চ দুর্গয়া॥
পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা খেটক শরাশন।
শোভে বাম করে পাঁচ পঞ্চপ্রহরণ॥

অসি চক্র শূল শক্তি কত মত শর।
পাঁচ অস্ত্র শোভিত দক্ষিণ পাঁচ কর॥

ইহার মূল—

ত্রিশূলং দক্ষিণেধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ।
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ॥
খেটকং পূর্ণ চাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেবচ।
ঘণ্টাং বা পরশুঃ বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ॥
"বাম দিকে লম্বমান শোভে জটাজুট।"
"অঙ্গদ বলয়া হার হৈল দশভুজা—"

ও

তপ্ত কল ধৌত জিনি বরণের আভা।
ইন্দিবর জিনি দুই লোচনের শোভা॥
শশিকলা শোভে মায়ের মস্তক ভূষণ।
সম্পূর্ণ শারদ ইন্দু জিনিয়া বদন॥

যে শ্লোকদ্বয় অবলম্বনে এই অংশ রচিত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥

এই সকল স্থলেও কবি মূল গ্রন্থের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই।

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত উর্দ্ধং রজস্বলা॥ ৬৬
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্ত নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥ ৬৭
তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোঽষ্টম বর্ষায়াঃ কন্যায়াস্ত প্রশস্যতে॥ ৬৮

সংবর্ত্ত সংহিতা।

সংবর্ত্ত সংহিতার এই শ্লোক তিনটি অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম তাঁহার "খুল্লনার বিবাহ প্রস্তাব" কবিতায় লিখিয়াছেন—

"অষ্টম বৎসরে কন্যা পিতা দিলে হয় ধন্যা
তার পুত্র কুলের পাবন।
আহরিয়া বর আনি কহিয়া মধুর বাণী
পণ বিনা করে সমর্পণ॥
নবম বৎসরে যদি বর আনি যথাবিধি
তনয়া করয়ে সম্প্রদান।
তার পুত্র দিলে জল সুরপুরে পায় স্থল
পিতৃলোকে পায় বহুমান॥
কেহ না বুঝাল্য তোমা গত হইল দশ সমা
তথাচ না কৈলে কন্যা দান।
প্রবেশিলে একাদশে মদন হৃদয়ে বৈসে
নব রস হয় একুস্থান॥
না করিলে কর্ম্ম ভাল এগার বৎসর গেল
অপযশ করিলে সঞ্চয়।
দ্বাদশ বৎসর বেলা হয় কন্যা রজস্বলা
পুরুষেরে নাহি করে ভয়॥
তাবত পুরুষে ভয় যাবত পুষ্পিতা নয়
রহে সয়ে তার কামমনা।
নর দেখি অনুপাম যদি কন্যা করে কাম
পায় পিতা নরক যন্ত্রণা॥

এ স্থলে কবিকঙ্কণের বর্ণনা পল্লবিত। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে একটী করিয়া ব্যাখ্যা যোজনা করিয়াছেন এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জনাদিও করিয়াছেন।

"অপ্রদাতা পিতাবাচ্য" সম্ভবতঃ মহাভারতের এই বচন অনুসারে তিনি কেবল পিতাকেই পাপভাগী করিয়াছেন, সংহিতাকার এ স্থলে পিতা, মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সকলকেই পাপভাগী করিয়াছেন। সংবর্ত্ত সংহিতার ৬৬ শ্লোকের ৩য় ও ৪র্থ চরণের "দশ বর্ষা ভবেৎ কন্যা অতঃ উর্দ্ধং রজস্বলা॥" স্থলে "দশমে কন্যকা প্রোক্তা দ্বাদশেতু রজস্বলা॥" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। কবি সম্ভবতঃ এই পাঠান্তরের উপর নির্ভর করিয়া "দ্বাদশ বৎসর বেলা কন্যা হয় রজস্বলা" বলিয়াছেন।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

মনুসংহিতা ৯ম অধ্যায় ৩য় শ্লোক।

মনুর এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

শৈশবে রক্ষিবে তাত যৌবনে প্রাণের নাথ
বৃদ্ধকালে তনয় রক্ষিতা।

হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্বের ৮৪ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়া মুকুন্দরাম তাঁহার "হরিবংশ কথা" বা কংশের জন্ম বৃত্তান্ত

রচনা করিয়াছেন। কূটবুদ্ধি রাম রায়, স্ত্রীজাতি অরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে তাহাদের কলঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা, এই কথা সমর্থনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা হরিবংশ পাঠ করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিতেছে।

রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১১৭শ হইতে ১২০ শক্তি সর্গের সাহায্য লইয়া কবি তাঁহার "রামায়ণ কথন"এর শেষ অংশ রচনা করিয়াছেন। ধনপতিকে বিড়ম্বিত করিবার জন্য, রামায়ণ হইতে জানকীর অগ্নি-পরীক্ষার বিবরণ শুনাইয়া, রামদত্ত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া স্বমত সমর্থন করিতেছে।

কবিকঙ্কণ তাঁহার যতু-গৃহের কল্পনা মহাভারত, আদি-পর্ব্ব, যতুগৃহ পর্ব্বাধ্যায়ের ১৪৪ অধ্যায়ের ৮ম হইতে ১১শ শ্লোক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থলে তিনি মহাভারত হইতে কেবলমাত্র কল্পনা বা ideaটি গ্রহণ করিয়াছেন, অন্য কিছুই নহে।

ষষ্ঠে মাস্যন্ন মশ্রীয়াৎ চূড়াকর্ম্ম কুলোচিতম্।
কৃত চূড়ে চ বালে চ কর্ণবেধো বিধীয়তে॥
ব্যাস সংহিতা, প্রথম অধ্যায় ১৮ শ্লোক।

ব্যাস-সংহিতার এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ তাঁহার চণ্ডী, কাব্যে অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধাদি সংস্কারগুলির বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়ার পরিকল্পনা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

নিশ্চয় জানিনু যদি আমারে বঞ্চিল বিধি
নাহি পিতা জীয়েন পরাণে।
আসিয়া আপন দেশে করিয়া পুত্তলীকুশে
করিব পিতার পরিত্রাণে॥

এইরূপ মৃত দেহের অভাবে মৃত ব্যক্তির কুশ-পুত্তলি বা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দাহ করিবার ব্যবস্থা কূর্ম্মপুরাণ উপরিভাগের ২৩ অধ্যায়ে আছে।

কবিকঙ্কণ তাঁহার 'সগরবংশ উপাখ্যান' রচনায় রামায়ণ আদিকাণ্ডের ৩৮, ৩৯ ও ৪০ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন; এবং "ভগীরথের গঙ্গা আনয়নে যাত্রা" "জহ্নুমুনি হইতে গঙ্গার উদ্ধার" ও "সগরবংশ উদ্ধার" রচনায় উহার ৪১, ৪২ ও ৪৩ সর্গের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল স্থলে রামায়ণের বর্ণনা অপেক্ষা কবিকঙ্কণের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্যখণ্ড ২৪ অধ্যায় ৬ শ্লোক।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন—

অযোধ্যা মথুরা মায়া যথা কৃষ্ণ পদ ছায়া
কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারকা।
হরি পদ আর যত বিশেষ বলিব কত
এই পুরী মুক্তির সাধিকা॥

শ্রীপতির জগন্নাথ দর্শন প্রবন্ধ রচনায় কবি স্কন্দপুরাণ উৎকল খণ্ডের সাহায্য লইয়াছেন। সমস্ত উৎকল খণ্ডে যাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তিনি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

"বিস্তার উৎকল খণ্ডে কত কব একদণ্ডে
ঝাট চল করি প্রণিপাত।"

কবিকঙ্কণের সেতুবন্ধ বিবরণ বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণের গল্পটি কবি ত্রিপদী ছন্দের ৪০টি মাত্র শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাকে "এক নিঃশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

সলিলে ডুবিলে মহী আশ্রয় করিল অহি,
শয়ন করিলা নারায়ণ।
সেই অবধান কালে প্রভুর শ্রবণ মলে
দুই দৈত্য কৈল মহারণ॥
মধু যে কৈটভনাম দুই দৈত্য অনুপাম
বিধাতারে কৈল বিড়ম্বন।
নাভিপদ্মে প্রজাপতি সে আমারে কৈল স্তুতি
তার আমি হইলাম শরণ॥

এই কবিতাংশ রচনায় কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮১ অধ্যায় (দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী মধুকৈটভ বধ) ৪৮ হইতে ৫৩ শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন।

মুকুন্দরাম "হনুমানের প্রতি ঔষধ আনয়নে দেবীর আজ্ঞা" ও "মৃত সৈন্যের পুনর্জীবন প্রাপ্তি" রচনায় রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১০২ সর্গের ২৯—৪১ শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন। রামায়ণের হনুমান বিশল্যকরণী, সাবল্যকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানকরণী চিনিতে না পারিয়া সমগ্র গিরিশৃঙ্গই আনিয়া

উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত বহুদর্শী চণ্ডী কাব্যের হনুমানের পক্ষে বিশল্যকরণী, অস্থিসঞ্চারিণী ও মৃতসঞ্জীবনী চিনিতে কষ্ট হয় নাই। এবার তিনি কেবল গাছই আনিয়াছেন, পাহাড় তুলিয়া আনিবার আবশ্যকতা হয় নাই।

"ধনপতির হর-গৌরী দর্শন।" কবিকঙ্কণ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বনে হর-গৌরী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ বিরাট্ কল্পনা, এরূপ মনোহর বর্ণনা কোন দেশের কোন কাব্যে আছে কি না সন্দেহ। শ্রীকালিকা পুরাণের ৫৪ অধ্যায়ে প্রথমে এই হর গৌরী রূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল। মূলতঃ সেই কল্পনা অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ এই অংশ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু স্থানে-স্থানে অন্যান্য পুরাণের বর্ণনারও যে সাহায্য না লইয়াছেন এমন বোধ হয় না।

যোগেনাত্মা সৃষ্টি বিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামাঙ্গ প্রকৃতি স্মৃতঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ৮ শ্লোক।

এ স্থলে কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

মুদিত নয়নে সাধু ভাবে মহেশ্বর।
পার্ব্বতী হইল তার অর্দ্ধ কলেবর॥
বাম ভাগে সিংহ হইল দক্ষিণ ভাগে বৃষ।
পতি বাম ভাগে গৌরী দক্ষিণে মহেশ॥

মৎস্যপুরাণ ২৬০ অধ্যায়ের ১—১০ শ্লোকে আমরা অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির বর্ণনা দেখিতে পাই। উহার দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—

ঈশার্দ্ধেতু জটাভাগ বালেন্দু কলয়াযুতঃ।
উমার্দ্ধে চাপি দাতব্যো সীমন্ততিলকাবুভৌ॥
বাসুকিং দক্ষিণে কর্ণে বামে কুণ্ডলমাদিশেৎ।৩
নানা রত্ন সমোপেতং দক্ষিণে ভুজগাঞ্চিতম্॥"

এ স্থলে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

অর্দ্ধ ফোঁটা হরিতাল অর্দ্ধেক সিন্দুর।
ডানি কর্ণে অহি বাম কর্ণে মণিপুর॥
ডানি ভাগে জটাজুট বামে অলি কেশ।
অর্দ্ধেক ভূষণ অহি অর্দ্ধ রত্নদেশ॥

হরগৌরী রূপের আধ্যাত্মিক অর্থ অতি গভীর। সৃষ্টি সম্বন্ধে ও ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিকগণের চরম সিদ্ধান্ত যাহা তাহারই সমন্বয় এই হরগৌরী রূপ কল্পনা। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই-ই নিত্য—সমস্ত বিশ্বই পুরুষ-প্রকৃতির বিকাশ। উচ্চস্তরের মানব হইতে বায়ু-সাগরে ভাসমান ধূলিকণা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই চৈতন্যরূপী পুরুষের অংশ ও প্রকৃতির জড়াংশ রহিয়াছে; সর্ব্বত্রই এই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত প্রকৃতি-পুরুষের লীলা। হরগৌরী রূপ এই বিশ্বের গূঢ়তম রহস্যের পরিচায়ক। কবিকঙ্কণ ধনপতির হৃদয়ে এই দার্শনিক তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিয়া ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন ও শিখাইয়াছেন যে, হরগৌরী বা পুরুষ-প্রকৃতি এইরূপে সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বঘটে বিরাজমান, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কিছুই নয়—"শক্তি শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদ কথঞ্চন"। তাই ধনপতির "কেবল ভাবিতে হয় ধ্যান নাহি রয়"; "অর্দ্ধ-নারী শিব বিনা না রহে ধেয়ান"। বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩৮ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া কবি তাঁহার "কলির দোষ কীর্ত্তন" রচনা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"নারদী পুরাণ মত কলির চরিত্র যত
শুন ঝিয়ে খুল্লনা সুন্দরী।

তুলনায় সমালোচনার জন্য নিম্নলিখিত অংশগুলি উদ্ধৃত হইল।

কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

মহা ঘোর কলিকালে বেদ নিন্দা করিবে ব্রাহ্মণে।

ইহার মূল

"ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে দ্বিজা বেদ-পরাঙ্মুখা।২৯
ন ব্রতানি চরিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা বেদ-নিন্দকাঃ॥"

কবিকঙ্কণের—"নীচ হবে মহীপাল" ইত্যাদির মূল—

"রাজানশ্চার্থ নিরতাস্তথা লোভপরায়ণাঃ।৪৬

তাঁহার—"ষোড়শ বৎসরে হইবে জরা।" মূল—

"পরমায়ুশ্চ ভবিতা তদা বর্ষাণি ষোড়শ।"৬৫

"ধার্ম্মিকে করিবে উপহাস" ইহার মূল

"ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে নরং ধর্ম্মপরায়ণং।
অসূয়া নিরতা সর্ব্বে উপহাসং প্রকুর্ব্বতে॥"৪২

ব্রাহ্মণগণ

"লোভে অতিপাপ মতি অকর্ম্মে সভার মতি
পরান্নে সভার অভিলাষ॥"

ইহার মূল

"লোভাভিভূত মানসঃ সর্ব্বে দুষ্কর্ম্মশীলিনঃ।
পরান্ন লোলুপা নিত্যং ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়॥"৪০

"করিবে অধর্ম্ম পথ পিতৃ হিংসিবেক সুত,
গুরু হিংসিবেক ছাত্রগণ
দারুণ কলির গতি বনিতা নিন্দিবে পতি"

ইত্যাদির মূল—

"দ্বিষন্তি পিতরং পুত্রা গুরুং শিষ্যা দ্বিষন্তি চ।
পতিং চ বণিতা দ্বেষ্টি কৃষ্ণে কৃষ্ণত্বমাগতে॥"৩৯

"পঞ্চ বর্ষে নারী গর্ভবতী" এবং "সপ্ত অব্দে নারী গর্ভবতী" ইহার মূল—

"পঞ্চমে বাথ ষষ্ঠে বা বর্ষে কন্যা প্রসূয়তে॥"৬৬

"দরিদ্র হইবে বৈশ্য ব্রাহ্মণ শূদ্রের শিশ্য
ভিক্ষাজীবী হবে সব লোক।"

ইত্যাদি কবিতাংশের মূল—

"ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা সর্ব্বে ধর্ম্ম পরাঙ্মুখা।
অন্নার্থাশ্চ ভবিষ্যন্তি তপঃ সত্য বিবর্জ্জিতা॥"৬৪

এবং

"কিঙ্করাশ্চ ভবিষ্যন্তি শূদ্রানাঞ্চ দ্বিজাতয়ঃ।"৩৮

"কলির গুণ কীর্ত্তন" ও উক্ত বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩৮ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়া রচিত হইয়াছে।

যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈ স্ত্রেতায়াং হায়নেহপিযৎ।
দ্বাপরে তচ্চ মাসেন চাহ রাত্রেণ তৎকলৌ॥৯৬
ধ্যায়ন্ কৃতে যাজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চ্চয়ন্॥
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্যকেশবম্॥৯৭

বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩৮ অধ্যায়ের এই শ্লোকদ্বয় অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

যেই ধর্ম্ম হয় সত্যে দ্বাদশ বৎসরে।
ত্রেতাযুগে এক অব্দে কহিনু তোমারে॥
দ্বাপরেতে সেই ধর্ম্ম হয় এক মাসে।
কলিতে সে ধর্ম্ম হয় রজনী দিবসে॥
ধ্যান করি হরি পদ পায় সত্য যুগে।
ত্রেতাযুগে হরি পদ পায় দান যোগে।
দ্বাপরে বৈকুণ্ঠে চলে পূজিয়া গোপালে।
হরি-সংকীর্ত্তনে পদ পায় কলিকালে।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম স্কন্ধ, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম তাঁহার গজেন্দ্র মোক্ষণ রচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০ হইতে ৩৪ শ্লোক ও তৃতীয় অধ্যায়ের ৩০ হইতে ৩৩ শ্লোকের উপর কবি বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পাণ্ড্য দেশীয় এক অতিশয় ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি অগস্ত্যের শাপে পৃথিবীতে গজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত গজরূপী ইন্দ্রদ্যুম্ন একদিন করিণীগণ সহ যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে ত্রিকূট পর্ব্বতস্থ হ্রদের জলে অবগাহনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছিল। ঐ সরোবরে কুম্ভীরবেশী হুহু নামক গন্ধর্ব্ব বাস করিত। অনন্তর কুম্ভীর উক্ত হস্তীর পদ ধারণ করিয়া প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। হস্তী উপায়ান্তর না দেখিয়া নারায়ণের স্তব করিতে লাগিল। তখন ভগবান বিষ্ণু কুম্ভীরের সহিত তাহাকে উত্তোলন করতঃ চক্র দ্বারা কুম্ভীরের মস্তক ছেদন করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দেন। পরিশেষে কুম্ভীর ও গজেন্দ্র উভয়েই ভগবানের করস্পর্শে শাপ-মুক্ত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়, বিশেষতঃ প্রথম অধ্যায়ের ১৯—৩২ শ্লোক এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০—২৩ শ্লোক অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ তাঁহার অজামিলের মুক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উভয় স্থলে কবি শ্রীমদ্ভাগবতের মূল আখ্যায়িকার কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই।

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্ব খণ্ড ২য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ জপতপ পিতা—
পিতা মহাগুরু জন পরম দেবতা॥

ইমানদার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ফৈজু বাড়ীতে থাকিবার মতলব করিয়াছিল; কিন্তু নানী আসিয়া গল্প জুড়িয়া দেওয়ায় রহিমা বাড়ীতেই রহিয়া গেল। বেগতিক দেখিয়া ফৈজু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল,—স্ত্রীর সহিত নিভৃত আলাপের প্রত্যাশায় ঘরে বসিয়া থাকিতে ভারী লজ্জা বোধ হইল।

রাত্রিতে পিতাপুত্রে যখন আহারে বসিয়াছেন, তখন রহিমা এ-ও-সে কথার পর টিয়ার পিত্রালয়ে যাওয়ার কথা তুলিল। পিতা সংক্ষেপে গম্ভীরভাবে জানাইলেন, ফৈজুর শ্বশুর তাঁহার কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন, এখন কি উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য?

সংবাদটা পুত্র-বধূর উদ্দেশে বিজ্ঞাপন করিলেও, বৃদ্ধ আসলে যে সেটা ফৈজুকেই প্রশ্ন করিলেন, ফৈজু সেটুকু বুঝিল। কিন্তু কি যে উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না, মাথা হেঁট করিয়া খাইতে লাগিল।

রহিমা শ্বশুর ও দেবরকে শুনাইয়া-শুনাইয়া বলিল, এখানে আসিয়া এই অল্প দিনেই ছোট-বধূর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে, আরো কিছুদিন তাহাকে এইখানে রাখিলে ভাল হয়। অবশ্য পিতার পত্র আসিয়াছে শুনিয়া, সেও যাইবার জন্য ছেলেমানুষের মত আব্দার জুড়িয়াছে, কিন্তু কি এত তাড়াতাড়ি যাইবার·········? ইত্যাদি।

আরো কতকগুলো মন্তব্য-গুঞ্জন শুনাইয়া উপসংহারে রহিমা প্রশ্ন করিল, "তোমার কি মত ফৈজু?"

ফৈজু শুষ্কভাবে একটু হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, "আমার আবার মত কি? তোমরা যা ভাল বোঝ, কর।"

প্রসঙ্গটা ঐখানেই থামিল। পিতাপুত্রের আহার শেষ হইলে, রোয়াকে বসিয়া দু'জনে কিছুক্ষণ এ-দিক্ ও-দিক্ কথাবার্ত্তা কহিলেন। তার পর রহিমা আহার করিয়া আসিলে, পূর্ব্বদিনের মত তাহাকে সঙ্গে করিয়া নানীর বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া, বৃদ্ধ স্বয়ং "বাবুদের বাড়ীর" উদ্দেশে চলিলেন।

দুয়ারে খিল লাগাইয়া আসিয়া, ফৈজু রোয়াকের উপর মাথার নীচে দু'হাত রাখিয়া, সটান লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া কি ভাবিতে লাগিল। টিয়া রান্না-ঘরে তখনো কি খুটখাট্ করিতেছিল, ফৈজু শুনিতে পাইল;—সেই জন্য ডাকাডাকি করিয়া, অসমাপ্ত কাযে বাধা দিয়া ব্যস্ত-বিক্ষুব্ধ করিতে চাহিল না। কায শেষ হইলে সে আপনিই আসিবে, সেটা জানা কথা; তাই নিরুদ্বিগ্নচিত্তে চুপচাপ শুইয়া, আপন মনে কি ভাবিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে টিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া কাপড়ে ভিজা হাত মুছিতে-মুছিতে আস্তে-আস্তে ঘরের দিকে চলিল। ফৈজু চোখ মেলিয়া চাহিয়া, মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এই খানেই এস না,—এখন থেকে ঘরে কেন?"

থমকিয়া দাঁড়াইয়া টিয়া বলিল, "আস্‌ছি—কাপড়টা বদ্‌লে।" তার পর একটু থামিয়া, দুষ্ট কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলিল, "ওখানে কতটুকু সময়ই বা বস্‌তে পাব—তুমি এখ্‌খুনি তো তাড়া দিয়ে উঠ্‌বে?"

ম্লানভাবে একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল, "কি কর্‌ব? তোমার যে শরীর ভাল নয়। থাক্, আজকের মত একটু-ক্ষণ বস্‌বে এসো তো।"

স্বামীর ম্লান মুখের পানে চাহিয়া, টিয়ার তরুণ মুখের চপল কৌতুক-লীলা মুহূর্ত্তে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া স্খলিত চরণে সে ঘরে ঢুকিয়া গেল।

একটু পরে ফর্শা কাপড়খানি পরিয়া, নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া, রোয়াকের নীচে দিয়া ঘুরিয়া গিয়া ফৈজুর পাশে দাঁড়াইল। চিন্তামগ্ন ফৈজু টের পাইল না, চোখ বুজিয়া নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া রহিল। টিয়া সলজ্জ-সঙ্কোচে একটু ইতস্ততঃ করিয়া, ধীরে-ধীরে স্বামীর বুকের উপর নিজের

হাত দু'খানি রাখিয়া স্নিগ্ধহাস্তে বলিল, "আমার হাত দু'টি কেমন ঠাণ্ডা হয়েছে ছাখো! বেশ সুন্দর না?"

ফৈজু চমকিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। তার পর সহসা ব্যগ্র বাহু-বেষ্টনে স্ত্রীর কটি জড়াইয়া ধরিয়া, পাশে টানিয়া বসাইয়া, নিজের সশব্দ-স্পন্দিত হৃদ্‌পিণ্ডের উপর তাহার হাত দু'টা সজোরে চাপিয়া ধরিল;—কিন্তু স্ত্রীর মুখ পানে সহসা যেন চাহিতে পারিল না, বিচলিত ভাবে চোখ বুজিল। প্রবল শক্তি-প্রয়োগে, নিজের গোপন-চিন্তা-উদ্বেলিত হৃদয়ের অধীর মত্ততা নিঃশব্দে দমন করিয়া লইয়া, বুকের উপর সেই হাত দু'টি অধিকতর জোরে চাপিয়া ধরিয়া, নিজের অন্তরে-অন্তরে অতি সুগভীর ভাবে সে কি যেন অনুভব করিতে লাগিল। বুঝি সেই সাড়ে-তিন বৎসর পূর্ব্বের দুঃখ-দুর্য্যোগ-পূর্ণ অতীতের স্মৃতি মনে পড়িয়া গেল। সেই ব্যাধি-পীড়িতা কিশোরীর জ্বর-তপ্ত শীর্ণ হাত দু'খানির জ্বালাময় স্পর্শ,—যে স্পর্শস্মৃতি—বহু—বহু দিন ধরিয়া তাহার দৃঢ় শক্তি-বিশিষ্ট একনিষ্ঠ-প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের মাঝে, তীব্র বেদনায় দীপ্ত সজাগ হইয়া জাগিয়াছিল, যে বেদনার সাড়া সে অহোরাত্র নিজের বুকের সমস্ত শিরা-উপশিরার মাঝে, ক্ষুব্ধ স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া ঘুরিতে দেখিয়াছিল,—তাহার যুবা-হৃদয়ের সমস্ত তৃষা-চাঞ্চল্য, যে রুক্ষ ব্যথার রুদ্র স্পর্শে শোক-মুহ্যমান হইয়া—এত দিন স্তম্ভিত নিস্পন্দ হইয়াছিল,—বুঝি আজ তাহাকে, এই নূতনতর কোমল শীতলতার, অভিনব আনন্দবাহী স্পর্শে, নব-উদ্বোধনের মাঝে সজীব করিয়া তুলিতে চাহিল। ফৈজু কোন কথা কহিতে পারিল না।

স্বামীর সেই গভীর চিন্তাশীলতার সুগভীর স্তব্ধ ভাব টিয়াকে বিচলিত করিয়া তুলিল। যা-হোক্ একটা কিছু শব্দ করিয়া সেই অসহ মৌনতা সজোরে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য অধীরচিত্তে সহসা সে বলিয়া উঠিল "আমার শেরগড় যাওয়ার কি ঠিক্‌ঠাক্ হোল তা হলে?"

সজোরে আত্মদমন করিয়া, শান্ত দৃষ্টি মেলিয়া, ফৈজু স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "তোমার মন কি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যাবার জন্যে?"

ফৈজুর কণ্ঠস্বরটা টিয়ার কাণে ভারী আশ্চর্য্য ঠেকিল। ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া, নিজের অজ্ঞাতেই সে বলিয়া ফেলিল, "না, তাতো হয় নি,—মন ব্যস্ত হবে কেন?"

অধিকতর কোমলকণ্ঠে ফৈজু বলিল, "কোন কষ্ট হচ্ছে কি এখানে—"

টিয়া আরো আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "না,—তা কেন হবে? দিদি আমায় মার চেয়েও বেশী যত্ন করে। কত সাবধানে রেখেছে। আমার বরং অত হুস্ থাকে না, কিন্তু দিদিকে তো ফাঁকি দিতে পারি না, দিদি কত ভালবাসে আমায়—"

নিজের প্রকাণ্ড মুঠার মধ্যে টিয়ার ঘর্ম্মাক্ত হাত দু'টি চাপিয়া ধরিয়া ফৈজু বলিল, "তবে আর দিন-কতক থেকে যাও,—আমি জয়দেবপুর থেকে ফিরে আসি। তার পর আমি নিজে তোমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সেখানে পৌছে দিয়ে আস্‌ব। কেমন, রাজী তো?"

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া টিয়া বলিল, "তুমি নিজে আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে? ঠিক তো? আচ্ছা, তা হলে আমি এখন যেতে চাই না। কিন্তু তুমি কত দিন পরে ফির্‌বে?"

ফৈজু বলিল, "মাসখানেকের মধ্যেই বোধ হয়; কিছু বেশী দিনও হতে পারে—"

টিয়া বলিল, "এই এত দিন তুমি সেখানে বসে থাক্‌বে? এর মধ্যে এক-আধ দিনের জন্যেও আর বাড়ী আস্‌বে না?"

ফৈজু হাসিয়া বলিল "অনেক দূরের রাস্তা যে! তা'হলেও খাজনার টাকা চালান দেবার জন্যে মাঝে মাঝে হয়তো আস্‌তে পারি। মোদ্দা, মাস-দেড়েকের মধ্যে এ কিস্তির খাজনা আদায় করে প্রথম হাঙ্গামটা মিটিয়ে আস্‌তে পার্‌ব বোধ হয়। সেই সময় তোমার শেরগড়ে রেখে আস্‌ব। এখন তুমি যাবার মতলব ছেড়ে দাও।"

টিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, বোধ হয় মনে মনে কথাগুলার পুনরালোচনা করিয়া লইল। তার পর সহসা যার-পর-নাই বিস্ময়ের সহিত বলিল, "আচ্ছা, তোমারই বা হঠাৎ এ মতলব হোল কেন বল দেখি? আমায় এখানে রাখবার জন্যে এত জিদ্ করছ কেন এবার?"

ফৈজু কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় নানী বাহিরের দুয়ারে করাঘাত করিয়া ডাকিলেন "ফৈজু, ফৈজু—"

ফৈজু সাড়া দিয়া, ত্রস্তে উঠিয়া দ্বার খুলিতে গেল। টিয়া ততক্ষণে মাথায় কাপড় টানিয়া, একছুটে অন্ধকার ঘরে গিয়া লুকাইল। লজ্জায় তাহার বুক দুরুদুরু করিতে লাগিল! মাগো, ছিঃ! নানী বাড়ীতে ঢুকিয়া এখনি যদি

হঠাৎ দেখিয়া ফেলিতেন যে, টিয়া তাঁহার নাতীর কাছে বসিয়া, অমন অসঙ্কোচে তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে, তাহা হইলে, না জানি নানী কি-ই মনে করিতেন! লজ্জায় অস্থির টিয়ার এত হাসি পাইতে লাগিল, যে, অন্ধকার ঘরে মুখে কাপড় চাপিয়া, আপনা-আপনিই হাসিয়া আকুল হইয়া উঠিল।

ফৈজু দুয়ার খুলিতেই, নানী ও রহিমা বাড়ী ঢুকিল। রহিমা দুয়ারটা পুনশ্চ বন্ধ করিতে-করিতে সংক্ষেপে জানাইল, আজ নানীর বাড়ীতে জন-কয়েক কুটুম্বিনী আসিয়াছে; তাই স্থানাভাব বশতঃ তাহারা এইখানে শুইতে আসিল।

পল্লীগ্রামের ইহা চির-প্রচলিত প্রথা। এক বাড়ীতে অতিথি-কুটুম্ব আসিলে, তাহাদের থাকিবার জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীর লোক প্রতিবেশীর বাড়ীতে নিজে আশ্রয় লইতে যায়। ইহাতে কেহ কিছুমাত্র দ্বিধা-সঙ্কোচের ধার ধারে না।

রহিমার বক্তব্য শেষ হইতে না হইতে, নানী ফৈজুকে প্রশ্ন সুরু করিলেন—"ফৈজু এতক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়াছিল কেন? তাহার ঘুমই বা আসে নাই কেন? নাত্‌বৌ কতক্ষণ ঘরে গিয়াছে? সে জাগিয়া আছে, না ঘুমাইতেছে? ফৈজু সে সংবাদ জানে কি না?......" ইত্যাদি। ফৈজু প্রথমে সরল ভাবেই দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দিল। তা'র পর বেগতিক দেখিয়া নিরুত্তরে হাসিতে লাগিল।

নানীর অফুরন্ত প্রশ্ন ক্রমাগতই চলিতে লাগিল, কিছুতেই সে থামে না। কিন্তু দুষ্ট নাতীটির কাছে সন্তোষ-জনক কৈফিয়ৎ মোটেই আদায় হইল না। অগত্যা তাহাকে কটুকাটব্য বর্ষণ করিয়া নানী নাত্‌বৌয়ের সন্ধানে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রহিমা প্রতিবন্ধক হইয়া, নানীকে টানিয়া লইয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া, শয়নের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়া, চেঁচাইয়া বলিল "ফৈজু, তুমি শুয়ে পড়গে,—ঘরে যাও।"

ফৈজুও আজ এখন এইটুকুই চায়। রোয়াকের বিছানাটা গুটাইয়া লইয়া বারেণ্ডায় ফেলিয়া, একটু ত্রস্ত-চরণে সে নিজের শয়ন-কক্ষের দিকে চলিল। কিন্তু দুয়ারের কাছাকাছি হইতেই, ঘরের ভিতর হইতে টিয়া সবেগে আসিয়া অন্ধকারে তাহার উপর পড়িল!—ফৈজুর বুকে মাথা ঠুকিয়া টক্কর খাইয়া, টিয়া বেশ ভালরকমই একটা আছাড় খাইবার যোগাড় করিয়াছিল; ফৈজু বলিষ্ঠ-ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া, সামলাইয়া লইল; চুপি-চুপি বলিল "আবার এখন ছুটছ কোথা? ঘরে চল, অনেক রাত হয়েছে।"

নিজের মাথায় হাত বুলাইয়া, টিয়া চুপি-চুপি ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "মাগো, কি মানুষ তুমি! ওম্নি করে অন্ধকারে আসে?"

ফৈজু হাসিয়া বলিল "বাঃ, অন্ধকারে আসার দোষটা বুঝি একা আমারি? তুমি তীরের মত ছুট্‌ ছিলে কেন ঘরে চল।"

টিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তুমি শোও গে, আমি নানীর সঙ্গে দেখা করে আসি,—বাড়ীতে মানুষ এলো, আর আমি শুয়ে থাক্‌ব, তা হবে না, সর।"

কিন্তু লৌকিকতা-আইনের অত সূক্ষ্ম ধারাগুলো আজ ফৈজুর আগ্রহ-উৎসুক মনের কোনখানে খুঁজিয়া পাওয়া দায়! কাযেই, বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "আজ থাক, কাল সকালে দেখা কোরো, এখন ওরা শুয়ে পড়েছে। কোন দর্‌কার তো নাই!"

টিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "দরকার না থাক্‌লেও যেতে হয়। তুমি সে সব, কিছু জান না,—সর, আমি শুনে আসি।"

"আঃ!......আচ্ছা যাও, যোদ্দা শীগ্‌গী ফিরো—" বলিয়া ফৈজু হাত ছাড়িয়া দিল। টিয়া চৌকাঠ ডিঙাইয়া বাহিরে গিয়াই, অকস্মাৎ অসহনীয় অভিমানের ঝাঁজভরা স্বরে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিল,—"হুঁ! আস্‌বে শীগ্‌গী! আমি এখন যত পারি, দেরী করে আস্‌ব আজ......"

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এই অদ্ভুত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া টিয়া অম্লান-বদনে দ্রুত প্রস্থান করিল! ফৈজু অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া—শেষে আপনা-আপনি নিঃশব্দে হাসিল! কি অদ্ভুত রহস্যময় ক্রোধ! অকারণ, পরম অসঙ্কোচে—শিশুর মত সরল-দুর্ব্বলতাপূর্ণ—একি বৃহৎ অভিমানের প্রতাপ!

কিন্তু থাক,—এ মান-অভিমানের অভিনয়-সমালোচনায় তন্ময় হইয়া থাকিবার মত চিত্তস্থৈর্য্য আজ তাহার নাই,—আজ ফৈজুর মন ভারী উতলা হইয়া উঠিয়াছে। টিয়াকে জপাইয়া, এখন তাহার পিত্রালয়-গমনের মন্ত্র-পরিবর্ত্তনটা

সুনিশ্চিত রূপে করাইয়া লইতে হইবে। জয়দেবপুর হইতে ফিরিয়া সে যেন টিয়াকে অন্ততঃ এক দিনের জন্যও এখানে দেখিতে পায়,—এটুকু বন্দোবস্ত করিয়া লইতেই হইবে!

ঘরের প্রদীপটা অত্যন্ত মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল; সেটা উস্কাইয়া দিয়া, ফৈজু বিছানায় গিয়া বসিল। গোঁফে তা দিতে-দিতে নিজ মনে কি ভাবিতে লাগিল।

একটু পরে, ও-ঘরে রহিমার সুস্পষ্ট তিরস্কারের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। কাণ পাতিয়া একটু শুনিতেই ফৈজু বুঝিতে পারিল, টিয়াই বকুনী খাইতেছে! কারণটা বুঝিতেও অবশ্য বিলম্ব হইল না,—ফৈজুর আবার হাসি পাইল। পরক্ষণেই দেখিল, মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া, সলজ্জ-কুণ্ঠিত ভাবে টিয়া ঘরে ঢুকিতেছে। সপরিহাসে ফৈজু বলিল, "যাঃ! রসভঙ্গ হয়ে গেল!"

সন্ত্রস্ত ভাবে পিছনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া টিয়া বলিল, "দিদি—দিদি—"

সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফৈজু বলিল, "কে, খলিফা আসছি? এস, এস—"

বাহিরের অন্ধকার বারেণ্ডা দিয়া দ্রুত চরণে পুনঃ প্রস্থান করিতে করিতে, খুব সংক্ষিপ্ত, গম্ভীর বচনে রহিমা বলিয়া গেল, "কপাট বন্ধ করে দাও, আমরা ঘুমুতে যাচ্ছি—" সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেদের শয়ন-কক্ষে ঢুকিয়া সে সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিল।

রহিমা টানিয়া আনিয়া তাহাকে দুয়ার পর্য্যন্ত রাখিয়া গিয়াছে,—লজ্জার উত্তেজনায় টিয়ার হাত-পা ঘামিয়া উঠিয়াছিল। এইবার সহসা নিতান্ত অকারণেই ফৈজুর দিকে এক কোপ-কটাক্ষ হানিয়া, অকস্মাৎ বিদ্রোহের স্বরে বলিল "যাও,—তোমার ওপর আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছে!—ছিঃ!"

মৃদু-মৃদু হাসিতে-হাসিতে, দুয়ার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সুকোমল কণ্ঠে ফৈজু বলিল "নিজে মাথা ঠুকে নিজে-নিজেই মাথা গরম করে তুল্‌লে!"

গ্রীবা বাঁকাইয়া উষ্ণ অভিমানে টিয়া বলিল, "কেনই বা তুল্‌ব না? বেশ করবো, তুল্‌বো, তোমার কি?"

হাসি-হাসি মুখে ফৈজু বলিল, "আমার অসুবিধা,—আর কি? একটা দরকারী কথা চুকিয়ে নেবার ছিল,—কিন্তু অম্নি তাবে পাগলামী জুড়্‌লে—"

বাধা দিয়া টিয়া বলিল, "এইটে পাগলামী হোল! অমন করে মাথা ঠুকে গেলে—"

ক্ষিপ্র চতুরতার সহিত ফৈজু বলিল, "বাঃ, মাথা বুঝি একা তোমারি ঠুকে গেছে! আর আমার বুকটা বুঝি সে ধাক্কায় জখম্ হয় নি?"

থতমত খাইয়া, টিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! মুখে-চোখে বিদ্রোহের রেখা মিলাইয়া, অভাবনীয় বিস্ময়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ভীতি-ম্লান মুখে বলিল, "সত্যি লেগেছে? খুব লেগেছে?"

একটা ছোট কথার ঘায়ে, টিয়ার যে এতখানি শোচনীয় বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়া যাইবে, ফৈজু তাহা আদৌ অনুমান করিতে পারে নাই। টিয়ার মুখপানে চাহিয়া ভারী হাসি পাইল। মনে মনে একটু লজ্জাবোধও হইল,—ছিঃ এই নিতান্ত সরল-বুদ্ধি দুর্ব্বলের সঙ্গে,—কথার চালাকি খেলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা!.........অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া, গম্ভীর মুখে বলিল "কেনই বা লাগবে না, মানুষ তো আমিও—" কথাটা বলিতে-বলিতে চট্ করিয়া টিয়ার হাত ধরিয়া টান দিয়া বলিল "এস—"

ফৈজুর মুখপানে চাহিয়া দারুণ সন্দেহে টিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠাট্টা হচ্ছে? না?"

ফৈজুর গাম্ভীর্য্য-আড়ম্বর লোপ হইল! সে হাসিয়া ফেলিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে, যথা-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা-মতে সকলে জয়দেবপুর রওনা হইলেন।

এবার বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইবার সময় ফৈজুর মন অত্যন্তই দমিয়া গেল। চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে মনের যে জোরটুকু লইয়া, বন্ধুর পরিহাসকে সে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল,—মনের সে জোরটুকু তখন যে কোথায় হারাইল, ফৈজু ঠিক করিতে পারিল না। বিদায়ের সময় টিয়ার দুটি হাত ধরিয়া—আবেগ ভরে পীড়ন করিয়া, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বলিল, "দেখো, ফিরে এসে যেন তোমায় দেখ্‌তে পাই।"

টিয়ার চোখ জলে তখন ভরিয়া গিয়াছিল। তবু সে ম্লান হাসি হাসিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "তুমি তো চৌকাঠ পার হলেই সব ভুলে যাবে!—"

পথে যাইতে যাইতে, ফৈজুর শুষ্ক মুখ এবং বিমর্ষ মন সবচেয়ে পরিষ্কার রূপে ধরা পড়িল মণ্ডলের চোখে! ফৈজুর ভাগ্য ভাল, তাই মিত্র মহাশয় সঙ্গে ছিলেন; না হইলে মণ্ডলের অসংযত পরিহাসে ফৈজুর দুরবস্থার সীমা থাকিত না। মণ্ডলের আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ফৈজু মিত্র মহাশয়ের পাশে স্থান লইল। মণ্ডল কিন্তু নিরস্ত হইবার পাত্র নয়,—সুযোগ পাইলেই ছোবল মারিয়া বসিত! মাননীয় জনের চক্ষুর অন্তরাল হইলে দুই বন্ধুতে অনেক সময় মুখোমুখী ছাড়িয়া হাতাহাতিও বাধাইয়া ফেলিত! রামটহল আজকাল ফৈজুকে বেশ খাতির করিয়া চলে; কারণ ফৈজু এখন—"নাউবজী" হইয়াছে! কাযেই ফৈজুকে আর ঠাট্টা-তামাসা করে না। তবে অন্য কেহ ঠাট্টা করিলে, সেও পিছনে থাকিয়া ঐকতান-বাদনে যোগ দিয়া, রসিকতা প্রকাশে কুণ্ঠিত হইত না! এমনি ভাবে হাস্য-পরিহাসে পথ সংক্ষিপ্ত করিয়া, সকলে যথাসময়ে জয়দেবপুরে পৌঁছিল।

সঙ্কটপুরের বাবুদের নিযুক্ত প্রবল প্রতাপশালী লোকজনের রুদ্রনীতির কঠোর তাড়নায়, জয়দেবপুরের প্রজারা বহুদিন ধরিয়া উগ্রবিদ্রোহভাব পোষণ করিতেছিল। দু'চারটা মারামারি, পেটাপেটি, ফৌজদারী নালিশ ফ্যাসাদও ইতিপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছিল। উত্যক্ত প্রজার দল, একটা নূতন কিছু পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। এই নূতন শাসক-সম্প্রদায়ের আগমনে প্রথমটা তাহারা একটু সন্দেহ-চাঞ্চল্য অনুভব করিল; কিন্তু ইহাঁদের আশ্বাস ও সদ্ব্যবহারে শীঘ্রই তাহারা বিশ্বাস করিয়া, স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করিল। মাতব্বর প্রজারা মিত্র মহাশয়ের মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত হইয়া,—আপনা হইতেই অবুঝ-আনাড়ি, গোঁয়ার-গোছের একরোখা প্রজাদের বুঝাইয়া-পড়াইয়া ঠাণ্ডা করিলেন। ফৈজুর অমায়িক সৌহৃদ্যে গ্রামের যুবক সম্প্রদায় মুগ্ধ হইয়া প্রাণপণ উৎসাহে তাহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইল। ও-তরফের কর্ম্মচারীরা ভিতরে-ভিতরে ষড়যন্ত্র করিয়া, দুই-চারিজন শক্তি-শালী দুঁদে গোছের প্রজাকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিবার চেষ্টায় লাগিয়াছিল; কিন্তু এ-তরফে ভক্ত অনুরক্ত 'ডানপিটে' দল, উত্তেজিত হইয়া, ও-তরফের শাসন-কর্ত্তাদের শাসাইয়া বলিল, "খবর্দ্দার! মুণ্ড ট্যানে ছিঁড়ে ফেল্‌ব! দু-আনির মজুর—দু আনির মত থাক!"

চৌদ্দআনার তরফের লোকেরা, দুআনার তরফের শাসনকর্ত্তাদের নূতন নামকরণ করিল—"দু-আনির মজুর!

যোলআনার মধ্যে চৌদ্দআনা বিষয়ের প্রভুত্ব হঠাৎ হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায়, ও-পক্ষের লোকেরা বড়ই ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকাশ্য বিদ্রোহে বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া, গোপন-যোগ-সাজসে ইহাদের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হইল না,—উল্টা বেশী করিয়া প্রজাদের বিরক্তিভাজন হইল।

প্রজারা বশীভূত হইল, নিরাপদে খাজনা আদায় হইতে লাগিল। কোন দিকে কোন গোলযোগের সম্ভাবনা না দেখিয়া, মিত্র মহাশয়ের অনুমতি লইয়া সুনীল কলিকাতা চলিয়া গেল। মিত্র মহাশয় আরো দিনকতক রহিলেন। তার পর সকল দিকে পরিপূর্ণ সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া, মিছামিছি কায কামাই করিয়া এখানে "সাক্ষী-গোপাল" সাজিয়া বসিয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া, খাজনা-আদায়ী টাকা লইয়া মণ্ডল মহাশয় সমভিব্যাহারে তিনি তিনি তেজপুরে ফিরিয়া গেলেন। তখনো অনেক খুচরা খাজনা আদায় বাকী,—কাযেই ফৈজু যাইতে পারিল না। আর ফৈজু যদি গেল না, তবে শ্যামলই বা কেমন করিয়া যায়? ফৈজুকে ছাড়িয়া যাইতে সে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না।

মিত্র মহাশয় চলিয়া যাইবার পর, একদিন নিভৃতে বসিয়া সযত্নে আঁকা-বাঁকা ছন্দে, তালব্য শ' এ, দন্ত্য স' এ' গাই-বাছুরের আকারে অক্ষর সাজাইয়া সুমতি দেবীকে "ভক্তি পুরঃসর প্রণাম নিবেদনে" শ্যামল জানাইল যে এখানে ফৈজু মামুর কাছে সে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, কোন কিছু দুষ্টামী করে না, মন দিয়া জমিদারী সেরেস্তার কায শিখিতেছে, তাহার রান্না খাইয়া এখানকার সকলে খুব 'তারিফ্‌' করে। তাছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ফৈজু, এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল হক্ক সর্দ্দারের কাছে তাহাকে লাঠিখেলা শিখিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়াছে, ফৈজু নিজেও খুব লাঠি খেলিয়া থাকে। হক্ক সর্দ্দার ফৈজুকে

খুব ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, শীঘ্রই সে পূর্ব্ব-প্রভুর চাকরী ছাড়িয়া এখানকার এষ্টেটে আসিয়া নগদীর কাজে বাহাল হইবে স্বীকার করিয়াছে। এখানে খুব আম হইয়াছে; সেখানে এ বছর আম-কাঁঠাল কেমন হইয়াছে?……… ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য বিচিত্র সংবাদের পর, সকলের কুশল প্রার্থনা করিয়া প্রণাম জানাইয়া পত্র শেষ করিল। তার পর ঠিকানা লিখিয়া চিঠিখানি ডাকে ফেলিবার পূর্ব্বে, হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায়, পুনশ্চ নিবেদনে 'দিদিমাকে প্রণাম' জানাইয়া অনেক কষ্টে ভাবিয়া-চিন্তিয়া 'মেন্তুর মা'কেও প্রণাম জ্ঞাপন করিল।

দিন দশ পরে পত্রের উত্তর আসিল। সুমতি দেবী লিখিয়াছেন, 'ফৈজুর কায শেষ হইলে উভয়ে যত শীঘ্র পারে যেন তেজপুরে ফিরে।'—আম-কাঁঠালের কোন সংবাদই তিনি লেখেন নাই দেখিয়া শ্যামল ভারী ক্ষুণ্ণ হইল।

পুরা দুই মাসের অবিশ্রাম চেষ্টায় ফৈজুর কায তখন অনেকটা শেষ হইয়া গিয়াছিল,—আর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই সে বাকীটুকু গুছাইয়া লইবে। বাড়ীর জন্য প্রাণ ছটফট্ করিতেছে। সহস্র কর্ম্ম-কোলাহলে ডুবিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া কায করিতে-করিতে,—এক-এক সময় মনটা সমস্ত বাঁধন কাটিয়া কোথায় যে ছুটিয়া উধাও হইত, তাহার খোঁজ পাওয়া যাইত না। সুমতি দেবীর অনুমতি-পত্র পাইয়া, ফৈজু শেষ কাযটুকু গুছাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময় এক অভাবনীয় বিঘ্ন ঘটিল! যাত্রার দিন প্রাতঃকালে গ্রামের দুইজন মাতব্বর প্রজা আসিয়া সংবাদ দিল যে, সঙ্কটপুরের সেজ বাবুর খাস কর্ম্মচারী হরিহর খাজনার টাকা লইয়া যাইবার জন্য সম্প্রতি জয়দেবপুরে আসিয়াছিল। তার পর চিরাভ্যস্ত দুশ্চরিত্রতা বশে, পাশের গ্রামে কোন এক নাপিত রমণীর উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হওয়ায়, সেখানকার লোকেরা পশু রাত্রে তাহাকে ধরিয়া প্রহার দিয়াছে। রাগের মাথায় একজন হরিহরের কপালে কাটারির এক চোট বসাইয়াছিল, আঘাতটা সাংঘাতিক হইলে রক্ষা ছিল না; কিন্তু হরিহরের পিতৃপুণ্য-বলে সেটা অল্পই হইয়াছিল। হরিহর রাতারাতি সঙ্কটপুরে পলায়ন করে। সেখানে সুপণ্ডিত প্রভু সেজবাবু চক্ষের নিমেষে সাফাই সাক্ষী যোগাড় করিয়া, হরিহরের কপালে সেই কাটারির দাগে দাগ মিলাইয়া আরো একটা ভালরকম চোট বসাইয়া, প্রচুর রক্তপাতের পর অজ্ঞান অবস্থায় হরি-হরকে সহরের হাসপাতালে দাখিল করিয়াছেন। সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়াছে যে, জয়দেবপুরের চৌদ্দআনা তরফের প্রজারা, একটা জল-নিকাশী নালার স্বত্ব জবরদস্ত ভাবে দখল করিতে গিয়াছিল। হরিহর নিজের প্রভুর স্বত্ব রক্ষার জন্য আইনসঙ্গত ভাবে বাধা দিতে গিয়াছিল। ফলে প্রজারা তাহাকে প্রহারের চোটে মরণাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছে…… …. ইত্যাদি।

উধোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে চড়িয়া, ফৈজুর বাড়ী যাও-য়ার পথে অলঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিল দেখিয়া, ত্যক্ত-বিরক্ত-চিত্তে ফৈজু একবার ভাবিল, "চুলায় যাক্ প্রজাদের মামলা ফ্যাসাদ,—সে তো সুমতি দেবীর আদেশ পাইয়াছে,—চোখ বুজিয়া এখন নিজের পথে চম্পট দিক্—"কিন্তু তখনি মনে পড়িল, ফৈজুর সেইটুকু হঠকারিতার ফলে, অনেকগুলি নিরপরাধ প্রজার সর্ব্বনাশের সঙ্গে সুমতি দেবীর সমূহ ক্ষতি হইয়া যাইবে। ফৈজুকে বিশ্বাস করিয়া তিনি যে গুরু দায়িত্বের ভার দিয়াছেন,—যে দায়িত্ব বহনের জন্য, ফৈজু বুক ঠুকিয়া সমস্ত ক্ষতি-সহিতে স্বীকৃত হইয়াছে,—সে বিশ্বাসের সম্মান রক্ষা হইবে না!-ইহার কাছে স্ত্রীর চিন্তা, ধিক্!

মনের সমস্ত দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া ফৈজু আপনাকে কঠিন করিয়া তুলিল। শ্যামল যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া তল্পী-তল্পা বাঁধিতেছিল; ফৈজু আদেশ দিল, "থাক্, এখন নয়—"

মামলা বাধিল। ফৈজুর যত্ন ও চেষ্টায় পাশের গ্রামের লোকেরা সত্য সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইল। তাহাদের জমিদার একজন সদাশয় মুসলমান ভদ্রলোক। নানা কারণে তিনি বহুদিন হইতে সঙ্কটপুরের বাবুদের উপর হাড়ে চটিয়া-ছিলেন। এবার এই তুচ্ছ কেলেঙ্কারী ব্যাপার লইয়া, তাঁহা-দের ধৃষ্টতা প্রকাশের স্পর্দ্ধা দেখিয়া, মর্ম্মান্তিক রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। ব্যক্তিগত কলঙ্ক-জনক ব্যাপার বলিয়া, নিজে প্রকাশ্য ভাবে ইহাতে যোগ দিলেন না, কিন্তু এ ব্যাপারে সংসৃষ্ট প্রজাদের গোপনে অর্থসাহায্য করিয়া বিধিমতে লড়িবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

এই সূত্রে ফৈজুর সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল। জমিদার সাহেবের অনুগ্রহে ফৈজুর সকল কাজেই

সুবিধা ঘটিল। যথাসময়ে অনেক কাঠ-খড় পোড়াইয়া মামলা শেষ হইল। মিথ্যা মামলা ফাঁসিয়া গেল, সত্য প্রকাশ হইল। হরিহর সাত বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।—কিন্তু সেজ-বাবুর চাতুরী-বলে সে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িল! পুলিশ গ্রামে-গ্রামে তাহার সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল!

এই সব গোলমালে আরো প্রায় দুই মাস কাটিল। এইবার ফৈজু নিশ্চিন্ত হইয়া, টাকা-কড়ি ও জিনিস-পত্র গুছাইয়া, তেজপুর রওনা হইবার উদ্যোগ করিল।

পরদিন প্রভাতে গো-যানে যাত্রা করিবার সমস্ত ঠিক-ঠাক,—বৈকালে সুমতি দেবীর এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল,—শ্যামলকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া সংক্ষেপেই তিনি লিখিয়াছেন যে, "ফৈজুর স্ত্রী পীড়িত, ফৈজু যেন শীঘ্র বাড়ী ফিরিবার চেষ্টা করে।"

এইবার ফৈজুর মাথা ঘুরিয়া গেল! অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চিঠিখানার দিকে চাহিয়া, খানিকক্ষণ হতবুদ্ধির মত নির্ব্বাক্ হইয়া সে বসিয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল, শ্যামল সাঙ্গো-পাঙ্গে আসিয়া লাঠি খেলিতে যাইবার জন্য ডাকিল; শরীর ভাল নাই বলিয়া ফৈজু তাহাকে বিদায় দিয়া শুইয়া পড়িল। ক্ষুধাতৃষ্ণা অকস্মাৎ কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল, রাত্রে জলস্পর্শ করিতেও প্রবৃত্তি হইল না; নিঝুম মারিয়া বিছানায় পড়িয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতে লাগিল।

রাত্রি দশটার পর প্রৌঢ় 'হরু সর্দ্দার' আহারাদি করিয়া কাছারী-বাড়ীতে শুইতে আসিল। হরু সর্দ্দার এখন ফৈজুর প্রধান লাঠিয়াল হইয়াছে। অন্য নগদী দুই জন তাহার অধীনে থাকে। হরু সর্দ্দার শুইতে আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল,—তত রাত্রে ফৈজু কাছারীর অন্ধকার রোয়াকে বিমর্ষ—চিন্তাকুল বদনে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছে।

হরু সর্দ্দার নানারূপে ফৈজুর কাছে অনেকবার উপকার পাইয়া বড়ই কৃতজ্ঞ ছিল। তার উপর, ফৈজুর শিষ্ট সদ্ব্যবহারের গুণে,—হরু সর্দ্দার তাহাকে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী বলিয়া যেমনি সম্মান করিত, পুত্রের মতন তেমনি স্নেহও করিত। মূর্খ নিরক্ষর হইলেও লোকটা বয়সে বড়, ফৈজুর চেয়ে 'মানুষ চিনিবার' ক্ষমতা তাহার ঢের বেশী,—সেইজন্য ফৈজু অনেক বিষয়েই সর্দ্দারের পরামর্শ ও মতামত জানিয়া কায করিত;—অধীনস্থ বলিয়া অবজ্ঞা করিত না।

ফৈজুর ব্যবহারের গুণে এই প্রৌঢ়ের মধ্যে এমন একটু অল্প দিনের মধ্যেই জোর জমিয়াছিল, যাহাতে সময়ে-সময়ে সে 'গায়ে পড়িয়াও' তাহার কাছে অনেক বিষয়ের সন্ধান লইত; আজও লইল! ফৈজুর মুখপানে চাহিয়া বিস্ময়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "শ্যামল ঠাকুর বল্লে, তোমার শরীর খারাপ হয়েছে। হাঁ বেটা, এ কি ঠিক খবর?"

ফৈজু দাঁড়াইল। বিবর্ণ মুখে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না সর্দ্দার, আমার মনের ঠিক নাই আজ। বাড়ীতে অসুখের খবর পেয়ে আমার ভারী মন খারাপ হয়ে গেছে।"

কাহার অসুখ, কি অসুখ, কখন সংবাদ আসিল, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জানিয়া সহানুভূতি-করুণ কণ্ঠে সর্দ্দার বলিল, "তাই তো বাবা, তুমি এমন ছট্‌ফট্ করছ,—বিকালে যদি একবার বল্‌তে আমায়, তা'হলে আমি তখুনি গাড়ী এনে তোমায় রওনা করে দিতুম,—এতক্ষণে কত রাস্তা চ'লে যেতে!"

উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল স্বরে ফৈজু বলিল, "সর্দ্দার, আমার মাথার ঠিক ছিল না,—না হলে আমি টাকা নিয়ে তখন যদি পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়তুম, তা হ'লে এই চৌদ্দ ক্রোশ পথ রাতারাতি পার হয়ে যেতুম যে!" একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল, "আমি এখুনি বেরিয়ে পড়তাম সর্দ্দার! কিন্তু সঙ্গে টাকা রয়েছে যে! অন্ততঃ রাত্রের রাস্তাটা পর্য্যন্ত সঙ্গে একজন লোক যদি পাই—"ফৈজু একটু থামিয়া আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে সর্দ্দারের মুখপানে চাহিল!

প্রৌঢ় সর্দ্দারের শরীরের শোণিত আজ শীতল হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু যৌবনের সকল-বাধা-অগ্রাহ্যকারী দৃঢ় উদ্যমের উষ্ণ উত্তেজনা একদিন সে শোণিত-প্রবাহে খর-স্রোতে বহিয়াছিল;—আজ এই উদ্বেগ-বিবর্ণ যুবার মুখপানে চাহিয়া সে কথা সর্দ্দারের মনে পড়িল! মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সর্দ্দার ধীরকণ্ঠে কহিল, "তুমি এখনি বেরিয়ে পড়বে? আচ্ছা চল, আমি হরিদাসকে শুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে, লাঠি-লণ্ঠন নিয়ে তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

ফৈজুর সমস্ত বুকটা উদ্বেগে তোলপাড় হইয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল! নিতান্ত অস্থির চিত্তেই হঠাৎ সে এই দুঃসাহসিক সঙ্কল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছিল! আগু-পিছু

ভাবিয়া দেখিবার সময় পায় নাই। এখন হরু সর্দ্দারকে সহায় পাইয়া সে আর কোন দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতে চাহিল না। ব্যাগের মধ্যে টাকাগুলি গুছাইয়া লইয়া একবস্ত্রে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিল।

শ্যামল ঘুমাইতেছিল, তাহাকে জাগাইল না। কথা স্থির হইল, সর্দ্দার ফৈজুকে কতকদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে। তারপর পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে আগামী কল্য প্রভাতে গোযানে জিনিসপত্র লইয়া শ্যামলকে সঙ্গে করিয়া তেজপুর যাইবে।

শ্যামলের যাহাতে কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, সেজন্য পুনঃপুনঃ হরু সর্দ্দারকে সতর্ক করিয়া ফৈজু দ্রুত চলিল।

———

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বেলা তখন আটটা বাজিয়াছে।

আহ্নিক সারিয়া সুমতি দেবী তখন রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া, এক বোঝা নারিকেল পাতা লইয়া, বঁটিতে চাঁচিয়া, পিসিমার আলোচালের মুড়ির খোলার জন্য কুঁচি তৈয়ারী করিতেছিলেন, এমন সময়ে রুক্ষ-বিশৃঙ্খলতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তির মত—দুশ্চিন্তা-মলিন, অনিদ্রা-শুষ্ক মুখে, অবসাদ-ক্লান্ত চরণে ফৈজু বাড়ী ঢুকিয়া, অভিবাদন করিয়া সামনে দাঁড়াইল। সুমতি দেবী ফৈজুর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমটা অবাক্ হইয়া গেলেন; তার পর সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি কি আমার চিঠি পেয়ে হঠাৎ চলে এলে?"

প্রাণপণ বেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে এতখানি পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া ফৈজুর ঠোঁট দুইটা শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল! অতি কষ্টে ঠোঁট খুলিয়া, নিঃশ্বাস টানিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া, জড়িত স্বরে বলিল, "না,—আজই আমাদের আসবার সব ঠিক ছিল। শ্যামলকে নিয়ে হরুসর্দ্দার আসছে,—আমি শুধু টাকা নিয়ে আগেই চলে এলুম।"

ফৈজুর মুখপানে চাহিয়া সুমতি দেবী ধীরকণ্ঠে বলিলেন "আমার চিঠি পাও নি?"

হাতের ব্যাগটা বারাণ্ডায় রাখিয়া, থামের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া, কপালের ঘাম মুছিতে-মুছিতে ফৈজু বলিল, "পেয়েছি, কাল বিকালে।"

ঈষৎ অনুতপ্ত স্বরে সুমতি দেবী বলিলেন, "তোমরা এত শীগ্রী আস্‌বে জান্‌লে আমি কখনই চিঠি লিখ্‌তাম না। দূরে থেকে অসুখের খবর শুন্‌লে বড় ভয় হয়,—যাক, বাড়ীতে গিয়ে দেখা করে এসেছ?"

নত দৃষ্টিতে চাহিয়াই ফৈজু বলিল, "না, টাকাগুলো এখানে জমা করে দিয়ে যাব বলে, প্রথমেই আপনার কাছে এসেছি।"

স্নেহময় ভর্ৎসনার স্বরে সুমতি দেবী বলিলেন, "সেটা তো পালাচ্ছিল না ফৈজু! কেন এত তাড়া? থাক, ব্যাগ ওইখানেই রেখে যাও,—এরপর এসে তুমি তোমার টাকা নিয়ে বোঝা-পড়া কোরো, এখন বাড়ী যাও।"

ফৈজু মাটীর দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া,—অলক্ষিতে তাহার মুখপানে ব্যথিত-করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সুমতি দেবী স্নেহময় আশ্বাসের স্বরে আবার বলিলেন, "ভাল হয়ে যাবে, ভাবনা কি? ছেলে-মানুষ, অনেক দিন মা-বাপের কাছ-ছাড়া হয়ে রয়েছে, বোধ হয় বেশী মন-টন কেমন কর্‌ত, তাই ভেবে-ভেবে একটা অসুখ বাঁধিয়েছে। বেচারা একটু কাহিল হয়ে পড়েছে, এই যা,—যাই হোক, তুমি এখন বাড়ী যাও।—আমার ভূত কখন আস্‌বে বল দেখি?"

সুমতি দেবীর প্রত্যেক সান্ত্বনা-কোমল কথাটিতে বোধ হইল যেন ফৈজুর বুকের উপর হইতে এক-একখানা ভারী পাথর নামিয়া গেল! এতক্ষণের পর হাল্কা হইয়া সহজ ভাবে একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল, "রাত্রি নটা-দশটার কম আপনার ভূত বোধ হয় এসে পৌঁছুতে পার্‌বে না। গরুর গাড়ীর চলন কি না,—তাহলে আমি এখন আসি।"

সুমতি দেবী বলিলেন, "এস। তুমি কাল কখন বেরিয়েছিলে?"

এ প্রশ্নটার জন্য কাল রাত্রে ফৈজু বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা অনুভব করে নাই; কিন্তু আজ দিনের আলোয় সহসা অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ হইল। ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "রাত্রি দশটার পর।"

সুমতি দেবী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ভারী দুঃসাহসের কাজ হয়েছে! আচ্ছা, এখন যাও।"

প্রস্থানোদ্যত হইয়া ফৈজু সবিনয়ে বলিল, "পিসিমা ওপরে আছেন বোধ হয়, আমার সেলাম দেবেন। একটু পরে আস্‌ছি।"

ব্যস্ত হইয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "এখন তাড়াতাড়ি করে আসবার কিছু দরকার নাই ফৈজু,—এখন আমার সময় নাই, তুমি ও-বেলা এস।"

সুমতি দেবীর এই উক্তিটুকুর মূলে যে কি নিগূঢ় স্নেহ-করুণা সঞ্চিত ছিল, ফৈজু তাহা অন্তরে-অন্তরে অনুভব করিল,—কৃতজ্ঞতাভারে তাহার বেদনা-বিমর্ষ হৃদয়টা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সসম্ভ্রমে নত হইয়া অভিবাদন করিয়া ফৈজু নিঃশব্দে চলিয়া গেল—একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না।

নিজের বাড়ীতে আসিয়া চৌকাট ডিঙাইয়া বাড়ী ঢুকিতে ফৈজুর যেন পা কাঁপিতে লাগিল। এখনই বাড়ী ঢুকিয়া—টিয়ার অসুস্থ মূর্ত্তি চোখে পড়িবে,—বড়ই ভয় হইতে লাগিল। অবসাদে শরীর যেন ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। ক্লান্ত পা-দুখানাকে অতি কষ্টে টানিয়া, দুয়ার ঠেলিয়া বাড়ী ঢুকিতেই, একটী ছোট মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। ফৈজু চিনিল সে নানীর নাৎনী হালিমা। শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "কিরে, বাড়ীর সব ভাল আছে?"

ফৈজু জিজ্ঞাসা করিল তাহাদের—হালিমাদের বাড়ীর কথা; কিন্তু সে উল্টা অর্থ বুঝিয়া—টিয়ার কথা মনে করিয়া, উত্তর দিল, "ভাল আছে,—এখন ঘুমুচ্ছে—ঐ ঘরে।"

এত উৎকণ্ঠার মাঝেও—সরলা বালিকার এই সুমিষ্ট সরলতায় ফৈজু স্নিগ্ধ হইল! একটু হাসিয়া তাহার মাথাটা ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "না রে, না—তোদের বাড়ীর খবর জান্‌তে চাইছি। নানী ভাল আছে? তোমার মা?"

"ভাল আছে সবাই—"

"খলিফা কোথায়?"

"আমায় এখানে বসিয়ে রেখে পুকুরে গেছে। তুমি এখন বাড়ীতে থাকবে ফৈজু দাদা?"

শুষ্ক মুখে আবার একটু হাসি টানিয়া ফৈজু বলিল, "কেন, খেল্‌তে যাবে বুঝি? আচ্ছা যাও।"

মুক্তি পাইয়া,—এক লাফে চৌকাঠ ডিঙ্গাইয়া মেয়েটি দ্রুত অন্তর্ধান করিল। ফৈজু বারেণ্ডার একপাশে জুতা ছাড়িয়া, নিঃশব্দ-পদে ঘরে ঢুকিল।

পাণ্ডু-বিবর্ণ মুখখানির দু'পাশে দু'খানি হাত রাখিয়া, দুয়ারের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া, টিয়া তখন অগাধে ঘুমাইতেছিল। তাহার মুখপানে চাহিয়া ফৈজুর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল! অবসন্নভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া, স্তম্ভিত নিস্পলক নয়নে সে চাহিয়াই রহিল!

দুর্ব্বল রুগ্নের শ্রান্তির নিদ্রা,—অল্পক্ষণেই সে নিদ্রা আপনি ভাঙ্গিয়া গেল। যন্ত্রণা-কাতর অস্ফুট শব্দ করিয়া —অন্যদিকে পাশ ফিরিতে গিয়া সহসা ফৈজুর উপর দৃষ্টি পড়িতেই—সে চমকিয়া উঠিল! বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া থাকিয়া—ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—"তুমি! সরে এস।"

টিয়া নিজের দুর্ব্বল কম্পিত হাতখানি বাড়াইয়া দিল। ফৈজু দু' হাতে সে হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া, পাশে গিয়া বসিল। আভ্যন্তরিক উদ্বেগ-পেষণে তাহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল,—চেষ্টা করিয়াও সে কোন কথা কহিতে পারিল না,—অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল!

বিষণ্ণ মুখে একটু ক্ষীণ হাসিয়া টিয়া বলিল, "রাত্রে জ্বরের যাতনায় ভাল ঘুম হয়নি, এখন তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কখন এসেছ, কিছু টের পাইনি,—কখন এলে?"

কণ্ঠ ঝাড়িয়া ফৈজু বলিল, "এই আস্‌ছি।" তার পর টিয়ার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া, বেদনা-মথিত স্বরে বলিল, "কি এ হয়ে গেছ, বল দেখি?"

স্বামীর মুখপানে চাহিয়া টিয়া একটু হাসিল। তার পর শ্রান্ত ভাবে চোখ মুদিয়া মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া,—স্বভাব-সিদ্ধ পরিহাস-স্নিগ্ধ কণ্ঠে চোক বুজিয়াই উত্তর দিল, "এই ঠিক হয়েছে, না? ভাল থাক্‌লে মোটেই তোয়াক্কা রাখ না, চোক বুজে এড়িয়ে চল'তো,—তার চেয়ে মাঝে-মাঝে অসুখ হ'লে একটু-একটু ভাবনা-চিন্তে মনে পড়বে, সেই ভাল।"

এই ন্যায্য-প্রাপ্য অনুযোগের আঘাতটুকুর জন্য ফৈজু অনেক দিন হইতেই মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু আজ এই অপ্রত্যাশিত দুঃখ-দুর্য্যোগের মাঝে এ আঘাত পাইয়া সহসা তাহার আশাতীত আনন্দবোধ হইল। টিয়া যে এমন করিয়া কথা কহিতে পারিবে, তাহা তো সে আশাই করে নাই! বুকভরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া

হাসিমুখে বলিল, "বল, বল, বলে নাও! যা মনে পড়ে, যা মুখে আসে, সব বল,—আমার তো কসুর হয়েই আছে; তুমিই বা মাপ্ করে চল্‌বে কেন? বল, আর কি বল্‌বে?"

সকরুণ ভাবে হাসিয়া টিয়া বলিল, "বল্‌বার এখন অনেক-কিছুই আছে, কিন্তু কি কর্‌বো বল, কথা কইতে ভারি কষ্ট হচ্ছে, কিছুই বল্‌তে পারছি না। খোদা আমায় মেরে রেখেছেন, তোমারি এখন সুবিধা! যাও, ওঠো এখন, হাত-মুখে জল দাও, তোমায় ভারী শুক্‌নো দেখাচ্ছে —চেহারা এমন কালি মেরে গেছে কেন বল দেখি?"

ফৈজু একটু হাসিয়া বলিল, "আমার খুসী"!"

স্বামীর হাঁটুতে মৃদু আঘাত করিয়া টিয়া হাসিমুখে বলিল, "আমার ওপর রাগ করে চুটিয়ে শোধ নেবার চেষ্টা বুঝি?—"কথাটা বলিতে-বলিতে, সহসা হাঁপাইয়া, নিঃশ্বাস টানিয়া, ব্যগ্র ভাবে ফৈজুর হাত দুইটা নিকটে টানিয়া লইয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "আমায় এবার তুমি বড্ড ভাবিয়েছ,—বড্ড বেশী! দেড় মাসের নাম করে গিয়ে তুমি—উঃ! শেষ ক'-দিন বড্ড বেশী রকম মন খারাপ হয়েই, বোধ হয় এই অসুখটা ধরে গেল; রাত্রে ঘুমুতে পারতুম্ না, আমার এত ভাবনা হোত—"কথা কয়টা বলিয়াই, হঠাৎ অপ্রস্তুত ভাবে থামিয়া, একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি ওঠো, আর বেশী কথা শুন্‌লেই তোমার রাগ হবে। যাও, হাত-মুখ ধোওগে।"

"যাচ্ছি—"বলিয়া ফৈজু বিমর্ষভাবে অন্য দিকে চাহিয়া খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। তার পরে মৃদুস্বরে বলিল, "শুধু জর? না আর কিছু উপসর্গ আছে? ক'দিন থেকে এ রকম হয়েছে?—"

ব্যস্ত চঞ্চল হইয়া টিয়া বলিল, "তুমি উঠে যাও এখন, ডাক্তার আস্‌বার সময় হয়েছে।"

ফৈজু বলিল, "কোন্ ডাক্তার দেখ্‌ছে?"

টিয়া পাশের গ্রামের একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ডাক্তারের নামোল্লেখ করিল। পরক্ষণেই উৎকর্ণ হইয়া বাহিরের দিকে কাণ পাতিয়া—সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "ঐ ওঁরা এসেছেন,—তুমি উঠে যাও।"

ফৈজু উঠিতে যাইতেছিল, টিয়া বাধা দিয়া বলিল, "দাঁড়াও, আমাকে একটুখানি ধরে বসিয়ে দাও তো!"

ইতস্ততঃ করিয়া ফৈজু বলিল, "কেন কষ্ট পাবে? শুয়েই থাক না, আমি না হয় চলে যাচ্ছি।" ব্যগ্র-মিনতির স্বরে টিয়া বলিল "না—না, তোমায় যেতে হবে না, তুমি আমায় বসিয়ে দাও।"

বেশী বাদানুবাদের সময় ছিল না,—বোধ হয় শক্তিও ছিল না। ফৈজু হেঁট হইয়া সযত্নে স্ত্রীকে তুলিয়া বসাইল। গভীর ক্লান্তি-দৌর্ব্বল্যের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, স্বামীর বিষণ্ণ মুখ-পানে চাহিয়া, একটু সহজ ভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া টিয়া বলিল "রোগে মানুষকে কি জব্দই করে! নিজের হাত-পায়ের জোর শুদ্ধ বেদখল!—"

এতক্ষণ যে মনস্তাপ-পীড়নটা ফৈজু মনে-মনেই গোপন-অনুশোচনায় ভোগ করিতেছিল, এবার আর সেটা চাপিয়া রাখিতে পারিল না! উগ্র ক্ষোভে অধীর হইয়া অকস্মাৎ তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমারই আহাম্মকী! কি যে কুবুদ্ধি হোল,—কেনই যে অত জেদ্ করে তোমায় থাক্‌তে বলে গেলুম,—এম্নি আপ্‌শোষ্ হচ্ছে আজ আমার—"

ব্যাকুল ভাবে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া, অনুনয়-কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া, কম্পিত স্বরে টিয়া বলিল, "না—না, তুমি তা মনে কোর না; তুমি নিজের ঘাড়ে সব দোষ টেনে নিও না। আমি তো নিজেই ইচ্ছা করে ছিলুম,—" তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। একটু থামিয়া, আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া, দৃষ্টি নামাইয়া—মৃদু স্বরে বলিল—"অসুখ যখন হবার হয়, আপনিই হয়,—কারুর দোষ নাই, ও সব খোদার মর্জ্জি!"

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এ কথাটা কাহারো মুখে শুনিলে, ফৈজু সরল চিত্তে, অকপট শ্রদ্ধায় মানিয়া লইতে পারিত; কিন্তু আজ পারিল না। সংসারের সহিত ইতিমধ্যে যেটুকু পরিচয় হইয়াছে, সেইটুকুর মধ্যেই—নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে অনেকগুলা শক্ত ঘা খাইয়া, অনেক রকম দেখিয়া, শুনিয়া—আজ তাহার আহত মনের মধ্যে কঠিন সত্যের তীব্র অভিজ্ঞতা জাজ্বল্যমান!—অপর-সাধারণের মত আজ সে নিজের মূর্খতা-সৃষ্ট দুঃখকে 'খোদার মর্জ্জির' ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিজেকে নিষ্কৃতি দিতে কিছুতেই রাজী হইল না। ভিতরে-ভিতরে নিজেকে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনায় পীড়িত করিবার জন্য ফৈজুর সমস্ত হৃদয় উগ্র-বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কতকগুলা উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার বিপর্য্যয় আলোড়নে মস্তিষ্ক

যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। অধীর ভাবে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্খলিত চরণে সে বাহিরে চলিয়া আসিল।

চিকিৎসককে লইয়া পিতা তখন বারেণ্ডায় ঢুকিতেছিলেন,—ফৈজু নতশিরে অভিবাদন করিল। পিতা সবিস্ময়ে বলিলেন "একি? কতক্ষণ?"—পরক্ষণেই গভীর স্নেহে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া, ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন, "এমন শুকিয়ে গেছিস কেন বাপ্?"

ফৈজু অস্ফুট স্বরে কি একটা কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিল,—পিতার কাণে তাহা ঢুকিল না। বৃদ্ধ চিকিৎসক মহাশয় ততক্ষণে অগ্রসর হইয়া, সস্মিত মুখে বলিলেন,—"এই ছেলে? বেশ,—বেশ! কি গো বাবা, বৌমা এখন কেমন আছেন?"

ফৈজু কি যে উত্তর দিবে, কিছু খুঁজিয়া পাইল না। মাথা হেঁট করিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল। পিতা পুত্রকে চিনিতেন,—কাজেই পুত্রের পরিবর্ত্তে তিনিই উত্তর দিলেন; বলিলেন, "আপনিই দেখবেন আসুন।"

চিকিৎসক মহাশয় প্রবীণ বিজ্ঞ হইলেও, বিজ্ঞতার দম্ভে পেচক-লাঞ্ছিত গাম্ভীর্য্য-আড়ম্বরের বিরাট্ মহিমা তাঁহার মুখে-চোখে, চাল-চলনে আদৌ প্রকাশ পাইত না। মানুষটিকে দেখিলেই বেশ অমায়িক স্নেহশীল প্রকৃতির বলিয়া বুঝা যাইত। ফৈজুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষক্ষেপ করিয়া, চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়া—যেন আপন মনেই, সমবেদনাপূর্ণ স্বরে তিনি বলিলেন, "এই সব ছেলেমানুষ,—অল্প বয়েসে বিয়ে, অল্প বয়সে ছেলে মেয়ের বাপ-মা হওয়া—রোগ-দুঃখের ভাবনা-চিন্তায় বেচারীরা কি ঝঞ্ঝাটই ভোগ করে!"—তার পর ফৈজুর পিতার দিকে চাহিয়া দুঃখ-ব্যথিত তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "তুমি নাতীর প্রাণের জন্য ব্যস্ত হচ্ছ সর্দ্দার! কিন্তু নিজের ছেলের মুখপানে একবার চেয়ে দেখো দেখি!"

ফৈজুর পিতা নিজের নসীবের উপর সমস্ত দুঃখের কারণ চাপাইয়া বিষণ্ণ ভাবে কৈফিয়ৎ দিলেন যে, দেশ শুদ্ধ সকল ঘরেই বাল্যবিবাহ চলিতেছে,—ফৈজুর মত বয়সের সকল লোকই দুই, চার বা ততোঽধিক সন্তানের পিতা হইতেছে,—ঘরে ঘরে সে নজীরের প্রাচুর্য্য যথেষ্ট; শুধু তাঁহারই দুর্ভাগ্য বশে,—তাঁহার, সন্তান-সম্ভাবিতা পুত্রবধূর প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে,—এ শুধু তাঁহারই ভাগ্যের দোষ!

বিষয়টা লইয়া দুই বৃদ্ধে আর বেশী কিছু আলোচনা করিলেন না;—অন্য প্রসঙ্গ পাড়িয়া, কথা কহিতে কহিতে ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। ফৈজু দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া, পাংশু-বিবর্ণ মুখে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাথা হইতে ঘাম ঝরিয়া টস্ টস করিয়া পায়ের উপর পড়িতে লাগিল।

প্রভুর দান

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

একদা ভুবন-জনবাসিগণে শুধালেন ভগবান,
কাম্য সবার কহ মোরে আজ, সিদ্ধি করিব দান।
নৃপতি চাহিল—ধন সম্পদ, রাজ্য শান্তিময়,
শত্রু নাশিতে অপার শক্তি, অজেয় সৈন্যচয়।
রাখাল বালক যাচে ধেনু সব স্তন্য-সুধায় ভরা,
রমণী চাহিল রূপ-যৌবন, কৃষক ধানের ছড়া।
সবার বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া উঠে যবে ভগবান,
হেন কালে কবি আসে সভা-মাঝে গাহি হরি-গুণ-গান।
প্রভু কহে—সব দেওয়া হল, এবে কি দিব তোমায় কবি,
ওহে ধরণীর কৌস্তুভ মণি—ওহে পুণ্যের ছবি!
ললিত বচনে নিবেদিল কবি—'হে মোর দয়াল প্রভু,
দাও মোরে, যাহা কালের চক্রে ধ্বংস হবে না কভু।'
"তাই হোক্ কবি, অক্ষয় প্রেম লও হে হৃদয়-ভরি,
বিশ্বের মহাবান্ধব হও, দুখ্ তার দূর করি।
পঙ্কের মাঝে পঙ্কজ তুমি, উজ্জ্বল ধ্রুবকান্তি,
তুমি রবে যেথা, বিরাজিবে সেথা অমরার মহা শান্তি।
ধরণীর বুকে নন্দন রচি নন্দিত কর সবে,—
তোমার চিত্ত-শতদল-মাঝে আমার আসন হবে।"

মেকি টাকা

[শ্রীসুশীলকুমার রায়]

"আর ত শরীর বয় না।"

যামিনী একখানি চেয়ার টানিয়া ধপাস্ করিয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িল।

কিরণশশী তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা ও কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া টেবিলের উপর রাখিতেই, যামিনী লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "ইস্! এত মিষ্টি, আবার চা! তাই ত বলি, এত খরচ হয় কেন! আমি সমস্তদিন আফিসে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটে যা উপার্জ্জন ক'রব, তুমি তা এই রকম বাজে খরচে উড়িয়ে দেবে?"

"আজকে একটু সকাল-সকাল এসেছ, তাই তোমায় জলখাবার দিতে গেলাম। আজকের দিনটা খেয়ে নাও, আর দেবো না।"

যামিনী চায়ের পেয়ালাটা একটু দূরে সরাইয়া দিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, "এই খরচের ভয়ে আমি জলখাবারের পাট একরকম উঠিয়ে দিয়েছি। আফিস থেকে এসে দুখানা যা পারি খেয়ে নিই। এ চায়ের নেশা বোধ হয় যতীনের আর তোমার। কালে-কালে কতই হবে। আমাদের সময়ে চা কি জিনিস, জানতুমই না।"

কিরণ এইবার একটু রাগত স্বরে বলিল, "তুমি না কেমাল অফিসের বড় বাবু? একবাটী চা খেলেই কি তোমার যত টাকা খরচ হ'য়ে যাবে?"

"এখন আর সে দিন নেই গিন্নী,—আর সে দিন নেই। দেখ্‌লে ত, সেদিন সেই হাজারীমল বেটা যাট্‌টা মেকি টাকা (base coin) পকেটে ফেলে দিয়ে কার্য্যোদ্ধার ক'রে চলে গেল। বেটাকে এখন হাতে পেলে একবার দেখে নিই।"

সে টাকা ত তোমার আর ঘরে পচেনি,—ডাক্তারের, ভিজিটে আর রমেনের দক্ষিণেয় তা প্রায় সাবাড় ক'রে এনেছ। আমারও মুখে আগুন, তাই তোমার পয়সায় আবার বার-বেরৃতো ক'রতে যাই।"

"কোত্থেকে করি বল। তোমার ত' বার মাসে তের পার্ব্বণ লেগেই আছে। রমেন ছেলে ভাল,—যা দিই তাতেই সন্তুষ্ট। পেশাদার ভট্‌চায্যি হ'লে ফর্দ্দের চোটে অস্থির ক'রতো। আর যতীন ছেলেটা,—ওর জ্বালায় অস্থির,—শরীরটা যেন অসুখের বাসা। আশু ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিটা ওর পেটের ভেতর পূরতে হ'চ্চে। এইবার একটা বিয়ে দিয়ে দেখি, যদি ছেলেটার ফাঁড়া, আপদগুলো কেটে যায়।"

"বলি বক্তৃতা সাঙ্গ হ'ল? এদিকে চা যে ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। আজ গলায় কাপড় দিয়ে ঘাট মানছি, এমন বেয়াদবী আর হবে না।"

অগত্যা যামিনী কিছু মিষ্টান্ন উদরস্থ করিয়া, এক চুমুকে চাটুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

২

"কেন বাবা অমন করছিস্, মাথার যন্ত্রণা কি বড্ড বেশী হ'চ্চে?" কিরণ ধীরে-ধীরে ছেলের শিয়রে বসিয়া পড়িল।

মায়ের হাতখানি উত্তপ্ত কপালের উপর টানিয়া আনিয়া যতীন বলিল, "আর যে যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে পারি না মা! এক-একবার মনে হয়,—এ দুঃসহ জীবনটাকে—"

মাতা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "ছি বাবা, অমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে! আমি এখনি রমেনকে ডেকে পাঠাচ্ছি।"

কিরণ বাহিরে গিয়া ভৃত্যকে ডাক্তারের নিকটে পাঠাইয়া দিল, ও রমেনবাবুকে শীঘ্র ডাকিয়া আনিতে বলিল।

যতীনের মাথার যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। কিরণ ক্রমাগত মাথায় জলপটি বদলাইয়া নীরবে বাতাস করিতেছিল।

রমেন ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "কি রে যতীন, আবার অসুখে পড়েছিস্! ভাল হ'লে ত' আর কিছু মনে থাকে না।" তাহার পর সে পকেট হইতে একটা অডিকোলনের শিশি বাহির করিয়া খানিকটা একটা বাটিতে ঢালিয়া দিল। পূর্ব্বোক্ত পটিটি তাহাতে ভিজাইয়া কপালে বসাইয়া দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

কিরণ তাড়াতাড়ি এক থাল মিষ্টি ও এক গ্লাস জল আনিয়া বলিল, "নাও ত' বাবা, একটু মিষ্টি খেয়ে জল খাও। আফিসের কাপড়টা পর্য্যন্ত ছাড়নি,—অমনি ছুটে এসেছ। আচ্ছা চাকরী হ'য়েছে।"

রমেন বলিল, "আপনি কেন ব্যস্ত হ'চ্ছেন? আমার এখন জল-খাওয়াটা কি বেশী দরকারী হ'ল?"

"আমি ওঁর সঙ্গে অনেক দেশ ঘুরেছি,—কিন্তু তোমার মত এমন পরোপকারী ছেলে দেখিনি। তুমি আফিসে যাচ্ছ, রোগীর সেবা কচ্ছ, সভা-সমিতিতে যোগ দিচ্ছ, আবার সময় বিশেষে পুরুত ঠাকুর সাজো। এত কাজের ভেতরেও তোমার মুখে সর্ব্বদাই হাসি লেগে আছে।"

রমেন ধীরে-ধীরে মাথার পটিটি বদ্‌লাইয়া দিয়া, জল-যোগ করিতে-করিতে বলিল, 'এখনও' ত' আশু ডাক্তার এলো না। পাঁচটা বেজে গেছে, যামিনী বাবুরও আসবার সময় হ'ল।"

কিরণ রেকাব ও গেলাসটি লইয়া চলিয়া গেল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, "বাবু ও ডাক্তার দুজনেই এসেছেন।" রমেন তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া আশু ডাক্তারকে লইয়া আসিল।

যতীনের মাথার যন্ত্রণা তখন অনেকটা উপশমিত হইয়াছে। রমেন আশু ডাক্তারের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, 'আজ জোড়ে এলে কি রকম?" ঔষধের বাক্স খুলিতে-খুলিতে আশু বলিল, "আমি গাড়ীতে আসছিলাম,—দেখ্‌লাম উনি হেঁটে আসছেন;—তাই তুলে নিলাম।"

ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দুজনেই উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় যামিনী আসিয়া বলিল, "ওহে রমেন, কাল সকালে একবার এসে পাঁজিটা দেখে দিও ত'—ফাল্গুন মাসে কটা বিয়ের দিন আছে;—আর একটা ফর্দ্দও ক'রে দিও। আশুবাবু, আপনার অনুগ্রহের সীমা নেই। ছেলেটাকে কেমন দেখলেন? মনে ক'রছি, আসছে মাসেই ওর বিয়েটা দিয়ে দিই। বুড়ো বয়েসে আর কদিকেই বা ভাবি। রমেন, আমার কথা যেন মনে থাকে বাবা,—আর সময় নেই,—দিল্লীতে তোমরাই আমার বল-ভরসা।"

আশু ও রমেন দুজনেই আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। যামিনী আশু ডাক্তারের পকেটে একটা কাগজের মোড়ক রাখিয়া দিল।

গাড়ী গন্ধনালার দিকে ছুটিয়া চলিল।—আশু ডাক্তার তাহার পকেট হইতে কাগজের মোড়কটি বাহির করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। রমেন বলিল, "কি দেখ্‌ছেন? ও-সব যামিনীবাবুর পেটেণ্ট টাকা বোধ হয়।"

"তাই ত দেখছি। এতগুলো base coin ও জোটালে কোত্থেকে হে! আমার কাছে ত,'—এইগুলো নিয়ে, প্রায় চুয়াল্লিশ টাকা জমলো।"

"ওকি বল্‌ছেন, আমার কাছেও প্রায় দশ বার টাকা জমেছে। সে দিন একটা ব্রত-প্রতিষ্ঠায়, ওর বাড়ী সমস্তদিন আগুন-তাতে খাট্‌লুম,—দিলে ত' দুটাকা দক্ষিণা, তাও পেটেণ্ট টাকা। এদিকে কিন্তু ব্রত পূজাগুলি কিন্তু সব ঠিক-ঠিক করা চাই।"

"তা ঠিক ক'রেছে। আপনাদের শাস্ত্রেই ত কাণা গরু বামুনকে দান ক'রতে লিখ্‌ছে না? আমি ত বৈদ্য,—আমায় কেন দিচ্ছে বুঝতে পারছি না।"

৩

রমেনের বাড়ীতে প্রত্যহ সকালে একটা ছোটরকম মজলিস্ বসিয়া থাকে। আজ রবিবার, সকালে আশু ডাক্তার, মধু মাষ্টার, নৃপেন প্রভৃতি সকলেই জুটিয়া চা পান ও গল্প-গুজবে আসরটা বেশ সরগরম করিয়া তুলিয়াছে।

নৃপেন চায়ের পেয়ালাটি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, —ওহে, যামিনী বাবুর ছেলের যে আজ বৌভাত। আপনাদের সকলের নেমন্তন্ন হ'য়েছে ত'?"

বসন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "আঃ! তোমার কি অন্য কোনও কথা ছিল না। সকাল বেলাই ঐ নামটা ক'রলে!"

রমেশ টেবিলের উপর চুরুটের ডিস্‌টা রাখিতে-রাখিতে বলিল—"বড় ঘটা হে, বড় ঘটা। এ পাড়াটা সব নেমন্তন্ন ক'রেছে—প্রায় ষাট্-সোত্তর জন লোক খাবে।"

মধু মাষ্টার খবরের কাগজটা মুখের উপর হইতে নামাইয়া, রমেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"বল কি হে! একেবারে ষাট্-সোত্তর!"

রমেন হাসিতে-হাসিতে বলিল,—"খরচ কি ঘর থেকে হবে,— ওসব বৌ-দেখানির টাকাতেই উসুল হ'য়ে আসবে। যামিনীবাবু আমাদের হিসেবে ঠিক আছেন।"

আশু ডাক্তার এতক্ষণ নীরবে কি ভাবিতেছিল ; এইবার গম্ভীর ভাবে বলিল,—"দেখুন, আমি ভদ্রলোককে একটু জব্দ ক'রতে চাই ;— আপনারা সকলে যদি একমত হন।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"কি রকম ?"

আশু ডাক্তার তখন তাঁহার মতলবটা সকলকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল। মধু মাষ্টার হাসিতে-হাসিতে বলিল,—"আপনার এমন বুদ্ধি! আপনি উকীল না হ'য়ে ডাক্তার হ'লেন কেন!"

নৃপেন উৎসাহের সহিত বলিল, "সেই কথাই ঠিক। রমেনবাবু আপনি পাড়ার সকলকে ব'লে দিন যে, আজ বিকালে ক্লাবে সকলে জমায়েত হ'য়ে, সেখান থেকে একত্র নিমন্ত্রণে যাওয়া যাবে। আপনারা কি বলেন ?"

সকলে উৎসাহের সহিত বলিল "বেশ কথা।"

৪

যামিনী আজ বড় ব্যস্ত। একখানি আট-হস্ত পরিমাণ কাপড় পরিধানে ও গামছা-কাঁধে গৃহকর্তারূপে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যতীনের কোনই উৎসাহ ছিল না,—সে বৈঠকখানায় একলাটি চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

রাত্রি নয়টার পর সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, যামিনী অতি সমাদরে সকলকে পরিতোষরূপে আহার করাইল।

আহারাদির পর সকলে বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া গল্প-গুজবে পুনরায় আসর সরগরম করিয়া তুলিল। ক্রমে অধিক রাত্রি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রমেন বলিল,—"ওহে, রাত অনেক হ'ল, ওঠা যাক্,—কাল আবার আফিস আছে ত'।"

সকলে একবাক্যে রমেনের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিল।

যামিনী তাহার চাকরকে ডাকিয়া বলিল "ওরে হ'রে, সিঁড়িতে একটা আলো দিয়ে যারে,— এঁরা সব বৌ দেখ্‌তে যাবেন।"

আশু ডাক্তার সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে হাসিতে-হাসিতে বলিল,—"কি বাবা, বৌভাতে এসে বৌএর মুখ না দেখে পালাবার চেষ্টা! আমাদের যামিনীবাবুর কাছে সেটি হবার যো নেই।"

নৃপেন বলিল "বিলক্ষণ, তাও কি হয়। চল হে সব, বৌ দেখে আসা যাক।"

* * * * *

"কত টাকা হ'ল ?" যামিনী ঔৎসুক্যপূর্ণ নেত্রে তাহার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল।

"অনেক টাকা হ'য়েছে। এই নাও, যত্ন ক'রে তুলে রাখ"। কিরণ টাকাগুলি মেঝের উপর ঢালিয়া দিল।

"এ কি! অতগুলো টাকা একত্র মেঝের ওপর প'ড়ল, তবু একটা কন্‌কনে আওয়াজ হ'ল না কেন?" বলিয়া যামিনী ব্যগ্র ভাবে টাকাগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল।

কিরণ হাত-মুখ নাড়িয়া শ্লেষপূর্ণস্বরে বলিল—"তোমার টাকা তোমাকেই ফেরত দিয়ে গেছে। ঠিক হয়েছে,— শঠে শাঠ্যং শাস্ত্রের বচন—বুঝলে!"

পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি

পরগণা ও প্রদেশের কর্ম্মচারী এবং দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের পাওনা

[অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম্-এ, পি-আর-এস্]

পাটীলের ন্যায় দেশমুখের আয়ও নিতান্ত মন্দ ছিল না। এল্ফিন্‌ষ্টোন্ বলেন, যে দেশমুখ আদায়ী রাজস্বের শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইতেন। তাঁহার ইনামের পরিমাণও নেহাৎ কম ছিল না; প্রত্যেক ১০০ বিঘার মধ্যে ৫ বিঘা তিনি ইনাম পাইতেন। এতদ্ব্যতীত পাটীলের মত তাঁহারও তৈলিকের নিকট হইতে তেল, চর্ম্মকারের নিকট হইতে জুতা, মুদীর নিকট হইতে সুপারী, বারুইয়ের দোকান হইতে পান প্রভৃতি পাওনা ছিল। এল্ফিন্‌ষ্টোনের মতে ইনাম জমি বা পৈত্রিক পদ অথবা তৎসংক্রান্ত বৃত্তি বিক্রয় বা দানের অথবা বন্ধক রাখিবার ক্ষমতা দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেদিগের ছিল না। বিক্রয় বা বন্ধকের কথা বলিতে পারি না;—কিন্তু কখন-কখনও দেশমুখ যে তাঁহার বৃত্তি অন্য প্রকারে হস্তান্তরিত করিতে পারিতেন, তাহার একটী প্রমাণ আছে। এই প্রমাণ একখানি 'বকশিসনামা'। এই প্রাচীন দলিলখানি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে তৎসম্পাদিত মারাঠা ইতিহাসের উপাদানের দশম খণ্ডে মুদ্রিত করিয়াছেন। (রাজবাড়ে মারঠাঞ্চা ইতিহাসাঞ্চি সাধনেঁ, ১০ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এই দলিলে দেখা যায় দেশমুখ গ্রাম-প্রতি ২৲ মাত্র পাইতেন। এই দলীলখানি হইতে দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের মান পান ও হক্কের একটী সাধারণ তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

১। গ্রাম-প্রতি দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের পুরাতন পাওনা; তন্মধ্যে দেশমুখ ২৲ ও দেশপাণ্ডে ১৲ পাইবেন।

২। সরকারী শিরোপা প্রথমে দেশমুখ ও তৎপরে দেশপাণ্ডে পাইবেন।

৩। 'বতন' সম্বন্ধীয় যাবতীয় দলীলপত্রে দেশমুখ নাম সহি করিবেন ও তাঁহার স্বাক্ষরের পার্শ্বে দেশপাণ্ডের সহি থাকিবে।

৪। সরকারী কর্ম্মচারীকে প্রথমে দেশমুখ ও তৎপরে দেশপাণ্ডে ভেট দিবেন।

৫। সরকারের নিকট ও অন্যান্য লোকের নিকট হইতে পান প্রথমে দেশমুখ ও তৎপশ্চাতে দেশপাণ্ডে গ্রহণ করিবেন।

৬। দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে বতনের অন্যান্য যাবতীয় মান পান প্রথমে দেশমুখ ও তৎপরে দেশপাণ্ডে পাইবেন।

৭। দেশমুখ বাসগ্রামে একখানি আবাস-বাটী নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড নিষ্কর জমি পাইবেন।

৮। আবাস-পল্লীর ও স্বীয় এলাকার সমস্ত গ্রাম্য বাজার হইতে শাক-সব্জী পাইবেন।

৯। দেশমুখ 'জিরাইত' ও 'বাগাইত' উভয় শ্রেণীর ইনাম জমি ভোগ করিবেন। (যে সকল জমিতে কেবল শস্য উৎপন্ন হইত তাহাকে 'জিরাইত' ও বাগান করিবার উপযোগী জমিকে 'বাগাইত' জমি বলে।)

১০। উৎসবের সময়ে প্রত্যেক গ্রামের মহারগণের নিকট হইতে জ্বালানি কাঠ দেশমুখের প্রাচীন পাওনা।

১১। সংক্রান্তির সময়ে তিল ও প্রত্যেক শ্রাদ্ধে ঘৃত দেশমুখ প্রত্যেক গ্রাম হইতে পাইবেন।

১২। পরগণার কার্য্যের জন্য দেশমুখ ও তাঁহার প্রতিনিধি দুইটী করিয়া ভেট পাঠাইবেন।

১৩। প্রত্যেক গ্রামের ধাঙ্গরগণের নিকট হইতে বার্ষিক একখানি কম্বল দেশমুখের পাওনা।

১৪। প্রত্যেক গ্রামের চর্ম্মকারগণের নিকট হইতে বার্ষিক একযোড়া জুতা দেশমুখের পাওনা।

১৫। 'সাবান' নামক ট্যাক্স প্রত্যেক গ্রাম হইতে দেশমুখ আদায় করিবেন।

১৬। শাহ দবলের মসজিদের ভৃত্যগণ বার্ষিক ৩৲

হিসাবে 'তবরুকা' দিয়া থাকে। তন্মধ্যে ২৲ দেশমুখের ও ১৲ দেশপাণ্ডের প্রাপ্য।

১৭। প্রত্যেক গ্রামের দেয় খোরাকির ('ভাকরি বাবদ এবজ') টাকা দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে সমানভাবে ভাগ করিয়া লইবেন।

১৮। কলাবন্ত, থের, গেরীপদিগকে (গীত বাদ্য করা ইঁহাদিগের কৌলিক বৃত্তি) প্রথমে দেশমুখ ও তৎপরে দেশপাণ্ডে পারিতোষিক দিবেন।

১৯। অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যের নিমিত্ত প্রাপ্য নানাবিধ পারিশ্রমিকের ⅓ দেশপাণ্ডে ও দুই-তৃতীয়াংশ দেশমুখ পাইবেন।

২০। পরগণার কার্য্যসম্পর্কে সরকারে দেয় মধ্যে দেশমুখ দুই-তৃতীয়াংশ ও দেশপাণ্ডে এক তৃতীয়াংশ বহন করিবেন।

এই তালিকায় দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের প্রধান প্রধান পাওনাগুলির উল্লেখ আছে; ছোট ছোট পাওনাগুলি অনাবশ্যক বোধে উল্লেখ করা হয় নাই সুতরাং এই একখানি মাত্র দলিলের সাহায্যে সমস্ত পাওনার একখানি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় নাই। তবে মোটের উপর এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের 'বতন বৃত্তিও' পাটীল ও কুলকর্ণীর বতন বৃত্তির অনুরূপ। পাটীল্ ও কুলকর্ণী যেমন গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে পারিশ্রমিক পাইতেন, সেইরূপ দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেগণের পারিশ্রমিক দিতেন তাঁহাদের নিজ নিজ পরগণার অধিবাসিবর্গ,—পেশবা-সরকার হইতে কোনও প্রকারের বেতন তাঁহারা পাইতেন না। সুতরাং পরগণার লোকের স্বার্থের সহিত তাঁহাদের স্বার্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

মহারাষ্ট্রে রমণীগণ প্রয়োজন হইলে কখন-কখনও যুদ্ধক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইতেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহাদের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। প্রথম রাজারামের বিধবা তারাবাই পেশবাদিগের ক্ষমতার উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। উমাবাই দাগড়ে ও অহল্যাবাই হোলকার এক-একটী রাজখণ্ডের শাসন-কার্য্য কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা দাদার পত্নী আনন্দীবাই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের জন্য ইতিহাসে চিরস্থায়ী অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেশপাণ্ডের কায স্ত্রীলোকের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া সেকালের মারাঠা পল্লীবৃদ্ধেরা সমীচীন মনে করিতেন না। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সরকার পুরন্দরের একটী পঞ্চায়েতে স্থির হয় যে, "ভবিষ্যতে দেশপাণ্ডে বতন আর কখনও স্ত্রীলোকের নামে রাখা হইবে না।" *

কামাবিসদার ও মামলতদার।

নিজামশাহী ও আদিলশাহী সুলতানদিগের রাজত্বকালে শাসন-সৌকার্য্যার্থ সমগ্র মহারাষ্ট্র অন্যান্য মুসলমান-শাসিত প্রদেশের ন্যায় কতকগুলি পরগণা, সরকার ও সুভায় বিভক্ত হয়। শিবাজী এই বিভাগের একটু পরিবর্ত্তন রেন। তাঁহার সময়কার ক্ষুদ্রতম বিভাগ গ্রাম বা

* ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ত্র্যম্বকজী হরি দেশপাণ্ডের বিধবা গিরমাবাই অভিযোগ করেন যে, তাঁহাদের পরিবারে চারি পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত কাহারও ঔরস পুত্র না থাকায়, বিধবারা দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া তাহার নামে বতনের কাজ চালাইয়া আসিতেছে। এই পারিবারিক প্রথা অনুসারে তিনিও দত্তক গ্রহণ করেন, এবং তাহার পুত্র তাঁহাদের উভয়ের নামে কাজ চালাইতে অঙ্গীকার করে কিন্তু কিছুকাল পরে বতনের কাজ হইতে তাঁহার নাম তুলিয়া দেয়। ইহার কিছু দিন পরে তাহার দত্তক পুত্র ভগবন্তরাও একটী ... বৎসরের নাবালক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ভগবন্তরাওয়ের মৃত্যুর পরে বালকের কর্ম্মচারীরা গিরমাবাইয়ের অধিকার অগ্রাহ্য করিতেছে অতএব পারিবারিক বতনে তাঁহার ও নাবালকের ... সমান অধিকার সরকার হইতে বাহাল করা হউক। গিরমাবাইর আবেদন গৃহীত হইল, কিন্তু ইহাতে বতনের কাযে নানাপ্রকার গোলযোগ আরম্ভ হইল। সুতরাং নাবালক অমৃতরাও আবার পেশবা সরকারের দ্বারস্থ হইলেন, তিনি আবেদন করিলেন যে, বতনের কাজের একটা পাকা বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। গিরমাবাইর দাবী গৃহীত হইলে, ভবিষ্যতে তাঁহার মৃত্যুর পরে অমৃতরাওয়ের বিমাতাও ঐরূপ দাবী করিতে পারেন, অতএব ঐ প্রশ্নেরও চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার একটী পঞ্চায়েতের উপর অর্পিত হয়। পঞ্চায়েতের বিচারে স্থির হয় যে, বতন সম্পর্কীয় কাগজপত্রে গিরিমাবাইয়ের নাম থাকিবে, কিন্তু বতনের কোন কাযে হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে না। তাঁহার মৃত্যুর পর অন্য কোন রমণী এই প্রকার অধিকারের দাবী করিতে পারিবেন না। "তিচে নাঁব তী জিবংত আহে তে পর্য্যন্ত দস্তরাত চলেবাবে। পুঢ়ে বায় কাঁচী নাচেঁ দস্তরাঁত চালবি নয়ে।"

মৌজা; কয়েকটি মৌজার সমবায়ের নাম তরফ; এবং কয়েকটি তরফ লইয়া একটী সুভা গঠিত হইত। মৌজার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে হবীলদার আর সুভার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে সুভেদার বা মুখ্য দেশাধিকারী বলা হইত। পেশবা-যুগে পরগণা, তরফ, মৌজা, সুভা, সরকার প্রভৃতি সকল নামগুলিরই প্রচলন ছিল; এবং দলিল-পত্রে এই সকল শব্দই ব্যবহৃত হইত; কিন্তু তাহাদের অর্থগত প্রভেদ এই সময়ে একপ্রকার লোপ পাইয়াছিল। তবে সাধারণতঃ পেশবাদিগের কাগজ-পত্রে সুভার পরিবর্ত্তে 'প্রান্ত' এবং তরফ ও পরগণার পরিবর্ত্তে 'মহাল' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট-ছোট মহালের প্রধান কর্ম্মচারীর অভিধা ছিল কামাবিশ-দার ও বড়-বড় মহালের কর্ত্তা ছিলেন মামলতদার। মামলতদারেরা সাধারণতঃ পুণা সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন, এবং হিসাব দাখিল করিতেন পুণা সরকারের নিকটে;—পেশবা সরকার ব্যতীত তাঁহাদের উপরে আর কোন উচ্চতর কর্ম্মচারী থাকিত না। কেবল খান্দেশ, গুজরাট ও কর্ণাটক* এই তিনটী প্রদেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত। এই প্রদেশ তিনটিতে মামলতদারদিগের কার্য্যের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত এক-একজন 'সরসুভেদার' থাকিতেন। তিনজন সর-সুভেদারের ক্ষমতা ও বেতন কিন্তু সমান ছিল না। কর্ণাটকের সরসুভেদার আপনার অধীন মামলতদারদিগকে বহাল ও বরখাস্ত করিতে পারিতেন, রাজস্ব আদায়-অনাদায়ের জন্য পেশবা সরকারের নিকটে তাঁহাকে দায়ী থাকিতে হইত। খান্দেশের সরসুভেদারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ইহা অপেক্ষা অনেক কম ছিল। তিনি সেখানকার মামলতদার ও কামাবিসদারগণের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন মাত্র। তাঁহাদিগের নিয়োগ-বিয়োগেও তাঁহার কোনও হাত ছিল না, সুতরাং রাজস্ব আদায় বা অনাদায়ের দায়িত্বও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইত না। সরসুভেদার কামাবিশদার ও মামলতদারদিগের ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহাদের বেতনের কথার আলোচনা করা যাউক।

পেশবা-যুগের কাগজপত্রে দেখা যায় যে, সকল কামাবিশদার সমান বেতন পাইতেন না; অথবা এখনকার মত সেকালে এই সকল কর্ম্মচারীর কোন নির্দ্দিষ্ট 'গ্রেড' বা বেতনের হারও ছিল না। মহালের আয়তন ও আয়ের তারতম্য অনুসারে, কর্ম্মচারিগণেরও বেতনের তারতম্য হইত। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ত্রিম্বক হরি নামক এক-ব্যক্তি বার্ষিক ১০০০৲ বেতনে সরকার হাণ্ডের কামা-বিশদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার তিন বৎসর পরে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ভুপাল পরগণার কামাবিশদার রামচন্দ্র বল্লাল ৭০০০৲ বেতন পাইতেন। সাধারণতঃ এই সকল কর্ম্মচারী, নিয়োগের সময় যে পরিমাণ রসদ বা আগাম টাকা দিতেন, তদনুপাতে তাঁহাদের বেতন নির্দ্দিষ্ট হইত। ভুপাল পরগণার কামাবিশদার পৌনে দুই লক্ষ টাকার রসদ দিয়াছিলেন; তিনি বেতন পাইতেন পৌনে দুই লক্ষের, ১৲৲ (শতকরা ৪) ৭০০০৲। (৭০০০ তুম্মাস বেতন রসদ পাবণে দোন লাখ রূপয়াস দরসদে ৪ রূপয়ে প্রমাণে)। ঠিক এই নিয়ম অনুসারেই এই সময়ে বুন্দেলখণ্ডের মামলতদারের বেতন তৎপ্রদত্ত রসদের শতকরা ৪৲ হিসাবে ১২৮০০৲ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। (তুম্মাস সুশাহিরা রসদে চা দরসতে রূপয়ে ৪ প্রমাণে ১২,৮০০ বারা হাজার আঠশে করার কেলে অসেত)। রাও বাহাদুর দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীসের মতে কামাবিসদার ও মামলতদার তাহাদিগের অধীন মহালের দেয় বার্ষিক রাজস্বের শত-করা ৪৲ হিসাবে বেতন পাইতেন। Peshwas' Diaries, বালাজী বাজীরাও প্রথম খণ্ডে ৪০৭ ও ৪০৯ সংখ্যক দলীলের পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"The remuneration of the Kamavisder of Bhupal was fixed at Rs. 4 pre cent of the revenue received." এবং "The Mamlot of Bundelkhand was entrusted to one person, and Rs. 320,000 were received from him in advance on account of land revenue. His remuneration was fixed at Rs. 12,800 at Rs. 4 per cent of the revenue."

* কর্ণাটক বলিতে প্রাচীন হিন্দুযুগের ন্যায় মারাঠাযুগেও মহীশূর প্রভৃতি সমস্ত দক্ষিণদেশীয় রাজ্য বুঝাইত। সুতরাং সেকালের কর্ণাটক আধুনিক ইংরাজি কর্ণাটক অপেক্ষা অধিক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত।

রাও বাহাদুর পারসনীস বহুকাল মারাঠা ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের মত বিনা বিচারে উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু রাও বাহাদুর তৎসম্পাদিত বালাজী বাজীরাও প্রথম খণ্ডের আর কয়েকখানি দলীল ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার মত যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা উপরে যে দুইখানি দলীল হইতে দুইটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে যে, রসদের শতকরা ৪৲ হিসাবে বেতন নির্দ্ধারিত হইল। রসদ শব্দের অর্থ রাজস্ব নহে। পেশবা সরকারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না বলিয়া, তাঁহারা প্রত্যেক মহালের কর্ম্মচারীর নিকট হইতেই বৎসরান্তে বা নিয়োগের সময় কিছু অগ্রিম টাকা লইতেন। এই অগ্রিম দানের নাম রসদ। একটু হিসাব করিলেই দেখা যাইবে যে, কামাবিশদার ও মামলাতদারগণ ঠিক নিজ নিজ রসদের শতকরা ৪৲ বেতন পাইতেন। ভুপালের কামাবিসদার রামচন্দ্র বল্লাল ১,৭৫,০০০৲ রসদ দিয়াছিলেন; তিনি ৭০০০৲ বেতন পাইতেন। বুন্দেলখণ্ডের মামলতদার লক্ষ্মণ শঙ্কর ৩,২০,০০০৲ রসদ দিয়াছিলেন; সুতরাং তাহার বেতন হইয়াছিল, ১২,৮০০৲। আবার বালাজী বাজীরাওয়ের শাসনকালীন আর একখানি দলীলে দেখিতে পাই যে, ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিম্বক বাবুরাও নামক এক ব্যক্তি ৫ বৎসরের জন্য কসবা পুণতাম্বার কামাবিসদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুণতাম্বার রাজস্ব পাঁচ বৎসরে ৪৫০০০৲ হইতে ৪৯০০০৲ পর্য্যন্ত 'ইস্তাবার' নিয়ম অনুসারে পড়িবার কথা ছিল।

১৭৫৯—৬০—৪৫,০০০৲
১৭৬০—৬১—৪৬,০০০৲
১৭৬১—৬২—৪৭,০০০৲
১৭৬২—৬৩—৪৮,০৭০৲
১৭৬৩—৬৪—৪৯,০০০৲

যদি রাও বাহাদুর পারসনীসের মত ঠিক হইত, তাহা হইলে পুণতাম্বার কামাবিসদার রাজস্বের শতকরা ৪৲ হিসাবে অন্ততঃ ১৮০০৲ বেতন পাইতেন। কিন্তু পেশবা সরকার তাঁহাকে বার্ষিক ২০০৲ মাত্র বেতন দিতেন। (Peshwas' Diaries, Balaji Baji Rao, Vol 1, P. 279 দেখুন।) মামলতদার ও কামাবিসদারগণ যে এক বৎসরের রাজস্বের সমান টাকা রসদ স্বরূপ দিতেন না, তাহার প্রমাণও রাও বাহাদুর পারসনীস সম্পাদিত পেশবার ডায়েরীতে মুদ্রিত বহু দলীলে পাওয়া যায়। কসবা পুণতাম্বার কামাবিসদার মাত্র ২০,০০০৲ টাকা রসদ দিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার মহালের বার্ষিক রাজস্ব ৪৫,০০০৲র কম ছিল না।

সকল সময়েই যে কামাবিশদারের রসদের $\frac{১}{২৫}$ অংশ বেতন পাইতেন, এমন কথাও বলা যায় না। কসবা পুণতাম্বার কামাবিশদারের কথাই ধরুন। তিনি বার্ষিক খাজানা আদায় করিতেন ৪৫ হইতে ৪৯ হাজার, বার্ষিক রসদ দিতেন ২০,০০০৲, রসদের অনুপাতে তাঁহার বেতন হওয়া উচিত ছিল ৮০০৲ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি বেতন পাইতেন ২০০৲ মাত্র। (সকতাপৈকী রসদ দরসলে রূপয়ে ২০,০০০ বীস হাজার প্রমাণে করার কেলী অসে। দরসলে বীস হাজার রূপয়ে সরকাবাঁত জমা করুন জাব খেত জানে। শিবন্দীব মহাল মজকুরচী নেমনুক পেশজী প্রমাণে করার —২০০ কামাবিসদার)

সাধারণতঃ কামাবিসদারের আফিস খরচ, পাল্কী-খরচ ও অন্যান্য খরচ চালাইবার জন্য পেশবা সরকার কিছু থোক টাকা মঞ্জুর করিয়া দিতেন। সরকার হাণ্ডের কামাবিসদার ত্রিম্বক হরির জন্য এই সম্পর্কে পেশবা সরকার যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা হইতেই এই কথা বেশ ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। ত্রিম্বক হরির নিয়োগপত্র হইতে তাঁহার আফিস খরচ প্রভৃতির তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

কামাবিসদাস স্বয়ং ১০০০৲

মাসিক ৬০৲ হিসাবে ১১ মাসের বেতন দিয়া বারো মাস খাটাইয়া লইবার করারে পাল্কী খরচ ৬৬০৲

৫০ জন সৈনিকের বাবদ ৭৫০০৲

মাসিক ২॥০, ২৮০, অথবা ৩৲ বেতনে ২০০ পেয়াদা রাখিতে হইবে। ইহাদিগকে বারো মাসেরই বেতন দিতে হইবে। চৌকীতে চৌকীতে প্রয়োজনমত মাসিক ৩॥০ বেতনে বারো জন কারকুন বা মুহুরী রাখিতে হইবে।

নিম্নলিখিত কারকুনেরা ১০ মাসে নিম্নলিখিত হারে বেতন লইয়া বারোমাস চাকরী করিবে:—

মজুমদার ২৫৲

নারোরাম ফডনিস্ ২৫৲
শিবাজী-দাদাজী চিটনীস ২৫৲
শিরমাজী আবজী কারকুন ২৫৲
জনার্দ্দন ভাস্কর, কারকুন ২৫৲

বিসাজী যাদব, ভিকাজী তনেদেব, মোরো শামরাজ এবং গিরগাজী নামক চারিজন কারকুন, জনপ্রতি ১৫৲ হিসাবে ৬০৲

বাবুজী ত্রিমল, গোবিন্দশিবদেব শিবাজীরাম ও বেঙ্কাজী অনন্ত নামক চারিজন কারকুন জনপ্রতি ১২৲ টাকা হিসাবে ৪৮৲

এই তালিকা হইতেই বেশ বুঝা যায়, পেশবা-সরকার প্রত্যেক মহালের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে কিরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখিতেন। এই তালিকার দুইটি বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। (১) বারোমাস চাকরী করিয়া দশ মাস বেতন পাইবার নিয়ম ও (২) পাল্কী-খরচ। এই দশমাসী বেতন ও বারোমাসী চাকরীর নিয়ম কেবল শাসন-বিভাগে নয়, সেনা-বিভাগেও প্রচলিত ছিল। বোধ হয়, এই নিয়ম প্রথমে মোগল-সেনা-বিভাগের অনুকরণে মারাঠা-সেনাদলে প্রবর্ত্তিত হয় ও ক্রমে-ক্রমে তথা হইতে মারাঠা শাসন-বিভাগেও বিস্তার লাভ করে। পেশবা-যুগের পাল্কী-খরচের সহিত এখনকার রাহা-খরচ বা travelling allowanceএর তুলনা করা সঙ্গত হইবে না। এখন যেরূপ সরকারী কর্ম্মচারীরা নিজ-নিজ বিভাগে কার্য্যের উৎকর্ষের জন্য 'রায় বাহাদুর,' 'খাঁ বাহাদুর', দেওয়ান বাহাদুর,' 'রায় সাহেব' 'খাঁ সাহেব' প্রভৃতি উপাধি পাইয়া থাকেন, সেইরূপ পেশবা-যুগের কর্ম্মচারিগণ পাল্কী ও 'আপ্তাগিরি' প্রভৃতি ব্যবহার করিবার সম্মান লাভ করিতেন। কিন্তু খালি পাল্কী চড়িবার অধিকার পাইলেই ত হয় না; পাল্কী কেনা চাই, পাল্কী বহিবার জন্য বেহারা চাই, ও এই সকল ব্যয়ের জন্য টাকা চাই। পাছে রাজদত্ত সম্মান দরিদ্র কর্ম্মচারীর পক্ষে পুরস্কার না হইয়া বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়ায়, এই ভয়ে পেশবা-সরকার কোন কর্ম্মচারীকে পাল্কী আপ্তাগিরি ব্যবহারের অধিকারের সঙ্গে-সঙ্গে এই অধিকার সম্ভোগের জন্য কিছু টাকাও 'পাল্কী-খরচ' বা 'আপ্তাগিরি খরচ' বাবদ মঞ্জুর করিতেন। আজকালকার অনেক 'রায় বাহাদুর' ও 'খাঁ বাহাদুর' যে রাজসকার হইতে পদমর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলিবার খরচ পাইলে বাঁচিয়া যাইতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কামাবিসদার ও মামলতদার পেশবার প্রতিনিধি;—সুতরাং পেশবা-সরকারের তাবৎ রাজক্ষমতাই ইঁহারা পরিচালন করিতেন। সুতরাং ইঁহাদের কর্ত্তব্যের সংখ্যা ও দায়িত্বের পরিমাণ খুব বেশী ছিল। একদিকে যেমন রাজস্ব আদায়ের সহিত, কামাবিশদারকে কৃষকের হিত-সাধন, কৃষির বিস্তার ও উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিতে হইত, অপর দিকে আবার তাঁহাকে মহালের মধ্যে নব-নব শিল্প-কলার প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দিতে হইত। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী সকল প্রকারের মামলার তদন্ত করিয়া বিচারের জন্য পঞ্চায়েত নিয়োগ করিতেন কামাবিসদার; ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ও সামাজিক সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন তিনি; মহালের 'শিবন্দী সেনা' ও পুলিশের কর্ত্তাও ছিলেন তিনি; সুতরাং পরোক্ষভাবে শান্তিরক্ষার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু এই-খানেই তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ হইল না। পেশবা-যুগের মারাঠাগণ আবার মধ্যযুগের য়ুরোপীয়দিগের মত ভূতপ্রেত ও ডাইনীদিগের কুহক-শক্তিতে আস্থাবান ছিল। কাজেই মহালে ভূতের উৎপাত হইলে, কোন ডাইনীর কুহকে কোন প্রজার ধনসম্পত্তি বা জীবনের অনিষ্ট হইলেও, তাহার প্রতিকারের জন্য আতঙ্কিত জনসাধারণ কামাবিসদারের দ্বারস্থ হইত। এত ক্ষমতা যাহার, ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ বা সুবিধা যে তাহার একেবারেই ঘটিত না, তাহা নহে। সুতরাং মারাঠা-কর্ম্মচারিগণের উৎকোচ-প্রিয়তার বহু বিবরণ বিদেশী লেখকগণের গ্রন্থে পাওয়া যায়। শিবাজীর সমকালীন ইংরেজ পর্য্যটক ডাক্তার ফ্রায়ার (Fryer) ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সৈনিক ডাঃ মেজর ব্রুটন্ (Broughton) উভয়েই মারাঠা-কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। ফ্রায়ার বলেন যে, একজন মারাঠা কর্ম্মচারী শিবাজীর দরবারে আগত ইংরেজ-দূত অক্সিন ডেন্‌কে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তাড়াতাড়ি কাজ করিয়া লইতে হইলে উপহারের তালিকাটি আরও কিছু বাড়ানো দরকার। আর ব্রুটন্ বলেন যে, দৌলতরাও সিন্ধিয়া তাঁহার এক মৃত ভাগিনেয়ের জন্যও খেলাত চাহিয়াছিলেন; নতুবা অপর সকলকে

খেলাত পাইতে দেখিলে তাঁহার ভগিনীর লুপ্তপ্রায় পুত্রশোক আবার প্রবল হইবার সম্ভাবনা। এই উপহার-প্রিয়তার বা অভদ্র ভাষায় উৎকোচের লোভ যে মারাঠাদিগেরই একচেটিয়া ছিল, এমন নহে। সেকালের ইংরেজ বা মুসলমান কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে মারাঠা কর্ম্মচারিগণের অপেক্ষা যে নৈতিক হিসাবে খুব উন্নত ছিলেন, এমন বোধ হয় না। হকিন্স এবং রোর (Hawkins এবং Rowe) ভারত-প্রবাস-কাহিনীতে মোগল কর্ম্মচারিগণের যে অর্থ-লোলুপতার বিবরণ আছে, তাহা সে-কালের নবাব, আমীর ও ওমরাহ্‌দিগের পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নহে। ইঁহারা না কি পাশ্চাত্য বণিকের বাক্স-পেটারার ভিতরের সন্ধান পাইবার জন্য অসঙ্গত কৌতূহল প্রকাশ করিতেন। আবার, বিলাতী জজের যে চিত্র সেক্‌স্‌পীয়রের অমর তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে—"the Justice in fair round belly with good cafon lined"—তাহাতে এলিজাবেথের যুগে স্থূলোদর বিলাতী-ধর্ম্মাবতারের আনুকূল্যও যে উৎকোচ দ্বারা ক্রয় করা যাইতে পারিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহার ঐতিহাসিক উদাহরণ- স্বনামখ্যাত লর্ড বেকন্‌। ভাগ্যদোষে তিনি ধরা পড়িয়া কলঙ্কের ভাগী হইয়াছেন। কিন্তু যাহারা ধরা পড়েন নাই, তাঁহাদের সংখ্যাও বোধ হয় কম নহে। যে সকল ইংরেজ কর্ম্মচারী, কোম্পানী বাহাদুরের চাকরী করিতে এ দেশে আসিতেন, তাঁহারাও এ বিষয়ে 'কালা-আদমীর' চেয়ে বড় বেশী উন্নত ছিলেন না। ক্লাইব ও তাঁহার সহযোগীরা অল্পকাল ভারত-প্রবাসের পরই স্বদেশে ফিরিয়া সকল জিনিসের বাজার-দর যেরূপ চড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহাতেই ইহা বেশ বুঝা যায়। আবার, ওয়েলিংটনের ডেস্‌প্যাচে পড়িয়াছি যে, তাঁহার অধীন একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কর্ণেল সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। একজন লেপ্টেন্যাণ্ট চোরাই মাল খরিদ করিয়াছিলেন, এবং অপর দুইজন লেপ্টেন্যাণ্ট বাজারে যাইয়া উপদ্রব করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া শাস্তি-ভোগ করিয়াছিলেন। সেকালের লোকের চক্ষে উৎকোচ-গ্রহণ খুব গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত না। উৎকোচ বা উপহার প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারীর ন্যায্য পাওনা বলিয়াই পরিগণিত হইত। সুতরাং ভারতে এবং বিলাতে উভয় দেশেই এক সময়ে উৎকোচ দান ও গ্রহণ পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত ছিল। পেশবা-রাজত্বের শেষভাগে মারাঠা কর্ম্মচারীরা প্রকাশ্যেই 'অন্তস্থ' বা 'দরবার-খরচ, দাবী করিতেন; বিলাতে এ রকম খোলাখুলি ছিল না, এই যা প্রভেদ।

অত্যাচার ও অনাচার সকল দেশে, সকল যুগে, সকল গবর্ণমেণ্টের অধীনেই, অল্পাধিক্ পরিমাণে থাকে; পেশবা-যুগেও ছিল। কিন্তু কামাবিস্‌দার ও মামলতদার যাহাতে তাঁহাদের বিপুল ক্ষমতার অপব্যবহার না করিতে পারেন, সে-দিকে পেশবা-সরকারের সতর্কতার অভাব ছিল না। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর কর্ম্মচারীর সাহায্যে পেশবা-সরকার কামাবিস্‌দার ও মামলতদারের ক্ষমতার অপব্যবহার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেদিগের সহিত আমাদের ইতঃপূর্ব্বেই সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইঁহাদের নিকটে গ্রাম্য-রাজস্বের এক-এক প্রস্থ হিসাব থাকিত। মামলতদার ও কামাবিস্‌দারের হিসাবের সহিত এই হিসাব মিলাইয়া লওয়া হইত; সুতরাং হিসাব জাল করা অথবা মিথ্যা হিসাব দেওয়া পরগণার কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের সাধারণ নাম 'দরকদার'। পাটীল, কুলকর্ণী, দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের মত ইঁহারা নিজ-নিজ পৈতৃক পদ উত্তরাধিকার-সূত্রে পুরুষানুক্রমে পাইতেন। ইঁহাদিগকে বহাল বা বরখাস্ত করিবার ক্ষমতাও কামাবিস্‌দারের বা মামলতদারের ছিল না; অথবা ইঁহারা নিজ-নিজ পৈতৃক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে না পারিলে, ইঁহাদিগের দ্বারা অন্য কায করাইয়া লইতেও কামাবিস্‌ ও মামলতদার পারিতেন না। যদি তাঁহারা এরূপ অসঙ্গত চেষ্টা করিতেন, তবে দরকদারেরা পেশবা-সরকারের নিকট অবেদন করিয়া তাহার প্রতীকার করিয়া লইতে পারিতেন।

৮। দরফদার।

প্রত্যেক কামাবিস্‌দারের ও মামলতদারের আফিসে বারোজন কারকুন্ ব্যতীত ৮ জন 'দরফদার' থাকিতেন। মহাল-সম্পর্কীয় প্রধান-প্রধান কায ইঁহাদের সম্মতি বা সহযোগিতা ভিন্ন সম্পন্ন হইবার উপায় ছিল না। নিম্নে ৮ জন দরফদারের তালিকা দেওয়া গেল :—

১। দেওয়ান।

২। মজুমদার।

৩। ফড়নবিস।
৪। দপ্তরদার।
৫। পোতনীস্।
৬। পোতদার।
৭। সভাসদ্।
৮। চিটনীস্।

এই সকল 'দরফদার' মামলতদারের নিকট হইতে বেতন পাইতেন না; সুতরাং ইঁহারা প্রয়োজন বোধ করিলে মামলতদারের কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে পেশবা-সরকারের নিকটে সকল সংবাদ পাঠাইতে ভীত হইবেন না, এই ভরসায়ই বোধ হয় প্রত্যেক বিভাগেই কতকগুলি দরফদার রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইঁহাদের কর্ত্তব্যগুলি আবার এমন দক্ষতার সহিত বিভাগ করা হইয়াছিল যে, আট জন দরফদারের মধ্যেও কাহারও অজ্ঞাতে শাসন বা রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কাজ হইবার উপায় ছিল না। দেওয়ান সকল হুকুমনামা ও চিঠি-পত্র সহি করিতেন। মজুমদার প্রত্যেক দলীল ও হিসাব সম্যকৃরূপে পরীক্ষা করিয়া ফড়নবিসের নিকটে পাঠাইতেন। ফড়নবিস প্রত্যেক দলীল ও হুকুমনামায় তারিখ লিখিয়া দিতেন এবং দৈনিক কাযের ও হিসাবের খস্ড়া লিখিতেন। টাকার থলিয়ায় তিনিই হিসাবের চিঠি বাঁধিয়া দিতেন। প্রত্যেক গ্রামের রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহার কাগজে তারিখ লিখিয়া দিতেন; এবং পরিশেষে সকল খাতাপত্র তিনিই সদরে লইয়া আসিতেন। দপ্তরদার ফড়নবিসের দৈনিক খস্ড়া হইতে খতিয়ান-বহি তৈয়ার করিতেন এবং মাসান্তে আয়-ব্যয়ের মোটামুটি একটা হিসাব সরকারে পাঠাইতেন। পোতনীস্ আদায়ী রাজস্বের ও নগদ টাকার হিসাব রাখিতেন এবং দৈনিক হিসাবের খস্ড়া ও খতিয়ান লিখিতে সাহায্য করিতেন। পোতদার প্রত্যেক আফিসে দুই-দুই-জন করিয়া থাকিত,—মুদ্রার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করাই ছিল ইহাদের কাজ। সভাসদ্ ছোট-ছোট মামলা-মোকর্দ্দমার রেজিষ্ট্রী রাখিতেন ও মামলতদারের নিকট তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট করিতেন। চিটনীস্ সকল প্রকার চিঠিপত্র লিখিতেন ও চিঠিপত্রের জবাব দিতেন। (Bombay Gazetteer Poona Volumes দেখুন।) এতদ্ব্যতীত প্রথম মাধব রাওয়ের সময়ের একখানি প্রাচীন দলীলে 'জমেনীস্' নামক আর একজন কর্ম্মচারীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দলীলখানিতে জমেনীসের কর্ত্তব্য নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে—

১। সরকারী কর্ম্মচারীরা জিরাইত ও বাগাইত জমি পরিদর্শন করিয়া তাহাদের মন্তব্য ও 'রিপোর্ট' জমেনীসের নিকটে দাখিল করিবেন। জমেনীস প্রয়োজনমত তদন্ত করিয়া তৎসাহায্যে খাজানার হার নির্দ্ধারণ করিয়া কারভারীকে জানাইবেন।

২। রাজস্ব-সম্পর্কীয় যাবতীয় হিসাব জমেনীসের নিকটে দিতে হইবে। আদায়-বাকী নির্ভুল ভাবে লেখা হইল কি না, তাহার প্রতি জমেনীস নজর রাখিবেন।

৩। গ্রাম্য রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা জমেনীসের থাকিবে। আবার আবশ্যক বিবেচনা করিলে কয়েক বৎসরের জন্য তিনি রাজস্ব সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে মাপ করিতে পারিবেন।

৪। বাকী আদায়ের হুকুম জমেনীস দিবেন।

৫। রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করিবার 'কৌল' জমেনীসের নামে বাহির হইবে।

৬। ফড়নবীসের দৈনিক খস্ড়া হইতে গ্রাম্য রাজস্বের আদায়-বাকীর খতিয়ান জমেনীস প্রস্তুত করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আটজন দরফদারের মধ্যে কেহই অপর কাহারও অজ্ঞাতে রাজস্ব বা শাসন সম্পর্কীয় কোন কিছু করিতে পারিতেন না। ইহারা কিরূপে পরস্পরের কাযের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাহা ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ধারবারের মামলতদার ব্যাঙ্কট নারায়ণের লিখিত দুইখানি পত্র হইতেই বেশ বুঝা যাইবে। এই চিঠি দুইখানিতে মজুমদার ও দপ্তরদারের কার্য্য-তালিকা দেওয়া হইয়াছে। মজুমদার, জমেনীস, ফড়নবীস ও চিটনবীসের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। আবার, দপ্তর-দারকে কামাবিস্দারের নিকট হিসাব দাখিল করিবার আগে ফড়নবিসকে হিসাব-সম্পর্কীয় সকল কথা বুঝাইয়া দিতে হইত।

মজুমদারের কার্য্যতালিকা।

১। তিনি প্রতিদিন দৈনিক হিসাব মিলাইয়া লইতেন।

২। ফড়নবীস ও চিটনীস লিখিত প্রত্যেক হিসাব ও চিঠি তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন।

৩। নব-নিযুক্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক-সৈন্যের বেতনের অঙ্ক ঠিক করিয়া যোগ দেওয়া হইল কি না, তিনি

দেখিবেন এবং প্রত্যেক মাসের অশ্বারোহী ও পদাতিকদিগের হাজিরা লইবেন।

৪। মহালের যে অংশের নিমিত্ত সহকারী মামলতদার নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহার আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব মজুমদার প্রস্তুত করিবেন এবং মামলতদারের সদরে দেয় হিসাবও মজুমদারের মারফতে দিতে হইবে।

৫। মজুমদারের অজ্ঞাতে মামলতদার পরিবর্তন করা হইবে না।

দপ্তরদারের কার্য্যতালিকা।

১। ফড়্‌নবীস দৈনিক খস্‌ড়া লিখিতেন ও তাহা হইতে দপ্তরদার খতিয়ান তৈয়ার করিতেন।

২। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব দপ্তরদার প্রস্তুত করিবেন। বর্ষান্তে কামাবিসদারের হিসাব তিনি কাগজ-পত্রের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিবেন।

৩। প্রজাদিগকে প্রদত্ত ঋণ ও তাহা পুনরাদায় সম্বন্ধীয় তদন্ত দপ্তরদার করিবেন।

৪। মহালের সোয়ার বা অশ্বারোহী-সেনা-সম্পর্কীয় হিসাব দপ্তরদার পরীক্ষা করিবেন।

৫। দপ্তরদার সমস্ত হিসাব ফড়্‌নবীসকে বুঝাইয়া দিবেন ও তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া মামলতদারের নিকট হিসাব দাখিল করিবেন।

৬। ফড়্‌নবীস নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে যে সকল হুকুম দিবেন, তাহা দপ্তরদারের মারফতে দিতে হইবে।

৭। ফড়্‌নবীসের অনুপস্থিতিতে তাঁহার কার্য্য দপ্তরদার করিবেন।

মামলতদারেরা যাহাতে রাজস্ব আত্মসাৎ করিতে বা প্রজাদিগের উপর অন্যায় উৎপীড়ন না করিতে পারেন, তাহার জন্য পেশবা-সরকার আরও দুইটি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মামলতদার ও কামবিসদারের বেতনের হার আলোচনা করিবার সময়ই আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক মামলতদার ও কামাবিসদার তাঁহাদের নিয়োগের সময় পেশবা-সরকারকে কিছু 'রসদ' বা অগ্রিম টাকা দিতেন। এই টাকার জন্য তাঁহারা পেশবা-সরকার হইতে মাসিক শতকরা ১৲ টাকা হইতে ১॥০ টাকা হিসাবে সুদ পাইতেন। পেশবাগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না, সুতরাং রাজস্বের কিয়দংশ অগ্রিম পাওয়াতে যেমন একদিকে অর্থাভাবের অসুবিধা কিয়ৎ-পরিমাণে দূর হইত, সেইরূপ মামলতদার ও কামাবিসদারদিগের কতকটা ভয় থাকিত যে, মহালের প্রজাসাধারণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিলে অথবা রাজস্ব-আদায়-সম্পর্কে কোন প্রকারের অপরাধ ধরা পড়িলে 'রসদের' টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। মামলতদারের অসাধুতা নিবারণের দ্বিতীয় উপায় 'বেহেডা' বা বার্ষিক আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব। পুণা-দপ্তরের কাগজ-পত্র হইতে বিশেষ পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত এই "বেহেডা" প্রস্তুত করা হইত, এবং সাধারণতঃ "বেহেডার" অতিরিক্ত কোন খরচ লিখিতে মামলতদারেরা সাহসী হইতেন না। এত সতর্কতা সত্ত্বেও কিন্তু মামলতদার ও কামাবিসদারের 'উপরি-রোজগার' বন্ধ হয় নাই। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলেন :—

The sources of their profit was concealment of receipt (especially fees fines and other undefined collections) false charges for remission, false musters, non-payment of pensions and other frauds in expenditure. The grand source of their profit was an extra assessment above the revenue, which was called Saudar Warrid Puttee. * * * * One of the chief of these expenses was called Durbar Khurch or Antast. This was originally applied secretly to bribe Ministers and Auditors. By degrees, their bribes became established fees, and the account was audited like the rest, but as bribes were still required, another collection took place for this purpose, and as auditors or accountants did not search minutely into these delicate transactions the Mamlatdar generally collected much more for himself, than for his patron." অর্থাৎ জরিমানা, নজর প্রভৃতি আদায়ের অনুল্লেখ, মিথ্যা রেহাইর ও মিথ্যা হাজিরার মিথ্যা খরচের ও পেন্সনের হিসাবই মামলতদারদিগের উপরি-রোজগারের প্রধান উপায়। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান লাভ হইত, "সদর

ওয়ারিদ পট্টী" হইতে। এতদ্ব্যতীত 'দরবার খরচ' বা 'অন্তস্থ' অথবা সরলভাষায় হিসাব-পরীক্ষককে দিবার জন্য উৎকোচ হইতেও তাঁহাদের বেশ আয় হইত। উৎকোচের জন্য যে পরিমাণ টাকা আদায় হইত, তাহার সমস্ত অথবা অধিকাংশও হিসাব-পরীক্ষকের বাক্‌সে উঠিত না; সুতরাং তাহা হইতেও মামলতদারের বেশ মোটা রকম লাভ হইত।

মামলতদার এইরূপ বিবিধ উপায়ে নিজের আয়-বৃদ্ধি করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রজাদের বড় বেশী লোকসান হইত না, লোকসান হইত সরকারের। মামলতদার জানিতেন যে, প্রজারা নিঃস্ব হইয়া পড়িলে তাঁহার আয়ের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে সুতরাং সুবর্ণ অণ্ড সংগ্রহের সময় সুবর্ণপ্রসূ হংসীর প্রাণরক্ষার জন্য সাধ্যমত যত্নবান্ হইতেন। প্রজাদিগের উপর নূতন নূতন ভার চাপান হইত না সত্য, কিন্তু পেশবার রাজকোষে যত অর্থ সংগৃহীত হওয়া উচিত ছিল, এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের মতে, তত অর্থ পুণার দরজা কখনও পার হইত না।

সাধারণতঃ মামলতদার ও কামাবিস্‌দারেরা অল্প কয়েক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতেন। শিবাজীর আমলে ইঁহাদিগকে এক মহাল হইতে অন্য মহালে, এখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদের ন্যায় বদলী করা হইত। পেশবা-যুগে মামলতদারেরা বিশেষ গুরুতর কোন অপরাধ না করিলে একই মহালে ৩০।৪০ বৎসরকাল নিরুপদ্রবে কাটাইয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পরে তাঁহাদের পুত্রগণ পেশবার অনুগ্রহে সেই কর্তৃত্ব লাভ করিতেন। সুতরাং প্রত্যেক মহালের সহিত তথাকার মামলতদারের একটা স্থায়ী সম্পর্ক জন্মিত এবং দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে তথাকার অধিবাসীদিগের জন্য তাঁহাদের একটু আন্তরিক মমতাও হইত। কোন অর্থলোভী মামলতদার প্রজার উপর অযথা অত্যাচার করিলে পেশবা-সরকার তাঁহাকে বরখাস্ত করিতে একটু ইতস্ততঃ বা বিলম্ব করিতেন না। এই নিয়মের ব্যত্যয় হইয়াছে কেবল পেশবা-কুল-কলঙ্ক দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের সময়। তিনি অর্থলোভে কতকগুলি ধর্ম্মজ্ঞানহীন লোকের নিকট মহাল ইজারা দিয়াছিলেন। এই ইজারা-নীতির ফল পেশবা ও তাঁহার প্রজাবর্গ উভয় পক্ষের কাছেই বিষময় হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মামলাতদার বা কামাবিসদারগণ হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই সকল রাজকর্ম্মচারী ছিলেন গ্রাম্যসঙ্ঘ ও হুজুর-দপ্তরের মধ্যে সংযোগ-সেতু স্বরূপ। পল্লীসঙ্ঘ ও মহালের কর্ম্মচারীদিগের কথা বলা হইয়াছে। এইবারে হুজুর-দপ্তরের আকৃতি-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা যাইবে।

৯। হুজুর-দপ্তর।

পুণার হুজুর-দপ্তর মারাঠা-সাম্রাজ্যের "ইম্পিরীয়াল সেক্রেটারিয়েট।" এইখানে বিভিন্ন বিভাগে প্রায় দুইশত কারকুন কায করিত। মারাঠা-সাম্রাজ্যের শাসন-সম্পর্কীয় যে কোন তথ্য এই দপ্তর হইতে পাওয়া যাইত। পরগণার দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেদিগের প্রদত্ত রাজস্বের হিসাব, মহালের কামাবিস্‌দার ও মামলতদারদিগের প্রদত্ত হিসাব, পাটীল ও কুলকর্ণী প্রদত্ত গ্রাম্য-রাজস্বের হিসাব, বন-বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব, শুল্ক-বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব, সরঞ্জাম ও ইনাম-জমির হিসাব, সৈনিক-বিভাগের হাজিরা প্রভৃতি যাবতীয় সরকারী কাগজ এই হুজুর-দপ্তরে রক্ষিত হইত। সুপ্রসিদ্ধ নানা ফড়নবীস হুজুর-দপ্তরের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইংরেজ-অধিকারের পর পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত ৮৮ বৎসরের সমস্ত কাগজ এই দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগে সুশৃঙ্খলভাবে পাওয়া গিয়াছিল। ইহা সে-কালের মারাঠা-কারকুনগণের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

হুজুর-দপ্তরের কর্ত্তা ছিলেন, হুজুর ফড়নবীস। মহালের আফিসেও এক-এক-জন ফড়নবীস থাকিত, এইজন্য পুণার ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটের বড় কর্ত্তাকে হুজুর ফড়নবিস্ বলা হইত। এই বিরাট আফিস পরিচালনার জন্য যে বহু অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। সুবিধার জন্য হুজুর-দপ্তর বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার মধ্যে চাম্‌রে দপ্তর ও একবেরীজ দপ্তরই প্রধান। একবেরীজ দপ্তরে সকল প্রকার হিসাব-নিকাশের কায হইত বলিয়া এই আফিসটি সর্ব্বদাই পুণায় থাকিত। আর চাম্‌রে-দপ্তরের কায ফড়নবীসের নিজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত।

চাম্‌রে দপ্তরে আবার ফড্, বোহডা, সরঞ্জাম প্রভৃতি কতকগুলি বিভাগ ছিল। ফড, ফড়নবীসের নিজস্ব বিভাগ।

সমস্ত হুকুম, সনন্দ প্রভৃতি এই বিভাগ হইতে দেওয়া হইত। এই বিভাগে অন্যান্য বিভাগ হইতে সকল তথ্য সংগৃহীত হইত এবং ফড়নবীস স্বয়ং সকল হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। বেহেড়া বিভাগে বেহেড়া বা বার্ষিক আয়-ব্যয় বজেট প্রস্তুত হইত। পুরাতন আয়-ব্যয়ের হিসাব, গ্রাম্য রাজস্ব ও মহালের রাজস্বের স্বতন্ত্র হিসাবের সাহায্যে বেহেড়া প্রস্তুত করা হইত। বেহেড়া তৈয়ার করিতে মারাঠা-কারকুনেরা এমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন যে, কামাবিস্‌দার ও মামলতদার প্রায়ই রাজস্ব-আদায়-কালে এই বেহেড়ার অন্যথা করিতে পারিতেন না। সরঞ্জাম-বিভাগে সকল সরঞ্জাম ও ফুসাল্লা জমির হিসাব রাখা হইত।

একবেরীজ দপ্তরে সমস্ত বিভাগের সকল হিসাব একত্র করিয়া, আদ্যক্ষর-অনুসারে সাজাইয়া রাখা হইত। সুতরাং প্রত্যেক বৎসরের আয়-ব্যয় ও উদ্‌বৃত্ত টাকার পরিমাণ অল্প সময়ের মধ্যে বাহির করিয়া লইতে মোটেই কষ্ট হইত না। একবেরীজ-দপ্তরের সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে হুজুর-দপ্তরের কর্ম্মচারীরা গ্রামের ও মহালের হিসাবের ভুল-প্রতারণা যে সহজে ধরিয়া ফেলিতেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

মিঃ ম্যাক্‌লিয়ড (Macleod) দপ্তরের কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাস-যোগ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং এই প্রশ্নের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। মারাঠা-সাম্রাজ্যের পতনের পরেও, বৃত্তানের স্বত্ব লইয়া কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলেই বতনদারগণ তাঁহাদের মালেকী-স্বত্বের দলীলের খোঁজ হুজুর-দপ্তরে করিতেন। ইনাম-কমিশনের তদন্তকালে বহু সম্ভ্রান্ত জায়গীরদার মূল দলীল কমিশনের নিকট উপস্থিত করিতে অপারগ হইয়া পুণার হুজুর-দপ্তরে অনুসন্ধান করিতে কমিশনের কর্ম্মচারীগণকে অনুরোধ করিয়াছেন। পারসনীস-পরিবারের তদানীন্তন কর্ত্তা, মিঃ হেন্‌রী ব্রাউন্‌কে লিখিয়াছিলেন,—"ইহার (অর্থাৎ তাঁহাদের মালিক-স্বত্বের) নিদর্শন পেশবা-সরকারের মারাঠা দপ্তরে আছে। (ত্যাচে দাখলে পেশবে সরকারচে মারাঠা দপ্তরী আহেত) (পারসনীস ও মাবজী সম্পাদিত কৈফিয়ৎ আদি দেখুন।) বিসাজী কৃষ্ণ বিনীওয়ালার বংশধরও উপরিউক্ত ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট লিখিয়াছিলেন—"পুরাতন কাগজের নকল আমাদের কাছে আছে, তাহাই আপনার দেখিবার জন্য পাঠাইলাম, মূল কাগজ দপ্তরে আছে।" (জুনে কাগদাবারীল নকল আম্মা পাশী আহে। তী পাহন্যা কারিতা পাঠবিলী আহে, অসসল দপ্তরী আহে—(পারসনীস ও মাবজী-সম্পাদিত কৈফিয়তাদি দেখুন) হুজুর দপ্তরের কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও সততায় বিশ্বাস না থাকিলে সে-কালের জায়গীরদার ও বতনদারগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দপ্তরে পাওয়া যাইবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন কি ?

পেশবা সরকারের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় হুজুর-দপ্তরেও দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের রাজত্বকালে তত্ত্বাবধানের অভাবে নানা রূপ বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। এই দুর্বুদ্ধি পেশবার সময়েই মারাঠা সাম্রাজ্যের সহিত পুণার হুজুর দপ্তরেরও বিলোপ হয়। ম্যাকলিয়ড লিখিয়াছেন—

"The Dafter was not only much neglected but its establishment was almost done away with, and people were even permitted to carry away the records or do with them what they pleased. "হুজুর দপ্তরে যে সকল পুরাতন দলীল পাওয়া গিয়াছিল, তাহার কতক বিলাতে চলিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট বোম্বাই সরকারের তত্ত্বাবধানে পুনা নগরীতেই রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু দপ্তর-গৃহের চিহ্নমাত্রও এখন সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পশ্চিম-তরঙ্গ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

১। মাকড়সার জাল।

কেউ যদি এসে গল্প করে যে, অমুক দেশে দেখে এলুম, জেলেরা মাকড়সার জালে মাছ ধর্‌ছে,—তাহলে কথাটা এ দেশের লোক কেউই বিশ্বাস করবে না;—অথচ, এই পৃথিবীতে এমন দেশ সত্যই রয়েছে, যেখানে জেলেরা মাকড়সার জালেই চিরকাল মাছ ধরে আস্‌ছে! সে দেশটি হচ্ছে 'নিউ গিনী', আর তার উত্তর-পশ্চিম দিকে 'কারোলাইন' দ্বীপপুঞ্জ। এখানকার জঙ্গলে এক জাতের বড়-বড় মাকড়সা গাছের ডালে বৃহৎ আকারের জাল বুনে বসে থাকে। এক-একটা জালের ব্যাস মাপে প্রায় ছ' ফিট। নিউ গিনীর আদিম অধিবাসীরা এই মাকড়সার জালের পরিচয় পেয়ে ও-গুলোকে মাছ-ধরার কাজে লাগিয়েছে। এই অদ্ভুত মাকড়সার জালগুলি বেশ মজবুত; এতে আধ সের পর্য্যন্ত ওজনের মাছ ধরা যায়। জলের তোড়েও জালগুলি সহজে ছেঁড়ে না।

জঙ্গলের যে অংশটায় এই মাকড়সার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী, সেইখানে তারা কতকগুলো লম্বা বেতের ডগা নুইয়ে গোল করে বেঁধে, খাড়া করে রেখে আসে। তার পর এক সপ্তাহ যেতে-না-যেতে মাকড়সার অনুগ্রহে তাতে চমৎকার জাল তৈরী হয়ে যায়। তখন তারা সেগুলো জঙ্গল থেকে বা'র করে নিয়ে এসে মাছধরা সুরু করে দেয়।

(Literary Digest.)

২। বাল্‌শা কাঠ

পৃথিবীতে যত রকম কাঠ আছে, তার ভেতর এই 'বাল্‌শা'-কাঠই সব চেয়ে হাল্‌কা; এত হাল্‌কা যে, একটা ৮। ৯ বছরের ছোট ছেলে এই কাঠের একখানা প্রকাণ্ড কড়িকাঠ স্বচ্ছন্দে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে পারে। 'এয়ারোপ্লেন্' বা উড়োজাহাজ তৈরি করার জন্যেই এই কাঠের চলন খুব বেশী;—তা ছাড়া, ইহা অন্য অনেক প্রয়োজনীয় কাজেও লাগে। সম্প্রতি সাঁতার-খেলুড়েদের জন্যে এই কাঠের এক রকম 'ভাসা-চেয়ার' তৈরি হয়েছে। এই চেয়ারে বসে বেশ আরামে ঢেউয়ের মুখে ভেসে বেড়ান যায়। ঘোড়ার খুরের মত কাটা একখানি তক্তা, তারই তলায়, বস্‌বার জন্যে চাম্‌ড়া দিয়ে একটা দোলার মত করা আছে, আর কিছু নয়। ছেলেদের সমুদ্রে খেলা করবার জন্যেও বড়-বড় মাছের মত দেখ্‌তে এক রকম 'বোট' তৈরি হয়েছে। খুব হাল্‌কা ব'লে ছেলেরা বেশ অনায়াসে সেটাকে নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে পারে।

(Scientific American.)

৩। নূতন মানচিত্র

আকাশে বসে উড়ো-জাহাজ থেকে নীচের জমির যে 'ফটো' নেওয়া হয়, তা থেকে অতি পরিষ্কার নির্ভুল মানচিত্র তৈরি হচ্ছে। যুদ্ধের সময় এই উপায়ে তৈরি মানচিত্রগুলিই সব চেয়ে বেশী কাজে লেগেছিল। দশ হাজার ফিট উঁচু থেকে—'ক্যামেরার' মুখে প্রত্যেক বারে এক-একখানি ছবিতে দুই-বর্গ-মাইল পরিমিত স্থানের চিত্র পাওয়া যায়। এর চেয়ে নীচু থেকে ছবি নিলে প্রত্যেক-বার আরও অল্প-পরিমিত স্থানের চিত্র ওঠে। যে দেশের যে অংশের একখানি নির্ভুল মানচিত্র দরকার হয়, উড়ো-জাহাজের 'ক্যামেরা' সেই দেশের উপর দিয়ে উড়তে-উড়তে ক্রমাগত তার 'ফটো' তুলে নেয়,—ক্রমে সব জায়গাটুকুর ছবি নেওয়া শেষ হলে নেমে আসে। তখন জনকতক লোক মিলে সেই ছবিগুলি আর একখানা বড় কাগজের উপর ঠিক পর-পর সাজিয়ে এঁটে ফেলে; তারপর একজন সুদক্ষ নক্‌সাকার তাই থেকে একখানি চমৎকার নির্ভুল মানচিত্র তৈরি করে দেয়।

(Literary Digest.)

৪। সেতু-বন্ধন

সুবিস্তৃত 'রাইন'-নদের উপর এক ঘণ্টার মধ্যে একটী সেতু-নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া আমেরিকার সমর-বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারগণ সমস্ত বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল। জার্ম্মাণীর 'হনিঞ্জেন' প্রদেশের নিকটে রাইন্‌-নদের বিশালতা প্রায় ১৪৪০ ফিট। এখানে স্রোতের গতি ঘণ্টায় চার মাইল করিয়া; এবং নদের গভীরতা প্রায় ২৫ ফিটেরও বেশী। নদের তলদেশ পর্ব্বতসঙ্কুল বলিয়া ইহার উপরে সেতু বন্ধন করা অতি দুরূহ কার্য্য। আমেরিকার সামরিক ইঞ্জিনীয়ারগণ জার্ম্মাণীর নিকট হইতেই মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া ইহার উপর ৫৮ মিনিটের মধ্যেই একটী ভাসমান সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বাহ্নে ইস্তাহার জারি করিয়া, ২৫শে মে রবিবার সকালে দুই ঘণ্টার জন্য রাইন্‌-নদের উপর সমস্ত নৌকা-চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ৯-১৫ মিনিটের সময় সেতুবন্ধন আরম্ভ করা হয়, এবং ১০-১৩ মিনিটের মধ্যে শেষ হইয়া যায়। এই সেতুটী আগাগোড়া পাশাপাশি 'পন্টুনের' উপর তৈয়ারি হইয়াছে। 'পন্টুনের' প্রত্যেক 'বোট'-খানিতে ১॥০ মণ ওজনের এক-একটী নঙ্গর বাঁধা আছে এবং আরও অধিক নিরাপদ হইবার জন্য সেতুর মধ্যভাগে ৬।০ মণ ওজনের অতিরিক্ত ২টী নঙ্গর দেওয়া হইয়াছে। নঙ্গরগুলি সেতু হইতে প্রায় ১৫০ ফিট তফাতে বাঁধা হইয়াছে। নদের তলদেশ পর্ব্বতসঙ্কুল বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, হয় ত নঙ্গরগুলি ভাসিয়া যাইবে; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ একটী নঙ্গর ব্যতীত আর কোনটীই ভাসিয়া যায় নাই। সেতুটি বেশ মজবুত হইয়াছে।

(Literary Digest.)

৫। উল্কাপিণ্ড

উল্কাপাত ও উল্কাবৃষ্টি প্রাচীন যুগে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে পরিগণিত ছিল। এক্ষণে উহা ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে। অধুনা, কোথাও উল্কাপাত হইয়াছে, সংবাদ আসিলে খবরের কাগজে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এতাবৎ কাল প্রকৃতির এই নৈসর্গিক ব্যাপারটিকে উপেক্ষা ও অবহেলা করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি এ বিষয়ে দু'একজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। গত ২৬শে নভেম্বর রাত্রিকালে 'মিচিগান' হ্রদে যে বৃহৎ উল্কাপাত হইয়াছে, উহা লইয়া আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলিতেছে। এই উল্কাপাত হইবার সময় একটা ভীষণ শব্দে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত হইয়াছিল। মিচিগান, ইণ্ডিয়ানা ও ইলিনয় প্রদেশের সমস্ত বাড়ী-ঘর ঘন-ঘন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ভূমিকম্প হইতেছে মনে করিয়া প্রাণভয়ে লোকজনেরা যে যার গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। একটা প্রচণ্ড আলোক-দীপ্তি প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল। অনেকে মনে করিয়াছিল, বোধ হয় কোন বৃহৎ কলকারখানায় হঠাৎ আগুন লাগিয়া ইঞ্জিন বা বয়লার ইত্যাদি কিছু একটা সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল! ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী একটী বাতিঘরের (Light house) জনৈক দীপরক্ষক এই উল্কাপতন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সে বলিয়াছে, "আমি দেখিলাম, যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিগোলক ভীষণ শব্দ করিতে-করিতে প্রচণ্ড বেগে হ্রদের ভিতর আসিয়া পড়িল।" এই যে, অগ্নিগোলক বা উল্কাপিণ্ড, এই বস্তুটি কি, তাহা জানিবার জন্য হয় ত অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে। উহা লৌহ ও প্রস্তর-মিশ্রিত এক প্রকার ধাতব পদার্থবৎ বস্তু। এই ধাতুপিণ্ড গ্রহান্তর হইতে পৃথিবীর আকাশমণ্ডলে সঞ্চারিত হইয়া বায়ুর সংঘর্ষে ভীষণ উত্তপ্ত হইয়া উঠে, এবং অগ্নিময় দীপ্তি বিকীর্ণ করিতে থাকে। উহা ভীষণ বেগে পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়ে বলিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। পতনকালে ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডল সহসা উত্তপ্ত হইয়া উঠে বলিয়া বজ্রাঘাতের ন্যায় উল্কাপাতেও ভীষণ শব্দ উত্থিত হয়।

য়ুরোপের অনেক বড়-বড় সহরের যাদুঘরে শীতল উল্কাপিণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরের যাদুঘরে সংরক্ষিত উল্কা-পিণ্ডটিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। উহা ১৮৯৭ সালে গ্রীণল্যাণ্ড হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। উহা ওজনে প্রায় ৩৬॥০ টন (১০২২ মণ); আকারে প্রায় ১১ ফিট লম্বা ৫ ফিট চওড়া ও ৬ ফিট ৯ ইঞ্চি উঁচু! অভিজ্ঞ ধাতুবিদেরা বলেন, এই প্রকাণ্ড উল্কাপিণ্ড যখন প্রথম এই পৃথিবীর

বুকে আসিয়া পড়িয়াছিল, তখন ইহা ওজনে ও আকারে আরও বৃহত্তর ছিল; কারণ, গ্রীণল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসীরা সকলেই অগণিত শতাব্দী ধরিয়া তীরফলক নির্ম্মাণার্থ ইহারই অংশ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া লইয়াছে।

(Scientific American.)

৬। ছেলেদের খেল্‌না

লড়াই'য়ের আগে পৃথিবীশুদ্ধ ছেলেদের খেল্‌না প্রায় অধিকাংশই জার্ম্মাণী থেকে তৈরি হ'য়ে আস্‌তো; কিন্তু যুদ্ধ বাধিবার পর জার্ম্মাণীর সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য এক রকম বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায়, বাজারে আর জার্ম্মাণীর তৈরি সে হরেকরকমের চমৎকার খেলনা কিছু দেখ্‌তে পাওয়া যেতো না, কেবল জাপানী খেল্‌না কতকগুলো আস্‌তো। তা'পেয়ে ছেলেরা কোন দেশেই তেমন সুখী হ'তো না। এই জন্যে ১৯১৭ সাল থেকে আমেরিকা আস্তে আস্তে তার নিজের দেশের ছেলেদের জন্যে নিজেরা খেল্‌না তৈরি করতে সুরু করে দিয়েছিল। এবার ১৯১৯ সালের 'বড়দিনের' উৎসবে আমেরিকার কোন ছেলের হাতেই আর বিদেশী খেল্‌না কিনে এনে দিতে হয় নি। রং-বেরঙের কাচের ছোট-বড় রঙ্গীন 'বল', যা এতদিন জার্ম্মাণীর একচেটে সম্পত্তি ছিল, অপরিসীম অধ্যবসায়ের গুণে, প্রাণান্তকর চেষ্টায় ও যত্নে আমেরিকা এবার তাও তৈরি করে ফেলেছে! বড়দিনের পার্ব্বণে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের খুসি কর্ব্বার জন্যে ক্রোরপতি থেকে দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত সবাই যথাসাধ্য খরচ করে কিছু না কিছু খেল্‌না কিন্‌তো; সুতরাং অনেকগুলো টাকা প্রতি বছর দেশ থেকে বেরিয়ে জার্ম্মাণীর পকেটে চ'লে যেতো। এখন থেকে আমেরিকাকে আর সে ক্ষতিটুকু সহ্য করতে হবে না! আর আমরা খেল্‌না তো দূরের কথা—নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলোর জন্যেও বিদেশের মুখ চেয়ে বসে আছি! (Scientific American)

৭। গৃহস্থের গৃহ

আজকাল আমাদের দেশের গৃহস্থ ভদ্রলোকদের পক্ষে যেমন ছোট বাড়ীর অভাবে সহরে বাস করা অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে, য়ুরোপের মধ্যবিত্ত লোকেরা অনেক দিন থেকেই এ অভাব ভোগ করে আস্‌ছে। তবে তাদের সামাজিক প্রথা অনুসারে মেয়েদের জন্যে কোন রকম আব্রু দরকার হয় না বলে এক বাড়ীর ভেতরেই অনেকগুলি পরিবার এক সঙ্গে বাস করতে পারে; কিন্তু আমাদের সেটি হবার যো নেই। নিতান্ত অভাবে না পড়লে তিন-চারটী পরিবার কখন একসঙ্গে এক বাড়ীতে থাক্‌তে রাজী হয় না। বড় জোর দু'ঘর একসঙ্গে থাকতে চায়, তাও আবার আপনা-আপনির মধ্যে হ'লেই ভাল হয়। য়ুরোপে এসব হাঙ্গামা নেই বটে; কিন্তু বাড়ীর ভাড়া বড্ড বেশি বোলে, যাদের উপার্জ্জন অল্প, তারা একখানি ঘরের বেশী ভাড়া নিতে পারে না। কাজে-কাজেই সেই একখানি ঘরের ভেতরই কাঠের বেড়া দিয়ে তারা একদিকে একটু বস্‌বার জায়গা, একদিকে শোবার, একদিকে রাঁধবার, আর একদিকে খাবার মত বন্দোবস্ত করে নেয়। একখানি ঘরকে আবার এমন কোরে ভাগ করে নিতে হয় বোলে, স্থান বড় সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়ে; সুতরাং স্থানাভাবে তাদের অত্যন্ত কষ্ট পেতে হয়। এই স্থানাভাবের কষ্ট ও অসুবিধা দূর করবার জন্যে য়ুরোপ নানা উপায় উদ্ভাবন করছে। সঙ্কীর্ণ স্থানের উপযোগী ছোট-ছোট সব আস্‌বাব তৈরি হয়েছে। অনেক জিনিষ এমন কৌশলে তৈরি হয়েছে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন কোরে দু'তিন রকম প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়; যেমন শোবার খাটখানিকে একটু অদল বদল কোরে বিলিয়ার্ড খেল্‌বার টেবিলে পরিণত করা বা বইয়ের আলমারীটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বস্‌বার কোচ্ কোরে ফেলা ইত্যাদি। কিন্তু এতেও বিশেষ সুবিধা হ'য় না বোলে সম্প্রতি একজন আমেরিকান একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন কোরেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত এই নূতন উপায়ে একখানি ঘরকেই গৃহস্থের ইচ্ছা ও আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন কোরে বসবার, শোবার, খাবার, রাঁধবার, পড়বার, বা স্নান করবার ঘরে রূপান্তরিত কোরে নেওয়া চল্‌বে। ব্যাপারটী শুনতে খুব অদ্ভুত বটে, কিন্তু উপায়টি অতি সহজ। তিনি একটী আবর্ত্তনীয় কক্ষ (Revolving apartment) নির্ম্মাণ করেছেন। এই আবর্ত্তনীয় কক্ষটি আবার চার-পাঁচটী ছোট-ছোট কক্ষে বিভক্ত। একটাতে একখানি মোড়া খাট (folding bed) আছে, সেখানি ইচ্ছামত টেনে পাতা যায়, আবার মুড়ে তুলে রাখা যায়। একটীতে আয়না ও দেরাজওয়ালা একটা আলমারী আছে। একটিতে রাঁধবার ও খাবার সরঞ্জাম

মাকড়সার তৈরি মাছধরা জাল

মাকড়সার জালে মাছধরা

জলে ভাসা চেয়ার

মৎস্য-তরী

সমাপ্তপ্রায় সেতু

(৬০০ শত ফুট উচ্চ হইতে 'বায়ুপোত' গৃহীত চিত্র)

এক ঘণ্টায় সম্পূর্ণ সেতু
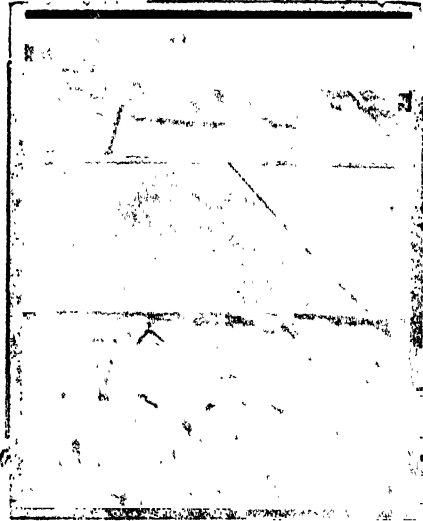
(৩৩০০ শত ফুট উচ্চ হইতে বায়ুপোতে গৃহীত চিত্র)

নূতন মানচিত্র
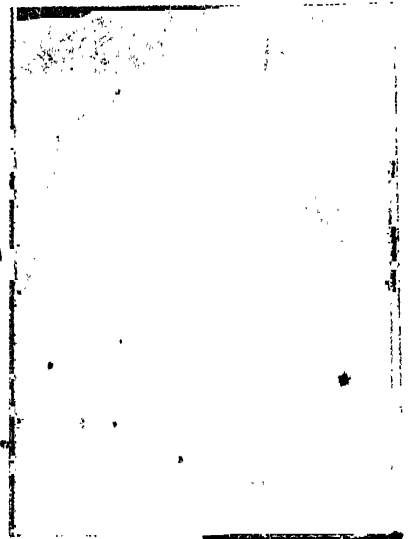
পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম উল্কাপিণ্ড

দেশের ছেলেদের জন্য আমেরিকায় খেলনা নিৰ্ম্মাণ হইতেছে
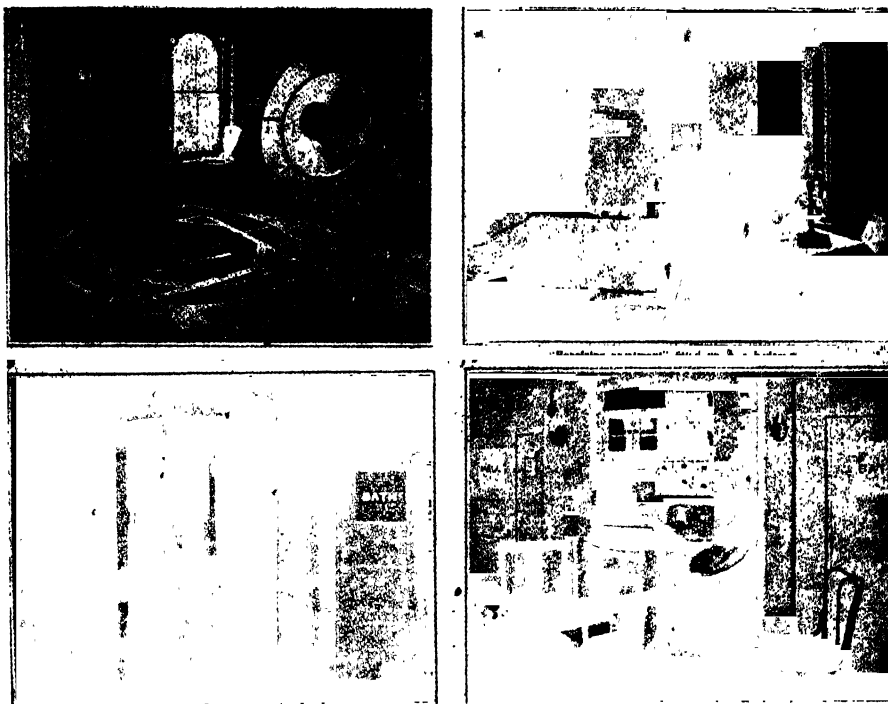
ক—গৃহকোণে "আবৰ্ত্তনীয় কক্ষ" স্থাপনের জন্য গোলার ছিদ্র ও তদনুসঙ্গিক 'ফ্রেম'। খ—মোড়া খাট টানিয়া গৃহটিকে শয়নকক্ষে পরিণত করা হইয়াছে। গ—খাটখানিকে মুড়িয়া রাখিয়া কক্ষটিকে প্রসাধনাগারে পরিণত করা। ঘ—কক্ষটিকে ভোজনগৃহ ও রন্ধনশালায় পরিণত করা।
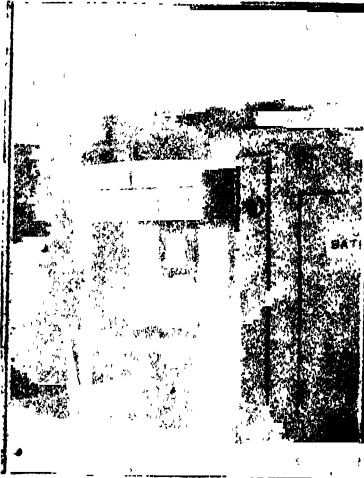
৬—কক্ষটীকে পাঠাগারে পরিণত করা।

পুর্ণসঞ্জীবন। (অর্দ্ধঘণ্টা পরে)

সমস্ত বন্দোবস্ত করা; একটীতে লিখবার টেবিল, 'বুক-কেস্' ইত্যাদি সাজানো আছে। ঘরের এক কোণে কাঠের মেঝে, এই আবর্ত্তনীয় কক্ষের মাপে গোল করে কেটে ফেলে, সেখানে এই নূতন আস্‌বাবটির জন্যে একটী 'ফ্রেম' বসাতে হয়। সেই 'ফ্রেমে' আঁটা প্যাঁচের উপর এই আবর্ত্তনীয় কক্ষটি সজ্জিত থাকে। সাম্‌নে একটি কাঠের 'পার্টিশান্' দেওয়া। পার্টিশানের একটী দিক এই আবর্ত্তনীয় কক্ষের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মাপে কাটা আছে। অন্যদিকে স্নানের ঘরের বন্দোবস্ত। পার্টিশানের যে অংশটুকু খোলা থাকে, সেইখানে, আবর্ত্তনীয় কক্ষের যখন যে প্রকোষ্ঠটি ঘুরিয়ে রাখা হয়, তখন সমস্ত ঘর-খানিই সেই প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে।

(Scientific American.)

বিমলিনা কমলিনী।

৮। ঝরা ফুলের মরা-বাঁচা।

মানুষ মাত্রেই ফুলের ভক্ত। ফুল ভালবাসে না এমন লোক বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। বাগান অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে অনেকেই ফুল হাতে কোরে বাড়ী ফেরেন। ফুলগুলি যদি খুব ভাল হয়—তাহ'লে তাঁরা বাড়ীতে এসে, একটা ফুলদানীতে অথবা ফুলদানীর অভাবে কাঁচের গেলাসে, শিশি বোতলে, কিম্বা নিদেন-পক্ষে ঘটিবাটিতেও একটু জল দিয়ে সেগুলি সাজিয়ে রাখেন,—যাতে তাঁর সেই প্রিয় পুষ্পগুচ্ছ অন্ততঃ আরও একটা দিন তাজা থাকে! কিন্তু অনেক ফুলবালা আবার এমন কোমলাঙ্গী আছেন যে, ডাল-ভেঙে তুলে আন্‌তে না আন্‌তেই পথের মাঝেই একেবারে এলিয়ে পড়েন; বাড়ী পর্য্যন্ত আর টাট্‌কা এসে পৌছোন না। ফুলের প্রেমিকরা তাতে প্রাণে বড় ব্যথা পান। বেল্‌ওয়ারী কাঁচের সৌখীন ফুলদানীতে সুবাসিত শীতল জলে সযত্নে স্থাপন করলেও সে সব ফুলের দুর্জ্জয় অভিমান কিছুতে দূর হয় না,—তারা তবুও তেম্‌নি মলিন মুখে মূর্চ্ছিতার মত একপাশে নুয়ে পড়ে থাকে। তাদের যদি কেউ মানভঞ্জন কোর্‌তে চান, বিরস কুসুমকুলের সেই নীরব পল্লবাধরে আবার যদি কেউ সরস প্রাণের প্রফুল্ল সজীবতা ফিরিয়ে আনবার অভিলাষী হন, তাহ'লে তাঁকে শীতল জলের পুষ্পাধারটী সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ কোর্‌তে হবে, আর তার বদলে গরম জলের পাত্র ব্যবহার কোর্‌তে হবে! ফুটন্ত জলের সঙ্গে অল্প খানিকটা সুরাসার (alcohol) মিশ্রিত করে তার ভেতর ফুলের গুচ্ছ বসিয়ে রাখ্‌লে আধ ঘণ্টার মধ্যেই শুষ্ক ফুল আবার মুঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে!

(Scientific American

যুদ্ধ-বন্দীর আত্মকাহিনী

[শ্রীআশুতোষ রায়]

(পূর্ব্বাভাষ—তৃতীয় পর্ব্ব)

একদিন খবর পাইলাম, বসোরার নীচে সাটেল্ আরব নদীর মধ্যে একটি মাইন (mine জল-নিহিত বোমা) পাওয়া গিয়াছে। সেটাকে নষ্ট করা হইবে। মাইন্ জিনিসটা কি এবং কিরূপে উহার ধ্বংসসাধন হইবে, তাহা দেখিবার জন্য আমরা সোৎসাহে নদী-তীরে সমবেত হইলাম। যেখানে মাইন (mine) ছিল, তাহার চারিপাশ হইতে জাহাজগুলিকে দূরে সরাইয়া দেওয়া হইল এবং সতর্কতা সহকারে বন্দুক ছোড়া হইতে লাগিল। মাইনটী আমরা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ভয়ানক একটা শব্দ হইয়া কর্দ্দমাক্ত জলরাশি প্রায় পঁচিশ ফিট ঊর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত হইল। এইরূপে মাইনটী নষ্ট করা হইল। এইরূপ মাইন ভূমধ্য সাগরের অনেক স্থানেই জার্ম্মাণেরা রাখিয়া দিয়াছিল। এই সব মাইনের সহিত জাহাজের সংঘর্ষ হইলেই, জাহাজগুলা কিরূপ দশা প্রাপ্ত হইত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতাম। এরূপ ঘটনায় জাহাজের একটী প্রাণীও রক্ষা পাইত না। আলি মুসা হইতে (সাটেল আরব যে স্থানে পারস্য উপসাগরে মিলিত হইয়াছে) বসোরা প্রায় সাতষট্টি মাইল। এই স্থানের মধ্যে কোন মাইন ছিল না, তাই রক্ষা।
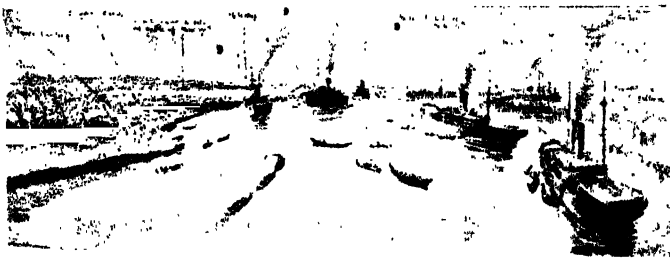
বেদুইন

টাইগ্রাস ও ইউফ্রেটিসের সঙ্গমস্থল (কুর্ণার নিকট)

যুদ্ধস্থল (সাটল আরবে ১৫ই ও ১৭ই নবেম্বর)

ষষ্ঠ ডিভিসনের সঙ্গে কাজ করিবার জন্য আমরা আদিষ্ট হইয়াছিলাম। আসারে (Ashar) আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, এই ষষ্ঠ ডিভিসন্ মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সর্ব্ব-বিষয়ে অগ্রণী হইবে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে

স্বীয় নাম অঙ্কিত করিবে। কিরূপে তাহা সংসাধিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন। 'আসারে' প্রায় দেড় মাসকাল অবস্থানের পর আমাদের যাত্রার ঢোল বাজিয়া উঠিল। ৭ই জুন্ 'কুর্ণা' অভিমুখে আমাদের অগ্রসর হইবার দিন স্থির হইল। তখন নদীর কুলে কুলে দশখানা ছোট ষ্টীমার, কুড়িখানা ফ্লাট (flat বা বড় নৌকা) লইয়া শ্রীমন্তের ডিঙ্গি সাজাইয়া সিংহল-যাত্রার ন্যায় যাত্রা করিল। জেনারেল ফ্রাই (General Fry) হইলেন আমাদের কর্ত্তা। আমি যে ষ্টীমারে ছিলাম, তাহাতে একটা পুরা গোরা পল্টন (Norfolk Regiment) স্থান লাভ করিল। আমাদের অগ্র পশ্চাতে দুইখানা ক্রুইজার (cruiser) রক্ষীবেশে গমন করিতে লাগিল। যুদ্ধ-জাহাজগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। উপরের রং বরফের মত সাদা। কিন্তু ইহার ভিতরে যে সকল ভীষণ ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র (কামান ইত্যাদি) সজ্জিত আছে, তাহা ভাবিলেও আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তাই মানুষের উপর দেখিয়া ভিতরের কালিমা সব সময়ে বুঝিতে পারা যায় না। আরও ২।৩ খানি কামানবাহী ছোট-ছোট ষ্টীমার সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। এইরূপ আড়ম্বরে

আসার প্রণালী

কুর্ণার কাষ্টল হাউসের ধ্বংসাবশেষ

ষ্টীমার প্রস্তুত—কুর্ণায়

আমরা গমন করিতে লাগিলাম। কিছুদূর যাইবার পর, একখানা উড়ো-জাহাজ নদীর উভয় পার্শ্বে শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য আমাদের অগ্রগামী হইল। উড়ো জাহাজখানা, অধিক উর্দ্ধ দিয়া যায় নাই। নদী-তীরবর্ত্তী আরব-পল্লীসমূহের বালক এবং স্ত্রীলোকেরা ষ্টীমারগুলি দেখিবার জন্য উৎফুল্ল হইয়া নদীতীরে আসিতেছিল; কিন্তু যেমন দেখিল যে প্রকাণ্ডকায় কি একটা দৈত্য তাহাদের মাথার উপরে উড়িয়া আসিতেছে, অমনি প্রাণভয়ে চীৎকার

করিয়া গ্রামের দিকে দৌড়িতে লাগিল। সে এক অভিনব দৃশ্য। দেখিয়া মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের 'জিন্' দানবের ধারণা তাহাদের মনে এখনও আছে; এবং তাহারা যে মানুষকে উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে, উড়ো-জাহাজ দেখিয়া তাহাও তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আমাদের ষ্টীমার-বাহিনী অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল। ভয়, পাছে কোথা হইতে শত্রু আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ করে। এইরূপে তৃতীয় দিবসে আমরা 'কুর্ণা'য় পৌছিলাম। তখন বেলা পাঁচটা,—দিবা অবসান প্রায়। তুর্কীরা বোধ হয় আমাদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। যেমন ষ্টীমার তীরের নিকটবর্ত্তী হইল, অমনি গুড়ুম্ করিয়া একটা তোপধ্বনি হইল। সে আওয়াজ লাট-বেলাট বা রাজা-মহারাজার অভ্যর্থনার জন্য ফাঁকা তোপধ্বনি নয়। তাহাতে মূর্ত্তিমান যম মহাশয়ের অধিষ্ঠান ছিল। তাই কবির

কুর্ণায় তুরস্ক অফিসারগণ

আলেপ্পোয় দরবেশদিগের নৃত্য

কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়, "কাঁপাইয়া খেজুর-বন, কাঁপাইয়া টিগ্রিস জল (Tigric water) উঠিল সে ধ্বনি।" এইরূপ একঘণ্টা ধরিয়া অভ্যর্থনার জের চলিল, টিগ্রিস্-নদী-তীরে পর্য্যবেক্ষণ-গৃহ (observation post) নির্ম্মিত হইয়াছিল। একজন কর্ম্মচারী উক্ত গৃহে উঠিয়া, দূরবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া, বিশেষ কিছুই নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। আমাদের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনার উত্তরে কিছুই বলা হইল না, অর্থাৎ প্রত্যুত্তরে একটা তোপও দাগা হইল না। তুর্কীর গোলা আসিয়া তীরস্থ রসদাদির গুদামের নিকট পড়িল বটে, কিন্তু একটাও ফাটিল না। দুইজন শাস্ত্রী প্রহরী অল্লাধিক আহত হইল মাত্র। ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল,—তুর্কীর অভ্যর্থনাও সে দিনের মত শেষ হইল। আমাদের নৌ-বহর টিগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিসের

কুর্ণায় তুরস্ক বন্দী
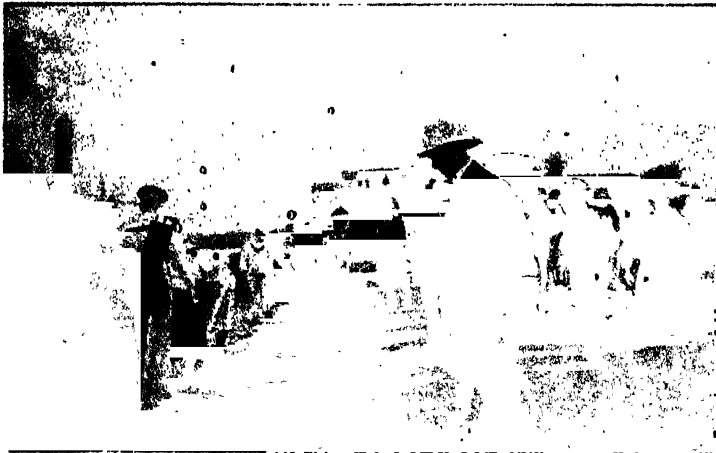
কুর্ণায় বন্দুক গ্রহণ

সঙ্গম-স্থলে গিয়া নঙ্গর করিল; এবং আমরাও আহারাদি সমাধা করিয়া, প্রাতঃকালে কি হয় দেখিবার আশায়, বিশ্রামলাভে মনোযোগী হইলাম।

এই অবকাশে পাঠকগণকে কুর্ণার বিষয় কিছু বলিয়া রাখি। কুর্ণা বা গুর্ণা (Kurna) টিগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিস্ নদীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। এই স্থান বসোরা হইতে ৪৯ মাইল। দক্ষিণদিকে টিগ্রিস এবং বামভাগে ইউফ্রেটিস প্রবাহিত। দুটিই সাট্‌ল আরবে মিলিত হইয়াছে; অথবা এই নদীদ্বয়ের মিলিত নাম সাট্‌ল-আরব। লক্ষ্মী-সরস্বতী যেন নারায়ণ পাদপদ্মে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছেন,—একজন প্রকৃতিমুখরা, অপরা চঞ্চলা। নদীদ্বয়ও সমধর্ম্মা বলিয়া

কুর্ণার যুদ্ধের মানচিত্র
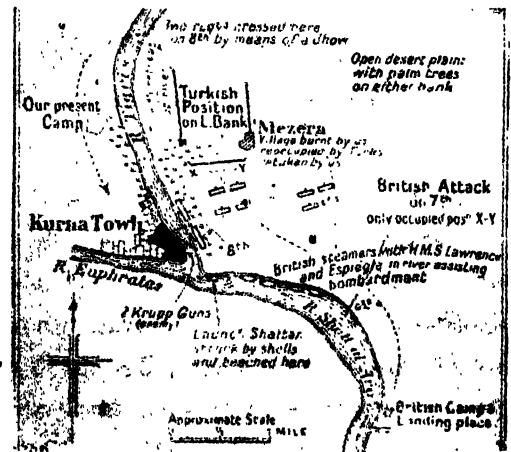
বোধ হয়। আরবেরা (Tigris) টাইগ্রিসকে তিগ্‌রিজ্ এবং (Euphrates) ইউফ্রেটিস্‌কে এফ্‌রাদ বলে। দুইটাই বাইবেলোক্ত বিখ্যাত নদী। সুতরাং এহেন নদী-দ্বয়ের সঙ্গমস্থল যে, বরুণা ও অসির সঙ্গমস্থলে অধিষ্ঠিত বারাণসী অথবা ত্রিবেণীসঙ্গমের প্রয়াগের ন্যায় বিখ্যাত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই কুর্ণাতেই নাকি স্বর্গোদ্যান (Garden of Paradise) ছিল; এবং বাইবেলোক্ত মানবজাতির আদি পিতামাতা আদম এবং ইভ বা হবা (Adam and Eve,) এই ইদন্ উদ্যানে (Garden of Eden) বাস করিতেন। এইখানেই শয়তানের পরামর্শে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া তাঁহাদের স্বর্গচ্যুতি ঘটে, এবং তাঁহারা ইদন উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত হন। পাপের সংস্পর্শ না কি এই প্রথম। সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফলও না কি আপেল (apple) বা সেভ ফল ভিন্ন আর কিছুই নয়। একটা পুরাতন বৃক্ষ দেখাইয়া দোভাষীরা (Interpreter) বলিল, 'ইহাই সেই জ্ঞানবৃক্ষ'। বৃক্ষটি দেখিয়া আমাদের কিন্তু তত প্রাচীন বলিয়া মনে হইল না; এবং এমন কোন বিশিষ্ট উদ্যানও দেখিলাম না, যাহাকে প্রকৃত উদ্যান নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এইখানেই যে স্বর্গোদ্যান প্রতিষ্ঠিত ছিল, তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেবলমাত্র একটা মিল এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাইবেল-লিখিত ইডন্ উদ্যান নামক স্থান টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিসের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত; এবং এই স্থানটিও উক্ত বর্ণনানুরূপ। ইহা হইতেই কেবল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ইহাই সেই বাইবেল-বর্ণিত স্বর্গোদ্যান-সমন্বিত স্থান। যাহা হউক, এহেন স্থানে মশার যে কি উপদ্রব তাহা বলিবার কথা নয়। মানুষের আদি পিতা-মাতার বাসোপযোগী উপযুক্ত স্থান বটে!

এখন আসল কথার অনুসরণ করা যাক। কবিদের নিদ্রাভঙ্গ হয় পাখীর সুমধুর প্রভাতী-সঙ্গীতে,—রাজারাজড়ার হয় বন্দীর স্তুতিগানে,—আর আমাদের ঘুম ভাঙ্গিল বজ্র-নিনাদী গভীর তোপ-গর্জ্জনে। ইহা তুর্কীর "মারহবা" বা সুপ্রভাতী অভিবাদন! আমরা ত্রস্তভাবে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। এইবার মুহুর্মুহু তোপধ্বনি হইতে লাগিল। ৮।১০টা আওয়াজের পর আমাদের পক্ষ হইতে প্রত্যভিবাদন করা হইল। আমাদের অগ্র-পশ্চাতে যে দুই যুদ্ধ-জাহাজ প্রহরীরূপে আসিয়াছিল, তাহারই পিছনের খানা হইতে এই (সম্ভাষণ) প্রত্যুত্তর। এ পর্য্যন্ত তুর্কীর যত গুলি গোলা আসিল, কোনটি ফাটিল বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু আমাদের গোলা গিয়া তুর্কী লাইনে পড়িয়া মহা হৈ-চৈ বাধাইয়া দিল। এইবার আমাদের উভয় রক্ষী-ক্রুইজারই পর-পর কামান দাগিতে লাগিল। তুর্কীদের ঘনঘন তোপধ্বনি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। আমরা দূরবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে যাহা দেখিলাম, তাহা অতি বিস্ময়কর! আমাদের গোলা গিয়া যখন শত্রু-শিবিরে ফাটিতেছে, তখন অনেকে হাত-পা ছড়াইয়া ভূমির উপর আপনার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ করিতেছে। কুর্ণা হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে, দ্বীপের মত একটা স্থানে তুর্কীরা আড্ডা গাড়িয়াছিল। সে স্থানটী কিছু উঁচু,—একটা টিলার মত। উক্ত স্থানের আড়ালে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তুর্কীরা অবস্থান করিতেছিল। সকল জায়গায় কিছু আবরণ ছিল না, সুতরাং গোলার কাজ বেশ ভালরূপ হইতেছিল। আবার নদীতীরে একটা প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান হইতে আমাদের প্রায় তিনশত সিপাহী এক-সঙ্গে বন্দুক ছুড়িতেছিল। এইরূপে ভোর পাঁচটা হইতে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ হইতে গোলাবর্ষণ হইবার পর তুর্কীরা শ্বেত পতাকা উড়াইয়া দিল। তখন আমাদের সিপাহীরা দলে-দলে মাহেলায় (mahella) করিয়া উক্ত দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইল এবং কিছুক্ষণ পরে দলে-দলে তুর্কী বন্দীদিগকে লইয়া আসিল। সর্ব্বসমেত সাতশত তুর্কী ও আরব ঐ দিনের যুদ্ধে বৃটিশ-রাজের হস্তে বন্দী হইল এবং কতক পলাইয়া গেল।

তথায় যুদ্ধশেষে দুই ঘণ্টা অবস্থানের পর পলায়নপর শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য আমাদের উপর আদেশ আসিল। বসোরার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা বা ওয়ালি সুভি-বে (Wail Subhi-Bey) কুর্ণায় তুর্কী-জেনারল্ হইয়া সৈন্য-পরিচালনা করিতেছিলেন। একখানা ক্রুইজার বন্দীদিগকে পাহারা দিয়া বসোরার দিকে রওয়ানা হইল—অপরখানি আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। ছোট-ছোট ২।৩ খানি গান্-বোট্ (Gun Boat) আমাদের সঙ্গে রহিল। কিয়দ্দূর যাইবার পর দেখিলাম, একখানা তুর্কীর ক্রুইজার গোলার আগুনে দাউ-দাউ জ্বলিতেছে। তাহার প্রধান কর্ম্মচারী (অধ্যক্ষ) এবং আর কতক গুলি নাবিক আমাদের ক্রুইজার কর্ত্তৃক

ধৃত এবং বন্দী হইয়াছে। আমাদের ক্রুইজারের একটা কামরার সামান্য রকম অনিষ্ট হইয়াছে। আমরা ধীরে-ধীরে আমারার (Amara) দিকে অগ্রসর হইলাম। পলায়মান তুর্কীরা যে আমাদের আগে-আগেই যাইতেছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ হরিৎ-তৃণাচ্ছাদিত কতকগুলি পর্ণকুটীর নদী-তীরবর্তী কোন-কোন স্থানে দেখিতে পাইলাম। তথায় ২।৪টি কুকুর প্রহরীস্বরূপ ছিল মাত্র। আমাদের আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। গুপ্তচর সংবাদ আনিল যে, পলায়নপর কতকগুলি তুর্কী-সৈন্য নাছিরিয়ার দিকে এবং আর কতকগুলি আমারার দিকে গিয়াছে। এই সব দেখিয়া-শুনিয়া একখানি গান্‌বোট আমাদের অগ্রবর্ত্তী হইল। জলপথ নিরাপদ কি না তাহা দেখা, এবং শত্রুর গতি-নির্দ্ধারণ করা এই গমনের উদ্দেশ্য। এইরূপে আমরা ক্রমাগত চলিয়াছি। নদীর উভয় তীরে দর্শনীয় কোন বস্তু নাই। তৃতীয় দিন বেলা প্রায় ৯টার সময় কি একটা কালো জিনিস নদীতে ভাসিতে দেখিয়া আমাদের ষ্টীমারের কম্যান্ডার তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন, অমনি সশব্দে পঙ্কিল জলরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখন বুঝা গেল, সে একটা মাইন্ (জল-নিক্ষিপ্ত বোমা); পলাইবার পূর্ব্বে তুর্কীরা নদীমধ্যে উহা রাখিয়া গিয়াছে। খুব একটা ফাঁড়া কাটিয়া গেল; নতুবা সেই দিনই একসঙ্গে কিঞ্চিদধিক এক সহস্র লোক টিগ্রিস্ নদীগর্ভে চিরতরে সমাধিলাভ করিতাম! কর্ম্মভোগ অনেক আছে, তাই সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম। এই ঘটনার পর হইতে ষ্টীমার আরও ধীরে-ধীরে এবং খুব সতর্কতার সহিত চলিতে লাগিল। এই দিকে নদীর পরিসরও এক-এক স্থানে অতি অল্প। তবে বেশ গভীর বলিয়া ষ্টীমার গমনের কোন অসুবিধা ছিল না। চতুর্থ দিনে বেদুইন বা বদ্দু (Bedouin) আরবদিগের কতকগুলি কাল কম্বলের তাঁবু দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জাতি লুঠেরা এবং অসভ্য। তাহারা এক সঙ্গে অনেকগুলি ষ্টীমার জীবনে কখন দেখে নাই। মেয়ে-পুরুষে আনন্দ-কোলাহল করিয়া নদীতীরে ছুটিয়া আসিল। বালক-বালিকারা ষ্টীমারের সঙ্গে-সঙ্গে নদীতীর দিয়া ছুটিতে লাগিল এবং মুখ ও পেট দেখাইয়া ইসারায় খাদ্য যাঞ্চা করিল। গোরা-সৈন্যদল কৌতূহলপরবশ হইয়া মাংসের টিন, সিগারেটের বাক্স, পাউরুটী ফেলিয়া দিতে লাগিল। বালক-বালিকাগণ উক্ত জিনিসগুলি পাইয়া মহা আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল, পুরুষেরা তাহাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল। সে নাচ যেমন-তেমন নয়—উদ্দাম নৃত্য। এইরূপ নাচ আরব দরবেশদিগের মধ্যে একবার দেখিয়াছিলাম এবং চীন লামাদিগের মধ্যেও দেখিয়াছি; এই সবগুলিই একই ধরণের নৃত্য বলিয়া মনে হয়।

পঞ্চম দিন প্রাতঃকালে দূরে বৃক্ষরাজি মধ্যে একটা সবুজ রংয়ের গুম্বজ দেখিতে পাইলাম। বালসূর্য্যরশ্মি উহার উপর প্রতিফলিত হইয়া আরও মনোরম দেখাইতেছিল। ক্রমে ষ্টীমার নিকটবর্ত্তী হইয়া উক্ত গুম্বজের নিকট নঙ্গর করিলে, আমরা উহা ভালরূপে দেখিবার সুযোগ পাইলাম। গুম্বজটি ঠিক নদীতীরে নির্ম্মিত। শুনিলাম, এটা আরমানীদের পয়গম্বর এজ্‌রার সমাধিস্থান (Ezra's Tomb); সুতরাং আরমানিদের প্রধান তীর্থস্থানের মধ্যে একতম। বৎসরের মধ্যে নানাস্থানবাসী বহু আরমানি স্ত্রী-পুরুষের এখানে সমাগম হইয়া থাকে। সমাধিটি সবুজ বর্ণের চীনা-মাটির টাইল দ্বারা প্রস্তুত। যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। সেদিনকার মত এইখানেই আমাদের বিশ্রাম করিবার হুকুম হইল।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন রাত্রিশেষে শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত ধবল গঙ্গা-সৈকতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। প্রতিপদের পূর্ণচন্দ্র দূর দিগন্ত রজতাভ করিয়া তুলিয়াছিল, শীতল লঘু নৈশ সমীরণ বীচিবিক্ষুব্ধ ভাগিরথী-বক্ষ ঈষৎ স্পর্শ করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছিল। মধ্যে-মধ্যে নিশাচর পক্ষী কর্কশ রবে সে স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের মাধুর্য্য নষ্ট করিতেছিল। নূতন নগরী মুর্শিদাবাদের পদ-প্রান্তে শীতকালে ভাগিরথী শীর্ণকায়া, স্বল্পতোয়া। আর্দ্র-সৈকতে বসিয়া সে ব্যক্তি গুন্‌গুন্‌ করিয়া গাহিতেছিল এবং ক্ষিপ্রহস্তে সিক্ত বালুকা লইয়া অপূর্ব্ব মন্দির ও প্রাসাদ-শিখর নির্ম্মাণ করিতেছিল।

বহুদূরে আর একজন পুরুষ আদ্র সৈকতাবলম্বনে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিল। দীর্ঘকায় পুরুষ তাহা লক্ষ্য করে নাই। আগন্তুক নিকটবর্ত্তী হইলেও তাহার পদশব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। দূর হইতে জ্যোৎস্না-ধারায় স্নাত সুগঠিত অবয়ব দেখিয়া আগন্তুক চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। সহসা সুদূর দিগন্ত কম্পিত করিয়া সঙ্গীত উত্থিত হইল; স্তব্ধ জগত পুলকিত হইয়া উঠিল; নিশ্চল পাষাণ যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। দীর্ঘাকার পুরুষ তাহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—

"মহেশং সুরেশং সুরারাতি নাশং
বিভুং বিশ্বনাথং মহাদেবমেকং
স্মরারিং স্মরামি।"

বিপুল পুলকে দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল, জ্যোৎস্না-ধবলিত বীচিবিক্ষুব্ধ গঙ্গাবক্ষে তাহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইল। গায়কের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারিত, হইল, "ভাই!" কম্পিতকলেবর দৃঢ়ালিঙ্গনে বদ্ধ হইল। নিশ্চল জগৎ যেন আবার স্তব্ধ হইল।

অর্দ্ধদণ্ড পরে আগন্তুক কহিল, "চলিয়া আসিলি ত বলিয়া আসিলি না কেন?" দীর্ঘাকার পুরুষ কহিল, "বলিয়া ত আসিয়াছি।"

"কই বলিয়া আসিয়াছিলি ভাই? স্পষ্ট করিয়া যদি বলতিস?"

"বলিলে কি এত সহজে ছাড়ান পাইতাম ভাই?"

"আমি কি তোকে ধরিয়া রাখিতে পারিতাম?"

"ধরিয়া না রাখ, তুমি, বৌদিদি ও দুর্গা কাঁদিয়া ও চীৎকার করিয়া গ্রামের অর্দ্ধেক লোক একত্র করিতে। তখন আমার ও ভূপেনের পক্ষে সহজে চলিয়া আসা বড় কষ্টকর হইত।"

"তাহা সত্য। কোথায় যাইবি?"

"তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। দেখ সুদর্শন! নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান। কাল যখন পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আসি, তখন ভাবিয়াছিলাম যে দিকে দুই চোখ যায়, সেইদিকেই যাইব। পথে ভগবান অবলম্বন জুটাইয়া দিলেন। কাল সন্ধ্যাবেলায় ভূপেন এক মুসলমানের জন্য খাবার চাহিতে গিয়াছিল, মনে আছে?"

"আছে।"

"সে ব্যক্তি বাদশাহের পৌত্র। মনে করিয়াছিলাম তাহাকে লালবাগের পথ দেখাইয়া দিয়া আমরা অন্যত্র চলিয়া যাইব; কিন্তু গঙ্গার পূর্ব্বপারে আসিয়া তাহার চেহারা বদলাইয়া গেল। একজন সওয়ার তাহাকে সেলাম করিল, আর সে তাহাকে হুকুম করিল যেন আমাদিগকে মহলে পৌঁছাইয়া দেয়। সওয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল শাহজাদ সাহিব-ই-জমান্‌।"

"বাবা! অর্থ কি ভাই?"

"অর্থাৎ রাজপুত্র বর্ত্তমানে পূজনীয়। সম্রাটবংশীয় ব্যক্তিমাত্রেই শেষের উপাধিতে পরিচিত। এখন বাঙ্গলা-দেশে বাদশাহের প্রপৌত্র ফর্‌রুখসিয়ার ব্যতীত আর কোন রাজপুত্র আছে বলিয়া বোধ হয় না।"

"রাজভোগ খাইলে কেমন?"

"মন্দ নয়, গৃহত্যাগ করিয়া অবধি জলবিন্দুও মুখে দিই নাই।"

"সে আবার কি কথা, তুমি কি কয়েদী নাকি ?"

"কয়েদী হইতে যাইব কেন ? দেখিতে পাইতেছ, রাত্রি তৃতীয় যামের শেষে মুক্ত ভাগীরথীবক্ষে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে শীতল নৈশ সমীরণ সেবা করিতেছি ?"

"রাজপ্রাসাদে অতিথি হইলে, আহারের কথাটা কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না ?"

"না, আমাদের খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক আছে কি না, এ কথা এখনও বোধ হয় কাহারও জিজ্ঞাসা করিবার সময় হয় নাই

"ভাল ? আছ কেমন ?"

"মন্দ নহে। গাহিয়া বাজাইয়া রাত্রিটা কাটিয়া গেল।"

"বল কি ?"

"সত্য কথা, মহলের চারিদিকে অসংখ্য তাম্বুতে রাজপুত ও মোগল সেনা আছে। প্রথমে আসিয়া এক জমাদারের তাম্বুর বাহিরে বসিলাম। ক্রমে দ্বিতীয় প্রহরের নহবৎ বাজিয়া গেল ; কোন খবরই নাই। কি করি, আপন মনে গুণগুণ করিয়া গান ধরিয়াছিলাম। তাহা শুনিয়া জমাদার তাম্বুর ভিতরে লইয়া গেল, শতরঞ্চি পাতিয়া দিল, গঞ্জিকা সাজিয়া ধূমপান করিতে আহ্বান করিল, খাই না শুনিয়া দুঃখিত হইল ; অবশেষে আর একজনের নিকট হইতে বাঁয়া-তবলা চাহিয়া আনিল। আসর জমিয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমেই বল আর দুর্ভাগ্যক্রমেই বল, ঠিক সেই সময়ে শাহজাদার মজলিসে একজন তবলচীর অভাব পড়িল, তাবলচী বোধ হয় আফিমের মাত্রাটা চড়াইয়া দিয়াছিল, সুতরাং যথাসময়ে শাহজাদার মজলিসে পেশ হইতে পারে নাই। একজন মু-সাহিব জমাদারের তাম্বুর পাশ দিয়া যাইবার সময় ভূপেনের সিদ্ধহস্তের সঙ্গত শুনিয়া গিয়াছিল। শাহজাদার মজলিসে যখন তবলচীর অভাব হইল, তখন সে নূতন তবলচীর সংবাদ দিয়া বাহবা পাইল। যথাসময়ে জমাদারের তাম্বু ও মলিন ছিন্ন সতরঞ্চি হইতে শাহজাদার খাস মজলিসে ঈরাণী গালিচায় বদলী হইলাম। মজলিস এইমাত্র শেষ হইয়াছে ; শাহজাদা রাজকার্য্যের পরামর্শ করিতে গোসাখানায় গিয়াছেন। আমি সেই অবসরে সমস্ত রাত্রি জাগরণের পরে মাথাটায় হাওয়া লাগাইতেছি। তুমি আসিলে ভালই হইল সুদর্শন ! আবার কবে দেখা হইবে, তাহা ত বলিতে পারি না ?"

"তবে আর দেশে ফিরবি না ভাই ?"

"ফিরিব না কেন, অবশ্য ফিরিব। যখন অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজের গুজরাণ নিজে করিতে পারিব, তখন আবার দেশে ফিরিব, আবার তোমাদের দেখিয়া সুখী হইব। দেখ ভাই, বড় সুখে দিন কাটিয়াছে, এত সুখ জীবনে আর পাইব কি না সন্দেহ। যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, একবার আসিয়া তোমাদের দেখিয়া যাইব।"

"দেখ্ অসীম ! আমি ত পাগল মানুষ, গান-বাজনা লইয়াই থাকি ; আমি যে তোকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব, তাহাও বোধ হয় না। তুই কবে দেশে ফিরিবি, তাহা বলিতে পারি না, আমার বোধ হয় শীঘ্রই তোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

দূরে পদশব্দ শ্রুত হইল, উভয়ে চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। একজন হরকরা দ্রুতপদে আসিয়া কহিল, "জহাঁপনা আপনাকে তলব করিয়াছেন।" তাহা শুনিয়া অসীম কহিলেন, "ফিরিয়া যাও ভাই, একদিন দেখা হইবেই। দেখ সুদর্শন, কাল রাত্রিতে দুর্গা একটা অন্যায় কার্য্য করিয়াছে ; তাহার ফল যে কতদূর গড়াইবে বলিতে পারি না। কাল রাত্রিতে যখন তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসি, তখন সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে আমরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়াছি। সে অন্ধকারে খিড়কীর দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া ষষ্ঠীতলার মাঠে আমার সহিত দেখা করিয়াছিল। সে কেন আসিয়াছিল জান ?"

"না, কিন্তু তাহাতে হইয়াছে কি ?"

"সে তাহার স্বামীর চিরসঞ্চিত অর্থ ভূপেনকে দিতে আসিয়াছিল। হইয়াছে কি তাহা পরে বুঝিতে পারিবে। কারণ সে যখন ফিরিয়া যায়, তখন নবীন নাপিত তাহাকে ও আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল।"

"কোন্ নবীন ?"

"ঘোষেদের বাড়ীর প্রাতঃস্মরণীয়া বড়গৃহিণীর জার।"

"সেজন্য চিন্তা করিও না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নে চিন্তাক্লিষ্ট বদনে বৃদ্ধ হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার ধীর পাদক্ষেপে সুবা বাঙ্গলার প্রধান কাননগই হরনারায়ণ রায়ের প্রাসাদসম অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। হরনারায়ণ তখন আহারান্তে বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, সুদীর্ঘ কারুকার্য্যখচিত আলবোলার সটকায় মুখ লাগাইয়া হরনারায়ণ তন্দ্রামগ্ন হইয়াছিলেন; শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া একজন ভৃত্য তাঁহার পদসেবা করিতেছিল। বিদ্যালঙ্কারের পদশব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ভট্‌চাজ যে, অসময়ে কি মনে করিয়া?" হরিনারায়ণ বিষণ্ন বদনে কহিলেন, "বড় বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি ভাই, এখন তুমি উদ্ধার না করিলে আর মান থাকে না।"

"তোমার আবার বিপদ কি হে? পরের চাকুরী কর না, কোন ঝঞ্ঝাট নাই, উদরান্নের জন্য পরিশ্রম করিতে হয় না, আমি ত দেখি যে শাহ আলম আর তোমাতে কোন প্রভেদ নাই।"

"রহস্যের সময় নয় হর, বিষম বিপদে পড়িয়াছি; এখন তুমি রক্ষা না করিলে আমার আর উপায় নাই।"

হরিনারায়ণ শর্য্যার এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। হরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কি গুরুতর কথা হে।"

"অক্ষয় গাঙ্গুলি আর হরিকেশব চট্টোপাধ্যায় ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে সমাজচ্যুত করিয়াছে।"

তোমাকে সমাজচ্যুত? বল কি? তুমি হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার একটা দেশবিখ্যাত পণ্ডিত; তোমার ভয়ে বাঙ্গলাদেশের সকল কুলীন একঘাটে জল খায়; আর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অক্ষয় গাঙ্গুলি আর হরিকেশব চট্টোপাধ্যায় তোমাকে সমাজচ্যুত করিল? তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছ না কি?"

"স্বপ্ন নহে ভাই, বিষম সত্য। হরিকেশব লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে যে, আজি হইতে আমার রজক নাপিত বন্ধ। দুর্গাকে যদি দূর করিয়া দিই এবং যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ সমাজ আমাকে পুনরায় গ্রহণ করিবে।"

"দুর্গার অপরাধ?"

"সে ব্যাভিচারিণী।"

"এ কথা কে বলে?"

"তোমার স্ত্রী।"

"আমার স্ত্রী?"

"হাঁ তোমার স্ত্রী!"

"প্রমাণ?"

"নবীন নরসুন্দর।"

"তুমি কি পাগল হইয়াছ? এখন দাবায় বসিবে বলিতে পার?"

"শুন হর! কল্য রাত্রিতে অসীম ও ভূপেন্দ্র যখন গৃহত্যাগ করিয়া যায়, তখন দুর্গা ভূপেনের জন্য অত্যন্ত কাতরা হইয়া অন্ধকারে একাকিনী ষষ্ঠিতলায় গিয়া তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া আসিয়াছিল। সেই সময়ে নবীন নাপিত তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিল। দুর্গা যদি আর কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইত, তাহাহইলে কোন কথা হয় ত উঠিত না; কিন্তু সে শৈশব হইতে ভূপেনকে লালন-পালন করিয়াছে এবং তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করে; সে দেশত্যাগ করিয়া যাইতেছে শুনিয়া দুর্গা দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল। আমি এখানে ছিলাম বটে, কিন্তু সুদর্শন ত গৃহে ছিল; দুর্গা সচ্ছন্দে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিত। নবীন তখনই আসিয়া গৃহিণীকে জানায় যে, সে একপ্রহর রাত্রিতে অন্ধকারে মাঠে অসীম ও দুর্গাকে দেখিয়া আসিয়াছে। অদ্য প্রভাতে তোমার পত্নীর আদেশমত নবীন এ কথা গ্রামময় প্রচার করিয়াছে এবং তাহারই আদেশমত গ্রামের সমস্ত কুলীন অক্ষয় গাঙ্গুলির গৃহে সমবেত হইয়া আমাকে সমাজচ্যুত করিয়াছে। দেখ ভাই, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তোমার আশ্রিত; যদি কোন কারণে অসীম তোমার বা গৃহিণীর অপ্রিয় হইয়া থাকে, সে জন্য আমি শাস্তি পাই কেন?"

"কি বল ভট্‌চাজ, গৃহিণী কায়স্থের মেয়ে, আর তোমরা ব্রাহ্মণ, নরদেবতা; কায়স্থ-কন্যার কথায় ব্রাহ্মণ সমাজচ্যুত হয়, একথা বলিলে লোকে যে হাসিবে? তুমি শান্ত হও, দাবা পাড়িতে বলিব?"

"কলির ব্রাহ্মণ সব করে ভাই। দাবা ত খেলিবই, কিন্তু মন স্থির করিতে পারিতেছি কৈ? হরিকেশবের

সধবা কন্যা যখন রূপবান্ গুণবান্ স্বামী পরিত্যাগ করিয়া যবনের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তখন তোমার সাহায্যে আমি তাহার জাতিরক্ষা করিয়াছিলাম। কৃতজ্ঞ হরিকেশব আজি তাহার প্রতিদান দিয়াছে। অক্ষয় ঘোর মূর্খ, ব্রাহ্মণ-সমাজে সে সর্ব্বদা কৌলীন্যের দোহাই দিয়া মাল্যচন্দনের দাবী করে; আমিও প্রতিবার তাহার প্রতিবাদ করি। এতদিন এই বিদ্যাহীন, আচারবিহীন কুলীনের সন্তানগুলি কুক্কুরের ন্যায় আমার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ফিরিয়াছে। আজি তোমার পত্নীর আশ্বাস পাইয়া তাহারা আমাকে এই অপমান করিতে সাহসী হইয়াছে। হর! তোমার ভরসায় এই গ্রামে বাস করি, আমার উচ্চ মস্তক কখনও নত হয় নাই। বন্ধু! আজি প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য কর; তোমার কটাক্ষপাতে কুলীন-সমাজ শাসিত হইবে। আমার কন্যা অসতী নহে।"

"তাই ত ভট্চাজ্, বড় বিপদে ফেলিলে!"

"তোমার আবার বিপদ কি?"

"লোকের মুখ কি করিয়া বন্ধ করিব?"

"সেখানে ত ভূপেন ছিল।"

"কথাটা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত হইল, আরে পাগল সে যে অন্ধ।"

"তবে তুমিও কি বিশ্বাস কর?"

"বিশ্বাসের কথা নয় ভট্চাজ্, এ প্রমাণের কথা, সাক্ষী-সাবুদের কথা।"

"তুমি অক্ষয় ও হরিকেশবকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেই সকল কথা মিটিয়া যাইবে।"

"দেখ ভট্চাজ্, আমি কায়স্থ, ব্রাহ্মণ-সমাজের কথায় হস্তক্ষেপ করা কি আমার উচিত হইবে?"

"সে কি কথা হর? হরিকেশবের কন্যার বেলায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলে কি বলিয়া?"

"তখন তোমরা আমার কথা রাখিয়াছিলে; আর এখন যদি না রাখ? সেটা কিন্তু হরনারায়ণ রায়ের পক্ষে বড়ই অপমানের কথা।"

"হর, তুমি আমার বাল্যবন্ধু; তুমি দুর্গাকে বাল্যাবধি জান। সে অসতী নহে। ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া স্নেহের বশে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। সুযোগ পাইয়া আমার শত্রুরা আমাকে নির্য্যাতন করিতেছে। এ সময়ে তুমি রক্ষা না করিলে আমাকে লাঞ্ছিত হইয়া দেশত্যাগ করিতে হইবে।"

"বড়ই দুঃখের কথা ভাই।"

"তবে তোমার ইচ্ছা কি?"

"আমার ইচ্ছা কি, তাহা কি তোমার অবিদিত?"

"বন্ধু! বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, তুমি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। আমাকে রক্ষা কর, বৃদ্ধ বয়সে নির্ব্বাসনে পাঠাইও না।"

"আমার কি সাধ যে, তুমি গ্রাম ত্যাগ কর; কিন্তু কি করিব ভাই, আমি কায়স্থ, ব্রাহ্মণ সমাজের কোন কথায় আমার হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।"

"তবে আমার কি উপায় হইবে?"

"দুই-চারি দিন বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া দেখ, অবশ্যই ইহাদের মনে দয়া হইবে।"

"সে কার্য্য হরিনারায়ণের দ্বারা হইবে না।"

"আমি ত অন্য উপায় দেখি না।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ ভূমিতে দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া রহিলেন; পরে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া তীরবেগে প্রস্থান করিলেন। হরনারায়ণ ইষৎ হাসিলেন।

(ক্রমশঃ)

রামচন্দ্র

[শ্রীযামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত]

যাঁর পুণ্যোজ্জ্বল চিত্র আঁকিবার তরে,
অমল তমসানীর, ছন্দের লহরে,
ব্যাকুল কামনা দিল ঋষির হৃদয়ে,
অমল তমসাতটে পূত গন্ধ ল'য়ে,
বহমান পবনের আকুল পরশে
ফুটিল কবিতা কলি ঋষির মানসে;
হোমের অনল দীপ্ত গৃহে অযোধ্যার
উঠে যবে বেদ-মন্ত্রে সঙ্গীত-ঝঙ্কার,
পবিত্রিয়া মন-প্রাণ রামায়ণ-গানে,
তখনি বিস্ময়ে চাহি যজ্ঞ-ধূমপানে
ভাবি মনে বেদ-মন্ত্র, সোপানে-সোপানে
ধাইছে স্বর্গের পানে, পূর্ণ পুণ্য-ছবি
আনিবারে; হোম-গন্ধে দেয় যেন কবি,
পূর্ণ করি ছন্দে-ছন্দে রামনাম গান,
জাগে হৃদে তেজ, ক্ষমা, পূর্ণতার ধ্যান।
তারকা রাক্ষসী-নাশে ধনুর টঙ্কার,
শিশু রামে বীরত্বের প্রথম ওঙ্কার—
বিশ্ব অকল্যাণ নাশে উঠিল ধ্বনিয়া।
মিথিলার রাজ-সভা, বিস্ময়ে চাহিয়া
দেখে হর-ধনু-ভঙ্গ; বিশ্ব-বীরপনা
রামের চরণে লুটি লভিল লাঞ্ছনা।
রাজর্ষি রক্ষিত যত্নে, শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,
নিলা বীর, বীরত্বের যোগ্য পুরস্কার!
ছন্দের পুরবী গাহে, যৌবন-সন্ধ্যায়
নিবে গেছে ভোগাতপ, পুণ্য জোছনায়,
শুভ্র করি দিছে তাঁর কৃষ্ণ কেশরাশি,
বৃদ্ধ রাজা দশরথ, আরামের হাসি
ভাসিল আননে তাঁর। ডাকি স্নেহভরে
বিশাল সাম্রাজ্য-ভার, রামচন্দ্র করে,
সঁপিতে চাহিল রাজা, পরম আনন্দে
পিতার আদেশ জানি শির নমি বন্দে।

ঘুরিল নিয়তি-চক্র, মুহূর্ত্ত ভিতরে
নির্দ্দোষীর দণ্ডবিধি, নির্ব্বাসন তরে
করিল ঘোষণা, অযোধ্যার রাজনীতি;
উঠিল করুণ-সুরে, সে কলঙ্ক-গীতি।
অচল অটল রাম তখনো আনন্দে,
পিতার আদেশ-বাণী শির নমি বন্দে;
উদয়াস্ত গগনের সীমান্ত রেখায়,
জ্বলে রবি সুখে, দুঃখে সম কান্তি ছায়।
পত্নী-প্রেমে আত্মহারা প্রসন্ন মানসে
পড়িল ভ্রান্তির ছায়া, আবেগ পরশে,
স্বর্ণ-মৃগ অসম্ভব! তবু তা'র তরে,
ধাইছে পশ্চাতে রাম দিতে পত্নীকরে।
বিরাট রাক্ষসী-শক্তি, প্রেমের প্রতিমা
হ'রিলা রামেরে ছলি, লঙ্কার গরিমা,
বাড়ায়ে তুলিলা দম্ভে, যাঁর কণ্ঠে হার
পড়াতে হইত মনে ভয়ের সঞ্চার
দারুণ বিচ্ছেদ গণি। মহাপারাবার,
সে মিলন ভাঙ্গি গড়ে, দীর্ঘ ব্যবধান,
সে বিচ্ছেদে ফুটে উঠে বিশ্ব-অকল্যাণ।
আকুল হইলা রাম, প্রেমের পরশে,
পাষাণ কুসুম সম উঠিল হরষে
ভাসিয়া সাগর-জলে। সেতু-পথ দিয়া
নিয়ে এল প্রেমরাশি, প্রিয়ারে বহিয়া।
যে শক্তি বিংশতি বাহু করিয়া বিস্তার
ভ'রে দিল দশদিকে দৈন্য হাহাকার,
সে শক্তি বিনাশি রাম ধরার কল্যাণ
আনিলা শান্তির হাসি, গাহে "জয়গান"
বিশ্বে নর, স্বর্গে দেব। তুলাদণ্ড ধরি
বুঝে সতী-মাণ বীর; উঠিল শিহরি
অনল,—বিস্ময়ে মৌন সতীর প্রভায়
বিজয়-গৌরব বহি অতি দ্রুত ধায়

দেবযান পুষ্পরথ, মুছি অশ্রুধার
হাসিলা অযোধ্যা পুনঃ। দুর্ম্মুখ আবার,
ঘোষিল দারুণ বার্ত্তা। প্রজার পালনে
কঠিন কুলিশ রাম, আদেশি লক্ষ্মণে
সীতা-নির্ব্বাসনবার্ত্তা করিলা প্রচার;
সে দিন কি অশ্রুধারা পড়ে নাই তাঁর?
সে দিন কি আদেশের প্রত্যেক অক্ষর
উচ্চারিতে বাষ্পরুদ্ধ হয় নাই স্বর?
অশ্বমেধে ছুটে অশ্ব, বিজয়-ঘোষণা
রুদ্ধ হ'ল শিশু-করে, সতীর লাঞ্ছনা
নিল প্রতিশোধ বুঝি; বীরের সম্মান,
দিলা শিশু পুত্রে রাম; রামায়ণ গান
অযোধ্যা-প্রাসাদ ভরি, উঠিল ধ্বনিয়া
অশ্রুসিক্ত নেত্রে রাম উঠে শিহরিয়া।
তপঃকৃশ-পুণ্যজ্যোতি ঋষি বাল্মীকির
দাঁড়াইলা সীতাদেবী শান্ত স্থির ধীর
উজলিয়া রাজসভা, পুণ্যের পরশে
হাসিল অযোধ্যাপুরী। উঠিল হরষে
"জয় সীতাদেবী জয়" কোটি কণ্ঠ ভরি।
তবুও রামের দৃষ্টি, সন্দেহ বিতরি
চাহিছে সীতার পানে। না পারিলা আর
সহিতে ধরণী মাতা, দুঃখ তনয়ার;
নিলা তুলি নিজ কোলে, রামের জীবন
কবির করুণ সুরে হ'ল সমাপন।

কত মাস কত বর্ষ তমসার তীরে,
কেটে গেছে মহাকবি! কত গেছে ফিরে
প্রভাত সন্ধ্যার ছবি। সে কোন্ সন্ধ্যায়,
প্রভাত আলোকে কোন্, প্রথমে ধরায়
ছন্দ এল দেবীরূপে তোমার সুমুখে?
তাঁর পূজা-মন্ত্র ভাষা দিতে তব বুকে
উঠিল স্পন্দন গুরু। ব্যাকুল বেদন,
ছুটিল স্বর্গের দ্বারে। টলিল আসন
বিধাতার, পূজা-মন্ত্র দেবর্ষি বহিয়া
তমসার পুণ্যতটে আসিলা নামিয়া,
দেবর্ষির বীণা-গানে উঠিতেছে ভরি
মধুময় রামনাম; উঠিছে শিহরি,
তমসার তট, জল, গাছ নাম-গান
যাঁর পদস্পর্শে ধরা হ'ল তীর্থস্থান।
সম্পদে পড়েনি ঢলি, দুঃখে যেই স্থির
শক্তি যাঁর, ক্ষমা দলি নহে উচ্চশির,
শুনাও সে প্রেম-গীতি ছন্দের ঝঙ্কারে,
প্রেমের ভিখারী যেই চণ্ডালের দ্বারে।
অতিক্রমি বিন্ধ্যাচল দক্ষিণ ভারতে
ছুটি যাঁর প্রেমরাশি, বিদ্বেষের পথে
গড়িল মিলন-ঘর; অনার্য্যের করে
সঁপে দিলা নিজ কর; লঙ্কার সমরে
জগতের নিষ্ঠুরতা, পাপ, অকল্যাণ,
যে মিলন-পুণ্যস্পর্শে হ'ল তিরোধান।
কহ সেই বার্ত্তা, যেই, আনিল প্রথম
মানব শৈশবযুগে স্বচ্ছ নিরুপম;
শুনাও জগতে, যাঁর চরণ পরশে
পাষাণ রমণীমূর্ত্তি জাগিল হরষে;
লহ নাম, যেই নাম মরণে স্মরণে
অমৃতের ধারা ঢালি নিখিল ভুবনে।
দেবতা শিখায়ে দিল দেবতা আঁকিতে
মানব-প্রকৃতি মাঝে বিশ্ব বিমোহিতে।
দেবতা মানবীমূর্ত্তি নিতে ধরা পরে
নেমে আসে স্বর্গ হ'তে ধন্য করি নরে।
যবে রামচন্দ্র নিলা ধরা-অধিকার,
বুঝে নর, কত উচ্চে নরত্ব তাঁহার।

মধু-মহোৎসব

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

"যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ-তীরে"

বিগত ১২ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী গিয়াছে। এই দিনে বঙ্গের গৃহে-গৃহে, পল্লীতে-পল্লীতে, মণ্ডপে-মণ্ডপে ব্রহ্মলোকবাসিনী বীণাপাণির পূজা হইয়া থাকে। এই বৎসরে শ্রীপঞ্চমীর সেই মহা শুভদিনে বঙ্গের একটী নিভৃত পল্লীতে বাণী-বরপুত্র মধুসূদনের স্মৃতি-পূজা হইয়া গিয়াছে। মায়ের পূজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ছেলের স্মৃতি-পূজার চির-মধুর স্মৃতি সহস্র কুমুদ-কহ্লারের স্বর্গীয় সৌরভে, দিগন্ত উদ্ভাসিত সৌন্দর্য্যে, সহস্র-দলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা মধুসূদনের জন্মতিথি-উৎসবে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে আমন্ত্রিত হইয়া সাগরদাঁড়ী গিয়াছিলাম। যশোহরের সদর সব-ডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস মহাশয়, এবং তত্রত্য প্রসিদ্ধ উকীল রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর প্রমুখ মনীষিগণ এই মহোৎসবের বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ ১৩১১ সাল হইতে আরম্ভ হইয়া ১৩১৩ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসর সাগরদাঁড়ীর কপোতাক্ষ-তীরে অবস্থিত 'মাইকেলোদ্যান' নামক আম্র-কাননে কবির স্মরণার্থ মধুমেলা' বসিয়াছিল। তার পরে বর্ত্তমান বৎসরে তাঁহার সেই জন্মোৎসবের উদ্বোধন নূতন প্রণালীতে হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে সেই কথা বলিব।

সন্ধ্যার সময়ে ঝিকরগাছা ষ্টেশনে উপনীত হইয়া দেখি, যতীন্দ্রবাবু-প্রমুখ মহাশয়েরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবামাত্র তাঁহারা অতি সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। কপোতাক্ষ-নীরে 'কুণ্ডলী' নামক ষ্টীমার অপেক্ষা করিতেছিল। আমাদিগকে তাঁহারা সেই ষ্টীমারে লইয়া গেলেন। রাত্রিতে যশোহর হইতে গাড়ী আসিলে, বহু ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে-দেখিতে ষ্টীমার লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই সঙ্গে ঐক্যতান-বাদ্য সম্প্রদায়ও আসিলেন। তাঁহারা ষ্টীমারের উপরিতলে রহিলেন। রজনীর তৃতীয়-যামে শুক্লা চতুর্থীর স্তিমিত নক্ষত্রালোকে ষ্টীমার ছাড়িল। অমনি শতকণ্ঠে 'বন্দে-মাতরম্' মন্ত্র আকাশ বিদীর্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল। মধুর ঐক্যতান-বাদ্যের সহিত জলোচ্ছ্বাসে নদীবক্ষ বিলোড়িত করিয়া 'কুণ্ডলী' অগ্রসর হইতেছে ;—চারিদিক নীরব—নিস্তব্ধ। কেবল জলের আন্দোড়ন-শব্দ বংশীধ্বনি সহ নৈশ-সমীরে মিশ্রিত হইয়া প্রকৃতির গভীর-সুপ্তি ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। আমরা ক্যাবিনের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা জাগিয়া উঠিবামাত্র কর্ণকুহরে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি সমবেত বাদিত্রধ্বনি সহ প্রবিষ্ট হইল। মধ্যরাত্র হইতেই গীতবাদ্য চলিতেছিল। আমরা ষ্টীমারের উপরিতলে গিয়া বসিলাম। দেখিলাম, কবি স্মৃতিময়-কপোতাক্ষ ঘুরিয়া-ঘুরিয়া, আকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। 'কুণ্ডলী'ও নদীবক্ষে মরালীর ন্যায় মৃদু-মন্থর গতিতে নাচিতে-নাচিতে ছুটিতেছে! নদীতটের কি অপূর্ব্ব শোভা! কখন বা ঘন-শ্যামল, বৃক্ষলতা-বহুল বনরাজি নেত্রপথে উদ্ভাসিত হইতেছে,—কখন বা দূর-প্রসারিত প্রান্তর দূর-দিগ্বলয়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে ;—তাল, নারিকেল, খর্জ্জুরের বিরাম নাই—তাহারা যেন কপোতাক্ষের উভয় তটে জাগ্রত প্রহরীর ন্যায় আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছে। ক্রমে তরুণ তপনের অরুণ কিরণ পূর্ব্বাকাশ হইতে ছড়াইয়া পড়িল ; নদীরূপ নীল সাড়ীর উপর কে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে সোণার ফুল ফুটাইয়া দিল! রূপ রস-গন্ধময়ী আলোকময়ী ধরিত্রী যেন কবি স্বর্গ বলিয়া বোধ হইল! পৃথিবীতে যেন ফুলের গন্ধ, পাখীর গান, তরুর মর্ম্মর, লতার হাসি জলের ঢেউ, স্নিগ্ধ বাতাস ভিন্ন আর কিছুই নাই ; - আর আছে কেবল আমাদের তরণী বক্ষে বংশীধ্বনি, সঙ্গীতের তান, বন্দে মাতরম্, জয় মধুসূদনজী কি জয়! Hip! Hip! Hurrah প্রভৃতি হর্ষ কোলাহল! প্রকৃতি যেন হর্ষে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছে - সৌন্দর্য্যে যেন আত্মহারা, ভাবে ভোর হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। সবই যেন মধুতে মধুর—মধুতে মধুময়! এইরূপ সঙ্গীতোচ্ছ্বাস ও কলধ্বনি-সহ বেলা প্রায় দশটার সময় 'কুণ্ডলী' সাগরদাঁড়ীর নিকটস্থ হইবামাত্র শতকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্', 'জয় মধুসূদনজী কি জয়' গগন-বক্ষ বিদীর্ণ করিতে লাগিল! ষ্টীমার হইতে দিগন্ত-কম্পিত করিয়া তূর্য্য-নিনাদ হইল—অমনি সাগরদাঁড়ীর তট হইতে ঘন-ঘন শঙ্খ-ধ্বনি তাহার প্রত্যুত্তর দিল! আমরা ষ্টীমার হইতে দেখিলাম, সারি-সারি পতাকা হস্তে গ্রামের যুবক ও বালকগণ কবিতীর্থ-যাত্রী-বর্গকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! তন্মধ্যে একজন ঘন-ঘন-শঙ্খ-ধ্বনি করিতেছেন। নদীকূলে পত্রপল্লবে সুসজ্জিত একটী তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে ; তোরণের শীর্ষদেশে রক্তবস্ত্রের উপরিভাগে বড়-বড় শ্বেত অক্ষরে "মধুহীন কোর না গো তব মনঃ কোক-নদে" লিখিত রহিয়াছে। 'কুণ্ডলী' কপোতাক্ষ-তীর স্পর্শ করিবামাত্র, সকলে উচ্চকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করিতে-করিতে অবতরণ করিলেন। ক্রমে আমরা ধীরে-ধীরে মধুসূদনের প্রকাণ্ড বাসভবনের সম্মুখে উপনীত হইয়া দেখিলাম যে, গবর্ণমেন্টের স্থাপিত মহাকবির স্মৃতি-স্তম্ভ পুষ্পমাল্যে বিমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেকে নতজানু হইয়া, ললাট দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া, কবিতীর্থের মহাপূত রজঃ বক্ষে মাখিয়া—সেই মহাকবির - সেই মহামনীষার—সেই মহাপুরুষের চরণতলে ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

আমাদের বিশ্রামের জন্য সম্মুখস্থ বাটীর একটি সুদীর্ঘ কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সকলে সেই কক্ষে কিছুকাল বিশ্রামানন্তর স্নানার্থ নদী-তীরে গমন করিলেন। নির্ম্মল সলিলা কপোতাক্ষ মৃদু-হিল্লোলে প্রবাহিত স্বচ্ছ মুকুরের ন্যায় নীল সলিলা,—নদীর তলদেশ পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতে লাগিল। বটতরুরাজির নিবিড় ছায়া সূর্য্য-কিরণোজ্জ্বল নদীবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। মধুসূদন যথার্থই বলিয়াছিলেন, "দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে!" আমরা স্নিগ্ধ নির্ম্মল জলে আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া বহুক্ষণ অবগাহন স্নানে অসীম তৃপ্তি অনুভব করিলাম। আমাদের দেহতাপ স্বর্গীয় স্নিগ্ধতায় জুড়াইয়া গেল। কোন্ সুদূর অতীত দিনের স্মৃতি আমাদের চিত্ত বিলোড়িত করিল। বালক মধুসূদন এই নদীতে স্নান করিতেন, সন্তরণ করিতেন। স্নানান্তে সকলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, মধুসূদনের স্মৃতিস্তম্ভ তুলসী-মঞ্চের ন্যায় পূজিত হইতেছে। মধ্যাহ্নে বাটীর মধ্যস্থিত বিরাট চণ্ডীমণ্ডপে ভোজের আয়োজন হইল। যে দেবীমণ্ডপে বালক মধুসূদন মহাপূজার মহা উৎসবের দিনে আগমনী-গীতি শ্রবণ করিয়াছিলেন, যে মহামণ্ডপে তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলে একত্র মিলিয়া সেই প্রাচীন মণ্ডপে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিলেন।

তৎপরে মধুসূদন যে গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই স্থানটী সকলে দেখিলেন। ঐ স্থানে একটি মর্ম্মর-রচিত প্রস্তর-ফলক সন্নিবিষ্ট হইবে। তাহাতে কবির জন্মকথা উৎকীর্ণ থাকিবে। মধুসূদনের প্রকাণ্ড বাসভবনের পশ্চাদ্‌ভাগ ধূলিসাৎ হইয়াছে—তৎস্থলে পুনরায় গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে। কপোতাক্ষ-তীরে 'মাইকেল উদ্যান' নামক আম্রকাননে 'মধুসূদন স্কুল'গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। গৃহপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। ছাদের কার্য্য বাকী আছে; শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন মধুসূদনের স্মৃতি-কল্পে সাগর-দাঁড়ীগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয়; একটি দাতব্য-ঔষধালয় এবং একটি নদীতীরবর্ত্তী পথ প্রস্তুতের প্রস্তাব হইয়াছে। স্থানীয় লোকের যেরূপ উৎসাহ দেখিলাম, ও যশোহরের প্রসিদ্ধ উকীল ও হাকিমের, যেরূপ অনুরাগ দেখিলাম, তাহাতে অচিরে সঙ্কল্প-সিদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয়। মধুসূদন শৈশবে নদীতীরবর্ত্তী যে বটবৃক্ষতলে 'রামায়ণ মহাভারত' পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, সেই পুণ্য-স্নিগ্ধ-ছায়াময় তরুতল পরিবেষ্টিত করিয়া একটি বৃত্তাকার বেদিকা নির্ম্মিত হইলে বড়ই শোভন হয়। বাটীর নিকটেই যে বাদাম বৃক্ষতল—মধুসূদনের শৈশবের ক্রীড়াস্থল, সেখানেও কোন স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপিত হইলে আমাদের সকল আশাই পূর্ণ হয়।

বাটীর সম্মুখস্থ বিশাল প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপ-তলে সভাস্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বেলা দুইটার পর দেখিতে দেখিতে সেই বিরাট প্রাঙ্গণ নানাশ্রেণীর দ্বিসহস্রাধিক জনমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কি বিপুল জনসঙ্ঘ! সকলেই ধীর স্থির মৌন নিস্পন্দ। সাগরদাঁড়ীর অনতিদূরস্থ নানা পল্লী হইতে নানাশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানেরা মধুসূদনের জন্মতিথির উৎসব দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেখপাড়া হইতে কৃতবিদ্য বহু সংখ্যক মুসলমান এই উৎসবে যোগদান করেন। কবির জন্মদিনে—হিন্দু-মুসলমানের এই প্রীতিপ্রদ সম্মিলনে আমাদের হৃদয় পুলক-পূর্ণ ও দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিচারে আমাদের স্বদেশীয় মহাকবির পূজা করিতে সমর্থ হইয়াছি—ইহা যে আমাদের জাতীয় উন্নতির লক্ষণ, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

বেলা প্রায় তিনটার সময় জন্মোৎসব-সভা বসিল। সর্ব্বপ্রথমে আবাহন সঙ্গীত গীত হইলে সভার সম্পাদক যতীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে এবং রায় যদুনাথের সমর্থনে সভাপতি আসন গ্রহণ করিলে, সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে টাকী-শ্রীপুরের জমীদার রায় কনক-কান্তি চৌধুরী মহাশয়, অনিবার্য্য-কারণে অনুপস্থিত কলিকাতার বিশিষ্ট-সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পত্রাবলী পাঠ করিলেন। তৎপরে রায় যদুনাথ স্বরচিত 'মধুমঙ্গল' পাঠ করিলেন। তৎপরে অনেকে তাঁহাদের স্ব-রচিত—মধুসূদনের উদ্দেশে লিখিত—কবিতাবলী পাঠ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যশোহর নিবাসী হবিবর রহমনের ও মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী সুনীতিবালার কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছিল। সাগরদাঁড়ীর অনতিদূরে অবস্থিত সেখপাড়া নামক স্থান হইতে আগত মুসলমানেরা কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা ও চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী হইতে অনেক স্থল পর্য্যায়-ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের দ্বারা পঠিত হইয়াছিল। অনেকে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন; সেই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশ স্থলে যাহাতে মধুসূদনের জন্মভূমিতে সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠান-মূলক তাঁহার স্থায়ী-স্মৃতি-রক্ষা হয়, এরূপ অনেক কথা ব্যক্ত হইয়াছিল। সে সব অনুষ্ঠানের উল্লেখ এই প্রবন্ধে পূর্ব্বেই হইয়াছে। সভার সম্পাদক যতীন্দ্র বাবু যখন তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন—তখন 'মধুসূদনের দুঃখ-স্মৃতিময়ী স্মৃতি-কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল এবং প্রবন্ধের অর্দ্ধপথে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সমস্ত জনসঙ্ঘ তাঁহার সহিত অশ্রুপাত করিয়াছিলেন! আমরাও অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই। তিনি বক্তৃতার শেষভাগে যশোহরে মহাকবি মধুসূদনের মহাকীর্ত্তি "মাইকেল মধুসূদন কলেজ" স্থাপনের প্রস্তাবের কথা—এবং তাহার উপযোগিতার কথা সকলকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া, এই মহা-হিতকর অনুষ্ঠানে সর্ব্বসাধারণকে যোগদান করিতে বদ্ধপরিকর হইতে বলিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের পর রায় যদুনাথ 'মাইকেল মধুসূদন কলেজ'-সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা বলিলেন এবং সেই কলেজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-বিভাগের সহিত বাঙ্গালা, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে। রায় বাহাদুরের পর সভাপতি মধুসূদনের নানাগুণের কথা বলিয়া এবং প্রস্তাবিত মাইকেল মধুসূদন কলেজের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। তৎপরে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে 'বিদায়-সঙ্গীত' গীত হইয়া সন্ধ্যার পরে

উচ্চ জয়-ধ্বনি-সহ সভা-ভঙ্গ হইল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইলে মধুসূদনের পত্র-পুষ্প-মাল্যে সুসজ্জিত দীপান্বিতা স্মৃতি-স্তম্ভে ধূপ-ধূনা-প্রজ্বলিত করিয়া শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলে আরতি হইল। অনেকে নতজানু হইয়া আবার মহাকবির উদ্দেশে প্রণিপাত করিলেন! রাত্রে মুকুন্দ দাসের যাত্রায় সামাজিক অভিনয় হইয়াছিল।

কবির আরতি পূর্ব্ব-কালের গৌড়-গৃহ-পল্লীর চির-সুখ-শান্তির বারতা বহিয়া আনিল! ধন্য মধুসূদন! তোমারি ভাষায় তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলি—

কবিতা পঙ্কজ-রবি, শ্রীমধুসূদন
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে! যশঃ সুধাদানে
অমর করিলা তোমা' অমরকারিণী
বাগদেবী!—

দিন আসিয়াছে—সময় আসিয়াছে—তোমার নিত্য-স্মৃতি-পূজা বাঙ্গালার গৃহে-গৃহে প্রতিষ্ঠিত হউক! বৎসরান্তে চিরদিন তোমার স্মৃতির মহাপূজা হইবে এবং প্রতিদিন বাঙ্গালার আবাল বৃদ্ধ বনিতা তোমার স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তির পূত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইবে!

সালোমে*

(সমালোচনা)

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার]

বাঙ্গালা সাহিত্যে এই বিশেষত্বহীন উপন্যাসপ্লাবনের দিনে মাঝে মাঝে দুই একটা অভিনব রচনা আমাদের সাহিত্য-বিকার কাটাইয়া দিয়া বিপর্য্যস্ত রুচির স্থৈর্য্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়া থাকে। সমালোচ্য গ্রন্থখানি এইরূপ একটা নূতন আবির্ভাব। ইহা Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wildeএর সালোমে (Salomé) নাটিকার বৈশ্লেষিক অনুশীলন (analytical study)। Wildeএর কৃতিত্বপূর্ণ নাট্যকাব্যখানি বর্ত্তমান আকারে বিদেশীয় ভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার হস্তে দিবার জন্য প্রণেতা যে সাধারণের ধন্যবাদার্হ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যে প্রকাশ্যভাবে সে ধন্যবাদ গ্রহণে ইচ্ছুক নহেন, তাহা গ্রন্থপ্রচ্ছদে তাঁহার স্বগৃহীত দ্রাবিড় ছদ্মনামে কতকটা অনুভূত হয়। গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার গৃহীত ছদ্মনামটিতে যেরূপ বর্ণবিন্যাস করিয়াছেন, সেরূপ যে কোনও কর্ণাটী করিবে না, তাহা নিশ্চয়। তামুল বা তামিল ভাষায় ভেঙ্কট শব্দ নাই, বেঙ্কট আছে। বোধ হয় গ্রন্থকার বেঙ্কটের ইংরাজী বানানের লিপ্যন্তর করিতে গিয়া V'র স্থানে "ভ" লিখিয়াছেন। তাহার পর আবার "মুদেলিয়র"; ইহাও হয় ত ইংরাজী ভ্রমপূর্ণ বর্ণবিন্যাসের লিপ্যন্তর মাত্র। কথাটা "মুদলিয়র", মুদেলিয়র নহে। একজন বাঙ্গালাভাষাভিজ্ঞ কৃতবিদ্য মান্দ্রাজবাসী আপনার নাম বাঙ্গালায় লিখিতে এরূপভাবে বর্ণবিন্যাস করিবেন না। গ্রন্থকার বাঙ্গালী,—তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় আছে,—তাঁহার অনেক প্রবন্ধাদি আমরা বাঙ্গালা মাসিকে পড়িয়া থাকি,—সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি অক্লান্ত-কর্ম্মী। একদিন অসাবধানতা বশতঃ তিনি সালোমের কথা আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তিনি যখন আত্মগোপন করিতে উৎসুক, তখন আমরাও তাঁহার মেঘনাদবৃত্তির রহস্যভেদের আবশ্যক দেখি না; তবে আমরা এইমাত্র আশা করি যে, কলিকাতার পুলিস্ কোর্টের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে মাতৃভাষা সেবার জন্য তিনি এইরূপ মাঝে-মাঝে অবকাশ করিয়া লইবেন। Wildeএর সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আভাস বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দেওয়া সম্ভবতঃ বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য; কিন্তু বিলাতের ধর্ম্মাধিকরণে সেদিন এই নাটিকা সম্বন্ধে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের ছায়া আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকারের মন্তব্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সাহিত্যক্ষেত্রে যে তাহাদের কোনও মূল্য নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই কারণে, Wildeএর এই নাটিকাখানির রচনার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে প্রদান করিলাম। কিন্তু, তৎপূর্ব্বে আরও দুই একটা কথা বলা বোধ হয় আবশ্যক। প্রথম, হেরোদের পত্নীর নাম হেরোদিয়া নহে, তিনি হেরোদিআস্ নামে পরিচিত। ইহা ফরাসী নাম নহে সুতরাং ফরাসী উচ্চারণ-নিয়ম এ সম্বন্ধে খাটিবে না; অতএব ইহার লিপ্যন্তর হেরোদিয়া না করিয়া হেরোদিআস্ করিলে ভ্রমহীন হইত, এরূপ আমাদের মনে হয়। দ্বিতীয়, তিজোলাঁ শব্দ লাটিন তিজেলিনস্ শব্দের ফরাসী আকার। বঙ্গানুবাদে মূল লাটিন শব্দ ব্যবহার করিলে বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত ও মূলানুযায়ী হইত। সালোমের ইংরাজী অনুবাদে উক্ত লাটিন শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অভিনয়-বিচারক সালোমে নাটকাভিনয়ের অনুমতি প্রদান করেন নাই। কিন্তু উহা গ্রন্থকর্ত্তা কর্ত্তৃক ফরাসী

* শ্রীভেঙ্কটরত্নম্ মুদেলিয়র প্রণীত। প্রকাশক:—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

ভাষায় পুনর্লিখিত হইয়া ১৮৯৬ সালে পারি নগরীতে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই নাট্যকাব্য রচনায় পারদর্শিতা সম্বন্ধে Wildeএর যশঃ সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য-সংস্কার কল্পে যাঁহারা অদম্য উৎসাহে Ruskinএর সহযোগিতা করিয়াছিলেন, সালোমে-প্রণেতা তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তাঁহার জীবনের নৈতিক শিথিলতার সম্বন্ধে জনসাধারণে প্রচারিত নিন্দাবাদ কিছুদিনের জন্য সাহিত্য-জগতে তাঁহার অমল ধবল যশোরাশিকে কিঞ্চিৎ আবিল করিয়া ফেলিয়াছিল বটে, কিন্তু সালোমে তাঁহার আচ্ছন্ন গরিমাকে বর্ষণ-বিধৌত শরতের নীলিমার ন্যায় মুক্ত, প্রোজ্জ্বল ও ভাস্বর করিয়াছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নাটিকাখানি Lord Alfred Douglas কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। নাটিকাখানি প্রণয়নের সহিত Wildeএর দুঃসময়টা যেন একটু ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছিল। গ্রন্থকার যখন ইহার ফরাসী অনুবাদ করেন, তখন বড় আশা করিয়াছিলেন যে যশস্বিনী Sarah Bernhardt কর্ত্তৃক সালোমে অভিনীত হইবে; কিন্তু সে আশা তাঁহার সফল হয় নাই। গ্রন্থকার বিলাতের Times পত্রে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করিলেও এখনও অনেকে মনে করেন যে Sarahর জন্যই নাটিকাখানি বিরচিত হইয়াছিল। Wildeএর অভিশপ্ত জীবন যখন জনসমাজের প্রান্তে ভণ্ডামি ও কৃত্রিম সৌষ্ঠবের নির্যাতনে নিপীড়িত হইতেছিল, তখন ফরাসী সাহিত্য-জগতে সালোমের সমাদর ও পারি নগরীতে সাহিত্যসেবিগণের সম্মুখে ইহার প্রথম অভিনয় দিনান্তের অরুণিমার ন্যায় তাঁহার জীবনের দিগন্তকে স্বর্ণাভ করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে দুই বৎসর ধরিয়া অভিনেত্রী Sarahকে অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন, কত অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। যখন Wildeকে Marquis of Queensburyর মকদ্দমায় রাজদ্বারে দণ্ড গ্রহণের জন্য দাঁড়াইতে হইয়াছিল, তখন তিনি অভাবে পড়িয়া নাটিকাখানি সামান্য মূল্যে Sarahর নিকট বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বিদুষী অভিনেত্রী তাঁহার প্রতি বড় সদ্ব্যবহার করেন নাই,—এমন কি পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। বহুদিন পরে, অনেক তাগিদের পর, Wilde তাঁহার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ফেরত পাইয়াছিলেন।

নাট্যের আখ্যায়িকাংশ সাধু Mark বিরচিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থে এই কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। Farrarএর খৃষ্টীয় জীবনীতে ইহা অতি বিশদরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং Nicephorusএর গ্রন্থেও সালোমেকাহিনী বিবৃত আছে।

আলোচ্য মূল গ্রন্থে অভিনয়মঞ্চ-সংক্রান্ত উপদেশসমূহ কার্য্যে পরিণত করা বড় কঠিন। সময়—রাত্রি—শুভ্র, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ইহুদা-দেশের রাত্রি—আর সেই চন্দ্রালোকের বিমল উৎসবের মধ্যে দাঁড়াইয়া একজন সুন্দর সিরীয় যুবক—হেরোদের রক্ষীদলের নেতা—মোহিনী সালোমের রূপে মুগ্ধ। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে আর সকল উপদেশ সহজে সাধারণ মঞ্চে কার্য্যে পরিণত করা বড় সহজসাধ্য নহে। হেরোদের সভা তাঁহার প্রাসাদশীর্ষে আহূত হইয়াছিল। সম্মুখে প্রশস্ত অধি-রোহিণী-পংক্তি; উপরে অলিন্দপ্রান্তে সৈন্যগণ এবং একপার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড জলাধার। সাধারণতঃ রঙ্গমঞ্চে কোনও প্রকারে—কতকটা কার্য্যে ও কতকটা কল্পনায়—যেমন-তেমন করিয়া কাজ সারিয়া দেওয়া হয় বলিয়া নাট্যকলা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

যাঁহারা ফরাসী সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা নাটকখানি একটু অবধানতার সহিত পাঠ করিলে ইহাতে Maeterlinck ও Flaubertএর প্রভাব অনুভব করিবেন। ভাষার সৌষ্ঠব, অর্থাৎ ফরাসী ভাষায় যাহাকে decor des phrases বলে, তাহার যথেষ্ট উদাহরণ ইহাতে বর্ত্তমান। চন্দ্রসম্বন্ধে এত পুনরুক্তি সম্বন্ধে অনেকে নাট্যকৌশল বা রসসঙ্কেত বলিয়া আপত্তি করেন। Max Nordau ইহাকে উন্মত্ততার লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু Wildeএর ন্যায় শিল্পীর সুনিপুণ হস্তে যে ইহা নাট্যকাব্যের সৌন্দর্য্য অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। ইওকানানের কথা অর্থাৎ নাটকের নেপথ্য কথাগুলি একটী সম্পূর্ণ নূতন সুরে গাঁথা; —বাইবেলের ভাষায় মেসিয়ার আগমনসংবাদপ্রচারকল্পে একটা রহস্যময় ঘনকুয়াসায় নাটকের সমগ্র অভিনয়াংশটি ঢাকিয়া দিয়াছে। সৈন্যগণকর্ত্তৃক এই ভবিষ্যদ্বক্তা সম্বন্ধে বিচার ও তাহার বর্ণনার অবতারণা করিয়া নাট্যকার অনেকটা তাহাদিগকে ফরাসী নাটকের raisonneur এর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। সিরীয় যুবকের রূপজ-মোহ, ভৃত্যের ভীতি ও তাহার উপদেশ, ইওকানানের মুখচুম্বনে সালোমের আগ্রহ এবং পরে তাহার শিরশ্ছেদনের জন্য নায়িকার প্রবল অনুযোগ এবং হেরোদের বিষাদপূর্ণ গাম্ভীর্য্য সম্বন্ধে সৈন্যগণের মন্তব্য,—সকলই একটা সাফল্যের সহিত গ্রথিত,—সকলই সহজভাবে নাটকের সমগ্র অভিনয়কে একটা সফলতার দিকে নীত করিতেছে। Wildeএর কথাগুলি ওজন করা কথা—যাহাকে ফরাসী ভাষায় বলে le mot juste—অনেকস্থলে নাট্যকারের কয়েকটি কথায়—একটি চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠে,—ইহা বড় কম ক্ষমতা-সাপেক্ষ নহে। সালোমে নাটিকায় একটি কথারও অপব্যয় দেখা যায় না—একটি কথাও অবান্তরভাবে প্রযুক্ত হয় নাই।

Wildeএর প্রাচ্যবর্ণবিন্যাসপ্রীতির প্রমাণ এই নাটিকাখানিতে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই প্রীতিপ্রণোদিত হইয়া Wilde তাঁহার বিনোদ নাট্যকুঞ্জ ললিতঝঙ্কারে মুখরিত করিয়াছেন। এই ঝঙ্কার ও পদবিন্যাস-সৌন্দর্য্যের প্রোজ্জ্বল পটে নাট্যের বিভীষিকাময় আখ্যায়িকার মসীলেপ সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নাটিকাখানি অনেকে দুর্নীতিব্যঞ্জক বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে অযথা আক্রমণ, তাহা নাটিকাখানি যিনি একটু মনোযোগের

জগন্মাতার আবাহন

By Courtesy of "Pratap Press", Cawnpore.

Blocks by Bharatvarsha Halftone Works.

সহিত পড়িয়াছেন, তাঁহাকে বুঝাইতে বড় কষ্ট পাইতে হয় না। আজকাল অনেক নিরপেক্ষ সমালোচকও এই ভ্রান্ত বিশ্বাস নিরাকরণের চেষ্টা করিতেছেন। Wildeএর বিরুদ্ধবাদিগণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভিন্নতা অনেক সময়ে ভুলিয়া গিয়া থাকেন। প্রাচ্যের নৈতিক আদর্শ ও সামাজিক রীতি যে প্রতীচ্যের সভ্যতা ও শ্লীলতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা সমালোচকগণকে অনেক সময়ে মনে রাখিয়া সাহিত্যের ধর্ম্মাধিকরণে প্রবেশ করিতে দেখা যায় না। নাটিকাখানি সুস্পষ্টভাবে একটা মোহজ ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠাপিত। নাট্যকার যদি পারিপার্শ্বিকগুলি নাটিকার সাফল্যের বা dénouementএর উপযোগী করিয়া সাজাইয়া থাকেন, এবং চিত্রকর চিত্রপটে যাহা চিত্রিত করিতে পারিতেন, তাহা যদি নাট্যকার কথায় বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা যে নাট্যকলার বিকার নহে, বরং চরম উৎকর্ষ, এ'কথা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। সালোমের সহিত সেক্সপিয়রের প্রাচ্যনাটক Anthony and Cleopatra'র অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে সালোমে আরও একটু আধুনিক যুগের। সে সময়ে রোমীয় সামন্তরাজ্যসমূহের সামাজিক ও ব্যক্তিগত নীতি হীনতর ও উচ্ছৃঙ্খলতর হইয়া পড়িয়াছিল। এই দুইটি নাটকের চরিত্রগুলিতে দুর্নীতির (immorality) ছায়া নাই, নীতিহীনতার (non-morality) আছে। ইংলণ্ডে এই নাটিকাখানির সম্বন্ধে কুসংস্কার Aubrey Beardsley অঙ্কিত চিত্রগুলিতে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। নাটিকাখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন Aubrey Beardsley ইহাতে কয়েকটি চিত্র সংযোজন করিয়াছিলেন। চিত্রগুলির পরোক্ষ উদ্দেশ্য যাহাই হউক, সেগুলি যেমন সুন্দর ও কবিত্বের পরিচায়ক, তেমনি যে অস্বাস্থ্যকর ও কুসঙ্কেতপূর্ণ সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। এই সকল চিত্র অঙ্কনের একটী গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে। Beardsley তাঁহার চিত্রকলার দ্বারা সাধারণ সহুরে ভণ্ডদের সন্ত্রস্ত করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন।

নাটিকাখানি পড়িলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ইহা কোনও ফরাসী গ্রন্থকারের লেখনী-প্রসূত নহে। গ্রন্থের ভাষা অতি বিশুদ্ধ ও সমলঙ্কৃত, কিন্তু যেন তাহাতে প্রাণ নাই—তাহা যেন সজীব ফরাসী ভাষা নহে—বড়ই ব্যাকরণসঙ্গত ও অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। লেখক তাঁহার ভাষাকে লইয়া "হস্তস্থিত লীলা কমলের"—ন্যায় ক্রীড়া করিতে পারেন নাই; তাঁহার ভাষা নির্দ্দোষ ভাস্কর্য্যের মত—শুভ্র, শান্ত ও অনিন্দ্যসুন্দর, কিন্তু নির্জ্জীব পাষাণ। কেহ কেহ বলেন যে, নাটিকাখানি লেখা হইবার পর Marcel Schwab দেখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে ইহাতে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন করেন নাই তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

নাটকখানি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষে লিখিত হইয়াছিল, এবং ১৮৯৩ সালে Madame Bernhardt ইহা Palace Theatreএ অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের অভিনয়বিচারক উক্ত বৎসর যে ইহার অভিনয়ের অনুমতি প্রদান করেন নাই, তাহা নাটকের তথাকথিত দুর্নীতির জন্য নহে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থোক্ত কোনও বিষয় ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়া সম্বন্ধে রাজকীয় আইনে (ecclesiastical laws) নিষেধ আছে এবং অভিনয়বিচারকের সালোমে অভিনয়ে অনুমতি প্রদান না করার কারণ একমাত্র ইহাই।

১৮৯৬ সালে পারিনগরীতে Théâtre Libre রঙ্গমঞ্চে Mons. Luigne Poë কর্ত্তৃক সালোমে নাটিকা অভিনীত হইয়াছিল এবং সালোমের অংশ যশস্বিনী Lima Muntz অভিনয় করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালের মে মাসে লণ্ডনস্থ Archer Street এ Bijou Theatre নামক রঙ্গমঞ্চে New Stage Club কর্ত্তৃক সালোমে নাটিকা অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয় সম্বন্ধে ১১ই মে, ১৯০৫ তারিখের Daily Chronicleএর মন্তব্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"Quite a brilliant and crowded audience had responded to what seemed to have come out of mere curiosity to see a play the censor had forbidden ; some through knowing what a beautiful, passionate, and in its real attitude, wholly inoffensive play Salomé is.

"As those who had read the play were aware this was in no way the fault of the author of Salomé. Its offence in the Censor's eyes—and considering the average audience, he was doubtless wise—was that it represents Salomé making love to John the Baptist, failing to win him to her desires, and asking for his death from Herod, as revenge. This, of course, is not Biblical, but is a fairly wide-spread tradition.

"In the play, as it is written, this love scene is just a very beautiful piece of sheer passionate speech, full of luxurious oriental imagery, much of which is taken straight from the 'Song of Solomon.' It is done very cleverly, very gracefully. It is not religious but it is in itself not blasphemous nor obscene, whatever it may be in the ears of those who hear it. It might possibly, perhaps, be acted grossly ; acted naturally and beautifully, it would show itself at least art."

সালোমের নাট্যকলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রাচীন গ্রীক নাট্যশাস্ত্রের নির্দ্দেশ লইয়া বিচার করিতে হয়। ইহা যে প্রাচীন গ্রীক নাটকের আদর্শে রচিত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। গ্রীক নাট্যকাব্যের বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে তিনটি একত্বের সমাবেশ থাকে। প্রথম সময়ের একত্ব, আলোচ্য নাট্যোক্ত বিষয়টি একরাত্রির ঘটনা।

দ্বিতীয় স্থানের একত্ব—নাটিকার ঘটনাটি একস্থানে অর্থাৎ হেরোদের রাজসভায় সংঘটিত হইয়াছিল, কেবল উপসংহারিক বা

catastrophe গ্রীক নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে মঞ্চের বাহিরে সংসাধিত হইয়াছিল; গ্রীক নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গমঞ্চে কোনও প্রকার ভয়াবহ বা নিষ্ঠুর কার্য্যের অভিনয়ের নিষেধ আছে। সালোমের উপসাংহারিক, ইওকানানের শিরশ্ছেদন মঞ্চের বাহিরে জলাধারের মধ্যে সংসাধিত হইয়াছিল। তাহার পর, কার্য্যের একত্ব—সালোমে নাটকে সকল ঘটনাগুলিই নাট্যোক্ত বিষয়টিকে সাফল্যের দিকে অগ্রসারিত করিতেছে।

সালোমে নাটকে গ্রীক নাট্যকলার নির্দ্দেশানুসরণের প্রমাণ আরও একটি বিষয়ে পাওয়া যায়। সেটি আখ্যায়িকাংশের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও বাহ্যিক বাধ্যতা। ইওকানান বন্দী হইয়াও মুক্ত—তিনি চিরস্বাধীন, অদম্য ও তেজস্বী। ইহুদার, পার্ব্বত্যপথে মেসিয়ার পদশব্দ কেবল তাঁহারই কর্ণে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল—জগতের ত্রাণকর্ত্তার আবির্ভাবের সূচনা একমাত্র তিনি বুঝিয়াছিলেন—ধর্ম্মের দুন্দুভিধ্বনি কেবল তাঁহাকেই প্রবুদ্ধ করিয়াছিল—আজ তাই প্রসুপ্ত জগৎকে জাগরিত করিতে তাঁহার সকল আয়াস, সকল চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন।—কে তাঁহার সে স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে? প্রশান্ত আকাশতলেই হউক বা ক্ষুদ্র জলাধারের মধ্যেই হউক, সর্ব্বস্থানে ও সকল সময়ে তিনি মুক্ত। তাহার পর বাহ্যিক বাধ্যতা—সেটা গ্রীক সাহিত্যে Moira বা নিয়তি—তাহার রথচক্র ত' জগতের উপর দিয়া অবিরামে ঘুরিয়া চলিয়াছে—সেই অদৃষ্ট-রথচক্রের নিষ্পেষণে ভাল-মন্দ, শুভাশুভ, পাপ-পুণ্য সব চূর্ণ হইয়া একাকার হইয়া যায়- সে চক্র কাহারও অপেক্ষা রাখে না—কাহারও মুখ চাহে না। ইউকানানের সাধুতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা, জ্ঞানগরিমা ও তেজস্বিতা কিছুই এই নিয়তিচক্রের গতিরোধ করিতে পারিল না।

গ্রীক নাট্যসাহিত্যে chorusএর কার্য্য ইওকানানের বাণী দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। অনাচারকে গালি দিয়া, পুণ্যের যশ ঘোষণা করিয়া, ইউকানানের বাণী নাট্যের আখ্যায়িকাকে চরম সাফল্যের দিকে নীত করিতেছে।

এখন আরও একটু বিচার্য্য আছে, সেটা আমাদের আলোচ্য নাটিকাখানির অংশ-বিভাগ ও তাহাদিগের স্তরবিন্যাস গ্রীক নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত কি না। গ্রীক নাটকে যেমন Prologos, Parodos, Epeisodion, Stasimon এবং Exodos পরে পরে বিন্যস্ত থাকে, আমাদের আলোচ্য নাটিকাখানিতে এই অংশগুলির বিভাগও যাবনিক নির্দ্দেশানুমোদিতভাবে বিন্যাস বেশ পরিস্ফুটরূপে লক্ষিত হয়।

আমাদের সমালোচ্য অনুশীলন-গ্রন্থে সালোমে নাটিকাখানি যৌন-সঙ্কেত-বহুল বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। এটা যে কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা বিচার করিতে গেলে প্রবন্ধান্তরের অবতারণা করিতে হয়। আমাদের একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, মানব ও মানবেতর জীবের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ কিছুই নাই। মানবপ্রমুখ সকল জীবেরই প্রকৃতিগত চেষ্টা আত্মরক্ষা। এই আত্মরক্ষাবৃত্তির মূলে আমরা আমাদের সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সকল প্রেম ও ভালবাসা সকল প্রীতি ও তৃপ্তি সিঞ্চন করিতেছি। ইহাকে ঘেরিয়া আমাদের সকল জ্ঞান-গরিমা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইহাকে লইয়াই আমাদের যত নীতি, যত ধর্ম্মনিয়ম ও সমাজ-শাসন। এই আত্মরক্ষা বৃত্তি ধর্ম্মের ইন্দ্রজালে আপনার নগ্নতাকে ঢাকিবার প্রয়াস করে এবং সেই প্রয়াসের ফলই যৌন-সঙ্কেত। ইহাতে সুনীতি-কুনীতি নাই। আবহমানকাল হইতে মানব যাহা করিতেছে এবং তাহার অস্তিত্বের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহা করিবে, যৌন-সঙ্কেত তাহারই একটা অব্যক্ত ইঙ্গিত মাত্র। যৌন-সঙ্কেত এই গ্রন্থে তত স্পষ্টভাবে আছে কি না, সে বিষয়ে অনেক মতদ্বৈধ আছে;—আর যদিও এরূপ কোনও সঙ্কেত থাকে তাহাতে নাসিকা কুঞ্চিত করিবার কিছুই নাই।

মূল গ্রন্থখানি বড় উপাদেয়—ইয়ুরোপীয় নাট্যকলার চরম উৎকর্ষের ফল। বঙ্গভাষায় ইহার আখ্যায়িকাংশ বর্ত্তমান আকারে প্রকাশিত হওয়াতে আমাদের মাতৃভাষার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে।—আমরা তজ্জন্য গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞ ও তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটের অবস্থা

[শ্রীশিবকুমার চৌধুরী]

পূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে সুরাট-সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি ; এ প্রবন্ধেও তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি। বেনিয়া ও মোগল ব্যতীত সুরাটে পার্শীর সংখ্যাও বড় কম ছিল না। তাহারা ভারতের আদিম অধিবাসী না হইলেও, বহুদিন যাবৎ ভারতে বসবাস করিতেছে। তাহাদের আদিম অধিবাস-স্থল পারস্যদেশ। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মুসলমানগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাহাদিগকে ভারতবর্ষে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল, ইহা বোধ হয় ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। কথিত আছে যে, তাহারা খালিফ ওমরের সময়ে এদেশে আগমন করে। গাভী যেরূপ হিন্দুগণের নিকটে মোরগ সেইরূপ পার্শীদিগের নিকটে শ্রদ্ধার পাত্র। পার্শীরা সূর্য্য-উপাসক। পরে তাহারা অগ্নি-উপাসকে পরিণত হইয়াছে। অগ্নি তাহাদিগের নিকট অত্যন্ত পবিত্র বস্তু। তাহাদিগের বিবেচনায় স্বেচ্ছায় অগ্নিকে নির্ব্বাণ করার ন্যায় গর্হিত কার্য্য জগতে আর নাই। কাজেই, কোন গৃহে অগ্নি লাগিলে, তাহা নির্ব্বাপিত করা দূরে থাকুক, বরং তৈলাদি দ্বারা তাহা অধিকতর প্রজ্বলিত করাই তাহাদের রীতি ছিল। একবার একটী মোমবাতি জ্বালাইলে তাহারা তাহা নির্ব্বাপিত করিতে বিশেষ কুণ্ঠিত। তাহাদের মত এই যে, অগ্নি জ্বলিবে, নির্ব্বাপিত হয় ত তাহা স্বভাবে করিবে, নির্ব্বাপিত করা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত। অগ্নিকে তাহারা এত ভক্তি করিত কেন, তাহার কারণ আছে। কথিত আছে যে, তাহাদের আইনদাতা জারতুস্ত স্বর্গ হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া স্বীয় অনুচরগণকে উহা পূজা করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আরও কথিত আছে যে, আব্রাহাম শয়তান কর্ত্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেও, অগ্নি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে ভস্মীভূত করেন নাই। এই দয়ালু অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করা তাহারা নেহাত অযৌক্তিক ও অন্যায় মনে করিত। তাহা ছাড়া, অগ্নি সূর্য্যের চিহ্ন ; কাজেই অগ্নি-উপাসনার প্রবর্ত্তন।

এক ঈশ্বর সর্ব্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। সেই জন্য তাহারা প্রতি মাসের প্রথম দিনে ভগবৎ-উপাসনা করিত। অবশ্য এই দিনগুলি ছাড়া যে অন্য দিনে উপাসনা করিত না, এমন নহে। সম্মিলিত উপাসনার দিনে তাহারা সকলে কিছু-কিছু খাদ্য লইয়া সুরাটের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া উপাসনানন্তর একত্র আহারাদি করিত। তাহারা স্বীয় ধর্ম্মে অত্যন্ত আস্থাবান্ ছিল, এবং সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিত। পৃথিবীর সকল জাতির ন্যায় তাহারাও কোন-কোন বিষয়ে কুসংস্কারাপন্ন ছিল। তদানীন্তন পার্শীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিল এবং স্বীয় সন্তানগণকে স্ব-স্ব ব্যবসায় শিক্ষা দিত। তাঁতের কার্য্যে তাহারাই দক্ষ কারিগর ছিল। সুরাটে রেশমের দ্রব্যাদি তাহারাই প্রস্তুত করিত।

পার্শীদিগের সর্ব্বপ্রধান পুরোহিতগণ দস্তুর নামে পরিচিত ছিলেন। আর সাধারণ পুরোহিতগণকে দরুজ বা হারবুদ বলা হইত। পার্শীগণ মৃতের সৎকার বা তাহাকে কবরে নিহিত করে না। পশুপক্ষীর খাদ্যস্বরূপ উন্মুক্ত প্রান্তরে তাহাদের মৃতদেহ রক্ষিত হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন পরে হালালচরগণ তাহাদের শ্মশান-সন্নিকটবর্ত্তী উন্মুক্ত প্রান্তরে মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইত। অনন্তর মৃত ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধবগণ চিরন্তন প্রথানুযায়ী নিকটবর্ত্তী গ্রাম বা স্থান হইতে কোন কুকুরকে রুটির টুকরা দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া মৃতদেহের নিকট লইয়া যাইতে চেষ্টা করিত। যদি কোন ক্ষুধার্ত্ত কুকুর দৈবযোগে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃতের মুখে স্থাপিত রুটির টুকরা আহার করিত, তাহা পার্শীগণ মনে করিত যে, মৃত ব্যক্তি পরলোকে বেশ সুখী হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কুকুর মৃতের নিকট আগমন না করিলে, মৃত ব্যক্তির অবস্থা পরকালে বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। কুকুরের কার্য্য শেষ হইলে দুইজন দরু দণ্ডায়মান হইয়া যুক্ত-করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। সেই অবসরে একখণ্ড সাদা কাগজ মৃতের কর্ণে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। প্রার্থনা শেষে হালালচরগণ মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইত।

শ্মশানটি একটী বিস্তৃত প্রান্তর,—সহর হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার চতুর্দ্দিকে একটী গোলাকৃতি প্রাচীর। প্রাচীরটি উচ্চে ১২ ফিট এবং প্রস্থে ১০০ ফিট। প্রাচীরের মধ্যস্থিত জমি প্রায় ৪ ফিট উচ্চ এবং একদিকে ঢালু। এই ঢালু দিক দিয়া গলিত শবের তরল পদার্থ এক স্থানে সঞ্চিত হয়। এই শ্মশানে শব পরিত্যাগ করিয়া বন্ধু বান্ধবগণ স্নানান্তে গৃহে গমন করিত। দুই দিন পরে নিকট-সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ শবের কোন্ চক্ষু গৃধ্রগণ কর্ত্তৃক উৎপাটিত হইয়াছে, দেখিবার জন্য শ্মশানে পুনরাগমন করিত। দক্ষিণ-চক্ষু প্রথমে উৎপাটিত হইলে তাহা মঙ্গলসূচক বলিয়া বিবেচিত হইত ; কিন্তু বাম চক্ষু প্রথমে উৎপাটিত হইলে, পার্শীগণ তাহা অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিত। পার্শীদিগের শ্মশান বড়ই বিভীষিকাময়। জগতের অন্য কোন শ্মশানে এরূপ বীভৎস দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন স্থানে পূতি-গন্ধময় গলিত শব, কোন স্থানে বা হস্তপদাদি-ভক্ষিত বিকৃত শব, কোথাও বা গৃধ্রাদি ও বায়সকুল আহারের জন্য কলরব করিতে-করিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে উপবিষ্ট। দৃশ্যটি যে সম্পূর্ণ রূপে বিভীষিকাময়,

তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত মৃত-যোদ্ধাগণের শবরাশি-পরিপূর্ণ রক্তাক্ত সমরক্ষেত্র, যুদ্ধের কিয়দ্দিবস পরে যে আকার ধারণ করে, শুধু তাহারই সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে।

তদানীন্তন পার্শীগণ কর্ত্তিত চুল রক্ষা করিতে বেশ সুদক্ষ ছিল। মস্তকের কেশরাশি ও শ্মশ্রু-গুম্ফাদি ইহারা বেশ সুন্দরভাবে রক্ষা করিতে পারিত।

সুরাটে তখন ইংরাজদিগের কুঠী ছিল। তৎকালীন "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী"র বাৎসরিক ব্যয় ছিল, এক লক্ষ পাউণ্ড। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে বাণিজ্যার্থ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিত। সুরাটে যে গৃহে ইংরাজগণ বাস করিত তাহা মোগল-বাদশাহের ছিল। গৃহটি নগরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। বাদশাহ ইংরাজদিগের উপর খুব সদয় ছিলেন। তিনি গৃহটির যে কর পাইতেন, গৃহের উন্নতির জন্য তাহা ব্যয় করিতে দিতেন। কোম্পানির কার্য্যাবলী একটী সভা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। যাহাতে কোম্পানির সম্মান বজায় থাকে, দ্রব্যাদি যাহাতে সুবিধা দরে ক্রয় করা যায়, ও স্বীয় পণ্যদ্রব্যাদি উচ্চহারে বিক্রয় করা যায়, তৎপ্রতি সভার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এই সভা চারিজন সভ্য দ্বারা গঠিত ছিল। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এই সভাস্থ চারিজন সভ্য ছাড়া একজন ধর্ম্মযাজক ও একজন কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। কোম্পানির কার্য্য চালাইবার জন্য বহু কেরাণী, আড়তদার ও পত্রবাহী ভৃত্যগণ নিযুক্ত ছিল। নিম্নতম ভৃত্যগণকে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সভাপতির নিকট উপস্থিত হইতে হইত। এই সমস্ত ভৃত্য ছাড়া সভাপতি নিজের জন্য কয়েক জন ভৃত্য পাইতেন। তাঁহার নিম্নতম কর্ম্মচারিগণের মধ্যে হিসাব-রক্ষক দুইজন, এবং ধর্ম্মযাজক ও প্রত্যেক সভ্য এক-একজন করিয়া চাকর পাইতেন। ইহাদের বেতন কোম্পানী দিতেন। সভার কর্ম্মচারিগণ বৎসরে একবার করিয়া বেতন পাইতেন। মাসিক বন্দোবস্ত ছিল না। তবে নিম্নতম ভৃত্যগণের মাসিক মাহিনা দেওয়া হইত। মাসিক চারি টাকা করিয়া তাহাদের বেতন ধার্য্য ছিল। ইহারা যেরূপ সৎপ্রকৃতির সেইরূপ কার্য্যদক্ষ ছিল। সভাপতির আদেশ ব্যতীত কেহ কুঠীতে প্রবেশ করিতে বা তাহা হইতে নির্গত হইতে পারিত না। দ্বারে দিবা-রাত্র পাহারা থাকিত এবং সভাপতি কুঠীর অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের সহিত দৈনিক একবেলা আহার করিতেন। সাধারণতঃ প্রতি রবিবারে তাঁহাদের ভোজ জাঁকজমকের সহিত নির্ব্বাহ হইত। কখন কখন তাঁহারা পবিত্র দিনে সকলে সম্মিলিত হইয়া নগর-সন্নিকটবর্ত্তী উদ্যানে গমন করিয়া আহার করিতেন। ভ্রমণের সময় তাঁহারা মহা আড়ম্বর করিয়া বাহির হইতেন, ইংরাজগণ তাঁহাদের দ্রব্য বিক্রয়ার্থ দালাল নিযুক্ত করিতেন। বেনিয়াগণই দালালের কার্য্য করিত। এ বিষয়ে তাহারাই বেশ দক্ষ ছিল। তাহারা শতকরা তিন-মুদ্রা পাইত। কুঠীর লোকের চিকিৎসার্থ একজন দেশীয় ও একজন ইংরাজ চিকিৎসক নিযুক্ত ছিল। ঔষধ-পত্রের ব্যয় কোম্পানী বহন করিতেন। কুঠীর মধ্যে একটী ভজনালয় ছিল। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ৬টার সময় এবং সন্ধ্যা ৮টার সময় উপাসনা হইত। ধর্ম্মযাজকের বেতন বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড ছিল। ইহা ছাড়া তিনি আহার, বাসস্থান, ভৃত্য, গাড়ী-ঘোড়া বিনামূল্যে পাইতেন।

সমবায় ও প্রাথমিক শিক্ষা

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সরকার, বি-এসসি।]

প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মাণদেশেই সর্ব্বপ্রথমে সমবায়-সমিতির উৎপত্তি হয়। রেফিসেন্ ও সুলজ ডেলিজ (Raifeisen & Schulze-Delitzsch) নামক দুই জন মহানুভব ব্যক্তি দরিদ্র কৃষক ও শিল্পিগণের সুবিধার জন্য পরস্পর পৃথক্ ভাবেই যৌথ-কারবার-পদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ইহার সেরূপ কোন উন্নতি হয় নাই; কিন্তু ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জার্ম্মাণীতে ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় রূপে স্থাপিত হয়; এবং তদবধি ইহার বিশেষ উন্নতি ও প্রসার হইতে থাকে। সমবায়-প্রথা ইংলণ্ডে সেরূপ বিস্তৃতি লাভ না করিলেও, ইউরোপের অন্যান্য দেশে ইহার বেশ আদর হইয়াছে. কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলে সমবায় যে একান্ত আবশ্যক, তাহা সে দেশের অধিবাসীরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। ডেন্মার্ক, আয়ারল্যাণ্ড, সুইডেন্ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাশ্চাত্য দেশের সমবায়ই একমাত্র উন্নতির মূল দেখিয়া, সদাশয় ইংরাজ-রাজ দারিদ্র্য-নিপীড়িত ভারতীয় প্রজাবৃন্দের আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য এ দেশেও সমবায়-পদ্ধতি (Co-operative system) প্রচলন করিবার চেষ্টা করেন; এবং স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, স্যার ফেডারিক নিকলসন্, মিঃ ডুপারনে প্রমুখ মহাপ্রাণ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ এ দেশে ইহার প্রবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। তাঁহাদের অদম্য উৎসাহের ফলস্বরূপ ইংরাজী ১৯১২ সাল হইতে এ দেশে সমবায় সমিতির (Co-operative Societies) রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে; এবং ভারত-গবর্ণমেণ্ট সেই বৎসর হইতেই প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া সমবায়-বিভাগ নামক একটী স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করেন।

যে দেশেই হউক না কেন, হঠাৎ কোন নূতন জিনিস সাধারণের সম্মুখে ধরিলে কেহই তাহা প্রথমে গ্রহণ করা ত দূরের কথা, দেখিতেও চাহেন না। তবে যে জাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অধিক, যাহাদের মধ্যে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা পাঁচ জনেরও কম তাহারা সেই নূতন জিনিসটা বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে চাহিবে; এবং ভাল বলিয়া মনে হইলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিতেও চাহিবে। কিন্তু যে দেশের ৩১,৩৪,১৫,৩৮৯ জন লোকের মধ্যে ২৯,৪৮,৭৫,৮১১ জন নিরক্ষর এবং শতকরা ২ জন মাত্র শিক্ষিত, সে দেশের লোকে বৈদেশিক

মস্তিষ্ক-প্রসূত সমবায়-প্রথা লইবেই বা কিরূপে, এবং তাহার প্রচারই বা হইবে কি প্রকারে? সে-জন্য, যতদিন পর্য্যন্ত না পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার প্রতি কেহই লক্ষ্য করেন না, এবং পরে যাঁহারা দেখেন, তাঁহাদের সংখ্যা অণুবীক্ষণে নির্ণয় করা যায় কি না সন্দেহ। সুতরাং সমবায়-প্রথা এ দেশে যখন প্রথম আসে, তখন দুই-চারি জন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ভিন্ন কেহই ইহার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই; কাজে-কাজেই ইহার সেরূপ আদরও হয় নাই। পরে যখন এই বিভাগের ভার শিক্ষিত বহুদর্শী রাজকর্ম্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত হইল, এবং তাঁহারা ইহার মূল মন্ত্রগুলির প্রচার করিতে ও কার্য্যক্ষেত্রে ইহার উপকারিতা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই সমবায়-প্রথার আদর ও সমবায়-সমিতির বিস্তার হইতে আরম্ভ হইল। আজ শিশু "সমবায়-পদ্ধতি"—ইহার সপ্তম বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে; এবং ইহার মধ্যেই আমরা রাজসাহী জেলায় "নওগাঁ গাঁজা চাষীদের সমবায়-সমিতি", কলিকাতার মেছুয়াবাজারে "চর্ম্মকার ঋণদান সমিতি", বঙ্গবাসী ও সেন্টপল্‌স্‌-কলেজের ছাত্রাবাসে "সমবায়-ভাণ্ডার" (Co-operative Stores) ফরিদপুর, মেদিনীপুর পাবনা প্রভৃতি স্থানে বৃহৎ সমবায়-কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক দেখিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেমন উচ্চ আশা পোষণ করিতেছি, তেমনি অন্য দিকে গ্রাম্য সমিতি-গুলির দুর্দ্দশা দেখিয়া নৈরাশ্যের আবর্ত্তে পড়িয়া হাত-পা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। ইংরাজীতে একটা কথা আছে,—"What is in microcosm is in macrocosm". ব্যষ্টিতে যাহা আছে, সমষ্টিতেও তাহাই আছে। ব্যষ্টি লইয়াই যখন সমষ্টির উৎপত্তি, তখন পল্লী-সমবায়-সমিতির উন্নতি না হইলে কেবলমাত্র দুই চারিটী সহরের সমিতির উন্নতি হইলেই সমগ্র দেশের উন্নতি হইবে কিরূপে?

দশজনে একত্র মিলিয়া কাজ করিবার পদ্ধতি আমাদের দেশেও যে পূর্ব্বে ছিল না, তাহা নহে। তবে তাহা অধুনা-প্রচলিত সমবায়-নীতির ন্যায় দেশবাসিগণের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিত কি না সন্দেহ। এখনও চলিত কথায় বলে, "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।" কিন্তু পূর্ব্বে দশে মিলে যে কাজ হইত, তাহা প্রায় বারোয়ারীর আমোদ-প্রমোদ কিম্বা দুই একটা পুষ্করিণী খনন বা রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতিতেই সীমাবদ্ধ থাকিত। তাহার মূলে ব্যক্তি বা জাতিগত উন্নতির ইচ্ছাও থাকিত না, আর তাহার সম্বন্ধে কোন চেষ্টাও হইত না। তাহার কারণ, আমাদের এই হতভাগ্য দেশে শতকরা ৯০ জন লোক অদৃষ্টবাদী। এক জনের উন্নতি হইল কি না, তাহা লইয়া অন্যে মাথা ঘামাইতে চাহে না। "যার হবার তার উন্নতি আপনিই হবে, তুমি-আমি হাজার চেষ্টা করলেও তা আটকাতে পারবো না; আর কপালে না থাকলে হাজার চেষ্টাতেও তাকে টেনে তুলতে পারবো না"—এই যে "ঘণ্ডবিষ্য ভবিষ্যতি" সংস্কার বহুকাল হইতে আমাদের অস্থি-মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। জার্ম্মাণী, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের কৃষিজীবিরাও প্রতিদিন সময়মত একটু-আধটু লেখাপড়া করিয়া থাকে। চর্ম্মকার জুতা সেলাই করিবার সময় তাহার পার্শ্বে একখানি পুস্তক রাখিয়া দেয়, এবং মধ্যে-মধ্যে অবসর পাইলেই দুই-এক পৃষ্ঠা পড়িয়া ফেলে। তাহারা এইরূপে লেখাপড়ার চর্চ্চা করে বলিয়াই, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়, এবং তাহারা আপন আপন ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে উচ্চ-শিক্ষাও লাভ করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও জনকাদি রাজর্ষিগণের এরূপ বিদ্যা-শিক্ষার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা এক হাতে লাঙ্গল ধরিতেন ও অন্য হাতে বেদ লইয়া অধ্যয়ন করিতেন। আর সেই দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়া আধুনিক কৃষক-সম্প্রদায়ের কি শোচনীয় অধঃপতন! তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, "যে চাষ-আবাদ করে, তাহাকে বোধ হয় আর কোন কাজই করিতে নাই।" তাহাদের অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বুঝাইতে গেলে তাহারা বলিবে, "মশাই, আমরা ছোট লোক—আমাদের আবার উন্নতি! আমাদের চাষ করে খেতে হবে, লেখাপড়ার সময়ই বা পাবো কখন, আর তার দরকারই বা কি? আপিসে চাকরী করতে যাচ্ছি না তো!" কি সুন্দর যুক্তি! যেন কেবল চাকরী করিবার জন্যই লেখাপড়া শিখিতে হয়! কায়ক্লেশে উদর-পূরণ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করাই যেন ইহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। আশা নাই, উদ্যম নাই, যেন একটী সজীব যন্ত্র! গ্রীষ্মে রৌদ্র, বর্ষায় বৃষ্টি, শীতে কম্পন উপভোগ করিয়া এক একটী মুরস্থমী কাঠের (Seasoned Wood) মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই যেন ইহাদের জন্ম। ইঁহারা না পায় দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে, না পায় একখানা ভাল কাপড় পরিতে। আর যাহারা ঋণের দায়ে ইহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া সামুদ্রিক শয়তানের (Octopus) মত ইহাদের রক্তশোষণ করিতেছেন, তাঁহারাই হইলেন ভদ্রলোক-- দেশের গৌরব ও সমাজের শীর্ষস্থানীয়!

দরিদ্র কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য এই ভদ্রলোকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী। কিন্তু পাছে স্বাস্থ্যের গ্লানি কিম্বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সামান্য ত্রুটী হয়, এই ভয়ে তাঁহারা ক্রমশঃ পল্লীগ্রামের অভদ্র (!) কৃষিজীবিগণের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সহরের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। ফলে পল্লীগ্রামগুলি ম্যালেরিয়া গ্রস্ত, দরিদ্র, অশিক্ষিত লোকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। তাহারা আপনার উন্নতি আপনি ত কখনও করিতে পারিবে না, আর যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য যত্নবান্ হন, তাহাও তাহারা সংশয়ের চক্ষে দেখিবে। কৃষিজীবিগণের কথা কি,—পল্লীগ্রামের অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকেরও ধারণা, গবর্ণমেণ্টের কোন স্বার্থ না থাকিলে তাহারা আমাদের সাহায্য করিতে আসিবে কেন? তাহাদের নিশ্চয়ই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাহা না হইলে তাহাদের এত মাথাব্যথা কিসের? কিন্তু কি যে সেই উদ্দেশ্য এবং কেন যে মাথাব্যথা, তাহা কেহই বুঝিবার চেষ্টা করিবে না। সুশিক্ষা পাইলে তাহারা এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার জিনিসটা বুঝিবার চেষ্টা করিত।

আর একটী কথা—অভাবে পড়্‌লে শালগ্রামের পৈতা চুরী করাও যখন পল্লীনীতি-বিরুদ্ধ নহে, তখন চিরস্থায়ী অভাবের মধ্যে পড়িয়া আমাদের নৈতিক চরিত্র যে কত হীন হইয়াছে, তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা শিক্ষিত; তাহাদের চরিত্রবল খুব বেশী। তাহারা স্বার্থত্যাগ করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি করিতে পারে; এবং যাহারা উপকৃত হয়, তাহারাও বুঝে যে, নিজের ক্ষতি না করিয়াও অপরের উপকার করা সম্ভব। কিন্তু এদেশের শিক্ষাই এরূপ যে, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলেও, কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না।

এতভিন্ন প্রত্যেক পল্লীগ্রামেই এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা প্রথম জীবনে কিছু টাকা উপার্জ্জন করিয়া সেই টাকার সুদে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইহাতে আদত টাকাটা মজুতও থাকে, আর সময়ে-সময়ে সন্তান-সন্ততিতে এই অর্থের দ্বিগুণ বা চতুর্গুণও আদায় হইয়া যায়। এরূপ লোকেরাই গ্রাম্য-সমবায় সমিতির প্রধান অন্তরায়। কৃষক ও শ্রমজীবিগণ যাহাতে সমিতির সভ্য হইয়া টাকা-কড়ি ধার লইতে না পারে, তজ্জন্য ইঁহারা ঐ সকল অশিক্ষিত লোকের মনে নানা রূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দেন। এই উত্তমর্ণগণ স্বার্থত্যাগ কাহাকে বলে জানেন না; এবং সেই জন্য কিছু কম সুদে গ্রাম্য সমবায় সমিতির হস্ত দিয়া এই টাকা ধার দিতে একান্ত কুণ্ঠিত।

সহরে উদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া রাজনীতি বিশারদ পণ্ডিতগণ "সমবায়" প্রচারের জন্য যাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন তাহা পল্লীগ্রামের অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকের পক্ষেও যে প্রযোজ্য হইবে, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। সহরে শিক্ষার বিস্তার অধিক—কাজে-কাজেই লোকের চরিত্র বেশ উন্নত, রীতিনীতি মার্জ্জিত এবং মনও উদার। তথায় কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি সাধারণের মঙ্গলের জন্য যদি কোন কাজ করিবার চেষ্টা করেন, লোকে চারিদিক হইতে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ছুটিয়া আসিবে; কিন্তু পল্লীগ্রামে ইহার ঠিক বিপরীত। কেহ আবহমানকাল-প্রচলিত কোন মন্দ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া, গ্রামবাসিগণের উন্নতির জন্য কিছু করিতে গেলেই, লোকের মাথায় বজ্রাঘাত হইবে। তাহারা একটুও বুঝিতে চেষ্টা করিবে না। "কাকে কাণ নিয়ে গেল" বলিলেই কাক মারিবার জন্য লাঠী লইয়া দৌড়াইবে; একবার কাণে হাত দিয়াও দেখিবে না কাণ আছে কি না। আর গবর্ণমেন্টের সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারিগণ দার্শনিকের গাম্ভীর্য্য লইয়া বলিবেন, "একটী জেলায় ছয় মাসে ৩৬টী নূতন গ্রাম্য-সমিতি গঠন কর। অংশ ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক চালাও। কেন হইবে না? এ সমস্তই ত লোকের উপকারের জন্য।" তাঁহারা ত সুচিন্তিত ও সুযুক্তিপূর্ণ মতামত লিখিয়াই নিশ্চিন্ত। যাহাদের জন্য এত উদ্যম তাহাদের মধ্যে এ সমস্ত শুনেই বা কয়জন, আর বুঝেই বা কয়জন? প্রায় সব পল্লী-গ্রামের লোকেই বলে "প্রবেশ ফি দিয়ে, টাকা জমাই যদি দিতে যাব, আমাদের টাকা ধার করবার দরকার কি? অন্য লোকে ত আমাদের অমনিই টাকা দেবে। পূর্ব্বে যে দেশে এ সমস্ত কিছুই ছিল না, তখন কি আমরা খাইতে পাই নাই, না, তখন পৃথিবী তাহার কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছিল?" যাহাদের জন্য এত চেষ্টা, তাহারাই যদি না বুঝিল, তবে সমস্তই ত অরণ্যে রোদন করার ন্যায় নিষ্ফল। যদি প্রকৃতই তাহাদের উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে গ্রামবাসীদের মধ্যে অন্ততঃ সমবায়ের মূলমন্ত্র বুঝিবার মত শিক্ষার বিস্তার করিয়া, তাহাদের অজ্ঞতা দূর করা চাই,—তাহাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা দেওয়া চাই; তবে তাহাদের মন উদার ও চরিত্র উন্নত হইবে; আর তখন তাহারা "সমবায়ের ছায়ার তলে" বসিয়া সমস্বরে গাহিতে পারিবে,—

ধন্য আমার দয়াল রাজা ধন্য তাঁহার দান
বুকে আমার শান্তি ভরা ধন্য ভগবান!"

শ্রমণী-সঙ্ঘ।

(প্রতিবাদ)

[শ্রীচরণদাস চট্টোপাধ্যায়, বি-এ]

বিগত পৌষ মাসের "ভারতবর্ষের" "বিবিধ প্রবন্ধে" শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, বি-এ, "শ্রমণী সঙ্ঘ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ, এবং তিনি সঙ্ঘের সুন্দর চিত্রটি যথাসাধ্য ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক প্রবন্ধ-মধ্যে কতকগুলি প্রধান থেরির ও উপাসিকার সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ করিয়া বিষয়টি সাধারণের বোধগম্য করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু ঐ সুন্দর প্রবন্ধটি কতকগুলি ঐতিহাসিক, কাল্পনিক ও ভৌগোলিক প্রমাদে অত্যন্ত দুষ্ট হইয়াছে। নাম বিধি বা technical terms সম্বন্ধেও লেখক দু'একটী ভয়ঙ্কর ভুল করিয়াছেন। বঙ্গে পালি-সাহিত্যের চর্চ্চা এখনও তত প্রবল হয় নাই; এজন্য যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয়ে একটু-আধটু আলোচনা করেন, তাঁহাদের অতি সাবধানে কার্য্য করা কর্ত্তব্য; নচেৎ সাধারণে তাঁহাদের নিকটে বৌদ্ধধর্ম্ম ও শাস্ত্রের অন্তর্গত অসত্য বস্তুকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

প্রথমেই লেখক বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সম্বন্ধে একটী ভয়ঙ্কর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "নারী সঙ্ঘের সেবিকা পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে দারুণ অমঙ্গল সাধিত হইবে, ইহাই ছিল বোধিসত্ত্বের একমাত্র আশঙ্কা।" যদি সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে বোধিসত্ত্ব যে কখনও শ্রমণী-সঙ্ঘ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা কুত্রাপি দেখা যাইবে না সমগ্র জাতকের গল্পগুলি বোধিসত্ত্বের মাহাত্ম্য ও পারমিতার দৃষ্টান্তে পূর্ণ। বহুস্থানে দেখিলাম, বোধিসত্ত্ব পশু রূপে পশু-সঙ্ঘের নেতৃত্বে বৃত হইয়াছেন, পশুসঙ্ঘে বহু নীতি কথার আলোচনা

করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাকে পশু রূপে কেন মনুষ্য রূপেও কখনও শ্রমণী-সঙ্ঘ স্থাপন করিতে দেখিলাম না। এমন কি, বোধিমূলে (যাউপাদিসেস) নির্ব্বাণ লাভ করা পর্য্যন্তও কখন শ্রমণী-সঙ্ঘ স্থাপন করার খবর "নিদান কথায়ও" (১) পাওয়া যায় না। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, লেখক কোথায় বোধিসত্ত্বকে ঐরূপ আশঙ্কা করিতে ও শ্রমণী-সঙ্ঘ স্থাপিত করিতে দেখিয়াছেন? তবে আমরা ভগবানকে বোধিসত্ত্ব রূপে নহে, বুদ্ধ রূপে ঐ আশঙ্কা ও ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ স্থাপন করিতে বিনয়পিটকে দেখিয়াছি বটে। (২)

গৌতমবুদ্ধ রূপে জন্মগ্রহণ করার পূর্ব্বে ভগবান যে পাঁচশতপঞ্চাশ বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এই সংখ্যাতীত বর্ষগুলি বোধিসত্ত্বের কার্য্যকাল। এমন কি বোধিমূলে নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বেও তিনি বোধিসত্ত্ব নামে বৌদ্ধশাস্ত্রে আখ্যাত। নির্ব্বাণলাভের পর তিনি বুদ্ধ বা সর্ব্বজ্ঞ। জাতকের কোনও গল্পে দেখা যায় না যে, বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ নামে আখ্যাত হইয়াছেন। সেইরূপ "নিকায়" প্রভৃতিতে বোধিমূলে নির্ব্বাণলাভের পরে তাঁহাকে কখনও বোধিসত্ত্ব বলা হয় নাই। নির্ব্বাণলাভের পর তিনি বুদ্ধ এবং তৎপূর্ব্বে বোধিসত্ত্ব—ইহাই বৌদ্ধশাস্ত্রের অভিমত; এবং তাহার প্রমাণ জাতকের প্রতি পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান। কপিলাবস্তুতে জন্মলাভ হইতে বোধিমূলে নির্ব্বাণের কাল পর্য্যন্ত সিদ্ধার্থ বোধিসত্ত্ব নামে খ্যাত। এ সময়ে তিনি যে কোনপ্রকার মনুষ্য-সঙ্ঘ স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ, এমন কি, পালি ভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় পরিবর্ত্তিত বৌদ্ধশাস্ত্রেও লিখে না। মহাত্মা Kern তাঁহার Buddhism (৩) নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"The sublime place occupied by the Buddha cannot be reached before his having gone through numerous, nay innumerable existences, and having lived in lower and higher states. A being destined to develop into a Buddha is called a "Bodhisattva" he is, we may say, a Buddha "potentia" not yet "de facto". Properly "Bodhisattva" simply means "a sentient or reasonable being" possessing bodhi, but this faculty has not yet ripened to "samyak—sambodhi"—perfect sensibleness. He is, in a word, the personification of what the Jogins call "buddhisattva" potential intelligence, just as the Buddha, the samyak-sambuddha, personifies "buddhi" the highest product of nature, in most Indian systems of philosophy based on cosmogony." সেইরূপ প্রাতঃস্মরণীয় মনীষি Childers (৪) লিখিয়াছেন—"A being destined to attain Buddhaship. This term is applied to a Buddha in his various states of existence previous to attaining Buddha-hood.,....... In his last existence when born as the son of king Suddhodhana, he was still a Bodhisattá and continued so until the age of 34 when he attained Buddhahood." লেখকের ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য বোধ হয় আর প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না।

আলোচ্য প্রবন্ধে আরও দেখা যায় যে, লেখক কোন-কোন স্থানে স্বীয় মন্তব্য স্থাপনেরও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—"অল্পকাল পরে লিচ্ছবিবংশীয় বেশালির অধীশ্বরও সপার্ষদ বুদ্ধদেবকে রাজপ্রাসাদে আহ্বানের জন্য আগমন করিলেন"। লেখক "লিচ্ছবিবংশীয় বেশালির অধীশ্বর" কথাটি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? দীঘনিকায় অন্তর্গত মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে (৫) "বেসালিকা লিচ্ছবি" অর্থাৎ বৈশালির লিচ্ছবি ইহাই উল্লিখিত আছে, কিন্তু তথায় বৈশালির অধীশ্বর স্বয়ং আসিয়াছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তথায় পার্ষদেরও কোন উল্লেখ নাই। আচার্য্য বুদ্ধঘোষও ঐ ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। কতকগুলি লিচ্ছবি নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন, ইহাই টীকায় লিখিত আছে। রাজাও আসেন নাই, রাজপ্রাসাদেরও উল্লেখ নাই। ঐ সংবাদ লেখকের সম্পূর্ণ অমূলক কল্পনামাত্র। বিনয়পিটকেও (৬) ঐ ঘটনার উল্লেখ আছে; কিন্তু তথায়ও লেখকের পক্ষ সমর্থন-স্বরূপ কিছুই নিদর্শন পাওয়া যায় না; এবং সমন্তপাসাদিকায় বুদ্ধঘোষ ঐ ঘটনার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। এ স্থলে আমাদের আরও বলা কর্ত্তব্য এই যে, তৎকালে লিচ্ছবি-প্রজাতন্ত্রে অধীশ্বর বলিয়া কোন একটী পদ ছিল না। প্রজাতন্ত্রের নেতা বা president রাজা উপাধিতে ভূষিত হইলেও, তিনি, অধীশ্বর অর্থে যাহা বুঝায়, তাহা ছিলেন না; এবং রাজকার্য্য একজনের দ্বারা পরিচালিত হইত না। লেখক আরও লিখিতেছেন, "তখন বিফলমনোরথ নরপতি অম্বপালীর শরণাপন্ন হইলেন।" এ স্থানেও মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে কেবলমাত্র লিচ্ছবিগণ প্রার্থনা করিলেন, ইহাই উল্লিখিত আছে, নরপতির নামমাত্রও নাই।

(১) Nidanakatha—Jataka Vol. I. Ed. V. Fausboll—Kopenhagen 1877.

(২) Cullavaggo—Vinaya Pitaka Vol. II. p p. 256-257. Ed. Hermann Oldenberg, Berlin 1880.

(৩) Manual of Buddhism—p. 65. Ed. H. Kern—Strassburg, 1896.

(৪) Pali-English Dictionary—p. 93. Ed. R. C. Childers, London, 1909. (4th Impression)

(৫) Digha Nikaya, Vol. II. p. 96. Ed. Rhys Davids, London, 1903. (Pali Text Society Series.)

(৬) Vinaya Pitaka Vol. I. Mahavagga, p. 232, Ed. Hermann Oldenberg—Berlin, 1879.

ঐ প্রসঙ্গে তিনি পুনশ্চ বলিয়াছেন, "কিন্তু সমগ্র রাজ-ভাণ্ডারের বিনিময়েও অম্বপালী তাহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন না।" লেখক রাজভাণ্ডারের কথা কোথায় পাইলেন? মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে কেবল আছে, "সচে পি মে অয্যপুত্তা বেসালিং সাহারং দস্‌সেথ এবং মহন্তং ভত্তং ন দস্‌সামী তি।" (৭) "বেসালিং সাহারং" অর্থে কি রাজভাণ্ডার বুঝায়? ইহার অর্থ বৈশালি ও তৎসমূহ জনপদ (৮) রাজভাণ্ডার ত দূরের কথা—অম্বপালী নিমন্ত্রণের পরিবর্ত্তে সমগ্র রাজ্য লইতেও স্বীকৃত হন নাই। সামান্য গণিকা যে কতদূর লোভ সংবরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভগবান বুদ্ধের উপর কিরূপ অটুট ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, তাহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই স্থান ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যায় না। লেখক বোধ হয় অম্বপালীর মুখে "বেসালিং সাহারং" কথাটি শুনিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়াছেন যে, ইহারা অধীশ্বর স্বয়ং ও তৎপারিষদবর্গ,—নচেৎ বৈশালি ও তৎসমূহ জনপদ দান করার আর কাহার ক্ষমতা? কিন্তু লেখকের জানা উচিত ছিল যে, লিচ্ছবিদের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের ব্যবস্থা ছিল, এবং প্রত্যেকের রাজ্যশাসন-প্রণালীর উপর যথেষ্ট ক্ষমতাও ছিল। এজন্য লিচ্ছবিগণের সম্মুখে অম্বপালীর এ উক্তি। লেখক আরও জানিবেন যে, অম্বপালী গণিকা, লিচ্ছবিবংশসম্ভূতা ছিলেন না। সুতরাং যিনি লিচ্ছবিবংশীয় নহেন, তাঁহার মুখে এইরূপ উত্তর শোভা পায়; কারণ ইহা তথাগতের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির পরিচায়ক।

ঐ সম্বন্ধে লেখক আরও লিখিয়াছেন, "আহার ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে যুক্তপাণি অম্বপালী নিবেদন করিলেন, তাঁহার বিশাল ভবন ও বিপুল ধনরাজি একটী বিহার স্থাপন ও সংরক্ষণের নিমিত্ত অদ্য হইতে উৎসর্গীকৃত হইল।" অম্বপালী যে ঐ সময়ে তাঁহার বিশাল ভবন ও বিপুল ধনরাজি দান করিয়াছিলেন, এরূপ কথা নিকায়সমূহে বা বিনয়পিটকে পাওয়া যায় না। আমরা বিনয়পিটকে (৯) দেখিতে পাই যে অম্বপালী তাঁহার প্রশস্ত উদ্যান সুবিখ্যাত "অম্বপালীবন" বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দান করিয়াছেন। সে স্থানে বিশাল ভবনের ত কোনরূপ উল্লেখ নাই! মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে (১০) ঐ স্থলে "আরাম" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এ স্থলে "আরাম" অর্থে প্রমোদ-কানন বুঝিতে হইবে; কারণ পালিভাষায় আরাম অর্থে কখনও বসতবাটিকা বুঝায় না। অম্বপালী, মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রের বর্ণনামতে অবশ্য তাঁহার প্রাসাদতুল্য ভবনে সসঙ্ঘ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ অট্টালিকা তিনি দান করেন নাই; কারণ, তাহা হইলে অবশ্য ঐরূপ অর্থের কোন একটী কথার উল্লেখ থাকিত; কিন্তু যে কথাটি ঐ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ উদ্যান বা প্রমোদ-কানন। Dr. Rhys Davids মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে ব্যবহৃত "আরাম" কথাটির "pleasance" বা প্রমোদকানন (১১) অর্থ করিয়াছেন। বহু কারণে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, অম্বপালী তাঁহার সুবিখ্যাত বৈশালি নগরীর বহির্ভাগস্থিত আম্রকানন ঐ সময়ে ভগবান তথাগতকে দান করিয়াছিলেন; কারণ বিনয়ের "মহাবগ্‌গে" স্পষ্টই "অম্বপালীবন" বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ প্রদত্ত উদ্যান বৈশালির মহাবন প্রভৃতির ন্যায় বৌদ্ধসঙ্ঘের একটী প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। বৈশালির ঘটনা-সংক্রান্তে মহাবন জীবক অম্ববন ও অম্বপালীবন এই কয়েকটির প্রধানতঃ উল্লেখ ত্রিপিটকে দেখিতে পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন এবং য়ুয়ং চয়ঙ দুইজনেই বৈশালি ভ্রমণকালে ঐ আম্রকানন পরিদর্শন করেন; এবং দুইজনেই উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়েন বলিয়াছেন—

"Three li, south of the city, on the west of the road is the garden, (which) the same Ambapali presented to Buddha in which he might reside." (১২) সেইরূপ য়ুয়ং চয়ঙ বলিয়াছেন—"Not far to the south of this is a vihara, before which is built a stupa; this is the site of the garden of the Amre-girl which she gave in charity to Buddha" (১৩)। পরলোকগত মহাত্মা Watters ঐ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"In Pali scriptures we find the gift which Ambapali presents to the Buddha called a "Vana" and "arama." Thus the Vinaya represents the lady as giving this "Ambapalivana" to Buddha who accepts the "arama" and in the Maha-parinibbana-sutta, the lady gives and the Buddha accepts the "arama." The accounts generally seem to agree, in placing the Amra-garden (or Ambapali's Orchard) to the south of Vesali and at a distance of three or four li, from the city according to Fa hsien or seven li, according to a Nirvana sutra............But then the authorities are not agreed as to the place at which the ceremony was performed, some making it the

(৭) Digha Nikaya loc cit.

(৮) সাহারং তি সজনপদং—Sumangala Vilasini, Mahavagga, Mahaparinibbanasuttantain—Rangoon Edition.

(৯) Vinaya Pitaka—Mahavagga, Vol. I. p. 233.

(১০) Mahaparinibbana suttantain, Digha Nikaya, Vol. II. p. 98.

(১১) Sacred Books of the Buddhists—Dialogues of the Buddha, Vol. III. p. & II. p. 105, trans. by T. W. and C. A. F. Rhys Davids, London, 1910.

(১২) Travels of Fâ-Hien, Ed. J. Legge; Oxford, 1886, p. 72-73.

(১৩) Buddhist Records of the Western World, Ed. Beal, Vol. II. p. 69, London, 1906.

lady's residence (দীঘ) and others the orchard itself.' বিনয় (১৪)

ফা-হিয়েন অম্বপালী-প্রদত্ত বৈশালি নগরের ভিতর একটী বিহারের (১৫) উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সম্ভবতঃ অম্বপালীর বসতবাটিকা হইবে, এবং বোধ হয় গণিকা প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে তাহাও সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। ঐ অট্টালিকা সম্ভবতঃ ভিক্ষুণিসঙ্ঘের বাসস্থান রূপে পরিগণিত হইয়া থাকিবে; এবং আরও বোধ হয়, গণিকা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈশালিস্থ ভিক্ষুণিগণের সহিত তথায় বাস করিতেন। যুয়ং চয়ঙ স্পষ্ট বলিয়াছেন—"Not far from this is a stupa; this is the old house of the lady Amra. It was here the aunt of Buddha and other Bhikshunis obtained Nirvana" (১৬) কিন্তু লেখক যে প্রসঙ্গে তাঁহার বিশাল ভবন ও বিপুল ধনরাজি দানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তাঁহার কল্পনামাত্র এবং মিথ্যা। ঐ সময়ে অম্বপালী তাঁহার উদ্যানমাত্র দান করিয়াছিলেন।

সৌভাগ্যবতী বিশাখার প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন "জীর্ণবস্ত্রধারিণী ভিক্ষুণিগণ অচিরাবতীতে নদীতে স্নানকালে নির্লজ্জা হাস্যকৌতুকময়ী বারবিলাসিনীদিগের দ্বারা উপহসিত হইত। ভিক্ষুণিগণের বসনদৈন্যের উল্লেখ করিয়া এই সকল বারাঙ্গনা তাঁহাদিগকে পঙ্কিল পাপপথে প্রলোভিত করিত। ভিক্ষুণিগণ তাঁহাদিগের অভাব বিমোচনের কোন পন্থাই আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইয়া, সলজ্জ বদনে অধোমুখে রহিতেন। করুণাময়ী বিশাখা তাঁহাদিগকে স্নান-বস্ত্র দান করিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন।" এ স্থলেও তিনি আমাদের যথেষ্ট অলীক সংবাদ দিয়াছেন। যতদূর বোধ হয়, তিনি অশ্লীলতা দোষ হইতে প্রবন্ধকে এক প্রকার রক্ষা করিয়া, সত্যের অপলাপ করিয়াছেন মাত্র, নতুবা তিনি এরূপ লিখিবেন কেন? সমগ্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণি-সঙ্ঘ পুরাকালে প্রতিমোক্ষ ও বিনয়পিটকের নিয়মাবলীর উপর একরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এবং অধুনাও সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশস্থ ভিক্ষুগণকে যথাসাধ্য ঐ সকল নিয়মাবলী পালন করিতে হয়। সমগ্র নিয়মাবলী একেবারেই প্রচলিত হয় নাই; ক্রমে ক্রমে ঐগুলি সঙ্ঘের জন্য আবশ্যক হইয়াছিল; এবং তাহাদের প্রত্যেকটি জ্বলন্ত পাপ দৃষ্টান্তের কবল হইতে রক্ষা জন্য ভগবান বুদ্ধ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত উহাতে কতকগুলি ব্যবস্থাও আছে; এবং কোন্‌গুলি আদিষ্ট ও কোন্‌গুলি অনাদিষ্ট, কোন্‌গুলি সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়, ইহারও উল্লেখ আছে। এ হেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘের চিরপ্রয়োজনীয় বিনয়ের মূলে লেখক আঘাত করিয়াছেন। যাহা হউক এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি "জীর্ণবস্ত্রধারিণী ভিক্ষুণিগণের জন্য বিশাখা স্নানবস্ত্রের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন" এইরূপ উল্লেখ বিনয়পিটকের কোন্ স্থানে দেখিলেন? আমরা মূল পালি হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া লেখকের বিবরণের সত্যাসত্যতা বিচার করিব। মহাবগ্‌গে এইরূপ লিখিত আছে, "ইধ ভন্তে ভিক্‌খুনিয়ো অচিরবতিয়া নদিয়া বেসিয়াহি সদ্ধিং নগ্‌গা একতিত্থে নহায়ন্তি। তা ভন্তে বেসিয়া ভিকখুনিয়ো উপ্পণ্ডেসুং "কিং নু খো নাম তুম্হাকং অয্যে দহরানং ব্রহ্মচরিয়ং চিণ্ণে, ননু নাম কামা পরিভুঞ্জিতব্বা, যদা জিণ্ণা ভবিস্সথ তদা ব্রহ্মচরিয়ং চরিস্সথ, এবং তুম্হাকং উভো অত্থা পরিগ্গহিতা ভবিস্সন্তি ইতি"। তা ভন্তে বেসিয়াহি উপ্পণ্ডিয়মানা মঙ্কু অহেসুং। অসুচি ভন্তে মাতুগামস্স নগ্গিয়ং জেগুচ্ছং পটিক্কূলং। ইমাহং ভন্তে অত্থবসং সম্পস্সমানা, ইচ্ছামি ভিক্খুনিসংঘস্স যাবজীবং উদকসাটিকং দাতুন্ তি"। (১৭) অর্থাৎ বিশাখা ভগবানকে এইরূপ বলিতেছেন, "হে ভন্তে, ভিক্ষুণিগণ নগ্না হইয়া বেশ্যাগণের সহিত অচিরবতী নদীর একতীর্থে স্নান করিতেছেন (দেখিলাম), এবং সেই বেশ্যাগণ, হে ভন্তে! ভিক্ষুণীদিগকে উপহাস করিলেন, "হে আর্য্যাগণ, তরুণকালে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার কি প্রয়োজন। (এ সময়ে) বাস্তবিক কাম ভোগ করাই উচিত। যখন বৃদ্ধা হইবেন, তখন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন। তাহা হইলে আপনাদের উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে।" হে ভন্তে! তাঁহারা এরূপে উপহসিত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হে ভন্তে! স্ত্রীজাতির নগ্নতা অত্যন্ত কদর্য্য, লজ্জাদায়ক ও বীভৎসতাজনক। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া, ভন্তে! আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, যাবজ্জীবন ভিক্ষুণি-সঙ্ঘকে স্নানবস্ত্র দান করিব।" লেখক এস্থানে, তাঁহার প্রদত্ত সংবাদের সহিত মূলের কতদূর প্রভেদ, লক্ষ্য করিবেন। ভিক্ষুণিগণ জীর্ণবসনের জন্য উপহসিত হইতেন না, তাঁহারা উপহসিত হইতেন তাঁহাদের উলঙ্গ হইয়া স্নান করার জন্য। বারবিলাসিনীগণ তাঁহাদের বসনদৈন্য নির্দ্দেশ করিয়া প্রলোভিত করিতেন না তাঁহারা প্রলোভিত করিতেন, "যৌবনের জন্য প্রব্রজ্যা নহে, তাহা বৃদ্ধকালের জন্য" এই সকল পাপ যুক্তির দ্বারা। এস্থলে বসনের কোনই উল্লেখ নাই। বিশাখা স্নান-বস্ত্রের বন্দোবস্ত যে কেন করিলেন, তাহা তিনিই উত্তম রূপে বুঝিয়াছিলেন। তৎকালে পুরুষ ও স্ত্রীলোক অনেকেই নগ্নাবস্থায় নদীতে স্নান করিত, এরূপ উল্লেখ আমরা স্থলস্থলে পাইয়াছি; এবং তাহা অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া তৎকালে পরিগণিত হইত না। ঐ দিবসে বিশাখার গৃহে নিমন্ত্রণে যাইবার পূর্ব্বে ভিক্ষুগণ উলঙ্গ হইয়া তথাগতের উপদেশানুসারে বৃষ্টির জলে জেতবন বিহারে স্নান করিয়াছিলেন; এবং ঐ দিবসই শ্রেষ্ঠী-পত্নীর পরিচারিকা আহারের সংবাদ দান করিতে যাইয়া, তাঁহাদের উলঙ্গাবস্থায় দেখিয়া, আজীবক বা নগ্ন সন্ন্যাসী বোধে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশাখাকে ঐ ঘটনা বলিলে,

(১৪) On Yuan Chwang (Royal Asiatic Society Series) Vol. II, Ed. Thomas Watters, p. 69-70. London, 1905.

(১৫) Travels of Fâ-Hien, Ed. Legge, loc. cit.

(১৬) Buddhist Records, Ed. Beal, Vol. II, p. 68.

(১৭) Vinaya-Pitaka, Vol. I, Ch. Ch. VIII, Sec. 15 p. 293 Ed. Hermann Oldenberg, Berlin 1879.

তিনি সসজ্ঘ ভগবান বুদ্ধের সন্নিকটে যাবজ্জীবন ভিক্ষুসঙ্ঘকে বর্ষায় স্নানের বস্ত্রদানে প্রতিশ্রুত হন। (১৮) ভিক্ষুণিগণ যে সময়ে-সময়ে নগ্না হইয়া স্নান করিতেন, এ সংবাদ আমরা "সুত্তবিভঙ্গে" প্রাপ্ত হইয়াছি (১৯) এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ কুৎসিত প্রথার সামাজিক হিসাবে তৎকালে প্রচলিত থাকিলেও, তাহা যে ভিক্ষুণি সঙ্ঘের অবনতির কারণ হইবে, ইহা সাধ্বী বিশাখা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। যাহাতে ঐ দোষটি সঙ্ঘ হইতে বর্জ্জিত হয়, তাহার উপায় চিন্তা করিয়া ঐ দিবসেই তথাগতের সন্নিকটে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণি-সঙ্ঘে স্নানবস্ত্র দানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভগবান বিশাখার ঐ সঙ্কল্পের সমর্থন করিয়া, সেই দিবসেই জেতবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বিশাখার প্রার্থিত বরগুলির সমর্থন করেন। 'তন্মধ্যে প্রথমটি ভিক্ষুদিগের বর্ষায় স্নানবস্ত্র দান এবং শেষটি ভিক্ষুণিগণের স্নানবস্ত্র দান। (২০) এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে যে, বিখ্যাত মৃগার শ্রেষ্ঠীর মাতৃস্থানে প্রতিষ্ঠিত পুত্রবধূ প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী বিশাখার মাহাত্ম্য কোথায়? তাঁহার মাহাত্ম্য এই যে, কতকগুলি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণিসঙ্ঘে প্রচলিত অভ্যাস, যাহা সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধও স্বয়ং দোষ বলিয়া চিন্তা করেন নাই, বিশাখা এক মুহূর্ত্তে তাহা যে সঙ্ঘের অবনতির কারণ ইহা বুঝিয়াছিলেন, এবং তাহার মূলোৎপাটনের জন্য যত্নবতী হইয়াছিলেন। স্ত্রীচরিত্র পুণ্যবতী বিশাখা উত্তমরূপে বুঝিতেন, এবং বারাঙ্গনাগণের ঐরূপ যুক্তিতে ভিক্ষুণি সঙ্ঘে সে কিরূপ সুফল ফলিবে, তাহাও তিনি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। এজন্য যথাসাধ্য যাহাতে ঐ কলঙ্ক-কীট ভিক্ষুণি-সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ না করিতে পারে, তজ্জন্য মহিমামণ্ডিত রমণী তথাগতের সন্নিকটে ঐ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

হিরণবাবু ঐ সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন, "বৈশালির রমণীয়" "পূর্ব্বারাম" উদ্যানটি এই মহিমামণ্ডিত রমণীর দানের অন্যতম নিদর্শন। "পূর্ব্বারাম" নামক বিহারটিকে তিনি কি কারণে উদ্যান বলিয়া স্থির করিলেন? উহা কখনও উদ্যান বলিয়া ত্রিপিটকে আখ্যাত হয় নাই, সর্ব্বত্র বিহার বলিয়া উল্লিখিত আছে। উহা সঙ্ঘের একটী সুন্দর বাসস্থান ছিল। যাহা হউক, আমরা আরও আশ্চর্য্য হইলাম যে, শ্রাবস্তির সুবিখ্যাত পূর্ব্বারাম বিহারটিকে তিনি বৈশালিতে প্রেরণ করিয়াছেন। সমগ্র "বিশাখা বথু" (২১) পাঠে কি লেখক স্থির করিলেন, যে উহা বৈশালিতে বিশাখা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? বা ত্রিপিটকের কোথাও তিনি ঐরূপ উল্লেখ দেখিয়াছেন? বিশাখাবথুর সর্ব্বপ্রথমেই "শ্রাবস্তির পূর্ব্বারাম"—ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। বুদ্ধ ঘোষের টীকা ব্যতীত, আমরা আচার্য্য ধর্ম্মপালের বিমানবথু অট্ঠ কথায় (২২) তথা মজ্ঝিম (২৩) এবং অঙ্গুত্তর (২৪) নিকায়ের স্থানে স্থানে "শ্রাবস্তির পূর্ব্বারাম" এই সংবাদই প্রাপ্ত হইয়াছি। "বৈশালির পূর্ব্বারাম" নামে কোনও বিহারের নাম ত্রিপিটকে বা তাহার টীকায় কখনও প্রাপ্ত হই নাই। যাঁহারা একটু-আধটু বৌদ্ধ-সাহিত্যের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই জানেন যে, শ্রাবস্তিনগরে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণি সঙ্ঘের দুইটি প্রধান বাসস্থান ছিল। একটী তৎকালের উত্তরভারত-প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য-শ্রেষ্ঠী অনাথ পিণ্ডিক বা সুদত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত "জেতবন" এবং অপরটি মৃগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা বিশাখা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত রমণীয় "পূর্ব্বারাম বিহার"। লেখক পরলোকগত মনীষি Watters এর মন্তব্যটি (২৫) একবার পাঠ করিবেন; এবং উহা ভারতের প্রাচীন বিবরণে যে কতদূর আবশ্যক তাহাও একবার চিন্তা করিবেন।

পরিশেষে বলিতে হইবে যে, লেখক যে শীর্ষকটি মনোনীত করিয়াছেন, তাহা এ প্রবন্ধে না ব্যবহার করাই সঙ্গত ছিল। শ্রমণী-সঙ্ঘ অর্থে পূর্ব্বোল্লিখিত ভিক্ষুণি-সঙ্ঘের বিবরণ বুঝায় না। সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় ইহার যাহাই অর্থ হউক না কেন, বৌদ্ধ সাহিত্যে উহার অর্থ আর একরূপ। শ্রমণ বা সমণ কাহাদের বলে, তাহা বোধ হয় লেখক উত্তমরূপে জানেন। তৎকালে উত্তরভারতে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল, এবং তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ও বিবরণ জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও বর্ত্তমান ছিল। এজন্য ত্রিপিটকের বহুস্থানে "সমণ ব্রাহ্মণ" কথাটি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন, অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই তথায় "সমণ" নামে আখ্যাত হইয়াছেন। গৌতমবুদ্ধ ক্ষত্রিয়, সুতরাং তিনিও "সমণগোতম" নামে পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই "সক্যপুত্তসমণ" নামে তৎকালে পরিচিত হইয়াছিলেন। "সক্যপুত্তসমণ" অর্থে শাক্যপুত্রশ্রমণ বুঝায়। ভগবান বুদ্ধ শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহার প্রতিভাশালী শিষ্যবৃন্দ তৎকালে অন্যান্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত নামে আখ্যাত হইতেন। এইরূপ তৎকালে কতকগুলি নারী-ধর্ম্মসম্প্রদায়ও বর্ত্তমান ছিল, এবং তাহার যথেষ্ট প্রমাণ Dr. Rhys Davids কৃত

(১৮) Vinaya Pitaka-Mahavaggo Vol. I Ch VIII Sec. 15, p. 290-91.

(১৯) Sutta-Vibhanga (V. P.) II—Bhikkhunivibhanga, p. 259 60 ed Hermann Oldenberg, Berlin 1882.

(২০) Mahavagga (V. P.) Vol I Ch. VIII, Sec. 15, p. 294.

(২১) Dhammapada Commentary, Vol. pt. II p. 384 ed. Norman Lordon 1909, P. T. S.

(২২) Dhammapalas Paramatthadipani (Vimana-Vatthu) p. 187-195, ed Prof. Hardy; London 1901.

(২৩) Majjhima Nikaya, Vol. I p. 251 ed. V. Trenckner, London 1888.

(২৪) Ariguttara Nikaya, Pt. III, p. 344-45 Ed. Hardy, 1895.

(২৫) On Yuone Chwang (Royal Asiatic Society) Ed. Thomas Watters, p. 399, Vol. I. London 1904.

Buddhist India নামক পুস্তকে (২৬) পাওয়া যায়। উহা ব্যতীত সুত্তবিভঙ্গের অন্তর্গত ভিক্ষুণি বিভঙ্গে আমরা দেখিতে পাই, চণ্ডকালী ভিক্ষুণি বলিতেছেন 'কিন্নু মা'ব সমনিযো যা সমনিযো সাক্যধিতরো সন্তি অঞ্ঞাপি সমনিযো লজ্জিনিযো কুক্কুচ্চিকা সিখাকামা—তাস' আহম সন্তিকে ব্রহ্মচরিযং চরিস্সামীতি (২৭) পালিসাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তৎকৃত প্রতিমোক্ষে উহা এইরূপে অনুবাদ করিয়াছেন—'এই যে শাক্যকন্যারা শ্রমণা হইয়াছেন ইঁহারাই কি শ্রমণা? আরো লজ্জাবতী (পাপকার্য্যে) অনুতাপিনী ও শিক্ষাভিলাষিণী শ্রমণা আছেন, আমি তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মচর্য্য করিব' (২৮)। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায় বর্ত্তমান থাকায় ভিক্ষুগণের ন্যায় ভিক্ষুণিগণও 'সক্যধিতরো' বা শাক্যদুহিতা উপাধিদ্বারা শ্রমণা সঙ্ঘ হইতে বিশিষ্ট ছিলেন।

প্রাতিমোক্ষ (২৯) সুত্তবিভঙ্গ, নিকায় ও জাতকসমূহের দ্বারা বৌদ্ধ যুগের বহুপ্রকার শ্রমণী সঙ্ঘের অস্তিত্ব বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, লেখকের মনোনীত প্রবন্ধ নামে আমরা কোন্ সম্প্রদায়টির বিবরণ বুঝিব? শ্রমণী সঙ্ঘ বলিতে সাধারণতঃ ভারতের স্ত্রী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত বুঝায়—কেবলমাত্র ভিক্ষুণি সঙ্ঘের বিবরণ বুঝায় না। যে সকল অভিধার বহু প্রকার অর্থ হয় বা সর্ব্বসাধারণ ভ্রমে পতিত হয়েন এরূপ নামের মনোনীত করা কোন লেখকেরই যুক্তিযুক্ত নহে।

(২৬) Buddhist India, p 142, Ed T W Rhys Davids, London 1911

(২৭) Sutta Vibhanga Vol II (Vinaya Pitaka IV), p 235 Ed H Oldenberg, Berlin, 1882

(২৮) Patimokkha Ed Vidhusekhar Sastri (Bhikkhuni Patim), p 295 Calcutta

(২৯) Pratimoksha Sutra Ed Minayeff, p 9) St Petersburg 1869

ভ্রান্তি ও মীমাংসা

[শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্ এ]

(১)

তখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নানা স্থানে স্থাপিত, বিদ্যাচর্চ্চা সর্ব্বত্র প্রচলিত। সে আজ প্রায় দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা।

বিম্বিবতীর রাজা বীরবিক্রম স্বয়ং বিশেষ বিদ্বান্ না হইলেও, একমাত্র কন্যা দেবলাকে তিনি যত্ন-সহকারে বিদ্যা-শিক্ষা দিয়াছেন।—তাঁহার ইচ্ছা, আভিজাত্য-গৌরবে প্রশংসিত কোন বংশে কন্যার বিবাহ দেন।

দেবলা শৈশবে মাতৃহীনা, জননীর স্মৃতি তাঁহার বিমাতা পর্য্যন্তই। বিমাতা অরুন্ধতী দেবীর সন্তান নাই, দেবলাকে তিনি অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছেন। অরুন্ধতীর চিন্তা,—দেবলার এত সৌন্দর্য্য, এত গুণ,—তাহাতে তাহার মঙ্গল হইলে হয়!—রাণীর ইচ্ছা, গুণবান্ পতির সহিত দেবলার পরিণয় হয়।

এ বিষয়ে দেবলার নিজের কোনরূপ ইচ্ছা আছে কি না, তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। যতদূর দেখা যাইত, তাহাতে পিতামাতার মতই দেবলার মত,—কিন্তু পিতা-মাতার মত তো একমুখী নয়।

(২)

দেবলা দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন।

পিতাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদি চিত্তবৃত্তির নিরোধই জীবের ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট পথ হ'লো, তবে পার্থিব স্নেহ ও আকাঙ্ক্ষার মর্য্যাদা কি? যদি নির্ব্বাণ জীবের স্বাভাবিক সমাপ্তি, তবে কর্ম্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের মূল্য কি? 'মুক্তি' আর 'নির্ব্বাণে' সম্বন্ধ কি?"

সপ্তদশবর্ষীয়া কন্যার আধ্যাত্মিক প্রশ্নে—পিতা মস্তক কণ্ডূয়ন করিয়া বলিলেন,—"এ-সব কথা অপর একদিন বুঝিয়ে দেবো।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা প্রায়ই হইত ;—কিন্তু কখনই পিতার অঙ্গীকৃত সেই শুভদিন উপস্থিত হয় না! পিতা কন্যা-স্নেহে মুগ্ধ হইয়া ভাবেন,—"মেয়েকে দার্শনিক তত্ত্ব শেখানো ঠিক হচ্ছে কি না ?"

অরুন্ধতী দেবী গর্ব্বিত দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবেন, "এত সৌন্দর্য্য, এত গুণের মর্য্যাদা রক্ষা হ'লে হয়।" কন্যার শিক্ষাবিধানে তাঁহারই সর্ব্বপ্রধান যত্ন; তিনি নিজে বিদুষী রমণী।

(৩)

শৈলদত্ত বিদ্যার্থী যুবক। দেখিতে সুন্দর, পাঠে নিবিষ্ট-চিত্ত; বয়স বিংশ বৎসর; দরিদ্র-সন্তান। সে রাজ-বাড়ীতে থাকিত,—রাজা ও রাণী তাহাকে স্নেহ করিতেন। বিম্বিবতী নগরে আসিবার পূর্ব্বে সে তালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু-দিন অধ্যয়ন করিয়াছিল। তাহার অধ্যয়ন-স্পৃহা বয়সের অতিরিক্ত; জটিল দার্শনিক প্রশ্নের সে মীমাংসা করিতে পারিত না,—কিন্তু প্রশ্নের বিষয় অনুধাবন করিতে পারিত; মীমাংসা-স্পৃহা তাহার প্রবল।

সে-দিন দেবলা যখন পিতাকে প্রশ্ন করিতেছিলেন, তখন শৈলদত্ত নিকটে ছিল; দেবলার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বদনের গৌরব-প্রভা তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা-স্পৃহা জাগাইয়া দিল।

সন্ধ্যার পর শৈলদত্ত দেবলাকে বলিল,—"একজন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।"

"কে ?"

"অনন্তব্রত,—তালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।"

"আমি তাঁকে জানি না।"

"আমি জানি,—তাঁর কাছে কিছু-দিন দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রেছি। তিনি অগাধ পণ্ডিত,—বিদ্যাচর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ ক'রেছেন।"

(৪)

একদিন তালন্দা প্রদেশে রাজা ও রাণী পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন; দেবলা সঙ্গে ছিলেন।

রাজা দেবলাকে লইয়া পদব্রজে একটী মন্দির দেখিতে গিয়াছেন; শিবিকা-সন্নিকটে রাণী অরুন্ধতী।

গৌরবর্ণ, দীপ্তমূর্ত্তি, নগ্নপদ, দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়স্ক অধ্যাপক অনন্তব্রত সেই পথে চলিয়াছেন। অরুন্ধতী দেবী তাঁহার দূর-সম্পর্কীয়া পিতৃস্বসা হইতেন;—তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র অনন্তব্রত সহাস্য বদনে আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন।

রাণী বলিলেন,—"তুমি আর একটু কাল অপেক্ষা কর্‌লেই রাজার সঙ্গে তোমার পরিচয় ক'রে দিতে পারি।"

বিনীত ভাবে, সহাস্য বদনে, অনন্তব্রত উত্তর করিলেন, "আজ আমি একটু কার্য্যে ব্যাপৃত আছি; আমার সৌভাগ্য হ'লে আর এক দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।"

"বেশ,—আমাদের বাড়ী একদিন এসো।"

"আস্‌বো,—নিশ্চয়; কিন্তু কবে, তা তো ঠিক বল্‌তে পাচ্চিনে; আচ্ছা,—দু'-মাস পর আস্‌বো।"

"বেশ তো; আজই দিন স্থির করা যাক।"

তখন বৈশাখ মাস; স্থির হইল, আষাঢ়ের শুক্লা-দ্বিতীয়ায় অনন্তব্রত রাজবাড়ী আসিবেন। তার পর অনন্তব্রত অরুন্ধতী দেবীর পদধূলি লইয়া চলিয়া গেলেন।

রাজা ও দেবলা শিবিকার নিকটে ফিরিয়া আসিলে, রাণী এ প্রসঙ্গ তাঁহাদের নিকট জ্ঞাপন করিতে বিস্মৃতা হইলেন।

(৫)

শৈলদত্ত আর পাঠে মনোযোগ দিতে পারে না; দেবলার সঙ্গে বাক্যালাপ আর দেবলার বিষয়ে চিন্তা এখন তাহার অধ্যয়নের স্থান পূর্ণ করিয়াছে।

দেবলা ভাবিতেন,—"আহা, প্রতিভাপূর্ণ, উন্নত-চরিত্র বালক! তার দারিদ্র্য-ক্লেশ দূর হ'লে হয়।"

শৈলদত্ত ভাবিত,—"এই দেবীমূর্ত্তি রমণী; এঁর কাছে কত শিক্ষার জিনিষ আছে!" আবার ভাবিত,—"এঁকে যদি গৃহিণীরূপে পাই!" দেবলা কিন্তু তাহাকে ভ্রাতৃস্থানীয়ই মনে করিতেন,—ওরূপ চিন্তা শৈলদত্তের মনে যে কখনও উদয় হইতে পারে, তাহা তাঁহার কল্পনার অতীত।

* * * *

একদিন শৈলদত্ত রাজাকে বলিয়া ফেলিল,—"আমি দেবলাকে বিবাহ করতে চাই; যদি আপনার অনুমতি হয়—"

রাজা বলিলেন,—"কি ব'ল্‌ছিলে ? তুমি বাতুল হয়েছ। শীঘ্র যদি এ চিন্তা পরিত্যাগ না কর, তবে আমি তোমার

মস্তিষ্ক-সংশোধনের জন্য যথোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রুন।"

শৈলদত্ত নিরুত্তর। তাহার মনে হইল,—তাহার দারিদ্র্য দূর হইলেই সে দেবলার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবে।

(৬)

পরদিন এই কথা অন্তঃপুরে প্রচারিত হইল।

দেবলা শৈলদত্তের আকাঙ্ক্ষার অনুমোদন করিলেন না; কিন্তু তাহার হৃদয়ের ব্যথা স্বয়ং অনুভব করিলেন;—অনুকম্পায় দেবলার হৃদয় ভরিয়া গেল।

শৈলদত্তের অনুসন্ধান করায় জানা গেল,—সে গত রাত্রিতেই রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেবলা ডাকিলেন,—"এস ভাই, ফিরে এস। কেন এমন চিন্তার হৃদয়ে স্থান দিলে?"

(৭)

ইতোমধ্যে একদিন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনন্তব্রত বিদ্বিবতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত আধ্যাত্মিক বিষয়ক প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা পাঠ করিলেন।

মূল প্রবন্ধের নাম,—"নির্ব্বাণ ও মুক্তি।" লেখকের নাম,—শ্রীদেবব্রত।

সমালোচনাংশে অনন্তব্রত পাঠ করিলেন,—

"দুই শ্রেণীর প্রবন্ধের সমালোচনা আবশ্যক; এক উৎকৃষ্ট, অপর অপকৃষ্ট। প্রবন্ধ নামতঃ চিত্তাকর্ষক হইলেই তাহাতে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্তি হয়; বর্ত্তমান প্রবন্ধ নামতঃ চিত্তাকর্ষক,—কিন্তু ইহার চিত্তাকর্ষতা কেবল নামতঃই; বস্তুতঃ ইহা সারবত্তা বিহীন।

"আবার প্রবন্ধটী যদিও নামতঃ কোন পুরুষের রচিত, বাস্তবিক কিন্তু একটুকু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ইহা কোনও স্বল্প-বিদ্যায় বিদুষী বালিকার লিখিত।

"অধ্যাত্ম-তত্ত্বের মীমাংসায় ইহা ভ্রান্তিপূর্ণ। 'মায়া' এবং 'মুক্তি' বিষয়ক তত্ত্বের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া লেখিকা (কারণ তিনি লেখিকাই বটেন) কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীতা হইতে পারেন নাই।

"বালিকা দার্শনিক-তত্ত্ব মীমাংসার প্রগল্‌ভতা না দেখাইয়া, যদি গৃহস্থালীর কার্য্যে মনোযোগ দিতেন, তবে তাহাতে পৃথিবীর অধিকতর উপকার হইতে পারিত।"

* * * *

এই সমালোচনার বিষয় রাজকুমারী দেবলা শুনিলেন। মাতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া দেবলা বলিলেন, "মা, এই সমালোচক এমন ভুল বুঝ্‌লে কেন?" তার পর বলিলেন, "আমি কি বাস্তবিকই এই রকম প্রগল্‌ভা রমণী?"

স্নেহবিগলিত নেত্রে মাতা বলিলেন, "মা, তুমি ক্ষোভ ক'রো না; বিদ্বান্ ব্যক্তিরা প্রায়ই গর্ব্বিত হন।" অরুন্ধতী দেবী জানিতেন না, এই সমালোচক অনন্তব্রত।

কন্যার এই নূতন ক্লেশ মাতা ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

(৮)

শৈলদত্ত নালন্দায় গিয়া অনন্তব্রতের পদধূলি গ্রহণ করিল; সে বলিল,—"আমি এক বালিকাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় তার পিতাকে এ বিষয় জানা'লে, তিনি আমাকে 'বাতুল' ব'লে বিদায় ক'রেছেন। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন সেই বালিকার উপযুক্ত পাত্র হ'তে পারি।"

অনন্তব্রত বলিলেন, "বৎস, আমি সে বালিকাকে জানি না; তার বিষয় তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস্ ক'রতেও আমার ইচ্ছা নাই। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যেন তার উপযুক্ত পাত্র হ'য়ে ফিরে আস্‌তে পার।"

শৈলদত্ত আবার বলিল, "আমার দারিদ্র্যই আমার আকাঙ্ক্ষার প্রধান অন্তরায়।"

তখন অনন্তব্রত বলিলেন, "আমি তো ধন সন্ধানের বিষয়ে অনভিজ্ঞ; স্ত্রী-জাতিকেও আমি বুঝ্‌তে অক্ষম; তবে তোমার যেমন প্রতিভা ও অধ্যবসায়, তাতে নিশ্চয়ই তুমি দারিদ্র্যের অন্তরায় অপনোদন ক'রতে পারবে,—এ আমার বিশ্বাস।"

(৯)

আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া।

অনন্তব্রত রাজবাড়ীতে আসিয়া অরুন্ধতী দেবীর পাদবন্দনা করিলেন। তিনি কয়েক দিন এখানে থাকিবেন।

দেবলা বিশেষ কিছু চিন্তা না করিয়াই অনন্তব্রতকে বলিলেন, "আপনি সে-দিন আমার প্রবন্ধের অন্যায়

সমালোচনা ক'রেছেন। অযথা তীব্রতা দ্বারা মানুষকে ক্লেশ দেওয়া অনুচিত কাজ।"

মৃদুহাস্যে অনন্তব্রত বলিলেন, "অবস্থাবিশেষে ক্লেশ দেওয়া ন্যায্য সমালোচকের কর্ত্তব্যের মধ্যে; তবে সেই কার্য্যানুযায়ী ক্লেশ যতটা কোমল ভাবে দেওয়া যায়, তাই উচিত। আমি জান্‌তেম না সেই প্রবন্ধ আপনার লেখা, আপনার কথায় তা' বুঝ্‌তে পেলেম; এবং আমি সন্তুষ্ট হ'য়েছি, আমার সমালোচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই।"

"আপনি আমায় 'প্রগল্‌ভতার' অপবাদ দিয়ে অবিচার ক'রেছেন।"

"তা'তে আমি ব্যথিত হ'লেম; কিন্তু,—'প্রগল্‌ভতা' যখন বাস্তবিক, তখন তার উল্লেখ করায় 'অপবাদ' বা 'অবিচার' হ'য়েছে, তা' আমি স্বীকার করি না।"

"স্ত্রীজাতির পক্ষে কি দার্শনিক তত্ত্ব মীমাংসার চেষ্টা ক'র্‌তে নেই?"

"চেষ্টায় বিশেষ দোষ না থাক্‌তে পারে,—তবে আমি স্ত্রীজাতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ; আমার বিবেচনায় কিন্তু এরূপ চেষ্টায় পৃথিবীর কোনো হিতই সাধিত হয় না।"

দেবলা দেখিলেন, কি দৃঢ়তা ব্যঞ্জক অথচ সহাস্য, স্থির বাক্য! তাহার বোধ হইল, যেন অনন্তব্রতের কথায় কোনও গর্ব্ব নাই,—অথচ জ্ঞানের গভীরতা আছে।

সমালোচক দেবলার সহিত ধীর, সংযত বাক্য ব্যবহার করিলেও দেখা গেল তিনি তাঁহার নিজ অভিমতের এক বর্ণও প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত নন। অনন্তব্রতও একটা বালিকার নিকট এতদূর দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপক উক্তি আশা করেন নাই। উভয়ের মত-পার্থক্য থাকিলেও পরস্পর পরস্পরের স্পষ্ট বাক্যে আশ্চর্য্য হইলেন।

দেবলা অনুভব করিলেন, তিনি পরাজিতা।

* * * *

সেই রাত্রিতে দেবলা আবার মাতার ক্রোড়ে মুখ রাখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। স্থির করিলেন, এই জ্ঞানী মহাত্মার নিকট তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহার সহিত আর তর্ক করিবেন না।

হায়! বালক শৈলদত্ত অবাধে দেবলাকে 'শিক্ষয়িত্রীর' আসন দিয়াছিল। এ ব্যক্তি কিন্তু 'শিক্ষকের' মর্য্যাদা হইতে একপদও নিম্নে আসিবেন না!

(১০)

আজ তিন দিন অনন্তব্রত রাজবাড়ীতে আছেন।

দেবলা নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করেন, তর্কের ক্ষমতা তাঁহার অপসৃত হইয়াছে।

সে-দিন "নির্ব্বাণ ও মুক্তি" সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে; দেবলা শ্রোত্রী।

অনন্তব্রত বলিতেছেন, "পার্থিব স্নেহ ও পার্থিব আকাঙ্ক্ষা আমার বিবেচনায় নির্ব্বাণ-প্রার্থী জীবের আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বৃদ্ধি করে, তাকে দরিদ্র করে না। সেই প্রবৃত্তির অস্তিত্বেই তার সম্পদ,—বাসনার অন্ধ অনুসরণে তার কোনও তৃপ্তি নাই। কর্ম্মের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সেই সম্পদের পরিমাপ জ্ঞাপন করে।"

তার পর আবার বলিলেন,—"যথাযথ 'কর্ম্ম' সাধনেই ইহলোক হ'তে জীবাত্মার মুক্তি; তখন 'মুক্ত' আত্মা স্বত্ব পরিত্যাগ ক'রে অনন্ত অবিনশ্বর 'আত্ম'-সাগরে বিলীন হয়,—সেই তার 'নির্ব্বাণ' লাভ।"

আবার,—"মহাসাগরের এক বিন্দু জল তু'লে নিলে তা'তে সমুদ্র-সলিলের সকল ধর্ম্মই বিরাজিত দেখ্‌তে পাওয়া যাবে; তা'কে জগতের কার্য্যে ব্যবহার করা যেতে পারে,—সেই কার্য্যের অবসানেই জলবিন্দুর অবস্থা হ'তে তার 'মুক্তি'; তার পর মহাসমুদ্রে আবার যদি সে মিশিল, তবে তার 'নির্ব্বাণ' লাভ হ'ল। তখন আর তার কোনো পৃথক্, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিল না।"

তার পর, "কিন্তু পার্থিব আকাঙ্ক্ষা বা স্নেহের অনুভূতি যে ব্যক্তির নাই, তার জীবাত্মার মর্য্যাদা তৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ। যদি ভগবান্ সিদ্ধার্থ-দেবের পার্থিব স্নেহ বা আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি না থাক্‌তো, তবে তাঁর মহানিষ্ক্রমণের এত বড় মাহাত্ম্য জগতে বিখ্যাত হ'তো না।"

আবার,—"সাধারণ মানবমাত্রেরই লৌকিক যশঃ-প্রয়াস স্বাভাবিক; কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব সম্পদের প্রার্থনা দ্বারা জীবাত্মাকে ভারাক্রান্ত করে, কাম্য সম্পদ্ প্রায়ই তার নিকট হ'তে দূরে চ'লে যায়,—অথচ তার প্রার্থনার জ্ঞাপন দ্বারা সে ব্যক্তি স্বীয় লঘুত্বই প্রচারিত করে।"

* * * * * *

দেবলার হৃদয় শ্রদ্ধায় নত হইল।

সমুদ্রের বিরাট গাম্ভীর্য্যের মধ্যে তটশালিনী নদীর পূর্ব্ব শোভা-স্মৃতি বিলুপ্ত হইল।

এ-কি অদম্য আকর্ষণ বক্তার দিকে তাঁহার হৃদয়কে টানিয়া লইতেছে!

অনন্তব্রত বুঝিলেন, বালিকাও সামান্য নয়। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সমালোচনা স্মরণ করিয়া মনে মনে সঙ্কুচিত হইলেন।

(১১)

আরও প্রায় পাঁচবৎসর চলিয়া গিয়াছে। দেবলা আজও অবিবাহিতা।

তাঁহার পিতা উৎপলবতীর রাজপুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। অরুন্ধতী দেবীর ইচ্ছা ছিল, অনন্তব্রতের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়া। অনন্তব্রতের ইচ্ছা ছিল, শৈলদত্তের অনুসন্ধান করিয়া তাহার সহিত এই দেবীপ্রতিমার পরিণয় সাধন করেন।

দেবলার নিজের কি ইচ্ছা ছিল, তাহা কেহই জানিল না।

শৈলদত্ত এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি,— উৎপলবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি তথায় রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন; তাঁহার দারিদ্র্য দূর হইয়াছে।

একদিন শৈলদত্ত আসিয়া অনন্তব্রতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন;—উভয়ে বিম্বিবতী নগরে গেলেন।

সেদিন রাজবাড়ীতে বিবাহ-উৎসব। উৎপলবতীর রাজপুত্রের সহিত দেবলার বিবাহ হইবে।

*   *   *   *   *

দেবলা মন্দিরমধ্যে বুদ্ধদেবের ধ্যানগত মূর্ত্তির পদ-প্রান্তে ধ্যানমগ্না। ধীর, কম্পিত স্বরে প্রার্থনা করিতেছেন,—

"ভগবন্, তোমার অনন্ত স্থিতির মধ্যে আমার সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষা ও স্নেহ নিমজ্জিত হোক। তোমার বিশালত্বের নিকট পৃথিবীর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয়ই সমান! যে স্নেহ ও আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে জাগ্রত, তা' তোমার অস্তিত্বে লিপ্ত হ'লে তবে তো ন্যায্য অধিকারীর নিকট স্থির ভাবে উপনীত হবে,—সেই উপনীতিতেই যে তার পরিসমাপ্তি। পার্থিব প্রণালীতে পরিচালিত হ'লে, তা' ন্যায্য স্থানে উপস্থিত হবে না।"

ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া আবার বলিলেন,—"আমার স্নেহময় পিতা-মাতার ও আমার ভ্রাতৃতুল্য শৈলদত্তের মঙ্গল হোক! আর যাঁর স্থির, গম্ভীর মূর্ত্তি আজ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে, যাঁর বাক্যধ্বনি আজ আমার ক্ষুদ্রত্বকে অসীমত্বের সন্ধানে অনুপ্রাণিত ক'রেছে,—তিনি আমার পার্থিব বাসনা, প্রয়াসের অতীত। তাঁকে আমি তোমার ওই অনন্ত অস্তিত্বে মিলিত দেখিয়াছি। তোমার ভিতর 'তাঁকে',—এবং তাঁর ভিতর ও সর্ব্বত্র 'তোমাকে'—আমি প্রণাম করি।"

*   *   *   *   *

রাজা ও রাণী দেবলার অনুসন্ধান করিতে-করিতে আসিয়া মন্দিরমধ্যে তাঁহাকে ধ্যানরতা দেখিলেন; তাঁহার প্রার্থনা-বাক্য শুনিতে পাইলেন।

তার পর নিকটে গিয়া দেখিলেন; দেবলার প্রাণহীন দেহ বুদ্ধমূর্ত্তির পদতলে লুণ্ঠিত!

তখন বহিঃপ্রাঙ্গণে বিবাহের বাদ্য বাজিতেছিল।

(১২)

আরও পাঁচবৎসর অতীত হইয়াছে।

সেই মন্দির প্রাঙ্গণে এক মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখানে রাজা ও রাণী দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষার বিপুল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এক নবীন শ্রমণ তাঁহার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ সেই কার্য্যে ব্যয় করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন। আর এক প্রবীণ শ্রমণ সেই মঠে দার্শনিক তত্ত্বের অধ্যাপক। উভয়ে প্রতি সন্ধ্যায় এক প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করেন, আর ভক্তি-অশ্রুতে প্রস্তরবেদী প্লাবিত করেন।

প্রবীণ শ্রমণ একদিন অশ্রু-বিগলিত নেত্রে তাঁহার নবীন সহকারীকে বলিলেন,—

"বৎস,—আমার ভ্রান্তির মীমাংসা হ'য়ে গিয়েছে। বোধিসত্বের মূর্ত্তির সহিতই এই দেবীমূর্ত্তি আমাদের নমস্য!"

নব্যতন্ত্র ও হিন্দুমহিলা

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

গতানুগতিকের সকল সম্ভ্রম-দায় হইতে কে যেন আজ আমাকে মুক্তি দিয়াছে। অন্তরে আমার ভরিয়া উঠিল কি এ?—কোন্ বিশ্ব-বিমোহনের চিরকিশোর চরণ-স্খলিত নৃত্য-নূপুর-কাকলি হৃদয়-নিকুঞ্জ ভরিয়া দিল,—আমায় অন্তরের গানে-গানে ঝঙ্কৃত করিল! নবীন অনুভূতিতেই আমি আজ অখণ্ড, সম্পূর্ণ, পরিতৃপ্ত! বাহিরের স্পর্শ ভিতরের স্বর্গ-সৃষ্টিকে ব্যর্থ করিবার নহে। মর্ত্ত্যে তাহা পরিদৃশ্যমান না হইলে, আমার স্বর্গে আমার মর্ত্ত্যে মেশামিশি না হইলে, এ ব্যাকুল আগ্রহ হৃদয়ে যেন চাপিয়া রাখা সাধ্যাতীত। অনন্তে লীন মুক্ত আত্মা ততদিনই অতৃপ্ত, আপনা হইতে মানবে অসংখ্য বন্ধনের জাল উর্ণনাভের মত সৃষ্টি করিতে থাকিবে। এ অনুভূতির উৎস মূল আছেই। তথা হইতে সমগ্র মানবে আমায় একাকার, একযোগ। এ নিশ্চয়।

ঐ যে জগতের অন্তর্যামীর প্রেরণা অজ্ঞাতে হিন্দুর হৃদয়ে তলে-তলে নূতনের আহ্বান পৌঁছিয়া দিতেছে—ও যে সত্য। আমার চক্ষে প্রত্যক্ষ, সকলেরই চক্ষে হইবে। কিন্তু কি উৎকট প্রলয়ের সাজে তাহার আগমন! কি নির্দ্দয়, নিষ্পেষণ-তন্ত্রে তাহার প্রতিষ্ঠা! প্রথম দৃষ্টিতে যে দিন তাহা সম্মুখে পরিস্ফুট হইল, কি আন্তরিক আতঙ্কেই না শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম! তার পর ক্রমে-ক্রমে দেখিতে-দেখিতে হৃদয়বৃত্তি সমস্তই স্তম্ভিত, নিশ্চল হইয়া গিয়াছে। আজ যে বুঝিয়াছি, ঈশ্বরের বিচার-অবিচার নাই। সকলি ঈশ্বরের লীলা। অসাড়তার চরম প্রকাশ করিয়াছেন,—এদিকে কষা-প্রহারে চরমতা ফুটিয়া উঠিবেই ত!

আঁধারে-আঁধারে কতই না বৈচিত্র্য দেখিলাম। ঘটে-ঘটে রহস্যের কত বিভিন্ন মূর্ত্তিই না চোখে পড়িল! যে প্রকৃতি-গ্রন্থ, যে জীবন-গ্রন্থ খুলিয়া শিক্ষক শিখাইলেন, তাহার পত্রে-পত্রে লব্ধ-অভিজ্ঞতা স্মৃতির সম্মুখে জলজ্বল্ জ্বলিতেছে। অনর্থক সে সব স্মরণ করা। সবার মূল রহস্য এইটুকু বলিতে পারি—লীলা-রহস্যের এইটুকু মাত্র আভাষ দিতে পারি যে, সাড় জাগিলে তবে অসাড়তার উপলব্ধি মানবে আসে। স্নেহ-করস্পর্শ সর্ব্বাঙ্গ যতক্ষণ না অভিষিক্ত করে, নির্দ্দয় কষা কেমন করিয়া কাহাকে বাজে,—ততক্ষণ তাহা অন্ধকার।

অসাড়তা জাতির সর্ব্বাঙ্গে। কষাও সর্ব্বাঙ্গে। ঘরে এই যে সংখ্যাহীন মর্ম্মন্তুদ ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে, তাহাদের অশ্রুগাথা শত-শত পরিবারে কত ভগ্ন-হৃদয় বীণার তারে থমকিয়া আছে,—সে বিষাদ-মলিন দুর্ভাগ্য-মসীমাখা জীবন-পত্রগুলি কি কোনও শিল্পীর রচনা নহে? বালকের অঙ্কিত অসংলগ্ন রেখা-সংলেপ মাত্র? অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, পরিণামহীন? যতদিন মধ্যে ছিলাম, কত কি ভাবিতাম। আজ না কি বিশ্ব-শৃঙ্খলার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি,—ইহার স্পষ্ট অর্থ-নির্দ্দেশ আজ আমার চোখে সুস্পষ্ট। বাহিরেও মানুষ হিসাবে অপরিণত, আমাদের সমষ্টিগত পশ্চাদ্বর্ত্তিতায়, ব্যষ্টি যখন দেশে-বিদেশে লাঞ্ছনা, অবমাননা, গ্লানি বহন করিতেছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে বৈষয়িক ব্যাপারের প্রতিযোগিতায় শিল্পে, বাণিজ্যে কি যেন নিহিত পাপের বোঝা আমাদের তুলনাহীন বিদ্যা-সম্পদ, বুদ্ধি-সম্পদ, কিছুই বিকশিত হইতে দিতেছে না, সমস্তই চাপিয়া রাখিতেছে। ক্রয়-বিক্রয়ের হাটে আমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হইতেছে—প্রতিদান মরণের মুদ্রায় গণিয়া পাইতেছি। এই সমস্ত নিত্য দেখিতেছি। কষাঘাত সত্য, তাহা আর ভুলিতে পারিতেছি কই? সংশয় দিনে-দিনে এমন করিয়া নিশ্চয়ে দাঁড়াইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্যও সুস্পষ্ট।

এই সকল অপ্রত্যাশিত ঘটনা চমকের পর চমক দিয়া, আত্মোপলব্ধি পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ে বিকশিত করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চায়। অন্তর্যামীর প্রেরণা, নূতনের আহ্বান এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই। সমস্তের অন্তর্নিহিত অখণ্ড লক্ষ্য—হিন্দুর জাগরণ। আর সে হিন্দু কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানবিশেষ নহে, মনুষ্যত্বের কোনও খণ্ডও

নহে,—সে সমগ্র পরিপূর্ণ মানবের ভাবমূর্ত্তি। সে জগতের ভাবী পরিণতির আলেখ্য-চিত্র।

এ প্রেরণা যে জাগরণের জন্য, সে জাগরণ হয় ত এখনও আমাদের কল্পনাতীত। যে কল্পনা-মধ্যে এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রথম বিকাশ পরিণত হইয়াছিল, হয় তো তাহারই মধ্যে সে জাগরণ এখনও তুরীয় সত্তায় লীন। চিত্রিত আলেখ্যের মত সেই জন্যই সে এখনও মানব-কল্পনায় ফুটিয়া উঠে নাই। আভাষ ব্যক্তি-বিশেষে জাগিয়াছে মাত্র।

মানবের সমগ্রতা, পরিপূর্ণতা, বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যতখানি পরিস্ফুট হইবার, সে হইয়া গিয়াছে। এ স্তর-বিশেষে মানুষ যতটা গঠিত হইবার তাহা সম্পূর্ণ। বিচার-জ্ঞান আহরণ ও সংরক্ষণ দ্বারা জগৎকে যতটা ভরান যায়, ততটা সে এত দিনে সম্পন্ন করিল। এইবার নব-পর্য্যায়। এ পর্য্যায়ে মানুষের কোন অংশটাই আর নেপথ্যে থাকিবে না। সবটা প্রকাশ পাইয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে। মানুষ অখণ্ডতা লাভ করিবে। এবারকার মন্ত্র তাই প্রেম ও বিশ্বাস। এবারের কর্ম্ম সম্প্রসারণ ও সংগঠন। অদূর-ভবিষ্যতেই মানুষের জীবন-সংগ্রামের ছুটাছুটি, অতৃপ্তি, পার্থক্যের অবসান হইবে। জীবন লইয়া আর সংগ্রাম চলিবে না। জীবনযাত্রা কথাটাই সত্য হইবে। অনবরত চেষ্টা করিয়া আপনার জন্য স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু রক্ষা করার পরিশ্রমে মানুষ সত্যই রুদ্ধশ্বাস। তাহার অহঙ্কারের ঘূর্ণিত মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়াছে। অমৃত তাহার দুরবস্থা দেখিয়াই কাতর হইয়া কোল পাতিয়া দিয়াছেন।

অমৃতের এই আহ্বান, অন্তর্যামীর এই প্রেরণা, সফল হইবেই। মানবের বিচ্ছিন্নতামুখী জীবন-স্রোত মহামিলনের এক লক্ষ্যে বিপরীত-মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইবেই। ঈশ্বর এ পরিণাম চাহিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের চিরন্তন সুখে-দুঃখে, শত-শত উচ্চাত্মার তপস্যায় এ নির্দ্দিষ্ট। এই দেব ভূমিই মানবের দেব-জন্ম লাভের সূতিকাগার হইবে। এই ভূ-স্বর্গেই মানবাত্মার চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোক, কল্পনালোক হইতে অবতরণ করিয়া বাস্তবলোকে বিকশিত হইবে। জয়ে-পরাজয়ে আমরা প্রস্তুত হইয়াছি। ঔদার্য্যের সংকীর্ণতার বিভিন্ন বিকাশে তাহারি জন্য আমরা নিজেদের গড়িয়া আসিয়াছি। ভারতবর্ষের এই বিচিত্র ইতিহাস—তাহার এই বিপুল বিস্ময়কর আয়তন সমস্তই স্রষ্টার উদ্দেশ্য-মূলক রচনা—ইহার মধ্যে বিপুল অর্থ প্রকাশিত হইবার আছে।

তাই তো এত একাগ্র আহ্বান তোমাদের। মানসিক জড়ত্বের কারাগার ভাঙিয়া বাহিরে এস নারী,—রমণী জননী হও। তুমি মা। সৃষ্টির নব-বীজকে রস-সেকে উদ্ভিন্ন নবাঙ্কুরে পরিণত করিবে তুমি। তোমারই তপঃসিদ্ধ মনে ঐশী তেজোধারা ধূর্জ্জটী-জটা-কলাপ-উচ্ছ্বসিত পতিতপাবনী পুণ্যময়ীর মত নামিয়া বিশ্বের ভবিষ্য প্রকাশের জন্য জীবনী-বেগ উল্লাসে থমকিয়া অপেক্ষা করিবে—সেই নবাবির্ভূত নবযুগের ঋষিদিগের আগমনের, যাঁহারা জাতির নব-জীবন-ধারা প্রবাহিত হইয়া বহিয়া যাইবার পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। ব্যষ্টি-হিসাবে উত্থিত হও, জাতি-হিসাবে গঠিত হও। বাহিরের প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন হয় তো না হইতে পারে। অন্তরের সমবেদনায় একে অন্যের সহিত স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া গিয়া মিলিত হইতে থাক। তোমরাও মানুষ হও—জাতির অঙ্গ বলিয়া নিজেদের বিবেচনা করিতে আরম্ভ কর। তোমাদের জীবন তোমাদের হউক। আদর্শে যাহারই অনুগামী হও, তুমি কাহারও আয়ত্তে নহ।

আর আদর্শ, সেও ত,—সকলেরই, ভগবান্, যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত। তাঁহার মধ্যে আপনাকে সমর্পিত করিতে, তাঁহার প্রেরণার চেতনায় আপনাকে জাগাইয়া রাখিতে—সে আবার কাহার আদেশ-মুখে আপনাকে সমর্পিত করিতে হইবে? কাহার প্রসন্নতার জন্য মুখাপেক্ষার চেতনায় নূতন করিয়া আবার আপনাকে জাগাইয়া রাখিবার হস্ত-গঠিত শৃঙ্খলে আপনাকে বদ্ধ হইতে হইবে! কাহারও নহে। ভগবানের পূতস্পর্শে চিত্ত-কমল দলে-দলে বিকশিত হইয়া ভগবানময় হইয়া যাক। যে দেহ সে প্রাণ মন ধারণ করিবে, সে ত ভগবতী তনু,—মানুষের নিন্দা, মানুষের গ্লানি, মানুষের ঈর্ষ্যা, সন্দেহ তাহাকে স্পর্শ করিবার নহে। সে ভাগবত আদর্শে, ভাগবত ইচ্ছায় নূতন সৃষ্টিকে বিকশিত করিবার ব্রত মাথায় লইয়াছে। ভাগবত শ্রদ্ধা তাহার সম্ভ্রম। আপন অধিকার আপনি চিনিয়া সে যখন আত্মবিকাশে অগ্রসর হইবে, তখন তাহাকে রোখে কে?

হিন্দুয়ানীর অন্তঃপুরে, মানব-প্রাণের সংস্কার-সংকীর্ণতায়, বাসনার আবিলতায়, দৈহিক অভাবে অক্ষমতায় সর্ব্বত্র

খণ্ড-খণ্ড হইয়া হিন্দুনারীর মহত্ব আজ চূর্ণীকৃত, ধূল্যবলুণ্ঠিত। সকল দিক হইতে ফিরিয়া আজ তাহাকে পুনরায় আপন স্বরূপের মহান প্রতিমা পুনর্গঠিত করিতে হইবে। বাহির যতই বাধা দিক, তাহার ভিতর হইতে আত্মার অতৃপ্তি ক্রমাগতই তাহাকে এই গঠনে উত্তেজিত করিতেছে। তাহার প্রাণে ইহাই নূতনের আহ্বান। ইহাই অমৃতের প্রেরণা। যে অসাড় থাকিবে, কষা প্রহার তাহার পৃষ্ঠে অনিবার্য্য। কেরোসিনের বিষ-লিপ্ত অগ্নিশিখা এই কষারই একটা আঘাত। বিধবার দুঃখ, কন্যাদায়ের অপমান সমস্তই এই একই অন্তর্নিহিত বস্তুর বাহিরের অংশ। নারীত্বের বিজয়িনী মহিমায় নারীকে জাগিতে হইবেই। জাগো নারী! শত শত মিথ্যা ছলনার কুহকে সঙ্কীর্ণ জীবন-গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া দিন কাটাইও না। ওই শোন, বড় কাছে সাগরের কলগর্জ্জন! চল—চল, অনন্তে উধাও হইয়া চল।—জীবন-গণ্ডী অনন্ত ব্যাপিয়া অসীম মধ্যে এলাইয়া দেওয়া যায়।

তুমি কাম নও, ক্রোধ নও, লোভ নও, মায়াও নও। কোনও অমঙ্গলেরই কোনও কুণ্ঠা জাগাইবার বস্তুরই তুমি মূর্ত্তি-স্বরূপিণী নও। অখণ্ড চৈতন্য সাগরের তুমিও ত এক খণ্ড-প্রকাশ। হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ সরসতায় ইহলোকের সংস্রবটাকে লইয়া বৈরাগ্যের ভণ্ডামি করিতে জান না, বাহিরের প্রতিবাদের ইহাই ত তোমায় আঘাত করিবার স্থান? লজ্জা দূর কর নারী! প্রতিবাদে-প্রতিবাদে কথা-কাটাকাটি জীবন-সাধনার সিংহদ্বারের ঠেলাঠেলি মাত্র। সঙ্কল্প তোমার নির্দ্দেশক হউক। ভিতরে ঢুকিয়া পড় তোমার —আজ আবার নূতনের অভিযান। ঐশী প্রেরণায়, ঐশী আহ্বানে, গতানুগতিকের অবশ, নিশ্চেষ্ট প্রাণ থাকিয়া-থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। পাষাণ-গহ্বরের সুপ্ত-নির্ঝর-ধারা সহসা একদিন সূর্য্যালোক-স্পর্শে ফুলিয়া গরজিয়া হুঙ্কারে ডাকিয়া ছল্-ছল্ কল্-কল্ বেগে ছুটিয়া বাহিরে আসিবেই। ইহার ব্যতিক্রম নাই।—একদিন এককে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। আত্মা আপনার ব্যষ্টি-মূর্ত্তি তাহার আলোক-সম্পাতে গড়িয়া লইল। পরদিন এককে রূপান্তরিত করিলেন। আপনার মত পরকে স্বীকার করিয়াই আত্মা সমষ্টি-মূর্ত্তির উপাদান রচিতে আরম্ভ করিল। স্বাধীনতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানবের হইল অন্তরের সত্য। উপাদান সম্পূর্ণ—তাই তাহারই আতিশয্যে পরিতৃপ্ত আত্মা নূতনের আবাহনে উদ্বুদ্ধ হইবেই।—আবার এক রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেছে—জগৎ ফিরিবেই। এবার সে অনাবশ্যক ব্যষ্টিকে সমষ্টির মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া, সমষ্টির অতীত যিনি, তাঁহার জন্যই সাধনা আরম্ভ করিবে। মনুষ্য-জাতি আর এক ধাপ উঠিবে।

নব-তন্ত্রের আকর্ষণে নারী নূতন হইবেই। "হিন্দু-মহিলা" এ নামটা কি এমনি-একটা অলৌকিক আবরণ যে, তাহার প্রভাব অকাট্য! স্থল, জল, বায়ু, কালাকাল, কিছুরই প্রভাব তাহাকে অভিভূত করিবে না। যেমনি তাহার কাণের কাছে তুমি "হিন্দু-মহিলা", এই সম্মোহন বাণী উচ্চারিত হইবে, অমনি সে মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধ-বীর্য্য ভুজঙ্গের মত উদ্যত ফণা সংহরণ করিয়া নত মুখে, মৌন দীর্ঘশ্বাসে, আপনার সমস্ত বিদ্রোহকে দমন করিয়া ফেলিবে। তা' হয় না।—এমন করিয়া স্বভাবকে অ-স্বভাবে পরিণত করিলে সে বিষাইয়া উঠে,—উঠিতেছেও। তাই আজ ঘর এত অশান্তিপূর্ণ।

সমাজের এই দিকে একটা প্রকাণ্ড ত্রুটী রহিয়াছে। নূতনের স্বর্গ-সৃষ্টি ইহার চাপে ফুটিতে বিলম্ব হইবে। এই এখানেই আমি কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ভগবানের আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছি। মানুষের অবস্থা যখন স্বাভাবিক, তখন তাহাদের ত্রুটিগুলা প্রদর্শনেই সংশোধিত হয়। অস্বাভাবিক অবস্থায় তাহা হয় না, বরং বাড়িয়া যায়। আমার অন্তরে যে সুর ধ্বনিত হইয়া এমন উজানে বহিয়াছে, সেই সুর যদি ইহাদের কর্ণে তুলিতে পারি, ইহারাও আমার মত হইলেও হইতে পারে। ভালবাসার বাঁশি কোন্ রন্ধ্রে ভরিব, তবে সে ধ্বনি ফুকরিবে,—তাহারই প্রত্যক্ষ-বোধ আজ আমার তপস্যা। চারিদিকে ওই স্বার্থের অনলকুণ্ড—মোহের ধূমোদ্গীরণের আবর্জ্জনা-স্তূপ! তাহারই মধ্যে আজ আমি ধ্যানের আসন পাতিয়াছি। রুদ্ধশ্বাস হইলেও নিবৃত্ত হইব না। হে আমার ভগবান! শেষ পর্য্যন্ত আমায় রক্ষা করিও! হৃদয় তোমার আপনারই। তাহার চাহিবার অধিকার আছে, ক্ষমতাও আছে। আপনাকে প্রকাশ করা সকলের মত তাহার চিরন্তন অধিকার, বাঁধিয়া রাখা দাসত্ব মাত্র। কাহারও চাওয়ায় নির্ব্বিচারে ধরা দিয়া বসিয়া থাকা সক-

লেরই মত তাহারও বেলায় হতবুদ্ধিতা। এখানে সে প্রবঞ্চিত,—তা' সে প্রবঞ্চনা যত বড় নামের মুখস্ পরিয়া আসুক। শুধু এক কথা, আপন ভার আপন হস্তে লইবার পূর্ব্বে আপনাকে ভার্গবতময় করিতে হইবে। চলিত কথায় মনুষ্যত্বের আদালতে আপনার সাবালকতা প্রমাণ করিয়া লইতে হইবে।

আজই না-হয় হিন্দুর মনীষা লক্ষ্যহীন। আজই না-হয় ভারতের অদৃষ্টাকাশ-প্রান্ত ঝটিকার আসন্ন-সূচনায় মৌন ইঙ্গিতে নিস্তব্ধ হইয়াছে;—চারিদিক শান্ত, স্থির। দিন পরিবর্ত্তনশীল। অতীতের স্মৃতি যখন এত জীবন্ত, ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার মানস-দর্পণ-উদ্ভাসিত এই চিত্রগুলি ব্যর্থ, সে কি সত্য? স্বপ্ন পর্য্যন্তও ত অনর্থক নহে। অতীত মুছিবার নয়, অতএব ভবিষ্যৎ জাগিবার নয়, অসংশয়ে এ কথা মানিতে পারিলাম না। দিনের পর দিন আসিয়াছে দেখিয়াছি। পরস্পর তাহাদের কত বৈচিত্র্য! —আসিবেও দেখিব। শুধু দেখিব না, মনের আ-প্রান্ত ছাপাইয়া যে ঈষণা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই সার্থকতা? তবে এ কি? তবে আমি কি? বিশ্বের সব সত্য, কেবল আমি আর আমার আজগুবি খেয়াল, এই দুইটিই মিথ্যা? অথচ, উভয়ই জ্বল্-জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে! বেশ। কাহার অভিধান উল্‌টিয়া যায়, জীবন-অন্তে বিচার করা যাইবে। জীবন প্রকাশ করা আমার সত্য, নূতন আমার তন্ত্র। জীবন চাপিয়া রাখা কাহারও সত্য থাকে, সে করুক আমার সহিত যুদ্ধ-ঘোষণা—চলুক যুদ্ধ। জগৎ যা হইয়াছে, তাহা কোন্ দিব্য ঈষণার প্রকাশে, কোন্ সত্যের কতখানি আলোক-সম্পাতে কেমন করিয়া দিনে-দিনে প্রস্ফুটিত, সে ক্রম-বিকাশ অতীতের সহস্র যুগেও যখন হারাইয়া যায় নাই, ভবিষ্যতে কোন্ ঈষণায় বৈচিত্র্য-প্রতিঘাতের মধ্যে সত্যের আলোকধারা কোন্ রশ্মি-শিখায় বিচ্ছুরিত হইবে, সে-ও হারাইয়া থাকিবার নয়! সংঘাতে, সংগ্রামে, মিথ্যার বিরাট পরিবেষ্টনের গ্রন্থি, কোন্ প্রণালীতে উন্মোচিত হইতে থাকিবে, সে রহস্য অখণ্ড চৈতন্য-সাগরের যোগে নিশ্চয়ই নূতনের সৈনিক করগত করিবে। তপস্যার অধিকার কোন যুগেই মানবের সঙ্কুচিত হইবার নয়। তপোবলে অজ্ঞাতের সকল বার্ত্তাই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। নূতনের তপস্যাপরায়ণ অবিচল সঙ্কল্প-শক্তি তাহা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। জয় তাহারই করতলগত।

"নূতন" এই শব্দমাত্রে শিহরিব কেন? ইহার আহ্বান বিশ্বের কাছে অপরিচিত নহে ত। পুরাতনের বিপরীত অর্থের ইহা দ্যোতনা করিতেছে বলিয়া অস্বাভাবিক ইহার মধ্যে কি দেখিলে?—বরং বিশ্বরাজের সভায় নূতনের সঙ্গীত জমে ভাল। বহুবার নূতন বহু রূপে আসিয়াছে, আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া আপনিই আবার পুরাতনে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাদের যাওয়া-আসা পরস্পর সম্বন্ধ-বদ্ধ। একের পশ্চাতে অপরে আছেই,—আসিবেই। কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ নাই। বিরোধ যা-কিছু সত্যে ও মিথ্যায়, নূতনে ও পুরাতনে নহে।

ভারতে দিব্য-অনুভবের প্রথম বিকাশ যে-দিন মানব-কণ্ঠে প্রথম ঝঙ্কৃত হইল, আত্মার জাগরণ হইল। মানুষ জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে আপনার রহস্যময় অন্তঃপুরে যে 'এক' আছেন, তাঁহারই বন্দনা-মুখর মণ্ডলী গড়িয়া আপনাদের হিন্দুত্বের সৃষ্টি করিতে বসিল, সে-দিন, সেই জাতির গঠনের দিনে, দেখগে গিয়া বেদের সূক্তে-সূক্তে, 'ব্রাহ্মণের' পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায়, সর্ব্বত্রই সমবেত কণ্ঠধ্বনি! পুরুষের সহিত নারীর চেষ্টা! কেহ পিছাইয়া নহে, কেহ আগাইয়া নহে। সেখানে অত্রি আছে, বিশ্ববারাও আছে, কশ্যপ আছেন, ইন্দ্রমাতৃগণও আছেন। অপালা, লোপামুদ্রা, অদিতি, যমী, দশাশ্বতী, কত নাম করিব? অরণ্যের শান্তি শ্রী-সম্পন্ন পর্ণকুটীর-প্রাঙ্গণে যে হোমানল প্রজ্বলিত হইত, তাহাতে ঘৃতাহুতি শুধু কেবল ঋষিগণ দিতেন, তাহা নহে, তাঁহাদের জায়া-কন্যা-ভগিনীরাও সে কার্য্যে সমাবৃতা হইতেন; বেদের কলেবর পুষ্টির জন্য তাঁহারাও মন্ত্রের পর মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।

এখনও মানব-প্রাণের চিরন্তন প্রার্থনা রূপে মৈত্রেয়ীর রমণীকণ্ঠের রমণীয় বাণীই শান্তি বহন করিয়া আমাদের গৃহে ধ্বনিত হইতেছে—"অসতো-মা-সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়। আবিরাবীর্ম্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

তার পর বৌদ্ধযুগের প্রথম উন্মেষ-কাল। একের সন্ধানে উধাও ব্রাহ্মণের উপেক্ষায় ক্ষুব্ধ নরের অন্তর-পুরুষ ভেদ করিয়া নারায়ণের সেই অমিতাভ বুদ্ধরূপে সৃষ্টির বুকে

সাগরের কলগর্জ্জনে নূতনের প্লাবন তুলিবার দিন। সে দিন বুদ্ধের নির্ম্মাণের গোপন দিনে অন্তর-সাধনার পশ্চাতে নারীর পশ্চাদ্বর্ত্তিতা আছে স্বীকার করি; সে-দিন পরিত্যক্তা বধূরূপে, ভগ্নপ্রাণা জননীরূপে, অশ্রুমোচনে, হারাইবার, ছাড়িবার ব্যথায় সে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে তো নারীত্ব নহে। সে দুঃখে, সে বিষাদে যেটা চূর্ণ হইয়াছিল, সেটা নারী-নরের সম্পর্ক। পরক্ষণেই দেখিতে পাই, তরুণ শাক্যসিংহ সে দিন আর সাধক নহেন,—সিদ্ধ। প্রচারের দিন আসিয়াছে। সাধনা আর অন্তরের নহে, তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে হইবে। তিনি নর-নারী সকলকেই ডাকিয়া আপনার চারি-দিকে সমবেত করিয়াছেন।—সে-দিন, ভিক্ষুণী সঙ্ঘে তাঁহার মাতা আসিয়াছেন, বণিতা আসিয়াছেন, জীবন-লব্ধ তপস্যার ফল সকলেরই হাত দিয়া তিনি জগৎকে বিলাইতে উদ্যত নারী ঘরের কোণে থাকিবে, পুরুষ বাহির লইবে।—পুরুষ মানাইবে, নারী মানিবে, সে সম্পর্ক সহসা অন্তর্হিত হইয়া জীবন এক উদ্দেশ্যে বিকশিত হইতে লাগিল—জগৎব্যাপী নির্ম্মমতার মহানল নির্ব্বাণ কর—নির্ব্বাণ কর।

এই নির্ব্বাণের অভিযানে অমৃত-পরিপূর্ণ হৃদয় উজাড় করিতে যাঁহারা ছুটিলেন, সে দলে অনন্যসঙ্কল্প-পরায়ণা ব্রত-ধারিণীরূপে ছিল-না-কি সুমেধা,—রাজকন্যা? শুভা,—চর্ম্মকার-কন্যা? অম্বপালী,—বারাঙ্গনা? পূর্ব্বের জীবন নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া, এই মঙ্গল-প্রবাহে প্রাণটাকে প্রস্রবণ-ধারার ন্যায় উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিবার একই সাধনার সম-সিদ্ধিতে সকলেই সহযোগিনীরূপে সমান হইয়া গিয়াছিলেন।

নিষ্কৃতি

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেশে সেবার বিষম অজন্মা, কারণ জল-দেবতার অনুগ্রহ সে বৎসর একেবারেই হয় নাই বলিলেই হয়। 'বিধাতার মার, দুনিয়ার বা'র'—কাযেই দুনিয়ার মনুষ্য-জাতীয় জীব যাহারা, এক ঘা' মার খাইলে দশ ঘা' দিবার জন্য প্রাণপণ পর্য্যন্ত করিয়া থাকে, তাহারাও—অম্লানবদনে ঠিক নয়,—সেই অদৃশ্য মার' বাধ্য হইয়া সহ্য করিল। প্রথমে আশা করিল; আশা ফুরাইতেই প্রার্থনা, স্তব, কাকুতি, মিনতি, অনুযোগ, অভিযোগ, মাটিপোতা, প্রভৃতি নানারূপ ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিল; তাহাও যখন উক্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব বিধাতা-পুরুষ শুনিলেন না, তখন বলহীন নিরুপায়ের ব্রহ্মাস্ত্র নানাবিধ অশাস্ত্রীয় এবং অহিন্দুর ভাষায় তাঁহাকে দিনরাত্রি বিঘোষিত করিতে লাগিল। কিন্তু সে ব্যক্তি এমনই পাষাণ এবং আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানহীন যে, তবুও কোন উচ্য-বাচ্য পর্য্যন্ত করিলেন না। অন্যান্য লোকে ক্ষেতের ভরসা পরিত্যাগ করিল। ধানগাছগুলি এক হাত পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করিয়া, যকৃৎ-দুষ্ট রোগীর মত পীতবর্ণ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তার পর ক্ষেতের মত সকলে ধর্ম্মঘট করিয়া একদিন শুইয়া পড়িল, আর উঠিল না।

মানুষের অন্ন যেমন ফলিল না, গরু-বাছুরের খাদ্যও সেইরূপ হইল না। মাঠ উষর, প্রান্তর বিস্তীর্ণ, রক্ত-পীত-ধূসর-বর্ণ; কোথাও হরিতের লেপ পর্য্যন্ত নাই। যত-দূর দৃষ্টি চলে, তত-দূর পর্য্যন্ত ধূ-ধূ মরুর মত।

ভাদ্র মাসের প্রারম্ভেই দেবতার দয়া গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল—নানা আকারে;—যথা, কলেরা, বসন্ত, জ্বর প্রভৃতি। ডাক্তার বাবুরা রোগী পান, কিন্তু পয়সা নাই। তাঁহারা পেটেণ্ট ঔষধ-সৃষ্টিতে লাগিয়া গেলেন। উকিল মহাশয়েরা গালে হাত দিয়া বাসায় কেবল তামাক খান, এবং আদালতে গিয়া বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া দেশের দুর্দ্দশার কথা আলোচনা করেন; কেহ-কেহ বা এই সময়ে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখিতে মনঃসন্নিবেশ করিলেন; যেহেতু

ওকালতী ব্যর্থ হইলেও, ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস বৃথা যাইবে না। সকলেই এইরূপে অর্থোপার্জ্জনে যখন চিরাচরিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, নব-নব সদুপায় অবলম্বন করিলেন, শ্রীমান্ দাশরথি দাশ ওরফে দেশো মালোও তখন একটা সুরাহা দেখিতে পাইল।

এই সময়, অর্থাৎ এমন দুর্দ্দিনে, যখন ডাক্তার-উকিল পর্য্যন্ত বিশেষ চিন্তিত,—এক সম্প্রদায়ের কিন্তু এ একটা ভারি মরশুম্। সে সম্প্রদায় চা-বাগিচার জন্য কুলি-সংগ্রাহক আড়কাঠি-কুল। সমস্ত নামটা তাহার কেহই জানিত না,—শুধু পাঁড়েজী নামক একজন আড়কাঠি একদা মাঝডাঙ্গা গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন; এবং বিন্দি তেলিনীর বহির্কক্ষে, যেখানে শ্রীক্ষেত্রের পাণ্ডারা, ব্রজবাসীরা, কাশীর শিবদূতগণ, গয়ার স্বনামখ্যাত অসুরবরের অনুচরবৃন্দ আড্ডা করিয়া থাকেন, সেইখানে নিবাস আরম্ভ করিলেন। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, মাঝডাঙ্গার বিন্দি তেলিনীর কক্ষটিই এ গ্রামে উক্ত প্রকার ভ্রমণকারীদের ডাকবাংলো অথবা গ্রাণ্ড-হোটেল রূপে-বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কাযেই, সেখানে কোন নূতন লোককে অবস্থান করিতে দেখিলেই, লোকের মনে তৎক্ষণাৎ কৌতূহল হইত - লোকটিকে জানিবার জন্য। কারণও তাহার ছিল নিতান্ত মন্দ নয়,—বস্তুতান্ত্রিক। পাণ্ডা আসিলেই লোকের চুয়া ও কর্পূরের মালা, ব্রজবাসীদের দান নামাবলী, শিব-দূতগণের দ্বারা কাশীর পেয়ারা, কাঠের খেল্‌না এবং গয়ালীদের দ্বারা প্যারা-নামক অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন-প্রাপ্তি হইত। এতদ্দ্বারা তৎপুরুষের আগমন-বার্ত্তা গ্রামময় যেরূপ শীঘ্র এবং যেরূপ প্রীতির সহিত বিঘোষিত হইত, তেমন বোধ হয় "অমৃতবাজার" বা "ষ্টেটস্‌ম্যানে" পূর্ণপৃষ্ঠা সচিত্র বিজ্ঞাপন অথবা ব্যাণ্ড বাজাইয়া নির্ব্বিচারে অজস্র হ্যাণ্ডবিল বিলি করাইলেও হইত কি না সন্দেহ।

দাশু দেখিল, খোট্টা,—সুতরাং নিশ্চয়ই সে এক জন পাণ্ডা। সে গেল। কয়েক ছিলিম তামাক খাইল; দুই ছিলিম 'বড়-তামাক'ও পাঁড়েজীর প্রসাদ পাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিল—মনটা একটু প্রফুল্ল এবং সচেতন।

দাশুর সংসারে তাহার জননী, একটী কন্যা এবং পত্নী। সে ছাড়া আর সকলেই জ্বরে শয্যাগত। দাশুর বয়স ত্রিশ, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ দেহ। তাহার চারি বিঘা রাজ-প্রদত্ত ক্ষেত আছে; তাহার জন্য জমিদারের যখনি মাছের প্রয়োজন হয়, দাশু গিয়া জাল ফেলে এবং মৎস্য সরবরাহ করে। বাদ-বাকী দিন সে চাষ করে, মাছ ধরে,—মা ও স্ত্রী বাজারে বিক্রয় করে। কন্যা দত্তদের বাড়ী গোয়াল সাফ করে এবং গোবর দেয়,—তৎপরিবর্ত্তে দুইবেলা খাইতে পায় এবং মাসিক চারি আনা বেতন পায়। মেয়ের নাম মুক্তো, অর্থাৎ মুক্তকেশী। বয়স আট বৎসর।

দাশু বাড়ী আসিয়াই, ঘরে ঢুকিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, কেমন আচিস্, আজ আর জ্বর এয়েচে? আর ওরাই'বা কেমন?"

মা পুত্রের হঠাৎ ঈদৃশ মাতৃ-ভক্তিতে মনে-মনে প্রীত হইয়া, পুত্রের আরও একটু ভক্তি ভোগ করিবার জন্য অনুনাসিক স্বরে কহিল,—"আজ আর আমাদের কেরুরই জ্বর আসে নেই, বাবা। এখন কবে সেরে উঠবো, তাই ভাবচি।"

"হাঁ, শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরেই ওঠ। পেট চলা চাই ত'?" তাড়াতাড়ি কথা কয়টি বলিয়াই সম্প্রতি-শ্রুত মতি-রায়ের যাত্রার "দাদা অভি, যদি যাবি" গানটি গুন্-গুন্ করিয়া নাকি-সুরে গাহিতে-গাহিতে বড়ঘরের দাওয়ার কোণে বসিয়া হর্‌ফিট্টি টানিয়া তামাক খাইবার জন্য চকমকি ঠুকিতে লাগিল।

পাঁড়েজীর নিকটে দুই-তিন দিন ঘন-ঘন গতিবিধি করিতে-করিতে, একদিন দাশু কুড়িটি টাকা আনিয়া জননীর হস্তে দিয়া বলিল যে, সে কলিকাতায় চাকরী করিতে চলিল। পাঁড়েজীর জনৈক অত্যন্ত নিকট আত্মীয়,—কারণ, সম্বন্ধটা যে কি, তাহা সে সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই,—কলিকাতায় থাকেন; তিনি এখন এই কুড়ি টাকা পাঠাইয়াছেন, তার পর সেখানে গেলে আরও দিবেন। কাজও এমন-কিছু শক্ত নয়,—বাগানের মালীগিরি।

দাশু কথা কয়টি এমন সহজ ভাবে এবং পুলকিত ও উৎসাহিত হইয়া বলিল যে, তাহাতে কাহারও কোন দুঃখ হইল না; বিশেষতঃ যখন বৃক্ষে না আরোহণ করিতেই এক কাঁদি সুপরিপক্ক কদলী লাভ হইল, তখন, এ যে একটী অপরিহার্য্য দাঁও, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। সারারাত্রি স্ত্রী, জননী ও নিজে পরামর্শ আঁটিল,—সংসারের কার্য্য কে কি করিবে, এবং ভদ্রাসনখানির কি প্রকার পরিবর্ত্তন ভবিষ্যতে আবশ্যক হইবে; কন্যার বিবাহ

দেশে অপেক্ষা কলিকাতাতেই হওয়া শ্রেয়ঃ—প্রভৃতি। আবার অজ্ঞাত কারুণিক কলিকাতাবাসী সেই বাবুর বাগান যখন আছে, তখন তাঁহার পুষ্করিণী যে গোটা-দশেক নিশ্চয়ই আছে, সে বিষয়ে এক-রকম সিদ্ধান্ত হইয়াই গেল। কেবল তৎবাসী মৎস্যগুলির ঠিকা লওয়াটিই আপাততঃ কেবল বাকী রহিল। শেষোক্ত সৌভাগ্য যদি কখনও ঘটে, তবে সকলকেই যে কলিকাতা যাইতে হইবে, ইহাও এক প্রকার স্থির হইয়া গেল; কিন্তু ইহাতে বুড়ী কেবল একটু নিম্‌রাজি হইল মাত্র।

পর দিন দাশু লাল ডুরে একখানি গামছা কিনিল। মাতার, স্ত্রীর এবং কন্যার এক-এক জোড়া কাপড় কিনিয়া দিল, কারণ পূজা সন্নিকট। নিজের আর কাপড় কিনিল না,—কারণ, বাবুর বাড়ীতে পূজায় তার তো মিলিবেই—কারণ বাবু যখন এত-বড় লোক।

বাড়ী-শুদ্ধ সকলেরই ইচ্ছা যে, পূজার পর দাশু যায়। দাশুরও তাহাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পাঁড়েজী বলিয়াছেন যে, বিলম্বে কার্য্যহানি সুনিশ্চিত। অতএব, এ দুর্দ্দিনে এমন সুযোগ ছাড়া নিছক্ বাতুলতা ব্যতীত আর কি?

গায়ে বখ্‌শিশপ্রাপ্ত ডবল্-ব্রেষ্ট ছেঁড়া এক সার্ট, পরণে আটহাত একখানা কাপড় ও কোমরে নূতন লাল গামছা বাঁধিয়া, দুঃস্থ পরিবারের দুঃখমোচন করিতে দাশু পাঁড়েজীর সঙ্গে কলিকাতা রওনা হইল।

দাশরথির অকস্মাৎ অর্থলাভ, চাকরিলাভ এবং কলিকাতা-গমন-ব্যাপার এত দিন গ্রামের লোকের কাছে গোপন ছিল; যেহেতু পাঁড়েজী নিষেধ করিয়াছিল। পরশ্রীকাতর মন্দলোকের ত অভাব নাই? হয়তো তাহারা দাশরথিকে বাধা দিবে। তাহার একান্ত হিতৈষী পাঁড়েজী নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়া তাহার যে সৌভাগ্যের সূচনা করিয়া দিল, গ্রামের পাঁচজনে শুনিলে হয়ত তাহা হইতে দিত না। কিম্বা আরও দশ জনে উপর-পড়া, রবাহুত হইয়া জুটিয়া সমস্ত পণ্ড করিয়া দিত। দাশুর মা পাঁড়েজীর কল্যাণের জন্য নিয়ত কামনা করিতে লাগিল। তাহার বড় দুঃখ রহিয়া গেল, একটা ভাল মাছ একদিন এমন মহানুভব মহাপুরুষকে তাহার দেওয়ার ভাগ্য হইল না!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আজ চারি বৎসর হইয়া গেল, দাশু জলপাইগুড়ি জেলায় একটী চা-বাগানের কুলি। বর্দ্ধমান জেলার পল্লীগ্রামের চাষারা নির্ব্বুদ্ধিতায় নিখিল-ভারতবর্ষীয় পল্লীবাসীদের মধ্যে অদ্বিতীয়; তাই প্রথমে দাশু কিছুই বুঝিতে পারে নাই। এবং পাঁড়েজীর মত সদ্‌ব্রাহ্মণ,—যিনি বঙ্গদেশীয় নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণেরও অন্ন গ্রহণ করেন না পাছে জাতিনষ্ট হয়,—তিনি যে, এরূপ প্রবঞ্চনা করিবেন, অথবা অসত্য কথা বলিবেন, ইহা মালো-নন্দনের মস্তকে প্রথমে ঢুকিতেই চাহে নাই। কিন্তু এই বাগানে অষ্টাহকাল বাস করিতে-করিতেই, সহস্রাধিক সমদশাপন্ন সহযোগীদিগের কথায় জানিতে পারিল যে, পাঁড়েজী ও তাঁহার অসম্বন্ধীয় আত্মীয়গণ এইরূপ জাল ফেলিয়া নিয়তই মনুষ্য ধরিয়া বেড়ান। সকলেই আপন আপন বুদ্ধিহীনতায় এবং দুর্ভাগ্যে শিরে করাঘাত করে, কাঁদে এবং কায করে।

কষ্টটা যে কি তাহা বুঝিতে, অন্যান্য সকলের মত দাশরথিরও কিছুদিন বিলম্ব হইল। যখন অবস্থার সম্যক উপলব্ধি ঘটিল, তখন সে চক্ষে অন্ধকার দেখিল; এবং পাঁড়েজীর উপর তাহার প্রীতিটা যত মধুময় ছিল, তত বিষতিক্ত হইয়া উঠিল। সময়ে-সময়ে তাহার মনে হইত যে, যে তাহাকে তাহার নিভৃত পল্লীকুটীর হইতে, স্নেহ-পরিপূর্ণ সুখনীড় হইতে মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া, তাহার আজন্ম-পরিচিত সুখ সান্ত্বনার স্নিগ্ধ আবেষ্টন হইতে ছিনাইয়া, তাহার শতসহস্র দুঃখ-দারিদ্র্যের সমুদ্রমন্থন-সঞ্জাত একান্ত বাঞ্ছিত প্রীতির এবং আদরের পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে, তাহাকে নিকটে পাইলে দ্বিখণ্ডিত করিয়া, ফাঁসি যায় কিম্বা দ্বীপান্তরিত হয়, সেও ভাল - তবু বাগানের কুলিগিরি তাহার অসহ। কিন্তু উপায় নাই। দাশরথি নিরুপায়, নিষ্ফল আক্রোশে আপনিই গর্জ্জিয়া উঠে; আবার পাঁচজনকে দেখিয়া, সর্দ্দারের রক্তচক্ষুতে ভীত হইয়া ভুলে। পলাইবারও উপায় নাই,—উপায় থাকিলে, আবার হাতে পয়সা হয় না।

দাশু উপার্জ্জন যাহা করে, গ্রহবৈগুণ্যে ব্যয় তদপেক্ষা প্রায়ই বেশী হইয়া যায়। কাজ করিতে-করিতে যদি কখনও সর্দ্দার তাহাকে একটু বসিয়া থাকিতে দেখে, অমনি তাহার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়,—সেদিনের মজুরী কাটা গেল। কাযেই মা শীতলা অথবা ওলাইচণ্ডীর পূজার মত সর্দ্দার সাহেবকে মাসে-মাসে কিছু দিতেই হয়।

যে বাবু মজুরী বাঁটেন, তাঁহারও প্রাপ্য বরাবরকার—তাহাও জমিদারের খাজনার মত অবশ্য দেয়; অর্থাৎ তিনি নিজ অংশ কাটিয়া, দয়া করিয়া বাকীটা প্রদান করেন। বাগানে যে ব্যক্তি মুদীখানার দোকান করে, তাহাকে বাগানের বাবুদিগকে অল্পমূল্যে সামগ্রী সরবরাহ করিতে হয় বলিয়া, কুলিদিগকে তাহার খরচ পোষাইতে হয়। সেই জন্য বাজারে সাড়ে চারি টাকা মণ চাউল কিনিয়া বাগানে তাহাকে নয় টাকায় বিক্রয় করিতেই হয়;—কারণ, তাহারও, কুলিগণ ব্যতীত, অন্য সকলেরই মত, পুত্র-পরিবার তাহারই উপর নির্ভর করে। ইহা ছাড়া, ধারে বিক্রয়ে তাহার আরও সুবিধা আছে যে, জিনিস বিক্রয় না করিয়াও দেনা বাড়াইবার বিশেষ সুবিধা। ফলতঃ ইহারা কেহই কখনও ঋণমুক্ত নহে—দাশুও হইতে পারে নাই: সুতরাং বাগানে আসিয়া প্রথম দুই মাস মাত্র দুইবার সে আটটাকা করিয়া বাড়ী পাঠাইয়াছিল। তাহার পর আর কখনও এক পয়সাও পাঠাইতে পারে নাই,—তাহার একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও সে অসমর্থ।

তাহার সেই বিশাল বক্ষ, বলিষ্ঠ দেহ আর নাই। এ দেশীয় জল-হাওয়ার একটা অতি মহৎ গুণ এই যে, কুইনীন্ ভিন্ন জল-হাওয়া হজম হয় না। এ কারণ দাশুর এখন দাঁড়াইয়াছে এই যে, জঠরে অন্নজলের অভাবটা প্লীহা-যকৃৎ পূরাইয়াছে, অবকাশ-কালটি ঔষধ সেবনে কাটে এবং অপরাহ্ণগুলি জ্বরের ঘোরে যায়; বিনা আয়াসে এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে।

ক্রমে দাশুর স্বাস্থ্য একবারে গেল। যে আগে দেড় মণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিত, সেই দাশু এখন পাঁচ সের বোঝা উঠাইতেও হাঁপাইয়া পড়ে। মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন কামাই; যাহা উপার্জ্জন করে—তাহারও কিছু অংশ সর্দ্দার এবং বাবুকে দিয়া, বাকীটা দোকানের বাকীতে উশুল দেয়,—তবুও একবারে সব ঋণ শোধ হয় না।

দাশু দেখিল, সে রোজগারের আশায় এখানে প্রবঞ্চিত হইয়া আসিয়া, উপার্জ্জন করিল ম্যালেরিয়া, প্লীহা এবং অপরিশোধ্য ঋণ। কতবার সে ভাবিয়াছে, সাহেবকে গিয়া, জানাইবে যে, সে দেশে ফিরিয়া যাইবে; কিন্তু সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ আর তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। ভগবানের দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু চা-বাগানের বড়সাহেবের দেখা পাওয়া অসম্ভব। যার সম্ভব, তার শুধু জন্ম-জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফলেই হয়। কাযেই নিরুপায় দাশু বাগানেই থাকে। কায করুক্ আর নাই করুক্, ছুটি নাই, মুক্তি নাই! যদি এমনি ছুটি না পায়—তবে মরিয়া ছুটি করিয়া লইবে, ভাবিয়া, দাশু কতবার আত্মহত্যা করিতেও সঙ্কল্প করিয়াছে; কিন্তু পারে নাই;—যদি কখনও সে মুক্তি পায় তো দেশে গিয়া পুনরায় স্ত্রী পুত্র-পরিবারের সহিত মিলিত হইতে পারিবে, এই ভরসায় পারে নাই। সময়ে-সময়ে তাহার মনে হইয়াছে যে, একবারে সমস্ত লোককে সে এক রাত্রে খুন করিয়া আপনার এবং তার মত সমদশাগ্রস্ত সহস্র-সহস্র নরনারীর বন্ধন মোচন সে করিয়া দেয়;—কিন্তু পরক্ষণেই আপনার বাতুলতায় সে আপনিই হাসিয়াছে। তাহার মন দিবারাত্রি তাহার পরিবারবর্গের চিন্তাতেই পরিপূর্ণ। এতদিনে তাহারা কে কত বড় হইয়াছে, কাহার দেহে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সাংসারিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, কন্যার বিবাহ হইল কি না, তাহার ক্ষেতে কে চাষ দিতেছে, পাশের ক্ষেতে কি হইয়াছে,—এই কথাগুলিই ঘুরিয়া-ফিরিয়া তাহার মনের মধ্যে মধুচক্র-নির্ম্মাণ-রত মৌমাছির মত রাত্রিদিন আনাগোনা করিতেছে। গ্রামের লোকেরা তাহার কথা বলে কি না, বন্ধুরা কি বলে, শত্রুরা কি ভাবে, আত্মীয়েরা কি মনে করে,—সে আপন মনেই কথা গাঁথিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর তৈরি করে। কখনও মনে করে, যদি সে আর দেশে না ফিরে, তবে তাহার পরিবারের কি দশা হইবে—সে চিত্রও আঁকে। আবার কখনও ভাবে, জ্বর সারিয়া গেলে শরীরটা এবার সুস্থ হইলে, সে দ্বিগুণ পয়সা উপার্জ্জন করিয়া নিশ্চয়ই দেশে ফিরিবে; কটিদেশে গেঁজেভরা রজতমুদ্রা দেখিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলে অবাক্ হইয়া যাইবে। সেই কাঙাল পরিজনবর্গের ম্লান মুখে আনন্দোজ্জ্বল হাসির স্বপ্নে দাশরথি আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইত। কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহার সমস্ত চেতনা বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু সেটা কল্পনা! বাস্তব নিদারুণ কঠিন, কুঠোর এবং নিষ্ঠুর। দাশু উন্মাদের মত রুদ্ধমুষ্টিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পরক্ষণেই আবার স্থির হইয়া বসিয়া পড়িত; আর তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে তপ্ত জলধারা শীর্ণ পাণ্ডুর গণ্ডযুগল বহিয়া টপটপ করিয়া গড়াইয়া পড়িত।

ন্যায্য-অন্যায্য নানা প্রক্রিয়া করিয়াও দাশু তাহার ছাড়পত্র যোগাড় করিতে যখন পারিল না, তখন ঠিক করিল যে একদিন রাত্রিকালে সে পলাইবে। প্রথম-প্রথম ভাবিত যে ইচ্ছা করিলেই ত' যাইতে পারে; কিন্তু যখন আসিয়াছে এতদূর, তখন কিছু না কামাইয়া রিক্তহস্তে সে ফিরে কেমন করিয়া? তাই সকলের সঙ্গে হাসিমুখেই কায করিত। জ্বর আসিত, কম্বল মুড়ি দিয়া শুইত; এবং যাহা পাইত, তাহাতে তাহার সব কষ্টের অবসান হইত। কিন্তু পরে যখন দেখিল যে স্বাস্থ্য গিয়াছে, এখান হইতে নিষ্কৃতি নাই, এবং যাহা পায় তাহা এইখানেই উড়িয়া যায়,—তখন সে বাড়ী যাইবার জন্য পাগল হইল। স্বর্ণমৃগের অনুধাবন করিয়া সে এমন জালে পড়িয়া গিয়াছে যে, এখন সে নিজেই বাহির হইতে অক্ষম! অমনি তাহার সমস্ত রক্ত চন্‌ করিয়া মাথায় উঠে এবং অনুপস্থিত পাঁড়েজীর উদ্দেশে নিষ্ফল আক্রোশে যষ্টি উত্তোলন করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাঘ মাস। কন্‌কনে শীত। আকাশভরা মেঘ—তাহাতে অন্ধকার রাত্রি। কোলের মানুষ দেখা যায় না। দাশু আপনার কম্বল, কম্বলের একটী কোট, একটী ঘটী, একখানি পিতলের থালা, বাটি এবং গ্লাস একটী পুঁটুলিতে থান ২।৩ ছেড়া কাপড়, একশিশি কুইনীনের বড়ি, কতকগুলি চা, সেরখানেক চাউল, চারিটি আলু, খানিকটা লবণ, একটা মাটির চোঙায় একটু সরিষার তেল এবং এমনি আরও কয়েকটা কি লইয়া উন্মাদের মত বাগিচা হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বিগত কয়েকদিন যাবতই সে কেবলমাত্র পলাইবার ফিকিরই করিতেছিল; কিন্তু নানা কারণে সে সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই; তন্মধ্যে প্রধান, জ্বর বিশ্রাম না হওয়ার দরুণ দৌর্ব্বল্য ও দ্বিতীয়তঃ মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাহার প্রাপ্যটা আদায়। প্রধানতঃ এই দুই কারণেই সে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই।

দোকানী একবার তাগাদা করিয়াছিল; কিন্তু দাশু আগামী কল্য দিব বলিয়া রেহাই লইয়াছে। দাশু ঠিক করিয়াছে যে, সে অনেক দিয়াছে, আর দিবে না। যেন সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছে যে, তাহাকে ধনে-প্রাণে মারিয়া ফেলিবে। বাগানের লোকেরা খাটাইয়া-খাটাইয়া, আধপেটা খোরাক দিয়া, তাহার ভীমের মত দেহ ছারেখারে দিয়াছে,—আর এই নিকট কুটুম্ব জুয়াচুরি করিয়া তাহার এই কষ্টের হাড়-জল-করা পয়সা আত্মসাৎ করিতেছে। দাশুর আর ধৈর্য্য বা বিবেচনা নাই! এ সংশ্রবে যারা আছে, সকলেরই উপর সে জাতক্রোধ হইয়া উঠিয়াছে! তাই সে পলাইবে।

সকাল হইতেই সে দুঃসহ প্রতীক্ষায় রাত্রির অপেক্ষা করিতেছিল। দেহে জ্বর না থাকা সত্ত্বেও সে জ্বরের ভান করিয়া, চুপ করিয়া শুইয়া-শুইয়া, তাহার স্ত্রী, কন্যা ও মাতার মুখ স্মরণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিল। আবার সে বাড়ী ফিরিবে! আবার আপনার পরিবারবর্গের সঙ্গে মিলিত হইবে! আবার আপনার আজন্ম-পরিচিত গ্রামের পথে সে চলিবে! এই কল্পনা—উগ্র মদের মত তাহাকে সারাদিন মাতাল করিয়া রাখিয়াছিল।

এই শক্ত পাহারার জেলখানা হইতে সে নিশ্চিন্তে, নির্ব্বিবাদে পলাইবে—মুক্ত হইবে—এই সমস্ত নরখাদকের চক্ষুতে সে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইবে,—ভাবিতে-ভাবিতে সে সময়ে-সময়ে অজ্ঞাতে হাসিয়া ফেলিতেছিল; কখন-কখন অজ্ঞাতসারে হস্ত-পদাদিও আস্ফালন করিতেছিল। গোপনে সে পাক করিয়া খাইতে বসিল; কিন্তু মনের অব্যক্ত আনন্দে সে ভাল করিয়া খাইতেই পারিল না। তাহার মনে আর অন্য কোনও চিন্তাই ছিল না,—কেবল একবার সন্ধ্যা লাগিলেই, গা ঢাকা আঁধার হইলেই, সে বাহির হইয়া পড়িবে।

অন্ধকারও হইল ঘুটঘুটে সে দিন। দাশু ভারি খুসী। সে, তাহার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই কোনও রকমে কম্বলখানায় জড়াইয়া মাথায় করিয়া, "জয় মা সিদ্ধেশ্বরী" বলিয়া আপনার কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

তাহার হৃৎপিণ্ড ঢকঢক্ করিয়া আঘাত করিতে লাগিল; কাণ বোঁ-বোঁ করিতে লাগিল; গায়ে স্বেদোদ্গম হইতে আরম্ভ হইল।

প্রথমটা খুব আস্তে-আস্তে চারিদিক দেখিতে-দেখিতে চলিতে লাগিল; ক্রমশঃ তাহার পদক্ষেপ দীর্ঘতর হইল,—শেষে সে রীতিমত দৌড়িতে লাগিল। কতবার হোঁচোট খাইল, কতবার পড়িয়া গেল, কতবার উঁচু-নীচু স্থানে পা পড়িয়া পড়িতে-পড়িতে বাঁচিয়া গেল,—তবু ভ্রূক্ষেপ নাই।

দৌড়িতে-দৌড়িতে কতদূর, কোন্ পথে আসিয়া পৌঁছিল, তাহাও খেয়াল নাই! কোন্ পথে যে যাইতে হইবে, তাহাও সে জানে না! তবু ছুটিয়াছে—এই অনির্দ্দেশ, নিরুদ্দিষ্ট পথে ছুটিয়াও তাহার সান্ত্বনা; কেন না, সে মুক্ত! তাহার ছয় বৎসরের কারা-ক্লেশের আজ অবসান!

কতটা পথ, কোন্ দিকে, কত রাত্রি, কিছুই দাশুর খেয়াল না থাকিলেও, তাহার বিশ্বাস, সে এখনও বেশী দূর আসিতে পারে নাই। এখনও সে বাগানের অতি নিকটে;—হয় ত সবাই জানিতে পারিয়াছে যে, দাশু পলাইয়াছে। লোক বুঝি ছুটিল! পিতলের-তক্‌মা-ঝুলান, চাপকান্-পরা, পাগ্‌ড়ী-আঁটা চাপ্‌রাশীরাও তাহার পিছু লইয়াছে। তাহারা সুস্থ, সবল,—খালি হাতে-পায়ে আসিতেছে;—তাহারা বেশ দৌড়িতে সমর্থ; কিন্তু দাশুর যে নানা বাধা! কি করে? সে বেগ বাড়াইয়া দিল। ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়িতে লাগিল। এখন তাহার ভাবনা যে, বাধা পড়িলে,—যে কষ্ট তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল,—তাহাই যে দ্বিগুণ হইবে। অতএব যখন পলাইয়াছে, তখন পলাইতেই হইবে। সে ঝড়ের মত দৌড়িতে লাগিল। যত দৌড়ায়, ততই মনে হয়, যেন সে চলিতেই পারিতেছে না।

কেবলি তাহার মনে হইতেছিল, যেন তাহার পিছু-পিছু আরও কে একজন সমান বেগে ছুটিতেছে! মধ্যে-মধ্যে ফিরিয়া তাকায়, কাহাকেও দেখিতে পায় না,—তবু ছুটে। সে যে এত কাছে, তার পায়ের শব্দ শোনা যায়, কিন্তু লোক দেখা যাইতেছে না। হয় ত অন্ধকারে! দাশু তাহার দৌড়ের বেগ আরও বাড়াইয়া দিল! সংজ্ঞাহীন উন্মত্তের মত ছুটিতে-ছুটিতে একঝাড় কালকাসিন্দা গাছের উপর সজোরে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। মাথার বোঝা তাহার আরও বহু আগে গিয়া সশব্দে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সত্য-সত্যই সে এতক্ষণে অজ্ঞান!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যখন তাহার জ্ঞান হইল—তখন বেলা প্রায় আটটা। তাহার চারিদিকে অসংখ্য লোক,—মায় পুলিশ পর্য্যন্ত উপস্থিত!

চক্ষু চাহিয়া দেখিয়াও সে প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না। কথা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না! সর্ব্ব-শরীরে তাহার প্রচণ্ড বেদনা। সে যে কি করিয়াছে, এবং কোথায় আসিয়াছে, এবং কেন এরূপ হইয়াছে, কিছুই মনে করিতে পারিল না!

সমাগত লোকেদের মধ্য হইতে কতজনে কত কি তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল,—সে প্রশ্নও ভাল বুঝিতে পারিল না,—কথার উত্তর দিবারও তাহার সামর্থ্য ছিল না। সকলে আস্তে-আস্তে কথা বলার দরুন একটা যে কলরব উঠিতেছিল, তাহাও সে ধরিতে পারিতেছিল না। একবার উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাও না পারিয়া, সে বিহ্বল নেত্রে লোকগুলির পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া সকরুণ ভাবে চাহিয়া রহিল।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছেলে-ছোক্‌রাই বেশী,—বয়স্ক লোক দুই-চারিজন। ছেলেরা কৌতূহলী হইয়া দাশুর মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া নির্ব্বাক্,—আর মাতব্বররা মধ্যে-মধ্যে ছড়ান জিনিষগুলির পানে কটাক্ষ হানিতেছেন; এবং সন্দিগ্ধ ভাবে অন্য একজনকে ইঙ্গিত করিতেছেন,—আর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মধ্যে-মধ্যে দাশুর মুখপানে চাহিতেছেন।

ফিস্‌ফিস্ কথায় সুখ কোন দিনই নাই। কাযেই আলোচনাটা মা দুর্গার মত হঠাৎ দশভুজা মূর্ত্তি ধারণ করিল। বৃদ্ধদের মধ্য হইতে কেহ বলিল চোর; কেহ বলিল খুনে; কেহ বলিল বদমাইস যে তার আর কোনও সন্দেহ নাই। দেখচ না কথা বল্‌চে না; কেহ ইত্যাদি। কিছু সিদ্ধান্ত হইল না,—যাহা এদেশে কোন বিষয়ে কখনও কোন দিনই হয় না, বিশেষতঃ সিদ্ধান্তপঞ্চানন দারোগা বাবুও যখন আসিতেছেন। ছেলেদের পক্ষ হইতেও বিচার হইতে লাগিল। কেহ বলিল বোবা; কেহ বলিল, একেই কে মেরে সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে গেছে; কেহ বলিল কি জানি! একজন কলেজের ছাত্র ছিল; সে বলিল, ডিটেক্টিভ্ নয় ত? সহসা সকলের দৃষ্টিই কথক মহাশয়ের উপর পড়িল এবং সকলের অন্তরেই অপ্রত্যক্ষ ভাবে একটা অহেতুকী ভীতির মন্দ হাওয়া বহিয়া গেল। বেশ একটু চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। এমন সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে দারোগা বাবু আসিয়া হাজির। সকলে অতি ভক্তিভাবে তাঁহাকে অভিবাদন অভ্যর্থনা করিলেন।

দারোগার আগমনের পর সকলেই চুপ করিল। সমাগত জনসংঘের পিছনদিক হইতে লোকও ক্রমশঃ ভাঙ্গিতে

আরম্ভ হইল। দারোগা অনেক প্রশ্ন করিল; দাশু কোন উত্তর দিতে পারিল না। অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দারোগা বলিল, "লোকটার যে খুব জ্বর! আপনারা সব এতক্ষণ কি তামাসা দেখছিলেন? লোকটা যে মরে!" সম্মুখস্থ সকলের মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল। কেহ গলা নাড়িতে, কেহ ঘাড় নাড়িতে এবং কেহ হাত কচ্‌লাইতে লাগিলেন।

"ওরে হরে, যা,—শীগ্‌গীর একটা ডুলি কি পাল্কি যা হয় জনচারেক বেহারা সুদ্ধ এখুনি নিয়ে আয়। একে থানায় নিয়ে যেতে হবে। আমি এই গাছতলায় বস্‌ছি। যাবি আর আসবি।" হরিদাস ওরফে হরে চৌকিদার সমস্ত কথাটা না শুনিয়াই দৌড়িল। দারোগা বাবু আসিয়া রুমাল দিয়া ঝাড়িয়া গাছতলে উঁচু শিকড়টির উপর বসিয়া অন্যদিকে চাহিয়া সিগারেট ধরাইলেন।

পশ্চাদ্দিকে দণ্ডায়মান লোকগুলি কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া উস্‌খুস্ করিল, কাসিয়া গলা ঝাড়িল, অকারণ দু-একটা শব্দ করিল; কিন্তু দারোগা বাবু ফিরিয়া চাহিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রায় একমাস কাল হাসপাতালে থাকিয়া দাশু নীরোগ হইল। দারোগা বাবু দাশুর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। দাশু আবার দেশের পথে চলিল।

থানা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দাশু যে কয়টি দিন সেখানে ছিল, তাহার মধ্যে সে সকলেরই বড় অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। সকলেই দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে যাইবার সময় কিছু-কিছু দিল। দাশু রেলগাড়ীতে চড়িল।

সকলেই তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, নৈহাটী ষ্টেশনে টিকিটখানি দেখাইয়া যেন অন্য গাড়ীতে চড়ে; টিকিটখানি যেন হস্তান্তরিত না করে; কিন্তু বর্দ্ধমানবাসী মালোনন্দন দাশরথি নৈহাটীতে টিকিটখানি টিকেট-কালেক্টারকে দিয়া সকলের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর যাহা হয় তাহাই ঘটিল, আবার অকূল সমুদ্রে পড়িল। রেলের বাবুদিগকে, খালাসীদিগকে, কুলিদিগকে পর্য্যন্ত অনেক অনুনয়-বিনয় করিল; কেহই তাহার টিকিটখানি আর ফিরাইয়া দিল না। সে চারি আনা পর্য্যন্ত পান খাইতে দিতে পারিত, তাহাও দিতে স্বীকৃত হইল; কিন্তু বাবু আরো কিছু বেশী প্রাপ্তির আশায় তাহাতে রাজী হইলেন না। দাশু চলিয়া গেল। আপনার হতভাগ্যকে ধিক্কার দিতে-দিতে দাশু বাহিরে গেল—যদি কোন সুরাহা হয়। কিন্তু দাতা পৃথিবীতে এত সুলভ নয়। দাশু পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিল। সারাদিন পথ চলে; ক্ষুধা পাইলে কিছু মুড়িমুড়্‌কি কিনিয়া খায়; বৃক্ষতলে শয়ন করে; অথবা কোন লোকের বহির্ব্বারান্দায় রাত্রিযাপন করে; আর প্রভাত হইলেই চলিতে আরম্ভ করে।

পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল। দাশু মাত্র ছয়আনা পয়সা সম্বল করিয়া নৈহাটি হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোনমতে জীবন রক্ষা করিয়া সে চলিতে ছিল। কিন্তু আজ সে একেবারে কপর্দ্দকহীন। যেখানে আসিয়াছে, এখান হইতে তাহাদের গ্রাম বারো ক্রোশ মাত্র। তবু আপন জেলায় ত! যে কোন উপায়ে সে বাড়ী পৌঁছিবেই, এই আনন্দে সে দিন উৎসাহে খালিপেটেই চলিতে লাগিল। যখন বড় পিপাসা পায়, তখন একেবারে পেট ভরিয়া জলপান করে। ক্ষুধায় চোখে অন্ধকার দেখিলেও ভিক্ষা করিতে মন সরিতেছিল না। অনেকবার মনে করিয়াছে যে, অন্য কোথাও না গিয়া কোনও ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া যদি দুই মুঠা প্রসাদ যাচিঞা করে, তাহা হইলে অন্যায় কি হয়, বা তাহাতে তাহার লজ্জাই বা কি; সে যে মালো—ব্রাহ্মণের দাসানুদাস; কিন্তু তবু পারিল না। কেমন একটা বাধ-বাধ ঠেকিল,—যাহা সে নিজেই সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারিল না। ফলে, সে সারাদিন অভুক্ত রহিয়া গেল।

একে মাঘ মাস, শীতকাল,—তাহাতে সমস্ত দিন না খাইয়া পথ চলিয়াছে; কাজেই অপরাহ্ণেই দাশু একেবারে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। শীতের প্রবল হাওয়ায় তাহার হাত, পা, মুখ, ঠোঁট সব ফাটিয়া গিয়াছে; শীতে, কয়েক দিনের দুর্ভাবনায় এবং পথশ্রমে মুখ-চোখ বসিয়া গিয়াছে; তৈলাভাবে কৃষ্ণ দেহবর্ণ আরো কৃষ্ণ এবং রুক্ষ হইয়াছে; পদতল ফাটিয়া-কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে; পেট ধক্-ধক্ করিতেছে। দৌর্ব্বল্যে মুখ দিয়া কথা ফুটিতেছে না। এই অবস্থায় দাশু একটি গ্রামে প্রবেশ করিয়া একজনের বাহিরের দাওয়ায় হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বসিয়া পড়িল। কোমর টন্‌টন্ করিতেছিল, শরীর অবশ অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল; বেশীক্ষণ বসিতে পারিল না, পুঁটুলিটি মাথায় দিয়া শুইয়া

পড়িল এবং অচিরে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মৃতের মত ঘুমাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই হঠাৎ দাশুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঢোল কাঁসি চড়বড়ে নাগরা রামশিঙা প্রভৃতি বাজাইয়া, বিপুল কোলাহল করিয়া, মশাল রং-মশাল বোম্ তুব্ড়ি প্রভৃতি রোশ্‌নাই করিতে-করিতে মহা সমারোহে এবং সোরগোলে উত্তরপাড়ায় বিরাট বাহিনী সহ একটি বর আসিল।

দাশু প্রথমে মাথাটি তুলিয়া এদিকে-ওদিকে চাহিয়া, ব্যাপারটি কি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, পুনর্ব্বার যথাস্থানে মস্তক স্থাপিত করিয়া, চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিল। তখন তাহার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল, এবং ক্ষুধায় জঠর জ্বলিয়া যাইতেছিল। একে শীতকাল। তাহাতে বারান্দায় শুইয়া, অল্প স্বল্প হাওয়াও বহিতেছিল—শীতের কাঁপুনি ধরিল। দাশু কম্বলটা ঢাকিয়া ভাল করিয়া আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া জড়-সড় হইয়া পাশ-ফিরিয়া শয়ন করিল। অনেকক্ষণ রহিল, কিন্তু ঘুম আসিল না, বা কাঁপুনিও থামিল না। তখন বিবাহ-বাড়ীর কলরবটা কয়েক পর্দ্দা নীচে নামিয়া গিস্-গিস্ শব্দে পরিণত হইল। দাশু উঠিয়া বসিল।

খানিকক্ষণ একমনে কি ভাবিয়া চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কম্বলখানি বেশ করিয়া দেহে জড়াইয়া লক্ষ্য করিয়া দাশু বিবাহ-বাড়ীর দিকে টলিতে-টলিতে গমন করিল। বিবাহ-বাটীতে পৌঁছিয়া সে দেখিল যে, তখন বরযাত্রীদিগকে আরো রসগোল্লা কিম্বা পান্‌তুয়া অথবা একটু ক্ষীর খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি চলিতেছে। বরযাত্রীরা যতই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, ততই অনুরোধ প্রবলতর হইতেছে। কেহ-কেহ পাতের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মিষ্টান্ন প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। দাশু নিষ্পলক নেত্রে দূর হইতে একমনে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। সে একবারে তন্ময়। বরযাত্রীরা যখন উঠিয়া পড়িল, তখন দাশুর ঘুম ভাঙিল এবং একবারে সে বসিয়া পড়িল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

পাশের খালি গো-শকটে বরযাত্রীরা শুভাগমন করিয়াছেন; তাহার পনের জন চালক, পাল্কী, বেহারা, ভৃত্য, নাপিত প্রভৃতি বরপক্ষীয় ব্যক্তিও বড় কম ছিল না। তাহাদেরও কন্যার পিতার গৃহে আজ জামাতার মত সমান আদর; কাযেই ব্রাহ্মণাদি বরযাত্রীদের ভোজন শেষ হইতে না হইতেই ইহাদের ডাক পড়িল। ইহারা অমনি, "দাদারে"; রামুখুড়ো", "হারুজ্যাটা", "ম'তো", "মাধা" প্রভৃতি আজন্ম-কথিত জাতীয়-আখ্যায় বেশ একটি হাঁকা-হাঁকি বাধাইয়া দিল। অনুপস্থিতদের মধ্যে সকলেই প্রায় যথা-তথা শায়িত এবং নিদ্রিত। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়াও যখন সকলকে একত্র করা গেল না, তখন দুই এক জন বিশিষ্ট শকট-চালক তাহাদিগকে অপ্রস্তত খাদ্য খাওয়াইতে-খাওয়াইতে প্রস্তত খাদ্যের জন্য ডাকিতে গেল। যাহারা রহিল, তাহারা শীতে, ক্ষুধায়, অনিদ্রায় এবং দৈবলব্ধ সুখাদ্য-ভোজনে বিলম্বহেতু হাঁই তুলিয়া, হি-হি করিয়া, চোখ্ রগড়াইয়া অপ্রসন্নচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল: কেহ কেহ সেইখানেই উপুড় হইয়া বসিয়া পড়িল।

খালি-গায়ে একখানি র‍্যাপার জড়াইয়া, খালি-পায়ে, পরিহিত বসন-খানি আজানু-উত্তোলিত কন্যাকর্ত্তা মহাশয় তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত লোকগুলিকে পরিতৃপ্তি-সহকারে আহার করিতে এবং যে দ্রব্য প্রয়োজন, তৎক্ষণাৎ তাহা চাহিয়া লইতে অনুরোধ করিয়া আবার তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। যাইতে-যাইতে জনৈক পরিবেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় বলিয়া গেলেন, যেন বরপক্ষীয় [illegible] ছাড়া বাহিরের কোন লোক এখন না বসে। দাশুর মাথা ঘুরিতেছিল; সে অতর্কিতে একটু সরিয়া অদূরে অন্ধকার পানে গিয়া বসিয়া পড়িল। দাশু স্থির করিয়াছে যে, সে-ও এই সঙ্গে বসিবেই; কারণ তাহাকে কোন পক্ষই চিনে না, আর চিনিলেও, সে পশ্চাৎপদ নহে, কারণ বড় ক্ষুধা। ক্ষুধা এখন খাদ্যদানে এবং তাহার গন্ধে চতুর্গুণ বাড়িয়াছে; সে আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না।

পাতা পড়িল। দাশুও একখানি পাতা লইয়া বসিয়া পড়িল। ভোক্তারা দাশুকে মনে করিল কন্যাপক্ষীয় কেহ, পরিবেষ্টা ভাবিল বরপক্ষীয় ব্যক্তি। পাতায় জল ছিটান হইতেছে, এমন সময় বরকর্ত্তা মহাশয় শাল-গায়ে, পায়ে খড়ম, একটা ডাবা হুঁক্কা হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন, —"দেখো ঈশেন, তোমার উপর সব ভার, কেউ যেন চীৎকার গোলমাল করো না। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বসে খাও, যা পারবে, তাই নিও; গুচ্ছের নিয়ে পাতে ফেলে কোন

জিনিস যেন আপ্‌চো ক'রো না। মাঝডাঙ্গার চাটুজ্জে-দের যেন মুখ হাসিও না।"

দাশু নতমুখে পাতে লুচিগুলি গোছ করিতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিতে সাহস করে নাই। কিন্তু হঠাৎ মাঝডাঙ্গার নাম শুনিয়া তাড়িতাহতের মত দাশু শিহরিয়া উঠিয়া বর-কর্ত্তার মুখপানে চাহিল। তাহার বুক ধরাস্‌-ধরাস্‌ করিতেছিল, মাথার মধ্যে ঝিম্‌-ঝিম্‌ শব্দ হইতেছিল। সে আহার ভুলিয়া আবিষ্টের মত একদৃষ্টে চাটুজ্জে মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া-চাহিয়া ঘামিয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে স্তম্ভিত থাকিয়া, এক লম্ফে চাটুজ্জে মহাশয়ের পদপ্রান্তে আসিয়া, তাঁহার চরণ যুগলে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া ডাকিল, "খুড়োঠাকুর!"

প্রথমে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটু চমকিয়া উঠিয়া-ছিলেন। বলিলেন—"কে, কে?"

দাশু কাঁপিতে-কাঁপিতে অতি-কষ্টে কহিল,—"আমি, দাশরথি, মাধবদাসের ছেলে।" দাশুর গলা শুকাইয়া গিয়াছিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চিন্তিত হইয়া, দাশুর মুখের পানে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া কহিলেন,—"দাশরথি, মাধবের ছেলে? কে? আমি তো চিন্‌তে [illegible] না বাপু! কোন্‌ পাড়ায় তোমাদের বাড়ী বল তো?"

দাশু তখনও ভাল করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই; বলিল—"মালোপাড়ায় আমাদের বাড়ী। নারান্‌ দা'-ঠাকুরের পৈতের সময় আমরাই খুড়ো-ঠাকুরকে মাছ দিয়ে'লাম।—"

"ওঃ! দাশু, দাশু, তাই বল্‌। তুই এখানে কোত্থেকে, তোকে যে আমি চিন্‌তেই পারি নাই।"

দাশু বাঁচিল। কহিল—"সে অনেক কথা খুড়ো-ঠাকুর, আমার মা'-রা সব ভাল আচে-তো?"

ভোক্তাদের দল হইতে এক জন হাত চাটিতে-চাটিতে বলিয়া উঠিল—"সে কি-রে দেশো, তোরি যাবার দু' তিন মাস পরেই তো তোর মা, ইস্তিরী আর তোর মেয়ে যে তোর কাছেই গিয়েছে, সেই পাঁড়েজী এসে নিয়ে গিয়েচে।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, তাইতো শুনেচি আমিও। তোর খুব ভাল চাকরী হয়েছে—ও কি, ও কি, অমন কচ্চিস্‌ কেন?"

হতাশভাবে দাশু বলিল,—"চাকরী কোথা খুড়োঠাকুর, আমাকে ভাঁড়িয়ে,—সে শালা চা-বাগানে আমাকে কুলি চালান দিয়েছিল।"

দাশুর হাত-পা অসাড় হইয়া গেল। সে বসিয়া পড়িল। কপালে করাঘাত করিয়া দাশু কাঁদিয়া অস্ফুটস্বরে একটা শুষ্ক শব্দ করিল। দু' একজন লোকও জমিয়া গেল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হতভম্বের মত হুঁকাটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর মা মেয়েরা তবে—"

"আর মা-মেয়ে খুড়োঠাকুর! তবে আর কার জন্যে আসা?" বলিতে-বলিতে দাশু সেইখানেই শুইয়া পড়িল।

"ওরে, ওরে, খেয়ে-নে আগে। দাশু, দাশু, দাশু! মূর্চ্ছা গেল না-কি?"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, বিবাহের বর নারায়ণ কলিকাতায় মেডিকেল-কলেজে উচ্চশ্রেণীতে পড়িত। এই গোলমালে সে-ও আসিয়া পড়িল। একটু নাড়াচাড়া করিয়া নাড়ী ও বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া কহিল—"হার্ট ফেল্‌ ক'রে মারা গেছে! কি হয়েছিল কি?"
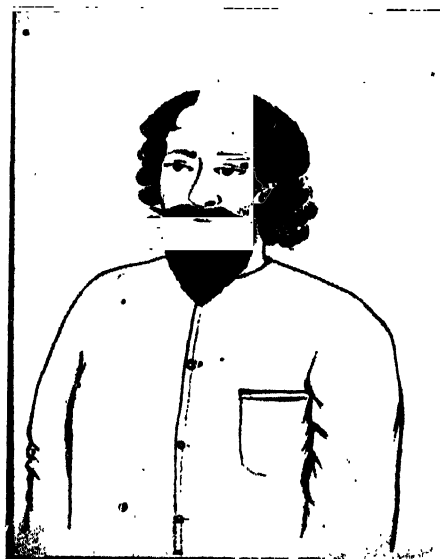
রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ]

হাতী শুঁড়ো গোঁফ

ঘোড়াছাঁটা চুল

চার্লি চ্যাপলিন্ ছাঁট

বঙ্গকবি ও সেক্সপীয়রের সংমিশ্রণ
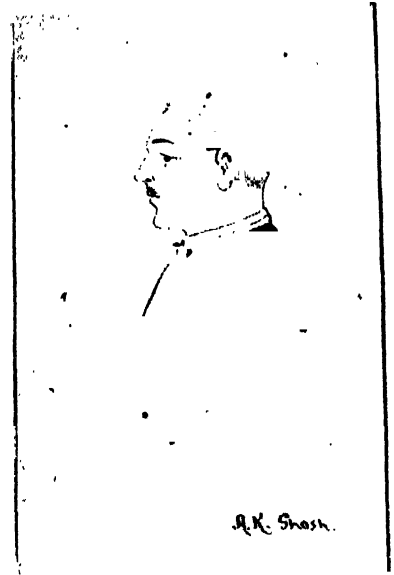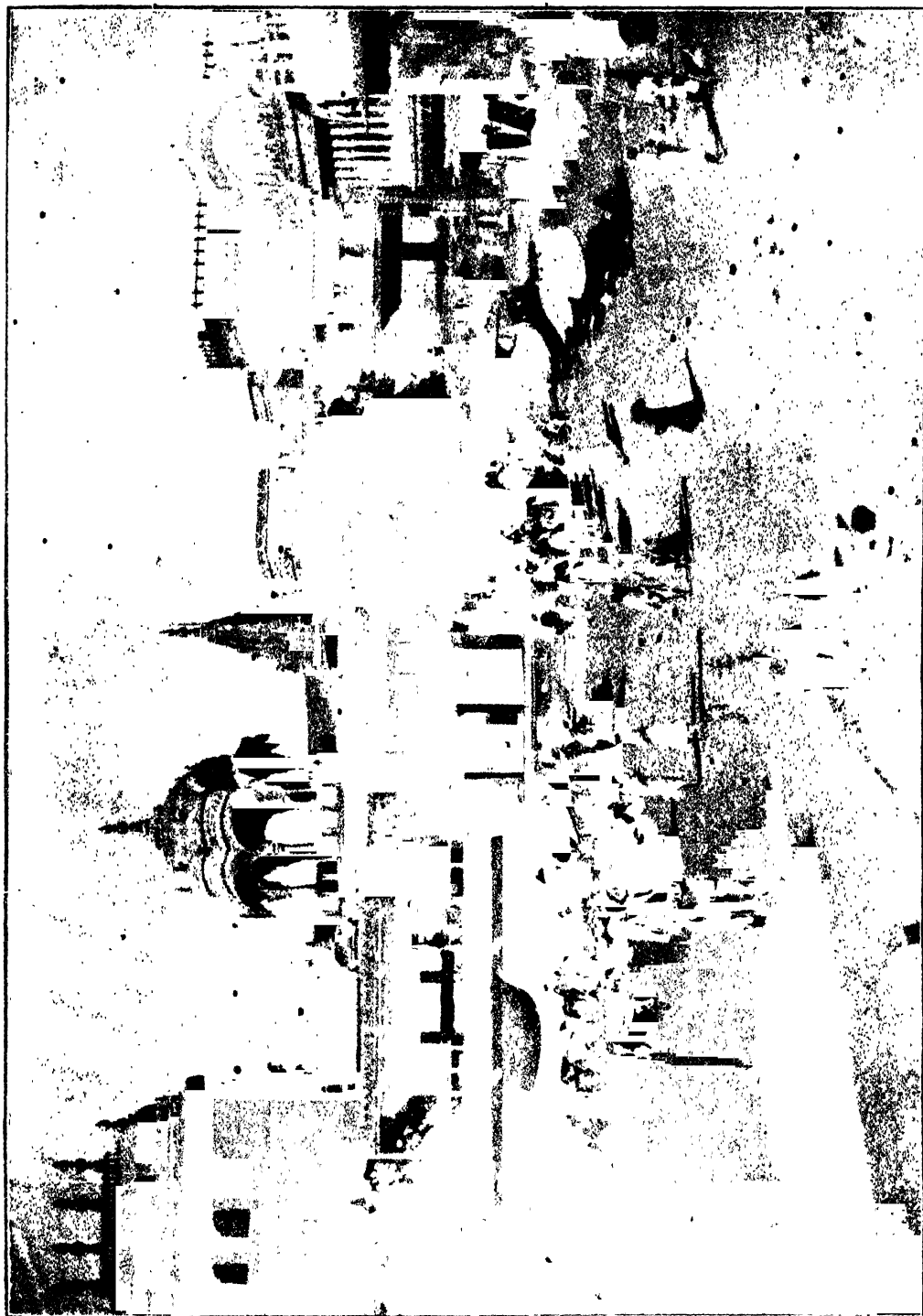
পুরুষের পাতাকাটা ও য়্যালবার্ট

সাহেবী ফ্যাসান

থিয়েটারী ফ্যাসান

ব্যারিষ্টারী ফ্যাসান

জোধপুরের রাজপথ

ফালকনামা রাজপ্রাসাদ হইতে হায়দরাবাদের (দাক্ষিণাত্য) দৃশ্য

কয়লার খনি

[শ্রীসুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী বি-এস সি]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কয়লার অন্বেষণ (Search after Coal)

কোথায়, কোন্ জমির নিম্নে কয়লা পাওয়া যাইবে, তাহা জানিতে হইলে, অন্য কোনরূপে বৃথা অর্থ নষ্ট না করিয়া, সর্ব্বাগ্রে কোন স্থানের ভূ তত্ত্বের আলোচনা করা আবশ্যক। স্বর্ণ, রৌপ্য বা অন্য কোন ধাতুর খনি আবিষ্কার করা অধিকাংশ স্থলে দৈব ঘটনার উপর নির্ভর করে। মেক্সিকোর বৃহৎ রৌপ্যখনি ও অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনি এইরূপে হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু কয়লার খনি আবিষ্কারের জন্য আমাদিগকে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে হয় না। কোন স্থানে কয়লা খুঁজিতে হইলে, প্রথমে সেখানকার শিলাগুলি (rocks) কোন্ সময়ের, অর্থাৎ Carboniferousএর (অঙ্গারক) পূর্ব্বের কি পরের যুগের, তাহার পরীক্ষা করিতে হয়। যদি পূর্ব্বের হয়, তবে সেখানে কয়লা পাওয়ার কোন আশা নাই; কারণ Carboniferous-এর পূর্ব্বে বৃক্ষ লতাদির আদৌ সৃষ্টি হয় নাই; আর যদি পরের হয়, তবে সেখানে কয়লা থাকা সম্ভব। যদি সে স্থলের শিলা (rocks) Carboniferousএর সময়ের হয়, তবে খুব সম্ভব সেখানে কয়লা আছে। তখন সেখানে out-cropএর সন্ধান করা উচিত। নিকটস্থ কোন নদী, ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী, কূপ ইত্যাদির কিনারা পরীক্ষা করিলে out-cropএর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। অনেক সময়ে নূতন মৃত্তিকা আসিয়া out-crop ঢাকিয়া দেয়। সেখানকার মৃত্তিকার রং দেখিয়া সেটা অনেকটা বুঝা যায়। অনেক সময়ে জমির উপর লাঙ্গল দিতে-দিতে out-cropএর অস্তিত্ব জানা যায়। এইরূপে কয়লার অস্তিত্ব জানিতে হইলে, ভূ-তত্ত্ব ভাল জানা দরকার।

এইরূপে কয়লার অস্তিত্ব জানিবার পর দেখা উচিত, সেখানকার কয়লা দ্বারা লাভ হইবে কি না ; অর্থাৎ কয়লা কিরূপ ও কত নীচে আছে এবং কয়লা-স্তরের ঘনতা (thickness) কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় জানিয়া তবে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই সমস্ত বিষয় জানিতে হইলে সেই স্থানে গর্ত্ত করিয়া দেখিতে হয়। ইহাকে Boring বলে। Boring দ্বারা আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারি—

১। গভীরতা (depth)—কয়লার স্তর কত নিম্নে অবস্থিত।

২। স্তরের পরিমাণ (Number of Seams)—সেই স্থানে কতগুলি স্তর আছে।

এইস্থানে বলিয়া রাখি যে, এক স্থানে একের অধিক কয়লার স্তর থাকিতে পারে। হয় ত কিছু নিম্নে ১০ ফিট ঘন (thick) একটা স্তর আছে। তাহার পর হয় ত কিছুদূর পর্য্যন্ত মৃৎপ্রস্তর (shale) বা বালুকা শিলা (Sand-stone) আছে; আবার তাহার নিম্নে ৮ ফিট ঘন আর একটা কয়লার স্তর আছে।

৩। কয়লা স্তরের Dipএর দিক নির্ণয় ও তাহার মাপ।

৪। Fault—সেখানে Fault কিম্বা অন্য কোন বিঘ্ন আছে কি না।

একস্থানে Boring দ্বারা উপরিউক্ত সব বিষয়গুলি জানা যায় না। সমস্তগুলি জানিতে হইলে অন্ততঃ ৩টি Borehole চাই।
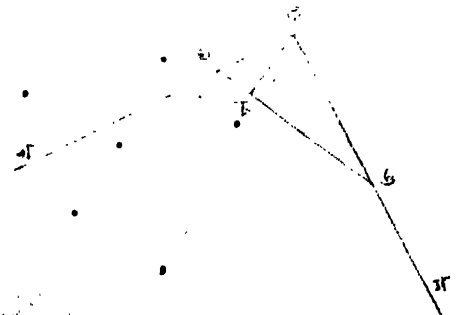
মনে কর ক খ গ ৩টি Bore-hole

ক—১৩০ গজ গভীর

খ—২০৫ „

গ—১৭০ „

সুতরাং খ ক অপেক্ষা ৭৫ গজ গভীর এবং ক খ ৩০০ গজ দীর্ঘ সুতরাং dip—৭৫/৩০০—১/৪ অর্থাৎ ৪এ১ (1 in 4)

আবার গ ক অপেক্ষা ৪০ গজ গভীর এবং ক গ ৩৬০ গজ দীর্ঘ।

সুতরাং dip—৪০/৩৬০—১/৯ অর্থাৎ ৯এ১ (1 in 9)

আমরা এই পাইলাম যে, ক খ এর dip ৪এ১ অর্থাৎ ক হইতে ৪ গজ দুরস্থিত ঘ ক অপেক্ষা ১ গজ গভীর; এবং ক গ এর dip ৯এ১ অর্থাৎ ক হইতে এই দিকে ৯ গজ দুরস্থিত '৬' ক অপেক্ষা ১ গজ গভীর। সুতরাং 'ঘঙ' যোগ করিলে ইহা সর্ব্বত্র ১ গজ গভীর হইবে। ইহাকে strike line বলে। এখন ক হইতে যদি এই রেখার উপর ক চ লম্ব টানি তবে তাহাই dip। ক হইতে ক ঘ যে মাপে ধরা আছে সেই মাপে ক চ মাপিলে দেখা যাইবে যে ক চ ৩·২ গজ এবং আমরা জানি যে ইহা ১ গজ গভীর; সুতরাং True dip—৩ ২এ১।

BORING

Boring দুই প্রকারে করা হয়।

১। Percussive Boring—অর্থাৎ যাহাতে পুনঃ পুনঃ আঘাত দ্বারা গর্ত্ত করা হয়।

২। Rotary Boring—যাহাতে Bore-rodকে যন্ত্র দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া গর্ত্ত করা হয়।

Boringএ ব্যবহার্য্য কতকগুলি যন্ত্রের বিবরণ।

১। Head-gear—

তিনটী দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড ত্রিভুজাকারে দণ্ডায়মান থাকে; এবং উপরে দণ্ড কয়টি একসঙ্গে আবদ্ধ থাকে। ইহার উচ্চতা Bore-rodএর অন্ততঃ দ্বিগুণ হওয়া উচিত; নচেৎ Bore-rod খুলিবার বা পরাইবার সময় বিশেষ অসুবিধা হয়। উপরদিকে একটী কপিকল থাকে। (১নং চিত্র)

২। Bore-rod—

ইহা উৎকৃষ্ট লৌহ দ্বারা প্রস্তুত। ইহার আকার গোল ও চতুষ্কোণ হয়। ইহা ফাঁপা এবং ইহা ৬ হইতে ১৮ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। পরস্পর যুক্ত হইবার জন্য ইহার উভয় পার্শ্বে পেঁচ থাকে। (২ নং চিত্র)

৩। Chisel—

ইহা Bore-rodএর নিম্নে থাকে এবং ইহাই প্রস্তর কর্ত্তন করে। ইহার আকার বিভিন্ন প্রকারের হয়; তন্মধ্যে Flat Chiselই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (৩ নং চিত্র)

৪। Brace-head—

ইহাতে ৪টী কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতল থাকে; এবং ইহারা লম্বভাবে (at right angles) থাকে। প্রত্যেক হাতল প্রায় ১৮" লম্বা এবং ইহা Bore-rodএর উপরে পেঁচ দ্বারা সংযুক্ত থাকে। (৪ নং চিত্র)

৫। Sludger—ইহা লৌহনির্ম্মিত ফাঁপা নল। ইহা Bore-rodএর মধ্যে প্রস্তর বা কয়লার কর্ত্তিত অংশ যাহা জমে তাহা উপরে তুলিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার নিম্নে একটী দ্বার (valve) আছে, তাহা কেবল উপরের দিকে খোলা যায়। ইহা দ্বারা সজোরে Bore holeএর নিম্নে ২।৪বার আঘাত করিলে প্রস্তর বা কয়লার কর্ত্তিত অংশ ইহার ভিতরে প্রবেশ করে এবং দ্বার (valve) দিয়া আর নীচে পড়িয়া যাইতে পারে না। তাহার পর ইহা উপরে তুলিয়া লওয়া হয়; এবং ইহার ভিতরের কর্ত্তিত অংশ দেখিয়া বুঝা যায় যে, কিরূপ প্রস্তরের ভিতর দিয়া Bore hole যাইতেছে। (৫ নং চিত্র)

৬। Rocking lever—যখন Bore-rodগুলি এত ভারী হয় যে Brace-head এর লোকগুলির পক্ষে তাহা উঠান অসাধ্য হয়, তখন এই lever দিয়া তাহা উঠান হয়। (৬ নং চিত্র)

৭। Stirrup—ইহা lever হইতে ঝুলান থাকে এবং Brace-head ও leverএর মধ্যস্থলে থাকে।

১। Percussive Boring :—

লৌহদণ্ড (Bore-rod) দ্বারা প্রস্তর কাটিয়া গর্ত্ত করা হয়। Bore-rodএর নিম্নে Chisel থাকে এবং উপরে Brace-head থাকে, যাহা দ্বারা Bore-rod উঠান কিম্বা নামান হয়। প্রস্তর কাটিবার সময় ২ বা ৪ জন লোক Brace-head ধরিয়া কিছু দূর উত্তোলন করে; তার পর সেখান হইতে জোরে ছাড়িয়া দেয় এবং Chisel দ্বারা প্রস্তর কাটিয়া যায়। গর্ত্ত গোলাকার করিবার জন্য Bore rod উঠাইবার সময় উপরের লোকগুলি Brace-headএর
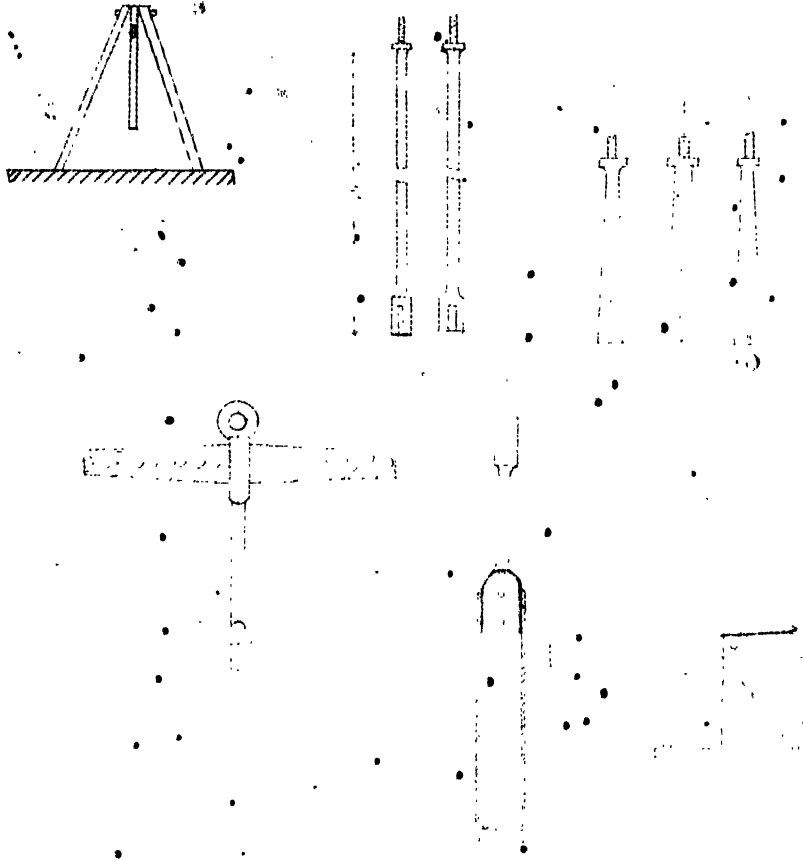
উপরের বামপার্শ্ব হইতে যথাক্রমে ১, ২, ৩ নং চিত্র ও নিম্নের বামপার্শ্ব হইতে ৪, ৫, ৬ নং চিত্র

হাতল ধরিয়া একটু ঘুরাইয়া লইয়া তবে উপরে উঠায়। কিছুক্ষণ কার্য্য করিবার পর Bore-rodগুলি উপরে উঠাইয়া তাহার নিম্নের Chisel খুলিয়া সেখানে Sludger পাঠাইয়া, তাহার দ্বারা নীচের কুর্ত্তিত অংশ উপরে উঠানহয়।

Sludger দ্বারা উত্তোলিত প্রস্তরগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া, কিরূপ স্তরের পর স্তর কিরূপ পাওয়া যায়, তাহা Note-Bookএ লিখিয়া রাখা হয়; এবং সর্ব্বশেষে সেই Note-book দেখিয়া খনির সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারা যায়।

২। Rotary Boring—ইহার মধ্যে Diamond Drill Boringই প্রধান। Boringএর যন্ত্রের মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট। ইহাতে Bore-rodএর নিম্নে Core-tube থাকে এবং তাহার ভিতর কর্ত্তিত প্রস্তরাংশ থাকে। Core-tubeএর নিম্নে হীরক-বসানো একটী ছোট চোঙ্গ (Cylinder) থাকে। ইহাকে Crown বলে। এই হীরকের রং কালো ও ইহা অল্প মূল্যের। ইহা সাধারণতঃ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে আনীত হয়। Bore-rod একটী Engine দিয়া ঘূর্ণিত হয় এবং সেই সঙ্গে Crownটিও ঘুরে এবং ইহার উপরকার হীরকগুলির দ্বারা নীচের প্রস্তর কর্ত্তিত হইতে থাকে। সেই কর্ত্তিত অংশ Core-tubeএর ভিতর উঠিতে থাকে। যখন Crown ঘুরিতে থাকে, তখন Bore-rodএর ভিতর দিয়া জল দেওয়া হয়, যাহাতে Crownটিকে শীতল রাখে এবং সেই জলস্রোতে

Bore-rodএর পার্শ্বস্থিত ছোট-ছোট প্রস্তরাংশকে উপরে তুলে। কিছুদূর কাটা হইলে উপর হইতে সব নলগুলিকে টানিয়া তুলা হয় এবং Core tubeএর ভিতর হইতে কর্ত্তিত অংশ বাহির করিয়া ঠিক পরে-পরে সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। ইহার দ্বারা উপর হইতে কয়লার স্তর পর্য্যন্ত প্রস্তরের স্তর কিরূপ ভাবে আছে, তাহা সুন্দর রূপে বুঝিতে পারা যায়।

ইহার খরচ মোটের উপর প্রতি ফুটে ৫৷৷৹ টাকা আন্দাজ পড়ে।

কোথায় ও কত নীচে কয়লা আছে, তাহার ঘনতা (thickness) কিরূপ, তাহার উপরে কিরূপ প্রস্তরের স্তর আছে, ইত্যাদি বিষয় এতক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম। এখন সমস্যা এই যে, কি উপায়ে ঐ কয়লা কাটিলে সুবিধা হইবে। সুবিধার অর্থ খরচ কম হইবে এবং তাহা হইলেই বেশী লাভ হইবে। মনে থাকে যেন, ইহা ব্যবসায়ের জিনিস ; সুতরাং সর্ব্বদা খরচের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

আমাদের এখানে তিন প্রকারে কয়লা কাটা হয়,

১। Quarry working (পুকুরে খাদ)

২। Incline সিঁড়িখাদ)

৩। Pit (কূয়াখাদ)

১। Quarry working ইহা অনেকাংশে পুষ্করণী খনন করার মত। যতক্ষণ কয়লা-স্তরে পৌছান না যায়, ততক্ষণ উপর হইতে প্রস্তর ও মৃত্তিকা কাটিয়া দূরে ফেলা হয়। তৎপরে কয়লা-স্তরে পৌছিলে, মাটী কাটার মত কয়লা কাটিয়া ঝুড়ি করিয়া উপরে আনা হয়। এই উপায়ে কয়লা কাটিতে গেলে, যাইতে খরচের ভাগ বেশী না পড়ে, সেজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রাখা হয়—

(১) কয়লা-স্তর পুরু হওয়া চাই—

(২) যে জমি লওয়া হইয়াছে, তাহা কয়লা-স্তরের strike lineএ হওয়া চাই ; কারণ lineএ হইলে অনেক মৃত্তিকা ও প্রস্তর তুলিতে হয়।

(৩) কয়লা-স্তর ভূপৃষ্ঠের খুব নিকট হওয়া চাই।

ইহার অসুবিধা।—

(১) বর্ষাকালে জল জমিয়া বিশেষ অসুবিধা হয়।

(২) উপরের মাটি কাটিয়া দূরে ফেলিতে হয়। অন্য উপায়ে হইলে উপরে চাষ ইত্যাদি অনায়াসে চলিতে পারিত।

(৩) বর্ষাকালে পার্শ্বের পাড় ভাঙ্গিয়া ভিতরে পড়ে।

২। Incline working (সিঁড়ী খাদ)

ইহাকে সিঁড়ী খাদ বলে। ইহাতে উপর হইতে বরাবর ঢালু করিয়া কয়লা-স্তরের নীচে পর্য্যন্ত কাটিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেখান হইতে কয়লা কাটিয়া উপরে মাথায় করিয়া বহিয়া আনে; কিম্বা নীচেই টব গাড়ীতে বোঝাই দেয়। কয়লা তুলিবার জন্য এক প্রকার ছোট-ছোট গাড়ী আছে, তাহাকে টবগাড়ী বলে ; এবং সেই গাড়ী যাতায়াতের জন্য উপর হইতে খাদের তল পর্য্যন্ত বরাবর লাইন (ইহাকে Tram line বলে) বসান থাকে। নীচে মালকাটারগণ (যাহারা কয়লা কাটে) কয়লা কাটিয়া টবগাড়ীতে বোঝাই দেয়। তাহার পর উপর হইতে Engine দিয়া টানিয়া তোলা হয়। ইহা টানিবার যে রজ্জু ব্যবহৃত হয়, তাহা লোহার তারের দ্বারা প্রস্তুত ; এবং খনিতে এই রজ্জুই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খনিতে সাধারণতঃ পুরুষে কয়লা কাটে ও মেয়েরা বোঝাই দেয়। এক-একটী পুরুষের সহিত একটী করিয়া মেয়ে থাকে এবং উভয়কে লইয়া এক গাঁইতি বলে। যদি ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মেয়ে কাজ করে, তবে ৫গাঁইতি কাজে লাগিয়াছে বলিবে। গাঁইতি অনেকে রাস্তা খুঁড়িবার সময় দেখিয়া থাকিবেন। ইহারা কয়লা কাটে। খাদের যেখানে টবগাড়ী বোঝাই হয়, সেখান হইতে Engine ঘর পর্য্যন্ত একটি লৌহতারের সিগন্যাল থাকে,—গাড়ি বোঝাই হইলে 'মালকাটাররা' ইহার সাহায্যে Engine খালাসিকে Engine চালাইবার সঙ্কেত করে।

সিঁড়ি খাদের অসুবিধা।—

১। উপর হইতে অধিক পরিমাণে জল গড়াইয়া খাদের ভিতর প্রবেশ করে।

২। কয়লা কাটিয়া লইয়া যাইবার সময় মালকাটারদিগকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে উপরে উঠিতে হয়।

৩। ইহাতে খালি টব নামান ও বোঝাই টব তোলা একসঙ্গে হয় না। সে জন্য বোঝাই টব তুলিয়া তবে খালি টব নামান হয় ; তাহাতে অনেক সময় নষ্ট হয়।

সিঁড়ি খাদের স্থান-নির্দ্দেশ কালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ক—এঞ্জিন ঘর
খ—লৌহ রজ্জু
গ—ট্রাম লাইন
ঘ—Friction roller
ঙ—ইষ্টকের খিলান
চ—কয়লা-বোঝাই টব গাড়ী
ছ—কয়লা
জ—শিলাস্তর
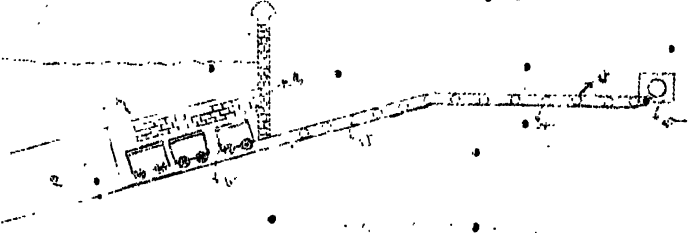
সিঁড়ি-খাদের চিত্র

১। ইহা অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে কাটা উচিত। কারণ, তাহা হইলে উপরের সব জল ভিতরে ঢুকিতে পারে না।

২। অপেক্ষাকৃত শক্ত জমিতে কাটা উচিত, যাহাতে উভয় পার্শ্বের মাটী ভাঙ্গিয়া না পড়ে।

৩। ইহা জমির এমন স্থানে কাটা উচিত, যেখান হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কয়লা পাওয়া যাইতে পারে।

৪। ইহা রেলওয়ে ষ্টেসনের যত নিকটে হয় ততই ভাল; কারণ তাহাতে চালান দিবার সুবিধা হইবে।

সিঁড়ি খাদ dip-lineএর দিকে কাটিতে হইবে। তার পর উপর হইতে নীচে যতদূর পর্য্যন্ত কঠিন প্রস্তর না পাওয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বে ইষ্টকের প্রাচীর দেওয়া হয় ও উপরিভাগে খিলান করা হয়; যাহাতে উপরিভাগ বা পার্শ্বদেশ হইতে মাটি ভাঙ্গিয়া না পড়ে। সিঁড়ি খাদ এরূপ ঢালু হওয়া উচিত, যাহাতে টব গাড়ীর সংলগ্ন রজ্জু বরাবর ভূমি স্পর্শ করিয়া যায়। ভূমির উপর ঘর্ষণ দ্বারা রজ্জু খারাপ হইয়া না যায়, এজন্য Tram lineএর মধ্যে ২৫।৩০ ফিট অন্তর একটী করিয়া Friction roller থাকে। এই rollerএর উপর রজ্জু থাকাতে তাহা ঘর্ষণ দ্বারা তত শীঘ্র নষ্ট হয় না।

৩। Pit (পিট্ খাদ)

ইহা কূপের ন্যায়। উপর হইতে কূপ খনন করার ন্যায় কয়লা-স্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত খনন করা হয়। কঠিন প্রস্তর সকল, যাহা কোন অস্ত্রের দ্বারা খনন করা যায় না, তাহা ডিনামাইট্ ইত্যাদির দ্বারা কাটাইয়া খনন করা হয়। উপর হইতে কঠিন প্রস্তরের উপরিভাগ পর্য্যন্ত ইষ্টকের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করা হয়, যাহাতে পার্শ্ব ভাঙ্গিয়া না পড়ে, এবং ভিতর হইতে জল চুয়াইয়া আসিতে না পারে। ইহাতে অবশ্য সিঁড়ি খাদের ন্যায় হাঁটিয়া উপর উঠিবার কোন উপায় নাই। ইহার গভীরতা আমাদের এখানে ১৫০।২০০ ফিট হইতে ১০০০।১২০০ ফিট পর্য্যন্ত দেখা যায়।

পিট্ খাদের উপরে কাষ্ঠের বা লৌহের কাঠাম থাকে; তাহাকে Head-gear বলে। ইহার উচ্চতা পিটের গভীরতার উপর নির্ভর করে। Head-gearএর উপর বড়-বড় দুটি কপিকল (Pulley wheel) থাকে। তাহাদের ব্যাস ৪ ফিট হইতে ২০ ফিট পর্য্যন্ত হয় এবং ইহা লৌহরজ্জুর পরিধির উপর নির্ভর করে। Headgearএর নিকটেই Engine-ঘর থাকে। Engineএর Drumএর গায়ে রজ্জু জড়ান থাকে, এবং ঐ রজ্জুর দুই প্রান্ত উপরি-উক্ত Pulley wheel দুটির উপর দিয়া পিট-মুখেস্থিত দুটি লৌহ-পিঞ্জরের উপর সংলগ্ন থাকে। যখন Engine চলে, তখন Drumএর এক প্রান্তের রজ্জু ইহার উপর জড়াইতে থাকে এবং অপর প্রান্ত ঢিলা হয়। সুতরাং ইহা দ্বারা একটী পিঞ্জর যখন খাদের নীচে যায়, তখন অপরটি উপরে উঠে। এই পিঞ্জরের আকার পিট্এর আকারের উপর নির্ভর করে। Pitএর আয়তন এইরূপ হইবে, যাহাতে দুইটি পিঞ্জর পাশাপাশি যাইতে পারে এবং তদ্ভিন্ন খাদের ভিতর উষ্ণজলোত্থিত বাষ্প (steam) ইত্যাদি লইয়া যাইবার জন্য উভয় পার্শ্বে স্থান থাকে। এই পিঞ্জর দ্বারা খাদের ভিতর হইতে একটী বোঝাই টব উপরে আনা হয়, এবং একই সময়ে অন্যটি দ্বারা একটী খালি টব নীচে পাঠান হয়। লোকজনও ইহার ভিতর চড়িয়া খাদে যাতায়াত করে।

Position of Shaft (স্থান-নির্দ্দেশ)

Boring ইত্যাদি দ্বারা কয়লা-স্তরের যথেষ্ট সন্তোষজনক প্রমাণ পাইবার পর, পিট খাদ খনন করিতে আরম্ভ করা হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে, কোথায় উহার স্থান নির্দ্দেশ করিলে সকল দিকে সুবিধা হইবে, তাহা দেখা উচিত।

১। গহ্বরটি জমির এরূপ স্থলে হওয়া উচিত, যেখানে হইতে সকল দিকের কয়লা লওয়ার সুবিধা হইবে।
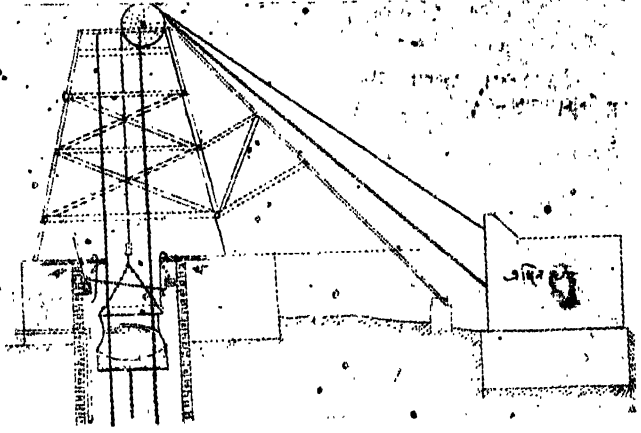
পিট খাদের উপরের চিত্র
ক'প,—গহ্বর মুখ
(লৌহ পিঞ্জর ভিতর হইতে উপরে আসিয়া 'ক' প 'এর নিকটে থাকে)

২। ইহা কয়লা-স্তরের Dipএর শেষের দিকে থাকা উচিত (সাধারণতঃ ২/৩ উপরের দিকে ও ১/৩ Dipএর দিকে)। ইহার সুবিধা এই যে, উপরের দিকে যে কয়লা কাটা হইবে, তাহা টব বোঝাই হইলে লাইনের উপর দিয়া আপনি গড়াইয়া নীচে আসিতে পারিবে।

৩। ইহা রেলওয়ে ষ্টেশনের যত নিকটে হয়, ততই ভাল। তাহা হইলে কয়লা চালান দেওয়ার খরচ কম হয়।

৪। যে স্থানে ইহা খনন করা হইবে, সে স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ হওয়া আবশ্যক। ইহাতে উপরের জল সব গড়াইয়া ভিতরে যাইতে পারে না; এবং তদ্ভিন্ন জমি উচ্চ হইলে সেখান হইতে টব গাড়ী বিনা আয়াসে গড়াইয়া নীচের জমিতে যাইতে পারিবে।

(একটী পিটগহ্বর অন্ততঃ ২০ বৎসর স্থায়ী হওয়া উচিত।)

ইহার পর দেখিতে হইবে, সেই জমিতে কাজ করিবার জন্ম কতগুলি ও কি আয়তনের গহ্বরের দরকার হইবে। Mines Act অনুসারে প্রত্যেক খাদে অন্ততঃ ২টি গহ্বর (Shaft) রাখিতে হইবে; এবং ঐ দুইটির মধ্যে যতদিন সংযোগ না হয়, তত দিন খাদের কাজ চলিতে পারিবে না। দুইটি গহ্বর রাখার প্রধান উদ্দেশ্য বায়ু-চলাচল (ventilation)। খাদের ভিতর বায়ু-চলাচল না হইলে তাহার ভিতর কায করা অসম্ভব। ইহার বিষয় পরে বলা যাইবে।

সময়ে-সময়ে ২টার অধিক গহ্বর করিলে কাযের সুবিধা হয়; কিন্তু তাহা খরচের উপর নির্ভর করে। যদি খুব গভীর করিতে হয়, তবে ২টার অধিক রাখা সম্ভব হয় না।

খাদের গহ্বরের আয়তন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

১। প্রতিদিনের প্রাপ্ত কয়লার পরিমাণ

২। জমির আয়তন।

যদি জমি বেশী হয় এবং প্রতিদিনের প্রাপ্ত কয়লার পরিমাণও বেশী হইবে বলিয়া বোধ হয়, তবে গহ্বরের আয়তনও সেই অনুসারে বেশী করিতে হইবে।

৩। টব গাড়ী ও লৌহ পিঞ্জরের আকার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পাশাপাশি ২টা লৌহপিঞ্জর থাকিবে। তদ্ভিন্ন জলীয় বাষ্প (steam) যাইবার ও নিচের জল দমকলের (pump) সাহায্যে উপরে তুলিবার জন্য নল ইত্যাদির জন্ম স্থান রাখিতে হইবে।

পিট গহ্বরের ব্যাস সাধারণতঃ ৮ ফিট হইতে ১৪ ফিট পর্য্যন্ত হয়।

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

মাঘ ও ফাল্গুন মাসের "ইঙ্গিত" পাঠ করিয়া অনেকেই অনুগ্রহ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। সে জন্য আমি তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ইহার মধ্যে একটু দুঃখের কারণ ঘটিয়াছে। কয়েকজন পত্র-লেখক এমন সব জিনিসের সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন, যাহা তৈয়ার করিতে একটুও পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করিতে হয় না; অথচ ঘরে বসিয়া জলের মতন অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যায়। তাঁহাদিগকে দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথ এতটা সোজাও নহে, সহজও নহে। এরূপ ফাঁকির ব্যবসায় যে একেবারেই নাই এমন নহে; কিন্তু সেরূপ ব্যবসায় কখনও স্থায়ী হয় না। তাহাতে প্রথম-প্রথম কিছু-কিছু উপার্জ্জন হইলেও, ক্রমে তাহা কমিয়া আসে; অবশেষে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কারণ, এই সব সহজ জিনিসের secret বেশী দিন গোপন রাখা যায় না, অল্প আয়াসেই তাহা লোকে ধরিয়া ফেলিতে পারে; এবং সহজ দেখিয়া, অনেকেই ঐরূপ এক-এক দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। কাজেই লাভের অংশটা অনেকের মধ্যে ভাগা-ভাগি হইয়া যাওয়ায় 'চটকস্য মাংসং ভাগশতং' হইয়া পড়ে।

ব্যবসায় করিতে হইলে, মূলধন না থাকে, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা থাকা চাই; মনের দৃঢ়তা, অধ্যবসায় না থাকিলে ব্যবসায় মোটেই চলে না। একটা বিষয়ে লাগিয়া থাকিবার (sticking to the bush) মত চিত্তস্থৈর্য্য থাকা নিতান্তই আবশ্যক।

আবার বলি, geometryর মত, There is no royal road to trade, commerce, manufacture। আর একটা প্রধান কথা এই যে, ব্যবসায় করিতে হইলে অনেক মাথা খাটাইয়া নূতন-নূতন ফন্দী বাহির করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, যে সব জিনিস নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সেই সকল জিনিসকে কাজে লাগানোই অর্থোপার্জ্জনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। কারণ, এই রকম নূতন জিনিসের ব্যবসায়ে গোড়ায় মোটেই প্রতিযোগিতা থাকে না। জিনিসটা যদি লোকের প্রয়োজনীয় হয়, এবং তাহার ব্যবসায় ক্ষেত্রে যদি প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে, তবে সে ব্যবসায়ের মালিক যে সহজেই ধনী হইতে পারিবেন, ইহা ত খুব সোজা কথা; এ কথা সকলেই বুঝিতে পারেন। যাক্, এখন একটু কাজের কথা হউক।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কিসে কি হয়, কি রকমে এক কাজ করিতে গিয়া আর এক কাজ হইয়া যায়, কি রকমে এক জিনিস তৈয়ার করিবার জন্য পরীক্ষা করিতে-করিতে অপ্রত্যাশিত রূপে আর একটা ভাল জিনিস তৈয়ার হইয়া যায়, সে বড় আশ্চর্য্য, আর ভারি মজার কথা।

আজকাল খাকি রংয়ের পোষাক সর্ব্বসাধারণের বড় আদরের জিনিস হইয়া উঠিয়াছে। এই খাকি রংয়ের সৈনিকের পোষাক যুদ্ধে খুব কাজ দিয়াছে। খাকি রংটি অতি আশ্চর্য্য এবং অপ্রত্যাশিত উপায়ে বাহির হইয়া পড়ে। যাঁহার দ্বারা এই মহৎ আবিষ্ক্রিয়া হয়, তিনি খাকি রং তৈয়ার করিবার কল্পনাও কখনও করেন নাই। তিনি কতকগুলি রঞ্জন পদার্থ লইয়া অন্য কোন একটা পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। নানা জিনিস পরস্পর মিশাইতে-মিশাইতে খাকি রংটি বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও, তিনি কত বড় একটা আবিষ্কার যে করিয়া ফেলিলেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যাহা চাহেন, উহা তাহা নহে দেখিয়া, প্রথমে উহার প্রতি একটুও মনোযোগ দেন নাই। এমন কি, তাঁহার প্রয়োজনীয় জিনিস নয় বলিয়া, কোন্-কোন্ জিনিসের কিরূপ ভাগের মিশ্রণে এই খাকি রংটি উৎপন্ন হইল, তাহাও তিনি লক্ষ্য করেন নাই; এবং সেজন্য তাহা তিনি note করিয়া রাখেন নাই। পরে, তাঁহারই হউক, কিম্বা তাঁহার সহকারী বা বন্ধু অপর কোন লোকেরই হউক, মনে হইল, ঐ নূতন রংটি অতি বিচিত্র; উহাকে কাজে লাগাইতে পারা যায়। তখন খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ! কিন্তু কিসে কি হইল, তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে আবার নূতন করিয়া হাজার-হাজার

পরীক্ষার পর রংটি আবার বাহির হইল। থাকি রংয়ের ভাগ্য ভাল যে, আবিষ্কারকের মনে ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা শুভক্ষণে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানাগারে এমন কত শত-শত জিনিষ পরীক্ষাকালে উৎপন্ন হয়, অথচ, তাহার কথা কাহারও মনে থাকে না। থাকিলে হয় ত এক সময়ে না এক সময়ে ঐ জিনিসগুলি কত না কাজে লাগিতে পারিত।

একবার লেখকের ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারেও এইরূপ সামান্য একটু ব্যাপার ঘটিয়াছিল। স্বদেশীর পূর্ণ প্রভাবের সময় যখন দেশময় স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের এবং বিদেশী জিনিস পোড়াইবার ঘটা পড়িয়া গিয়াছিল, তখন ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে নানা জিনিস কলিকাতায় আমদানী হইতে আরম্ভ হয়। সেই সূত্রে শ্লেট-পেন্‌সিলও আসিয়াছিল। কিন্তু সে পেন্‌সিলগুলি অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ।

তৎপূর্ব্বে আমি একবার আমার এক আত্মীয়ার নিকট হইতে ৺পুরীধাম হইতে আনীত শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের একরূপ ছোট ছোট খুব মিশ্‌মিশে কালো, খোদাই-করা মূর্ত্তি উপহার পাইয়াছিলাম। কি রকমে মনে নাই,—সেই মূর্ত্তির একটা কোণ দিয়া পাথরের শ্লেটের উপর হয় ত অন্যমনস্ক ভাবেই দাগ কাটিয়াছিলাম। দেখিলাম, দিব্য পেন্‌সিলের মত দাগ পড়িতে লাগিল, এবং জল দিয়া বেশ মুছা যাইতে লাগিল। তখন তাহা আমার একরূপ পেন্‌সিলের কাজ করিতে লাগিল। আমার মনে হইয়াছিল, ঐ মূর্ত্তিগুলি মাটীর,—পোড়াইয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। কেহ-কেহ বলিয়াছিলেন, না, উহা নরম পাথরের,—খোদাই-করা। কিন্তু ভাঙ্গিয়া দেখা গেল, বাহিরের রং আর ভিতরের রং একরূপ নহে; এবং তখনও আরও মনে হইল, উহা মাটীর হওয়াই খুব সম্ভব।

সে যাহাই হউক, সেই বিশ্বাসে, স্বদেশী পেন্‌সিলের ঐরূপ ভঙ্গপ্রবণতা দেখিয়া, আমার মনে হইল, পুরী অঞ্চলে ঐরূপ মাটী পাওয়া যাইতে পারে, এবং তাহা লইয়া পেন্‌সিলের কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে। তখন আমি আমার এক পুরী-প্রবাসী আত্মীয়কে ঐ সকল কথা লিখিয়া, কিছু মাটী পরীক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় আমার কাছে পাঠাইয়া দিতে লিখিলাম। তিনি একঝুড়ি মাটী কলিকাতায় আসিবার সময় সঙ্গে লইয়া আসিলেন। সেই মাটীগুলি ডেলা-ডেলা, খুব শক্ত, এবং সাদা রংয়ের। আমি দুই চারিটা ডেলা ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া জল মিশাইয়া কাদার মত করিলাম। মাটীতে জল মিশাইবার সময় উহা হাতে আঠার মত (যেমন সাজ্জিমাটীর ভিতর হইতে বাহির হয়) ঠেকিতে লাগিল। যাহা হউক, কিছু ঐ কাদা পেন্‌সিলের আকারে গড়িয়া, আগুনে পুড়াইয়া লইলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে পেন্‌সিল হইল না। কিন্তু কি হইল বলুন দেখি? পুড়িয়া তাহা পাথরের মত শক্ত হইয়া গেল। আমি তখন আরও কিছু কাদা গুলির আকারে গড়িয়া আবার পোড়াইয়া লইলাম। দিব্য (ছেলেদের খেলিবার) মার্ব্বেলের গুলি তৈয়ার হইয়া গেল। আমার আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, পুরীর কাছে কি একটা পাহাড়ের পাদদেশের একটা পতিত মাঠ হইতে তিনি ঐ মাটী কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন। আমি যে মার্ব্বেলের গুলি প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহা porus হইয়াছিল। জলে ফেলিলে তাহা জল শোষণ করিত, এবং পরে শুকাইয়া যাইত। কিন্তু পাথরের মত শক্ত বরাবরই থাকিত। ঐ মাটীর সঙ্গে কিছু kaolin মাটীর sizing দিলে আর উহা জল শোষণ করিবে না। তখন তাহা হইতে চীনা-মাটীর সকল প্রকার বাসন প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে; অন্ততঃ মার্ব্বেলের গুলি ত স্বচ্ছন্দে হইতে পারে, এবং তাহা করা খুব শক্ত বলিয়া মনে হয় না। গুলি প্রস্তুত করিবার কলও সংগ্রহ করা খুব শক্ত নয়। কবিরাজ এবং ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্ট মহাশয়েরা ঔষধের গুলি প্রস্তুত করিবার জন্য বোধ হয় ঐ রকম কল ব্যবহার করেন। ছেলেদের মার্ব্বেল খেলিবার গুলি বেশ একটী সুন্দর পণ্য, এবং তাহাও বিদেশ হইতে আসিয়া থাকে। চেষ্টা করিলে কেহ-কেহ বোধ হয় এই ব্যবসায়ে হাত দিতে পারেন।

বাঙ্গালার জল-হাওয়ায় এই মাটীর গুণ বদলাইয়া যায়। কেহ ইহা হইতে ব্যবসায়ের জন্য কোন কিছু প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিলে, পুরীর কাছাকাছি কোথাও কারখানা স্থাপন করিলে ভাল হয়। ইহা হইতে আরও একটা কাজ হইতে পারে। ইহা হইতে উত্তম imitation stoneএর টালি (slab) তৈয়ার হইতে পারে। তবে জলশোষকতা নিবারণের জন্য ইহার সহিত অন্য কিছু মিশাইয়া লইতে হইবে।

এখন, পেন্‌সিলের ভাগ্যে কি ঘটিল? প্রথম পরীক্ষার এইরূপ ফল দেখিয়া আর পরীক্ষায় হাত দিই নাই। তবে সন্ধান করিতে করিতে জানিতে পারিয়াছিলাম, কুমারটুলির কুমারেরা পোড়াইবার কায়দায় গঙ্গার পলি মাটী হইতে চমৎকার পেন্‌সিল তৈয়ার করিয়া দিতে পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাহাকেও এই কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারি নাই। তাহারা দেবমূর্ত্তি গড়ে,—পেন্‌সিলের মত তুচ্ছ কাজে হাত দিতে রাজী নয়।

মার্ব্বেলের গুলির কথায় ছেলেদের খেলানার কথা আসিয়া পড়িতেছে। খেলানা প্রস্তুত করা মস্ত বড় একটা ব্যবসায়। প্রতিবর্ষে প্রত্যেক দেশে কোটী কোটী টাকা এই খেলানা প্রস্তুত ও তাহার ব্যবসায়ে খাটিয়া থাকে। আগে জার্ম্মাণী পৃথিবীর খেলানার ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল, এখন জার্ম্মাণীর হাত পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে এবং জাপান পৃথিবীর খেলানার বাজার capture করিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটস খেলানার বিষয়ে কিরূপে জাপানের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, তাহার বিবরণ সম্প্রতি Scientific American পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন কলিকাতার পথে ঘাটে জাপানী খেলানার ছড়াছড়ি যাইতেছে।

খেলানা প্রস্তুত করা যেমন মস্ত বড় ব্যবসায়, তেমনি খুব শক্ত ব্যবসায়ও বটে। ছেলেদের মত খামখেয়ালী জীব পৃথিবীতে আর নাই। তাহাদের Imagination capture করাও তেমনি সহজ নহে। অনেক মাথা ঘামাইয়া ছেলেদের মনের মত খেলানা প্রস্তুত করিতে হয়।

ছেলেদের খেলানা প্রস্তুত করা সম্বন্ধে অনেক ভাবিবার কথা আছে। খেলানা জিনিসটি শুধুই খেলানা নয়, উহা মানবদিগের ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করে। বিশেষ বিশেষ খেলানা ছেলেদের হাতে পড়িয়া তাহাদের মানুষ করিয়াও গড়িয়া তুলিতে পারে, আবার পশু করিয়াও গড়িয়া তুলিতে পারে। দেশের এবং জাতির প্রতি একটু মায়া-মমতার দাবী যাঁহারা করিতে পারেন, কেবল তাঁহারাই ছেলেদের খেলানা প্রস্তুত করিবার যোগ্য লোক।

ছেলেদের খেলানা প্রথমতঃ খুব চটক্‌দার রংচঙে, চক্‌চকে হওয়া দরকার—যেন প্রথম দর্শনেই ছেলেদের মন ভুলাইতে পারে। ছেলেদের মনের মতন খেলানা হইলে, বিক্রয়ের জন্য ভাবিতে হয় না। ছেলেদের আব্দার, বায়না, জেদ, কান্নাহাটি,—তাহাদের খেলানা আদায় করিবার কত-শত কৌশল। তার পর, এই খেলানা যেন দামী না হয়। প্রথমতঃ, ব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মানুসারে যে জিনিসের দাম যত কম, তাহার বিক্রয় তত বেশী,—এই হিসাবে খেলানার দাম খুব কম হওয়া চাই, দ্বিতীয়তঃ, দামী খেলানা হইলে ছেলেদের বাপেদের উপর বড় বেশী জুলুম করা হইবে, বিশেষতঃ, এই মাগ্‌গী গণ্ডার দিনে। খেলানা দামী হইলে ছেলেদের ভাগ্যে খেলানার বদলে প্রহার লাভ হইতে পারে, অথচ তাহাতে বিক্রেতার সিকি পয়সাও লাভ নাই। বিশেষতঃ ছেলেদের হাতে খেলানার পরমায়ু বেশীক্ষণ নয়, এক আধ ঘণ্টা মাত্র। সেইজন্য দাম যথাসম্ভব কম হইলেই ভাল হয়। তবে দামী খেলানাও কিছু কিছু চাই, ধনীসন্তানদের জন্য। ধনী ব্যক্তিরা আবার কম দামের খেলনাও পছন্দ করেন না। আর যদি খেলানাটি খুব টেঁকসই হয়, দু'চার মাস টিঁকিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে দাম কিছু বেশী হইলেও ক্ষতি নাই।

খেলানার অনেক শ্রেণী-বিভাগ আছে। মাটীর, টীনের, কাঠের—এই রকম একটা শ্রেণী বিভাগ হইতে পারে, আবার, তাহাদের ব্যবহারের দিক দিয়াও অপর একটা শ্রেণী বিভাগ হইতে পারে, যেমন (১) মেয়েদের গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি, যথা, হাঁড়ী কড়া, বেড়ী, ইত্যাদি। (২) পুতুল। (৩) ঘরের আসবাব, যথা, বাক্স, পেঁড়া, তোরঙ্গ, আলমারি ইত্যাদি। (৪) জীবজন্তু। (৫) ফলমূল, শাক তরকারী ইত্যাদি। ছেলেদের (১) ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাটবল। (২) ছেলেরা স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া সবল ও দৃঢ়-কায় হইতে পারে এমন খেলানা, যথা, miniature রামমূর্ত্তি, শ্যামাকান্ত, স্যাণ্ডো, ভীমভবানী এবং বক্সি, খেলোয়াড় বা কুস্তি বেশে পালোয়ান, প্রভৃতির পুতুল। টীনের বা সীসার বা দস্তার ঢালাই করা তরবারি, ধনুক, বন্দুক, পিস্তল, কামান প্রভৃতি, সিপাহী, গোরা, সৈনিক, ঘোড়-সওয়ার। (৩) সাইকেল, মোটর, এরোপ্লেন প্রভৃতি। (৪) বৈজ্ঞানিক খেলানা, যেমন, রেলের গাড়ী, ঘড়ি, সেলায়ের কল। (৫) ছুতারের যন্ত্র (মেয়েদের গৃহস্থালীর পাল্টা হিসাবে, একটু বয়স্ক বালকদের জন্য) যথা, করাত, বাটালী, মুগুর, র‍্যাঁদা,

থিস্‌কাপ, ভ্রমর ইত্যাদি। (৬) কামারের যন্ত্র, যথা, হাপর হাতুড়ী, ভাইস, anvil, সাঁড়াসী প্রভৃতি।

ছেলেমেয়েদের 'মানুষ' করিয়া ('মেষ' করিয়া নহে!) গড়িতে হইলে, তাহাদের খেলনার দিকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এখন কয়েকটি মাত্র নাম দিতে পারিলাম। একটু বিবেচনা করিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিলে, হাজার-হাজার রকম খেলানা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সেই হাজার হাজার খেলানার মধ্যে যে ছেলে যে রকম খেলানা পছন্দ করিয়া লইবে, সেই ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনও অনেকটা সেই ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে বলিয়া মনে হয়। এই খেলানার ভিতর দিয়া, ছেলেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে কত রকমই যে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই খেলানা সামান্য বা অবহেলার জিনিস নয়। দেশের যাঁহারা মাথা, দেশের যাঁহারা যথার্থই মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদেরও ইহা উপেক্ষার বিষয় নয়, বরং ধৈর্য্য করিয়া ভাবিবার বিষয়।

খেলানার সম্বন্ধে যতটুকু পারিলাম, ইঙ্গিত মাত্র করিলাম। ইহার recipe দেওয়া বড় সহজ নয়। সামান্য একটু-আধটুমাত্র বলিতেছি।

Papier mache নামক জিনিসের নাম কেহ-কেহ হয় ত শুনিয়া থাকিবেন। যে কোন রকমের কাগজ (ছেঁড়া, অব্যবহার্য্য বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইলেও ক্ষতি নাই) ইহাতে এই papier mache প্রস্তুত হয়। ছেঁড়া কাগজ ছাড়া, papier macheর আরও কয়েকটি উপকরণ আছে, যথা, শিরিসের আঠা, প্ল্যাষ্টার অব প্যারিস, জল।

এক ভাগ শুষ্ক কাগজের জন্য তিন ভাগ জল, শুষ্ক প্ল্যাষ্টার অব প্যারিস ৮ ভাগ এবং তরল শিরিস সাড়ে ৪ ভাগ। কাগজ যত ভাল qualityর এবং যতটা সাদা হইবে, papier macheও তত উৎকৃষ্ট হইবে। ভাল qualityর কাগজের অণুগুলি খুব সূক্ষ্ম, ও ক্ষুদ্র হয়। আর, papier machecে রং ব্যবহার করিতে হইলে, কাগজ যত সাদা হইবে, রং তত বেশী খুলিবে। কাগজ মলিন হইলে রং ভাল খুলিবে না। সাদা ব্লটিং কাগজ papier mache প্রস্তুত করিবার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ যাহা দিতেছি, তাহা মোটামুটি ভাগ। উপকরণের quality অনুসারে ভাগের একটু ইতর-বিশেষ করিতে হয়। সেটা অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ,—বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। এই উপকরণের দুই-একটা বদলানোও যায়। যথা, শিরিসের বদলে আমরা পূর্ব্বে যে গালার রসের ইঙ্গিত করিয়াছি, তাহাও ব্যবহৃত হইতে পারে; এবং সুবিধা হইলে সেইটাই ব্যবহার করা ভাল।

প্রথমে কাগজগুলিকে যতটা পারেন সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম করিয়া কাটিয়া লউন। হামানদিস্তায়, কিম্বা বেশী হইলে ঢেঁকিতে, অথবা যন্ত্রের সুবিধা থাকিলে দুইটা লোহার রোলারের ভিতর দিয়া পিষিয়া লইয়া, কিম্বা খড়-কাটা কলের মত কোন যন্ত্রের সাহায্যে যতটা পারেন সূক্ষ্ম করিয়া কাটিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ, কাগজের অণুগুলির সংহতি ভাঙ্গিয়া দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন, ছেঁড়া কাগজই papier mache প্রস্তুত করিবার পক্ষে খুব প্রশস্ত।

এইরূপ প্রস্তুত করা কাগজগুলিকে জলে ভিজিতে দিন; এবং সঙ্গে-সঙ্গে শিরিসের আঠাও তৈয়ার করিয়া লউন। ক্যাবিনেট-মেকাররা যতটা পুরু শিরিসের আঠা ব্যবহার করে, সেই রকম ঘন আঠা হইলেই চলিবে। কাগজগুলি ভিজিলে সেগুলাকে আঙ্গুলে করিয়া পিষিয়া যতটা পারেন সংহতি ভাঙ্গিয়া দিন। একবার সিদ্ধ করিয়া লইলে আরও ভাল হয়। পরে ঐ তরলীকৃত কাগজমণ্ড ছাঁকিয়া লউন। আপনা-আপনি যতটা জল ঝরিয়া পড়ে, তাহাই যথেষ্ট। নিংড়াইবার দরকার নাই; যেন বেশ ভিজা-ভিজা থাকে। ঐ কাগজের তালটি ন্যাকড়া হইতে তুলিয়া লইয়া একটা পাত্রে রাখুন, এবং তাহার সহিত সিকি পরিমাণ গরম শিরিস মিশাইয়া লউন। খুব উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে, যেন কাগজের ডেলা একটুও না থাকে—সর্ব্বত্র যেন শিরিসটা সমানভাবে মিশানো হয়। মিশানো ও মন্থন করা হইলে বেশ চট্‌চটে একটা জিনিস হইবে। তাহার সহিত ধীরে-ধীরে প্ল্যাষ্টার অব প্যারিস মিশাইতে থাকুন। কিছু প্ল্যাষ্টার অব প্যারিস উত্তমরূপে মিশাইবার পর দেখিবেন, তালটা ক্রমে শুকাইয়া আসিতেছে। তখন আরও সিকি পরিমাণ শিরিস গরম থাকিতে-থাকিতে মিশাইয়া লউন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে শিরিস ও প্ল্যাষ্টার অব প্যারিস মিশাইতে হইবে। এইরূপে যখন সমস্ত উপকরণ সম্পূর্ণরূপে মিশানো হইয়া যাইবে, তখনই একটা papier

macheর তাল প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। খুব উত্তমরূপে মিশান চাই। তালটি যদি একটু বেশী শুষ্ক হয়, তবে তাহাতে আরও একটুখানি শিরিসের আঠা কিম্বা সামান্য পরিমাণ জল মিশাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

জিনিসটি দেখিয়া, এবং যে কাজে লাগাইবেন তাহার প্রকৃতি বুঝিয়া, উহার ভাগ এবং প্রস্তুত-প্রণালী ঠিক করিয়া লইবেন। শিরিসের বদলে ময়দার কাই, কিম্বা গালার আঠাও ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। চতুর লোকের হাতে পড়িলে ইহা হইতে সোণা ফলিতে পারে। এই জিনিসটি তৈয়ার করিবার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। কারণ, একবার শুকাইয়া শক্ত হইয়া গেলে, উহাতে আর কোন কাজ হইবে না। কিন্তু যদি রহিয়া-বসিয়া ব্যবহার করিতেই হয়, তবে প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর উহা ভিজা ন্যাকড়ায় জড়াইয়া রাখিবেন এবং মাঝে-মাঝে ন্যাকড়া খুলিয়া ভিজাইয়া আবার জড়াইয়া রাখিবেন, যেন ন্যাকড়া শুকাইয়া না যায়।

Papier mache হইতে ছেলেদের অনেক রকম খেলানা, বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ছাঁচে ফেলিয়া খুব পিষিয়া লইয়া শুকাইতে দিলে, উহা এমন শক্ত হইবে যে, ছেলেদের বেশ মজবুত খেলানা স্বচ্ছন্দে প্রস্তুত হইতে পারিবে। জাপানী পুতুল (doll) ইহা হইতেই প্রস্তুত হয়; কিন্তু বিলাতী doll প্রায় চীনামাটীর হইয়া থাকে। এখানে ভাল রকম কোন কাচের কারখানা না থাকায় dollএর চক্ষু প্রস্তুত করা অসম্ভব বিধায় আমরা doll প্রস্তুত করিবার পরামর্শ দিতে পারিতেছি না। এখানকার কোন কাচের কারখানা যদি dollএর চক্ষু প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে, অথবা এরূপ চক্ষু ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপান হইতে আমদানী করিবার যদি সুবিধা থাকে তবে papier macheর bust (বুকের আধখানা পর্য্যন্ত) এবং পা দুইটী তৈয়ার করিয়া বাকী দেহটা করাতের গুঁড়া-ভরা ন্যাকড়ার দ্বারা তৈয়ার করিয়া তাহাকে সাড়ী বা ধুতি-জামা পরাইয়া দিলে অতি সুন্দর বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ের পুতুল তৈয়ার করা যায়। *

এবার ইঙ্গিত অনেকটা হইয়া গেল; মাননীয় সম্পাদক মহাশয় এতটা সহ্য করিবেন কি না জানি না। সেই জন্য এবার papier mache প্রস্তুত করিবার প্রণালী মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। Papier mache সম্বন্ধে অন্যান্য খবর এবং উহা হইতে যে প্রণালীতে যে সব জিনিস তৈয়ার করা যাইতে পারে, তাহাদের বিবরণ বারান্তরে বলিবার চেষ্টা করিব। এবার এই পর্য্যন্তই থাক।

* Papier mache সম্বন্ধে একখানি অতি সুন্দর পুস্তিকা গবর্ণমেণ্টের পুস্তক-প্রকাশ-বিভাগ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ এই জিনিসটির সম্বন্ধে আরও অধিক সংবাদ জানিতে চাহিলে, ঐ পুস্তিকাখানি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে পারেন।

সাময়িকী

পঞ্জাবের জননায়কগণ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য কলিকাতার মুসলমান ও হিন্দুগণ বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন; বলিতে গেলে, এমন অভ্যর্থনা, এত জনসমাগম ভারত-সম্রাটের কলিকাতায় অভ্যর্থনা ব্যতীত আর কখন হয় নাই। কলিকাতার মুসলমানগণই এই অভ্যর্থনার অগ্রণী, হিন্দুগণও ইহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধীরও কলিকাতায় আগমনের কথা ছিল, কিন্তু কার্য্যগতিকে তিনি আগমন করিতে পারেন নাই। কলিকাতাবাসিগণ এই জননায়কগণের যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের সেই দুর্দ্দিনের কথা এখনও কেহ ভুলিতে পারেন নাই। পঞ্জাবের নায়কগণ যে অপমান, কষ্ট, কারাযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা অনেক দিন দেশবাসীর মনে

থাকিবে। শুভক্ষণে ভারত-সম্রাটের মহান ঘোষণাবাণী প্রচারিত হইল, তাই ভারতের বিবিধ প্রদেশের লাঞ্ছিত ও অন্তরীণে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ মুক্তিলাভ করিলেন। নূতন ভারত-শাসন-আইন পাশ হইয়া গেল; আগামী শীতকালে যুবরাজ স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়া উক্ত আইন প্রচলিত করিবেন; দেশের লোক কিয়ৎ পরিমাণে শাসনাধিকার লাভ করিলেন, অন্তরীণে আবদ্ধগণের অনেকেই মুক্তিলাভ করিলেন; সকলেই মনে করিলেন দেশে সুবাতাস বহিল, আর কোন প্রকার অশান্তির সম্ভাবনা রহিল না।

কিন্তু, তাহা ত হইল না,—আর এক গোলযোগ—গোলযোগই বা বলি কেন,—বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহা তুরস্ক লইয়া। সকলেই জানেন, তুরস্কের সুলতান মহোদয় মুসলমান ধর্ম্ম-জগতের অধিনায়ক; পৃথিবীর যেখানে যত মুসলমান আছেন, সকলেই সুলতানের নিকট অবনত-মস্তক—সকলেই সুলতানের ক্ষমতা ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। য়ুরোপের বিগত মহা-সমরের সময় তুরস্কের সুলতান জর্ম্মাণ পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। সে সময় মুসলমান-সমাজে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। তখন ভারতের মুসলমানগণ ভারত-সম্রাটের জয় কামনায় সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন;—যথাসাধ্য অর্থ ও সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। সে সময় বিলাতের মন্ত্রী-সমাজ বলিয়াছিলেন যে, তুরস্কের সুলতান বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহার রাজ্য, ক্ষমতা ও মর্য্যাদা অব্যাহিত রাখা হইবে। কিন্তু তখন কেহই ভাবেন নাই যে, এই পৃথিবীব্যাপী সমরে শুধু ইংরাজই নহেন, অন্যান্য প্রায় সমস্ত শক্তিপুঞ্জই যোগদান করিয়াছিলেন; যুদ্ধ শেষ হইলে কাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার নিয়ামক একা ইংরাজ হইতে পারিবেন না, মিত্র-শক্তিপুঞ্জ শান্তি-পরিষদে যাহা ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই সকলকে অবনত-মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং বিলাতের মন্ত্রীসমাজ যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্বন্ধে অনেক বিঘ্ন ছিল। এখন সেই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। তুরস্ক সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তাহার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে; বিলাতের মন্ত্রীসমাজ তাঁহাদের পূর্ব্বের মতই জ্ঞাপন করিতেছেন; কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষ তাহাতে সম্মত নহেন। তাঁহারা বলেন য়ুরোপ হইতে তুরস্কের অধিকার লোপ করিতে হইবে; কনস্তান্তিনোপল হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিতে হইবে। কেহ বলিতেছেন, রোমের পোপ যেমন নামমাত্র খৃষ্টান-জগতের অধিনায়ক, সুলতানকেও তাহাই করিতে হইবে; মুসলমানের পবিত্র স্থানগুলি ও কিছু ভূ-সম্পত্তি দিয়া তাঁহাকে সাক্ষীগোপাল করিয়া রাখিতে হইবে।

ওদিকে আমাদের ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু স্পষ্টবাক্যে বলিতেছেন—"It Sir Robert Cecil had his way blame would fall upon England, the loyalty of the Moslems in India would be solely tried, and their faith in the British Empire might be imperilled" অর্থাৎ "যদি সার রবার্ট সেসিলের (ইনিই বিরুদ্ধদলের মুখপাত্র) মতেই কাজ হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের স্কন্ধেই দোষ চাপিবে, ভারতের মুসলমান-সম্প্রদায়ের রাজভক্তি ক্ষুণ্ণ হইবে এবং ইংরাজ রাজের উপর তাহাদের বিশ্বাস অপগত হইবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"In view of India's war services, no country in the world was so entitled to have its wishes considered in this connection as India, and throughout India all who expressed the opinion on the subject, whatever their race or creed; believed that non-interference with the seat of Khalifat was indispensable to external and interval peace of India."—অর্থাৎ "বিগত যুদ্ধে ভারতবর্ষ যে সহায়তা করিয়াছে, সে কথা ভাবিলে ইহা বলিতেই হইবে যে, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ নাই, যে দেশের মতামত ভারতবাসীর মতামতের অগ্রে শ্রবণযোগ্য। তাহার পর দেখিতেছি যে, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে ভারতবর্ষের যাহারা এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বিশ্বাস যে, খালিফাতের সম্বন্ধে হস্তার্পণ করিলে তাহাতে ভারতবর্ষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষিত হওয়া সম্ভবপর হইবে না।" মিঃ মণ্টেগুর ন্যায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ

রাজনীতিক যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা যে সর্ব্বাংশে সঙ্গত, এ কথা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

ভারতবাসী মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; দেশের সর্ব্বত্র সভাসমিতি হইতেছে; কলিকাতায় ও বাঙ্গালা দেশের মফস্বলেও আলোচনা চলিতেছে; ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় সত্যসত্যই অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের ক্ষোভের কথা কিছুমাত্র গোপন না করিয়া তাঁহারা স্পষ্ট-বাক্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। নানা জনে, নানা পন্থা অবলম্বন করিবার পরামর্শ করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানদিগের অভিমত অনুসারে যদি এ প্রশ্নের মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে বিশেষ গোলযোগের কথা। ভারত সম্রাটের ঘোষণা-বাণী ও শাসন সংস্কার আইনের দ্বারা দেশের মধ্যে যে শান্তি ও সন্তোষের আশা করা গিয়াছিল, তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কাই সকলের মনে উঠিয়াছে। এ সময়ে মিত্রশক্তিপুঞ্জ বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাজ না করিলে, মিঃ মণ্টেগু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বা কার্য্যে পরিণত হয়!

এখন অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাক্। এটী স্বর্গের সংবাদ। অনেকেই বোধ হয় বৈজ্ঞানিক মার্কণীর (Signor Marconi) নাম অবগত আছেন; তারহীন টেলিগ্রাফ উপলক্ষেই তিনি জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি এবং অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিকই কয়েক বৎসর হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন যে, যখন তারহীন বার্ত্তার আদান-প্রদান হয়, তখন আর একটা কি সঙ্কেত সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়;—য়ুরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য অনেক স্থানেই এ সঙ্কেত অনেক সময়ে অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু বিগত যুদ্ধের বিষম গোলযোগে নানা স্থানের পণ্ডিতেরা এই শব্দ বা সঙ্কেতের দিকে এতদিন মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই, কোন আলোচনারও অবকাশ হইয়া উঠে নাই। এখন যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে, গোলা-গুলির গর্জ্জন আর নাই, বৈজ্ঞানিকগণেরও মাথা ঠাণ্ডা হইয়াছে; এখন ঐ সঙ্কেতের কথা উঠিয়াছে।

সকল দেশেই অল্পাধিক সংখ্যায় আমাদের মত সবজান্তা পণ্ডিত আছেন। এই সবজান্তার দল বলিতেছেন, "আরে, রেখে দেও। ও সঙ্কেত-টঙ্কেত কিছু নয়। যে মহাযুদ্ধ হ'য়ে গেল, তাতে কি আর কিছু ঠিক আছে; সব ওলোট-পালোট হ'য়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে যা হবার তা ত দেখ্‌তেই পাওয়া যাচ্ছে,—গগন-পবন পর্য্যন্ত বারুদে, কামান-বন্দুকের গর্জ্জনে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে গেছে; হয় ত বা দেখ্‌তে পাবে যে, গ্রহ-নক্ষত্র পর্য্যন্ত আকাশবিহারী যুদ্ধযানের ভয়ে নির্দ্দিষ্ট পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছেন। এই সব বারুদের ধুম, কামানের গর্জ্জন, অন্তরীক্ষ হইতে বজ্র-বর্ষণের জের এখনও ব্যোমপথ হইতে দূর হয় নাই। তারই জন্য ঐ সব শব্দ এখনও তারহীন বার্ত্তাকে বাধা দিচ্চে। এই বাপু সোজা কথা; এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু প্রয়োজন নাই,—খাও-দাও অকাতরে নিদ্রা দেও।" কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের দল এক ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ; তাঁহারা একটু টুঁ শব্দ শুনিলেই একেবারে কাণ খাড়া করিয়া বসেন,—তাহার কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হন; মাস, বৎসর তাতেই নিবিষ্টচিত্ত হন। তাঁহারা তারহীন বার্ত্তার মধ্যে এই বহু-দূরাগত সঙ্কেতকে 'ও কিছু নয়' বলিয়া উপেক্ষা করিতে শেখেন নাই। এতদিন নানা গোলমালে চুপ করিয়া ছিলেন; এখন আন্দোলন, অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের উপলব্ধি হইয়াছে। তাই কথাটা উঠিয়াছে।

এই তারহীন বার্ত্তার প্রধান পাণ্ডা যে মার্কণী সাহেব, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত ও ধারণার কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, "আমি অনেক দিন হইতে এ সঙ্কেত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। ইহা শুধু য়ুরোপেই আবদ্ধ নহে, আমেরিকাতেও এ সঙ্কেত চলিতেছে। কোন দুষ্ট লোকে যে কৌতুক করিতেছে, তাহা আমি মোটেই মানি না; কারণ, লণ্ডনেও যেমন এ সঙ্কেত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তেমনই ৩২০০ মাইল দূরবর্ত্তী নিউইয়র্কেও শোনা যাইতেছে।" তিনি আরও বলিতেছেন, যে, "এই সঙ্কেত দুর্ব্বোধ্য হইলেও, একেবারে অসম্বদ্ধ বলিয়া মনে হয় না; কারণ, এই সঙ্কেতের মধ্যে ইংরাজী 'S' অক্ষরের মত একটা আওয়াজ সর্ব্বদাই পাওয়া

যাইতেছে; সুতরাং ইহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন।" তিনি বলিয়াছেন—"As yet we have not the slightest proof as to the origin of the interruption. They might conceivably be due to some natural disturbance at a great distance, such as eruptions on the sun, which might cause electrical disturbance"—মার্কণী সাহেবের কথা কয়টী একেবারে উদ্ধৃত করিলাম। ইহার অর্থ এই যে, "এই গোলমালের সামান্য কোন কারণের সন্ধানও পাই নাই, সামান্য কোনও প্রমাণও এখন পর্য্যন্ত আমরা উপস্থিত করিতে পারিতেছি না। হয় ত সূর্য্যে কোন উৎপাত সংঘটিত হইয়াছে; তাহার ফলে এই বৈদ্যুতিক গোলযোগ হইতেছে; তাহারই জন্য এই প্রকার হইতেছে।"

কিন্তু এই জবাবেই পণ্ডিত মহাশয় অব্যাহতি পান নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,—"আপনি কি এটা সম্ভবপর মনে করেন না যে, অপর কোন গ্রহ হইতে কোন জাতীয় জীব আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপনের জন্য এই সঙ্কেত করিতেছে?" পণ্ডিত মহাশয় তাহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, "এ সম্ভাবনা আমি অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু তাহার ত কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাইতেছি না। ভাল করিয়া পরীক্ষা ব্যতীত এখনই এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।" কথাটা কি জানেন? যতগুলি গ্রহ-উপগ্রহ এতদিন পর্য্যন্ত নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে মঙ্গল-গ্রহটিই আমাদের এই পৃথিবীর একটু নিকটে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেছেন যে, এই মঙ্গল-গ্রহে কোন উচ্চজাতীয় জীব বসবাস করিয়া থাকেন। আমরা যেমন মঙ্গল-গ্রহের সান্নিধ্য দেখিতেছি, তাঁহারাও তেমনি আমাদিগকে তাঁহাদের নিকট-প্রতিবেশী বলিয়া মনে করিতেছেন। এত নিকটে বাস করিয়াও এই দুই গ্রহের মধ্যে পরিচয় নাই, এ জন্য সেই মঙ্গলগ্রহের জীবগণ বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যেও হয় ত মার্কণীর মত বা তাঁহার অপেক্ষাও বড় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন; তাঁহারাও তারহীন বার্ত্তার খবর জানেন। তাই তাঁহারা সৌদামিনীর মারফৎ সন্দেশ প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাষা কি, তাহা ত আমাদের জানা নাই; তাঁহাদের সঙ্কেত-নির্ণয়-পুস্তিকাও পাওয়া যাইতেছে না; কাজেই, সেই সঙ্কেতের অর্থ-নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই ধারণার উপর নির্ভর করিয়াই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এখন হইতে এই বিষয়ের অনুসন্ধানে, গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। ইহার ফলে যদি মঙ্গলগ্রহের সহিত পরিচয় হয় এবং কুটুম্বিতা সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে হয় ত একদিন অধিকতর শক্তিশালী এরোপ্লেনের সাহায্যে মঙ্গলগ্রহে গমনাগমনও অসম্ভব হইবে না। আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ এ সংবাদে অবশ্যই উল্লসিত হইবেন; তাই আমরা কথাটা বলিয়া রাখিলাম।

মঙ্গল-গ্রহের অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হইবে; কিন্তু ঘরের মধ্যে যে একটা মহা অমঙ্গলের সূচনা হইয়াছে, তাহার কি উপায় হইবে? সেই কথার একটু আভাষ দিতে হইতেছে। সে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটা কমিশন বসিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যায় পরম অভিজ্ঞ শ্রীযুত সাড্‌লার সাহেব এই কমিশনের নেতা হইয়াছিলেন; আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিধাতা, অনন্য-সাধারণ প্রতিভাশালী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয় সেই কমিশনের একজন সদস্য হইয়াছিলেন। এই কমিশন বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান, বিচার বিতর্ক করিয়া যে রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন, তাহা এক অপূর্ব্ব ইতিহাস; শিক্ষাবিষয়ে এমন সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। সে বিবরণ-পুস্তক আমাদের অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত অপেক্ষাও বৃহত্তর। তাহার আগাগোড়া পাঠ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে, আমরাও তাহা পারি নাই; মোটামুটি দেখিয়া রাখিয়াছি। সেই কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে ভারত-গবর্ণমেণ্ট এক মন্তব্য-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সে মন্তব্যের আদ্যন্ত বিবরণ আমরা লিপিবদ্ধ করিব না, করিবার বিশেষ প্রয়োজনও আপাততঃ দেখিতেছি না। কেবল একটি বিষয়ে আমরা পাঠকগণের, তথা ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্যগণ এবং সার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে জনসাধারণের যে সভা সে দিন আহুত

হইয়াছিল, সেই সভাও ভারত-গবর্ণমেণ্টের এই মন্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ইণ্টার-মিডিয়েট্ পাঠটা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া হউক; অর্থাৎ ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষা একেবারে তুলিয়া দিয়া সেই পাঠটা ম্যাট্রিকিউলেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হউক। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বি-এ, এম্-এ প্রভৃতি লইয়াই থাকুন। কমিশনের এ মন্তব্য যে ঠিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই ছাত্রেরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে; কিন্তু তাহারা এখন প্রবেশিকায় যতখানি বিদ্যালাভ করে, তাহাতে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের উপযুক্ত হয় না। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইণ্টার-মিডিয়েটকে বাহির করিয়া স্কুলের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হউক,—ইহাই কমিশনের অভিপ্রায়। কিন্তু কমিশন সেই সঙ্গে-সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সময় আবশ্যক। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়াই কমিশন এই সময়ের কথাটা বলিয়াছেন। কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এই পরি-বর্ত্তনটী সত্বরই করা কর্ত্তব্য বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ফলাফল সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব; বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণও সেদিন বিশেষভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

প্রথম কথা এবং প্রধান কথা এই যে, ইণ্টার-মিডিয়েট ক্লাসগুলি যদি কলেজের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কোন কলেজেরই অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে না। ইণ্টার-মিডিয়েট ক্লাসে যে সমস্ত ছাত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের প্রদত্ত বেতন হইতে যে আয় হয়, তাহার দ্বারা কলেজের ব্যয়ের অনেকটা অংশ সঙ্কুলান হইয়া যায়। যে সমস্ত অধ্যাপক এই সকল কলেজে কাজ করেন, তাঁহারা ইণ্টার-মিডিয়েট, বি-এ, বি-এস্-সি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীতেই অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। এখন যদি ইণ্টার-মিডিয়েট শ্রেণী কলেজের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কোন কলেজেরই ব্যয়-সঙ্কুলান হইবে না। তাহার পর বি-এ, বি-এস্-সি প্রভৃতি অধ্যাপনার জন্য প্রত্যেক কলেজে অধিক সংখ্যক অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে। সে সংখ্যাও গবর্ণমেণ্ট বাঁধিয়া দিয়াছেন;—প্রতি ২৫ জন ছাত্রের হিসাবে এক-এক জন অধ্যাপক। একদিকে ইণ্টার-মিডি-য়েট চলিয়া যাওয়ায় আয় কমিয়া গেল; তাহার উপর অধ্যাপকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ব্যয় বাড়িয়া গেল। ইহাতে বে-সরকারী কলেজগুলির যে অস্তিত্ব লোপ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর যদিও বা কেহ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চান, তাহা হইলে কলেজের ছাত্রবেতন এত বাড়াইতে হইবে যে, মধ্যবিত্ত অবস্থার ছাত্রগণ কলেজের সীমানার মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিবে না। এখনই যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতেই অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেদের অভিভাবকগণ, ছেলেদের কলেজের ব্যয় যোগাইতে গিয়া, কেহ-বা ঋণগ্রস্ত হইতেছেন, কেহ-কেহ বা ঘটী-বাটি বেচিতেছেন। ইহার পর বর্ত্তমান প্রস্তাব অনুসারে যাহা হইবার কথা হইতেছে, তাহাতে গরীব ভদ্রলোকের ছেলেদের আর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারের কাছেও যাইতে হইবে না। তাহার পর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা। গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অনুমোদন করিতে চান, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বহু অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। বিশ্ব-বিদ্যালয় এত অর্থ কোথায় পাইবেন? গবর্ণমেণ্ট যাহা দিতে পারিবেন, তাহাতে কুলাইবে না। যদি গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ব্যয় দিতে পারেন, তাহা হইলে এক কথা বটে। কিন্তু যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের তহবিলের হিসাব দেখিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন, ভবিষ্যৎ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিধানের জন্য গবর্ণমেণ্ট অত বেশী টাকা দিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের যাহা আয় হইবে, তাহা হইতে যদি প্রস্তাবিত উচ্চ-শিক্ষার উপযুক্ত সাহায্য করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের আর সকল প্রয়োজনে ব্যয় করিবার টাকা মোটেই থাকিবে না। এ অবস্থায় গবর্ণ-মেণ্ট উচ্চশিক্ষার জন্য এত অধিক টাকা দিতে পারিবেন না, এ কথা খাঁটি।

তাহার পর আর-একটা বিবেচনার কথা আছে। কথাটা স্পষ্ট করিয়াই বলা দরকার। আমাদের জন্য যে নূতন শাসন-বিধি পাশ হইয়াছে, যাহা আগামী বৎসরেই

প্রচলিত হইবে, তাহার বিধান অনুসারে শিক্ষা-বিভাগ দেশীয় মন্ত্রীবৃন্দের অধিকারভুক্ত হইবে। শিক্ষাবিভাগের ব্যবস্থা দেশীয় প্রতিনিধিদিগকেই করিতে হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে যে টাকা হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা সকল বিভাগে ভাগ করিয়া দিবেন। তখন দেশীয় প্রতিনিধিগণ সেই টাকা দিয়া কোন্ দিক্ সামলাইবেন? তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষাবিভাগের এত অধিক ব্যয় যোগান দেওয়া অসম্ভব হইবে। তাহার ফলে এই হইবে যে, কোন দিকেই সুব্যবস্থা হইবে না। তখন হয় ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য শিক্ষা-বিভাগের আয় বাড়াইতে হইবে, না হয় নূতন ট্যাক্স্ বসাইতে হইবে, না-হয় লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে। সার তারকনাথ কি সার রাসবিহারী ত দেশে অধিক জন্মেন না; সুতরাং দশলাখ বিশলাখ দানের সুখ-স্বপ্ন না দেখাই ভাল। তাহা হইলে অবস্থা এই দাঁড়াইতেছে যে, বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে ভারতগবর্ণমেণ্ট যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য হইলে উচ্চশিক্ষা যথেষ্ট বাধা প্রাপ্ত হইবে। ইহাকেই আমরা বিশেষ অমঙ্গলের সূচনা বলিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনও এই কথা বিবেচনা করিয়াই উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সময় সাপেক্ষ বলিয়াছেন।

— —

আমাদের দেশে চিত্রকলার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন-চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। আমাদের দেশের লোক এখন আর কালীঘাটের পট পাইয়াই সন্তুষ্ট হয় না। তাহার ফলে দেশে চিত্রবিদ্যার দিকে অনেক লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; এবং অনেক চিত্রশিল্পী বিশেষ প্রতিষ্ঠা, এবং আশানুরূপ না হইলেও, অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিত্রশিল্পে অনেকে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে পুরস্কার-লাভও করিতেছেন। সম্প্রতি আমরা Indian Academy of Art নামক একখানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। বোধ হয়, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারের জন্যই অনুষ্ঠাতৃবর্গ পত্রখানি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত করিতেছেন। এই পত্রে কিন্তু যতগুলি সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এ দেশী চিত্র। আমরা অনুষ্ঠাতৃবর্গের এই উদ্যমের প্রশংসা করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই পত্রখানি আদর লাভ করিবে; এবং যাঁহারা প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া পত্রখানি চালাইতেছেন, তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ হইবে। আমাদের চিত্রশিল্পীগণের সাধনা জয়যুক্ত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

— —

এবার আর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না; কোন দিকেই উচ্চবাচ্য নাই। বৎসর ত শেষ হইতে চলিল; এখনও কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে না; যাঁহারা এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন, যাঁহাদের যত্ন-চেষ্টায় এতকাল এই সম্মিলন হইয়াছে, তাঁহারাই বা কোথায়? রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশের পরলোকগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই কি সাহিত্য-সম্মিলনেরও অস্তিত্ব-লোপ হইবে? এই সম্মিলন পরিচালনের ভার এখন আর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের হস্তে নাই; ইহার জন্য একটা পৃথক্ কমিটি গঠিত হইয়াছে; অক্লান্তকর্ম্মা, উৎসাহের অবতার শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয় সেই কমিটির সভাপতি। এমন দিগ্বিজয়ী সভাপতি থাকিতে যদি এত দিন পরে 'সাহিত্য সম্মিলনের' অস্তিত্ব লোপ হয়, তাহা হইলে বড়ই ক্ষোভের, বড়ই দুঃখের কথা হইবে। এখনও কিঞ্চিৎ সময় আছে; এখনও চেষ্টা করিলে কোন-না-কোন স্থানে সম্মিলনের ব্যবস্থা হইতে পারে।

শোক-সংবাদ

৺ যোগেশচন্দ্র দে বিশ্বাস

আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত চিত্তে যোগেশচন্দ্র দে বিশ্বাস মহাশয়ের পরলোক-গমন সংবাদ পত্রস্থ করিতেছি। ইনি স্বনামধন্য স্বর্গীয় শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ৬ই ফাল্গুন শিবরাত্রির দিন ৭০ বৎসর বয়সে ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। প্রায় ৫০ বৎসর ওকালতী ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইবার পর যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র যোগেশ বাবু এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া ২১ বৎসর বয়সে হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তিনি একটী বিশাল একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন। আজকালকার দিনে একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা হওয়া এবং সকল রকম মতের বহু ব্যক্তিকে শান্ত সংযত রাখিয়া পরিচালন করা অল্প গুণপনার পরিচায়ক নহে। আশা করি, তাঁহার বংশীয়েরা উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁহার মহৎ গুণাবলীরও অধিকারী হইবেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, তাঁহার কবিত্ব-শক্তি, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে, যিনি তাঁহার সংস্পর্শে কোন দিন আসিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে সকল গুণে সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হন, সে সকল গুণই পণ্ডিত অজিতনাথের প্রচুর পরিমাণে ছিল। সংস্কৃত কবিতা রচনায় তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তিনি উপস্থিত-কবি ছিলেন; কোন সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অতি সুন্দর সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন; এবং সেই কবিতার দুই, তিন, অনেক সময় ততোঽধিক বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিতে পারিতেন। পণ্ডিত অজিতনাথের পরলোকগমনে বাঙ্গালার পণ্ডিত-সমাজ একটী উজ্জ্বল রত্নহারা হইলেন। নবদ্বীপে আবার কবে এমন পণ্ডিত, এমন কবির আবির্ভাব হইবে, কে বলিতে পারে।

পরলোকগত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

গত শুক্রবার ১৬ই মাঘ বেলা ৪॥০টার সময় প্রসিদ্ধ শোভাবাজার রাজবংশের কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর দুই দিনের জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কতকগুলি সংস্কৃত নাটক বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদ করেন, তাহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। পরিষদ হইতে প্রকাশিত রামায়ণ-তত্ত্ব তিনি সঙ্কলন করেন, মহাভারতেরও ঐরূপ সূচী সঙ্কলন করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিছু-কিছু সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন; তাহার কতক অংশ মহাভারতীয় নীতি-কথা নামে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; কিন্তু আড়ম্বর ঘৃণা করিতেন। তিনি সাহিত্য সভা হইতে 'বঙ্গের কবিতা' নামে একখানি সুললিত পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে বাঙ্গালার কবিতার ইতিহাস আদিকাল হইতে রাজা রামমোহন রায়ের সময় পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার 'ব্রাহ্মণ ও শূদ্র' প্রবন্ধে বহু শাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এই উভয় বর্ণের স্থান সমাজে কিরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'জীব-বলি' ও 'ব্রাহ্মণ ও শূদ্র' প্রবন্ধদ্বয়ে তাঁহার গভীর শাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় ৩০ বৎসর পর গত বৎসর তিনি বহু চেষ্টা করিয়া কলিকাতায় হাফ্ আখ্ড়াই পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়গণের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

চিত্র-পরিচয়

জগন্মাতার আহ্বান

চিত্রখানির অর্থ এই যে, যুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর সমস্ত পৃথিবী নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু এখনও যাহারা সেই নূতন মানব-সমাজ-সৃষ্টির ব্যাপারে যোগ না দিয়া নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট অলস ভাবে পুরাতন নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া আছে, জগন্মাতা তাহাদের আহ্বান করিয়া পথ-নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং বলিতেছেন—উঠ বৎস! জাগো! পৃথিবীর পুনর্গঠনে তোমরাও যোগদান কর। এই চিত্রখানিতে ভ্রমক্রমে ভারতবর্ষের হাফটোন ব্লক বিভাগ হইতে ব্লক নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া লেখা হইয়াছে; ব্লকগুলি কানপুরের 'প্রভা' পত্রিকার পরিচালক-বর্গ 'ভারতবর্ষে' ছাপিবার জন্য দিয়াছেন; এজন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

শ্যাম-বসন্ত

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

মথুরার রাজা আবার আসিল কি রে
এ ব্রজ-পুরীতে ফিরে ?
লুকালে কি হবে—আর কি লুকাতে পারিবে তা',?
কোন্ দিক্ বল' সামালিবে—কিসে বারিবে বা ?
ধরা পড়ে' গেছ, ধরার এ মহা-উৎসবে
উঠেছে যা' বাজি গীতি-রস-রূপ-সৌরভে;
নানা দিকে নানা সমারোহে
মধু-মিলনের সন্ধি-বারতা
এনেছ' কি আজ বিরহের বিদ্রোহে ?
এ ব্রজবাসীরে ছলিয়া যাইবে চলি'
এনেছ কি তাই বলি,
রাজার সজ্জা, গোপ-গরীবের বেশ ঢাকি ?
কাঙাল বলে' কি এতই সহজে দিবে ফাঁকি ?
আমি জানিতাম—সেই দিনই ঠিক, যদবধি
পথ মাজা হ'ল ধূলি অপসারি দ্রুতগতি,
শিশির ঢালিল জলধার,
তোমার আভায় শিহরি উঠিল
তৃণ-তরু-লতা পথ-পার !
তপন করিল মন্দ রথের গতি,
মালতী ভক্তিমতি
রচিল তোমার প্রবেশ-তোরণ ফুলময়,
দাঁড়াল কেশর কনকদণ্ড পাণিচয়,
আসিল পাটলী ফুল-তূণ-ধনুধারীগণ,
মধু-মক্ষিকা পদাতিক তব অগণন;
নিম্ব-বিল-কিশলয়
শ্যামল-শোভায় পতাকা উড়ায়ে
রটিল শ্যামের স্বাগত বিশ্বময়!
কাঞ্চন-ফুল পুলকাঞ্চনে ধীরে
ধরিল ছত্র শিরে,
ব্যাকুল বকুল বরষিল লাজ রাঁশিরাশি,
বিহঙ্গকুল হুলু দিল ঘন উল্লাসি;
ঘোষি আগমনী মুহুমুহু পিক বৈতালি
"পিউ—আয়া—পিউ" হাঁকিয়া পাপিয়া দিয়া তালি
জানাল' যে কথা অবনীতে
কে না তা' শুনেছে ? ছলা ছাড়ি, শ্যাম,
দেখা দে' রূপের অপরূপ মাধুরীতে।
বিস্তৃত নীল দিক্ পরিসর চুমে
চাঁদোয়া লুটিছে ভূমে,—

কুসুম পরাগ সুরভি বিলেপ নন্দিত
মানস-মুগ্ধ মরাল মাল্য লম্বিত ;
চাউনির তবু ছাউনী ভরিয়া আছে খাড়া
কিংশুক-শুক-চঞ্চুতে শত ধানুকীরা ;
দখিণ হাওয়ার চাঁদমারি,
অশোকের শিরে উচাঁন' সঙীন্,
শুষ্ক-পত্র দ্বারে দ্বারী।
শিমুল আমূল হইয়া কণ্টকিত
রয়েছে উচ্চকিত
আদেশ মাত্র পাঠাইবে বলি আহ্বান
তুলার পত্রে নিমন্ত্রণের লিপিখান ;
সরসিজ আর মনসিজ যারা এত দিন
আছিল বন্দী শীতের কারায় প্রাণহীন
মুক্তি লভিয়া তারা আজ
জলে থলে মনে প্রবাসে ভবনে
ভুবনে ঘোষিল—"আসিয়াছে যুবরাজ।"
কুহু যামিনীতে কামিনীর বেদনায়,
প্রিয়তম কামনায়,
পেতেছে তোমার কুসুম আসন কিশলয়
ফুল মধু দিয়ে অলি গুঞ্জনে গীতময় ;
কুঞ্জে কুঞ্জে জমে আছে তব মৃদু হাসি,
কুরুবকশাখা প্রসাধিছে তব কেশরাশি ;
তৃণ তরুলতা শ্যামাভায়
ঢেকেছ' অঙ্গ—চূড়াটি কিন্তু
চুত-মুকুলে যে দেখা যায়!
পীত-অম্বর কর্ণিকারের ফুলে
দখিণ পবনে দুলে
নয়নের আভা পুণ্ডরীকে যে রঙাইছে,
বেণুবন ঘন বাঁশরীর সুর ছড়াইছে,
নরনারী হৃদে এই যে মিলন-ব্যাকুলতা
কহে না কি এরা মাধবের মধু-কথা?
যেমনি ছদ্ম বেশ ধর'
চিনেছি তোমারে—ধর নিজ রূপ
আর কেন মিছে ছল কর'?

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ].

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারিগণ মিলিত হইয়া "দি কর্পোরেশন কো-অপারেটিভ ইনষ্টিটিউট লিমিটেড" নামে একটী সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য একটী ষ্টোর্সও খুলিয়াছেন। তাঁহারা কেবল বাজারের উপর নিভর করিবেন না ; কারণ বাজারে আজকাল কোন খাদ্যদ্রব্যই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাইবার উপায় নাই। সেইজন্য তাঁহারা নিজেদের ব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিবেন। সমস্ত জিনিসই বিশুদ্ধ হইবে, তাহাতে ভেজালের নামগন্ধও থাকিবে না। কেবল জিনিসপত্র সংগ্রহ করা নহে,—এই ইনষ্টিটিউটের অন্যান্য উদ্দেশ্যও আছে। ইনষ্টিটিউটের সদস্যগণের মধ্যে সঞ্চয়-প্রবৃত্তির উদ্রেকের চেষ্টা করা হইবে। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থাও হইবে। ব্যাঙ্কিং এবং বীমার কাজও চলিবে। ইহারা আরও একটী সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিতেছেন। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীরা ঘরের লোক বলিয়া ঘরোয়া (internal) সদস্য হইবেন ; এবং বাহিরের লোককেও—অবশ্য কলিকাতা সহরের অধিবাসী—তাঁহারা সহযোগী (associate) সদস্য করিয়া লইবেন। সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র বেশ বিস্তৃতই হইবে, এবং বোধ হয় সহরবাসীদের তাহাতে উপকারই হইবে। ইনষ্টিটিউটের মূলধন ২৫০০০ টাকা এবং প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫ টাকা কিন্তু ইনষ্টিটিউট যেরূপ বিরাট আয়োজন করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে এই মূলধনে কুলাইবে কি? অবশ্য প্রত্যেক অংশীকে একটাকা করিয়া প্রবেশিকা ফী দিতে হইবে। তাহাতে খুব বেশী হয় ত ৫০০০ অংশের জন্য ৫০০০ টাকা, কিন্তু যদি কেহ একাধিক অংশ গ্রহণ করেন, তবে প্রবেশিকা বাবদ এত টাকা পাওয়া যাইবে না। যাহা হউক, মতলবটি ভাল। ইহাতে কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের সুবিধা হইলে ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা সার্থক হইবে। তখন তাঁহাদের দেখাদেখি রেলওয়ে প্রভৃতিতেও এইরূপ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হইতে পারিবে। তা' ছাড়া, এই ইনষ্টিটিউটের অনুষ্ঠান সফলতা লাভ করিলে ব্যবসাদাররা কিছু জব্দ হইয়া যাইতে পারিবে। সহরের এতগুলি খরিদদার পরিবার হাতছাড়া হইয়া গেলে, তাহাদের ক্ষতি অনিবার্য্য। তখন হয় ত তাহারা বাধ্য হইয়া খাঁটি জিনিসের কারবার আরম্ভ করিবে। ইনষ্টিটিউটের দ্বারা যদি হয় ত এইটেই সব চেয়ে বড় কাজ হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "গৃহদাহ" ভারতবর্ষে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল ; মূল্য ৪৲ টাকা।

শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত নূতন উপন্যাস "মিষ্টি-সরবৎ" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ১৷৷০।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত নূতন নাটক "বিদ্যারণ্য" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ১৲।

শ্রীমতী সরসীবালা বসু প্রণীত ৷৷০ আনা সংস্করণের—৪৯ সংখ্যক পুস্তক "মনোরমা" প্রকাশিত হইল।

শ্রীহরিদাস বসু প্রণীত "সদগুরু ও সাধনতত্ত্ব" ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৷৷০।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায় প্রণীত "রহস্য-লহরীর" নূতন গ্রন্থ "চীনের চক্র" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৸০।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "কবি কথা" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের "বিয়ের কনে" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য পাঁচ সিকা।

মীর্জাপুর সৎসাহিত্য সম্মিলনীর আগামী বার্ষিক অধিবেশনে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের রচনার প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত পদকগুলি পুরস্কার প্রদান করা হইবে। ১। রসিকচন্দ্র সুবর্ণ পদক। বিষয় :— বঙ্গ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান। ২। কৈলাসচন্দ্র রৌপ্য পদক। বিষয় :—দেশের অবনতির কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায়। ৩। সুচিত্রা রৌপ্য পদক। বিষয় :—মেদিনীপুর জেলার শিল্পোন্নতির উপায়। ৪। পুরন্দর রৌপ্য পদক। বিষয় :—কাঁথি মহকুমার শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস।

কালিপদ রৌপ্য পদক। বিষয় :—বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা ও তাহার পূরণ অথবা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পরস্পর সম্বন্ধ। ৬। অন্নপূর্ণা রৌপ্য পদক। বিষয় : জাতিগঠনে স্ত্রীশিক্ষার প্রভাব অথবা পারিবারিক জীবনে স্ত্রীজাতির প্রভাব। ১।২।৩।৪র্থ প্রবন্ধ সর্ব্বসাধারণের জন্য ; পঞ্চম প্রবন্ধ ছাত্রদিগের জন্য ৬ষ্ঠ প্রবন্ধ মহিলাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ছাত্রদিগের জন্য নির্দিষ্ট প্রবন্ধের লেখকগণ যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট সহ তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন।

সেদিন হাবড়া শালকিয়ার গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ ও সাহিত্য-সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গান, বাজনা, আমোদ, আনন্দ, বক্তৃতা, সম্মিলন সমস্তই হইয়াছিল ; অবশেষে নাটকাভিনয় এবং জলযোগেরও ব্যবস্থা ছিল। শালকিয়ার অধিবাসীবৃন্দ, বিশেষতঃ যুবকগণের উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা এই সমিতির উন্নতি কামনা করি।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' বহু চিত্র শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

"অম্বর হইতে সম শতধার জ্যোতিঃ প্রপাত তিমিরে—
নামি' ধরায় হিমাচলমূলে—মিশিলে সাগর সঙ্গে" —দ্বিজেন্দ্রলাল

[Blocks by Bharatvarsha Halftone Works.

বৈশাখ, ১৩২৭

দ্বিতীয় খণ্ড] সপ্তম বর্ষ [পঞ্চম সংখ্যা

অভিব্যক্তির ধারা

[অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ]

অভিব্যক্তিবাদ বা ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব অন্য অনেক সনাতন সত্যের মত বিজ্ঞানের পুরাতন দপ্তরখানায় স্থায়ী ভাবে অবস্থিতি করিতে চলিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে যদিও ইহা কবি ও দার্শনিকের কল্পনা ও স্বীকার্য্যমাত্রের ন্যায় মানবের মনে সময়ে-সময়ে প্রতিভাত হইত; তথাপি বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসাবে ইহার পরমায়ু এক শতাব্দীও নহে। কিন্তু এই নবীন যুগের নবীন মন্ত্রটি এমন ভাবে আমাদের আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে যে, ইহার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে চাহিলে, সেটা নিতান্তই অনাবশ্যক ও অবান্তর মনে হওয়াও বিচিত্র নহে। এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিকল্প ডারউইন্ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই এই মহান্ সত্যটিকে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহার শত শাখা বিস্তৃত হইয়া জ্ঞানরাজ্যের নানা বিভাগকে আক্রমণ করিয়াছে। ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, জৈববিদ্যা, চারিত্রনীতি, অর্থনীতি, এমন কি তত্ত্ববিদ্যায় পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব সংক্রমিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই আমরা একটী গতি বা অভিব্যক্তির ধারা অন্বেষণ করি; এবং যতক্ষণ ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে সেই গতিশীলতা, বা ক্রমোন্নতি দেখিতে না পাই, ততক্ষণ জ্ঞানের একাংশ অন্ধকার রহিয়া গেল বলিয়া গণনা করি।

তাহার কারণ এই যে, বিশ্বের অন্তরতম সত্ত্বা সর্ব্বদা গতিশীল। গতিশীল বলিয়াই বিশ্বের নাম জগৎ। যন্ত্র-বদ্ধতা ইহার প্রকৃতি নহে। যন্ত্র এক ভাবেই থাকে। যে ভাবে তাহাকে চালাইয়া দেও, সেই ভাবেই সে চলে। তাহার ব্যতিক্রম নাই, বিরাম নাই। যন্ত্রের ভিতর এমন কোনও শক্তি নাই, যাহা তাহাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষ হইতে একটুও নড়াইতে পারে। বিশ্ব যন্ত্র নহে, কেন-না বিশ্বে নিয়মের পার্শ্বে ব্যতিক্রম আছে। সে রেলগাড়ীর মত লৌহবর্ত্মে অবিরাম চলে না; বা চলা বন্ধ হইলে, চিরদিনের মত স্তব্ধ, অসাড়, লৌহপঞ্জরের মত পড়িয়া থাকে না। পরন্তু একটী বিরাট বটবৃক্ষের ন্যায় নানা দিকে নানা ভাবে শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত করিয়া নিয়ম-

ব্যতিক্রমের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। এইরূপ সংসরণশীল বলিয়াই এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির নাম সংসার।

অভিব্যক্তিবাদের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, জগৎ-সংসারের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের মধ্যে ইহা ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই যে সমস্ত ভেদের মধ্যে অভেদ কল্পনা,—ইহা সত্যই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। বিশ্ব চরাচরের যেখানে যাহা কিছু আছে, গ্রহ-চন্দ্র-তারকা হইতে আরম্ভ করিয়া কীট-কীটাণু পর্য্যন্ত সমস্তই একই নিয়মের সুবর্ণ-সূত্রে শৃঙ্খলিত। এক দিকে জড়জগৎ, অপর দিকে জীব-জগৎ; আপাত-দৃষ্টিতে এ দু'য়ের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য দেখা যায় না। মনে হয় যেন, বিশাল জড়-বিশ্ব চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের চৈনিক প্রাচীর তুলিয়া দিয়া, জীব-জগৎকে ঠেলিয়া পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। নিঃসাড়, নিস্পন্দ, বধির জড়-পদার্থ-নিবহ জীবনের অশেষবিধ বিকাশের বহু দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জীবনের ভোজে তাহাদের স্থান নাই। কিন্তু অভিব্যক্তির ধারা জীবনের সহিত জড়কে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞান এক দিকে জড়-জগৎকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া দেখাইতেছে যে, তাহাদের মধ্যে একটা সুন্দর বংশগত সাদৃশ্য আছে। এই বংশগত সাম্য হইতে অনুমান করা যায় যে, বিভিন্ন ভূতসমূহ একই মৌলিক উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তাহারা একই বংশসম্ভূত বিভিন্ন শাখার ন্যায় আকার ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যবিশিষ্ট। আমরা স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকে ৭০ কি ৮০টি মূল ভূতের বা Elementsএর কথা পড়িয়াছি। কিন্তু এই মূল ভূতগুলি যে প্রকৃত মৌলিক তাহা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারে না। আজ যাহা মৌলিক বলিয়া বোধ হইতেছে, কাল তাহা বিশ্লেষণ-যন্ত্রে পড়িয়া যৌগিক পদার্থ প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। কয়লা ও হীরকের মধ্যে যেমন বংশগত সাদৃশ্য রহিয়াছে, সমস্ত জড়-পদার্থের মধ্যে তেমনই একটা মৌলিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে,—ইহাই জড়-বিজ্ঞানের মুখ্য প্রতিপাদ্য। জড়-দ্রব্যের ন্যায় জড়-শক্তির মধ্যেও এইরূপ গোত্রীয় সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। হার্ৎজ্ যখন তাড়িতের ক্রিয়ার সুন্দর ব্যাখ্যা প্রচারিত করিলেন, তখন ফ্যারাডের কল্পনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল যে, আলোক ও তাপ, তাড়িত ও চুম্বক একই শক্তিপুঞ্জের ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়া-মাত্র। এক প্রকারের শক্তি অন্য প্রকারের শক্তিতে সহজেই রূপান্তরিত হইতে পারে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে এই অনুমানই স্বাভাবিক যে, সমস্ত জড়তত্ত্বের মূলে একপ্রকার অণু বা ধূলিকণা আছে, যাহার সংহতিতে নিখিল জড়বস্তু উৎপন্ন হইতেছে,—একই মূল প্রকৃতি অবস্থাভেদে রূপান্তরিত হইয়া জগদ্-বৈচিত্র্য সাধন করিতেছে;—ইহাই জড়ের অভিব্যক্তির ধারা।

প্রাণী-জগতের মধ্যে এই অভিব্যক্তির ক্রিয়া আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জড়ের মধ্যে যাহা অব্যক্ত, বা অল্প-ব্যক্ত—প্রাণীর মধ্যে তাহা সত্যই অভিব্যক্ত। জড়ের সম্বন্ধে 'ক্রম-বিকাশ' বা 'উন্নতি' কথাটি আমরা এখনও প্রয়োগ করিয়া উঠিতে পারি না; কিন্তু উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর সম্বন্ধে আমরা একটুও সন্দিহান নহি। জড়বস্তু অন্ধভাবে ক্রিয়া করিয়া যায়,—শক্তির প্রয়োগ হইলেই আমরা তাহার বিশেষ ফল দেখিতে পাই। লৌহে যে মরিচা পড়ে, তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, লৌহের উপর বাতাসের ক্রিয়ায় এইরূপ একটা পরিবর্ত্তন ঘটে। পালে জোর হাওয়া লাগিলে নৌকা এইরূপ জোরে চলে, এই মাত্র। ইহার মধ্যে বিশেষ ব্যতিক্রম নাই, সুতরাং বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু প্রাণী জগতে যে কার্য্যপরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ব্যতিক্রমের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলার মধ্যে ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে কার্য্য-কারণ-প্রবাহ, ইহাতে অন্ধ বাধ্যতা নাই। প্রাণী জগতের কার্য্য-কলাপে এমন একটা সূক্ষ্ম, অনবচ্ছিন্ন ধারা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সমস্ত নিয়মের সহিত ছন্দ রক্ষা করিয়াও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে। একটা মাকড়সার ক্রিয়া লক্ষ্য করিলেই এই বিষয়টা পরিস্ফুট হইবে। মাকড়সা অনেকবার অকৃতকার্য্য হইয়াও তাহার অভীষ্ট স্থানে জালের প্রান্ত বাঁধিয়া দিল, এবং অনেকবার দোল খাইয়া-খাইয়া অপর প্রান্তও আট্‌কাইল। তার পরে ধীরে-সুস্থে বৃহৎ একটা জাল বুনিয়া ফেলিল। আরও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, মাকড়সা নিশ্চিন্ত ভাবে জালের কেন্দ্রভাগে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতে-করিতে নিবিষ্ট মনে শুনিতেছে, মাছির গুঞ্জন। তারপর কোন এক মুহূর্ত্তে একটা মাছি উড়িয়া আসিয়া জালের সূতায় সঙ্গে জড়াইয়া গেল। মাকড়সা যেন চোখের কোণে একটু হাসির ভাব

লইয়া মুক্তির জন্য মাছির নানা ব্যর্থ চেষ্টা লক্ষ্য করিতেছে। তার পর মাছিটি যখন ছাড়াইতে গিয়া আরও জড়াইয়া পড়িল, তখন সতর্ক পদক্ষেপে মাকড়সা তাহার শিকারের নিকটে গেল এবং আঘাতে-আঘাতে তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়া দিল। অবসর-মত তাহার ভোজ নিষ্পন্ন করিতে পারিবে, এই আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া সে সুস্থ চিত্তে বিশ্রাম করিতে গেল। এই ধারাবাহিক ক্রিয়া-কলাপ যে কোনও একটী উদ্দেশ্যের অভিমুখে নিয়োজিত হইতেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। এই উদ্দেশ্যানুকূল ক্রিয়ার পারম্পর্য্যই জীব-জগতের বৈশিষ্ট্য। এমন কি, উদ্ভিদ্-রাজ্যেও এইরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। তবে উদ্ভিদ্ ভূমিতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, বাতাস ও বৃষ্টি অনায়াসে তাহার খাদ্য জোগায়; এই জন্য উদ্ভিদের ক্রিয়ায় বড় একটা বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উদ্ভিদেরও সাড়ায় বৈচিত্র্য আছে। আমরা জানি, বৃক্ষলতা আলোক চাহে। অঙ্কুর হইতে বাহির হইয়া তাহারা আলোকের দিকে মাথা তুলে; অন্ধকারের দিকে ফিরাইয়া দিলেও, তাহারা আলোর সন্ধানে ফিরে। আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, সমস্ত জীবনী-শক্তি দিয়া একটু মুক্ত বাতাসের আস্বাদ পাইতে ব্যগ্র হয়। বৃক্ষলতাও প্রাণীদের মত ঘুমাইয়া পড়ে, আলোকে ও আঁধারে তাহাদের জীবনী শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, বিষ-প্রয়োগে তাহারাও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। মদ্য বা অহিফেন সেবনে তাহাদেরও নেশা হয়, আঘাত পাইলে তাহারাও কাতর হয় এবং অল্পে-অল্পে আঘাতের ক্ষত শুকাইয়া গেলেও তাহাদের দেহে দাগ থাকে। এই সমস্তই প্রাণের ক্রিয়া। অবস্থার ব্যতিক্রমে ক্রিয়ার ব্যতিক্রম এবং উদ্দেশ্যের সহিত ক্রিয়ার সামঞ্জস্য—ইহাই মোটামুটি প্রাণের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে দেখিলে, আমরা প্রাণী ও উদ্ভিদ্ এই বৃহৎ পরিবারদ্বয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না।

আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদিগের মধ্যে যে অনুক্রমিকতার ধারা রহিয়াছে, জড়-জগতে তাহা নাই। একখণ্ড লৌহ বা একখণ্ড হীরক জগতের সমস্ত লৌহ বা হীরকের অংশমাত্র। লৌহ হইতে লৌহের বা হীরক হইতে হীরকের উৎপত্তি হয় না। সিন্দুকের মধ্যে সহস্র-সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা অনন্ত কাল আবদ্ধ থাকিলেও, তাহা হইতে আর একটী মুদ্রাও জন্মগ্রহণ করে না। জীবজগতে অল্প হইতে বহু জন্মলাভ করে—ইহারই নাম বংশ-বিস্তৃতি। একটী জীব হইতে অপর একটী জীব জন্মলাভ করে। এইরূপে জগতে বিশাল জীব-প্রবাহ চলিয়াছে। এই জীব-প্রবাহের একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, এক প্রকার জীব হইতে সেই প্রকারের জীবই জন্ম লাভ করে। মনুষ্য হইতেই মনুষ্য হয়, অশ্ব হইতেই অশ্ব হয়, মনুষ্য হইতে অশ্ব বা অশ্ব হইতে গর্দ্দভ জন্মলাভ করে না। গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করা যায় না, জীব তত্ত্ববিদেরা এই জনশ্রুতির সমর্থন করেন। কিন্তু মানুষের ছেলে সময়ে-সময়ে যে কিরূপে বানর হইয়া যায়, এ সমস্যা শিক্ষক, অভিভাবক ও জীবতত্ত্ববিদ্ সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করে।

পূর্ব্বে যে সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সাদৃশ্যাত্মক; অর্থাৎ মানুষে-মানুষে, গরুতে-গরুতে, কুকুরে-কুকুরে, অথবা লেবুতে-লেবুতে যে সাদৃশ্য আছে, তাহা বংশগত সাদৃশ্য। একই বংশে যে সকল তরুলতা, বা যে সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ইতর বিলক্ষণ গুণসম্পন্ন এবং সমান শ্রেণীর বা সমান বংশীয়ের সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট। পূর্ব্ব-বংশীয়ের গুণ উত্তর-বংশীয় জীবে সংক্রমিত হয়। সন্তান পিতৃ-পিতামহের ধারা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই ধারা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে একই রকমের জীব পুনঃ-পুনঃ অবিকল অনুবৃত্ত হইয়া পৃথিবীকে নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন বা একঘেয়ে করিয়া তোলে। প্রকৃতি এই একঘেয়ে, বৈচিত্র্যবর্জ্জিত অবস্থা পছন্দ করেন না। তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডার অনন্ত কাল ধরিয়া বিবিধ রূপ, বিবিধ মূর্ত্তি যোগাইলেও শেষ হয় না। তাই যেখানে সাদৃশ্য, সেখানেই কিছু-না-কিছু বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের সন্তান মানুষ হয় বটে, সুন্দর পিতামাতার সন্তান সুন্দর হয় বটে, কিন্তু সন্তান সব বিষয়ে পিতামাতার অনুরূপ হয় না। একই পিতামাতার সকলগুলি সন্তানও একই রূপ হয় না। ইহাই জীব-জগতের অপর সাধারণ নিয়ম। প্রথম নিয়মের নাম বংশানুক্রম; দ্বিতীয় নিয়মের নাম ক্রম-বিপর্য্যয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, পূর্ব্বপুরুষের সহিত

উত্তর পুরুষের সাদৃশ্যই বা কতখানি এবং বৈষম্যই বা কতখানি হইতে পারে? অর্থাৎ পিতামাতার গুণ সন্তানে কতখানি বর্ত্তিতে পারে? জীব কতকগুলি গুণ বংশ-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হয়; আর কতকগুলি গুণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার গতিকে তাহাকে অর্জ্জন করিতে হয়। জীবনের উপর অবস্থার প্রভাব প্রথমাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অবস্থার প্রভাবেই জীবন গঠিত হয়। প্রত্যেক জন্তুকে পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত বনাইয়া চলিতে হয়; অবস্থার সহিত না বনাইতে পারিলে, জীবন ধ্বংসের অভিমুখে প্রস্থিত হয়। যে সকল জীব অবস্থার সহিত সর্ব্বতোভাবে আপনাকে মিলাইয়া মানাইয়া লইতে অক্ষম হইয়াছে, তাহারা কালের গহ্বরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এমন কত জীব জন্তু শুধু অবস্থার ফেরে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে,— সাক্ষী আছে কেবল ভূগর্ভে তাহাদের কঙ্কাল। এই যে অবস্থার সহিত, পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত মানাইয়া চলিবার অবিশ্রান্ত চেষ্টা, ইহাকেই জীবন-সংগ্রাম বলে। অনাদিকাল হইতে এইরূপে একটা মহা বিশ্বব্যাপী প্রতি-যোগিতা চলিতেছে, যাহার ফলে লক্ষ-লক্ষ জীব ঝরিয়া, খসিয়া, মুছিয়া যাইতেছে; আবার লক্ষ-লক্ষ প্রাণী বাঁচিবার মত, টিঁকিয়া থাকিবার মত শক্তিলাভ করিতেছে। এইরূপে প্রকৃতির নির্ব্বাচন-প্রণালী যোগ্যতমের উদ্বর্তন সাধন করিতেছে। এইরূপে উদ্বৃত্ত জীবসমূহের মধ্যে আবার যাহারা দায়াধিকার-সূত্রে পিতামাতার অর্জ্জিত যোগ্যতা লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহারাও অযোগ্য সাব্যস্ত হইয়া মহাপ্রস্থান করিতেছে। পিতামাতা কর্তৃক অর্জ্জিত, দৈব-লব্ধ যোগ্যতা শুধু যে সন্তানে বর্ত্তে, তাহা নহে; সে সকল গুণের পরিণতি ও উন্নতি সন্তান-পরম্পরায় সম্ভাবিত হয়। এই জন্যই পুত্রের বৈদিক অর্থ— যে পূরণ করে, অর্থাৎ পিতার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। চিল এইরূপে দূরদৃষ্টি লাভ করিয়াছে, মাছরাঙ্গা জলের ভিতর মাছ দেখিয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে তাহাকে ধরিবার শক্তি লাভ করিয়াছে। জিরাফের গলা বৃক্ষের ফল পাড়িতে-পাড়িতে লম্বা হইয়া গিয়াছে; গো-মহিষের শৃঙ্গ ঢুঁষাঢুঁষি করিতে-করিতে গজাইয়াছে। যাহাদের এরূপ সুবিধা হয় নাই, তাহারা ভবধাম হইতে চিরবিদায় লইয়াছে। যাহাদের প্রয়োজনের অনুরূপ এই সকল সুবিধা হইয়াছে, তাহারাই উদ্বৃত্ত হইয়াছে, রহিয়া গিয়াছে।

তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, আমরা বর্ত্তমান কালে যে সকল জীব দেখিতেছি, তাহারা অনেক ব্যর্থ চেষ্টার মধ্য দিয়া জন্ম লাভ করিয়াছে। পরিণতির পথে অগণিত জীব ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক নির্ব্বাচন। ইহার একদিকে সৃষ্টি, অপর দিকে সংহার। সৃষ্টি বা স্থিতি এবং সংহার একই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক্ মাত্র। রাত্রি এবং দিনের মত ইহারা পরস্পর গলাগলি করিয়া রহিয়াছে। যে অলংঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে যোগ্যতমের উদ্বর্তন সাধিত হইতেছে, সেই নিয়মের ফলেই যত অযোগ্য, যত স্থিতিশীল জীব, তাহারা ঝরিয়া পড়িতেছে। জীব-জগতের এই উত্থান-পতন চক্রনেমির মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

হিসাব-নিকাশের সুদীর্ঘ যোগবিয়োগ অন্তে যেমন আমরা শুধু দেনা বা পাওনা মোট কত দাঁড়াইল, তাহাই জানিতে পারি; তেমনি অনাদিকালের এই নির্ব্বাচন-প্রণালীতে যুগযুগান্তর ধরিয়া যে ধ্বংস-নাটিকা অভিনীত হইতেছে, তাহারই শেষ অঙ্কটি মাত্র আমরা দেখিতে পাইতেছি। যাহা অতীত, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমানের ললাটে অঙ্কিত রহিয়াছে; সেই জন্যই আমরা এই সুদূর অতীতের ইতিহাস সংকলন করিতে সমর্থ হই। বর্ত্তমান জীব অতীতের ধারা রক্ষা করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা লক্ষ-লক্ষ বর্ষব্যাপী জীবন-সংগ্রামের ফলে অর্জ্জিত হইয়াছে। একই পরিবারের বা শ্রেণীর বিভিন্ন জীব বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে অবস্থান করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন গুণগ্রাম লাভ করিয়াছে। গুণভেদ দেখিয়া আমরা জাতিভেদ কল্পনা করিয়া বসি। বাদুড় উড়িতে পারে বলিয়াই যে সে পক্ষী-জাতিভুক্ত হইবে, এরূপ নহে। বাদুড় স্তন্যপায়ী জীবের অন্তর্গত; কিন্তু ক্রমাগত উড়িবার চেষ্টা করিয়া-করিয়া, তাহারা একরূপ পক্ষ উদ্ভাবিত করিয়া লইয়াছে। এক-প্রকার কাঠবিড়ালীও উড়িয়া এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইতে পারে। হাঁস অন্যান্য পক্ষীরই মত। একপ্রকার হাঁস সারি বাঁধিয়া আকাশ-পথে উড়িয়া চলে। 'মানসং যান্তি—হংসাঃ' ইহা প্রাচীন কবিপ্রসিদ্ধি। কিন্তু সন্তরণ করিবার প্রবল চেষ্টা হইতে তাহাদের পায়ের আঙ্গুল জোড়া লাগিয়া গিয়াছে; ইহাতে তাহাদের সন্তরণের সুবিধা হয়।

পক্ষান্তরে, পক্ষের অব্যবহার হেতু, গৃহপালিত হংস উড়িবার শক্তি হারাইয়াছে; এখন তাহাদের বিস্তৃত পক্ষ বোঝা মাত্রে দাঁড়াইয়াছে, হয় ত কালে ইহাদের পক্ষ লোপ পাইবে। মৎস্য জলে থাকিয়া-থাকিয়া যে ডানা গজাইয়া লইয়াছে, তাহাই বাতাসের সাহায্যে পক্ষীর পক্ষদ্বয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। তিমি মাছ জলে থাকিয়া মৎস্যের অনেকগুলি স্বভাব পাইয়াছে, কিন্তু তথাপি তিমি মৎস্যের জাতি নহে। ইহারা স্তন্যপায়ীদিগের জাতি। এই সকল তথ্য পুরাতন কাহিনীতে দাঁড়াইয়াছে; ইহাদের বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমার এই প্রবন্ধের জন্য এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, আমরা আপাত-দৃষ্টিতে যে সকল প্রভেদ দেখিয়া জীবসমূহের মধ্যে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র জাতি বা শ্রেণীর কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা হয় ত কোনও স্থায়ী বা অপরিবর্ত্তনীয় পার্থক্য নহে। একই মনুষ্য-পরিবারের শাখা যেমন ভৌগোলিক সংস্থানের বিপর্য্যয়ে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণবর্ণ হয়, কেহ বিড়ালাক্ষ, কেহ হনুমন্ত এবং কেহ বা বহুলোমশ হয়, তেমনি একই পরিবারের বা আদিম অবিভক্ত শ্রেণীর জীবগণ অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে ভিন্ন-ভিন্ন গুণের আশ্রয়ভূত হইয়া ভিন্ন-ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাই ক্রম-বিকাশবাদের প্রতিপাদ্য। পূর্ব্বে ভিন্ন-ভিন্ন জাতি ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে পৃথক-পৃথক ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া কথিত হইত; ডারুইন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, অল্প-সংখ্যক বা একইমাত্র মূল জাতি হইতে সমস্ত জাতি সৃষ্ট হইয়াছে। জীবন-সংগ্রাম ও স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের ফলে নূতন-নূতন গুণের উদ্ভব হওয়ায়, সেগুলি জাতিগত পার্থক্যে পরিণত হইয়াছে; এবং আমরা তাহাদের জন্ম-কথা ভুলিয়া গিয়া, জাতি-বৈষম্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া দিয়া, জীবকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছি। বস্তুতঃ, তাহারা একই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখামাত্র।

এক্ষণে সমস্যা হইতেছে এই যে, বিড়াল ও ব্যাঘ্র, শৃগাল ও নেকড়ে, গাধা ও ঘোড়াতে, গোরিলা ও ওরাঙ্গকে আমরা এক পরিবারভুক্ত বলিয়া গণনা করিতেও পারি; কিন্তু সমস্ত পশুজাতির মধ্যে ত এমন একটী সুস্পষ্ট জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাই না! তাহার উত্তরে জীবতত্ত্ববিদ্ বলিবেন যে, আমরা প্রথমতঃ পৃথিবীর যাবতীয় জন্তুকে শ্রেণী-বদ্ধভাবে সাজাইয়া দেখিলে, এই ঐক্যের সূত্রটি দেখিতে পাই। বিড়ালকে রূপকথায় বাঘের খুব নিকট কুটুম্ব বলিয়া প্রচার করিলেও, আমরা তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্যের একটু আভাষমাত্র বই আর কিছুই পাই না। মানুষ ও সাধারণ বানরে যে সাম্য, সে শুধু তিরস্কারের সময়ে আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করে; তাহাদিগের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার বিষয় বুঝিতে সাহায্য করে না। কিন্তু যদি বিড়ালের পার্শ্বে স্তরে-স্তরে বন্য বিড়ালগুলিকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়, এবং তার পরেই ঠিক রয়েল বেঙ্গল জাতীয় বাঘ না আনিয়া, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগুলিকে পর-পর সাজাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের বুঝিতে বাকী থাকে না যে, কেমন করিয়া এই সমস্ত জীব এক বৃহৎ বিড়াল-পরিবারে স্থান পাইতে পারে। সেইরূপ বানর জাতীয় জীব যত প্রকার আছে, তাহাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রকার হইতে আরম্ভ করিয়া, পর-পর শিম্পাঞ্জি, ওরাঙ্গ, ও গোরিলাকে দাঁড় করাইয়া তাহার পার্শ্বে কতকগুলি পার্লামেন্টের মেম্বরকে স্থাপন না করিয়া, যদি লঙ্কার বনমানুষ বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণকে দাঁড় করিয়া দেওয়া যায়, এবং পর-পর নিগ্রো, রেড ইণ্ডিয়ান্, মোঙ্গোলিয়ান ও আর্য্যগণকে সাজাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক আপত্তির মীমাংসা সহজেই হইয়া যায়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে স্তর বিন্যস্ত ভাবে আমরা জন্তুদিগকে সাজাইতে পারি না। অনেক সময়ে এইরূপ সাজাইবার মধ্যে-মধ্যে ফাঁক থাকিয়া যায়। পূর্ব্বে যে স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের কথা বলিয়াছি, তাহাই আমাদিগকে এই ফাঁকগুলি পূরণ করিবার পক্ষে সহায়তা করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের ফলে অযোগ্য জীবগুলি বিনাশপ্রাপ্ত ও কালে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে সকল জীব জ্ঞাতিত্বের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিত, তাহারা লোপ পাইয়াছে; কাজেই আমাদের শ্রেণী-বিভাগের পারম্পর্য্যে ফাঁক থাকিয়া যায়। ইহা যে কল্পনা-মাত্র, তাহা নহে। ইতিহাসের একটী বিস্মৃত অধ্যায় হইতে আমরা ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাই যে, সকল জীব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কঙ্কাল ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। সেই সকল জীর্ণ কঙ্কাল আমাদের সমস্যাপূরণে সহায়তা করে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সব সময়ে পৃথিবী কঙ্কাল জোগাইয়া আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন না। তাহার

কারণ, কোটী-কোটী বৎসরে যে সমস্ত প্রাকৃতিক বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহাতে অনেক চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। শুধু শ্রেণী-বিভাগ হইতেই যে আমরা জাতিত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, তাহা নহে। প্রত্যেক জীবেরই একটা আদিম অবস্থা আছে, এবং সেই আদিম অবস্থায়, অর্থাৎ গর্ভস্থ ভ্রূণের অবস্থায় সমস্ত জীবেরই আকৃতি প্রায় একরূপ। পরে যত সে ভ্রূণ অভিব্যক্তি লাভ করে, ততই তাহার বিশেষ-বিশেষ জাতীয় গুণ প্রকাশিত হইতে থাকে। অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক অবস্থায় যে সকল গুণ অন্তর্নিহিত থাকে, তাহাই পরে পরিস্ফুট হইয়া উঠার নামই অভিব্যক্তি।

জীবজন্তুদিগকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজাইয়া আমরা অল্প কয়েকটি জাতিতে উপনীত হই,- যেমন স্তন্যপায়ী জীব, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য ও উভচর। সমস্ত মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীবকে এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এই সকল শ্রেণী এক-একটী বৃহৎ পরিবার; এবং ইহাদের মধ্যে যে সমতা দেখা যায়, তাহা রক্তের সম্বন্ধ বা সমানগোত্র-জনিত। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, এক পরিবারের যাবতীয় জন্তুর মধ্যে যে আকৃতি, বর্ণ ও অভ্যাস বিষয়ে নানা বৈষম্য রহিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া জীবতাত্ত্বিক তাহাদের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন যে, ইহারা একই মূল বংশ হইতে বা একই পিতামাতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে, জীবন-সংগ্রামের অল্পাধিক তীব্রতার ফলে ইহারা ভিন্ন-ভিন্ন রূপ বা স্বভাব প্রাপ্ত হইলেও ইহাদের মূলগত প্রকৃতি এক। অবস্থার সংবলনে এই যে বৈচিত্র্য সাধিত হইতেছে, ইহার একটী নির্দ্দিষ্ট ধারা বা পন্থা আছে, যাহাকে ক্রম-বিকাশ বলা যায়। ক্রম-বিকাশ অর্থে জীবতত্ত্বে ইহাই বুঝায় যে, জৈব পদার্থ ক্রমশঃ সরলতা হইতে জটিলতায়, একরূপতা হইতে বিবিধ-রূপতায়, সাজাত্য হইতে বৈজাত্যে উপনীত হয়। পূর্ব্বে জীবের আদিম অবস্থার প্রসঙ্গে গর্ভস্থ ভ্রূণের কথা বলিয়াছি। ভ্রূণ প্রথম অবস্থায় অনির্দ্দিষ্ট পিণ্ডের মত আগাগোড়াই একরূপ অবয়ববিশিষ্ট থাকে; পরে হস্ত, পদ, মস্তক আবির্ভূত হইয়া তাহাকে ক্রমশঃ জটিল করিয়া তুলে। গর্ভস্থ ভ্রূণের সম্বন্ধে যে অবিসংবাদী নিয়ম খাটে, সমস্ত জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধেও সে নিয়ম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। একটি বা কয়েকটি মৌলিক জীবপ্রকৃতি হইতে সমস্ত জীব-নিবহ উদ্ভূত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হই। অর্থাৎ মার্জ্জার যদি অভিব্যক্ত হইয়া ব্যাঘ্রে পরিণত হইয়া থাকে, বানর যদি বিবর্ত্তন-ফলে মানুষে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে ইহা মোটেই বিচিত্র নহে যে, মৎস্য সরীসৃপে, সরীসৃপ পক্ষীতে, এবং পক্ষী চতুষ্পদে ও চতুষ্পদ ক্রমে দ্বিপদ ও দ্বিভুজ জীবে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। বংশানুক্রমিকতার ফলে সমস্ত জীবনিচয়ের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই সাদৃশ্যের ক্রিয়া ক্রমবিপর্য্যয়ের দ্বারা বাধিত হয়। মৌলিক জীবোপাদান হইতে যেমন একটী সাদৃশ্যের ধারা অক্ষুন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তেমনই বিপর্য্যয় বা বৈচিত্র্যের দিকেও জীবের যথেষ্ট ঝোঁক রহিয়াছে। স্বাভাবিক নির্ব্বাচনে যে সকল বৈচিত্র্য বা বিপর্য্যয় জীবের সুবিধাজনক হইয়াছে, তাহারাই স্থিতিলাভ করিয়াছে। এই সত্যটি আমরা কার্য্যতঃও দেখিতে পাই। মানুষ ইচ্ছা করিয়াও জীবদেহে কতকটা বৈচিত্র্যের সংঘটন করিতে পারে। পশুপালক এবং কৃষক জানে যে, বাছিয়া-বাছিয়া পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতার সংমিশ্রণ সাধন করিলে নূতন-নূতন প্রকারের বর্ণ, আকৃতি ও প্রকৃতি দেখা গিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে যৌন-সম্মিলন ঘটাইয়া, বিভিন্ন বৃক্ষলতার কলম একত্র রোপণ করিয়া অদ্ভুত রকমের বৈচিত্র্য পাওয়া গিয়াছে। মানুষ যাহা অল্প পরিমাণে সাধন করে, প্রকৃতির বিশাল পরীক্ষাশালায় তাহা বহু পরিমাণে সাধিত হইতেছে,—ইহাই বিজ্ঞানবিদ্‌গণের স্বাভাবিক নির্ব্বাচন।

এই মতবাদ যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন তাহার প্রথম শত্রু ছিল জগতের ধর্ম্মমতসমূহ। অনেক ধর্ম্ম বলে যে, ভগবান পৃথক্-পৃথক্ ভাবে জীব-সম্প্রদায় বা জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং এই সকল প্রাণী, জাতি অপরিবর্ত্তনীয়; অর্থাৎ এক জাতির জীব অপর জাতিতে কোনও কালে বিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কিন্তু, এক্ষণে সমস্ত তর্ক নিরস্ত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মমত সকলও বুঝিয়াছে যে, পৃথক্ ভাবে পশুপক্ষী সৃজন করা অপেক্ষা একটি মূল বীজ সৃজন করায় ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য সমধিক প্রকাশিত হয়। মনু বহুপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন:

অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।

ভগবান স্বয়ম্ভু পূর্ব্বে জল সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে বীজ আরোপণ করিলেন।

এই বীজে প্রাণী-জনক সমস্ত শক্তিই অন্তর্নিহিত আছে। কেন না যাহা আছে, তাহাই সময় ও সুবিধা পাইলে অভিব্যক্ত হয়; যাহা নাই, তাহা কোনও কালেই আসিতে পারে না। সুতরাং বংশানুক্রম সিদ্ধ হইতে হইলে, বীজাণুতে সমস্ত শক্তির বীজ নিহিত আছে স্বীকার করিতে হয়। এবং তাহা স্বীকার করিলেই আমরা বুঝিতে পারি, কেন পূর্ব্বপুরুষের দ্বারা অর্জ্জিত কোন-কোন গুণ উত্তর-পুরুষে সংক্রমিত হয়। প্রত্যেক জীবকণা বা জীবপঙ্ক প্রথম হইতেই এরূপ ভাবে গঠিত যে, পরে যে সকল গুণ বা লক্ষণ তত্তদ্ জীবদেহে আবির্ভূত হইবে, তাহার অঙ্কুর সেই জীবপঙ্কেই নিহিত থাকে। সুতরাং যদি কোনও অর্জ্জিত গুণ আদিম জীবকণাকে আংশিক রূপেও রূপান্তরিত করিতে পারে, তাহা হইলে সেই গুণ শুক্রশোণিতের সাহায্যে সংক্রমিত ও পরিপুষ্ট হইয়া সন্তানে বর্ত্তে। যাহা এই মৌলিক জৈব উপাদানের উপর কোও রূপ প্রভাব বিস্তার করে নাই, তাহা সন্তানে সংক্রমিত হয় না। ইহাই ভাইস্মানের Germ Plasm Theory বা জীবাঙ্কুর বা জীবাঙ্কুর-বাদ। ডারুইনে Gemmules, স্পেন্সারের Ids এবং ভাইস্ম্যানের Germ-plasm, এই একই মূল জৈব উপাদানের বিভিন্ন নাম মাত্র। ভাইস্ম্যানের মতের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বংশানুক্রমিকতার সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করে। কেন যে একটী গুণ সন্তানে সংক্রমিত হইবে এবং অপর একটী গুণ কেন যে হইবে না, তাহা বীজাঙ্কুরের প্রকৃতি প্রথম হইতেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। একজন আজীবন সঙ্গীতকলার চর্চ্চা করিয়া যশস্বী হইল, সন্তান সে স্থলে পিতার ধারা মোটেই পাইল না; কিন্তু অপর এক ব্যক্তি একটু তোতলা, তাহার সন্তান সে-গুণটি উত্তরাধিকার-সূত্রে অবিকল প্রাপ্ত হইল। ইহার কারণ এই যে, সঙ্গীত-কলার অনুশীলন তাহার মূল ধাতুর উপর একটুও ছাপ মারিয়া দিতে পারে নাই; অথচ তোতলার তোতলামি তাহার মূল ধাতুকে এমন ভাবে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে যে, তাহার সন্তান-সন্ততিতেও সেই ধাতু অভিব্যক্ত হয়। এইরূপে অনেক ব্যাধি পূর্ব্বপুরুষ হইতে উত্তরপুরুষে সংক্রমিত হয়, এবং অনেক ব্যাধি হয় না। চরকও এই প্রশ্নের মীমাংসায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এবং তাঁহার মীমাংসা অনেকটা আধুনিক মতের পরিপোষক।

তত্র চেৎ ইষ্ট মেতৎ যস্মাৎ মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ, তস্মাদেব মনুষ্য বিগ্রহেণ জায়তে, যথা গৌর্গোপ্রভবঃ যথা চাশ্বঃ অশ্বপ্রভবঃ ইত্যেবং যদুক্তং অগ্রে সমুদায়াত্মক ইতি তদযুক্তং।......যচ্চোক্তং যদি চ মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ কস্মাৎ জড়াদিভ্যো জাতাঃ পিতৃসদৃশরূপা ন ভবন্তীতি তত্রোচ্যতে যস্য যস্য হি অঙ্গাবয়বস্য বীজে বীজভাব উপতপ্তো ভবতি তস্য তস্য অঙ্গাবয়বস্য বিকৃতিঃ উপজায়তে।

অর্থাৎ মনুষ্যদেহ হইতে যে মানুষ, গো-দেহ হইতে যে গো উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ, পিতার সমুদায় দেহ-যন্ত্র তাহার বীজে অনুস্যূত হইয়া থাকে। কিন্তু পিতা যদি জড় বা মূক বা বামন হয়েন, তাহা হইলে ঐ সকল দোষ সন্তানে না বর্ত্তিতেও পারে। দৈবগতিকে কখন-কখনও পিতৃ-বীজে এই সকল দোষ উপতপ্ত হইলে, সন্তানও তদনুসারী হয়।

[দম্পত্যোঃ কুষ্ঠবাহুল্যাৎ দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ। যদপত্যং তয়োর্জাতং জ্ঞেয়ং তদপি কুষ্ঠিতং। ইত্যাদি

(শারীর-স্থান)

এক বীজাঙ্কুর হইতে যেমন সমস্ত প্রাণি-জগতের বৈচিত্র্য বুঝিতে চেষ্টা করা যায়, জড়-জগতেরও তেমনি একটা মূল কারণ কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রেই এক হইতে বহুর আবির্ভাব সিদ্ধ হয়। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, জড় ও জীব এই উভয়াত্মিকা পৃথিবীর দুইটি বিভিন্ন ধারা হওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সমস্ত চরাচর বিশ্ব এত বৈচিত্র্য, বৈষম্য, বিপর্য্যয় লইয়াও অদ্ভুত সামঞ্জস্যের সহিত ক্রিয়া করিতেছে। মানবের শ্রেষ্ঠ কলা-কৌশল-প্রসূত যন্ত্রও মাঝে-মাঝে বিকল হইয়া যায়; কিন্তু এই আবহমান কাল হইতে চলিষ্ণু বিশ্ব-যন্ত্রের মধ্যে কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, একই প্রণালী জীব ও জড়াত্মক ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। স্থাবর, জঙ্গম একই নিয়মে চলিতেছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে একই অভিব্যক্তির ধারা জীব ও জড়কে একসূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছে। একই ধূলিকণা বা বাষ্পপুঞ্জ হইতে জড়ের বহুবিধ রূপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। মেঘে যাহা ধূমের আকারে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, জলে তাহাই নীলিমার দ্যুতি ফলায়। বরফের আকারে যাহা প্রস্তর-কঠিন, বাষ্পের আকারে

তাহাই স্বচ্ছ ও স্পর্শের অতীত। সমস্ত জড় পদার্থের মধ্যে এই যে অন্তরঙ্গ ভাব আছে, তাহাই অতীতের কোনও অখ্যাত দিবসে হয় ত বীজাঙ্কুর রূপে প্রথম দেখা দিয়াছিল। সেই হইতে এই অগণিত জীব-প্রবাহের আরম্ভ হইল। পাষাণের বক্ষ ফাটিয়া কবে একটুকু ঘাম বাহির হইয়াছিল, আর তাহারই বিন্দু-বিন্দু যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া এক পুণ্য-প্রবাহিনীর সৃষ্টি করিল, যাহার পূত ধারা ধরার বক্ষ শীতল করিয়া দিল।

অনেকে মনে করেন, জীব হইতেই জীব জন্মে, অ-জীব পদার্থ বা জড় হইতে জীবের জন্ম হয় না। এই জন্যই কোনও আদিম জীবপঙ্ক বা Germ-plasmএর কল্পনা করিতে হয়। বৃক্ষ শুকাইয়া পচিয়া ভূ-গর্ভের অঙ্গারে পরিণত হয়, জীবদেহ পরিণামে পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়; কিন্তু অঙ্গার কখনও একটী দূর্ব্বাদলও উৎপন্ন করিতে পারে না এবং পঞ্চভূত কখনও প্রাণের সৃষ্টি করিতে পারে না। প্রাণের সৃষ্টি প্রাণ হইতেই হয়, প্রাণহীন জড় হইতে হয় না। অথচ এই জড় নহিলেও আবার প্রাণের চলে না। প্রাণের সাড়া আছে সত্য; কিন্তু জড় পদার্থ না থাকিলে সে সাড়া কোন্ কালে বন্ধ হইয়া যাইত। বৃক্ষ, লতা জড় পদার্থ হইতেই রস সংগ্রহ করে, বাতাস হইতে কার্ব্বন বা অঙ্গারক গ্রহণ করিয়া তবে বাঁচে। জড় মৃত্তিকা যদি তাহাদের আশ্রয় না দেয়, বৃষ্টি বা জলসেচনের দ্বারা যদি তাহাদের রস-সঞ্চার না হয়, বাতাস, আলো ও তাপ যদি তাহাদের খাদ্য না যোগায়, তবে উদ্ভিজ্জের পরমায়ু সেইখানেই শেষ হয়। আর উদ্ভিদ্ যদি না থাকে, তবে প্রাণী-জগতের পুষ্টিসাধন হয় কিরূপে? জড়ের দ্বারা উদ্ভিদের পুষ্টি, উদ্ভিদের দ্বারা এবং উদ্ভিদ্ ও জীব উভয়ের দ্বারা প্রাণীর পুষ্টি, ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম। তবুও প্রকৃতি জড়, অন্ধ, নিঃসাড়। জড় বা খনিজ পদার্থের ও উদ্ভিজ্জের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা একটী সূক্ষ্মরেখায় পর্য্যবসিত হয়; এবং উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া মিলাইয়া যায়। তথাপি আমরা জড় ও জীবকে পৃথক্ করিয়া দিয়া, তাহাদের সম্পর্ককে জটিল ও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, জড় হইতে জীবের উদ্ভব এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। কোনও পরীক্ষাগারে এ পর্য্যন্ত জীবনের দানা একটীও প্রস্তুত হয় নাই। চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া যেমন একটী নূতন রঙ প্রস্তুত হয়, প্রাণকে সেরূপভাবে উৎপন্ন হইতে আমরা দেখি নাই।

> ন খলু চূর্ণ হরিদ্রা সংযোগ জন্মাহরূণগণ-
> স্তয়োরণ্যতরাভাবে ভবিতুমর্হতি।
> —ভামতী।

প্রাণের রহস্য সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। এই জন্যই প্রাণকে একটী স্বতন্ত্র সত্ত্বা বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা এতক্ষণ যে পারম্পর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, ইহা অন্ততঃ কতকটা আশা করি যে, প্রকৃতির মধ্যে কোথাও ফাঁক নাই; স্তরের পর স্তর, স্তরের পর স্তর এইরূপ ভাবে সামান্য অণু-পরমাণু হইতে ক্রমান্বয়ে জীব-সৃষ্টির মুকুটমণি মানবাত্মা পর্য্যন্ত একই ধারায় চলিয়া আসিয়াছে।

জড়ে যে শক্তি, যে উপাদানপুঞ্জ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাই জীব-জগতের ধারক ও পরিপোষক। যে আলোক গ্রহনক্ষত্রে দীপ্ত হয়, তাহাই হীরক মরকত সুবর্ণে রঙ্গীন্ হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাই পত্রপুষ্পের অফুরন্ত শোভায় বিকশিত হইয়াছে। যে রস মেঘের বাষ্পকণায় পুঞ্জীভূত হইয়া রহে, তাহাই সরিৎসরে বাহিত হইয়া বনৌষধির প্রাণে সঞ্চারিত হয়। আবার তাহাই জীব-দেহের পরিপুষ্টি সাধন করে।

এই ক্রম-বিকাশের ধারা স্বীকার করিলে জড়বাদী হইতে হয়, ইহা আমি স্বীকার করি না। কারণ, এই যে উন্নতির স্তর-লীলায়িত পন্থা, ইহা দৈবের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। দৈব-শক্তি বা chance এই জগৎ-প্রপঞ্চের কারণ হইলে এত সামঞ্জস্য, এমন শৃঙ্খলা, এমন একনিষ্ঠ ধারা সম্ভব হইত না; জড়পদার্থ এমন ভাবে জীবের প্রয়োজন সাধন করিত না। জীবকে প্রস্তুত করিবার জন্যই যেন জড়-বিগ্রহ। সমস্ত বিশ্বের মধ্যে যেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠার একটী বিরাট উদ্যোগ-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইতেছে। সমস্ত জগৎ যেন প্রাণের স্পন্দনে মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে। নদী অমৃত-ধারা বহন করিতেছে, বাতাস অম্লজান অজস্র যোগাইতেছে, তরু-লতা পত্রপুষ্পের সম্ভার উন্মুক্ত করিয়া

দিতেছে, সূর্য্য আলোক ও তাপ দিতেছেন,—এ কি কেবল একটা অন্ধ প্ররোচনা মাত্র? জীবাঙ্কুর কি কীট-পতঙ্গ গো-অশ্বের মধ্য দিয়া নিরর্থক মানুষে পরিণত হইতেছে? এই যে অভিব্যক্তির ধারা ইহা কি অর্থশূন্য দৈবায়ত্ত ঘটনা-পরম্পরায় অন্ধ আবর্ত্তন? এই প্রশ্নই মানবের দর্শনে, ইতিহাসে, কবিতায় ও বিজ্ঞানে, যোগে ও উপনিষদে অনন্তকাল ধরিয়া জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছে। সময়ে-সময়ে মনে হয়, বুঝি বা আমরা এ রহস্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছি; কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাল অতিক্রম করিয়া প্রাণের রহস্য, আত্মার রহস্য, আবার দূর হইতে আমাদিগকে উপহাস করে, বৈজ্ঞানিকের মত আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"The question of questions for mankind—the problem which underlies all others and is more deeply interesting than any other—is the ascertainment of the place which man occupies in nature and of his relations to the universe of things. Whence our race has come; what are the limits of our power over nature, and of nature's power over us; to what goal we are tending; are the problems which present themselves anew and with undiminished interest to every man born into the world."

ছান্দোগ্য উপনিষদে শালাবতের পুত্র শিলক নামে ঋষি প্রবাহণ জৈবলিকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

অস্য লোকস্য কা গতিঃ

এই লোকের গতি কি?

আকাশ ইতি হোবাচ; সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।

প্রবাহণ বলিলেন, আকাশ অর্থাৎ পরমাত্মাই এই পৃথিবী লোকের গতি। সমস্ত স্থাবর জঙ্গম এই পরমাত্মা হইতেই সমুৎপন্ন হয় এবং এই পরমাত্মাতেই অস্তগমন করে অর্থাৎ লীন হয়। এই পরমাত্মাই ভূতসমূহ হইতে মহান্। অতএব অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই পরমাত্মা সকল ভূতের পরম গতি বা চরম আশ্রয়।

তপোবনের শান্তশীতলচ্ছায়ায় বসিয়া সৌম্যকান্ত ঋষিগণ ধীরে স্বস্থ, সমাহিত চিত্তে চিন্তা করিতেছিলেন "ইহ লোকের গতি কি?" মন্ত্রের আশ্রয়স্থল স্বর; স্বরের আশ্রয় প্রাণ; প্রাণের আশ্রয় অন্ন; অন্নের আশ্রয় জল, কেন না জল নহিলে অন্ন উৎপন্ন হয় না; জলের আশ্রয় স্বর্গ; কেন না স্বর্গ হইতে বৃষ্টি পতিত হয়; স্বর্গের আশ্রয় পৃথিবী এবং পৃথিবীর আশ্রয় আকাশ। আকাশ অর্থে ভূতাকাশ বা নভোমণ্ডল নহে, পরমাত্মা। পরমাত্মা হইতেই সমস্ত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; পরমাত্মাই সর্ব্বভূতের আশ্রয়। এই পরমাত্মাকে জানিলে জীবন ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীর ইহা ভিন্ন আর গতি নাই।

অভিব্যক্তির ধারা এই পরমাত্মায় আসিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে। ইতিহাসের মধ্য দিয়া মানবীয় দর্শন পরিপূর্ণতা লাভ করিতেছে। সমস্ত জগৎ, সমস্ত জড় ও জীব পরমাত্মার বিকাশে পরিণতি লাভ করে। দেহের উপাদান জড়; মনের পাত্র দেহ; প্রাণের আশ্রয় অন্ন; মনও অন্নময়, অন্নময়ংহি মনঃ; মনের আশ্রয় আত্মা; আত্মার চরম আশ্রয় পরমাত্মা। অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য পরমাত্মায় পর্য্যবসিত হয়, ইহাই প্রাচীন ঋষিদিগের অভিমত।

অগ্নি-সংস্কার

[ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল্]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সত্যেশের কয়েকটী বন্ধু একদিন তাহাকে সম্বর্দ্ধনার জন্য একটা পার্টী দিল। এরা সত্যেশের সাবেক বন্ধু, তাহার ছাত্র-জীবনের সঙ্গী। সত্যেশের অদৃষ্টক্রমে সে এখন যে দলে আসিয়া পড়িয়াছে, এ সব বন্ধু সে দলের নয়। ইহাদের মধ্যে কেউ উকীল, কেউ কেরাণী, কেউ মাষ্টার, কেউ প্রফেসার, কেউ বা জমীদার; কিন্তু সকলেই বাঙ্গালী অর্থাৎ বিলাতফেরত সমাজেরও নয়, সে সমাজের সঙ্গে বড় সম্পর্কও নাই। আর তাহারা সকলেই এখনো জীবন-সংগ্রামের প্রথম ধাপে, এখনো সত্যেশের মত কেউ মাথা ঝাড়া দিয়া ওঠে নাই।

সত্যেশের এ দিনটা বড় আনন্দে কাটিল। সে বন্ধুদের সঙ্গে অনেক দিনের পর প্রাণ খুলিয়া একটু আনন্দ করিবার অবসর পাইল। যে সমাজের ভিতর সে পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বড় একটা জুটে নাই, আর বেশীর ভাগ লোকের উপর তো তার বিশেষ শ্রদ্ধাই ছিল না। কাজেই প্রাণ-খোলা আনন্দ সে সমাজে সে পাইত না। তা' ছাড়া, সে সমাজের সবার ভিতর এবং সকল জিনিষেরই মধ্যে সত্যেশ এমন একটা অস্বাভাবিক ভাব দেখিতে পাইত, এমনি একটা আড়ষ্ট-গোছের চলন-চালন, কথাবার্ত্তা দেখিত যে, তাহার মনে হইত ঠিক যেন সবাই মুখোস পরিয়া ষ্টিল্টে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাই তাহার বড় বাধ-বাধ ঠেকিত, সেও মুখোস পরিয়া ষ্টিল্টে চড়িয়া থাকিত। কিন্তু এখানে আজ তার অনেক দিন পরে মনে হইল যেন সে মাটীতে পা ফেলিয়া মানুষের মত ঘোরা-ফেরা করিতেছে;—তাহার মুখোস পরিবার যেন আর কোনও দরকার নাই।

খুব উৎফুল্ল হৃদয়ে সে বাড়ী ফিরিল; খুব আনন্দের সঙ্গে শিষ্ কাটিতে-কাটিতে ঘরে ঢুকিল। তখন বেশ রাত্রি হইয়াছে। ইলা ড্রইং-রুমে তার রাইটিং-টেবিলের কাছে বসিয়া কি যেন লিখিতেছে। সত্যেশ এক রকম নাচিতে-নাচিতে আসিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া ফেলিল। স্বামীর অনেক দিন পরে এমনি হাসিমুখ দেখিয়া ইলাও হাসিল, তার যেন হাসির একটা ছোঁয়াচ্ লাগিয়া গেল। খানিক ক্ষণ হাসি-তামাসা রঙ্গরস হইলে ইলা কপট ক্রোধভরে তার বড়-বড় ডব্‌ডবে চোখ দুটী ঘুরাইয়া বলিল, "যাও, তুমি বড় কাজ নষ্ট ক'রতে পার! আমি যে ভারি ব্যস্ত আছি দেখছো না!"

"তাই না কি! তবে মাথার উপর একটা লেবেল মেরে রাখনি কেন 'ব্যস্ত'। আমরা আফিসে কারখানায় কাজ করি; সেখানে সব জিনিষে লেবেল মারা থাকে; তা না হ'লে আমরা কিছু বুঝি না। যাক্, কাজখানা কি জানতে পারি কি?"

ইলা বলিল, "না জেনে আর এখন উপায় কি? আমি কিন্তু ভেবেছিলাম যে, এটা একেবারে শেষ না ক'রে তোমাকে জানাব না! তোমাকে surprise করবো।"

"তাই না কি? আচ্ছা, আমি দেখ্‌বো না! কিন্তু আমি guess করি। আচ্ছা, এই আমার আজকের party থেকে এটা তোমার মনে হ'য়েছে? না?"

ইলা স্বীকার করিল।

তা'র পর সত্যেশ অনেকক্ষণ ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে-ভাবিতে তা'র চক্ষু বারবার ইলার হাতে-চাপা কাগজখানির উপর পড়িতে লাগিল এবং একবার সে একটু লেখা দেখিতে পাইল;—তা'র পর যেন কিছু দেখে নাই, এইরূপ ভাবে সে বলিল, "ইচ্ছা, একটা পার্টী দেবার প্রস্তাব হ'চ্ছে, Mrs Mukherjee at Home—না?"

ইলা হাসিয়া তাহার হাতের কাগজখানা খুলিয়া দেখাইল,—সেখানা একখানা নিমন্ত্রণের কার্ডের খসড়া। তাহার বন্ধুদিগকে বাড়ীতে আনিয়া সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ইলার এই আগ্রহ দেখিয়া সত্যেশ ভারি খুসী হইল। সে বলিল, "খুব ভাল কথা, কিন্তু দেখ, এসব at Home-

টোমে ওরা বড় আমোদ পাবে না, আমার মতে এটা একটা পূরাপূরি ডিনার করাই উচিত।"

ইলা এতটা করিতে ভরসা করে নাই; তাহার স্বামী যে তাহার প্রস্তাব মোটে পছন্দ করিবেন কি না, সে সম্বন্ধেও তাহার একেবারে সন্দেহ ছিল না এমন নয়। কাজেই সে খুব আনন্দের সহিত সম্মত হইল।

সত্যেশ বলিল, "ডিনার দেশীভাবে—একেবারে ঠাঁই ক'রে খাওয়া, সেই ভাল হ'বে; তা'র পর after-dinner party হবে!"

দেশীভাবে খাওয়াইতে ইলার কোনও আপত্তি ছিল না; কেন না সে নিজে অনেকগুলি দেশী রান্নার বিশেষ পক্ষপাতী ছিল। ঠাঁই করিয়া খাওয়াইতেও তাহার অন্য কোনও আপত্তি ছিল না; কিন্তু টেবিলে বসিয়া খানা খাইলে খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বেশ একটু মজলিশ করা যায়, ঠাঁই করিয়া খাইলে তেমনটি হয় না বলিয়া ইলার মন সরিতেছিল না। সে একটু মৃদু আপত্তি করিল। সত্যেশ সব আপত্তি ভাসাইয়া দিল। সে সত্যসত্যই উৎসাহিত হইয়া উঠিলে তাহার মুখের সামনে কেহ কখনও দাঁড়াইতে পারিত না। ইলার সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া ইলার সম্মতি আদায় করিবার পর শেষে সত্যেশ বলিল "তা' ছাড়া, ওদের মধ্যে অনেক হয় তো কাঁটা-চামচে ব্যবহার ক'রতেই জানে না।"

ইলা প্রথমে কথাটা বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিতেছিল, তা'র বিলাত-ফেরত বন্ধুদের কথা; আর সত্যেশ ভাবিতেছিল তা'র দেশী বন্ধুদের কথা। তাই ইলা না বুঝিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সত্যেশের মুখের দিকে ফিরাইল; পর মুহূর্ত্তে সে বুঝিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, "হাঁ তা বটে।" সে যে একটু অপ্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার বিব্রত ভাবটা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে, সত্যেশ তাহা দেখিতে পাইল। চট্ করিয়া তাহারও সত্য কথাটা এতক্ষণে খেয়াল হইল। সে ধরিয়া লইয়াছিল যে, ইলা তাহার দেশী বন্ধুদের পার্টীর রিটার্ণ দিবার জন্য ব্যস্ত। সেটা যে সম্পূর্ণ ভুল এবং ইলা যে তাহাদের কথা মোটেই ভাবে নাই, এই মুহূর্ত্তে তাহার সে সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। ইলার প্রতি প্রীতির যে উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছিল, তাহা এখন প্রায় বিরাগে পরিণত হইল। সে যথাসম্ভব মনোভাব গোপন করিয়া বলিল, "নিমন্ত্রিতদের লিষ্ট ক'রেছ ?"

ইলা একটু স্পষ্ট ভাবেই লাল হইয়া উঠিল। সে মিথ্যা কথা বলিতে পারিত না, বলিতে গেলে মিথ্যাটা খুব স্পষ্ট-ভাবেই ধরা পড়িত। সে আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "হাঁ কতক-কতক নাম লিখেছি," বলিয়া ডেস্কের এক পাশে রাখা একখানা কাগজের দিকে সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় হাত বাড়াইল। সত্যেশ চট্ করিয়া সেই কাগজখানা তুলিয়া লইয়া দেখিল। তাহাতে ইলা তাহার সুন্দর মুক্তার মত হরপে খুব পরিচ্ছন্ন করিয়া একটি লিষ্ট প্রস্তুত করিয়াছে। লিষ্টের শেষে সে বেশ একটু কারিগরি করিয়া দাগ টানিয়া দিয়াছে—স্পষ্টই বুঝা যায় যে তার মতে এই লিষ্ট সম্পূর্ণ হইয়াছে। সত্যেশ দেখিল যে, তাহার বাড়ীতে যে সকল বিলাতী বন্ধুর যাতায়াত আছে, তাহার কারখানায় এবং আফিসে মার্কিন ও বাঙ্গালী যত বড় কর্ম্মচারী আছে, তাহাদের কেহ বাদ যায় নাই; কিন্তু গোড়ায়, মধ্যে বা শেষে কোথাও তাহার দেশী বন্ধুদের নাম নাই! অথচ ইলা নিজে স্বীকার করিয়াছে যে, আজকার পার্টীর কথায়ই তাহার একটা পার্টীর কল্পনা হইয়াছিল। তাহার প্রকৃত বন্ধুদের সম্বন্ধে ইলার এই তাচ্ছিল্য সত্যেশের বুকে আঘাত করিল। সে কিছু প্রকাশ করিল না, সুধু বলিল, "তা' বেশ, এ তো সম্পূর্ণই হ'য়েছে।"

সত্যেশের হাসি ও উৎসাহ মিলাইয়া গিয়াছিল। ইলা বুঝিয়াছিল, কিসের জন্য। সে একটু লজ্জিত ও একটু শঙ্কিত হইয়া বলিল, "না, এটা সম্পূর্ণ নয়, তোমার আজকের পার্টীর বন্ধুদের নামের লিষ্টটা তুমি ক'রে দেবে ব'লে রেখে দিয়েছি।"

সত্যেশ এ বঞ্চনায় বঞ্চিত হইল না। সে বলিল, "না, এ দলে তা'রা ঠিক মিশ খাবে না, এরা এমনি থাক।"

ইলার বুক কাঁপিয়া উঠিল; সে হাসির অভিনয় করিয়া বলিল, "বাঃ, তা'দের পার্টীর রিটার্ণের জন্যেই পার্টী, আর তাদেরই বাদ দেবে?"

সত্যেশ এই ব্যর্থ বঞ্চনার চেষ্টায় একটু হাসিল, কিন্তু ইহা লইয়া আর গোলযোগ করা সঙ্গত মনে করিল না। "আচ্ছা কাল সকালে দেব" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় ছাড়িতে গেল।

কাজেকাজেই সত্যেশের বিরাট পার্টীতে তাহার নিরেট বাঙ্গালী বন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ হইল। কিন্তু নিমন্ত্রণের রাত্রি

শেষ হইবার পূর্ব্বেই সত্যেশ হাড়ে হাড়ে বুঝিল যে, ইহাদের নিমন্ত্রণ না হইলেই ছিল ভাল।

সেদিন রাত্রি ৮টার সময় হইতে দলে-দলে নিমন্ত্রিতেরা আসিতে লাগিল। লীলা, ইলা ও সত্যেশ তাহাদিগকে গাড়ী-বারান্দা হইতে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইতে লাগিল। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী ক্লাব হইতে তাঁহার একটি পুরাতন এটর্ণি বন্ধুকে লইয়া সর্ব্বাগ্রে পৌঁছিলেন। সত্যেশ তাঁহাদিগকে লইয়া ড্রইং-রুমে বসাইয়া দিল এবং খানিকক্ষণ বসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল।

সত্যেশ বসিয়া গল্প করিতে-করিতে ইলাদের কয়েকজন ছোকরা বন্ধু ও মহিলা আসিলে ইলা ও লীলা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তাহারা সিঁড়িতে পা দেওয়ার পর হইতেই একটা হাসির ফোয়ারা ছুটিয়া গেল, ইলা ও লীলা এই বন্ধুদের সঙ্গে একেবারে হাসি-তামাসা ও গল্পে যেন ডুবিয়া গেল। ইহারা সিঁড়ির মাথায়ই দাঁড়াইয়া রহিল, ড্রইং-রুমের ভিতর গিয়া বসিল না। তাহাতে অভ্যর্থনা ব্যাপারটা খুব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সহায়তা হইল না। দেখিয়া সত্যেশ উঠিয়া একবার সিঁড়ির কাছে গেল, ইচ্ছা ইহাদিগকে আনিয়া ঘরের ভিতর বসায়। সত্যেশ যখন দরজার কাছে, ঠিক তখনি বুড়ো ব্যানার্জ্জী-প্রমুখ একদল ছোকরা আসিয়া জুটিল। ইলা অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেই ব্যানার্জ্জী বলিলেন, "I say, you look charming! ওহে সত্যেশ, তুমি কাজটা ভাল করছো না। তুমি যদি ইলাকে harem-এ না রাখ, তা' হ'লে শীঘ্র একটা কাণ্ড-কারখানা হ'য়ে যাবে।" ইলা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল; তাহার মুখখানা একটা টকটকে গোলাপের মত লাল হইয়া উঠিল।

সত্যেশ কিছু না বলিয়া হাস্যমুখে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে ঘরে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে কার্য্য সহজ হইল না। দলের প্রত্যেকে পর্য্যায়ক্রমে এবং একসঙ্গে, ইলা ও লীলার সঙ্গে অনেকক্ষণ হাস্য-পরিহাস করাটা এই অভ্যর্থনা-লীলার একটা অত্যাজ্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিল। ফলে সেই অল্প-পরিসর ল্যাণ্ডিংটায় বেশ একটা ভিড় অনেকক্ষণ জমিয়া রহিল এবং সেই ভিড়টা ইলা ও লীলাকে ঘিরিয়া চক্রবৎ ঘুরিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর ব্যানার্জ্জী বলিলেন, "ওহে সত্যেশ, তোমাকে public nuisance করার জন্য prosecute ক'রতে হয়।"

সত্যেশ বলিল "অপরাধ?"

ব্যানার্জ্জী। এই দেখছো না, পাব্লিকের গমনা-গমনের রাস্তা এমন ক'রে বন্ধ ক'রেছ।

সত্যেশ। মন্দ নয়, আপনারা করেন nuisance, আর আমায় ক'রবেন prosecute, এ আপনার কোন্ আইনে বলে?

ব্যানার্জ্জী। বলে হে বলে, ধারাটা আমার এখন ঠিক মনে হ'চ্ছে না; কিন্তু সে ধারায় তোমাকে প্রসিকিউট্ করা চলে। আমি যখন প্র্যাক্টিস্ ক'রতাম, তখন একটা ঢুলিকে ধ'রে কোথাকার এক হাকিম জেলে পূরেছিল। আমি তা'র মোশন করি হাইকোর্টে। জজ-সাহেবদের বিচারে দাঁড়াল এই যে, আমার মক্কেল নিজে যে খুব দোষী তা' নয়, তবে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঢেঁটরা দিচ্ছিল, এবং তা'তে চার-দিককার লোকজন তা'কে ঘিরে রাস্তা বন্ধ ক'রেছিল—সেইজন্য তা'র শাস্তি বহাল রইল। আর এমন তো আখ্ছার হ'চ্ছে। তুমি যদি পথের মধ্যে বাঁদর নাচান আরম্ভ ক'রে দাও, আর তা'তে যদি লোক জুটে রাস্তায় চলাচল বন্ধ করে, তবে তোমাকে prosecute ক'রবে না? ভাল চাও তো তোমার ওই ছুঁড়ীটাকে সরাও, নইলে এ ছোকরাগুলো এখান থেকে নড়বে না।

ইলা এ কথায় বড় লজ্জিত হইল; ছোকরাদের মধ্যে হাসির গর্‌রা পড়িয়া গেল; কিন্তু ভিড় ক্রমশঃ ঘরের দিকে যাইতে আরম্ভ করিল; লীলা তাহাদের লইয়া ঘরে ঢুকিল।

তখন তিন গাড়ী বোঝাই করিয়া দল বাঁধিয়া সত্যেশের দেশী বন্ধুরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সকলে ফটকের বাহিরে নামিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া একজোট হইয়া ম্যাসিডোনিয়ান ফ্যালাংসের মত একসঙ্গে আসিয়া সিঁড়ির উপর উপস্থিত হইল। সত্যেশ অর্দ্ধেক সিঁড়ি নামিয়া গিয়া তাহাদের অভিবাদন করিল; তা'র পর একে-একে সকলকে ইলার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিল। ইলা সকলের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল; বন্ধুরাও সব অত্যন্ত লজ্জিত, আড়ষ্টভাবে কোনও মতে এই অনভ্যস্ত নারী-সম্ভাষণ ব্যাপার সমাধা করিয়া সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইল। দেখিয়া সত্যেশ তাহাদিগকে ঘরের ভিতর

লইয়া বসাইল। তাহারা সবাই খুব ঠেসাঠেসি করিয়া ঘরের এক কোণ জুড়িয়া বসিল। সত্যেশের বিলাতী বাবুদের মধ্যে কেহ এই দলের সঙ্গে শিষ্টালাপ করিতে অগ্রসর হইলেন না দেখিয়া সত্যেশ নিজেই তাহাদের মধ্যে বসিয়া তাহাদিগের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু বাবুরা কেহই বড় স্বস্তি বোধ করিতেছিল না। তাহাদের কথার উৎস যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যে সব চেয়ে রসিক, যে তাহাদিগকে আট-দশ ঘণ্টা সমানে হাসির ফোয়ারায় স্নান করাইতে পারিত, সেও সম্পূর্ণ স্তব্ধ ও নীরব হইয়া রহিল; মৃদুস্বরে দু' একটা পরিহাসের চেষ্টা করিয়া দেখিল সুবিধা হইতেছে না। হাস্যরসের ধারা আপনি যদি বন্ধ হয়, তবে চেষ্টা করিয়া তাহার সৃষ্টি অসম্ভব। তাই সে চুপ করিয়া গেল।

সত্যেশের এই বাবুদের হংসমধ্যে বকের মত বোধ হইতেছিল। তাহারা অনুভব করিতেছিল যে, এই যে সমাজের ভিতর তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে, ইহার ভিতর যেন তা'রা অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে; আরও, এই সমাজের লোক যাহারা, তাহারাও যে সেই রকমই মনে করিতেছিল, তাহা, তাহারা কোনও কথা না বলিলেও, তাহারা সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতেছিল। সত্যেশ সাধ্য-মত তাহাদের এই ভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু সেও তাহাদের এই অস্বস্তিটা বেশ অনুভব করিতেছিল বলিয়াই তাহার কথা-বার্ত্তাও খুব জমিয়া উঠিতে পারিল না। তা'র পর যখন দরজার দিকে চাহিয়া সে দেখিল যে, ইলা, লীলা ও তাহাদের কয়েকটি যুবক বন্ধু তাহাদের দিকেই চাহিয়া বেশ স্পষ্টভাবেই হাসা-হাসি করিতেছে, তখন লজ্জায়, বিরক্তিতে তাহার মনের স্থিতিস্থাপকতা একেবারে ওলট-পালট হইয়া গেল। সে তাহার বন্ধুদিগের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; তাহাদের মধ্যেও অনেকে তাহা দেখিতেছে। লজ্জায় ঘৃণায় সত্যেশের মুখচোখ লাল হইয়া উঠিল। ইহার পর কথা-বার্ত্তা চালান প্রায় অসম্ভব হইল। সত্যেশ উঠিয়া ইলার কাছে গেল। তখনও তাহাদের কথা-বার্ত্তা চলি-তেছে; লীলা বলিতেছে, "ওরা হ'চ্ছে সত্যেশ as he was. তা'র সঙ্গে আমার যেদিন প্রথম আলাপ হয়, সেদিন সেও অমনি জুজুর মতন ঘাড় নীচু ক'রে ব'সে ছিল।" সত্যেশ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া ইলাকে টানিয়া লইল, তাহার ভ্রূ-কুঞ্চিত। সে তাড়াতাড়ি খাওয়ার উদ্যোগ করিয়া সবাইকে খাইবার ঘরে লইয়া গেল।

আহারের পর ড্রইং-রুমে সত্যেশের বন্ধুরা আর বেশী-ক্ষণ অপেক্ষা করিল না; একটা গান হইতেই তাহারা বিদায় হইল, কেন না, তাহাদের ট্রাম ধরিবার ইচ্ছা ছিল। যেমন সঙ্কুচিত-ভাবে তাহারা আসিয়াছিল, তেমনি সঙ্কুচিত-ভাবেই তাহারা বিদায় হইল। ইলাকে প্রথমে তাহারা দূর হইতে সবাই নমস্কার করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জনের বিলাতী কায়দা-কানুন একটু পড়া ছিল, সে অগ্রসর হইয়া ইলার কাছে বিদায় চাহিল; সঙ্গে-সঙ্গে আর সকলে অগ্রসর হইয়া আসিয়া যেন-তেন-প্রকারেন ঠেলা-ঠেলি করিয়া বিদায়টা সারিয়া ফেলিল। সত্যেশ তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে ফটক পর্য্যন্ত গিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিল। ফটকে দাঁড়াইয়াও অনেকক্ষণ তাহাদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা হইল।

যখন তাহারা চলিয়া গেল, তখন সত্যেশ ঘরে না ঢুকিয়া বাগানের একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। সে দিন অমাবস্যা; আকাশে তারাগুলি ঝলমল করিতেছে। রাস্তা-গুলি অনেকটা নির্জ্জন হইয়া আসিয়াছে। তার ভিতর গ্যাসের আলোগুলি যেন আকাশের তারার সঙ্গে পাল্লা দিয়াই ঝলমল করিতেছে। গাছগুলি নীরব গাম্ভীর্য্যে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; কেবল তাহাদের মধ্য দিয়া মাঝে-মাঝে অতি সন্তর্পণে পাতাটি নাড়িয়া একটু মৃদু বায়ু সামান্য জীবনের সাড়া দিতেছে। সত্যেশ উপরের হট্টগোলের মধ্যে বিরক্তির পাত্র পূর্ণ করিয়া আসিয়া এই নীরব গাম্ভীর্য্যের ক্রোড়ে মুহূর্ত্তের জন্য আশ্রয় লইল। তাহার মনের ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল; ইলার উপর রাগ হইতেছিল; তার আত্মীয়দিগকে সে অভিশাপ দিতেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ এই শান্তভাবের মধ্যে বসিতেই তাহার ক্রোধ বিষাদে পরিণত হইতে লাগিল; তাহার সমস্ত ক্রোধকে আচ্ছন্ন করিয়া একটা ব্যর্থতার বিষাদ তাহার হৃদয়কে পরিপূর্ণ রূপে আবৃত করিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল, সে প্রথম জীবনে একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়া সমস্ত জীবনের সুখ-শান্তি জন্মের মত বিসর্জ্জন করিয়া বসিয়াছে। এই স্ত্রী লইয়া, এই সমাজ লইয়া জীবন তাহার কাছে একটা ব্যর্থ বোঝার ভার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার জীবনটা একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি, একটা গাধার

বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সুন্দর মাধবী লতাকে সে আনন্দ করিয়া, আশা করিয়া বুকে জড়াইয়া লইয়াছিল, তাহা আজ কালসর্প হইয়া তাহার হৃদয়ের রক্ত বিষে ভরিয়া দিয়াছে। হা অদৃষ্ট! কেন রূপ দেখিয়া মজিয়াছিল সে, কেন সে নিজের সমাজের ভূমি ছাড়িয়া একটা অদ্ভুত দো-আঁসলা সমাজের ভিতর শিকড় গাড়িতে গিয়াছিল!

ভাবিয়া-ভাবিয়া সত্যেশের মনের ক্ষোভের তীব্রতা শান্ত বিষাদে পর্য্যবসিত হইল। সে ভাবিল, সুখের জন্য তাহার জগতে আসা হয় নাই; দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়াই তাহাকে জীবন কাটাইয়া দিতে হইবে, ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। এই ভাবিয়া সে মনটাকে শান্ত করিল। তাহার লম্বা-লম্বা চুলের ভিতর দিয়া আঙ্গুলগুলি চালাইয়া দিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার সম্মুখের কেশ আকর্ষণ করিয়া দন্তে অধর দংশন করিয়া সে তাহার জীবনের এই martyrdom আয়ত্ত করিল, তার পর অপেক্ষাকৃত শান্তচিত্তে সে ঘরে ঢুকিল। কিন্তু সেখানে যে আনন্দের মেলা চলিতে লাগিল, তাহাতে সে যোগদান করিতে পারিল না। তাহার ভাবান্তর কেহ লক্ষ্য করিল কি না, সে বুঝিতে পারিল না। যখন ক্রমে সভা ভঙ্গ হইল, তখন একে-একে সবাই বিদায় গ্রহণ করিল। সত্যেশের নিকট সবাই সংক্ষেপে বিদায় লইল, কেবল চ্যাটার্জ্জী সাহেব তাহার হাত জোরে চাপিয়া বেশ আবেগের সহিত বিদায় লইতে গিয়া বলিলেন, "তোমার চেহারা ভাল দেখাচ্ছে না, তোমার অসুখ করেছে কি?"

সত্যেশ "না" বলিয়া একটু হাসিল। চ্যাটার্জ্জী তাহার হাত ধরিয়া খুব জোরে ঝাঁকি দিয়া বলিলেন, "Back up old boy! মুশড়ে যেও না, বীর হও। সংসার-সংগ্রামে বীর হওয়া বড় সোজা কথা নয়।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কথাটা সত্যেশের কাণে বাজিতে লাগিল, তা'কে বীর হইতে হইবে! সহিবার জন্য, মরিবার জন্য তাহার বীর হইতে হইবে! কিন্তু এ কি অবিচার! আর দশ-জনে কেবল প্রজাপতির মত আনন্দ করিয়া বেড়াইবে, সে কেবল লড়িয়াই যাইবে, ইহার কি অর্থ আছে?

ক্রমে সকল অতিথি চলিয়া গেল। শেষ অতিথিকে বিদায় দিতে সত্যেশ বাগানের ফটক পর্য্যন্ত গেল; তার পর বাগানে খানিক পায়চারী করিয়া ফিরিল। তখনও তাহার মুখ মেঘাচ্ছন্ন।

ইলা সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও চিন্তার ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া ড্রইং-রুমের একটি সোফায় গা ছাড়িয়া শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার সুগঠিত, নবনীত-কোমল বাহু দুটি হাতা-কাটা জামার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া সমস্ত মুখটাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইলেক্‌ট্রিক পাখার তলে হাওয়া খাইতেছে। যখন সুন্দরী যুবতী তাহার শরীর ও মনের সমস্ত বন্ধন এলাইয়া দিয়া আপনাকে আলস্যের ক্রোড়ে ছাড়িয়া দেয়, তখন সে ছবি বড় সুন্দর হয়। সত্যেশ বহুদিন এইরূপ ছবি কল্পনা করিয়া আনন্দ বোধ করিয়াছে, ইলার এই মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু, আজ যেন ইলাকে এইরূপে দেখিয়া তাহার মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল,—এ যেন অলস বিলাসের, হৃদয়শূন্য লঘু-চিত্তের, অন্তঃসারশূন্য মেকী রূপের জলসা! সত্যেশ কিছু না বলিয়া তা'র ড্রেসিং-রুমের দিকে চলিল; কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়াই থামিল। ভাবিল "নাঃ, আর চলে না।" আজ একবার মন খুলিয়া দুটা কথা না শুনাইলে তাহার অশান্ত মন কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। যাহাকে লইয়া চিরদিন ঘর করিতে হইবে, তা'র সঙ্গে একটা বোঝাপড়া দরকার। এই মনে করিয়া সে একখানি চেয়ার লইয়া ইলার সামনে বসিল। ইলা তাহার হাত দু-খানা সত্যেশের কোলের উপর রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। সে চাহনি অলস বিলাসের নহে, তাহা অন্তঃসারশূন্য লঘু হৃদয়ের নহে; তাহা করুণায় ভরা, নির্ভরশীল স্নেহে পরিপূর্ণ। এই চাহনিতে সত্যেশের প্রস্তাবিত কথাগুলো ওলোট-পালোট হইয়া গেল। খানিক-ক্ষণ সে কিছু বলিতে পারিল না। যে সকল কথা তাহার মনে আসিতে লাগিল, সেগুলি অত্যন্ত চড়া-চড়া; কিন্তু এখন আর ইলাকে আঘাত করিতে তা'র মন সরিতেছিল না। কথাগুলি একটু মোলায়েম করিয়া বলিবার ইচ্ছায় সে মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

ইলাও কিছু বলিতে পারিল না। তারও মনের ভিতর একটা অপ্রিয় কথা উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল; সেও সে কথাটা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল। আজ ইলার ব্যবহার সত্যেশের চক্ষে যেমন বিসদৃশ ঠেকিয়াছে, সত্যেশের ব্যব-

হারও ইলার বন্ধুদের কাছে ঠিক সেইরকম বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল ;—কাজেই ইলার কাছেও কতকটা অন্যায় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সত্যেশ তার দেশী বন্ধুদিগকে খুসী রাখিতে যাইয়া তাহার বিলাতী বন্ধুদিগের দিকে একেবারে নজর দেয় নাই। সেজন্য লীলা ও তাহার বন্ধুরা বেশ একটু রাগ করিয়াছে এবং সত্যেশকে cad বলিয়াছে, তাহা ইলা শুনিয়াছে। সত্যেশের অসামাজিকতাকে ঢাকিয়া তা'কে সমাজে চালাইয়া লওয়া ইলার জীবনের একটা প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। স্বামীর সকল দোষ-ত্রুটি যথাসম্ভব লুকাইয়া এবং নিজের সৌজন্যের আতিশয্যে সকলকে খুসী করিয়া সমাজে স্বামীর প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিত। কিন্তু সত্যেশ আজ যে রকম রূঢ়ভাবে সকলকে যেন বিশেষভাবে দেখাইবার জন্যই তাহার অসামাজিকতার প্রচার করিয়াছে, তাহাতে ইলার সকল চেষ্টাই বৃথা হইয়াছে, তাহা সে বুঝিল। সত্যেশ যদি এমন করিয়া সকলকে ঘা' দেয়, তবে ইলা কেমন করিয়া বন্ধু-সমাজে তাহাকে প্রিয় করিবে। তাই আজ ইলা স্বামীকে এই কথাটা বলিতে চাহিতেছিল। কিন্তু অপ্রিয় কথা বলা তাহার কোষ্ঠীতে লেখে নাই; সে কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, কি রকম করিয়া কথাটা পাড়া যায়।

দুইজনেরই মনের ভিতর এই অবস্থা, কাজেই কেউ একটা বাজে কথাও বলিয়া উঠিতে পারিল না। অনেকক্ষণ এইরূপ নীরব অভিনয়ের পর ইলার মনে হইল যে, চুপ করিয়া থাকাটা ভাল দেখায় না। কিন্তু কি বলিবে তাও ছাই খুঁজিয়া পাইল না। যতই ভাবিল, ততই এই নীরবতার অশোভনতা তাহার কাছে বেশী অন্যায় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাই সে শেষে ধপ্ করিয়া বলিয়া বসিল, "দিদি আজ তোমাকে বড়—এই—এই ঠাট্টা ক'রছিল।" "নিন্দা ক'রছিল"—কথাটা তাহার জিভের ডগায় আসিয়াছিল, সে শেষ মুহূর্ত্তে তাহা সম্বরণ করিল।

গরম তেলে বেগুন পড়িল। লীলার নামেই সত্যেশ জলিয়া উঠিত, আজ তো উঠিবেই। ইলা স্বামীর আঘাত বাঁচাইবার চেষ্টায় কথা খুঁজিয়া-খুঁজিয়া অবশেষে যে কথাটী বলিল, তাহাতে তার হৃদয়ের ভিতর যে ঘা, তাহাতে কঠোর আঘাত করিল। সত্যেশ তাহার উদ্যত ক্রোধ কষ্টে চাপিয়া বলিল, "অপরাধ ?"

কথাটা বলিয়াই ইলার মনে হইতেছিল যে, আজ কথাটা না তুলিলেই ছিল ভাল। কিন্তু যখন উঠিয়া পড়িয়াছে, তখন আর না বলিয়া তাহার উপায় রহিল না। সত্যেশ যে আজ তার বিলাতী বন্ধুদের রীতিমত অবহেলা করিয়াছে, সেইজন্য লীলা রাগ করিয়াছে, এ কথা তাহার স্বীকার করিতে হইল।

সত্যেশের বুকের ভিতর ঝড় বহিতে লাগিল। এক রাশ খুব চোখা-চোখা কথা তাহার বুক ঠেলিয়া এক-সঙ্গে বাহির হইবার জন্য মনের ভিতর হুড়ামুড়ি করিতে লাগিল। সত্যেশ বলিল, "আমি তোমার বন্ধুদের neglect ক'রেছি—কিন্তু তুমি কি ক'রেছ ভেবে দেখেছ কি ?"

কথার সুরে ইলার সন্দেহ করিবার কোনও কারণ রহিল না যে, ইহা আগ্নেয়গিরির অগ্নুদ্গারের প্রথম উচ্ছ্বাস মাত্র। সে তাহার বিষাদপূর্ণ চক্ষু দুটি সত্যেশের মুখের উপর রাখিয়া শঙ্কিত চিত্তে অগ্নিবর্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সত্যেশের রক্ত মাথায় উঠিয়া গিয়াছিল। সে বলিয়া গেল, "তুমি আর তোমার বন্ধুরা, বিশেষ তুমি, যে ব্যবহার ক'রেছ, বিলাত হ'লে লোকে এর জন্য তোমার গায় থুথু দিত! আমার বন্ধুদের যেচে-পড়ে নেমন্তন্ন ক'রে এনে অপমান ক'রবার তোমার কি দরকার ছিল? কি অধিকার ছিল তোমার তাদের অপমান ক'রবার? তুমি তা'দের নগণ্য বলে' অগ্রাহ্য তো করেইছো, আর তা'র পর তাদের সঙ্গে অশিষ্টতার এক-শেষ ক'রছো।"

সত্যেশ থামিল। ইলার হাতখানা সত্যেশের কোল হইতে পড়িয়া গেল। ইলা আড়ষ্ট জড়ের মত কেবল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একবার শুধু বলিল, "আমি কি ক'রেছি ?"

"কি ক'রেছ ? হায় রে! এমনি তোমার শিক্ষা-সংসর্গ যে, তোমাকে এ কথাও বুঝিয়ে দিতে হয়! তোমরা কয়জন যে তফাৎ থেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওদের দেখে-দেখে ফিস-ফিস ক'রছিলে, আর হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছিলে, সেটা কোন্ দেশী ভব্যতা? কোথাকার এ শিষ্টাচার? তুমি তা'দের hostess, তারা তোমারই নিমন্ত্রিত,—আর

তুমি স্বচ্ছন্দে, তা'দের চোখের উপর দাঁড়িয়ে, লজ্জার মাথা খেয়ে, এমনি ক'রে তাদের নিয়ে তামাসা ক'রতে পারলে? একটু কি লজ্জা হ'ল না?"

ইলা কথা কহিল না, মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। সে বলিল না যে, অপরাধ তাহার নহে, তাহার দিদির। সে বরঞ্চ স্বামীর বন্ধুদের পক্ষেই দু'চারটা কথা বলিয়াছিল। কিন্তু তা'র দিদি এবং মিষ্টার বোস এমন ভয়ানক হাসির কথা সব বলিতেছিলেন যে, সে একটু না হাসিয়া পারে নাই। সে জন্য সে তখনই অনুতপ্ত হইয়াছে। এ সব সে বলিতে পারিত, কিন্তু বলিল না।

সত্যেশ বলিয়া গেল, "আর কেবল তোমার অতিথিদের নয়, তোমার স্বামীর পর্য্যন্ত নিন্দা হ'চ্ছিল, আর সেই নিন্দায় তুমি অকাতরে হেসে এই বর্ব্বরদের উৎসাহ বর্দ্ধন ক'রছিলে। ভদ্রতা, শিষ্টতা তো শেখই নি, আমার প্রতি একটু শ্রদ্ধাও কি তোমার নেই, যাতে ক'রে তুমি আমার নিন্দা শুনতে কষ্ট পেতে পার?

"আর, তা'দের অপরাধটা কি, যে, তাদের তুমি এমন অপমান ক'রলে? কি না, তারা তোমাদের মত রং-করা পুতুল নয়, তোমাদের মত টক্‌টক্ ক'রে পাখনা উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় না, ফট্ ফট্ ক'রে অন্তঃসারশূন্য কথা কয় না। কিন্তু জান কি, যাদের চোখ আছে, তারা কি মনে করে? তোমাদের এ বিলাতী ভড়ংএ তাদের চোখে ধুলো লাগে না। তাদের কাছে তোমরা কেবল রং-করা খেলার পুতুল। আর ওরা মানুষ। ওদের একটা প্রাণ আছে, মনুষ্যত্ব আছে! ওরা মানুষ! এই বাঙ্গালা দেশের মানুষ,—ওরাই বাঙ্গালী। আর নকলনবীশ মেকি ফিরিঙ্গি তোমরা;—তোমরা এ দেশের কেউ নও, কোনও দেশেরই কেউ নও। তোমরা মাথা উঁচু ক'রে ফেরো, আর যে তোমাদের মত নয়, তাকে ঘৃণা কর,—এমনি তোমাদের অহঙ্কার! কিন্তু যদি চোখ থাকতো, তবে দেখতে পেতে যে, ঘৃণার পাত্র, দয়ার পাত্র যদি কেউ থাকে, সে তোমরা—তোমাদের ঐ চাঁচা-ছোলা কথা, আর পালিস-করা চাল-চলনের ভিতর তোমাদের যত দৈন্য, এত দৈন্য বুঝি কোথাও নাই।"

ইলা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল,—কোনও কথা কহিল না। সত্যেশের মাথায় খুন চাপিয়া গিয়াছিল; সে থামিল না। সে বলিল, "তুমি বুদ্ধিশূন্য, হৃদয়শূন্য! ফ্যাসানের দাসী! তুমি দিন-দিন তিল-তিল ক'রে আমার মনের ভিতর যে তুষানল জ্বেলে আসছো, আজ কেবল তাতে ঘৃতাহুতি দিয়েছ?" বলিয়া সে খুব চোখা-চোখা ভাষায় ইলার সমস্ত দোষ খুঁটিনাটি করিয়া বর্ণনা করিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের কন্দরে-কন্দরে যত লুকান বেদনা ছিল, সব সে ইলার ঘাড়ে ঝাড়িয়া ফেলিল। ইলা আড়ষ্ট হইয়া শুনিল। সমস্ত কথা শেষ করিয়া সে বলিল, "মূর্খ আমি, তাই তোমার হাতে ধরা পড়েছিলাম। রূপকথায় শুনেছি যে, রাজারা ডাইনী-রাক্ষসী বিয়ে ক'রতেন, আমি এখন হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি যে, আমি ঠিক তাই ক'রেছি—এতদিনে তোমার ভিতরকার খাঁটি মূর্ত্তিটা বেরিয়েছে।" বলিয়া সে উঠিয়া বেগে তাহার ড্রেসিং-রুমে প্রবেশ করিল।

ইলা সেইখানে পড়িয়া রহিল,—কেবল কুশনের ভিতর মুখ চাপিয়া পড়িয়া রহিল। আয়া আসিয়া ডাকিল; ইলা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "তুম যাও, হম আপনে যায়েঙ্গে।" আয়া বেয়ারা সব কাজ-কর্ম্ম সারিয়া চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি, বি-এ]

যুগান্তরকারী জার্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল যেমন একদিন বলিয়াছিলেন যে, জানা ও অজানা এই দুইয়ের সম্মিলনে সম্পূর্ণ জ্ঞান, স্থিতি ও অস্থিতি এই দুইয়ের মিলনে পূর্ণ-অস্তিত্ব, জড়জগৎ ও আত্মা এই দুইয়ের পূর্ণবিকাশ ব্রহ্মে ;—সেইরূপ রামপ্রসাদও জগজ্জনকে শিখাইয়াছিলেন যে, সুখ ও দুঃখ, আশা ও নিরাশা, জীবন ও মরণ, আলোক ও অন্ধকার এ সকলের সঙ্গমস্থল এক,—যাহা সুখ ও দুঃখ, আশা ও নিরাশা, জীবন ও মরণ, আলোক ও অন্ধকার হইতে ভিন্ন অথচ এক। পরিধি হইতে সকল ব্যাসার্দ্ধ কেন্দ্রে গিয়া সম্মিলিত হয়। কেন্দ্রসকল ব্যাসার্দ্ধের সঙ্গমস্থল, অথচ কেন্দ্র ব্যাসার্দ্ধ নহে। শাক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদ দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, জগতের সকল শক্তির কেন্দ্রস্থল এক মহাশক্তি - জগজ্জননী আদ্যাশক্তি। পুঞ্জীভূত অনন্ত তেজোময়ী সনাতনী আদ্যাশক্তি হইতে জগতের সকল শক্তি রশ্মির মত শত ধারায় পরিস্ফুরিত হইতেছে। রামপ্রসাদ তেজোবহুত্বের মাঝে চির-একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন ; শক্তি-বিভিন্নতা-মাঝে সাম্যের দিব্য সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সত্যের দুই দিক দেখিতেন এবং এই দুইয়ের ; মিলনস্থল কোথায়, তাহাও দেখিতেন। তাই রামপ্রসাদ গাহিতেন,

"অশুচি শুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে শুয়ে রবি,
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি।"

এটী কি ঠিক হেগেলের কথা নহে? তিনি বলিয়াছেন, যেখানে thesis, সেখানে তাহার antithesis আছেই আছে; আর এতদুভয়ের যেটী synthesis সেটী higher truth ; অর্থাৎ যেখানে একটী নির্দ্দিষ্ট ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে সেই ভাবের বিরোধভাব আছেই আছে ; আর এই দুই ভাবের যেটী সমবায়, সেটী এতদুভয় অপেক্ষা "উচ্চ সত্য।" রামপ্রসাদ ঠিক যেন এই সত্যের উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছেন যে, যেখানে শুচি, সেখানে অশুচি আছেই আছে। আর এই শুচি অশুচি দুটী সতীন। দুই সতীনের পরস্পরের প্রতি যেমন বিরোধ-ভাব, এই দুইয়ের মধ্যেও ঠিক তেমন।' কিন্তু এই দুইয়ের মিলন কোথায়? এই দুইয়ের মিলন শ্যামা মার চিরশান্তি-নিকেতনে। ইহাদের মিলন কখন দেখা যায়? মানব! তুমি ইহাদের মিলন দেখিবে তখন, যখন তুমি শুচি এবং অশুচির মধ্য দিয়া গিয়া, তাহাদের পরপারে মহাসত্যের উচ্চ অধিত্যকায় উঠিয়া দাঁড়াইবে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ জীবনের শত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও বিষাদ পরস্পরের সহিত চিরবন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ। যেখানে সুখ সেখানে দুঃখ; যেখানে হর্ষ সেখানে বিষাদ। ভিত্তি ছাড়া যেমন প্রাসাদ দাঁড়াইতে পারে না, দুঃখ ছাড়া সুখও ঠিক তেমনি দাঁড়াইতে পারে না। দুঃখ সুখের হাত ধরিয়া চিরদিনই আসিয়া থাকে। কোকিল যেমন বসন্তের দূত, দুঃখও তেমনি সুখের দূত। কোকিল দেখিতে কাল, কিন্তু তাহার গান মধুর ; এবং সে গানে সে বলিয়া দেয় যে, ঋতুরাজ বসন্ত ফুল্লফুলরাশি ও সুখস্পর্শ সমীর লইয়া কুঞ্জকাননের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে,—উৎসবের আর বেশী দেরী নাই। দুঃখও ঠিক সেইরূপ কদাকার ; কিন্তু যে অভিজ্ঞতাটুকু সে দেয়, তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, সুখ হাসি, হর্ষ ও নৃত্য লইয়া কুটীরের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে,—উৎসবের আর বেশী দেরী নাই। অভিজ্ঞতার এ মধুর আশ্বাস রামপ্রসাদ সতর্ক-শ্রবণে শুনিয়াছিলেন ; তাই তিনি গাহিতেন—

"আমি কি দুখেরে ডরাই?
সুখ পেয়ে লোকে গর্ব্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই।"

তিনি দুঃখের বড়াই করিতেন। দুঃখের ললাটে যে বিধি-লিখন লেখা আছে, তাহা তিনি সম্যক্ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, দুঃখের সহিত আলাপ করিতে পারিলে সুখের অঙ্কে বসিতে পাইবেন। কারণ, সুখ দুঃখ দুই

ভাই। যাহারা হর্ষে অঙ্কোৎফুল্ল হইয়া পড়িত, এবং বিষাদের কথা শুনিলে যাহারা ক্রোধে আঁখি দুইটী জবাফুলের মত রক্তবর্ণ করিয়া ফেলিত,—রামপ্রসাদ তাহাদের বুঝাইবার জন্য গাহিতেন—

"হরিষে বিষাদ আছে মন, কোরোনা এ কথায় গোঁসা,
ওকে সুখেই দুখ, দুখেই সুখ, ডাকের কথা, আছে ভাষা।"

এই ত প্রকৃত সাধকের কথা। এইরূপ সাধকের বিপদাপদ নাই, নিরানন্দ নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন

"যে জন সাধক বটে তার কি দুঃখ ঘটে?
* * * * * *
শ্রীরামপ্রসাদ দাসে আনন্দ সাগরে ভাসে
সাধকের কি আছে জঞ্জাল!"

এক্ষণে দেখা যাউক, পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে রামপ্রসাদের কি মত। তিনি কি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রতিমার পূজা করিতেন? তাঁহার সকল ধ্যান-ধারণা কি শ্যামা-মার মৃত্তিকানির্ম্মিত মূর্ত্তিটীতে পর্য্যবসিত ছিল? তিনি কি করালবদনীর শুধু করাল বদন ও চতুর্হস্ত, লোলজিহ্বা ও নরমুণ্ডমালা, আলুলায়িত কেশরাশি ও চরণতলে মহেশ্বরকে দেখিতেন? তিনি কি রণরঙ্গিণীর শুধু ভৈরব মূর্ত্তিখানির পূজা করিতেন—যে মূর্ত্তি সুপটু পটুয়া গড়িয়া থাকে? তিনি কি তাঁহার অনাবিলা ভক্তি শুধু কর্দ্দম-বিনির্ম্মিত জড় প্রতিমার তুলিকারঞ্জিত চরণে ঢালিয়া দিতেন? তিনি কি তাঁহার পূজার উপকরণ দন্তবিহীন, পাকস্থলীবিহীন, পরিপাকশক্তিবিহীন, প্রাণহীন মৃত্তিকাস্তূপের ভোজনের জন্য মূঢ়ের মত চিরদিন উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। তথাপি যতদূর সংক্ষেপে বলা যায়, বলিবার চেষ্টা করিতেছি। রামপ্রসাদ এরূপ ভাবে পূজা করিতেন না। তিনি প্রতিমার পূজা করিতেন সত্য, কিন্তু তিনি প্রতিমার মধ্য দিয়া অতি দূরে দৃষ্টি চালাইতেন। তাঁহার দৃষ্টি প্রতিমার আয়তন-টুকুতে আবদ্ধ ছিল না। তিনি করালবদনীর চতুর্হস্তের মধ্য দিয়া শক্তির পরিস্ফূরণ দেখিতেন; রণরঙ্গিণীর রণরঙ্গের মধ্যে মহাশক্তির অপূর্ব্ব লীলা দেখিতেন। তিনি জড়বাদীর মত অন্ধ ছিলেন না। তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জড়পদার্থের সমষ্টি বলিয়া ধরিতেন না। তিনি যাহা কিছু দেখিতেন, তাহা শক্তির মূর্ত্তি; যাহা কিছু শুনিতেন, তাহা শক্তির গান। তিনি নাম লইতেন, অথচ নামের পূজা করিতেন না; প্রতিমার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিতেন অথচ তিনি প্রতিমার মধ্য দিয়া অনেক দূরে গিয়া পড়িতেন। তিনি সাকার দেবতা-পূজা-করা-রূপ সোপান দিয়া আধ্যাত্মিকতার শিখরে উঠিয়াছিলেন। ইহাই রাম-প্রসাদের পৌত্তলিকতা, ইহাই হিন্দুদের পৌত্তলিকতা। এইরূপ পৌত্তলিকতার মধ্য দিয়া গিয়া তিনি নিরাকারের ধ্যান-ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন এবং মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন যে, আদ্যাশক্তি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী ও নিরাকারা। তাই তিনি গাহিতেন—

"তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে।"

রামপ্রসাদ বিশ্বমাতৃত্বের পূজা করিতেন। জননী যেমন তাঁহার শিশু পুত্রগণকে স্তন্য পান করাইয়া জীবিত রাখেন, তেমনি সমগ্র পৃথিবীর পুত্রগণকে বাঁচাইবার জন্য এক জননী আছেন, তাঁহাকে বিশ্বজননী বলা যায়। তিনি তাঁহার শক্তিরাশি জীবনীশক্তি রূপে জগতের শস্যে, ফলে, জলে, অনলে, অনিলে লুকাইয়া রাখিয়াছেন—যাহারা জগৎ জনগণকে চিরদিন বাঁচাইয়া রাখে। এই যে বিশ্ব-জননী, যাঁহার এত অনুকম্পা, তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে মূর্ত্তিমান্ ভক্তের স্বভাবতঃই অভিলাষ হয়। এই জন্য মানব বিশ্বজননীর এক প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে; এবং সেই জননী-প্রতিমার সন্তুষ্টি-সাধনের জন্য নিজেরা যে অন্ন ভক্ষণ করে, সেই অন্নের নৈবেদ্য করিয়া উৎসর্গ করে। মানব মনে করে যে, বিশ্বজননী এ নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন ও তিনি প্রীত হন। মানব নিজে যেরূপে সন্তুষ্ট হয়, সে সেইরূপে তাহার দেবতার সন্তুষ্টি সাধন করে। ভক্তের এ আচরণ যে অনেকটা বালকের মত, তাহা রামপ্রসাদ জানিতেন। তাই তিনি বলিতেন

"জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা;
ওরে, কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তায়
আলোচাল আর বুট-ভিজানা।"

কিন্তু এই বালকত্বের মধ্যে যদি সরলত্বের অমৃতধারা ও ভক্তির স্বর্গীয় সুধা মাখান থাকে, তাহা হইলে দেবতা প্রীত হন কি না কে বলিতে পারে? শুধু জাঁকজমক করিয়া পূজার আয়োজন করিলে চলিবে না; ঢাক-ঢোল

বাজাইয়া লোক জমা করিয়া পূজা করিলেই যে ভগবান্ ধরা পড়িলেন, এমন কোন কথা নাই। দু'দশ হাজার ছাগবলি দিয়া রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া দিলে—যেমন তৈমুরলঙ্গ একদিন দিল্লীনগরে নরবলি দিয়া করিয়াছিল—যে শ্যামা মা পরম প্রীতা হইলেন, এমন কোন কথা নাই। নীরস আহ্বানে দু'দশ হাজার ব্রাহ্মণ আহূত করিয়া সাধ্যাতীত ভক্ষণে বাধ্য করিলেই যে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলেন, এমন কোনও কথা নাই। বরং এরূপ পূজায়, এরূপ পূজার আয়োজনে, এরূপ পূজার আড়ম্বরে ও এরূপ ব্রাহ্মণ-ভোজনে জগজ্জননী বিরূপা হন। সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন যে, যদি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া পূজার আয়োজন করিলেই ভগবানকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ধনী ইচ্ছা করিলে ভগবানকে ক্রীতদাস করিতে পারিত; আর নির্ধন কোন দিন ভগবানের অনুকম্পা, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ পাইত না। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন :

"জাঁকজমকে কর্‌লে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে;
তুমি লুকিয়ে তাঁরে কর্‌বে পূজা জান্‌বে না রে জগজ্জনে।"

বাস্তবিক জাঁক্‌জমক্ করিয়া পূজা করিলেই মনে-মনে অহঙ্কার হয়; আর এক কলসী দুগ্ধে এক ফোঁটা গো-মূত্রের মত ঐ একটু অহঙ্কার বিরাট্ একটা ক্রিয়ার ফল পণ্ড করিয়া দেয়। ভগবানের পূজার সিংহাসন—সরল, নির্ম্মল হৃদয়; নৈবেদ্য—একমাত্র অনাবিলা ভক্তি; পুরোহিত—শান্তিময়ী তন্ময়তা।

"আলোচাল আর পাকা কলা কাজ কিরে তোর আয়োজনে;
তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্ত কর আপন মনে।"

এই ত পূজা। এই পূজাতে জগদম্বা তুষ্টিলাভ করেন। দু'দশ মণ আলো-চালের গাদা ও দু' পাঁচ কাঁদি পাকা কলাতে ভগবান্ ভুলেন না। তাঁহাকে নির্জ্জনে ভক্তিসুধা খাওয়াইতে হইবে, তবে তিনি প্রীত হইবেন। আর এই ভক্তিসুধা আপন মনে খাওয়াইতে হইবে—পাড়ার পাঁচজন মুরুব্বিকে ডাকিয়া নয়। ভগবান্ ভক্তাধীন। ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, উচ্চ ও নীচ, উত্তম ও অধম যে যেমন ভক্তির অধিকারী, সে তেমন ভাবে ভগবানকে পায়। যে যতটুকু ভক্তিরস ভগবানকে দিতে পারে, সে ততটুকু ভগবচ্চিন্তার মধুর রসের আস্বাদন পায়।

রামপ্রসাদ শক্তির উপাসক ছিলেন। অনেকের ধারণা, শক্তির উপাসনা করিতে গেলেই মদ্যপান করিতে হয়। শুনিতে পাওয়া যায় যে, কুমারহট্টনিবাসী অধ্যাপক বলরাম তর্কভূষণও না কি একদিন রামপ্রসাদকে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করিতেন। এতদ্ব্যতীত, পানাসক্ত অনেক ভক্ত নিজেদের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, রামপ্রসাদ সুরা-পান করিতেন, এইরূপ প্রচার করেন। কারণ, এইরূপ প্রচার করিতে পারিলে সাত খুন মাপ! কেহ কিছু বলিলে, তাঁহারা তর্ক করিবেন, "রামপ্রসাদ সুরাপান করিতেন; অতএব আমরা কেন না করিব?" তাঁহারা দেখান যে, রামপ্রসাদের একটী গানের মধ্যে আছে—

"মাতাল হলে বোতল পাবি, বৈতালী করিবে কোলে।"

আরও বলেন যে, সুরাপান সম্বন্ধে রামপ্রসাদকে বলায় তিনি উত্তর দেন—

"সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই কুতূহলে।"

তিনি সুরাপান করিয়া বলেন যে সুধা খাই। আর ভক্তেরা সুরাপান করিয়া এইরূপ উত্তর দিলে, তাঁহাদিগকে ভণ্ড বলিয়া তিরস্কার করা হয়। পানাসক্ত ভক্তগণের এইরূপ যুক্তি। ইহা অপেক্ষা মূর্খতার পাণ্ডিত্য আর কতদূর হইতে পারে? গানটীকে কি অর্থ হইতে কি অর্থে লইয়া যাওয়া হইল! পরের কথা কয়টী দেখা যাউক—

"আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মোদো মাতালে মাতাল বলে।"

এই ছত্র দুইটীর কি অর্থ তাঁহারা করিবেন করুন। আর এক কথা। স্বীকার করিলাম, তিনি মদ্যপান করিতেন। কিন্তু পানাসক্ত ভক্তবৃন্দ আপনারা একবার রামপ্রসাদের বোতলের লেবেলটী পড়িয়া দেখুন। সন্ধান করিয়া জানুন, কি মস্‌লার চোলাই করিয়া এ মদ্য বাহির করা হইয়াছে। আর এ মদ্যের ভাঁটীই বা কোথায়। তবে শুনুন—

"গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মস্‌লা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে।
মূল-মন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা মা;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে।"

শুনিলেন মদ চোলায়ের তালিকা? বুঝিলেন এ কি মদ? এ মদ সাহাকোম্পানীর দোকানে পাওয়া যায় না। এ মদ খাইলে পায়ের তলায় ধরণী টলে না। এ মদ রসার

ডিষ্টিলারীতে চোলাই করিতে পারে না। এ মদ খাইলে চতুর্ব্বর্গ মেলে। পানাসক্ত ভক্ত, পার ত শাক্ত-চূড়ামণি রামপ্রসাদের এই মদ খাও, আর তা যদি না পার, সাহা-কোম্পানীর দোকানের মদ খেয়ে চতুর্ব্বর্গ হারাও! এই ত সাধনা! আর পার ত এই সাধনার শতমুখে গর্ব্ব কর!!

কর্ম্মসম্বন্ধে রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"সত্ত্বে ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজো মিশালে।"

এ কথাটীর অর্থ কি? পূর্ব্বোক্ত পানাসক্ত ভক্তগণ এ কথাটীর এইরূপ অর্থ করেন, যে, রজো মিশালে অর্থাৎ মদ্য পান করিলে কর্ম্মে আসক্তি আসে। মদ্য পান করিলে মানুষ শরীরে বল পায় এবং বল পাইয়া কর্ম্মে উদ্যত হয়। অর্থাৎ এক কথায়, মদ্যপান করিলে মানুষ কর্ম্মী হয়। সুন্দর ব্যাখ্যা! ইহা লইয়া আর অধিক বাক্যব্যয় না করাই ভাল। এক্ষণে রামপ্রসাদ কিরূপ অর্থ করিতেন, দেখা যাউক। সত্ত্বরজস্তমঃ এই ত্রিগুণের ধর্ম্ম কি, বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কর্ম্ম কখন হয়। সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম্মে আসক্তি। সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তি দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য প্রভৃতি গুণের অধিকারী। কিন্তু দয়া ইত্যাদি থাকিলেই যে দয়ার কার্য্য হইল, তাহা নহে। এইজন্য রামপ্রসাদ বলিতেছেন তমে মর্ম্ম—আসল জিনিস তমে অর্থাৎ শক্তি-চালনে। সত্ত্ব আমাদিগকে জানাইয়া দেয়, আর তমঃ সেই কার্য্য করিতে আমাদিগের শক্তির নিয়োগ করে। কিন্তু কি কার্য্য করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া তৎসাধনে আমরা নিযুক্ত হইতে পারি না, যদি আমাদের তৎসাধনে কামনা না থাকে। তাই রামপ্রসাদ বলিতেছেন "কর্ম্ম হয় মন রজঃ মিশালে"। আর রজঃ গুণের বিশেষ ধর্ম্মই এই যে, সে ইচ্ছা বা অভিলাষ, বাসনা বা কামনা প্রদান করে। এই অভিলাষ না থাকিলে কার্য্যে আসক্তি বা অনুরাগ আসে না। অনুরাগ না থাকিলে শক্তিচালনা অসম্ভব; কার্য্য হয় তখন, যখন অভিলাষ থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কার্য্যের তিনটী পর্য্যায়। প্রথম, যে কার্য্য করিব তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা; দ্বিতীয়, অভিলাষ থাকা; তৃতীয় শক্তি পরিচালনা—হস্ত, পদ, ইত্যাদির কার্য্যে নিয়োগ। রামপ্রসাদ, সত্ত্বরজস্তমঃ এই ত্রিগুণ যে প্রকৃতির ধর্ম্ম, ও সেই ধর্ম্ম যে কিরূপে কার্য্য করে, তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। তিনি জ্ঞানীর চক্ষে ও দার্শনিকের ধ্যানে কর্ম্মের বিকাশ দেখিতেন।

"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" এ কথা রামপ্রসাদ জানিতেন। তিনি গাহিতেন—

"যার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, কর্ম্মফলে ফল ফলেছে।"

তিনি কতবার মাকে পাইয়াছেন; আবার কর্ম্মদোষে তাঁহাকে হারাইয়াছেন। তাই এখন বলিতেছেন—

"যেমন অন্ধজনে হারাধন পুনঃ পেলে ধরে এঁটে;
আমি তেমনি মত ধরতে চাই মা
কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে।"

তিনি কর্ম্মের দ্বারা উদ্ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এজন্য তিনি কর্ম্মও চান না, কর্ম্মের ফলও চান না। তাই তিনি পরেই বলিতেছেন—

"প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী কর্ম্মডুরি দে মা কেটে।"

তিনি কাঁদিয়া বলিতেছেন, "মা গো, কর্ম্মের ডুরি কাটিয়া দাও।" মা যদি একবার কর্ম্মের ডুরি কাটিয়া দেন, তাহা হইলে এ মর-জগতে আর আসিতে হইবে না, আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। বুঝি, ইহাই তাঁহার কামনা—

"ইহজন্ম পরজন্ম বহুজন্ম পরে
প্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে।"

অনেক জন্ম হইয়াছে। কে জানে আর কত জন্ম হইবে! কিন্তু এক দিন আসিবে, যে দিন কর্ম্মের জের শেষ হইয়া যাইবেই যাইবে,—জন্ম আর হইবে না। সাধক রামপ্রসাদ আর জন্ম চান না। তবে কি চান? তিনি কি চান, তিনি নিজেই জানেন না—

"ক্ষিত্যপ্তেজঃমরুৎ ব্যোম্ বোঝাই আছে নায়ের খোলে;
* * * * * *
যখন পাঁচে পাঁচ মিশিয়ে যাবে
কি হবে তাই প্রসাদ বলে।"

সে দিন কি হইবে, তাহাই ভক্ত ভাবিতেছেন, যে দিন পঞ্চভূত পঞ্চভূতে বিলীন হইবে। সে দিনের সে প্রহেলিকার অর্থ কি, সে দিনের সে নিগূঢ় রহস্যের অভিব্যক্তি কি, তাহা সাধক কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না! আর এই ঠিক করিতে না-পারারই মধ্যে ইহার অর্থ! এই খুঁজিয়া না-পাওয়ার মধ্যেই ইহার সন্ধান!

তিনি কর্ম্মের ডুরি কাটিতে চাহেন, জঠরে জন্মগ্রহণ

করিতে তাঁহার আর বাসনা নাই। তবে কি তিনি কর্ম্মের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে চান? মর জগতের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতে কামনা করেন? তিনি কি বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে চিরদিনের মত অভিনয় শেষ করিতে চাহেন? অর্থাৎ তিনি কি মুক্তির অভিলাষী? তিনি কি শুধু মোক্ষের জন্য তপস্যা করিয়াছেন? তিনি কি নির্ব্বাণ চাহেন? না,—আমরা জানি, তিনি এ সকল চান না। আমরা জানি, তিনি নির্ব্বাণের অভিলাষী ন'ন। আমরা তাঁহার প্রাণের ঋণী

"নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
(ওরে) চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।"

তিনি মুক্তির পূর্ণচন্দ্রতলে, চিরশান্তিকুসুমের সুবাসে প্রফুল্ল হইতে চান না। তিনি চান কর্ম্মসূর্য্যের প্রখর কিরণতলে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে সিদ্ধির বিল্বপত্র মালা গলে পরিতে। তিনি জগজ্জননীর প্রাণের পুত্র। তিনি কি জননীর রীতি, জননীর ধারা পাইবেন না? আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ী সনাতনী যে নিজে মুক্তি চান না। তিনি কখনো হস্তে অসি লইয়া গলে নরমুণ্ডমালা পরিয়া, কেশদাম আলুলায়িত করিয়া উলঙ্গিনী হইয়া রণরঙ্গিণী সঙ্গিনীসনে অট্টহাসে মেদিনী কাঁপাইয়া অসুরকুল সংহারে উন্মাদিনী;—চরণতলে প্রমথাধিপ ভোলানাথ পড়িয়া আছেন, ভ্রূক্ষেপ নাই,—করাল-বদনী তাঁহার বক্ষোপরি নাচিতেছেন! আবার কখনো বাঁশী লইয়া, গলে কদম্বফুলমালা পরিয়া, কেশদাম চূড়া করিয়া বাঁধিয়া, প্রেমময় শ্রীমাধব রমণীরমণ বেশে শ্রীরাধাকে-বামে লইয়া যমুনাতীরে কদম্বতলে বিহার করিতেছেন! একদিকে সংহারের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, আর একদিকে প্রেমের মনোমোহন বেশ! "ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিবরাম—সকল আমার এলোকেশী।" মা ব্রহ্মময়ীর অনন্তলীলা! শ্রীরামপ্রসাদ মায়ের ধারা পাইয়াছেন। তাই লীলাময়ী জননীর প্রিয় পুত্র লীলা হইতে অবসর পাইতে ইচ্ছা করেন না। আবার বলি, জলে জল হইয়া মিশিতে রামপ্রসাদের ইচ্ছা ছিল না। তিনি নির্ব্বাণ চাহিতেন না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত রামপ্রসাদের দার্শনিকত্ব ও ধর্ম্ম-প্রবণতার বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এতক্ষণ রামপ্রসাদকে ধর্ম্মোপদেষ্টা স্বরূপে দেখিয়াছি; সুখ ও দুঃখ, কর্ম্ম ও জন্ম, মোক্ষ ও নির্ব্বাণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জানিয়াছি। দেখিয়াছি, দার্শনিক ও উপদেষ্টা হিসাবে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। এক্ষণে কবি হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়, তাহার আলোচনা করা যাউক।

কবির জন্মভূমি ও আবাসভূমি কুমারহট্ট গ্রাম গঙ্গাতীরে অবস্থিত। কবিরঞ্জন আশৈশব গঙ্গাতীরে বেড়াইয়াছেন, গঙ্গানীরে স্নান করিয়াছেন। তিনি জীবনে কখনো নদীর উল্লাস, নদীর বিষাদ, নদীর হাসি, নদীর কান্না ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার গানে ও কবিতার মধ্যে নদীর ও তরণীর প্রচুর উপমা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালের বিপুলবক্ষা, পুলকস্পন্দিতা, চঞ্চলা নদীর আকৃতি দেখিয়া তিনি সাগরের মূর্ত্তি অনুমান করিয়া লইতেন। তনুকে তরণীর সহিত তুলনা করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"এ তনু তরণী ভব-সাগরে ডুবালাম"

পরেই বলিতেছেন—

"আমার তুফানে ডুবিল তরী আমি মজিলাম।"

অন্যত্র দেখিতে পাই, তিনি গর্ব্বভরে বলিতেছেন—

"এ কি পেয়েছ আনাড়ী দাঁড়ী, তুফানে ডরাবে।"

আর একস্থলে বলিতেছেন—

"ঐহিকের সুখ হল না বলে, ঢেউ দেখে কি নাও ডুবাবে।"

কুসঙ্গে জীবন নষ্ট করিয়াছে,—এই কথা সুন্দর ভাবে বলিলেন—

"ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত মধ্যে তরী ডুবাইলি।"

এইরূপ উদাহরণ আরও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"এ তনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে,
ভবের ভাবনা কিবা মনকে কর নেয়ে।"

পুনরায়,—

"প্রসাদ বলে থাক বসি' ভবার্ণবে ভাসাইয়ে ভেলা,
যখন জোয়ার আস্‌বে উজিয়ে যাবে,
ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা।"

অন্যত্র,—

"সামাল ভবে ডুবে তরী (তরী ডুবে যায় জনমের মত)
জীর্ণ তরী তুফান ভারী,
বইতে নারি, ভয়ে মরি,
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু
এবার তারাই করছে দাগাদারী।"

শেষে কবি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—

"দীন রামপ্রসাদ বলে এবার কালী কি করিলি,
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা লাভে-মূলে সব ডুবালি।"

জীবনকে তরণীর সহিত, ভবসংসারকে নদী বা সাগরের সহিত, মনকে কর্ণধারের সহিত ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে দাঁড়ীর সহিত তুলনা করিয়া, রামপ্রসাদ ছাড়া আর কেহ এত সহজে সংসার-সাগর পার হইতে পারেন নাই। বঙ্গসাহিত্যে রামপ্রসাদের পূর্ব্বে এরূপ নিখুঁত ও সুবোধ্য উপমা এত বেশীভাবে কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। রামপ্রসাদের পরে অনেক কবিওয়ালা, অনেক গীতিরচয়িতা, ছন্দরচয়িতা রামপ্রসাদের অনুগ্রহ-প্রসাদ পাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু যেটুকু প্রসাদ পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের যশের উদর ভালরূপ পূর্ণ হয় নাই; রামপ্রসাদের এই উপমার অনুকরণ করিতে গিয়া অনেক সময় তাঁহারা উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাম্য বা সাদৃশ্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। ফলে এমন অনেক খঞ্জ, বধির, অন্ধ উপমার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা ভাল চলিতে পারে না, শুনিতে পায় না, দেখিতে পায় না। প্রতিভার সহিত শিক্ষার পার্থক্য! শিক্ষিত বা বিদ্বান্ হইলেই যে কবি হইবে, এমন কোন কথা নাই। তাই সকল যুগে, সকল দেশে যুগপ্রবর্ত্তনকারী প্রতিভাবান্ কবির সহিত তাঁহার শিক্ষিত শিষ্যগণের বা গর্ব্বিত শত্রুগণের বা চতুর অনুকরণ-কারীদিগের এত পার্থক্য।

কুমারহট্ট গ্রামের আশে-পাশে অনেক চাষের জমি ছিল। রামপ্রসাদ অনেক চাষের কাজ দেখিয়াছেন। শরতের সূর্য্যকরোজ্জ্বল ক্ষেত্রে শ্যামল ধান্যের বিপুল পুলকনৃত্য দেখিয়া তিনি কত হাসিয়াছেন, কত গাহিয়াছেন। তাই নদী বা সাগরের সহিত সংসার ও জীবনের তুলনা করার পর আমরা দেখি যে, তিনি দেহকে জমির সহিত তুলনা করিতেছেন।

"দেহ জমীন্ জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি তায় সফল চষি;
হৃদয় মধ্যেতে আছে পাপরূপ তৃণরাশি;
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত করগো মুক্তকেশী।
কাম আদি ছটা বলদ বহিতে পারে অহর্নিশি,
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে শস্য পাব রাশিরাশি।"

অন্যত্র এই কৃষিকার্য্যের তুলনা অবলম্বনে মনকে ধিক্কার দিয়া অতি সুন্দরভাবে তিনি বলিতেছেন—

"মন রে কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব-জমীন্ রইল পতিত,
আবাদ্ করলে ফল্‌তো সোনা।"

কালীনামে দাও রে বেড়া, ফসলে তছ্‌রূপ হবে না;
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছে যম ঘেঁসে না।
অদ্য অব্দ শতান্তে বা বাজাপ্ত হবে তা জান না;
এখন আপন ভেবে যতন কর চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তিবারি তায় সেঁচ না;
ওরে, একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।"

রামপ্রসাদ খুব দক্ষ চাষী ছিলেন। তিনি বড়-গলা করিয়া বলিতেছেন, "ওরে একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।" যাহা হউক এরূপ আধ্যাত্মিক চাষের বিস্তৃত বিবরণ রামপ্রসাদের পূর্ব্বে আর কোন কবি দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না...অন্য কোন দেশের কবি দিয়াছেন কি না জানি না।

মৃত্যু অনিবার্য্য। এ মর-সংসারে সকল স্থানেই মৃত্যুর অবাধ অধিকার। মানব মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না, যদি সে শমনভয়বারিণী শ্যামা-মাকে প্রাণের সহিত না ডাকে। তাই রামপ্রসাদ মৃত্যুকে অতি সুন্দরভাবে জেলের সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন,—

"জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।
অগাধ জলে মীনের ঘর, জাল ছেয়েছে ভুবন ভিতর,
যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে।
পালাবার পথ নাই কোন কালে,
পালাবি কোথায় ঘিরেছে জালে,
প্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন করিবে সে।"

যম-জেলে এমন বিস্তৃত মজবুত জাল ফেলিয়াছে যে, সংসার-সাগরের মীন পর্য্যন্ত পলাইতে পারিবে না। এক্ষণে উপায়? উপায়—শুধু শ্যামা-মাকে ডাক, যদি কালকে জয় করিতে চাও। ভয় করিও না। ভয় করিবার কিছুই নাই,—

"প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবিরে নিদান কালে;
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।"

রামপ্রসাদ পাশা, সতরঞ্চ প্রভৃতি খেলাও জানিতেন। এই সকল খেলার তুলনা দিয়াও তিনি গান গাহিতেন।

উদাহরণ স্বরূপ দুইটী গান দেওয়া গেল। পাশা খেলার তুলনা দিয়া বলিতেছেন,—

"ভবে আসা খেল্‌ব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল,
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরী পলো।
পো বার, আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল,
শেষে কচে বার পেয়ে মাগো পাঞ্জা ছক্কায় বন্ধ হ'লো।"

পাশাপটু, ভক্ত-ভাবুক রামপ্রসাদের ভাব-মাধুর্য্যের আস্বাদ করুন। আবার সতরঞ্চ খেলার তুলনা দিয়া গাহিতেছেন,—

"এবার বাজী ভোর হ'লো,
মন, কি খেলা খেলাবি বল।
সতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল,
এবার বেড়ার ঘর, কোরে ভর মন্ত্রীটী বিপাকে ম'লো।
দুটা অশ্ব, দুটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটাল,
তারা চল্‌তে পারে সকল ঘরে, তবে কেন অচল হ'লো।"

রামপ্রসাদের উপমা সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ দেওয়া হইল। এগুলি সামান্য কথার উপমা নহে, সামান্য ভাবের উপমা নহে—একটী বিষয়ের উপমা লইয়া একটী গীত রচিত এবং প্রতি ভাবের, প্রতি কথার সাম্য সুন্দর ভাবে রক্ষিত। আর একটী উদাহরণ দিব। সেটী এই,—

"শ্যামা-মা উড়াচ্ছে ঘুঁড়ি (ভবসংসার মাঝে)
ঐ যে মন ঘুঁড়ি, আশা বায়ু বাঁধা, তাহে মায়া দড়ি।"
ইত্যাদি।

এ গানটীর উল্লেখ করিতে গেলেই নরেশচন্দ্রের সেই গানটী মনে পড়ে,—

"শ্যামাপদ আকাশেতে, মন ঘুঁড়িখানি উড়্‌তেছিল,
কলুষের কু-বাতাস পেয়ে গোঁত্তা মেরে পড়ে গেল।"
ইত্যাদি।

নরেশচন্দ্র রামপ্রসাদের কাছে এই "মন-ঘুঁড়ি" "শ্যামাপদ আকাশেতে" উড়াইতে শিখিয়াছিলেন কি না, এ বিষয়ের আলোচনায় প্রয়োজন নাই। কে কাহার নিকট ঋণী, তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই।

রামপ্রসাদ খেলা-ধূলার, এমন কি ঘুঁড়ি উড়ানর উপমারূপ কাঠাম লইয়া শব্দের বিচালী জড়াইয়া, তাহার উপর যতি ও শব্দমিলনের মাটী দিয়া, শেষে সুর-রঙ্ চড়াইয়া, অতি উচ্চ, অতি উদার, অতি মহৎ ভাবের প্রতিমার মোহিনী-মূর্ত্তি গড়িতে অদ্বিতীয় কারিগর।

রামপ্রসাদ জীবনের শেষভাগে যে গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। পদলালিত্যে ও ভাবগাম্ভীর্য্যে, অনুপ্রাসে ও যতিতে সে গানগুলি রামপ্রসাদের পরিপক্ক রচনা-চাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছে। তিনি হর-হৃদে রণোন্মাদিনী এলোকেশী শ্যামাকে দেখিয়া বিস্ময়ে গাহিতেছেন—

"কে হর হৃদে বিহরে!
তনুরুচির সজল-ঘন নিন্দিত-চরণে উদিত বিধু নখরে॥
নীল-কমল-দল শ্রীমুখ-মণ্ডল শ্রমজল শোভে শরীরে।
মরকত-মুকুরে মঞ্জু-মুকুতাফল রচিত কিবা শোভা
মরি মরি রে॥
গলিত চিকুরঘটা নব-জলধর-ছটা ঝাপল
দশদিশি তিমিরে।
গুরুতর পদ-ভর কমঠ-ভুজগবর কাতর মূর্চ্ছিত মহীরে॥
মোর বিষয়ে মজি' কালীপদ না ভজি' সুধা ত্যজি'
বিষপান করিরে।
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন, বিফলে মানব
দেহ ধরি রে॥"

"মরকত-মুকুরে মঞ্জু-মুকুতাফল রচিত কিবা শোভা 'মরি-মরি রে" এই ছত্র বলিতে গেলে অমনি তাঁহার আর একটী ছত্র মনে পড়ে,—"মরকত-মুকুর বিমল-মুখ-মণ্ডল নূতন জলধর-বরণী।" রামপ্রসাদ কোন্ সৌন্দর্য্য-চক্ষে শ্যামা-মার মুখমণ্ডল দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত সৌন্দর্য্য-পিপাসু ভক্ত-উপাসক কবিই জানেন! অপরে তাহা কি করিয়া জানিবে? অপরের পক্ষে তাহা জানা অসম্ভব। উপরিউক্ত গানে রামপ্রসাদের পদলালিত্য, ভাষার স্বাভাবিক সুন্দর গতি প্রত্যেক সাহিত্যিকের দেখিবার কথা, বুঝিবার কথা। এ গানটীর ছত্রে-ছত্রে যেন জয়দেবের বীণার ঝঙ্কার, যেন চণ্ডীদাসের, জ্ঞানদাসের মধুর প্রফুল্লতার বিকাশ! "অমল কমল-দল, বিমল চরণ-তল, হিমকরনিকর রাজিত নখরে" এটী কি ঠিক জয়দেবের "মধুর কোমল-কান্ত" পদ বলিয়া মনে হয় না? আর একটী গান দেখিতে পাই—

"নখর নিকর হিমকরবর রঞ্জিত মন তনু মুখহিমধামা,
নব-নব সঙ্গিনী নব-নব রঙ্গিনী হাসত ভাষত নাচত বামা।"

এই গানের শেষে বলিতেছেন,—

"ভবভয়ভঞ্জন হেতু কবি রঞ্জন মুক্তিত কর্ম্ম সুনামা,
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে, ঘোর ভবে
পুনরপি গমন বিরামা।"

কি অদ্ভুত রচনা-শক্তি! যাঁহাদের সৌন্দর্য্যপিপাসু, সুনিপুণ শ্রবণ আছে, তাঁহারা এই পদগুলি পাঠ করুন ও তাহাদের মাধুর্য্য উপভোগ করুন; আর সঙ্গে-সঙ্গে রামপ্রসাদের রচনা-প্রণালীর দক্ষতা দেখিয়া বিস্মিত হউন। পাঠকালে প্রতি ছত্রে প্রতি শব্দ তালে-তালে পা ফেলিয়া নাচিতেছে, হঠাৎ পড়িয়া যাইতেছে না—কোন খঞ্জপদ নাই। পাঠক ও পাঠিকার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য তাঁহার আর একটী সুললিত গান উদ্ধৃত করিলাম,—

"ও কে ইন্দীবর নিন্দি' কান্তি বিগলিত-কেশ
বসন-বিহীনা কে রে সমরে!
মদন-মথন উরসি শিরসি, হাসি হাসি বামা বিহরে।
প্রলয়কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,
জন-মনোহরা শমন-সোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে।
অস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়সে বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ-নয়নে নিরখে যে জনে গমন শমন-নগরে।
কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু-কদম্বে,
সম্বর বেশ কুরু কৃপালেশ, রক্ষ বিবুধনিকরে।"

উপরিউক্ত গানগুলির মধ্যে রামপ্রসাদের অনুপ্রাসের অনেক সুদক্ষ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া উদাহরণ দিতে গেলে বলা যায়,—

"রূপসীশিরসি শশী হরোরসি এলোকেশী
মুখঝালা (?) সুধাঢালা কুলবালা নাচিছে।
দ্রুত চলে ধরা টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে,
ডাকে শিবা যাব কিবা দিবা নিশা করেছে।"

রামপ্রসাদ আধুনিক কষ্টকবির মত চেষ্টা করিয়া "অনুপ্রাসের অট্টহাসের" মধুর বিকটধ্বনি কবিতায় প্রকটিত করিতে প্রয়াস পান নাই। রচনা-প্রণালী পরিপক্ব হইলে অনুপ্রাস আপনা-আপনি ঘটিয়া থাকে। একই রকমের বর্ণ-সংযোজিত শব্দের একত্র বিন্যাস করিয়া অনুপ্রাসের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। রামপ্রসাদের প্রধান লক্ষ্য অনুপ্রাসের উপর বা কবিতার এমনি কোন বাহ্য সৌন্দর্য্যের উপর ছিল না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল ভাবের উপর, কবিতার প্রাণের প্রতি। তিনি কতকগুলি কথার চাক্‌চিক্যে প্রাণহীন কবিতাকে কমনীয় করিয়া তুলিয়া বাহ্য-সৌন্দর্য্য-প্রিয় মূঢ় জন-সাধারণকে আপাতঃ সুখে বিমোহিত করিয়া চতুরের মত ঠকাইতেন না। তিনি তদানীন্তন জাতীয় চিন্তার স্রোত পঙ্কিল পথ হইতে নির্ম্মল পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সফলও হইয়াছিলেন। নীচতায় ও হীনতায় জাতির মজ্জা পর্য্যন্ত কলুষিত হইতেছিল; এমন সময়ে রামপ্রসাদ মহৎ ও উদার ভাবের ঔষধ দিয়া, সকল ব্যাধি বিদূরিত করিয়া, জাতিকে সুস্থ ও পবিত্র করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল মহাপুরুষ জাতিকে পুনরায় সৎপথে লইয়া যাইবার ও অন্ধ জাতিকে দৃষ্টিদানরূপ মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি অধঃপতিত মৃতপ্রায় জাতির দেহ ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া বিশ্বমাতৃত্বের উদার-ভাবরূপ মহৌষধি দিয়াছিলেন। ক্ষীণ, হীন, দুর্ব্বল জাতিকে পুণ্য-পবিত্র শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সবল, সক্ষম, শক্তিমান করিতে অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার গানে, গাথায়, পদে কৃত্রিমতা নাই, বাহ্যিকতা নাই;—আছে, প্রাণের কথা, সাধকের উপদেশ।

রামপ্রসাদ মাঝে-মাঝে এমন ভাষার ব্যবহার করিতেন, যাহার শব্দোচ্চারণে ভাবের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়; অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে Onomatopœia বলে, তাহা রামপ্রসাদের গানের কোথাও-কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে-মাঝে তাঁহার বাক্য-বিন্যাসের এমন স্বভাব-সিদ্ধ দক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার কোন গাথার শব্দের পর শব্দ, পদের পর পদ উচ্চারণ করিলে সামান্য শ্রোতারাও নয়ন-সম্মুখে সেই ভাবের ছবি উপস্থিত হয়, যাহার জন্য তিনি শব্দযোজনা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,—

"ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা।"

অথবা—

"নিগম স ঋ গ'ম গণ গণ গণ অবয়ব যন্ত্র মণ্ডন ভাল,
তাতা থেই থেই, দ্রিমিকি দ্রিমিকি, ধা ধা ডক্কণবাদ্য রসাল।"

পুনরপি, পাগ্‌লা ভোলা শিঙ্গা বাজাইয়া ও গাল বাজাইয়া ফিরিতেছেন। তাই রামপ্রসাদ বলিতেছেন,—

"শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্ ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্
বব বম্ বব বম্,
গাল বাজাইয়া মত্ত হইয়া শঙ্কর ফিরিছে।"

কথাগুলির রণেই যেন মানসনয়নের সম্মুখে শিঙ্গা ও গাল বাজাইয়া মত্ত শঙ্করকে তালে-তালে নৃত্য করিয়া ফিরিতে দেখিতেছি। অন্যত্র, বৃষভারূঢ়, হরিগানে প্রমত্ত শিবকে ঠিক এমনি ভাবে বর্ণনা করিতেছেন,—

"বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি
ধরত তাল দ্রিমিকি দ্রিমিকি
হরি গানে হর নাচিয়া।
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল
শিরে দ্রবময়ী করে টল্ টল
লহরী উঠিছে কল কল কল
জটাজুট মাঝে থাকিয়া॥"

এইরূপ রচনা কম দক্ষতার কার্য্য নহে। প্রতিভাবান্ সুদক্ষ কবিই শুধু এইরূপ রচনা করিতে পারেন। তাই ইংরাজী সাহিত্যে সেক্স্‌পীয়ার, মিল্টন্ ও টেনিসনের রচনায়, সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস, ভবভূতি ও জয়দেবের কবিতায় এইরূপ রচনা-চাতুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দর" সাধারণের নিকট অপরিচিত। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দর"কে ম্লান করিয়া দিয়াছে। ভারতচন্দ্রের নায়ক-নায়িকা আদিরসের অবতার; রামপ্রসাদের নায়ক-নায়িকা যেন মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম ও মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা। ভারতচন্দ্রের কাব্য সৌন্দর্য্যের আধার, মাধুর্য্যের খনি। রামপ্রসাদের কাব্য আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ;—এইজন্য ইহা সাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য;—দুর্ব্বোধ্য না হইলেও আনন্দপ্রদ নহে। যাহা হউক, পণ্ডিত ও মূর্খ সকল বঙ্গবাসীই রামপ্রসাদের কালী-কীর্ত্তন ও শ্যামা সঙ্গীতের সহিত পরিচিত। রামপ্রসাদের নাম তাঁহার গানে। "এ দেশের সাহিত্যে কাব্য অপেক্ষা গীতিই প্রশংসনীয়; কারণ এখানে কর্ম্ম অপেক্ষা ভক্তিই অধিক কার্য্যকরী।" রামপ্রসাদকে আমরা তাঁহার গানের মধ্য দিয়াই চিনি; তাই তাঁহার গানের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা কর্ত্তব্য এবং সাধারণের অজ্ঞাত তাঁহার "বিদ্যাসুন্দর" লইয়া প্রবন্ধের কলেবর পুষ্ট করা যুক্তিযুক্ত নহে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ভাব ও ভাষা দুইয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি জানিতেন ভাবের পরিশুদ্ধি যেরূপ আবশ্যক, ভাষার পরিশুদ্ধিও সেইরূপ আবশ্যক। ভাষা ভাবের বাহিকা মাত্র; ভাষা ভাবের স্পন্দন। ভাষা যদি ক্ষীণা ও দুর্ব্বলা হয়, তবে সে কখন উচ্চ ভাবের গুরুভার বহন করিতে পারে না। ভাষার মধ্য দিয়াই ভাবের বিকাশ। ভাষা যদি কৃত্রিম হয়, ভাবও কৃত্রিম হইবে। ভাষা যদি সরল ও উদার হয়, ভাবও সরল ও উদার হইবে। পদ্যেরই হউক বা গদ্যেরই হউক, ভাব প্রাণ, আর ভাষা এই প্রাণধারণকারী অবয়ব মাত্র। দেহের সঙ্গে প্রাণের বা মনের যেমন সম্বন্ধ, ভাষার সঙ্গে ভাবেরও ঠিক তেমনি সম্বন্ধ। দেহে যদি ব্যাধি থাকে, মনে শান্তি থাকে না; মন যদি নিরানন্দ থাকে, আঁখি সৌন্দর্য্যের দিকে দেখে না, অধর হাসে না, কণ্ঠ আনন্দের গান গাহে না। ভাষা ও ভাবের মধ্যেও ঠিক এই সম্বন্ধ। নীচ ভাষা বা কদর্য্য ভাষা উচ্চ বা সুন্দর ভাবের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিতে পারে না। আবার উচ্চ বা সুন্দর ভাব নীচ ও কদর্য্য ভাষার আবরণে উচ্চতা ও সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলে।

রামপ্রসাদ পবিত্রতার প্রতি প্রধানতর লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তাই তাঁহার ভাবে পবিত্রতার বিকাশ; এবং ভাবের এই পবিত্রতা বিকাশের জন্য তিনি উপযুক্ত ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। তা ছাড়া, গানের সর্ব্বস্ব সুর। এই সুর রামপ্রসাদ এমন সুন্দরভাবে দিতেন যে, অতি-বড় পাষাণও শুনিলে গলিয়া যাইত। একটী কথা আছে, Science teaches; Art moves। এখানে Art অর্থে "সাহিত্য" ধরিয়া লই। বাস্তবিকই বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, এবং সাহিত্য আমাদের নিদ্রিত হৃদয়কে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া তুলে। রামপ্রসাদের এক-একটী গান এক একটী আদর্শ সাহিত্য। ভাব ও ভাষার যেমন মিল, তেমনই তাহাদের মোহন ঐক্যতান। রামপ্রসাদের ভাব, ভাষা ও সুর এই তিনে মিলিয়া ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগাইয়া তুলে, অন্ধকে দৃষ্টিদান করে, পাষাণকে গলাইয়া দেয়, বৃক্ষ, তরু, লতা, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, সকলকে বিমোহিত করে,—সকলকে শক্তির স্পন্দনে স্পন্দিত করে, সকলকে শক্তি-বীজ-মন্ত্রে দীক্ষিত করে। একটা উদাস উল্লাস, একটা অপরিমেয় সুখানুভূতি জীবনটাকে যেন ভাসাইয়া লইয়া যায়। ছত্রের পর ছত্র গান গাহিবার সঙ্গে-সঙ্গে এই উল্লাস এবং এই উল্লাসের অনুভূতি বাড়িতে থাকে। তখন জগতের জ্বালা, দুর্দ্দিনের ব্যথা, দৈন্যের পীড়ন,

শোকের করুণ হাহাকার—সকল ভুলিয়া যাই। মনে হয়, গানই সত্য, আর সব মিথ্যা; মনে হয়, জগতের সব যাহারা আমাদের আপনার, তাহারা স্বপ্ন-রাজ্যের অধিবাসী; মনে হয়, সংসারের ক্ষণিকের সুখ জলের বুদ্বুদ; মনে হয়, স্বার্থের জন্য ছুটাছুটি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যাকুল ব্যস্ততা সব দারুণ ভ্রান্তি। যে সব প্রহেলিকাও প্রশ্নের উত্তর কখন দিতে পারি নাই, যে সব জটিল সমস্যার মধ্য হইতে কোন দিন বাহির হইতে পারি নাই, সে সব প্রহেলিকার উত্তর তখন আপনি মনে পড়ে, সে সব সমস্যার মধ্য হইতে এক প্রশস্ত রাজপথ বাহির হইয়াছে দেখিতে পাই। জীবনের ও মৃত্যুর, আলোকের ও আঁধারের, জ্ঞানের ও অজ্ঞানের সকল সত্য মূর্ত্তি ধরিয়া নয়নের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন আমি কোন্ জগতে, তখন আমি কোন্ গগনচন্দ্রাতপ-তলে, তখন আমি জীবনের কোন্ উচ্চ শিখরে, তাহা বুঝিতে পারি না! শুনিতে-শুনিতে সাধক কবির ভাব, ভাষা, সুর আমায় উন্মাদ করিয়া তুলে! ভাব, ভাষা, সুরের ত্রিতন্ত্রীর তারে ঘা দিয়া গায়ক যখন বিমল আনন্দোচ্ছ্বাস তুলেন, তখন স্রোতের ফুলের মত আমি ভাসিয়া-ভাসিয়া কোন্ প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়া পড়ি! শত প্রার্থনায়, শত উপাসনায় যাহা পাই নাই, তাহা রামপ্রসাদের নিখুঁত গান শ্রবণ করিয়া পাই। সূর্য্য যাঁহার কণা তেজঃ পাইয়া তেজোময়, তাঁহার অনন্ত তেজোময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই! সুধাংশু যাঁহার কণা সুধা পাইয়া সুধাময়, তাঁহার অনন্ত সুধার ক্ষণিক আস্বাদ পাই! আকাশ ও সাগর যাঁহার কণা গাম্ভীর্য্য পাইয়া গুরুগম্ভীর, অসীম, সুনীল, তাঁহার অনন্ত গাম্ভীর্য্য-মাধুর্য্যের তিল আভাষ পাই! যখন গান থামিয়া যায়, তখনও প্রাণের মাঝে সুর থামে না। ধ্বনি থামিয়া যাবার পরেও প্রতিধ্বনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই। কিন্তু এই প্রতিধ্বনিও যখন থামিয়া যায়, তখন আবার ব্যস্ততা, আবার ব্যাকুলতা, আবার গান শুনিবার তীব্র বাসনা!

রামপ্রসাদের গানের সুর একবার শুনিলে আর ভুলিতে পারা যায় না। একবার একজন গায়ককে বলিতে শুনিয়াছিলাম, "আমের মধ্যে যেমন ন্যাংড়া আম, সুরের মধ্যে তেমনি প্রসাদী সুর।" কথাটা নেহাৎ মন্দ হয় নাই। আম অনেক রকমের আছে; সুরও অসংখ্য। বিভিন্ন রকমের আমের বিভিন্ন তার; বিভিন্ন সুরের মাধুর্য্যও বিভিন্ন। ন্যাংড়া আম আম বটে, কিন্তু ইহার আস্বাদে এমন কিছু আছে, যাহা ইহাকে অন্য আম হইতে পৃথক্ বলিয়া জানায়। প্রসাদী সুর সুর বটে; কিন্তু ইহার মধ্যে এমন কিছু মোহিনী শক্তি আছে, যাহা শ্রোতাকে বড় বেশী মুগ্ধ করে। অনেকে আপত্তি করেন এই বলিয়া যে, রামপ্রসাদের অনেক সুর একরকমের, বড় একঘেয়ে। এ কথা সত্য, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, "প্রসাদী সুর" সব এক রকম—ইহা জানিয়াও যখনি রামপ্রসাদের প্রসাদী সুরের কোন গান শুনি, তখনি মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না। এই ক্ষমতাটাই "প্রসাদী সুরের" বিশেষত্ব। এক সুরে অনেক গান শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সবগুলি মর্ম্মস্পর্শী হয় না। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের "জন্মভূমি"র সুরে অনেক গীতি রচিত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা "জন্মভূমি"র মত মর্ম্মস্পর্শী হয় নাই। ইহার কারণ এই, সুরের সঙ্গে ভাষার তত ভাব হয় নাই—ভাবের অভাব,—অভাব না হইলেও,—দৈন্য। ভাষা জোর করিয়া সুরের ছাঁচে ঢালা হইয়াছে; কাজেই, যে প্রতিমা হইয়াছে, তাহা নিখুঁত নয়; স্বাভাবিক সুরের সহিত কৃত্রিম ভাষার মিলন সুন্দর হয় না। তাই, যত চেষ্টা করিয়াই হউক, যত সুন্দর কথা বাছিয়াই হউক, তুমি "জন্মভূমির" সুরে গান রচনা কর না কেন, তাহা "জন্মভূমি" গানের মত মর্ম্মস্পর্শী ও আনন্দদায়ক হইবে না। অনুকরণ কখন আদর্শকে হারাইতে পারে না; যখন পারে, তখন জানিতে হইবে যে, সে আদর্শ আদর্শই নহে। "প্রসাদী সুরে" কত কবি কত গান রচনা করিয়াছেন; কিন্তু সেগুলি রামপ্রসাদী গানের মত হইয়াছে, বা তাহাকে হারাইয়াছে, ইহা কখনই বলা যায় না। "প্রসাদী সুরে" প্রসাদী গানই ভাল লাগে, অর্থাৎ "প্রসাদী সুরে" রামপ্রসাদের মত পবিত্র চিন্তাপ্রসূত গান বা সাধনসঙ্গীত সুন্দর লাগে। গোঁফ-দাড়ীওলা বেটাছেলেকে মেয়ে-মানুষ সাজাইলে যেমন বিশ্রী দেখায়, "প্রসাদী সুরে" টপ্পা গান ঠিক তেমনি বিশ্রী শুনায়। "প্রসাদী সুরে" পবিত্র ভাব অতি সুন্দর ভাবে প্রকটিত হয়। এই জন্য রামপ্রসাদের গান "রামপ্রসাদী সুরে" গাহিলে এত ভাল শুনায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, ভাবে ও ভাষায়, ছন্দে ও

সুরে রামপ্রসাদ কম দক্ষতার পরিচয় দেন নাই! দার্শনিক ও উপদেষ্টা হিসাবে রামপ্রসাদ যেমন পূজনীয়, কবি ও গায়ক হিসাবেও তেমনি বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি। শক্তি-সাধনার অতি নির্ম্মল ভাব, অতি সুন্দর ভাবে বঙ্গসাহিত্যে তিনি প্রথম দিয়া গিয়াছেন। বিশ্বমাতৃত্বের মোহিনীমূর্ত্তি তিনিই প্রথম বঙ্গসাহিত্যে—গানে ও গাথায়—অঙ্কিত করেন। বঙ্গসাহিত্যোদ্যানে ভক্তিবারি সেচনে তিনি যে অতুলনীয় গীতিকুসুমরাজি প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, তাহা সৌরভে চিরদিন বঙ্গভাষীর প্রাণ মাতাইবে; সৌন্দর্য্য বাঙ্গালীর চিত্ত মুগ্ধ করিবে। রামপ্রসাদ যে স্রোত বঙ্গসাহিত্যে প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহার গতি চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে; নানা কালে, নানা কারণে সে স্রোত কখন বাতাহত সমুদ্রের মত আলোড়িত ও তরঙ্গায়িত, কখনো বা প্রশান্ত মহাসাগরের মত শান্ত ও গর্জ্জনবিহীন হইতে পারে সত্য; তথাপি তাহার গতি চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বিষাদে ও দুঃখে, পীড়ায় ও যন্ত্রণায়, বিপদে ও দুর্দ্দিনে যখন মনের অন্ধকার জীবনের লক্ষ্যকে রাহুর মত গ্রাস করে, যখন মানব অধঃপতনের পথে উন্মাদের মত ছুটিতে থাকে, যখন অধর্ম্ম, অসত্য ও পাপের পঙ্কিল স্পর্শে দেহ-মন-প্রাণ কলুষিত ও দূষিত হইয়া উঠে,—যখন মনে হয়, এ জীবন শুধু যন্ত্রণা, এ সংসার শুধু প্রতারণা, ঈশ্বর শুধু মূর্ত্তিমান্ অত্যাচার, তখন ভক্ত-সাধক শ্রীকবিরঞ্জন রামপ্রসাদের অমর গান ও সুরের ধারা অমৃত-ধারার মত শ্রবণে বর্ষিত হইয়া, জীবনকে তৃপ্ত ও শীতল করিয়া তুলে; উজ্জ্বল আলোকের মত পতিত হইয়া সকল অন্ধকার দূর করে—আবার জীবনের লক্ষ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়; আবার মনে হয়, এ জীবন সুখের ভাণ্ডার, এ সংসার শান্তিনিকেতন, ভগবান্ আমাদের প্রিয়তম, জীবন-দেবতা! ভক্ত কবির গানের এই ক্ষমতা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যতদিন বঙ্গসাহিত্য জীবিত থাকিবে ততদিন রামপ্রসাদের গানগুলি বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে; যতদিন বাঙ্গালী জীবিত থাকিবে, ততদিন অদ্বিতীয় কবি বলিয়া রামপ্রসাদের উদ্দেশে প্রণাম করিবে!

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(৪১)

সেই যে মনোরমা সে-দিন নিজের সমস্ত ইতিহাসটা শুনাইয়া দিয়া অবশেষে বলিয়াছিল, "এখন সবই তো তুমি জান্‌তে পারলে, লোকের কথায় নিজের মনকে আর খারাপ হ'তে দিও না। অন্যের পক্ষে যাই হৌক, তুমি যার ছেলে, তাঁর ছেলের পক্ষে বাপের উপর একবিন্দু বিরুদ্ধ ভাব মনের কোণে আস্‌তে দেওয়াও অপরাধ। তিনি বাপের হুকুমে নিজেকে যে কতখানি সইয়েছেন অজু! আজ তুমি ছেলেমানুষ, বুঝবে না। কিন্তু আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি বাবা,—বাঁচিয়ে রেখে ঈশ্বর তোমায় ছেলের বাপ হ'তে দিন, তখন বুঝতে পারবে, এ কি ভীষণ ত্যাগ!" সেই-যে অজিতের মনের মধ্যে দেব-নির্ম্মাল্য-ধোয়া শান্তিজল ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, মনের সমস্ত অভিমানের কালী তাহার সেই জলের ধারায় ধুইয়া গিয়া তাহা যেন শিশির-ধৌত শতদলের মতই মুহূর্ত্তে বিকশিত ও সুবাসিত হইয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে একটা মধুর আবেগে অজিতের হৃদয়-মন পূর্ণ হইয়া গেল। দিনান্তের সূর্য্যালোক তাহার ভবিষ্যতের আশাটাকে যেন স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া তুলিল। কি সুন্দর পৃথিবী, কি আলোকোজ্জ্বল আকাশ-বাতাস; যেন সুগন্ধি বাসরের মত দেহ-মনের সকল ক্লান্তি হরণ করিয়া লইয়া গেল রে! এত শোভা এত দিন কোথায় লুকাইয়া ছিল?

যে মুসলমান ফকিরটী প্রায় প্রতিদিন ভিক্ষা করিতে আসে, নিজের বাঁধা বুলি, "আল্লাকে নামকো চাউল, মহম্মদকো নামকো পয়সা, খোদাকো নামকো রোটি—দিলা দেগা, ভালা হোগা"—বলিতে-বলিতে দ্বারে আসিয়া

দাঁড়াইতেই অজিত কোথা হইতে তিন লাফে আসিয়া তাহাকে একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া, আশীর্ব্বাদের সঙ্গে-সঙ্গে সমান ওজনে গাল-ভরা হাসি লইয়া ফিরিয়া গেল।

ভক্তি এতদিন শুধু উপদেশের বাণীতেই নিবদ্ধ ছিল; আজ সে বাস্তব সত্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে; তাই সমুদয় জগৎ-সংসারের উপর হইতেও যেন আবরণ খসিয়া গিয়াছে। চির-পরিচিত পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা অন্তর্হিত হইয়া গিয়া, পশু-পক্ষী, গাছপালা, পথের জনতা, সকলই আজ আবার পূর্ব্বের মতই—কি তদপেক্ষাও অভিনবত্বে অপরূপ হইয়া উঠিল। এই বিশ্ব-ব্যাপী সৌন্দর্য্য-সাগরে সে যেন ডুবিয়া ভোর হইয়া রহিল; এবং উচ্চ-আশার রাগিনীতে বাঁধা তাহার মনোযন্ত্রের সমস্ত তার-গুলা খুব উঁচু সুরেই ঝঙ্কৃত হইতে থাকিল। এই ভাবাবেশে, মুঙ্গুলী গাইকে ও তাহার 'বুধী' বাছুরকে অনেক দিনের পরে সে খুব একচোট আদর করিয়া তাহাদের ইংরেজী কবিতায় মুখস্থটা আদ্যোপান্ত শুনাইয়া দিয়া আসিল। 'রাখুদা' মরিয়া গেলে যে পাঁচু কৃষাণ তাহার স্থলে কাজে বাহাল হইয়াছে, তাহার সঙ্গে খানিকটা হিস্ট্রী সম্বন্ধে আপন-মনে বকিয়া, অনেক দিনের অনাদৃত চন্দনাটার ল্যাজ ধরিয়া টানিয়া তাহাকে "গোপীকৃষ্ণ কহো" বলাইয়া, এমন কি, গম্ভীর-প্রকৃতি দিদিমাকে শুদ্ধ যা-তা বলিয়া হাসাইয়া যেন এত-দিনকার অকাল-গাম্ভীর্য্যের শোধ তুলিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই সঙ্গে নীরবতার নৈষ্ঠুর্য্যে হানা-বাড়ীর মত থম্‌থমে সমস্ত বাড়ীখানার ঘনীভূত বিষাদ যেন এক মুহূর্ত্তে শরৎকালের লঘুগতি পুঞ্জ-মেঘের মত কোথায় উড়িয়া চলিয়া গিয়া, তাহারই দিকে পুলকোচ্ছ্বসিত শিশু-কণ্ঠের স্বর্ণবীণার অলোকশ্রুত সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে দিনের সমস্ত পড়াশোনায়, আহার-নিদ্রায় কি অসীম আগ্রহ, কি মধুর শান্তিই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তার পর এই সকল আগ্রহ-উদ্দীপনার ভিতরে-ভিতরে বুকের মধ্যে যে একটা অনুশোচনা-পূর্ণ আত্মগ্লানি প্রবাহিত হইতেছিল, সেটাকে লইয়া সে যখন ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেল, তখনি প্রবল আত্মধিক্কারে সমস্ত প্রাণটা তাহার যেন ঘৃণায় কুণ্ঠিত হইয়া আসিল। পিতার এত-খানি মহত্বকে ভুল করিয়া নিজের মনটা যে কত-খানি কদর্য্য, কত-খানি কুৎসিত, তাহারই পরিমাপ করিতে গিয়া লজ্জায়, ঘৃণায়, সে যেন মরিয়া যাইতে লাগিল; এবং যে মা তাহাকে এই অধঃপতনের পথ হইতে ফিরাইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে সে বারম্বার প্রণাম করিল। রাত্রে বিছানায় শয়ন করিতে গিয়া, মাকে পূর্ব্বের মত একবার জড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহার বুকের ভিতর ঢুকিয়া শুইল। ছেলের মনের ভাব বুঝিয়া মনোরমা শান্ত চিত্তে একটু হাসিল এবং তাহার বক্ষ মথিত করিয়া একটি দীর্ঘ তপ্তশ্বাস উত্থিত হইল।

(৪২)

বাজ-পড়া তালগাছ যেমন বাহিরে স্থির থাকিয়া নিঃশব্দে পুড়িয়া যায়, প্রবল অভিমানের আগুন বুকের মধ্যে জ্বালাইয়া লইয়া ব্রজরাণীও ঠিক তেম্‌নি করিয়া রহিল। এ অভিমান কাহার উপর? এ প্রশ্নের উত্তর করিলে সে নিজেই বোধ করি সব-চেয়ে বিপদে পড়িত। মনের এই যে নৈরাশ্য ও বেদনা, এবং ইহার ফলে প্রসূত এই যে দুর্জ্জয় অভিমান, ইহার লক্ষ্য যে কে, সে কথা হয় তো সে নিজেও ভাবিয়া দেখে নাই। তবে খুব সম্ভব, ভৃগু-ঋষিই ইহার মূল। তাঁহার ব্যবস্থাপত্রখানা ফিরিয়া-ফিরিয়া যতবারই পড়িল, ততবারই যেন সেখান হইতে হাজারটা ভীমরুল উড়িয়া আসিয়া সহস্রটা বিষাক্ত হুল ফুটাইয়া দিয়া, তীব্র বিষের যন্ত্রণায় তাহার শরীর-মনকে বিষাক্ত করিয়া দিল।

নিজের নিঃসহায় অবস্থায় অস্থির হইয়া পড়িয়া ব্রজরাণী স্বামীর কাছে দিনে অমন পঁচিশ বারও নিস্ফল নালিস করিয়া-করিয়া তাহার মুখের বিপুল ঔদাস্যে এতটু মাত্র পরিবর্ত্তনের রেখা বদল করিতে না পারিয়া রাগিয়া অভিমানে অধীর হয়। এবার কিন্তু নিজের নিঃসঙ্গাবস্থাতে কতকটা শান্তি লাভ করিয়া সে নিজের ঘরের বিছানা এমন করিয়া দখল করিল যে, যে অরবিন্দের মনটাকে দুই হাতে ধরিয়া নাড়া দিলেও তাহা নড়ে কি না বলিয়া সন্দেহ জন্মে, সেই মানুষেরও হঠাৎ একদিন এই নির্লিপ্ততা নজরে ঠেকিয়া গেল। বাহিরের ঘরে, হয় বন্ধুবান্ধব লইয়া তাস-পাশার আড্ডা চালান, অথবা খবরের কাগজ ও বইয়ের গাদা লইয়া তন্মধ্যে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া থাকা, ইহাই অরবিন্দের জীবন-যাত্রার চিরাভ্যস্ত পদ্ধতি। এখানে বন্ধুর সংখ্যা বেশী নয়। পড়সী দু' তিনটি ক্রমে-ক্রমে আসিয়া জড় হইতেছিল। বেশীর ভাগই তাহারা কখনমেধে ভাগবৎ-কথা শুনিতে যায়। দৈবাৎ কোন দিন সন্ধ্যার পর

তাসের আড্ডা বসে। এখানে বই-কাগজই এক মাত্র সঙ্গী।* এঁদের আশ্রিতবর্গের সঙ্গীহীনতা কখনই উপলব্ধি হয় না। নিজ-নিজ রুচি-প্রবৃত্তি অনুসারে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিলে, সৎ-অসৎ, হাস্যরসিক, গীম্ভর প্রকৃতিক, নাস্তিক, আস্তিক সর্ব্বপ্রকারেরই সহচর পাওয়া যায়। তথাপি ইহারই ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ দৈবক্রমে মানুষের মন কোন একটা সময় হয়ত জীবন্ত একটা অতি সাধারণ মানুষের বিচিত্রতাবিহীন একটু সাহচর্য্যের লোভে এমন চঞ্চল হইয়া উঠিতে পারে, যখন স্বদেশীয় অথবা বৈদেশিক মহামহোপাধ্যায়গণের আশ্চর্য্য গুণগরিমা তাহার সেই শিক্ষিত চিত্তকে বাঁধিতে পারে না।

অরবিন্দের হঠাৎ সেদিন মনটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। বই ফেলিয়া একা বসিয়া-বসিয়া শরতের কথাই সে ভাবিতেছিল। তাহাকে মনে করিতে মনের মধ্যটা সুখের আলোয় ভরিয়া-উঠিয়াছিল। আবার তাহার সহিত এই বিচ্ছেদের স্মৃতি মনে জাগিয়া পীড়িত এবং ব্যথিত করিয়াও তুলিতেছিল। একটি-একটি করিয়া কত দিনের কত কথাই মনে আসিল। যেদিন নিতাইএর সঙ্গে কনে দেখিতে সে বর্দ্ধমানে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া শরতের শ্বশুরবাড়ী গিয়া দেখা করিয়া বলে, "ঐ মেয়েটী যদি তোদের বউ হয়, তোর নিশ্চয় খুব পছন্দ হবে। অমন কথ্‌খন আর পাবিনে, তা আমি তোকে ব'লে দিচ্ছি।"

শরৎ দুষ্টু-দুষ্টু হাসি হাসিয়া, মাথা নাড়িতে-নাড়িতে বলিয়াছিল, "বউএর উপর যদি তোমার চাইতে আমার দাবী বেশি ক'রে করিয়ে দাও, তা হ'লেই আমি ঘটকালী করি।"

অরবিন্দ অবশ্য তখনই এই সর্ত্ত আগ্রহের সহিতই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল,—বিশেষ কিছু না ভাবিয়াই। কিন্তু তাহাদের জীবনে এ অঙ্গীকারকে তাহাদের অন্তর্যামী যে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই কথাটাই শুধু আজ বলিয়া নয়, অনেকবারই অরবিন্দের স্মরণে আসিয়াছে। আজ আবার তাহাই মনে করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত হইল। আর একটা দিনের কথা;—ব্রজরাণীকে বিবাহ করার পর, দ্বিতীয় বৎসরের প্রারম্ভে, তৃতীয়বার একজামিনে ফেল করিয়া, সে যখন পিতার আদেশে পড়া ছাড়িয়া চাকরী আরম্ভ করিল, এবং বধূকে লইয়া বাবার বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, তখনকার তাহাদের কি একটা ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া, শরৎ একদিন কঠিন কণ্ঠে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল, "তার সেই দুর্দ্দশা ক'রে একে যে এমন মাথায় তুলে নাচাচ্চো, জিজ্ঞাসা করি, অধর্ম্মেরও কি একটা ভয় হয় না?" অরু তখন হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, "তা হ'লে তোর মতে, তার যখন দুর্দ্দশা করেচি, অতএব এরও তাই করা উচিত,—এই না? আরব্য উপন্যাসের বাদ্‌শার মতই দেখছি তোর মনটা! সে ভদ্রলোক তার সব ক'টা বউএরই এক দশা করেছিল;—রাত্রে বিয়ে এবং সকালে খুন! এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানোর চাইতেও একটুখানি বেশি।" শরৎ বলে, "না, তা আমি বল্‌ছিনে যে, একেও তুমি তার মতন ত্যাগ করো। কিন্তু তা ব'লে একে তুমি যদি এমন করেই মাথায় তোলো;—তা হ'লে তার প্রতি তোমার ব্যবহারটাকে ইচ্ছাকৃত,—অতএব মনুষ্যত্বের বিরোধী বলে—লোকের মনে সন্দেহ আসবে যে!" অরবিন্দ সে কথার কণ্টকটুকু স্বীকার করিয়া লইয়া প্রতিপ্রশ্ন করিল, "একে আমি পায়ে ফেলে রাখলে, তার দুঃখের একচুলও কি তফাৎ হবে?" "তা হবে না, কিন্তু—" "তা হ'লে অনর্থক আমার পুণ্যের ভরাথানা ভরিয়ে তোমার লাভ?"

এই পর্য্যন্ত আলোচনার পর শরৎ হঠাৎ গভীর উচ্ছ্বাসে "দাদা গো, তোমার পায়ে পড়ি, অন্ততঃ আমায় দেখিয়েও তুমি ওকে একটুখানি কম ভালবেসো;—আমি যে কিছুতেই সইতে পারি নে—" এই কথা বলিয়াই কাঁদিয়া উঠিয়া, মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজিতে-গুঁজিতে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সে কথাও অনেকবারের মত আবার ফিরিয়া মনে আসিল। আরও কত দিনের কত কথা। এম্‌নি করিয়া শরতের স্নেহময়ী স্মৃতি বুকের মধ্যে ভরিয়া লইয়া, তাহাকেই নাড়িয়া-চাড়িয়া সে অনেকখানি সময় কাটাইয়া দেয়। স্মৃতির মধ্যে তন্ময় হইয়া থাকা তাহার তো আজিকার অভ্যাস নয়। এই করিয়াই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলা—যেগুলা শুধু বাস্তবেরই প্রধান উপভোগ্য—সেইগুলাই কাটিয়া গিয়াছে। আজ তো তবু তাহার পুরাতন খাতার খালি পৃষ্ঠাগুলা সমস্তই প্রায় ভরা।

শীতের দিনের মেঘলা বড় ক্লান্তিকর,—অস্বস্তিতে শরীরের সঙ্গে মনটাকেও সে যেন ঝাপ্‌সা করিয়া রাখে। ঘরের মধ্যে আলোর অভাব ক্ষণে-ক্ষণেই ঘটিতেছিল, এই বয়সেই

ক্ষীণদৃষ্টি, শিরঃপীড়াগ্রস্ত অরবিন্দের নজর বইএর লেখায় বাধিত হইতে লাগিল। চিন্তাও ক্রমে গুরুভারগ্রস্ত বোধ হইল। বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই, বৃষ্টি-অধ্যুষিত রাজপথ ও পথিপার্শ্বের ক্লেদাক্ত আর্দ্রতা তাহার ভারাক্রান্ত চিত্তটার উপর যেন গো যান-চক্রের মথিত কর্দ্দমের ন্যায় ছিট্‌কাইয়া আসিয়া পড়িল। দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া, ঘরে ফিরিয়া ঢুকিতে গিয়া হঠাৎ মনে হইল, আজ ভোরবেলা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসার পর হইতে ব্রজরাণীকে সে আর একবারও দেখিতে পায় নাই। ব্রজরাণীকে দেখিবার জন্য সে যে কিছু ব্যস্ত ব্যাকুল থাকে, এমন সন্দেহও তাহার মনের মধ্যে কোনদিনই ছিল না, অথবা সে সন্দেহোদয়ের অবসরও কোনদিন ঘটে নাই। অপ্রাপ্য বা আয়াসলব্ধ বস্তুতেই মানুষ লুব্ধ হয়। কিন্তু অরবিন্দের এই দ্বিতীয়া বধূটি তাহার পক্ষে প্রাংশুলভ্য ফল নহেন,—নিতান্তই অনায়াস-প্রাপ্ত ঘাড়ের বোঝারূপেই সে ইহাকে ঘরে আনিয়াছিল। তার পর সেই মাথার মোটকে সে যে সহনীয় এবং বহনীয় করিয়া লইতে পারিয়াছে, সে কেবল তাহার অনন্যসাধারণ ধৈর্য্য-সহায়েই। যাই হোক্, গুণপনা ইহাতে যাহারই থাক্, মোট কথা, অরবিন্দ এই স্ত্রীটিকে যত বেশি আদরে করিয়া তুলিয়াছিল, তত বেশি আদর করিবার প্রয়োজন তাহার কোনদিনই হয় নাই। এক-একজন মানুষ যেমন কেবল মানুষ চরাইবার জন্যই জন্মায়, ব্রজরাণীও জন্মগত সেই রকম কর্ত্তৃত্বের, একটা শক্তি লইয়া আসিয়াছিল। কেহ তাহাকে সে অধিকার দিক না দিক্, সে লোককে চালাইবার ন্যায্য অধিকার নিজের জোরে দখল করিয়া বসিবেই বসিবে, —ঠেকাইতে কেহ পারিবে না। অতএব, ইহার সহিত বিদ্রোহ না করিয়া সন্ধিতে কাটানই শ্রেয়ঃ।

অরবিন্দ স্ত্রীকে চিনিয়া এই নীতির আশ্রয়েই এতদিন কাটাইল। সে দেখিল, ব্রজরাণী তাহার আদর-অনাদর কোন কিছুরই প্রত্যাশা না রাখিয়া, নিজের অপ্রতিহত শক্তিতে, নিজের অধিকার-অনধিকার-নির্বিচারে যেমন সবার উপর, তেমনি তাহার উপরেও দখল লইয়া বসিল। এ লইয়া চেঁচামেচি করিতে গেলেই যে সে, তাহার হক্-সীমানা বলিয়া যেটাকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া দিবে, এমন কোন প্রমাণ তাহার কোন আচরণেই প্রমাণ হয় নাই। সে বিনা বাধায় তাহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইল। মেয়েরা অন্তঃপুরে গালে হাত দিয়া এবং পুরুষেরা সদরে গলা ছাড়িয়া, উচ্চকণ্ঠে তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"একেবারে ভেড়া বনে গ্যাছে!" "এতটা যে বিদ্যে বুদ্ধি, সবই কি না ঐ মাতুল চরণে ডালি দিলে!—অরবিন্দ এ করলে কি!" এই বলিয়া কোন-কোন হিতৈষী আক্ষেপও করিতে লাগিলেন।

অরবিন্দ শুনিয়া তাহার কোন এক বন্ধুর কাছে কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিল,—"আর একদিন ঐ উনিই আবার বলেছিলেন যে, এতটা বিদ্যে শিখে নিজের ধর্ম্মপত্নীটাকে কি না অমন ক'রে বিদায় ক'রে দিলে,—অরবিন্দটা এত বড় পাষণ্ড! ওঁদের যখন ক্ষণে-ক্ষণে এমন মত বদলায়, তখন এর উপায় তো আমি কিছুই দেখতে পাইনে।"

তা, এই নতুন গৃহিণীর কর্ত্তৃত্ব তাহার এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, কোন দিন তাহার সঙ্গলিপ্সা মনে জাগাইবার প্রয়োজনই উপস্থিত হয় নাই। ব্রজরাণীই যে উদয়াস্ত তাহার পিছনে ছায়ার মত ঘুরিতেছে। বরং কত সময়ে, ইহার দৃষ্টি এড়াইয়া একটুখানি নিঃসঙ্গ হইবার জন্য নিরালার সন্ধানে সে অস্থির হইয়াছে।

আজ শীতশীর্ণ গাছপালার উপর, কর্দ্দমাক্ত পথপানে, জীর্ণকন্থা-বিশোভিত বারান্দার দিকে চাহিয়া, যখন তাহার মেঘাচ্ছন্ন চিত্ত অধিকতর বিষণ্ণতায় ভরিয়া উঠিল, তখন এই বাড়ীরই আর একটি নিঃসঙ্গ জীবের কথা তাহার সহসাই স্মরণ হইয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়িল, দিনের মধ্যে না হোক পাঁচ-সাতবারও যে অন্দর ও বাহিরের ঘরকে এক ক'রে, সে আজ একটিবারও তো তাহার তত্ত্ব লইতে আসে নাই। তখন মনে পড়িল, আজকাল কিছুদিন হইতেই সে আসে'না। আবার এও মনে হইল, প্রায় দিন চার-পাঁচ তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তাও কই বড় একটা হয় নাই। কোন কিছু লইয়া ঝগড়া হইয়াছিল কি? স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেও স্মরণে আসিল না। তবে একবার খবর লওয়া উচিত তো।

ব্রজরাণী ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, বোধ করি কড়িকাঠই গুণিতেছিল, কি, কি! অরবিন্দ ঘরে ঢুকিয়া তাহার দিকে চাহিতে, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি অধঃ নামাইয়া আনিয়া, সে ক্লান্তভাবে একটুখানি হাসিল। সেই হাসিটুকুর মাঝখান দিয়া অরবিন্দ সাশ্চর্য্যে দেখিল, উহার ভিতরটা

যেন তাহা অপেক্ষাও পরিশ্রান্ত, অবসন্ন। অবসাদের চরম গহ্বরে গড়াইয়া না পড়িলে মানুষের ঠোঁট দিয়া অমন হাসি ব্যক্ত হইতে পারে না। বিশেষ যারা রূপৈশ্বর্য্যের মহামানে মণ্ডিত এবং যৌবন নিজের প্রখর জ্যোতিঃ যাহাদের শরীর-মনে সহস্র ধারায় ঢালিয়া দিয়া, দীপ্ত শিখায় সূর্য্যের মত জ্বালাইয়া রাখিয়াছে! অরবিন্দ অগ্রসর হইয়া ডাকিল, "কি রাণি, এমন সময় শুয়ে যে!"

ব্রজরাণী কহিল, "আমার আবার সময়-অসময় কি?" "অসুখ-বিসুখ তো করে নি?" "আমি বাঁজা-খাঁজা মানুষ, আমার আবার অসুখ কি করবে?" "তবে অবেলায় চুপটি ক'রে শুয়ে আছ কেন?" শ্রান্ত স্বরে রাণী জবাব দিল—"কাজ কই?"

অরবিন্দ একটা চৌকি টানিয়া বসিয়া বলিল, "কাজের আবার অভাব কি? সেই যে কি সব শলমার কাজ-টাজ করছিলে, সে সব হ'য়ে গেছে?"

ব্রজরাণী ক্লান্তভাবে চোখের উপর একটা হাত চাপা দিয়া উত্তর করিল—"কি হবে সে সব ক'রে?"

অরবিন্দ বলিল, "কি হবে কেন? বালিগঞ্জের নতুন বাড়ী সাজাবে না?"

ব্রজরাণী ঈষৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনশ্চ জবাব দিল, "কি দরকার? আমার কিছু দরকার নেই। মরে গেলে যার পিছনে চাইবার কেউ কোথাও নেই, তার আবার—" কথাটা শেষ না করিয়াই সে বক্ষোত্থিত দীর্ঘশ্বাসটাকে চাপা দিতে গিয়া, নড়িয়া-চড়িয়া কপালটা টিপিয়া ধরিয়া, একটু চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়া সেটাকে শেষ করিয়া দিল। স্বামীকে আপন ভাবিয়া আপনার এই অপ্রতিবিধেয় দুঃখের অংশ সে ভাগ করিয়া লইতে কুণ্ঠিতই হইত। স্বামী তো তাহার একার নহেন! বিশেষ ব্রজরাণীর দুঃখের সহিত সহানুভূতি তাঁহার কিসের? নিজে তিনি অপত্যবান্। তাহার এ দুঃখ তিনি কখন বুঝিতে পারেন? বরং হয় ত তাহার এই নিঃসঙ্গ মাতৃ-বক্ষের ব্যাকুল বেদনা অনুভব করিয়া মনে-মনে একটা বিদ্বেষের সুখানুভবে বিদ্রূপের হাসিই হাসিবেন, এই মনে করিতেই তাহার মনের ইন্ধনে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নিজের প্রকাশমান দুর্ব্বলতায় সে মর্ম্মান্তিক রূপে নিজের উপরেই চটিয়া, দশনে অধর চাপিল।

অরবিন্দর মনে কিন্তু সে সময় প্রতিশোধ-স্পৃহা বিন্দুমাত্র জাগে নাই; বরঞ্চ, ইহার এই সঙ্গীহীন, নৈরাশ্য-ব্যথিত জীবনের ভারটা তাহার অন্তরে যেন কতকটা চাপিয়া ধরিয়া, ইহার প্রতি তাহাকে সহানুভূতি-সম্পন্নই করিয়াছিল। সরল মনেই তাই সে প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তোমার ভৃগুসংহিতা, আমায় দেখালে না যে!" উত্তর না পাইয়া এবার রঙ্গ করিবার জন্যই হাসিতে-হাসিতে কহিল, "তা, না দেখাও গে,—আমি সব শুনে নিয়েছি। আর-জন্মে তুমি রাণী ছিলে, আর আমি ছিলুম রাজা,—এই তো? আমি রাজা থাকি আর না থাকি, তুমি যে রাণী ছিলে তাতে ভৃগু ঋষি কেন,—আমারও সন্দেহ নাস্তি। রাণী ব'লে রাণী!—মহারাণী!"

তখন সেই আষাঢ় মেঘের মত ব্যথা-ভারাতুর চিত্ত চিরিয়া বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় লজ্জার হাস্য স্ফুরিত হইল। সলজ্জ, সপ্রেম দৃষ্টি স্বামীর মুখে তুলিয়া ধরিয়া, কৃত্রিম কোপে রাণী সবেগে কহিয়া উঠিল, "আঃ, কি যে তুমি বলো? তুমি রাজা ছিলে না, আর আমি ছিলুম রাণী, তাই না কি আবার হয়। সে তা হলে বোধ করি চাকরাণী কি মেথরাণীই বা হবে।"

অরবিন্দের হৃদপিণ্ডটা কে যেন বিপুল বলে টানিয়া ধরিল। ঠিক এই কটা কথাই যে আর এক রকম ভাষায়, আর এক দিন, আর একজনের মুখে সে শুনিয়াছিল।

(৪৩)

ভৃগুসংহিতার ব্যবস্থামত যাগযজ্ঞের কোন উদ্যোগ আয়োজন করিতে ব্রজরাণীর আগ্রহ দেখা গেল না। বরঞ্চ, তাহার বাপের বাড়ীর পুরোহিত কালীঘাটে কি সব হোম-যাগ করিতেছিলেন,—তাঁহাকে পত্র দিয়া এই কথা লিখিল যে, "ভাবিয়া দেখিলাম, বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে লড়াই না করাই ভাল। অতএব ও-সকলে প্রয়োজন নাই।" ভৃগুসংহিতাখানা কাপড়ের ট্রাঙ্কের মধ্যে রক্ষিত ছিল, খুলিতেই চোখে পড়িল। সাভিমানে চোখ ফিরাইয়া বোধ করি ভৃগুঋষিকেই শুনাইয়া বলিল, "কাজ নেই আমার এত সৃষ্টি করে, একটিবারের জন্য মা হয়ে। আমার পোড়া কপাল আমারই থাক। আমি আর কারু দয়া চাই নে।"

একদিন কোথাও কিছু নাই,—অকস্মাৎ ঝড়ের মত বাহিরের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া ব্রজরাণী কহিয়া উঠিল,

"ওগো, শীগ্‌গির করে ঠাকুর-জামাইকে একখানা তার করে দাও। বেলার বড্ড অসুখ করেচে।"

অরবিন্দ চম্‌কাইয়া উঠিল, "কি হয়েছে তার ?"

"জ্বর। ওগো, বড্ড জ্বর তার।"

"টেম্‌পারেচার নিয়েছিলে ? কত উঠ্‌লো ?"

ব্রজরাণী কহিল, "সে তেমন বেশি নয়;—তবে বেশি হ'তে কতক্ষণ।"

অরবিন্দ বলিল, "তবু কতটা হলো শুনিই না।"

ব্রজ। নিরেনব্বুই পয়েন্ট ছয়। সর্দ্দিও খুব আছে,—একটু-একটু কাসচেও।"

অরবিন্দ। এই ? আমি বলি না জানি কি! তা এর জন্য জগদিন্দ্রকে তার না করে, সোজাসুজি ঈশান ডাক্তারকে ডাক্‌তে পাঠালেই তো চুকে যায়।"

ব্রজরাণী নির্ব্বন্ধ সহকারে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, "ওগো, না—না, রোগকে তুমি অত সোজা মনে করো না। পরের মেয়ে নিয়ে এসেছি,—একটাকে তো মেরেই ফেলেছি, শেষকালে কি হ'তে কি হয়ে যাবে। তুমি বাবু ওর বাপকে খবর দিয়ে দাও।"

সেদিন ঈশান ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিয়া, তাঁহার মুখে সামান্য সর্দ্দি-জরমাত্র খবর শুনিয়া, অরবিন্দ বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু নিষ্কৃতি পাইল না। মধ্য রাত্রে ঘুম ভাঙ্গাইয়া ব্রজরাণী কাঁদো-কাঁদো গলায় বলিল, "অত করে বল্লুম—তুমি আমার কথা তখন শুন্‌লে না,—এখন জ্বর যে এই বাড়চে, কি আমি করি ? কেনই যে মরতে পরের মেয়ে নিয়ে এলুম। ঠেকেও শিখলুম না। আমার যেমন মরণ নেই!" অরবিন্দ ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া, চোক রগড়াইতে-রগড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর কি বড্ড বেশি বেড়েচে ? কি করচে সে ? ছটফট করচে কি বেশি ?"

ব্রজরাণী অধীর হইয়া কহিল, "ছট্‌ফট করবে কেন, একেবারে নিঝুম হয়ে রয়েছে। জরও খুব বেশি বলে মনে হচ্চে,—তুমি একবার দেখতেই এসো না।" এই বলিয়া স্বামীকে পাশের ঘরে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। সেখানে নেয়ারের খাটে বেলা অঘোরে ঘুমাইতেছিল,—তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সহজ এবং স্বাভাবিক। মেঝের বিছানায় তাহার ঝি গভীর নিদ্রামগ্না। শুধু ব্রজরাণীর শয্যাটিই খালি। সে সমানে সন্ধ্যা হইতে ইহার মুখ চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া, পৌষ-রাত্রির দুর্জ্জয় শীত ভোগ করিয়াছে। অরবিন্দ ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভাগিনেয়ীর ললাটের তাপ পরীক্ষা করিল, নাড়ীর গতি দেখিল; তার পর উঠিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিল, "তুমি একটী আস্ত পাগল! কোথায় জ্বর বাড়চে ? জ্বর তো নেই বল্লেই হয়। অমন স্থির হয়ে ঘুমুচ্চে, কেন মিথ্যে ওকে হেঁচড়া-হেঁচড়ি করচো। তার চাইতে চুপটি করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো দেখি। ওরও ভাল, আর তোমারও ভাল।"

"বলো কি তুমি! আমার চক্ষে আজ না কি ঘুম আস্‌বে ?" "তবে বসে শীতে হিহি করো;—আমি শুতে যাই।" এই বলিয়া অরবিন্দ চলিয়া গেল। নিজের বিছানা হইতে আর একবার ধর্ম্মডাক দিয়া তাহাকে শুইতে বলিয়া, অনতিবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। ব্রজরাণী কিন্তু কোন যুক্তিই কাণে তুলিল না। গায়ে একখানা শাল জড়াইয়া, সে রোগীর সুপ্তিমগ্ন মুখের দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া বসিয়া, মনের মধ্যে অশেষবিধ অশান্তি উপভোগ করিতে-করিতে প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, যে, সকালে উঠিয়াই সে, স্বামীকে না জানাইয়া, সকলের পূর্ব্বে টেলিগ্রাফ করিয়া জগদিন্দ্রকে আসিতে অনুরোধ করিবে এবং ঠাকুরদেবতার কাছে মনে-মনে নাকে-কাণে খত দিয়া কাতর অনুনয়ে বারম্বার করিয়া বলিল, যে, এইবার তাঁহারা মেয়েটীকে বাঁচাইয়া দিন, নিশ্চিত্ত সে ইহাকে ইহার বাপের কাছে ফিরাইয়া দিবে এবং আর কখনও এমন করিয়া পরের ছেলে-মেয়ের উপর লোভ করিতে যাইবে না। এই কথা তিন সত্য করিয়া বলিল, তাহার গায়ের বাতাসে যখন পরের ছেলের শুদ্ধ ক্ষতি লেখা আছে, তখন জানিয়া শুনিয়া কেন সে এমন কর্ম্ম করিল ? কেন, যে দিন এ খবর পাইয়াছিল, সেই দিনেই ইহাকে ফিরাইয়া দিল না ? এত বড় কুমতি তাহার কেন, কেমন করিয়া হইয়াছিল, এই আশ্চর্য্য কথাটা আজ সে এই নিদ্রাহীন মধ্যরাত্রে মনের অজস্র আত্মগ্লানির মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাইল না।

ফাল্গুন মাসে সরলার বিবাহোপলক্ষে সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ-পত্র আসিল। অরবিন্দ কোন কথাই কহিল না দেখিয়া, ব্রজরাণী নিজে হইতেই বলিল, "বেলাকে নিয়ে তুমি যাও, আমি এখানে থাকি।"

অরু কহিল, "আমার এখন যাবার সুবিধে হবে না।" "তা হলে বেলাকে কে নিয়ে যাবে?" "সে ব্যবস্থা তারা কি আর না করবে?" অসীমার বিবাহের কাণ্ড মনে করিয়া ব্রজরাণী ভাল-মন্দ আর কোন কথাই কহিল না। কিন্তু তথাপি তাহাদের যাইতে হইল। জগদিন্দ্র যখন নিজে আসিয়া উপস্থিত হইয়া, সরলার মাতৃহীনতার দোহাই পাড়িল, তখন ব্রজরাণী আর 'না' বলিতে পারিল না। যাত্রার উদ্যোগ করিতে বসিয়া গেল। ইহা দেখিয়া অরবিন্দ আসিয়া বলিল, "তুমি যে ক' দিন থাকবে না, তারি মত সব বন্দোবস্ত করে রেখে যাও। আমি ও-সব পেরে উঠ্‌বো না।"

ব্রজরাণী বিস্মিত হইয়া ট্রাঙ্কের কাপড় চোপড় হইতে চোক তুলিল, "সে কি! তুমি কি যাবে না?" অরবিন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না।" "কারণ?" "অনিচ্ছা।" হাসিমুখ আঁধার করিয়া রাণী গম্ভীর মুখে কহিল, "সেবারের কথা মনে করে যে তুমি আমায় দুঃখ দেবার জন্যে যেতে চাইচো না, সে আমি জানি। কিন্তু সেই জন্যেই এবার আমার যেতেই হবে--সরলার যে মা নেই!"

অরু কহিল, "আমি তো তোমায় যেতে বারণ করচিনে।" স্বামীর শান্ত-উদাসীনতার মধ্যে যে কত বড় বজ্রবল লুকান আছে, সে খবর ব্রজরাণী যত জানিত, অরবিন্দের অপর কোন আত্মীয়, পর, এমন কি তাহার গর্ভধারিণী জননী নিজেও ততটা জানিতেন কি না সন্দেহ। সে লজ্জিত, কুণ্ঠিত, বিরক্ত এবং এমন কি, ক্রুদ্ধ হইয়াই, মনের মধ্যে আপনাকে আপনি ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তুলিলেও, বাহিরে আর একটি কথাও ইঁহাকে বলিতে পারিল না; জানিত যে, বলিলে জবাব পর্য্যন্ত পাইবে না। এম্‌নি তাহার মান-অভিমানকে ঔদাস্যের মৃদুমন্দ হাস্যে তুচ্ছ করিয়া দিয়া, হয় ত সারনাথ না হয় চুণার—এম্‌নি কোথাও একটা চলিয়া গিয়া, দিন-দুই সেখানে কাটাইয়া আসিবে বৈ তো নয়।

যে ব্রজরাণী স্বামীকে ছাড়িয়া এক রাত্রির বেশী দুই রাত্রি বাপের বাড়ীতেও থাকিতে পারে না, সেই ব্রজরাণী যখন নন্দাইএর সঙ্গে তাহার বাটীতে নিমন্ত্রণ রাখিতে স্বামীকে ছাড়িয়া আসিল, তখন আর দশজনের মত নিজেও সে কম আশ্চর্য্য হয় নাই। কিন্তু যখন আসিবার দু'এক দিনের মধ্যেই সে জানিতে পারিল যে, তাহার এই আগমনের উদ্দেশ্য শুধুই মাতৃহীনা সরলার প্রতি সহানুভূতিই সবটা নয়, আরও একটা কারণ,—যদিও অত্যন্ত সঙ্গোপনে এবং হয় ত বা নিজেরও অজ্ঞাতেই—কখন কেমন করিয়া বলা যায় না,—মনের কোণে আশ্রয় লইয়া বসিয়া আছে—তখন ভীষণ লজ্জার তাড়নে সে অবশ্য নিজের কাছে নিজের এই দুর্ব্বলতাটুকু স্বীকার পর্য্যন্ত করিতে চাহিল না। অগত্যা এ লইয়া মনের মধ্যেও কোন আন্দোলন না তুলিয়াই, নিঃশব্দ ধৈর্য্যে শুধু উৎকর্ণ হইয়া, কাণ পাতিয়া, এবং উন্মুখ হইয়া চোখ মেলিয়া, যেখানে যেখানে ছোট ছেলেপুলের ভিড় দেখে, সেইদিকেই সব ফেলিয়া ছুটিয়া যায়। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি চক্ষু, কর্ণাশ্রয়ী করিয়াও, উতলা বিমনা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াও, সেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইল না। সে যাহা শুনিতে এবং দেখিতে চাহিয়াছিল, সে নাম, তো কই কাহাকেও লইতে শোনা গেল না; এবং দুই বৎসর পূর্ব্বের এমনি আর এক দিনের অতর্কিতে দেখা একখানি মুখ,—এতদিন এত দেশে-বিদেশে ঘুরিয়াও ব্রজরাণী যে মুখের আর একখানি যোড়া পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই,—সেখানি তো কই তাহার বুভুক্ষিত দৃষ্টি-পথে আর তেম্‌নি করিয়া ভাসিয়া উঠিল না! সেই যে স্পর্শটুকু ছোট একটি পাখীর গায়ের পালকের মত গভীর অনিচ্ছা অবহেলার সর্ব্ব-প্রযত্ন চেষ্টাকে পরাভূত করিয়া আজও তাহার সমস্ত দেহ-মনকে রোমাঞ্চিত করিয়া আছে, আজও আবার যদি ঠিক তেমনি করিয়া সেইটুকু সে ফিরিয়া পাইত! অথচ এই সম্ভাবনাটা তাহার উন্মুখ চিত্তকে কতবারই না বিমুখ করিতেও ছাড়ে নাই।

অবশেষে থাকিতে না পারিয়া সে অসীমাকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, বর্দ্ধমানে এবারে যে বলা হয় নি?" অসীমা বলিল, "হয়েছিল বই কি, মামী-মা! বাবা যে সব-আগে নিজে বর্দ্ধমানে গিয়েছিলেন। তা বড় মামী-মা বল্লেন, 'অজিতের এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা—কি করে সে যাবে? আর তিনি নিজে তো আস্‌তে ভালবাসেন না,—রাজী হলেম না'।"

শুনিয়া একদিক দিয়া ব্রজরাণীর মন যেন কি এক রকম তীব্র নৈরাশ্যে ফাঁক হইয়া গেল। মনে হইল, তাহার

আসার উদ্দেশ্যই যেন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; আর একদিক দিয়া নন্দায়ের উপর একটা অভিমানও আসিয়া পৌছিল।

তাই বটে! বড়-গিন্নির কাছে আমোল পান্ নি বলে, তখনই—এই ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো—আমার কথা মনে পড়েছে!

বিবাহের পরদিন বর-কন্যা বিদায় লইলে, বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়া ভাইকে বলিল, "দাদা, আমায় কাশী পৌছে দেবে চল।" মা বলিলেন, "সে কি রে রাণী! এই তো মোটে চারটি দিন এসেছিস্। আমরা তোকে একদিন তো চোখ দিয়ে দেখ্‌লুমও না,—এরই মধ্যে তুই ফিরে চল্লি কি রে?" মিনতি করিয়া সে বলিল, "মা, আমায় যেতে মত দাও। আমার মন মোটে ভাল নেই। সেখানে ভারি কষ্ট হচ্চে যে!"

মা আর আপত্তি তুলিলেন না, দুঃখিত হইয়া নীরবে রহিলেন। দাদা একটু চিন্তিতভাবে একটা খট্‌কা বাহির করিলেন, "আজই যাবি, তাহ'লে রিজার্ভের কি করা যায়!" অধৈর্য্য হইয়া সে ইহাও খণ্ডন করিয়া দিল, "নাই বা গাড়ী রিজার্ভ হ'লো। তুমি আমায় অম্‌নি নিয়ে চলো।"

অরবিন্দ উহাদের কাশীতে হঠাৎ দেখিয়া এতটুকুও বিস্ময় প্রকাশ করিল না, নিজের খেয়ালী স্ত্রীটিকে সে কাহারও চাইতে কম চিনিত না।

(৪৪)

বৈশাখ মাসে বালীগঞ্জের নূতন বাড়ী সম্পূর্ণ হইয়া গেলে গৃহ-প্রবেশ করিবার জন্য অরবিন্দকে কাশীর বাসা উঠাইয়া আসিতে হইল। প্রকাণ্ড একটি জমি লইয়া অরবিন্দের নূতন বাড়ী। সাম্‌নে সবুজ তৃণমণ্ডিত সমচতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডের চারি পাশে বিবিধ বর্ণখচিত ফুলের বাগান, পিছনেও তাহাই এবং ইহার একদিকে সুন্দর একটা দীর্ঘিকা। এ ভিন্ন, বাটী ও পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি হইতে দূরে বৃহৎ-বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী, নানাবিধ দেশ হইতে সংগৃহীত উপাদেয় ও দুর্ল্লভ-দুর্ল্লভ ফলকর বৃক্ষেরও অভাব ছিল না। অট্টালিকাটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে গঠিত, এবং সেইভাবেই সুচারুরূপে সজ্জিত। এই সুরম্য গৃহের গৃহকর্ত্রী রূপে, ইহার সবচেয়ে সুসজ্জিত অপূর্ব্ব চাকচিক্যময়, আলোকে-ঐশ্বর্য্যে উদ্ভাসিত দ্বিতলের বৈঠকখানা ঘরে দাঁড়াইয়া, ব্রজরাণীর দুই চোক জ্বালা করিয়া, তাহার বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ যেন শূন্যতায় হা হা করিয়া উঠিল। অনেক সাধ করিয়া, এবং বিস্তর সাধ্যসাধনায় স্বামীকে সম্মত করাইয়া, একদিন সে এই বাড়ী তৈরি করাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ এ সফলতার দিনে, ইন্দ্রপুরীতুল্য সাজান বাড়ীতে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল, ইহার কিছুমাত্র প্রয়োজন তাহার ছিল না। একেবারে অনাবশ্যক আড়ম্বরে সে যে অনর্থক অজস্র অর্থ অপব্যয় করিল, শুধু তাই নয়,—নিজেকেও সে এই সঙ্গে অনেকখানি বদ্ধ করিয়া ফেলিল। এই যে এখানে সে এই রাজৈশ্বর্য্যের সমাবেশ করিয়া তুলিয়াছে, এদের লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া জীবনের দিন কয়টা কাটাইয়া দিয়া সে পাইবে কি? কাহার জন্য এ সকল আয়োজন? যেদিন ভবের হাটে পাওনা-দেনা মিটাইয়া দিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে, সেদিন এই পুঁজির রাশি কোথায় ফেলিয়া সে চোখ বুজিবে? এমন একটা দিনের ছবি তাহার চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিল, যে দিনে সে বাঁচিয়া নাই। সে দিনও অবশ্য আর কাহারা তাহার এই সাধের নিকুঞ্জে নিবাস করিতেছে; কিন্তু ব্রজরাণীর নাম ইহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। ব্রজরাণীর রক্ত তাহার শিরা-ধমনীতে কাটিয়া কুচাইয়া দিলেও এক ফোঁটা বাহির করা যাইবে না। এই তো?

বাড়ীখানা তাহার যেন অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। স্বামীকে গিয়া বলিল, "এখন দিনকতক আমরা আমাদের হাবড়ার বাড়ীতে গিয়ে থাকিগে চলো।"

অরবিন্দ আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাঃ! এত খরচপত্র করে বাড়ী করলুম, এখানে না থেকে এখন হাবড়ার বাড়ীতে গিয়ে থাকবো কোন্ দুঃখে? হাবড়ার বাড়ী আমি ইস্কুলকে ভাড়া দেবার বন্দোবস্ত করে ফেলেছি।"

ব্রজরাণী বলিল, "না—না, তা করো না, বরং এইটেই যদি কেউ ভাড়া নেয় তো বরং—"

অরবিন্দ কহিল, "সে আর হয় না রাণি! আমার কথা আর ফেরে না।"—এই বলিয়াই সে চলিয়া গেল। ব্রজরাণীর পক্ষটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে কি? সে তো কই এলাইয়া কাঁদিতে বসিল না!

(ক্রমশঃ)

মহীশূর—শ্রবণ-বেলগোলা

[শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-সি-ই]

(২)

সোজা পথে চেন্নরায়পাট্না হইয়া শ্রবণ-বেলগোলা যাইতে হইলে অনেক সময় লাগে ; পথটি কিকেরি বাহুল্যে হইতে দৈর্ঘ্যে ২১ মাইল। আর উষর, বন্ধুর, পার্ব্বত্য পথ দিয়া যাইতে অল্প সময় লাগে ; ইহা দৈর্ঘ্যে ৮ মাইল মাত্র। শকটচালক এই পথ দিয়া যাইতে চাহিল। আমার কোন আপত্তি ছিল না ; কেন না, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পৌছিতে পারা যাইবে। কিন্তু যদি জানিতাম যে, এই পথে যাওয়া, আর তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র-বক্ষের উপর গো-শকটে যাওয়া একই প্রকার, এবং এই পথে যাওয়ার জন্য অস্থিপঞ্জরের ব্যথা মরিতে কিছু সময় লাগে, তাহা হইলে আমি এ পথে যাত্রায় কিছুতেই স্বীকৃত হইতাম না। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাইবে? বিহার-প্রবাস-কালে অনেকবার "বিষোরে" এক্কা চড়িয়াছি ; কিন্তু সে কষ্টে আর এ কষ্টে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সে কষ্টভোগের পর যখন আম্র, শিশু ও তালবৃক্ষের ছায়া-শীতল কুঞ্জে সন্নিবেশিত শিবির বা তাম্বুর মধ্যে আমার দেহযষ্টি অপেক্ষা ক্ষুদ্র চারপাইয়ের উপর শায়িত হইয়া প্রভুভক্ত উড়িয়া ভৃত্য ও অজাতশত্রু ব্রাহ্মণ-বালক বা "মহারাজ"-কুমারের সহিত আপনার সুখদুঃখের গল্পে বিভোর হইতাম, কিম্বা প্রত্যহ ভাত ও অড়হর ডালে অনভ্যস্ত জিহ্বাকে বিশ্রাম দিবার বৃথা পরামর্শ করিতাম, তখন গাত্র-বেদনা কোথায় পলাইত। কিন্তু এ যাত্রার বেদনা দূর করিতে, সেই বিহারের প্রভুভক্ত উড়িয়া ভৃত্যটি সহযাত্রীস্বরূপ থাকিলেও, বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

কিয়দ্দূর যাইতে-না-যাইতেই বুঝিতে পারিলাম যে, এ পথে আসিয়া বিষম ভ্রম করা হইয়াছে। মাঠের উপর দিয়া শকট চলিতেছিল ; যে বর্ত্মে ইহা চলিতেছিল, তাহাকে পথ বলা যায় না। কখন উচ্চে যাইতেছে, কখন নিম্নে চলিতেছে, কখন বা ইতস্ততঃ অবস্থিত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপর বা পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় শকটটী উল্টাইয়া যাইবার মত হইতেছে। আমার ত পঞ্জরাস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া যাইবার মত বোধ হইতে লাগিল ; এবং উদরে বিষম বেদনা বোধ করিতে লাগিলাম। একবার ত বাক্স, তোরঙ্গ, বিছানা-পত্র সমস্ত গায়ের উপর আসিয়া পড়াতে, বিষম বেদনা পাইলাম। এ স্থানটী সৃজন করিবার সময় বোধ হয় প্রকৃতিদেবী বিশেষ অন্যমনস্কা ছিলেন ; নয়নাভিরাম ত কিছুই দেখিলাম না। অনেকক্ষণ যাইবার পর দূরে দিগ্‌বলয়ে নীলাভ অস্পষ্ট পদার্থ দেখিয়া অনুমান করিলাম যে, পর্ব্বত না হইয়া যায় না ; ক্রমে অনুমান সত্যে পরিণত হইল। দূরবীক্ষণ-যন্ত্র বাহির করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া, বিফল-মনোরথ হইতে হইল। সে প্রকার নড়াচড়ার মধ্যে সাধ্য কি যে যন্ত্রটিকে ঠিক রাখিতে পারি। চারিদিকে ধূসর ক্ষেত্র,—বন্ধুর, কঙ্করময় ; শ্যামলতার চিহ্নও দেখিলাম না। মাঝে-মাঝে রাখাল-বালক মেষ চরাইতেছে। কোনও স্থানে কতিপয় বালক একত্র হইয়া ক্রীড়া কিম্বা বিশ্রাম-কৌতুকে সময় কাটাইতেছে ; এবং আমাদের মত অপরিচিত বিদেশী যাত্রী এ ভীষণ পথে কোথায় যাইতেছে ভাবিয়া, নির্নিমেষ নেত্রে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে।

এ প্রকার বৈচিত্র্যবিহীন দৃশ্য আমার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। সুখের বিষয়, পর্ব্বত বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল ; এবং কিয়ৎক্ষণ পরে এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তির মত এক অস্পষ্ট পদার্থ দেখিতে পাইলাম। পর্ব্বতটির গাত্র নগ্ন,—বৃক্ষলতাদির চিহ্ন নাই। পূর্ব্বে জানা ছিল যে, পর্ব্বতের উপর গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্ত্তিটি বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বোধ হয়, ইহাই সেই মূর্ত্তি হইবে। শকটকে স্থির করাইয়া, দূরবীক্ষণ-যন্ত্র সহকারে দেখিয়া লইলাম। একবার দূরবীক্ষণের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া লইবার পর, শকট চলিলেও, মূর্ত্তিটিকে দৃষ্টিপথ হইতে হারাইয়া ফেলি নাই। গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ের যে ভাব হইয়াছিল, আমি তাহার বর্ণনা করিতে অক্ষম। কতদিনের কামনা আজ চরিতার্থ হইবে ভাবিয়া পুলকে আবিষ্ট হইলাম। বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আমিই যে এ-স্থানে আসিতে সমর্থ

হইলাম, সে চিন্তায় হর্ষগর্ব্বভরে হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ; পথশ্রমের সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। তখন হৃদয়ে যে আনন্দের অমৃতধারা বহিতেছিল, তাহাতে বোধ হইতেছিল—

"দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত ; বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটি' এ পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধকারাগার,—হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকীরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, চমকিয়া, আলোকে-পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে।"

আনন্দে অধীর হইয়া যখন এপাশ-ওপাশ ফিরিয়া মূর্ত্তিটি দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন শকটচালক মহাব্যস্ত হইয়া পড়িল ;—এ প্রকার নড়াচড়ায় বৃষদ্বয়ের কষ্ট হইতে-ছিল। ক্রমে-ক্রমে কঙ্করময়, আবাসহীন পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়া মনুষ্যালয়ে প্রবেশ করা গেল,—চেন্নরায়-পাট্নার পথে আসিয়া পড়িলাম। শকট এখন সোজা পথে চলিতে লাগিল ; এবং অল্পক্ষণ পরেই এক সরোবরের তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহার কথা পরে বলিব। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, এখানে থাকিবার জন্য সুন্দর জৈন ধর্ম্মশালা বা ছত্র আছে। খুঁজিয়া-খুঁজিয়া শকট লইয়া সেই ধর্ম্মশালার দিকে চলিলাম। ইহা একটি দ্বিতল বাটী এবং এখানে সে সময়ে অন্যান্য জৈন যাত্রী ছিল। যে প্রকোষ্ঠে থাকা নিরাপদ, তাহার চাবি পাওয়া যাইতেছিল না বলিয়া, আমি সে গ্রামের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির নিকট গমন করিলাম। ইঁহার নাম পদ্মনাভাইয়া। পূর্ব্বে তাঁহার জামাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা আমার সংবাদ বৃদ্ধকে দিতে গিয়াছিলেন ; এদিকে তিনিও আমার দিকে আসিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই, কি জানি কেন, নিতান্ত স্নেহপরবশ হইয়া বলিলেন, ছত্রে গিয়া কাজ নাই,—সেখানে থাকা বিপদশূন্য নহে। তাঁহার নূতন দ্বিতল বাটী তৈয়ার হইয়াছে ; সেইখানে যাইয়া থাকিতে বলিলেন। সে বাটীর একাংশের এখনও সমস্ত নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয় নাই এবং স্বয়ং বৃদ্ধ সেখানে বাস করেন ; সুতরাং স্ত্রীলোক-সঙ্গ-বিহীন বলিয়া আমার থাকিতে বিশেষ সুবিধা হইবে। আমি অনিচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও, আমায় ধরিয়া লইয়া গেলেন। আমার জিনিস-পত্র দ্বিতলস্থ তাঁহার নিজের গৃহে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। এই প্রকার পর্ব্বতময় অজানা দেশে যে এমন থাকিবার স্থান মিলিবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। ইহাতে আমার নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়িল। ইঁহাদের ভাষা আমার ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; ইঁহারা জাতিতে কানাড়ি ; এ দেশ আমার জন্মভূমি হইতে কতদূরে,—তথাপি আমাকে অবিশ্বাস না করিয়া যে একে-বারে দ্বিতলস্থ আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিলেন, ইহা ভগবানের অপার মহিমা ভিন্ন আর কি হইতে পারে। বৃদ্ধের শয়ন-গৃহটি বিশেষ ভাবে সজ্জিত ও অনেক মূল্যবান্ পদার্থে পূর্ণ। বাহিরে বসিবার জন্য একটা হল-ঘর রহিয়াছে। আমি ত সেই ঘরে বিছানা পাতিয়া বসিলাম ; আমার মনে বিশেষ লজ্জা ও ভয় হইতেছিল যে, এত বড় নির্জ্জন বাটীতে বৃদ্ধের মূল্যবান্ দ্রব্যে পূর্ণ ও তাঁহার টাকাকড়ির সিন্ধুকযুক্ত গৃহে কি করিয়া থাকা যায়। বৃদ্ধের জামাতা ও পুত্র প্রভৃতি সকলে আমার বিছানা ধরাধরি করিয়া শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন। তাঁহারা আমার সহিত কত পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুর ন্যায় গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়া, কৌশলে জানিয়া লইলেন যে আমি ব্রাহ্মণ। তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে, তাঁহাদের দেশে ব্রাহ্মণ জৈন কর্ত্তৃক প্রস্তুত খাদ্য স্পর্শ করে না। আমিও পাছে গ্রহণ না করি এই আশঙ্কায় ঘৃত, আটা, চাউল, ডাউল, তরকারি প্রভৃতি পূর্ণ এক প্রকাণ্ড সিধা পাঠাইয়া দিলেন। আমি ত দেখিয়া অবাক্। আহার্য্যাদি পূর্ণ বাক্স সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকে। এ সব ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বলাতে তাঁহারা সকলে বিশেষ সম্মান ও কুণ্ঠার সহিত বলিলেন যে, আমি যখন তাঁহাদের অতিথি হইয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছি, তখন তাঁহাদের সিধা গ্রহণ করিতেই হইবে ; ইহা না করিলে তাঁহাদের ধর্ম্মস্খলন হইবে। এই বিংশ শতাব্দীতে মানুষ এতটা অতিথি-পরায়ণ ও ধার্ম্মিক হয় দেখিয়া আমি ত বিস্মিত হইলাম। আমি প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি ; কিন্তু, কি হিন্দু-সমাজ, কি মুসলমান সমাজ, কি শিখ বা পঞ্জাবী-সমাজ, কি স্বদেশী বাঙ্গালী-সমাজ—কোথাও এরূপ হৃদয়ভরা আতিথেয়তা দর্শন করি নাই। আমার প্রত্যহ এইরূপ ৩।৪ জনের খাইবার মত সিধা পাঠাইতেন। যখন আমি শ্রবণ-

বেলগোলা গ্রামে পৌঁছি, তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ইঁহারা তখন আপন-আপন কর্ম্ম শেষ করিয়া আসিয়াছেন; নির্ভাবনায় আমার সহিত গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর ইংরাজী কহিতে পারেন; এবং আমার সহিত এই ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন। আমি কি জন্য আসিয়াছি, কোথায়-কোথায় ভ্রমণ করা হইয়াছে, এবং কোথায়-কোথায় যাইব, শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের চিফ্ সেক্রেটারী মহাশয় আমাকে লাট সাহেবের পরিচয়-পত্র হিসাবে যে পত্রখানি দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের দেখাইলে, তাঁহারা বিশেষ ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিলেন; এবং আমি যে এই কারণে একজন সম্মানিত ব্যক্তি, এইরূপ ভাব দেখাইলেন। গল্প করিতে-করিতে আমারও আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া গেল; আহারের সময় বলিয়া ও সন্ধ্যা আগতপ্রায় বলিয়া, তাঁহারা সে রাত্রির জন্য বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন; কেন না, জৈনেরা সন্ধ্যার পরে আর আহার করেন না। এ স্থানটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২৮০০ ফিট উচ্চ; এবং পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত বলিয়া সেপ্টেম্বর মাসে ঠিক নবেম্বর বা ডিসেম্বর মাসের ন্যায় শীত বোধ হইতে লাগিল। সামান্য একটু বৃষ্টি হওয়ায় শীত বেশ জমিয়া উঠিল; এবং এই কারণে রীতিমত উষ্ণ বস্ত্র ও লেপ ব্যবহার করিতে হইল। বৃদ্ধ আসিবার পূর্ব্বেই আমি শয়ন করিলাম; কেন না, অন্ধকার শকটযানে আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা ধরিয়াছিল। পরদিন প্রত্যুষে বৃদ্ধ শয্যা হইতে উঠিয়া, আমায় সাদর সম্ভাষণ করিয়া, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কেমন আছি এবং আমার কোন অসুবিধা হইতেছে কি না। কুশল প্রশ্নাদির পর, তিনি কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন; এবং তাঁহার জামাতা, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি অনেকে গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য আমায় লইতে আসিলেন।

গোমতেশ্বরের মূর্ত্তির বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমি যাঁহাদের অতিথি ও যে গ্রামে আসিয়াছি, তাহার সামান্য পরিচয় দেওয়া উচিত মনে করি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের আশ্রয়ে আমি অতিথি স্বরূপ আছি, তাঁহার নাম পদ্মনাভাইয়া। ইনি একজন পিত্তলব্যবসায়ী। এ গ্রামটি মহীশূর রাজ্যের মধ্যে পিতলের বাসন তৈয়ার করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ। পিত্তল পিটিবার শব্দে এ গ্রামটি সর্ব্বদা মুখরিত। পদ্মনাভাইয়া গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও সম্ভ্রান্ত। ইনি মহীশূর ইকনমিক কন্‌ফারেন্সের সভ্য। ইঁহার জামাতার নাম দেবরাজাইয়া; ইনিও পিত্তল ব্যবসায়ী; পূর্ব্বে ইনি শিক্ষক ছিলেন। ইঁহার যত্ন আমি কোন কালে ভুলিতে পারিব না। সে সব কথা ক্রমশঃ বলিব। পদ্মনাভাইয়ার পুত্রের নাম সন্তরাজাইয়া; ইনিও পিতার সঙ্গে ব্যবসা চালাইতেছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রবণবেলগোলা গ্রামে প্রবেশ করিয়া এক সরোবরের তীরে আমাদের শকট থামিয়াছিল। এই সরোবরের নাম হইতে গ্রামটির নামকরণ হইয়াছে। শ্রবণ শব্দটি শ্রমণ শব্দের অপভ্রংশ; এবং বেলগোলার অর্থ শ্বেত-সরোবর। হালে কানাড়ি ভাষায় বেল শব্দের অর্থ শ্বেত, এবং কোলা শব্দ সরোবরবাচক; "গোলা" শব্দটি "কোলা" শব্দের অপভ্রংশ। তাহা হইলে "শ্রবণবেলগোলা"র অর্থ দাঁড়াইল যে, শ্রমণদিগের নিমিত্ত শ্বেত-সরোবর। এস্থানে আর দুটি বেলগোলা আছে। এটি শ্রমণদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়া সে দুটী হইতে বিভিন্ন। গ্রামটি মহীশূর রাজ্যান্তর্গত হাসান্ জেলাস্থ চেন্নরায় পাট্‌না তালুকে অবস্থিত। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি পর্ব্বত, অথবা ইহাকে পর্ব্বতদ্বয়ের পাদদেশের মধ্যে স্থিতও বলা যাইতে পারে। দক্ষিণদিকের পর্ব্বতটির নাম বিন্ধ্যগিরি ও উত্তরদিকেরটির নাম চন্দ্রগিরি। বিন্ধ্যগিরি পর্ব্বতে গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্ত্তি অবস্থিত; কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে ও তীর্থ হিসাবে চন্দ্রগিরির মূল্য নাই। সে সব কথা ক্রমশঃ বলিতেছি। স্থানীয় ভাষায় বিন্ধ্যগিরিকে "দোডা বেট্টা" বা বৃহৎ গিরি এবং চন্দ্রগিরিকে "চিক্কা বেট্টা" বা ক্ষুদ্র গিরি বলে; ইহার কারণ, বিন্ধ্যগিরি চন্দ্রগিরি হইতে অধিকতর উচ্চ। পূর্ব্বোক্তটির উচ্চতা শেষোক্তটির হইতে প্রায় ৩০০ ফিট অধিক। বিন্ধ্যগিরি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৩৪৭ ফিট এবং গ্রামটি অপেক্ষা প্রায় ৪৭০ ফিট উচ্চ। চন্দ্রগিরির ইতিহাসের কথা বলিবার পূর্ব্বে বিন্ধ্যগিরির কথা বলিয়া রাখি; কেন না, এইটিই সর্ব্বপ্রথমে দর্শন করি।

প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে দেখি যে, পদ্মনাভাইয়ার জামাতা, পুত্র, আত্মীয় ও গ্রামের অনেকে আমাকে বিন্ধ্যগিরিতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত যাত্রা করা গেল। উপরে উঠিতে ৬৫০টি

সিঁড়ি আছে। পর্ব্বতটি গ্রাণাইট্ প্রস্তরের। ইহার গাত্র কাটিয়া তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য সিঁড়ি তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছে। দুই মাস ধরিয়া প্রায় অনশনে বা অর্দ্ধাশনে নানা গ্রাম, অরণ্য, পর্ব্বত প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়াছি; ইহাতে আমার শরীর বিষম দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। বিশ্রাম না করিয়া প্রায় অনবরত ভ্রমণ করা যাইতেছে; এবং ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতেছে। এ কারণে, শরীরও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য রৌদ্রে পর্ব্বতের উপর উঠিতে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। আমার সহযাত্রীরা অবলীলাক্রমে উঠিতেছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতপদে উঠিতেছিল পদ্মনাভাইয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র বালক স্বধর্ম্মাইয়া। সে মৃগের মত লাফাইয়া-লাফাইয়া সিঁড়ি ছাড়িয়া দিয়া, পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া উঠিতেছিল। ক্লান্তিতে আমার বিশেষ লজ্জা হইল। সহযাত্রিগণ আমাকে বিশ্রাম না করিয়া উপরে উঠিতে নিরস্ত করিলেন। পাছে আমি লজ্জায় সঙ্কুচিত হই, এই আশঙ্কায় স্তোক বাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন, "আপনি এতদিন ধরিয়া কষ্ট সহ্য করিয়া শরীর নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন; আর বোধ হয় আপনাদের দেশে পর্ব্বত নাই বলিয়া, পর্ব্বতারোহণে তত অভ্যস্ত নহেন - এই জন্যই সামান্য কষ্ট হইতেছে।" পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাতে কিছু আহার করিয়া বাহির হইয়াছেন কি?" "না" বলাতে তাঁহারা সকলে বলিয়া উঠিলেন, তবে ত কিছু না খাইয়া উঠিতেই দেওয়া হইবে না। তাঁহাদের অন্তঃকরণ জননীর ন্যায় কোমল দেখিয়া, আমার সকল কষ্ট দূর হইয়া গেল। বালক স্বধর্ম্মাইয়া বিদ্যুতের বেগে নীচে নামিয়া গেল; এবং প্রায় পনর মিনিট বা অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল পরে কমণ্ডলুর ন্যায় রজত-পাত্রে সুগন্ধ কফি ও অনেকগুলি ঘৃত-ভর্জ্জিত কচুরী বা পুরি লইয়া আসিল। এ সকল আহার করিয়া শরীরে বিশেষ বল পাইলাম; এবং দ্বিগুণ উৎসাহে উপরে উঠিতে লাগিলাম। উপরে উঠিয়া, গোমতেশ্বরের মূর্ত্তিটি যে মন্দির মধ্যে অবস্থিত, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা গেল। মন্দিরটির চারি ধারে গৃহ এবং অঙ্গন; মধ্যে বিরাট মূর্ত্তিটি পর্ব্বতের গাত্র কাটিয়া খোদিত করা হইয়াছে। মূর্ত্তিটির উচ্চতা প্রায় ৫৭ ফিট। এ পরিমাণটি আনুমাণিক; কেন না, যখন মূর্ত্তিটির মাপ করা হইয়াছিল, তখন পাদদেশ হইতে কর্ণমূলের উপরে মাপিবার সুবিধা পাওয়া যায় নাই। ইহার ভিন্নাংশের উচ্চতা নিম্নে দেওয়া গেল।

পাদদেশ হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত	...	৫০	ফিট্
পাদদ্বয়ের দৈর্ঘ্য	...	৯	
„ „ প্রস্থ	...	৪'-৬"	
বৃদ্ধাঙ্গুলি (ঐ) দৈর্ঘ্য	...	২'-৯"	
পাদগ্রন্থির অর্দ্ধ-পরিধি	...	৬'-৪"	
উরুদেশের অর্দ্ধ-পরিধি	...	১০'	
কটিদেশ হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত	...	১৭'	
কটিদেশের প্রস্থ	...	১৩'	
স্কন্ধের নিকট প্রস্থ	...	২৬'	
তর্জ্জনীর দৈর্ঘ্য	...	৩'-৬"	
মধ্যাঙ্গুলীর দৈর্ঘ্য	...	৫'-৩"	

উপরিউক্ত পরিমাণগুলি হইতে বুঝা গেল যে, মূর্ত্তিটি কি বিশাল। সহস্র বৎসর রৌদ্র বৃষ্টি ভোগ করিয়াও মূর্ত্তিটি সম্প্রতি খোদিত করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহা উত্তর-মুখী এবং নগ্ন। উরুদেশের উপরে মূর্ত্তিটির রক্ষার জন্য কোন "ঠেশের" বন্দোবস্ত নাই। এরূপ ভাবে ক্ষোদিত করা হইয়াছে, যেন মূর্ত্তিটি উরুদেশ পর্য্যন্ত উচ্চ বল্মীক বা স্তূপের মধ্যে দণ্ডায়মান। এক প্রকারের লতা যেন ইহার পদ ও বাহুদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে;—লতাপল্লবের শিরা-উপশিরাগুলি পর্য্যন্ত পরিষ্কার রূপে দেখা যাইতেছে। উহার মুখদেশ আয়ত নয়ন ও সমুন্নত নাসিকা দ্বারা সুন্দর দেখাইতেছে, এবং বেশ গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক। ভাস্কর গলদেশের রেখাগুলি খোদিত করিতে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েন নাই। মূর্ত্তিটির কেশগুলি গুচ্ছাকারে আবর্ত্তিত। বৌদ্ধ ও জৈন মূর্ত্তির মস্তকে যেরূপ কেশাবর্ত্ত লক্ষিত হয়, এগুলি সেইরূপ ও তাহাদের কর্ণের ন্যায় এ মূর্ত্তিটির কর্ণদ্বয় আলম্বিত।

গোমতেশ্বরের মূর্ত্তির কথা ত বলিলাম; কিন্তু আমার বিশ্বাস ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধিৎসুদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন ব্যক্তি জানেন না যে, গোমতেশ্বর কে এবং কি জন্য জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রে ইঁহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই কারণে ইঁহার সামান্য সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। জৈনদিগের চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পুত্রের নাম গোমতেশ্বর স্বামী বা গোমতেশ্বর। ইনি তীর্থঙ্করের ন্যায় সমান সম্মান ও পূজা পাইয়া থাকেন।

দক্ষিণ কানাড়া জেলায় য়েণুর (Yenur) গ্রামের গোমতেশ্বর মূর্ত্তির অনুশাসনে ইঁহাকে "ভীম" আখ্যায়

অভিহিত করা হইয়াছে—"অস্থাপরত প্রতিষ্টাপ্য ভুজবল্যাখ্যায়কম্‌ জীনম্‌।"

বার্গেশ (Dr. Burgess) বলেন, দিগম্বর-শাখান্তর্গত জৈনেরা ঋষভদেবের পুত্রকে গোমতেশ্বর নামে এবং শ্বেতাম্বরীয় জৈনেরা তাঁহাকে বাহুবলী বা ভুজবলী নামে অভিহিত করেন।* আমার বোধ হয় বার্গেশের এই উক্তিটি ভ্রমাত্মক; কেন না, আমি স্থানীয় দিগম্বরী জৈনদিগকে এই নামদ্বয় ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি। পুনশ্চ, দক্ষিণ কানাড়া জেলার যে দুইটি গোমতেশ্বরের মূর্ত্তির অনুশাসন ইণ্ডিয়ান্‌ এণ্টিকোয়েরি † পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও ভুজবলী নাম দৃষ্ট হয়। এ দুইটী মূর্ত্তি যে স্থানে অবস্থিত, তাহা কোন কালে শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের বসতি ছিল না এবং এক্ষণেও ইহারা দিগম্বরী জৈনদিগেরই বিশেষ তীর্থস্থান।

গোমতেশ্বরের সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত। তিনি তাঁহার বিমাতা পুত্র রাজা ভরতের একচ্ছত্রত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহার রাজ্যের বাহিরে তপশ্চরণের জন্য যাত্রা করিলেন। কিন্তু যেখানেই যান, সেখানেই দেখেন ভরতের রাজ্য; কিছুতেই তাঁহার রাজ্যের বাহিরে স্থান মিলিল না। ইহা দেখিয়া এক যক্ষের মনে কৃপার সঞ্চার হইল। গোমতেশ্বরের দাঁড়াইবার স্থান স্বরূপ তিনি সর্পরূপে আপনার মস্তক পাতিয়া দিলেন। এ মূর্ত্তিটি কিন্তু সর্পের উপর দণ্ডায়মান নহে। দক্ষিণ কানাড়া জেলায় যে এই প্রকারের আর দুইটী মূর্ত্তি বর্ত্তমান, তাহাদিগকেও সর্প-মস্তকে দণ্ডায়মান রূপে খোদিত করা হয় নাই।

মূর্ত্তিটির চারিদিকে যে প্রকার মণ্ডপের কথা বলিয়াছি, তাহাতে জলপীঠের উপর দণ্ডায়মান জৈন তীর্থঙ্করগুলির মূর্ত্তি রহিয়াছে। প্রত্যেক মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে তাহার আপন আপন যক্ষ ও যক্ষীর মূর্ত্তি বিদ্যমান। তীর্থঙ্করগুলির বৈশিষ্ট্যদ্যোতক লাঞ্ছন বা চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। ইহাতে বিস্মিত হইলাম; কেন না, এরূপ প্রায়ই দেখা যায় না। সাধারণ পাঠকের জন্য কল্পিত না হইলেও, একটি কথা বলিয়া রাখি;—পূর্ব্বোক্ত প্রাকার মণ্ডপের পোতায় পল্লবস্থাপত্যের চিহ্ন স্পষ্টভাবে রহিয়াছে দেখিলাম।

সকলে মিলিয়া একবার মণ্ডপের শীর্ষদেশে উঠিলাম; তথা হইতে গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্ত্তিটিকে স্পর্শ করিতে পারা যায়। আমি মাপিবার জন্য স্পর্শ করিতে গেলে, সকলে নিষেধ করিয়া উঠিলেন। তখন আমার স্মরণে আসিল যে, জৈনেরা পুরোহিত ভিন্ন কাহাকেও তাঁহাদের মূর্ত্তি স্পর্শ করিতে দেন না; তাঁহারা নিজেরাও স্পর্শ করিতে পান না; এমন কি, গর্ভগৃহেও প্রবেশাধিকার নাই; এবং দ্বারপাল বা যক্ষ-যক্ষীর মূর্ত্তি স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। হিন্দু-জৈন-নির্ব্বিশেষে দাক্ষিণাত্যের বা দ্রাবিড় দেশের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম।

গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া নামিবার সময়ে সম্মুখে একটি মনোহর কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রস্তরের উপর এমন সুন্দর কারুকার্য্য আমি কুত্রাপি দর্শন করি নাই। বোধ হইল, ঠিক যেন কাষ্ঠের উপর কারুকার্য্য করা হইয়াছে। এই স্তম্ভের উপরে ব্রহ্মদেবের মূর্ত্তি রহিয়াছে। দশম তীর্থঙ্কর শীতলনাথের যক্ষের নাম ব্রহ্মদেব এবং যক্ষীর নাম মানবী। এই স্তম্ভটির নাম "ত্যাগদ ব্রহ্মদেবের স্তম্ভ"। আমার সহযাত্রীরা "ত্যাগদ" কথার তাৎপর্য্য কি বুঝাইতে পারিলেন না। ব্রহ্মদেবের অনুগ্রহে মানব-মনে ত্যাগ-বৃত্তি উত্তেজিত হয় বলিয়াই কি ত্যাগদ নাম প্রদত্ত হইয়াছে?

ব্রহ্মদের স্তম্ভ দেখিয়া যে মন্দিরটি দেখিলাম, তাহার নাম "ভডেগল্লু বসতি"। ইহা উত্তরমুখী। "ভদেকল্লু"র অর্থ চাড়া বা strut; "ভদেকল্লু" হইতে "ভডেগল্লু"র উৎপত্তি। এ মন্দিরটি পর্ব্বতের পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া প্রস্তরের "চাড়া" দ্বারা রক্ষিত; শ্রবণ বেলগোলার জৈনেরা মন্দির অর্থে বসতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন; ইহা অনেক শতাব্দী হইতে চলিতেছে।

ভডেগল্লু বসতি চালুক্য রীতিতে নির্ম্মিত; কিন্তু ইহার পোতায় পল্লবস্থাপত্যের চিহ্ন বর্ত্তমান। উত্তর চালুক্য রীতির যাহাতে বৈশিষ্ট্য, সেই তিনটী গর্ভগৃহের সত্ত্ব এই মন্দিরে বর্ত্তমান। মধ্যস্থিত গর্ভগৃহে আদিনাথ বা ঋষভদেবের মূর্ত্তি রহিয়াছে, এবং ইহার বামে ও দক্ষিণে যথাক্রমে ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ ও একবিংশতি তীর্থঙ্কর নিমি

---

* Digambara Jaina Iconography by James Burgess (পৃ ৩)।

† Indian Antiquary, vols. II and V.

বা নমিনাথের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। সম্পূর্ণ মন্দিরের অঙ্গ-চতুষ্টয় এ মন্দিরে বর্ত্তমান; অর্থাৎ গর্ভগৃহে অন্তরাল, অর্দ্ধমণ্ডপ, ও মহামণ্ডপের সমষ্টি লইয়া মন্দিরটি গঠিত। এখানে দেখিলাম মহামণ্ডপকে মুখমণ্ডপ বলে। পশ্চিমদিক ছাড়িয়া দিলে মহামণ্ডপ ও দুইটি গর্ভগৃহের পরিমাণ সমান; ইহা দ্বারা জ্যামিতিক সামঞ্জস্য সুন্দর ভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

ভডেগল্লু বসতির পর চন্দনবসতি বা অষ্টম তীর্থঙ্কর চন্দ্রপ্রভ দেবের মন্দির দর্শন করা গেল। ইহার সম্মুখস্থ স্তম্ভটি উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় ভাষায় ইহার নাম মানস্তম্ভ। ইহা দর্শন করিলে দর্শকের মনে কু-ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। এগুলি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জৈন-মন্দিরের দীপদানস্বরূপ এবং বৈষ্ণব-মন্দিরের সম্মুখস্থ গরুড়স্তম্ভের সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে।

বিন্ধ্যগিরির আর আর যাহা দ্রষ্টব্য, সমস্তই দেখিলাম; বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গেল বলিয়া, পর্ব্বত হইতে অবতরণ করা গেল। অবতরণ করিবার সময় বৃদ্ধ পদ্মনাভাইয়া ও তাহার মৃত ভ্রাতা ধরণাইয়া নির্ম্মিত পর্ব্বতগাত্রস্থ পার্শ্বনাথজীর মন্দির দেখা গেল। ইহা আধুনিক পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। এ স্থানের মন্দিরগুলির নিয়ম এই যে, দাক্ষিণাত্যস্থ হিন্দু-মন্দিরের অচল মূর্ত্তির ন্যায় একটি মূর্ত্তি সর্ব্বপশ্চাতে থাকে, এবং "সম্মুখে" তাহারই অনুকরণে নির্ম্মিত আর একটি মূর্ত্তি থাকে; এবং উহার দুইপার্শ্বে তাহার যক্ষ-যক্ষী ও অন্যান্য তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি বিদ্যমান। এ মন্দিরস্থ গ্রাণাইট প্রস্তরের পার্শ্বনাথ মূর্ত্তিটি বড়ই সুন্দর। ইহার সম্মুখে মার্ব্বেল-প্রস্তর-নির্ম্মিত পার্শ্বনাথজীর একটি আসীন মূর্ত্তি অবস্থিত।

ইমান্‌দার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

যাহাই হউক—বিজ্ঞ চিকিৎসকের সুনির্ব্বাচিত ঔষধ-মাহাত্ম্যেই হউক, বা পরিপূর্ণ সেবার সুনিয়মেই হউক, বা ফৈজুর পিতার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের ফলেই হউক, টিয়া দিন-কতকের মধ্যে—সেই আশু প্রাণসঙ্কটের আশঙ্কা হইতে মুক্তিলাভ করিল; কিন্তু দৌর্ব্বল্য ও অন্য কতকগুলি উপসর্গ সারিল না। চিকিৎসক আশ্বাস দিয়া বলিলেন, এগুলির জন্য ভয় নাই;—সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই উহা সারিয়া যাইবে।

অনুতাপ-পীড়িত হৃদয়-মনকে যখন একটুখানি আশা ও আশ্বাসের ছায়ায় শান্ত-সংযত করিয়া ফৈজু হাঁপ ছাড়িবার সময় পাইল, তখন হঠাৎ সংবাদ আসিল,—সুমতি দেবীর জমিদারীতে আবার কি একটু গোলযোগ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। উদ্বেগ-কাতর ফৈজু মণ্ডলকে গিয়া ধরিল। মণ্ডল বেশী আপত্তি করিতে পারিল না,—ফৈজুকে এখানকার কাযগুলা বুঝাইয়া দিয়া, মিত্র মহাশয় ও সুমতিদেবীর অনুমতি লইয়া, জয়দেবপুরে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে চলিয়া গেল।

শ্যামল জয়দেবপুর হইতে ফিরিয়া, ফৈজু মামুর সহিত সে রাত্রের সুখময় পথ-ভ্রমণে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে, সুমতি দেবীর কাছে অনেক আক্ষেপ ও অনুযোগ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, এবার সে কখনই ফৈজুর সঙ্গ ছাড়িবে না। কিন্তু ফৈজুর অনুরোধে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, মোড়ল মশাইয়ের সুবিধার জন্য তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল।

ফৈজু মিত্র মহাশয়ের সহকারীত্বে নিযুক্ত হইয়া এখান-কার কায দেখিতে লাগিল। কিন্তু মণ্ডল মশাই সেখানে গিয়া বিশেষ কিছুই সুবিধা করিতে পারিল না। প্রজাদের মধ্যে দলাদলির উত্তেজনা জাগিয়া উঠিল;—কারণ, পলাতক আসামী হরিহর না কি জয়দেবপুরের কোন দূর সম্পর্কীয় কুটুম্ব-বাড়ীতে লুকাইয়া আছে, বলিয়া কে একজন পুলিশে মিথ্যা খবর দিয়াছিল। পুলিশ দল বাঁধিয়া আসিয়া কতক-

গুলা বাড়ী ঘেরাও এবং খানাতল্লাসী করিয়া যায় ;—ইহাতেই প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠে। মণ্ডল বহু চেষ্টায় প্রজাদের অসন্তোষ দূর করিতে পারিল না। উল্টা সে চেষ্টার ফলে নিরীহ মণ্ডল প্রজাদের কোপ দৃষ্টিতে পড়িল। বিপন্ন হইয়া সত্বর ফৈজুকে লইয়া যাইবার জন্য সে লোক পাঠাইল। ফৈজু আর ঠেকাইতে পারিল না, চলিয়া গেল। টিয়াকে বলিয়া গেল, যেমন করিয়া হউক, এবার শীঘ্রই সে ফিরিয়া আসিবে।

কিন্তু, এবারকার বিশৃঙ্খলতা দূর করিতে গিয়া, ফৈজু দেখিল—তাহার নিজের মন ও মস্তিষ্কে ততোঽধিক শোচনীয় বিশৃঙ্খলতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সমস্ত ব্যাপারই বিষম কঠিন ঠেকিতে লাগিল। কিসে যে কি ঘটিয়াছে, সহস্র চেষ্টাতেও ফৈজু তাহা বুঝিতে পারিল না। উদ্বেগ-আকুল চিত্তটা অন্য চিন্তায় এমনি ব্যস্ত-বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, যে, এদিককার ব্যাপারে তাহাকে কিছুতেই ভিড়াইতে পারা গেল না। পরস্পর-বিরোধী চিন্তার দ্বন্দ্বে উৎকট রকমে মাথা খাটাইয়া,—শেষে ত্যক্ত-বিরক্ত চিত্তে সে এই "বদ্‌মাইস প্রজাগুলির গুণ্ডামী 'মতলবের" উপর হাড়ে-হাড়ে চটিয়া উঠিল! মাথা চুলকাইয়া মণ্ডলকে বলিল, "না ভাই, এ বড় গোলযোগের কাণ্ড! দিদিমণি ঠিকই বলেছেন, এ বিষয় ছেড়ে দেওয়াই ভাল; আমি তো আর পেরে উঠ্‌ছি না!"

মণ্ডল সুযোগ পাইয়া খুব এক চোট বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়া বলিল, "হাঁ—হাঁ, তুমি যে আর কিছুই পেরে উঠ্‌বে না, আমি তো সেটা বহুদিন থেকেই জানি!"

ফৈজু হাসিল, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিল না। মনের কোনখানেই এমন এতটুকু সত্য-জোর খুঁজিয়া পাইল না, যাহার বলে আজ সে ইহাকে অস্বীকার করে! নিজের দুর্ব্বলতায় সে নিজেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। নিজের বিবাহিত জীবনের উপর এক-এক সময়ে তীব্র বিতৃষ্ণার উদয় হইতে লাগিল,—কেনই যে মানুষ সাধ করিয়া এমন দুর্ব্বহ ভার কাঁধে তুলিয়া লয়! অবস্থা-সঙ্কট-পীড়িত ফৈজু আজ নিজের মধ্যে বিস্তর প্রশ্ন-তর্ক করিয়া সে সমস্যার কোনই মীমাংসা পাইল না! বিবাহ না হইলে আজ সে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সংসারের সকল সঙ্কটের সঙ্গে যুঝিতে পারিত,—এই তত্ত্বই বার-বার মনে পড়িতে লাগিল।

কিন্তু যাহাদের মঙ্গলের জন্য খাটিতে হইবে, তাহাদের অমঙ্গল-আশঙ্কায় বেদনাহত চিত্তে অকর্ম্মণ্যের মত বসিয়া থাকা,—সে দুর্ব্বলতাও মহাপাপ! প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে সংযত করিয়া ফৈজু আবার নবীন উদ্যমে কাজে লাগিল। দেহ-মনের সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করিয়া সে কায করিবে,—মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিবে; মঙ্গল আসে ভালই, না হইলে—হে জগদীশ্বর, শক্তি দিও,—সমস্ত অমঙ্গলের আঘাত যেন তোমার হাতের দান বলিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে সে মাথায় তুলিয়া লইতে পারে! চেষ্টা সফল হউক, আর নাই হউক, সে যেন পরিপূর্ণ চেষ্টায়-কর্ত্তব্যপালন করিয়া যাইতে পারে। তাহার কর্ত্তব্য-অবহেলার ত্রুটিতে যে-কোন অমঙ্গল ঘটিল,—এ আক্ষেপ হইতে তাহাকে পরিত্রাণ দাও!

চেষ্টা—চেষ্টা—অবিশ্রাম চেষ্টা! ফৈজুর অসীম ধৈর্য্য, অক্লান্ত শ্রম-চর্চা দেখিয়া মণ্ডল এবার নিজেই বিস্মিত হইল। নায়েবজী যে কেমন স্নেহময়, আত্মীয়তাপূর্ণ মন লইয়া সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন—প্রজারা আবার সেটা বুঝিল। বিদ্রোহিতা ছাড়িয়া তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিল।

মণ্ডল হাঁপ ছাড়িয়া তেজপুর প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিল। ফৈজু অনুনয় করিয়া বলিল, "দাঁড়াও দাদা, এতটা মেহেরবাণী যখন করেছ, তখন আর একটু কর,—আর দুটো দিন সবুর কর,—আমি চট্ করে একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি!"

বাড়ী ঘর ছাড়িয়া এই বিদেশে আসিয়া বাস করিতে একেই মণ্ডলের প্রাণ আন্‌চান্ করিতেছিল;—ফৈজুর এই প্রস্তাবে সে অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল "তুমি দুদিনের নাম করে গিয়ে দশদিন দেরী করবে তো।"

ফৈজু দৃঢ়স্বরে বলিল, "নেহাৎ দায়ে না ঠেক্‌লে খামকা আমি কথার খেলাপ করি না, ভাই, সে তুমি জানো? আমি যেতে-আসতে শুধু দুটো দিন ছুটি চাই, এর বেশী তোমার কোন অসুবিধা আমি হতে দেব না।"

মণ্ডল ভাবিয়া-চিন্তিয়া করুণার্দ্র চিত্তে বলিল, "না, অতটা কষ্ট কোরো না,—যাচ্ছই যখন, তখন বাড়ীতে দুটো দিন জিরিয়ে এস।"

ফৈজু হাসিয়া বলিল, "না দাদা, তুমি যা দয়া করেছ, এই ঢের,—আমি বেইমানি করব না, যত শীগ্রী পারি, চলে আসব।"

সমস্ত দিন পথ হাঁটিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফৈজু আসিয়া গ্রামে ঢুকিল। তার পর জমিদার-বাড়ী যাইয়া, সুমতি দেবীকে অভিবাদন করিয়া, জয়দেবপুরের সংবাদ জানাইল। সুমতি দেবী সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু 'রোজা' রাখিয়া উপবাস-ক্লান্ত দেহে ফৈজু সারাদিন পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে বলিয়া, ভর্ৎসনাও কিঞ্চিৎ করিলেন! ফৈজু হাসিমুখে কৈফিয়ৎ দিল,—বর্ষাকালের দিনে উপবাস করিয়া পথ হাঁটিতে কিছুই কষ্ট হয় নাই,—সেইজন্য সে মিছামিছি গরুর গাড়ীর ভাড়া খরচ করে নাই!

তার পর তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িল। শ্যামল তাহার সহিত আসিবার জন্য কেমন করিয়া নাচিয়াছিল, এবং সে কল-কৌশলে তাহাকে ভুলাইয়া নিরস্ত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ নিবেদনে উদ্যত হইতেই, সুমতি দেবী অন্য কাযের অছিলায় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি এখন বাড়ী যাও ফৈজু,—কাল সকালে তোমার গল্প শুনব।"

ফৈজু উঠিয়া সেলাম করিয়া সবিনয়ে বলিল, "আমি ভোর থাক্‌তে বেরিয়ে পড়্‌ব দিদিমণি, মোড়ল মশাইকে কথা দিয়ে এসেছি।"

পিসিমা এতক্ষণ যদি বা ফৈজুকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, এবার আর ক্ষমা করিতে পারিলেন না! এমন দুঃসাহসী, গোঁয়ার ছেলে তিনি যে পৃথিবীতে দুটা দেখেন নাই, সেজন্য বিস্তর আক্ষেপ জুড়িয়া দিলেন। সুমতি দেবীও অপ্রসন্ন ভাবে কি বলিতে যাইতেছেন দেখিয়া,—ফৈজু আর দাঁড়াইল না। গোলমাল করিয়া অন্যান্য কথা কহিয়া, তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

নিজের বাড়ীতে আসিয়া ফৈজু দেখিল, পিতা বাড়ীতে নাই,—রহিমারও কোন সাড়া পাইল না,—জুতা খুলিয়া নিঃশব্দে আসিয়া স্ত্রীর ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল; দুয়ারের সামনে শয্যায় শুইয়া, টিয়া প্রদীপের দিকে চাহিয়া চুপচাপ পড়িয়া ছিল,—তাহার শীর্ণ-শান্ত মুখে আজ কোন যন্ত্রণার চিহ্ন নাই।

মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ ভাবে দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া, নিঃশব্দেই একটা সুগভীর আশ্বস্তিপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ধীরে—একটু শব্দ করিয়া—ফৈজু ঘরে ঢুকিল। চাহিয়া দেখিয়া টিয়া সন্ত্রস্ত ভাবে মাথায় কাপড় টানিল। ফৈজুও থতমত খাইয়া দাঁড়াইল, দেখিল—দুয়ারের পাশে কোণ ঘেঁসিয়া বসিয়া রহিমা প্রদীপের সামনে হেঁট হইয়া ঘুন্সী বিনাইতেছে! আর অগ্রসর হওয়া চলিল না, তাড়াতাড়ি মাথা হেঁট করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। এত রোগ-দুঃখ-বিপ্লবের মাঝেও সে এরূপ স্থলে পিতা ও ভ্রাতৃজায়াকে সসম্ভ্রমে সমীহ করিয়া চলিবার অভ্যাস ছাড়ে নাই।

রহিমা মাথা তুলিয়া চাহিয়া বলিল "ও কি! ও কি! এসেই তাড়াতাড়ি চোরের মত পালাচ্ছ কেন? শোন, শোন,—"

ফৈজু বাহির হইতেই স্নিগ্ধ হাস্যে উত্তর দিল, "তুমি যে আর কিছুই বাকী রাখ্‌ছ না খলিফা, চোর ডাকাত যা মুখে আস্‌ছে, সবই যে বলে যাচ্ছ!"

রহিমা হাসিতে হাসিতে বলিল "বল্‌ব না? যা তোমার গতিক! ঘরে এস, ঘরে এস,—কখন এলে বল—কেমন আছ?"

ফৈজু দুয়ারের কাছে একটু সরিয়া আসিয়া বলিল "ভাল আছি, অল্পক্ষণই আস্‌ছি,—এখানকার দেশ্‌লাইটা কোথা গেল খলিফা? হ্যরেণ্ডার আলোটা জাল্‌ব!"

রহিমা বলিল "ঐ জানালায় আছে ছ্যাখো!—"

ফৈজু দিয়াশলাই লইয়া আলো জ্বালিল। তার পর ধুনাচি আনিয়া টিকা ধরাইয়া আগুনে বাতাস করিতে বসিল। রহিমা বাহিরে আসিয়া তাহার 'কাণ্ড দেখিয়া' তিরস্কার করিল,—ঘরগুহায় এখনি ধুনার ধোঁয়া না দিলে কি চলিত না?

ফৈজু সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিল "আমি যে সেই ঝি রাখবার ঠিক করে গিয়েছিলুম, তার কি কর্‌লে খলিফা? একলাটি সমস্ত কায করতে তোমার যে বড়ই কষ্ট হচ্ছে!"

প্রতিবাদের স্বরে রহিমা বলিল "হ্যাঁ হচ্ছে! তোমাদের ঐ এক বুলী! ও-ও পড়ে-পড়ে ধুঁক্‌ছে, আর বল্‌ছে, 'দিদি একলা তুমি কত কষ্ট পাচ্ছ,—আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে!'—কিন্তু কষ্ট যে কি, তা তো আমি কিছুই বুঝি না। তোমরা রাতদিন ও রকম করে বোল না ফৈজু।" ফৈজু হাসিয়া বলিল "ধমক দাও তো আমি নাচার! কিন্তু মানুষের শরীর তো,—এত খেটে তোমার যদি এই সময় অসুখ হয়, তা'হলেই যে মাথায় পাহাড় ভেঙ্গে পড়্‌বে! না

—না, ঝি একটি রাখো খলিফা,—না হলে, শেষে এই অল্প সাশ্রয় করতে গিয়ে অনেক লোকসানের দায়ে ঠেক্‌তে হবে।"

ফৈজু আরো অনেকগুলি কথা বলিল। রহিমাও অনেক তর্ক করিল,—ঝি রাখিতে তাহার আপত্তি নাই,—কিন্তু তাঁহাদের মত গরীবের ঘরে,—ঝি-চাকর পোষা যে এক মহাপাপ! সাধারণ ঝি-চাকরেরা—বড়লোক মনীবের ঘরে অকাতরে অনেক অসুবিধা সহ্য করিতে পারে,—কিন্তু গরীব মনীবের ঘরে তাহারা এতটুকু ত্রুটির ছল পাইলেই একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতে চায়! পয়সা দিয়া লোক রাখিয়া সেরূপ অবজ্ঞা ঝঙ্কার সহিতে রহিমা আদৌ প্রস্তুত নয়! তার চেয়ে সে নিজে সংসারের সব কায করিবে. সেই ভাল!

ফৈজু অনেক অনুনয় করিয়া অবশেষে রহিমাকে সম্মত করাইল, যে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য একটা ঝি রাখা হইবে, এবং আগামী কল্য হইতেই লোক বাহাল হইবে। আরো এদিক-ওদিক দুই চারিটা কথার পর, রহিমা ফৈজুর আহারাদির তত্ত্ব লইয়া—সে উপবাস করিয়া আছে, এতক্ষণ সে কথা বলে নাই কেন—এবং হঠাৎ তাহার ঐ সব ক্লেশকর ধর্ম্মানুষ্ঠানের হুড়োহুড়ি বাড়িয়া উঠিয়াছে কেন,—সেজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলা তিরস্কার করিল! ফৈজু অপ্রস্তুতে পড়িয়া ব্যস্ত-সমস্তভাবে বুক-পকেট হইতে কতকগুলা প্রসাদী নির্ম্মাল্য বাহির করিয়া রহিমার হাতে দিয়া জানাইল, পথে আসিতে কোন এক মস্‌জিদে নামাজ পড়িয়া পীরের দর্‌গায় পূজা দিয়া, প্রসাদী নির্ম্মাল্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। রহিমা শশব্যস্তে নির্ম্মাল্য লইয়া টিয়ার ঘরে ছুটিল। তার পর রান্নাঘরে গিয়া আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বসিল।

এঘরে-ওঘরে ধুনা দিয়া, ফৈজু টিয়ার ঘরে আসিয়া ধুনাচি একপাশে রাখিল; পকেট হইতে একটু ধূপ বাহির করিয়া আগুনের উপর ছাড়িয়া দিল; সুগন্ধে ছোট ঘরখানি আমোদিত হইয়া উঠিল।—স্ত্রীর শয্যার কাছে সরিয়া গিয়া, হেঁট হইয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া স্নেহময় স্বরে বলিল "কেমন, আজকাল বেশ ভাল বোধ হচ্ছে না?"

টিয়া এতক্ষণ পড়িয়া-পড়িয়া তাহাদের সমস্ত কথাই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। এইবার অনুযোগ-ব্যথিত দৃষ্টি তুলিয়া ক্ষুণ্ণভাবে বলিল "কেন এমন কষ্ট করে ছুটে এলে বল দেখি? আমি তো সত্যিই এখন বেশ ভাল আছি।"

পাশে বসিয়া পড়িয়া—শীতল-কোমল কণ্ঠে ফৈজু বলিল, "আমি ঐটুকুই শুনে যাবার জন্যে এসেছি। এতে আমার কিছুই কষ্ট হয় নি।"

টিয়া ম্লানহাস্যে বলিল "তুমি তো কখনই মুখোমুখি কষ্ট-স্বীকার করতে পার না,—কিন্তু এম্নি করেই শরীরটা কি ভেঙে ফেল্‌বে?"

ফৈজু হাসিয়া বলিল "এ শরীর সহজে ভাঙ্‌বার নয়! তুমি তার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না—"তারপর সে কথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িল। টিয়ার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল।

অন্যান্য কথার পর টিয়া বলিল "নজ্‌রু সাহেবদের বিপদের কথা শুনেছ?"

ফৈজু বিস্মিত হইয়া বলিল "কই না, কি হয়েছে?"

টিয়া ব্যথিত করুণ কণ্ঠে সংক্ষেপে যাহা বলিয়া গেল, তাহার অর্থ এই,—নজিরুদ্দীনের প্রথম পুত্রটি বহুদিন ধরিয়া জ্বরাতিসারে ভুগিয়া, বিনা চিকিৎসায়, অযত্নে সম্প্রতি মারা গিয়াছে। তার পর দ্বিতীয়টি আটদিন পূর্ব্বে সহসা ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছে। নজরুর স্ত্রী তখন সূতিকাগারে অযত্নে অনিয়মে দারুণ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—পুত্রশোকে সেও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বাকী আছে সদ্যোজাত শিশুটি! নানী তাহাকে আনিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অবস্থা ভাল নয়,—শিশুর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যে দুধের প্রয়োজন,—তার পয়সা তিনি কোথায় পাইবেন? নজিরুদ্দীন থিয়েটারের হুজুগে উন্মাদ হইয়া আড্ডা-বাড়ীতে পড়িয়া-পড়িয়া মদ খাইতেছে। সেইখান হইতেই সে লম্বা চালে হুকুম দিয়া পাঠাইয়াছে,—'স্ত্রীপুত্রের গোরের খরচে সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে,—এখন ঐ এক-ফোঁটা ছেলেকে বাঁচাইবার জন্য আর পয়সা খরচ করিতে পারে না! যে কদিন ঐ হতভাগ্য শিশুটা না মরে, সে কদিন জল বার্লি খাওয়াইয়া উহার ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিয়া রাখা হউক!'

ফৈজু গুম্ হইয়া বসিয়া সমস্ত শুনিয়া গেল; একটিও শোক, দুঃখ, বা ক্ষোভসূচক শব্দ উচ্চারণ করিল না! এমন শোচনীয় হতশ্রদ্ধায় যাহাদের প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রাণের জন্য শোক প্রকাশ করিলে

শোকের স্বর্গ-শুচিতার অপমান করা হয় যে!—ফৈজু বাহিরে চুপ করিয়া রহিল ; কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তাহার অন্তরাত্মাটা কি এক অব্যক্ত রোষে, ক্ষোভে আপনা-আপনি যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল ! নজিরুদ্দীনের উপর তাহার মনের ভাবটা তখন যে কিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল,—সেটা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে ফৈজুর নিজেরই ভয় হইতে লাগিল ! কিন্তু তবুও সে বুঝিল—শুধু এই একটি মাত্র—মুখ-চেনা নজিরুদ্দীনের উপর রাগ করিলেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না ;—ঘরে-ঘরে এমন কত নজিরুদ্দীনের কত মূর্খতার নজীর জাজ্জল্যমান,—কে তাহার হিসাব রাখে ? সাধারণের পক্ষে,—এগুলা তো নিতান্ত সহজ—গা-সহা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে ! এ মূর্খতার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলিতে বা ভাবিতে যাওয়া মহামূর্খতা মাত্র ! ইহারা বিবাহ করে সহজেই,—কিন্তু বিবাহিত জীবনের কঠিন-দায়িত্ব বহনের সময় হাত-পা ছাড়িয়া এলাইয়া পড়ে, ততোঽধিক সহজেই !

বিদ্যুদ্বেগে তাহার মনের মধ্যে কত চিন্তা বহিয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা নাই ! একটা অধীর-রুদ্ধতায় হৃদপিণ্ডটা বুকের মধ্যে সশব্দে লাফাইতে লাগিল ! ফৈজু প্রাণপণে সংযত হইয়া নিঃশব্দে আত্মদমনের চেষ্টা করিতে লাগিল ;—পাছে টিয়া তাহার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া কোনরূপ উত্তেজনা-চঞ্চল হইয়া উঠে, সেই ভয়ে তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল ।

ফৈজু নিঝুম মারিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া, টিয়াও খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। তার পর ধীরে-ধীরে স্বামীর হাতটি টানিয়া লইয়া বলিল, "শোন—"

দৃষ্টি ফিরাইয়া অত্যন্ত শান্তভাবে ফৈজু বলিল, "কি ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া টিয়া বলিল "এই কথার কথা বলছি,—যদি আমিও ওম্নি করে মরে যাই—"

ফৈজুর কণ্ঠ শুকাইয়া গেল ! অস্থিরভাবে শয্যা ত্যাগ করিয়া রুদ্ধ-দ্রুত স্বরে বলিল, "পাগলামী কোর না, থাম—"

নির্ব্বাণোন্মুখ ধূনাচির উপর সজোরে বায়ু-সঞ্চালন করিয়া আগুনটা জাগাইবার চেষ্টা করিতে-করিতে—ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া, একটু পরিহাস-মিশ্রিত ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "পড়ে-পড়ে ঐ সবই হচ্ছে, না ? ডাক্তার বুঝি তোমায় ঐ সব ভাবনায় মাথা ঘামাতে বলে গেছেন ?"

অপ্রস্তুতে পড়িয়া টিয়া অনুনয় করিয়া বলিল, "না, তা নয়,—তুমি কাউকে বলে দিও না ওগো,—ও আমি শুধু তোমাকেই বল্‌ছি—দিদিকে বোল না কিছু—"

ফৈজু উঠিয়া আসিয়া আবার নিকটে বসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া—খুব সহজভাবেই বলিল, "আমার পকেটে কিছু আছে,—নানীর সঙ্গে দেখা করে ছেলেটির জন্যে একটু দুধের বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসি,—কি বল ?"

একটু বিচলিত ভাবে দৃষ্টি তুলিয়া টিয়া বলিল, "আমায় জিজ্ঞাসা করছ ? কেন ?"

অপ্রতিভ হইয়া ফৈজু বলিল, "কিছু না,—এইখান থেকেই উঠে যাচ্ছি,—তাই মতলবটা তোমায় জানিয়ে যাচ্ছি।"

"তাই বল"—বলিয়া সুগভীর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া টিয়া চুপ করিয়া রহিল। ফৈজু দুর্ব্বোধ্য বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "কেন ? যদি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করতুম, তা হলে কি হোত ?"

ক্ষুণ্ণভাবে একটু হাসিয়া টিয়া বলিল "শুধু অপরাধের ভাগী করা ! তোমার মত মানুষের মনকে চিন্‌তে হলে যেটুকু বুদ্ধি থাকার দরকার, আমার যে সেটুকু নাই।" কথাটা বলিতে গিয়া, অজ্ঞাতেই টিয়া আবার গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িল। একটু থামিয়া বলিল "আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না,—যখন-তখন যা-তা বলে তোমায় বড়ই জ্বালাতন করি,—ভারী ভোগাই, না ?"

ফৈজু স্মিত-কোমল-হাস্য-রঞ্জিত মুখে তাহার পানে শুধু একবার চাহিল, কোন উত্তর দিল না, সস্নেহে কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। টিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর ধীরে-ধীরে বলিল "সংসারে পয়সার অভাবে গরীব হয়ে অনেকেই থাকে, কিন্তু তার মাঝেও—মন যার বড় হয়—"

টিয়া কি বলিতে চায়, ফৈজু সেটা বুঝিল। বাধা দিয়া বলিল, "ঐ খলিফা আস্‌ছে, আমি উঠি তা হলে ? তুমি কাহিল মানুষ, বেশী রাত জেগো না,—যা খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়,—আসি তবে ?"

টিয়া একটু চঞ্চল হইয়া বলিল "তুমি কাল ভোরেই উঠে চলে যাবে? যাবার আগে আমার সঙ্গে আর একবার দেখা কোরো।"

ফৈজু উঠিতেছিল, আবার বসিল। স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বলিল "কিছু বল্‌বার আছে? বল, তা'হলে, আমি এখুনি শুনে যাই।"

টিয়া বলিল, "না, বল্‌বার কিছু নাই,—চলে যাচ্ছ, কত দিনের মত, তাই বল্‌ছি,—আর একবার দেখা দিয়ে যেও—খাবার সময় আর একবার এখানে এস।"

একটু হাসিয়া ইতস্ততঃ করিয়া ফৈজু বলিল, "থলিটা থাকবে যে তোমার কাছে।" তার পর একটু থামিয়া, দৃষ্টি নত করিয়া, মৃদুস্বরে বলিল "এই তো দেখা হোল, আবার কি?—আমি দিন পনের পরে আবার তো আসছি, কেন মন খারাপ করছ।"

অনুরোধের স্বরে টিয়া বলিল; "তা হৌক, তুমি আর একবার দেখা দিয়ে যেও।"

খুব জোরের সহিত হাসিয়া ফৈজু বলিল, "নেহাৎ ছেলেমানুষী!"—তার পর থামিয়া, কি ভাবিয়া আবার একটু হাসিল। নিজের মাথা হইতে টুপিটা খুলিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও, এইটে তোমার কাছে জমা রেখে চল্লুম, যাবার সময় এসে নিয়ে যাব, কেমন?" ফৈজুর দৃষ্টি স্নিগ্ধ কৌতুকে পূর্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠিল! যেন—সেও একটা খুব অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক ছেলেমানুষী করিয়া ফেলিল! টিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া, একটু হাসিয়া—সাবধানে, মৃদু নিঃশ্বাস ছাড়িল!

উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কাঁধের উপর হইতে চাদরখানা টানিয়া লইয়া, ক্ষিপ্রহস্তে মাথায় পাগড়ী জড়াইতে-জড়াইতে, হাসিমুখে ফৈজু বলিল, "আমি চল্লুম তা'হলে,—মন খারাপ কোর না,—সাবধানে থেকো।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পথে বাহির হইয়া, এলোমেলো ধরণের চিন্তায় ফৈজুর মন ভরিয়া গেল। যে হতভাগ্য জীব জন্মিবামাত্র পিতার হৃদয়কে স্নেহ-বিমুখ করিয়া তুলিবে, মাতার কোল জন্মের মত হারাইবে,—সে যে কেনই পৃথিবীতে জন্মায়, আর কেনই সে বাঁচিয়া থাকিতে চায়, সে সম্বন্ধে দর্শন-বিজ্ঞানের জটিল সূত্রসম্মত কোন বড় ভাবনাকে ফৈজু ভাবিতে পারিল না;—সে, তাহার সহজ বুদ্ধিতে যতটুকু কুলায়, ততটুকু ভাবনাই ভাবিল। নিজে যথাসাধ্য দিয়া শিশুর আজিকার অভাব মিটাইলেই তো সব চুকিয়া যাইবে না,—তাহার ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা কি করিতে পারিবে, সেইটা ফৈজুর মহৎ ভাবনা হইল।

নানীর বাড়ী গিয়া, শিশুটির অবস্থা দেখিয়া, ফৈজুর অন্তর্নিহিত ক্ষোভ চারগুণ বাড়িয়া গেল। পাঁকাটির মত সরু, ক্ষীণ হাত-পা—উদর অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত,—শিশুর মূর্ত্তি দেখিলেই ভয় হয়! সহস্র অনাচার, অত্যাচার, অনিয়ম, অবহেলার জীবন্ত প্রতিক্রিয়ার মত সে যেন সংসারে আবির্ভূত হইয়াছে! বিরক্তির আক্রোশে সে ক্রমাগতই চীৎকার করিতেছে। তাহার ক্ষুধা কিছুতেই মিটিতেছে না। উদরে স্থান নাই, তবুও ক্ষুধার জ্বালা তাহার কাছে—অশ্রান্ত, অনির্ব্বাণ! শ্রেষ্ঠ খাদ্য মাতৃদুগ্ধে বঞ্চিত হতভাগ্য বালক কৃত্রিম খাদ্যে পরিতৃপ্ত হইতে কোন মতেই ইচ্ছুক নয়!

তার পর, এই সব নিঃসম্বল দরিদ্র গৃহে এমন সব মাতৃহীন শিশু পালনের জন্য যে প্রথা-পদ্ধতি বাঁধা আছে, তাহার চমৎকারিত্ব বড় সুন্দর! সে সৌন্দর্য্য যিনি দু'চোখ ভরিয়া দেখিতে পারিয়াছেন, তিনি যতবড় ধৈর্য্যশীল মানুষই হউন,—তিনিও মানব জীবনকে ঘৃণাভরে ধিক্কার দিবেন! একটা মোটা 'খড়ের নলে' অপরিষ্কার কাপড়ের টুক্‌রা জড়াইয়া, কৃত্রিম উপায়ে শিশুকে দুধ খাওয়ান হইতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া, ক্ষোভে ফৈজুর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল!

নজিরুদ্দীনের উদ্দেশে অনেকগুলা বিষাক্ত অভিসম্পাৎ বর্ষণ করিয়া নানী কাঁদিয়া-কাটিয়া জানাইল, দানশীলা সুমতি ঠাকুরাণীর সদয় করুণার দানে শিশুটি এখনও বাঁচিয়া আছে। তিনি গত কল্য হইতে সংবাদ পাইয়া, কর্ম্মচারীদের মারফৎ সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিতেছেন,—শিশুর দুধ খাইবার কাঁচের বোতল কাল পাঠাইবেন। কিন্তু নজিরুদ্দীন···হায়!

নিজের পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া নানীর হাতে দিয়া, শিশুর যত্নের সুব্যবস্থা করিতে বলিয়া মর্ম্মাহত ফৈজু নজিরুদ্দীনের সন্ধানে চলিল!—তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়া কহিয়া যদি মন ফিরাইতে পারে!—যদি শিশুর ভবিষ্যতের

জন্য কিছু ব্যবস্থা করিতে পারে! কিন্তু ভাল'র জন্য চেষ্টা করার ফল এ ক্ষেত্রে ভাল হওয়া—বড়ই সন্দেহ-জনক!

সমস্ত দিনের পর, এইবার পথ চলিতে ফৈজুর বেশ একটু ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল। চলিতে-চলিতে এক-একবার মনে হইতে লাগিল, এই নিষ্ফল উদ্যমে আর কায নাই,— নজিরুদ্দীন তো ভাই বলিয়া তাহাকে গ্রাহ্য করিবেই না,— বন্ধু বলিয়াও তাহার উপদেশে কর্ণপাত করিতে চাহিবে না;—এরূপ স্থলে তাহার শিশুর জন্য দয়া ভিক্ষা চাহিতে যাওয়া,—সে মিছামিছি একটা ধৃষ্টতা মাত্র!

কথাটা ফৈজু যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার গতি ততই মন্থর হইয়া আসিতে লাগিল! ফৈজুর বড় আক্ষেপ হইতে লাগিল যে—সাধারণ স্বার্থপর বুদ্ধিমানদের দলে ভিড়িয়া, সেও অনর্থক অভাব সৃষ্টির জন্য, নিজেও একটা সংসার পাতিয়া ফেলিয়াছে! আজ নিজের অভাবের ভারে তাহার নিজের ঘাড় ভাঙ্গিয়া না পড়িলে,— সে যে স্বচ্ছন্দে অন্যের কত সাহায্য করিয়া কৃতার্থ-প্রসন্নতায় ধন্য হইয়া যাইত! এমন ভিক্ষাই বা করিবে কেন?

অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের সামনে দাঁড়াইয়া, যখনই সে নিজের দারিদ্র্য-কুণ্ঠিত হাত দুটি গুটাইয়া লইতে বাধ্য হইত, তখনই তাহার মনে ঐ আক্ষেপ, ঐ বিরক্তিটা জাগিয়া উঠিত! হায়—অভাব-পীড়িত দরিদ্রের পক্ষে এই যে অভাব বৃদ্ধির উদ্যম,—কি নৃশংস অবিবেচনা ইহা!

নানা কথা ভাবিতে-ভাবিতে, ফৈজুর মনের মধ্যে ভারী একটা বিক্ষিপ্তির গোলমাল জমিয়া উঠিল। অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে-চলিতে কখন যে সে ঠাকুরবাড়ীর নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, ঠিক করিতে পারে নাই!—হঠাৎ চমক ভাঙ্গিতেই শুনিতে পাইল, ঠাকুরবাড়ী ঢুকিবার চলন-ঘরটায় কে একজন গুণ-গুণ করিয়া গান গাহিতেছে—

"আহা এমন সোণার দেশ;
হেথা নাইক সুখের লেশ—"

চলিতে-চলিতেই অনাবশ্যক কৌতূহলে ফৈজু একবার ঘরখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিল; দেখিল, একজন গৈরিক-আলখাল্লাধারী বাউল পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, দেওয়ালের প্রজ্বলিত 'ওয়াল্-ল্যাম্পটা' একবার কমাইতেছে, একবার বাড়াইতেছে,—আর, তারই মাঝে ঘন-ঘন সতর্ক নয়নে এদিক ওদিক চাহিয়া, ভিতরের দুয়ারের পাশে আড়ে আড়ে চাহিয়া, কাহাকে যেন লক্ষ্য করিতেছে।

লোকটা যদি স্পষ্ট চোখে কাহাকেও লক্ষ্য করিত, তবে ফৈজু তাহার আচরণে দৃক্পাতও করিত না;—কিন্তু ঐ বিশ্রী বাঁকা চাহনীতে তাহার মনে কেমন একটা খট্কা বাধিয়া গেল! হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল!—নজিরুদ্দীনের কথা ভুলিয়া গেল!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আর একজন ভিতর হইতে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বাহিরে আসিলেন;—তাঁহার নাকে সোণা বাঁধান স্প্রীংএর চশমা-আঁটা, গায়ে গরদের চাদর, গলায় প্রকাণ্ড ফুলের মালা! লোকটাকে দেখিয়া ফৈজু হতভম্ব হইয়া গেল! প্রথমটা চিনিতেই পারিল না; পরে চিনিল,—তিনি সেই সুবিখ্যাত মোহন্ত মশাই!

মোহন্ত মশাই আসিতে-আসিতে—যেন ভক্তির আবেগে উন্মত্ত হইয়াই, বিরাট হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "গোবিন্দ হে প্রাণবল্লভ! জয় গোরাচাঁদের জয়!"

তৎক্ষণাৎ বাউলটিও দু'হাত তুলিয়া অস্বাভাবিক ভক্তি-গদ্গদকণ্ঠে হাঁকিল "জয় গোরাচাঁদের জয়!"

মোহন্ত ছুটিয়া আসিয়া, ঘাড় মুখ নাড়িয়া, চুপি-চুপি বাউলের কাণে-কাণে কি বলিলেন। বাউল হুঁ হুঁ করিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। মোহন্ত আবার তেমনি ব্যস্তভাবে ছুটিয়া ভিতর দিকে চলিলেন। চৌকাঠ পর্য্যন্ত গিয়াই মুখ ফিরাইয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিলেন, "আলোটা কমিয়ে দাও, কমিয়ে দাও,—হুঁসিয়ার হয়ে এইখেনে পাহারা দাও,—হঠাৎ কেউ না আসে!" তিনি চলিয়া গেলেন।

বাউল মহাশয় আলোটা খুব কমাইয়া দিলেন, এত কম যে ঘর প্রায় অন্ধকার বলিলেই চলে! তার পর সন্তর্পণে ভিতর দিকে আবার উঁকি মারিয়া, একটু সরিয়া আসিয়া হঠাৎ উচ্ছ্বাসভরে অন্য গান ধরিলেন। সে গান, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভক্তি-যোগ-প্রণালী সাধনের কিছুমাত্র অনুকূল নয়,—তার সম্পূর্ণই বিপরীত।

ফৈজুর সংশয় ক্রমে শঙ্কায় পরিণত হইল। মোহন্ত মহাশয়ের অশেষ গুণের সুখ্যাতি বেশ জানা-শোনা আছে; কিন্তু আজ এখনকার এই ছুটাছুটি, লুকাচুরির অর্থ কি? সেটার সন্ধান লইতে যাওয়া ফৈজুর পক্ষে বড়ই অশোভন

স্পর্দ্ধা প্রকাশ করা হইবে। কিন্তু তবুও……! ফৈজু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

নিরুপায় হইয়া চারিদিকে চাহিল,—কেহ নাই। দূরে-দূরে পল্লীর মুদীখানার দোকানগুলার ঝাঁপ বন্ধ হইবার উদ্যোগ হইতেছে। কাছাকাছি যে কয়খানি ভদ্র গৃহস্থ-বাড়ী আছে, সেখানে সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু বর্ষাকালের দিন বলিয়া সন্ধ্যার পরেই পুরুষেরা সবাই বাড়ীর ভিতর আশ্রয় লইয়াছেন। রাস্তায় এমন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না, যাহাকে ঠাকুরবাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া, একটু সন্ধান লইয়া নিশ্চিন্ত হয়!

হঠাৎ ফৈজুর মাথায় এক ফন্দী আসিল। ঠাকুরবাড়ীর চলন-ঘরে সকলের প্রবেশাধিকার আছে;—ফৈজু এক লাফে সিঁড়ি ডিঙাইয়া অকস্মাৎ চলন-ঘরের ভিতর ঢুকিল,—ব্যস্তভাবে বলিল, "নজিরুদ্দীন সাহেব কি এখন থিয়েটারের আড্ডা বাড়ীতে আছে, জানেন?"

ফৈজুর কণ্ঠস্বরে বাউল মহাশয় হঠাৎ ভয়ঙ্কর চমকিয়া উঠিলেন। উল্লাসে উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত থামিয়া গেল। মাথা হেট করিয়া কাঁধের পাশ হইতে মুখ ফিরাইয়া, কেমন এক রকম 'চোর-চোখো' চাহনীতে, নিতান্ত ভীতভাবে ফৈজুর দিকে বক্রকটাক্ষ-ক্ষেপ করিয়া, অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিলেন, "জানি না, আমি নতুন অভ্যাগত বৈষ্ণব—" পরক্ষণেই তিনি ভিতরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন।

ফৈজুও চমকিল! সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও, এ মানুষটা যে চেনা-চেনা ঠেকিতেছে! লোকটাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তৎক্ষণাৎ সেও সঙ্গে-সঙ্গে অগ্রসর হইয়া বলিল, "দাঁড়ান ঠাকুর, মেহেরবাণী করে একটা কায করুন,—ঠাকুরবাড়ীর ভেতর দিক দিয়ে আড্ডা-বাড়ীতে যাবার ঐ যে দুয়ারটা আছে, ঐখান থেকে একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন, আমি এদিকের রাস্তা দিয়ে তা হ'লে—"

ফৈজুর মুখের কথা মুখে রহিল—কি একটা অস্ফুট উক্তি করিয়া, ঠাকুর ততক্ষণে চৌকাঠ ডিঙাইয়া ভিতরে অদৃশ্য হইলেন। ফৈজু স্তব্ধ হইয়া গেল!

অকস্মাৎ ভিতরের অন্ধকার হইতে, ব্যগ্র-বিকম্পিত কণ্ঠে কে ডাকিল, "ফৈজু, তুমি!"

কাহার কণ্ঠস্বর ফৈজু বুঝিতে পারিল না;—কিন্তু বুঝিল, নারী-কণ্ঠ! তৎক্ষণাৎ অন্ধকার চৌকাঠের সামনে ছুটিয়া গিয়া, বিনা দ্বিধায় বলিল, "হাঁ মা, আমি ফৈজু,—আপনি?"

"তোমাদের দিদিমণি—" বলিয়া অবগুণ্ঠনবতী সুমতি দেবী অন্ধকারের ভিতর হইতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

"দিদিমণি!" ফৈজু স্তম্ভিত হইয়া গেল! দেখিল, তিনি একাকিনী! সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়িল, সেই পলায়িত বাউলটার বাঁকা-চাহনী ও বিসদৃশ সঙ্গীত! ফৈজু আত্ম-দমন করিতে পারিল না,—রুক্ষ বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আপনি! একলা এখানে অন্ধকারে! ঠাকুর প্রণাম করতে এসেছিলেন বুঝি? পিসিমা কই?"

কম্পিত কণ্ঠে সুমতি দেবী বলিলেন, "পিসিমা আসতে পারেন নি—শরীর খারাপ হয়েছে। আমি, মোক্ষদা দিদি আর ঝিকে সঙ্গে করে ঠাকুর দর্শনে এসেছিলুম—কিন্তু…" দারুণ ক্ষোভ মিশ্রিত ঘৃণার স্বরে বলিলেন, "খুব শিক্ষা হয়েছে আমার! আর আমার ঠাকুর দর্শনে কায নাই,—আমি এইখান থেকেই প্রণাম করে যাচ্ছি। তুমি আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবে চল ফৈজু!" সুমতি দেবী হেঁট হইয়া গলবস্ত্রে চৌকাঠের উপর মাথা ঠেকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ফৈজু হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, এখনো "ঠাকুর দর্শন হয় নি? তবে? তারা কোথা?"

তীব্র-বিরক্তির সহিত সুমতি দেবী বলিলেন, "চুলোয় গেছে! ঠাকুরবাড়ী ঢুকে আমায় বল্লে, 'দিদি দাঁড়াও, পূজারী ঠাকুরকে ডেকে আনি, স্নান-জল দেবেন,—' বলে মোক্ষদা গেলেন। তার আসতে দেরী দেখে ঝি বল্লে, 'দিদি দাঁড়াও, এইখান থেকে একটু এগিয়ে দেখি—' তার পর কোথায় কে গেল, আর খোঁজ নাই। একলা আমি মহা বিপদে পড়েছি, ফৈজু—" বলিয়াই একটু থামিয়া—ক্ষোভোত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "কথাটা ঠিক, যে, সৎ'এর সঙ্গে নরকে যাওয়াও ভাল, কিন্তু বদ'এর সঙ্গে স্বর্গে যাওয়াও উচিত নয়! বাড়ী চল—"

ফৈজুর বিরক্তি-উদ্ধত চিত্ত, সহসা মন্ত্রমুগ্ধের মত নত হইয়া পড়িল! সেও যে বড় দুঃখে ঐ কথাই ভাবিতেছিল! ফৈজুর মনের গ্লানি এক মুহূর্ত্তে পরিষ্কার হইয়া গেল! নম্র শান্ত স্বরে বলিল, "ঠাকুর-দর্শনে এসে অমনি ফিরবেন? কেন খুঁৎ রাখবেন দিদিমণি!—আমি এইখানে দাঁড়াচ্ছি, আপনি

একটু এগিয়ে গিয়ে নাটমন্দির থেকে দর্শন করে আসুন না,—ওখানে লোকজনের ভিড় তো নাই !"

মাথা নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে সুমতি দেবী বলিলেন,"ঐ ভিড়ের ভয়েই সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় আসি নি,—ভিড় সরে যাবার পর এসেছি। কিন্তু এখানে অতিথি-অভ্যাগত, সাধু-সন্ন্যাসী যেগুলি জুটেছেন, তাঁদের ছুটোছুটি, হুটোপাটির ধূম দেখে আমার হাড় জ্বলে গেছে,—আর নয় ফৈজু, চল এখান থেকে।"

মোহন্ত মশাই এতক্ষণ কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন, কে জানে,—এই সময় হঠাৎ গুম্ গুম্ শব্দে মাটী কাঁপাইয়া, অচিন্তিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,"কে এখানে—কেগা তোমরা - আঃ!" পরক্ষণেই শশব্যস্তে বলিলেন, "দিদি ঠাকরুণ্ নয়? হ্যাঁ, তাই তো, এ কি! চলে যাচ্ছেন কেন? আসুন, আসুন,—ঠাকুর দর্শন করে যান।"

ফৈজু থমকিয়া দাঁড়াইয়া সুমতি দেবীর পানে চাহিল। সুমতি দেবী মাথা নাড়িলেন। ফৈজু মোহন্ত মশাইয়ের দিকে চাহিয়া ধীরভাবে বলিল "উনি এইখান থেকে প্রণাম করে যাচ্ছেন।"

মোহন্ত মশাই অধিকতর ব্যস্ত হইয়া, তড়্বড়্ করিয়া বলিলেন, "কেন, কেন,—ঠাকুর দর্শন করবেন না? সঙ্গে কে এসেছে? পিসি ঠাকরুণ্ কই?"

সুমতি দেবী তাহাদের বাক্যালাপের অবসর দিবার জন্য দাঁড়াইলেন না,—অগত্যা ফৈজুও ফিরিল। সুমতি দেবীর পিছু-পিছু চলিয়া যাইতে-যাইতে সংক্ষেপে উত্তর দিল, "তিনি আজ আসেন নি, শরীর ভাল নাই—" তাহারা চলন-ঘুর পার হইয়া রাস্তায় নামিল। মোহন্ত মশাই কেমন একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্কে অভিভূত হইয়া, নিস্পন্দ ভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন;—না পারিলেন নড়িতে—না পারিলেন আর কিছু বলিতে!

রাস্তায় অত্যন্ত অন্ধকার। কয়েক পদ গিয়া, ফৈজু একটু ইতস্ততঃ করিয়া, কুণ্ঠিতভাবে বলিল—"বড় অন্ধকার দিদিমণি, বর্ষাকাল আওলের দিন,—যদি একটু দাঁড়ান, তা হ'লে মোহন্ত মশাইয়ের কাছে একটা আলো চেয়ে নিই।"

ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবে সুমতি দেবী বলিলেন, "মোহন্তর কাছে? না ফৈজু, দরকার নাই, চলে এস, তোমার পায়ে জুতো আছে তো—"

দুঃখিত ভাবে হাসিয়া ফৈজু বলিল "আমার জন্যে কি ভাবছি দিদিমণি, আপনার পা যে খালি—"

"তা হোক, ভগবান আমার ওপর এত সদয় হন নি যে আমি সাপের ঘাড়ে পা দেব। তোমাদের দিদিমণি কি অত সহজে মরবার মত পুণ্য করেছে ফৈজু, কিছু ভেবো না।" বলিয়া সুমতি দেবী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। ফৈজু হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিল; কিন্তু মনে-মনে বুঝিল, কথাটা শুধুমাত্র উপহাস নয়—সুমতি দেবীর অন্তর্নিহিত কি একটা তিক্ততার ঝাঁজ তাহাতে মিশ্রিত আছে? তিনি ভিতরে-ভিতরে আজ একটু অতিরিক্ত মাত্রায় বিরক্তি-বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন!

সদর রাস্তা পার হইয়া, জমিদার-বাড়ীর কাছাকাছি হইয়া, গলি-রাস্তায় ঢুকিয়া, ফৈজু নিম্নকণ্ঠে বলিল "মহন্ত মশাই আমার সঙ্গে সেই খিটিমিটিটুকু হয়ে যাবার পর মোহন্তগিরি ছেড়ে দেবেন বলে একবার খুব হৈ হৈ করে লাফিয়েছিলেন,—তার পর কিসের জন্যে যে দয়া করে সে মতলব ছেড়ে দিলেন, কিছু বুঝ্তে পারলুম না,—আজ আপনার খাতিরে আমার সঙ্গে কথাও কয়ে ফেল্লেন দেখলুম।"

তীব্র ঘৃণা-ভরা বিরক্তির সহিত সুমতি দেবী বলিলেন, "ঐ লাফালাফিই সার! ভর্ত্তি ঘড়া নিঃশব্দই থাকে,—কিন্তু খালি কলসীর বক্বকানির চোটেই মানুষের কাণ ঝালাপালা হয়ে যায়! দ্যাখো ফৈজু, আমার মন এত নীচু নয় যে, রাতদিন পরের ছুতো খুঁজে বেড়াব, বা তাই নিয়ে ভজন পূজন করে সময় কাটাব। মানুষের দোষ-ত্রুটি যা আমার চোখে পড়ে, আমি যতক্ষণ পারি নিজের চোখ নীচু করে, সাধ্যপক্ষে সেগুলো এড়িয়ে যেতে চাই; কেন না, আমি মানুষকে মানুষ বলেই খাতির করতে ভালবাসি,—ইতর জানোয়ার বলে ভাব্তে আমার নিজের প্রাণে ঘা লাগে! কিন্তু ক্রমশঃ বুঝ্ছি ফৈজু, মানুষের স্বভাব যাই হোক, কিন্তু ছারপোকার স্বভাব,—সে ছারপোকাই থাকবে। পিঠের জোরে তাকে যতই চাপ দাও, কিন্তু সে সেই চাপের নীচেই গুটি-সুটি মেরে বসে রক্ত শুষ্তে চাইবে! আর রক্ত যত সে শুষ্তে পারুক না পারুক, কামড়ের জ্বালায় নিরীহের শান্তির ঘুমটা সে হিংসা করে ভাঙাবেই ভাঙাবে,—এই তার অভ্যাস।"

ফৈজুর ধমনীর রক্ত-স্রোতে ধিকি-ধিকি করিয়া আবার আগুনের শিখা জ্বলিয়া উঠিল ? চির-সংযত-স্বভাবা সুমতি দেবীর মানসিক দৃঢ়তা যে আজ কত বড় অসহনীয় ক্ষোভের আঘাতে এতখানি বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, সেটা বুঝিতে তাহার মস্তিষ্কের ভিতর বজ্রঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল ! সুমতি দেবীকে ঠাকুরবাড়ীতে সেই নিতান্ত অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যে হঠাৎ দেখিয়া, গোড়াতেই তাহার ধৈর্য্য টলিয়া গিয়াছিল। তবু সে জোরের উপর আত্মদমন করিয়া সে প্রসঙ্গে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল !

সুমতি দেবীর অসতর্কতা-ত্রুটি সসম্মানে এড়াইয়া চলিবার জন্যই সে, সেই বাউলটার অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতাও, অবহেলা ভরে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে ; তবু আবার সেই প্রসঙ্গই উঠিয়া পড়িল !

ফৈজু আত্ম-দমন করিতে পারিল না,—তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিয়া উঠিল, "শুধু পিঠের জোরে চাপ দিলেই ছারপোকা শাসন করা যায় না দিদিমণি,—তাকে শাসন করতে হ'লে নির্দ্দয় ভাবে নোখে টিপে রগড়ে পিষে ফেলাই দরকার !"

পরক্ষণেই ফৈজু আপনাকে সবলে সংযত করিয়া লইল। একটু থামিয়া, ধীর কণ্ঠে বলিল, "কিছু মনে করবেন না দিদিমণি ! আমার মা যদি বেঁচে থাকতেন, তা'হলে তাঁকে আজ এমন অবস্থায় আমার যে কথা বলা উচিত ছিল, আপনাকেও সেই কথাটা—" ফৈজু থামিল।

সুমতি দেবী সহসা স্থির হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বেশ দৃঢ় অথচ শান্ত কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "থামলে কেন ফৈজু, বল !—হাঁ, আমার আজ উপযুক্ত সন্তান থাকলে, সে আমায় আজ এস্থলে যা বলতে পারত, তুমিও তাই বল। সাহস করে যে সত্যি কথা বলতে পারে,—সে আমার মাথায় দশ ঘা মেরেও যদি সৎপরামর্শ দেয়, আমি তার কথা মাথায় করে নিই ফৈজু—" সহসা গভীর আবেগে সুমতি দেবীর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষণিকের জন্য নীরব থাকিয়া, গাঢ়স্বরে বলিলেন, "ফৈজু, আমার পয়সা নিয়ে তুমি খাটছ বলে নয়, তোমার চরিত্রের জন্যই আমি তোমায় বেশী স্নেহ করি। অসৎ স্বভাব আত্মীয়ের চেয়ে একজন সৎস্বভাব মানুষকে—সে আমার যতবড়ই নিঃসম্পর্কীয় লোক হোক,—আমি বেশী শ্রদ্ধা করি, বেশী বিশ্বাস করি। মা নিজের গর্ভজাত সন্তানকে যেমন ভাবে ভালবাসতে পারেন, তাকেও তেমনি ভাবে ভালবাসতে আমার ইচ্ছা হয়।"

ফৈজুর বুক ভরিয়া গেল !—আত্ম-শ্লাঘার গর্ব্বে নয়, একটি মহৎ প্রাণের উদার মহত্ত্ব-উজ্জ্বল আনন্দ-জ্যোতিঃ স্পর্শে ! সহসা নত হইয়া উদ্বেলিত কণ্ঠে সে বলিল, "দাঁড়ান দিদিমণি, দাঁড়ান ;—আর একটু—"

অন্ধকারেই সুমতি দেবী যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার সামনের মাটীটুকু স্পর্শ করিয়া ফৈজু মাথা নোয়াইয়া শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন করিল। সুমতি দেবী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর, কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "ভগবান মঙ্গল করুন !"

মাথা তুলিয়া, প্রসন্নোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া ফৈজু বলিল, "বাড়ী চলুন দিদিমণি, আর রাস্তায় কেন ?"

সুমতি দেবী মুহূর্ত্তের জন্য একটু কুণ্ঠিত হইয়া, ইতস্ততঃ করিয়া, স্নেহময় কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি যা বলতে চাইছিলে, সেটা কি আর বলবে না ফৈজু ?"

ফৈজুর মন তখন সমস্ত সঙ্কোচ-মুক্তির আনন্দে পরিপূর্ণ, স্বাচ্ছন্দ্য-ঔজ্জ্বল্যে-উদ্ভাসিত ! সহসা বালকের মত সরল উচ্ছ্বাসে, মুক্ত কণ্ঠে হাসিয়া ফৈজু বলিল, "না দিদিমণি, আর নয়,—আমায় মাপ করুন। এর পর আর কি বলবার থাকবে ?"

"থাক"—বলিয়া সুমতি দেবী অগ্রসর হইলেন।

সহসা সামনে হইতে সুতীব্র আলোকচ্ছটা আসিয়া উভয়ের উপর আপতিত হইল ! সঙ্গে-সঙ্গে পরুষ কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কে ওখানে হাসে ?"

ফৈজু অন্তরে-অন্তরে চমকাহত হইয়া গেল ! চিনিল, সেটা পিতার কণ্ঠস্বর ! আর বুঝিল, সেই প্রশ্নটা অত্যন্ত উগ্র-রূঢ়তায় পরিপূর্ণ ! ফৈজু হাসিয়াছে, পিতা সেইটুকুই শুনিলেন ;—প্রাণের কি বিমল তৃপ্তির আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সে বালকের মত অসঙ্কোচে হাসিয়াছে, সেটা তিনি জানিলেন না, জানিতে চাহিবেনও না। তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই, ফৈজুর প্রতি কঠোর বিচারকের দৃষ্টি স্থাপন করিবেন !

সুমতি দেবীর দিকে চাহিয়া, অন্ধকারেই ফৈজুর মুখ পাংশু হইয়া গেল ! সে পিতার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল

না। সুমতি দেবী তৎক্ষণে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "সর্দার, তোমার ফৈজু এসেছে বাবা, শুনেছ?"

"শুনেছি, এই যে -" বলিয়া বৃদ্ধ, আগমনশীল পুত্রের দিকে গম্ভীরভাবে চাহিয়া রহিলেন। ফৈজু সাম্‌নে আসিয়া নীরবে অভিবাদন করিল।

কেমন আছে, কখন আসিয়াছে, ইত্যাদি চিরপ্রচলিত স্নেহ-সম্ভাষণের এক বর্ণও উচ্চারণ না করিয়া, বৃদ্ধ শুধু তীক্ষ্ণ সংশয়ের দৃষ্টিতে পুত্রের আপাদ-মস্তক বিদ্ধ করিয়া ক্ষণেকের জন্য নীরব রহিলেন। তার পর সুমতি দেবীর পানে চাহিয়া অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে যারা গিয়েছিল, তারা কই? তারা যে এলো না?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সুমতি দেবী সংক্ষেপে বলিলেন, "তারা ঠাকুরবাড়ীতে রয়েছে।"

বৃদ্ধের মুখ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। (ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

বেদ

(সংগ্রহ-আলোচনা)

[শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী]

"ভারতবর্ষের অথবা হিন্দুর স্পর্দ্ধা করিবার এবং নিজস্ব বলিয়া অহঙ্কার করিবার মত একটী অতুল্য সামগ্রী আছে,—তাঁহা বেদ।

ইহার বিষয়ে বহু আলোচনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ভারতবর্ষীয় অধ্যাপক-সমাজ যাহাকে নির্দ্ধারিত ধ্রুব-সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সে বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, অপর দেশের অপর জাতি ইহাকে কি চক্ষে দেখিয়াছেন, প্রথমতঃ আমরা সেই বিষয়ের আলোচনা করিব। কারণ, গৃহের সামগ্রীর বিষয়ে গৃহের মতামত গৃহেই আছে; কিন্তু সেই বস্তু অপরের নিকট, কি-ভাবে উপস্থিত হইয়াছে, কতটুকু সম্মান, কতটুকু আদর পাইয়াছে ও পাইতেছে, তাহা দেখিতে, তাহা বুঝিতে আনন্দ অধিক।

য়ুরোপের প্রধান প্রধান জ্ঞানী, আচার্য্য ও অধ্যাপক-সমাজ, বেদের প্রচার-কাল, ও বিষয়ের তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে গিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, খৃষ্টের জন্মের হাজার হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্ববর্ত্তী সময়ই ইহার যথার্থ প্রচারের সময়। পক্ষান্তরে, উঁহাদের মধ্যে কাহার-কাহারও অভিমত, ইহা খৃষ্ট জন্মের দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্বেকার সময়ে প্রথম হস্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। ভাষাকে অক্ষর দ্বারা আবদ্ধ করার সূত্রের, এই বেদ-লিখন-কার্য্য হইতেই না কি আরম্ভ!

তৎপূর্ব্বে,—ইহা গুরু হইতে শিষ্যেবাচনিক-শ্রবণে, ও তাহা ধারণার মধ্যে রক্ষা করিবার প্রথায়, প্রচলিত ছিল। এই জন্যই ইহার প্রসিদ্ধ নাম শ্রুতি।

পাশ্চাত্য এই সকল পণ্ডিতবর্গ বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত না করিলেও, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, "মানবের দ্বারা আবিষ্কৃত, বেদ-উপনিষদ্ ব্যতীত অপর কোনও পুরাতন গ্রন্থে ভগবানের "অসীম" "অনন্ত" (infinite) নাম, আমরা কুত্রাপি দেখি না।" আর একটী বিষয় তাঁহারা বলেন,—তাহা তাঁহাদেরই ভাষায় অবিকল উদ্ধৃত করিতেছে:—

"Who can deny that the *Veda* (I know) is the oldest monument of Aryan speech and Aryan thought of which we possess?

ইনি আর্য্যজাতি (Aryan nation) বলিতে জগতের কোন্ কোন্ জাতিকে বুঝিতেছেন, এবং আপনাকেও আর্য্য (Aryan) বলিতেছেন কি না, এ সকল বিষয়ে বিচার করা এক্ষেত্রে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগের উদ্দেশ্য, উক্ত অধ্যাপকগণ 'বেদ'কে কোন্ আসনে বসাইতেছেন তাহাই প্রদর্শন করা।

বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য জগতের ভাষাতত্ত্ববিদ্, সমাজতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ, এবং তদনুশীলনকারিগণের নিকটে সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া চর্চ্চা করিবার একমাত্র বস্তু 'বেদ',—ইহা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন।

ভাষান্তরিত হইবার বিষয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিলে দেখা যায়, বেদের আংশিক অনুবাদ প্রথমে চীনজাতি দ্বারা হইয়াছে; এবং চীনই প্রথমে "বেদ'কে স্বীয় ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া য়ুরোপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

মুসলমান-কুল-তিলক সম্রাট আকবর তাঁহাদের ব্যাবহারিক ভাষায় বেদের অনুবাদ করান। কিন্তু তাহাও অংশতঃ হইয়াছিল। এ বিষয়ের যথার্থ মীমাংসা করিবার মত গ্রন্থ এবং সুযোগ আমাদিগের নাই। যাহা পাই, তাহা দ্বারা জ্ঞাত হই, সম্রাট আকবর

অথর্ব্ববেদ এবং অপর-বেদের আংশিক অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার সময় হইতে একশত বৎসর পরে সাজাহান-পুত্র ভাগ্যহীন দারা কেবল বেদ অধ্যয়ন এবং তাহার অনুবাদ করিবার মানসেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব আমরা প্রাপ্ত হই না।

তবে দারার চেষ্টা ইহাই বুঝাইতেছে যে, পার্শী বা অপর কোন ভাষায় তাঁহার পূর্ব্বে বেদের অনুবাদে আর কেহ পূর্ণকাম হয়েন নাই।

এই পার্শী-ভাষার অনুবাদ অবলম্বনে ১৭৯৫ খৃঃ লাটিন ভাষায় বেদের অনুবাদ করা হয়।

তাহার পর হইতেই য়ুরোপের পণ্ডিতবর্গ ইহার চর্চ্চা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন। তাহা হইতেই অনেক দর্শন-বিষয়ক আলোচনা হয়।

"—which inspired Schopenhauer and furnished to him —as he himself declares,—the fundamental principle of his own philosophy,"

যদিও নিতান্ত সংক্ষেপে, তথাপি ইহা দ্বারা, সভ্য-জগতের মানব-সমাজ কোথায় কি ভাবে 'বেদ'কে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতেছে। অতঃপর আমরা গৃহের সংবাদের আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষীয় আলোচনার সার পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, "বেদ" অনন্ত কাল হইতে প্রচলিত। ইনি অপৌরুষেয়—"ন কেন চিদপি পুরুষেণ প্রণীতো বেদঃ।" সুতরাং ইহা ঈশ্বর-বাক্য।

দ্বাপর যুগের শেষ সময়ে ভগবান বেদব্যাস সমস্ত বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন। সেই চারি বেদের নাম,—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। বেদমাত্রেই মন্ত্রাত্মক ও ব্রাহ্মণাত্মক। সূত্রভূত অংশ মন্ত্রাত্মক; যজ্ঞাদি কর্ম্মে মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। ব্যাখ্যাত্মক অংশ—ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ—অর্থাৎ মন্ত্রের ব্যাখ্যা।

প্রত্যেক 'বেদ'ই—কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই তিন কাণ্ডে বিভূষিত।

১ম। **ঋক্‌বেদের**- যে সকল মন্ত্র একপাদ বা অর্দ্ধপাদরূপে পঠিত হয়, এবং যাহা হোতৃ-বিহিত কার্য্যোপযোগী; তাহাকেই মন্ত্র কহে। ভাবোদ্দেশ্যজ্ঞাপক বেদাংশই ব্রাহ্মণ ভাগ।

২য়। **যজুর্ব্বেদ** ছন্দোগান বর্জ্জিত, কর্ম্ম-সম্পাদক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ।

৩য়। **সামবেদ**—গেয় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ।

৪র্থ। **অথর্ব্ববেদ** উপাস্ত ও উপাসনাত্মক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। (পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন অথর্ব্ববেদ পরবর্ত্তী সময়ে রচিত)।

কেহ-কেহ মতান্তরে বলেন—"ত্রয়ী" শব্দে ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন বেদকে বুঝায়। কিন্তু বিচারে স্থির হইয়াছে, "ত্রয়ীই" বেদ। মন্ত্রসমূহের রচনার ক্রম অনুসারে "ত্রয়ী" নামের উৎপত্তি। প্রচলিত মন্ত্রকে "ত্রয়ী" বলা হয়। এ বিষয়ে মাধবাচার্য্য অধিকরণমালার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, মন্ত্রভাগানুগত ব্রাহ্মণাংশ ব্যাবহারিক ভাবে "ত্রয়ী" পদবাচ্য।

বেদ শব্দের প্রসিদ্ধ নামান্তর শ্রুতিঃ। "শ্রবণাৎ শ্রুতিঃ", কারণ "বেদ" চিরদিনই গুরু-পরম্পরায় শ্রুত। এ জন্যই ইহার প্রণয়নকাল-নির্ণয় বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হঠাৎ যে কোনও সিদ্ধান্তেই উপনীত হউন, আমরা বিশেষ জোর করিয়াই বলিব, ইহা 'অনাদি' ও অপৌরুষেয়'। "ছন্দাংসি ছাদনাৎ"—(৭।৩।৬) প্রভৃতি হইতে জ্ঞাত হই, বেদের অপর নাম 'ছন্দ'।

এই চারি বেদান্তর্গত উপবেদসকলে বহু মতান্তর থাকিলেও সার কথায় বলিতে হইলে বলা যায়, চারি বেদের চারিটি উপবেদ আছে।

১ম—ঋক। উপবেদ—**আয়ুর্ব্বেদ**। কর্ত্তা ব্রহ্মা, প্রজাপতি অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি। কামশাস্ত্রও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত।

২য়। **ধনুর্ব্বেদ**—যজুর্ব্বেদের উপবেদ। কর্ত্তা—ব্রহ্মা, প্রজাপতি। বিশ্বামিত্র, ইহার প্রকাশক।

৩য়। **গন্ধর্ব্ববেদ**—সামবেদের উপবেদ। ভরত ইহার প্রকাশক। সঙ্গীত ইহার প্রতিপাদ্য।

৪র্থ। **অর্থবেদ**—অথর্ব্ববেদের উপবেদ। সর্ব্বনীতি, সর্ব্বশিল্প ইহার প্রতিপাদ্য।

বেদোক্ত যজ্ঞ কর্ম্মবিধানে—অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা, এই চারিজন ঋত্বিকের প্রয়োজন। অধ্বর্য্যুর কার্য্য বেদী-নির্ম্মাণ প্রভৃতির অনুষ্ঠান। যজুর্ব্বেদোক্ত তাঁহার এই কর্ম্মকে অধ্বর-ক্রিয়া বলা হয়। হোতার কার্য্য হোমাদি কর্ম্ম সম্পাদন। ঋক্‌বেদোক্ত হোতার কার্য্যকে হোতৃক্রিয়া কহে। উদ্গাতা সামবেদোক্ত গান। শ্রীভগবান স্মরণাদি উক্ত গানে সম্পাদন ইহার কর্ম্ম। ইহার নাম উদ্গান ক্রিয়া।

ব্রহ্মা। ইনি সকল বেদজ্ঞ। ঐ সম্বন্ধীয় কার্য্য পরিদর্শক। ইহাঁর কর্ম্মকে ব্রহ্ম-কর্ম্ম বলে। বেদোক্ত কর্ম্ম সম্পাদনে এই চারিজন ঋত্বিকের প্রত্যেকের তিনজন করিয়া সহকারী থাকেন। প্রতিপ্রস্থাতা, নেতা, উন্নেতা, এই তিনজন অধ্বর্য্যুর সহকারী। মৈত্রাবরুণঃ অচ্ছাবাক্, গ্রাবস্তোতা, এই তিনজন হোতার সহকারী। প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা, সুব্রহ্মণ্য, উদ্গাতার সহকারী। ব্রহ্মার সহকারী ব্রাহ্মণাচ্ছংসি, আগ্নীধ্র, পোতা।

বহু বিস্তার, এবং বহু মতান্তর থাকিলেও সংক্ষেপে,—'ঋক' বেদের ব্রাহ্মণ-একটী; তাহার নাম ঐতরেয়। যজুর্ব্বেদের দুইটি ব্রাহ্মণ; তৈত্তিরীয় ও শতপথ। সামবেদের একটী ব্রাহ্মণ; তাহার নাম তাণ্ড্য। অথর্ব্ববেদের একটি ব্রাহ্মণ; উহাকে গোপথ নামে জ্ঞাত হওয়া যায়।

ঐ মন্ত্র-ব্রাহ্মণের যে যে অংশে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাঁহাকে উপনিষৎ বলা হয়। অতি সংক্ষেপে উপনিষৎ শব্দের অর্থ উপ নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতু হইতে নিষ্পত্তি করা হয়।

সদ্ অর্থাৎ সাংসারিক বুদ্ধিবৃত্তিকে শিথিল করিয়া পরব্রহ্মের প্রাপ্তি বিষয়ক সাফল্য প্রদান যিনি করেন, তিনিই উপনিষদ্।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে 'বেদ' অপৌরুষেয়। (হিন্দু মাত্রেই ইহা স্বীকার

করেন) পরমেশ্বর করুণাময়; তিনি জড়-উপাধি-বিশিষ্ট জীবের নিবৃত্তির কারণ; সাধনা আবশ্যক ও তাহা উপদেশ-সাপেক্ষ বোধে এই "বেদ"রূপ বাণী দ্বারা উপদেশ প্রদান করেন। ইহার বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন, এবং অধিকারী, বিষয়ে সংক্ষেপে বলিলে, বলা যায় ইহার বিষয়—সাধনা; ইহার সম্বন্ধ—ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ-নির্দ্দেশ; ইহার প্রয়োজন—(মুখ্য) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার; (গৌণ) তাপত্রয় ক্ষয়; ইহার অধিকারী—যথার্থ জিজ্ঞাসু বা শ্রদ্ধালু ব্যক্তি। তাহার ক্রম-ভোগ-তৃষ্ণার অবস্থায়,—সকাম কর্ম্ম-প্রতিপাদ্য বেদ; ক্ষয়িষ্ণু ভোগ তৃষ্ণায়; নিষ্কাম প্রতিপাদক বেদ। চিত্তের শুদ্ধি অবস্থায় জ্ঞান প্রতিপাদক 'বেদ'। তৎ অনুশীলনে মোক্ষেচ্ছার বিনিবৃত্তিতে ভক্তি প্রতিপাদক বেদ।

বেদোক্ত সাধন দ্বারা সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্ষয়িষ্ণু বুদ্ধির উদয় দ্বারা মোক্ষাভিনিবেশের ত্যাগ হইবার পর, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত নির্ম্মল হয়। অনাদি অনন্ত, অপৌরুষেয়—বেদ এই সকলের সাধন পন্থা সরল ও ধ্রুব নির্দ্দেশে দেখাইয়া থাকেন।

উপবীত-রহস্য

(বৈদিক প্রত্নতত্ত্ব)

[অধ্যাপক শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ]

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় উপনয়নে উপবীত গ্রহণ করিয়াই দ্বিজত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উপবীত-গ্রহণে তাঁহাদিগের যেমন একদিকে বেদ গ্রহণ দ্বারা বিদ্যাবিষয়ে দীক্ষা হইয়া থাকে, তেমনই অপর দিকে বৈদিক কার্য্যানুষ্ঠানের অধিকার লাভ দ্বারা ধর্ম্মবিষয়েও দীক্ষা হইয়া থাকে। উপবীতের দ্বারা এই প্রকারে আর্য্যজীবনের সূত্রপাত হইতেই যেন ইহার সূত্রময় রূপ কল্পিত হইয়াছে। "সূত্র" শব্দের ঘটনা-ধারা বা পরম্পরা-অর্থ "সূত্রধার" শব্দে পরিষ্কার রূপেই সন্নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। উপবীতের রূপ সম্বন্ধে যেরূপ রহস্যের আভাষ আমরা পাইতেছি, ইহার নির্ম্মাণ ও ব্যবহার সম্বন্ধেও অনুরূপ রহস্যোদঘাটনের আশাতেই আমরা বর্ত্তমান অনুসন্ধান আরম্ভ করিতেছি।

উপবীতের "যজ্ঞোপবীত" "যজ্ঞসূত্র" ও "পবিত্র" এই কয়টী নামই বিশেষরূপে প্রচলিত দেখা যায়। "যজ্ঞোপবীত" ও "যজ্ঞসূত্র" নামের দ্বারা ইহার সহিত যজ্ঞের সম্পর্ক স্পষ্ট রূপেই প্রকাশিত হয়। যজ্ঞকার্য্য দ্বারা উপবীত গৃহীত হয় বলিয়া, ইহার যে যজ্ঞোপবীত ও যজ্ঞসূত্র নাম হইয়াছে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়; এবং পবিত্রভাবে ইহার ধারণ করিতে হয় বলিয়াই যে ইহার নাম "পবিত্র" হইয়াছে, তাহাও সহজেই প্রতীত হয়। "পৈতা" শব্দ এই পবিত্র শব্দেরই অপভ্রংশ।

"যজ্ঞোপবীত" ও "যজ্ঞসূত্র" নাম যজ্ঞের দ্বারা উপবীত গৃহীত হওয়াতে যেমন হইয়াছে, তেমনই উপবীত গ্রহণের পর নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠান হইতেও হইয়াছে। অমরকোষ অভিধানের "যজ্ঞসূত্র" শব্দের টীকায় ভট্টোজি দীক্ষিত উভয় প্রকার ব্যাখ্যাই প্রদান করিয়াছেন; যথা, "যজ্ঞস্য সূত্রং। যজ্ঞার্থং ধৃতং সূত্রং বা। শাকপার্থিবাদিঃ।"

উপনয়নের পর ব্রহ্মচারীর যজ্ঞসূত্র যে সমস্ত উপাদানে নির্ম্মিত হইত, তৎসম্বন্ধে মনুতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"মৌঞ্জীত্রিবৃৎ সমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বীজ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী।" ৪২

মনুসংহিতা—২য় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণদিগের সমান গুণত্রয়ে নির্ম্মিত সুখস্পৃশ্য মুঞ্জময়ী মেখলা করিতে হয়, ক্ষত্রিয়দিগের মূর্ব্বাময়ী ধনুকের ছিলার ন্যায় ত্রিগুণিত এবং বৈশ্যের শণতন্তু নির্ম্মিত ত্রিগুণিত মেখলা করিতে হয়। ইহা লিখিয়াই, এই সমস্তের অভাব হইলে, তৎপরিবর্ত্তে কিরূপ উপাদান ব্যবহৃত হইবে তৎসম্বন্ধেও মনু লিখিতেছেন:—

"মুঞ্জাভাবেতু কর্ত্তব্যা কুশাশ্মন্তক বল্বজৈঃ।" ৪৩

মনুসংহিতা—২য় অধ্যায়।

"মুঞ্জাদির অপ্রাপ্তিপক্ষে ব্রাহ্মণের কুশের মেখলা করিবেন, ক্ষত্রিয়েরা অশ্মান্তক নামক তৃণবিশেষের এবং বৈশ্যেরা বল্বজ তৃণের মেখলা করিবে।"

পূর্ব্বোক্ত বিকল্প কল্পনার তাৎপর্য্য ইহা বলিয়াই বোধ হয় যে, আর্য্যগণ ক্রমে তাঁহাদের আদি-নিবাস হইতে সরিয়া আসিলে, সেই আদি-নিবাসের উদ্ভিদাদি তাঁহাদের নূতন বাসস্থানে অপ্রাপ্য হওয়াতেই, তাঁহারা নূতন স্থানের উদ্ভিদাদিই তাঁহাদের উপবীতের উপাদান রূপে কল্পনা করিতে বাধ্য হইলেন। বর্ত্তমান সময়ের ভূগোলে আমরা উত্তর-মেরুর উদ্ভিজ্জের বর্ণনায় যে ক্ষুদ্র গুল্ম ও অপুষ্প উদ্ভিদের * উল্লেখ প্রাপ্ত হই, তৎসমস্ত আমাদের নিকট মনুসংহিতায় বর্ণিত তৃণজাতীয় উদ্ভিদের সজাতীয় বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং আর্য্যগণের প্রথম উপবীত গ্রহণের সময় উত্তরকুরুতে বাস করিবার প্রমাণই আমরা এখানে প্রাপ্ত হইতেছি বলিয়া মনে করি।

উপবীতে তিনটী করিয়া সূত্র ও একটী করিয়া গ্রন্থি থাকার নিয়ম। তিনটী করিয়া সূত্র থাকায়, ইহার নাম "ত্রিবৃৎ" হইয়াছে। মনুতে উপবীতের সূত্র ও গ্রন্থি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:—

"ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেববা।" ৪৩—২য় অধ্যায়।

"ত্রিগুণা মেখলা এক তিন অথবা পঞ্চগুণিত গ্রন্থিদ্বারা বদ্ধ করিবে।"

তিনটী সূত্র একগ্রন্থিতে আবদ্ধ হইয়া উপবীত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই সূত্রের প্রত্যেকটীতে আবার তিনটী করিয়া গুণ থাকাতে ইহা নবগুণযুক্ত হইয়া থাকে। কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার টীকায় ইহা এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন; যথা:—

"ত্রিবৃতং চোপবীতং স্যাত্তস্যৈকোগ্রন্থিরিষ্যতে।
দেবলোঽপ্যাহ যজ্ঞোপবীতং কুর্ব্বীত সূত্রাণি নবতন্তবঃ।।"

আমরা পৈতার যে "নগুণ" নাম সাধারণ ভাষায় প্রাপ্ত হই, তাহা ইহার নবতন্তু বা নবগুণ দ্বারা নির্ম্মাণ হইতেই হইয়াছে।

এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত উপবীতের তিন সূত্র ও এক, তিন বা

---

* "The World with fuller treatment of India. Longmans, Green & Co. 1-5.

পঞ্চ গ্রন্থির প্রকৃত অর্থ কি? তাহাই আমরা বিচার করিয়া দেখিব।

গ্রন্থি সম্বন্ধে শব্দকল্পদ্রুমের উপনয়ন-বিধিতে আমরা এইরূপ উল্লেখ প্রাপ্ত হই—"ততঃ প্রবর সংখ্যয়া পঞ্চত্রয়ো বা মেখলা যজ্ঞোপবীত রূপ গ্রন্থয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ॥" ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে স্ব স্ব বংশের প্রবর সংখ্যানুসারেই গ্রন্থির সংখ্যা কল্পিত হইয়াছে। বংশোজ্জলকারী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণই "প্রবর" নামে খ্যাত। ইঁহাদের নামানুসারে উপবীতের গ্রন্থিবন্ধন দ্বারা ইঁহাদের উন্নত প্রভাবের স্মৃতি চিরকাল সংরক্ষণই গ্রন্থির প্রকৃত উদ্দেশ্য।

দিনে তিনবার যজ্ঞ-সম্পাদনের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশের জন্যই উপবীতের ত্রিসূত্র কল্পিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। যজ্ঞোপবীত ও যজ্ঞসূত্র নামের অর্থ হইতেও আমরা এই মর্ম্মই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। ইতঃপূর্ব্বেই আমরা এ সম্বন্ধে ভট্টোজি দীক্ষিতের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছি। যজ্ঞোপবীত গ্রন্থনের মন্ত্রে ইহা আরও বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা দেখিতে পাই; যথা—

"যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্যত্বোপবীতেনোপ নহ্যামি।"

"তুমি যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞের উপবীতরূপেই
তোমার বন্ধন (গ্রন্থন) করিতেছি॥"

দিনে তিনবার যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম সম্বন্ধে বেদে যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা আমরা নিম্নোদ্ধৃত ঋক্‌টীর অর্থ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব—

"স সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ পরিব্যত তন্তুং তন্বানস্ত্রিবৃতং যথা বিদে॥" ৩২
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৮৬ সূক্ত।

এই সোম যেন সূর্য্যকিরণময় পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছেন, আমার বোধ হয় ইনি ত্রিগুণসূত্র টানিতেছেন। (অর্থাৎ দিনের মধ্যে তিনবার যজ্ঞ হয়।)" রমেশবাবুর অনুবাদ। মনুতে আমরা যজ্ঞোপবীতের যে "ত্রিবৃৎ" বিশেষণ পাইয়াছি, তাহা যেন অবিকল বেদের পূর্ব্বোক্ত "ত্রিবৃৎ" হইতেই গৃহীত। যজ্ঞসূত্রের—সূত্রের কল্পনাটীও যেন বেদের "তন্তু হইতেই পরিগৃহীত। ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা যে দিনে তিনবার যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা হইতে তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে।

উপবীতের এক নাম ত্রিদণ্ডীও অভিধানে স্বীকৃত হইয়াছে। এই নামে ব্রহ্মচর্য্য সংযমের অতি আশ্চর্য্য আভাষই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপবীত ধারণের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের যে নিষ্ঠা আমাদের অবশ্য-পালনীয় হয়, উপনয়নের "ত্রিদণ্ডী" নাম তাহারই জ্ঞাপক বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমাদের কায়, মন ও বাক্য এই ত্রিবিধ প্রকৃতির উপর উপবীতের দ্বারা শাসন-দণ্ড পরিচালিত হয় বলিয়াই ইহার যে "ত্রিদণ্ডী" নাম হইয়াছে, ইহাই ত্রিদণ্ডী নামের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। শব্দকল্পদ্রুমে ত্রিদণ্ডী শব্দের যে নিরুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা হইতেই আমাদের বক্তব্যের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যাইবে—"ত্রিদণ্ডী—ত্রিদণ্ডধারি যতিঃ। কায়বাঙ্মনোদণ্ডযুক্তঃ। শ্রীভাগবতম্। যজ্ঞোপবীতম্॥"

এতক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, উপবীতের দ্বারা প্রথম যজ্ঞ-সম্পাদনের অধিকার জন্মিত বলিয়াই, ইহার যজ্ঞোপবীত নাম হইয়াছিল। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া প্রথম ধর্ম্মজীবন আরব্ধ হইত বলিয়াই ইহা দ্বিজত্বের বা উচ্চ নবজীবনের চিহ্ন হইয়াছে। তাহাতেই শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে, "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।" "প্রথমে শূদ্ররূপেই জন্ম হয়; পরে সংস্কার দ্বারা দ্বিজনামে কথিত হইয়া থাকে।"

আমাদের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, উপনয়নের কুশময় উপবীতের উপাদানের সহিত আর্য্যদিগের প্রথম যুগের জীবনের পবিত্র স্মৃতি যেমন বিজড়িত রহিয়াছে, তেমনি নিত্য-ব্যবহার্য্য উপবীতের গ্রন্থিতে আমাদের আর্য্যপূর্ব্বপুরুষের গৌরবময় স্মৃতি সংগ্রথিত রহিয়াছে। ইহার ত্রিবৃৎ রূপে আমাদের দৈনিক ত্রিসন্ধ্যাকৃত্যের নির্দ্দেশ রহিয়াছে; এবং ইহার ত্রিদণ্ডী নামে আমাদের ব্রহ্মচর্য্য-নিষ্ঠার ভাব নিহিত রহিয়াছে। এইরূপে উপবীতের মধ্যে আর্য্য-জীবনের একটী উচ্চতম সংক্ষিপ্ত আলেখ্য যে ঐতিহাসিক সূত্রে অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহারই রহস্য আমরা জানিতে পারিতেছি।

ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

[শ্রীমোহাম্মদ আবদুর রসিদ, বি-এ]

কর্ম্মের উত্তেজনা প্রতি শোণিত-বিন্দুতে অনুভব করিয়া যখন য়ুরোপ খাটিয়া-খাটিয়া একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং দেখিতে পাইল যে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খাটুনি কেবলই বাড়িতেছে, তখন য়ুরোপের অন্তরাত্মা হইতে এই নৈরাশ্যময় নিঃশ্বাস বাহির হইল, "আর ভাল লাগে না!" তখন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ফিট্‌জেরাল্ড ওমর খৈয়ামের কবিতাকে ইংলণ্ডে প্রচারিত করিলেন। আলিবাবার খোঁজ-প্রাপ্ত লুক্কায়িত বিপুল ধনের অধিকারী চল্লিশ জন দস্যু যেমন দলপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "এই যে আজীবন জীবন-মরণ যুদ্ধ করিয়া, হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া, ধন সঞ্চয় করিতেছি, ইহা কাহার ভোগের জন্য?" য়ুরোপের কর্ম্মক্লান্ত বীরগণও তেমনি একটা প্রশ্ন করিতে লাগিল। দস্যু-দলপতি যেমন তাহাদের প্রশ্নের বিশেষ মীমাংসা না করিয়া কেবল বলিয়াছিল, "কাহার ভোগের জন্য, এ প্রশ্ন করিও না; সঞ্চয় কর! আন, আর সঞ্চয় কর!!" য়ুরোপের শাসক-সম্প্রদায় সেইরূপ একটা উত্তর ছাড়া আর কোন উত্তরই দিতে পারিতেছিলেন না। এমনি সময় ফিট্‌জেরাল্ড ওমর খৈয়ামের কবিতা প্রকাশ করিলেন :—

"জুড়াই খানিক বঁধু এস দোঁহে শীতল ছায়ায়!"

কর্ম্মক্লান্ত ও সর্ব্বশক্তিমানের অস্তিত্বে ও ক্ষমতায় আস্থাহীন য়ুরোপ ওমর খৈয়ামের কবিতা-রস বিভোর হইয়া পান করিতে লাগিলেন।

এই ওমর খৈয়ামের কবিতার আলোচনা করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমার বক্তব্য এই যে, যদিও তাঁহার কবিতা পড়িয়া মনে হয় যে, তিনি অনাস্থার নৈরাশ্যকে দ্রাক্ষারসে ডুবাইতে চাহিয়াছিলেন, এবং যদিও দুরাকাঙ্ক্ষার অস্বস্তিকে সুদ বলিয়া তুচ্ছ করিয়া বর্ত্তমানরূপ জীবন্ত মুহূর্ত্তে জীবন-মদিরার গ্লাস নিঃশেষ করিতে চাহিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কর্ম্মকে একবারে ভুলিতে পারেন নাই।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে সেলযুক নামক তুর্কীজাতি এসিয়ায় প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। তখন আরব সাম্রাজ্য ও বাগদাদের খেলাফতের প্রভাব ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছিল। সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে তখন তুর্কীজাতির প্রাধান্য স্থাপিত হইয়া আসিতেছিল।

সোলতান জালালুদ্দিন মালিক শাহ্ সেলযুক বংশের তৃতীয় পরাক্রান্ত সম্রাট্। ১০৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহার পিতা আল্প-আরসালান (সাহসী কেশরী) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ২১ বৎসর রাজত্বের পর মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে মালিক শাহের মৃত্যু হয়। মালিক শাহের রাজত্ব ঐশ্বর্য্যে, সুশাসনে, পরাক্রমে ও বিদ্যালোচনায় রোম কিংবা আরব রাজত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশের সহিত তুল্য হইবার যোগ্য। তাঁহার রাজত্বে বাণিজ্যের ও শিল্পকলার চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এসিয়ার তাবৎ নগরই বিদ্যালয়, ভজনালয়, পুস্তকালয় ও চিকিৎসালয়ে পরিশোভিত হইয়াছিল। ইঁহার গৌরবময় রাজত্বেই ওমর খৈয়ামের অভ্যুথান হয়।

ওমর খৈয়াম, নিজাম উলমুল্ক (১), ও হাসান বিন সাবা মুসলমান ইতিহাসের এই তিন বিখ্যাত ব্যক্তি বাল্যকালে খোরাশানের অন্তঃপাতী নিশাপুর বিদ্যালয়ে একসঙ্গে অধ্যয়ন করিতেন। একদিন তাঁহাদের শিক্ষক কোনও কার্য্যোপলক্ষে শিক্ষাগৃহের বাহিরে গেলে, তাঁহারা তিন জনে এক অভিনব প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। প্রতিজ্ঞাটী এই যে, তাঁহারা তিন জনের মধ্যে যে কেহ ভবিষ্যতে উচ্চ পদে আরূঢ় হইবেন, তিনি অপর দুইজনকেও সম্পদে পৌঁছাইয়া দিবেন।

যাহা হউক, কয়েক বৎসর পরে সত্যসত্যই নিজাম-উলমুল্ক রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীর পদে আরূঢ় হইলেন। তিনি আল্প আরসালানের মন্ত্রীত্ব করিয়া এত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন যে, মুসলমান ইতিহাসে তাহার মত কার্য্যদক্ষ একটীও মন্ত্রীর আর উল্লেখ নাই। আল্প-আরসালানের মৃত্যুর পর তাঁহার তদপেক্ষা বিখ্যাত পুত্র মালিক শাহও ইঁহাকে মন্ত্রীত্বে নিয়োজিত রাখেন। মালিক শাহের বিস্তৃত রাজত্ব চীনের প্রান্তর হইতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত এবং উত্তরে জর্জ্জিয়া (বর্ত্তমান ককেশস্) হইতে দক্ষিণে আরবের ইমেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নিজাম-উলমুল্ক প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার মানসে ও রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধানার্থ এই বিস্তৃত রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, দ্বাদশ বার পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, নিজাম-উলমুল্ক ঐশ্বর্য্যে ও সম্পদে পৌঁছিবার পর ওমর খৈয়াম ও হাসান উভয়েই উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন। নিজাম-উল্-মুল্ক হাসানকে মাজেন্দ্রান নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের উপর আধিপত্য করিতে দিলেন। ওমর খৈয়াম হাসানের মত কিছুই প্রার্থনা না করিয়া কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতে পারে এমন বন্দোবস্ত চাহিলেন। নিজাম-উলমুল্ক তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার জীবনোপায়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বস্তুতঃ বিজ্ঞানানুশীলন ও জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা ছাড়া ওমর খৈয়ামের হৃদয়ে আর কোন উচ্চাভিলাষ স্থান পায় নাই।

মোস্লেম ইতিহাসের এই তিন ব্যক্তি তিন দিক দিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। নিজাম-উলমুল্কের কথা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ওমর খৈয়াম সোলতান মালিক শাহ কর্ত্তৃক তৎকালের প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার সাধন করিতে নিযুক্ত হন। তিনি আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে লইয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পঞ্জিকা সম্বন্ধে গিবন বলিতেছেন, "সময়-গণনা করিবার এই প্রণালী জুলীয়ান প্রবর্ত্তিত প্রণালী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট এবং সঠিকতায় গ্রেগরী প্রবর্ত্তিত প্রণালীর প্রায় সমকক্ষ।" যে সময়ে সূর্য্য রাশিচক্রের মেষে প্রবেশ করে, সেই সময় হইতে ওমর খৈয়াম বৎসরের প্রথম দিন নির্ণয় করেন। ইতঃপূর্ব্বে সূর্য্যের মীনে প্রবেশ করা হইতে বৎসরের প্রথম দিন গণনা করা হইত। এতদ্ব্যতীত ওমর খৈয়াম আরও বহুবিধ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বীজগণিত প্যারীর লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

হাসান বিন সাবা মুসলমান রাজ্যের নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি সেলযুক সাম্রাজ্যে নিজের প্রভাব স্থাপন করিতে বিফল মনোরথ হইয়া পদস্থ লোকদিগকে ও রাজপুরুষগণকে গুপ্ত আঘাত দ্বারা হত্যা করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। হাসান তাঁহার দলস্থ লোকদিগকে দৃঢ়চিত্ত, কঠোর ও বদ্ধপরিকর করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে এক অভিনব জাগরণ আনয়ন করিলেন। এই ঘৃণিত নরহত্যাকারী সম্প্রদায় নরহত্যাকে তাহাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিত। হাসান তাহাদিগের মনে এইরূপ ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বিশ্বাস করিত যে, ধর্ম্ম তাহাদের কার্য্য সমর্থন করে। ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; যথা—"দয়িছ" যাহাদিগকে গুপ্ত মন্ত্রণার সকল খবরই বিশ্বাস করিয়া বলা হইত; "রফিক" যাহাদিগকে কিছু কিছু গোপনীয় বিষয় জানিতে দেওয়া হইত; "ফিদাই" যাহারা দলপতি হইতে কোন আদেশ প্রাপ্ত হওয়ামাত্র জীবনের মমতা না করিয়া সেই আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত।

এই ঘৃণিত নরহত্যাকারী দলের নেতার উপাধি ছিল "সৈয়েদেনা" বা "আমাদের প্রভু"। এই দলপতি "পার্ব্বত্য বৃদ্ধ" আখ্যায় অভিহিত হইয়া তৎকালীন জন সমাজে এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। অবশেষে হাসানের উপকারী নিজাম-উলমুল্কও ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। হাসান-প্রেরিত গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তিনি ১০৯১ খৃষ্টাব্দে

---

(১) ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসেও একজন নিজাম উলমুল্ক নামীয় নরপতি ছিলেন।

নিহত হইলেন। ইংরেজী শব্দ "এসেসিন" এই 'হাসান' নরহন্তার নাম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সময়েই খৃষ্টীয়ান জগতের সহিত মুসলমান জগতের সজ্ঘর্ষ চলিতেছিল। ক্রুসেডারগণ দ্বারা হাসানের লোমহর্ষণ কার্য্যাবলী য়ুরোপে প্রচারিত হয়; এবং তাহার পর হইতেই য়ুরোপে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

মালিক শাহ তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এই দলের উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনিও ইহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ওমর খৈয়াম, নিজাম উলমুল্ক ও হাসান বিল সাবা তিন বিভিন্ন দিক দিয়া অমরত্ব লাভ করেন। নিজাম উলমুল্কের রচিত "সিয়ছতনামা" বা "রাজ্যশাসন প্রণালী" অদ্যাবধি মুসলমান সমাজে আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে; এবং উহা একটী মূল্যবান পুরাতন তত্ত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, একমাত্র উহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিতে পারিত।

—

ভাষা-বিজ্ঞান ও প্রাকৃত-বিজ্ঞান

[শ্রীজয়মঙ্গল সাহা বি-এল, এম্-আর্-এ-এস, (লণ্ডন)]

ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, আমরা এখনও এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে পারি না। কেহ বলেন, ভাষা প্রকৃতি-জাত; কেহ বলেন, ইহা ঈশ্বর-দত্ত; আবার কেহ বা বলেন, ইহা মানবীয় শিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন। ভাষা-বিজ্ঞানের সঙ্গে এই শ্রেণীর অন্য কোনও বিজ্ঞানের তুলনা হইতে পারে না। ভাষা ভাবের পবিত্র আধার। এই আধারেরও একটু বিশেষত্ব আছে,—ঘটি যেমন জলের আধার, ভাষা ভাবের তেমন আধার নয়। পুষ্পের সঙ্গে গন্ধের যে সম্পর্ক, ভাষার সঙ্গে ভাবের সেই সম্পর্ক।

জগতের ইতিহাসে ভাষা-বিজ্ঞান এখনও নাবালক,—ভাষা-বিজ্ঞানের বয়স মাত্র একশত বৎসরের কিছু উপর হইবে। যৌবন-দশায় উপনীত হইয়া, নিজ ক্ষমতা-বলে, জগতের বিজ্ঞান-সঙ্ঘে (League of Science) যোগদান করিতে ভাষা-বিজ্ঞানের এখনও বহুকাল বিলম্ব আছে। ভাষা-বিজ্ঞানের সে শুভদিন কবে আসিবে,—ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ভাষা-বিজ্ঞানের নাম-করণ লইয়া পণ্ডিত-সমাজে একটু মতদ্বৈধ চলিয়াছে। Comparative Philology, Scientific Etymology, Phonology, Glosology,—এই সকলই ভাষা-বিজ্ঞানের ভিন্ন-ভিন্ন নাম। নামের বিভিন্নতা ভাষা-বিজ্ঞান-তত্ত্বানুসন্ধানের প্রতিকূল হইবে, এরূপ মনে হয় না। ফুলকে পুষ্পই বল, আর কুসুমই বল, সকলেই ফুলকে ভালবাসিবে, এবং অনেকেই তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিবে। অবশ্য ফুলকে 'কদলী' বলিলে গোলমালের সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে।

অনুমানমূলক বিজ্ঞানসমূহের (Inductive Sciences) জীবন-বৃত্তান্ত বা ইতিহাসে এক সাম্য-শাসন পরিলক্ষিত হয়। এই সকল বিজ্ঞানের প্রায় সকলেরই জীবনে তিনটী যুগ বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয়:—প্রারম্ভ-যুগ (The Period of Origin), বর্দ্ধনযুগ (The Period of Progress), ও পরিণতি-যুগ (The Period of Failure or Success)।

প্রথমতঃ প্রারম্ভ-যুগের কথাই বলিব। ইংরেজীতে একটী সুন্দর কথা আছে,—

"Necessity is the mother of invention."—অভাবই আবিষ্ক্রিয়ার প্রসূতি। প্রায় সকল বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মূলেই কোনও ধর্ম্মাধ্যক্ষ-প্রধান সমাজের, বা কোনও অর্দ্ধসভ্য জাতির অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন কোনও উদ্যান বা প্রান্তর পরিমাণ করিবার আবশ্যক বোধ হইল, তখনই ক্ষেত্রতত্ত্বের আরম্ভ। যখন অকূল সমুদ্রে নাবিক চন্দ্রের উদয়াস্ত লক্ষ্য করিয়া জাহাজ চালাইতে অসমর্থ হইল, তখনই জ্যোতিষ শাস্ত্রের (Astronomy) সূচনা।

যদি কোনও বিজ্ঞান-শাস্ত্র কোনও সমাজের স্বার্থ-সম্পাদনে, কোনও না কোনও উপায়ে, সহায়তা করিতে না পারিত, তবে জগতে সে শাস্ত্রের অধিককাল টিকিয়া থাকা দায় হইত। যদি ভূতত্ত্ব (Geology), খগোল-বিজ্ঞান (Astronomy), রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry), কেবল জগতের আমোদই জোগাইয়া দিত, কিন্তু কাহারও উপকারে না আসিত, তবে তাহাদিগকে অপ-রসায়ন বিদ্যা (Alchemy) বা ফলিত জ্যোতিষের (Astrology) দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত। নিকৃষ্ট ধাতু স্বর্ণে পরিণত করার, কিংবা সর্ব্ব-রোগের একমাত্র ঔষধ প্রস্তুত করার রাসায়নিক চেষ্টা বা বিদ্যাকে অপরসায়ন-বিদ্যা বলে। এই বিদ্যা এককালে মিশর দেশে বেশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল, ধাতুর স্বর্ণে পরিণতি, বা সর্ব্বরোগের একমাত্র ঔষধ প্রস্তুত-করণের চেষ্টা ফলবতী হইবার নয়, তখন সে বিদ্যা আস্তে-আস্তে সে দেশ হইতে অপসারিত হইল। সমাজের উপকার-সাধনে ফলিত-জ্যোতিষের তেমন কোনও কার্য্যকারিতা দেখা যায় না। সেই জন্য ভারতে এই বিদ্যার আলোচনা ও প্রসার দিন-দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তবেই দেখা গেল, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতি সমাজে তাহার কার্য্যকারিতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

সকল বিজ্ঞানেরই কোনও একটী অভিপ্রায় আছে। সেই অভিপ্রায়-সম্পাদনই সেই বিজ্ঞানের ধ্যান—সেই বিজ্ঞানের সাধনা। কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞানের তেমন কোনও কার্য্যগত অভিপ্রায় আছে বলিয়া মনে হয় না। ভাষা বিজ্ঞান ভাষা শিক্ষার পথ সুগম ও সহজ করিবার ভান করে না, এবং ভবিষ্যতে কোনও বিশ্বজনীন ভাষা-বিস্তারের ধারণাও লোকের মনে জাগাইয়া তুলে না। ভাষা-বিজ্ঞানের একমাত্র কার্য্য,—ভাষা কি তাহা শিক্ষা দেওয়া এবং প্রতিভাষা, প্রতিশব্দ বিশ্লেষ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া।

একদল ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা নানা দেশের নানা শব্দের বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন, যে, জগতের সকল ভাষারই মূল এক;—সুতরাং যত্ন করিলে কালক্রমে জগতে এক ভাষার

প্রবর্ত্তন অসাধ্য কার্য্য নয়; অন্ততঃ পক্ষে কোনও একটী বিশিষ্ট ভাষার সকল দেশে প্রাধান্য-স্থাপন খুবই সম্ভব বটে। আবার আমেরিকাতে একদল শব্দ-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা কোমর বাঁধিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, সকল জাতি এবং সকল ভাষার মূল কিছুতেই এক হইতে পারে না। সুতরাং বিশ্বপ্রসারী একভাষা স্থাপনের, অথবা সকল দেশে এক ভাষার প্রাধান্য স্থাপনের কল্পনা, আকাশে রাজবাটী নির্ম্মাণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পশুরাজ্য ও নর-রাজ্যের সীমা লইয়া ভাষাতত্ত্বজ্ঞদিগের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তাঁহারা বলেন, মানব ও পশুর প্রভেদ ভাষা যতটা বুঝাইতে পারে, ততটা আর কিছুতেই পারে না। এ পর্য্যন্ত পশুজাতি কোনও ভাষার সৃষ্টি করিতে পারে নাই; মানব পারিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত লক্ (Locke) বলেন, পশুদিগের মধ্যে কোনও ব্যাপক-অর্থ-বোধক শব্দের বা ইঙ্গিতের ব্যবহার নাই। "লতা"—এই শব্দটী উচ্চারণ করিলে, মানব বিশেষভাবে কোনও একটী লতাকে বুঝিলেও সাধারণ ভাবে আরও বহু ও ভিন্ন-ভিন্ন প্রকার লতার ধারণা তাহার মনের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে জাগিয়া উঠে। কিন্তু পশু সেইরূপ ব্যাপক-অর্থ-বোধ-পরিশূন্য। এইখানেই মানবে ও পশুতে প্রভেদ।

এখন আমরা বিজ্ঞানের-'বন্ধন-যুগ' বা শ্রেণীবন্ধনযুগের (Classificatory Age) কথা বলিব। বিজ্ঞানের প্রকৃত কার্য্য শ্রেণীবন্ধন। বৈজ্ঞানিক প্রথমতঃ পর্য্যবেক্ষণবলে ঘটনাবলী সংগ্রহ করেন; তৎপরে তুলনা দ্বারা সংগৃহীত ঘটনাবলীর পশ্চাতে এক সাম্য-নীতির আবিষ্কার-চেষ্টা করেন। শ্রেণীবন্ধনের উদ্দেশ্য, পর্য্যবেক্ষণ এবং তুলনা করণ—এই দুইটীই বৈজ্ঞানিকের কাজ।

বিষয়টী আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝানো দরকার। আমরা ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষকে, কেবল তাহারই খাতিরে, মনোযোগ সহকারে বিচার-বিবেচনা করি না। আমরা পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির অধিকার অনবরত বাড়াইয়া-বাড়াইয়া বস্তুর মধ্যে কোনও সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করি। সাধারণ ধর্ম্ম, আবিষ্কৃত হইলে, বস্তুগুলিকে এক শ্রেণীর বলিয়া গণ্য করি। পুনরায়, এই শ্রেণী, এবং অন্যান্য আরও অনেক শ্রেণী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই শ্রেণীগুলির মধ্যে কোনও সাধারণ ধর্ম্ম বাহির করিবার প্রয়াস পাই। সফলকাম হইলে, এই শ্রেণীগুলিকে কোনও এক ঊর্দ্ধতন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করি। এইরূপ বহু শ্রেণী হইতে এক শ্রেণীতে উন্নীত হইতে-হইতে, অবশেষে আমরা এমন এক শ্রেণীতে যাইয়া উপস্থিত হই, যেখানে আমাদের ক্ষুদ্র মানব-জ্ঞান, কূল-কিনারা না পাইয়া, মস্তক অবনত করে;—যাহার উপরে, অন্য শ্রেণীর আবিষ্কার করা আমাদের নগণ্য শক্তিতে আর কুলায় না। তখন আমরা বুঝিতে পারি, সমস্ত প্রকৃতি-রাজ্য ব্যাপিয়া, একটি ভাব, একটি নিয়ম, একটি মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে; তখন আমরা অনুভব করিতে পারি,—এই অন্ধ জড়-জগৎ চেতনা-শক্তির ধ্যানে অনুপ্রাণিত! Aristotle বলিয়াছেন "There is in nature nothing interpolated or without connection, as in a bad tragedy!" শ্রেণীবন্ধন-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে, আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, প্রকৃতি রাজ্যে কোনও ব্যাপারই দৈবক্রমে সম্পাদিত হইতে পারে না,—কোনও জিনিসেরই দৈবক্রমে উৎপত্তি সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক জিনিসই কোনও জাতির অন্তর্ভুক্ত, এবং প্রত্যেক জাতিই পুনঃ এক পরাজাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতিরাজ্যে সৃষ্ট জিনিসগুলির মধ্যে দৃষ্টতঃ স্বাধীনতা ও প্রকারভেদ থাকিলেও, এই স্বাধীনতা ও প্রকারভেদের অন্তরালে, কতকগুলি নৈসর্গিক বিধানের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই বিধানগুলি, সৃষ্টি সম্বন্ধে, সৃষ্টিকর্ত্তার মনে এক রহস্যময় অভিপ্রায়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে।

বিজ্ঞান-রাজ্যে Inductionএর (বিশেষ হইতে সামান্য সিদ্ধান্ত) কার্য্য বড়ই প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানবিদ্ কল্পনার মশাল জ্বালিয়া অন্ধকার-পূর্ণ বিজ্ঞান-রাজ্যে, সত্যের সন্ধানে ঘুরেন ফিরেন। দুই-চারিটি ঘটনা সংগ্রহ করিয়া, ইহাদের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক 'জ্ঞাত' হইতে 'অজ্ঞাতে' পঁহুছিতে চেষ্টা করেন। অনেকে সফল-মনোরথ হইয়া থাকেন, কেহ-কেহ বা অর্দ্ধপথে ভগ্নাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন। 'জ্ঞাত' হইতে 'অজ্ঞাতে' যাইতে, অন্ধকারে সত্যের অনুসন্ধান করিতে, Inductionই বৈজ্ঞানিকের একমাত্র সহায়।

আমরা এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, পর্য্যবেক্ষণ (Observation), তুলনামূলক শ্রেণীবন্ধন (Comparison and classification), এবং অনুমান, বা বিশেষ হইতে সামান্য সিদ্ধান্ত, (Induction) এই তিনটী প্রণালী বৈজ্ঞানিকের অব্যর্থ অস্ত্র। এই তিনটির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সহজে সত্যের রাজ্য আক্রমণ করিয়া, তথা হইতে অমূল্য রত্নের সংগ্রহ করেন, এবং জগৎকে সেই সকল রত্ন দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন।

ভাষা-বিজ্ঞান সাধারণতঃ Comparative Philology নামে পরিচিত। ইহা প্রাকৃত বিজ্ঞান-সমূহের শ্রেণীভুক্ত; সুতরাং উদ্ভিদ-তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, শারীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃত-বিজ্ঞান-সমূহের তত্ত্বানুসন্ধানে যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতে হয়, ভাষা-বিজ্ঞানের অনুশীলনেও সেই সকল পন্থাই অবলম্বনীয়।

মানুষের জ্ঞানকে বিষয়ভেদে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক। প্রাকৃতিক জ্ঞানের বিষয়—ঐশ্বরিক বা প্রাকৃতিক কার্য্যাবলী, এবং ঐতিহাসিক জ্ঞানের বিষয়—মানবীয় কার্য্যাবলী। নাম দ্বারা বিচার করিলে, ভাষাতত্ত্বকে প্রাকৃত বিজ্ঞান না বলিয়া ঐতিহাসিক বিজ্ঞান বলিলে অধিকতর সুসঙ্গত হয় বলিয়া মনে হয়। কলা-বিজ্ঞান, আইন, রাজনীতি প্রভৃতির ইতিহাস যে শ্রেণীর অন্তর্গত, ভাষা-বিজ্ঞানও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া ধারণা জন্মে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে, ভাষা-বিজ্ঞান প্রাকৃত বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; সুতরাং কেবল নাম দ্বারা যেন ভ্রান্তির বশবর্ত্তী না হই,—সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এতক্ষণ আমরা তুলনা-মূলক ভাষা-বিজ্ঞানের (Comparative Philology) কথাই বলিতেছিলাম। এক্ষণে, Philology এবং

Comparative Philology, এই দুই বিজ্ঞানের প্রভেদের আলোচনা আবশ্যক। Philology ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু Comparative Philology প্রাকৃত-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। Philologyতেও ভাষার আলোচনা হয়, Comparative Philology-তেও ভাষার আলোচনা হয়;—তবে এই দুই আলোচনায় একটু প্রভেদ আছে। Philologyতে ভাষাকে মাত্র উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করা হয়। Philologyতে আমরা ভাষার অনুশীলন করি, ব্যাকরণ ও শব্দকোষের আলোচনা করি; কিন্তু ইহাদের খাতিরে নয়, এই সকলকে উপায় করিয়া এই সকলের আশ্রয় লইয়া, যাহাতে সমাজ-বিশেষের কিম্বা জাতি-বিশেষের উৎকৃষ্ট সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য। কিন্তু Comparative Philologyতে বিষয়টী স্বতন্ত্র। সেখানে ভাষাকে উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করা হয় না। সেখানে ভাষা নিজেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একমাত্র বিষয়। যে সকল প্রদেশীয় ভাষাতে এখনও কোনও প্রকার সুসাহিত্যের উৎপত্তি হয় নাই, যে সকল অস্পষ্ট অপভাষা এখনও পার্ব্বত্য বর্ব্বর-সমাজে আবদ্ধ,—সেই সকল ভাষাও Comparative Philologistদিগের নিকট অত্যন্ত আদরণীয়। হোমারের বা কালিদাসের ললিত পদ, সিসেরো বা কালীপ্রসন্নের মার্জ্জিত ভাষা, তাঁহারা যে চক্ষে দেখেন, এই সকল প্রদেশীয় ভাষা বা অপভাষাকে তাহা অপেক্ষা হীন চক্ষে দেখেন না। Comparative Philologyর উদ্দেশ্য কি, একটু ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। Comparative Philologist বা ভাষাবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে জ্ঞানলাভ করিতে চাহেন না,—মাত্র ভাষা কি, জানিতে চাহেন; ভাষা কিরূপে ভাবের অঙ্গস্বরূপ হয়; কিরূপে ভাষার উৎপত্তি হইল, ইহার প্রকৃতি কি, ইহা কোন্ কোন্ সামান্য বা বিশেষ বিধি দ্বারা শাসিত,—ইত্যাদি বিষয় Comparative Philologyর আলোচ্য, এবং এই সকল সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যরাজ্যে পঁহুছিবার জন্য, ভাষা-বিজ্ঞানবিদেরা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা, ভাষার বিভিন্ন তত্ত্ব সংগ্রহ করেন, তুলনা-দ্বারা এই সকল তত্ত্বের শ্রেণীবন্ধন করেন, এবং অনুমান দ্বারা এই সকল তত্ত্ব হইতে নূতন তত্ত্ব—নূতন সত্যের অনুসন্ধানে ধাবিত হন।

যে ব্যক্তি অনেক ভাষা জানেন ও অনেক ভাষায় কথা কহিতে পারেন, তাঁহাকে ইংরেজীতে Linguist বলা হয়। ভাষা-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত-গণকে অবশ্যই Linguist হইতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। ভাষা-বিজ্ঞানবিদ্ ভাষা বিজ্ঞানের খাতিরে, যে সকল ভাষার ব্যবহার করেন, সেই সকল ভাষাতেই তাঁহার ব্যাবহারিক জ্ঞান থাকিবে এমনটি অসম্ভব। তিনি বিদেশী ভাষা জানিতে বা ঐ ভাষায় কথা কহিতে ইচ্ছুক হইতে নাও পারেন; ঐ ভাষার ব্যাকরণ, ঐ ভাষার শব্দ-কোষই তাঁহার একমাত্র অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়।

ভাষা-বিজ্ঞানবিদ্ ভিন্ন-ভিন্ন ভাষার ভিন্ন-ভিন্ন শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া, সতর্কতা সহকারে উপাদানগুলির পরীক্ষা করেন। সুসাহিত্যে কখনও ব্যবহৃত হয় নাই, এরূপ শব্দাবলীর সুদীর্ঘ তালিকা দ্বারা তিনি কখনও স্মৃতি-শক্তির পীড়া উৎপাদন করেন না। কোনও ভাষাতে অধিকার-লাভ করিতে হইলে, ঐ ভাষার ভিন্ন-ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য পাঠ করিতে হয়; কিন্তু ভাষা বিজ্ঞানবিদকে সে আকাঙ্ক্ষা বা সে চেষ্টা করিতেই হইবে এমন নয়। তিনি ব্যাকরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালিকা লইয়া পর্য্যবেক্ষণ, তুলনা ও অনুমান বলের তন্ন-তন্ন করিয়া পরীক্ষা করেন। শারীর-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ যেমন মৃত্তিকার স্তরে-স্তরে প্রাপ্ত প্রস্তরীভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি পরীক্ষা করিয়া, অথবা বহু দূরদেশ হইতে আনীত, অস্পষ্ট, বিকৃত ছবি দর্শন করিয়া, শারীর-বিজ্ঞানের অনেক নূতন সত্যের আবিষ্কার করেন, ভাষা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতও ব্যাকরণের ক্ষুদ্র অংশবিশেষ, বা শব্দাবলীর ক্ষুদ্র তালিকা-বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ভাষা-বিজ্ঞানের অনেক নূতন সত্যের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হন। যদি জগতের সকল ভাষাতেই ভাষা-বিজ্ঞান-বিদের সূক্ষ্ম ব্যাবহারিক জ্ঞানলাভ করিতে হইত, তাহা হইলে ভাষা-বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব জগতে সম্ভবপর হইত না। কারণ, জগতের ভাষাসমূহের প্রকৃত সংখ্যা নির্দ্ধারণ করাই অসম্ভব, সেইগুলিকে আয়ত্ব করা তো দূরের কথা। ভাষার সংখ্যার মোটামুটি যে হিসাব পাওয়া যায়, তাহাও নয় শতের কম নয়।

পাটলীপুত্র এবং জগৎশেঠ বংশ

[২]

[শ্রীরামলাল সিংহ, বি-এল]

শেঠ মাণিক্‌চাঁদ সাহ।

হীরানন্দ সাহের সাত পুত্র—গোবর্দ্ধন সাহ, সদানন্দ সাহ, রূপচাঁদ সাহ, মুলকচাঁদ সাহ, আমীরচাঁদ সাহ নয়ানচাঁদ সাহ এবং মাণিক্‌চাঁদ সাহ। হীরানন্দ সাহ নিজ জীবদ্দশায় ভারতের নানা স্থানে কুঠি স্থাপন করিয়া পুত্রগণকে মহাজনী ব্যবসায় শিক্ষা দিয়াছিলেন। হীরানন্দ সাহের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্রগণ ভারতের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে থাকিয়া পিতার ন্যায় মহাজনী ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন।

মাণিক্‌চাঁদ সাহ হীরানন্দ সাহের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি তৎকালীন মুসলমান-বঙ্গের রাজধানী ঢাকানগরে থাকিয়া মহাজনী ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে যখন ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুস্থান্ ঢাকায় বাঙ্গালার সুবাদার, সেই সময়ে ঔরঙ্গজেব্ ইস্পাহান দেশীয় মুসলমান বণিক্-পালিত মুর্শিদকুলী খাঁ নামধারী দক্ষিণ দেশীয় ব্রাহ্মণ-তনয়কে বাঙ্গালার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন (১)। মুর্শিদকুলী খাঁর রাজস্ব-বিভাগের সহিত সম্পর্ক থাকাতে, ধনকুবের মাণিকচাঁদের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ গাঢ়তর হইল; এবং অচিরে মাণিকচাঁদ সাহ মুর্শিদকুলী খাঁর দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ১৭০২-৩ খৃষ্টাব্দে আজিমুস্থানের সহিত মুর্শিদকুলী খাঁর মনোমালিন্য ঘটিল। মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা নগর পরিত্যাগ করিয়া কুলুড়িয়া নামে পতিত মৌজায় আপন

---

(১) ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালার ইতিহাস পৃ ৩৯৮।

প্রাসাদ, দেওয়ানখানা ও অন্যান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, মুর্শিদাবাদ নগরের প্রতিষ্ঠা করেন (২)। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে আজিমুশ্বান ঢাকা নগর পরিত্যাগ করিয়া পাটনায় আসিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিলে, মুর্শিদকুলী খাঁ খালসা দপ্তর অর্থাৎ রাজস্ব-বিভাগও মুর্শিদাবাদে তুলিয়া আনিলেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মাণিকচাঁদও ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে মহিমাপুর নামক স্থানে আপনার আবাস স্থাপন করিলেন। (৩)

কিছুদিন পরে মাণিকচাঁদের পরামর্শ অনুসারে মুর্শিদাবাদে নূতন টাঁকশাল স্থাপিত হইলে, মাণিকচাঁদ সেই টাঁকশালের তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হন। এই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ এক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন যে, জমিদার এবং অন্যান্য রাজস্ব-আদায়কারিগণকে রাজস্ব মাসে-মাসে জমা দিতে হইবে। এই রাজস্ব আদায়ের ভার মাণিকচাঁদের উপর ন্যস্ত হইল। মাণিকচাঁদ রীতিমত রাজস্ব আদায় করিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। মাণিকচাঁদ দিল্লীতে নগদ টাকা না পাঠাইয়া হুণ্ডী পাঠাইতেন। সেই হুণ্ডী দিল্লীতে মাণিকচাঁদের ভ্রাতার কুঠিতে ভাঙ্গান হইত। এই কারণে বঙ্গের রাজস্বের আদায়কৃত সমস্ত নগদ টাকা মাণিকচাঁদের কুঠিতেই জমা থাকিত। কাজেই মাণিকচাঁদের ক্ষমতা অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর ফরুখ্‌শেয়র মাণিকচাঁদকে "শেঠ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে মাণিকচাঁদের মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে দয়াবাগে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ অনেকদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে ভাগীরথী তাহাকে নিজগর্ভে স্থান দান করিয়াছেন (৪)।

পাটনায় মাণিকচাঁদের স্মৃতি চিহ্ন

বাঁকিপুরে "মাণিকচাঁদ কি তালাও" নামে একটি বৃহৎ এবং প্রাচীন পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বাঁকিপুর বা বর্ত্তমান পাটনা জংশন রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে সাড়ে তিন মাইল পশ্চিমে পাটনা-খগোল নামক রাজপথের দক্ষিণ ধারে অবস্থিত। এই পুষ্করিণীটি দীর্ঘায়তন এবং গভীর। ইহার জল অতি অনাবৃষ্টির সময়েও শুকাইতে দেখা যায় নাই। পুষ্করিণীর চারিধার ইষ্টক দ্বারা বাঁধান। চারিদিকে চারিটি বাঁধান ঘাট ছিল। এখনও তিন দিকের বাঁধান ঘাট বর্ত্তমান। পূর্ব্বদিকের ঘাটটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। এই পুষ্করিণীর পরিমাণফল ৮-৯৭ একর বা বিহারের মাপ অনুসারে ১৪ বিঘা ৭ কাঠা এবং বাঙ্গালা দেশের মাপ অনুসারে প্রায় ২৬ বিঘা হইবে। ইহাকে দীর্ঘিকা বা ত্রিশত ধনু পরিমিত জলাশয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে রাজপথের ধারে এই পুষ্করিণী অবস্থিত, উহা অতি প্রাচীন রাজপথ। উহা অধুনা শেরশাহের সময়ের পথ বলিয়া বিদিত; বস্তুতঃ উহা বৌদ্ধ যুগ হইতে পাটলীপুত্র হইতে পশ্চিম প্রদেশে গমন করিবার পথ। শেরসাহ এই পথের জীর্ণসংস্কার মাত্র করেন। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে এই পথ দিয়া লোকে পাটনা হইতে দিল্লী প্রভৃতি পশ্চিমদেশে যাতায়াত করিত।

এই পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্প প্রচলিত আছে। একদিন মাণিকচাঁদ বর্ত্তমান পুষ্করিণীর সন্নিকটস্থ স্থানে সপরিবারে পটমণ্ডপে অবস্থিতি করিতেছিলেন; এমন সময়ে একজন তৃষ্ণাতুর পথিক সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, পাটনায় এত বড়-বড় ধনী লোকের বাস থাকিতে, পথিকদিগের জলকষ্ট নিবারণের জন্য এই বিস্তৃত রাজপথের ধারে একটিও জলাশয় নাই। মাণিকচাঁদ এই কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অনুমতি করিলেন যে, যেখানে দাঁড়াইয়া ঐ পথিক ঐ কথাগুলি বলিল, সেইখানেই একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা হউক। মাণিকচাঁদের আজ্ঞামাত্র লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান পুষ্করিণীটি খনন করান হইল। আজকাল উপরিউক্ত পুষ্করিণীর অর্দ্ধাংশের স্বত্বাধিকারী কলিকাতার জয়মিত্রের লেনবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এবং অন্য অর্দ্ধাংশের স্বত্বাধিকারী পুষ্করিণীর নিকটস্থ চিৎকোহরা (চৈত্য কোড়ত্তা) গ্রামবাসী জনৈক মুসলমান জমিদার। নগেন্দ্র বাবু পাটনায় অবস্থানকালে ঐ পুষ্করিণীর অর্দ্ধাংশ রামপ্রসাদ নামক জনৈক বিহারী কায়স্থ ভদ্রলোকের নিকট হইতে অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করেন।

রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্রগণ এখনও বর্ত্তমান। তাঁহারা বলেন, মাণিকচাঁদের তালাও জৈন মাণিকচাঁদের প্রতিষ্ঠিত নয়। উহা রামপ্রসাদের অতিবৃদ্ধ-পিতামহ দেওয়ান মাণিকচাঁদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা নিজেদের নিম্নলিখিত বংশাবলী প্রদান করিয়া থাকেন:—

রামপ্রসাদের পুত্রগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান মাণিকচাঁদ সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব গল্প বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, দেওয়ান মাণিকচাঁদ পাটনার এক অতি দরিদ্র কায়স্থ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে উর্দ্দু এবং পারসী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অসহায় মাণিকচাঁদ উদারান্নের দায়ে 'আরাকশের' অর্থাৎ বড়-বড় কাষ্ঠ চিরিবার ব্যবসায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। একদিন মাণিকচাঁদ পাটনার গঙ্গার তীরে কাঠ চিরিতেছিলেন, এমন সময়ে ইংরাজদিগের একখানি বজরা ঘাটে আসিয়া লাগিল। বজরাস্থিত জনৈক ইংরাজ একখানি পারসী চিঠি পড়িবার জন্য একজন লোককে ডাকিতে বলিলেন। সাহেবের লোক ঘাটে উঠিয়া মাণিকচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিল, পারসী পড়িতে পারে এমন কোন লোক নিকটে আছে কি? মাণিকচাঁদ বলিলেন, আমি পারসী পড়িতে পারি। সাহেব খুব আজ্ঞা করেন, তাহা

(২) কালীপ্রসন্নের বাঙ্গালার ইতিহাস পৃ ৩৭।
(৩) মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃঃ (৫২)।
(৪) মুঃ কাঃ পৃ ৫৪।

হইলে আমি যাইতে পারি। সাহেবের লোক বজরায় ফিরিয়া গিয়া সাহেবকে বলিল যে, একজন হিন্দু ঘাটের উপরে কাঠ চিরিতেছে;—সে বলিল যে সে পারসী পড়িতে জানে। তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব? সাহেব বলিলেন, আঁরাকশের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু আবার পারসী চিঠি কি পড়িবে? কোন মুসলমান মৌলবীকে ডাকিয়া আন। সাহেবের লোক তার পর তিন চারিজন মৌলবীকে ডাকিয়া আনিল। কিন্তু তাহারা কেহই চিঠিখানির মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপ সাহেবকে বুঝাইয়া দিতে পারিল না। তখন সাহেব ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, ঐ হিন্দু 'আরাকশ'কেই ডাকিয়া আন। মাণিক্‌চাঁদ আসিলেন; তিনি সুন্দর ভাবে পারসী চিঠিখানি পড়িয়া দিলেন, এবং উহার সকল কথা সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন। সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া মাণিক্‌চাঁদকে ৪০ টাকা বেতনে মুহুরী নিযুক্ত করিয়া রঙ্গপুরে লইয়া গেলেন। রঙ্গপুরে থাকিতে-থাকিতে মাণিক্‌চাঁদ দেওয়ানী পদে উন্নীত হন। সাহেবও রঙ্গপুরে অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। একদিন ইংরাজ কোম্পানির কলিকাতার হেড্ আফিস্ হইতে হঠাৎ চিঠি আসিল যে, অচিরে তিন লক্ষ টাকা পাঠাইতে হইবে। তখন রঙ্গপুরের কুঠির ধনাগার শূন্য। সাহেব ভাবিয়া অস্থির। মাণিক্‌চাঁদকে ডাকিলেন। মাণিক্‌চাঁদ বলিলেন ভাবিবার কোন কারণ নাই। রঙ্গপুরের দুইটি জমিদারের প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। আপনি যদি উহাদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করাইতে পারেন, তাহা হইলে তিন লক্ষ টাকা এখনই সংগৃহীত হইতে পারে। সাহেব বলিলেন, আমি জমিদারগণের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিলাম। কলিকাতা হইতে উহাদের মুক্তির আদেশ শীঘ্রই আনাইয়া দিতেছি, তুমি টাকার যোগাড় কর। মাণিক্‌চাঁদ জমিদারদ্বয়ের আত্মীয়গণকে ডাকাইয়া বলিলেন, যদি তোমরা অচিরে তিন লক্ষ টাকা যোগাড় করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে দুইজনেরই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইতে পারে। জমিদারগণের আত্মীয়েরা তিন লক্ষ টাকা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিছুদিন পরে জমিদারগণ মুক্তিলাভ করিলেন; এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মাণিক্‌চাঁদকে একলক্ষ টাকা উপহার দিলেন। মাণিকচাঁদ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি একদিন পাটনা হইতে পুনপুন্ গ্রামের নিকটে নিজ জমিদারী দেখিতে যাইতেছিলেন; তিনি বর্ত্তমান পুষ্করিণীর নিকটস্থ স্থানে আসিয়া, পথিকদিগের জলকষ্ট দেখিয়া, তাহার কর্ম্মচারীদিগকে ঐ স্থানে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিতে বলেন। উক্ত পুষ্করিণী খনন করিতে, ঘাট বাঁধাইতে এবং শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

উপরিউক্ত গল্পের মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। পুষ্করিণীর উত্তর পারে অবস্থিত ক্ষুদ্র শিব-মন্দিরটি যে হিন্দু-কীর্ত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা পুষ্করিণী খননের সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয় না। পুষ্করিণী যেরূপ বৃহৎ, মন্দিরটি তাহার উপযুক্ত নয়। আমাদের বোধ হয় পুষ্করিণী খননের বহুকাল পরে যখন কোন হিন্দু উহার স্বত্বাধিকারী হন, তখন তিনি উহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। আমাদের বিশ্বাস, এই পুষ্করিণীটি শেঠ মাণিক-চাঁদেরই কীর্ত্তি।

নিখিলবাবু তাঁহার মুর্শিদাবাদ-কাহিনীতে লিখিয়াছেন যে "একরূপ কথিত আছে যে, কোন জগৎশেঠ পত্নীর ধর্ম্মার্থ ১০৮টি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। কাহার সময়ে সে পুষ্করিণীগুলি খনন করা হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। আমাদের বিবেচনায় সে সকল খোশাল-চাঁদেরই কৃত হওয়া সম্ভব।" (৫)

আমাদের মনে হয়, পাটনার "মাণিকচাঁদের তালাও" উপরিউক্ত ১০৮টি পুষ্করিণীর অন্যতম। সম্ভবতঃ শেঠ মাণিকচাঁদই তাঁহার পত্নীর ধর্ম্মার্থ ১০৮টি পুষ্করিণী খনন করাইয়া থাকিবেন।

শেঠ মাণিকচাঁদের সমসাময়িক ঘটনাবলী। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ মুর্শিদ-কুলিখাঁ খালসা দপ্তর বা রাজস্ব বিভাগ মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করিলে, মাণিকচাঁদ ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে মহিমাপুরে বাস-ভবন নির্ম্মাণ করেন।

১৭০৬ খৃঃ। মুর্শিদাবাদে থাকিলে নবাবের টাঁকশালে নিজের মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া লইবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া ইংরাজ কোম্পানী মুর্শিদ-কুলি খাঁকে ২৫০০০ টাকা উপঢৌকন প্রদান করেন, এবং কাশিমবাজারে কুঠি নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হন। (৬)

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৭০৭। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু। (৭)

২২শে ফেব্রুয়ারী। ঔরঙ্গজেবের মধ্যম পুত্র আজিম্ শাহের দিল্লী অভিমুখে যাত্রা, এবং সিংহাসনারোহণ। (৮)

জুন ১৭০৭ খৃঃ। আজিম্‌শাহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহ আলম্ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হন। শাহ আলম দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন এবং বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণ করেন। (৯)

ফরোখশেয়রের ঢাকানগর পরিত্যাগ এবং মুর্শিদাবাদে, লালবাগে বাসভবন নির্ম্মাণ, বাহাদুর শাহ কর্ত্তৃক আজিমুখানকে বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যার সুবাদারী পদ পুনঃ প্রদান। আজিমুখান সুবাদারী পদ প্রাপ্তি সত্বেও পিতার নিকট আগ্রায় বাস করাতে সৈয়দ হোসেন আলীখাঁ বেহারের সুবেদারী পদে নিযুক্ত হন। (১০)

১৭১২ খৃঃ। বাহাদুর শাহের মৃত্যু। জঁহাদার সাহের সিংহাসনা-রোহণ। (১১) আজিমুখানের মধ্যম পুত্র ফরোখশেয়রের মুর্শিদাবাদ

(৫) মুঃ কা পৃঃ ৫২।

(৬) ষ্টুঃ বাঃ ইঃ পৃঃ ৪১৯। কালীপ্রসন্নবাবু বলেন, ২৫০০০ টাকা দিয়া সনন্দ লইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল মাত্র, আরঙ্গজেবের মৃত্যু হওয়াতে টাকা হস্তান্তরিত হয় নাই। বাঃ ইঃ পৃঃ ১১৯।

(৭) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪০৯।

(৮) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪০৯।

(৯) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪১১।

(১০) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪১২।

(১১) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪৩৫।

পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা। পাটনার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া পাটনার পূর্ব্ব উপকণ্ঠস্থ "বাগজাফরখাঁ" নামক বাগানে অবস্থিতি এবং সুবেদার হোসেন আলীর (১২) নিকট সাহায্য প্রার্থনা। ফররোখ্-শেয়রের পাটনা নগরমধ্যে প্রবেশ। পরদিন হিন্দুস্থানের সম্রাটরূপে অভিষেক। হোসেন আলী কর্ত্তৃক ফররোখশেয়রের জন্য পাটনার মহাজনগণের নিকট হইতে অর্থ এবং ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে সৈন্যগণের ব্যবহার্য্য সামগ্রী ধারে সংগ্রহ। এলাহাবাদের সুবাদার অবদুল্লার্খাকে ফররোখশেয়রকে সাহায্য করিবার জন্য হোসেন আলী কর্ত্তৃক অনুরোধপত্র প্রদান। রণসাজে সজ্জিত হইয়া ফররোখশেয়রের পাটনা হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা। বারাণসীতে নগর শেঠ এবং অন্যান্য মহাজনের নিকট ভারত সাম্রাজ্য বন্ধক দিয়া এক ক্রোড় টাকা কর্জ্জ গ্রহণ এবং সৈন্য সংগ্রহ। (১৩)

জানুয়ারী ১৭১৩ খৃঃ। জাঁহাদার শাহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। (১৪) ফররোখশেয়রের সিংহাসনারোহণ। (১৫)

১৭১৩ খৃঃ। মুর্শিদকুলীখাঁর নাজিম বা সুবেদারী এবং দেওয়ানী উভয় পদ প্রাপ্তি। (১৬) মুর্শিদকুলীখাঁ কর্ত্তৃক আজ্ঞা প্রচার যে, অতঃপর ইংরাজ বণিকগণকে ৩৯০ টাকা পেশকশের পরিবর্ত্তে হিন্দুগণ যে হারে শুল্ক প্রদান করেন, সেই হারে কর প্রদান এবং তাঁহাকে এবং তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে সদা-সর্ব্বদা উপঢৌকন প্রদান করিতে হইবে।

উদ্বিগ্ন-চিত্ত ভারতীয় ইংরাজ বণিক প্রতিনিধিবর্গ কর্ত্তৃক ডিরেকটর-গণের নিকট বিলাতে অনুযোগপত্র প্রেরণ এবং দিল্লীশ্বরের নিকট দূত প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা। ডিরেক্টরগণের সম্মতি প্রদান এবং মান্দ্রাজ ও বম্বের গভর্ণরগণের প্রতি আদেশ যে, বঙ্গের দরখাস্তে নিজ-নিজ দেয় সম্বন্ধীয় অনুযোগ সন্নিবেশিত করিয়া দিবেন। ইংরাজ-কোম্পানীর কলিকাতার অধ্যক্ষ হেজস্ সাহেব কর্ত্তৃক মিষ্টার জন্ সুরমান, এডওয়ার্ড ষ্টিফেন্সন্ এবং আর্ম্মানী বণিক খোজা শেরহন্দ দিল্লীর দৌত্য কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হন। মিষ্টার উইলিয়াম্ হ্যামিলটন্ দূতগণের সহযাত্রী ডাক্তার নির্ব্বাচিত হন। পরে তিনলক্ষ টাকা মূল্যের কাচের দ্রব্যাদি, ঘড়ি, জরির কাপড়, পশমী এবং রেশমী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি উপঢৌকন লইয়া কলিকাতা হইতে ইংরাজ দূতগণের দিল্লী অভিমুখে যাত্রা। দূতগণের পাটনায় আগমন। পাটনা হইতে স্থলপথে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা। [illegible] তিনমাসের পর, দিল্লীতে উপস্থিতি, (১৭) এবং ডাক্তার হ্যামিলটন কর্ত্তৃক ফররোখ্শেয়ারের ব্যাধি-মুক্তি। (১৮)

(১২) এই বাগান এখনও বর্ত্তমান।

(১৩) রিয়াজুস সলাতীন্।

(১৪) ষ্টুঃ বাঃ ইং পৃঃ ৪৪১।

(১৫) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ১৪৩।

(১৬) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪৬১।

(১৭) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪৪৭-৪৯।

(১৮) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪৫০।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দ : - দিল্লীশ্বরের নিকট মাণিকচাঁদের "শেঠ" উপাধি প্রাপ্তি।

জানুয়ারী ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ। বাণিজ্যাধিকার পাইবার জন্য দূতগণের দিল্লীশ্বরের নিকট দরখাস্ত প্রদান। (১৯)

১৭১৭ খৃষ্টাব্দ। ইংরাজগণের ফর্ম্মান্ প্রাপ্তি। মুর্শিদকুলী খাঁ মর্ম্মাহত।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দ। ফররোখ্শেয়রের পরলোক গমন। (২০)

১৭২২ খৃষ্টাব্দ। শেঠ মাণিকচাঁদ সাহেব মৃত্যু।

বহুরূপী তারা-পর্য্যবেক্ষক সমিতি

[শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র]

আমেরিকার হার্ভার্ড কলেজ মানমন্দিরের অধ্যক্ষগণ বহুরূপী তারা (Variable stars) আবিষ্কার, তাহাদের জ্যোতির হ্রাস ও বৃদ্ধির পরিমাণ এবং ঐ হ্রাস ও বৃদ্ধির কাল পরিমাণ নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে "বহুরূপী তারা পর্য্যবেক্ষক আমেরিকান সমিতি, (American Association of variable star observers) নামে একটী সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ অঃ কেবল মাত্র সাত জন সদস্য লইয়া এই সমিতি প্রথম গঠিত হয়। এক্ষণে তাহার সদস্য-সংখ্যা একশত একষট্টি জন। এই সমিতির সদস্যগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা সারাজীবনের জন্য সদস্য (Life member) হইবেন, তাঁহাদিগকে এককালীন ২৫ ডলার, ও যাঁহারা কার্য্যকরী সদস্য (Active member) হইবেন ; তাঁহাদিগকে বার্ষিক ২ ডলার চাঁদা দিতে হয়। আর যাঁহারা এই সমিতির প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতাদি করিবেন, ও বহুরূপী তারার আবিষ্কার ও পর্য্যবেক্ষণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবেন, তাঁহারা মাননীয় সদস্য (Honorary members) বলিয়া গণ্য হইবেন ; তাঁহাদিগকে কোন চাঁদা দিতে হয় না। সারাজীবন সদস্যগণের প্রদত্ত চাঁদার ½ অংশ লইয়া দূরবীক্ষণ ভাণ্ডার (Telescope fund.) স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাণ্ডারে সঞ্চিত অর্থ হইতে ভাল-ভাল দূরবীক্ষণ ক্রয় করিয়া উপযুক্ত সদস্যগণকে বহুরূপী তারা পর্য্যবেক্ষণের জন্য দেওয়া হয়। অবশ্য উহা সমিতির সম্পত্তি থাকিবে। সদস্যগণের দূর-বীক্ষণ 'মেরামত' ও দূরবীক্ষণ সম্পর্কীয় অপর যন্ত্রাদির 'মেরামত' কার্য্য এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অবশিষ্ট ½ অংশ লইয়া একটী স্থায়ী ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাণ্ডারের উৎপন্ন আয় এবং কার্য্যকরী সদস্যগণের প্রদত্ত চাঁদা দ্বারা সমিতির সর্ব্বপ্রকার ব্যয় সঙ্কুলান করা হয়।

পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন দেশ হইতে বহুরূপী তারা পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ সংগ্রহ করিবার মানসে তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, ভারতবর্ষ, জাপান, চীনদেশ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড এবং স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের

(১৯) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪৫১।

(২০) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪৫৩।

জ্যোতিষামোদী ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের সমিতির সদস্য হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এই সকল দেশে বহু সৌখিন জ্যোতিষামোদী ব্যক্তি আছেন; এবং হয় ত অনেকেরই দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে। তাঁহারা কেবল আমোদ উপভোগের জন্য অসম্বদ্ধ ভাবে চন্দ্র ও প্রধান গ্রহগুলি এবং কদাচিৎ দুই চারিটী নীহারিকা ও যুগল নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া থাকেন। হার্ভার্ড মানমন্দিরের অধ্যক্ষগণ মনে করেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদের সমিতির সদস্য হইলে, তাঁহাদের মূল্যবান যন্ত্রের সদ্ব্যবহার হইবে,—নিরানন্দ এবং কর্ম্মহীন সময় আনন্দে অতিবাহিত হইবে, অথচ তাঁহারা জগতের একটী শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান,—জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উন্নতির অংশ-ভাগী হইবেন। পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে পর্য্যবেক্ষক আহ্বান করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহাদের দেশে যখন দিনমান, আমাদের দেশে সে সময়ে রাত্রিকাল। তার পর একদেশের আকাশে মেঘ থাকিলে অন্য দেশের আকাশ নির্ম্মল থাকা সম্ভব। সুতরাং নানা স্থান হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দিবা বা রাত্রি সকল সময়েরই পর্য্যবেক্ষণের ফল পাওয়া যাইবে।

হার্ভার্ড মানমন্দিরের অধ্যক্ষগণ পঁচিশ বৎসর কাল নিয়ত যত্ন করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন সময়ের নভোমণ্ডলের দুই লক্ষাধিক ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই, যে জ্যোতিষ্কতত্ত্ববিদ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল ফটোগ্রাফ বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা ৫৫ খানি তারা চিত্র সম্বলিত সমগ্র নভোমণ্ডলের একখানি 'য়্যাটলাস্' বা নভোচিত্রাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ চিত্রাবলীতে ১২শ শ্রেণীর তারা অপেক্ষা উজ্জ্বল দশলক্ষ পঞ্চাশ হাজার তারার অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহারা ছয়শত বহুরূপী তারার ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সকল ফটোগ্রাফ তাঁহারা সমিতির সদস্যগণের ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে দিয়া থাকেন। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শনের জন্য জ্যোতিষ্কের এবং হার্ভার্ড মানমন্দিরের গৃহ ও যন্ত্রপাতির অসংখ্য স্লাইড প্রস্তুত করিয়াছেন। সদস্যগণ ঐ সকল স্লাইড লইয়া নিজেদের দেশের জন-সাধারণকে দেখাইয়া, জ্যোতিষ্কের ও জ্যোতিষশাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারেন। ঐ সকল স্লাইড সদস্যগণ বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন; কিন্তু উহা মানমন্দিরের সম্পত্তিই থাকিবে, এবং আবশ্যক মত তাঁহারা উহা ফেরত লইবেন। কেবল আসা ও যাওয়ার খরচা সদস্যগণকে দিতে হয়।

"দন্ত ও দন্তের যত্ন" বিষয়ে দুটি কথা

[শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ]

বিগত শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত রফিদিন আমেদ মহাশয় "দন্ত ও দন্তের যত্ন" সম্বন্ধে যে সুন্দর প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপলক্ষে দন্তসংরক্ষণ বিষয়ে দুচারিটি কথার আলোচনা করিবার উদ্দেশে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে সাহসী হইলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি দন্তরোগের যন্ত্রণায় ভুক্তভোগী। কয়েক বৎসর ধরিয়া দন্তরোগে অত্যধিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শেষে দন্তগুলি উৎপাটন করাইয়া কতকটা শান্তিলাভ করিয়াছি। প্রথমে যখন দন্ত খারাপ হইতে আরম্ভ হয়, সে সময়ে উহাকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম,—বিশেষ কোন প্রতিকার চেষ্টা করি নাই। তাহার ফলে পরিণামে অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছি। "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না" আমাদের দেশের পক্ষে এ কথাটা বড়ই সত্য। সুতরাং যাঁহাদের দন্ত এখনও সুস্থ আছে, তাঁহারা এখন হইতেই উহার উপর একটু বিশেষ মনোযোগ করিলে, ভবিষ্যতে আমার মত দশায় উপস্থিত হইতে হইবে না।

শ্রীযুক্ত রফিদিন আমেদ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, মুখ অপরিষ্কার রাখার জন্যই দন্তরোগ উৎপন্ন হয়;—এ কথাটা খুব সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে কতকগুলি রোগের ফলে এবং পারদঘটিত ঔষধাদির অপব্যবহারের ফলে দন্তমূল শিথিল হইয়াও দন্তরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা আমরা জ্ঞাত আছি।

লেখক মহাশয় দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত পরীক্ষা করাইবার এবং তাঁহাদের দ্বারা দন্তরোগের চিকিৎসা করাইবার বিষয়ে যে সব উপদেশ প্রদান করিয়াছেন সে সব সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই যে, ঐরূপ ব্যবস্থা পাশ্চাত্য প্রদেশাদিতে সুকর হইলেও আমাদের এই দেশে দুচারিটি বড় বড় সহর ভিন্ন অন্যত্র সুলভ নহে। একে তো দেশের জন-সাধারণের দারিদ্র্য নিবন্ধন প্রাণান্তকারী রোগসমূহের উপযুক্ত চিকিৎসা করাইতেই অনেকে প্রকৃতপক্ষেই অপারগ; তার পর পল্লীগ্রামে বা ছোট-খাট সহরে দন্ত-চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অপ্রাপ্য। যে ব্যবস্থা সহজে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতে না পারে, সে ব্যবস্থায় দেশের কল্যাণ হইতে পারে না; মুষ্টিমেয় ধনীদিগের উপকার হইতে পারে মাত্র। Tooth pick or floss silk এর নাম অতি অল্প লোকেই জ্ঞাত আছে, ব্যবহার করা ত দূরের কথা। স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির দ্বারা দন্তগহ্বর পূরণ করিবার ক্ষমতাও আমাদের দেশের কম লোকেরই আছে। 'ভারতবর্ষের' পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে কতজন তাঁহার ব্যবস্থামত দন্তরক্ষণের বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, জানি না, তবে বোধ হয় তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী হইবে না।

আমি ঠিক বলিতে পারি না, তবে আমার বোধ হয় যে, অনুপাত হিসাবে ধরিয়া দেখিলে, আমাদের দেশের লোকদিগের দন্ত য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদিগের দন্ত অপেক্ষা বেশী সুস্থ। বিলাত আদি দেশে কৃত্রিম দন্তের ব্যবহার আমাদের দেশ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক, এ কথা বোধ হয় অবিসংবাদী সত্য। আমাদের বঙ্গদেশ অপেক্ষা বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাসিগণের দন্ত বেশী দৃঢ় এবং স্থায়ী হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। এ বিষয়ে একজন প্রাচীন বাঙ্গালী ডাক্তার মহাশয়ের সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "বহুকাল হইতে দন্ত দ্বারা শক্ত জিনিস খাওয়ার বেশী অভ্যাস থাকিলে, সে দন্ত বেশী দিন কার্য্যক্ষম থাকে। এই সব পশ্চিম দেশে লোকে চানা,

ভুট্টা প্রভৃতি শক্ত জিনিস চর্ব্বণ করিয়া আহার করে, এ জন্য তাহাদের দাঁত বেশী শক্ত থাকে। আর আমরা এরূপ শক্ত জিনিস খুব কমই ব্যবহার করি। ছোলা, চিঁড়া প্রভৃতিও আমরা বেশীর ভাগ ভিজাইয়া নরম করিয়াই খাই। সুতরাং প্রকৃতি মনে করেন যে, ইহাদের দাঁত আর শক্ত রাখিয়া কি হইবে। এ কথাটা নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহার মধ্যে সত্য আছে বলিয়া আমি মনে করি। আমাদের হিন্দুর ঘরের অনেকগুলি প্রাচীন প্রথার মধ্যেও এই দন্তরক্ষণ উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আহারান্তে 'খড়িকা' খাওয়ার প্রথাই তাহার প্রমাণ। 'খড়িকা' আমাদের toothpickএরই কাজ পূর্ব্বে নিখরচাতে সম্পাদন করিত।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই মধ্যে "দাঁতনকুল্লা" করিবার প্রথাটি খুব বেশী ভাবে এখনও প্রচলিত আছে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অনেকক্ষণ ধরিয়া দন্ত-কাষ্ঠ দ্বারা বেশ করিয়া বাহির ভিতর উভয় দিকে দাঁত মাজিয়া, তার পর সেই দাঁতন চিরিয়া তদ্দারা জিহ্বা মার্জ্জন করে, তৎপরে "কুল্লা" করিয়া থাকে। এই 'দাঁতন কুল্লা' করিবার পূর্ব্বে তাহারা কখন কিছু আহার করে না। রেলপথে ভ্রমণ করিতেও, যে ষ্টেসনে প্রাতঃকাল হয়, সেখানে ষ্টেসনের পানিপাঁড়ের নিকট হইতে দাঁতন লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে বসিয়া 'দাঁতন কুল্লা' করে; তার পর "পানিপিনা" অর্থাৎ যাহা কিছু একটু মিষ্ট দ্রব্য মুখে দিয়া জলপান করে।

এইরূপ দাঁতন কুল্লার' প্রচলন থাকায়, এবং নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অতিরিক্ত পান খাইবার প্রথা প্রচলিত না থাকায়, ইহাদের, দন্তগুলি বেশ পরিষ্কার থাকে, এবং দন্তের রোগও অনেক কম হয়; শীঘ্র ইহাদের দাঁতও পড়ে না। কঠিন বস্তু চর্ব্বণ এবং এইরূপ দন্ত মার্জ্জন করাই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। দাঁতন করা আমাদের দেশেও পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; এখন অনেকেই তাহা বর্জ্জন করিয়া, টুথ-ব্রাসের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। হিন্দু-শাস্ত্রে প্রাতঃকৃত্যের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলীর মধ্যে দন্ত ধাবন একটি প্রধান কার্য্য। কোন্ কোন্ কাষ্ঠ দন্ত-কাষ্ঠ রূপে ব্যবহার করা হইবে, আয়ুর্ব্বেদে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আসসেওড়া, আম, বকুল প্রভৃতি অনেক বৃক্ষের সরল ডালের দ্বারা দন্ত-মার্জ্জন করিবার বিধি আছে। আপামার্গ বা আপাংএর মূল দ্বারা দন্ত-মার্জ্জন করিলে, দন্তমূল দৃঢ় হয় এবং দন্ত রোগ হইতে পারে না—এ কথাও আয়ুর্ব্বেদে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে। আমার কয়েকজন বন্ধু নিয়মিত ভাবে আপামার্গের মূল দ্বারা দন্তমার্জ্জনা করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি।

খুব ভাল এঁটেল মাটি সূক্ষ্ম ভাবে চূর্ণ করিয়া, তাহা ছাঁকিয়া, জলে গুলিয়া, ভাল করিয়া থিতাইয়া লইয়া, অর্থাৎ যাহাতে তাহার মধ্যে শক্ত কঙ্করাদি না থাকে, এইরূপ করিয়া লইয়া, তাহার দ্বারা দন্ত-মার্জ্জনা করিলেও দন্ত-রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

আহারান্তে খড়িকা দ্বারা দাঁত খুঁটিয়া, দাঁতের ফাঁকে-ফাঁকে যে সব খাদ্যাদির কণা জমিয়া থাকে, তাহা বাহির করিয়া ফেলিয়া, পুনরায় ভাল করিয়া কুলকুচি করিয়া ফেলা বড়ই উপকারক। আমাদের হিন্দু পরিবারে এই প্রথা বহুলরূপেই প্রচলিত ছিল। এখন সে সব বিষয়ে আমাদের অনাস্থা জন্মিয়াছে। সকলের মধ্যেই আমরা কু সংস্কারে ভীতিপূর্ণ চিত্র দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি; সুতরাং খড়িকা খাওয়াটাও বুঝি অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

আরও একটি প্রথা আমরা বাল্যকালে আমাদের গুরুজনের মধ্যে দেখিয়াছি। তাহা এই যে, দুই বেলাই আহারান্তে ভুক্তাবশিষ্ট লবণ দ্বারা দন্তমার্জ্জনা করা। ভোজন পাত্র ত্যাগ করিয়া উঠিবার সময়ে পাতে যে লবণ অবশিষ্ট থাকে, তাহা অঙ্গুলিতে করিয়া লইয়া বেশ করিয়া তাহা দ্বারা তাঁহারা দাঁত মাজিয়া ফেলিতেন; তার পর মুখ প্রক্ষালনাদি করিতেন। একজন ডাক্তার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ লবণ দ্বারা আহারের পর দন্ত-মার্জ্জনা করা দন্ত-ক্ষয় নিবারণ পক্ষে বৈজ্ঞানিক হিসাবেই বিশেষ সহায়তা করে। ভুক্ত দ্রব্যের কণা প্রভৃতি দাঁতের ফাঁকে-ফাঁকে থাকিয়া, ক্রমে পচিয়া অম্ল উৎপাদন করে। লবণ দ্বারা সেই দোষ দূরীভূত হয়। আমাদের দেশে যে "আঁতে তিতা দাঁতে নুন, পেট ভরে তিন গুণ" ইত্যাদি প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে দাঁতে নুন দিয়া মার্জ্জনা করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

সকাল বেলা সরিসার তেল এবং লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বারা দন্ত-মার্জ্জন করাও দন্তের পক্ষে হিতকর।

যোগনিষ্ঠ একজন ব্যক্তি আমাকে আর একটি মুষ্টিযোগ বলিয়া দিয়াছিলেন; তাহা এই যে, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই মুখে একমুখ শীতল জল লইয়া, কিছুক্ষণ মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া, তার পর কুলকুচি করিয়া ফেলা; আর মলমূত্র ত্যাগকালে দাঁতে-দাঁতে একটু জোরে চাপিয়া মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে হইবে,—মুখ খুলিবে না। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই প্রক্রিয়া প্রত্যহ নিয়মমত করিলে, দাঁত নিশ্চয় ভাল থাকিবে। দুঃখের বিষয় এই যে আমার দাঁত তৎপূর্ব্ব হইতেই খারাপ হইয়া গিয়াছিল,—আমি ঐ প্রক্রিয়া নিজে রীতিমত নিয়মিতভাবে করিতে পারি নাই। অতিরিক্ত পান খাওয়াতেও দাঁতের পীড়া জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ, পান খাইয়া, মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার না করিলে ঐ সব কুচি মুখের মধ্যে থাকিয়া গিয়া দাঁতের পীড়া উৎপাদন করে।

লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, মুখ গহ্বর পরিষ্কার রাখা দাঁতের রোগ হইতে মুক্তি পাইবার প্রধান উপায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের লোক (হিন্দু-মুসলমান উভয়েই) দিনের মধ্যে অনেকবারই মুখগহ্বর ধৌত করিয়া থাকেন। উভয় জাতিরই ধর্ম্মকার্য্যেও জলের ব্যবহারের বেশী প্রয়োজন হয়। হিন্দুর পূজা-আহ্নিক এবং মুসলমানের নমাজের সময়েও মুখ-গহ্বর ধৌত করা এবং হস্তপদাদি প্রক্ষালন করা অবশ্য কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। এই কারণেও বোধ হয় আমাদের দেশের লোকে পাশ্চাত্য দেশীয়গণের অপেক্ষা দন্ত পীড়া অনেক কম ভোগ করেন।

আমি নিজে অনেকগুলি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের আলোচনা করিয়া

দেখিয়াছি যে, আমাদের দেশের প্রাচীন লোকদের মধ্যে দন্তরোগ আরও অনেক কম ছিল বলিয়া বোধ হয়। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত চাল কলাইভাজা আহার করিয়াছেন দেখিয়াছি। কোন কোন বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার ৬০।৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্তও দন্ত অবিকৃত থাকার বিষয় জ্ঞাত আছি। এই সব কারণে আমার বোধ হয় যে, যখন আমাদের দেশে দন্তচিকিৎসালয় এবং দন্ত-পীড়ার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তেমন সুলভ নহে, এবং কথায়-কথায় দন্ত-চিকিৎসককে দেখানও আমাদের দেশের সাধারণ লোকদিগের সহজ নহে, তখন যে সমুদয় উপায় ও প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানে কোনই খরচ নাই, কেবল নিজের ইচ্ছার আবশ্যকতা মাত্র, অথচ যাহার দ্বারা বিশেষ সুফল পাইবার প্রত্যাশা আছে, সেই সবগুলির দিকে সকলে প্রথম হইতে মনোযোগ করিলে, দন্তরক্ষণ বিষয়ে অনেক সাহায্য হইতে পারে। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাগণের দন্ত পরীক্ষার ব্যবস্থার কল্পনা তো সুদূর পরাহত, প্রত্যেক সহরে সেরূপ ব্যবস্থারও বহুকাল বিলম্ব আছে। আর আমার বোধ হয় সরকার হইতে সেরূপ ব্যবস্থার প্রচলন হইলেও তাহার দ্বারা চিকিৎসক পোষণ ব্যতীত আর বেশী কিছু হইবে না। তাহাতে রোগীর সংখ্যা অতি কমই পাওয়া যাইবে। কারণ আমার বিশ্বাস এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে দন্ত-রোগটা ম্যালেরিয়ার মত বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে-নাই। বিলাত আদি প্রদেশেই উহার প্রসার বেশী।

আমি উপরে যে সমুদায় সহজ এবং ব্যয়বাহুল্যহীন উপায়গুলির কথা বলিলাম, এগুলি অতি দরিদ্র ব্যক্তিও অনায়াসেই ব্যবহার করিতে পারেন এবং নিয়মিত ব্যবহারে ইহার দ্বারা সুফল লাভও নিশ্চয়ই করা যাইবে।

লেখক মহাশয় প্রথম হইতে সন্তানের দন্তের সুস্থতা সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিবার জন্য পিতামাতাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা, অতি সমীচীন, সে কথা বলাই বাহুল্য। দুধে দাঁত বলিয়া প্রথম হইতে অবহেলা করিলে শেষে অনেক সময় দন্তরোগ দূর করা কঠিন হইয়া পড়ে। ছেলেবেলা "দাঁতে পোকা" লাগিয়া অনেক সময় দাঁত এমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় যে, আজীবন সেইরূপ দাঁত লইয়াই কাহাকে কাহাকে কাটাইতে হয়। অতএব সময় থাকিতে সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সকল পরিবারেই এটা প্রধান লক্ষ্য-হওয়া উচিত যে, বালক বালিকাগণ সকালে উঠিয়া ভাল করিয়া দন্ত-মার্জ্জন করে এবং প্রত্যেকবার আহারান্তে বেশ ভাল করিয়া বারবার জোরে কুলকুচি করিয়া মুখ ধৌত করে। মাংসাদি আহারের পর দাঁতের ফাঁকের মধ্যে মাংসের আঁশ বা সূক্ষ্ম অংশ লাগিয়া না থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

রাত্রিকালে আহারাদির পর শয়নের পূর্ব্বে একবার ভাল করিয়া দন্ত-মার্জ্জনা পূর্ব্বক মুখ ধৌত করা দন্তের পক্ষে বড়ই উপকারী। আর এরূপ ভাবে মুখ ধুইয়া ফেলিলে একটা বড় আরাম পাওয়া যায়, তাহা যাঁহারা উহা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দন্ত পরীক্ষাগার স্থাপন করা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে অসম্ভব হইলেও, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সাধারণ স্বাস্থ্য ভঙ্গের মূল সূত্রগুলি শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দন্তের প্রতি যত্ন করিবার উপকারিতা, প্রত্যহ দন্ত-মার্জ্জনা ও মুখগহ্বর ভাল করিয়া ধৌত করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কঠিনও নহে, অথচ বালক-বালিকাগণের পক্ষে পরম হিতকর।

আমাদের বাল্যকালে "সরল শরীর পালনে" দন্ত মার্জ্জনের যে যে উপদেশ দেওয়া ছিল, তাহা উৎসাহের সঙ্গেই পালন করিতাম, বেশ মনে আছে। ছাত্রগণ প্রত্যহ ভাল মত দন্ত পরিষ্কার করে কি না, কাহারও মুখে দুর্গন্ধ পাওয়া যায় কি না, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষকগণের পর্য্যবেক্ষণের অন্তর্গত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। দন্তের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ, দন্ত অসুস্থ হইলে শরীরের পোষণের ব্যাঘাত এবং নানা রোগ জন্মিবার আশঙ্কা, ইত্যাদি সহজভাবে সরল ভাষায় শিশুগণকে বুঝাইয়া দিলে অনেক সুফলের আশা করা যায়। শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং শিক্ষাকার্য্যে ব্রতীগণের দৃষ্টি এদিকে নিপতিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

লেখক মহাশয় বর্ণিত দন্তের যত্ন লইবার উপায় আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকের পক্ষে সহজ এবং সুকর না হইলেও দন্তের যত্ন করা যে আবশ্যক, এ কথা সর্ব্ব সম্মত, সন্দেহ নাই। লেখক মহাশয় এ দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমি ঐ উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের দেশের সকলেরই পক্ষে সমান উপযোগী কয়েকটি বিধানের উল্লেখ এস্থলে করিয়া এই-দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম মাত্র।

মাষ্টার মশায়

[শ্রীপ্রতিভা দেবী]

স্কুলের নূতন মাষ্টার সমীর বোস এই দুই দিন দিব্য স্বচ্ছন্দ-চিত্তে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছিল ; কিন্তু অদৃষ্টের ভোগ যাইবে কোথায় ! আজ প্রথম ঘণ্টায় থার্ড ক্লাসের রেজেষ্টারী-খাতায় উপস্থিতি লিখিতে-লিখিতে একটা পরিচিত নাম ভাবিয়াই সে নামটার অধিকারিণীর দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল।

এ যে চেনা মুখ,— মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে কি আর এত বিস্মৃতি ঘটিতে পারে !

মেয়েটি পাতলা, রং বেশ ফর্সা। তাহার কাপড়, জামা, জুতা, মোজা, সবই সাদা ; এমন কি, সাবান-ঘসা, একরাশি হাল্কা কালো-চুলেও একটি ধব্‌ধবে সাদা সিল্কের ফিতার গ্রন্থি বাঁধা। মেয়েটিকে দেখিয়া মনে হয়, যেন একটি সদ্য-ফোটা নিটোল রজনীগন্ধা ! সমীর চশমার ভিতর হইতে কয়েকবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

মনে-মনে একটু বিস্ময় বোধ করিলেও, তাহার মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল। অবশেষে যে এইরূপে দেখা হইয়া যাইবে, কে জানিত !

দেখিয়া বোধ হইতেছে, শোভনা তাহাকে চিনিতে পারে নাই ; দুই বৎসর পূর্ব্বে মাত্র কয়েক ঘণ্টার দেখাতে সে সমীরের মুখ মনে রাখিতে পারে নাই।

ইহাতে সমীর অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

পড়াইতে-পড়াইতে সে কথাচ্ছলে একবার শোভনার পার্শ্ববর্ত্তিনী মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা থেকে আস ?" মেয়েটি উত্তরটা সম্পূর্ণ করিতে না করিতে সমীর শোভনাকে বলিল, "তুমি ?" "আমি আসি গ্রে ষ্ট্রীট্ থেকে।" "ওঃ, তুমি গ্রে ষ্ট্রীট্ থেকে আস। তোমার বাবার নাম কি ?" শোভনা আগ্রহের সহিত বলিল, "বাবার নাম ব্রজনাথ মিত্র। আপনি কি তাঁকে চেনেন ?" মনে-মনে নিঃসংশয় প্রমাণ পাইয়া সমীর মাথা নাড়িয়া বলিল, "নাঃ, আমি যাঁকে চিনি, তাঁর তো ও নাম নয়।"

পিছনের বেঞ্চের একটি শ্যামবর্ণা মেয়ে যেন বিস্মিতভাবে শোভনাকে বলিল, "আমি তো ভেবেছিলুম, তুমি আজ-কাল শ্যামবাজার থেকে আস।" এই ছোট শ্যামবাজার শব্দটিতে শোভনা সুন্দর ভ্রূ-দুটিকে বাঁকাইয়া কপট বিস্মিতা মেয়েটির দিকে সবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সমীর ব্যাপারটা বুঝিয়া মৃদু হাসিল ; দুষ্ট মেয়েটির অভিপ্রায় ব্যর্থ করিয়া দিয়া, অর্থাৎ শ্যামবাজার সম্বন্ধে কোন রূপ প্রশ্ন না তুলিয়া, আবার পড়াইতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যায় যখন বন্ধু প্রমোদের সহিত দেখা হইল, তখন সমীর এই আশ্চর্য্য কাণ্ডটা তাহার কর্ণে উপহার দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না।

শুনিয়াই প্রমোদ একটা বড় রকমের "হুঁ" করিয়া, চোখ-দুইটা যথাসম্ভব বিস্তারিত করিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই হাসির ফোয়ারাটা এমন অদ্ভুত ভাবে খুলিয়া দিল যে, সমীর ব্যস্ত হইয়া "চেঁচাস্‌নে প্রমোদ," "আঃ, থাম্ না', "কি করিস," ইত্যাদিরূপ কাকুতি-মিনতি করিয়া বিব্রত হইতে থাকিল। প্রমোদ হাসি থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর ভুল হয় নি ত ?" "না,—না, সে আমি কথায়-কথায় তার বাপের নাম-টাম সব জেনেছি।" প্রমোদ বন্ধুর পিঠটা চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "সাবাস্ !" তার পরে তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া, অতি নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখতে বেশ সুন্দর,—নয় রে ?" সমীর শিহরিয়া চাপা গলায় উত্তর করিল, "হাঁ।" তাহার মুখে লজ্জা-আনন্দের দীপ্তিটুকু প্রমোদের দৃষ্টিকে এড়াইতে পারিল না।

সমীরের পিতা কৃপণ বৈবাহিককে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে বধূর মুখদর্শন করিবেন না বলিলে কি হইবে ;—এদিকে অদৃষ্টদেবী তাঁহাকেই পরাজিত করিবার মতলবে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন ! পিতা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাঁহার পুত্র প্রত্যহই পরিত্যক্তা বধূর নিষিদ্ধ সুকুমার মুখখানা,—শুধু চোখে নয়, বেশ একটু প্রীতির চোখেই দেখিতেছে।

কিন্তু কোন দিন সে শোভনার নিবিড় কালো চুলের মধ্যে সিঁদুরের রক্তরাগটুকু দেখিতে পায় নাই। সমীর বুঝিল, শোভনা বিদ্রোহী হইয়া, বাঁকা-সিঁথি কাটিয়া, বিবাহটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।

সেদিন টিফিন-ঘণ্টায় কি-একটা প্রয়োজনে সমীর বারান্দা দিয়া যাইতে-যাইতে একেবারে লুকোচুরি খেলায় মত্ত শোভনার উদ্দাম গতির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। সহসা সাম্‌নে বাধা পাইয়া শোভনা স্পন্দিত বক্ষে থমকিয়া দাঁড়াইল,—আবার তৎক্ষণাৎ পাশ কাটাইয়া ছুটিল; তাহার ঘর্মাক্ত রক্তিম মুখশ্রী দেখিয়া সমীরের হাসি আসিল। পিছন ফিরিয়া আবার একটু দেখিয়া লইবার লোভ সে ভদ্রতার খাতিরে সংবরণ করিয়া লইল।

পড়াইবার সময় চঞ্চলা ছাত্রীটিকে অনেকবার শাসন করিতে হইত। গ্রহবৈগুণ্যে শ্বশুর-বাটীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শোভনার স্বভাবসিদ্ধ চপলতা স্বাধীনতার হাওয়ায় আরো বাড়িয়া উঠিয়াছিল; সুযোগ পাইলে মাষ্টার মহাশয়দেরও সে জ্বালাতন করিতে ছাড়িত না। ইংলিশের মাষ্টার সমীর বাবু একটু ভালমানুষ বলিয়া সে তাঁহাকে দয়া করিয়া চলিত।

তবুও অভ্যাসের বশে যদি কোন দিন সে শিক্ষকের আদেশের উল্টা কাজ করিত, তখন অগত্যা সমীরকে কৃত্রিম কোপে গার্জ্জেনের কথা তুলিতে হইত। অমনি পিছনের বেঞ্চের অপর্ণা বলিয়া উঠিত, "ওর গার্জ্জেনের ঠিকানা হচ্ছে, ১২ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।"

শোভনা একটা জ্বলন্ত রোষ-কটাক্ষ অপর্ণার উদ্দেশে পাঠাইয়া, মাষ্টার মশায়কে তর্ক করিয়া বুঝাইত, সে তাঁহার আদেশ যথারীতি পালন করিতেছে! ছাত্রীটির দুষ্টামীতে সমীর বিরক্ত হইত কি আনন্দিত হইত, ঠিক করিয়া বলা শক্ত; তবে তাহার শ্বশুর-বাড়ী শ্যামবাজারের নামটায় পর্য্যন্ত তাহার বিতৃষ্ণা দেখিয়া একটু আহত হইত।

এতদিন পরে এই আঘাত এখন কেন বাজিয়া উঠিত, তাহা বুঝিতে বুদ্ধিমান সমীরের বাকী ছিল না।

আরো একবার এই রকম ব্যথা সে অনুভব করিয়াছিল, যখন অসুখ হইয়াছিল বলিয়া শোভনা দিন-কতক স্কুলে আসে নাই।

স্কুল-হলে ঢুকিয়াই তাহার চোখ দুটী থার্ড-ক্লাসের পরিচিত বেঞ্চখানার দিকে চাহিয়াই নিরাশার —— ভরিয়া উঠিত। অসুখের পরে প্রথম যে-দি ক্লাসে আসিয়া বসিল, সেদিন তাহার শুষ্ক মুখ চাহিয়া সমীরের চোখ দুইটা সজল হইয়া উঠিয়া

মা ভিতরে
নি সমীর?"
াড়ছি।"

বর্ষাকাল শেষ হইয়া গেলেও, বৃষ্টির কিছুমাত্র নাই। সারাদিন টিপ্‌ টিপ করিয়া ঝরিয়া, বৈকালে বৃষ্টি যেন আকুল আগ্রহে পৃথিবীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ি তখন সবে-মাত্র স্কুলের ছুটি হইয়াছে। সেই বৃষ্টিধারা মধ্যেই স্কুলের লম্বা লম্বা ভারি গাড়ীগুলা কতকগুলি মেয়েকে তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অবশিষ্ট মেয়েরা বইগুলি গুছাইয়া কোলে লইয়া প্রশস্ত হলের বেঞ্চে বসিয়া গুন-গুন করিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিল; বাহিরের এই প্রবল বারিধারায় তাহাদের ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই।

স্কুলের একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া সমীর বৃষ্টির বেগ কমিবার আশা করিতেছিল। শেষটা নিরাশ হইয়া সামনের কাপড়টা মল্লদের মত পিছনে গুঁজিয়া, ছাতা খুলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতে একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। শোভনা একরাশি খাতা, বই ও একটা বেতের সেলায়ের বাক্‌সে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া, বোধ হয় নিকটের বেঞ্চখানি অধিকার করিবার আশায় আসিতেছিল; কিন্তু ভিজা বারান্দায় সাধের উঁচু-হিলের জুতা-শুদ্ধ পা ফস্‌কাইয়া যাওয়ায় বেচারা বই-খাতাগুলির মায়া ত্যাগ করিয়া, তাড়াতাড়ি বেঞ্চের হাতাটা ধরিয়া সামলাইয়া লইল। এ হেন বিপদে আবার মাষ্টার সমীর বাবুকে দেখিয়া সে লজ্জায় মরিয়া গেল। ছাতাটা ফেলিয়া, ছড়ান বই-খাতাগুলা ক্ষিপ্রহস্তে কুড়াইয়া, সমীর বেঞ্চের উপর রাখিয়া দিল। তার পর হঠাৎ শোভনার মুখের দিকে চাহিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। পড়িয়া যাওয়ার লজ্জা হইতে রক্ষা পাইলেও, শোভনা তখনো দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। তাহার কোমল কালো চুলে ঘেরা ছোট কপালখানির নীচে ঘন-পল্লব, নত চোখ-দুটি, আর লজ্জারুণ তরুণ মুখের সুষমা সমীরের দুই চক্ষুকে মুগ্ধ করিয়া দিল,—অনিমেষ অবাক্‌ দৃষ্টি স্থান-কাল ভুলিয়া গেল। এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া, শোভনা সবলে মাথা নাড়িয়া, লজ্জাটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "কি মুস্কিল! শুধু-শুধু আপনাকে কষ্ট দিলুম। আপনিও বুঝি বৃষ্টির জন্যে আটকে

ন?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিটা শিক্ষকের মুখে পড়িতে, সেও ...যা গেল। কি উজ্জ্বল দৃষ্টি! আর সেটা ...খর উপর নিবদ্ধ! সমীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, ...য়া, ছাতাটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ...তা ছাত্রীর গভীর দৃষ্টিটুকু তাহার অনুসরণ করিল।

বাড়ী ফিরিয়া সন্ধ্যার পরে একটা উজ্জ্বল আলো সম্মুখে রাখিয়া, সমীর যখন এলোমেলো মনটাকে গুছাইয়া লইবার জন্য খবরের কাগজখানা পড়িতেছিল, তখন সহসা পিছন হইতে কে টপ করিয়া কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া, রহস্য-ভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মনটা অন্য জায়গায় পাঠিয়ে, মিছে কেন এখানা দেখিয়ে লোককে ঠকাচ্ছিস্?" সমীর ফিরিয়া বন্ধুর হাস্য-প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। পাঁচ লাইন লেখা সে যে আধ ঘণ্টা ধরিয়া পড়িতেছে, এ কথা মনে-মনে স্বীকার করিয়া লইল।

প্রমোদ বন্ধুকে নীরব দেখিয়া, মস্তক হেলাইয়া, চশমার ভিতর হইতে চক্ষু-দুইটার দীপ্ত দৃষ্টি যেন সার্চ্চ্ লাইটের মত সমীরের মুখের উপর ধরিয়া, থিয়েটারি সুরে বলিল, "সখি, তুমি মরেছ!" সমীর রক্তিম মুখে তাহার বাহু ধরিয়া একটা প্রবল নাড়া দিয়া বলিল, "থাম্।" নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া, প্রমোদ হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "নাঃ, আর কোন আশা নাই।" সমীর বিরক্তিভরে বলিল, "সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না প্রমোদ!" প্রমোদ সোজা হইয়া বসিয়া চড়াসুরে বলিল, "ঠাট্টা কি? তুই কি বলতে চাস যে—" সমীর ব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া বলিল, "আমি কিছু বলতে চাই না,—তুই থাম।"

প্রমোদের কৌতুক-দীপ্ত মুখখানা স্নেহে কোমল হইয়া উঠিল। সে নীচু হইয়া সমীরের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমাকেও লুকোবি সমীর!" সমীরের মুখের রক্তাভাটুকু তখন কোথায় উবিয়া গিয়াছে। সে ম্লান, বিবর্ণ মুখে শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "টিচারিটা ছেড়ে দেব প্রমোদ!" প্রমোদ কি একটা বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু সামনের দরজাটা খুলিয়া সমীরের মা আসিয়া দাঁড়াইতে, সে সংযত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সমীরের মা শ্যামবর্ণা, মুখখানি বুদ্ধির শ্রীতে দীপ্ত; চোখ দুটি স্নেহার্দ্র, দেখিলেই 'মা' বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হয়।

প্রমোদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ আমি শীগ্গীর আসিনি মাসিমা?" প্রত্যুৎপন্ন-বুদ্ধি সমীর নিজের ব্যথা লুকাইয়া চট করিয়া জবাব দিল, "খা'বার কথা থাকলে কবেই বা তোমার আসতে দেরী হয়?" মা হাসিয়া বলিলেন, "ও কি কথা সমীর!" প্রমোদ সমীরের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "ওটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!" ভিতরে আসিয়া খোলা বারান্দায় পাশাপাশি দুই বন্ধুতে খাইতে বসিল। কতক্ষণ পরে সমীর যখন আহার শেষ করিয়া উঠিল, প্রমোদ তখনো খাইতেছে। "প্রমোদটা বেহদ্দ পেটুক, কুড়ে" ইত্যাদি নানারকম দোষারোপ করিতে-করিতে সে বাহিরে চলিয়া গেল। খোলা জানালার কাছে একখানা চৌকি টানিয়া বসিয়া, বাহিরের বৃষ্টিসিক্ত রাস্তাটার দিকে চাহিয়া, সে একখানি লজ্জারক্ত নবীন মুখের ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেল।

মাষ্টারি কাজটা ছাড়ি ছাড়ি করিয়াও যখন সমীর আটকাইয়া রহিয়া গেল, তখন একদিন তাহার পিতা তাহাকে এই দুর্দ্দৈব হইতে মুক্তি দিয়া বলিলেন, "তোমায় আর প্রাইভেট পড়তে হবে না,—আমি খরচ দেব, তুমি টিচারি ছেড়ে দাও।" সমীর বিস্মিত হইয়া বলিল, "প্রাইভেট পড়তে হবে না?" সমীরের পিতা দৃষ্টিকৃপণ লোক; সুতরাং তিনি 'কৃপণ' শব্দটার আঁচও সহিতে পারিতেন না। সমীরের বিস্ময়-মূঢ় ভাব দেখিয়া তিনি বলিলেন, "হাঁ—হাঁ, প্রাইভেট পড়তে হবে না,—এতে এত অবাক্ হবার কি আছে! পূজার ছুটি কবে?" সমীর মাথা নীচু করিয়া বলিল, "দিন পাঁচেক দেরি আছে এখনো।" "ছুটির পর আর যেও না তা'হলে।" উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সমীর পিতার এই হঠাৎ মত-পরিবর্ত্তনের কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া অবাক্ হইয়া গেল। সে তো তাঁহারি আদেশে স্কুলের মাষ্টারি যোগাড় করিয়া লইয়াছিল। সে নিজে কাজটা ছাড়িবে বলিলেও, আজ সত্যই ছাড়িতে হইবে দেখিয়া, তাহার মনটা খারাপ হইয়া গেল; বোধ হইল, কে যেন তাহার সুখ-সম্পদ সমস্ত কাড়িয়া লইতেছে। মনের চোখে শোভনার হাসিভরা মুখখানা কেবলি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সমীর আজ ভাল করিয়া বুঝিল, সে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। আহত হৃদয়ের ব্যথা চাপিয়া, সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। স্কুলে পৌঁছিয়া আজ সে চঞ্চল চোখ-দুইটার রাশ

চাপিয়া ধরিল। আর না, যথেষ্ট বোকামি সে করিয়াছে, এইবার তাহাকে সংযত হইতে হইবে। কিন্তু পড়াশুনার মধ্যে, অবাধ্য দৃষ্টি কখন যে থার্ড-ক্লাসের পিছন-ফেরা একটি মেয়ের দীর্ঘ বেণীর লাল টুকটুকে ফিতার ফাঁসে গিয়া জড়াইয়া পড়িল, তাহা তাহার খেয়ালই রহিল না। থার্ড ক্লাসের ঘণ্টায় অসম্ভব গম্ভীর হইয়া সে ক্লাসে ঢুকিল। তাহার কঠিন, শুষ্ক মুখখানার দিকে লক্ষ্য করিয়া শোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আপনার শরীর ভালো নেই, না?" "না, হাঁ, শরীরটা খারাপ বটে।" এই রকম একটা জবাব দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা পূজার সময় কোথাও বেড়াতে যাবে না?" প্রশ্নটা অপর্ণাকে হইল। অপর্ণা মাথা নাড়িয়া বলিল, "সবাই যাব না, শুধু শোভনা যাবে।" "কোথায়" জিজ্ঞাসা করিতেই শোভনার মুখখানা আবার সেদিনকার মত লাল হইয়া উঠিল। সে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "মধুপুরে।" অপর্ণা হাতের বইখানা ফেলিয়া দিয়া, কুড়াইবার ছলে নীচু হইয়া হাসি চাপিল। মেয়েরা নিজেদের যতই সেয়ানা মনে করুক না কেন, এসব ঝাপসা রহস্য শিক্ষকের চোখে বাধিল না।

ছুটীর সময় যখন সমীর কর্ম্মত্যাগের কথাটা হেড্‌ মিস্‌ট্রেস্‌কে জানাইতে যাইতেছিল, তখন সিঁড়ি দিয়া নামিতে-নামিতে অপর্ণা শোভনার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছিল, "আহা, একেবারে মধুপুর! স্বর্গপুর বল্লি না কেন?" শোভনা হাসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যাঃ, ঐ জন্যে তো তোকে কিছু বল্‌তে ইচ্ছে হয় না।"

"তা বলে তুই একেবারে মধুপুর বল্‌লি কি করে? বাবাঃ—হা—হা—হা!" হাসিতে-হাসিতে তাহার দম প্রায় বন্ধ হইয়া গেল।

পিছন হইতে কথাগুলা শুনিয়া সমীর তাহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইল না। মেয়েদের তো সকলি অদ্ভুত!

অত্যন্ত উদাস ভাবে সমীর ঘরে ফিরিল। মনটা তখন খাপছাড়া হইয়া গিয়াছে। যাক আর উপায় কি? একবার মনে হইল, শোভনাকে একখানা চিঠি লেখা যাক্‌। পর মুহূর্ত্তেই মনে পড়িল, পিতা যদি তাহাকে গ্রহণই না করেন, তাহা হইলে চিঠি লিখিয়া সে বেচারাকে জড়ান কেন? সে বেশ আছে। কিন্তু—সমীরের কণ্ঠ পর্য্যন্ত একটা উচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল। সে টেবিলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে দরজা ঠেলিয়া সমীরের মা ভিতরে আসিয়া বলিলেন, "এখনো কাপড় ছাড়িস্‌নি সমীর?" সমীর টপ্‌ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই যে, ছাড়ছি।" মা তাহার সর্ব্বস্বহারা মুখখানার দিকে চাহিয়া ব্যথা পাইয়াও মৃদু হাসিলেন।

সমীর হাত-মুখ ধুইয়া খাইতে বসিল। মা কাছে বসিয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন, "ভাবছিলুম কি, এবার পূজার সময় বৌমাকে আন্‌বো।" "কাকে?" সমীর অত্যন্ত চমকিয়া উঠিল। মা বলিলেন, "আমার বৌমাকে। মিছে-মিছি ঝগড়া করে আর কত দিন ফেলে রাখ্‌ব।"

সমীর অবাক্‌ হইয়া বলিল, "সে কি! বাবা যে—" বাধা দিয়া মা বলিলেন, "ওঁর ও-সব পাগলামি শুন্‌তে গেলে আমার চল্‌বে না। তা ছাড়া ওঁর এখন তত অমত নাই।" সমীর বুঝিল, তত মানে এখন অমত নাই। তাহার পিতার স্বভাবে হয় প্রবল অমত, নয় মত,—এই দুই ছাড়া মাঝামাঝি কিছু নাই।

সে দারুণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া, পাতের খাবারগুলা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

মা একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "তাদের আমি চিঠি লিখেছিলুম। বৌমার মা খুব খুসি হয়ে পাঠিয়ে দেবেন লিখেছেন।"

এই সব অসম্ভব কথাগুলা ক্রমাগত শুনিতে-শুনিতে সমীরের যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মা ব্যস্ত হইয়া, তাহার আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "ও কি রে,—কিছুই যে খেলিনে।" "খেয়েছি তো,—আর বেশী খাব না।" বলিতে-বলিতে সে এক রকম দ্রুতপদে পলাইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এ কোন্‌ যাদুকরের মায়াদণ্ড-স্পর্শে অসাধ্য-সাধন হইতে চলিল! তাহার মনে যেন বিস্ময়ের ঝড় বহিতে লাগিল।

খানিক স্থির হইয়া, বসিয়া-বসিয়া যখন সে একটু সামলাইয়া উঠিয়াছে,—তখন প্রমোদ আসিয়া তাহার কাণের কাছে গুঞ্জন করিয়া বলিল, "বকশীষ!"

পূজার আর বিলম্ব নাই। বর্ষার স্নেহ-মুক্ত প্রকৃতি শরতের পদার্পণে হয় তো কোথাও হাসিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সে

হাসি এই সব ইট-কাঠের অধিবাসীদের কপালে কোথায় মিলিবে? তাহারা প্রকৃতির ভাণ্ডার হতে যেটুকু স্নেহ পায়, সেই নির্ম্মল জ্যোৎস্নাটুকুকেও লজ্জা দিয়া উজ্জ্বল গ্যাস্ ল্যাম্পগুলা রাস্তায়-রাস্তায় দেওয়ালির উৎসব লাগাইয়া দিয়াছে।

পথের দুইধারে জামা-কাপড়ের দোকানগুলা নানা রঙের বিচিত্র শোভা ছড়াইয়া বেচারা "হাঁ-করা" পথিকদের মোটর-চাপা পড়িবার সুবিধা করিয়া দিয়াছে। পথে জনস্রোতের বিরাম নাই।

এমনি এক কোলাহলময়ী শারদ-সন্ধ্যায় শোভনা শ্বশুর-গৃহে আসিয়া পৌছিল। শ্বাশুড়ী আদর করিয়া কাছে টানিয়া বলিলেন, "এস মা, আমার ঘরের লক্ষ্মী!" শ্বশুরকে প্রণাম করিতে, তিনিও অস্ফুটস্বরে কি একটা আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এত সমাদরেও তবু তাহার দুই চোখ কেবলি জলে ভরিয়া আসিতেছিল। বুকের কম্পনটা একটুও থামে নাই। তার পর যখন বাপের বাড়ীর পুরানো চাকর দীনবন্ধু "তবে এখন আসি দিদিমনি, আবার রাত হয়ে যাবে।" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল, তখন শোভনার পাউডার মাখা নিটোল গণ্ড দুইটি বাহিয়া অশ্রুর বন্যা ছুটিল। শ্বাশুড়ী অশ্রু মুছাইয়া সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "কেঁদ না মা,—যখনি যেতে চাইবে, আমি পাঠিয়ে দেব।" পরের মেয়ের এই বাপের-বাড়ীর বিচ্ছেদ-ব্যথা, আর পরের বাড়ী ঘর করার একটা অজানিত আশঙ্কা তিনি তাঁহার হৃদয় দিয়া বুঝিলেন। শোভনা আশ্বাস পাইয়া শান্ত হইল। শ্বাশুড়ীর স্নেহার্দ্র মুখখানি দেখিয়া তাহার মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল।

এতক্ষণে এই বাড়ীর আরো একজনের কথা তাহার মনে পড়িল। তিনি এখনও ক্লাব হইতে ফিরেন নাই। মা জানিতেন, আজ তাঁহার ফিরিতে বিশেষ বিলম্ব হইয়া যাইবে।

স্বামীটি পুরাতন হইলেও নূতনই বটে,—কে জানে তিনি কি রকমের লোক! ভয়ে, লজ্জায় শোভনার বুকটা কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

শ্বাশুড়ী যে ঘরটি তাহার বলিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই ঘরের মধ্যে একটা চকচকে পালিশ-করা টেবিলে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া, সে অপরিচিত ঘরখানার চারিদিকে দেখিতে লাগিল। ঘরখানা অতি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন; খাটের উপর সুন্দর, ধব্‌ধবে বিছানা; দেয়ালে দুই-একখানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি; একপাশে আল্‌নায় দুই-তিনটা সার্ট-কোট ঝুলিতেছে। শোভনা বুঝিল, সেগুলা কাহার।

বাতিটা বাড়াইয়া দিয়া, টেবিলের উপর হইতে একখানা বই তুলিয়া, সে পাতা উল্টাইতে লাগিল। খানিক পরে নীচে কড়া-নাড়ার শব্দ, ও তার পরে সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইলেও, সেদিকে কাণ গেল না। একটু পরেই খট্ করিয়া ঘরের দরজাটা খুলিয়া গেল। শোভনা চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, তাহাদের ইংলিশের টীচার সমীর বাবু ঘরে ঢুকিলেন। সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আপনি।" সমীর দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া, তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। আজ শোভনার ঘন, কালো চুলের সোজা সিঁথিতে সিন্দূরের রক্ত-রেখা জল্ জল্ করিতেছে। ফিরোজা রঙের পাতলা সাড়ীখানার আঁচল আজ মাথার উপর দিয়া গিয়া পিনে বদ্ধ হইয়াছে। পায়ে জুতা মোজার বালাই নাই,—শ্বেত-পদ্মের মত শুভ্র ছোট পা দুইখানি আল্‌তার রাঙ্গা রসে লক্ষ্মীর পাদপদ্মের মত দেখাইতেছে।" আজ যেন কল্যাণময়ী বধূমূর্ত্তি!

সমীর অগ্রসর হইয়া, শোভনার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া; কোমল কণ্ঠে বলিল, "আমায় কি তুমি চিনতে পার নি শোভা?" তাহার দুই চোখে প্রেমের ঢেউ উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

এমন অদ্ভুত ব্যাপারে শোভনা থতমত খাইয়া গেল। সমীর নামটি তাহার স্বামীরও আছে, সে তাহাই জানিত। কিন্তু স্কুলের মাষ্টার সমীর বাবুই যে তিনি, তাহা তো সে স্বপ্নেও ভাবে নাই! সত্যই সে তো চিনিতে পারে নাই!

অবাক্ হইয়া, সে তাহার বিস্ময়-ব্যাকুল দুই চোখের ব্যগ্র দৃষ্টি দিয়া, স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। সমীরের হাতের মধ্যে তাহার হাত দুইখানা ঘামিয়া উঠিল। সমীর হাসিয়া তাহার ধৃত হাত দুইখানা নাড়া দিয়া বলিল, "কি ভাবছ বল তো?"

শোভনা একটা বিস্ময়-মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ

মণিদর্শন

[অশ্বত্থামার মস্তক-মণি দর্শনে ভীমের নিকটে দ্রৌপদীর আনন্দ প্রকাশ]

শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার]

[Blocks by Bharatvarsha Halftone Works.

উচ্চ শ্রেণীর
ইউরোপীয়
ধরণের
পোষাক
ও
সকল প্রকার
ধুতি ও
শাড়ী
সুলভ মূল্যে
বিক্রয় হয়।

মফস্বল-
বিক্রয়ের
বিশেষ
সুবন্দোবস্ত
আছে।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নীচু করিল। লজ্জায় মুখ-চোখ লাল করিয়া, সে ফস্‌ করিয়া হাত-দুইখানা খুলিয়া লইয়া, মুখখানা ঢাকিয়া ফেলিল। কি লজ্জা! কি লজ্জা! শেষে কি না ক্লাসের টীচার সমীর বাবুই—ছিঃ! ছিঃ! সে আর ভাবিতে পারিল না।

দুষ্ট মাষ্টার মহাশয় তাহার লজ্জার উপর আরো লজ্জা দিয়া, মুখখানা জোর করিয়া তুলিয়া—কাণের কাছে ফিস্‌ ফিস করিয়া বলিল, "মধুপুরটা ভাল লাগবে তো শোভা?"

অভিনব শ্রাদ্ধ-বিধি

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল]

বাঙ্গালা দেশে এক অভিনব শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে—জীবন-চরিত লেখা। উহার মূলে যদি একটুও শ্রদ্ধার আভাস থাকিত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। তাহা নহে। এ শ্রাদ্ধের এক এবং অনুপম উদ্দেশ্য "পিণ্ডং দত্বা ধনং হরেৎ"। অপহারী নয়, এই প্রকারের ধনহারীদল যদি কাহাকে দেখেন সাধারণ হইতে বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র, অমনই তাঁহাদের ধারণা হয়, এ ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, আমরা জীবনচরিত লিখিব বলিয়া। কিন্তু লিখিবার সময় ইহাঁরা ভুলিয়া যান যে, জীবন-চরিত উপন্যাস অথবা নিছক প্রশংসাপত্র নহে। তাহার পর, বৈদিক এবং স্মার্ত্ত উভয় মতে, অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি অবলম্বন করিয়া বৃষোৎসর্গের আয়োজন করা হয়। শাস্ত্রীয় বৃহৎ ব্যাপারে যে, একজন 'ধারক' থাকে, এ ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন হয় না; কেন না কোন বিষয়ই যাচাই করিয়া তাহার যাথার্থ্য নিরূপণ ইঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। সম্ভবতঃ ইঁহাদের বিশ্বাস যে,—ধর্ম্ম বল, সত্য বল—কলিযুগে তাহার তিনপাদ বিলুপ্ত হইয়াছে। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা পাঠককে এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সম্প্রতি "নাট্য-প্রতিভা-সিরিজ" নাম দিয়া তিনখানি "জীবনী" বাহির হইয়াছে; যথা,—গিরিশচন্দ্র, তিনকড়ি, অমরেন্দ্রনাথ। উদাহারণগুলি আমরা এই তিনখানি পুস্তক হইতে গ্রহণ করিলাম। তিনখানির কোনখানিতেই গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু সম্পাদকরূপে বৃহদক্ষরে যাঁহার নাম ছাপা আছে, তিনি কলিকাতার "সিটি" কলেজের "বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক"। গিনি যে গিল্‌টী নহে, তাহার একটা প্রমাণ টাঁকশালের ছাপ। অপর প্রমাণ কষ্টি-পাথরের কষ। ছাপের কথা আমরা বলিলাম; অপর প্রমাণ—"কষে" কি দর যাচাই হয়, তাহাই দেখা যাক।

গিরিশচন্দ্রের জীবনীর ১৫।১৬ পৃষ্ঠায় লেখা আছে:—

"পিতৃমাতৃহীন হইবার পর তাঁহার (গিরিশের) এক 'জ্যেঠতুতো' ভগিনী গিরিশচন্দ্রের অভিভাবিকা হন। *** সিপাহীরা কলিকাতা আক্রমণ করিবে এই সংবাদ গিরিশচন্দ্রের স্নেহময়ী ভগিনীর কর্ণে পৌছিবামাত্র তিনি গিরিশচন্দ্রের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং প্রাণের ভাইটীকে নিজের অঞ্চলে ঢাকিয়াই যেন ভয়ে জড়সড় হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।"

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী লাইন আছে—

"সেই ঘোর দুর্দ্দিনে স্কুল কলেজ সকলই বন্ধ হইয়া গেল।" স্কুল কলেজ যদি বন্ধই হইয়া গেল, তবে আর গিরিশচন্দ্রের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিবার সার্থকতা কি? তবে আত্মপক্ষ সমর্থন পক্ষে এ কথা নিশ্চয় বলা যায় যে, স্নেহ কখনো কখনো বন্ধনের উপর বন্ধন দিয়া থাকে, এবং স্নেহময়ী জ্যেঠতুতো ভগিনী তাহাতে ক্রটী করিবেন কেন? কিন্তু গিরিশচন্দ্র তো কোনরূপ নিষেধে নিবৃত্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। এই পুস্তকেরই ১০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "গিরিশচন্দ্রের বাল্যকাল হইতেই কেমন যেন স্বভাব ছিল, তাঁহাকে যেটী নিষেধ করা যাইত, সেইটীই করিবার জন্য তিনি একেবারে ব্যগ্র অস্থির হইয়া উঠিতেন। শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি এইভাবে চালিত হইয়া আসিয়া-

ছেন।" ইহার আবার ফুটনোট আছে—"গিরিশচন্দ্র নিজের এই ভাবটী তাঁহার চৈতন্যলীলায় নিমাইয়ের বাল্যলীলায় বেশ পরিস্ফুট করিয়াছেন।" এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক। গিরিশ নিজমুখে বলিতেন "বুড়ো বয়েসেও আমার এ স্বভাব গেল না।" বাস্তবিক এই স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পরিণত বয়সেও তিনি সময়ে-সময়ে অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। স্নেহময়ী জ্যেঠতুতো ভগিনী স্কুলে যাইতে নিষেধ করিলে, গিরিশ যে সকল কার্য্য পরিহার করিয়া বিদ্যালয় অভিমুখে আগে ধাবিত হইতেন, তাহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তাহার পর, এ সকল কথা যে নিছক রচনা, তাহার একটা বড় প্রমাণ এই যে গিরিশের "জ্যেঠতুতো" ভগিনী কেহ ছিলেন না; কারণ তাঁহার জ্যেঠতাত নিঃসন্তান ছিলেন। আবার এর চেয়েও বড় প্রমাণ এই যে, ঐ কলিকাতা আক্রমণের জনরবটা যে সময় উঠিয়াছিল, গিরিশের পিতা তখন জীবিত; ভগিনীর অভিভাবকতার কোন প্রয়োজন ছিল না। গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে এতাবৎ যে কিছু বিশ্বাসযোগ্য জীবন-কথা বাহির হইয়াছে, তাহার কোথাও জ্যেঠতুতো ভগিনীর উল্লেখ নাই—আছে এক জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কথা। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই গিরিশের অভিভাবিকা, এবং যতদিন জীবিতা ছিলেন, সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। কিন্তু "জ্যেষ্ঠার" অর্থ "জ্যেঠতুতো" নয়, এ কথা "বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক" যে জানেন না, তাহা মুখে আনিলে পাপ, এবং কাগজে কলমে লিখিলে লাইবেল্ হয়।

"নাট্য-প্রতিভা-সিরিজের" গিরিশচন্দ্র পড়িতে-পড়িতে মনে হয়, অবিকল এই সকল কথাবার্ত্তা যেন আর কোথাও পড়িয়াছি। আমরা ঘটনার কথা বলিতেছি না—বলিতেছি, ভাব ও ভাষার কথা। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, যাঁহাকে এই পুস্তকের ১৬৭ পৃঃ ফুটনোটে গিরিশবাবুর বস্‌ওয়েল (Boswell) উপাধি দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার "গিরিশচন্দ্র" ও নাট্য প্রতিভা-সিরিজের "গিরিশচন্দ্র" হইতে দুই একটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি—কাহারও গৌরব লাঘব করিবার জন্য নহে, পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য। যথা—অবিনাশচন্দ্রের "গিরিশচন্দ্র" ১৫৪ পৃঃ—"শোক যতই তাঁহার হৃদয়ে উপর্য্যুপরি শেলাঘাত করিয়াছে, গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর প্রভা ধারণ করিয়াছে।"

নাট্যপ্রতিভা-সিরিজের "গিরিশচন্দ্র" ২০ পৃঃ—"শোক যতই তাঁহার হৃদয়ে শেলাঘাত করিয়াছে, ততই তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল হইতে আরও উজ্জ্বলতর হইয়াছে।"

অবিনাশচন্দ্রের "গিরিশচন্দ্র" ১৩০ পৃঃ—"এইরূপে যখন মাঘ মাসের অর্দ্ধেক দিন অতীত হইল, তখন সকলের আশা হইল এ বৎসর ভালয় ভালয় কাটিয়া গেল।"

নাট্যপ্রতিভা-সিরিজের "গিরিশচন্দ্র" ৯৮ পৃঃ—"এই ভাবে যখন মাঘ মাসের অর্দ্ধেক কাটিয়া গেল, তখন সকলেরই আশা হইল এ বৎসরও ভালয় ভালয় কাটিয়া গেল। কিন্তু হায়, মানুষ কত আশা করিয়া থাকে!"

উক্ত কয়েক ছত্রের পরে অবিনাশের "গিরিশচন্দ্রে" আছে —"এই দ্বিতল বৈঠকখানার সহিত গিরিশচন্দ্রের কত স্মৃতিই না বিজড়িত, ইহাই তাঁহার অধ্যয়ন-কক্ষ, ইহাই তাঁহার চিকিৎসালয়; এই স্থানে প্রত্যহ পরিচিত, অপরিচিত বহু ব্যক্তির সহিত, তাঁহার সাহিত্য ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। বহিঃসংসারের নানা দুঃখ তাপ জ্বালায় উত্যক্ত কর্ম্মক্লান্ত জীবন এই কক্ষে আসিয়া পরম শান্তি লাভ করিত। এই কক্ষই তাঁহার অমর-কবি-কল্পনার লীলা-বিলাস ভূমি! এই কক্ষই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পদধূলি বক্ষে ধারণ করিয়া গয়া গঙ্গা বারাণসীর ন্যায় তীর্থ মহিমায় মহিমান্বিত। এইখানেই অমর-মহাকবির অন্তিম শ্বাস অনন্তে বিলীন হইয়াছে।"

নাট্য-প্রতিভা-সিরিজের 'গিরিশচন্দ্রে' ৯৮ পৃষ্ঠার পর ৯৯ পৃষ্ঠায় আছে, "এই বৈঠকখানার সহিত গিরিশচন্দ্রের কত শত স্মৃতি জড়িত। ইহাই তাঁহার অধ্যয়ন-আগার, ইহাই তাঁহার চিকিৎসালয়, সংসারের নানাবিধ ক্লান্তি ও পরিশ্রান্তির পর এইখানে আসিয়াই তিনি পরম শান্তি লাভ করিতেন। এই কক্ষই তাঁহার অমর কাব্যকলার লীলা-ভূমি। এই কক্ষই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পদধূলি বক্ষে ধারণ করিয়া মহাতীর্থ হইয়া আছে। এইখানেই মহাপুরুষের অন্তিম নিশ্বাস অনন্তের সহিত মিলিত হইয়াছে।"

এই কম্বলের লোম-বাছা কাজে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। ভাষা ও ভাবের এইরূপ ঐক্য এক-আধ স্থলে নয়, বহুস্থলেই লক্ষিত হয়। যিনিই অবিনাশচন্দ্রের 'গিরিশচন্দ্র' ও নাট্যপ্রতিভা-সিরিজের 'গিরিশচন্দ্র' মনোযোগ সহকারে

পাঠ করিবেন, তিনিই এই দুইখানি পুস্তকের ভাষার অদ্ভুত ঐক্য ও "টেলিপ্যাথি"র আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। পূর্ব্ববর্ত্তীর সহিত পরবর্ত্তী পুস্তকের ভাষা ও ভাবের যে সামান্য প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, সম্ভবতঃ তাহা আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, নহিলে দুই যমজ ভ্রাতার এমন বিস্ময়কর মিল প্রায় দেখা যায় না; অথচ সাধারণ শিষ্টতার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত যেটুকু প্রয়োজন, অর্থাৎ গিরিশবাবুরবস ওয়েলের কাছে ঋণ স্বীকার করা—এ পুস্তকে তাহার নামগন্ধও নাই।

তথাপি, এই নাট্যপ্রতিভা-সিরিজে গিরিশচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে নূতন তথ্য কিছু নাই, এমন কথা কহিবার দুঃসাহস যেন কাহারও না হয়। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের সকল প্রবীণ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জীবনের সহিত গিরিশচন্দ্রের কর্ম্মজীবন অল্প-বিস্তর জড়িত ছিল, আমরা এই সিরিজের দ্বিতীয় পুস্তক 'তিনকড়ির' জীবনী হইতে ঐ সকল নূতন তথ্য প্রতিপন্ন করিব।

তিনকড়ির জীবনীর ৬৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

"নাট্যকলার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ভাবভঙ্গীর চিত্র। আমাদের মনে হয় শ্রীমতী তিনকড়ির এই ভাবভঙ্গীর বিকাশে কিরূপ দক্ষতা জন্মিয়াছে, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র 'মুকুল মুঞ্জরা' নাটকে এই তারার ভূমিকাটির অবতারণা করিয়াছিলেন"। ইহার কয়েক ছত্র পূর্ব্বেই আছে—"সেক্ষপীয়ারের নাটক বুঝিবার ক্ষমতা বঙ্গ-রঙ্গালয়ের দর্শকগণের তখনও হয় নাই দেখিয়া তিনি (৺গিরিশচন্দ্র) সে কার্য্য হইতে বিরত হইলেন এবং থিয়েটারের আয়বৃদ্ধির জন্য মুকুল মুঞ্জরা নাটক অতি সত্বর প্রণয়ন করিলেন।" এ সত্বর যে কত সত্বর তাহা স্বয়ং গিরিশচন্দ্রও জানিতেন না। এই সিরিজের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে ১৬৭ হইতে ১৭১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উল্লিখিত আছে, ম্যাকবেথের প্রথম অভিনয়-রজনী ১৬ই মাঘ এবং মুকুল মুঞ্জরার প্রথম অভিনয়-রজনী ২৪শে মাঘ ১২৯৯ সাল। এই সাত দিনের ভিতরে বৃহদাকারের একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক কল্পিত ও রচিত হইল; তার পর তাহার ভূমিকাসকল নকল করিয়া নির্ব্বাচিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের প্রত্যেককে তাহা বিতরণ, সাজ-সরঞ্জাম দৃশ্যপট প্রস্তুত, মহলা দেওয়া, সায় অভিনয় হইয়া গেল। বাজীকর যে আমের আঁটী পুতিয়া সদ্য সদ্য ফল ফলাইয়া দেয়, এ সত্বরতার তুলনায় সেও দীর্ঘসূত্রী! মুকুল-মুঞ্জরা ও আবুহোসেন দ্বিতীয়বার ম্যাকবেথ অনুবাদের যে বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল তাহা জীবনী-লেখক বা সম্পাদক না জানিতে পারেন, কিন্তু নিতান্ত তন্দ্রাতুর অবস্থায় না লিখিলে সাতদিনে এমন অসম্ভবকে সম্ভাবিত করা অসম্ভব। তার পর, জনার অভিনয় সম্বন্ধে ৬৭ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে, "গ্রন্থকার যাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই, শ্রীমতী তিনকড়ির অভিনয়-নৈপুণ্যে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।" শ্রীমতী তিনকড়ি জীবিত থাকিলে সম্ভবতঃ এ কথায় আদর হইত!

অতঃপর, করমেতি অভিনয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে পরিচ্ছদ লইয়া বিভ্রাট! ৬৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,—"প্রথম অভিনয় রজনীর রাত্রে (রজনীর রাত্রি কি রকম?) থিয়েটারে আসিয়া তিনকড়ি এই ভূমিকা অভিনয় করিতে সম্মত হয় না, কেন না করমেতি বিধবা, কাজেই করমেতির ভূমিকা অভিনয় করিতে হইলে বিধবার বেশে রঙ্গস্থলে বাহির হইতে হইবে।" তাহা করিতে তিনকড়ি অসম্মত, কেন না—তাহার "গন্ধর্ব্ব মতে বৃত পতি" (৭০ পৃঃ ফুটনোট) তখন বক্সে বসিয়া আছেন, সুতরাং গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় যে তিনকড়ি "অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া" "লালসা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক" নটনাথের চিরপ্রিয় অভিনয় সাধনা করিয়াছিল, জীবনীর ৭০ পৃষ্ঠায় আসিয়া সে ভুলিয়া গেল যে, যে ভূমিকা তাহাকে অভিনয় করিতে হইবে, তাহা বিধবার নহে; ভুলিয়া গেল যে 'আলোক' নামে তাহার স্বামী বিদ্যমান, এবং এই নাটকের অভিনয়ে অবিলম্বেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। বক্সে বাবু বসিয়া আছেন শুনিয়া সে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া গোঁ ধরিয়া বসিল, "ও-বেশে, (অর্থাৎ থান পরিয়া) কিছুতেই বাহির হইবে না"। তার পর "গিরিশচন্দ্রের নিকট যাইয়া যখন এই সংবাদ উপস্থিত হইল, তখন রাগে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল।" (৬৯ পৃঃ) তিনিও ভুলিয়া গেলেন যে, তিনকড়িকে থান পরিয়া বাহির হইতে হইবে না; ভুলিয়া গেলেন যে, তিনকড়ির জন্য দিব্য ধানি-রঙের সিল্কের উপর শল্মা চুম্কীর কাজ-করা কাল মখমলের পাড়-বসান সাটী ও বডি, সাজঘরে প্রস্তুত রহিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ সে ঐ পরিচ্ছদে সজ্জিত

হইয়া যবনিকা উঠিবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তিনিও আত্মবিস্মৃত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া "নিজেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ডাক নাপিত, আমিই আজ, (অবশ্য গোঁফ মুড়াইয়া) করমেতি সাজব"। গ্রন্থকার-বর্ণিত এই এক রজনীর কেচ্ছার কাছে "একাধিক সহস্র রজনীর" আজগুবি কল্পনা নিছক ছেলেখেলা।

ঘটনাটা আমরা জানি,—এইরূপ ঘটিয়াছিল। কথা আর কিছুই নহে,—সাজ-পোষাকের চটকের উপর তিনকড়ির বিশেষ দৃষ্টি ছিল। করমেতি ভূমিকার মহলা দিবার সময় সে গিরিশ বাবুর কাছে আবদার করে যে, "পোষাক ভাল না হইলে সে ও-পার্ট সাজবে না।" গিরিশ বাবু অগত্যা তাহাতে সম্মতি দান করেন। তাহাতে কেহ-কেহ আপত্তি করিয়াছিল যে, দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, স্বামী বড়মানুষ হইলেও যাহার কোন তত্ত্ব লয় না, তাহার কি জমকাল পোষাকে বাহির হওয়া উচিত। গিরিশ বাবু তাহাতে উত্তর দেন—"চুলোয় যাক্, পার্ট যদি ভাল ক'রে করতে পারে, ও সামান্য দোষ অডিয়েন্স (Audience) ধরবে না।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, পার্টও ঠিকমত হয় নাই। যাহাকে যে ভূমিকা অভিনয় করিতে হয়, অভিনয়কালে আপনাকে সেই চরিত্রে পরিণত করিতে না পারিলে অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না; লেডি ম্যাকবেথ, জনা প্রভৃতি তেজস্বিনীর ভূমিকায় তিনকড়ির অসামান্য ক্ষমতা ছিল; কিন্তু ভক্তির ভূমিকায় তাহার তাদৃশ অধিকার ছিল না। এই জন্যই অমন সুন্দর ভক্তি-রসাশ্রিত একখানি নাটক অধিকদিন রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই।

অবশেষে অমরেন্দ্রনাথের জীবনীতে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে ১৪।১৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"শিষ্য ও সুহৃদবর্গের প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ গিরিশচন্দ্র খালধারে খোলার ঘর ভাড়া করিয়া লাল-পেড়ে সাড়ী পরিয়া অতি গোপনে এই নাটকখানি (নসিরাম) লিখিয়া দিয়াছিলেন; পাছে গোপাললাল শীল জানিতে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি স্ত্রীলোক সাজিয়া গভীর রাত্রে এই বই লিখিতেন।" এবার আবিষ্কারের জন্য হাঁক-ডাক নাই; গিরিশচন্দ্রের বিপুল দেহ সগুম্ফ নারী সাজিয়া কেমন দেখাইয়াছিল, কে জানে! তাঁর মৃত্যুর পর জীবন লইয়া এমন টানাহেঁচড়া হইবে জানিলে গিরিশচন্দ্র যে জন্মগ্রহণ করিতেন না, এ-কথা আমরা নিশ্চিন্ত বলিতে পারি। প্রতিভার মরিয়াও সুখ নাই! আমরা শুনিয়াছি, কোন 'অনভিগম্য' স্থানে বসিয়া গিরিশ ষ্টারের জন্য "নসীরাম" লিখিয়া দিয়াছিলেন। 'অনভিগম্য' কথাটা আমরা 'তিনকড়ির জীবনীতেই পাইয়াছি। ১৪৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,—"সর্ব্বত্র তিনকড়ি অনভিগম্য" !!!

এইবার তিনকড়ির জীবনী সম্বন্ধে দু-একটা কথা আলোচনা করিব। তিনকড়ি একদিন জীবনী-লেখককে বলিয়াছিল যে, সে যখন মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ করে, তখন "নূতন স্থান, কাজেই আমার কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল; আমি গাড়ী হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে থিয়েটারের ভিতর প্রবিষ্ট হইলাম।" তিনকড়ি এক-প্রকার নিরক্ষর ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভূমিকার উক্তি ব্যতীত, তাহার মুখ দিয়া এমন সাধু ভাষা কখনই বাহির হইত না। 'প্রবিষ্ট' হইবার কথা যিনি শুনিয়াছিলেন, তিনিই বোধ করি তখন ঘোর সুষুপ্তি-মগ্ন ছিলেন। তিনকড়ির জীবনীতে প্রকাশ যে, লেডী ম্যাকবেথের পার্টে প্রমদা নাম্নী অভিনেত্রীকে বদল করিয়া তিনকড়িকে নিয়োগ করিবার ঘটনা মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ঘটিয়াছিল; তাহা নহে। তিনকড়ি যখন প্রথম 'মিনার্ভায়' যোগদান করে, তখন কলিকাতা সহরের কোন "অনভিগম্য" স্থানে 'ম্যাকবেথ' 'মুকুল মুঞ্জরা' ও একখানি অপেরার মহলা চলিতেছিল। এইখানেই তিনকড়ি প্রথম যোগদান করে, রঙ্গমঞ্চ তখনও প্রস্তুত হয় নাই। অবশ্য ইহার সাক্ষী এখনও বিদ্যমান আছে, কিন্তু তিনকড়ি অপেক্ষা ইহা কে অধিক জানিত!

সময়-সময় দেখা যায় "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" চড়ে। 'নাট্য-প্রতিভা-সিরিজের' পিণ্ডদান ব্যাপারে তাহারও ত্রুটী নাই। তিনকড়ির জীবনীতে ১৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "শ্রীমতী তিনকড়িই সিরাজদ্দৌলার "জহরা" ও মীর কাসেমের 'তারা' চরিত্রের প্রকৃত মূল উপাদান সন্দেহ নাই।" এই জীবনীত্রয়ে একটা আশ্চর্য্য 'বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন বিষয়ে লেখক অথবা সম্পাদকের সন্দেহ হয় না; যা শোনেন, যা দেখেন, সব বিশ্বাসের চক্ষে ও কর্ণে; আর লিপিবদ্ধ করেন নির্ভাবনায়। সিরাজদ্দৌলা যখন লেখা হয়, তখন মিনার্ভায় তিনকড়ি ছিল কি না তাহা একবার অনুসন্ধান করাও যুক্তিযুক্ত মনে হয় নাই।

বাস্তবিক, 'জহরার' ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল—শ্রীমতী তারাসুন্দরী। তিনকড়ির জীবনীতে ১১৫, ১১৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র কোন সময়ে বলিয়াছিলেন, "বঙ্গ-রঙ্গালয়ে এমন দিন আসিবে, যখন শিক্ষিতা অভিনেত্রী-গণ কোন থিয়েটারে যোগদান করিয়া ও কেবল এক রাত্রি অভিনয় করিয়া আশাতীত পারিশ্রমিক উপার্জ্জন করিতে পারিবে।" তারপর "তিনকড়ির উপর দিয়া সেই ভবিষ্যৎ-বাণী হরপে হরপে ফলিয়া গিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত বঙ্গ রঙ্গালয়ে আর কোন অভিনেত্রীই কেবল এক রাত্র অভিনয় করিয়া ৫০, ৬০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে নাই।" কেন পারিবে না? বহুপূর্ব্বের কথা বলি; সুপ্রসিদ্ধা সুকুমারী দত্ত ১০০ শত টাকা করিয়া প্রতি অভিনয় রজনে কত রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়াছে। এই সেদিনও শ্রীমতী নরীসুন্দরীকে প্রতিরাত্রি ৭৫ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক দিয়া সিংহল-বিজয় ও অন্যান্য নাটকে অভিনয় করান হইয়াছিল, এ কথা অনেকেই জানেন। অন্যথা বাড়াইলে মর্য্যাদার হ্রাসই হয়।

বাঙ্গলার ঔপন্যাসিক ও জীবনী-লেখকগণ মনে করেন যে, অন্তিম সময়ে একটি বক্তৃতা দিয়া দেহত্যাগ না করিলে নায়ক-নায়িকার সমস্ত জীবন একেবারে নিষ্ফল হইয়া যায়! এই অভিনেত্রী-জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত তেমনি এক নাটকীয় মহিমায় মহিমান্বিত। নটনাথকে সম্বোধন করিয়া তাহার অন্তিম শ্বাসত্যাগের বর্ণনা (১২১ পৃষ্ঠায়) কল্পনার দিক হইতে যেমন মনোরম, সত্যের দিক হইতে সেরূপ নহে; কেন না, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনকড়ির বাহ্য-চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল।

জীবনী লিখিবার সময় নায়কের জীবন-সংক্রান্ত কোন ঘটনা শুনিলে তাহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু নাট্য-প্রতিভা-সিরিজের লেখক ও সম্পাদক যে মৌলিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

অমরেন্দ্রনাথ শুনিয়াছিলেন, মাতুলালয়ে যখন তাঁহার জন্ম হয়, সেই সময় তথায় সধবার একাদশী অভিনয় হইতেছিল। জন্ম-সময় কোথায় কি হইতেছিল, তাহা অবশ্য হলপ করিয়া বলা জাতকের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। এ কথা তাঁহার জীবনী-লেখক একটু ভাবিলে ভাল করিতেন। বাগবাজার এমেচিওর পার্টি মোটে সাতবার সধবার একাদশী অভিনয় করেন। তাহা ১৮৬৯ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শেষ হইয়া যায়। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে! তবে এ কথা অবশ্য বলা যায় যে, অন্য কোন দল কর্ত্তৃক অভিনয় হইতে ক্ষতি কি? ক্ষতি নাই। কিন্তু অমরেন্দ্রের মাতুলালয়ে সধবার একাদশী যে অভিনয় হয় নাই, এ কথা ঠিক। অমরেন্দ্রনাথের স্মৃতির উপর যে কতটা নির্ভর চলে, তাহা বলিতে চাহি না; কিন্তু সম্পাদকের বিস্মৃতি যে পাঠকের ধাঁধা, তাহা নিশ্চিত বুঝিয়াছি। যে তিনখানি জীবনী লইয়া আমরা আলোচনা করিতেছি, তাহাদের লেখক সম্ভবতঃ ভিন্ন-ভিন্ন; এবং আশ্চর্য্য নয় যে, একই ঘটনা বর্ণনায় তাঁহাদের পরস্পর সামঞ্জস্য না থাকিতে পারে; কিন্তু এই সিরিজের সম্পাদক এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁহার কর্ত্তব্য, কোন্‌টি ঠিক, অনুসন্ধানে তাহা নির্ণয় করিয়া পাঠককে আলোক প্রদান করা। গিরিশচন্দ্রের জীবনীর ৭০ পৃষ্ঠায় বিবৃত আছে, "কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সহিত গিরিশচন্দ্রের যে-দিন প্রথম আলাপ হয়, সেইদিন তিনি তাঁহাকে বলেন, আপনার পলাশীযুদ্ধের 'দ্রুম করে দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি' লাইনটি লর্ড বাইরণের Childe Harold হইতে গৃহীত'। তারপর গিরিশচন্দ্র বলেন, অনুবাদ ঠিক হয় নাই। কি হইলে ঠিক হয় নবীন জিজ্ঞাসা করিলে গিরিশ বলিয়াছিলেন, এইরূপ হ'লে বাইরণের ভাব কতকটা থাকে—

"নিকট প্রকট ক্রমে বিকট গর্জ্জন
অস্ত্র ধর অস্ত্র ধর, কামান ভীষণ।"

গিরিশচন্দ্রের জীবনীতে এ ঘটনা সম্বন্ধে অমরের নামগন্ধ নাই; কিন্তু অমরেন্দ্র-জীবনীর ৩১।৩২ পৃষ্ঠায় অমরেন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, "এই ঘটনার কিছুদিন পরে (অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র নবীনের সহিত অমরের আলাপ করাইয়া দিবার কিছুদিন পরে) নিমন্ত্রিত হইয়া আমি কবিবরের বাটীতে গমন করিলাম। * * * পলাশীর যুদ্ধের কথা উপস্থিত হওয়ায় গিরিশবাবু কবিবরকে 'দ্রুম করি দূরে তোপ গর্জ্জিল আবার' এই পংক্তিটী সম্বন্ধে বলিলেন যে, ইহা Lord Byronএর Childe Haroldএর 3rd. cantoর 22nd. stanza হইতে অনুকৃত।" অনূদিত নয় অনুকৃত!

তারপর গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি ছিল বটে—যদিও গিরিশচন্দ্রের জীবনীতে তাহার আভাস পাওয়া যায় না;—কিন্তু কথায়-কথায় একবারে Canto, stanzaর সংখ্যা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ,—তাও আবার নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া! যাহাই হউক, "গিরিশবাবু নবীনবাবুকে জানাইলেন যে, তাঁহার বিবেচনায় অনুবাদটী তেমন পরিস্ফুট হয় নাই।" তারপর নবীনবাবু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশ অনুবাদ করিলেন—

"নিকটে বিকট পুনঃ বিপুল গর্জ্জন
যে যেখানে অস্ত্রধর কামান ভীষণ!"

শেষোক্ত বর্ণনা ঠিক কি না তৎপক্ষে সন্দেহও ভীষণ! তবে ব্যাপারটা না কি পলাশীর যুদ্ধ সংক্রান্ত,—সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে না থাকিতে পারে। কোথায় ১৭৫৭ আর ১৯১৯—দীর্ঘ ব্যবধান! কিন্তু ৯৮ হইতে ১১৩ পৃষ্ঠার ব্যবধানে যে এমন ওলোট-পালট হইতে পারে, তাহা ঐ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ন্যায় বিচিত্র। এ বিভ্রম ও বিভ্রাট তিনকড়িকে লইয়া। তিনকড়ির জীবনীর ৯৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "শ্রীমতী তিনকড়ি আবার ন্যাশনেল থিয়েটারে যোগদান করিল।" অপিচ, ১১৩ পৃষ্ঠায়—"সে অবিলম্বে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিল"—উভয় ঘটনাই তিনকড়ি কাশী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর। যদি দুই উক্তিই সত্য হয়, তথাপিও একটা কথা আছে। থিয়োসফিষ্টগণ বলেন, আমাদের দুইটা শরীর—একটা স্থূল, একটা সূক্ষ্ম। এখন কোন্ দেহ কোন্‌টায় যোগ দিয়াছিল?

যাক! এখন অমরেন্দ্রনাথের জীবনী সম্বন্ধে আর দুই-একটা কথা বলি। গিরিশচন্দ্রের জীবনীতে আছে (৫৯-৬০ পৃষ্ঠায়) "গিরিশচন্দ্র কর্ম্মবীর মহাপুরুষ ছিলেন।" "তিনি প্রত্যেক থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীরই কল্যাণ সাধনের জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন; কিন্তু মোসাহেবের কুপরামর্শে যখনই তাঁহারা গিরিশবাবুর মঙ্গল-ইচ্ছা বুঝিতে পারেন নাই তখনই তাঁহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। * * *" "১৩১১ সালের আশ্বিন মাসে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া পৌষ মাসে আবার মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিলেন।" পড়িলে মনে হয় না কি যে, মোসাহেবদিগের কুপরামর্শে অমরেন্দ্র গিরিশচন্দ্রের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়াছিলেন? নহিলে ক্লাসিকের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদের কথা বলিবার সময় হঠাৎ এ তথ্য অবতারণার উদ্দেশ্য কি? কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের জীবনীর ৫৬।৫৭ পৃষ্ঠায় ক্লাসিকে 'পাণ্ডব গৌরব' খুলিবার পরে মহাপুরুষ গিরিশ অমরেন্দ্রকে বলিতেছেন, "আমার জন্যই তোমার থিয়েটার এখন চলিয়াছে। * * * সুতরাং তোমার আমাকে লাভের একটা অংশ প্রদান করা উচিত, তাহা না হইলে আমি তোমার থিয়েটারে থাকিতে পারিব না।" এ কথায় স্বাধীনচেতা অমরেন্দ্র যে উত্তর দিলেন, তার শেষ কথা এই, "আমায় মাপ করিবেন, প্রাপ্য দেয়াতিরিক্ত লাভের অংশ দেওয়া অসম্ভব।" এ সংবাদ আমরা জানিতাম না। গিরিশবাবুর বসোয়েল্, যিনি গিরিশচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবনের শেষ পনের বৎসর "সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তাঁহার নিকট থাকিতেন" তিনিও এ পর্য্যন্ত এ কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। অমরেন্দ্রের জীবনীতে আছে (৫৭ পৃষ্ঠা) "সেদিন আবার দোল, সর্ব্বত্র আবিরের ছড়াছড়ি।" ইহা রক্তারক্তির ইঙ্গিত কি না, কে বলিবে! কিন্তু একটা কথা জানিতে ইচ্ছা করে যে, এ সকল কথা নাট্য-প্রতিভা সিরিজের গিরিশচন্দ্রে নাই কেন?

এইবার অমরেন্দ্রনাথের জীবনী-সংক্রান্ত একটী গুরুতর অথচ সঙ্কোচ-সঙ্কুল বিষয় আমরা আলোচনা করিব। অমরেন্দ্র এখন বাদ-প্রতিবাদের অতীত দেশে। এখানকার সত্য মিথ্যায়, সুখ্যাতি-নিন্দায়, তাঁহার আর কিছুই আসে যায় না। তথাপি কথাটা না তুলিতে হইলে ভাল হইত; আর সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইত লেখক বা সম্পাদক যদি এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিতেন। তিনি যখন তুলিয়াছেন, তখন সত্যের অনুরোধে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। কথাটা এই 'হরিরাজ' নাটকের প্রণেতা কে? বহুবার অভিনয়ে 'পলাশীর যুদ্ধে' দর্শকের অরুচি জন্মিয়াছে দেখিয়া অমরেন্দ্র একখানি নূতন নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়া দেন এবং অতি শীঘ্রই একখানি নূতন নাটক রচনা করেন। এই নাটকখানির নাম হরিরাজ। এইখানে ক্রস মার্কা দিয়া ফুটনোট আছে "নাটকখানি সম্পূর্ণ নাট্য-সম্পৎপূর্ণ, সুতরাং অমরেন্দ্র বাবুর ন্যায় অপরিপক্কবুদ্ধি নবীন লেখক দ্বারা বিরচিত বলিয়া বিশ্বাস

করিতে প্রবৃত্তি হয় না"। এখানে জিজ্ঞাস্য, বিশ্বাসটা কার? লেখকের, সম্পাদকের, না পাঠকের? সম্ভবতঃ পাঠকের, কেন না অব্যবহিত পরেই প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হইয়াছে—"হরিরাজ নাটকই অমরেন্দ্র বাবুর শ্রেষ্ঠ নাটক।" কিন্তু, একটু অনুসন্ধান করিলে কেহ সাদায় কালি দিয়া এ সকল কথা লিখিতে সাহস করিতেন না। সম্ভবতঃ, হরিরাজ অমর গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভূত দেখিয়া লেখক ও সম্পাদক এই লজ্জাজনক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। একটু অনুসন্ধান করিলে লেখক এবং সম্পাদক উভয়েই জানিতে পারিতেন যে, ক্লাসিকে যে সময় "হরিরাজ" রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইঁহারা ভেরী-নিনাদ করিতেছেন, তাহার বহু পূর্ব্বে এই কলিকাতা নগরীতে সেই নাটক একটী অবৈতনিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বহুবার অভিনীত হইয়াছিল। সিটি থিয়েটারের দল যেমন 'মিনার্ভার বীজ, Victoria Dramatic Club নামীয় এই অবৈতনিক সম্প্রদায় ও তাহার সাজ-সরঞ্জাম, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিও তেমনি ক্লাসিকের ভিত্তি। এই দল রামবাগানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুবিখ্যাত মিঃ পালিত প্রভৃতি ইহার অভিনেতা ছিলেন এবং স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর সময়-সময় ইহার শিক্ষকতা করিতেন। এই দলেই হরিরাজের প্রথম অভিনয় হয়। ইহার রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী—এক্ষণে পরলোক গত। ইনি পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষের ভাগিনেয়। ১৩০২ সালে গ্রেট ইডেন্ প্রেসে হরিরাজের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় এবং তাহার প্রকাশক ছিলেন সুরেশচন্দ্র বসু। এ সংস্করণে অমরবাবুর নাম-গন্ধও নাই এবং ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধও ছিল না। সুরেশ বাবুর তহবিলে যে তাহা জমা হইত, তাহা সুরেশবাবুর খাতা পরীক্ষা করিলে অনায়াসে জানা যায়।

হরিরাজে কেন যে নগেনবাবু আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাহা জানা নাই। কিন্তু প্রথম সংস্করণে রমানাথ বাবুর উদ্দেশে যে উৎসর্গ-পত্র আছে, আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন যে, তাঁহার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি হরিরাজের রচয়িতা।

"যে অসীম স্নেহঋণে
বাঁধা আছি শ্রীচরণে
কণামাত্র প্রতিদান শকতি কোথায়।
অতীতের দ্বার খুলি
শৈশবের স্মৃতিগুলি
ফুটে উঠি সে ঋণের গুরুত্ব বাড়ায়।"

৺রমানাথ ঘোষের বাটীতে যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী কর্ত্তৃক হরিরাজের অভিনয় হয়, তাঁহাদের নামের তালিকাও আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

হরিরাজ—৺চন্দ্রনাথ সেন (ইনি ক্লাসিকেও অমরেন্দ্রনাথের পরিবর্ত্তে সময়ে সময়ে হরিরাজ সাজিতেন)

জয়াকর—শ্রীমনীন্দ্রনাথ মণ্ডল (পরে ক্লাসিকেও অভিনয় করেন)

কুলধ্বজ—৺গোষ্ঠচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দধিমুখ—৺ভোলানাথ দে

শ্রীলেখা—ছোটরাণী (পরে ক্লাসিকে)

ইত্যাদি ইত্যাদি।

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় হরিরাজের সঙ্গীতগুলিতে সুর-যোজনা করেন এবং তাঁহার প্রদত্ত সুরেই ক্লাসিকে ঐ সকল সঙ্গীত গীত হইত।

কিরূপ যত্ন ও সতর্কতার সহিত এই নাট্য-প্রতিভা-সিরিজ সম্পাদিত হইতেছে, উপসংহারে তাহার একটী হাস্যকর উদাহরণ না দিয়া এ আলোচনা শেষ করিতে পারি না—

তিনকড়ির জন্ম অনুমান ১২৭৭ এবং তাহার মৃত্যু ১২২৪ সালে, অর্থাৎ জন্মিবার ঠিক ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে! এ ভুলটা ও Marchant of Voice (১৩৮ পৃষ্ঠা) যেন ছাপাখানার ভূতের ঘাড়ে চাপান যায়; কিন্তু অন্যান্য প্রমাদ যে কোথায় কাহার স্কন্ধে চাপিবে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমাদের এখনও আর একটা প্রশ্ন আছে। এই সকল জীবনী উপন্যাস সিরিজের অন্তর্গত না করিয়া বিভিন্ন সিরিজভুক্ত করিবার তাৎপর্য্য কি? এই সকল জীবনীতে কল্পনার অবাধ বিহার ও কলমের যথেচ্ছাচার দেখিয়া আজ রাহু জীবিত থাকিলে 'মিঠেকড়া'র ভাষায় বলিতেন—"তাও ছাপালি, গ্রন্থ হল, নগদ মূল্য এক টাকা"।

মৃতের শ্রাদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া এই সিরিজে এখন জীবিতের শ্রাদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। যাঁহাদের শ্রাদ্ধ, তাঁহারা বুঝিবেন।

পশ্চিম-তরঙ্গ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

গভীর কত সাগর-জল?

কিছুদিন আগেও এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলতে বাধ্য হতেন, "কি জানি তা; শুনেছি অতল!" কিন্তু এখন 'সমুদ্রমান' (Marimeter) যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই লোকে ব'লে দিতে পার্বে, কোন্ সাগরতল কত গভীর। এই 'সমুদ্রমান' যন্ত্র থেকে একটা শব্দ-তরঙ্গ (Sound wave) একেবারে সমুদ্রের তলা পর্য্যন্ত ছুটে যায়; আবার সেখান থেকে তার একটা প্রতিধ্বনি উপরে ফিরে আসে। ঐ শব্দ-তরঙ্গ যখন সমুদ্রের নীচে নামে, আর তার একটা প্রতিধ্বনি আবার উপরে উঠে আস্তে থাকে, সমুদ্রমান যন্ত্র তখন সেই শব্দ তরঙ্গের যাওয়া-আসার সঠিক সময়টুকুরও একটা হিসাব রাখে। পরে সেই হিসেব দেখে সহজেই সমুদ্রের গভীরতা স্থির হোতে পারে। কারণ, শব্দ যখন জলের ভেতর চলাচল করে, তখন তার গতির কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না; বরাবর ঠিক একসমান বেগে যাতায়াত করে। (প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৪০০০ ফিট চলে।) সুতরাং ঐ শব্দ-তরঙ্গের সমুদ্র-তলায় যেতে আসতে কতটা সময় লাগ্‌ল, জানতে পারলেই, সাগরের গভীরতার একটা খুব সোজা হিসেব পাওয়া যায়।

(Literary Digest.)

২। ভূগোলের ভুল ছবি!

পৃথিবী গোল; কিন্তু তার মানচিত্র আঁকা হয়, একখানা চৌকো কাগজে চ্যাপ্টা ভাবে; কাজেই পৃথিবীর সে মানচিত্র কিছুতেই সঠিক হয় না। অনেক সময়ে ভূগোলের এই বেঠিক মানচিত্র লোকের বিস্তর ক্ষতির কারণ হ'য়ে পড়ে। একবার ক্যালিফোর্ণিয়ায় এই রকম হ'য়েছিল। 'মণ্টেরী' বন্দরের কিছু দূরে একখানা জাহাজ চড়ায় আটকে গেছল। তারা এজেণ্টকে খবর পাঠালে যে, শিগ্‌গীরই যেন কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে একখানা পোতত্রাণ (wreoker) পাঠান হয়। এজেণ্ট দেখলে, মোটে দু'খানি পোত-ত্রাণ হাতে আছে,—একখানি 'আকাপুল্কো'-য়, আর একখানি 'জুনো'য়। তাড়াতাড়ি একখানা ম্যাপে দেখে নিলে, কোন জায়গাটা বেশি কাছে। ম্যাপ দেখে এজেণ্টের মনে হো'ল, যেন 'আকাপুল্কোটাই' বেশি কাছে। তিনি অমনি 'আকাপুল্কোয়' টেলিগ্রাম করলেন! ভূগোল অনুসারে যদিও 'জুনো'ই বেশি কাছে,—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চ্যাপ্টা ম্যাপ আঁকার দোষে জুনোটাই দূরে বলে মনে হয়েছে। ফলে 'আকাপুল্কো' থেকে সাহায্য আসবার আগেই রুদ্র সমুদ্রের বিরাট তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাতে জাহাজখানি গুঁড়ো হ'য়ে গেল! জাহাজখানা নষ্ট হওয়ার যে ক্ষতিটা হ'ল, সেটা কেবল ঐ ভূগোলের ভুল ছবির জন্যে। কারণ, ঐ ম্যাপে বিষুবরেখা থেকে মেরু প্রান্তের দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে—কিন্তু ঐ ম্যাপখানি যদি ঠিক করে আঁকা হো'তো, অর্থাৎ গোলাকার পৃথিবীটাকে চারফলা কোরে কেটে, তার পর তাকে চ্যাপ্টা কোরে এঁকে দেখান হোতো, তা হোলে আর কোন জাহাজ-কোম্পানীর এজেণ্টের পক্ষে অমন মারাত্মক রকম ভুল করার সম্ভাবনা থাক্‌তো না।

(Literary Digest.)

৩। বীরের ভূষণ।

পৃথিবীর সভ্যতার সেই আদিম যুগের ইতিহাস থেকে আজ পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্চে যে, কটি-লম্বিত কৃপাণই সকল দেশের সকল বীরের যেন একমাত্র বাঞ্ছিত অঙ্গ-ভূষণ। ওটা যেমন তাদের পক্ষে একটা মস্ত গৌরবের বস্তু, তেমনিই সবচেয়ে শোভনও বটে। তাই বোধ হয় বীরত্বের পুরস্কার দিতে হ'লে, বীরেন্দ্র-বৃন্দকে সর্ব্বাগ্রে বহুমূল্য অসি উপহার দিতে হয়। এইটেই সকল দেশের একটা সনাতন প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের চারজন মিত্রপক্ষীয় প্রধান সেনাপতিও তাঁদের বীরত্ব আর রণ-কৌশলের জন্যে চারখানি অসাধারণ অসি উপহার পেয়েছেন। তাঁরা জোফ্রে, জেনারেল 'জোফ্রে',

'ফশ্', 'প্যার্শিং' আর 'পীতেন্'। 'জোফ্রে'কে যে তরবারিখানি উপহার দেওয়া হোয়েছে, তার সোনার বাঁট, তাতে মীনের কাজ করা। বাঁটের গায়ে নানা রকম শিল্প-কার্য্য আছে। তার মধ্যে সব চেয়ে প্রধান হচ্ছে, "প্যারী সহর" (The City of Paris) নামে একখানি জাহাজের 'নামলিপি'র (Escutcheon) অনুকৃতিটি। টক্‌টকে লাল জমীতে ছোট্ট জাহাজখানির শুভ্র রূপোলী তলা, ওপরে রূপোর সাদা পাল নীল আকাশের গায়ে উড়ছে! আকাশের গায়ে চিত্রিত ফ্রান্সের হ্রদ-কমল যেন তারাদলের মত ফুটে রয়েছে! বাঁটের মাথার ওপর সোনার 'ওক্'-পাতায় তৈরী একটী চমৎকার বিজয়মুকুট! প্যারী সহরকে জার্ম্মাণীর আসন্ন ও অনিবার্য্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে প্যারীর অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে, তাদের গভীর কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই অসিখানি ওই প্রবীণ মহারথীকে উপহার দিয়েছে। 'ফশের' তরবারিখানিরও সোনার বাঁট; কিন্তু তাতে বেশি কারুকার্য্য নেই; কারণ, 'ফশ' নিজে বড় সাদাসিধে লোক;—তাই তাঁর চরিত্রের এই দিকটায় লক্ষ্য রেখে শিল্পী যতদূর সম্ভব তার কারুকলাটুকু আড়ম্বরহীন করবার চেষ্টা কোরেছে। বাঁটের যে অংশটুকু মুঠোর মধ্যে থাকে, সেখানে ফ্রান্সের রূপ কল্পনা কোরে, তার একটি প্রতিমূর্ত্তি খাড়া কোরে দেওয়া হোয়েছে। এই মূর্ত্তির পায়ের নীচে 'আলসেস্', 'লোরেণ' দুই ভগিনী যেন বিজয়িনী জননীর মুখের পানে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে চেয়ে আছে! বাঁটের মাথার ওপর যোদ্ধার শিরস্ত্রাণ। তার চার ধারে আবার রণযাত্রী বীরবৃন্দের অভিযান আঁকা! বাঁটটি মুটো কোরে ধরলে হাতের মুঠোর ওপর দিয়ে যে অর্দ্ধচন্দ্রের মত একটি বৃত্ত অসিমূল থেকে বাঁটের শেষ পর্য্যন্ত ঘুরে যায়, সেখানে দেবী জয়শ্রীর মূর্ত্তি পরিকল্পনা করা আছে। জেনারেল ফশ ফ্রান্সের যে প্রদেশে জন্মেছিলেন, সেই প্রদেশের অধিবাসীরা তাদের আপন অঞ্চলের এই মহাবীরের সম্মানের জন্য, তাঁকে সগৌরবে এই অপূর্ব্ব অসি উপহার দিয়েছে। মার্শেল 'পীতেনে'র সুবর্ণ অসিমূলে ফরাসী-জাতীয়-পতাকা ধারণ করে, মূর্ত্তিমতী প্যারীনগরী যেন দু'হাতে একটি বিজয়-মালা ধারণ ক'রে, বীরবরকে বরণ কর্ব্বার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পদতলে প্যারী সহরের নামলিপি খোদিত পোত-প্রতীক্ (Symbolic ship of the Paris Escutcheon); অপর দিকে প্যারীর রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদাজ্ঞাপক কৌলীন্য-নিদর্শন (Coat of Arms)। এগুলি সমস্ত মীনের কাজ করা। বাঁটের গায়ে প্লাটিনাম্-নির্ম্মিত বন্ধনীর মধ্যে জহরতের কাজ করা 'সপ্তর্ষি-মণ্ডল' ঝকমক্ কর্চ্ছে। জেনারেল 'পার্শিং'কে লণ্ডন সহর সসম্মানে যে স্বর্ণমণ্ডিত তরবারি উপহার দিয়েছে,—তার সেই বহুমূল্য কারুকার্য্য-খচিত বাঁটের একদিকে শ্রীমতী 'ব্রিটানিয়ার' প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে,—অপর দিকে 'স্বাধীনতার' প্রতিমা অঙ্কিত। লণ্ডন সহরের ও আমেরিকার রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদাজ্ঞাপক কৌলীন্য-নিদর্শন ও মূর্ত্তিমতী লণ্ডন নগরীও খোদিত করা আছে। হাতোলের নীচেই সেনাপতির নামাক্ষর (monogram) কয়টী মণিমুক্তা ও হীরকে খচিত করা হয়েছে।

(Literary Digest.)

৪। অদৃষ্টপূর্ব্ব খবরের কাগজ

প্যারী সহরের ছাপাখানার কর্ম্মচারীরা যখন সকলে ধর্ম্মঘট ক'রে একসঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দিলে, তখন প্যারীর বড়-বড় দৈনিক খবরের-কাগজওয়ালারা স্ব-স্ব পত্রিকা প্রকাশের উপায়ান্তর না দেখে, সকলে মিলে একজোটে একখানা এক ফর্দ্দ কাগজ বার করতে সুরু করেছিল। সেই সময়ের কয়েকখানি বিখ্যাত সংবাদ-পত্রের ঐ একখানি মাত্র সম্মিলিত সংখ্যা পৃথিবীর খবরের কাগজের ইতিহাসে এক অদ্ভুত নূতন কাণ্ড! এই কাগজখানির নাম দেওয়া হয়েছিল "প্যারীর সংবাদপত্র" (La Presse de Paris)। যে ক'দিন ধর্ম্মঘট চলেছিল, তার মধ্যেই কাগজখানি একফর্দ্দ থেকে ক্রমে চার পাতায় দাঁড়িয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশখানি খবরের কাগজের স্বত্বাধিকারীরা একত্র মিলিত হ'য়ে, অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমে, এই একখানি কাগজ প্রকাশ ক'রতে সমর্থ হয়েছিল। কাগজখানির একপৃষ্ঠায় কেবল বিজ্ঞাপন থাক্‌তো, অন্যান্য পৃষ্ঠায় সমস্ত সম্মিলিত সংবাদপত্রের প্রত্যেকের এক-একটী বিভিন্ন সম্পাদকীয় স্তম্ভ, আর প্রধান-প্রধান জরুরী খবরগুলি। এই কাগজখানি জনসাধারণের খুব পছন্দ হ'য়েছিল; কারণ, তারা একখানি কাগজ কিনেই পঞ্চাশখানি কাগজের মতামত জানতে পাচ্ছিল। আমেরিকায় যখন এই ছাপা-

খানার হাঙ্গাম বাধে, তখন আমেরিকার কাগজওয়ালারা হাতের লেখা 'লিথো' কোরে, আর লিপিযন্ত্রের (Type-writer) সাহায্যে তাদের কাগজ প্রকাশ ক'রেছিল। সেও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে কেউ কখনও পূর্ব্বে এরকম হ'তে দেখেনি। আমেরিকার আবিষ্কৃত এই নূতন ধরণের উপায় দেখে এখন অনেকে বল্ছেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে ছাপাখানার অস্তিত্ব আর থাক্‌বে না; ক্রমে সমস্ত পত্র, পত্রিকা, গ্রন্থ প্রভৃতি এই 'লিপিযন্ত্র' কিম্বা 'লিথোগ্রাফে' ছাপা হবে।

৫। ফসলের খবর

আমেরিকার সরকারী কৃষিবিভাগ থেকে আগামী বৎসরের ফসল উৎপন্নের একটা আনুমানিক হিসাব পূর্ব্বাহ্নেই প্রকাশিত হয়। এই আগামী বর্ষের ফসল-সম্ভাবনার সরকারী হিসাবটা যত শীঘ্র সম্ভব জান্‌বার জন্য অনেক কারবারী লোক উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করে। কৃষি-বিভাগে ১০জন ফসল সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অভিজ্ঞ লোক-ভিন্ন-ভিন্ন ফসল আগামী বৎসর কি পরিমাণ উৎপন্ন হ'তে পারে, তার একটা সঠিক হিসাব প্রস্তুত কর্ব্বার জন্য নিযুক্ত আছেন। আর তাঁদের সাহায্য কর্ব্বার জন্যে প্রায় ১৭৫০০০ হাজার লোক বিভিন্ন প্রদেশের চাষবাসের সন্ধান কোরে তাঁদের কাছে খবর পাঠাচ্ছেন। চাল, দাল, তূলো, তামাক প্রভৃতি পণ্যের ব্যবসায়ীরা আস্‌ছে বছরের ফসলের হিসেবটা একটু আগে জান্‌বার জন্যে অনেক টাকা খরচ করতেও প্রস্তুত থাকে। কারণ খবরটা জান্‌তে পারলে, কোন্ ফসলটা কি রকম জন্মাবে দেখে, তারা আস্‌ছে বছরের বাজার-দরটা সহজেই অনুমান করতে পারে,—আর সেই বুঝে মাল কেনা-বেচা কোরেও বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিতে পারে। এজন্য অনেকে প্রচুর ঘুস প্রভৃতি নানা অসদুপায় অবলম্বন কোরতেও পশ্চাৎপদ হয় না! তাই কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকেন, পাছে কোনও রকমে সরকারী 'রিপোর্ট' প্রকাশ হবার আগে, বিশেষজ্ঞদের আগামী ফসলের হিসাব-নিকাশটা ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে! হিসাব প্রকাশ হবার দিন সকাল থেকেই দলে-দলে খবরের কাগজের সংবাদদাতারা (Reporters) সরকারী কৃষি আপিসে এসে অপেক্ষা করে। আপিসঘরের দোর-জানলা বন্ধ কোরে হিসাবের খসড়া রাখা হয়। তার পর কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যে মুহূর্ত্তে হিসাবটা সাধারণ্যে প্রকাশ করা হো'ক বলে অনুমতি দেন, অমনি সংবাদদাতাদের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়ে যায়! সকলেই যে যার নিজের কাগজে সবার আগে খবর পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হোয়ে পড়ে। তাদের আর সংবাদ নিয়ে আপিসে ফিরে যাওয়ার ফুরসৎ হয় না, 'টেলিফোঁ' কোরে খবরটা যে যার কাগজে পাঠিয়ে দেয়। রিপোর্টের কাগজখানা হাতে কোরে ধ'রে, কাণ খাড়া কোরে তারা নিজের-নিজের টেলিফোঁর দিকে ফিরে তৈরী হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে; যেমন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির হুকুম পায়, অমনি ছুটে গিয়ে যে যার কাগজে টেলিফোঁ কোরতে থাকে। তাদের ভেতর যেন এক জীবন-মরণ সংগ্রাম চলে। যার খবর পাঠাতে একটু দেরী হবে, তারই চাক্‌রী যাবে; কারণ কাগজওয়ালাদের ভেতর কে সর্ব্বাগ্রে এই ফসলের খবর প্রকাশ কোরতে পারে, তাই নিয়ে সেদিন একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে।

(Literary Digest.)

৬। আমেরিকায় 'খলিফাৎ' আলোচনা

ভারতবর্ষে "খলিফাৎ" সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানের যে সম্মিলিত আন্দোলন চলেছে, আমেরিকায় অনেক কাগজে মধ্যে-মধ্যে তার খবর প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি Literary Digest নামক আমেরিকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক কাগজখানি এ সম্বন্ধে প্রায় একপৃষ্ঠাপূর্ণ প্রবন্ধ ও "When the East prays against the West" নাম দিয়ে 'হরতালের' দিন দিল্লীর জুম্মা মসজিদে সহস্র-সহস্র হিন্দু মুসলমান একত্র সমস্ত ঐহিক কাজ ফেলে রেখে, উপবাস ব্রত পালন করে, শুদ্ধ সত্ব সংযত চিত্তে ভগবানের দরবারে নতশিরে দাঁড়িয়ে হৃদয়ের যে করুণ প্রার্থনা নিবেদন করে দিয়েছিল, তারই একখানি সুন্দর ছবি প্রকাশ কোরেছে!

প্রবন্ধটীর আগাগোড়া বেশ একটু সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতার "অমৃতবাজার পত্রিকা" ও মান্দ্রাজের "নিউ ইণ্ডিয়া" কাগজ থেকে তারা এখানকার অনেক কথা উদ্ধৃত ক'রে দিয়েছে। প্রবন্ধটী অত্যন্ত দীর্ঘ ব'লে তার সমস্ত অনুবাদ দেওয়া অসম্ভব; এখানে কেবল তার একটু সারমর্ম্ম দেওয়া গেল:—"বিশাল সাগরতুল্য এক বিচিত্র বিরাট জনসঙ্ঘ মসজীদ প্রাঙ্গণে সম্মিলিত

হইয়া, আবেগ-কম্পিত হৃদয়ে ঈশ্বর-আরাধনা করিতেছে,—এরূপ মহান্ দৃশ্য প্রাচ্য জগতের বহির্ভাগে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; এমন কি পৃথিবীর পূর্ব্বখণ্ডেও এমন অসাধারণ ব্যাপার সচরাচর বড় একটা কেহ দেখিতে পায় না। তুর্ক সাম্রাজ্যের বিভেদ ও সুলতানের রাষ্ট্রীয় শক্তি খর্ব্ব করার বিরুদ্ধে মোস্লেম জগতের প্রতিবাদ স্বরূপ এই বিপুল আন্দোলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া এই ব্যাপারটি আজ বিশেষভাবে পাশ্চাত্যবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই আন্দোলন হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, খৃষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বী কোন শক্তি মুসলমানের স্বধর্ম্মী কোন রাজ্যের অভিভাবক হইবে, ইহাতে তাহারা একেবারেই সম্মত নয়। এমন কি মিত্রশক্তির পক্ষপাতী আরব-অধিপতিকে 'ইস্লাম্' ধর্ম্মের খলিফা নির্ব্বাচিত করা ও পবিত্র 'হজ' তীর্থ তাঁহার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করাতেও তাহাদের বিশেষ আপত্তি আছে। তুরস্কের সুলতান্কেই তাহারা চিরপ্রথা অনুসারে খলিফের পদে অভিষিক্ত দেখিতে চায়, এবং সুলতানের রাষ্ট্রীয় শক্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম তাহারা ইচ্ছা করে না। এই জন্যই ভারতের সাতকোটী মুসলমান প্রজা তাহাদের হিন্দু ভ্রাতাগণের সহিত মিলিত হইয়া আজ এমন প্রবল প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়াছে।"

৭। য়ুরোপে পঞ্জাবের কথা।

এদেশের খবর বড় একটা য়ুরোপের লোক জান্তে পায় না। তবে নিতান্ত কোন রকম কিছু অসাধারণ ব্যাপার ঘটলে সে দেশের কাগজওয়ালারা তার খবর দেবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তার পনর আনাই মিথ্যা খবর। এই যেমন আমেরিকার "Review of Reviews" কাগজে পাঞ্জাবের ব্যাপার সম্বন্ধে যা লিখেছে—তা একেবারেই হাস্যকর! যথা—

REVOLUTION IN INDIA

Last April there was a revolution which affected the provinces of Bombay, Bengal, the Punjab, and the United Provinces. Hundreds of lives have been lost on both the sides. It is admitted that the Sixth City of Amritsar was a scene of serious troubles. Many English banks were looted by the revolutionists, and the entire city was in their hands for about a week. The northern section of Calcutta was in the hands of the revolutionists for two days. Bombay, Ahmedabad, Lahore, Delhi, Gurjanwala, Allahabad, and other cities were tremendously affected by riots and strikes. The Hindus, the Mahommedans, the Sikhs, the Marwaris, and other sects and creeds united in an organized opposition to the British rule in India. India's disarmed people have now been taken under control by British machine-guns, bombing planes, and armored cars.

বরং Literary Digest কাগজখানা কতকটা খবর দিতে পেরেছে বলে মনে হয়; যেমন:—

THE BRITISH "MASSACRE"
IN INDIA.

"To make a wide Impression" on the elements of discontent in the Punjab, according to their commander, Brig-Gen. R. E. H. Dyer, British and Indian troops fired without warning last April on a meeting of Indians at Amritsar, killing 500 persons and wounding about 1,500 in ten minutes. The wounded were left to die or recover in the place where they fell, because, as General Dyer explained, "That was not my job. There were hospitals." In the view of some severe British critics, General Dyer has "made a wide impression," not only in the Punjab, but also "throughout the world." and an impression which must be removed at all costs, "if our credit and honor are not to be fatally impaired." On the other

hand, certain British editors give credit to General Dyer and other British officials, civil and military, for having saved northern India from a danger comparable only to the Indian mutiny." But even these defenders of the strong hand at Amritsar regret that the British public was not allowed to know at the time all that happened in the Punjab. Full disclosure of these happenings began with the opening of an inquiry at Lahore on November 11 by a committee headed by Lord Hunter. The violent outbreaks of disorder in Calcutta, Bombay, and the Punjab, we are told, eventuated from the "passive-resistance" movement against the Rowlatt Act, which is directed at revolutionary and anarchical crime.

The appalling news from Amritsar is a revelation to the British people of what their rule in India might have come to but for the change of course set up by the measure of self-government now passing into law.

এ ত গেল আমেরিকার খবর। বিলাতের "Morning Post" আর Manchester Guardian" অবশ্য খবর কিছু পেয়েছেন ; কিন্তু তাঁরাও যা ছেপে দিয়েছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর ! যেমন—

The Rowlatt Act, a measure continuing in milder form the Defense of India Act, was made necessary by the attempts to overthrow British rule during the war. Agitators seized upon this measure, to organize an agitation which "threatened the very existence of British rule in India." Events in Afghanistan, and even in Bolshevik Russia, "may or may not have had a connection with the movement," but at all events they made the situation more dangerous. All humane men deplore such a loss of life as occurred at Amritsar, but all men of sense agree that it is a mere trifle compared with the loss of life which must certainly have occurred if these heroic men had not done as they did—and as we hope Englishmen will continue to do in similar situations." The shooting at Amritsar was preceded by earlier trouble there, in the course of which four Europeans were murdered and two banks and the town-hall were wrecked.

(*Morning Post.*)

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন লিখেছেন—

We must wait for the report of Lord Hunter's Committee in order to judge of the extent and seriousness of the disturbances which, on April 13, were at Amritsar "quenched in blood," but "it may be said at once that few more dreadful incidents can be found in the history of British rule in India than the story of their suppression." The appalling story of the shooting at Amritsar reads "as tho a madman had been let loose to massacre at large."

* * * * * * *

"It is unnecessary to recall the further incidents in Amritsar itself of public floggings, apparently without any sort of trial, and the order given by General Dyer that all native Indians passing through the street in which Miss Sherwood was attacked (including those residing in it) must go on all fours. The question for Englishmen is how far proceedings of this kind are to be regarded as necessary incidents of our Indian administra-

সমুদ্রমান নল

ভূগোলের ভুল ছবি
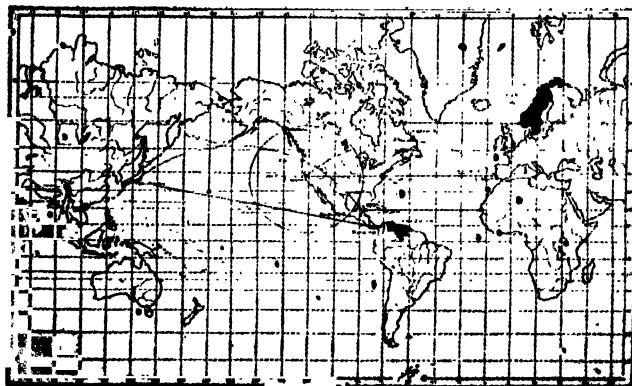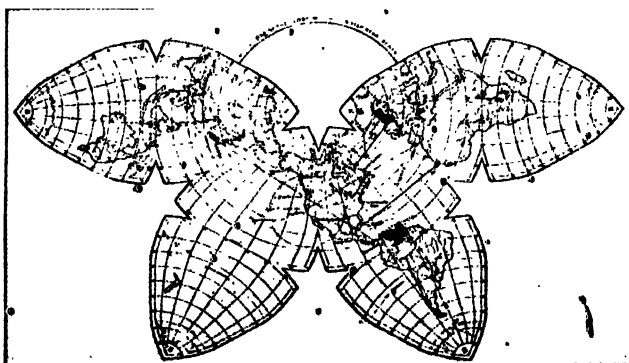
সঠিক মান-চিত্র

সেনাপতি "পার্শিং" সেনাপতি "জোফ্রে" সেনাপতি "ফস"

সেনাপতি 'জোফ্রের' অসি
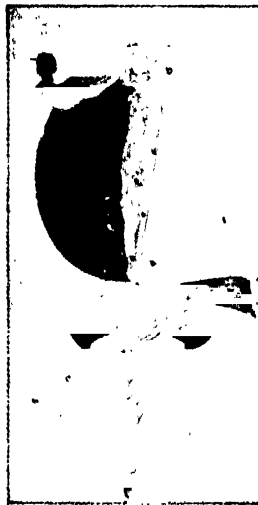
সেনাপতি ফসের' অসি

সেনাপতি 'পাঁতেনের' অসি

সেনাপতি পার্শিংএর অসি

Ce journal est publié avec le concours de tous les journaux de Paris

ANNIVERSAIRE

LA PRESSE DE PARIS

MARDI 11 NOVEMBRE 19[illegible]

N° 1. ÉDITION DU MATIN 10 Centimes

LA « PRESSE DE PARIS »

ANNIVERSAIRE

11 NOVEMBRE 1918 — 11 NOVEMBRE 1919

Une année de France en Alsace retrouvée

LONDRES A FAIT A M. POINCARÉ UN ACCUEIL INOUBLIABLE

THE COMBINED PRESS OF PARIS,

Which joined forces to break the printers' strike in the French capital, and gave the world something new in the domain of journalism. We reproduce the top part of page one, which states that "this journal is issued with the concurrence of all the newspapers of Paris"

অদৃষ্টপূর্ব্ব সংবাদপত্র

tion, and how far, when they have occurred, they are to be treated as venial errors to be lightly regarded or condoned. General Dyer appears to be an honest soldier who, however deeply disqualified for the wise exercise of the powers entrusted to or assumed by him, believed and believes that the measures he took, however dreadful, were necessary under the circumstances, and that, in fact, they saved the situation. It is quite true that, whether as a consequence or not of his action the outbreak at Amritsar had no sequel elsewhere, and that the movement of discontent died down or went underground. But that does not in any degree absolve the British Government from its responsibility."

(Manchester *Guardian*).

TRIBUNE LIBRE

L'ACTION FRANÇAISE

Le Gaulois

LE RADICAL

LA LIBRE PAROLE

La Victoire

THE EDITORIAL PAGE

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা। [এই পৃষ্ঠায় প্রত্যেক কাগজের পৃথক পৃথক সম্পাদকীয় মন্তব্য (Editorial) বাহির হইয়াছে।

SCIENTIFIC AMERICAN

Printing of the Future.

The compositors' walkout led to the appearance of this issue, in which the pages are typewritten and transferred to the stone by a photographic process. The attempt, somewhat crude tho' it be, suggests the ultimate elimination of composition and typesetting, with all the resulting economies. Some time ago the suggestion was made of using paper or metal signs, arranged in lines or columns, and photographed down to printing size. There is a long step between the present ... the commercially method of the future. Herein lies a promising field for research and inventive skill.

হাতের লেখা 'লিথোগ্রাফ' সাপ্তাহিক পত্র

The Independent

Including Harper's Weekly

THE INDUSTRIAL IDEAL

An Editorial

লিপিযন্ত্রে (Typewriter) প্রকাশিত সংবাদপত্র

এই ত গেল এক দলের কথা; বিলাতের আর এক দলের মুখপত্র লণ্ডন 'Daily News' আর এক সুরে কি বলছেন, তাও শুনুন। Daily News লিখেছেন—

It was innocently assumed in England that when the armistice was signed the reign of frightfulness was over. That assumption was wrong. * * *

"The scene of this new frightfulness is not Belgium, but India; the general responsible is not German, but British. The Government

ফসলের খবর বাহির হইবামাত্র সকলে স্ব স্ব পত্রিকায় পাঠাইবার জন্য, নানা কাগজের সংবাদদাতার (Reporters) প্রস্তুত হইয়া ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছে

"When the East prays against the West."
(পশ্চিমের বিরুদ্ধে পূর্ব্বের উপাসনা)

which has practised this concealment—in its way one of the most shocking features of the whole concern—is British. The victims are not even technically enemies, but 'rebels,' in General Dyer's words, that is to say, British subjects who innocently or otherwise ventured to act in contravention of his decrees. We do not ignore the gravity of the crimes previously committed. . . . We do not forget the difficulty and delicacy of the position. It is just to remember, moreover, that the case is in a sense *sub judice*, and that the final conclusions of the Commission of

অমৃতসহরী চালে স্বাধীনতার পরিচালনা

Inquiry may to some extent modify the story as we know it at present. We hope profoundly that it will, for what could be more futile than to talk of Indian reforms, of 'self-government for India', of Indian government as a trust held by the British Parliament and people if wholesale massacres could be perpetrated without the British Parliament or people knowing a word about them for months ?" (London *Daily News*)

অর্থাৎ, কথাটা এই যে, কোন পক্ষই ভেবে চিন্তে কিছু বলেন না। বিলেতের লোকেরা ভেবে ঠাওর পান না, এর কোন্ কথাটা সত্য ; অথচ তাঁদের উপরই আমাদের শুভাশুভ আঠারো আনা নির্ভর করছে। উপরে যে সব মত উদ্ধৃত করা হোলো, তার থেকে বেশ বোঝা যায় যে, পাঞ্জাবের সম্বন্ধে যার যা খুসী, সে তাই লিখেছে! বিলেতের লোক তাই শুনছেন। এতে আমাদের পক্ষে মন্দ বই ভাল হয় না। আমাদের এই সব দেখে বলতে ইচ্ছে হয় —'Save us from our friends.'

ত্রিবাঙ্কুর-ভ্রমণ

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, বি-এল্]

(১)

সম্প্রতি কার্য্যোপলক্ষে আমাকে, একবার ত্রিবাঙ্কুরে যাইতে হইয়াছিল। ত্রিবাঙ্কুর ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা,— ইহার উত্তরে কোচিন, দক্ষিণে ভারতমহাসাগর, পূর্ব্বে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণী এবং পশ্চিমে আরব-সমুদ্র। দাক্ষিণাত্যে যে কয়েকটি দেশীয় রাজ্য আছে, তন্মধ্যে হায়দরাবাদ ও মহীশূরের নিম্নেই ত্রিবাঙ্কুরের স্থান। আয়তনে মহীশূর ইহার চারিগুণ, ও হায়দরাবাদ দ্বাদশগুণ, বড়।

সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কল্যাণে ত্রিবাঙ্কুর আর পূর্ব্বের ন্যায় সুদূর নহে। আজকাল মান্দ্রাজ হইতে ৩৬ ঘণ্টায় ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবন্দ্রমে পৌঁছিতে পারা যায়। রেল-পথে উভয় স্থানের ব্যবধান ৫৯১ মাইল।

রাত্রি ৮ টায় মান্দ্রাজের এগ্‌মোর ষ্টেশনে "বোটমেল"

অনন্তশয়নম্

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা বাহাদুর
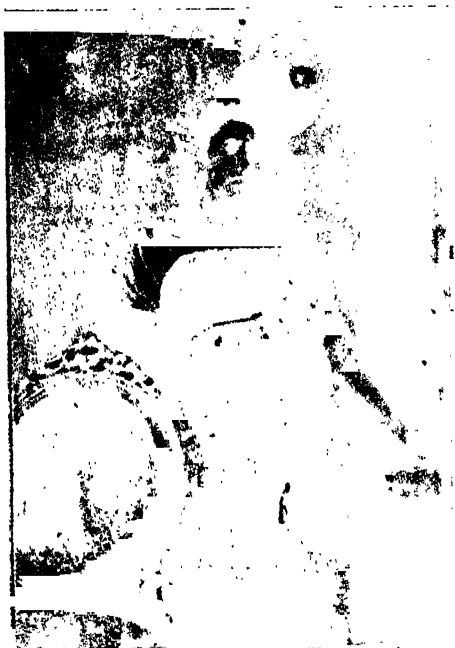
ত্রিবাঙ্কুরের আলওয়াই নদীতে শিবরাত্রির উৎসব

পদ্মনাভস্বামী মন্দির, ত্রিবন্দ্রম

মলয়ালী বালিকা (ব্রাহ্মণেতর জাতীয়া)

মাদুরার নিকটে তিরুপ্পারানকুন্দ্রম—তেপ্পাকুলম্ মন্দির ও পাহাড়

ট্রেণের একটি কক্ষে উঠিয়া পড়িলাম। এই ট্রেণখানি এগ্‌মোর ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়া, রামেশ্বর দ্বীপের শেষ সীমা ধনুকোটি পর্য্যন্ত যায়। সেখান হইতে সিংহল-যাত্রীদিগকে ষ্টীমারে পক-প্রণালী পার হইতে হয়। সিংহলের ডাক এই ট্রেণে ষ্টীমার পর্য্যন্ত যায় বলিয়া, ইহার নাম "বোটমেল।" এই লাইনের গাড়ীগুলি আকারে ছোট (Metre gauge); কিন্তু যাত্রীর ভীড় খুব বেশী। এই জন্য পূর্ব্বে যোগাড় করিয়া না রাখিলে, স্থান পাওয়া কঠিন।

ঘটনাক্রমে এদিন আমার কক্ষের দ্বিতীয় "বার্থ"টি শূন্য ছিল। আমি দ্বার বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে শয্যাগ্রহণ করিলাম। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম ভোর হইয়াছে, এবং ট্রেণ তাঞ্জোর ষ্টেশনে উপস্থিত। এখানে 'রিফ্রেশমেণ্টরুম' আছে; প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ অনেকেই শয্যা-ত্যাগ না করিয়াই চা পান সম্পন্ন করিলেন। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে, তাঞ্জোরের বিখ্যাত বৃহদীশ্বরের বৃহৎ মন্দির নয়নগোচর হইল।

ইহার পর, বেলা ৮টায় ট্রেণ একেবারে ত্রিচিনপল্লী আসিয়া থামিল। সাহেব যাত্রিগণ এখানে চা-পানের দ্বিতীয় অধ্যায় সাঙ্গ করিলেন। ত্রিচিনপল্লী কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। নদীর অপর পারে, দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বপ্রধান বিষ্ণুমন্দির—'শ্রীরঙ্গম্'। ত্রিচীনপল্লীর প্রসিদ্ধ "শৈলমন্দির" দূর হইতে দেখা গেল। এই মন্দির একটি উচ্চ পাহাড়ের উপরিভাগে নির্ম্মিত। পাহাড়টি রাজপথের পার্শ্ব হইতে ২৭৩ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। শৈলশিখরে মন্দিরের দৃশ্য অতি সুন্দর। বিলাতের "ওয়েষ্টমিনষ্টার য়্যাবি" গির্জ্জায়, এই পাহাড়ের প্রতিকৃতি মেজর লরেন্সের স্মৃতি ফলকে অঙ্কিত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ত্রিচিনপল্লীতে ইংরাজ ও ফরাসী জাতির যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে লরেন্স ইংরাজের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

১২॥ টায় ট্রেণ মাদুরা জংসনে পৌঁছিল। মাদুরা দাক্ষিণাত্যের অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ নগরী। প্রাচীন পাণ্ড্যবংশের রাজধানী বহুকাল এখানেই ছিল। মীনাক্ষী দেবীর মন্দির এখনও মাদুরার অতীত গৌরবের সাক্ষী রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ট্রেণ সহরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই, দূর হইতে মীনাক্ষী-মন্দিরের "গোপুরম্"—অর্থাৎ তোরণের উচ্চ চূড়াসমূহ যাত্রিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ষ্টেশনে আমার দুইজন বাঙ্গালী বন্ধু আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইঁহাদের একজন সার্ভিসের ফেরে ত্রিচিনপল্লী-প্রবাসী। সুদূর বিদেশে ইঁহাদের আন্তরিক স্নেহ ও যত্ন আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। বন্ধুদ্বয় ষ্টেশনেই আমার মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি এই জংশনে 'বোটমেল' হইতে নামিয়া টুটিকরিণ-গামী গাড়ীতে উঠিলাম। ধনুকোটি পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে, সিংহলযাত্রীদিগকে টুটিকরিণ হইতে জাহাজে কলম্বো যাইতে হইত। এই জন্য, বোট-মেল তখন মান্দ্রাজ হইতে মাদুরা হইয়া টুটিকরিণ পর্য্যন্ত আসিত। এখন টুটিকরিণের পূর্ব্ব-গৌরব নাই; টুটিকরিণে যাইতে হইলে মাদুরায় ট্রেণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

মাদুরার ৫ মাইল দক্ষিণে, একটি পাহাড়ের পাদমূলে, 'তিরু-প্পারণ-কুণ্ড্রম' নামক ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল। নামটি বড় হইলেও, ষ্টেশনটি খুব ছোট। এইখানে 'শুভ্রমণ্যম্', অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের একটি সুন্দর মন্দির আছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলে কার্ত্তিকেয়ের 'শুভ্রমণ্যম্' নাম অত্যন্ত প্রচলিত। শুভ্র মণির ন্যায় কান্তি বলিয়াই তাঁহার এরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। ষ্টেশনে বহু যাত্রী-সমাগম দেখিলাম। অধিকাংশ অবশ্যই স্ত্রীলোক। সকল স্ত্রীলোকেরই, দ্রাবিড়ী প্রথানুযায়ী, পরিধেয় বসন রঙিন এবং মস্তক অনাবৃত। শুনিলাম, প্রতি মাসেই কৃত্তিকা নক্ষত্রে বহু নর-নারী পূজা দিবার জন্য এই মন্দিরে আসিয়া থাকে।

অপরাহ্ণ ৪॥টায় মানিয়াচী জংসনে পুনরায় গাড়ী পরি-বর্ত্তন করিতে হইল। এখান হইতে একটি ব্রাঞ্চ লাইন ত্রিবন্দ্রম্ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই ষ্টেশনটির চারিধারেই মাঠ। এখান হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত রেলপথের দুই পার্শ্বের ভূমি শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ। এই জমিতে কার্পাস জন্মিয়া থাকে (Black Cotton Soil)। রাত্রি ৮টায়, তাম্রপর্ণী-তীরবর্ত্তী তিনেভেলী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তিনেভেলী অতি প্রাচীন জনপদ। পূর্ব্বকালে তিনেভেলী হইয়া স্থলপথে কন্যাকুমারী ও ত্রিবন্দ্রমে যাইতে হইত। এখনও মান্দ্রাজ হইতে কন্যা-কুমারী যাইতে হইলে, তিনেভেলির পথে যাওয়াই সুবিধা। এখান হইতে নাগের কইল পর্য্যন্ত (৪২ মাইল) মোটর গাড়ীতে যাওয়া যায়। নাগের কইল হইতে কন্যাকুমারী (১০ মাইল) গো-যানে যাইতে হয়। তিনেভেলি নগরে

খৃষ্টান মিশনারীদের একাধিক বিদ্যালয় ভিন্ন একটি "হিন্দুকলেজ" আছে। অল্প দিন যাবৎ একজন বাঙ্গালী ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। মাদুরার দক্ষিণে —ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বাহিরে—সম্ভবতঃ ইনিই একমাত্র বাঙ্গালী আসিয়া পড়িয়াছেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে, ট্রেণ সেনকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে প্রবেশ করিল। এখান হইতে প্রায় ৩০ মাইল রেললাইন পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। দুইধারে বিশাল অরণ্য। স্থানে-স্থানে রেলপথের জন্য পর্ব্বত কাটিয়া সুড়ঙ্গ (Tunnel) প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়! কিন্তু নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে পার্ব্বত্য পথের শোভা দর্শন করিবার সুবিধা হইল না।

রাত্রিশেষে, ট্রেণ কুইলন ষ্টেশনে পৌছিল। এখান হইতে ত্রিবন্দ্রম স্থলপথে ৪২ মাইল। ২ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ত্রিবাঙ্কুর শাখা রেলওয়ের ইহাই শেষ ষ্টেশন ছিল। এখান হইতে স্থলপথে অথবা জলপথে ত্রিবন্দ্রম যাইতে হইত। কুইলন হইতে ত্রিবন্দ্রমে রেলওয়ে লাইন, দুইটি সমুদ্র-সংযুক্ত হ্রদ (Lagoon) পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রভাতের আলোকে, রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে নদী-গিরি-প্রান্তর ও নারিকেল-তরু-বেষ্টিত পল্লীর শোভা মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিলাম। লর্ড কার্জ্জন ত্রিবাঙ্কুরে আসিয়া কবিত্বময়ী ভাষায় ইহার যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে, এতদিনে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"এই দেশের উপরে প্রকৃতি-সুন্দরী তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্-রাশি ঢালিয়া দিয়াছেন। এদেশে দিবাকর প্রতিদিন কিরণ দানে কুণ্ঠিত হন না; পর্জ্জন্যদেব যথাকালে বারিবর্ষণ করেন। অনাবৃষ্টি এখানে অপরিজ্ঞাত। চতুর্দ্দিক্ চিরবসন্ত-শোভায় উদ্ভাসিত। যে স্থানে ভূমি কৃষি-উপযোগী, সেখানে মনুষ্যের বসতি ঘন-সন্নিবিষ্ট; আবার যেখানে অরণ্য, হ্রদ অথবা সমুদ্রবারিপূর্ণ জলাভূমি (Back Water) বিরাজিত, সে স্থানের দৃশ্যও পরীরাজ্যের ন্যায়—অতুলনীয়।"

কুইলনের ১৮ মাইল দক্ষিণে, ত্রিবন্দ্রমের পথে বারকলা নামক একটি ষ্টেশন আছে। বারকলা অথবা 'জনার্দ্দনম্' পশ্চিম-সমুদ্র-তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ তীর্থ। প্রতি বৎসর বহুদূর হইতে যাত্রীর দল এখানকার জনার্দ্দন মন্দির দর্শন করিতে আসিয়া থাকে।

বেলা ৮টায় ত্রিবন্দ্রম্ ষ্টেশনে পৌছিলাম। ষ্টেশনটি ছোট, সহরের বাহিরে মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে অল্পদিন যাবং নির্ম্মিত হইয়াছে। ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে ৩ মাইল উঁচু-নীচু পথ অতিক্রম করিয়া, রাজ-সরকারের পান্থ-নিবাসে (Traveller's bunglow) উপনীত হইলাম। বাংলাটি রেসিডেন্সী-ভবনের খুব নিকটে। সম্মুখে ক্ষুদ্র বাগান। আহার ও বিশ্রামের পর, অপরাহ্ণে নগর-ভ্রমণে বাহির হইলাম।

(২)

'ত্রিবন্দ্রম' নামটি 'তিরু-অনন্তপুরম্'এর অপভ্রংশ। ত্রিবাঙ্কুর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ 'পদ্মনাভ স্বামী'—অনন্ত-শয্যাশায়ী নারায়ণ। এই 'অনন্ত' হইতে নগরের নাম 'তিরু-অনন্তপুরম্' অর্থাৎ ৺অনন্তপুর রাখা হইয়াছিল।

ত্রিবন্দ্রমের প্রধান দর্শনীয় স্থান পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা সমগ্র ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ৺পদ্মনাভ স্বামীকে উৎসর্গ করিয়া দেন। তদবধি, ত্রিবাঙ্কুর-রাজগণের বংশগত উপাধি 'পদ্মনাভদাস'। রাজবৃত্তি ব্যতীত ভূ-সম্পত্তি হইতে ৺পদ্মনাভ-স্বামীর বার্ষিক আয় ৭৫ হাজার টাকা। মন্দির-সংলগ্ন 'অগ্রশালা'য়, সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা আছে। মন্দির ও তৎ-সংলগ্ন রাজপ্রাসাদ, উচ্চ প্রাকার-বেষ্টিত। প্রাচীরের অভ্যন্তরে দুইটি সরোবর —একটি ব্রাহ্মণ, ও অপরটি অন্যান্য জাতির ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট। মন্দিরের প্রবেশদ্বার পূর্ব্বদিকে—উহার 'গোপুরম্' ১০০ ফিট উচ্চ। 'গোপুরমের' শীর্ষদেশে সাতটি স্বর্ণস্তূপি, অর্থাৎ স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া। প্রবেশ-দ্বার ও ঠাকুর-ঘরের মধ্যে ৪৫০ ফিট দীর্ঘ ও ২৫ ফিট প্রশস্ত একটি 'মণ্ডপম্' (নাট-মন্দির)। ইহাই ব্রাহ্মণগণের আহারের স্থান। এই মণ্ডপের ৩২৪টি প্রস্তর-স্তম্ভ;—প্রতি স্তম্ভে এক-একটি দীপধারিণী নায়ার-নারীর মূর্ত্তি খোদিত। প্রতি দুইটি স্তম্ভের ব্যবধানে লৌহ-প্রদীপের শ্রেণী। এই মণ্ডপের নাম 'শিবালী-মণ্ডপম্'। এই মণ্ডপের সম্মুখে ধ্বজস্তম্ভ; তাহার পরে গরুড়-মূর্ত্তি; এবং তাহার সম্মুখভাগে স্বয়ং পদ্মনাভ স্বামীর গৃহ—"বিমানম্।" মন্দিরের অঙ্গনে "কুলশেখরমণ্ডপম্" ও "জপ-মণ্ডপম্" নামক আরও

দুইটি 'মণ্ডপ' এবং অন্যান্য বহু দেবতার বিগ্রহ বিদ্যমান।

আমি যখন ত্রিবন্দ্রমে গিয়াছিলাম, তখন ত্রিবাঙ্কুর-রাজ সপরিবারে কল্যাণকুমারী তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে, পদ্মনাভ স্বামীর ঘর প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় অতি অল্প সময়ের জন্য খোলা হইত। এইজন্য আমার অদৃষ্টে দেবতাদর্শন ঘটে নাই।

ত্রিবন্দ্রমের আফিস-আদালত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের বাটী একটি-একটি উচ্চ টিলার উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে। সমস্ত সহরটিকে কতিপয় অনুচ্চ পাহাড়ের সমষ্টি বলিলেও চলে। একটি প্রশস্ত টিলার উপরে 'নেপিয়ার পার্ক'—নামক উদ্যান; উহার মধ্যস্থলে যাদুঘর—'নেপিয়ার মিউজিয়াম'। মিউজিয়াম গৃহটি যেরূপ সুদৃশ্য, উহাতে সংরক্ষিত দ্রব্য-সম্ভারও সেইরূপ বিচিত্র। পুরাকালের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে একটি লৌহযন্ত্র দেখিলাম—উহার ইতিহাস ভয়াবহ,—সেকালে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ইহাতে আবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্য স্থলে ঝুলাইয়া রাখা হইত। কাচের আধারে রক্ষিত একটি জিনিসের নামের সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের নাম সংযুক্ত দেখিলাম—সে এক জাতীয় কুমীর।

উদ্যানের এক দিক ক্রমশঃ ঢালু হইয়া অনেকটা নামিয়া গিয়াছে,—সেইদিকে চিড়িয়াখানা। মাদ্রাজের চিড়িয়াখানা অপেক্ষা ইহা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এখানে নানা জাতীয় পশু-পক্ষী সংগৃহীত হইয়াছে। সিংহের কক্ষে, মাতৃস্তন্যপানরত দুইটি নবপ্রসূত সিংহ-শাবক দেখা গেল।

ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে নানাবিধ শিল্প ও কারুকার্য্যের উৎকর্ষ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। ত্রিবন্দ্রমে একটী 'আর্ট-স্কুল' আছে—এখানে চিত্রশিল্প ভিন্ন, ভাস্কর (Ivory Carving), সূত্রধর এবং কুম্ভকারের বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ে ভারত-বিখ্যাত চিত্রকর ৺রবিবর্ম্মার স্বহস্তাঙ্কিত কয়েকখানি তৈল-চিত্র আছে। ঐ সকল চিত্রের প্রতিলিপি 'বঙ্গে যথা-তথা' দেখিতে পাওয়া যায়। এতদিনে মূল চিত্র দেখিতে পাইলাম। অনেকে হয় তো জানেন না যে, রবিবর্ম্মার জন্মভূমি ত্রিবাঙ্কুর এবং ত্রিবাঙ্কুর-রাজের আনুকূল্যেই তিনি চিত্র-বিদ্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করেন। গৃহ-শিল্প-বিভাগে একজন কুম্ভকার অবলীলাক্রমে মাটীর নানারূপ জিনিষ প্রস্তুত করিতেছিল,—বহুক্ষণ ধরিয়া আমরা তাহার নৈপুণ্য দেখিলাম। এদেশে কুম্ভকার জাতি উপবীত ধারণ করেন।

ত্রিবন্দ্রমের বিচারালয়সমূহের নিকটবর্ত্তী প্রকাশ্য স্থানে একটি প্রস্তরমূর্ত্তি ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্যার টি, মাধব রাওয়ের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের বর্ত্তমান উন্নতির ইনিই মূল। শিক্ষা বিষয়ে ত্রিবাঙ্কুর খুব উন্নতিশীল; বিশেষতঃ, স্ত্রী-শিক্ষায় ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশই ইহার পশ্চাদ্বর্ত্তী। রাজপথে বালকদের ন্যায় দলে-দলে বালিকাদিগকেও বিদ্যালয় যাইতে দেখিলাম। অবরোধ প্রথা এদেশে প্রবেশলাভ করে নাই। ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের নিজস্ব ডাক-বিভাগ আছে—উহা এদেশে "অঞ্চল" নামে অভিহিত। ত্রিবন্দ্রমে দুইজন বাঙ্গালী আছেন; একজন রাজ সরকারে ইঞ্জিনিয়ার; অন্যজন কাগজ-ব্যবসায়ী ডিকিন্‌সন্ কোম্পানির কর্ম্মচারী।

ত্রিবাঙ্কুর প্রাচীন পরশুরামক্ষেত্র অথবা কেরল দেশের দক্ষিণাংশ। ত্রিবাঙ্কুর-রাজবংশ দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'চের'-বংশ সমুদ্ভূত। এই রাজ্য কখনও মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হয় নাই; সুতরাং অনেক প্রাচীন রীতি-নীতির অবিকৃত নিদর্শন এখনও ত্রিবাঙ্কুরে দেখিতে পাওয়া যায়। মালাবারের ন্যায় ত্রিবাঙ্কুরেও নাম্বুদ্রি' ব্রাহ্মণ এবং নায়ারজাতির মধ্যে বিবাহাদি বিষয়ে কতকগুলি অদ্ভুত প্রথা বর্ত্তমান। এখানকার রাজবংশে নায়ারজাতির 'মারুমাক-তারম' অর্থাৎ ভাগিনেয়-উত্তরাধিকার-বিধি প্রচলিত। রাজ-পুত্রের পরিবর্ত্তে রাজ-ভাগিনেয় সিংহাসনের অধিকারী; তদনুসারে রাজ-ভগিনী এ রাজ্যের রাণী। রাজার ভগিনী না থাকিলে, অথবা ভগিনী পুত্রহীনা হইলে, পোষ্যপুত্রের ন্যায় 'পোষ্যা'-ভগিনী গ্রহণ করিতে হয়। বর্ত্তমান মহারাজা স্যার রামবর্ম্মা ভূতপূর্ব্ব মহারাজার একমাত্র ভগিনী রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের পুত্র। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় কুমারিকা অন্তরীপ। এখানে ভারত-মহাসাগরের বেলাভূমিতে কন্যাকুমারীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। তিনেভেলীর পথ ভিন্ন, ত্রিবন্দ্রম হইতেও কন্যাকুমারী যাতায়াতের সুবিধা আছে। ত্রিবন্দ্রম হইতে নাগের কইল (৪৫ মাইল)—প্রত্যহ যাত্রী লইয়া মোটর গাড়ী যাতায়াত করে। যাঁহারা কন্যাকুমারী গিয়াছেন,

তাঁহারা সকলেই প্রকৃতির মহান্ দৃশ্য ও কুমারী-প্রতিমার অপার্থিব রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। যাত্রীদিগের বাসের জন্য মন্দিরের নিকটেই একটী সুন্দর পান্থ-নিবাস আছে। কিন্তু সময়াভাবে, এত নিকটে আসিয়াও, বহুদিন-পোষিত কন্যাকুমারী-দর্শন-সাধ পূর্ণ করিতে পারিলাম না। অগত্যা, অধিকতর ভাগ্যবান্ যাত্রিগণের জন্য কন্যাকুমারী-তীর্থের পথ-নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

বর্ষ-প্রণতি

[শ্রীহেমনলিনী দেবী]

নবীন বরষ এস—ধন্য !
জাগ্রত ভারত তব সম্মুখাগত
নহে ভীত নহে অবসন্ন।
উদয়-অচল-তলে দীপ্ত তপন জ্বলে
নব জ্যোতিঃ ঠিকরে ললাটে ;
বিশ্ব ভবন মাঝে উন্নত শিরে সাজে
দাঁড়ায়েছে আপন পাটে।
হরিহরি শঙ্ক বাজায়ে শঙ্খ
বরিয়া লয়েছে দুখ-দৈন্য,—
আজি হের গণ্য ভুবন-বরেণ্য
ভারত আজি পুন ধন্য !

* * *

সামগীতি-বন্দিত তব চিত নন্দিত
মহা পুরা মহিম ছন্দে,
কুরু রণ-ক্লান্তি শ্রান্ত সে শান্তি
তোমারি চরণ আসি বন্দে।
তপোবনে তুষ্টি, নরদেহে পুষ্টি,
সৃষ্টি সারভূত প্রাণ ;
ভারত কল্যাণ সাধনে সাবধান
আবির্ভূত ভগবান !
পুন বহে বন্যা, ধরণী ধন্যা,
মরণ বিজয়ী মহাহর্ষ।
সে পূত দিবসে না জানি কি বেশে
প্রবেশিলে দেশে তুমি বর্ষ !
দেখিলে, সঙ্ঘে হিমাচল লঙ্ঘে
তিব্বত চীনে আনে জয়,—
জয় জয় ভারত! আগত তথাগত !
দমিত দুখ শোক ভয়।

নারায়ণ রূপ একছত্রী ভূপ
বিশ্ব-পাধক-মহা-গর্ব্ব,
বঙ্কিত জাতি কম্পিত অরাতি,
গৃহে গৃহে নিতি নব পর্ব্ব।
সাগর-তট ভরি সাজিল শত তরি
পূরিত ধন জন-পণ্য,
হেরিলে সে গরিমা ভুবনেশ্বরী মা !
দেশে দেশে বিতরিলা অন্ন !

* * *

না জানি কি পাপে কোন অভিশাপে
নাশিল ভারত পুণ্য ?
দেশ ধূলি লুণ্ঠিত, বায়ু বহে কুণ্ঠিত,
মন্দির হল দেব-শূন্য !!
হে কাল পন্থী, সে সাগর মন্থি
উঠিল যে ঘন কালকূট,
পিইল তা জনে-জনে, আগমন লগনে
ভরিল তোমারো করপুট !

* * *

সে কাল কুহেলিকা আবৃত জ্যোতিলিখা
ফুটে বুঝি—উঠে ঐ সূর্য্য !
অন্তরে জাগে প্রাণ, জাগ্রত ভগবান !
বাজে তাঁর আহ্বান তূর্য্য।
আজি পুন ধরণী দিয়াছে সরণি
অরণি ঝলসে জ্যোতি ভায় ;
হে বরষ, মঙ্গল ! নবীন যাত্রীদল,
নতি রাখে, আশীষ চায় !

কাহিনী

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্]

সমুদ্রের নীল জলকে তরল, গলিত সোণার রংএ রঞ্জিত করিয়া, ধীরে-ধীরে সূর্য্যাস্ত হইতেছিল। সকালে ও সন্ধ্যায় প্রত্যহ যেমন ভীড় হয়, পুরীর সমুদ্র-সৈকতে সেদিনও সেইরূপ হইয়াছিল।

শোকার্ত্ত এই মহা-উদারতার মাঝখানে শোক ভুলিবার জন্য আসে,—বিরহীর এখানে বেদনার উপশম হয়, —প্রেমার্থীরা এই রমণীয়তার মধ্যে প্রেমের উপাদান পায়,— এবং স্বাস্থ্যহীনেরা স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে। কিন্তু পুলিশের দারোগার এখানে আসিবার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে, তাহা না বুঝিয়াও, আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনেরই মত, সেদিনও সেখানে আসিয়াছিলাম।

সি-আই-ডিতে কাজ করিয়া কষ্টে সংসার প্রতিপালন করি, এবং প্রভুর, দশের এবং ঘরের চোখ-রাঙানি খাই। বোধ হয় এই সব-কটাতে মিলিয়াই আমাকে রোজ সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে আনিত।

নর-নারীর কোলাহল হইতে একটু দূরে বেড়ানই পছন্দ করিতাম। সেদিও তাহাই করিতেছিলাম।

হঠাৎ অতি দূরে একটা জাহাজের মত বোধ হইল। "জাহাজ—জাহাজ" করিয়া একটা কোলাহল হইতেই, চক্ষু সেই দিকে ফিরিল।

যাহা দেখিলাম তাহা এত অস্পষ্ট যে, তাহাকে জাহাজ বলিলেও চলে, পাখী বলিলেও চলে। সুতরাং কষ্ট করিয়া তাহা দেখিবার বিড়ম্বনায় প্রয়োজন নাই ভাবিয়া চোখ ফিরাইলাম।

চোখ-ফিরাইতেই, যাহা দেখিলাম, তাহা সেই কষ্ট-দৃশ্য জাহাজ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। দেখিলাম, একটি সুন্দরী যুবতী স্থির দৃষ্টিতে আমারই পানে চাহিয়া রহিয়াছে। চারি চক্ষু এক হওয়াতে, সে যেন কতকটা লজ্জিত হইয়া কহিল, "একটু দয়া করবেন কি"? আমি বিস্ময়ে কহিলাম "কি?"

সে কহিল, "আমার হাত থেকে আংটিটা খুলে এই বালিতে পড়েছে,—আমি খুঁজে পাচ্ছি না-যদি"—

আমি কহিলাম,—"নিশ্চয়ই,—আমি খুঁজে দিচ্ছি।" বলিয়া খুঁজিতে লাগিলাম—সেও খুঁজিতে লাগিল। মাঝে-মাঝে এত নিকটে আসিয়া পড়িতেছিলাম যে, তাহার নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছিল!

অবশেষে পাওয়া গেল—আমিই পাইলাম। আংটিটা যখন তাহাকে দিলাম, তখন তাহার সমস্ত অন্তরের কৃতজ্ঞতা যেন দুই চোখে ফুটিয়া উঠিল; আমার দিকে কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ধন্যবাদ!"

আমি প্রত্যভিবাদন করিয়া যখন ফিরিব, তখন সে করুণ কণ্ঠে কহিল, "আপনার কি ভারি জরুরি কাজ? একটু বসতে পারবেন না?"

আমি কহিলাম, "না—তা, এমন বিশেষ কিছু—"

সে কহিল "তবে চলুন,—ওই সমুদ্রের ধারটায় একটু বসি।"

দারোগার অন্ধকার কুঠুরি হইতে একেবারে আরব্যোপন্যাসের স্বপ্ন-লীলা! সমুদ্র যে এত সুন্দর এবং নারী-চক্ষু যে এত কোমল, ইহা এমন করিয়া পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই।

রমণী কহিল, "আপনি বোধ হয় খুব আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন—হবার কথাও বটে। কিন্তু, আমি দু'চার দিনের জন্যে এখানে এসেছি,—এক-আধ জন বন্ধু পেতে চাই। গোড়াতেই আপনি আমার যা উপকার ক'রেছেন, তাতে নিশ্চয়ই আপনাকে এই বিদেশে আমি একজন বন্ধু বলে মনে ক'রতে পারি।"

আমি কহিলাম, "আমি আপনার যে সামান্য—" রমণী বাধা দিয়া কহিল, "আমাকে আপনি বলবেন না। বয়সে আমি আপনার চেয়ে ছোটই হব বোধ হয়—", হাসিয়া

একটু বসিয়া কহিল, "আমাকে মায়া বল্‌বেন - মায়া-লক্ষ্মী আমার নাম।"

এমন অসঙ্কোচ ভাব আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই; সুতরাং ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম।

মায়ালক্ষ্মী হাসিয়া কহিল "আপনি বুঝি পুলিশের লোক?"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম "কেমন ক'রে জান্‌লে?"

সে আরও হাসিয়া কহিল, "আপনার ঐ জুতো-যোড়ায়। ছিঃ, এমন জায়গায় কি ওই টাটু-ঘোড়ার মত জুতো নিয়ে আসতে হয়!"

আমাকে অবাক্ করিয়া দিয়াছে! একটু নড়িয়া চড়িয়া, উঠিবার চেষ্টা করিলাম।

তাহা দেখিয়া সে কহিল, "তাই ভাল, চলুন ওঠাই যাক্।" বলিয়া উঠিয়া পড়িল। সমুদ্রের উপকূল হইতে রাস্তায় উঠিয়া দেখিলাম, একখানি গাড়ি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মায়ালক্ষ্মীর অনুরোধে অগত্যা আমাকেও তাহাতে উঠিতে হইল।

৩

সহর হইতে কতকটা দূরে তাহার বাড়ী। সেইখানে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল।

বাড়ীটী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আস্‌বাব-পত্র সামান্য; কিন্তু মূল্যবান এবং পরিষ্কার। ভাবিয়াছিলাম, আত্মীয়-স্বজন হয় ত কেহ আছে; কিন্তু অপর কাহাকেও দেখিলাম না। এক দাসী, আর এক চাকর।

খানিকটা অপেক্ষা করিয়া "আমি কহিলাম, "উঠি তা হ'লে।"

মায়া কহিল, "নেহাৎ যদি উঠ্‌বেন, ত' আর কি বলব। তবে অনুরোধ, মাঝে মাঝে আসবেন। আমি অল্প দিনই থাকব। একবার জগবন্ধু দর্শন করতে এসেছি,—দর্শন হ'লেই ফিরে যাব। হাঁ, গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে—আপনাকে পৌঁছে দেবে।"

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কে এ নারী? সত্যই আমাকে একেবারে অবাক্ করিয়া দিয়াছে! জানা নাই, শুনা নাই, অথচ একেবারে চির-পরিচিতের মত ভাব! কোন সঙ্কোচ, কোন দ্বিধা নাই! বরং সঙ্কোচ যদি কাহারও হইয়া থাকে, ত সে আমারি! বয়স ২০।২২এর ঊর্দ্ধ নহে,—রূপ অসাধারণ; অর্থেরও অভাব আছে বলিয়া বোধ হয় না। আশ্চর্য্য!

*　　*　　*　　*

পরদিন সকালে উঠিয়া কাগজ-পত্র লইয়া বসিয়াছি—মায়ালক্ষ্মীর মায়া কাটাইতেই হইবে। অঙ্ক এবং রিপোর্টে সবেমাত্র মনোনিবেশ করিয়াছি, এমন সময়ে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল। মায়ালক্ষ্মী!

মায়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "আশ্চর্য্য হচ্ছেন নিশ্চয়ই! কিন্তু এই গাড়োয়ান আপনার বাড়ী চিনেছে, তা' ভুলে গেছেন বোধ হয়। ওঃ, কাজ করছেন!"

আমি কহিলাম, "না, এমন বিশেষ কিছুই নয়।"

মায়া একজোড়া বহুমূল্য, বিলাতী জুতা বাহির করিয়া কহিল, "তা করুন, আমি বিরক্ত করবো না। কিন্তু দোহাই আপনার, ওই থ্যাবড়া জুতো পরে আর সমুদ্র-তীরে যাবেন না। আমার এই জুতো-যোড়া পরবেন,—এই জুতোর দোহাই দিয়ে কিছুদিন আমাকে মনেও রাখবেন; আর আমাদের দাম ত' ওর চেয়ে বেশী নয়!" বলিয়া সে এমন হাসি হাসিল, যাহা ঠিক হাসির মত শোনাইল না।

আমি জবাব দিবার পূর্ব্বেই সে কহিল, "কাজ করুন আপনি,—আমি একবা আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে আসি।"

জুতার সম্বন্ধে ধন্যবাদ বা প্রত্যাখ্যানের অবসর-মাত্র না দিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল! একদিনের মাত্র আলাপে এইরূপ জুতা-দান হয় তো ঠিক শোভনীয় নয়; কিন্তু সে এটা এমনি ভাবেই করিল যে, ইহাকে অশোভন মনে করাও কঠিন। মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই ভিতরে উচ্চ কলহাস্যের শব্দে বুঝিলাম, সেখানেও ইহারই মধ্যে আসর জমিয়াছে!

ছিন্ন-সূত্র গুটাইয়া আবার রিপোর্টে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু এই দুর্বোধ্য রমণীর ব্যবহার প্রহেলিকার মত বারংবার বাধা দিতে লাগিল।

খানিক পরে মায়া ফিরিল। সঙ্গে আমার স্ত্রী। স্ত্রী অনুযোগ করিয়া কহিল, "দেখ দিকি নি, ইনি এমন একটা দামী নেক্‌লেস্ দিয়ে যাচ্ছেন কমুকে,—কেন?"

কমলা আমার কন্যা। নেক্‌লেসের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—বাস্তবিকই মহামূল্য।

আমি রিপোর্টখানা উল্‌টাইতে-উল্‌টাইতে কহিলাম "বাস্তবিক, এ-সব আপনার ভারি অন্যায়! এর মানে কি?"

মায়া হাসিয়া কহিল "পৃথিবীতে কি সব জিনিসেরই মানে থাকে? তা-ছাড়া, অন্যায় যদি হয়ে থাকে ত' আমি এইটুকু বল্‌তে পারি যে, জীবনে এর চেয়ে ঢের বেশী অন্যায় কাজ আমি করেছি।"

আমি কহিলাম, "এ-সব আমি নোবো না।" মায়া কহিল, "না নেন, ফিরিয়ে নেবো। স্নেহ করেই দিয়েছিলাম, না নিলে বুঝবো যে, আমার কপালের মতই হ'য়েছে। ও-জিনিস আমি একদিনও ব্যবহার করিনি; সেইজন্যেই—" কণ্ঠস্বর করুণ, কম্পিত।

নারী-হৃদয়েই প্রথম বাজিল! স্ত্রী কহিলেন, "তবে থাক্‌, এতই যদি দুঃখ পান!"

মায়া আমার দিকে চাহিয়া কহিল,—"আর একটা প্রার্থনা পূর্ণ করতে হবে। একবার জগন্নাথদেবকে দেখব—আপনারা পুলিশের লোক,—আপনাদের সাহায্যেই দেখার সুবিধে হবে। আজ সন্ধ্যের পর যদি দয়া করে দেখান। আমি উপোস করে থাক্‌ব।"

আমি কহিলাম, "বেশ।"

আমার স্ত্রীর সহিত একবার দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া মায়া চলিয়া গেল।

৪

সে-দিন সন্ধ্যার পর দেখিলাম, এ এক অন্য মূর্ত্তি। উপবাস-ক্লিষ্ট, পবিত্র-শ্রী মায়ালক্ষ্মীর মুখে যেন দেব-ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। তৃষিত যেমন আগ্রহে জল পান করে, তেমনি সে ব্যাকুল ভাবে দেবতার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ যে চাহিয়া রহিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। মনে-মনে সে কি প্রার্থনা করিতেছিল, সে-ই জানে; তাহার পর যখন চক্ষু ফিরাইল, তখন দুই গণ্ড সিক্ত করিয়া জলধারা বহিতেছে। আজ তাহাকে এই নূতন প্রেম-মূর্ত্তিতে দেখিয়া আমার মাথা নত হইয়া আসিতে লাগিল।

পূজা সমাপনান্তে সে কহিল, "এবার চলুন।"

আমি কহিলাম, "চলো আমাদের ওখানে—সমস্ত দিন খাওনি, কিছু খাবে।"

সে হাত-জোড় করিয়া কহিল, "মাপ করবেন, আজকের রাত্রিটা আমায় একলা থাক্‌তে দিন। আজ আমার পক্ষে পরম দিন। কাল যাবো আপনাদের ওখানে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

সে আজ আর আমাকে তাহার গাড়ীতে যাইতে অনুরোধ করিল না—শুধু গাড়ীতে উঠিবার আগে, আমাকে প্রণাম করিয়া, সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"চল্লাম।"

গাড়ী চলিয়া গেল। মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই প্রহেলিকাময়ীর প্রহেলিকার কথা ভাবিতে লাগিলাম।

৫

সকালের ডাকে একখানা অনেক টাকার ইন্‌সিওর্ড খাম, আর কয়েকখানা সরকারী চিঠি আসিয়াছিল। বিস্মিত হইয়া ইন্‌সিওর চিঠিখানা খুলিতেই, কয়েক সহস্র টাকার নোট ও একখানি চিঠি বাহির হইল। চিঠিটা এইরূপ:—

"পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,—

আমার নাম মায়া নহে, সুরমা। কলিকাতার বাবু-মহলে, সোণাগাছির সুরমাকে চেনে না, এমন লোক কম।

"এ ঘৃণিত জীবন আমার ছিল না,—আমি গৃহস্থের বধূ ছিলাম,—এবং সেই আমার যোগ্য স্থান ছিল। দরিদ্রের বধূ ছিলাম;—নবীন বয়সে বুঝি নাই যে, দরিদ্র-গৃহেও সোণা মাণিকের অভাব নাই,—যদি গ্রহণ করিবার শক্তি থাকে। জীবনের মধ্যে একটা ভুল করেছিলাম। কিন্তু এমনি নারী-জাতির দুর্ভাগ্য যে, ভুল যদি কোন দিন হোল, তা তাকে ঘাড়ে ধ'রে সেই ভুলের কদর্য্য পথেই নামিয়ে দেওয়া হয়।

"যে লোকটি আমাকে সর্ব্বনাশের পথে পৌছে দিলে, সে সেইখান থেকেই ফিরল! আমি সোণাগাছিতে উঠলাম। সোণাগাছির হিসাবে আমার মন্দ কিছুই হয় নাই,—অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেছি,—অনেক বাহবা নিয়েছি।

"কিন্তু মন আমার সুরু থেকেই কাঁদতো আমার স্বামীর জন্যে! জীবনে এমন ভালবাসা কাউকে বাসিনি,—অথচ, অভাগিনী আমি,—হেলায় হারালাম। দুনিয়াতে কত ভুলের কত-রকম ক্ষমা আছে, কিন্তু আমাদের ভুলের বিধান একেবারে ফাঁসির চেয়ে কঠোর!

"গোড়া থেকেই আমার সমস্ত মন তিক্ত হয়ে উঠেছিল সেই লোকটার ওপর, যে নীড়বদ্ধ পাখীর মত আমাকে আমার স্বামীর বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছিল। সে ও বোধ হয় তা বুঝেছিল,—তাই আমার কাছে আর ঘেঁসত না। কিন্তু তাকে একবার পেতেই হবে। কতদিন জগবন্ধুকে বলেছি, হে দেবতা, তুমি যদি থাকো, ত' একবার তাকে এনে দাও!

"কয়েক বছর সে এলো না। তাকে আনবার জন্মেই আমার এ কয়-বছরের ফাঁদ পাতা। তার পর একদিন আমার উর্ণেনাভির মত সে এসে পড়ল। বাস্! আমাদের প্রতিশোধ আমাদের ভুলেরই মত অমোঘ, সাংঘাতিক;—আপনাদের মত ছলা-কলা বোঝে না।

"এখন আমি খুনী, ফেরারী! পৃথিবীর চক্ষে তাই হলেও, আমি জানি, আমি খুনী নই। খুনের মধ্যে পাপ থাকলেই সে খুন,—নইলে নয়। বিচারক ফাঁসি দেয় বলে সে কি খুনী? আর ফেরারী? না, তাও নয়। আমি চর্ম্মচক্ষে একবার আমার জাগ্রত দেবতা জগবন্ধুকে দেখতে এসেছিলাম;—আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরই পায়ে আমার স্থান হবে।

"এখানে এসে দেখলাম, আপনার চোখ দুটী ঠিক আমার স্বামীর চোখের মত—তেমনি প্রশান্ত, তেমনি ধীর। সমুদ্র-তীরে তাই দেখে আমার মধ্যে কত দিনকার সেই প্রাণ-জুড়ানো হারানো কথা জেগেছিল! তাই আমি আপনাকে ছাড়তে চাইনি! আপনি কত-কিই না মনে করেচেন!

"অনেক-গুলো টাকা ছিল—সে গুলো এই সঙ্গেই পাঠালাম;—যেমন ইচ্ছে, ব্যবহার করবেন।

এবার আমি চল্লাম। আর কেউ আমার নাগাল পাবে না। অনেক দূরে যাচ্ছি,—জগবন্ধুর শ্রীচরণে।"

ইতি—

সুরমা।

সরকারী চিঠি খুলিয়া দেখিলাম,—জরুরি হুকুম,—সুরমা নামক এক বারাঙ্গনা খুন করিয়া পুরী গিয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে। তাহার ফটোও পাঠাইয়াছিল।

মনের উপর দিয়া একটা ঝড় বহিয়া গেল। অদ্ভুত এ কাহিনী!

* * * *

একজন কনেষ্টবল আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল,—"হুজুর! সমুন্দর মে এক লাশ মিলা!"

গিয়া দেখিলাম, সুরমার মৃতদেহ। সে বোধ হয়, তাহার জগবন্ধুর শ্রীচরণে পঁহুছিয়াছে।

সঙ্গীহারা

[শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল]

সঙ্গীহারা সারা নিশা করি' জাগরণ,
বিরহ-সঙ্গীতে ভরি' অরণ্য নিরালা
হে বিহঙ্গ! জুড়া'তে কি হৃদয়ের জ্বালা
অবিচ্ছেদে করিতেছ বিচ্ছেদ-ক্রন্দন!
তোমার ও মরমের করুণ স্পন্দনি
পরায় বিরহী-কণ্ঠে কণ্টকের মালা,
সেই জানে তব গানে কি বেদনা ঢালা
প্রিয়া যার পলায়েছে ছিঁড়িয়া বন্ধন;
জাগিয়া জাগালে মোরে, রে অবোধ পাখি!
জ্বালা'লে বিরহী-প্রাণে নিবান অনল,
চলে' গেছে যে পাষাণী দিয়া তোরে ফাঁকি,
সে কিরে আসিবে ফিরে হেরে আঁখি-জল?
একাকী তবুও পাখী সারা রাতি ডাকে:—
"প্রিয়া কই, প্রিয়া কই, দেখা দে আমাকে।"

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"সে কি! বল কি! এত বড় একটা ছাউনী, বাদশাহী লস্কর, ঘোড়া, উট হাওয়া হইয়া উড়িয়া গেল! এ কি ভোজবাজী দাদাঠাকুর!"

"ভোজবাজী কি জুয়াচুরী, তাহা ত বুঝিলাম না দীননাথ! কিন্তু কয় বেটা ভোজপুরী সিপাহী এই কয় মাস ধরিয়া কতকগুলা টাকা খাইয়া গেল—তাহার আর কোন উপায় দেখিতেছি না।"

"বল কি দাদাঠাকুর! কয় বেটা রজপুত না রাজপুত আমার যে সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে,—আমার দোকানের দেড় হাজার টাকার উঠনা খাইয়া গিয়াছে। দাদাঠাকুর, আমি ধনে-প্রাণে মারা গেলাম।"

"আমিই বা কোন্ বাঁচিয়া আছি দীননাথ! গৃহিণীর হাতে যে কয়টা টাকা ছিল, যাহার ভরসায় বুড়া বয়সে কাশীবাস করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা আর একটিও দেখিতে পাইব না।"

"ও দাদাঠাকুর, তোমার ঘরবাড়ী, জমাজমী আছে;—আমার যে দোকানখানিমাত্র সম্বল! অধিক লাভের আশায় দ্বিগুণ দর ধরিয়া কয় মাস ধরিয়া কেবল পাওনার সুদ কষিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, এই কয়টা টাকা আদায় করিতে পারিলে, নূতন সহরে গিয়া বড় করিয়া একখানি দোকান ফাঁদিব! হায়, হায়! দাদাঠাকুর, আমার সর্ব্বনাশ হইল!"

"সেটা উভয়তঃ দীননাথ! কিন্তু, এই আমবাগানে দাঁড়াইয়া চেঁচাইলে কি হইবে,—চল দেখি, কাজীবাড়ী যাই।"

"দাদাঠাকুর বুঝি এখনও সেই ভরসায় আছ! সে দফা রফা। বনোয়ারী সাহা আমাদের কথা না শুনিয়া অনেক টাকা কারবারে লাগাইয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, কাজীর কাছে নালিশ করিলেই সুদসমেত সব টাকা আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু যখন সে কাজীর নিকট পৌছিল, তখন একেবারে হিম হইয়া গেল। লস্করের কাণ্ডকারখানা আলাহিদা,—ফরীয়াদ-মামলা সমস্তই বখ্শীর হাতে,—কাজীর কোন ক্ষমতাই নাই।"

"বল কি দীননাথ! তবে—তবে—সর্ব্বনাশ হউক, উচ্ছন্ন যাউক,—এতদূর অধর্ম্ম করিলে, তাহার অধঃপতন হইবেই হইবে।"

"অভিসম্পাতই কর, আর পৈতেই ছেঁড়,—টাকা ফিরিবে না দাদাঠাকুর! আমার সেজ ঠাকুরদাদা ঠেকিয়া শিখিয়া বলিতেন, ফৌজী কারবার অতি কঠিন ব্যাপার! আমার কর্ত্তাবাবা—"

"আরে, রাখ তোর কর্ত্তাবাবা,—আমার বলে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল!" "তোমাদের জাতির ঐ ত দোষ দাদাঠাকুর! তুমি না হয় কুলীন ব্রাহ্মণ, আর আমি না হয় গন্ধবণিক্; উপস্থিত কিন্তু অবস্থাটা দু'জনেরই সমান। খাতক টাকা খাইয়া পলাইয়াছে,—সে খাতক এমন যে, কাজীর দুয়ারে ফরীয়াদ করিয়া কোন ফল নাই। টাকা আদায় করা তোমারও যেমন প্রয়োজন, আমারও তেমন প্রয়োজন। সুতরাং এক্ষেত্রে তোমার বামণামী ফলাইয়া বিশেষ উপকার নাই। আমার কর্ত্তাবাবা বলিতেন—"

"আবার কর্ত্তাবাবা!"

"দেখ ঠাকুর, আমার ইচ্ছা—আমি আমার কর্ত্তাবাবার নাম করিব,—তাহাতে তোমার কি। আমি কি তোমার জমীতে দাঁড়াইয়া আছি যে, তুমি আমাকে চোখ রাঙ্গাইতেছ! আমি দীননাথ সাহা, দশখানা গ্রামে আমার লগ্নি কারবার আছে,—সহরে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে,—তুমি আমায় চোখ রাঙ্গাইবার কে! ব্রাহ্মণ হইয়া যখন বেণিয়ার ব্যবসায় ধরিয়াছ, তখন বেণিয়ার চাল ধরিতে হইবে। আমার কথা শুনিতে যদি বিরক্ত বোধ হয়,—সিধা রাস্তা পড়িয়া আছে,—যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও।"

মধ্যাহ্নে ভাগীরথীতীরে আম্রকাননে যে দুই ব্যক্তির মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অপর দিকে চলিয়া গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি

এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল এবং আপন মনে বিড়বিড় করিয়া বকিতে আরম্ভ করিল,—"কাজটা নেহাইৎ অন্যায় হইয়াছে। আমার কর্ত্তাবাবা নবদ্বীপচন্দ্র সাহা সুবা বাঙ্গালার মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন;—তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়াই আমার এই দশা হইল। ফৌজী কারবার অতি বিষম ব্যাপার। আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি,—ইহা কি আমার পক্ষে সম্ভব! লোভ অতি পাপ। টাকায় একমণ গম কিনিয়া তিন টাকায় বেচিয়াছি; তাহার উপর প্রতি মাসে তিন টাকা সুদ ধরিয়াছি। বার আনা মণের চাউল দেড় টাকায় বেচিয়া টাকায় টাকা সুদ ধরিয়াছি। আমার অদৃষ্টে কি এত সহে! হে ঠাকুর, তুমি অন্তর্যামী, পাপ-পুণ্য কিছুই তোমার অগোচর নহে,—তুমি ভিন্ন দীননাথের আর গতি নাই। হে বাবা কালাচাঁদ, যদি কোন গতিকে টাকাটা আদায় করিতে পারি, তাহা হইলে টাকায় এক পয়সা হিসাবে—না বাবা, এক পয়সা পারিব না বাবা,—আধলা পয়সা হিসাবে তোমার পূজা দিব।"

ব্রাহ্মণ এই সময়ে ফিরিয়া আসিয়া বণিক্‌কে কহিল, "দীননাথ, তোমার কর্ত্তাবাবার কথা কি বলিতেছিলে বল।" দীননাথ হাসিয়া কহিল, "দেখ ঠাকুর, আমার কর্ত্তাবাবার কথা অনেক কথা। এখন এক কাজ কর দেখি,—যে টাকাটা বাকী পড়িয়াছে, তাহাতে আধলা পয়সা হিসাবে ঠাকুরের পূজা মানিয়া ফেল দেখি!"

"আধলা পয়সা কেন দীননাথ, আমি টাকায় পয়সা হিসাবে পূজা দিব!"

"ঐ ত তোমাদের দোষ দাদাঠাকুর, তোমরা কারবার বুঝ না। আমি টাকায় আধলা হিসাবে পূজা মানিলাম,—আর তুমি একেবারে দুগুণ দর চড়াইয়া দিলে,—ইহাতে কি কারবার চলে।"

"ঠাকুর-দেবতার কাছেও কি কারবার দীননাথ!"

"এইজন্যই দাদাঠাকুর, তোমাদের জাতির পয়সা হয় না। কারবারে ঠাকুর দেবতা, আত্মীয়-স্বজন সমস্তই সমান। তুমি টাকা-পিছু আধলা পয়সা পূজা মানিয়া ফেল দেখি!" "ভাল, মানিলাম; কিন্তু টাকাটা উদ্ধারের কি হইবে?" "দেখ দাদাঠাকুর, আমার কর্ত্তাবাবা অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন।"

"সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই দীননাথ!"

"তিনি বলিতেন যে, জলে জল বাধে, কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা যায় এবং টাকা ভিন্ন টাকা উদ্ধার হয় না। তোমার কত টাকা পাওনা বল দেখি!"

"হাজার দুই।"

"আর কত টাকা ছাড়িতে রাজী আছ?"

"দোহাই ধর্ম্মের, মা কিরীটেশ্বরীর দিব্য, আর একটী পয়সাও নাই।"

"ধার করিবে?"

"কত টাকা লাগিবে?"

"দুই তিন শত ত বটেই!"

"অত টাকা কি হইবে দীননাথ!"

"পেশকশ্‌, দাদাঠাকুর, পেশকশ্‌!"

"সে কি বাপু?"

"ঘুস, দাদাঠাকুর ঘুস। সুবাদারের দরবারে যাইতে হইবে,—আর্জী পেশ করিতে হইবে,—পিয়াদা হইতে সুবাদার পর্য্যন্ত পূজা দিতে হইবে,—তবে যদি টাকার উপায় হয়। এখন ধার করিবে কি না বল।"

"সুদ কত!"

"টাকায় আনা।"

"করিব।"

"চল, তমসুখ লিখিবে চল। সুবাদারী ফৌজের বখ্‌শী এনায়েতুল্লা খাঁ আমার খাতক,—তাহাকে কিছু খাওয়াইতে পারিলে টাকাটা উদ্ধার হইতে পারে।"

"তবে চল।"

উভয়ে গঙ্গাতীরস্থিত পরিত্যক্ত শিবির-ক্ষেত্র হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নূতন মুরশিদাবাদ সহরের মধ্যস্থলে এক নবনির্ম্মিত অট্টালিকার সম্মুখে বসিয়া জনৈক খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ মুসলমান নমাজের পূর্ব্বে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিতেছিল,—এমন সময়ে দীননাথ ও তাহার সঙ্গী তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। দীননাথকে দেখিয়া সে ব্যক্তি হাসিয়া উঠিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী, এ মাসে কি দ্বিগুণ সুদ দিতে হইবে? মাহিনা কাবারের এখনও ছয় দিন বাকী আছে।" দীননাথ

অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না,—না, সেখ সাহেব, এখন সুদের তাগাদায় আসি নাই, সেলাম।" এই বলিয়া বণিক্‌পুত্র সেলামের পরিবর্ত্তে মুসলমানকে প্রণাম করিয়া ফেলিল,—মুসলমান উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। দীননাথ লজ্জিত হইয়া কহিল, "সেথ সাহেব, বড় বিপদে পড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছি.—তুমি না উদ্ধার করিলে আমাদের আর উপায় নাই।" মুসলমান বিস্মিত হইয়া কহিল, "সাহাজী, তোমার মত হুঁসিয়ার বেণিয়া মুরশিদাবাদ সহরে অতি অল্পই দেখিয়াছি। তোমার আবার কি বিপদ্ হইল? কোন ফৌজদারী হাঙ্গামায় পড়িয়াছ না কি?"

"না, সেথজী। কর্ত্তাবাবার কৃপায় দীননাথ এ পর্য্যন্ত ফৌজদারী হাঙ্গামায় পড়ে নাই। কথাটা বড় গোপন, পথে দাঁড়াইয়া বলিতে ভরসা হয় না।"

মুসলমান দীননাথকে ও তাহার সঙ্গী ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া বসাইল; এবং দীননাথ তাহার পিতামহের বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে বহু অবান্তর প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া, তাহার ও তাহার সঙ্গীর অবস্থা জানাইল। মুসলমান পুনরায় উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল, "সাহাজী, যে কাজটী করিয়াছ, তাহা বেণিয়ার উপযুক্ত হয় নাই।" দীননাথ তাহা শুনিয়া হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি টাকা আদায় হইবার কোন উপায় নাই?" "আছে; কিন্তু সাহাজী, তুমি কি তাহা পারিবে?" "দেখ সেখ সাহেব, আমরা জাতিতে বেণিয়া, পাওনা টাকা আদায়ের জন্য আমরা বুকের রক্ত পর্য্যন্ত দিতে পারি।" "দেখ, বাবুজী, জিন্নৎমকানি আলমগীর বাদশাহের আমল হইতে বাদশাহী ফৌজের চাকরী করিয়া আসিতেছি। লস্করের হাল-চালের খবর আমার নিকট যত পাইবে, সুবা বাঙ্গালায় আর কাহারও নিকট এত পাইবে না। দেখ বাবুজী, আমার অসময়ে তুমি বড় উপকার করিয়াছ,—সে'জন্য তোমার নিকট বড় কৃতজ্ঞ আছি। আমি যেমন করিয়া পারি, তোমার পাওনা টাকা উদ্ধারের উপায় করিয়া দিব; কিন্তু কিছু টাকা খরচ করিতে হইবে।"

দীননাথ মুসলমানের পদদ্বয় আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, "খাঁ সাহেব, আমার অতি কষ্টের পয়সা;—তুমি যদি কোন উপায়ে টাকাটা আদায় করিয়া দিতে পার—কি আর বলিব,—আসলটা ছাড়িতে পারিব না,—তবে যদি আর কখন সুদের নামও করি, তাহা হইলে আমি নবদ্বীপচন্দ্রের পৌত্রই না।"

মুসলমান পুনরায় উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল; এবং কহিল, "বাবুজী, সুদের টাকা নিয়মমত যথাসময়ে লইও। তুমি অসময়ে আমার উপকার করিয়াছিলে, তোমার প্রাপ্য বঞ্চিত করা আমার উচিত নহে। টাকা অন্যত্র ব্যয় করিতে হইবে। সুবাদারী ফৌজের কথা হইলে আমি বিনা খরচে তোমার টাকা আদায় করিয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু এ টাকা বাদশাহী লস্কর খাইয়াছে; সুতরাং আমার ক্ষমতার অতীত। বাদশাহী লস্করের বথ্‌শী ব্যতীত আর কেহ তোমার ফরীয়াদ শুনিতে পারিবে না। শাহজাদার সহিত রহমৎআলি খাঁ আছেন,—তিনি আমার পরিচিত; কিন্তু তাঁহার নিকট ঐ অর্থের পরিবর্ত্তে লম্বা জবানই সুলভ। দেখ, বড়-ঘরানার কথা,—আমরা নফর,—আমাদের মুখে ভাল শুনায় না; তবে লোকের মুখে যতটা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে বোধ হয় যে, শাহজাদা ফররুখশিয়রের লস্করে অর্থের বড়ই অনাটন। দীননাথজী, আজি তোমার মত অনেক বেণিয়াই আফ্‌শোষ করিতেছে। জাহাঙ্গীরনগর হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত শাহজাদা ফররুখশিয়রের লস্করের হাজার-হাজার পাওনাদার আছে। দেখ বাবুজী, আমি তোমাকে রহমৎ আলি খাঁর উপরে একখানি রোকা দিতেছি; তুমি তাহা লইয়া আজিমাবাদের পথে যাও,—সে তোমাদের পাওনা টাকার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেই দিবে। তবে একটা কথা স্মরণ রাখিও যে, পেশকশটা নগদ দিতে হইবে; কিন্তু টাকাটা নগদ আদায় না হইতেও পারে।"

"সে আবার কি কথা সেখজী!"

"কথাটা ভাল করিয়া বুঝ। শাহজাদা ফররুখশিয়র আজীম-উশ্-শানের পুত্র। বাদশাহ অতি বৃদ্ধ,—নয়নের পলক পড়িতে-না-পড়িতে হয় ত আজীম-উশ্-শান ময়ূর-তখ্‌তে উপবিষ্ট হইবে। তখন এই বৃদ্ধ মুরশিদকুলি খাঁ ফররুখশিয়রের পদপ্রান্তে লুটাইবে; এবং মুরশিদাবাদ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত প্রত্যেক সুবাদার ও ফৌজদার ফররুখশিয়রের দস্তখৎ-যুক্ত হুকুমনামা দেখিলে, টাকার পরিবর্ত্তে আশরফি আনিয়া হাজির করিবে। দীননাথ, তুমি বেণিয়া, কারবার তোমার জাতির পেশা,—যদি টাকার পরিবর্ত্তে

আশরফি রোজগার করিতে চাহ, তাহা হইলে নগদ টাকা খরচ করিয়া একখানা হুকুমনামা লইয়া ফিরিয়া আসিও। টাকার জন্য অধিক তাগিদ করিও না। দেখ, আলমগীর বাদশাহের আমলে দক্ষিণদেশে বহুদিন কাটাইয়াছি, বহুতর শাহজাদা দেখিয়াছি। ফররুখশিয়ার সদাশয় ব্যক্তি। এখন যদি তাহার উপকার করিতে পার, তাহা হইলে কালে একের পরিবর্ত্তে শতগুণ পাইবে।"

"সেখজী, রাজা-রাজড়ার কথা! তাঁহাদিগের কি সকল সময়ে সকল কথা মনে থাকে! ধোকা দিয়া যদি পরে ভুলিয়া যান! দেখ সেখজী, দেড় হাজার টাকার এক একটী আমার বুকের এক-এক ফোঁটা রক্ত; পুত্রশোক সহ্য করিতে পারি, কিন্তু টাকার শোক সহ্য হয় না।"

"দীননাথ তুমি একটী আস্ত পাগল। তোমার টাকা আদায় করিয়া দিবার জন্যই তোমাকে সন্ধান বলিয়া দিলাম। ইহা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। বাদশাহী লস্কর যে টাকা হাওলাত লইয়াছে, স্বয়ং বাদশাহ অথবা বাদশাহী লস্করের বক্শী ব্যতীত অপর কেহ সে ফরীয়াদ শুনিতে পারে না। স্বয়ং মুরশিদ কুলি খাঁ তোমার মামলার বিচার শুনিতে অক্ষম। তাহার উপর, শাহজাদা ফররুখশিয়ার বর্ত্তমান সময়ে প্রায় নিঃসম্বল। সেখানে অধিক তাগিদ করিলে টাকার পরিবর্ত্তে চামড়ার কোড়া পাইবে; আর যদি মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া পাওনা টাকার হুকুমনামার উপরে শাহজাদার দস্তখৎ করাইয়া আনিতে পার, তাহা হইলে কালে সুদ ও সুদের সুদ সমেত সমস্ত টাকা ওয়াসিল করিতে পারিবে। আমার বিপদের সময়ে তুমি বড় উপকার করিয়াছিলে,—আমার যে উপায় ভাল বোধ হইল, তাহাই বলিলাম,—এখন তোমার যাহা ইচ্ছা কর। নমাজের সময় প্রায় অতীত হইল,—আমাকে আপনারা মাফ করিবেন।"

দীননাথও তাহার সঙ্গী বাহিরে আসিল। ব্রাহ্মণ কহিল "ওহে, দীননাথ যখন অন্য উপায় নাই তখন চল, কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া, আজীমাবাদের পথেই যাওয়া যাক।"

দীননাথ বিষণ্ণ বদনে কহিল "চল। দেড় হাজার গিয়াছে,—আরও কত যাইবে, তাহা ভগবান্‌ই জানেন।"

সাহিত্যিক লড়াই

[সঙ্কলন]

(১)

৺রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত

"জামাই-বারিক

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কেশবপুর—জামাই-বারিক।

চারিজন জামাই আসীন।

পঞ্চম-জামাই।...

"রাম-লক্ষণ পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়ায় নিতান্ত মূঢ়মতি বিবেচনায় পঞ্চবটী বনে উপসংহার করিয়া ডেরাডাণ্ডা ফেল্লেন। সাঁওতাল-নন্দনদিগের সহিত হেঁড়ুডুডু, নবীন তুড়কি, কপাটি-কপাটি, ডাণ্ডাগুলি খেল্‌তে লাগলেন; অল্পদিনের মধ্যে সুমেরু-শিখর-নিকর-পরাজিত-দিগ্বিজয়ী বীর হয়ে উঠ্‌লেন। ইতিমধ্যে কিচকিন্দা-অধিপতি বালী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিণয় উপলক্ষে তাঁহার বৈঠকখানায় নৃত্য করিবার জন্য একযোড়া খ্যাম্‌টাওয়ালী উপস্থিত হয়। নাচ আরম্ভ হয়েছে; বালী-রাজা সিংহাসনে বক্রভাবে দীর্ঘ লাঙ্গুল উচ্চ করিয়া উপবিষ্ট; দুই পার্শ্বে হনুমান্, জাম্বুবান্ নল, নীল, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি লোমাচ্ছাদি-উচ্চ-পুচ্ছধারী মহোদয়গণ চেয়ারে, বেঞ্চে, কোচে বিরাজ কচ্চেন; জরীর টুপি, মেরেসা, শ্যামলা, কিংখাপের চাপকান, সাটিনের চায়না-কোটে বানরকুল ঝলমল। রাম-লক্ষণ টিকিট পেয়েছিল; তারাও সভায় উপস্থিত। বুনোদের সঙ্গে থেকে ছোঁড়া দুটোর স্বভাব বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল। বালী রাজাকে বল্লে,

"খ্যাম্‌টাওয়ালী ছুটোকে আমাদের দাও।" বালী বল্লে, "দেব না।" ঘোর যুদ্ধ,—বালী-রাজা বধ। খ্যাম্‌টাওয়ালী ছুটোকে দু-ভাইতে ভাগ করে নিলে; যেটার নাম সীতা সেটা নিলে রাম; যেটার নাম সূর্পণখা, সেটা নিলে লক্ষ্মণ।"

(২)

৺রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত

"সধবার একাদশী"

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিৎপুর রোড—গোকুল বাবুর বাড়ীর সম্মুখ।

নিমচাঁদ।..

"চ'দ্দ বৎসর কেন, চদ্দ হাজার বৎসর বনে থাকৃতে পারি, আমার মালিনী মাসী জানকী কাছে থাকে—পবন তনয়ের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ঐরূপে বাস, তার পর সীতা পাই ভাল, নইলে সীতাও যে পথে, জগন্নাথও সেই পথে।"

(৩)

—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "ঘরে বাহিরে" ৯৫ পৃষ্ঠা—

সন্দীপ।..

"যে-রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে' শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোকবনে রেখেছিল—অতবড় বীরের অন্তরের মধ্যে ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সঙ্কোচ ছিল তা'রই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে গেল। এই সঙ্কোচটুকু না থাকৃলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পূজো করত। এই রকমেরই একটু সঙ্কোচ ছিল বলেই, যে-বিভীষণকে তা'র মারা উচিত ছিল, তাঁকে রাবণ চিরদিন দয়া এবং অবজ্ঞা করলে, আর ম'ল নিজে।"

(৪)

রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে"

[শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, এম-এ, বি-এল]

এ মহাপাতকে হিন্দু! তব পুণ্য গেহ
করিও না কলঙ্কিত; আর্য্য রক্ত দেহ
ধরে যদি এক বিন্দু একটি শিরায়,
যদি শুদ্ধ শুচিতার একটি রেখায়
শুভ্র থাকে ও চিত্তের এক তিল স্থান,
এ কলুষ হ'তে দূরে করো অবস্থান;
যে পবিত্র সীতা নামে ধন্য আর্য্য দেশ,
যেথা স্বপ্নে পাপ চিহ্ন করে না প্রবেশ,
সেই শ্বেত সরোজের অমল ধবলে,
আর্য্য হৃদয়ের সেই পূজার কমলে
কালিমার ছায়া দিতে যাহার সৃজন,
আর্য্য কর যেন নাহি করে পরশন;
হায় বঙ্গ! যে কবির বীণায় আপনি
সুমন্দ মলয় এসে করে প্রতিধ্বনি,
তার কর প্রণালীর পূতিগন্ধময়
পঙ্কে কলঙ্কিছে যত দিব্য কুবলয়!
কিন্তু যেই লেখনীর লজ্জালেশহীন
বর্ব্বর যথেচ্ছাচার সেই অমলিন
শুদ্ধ শুচি সতীত্বের তেজে জ্যোতির্ম্ময়
সীতা-চিত্তে কল্পিয়াছে পাপিষ্ঠ আশয়,
তার হাতে আর্য্যনারী 'বিমলা'র প্রায়
যথেচ্ছাচারিণী হবে, কি আশ্চর্য্য তায়?
তার হাতে এ ঘরের পবিত্র বাতাস,
সংধমের সুনীতির এ দিব্য আবাস
স্বৈরিণী-বিলাস দুষ্ট বাইরের মত
কলুষিত কলঙ্কিত হবে অবিরত।*

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' দেখুন।

অর্চ্চনা, (ফাল্গুন, ১৩২৬।)

(৫)

বেতালের প্রশ্ন*

[শ্রীত্রিবিক্রম বর্ম্মণ]

পরিচয় দিয়ে যাও গো চলিয়ে,
হিঁদুয়ানী-অবতার আমার!
সন্দীপ কৃত সীতার গ্লানিতে
বোতাম বিদরে যার জামার?
"ঘরে বাইরে"টা ঘরের বাহির,
করিতে তো তুড়ে ফয়তা দাও,
হিন্দুয়ানীর পুঁচ্কে দুয়ানী!
এদিকে বারেক চোখ্ তাকাও।

"জানকী মালিনী মাসী" ব'লে হেথা
হল্লা করে কে হাঁকডাকে,
আমি বলি বুঝি নিমে দত্তটা,
তুমি বল দেখি, লোকটা কে?
সীতারে থেম্‌টাউলী বানায়ে কে
নাচালে বানর-বৈঠকে,
আমি বলি ওটা গেঁজেল জামাই,
যে হোক্‌, চাবুক দাও ও'কে।
ব'কে ধম্‌কিয়ে 'ধ' বানিয়ে দাও,
ক'সে ওরে তুমি দাও গালি,
বেয়াৎ কোরো না,—হিঁদুর শত্রু,
কই?—কোথা গেল?—ভুণক....

* অর্চ্চনার "ঘরে বাইরে" কবিতা দ্রষ্টব্য।

ভারতী, (চৈত্র, ১৩২৬।)

(৬)

সাহিত্য-বিচার

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

"ঘরে-বাইরে" উপন্যাসখানা লইয়া বাংলার পাঠকমহলে এখনো কথা চলিতেছে। হৃদয়াবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল হয় তখন মানুষ গদ্য ছাড়িয়া পদ্য ধরে। সম্প্রতি তাহারও সূচনা প্রকাশ পাইতেছে। এক জায়গায় দেখিলাম, "ঘরে-বাইরে" সম্বন্ধে ক্ষোভ চোদ্দ অক্ষরের লাইনে লাইনে রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাতে পদ্যসাহিত্যের বিপদ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। পাছে ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে সেইজন্য এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিলাম না।

পছন্দ লইয়া মানুষের সঙ্গে তর্ক চলে না। ভর্তৃহরির অনেক পূর্ব্ব হইতেই কবিরা এ সম্বন্ধে অবস্থাবিশেসে হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন। স্বয়ং কালিদাসও কবিতাই লিখিয়াছেন, কিন্তু দিঙ্‌নাগাচার্য্যের সহিত বাদপ্রতিবাদ করেন নাই। সাধারণত কবিদের নিন্দা-অসহিষ্ণু বলিয়া খ্যাতি আছে; কিন্তু সেই অসহিষ্ণুতা লইয়া (দুই-একজন ছাড়া) তাঁহারা নিজেরাই ক্ষোভ অনুভব করিয়াছেন, সাহিত্যকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলেন নাই। যখন তাঁহাদের লেখার প্রতি কেহ কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে, তখন সেই কলঙ্ক-ভঞ্জনের ভার তাঁহারা কালের হস্তেই সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ভাগ্যবান তাঁহাদের লেখা সম্বন্ধে ইহাই প্রমাণ হইয়া গেছে যে, তাঁহাদের রচনার কলসে আলঙ্কারিক ছিদ্র, একটা কেন, একশোটা থাকিতে পারে, কিন্তু তবু তাহা হইতে রস বাহির হইয়া যায় নাই। সাহিত্যে এই কলঙ্কভঞ্জনের পালা অনেক দিন হইতে অনেকবার অভিনীত হইয়াছে, যাঁহারা আলঙ্কারিক তাঁহাদের গঞ্জনা হইতে কবিরা বারবার রক্ষা পাইয়াছেন।

"ঘরে-বাইরে" সম্বন্ধে রসবোধ লইয়া যদি কথা উঠিত তবে সে-কথা যতই কটু হউক নীরব থাকিতাম। কিন্তু যে কথা উঠিয়াছে তাহা সাহিত্যসীমানার বাহিরের জিনিষ। তাহা যুক্তির অধিকারের মধ্যে, সুতরাং তাহা লইয়া তর্ক চলে, এবং তর্ক না চালাইলে কর্ত্তব্য পালন করা হয় না। কারণ, যাহা অন্যায় তাহাকে সহ্য করিয়া গেলে সাধারণের প্রতি অন্যায় করা হয়।

"ঘরে-বাইরে" বাহির হইবার পরেই আমার বিরুদ্ধে একটা নালিশ শোনা গেল যে, আমি এই উপন্যাসে সীতার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিয়াছি। কথাটা এতই অদ্ভুত যে আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এমন কি, আমাদের দেশেও ইহা গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু দেখিলাম, লোকে উৎসাহের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়াছে; এবং জনগণের নিন্দায় একদা সীতা যেরূপ নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন এ গ্রন্থও সেইরূপ গণ্যমান্যদের সভা ও লাইব্রেরি ঘরের টেবিল হইতে নির্ব্বাসিত হইতে থাকিল।

এটাকে সামান্য ব্যক্তিগত হিসাবে দেখিলে ইহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু যে-কোনো প্রভাবে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে বিকৃত করে, সেই প্রভাব যদি ব্যাপক হইয়া উঠিতে থাকে তবে সেটাকে সাধারণের পক্ষে ক্ষতিজনক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অতএব "ঘরে-বাইরে" গ্রন্থের যে-অপরাধ বানাইয়া তুলিয়া আমার প্রতি কেবলি আক্রোশবর্ষণ চলিতেছে সেই অপরাধের অভিযোগটাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার।

মহাকাব্যে নাটকে বা নভেলে যে আখ্যানবস্তু পাওয়া যায় তাহার নানা বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু সকল বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সেই-সমস্ত আখ্যানে একটা সাধারণ উপাদান দেখিতে পাই; সেটি আর কিছু নয়, সাধারণে আমোদের

দ্বন্দ্ব। তাই রামায়ণে দেখিয়াছি, রাম-রাবণের যুদ্ধ; মহাভারতে দেখিয়াছি, কুরু-পাণ্ডবের বিরোধ। কেবলি সমস্তই একটানা ভালো, কোথাও মন্দের কোনো আভাস মাত্র নাই, এমনতর নিছক চিনির সরবৎ দিয়াই সাহিত্যের ভোজ সম্পন্ন করা অন্তত কোন বড় যজ্ঞে দেখি নাই।

এত বড় মোটা কথাও যে আমাকে আজ বিশেষ করিয়া বলিতে হইতেছে সেজন্য আমি সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। শিশুরা যে রূপকথা শোনে, সেই রূপকথাতেও রাক্ষস আছে; সেই রাক্ষস শুদ্ধ সংযত হইয়া কেবলি মনুসংহিতা আওড়ায় না,—সে বলে, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ।" ধর্ম্মনীতির দিক্ হইতে দেখিলে তাহার পক্ষে এমন কথা বলা নিঃসন্দেহই গুরুতর অপরাধ; আশা করি যাহারা এই-সকল গল্প রচনা করিয়াছিল তাহারা নরমাংসাশী ছিল না এবং যাহারা এইসব গল্প শোনে নরমাংসে তাহাদের স্পৃহা বাড়ে না। তাই বলিতেছি, মানুষের গন্ধে গল্পের রাক্ষসের লুব্ধতা-উদ্রেক হওয়া ধর্ম্মশাস্ত্রমতে অপরাধ সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষের গন্ধে গল্পের রাক্ষসের ভ্রাতৃ-প্রেম যদি জাগিয়া উঠিত, এবং সে যদি সুমধুর স্বরে বলিয়া উঠিত "অহিংসাপরমোধর্ম্ম" তবে সাহিত্যরসনীতি অনুসারে রাক্ষসের সে অপরাধ কিছুতে ক্ষমা করা চলিত না। কোনো শিশুর কাছে ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই এক মুহূর্ত্তেই আমার কথা সপ্রমাণ হইবে। কিন্তু সেই শিশুই কি বড় হইয়া এম-এ পাস করিবামাত্র গল্পের রাক্ষসটা মরাল্‌-ফিলজফির নীচে চাপা পড়িয়া সকরুস্বরে শান্তিশতক আওড়াইতে থাকিবে?

যাই হউক, সকল ভাষার সকল সাহিত্যেই ভালো মন্দ দুই রকম চরিত্রেরই মানুষ আসরে স্থান পায়। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেও সেইরূপ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। এই-জন্যই "ঘরে-বাইরে" নভেলে যখন সন্দীপের অবতারণা করিয়াছিলাম তখন মুহূর্ত্তের জন্যও আশঙ্কা করি নাই যে সেটা লইয়া আমাদের দেশের উপাধিধারী এত গণ্যমান্য লোকের কাছে আমাকে এমন জবাবদিহির দায়ে পড়িতে হইবে। এখন হইতে ভবিষ্যতে এই আশঙ্কা মনে রাখিব, কিন্তু স্বভাব সংশোধন করিতে পারিব না; কেননা আমাদের দেশের বর্ত্তমান কাল ছাড়াও কাল আছে এবং গণ্যমান্য লোক ছাড়াও লোক আছে, তাহারা নিশ্চয়ই রাক্ষসের মুখ হইতে এই অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ কথা শুনিতে চায়—হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ; চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য প্রয়োগেও তাহারা বাংলাভাষা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইবে না।

জানি আমাকে প্রশ্ন করা হইবে, সন্দীপ যত বড় মন্দ লোকই হউক তাহাকে দিয়া সীতাকে অপমান কেন? আমি কৈফিয়ৎস্বরূপে বাল্মীকির দোহাই মানিব,—তিনি কেন রাবণকে দিয়া সীতার অপমান ঘটাইলেন? তিনি ত অনায়াসেই রাবণকে দিয়া বলাইতে পারিতেন যে, মা লক্ষ্মী, আমি বিশহাতে তোমার পায়ের ধূলা লইয়া দশ ললাটে তিলক কাটিতে আসিয়াছি।—বেদব্যাস কেন দুঃশাসনকে দিয়া জয়দ্রথকে দিয়া দ্রৌপদীকে অপমানিত করিয়াছেন? রাবণ রাবণের যোগ্যই কাজ করিয়াছে, দুঃশাসন জয়দ্রথ যাহা করিয়াছে তাহা তাহাদিগকেই সাজে,—তেমনি আমার মতে সন্দীপ সীতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা সন্দীপেরই যোগ্য—অতএব সে কথা অন্যায় কথা বলিয়াই তাহা সঙ্গত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গতি সাহিত্যে নিন্দার বিষয় নহে।

যদি আধুনিক কালের কোনো উপাধিধারী এমন কথা গদ্যে বা পদ্যে বলিতে পারিতেন যে, রাবণের পক্ষে সীতাহরণ কাজটা অসঙ্গত, মন্থরার পক্ষে রামের প্রতি ঈর্ষা অযথা, সূর্পনখার পক্ষে লক্ষ্মণের প্রতি অনুরাগের উদ্রেক অসম্ভব, তাঁহা হইলে নিশ্চয় কবিগুরু বিচারসভায় হাজির থাকিলেও নিরুত্তর থাকিতেন; কেননা এমন সকল আলোচনা সাহিত্য-সভায় চলিতে পারে। কিন্তু তাহা না বলিয়া ইঁহারা যদি বলিতেন এ-সকল বর্ণনা নিন্দনীয় কারণ ইহাতে সীতাকে রামকে লক্ষ্মণকে অপমানিত করা হইয়াছে এবং এই অপমান স্বয়ং কবিকৃত অপমান; ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে এই সকল ভালোমানুষের প্রতি সকলেরই সাধু ব্যবহার করাই উচিত; তবে যে-কবি সর্ব্বাঙ্গে কীটের উৎপাত স্তব্ধ হইয়া সহ্য করিয়াছিলেন তিনিও বোধ হয় বিচলিত হইয়া উঠিতেন।

আমি অন্যদেশের কবি ও লেখকের গ্রন্থ হইতে কোনো দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম না। কেননা, এমন কথা আমাদের দেশে প্রচলিত যে, অন্যদেশের সহিত ভারতবর্ষের কোনো অংশে মিল নাই, সেই অমিলটাকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া

থাকা আমাদের ন্যাশনাল সাহিত্যের লক্ষণ—অর্থাৎ ন্যাশনাল সাহিত্য কূপমণ্ডুকের সাহিত্য।

(প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৬।)

(৭)

রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ছন্দ

[শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন]

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদিগের পদানুসরণে ছন্দঃ লইয়া ভগবানের উপরে কান্তভাব স্থাপন করিয়া অধিকাংশ কবিতা লিখিয়াছেন। শোক হইতে শ্লোকের সৃষ্টি; বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথম শ্লোক বাহির হইয়াছে; এই কথা যিনি বলিবেন, বলিব,—তিনি নিশ্চয়ই ভুল করিতেছেন। অপৌরুষেয় বেদে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আছে; বাল্মীকি তাহা সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত কাব্যে আনিয়াছেন, এই বাল্মীকির মুখে শ্লোকের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ছন্দঃগুলি বৈষ্ণব কবিদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত। এমন কি, তিনি গীতগোবিন্দের রচয়িতা, শব্দমধুর রচনায় সিদ্ধহস্ত, সুরসিক উক্ত কবি জয়দেবের নিকট হইতেও ছন্দঃ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা উদাহরণ স্বরূপে "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" ছন্দের অনুকরণে তাঁহার রচিত "একদা তুমি অঙ্গ ধরি" এই কবিতায় উল্লেখ করিতে পারি।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ এমন কি ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত যখন যে সংস্কৃতচ্ছন্দে কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তাঁহারা সেই সেই কবিতায় "হ্রস্ব লঘু, দীর্ঘ গুরু, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণও গুরু" এই নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন। পশ্চিমদেশে ধ্রুপদ গানেও অদ্যাপি সেই নিয়ম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন নিয়মের দূরে বর্জ্জন করিয়াছেন, "হ্রস্ব লঘু দীর্ঘ গুরু" তিনি মানেন নাই; "সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণগুরু" এই মাত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের যুক্তি এই;—বাঙ্গালায় হ্রস্ব-দীর্ঘ লইয়া লঘু-গুরু উচ্চারণ নাই; কেহই দীর্ঘ বর্ণে গুরু উচ্চারণ করে না, হ্রস্বদীর্ঘ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র লঘু উচ্চারণই প্রচলিত; সুতরাং কেবল ছন্দে কেন দীর্ঘ স্বরের গুরু উচ্চারণ গ্রহণ করিব? সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণের উচ্চারণ অনিচ্ছাতেও যখন স্বভাবতঃ একটু জোর আসে, তখন তাহাকেই গুরু বর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইব,—ইত্যাদি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের মতে যখন বাঙ্গালায় দীর্ঘ বর্ণের উচ্চারণ গুরু নয় অবধারিত তখন সংস্কৃতে "কিম্" শব্দের অপভ্রংশে বাঙ্গালায় যে "কি" শব্দের উৎপত্তি, চিরদিন বাঙ্গালী যাহাকে হ্রস্ব ইকারের যোগে লিখিয়া আসিতেছে, কোন-কোন স্থলে সেই "কি" শব্দের গুরু উচ্চারণ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার ঘাড়ে কেন যে দীর্ঘ ঈকারের চাপ বসাইতেছেন, বুঝিতে পারিলাম না। বাঙ্গালায় দীর্ঘের, গুরু উচ্চারণ নাই; তবে "কী"এর বেলায় তাঁহার প্রদত্ত দীর্ঘ ঈকার বলিয়াই কি গুরু উচ্চারণ হইবে?

সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্বর গুরু, এই নিয়মই কি খাঁটি বাঙ্গালা কবিতায় পূর্ব্বে গৃহীত হইত? "কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ। গাইল উত্তরাকাণ্ড গীত রামায়ণ।" এবং

"পূর্ণ সুধাকর; হইতে প্রবর,"
"নেত্র যুগ মীন, দেখিয়া হরিণ,"
"কহলো মালিনী, কি রীতি,
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে নাইক ভীতি।"

ইত্যাদি ইত্যাদি কবিতায় কি সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্বরের গুরু উচ্চারণ জন্য তাহাকে দুইমাত্রা বলিয়া ধরা হইয়াছে? যদি বল,—খাঁটি বাঙ্গালা ছন্দের কবিতায় মাত্রা গণনা নাই, অক্ষর মাত্র গণনা আছে। ভাল কথা, স্বীকার করিলাম, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের—

"পঞ্চনদের তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে।"

এই কবিতাতেই বা কেন "পঞ্চ" এই শব্দের 'প'কারে দুই মাত্রা ধরা হইল?

"বিপুল গভীর, মধুর মন্দ্রে"
"সফল অশ্রু মগন হাস্য"
"প্রভাত অরুণ কিরণ রশ্মি"
"চিরকাল ধরে, গম্ভীরস্বরে"

ইত্যাদি ইত্যাদি কবিতাতেই বা "মন্দ্রে"র "ম"কে, "অশ্রু"র "অ"কে, "হাস্যের" "হা"-কে, "রশ্মির" "র"কে এবং "গম্ভীরে"র "গ"কেই বা কেন দুইমাত্রার উচ্চারণে ধরিয়া লওয়া হইল? এ ছন্দটীও ত লঘু-ত্রিপদীর একটি রূপান্তর। সংস্কৃত "কূজতি কিল কোকিলকুলমুঞ্জুকলনাদং।" এই ছন্দঃ হইতে-লঘু-ত্রিপদীর উৎপত্তি হইলেও বাঙ্গালায় আসিয়া

সে খাঁটি বাঙ্গালা ছন্দঃ হইয়াছে। এইজন্য পূর্ব্বোদ্ধৃত "পূর্ণ সুধাকরের" "পূ"এ দুইমাত্রা ধরা হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে রবীন্দ্রনাথ স্বরবর্ণের গুরু উচ্চারণ করেন না, তিনিই আবার

"চৌদিক হ'তে উন্মাদ স্রোতে"

ইহার "চৌ"র দুইমাত্রা গ্রহণ করিয়াছেন।

যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যেও কলিকাতা প্রদেশের কথ্য ভাষা চালাইতে বদ্ধপরিকর, তিনি যে কবিতায় সংযুক্তবর্ণগুম্ফিত শ্রুতিকঠোর সংস্কৃত শব্দরাশি কেন চালাইতেছেন, তাহার কারণ-নির্ণয়ে আমরা একান্ত অসমর্থ। "কী" লিখিয়া যিনি নিজের নিয়ম নিজেই ভঙ্গ করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে গদ্যে ও পদ্যে এইরূপ বৈচিত্র্য দেখিয়া বিস্মিত হই নাই; অনুবর্ত্তী কবিবৃন্দের সেইদিকে ঝোঁক দেখিয়াও আশ্চর্য্য ভাবি নাই; বরং তাঁহাদিগের এইরূপ অবিচারিত ভাবে এই পদ্ধতিগ্রহণে গুরুভক্তির আতিশয্য বুঝিয়া আনন্দিত হইয়াছি। পদাবলীর প্রণেতা বৈষ্ণব কবিগণ ও প্রাচীন অন্যান্য কবিগণ সংস্কৃতশব্দের সংযুক্তবর্ণকে বিযুক্ত করিয়া, শিথিল করিয়া, কোমল করিয়া কবিতায় বসাইতেন; তাহার ফলে "ধর্ম্ম" "ধরম", "কর্ম্ম" "করম" "প্রীতি" "পীরিতি", হইয়াছে; কৃষ্ণ পর্য্যন্ত কানু হইয়াছেন। উদাহরণের বাহুল্যে আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না।

যাহা হউক, আবার সেই পূর্ব্বকথিত বিষয়েরই অবতারণা করিতেছি। বাল্মীকি যেমন বেদ হইতে, দেবলোক হইতে সংস্কৃত কাব্যে—মর্ত্ত্যলোকে খাঁটি বৈদিক ছন্দকে নামাইয়াছেন, আবার কতকগুলি বৈদিক ছন্দকে ভাঙ্গাচূরা করিয়া নূতন আকার প্রদান করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ যখন সেইরূপ গীতগোবিন্দ হইতে ও বৈষ্ণব পদাবলী হইতে ছন্দোগ্রহণ করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন [illegible] লিকে বিবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়া নবীন পরি[illegible]নবীন ভূমিকায় প্রদর্শন করিতেছেন, তখন এ যুগের কবিদিগের মধ্যে তাঁহাকে বাল্মীকি না বলিয়া আর কাহাকে বলিব? বাল্মীকি তমসাতীরে ব্যাধবিদ্ধ রুধিরপরিপ্লুতদেহে ভূলুণ্ঠিত ক্রৌঞ্চকে দেখিয়া, ক্রৌঞ্চীর আর্ত্তনাদে আত্মহারা হইয়া শুধু "মা নিষাদ" শ্লোকে নয়—তাঁহার মধুর-লেখনীপ্রসূত রামায়ণের করুণপ্রস্রবণে বিশ্ব ভাসাইয়াছিলেন, আমাদিগের বঙ্গবাল্মীকি তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি নিছক করুণ ত সহ্য করিতে পারেনই নাই, শৃঙ্গারে যে করুণ বিপ্রলম্ভ আছে, তাহারও তিনি ছায়া মাড়াইতে রাজি নহেন। তিনি বিশ্বপতিকে পতি বলিয়া টানিয়া লইয়া গৃহে, বাহিরে, বনে, উপবনে, তরুমূলে, নদীকূলে, গিরিশৃঙ্গে, নদীতরঙ্গে, সরোবরে, তারায় তারায়, চাঁদের জ্যোৎস্নায়, মেঘের গায়, আকাশে, বাতাসে, সর্ব্বত্র তাঁহাকে নিভৃতে পাইয়া জড়াইয়া ধরিয়াছেন; তাঁহার স্পর্শে পুলকে মৃদুমধুর হাসি হাসিতেছেন, পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ, ভুলিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে জগৎ হাসিতেছে। যিনি ঝঞ্ঝানিলের তর্জ্জনে, সমুদ্রের ঘোর গর্জ্জনে, অভ্রশৃঙ্গ-গগনব্যাপী নীলজলধরে খেলায়মান বজ্রপাতকারিণী বিদ্যুতের অট্টহাস্যে ভয় না করিয়া প্রাণনাথের সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কাটিয়া বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া মেঘের গায়ে চলিয়া বাঁশী বাজান, তিনি ধন্য।

ইয়ুরোপ বিরহ জানিত, ভগবানের সম্ভোগ জানিত না; রবীন্দ্রের মুখে সম্ভোগের নূতন গান শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে। বঙ্গবাল্মীকি সেই দুঃখস্মৃতির তামসী তমসার তীরে না দাঁড়াইয়া মধুময়ী তমসার (টেম্‌স্) তীরে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেখানে ব্যাধের ভয় নাই, নিষাদের শরের ভয় নাই; যূথে যূথে তুষারশুভ্র ক্রৌঞ্চমিথুন আনন্দে তালে তালে পা ফেলিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে পরিভ্রমণ করিতেছে, দেখিয়া বঙ্গবাল্মীকি সম্ভোগের মাহাত্ম্য অনুভূতিতে আনিয়া নিজের গানে নিজেই মুগ্ধ হইয়াছেন। দেবদেবীরা মিলিয়া, মাণিক্যে যাহার পাপড়ী, সেই সোণার পারিজাতের মালা গাঁথিয়া বাল্মীকিকে পরাইয়া দিয়াছেন। ইহা কেবল রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য নয়, বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নয়, সমস্ত ভারতবাসীর সৌভাগ্য।

নৈদাঘতাপে সন্তপ্ত না হইলে মলয়-সমীরণের উপভোগে সুখানুভব হয় না; তৃষ্ণানিপীড়িত কণ্ঠ না হইলে, স্বচ্ছ শীতল সলিলের শৈত্য ও মধুরতার অনুভূতি হয় না; ক্ষুধার জ্বালায় অধীর না হইলে অন্নব্যঞ্জনে তাদৃশী প্রবৃত্তি জন্মে না; "ন বিনা বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।" বিপ্রলম্ভ ভিন্ন সম্ভোগের পুষ্টি হয় না। তাই, বৈষ্ণব কবিদিগের কল্পনা পূর্ব্বরাগে বিরহ, মানে বিরহ, প্রবাসে বিরহের তুফান তুলিয়া সম্ভোগের বারিধারা বর্ষণে ভক্ত-জগৎকে শীতল, মুগ্ধ করিয়াছে।

বিরহ কেবল সম্ভোগের পুষ্টি করে না, বিরহের অতিমাত্র তীব্রতায় ব্যক্তিত্ব, ভেদবুদ্ধি, আত্মসত্তা পর্য্যন্ত প্রিয়তম বা প্রিয়তমার সত্তায় ডুবিয়া যায়। "অদৃষ্টে বিরহোৎকণ্ঠা দৃষ্টে বিশ্লেষ ভীরুতা" আর থাকে না। আরশুলা যেমন কাঁচপোকা ভাবিতে ভাবিতে কাঁচপোকা হইয়া যায়, বিরহী ধ্যাতা সেইরূপ ধ্যান করিতে করিতে ধ্যেয় হইয়া পড়ে। মহাকবি ভগবান্ বেদব্যাস তাই ভাগবতে বিরহোন্মত্তা গোপীদিগকে কৃষ্ণতন্ময়তালাভ করাইয়া কৃষ্ণলীলার অভিনয় করাইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস রাধিকার তন্ময়তা আনিয়াছিলেন,—অভিনয় করান নাই। অবশ্য এই তন্ময়তা নিদিধ্যাসনের অনুকূল মনন মাত্র, বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় ক্ষণিক স্থায়ী হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারে আবার গোপীদিগের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়াছিল। মহর্ষি গোপীদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—এইরূপ মনন করিয়া যাও, নিদিধ্যাসন আসিবে;' নিদিধ্যাসনে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবে। তখন কে কাহাকে কাহার দ্বারা দেখিবে? ধ্যান, ধ্যাতা কিছুই থাকিবে না; জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা, কিছুই থাকিবে না; একত্বে সমস্ত দ্বিত্ব ডুবিয়া যাইবে। তখন পূর্ণানন্দ হইবে, সচ্চিদানন্দ হইবে; উপনিষৎ যাহা তারস্বরে বলিয়াছেন, তাহার সম্যগুপলব্ধি হইবে। এইজন্য প্রাচীন গ্রন্থকারেরা বদ্ধাঞ্জলিপুটে বেদান্তাঃ পরমাত্মা তত্ত্ব-গুরবঃ" বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সম্ভোগাত্মক কবিতা শুনিয়া ইয়ুরোপ বিস্মিত হইয়াছে; আমরা কিন্তু বিস্মিত হয় নাই, তাঁহার বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগাত্মক কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার জুবিলি উৎসবে মিশিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ যেমন ইয়ুরোপে যাইয়া তাহাকে নূতন কথা শুনাইয়াছিলেন, সেইরূপ তাহার নিকট হইতে নূতন-তত্ত্ব, ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য শিখিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার গদ্যে পদ্যে সর্ব্বত্র ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া বাহির হইতেছে; সুতরাং তাঁহার পরিণত বয়সের কবিতায়, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদের গানের মত নানাছাঁদে একত্ববাদের ফোয়ারা ছুটিবে; আশা করিতে পারি না।

নারায়ণ, (মাঘ, ১৩২৬।)

(৮)

বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ

[শ্রীনবকুমার কবিরত্ন]

কে ক'রেছে ঠাট্টা তোমায় দিয়ে কবির তক্ত?
বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ চেনা তোমায় শক্ত!
বাংলা ভাষার ওজন তুমি বোঝ তো ছাই ঘণ্টা,
মিথ্যে কেন মাথা বকাও গরম কর মনটা?
রবি-রথের ঘোড়ার খুরেও জন্মে যে সব ছন্দ,
নাই ক্ষমতা বুঝতে তোমার, তাই করো গালমন্দ।
ব্যাকরণের চচ্চড়িতে বুদ্ধি-জাতা পণ্ডা,
উদ্ভুটে শ্লোক বানাও নীরস সাত বুড়ি সাত গণ্ডা,
সংস্কৃতের গণ্ডোপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক,
বাংলা ভাষার কেউ তুমি নও, হংস, সারস কিম্বা বক।
ভাব-সাধনার ধার ধার না, ঠাট্টা জান বৃদ্ধ হে!
ধ্যান-রসিকের তপোবনে নাড়ছ গ্রীবা গৃধ্র হে!
শাস্ত্র পুঁথি ফুঁড়ে ফুঁড়ে কর্‌লে শুধু কীটপনা
কথার আঁচে টের পেয়েছি পাওনি সুধা এক কণা।
একটা কথা এক্‌শো-বারি বুঝিয়ে কত বল্‌ব?
অবোধ মোষের ঘাড় নোয়াতে কত বা ঘি ডল্‌ব?
চতুর্ম্মুখের মুখ ব্যথা হয় ঢেঁকীর সঙ্গে তর্কে
এক মুখে কি বল্‌ব আমি বলদ-ধুরন্ধরকে!
[illegible] উ বোঝে, আবার কেউ বা বছর চল্লিশে।
[illegible] গুণ কাট্‌ল বয়েস, আর বোধোদয় হয় কিসে?

(ভারতী, চৈত্র, ১৩২৬।)

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা—]

ইঙ্গিত পাঠ করিয়া 'ভারতবর্ষে'র মফস্বলবাসী পাঠকগণের মধ্যে অনেকে এমন সব জিনিসের এবং ব্যবসায়ের সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন, যাহা তাঁহারা নিজ-নিজ গৃহে থাকিয়াই তৈয়ার করিয়া ব্যবসায় চালাইতে পারেন। ইহার উত্তর দেওয়া কিছু শক্ত। মফস্বলের সকল স্থলের অবস্থা সমান নহে। কোন্ স্থানে কিরূপ ব্যবসায়ের সুবিধা হইতে পারে, কোন্ কোন্ জিনিষ কোথায় সহজে তৈয়ার করা যাইতে পারে, তাহা স্থানীয় অভিজ্ঞতা ভিন্ন কলিকাতায় বসিয়া-বসিয়া স্থির করা সহজ নহে। তবে, এ বিষয়ে মফস্বলবাসী ভদ্রমহোদয়গণ সাহায্য করিলে কিছু-কিছু চেষ্টা করা যাইতে পারে।

মফস্বলে বসিয়া ব্যবসায়ের সুবিধা হইতে পারে এমন জিনিসের প্রথমে সন্ধান লইতে হইবে; অর্থাৎ, যেখানে যাহা পাওয়া যায়, প্রথমে তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে, ঐ সকল জিনিসের মধ্যে কোন্টা এখন কাজে লাগে, কোন্টা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা বাছাই করিতে হইবে। তার পর, শেষোক্ত শ্রেণীর জিনিসগুলি লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে, এবং তাহা হইতে নূতন-নূতন প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবে ইহা বহু কাল, পরিশ্রম ও চেষ্টাসাপেক্ষ। আপাততঃ, একটী সুবিধাজনক সংবাদ পাইয়াছি। তাহাই এখন পাঠকগণকে জানাইয়া দিতেছি। 'ইঙ্গিত' পাঠ করিয়া ঢাকা Sabir Cottage হইতে শ্রীযুক্ত K. A Sabir মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই সংবাদটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সেজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এই সংবাদটী আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। এ সংবাদ পাইয়া আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। বোধ হয় 'ভারতবর্ষে'র বহু পাঠকের নিকটেই ইহা নূতন ঠেকিবে। সুতরাং ইহা ইঙ্গিতের মধ্যে প্রকাশ করায় তাঁহাদেরও উপকার হইতে পারে। শ্রীযুক্ত সবির মহাশয় লিখিয়াছেন—

"মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের ভারতবর্ষে "ইঙ্গিত" প্রবন্ধটী পাঠে নিতান্ত আনন্দিত হইলাম। আজ ৪০ বৎসর হবে, জনৈক দিল্লীনিবাসী ভদ্রলোকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, এক প্রকার জঙ্গলা গাছের ডালের দ্বারায় দুগ্ধ ঘুঁটিলে পরিষ্কার চূর্ণে পরিণত হয় (dessicated milk)। তার পর, সেও প্রায় ২৫।৩০ বৎসর হইবে যে, বর্দ্ধমান-নিবাসী এক ভদ্রলোকের মুখেও এই কথা শুনিয়াম; এবং তিনি বলিলেন যে, তিনি সেই গাছ জানেন এবং দুগ্ধ চূর্ণ করিতে পারেন। শিখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল এবং সাধ হইল; কিন্তু তিনি না কি কোন সাধু সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বহু কষ্টে শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমাকে বলিলেন না। ক্রমান্বয় অর্থাৎ ১৮৯০ সাল হইতে ১৯০৯ সন পর্য্যন্ত যখনি বন্ধুবরের দর্শন পাইয়াছি, অনুনয়-বিনয় করিতে আর ত্রুটি করি নাই; কিন্তু কোন ফল হইল না। কিন্তু বিধাতার কৃপায় ১৯১৩ সনে আমি আলিগড়ে গিয়াছিলাম। সেইখানে ইহা জানিতে পারিলাম। জনৈক Graduate এবং England-returned gentleman ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এই গাছ সর্ব্বত্রই জঙ্গলে জন্মে। ইহাকে আলিগড়ে এবং এখানে সহরেও "কাংঘেয়া" "কাঙ্গির" গাছ বলে। গাছ বেশী বড় হয় না। ছোট পাতা, ফুল এবং গোল গোল পোটার মত (যেমন স্ত্রীলোকদের কর্ণের অলঙ্কার ঝুম্‌কা হয়) ফল হয়। তাহারি ৪।৫টী ডাল, যাহা বেতের মত— বেশী মোটা হয় না, ২।২॥ ফীট লম্বা— পরিমাণ লইয়া, বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া,—কাঁচা দুগ্ধ উনুনে দিয়া, তদ্দ্বারা ঘণ্টা খানিক ঘুঁটিলেই, প্রথম ঘনো হওয়া আরম্ভ হয়; শেষে ময়দার মত চূর্ণে পরিণত হয়। ইহাতে আস্বাদের পরিবর্ত্তন, কি কোন প্রকারের গন্ধ বা গুণের পরিবর্ত্তন হয় না। আমি বহুবার প্রস্তুত করিয়াছি এবং নিজে ও আত্মীয় পরিবারবর্গসহ অনেক প্রকারে, পায়স, পুডিং এবং চায়ের সহিত ব্যবহার করিয়াছি। গরম জলে ঘুলিয়া শিশু সন্তানদেরও নির্ব্বিঘ্নে দেওয়া যায়। যত্নে bottleএ পুরিয়া রাখিলে অনেক দিন ভাল থাকে।"

সুচতুর পাঠকগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন, ইহা কতখানি প্রয়োজনীয় সংবাদ। যেখানে দুগ্ধ সুলভ, সেখানে এই উপায়ে দুগ্ধ-চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া স্বচ্ছন্দে ইহার ব্যবসায় চালানো যাইতে পারে। এই দুগ্ধ-চূর্ণ, কন্‌ডেন্‌স্ট মিল্কের (Condensed milk)এর মত বিদেশ হইতে আমদানী হয়; এবং milk powder নামে খুব বিক্রীতও হয়। কারণ, ইহার সুবিধা অনেক। সময়ে-অসময়ে যাঁহাদের চা খাওয়ার অভ্যাস আছে, তাঁহারা ত ইহার খুবই আদর করেন। অসময়ে, যখন টাটকা দুধ পাইবার উপায় থাকে না, তখন চা খাইবার ইচ্ছা হইলে, এই দুধ খুব কাজে লাগে। ভ্রমণকারীদের পক্ষেও ইহা খুব দরকারী জিনিস; বহিতে কষ্ট নাই অথচ যখন-তখনই ব্যবহার করা চলে। সুতরাং ইহার ব্যবসায় বেশ চলিতে পারে। গুঁড়া দুধ বা milk powder-এর ব্যবসায় করিতে হইলে প্রথম হইতেই প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে নামিতে হইবে। সেই জন্য ইহাতে একটু আড়ম্বর দরকার হইতে পারে। টিনের কৌটা বা কাঁচের শিশি,—যে কোন আধারে ইহা রক্ষিত হইবে, তাহা এবং তাহার লেবেল (label) প্রভৃতি খুব সুদৃশ্য হওয়া চাই। সেইটাই যেন ইহার প্রধান আকর্ষণ হয়। আর রীতিমত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইবে। আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীদের একটা মস্ত দোষ এই যে, তাঁহারা ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের মূল্য ভাল বোঝেন না; মনে করেন, উহা অপব্যয়, কিম্বা অনাবশ্যক ব্যয়। ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা—সে অনেক কথা; আর একবার বিশদভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে; সেই জন্য এখন কেবল এ সম্বন্ধে একটুখানি ইঙ্গিত করিয়াই নিরস্ত হইলাম।

গালা-বাতি একটী সহজ শিল্প। আপিস-আদালতে ইহার ব্যবহার বিস্তর। শিশি বা বোতলে যে সকল দ্রব্য বিক্রীত হয়, ঐ সকল শিশি-বোতলের ছিপির উপর গালা-বাতি লাগাইয়া তাহাতে শিলমোহরাঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়। এই জিনিসটি এদেশে কেহ-কেহ তৈয়ারি করিতেছেন। আরও অনেকে করিতে পারেন। ইহার recipe এই—

রজন, পিচ, ও ভূষা বা আইভরি ব্ল্যাক সমান ভাগে লইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হইবে। গলিয়া গেলে উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশাইয়া লইতে হইবে। তার পর নরম থাকিতে-থাকিতে উহাকে বাতির আকারে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। বাতির আকারে না করিয়া চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ যে কোন আকারেই করা যাইতে পারে। পিচ জিনিসটি আলকাতরার কঠিন অংশ। পিচ কঠিন বটে কিন্তু খুব কঠিন নয়। সেইজন্য উহার সহিত রজন মিশাইয়া কঠিনতর করিয়া লইতে হয়। কঠিন হইলে ব্যবহারের সুবিধা হয়। গলাইয়া ব্যবহারের পর উহা ঠাণ্ডা হইয়া কঠিন হইয়া যায়। পিচ খুব কালো জিনিস; কিন্তু রজন তেমন কালো নয়। সেই জন্য ঐ দুই দ্রব্যের মিশ্রণে যে জিনিসটি হয়, তাহা ততটা কালো হয় না। তাই ভূষা বা আইভরি ব্ল্যাক মিশাইয়া কালো রংটা ঘন করিয়া লওয়া দরকার হয়। না মিশাইলেও কোন ক্ষতি নাই,—কেবল রংটা একটু ফিকে হয় মাত্র। এইটী সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা লা-বাতি। কিন্তু ইহার ব্যবহার মোটামুটি রকম। কালীর দোয়াত, বোতল প্রভৃতি কম সৌখিন জিনিসে এই বাতি ব্যবহার করা হয়। রেলেও ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে। কেহ কোন রেল কোম্পানীর সহিত চুক্তি করিয়া এই বাতি সরবরাহের জন্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে, একটী ছোট-খাট কারখানা বেশ চলিতে পারে। কিন্তু ইহার দ্বারা সৌখিন কাজ চলে না। আদালতের দলিলপত্র, পোষ্ট-আফিসের রেজিষ্ট্রি-করা বা বীমা-করা পার্শেল প্রভৃতিতে যে লা-বাতি ব্যবহৃত হয়, তাহা আলাদা এবং দামী জিনিস। তন্মধ্যে দুই একটীর উপকরণ এবং ভাগ;—রজন ১৩ ভাগ, মোম ১ ভাগ, মেটে সিঁদুর ৩ ভাগ। অথবা, গালা ৩ ভাগ, তার্পিণ ২ ভাগ, চীনের সিঁদুর, অভাবে মেটে সিঁদুর ৩ ভাগ। কিম্বা রজন ৬ ভাগ, পাতগালা ২ ভাগ, তার্পিণ ২ ভাগ, কোন রং ৩ কি ৪ ভাগ। ইহা হইল মোটামুটি ভাগ। সিঁদুরের বদলে অন্য রং, যথা, সবুজ, নীল, পীত, সোণালী প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। সে সকল অভিজ্ঞতার দ্বারা স্থির করিয়া লইতে হয়। এই জিনিসটী তৈয়ার করিতে একটু সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। অসাবধান হইলে জ্বলিয়া উঠিতে পারে। তাপ যত কম হয় ততই ভাল। কেবল গলাইয়া লওয়া তাপের কার্য্য। কাঠ-কয়লার আগুনেই কাজ চলিতে পারে। প্রথমে রজন, গালা ইত্যাদি গলাইয়া লইয়া তাহাতে তার্পিণ যোগ করিতে হয়। তার পর রং। মালে ভারী করিবার জন্য অল্প পরিমাণে মিহি চূর্ণ চাখড়ি যোগ করা চলে। নরম থাকিতে

থাকিতে ছাঁচে ঢালিয়া লইলে হয়। ইট তৈয়ারী করিবার ফর্ম্মা যেরূপ, গালা-বাতির ছাঁচও সেই ভাবের। প্রস্তুতকারকের নাম বা ট্রেড মার্কা অঙ্কিত করিতে হইলে ছাঁচেই উল্টা করিয়া তাহা খোদাই করিয়া লইতে হয়। ছাঁচ সাধারণতঃ পিতলের হইয়া থাকে; দুইচারবার পরীক্ষা করিলেই ইহার হাড়হদ্দ সমস্ত বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

শঠি নামক একটি পদার্থের সহিত বোধ হয় 'ভারতবর্ষে'র অনেক পাঠকই পরিচিত আছেন। এই শঠির বয়স বেশী নয়; ২০।২৫ বৎসরের বেশী হইবে না। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা বেশ একটী ব্যবসায়ের জিনিস হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা ইহার ব্যবসায় করিতেছেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ ইহা হইতে কিছু-কিছু লাভও পাইয়া থাকেন। অথচ ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা বন্য জঙ্গল বলিয়াই উপেক্ষিত হইত। ইহা যে কোন দিন লাভজনক পণ্যে পরিণত হইতে পারে, এমন কল্পনাও বোধ হয় তখন কেহ করেন নাই। বাঙ্গলার বনজঙ্গলে এই শঠির মত আরও কত জিনিষ যে উপেক্ষিত না হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? খুঁজিলে কোন না আরও দুইচারিটা ঐ রকম জিনিস বাহির হইতে পারে? মফস্বলে যাঁহারা ঘরে বসিয়া কিছু কিছু কাজ করিতে চাহেন, তাঁহারা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখুন না?

শঠি, সাগু, এরারুট, প্রভৃতি একই (শ্বেতসার, starch) জাতীয় পদার্থ। ময়দা, আলু প্রভৃতিরও শ্বেতসার অন্যতম প্রধান উপাদান। কোন নূতন, অজ্ঞাত-পরিচয় উদ্ভিজ্জে এই শ্বেতসার আছে কিনা, তাহা স্থির করিতে হইলে শ্বেতসার কিরূপে বাহির করিতে হয়, তাহা জানা দরকার। এখানে তাহা বলিয়া দিতেছি।

আধসের আন্দাজ ময়দা লইয়া খানিকটা ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া একটি পুঁটুলী করুন। অথবা কচি ছেলেদের মাথার কিম্বা পাশ-বালিসের একটা অড় হইলেও চলিবে। এই অড়ের এক-মুখ খোলা, ও এক-মুখ বন্ধ হইবে। এটী থলির মত দেখিতে হইবে। ময়দাগুলি ইহার ভিতরে পূরিয়া থলির খোলা মুখটি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলুন। পরে ঐ থলির উপর-দিকটা একটা রুল, কিম্বা একটা ছড়ি, অথবা বাঁখারির মাঝখানে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিন। সেই দণ্ডটি একটি টবের উপর আড়া-আড়ি ভাবে রাখুন; যেন থলিটি টবের ভিতর ঝুলিয়া থাকে, কিন্তু তলা স্পর্শ না করে,—থলির প্রান্ত যেন টবের তলা হইতে ৮।১০ অঙ্গুলি উপরে থাকে। পরে ঐ টবটি জলে পূর্ণ করিয়া থলিটী দুই হাতে ময়দা-মাখার মত মর্দ্দন করিতে থাকুন। দুই-এক মিনিট পরে দেখিবেন, থলির ভিতর হইতে একটি সাদা জিনিস বাহির হইতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাদা জিনিসটি বাহির হইতে থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত থলিটীকে মর্দ্দন করিতে হইবে। যখন সাদা পদার্থ বাহির হওয়া বন্ধ হইবে, তখন থলিটীকে জল হইতে উঠাইয়া লউন। টবের জল কিছুক্ষণ স্থির ভাবে থাকিলে সাদা জিনিসটি তলায় থিতাইয়া পড়িবে। তখন আস্তে-আস্তে উপরের পরিষ্কার জল ফেলিয়া দিয়া সাদা জিনিসটিকে শুকাইয়া লইলেই উহা শ্বেতসার বা starch হইল। আর থলির মুখ খুলিয়া উল্টাইয়া লইলে যে পদার্থটি বাহির হইবে, উহা একটি ঘন আঠাবৎ পদার্থ। উহার নাম গ্লুটেন gluten।

শ্বেতসার অনেক কাজে লাগে। উহা খুব লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর খাদ্য। হোলি-খেলায় ফাগ বা আবীর এই শ্বেতসারের সহিত রং মিশাইয়া প্রস্তুত করা হয়। দপ্তরীরা যে নানা রঙ্গের 'কাপড়' দিয়া বই বাঁধে, তাহা এই শ্বেতসার ও রং-সংযোগে প্রস্তুত হয়। সুতরাং নূতন নূতন উদ্ভিজ্জ হইতে শ্বেতসার বাহির করিতে পারিলে, তাহা ব্যর্থ হইবে না। কোন অজ্ঞাত-পরিচয় উদ্ভিজ্জ হইতে শ্বেতসার বাহির করিয়া প্রথমেই তাহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করা উচিত নহে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা উহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া উহাকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিবার অনুমতি না দিলে যেন উহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত না হয়। কিন্তু অপর দুইটি কাজে উহা স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পল্লীগ্রামের অবস্থা আমি ভাল জানি না। সেইজন্য কোন্ কোন্ গাছ হইতে শ্বেতসার পাওয়া যাইতে পারে, তাহা বলিতে পারিলাম না। অনুমানে দুই একটি জিনিসের নাম করিতেছি—খাম-আলু, চুপড়ী-আলু, বুনো ওল, বুনো-কচু প্রভৃতি পরীক্ষা করা যাইতে পারে। পচা গোল-আলু হইতে যদি শ্বেতসার পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক লোকসান নিবারিত হইতে পারে।

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীতারকচন্দ্র রায় প্রণীত, মূল্য ১।০।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। উপক্রমণিকায় তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতি বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন, এবং মূলগ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে সেই তত্ত্বের কেমন সুন্দরভাবে বিকাশ হইয়াছিল, তাহাই দেখাইয়াছেন। উপক্রমণিকায় যে নিগূঢ় সত্যের উল্লেখ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যের জীবনী বর্ণনা করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তার্কিক নিমাই পণ্ডিতের হৃদয়ে ভক্তির বিমল রশ্মি প্রবেশ করিয়া কিরূপে তাঁহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয়; জ্ঞান-গর্ব্বোন্নত নিমাই পণ্ডিতের মস্তক কিরূপে ভক্তিভরে অবনত হইয়া পড়ে; কিরূপে সুব্রাহ্মণ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ নিমাই পণ্ডিত জাতি-ভেদের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া আচণ্ডাল সকলকেই প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করেন; ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তাঁহাকে সম্ভোগ করিয়া, তাঁহার যে বিপুল আনন্দ হইত, তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ যে আনন্দের বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া কিরূপে প্রক্ষিপ্তচ্যুত হইয়া পড়িত; পক্ষান্তরে কিরূপে তাঁহার দেহ ভগবদ্বিরহজনিত দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বিকল হইয়া পড়িত; কিরূপে এই নবীন সন্ন্যাসী বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের মোহ অপসারিত করিয়া ভক্তিপীযূষ-ধারায় তাঁহাদের হৃদয় পবিত্র করিয়াছিলেন; কিরূপে তাঁহার হৃদকন্দর-নিঃসৃত প্রেমমন্দাকিনী-ধারা উত্তরভারত হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে প্রাঞ্জল ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত এই পুণ্যকাহিনী পাঠ করিতে করিতে পাঠকের কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না, প্রেমের বন্যায় আত্মহারা হইয়া ভাসিতে ভাসিতে তিনিও সেই প্রেম-পয়োনিধির দিকে অগ্রসর হইবেন।

ছবি

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অষ্টচত্বারিংশ গ্রন্থ। লেখক বঙ্গের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক, সর্ব্বজন-পরিচিত শরৎচন্দ্র; বইয়ের নাম ছবি। শব্দ চিত্র-অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত লেখক মহাশয়ের অতুলনীয় তুলিকাপাতে যে 'ছবি' অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যে সকলেরই মনোরম হইবে, এ কথা আজকার দিনে না বলিলেও চলে। আমরা 'ছবি'র কোনও পরিচয়ই দিব না; পাঠকগণ পূর্ব্বেও শরৎচন্দ্রের অনেক ছবির পরিচয় পাইয়াছেন, এখানিতেও সেই পাকা হাতের পরিচয় পাইবেন। আট আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার মধ্যে এই ছবি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে ইহা নিশ্চিত।

মনোরমা

শ্রীমতী সরসীবালা বসু প্রণীত, মূল্য আট আনা

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের আট-আনা গ্রন্থমালার ঊনপঞ্চাশৎ গ্রন্থ। লেখিকা মহাশয়া বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিতা নহেন, তাঁহার কয়েকটী ছোট গল্প 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। এই 'মনোরমা' বোধ হয় তাঁহার প্রথম উপন্যাস; কিন্তু প্রথম হইলেও তিনি পারিবারিক চিত্র অঙ্কনে যে যোগ্যতা, যে লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আশা হয়, তাঁহার ক্ষমতা কম নহে। আমরা এই 'মনোরমা' পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, এবং যাঁহারা এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি পাঠ করিবেন, তাঁহারাই আমাদের ন্যায় এই উপন্যাস লেখিকার প্রশংসা করিবেন।

কবিকথা (দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীনিখিলনাথ রায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় এক নূতন কাজে হাত দিয়াছেন। তিনি ইতিহাস-চর্চ্চা করিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এখন তিনি সংস্কৃত নাট্যাবলীর আখ্যায়িকা সরল বাঙ্গালায় লিখিয়া প্রকাশিত করিতেছেন। তিনি 'কবিকথা' প্রথম খণ্ডে কালিদাস ও ভবভূতির নাটকাবলীর মূল ঘটনা অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেখানি পাঠক সমাজে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। এক্ষণে 'কবিকথার' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে মহাকবি ভাসের নাটকাবলীর সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা মূল সংস্কৃতে উক্ত নাটকাবলী পড়িবার অবকাশ পাইবেন না এবং যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে মহাকবির ও তাঁহার নাটকাবলীর পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। নিখিলবাবুর ন্যায় প্রাচীন সাহিত্যিকের রচনা-ভঙ্গী ও বর্ণনার প্রশংসা আর নূতন করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হইবে না। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ অতি সুন্দর, অনেকগুলি বহুবর্ণ ও একবর্ণ চিত্রও এই পুস্তকে আছে, অথচ এই ৫১৬ পৃষ্ঠার বইখানির মূল্য তিনি অতি সামান্য অর্থাৎ দুইটাকা করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকসমাজ নিশ্চয়ই এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন।

বিয়ের কনে

শ্রীব্রজমোহন দাস প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা।

অল্পদিনের মধ্যেই এই গল্প-পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, পুস্তকখানি বিশেষ আদৃত হইয়াছে। ইহাতে বিয়ের কনে, কিরণের মা, ছোট জাত

প্রভৃতি কয়েকটী ছোট গল্প আছে। গল্পগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। লেখা বেশ ঝরঝরে; বর্ণনা কৌশল এবং ঘটনা-সংস্থানও ভাল। আমরা এই গল্প লেখকের প্রশংসা করিতেছি এবং তিনি যে একজন ভাল গল্প লেখক হইবেন, তাহার পরিচয় এই পুস্তকে পাইয়া আমরা অনন্দিত হইয়াছি।

স্মৃতি-মন্দির

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা

এখানি উপন্যাস। গ্রন্থকার উপন্যাস-ক্ষেত্রে এই প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল; সেইজন্য তাঁহার এই পুস্তকে স্থানে স্থানে বর্ণনা একটু দীর্ঘ হইয়াছে কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার রচনা-কৌশল প্রশংসনীয়। উপন্যাসখানির আখ্যায়িকাভাগও সুবিন্যস্ত; কয়েকটা চিত্রও বেশ অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথম চেষ্টা জন্য স্থানে স্থানে যে বর্ণনা-বাহুল্য আছে, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। আমরা এই নবীন গ্রন্থকারকে উৎসাহ প্রদান করিতেছি; তাহার পুস্তকখানি মোটের উপর ভালই হইয়াছে। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই বেশ হইয়াছে।

মহাবীর গারফীল্ড

শ্রীউমাপদ রায় সঙ্কলিত, মূল্য সাধারণ সংস্করণ ৸৵৹, রাজ সংস্করণ ১।৹।

মহাবীর গারফীল্ডের জীবন-কথা অপূর্ব্ব; শুধু অপূর্ব্ব নহে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। শ্রীযুক্ত উমাপদ রায় মহাশয় এই মহাবীরের জীবন কথা আমাদের দেশের বালক বালিকাগণের অধিগম্য করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগ এই সুন্দর পুস্তকখানিকে বালকদিগের পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচিত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই শ্রেণীর পুস্তক যত অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গলের কথা। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি।

বেদ-সাহিত্যে অদ্বৈতবাদ

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী প্রণীত, মূল্য এক টাকা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত সাহিত্যরথী বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের স্মৃতি-প্রবাহ সংরক্ষণ-কল্পে 'বেদ সাহিত্যে অদ্বৈতবাদ' সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে পুরস্কার দিবেন ঘোষণা করেন। প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী মহাশয় সেই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সেই প্রবন্ধ। বিষয় যেমন গুরুতর, লেখক মহাশয়ও তেমনই উপযুক্ত; সুতরাং এই পুস্তকখানি যে পরম উপাদেয় হইয়াছে, সে কথা না বলিলেও চলে। পূজ্যপাদ লেখক মহাশয় অতি সুন্দর ভাবে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, সবিশেষাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে সবিস্তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই; কিন্তু আমাদের মনে হয়, ঐগুলির আলোচনা করিলে আমাদের ন্যায় লোকের পক্ষে অদ্বৈতবাদ বুঝিবার আরও সুবিধা হইত। সে যাহাই হউক, আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি। আশা করি গোস্বামী মহাশয় অতঃপর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়া আমাদের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিবেন।

জ্যোতিষ-যোগতত্ত্ব

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা

শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই উপাদেয় গ্রন্থখানি সংকলন করিয়াছেন। ইহাতে জ্যোতিষ সম্বন্ধে তত্ত্বগুলি এমন সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছে যে, যাঁহারা জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারাও অনায়াসে এই পুস্তকের সাহায্যে জ্যোতিষ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, 'সকল বাঙ্গালীর পক্ষেই এই উপাদেয় গ্রন্থখানি বাটীতে রাখা আবশ্যক মনে করি।' আমরাও সেই কথা বলিতেছি।

বৃন্দাবন-কথা

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত বিরচিত, মূল্য আড়াই টাকা মাত্র

শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় বহুদিন হইতে মাসিক-পত্রাদিতে ব্রজ-কাহিনী বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। তাহার লিখিত কয়েকটী সচিত্র প্রবন্ধ আমরা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছি। এক্ষণে সেই প্রবন্ধগুলির সহিত আরও অনেক নূতন তথ্য সংযোজিত করিয়া তিনি এই বৃন্দাবন-কথা প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীধাম বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তবে আমাদের মনে হয় যে, বৃন্দাবনের সহিত মথুরা এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে, মথুরার কথা বিস্তৃতভাবে না বলিলে বৃন্দাবন-কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। লেখক মহাশয়ও সে কথা বুঝিয়াছেন। ভরসা করি, ভবিষ্যতে তিনি সে অভাবও পূর্ণ করিবেন। গ্রন্থখানিতে অনেকগুলি ছবি আছে, আর বর্ণনা কৌশল—একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্জ্বল্যমান।

ত্রিরাত্রি

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য এক টাকা চার আনা

'ত্রিরাত্রি' কয়েকখানি পত্রের সমষ্টি। লেখকমহাশয় এই পত্র কয়খানির মধ্য দিয়া রূপমুগ্ধ এক যুবকের পতন ও উত্থানের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সুধু যুবক নহে, এক নবীনা যুবতীর মোহ ও তাহার অবসানের করুণ কাহিনীও অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ঘটনার কোন বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু লেখকমহাশয়ের লিপি-

কুশলতা পাঠককে একেবারে তন্ময় করিয়া ফেলে। অতি সুন্দর, অতি মনোরম, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাষা! মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণও অতি সুন্দর! আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা।

কবি বসন্তকুমার একটা কাজের মত কাজ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবন-কথায় বিগত ৮০।৮৫ বৎসরের সমাজ ও সাহিত্যের একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। বসন্তকুমার শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ বাবুর নিকট হইতে জোর করিয়া সেই ইতিহাস আদায় করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র বাবু এখন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার পর তিনি যে প্রকৃতির মানুষ, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে কথা বাহির করা বড় সহজ নহে। এই জীবন-স্মৃতিতেও তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি মোটামুটি কথাগুলি যেন-তেন প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। এই জীবন-স্মৃতি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, আরও কত কথা তিনি বলেন নাই, কারণ তিনি সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশে নিতান্ত কুণ্ঠিত। আমাদের মনে হয়, লেখক বসন্তকুমার এই পুস্তকে যদি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতৃত্রয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ও ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতি গ্রথিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, অকৃত্রিম সাহিত্যসেবী ও কলাবিদের জীবন-কথা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইত।

[শ্রীগুরুদাস হালদার]

হৃদয়-মাঝারে বাসিব হে ভাল,
এ জীবনে ধরা দিব না।
আছি সখা শুধু দরশ-পিয়াসে
হিয়ার পরশ চাহি না॥
উছলে আলোক ধরণী-অঙ্গে,
হাসিছে প্রকৃতি নবীন রঙ্গে,
সঙ্গের সাথী অঙ্গনা পেয়ে
ভুলেছে বিরহ-যাতনা।
আমার বিরহ
বড়ই দুঃসহ
সে যাতনা কিবা যাবে না?
ফাগুন আকুল নবীন ছন্দে,
হৃদয় ব্যাকুল কুসুম-গন্ধে,
গুঞ্জিছে অলি, মুঞ্জিছে তরু,
মলয় করিছে ছলনা।
তাহে ভয় পাই
'পাছে ভুলে যাই';—
ডেকে নাও সখা, নাও না!!
বুঝেছি নিঠুর, ঐ তব যুক্তি—
কাড়িয়ে নেবে বা এ মম ভক্তি;
মুক্তির পথ ভক্তের তব
কিছুতে খুলিতে দেব না;—
ধরণী সাজায়ে
শোভায় ভুলায়ে
দিতেছ, করিছ ছলনা!!
এতই নিঠুর হৃদয়-চন্দে
কে নেবে হৃদয়ে প্রীতির ছন্দে?—
স্পন্দিত হৃদি চূর্ণি ফেলিব
আর ভালবাসা দিব না।
অভিমান-ভরে
নেব মুখ ফিরে—
স্বপনেতে আর এস না!!
ত্যজিব যখন এ ভব-কুঞ্জ
হেরিব শুধুই আলোক-পুঞ্জ;
সঞ্চিত প্রীতি অঞ্জলি পূরি'
সেথা সখা আমি লব না!
ভকতি-কোমল
চারু শতদল
ও চরণে তব দিব না॥

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ]

স্কুলের বালক

কলেজের ছাত্র

সন্ত বিবাহিত

কাব্যি-ফেসান

ঢেউ-খেলানো চল

Beg your pardon !

Don't care

ডেড-নট

কৃষকের জীবন-নাট্য*

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

স্বচ্ছলতা

প্রথম দৃশ্য।—"স্বাচ্ছলতায়"

কৃষক-দম্পতীর বর্ত্তমান অবস্থা বেশ সুখে-শান্তিতেই কাটিয়া যাইতেছে; কিন্তু প্রতিবেশীদের ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত। তাই সে তামাক সেবন করিতে করিতে স্ত্রীকে বলিতেছে, "আহা! নিতাইদের ভারি কষ্টে দিন যাচ্ছে—একরকম না খেয়েই তাদের দিন কাটাতে হয়। প্রভুর দয়ায় ঘরে যখন চাষের কিছু ধান আছে, তখন এগুলি তাদের বিলিয়ে দাও-চোখের উপর এত কষ্ট কি দেখা যায়! আর বলে দিও, তাদের যখনই যা দরকার হবে, তখনই আমাদের কাছে আস্‌তে যেন কোন রকম সরম না করে।"

---

* খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই জীবন-নাট্যের প্রত্যেক দৃশ্যেই স্বয়ং স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন। আলোকচিত্রগুলি 'আনন্দ ভাণ্ডার' তুলিয়াছিলেন।

অনটনে

দ্বিতীয় দৃশ্য।—"অনটনে"

কালের পরিবর্ত্তনে এই কৃষকপরিবারেই দুর্ভিক্ষের ভীষণ উৎপীড়ন উপস্থিত হইয়াছে। গৃহে যা কিছু তৈজস-পত্র ছিল, অভাবের তাড়নায় একে একে সকলই বিক্রী করিয়াছে, তবুও অন্নবস্ত্রের অভাবে প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহাদিগকে নিষ্পেষিত হইতে হইতেছে। স্ত্রী একটী শত-ছিন্ন চট্ পরিধান করিয়া কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করিতেছে, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছে না। তথাপি স্বামীর অন্নক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া নিজের সব ভুলিয়া গেল; তাই, হাঁড়িতে যা কিছু যৎসামান্য অন্ন ছিল, তা আজ স্বামীকেই সব কুড়াইয়া দিতেছে এবং স্বামীও তদ্দারা কোন রকমে জঠরজ্বালা নিবারণ করিতেছে।

দুর্ভিক্ষের দৃশ্য

তৃতীয় দৃশ্য।—"দুর্ভিক্ষের দৃশ্য"

স্ত্রী এতদিন পর্য্যন্ত যাহা কিছু অদৃষ্টে জুটিয়াছে তাহা দ্বারাই কোনও প্রকারে প্রাণধারণ করিয়াছে; নিজে অনশনে থাকিয়াও স্বামীকে রক্ষা করিয়াছে;—কিন্তু আর পারিতেছে না, পেটের জ্বালায় লতাপাতা ও নানাপ্রকার অখাদ্য দ্বারা এতদিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা পাইয়াছে, কিন্তু অন্নাভাবে এখন বাক্য রোধ হইয়া গিয়াছে, উঠিয়া চলিবার শক্তি নাই, পেটে দাউ-দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। তাই শরীরটাকে একেবারে মাটিতে বিছাইয়া দিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে।

মৃত্যু-শয্যায়

চতুর্থ দৃশ্য।—"মৃত্যুশয্যায়"

অবশেষে স্ত্রীর মৃত্যুকাল উপস্থিত। স্বামী যে এই অবস্থায় কি করিবে বা করিতে পারে, তাহা কিছুই ভাবিয়া পাইতেছে না। একে অন্নাভাবে দেহ অবসন্ন, তার উপর আবার এই ভীষণ দৃশ্য—সমস্ত আকাশটা তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। "হা ভগবান্ এই কি তোমার দয়া-মানুষকে এত কষ্ট দিয়ে তোমার কি লাভ! না! আর সহ্য হয় না, আমিও ঐ পথেই যাব, "এই বলিয়া কৃষক স্বহস্তে নিজের গলা টিপিয়া ধরিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

উদ্বন্ধনে

পঞ্চম দৃশ্য।—"উদ্বন্ধনে"

অভাগিনী স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে; শোকে, দুঃখে অবসাদে, হতভাগ্য স্বামী একেবারে উন্মত্তপ্রায়; উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া চির-শান্তিময় দেশে চলিয়া গিয়াছে—, 'গিয়াছে' যে দেশে দুঃখ নাই, দারিদ্র্য নাই, অত্যাচার নাই, অবিচার নাই।

মালাকণ্ড সদর-ঘাঁটি হইতে কঙ্ক পাহাড়ের দৃশ্য
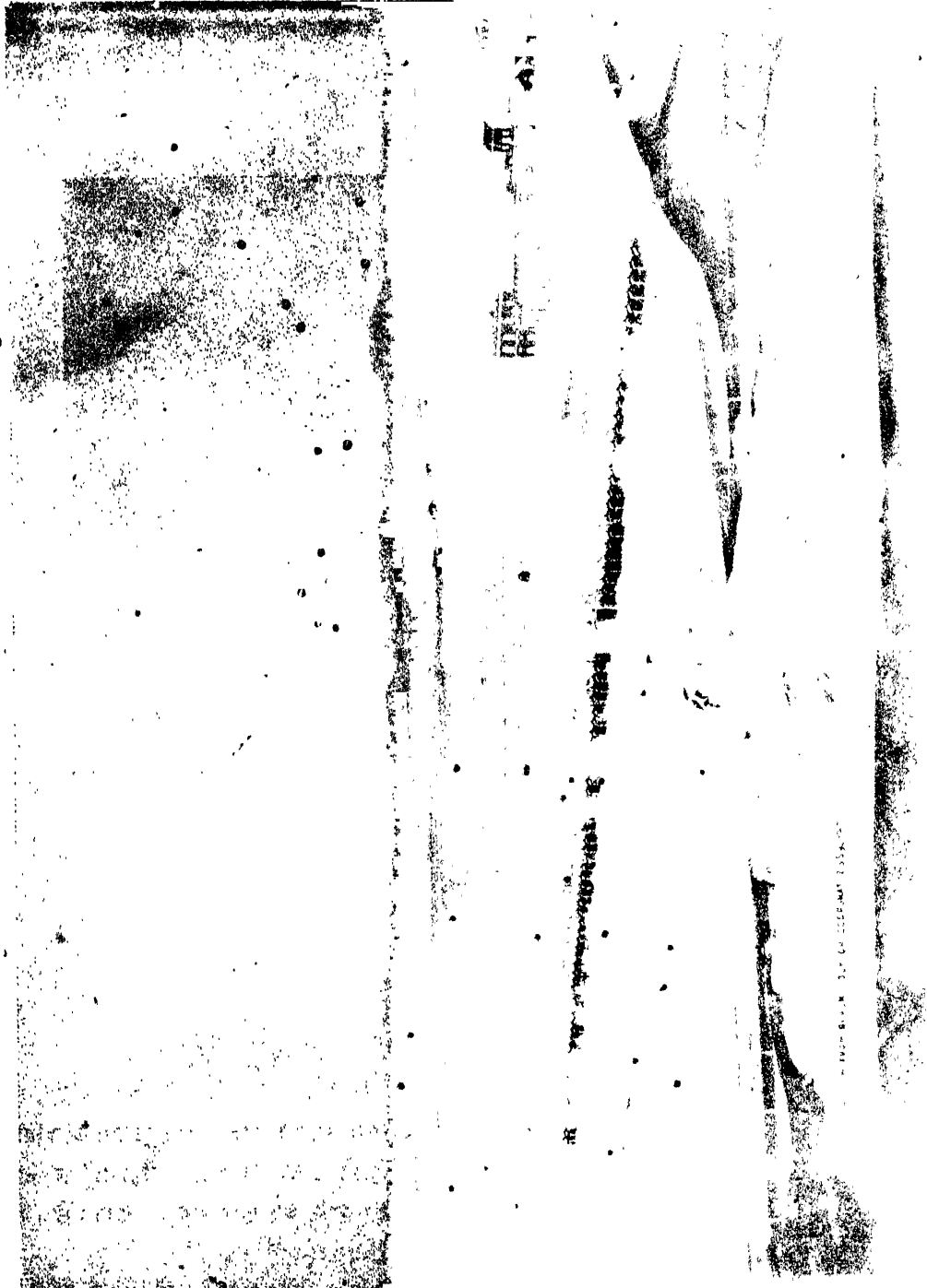
হার-জিৎ

(রঙ্গ-চিত্র ।)

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

(১)

রূপচাঁদ চাকীর দ্বিতীয়-পক্ষ পুঁটি যখন একরাশ খাড়া লইয়া চিবাইয়া-চিবাইয়া ছোবড়ার আকারে পরিণত করিতেছিল, চাকী তখন সসম্ভ্রম-বিস্ময়ে ভাবিতেছিলেন, সেই ছোবড়াগুলোকে রৌদ্রে শুকাইয়া উনান্ ধরাইবার কাজে লাগাইতে পারা যায় কি না? কিন্তু কি আশ্চর্য্য চর্ব্বণ-শক্তি! চাকীর জিহ্বাটা অজ্ঞাতসারে একবার তাঁহার মসৃণ মাড়ি দুইটার উপর দিয়া চলাফেরা করিয়া আসিল। চাকী একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন,—একটাও নাই! দুটা মাড়িই মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে! অথচ বয়স তাঁহার পঞ্চাশের বেশী নয়! চল্লিশ না পার হইতে গাল দুইটা এমন তুব্ড়াইয়া গেল যে, ক্ষৌরকার্য্য করিতে রক্তা রক্তি হয়। রূপচাঁদ সেই তোব্ড়ান ঢাকিবার নিমিত্ত শ্মশ্রু গজাইলেন, এবং শ্মশ্রু রাখিবার কারণ ঢাকিবার নিমিত্ত মাথায় কেশ রাখিলেন; আর অন্তরের আসল কথাটা ঢাকিবার উদ্দেশ্যে, বাবা তারকনাথের দোহাই পাড়িলেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। এক অলক্ষ্য কৌতুকী তাঁহার কালো চুলের উপর চূণকাম করিয়া দিল। রূপচাঁদের আনাভি বিলম্বিত শ্মশ্রু ও কেশরের ন্যায় তুষার-ধবল কেশভার দেখিয়া পাড়ার প্রবীণগণ তাঁহাকে নিখরচায় উপাধি দিলেন—ঋষি; কিন্তু উপাধি শুনিয়া ঋষির সহধর্ম্মিণী পুঁটি এমন হাসিয়া উঠিল যে, আজও পর্য্যন্ত রূপচাঁদ তাহা ভুলিতে পারেন নাই। পুঁটিকে ঘরে আনিয়া রূপচাঁদ বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে অচিরাৎ তাঁহাকে উদ্বাস্ত হইতে হইবে। পুঁটি-মাছের মত এক ফোঁটা পুঁটি গোটা একটি শক্তিশেল! সে যে সুধু স্বামীর দেহার্দ্ধভাগিনী হইতে আসিয়াছে, তাহা নহে; পুরাদস্তর তাহার সরিক্, যেন যৌথ-কারবারের অংশীদার—ভাগের-ভাগ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে চায়। রূপচাঁদ নিজের জন্য যখন বস্ত্র কিনিয়া আনেন, সেই সঙ্গে স্ত্রীর জন্য এক জোড়া না আনিলে সে বস্ত্র আর তাঁহার অঙ্গে উঠে না; কখন কিরূপে উধাও হইয়া যায়, অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম। রূপচাঁদের বাতিকের ধাত, নিত্য একটু মিছরির পানা পান করেন। কিন্তু পুঁটির প্রিয়-সাধনে কোন দিন সামান্য ত্রুটি হইলে সে মিছরি সহসা সৈন্ধবে রূপান্তরিত হইয়া যায়। দৈবাৎ কোন দিন ঝোলে এত ঝাল হয় যে, সারাদিন স্রোতের মত অবিশ্রান্ত গোটা-নাল ভাঙ্গিতে থাকে। ডালে নূন বা পানে চূণ এক-একদিন এমন আকার ধারণ করে যে, অন্ততঃ তিন দিন রূপচাঁদের আহার বন্ধ হইয়া অন্তরে সংসার বৈরাগ্যের উদয় হয়! দুধের উপর দিব্য নধর সর পড়িয়াছে, কিন্তু বাটীতে চুমুক দিতেই ওয়াক্! পেটের সমস্ত নাড়ীগুলা বাহির হইবার জন্য ইড়্‌বিড়্ করিতে থাকে। কোন দিন ধূনার পরিবর্ত্তে লঙ্কার ধোঁয়া—রূপচাঁদ ঘরে ঢুকিয়াই—বাপ্‌স্! ছুটিয়া পলাইতে পথ পান না।

পাড়ায় একটা কিংবদন্তী ছিল যে, রূপচাঁদ প্রথম-পক্ষকে এত অতিরিক্ত লাগাম কসিয়াছিলেন যে, বেচারা অতিষ্ঠ হইয়া ইহলোক ছাড়িয়া পলাইয়াছে। তাহাকে যাহা খাওয়াইতেন, যেমন পরাইতেন, সে কোন কথা কহিত না। শুনিয়া দ্বিতীয়-পক্ষ মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়াছিল মাত্র। তারপর অবিশ্রাম এই নিঃশব্দ সংগ্রাম। রূপচাঁদ প্রথম-প্রথম ভাবিয়াছিলেন—দেখাই যাক না কতটা দৌড়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখিলেন, তাঁহার ভার্য্যার অফুরন্ত ভাণ্ডার। উৎপাত নিত্য নূতন আকার ধারণ করে। হাজার সাবধান হইয়াও পরিত্রাণ নাই। খুব সতর্ক হইয়া স্বামী যখন উত্তর দিক লক্ষ্য করেন, তখন শরাঘাত হয় দক্ষিণ দিক হইতে।

এমনি করিয়া এক দিন বিঘোরে প্রাণ যাইবে। কাজ কি? স্বামী মনে মনে সন্ধিস্থাপন করিলেন। স্ত্রীর অস্ত্র শস্ত্র-সকল আপাততঃ নিদ্রিত হইল সত্য, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মনে প্রতিযোগিতার ভাব এখনও জাগিয়া রহিল।

স্ত্রী বিদ্রোহের ছিদ্র খোঁজে। স্বামী অন্বেষণ করেন, কোথায় তাহার দুর্ব্বলতা। অন্তরাল হইতে কিছুদিন লক্ষ্য করিয়া রূপচাঁদ দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী একটু ভোজনপ্রিয়! নিত্য নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু তিনি দন্তস্ফুট করিতে পারেন না - দন্ত নাই বলিয়া। এই এক বিষয়ে পক্ষপাতী বিধাতা তাঁহার প্রতিযোগিনীকে অপরিচ্ছিন্ন প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন। হায় দন্ত! তুমি হস্তীর শোভা, সিংহের শৌর্য্য, ব্যাঘ্রের বীর্য্য, সর্পের প্রহরণ, মূষিকের সম্বল, আর অবলার বল। আজ সহধর্ম্মিণীর চর্ব্বণশক্তি রূপচাঁদের মনে ধিক্কার জন্মাইয়া দিল, বাঃ—তারিফ্ করিতে হয়! সজিনা বল, নাজিনা বল, পুঁই বল, ডেঙো বল, লাউ কুমড়া যাহাই বল, থাড়া চিবাইতে হয় ত এমনি করিয়া। হে খাড়ে! হে ডাঁটে! হাটে-হাটে প্রকটে! রসাল-রস-রসিতে! শ্বেত-রক্ত-হরিত-পীত বহুরূপ-চরিতে! হে রুচির-রদন-নিপীড়িতে! তুমি দরিদ্রের ভরসা, রমণীর ভালবাসা, দন্তহীনের দুরাশা! লোকটি বঙ্কিম-যুগের। ভাবে গদ্গদ হইয়া উঠিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন খোদার উপর খোদ্কারী করিবেন, অর্থাৎ দাঁত বাঁধাইবেন। এত খাবার কষ্ট সহ্য করা কিসের জন্য? অর্থের অভাব নাই এবং কিঞ্চিৎ কৃপণ-স্বভাব হইলেও আত্মপক্ষে তাহা সম্ভবমত ব্যয় করিতে রূপচাঁদ কাতর নহেন। আর কিই বা ব্যয়? যাই হ'ক, অবিলম্বে কলিকাতায় গিয়া দুই-পাটি দাঁত কিনিতে হইবে। কিন্তু পুঁটির কাছে সে কথা এখন প্রকাশ করা হইবে না। রূপচাঁদ শয্যায় কিছুক্ষণ এ-পাশ ও পাশ করিয়া পুঁটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমুলে না কি?" পুঁটি উত্তর দিল না। রূপচাঁদ বলিলেন— "কাল একবার কল্‌কাতায় যেতে হবে।" পুঁটি তন্দ্রার ভাণ করিয়া জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

'কেন'র কি যে উত্তর দিবেন, ভাবিয়া না পাইয়া রূপচাঁদ সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "উড়্‌তে।"

সেই আগেকার মত পুঁটি হাসিল। রূপচাঁদ খাটের খুঁটি ধরিলেন। একটু পরে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, "কল্‌কাতায় একখানা উড়োজাহাজ এসেছে, শোননি? তার কাপ্তেন পঞ্চাশ টাকা দিলে ওড়ায়।" আবার সেই হাসি! রূপচাঁদের রূপ বিরূপ হইয়া গেল। জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "হাস্‌ছ যে!"

"তাই জিজ্ঞাসা করছি, কি ওড়ায়, টাকা না মানুষ?" এতক্ষণে রূপচাঁদের ধড়ে প্রাণ আসিল। তবু ভাল, রসিকতা! বলিলেন, "টাকা কি ওড়ে? মানুষ।"

"পঞ্চাশ টাকা পেলে আমিও ওড়াতে পারি।"

রূপচাঁদকে খাম-খেয়ালী পত্নীর নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে হইবে। তিনিও একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন, "তুমি ত অমনিই পার; হেসেও পার, তুড়ি দিয়েও ওড়াতে পার।" পুঁটি বুঝিল, স্বামীর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ভিতরে-ভিতরে কি একটা মতলব আছে। বলিল, "তা বেশ! আমাকেও নিয়ে চল।"

"ওরে বাপ্‌রে! পরিবার ত আমার পাঁচ-সাতটা নাই যে, একটাকে উড়িয়ে দোব!"

পুঁটি বলিল, "আমারই ব্য কটা আছে বল যে, একটাকে উড়িয়ে দেব! আমার হাত ছাড়িয়ে কোথায় উড়ে যাবে, মনে করেছ?"

হায়, তাহা ত সম্ভব নয়! রূপচাঁদের বুক ঠেলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিল; তিনি সেটাকে চাপিয়া লইয়া বলিলেন "কোথায় আবার যাব? তোমারই কাছে ফিরে আস্‌ব।"

"কি? উড়ো জাহাজে করে?"

শাস্ত্রে আছে স্ত্রীর কাছে মিথ্যা কথা কহা যায়। রূপচাঁদ অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, "হাঁ! উড়ো জাহাজে ক'রে আমাদেরই ছাতের ওপর এসে নাম্‌ব।"

"আর যদি পড়ে যাও?"

রূপচাঁদ ভাবিলেন, যদি মরিয়া যাই, ইহার দশা কি হইবে, তাহাই ভাবিতেছে। যেরূপে হউক ইহাকে ঠাণ্ডা করিয়া একবার বাহির হইতে পারিলে হয়। বলিলেন, "ভয় কি পুঁটি, লোহার সিন্দুকের চাবি তোমার কাছে রেখে যাব। যদিই মরে যাই, তুমি ভেসে যাবে না। বরং সুবিধাই হবে, আমাকে রোজ রোজ রেঁধে খাওয়াতে হবে না!

স্বামী যে পেটুক, পুঁটি তাহা বিলক্ষণ জানিত। তাঁহার এই মরিয়া ভাব দেখিয়া নিশ্চিত করিল, কলিকাতা যাওয়ার কোন গভীর উদ্দেশ্য আছে। হঠাৎ ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া রূপচাঁদের হাত ধরিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমার গা-ছুঁয়ে বল, সেখানে তুমি ভীমনাগের সন্দেশ খাবে না?"

পত্নীর প্রশ্ন শুনিয়া পতি অবাক্ হইয়া বলিলেন, "সে কি! তোমাকে না দিয়ে? কখন না!"

পুঁটি ইহা বিশ্বাস করিল না। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, "বাগবাজারের নবীনময়রার রসগোল্লা?"

"তাও না।"

"তা হ'ক! আমাকে নিয়ে চল।"

"তুমি গিয়ে সেখানে কোথায় থাক্‌বে?"

"তুমি কোথায় থাক্‌বে।"

"বড়বাজারে মিঠাই-পটিতে।"

পুঁটি দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "আমি যাবই!"

রূপচাঁদ মহা ফ্যাঁসাদ্ দেখিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল হলে না কি! যে জন্যে যেতে চাচ্ছ, তা যদি ঘরে বসে পাও, তা হলে যাবার দরকার কি? আমি দি'ব্যি করছি এক হাঁড়ি ভীমনাগের সন্দেশ, আর এক হাঁড়ি নবীনের রসগোল্লা আন্‌বই; তা ছাড়া বড়বাজারের মিঠাই।"

"আর যদি না আনো?"

"কেমন করে আনাতে হয় তা' ত তুমি জানো!"

পুঁটি এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইল। পরদিন যাত্রার পূর্ব্বে তাহাকে লোহার সিন্দুকের চাবিটি দিয়া রূপচাঁদ বলিলেন, "সাবধানে রেখ, কদাচ হাতছাড়া কোর না। আমি এসে নেব। আর সাবধানে থেক।"

(২)

কলিকাতায় আসিয়া রূপচাঁদ বড় মুস্কিলে পড়িলেন। সন্ধ্যার পর পথে বাহির হইলে, বলে 'মুস্কিল্ আসান'; সকালে বলে 'মুনি গোঁসাই।' একদিন একটা মাতাল তাঁহার দাড়ি নাড়িয়া দিয়া বলে, 'পরচুলো কি না দেখ্‌ছি।' রূপচাঁদ পালাই-পালাই ডাক ছাড়িতে লাগিলেন। কিন্তু দাঁত প্রস্তুত হইতে এখনও তিন-চারি দিন দেরী। দন্তের জন্য এত বিলম্ব করিতে হইবে, রূপচাঁদ ভাবিতেই পারেন নাই। তিনি মনে করিতেন, ছাতা-জুতার মত কলিকাতায় তৈরী দাঁতও বিক্রয় হয়; আসিয়াই কিনিয়া লইয়া যাইবেন। তাহা ত হইল না!

যে বাড়িতে রূপচাঁদ থাকিতেন, তাহা এক মহাজনের গদি। রূপচাঁদের স্যাঙাত স্বরূপ মাইতি হেথা মুহুরীর কাজ করে, আর টেলিফোঁ ধরে। গদিতে তর-বেতর লোক আনাগোনা করে। লক্ষ-লক্ষ টাকার কারবার হয়, কিন্তু এক মুষ্টি পণ্য হেথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোথাকার মাল কোথায় চালান হয়, আর ঝন্-ঝন্ করিয়া টাকা আসিয়া পড়ে, যেন ভূতের কাণ্ড! বাড়ীটা চৌতালা, সুসজ্জিত—যেন ইন্দ্র-ভবন; কিন্তু ঘোর অন্ধকার। দিনের বেলা বিদ্যুতের আলো না জ্বালিলে কাজ চলে না। এ-ঘরে টেলিফোঁ ঝুন্-ঝুন্ করিতেছে, ও-ঘরে বন্-বন্ করিয়া বিদ্যুতের পাখা চলিতেছে, সে-ঘরে বিজ্-বিজ্ ফিস্-ফিস্—তাও সাঙ্কেতিক ভাষায়। রূপচাঁদ একটু উতলা হইয়া উঠিয়াছেন। গ্রামের সেই মৃদু-তরঙ্গিত শস্যশীর্ষ হরিৎ-সাগর; সেই বনফুল-বাস-বিলসিত বাতাস; দিগন্তচুম্বিত আকাশ; সেই শৈবাল-বসনা সরসীকূলে কুলনারীকুলের কলহাস, সে যেন আর একটা জগৎ! আর এখানে কেবল ঝন্-ঝন্ ঝুন্-ঝুন্! আচ্ছা, ঐ কাল চোঙ্‌টা কি রকম করে কথা কয়! বাড়ী ফেরবার আগে একবার শুন্‌তে হবে।

রূপচাঁদ আর ভ্রমণে বাহির হইবেন না—প্রতিজ্ঞা। আপনার উপর আপনি কারাদণ্ডের আদেশ দিয়া ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, এমন সময় ঝুন্-ঝুন্ করিয়া টেলিফোঁ বাজিয়া উঠিল। স্বরূপ মাইতি তখন মনিবের কাছে কি কাজে গিয়াছে। রূপচাঁদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোঙ্ ধরিলেন স্বরূপ যেমন ধরে।

স্বরূপের অনুকরণ করিয়া রূপচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?—কি—কি-কি বল্‌লেন, মশাই? সকাল বেলা! খামকা গাল দেন কেন, মশাই? কে আপনি?"

গ্রন্থকার সর্ব্বজ্ঞ। নারীর মনের কথা যিনি অনায়াসে অবগত হইতে পারেন, চোঙে কাণ না দিয়া টেলিফোঁর কথোপকথন শোনা, তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। রূপচাঁদের প্রশ্নের উত্তরে যন্ত্রের অপর প্রান্ত প্রশ্ন করিল, "আপনি কে?"

"আমি রূপচাঁদ।"

"ওঃ! স্বরূপবাবু! আমি হিরণচাঁদ!"

"কি! হারাম্‌জাদ! আপনার ত ভারি আস্পর্দ্ধা! হারাম্‌জাদ্ বলেন কাকে? কি চান আপনি?"

"একের নম্বর বাড়ীটা ভাড়া নোব।"

"কি? ঝি? একের নম্বর দাড়ী?"

"হাঁ হাঁ বুঝেছেন? ভাড়া নোব।"

"নাড়া দোব? কেন, মশাই, মাগ্‌না ত নয়!"

"মাগ্‌না কে বল্‌ছে মশাই, ভাড়া দোব!"

"ওঃ! ভাড়া দেবেন?"

"হাঁ, ভাড়া দোব—পয়লা নম্বর বাড়ী।"

"বটে! আমার পয়লা নম্বর দাড়ী ভাড়া নেবেন? দাড়ী ভাড়া দেবার জন্যে ত সঙ্গে করে কল্‌কেতায় আনিনি, মশাই।"

"আপনাকে ঠিক করে দিতেই হবে!"

"দিতেই হবে? কেন বলুন ত? এ আপনার কি রসিকতা? দাড়ি ভাড়া নেবেন!"

"রসিকতা নয়, মশাই। আপনি যা নেবেন তাতেই রাজি!"

"জান্‌বেন—কি?"

"রাজি।"

"কাজি?"

"কাজি নয়—রাজি।"

"ওঃ! পাজী!"

"হাঁ হাঁ—আপনি স্বীকার?"

"আমি শুয়ার!"

"তা হলে পাকা?"

"পাকা? নিশ্চয়ই পাকা? শুন্‌ছেন? কথা কন্ না যে!"

ততক্ষণে হিরণচাঁদ যন্ত্র ছাড়িয়া চলিয়া গেছে। কিন্তু অজ্ঞ রূপচাঁদ বলিতে লাগিলেন, "শুনুন, মশাই, শুনুন! আমার পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে। এখন দাড়ী পাকায় দোষ নেই। আপনি হারামজাদা বল্‌লেন, পাজী বল্‌লেন, শুয়ার বল্‌লেন; আর বল্‌লেন, আমার পাকা দাড়ী আপনি ভাড়া নেবেন! আপনি নানা কথা কইলেন। আমার উত্তরটা শুনে যান—আমি দোব না। ভদ্রলোকের এক কথা।"

রূপচাঁদ রাগে গুম্ হইয়া বসিলেন। এমন সময়ে স্বরূপের প্রবেশ। জিজ্ঞাসা করিল, "স্যাঙাত, আজ ভ্রমণে বেরোও নি যে! তা বেশ করেছ! কল্‌কেতার আজকাল কার নতুন খেলা দেখে যাও।"

"কি? এই ত এক খেলা দেখ্‌লুম।"

"কি? টেলিফোঁ শুনছিলে? আরে ও পুরণো হয়ে গিয়েছে। এস এস, সব জুটেছে!" বলিয়া রূপচাঁদকে এক প্রকার টানিতে-টানিতে হলঘরে লইয়া গেল। সেখানে দশ বারো জন যুবক উপস্থিত। সকলেরই ফিট্‌ফাট্ ফুট্‌ফুটে চেহারা। গায় ফিন্‌ফিনে চুড়িদার—সোণার চেন্‌যুক্ত বোতাম-আঁটা, তা'তে হীরা, মতি, চুণি, পান্না, নানা রত্ন বসান। সকলেরই মাথায় পাগ্‌ড়ী,—হরেক রঙের—শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত। প্রত্যেকের হাতে এক-একটী পান-ভরা রূপার কেস্; তার সঙ্গে একটি-একটি ছোট কেস্—সেটা রুচি-অনুযায়ী জরদা, সুরতী, কিমা, তাম্বুলবিহার প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। স্বরূপ সেই যুবক সভায় রূপচাঁদকে লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন "আমার দোস্ত।" এমন সময় দূরে শব্দ উঠিল—"রাম নাম সত্য হায়!" "রাম নাম সত্য হায়।" আওয়াজ শুনিয়াই যুবকবৃন্দের সস্মিত মুখের দীপ্তি সহসা যেন নিবিয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া একজন বলিয়া উঠিল—"এই মুদ্দরের সাথে কয় জন লোক আছে? আমি বল্‌ছি আটজন।"

সঙ্গে-সঙ্গে আর এক যুবক শব-বাহকদিগের বিকট ধ্বনি একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দশ টাকা বাজী—দশজন।"

"না, বারো জন—পঞ্চাশ টাকা।"

তৎক্ষণাৎ আর একজন বলিল, "একশো টাকা—পনের জন।"

তারপর শব স্ত্রীলোকের কি পুরুষের? "স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক—পঁচিশ।"

"পঞ্চাশ টাকা—পুরুষ।"

একশো, দুশো—বাজী ক্রমে পাঁচশোয় উঠিল। "আচ্ছা কি ব্যামোয় মারা গিয়েছে?"

"কলেরা—না হয় ত পঞ্চাশ টাকা দেব।"

"কলেরা হয় ত একশো টাকা বাজী।" "রাজি"-"রাজি"। "বসন্ত না হয় ত দুশো টাকা।" ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—"ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা না হয় ত তিনশো।" নিদানের তালিকা যেমন ওড়ন্-পাড়ন্ হইতে লাগিল, সঙ্গে-সঙ্গে বাজিও উঠিল হাজারে। তারপর শব কৃশ কি স্থূল; দীর্ঘাকার কি খর্ব্ব; তাহার নাক, কাণ, চোখ কেমন? তখন সকলের মাথায় খুন চড়িয়াছে—টাকার যেন পাখা গজাইয়া উড়িতে লাগিল। রূপচাঁদ বিস্মিত, স্তম্ভিত, আত্মহারা। ইত্যবসরে তাঁহার দিকে একজন চাহিয়া বলিল, "শবের দাড়ী ছিল কি না?" "হাঁ-হাঁ"—"না-না।" "একশো"-"দুশো"-"পাঁচশো"-"হাজার।"

"কি রকম দাড়ি?" 'ছাগল-দাড়ি?" "আলবৎ!" "পাঁচশো", "ছয়শো", "হাজার", "দুহাজার।"

একজন রূপচাঁদের পানে চাহিয়া বলিল, "এমনি চাঁপদাড়ি।"

"না"—"না"—"দুশো", "পাঁচশো", "হাজার", "দুহাজার।"

যিনি দক্ষ মুনির স্কন্ধে ভর করিয়া শিবনিন্দা করাইয়াছিলেন; যাঁহার অমোঘ প্রভাবে রণক্ষেত্রে রাবণ রামচন্দ্রের প্রতি কটূক্তি করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল; যাঁহার দুর্ব্বার শক্তি পতিপত্নীর বিচ্ছেদসাধন করে, পিতা পুত্রে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় বিরোধ বাধায়; সেই দুষ্টা সরস্বতী সহসা আজ রূপচাঁদের কণ্ঠে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—"কভি নেই।" তারপর শ্মশ্রুতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে-করিতে কহিলেন, "এসি দাড়ি হোগা ত হাম দশ হাজার টাকা দেগা।" চারিদিকে রব উঠিল—"রাজি"—"রাজি"—"রাজি।" একজন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বলিলেন, "দেখবেন, মোসাই, ভদ্দর লোকের এককথা। আপনি স্বরূপবাবুর দোস্ত। চলুন, নিমতলায় গিয়ে দেখা যাক।" বলিয়া দুইজন তাঁহার হাত ধরিল। রূপচাঁদ বুঝিলেন, ইহারা শুধু বাক্যবীর নহে, সাংঘাতিকরূপে কার্য্য তৎপর। তাঁহার ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস ক্ষণিকে লয়প্রাপ্ত হইয়া গেল। রূপচাঁদ ব্যাকুল ভাবে স্বরূপের মুখ চাহিয়া কহিলেন, "আমার যাবার দরকার নেই। আপনারা দেখে এসে যা বলবেন, আমি মেনে নেব।" "হুর্‌রে হুর্‌রে" করিতে-করিতে যুবকদল স্বরূপকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

রূপচাঁদ হল্‌ঘরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ কি কাণ্ড করিয়া বসিলাম! ইহারা ত টাকা আদায় না করিয়া ছাড়িবে না। কিছুতেই না। আবার স্বরূপকে মধ্যস্থ মানিলাম কেন? নিশ্চয় এদের সঙ্গে সাজোস্ আছে। ওরা এখনই আসিয়া ধরিবে, আর টাকা আদায় করিয়া ছাড়িবে। কি করিয়া আদায় করিবে? অত টাকা ত আমার সঙ্গে নাই! কেন, হ্যাণ্ডনোট্ লিখাইয়া লইবে। কি সর্ব্বনাশ! হাতে পাইয়া এখন যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। ইহাদের খর্পরে পড়িয়াছি, একান্ত অসহায়। দেশে হইলে দেখিতাম, কেমন সব জুয়াড়ি! লক্কার ধোঁয়াতেই পুঁটি গাঁ-ছাড়া করিয়া দিত! এখন কি করি? এখান থেকে সরি। কিন্তু যাই-ই বা কোথায়? এখনও দুই তিন দিন কলিকাতায় থাকিতে হইবে, নহিলে দাঁত পাওয়া যাইবে না। এই দুই তিন দিন গা ঢাকা থাকিতে হইবে। ইহারা অবশ্য কলিকাতা পাতি-পাতি করিয়া খুঁজিবে। দশ হাজার টাকার মায়া কে ছাড়ে! কিন্তু আমাকে খুঁজিয়া না পাইয়া যদি দেশে গিয়া উপস্থিত হয়! স্বরূপ ত সবই জানে! সর্ব্বনাশ! এ কথা ত আগে ভাবি নাই! হাজার হোক, পুঁটি মেয়েমানুষ। এখনই সতর্ক করিয়া দিই। তৎক্ষণাৎ রূপচাঁদ পুঁটিকে পোষ্টকার্ড লিখিয়া দিলেন,—"আমার যাইতে বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে আমার নাম করিয়া যদি কেহ যায়, কদাচ, কদাচ তাহাকে আমল দিবে না। খুব সাবধান!" এদিক ত সামলাইলাম, এখন আমি যাই কোথা? কোনও হিন্দু-হোটেলে দুই-একদিন থাকিলে হয় না? সেই পরামর্শই ঠিক! অবিলম্বে রূপচাঁদ আপনার ব্যাগটি লইয়া "মহৎ আশ্রম" অভিমুখে চলিলেন। পথে পোষ্টকার্ডখানা একটা ডাকঘরে ফেলিয়া দিয়া গেলেন।

মহৎ-আশ্রমে আসিয়া রূপচাঁদের শয্যা-কণ্টকী উপস্থিত হইল। আশ্রমের অধিকারী বড়বাজারে যদি কোন সামগ্রী কিনিতে লোক পাঠান, রূপচাঁদের মনে হয়, অছিলা করিয়া স্বরূপকে সংবাদ দিতে যাইতেছে। অমনি তাহার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া নাচিতে থাকে! রাত্রিতে ভাল নিদ্রাও হইল না। পরদিন আহারাদির পর শয্যায় একটু গড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় একটি লোক কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ছাতা ও হাত-ব্যাগটা মেঝেয় রাখিয়া একটা মাদুর পাতিয়া বসিল। রূপচাঁদের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল; তিনি আধঘুমে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—যেন একজন ডিটেক্‌টিভ আসিয়া তাঁহার সন্ধান লইতেছে। লোকটি ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি চকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। সে ব্যক্তি কিছুক্ষণ ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের নিবাস?"

"এই ত দেখছেন, এইখানে।"

আগন্তুক জিজ্ঞাসিল, "আপনার নাম?"

রূপচাঁদের বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল। নিশ্চয় চর! নহিলে নাম জানিতে চায় কেন? বলিলেন, "আমি জানিনি।"

"সে কি মশাই, জানেন না কি?"

"মাইরি জানিনি! আপনার দিব্যি বল্‌ছি।"

"কি বল্‌ছেন আপনি?"

রূপচাঁদ এই সংশয়ীর উপর অতিশয় চটিয়া উঠিলেন, "বলাবলি আর কি মশাই? কারুর ধার করেও খাইনি, আর চুরি-জোচ্চুরিও করিনি!"

"রাম, রাম! আমি কি তাই বল্‌ছি! আপনি জানিনি বল্‌ছেন কি?"

"জানিনি তার আবার কি কি? জানতেই হবে এমন কিছু কথা আছে?. হুঃ, লোকে বাপ-পিতৃমোর নাম ভুলে যাচ্ছে। ভারি অপরাধ হয়েছে, না? আমার নাম নেই।"

"বাপ-মা আপনার নামকরণ করেন নি?"

"সেই অন্নপ্রাশনের সময়। ততদিনের কথা কি মনে থাকে?"

আগন্তুক বলিলেন, "কেন থাক্‌বে না, মশাই? নাম মনে থাক্‌বে না? আমার নাম বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়; বিশু চাটুয্যেও বলে।"

"পেন্নাম মশাই! আপনার স্মরণ-শক্তির খুব তারিফ করছি! হ'ল ত? আর কি চাই বলুন?"

"এইবার আপনার নামটা বলুন।"

"ওঃ, আপনি আচ্ছা জিদি লোক! পোষাবে না, মশাই, আমি চল্লুম।" বলিয়া রূপচাঁদ ছাতা-ব্যাগ লইয়া চটাপট্ শব্দে সিঁড়ি নামিতে লাগিলেন। মহৎ-আশ্রমের ম্যানেজার পিছু ডাকিতে লাগিলেন, "যান কোথা, মশাই? আমাদের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে যান।" আর পাওনা! "আসছি" বলিয়া রূপচাঁদ উধাও হইয়া গেলেন।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে একেবারে দাঁতের দোকানে উপস্থিত। রূপচাঁদের গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবর, উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া দন্তবিক্রেতা বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

"কিসের?"

"এত তাড়া?"

"তাড়ালে আর তাড়া না করে করি কি? বাপু, দাঁত হয়ে থাকে ত দাও, নইলে আমি চল্লুম। আর এক দণ্ডও হেথা থাক্‌ব না।"

"একটু অপেক্ষা করুন" বলিয়া বিক্রেতা চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে দাঁত আনিয়া বলিলেন, "পরুন দেখি!"

তারপর ঘসাঘসি করিয়া যতক্ষণ তাহারা দাঁত ফিট্ করিতে লাগিল, রূপচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন, স্বরূপ যদি ষ্টেশনে ছোঁড়াগুলোকে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে! দাড়িতে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে-করিতে চট্ করিয়া তাঁহার মাথায় একটা মতলব উঠিল। দাঁত পরিয়া, দাম চুকাইয়া দিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া রূপচাঁদ এক হেয়ার-কাটারের দোকানে গিয়া উঠিলেন। নরসুন্দর তাঁহাকে দীর্ঘচ্ছন্দে সেলাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চান, কর্ত্তা?"

রূপচাঁদের রক্ত তখনও টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছিল; বলিলেন—"তোমার এখানে ত, বাপু, বর্দ্ধমানের সীতাভোগও পাওয়া যায় না, আর ধনেখালির খৈচুরও পাওয়া যায় না। অত লম্বা-লম্বা কথা কইছ কেন?"

কিন্তু মুসল্‌মান্ নাপিত সহজে অপ্রতিভ হইবার পাত্র নয়।

রূপচাঁদের দুগ্ধধবল কেশ, গুম্ফ, শ্মশ্রু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উত্তম কলপ্ নেবেন, কর্ত্তা? মাথাতে-মাথাতে আপনার বেবাক চুলে মীশ্ কালী বরণ ধরবে! তখন বলবেন—হাঁ!"

রূপচাঁদ বলিলেন—"হাঁ, ভগবান্ চূণকাম্ করে দিয়েছেন, তুমি কালী মাখিয়ে দাও। তা হ'লে চূণ কালী দুই-ই হয়?"

"কর্ত্তা ঠিক যোয়ান্-মরদের মত দেখ্‌তে হবে। আপনি পরখ করে দাম দেবেন।"

"সে যা হ'ক, বাপু, আমার এই গোঁফ-দাড়ি সব কামিয়ে চুলগুলো ছোট করে ছেঁটে দিতে পার?"

"বেশ আলবার্ট ফ্যাসান্ করে দিব, কর্ত্তা, আপনি এই চেয়ারে বসেন।"

নরসুন্দর প্রসাদন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে রূপচাঁদ আরসীতে মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দাঁত পরিয়া গাল বেশ পুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। খানা-খোন্দল আর কোথাও কিছু নাই। কি সুন্দর! নরসুন্দর আবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছে, "কর্ত্তা, আপনি কলপ্ নেন। দুইঘণ্টা পরে যদি আপনারে আপনি চিন্‌তে পারেন ত আমি পয়সা নিমু না।"

দুই ঘণ্টা পরে দর্পনে মুখ দেখিয়া রূপচাঁদ সত্যই চকিত হইলেন। সত্যই আর নিজেকে নিজে চেনা যায় না।

মুকুরে যে মুখ আজ তিনি দশ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছেন, তাহা কোথায় অন্তরিত হইয়া গেছে—আর তার পরিবর্ত্তে আরসীর অন্তরাল হইতে যে মূর্ত্তি উঁকি মারিতেছে, সে তিনি নহেন! রূপচাঁদের মুখে একগাল হাসি ফুটিয়া উঠিল। আ মরি, মরি! একি! যেন মুক্তা ঝকিতেছে! হেয়ার কাটারকে বখ্‌শিস্ দিয়া, চাদরখানা বুকে আড় করিয়া বাঁধিয়া, বড়বাজার অভিমুখে দুই অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া রূপচাঁদ কলিকাতা হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

(৩)

"ওগো, লোহার সিন্দুকের চাবিটা দাও ত।" নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়াই রূপচাঁদের এই প্রথম উক্তি। লোহার সিন্দুকের চাবি পুঁটিকে দিয়াও রূপচাঁদের বিশ্বাস নাই। কি জানি! সব ঠিক্‌ঠাক্ আছে কি না, না দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। বেলা তখন অপরাহ্ণ। ঘণ্টা দুয়েক দিবানিদ্রার পর পুঁটি উঠি উঠি করিতেছে। রূপচাঁদকে দেখিয়াই সে আঁৎকিয়া উঠিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "কে—কে—কে কে তুমি?"

রূপচাঁদ একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন, "বেশ করে ঠাউরে দেখ দিকি কে! কখন আলাপ-পরিচয় ছিল কি না?"

পুঁটি চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বিন্দি, বিন্দি, দেখ্ ত কে এক মিন্‌সে ঘরে ঢুকে বল্‌ছে, নো'র সিন্দুকের চাবি দাও।"

"আহা, চেঁচাও কেন?"

"এক্ষুনি বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। নইলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় কর্‌ব। ডাক্ ত চৌকিদার।"

রূপচাঁদ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ডাক্ চৌকিদার! এ বলে কি? পুঁটি গলা আর এক গ্রাম চড়াইয়া বলিল, "আ গেল মিন্‌সে, এখনও নড়ে না যে! বেরো বল্‌ছি আমার বাড়ী থেকে! বিন্দি, বিন্দি, ডাক্ ত ন'ঠাকুর-পোকে।"

বিন্দি ঘাটে বাসন মাজিতেছিল। সে সেইখান হইতেই চেঁচাইয়া বলিল, "কি হয়েছে গো বৌদি?"

"আমার মাথা হয়েছে! তুই শীগ্‌গির ন'ঠাকুরপো, মতি খুড়ো, বামুন-জ্যাঠাদের ডাক্। কে এক মিন্‌সে —ঘরে কে সর্ব্বস্ব চুনিতে এয়েছে।"

রূপচাঁদের আর ধৈর্য্য রহিল না। রাগে গরম হইয়া বলিলেন, "আমাকে চেন না? কখন দেখনি?"

"কস্মিন কালেও না।"

মহা উত্তেজিত হইয়া রূপচাঁদ কহিলেন, "কচি খুকি আর কি! আমার আওয়াজে চিন্‌তে পারছ না?"

তেমনি উত্তেজিত হইয়া পুঁটি বলিল, "না।"

এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! পরের পরিবার না চিনিলে কোনই ক্ষতি নাই। কিন্তু নিজের অর্দ্ধাঙ্গিনী! লোহার সিন্দুকের চাবিটা হস্তগত করিয়া আপনার অর্দ্ধাঙ্গকে একেবারে নির্ম্মম ভাবে নাকচ করিয়া দিতেছে! রূপচাঁদের আর বাক্য-নিঃসরণ হইল না। কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। পুঁটি সপ্তমে গলা চড়াইয়া হাঁকিল, "ওমা, মিন্‌সে যায় না যে রে! ন'ঠাকুর-পো, ন'ঠাকুর পো, ছুটে এস ত!"

"ডাক্ তোর ন'ঠাকুর পো, আর যে যেখানে আছে, আমার বাড়ী থেকে কেমন করে আমাকে তাড়ায় দেখি!" বলিয়া রূপচাঁদ একটা বাসনের সিন্দুক চাপিয়া বসিলেন। দেখিতে-দেখিতে বাড়ীও লোকারণ্য হইয়া গেল। পুঁটি একটু আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। দিনের বেলা একা ডাকাতী করিতে আসিয়াছে, কি জানি, যদি কোমরে কোথাও ছোরাছুরি গোঁজা থাকে! মতিখুড়ো পলাইবার পথ রাখিয়া বলিলেন, "বাপু, ভাল এস্তেক যাবে, না চৌকিদার ডাকব?"

রূপচাঁদ সবিস্ময়ে তাঁহার মুখ চাহিয়া বলিলেন, "সে কি খুড়ো, আমায় চিন্‌তে পারছ না? আমি রূপচাঁদ।"

বামুন-জ্যেঠা ভিড়ের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "অমন অনেকে বলে! তার প্রমাণ?"

কি সর্ব্বনাশ! রূপচাঁদ যে রূপচাঁদ, অর্থাৎ তিনি যে তিনি, এ কথা প্রমাণ করেন কেমন করিয়া? যে প্রকৃষ্ট প্রমাণ ছিল তা' ত নাপিতের দোকানে রাখিয়া আসিয়াছেন। কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "খুড়ো, আমার গলার আওয়াজে বুঝ্‌তে পারছ না?"

পুঁটি বলিল, "ও কম ধড়িবাজ! ঠিক্ তেমনি গলা করে কথা কইছে।"

রূপচাঁদের পুরোহিত বলিলেন, "তুমি ত আচ্ছা

জোচ্চোর হে! দেখ্‌তে ভদ্রলোকের মত! ছিঃ—ভালয়-ভালয় চলে যাও! কেন আর কেলেঙ্কারী কর!"

"কেলেঙ্কারী করছি আমি না আপনারা?"

ঠিক্ এই সময় পুঁটি আসিয়া মতি খুড়োর হাতে একখানা পোষ্টকার্ড্ দিয়া বলিল, "ওর কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। এই দেখুন, তিনি কি চিঠি লিখেছেন।"

অমনি পাঁচ-সাতটা গলা চেঁচাইয়া উঠিল, "কি হে, কি হে? চেঁচিয়ে পড়।"

মতি খুড়ো বলিলেন, "রূপচাঁদ লিখেছে, 'আমার নাম করে কেউ যদি যায়, কদাচ তাকে আমল্ দেবে না। খুব সাবধান!'"

অনেকগুলো গলা চৌকিদার চৌকিদার, করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। নিজ হস্তলিপির এই বিদ্রোহাচরণ দেখিয়া রূপচাঁদ হতাশ কণ্ঠে বলিলেন, "মশাইরা চৌকিদার ডাক্‌বেন এখন! আমার একটা কথা শুনুন।"

"কি বল?"

"মশাই, আমার হাতের লেখা ত আপনাদের চোখের ওপর রয়েছে। আমি যদি আপনাদের সাম্‌নে ঠিক্ অমনি লিখে দিতে পারি, তা হলে কি বলবেন?"

"তা হলে বল্‌ব তুমি যেমন জোচ্চোর, তেমনি জালিয়াৎ।"

রূপচাঁদ কাণে আঙ্গুল দিলেন। তারপর বলিলেন, "আমার এই জুতা, জামা, কাপড়, চাদর, ব্যাগ্, এও কি সব জাল? আমার পরিবারকে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন, কল্‌কাতা যাবার সময় আমি এই সব পরে গিয়েছিলুম কি না?"

পুঁটি হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"আপনারা চৌকিদার ডাকুন, ও মিন্‌সে তাঁকে খুন করে সব কেড়ে নিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, কল্‌কেতা থেকে আপনাদের জন্য দু' তিন হাঁড়ি মিষ্টি আন্‌বেন।" কিন্তু চকিত চাকী এই ক্রন্দনের ভিতর পুঁটির সেই হাসির আভাস শুনিলেন। কতকগুলা গলা এক সঙ্গে হাঁকিল—'চৌকিদার, চৌকিদার!' রূপচাঁদ তখন উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আমি যে আপনাদের গাঁয়ের লোক, রূপচাঁদ চাকী, তার আরও প্রমাণ দিচ্ছি। দশ বছর আগে মতি-খুড়ার বাড়ীতে টিল পড়্‌ত, মনে আছে?"

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পুরুতমশায় বলিলেন, "বাপু, এই ভরসন্ধ্যাবেলা উপদেবতাদের কথা তুল্‌ছ কেন? তুমি যে রূপচাঁদ নও, তার অনেক প্রমাণ আছে। রূপচাঁদের মস্ত গোঁফ ছিল, একহাত-দাড়ি ছিল।"

রূপচাঁদ বলিলেন, "গোঁফ দাড়ি কামান যায় না?"

"তার লম্বা-লম্বা চুল ছিল।"

"চুল ছাঁটা যায় না?"

পুরুত্ বলিলেন "সে চুল ছিল, শোণের নুড়িরমত সাদা।"

"পাকা চুলে কলপ্ দেওয়া যায় না?"

"রূপচাঁদ ফোক্‌লা ছিল।"

রূপচাঁদ তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে; দুই হাত দিয়া দুই পাটি দাঁত খুলিয়া পুরুৎ মশায়ের গায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই দেখ্, এই দেখ্।"

পুরুতমশায়ের বুকের ভিতরটা গুরগুর করিয়া উঠিল। একটু পূর্ব্বে ভূতে টিল ফেলার কথা হইয়া গিয়াছে। দুই পাটী দাঁত যে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার গায় পড়িবে, তিনি স্বপ্নেও কখন কল্পনা করিতে পারেন নাই। পুরোহিত হাতে পৈতা জড়াইয়া রাম নামের সঙ্গে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে কর্পূরের মত একেবারে উবিয়া গেলেন। অমনি নিমেষে গৃহ জনশূন্য হইয়া গেল। পরাজিত, লজ্জিত, লাঞ্ছিত রূপচাঁদ বাসনের সিন্দুকে বসিয়া হতাশ নেত্রে পুঁটিকে দেখিতে লাগিলেন। ঘর প্রকম্পিত করিয়া পুঁটির বিরাট হাস্যধ্বনি উঠিল, আর তাহার স্খলিত অঞ্চল বিজয় পতাকার ন্যায় সান্ধ্য-পবনে উড়িতে লাগিল।

শোক-সংবাদ

স্বর্গীয় অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ

মাত্র সাত দিনের ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে অমূল্যকৃষ্ণ আমাদিগকে জন্মের মত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। এক বুধবারে তাঁহার জ্বর হয়—পরের বুধবার ২০শে ফাল্গুন রাত্রিতেই তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেন। সংসারের বন্ধন, মানুষের শত চেষ্টাও তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না;—মৃত্যুর আহ্বান এমনি অপরিহার্য্য, এমনি নিষ্ঠুর, এমনি নির্ম্মম হৃদয়হীন! ২৭ বৎসর মাত্র তাঁহার বয়স হইয়াছিল; এম,

স্বর্গীয় অমূল কৃষ্ণ ঘোষ

এ, বি, এল পাশ করিয়া সবেমাত্র সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন; যৌবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ লইয়া পূর্ণ-উদ্যমে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিবেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মৃত্যুর আহ্বান তাঁর প্রাণের দ্বারে আসিয়া পৌছিল; সে আহ্বান তুচ্ছ করে, মানুষের সে ক্ষমতা নাই। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং কলেজে পড়িবার সময় "প্রীতি" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালন এবং কয়েক বৎসর তাহার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। এই অল্প বয়সের মধ্যেই কলেজের পড়া করিয়াও তিনি সাতজন মহাপুরুষের জীবন-চরিত লিখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, গোখলে, টাটা, নেপোলিয়ান, ওয়াসিংটন এবং কিচনার এই সাতজন আদর্শ পুরুষের জীবনী সহজ সরল ভাষায় লিখিয়া বাংলা দেশের বালক-বালিকাদিগের সম্মুখে যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায়, সেগুলি কত গভীর; কিন্তু তাঁর ভিতরে যে শক্তি সঞ্চিত ছিল, তাহা আর বিকাশ লাভ করিতে পারিল না। বাঁচিয়া থাকিলে বাংলা সাহিত্য তাঁহার নিকট অনেক আশা করিতে পারিত; কিন্তু হায়—

ফুটিতে পারিত গো
ফুটিল না সে।

মৃত্যুর শীতল স্পর্শে অকালে যে পাতা ঝরিয়া গেল বসন্তের মলয় হিল্লোল সেখানে নবকিসলয় ফুটাইয়া তুলিবার আর অবসরও পাইবে না।

৺ রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মণিলাল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, আমাদের পরম প্রীতিভাজন রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নে মণিলাল কোম্পানীর উন্নতি হইয়াছিল। তিনি অবসর-সময় বৃথা ক্ষেপন না করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন; তাহারই ফলে আমরা কয়েকখানি ভাল বই পাইয়াছি। অল্পদিন পূর্ব্বেই তাঁহার 'শিলংভ্রমণ' প্রকাশিত হইয়াছে। ১লা বৈশাখ হালখাতা উপলক্ষে প্রতিবৎসর তিনি সাহিত্যিক-সম্মিলন করিতেন এবং উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখকগণকে পুরস্কৃত করিতেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী

বাঙ্গালীর গৌরব, দেশের সুসন্তান, মাননীয় শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় অস্থায়ীভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে আমরা গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। সার আশুতোষের ন্যায় বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কর্ম্মকুশল ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে অতি কমই আছেন; হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কেন, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবারও তিনি সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু আইনে না কি আছে যে, শ্বেতাঙ্গ না হইলে স্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতি হওয়া যায় না; সেই জন্য ইতঃপূর্ব্বে সার রমেশচন্দ্র, সার চন্দ্রমাধবও অস্থায়ী ভাবেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক, সার আশুতোষের এই নিয়োগে আমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি, এবং বঙ্গমাতার এই সুসন্তানকে আমরা ভক্তিভরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর স্বরাজ্যের অনেক উন্নতিকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তন্মধ্যে রাজ্যশাসনের সুবন্দোবস্তের জন্য একজিকিউটিভ কাউন্সিলের উন্নতি-সাধন অন্যতম। কিছুদিন পূর্ব্বে (হিজরী ১৩৩৮ অব্দের সফর উলমুজাফর মাসের ২২ তারিখে) একটী ফরমানের দ্বারা, রাজ্যের শাসন-সৌকর্য্যার্থ নিজাম বাহাদুর একটী একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে, বর্ত্তমান নিজাম বাহাদুরের পিতার আমলে একটী লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু নিজাম বাহাদুরের মতে তাহা বর্ত্তমানকালের প্রয়োজনের অনুপাতে যথেষ্ট নহে, কিম্বা তাহা তাঁহার প্রিয় প্রজাবর্গের উন্নতি ও অগ্রগতির পক্ষে কর্ত্তব্য সম্পাদনের পক্ষে সম্যক উপযোগী বলিয়া নিজাম বাহাদুর মনে করেন না। "Nor do they give promise of the fulfilment of those duties, and functions which I consider necessary for the prosperity and advancement of my beloved subjects."। সেইজন্য তিনি এক্ষণে আর একটী ফরমানের দ্বারা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সংস্কার সাধনের ফলে কাজ খুব ভালই হইতেছে। এক্ষণে হিজ এক্জলটেড হাইনেস নিজাম বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সদর ই আজাম শ্রীযুক্ত সার আলি ইমাম সাহেবকে ইহার বন্দোবস্ত করিবার ভার দিয়াছেন। সার আলি ইমাম মহোদয় নিজাম বাহাদুরের নির্দ্দেশ অনুসারে কতকগুলি বিষয়ের সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিলে ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সাধিত হইবে।

মান্দ্রাজ—তাঞ্জোরের উকীল শ্রীযুক্ত কাথুনাস্থ আয়ার একটী নূতন উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি এমন একটী যন্ত্র (propeller) প্রস্তুত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা দূরদেশ-যাত্রার সময় খুব কমিয়া যাইবে। এই প্রোপেলার যন্ত্রটি, ইহার উদ্ভাবকের বিবেচনায়, রেলওয়ে, ট্রেণ, ষ্টীমার কিম্বা বিমান—যে-কোন প্রকার যানে ব্যবহৃত হইতে পারিবে, এবং ইহার সাহায্যে যানগুলির গতিবেগ বর্দ্ধিত করা যাইবে। তিনি বলেন, এই প্রোপোলারের বলে বিমানে চড়িয়া ঘণ্টায় ১৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করা চলিবে। এই পর্য্যন্ত সংবাদ এখন পাওয়া গিয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে এই যন্ত্রটি কিরূপ ফল প্রসব করে, তাহা দ্রষ্টব্য। বিমানে এই যন্ত্র

বসাইয়া যদি যথার্থই দেখা যায় যে, ইহার সাহায্যে বিমান ঘণ্টায় ১০০০ মাইল দৌড়িতে পারে, তাহা হইলে বিমান-যানের ক্ষেত্রে যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। একজন ভারতবাসীর উদ্ভাবনের ফলে এই ব্যাপারটি ঘটিলে বিজ্ঞান-জগতে ভারতবর্ষ সমাদর লাভ করিতে পারিবে। সে যাহাই হউক, আপাততঃ ভারত-বাসীদের নিজেদেরও একটু কর্ত্তব্য রহিয়াছে। দুই এক জন করিয়া ভারতবাসীরা যেমন বিজ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন, অন্যান্য ভারতবাসীরাও তাঁহাদের পন্থানুসরণ করুন,—নব নব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উদ্ভাবনের চেষ্টা করুন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই, বর্ণভেদ নাই;—সেখানে কেবল গুণের আদর হইয়া থাকে। সামাজিক হিসাবে পৃথিবীর সভ্য-সমাজে ভারতবাসীর স্থান এখন নগণ্য বলিলেই হয়। কিন্তু সেখানে উচ্চাসন লাভ করা না করা আমাদের হাত। সে চেষ্টা আমরা করিতে ছাড়িব কেন? এবং কৃতকার্য্য হইলে কে আমাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে।

বাড়ী-ভাড়া, বাড়ী-ভাড়া—কলিকাতা সহরে একটা রব উঠিয়াছে। বাড়ীর ভাড়া যে বাড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কোন কোন স্থলে খুব অসঙ্গত ভাবেই বাড়িয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। বাড়ী-ওয়ালাদের দিক হইতে ভাড়া বাড়াইবার যে কারণ দেখানো হইতেছে, সেটাকে একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কারণ, জমির মূল্য, উপকরণাদির মূল্য যথার্থই অনেক বাড়িয়াছে। তাহার উপর demand and supplyএর কথাটাও বিবেচ্য। সহরে লোকসংখ্যা নিত্যই বাড়িতেছে। তার সঙ্গে-সঙ্গে সহরের আয়তনও কিছু কিছু বাড়িতেছে বটে, সহরতলীর দিকে সহর ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে বটে; এবং সহরে যে সকল পতিত জমি ও বস্তি ছিল, তাহাতে কোটা-বালাখানা নির্ম্মিত হইয়া লোকের বাস করিবার স্থানের পরিমাণ বাড়িতেছে বটে, কিন্তু লোকসংখ্যা তাহার অনুপাতে অনেক বেশী বাড়িতেছে; কাজেই মোটের উপর স্থানাভাব কিছুতেই মিটিতেছে না। তাহার উপর ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কার্য্য আরম্ভ হওয়া অবধি সহরে বাস্তবিকই স্থানাভাব ঘটিয়াছে। কাজেই বাড়ীওয়ালারা এখন 'গো' পাইয়া ভাড়া বাড়াইয়া দিতেছেন। এবং এই বৰ্দ্ধিত হারে ভাড়ার দাবী করাতেও বাড়ী একদিনের জন্য পড়িয়া থাকিতেছে না। পক্ষান্তরে যাঁহারা দীর্ঘকাল সহরে বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে হঠাৎ দেড়গুণ, দুইগুণ বৰ্দ্ধিত হারে ভাড়ার দাবী করায় তাঁহারাও যে আপত্তি উত্থাপন করিবেন, ইহাও খুবই স্বাভাবিক। সেই জন্যই বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে আইন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আইনের খসড়া সিলেক্ট কমিটীর হাতে গিয়াছে। 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই আইন পাশ হইয়া যাইবে। আমরা এই আইন সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া আর এক দিক দিয়া (from a different angle of vision) কথাটার আলোচনা করিতে চাহি।

অমঙ্গল হইতেও মঙ্গলের উৎপত্তি হয় বলিয়া একটা কথা আছে। বাড়ীর ভাড়াবৃদ্ধি ভাড়াটিয়াগণের পক্ষে নিশ্চয়ই অমঙ্গলজনক। তাঁহারা কি এই ঘটনার মুখটা অমঙ্গলের দিক হইতে মঙ্গলের দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন না? পারেন বোধ হয়। বাঙ্গলা সংবাদ ও সাময়িক পত্রের নিয়মিত পাঠকগণ বোধ হয় স্মরণ করিতে পারিবেন যে, বাঙ্গলা দেশে পল্লীবাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব অনেক দিন ধরিয়া চলিতেছে, এবং প্রায়ই তাহার আলোচনাও হইতেছে। মফস্বলের লোক সহরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করাতেই না পল্লীগুলি শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে! পল্লীবাসের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, পল্লী-শ্রীর পুনরুদ্ধার করিতে হইলে কাজেই তাঁহাদিগকে পল্লীভবনে ফিরিয়া যাইতে হয়। এখন যখন সহরে বাসের স্থানাভাব হইতেছে, বাড়ীর ভাড়া অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছে, তখন পল্লীবাসের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় শুভ অবসর উপস্থিত হয় নাই কি? অমঙ্গলের ভিতর হইতে ইহাই ত মঙ্গলের সুন্দর সূচনা হইতে পারে! পল্লীভবনে ফিরিয়া যাইবার পক্ষে ম্যালেরিয়া, চোর ডাকাত, রাস্তা-ঘাটের অসুবিধা, ডাক্তার কবিরাজের অভাব প্রভৃতি যে সকল আপত্তি আছে, তাহাদের কথা ত অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু গ্রামে ফিরিয়া না গেলেও ত তাহাদের প্রতিকার হইতে পারে না। এই সকল অসুবিধার প্রতিকার করিবে কে? ইহাও ত আমাদিগকেই করিতে হইবে! সহরে বসিয়া থাকিয়া এ সকলই হয় কি? সাঁতার না শিখিয়া জলে নামিব না প্রতিজ্ঞা করিলে যেমন কোন কালেই সাঁতার শিখিবার সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ গ্রামে ফিরিয়া গিয়া বাস করিতে আরম্ভ না করিলেও গ্রামের অভাব অভিযোগগুলির প্রতিকার হওয়া অসম্ভব। এখন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন না কেন? যাঁহাদের পল্লীগ্রামে বাড়ী-ঘর আছে, জায়গা-জমি আছে, যাঁহারা-ঘর দোর তালাবদ্ধ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন, যাঁহাদের কলিকাতা হইতে গ্রামে অল্পব্যয়ে ও অল্প সময়ে যাতায়াতের সুবিধা আছে, তাঁহারা যদি পরিবার-বর্গকে দেশে রাখিয়া গ্রামের বাড়ীতে সন্ধ্যা-দীপ দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতার বিষয় কর্ম্ম করেন, তাহারা মেসে থাকিতে পারেন; যাঁহারা কিছুই করেন না, তাঁহারা পল্লীভবনে, থাকিয়া সেখানকার পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ঘর বাড়ী জায়গা-জমির তত্ত্বাবধান করিতে পারেন। এইরূপে যদি ২০০০ পরিবার কলিকাতার মায়া কাটাইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে, এই দুই হাজার "ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের বাসোপযোগী ঘরভাড়া" ভাড়াটের অভাবে নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। প্রত্যেক পরিবারের গড়ে লোকসংখ্যা পাঁচজন করিয়া ধরিলে এই দুই হাজার পরিবারের লোক সংখ্যা ১০০০০ হয়। এই দশ হাজারের মধ্যে অনুমান আড়াই হাজার পুরুষ বিষয়কর্ম্ম চাকুরী বা ব্যবসা, উপলক্ষে

কলিকাতায় বাস করিতে বাধ্য হইলেও ১০০০০ লোকের জন্য যতটা স্থান দরকার হইতেছিল, ২৫০০ লোকের জন্য তদপেক্ষা নিশ্চয়ই অনেকটা কম জায়গা লাগিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা এক সময়ে পল্লীবাসের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় পরামর্শ দিতেছিলেন, তাঁহারা এমন একটা সুযোগ পাইয়াও সে সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিতেছেন না ; অধিকন্তু, বাড়ী ভাড়ার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁহাদের মধ্যে আপত্তির কোলাহল, কলরবটাই যেন বেশী শুনা যাইতেছে।

ভারতগবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটী নূতন কাজে হাত দিয়াছেন,—"ড্রাগস্ ম্যানুফ্যাকচার কমিটি" নামে একটী কমিটি গঠন করিয়া, কমিটির হাতে, দেশীয় ভেষজের চাষ ও তাহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত করার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ভার দিয়াছেন। এই কমিটির সেক্রেটারী লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল এইচ, রস একটী কমিউনিক প্রচার করিয়া সাধারণকে জানাইয়াছে যে, কমিটি দুইটী কাজ করিবেন,—ভারতবর্ষে দেশীয় ঔষধ রূপে ব্যবহার্য্য গাছ-গাছড়ার চাষ করা কতদূর সম্ভবপর এবং ব্যবসায়ের হিসাবে তাহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা কতখানি সম্ভবপর, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন। ঔষধ প্রস্তুত-কার্য্যের তদন্ত গবর্ণমেণ্টের মেডিক্যাল ষ্টোর ডিপোয় চলিবে। এবং যখন বুঝা যাইবে যে, অল্পব্যয়ে ঔষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তখন প্রাইভেট কোম্পানীগুলিকে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া আপাততঃ কমিটি গঠিত হইয়াছে,—(১) ডাইরেক্টার জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মেডিকাল সার্ব্বিস, সভাপতি; (২) এসিষ্টাণ্ট ডাইরেক্টার জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ব্বিস সেক্রেটারী (৩) এগ্রিকালচারাল য়্যাডভাইসার টু দি গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া ; (৪) ডাইরেক্টার, বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ; (৫) ডাইরেক্টার, জিয়লজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ; (৬) মিঃ অফ, এম, হাউলেট, ইম্পীরিয়াল প্যাথোলজিক্যাল এণ্টমলজিষ্ট ; (৭) এসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর জেনারেল অব ফরেষ্টস্ ; (৮) য়্যাডভিসরি কেমিষ্ট, মান্দ্রাজ। কমিটিকে কোন চিঠিপত্র লিখিতে হইলে সেক্রেটারীর নামে, অফিস অব ডাইরেক্টার জেনারেল ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ব্বিস এই ঠিকানায় চিঠি পাঠাইতে হইবে।" এ পর্য্যন্ত এদেশে পাশ্চাত্য প্রণালীতে দেশীয় গাছ-গাছড়া এবং খনিজ ও উদ্ভিজ্জ উপাদান হইতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি মহাশয় কর্ত্তৃক যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে, এবং যাহা গত মহাযুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত, উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে, উক্ত কমিউনিকে তাহার একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

ড্রাগস ম্যানুফ্যাকচার কমিটি গঠন করিয়া দেশীয় ঔষধের গাছ-গাছড়া এবং তজ্জাত ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ ও হাকিমি চিকিৎসা শাস্ত্রকে প্রকারান্তরে স্বীকার (recognise) করিয়া লইলেন কি না, তাহা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যদি লইয়া থাকেন, অথবা অচির ভবিষ্যতে ল'ন, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হয়। কারণ, বহুদিন হইতে দেশবাসী এই প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ, পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত দেশীয় চিকিৎসকগণ ত বটেই, এমন কি, শুনিতে পাই, অনেক কবিরাজ মহাশয়ও আজকাল দেশীয় গাছগাছড়া হইতে য়ুরোপীয় প্রণালীতে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ব্যবসায়ের হিসাবে ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েকটি দেশীয় কোম্পানীও গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস দেশের গৌরবস্থল। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ড্রাগস লিমিটেড নামে আরও একটী ঐরূপ কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার দ্বারাও দেশীয় ঔষধ প্রস্তুতকার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেডের গঠন পূর্ব্বে,—যে সকল দেশীয় ঔষধ বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় গৃহীত হইয়াছে,—তাহাদের একটী তালিকা এবং গুণাগুণ সম্বলিত একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন দেখিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া, আরও দুই একজন দেশীয় ভদ্রলোক এরূপ আরও দুই একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। সে অনেক দিন পূর্ব্বের কথা। তন্মধ্যে স্বর্গীয় ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোম, স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইহার পরেও আরও অনেক দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে পাশ্চাত্য প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। সেগুলিকেও বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় গ্রহণ করিলে ভাল হয়।

গালার চুড়ী

[শ্রীসুশীলকুমার রায়]

অ

সে চুড়ী বেচত। গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তার, "চুড়ী চাই গো চুড়ী" শব্দে ছোট ছেলে-মেয়েদের বুকের ভেতর তরুণ রক্ত তালে-তালে নেচে উঠত—ঐ চুড়ী পরার আনন্দে।

ফৈজু যখন চুড়ী বেচতে ব'সতো, তখন মেলা ব'সে যেতো। তাদের মুখের দিকে চেয়ে সে চুড়ীর দাম ভুলে যেত। কেমন অন্যমনস্কভাবে প্রত্যেকের মুখের দিকে তার নিষ্প্রভ চোক-দুটী ফিরিয়ে কি যেন অনুসন্ধান ক'রত; তার পর, একটা ব্যর্থতার চাপা শ্বাস ফেলে যা হয় বেচে উঠে প'ড়ত।

সন্ধ্যার সময় যখন ফৈজু, হাতের আঙ্গুলে গণনা করে লাভ-লোকসানের একটা হিসাব ক'রতে ব'সত, তখন দেখ্‌ত যে তার লাভ না হ'য়ে লোকসানই হ'য়েছে বেশী; উপরন্তু দু-একজোড়া গালার চুড়ী কারুর কচি হাতে পরিয়ে দিয়েছে।

বিছানায় শুয়ে সে তার বুকের ওপর হাত দুখানি চেপে কি যে প্রার্থনা ক'রত, সে অনেক সময় নিজেই বুঝতে পারত না; তবে তার মনে হ'ত, খোদা যেন তার আশা একদিন পূর্ণ ক'রবেন।

আ

গ্রামের কেউ জানত না যে ফৈজুর বাড়ী কোথায়। সে যেন একটা দম্‌কা হাওয়ায় উড়ে-আসা কুটোর মত; হয়ত আবার একটা জোর বাতাসে সে কোথায় চ'লে যাবে।

পুরো এক বছর কেটে গেছে। ফৈজু ঠিক একভাবে প্রত্যহ চুড়ী বেচে চ'লে যায়। আজকাল যেন তার সদা-মলিন মুখখানির ওপর গভীর নৈরাশ্যের একটা গোপন অতৃপ্তি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সে পথের ধারে কোন ছোট ছেলে দেখলে, হাঁ ক'রে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর সেই সময়ে তার কোটরগত চক্ষু-দুটো উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

বৈশাখ মাস। প্রাতে রোদের তেজে গ্রামখানি নিস্তব্ধ নিঝুম। ফৈজু চুড়ীর ঝাঁকাটি মাথায় ক'রে তার চির-অভ্যস্ত, "চুড়ী চাই গো চুড়ী" হেঁকে চ'লেছে; এমন সময় ফ্রক-পরা একটি ফুট্‌ফুটে ছেলে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। ফৈজু দরজার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার মাথার ওপর চুড়ীর ঝাঁকাটা একবার বড় জোরে কেঁপে উঠল। সে ধীরে-ধীরে ঝাঁকাটি নামিয়ে ছেলেটির দিকে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল। ছেলেটি বোধ হয় গ্রামে নূতন এসেছে; তাই, ফৈজুর শীর্ণ দেহ ও লম্বা দাড়ী দেখে ভয়ে বাড়ীর ভেতর পালিয়ে গেল।

ই

আজ ফৈজুর বুকের ভেতর একটা লড়াই চ'লেছে। সে সমস্ত রাত্রি ঘুমুতে পারলে না; বায়স্কোপের দৃশ্যের মত তার চোখের সামনে আজ লুপ্ত স্মৃতি সজীব হ'য়ে ফুটে উঠেছে। সে যে আজ প্রায় আট বৎসরের কথা। তারও সংসার ছিল, পরিবার ছিল, আর 'সাত রাজার ধন এক মাণিক' ছেলে ছিল। ফতেমার কোল থেকে কতদিন সে যে তাকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছে। তার সুন্দর কচি হাতে গালার সোনালী চুড়ী যখন সূর্য্য-কিরণে ঝক্-ঝক্ ক'রে উঠত, তখন তার সামনে যে জগৎ-সংসার লুপ্ত হ'য়ে যেত। তবু প্রাণভ'রে ত' তাকে চুড়ী পরাতে পারেনি—ফতেমার ভয়ে। অত চুড়ী ভাঙ্গলে সংসার চ'লবে কেমন ক'রে?

তারপর একদিন হঠাৎ ফতেমা সব ছেড়ে অনন্তের পথে যাত্রা ক'রল। প্রাণের দুলাল কাসিমকে বুকে চেপে সে সব ভুলবে ভেবেছিল; কিন্তু সেও দুদিন পরে চ'লে গেল। তার মৃত্যু-মলিন মুখখানি যেন ব'লেছিল "বাবা, আবার এসে চুড়ী প'রব', তাই না সে তাকে পাবার আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফৈজুর প্রাণ যেন ব'লছে, এই গ্রামেই তাকে পাবি; তাই এক বছর ধ'রে সে এখানে আছে, আর রোজ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আর ফৈজু ছেলেটির মুখখানি দেখে পাগলের মত হ'য়ে গেছে। তবে কি তার কাসিম আবার ফিরে এসেছে। মুখখানি যে ঠিক তারই মত, সন্ত-প্রস্ফুটিত যুঁই ফুলের মতই সুন্দর। সে রাত্রে ফৈজু কেবল কাসিমকে স্বপ্ন দেখ্‌লে।

সকালে উঠেই ফৈজু সেই বাড়ীটার আনাচে-কানাচে "চুড়ী চাই গো চুড়ী" ব'লে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ছেলেরা সব ছুটে এল, আর তাদের সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে এল তার হারাণ মানিক। ফৈজু সকলকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে সেই ছেলেটিকে ডুগাছা ভাল চক্‌চকে চুড়ী পরিয়ে দিলে; তারপর চোরের মত ঝাঁকা উঠিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

ঈ

আজ চার দিন থেকে ফৈজু সেই বাড়ীর কাছ দিয়ে হেঁকে যায়; কিন্তু কেউ ত' আর বেরোয় না। তা'র প্রাণ কেঁদে উঠল। সাহসে বুক বেঁধে দরজা ঠেলে সে বাড়ীতে ঢুকে প'ড়ল।

রোয়াকের ওপর পাঁচ-ছজন লোক বিষণ্ণমুখে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই ছেলেটি,—তার হারাণ মাণিক, তারই দেওয়া গালার চুড়ী হাতে উঠানে তুলসীতলায় প'ড়ে আছে। মৃত শিশুর মুখে তখন যেন স্বর্গের হাসিটি লেগে আছে!

ফৈজু বিহ্বলের মত খানিকক্ষণ সেইদিকে চেয়ে বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল।

এতক্ষণ ফৈজুর দিকে কারও নজর প'ড়ে নি। এইবার সকলের দৃষ্টি তার ওপর প'ড়ল। দুটি ছোট-ছোট ছেলে রোয়াকের ওপর থেকে আঙ্গুল পেড়ে চেঁচিয়ে উঠল 'ঐ লোকটা, ঐ লোকটা" সকলে ফৈজুকে ডাইন, যাদুকর, বদমায়েস, ইত্যাদি ব'লে মারতে-মারতে বাড়ীর বার ক'রে দিলে। ফৈজু কাতর দৃষ্টিতে আর একবার তার হারাণ মানিকের দিকে চাইলে, তখন যেন সে হাসছে।

শ্মশানের চিতা ধৌত করে ফেরবার সময় সকলে দেখলে এক ঝাঁকা গালার চুড়ী কে গাছতলায় রেখে গেছে। সকলে একটু বিস্মিত হ'য়ে গেল। সেই দিন থেকে গ্রামে কেউ আর সেই চুড়ীওয়ালাকে দেখেনি।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'মোগল বিদুষী' প্রকাশিত হইয়াছে; ১৲।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বীরপূজা' তৃতীয় সংস্করণ বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রিত হইল; মূল্য ১॥০।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত ॥০ সংস্করণের ৫০ সংখ্যক গ্রন্থ 'সুরেশের শিক্ষা' প্রকাশিত হইল, মূল্য ॥০।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত নূতন উপন্যাস 'স্মৃতি মন্দির' প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস 'চারুদত্ত' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত 'মোহমুদ্গর'-মূল, অন্বয়, টীকা, ভাবার্থ, সরল বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য এক আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত এম এ প্রণীত 'পল্লীর প্রাণ' প্রকাশিত হইল; মূল্য ২॥০।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

বাউল

BY COURTESY OF
THE PHOTO TEMPLE

Blocks by
BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

দ্বিতীয় খণ্ড] সপ্তম বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

বেদ ও বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

(জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ জ্ঞান-প্রচার-সমিতির ষড়বিংশতিতম অধিবেশনে পঠিত)

বেদ ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিচারের আবশ্যকতা কোথায়, এবং কি ভাবে, কি উদ্দেশ্যে সে সম্বন্ধ বিচার করিতে হইবে, তাহা আমরা মোটামুটিভাবে গতবারের বক্তৃতায় দেখাইয়াছি। এই সংশয় ও নাস্তিকতার যুগে, আমরা অনেকে অনভিজ্ঞ হইলেও, বিজ্ঞানের কথাগুলিতে আস্থাসম্পন্ন রহিয়াছি। এমন কি, আমাদের অবস্থার মাত্রা অনেক সময় চড়িয়া গিয়া, বিজ্ঞানের গোঁড়ামি নামে একটা অদ্ভুত ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া থাকে। বিজ্ঞানাগারে ঢুকিলেই দেখিতে পাই যে, বিজ্ঞান তার অনেক কথাই হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া, বেশ নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত করিয়া দেয়। দুইটা নিরাকার গ্যাস মিশাইয়া যে সাকার জল হয়, এ কথাটা আমি বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও, পরীক্ষায় প্রত্যক্ষের আমোলে আনিতে পারি। চুম্বকের শক্তি-রেখা (lines of force)গুলির একটা [illegible] বৈজ্ঞানিক আমাকে দেখাইলেন। আমি দেখিয়া প্রশ্ন করিলাম,- এইরূপ নক্‌সা যে সত্য-সত্যই চুম্বকের শক্তি-সমাবেশ দেখাইতেছে, ইহা মানিতেছি কেন? বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন শুনিয়া তর্ক জুড়িয়া দিলেন না। আমায় পরীক্ষাগারে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, একখানা কাগজের উপর কতকটা লোহার গুঁড়া ছড়াইয়া, একটা যন্ত্র সাহায্যে দেখাইয়া দিলেন যে, তাঁহার নক্‌সাখানি স্বকপোলকল্পিত নহে। X-ray নামক রশ্মি আমাদের দেহের ভিতরের অস্থি-সংস্থান প্রভৃতি সবই একরূপ দেখাইয়া দিতে পারে, এ কথাটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঐ মেডিক্যাল কালেজের পরীক্ষাগারে আমরা প্রত্যহই পাইতেছি। এই সব দেখিয়া-শুনিয়া বিজ্ঞানের কাছে আর আমরা মাথা তুলিতে পারি না। দুটো একটা পরীক্ষা দেখিয়া তাহার সকল কথাই একপ্রকার নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে যাই। ইহাতে কিছু গোল আছে। সকল পরীক্ষাকেই এক জাতীয় মনে করিয়া

আমরা ভুল করি। বিজ্ঞানের কতক-কতক পরীক্ষার ফলাফল একরূপ প্রতিষ্ঠিতই হইয়াছে,—এরূপ মনে করিলে তেমন দোষের হইবে না; কিন্তু অনেক পরীক্ষার ফলাফল এখন পর্য্যন্ত অব্যবস্থিত রহিয়াছে, অথচ সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা, মতবাদ খুবই চলিতেছে। আবার, এমন অনেক স্থল আছে, যেখানে কথার কাটাকাটি, মতবাদের ছড়াছড়িই বেশী, কিন্তু সে সব স্থলে হাতে-কলমে পরীক্ষা এখনও বিশেষ কিছু হয় নাই, অথবা করিতে পারা যায় নাই! পিতামাতার স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্মগুলি (acquired characters) সন্তান উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইবে কি না; আমি বেশী পড়াশুনা করিয়া চোখ-দুটা মাটি করিয়া গেলাম,—আমার সন্তান কৃপণ-দৃষ্টি-শক্তি হইয়া জন্মিবে কি না;—এই সব কথা লইয়া পরীক্ষা করিয়া ভ্যাইজমান সাহেব রায় দিলেন—না, ঠিক স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্মগুলি সন্তানে সংক্রামিত হয় না। কিন্তু তাঁহার পরীক্ষা এখনও সকলে মানিয়া লন নাই; পরীক্ষা এখনও চলিতেছে এবং বিভিন্ন পরীক্ষকের ফলাফলেরও কিছু-না-কিছু ইতর-বিশেষ হইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত হয় ত ভ্যাইজমান সাহেবের কথাটা টিকিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এখনও সংশয় রহিয়াছে প্রচুর। একজনের পরীক্ষা অপরে নাকচ করিয়া দিতেছে; পূর্ব্ব-পরীক্ষা উত্তর-পরীক্ষা দ্বারা সংশোধিত হইয়া যাইতেছে। বোতলে খানিকটা জল লইয়া, বেশ করিয়া ফুটাইয়া ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিয়া একজন হয়ত দেখিলেন, জলে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম সজীব পদার্থ আবার আপনা হইতেই দেখা দিল; অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া গেলেন—জড় পদার্থ হইতে সজীব পদার্থের স্বাভাবিক উৎপত্তি (spontaneous generation) হইতে পারে। কিন্তু আবার অপরে সেই পরীক্ষাটি অধিকতর সাবধানতার সহিত করিয়া দেখিলেন—না, বোতলের জলে আর সজীব কিছু জন্মায় না, যদি বাহিরের বাতাস প্রভৃতির সঙ্গে সে জলের কোনও রূপ সংস্পর্শ না থাকে। মেলা দৃষ্টান্ত লইয়া কাজ নাই। কয়েকটা মোটামুটি কথা ভুলিয়া গেলেই আমরা বিজ্ঞানের অন্ধ স্তাবক এবং গোঁড়া ভক্ত হইয়া বসি। বস্তুতঃ, হালের এই প্রকৃতি-বিদ্যা বা অপরাবিদ্যা মায়াবিনী। তার আজব কাণ্ডকারখানায় তাক্ লাগিয়া যাইবারই কথা। Poulet এবং Ross Smith বিমানে চড়িয়া আকাশ-পথে পৃথিবীর কোন্ প্রান্ত হইতে আমাদের এই সহরের উপর আসিয়া পড়িলেন; আমরা সারাটা জীবন পদব্রজে কেরাণীগিরি করিয়া বসুন্ধরার বসুর পরিচয় ত ধুলোকাদারই মধ্যে পাইলাম; সেই রামায়ণ মহাভারতের পুষ্পক রথ, কপিধ্বজ-রথ প্রভৃতির কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি নাই; আজ যে সত্য-সত্যই আকাশ-পোত পক্ষবিস্তার করিয়া আমাদের মাথার উপরে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ইহা দেখিলে আমাদের অবাক্ হইবারই কথা। বিজ্ঞানের এই সব ইন্দ্রজাল দেখিয়া আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি। অপিচ, বিজ্ঞানাগারে এক-আধবার ঢুকিয়া হাতে-কলমে পরীক্ষার যে দুটো-একটা ফলাফল দেখিয়াছি, তাহাতে প্রত্যয় খুবই দৃঢ় হইয়াছে। বিজ্ঞান বা Scienceএর কথা শুনিলে মাথা নাড়িতে আর সাহস হয় না। এই যে বিশ্বাসের বাড়াবাড়ি, এটা কিন্তু একটা মোহ। এই মোহ জমিয়া ঘোট হইয়া থাকিলে মানবাত্মার স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নাই।

কেন বিজ্ঞানের সাক্ষ্যকে চরম সাক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না, তাহার একটা নিদান পূর্ব্বের বক্তৃতাতেই দিবার চেষ্টা করিয়াছি। সংক্ষেপে, গোটা-দুই-তিন কথার মধ্যেই বিজ্ঞানের অপ্রতিষ্ঠা ও অব্যবস্থার একটা নিদান আমরা খুঁজিয়া পাই। প্রথমতঃ, বিজ্ঞান যে সমস্ত যন্ত্রপাতি লইয়া পরীক্ষা করে, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ ও চরম নহে। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহার দ্বারা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি হইয়া থাকে, তিনি সাধারণতঃ পক্ষপাতশূন্য, রাগ-দ্বেষাদি-সংস্পর্শ-রহিত নহেন; অথচ পরীক্ষা বিশুদ্ধ হইতে গেলে পরীক্ষককে পক্ষপাতশূন্য হইতেই হয়। তৃতীয়তঃ পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়া যে সমস্ত ব্যাখ্যা ও মতবাদ (theories) গড়িয়া তোলা হয়, তাহাতে বিশ্লেষণ-দোষ, বিচার-দোষ প্রভৃতি অল্লাধিক থাকিবারই সম্ভাবনা; কাজেই মাল-মসলা পহিলা নম্বরের হইলেও, গড়িবার দোষে সিদ্ধান্তের ইমারতগুলি বেশ পাকা হইয়া গড়িয়া উঠে না। একই মাল-মসলা লইয়া কেহ গড়িতেছেন শিব, কেহ বা গড়িতেছেন বানর। ডারউইন ও ওয়ালেস্ উভয়েই সম-সাময়িক বৈজ্ঞানিক-ধুরন্ধর। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা লব্ধ তথ্যগুলি দুজনারই প্রায় একরূপ; সাধারণতঃ মতবাদেও উভয়ের মধ্যে মিল্ আছে। কিন্তু মানবের পূর্ব্বপুরুষ খুঁজিতে গিয়া একজন কিষ্কিন্ধ্যায় হাজির হইলেন; অপর

জন কিন্তু সকল প্রমাণের নিগমন দেখিলেন বাইবেলের সেই মহাবাক্যে—ভগবান্ মানুষকে নিজের অনুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রধানতঃ এই তিন কারণে, বিজ্ঞানের যে আয়তন, তাহা শিথিল ও ভঙ্গুর। শুধু যে উপরের ইমারৎ-খানাই ভঙ্গুর এমন নহে, তাহার বুনিয়াদও খুব সুস্থির নহে। সে দিন বলিয়াছিলাম, নিউটনের মানসপুত্র গতি-বিজ্ঞান (Dynamics) দুর্য্যোধনের মত গত দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া কতই আস্ফালন করিতেছিল; কিন্তু আইনষ্টাইন প্রভৃতির গদাঘাতে তাহার সম্প্রতি উরুভঙ্গ হইয়াছে। যে মাপ-কাটির সাহায্যে এতদিন আমরা প্রকৃতির হিসাব লইতেছিলাম, সে মাপকাটিতে সম্প্রতি ভুল ধরা পড়িয়া গিয়াছে; সে ভুল সারিয়া লইতে না পারিলে আমাদের হিসাব বিশুদ্ধ হইবে না। নিউটন-লা'গ্রাঞ্জের শিষ্যেরা যে সাধ করিয়া এতদিন জুয়াচুরি করিয়া আসিতেছিলেন তাহা নহে; নূতন কতকগুলি আবিষ্কার ও পরীক্ষা—যেগুলি নিউটনের সময়ে হয় ত আদৌ সম্ভবপর ছিল না—আমাদের ভুল ধরিয়া ফেলিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইখানে সাটে বুঝিবেন, আমি কোন্ পরীক্ষাগুলির প্রতি ইঙ্গিত করিতেছি—মার্লি-নিকেলসন এক্‌সপেরিমেণ্ট, ব্রেস-র‍্যালি এক্‌সপেরিমেণ্ট, লোরেঞ্জ-ফিট্‌জেরাল্ড এক্‌সপেরিমেণ্ট প্রভৃতি। যাহা হউক, এই শেষ কথাটা খুব গুরুতর হইলেও, আজ আর ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। ফল কথা, এই সব নানা কারণে বিজ্ঞানে গোঁড়ামি মোটেই শোভা পায় না। 'বিজ্ঞান' এই নামটা শুনিবামাত্রই আমাদের ভয়ে ও বিস্ময়ে 'হতভম্ব' হইবারও কিছু অজুহাত নাই।

পক্ষান্তরে, সেদিন সিদ্ধাশ্রমের গোঁড়ামির কথারও আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম। যাঁহারা সিদ্ধাশ্রমের আশ্রমী, তাঁহাদের গোঁড়ামি না থাকারই কথা; যেমন, যাঁহারা বিজ্ঞান-মহাতীর্থের বড় বড় পাণ্ডা, তাঁহাদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও অভিমান কম থাকিতেই দেখা যায়। কিন্তু একদিকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছড়িদার মহাশয়েরা যেমন দল পাকাইয়া গোল বাধাইয়া থাকেন, সেইরূপ অন্যদিকে সাধনের ক্ষেত্রেও, চেলা-মহারাজেরা সত্যের সরলতা ও উদারতার কথা ভুলিয়া গিয়া, অনেক সময়ে কূপ-মণ্ডুক হইয়া বসেন। আসনে বসিয়া স্বহস্তে নাসিকা ও কর্ণ মলিলেই তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শী হইয়া গেলাম; ছাপার অক্ষরে যাহাই পড়িতেছি, তাহাই অভ্রান্ত বেদবাক্য;—এই এক রকম ভীষণ অন্ধতমিস্র আমাদের অনেককেই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা হইতেও পরিত্রাণ চাই। পরিত্রাণের জন্য তর্কের ঝুলির ভিতর ঢুকিলে চলিবে না। পরীক্ষা ও সাধন চাই। বিজ্ঞান নিজে অপ্রতিষ্ঠিত ও অসিদ্ধ হইলেও, পরীক্ষামূলক বলিয়া অনেক সময়ে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না হউক আভাসে-ইঙ্গিতে, সত্যের সূত্র আমাদিগকেও ধরাইয়া দিয়া থাকে। বিশেষতঃ, যেখানে সংশয় ও ক্লৈব্য আসিয়া অর্জ্জুনের মত আমাদিগকেও ঘিরিয়া ধরিয়া বিনাশের পথে টানিয়া লইতে চায়, সেখানে বিজ্ঞানের দেওয়া সূত্র ধরিয়া আমরা সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দেখিবার মত ভূমিতে ক্রমশঃ গিয়া উপনীত হইতে পারি এবং পরিণামে ছিন্নসংশয় ও বিগতজ্বর হইতে পারি। অর্জ্জুন স্বয়ং ভগবানের মুখ হইতে কত সাংখ্যযোগ, ভক্তি-যোগ প্রভৃতি শুনিলেন; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ছিন্নসংশয় হইতে পারিলেন না, যতক্ষণ না দেখিলেন ভগবানের বিশ্বরূপ। এই দেখা বা অপরোক্ষ জ্ঞান না আসা পর্য্যন্ত জীবের সুস্থিরতা নাই। বিজ্ঞানও সত্যকে, ভূমা না করিয়া হউক, অল্প করিয়াও দেখাইতেছে। কিছুই না দেখার চেয়ে এ দেখায় লাভ আছে। যেমন করিয়াই হউক, দেখিয়া-শুনিয়া পরীক্ষা লইবার একটা নেশা জীবনে আসিলে, ক্রমে কিছুই আসিতে বাকী থাকিবে না। যে বৈজ্ঞানিক হয় ত সারা জীবনটা জড়তত্ত্ব লইয়া পরীক্ষা ও গবেষণায় কাটাইয়াছেন,—হঠাৎ বুড়া বয়সে তাঁহার বিজ্ঞানাগারের দ্বারে দুটো-একটা অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ছট্‌কাইয়া আসিয়া পড়িলে, তিনি নিশ্চিন্তও থাকিতে পারেন না, অতি বিজ্ঞের মত তুড়ি দিয়া উড়াইয়াও দিতে পারেন না। তাঁহার চির-পরিচিত জড়ের রাজ্যে যে কঠোর পরীক্ষার ব্যবস্থা তাঁহাকে চালাইতে হইয়াছে, সেই ব্যবস্থামতই, তিনি নূতন অতিথিকে নিজের জ্ঞান-বিশ্বাসের এলাকাভুক্ত করিয়া লইতে প্রয়াস পান। যতক্ষণ তাহা না করিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই। ইহাকেই বলে দেখার নেশা। স্যার ওলিভার লজ্, স্যার উইলিয়ম ক্রুক্‌স, আরও কত কে, এই নেশাতেই পাগল। বিজ্ঞানাগারের জানালা-দরজাগুলি বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া যাঁহারা গ্যাসের ধূমে সমাধি পাইবেন এই আশাতেই টেষ্ট-

টিউব নাকে গুঁজিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের সিদ্ধি অবশ্যই ভাবনানুরূপ হইবে। কিন্তু যাঁহারা দরজা-জানালাগুলি একটু ফাঁক করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা দৈবাৎ দু'-একজন নূতন অতিথিকে অতর্কিতভাবে দ্বারে আসিয়া পড়িতে দেখেন। পশ্চিম দেশে এই নূতন অতিথি সম্প্রতি Psychic Research, Spiritualism প্রভৃতি। কিন্তু, ঐ যা বলিলাম, নূতন কিছু আসিলেই তাহাকে বিনা পরীক্ষায় ও বিনা বিচারে উপাদেয় বা হেয় মনে করা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাগারগুলির দস্তুর নহে। তাই সেখানে সকলকেই—প্রাচীন অর্ব্বাচীন সকল কথাগুলাকেই—টিকিট দেখাইয়া, গেট্‌পাশ লইয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়; সাধ্যপক্ষে গোঁজা মিল সেখানে চলে না। এই যে অপরোক্ষানুভূতির জন্য তীব্র স্পৃহা ও প্রাণপণ সাধনা—এটা বড় কম কথা নহে;—অপরোক্ষানুভূতির লক্ষ্য ও বিষয় আপাততঃ যাহাই হউক। বিষয়টা যদি আপাততঃ তুচ্ছও হয়, তবুও এই স্পৃহা ও সাধনার একবার মোড় ফিরাইয়া লইতে পারিলে, তাহাদিগকে নিখিল অভ্যুদয় ও সাক্ষাৎ নিঃশ্রেয়সের উপায় করিয়া লইতে বড় একটা বেগ পাইতে হয় না। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির জন্য তাহার আদর যতটা করিতে হয় আর নাই-ই হয়,—তাহার জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা, এই দুইটা জিনিষকে আমাদের আদর করিতেই হইবে। আমাদের অনেকের মধ্যে এই জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসার বড়ই অভাব দেখা গিয়াছে। অথচ ভিতরে বেদ ও শাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে সংশয়ের আদি-অন্ত নাই। ভাবের ঘরে চুরি করিয়া যদি বা মুখে সায় দিয়া যাইতেছি—তবুও আমাদের সাধন-ভজন, উদ্যোগ-অনুষ্ঠান, কাজকর্ম্ম এতই শিথিল, পঙ্গু ও অশোভন হইয়া পড়িতেছে যে, সে ভাবের ঘরের চুরি আর কোন মতেই ছাপিয়া রাখা চলে না। দৃষ্টান্ত দিয়া এ কথাটাকে ফেনাইতে হইবে কি? যাঁহারা গতানুগতিক ভাবে মুখে সায় দিয়া যাইতেছেন, কাজকর্ম্মেও বিধিনিষেধগুলি একটু-আধটু মানিয়া চলিতেছেন, তাঁহাদেরও অন্তরে সংশয়-অবিশ্বাস গাঢ় হইয়া উঠিতেছে; কায়মনোবাক্যের মধ্যে বেশ একটা মিল পাতাইয়া লইবার মত বল ও সাহস ইঁহাদের নাই। পক্ষান্তরে, যাঁহারা মুখে সায়ও দেন না, কাজকর্ম্মেও শাস্ত্রতন্ত্রতা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের রোগ, ঐ দুর্ব্বলতা ও অবসাদ। জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষার বালাই কোন পক্ষেই নাই। আস্তিকও চোখকাণ বুজিয়া চলিতেছেন, নাস্তিকও তাহাই। তবে নাস্তিক মহাশয় একটু বাচাল বেশী, এই যা তফাৎ। আসল কথা, এইরূপ আস্তিক বা নাস্তিক হইয়া থাকার চেয়ে মরিয়া থাকা ভাল। আমাদের বর্ত্তমান বেদ ও বিজ্ঞানের আলোচনার উদ্দেশ্য—এ রোগের একটা প্রতিকার ভাবিয়া দেখা। কালাপাণি পার হইয়া না আসিলে আজকাল কোন জিনিসেরই সম্যক্ কদর আমাদের কাছে হয় না। কাজেই, এই আলোচনাগুলির মধ্যে যদি প্রাচীন বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিকে অন্ততঃ একটা সমস্যার (problemএর) মতও পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষার ভিতরে আনিতে পারি, তবে সে প্রাচীন ঘরওয়া জিনিসগুলা আমাদের কাছেও কতকটা আদরণীয় হইয়া পড়িতে পারে। তন্ত্রের নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করা আমাদের মধ্যে একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—কিন্তু বন্ধুবর স্যার জন উড্‌রফ তন্ত্রকে এমন সাজে আমাদের কাছে উপনীত করিয়াছেন যে, তাহাকে আপনার বলিয়া ঘরে বরণ করিয়া লইতে আমরা অনেকেই আবার গৌরব বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। পরীক্ষার উপযোগী বিষয় পাইলে আমরা হয় কিছুই না করিয়া চুপ করিয়া থাকি, নয় সবজান্তা পুরুষের মত হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি। কিন্তু পশ্চিমের ধারা অন্যরূপ। গঙ্গাজলে radio-activity আছে কি না এ প্রশ্নে কোন পক্ষেরই কিছু ইষ্টানিষ্ট নাই; অথচ এ প্রশ্ন কেহ তুলিলে, সমাধান যাহাই হউক, তাহার জন্য একটুও চিন্তিত না হইয়া, হয় কাণে আঙ্গুল দিই, নয় হাসিয়া উড়াইয়া দিই। যিনি আস্তিক্যের বড়াই করেন, তাঁহার ভয়—এ প্রশ্নটা লইয়া বিবেচনা চলিলেই যেন পতিতপাবনী গঙ্গার পাতিত্য ঘটিবে; আর যিনি আলোয় আসিয়াছেন, তাঁহার অসহিষ্ণুতার হেতু—জগতে এত কাজ পড়িয়া থাকিতে, কোথায় গঙ্গাজলে কি সূক্ষ্ম অখড়িয় আছে তাহাই খুঁজিয়া-পাতিয়া বেড়ান! কিন্তু, পশ্চিমের পণ্ডিতেরা এই দশ-বিশ বছরের মধ্যে radio-activityর সন্ধানে জল, মাটি, বাতাস প্রভৃতি ভূতগুলাকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক Sir J. J. Thomson তাঁহার Electricity and Matter নামক গ্রন্থে বলিতেছেন—"These radio-active sub-

stances are not confined to rare minerals. I have lately found that many specimens of water from deep wells contain a radio-active gas, and Elster and Geitel have found that a a similar gas is contained in the soil." অর্থাৎ গোটা কয়েক পদার্থেই যে radio-activity, একান্ত ভাবে আবদ্ধ, তাহা নহে। আমি স্বয়ং নানা রকমের জলে এই শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। অপরে আবার মৃত্তিকার মধ্যেও এই শক্তি দেখিতে পাইয়াছেন। রাদারফোর্ড সাহেব এই অভিনব বিজ্ঞানের একজন প্রধান ঋষি। তিনি তাঁহার Radio-activity নামক গ্রন্থে (৫১১ পৃঃ) Sir J. J. Thomsonএর উক্ত পরীক্ষার কথার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন--"This led to an examination of the waters from deep wells in various parts of England, and J. J. Thomson found that in some cases, large amount of emanation could be obtained from the well-water." পরে Adams সাহেব কূপোদক লইয়া আরও বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করেন। রাদারফোর্ড সাহেবের ভাষায় পরীক্ষার ফল ইহাই মনে করা চলিতে পারে—"Thus it is probable that the well-water, in addition to the emanations mixed with it, has also a slight amount of a permanent radio-active substance dissolved in it." কাজেই দেখিতে পাইতেছি যে, পশ্চিমের পণ্ডিতেরা স্থানে-স্থানে মাটি, জল, বাতাস প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়াটা ইতরের কাজ বলিয়া মনে করেন না। রাদারফোর্ড সাহেবের উক্ত প্রামাণিক গ্রন্থে একটা প্রকাণ্ড অধ্যায়ই রহিয়াছে—"Radio-activity of the atmosphere and of other elements." ইহার মধ্যে কত জনের কত পরীক্ষার ফলাফলের কথা নিবদ্ধ হইয়া আলোচিত হইয়াছে। আমরা যদি আমাদের দেশের নদীনালা, পাহাড়, মাঠ প্রভৃতি স্থানে ঐ জাতীয় পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিই, তাহা হইলে কি একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে? হইলই বা হিন্দুদের আরাধ্য নদনদীর উদক, অথবা অভীষ্ট তীর্থস্থানের পবিত্র ভূমি। পশ্চিম-দেশের পরীক্ষার ফলেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের radio-activity বা তাড়িত-রেণু-বিকীরণ-শক্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; আমাদের দেশেও উইলসনের হোটেল এবং বিশ্বেশ্বরের মন্দির এতদুভয় স্থানের মধ্যে যদি ঐ শক্তির তারতম্য দেখিতে পাই, তবে তাহাতে মনস্তাপ বা বিস্ময়ের কিছু আছে কি? আসল কথা, নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা চাই। পরীক্ষার ফলাফল যাহাই হউক না কেন, তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ধর, পরীক্ষার ফলে পাইলাম যে, কূপোদকের মত গঙ্গোদকেও ঐ শক্তি আছে। তখন প্রশ্ন উঠিবে—ঐ শক্তি থাকা না থাকার সঙ্গে জলের পবিত্রতার কি সম্পর্ক আছে? ঐ শক্তির সদ্ভাব জলকে কি কোনও বিশেষ গুণসম্পন্ন করিয়া থাকে যে, তাহার জন্য সে জল আদরণীয় হইবে? যে পদার্থের অণুগুলা (atoms)র মধ্যে একটা বিপ্লব, ভাঙ্গাযোড়া চলিতেছে, যে পদার্থের ভিতর হইতে অণু হইতেও সূক্ষ্মতর এবং অণুর দানা-স্বরূপ তাড়িত-কণাগুলি প্রবলবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, সেই পদার্থকে, আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাষা-মত, radio-active বলা হয়। বেদের জড়তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া ইহার কথা আমাদের বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে; আপাততঃ প্রশ্ন এই:—গঙ্গোদক যদি বা এইরূপ লক্ষণবিশিষ্টও হয়, তবে তাহাতে আসিয়া যাইল কি-গঙ্গামাহাত্ম্য বাড়িবার বা কমিবার সম্ভাবনা হইল কোথায়? খুব ধীর ভাবে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রশ্নটা একেবারে বাজে না হইতেও পারে। Sir J. J. Thomsonএর গভীর কূপোদকে ঐ শক্তির আবিষ্কারটা অবান্তর ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিবার নহে।

Radio-active পদার্থগুলি অফুরন্ত তাপের ভাণ্ডার, ইহা আমরা পরীক্ষায় দেখিতে পাইয়াছি। সামান্য এক-টুকরা রেডিয়াম এত তাপ ছড়াইতে পারে যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা তাহার ভিতরে তাপ জন্মিবার একটা ব্যাখ্যাও দিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যাখ্যা যাহাই হউক, কথাটা সত্য। এখন, এই রেডিয়াম যে দুর্ব্বাসা মুনির মত গরমই হইয়া আছেন, এ কথাটা স্মরণ রাখিলে, আমাদের পৃথিবীর বয়স-নিরূপণ-সমস্যার মধ্যে একটা নূতন আলোক-রেখাপাত আমরা পাইলাম মনে হয়। আমাদের পৃথিবীর ভিতরটা ক্রমেই নীচের দিকে

গরম হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনুমান হয়, পৃথিবী এক সময়ে ভিতরে-বাহিরে খুবই গরম ছিল ; এখন ক্রমে বাহিরটা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরের জ্বালা এখনও নিভে নাই। তাপ বিকীরণ (radiation)এর ধারা অনুসারে এইরূপে বাহিরে ঠাণ্ডা কিন্তু ভিতরে গরম হইয়া থাকিতে পৃথিবীর যে কত কোটি বৎসর লাগিয়াছে, তাহা প্রসিদ্ধ লর্ড কেলভিন্ গণিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর গভীরতর স্তরগুলিতে যদি যথেষ্ট পরিমাণে রেডিয়াম-জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তবে পৃথিবীর তাপের উৎপত্তি ও পরিণতির ব্যাখ্যা অন্যরূপ দাঁড়াইয়া যাইতে পারে—অন্ততঃ পক্ষে কেল্‌ভিন্ সাহেবের আঁকের খাতাখানা অনেকাংশে সারিয়া লওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। অক্লান্ত ভাবে ও প্রচুর পরিমাণে তাপ যোগাইবার ভার যদি পৃথিবীর গর্ভস্থ রেডিয়াম গ্রহণ করিয়া থাকে, অন্ততঃ আংশিক ভাবেও, তাহা হইলে পৃথিবীর বয়সের আনুমানিক ইতিহাসটা বোধ হয় আবার আমাদের ঢালিয়া সাজিতে হয়। আদৌ গরম জিনিস ক্রমে ঠাণ্ডা হইতে-হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে,—ঠিক এমনটা কয়েক কোটি বৎসরের মধ্যেই হয় ত না হইয়া থাকিতেও পারে। পৃথিবীর গর্ভে radio-activityর যে যজ্ঞাগ্নি প্রতিনিয়ত জ্বলিতেছে, তাহাই হয়ত পৃথিবীকে প্রায় এমনি-ধারা বাহিরে ঠাণ্ডা কিন্তু অন্তরে গরম অনেকদিন ধরিয়া করিয়া রাখিয়াছে। ফল কথা, এই যজ্ঞ যখন পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপ-জননের একটা মুখ্য কারণ, তখন ইহাকে বাদ দিয়া পৃথিবীর ইতিহাস খাড়া করিতে গেলে, ভুল হইবে এবং লর্ড কেল্‌ভিনের সে ভুল সম্ভবতঃ হইয়াছিল। গভীর কূপের জলে সত্য-সত্যই radio-activity ধরা পড়িয়া এ কথাগুলাকে কল্পনা-জল্পনার ভিতর হইতে টানিয়া নিশ্চয় কোটির কাছাকাছি অনেকটা আনিয়া দেয় না কি? পৃথিবীর স্তরগুলিতে radio-active পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও থাকিতে পারে, এবং তাহাই পৃথিবীর অন্তর্দাহের (Plutonic energyএর) একটা মুখ্য কারণ,—এ কথাতে আর বিস্ময়ের কিছুই আমরা দেখিতেছি না। অতএব পরীক্ষা সামান্য বিষয় লইয়া হইলেও, তাহার ফলের দাম অসামান্য হইতে পারে। গঙ্গোদক প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা এই কারণে তুচ্ছ ও অনাদরণীয় মনে করা কর্ত্তব্য হইবে না। বায়ুশূন্য কাচপাত্রের মধ্যে বিজলি লইয়া রং-বেরঙ্গের খেলা করা এক সময়ে বিজ্ঞানাগারে একটা কৌতুকের ব্যাপার ছিল; কিন্তু এখন এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, বিংশ শতাব্দীর নূতন পদার্থ-বিজ্ঞানটাই ঐ নির্ব্বাত কাচপুরীর মধ্যে একরূপ ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা এ রহস্য অবগত আছেন। আর স্বয়ং radio-activityর গরিমার ত সীমা নাই। আজকালকার বৈজ্ঞানিক জড়তত্ত্বের রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছে—মর্ম্মকথা শুনাইয়াছে আমাদিগকে এই রেডিয়াম। ইহা না আসিলে জড়ের কুহক আমাদের এত শীঘ্র, এত সহজে ভাঙ্গিত না ;—আমরা চিনিতাম না যে, যাহাকে জড় রূপে বহুধা দেখিতেছি, তাহা মূলতঃ, ব্যোমে শক্তির বিচিত্র খেলা বই আর কিছুই নহে। অতএব, পরীক্ষা ছোট জিনিস লইয়া হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। প্রথমতঃ, জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষার আগ্রহ নূতন করিয়া আমাদের মূর্চ্ছিত জাতীয় প্রকৃতির মধ্য হইতে জাগাইয়া তোলার জন্য দরকার—পরীক্ষা ;—তা গঙ্গাজল লইয়াই হউক আর গোময় লইয়াই হউক। পরীক্ষা ছাড়া, একরূপ আন্দাজি কথা লইয়া আলোচনা আমাদের দেশে চলিয়াছে, সেটার নাম গবেষণা ; এবং সেটাকে যিনি গলদ্‌গোময় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনি নিতান্ত অবিচার করেন নাই। কিন্তু আমি যে জাতীয় পরীক্ষা ও বিচারের জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, তাহা প্রাচীনকালে এদেশে ছিল, কিন্তু এখন অন্ততঃ আমাদের মত শিক্ষিতাভিমানীদের কাছে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। চায়ের পেয়ালায় ঝড়-তুফান তুলিয়া এখন আমরা সকল বিষয়ে কেল্লা ফতে করিয়া ফেলিতে চাই। কিন্তু, শুদ্ধ চালাকির জোরে জাতিটা বড় হইয়া উঠিবে কি?

একদিকে যেমন আমাদের প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানাগারে ঢুকিবার প্রয়োজন আছে, অন্যদিকে তেমনি বিজ্ঞানের গোঁড়ামি ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার দৃষ্টি প্রসারিত, নির্ম্মল ও সঙ্কোচহীন করিবার জন্য সিদ্ধাশ্রমে যাইবার প্রয়োজন আছে—একথা পূর্ব্বেই আমরা হেতুবাদ দেখাইয়া জানাইয়া রাখিয়াছি। অনেক ব্যাপারের পরীক্ষা বিজ্ঞানাগারে সম্ভবপর হইবে না। সে সকল ব্যাপারের পরীক্ষার জন্য তপোবন-যাত্রার আবশ্যকতা রহিবে।

আমাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে ক্রমশঃ আমরা এ আবশ্যকতা দেখিতে পাইব।

প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য, বিজ্ঞানাগারে ঢুকিবার পূর্ব্বে, বিজ্ঞানের অনেক হাল কথাবার্ত্তা শুনিয়া লইলেও, অনেক সময়ে সে সকলের মধ্যে তথ্যানুসন্ধানের সূত্র ধরিতে পাই। গীতায় স্বয়ং ভগবানের মুখে শুনিলাম—"যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যঃ"; কিন্তু প্রত্যয় হইতেছে না। ঠিক প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য অবশ্য সত্য-সত্যই বিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু বিশুদ্ধ ভাবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে যজ্ঞ করিবার পথে হাঙ্গামা বিস্তর। তা ছাড়া, সে অনুষ্ঠানে আদৌ আমার প্রবৃত্তি দিবার জন্য কতকটা প্রত্যয় মনে আসা দরকার। কেন মিছে আগুণে ঘি ঢালিয়া মরিব? আমি মন্ত্র পড়িয়া আগুণে ঘি ঢালিব, আর তাহা গিয়া আকাশে মেঘমালা রচিয়া দিবে—ইহা কি আদৌ বিশ্বাস-যোগ্য কথা? এ জাতীয় প্রশ্ন মনে উঠিয়া থাকে। এবং বিজ্ঞানের হাল কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং পরীক্ষা দেখিয়া যদি এ প্রশ্নগুলার কোনও রকম একটা জবাবের সূত্র পাই, তাহা হইলে তাহাতে সুবিধা হইল না কি? আমরা স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের দুটা একটা কথা পাড়িয়া দেখাইয়াছিলাম যে, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্যের সৃষ্টি সম্ভবপর হইতেও পারে। মন্ত্র সম্বন্ধে আরও দুটো-একটা আজগবি কথায়, বিজ্ঞানের তরফ হইতে, কৈফিয়ৎ দিতে আমরা প্রয়াস পাইয়াছিলাম। আমাদের বর্ত্তমান আলোচনাগুলির মধ্যেও প্রসঙ্গক্রমে সেই সকল কথা আবার পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইবে। সে সকল কথার প্রকৃষ্ট আলোচনার জন্য জড়তত্ত্ব আগে আমাদের ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রাচীন বেদের জড়তত্ত্বই বা কি এবং অভিনব বেদ বা scienceএর জড়তত্ত্বই বা কি—এ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার রকমের বোঝাপড়া গোড়াতেই আমাদের করিয়া লইতে হইবে। অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, বেদের যে লক্ষণ আমরা করিয়া লইয়াছিলাম, তাহাতে ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি পুঁথি-কয়খানাকেই আমরা বেদ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকি নাই। আমরা 'বেদ' শব্দকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। এবং এ কথাও বলিয়া রাখিয়াছি যে, এক চরম বেদ বা Veda in the limit ছাড়া, অন্য কোনও বেদ পূর্ণ ও নিরতিশয় রূপে বিশুদ্ধ নহে। বেদ ও বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে গিয়া আমি যদি গীতার কথা, পাতঞ্জলাদি দর্শনের কথা, পুরাণের কথা এমন কি তন্ত্রের কথাও উত্থাপন করি, তাহা হইলে আপনারা কথাগুলি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমায় বসাইয়া দিবেন না। শিষ্য-পরিগৃহীত গুরু-পরম্পরাগত বেদকে মূল করিয়া যে প্রাচীন বিদ্যা (ancient wisdom) এদেশে নানা শাখায় নানা ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, মূলের সঙ্গে অবিরোধী হইলে, সেই সমস্ত বিদ্যাটাকেই আমরা 'বেদ' শব্দের বাচ্য মনে করিব। স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতিতে যে কথাগুলি স্পষ্ট করিয়া পাইতেছি, বেদের পুঁথি-কয়খানায় সে কথা-গুলিকে হয় ত ততটা স্পষ্টভাবে পাই না। তবে মূল আছে কি না তাহার অবশ্য অনুসন্ধান লইতে হইবে। এরূপ আলোচনাকে যিনি বৈদিক আলোচনা বলিতে নারাজ, তিনি আমার বর্ত্তমান আলোচনাগুলিকে হয় ত বৈদিক আলোচনা বলিবেন না। কিন্তু আলোচনার নাম যাহাই দেওয়া হউক, আমাদের জাতির বিশিষ্ট সভ্যতা ও সাধনার অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, এবংবিধ আলো-চনাকে প্রয়োজনীয় মনে না করিয়া পারা যায় না।

ধরুন প্রাণায়ামের কথা। পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্র ও মন্ত্রসমূহে ইহার কথা খুব ফলাও করিয়া বলা হইয়াছে। আবার শ্রুতিতেও ইহার মূল খুঁজিয়া পাই। এখন, উপ-নিষদেই থাকুক, আর তন্ত্রেই থাকুক, এ অনুষ্ঠান আমাদের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্ম ও সাধনপদ্ধতির মধ্যে একটা মুখ্য আসন লাভ করিয়াছে; ইহাকে বাদ দিয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্মও হয় না, সাধনও হয় না। এত বড় জিনিসটার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা যদি অবৈদিক হইয়া পড়ি, তবে সেরূপ অবৈদিক হইতে আমাদের কুণ্ঠা নাই। নানা বিষয়ে আমাদের মনে সংশয় আসিয়াছে; এবং সে সংশয় নিরসনের জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও বিচার একটু-আধটু করিলে সুবিধাই হইতে পারে,—এ কথা বরাবর বলিয়া আসিতেছি। প্রাণায়ামের বিভূতি বা ফলাফল শুনিয়া মনে হয় ত অবিশ্বাস হয়। সুস্থির বিশ্বাস আনিবার জন্য তপোবনে যাত্রা করিয়া প্রাণায়াম করিয়া দেখিতে হইবে; কিন্তু কাজ-চালানো রকমের বিশ্বাস আনিবার জন্য, হালের বিজ্ঞানের দু'চারিটা কথা শুনিলে এবং দুটো-একটা পরীক্ষা দেখিলে, আমাদের

আশু উপকার হইতেও পারে। যে জড়তত্ত্বের কথা বলিতেছিলাম, তাহার বিধিমত আলোচনার পূর্ব্বে প্রাণায়ামের ব্যাখ্যায় হাত দিলে কাজটা একটু কাঁচা হইবে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য বিবৃতির পক্ষে কতকটা সুবিধা হইতে পারে এই আশায়, প্রাণায়াম-সংক্রান্ত নানা কথার মধ্যে একটামাত্র কথার একটু সংক্ষিপ্ত বিচার এই স্থলেই করিয়া লইবার অনুমতি আপনাদের কাছে ভিক্ষা করিতেছি। এই বিচারের ফলে হয় ত বুঝিতে পারিব, আমরা প্রাচীন বিদ্যার হিসাব লইতে গিয়া, কেনই বা অর্ব্বাচীন বিদ্যা বা বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হইতেছি। সরাসরি তপোবনাভিমুখে যাত্রা করিলেই কি ভাল হইত না? ভাল হয় ত হইত; কিন্তু যাত্রা করে কে? হাতে-কলমে প্রাণায়াম পরীক্ষা করিয়া দেখ, ইহা সত্য না বুজরুকি—এ কথা যেই শুনিলাম, সেই অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যচিত্ত হইয়া প্রাণায়াম করিতে বসিয়া গেলাম, এমনটা হইলে লেঠা চুকিয়া যাইত, কিন্তু এমনটা হয় কৈ? শুধু কথা শুনিয়া চিড়া আর ভিজাইতে যে কোনমতেই পারিতেছি না। এইজন্য, গোড়াতেই কোনও উপায়ে কতকটা সংশয় নিরসন করিয়া প্রত্যয় জন্মানর প্রয়োজন রহিয়াছে,—সুস্থির প্রত্যয় না হউক, কাজ-চালান রকমের প্রত্যয়। সকালে-সন্ধ্যায় চায়ের পেয়ালার সেবা ত্যাগ করিয়া, হাত-পা ধুইয়া, কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া, নাক টিপিতে বসিয়া না গেলেও, হাল বিজ্ঞানের দুটো-চারিটা কথা কোনও মতে কর্ণগোচর করা চলিতে পারে; তবে আবার যে কালে স্বামীজীরা মায় গেরুয়ার নেকটাই লাগাইয়া সিদ্ধাশ্রম হইতে নামিয়া আসিলেও, আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছেন না, সে কালে যে প্রাণায়াম করিতে গিয়া সত্য সত্যই চা-বিস্কুট সরাইয়া রাখিতে হইবে, এমনটাই বা ভাবি কেন? শিষ্ট সমাজে কাট-খোলায় সন্ধ্যাহ্নিক পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু অনুষ্ঠানটা নিরম্বু, সুতরাং নীরস; এখন গঙ্গাগায়ী যদি লোকের রুচি ও সুবিধা বুঝিয়া কোশাকুশি ছাড়িয়া, চায়ের পেয়ালায় ও চামচে মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপত্তির এমনই বা কি হইল? বিশেষতঃ এই শীতের দিনে গঙ্গা-সলিলে radio-activityর সন্ধান করিতে যাওয়া ঝকমারি এবং সম্ভবতঃ মরীচিকানুগমন; কিন্তু চায়ের পেয়ালায় radio-activity ত প্রত্যক্ষ। ফল কথা, প্রাণায়াম-প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের দুচারিটা কথা শুনিয়া লইতে কেহই হয় ত গররাজি হইবেন না।

ধরুন, পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে পাইলাম যে, উদান বায়ুর জয় হইলে, দেহের এতই লঘুত্তা হয় যে, সে দেহ তুলার মত শূন্যে ভাসিতে পারে; পঙ্ক, কণ্টক,জল ইত্যাদির উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া যাইতে পারে। এই রকম সব আজগবি কথা পাইলাম। প্রাণায়ামের নানা বিভূতির মধ্যে ইহা একটামাত্র; প্রাণায়ামের আসল সিদ্ধি আধ্যাত্মিক রাজ্যে। যাহা হউক, প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে দুটো-একটা কথা শুনিলাম, তাহা বড়ই আজগবি বলিয়া ঠেকিল। আপাততঃ প্রত্যক্ষের বিরোধী ও যুক্তির বিরোধী বলিয়াই মনে হইল। যদি হরিদাস সাধুর মত আবার, এই ৫০।৬০ বৎসর পরে, কেহ আসিয়া আমাদের ঐ বিভূতিগুলা দেখাইয়া দেন, তবে আর মাথা নাড়িতে পারিব না বটে; কিন্তু তথাপি মনের গোল মিটিবে না। মন জেরা তুলিবে--আচ্ছা, কেমন করিয়া কি হইল? ব্যাপারখানা কি, তাহা ত কিছুই বুঝিতেছি না। ভেল্কি নয় ত? আকাশে সূত্রক্রীড়ার মত ভোজবাজী নয় ত? অপিচ, ভেল্কি বলিলেই খালাস নাই। ভেল্কি ব্যাপারটাই বা কি এবং লাগেই বা কিরূপে? এইজন্য বলিতেছিলাম, এই সকল প্রশ্ন ও সংশয়ের মধ্যে বিজ্ঞান যদি একটা আলোক ফেলিয়া দিতে পারে, তবে তাহাতে উপকার বই অপকার নাই। কথাটার বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনা এখন হইবে না; তবে ইসারায়-ইঙ্গিতে দুচার কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করিলে, অন্ততঃ এইটুকু আপনারা স্বীকার করিয়া যাইবেন যে, বিজ্ঞানের দিক্ হইতে আমাদের পুরাতন জ্ঞান-বিশ্বাস ও ব্যবস্থাগুলির একটু বোঝাপড়া হইলে, কতকটা মনের গোলও মিটে, আবার সত্য সত্য শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষার একটা প্রবৃত্তি ও সাহসও হয়। দরকার তাহাই। আমরা শিশু না হইলেও অবোধ; আমাদিগকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া কাজে লওয়াইতে কিছু বেগ পাইতে হয়। প্রাচীনেরা অর্থবাদ প্রভৃতি ফাঁদিয়া জন-সাধারণের মতিগতি বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও উপাসনার দিকে লইতেন; আমাদের অদৃষ্টে অর্থ সত্য-সত্যই বাদ পড়িয়া গিয়াছে; প্রত্যয়ের দশাও তথৈবচ; আছে শুধু বাক্ বা শব্দ।

শুনিতেছি অনেক কথা ; বকিতেছি আরো বেশী ; প্রত্যয় বড় একটা হয় না ; প্রত্যয় যদি বা হইল, অর্থপ্রতিপত্তি বা সাক্ষাৎকার আদৌ হইতেছে না।

আচ্ছা, পাতঞ্জলের বিভূতিপাদের ৩৯ ও ৪২ সূত্রে বায়ুজয়ের ফলে "জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গঃ" এবং কায় ও আকাশের সম্বন্ধে ধ্যানাদির কল্যাণে "লঘুতূলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্"—এই সকল বিভূতি দেখিতে পাই। এ কথাগুলা শ্রুতির অবিরোধী এবং ইহাদের মূলও শ্রুতিতে আছে, ইহা আমরা পরে বলিব। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমাধ্যায়েই প্রাণ অপান এবং তদুভয়ের সন্ধি স্বরূপ ব্যানের কথা আছে ; এবং ব্যানের উপাসনাও বিশেষ ভাবে বিহিত হইয়াছে। ব্যাপারটির প্রাচীনত্ব, অর্ব্বাচীনত্ব সম্বন্ধে আপাততঃ আর প্রশ্ন করিব না। এখন কথাটা এই,-- এই যে সব বিভূতির কথা বলা হইতেছে, ইহা কি বায়ুরোগগ্রস্তেরই প্রলাপ, অথবা এ সকলের মূলে সত্যসত্যই একটা কিছু থাকিতে পারে ? যিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাঁহার বালাই নাই বটে ; কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বাহ্ণে একটা কৈফিয়ৎ শুনিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে। চলুন বিজ্ঞানাগারে। তার পর, প্রয়োজন বুঝিলে না হয় হরিদাস ঠাকুরের আখড়াতেও যাইব।

বিজ্ঞানাগারে ঢুকিয়া দেখি, বৈজ্ঞানিক দুইটা জড়দ্রব্যের পরস্পর আকর্ষণের (gravitation এর) একটা হিসাব লইতেছেন। দুইটা জড়দ্রব্যের যে টানাটানি আছে, এবং থাকিলে সেটা কি পরিমাণে কাহার উপর নির্ভর করে, তাহা বৈজ্ঞানিক আমাকে বেশ করিয়া দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন। ঐ টানাটানির নিয়মের বিবরণ দিয়া নিউটন যশস্বী হইয়া গিয়াছেন ; এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সকল জ্যোতিষ্কের চলা-ফেলার এমন সুন্দর কৈফিয়ৎ ঐ বিবরণের মধ্যে আমরা পাইয়াছি যে, এই দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া আমাদের স্পর্দ্ধার সীমা নাই। নিউটনের টানাটানির আইন ও চলা-ফেরার আইন (laws of gravitation and laws of motion) পুঁজি করিয়া ল্যাপ্লাস প্রভৃতি গণিতবিদ্‌গণের আশার আর অবধি নাই—সমস্ত জড়জগৎ (celestial sphere)কে একটা ঘড়ির মত বা এঞ্জিনের মত ব্যাখ্যা করিতে, ইঁহারা আশা করিয়াছেন। অথচ, মজার কথা এই যে, দুইটা জিনিসের অতিরিক্ত আর একটা জিনিস উপস্থিত থাকিলেই, তাহাদের পরস্পরের টানাটানির বিবরণ দিতে ইঁহাদের পুঁজি ফুরাইবার উপক্রম হয়। যাহা হউক, বিজ্ঞানাগারে জড়দ্রব্যের টানাটানির হিসাব পাইয়া পুলকিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে একজন নবীন বৈজ্ঞানিক ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জড়ের টানাটানি বুঝিতে সাধ তোমার,—কিন্তু জড় নিজে কি এবং কেনই বা টানে, তাহা খেয়াল করিয়া দেখিয়াছ কি ? আমি প্রশ্ন শুনিয়া কিছু বিপন্ন বোধ করিলাম। জড়ের টানাটানি বা gravitationএর ব্যাখ্যা নানা জনে নানারূপে দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এখন জড় সম্বন্ধে বিজ্ঞানের ধারণাই যখন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, তখন সেই পূর্ব্বের ব্যাখ্যা (Le Sage প্রভৃতির) আবার নূতন করিয়া ঝালাইয়া লইতে হয়। জড় পদার্থ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের হাল মতকে Electro magnetic theory of matter অথবা Electronic theory of matter বলা হইয়া থাকে। ইহার কথা আগামীবারেই বিশেষভাবে আমাদের পাড়িতে হইবে। তবে আপাততঃ এইটুকু বলিলেই চলিবে—তড়িৎ জিনিসটার নাম আমরা সকলেই শুনিয়াছি ; আর ঐ আলোতে, ট্রাম গাড়ীতে, টেলিফোঁ প্রভৃতিতে তার লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই তড়িৎ দ্রব্যটা সত্যসত্যই কি, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। তবে এই তড়িৎকে পূর্ব্বে দুই জাতীয় এক রকম fluid মনে করা হইত—তারের মধ্য দিয়া যেন স্রোতের মত গড়াইয়া যাইতে পারে। এখন ফ্যারাডে-ম্যাক্‌সওয়েলের পর হইতে, আর বড়-একটা সন্দেহ নাই যে, এই তড়িৎ জিনিসটা অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম আলাদা-আলাদা দানায় গঠিত। তড়িৎ দানাদার জিনিস—ইহাই হালের প্রসিদ্ধ atomic structure of electricity. প্রমাণ-প্রয়োগের ইহা স্থল নহে, তবে Helmholtz তাঁহার Faraday lectureএ কি বলিয়াছিলেন, শুনিয়া রাখুন—"If we accept the hypothesis that the elementary substances are composed of atoms, we cannot avoid the conclusion that electricity, positive as well as negative, is divided into definite elementary positions which behave like atoms of electricity." তড়িতের এই সমস্ত ছোট-ছোট দানাগুলির

নাম J. J. Thomson দিয়াছেন, 'corpuscles', Dr. Johnston Stoney দিয়াছেন 'Electrons'; এই শেষোক্ত নামটাই বিশেষভাবে চলিয়া গিয়াছে। তবেই, তারের মধ্য দিয়া যখন তড়িৎ ছুটিয়া যায়, তখন ঠিক তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন একটা কিছু যে চলিয়া যায়, এমন নহে; ঐ ইলেকট্রনগুলা দলে-দলে একটা বিপুল বাহিনীর মত অভিযান করিয়া থাকে। ফলতঃ, এই উপমায় বৈজ্ঞানিকেরা ইলেকট্রনদের দলগুলাকে 'Company,' 'army' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই তড়িতের কণাগুলি রসায়ন-শাস্ত্রের অণু বা atomগুলির চেয়ে ঢের ছোট। হাইড্রোজেনের অণু হয় ত একটা তড়িত-কণিকার চেয়ে সহস্রগুণ গুরু-গম্ভীর। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদের লইয়া মাপাজোকা করিতেছেন। এখন হালের মত এই, যে জিনিষটাকে আমরা জড়ের অণু (atom) বলিতেছি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সূক্ষ্মতর তড়িত-কণিকায় (positive and negative charges of electricityতে) গঠিত। একটা অণু যেন একটা বালখিল্য সৌরজগৎ। একটা অণুর ভিতরে তড়িত-কণিকাগুলি, সৌরজগতে গ্রহউপগ্রহগুলার মত, নিজ নিজ কক্ষে পাক খাইতেছে, সময়ে সময়ে ছটকাইয়াও বা আসিতেছে। ছটকাইয়া আসিলেই অণুর ভিতরে খণ্ডপ্রলয় হইয়া গেল। ১৭ই ডিসেম্বর কয়েকটা গোঁসাই-গোবিন্দ তালকাণা গ্রহ এক-জোট হইয়া যেমনধারা খণ্ডপ্রলয় ঘটাইবে আশঙ্কা করিতেছি সেইরূপ। অণুর ভিতরে খণ্ডপ্রলয় হইতে থাকিলে, বাহিরে যে তাহার অভিব্যক্তি, তাহাই radio-activity,—এ কথা ভবিষ্যতে আরও খোলসা করিয়া বলিব। যাক্—অণু যদি তাড়িত-উপকরণেই নির্ম্মিত হয়, তবে দুইটা অণুর মধ্যে যে টানাটানি, অর্থাৎ জড়ে-জড়ে যে টানাটানি, তাহার মূল তড়িতের মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হইবে। দুইটা জড় যখন দুই বিন্দু তড়িত, তখন জড়ের টানাটানি মানেই ঐ তড়িত-বিন্দুদ্বয়ের টানাটানি। কিন্তু তাড়িত-বিন্দুদের আবার জাতিভেদ আছে। পরীক্ষায় দেখিতে পাই যে, তড়িত-বিন্দুগুলি সজাতীয় হইলে পরস্পরকে তাড়াইয়া দেয়। সেখানেও সেই চিরন্তন জ্ঞাতিবিরোধ। বিজাতীয় হইলে পরস্পরকে টানিয়া লয়। "পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর" —ঐ আণবিক বালখিল্য জগতের কবিও এ খেদ করিয়াছেন। এখন ধরুন, সোজাসুজি বুঝিয়া লই যে, একটা অণুতে দুইটা বিজাতীয় তড়িতবিন্দু প্রকৃতি-পুরুষের মত, পরস্পরে অধ্যাস করিয়া বাস করিতেছে। টম্‌সন সাহেবের ভাষায়, ধরুন, একটা অণু যেন একটা electrical doublet। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু অণুগুলার গঠন বিচিত্র। এখন, 'ক' অণুতে দুই বিন্দু বিজাতীয় তড়িত আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে; 'খ' অণুতেও তাহাই। 'ক'এর এক বিন্দু তড়িত অবশ্য 'খ'এর এলেকাভুক্ত নিজের বিজাতীয় তড়িত-বিন্দুটিকে আকর্ষণ করিতেছে; আবার 'ক'এর অন্তর্গত অন্য বিন্দুটি 'খ'এর অন্তর্গত স্বজাতীয় বিন্দুটিকে ঠেলিয়া দিতেছে। ইহাতে পাইলাম কি? 'ক' অণু 'খ'কে টানিতেছেও এবং ঠেলিতেছেও। টানা ও ঠেলা যদি ঠিক সমান-সমান হয়, তবে উভয়ের মধ্যে কার্য্যতঃ (effectively) টানাটানি ঠেলাঠেলি না থাকাই হইয়া গেল। আমি তোমায় যত জোরে টানিতেছি, তুমি যদি আমায় ঠিক তত জোরে ঠেলিয়া দাও, তবে আমিও তোমায় টানিয়া কাছে আনিতে পারিলাম না, তুমিও আমায় ঠেলিয়া দূরে সরাইতে পারিলে না। কিন্তু টানের জোরটা যদি ঠেলার জোরের চেয়ে ঈষৎ বেশী হয়, তবে ব্যাপারটা দাঁড়াইবে অন্যরূপ। অণু ও অণুর মধ্যেও সম্ভবতঃ হইয়াছে তাহাই। সজাতীয় তড়িত-কণিকারা পরস্পরকে যত জোরে ঠেলিয়া দেয়, তার চেয়ে বিজাতীয় তড়িত-কণিকারা পরস্পরকে ঈষৎ বেশী জোরে টানিয়া থাকে। ফলে, 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে একটুখানি টানই রহিয়া গেল। দুয়ের মধ্যে দ্বেষ-রাগও আছে। কিন্তু তারা পরস্পরকে যতটা দ্বেষ করে, তার চেয়ে একটু বেশী পরস্পরকে ভালবাসে। ফলে, দুয়ের মধ্যে একটুখানি প্রাণের টানই (resultant attractionই) দেখা যায়। রাগ হইতে দ্বেষের খরচা বাদ দিয়া কিছু উদ্বৃত্ত আছে বলিয়াই এই একটুখানি টান; নইলে দ্বেষ ফাজিল হইলে এ জগতে কেহ আর অপর কাহারও সহিত ঘর করিত না। অণুদের মধ্যে ঐ যে উদ্বৃত্ত টানটুকু, তাহাই জড়ের টানাটানি বা gravitation। ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসের Philosophical Magazineএ W. Sutherland electron theory of gravitation প্রসঙ্গে এই ভাবে

বলিয়াছেন :-- "The attraction between opposite charges is greater than the repulsion of similar charges in the ratio of $(1+10^{-43}):1$, Thus accounting for a very small resultant attraction" । Sir J. J. Thomson লিখিতেছেন, "In another development of the theory, the attraction is supposed to lightly exceed the repulsion, so as to afford a basis for the explanation of gravitation" । আচ্ছা, ঐ যে সামান্য একটু বাড়তি টান, তাহাই যদি দুইটা জড়ের মধ্যে gravitation হয়, তবে ঐ একটুকু টান কাটাইয়া দিতে পারিলেই তাহারা আর পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে না; অঙ্ক ফাজিল হইয়া গেলে তাহারা পরস্পকে ঠেলিয়া দিবে। এই কথাটা স্মরণ রাখা দরকার। বাড়তি টানটুকু খুবই কম হইলেও, তড়িত-বিন্দুগুলির মধ্যে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ কিন্তু খুবই বেশী। ইহারা অণু-রাজত্বে বাস করিলে কি হইবে, ইহারা আকারে "অণোরণীয়ান্" হইলেও শক্তি-সামর্থ্যে "মহতো মহীয়ান্"। দুইগ্র্যাম সীসা লইয়া পরস্পরের এক Cent. m. দূরে রাখিলে তাহাদের মধ্যে ঐ বাড়তি টান বা gravitation 6.6×10^{-3} dynes,—এতই কম যে, আমাদের আবিষ্কৃত কোনও যন্ত্রেই তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। কিন্তু দুই গ্র্যাম electricity যদি ঐ রূপ ব্যবধানে রাখা যায়, তবে তাহাদের ঠেলাঠেলির মাত্রা ভাবিতে কল্পনাও অবসন্ন হইয়া পড়ে—31.4×10^{34} dynes অথবা 320 quadrillion tons. অণুর চেয়েও ছোট বলিয়া ইহাদের আমরা উপেক্ষা করিতেছিলাম। "Even if they were placed, one at the North Pole of the earth, and the other at the South Pole, they would still repel each other with a force of 192 million tons, and that in spite of the fact that the force decreases the square of the distance." অবশ্য, আমাদের কল্পিত 'ক' অণু ও 'খ' অণু; মধ্যে মাত্র দুইটি করিয়া তড়িতের দানা আছে—এক গ্র্যাম করিয়া তড়িত আমাদের নাই। তথাপি, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দুইটা দানার মধ্যে টানাটানি বা ঠেলাঠেলি খুবই কম হইলেও, ঐ মাপের দুইটা জড়ের gravitationএর তুলনায় তাহা 10^{41} গুণ বেশী। তড়িতের শক্তি এমনি বিপুল! তাড়িত-শক্তি দ্বারা শুধু যে gravitationএর হিসাব লইতে হইবে এমন নহে, জড়ের মধ্যে অন্য যত প্রকার রাগ বা দ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলেরই মূল এইখানেই অন্বেষণ করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, J. J. Thomson দেখাইতেছেন—"The view that the forces which bind together the atoms in the molecules of chemical compounds are electrical in their origin, was first proposed by Berzelins; it was also the view of Davy and of Faraday. Helmholtz, too, declared that the mightiest of the chemical forces are electrical in origin."

আচ্ছা, ধান ভানিতে এ মহীপালের গীত হইতেছে কেন? প্রাণায়ামে দেহের লঘুতা হয় এবং তজ্জন্য "জলপঙ্ক কণ্টকাদিষ্বসঙ্গ" ও "আকাশ-গমনং" হয়, ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অণু-পরমাণু লইয়া এত টানাটানি-ঠেলাঠেলি হইতেছে কেন? কারণ আছে। দেহের গুরুতা মানে কি? ধরিত্রী ও আমার দেহের মধ্যে ঐ মাধ্যাকর্ষণের টান। আমার দেহের ওজন যদি দেড় মণ হয়, তবে তাহাই এই জড় পদার্থযুগলের টানা-টানির মাপ বা পরিমাণ। এই টানের দরুণ উড়িবার বিলক্ষণ ইচ্ছা থাকিলেও আমাকে ধরণী-পৃষ্ঠেই সংলগ্ন হইয়া থাকিতে হয়। পুলে'র মতন যন্ত্র-সাহায্যে উড়িয়া আসিতে পারিলে আলাদা কথা। সে ক্ষেত্রে মোটরের জোরে পৃথিবীর টানের বিপরীত দিকে একটা টানের সৃষ্টি করা হইয়াছে। পাখীরা ত কত লক্ষ বৎসর আকাশে এক রকম এ্যারোপ্লেন চালাইয়া বেড়াইতেছে। পাখীর ডানার সঞ্চালনে এমন কৌশল আছে, যাহাতে তাহার দেহের লঘুতা ও আকাশ-গমন স্বভাব-সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমরাও একটু লম্ফ-ঝম্প করিয়া ধরণী-পৃষ্ঠ ছাড়িয়া উঠিতে পারি, কিন্তু বেশী চালাকি করা চলে না। ডারউইন মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষ খুঁজিতে যে দেশে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সে রাজ্যের অধিবাসীরা লম্ফ-ঝম্প করিয়া অনেক বাহাদুরী দেখাইতে পারে। সে দেশেও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে একটা সহজ কৌশল বহুদিন হইতে

আবিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। গাছ-পালা সাধারণতঃ মাটিতে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া না থাকিয়া আকাশের দিকে বাড়িয়া উঠে;—এক-একটা শাল, তাল, নারিকেল, দেবদারু কতই না উঁচু হইয়া উঠে। এখানেও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে যাইবার একটা স্বাভাবিক প্রয়াস,—যিনি করিতেছেন তিনি উদান-বায়ুই হউন, অথবা অপর অন্য কোনও দেবতাই হউন। এ প্রকার দৃষ্টান্ত অনেক। ধরুন, আমাদের দেহ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ যে পথে টানিতেছে, সে পথটা মোটামুটি আমাদের মেরুদণ্ডের কাছাকাছি,—অর্থাৎ, ধরা যাক্, ঐ রেখাতেই পৃথিবীর বাড়্‌তি টানটা আমার উপর কাজ করিতেছে। এখন, ঐ টানকে রদ করিয়া দিতে হইলে আমি কি করিব? হয় ছান্দোগ্য-প্রোক্ত ধ্যান-শক্তির বলে একটু উর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিব, নয় কোনও বিমানে চড়িয়া বসিব। এ ছাড়া, আমার আয়ত্তাধীন অন্য কোনও উপায় আছে কি? আছে, এবং তাহাই প্রাণায়াম। কুম্ভক করিয়া দেহটাকে বেলুনের মত বায়ুপূর্ণ করিলে সেটা উঠিয়া পড়িবে, এ কথা বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হয় না। প্রাণায়ামে দেহ উঠিয়া পড়িতে পারে, যদি ব্যাপারটা এইরূপ দাঁড়ায়। আমরা দেখিয়াছি যে, দুইটা জড়-দ্রব্যের মধ্যে যে বাড়্‌তি টান, তাহাই হয় ত gravitation। আসল ও প্রবল টানা ও ঠেলা তাড়িত-শক্তিরই কাজ। টানাটা ঠেলার চেয়ে অতিরিক্ত হইলেই gravitationএর আবির্ভাব। পৃথিবী ও আমার দেহের মধ্যে এই অতিরিক্ত টান রহিয়াছে এবং ইহারই নাম আমার দেহের গুরুত্ব—দেড়মণ। কিন্তু ঠেলাটা টানার সমান বা তার চাইতে বেশী হইলে আমার দেহের গুরুত্ব পৃথিবী-সম্পর্কে আর রহিল না—আমার "লঘুতুল-সমাপত্তি" হইল। এখন প্রাণায়ামে খুব সম্ভবতঃ মেরুদণ্ডের মধ্যে পৃথিবীর টানের বিপরীত দিকে একটা টান জন্মায়,—হয় ত সেটা পরীক্ষায় Electric repulsive বলিয়াই সাব্যস্ত হইতে পারে। Electric forceগুলি gravitationএর তুলনায় কত বিপুল, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। দুই গ্র্যাম সজাতীয় তড়িতের মধ্যে যে ঠেলাঠেলি, তাহা ৩২০ quadrillion tons; কাজেই তাড়িত-শক্তির পক্ষে আমার দেহের ভার দেড়-মণ তুলিয়া ফেলা অসাধ্য-সাধন নহে। আসল কথা, প্রাণায়ামের ফলে মেরুদণ্ডের পথে পৃথিবীর টানের বিপরীত দিকে একটা টানের বিকাশ হইয়া থাকে, এবং সেটা খুব সম্ভবতঃ তাড়িত শক্তির বা তদনুরূপ অপর কোনও শক্তির টান। এই কথা কয়টির মধ্যে প্রাণায়ামের ঐ বিভূতির কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ এখনই মিলিয়া যায় নাই, এবং প্রাণায়ামের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও ছাঁটা-ছোঁটা ভাবে তৈয়ারী এখনই হয় নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—নব্য-বিজ্ঞান তাড়িত-বিন্দু ও তাহাদের টানাটানি ঠেলাঠেলির সাহায্যে gravitation এবং অন্যান্য জড়-ব্যাপারের যে ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে পাতঞ্জল-দর্শনের উক্ত বিভূতির একটা সন্তোষ-জনক হেতুবাদ ভবিষ্যতে আমাদের মিলিবে, এমনটা আশা কি আমরা করিতে পারি না? ঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার পথে অন্তরায় ও অসুবিধা এখনও বিস্তর। দেহের তাড়িত-শক্তিগুলির পরিমাণ ও সমাবেশ কিরূপ? প্রাণায়াম দ্বারা সে শক্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া সত্য-সত্যই কি মেরুদণ্ড-পথে (অথবা সুষুম্নামার্গে) একটা শক্তির উর্দ্ধস্রোত হইয়া থাকে —একটা Electro-magnetic impulsion যাহার গতির মুখ (direction) পৃথিবীর টানের গতিমুখের বিপরীত? যদি বা হয়, তবে তাহার পরিমাণ (magnitude) কত? এ সকল প্রশ্নই ধীর পরীক্ষা ও বিচারের দ্বারা সমাধান করিয়া লইবার;—শুনিয়া সহসা আজগবি অথবা ধ্রুবসত্য মনে করিবার ব্যাপার ইহা নহে। কাজেই, বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যা আপাততঃ না মিলিলেও, নব-বিজ্ঞান জড়-তত্ত্বের এবং মাধ্যাকর্ষণের যে রহস্য আমাদিগকে শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে বিভূতির কথা শুনিলেই বিজ্ঞের মত হাসিয়া উঠিতে আর ভরসা পাই না। আমাদের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলাইতে যাইলে এই একটুখানি লাভ আছে দেখিতে পাই। বিজ্ঞানাগারে গিয়া ঢুকিয়াছিলাম এই আশাতেই। বিজ্ঞানের নূতন পরীক্ষা ও কথাগুলি এইরূপ আভাসে-ইঙ্গিতে সত্যের পথ দেখাইয়া কতকটা আশ্বস্ত করিতে পারে।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞানের মন্দিরে পূজা ও বলি দিয়াই আমাদের আশু সর্ব্বকাম হইবার আশা নাই। পরীক্ষার শেষ দেখিবার জন্য তপোবনে যাইবারও প্রয়োজন আছে। আগামী বার হইতে সুস্থির ভাবে বেদ ও বিজ্ঞানের

জড়-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। প্রকৃত কথারম্ভ হইবে তখন হইতেই। আজ একবার সেই ছান্দোগ্য শ্রুতির দিনে ফিরিয়া যাই,—দেখি গিয়া সে সময়ের আরুণি ও শ্বেতকেতুগণ কি ভাবে এবং কি পদ্ধতিতেই বা তত্ত্ব-পরীক্ষা ও তত্ত্ব-মীমাংসা করিয়া ছিন্ন-সংশয় হইতেন। পিতা আরুণি ত্রিবৃৎকরণ বুঝাইতে গিয়া বলিলেন—অন্ন অশিত হইলে তাহারই যে অণিষ্ঠ বা সূক্ষ্মতম অংশ তাহাই মন হয়। সেইরূপ "আপঃ" পীত হইলে তাহাদের যে অণিষ্ঠ অংশ তাহাই প্রাণ হয়। সেইরূপ আবার "তেজঃ" অশিত হইলে তাহার যে অণিষ্ঠ অংশ তাহাই হয় বাক্। শ্বেতকেতু শুনিয়া বুঝিলেন না, কিরূপে মন অন্নময়, প্রাণ আপোময় ও বাক্ তেজোময় হইল। পিতা কত দৃষ্টান্ত ও উপমা দেখাইলেন—হে সৌম্য! দধি মথ্যমান হইলে তাহার সে অণিমা (অর্থাৎ নবনীত কণিকাসমূহ) তাহা যেমন সর্পিঃ হইয়া ঊর্দ্ধে ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ অশ্যমান অন্নের সূক্ষ্মাংশগুলি মন হইয়া ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। কিন্তু এ সমস্ত উপমান দেখিয়া শ্বেতকেতুর সংশয় দূর হইল না,—তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন—"ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু"। তখন পিতা হাতে-কলমে পরীক্ষা জুড়িয়া দিলেন। বলিলেন—"পুরুষ ষোড়শকলা চন্দ্রের মত। তুমি পনের দিন কিছুই খাইও না। তবে ইচ্ছামত জলপান করিতে পার।" এক পক্ষকাল উপবাসের ব্যবস্থা—শ্বেতকেতুর ভক্তি টলিল না, প্রাণে দ্বিধা হইল না। আর তর্ক নাই, জেরা নাই—শ্বেতকেতু গিয়া না খাইয়া পড়িয়া থাকিলেন। পক্ষান্তে পিতার সন্নিধানে আসিলে তিনি বেদের প্রশ্ন পুত্রকে করিলেন। পুত্র জবাব দিলেন—"কৈ আমার স্মৃতিতে কিছুই ত প্রতিভাত হইতেছে না।" পিতা কহিলেন—"চন্দ্রের ষোলকলা কৃষ্ণপক্ষ দিনে-দিনে ক্ষয় পাইয়া শেষে যেমন এককলা অবশিষ্ট থাকে, তেমনি তোমার মন উপবাসে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া এক কলায় গিয়া ঠেকিয়াছে। ঐ একটি কলায় কিছুই স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। আগুনের যখন খদ্যোত মাত্র একটু অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, তখন তাহাতে দাহিকা শক্তির কতটুকুই বা প্রকাশ? আবার তৃণ কাষ্ঠ যোগাইয়া আগুন জাঁকাইয়া তোল; তাহাতে সবই পুড়িয়া যাইবে। তুমিও আবার আহার করিয়া তোমার মনের কলাগুলিকে পুষ্ট করিয়া তোল, আবার বেদ-বিদ্যা তোমার মধ্যে প্রতিভাত হইবে।" হইলও তাহাই; শ্বেতকেতুও অন্বয় ব্যতিরেকে অন্ন-মনের সম্পর্ক বুঝিয়া নিশ্চিত হইলেন। সেই ছান্দোগ্যের দিন হইতে বহু সহস্র বর্ষের উপবাসে আমাদেরও ধীবৃত্তি ক্ষীণ খদ্যোত মাত্র হইয়া গিয়াছে—এ বুদ্ধিতে আর নির্ম্মল বেদ-বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় না। এখন অয়ি বেদমাতঃ, তোমার স্তন্য সুধা জাহ্নবী-ধারার মত অপরোক্ষানুভূতিরূপে আমাদের প্রাণে আবার না পৌছিলে, আমরা যে চিরকাল এমনি মূঢ় ও বেদবিগর্হিতই রহিয়া যাইব। শ্বেতকেতুর মত আমাদেরও একটি মাত্র স্মৃতিই পরিস্ফুট রহিয়াছে—আমরা এই মৃত্যুকল্প অবসাদ ও দৈন্যের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকিয়াও "অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

একটী গান

[৺নবীনচন্দ্র সেন]

[মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবকে একটী গান লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সম্প্রতি কতকগুলি পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে আমি তাহা পাইয়াছি। নিম্নে তাহা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। ভরসা করি, কবিবরের গানটী পেন্সন-প্রার্থী ব্যক্তিগণের 'রসায়ন' স্বরূপ হইবে। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

মন! বল আর কি ভাবনা?

তোর ফুরাল সাহেব ভজনা!

চাকরী ছেড়ে যেতে কি মন তোর এত মনোবেদনা?

এ যে জগৎ ছেড়ে যেতে হবে কর এবে তাঁর ভাবনা!

ইংরাজেরো রাজা যিনি তাঁর রাজ্যে মন, চল না!

তিনি কীট-পতঙ্গে যোগান অন্ন নিরন্ন তুমি রবে না!

খোসামুদি, জুয়াচুরি, হিংসা, দ্বেষ, প্রবঞ্চনা,

এ পাপ নাই সেই রাজ্যে মন আমার, চুকলি শুনে না!

মা আমার আনন্দময়ী মন, তুমি কি তা' জান না?

মনরে!

নবীন কহে জয় কালী বল ঘুচিল ঘোর লাঞ্ছনা!

অগ্নি-সংস্কার

[ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরের দিন ভোরে লীলা আসিয়া দেখিল, ইলা ড্রইং-রুমে সেই ভাবে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সে আস্তে-আস্তে তাহাকে ডাকিয়া উঠাইল। ইলা ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। লীলা বলিল, "সারারাত এই ভাবে কাটিয়েছিস ?—scoundrel !—আমি আয়ার কাছে সব শুনেছি—rascal—; বাবার যেমন খেয়ে কাজ ছিল না, বাঁদরের গলায় মুক্তোহার ঝুলিয়েছেন। নে, এখন ওঠ্, মুখহাত ধুয়ে চল্ আমার ওখানে।"

ইলা উঠিল না। অর্দ্ধেক রাত সে কাঁদিয়া কাটাইয়াছে। এখন বেদনার অবসাদে তাহার নড়িবার বা ভাবিবার শক্তি ছিল না। সে কেবল কাঁদিয়া ফেলিল। লীলা বলিল, "নে ওঠ্! চল্, কাপড় তো পরাই আছে; চল্, আমার ওখানে গিয়ে মুখহাত ধুবি। গাধাটাকে আচ্ছা করে শাস্তি দিয়ে তবে ছাড়বো। Devil !"

ইলা চক্ষু মুছিয়া উঠিল, আবার থমকিয়া দাঁড়াইল। কি করিবে স্থির করিতে পারিল না। একবার বলিল, "তুমি একবার ওঁকে ব'লে এস।"

লীলা ভ্রূকুঞ্চিত করিল। পরে "আচ্ছা" বলিয়া সত্যেশের ঘরের দিকে গেল।

সত্যেশ তাহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে উঠিয়া দেখিল বিছানায় ইলা নাই। মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। পরে ড্রইং-রুমের দিকে চাহিয়া দেখিল, ইলা ঠিক রাত্রে যেমন ছিল তেমনি পড়িয়া ঘুমাইতেছে। মনে একটু অনুশোচনা হইল। একবার মনে হইল যে এতগুলো কড়া-কড়া কথা বলিবার কোনও দরকার ছিল না। মনে করিল 'আজ ইলাকে শান্ত করিতে হইবে। ইলা উঠিলে তাহাকে কি বলিবে, তাহার মুসাবিদা করিতে-করিতে সত্যেশ দাড়ী কামাইতে বসিল। এমন সময় লীলা আসিল। তাহার মধুর বচন এবং মধুর সম্ভাষণগুলি সত্যেশের কাণে ঢুকিয়া ঠিক অমৃত সিঞ্চন করিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার সুপ্ত ক্রোধ আবার উদ্যত হইয়া উঠিল, ক্ষমার স্থানে হিংসা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। তাহার সমস্ত শরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল, এমন কি একবার ইচ্ছা হইল যে গিয়া লীলাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেয় এবং কখনও এ বাড়ীতে আসিতে মানা করে।

রাগে যখন সে ভিতরে-ভিতরে গর্জ্জন করিতেছে, তখন লীলা আসিয়া পরদার আড়াল হইতে বলিল, "আমি ইলাকে নিয়ে চল্লুম।" সত্যেশকে উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়াই সে চলিয়া গেল এবং পরমুহূর্ত্তে সত্যেশ দেখিল যে, সে ইলাকে প্রায় বগলদাবা করিয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। অক্ষম রোষে সত্যেশের সমস্ত শরীর জ্বলিতে লাগিল; সে স্থির হইয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

প্রথমটা ঝোঁকের মাথায় ইলা লীলার সঙ্গে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তা'র পরক্ষণেই তার মনে হইল সে কাজটা ভাল করিল না। তা'র পর ভাবিল, সত্যেশ নিশ্চয়ই শীঘ্রই তাহার খোঁজ করিতে একবার আসিবে; তখনই সে চলিয়া যাইবে। এই মনে স্থির করিয়া সে অশান্ত চিত্তে বসিয়া-বসিয়া গত রাত্রির সমস্ত কথা আবার ভাবিতে লাগিল। কাল রাত্রে তাহার মনে হইতেছিল, তাহার স্বামী তাহার উপর কঠোর অবিচার করিতেছে। সে যা নয়, ঠিক সেইটা বলিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া, তা'র স্বভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ সমস্ত দোষ তার ঘাড়ে চাপাইয়া তাহার স্বামী তাহাকে যে গালাগালি দিয়াছে, সেটা ঘোরতর অন্যায়। তাহা ছাড়া যে সকল ছোট ছোট তুচ্ছ বিষয়ে সত্যেশ তাহাকে অপরাধী করিয়া মনের ভিতর এতদিন বিষ পুষিয়া আসিয়াছে, সে সব কথা যে সে আগাগোড়া ভুল বুঝিয়াছে, এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই যে ভুল সংশোধন হইয়া যাইত, সেই ভুল যে তাহাকে সংশোধনের কোনও অবসর না দিয়া তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়াছে, ইহাতে সত্যেশের উপর তাহার দারুণ অভিমান হইল। তা'র বুকভরা ভাল-

বাসা, তার স্বামীর মঙ্গলের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা, সে সব কি এমনি করিয়া ভুলিয়া তা'র অপমান করিতে হয়? তার'পর মনে হইল, তা'র বিবাহের কথা। সে যে সত্যেশকে দেখিয়াই ভালবাসিয়াছিল, এবং ভালবাসিয়াছিল বলিয়াই মায়ের, ভাইয়ের, ভগিনীর এবং তাহার সমাজের দারুণ অসম্মতি এবং বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিল, সে কথা মনে পড়িল। তা'র পর হইতে আরম্ভ করিয়া কবে সত্যেশের জন্য কি ভাবিয়াছে, কি করিয়াছে, সব স্মরণ করিল। এই যে সেদিন তা'র সমস্ত আত্মীয়-বন্ধুকে অবহেলা করিয়া, সব আমোদের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া কেবল সত্যেশের জন্য সে মহীশূর গেল—সে কথা সত্যেশ এর মধ্যেই কেমন করিয়া ভুলিল? তা'র পর সংসারে থাকিয়া রোজ-রোজ নানা ক্ষুদ্র কার্য্যে সে কেমন করিয়া শুধু স্বামীর প্রীতি লক্ষ্য করিয়াই কত কাজ করিয়াছে, তাহার খাওয়া-দাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনিক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যটিতে সব চেয়ে সত্যেশের কিসে সুখ বেশী হয় সেই চিন্তা সেই ধ্যান সে দিন-রাত করিয়াছে; সত্যেশের যে এই এক বৎসরের অধিক কাল ঘরে আসিয়া একবিন্দু অসুবিধা বা অশান্তি ভোগ করিতে হয় নাই—এ সব কথা সত্যেশ একবারও ভাবিল না? সত্যেশের তিরস্কারের মধ্যে সব চেয়ে বেশী বিঁধিয়াছিল তাহাকে তাহার প্রাণঢালা ভালবাসার এই অপমান।

যখন সকালে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখনও অপমান-জ্ঞানটাই তাহার প্রবল ছিল; তাই সে চট করিয়া লীলার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া চলিয়া আসিল। কিন্তু, যখন সে অনুভব করিল যে, সে দিদির সঙ্গে অমন করিয়া ঘর ছাড়িয়া আসিয়া গুরুতর অন্যায় করিয়াছে এবং সত্যেশকে গুরুতর আঘাত করিয়াছে, তখনই তার মনের দৃষ্টির ক্ষেত্র একদম ঘুরিয়া গেল। সে বুঝিল যে, সেই তাহার স্বামীর প্রাণঢালা প্রেমের অপমান করিল। স্বামীর সঙ্গে মতান্তর যে সে দিদির কাছে লইয়া আসিয়াছে, ইহাতে তাহার বড় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল; সত্যেশের এই অপমানে দুঃখ বোধ হইল। তখন আবার সমস্ত কথাগুলি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া সে পদে-পদে নিজেকেই দোষী মনে করিতে লাগিল। সে দেখিল যে, বাস্তবিক সে কোন দিনই সত্যেশের জন্য কোনও বিশেষ কিছু ত্যাগস্বীকার করে নাই; কিন্তু সত্যেশ তাহার জন্য সব ছাড়িয়াছে। এই সর্ব্বত্যাগী ভালবাসার সে মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। যে সব দোষের জন্য সত্যেশ তাহাকে তিরস্কার করিয়াছে, সে দোষ যে তাহার হইয়াছে সে ঠিক। মনে-মনে না হউক বাহিরের আচরণে সে সত্যেশের কাছে দোষী হইয়া গিয়াছে। দশ জনের কাছে মান রাখিতে গিয়া সে সর্ব্বদাই দশজনের মতকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়াছে, সত্যেশের মতের দিকে চাহে নাই। তার দুর্ব্বলতাই ইহার জন্য দায়ী। যখন লোকে বলিল, সত্যেশ তাহাকে একচেটিয়া করিতেছে, তখন তাহার মন বলিতেছিল কথাটা সত্য এবং ইহা প্রশংসা বই নিন্দার কথা নয়; কিন্তু দশ জনের এই কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন নিন্দাটুকু সে সহ্য করিতে না পারিয়া দশের মতকে অন্যায়রূপে মানিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়াই অপরাধ করিয়াছে। যদি সে বুক ফুলাইয়া সকলকে নিজের মনের কথাটা, সত্য কথাটা শুনাইত, তবে তো তাহাকে এত বিপদে পড়িতে হইত না। তা' ছাড়া, সে যে এতদিন এসব বিষয়ে সত্যেশের সঙ্গে লুকাচুরি করিয়াছে, সব কথা তাহাকে খুলিয়া বলিয়া তাহার সঙ্গে পরামর্শ করে নাই, এটাও তাহার দাম্পত্য-ধর্ম্মের অযোগ্য হইয়াছে।

আজ সে এইরূপে সমস্ত ব্যাপার খুঁটাইয়া-খুঁটাইয়া দেখিয়া পদে-পদে নিজেকেই অপরাধী করিতে লাগিল। আর, তা'র পর স্বামীর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত না করিয়া, যে লীলাকে সত্যেশ দু'চক্ষে দেখিতে পারে না এবং ইলাও বড় প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে না, তাহার সঙ্গে সে চলিয়া আসিল, এই অপরাধ সত্যেশের সমস্ত ত্রুটী ছাপাইয়া তাহার চক্ষে পর্ব্বত-প্রমাণ হইয়া উঠিল। সে আবার ঘরে ফিরিবার একটা সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আশা করিল যে মিষ্টার ঘোষ এখনি যাইয়া সত্যেশকে বুঝাইয়া-পড়িয়া ডাকিয়া আনিবেন। কিন্তু মিষ্টার ঘোষের সেদিকে কোনও গা দেখা গেল না; বরঞ্চ সত্যেশকে বেশ জব্দ করিবার জন্যই যেন তাঁহাকে উৎসুক দেখা গেল। তা'র পর, সে আশা করিল যে, সত্যেশ নিজেই হয় তো আসিবে; কিন্তু বারোটা বাজিয়া গেল, সে আসিল না। তখন সে ছটফট করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল বাড়ী ফিরিয়া যায়, কিন্তু

দিদির ঠাট্টার ভয়ে পারিল না। সমস্তক্ষণ অস্থির ভাবে ছুটাছুটী করিতে লাগিল।

মিষ্টার ঘোষ আফিসে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পর একটা চাপরাসী ইলার কাছে একখানা চিঠি লইয়া আসিল। স্বামীর চিঠি ভাবিয়া সে কম্পিত-পদে অগ্রসর হইল। খুলিয়া নিরাশ হইল। চিঠি লিখিয়াছেন তার বাবা। চিঠিটি এই :—

"ইলা মা, নলিনের কাছে যাহা শুনিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইয়াছি। এ কি করিয়াছ মা? তুমি আমার কথা শুনিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, মনে আছে কি? বাড়ী ফিরিয়া যাও, সেখানে আমি সন্ধ্যার আগেই আসিব। সত্যেশকেও লিখিলাম। পাগলামি করিও না।

তোমার বাবা।"

পত্রখানি যেন ইলাকে কষাঘাত করিতে লাগিল। চিরদিন সে বাপের ভক্ত, পিতার মতামতের সঙ্গে একমত হওয়াই তাহার বরাবর অভ্যাস। তাই পিতার এই তিরস্কারে সে অন্তরে-অন্তরে আরও দৃঢ়ভাবে অনুভব করিল যে, সে অন্যায় করিয়াছে। সে কাঁপিতে-কাঁপিতে পত্রখানি লীলাকে দিল। লীলা তো পত্র পড়িয়া চটিয়া গেল। সে বলিল, "Nonsense, এইখানেই তোমায় থাকতে হ'বে যে পর্য্যন্ত ঐ পাজীটা মাথা না নোয়ায়। বাবা তো সব বোঝেন! বুঝলে আর আজ এ দুর্গতি হ'ত না। বাঁদরের গলায় মুক্তাহার পরিয়েই না এত কাণ্ডকারখানা।"

কথাগুলি ইলার ভাল লাগিল না, কিন্তু সে কিছু বলিল না। নীরবে গিয়া একখানি বই লইয়া পড়িতে বসিল। কিন্তু সে পড়িল না, সে কেবল নিজেকে মনে-মনে চাবুক মারিতে লাগিল। সে যে কেন দিদির কথা অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেছে না, যেটা সত্য-সত্য উচিত তাহা যে সে এই তুচ্ছ নারীর নাসিকা-কুঞ্চনের ভয়ে কেন করিতে পারিতেছে না, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে পারিতেছে না বলিয়া নিজেকে তিরস্কার করিতে লাগিল, কিন্তু সত্য-সত্য উঠিয়া বাহির হইয়া পড়িতেও পারিল না।

বৈকালে মিষ্টার ঘোষ এক দল বন্ধু লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। বন্ধুরা মিসেস মুখার্জ্জীর সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন! Lawnএ বসিয়া চা খাইতে-খাইতে লীলা ও বন্ধুরা সত্যেশের বেশ স্বচ্ছন্দ সমালোচনা করিতে লাগিল;—বলা বাহুল্য, কাহারও ভাষা বিন্দুমাত্রও সংযত করিবার জন্য চেষ্টা করিবার কেহ প্রয়োজন অনুভব করে নাই।

ইলা প্রথমে ভদ্রতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং এক-আধজনকে সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদও দিয়াছিল। তা'রপর ক্রমে তাহার অসহ্য হইতে লাগিল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া চা খাইতে লাগিল। শেষে যখন গালাগালির মাত্রা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল, তখন সে দাঁড়াইয়া উঠিল; বলিল, "দিদি, আমি তোমার এখানে অপমান হ'তে আসি নি।"

"যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!" সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। পুরুষ বন্ধুরা বেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল, কিন্তু লীলা জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "ইস্. ভারী যে দরদ! তবে আমার সঙ্গে এলি কেন?"—

ইলা বলিল, "ঘাট হ'য়েছে, ঢশো'বার ঘাট হ'য়েছে। এই চল্লুম।" বলিয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়া সে দেখিতে পাইল যে অনেকগুলি ট্রাঙ্ক সত্যেশের ড্রেসিং রুমে পড়িয়া রহিয়াছে। বেয়ারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল যে সাহেব তাহাকে তাঁহার সমস্ত কাপড়-চোপড় বিছানা পত্তর প্যাক করিতে হুকুম দিয়া সকালে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

ইলার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবেন বলিয়া গিয়াছেন কি?"

বেয়ারা বলিল "তাহা বলেন নি, কিন্তু কাল জাপানী জাহাজে মাল পাঠাইতে বলিয়াছেন।"

জাপানী জাহাজে? তবে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া—সত্যেশ নিজেকে নির্ব্বাসিত করিতে বসিয়াছে! কম্পিতকণ্ঠে ইলা জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব কারখানা থেকে ফেরেন নি?"

বেয়ারা বলিল, "ফেরেন নি, তবে গাড়ী তাঁকে হাবড়া ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছে।"

কম্পিত-হস্তে ইলা টেলিফোনের রিসীভারে হাত দিয়াছিল, সে তাহা ফেলিয়া দিল। তবে কি সত্যেশ চলিয়া গিয়াছে! তাহাকে একটিবার না বলিয়া, ক্ষমা-ভিক্ষার একটা অবসর না দিয়া চলিয়া গিয়াছে! তাহার

বড় কান্না পাইল, কিন্তু বুড়ো বেয়ারার সম্মুখে লজ্জায় কাঁদিতে পারিল না।

বেয়ারাকে বিদায় দিয়া সে ছটফট্ করিতে লাগিল। একটু পায়চারি করিয়া সে আবার টেলিফোনে গিয়া Mc-Crindle সাহেবকে ডাকিল, তাহার কাছে যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, মাথা ঘুরিয়া পড়িতে-পড়িতে সে সামলাইয়া গেল। Mc-Crindle বলিলেন যে, মরিসাস দ্বীপে একটা শাখা কারখানা খোলার জন্য তাঁহার সেখানে যাওয়ার কথা ছিল। আগামী কল্য নিপ্পন ইয়ুফেন কাইশার ষ্টীমারে যাওয়ার প্রস্তাব ছিল। আজ সকালে সত্যেশ হঠাৎ যাইয়া বলিল যে, সেই নিজে যাইবে, Mc-Crindle কলিকাতায় থাকুক। এই বন্দোবস্ত করিয়া সে বেলা তিনটায় আফিস হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহার আদেশ যে আবশ্যক কাগজপত্র সাজ-সরঞ্জাম একটি লোক দিয়া জাহাজে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। সত্যেশ নিজে রেলে যাইয়া মাদ্রাজ হইতে ষ্টীমারে উঠিবে।

ছুই হাতে মাথাটাকে চাপিয়া ধরিয়া ইলা বসিয়া পড়িল,—তবে কি সে সত্যই গিয়াছে, আর কি ইলা তাহাকে ফিরাইতে পারিবে না? ভাবিতে তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় চ্যাটার্জ্জী সাহেব আসিলেন। তাঁহার মুখে ব্যস্ত ভাব। তিনি আসিতেই ইলা তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। চ্যাটার্জ্জী সাহেব তাঁহাকে যথাসাধ্য শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যেশ বাড়ী আসেনি?"

ইলা কাঁদিতে কাঁদিতে Mc-Crindleএর কাছে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা জানাইল। চ্যাটার্জ্জী সাহেব চিন্তিত হইলেন। কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পর ইলা কাতরভাবে বলিল, "বাবা, আমার কি উপায় হইবে?" বলিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে আবার পিতার বুকে মুখ লুকাইল।

বৃদ্ধ কন্যার বিস্রস্ত কেশে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর ইলাকে বসাইয়া সত্যেশের শফারকে ডাকাইলেন। সে বলিতে পারিল না সাহেব কোন্ জায়গার টিকিট কিনিয়াছেন; কিন্তু তাহার কথায় প্রকাশ পাইল যে, সত্যেশ অন্ততঃ বেঙ্গল-নাগপুর লাইনের গাড়ীতে ওঠে নাই। ইহা শুনিয়া চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "তুমি মিছে ব্যস্ত হচ্ছ। আমার ঠিক বিশ্বাস যে, সত্যেশ বর্দ্ধমানে গেছে তার বাবার সঙ্গে দেখা ক'রতে। বেয়াই বর্দ্ধমানে বদলী হ'য়ে এসেছেন কি না! সেখান থেকে ফিরে তবে মাদ্রাজ যাবে। আমি এখনি বর্দ্ধমানে টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি।"

চ্যাটার্জ্জী কেবল বর্দ্ধমানে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন না, তিনি তাহা ছাড়া নিপ্পন ইয়ুফেন কাইশারের এজেণ্ট সাহেবের কাছে টেলিফোন করিলেন। সাহেবের সঙ্গে চ্যাটার্জ্জীর পরিচয় ছিল। টেলিফোনের আলাপের ফলে, যে ষ্টীমারে সত্যেশের যাইবার কথা, সেই ষ্টিমারে ছ'খানা কেবিন মাদ্রাজ যাইবার জন্য রিজার্ভ করা হইল।

সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া চ্যাটার্জ্জী কন্যাকে বলিলেন, "তোমার কোনও চিন্তা নেই, সত্যেশের সঙ্গে দেখা হ'বেই। সে খুব সম্ভবতঃ কাল এখানে আসবে। যদি না আসে, তবে কাল আমরা তা'র জিনিষগুলির সঙ্গে মাদ্রাজ চ'লে যাব, সেখানে তা'কে ধরতে পারবোই। তার পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব হ'বে কি না, সেটা কাল সকালবেলা Mc-Crindleএর কাছে জেনে পরামর্শ ক'রে কর্ত্তব্য স্থির করা যাবে। সুতরাং তোমার ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নেই।"

ইলা সমস্ত বুঝিয়া আশ্বস্ত হইল।

চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "মা, আমার কথা শুনো, দেখা হ'লে যেন নরম হ'য়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ো। একজনের দোষে কখনই ঝগড়া হয় না। কাজেই, তোমার পক্ষে অনেক কথাই হয় তো ব'লবার আছে, তা'র অনেক কথা জবাব দেবার মত আছে; কিন্তু যদি আমার কথা শোন, তবে কোনও জবাব দিও না। সব কথার যদি ন্যায্য জবাব দিতে যাওয়া যায়, তবে সংসার অনেক সময় একটা ভালুকের খাঁচা হ'য়ে পড়ে। সে না হয় তোমাকে একটা অন্যায় কথা ব'ললেই; তা'তে বিশেষ কিছু লোকসান হয় না। কিন্তু, তা'র জবাব দিতে গেলে কথা বাড়ে, আরও অন্যায় হয়। তাই বলি মা, এবার দেখা হ'লে কোনও অন্যায় কথারও প্রতিবাদ করো না।"

ইলা কিছু বলিল না। এ কথার উত্তরে তার বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল যে, সে কোনও জবাবই এ পর্য্যন্ত দেয়

নাই, কেবলই শুনিয়া গিয়াছে; কিন্তু এ জবাবটাও না দিয়াই সে পিতার উপদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিল।

চ্যাটার্জ্জী চলিয়া গেলেন। ইলা তার মাদ্রাজ যাওয়ার উপযোগী কাপড়-চোপড় গুছাইয়া প্যাক করিল। তাহার অনুপস্থিতিতে ঘর-দুয়ারের কি ব্যবস্থা হইবে, সে সব মনে মনে ঠিক করিল। এই রকম করিয়া সে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মনটাকে ব্যস্ত করিয়া শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। বাহিরে আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম পাইল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া অসম্ভব আশায় আশান্বিত হইয়া সে টেলিগ্রাম খুলিল; পড়িয়া বসিয়া পড়িল। সত্যেশের পিতা টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে, সত্যেশ বর্দ্ধমানে গিয়া মাত্র দুই ঘণ্টা ছিল, তাহার পর সে কলিকাতার ট্রেণে ফিরিয়াছে।

তবে সে কোথায়? কালই যদি সত্যেশ কলিকাতায় ফিরিয়া থাকে, তবে সে এখনো কলিকাতাতেই আছে! ভাবিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সে মোটর তৈয়ার করিতে বলিয়া টেলিফোনের কাছে গেল। যত সম্ভব-অসম্ভব জায়গা ছিল, সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিল,—কেহ সত্যেশের খবর দিতে পারিল না।

চ্যাটার্জ্জী সাহেব আসিয়া দেখিলেন যে, ইলা একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। তাঁহার হাতে টেলিগ্রামখানি দিয়া সে শুষ্কমুখে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। চ্যাটার্জ্জী ইলাকে চা খাওয়াইয়া বলিলেন, "তুমি সুস্থির হও, আজ রাত্রেই জাহাজে উঠতে হ'বে। সেজন্য প্রস্তুত হও। আমি একবার কারখানায় Mc-Crindleএর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"

চ্যাটার্জ্জী চলিয়া গেলেন, ইলা আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার শরীর-মন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াছিল; সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, সত্যেশ ফিরিয়া আসিয়াছে। ইলা লজ্জায় তাহার সামনে যাইতে পারিতেছে না, তাহার পা যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, কণ্ঠরোধ হইয়াছে। সত্যেশ জিনিষপত্র গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া মোটরের উপর উঠিয়া বসিল, ইলা ঘর হইতে দেখিল। শেষে প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া যেই সে সত্যেশের কাছে যাইবে, অমনি হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। সে তখন সত্য-সত্যই খাট হইতে পড়িতে-পড়িতে ঘুম ভাঙ্গিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। কিন্তু জাগিয়াও সে শুনিতে পাইল যেন সত্যেশ শোফারকে বলিতেছে "জাহাজ-ঘাট"।

সে চমকিয়া চক্ষু রগড়াইয়া উঠিয়া বসিল। সত্যই সত্যেশ আসিয়াছে, তাহার মালপত্র গাড়ী বোঝাই করাইয়া গাড়ী জাহাজঘাটে যাইবার আদেশ দিতেছে। ইলা উঠিয়া দাঁড়াইল, বুক ভয়ানক ধড়ফড় করিয়া উঠিল; বুক চাপিয়া সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ততক্ষণ সত্যেশ গাড়ী বিদায় করিয়া খাইবার ঘরে গেল।

আয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া ইলাকে বলিল, "হুজুর, সাহেব আয়ে হৈঁ; খানেমে বৈঠে হৈঁ।" ইলা কোন কথা না বলিয়া একেবারে খানার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। সত্যেশ একবার চাহিয়া দেখিল, কোনও কথা বলিল না। ইলা তাহার চেয়ারটীতে গিয়া বসিল; সেও কিছু বলিতে পারিল না। খানসামা তাহার সামনে একখানি প্লেট দিতে আসিল; ইলা বারণ করিল।

সত্যেশ নীরবে মাথা গুঁজিয়া খাইয়া যাইতে লাগিল। ইলা কেবল খানসামাকে এটা-ওটা আদেশ করা ছাড়া কিছুই বলিল না। খাওয়া শেষ হইলে সত্যেশ উঠিল; তখন ইলা তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত ধরিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কোথা যাবে?" তাহার কণ্ঠ যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

সত্যেশ কেবল বলিল, "মরিসাসে।" তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তোমার কোনও চিন্তার কারণ নেই। আমি এখানকার আফিসে অর্ডার দিয়ে গেলাম, এরা এখান থেকে তোমাকে মাসে মাসে ৫০০৲ টাকা ক'রে দেবে, বাড়ী-গাড়ী সব থাকবে, তোমার কোনও কষ্ট হ'বে না।"

ইলার কেবল বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। তাহার মনের ভিতর কত কথা গজগজ করিতেছিল; কিন্তু সে একটী কথাও বলিয়া উঠিতে পারিতেছিল না,—কথাগুলা যেন তাহার গলার কাছে আসিয়া ভয়ানক ঠেকিয়া গিয়াছিল। তাই সে শুধু বলিল, "কেন যাবে?" বলিয়া তাহার করুণ চক্ষুদুটি একবার সত্যেশের মুখের উপর রাখিল। সত্যেশও একবার তাহার দিকে চাহিল। সত্যেশের মনে যেন একটু ধোকা লাগিল। ইলা যে এই একদিনে এতটা রোগা ও ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে, তাই

লক্ষ্য করিয়া সত্যেশের ধোকা লাগিল। কিন্তু সে ভাব সামলাইয়া সে ধীর ভাবে বলিল, "কেন, সে কথা বলবো; যাচ্ছি যখন, তখন তোমার কাছে কথাটা স্পষ্ট ক'রে বলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু এখানে চাকরদের সামনে নয়, ও-ঘরে চল।"

ড্রইং-রুমে যাইয়া সত্যেশ ইলাকে একটা চেয়ারে বসাইল; নিজে সামনে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "আমি যে হঠাৎ রাগের মাথায় একটা কিছু করেছি তা নয়। আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি, যে, তোমায়-আমায় এক-সঙ্গে থাকলে আমাদের দুজনেরই জীবন ব্যর্থ হ'বে। হিন্দুমতে আমাদের বিবাহ হ'য়েছে, কাজেই এটা ভাঙ্গবার কোনও উপায় নাই। তাই ব'লে যদি আমরা দুজন একসঙ্গেই থাকতে আরম্ভ করি, তাতে তোমারও কষ্ট, আমারও কষ্ট। এটা কারও দোষ নয়, আসল কথা আমরা পরস্পরের জন্য তৈয়ারী হইনি। তোমার দিদি ঠিক ব'লেছেন, এ যেন বাঁদরের গলায় মুক্তাহার। অথচ আমরা যদি তফাৎ থাকি, তবে তুমিও আনন্দে জীবন কাটাতে পারবে, আমিও বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারবো। সেই জন্যই আমি যাচ্ছি। জীবনের প্রথমে একটা প্রকাণ্ড ভুল ক'রে বসেছি। অনেক আশা ক'রে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম; অনেক স্বপন দেখেছিলাম; এখন দেখছি সেটা ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তাই বলে কি দুটো জীবনকে একদম ব্যর্থ ক'রে দিতে হবে? তুমি যদি তোমার পথে যাও, আমি আমার পথে যাই, তবে এখনও আমাদের দুজনেরই জীবন সার্থক হ'তে পারে। ভালবাসাবাসি ছাড়াও জীবনের একটা সার্থকতা হ'তে পারে।"

ইলা সব কথা শুনিল না, শুনিতে পারিল না, শুনিবার কোনও দরকার বোধ করিল না। সত্যেশের কথা শেষ হইলে সে কেবল বলিল, "আমার একটি কথা রাখবে কি? আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি, সে আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি দোষী, কিন্তু আমাকে এত বড় একটা শাস্তি দেবার আগে আমাকে একটিবার পরীক্ষা ক'রে দেখবে? ছয় মাস আমি সময় চাচ্ছি; আর একটীবার আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখ; ছয়মাস পরে পায় ঠেলতে চাও আমি বারণ ক'রবো না।"

সত্যেশ বলিল, "দেখ ইলা, তুমি পণ্ডিত, তুমি বাজে স্ত্রীলোকের মত কথা বলো না। আমাদের সম্বন্ধটা কি ভাল ক'রে মনে করে দেখ। এতে পায় ঠেলার কোনও কথা আসে না। তোমায়-আমায় একটা সংসার গড়বার চেষ্টা করলাম। দেখতে পাচ্ছি, আমাদের স্বভাব-চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা এমন বিপরীত যে, পরস্পরকে খোঁচা না দিয়ে আমাদের চলাই কঠিন। দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের সংসার করবার Experimentটা সফল হ'ল না। কাজেই এটা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। এ নিয়ে কোনও কান্নাকাটি করাটা তোমার মত বুদ্ধিমতীর শোভা পায় না। আর ছয় মাস সময় নিয়ে কোন লাভ নেই। আমাদের সমস্ত সত্তা এতটা বিরুদ্ধ রকমের যে, কোনও চেষ্টা করেই আমরা আমাদের জীবনটা সুখী ক'রতে পারি না। কাজেই ছয় মাস যদি আবার আমরা সংসার ক'রতে বসি, তবে হয় আমরা ঠিক এমনি পরস্পরকে কষ্ট দিতে থাকবো, না হয় তুমি একটা প্রচণ্ড চেষ্টা করে হয় তো তোমার সমস্ত স্বভাবটাকে মাস কয়েকের জন্য চেপে দেবে। তোমাকে এমন করে রাখতে আমি ইচ্ছা করি না, আমার এমন কোনও অধিকার আছে ব'লে মনে করি না।"

ইলা এবার উঠিয়া সত্যেশের পা জড়াইয়া ধরিল; চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসাইয়া সে সত্যেশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে মেরে ফেলো না, বাঁচতে দাও। তুমি আমায় ফেলে গেলে আমি দু'দিনও বাঁচবো না। আমায় দয়া কর, ছ'মাস না হয় দু'মাস আমায় সময় দাও!"

সত্যেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইলাকে টানিয়া বুকের কাছে তুলিয়া লইল। তাহারও চক্ষু ছলছল করিতেছিল। ইলাকে বক্ষে ধরিয়া সে তাহার কম্পিত অধরে একটি চুম্বন দিল। তাহারা আর কোনও কথা কহিল না।

কিছুক্ষণ পর, চ্যাটার্জ্জী সাহেব একেবারে Mc-Crindleকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যেশকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কন্যার দিকে চাহিলেন। ইলার আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখ চোখ দেখিয়া তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না।

চ্যাটার্জ্জী আসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে মিটে গেছে সব? Mc-Crindleকেই তবে যেতে হবে মনিসাস?"

সত্যেশ বলিল, "না, আমিই যাব।"

ইলা ও চ্যাটার্জ্জী দু'জনেই শঙ্কিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সত্যেশ বলিল, "ইলাকে একটু কালাপাণি পার করিয়ে নিয়ে আসি। কি বল ইলা?" ইলার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সত্যেশ ও ইলা সেই জাহাজেই মরিসাস যাত্রা করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ছয় মাস পরে সত্যেশ ও ইলা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। মরিসাসে ম্যাসাচুসেটস্ মেশিনারী লিমিটেডের কারবার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সেখানে একজন যোগ্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া সত্যেশ ফিরিয়া আসিল। বন্ধু-মহলে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের ছড়াছড়ি লাগিয়া গেল।

সত্যেশ আসিয়া দেখিল তাহার পিতা মৃত্যুশয্যায়। তিনি ইতিমধ্যে পেনসন লইয়া কাশীবাস করিতেছিলেন; সেখানে যাইয়া তাঁহার এপোপ্লেক্সী হয়। সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু তাহার 'পর তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইয়া তিনি শয্যাগত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তিনি তিন চার মাস পড়িয়া আছেন; এখন তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কলিকাতায় আসিয়াই সত্যেশ কাশী যাত্রার উদ্যোগ করিল; ইলা সঙ্গে চলিল, কিছুতেই ছাড়িল না। ইহার পর প্রায় একমাস বৃদ্ধ কালীভূষণ মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইলেন; কিন্তু এই এক মাস বৃদ্ধের সন্তপ্ত হৃদয় অনেকদিন পর শান্তির আস্বাদ পাইয়াছিল। এ একমাস সত্যেশ তাহার পিতার শয্যাপার্শ্ব ছাড়ে নাই। ইলা এই একমাস দেবীর মত শ্বশুরের শিয়রে বসিয়া সেবা করিয়াছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে সংসারে এমন একটা সুশৃঙ্খলা ও শান্তি আনিয়াছে যে, কালীভূষণ বাবুর সমস্ত সমবেত আত্মীয়বর্গ তাহার নিষ্ঠা, চেষ্টা ও পটুতায় অবাক্ হইয়া গিয়াছে।

সত্যেশের বোন মনোরমা একদিন কাঁদিয়া বলিল, "বৌদিদি, তুমি এত জান, এত পার! এতদিন যদি তুমি বাবার কাছে থাকতে, তবে বুঝি আজ তাঁর এ দশা হইত না।"

ইলা শুধু কাঁদিল, কিছু বলিল না। তাহারও মনে হইতেছিল যে, কেবল যত্ন ও শুশ্রূষার ত্রুটিতেই তাহার শ্বশুরের এই বয়সেই এ দশা হইয়াছে। সে যদি তাঁহার কাছে থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে তাহার প্রীতি, সেবা ও পূজার দ্বারা ঘিরিয়া রাখিতে পারিত, তবে বুঝি তাঁহাকে আজ যমে ছুঁইতে পারিত না। কেন সে তাহা পারিল না?

কালীভূষণ বাবু নিজে অবাক্। তাঁহার জ্ঞান শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিল; কিন্তু কথা অস্পষ্ট ও স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আকার-ইঙ্গিতে সকলকে তাঁহার কথার ভাব গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু কি জানি কেমন করিয়া ইলা তাঁহার সব কথা, সকল ইঙ্গিত চট্ করিয়া বুঝিত, আর কেহই তাহা বুঝিত না। কালীভূষণ বাবু মাঝে-মাঝে সপ্রশংস নীরব দৃষ্টিতে সত্যেশ ও ইলার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। ইলা তখনি নিজের অশ্রু চাপিয়া তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া কত কি কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিত। সে ঠিক তাঁর মনের কথা বুঝিয়া উত্তর দিত বলিয়াই তাহার সান্ত্বনায় বৃদ্ধের মুখে শীঘ্রই আনন্দ ফুটিয়া উঠিত।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন চ্যাটার্জ্জী সাহেব আসিলেন। সেদিন কালীভূষণ বাবু অনেকটা শান্ত ও সুস্থ হইয়াছেন। চ্যাটার্জ্জী সাহেবকে দেখিয়া তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে ইলার খোঁজ করিতে শিয়রের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। ইলা পাশের ঘরে গিয়াছিল, সত্যেশ ইঙ্গিত করিতেই আসিয়া দাঁড়াইল। কালীভূষণ ইঙ্গিত করিয়া ইলাকে কি বুঝাইয়া তাহার পিতাকে বলিতে বলিলেন। ইলা বুঝিল, কিন্তু পিতাকে কিছু বলিল না, কেবল শ্বশুরকে বলিল, "আপনি ওসব কথা বলবেন না, ছি!" বলিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিল। কালীভূষণ অনেকদিন পর আজ তাঁহার কম্পিত দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া ইলার চোখের কাপড় সরাইলেন; প্রায় স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, "কেঁদো না, বাবাকে বল।"

ইলা তাহার মুখের দিকে চাহিল, বৃদ্ধের ব্যগ্রতা দেখিয়া বুঝিল না বলিলে চলিবে না। চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "কি বলছেন উনি মা, বল আমাকে।"

ইলা বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিল না। কিন্তু সত্যেশ এতক্ষণে কথাটা বুঝিয়াছিল; সে বলিল, "উনি যে ইলাকে যত্ন ক'রতে পারেন নি, সেই কথা ব'লছেন?"

কালীভূষণ সম্মতি জানাইলেন, পরে অনেকক্ষণ চেষ্টা

করিয়া নিজেই চ্যাটার্জ্জীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রত্ন দিয়েছিলে—চিনিনি।"

ইলা কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "এ সময় ও-কথা ব'লে আমাকে অপরাধী ক'রবেন না। আমি ত জানি আমি আপনার কাছে কত দোষ ক'রেছি। আপনার কোলে ঠাঁই পাই নি, সে তো আমারই দোষ।"

কালীভূষণের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লগিল। চ্যাটার্জ্জী সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহারও দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অনেকদিন পর কালীভূষণ আজ স্পষ্ট করিয়া দুটী কথা বলিয়া জন্মের মত নির্ব্বাক্ হইলেন। পরদিন প্রাতে তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন।

সত্যেশ কলিকাতায় ফিরিল। সেখান হইতে দেশে গিয়া প্রায়শ্চিত্ত ও শ্রাদ্ধ করিবে স্থির করিল। ইলা কিছুতেই ছাড়িল না, তাহার সঙ্গে গেল। তখন বর্ষাকাল, সারা বিক্রমপুর জলে থৈ-থৈ করিতেছে। অপার জলরাশির মাঝখানে এক-একখানি বাড়ী বা এক-একটি পাড়া যেন ভেলার মত ভাসিয়া রহিয়াছে। সত্যেশ ইলাকে বলিল, "কেমন লাগ্‌ছে।"

নৌকার ছাদে দুজনে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল। নীল আকাশে থরে-থরে মেঘ চারিদিকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে; আকাশের ঠিক মাঝখানে পূর্ণচন্দ্র সেই বিস্রস্ত মেঘরাশির উপর ঝলকে-ঝলকে আলো ছড়াইয়া তাহাদিগকে রঙ্গাইয়া দিতেছে; সেই অপার বারিরাশি চাঁদের আলোয় ঝিক-মিক করিতেছে। মাঝিরা তালে-তালে দাঁড় ফেলিয়া জলের ভিতর চাঁদির ঝলক তুলিতেছে। দূরে গ্রামের গাছগুলি অন্ধকারে জ্যোৎস্নার আড়ালে যেন চোরের মত উঁকি মারিতেছে।

ইলা বলিল, "বড় সুন্দর!"

এই নীরব নির্জ্জন অন্ধকারে ইলার মনে হইতে লাগিল যেন তাহারা আর এ জগতের নহে। কোন এক অজানা ইন্দ্রজালের নৌকায় চড়িয়া তা'রা দুটি প্রাণী যেন পরলোকের পথে মেঘের মাঝখান দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সমস্ত জীবনের পরপারটা যেন তার চোখে ওই স্বচ্ছ নীল আবরণের ভিতর দিয়া একেবারে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে সত্যেশের হাতখানা আরও চাপিয়া ধরিল। বলিল, "সুন্দর, বড় সুন্দর! বুঝি সমুদ্রের চাইতেও সুন্দর!"

সত্যেশের পৈতৃক বাস-গৃহ অনেক দিন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। সে আসিবে বলিয়া তাহা ঝাড়া-পোঁছা হইয়া একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু বালিগঞ্জের সে সুরম্য অট্টালিকার তুলনায় ইহা একটা অন্ধকূপ বলিলেও চলে। সত্যেশ ইলাকে বলিল, "তোমার আর বাড়ীতে উঠে কাজ নাই; তুমি এই বোটেই থাক, সে বাড়ীতে তুমি বাস ক'রতে পারবে না।"

ইলা সত্যেশের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, বলিল, "সে হবে না।"

দু'দিন বাড়ীতে থাকিতেই সে গৃহখানিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। মনোরমা বলিল, "বৌদিদি, তুমি কি পরেশ পাথর, যা ছোঁবে তাই সুন্দর হ'বে।"

ইলা বলিল, "আমি নই ঠাকুরঝি, তোমার দাদাই পরশ-পাথর—কিম্বা, হয় তো বা আগুন।"

"কেন আগুন কিসে হ'লো?"

"আগুনে পোড়ালে সোণা খাঁটি হয় জানো না? পরশ-পাথর সত্যি-সত্যি নেই, কিন্তু আগুনটা সত্যি।"

দারুণ বর্ষা, দিনরাত সমানে বৃষ্টি! ব্যাপারের বাড়ী; লোকজনের হাঁটাহাঁটিতে সমস্ত উঠান কাদায় থই-থই করিতেছে! তাহার ভিতর সকলে ছুটাছুটি করিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেছে। ইলারই সবার চেয়ে কাজ বেশী, সেই খুব বেশীর ভাগ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। ওয়াটারপ্রুফ গায় চড়াইয়া সে চারিদিকে ছুটিয়া সব তদ্বির করিতেছে। একদিন সকালে এক-হাঁটু কাদা ভাঙ্গিয়া সে ভিজিতে-ভিজিতে তার শুইবার ঘরের বারান্দায় আসিয়া পা দিল। তাহার গায় বর্ষাতি নাই, মাথায় একটা "মাথাল", হাতে জামা ও চুড়ি রহিয়াছে, আর সারা হাত হলুদ-মাখা। বারান্দায় জল ও গামছা ছিল; সে হাত-পা ধুইয়া-মুছিয়া ঘরে উঠিল; সম্মুখে দেখিল সত্যেশ।

সত্যেশ বলিল, "কি ইলা, এখন কেমন লাগছে, বড় সুন্দর! না? কেমন কাদা, কেমন জল! কেমন থৈ-থৈ—না?"

ইলা হাস্যময় চক্ষু ঘুরাইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, বলিল, "ঠাট্টা নয়, সত্যি বড় সুন্দর! পৃথিবীর মাটী জল-হাওয়ার সঙ্গে কি চমৎকার মাথামাথি—প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে মিশে গেছি! এ যে Life! এর চেয়ে সুন্দর

আর কি আছে?" তাহার গণ্ডে ও ওষ্ঠাধরে রক্ত আভায় জীবন ফুটিয়া উঠিতেছিল; সত্যই সে জীবনের স্বরূপ উপভোগ করিতেছিল, তাহা বুঝা গেল।

সত্যেশ বলিল, "ইলা, তুমি আমায় অবাক্ ক'রলে! আমার এ দেশের সঙ্গে রক্ত-মাংসের সম্পর্ক; আমি বিশ্বাস করি যে, আমি এদেশ খুব ভালবাসি, তবু আমি প্রায় ক্ষেপে যাবার মত হ'য়েছি। জল আর কাদা, কাদা আর জল! ঘরে থেকে ভদ্রভাবে বেরোবার উপায় নেই! আর তুমি বলছো কি না সুন্দর!"

ইলা হাসিয়া বলিল, "তুমি যে একটা গোড়ায় গলদ ক'রে রেখেছ! এখানে আসবার সময় ভদ্রভাবটা যে বাক্স-বন্দী ক'রে রেখে এসনি, সেই ক'রেছ ভুল। এখানে প্রকৃতি তার কাদা-মাখা হাত-বাড়িয়ে আলিঙ্গন ক'রতে এগিয়েছে,—ভদ্রামীর পোষাক আসবাব ছেড়ে না এলে তা'র ভিতর ঢুকে উপভোগ ক'রবে কি ক'রে?"

সত্যেশ বলিল, "আর তা' ছাড়া এই দেশের লোকগুলো আমায় পাগল ক'রে তুলবে। সমস্ত রাজ্যশুদ্ধ লোক ঘোঁট পাকাচ্ছে, যাতে আমি এই কাজটা সারতে না পারি। আমাকে অপমান করবার একটা সুযোগ পেয়ে কেউ সেটা হেলায় হারাতে চায় না। অথচ কি যে সব লোক? মনুষ্যত্ব হিসাবে আমার কারখানার মুটে-মজুরেরও অধম। সমস্তটা জীবন ভরে' খাওয়া দাওয়া ঘুমোনো, কুকার্য্য আর কুচিন্তা ছাড়া তা'দের অন্য অবলম্বন নাই। একবারের তরে কেউ ভাবে না যে, ভগবান তা'দের মানুষ করে সৃষ্টি ক'রেছেন কিসের জন্য? আচ্ছা, প্রকৃতি না হয় খুব বেশী ক'রে তোমায় পেয়ে ব'সেছে, এখানকার মানুষগুলোও কি তোমায় জ্বালাতন ক'রে উঠতে পারেনি?"

ইলা বলিল, "মোটেই না। আমি তো দেখি, এরা সহৃদয়! এরা সর্ব্বদাই যে আমায় বাহবা দেবে, আর সব বিষয়েই ঠিক আমার মতে মত দেবে, আমার দরকার বুঝে কাজ ক'রবে, এমন আমি আশাও করি না, এমন হয়-ও না। ও-বাড়ীর বট্‌ঠাকরুণ সে দিন তো আমায় এসে যা নয় তাই ক'রে ব'কে গেলেন, আমি বেহায়া বলে। আমার তাতে একটুকুও রাগ হয়নি। আমি ঘোমটা দিই না, সবার সামনে বেরুই, পাড়ার বাবুদের কাছে ব'সে সমানে-সমানে কথা কই, এ দেখে বট্‌ঠাকরুণের মত লোক যদি আমায় বেহায়া না বলে—তাদের সংস্কারের সঙ্গে তাদের কথা এতটা বেখাপ হয়—তবে বলতে হবে যে, তারা মনের কথা বলছে না। কল্‌কাতায় হ'লে তাই হ'ত। সেখানে যিনি অতি-বড় নিষ্ঠাবান হিন্দু, যিনি গঙ্গাস্নান না করে জল-গ্রহণ করেন না, তিনি হয়তো আমার বাড়ী নিমন্ত্রণে এসে নানা মিষ্ট কথায় আমাকে আপ্যায়িত করে, ফের গঙ্গা-স্নান ক'রে বাড়ী ফিরতেন। এখানে যে সেটি হয় না, যে যা ঠিক সেইটাই প্রকাশ করে, সেইটে আমার বড্ড ভাল লাগে।"

সত্যেশ ইলার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল, সে প্রাণের কথা বলিতেছে। সে বলিল, "তা না হয় হ'ল, কিন্তু এখন উপায় কি? প্রায়শ্চিত্ত তো হ'ল, এখন শ্রাদ্ধ নিয়ে বড় গোলযোগ, কেউ আসবে না বোধ হয়!"

ইলা বলিল, "তার আর কি করবে বল। তুমি যেটা ভাল বুঝবে, সেইটে তুমি করবে; তাতে যে আসে আসুক, না আসে না আসুক।"

"কিন্তু তা'হলে আমার লাভ হ'ল কি? সমাজকে ত আমার দিকে পেলাম না। সমাজের তো সংস্কার হ'ল না।"

"না হ'ক, শ্বশুর মশায়ের আত্মার তৃপ্তি হবে! আর সমাজের জন্য তুমি চিন্তা করো না। ধাঁ ক'রে এক মুহূর্ত্তে জোর করে সমাজকে ঠেলে তোলা যায় না। কিন্তু সত্যের পথে সমাজকে আসতেই হবে! আজ তুমি আমাকে নিয়ে এসে সমাজের ভিতর যে বোমা ঢুকিয়ে দিয়েছ, সেটা ফাটবেই, তাতে পুরাণো সংস্কার ভেঙ্গে চুরমার হবে। তুমি-আমি আজ যে কাজ করছি, তার্কি-কেরা যত অপছন্দ করুক, যত গাল দিক, যদি আমাদের পথ সত্য পথ হয়, তবে সেটা এদের নিতেই হবে।"

শ্রাদ্ধ কোনও মতে শেষ হইল। কতক-কতক লোক সত্যেশের পক্ষে আসিল, বেশীর ভাগ আসিল না। কিন্তু সত্যেশ পিতার অন্ত্যকৃত্য শাস্ত্রমতে সম্পন্ন করিয়া উঠিল।

শ্রাদ্ধের পর সত্যেশ কলিকাতায় ফিরিল। সে এখন একজন মস্তলোক। কাজেই তার সময় বড় কম। ইলাও এখন মহাব্যস্ত। কেন না, আগের চেয়ে এখন বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবের ভিড় বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তাহাদিগকে আদর-আপ্যায়ন করিতে এবং মাঝে-মাঝে নানাবিধ

ভোজ্য-পেয়ে পরিতৃপ্ত করিয়া সত্যেশের আতিথেয়তার খ্যাতি বিস্তার করিতে তাহার অনেকটা সময় কাটিয়া যাইত। তাহার উপর আর এক উৎপাত দাঁড়াইল, তাহার নিজের খ্যাতি। সে "জগতের ইতিহাসে নারীর স্থান" সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়া ছাপাইয়াছে; সে বইয়ের প্রশংসা দেশ-বিদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। কাজেকাজেই তাহাকে আরও লিখিতে হয়। মাসিকপত্রের সম্পাদক, পুস্তকের প্রকাশক প্রভৃতি জীবের উৎপাতে তাহাকে সদা-সর্ব্বদাই কোনও একটা কিছু লিখিতে হয়। তাহার সাহিত্যিক কর্ম্মজীবন কাজেকাজেই অত্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়িল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যেশ ও ইলা তাহাদের নূতন বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার ছাদে বসিয়া কাগজ পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সত্যেশের নূতন ব্যারিষ্টার বন্ধু অশোক ঘোষ আসিয়া যোগদান করিল। অশোক বলিল, "মিসেস্ মুখার্জ্জী, দেখেছেন কি, Miss Rankfast 'Woman's World' পত্রে আপনার সমালোচনা করে কি বলেছেন।"

ইলা কেবল একটু হাসিয়া বলিল, "দেখেছি।"

সত্যেশ বলিল, "সে কি, তুমি দেখেছ, আর আমায় কিছু বলনি! কি লিখেছে হে অশোক?"

"Miss Rankfast বলেছেন যে, Mrs. Mukherjee মোটের উপর স্ত্রীজাতির আধুনিক পন্থার সঙ্গে বেশ সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তবে তিনি ভারতবর্ষের স্ত্রীজাতির বন্ধনদশার ফল থেকে একেবারে মুক্তি পান নি। সেই বন্ধনদশাকে তিনি idealise ক'রে নারী-জীবনের যে একটা আদর্শ এঁকেছেন, তাহা কবিত্ব হিসাবে বেশ সুন্দর, কিন্তু বাস্তবিক রক্ত-মাংসের জগতে সে জিনিসটা যে আকারে দেখা যায়, সেটা নারীর দাস্যের নামান্তর। মোটের উপর পঞ্চাশ বছর আগে হ'লে এঁর কথাগুলো বেশ শোনবার যোগ্য বলে ধরা যেত, কিন্তু আজকার দিনে তিনি out-of-date. তা হলেও সে এঁকে খুব সুখ্যাতি করেছে।"

ইলা বলিল, "আবার এদিকে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় লিখেছেন যে, আমি একেবারে বিপ্লববাদী, হিন্দুনারীর জীবনের আদর্শ বুঝতেই পারিনি। আমি পুরা মেমসাহেব, ভারতীয় নারী-জীবনের কিছুই জানি না ইত্যাদি।"

অশোক বলিলেন, "তা আর বলবেন না। তিনি সে-দিন ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন যে, গভর্ণমেণ্ট স্ত্রী-শিক্ষায় বেশী হাত দিতে গেলে অনর্থ হবে। স্ত্রীজাতির আসল শিক্ষা হচ্ছে অন্তঃপুরে, সেখানে সে যে শিক্ষা পায়, সেটা 'Spiritual, if not intellectual' আর তাতে ক'রে যে মেয়েমানুষ তৈরী হয়, সে নাকি একটা ministering angel. তা ছাড়া পরিবারের বাহিরের কোন রকম প্রভাব মেয়েদের ভেতর হ'তে গেলে হিন্দুসমাজ ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে যাবে—ইত্যাদি।"

সত্যেশ বলিল, "The blessed word—Spiritual. —আমাদের যত দোষ-ত্রুটী ঢাকবার একটা ব্রহ্মাস্ত্র! আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের দেখে এখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে তিন শ্রেণীর লোক; এক, যারা কখনও আর কোন রকমের স্ত্রীলোক দেখেনি; তারা অবশ্য নারী-চরিত্রের যে সব গুণ দেখে, তাতেই মুগ্ধ হয়ে বাহবা দিতে থাকলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। আর এক দল হচ্ছে তারা, যাদের প্রভুত্বস্পৃহা আর সকল প্রবৃত্তিকে একেবারে দমন ক'রে রেখেছে। আর তৃতীয় দল হচ্ছেন তাঁরা, যাঁদের সাংখ্যের ভাষায় বলা যায় 'তুষ্ট'—যারা যা আছে তাতেই খুসী! চোখ মেলে দেখবার বা হাত-ছড়িয়ে কাজ করবার চাইতে যা কিছু তারা মেনে নিতে রাজী। তবু আমার মনে হয় যে, চাটুজ্জে মশায় যদি আমাদের গ্রামের কাদম্বিনী ঠাক্‌রুণের মত spiritual মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়তেন, তবে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক্ ছাড়তেন।"

ইলা ঈষৎ হাসিয়া স্বামীর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল, "কাদম্বিনী ঠাক্‌রুণ কি 'মেকী ফিরিঙ্গীর' চেয়েও খারাপ।"

সত্যেশের মুখ লাল হইয়া উঠিল—আট মাস আগের কথা মনে পড়িয়া সে আজ লজ্জিত হইল।

অশোক চলিয়া গেলে সত্যেশ বলিল, "ইলা, আজ কথাটা মনে করিয়া দিলে, তোমার কাছে আমার সেই দিনের জন্য মাপ চাওয়া হয়নি। তোমার মত স্ত্রীকে আমি যে অপমান ক'রেছিলাম, তা'র জন্য আমি লজ্জিত।"

ইলা দুই হাতে সত্যেশের মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,

"অপমান করনি গো কর্ত্তা, শোধন ক'রেছ। আগুনে না পোড়ালে কি সোণা খাঁটি হয়।"

সত্যেশ বলিল, "তাই নাকি, তুমি খাঁটি সোণা।"

ইলা হাসিয়া বলিল, "তুশো বার, নইলে এমন হীরে কি তার মাথায় এমনি মানায়?" বলিয়া সত্যেশের চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

"ইস, খোসামোদ ক'রতেও শিখেছ দেখছি। যাই বল, আজ তোমায় বল্‌তে হ'বে যে, তুমি আমায় সত্য-সত্য প্রাণের সঙ্গে ক্ষমা ক'রেছ।"

ইলা বলিল, "এ যে বড় জবরদস্তি, যেটা সত্যি নয় সেটা ব'ল্‌তে হবে। তোমার বাপ-মা তো ভারি নাম রেখেছিল তোমার—সত্যেশ।"

সত্যেশ একটু মুখ ভার করিয়া বলিল, "না, সত্যি-সত্যি যদি ক্ষমা ক'রতে না পেরে থাক, তবে তোমায় ব'লতে বলি না"—

ইলা মৃদু-মৃদু হাসিয়া সত্যেশের গম্ভীর কাতর মুখখানা কিছুক্ষণ দেখিল; তার পর দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া বুকে মাথা রাখিয়া বলিল, "তুমি আজ আমায় এমন কথা কেন ব'লছো। আমি কি জানি না, আমি তোমার কাছে কত বড় দোষ ক'রেছিলাম—তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছিলাম। তা'র পর এই আট মাস গেছে, এতে কি আমি একটুকুও বদলাই নি? এখনো কি তোমার মনের মত হইনি? তবে তুমি কেন এ কথা ব'লছ।"

সত্যেশ নিবিড় ভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া শুধু চুম্বন করিল। কিছুক্ষণ কেহ কথা কহিল না। তাহার পর ইলা উঠিয়া বসিল, বলিল, "আজ তোমার কিছু বলবার নেই, আজ আমার পালা। সেদিন তুমি শুধু বলে গিয়েছিলে, আমি শুনে গিয়েছিলাম। অনেক কথা জবাব দেবার ছিল, কিছু বলিনি। ভেবেছিলাম, যদি তুমি কোনও দিন আমায় ক্ষমা কর, যদি আমায় আবার ঠিক আগের মত ভালবাস, তবে সে জবাব দেব।"

সত্যেশ বলিল, "পাগলের কথা শোন, যেন নেকা, জানেন না ওঁকে ভালবাসি কি না।"

"যদি ভালবাস, যদি আর রাগ না কর, তবে বলি। আমি দোষ করেছিলাম সত্য, কিন্তু তুমি কি দোষ কর নি? তুমি কি কোনও দিন মুখ-ফুটে আমায় ব'লেছিলে, আমার কাছে কি তুমি চাও? যাতে তুমি খুব বেশী দুঃখ পেয়েছ, সে কাজ ক'রতেও কি তুমি আমায় একদিন বারণ ক'রেছ? তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়েছে বলেই আমাকে তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলতে হ'বে তোমার মনের আনাচে-কানাচে কোথায় কি আছে, তুমি এই স্থির ক'রেছিলে; কিছু ব'লতে হবে, এ কথা ভাবতেই তোমার অভিমান হ'য়েছে! কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে, তার আগে মাত্র কয়দিন তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হ'য়েছে। আমি তোমার সব মনের কথা বুঝিতে পারি নি, সেটা কি আমার এত বড় গুরুতর অপরাধ, যার জন্য আমাকে ভাসিয়ে দিতে হ'বে?"

সত্যেশ হাসিয়া বলিল, "কাব্যে এই রকম লেখে বটে?"

"কি রকম?"

"যে যাকে ভালবাসে, সে নিজের হৃদয়ের ভিতর ভালবাসার বস্তুর সমস্ত মনের ছবি দেখতে পায়; বুকে-বুকে রেখেই সুখ-দুঃখের খবর ক'রে নেয়; আরও কত কিছু। কাব্যের মতে ভালবাসার পক্ষে এ কথাটা একান্ত নিষ্প্রয়োজন!"

"তা' বটে, কিন্তু জীবনটা কাব্য নয়।"

"না ঠিক, কিন্তু বিয়ের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত লোকে ভাবে জীবনটা কেবলি একটা কাব্য, কেবল অক্ষরে লিখে ছাপালেই মহাকাব্য হ'য়ে উঠতে পারে। 'প্রথম যখন বিয়ে হ'ল'—জান না?"

"অনেক ভুলই বোধ হয় বয়স হ'লে সারে; রজ্জুতে সর্পভ্রম—যেমন যাকে-তাকে দেখে মেকী ফিরিঙ্গী সাব্যস্ত করা! অথচ ধরতে গেলে নিজে ষোল আনা সাহেব!"

"আমি সাহেব!"

"নও কি? দাদার সঙ্গে অশন-বসন সাজ-সজ্জা কিসে তোমার তফাৎ?"

সত্যেশ একটু ভাবিয়া বলিল, "বলতে পার হয় তো! কিন্তু তফাৎ আছে—মনের ভিতর।" (সমাপ্ত)

সেতুবন্ধের পথে

[অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম, এ]

ঠিক করিয়াছিলাম, সেবার পূজাবকাশে পুরী পর্য্যন্ত গিয়াই ফিরিব। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। ৺বিজয়ার পর ত্রয়োদশীর দিন বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় নদীয়ার পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত কুক্ষণে অথবা সুক্ষণে দেখা হইল। তিনি সস্ত্রীক রামেশ্বর যাইতেছিলেন,—আমাদেরও পূর্ব্বে একবার রামেশ্বর যাইবার কল্পনা-জল্পনা হইয়াছিল; তার উপর অক্ষয়বাবুর মত উকীলের বক্তৃতা আমাদের পুরীর পথটাকে লম্বা করিয়া একবারে রামেশ্বরে পৌছাইয়া দিল। সঙ্গে জিনিস-পত্র টাকা-কড়ি বিশেষ কিছু ছিল না,—কলিকাতা পৌছিয়া জনৈক আত্মীয়ের নিকট তাড়াতাড়ি কিছু টাকা লইয়া মাদ্রাজ মেলে চড়া গেল।

সারারাত্রিই ট্রেণে চলিয়াছি; রূপনারায়ণ, মহানদী, কাঠজুড়ির সেতুর উপর দিয়া যাইতে-যাইতে ম্লান জ্যোৎস্নায় ঢাকা চারিদিকের সুন্দর নৈশ দৃশ্য চোখের ঘুম যেন কোথায় কাড়িয়া লইয়া গেল। প্রভাতের আলোকে এক নয়ন-মনোরম দৃশ্য সম্মুখে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। চিল্কা-হ্রদের বিস্তৃত জলরাশির এক পাশ হইতে সূর্য্যদেব পূর্ব্ব-গগনে আরোহণ করিলেন। সে অরুণচ্ছটায় প্রকৃতির সারা অঙ্গ মোহন রাগে রাঙিয়া উঠিল। চিল্কার পাশ দিয়া ট্রেণ চলিতে লাগিল; হ্রদটী ৪৪ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থে ৫ হইতে ২০ মাইল; কিন্তু জল কোথাও ৬ ফুটের অধিক নয়। চিল্কার মাঝে-মাঝে বৃক্ষলতা-শোভিত ছোট-ছোট দ্বীপগুলি যেন সবুজ স্পঞ্জের মত ভাসিয়া রহিয়াছে। কত রকমের পাখী চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। ওদিকে দূরে জেলেরা ছোট-ছোট ডিঙি লইয়া মাছ ধরিতেছে।

চিল্কা শেষ হইলে পূর্ব্বঘাট-গিরিমালার অনন্ত সৌন্দর্য্য আমাদের পাশে-পাশে যেন ছুটিয়া চলিতে লাগিল। মেঘের কোলে মেঘ জমিয়া শৈল-শিখরে স্বপ্নাবেশে যেন শুইয়া আছে। কত গ্রাম, কত নগর, কত শস্য-শ্যামল প্রান্তর অতিক্রম করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। উৎকলের ভাষা এবং পাহাড়-পর্ব্বত হইতেই বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, অপরিচিতের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। ষ্টেশনে বাঙ্গালীর জলখাবার বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না—মুড়ি, কলা, দই, দুধ, এই কয়টি জিনিসই দেখিলাম। মধ্যে-মধ্যে নারিকেল ও কিছু-কিছু মিষ্টান্নের দর্শন মিলিয়াছিল। দইএর নাম এদেশের ভাষায় 'পেরগু' এবং দুধকে বলে 'পালু'। উড়িষ্যা হইতে রামেশ্বর এবং রামেশ্বর হইতে উড়িষ্যা কেবল এই পালু-পেরগুর কারবার।

ওয়াল্‌টেয়ার ষ্টেশনে নামিয়া Indian Refreshment Roomএ কিঞ্চিৎ অন্নাদি আহার করা গেল। বাঙ্গালী বলিয়া আমাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে বসিতে দেওয়া হইল। মাছ খাইয়া বাঙ্গালী কি অপরাধই করিয়াছে—উত্তরে দক্ষিণে কোথাও তাহার নিস্তার নাই! টকের ডাল, লেবুর ডালনা, লঙ্কার চচ্চড়ী প্রভৃতি দিয়া ভাত দেওয়া হইল,—অবশেষে পাচক-ঠাকুর জলবৎ তরলম্ খানিকটা ঘোল আনিয়া দিয়া বলিলেন—Master, card, nice Master। আমরা যে-স্থলে 'মহাশয়' বা 'হুজুর' ব্যবহার করি, মাদ্রাজীরা সেই-স্থলে 'স্বামী' অথবা ইংরেজীতে Master কথাটি ব্যবহার করে। মাদ্রাজের মুটে, মজুর, ঠাকুর, চাকর, দোকানদার প্রায়সকলেই কিছু-কিছু ইংরেজী বলিতে পারে। ভদ্রলোকের তো কথাই নাই, স্কুলের খুব ছোট-ছোট ছেলেরাও বেশ ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলে। আমাদের দেশে কিন্তু কলেজের ছেলেরা, এমন কি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চাপরাসপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটরাও অনেকে ইংরাজী বলিতে ভয় পান।

মাদ্রাজীরা ইংরেজীটাকে এতটা স্বরগত করিয়াছে যে, এমন কি নিজেদের মধ্যেও মাতৃভাষা না বলিয়া পরস্পর ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলে। পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনিয়াছি যে, তিনি এই আচরণের নিন্দা করিয়া মাদ্রাজ টাউন-হলে কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহার দাক্ষিণাত্য-

ভ্রমণকালে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে জনৈক সভ্য কাউন্সিল-গৃহে পরদিনই একবারে স্বীয় মাতৃভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দেন। অবশ্য লাট সাহেব বাধা দেওয়ায় তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি এই হঠাৎ সম্মান-প্রদর্শনের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। যাই হোক, মাদ্রাজীরা অনেকে ইংরেজী জানে বলিয়াই ভ্রমণকারীদের এত সুবিধা, নতুবা কি মুস্কিলেই যে পড়িতে হইত, বলা যায় না। হিন্দীরও কতক চলন মাদ্রাজে আছে,—বিশেষতঃ মুসলমানগণের মধ্যে। ভারতবর্ষে যদি কোনো সাধারণ ভাষা চালানো সম্ভবপর হয়, তবে সে হিন্দী, এই ধারণা ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া আমার মনে বিশেষভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে।

রেলপথের দুধারে অসংখ্য তালগাছ রহিয়াছে;—তবে সবগুলিরই অধিকাংশ পাতা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে,—নব্য বাঙ্গালী বাবুর মত মাথাটি চৌদ্দ-আনা-দু-আনা রকমে ছাঁটা। পরে দেখিলাম যে, এদেশে ঘর-ছাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া নানা কাজে তালপাতার ব্যবহার হয়। কোথাও তাড়ির জন্য তালগাছ কাটা হইয়াছে দেখি নাই—বোধ হয় 'তাড়িত'-শক্তির আস্বাদন এদেশের লোক এখনো পায় নাই।

গোদাবরী, কৃষ্ণা প্রভৃতির উপর দিয়া দাক্ষিণাত্যের নৈশ প্রকৃতির নীরব শোভা দেখিতে দেখিতে ৪২ ঘণ্টা রেলে চলার পর তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্নে মাদ্রাজে পৌঁছিলাম। শ্রীযুক্ত ভি, আর, চৌধুরী এম-এ নামক জনৈক সহৃদয় মাদ্রাজী ভদ্রলোক আমাদিগকে সেন্‌ট্রাল ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী দানবীর রাজা স্যার রামস্বামী মুদালিয়ারের ধর্ম্মশালায় পৌঁছাইয়া দিলেন। এদিকে ধর্ম্মশালাকে Chouttry অথবা ছত্রম্ বলে। ব্রাহ্মণ এবং অ-ব্রাহ্মণদিগের জন্য বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র। ধর্ম্মশালাটিতে বৃহৎ রান্নাঘর প্রভৃতি আছে,—বন্দোবস্ত সবই ভাল; কেবল পাইখানার বন্দোবস্ত অদ্ভুত, এদেশে এ বিষয়ে পর্দ্দা কিছুমাত্র নাই। শুনিয়াছি ইউরোপেও নাকি এইরূপ বন্দোবস্ত প্রচলিত। যাই হোক, আমাদের বড়ই অসুবিধা বোধ হইত। মাদ্রাজে আরো কয়েকটি ধর্ম্মশালা আছে; তন্মধ্যে গুজরাতী ছত্রম্ এবং Eggmore ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী আর একটি ছত্রই ভাল—কিন্তু দু'টিই Central Station হইতে দূরে।

মাদ্রাজ সহরটি বেশ সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। কলিকাতা-বাসীর পক্ষে অবশ্য দ্রষ্টব্য এখানে বিশেষ কিছুই নাই—কেবল সাগরতীর ও তাহার সৌধরাজি দেখিবার মত বটে। এখানে সাধারণতঃ রিক্‌স, বাণ্ডি, ঝটকা ও ফিটন পাওয়া যায়। এক-গোরুর গাড়ীকে বাণ্ডি এবং ঐ প্রকার গাড়ীর একটু ভাল সংস্করণে ঘোড়া জোড়া থাকিলেই ঝটকা হইল। এদেশের গোরুগুলি কিন্তু খুব দৌড়িতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলাল বেঘোরে বেহারে এক্কা চড়িয়াছিলেন, আর আমরা বেঘোরে মাদ্রাজে ঝটকা চড়িলাম। তবে পেটের নাড়ী হজম করাইয়া ক্ষুধার উদ্রেক করিতে ঝটকাও এক্কার সমান নয়। এখানকার ট্রামগাড়ীগুলি একটু ছোট ধরণের; সাধারণত একখানা গাড়ী থাকে—ভাড়া ८১০ হইতে ८/১০ পর্য্যন্ত। ট্রামে করিয়া মাইলাপুরে রামকৃষ্ণ মিশন দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানে সুন্দর কাজ হইতেছে।

মাদ্রাজের Indian Reviewএর সম্পাদক অনরেবল জি, এ, নটেশন মহাশয়ের সহিত আলাপ হইয়াছিল। পুস্তক-প্রকাশের দ্বারা তিনি দেশের অনেক উপকার করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি বলিলেন যে, বাঙ্গালীরা তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক খুব কমই কেনে—The Bengalees seldom buy out-books; they are a very tight-fisted people। মাদ্রাজে এখন স্বদেশীর যুগ;—আমাদের দেশে সে সময়ে যেমন একটা ভাবের প্রবল বন্যা বহিয়াছিল, বর্ত্তমানে মাদ্রাজেও ঠিক সেইরূপ চলিতেছে। তবে স্থানীয় লোকের মুখে শুনিলাম যে, বাংলা দেশের মত সেখানেও কার্য্য অপেক্ষা বাগাড়ম্বরই বেশী। এদেশে 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র খুব আদর। গান্ধী প্রভৃতি মহাত্মগণের ছবির সঙ্গে মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের ছবিও বিক্রী হইতেছে।

মাদ্রাজের 'এগ্‌মোর' ষ্টেশন হইতে ছোট লাইনে সাউথ-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের Ceylon-Boat-Mailএ রামেশ্বর যাত্রা করিলাম। S. I. R.এর মত মেল-লাইন ভূভারতে আর নাই। একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন S. I. R. মানে Stupid Irreguler Rascal,—কথাগুলির সত্যতা ভ্রমণ করিতে-করিতে অন্তরে-অন্তরে অনুভব করিয়াছিলাম। সন্ধ্যাবেলায় গাড়ী ছাড়ে, টিকিট কিনিতে হয় সকালে কিম্বা তার আগের দিন। প্রত্যেক ষ্টেশনে

নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক টিকিট ডাকগাড়ীর জন্য দেওয়া হয়। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে, তাহা হইলে বেশ আরামে যাওয়া যায়। তাহা নয়; কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদান করিলেই টিকিট মিলে। এই লাইনের টিকটাকি গিরগিটিটা পর্য্যন্ত দক্ষিণা-গ্রহণে সিদ্ধহস্ত,—ষ্টেশন-মাষ্টার হইতে কুলী পর্য্যন্ত সকলেরই এ বিষয়ে সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতা দেখিলাম। ষ্টেশনে 'টাইম টেবল' পাওয়া যায় না—বলিল ফুরাইয়া গিয়াছে। একে গাড়ীগুলি ছোট ছোট, তাতে আবার ভিতর দিয়া বরাবর যাতায়াতের পথ, সুবিধা কিরূপ, সহজেই অনুমিত হইবে। ইণ্টার-ক্লাস নাই, তবে সেকেণ্ড-ক্লাসের বন্দোবস্ত ভাল—এক-একৃ গাড়ীতে ছুটী ছুটী বেঞ্চ। যাই হোক, কষ্টে-সৃষ্টে একখানি 'রাজকীয়' শ্রেণীর গাড়ী দখল করিয়া আমরা ২৪ ঘণ্টায় রামেশ্বর পৌঁছিলাম।

মন্দিরের নিকটস্থ তুলচাঁদ লোহানার প্রতিষ্ঠিত ছোট একটি সুন্দর ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। মাদ্রাজ হইতেই পণ্ডিত শিউনারায়ণ নামে জনৈক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ আমাদের পিছনে ফিঙাপাখীর মত লাগিয়াছিলেন। রামেশ্বরের প্রধান পাণ্ডার নাম গঙ্গাধর পীতাম্বর—মারাঠী ব্রাহ্মণ। শুনিলাম যাত্রি-সংগ্রহের জন্য ইঁহার ছয় শত গোমস্তা আছে এবং ইনি দৈনিক দুই হইতে তিন হাজার টাকা পাইয়া থাকেন।

রামেশ্বরের মন্দির পাম্বম্‌ দ্বীপের উপর অবস্থিত। এই দ্বীপ ১২ মাইল লম্বা ও ৫ মাইল চওড়া। যাইতে হইলে সমুদ্রের উপর নির্ম্মিত রেলের পুল পার হইতে হয়। উভয় পার্শ্বের দৃশ্য অতি মনোরম! সেতুবন্ধের নিকট সাগরের জল গভীর-নয়; ঢেউ তত নাই, চারিদিকে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত পাথর পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দ্বীপমালা, বালুকাস্তূপ এবং নারিকেলকুঞ্জ সাগর-শোভাকে আরো সুন্দর করিয়াছে। রামেশ্বর মন্দিরে শিবলিঙ্গ বিরাজমান—মন্দিরটি ১২০ ফুট উচ্চ; ভিতরের কারুকার্য্য বিস্ময়জনক।

তিন দিন রামেশ্বরে থাকিয়া আমরা চব্বিশ মাইল দূরস্থিত ধনুষ্কোটি নামক স্থানে যাত্রা করিলাম। প্রবাদ আছে, এই স্থলে রামচন্দ্র ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা বিভীষণের অনুরোধে সেতুবন্ধনের খানিকটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। এখান হইতে সিংহলদ্বীপ দুইমাইল মাত্র—জাহাজে যাইতে হয়। [illegible] জাহাজের জেটিতে পৌঁছিলে কতকগুলি কৃষ্ণকায় বালক আসিয়া সমুদ্রজলে সাঁতরাইতে লাগিল। যাত্রীরা পয়সা জলে ফেলিয়া দেয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়া তুলিয়া ফেলে। ধনুষ্কোটির ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন যে, এই দুইমাইল জল এত অল্প, যে হাঁটিয়াও যাওয়া যায়—তবে মধ্যে-মধ্যে দু এক জায়গায় সাঁতরাইতে হয়। খরচ অত্যন্ত বেশী বলিয়া রেল-কোম্পানী পুল বাঁধে নাই। ধনুষ্কোটির পথের শোভা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হয় না—বঙ্গোপসাগর ও আরব উপসাগর এখানে আসিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে;—যে দিকে দেখা যায়, অনন্ত নীলাম্বুধি নীল আকাশকে চুম্বন করিতেছে—চারিদিকে কিয়দ্দূর শ্বেত বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে—'নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল অঞ্চল' ভারত-মায়ের মোহন সৌন্দর্য্য এখানে যেন অলসভাবে অনন্ত নীলিমার মাঝে এলাইয়া পড়িতেছে।

সেতুবন্ধের দৃশ্য দেখিয়া অমরকবি কালিদাসের সেই কথাগুলি মনে পড়ে—

> বৈদেহি, পশ্যামলয়াদ্‌বিভক্তম্‌
> মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্‌।
> ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নম্‌
> আকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্‌॥

আর সেই—

> দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
> তমালতালীবনরাজিনীলা।
> আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
> র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

সন্ধ্যার অন্ধকারে তীরে বসিয়া সাগরের ভৈরব সঙ্গীত শুনিতে লাগিলাম,—ঢেউএর সঙ্গে ফস্‌ফরস্‌ জ্বলিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছিল;—পাগল হাওয়া হুহু করিয়া গায়ের উপর দিয়া তরঙ্গ-জলকণা বহিয়া অবিশ্রান্ত ছুটিতে লাগিল;—তখন কবির কথা মনে পড়িতে লাগিল—

> "হে আদি জননি, সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার
> একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
> চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
> সদা আন্দোলন, তাই উঠে বেদমন্ত্র সম ভাষা
> নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্র মন্দির পানে

অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গানে
ধ্বনিত করিয়া দিশিদিশি, তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর, আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গ-বন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি' সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।"

উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা, ভীমকায়া স্রোতস্বতী, অনন্তবিস্তৃত জলধি এবং শস্যশ্যামল প্রান্তর সমগ্র মাদ্রাজকে যেন একখানি ছবির মত করিয়াছে। তাহার উপর তীর্থস্থানগুলি মানবের মহনীয় কীর্ত্তিরাজি বক্ষে ধারণ করিয়া ভ্রমণকারীর নিকট দক্ষিণাপথকে চিরপ্রিয় করিয়াছে। উত্তর-মাদ্রাজে তাল, নারিকেল, খেজুর—তিনপ্রকার গাছেরই ঘন-সন্নিবেশ দেখা যায়। দক্ষিণের নারিকেলকুঞ্জ ও তালের সারি দেখিবার মত। ঝাউ এবং কলার চাষও এদিকে রীতিমত হয়। জমি খুব উর্ব্বর। এখন ওদিকে' বর্ষাকাল, ধানও যথেষ্ট হইয়াছে দেখিলাম।

অদৃষ্টের এমনই দারুণ পরিহাস যে, এই স্বর্ণপ্রসূ দেশের সন্তানগণই অনশনে-অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে বাধ্য হয়।

একজন বন্ধু দুঃখে গাহিয়াছিলেন—

"কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।
(এমন) পেটের সাথে পিঠ মিশে যায় ক্ষুধায় কাহার দেশে॥"

শ্যামল হাস্যে মা নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়া কবিজনের মনকে আহ্লাদিত করেন বটে, কিন্তু প্যোলিটি-ক্যাল ইকনমির ভাষায় ইহার সাদা বাংলা ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, রপ্তানির চোটে আজ দেশের ধান গম চলিয়া গিয়া আমাদের প্রাণ বাহির করিয়া দিতেছে। রোগের ঔষধ জানা আছে,—দুঃখের বিষয় প্রয়োগের উপায় অন্যের হাতে।

সমুদ্র-সৈকতের অসীম শোভার মায়া ত্যাগ করিয়া পরদিন প্রত্যাবর্ত্তনের পথে যাত্রা করিলাম। ধনুষ্কোটি হইতে একবারে মদুরায় আসিলাম,—পথে রামেশ্বরে আর নামি নাই। সিংহলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রামেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী মণ্ডপম্ ষ্টেশন হইতে হেল্‌থ সার্টিফিকেট লওয়া হয় নাই বলিয়া যাইতে পারিলাম না। পবন-নন্দনের পন্থা অনুসরণের সাধ্য ছিল না,—তাই লঙ্কা দর্শন ঘটিয়া উঠিল না।

'মদুরা' নামটি, 'মথুরা'র প্রকারান্তর মাত্র। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ইহা দ্বিতীয় সহর—লক্ষাধিক লোকের বাস। এখানকার মন্দিরের মত দেবালয় বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এই মন্দিরে আরতির পূর্ব্বে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দশ হাজার প্রদীপ জ্বালা হয়; আর পর্ব্ব-উপলক্ষে এক লক্ষ প্রদীপ জ্বলে। সুন্দরেশ্বর শিবলিঙ্গ ও মীনাক্ষীদেবী মন্দিরমধ্যে অধিষ্ঠিত। 'স্বর্ণপদ্ম পুষ্করিণীর' বামপার্শ্ব দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সুবর্ণমণ্ডিত মন্দির-চূড়ার অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। দেবতার অলঙ্কার ও দেবালয়ের তৈজসপত্র দর্শনীয়। তৈজসপত্রের মূল্য পঞ্চাশ হাজার ও মণিমুক্তাদির মূল্য প্রায় দেড়লক্ষ টাকার অধিক। মন্দিরের গগনস্পর্শী প্রবেশদ্বার, যাহাকে এ দেশে গোপুরম্ বলে—তাহার কারুকার্য্য এবং সহস্রমণ্ডপের ৯৯৭টি স্তম্ভের শিল্পচাতুর্য্য দর্শনে বিস্ময়ে আত্মহারা হইতে হয়। হিন্দুরাজা তিরুমল নায়ক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মদুরা নগরীকে সুন্দর নয়নাভিরাম সৌধমালায় সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরাট প্রাসাদের অন্তঃপুরে আজ ইংরেজের আদালত বসিয়াছে;—কালের কি বিচিত্র গতি!

মদুরা হইতে ত্রিচিনাপল্লী হইয়া শ্রীরঙ্গমে গেলাম। মন্দিরের প্রাকারের ভিতরেই সহরটি অবস্থিত। ত্রিচিনাপল্লী-ফোর্ট ষ্টেশনে নামিয়া যাওয়াই সুবিধা;—পথে যাইতে যাইতে গিরিশিখরস্থিত দুর্গটি চোখে পড়িয়াছিল এবং এই দেশ জয় করিবার সময় ক্লাইব যে বাড়ীতে ছিলেন, সেটিও দেখিয়াছিলাম। শ্রীরঙ্গম মন্দিরের ধনসম্পত্তি অতুল—পৃথিবীর মধ্যে ইহার ধনসম্ভার তৃতীয়স্থান অধিকার করে। সোণার ছাতা লইয়া স্বর্ণকলসে হস্তীপৃষ্ঠে করিয়া দেবতার জন্য কাবেরী হইতে জল আনা হয়। রীতিমত তিলক কাটিয়া হস্তীটিকেও পরম বৈষ্ণববেশ ধারণ করানো হয়। পূর্ব্বে হিন্দু-বিস্কুট, হিন্দু গরম চা, এমন কি মেডিকেল কলেজের সম্মুখে হিন্দু-পাঁটার মাংসের কথাও শুনিয়াছিলাম; এতদিন পরে দেবতার জলবাহী তিলক-কাটা পরম-বৈষ্ণব হিন্দু-হস্তী দেখিয়া মনে-মনে যে একটু বিস্ময় অনুভব করি নাই, এমন নয়।

দুকূল প্লাবিয়া খরস্রোতা কাবেরী বহিয়া যাইতেছে—সহস্র-সহস্র যাত্রী কাবেরীস্নান করিয়া নিজেকে পবিত্র করি-

তেছে। কাবেরীর বিশাল ভীমকান্ত সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই যেন চিত্তের সকল পাপ মুছিয়া দেয়। আমরা পথে কাবেরী-স্নান সমাপন করিয়া ত্রিচিনাপল্লীতে ফিরিয়া আসিলাম। গবর্মেণ্ট-টেলিগ্রাফ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত প্রমথ নারায়ণ বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

কাঞ্চির পথে চিঙ্গলপতে একটী মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। চিঙ্গলপতে জনকয়েক মাদ্রাজী আসিয়া তাড়াতাড়ি আমাদের মালপত্র উঠাইয়া দিয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবুকে গাড়ীতে সসম্মানে বসাইয়া দিলেন এবং একটু সরিয়া আসিয়া আমাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনিই তো বাবু মতিলাল ঘোষ। আমি শুনিয়াও যেন শুনিতেছি না, এই ভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গাড়ী ছাড়িবার সময় উত্তর দিলাম, 'না'। তখন বেচারীরা একটু অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেলেন।

ছবিতে চেহারা দেখিয়া তাঁহাদের এ ভ্রম হইয়াছিল; অবশ্য সাদৃশ্য যে কিছু ছিল না, তাহা নয়। যাহা হউক, সে সাদৃশ্য সেই দূর বিদেশে আমাদের বেশ কাজে আসিয়াছিল। এ দেশে 'পত্রিকার' উপর লোকের খুব অনুরাগ।

প্রমথবাবুর আতিথ্যে পরম পরিতোষ লাভ করিয়া সেই দিনই কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। শাস্ত্রে বলে—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতাঃ মোক্ষদায়িকাঃ॥

কাঞ্চী দাক্ষিণাত্যের বারাণসী। শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণু-কাঞ্চী, দুইভাগে সহরটি বিভক্ত। "নগরীষু কাঞ্চী" এ কথা খুবই সত্য। সহরের রাস্তাগুলি সোজা-সোজা এবং লম্বা ও চওড়ায় যথেষ্ঠ,—বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; দুই ধারে নারিকেল ও অন্যান্য গাছের সারি দেখিতে বড়ই সুন্দর। যাঁহারা কাশীর বাঙালীটোলা অথবা দিল্লীর পুরাণো দিকটার অসূর্য্যম্পশ্যা গলিগুলি দেখিয়াছেন—তাঁহাদের বিবেচনায় কাঞ্চী অমরাপুরী বলিয়া বোধ হইবে। এখানকার মন্দির-গুলির মধ্যে পাথরের গায়ে হাজার হাজার অনুশাসন সংস্কৃত, তামিল প্রভৃতি ভাষায় লেখা রহিয়াছে। কানাক্ষীদেবীর প্রাঙ্গণে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সমাধি আছে। সমাধির উপরে তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরসমূহে লক্ষ-লক্ষ টাকার ধনরত্ন রহিয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে—গঙ্গাগোপাল রাও নামক রাজা বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ঐ দেশের একজন শেঠ একটি মন্দির মেরামতের জন্য দশলক্ষ টাকা দিয়াছেন,—এখনও কাজ চলিতেছে। কাঞ্চীর নৃসিংদেব ও বামন অবতারের মূর্ত্তি বিস্ময়জনক। বামনমূর্ত্তি কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত, প্রায় ২০ ফুট উচ্চ হইবে;—তাহার ভাস্কর্য্য অতুলনীয়। এখানকার পাণ্ডাদের অনেকে ইংরাজী, হিন্দী প্রভৃতি বেশ বলিতে পারেন। আমাদের অন্যতম সঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাজার করিতে দিবার সময় চাল, ডাল, হাঁড়ি প্রভৃতির সঙ্গে কিছু 'লেড়কী' আনিবার আদেশ দিতেছিলেন; পাণ্ডা-ঠাকুর বাজার হইতে কেমন করিয়া 'লেড়কী' আনিবেন ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছেন, এমন সময় আমরা হাসিতে-হাসিতে বুঝাইয়া দিলাম যে 'লকড়ী' আনিলেই হইবে—লেড়কী নয়।

কাঞ্চীতে তিনটি বেদের পাঠশালা আছে। এখনও এমন একজন পণ্ডিত আছেন, যাঁহার না কি সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ। আর একজন বড় পণ্ডিতের সহিত সংস্কৃতে আলাপ হইল—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করেন না শুনিয়া তিনি অবাক্ হইলেন। আমাদের বাসার সম্মুখেই একটি বেদের পাঠশালা ছিল—ছাত্রগণের অধ্যয়নের সুরটা ঠিক বর্ষাকালের ব্যাং ডাকার মতই বোধ হইত।

কাঞ্চী হইতে মাদ্রাজ হইয়া পুণ্যতোয়া গোদাবরীতে উপস্থিত হইলাম।—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলম—"অস্তি গোদাবরী তীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ"—চারিদিকে নানা বৃক্ষ দেখিলাম, কিন্তু শৈশবের স্মৃতি-কল্পিত সেই বিশাল শাল্মলীতরু দেখিতে না পাইয়া নয়ন যেন হতাশভাবে ফিরিয়া আসিল।

গোদাবরীর ডিষ্ট্রীক্ট-মুন্সেফ মহাশয়ের পুত্রের সহিত পূর্ব্বে ট্রেণে আলাপ হইয়াছিল। তিনি আসিয়া ষ্টেশন হইতে আমাদিগকে লইয়া গিয়া পরম সমাদরে আতিথ্য সম্পাদন করিলেন। গোদাবরীর পুলটি লম্বায় পৌনে দুই মাইল,—ভারতের মধ্যে ইহা তৃতীয়-স্থানীয়। পথে রাত্রির অন্ধকারে কৃষ্ণার পুল পার হইয়াছিলাম—কৃষ্ণার সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়। দুধারে পাহাড়, মাঝখান দিয়া বেগবতী

প্রবাহিত। গোদাবরীতে স্নানাদি করিয়া একবারে পুরী আসিলাম;—পথে ওয়াল্টেয়ারে নামিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দৈব-দুর্য্যোগে ঘটিয়া উঠে নাই।

এখন মাদ্রাজের সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটী কথা বলিব। বাঙালীরা প্রায়ই এদিকে আসেন না;—তাহার প্রধান কারণ, ভাষা ও খাদ্য। অবশ্য যাঁহারা ইংরেজী জানেন তাঁহাদের অনেকটা সুবিধা। মাদ্রাজের উত্তরে তেলেগু এবং দক্ষিণে তামিল ভাষা প্রচলিত। তামিল অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা। তেলেগু ভাষা অত্যন্ত শ্রুতি-কটু। কিন্তু নিজের ঘোল যেমন কেহ টক বলে না—সেইরূপ তেলেগুরাও তাহাদের ভাষাকে শ্রুতিকটু বলে না। মাদ্রাজে ধর্ম্মশালায় এক ভদ্রলোক এমন কি তেলেগুকে most musical language বলিয়া ফেলিলেন। অবশ্য যখন তিনি ও তাঁহার ভগিনী সজোরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন, তখন আমরা ভাবিলাম কি এক অনর্থই বা ঘটিয়াছে,—হয় ত বা দুজনে বিষম ঝগড়া বাধিয়াছে। তখন তাঁহাদের মুখে মধ্যে-মধ্যে হাসি না দেখিলে, হয় ত আমরা সেই most musical language শুনিয়া পুলিস ডাকিতে বাধ্য হইতাম। এক ভদ্রলোক ট্রেণে গান ধরিয়াছিলেন; গানের দুটি লাইনের শেষ কথা দুটি বুঝিতে পারিয়াছিলাম—প্রথমটি 'জাভা' দ্বিতীয়টী 'তাভা'। কবিত্ব সহজেই অনুমেয়! ঘণ্টাখানেক বৃষভ-বিনিন্দিত ভৈরবীসুরে গান চলার পর আমরা তাঁহাকে সঙ্গীতসুধা পান হইতে বিরত করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কথায় বলে, "ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি!" What is play to you is death to us;—জানি না, আমাদের ভাষাটা উঁহাদের কাণে কেমন লাগে।

তামিল ভাষা শুনিতে তত মধুর না হইলেও, তামিল গানগুলি বড় মিষ্ট। ট্রেণে এক ভিখারিণী তামিল-যুবতী ছোট একটী ছেলে কোলে করিয়া এমন একখানি গান গাহিয়া গেল, যাহার মিষ্ট-মধুর করুণ সুরটি আজো যেন কাণে লাগিয়া রহিয়াছে। একবর্ণও বুঝি নাই—কিন্তু সুরটি আজো ভুলিতে পারি নাই। আরও একটি বালককে গাহিতে শুনিয়াছিলাম—সে গানটিও বড় মধুর লাগিয়াছিল! কুল্পী বরফের হাঁড়ী নাড়া দিলে যেমন শব্দ হয়, এ দেশের ভাষার ধ্বনিও তদ্রূপ বলিয়া এক ভদ্রলোক উপমা দিয়াছিলেন। এটি ঠিক [illegible] উপমা না হইলেও ব[illegible] realistic হইয়াছে। এই ভাষায় ট, ঠ, ড, ঢ প্রভৃ[illegible] ধ্বনির অত্যন্ত আধিক্য। প্রাচীন আর্য্যভাষায় এই ধ্বনি ছিল না,—পরে অন্‌আর্য্য (১) সংস্রবে যে ইহা আসিয়াছে সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। তামিল ভাষার ব্যাকরণ [illegible] বাক্যবিন্যাস-পদ্ধতির সহিত বাংলার যথেষ্ট মিল আছে আমাদের সহিত দ্রাবিড় জাতিরও সভ্যতার যে এককালে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—হয়তো আমরা তাহাদেরই বংশধর—নানা কারণে ইহা খুব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। আমরা কতকগুলি এদেশী কথা শিখিয়াছিলাম, তন্মধ্যে ভিখারী তাড়াইবার ও গাড়োয়ানকে চলিবার জন্য "পো [illegible] সিগ্রম্ পো" প্রায়ই ব্যবহার করিতাম। ইহার মানে '[illegible] যা।" সিগ্রম্ কথাটি সংস্কৃত, শীঘ্রমের রূপান্তরমাত্র।

এখন খাদ্যের কথা বলিব। পেঁয়াজ, লঙ্কা, নেবু, কলা নারিকেল এদিকে খুব পাওয়া যায়। ছানা এ দেশের লোকে তৈরী করিতে জানে না। মিষ্টি খাবার প্রায়ই পাওয়া যায় না। মাদ্রাজী হোটেলের লঙ্কা ও টকের চোটে বাঙালীর প্রাণ বাহির হইয়া আসে। বাঙালীর মত নানা সুব্যঞ্জনে রসনার পরিতৃপ্তি করিতে অন্য জাতি পারে না এবং বাঙালীর মত অজীর্ণ রোগেও নিরন্তর ভুগিতে অন্য জাতি জানে না।

তীর্থস্থানগুলি প্রায়ই বড়-বড় সহর—সবগুলিতেই সুন্দর সুন্দর ছত্রম্ আছে; বিনা ভাড়ায় সেখানে তিন দিন থাকিতে পাওয়া যায়। নিজেদের রান্নার বন্দোবস্ত করিয়া লওয়াই ভাল। এদেশে জিনিসপত্র বড় মহার্ঘ। রামেশ্বরে টাকায় দেড়সের চাল, দশ আনা সের দুধ, এবং ছয় আনায় একটি মাটির হাঁড়ি কিনিয়াছিলাম। অন্যত্র অবশ্য দু'সের, আড়াই সের দর—তবে সের ১০৫ তোলার ওজন। চালের অনুপাতে অন্যান্য জিনিসও মহার্ঘ। গোদাবরীতে এক প্রকার বাতাবী লেবু পাওয়া যায়—খুব সুস্বাদু। এখানকার কলাও খুব মিষ্ট।

মাদ্রাজে চায়ের তত চলন নাই—'পাল্‌কাফী' অর্থাৎ দুধ-কফীর খুব চলন;—একপ্রকার পিতলের পাত্রে দেওয়া

(১) "অনার্য্য" শব্দটির সঙ্গে একটি বদ্ গন্ধ জড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পদানুসরণে "অন্ আর্য্য" লিখিলাম।

হয়। 'বিড়বিড় পালু' অর্থাৎ গরম-গরম দুধ—সে বরফের মত ঠাণ্ডাই হোক, আর যাই হোক—এবং ইট্‌লী নামক এক প্রকার পিঠা এদেশের ষ্টেশনগুলিতে পাওয়া যায়। Coffee club অসংখ্য ;—সকলগুলিতেই লেখা—Best coffee club,—কাজেই সস্তা দরে খারাপ কফিক্কাব পাইবার জো নাই। Superlative ডিগ্রির এমন অপব্যবহার আর কোথাও দেখা যায় না!

এদিকে সরিসার তেলের ব্যবহার নাই—নারিকেল ও তিলের তেলেই কাজ চলে। স্ত্রী-পুরুষ কেহই প্রায় তেল মাখে না। পুরুষদের কাপড়ে কাছা নাই ; চাদর গায়ে, পায়ে জুতা নাই। তেলেগুদেশে একটু কাছা আছে। Sandal জুতার চলনই দেখা যায়—পুলিশ কনষ্টেবলরাও স্যাণ্ডাল পায়ে দেয়। খালি পায়ে, নেকটাই গলায় এবং টুপি মাথায় প্রকাণ্ড টিকিওয়ালা লোক এদেশে অনেক দেখা যায় ;—তাহা দেখিয়া, দেশটা যে বালি-সুগ্রীবের রাজ্য ছিল, সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এত হইলেও, মাদ্রাজ বাংলার মত anglicised হয় নাই। এখনো বিদ্যাসাগরী ফ্যাসানে চুল না কাটিলে এবং দেশীয় আচারপদ্ধতি না মানিলে, উচ্চবর্ণের মধ্যে সমাজচ্যুতি হয়। এদেশে সকলে পেঁয়াজ খাইলেও, নিষ্ঠাবান উচ্চশ্রেণীর লোকে মাছ-মাংস-পেঁয়াজ প্রভৃতি খান না।

মাদ্রাজের সধবা স্ত্রীলোকেরা প্রকাণ্ড রঙীন কাপড় কাছা দিয়া পরে। বিধবারা মাথায় কাপড় দেয় ও সাদা কাপড় পরে। সধবারা মাথায় কাপড় দেয় না—খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া কেশের কত বিচিত্র বিন্যাস করে। মালাবার প্রদেশের নায়ার জাতির মধ্যে মেয়েলোকের উৰ্দ্ধাঙ্গে কাপড় দেওয়ার প্রথা নাই,—তাঁহারা অনাবৃত বক্ষেই বিচরণ করিয়া থাকে। নায়ার পরিবারে ভ্রাতা এবং ভগিনীই কর্ত্তা। ছেলে মামার নামে পরিচয় দেয়, এবং মামার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এই সমাজেই ভারতের উজ্জ্বল মণি স্যার শঙ্করম্ নায়ারের জন্ম। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও নায়ার সমাজের ব্রাহ্মণবংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, শোনা যায়।

রামেশ্বরের দিকের স্ত্রীলোকগুলি দেখিলে অন্ধকারে শূর্পনখাজাতীয়া বলিয়াই ভ্রম হয়। ইহারা কাণে প্রকাণ্ড এক ছিদ্র করিয়া গুরুভার বিচিত্র রকমের গহনা পরিয়া থাকে। দেখিয়া বুঝিলাম, এত থাকিতে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাক-কাণ কেন কাটিয়া দিয়াছিলেন।

বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পের জন্য মাদ্রাজ বিখ্যাত। কাপড়, চাদর, সাড়ী—এক-একখানির দামও অনেক, দেখিতেও বড় সুন্দর। তেলেগুপ্রদেশে পুরুষেরা কাণে ফুল ও হাতে নিরেট সোণার বালা পরে। এদেশের অধিকাংশ লোকের স্বাস্থ্য ভাল এবং বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। ফরসা লোক বোধ হয় তিন হাজার মাইলের মধ্যে ত্রিশটি দেখিয়াছিলাম কি না সন্দেহ। তবে মেয়েদের রং প্রায়ই তেমন কালো নয়।

জাতিভেদের কঠোর শাসনে এখানকার সমাজ নিতান্ত পীড়িত। পঞ্চম নামক জাতি হিন্দুর চারি বর্ণের বাহিরে বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণিত হয়। অবশ্য সহরে তাহাদের উপর তেমন অত্যাচার নাই ;—কিন্তু মফস্বলে ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করে। পথে চলিবার সময় ব্রাহ্মণগণকে সাবধান করিবার নিমিত্ত ইহাদিগকে চীৎকার করিতে-করিতে যাইতে হয় ; কারণ, ইহাদের ছায়া মাড়াইলেও পবিত্র ব্রাহ্মণের জাতি যায়! দৃষ্টি পড়িলেও ব্রাহ্মণের আহার উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়! কিছুদিন পূর্ব্বে একজন 'পেরিয়া' এক ব্রাহ্মণের পুকুরের নিকট দিয়া গিয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণ তাহার নামে আদালতে নালিশ করে যে, তাহার পুকুরের জল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মকদ্দমার ফলাফল জানিতে পারি নাই। ইহা দেখিয়া ভাবি, what man has made of man! আমরা আবার হোমরুল চাই—রেলগাড়ীতে Reserved for Anglo Indians দেখিলে চটিয়া অস্থির হই! জানি না, কবে এই don't touchismএর পর্ব্ব শেষ হইবে!

আমার গোঁফদাড়ি দেখিয়া অনেকে মুসলমান বলিয়া সন্দেহ করিত ; তাই মন্দির প্রবেশে বাধা পাইয়া, অকালে শ্মশ্রু-গুম্ফের মায়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অব্রাহ্মণগণ মন্দিরের ভিতর দেবতার নিকটে যাইতে পারে না—একগাছা উপবীতেই সে অধিকার পাওয়া যায়। সেজন্য মনে হইয়াছিল, কায়স্থ, গোয়ালা, যোগী প্রভৃতি জাতি পৈতা লইয়া ভালই করিতেছেন। তবে দেশে এই মহান্ বস্ত্র-সমস্যার দিনে এইরূপ সংস্কার ভাল কি না, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য!

আসিবার সময় রামেশ্বরে আমাদের পরিচারিকাকে চারি

আনা বক্‌সিস দিয়াছিলাম। ধর্ম্মশালায় এক ভিক্ষুক অলস ব্রাহ্মণী ছিল, অনেক বিরক্ত করাতে তাহাকে এক আনা দিয়াছিলাম বলিয়া সে আমাদিগকে যমলোকের কত ভয় দেখাইয়াছিল—পরিচারিকা শূদ্রাণীকে চারি আনা আর অলস ব্রাহ্মণীকে এক আনা দেওয়াতে যে আমাদের ঘোর অধর্ম্ম হইল, ইহা বুঝাইতে সে কত শাস্ত্রের প্রমাণই না উপস্থিত করিল। আমরা কিন্তু সে ভয়ে সাদাবুদ্ধির শাস্ত্রটা ভুলি নাই।

এই যুক্তিহীন অন্ধ-বিশ্বাসই আমাদের জাতির কাল হইয়াছে। পুরীতে দেখিয়াছি সহস্র-সহস্র দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরন্ন কঙ্কালসার ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট্‌ করিতেছে। তাহাদের মুখে জল দিবার লোক নাই, কিন্তু ধর্ম্মের ষাঁড়-গুলিকে পয়সা দিয়া ঘাস কিনিয়া 'গোগ্রাস' প্রদান করিতে কত যাত্রী ব্যস্ত এবং এই সকল জীবের সমধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলি অত্যাহার-পীড়িত পেশাদার জুয়াচোরকে ভোজন করাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে আরো কত জনে ব্যগ্র। কিন্তু হায়, দরিদ্র-নারায়ণের ক্ষুধিত উদরে একবিন্দু জলও কেহ দিতেছে না। কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"যদি ক্ষুধাতুরে অন্ন নাহি পায়, তবে আর কিসের উৎসব
যদি দেয় কাটাইয়া ম্লানমুখে বিষাদে দিবস, তবে মিছে
সহকার শাখা, তবে মিছে মঙ্গল-কলস।"

অন্ধ-বিশ্বাসে আমাদের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়াছে—তাই আমাদের এই শোচনীয় অধোগতি। শ্রীবুদ্ধের ভারতে বিবেকানন্দের-বাণী এখনো কেহ শুনিল না—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু—সর্বভূতে সেই প্রেমময়
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন পূজিছে ঈশ্বর।"

যাহা হোক, জাতিভেদের ভীষণ কারাগার মাদ্রাজ হইতে পুরী আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। উদার নীলাম্বুধিতীরে অবস্থিত জগন্নাথক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে ভেদ নাই—এখানে এখনো একপাত্রে ব্রাহ্মণ শূদ্রে আহার করে—এখানকার দেবতা মূর্ত্তিহীন বলিলেই হয়;—কবে এই অমূর্ত্ত, অখণ্ড, অভিন্নের পূজক হইয়া মানবের সকল তীর্থ জগন্নাথ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া বিশ্বমৈত্রী এবং করুণার ধারায় পূত হইবে জানি না! জানি না, কবে সেই তীর্থের পূজারির আহ্বান কবির কথায় ধ্বনিত হইয়া উঠিবে—

"এস হে আর্য্য এস হে অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খ্রীষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন,
ধরি হাত সবাকার।
এস হে পতিত কর অপনীত,
সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গল-ঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা,
তীর্থ নীরে,
এই ভারতের মহামানবের,
সাগর-তীরে।"

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

৪৪

জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগে একদিন একটা বৃষ্টিশূন্য ঝড়ের অবসানে, আসবাবপত্রের ধুলাঝাড়া লইয়া চাকরদের সহিত বকাবকি করিয়া, তিক্ত-বিরক্ত চিত্তে ব্রজরাণী নিজেই উহাদের হাত হইতে ঝাড়ন লইয়া, কেমন করিয়া ঝাড়িতে হয়, দেখাইয়া দিবার জন্য বিশেষ-বিশেষ স্থানগুলির ঝাড়াঝুড়ি স্বহস্তে করিতে লাগিয়া গেল। চতুরিয়া, বিষণা, বেহারি প্রভৃতি চাকরের দল কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া, শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিয়াও যখন কর্ত্রীঠাকুরাণীকে শিক্ষকতা হইতে নিবৃত্ত হইতে দেখিল না, তখন তাহারা একে-একে গৃহান্তরে, কেহ বা কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল। যে ঘরটার সম্মার্জ্জন লইয়া চাকর-মনিবে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেটা অরবিন্দের বসিবার ঘর, এবং এই ঘরটিই খাস করিয়া তাহার নিজের। এই ঘরটাতেই তাহার দিনের মধ্যের অন্ততঃ তিনভাগ সময় কাটে। ব্রজরাণী চিরদিন কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছে। চাকর-দাসীর চরিত্র বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। কর্ত্তা বা কর্ত্রী—যাহার প্রকৃতি কিছু ঠাণ্ডা, ইহারা আড়ালে দশের কাছে তাহার খ্যাতি বাড়ায় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ইঁহার ভাগেই ফাঁকি চালায়। অরবিন্দ হাজার ত্রুটী পাইলেও, কাহাকেও কখনও মুখ ফুটিয়া একটা কথা পর্য্যন্ত বলে না; সেইজন্য মনিবের মতন অমন মনিব কি আর আছে; এ কথা গর্ব্বের সহিত বলিয়া বেড়াইলেও, তাহার ঘরে যদি সাত মণ ধূলা জমিয়া থাকে, তাহার গামছায় যদি চিটা পড়ে, বা জুতাগুলায় ছাতা ধরে, সে সব কাজ করিতে উহাদের আলস্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ব্রজরাণীর বেলায় পান হইতে চূণটুকু না খসে, এজন্য সকলেই সদা-সর্ব্বদা তটস্থ। ব্রজরাণী এ সমস্তই দেখিতে পায়; দেখিয়া সে যৎপরোনাস্তি রাগও করে। চাকরদের এবং তাহাদের কর্ত্তৃত্ব-শক্তিতে খর্ব্বতাপ্রাপ্ত, অকর্ম্মা মনিব উভয় পক্ষই তিরস্কৃতও হয়। কিন্তু স্বভাব কোন পক্ষেরই সংশোধিত হয় না। নিরুপায়ে ব্রজরাণী যতটা পারে নিজেই উহার ঘরদ্বার বিছানা-বস্ত্রের তদারক করিয়া বেড়ায়। আজও তাই এই এত বড় তিনতালা বাড়ীটার সর্ব্বত্র ছাড়িয়া ইঁহার ব্যবহৃত ঘর কয়টারই তদ্বির করিতে আসিয়া দেখিল—এই ঘরটায় সে সচরাচর আসে না বলিয়াই বোধ করি সেই ভরসাতে চাকর মনিবের মিলিত চেষ্টায় ফলে এটার যে অবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার জন্য আজিকার এই ঝড়কে দায়ী করিতে গেলে, সে যে কত বড় মিথ্যা অপবাদ রটনা করা হয়, তা যাহারা অম্লানমুখে সে কথা বলিয়া গেল, তাহারাও বুঝে। ঘরের চারিদিকের কোণে-কোণে, আলমারি কৌচের পাশে-পাশে ধূলায় জাল পড়িয়া গিয়াছে। আলমারির বইগুলার মাথা দশখানার বা সোজা আছে, আবার তিনখানার বা উল্টা দিকে নামান; কাগজ ফেলা ঝুড়িটা ভরিয়া গিয়া, ছেঁড়া খাম, খবরের কাগজ, মাসিক-পত্রিকার মোড়ক, শীলভাঙ্গা গালা ছাপাইয়া পড়িয়াছিল,—ঝড়ে উড়িয়া এক্ষণে ঘরময় ছড়াছড়ি হইয়া গিয়াছে। লিখিবার টেবিলের উপর আঁটা সবুজ বনাতটা নিজের গাঢ় সবুজত্ব হারাইয়া ধূলায় ধূসর হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর ছড়ান নাই, বোধ করি এমন কোন জিনিসই সংসারে নাই। দোয়াত প্রায় পাঁচটা জড় হইয়াছে, তার মধ্যে গোটা তিনেক কালিহীন। কলমের সংখ্যার অনুপাতে নিবের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। ত্যক্ত চিত্তে চারিদিকের গোছ-গাছ সমাধা করিয়া তুলিয়া, টেবিলে বিক্ষিপ্ত চিঠিপত্রগুলা বাছিয়া-বাছিয়া চিঠির ফাইলে গাঁথিয়া দিতে গিয়া, একখানা খামের লেখায় হঠাৎ তাহার চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া পড়িল। চিঠিখানা হাবড়ার বাড়ী হইতে ঠিকানা কাটিয়া এখানে আসিয়াছে। ইহার খামের উপর বর্দ্ধমানের ছাপ। তা'ভিন্ন আরও কয়েকটা;—একটা হাবড়ার, একটা এখানের। কাটা খামের মধ্য হইতে পত্রখানা টানিয়া বাহির করিয়া সে চঞ্চল চক্ষে তাহারই উপর চাহিল; বুকের মধ্যটা হঠাৎ তাহার এমনি প্রচণ্ড বেগে দুলিয়া উঠিয়াছিল, যে,

তাহারই আবর্ত্তে চোখের দৃষ্টিও কিছুক্ষণের জন্য যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। চিঠিখানা এই—

"প্রণামা শতকোটি নিবেদনমিদং

আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না, আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছি। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আর অধিক কি লিখিব। এখানের সমস্ত কুশল। ইতি সেবক শ্রীঅজিতকুমার বসু।"

চিঠিখানা পাঠ শেষে ব্রজরাণী সেখানা হাতে করিয়া অনেকক্ষণই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু বাহিরে স্তব্ধ থাকিলে কি হইবে, এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহারই ঘরকন্নার জিনিস্পত্র উলোটপালট করিয়া দিয়া যেমন করিয়া ঝটিকা বহিয়া গিয়াছিল, সেই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নের আগুনে হাওয়ার অনুকল্পে তাহার মধ্যেও তখন একটা উন্মত্ত ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রথম হইয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে, সেই নবকিসলয়তুল্য সুন্দর কিশোর, বিদ্যার গরিমায় দীপ্ত সমুজ্জল মুখে মনোরমাকেই তো 'মা' বলিয়া ডাকিতেছে! আজ এতক্ষণে পুত্রগৌরবে মনোরমার বুকটা যে কতখানিই ভরিয়া উঠিয়াছে, নিজের বুকের এই আকস্মিক অভাবনীয় শূন্যতা হইতেই সে ইহা কল্পনা করিয়া লইয়া, যেন অসহনীয় একটা তীব্র যন্ত্রণা বুকের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল। চেনা-অচেনা সবাই তো আজ রত্নগর্ভা বলিয়া সেই সৌভাগ্যবতীর অভিনন্দন করিবে। দরিদ্র-কুটীরে আজ কত উৎসব! আর তাহার এই এতবড় রাজপ্রাসাদ—এ যে নিরানন্দভরা, চির-অন্ধকারময়। তাহাকে গৌরবান্বিত করিতে আজ কেহ কোথাও নাই! এইখানে রাণীর গৌরবের মাঝখানেও সে যে ভিখারিণী!

চিঠিখানা যেখানকার সেইখানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু মনটাকে ব্রজরাণী আর সেদিন সেখান হইতে নড়াইয়া আনিতে পারিল না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া কেবল সেই দুই বর্ষাধিক পূর্ব্বে দেখা মুখখানি মনে পড়ে, আর চিঠির কথাগুলা বুকের মধ্যে আসিয়া ঘা দেয়। একবার ইহাও তাহার মনে হইল, যে, হে ভগবান! ওই ছেলেটাকে কেন আমার পেটে একটু জায়গা দিলে না? আবার নিজের কাছে নিজেই লজ্জায় রাঙিয়া এ চিন্তার সুখ-প্রলোভনটুকু চাপা দিয়া ফেলিতে হইল। কে যেন হৃদয়-গুহায় অন্ধকার কোণ হইতে তাড়না করিয়া কহিয়া উঠিল, তার স্বামী নিয়েও তোর মন উঠেনি? ঐটুকু শেষ বাঁধনও তার, তুই রাক্ষসী খসিয়ে নিতে চাস্ না কি?

অরবিন্দ কি একটা বৈষয়িক কার্য্যে দুদিনের জন্য ভাগলপুরে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিলে, দু'একদিন ইতস্ততঃ করিয়া এক সময় দ্বিধার নিষেধ সরাইয়া ফেলিয়া ব্রজরাণী হঠাৎ এই কথাটা তুলিয়া বসিল। বলিল, "অজিত ফার্ষ্ট হয়ে পাশ করেছে।" বলার ধরণে, এই কথাটা সে জিজ্ঞাসা করিল, অথবা জানাইল,—ঠিক করিয়া বুঝা গেল না। অরবিন্দ শুনিয়াও যেন শুনে নাই, এম্নি করিয়া থাকিয়া পূর্ব্বের মতই আহার করিতে লাগিল। ব্রজরাণী তাহার নিরুত্তর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "সে এইবার কল্‌কেতায় এসে পড়বে বোধ করি?" অরবিন্দ তাহার প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া জবাব দিল, "বর্দ্ধমানেও একটা কলেজ আছে যে।" "সে তেমন ভাল কলেজ নয়। এমন ভাল করে পাশ হয়ে কি আর সে কলেজে সে পড়বে।"

ইহাও ঠিক প্রশ্ন নয়। অরবিন্দ আপন মনে খাইয়া যাইতে লাগিল, জবাব দিল না।

এ কয়দিন ব্রজরাণী রাত্রিদিন ধরিয়াই ভাবিয়াছে। ভাবিতে গিয়া নিজের মাথার মধ্যে আগুন ধরাইয়া দিয়া, কতই না সম্ভব-অসম্ভব কল্পনার জালই সে বুনিতে বসিয়া গিয়াছিল; সে সবের একটুখানি আভাষও যদি বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তো, লোকে তাহাকে পাগল বলিতে দ্বিধামাত্র করিবে না। কতবার তাহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এইবার অজিতের পিতা নিশ্চয়ই তাহাকে এইখানে নিজের কাছে লইয়া আসিবেন। তা ছেলে যখন আসিল, তখন ছেলের মা-ই বা না আসিবেন কেন?—বিশেষ, যেমন-তেমন মা নয়,—অমন ছেলের মা। তার মর্য্যাদা কি আজ পুত্রের মর্য্যাদায় মিলিয়া শতগুণেই বাড়িয়া উঠে নাই? চাহি কি, ভাগলপুরে যাওয়া একটা অছিলা,—আসলে উনি স্ত্রী পুত্রকে আনিতেই গিয়াছেন।

আচ্ছা, ব্রজরাণী তখন কি করিবে? যেমন আধুনিক দু'একখানা উপন্যাস বা ছোট গল্পে সপত্নী-প্রীতির ঢেউ উঠিয়াছে, তেম্নি,—না, সেকালের সেই বগী-বিন্দির মত চুলাচুলি করিতে-করিতে সতীন লইয়া ঘর-কন্না করিতে বসিয়া যাইবে? মনে করিতেই, দারুণ বিতৃষ্ণায়, বিরাগে মন ভরিয়া উঠিল। বিশেষতঃ, ছোট বয়সে ঝগড়া করাও

সাজে, আবার 'পিরিতি' করাও চলে ;—এ বয়সে কাঁচিয়া ও-দুটার একটাও আর চলে না। মরিয়া গেলেও সতীন লইয়া ঘর সে করিতে পারিবে না। স্বামী তাহাকে মনে-মনে ভালবাসেন মনে হইলে, কত সময়ে তাহার এমনও মনে হইয়াছে যে, ঐ মনটা যদি কোন পদার্থ হইত, তো, সেটাকে সে নির্দ্দয় হস্তে ছিঁড়িয়া আনিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিত ; এবং এই একমাত্র উপায়েই সেই অবিস্মৃতার গুপ্ত স্মৃতি সে ইহার হৃদয় হইতে লুপ্ত করিতে যদিই প্যারিত। তদ্ভিন্ন স্বামীর সেই প্রিয়তমাকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়া সে দৃশ্য চোখ মেলিয়া বসিয়া দেখিতে পারে, এত উদারতা তাহার মধ্যে নাই। তা'এর জন্য তাহাকে যে যা বলিতে হয় বলুক!

কিন্তু—! কিন্তু কি? সে নিজেও বুঝি ভাল করিয়া বুঝিতেছিল না যে এ কিন্তুটা কি? এবং ইহার মূলই বা কোথায়? তাই স্বামীকে ঐ বিষয়ে যথাপূর্ব্ব নীরব থাকিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে কোথায়, তা নয়,—তাহার বুকের মধ্যে অস্বস্তিতে ঢেঁকি পড়িতে লাগিল।

এখন স্বামীর নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ততায় নিজের বক্তব্যটাকে জটিলতর হইয়া উঠিতে দেখিয়া মনে-মনে চটিয়াছিল,—গলার স্বরে খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "তার চিঠিটার জবাব দিয়েছ, না—না?"

অরবিন্দ পাতের উপরকার তপ্‌সে মাছটা টানিতে গিয়া হাত সরাইয়া লইয়া, তাহার উত্তেজিত মুখের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া দেখিল, এবং পুনশ্চ আহারে মনোনিবেশ করিল, কথা কহিল না।

তা কথা না কহিলে কি হয়, স্বামীর সেই এক লহমার সাশ্চর্য্য দৃষ্টিটুকুই যে একশো'টা কথার চাইতে অনেকখানি বেশি, সে কথা না কি ব্রজরাণী জানিত না? মুহূর্ত্তে সে বিদ্যুৎচ্ছটার ন্যায় দৃপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"বলি, পরও তো পরকে একখানা চিঠি লিখ্‌লে তার জবাব দেয়—এটুকুও কি মনে করলে পারতে না? না, আমিই তা'তে দম ফেটে মরে যেতুম।"

অরবিন্দ এবার কথা কহিল ; বলিল, "তুমি মরে যেতে কি না ঠিক জানিনে, কিন্তু আমি এটা পারতুম না। আমি তাদের পরের চাইতেও যে অনেক বেশি পর, সে কি তোমারও জানা নেই?"

"তুমি না' বল্লেই তো আর সত্যিকারের সম্বন্ধটা ফুস্-মন্তরের চোটে হুস্ করে উড়ে যাবে না। জগৎ-শুদ্ধ সবাই তাকে তোমার ছেলে ছাড়া আর কিছু বল্‌বে কি? তুমি পর হ'তে চাইলে কি হবে?"

অরবিন্দ শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "জগৎ-শুদ্ধ সবার সঙ্গেই তো আর আমার কারবার নয়। তুমি তাকে আমার আপন বলে স্বীকার করতে কখন্ চেয়েছ কি? সেই কথাটারই জবাব দাও না?"

এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য যাহাই থাক, ব্রজরাণীর উত্তপ্ত মন ইহাকে নিছক ব্যঙ্গ বলিয়াই ধরিয়া লইল। তাই অপমানে অভিমানে আগুন হইয়া গিয়া সে উত্তর করিল, "সৎ-মায়ে সংসারে অনেক কুকীর্ত্তি করে থাকে,—সে এমন কিছু নতুন কথা নয়; কিন্তু সৎ-বাপ যেমন আমি অজিতের দেখ্‌ছি, এমন আর কোথাও কারও দেখিনি। বেশ ত, তোমার ছেলে, তুমি যদি তার ভাল-মন্দ না দেখ, নাই দেখবে। আমার তো তাতে বড় বয়েই গেল। আমি ধর্ম্ম ভেবেই বলেছিলুম।" এই বলিয়া ব্রজরাণী কাঁদো-কাঁদো হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

অরবিন্দের খাওয়া হইয়াছিল, "এতদিন আমি ভাল-মন্দ না দেখে যদি কেটে গিয়ে থাকে, আজও দিন পড়ে থাকবে না।"—এই কথা কয়টা বলিয়াই উঠিয়া চলিয়া গেল। এ আলোচনা এই পর্য্যন্তই থামিয়া রহিল।

৪৫

ভগবান যাহাকে দিতে ইচ্ছুক না থাকেন, তাহাকে এমনি বঞ্চিত করিয়াই বুঝি দান করেন? অজিতের পরীক্ষার ফল যেদিন জানা গেল, দুর্গাসুন্দরীর অসুখ সেদিন খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। অজিত যখন লাফাইতে-লাফাইতে ঘরে ঢুকিয়া চেঁচামেচি করিয়া বলিয়া উঠিল, "দিদিমামণি! তোমায় একটা সুখবর দিই যদি, তো, কি আমায় দেবে' বলো?" তখন সেইমাত্র একটা শ্বাসকষ্ট হইতে উদ্ধার পাইয়া দুর্গাসুন্দরী ঘন-ঘন হাঁপাইতেছিলেন,—কষ্টে দম লইয়া-লইয়া বলিলেন, "কি দোব, কি আছে দাদু, তোর দিদিমণির মত এত বড় গরীব কি আর এ ভূ-ভারতে আছে রে? তুই পাশ হয়েছিস্ বুঝি?"

অজিত প্রথম উচ্ছ্বাসের মুখে ঈষৎ দমিয়া গিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ফার্ষ্ট হয়েছি।"

সমপাঠী অনেকেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছিল,—আবার ফেলও অনেক ছেলেই করিয়াছে। এই দুই দলের ছেলেই অজিতকে নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিল যে, একদিন ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে। যাহারা পাশ করিয়াছিল, অজিত তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তাহলে তোমরাও তো ভাই, খাওয়াতে পারো ?"

তাহারা বলিল "হ্যাৎ, আমরা না কি আবার পাশ করেছি! ইউনিভারসিটি আমাদের দয়া করে ফাউ দিয়েচে। তোর মতন পাশ করলে আমরা রোজ একশোটা করে বামুন খাওয়াতুম।" অজিত বলিল, "আমরা তা হলে তো ফাঁকে পড়েই যেতুম।" "আচ্ছা, তোরাও না হয় প্রসাদ পেতিস্।"

শেষকালটায় এই রকম বন্দোবস্ত দাঁড়াইল যে, খবরের কাগজে শ্রেণীবিভাগ হিসাবে যাহার নাম যেরূপ আগে, পরে বাহির হইয়াছে, খাওয়ানর ব্যবস্থাও ঠিক সেই হিসাবে হইবে। তা গুণানুসারে বা বর্ণমালা অনুসারে যেদিক দিয়াই ধরা হোক না কেন,—ঘুরিয়া-ফিরিয়া প্রথম ভোজের আয়োজনটা অজিতেরই উপরে পড়ে। অজিত মাকে আসিয়া বলিল, "ছেলেদের একদিন ভাল করে খাওয়াতে হবে যে মা-মণি, কবে খাওয়াবেন বলুন তো ?"

মনোরমা ছেঁড়া কাপড়ে তালি লাগাইতে লাগাইতে কি সব চিন্তা করিতেছিল ; বিষণ্ণ মুখ তুলিয়া বলিল, "সে কি করে হবে অজি, দিদিমায়ের অত অসুখ।"

অজিত মুহূর্ত্তে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল ; কিন্তু নিজের সঙ্কট অবস্থা স্মরণে আসিয়া তাহাকে নিবৃত্ত হইতে দিল না, —সঙ্কোচের সহিত কহিল, "সে ওদের বলেছিলুম, কিছুতেই ওরা শুনতে চায় না যে।"

মনোরমা কহিল, "তা হ'লে একদিন টাকা দুয়ের জলখাবার আনিয়ে দিই, খাইয়ে দে'।"

পুনশ্চ সঙ্কোচের সহিত অজিত জানাইল, "সে রকম খাওয়া তাহারা মানিবে না। সবাই বলে, দুটো স্কলারশিপ পাচ্চিস্, একলাই খাবি, আমরা না হয় দশটা টাকাই খেলুম। একটা দিন বই তো নয়। দিন্ না মা-মণি, একটু ভাল রকম করে খাইয়ে।"

মনোরমা কিছু অপ্রসন্ন হইয়া উত্তর করিল, "ঘরে এত বড় একটা রোগী, অবস্থা তো এই ; যা ক'রে দিন যাচ্চে,—যাক্ এ সব যখন তারাও বুঝবে না, তুমিও না, তখন তাই হবে। বোলো তাদের।"

ইহার পর হইল সবই, কিন্তু অজিতের মনে সুখ আর হইল না। তাহার মুখের হাসি কোথায় মিলাইয়া রহিল, কাজকর্ম্মের উৎসাহ অনেক দূরেই চলিয়া গেল। শিশিরে-ভেজা ফুলের কুঁড়ির মত চোখের পাতার তলায়-তলায় জলের আভাষ জমিয়া ক্ষণে ক্ষণে পতনোন্মুখ হইয়া আসিতে লাগিল। দুঃখের মধ্যে জন্ম হইলেও অভাবের স্পর্শ সে এ পর্য্যন্ত পায় নাই। নিজের প্রাণ বাহির করিয়াও মনোরমা আজ পর্য্যন্ত ছেলের কাছে ঐ জিনিষটাকেই অপরিচিত রাখিয়াছে। কিন্তু আজ-কাল দুর্গাসুন্দরীর ভীষণ রোগের চিকিৎসায় যখন মনোরমার সমস্ত সম্বলই শেষ হইয়া আসিল, তখন হইতেই এ জিনিষটা এ বাড়ীতে একটু বেশি রকম প্রভাব বিস্তৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একে রাখু'র মৃত্যুর পর হইতেই জমিজমার দেখা-শুনার অভাবে পূর্ব্বের মত ইহাতে উৎপন্ন হয় না ; তার উপর এ দু'তিন বৎসর অজন্মায় খাজনা-টেক্স দিয়া জন-মজুরের মজুরি পোষাইয়া বাকি তো কিছুই থাকেই না, উপরন্তু ঘর হইতেই বাহির করিয়া দিতে হয়। তা ঘরের সঞ্চয়ই বা কতটুকু ? অকূল-পাথারে হাবু-ডুবু খাইতে খাইতে মনোরমা দুর্গা, কালী - সবার কাছেই মাথা খুঁড়িয়া প্রার্থনা করিতেছিল, অজিত যেন অন্ততঃ নিজের পড়াটা চালাইয়া লইতে পারে। নতুবা কেমন করিয়া সে উহার পড়ার খরচ যোগাইবে ? অথচ,—উঃ! কেমন করিয়া এ কথা সে মনেই আনিবে ? তা, প্রার্থনা তাহার দেব-দেবীরা শুনিয়াও ছিলেন। অজিত পঁচিশ এবং পনের, এই চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া মায়ের ঘোরতর দুশ্চিন্তা দূর করিল। এখন চারিদিকের দেনা-কর্জ্জের মধ্যে ঐটুকুকে সম্বল করিয়াই মনোরমা আবার নবীন আশায় বুক বাঁধিতেছিল। সংসারে যে এত বড় করিয়া অভাব দেখা দিতে পারে, ইতঃপূর্ব্বে এই খবরটা তাহার এমন করিয়া জানা ছিল না। রাখু নিজের বুকের রক্ত দিয়া জমিজমাগুলি দেখিত, দুর্গাসুন্দরী নিজে দাঁড়াইয়া তদারক করিতেন, তার উপর উপ্‌রি দরকারের বেলায় মনোরমার কয়েকখানা অলঙ্কারও ছিল। এখন যে আর কোন দিকেই কিছু নাই। তা হোক, এত অভাবের দিনেও মনোরমা

এই একটুখানি অবলম্বন লাভ করিয়াই অনেকখানি সুস্থ হইল। সে জানে জীবনের মধ্যাহ্নে সূর্য্যরশ্মি একটু প্রখর হইয়াই উঠে; এবং আবার তাহা অস্তের ছায়ায় শীতল হইয়া যায়।

অজিত একখানা সদ্য-লেখা চিঠি হাতে করিয়া তাহার কাঁচা কালি শুখাইবার জন্য নাড়া দিতে-দিতে আসিয়া বলিল, "বাবাকে এই চিঠিখানা লিখলুম, পাঠিয়ে দিই?"

মনোরমা প্রথম একবার চমকাইয়া উঠিয়াই, সাগ্রহে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি লিখেছিস, কৈ দেখি।" পড়িয়া দেখিয়া, কিছুক্ষণ মনে-মনে কি একটা চিন্তা করিয়া, ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পাঠাও।"

কয়দিন নিজেই সে ঠিক এই কথাটাই ভাবিতেছিল। কিন্তু চিন্তা করিয়া কোন মীমাংসায় পৌছিতে পারে নাই। ছেলের মনেও যখন সেই চিন্তারই তরঙ্গ পৌছিয়াছে, তখন ইহাকেই প্রত্যাদেশ বলিয়া গ্রহণ করা যা'ক্। অপরিহার্য্য বাধা বশতঃ পুত্রের অবশ্য প্রাপ্য অধিকার দানে অপারগ হইলেও পিতার নিশ্চিত প্রাপ্য কেন তিনি পাইবেন না? অজিতকে চুম্বন করিয়া মনে-মনে আশীর্ব্বাদের উপর আরও অনেক আশীর্ব্বাদ করিল।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। বাহিরের ঘরের যে জানালাটা হইতে রাস্তার সবচেয়ে বেশি দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, সেইখানে অজিতের বসিবার আড্ডা হইয়াছে। প্রত্যহই প্রায় ডাক-পিয়ন ঐ পথে যায়। তাহাকে দেখিলেই তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত একটা আহ্বানের প্রত্যাশায় কাণের মধ্যে গিয়া শব্দ করিতে থাকে, উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু অধীর প্রতীক্ষা সফল হয় না। কোন দিন থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করে, "নকড়ি! আমার চিঠি আছে ভাই?" উত্তরে যখন শুনিতে পায়, "এজ্ঞে, না দাদাঠাকুর, নেই তো।" তখন তাহার ভয় হয়, পাছে তাহার কান্না আর চাপা না থাকে!—এমন করিয়া আশার আশ্বাসের প্রতীক্ষায় দিন যখন গত হইয়া গিয়া, সমুদয় বুকখানা জুড়িয়া একটা গভীর নৈরাশ্যের বেদনা হা-হা করিয়া উঠিয়াছে,—বর্ষা-সমাগত বন্যাধারার ন্যায় প্রবল ও গভীর উচ্ছ্বাস যখন আকস্মিক নিদাঘ-রৌদ্রের তপ্ত কিরণ-স্পর্শে পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে,—এমনি সংশয়-সঙ্কুল দুঃসময়ে একদিন অপ্রত্যাশিত সঙ্গীতের রেশ কাণে আসিয়া ধ্বনিত হইল, "দাদাঠাকুর, চিঠি আছে গো।"

শুনিয়াই হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন পা-দুখানার আগেই লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া যাইতে চাহিল। ব্যথিত বালকের কাতর মর্ম্মের করুণ ক্রন্দন তখনি থামিয়া পড়িয়া তাহারই মধ্য দিয়া মধুর মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় আশার দিব্য সঙ্গীত যেন মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিল।

কিন্তু কার লেখা এ চিঠি? শিরোনামার ইংরেজী লেখা দেখিয়াই তাহার চিত্তে সংশয় জাগিয়াছিল। খামের মধ্য হইতে লেখা চিঠিখানা টানিয়া বাহির করিতে সন্দেহ দৃঢ় হইল। কেমন মনে হইল, এ লেখা তাঁহার পিতার নয়। যদিও তাহার মনের মধ্যে উৎসাহের জোয়ারে ভাঁটা আসিয়া গিয়াছিল, তথাপি কৌতূহলের বশে সে চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। সে চিঠিখানা অসীমা বা তাহার পরিচিত কাহারও নয়। বিশেষতঃ, ইহার সম্বোধন পদ হইতে লেখককে তাহার 'গুরুজন' পর্য্যায়-ভুক্ত বুঝায় এবং পরলোকনিবাসিনী পিসিমাকে মনে পড়ে। চিঠিখানা এমনি—

"শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন,

অজিত! তুমি পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছ জানিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি জানিবে। ঈশ্বর তোমায় দীর্ঘজীবী ও কীর্ত্তিমান করুন; তাঁহার নিকট ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা। অতঃপর তুমি খুব সম্ভবতঃ কলিকাতায় পড়িতে আসিবে? প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াই স্থির করিয়াছ বোধ হয়? কবে আসিবে? আশা করি সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছ? আশীর্ব্বাদ লইও। আর অধিক কি লিখিব?

ইতি—তোমার ছোট-মা।"

পত্রের উত্তর দিবার অনুরোধ দুইবার দুই জায়গায় করিয়াই আবার উহা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। চিঠিখানার পাঠ সমাপ্ত হইতেই, সেখানা যেন বিশ মণ ভারি একখানা পাথরের মত দুঃসহ হইয়া অজিতের হাত হইতে খসিয়া পড়িল; সঙ্গে-সঙ্গে বিস্মিত, স্তম্ভিত অজিতের মনশ্চক্ষে বহুদিন পূর্ব্বেকার সেই একটা দৃশ্য, যে দিন অপরিচিতা নারী তাহার ভ্রমের লজ্জাকে নিজের মাতৃ-অঙ্কে

তুলিয়া লইয়া, কোমল করুণায় তাহাকে বুকে টানিয়াই, সহসা আবার কোন্ অজ্ঞাত-সত্যের আকস্মিক আবিষ্কারে অসহ্য ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করিয়াছিল! একটি নিমেষের মধ্যেই করুণাময়ীর মমতা-মাখান মুখের ছবি, অকরুণার নৈষ্ঠুর্য্যে যে কেমন করিয়াই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে, সে দিনের সে দৃশ্য চোখে দেখা না থাকিলে, সে কল্পনায়ও উহা আনিতে পারিত না। তখন তাহার নিকট যত বড় আশ্চর্য্য রহস্যই এ থাক, আজ অনেক জিনিষের মত এ বিষয়টাও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুটা যে বিমাতার বিদ্বেষ,—এই সত্যটুকু আজ কিশোর অজিতের অজ্ঞাত নয়। তাহার অন্তরকেন্দ্রে অঙ্কিত সেই ঘৃণাপূর্ণ মুখের ছবি সে তাহার মাতৃমূর্ত্তির পাশাপাশি স্থাপন করিতেই, দুজনের মধ্যেকার সুস্পষ্ট বৈষম্য তাহার অনভিজ্ঞ কিশোর চক্ষুকেও প্রতারণা করিতে পারিল না। মা তাহার যথার্থই মাতৃ-প্রতিমা—তাঁহার ভুবন-মোহন রূপে শুধু মায়েরই ছবি! দৃষ্টিতে মাতৃদৃষ্টি, অধরে বাৎসল্য-উৎস, কণ্ঠে করুণা-মমতায়-গলান যে সুধারস স্বতঃই উৎসারিত—সে যেন জগতেরই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে সমর্থ। এ মায়ের পাশে সেই মা! বিতৃষ্ণায় মন তাহার বিকল হইয়া গেল।

মনোরমা লক্ষ্য করিল, অজিতের মুখে কি যেন একটা দৃপ্ত গাম্ভীর্য্যের ভাব প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে। গতি তাহার রেলগাড়ির এঞ্জিনের মতই বেগবান ছিল। ছুটা-ছুটির চোটে হাত-পা তাহার ছড়াকাটা কোন দিন বন্ধ থাকিত না। আজকাল সেটা প্রায় ঘুচিয়াছে। দরজা সে ধাক্কা দিয়া খুলিয়া ধড়াস্ করিয়া বন্ধ করিত,—এর জন্য মৃদু তিরস্কার লাভেও স্বভাব শোধরায় নাই,—আজকাল তাহার চালচলনে সব সময়ই যেন কেমন একটা অস্বাভাবিক ভব্যতা প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষ করিয়া মায়ের সঙ্গে সে এমন করিয়া ভক্তি-সম্মান দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে, যে, সে দেখিয়া মনোরমা হাসি চাপিতে না পারিলেও, মনের মধ্যটা ইহাতে তাহার বেদনার ব্যথা অনুভব না করিয়া পার পায় না। আসন্ন-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা অতি তীক্ষ্ণ ছুরিকার সূক্ষ্ম ফলার মত এই শিশুর মনটাকে যে নিয়তই কাটিতেছে, ইহাতেই তাহার খেলা-ধূলা ঘুড়ি-নাটাই, বন্ধু সমপাঠী, মায়ের উপর আব্দারের অত্যাচার, ভুলাইয়া তাহাকে এই অকাল-প্রৌঢ়ত্ব প্রদান করিতেছিল, ইহাতে সে নিঃসংশয়ই ছিল। একদিন কথায়-কথায় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, সেই যে চিঠিখানা লিখেছিলি, তার উত্তর এসেছে?" মা যে এ প্রশ্ন কোন দিন না কোন দিন করিবেন, এ ভয় অজিতের মনে ছিল। তথাপি জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহার অন্তর-সঞ্চিত নিবিড় বেদনা চঞ্চল হইয়া উঠিল। মুখখানা পাশের দিকে ফিরাইয়া রাখিয়া, নত চক্ষে সবেগে মাথা নাড়িয়াই, সে দ্রুতপদে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। ডাল নাড়া দিলে যেমন পাতায়-ভরা জল ঝরঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে, মায়ের মুখের ঐটুকু কথাতেই তেমনি করিয়া তাহার গোপন-সঞ্চিত অভিমানাশ্রুরাশি বাহিরে আসিবার জন্য উদ্দাম বেগে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনের এই সর্ব্বপ্রথম সফলতার আনন্দময় দিনে জীবনকে এত বড় ব্যর্থতার বেদনায় ভরাইয়া নিরানন্দ করিয়া তুলিতে যে পিতৃ হৃদয় একবিন্দু সঙ্কোচ মাত্র করিল না, সেই পিতাকেই যে দেবতারও উর্দ্ধে স্থান দিয়া রাখিয়াছিল, আজীবন ইঁহার নিকট তীব্র অবমাননা লাভ করিয়াও সে যে তাঁহার দত্ত লাঞ্ছনাকে তাঁহারই গরিমারূপে কল্পনা করিতে ছাড়ে নাই, সেই পিতার এই এত বড় নিষ্ঠুর পরিচয় কেমন করিয়া সে আজ সহ্য করিবে? সামান্য একটা কাগজে কয়েকটা অক্ষর টানিয়া পাঠাইলে যদিই তাঁহার ব্রতভঙ্গ হইত, তা না হয় না-ই পাঠাইতেন। যাহার অন্তর তাহার প্রতি বিদ্বেষের বহ্নিতে রশ্মিময়, তাহাকে অজ্ঞাতে স্পর্শ করিয়াও যে হস্ত অস্পৃশ্য স্পর্শের সঙ্কোচে কুঞ্চিত হইয়া উঠে—সেই হাতের চিঠি তাহাকে পাঠাইয়া অবহেলার চরম দেখাইবারও কি তাঁহার প্রয়োজন ছিল?

৪৬

অজিতের মনের সুখস্বপ্নটুকু শরতের ক্ষীণ মেঘের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া গিয়া, তাহার সমস্ত দেহ-মনের উপর রৌদ্রতপ্ত একটা দারুণ গুমোটের মত করিয়া রাখিল। কিন্তু বয়সের ধর্ম্ম তাহাকে ইহার জন্য ক্লান্ত না করিয়া বরং আর একদিক দিয়া ভাবের বন্যায় তাহার নবজীবনকে ভাসাইয়াই লইয়া গেল;—নৈরাশ্যের পঙ্ক-শয্যায় ফেলিয়া গেল না। বয়সে বালক মাত্র হইলেও, অবস্থার অভিজ্ঞতায় এবং পুস্তকের শিক্ষায় তাহাকে সাধারণ বালক অপেক্ষা অল্পদিনের মধ্যেই যেন এই সরল মাধুর্য্য-মণ্ডিত কৈশোর

হইতে একেবারেই যৌবনের মধ্যভাগে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। সে যেদিন মাতার অবিরল অশ্রু-প্রবাহের স্রোতে ভাসিয়া আরক্ত মুখে অশ্রু-স্পন্দিত অক্ষ-নেত্রে নিতাইচরণের সহিত একটা বিছানার মোট ও পিসিমা-দত্ত ষ্টীল ট্রাঙ্কটি সঙ্গে লইয়া কোলাহল-মুখরিত ঈডেন হিন্দু-হোষ্টেলের দ্বারদেশে অবতরণ করিল, সেদিন সেই সদ্য মাতৃক্রোড়-ভ্রষ্ট বিচ্ছেদ-ব্যাকুল, দুঃখার্ত্ত বালকের আধিক্লিষ্ট ম্লান মুখচ্ছবিতেও একটা অটল প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ও তেজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। যখন মায়ের আদরের দুলাল, অঞ্চলের নিধি, আত্মীয় বান্ধব-পরিশূন্য, জন-কোলাহল-মুখর কর্ম্মকঠোর কঠিন রাজধানীর, নির্ব্বান্ধব ছাত্রাবাসের সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি শূন্য কক্ষে, ততোঽধিক শূন্য অন্তঃকরণ লইয়া প্রবিষ্ট হয়, তখন সেই কাতর অন্তরের মাঝখানে মায়ের অশ্রুপরিপ্লুত করুণ মুখের ছবিখানা একান্তই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। সারাদিনের পুঞ্জীভূত গোপন অশ্রুর রুদ্ধ-ধারা যখন এই নিঃসঙ্গ নিরালোক অন্ধকারে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, নয়ন-পল্লব সিক্ত করিয়া ধারায়-ধারায় প্রবাহিত হইয়া শেষে মাথাবালিস-টাকে আর্দ্র করিয়া দেয়, তখনও অবসাদক্লিষ্ট কাতর চিত্তে চিরদুঃখিনী জননীরই বিদায়-বেদনায় পরিম্লান মুখচন্দ্রমা একান্ত চিত্তে ধ্যান করিতে থাকে। ধ্যানের তন্ময়তায় অবশেষে কখন গণ্ড-প্রবাহী অশ্রুর ধারা থামিয়া যায়, আর্ত্ত হৃদয় শান্ত হইয়া সুপ্তির শান্তিতে সমস্ত তাপদাহ জুড়াইয়া দেয়, জানিতেও পারে না। অহোরাত্রের মধ্যে এই সময়টুকুই অজিতের পক্ষে সব চেয়ে আরামের। তাই এইটুকুর জন্য সে যেন কাঙ্গালের মত ব্যাকুল হইয়া পথ চাহিয়া থাকে। নিদ্রার আবেশে স্বপ্নের ঘোরে প্রত্যহই সে মাকে দেখিতে পায়। স্বপ্নের জননী স্বপ্নের মত রহস্যময়ী নহেন;—বাস্তবেরই মত, সেই একান্ত তাহারই মা। ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াও তাই সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝিতেই পারে না যে, স্বপ্ন কোন্‌টা? এই যে এতক্ষণ সে চিরদিনের মতই চিরপরিচিত মায়ের কোলের মধ্যে শুইয়া, মায়ের গলা জড়াইয়া, তাঁহার স্নেহ-হাস্য-বিভাসিত মুখে চুম খাইয়া কত আবদার-আদর জানাইতেছিল, মা যে তাহার মুখে ভাতের গ্রাস তুলিয়া দিতেছিলেন, স্নান করাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেছিলেন, দুজনে হাসি-কথার বিরাম ছিল না, সেইগুলাই কি যত মিথ্যা? —আর এই শব্দহীন বিশাল অট্টালিকার একতলার একটা ছোট্ট কোণের ঘরের মধ্যে সরু খাটের নিঃসঙ্গ শয্যায় মায়ের বুকের পরিবর্ত্তে শীতল একটা পায়ের বালিস জড়াইয়া ধরিয়া সে যে এই পড়িয়া আছে, পাশের আর একখানা খাটিয়া হইতে তাহার গৃহসঙ্গী অপর একটি যুবকের নাসিকা-গর্জ্জন, নির্জ্জন অন্ধকারে শিশুচিত্তে আকস্মিক ভীতি উৎপাদনেও অসমর্থ নয়;—এই সবগুলাই সবচেয়ে বড় সত্য? অজিত আর সহিতে পারে না! প্রাণপণে কান্না চাপিতে গিয়া সে গুমরিয়া-গুমরিয়া কাঁদিতে থাকে। এ পৃথিবীতে মা ব্যতীত আর যে তাহার কেহ নাই। সেই মাকে দূরে ফেলিয়া আসিয়া কেমন করিয়া সে একা, একেবারে অসহায় বালক, একাকী এই প্রাণহীন, হৃদয়হীন কলিকাতার বন্দীশালায় দীর্ঘ দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিবে?

অতীতের স্মৃতিগুলি আজ অজিতের মানসনেত্রে সন্ধ্যা-তারার মত সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিতে একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া তাহার দুঃখাহত হৃদয়ে আনন্দের চকিত স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া যায়। কবে তাহাকে কে কি বলিয়াছিল। কাহার উপরোধ শুনা হয় নাই। তাহার কোন্ অপরাধের জন্য মা তাহার কোন্ এক সুদূর দিনে দুঃখ করিয়া কি একটা কথা বলিয়াছিলেন—অমনি বুক চিরিয়া-চিরিয়া কৃত কার্য্যের অনুশোচনায়, আত্মগ্লানির প্রচণ্ড ধিক্কার তাহার হৃদপিণ্ডের ক্রিয়াকে যেন রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহে। অতি ক্ষুদ্রতম কীটাণুটিও যেমন অণুবীক্ষণের তলায় বৃহদাকৃতি লাভ করে, প্রতিদিনের অতি তুচ্ছানুতুচ্ছ ব্যাপারটুকুও আজ এই গৃহহীন বালকের চক্ষে তেমনি করিয়া একটা বিশেষ আকার ধরিয়া দেখা দিতে লাগিল। খাইতে বসিয়া অনভ্যাস-প্রযুক্ত মাছের কাঁটা আঙ্গুলে বিঁধিয়া যায়, গলায় বেঁধে, পাচকের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন বিতৃষ্ণায় পাতের উপরেই পড়িয়া থাকে। জলখাবারের জোগাড় করিতে একটি দিনও স্মরণ থাকে না। আর সকল সময়েই পড়াশোনা, খাওয়াপরা—সব চিন্তা ডুবাইয়া দিয়া—যন্ত্রণার্ত্ত প্রাণটা তাহার কচিছেলের মত কাঁদিয়া-কাঁদিয়া পাগল হইয়া গিয়া অনবরত ডাকিতে থাকে, মা, মা, মা। এ ধ্বনি তাহার ব্যথাহত অন্তরের অন্তস্তলে সে কোনমতেই চাপিয়া রাখিতে পারে না;—কেমন করিয়া পারিবে? এইটুকুই যে তাহার স্বজনত্যক্ত, নিরালোক জীবনের একটি

মাত্র আলো। আবার এই মাকেই স্মরণ করিয়া সে অসহ্ বেদনায় বিক্ষত চিত্তকে সুস্থির করিয়া ভবিষ্যটাকে আশার আলোয় সমুজ্জল করিয়া বইএর বোঝা টানিয়া লইয়া সেই আলোতেই পড়িতে বসে। মন যখন অবাধ্য ঘোড়ার মত রাশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বর্দ্ধমানের চিরপরিচিত গৃহাভ্যন্তরেই ছুটিতে চায়, তখন স্নেহ-শাসনে অটল ধৈর্য্যময়ী মাতৃদৃষ্টিই তাহার ভিতরটাকে লজ্জার চমকে চাবুক মারিয়া শিষ্ট সংযত করিয়া রাজ্যের কেতাব ও নোটবুকের গাদার মধ্যেই ঠাসিয়া ধরে। বাহিরের মাকে আড়াল করিয়া ভিতরের মা যে এমন করিয়া জাগিয়া উঠিতে পারেন, এ যে ধারণারও অতীত ছিল! আজ এই চরম দুঃখের দিনে পরম পরিতৃপ্তির মতন করিয়া সে এই মানসী মায়ের ছবিখানাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া, শুধু তাঁহারই মুখ চাহিয়া সীমাহীন দুঃখ-সমুদ্রে নিজের ক্ষুদ্র ভেলাটুকু ভাসাইয়া দিল,—যদি কখনও কূল পায়, তবেই তাহার জন্ম দুঃখিনী মায়ের মুখে সে হাসি ফুটাইতে পারিবে। আর এটুকুও যদি সে না পারে, ভগবান্! সেই কুপুত্রবতীকে অপুত্রক করিও,—সংসারের অনেক দুঃখের মত এ দুঃখটাও তাঁহার সহিবে।

নিজের মনের অসহ্ ব্যথায় মার কথা তাহার প্রথম-প্রথম বেশি করিয়া মনে হইল না। যখন হইল, তখন সে ভাবিল, মার দুঃখ বুঝি তাহার অপেক্ষাও অধিক। সে তো তবু দশটা-চারটের কলেজ করে, ভাল লাগুক আর না লাগুক, তবুও পড়াশুনা কিছু-কিছু করিতেই হয়। কিন্তু যেখানে জন্মাবচ্ছিন্নে সে একটা দিনের জন্যও মায়ের কোল-ছাড়া হয় নাই, জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আজ এই চৌদ্দটি বৎসর নিরবচ্ছিন্ন যেখানে অনন্যসহায় হইয়াই শুধু মায়েরই বুকে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেইখানের আশ্রয় হইতে এই যে সে উৎপাটিত হইয়া উঠিয়া আসিল, এর অভাব যার বুক জুড়িয়া শিকড়ের জাল বুনাইয়া গিয়াছিল তাহার যত হইবে—সেই শিকড়-ছেঁড়া বুকের বেদনা কি গাছের অভাবের সহিত তুলনীয়?

ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া এই কথাটাই অশ্রু-জলের মধ্য দিয়া ভাবিতে গিয়া বর্দ্ধিত বিস্ময়ে সহসা তাহার স্মরণ হইল, বর্দ্ধমানে থাকিতে সকাল বেলায় সাত বার না ডাকিয়া মা কখনও তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারিতেন না। এখনও তো সূর্য্যি ওঠেনি, ওমা, মাগো, আর একটু ঘুমুই না মা! এম্‌নি কত কি আদর-কাড়াকাড়ি,—মায়ের সস্মিত মুখের সেই তিরস্কার "হনুমান ছেলে, নবাবী ঘুমটুকু বেশ পেয়েছেন;" এইটুকু শুনিয়াই আবার পাশবালিসের আলিঙ্গনে আবদ্ধ-হওন মনে পড়িয়া গেল। আজকাল তাহার অসাড় নিদ্রাই বা গেল কোথায়? বর্ষারাতে যখন আকাশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বজ্রের হুহুঙ্কার সহস্র কামান দাগিয়া ফেরে, ভীষণ কলরোলে ঝটিকা গর্জ্জিয়া আর সেই ভীষণ রণাঙ্গনে বিজয়মদে মাতিয়া উঠিয়া রণবাদ্যের কর্ণ-বধিরকারী ধ্বনির ঝমাঝম শব্দে বর্ষণ চলিতে থাকে, তখন মাতৃক্রোড়ভ্রষ্ট ভীত বালক আড়ষ্ট হইয়া বিছানার মধ্যে জাগিয়া পড়িয়া, মায়ের স্নেহতপ্ত আলিঙ্গনের দৃঢ়পাশ নিজের কুঞ্চিত রোমাঞ্চিত শরীরের উপর অনুভব-চেষ্টা প্রাণপণ শক্তিতেই করিতে থাকে। এমন বর্ষারাতে মায়ের কোলের ভিতর ঢুকিয়া গিয়া তাঁহাকে এমন করিয়া জড়াইয়া সে দুড়-দুড়-বক্ষে মেঘগর্জ্জন শুনিতে-শুনিতে ঘুমাইয়া থাকিত যে, সারারাত্রি মাকে সেই একটি পাশেই যাপন করিতে হইয়াছে। এ মা তাহার কেমন করিয়া বাঁচিবে?

কালের ব্যবধানে সকল শোকেরই হ্রাস হয়। মানব-চিত্তের ধর্ম্মই এই যে, যত বড় দুঃখই হোক, চিরদিন ধরিয়া সেই একই অসহ্ যন্ত্রণা তাহাতে অনুভূত না হইয়া ক্রমেই ইহার বেগ মন্দীভূত ও সহ্য-সীমার অন্তর্নিহিত হইয়া যায়। অজিতের বিচ্ছেদবেদনাতুর চিত্তও দিনের পর দিনে, মাসের পর মাসে, অল্পে-অল্পে একটু-একটু করিয়া শান্ত হইয়া আসিল। অভ্যাসেই সব করে, বিশেষতঃ ক্ষুধার জ্বালা জিনিষটাকে খুব তুচ্ছ করা চলে না। পাচক-ব্রাহ্মণের অবহেলাদত্ত অপরিচ্ছন্ন থালায় ছড়ান, অন্ন-ব্যঞ্জন আজকাল আর বেশির ভাগই পড়িয়া থাকে না। বর্ষা, শরৎ কাটিয়া শীতেরও অন্ত হইয়া আসিল। মেঘের ডাক এখন কদাচিৎ, আর সে ডাক এখন তেমন করিয়া অজিতের বুক কাঁপাইয়া তুলে না। ঘুম এখনও ভোরে ভাঙ্গে, তবে রাত্রের নিদ্রাকে সুনিদ্রাই বলা চলে। ভোরের আলোকে মায়ের স্মৃতিভরা তপ্ত-অশ্রু উপহার না দিয়া এখন সে ঐ সময়টিতেই ইংরাজি সাহিত্যের বাছাবাছা পাঠ্যগুলি লইয়া পড়িতে বসে। মার বরাবর সাধ ছিল, সে ভোরের বেলা উঠিয়া পড়া করে; সে তাহার পিতার কাছে শুনিয়াছিল যে এই সময় পড়া করিলে সময়ের গুণে চিত্তস্থৈর্য্য বশতঃ উহা অধিকতর ফলদায়ক

হইয়া থাকে। মায়ের বুকের চেয়ে মায়ের মুখের দিকে চাহিতেই, এক্ষণে তাহার মাতৃ-বৎসল চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। গায়ত্রীর অনুরূপ একটি মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া মা, একদা উহা অভ্যাস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।—দুটি বেলা কাচা-কাপড়ে সেই মন্ত্রটা সে আটাশ-বার করিয়া জপ করিত। সে যে এ রকম করিত তাহা দেবতুষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, শুদ্ধ মায়ের আদেশ বলিয়াই তাঁহার তৃপ্তির জন্য করিত। অথচ মা এ সব দেখিতেও আসিতেছেন না, সে কথাও সে জানে। পিতৃ-সম্বন্ধে অনেক দিন হইতেই অজিত মনের রাশখানাকে টানিয়া ধরিয়াছিল। পিতার কথা লইয়া মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে গেলেও, চারিদিকের আঘাতদ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্ত-বীণার তার কাটিয়া পাছে তাহাতে আবার কিছু বেসুরা বাজিয়া উঠে, এই ভয়ে সে তাঁহার চিন্তাটাকে যেন একটা পাথর-ঢাকা কবরের মত সমাহিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এবং সাধ্যপক্ষে সেটাকে যতদূর এড়াইয়া চলিতে পারা যায়, তেম্‌নি করিয়াই চলিত। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, অপরিচিত পিতার রহস্যময় পরিচয়কে সে অত্যন্ত ভয়ের চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অতীতের যে গৌরবোজ্জল, উদার ও মহিমান্বিত পিতৃমূর্ত্তি সে মার নিকট হইতে পাইয়াছিল, সে ছবি, অরবিন্দের কনভোকেশনের ক্যাপ ও গাউন-পরা সেই বি এ পাশের সময়ের ছবিটার মতই অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এখন যে পিতার পরিচয়ের দিকে তাহার আহত-অভিমানের বেদনা বুদ্ধি-বিবেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া দেখিতে চায়, সে যেন 'এক্সরে'র মত মাংস-ত্বক সব বাদ দিয়া, শুধু অস্থি-পঞ্জরটাকেই দেখাইতে চায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে নাকি ঐ স্থানটা সবচেয়ে কুশ্রী—আর ভীষণ, কাজেই চোখ সেদিকে ফিরাইয়া আতঙ্কে আধমরা হওয়ার চাইতে দৃষ্টিটাকে অন্যত্র রাখাই সুবিবেচনার কার্য্য। সে জানিত, মা যদি তাহার এই মানস বিদ্রোহের এতটুকু খবর পান, বুক তাঁহার ফাটিয়া যাইবে। মাকে ছাড়িয়া আসিয়া অজিত মাকে চিনিয়াছে। সরল অজিত জটিল সংসার পথে পা দিয়াই আজ কুটিল হইয়া উঠিল কি? যদি তাই হয়, তবে তার জন্য একমাত্র ভাগ্যই তাহার দায়ী।

বাৎসরিক একজামিন হইয়া গ্রীষ্মের ছুটী আসিয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়া অজিত মা, দিদিমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে, যুগপৎ হর্ষবিস্ময়ে উভয়েই একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন "ওমা! এর মধ্যে কতখানি লম্বা হয়েছিস রে! মাগো মা! আবার তেম্‌নি কি রোগা হয়েছিস্! ও অজিত! অমন হলি কি করে রে! পেটভরে খাস্ না বুঝি?"

ত্রিপুরাসুন্দরীর বুকের অসুখ শীতে কম থাকিয়া আবার গ্রীষ্মের দিকে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অজিতের কুশল প্রশ্নের উত্তরে তিনি বড় দুঃখের একটি ফোটা হাসি হাসিয়া দুর্ব্বল কণ্ঠে জবাব দিলেন, "কেমন আর আছি দাদা! দেখ্‌চোই তো দামড়াগাছিয়া কুড়ুলের মত আধপোড়া হয়েই রইলুম। বাঁচবোও না, মরবোও না, শুধু তোমাদের জ্বালাবো।" শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া দুটি বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অজিত তখনি সযত্নে কোঁচার খুঁটে উহা মুছাইয়া দিয়া ধীরে-ধীরে পাখাখানি তুলিয়া লইয়া বিছানার একধারে বসিল। চেঁচামেচি করিয়া উহাঁর এমন কথারও কিছুমাত্র প্রতিবাদের কথা কহিল না। দেখিয়া মনোরমা সবিস্ময়ে মনে-মনে বলিল "অজু এখন সত্যি-সত্যি বড় হয়ে গ্যাছে। কিন্তু ওর মুখখানি অমন গম্ভীর দেখলে আমার বুক যেন কড়কড় করে ওঠে। ও যে আমার বড় ছেলেমানুষ।"

(ক্রমশঃ)

স্মরণে

[শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ]

১

যদি কভু পথ ভুলে, কভু আনমনে,
অজানা গোপন তব হৃদয়-দুয়ারে—
খুঁজিতে আসিয়া মোর মানস-প্রিয়ারে—
অজ্ঞাতে পশিয়া থাকি নিঃশঙ্ক চরণে—

তারি স্মৃতি জেগে রবে বিশ্বমাঝে আজ ?
বাজিবে না হৃদিতন্ত্রে আর কোনো সুর—
অতীতের দীপ্তজ্বালা করি দিয়া দূর—
মল্লার রাগিণী স্নিগ্ধ—দীপকের মাঝ ?

আজি তাই ভিক্ষা মাগি ও কম চরণে—
অনন্ত বিস্মৃতি এক অনন্ত মরণে !

মালাগাছি দূরে ফেলা গন্ধ সাথে তার,
পথ-রেখা মুছে ফেলা আঁধারের রাতে ;
মরণেতে বিসর্জিয়া স্মৃতি গুরুভার,
উপাড়ি কামনা-বীজ প্রণয়ের সাথে।

২

তোমারি সাথে এই নিগূঢ় পরিচয়,
নূতন ক'রে এ যে হৃদয়-বিনিময়।
এ নব পরিচয়ে বলিতে পারি আজ
পুরানো কথা যত জাগিছে স্মৃতিমাঝ—
কবে যে মধু-রাতে বিফলে কতবার
তোমারি আঙিনাতে মানস-অভিসার—
বুঝিবে তুমি সেই বিরহ রজনীর
কত না অনুতাপ, বেদনা সুগভীর ?

কোথায় আছ তুমি আজি এ বরষায়
মরম ব্যথা কার স্বপন মাঝে ভায়—
ভাষাতে যে কথা ফোটেনি কোন দিন,
অধর-কোণে এসে হ'য়েছে মনোলীন—
বাজে গো যদি সেই সুরটী হৃদিমাঝ
পত্র-পরিচয়ে বুঝিবে তুমি আজ ?

৩

পথেরি পানে চেয়ে
কাটিছে সারা বেলা,
স্মৃতিটী নিয়ে শুধু
আপন মনে খেলা।
বাঁশীটি কোথা আজি,
তুলিছে নবতান,
কণ্ঠ আনমনে
গাহিছে নব গান ;
মিলন-নব-হাস
জাগে কি তারি মাঝ—
প্রবাস-স্মৃতিকথা
বরষ পরে আজ ?

বাঙ্গালীত্ব ও মনুষ্যত্ব

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

বাঙ্গালী আমরা বড় ভাবপ্রবণ জাতি। আমাদের প্রাণ সরস, কোমল,—মস্তিষ্কের রহস্যোদ্ভেদ-শক্তি সূচ্যগ্র-তীক্ষ্ণ। যে তথ্য যেমনই হউক, তাহা অবগত হইতে পারি; যে তত্ত্ব যেমনই হউক না, হৃদয়ঙ্গম করিতে দেরি হয় না। মোটের উপর আমরা বেশ;—দেখিতেও বেশ, শুনিতেও বেশ, পরিচয় দিতেও বেশ। বাহিরের দিক হইতে অশোভন কিছুই নাই,—বরং তদ্বিপরীত। আকুমারিকা-হিমাচল ভারতের লোকের মনে আমাদের উপর একটা শ্রদ্ধার ভাবই জাগিয়া আছে।

ঘরের বাহির হইতে বাঙ্গালীকে দেখ, চমৎকৃত হইবে। বাহিরে গিয়া তাহার গুণপনা কীর্ত্তন কর, জমিবেও ভাল। সে "ইলেমদার", সে "বাহাদুর", সে "আংরেজকা গুরু।"—সত্যই তাহার মধ্যে প্রভাব উৎপন্ন করিবার এমন একটা ক্ষমতা আছে যে, তাহার আসন শুধু ভারতবর্ষেই সকলকে ছাপাইয়া যায়, তাহা নহে,—ইয়োরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পীঠস্থানের কষ্টিপাথরে ঘষামাজা হইয়াও সেই-ই ভারতের সকল প্রদেশবাসী অপেক্ষা উন্নতিশীল, শ্রেষ্ঠ, এ কথা প্রতিপন্ন হইয়া যায়;—যাইতেছেও।

তথাপি কিন্তু এততেও, হায়, বিধাতা বিমুখ। গৃহলক্ষ্মীগণ যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট মেডেলের কবচ কুণ্ডল-ধারী বংশদুলালগুলিকে বুক ফুলাইয়া ছাঁদনাতলাটুকু পার করাইবার পরই ঠেকিয়া যান,—তেমনি দেশলক্ষ্মীও তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি-সৌরভ-মণ্ডিত-মহিমা দুলালগুলিকে সগর্ব্বে সভামণ্ডপটুকু পার করাইয়া আনিয়াই ঠেক্ খাইয়া যাইতেছেন। কর্ম্ম-পদ্ধতি "রেজোল্যুসন" অবধারণার পর অবতারণা আর তাঁহাদের দ্বারা ঘটিয়া উঠে না। জীবনের যেখানটায় প্রতিষ্ঠা উপার্জ্জন করিবার কথা, সেখানে তাঁহার সন্তানগুলি অচল, তিনিও হতভম্ব।

অবশ্য আমি কোনও আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া বক্ষ্যমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। বাঙ্গালীর কোনও ক্ষেত্রবিশেষের হার-জিত আমার অন্তরকে স্পর্শ করিয়া নাই। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা জাতির মূল স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি।

ওই যে সৌম্যমুখ গম্ভীর-দর্শন বাঙ্গালী "সাহেব" বা কর্ত্তাবাবু (হঠাৎ দর্শনে সাধারণ দরিদ্র লোকের সাধ্য কি যে মুখের সম্মুখে কথা কহিতে পারে)—উঁহার বাহিরটা দেখিলে, জার্ম্মাণ, রুষ, মার্কিণ হইতে আরম্ভ করিয়া, অসভ্য হনলুলু পর্য্যন্ত সকলকেই একবার না একবার বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিতে হইবে। চালে-চলনে, হাবে-ভাবে, কথা-বার্ত্তায় আলাপ জমাইবার পদ্ধতিতে পৃথিবীর কোনও সারবান বলবান জাতির কাছেই বাহিরের দিকটায় ন্যূন নহেন। মেলামেশার মধ্যে যে জিনিসটাকে ইংরাজিতে "এটিকেট্" বলে, সেটাও না কি ইঁহাদের ব্যবহারে ও-সব জায়গায় নিখুঁত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে;—আদর্শ বলিলেও ক্ষতি নাই।

মাঝারি শ্রেণীর কর্ত্তা যাঁহারা,—অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বাবু-সম্প্রদায় তাঁহাদের মধ্যেও চালে-চলনে ভব্যতার যে সম্ভ্রান্ত ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহাতে মহত্ত্বের উপাদান এতখানি মিলে যে, অনুমান করিতে ইচ্ছা হয়—যেন কি একটা স্তরে আটকাইয়া, তথায় সেই পদার্থটাই থমকিয়া আছে, যেটা জাতি হিসাবে জাগিবার জন্য আমাদের আজ নিতান্ত প্রয়োজন।

নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী ছোটলোক যাহারা, তাহাদের মধ্যেও সরসতা, কোমলতা, স্পষ্টতা,—সর্ব্বোচ্চ ভাবগুলি ধারণায় আনিতে সামর্থ্য পর্য্যন্ত বেশই দেখিতে পাই। মনে হয়, উপযুক্ত গুরুশক্তি উপর হইতে টানিয়া তুলিলে ইহাদের ভবিষ্যৎ সামান্য নহে।

এতগুলি উপাদান ত পুঞ্জীভূত; তবু বাঙ্গালী মনো-বৃত্তি হিসাবে নিঃস্ব কেন? তাহার হৃদয়-বীণায় এমন তার নাই কেন, যেখানে ঘা দিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া তোলা যায়? উন্নতির সংসারে সুন্দরী বধূর যে স্থান, বিশ্ব-সংসারে তাহার স্থানটা অনেকটা সেই রকমই। আদরটুকু

সৌখীনতার খাতিরে,—পরের সখ্ ছাড়া সেটুকু পাইবার দাবী তাহার নাই,—এটা কি কিছুতেই বুঝান যাইবে না? বাঙ্গালী তর্কে খুবই মজবুত,—discussion স্রোতের জলের মত তাহার মনটাকে তর্-তর্ করিয়া ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে;—সেইজন্য সেখানে কিছু স্থান পায় না, এটা সম্ভব হইতে পারে।

স্থান কিন্তু কিছুকে আজ পাইতে হইবে। অবস্থা এ দিকে সঙ্গীন।

প্রথম শ্রেণীর সৌম্যমুখ গম্ভীরদর্শন কর্ত্তাবাবু,—বংশ-গরিমারই হউক অথবা সভ্যতা বা প্রভাব-গরিমারই হউক,—উঁচু মাথাটা অর্থ-সামর্থ্যে খাড়া করিয়া রাখা, যাঁহাদের চলিয়া যাইতেছে,—আছেন বেশ। তাঁহারা যে উপরতলা;—নীচের তলা হইতে অনেক দূর কি না? সে দিকটা আছে কি ভাঙ্গিয়া গেছে, দেখিতে গেলে মাথা যদি নীচু করিতে হয়? বাপ রে! প্রাণের চেয়েও মূল্যবান্ মানের পার্থক্যটুকু তিল পরিমাণেও খসিয়া গেলেই যে সর্ব্বনাশ! যে কৃষাণ তাঁহাদের বিস্তৃত দেশের ক্ষেত্রগুলি শস্যে সু-শ্যামল রাখিত,—যে ছোটলোক সেবার সহস্র উপাদান যোগাইয়া জীবন স্বচ্ছন্দ করিত,—সে বর্ত্তমান জীবন সংগ্রামে বাঁচিল কি মরিয়া গেল, প্রয়োজন কি দেখিবার? বাঁচিয়া থাক্ টাকা। তাহার চকচকে রূপের ঝম্‌ঝম্ নৃত্যশব্দে দেশদেশান্তরে যে আছে, প্রয়োজনের মুখে দ্রব্যসম্ভার যোগাইতে ছুটিয়া আসিবে!—আমি উঁচু, নীচুর সহিত আমার সম্পর্ক বড়ই যে প্রাকৃত! আমি থাকিব আমার দিব্য সুকোমল সুরম্য হর্ম্ম্যে শয়ান; আমি শুনিব কাণের কাছে প্রতিধ্বনিত চাটুবাদের কলগুঞ্জন ও করতালি!

কিন্তু হায় রে! প্রয়োজনের জিনিস জুটিবে জানি। কালিফর্ণিয়া ধান্য যোগাইবে, অষ্ট্রীয়া গোধূম যোগাইবে, ল্যাঙ্কেশায়ার বসন যোগাইবে! আনাজ, তরি-তরকারি পর্য্যন্তও একদিন বরফের বাক্সবন্দী হইয়া জাপান অথবা বাটাভিয়া হইতে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইবে;—আটকাইবে না তাহাও জানি। কিন্তু দেশের এই মুমূর্ষু ছোটলোকগুলি যে হৃদয়ের সম্পর্কে তোমার জন্য তাহা উৎপন্ন করিত, সে হৃদয়ের সম্পর্ক কি ঐ বিদেশীদের সহিত পাতাইতে পারিবে? বণিক কি কোনও দিন সেবক হইয়া তোমার কাছে ধরা দিবে? তাহাদের লোভটাকে তোমরা কি কোন উপায়ে তোমাদের উপর ভক্তিতে রূপান্তরিত করাইতে পারিবে? সে কি কোনও দিন তোমার বাধ্য হইবে? তোমায় মমতা করিবে?

যতই দেশের শূদ্রশক্তি ভিতর হইতে স্তিমিত হইয়া আসিতে থাকিবে, বণিকশক্তি ততই আপনার উপযোগিতা প্রভাবের ভাবে বিস্তার করিতে-করিতে স্পর্দ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। সে তাহার লোভ এমন বাড়াইয়া তুলিবে যে, সে হুতাশনের আহুতি যোগাইতে বড় ঘর-ওয়ালার অর্থ-সামর্থ্য নিঃশেষ হইবেই। জানি না, মানের সঙ্গে প্রাণ তাঁহাদের ঠেকিবে গিয়া কোথায়!

তাঁহাদের মনের সমস্ত ধারা যে দিকে গিয়াছে, তাঁহাদের মানের সমস্ত আদর্শ যে দিকে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের প্রাণের সমস্তটা যেখানে আপনাকে পরিতৃপ্ত, সার্থক ভাবি-তেছে, সে দিক হইতে ফিরিবার জন্য প্রয়োজনের তাগিদ পড়িতেছে, এটা কি আজ তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে না?—হইবে কি নীচের তলার ভিত্তিমূল ধসিয়া স্বয়ং বিরাট মহিমাশুদ্ধ যেদিন হুড়মুড় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিবেন সেই দিন?

তার পর, মাঝারি শ্রেণীর কর্ত্তাদের বলিবার অনেক আছে। তাঁহারা উপরতলা বটে, আবার নীচের তলাও। অভিমানে তাঁহারা উপরতলার উঁচু মেজাজ লইয়া, চারি দিকে চাহিয়া, নাসিকা সীটকারের সহিত ফুৎকার করিতে-ছেন। আর অক্ষমতায় অপমান-মৌন অন্তরাত্মাকে ভিতরের দিকে কুঞ্চিত করিতে-করিতে, নীচের তলার ভাগ্যকে বরণ করিয়া, অস্তিত্বের প্রায় শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন বলিলেই হয়। বৈরাগী ভারত মুক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়াছিল। আজ অভিমানী বাঙ্গালী অন্তর্দ্ধান-মার্গের অনুসরণ করিয়াছে।—এ মার্গের লক্ষ্যস্থল মৃত্যু!—জাতি হিসাবে extinct হওয়া।

ঐ যে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী দিবসের একমাত্র আহার তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়া-ছেন, সারসের গতিভঙ্গীর অনুকরণে ঐ দীর্ঘ-দীর্ঘ পদ-ক্ষেপ,—ও কোথাকার অভিমুখে? অফিস। জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র। তাঁহারি ঘরের সতী-সাধ্বী সীমন্তিনীর মত তাঁহারও ওই জীবন-বিকাশের স্থানটিতে আবদ্ধ থাকিতে

হয়, পর্দ্দা মানিতে হয়,—লজ্জা, সরম, ভয়, মান্য সবই রাখিয়া চলিতে হয়। আবার সেখানে মধ্যাহ্নে একটু কাজের ভিড় হাল্‌কা হইলে, সেই সময়ে নিঃশ্বাস লইবার জন্য, সখীতে-সখীতে বিশ্রম্ভালাপের ন্যায় সভয়, সতর্ক, অস্ফুট হাস্যকৌতুক-ময়ী আলাপ-প্রলাপটুকুও না কি আছে, তাও শুনিতে পাই। ঘরের মধ্যে অসার, নিস্তেজ, অবকাশটুকুর অর্দ্ধাংশের উপর শয্যাশায়ী অথবা অলস সুখাসনে উপবিষ্ট! বাহিরে স্তম্ভিত স্তিমিত কর্ম্মচাঞ্চল্য! এই জাতিটির মনস্তত্ত্ব বিশেষ রূপেই আলোচনা করিতে আমার ইচ্ছা হয়! ইহারা কোন্ ভাবে ভাবুক, কোন্ রসে রসিক, কোন্ শিক্ষা-প্রণালী বা গঠনপদ্ধতিতে বিকশিত;—আর কেমন করিয়াই বা ভাবের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিতে পারিলে ইহাঁদের মধ্যে নূতনের আহ্বান ধ্বনিয়া উঠিবে!

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী আপনাকে সকল হইতে স্বতন্ত্র জানে। সে মান্য চায়; কিন্তু মানাইয়া লইবার ক্ষমতা তাহাতে নাই। তাই পরে যতটা অবজ্ঞা করে, সেটা ভুলিতে মনে-মনে আপনাকে আপনি একটা গৌরব-ভারের বোঝা বহিতে দিয়া, ভারগ্রস্ত হইয়া বসিয়া থাকে। আমি অমুক ঋষির সন্তান, অথবা আমি শিক্ষিত সুসভ্য ভদ্রলোক, ইত্যাদি চিন্তা দশের উপর তাহার শ্রদ্ধা-বুদ্ধি কিছুতেই জন্মিতে দিবে না। পরের শ্রদ্ধা-বুদ্ধিও তাহার উপর স্থাপিত নয়। এইরূপে সেও কাহাকে শ্রদ্ধা করে না, তাহাকেও কেহ শ্রদ্ধা করে না;—উভয়ে মিলিয়া-মিশিয়া শ্রদ্ধা-বুদ্ধিটাকেই তাহার ভিতর হইতে ঘুচাইয়া দেয়। আত্ম-সম্প্রসারণ-শক্তি শ্রদ্ধার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই শক্তিই মানুষকে পৃথিবী-বক্ষে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রতিষ্ঠিত হইবার সকল সহায় ঘুচাইয়া বাঙ্গালী দিনে-দিনে আপনার মধ্যে সঙ্কুচিত হইতেছে।

ছোটলোক সম্বন্ধে এইটুকু বক্তব্য যে, আইন-আদালত স্থাপিত হইবার পর হইতে, পিতৃ-পিতামহ-ক্রমে সঞ্চিত ভূয়োদর্শনের ফলে তাহারা ঠিক করিয়াই রাখিয়াছে যে, যাঁহাদের পেটে কালির অক্ষর আছে, সেই ভদ্রলোকের দল তাহাদের বন্ধু হইতে পারেন না;—তাঁহাদের সহিত উহাদের ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্পর্ক। তাহারা ইহাঁদের ভয় করে, অবিশ্বাস করে;—প্রণতি যেটুকু করে, সেটুকু উপদেবতাকে প্রণাম করিবার মত। অন্তরাত্মাটা তাহাদের বিবাইয়াই আছে।

অথচ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত ছোটলোকের কতটুকু পার্থক্য! অর্থ হিসাবে, শক্তি হিসাবে, স্বার্থ হিসাবে পার্থক্যের পাকা বনীয়াদ কিছুই নাই। বিদ্বেষ-বুদ্ধিমূলক এ পার্থক্য-জ্ঞান বাঙ্গালীকে দিন-দিন নিঃস্ব করিয়াছে। উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক, বড়ভাই-ছোটভাই সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াই স্বাভাবিক। পার্থক্যটুকু তবেই মধ্যবিত্তকে সত্যকার উচ্চ আসন দিবে। এ মঙ্গল-বুদ্ধি আজ কোথায় গেল!

সত্যই বাঙ্গালায় অদূর-ভবিষ্যতেই এই মঙ্গল-বুদ্ধির উপর ভদ্রলোক-ছোটলোকের সম্পর্ক স্থাপিত করিতে হইবে। এই পাকা ভিত্তিমূলে জাতির জীবিকা, শিক্ষা, সভ্যতা সমস্তকেই নূতন করিয়া গাথিতে না পারিলে পরিত্রাণ নাই। আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব।

ভদ্রলোক বলিতে শিক্ষাভিমানী, সভ্যতাভিমানী সকলকেই বুঝাইতেছে। জাতিভেদের কথার এখানে কোনও প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে ভদ্রলোক ছোটলোক বলিয়া দুইটা জাতি যে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে সে ত' দেখিতেই পাইতেছি। ছোটলোকের মধ্যে কেহ আমার এ প্রবন্ধের পাঠক নহে জানি। যাহা ভদ্রলোককে বলিবার, তাহাই এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিব। ভদ্রলোক বলিতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বা বৈশ্য নহে;—যে লেখাপড়া শিখিয়াছে; লেফাফা-দুরস্ত হইয়া আদব-কায়দা অভ্যস্ত করিয়া লইতে পারিয়াছে, তাহাকেই ও-নাম দিতে হইবে। ইংরাজি শিক্ষা, আর বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রভাব মানুষের মধ্যে আসিলে, গণতন্ত্রের ভাব প্রবল হইবেই, —হইয়াছেও। আর এটা লক্ষণ যে মন্দ, তাহাও নহে। এ যুগে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকুন, কায়স্থ কায়স্থই থাকুন, শূদ্র শূদ্রই থাকুন। আপন-আপন জাতি নিজেদের ঘরের ভিতরকার বৈশিষ্ট্য;—বাহিরে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের উপায় নহে। বাহিরে সকলকেই চরিত্র ও গুণপনাতেই প্রভাব বিস্তার করিয়া লইতে হইবে। দৈবী প্রভাব উপভোগ বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম্ম নহে।—এই কথাটা স্মরণ রাখিয়া সামাজিক গোলমাল-গণ্ডগোল আপনা-আপনিই থামাইয়া লইতে হইবে। সকল জাতিকে এক করিয়া সমাজ-সংস্কার করিতে হইবে না;—এক মনুষ্যত্বের শিক্ষা সকল জাতির মধ্যে সমভাবে বিস্তার করিয়া, আমাদের

সমাজকে শিক্ষিত করিয়া লইতে হইবে। এ ব্যবস্থায় কার্পণ্য করিলে বিপদ অনিবার্য্য।

ভদ্রলোক ছোটলোকের গুরু! তাহাদের যে জীবনে প্রয়োজন, গুরুগিরি করিয়া সেই জীবনটাই গড়িয়া দিতে হইবে।—এ জীবনটা আধ্যাত্মিক নহে, সে সকলেই জানেন। সুতরাং গুরুগিরির একটা শিক্ষা চাই। গুরুকে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি শিখিয়া নিজের মস্তিষ্কের সহিত তাহাদের হাত দুখানা এক দেহের অঙ্গের মতই জুড়িয়া ফেলিতে হইবে। শুধু দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় চিন্তা করিলে চলিবে না,—ধনবৃদ্ধি করাইয়া লইতে হইবে। তবেই গুরুগিরি সম্ভব। তাঁহারা বড়ভাই, ছোটর সমস্ত দায়িত্ব তাঁহাদের কাঁধে;—দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতিতে যথোপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণের অভাবে তাহারা উজাড় হইলে সে লজ্জা তাঁহাদেরই।

কাহারও এতক্ষণে এমনটা মনে হওয়া বিচিত্র নহে যে, এ সকল প্রস্তাবের মত কার্য্য যদি হয়, তবে ভদ্রলোকের ভদ্রলোক হইয়া বসিয়া থাকা চলে কই? আর ছোটলোককেই বা ছোটলোক করিয়া রাখা চলে কই?—এও ত এক রকম ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া একাকার করিবার মতলব। মতলব অবশ্য প্রকৃতপক্ষে কি, সে আমি স্পষ্ট করিয়াই বলিতে চাই। আমি দেখিতেছি, সকলি ত নিরাকার হইতে বসিয়াছে। তাড়াতাড়ি একটা আকার খাড়া করিয়া না বসিলে, বাঙ্গালীর অস্থি পঞ্জর মিউজিয়মে গিয়া উঠিবে। ভদ্রলোকের ভদ্রতার রীতিনীতি কতটা, সে এখন ধামা-চাপা থাক,—আগে লোক বলিয়া লোকের মধ্যে সে যেমন করিয়া পারে প্রতিষ্ঠিত হউক।

মালকোঁচা-আঁটা পাগড়ি-মাথায় ঐ যে বিকানিরী, বা ভাটিয়া বণিক, যে আদব-কায়দা, বিধি-সহবৎ কিছুরই ধার ধারে না—আমাদের কলিকাতার সামান্য মুদিখানা, পান-সরবতের দোকান পর্য্যন্ত ঐ যে বিভিন্ন প্রদেশবাসীর করগত। ঐ যে বড়বাজারের মহাজন প্রকাণ্ড জুড়িতে রাস্তা কাঁপাইয়া চলিয়াছে! সবই ত আজ চক্ষের সম্মুখে স্বপ্ন! চমৎকার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া বসিয়া আছে!—বাঙ্গালী উহাদের এখনও মুখ ভেঙ্গাইতেছে, উহাদের মেড়ুয়াবাদী ভূত বলিতেছে; আবার যখন আপনার বাস-গৃহখানি উহাদের কাছে চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রয় করিতে পাইতেছে, অথবা উহাদের একটা বড় পাবলিক দানে কিছু প্রাপ্তির আশা করিতেছে, তখন 'সেলাম' সাহেব 'ভাই সাহেব' বা 'বাবু সাহেব' বলিয়া কম্পিত হস্তখানি প্রসারণ করিতেও ছাড়িতেছে না। বাঙ্গালী ভদ্রলোক; উহারা এখনও, বাঙ্গালী যে অর্থে ভদ্রলোক সে অর্থে ভদ্রলোক, হয় নাই।—উহাদের আছে টাকা, আর টাকা না হইলে ভদ্রয়ানা রক্ষা হয় না। বাঙ্গালীর টাকা নাই। টাকা কিসে আসে, কিসে থাকে,—সেও বাঙ্গালী জানে না। অথচ ভদ্রয়ানী বাঙ্গালীর হাড়ের সামগ্রী। সে কি করিবে। এই কলিকাতায়, এই বিংশ-শতাব্দীতে, টাকা হাতে আসিবার তাহার সকল দরজা বন্ধ,—সে ভদ্রয়ানা সামলায় কি করিয়া?

এই টলটলায়মান ভদ্রয়ানাকে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে এখনও দেখুক, এখনও বিচার করুক, ভদ্রয়ানা কাহাকে বলে! এই দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা, উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে এই অনুপযুক্ততা কেন তাহার আসিল? যাইবেই বা কিসে?

আচ্ছা, বাঙ্গালী পারে কি? বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য কি?

বৈশিষ্ট্য যে কি নয়, আর পারে না যে কি, সে স্থির অবধারণ করা সহজ নয়। বিশেষ বাঙ্গালী হইয়া সে সমাধান করা ত বড়ই শক্ত। কেবল হাতে-কলমে যে সমাধানটুকু বিধাতা জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়া করিয়া দিয়াছেন, সেইটুকুই অবলম্বন করিয়া আমাদের বিচার আরম্ভ করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গালী পারে না আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াইতে; বাঙ্গালী পারে না, যেখানে বাক্য ছাড়া আর কিছুর প্রভাব দেখাইতে হয়, সেখানে জয় লাভ করিতে। এই পরাবলম্বিনী লতা কোনও সহকারকে আশ্রয় করিতে পাইলে, কুসুম-কিশলয়ে তাহার সকল অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া শোভাময়ী হইতে জানে।—ইহার মঞ্জরীগুলি স্তবকে-স্তবকে ঝুলিয়া পড়ে; ইহার নধর শাখা-প্রশাখাগুলি কোমল কান্তিতে টলিয়া, এলাইয়া, ছড়াইয়া পড়িতে জানে। শাখা-প্রশাখার যে ধর্ম্ম—চারি দিকে ঝাঁকড়া হওয়া—সে ধর্ম্ম ইহার প্রচুর। মূলের-কাণ্ডের যে ধর্ম্ম উপর দিকে খাড়া হইয়া উঠে, শত ঝঞ্ঝাবাতে আপনাকে অটুট রাখে, সে ধর্ম্মের একেবারেই এখানে অভাব। ভাবুকতার দিকে বাঙ্গালী অনেকখানি;—চরিত্রের দিক হইতে বাঙ্গালীর কোনও যোগ্যতা নাই।

বাঙ্গালীর চরিত্র নাই—বাঙ্গালা মাসিক পত্রেই এমন

কথার অবতারণা করিলাম,—এ অত্যন্ত অশোভন দেখাইতেছে। কথাটা ঘুরাইয়া লইলাম; বলিব, বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব নাই।—বাঙ্গালীত্বে মনুষ্যত্বের সংমিশ্রণ আজ চাই।

বাঙ্গালী পারে সব; কিন্তু কিছুই আজ সে করিতেছে না। মানুষে যাহা-যাহা করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠিত, সকলই তাহাকে করিতে হইবে। তাহাকে মানুষ হইতে হইবে।

দেশের মাটী বাঙ্গালীরই। সে যদি সবল হইয়া আত্ম-বিকাশ করিতে পারে, কেহই তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইতে পারিবে না। আপন দেশে বাঁচিবার অধিকার তাহার আপনারই হাতে। যে কাপড় সাতটাকা জোড়া বিকায়, সে পরের হাতে তৈয়ারী ও বিক্রির ভার আছে বলিয়াই বিকাইতেছে। যে চাউল বারটাকা মণ, তাহার আবাদ, আমদানী, রপ্তানীর উপর আপনার মন নাই বলিয়াই তেমনটা হইয়াছে। দুধ-ঘি কিছুই আজ মিলিতেছে না;—দোষ কাহার? খাইবে বাঙ্গালী। খাবার তৈয়ারী ঘরে হইতেছে কি না, সেটা দেখিয়া লওয়া ভদ্রয়ানার বাহির,—ইহাই আজ তাহার ধারণা। দেহ-পুষ্টির জন্য যেগুলি প্রয়োজন, জীবনরক্ষার জন্য যেগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য, সেগুলির উৎপাদন ও আনয়নের ব্যবস্থা, দেশের ভিতরে, স্বজাতির ভিতরে পরস্পর সেবাপ্রবৃত্তি জাগাইয়া, স্থির করিয়া লওয়াই স্বাভাবিক। সকল জাগ্রত দেশেই তাহা হইতেছে। বাঙ্গালীরও এতদিন তাহাই ছিল। বিদেশীর ব্যবসামূলক লোভের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া ও-গুলির আশা করিলে আমরা বিষ খাইব, সে আবার বিচিত্র কি?

আজ ভদ্রলোক সম্প্রদায়, এমন কি অভিজাত সম্প্রদায় পর্য্যন্ত দেশের অপর দশজন হইতে আপনার পার্থক্য ও দূরত্ব রক্ষা করাটাকেই আপনার respectibility রক্ষা বলিয়া মনে করিতেছেন। এই মোহ বিনাশের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। সম্মান ত তাহাই, পরস্পর মিলমিশের মধ্যে যেটা আপনাকে অপর পাঁচজন হইতে বিশিষ্ট করিয়া তোলে। পৃথক্ হইয়া দূরে থাকা কখনই কোন বিশেষত্ব দিতে পারে না। দেশে আমি কতটা সকলের পক্ষে উপযোগী হইয়া উঠিলাম, আমার অভাবে শত কিংবা সহস্র লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানটাই ত সম্মান। আবার সে দিন আসুক, অভিমানের তৃপ্তি অপেক্ষা হৃদয়ের তৃপ্তিই যেদিন মানুষের কামনার বস্তু হইবে।

আপনার মধ্যে স্থির উচ্চ আদর্শ, আর সেই আদর্শ-অনুযায়ী জীবনকে বিকশিত করিয়া তোলার সঙ্গে-সঙ্গে, অপরাপর সকলকে গঠন করা, ইহাই ত মনুষ্যত্ব। বাঙ্গালীর এই মনুষ্যত্বেরই আজ প্রয়োজন। বাঙ্গালীর স্বজাতীয় পণ্ডিত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন "বাঙ্গালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি।"—আত্ম-সংজ্ঞা বিস্মৃতির অগাধ জলতল হইতে উঠিয়া কবে ইহাদের আপনাকে চিনাইয়া দিবে? বাঙ্গালী আপনাকে চিনুক, আপনাকে বুঝুক, আপনাকে গড়িয়া তুলুক। নতুবা, বাঙ্গালী এই নামের মধ্যে যে গর্ব্ব আছে, সে গর্ব্বের সার্থকতা কোথায়?

পরের মধ্যে প্রভাব-বিস্তার-শক্তি আমাদের প্রচুর; কিন্তু আপনার মধ্যেও যদি প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলাম, তবে ত এ প্রভাব মেরুদণ্ডহীন। শ্রদ্ধা আপনাকে করিতে হইবে। আপনার আত্ম-শক্তি স্থির সংযত প্রত্যক্ষ করিয়া, তার পর পরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ বা দৃষ্টি আকর্ষণ,—তাহার কাছে নিজেকে উপযোগী প্রতিপন্ন করা,—সেইটাই ত জয়। নতুবা তাহার যত আদরই পাই, যত সম্ভ্রমই জাগাই, সে ত' ভাঁড়ামি,—মনযোগান মাত্র। বাঙ্গালী আত্মগঠিত নহে বলিয়াই, তাহার এত এত মহদ্গুণ সত্ত্বেও অতি অপদার্থ জাতিতেও তাহাকে বার-বার জয় করিয়া গিয়াছে।

বিয়োগে

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

তব যৌবন হাসি ভাষা দেহ রূপ
তোমারি পূজায় জেলেছে তাহারা ধূপ—
তবে তুমি মনো মন্দিরে মম আজি
ভুবন-ভুলানো রূপে আসিয়াছ সাজি।
যা নেবার তা'তো নিয়ে গেছ দুই হাতে—
ফেলে গেছ যাহা যাবার ব্যস্ততাতে,
তারা কেন হেন তপ্ত তীক্ষ্ণ বাজে
বিষ বাণ বুক-মাঝে?
সে যে অসংখ্য—সারাটি গৃহের কাযে!

এতদিন যারা আছিল চোখের আড়ে
শেফালির মত পড়ি একান্ত ধারে—
পাইতাম শুধু মৃদু সৌরভ যার,
পরিচয় ছিল,—গন্ধেরি সম্ভার,—
আজ তারা সব দাঁড়ায়ে দৈত্যসামি
রোষ-কষায়িত নিকাসিত তরবারি
রুধিয়া দুয়ার হানা দেয় নিশি-দিন
বিরাম-বিরতি-হীন;
স্তম্ভিত ভীত, চেয়ে থাকি আমি দীন।

আয়না দেরাজে নানাবিধ বড় ছোটো
শঙ্খের জোড়, কত সিঁদুরের কোটো।
কোন কৌটায় আঙুলের দু'টী দাগে
তব আঙুলের রেখাবলী আজো জাগে;
তেলের বোতলে আছে তেল আজো আধা,
কা'ল বুঝি আর হয় নি ক' চুল বাঁধা?
গুছিতে, ফিতাতে, কাঁটাতে, পিনেতে, তাই
বাঁধা যে দেখিতে পাই!
চুলের বাঁধন—তাও কিগো বাঁধ নাই?

কোঁচানো শাড়ীটি সংকোচে ছোট হ'য়ে
ঝুলে আলনায়—মূক প্রতীক্ষা ল'য়ে—
মেলিবে বলিয়া আপন বিপুল দেহ
তোমারে আবরি, পাবে বলি তব স্নেহ,
দুঃসহ আশে আছে প্রভাতের লাগি,
প্রভাত আসিল শ্মশান রজনী জাগি।
এখনো শেমিজে দেহ-কুঞ্চনগুলি
উঁচু-নীচু হয়ে ফুলি
রেখেছে তোমায় সুবাসিত ছবি তুলি।

গহনারা তব বাহন হারায়ে আজ
হেথা হোথা পড়ে অযতনে গৃহ-মাঝ!
তোমার তনুর অণু অণু মলা নিয়া
পরশ-স্মারক রেখেছে ভরিয়া হিয়া।
ভিজে আলনায় গিয়াছিলে কবে চলি,
আজো সেই পাজ কক্ষে রয়েছি ফলি
ম্লান জোছনায় নিশান্ত বিধু যথা।
চাবির রিঙের কথা
তাও শেষ—সেও বহিছে নীরব ব্যথা!

সরু-মোটা তব চিরুনীরা অই প্রিয়ে,
গুটি কত তব কেশ-সম্বল নিয়ে,
কলিজা চিরিয়া রেখেছে সিঁদুরে বাসে—
রঙীন সুরভি মূর্ত্ত স্বপনে হাসে।
শেলাই তোমার এলায়ে আসেনি আজো
দু'টি কাপড়ের অটুট বাঁধন ভাঁজ-ও!
গিয়াছে কেবল প্রাণের গ্রন্থি টুটি
চিতার ভস্মে লুটি—
চকাচকী সম দু'পারে হৃদয় দু'টি।

ইমান্‌দার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ ক্ষণিকের জন্য গুম্‌ হইয়া রহিলেন। তার পর বিরক্তভাবে নিজের শ্মশ্রু উৎপাটন করিতে-করিতে—সুমতি দেবীর দিকে চাহিয়া,—বেশ সংযত ভাবেই স্বভাব সিদ্ধ কোমল নম্রতার সহিত বলিলেন, "তুমি তাদের ছেড়ে একলা চলে এলে কেন মা?"

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর যতই নম্র হউক, তাঁহার দৃষ্টিতে যে প্রচ্ছন্ন উগ্রতার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেটা সুমতি দেবীর দৃষ্টি এড়াইল না। মোক্ষদা ও ঝিএর আচরণটা তিনি বৃদ্ধের কাছে চাপিয়া যাইতেই চাহিতেছিলেন,—কেন না তিনি নিজে, তাহাদের অবহেলার উপর যেটুকু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহাই সুমতি দেবীর মতে- যথেষ্ট! প্রভু-বংশের সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম মান অপমানের প্রতি এই কর্ত্তব্য-প্রিয় বৃদ্ধ ভৃত্যের দৃষ্টি যে কত কঠোর, সেটা সুমতি দেবীর খুব ভাল রূপেই জানা ছিল। সেইজন্য ইহাঁর বিচার দৃষ্টির সামনে, তিনি অন্য আশ্রিত প্রাণীগুলির দোষ ঘাট যথাসাধ্য ঢাকা দিয়াই চলিতেন। আজও তাহাই করিতে চাহিতে-ছিলেন;—কিন্তু তাহার ফলটা বড় বিপরীত দিকে গিয়াই দাঁড়াইতেছে দেখিয়া, তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি কি ভাবিয়া লইলেন কে জানে,—তার পর বেশ শান্ত ভাবেই সংক্ষেপে মোক্ষদা ও ঝিকে ছাড়িয়া আসিবার কারণটা ব্যক্ত করিলেন;—সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, তাহারা শীঘ্রই আসিবে বলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাদের অপেক্ষায় বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিলেন না,—যেহেতু, ঠাকুর বাড়ীতে আজ অতিথি-অভ্যাগত বৈষ্ণবগণের কার্য্য-ব্যস্ততার অত্যন্ত ভিড়।

সুমতি দেবী সঙ্কোচ কাটাইয়া, বৃদ্ধের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে কোন কার্য্য-ব্যস্ত বৈষ্ণবের নামোল্লেখ করিলেন না।

হঠাৎ পুত্রের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "তুই এ সময় সেখানে কি কর্‌তে গিয়েছিলি?"

অন্য সময় হইলে, পিতার এই অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নটা ফৈজু সরল চিত্তেই গ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু আজ পারিল না। আজ প্রথমেই পিতার সেই অন্তর্ভেদী সংশয়ের দৃষ্টি তাহার চিত্তে বিদ্রোহের তাণ্ডব জাগাইয়া দিয়াছিল; তার উপর এই প্রশ্নে একেবারে আগুন জ্বালাইয়া তুলিল।—অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া পরিষ্কার স্বরে বলিল, "নজিরুদ্দীনকে খুঁজ্‌তে গিয়েছিলুম—" কিন্তু দৃষ্টি তাহার নত হইয়াই রহিল। পাছে তাহার দৃষ্টির প্রচ্ছন্ন বিরক্তি-অসহিষ্ণুতা পিতার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, সেই ভয়ে সে চোখ তুলিতে পারিল না।

বৃদ্ধ তীব্র কটাক্ষে চাহিয়া সন্দিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "নজিরুদ্দীনকে খুঁজ্‌তে? ঠাকুর-বাড়ীর মধ্যে?"

প্রাণপণে ধৈর্য্য বজায় রাখিয়া ফৈজু ধীরভাবে বলিল, "ঠাকুর-বাড়ীর ভেতর কেন যাব? ঠাকুর-বাড়ীর চলন-ঘরে একজন আলখাল্লা-পরা বাউল দাঁড়াইয়া ছিল, তাকেই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলুম,—পেছনে আড্ডা-বাড়ীতে নজরু আছে কি না?"

সুমতি দেবী একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন, "আমি সেইখানেই—মাঝের দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম, ফৈজুর সাড়া পেয়ে তাই চলে এলুম,—বাড়ী চল সর্দ্দার—" সুমতি দেবী কথাটা শেষ করিয়াই অগ্রসর হইয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ আলো হাতে লইয়া মাঝে চলিতে লাগিলেন; ফৈজু চলিল সকলের পিছু। চলিতে চলিতে বৃদ্ধ বলিলেন, "নজরুর কাছে তোর কি দরকার ছিল রে ফৈজু?"

ঠোঁট কাম্‌ড়াইয়া, অসন্তুষ্ট ভাবে ফৈজু বলিল, "আমার নিজের দরকার কিছুই না, নজরুর ছেলের অসুখ......... তাই......।"

তাই যে কি, ফৈজু সেটা আর সুস্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিল না, বৃদ্ধও সেটা জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন না। বোধ হইল, তিনি আর একটা কিছু ভাবিতে-ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের গাম্ভীর্য্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল।

তিনজনে নিঃশব্দে বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিলেন।

পিসিমা রোয়াকের উপর গড়াগড়ি দিয়া, শুইয়া-শুইয়াই মালা জপিতেছিলেন। সুমতি দেবী আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া, পায়ে হাত দিয়া—যেন কিছুই হয় নাই, এমনি প্রসন্ন, নির্ব্বিকার দৃষ্টি তুলিয়া, বলিলেন, "গায়ের জ্বালাটা এখন কমেছে পিসিমা ?"

"আর বাছা, যে পিত্তির জ্বলন্" বলিতে-বলিতে পিসিমা উঠিয়া বসিলেন। সর্দ্দার ও ফৈজু পিছনে আসিতেছে দেখিয়া, গায়ের কাপড়টা টানিয়া গুছাইয়া লইয়া বলিলেন, "সর্দ্দার, বাড়ী যাব বলে বেরিয়ে আবার ফিরলে যে ?"

সর্দ্দার "হুঁ" বলিয়া অদূরে রোয়াকের উপর বসিলেন, ফৈজু তাঁহার পায়ের নীচে সিঁড়িতে বসিয়া, মাথা হেঁট করিয়া শান-বাঁধান উঠানটা দেখিতে লাগিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সর্দ্দার বলিলেন—দিদিঠাকুরুণ্, আপনি নিজে যেখানে যেতে পারবেন না, সেখানে যার-তার সঙ্গে ছোটমাকে কেন পাঠান বলুন দেখি ? বিশেষ ঐ মেনীর-মা টেনীর-মার সঙ্গে ? জানেন, ওরা কি রকম ধরণের লোক, তবু আপনাদের কি যে বিশ্বাস—হুঁ !"—বৃদ্ধ বিরক্ত ভাবে থামিলেন।

শঙ্কিত হইয়া পিসিমা বলিলেন, "কেন, কি হয়েছে ? তারা কই ?"

রুক্ষ-শ্লেষের স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "তারা এখন ঠাকুর-বাড়ীতে—ঠাকুর-ই দেখ্ছেন্! তাঁদের ঠাকুর-দেখা এখনো শেষ হয় নি! লোকে ষোল-আনাই পুণ্যি করে,—কিন্তু তাঁদের পুণ্যিটা বত্রিশ-আনা হওয়া চাই তো! কোনখানে এতটুকু কসুর থাকলে চল্‌বে না! তাঁরা চান-জল নেবেন, ফুল নেবেন, পেসাদ নেবেন, আলাপীদের সঙ্গে সাত-সতের খবর লেনা-দেনা করবেন, তবে তাঁদের ঠাকুর দর্শন ঠিক হবে, না হলে হবে না!"—একটু থামিয়া উগ্র ভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, কঠোর উত্তেজনার সহিত বলিলেন, "এত বড় বুকের পাটা তাদের, যে, ছোটমাকে একলা দোর-গোড়ায় দাঁড় করে রেখে, তারা দুজনেই পূজারীকে খোঁজবার ছল করে, সরে পড়ে! আজ আসুক তারা,—আমি এইখান থেকে তাদের দূর করে দিয়ে, তবে এ জায়গা ছেড়ে উঠ্‌ব! তারা জানে না, কোন্ ঘরে তারা চাকরী কর্‌তে এসেছে ?·········যত মনে করি ভালমানুষীর ওপর চল্‌ব, ততই যে দেখ্‌ছি বাড়াবাড়ি হয়ে উঠ্‌ছে !"

পিতার প্রত্যেক কথাটির ভিতর হইতে ফৈজু নিজের জন্য অন্তরে-অন্তরে, 'অনেক কিছু' সংগ্রহ করিয়া লইল! তাহার মাথাটা ক্রমশঃই নিজের পায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল।

পিসিমা বহুদিন হইতেই এই সংসারে গৃহিণীপনা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার গৃহিণীত্বের যা-কিছু বিশেষত্ব, সে শুধু সংসারের সকলকে 'পেট ভরিয়া খাওয়ান'র ব্যবস্থাতেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল,—অন্য সকল ব্যাপারে তিনি নিতান্তই ঢিলা প্রকৃতির মানুষ,—বিশেষ ঝি-চাকরদের অবাধ্যতা সংশোধনে, শাসন-কসন প্রয়োগে, তিনি সম্পূর্ণই অপারগ! এ সকল বিষয়ে তিনি ভ্রাতুষ্কন্যা সুমতি দেবীর বুদ্ধি বিবেচনার উপরই একান্ত ভাবে নির্ভর করিতেন। সুমতি দেবী, পিসিমার মত অতখানি ঢিলা প্রকৃতির মানুষ না হইলেও, ঝি চাকরদের সহিত বকাবকি করিতে আদৌ ভালবাসিতেন না,—ঝি চাকরদের ত্রুটি তিনি নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতেন, দু'পাঁচবার মৃদুভাবে সতর্কও করিয়া দিতেন; তার পর নিষ্ফল হইলে—সর্দ্দারকে ডাকিয়া বলিতেন অন্য লোক দেখিতে,—আর গোমস্তাদের ডাকিয়া বলিতেন, মাহিনা চুকাইয়া দিতে! অবাধ্য ঝি-চাকররা এমনি ভাবে শিষ্টাচারের সহিত এ বাড়ী হইতে বিদায় লাভ করিত।

আজ সর্দ্দার কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া, নিজেই একসঙ্গে দুই-দুইটা মানুষকে বিদায়দানে উদ্যত দেখিয়া, পিসিমা বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। সুমতি দেবীর মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি সম্পূর্ণ শান্ত-শীতল ভাবে চুপচাপ বসিয়া আছেন। তাঁহার জন্যই এই অপ্রীতি-কর কাণ্ড ঘটিতে চলিয়াছে, অথচ তাঁহার কোন সাড়াশব্দ নাই দেখিয়া পিসিমা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। নিরুপায় ভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া—শেষে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "অবিশ্যি অন্যায় তারা করেছে বটে, তা' সর্দ্দার তুমি আজকের মত তাদের·········ওর নাম কি, একটু ধমকধামক দিয়ে যাও। এখনকার দিনে আর লোকজন রেখে সুখ নাই, যে লঙ্কায় আসে সেই তো রাবণ হবে! কি আর করা যাবে বল·······আর [illegible] লোক

ভাদ্দর মাস, এখন শিয়াল-কুকুরকে বাড়ী হতে তাড়াতে নাই!"

বাধা দিয়া সর্দ্দার তীব্রস্বরে বলিলেন, "শিয়াল-কুকুর বাড়ী থেকে তাড়াতে নাই,—কিন্তু গোখ্‌রো সাপ তাড়াতে আছে! কি বলেন দিদিঠাকরুণ, যে নিমকহারাম ঝি-চাকর মনীব-গোষ্ঠির মান-ইজ্জতের দিকে নজর রাখে না, তাদের জন্যে আবার ভাদ্দর মাস, পৌষ মাস!" বৃদ্ধ উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—অধিকতর তীব্র স্বরে বলিলেন, "ও সব নিমকহারাম ঝি চাকরদের এক লহমা বাড়ীতে ঠাঁই দেওয়ার চেয়ে গোখরো কেউটে সাপ এনে বাড়ীতে পুষে রাখা ঢের ভাল।"

ঐ উপর্য্যুপরি উচ্চারিত নিমকহারাম শব্দটা ফৈজুর মাথায় যেন বজ্রাঘাতের মত বাজিল! তাহার বেশ বোধ হইল, পিতা যাহাদের উপর কটাক্ষপাত করিয়া এ কথাটা বলিতেছেন, ফৈজুও তাহাদের মধ্যে একজন! ফৈজুর সমস্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দগ্ধ করিয়া মনের মধ্যে যেন দারুণ হুঙ্কারে দাউ দাউ করিয়া দাবানল গরজিয়া উঠিল! হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কাহারো দিকে না চাহিয়া, মাঝখান হইতে মাথা নোয়াইয়া সে বলিল, "আমায় ভোরেই বেরুতে হবে, এখন তা'হলে আসি।"

সে দুয়ারের কাছাকাছি হইয়াছে, এমন সময় মোক্ষদা ও ঝি বাড়ী ঢুকিল। পথ দিবার জন্য ফৈজু পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মোক্ষদা কোল হইতে কুল কুচকুচে নাদুসনুদুস গড়নের মেয়েটিকে নামাইয়া, ঝঙ্কার হানিয়া বলিলেন, "হেঁগা দিদি, তোমার কি আর একটু তর সইল না?"

সর্দ্দার বাধা দিয়া দৃঢ়, সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "না, সইল না। যাও বাছা, তোমাদের যার-যা জিনিসপত্র আছে, নিয়ে এখনি যে যার আপনার বাড়ীতে চলে যাও,— আমি এখনি অন্য লোক ঠিক করে আস্‌ছি,—তারা কাল সকাল থেকে কাযে আস্‌বে। তোমাদের দ্বারা এ বাড়ীর কায আর হবে না।"

দারুণ আক্রোশে মোক্ষদা দিদির চক্ষু দুটা ধবক্ ধবক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! দুহাত নাড়িয়া কর্কশ চীৎকারে বলিলেন "আমাদের দ্বারা হবে না? তবে হোল কি করে এত দিন? তোমার হুকুমে আমরা যাব না কি? মুনী-[illegible] দিক, যাচ্ছি। তুমি বল্‌বার কে?"

সুমতি দেবী রুষ্ট স্বরে বলিলেন, "আমার বাবার আমলের লোক,—এ বাড়ীর পঁচিশ বছরের পুরোনো লোক;—মোক্ষদা দিদি, তুমি একটু মুখ সামলে কথা কও,—মনে রেখো, আমাদের ভালমন্দটা সর্দ্দার আমাদের চেয়ে বেশী বোঝে।"

মোক্ষদা দিদি চেঁচাইয়া বলিলেন—"তা সে জানি, জানি, ওরাই তোমাদের সব, সেটা খুব ভাল করেই জানি! নইলে।"

বাধা দিয়া সর্দ্দার বলিলেন, "ত্যাখো, মায়ের জাত তোমরা,—মান রেখে কথা কইছি। শোন, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, অত চেঁচিও না। ঠাকুরবাড়ীর সেই হোটেলখানায়, যত রাজ্যের ভদর-কুটে জংলী-গুলিখোর জুটে যে চেঁচামেচিটা করে, সে চেঁচামেচিটা এখানে চল্‌বে না, বুঝ্‌লে, বাড়ী যাও।"

মোক্ষদা সর্দ্দারের মুখপানে একটা বক্র-কটাক্ষক্ষেপ করিয়া, উদ্ধতভাবে বলিল, "এ কি হিঁদুর বাড়ী, না আর কিছু। বাড়ীর ভেতর বোষ্টমের নিন্দে, বোষ্টম ধর্ম্মের নিন্দে, আর সবাই কাণ পেতে বসে তাই শুনছে? এ গাঁয়ের কি আর ভদ্দর আছে? থাকতো যদি আজ এখানে মানুষের মত মানুষ কেউ, তা হলে—"

"তা হলে, হাঁ," বাধা দিয়া, শান্তকণ্ঠে সুমতি দেবী বলিলেন "হাঁ, যিনি যথার্থ বৈষ্ণবধর্ম্মকে প্রাণের নিষ্ঠায় ভালবেসে পূজা করেন, ভণ্ড বৈষ্ণবদের উচ্ছৃঙ্খলতা, অনাচার—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অত্যাচারকে তিনি অন্ধ ভক্তির খাতিরে চোখ বুজে প্রণাম করবেন না,—এ আমি নিশ্চয় বল্‌ছি! তবে যার নিজের ভেতর সত্যনিষ্ঠার জোর নাই, নিজের ভণ্ডতাকে ঢাকবার জন্যে যিনি পরের ভণ্ডামীকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেন, তাঁর কথা আলাদা!"

সুমতি দেবী কি বলিলেন মোক্ষদা সেটা আদৌ বুঝিতে পারিল কি না, বলা শক্ত; কিন্তু নিশ্চয় বুঝিতে পারিল, সে কথাগুলার মধ্যে একটা দুঃসহ গালাগালি প্রচ্ছন্ন আছে-ই! নিষ্ফল আক্রোশে অধীর হইয়া, ক্ষিপ্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া, দুহাত নাড়িয়া বলিল, "আমি অত পুঁথী-কেতাব পড়ে লাট-বেলাটের দরবারের খবর রাখি না,—পিথিমি সুদ্ধ বোষ্টম ভণ্ড কি অভণ্ড তা আমি—"

রুক্ষ কণ্ঠে সুমতি দেবী বলিলেন, "পৃথিবী সুদ্ধ বৈষ্ণবের

কথা হচ্ছে না মোক্ষদা দিদি, কথা হচ্ছে আমাদের ঠাকুর-বাড়ীর মোহন্ত, আর তার চেলা-চণ্ডদের খবর। এর মধ্যে পৃথিবী সুদ্ধ লোককে টেনে আনবার কোন দরকার নাই। তোমরা খুব বেশী কথা কইতে পার, তা আমি খুব জানি; কিন্তু আমার সামনে বাজে বোক না,—থাম।"

মোক্ষদা দিদি উদ্ধত ভাবে আর একটা কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, সর্দ্দার দুয়ারের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন "চলে যাও, আর নয়!"

মোক্ষদা নিরুপায় হইয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিলেন; তারপর চোখে আঁচল দিয়া, বার দুই ফোঁশফোঁশ করিয়া,—সহসা পিছন হইতে মেয়েটিকে টানিয়া নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, তাহার মাথায় ডানহাত রাখিয়া, নাকি কান্নার সুরভরা কণ্ঠে বলিলেন, "আমার এই 'নোক্ষ' টাকার ছেলে পিসিমা, এর মাথায় হাত রেখে আমি বলছি, আমি কোন দোষে দুষী নই।"

সুমতি দেবী স্তম্ভিত-নয়নে একবার সেই মেয়েটির পানে, একবার তাহার মার পানে চাহিলেন; কিন্তু মোক্ষদার নির্ঘাৎ প্রতিজ্ঞা থামাইতে পারিলেন না,—কি একটা অব্যক্ত ক্ষোভে তাঁহার কণ্ঠ যেন সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল। আড়ষ্ট হইয়া তিনি মোক্ষদার অস্বাভাবিক জ্বালাভরা চোখ দুইটার পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন!

পিসিমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আহা, কর কি মোক্ষদা, ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি করো কেন বাপু? থামো না, ওতে যে ছেলের অকল্যাণ হয়!"

মোক্ষদা যেন এই আদরের গৌরব টুকুই খুঁজিতেছিলেন—ফুলিয়া উথলিয়া উঠিয়া—একেবারে উচ্ছ্বাস ভরে ক্রন্দন জুড়িয়া দিলেন—"আমার কত দুঃখের মরা-হাজা ছেলে, আজ আদর করবার লোক নেই তাই,—নইলে আমার 'নোক্ষে' টাকার ছেলে, কি বল্‌ব পরের দুয়োরে খেটে খাচ্ছি, মিনি দোষে তাই অপমান সইতে হচ্ছে—কথা কবার নোক নেই! আমি ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি করছি—"

পিসিমা আবার বাধা দিতে গেলেন,—কিন্তু মোক্ষদাকে ঠেকায় কে? পিসিমার পুনঃ-পুনঃ নিষেধ ও পুনঃ পুনঃ জেদ—দুই প্রতিকূল চেষ্টার শুষ্ক-দ্বন্দ্ব সংঘাতে একটা বিষম কোলাহলের সৃষ্টি হইল। ঝি এতক্ষণ ভয়ে চুপ করিয়াছিল, এবার সাহস পাইয়া, সেও মোক্ষদার পক্ষ সমর্থনে লাগিয়া পড়িল! বড়লোক হইলেই কি এমনি হইতে আছে? না হয় ঝি ও মোক্ষদা গরীব,—পেটের দায়ে বড় লোকের বাড়ীতে খাটিতেই আসিয়াছে,—তাই বলিয়া এত অবিচার কি সহিতে পারে? মিছামিছি তাহাদের এত অপমান, ...কাযেই তাহারা ছেলের মাথায় হাত দিয়া দিব্যি করিবে না তো কি করিবে? মাথার উপর ধর্ম্ম একজন আছেন, তিনি সবই দেখিতে পাইতেছেন...... ইত্যাদি! যেন দৃশ্যমান দোষের প্রমাণগুলা খণ্ডন করিবার একমাত্র উপায়—অদৃশ্য ধর্ম্মকে সাক্ষী মানিয়া সন্তানের মাথায় হাত দিয়া শপথ করা, ও অসংযত তীব্র চীৎকারে আর্ত্তনাদ করা ছাড়া আর কিছুই না! ঝি ও মোক্ষদা দিদি বিস্তর চেঁচাইয়া, পরস্পরকে পরস্পরের নির্দ্দোষিতার সাক্ষী মানিয়া, পরস্পরে পরস্পরের পক্ষ সমর্থন করিয়া, নিশ্চয়রূপে প্রমাণ করিতে চাহিল—তাহারা খুব ভাল, খুব ভাল, খুব ভাল!

ফৈজু এতক্ষণ দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া, অন্যদিকে চাহিয়া ইহাদের কলহ-কলরবের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না,—শব্দগুলা কাণের উপর দিয়া অকারণে ভাসিয়া গেল,—মন তাহার একবর্ণও আয়ত্ত করিতে পারিল না। সেখানে যে অগ্নিদাহের আলোড়ন চলিতেছিল, তাহাই নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতে লাগিল! আর অনর্থক দাঁড়াইয়া থাকিতে ভাল লাগিল না,—ফৈজু নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িল।

সদর দেউড়ীর পাশে, অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া একটা লোক দাঁড়াইয়া ছিল, ফৈজুকে দেখিয়া সে সহসা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল! ফৈজুর মনের অবস্থা যদি আজ ভাল থাকিত, তবে পলায়ন-তৎপর মানুষটার অদৃষ্টে কি দুর্গতি ঘটিত কে জানে;—কিন্তু ফৈজু ইচ্ছা করিয়াই নিশ্চেষ্ট হইয়া তাহাকে পলায়নের সুযোগ দিল,—একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসাও করিল না, সে কে,—বা, কেন পলাইল! নিগূঢ় বেদনায়, তীব্র অভিমানে আজ তাহার মন জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে,—নিজের দুঃখে আজ তাহার সমস্ত চিত্ত কঠোর-উৎক্ষেপে ভরিয়া গিয়াছে, অন্যের আচরণে আজ তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইবে কেমন ক'রয়া?—অর্থহীন দৃষ্টিতে সে একবার শুধু পলায়মান মানুষটার দিকে চাহিয়া দেখিল; আর পর

নিঃশব্দে নিজের বাড়ীর দিকে চলিল। মানুষটার ব্যবহারে এতটুকু বিস্ময় বা এতটুকু সংশয় আজ তাহার মনে স্থান পাইল না! যেন ওটা কিছুই না!

পিতা যদি মুখোমুখি ফৈজুকে প্রশ্ন করিতে পারিতেন, তবে ফৈজু মুখোমুখি উত্তর দিয়া, বোধ হয় হাল্কা হইয়া যাইতে পারিত! কিন্তু পিতা তাঁহার মনের সংশয়কে রাখিয়া দিলেন মনের অন্ধকারে,—আর ফৈজু সেই সংশয়ের গ্লানিতে বুক ভরাইয়া গোপন-ক্ষোভের পীড়ন ভোগ করিতে লাগিল,—গোপন অন্তরে! একটা অসহনীয় ঘৃণার ধিক্কারে তাহার চিত্ত থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল! পিতা তাঁহাকে এতদূর হীন দৃষ্টিতে দেখেন! এত বড় নৃশংস কৃতঘ্ন বলিয়া মনে করেন! সে বাহিরে যতই দৈন্য দারিদ্র্যের মধ্যে অবস্থান করিতে বাধ্য হউক,—কিন্তু নিজের ভিতরে, নিজের মাথাটাকে শক্ত ভাবে উঁচু করিয়া চলিবার শক্তি তাহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে,—এ কথা কি পিতা কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না? শুধু ঘৃণার্হ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতেই তাঁহার অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিয়া যাইবেন?

সহসা বজ্র চমকের মত ফৈজুর মনে পড়িল, শুধু পিতা-ই বা কেন, পত্নীও তো তাহাকে একদিন এ সন্দেহে আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই!

ফৈজুর যেটুকু ধৈর্য্য অবশিষ্ট ছিল, সেটুকু এবার লোপ পাইল! দুর্জ্জয় ক্রোধে আপাদ-মস্তক পূর্ণ হইয়া গেল! ফৈজুর ইচ্ছা হইল, এই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গিয়া,—খুব একটা উৎকট রূঢ়তার সহিত, যতগুলা শক্ত কথা মনে পড়ে, সমস্তগুলা টিয়াকে শুনাইয়া, বজ্রকণ্ঠে জানাইয়া দিয়া আসে যে, সে দুর্ব্বলতার চরণে নত হইতে জানে না, নত হইতে জানে প্রবলতার চরণে! এবং সে যতই নগণ্য, যতই অধম, যতই হেয় অবজ্ঞেয় মানুষ হউক, তাহার বুকের ভিতর যে প্রাণটা অহরহঃ কাজ করিতেছে, সেটা মানুষেরই প্রাণ, ইতর জন্তুর কুৎসিত লালসা-উন্মাদ-জঘন্য প্রাণ নয়! ইহা যদি সে না বিশ্বাস করিতে পারে, তবে স্বামী বলিয়া যেন তাহার মুখপানে না চায়!

ঝড়বেগে কত চিন্তা ফৈজুর মনের মধ্যে বহিয়া গেল, তাহার হিসাব নাই। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া, অন্ধকার বাড়ীর মধ্যে পা দিয়াই কিন্তু সহসা সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল! মনে পড়িল, টিয়ার অবস্থা এখন সহজ নহে! ফৈজুর মনের মধ্যে আজ যে বিষময় দ্বন্দ্বের গরল ফেনাইয়া উঠিয়াছে, সে দ্বন্দ্বের প্রচণ্ড অভিঘাত টিয়ার উপরে বর্ষণ করিতে চাওয়া, আর তাহাকে হত্যা করিয়া বসা, এখন একই কথা! ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া সসম্মানে যাহাকে বংশধরের জননী পদে বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে—আজ স্বামীত্বের প্রবল গর্ব্ব-মর্য্যাদার অহঙ্কারে আত্মহারা উন্মাদ হইয়া, তাহাকে এমনি নৃশংসভাবে সংহার করাই উপযুক্ত কর্ত্তব্য পালন হইবে বটে!

প্রতিকূল ঘৃণার ধিক্কারে,—নিজের অসংযত উন্মাদনা-পূর্ণ মনটাকে সবলে আঘাত করিয়া, ফৈজু নিঃশব্দে আসিয়া অন্ধকার রোয়াকের উপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর উঠিয়া, জামা জুতা পাগড়ী খুলিয়া, কুয়া-তলায় গিয়া, বালতী কতক জল তুলিয়া অন্ধকারেই স্নান করিতে বসিল।

শব্দ পাইয়া রহিমা বাহিরে আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "রকম কি?"

ফৈজু সংক্ষেপে উত্তর দিল, "বড় মাথা ধরে গেছে।"

রহিমা তিরস্কার করিল, সারাদিন অনাহারে রৌদ্রে পথ হাঁটিলে মাথা ধরে আর না ধরে! ফৈজু চুপ করিয়া রহিল।

ব্রতের উপাসনা ও উপবাস ভঙ্গের নিয়ম রক্ষাটা পূর্ব্বেই সারিয়া লওয়া হইয়াছিল। স্নানান্তে ফৈজু আহারে বসিল; রহিমা এদিক-ওদিক কথা কহিতে কহিতে জানিয়া লইল, শ্বশুরের সহিত ফৈজুর সাক্ষাৎ হইয়াছে। নিশ্চিন্ত হইয়া সে বলিল, "তবে আর কি, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়, আহা সারাদিনের কষ্ট............।"

ফৈজুর আহার শেষ হইতেই, রহিমা একটা কাজের ছল করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল—অভিপ্রায় দম্পতিকে কিছুক্ষণ নিভৃত আলাপের সুযোগ দেওয়া! কিন্তু ফৈজু সে সুযোগটা নির্দ্দয়-তাচ্ছিল্যে উপেক্ষা করিয়া নিঃশব্দে পাশের ঘরে ঢুকিয়া পিতার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শুইয়া পড়িল, এবং সমস্ত দিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত দেহে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক রাত্রে, কি একটা মৃদু-আহ্বান শুনিয়া ফৈজুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—চাহিয়া দেখিল, টিয়া কাঁধের উপর হাত দিয়া

জাকিতেছে। নিদ্রালস-বিকল মস্তিষ্কে কোন কথা ভাল করিয়া স্মরণ হইল না—চমকিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি! কেন?"

একটু দূরে সরিয়া গিয়া, টিয়া মৃদুস্বরে বলিল "খাবে চল, রাত দুটো বেজে গেছে – কাল আবার উপবাস তো, ওঠো।"

চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া ফৈজু বলিল "দুটো!"—একটু সন্ত্রস্ত হইয়া চুপি-চুপি বলিল "বাবা কই?"

টিয়া বলিল, "তিনি খেয়ে-দেয়ে ও-বাড়ীতে ঘুমুতে গেছেন।"

ফৈজু বলিল, "আমায় খোঁজেন নি?"

টিয়া উত্তর দিল, "খুঁজেছিলেন, দিদি বল্লে সব। তাই একটু বকে গেলেন শুধু—"

অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া ফৈজু বলিল "কেন?"

একটু হাসিয়া টিয়া বলিল "বল্লেন্ ছেলেমানুষদের এত কট্‌কিনি কেন? রাতদুপুরে আস্‌নান্ করা!"

"ওঃ!" বলিয়া ফৈজু চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। টিয়া ইতস্ততঃ করিয়া, নিকটে সরিয়া আসিয়া তাহার মাথার চুলে আঙুল লাগাইয়া বলিল, "সত্যি. মিছে নয়,—এই এক-মাথা চুল নিয়ে স্নান করলে, ভিজে মাথায় ঘুম হচ্ছে; তার পর এতে অসুখ হবে না?"

উন্মনা ভাবে ফৈজু উত্তর দিল, "অনেকদিন চুল ছাঁটা হয় নি, ওগুলো বড় বেড়ে গেছে, এবার ছাঁট্‌তে হবে।"

স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া বলিল "তুমি শুয়ে পড় গে, আমি উঠ্‌ছি।"

টিয়া বলিল "তোমার খাওয়াটা শেষ হোক না, আমি যাচ্ছি।"

ব্যস্ত হইয়া ফৈজু বলিল "না,—না, তোমায় আর জাগ্‌তে হবে না,—ঘুমোও গে। খলিফা ও-ঘরে আছে তো? ঘুমুচ্ছে? আচ্ছা যাও, তুমিও শুয়ে পড় গে।"

অনুনয়-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া টিয়া বলিল, "তোমার খাওয়া হয়ে যাক্, আমি চলে যাচ্ছি,—এখন আমার ঘুম চটে গেছে—কিছুতেই ঘুমুতে পার্‌ব না।"

ঈষৎ বিরক্ত হইয়া ফৈজু বলিল "মুস্কিল এক!"

কিন্তু মুস্কিল কাটাইবার জন্য স্ত্রীকে চলিয়া যাইবার অনুরোধ আর করিল না। নিজেই উঠিয়া, হাত-মুখ ধুইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

যথারীতি ভোজন শেষ করিয়া, আঁচাইয়া আসিয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিয়া স্নেহময় স্বরে বলিল, "আর কেন? এবার হয়েছে তো, এখন যাও।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া টিয়া বলিল "যাই, তুমি দিন পনের পরে আবার আস্‌বে তো?"

"বোধ হয়—" বলিয়া ফৈজু মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবিল। তার পর মুখ ফিরাইয়া শয্যার দিকে চলিয়া যাইতে-যাইতে বলিল, "কিন্তু বলা যায় না,—যদি কাজ পড়ে তো না এলেও না আসতে পারি। না যদি আসি, তাহলে তোমার ভাব্‌বার দরকার কিছু নাই, বুঝ্‌লে,—আমি যেখানেই থাকি, বেশ ভালই থাক্‌ব,—আমার জন্যে ভাবনা কি?"

টিয়া নতদৃষ্টিতে নিরুত্তর হইয়া রহিল।

টিয়াকে অতটা শান্ত স্থির দেখিয়া, ফৈজু মনে-মনে কেমন একটু অশান্ত—অস্থির হইয়া উঠিল! শয্যায় বসিতে গিয়া সহসা উঠিয়া,—ঘরের এদিকে-ওদিকে পায়চারী সুরু করিয়া দিল। তার পর কোথাও কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া, হুকের উপর হইতে জামাটা টানিয়া লইয়া,—পকেট খুঁজিয়া একটা বিড়ি বাহির করিয়া বলিল "দাও তো, তোমার হাতের কাছে ঐ জানালায় দেশ্‌লাইটা আছে—"

টিয়া দিয়াশলাই আনিয়া, স্বামীর হাতে দিয়া, একটু সরিয়া দাঁড়াইল, কোন কথা কহিল না। ফৈজু মনে-মনে আরো বিচলিত হইয়া উঠিল;—একটু ইতস্ততঃ করিয়া, বিড়িটা দাঁতে চাপিয়া অগ্নি-সংযোগ করিতে-করিতে, আপন মনেই রহস্যের সুরে—কৈফিয়ৎ-ছন্দে অস্পষ্ট ভাবে বলিল, "বড় বদ্‌খৎ জিনিস! তবে নিষ্কর্ম্মাদের সময় কাটানর পক্ষে মন্দ নয়!"

টিয়া ম্লান মুখে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল "আমিও তাই ভাব্‌ছি,—তোমায় এ নেশা ধর্‌ল কোত্থেকে?"

ফৈজুর ভিতরটা অনেকখানি লঘু হইয়া গেল,—স্বচ্ছন্দ-সরল হাস্যে বলিল "নেশা! নাঃ, আমার এ স্রেফ্ সখ্!"

টিয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল "তা'হলে আমি এখন চল্লুম।"

"যাও—" বলিয়া, পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, খোলা

জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অন্ধকারের পানে চাহিয়া, ফৈজু চিন্তাকুল মুখে বিড়ি টানিতে লাগিল। টিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণপরে বিড়ি ফেলিয়া দিয়া, ফৈজু শয্যায় গিয়া বসিল। দুহাতে মাথা ধরিয়া, হেঁট হইয়া বসিয়া গভীর অন্যমনস্কতার সহিত—কি কতকগুলা কথা ভাবিতে লাগিল।

টিয়া নিঃশব্দ পদে আসিয়া আবার ঘরে ঢুকিল। ফৈজু হেঁট হইয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল, মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল না। বোধ হয় অনুভব করিতেই পারিল না যে, টিয়া আবার আসিয়াছে! টিয়া সেই টুপিটা হাতে করিয়া সামনে আসিয়া, ফৈজুর মাথায় সেটা বসাইয়া দিয়া, স্নিগ্ধ হাস্যে বলিল, "এই নাও, তোমার জিনিস তোমায় ফেরৎ দিয়ে চল্লুম,—এটার জন্যে কষ্ট করে ভোরবেলা আর ও-ঘরে যেতে হবে না। শুধু দিদি বলে দিলে,—যাবার সময় দিদিকে উঠিয়ে দিয়ে যেও।"

টিয়া কি বলিল, কি করিল, কিছুই ফৈজুর বোধগম্য হইল না, শুধু উদ্বেগ-বেদনাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল! টিয়ার কথা শেষ হইতেই—সহসা গভীর ক্ষোভের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাকুল কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "নিজের হিতাহিত বুদ্ধিকে শিকেয় তুলে রেখে, যে আহাম্মক, পরের বুদ্ধিতে বাদশাই করবার লোভে নেচে ওঠে, সংসারে সে বড় হতভাগা! আমি তাদেরই একজন, টিয়া! ছি, ছি! কি মহাপাপই করেছি বল দেখি! জেনে-শুনে ইচ্ছে করেই, তোমায় এমন মরণের পথে—উঃ! লৌকিকতার দোহাই দিয়ে, লোকের রক্ত-মাংসে-গড়া চোখকে ফাঁকী দেওয়া খুব সহজ; কিন্তু তার ওপর আর একজনের চোখ জেগে আছে! আমার নির্বুদ্ধিতার দণ্ড আমাকেই মাথায় করে বইতে হবে,—সেখানে ফাঁকী চলবে না! উঃ, কি অশান্তি!"

টিয়ার হাত দুইটা কাঁপিতে লাগিল। পাছে ফৈজু টের পায় সেই ভয়ে পাশের দেওয়ালটা ধরিয়া ফেলিয়া, প্রাণপণে আত্ম-সংযম করিয়া, মৃদু-কম্পিত স্বরে বলিল, "আমার মত এমন অসুখ তো কত লোকের হয়। আবার তারা ভালও তো হয়ে যায়—বেঁচেও তো থাকে।"

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ফৈজু বলিল, "থাকে আধ-মরা হয়ে!" পরক্ষণেই উঠিয়া, অস্থির চরণে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে-করিতে ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিল, "বাপ-মা'রা অবশ্য আমাদের ভাল খুঁজেই কাজ করেন; কিন্তু আমাদের নিজের ভালমন্দটা বুঝে চলবার সুবিধে দেন না,—তার শাস্তিটা ভোগ করতে হয় আমাদেরই! ......কি পাপই করেছি!"

উত্তেজনার ঝোঁকে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ফৈজু আরো কত কি বলিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু রুগ্না স্ত্রীর বেদনা-নত চোখ দুটির উপর দৃষ্টি পড়িতেই, আহত চিত্তে থামিল। মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, নিঃশব্দেই আত্মদমন করিয়া লইয়া, নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া, স্নেহময় স্বরে বলিল, "এই রাত তিন পহরে রোগা শরীর নিয়ে টলতে-টলতে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছ কেন?—খলিফা এবার বকাবকি করবে নিশ্চয়,—যাও শুয়ে পড় গে।"

ভয়-চকিত নয়নে চাহিয়া টিয়া বলিল "আমি যাচ্ছি, কিন্তু আগে,—তুমি রাগ করে, ও রকম যা-তা গুলো বোল না,—আমার শুনতে বড় কষ্ট হয়।"

ফৈজুর ভ্রূযুগল আবার তীব্র কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। উগ্র হইয়া বলিল "কষ্ট? কই, আমি তো তোমায় কিছু বলিনি, তোমার দোষ কি? তুমি তো নিরুপায়...... আমার এ আপশোষ কারুর কাছে ফোটবার নয় টিয়া, আমি এমন হতভাগা...... নিজের নির্বুদ্ধিতার ওপর আমার কি রাগই যে হচ্ছে, সে—"

টিয়ার পা অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল! দেয়ালের গায়ে ভর রাখিয়া, স্বামীর হাতটা খুব জোরের সহিত চাপিয়া ধরিয়া, অধীর কণ্ঠে বলিল, "তুমি ওরকম করে বোল না,—বোল না,—আমি ওসব শোনবার জন্যে এখানে আসিনি,—তুমি কেন পাগলের মত নিজের ওপর রাগ করছ?—তুমি কি আমার অসুখ হতে বলে দিয়েছিলে? তোমার দোষ কি?"

বড় অসহ সান্ত্বনা! সন্ধ্যাবেলার সেই সুমতি দেবী-ঘটিত সমস্ত ব্যাপারের সুপ্ত জ্বালাটা ফৈজুর মনের ভিতর সহসা আবার উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্যে জাগিয়া উঠিল,—তাহার ধৈর্য্য লোপ হইল! ক্ষিপ্তস্বরে বলিল "করব না! কি বুঝবে তুমি,—আমার ঝঞ্ঝাট কত! বাড়ীতে এক লহমা বসে থাকতে আজ আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে, সে আমি জানি। কি করব—তোমার জন্যে আজ আমার হাত-পা

বাধা! নইলে আজ তুমি যদি ভাল থাক্‌তে, কি ডাক্তার যদি না বারণ করতেন, তবে আজই তোমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে যেখানে হোক চলে যেতুম! এত পাপ, এত সন্দেহের বাতাসের মধ্যে বাস করা আমার অসাধ্য! এখানকার বাতাসে নিঃশ্বাস টান্‌তে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমার আজ কলিজা ঝল্‌সে যাচ্ছে.—এখানে আমি কিছুতেই তিষ্ঠাতে পারব না—কিছুতে না!"

এ ক্রোধোত্তেজনার অর্থ টিয়া কিছুই বুঝিল না,—[illegible]ধু অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাহার মুখখানা বিবর্ণ [illegible]ণ্ডুর ম্লানিমায় ভরিয়া গেল! টলিয়া—কাঁপি[illegible] [illegible]নোন্মুখ হইতেই ফৈজুর সংজ্ঞা ফিরিল! তৎ[illegible] [illegible]ত হইয়া সন্তর্পণে তাহাকে ধরিয়া, শয্যায় শো[illegible] দিল, পাখাটা লইয়া সজোরে মাথায় বাতা[illegible] [illegible] লাগিল। কিন্তু একটা কথাও কহিতে পারিল না[illegible]

রুদ্ধ ব্যাকুল কণ্ঠে টিয়া [illegible] [illegible] আবার সেই মতলব! তোমার পায়ে পড়ি এবার [illegible] [illegible]কো,—দেখ্‌ছ আমার অবস্থা—" টিয়া আর বলি[illegible] প[illegible] না, হাঁপাইতে লাগিল,—তাহার দুই চক্ষু ছাপা[illegible] [illegible] ঝরিতে লাগিল!

মূঢ় বেদনায় ফৈজু [illegible]! —নিজের মূর্খতার উপর অপরিসীম ক্রোধের উদয় হইল। কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিল,—সেটা এখন সম্পূর্ণই নিষ্ফল! নিঃশব্দে আত্মদমন করিয়া লইয়া, খুব সহজ ভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া, সান্ত্বনা-কোমল কণ্ঠে বলিল "তুমি পাগল হয়েছ! আমি কি এখন কোথাও যেতে পারি? সেবারে টাকার জন্যে,—যাক্‌ গে সে কথা,—তুমি কিছু ভেবো না, তুমি যতদিন না সুস্থ হবে, ততদিন আমি কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পার্‌ব, এটা তুমি বিশ্বাস কর?"

স্বামীর দুই হাত টানিয়া লইয়া, নিজের অশ্রু-উচ্ছল চোখের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিয়া, বেদনাহত কণ্ঠে টিয়া বলিল "সেই জন্যেই তো! তুমি আমার জন্যে বড্ড বেশী ভাবো—সেই জন্যেই তোমায় আমি বড় ভয় করি।" ফৈজু মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তারপরে প্রাণপণে আত্মসংযম করিয়া সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে,—নিতান্ত সহজ ভাবে হাসিয়া বলিল, "ভয়! কেন কিসের ভয়? পাগল তুমি! আমিই বা তোমার জন্যে ভেবে কি করি? খোদা-মালিক। তবে আমার যেটুকু কর্ত্তব্য, সেটুকু পালন করা চাই, তারই জন্যে যতটুকু যা ভাবা উচিত, তাই ভেবে থাকি মাত্র। না, না, ওর জন্যে তুমি কিছু মনে কোর না—যাক্‌ ওসব কথা এখন থাক,—শোন, মাথায় একটু জল দিয়ে দেব? বড় গরম ঠেকছে না?"

টিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "দাও জল, আমার গলাটাও শুকিয়ে গেছে।"

ফৈজু জল আনিয়া দিল, মাথায় জল দিয়া জল পান করিয়া টিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। ফৈজু পাশে বসিয়া মাথায় বাতাস করিতে করিতে তাহাকে আবার মিষ্টস্বরে বুঝাইতে আরম্ভ করিল, এত ভীরু, এত দুর্ব্বল মন লইয়া সংসারে বাস করা বড় বিপজ্জনক! মনকে যথাসাধ্য শক্ত ও সাহসী করিয়া তোলা উচিত! শেষে একটু পরিহাস করিয়া, বলিল—মানুষের মন, মানুষের মতই বুদ্ধি ও ধৈর্য্য সম্পন্ন হওয়াই উচিত। ভীরু খরগোস বা চঞ্চল চড়ুইয়ের মত মনটা মানুষের দেহের মধ্যে পুষিয়া রাখা বড় অন্যায়! টিয়া যেমন নির্ব্বোধ! সামান্য কথার জন্য ··!

টিয়া চুপ-চাপ করিয়া সমস্ত শুনিয়া গেল। ফৈজু বেশ অনুভব করিতে পারিল, কথাগুলা সে শুধু কাণ দিয়াই শুনিতেছে না, যথেষ্ট মনোযোগ সহকারেই শুনিতেছে!

একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে ফৈজু বলিল "আর একটা কথা তোমায় বলে রাখি,—যদি কিছু না মনে করো।"

টিয়া দৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া বলিল "কি?"

ফৈজু সুকোমল হাস্যে বলিল "কিছু মনে করবে না তো?"

একটু হাসিয়া টিয়া বলিল "না, বলো।"

আবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া, হাতের পাখাখানার গা খুঁটিতে খুঁটিতে, সেইদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া, ফৈজু মৃদুস্বরে, ধীরে ধীরে বলিল, "আমি সকল রকমে রাগ সাম্‌লাতে পারি, কিন্তু একটা বিষয়ে পারি না,—সেইজন্যেই তোমায় এটা জানিয়ে রাখছি। যারা আমায় চেনে না, তারা আমার চরিত্র সম্বন্ধে যত খুশী অপবাদ রটনা করে যাক্‌, আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু যারা আমায় চেনে,—যেমন তুমি একজন,—তুমি কোনদিন আমার দিকে সে রকম নজরে চেও না। আমি বলে দিচ্ছি, তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রেখো,—আমি কোনদিন তোমার সে বিশ্বাস নষ্ট করব না। তুমি মনে

রেখো, সংসারের পথে চল্‌তে গিয়ে যদি কোন দিন পাপের দিকে আমার পা টলে, তবে—পা টল্‌বার আগেই আমি নিজেই নিজেকে খুন করে ছাড়্‌ব! এটুকু নিষ্ঠার জোর আমার মধ্যে আছে!"

টিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া স্তব্ধ ভাবে পড়িয়া রহিল! কোন কথা বলিল না। ফৈজুও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর অধিকতর ধীর কণ্ঠে বলিল, "মানুষের যত রকম ক্ষতিকে আমি ভয় করি,—তার মধ্যে সব চেয়ে ভয় করি, ঐ ক্ষতিকে! কোন মানুষ মারা গেছে শুন্‌লে, আমার যত-না দুঃখ হয়, সে চরিত্রহীন হয়েছে শুন্‌লে আমার তার চেয়ে বেশী দুঃখ-বোধ হয়!"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াই কাতর কণ্ঠে টিয়া বলিল, "আমি কবে তোমায় কি একটা কথা বলেছিলাম, তুমি সেটা আজও ভুল্‌তে পার নি। আচ্ছা, কেমন করে বল্লে তোমার বিশ্বাস হবে বল,—আমি তেমি করেই বল্‌ছি—আজ আমি তোমায় আর এক চুলও অবিশ্বাস করিনা,—করি না, —করি না!" টিয়া আবার কাঁদিয়া ফেলিল!

সস্নেহে তাহার মাথা চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে ফৈজু কোমল কণ্ঠে বলিল "না—না; কেঁদ না,—কেঁদ না,—এ তো কান্নার কথা হচ্ছে না টিয়া! থাক্‌, আর আমার কিছু শোনবারও নাই, শোনাবারও নাই। এবার ওঠো তুমি, শোবে চল,—না, এই ঘরেই তুমি থাক্‌বে? খলিফাকে এখানে ডেকে দিয়ে আমি ঐ ঘরেই যাব?"

"না,—না, আমিই উঠে যাচ্ছি।" টিয়া চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। ফৈজু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কি একটু ভাবিল, তার পর হঠাৎ হাসি-হাসি মুখে বলিয়া প্রশ্নের মন্তব্য প্রকাশ করিল, "আমি দিন পনের পরেই আবার আস্‌ব,—অন্ততঃ ঘণ্টা-খানেকের জন্যেও এসে তোমায় দেখে যাব, বুঝ্‌লে।"

টিয়া চকিতের জন্য তাহার মুখপানে শুধু বেদনা-করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিল মাত্র, কিছু বলিল না; মাথায় কাপড় টানিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল।

টিয়ার সেই বেদনা-করুণ দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া, ফৈজু ভিতরে-ভিতরে আবার দমিয়া গেল! অসতর্ক মুহূর্ত্তে বর্ব্বরের মত আঘাত দিয়া, এই দুর্ব্বল-চেতা রুগ্না স্ত্রীর মনে সে যে শঙ্কা, যে দ্বিধা জাগাইয়া তুলিয়াছে, এখন সহস্র কৈফিয়ৎ এবং ছদ্ম-চপলতার অভিনয়েও সে দ্বিধা কাটান বড় সহজ নহে! বিচলিত চিত্তে, মূঢ়ের মত ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া, সহসা তাহার পথরোধ করিয়া বলিল "না, আর একটু বসে যাও,—তুমি এখনো কাঁপ্‌ছ যে! বোস—"

ফৈজু তাহার হাত ধরিতে গেল, কিন্তু টিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া, ঘাড় নাড়িয়া, নতমুখে বলিল, "না, অনেকক্ষণ এসেছি। দিদির ঘুম ভেঙে যায় তো এবার খুঁজ্‌বে।"

ফৈজু সঙ্কুচিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিয়া রহিল। তার পর ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিল, "আজ আমার বড় মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল,—ঝোঁকের মাথায় কতকগুলো কথা বলে তোমায় মনে হয় তো বড়ই কষ্ট দিলুম। তুমি ওগুলো ভুলে যাও টিয়া,—নইলে, ভেবে-ভেবে অসুখে পড় যদি,—আমার তা হলে মুস্কিলের সীমা থাক্‌বে না, একে এই ঘরে-বাইরে—" কথাটা বলিতে গিয়া সামলাইয়া লইয়া—ঈষৎ অধীর ভাবে বলিল "বল তুমি, এ সব ভেবে আড়ালে-আড়ালে কান্নাকাটি করবে না?"

টিয়া নিঃশব্দে নতমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল, "না।"

নিকটে আসিয়া, তাহার দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া, শান্ত ভাবে ফৈজু বলিল "ও-রকম করে না,—আমার মুখের দিকে চেয়ে বল।"

ফৈজুর মত সহিষ্ণু মানুষের এতটা অসহিষ্ণুতা, টিয়ার কাছে আজ—এত দুর্ভাবনার মাঝেও, একটু অদ্ভুত ঠেকিল!—তাহার ম্লান মুখের উপর মৃদু কৌতুকের হাস্যরেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দ্বিধা সরাইয়া, মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল "বল্‌ছি—'না'। কিন্তু ও কি তোমার কপাল যে ঘামে ভরে গেছে—" বলিতে বলিতে অজ্ঞাতেই নিজের আঁচলটা মুঠার মধ্যে গুছাইয়া তুলিয়া অনুনয়ের স্বরে বলিল "একটু হেঁট হও না।"

অন্য সময় হইলে ফৈজু নিশ্চয়ই আপত্তি করিত; কিন্তু আজ বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, বিনাবাক্যে তৎক্ষণাৎ মাথা নোয়াইল!

নিজের যত্ন-আরামের সম্বন্ধে চির উপেক্ষা-পরায়ণ এই মানুষটি আজ কেন হঠাৎ ঔদাসীন্য কাটাইয়া, তাহার ক্ষুদ্র অনুরোধ পালনে এত আগ্রহের সহিত ঝুঁকিয়া পড়িল, টিয়া সেটা বুঝিতে পারিল কি না বলা যায় না; কিন্তু সে কেমন যেন একটু লজ্জায় পড়িয়া গেল! ফৈজুর মুখের দিকে আর চোখ তুলিতে পারিল না। সসঙ্কোচে দৃষ্টি নত করিয়া,

লজ্জা-কম্পিত-হস্তে, নিজের প্রাথিত কাজটুকু করিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু ফৈজু বেশীক্ষণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিল না; ক্ষণপরেই মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল, "হয়েছে, এবার তুমি শোওগে!"

অসমাপ্ত কাজে বাধা পাইয়া, টিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "বড় ছট্‌ফটে মানুষ! এঃ, পড়্‌ল টুপিটা!"

সত্যই নাড়া পাইয়া ফৈজুর মাথা হইতে টুপিটা খুলিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল! টিয়া হেঁট হইয়া সেটা কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "কি মানুষ তুমি বল দেখি!"

স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া, সহসা সকৌতুকে হাসিয়া উঠিয়া ফৈজু বলিল, "বাঃ, ওটা যে এর মধ্যে কখন এসে মাথায় চড়ে বসেছে তা জানি কি? তোমার তো আচ্ছা সাফাই হাত!—" বলিতে-বলিতে স্ত্রীর দুই হাত ধরিয়া আবেগভরে পীড়ন করিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "একটু ঘুমোও গে,—রাত শেষ হয়ে এল যে!"

টিয়ার স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল মুখের উপর একটা প্রচ্ছন্ন বিষাদের ম্লান ছায়া আবার নামিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল "যাই।"

"চল, আমিও সঙ্গে যাই-" বলিতে-বলিতে অগ্রসর হইয়া, ফৈজু মৃদু কণ্ঠে পুনশ্চ বলিল, "আমি পনর দিন পরে নিশ্চয় আস্‌ব,—তুমি কিছু ভেবো না।"

"না।" বলিয়া টিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া চলিল।

একটু থামিয়া শান্তস্বরে ফৈজু বলিল, "মাথার ওপর একজন আছেন, তাঁর কথা আমরা যেন সব সময়ে মনে রেখে চল্‌তে পারি। মিছে কেন ভাবছ? ভয় কি?"

পরকে অভয়, আশ্বাস দিতে গিয়া, ফৈজু নিজের মনের কোন নিগূঢ় প্রদেশ হইতে কি নির্ভয় সান্ত্বনার বাণী শুনিতে পাইল, কে জানে,—কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেই সহসা তাহার দুই চক্ষু অস্বাভাবিক প্রসন্ন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! স্ত্রীর মাথার উপর হাত রাখিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল "নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিও—"

টিয়া যন্ত্র-চালিতের মত নিঃশব্দে চলিয়া গেল। ফৈজু ফিরিয়া আসিয়া গ্লানি-ভার-মুক্ত চিত্তে, গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া শয্যাশ্রয় করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরে উঠিয়াই সে জয়দেবপুরের উদ্দেশে চলিল। ঠাকুরবাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়া যখন সে যায়, তখন দেখিল, একটা লোক তত ভোরে উঠিয়া ঠাকুরবাড়ীর দুয়ার খুলিয়া, সন্তর্পণে মুখ বাড়াইয়া, উঁকি মারিয়া এদিক্-ওদিকে, কি দেখিতেছে! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া-চাহিয়া, ফৈজু দূর হইতেই চিনিল, গত রাত্রের সেই বাউল মহাশয়!

ফৈজুর সহিত চোখোচোখি হইতেই, বাউল মহাশয় আচম্বিতে সশব্দে দ্বাররোধ করিলেন। ফৈজুর ভারী হাসি পাইল। মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিল, এই অপরিচিত বাউল মহাশয় নিশ্চয় কোনরূপ ছিট্‌গ্রস্ত! না হইলে গত রাত্রে তাহাকে দেখিয়া, সেই উল্লাসের গান থামাইয়া তেমন করিয়া ছুটিয়া পলাইবেই বা কেন, আর আজ বিনাপরাধে এমন অভদ্রভাবে মুখের উপর দুয়ার বন্ধই বা করিবে কেন? খোদার রাজ্যে কত অদ্ভুত প্রাণীই যে আছে!

হাসিতে-হাসিতে ফৈজু নিজের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। অনাবশ্যক বোধে, লোকটার ব্যবহারে কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিল না; একান্ত সংযত চিত্তে ভাবিতে-ভাবিতে চলিল—জয়দেবপুর মহলের জন্য তাহার উপস্থিত কর্ত্তব্যগুলার কথা। আর তাহার মাঝেই এক-একবার অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষোভ-কাতর চিত্তে ভাবিয়া লইল পীড়িতা স্ত্রীর ভূত এবং বর্ত্তমান অবস্থা।

(ক্রমশঃ)

আমেরিকার স্মৃতি

(১—পথে)

[শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম,ডি (নিউইয়র্ক)]

সন ১৩১৯ সাল, ৩১শে শ্রাবণ বোম্বাই বন্দরে ইতালীয় জাহাজ "রুবিতানো"তে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইয়াছিলাম। জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে ডাক্তার আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে পরীক্ষা করিলেন। সে পরীক্ষা কিছু অদ্ভুত রকমের। চকিতের স্থায় একবার করিয়া স্পর্শ মাত্র। এ রকম নাড়ীজ্ঞান আর কাহারো আছে কি না জানি না। যাহা হউক, ডাক্তার মহাশয়ের নিকট হইতে অব্যাহতি পাইয়া আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম; কারণ, পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল, এই ডাক্তারী পরীক্ষা কি একটা ভীষণ ব্যাপার হইবে। বেলা ১১টায় জাহাজ ছাড়িবে। আমরা ১০৷৷০টার সময় জাহাজে উঠিয়া নিজের-নিজের কামরা অনুসন্ধান করিয়া লইলাম। সঙ্গে আসবাব-পত্র অন্য কিছুই নাই, কেবল একটি হ্যাণ্ড-ব্যাগ্ মাত্র। একটি বড় পেটিকায় বস্ত্রাদি ছিল; তাহা বোম্বাই নগরের "প্রিন্স্ অফ্ ওয়েল্স্ হোটেলে" সেই দিন প্রাতে টমাস কুকের কর্ম্মচারীর নিকট দিয়াছিলাম। কথা ছিল যে তিনি যথাসময়ে আমার কেবিনে তাহা দিয়া যাইবেন। কিন্তু দেখিলাম, ট্রাঙ্কটি এখনো যথাস্থানে আসে নাই। তখন সেই কর্ম্মচারীর অনুসন্ধানে ছুটিলাম। জাহাজখানি ক্ষুদ্র সহর-বিশেষ। নানা শ্রেণীর আরোহী, তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধব, জাহাজের কর্ম্মচারী, কুলী, মজুর প্রভৃতি লোকের ভিড়ে, বিশেষ একজনকে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ ব্যাপার নহে। প্রায় বিশ্ মিনিট্ দৌড়াদৌড়ির পর তাঁহাকে আবিষ্কার করিলাম। তিনি বেশ ইংরাজী কায়দা-মাফিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাকে জানাইলেন যে, ভুলক্রমে আমার কেবিনের পরিবর্ত্তে পেটিকাটি জাহাজের খোলে (hold) চলিয়া গিয়াছে, এবং এডেন্ পঁহুছিবার পূর্ব্বে তাহা পাইবার কোন আশা নাই। চমৎকার! একসুট কাপড়ে আটদিন কাটাই কি করিয়া? তাঁহার বিস্মৃতিকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া, তাড়াতাড়ি জাহাজের এক কর্ম্মচারীকে ধরিলাম। তাঁহাকে যত কথা বলি, তিনি হাঁ করিয়া শুনেন মাত্র; মুখে একটি কথা নাই—কেবল হাত-নাড়া ও কাঁধ-নাড়া। বুঝিলাম যে, তিনি ইংরাজী মোটেই জানেন না। আর একজন কর্ম্মচারীর শরণাপন্ন হইলাম,—তিনিও দাদার ভাই। তাঁহার তিনটি মাত্র ইংরাজী শব্দ জানা আছে—ইয়েস্, নো, এবং ভেরি ওয়েল। এই তিনটি কথা আমার কথার পৃষ্ঠে তিনি পর্য্যায়ক্রমে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বেগতিক দেখিয়া কাপ্তেন্‌কে খুঁজিয়া বাহির করিলাম—তিনিও ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ! পরে জানিয়াছিলাম যে, তিনি ইয়েস, নো, ভেরি ওয়েল্ ছাড়া আর একটি কথা জানেন, থ্যাঙ্কস্! কি মুস্কিল! এই ইতালীয়ান জাহাজ ক্রমাগত জেনোয়া হইতে জাপান যাতায়াত করে; এবং প্রত্যেকবার বোম্বাই, এডেন্, সুয়েজ, ও [illegible] হইতে আরোহী ও মাল লইয়া থাকে; কিন্তু ইহার কোন কর্ম্মচারী ইংরাজী জানে না,—আর এই জাহাজে আমাদের প্রায় কুড়ি দিন থাকিতে হইবে।

নিরুপায় হইয়া কেবিনে ফিরিতেছি;—ভয় হইতেছে যে, আমার অনুপস্থিতিতে হ্যাণ্ড্ ব্যাগটি না অন্তর্হিত হইয়া থাকে! এমন সময়ে জাহাজ ছাড়িয়া দিল। তখন ডেকের উপর হইতে বোম্বাইকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। বোম্বাই কলিকাতা নহে, এবং সেখানেও আমার পরিচিত কোন লোক নাই; তথাচ বোম্বাইকে কত প্রিয় মনে হইতেছিল। কত দূরে যাইতেছি,—জীবন-মরণের কথা কে বলিতে পারে;—আবার বোম্বাই দেখিতে পাইব কি না কে জানে! অন্য আরোহীদিগের আত্মীয়েরা ঘনঘন রুমাল উড়াইতেছিলেন,—তাঁহাদিগকে পরমাত্মীয় মনে করিয়া রুমাল নাড়িয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় চাহিলাম।

দেখিতে-দেখিতে জাহাজ গভীর সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং ব্রেক্-ফাষ্টের ঘণ্টা বাজিল। এতক্ষণ ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা কিছুই মনে হয় নাই। প্রাতে হোটেলে

কিছু রুটী মাখন ও এক পেয়ালা কোকো খাইয়াছিলাম। ঘণ্টা ধ্বনিতে যেন সুপ্ত ক্ষুধা জাগ্রত হইয়া উঠিল। কেবল জাগ্রত হইল নহে, যেন একটা লম্ফ প্রদান করিল। কাল-বিলম্ব না করিয়া খাবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রত্যেক চেয়ারে আরোহীর নাম দেওয়া আছে। দেখিলাম, আমরা ছয় জন ভারতবাসী এক টেবিলে পাশাপাশি আছি। বড়ই আহ্লাদ হইল। আমাদের টেবিলে আর ছয়জন য়ুরোপীয়ান আছেন; তাঁহাদের মধ্যে তিনজন মহিলা।

অনেকেই হোটেল্ হইতে প্রাতরাশ শেষ করিয়া আসিয়াছেন,—তাঁহারা আসিলেন না। আমরা চারিজনমাত্র ভারতবাসী একত্র বসিলাম। বোম্বের এক জন হিন্দুবণিক, রেশমের কারবার করিবার জন্য ফ্রান্সে যাইতেছেন;—তিনি টেবিলে আসিয়াই আমাকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি নিষিদ্ধ মাংস দেখিলে চিনিতে পারি কি না। তাঁহাকে বলিলাম যে, আমিও কখন—যে জীব মাতৃ-স্থানীয়া—যাহার দুগ্ধ পান করিয়া মানুষ হইয়াছি—তাহার মাংস খাই নাই, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছি যে, কিছুতেই তাহা খাইব না। এবং ভগবান বরাহ-অবতার হইয়াছিলেন, সুতরাং সে মাংস কিছুতেই ভক্ষণ করা যাইতে পারে না;—ও শূকর জীবটা এমন অখাদ্যভোজী যে, তাহার মাংসের নামে আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠিয়া আইসে। নিষিদ্ধ মাংস খাইব না বলিয়াই তাহা বিলক্ষণ চিনিয়া লইয়াছি, অতএব খাদ্য গ্রহণের সময় তিনি স্বচ্ছন্দে আমার অনুকরণ করিতে পারেন। দেখিলাম, ভদ্রলোকটি আশ্বাস পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। যতক্ষণ আমরা কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, মধ্যে-মধ্যে আমার কর্ণে "হরিঃ ওম্, হরিঃ ওম্" শব্দ আসিতেছিল। শব্দকারী এক শিখ ভ্রাতা, এক-খানি আসন ব্যবধানে বসিয়া আছেন। তিনিও বলিলেন যে, তিনি আমাদের দলভুক্ত—বৃহৎ চতুষ্পদ জীবাদির মাংস গ্রহণ করিবেন না। আমরা তিনজনে রুটি, মাখন ও আলুপোড়া তখন পেট ভরিয়া খাইয়া লইলাম। পরে যখন জাহাজের ভাণ্ডারীরা দেখিল যে, আমরা নিরামিষভোজী, তখন আমাদের প্রচুর পরিমাণে চকলেট, বাদাম, পেস্তা, আখরোট, আঙ্গুর, আপেল, পেয়ারা প্রভৃতি ফল প্রত্যহ দুই-তিনবার করিয়া দিত। ইহাতে আমাদের স্বাস্থ্য বরাবর খুব ভালই ছিল। জাহাজে পাঁচবার দৈনিক ভোজনের ব্যবস্থা। মাছ-মাংস বাদ দিয়া খাইলেও, কোন মহা পেটুকের ক্ষুন্নিবৃত্তি না হওয়ার ভয় নাই।

দিনের বেলা এক রকম গোলমালে কাটিয়া গেল। দেখিলাম, দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমরা মোট এগারজন ভারতবাসী আছি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সকলে যেন ভাই-ভাই হইয়া গেলাম। দুই-চারিজন য়ুরোপীয়ানের সহিতও পরিচয় হইল। কেহ বা আমাদের সহিত আগে কথা কহিলেন, কাহারো মুখের ভাব দেখিয়া আমরাই আগে আলাপ করিলাম। যাঁহাদের গম্ভীর ভাব দেখিলাম, তাঁহাদের নিকট গেলাম না। ইংরাজী আদব-কায়দা বজায় রাখিতে হইবে।

ধন্য এই "এটিকেট্"! একটা গল্প আছে যে, এক জাহাজ জলমগ্ন হওয়ার পর একজন সাহেব ও একজন মেম এক ভেলায় সমুদ্রে ভাসিতে থাকেন। ভেলার মধ্যস্থলে একটা মাস্তুল, তাহার উপর সাহেব নিজের রুমালখানি নিশানের মত বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, কোন জাহাজ দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের উদ্ধার করিবে। মাস্তুলের এক দিকে সাহেব পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন,—বিপরীত দিকে মেমও সেইভাবে সমাসীনা। এইরূপে দুইজনে নিঃশব্দে এক দিন কাটাইলেন। দ্বিতীয় দিবস সাহেব আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি সসম্ভ্রমে বলিলেন, "Madam, I am afraid, we shall have to spend more days like this".—(মহাশয়া, বোধ হয় এইরূপে আমাদের আরও কিছুদিন কাটাইতে হইবে)। মেম ভ্রূকুটী করিয়া উত্তর দিলেন,—"How dare you address me, sir? We have not been introduced!—(কি সাহসে আপনি আমার সহিত কথা কহিলেন, মহাশয়? আমাদের ত' পরিচয় হয় নাই!))। এই গল্পটি স্মরণ করিয়া আমরা উপযাচক হইয়া কোন শ্বেতাঙ্গের সহিত আলাপ করিতে বিরত হইলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ভগবানের লীলা! বিশাল সমুদ্র-বক্ষে জাহাজ যখন ভেলার মতন ভাসিতে থাকে, প্রত্যেক ভীষণ তরঙ্গের আঘাত যখন পোতখানির ক্ষণভঙ্গুরতা প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দেয়, ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝাবাতের প্রবল আক্রমণে যখন অর্ণব-পোত সজীব হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, এবং মৃত্যুর ছায়া যখন চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করে,—তখন আমরা সব

ভুলিয়া যাই। তখন মান-অভিমান থাকে না, এবং ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, দাতা-কৃপণ, কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ সব এক হইয়া যায়। ফ্রীমেসনদের ভ্রাতৃভাব দেখিয়াছি; কিন্তু সমুদ্র-বক্ষে মনে হয় ভ্রাতৃভাব বা মনুষ্য-প্রেম অধিকতর পরিস্ফুট। কবে সমগ্র ভারতবাসী এক জাহাজে বাস করিবে!

প্রথম রাত্রে ডিনার খাইতে বসিয়া একটু গোলযোগ হইয়াছিল। বোম্বের সেই হিন্দু বণিক ভদ্রলোকটি সাহেবী পরিচ্ছদের উপর মাথায় এক দেশী টুপি দিয়া খাইতে বসিয়াছিলেন। তাহার কারণ পরে বুঝিয়াছিলাম। জাতীয় নিয়ম অনুসারে তাঁহার মস্তক অর্দ্ধ-মুণ্ডিত—অর্থাৎ মধ্যস্থলে কেশদাম, ও চতুষ্পার্শ্বে কেশহীন—যেন সাহারার মধ্যে ওয়েসিস্। আমাদের টেবিলে ছয় জন য়ুরোপীয়ান ছিলেন, যথা—মিসেস্ ও কাপ্তেন পেরী, মিসেস্ ও লেফ্‌টেনাণ্ট গন্, মিসেস্ ও মিঃ হিউম। শেষোক্ত দুইজন আমেরিকান পর্য্যটক, দেশে ফিরিতেছেন। মাথায় টুপি দেখিয়া গন্ সাহেব উঠিয়া বলিলেন যে, ইহার জন্য তাঁহারা বিশেষ অপমানিত বোধ করিতেছেন,—টুপি না খুলিলে তাঁহারা সকলে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন। উত্তরে তাঁহাকে বলা হইল যে, ইহা দেশী টুপি, ইহা মাথায় থাকাই সম্মানের চিহ্ন, খুলিয়া ফেলিলে তাঁহাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে। তখন তিনি নিজের অজ্ঞতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। তাহার পর এক হাস্যজনক ঘটনা হইল। আমাদের পঞ্জাবী ভ্রাতা কাঁটা-চামচের ব্যবহার না শিখিয়াই জাহাজে উঠিয়াছেন। তিনি যদি হাত দিয়া খাইতেন, (তাঁহার ইংরাজী পরিচ্ছদ সত্ত্বেও) তাহা বরং ভাল ছিল; কিন্তু তিনি কাঁটা-চামচ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ও মধ্যে মধ্যে ছুরীখানিও মুখের মধ্যে দিতে লাগিলেন। শেষোক্ত কার্য্যের পরিণাম অচিরাৎ ভীষণ হইল। আমি তাঁহাকে হিন্দি কথায় সাবধান করিতে-না-করিতে দেখিলাম তাঁহার জিভ কাটিয়া শোণিত-স্রাব হইতেছে। বেচারী ছুরী ও কাঁটার সাহায্যে "ভারমিচিলি" খাইতে গিয়াছিল,—তার আর খাওয়া হইল না, টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে হইল। সাহেব-মেমেরা মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন, দেখিলাম তাঁহারা অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া আছেন মাত্র। আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। পরের দুঃখে হাসিটাই আগে আসে।

পরদিবস বোম্বাইয়ের সেই ভদ্রলোক সশব্দে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মিসেস্ পেরি অদূরেই ছিলেন। দুই মিনিট পরেই কাপ্তেন পেরি আমাকে আসিয়া বলিলেন যে, এই ঘটনা দ্বারা তাঁহার মেমকে বিশেষ অপমান করা হইয়াছে,—এবং অপমানকারী এই দণ্ডে ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে, তিনি জাহাজের কাপ্তেনের নিকট নালিশ করিতে যাইবেন। দোষীকে আনিয়া হাজির করিলাম। তিনি বলিলেন যে, অভ্যাসমত তিনি থুথু ফেলিয়াছেন। কাহাকেও অপমান করিবার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মিসেস্ পেরির নিকট তিনি ক্ষমাও চাহিলেন। সব মিট্‌মাট্,—কাপ্তেন পেরি সন্তুষ্ট হইয়া বণিক-প্রবরের করমর্দ্দন করিলেন। এই ঘটনার কিছু পরেই আমরা সবাই ডেকের উপর বসিয়া আছি। মিসেস্ পেরি ও মিসেস্ গন্, তাঁহাদের স্বামী ও আমি এক সারিতে বসিয়া গল্প করিতেছি। আমাদের সম্মুখেই সেই থুথু-ফেলার আসামী ও অপর জনকয়েক বসিয়া আছেন। হঠাৎ নজর পড়িল যে, গন্ সাহেব আমার বণিক-বন্ধুর চেয়ারের পশ্চাৎ দিকে একটি পা বেশ আরাম করিয়া তুলিয়া দিয়াছেন। এই রকম একটা সুযোগ আমি খুঁজিতেছিলাম। গন্ সাহেবকে বলিলাম যে, তিনি একজন ভারতবাসীর আসনের উপর পা রাখিয়া তাঁহাকে যে কতটা অপমান করিতেছেন, সে জ্ঞান আছে কি? প্রশ্ন শুনিয়া তিনি যেন একটু অবাক্ হইয়া গেলেন—বলিলেন যে, তাঁহার এই কার্য্যে যে কোন দোষ হইতে পারে, তাহা তাঁহার আদৌ জানা ছিল না; য়ুরোপীয়েরা ত' এরূপ করিয়াই থাকে। যাহা হউক, তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া তখনই নিজের অপরাধের জন্য প্রকাশ্যভাবে অপর পক্ষের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গোল মিটিল।

তখন আমি শ্বেতাঙ্গের দলকে বলিলাম যে, দুঃখের বিষয় এই যে, শ্বেতাঙ্গেরা ভারতবর্ষে বাস করিয়া ভারতবাসীদিগের সহিত মেলা-মেশা করেন না; তাহার-ই ফলে পরস্পরের নীতি-রীতি জানিবার সুযোগ হয় না। অথচ অনেক ইংরাজ দেশে ফিরিয়া ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধে পুস্তকাদি লিখিয়া এরূপ বিদ্যার পরিচয় দেন যে, তাহা পড়িলে ভারতবাসীরা হাস্য-সম্বরণ করিতে পারে না।—

যাহা হউক, আমাদের যখন একসঙ্গে কিছুকাল কাটাইতে হইবে, তখন উভয় পক্ষেরই একটু সহ ও ক্ষমা গুণের প্রয়োজন।—ইহার পর হইতে আর কোন সংঘর্ষ হয় নাই। বড়ই আমোদে দিন কাটিয়াছিল।

আর দুইজন সংযাত্রীর কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। একজন মান্দ্রাজ-ফেরত মিশনারী। তিনি কালা-আদমীদের ঠাকুর-দেবতাকে গালি দিয়াছেন বলিয়া, কালা-আদমীরা তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিল,—এই জন্য ভারতবাসী সকলকেই তিনি অসভ্য, বর্ব্বর ইত্যাদি মনে করিয়া থাকেন। একদিন তিনি আক্ষেপ করিতেছেন যে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে গিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। আমরা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন পেরি উত্তর দিলেন যে, যে-সব খৃষ্টান্ মিশনারী পরের ধর্ম্মকে গালি দিয়া থাকেন, তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন না, এবং তাঁহাদের লাঞ্ছনা ভোগ করা কিছুই বিচিত্র নহে। ইহার পর হইতে খৃষ্টীয় প্রচারক মহাশয় আমাদিগকে দশহস্ত ব্যবধানে রাখিতেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ডাক্তার ফ্লানাগান্। ইনি এডেনে বদলি হইয়া যাইতেছেন। সদালাপী, হাস্যমুখ, এবং সর্ব্বদাই পরসেবা করিতে ব্যস্ত। দুই দিন পরে যখন সমুদ্রে খুব তুফান আরম্ভ হইল এবং অধিকাংশ যাত্রী শয্যা গ্রহণ করিল, তখন এই ডাক্তার নিজে সমুদ্র-পীড়ার কবলগত হইয়াও সকলের সেবা করিতেন। এক হাতে রুমাল দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছেন, ও অন্য হাতে একটা কমলালেবু লইয়া ঘরে ঘরে বেড়াইতেছেন;—এই চিত্রটি এখনও আমার স্মৃতিপটে জাজ্বল্যমান।

তখন অগষ্ট মাস, তুফানের সময়। সমুদ্র এত ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল যে আট দিনে এডেন পহুঁছিবার কথা, কিন্তু আমরা দশ দিনে পহুঁছিলাম। যাঁহারা সমুদ্র-পীড়া-গ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক বেলার জন্য নবজীবন লাভ করিলেন। কি কষ্টই তাঁহাদের হইতেছিল! ভগবানের কৃপায় আমরা চারিজন ভারতবাসী এক দিনের জন্যও সমুদ্র-পীড়া ভোগ করি নাই। খুব তুফানের সময়ও আমরা উপরের ডেকে থাকিয়া সমুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিতাম।

এডেনে জাহাজ থামিলে আমরা সহর দেখিতে গেলাম। সমুদ্র-তীরের ঘর-বাড়ী, দোকানগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাজারটিও দেখিতে বেশ; কিন্তু মাছিতে পরিপূর্ণ। একজন মাড়োয়ারী দোকানদারকেও এখানে দেখিলাম। তিনি এই উত্তপ্ত বালুকার দেশে আসিয়া মসলার ব্যবসা করিতেছেন। এমন অধ্যবসায় না থাকিলে কি লক্ষ্মী-শ্রী হয়! একজন সোমালী বালক আর কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। অল্প ভিক্ষায় সে সন্তুষ্ট নহে। লেফ্‌টেনান্ট গন্ বিরক্ত হইয়া তাহাকে "ড্যাম্" বলিয়াছিলেন। বালকটি তৎক্ষণাৎ একটু দূরে সরিয়া গিয়া গন্ সাহেবকে বলিল, "ইউ ড্যাম্"। বলিয়াই চম্পট্! সাহেব অবাক! একটি তরমুজ কিনিয়া আমরা জাহাজে ফিরিলাম। এমন শীতল ও সুমিষ্ট তরমুজ আর কখন খাই নাই।

বিকালে জাহাজ ছাড়িল। পুনরায় "সমুদ্র-পীড়ার" প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল। এ ব্যাধির কোন ঔষধ নাই। ইহা স্নায়বিক পীড়া মাত্র। ভরা-পেট, খালি পেট, শ্যাম্পেন্-পান, প্রভৃতি যত রকম তুক্‌তাক্ আছে শুনিয়াছিলাম, তাহাতে কাহারো কিছুমাত্র উপকার হইল না দেখিলাম। যে "সমুদ্র-ব্যাধির" ঔষধ আবিষ্কার করিবে, সে অল্প সময়েই ক্রোরপতি হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্দের মধ্যেও কিছু ভাল থাকে—এই সমুদ্র-পীড়ায় পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি জাগাইয়া তোলে।

ক্রমশঃ উত্তপ্ততর বায়ুস্তরের মধ্যে উপস্থিত হওয়া গেল। সুয়েজ-কেনাল্ নিকটবর্ত্তী। প্রবাদ আছে যে, বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সময়ে অনেক সাহেবের এই সুয়েজের গরম হাওয়া লাগিয়া মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া যায়। ভারতবর্ষে প্রচুর আহারাদি ও সেলামের গুণে সেই উষ্ণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, এবং স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া পুনর্ম্মূষিক না হওয়া পর্য্যন্ত রোগের শান্তি হয় না। আমরা গরীব ভারতবাসী, আমাদের রক্ত ঠাণ্ডা; সুতরাং মাথা গরমের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কেবল পিপাসা বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমাগত বরফজল পান করিয়াও তাহার নিবৃত্তি করিতে পারিতেছিলাম না।

এডেনে মিসেস্ ও কাপ্তেন পেরি এবং ডাক্তার ফ্লানাগান্ নামিয়া গিয়াছেন। ডেকের উপর তাঁহারা যেখানে বসিতেন, সেদিকে চাহিয়া বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মিসেস্ পেরি বিদায় লইবার সময়ে কম্পিত স্বরে বলিলেন,

"ভগবান আপনাদের শরীর ভাল রাখুন,—আপনাদের মঙ্গলের জন্য আমি প্রার্থনা করিতে ভুলিব না।" তাঁহার কথাগুলি আমার কাণে এখনও যেন বাজিতেছে। আমরা কাহারো সহিত ঝগড়া করিলে, বাহ্যিক মিটমাট করিয়া মনের মধ্যে কিছু-না-কিছু অসন্তোষের ভাব লুকাইয়া রাখি। এই বিষয়ে ইংরাজ জাতি আমাদের অপেক্ষা কত মহৎ। তাহারা মুখের চেয়ে হাতের ব্যবহারই বেশী করিয়া থাকে—অনেক সময় রক্তারক্তি হইয়া যায়। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই যদি সব মিটিয়া যায় ও পরস্পরে করমর্দ্দন করে, তাহা হইলে সেই সঙ্গে তাহাদের মনের কালিও সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলে—যেন কখন কিছু হয় নাই। আমরা অনেক সময়ে ইংরাজদের দোষগুলির অনুকরণ করিয়া থাকি,—তাহাদের গুণের অনুকরণ করাই প্রয়োজন।

সুয়েজ কেনাল্ ও সুয়েজ বন্দরের পথে কেবল বালি ধূ-ধূ করিতেছে। গাছের মধ্যে কেবল খেজুর গাছ। বালুকারাশির দিকে বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকা যায় না। মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ু আমাদের শরীর দগ্ধ করিতেছিল। হঠাৎ তখন মনে পড়িল, "সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।" দুই দেশে কত প্রভেদ! যাহা হউক, বেশী দিন কষ্ট পাইতে হয় নাই,—শীঘ্রই ভূমধ্যসাগরে আসিয়া পড়িলাম, গরমও কমিয়া গেল।"

এডেন হইতে ষষ্ঠ দিবসে আমরা পোর্টসায়েদে পঁহুছিলাম। সুয়েজ বন্দর একটি ক্ষুদ্র স্থান কিন্তু পোর্টসায়েদ বেশ একটি জমকাল সহর। এই স্থান হইতে য়ুরোপের আরম্ভ বলিতে পারা যায়; কারণ, আফ্রিকার উপকূল হইলেও, সহরটিতে য়ুরোপীয়ান বিস্তর। ইহার আর একটি নাম "ক্ষুদ্র প্যারিস্" (miniature Paris)। য়ুরোপের যত বদমায়েস্দের আড্ডা এই সহরে,—এবং পাপের স্রোতে ইহা পঙ্কিল। পোর্টসায়েদে আসিলে প্রথমে মনে হয় যে, এতদিনে য়ুরোপীয়ান সহরের একটু নমুনা দেখা গেল। এই স্থানেই প্রথমে "glare of the West" (পাশ্চাত্য দেশের চাকচিক্য) বুঝিতে পারা যায়।

পোর্টসায়েদ ছাড়িয়া পঞ্চম দিবসে মেসিনায় আসা গেল। পথে "ষ্ট্রম্বলি" (Stromboli) আগ্নেয়-গিরির নিকট দিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের জাহাজ চলিয়াছিল। সে সুন্দর ও ভীষণ দৃশ্য জীবনে কখন ভুলিব না। যেন আরব্য উপন্যাসের এক ভীষণ দৈত্য মুখ দিয়া অগ্নি উদগীরণ করিতেছে। মেসিনা সহরটি অতি সুসজ্জিত ও মনোরম, যেন একখানি ছবি। এইবার যথার্থ য়ুরোপীয়ান সহর প্রথম দেখিলাম। কে তখন জানিত যে, তিন মাস পরে "ষ্ট্রম্বলির" কৃপায় এই সমৃদ্ধিশালী নগর এক দিনে ভূগর্ভে মিশিয়া যাইবে, তাহার কোন চিহ্ন মাত্র থাকিবে না! আমরা নিউইয়র্কে পঁহুছিবার দুই মাস পরে সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, মেসিনা রসাতলে গিয়াছে। কি পাপে বা পুণ্যে এক দিনে লক্ষাধিক স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকার জীবন্ত সমাধি হইল, কেহ বলিতে পারেন কি?

সেই দিনই মেসিনা ত্যাগ করিয়া জাহাজ ইটালী অভিমুখে ছুটিল, এবং পর দিবস আমরা নেপল্সে পঁহুছিলাম। যাত্রার প্রথম অংশ ভগবানের কৃপায় সম্পূর্ণ হইল,—এই স্থানে জাহাজ বদল করিতে হইবে। নেপল্সের সৌন্দর্য্য ও মনোহর দৃশ্যাবলীর বর্ণনা করিতে গেলে একখানি বড় পুস্তক লিখিতে হয়। ভ্রমণ-কাহিনী লেখা যখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, তখন সহরের বর্ণনা করিয়া পুঁথির আয়তন বৃদ্ধি না করাই ভাল। আর য়ুরোপ ত' এখন ঘরের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—ইচ্ছা করিলেই আপনারা স্বচক্ষে সব দেখিয়া আসিতে পারেন।

জেনোয়া হইতে যে বড় জাহাজগুলি প্রতি সপ্তাহে আমেরিকা যায়, তাহার একখানি আমরা নেপল্সে পঁহুছিবার দুই দিন পূর্ব্বেই এই বন্দর হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের এখন পাঁচ দিন এখানে থাকিতে হইবে। অন্যান্য বন্ধুবান্ধব সকলেই এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এগার জনের মধ্যে আমরা পাঁচজন মাত্র ভারতবাসী আমেরিকা-যাত্রী রহিলাম। তিন সপ্তাহকাল একত্র বাস করিয়া এত বন্ধুত্ব হইয়াছিল যে, স্বদেশে এক যুগেও তাহা হয় না। বিদায় গ্রহণের কালে প্রায় সকলেরই চক্ষু আর্দ্র হইয়াছিল। হোটেলে আসিয়া মনে হইল, "নানা পক্ষী এক সঙ্গে, নিশীথে বিহরে রঙ্গে, প্রভাত হইলে করে, সবে পলায়ন"। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, এই পাঁচ দিন জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, ও রোম দেখিয়া কাটাইব; কিন্তু পর দিন মতলব উল্টাইয়া গেল। "নর্ড—এমেরিকা" নামের একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজ সেই দিন নিউইয়র্কে যাইবে শুনিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া জেটিতে উপস্থিত হইলাম। এবার একটু নূতনত্ব

আছে। চক্ষুরোগ (Trachoma) থাকিলেই সর্ব্বনাশ। যাহা হউক, আমাদের কোন ভয়ের কারণ ছিল না। আমরা ডাক্তারের নিকটবর্ত্তী হইয়া নিজেরাই চক্ষু বিস্তৃত করিয়া দেখাইলাম। তিনি একই তারের যন্ত্র দিয়া সকলের চক্ষু পরীক্ষা করিতেছিলেন। কি ভয়ানক! Trachoma সংক্রামক পীড়া, ইহা কি তাঁহার জ্ঞান ছিল না! নিউইয়র্কে পঁহুছিয়া কিছুদিন পরে এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়াছিলাম; তাহাতে ডাক্তারদের ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

কি কুক্ষণে "নর্ড এমেরিকা" জাহাজে পদার্পণ করিয়াছিলাম! এমন স্বেচ্ছাচার কখন দেখি নাই। ইহা uni-class জাহাজ—অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণী কিছুই নাই। সবই এক ক্লাসের যাত্রী। অধিকাংশই ইতালীয়ান, দুই চারিজন আমেরিকানও আছেন। পরিচিতের মধ্যে মিসেস্ ও মিঃ হিউমকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। কেবিনে গিয়া দেখি, কি একটা দুর্গন্ধময় পদার্থ পড়িয়া আছে। তাহা আর কিছু নহে, জেনোয়া হইতে যে লোকটি এই কামরায় ছিল তাহারই "সমুদ্র-পীড়ার" চিহ্ন। তিন সপ্তাহ ইতালীয়ান জাহাজের কর্ম্মচারীদের সহিত মিশিয়া ও একখানি বাক্যালাপের পুস্তকের সাহায্যে চলিত কথা অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিলাম। এবার একেবারে কাপ্তেনের নিকটে গিয়া কেবিন পরিষ্কার করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে বলিলাম। হুকুম হইল যে, আমরা যে কয়জন প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী এ জাহাজে আছি, তাহাদের সুবিধার দিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। কিন্তু সুবিধা হইবে কোথা হইতে? জাহাজে স্নানের বন্দোবস্ত মোটেই নাই। এ জাহাজে স্নান অর্থে মাথায় ও মুখে হাতে দুই পেয়ালা আন্দাজ জল দেওয়া। রাস্তায় পালার্মো সহরে জাহাজ থামিলে, একটা হোটেলে গিয়া স্নান করিয়াছিলাম; আর তাহার পরের স্নান দুই সপ্তাহ পরে নিউইয়র্কে। "রুবিতানো" জাহাজে জলাভাব মোটেই ছিল না; আমরা প্রত্যহই স্নান করিতাম। কিন্তু "নর্ড-আমেরিকা"র কেবল পানীয় জল ছাড়া আর কিছু ছিল না। সমুদ্রের লোণা জল ছিল বটে, কিন্তু স্নানাগার কোথা? তাহার পর, ভূমধ্যসাগর জিব্রল্টরে যখন শেষ হইল ও আমরা আট্‌লান্টিক মহাসাগরে পড়িলাম, তখনকার অবস্থা অবর্ণনীয়। প্রবল পরাক্রম আটলান্টিক যেন জাহাজখানিকে লইয়া ফুটবল্ খেলিতে লাগিল। স্ত্রীলোকদের চীৎকার, বালকদের ক্রন্দন, কতকগুলি পুরুষের (ইহারা পুরুষ কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে) উন্মত্তের ন্যায় মস্তকের কেশ উৎপাটন—এক দিকে এই দৃশ্য, অপর দিকে দুই হাত অন্তর "সমুদ্র-পীড়া"র চিহ্ন সকল চতুর্দ্দিকে ছড়ান। প্রায় সাড়ে তিনশত যাত্রী। তাহাদের আবর্জ্জনা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা এই জাহাজের অল্প সংখ্যক কর্ম্মচারীদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং আমরা দুর্গন্ধের মধ্যেই রাত্রিবাস করিতে লাগিলাম। রাত্রে বেশ কন্‌কনে শীত, ডেকের উপর শয়নের উপায় নাই।

যাহা হউক, এত যে কষ্ট, তাহা আমরা আটলান্টিক্ দেখিয়া ভুলিয়াছিলাম। পর্ব্বত দেখিতে হইলে হিমালয়, আর সমুদ্র দেখিতে হইলে আটলান্টিক্। ভারত-মহাসাগর বা ভূমধ্য সাগর ইহার নিকট পুকুর বলিলেই চলে। ভূমধ্য সাগরের ত' একটা অপর নাম Herring pond। বেশী তুফানের সময় আটলান্টিকের এক-একটি ঢেউ ষাট্ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। পর্ব্বতাকার তরঙ্গ, একটির পর একটি যখন প্রবল বেগে আসিতে থাকে, তখন মনে হয় যে, যে কোন মুহূর্ত্তে জাহাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। দূরে অন্য একখানি জাহাজ যখন দুইটি তরঙ্গের মধ্যে পড়িতেছে, তখন তাহার মাস্তুল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না,—মনে হইতেছে, যেন চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইল। এই আট্‌লান্টিকে যত জাহাজ নষ্ট হয়, তত আর কোন সমুদ্রে হয় না।

গল্প-গুজবে এক রকম দিন কাটিতেছে। জাহাজের আমরা নূতন নামকরণ করিয়াছি, "নর্দ্দামা-মার্কা।" আহারের বিশেষ কোন কষ্ট নাই; তবে প্রত্যহ দুইবার করিয়া এমন একটি চমৎকার পনীর টেবিলের নিকট লইয়া আইসে যে, তাহাতে আমরা দশ মিনিট কাল নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হই। ওয়েটারটি বেশ রসিক। প্রত্যহ হাসিতে হাসিতে সেই পনীর লইয়া উপস্থিত হয়, আর ঘরের চৌকাট পার না হইতেই সব টেবিল হইতে যোড়া-যোড়া হাত উঠিয়া তাহাকে "দূর-দূর" করিতে থাকে। কিন্তু সেও নাছোড়বন্দা। সকলের নিকটে একবার পনীরটি

সোমালীগণ

এডেনের সোমালী ব্যবসায়িগণ

আরবের মরুভূমিতে আরবীয় উষ্ট্র

এডেনের আরব পল্লী

নিশ্চয়ই দেখাইবে। এই পনীরের একটু ইতিহাস আছে,—সেই জন্যই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। ইহার কল্যাণে আমেরিকান্ মহিলার পুরুষোচিত বীর্য্যের নমুনা প্রথমে দেখিতে পাইলাম। মিসেস্ হিউমকে একজন ইটালিয়ান পনীরের কথা লইয়া কি বিদ্রূপ করিয়াছিল। মিঃ হিউমকে কিছু বলিতে হইল না। মিসেস্ চক্ষের নিমেষে চেয়ার হইতে উঠিয়া, সেই ইটালীয়ানের পঞ্জরে সজোরে এমন পদাঘাত করিলেন যে, সে মেঝের উপর পড়িয়া গেল। বেচারী যেমন গা ঝাড়িয়া উঠিল, মিসেস্ হিউম তাহার মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ

করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে ঘরের বাহিরে গেলেন। আমার মনে হইল, যেন Duke of Wellington Waterloo জয় করিয়া চলিয়া গেলেন। স্ত্রীলোকের পদাঘাত ইতালীয়ান মহাশয় হজম করিতে বাধ্য হইলেন। আর কোন উচ্চ বাচ্য হইল না। কেবল সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, ইহুদি পরিবার অন্য টেবিলে বসিয়াছেন।

আমরা ক্রমশঃই বেশী শীত অনুভব করিতেছি। নিউ ইয়র্ক নিকটবর্ত্তী। দুই দিন তিমি মৎস্যের দল দেখা গেল।
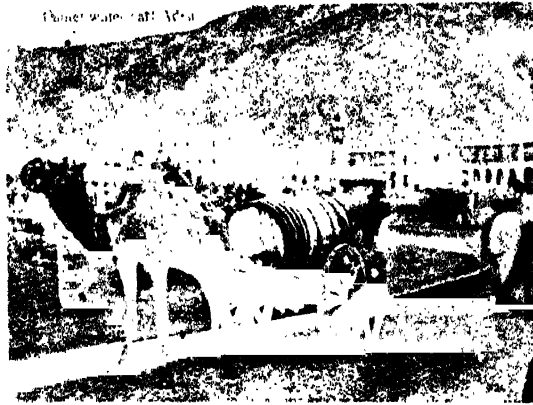
সাধারণ চক — নেপল্‌স

লা ফনটানা — জাতীয় উদ্যান বাটিকা — নেপল্‌স

একটা ছানা এক দিন জাহাজের খুব নিকটে আসিয়াছিল, —তাহার বিরাট আকার দেখিয়া ভয় হইয়াছিল যে, পুচ্ছাঘাতে জাহাজ না ভাঙ্গিয়া দেয়।

১লা আশ্বিন, ১৩১৫ সাল আমার চিরকাল মনে থাকিবে। এই দিন বিকালে জাহাজ Statue of Liberty (স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি)র নিকটে আসিল। দূর হইতে জাহাজের বেগ মন্দীভূত করা হইল; এবং মাস্তুলে ইটালিয়ান ও আমেরিকান জাতীয় নিশান উড়িতে লাগিল। জাহাজে বাদ্য ছিল না। কিন্তু জনকয়েক ইতালীয়ান হার্প ও বেহালাসংযোগে Star Spangled Banner

সন্ট মা[illegible] [illegible] নেপলস

নেপলস [illegible]—[illegible]

মিউনিসিপ্যাল উদ্যান—নেপলস

বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন। কি মিষ্ট বাদক এই ইটালিয়ান্‌রা! অনেক ইটালিয়ান্ গান বা গৎ আমাদের দেশের সুর বলিয়া মনে হয়।

স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র জাহাজ একেবারে থামিয়া গেল; আর শত শত কণ্ঠ হইতে এক গগনভেদী জয়ধ্বনি উঠিল। সকলে অনাবৃত মস্তকে বার বার তিনবার জয়ধ্বনি করিলেন,—জাহাজ হইতে ক্রমাগত Syren (জাহাজের বাঁশী) বাজিতে লাগিল, এবং তাহার পরই সকলে নতজানু হইয়া বসিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। ধন্যবাদ শেষ হইলে জাহাজ পুনরায় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। যতক্ষণ পারিলাম, চক্ষু মেলিয়া স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তিকে দেখিলাম। এই শত-শত বৎসরের পরাধীন জাতির একজন লোকের কি তখন মনে হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে অক্ষম। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে আমি ভাল মনে করিতাম ও এখনও করি। বাল্যকাল হইতে অনেক ভাল ইংরাজের সহিত মিশিয়াছি; এবং পরে বিলাতে অনেক

নুয়ো মিজার অভ্যন্তর-ভাগ—নেপলস

নেপলস—কাপোডিমণ্টি উদ্যান

ভিলা আল্লা এ পোসিলিপো প্রাসাদ—নেপলস

সেণ্ট এলিমো দুর্গ নেপলস

নেপলস — বাঁধ
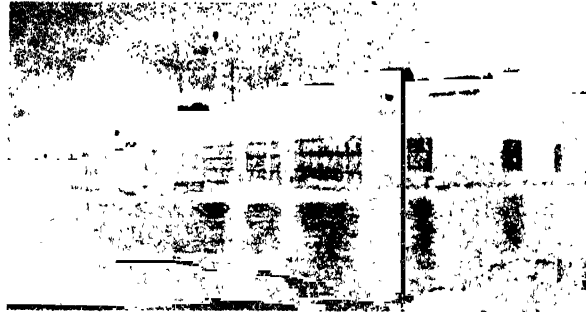
উদার হৃদয় মহাপুরুষ ইংরাজের সংস্রবে আসিয়াছি। ইংরাজ মহিলার ভগিনীর অধিক যদি অকৃত্রিম যত্ন থাকে, তাহাও পাইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি; কিন্তু কি জানি কেন, তখনও মনে হইয়াছিল এবং এখনও মনে হয় যে, সেই Statue of Libertyর দেশে থাকি।

কি বিরাট মূর্ত্তি! দেখিলেই যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময় মনকে অধিকার করে এবং মনে কত যেন আশা ও ভরসার উদ্রেক হয়।

পরে নিউইয়র্ক হইতে আসিয়া এই প্রতিমূর্ত্তিকে ভাল করিয়া দেখিয়াছি এবং ইহার উপরেও উঠিয়াছি। সন্ধ্যা হইলেই ইহার হস্তস্থিত মশাল ও মস্তকের মুকুট হইতে যখন বৈদ্যুতিক আলোকের ছটা বাহির হয়, তখন এক অপূর্ব্ব শোভা হয়। বহুদূর হইতে এই আলোক দেখা যায়।

এই প্রতিমূর্ত্তি আমেরিকার স্বাধীনতার সম্মানস্বরূপ ফ্রান্স আমেরিকাকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ইংরাজি ১৮৮৬ সালে ইহা সংস্থাপিত হয়। ইহার নির্ম্মাতা বিখ্যাত ভাস্কর বার্থলডি। ইহার ওজন ৪৫০,০০০ পাউণ্ড বা ২২৫ টন্। ইহাতে 'ব্রোঞ্জ' ধাতুই আছে ২০০,০০০ পাউণ্ড। চল্লিশ জন লোক ইহার মাথার ভিতর আরামে দাঁড়াইতে পারে, হাতে যে মশাল আছে তাহার মধ্যে বারজন। প্রতি অঙ্গের আয়তন লিখিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না, দুই চারিটি বলিলেই বোধ হয় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন :—

ভিত্তি হইতে হস্তস্থিত মশালের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত— ৩০৫ ফীট, ৬ ইঞ্চ।

কেবল প্রতিমূর্ত্তি	১৫১	ফীট	১	ইঞ্চ
বাম হস্ত, লম্বা	১৬	„	৫	„
দক্ষিণ বাহু	৪২	„		
নাসিকা	৪	„	৬	„
এক একটি নখ	১৩×১০ ইঞ্চ			

প্রতিমূর্ত্তির ভিতরে উঠিবার জন্য ১৫৪টি ধাপ আছে ও কতকদূর পর্য্যন্ত ইলেক্‌ট্রিক্ লিফ্‌টও আছে।

স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর শ্রেষ্ঠ দেশ আমেরিকার উপযুক্ত এই মূর্ত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যে ফ্রান্স ইহা তাহার নিজ-তন্ত্রের ভগিনীকে উপহার দিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় কত উদার!

আজ জাহাজ নিউইয়র্ক বন্দরের অতি নিকটে। স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বন্দরে প্রবেশ করিতে হয়, যেন দেবতার মন্দির হইয়া গৃহ-প্রবেশ।

পরনিন্দা-চাট্‌নী

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]
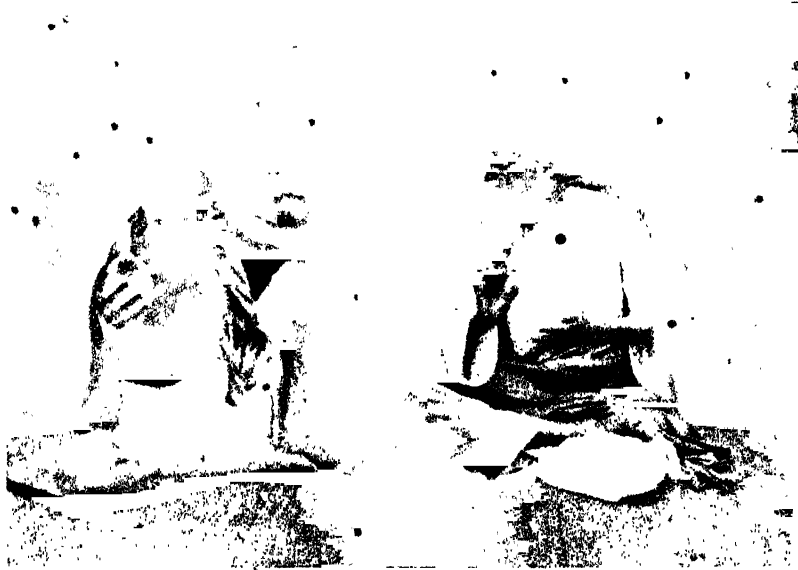
প্রথম চিত্র

দ্বিতীয় চিত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ

কয়লার খনি

[শ্রীসুশীলচন্দ্র রায় বি-এস্‌সি]

গহ্বরের আকার (Shape of the Shafts)

ইহার আকার চারি প্রকার হইতে পারে।

(১) সমকোণী (Rectangular)

(২) বহুভুজবিশিষ্ট (Polygonal)

(৩) ডিম্বাকৃতি (Elliptical)

(৪) গোলাকার (Circular)

(১) ইহা প্রায়ই ধাতুখনিতে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে প্রত্যেক পিঞ্জরের জন্য কাঠের খোপ প্রস্তুত করা হয়। ইহার অসুবিধা এই যে, যখন একটি পিঞ্জর উঠে ও একটি নামে তখন তাহাদের ভিতর বায়ু-চলাচলের জন্য যথেষ্ট স্থান থাকে না।

(২) এই আকার ফ্রান্সে ও সাউথ ওয়েলসে (South Wales) ব্যবহৃত হয়। ইহাতেও ১নং আকারের অনেক কাঠের দরকার। সুতরাং যেখানে কাঠের মূল্য সুলভ সেখানেই এরূপ আকার সম্ভব।

(৩) উপরিউক্ত দুইপ্রকার অপেক্ষা ইহা মজবুত। মধ্যস্থলে পিঞ্জর থাকে এবং উভয় পার্শ্বে দমকল, নল ও বায়ু চলাচলের জন্য স্থান থাকে। ই, আই, আর কোম্পানীর গিরিডির খনির গহ্বরের আকার এইরূপ।

(৪) আমাদের এখানে সর্ব্বস্থানের গহ্বরের আকার গোল। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মজবুত এবং ইহা অন্য আকার অপেক্ষা পার্শ্বের মৃত্তিকার ও জলের চাপ সহ্য করিতে সক্ষম। ইহার খরচও সর্ব্বাপেক্ষা কম।

খনন (Sinking)

গহ্বরের (Shaft) স্থান ও আকৃতি ঠিক হওয়ার পর তাহার খনন কার্য্য আরম্ভ হয়। গহ্বরের ব্যাস যেরূপ হওয়া দরকার, কাটিবার সময় চতুষ্পার্শ্বে ইষ্টক প্রাচীরের জন্য তদপেক্ষা ব্যাস বেশী করিয়া আরম্ভ করা হয়। এ প্রাচীর প্রায়ই দুই ফিট চওড়া করা হয়। কঠিন প্রস্তরে পৌঁছান পর্য্যন্ত গহ্বরের ব্যাস এইরূপ বেশী রাখিয়া যাওয়া হয়। তার পর সেখান হইতে আবশ্যক মত ব্যাস রাখিয়া যাওয়া হয়; কারণ সেখান হইতে আর ইষ্টক প্রাচীরের আবশ্যক হয় না।

কাটিবার সময় উপর হইতে প্রায় ১০ ফিট পর্য্যন্ত পুষ্করিণী খননের ন্যায় একধারে মাটির সিঁড়ি রাখিয়া যায় এবং তাহার দ্বারা উপরে যাতায়াত করে। কিন্তু ১০ ফিটের বেশী হইলে মাথায় বোঝা লইয়া এইরূপ উঠা নামা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তখন উপরে একটি কাঠের ফ্রেম করিয়া তাহাতে একটি কপিকল ঝুলান হয়—এবং তাহার দ্বারা দড়ি দিয়া বেতের ঝুড়ি করিয়া নীচের প্রস্তরাদি কর্ত্তিত অংশ উপরে তুলা হয়। জল তুলিবার সময় বেতের পরিবর্ত্তে মহিষ চর্ম্মের ঝুড়ি ব্যবহৃত হয়।

গহ্বরের আকার (১)

(২) (৩) (৪)

এইরূপে কঠিন প্রস্তরে পৌঁছিলে, সেই প্রস্তরের উপর হইতে ইষ্টকের প্রাচীর গাঁথিয়া উপর পর্য্যন্ত তোলা হয় এবং প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়া গেলে, তখন উপরে অস্থায়ী ভাবে ছোট Headgear ও ছোট Engine বসান হয়। এই Headgear ও Engine কেবল খনন কার্য্যের জন্য। খনন কার্য্য হইয়া গেলে, তাহার পর স্থায়ী ভাবে Headgear ও Engine বসান হয়।

কঠিন প্রস্তর ডিনামাইট দিয়া ফাটাইয়া দেওয়া হয়। ডিনামাইট কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা নিম্নের চিত্র হইতে বুঝা যাইবে।
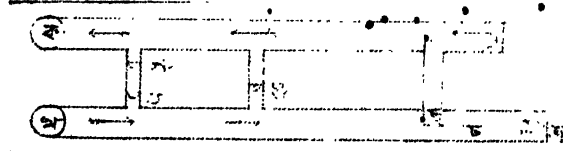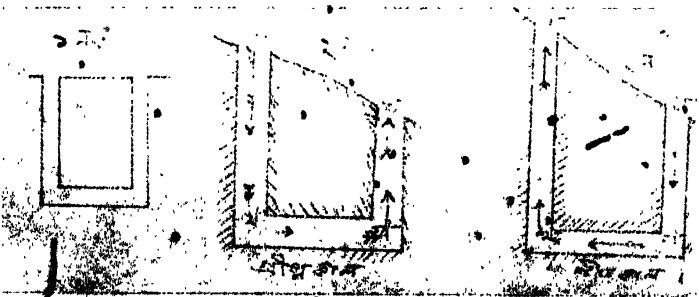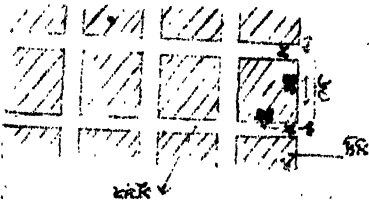
ডিনামাইট ব্যবহারের প্রণালী
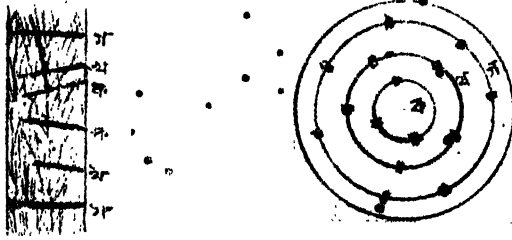
প্রথমে 'ক' চিহ্নিত গর্তগুলি খনন করা হইল। এই গর্তগুলি সোজা না হইয়া একটু বক্র হইবে। তাহার পর ইহাদের ভিতর ডিনামাইট পুরিয়া ফুটান গেল। তৎপরে 'খ' চিহ্নিত গর্তগুলি ঐরূপে ফুটান গেল। এইরূপে খনন প্রান্তে পৌঁছান গেল, তখন সেখানে আর ডিনামাইট ব্যবহার করা হয় না,—তাহাতে গহ্বরের পাশ খারাপ হইতে পারে। সেখানে সাবল দিয়া সমান করা হয়।

বিস্ফোরক (Explosives)

প্রস্তরের কঠিনত্ব অনুসারে বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়।

(১) Gunpowder—ইহা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া সকল স্থানে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারা যায়।

ইহাতে শতকরা—৭৫ ভাগ Potash Nitrate (সোরা)
" ১৫ কাঠকয়লা
" ১০ " গন্ধক থাকে।

ইহা কঠিন প্রস্তরে ব্যবহৃত হয় না।

(২) Dynamite—কয়লার গুঁড়া ও সোরা দিয়া Nitro-glycerine শোধন করা হয় এবং ইহাকেই ডিনামাইট বলে। ইহা টোটার (cap) ভিতর পুরিয়া ব্যবহৃত হয়। অগ্নি-সংযোগ করিবার সময়ে প্রথমে পলিতার একমুখ একটু বক্র ভাবে কাটিয়া তাহা detonatorএর ভিতর পুরিয়া দিয়া detonatorএর মুখ বেশ করিয়া চাপিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে তাহা পলিতাটি ধরিয়া থাকে। তৎপরে একটি কাঠশলাকা দ্বারা টোটার ভিতর গর্ত করিয়া detonatorটি ভাল করিয়া বসাইয়া দেওয়া হয় এবং টোটাটি প্রস্তরের গর্তের ভিতর পুরিয়া প্রথমে মৃত্তিকা দ্বারা ধীরে ধীরে, এবং পরে কাষ্ঠ বা তাম্রশলাকা দ্বারা ভাল করিয়া চাপিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে সব ঠিক হইলে, সেখানকার লোকজন সরাইয়া পলিতায় অগ্নি-সংযোগ করা হয়। পলিতাটি ৪।৫ ফিট বাহিরে থাকে; সুতরাং ঐ ৪।৫ ফিট জ্বলিয়া যাইবার পূর্বে, যে লোক অগ্নি সংযোগ করে, সে পলাইতে পারে।

Detonator—Fulminate of Mercury আর Potash chlorate এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া একটি তাম্রনির্মিত চোঙ্গের ভিতর পূরণ করা হয়। ইহাকে detonator বলে। পলিতার অগ্নি ইহা স্পর্শ করিবামাত্র, ইহা ফাটিয়া যায় এবং ইহার সংঘর্ষণে ডিনামাইটও ফাটে।

পলিতা—প্রথমে বারুদ পাট (jute) দিয়া জড়ান হয় এবং তৎপরে ইহা আলকাতরায় ডুবান হয়, যাহাতে জল লাগিয়া নষ্ট না হয়।

যে সমস্ত খাদে Marsh gas ইত্যাদি গ্যাস আছে, সেখানে ডিনামাইট ব্যবহার করা বিপজ্জনক। সেখানে Mines Actএর অনুমোদিত একরূপ explosive আছে, তাহারই ব্যবহার করা হয়। ইহাদিগকে Nitrate of ammonium class explosives বলে।

গহ্বরের ব্যাস (Diamter of the Shaft)

গহ্বর দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে গেলে দেখিতে হইবে, যাহাতে তাহার ব্যাস বরাবর সমান হয় এবং তাহা ঠিক সোজা (vertical) থাকে। ইহার জন্য নিম্নের উপায় অবলম্বন করা হয়।

(১) গহ্বর মুখের দুই পার্শ্বে কাঠের গজাল থাকে এবং ইহার মধ্যে একজোড়া Tramline সমান থাকে। গহ্বরের ঠিক মধ্যস্থলে Tramlineএর উপর একটি কপিকল থাকে এবং এই কপিকলের উপর দিয়া একটি রজ্জু ঝুলান থাকে। রজ্জুর এক প্রান্ত গহ্বরের ভিতর থাকে এবং তাহাতে একটি ওলন (plumb bob) ঝুলান থাকে এবং অন্য প্রান্ত গজালে আবদ্ধ থাকে। সেই ওলনকে কেন্দ্র করিয়া চারিধার মাপিয়া ইহার ব্যাস ঠিক রাখা হয়।
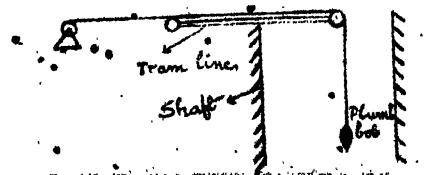
ট্রামলাইন ও স্যাফ্‌ট

(২) Tram lineএর পরিবর্তে একটি কব্‌জা দেওয়া হাতল থাকিতে পারে এবং তাহার একপ্রান্তে একটি কপিকল থাকে। ইহার উপর দিয়া পূর্বোক্ত উপায়ে ওলন ঝুলান থাকে। কার্য্য হইয়া গেলে হাতল গহ্বরের মুখ হইতে সরাইয়া রাখা যাইতে পারে।

প্রাচীর গঠন

উপর হইতে খনন করিতে আরম্ভ করিয়া নিম্নে কঠিন প্রস্তরে পৌঁছিলে, যেখানে চতুষ্পার্শ্বে আলিসা (ledge) রাখা হয়। এই আলিসার উপর হইতে গহ্বর-মুখ পর্য্যন্ত ইষ্টক-প্রাচীর গাঁথা হয়। ইংলণ্ডে ইষ্টক প্রাচীরের পরিবর্তে লৌহের পাত দিয়া চারিধারে মুড়িয়া

দেয়। প্রাচীর গাঁথিবার সময় আলিসার (ledge) উপরিভাগ সাবল দিয়া সমান করা হয় এবং গাঁথিবার সময় মিস্ত্রীরা উপর হইতে লম্বমান্ বাঁশের মাচানের উপর বসিয়া কার্য্য করে। এই মাচানের মধ্যস্থলে বালতি দিয়া নীচে হইতে জল ইত্যাদি তুলিবার জন্য জায়গা থাকে।

বাঁশের মাচানের পরিবর্ত্তে আর এক প্রকার মাচান ব্যবহার করা হয়, তাহাকে Walling Stage বলে। ইহা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ও গোলাকার এবং ইহার চারিদিকে টিন দিয়া ঘেরা থাকে, যাহাতে লোকজন নীচে পড়িয়া না যায়।

ইষ্টকের পরিমাণ

এই প্রাচীরের ইষ্টক খুব ভাল হওয়া দরকার। ইহা সাধারণতঃ ৯"×৪"×৩" বা ১০"×৫"×২½" আকারের হইয়া থাকে।

গহ্বর

যদি ক গহ্বরের বহির্ব্যাস হয়

" খ " ভিতরের ব্যাস হয়, তাহা হইলে বাহিরের বৃত্তের কালি (area) ক² × ৭৮৫৪, ভিতরের কালি (area) খ² × ৭৮৫৪। কিন্তু আমাদের যতটা ইষ্টক দিয়া গাঁথিতে হইবে, তাহার কালি (area) = ৭৮৫৪ (ক² − খ²); এবং 'গ' যদি ইহার গভীরতা হয়, তবে ইহার ঘন কালি (cubic area) = গ × ৭৮৫৪ (ক² − খ²) অতএব ইষ্টকের সংখ্যা গ = × একখানি ইষ্টকের ঘনকালি ৭৮৫৪ (ক² খ²)। এই গণনায় অবশ্য mortar ধরা হয় নাই। গাঁথুনির মসলার মধ্যে চূণ এবং বালি কিম্বা চূণ এবং সুরকি আর যেখানে বেশী জল থাকে সেখানে সিমেন্ট মাটি ব্যবহার করা হয়। ১ ভাগ চূণ ও ২ ভাগ সুরকি এই অনুপাতে থাকে।

প্রাচীর প্রায় ১৮" ইঞ্চি হইতে ২৪" ইঞ্চি পর্য্যন্ত চওড়া হয়।

খরচ

গহ্বর খননের সাধারণ খরচ, বিস্ফোরক (Explosives) লোক-জনের বেতন ইত্যাদি ধরিয়া ৩০ হইতে ৪০ টাকা প্রতি ফুটে পড়ে এবং Engine ইত্যাদি সমস্ত ধরিয়া একটি গহ্বরের সমস্ত খরচ প্রতি ফুটে ১০০ টাকা পড়ে। অবশ্য আমি যুদ্ধের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি; এখন খরচ অনেক বেশী পড়ে। প্রতি সপ্তাহে সাধারণতঃ ১০ ফিট গভীর কাজ হইয়া থাকে।

খাদের পার্শ্ব-রক্ষণ (Temporarily supporting the side of Shafts.)

গহ্বর খনন করিবার সময় যদি উভয় পার্শ্বের মাটি এরূপ নরম হয় যে, তাহা খসিয়া পড়িতে পারে, তবে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে হয়।

কিছুদূর খনন করিবার পর উপরে গহ্বর অপেক্ষা কিছু বড় একটি চতুষ্কোণ কাষ্ঠের ফ্রেম বসান হয়। তাহার পর আন্দাজ ৫ ফিট গভীর হইলে, যেখানে একটি গোলাকার কাঠের ফ্রেম বসান হয়। এই ফ্রেম গহ্বরের ধার ঠিক মিল করিয়া ছোট-ছোট অংশে ভাগ করা থাকে,—ইহাদিগকে crib বলে। ইহা প্রায় ৬" ইঞ্চি চওড়া ও ৫ ফিট লম্বা এবং ইহা উপরে চতুষ্কোণ ফ্রেম হইতে লোহের আংটা দিয়া ঝুলান থাকে। গহ্বরের ধার ও এই গোলাকার ফ্রেমের ভিতর কাঠের তক্তা উপর হইতে আঘাত দিয়া আঁটিয়া বসান হয়, যাহাতে ধারের মাটি খসিয়া না পড়িতে পারে। ধারের মাটির প্রকৃতি অনুসারে প্রায় ৫।৬ ফিট অন্তর এক-একটি crib বসান হয়। ২টি cribএর সম্মুখে আবার ছোট-ছোট তক্তা দিয়া, গজাল দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। যতক্ষণ কঠিন প্রস্তরে না পৌঁছান যায়, ততক্ষণ এইরূপে পার্শ্ব রক্ষা করা হয়। তাহার পর যখন প্রস্তর স্তরের উপর হইতে প্রাচীর গাঁথা আরম্ভ হয় তখন একে একে এইগুলি খুলিয়া লওয়া হয়।
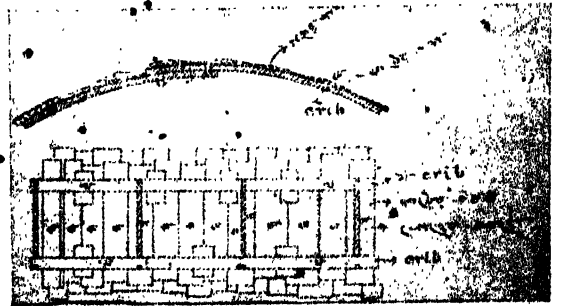
কাঠের ফ্রেম

গহ্বর খনন করিবার সময় ভিতরে অনেক জল জমে। যেখানে খনন করা হয় যেখানে জল থাকে; তদ্ভিন্ন বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া জল চুয়াইয়া আসে। এই জল হয় দমকল দিয়া উপরে তোলা হয়, নচেৎ কপিকলের উপর দিয়া লৌহ রজ্জু দ্বারা বালতি ঝুলাইয়া সেই বালতি দিয়া তোলা হয়।

এই বালতি নানা প্রকারের আছে; তন্মধ্যে দুই প্রকারের চিত্র দেওয়া গেল। যেখানে জলের ভাগ কম সেখানে ১নং বালতি ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু যেখানে জল বেশী সেখানে ২নং বালতি ব্যবহৃত হয়। ইহার নীচে একটি দ্বার (Valve) আছে। যখন বালতি জলের ভিতর ডুবান হয়, তখন নীচের জলে চাপে দ্বার (Valve) খুলিয়া যায়

এবং ভিতরে জল প্রবেশ করে; কিন্তু যখন বালতি উঠান হয়, তখন বালতির জলের চাপে দ্বার (Valve) বন্ধ হইয়া যায়। বালতি উপরে পৌঁছিলে ঐ দ্বার (Valve) সংলগ্ন দড়ি টানিয়া ধরা হয় এবং সব জল বাহির হইয়া যায়।

১নং ও ২নং বালতি

পুরাতন কথা—খাঞ্জা খাঁ
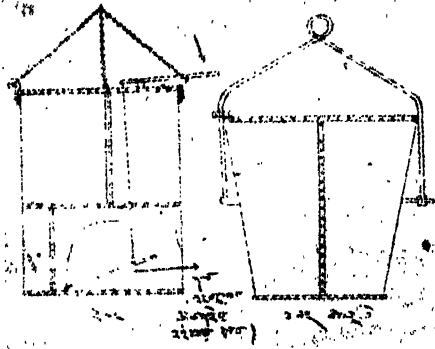
[শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

মানুষ সমাজে তাহার নিজের নাম রাখিয়া যায় নানা কাযের সাহায্য লইয়া,—তা সে কাজ যে প্রকারই হউক।

'বিশ্বনাথ' তাঁহার নাম রাখিয়া গিয়াছেন ডাকাতি করিয়া ও সেই সঙ্গে 'বাবু' খেতাব লইয়া, 'আশানন্দ' অসাধারণ দৈহিক শক্তি হেতু 'ঢেঁকি' হইয়া; 'মুণ্ডকে রগু' ও 'আধমুণে কৈলাস' অপরিমিত অর্থাৎ একমণ ও আধমণ আহার করিয়া (১); 'গৌরী সেন' তাঁহার বদান্যতায়—যথা "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"; আর 'খাঞ্জা খাঁ' তাঁহার 'বাবুয়ানায়' বা 'নবাবিতে'—যথা "বেটা যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ"। তন্মধ্যে গৌরী সেন ও খাঞ্জা খাঁ, বেচা-কেনা শেষ করিবার জন্য একই স্থানে তাঁহাদের ভবের দোকান-পাট খুলিয়া বসিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে গৌরী সেন সম্বন্ধে দু-একটী কথার অবতারণা করিবার অভিলাষ হইয়াছিল; কিন্তু "ভারতবর্ষের" পৃষ্ঠায় একবার সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় আর সে চেষ্টা করি নাই।

অতিমাত্রায় সৌখীন বা বিলাসী কাহাকেও (অথবা কাহারও অনাবশ্যক বা অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর) দেখিলে, অনেকে তাহাকে উপহাস করিয়া বলিয়া থাকেন—"বেটা যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ"। নবাব খাঞ্জা খাঁর বিলাসিতা চিরপ্রসিদ্ধ এবং আজীবন তাহা সমভাবেই চলিয়াছিল। অভাব, অভিযোগ, দারিদ্র্যের প্রবল তাড়নায়ও তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই এবং এই জন্যই সে বিলাসিতার খ্যাতি এত অধিক। ধনী নির্ধন হইয়া পড়িলে তাঁহার পদমর্য্যাদা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে; এবং অগত্যা বিলাসিতা ও বাহ্যাড়ম্বর ক্রমশঃ তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু অভাবের দুঃসহ অত্যাচার ও লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র্যের শত সহস্র কশাঘাতও নবাব খাঞ্জা খাঁকে টলাইতে পারে নাই। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু বিলাস ও বাহ্যাড়ম্বরের এতটুকু ব্যতিক্রম সহ্য করিতে তিনি কোন দিন প্রস্তুত হন নাই। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—নীতি বাক্যের তিনি একদিনও অবমাননা করেন নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে খাঞ্জা খাঁ (প্রকৃত নাম খান্ জাহান্ খাঁ) ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইঁহার পিতা মুজা কুলি খাঁ তিহারাণের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারা সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ইরাণি মোগল।

যুবক খাঁ জাহান মোগল-সরকারে কর্ম্ম-প্রার্থী রূপে উপস্থিত হইয়া অল্প দিনেই নিজের কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করেন। এই সময়ে হুগলীর ফৌজদার ওমর বেগ্ খাঁর (২) মৃত্যুতে খাঁ জাহান ঐ পদে নিযুক্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান।

ইংরাজের সুপ্রিম কাউন্সিল স্থাপিত হইলে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ ও অপরাপর সভ্যগণের মধ্যে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়; এবং এই গোলযোগের ভিতর নবাব খাঞ্জা খাঁও জড়াইয়া পড়েন।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে মহারাজ নন্দকুমারের নির্দ্দেশানুসারে জেলালউদ্দিন নামক এক ব্যক্তি কাউন্সিলে একখানি আবেদনপত্র পেশ করেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, হুগলীর ফৌজদার কোম্পানীর নিকট হইতে বেতন স্বরূপ বার্ষিক ৭২,০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইতেন। তন্মধ্যে ৩৬,০০০৲ হেষ্টিংস্‌কে ও ৪,০০০৲ তাঁহার দেশীয় সচিবকে (Secretary) প্রদান করিতেন এবং ৩২০০০৲ নিজের জন্য রাখিতেন। এই হিসাব প্রদর্শন করিয়া আবেদনকারী কোম্পানীর নিকট আর্জ্জি করেন যে, ৩২,০০০৲ বার্ষিক বেতনে তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলে তিনি উহাতে স্বীকৃত হইবেন ও কোম্পানীর বার্ষিক চল্লিশ সহস্র মুদ্রা লাভ থাকিবে। (৩)

নবাবের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিল। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সপ্রমাণের জন্য তাঁহাকে সত্য প্রকাশ করিতে আদেশ করা হইল। কিন্তু তাহা না করায় বা তাহাতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি পদচ্যুত হইলেন। নন্দকুমারের ইচ্ছানুসারে ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ প্রভৃতি মির্জ্জা মিন্দি নামক এক ব্যক্তিকে ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। (৪) কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে

(১) এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকটিত 'ককারের অহঙ্কারে' অনুপ্রাসের বহর দ্রষ্টব্য।

(২) ইঁহাকে কেহ কেহ আমির বেগ্ খাঁ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বেগ্ খাঁর পর ইনি হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন।

(৩) History of British India. Vol iii. pp 441—442; 5th Edn.: by H. H. Wilson.

(৪) মির্জ্জা মিন্দি নন্দকুমারের অধীনে ২০৲ বেতনে কর্ম্ম করিতেন। "বেটা যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ" চলিত কথাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ফৌজদার হইলেন তখন নন্দকুমার। নূতন রাজ্যের পত্তন তখন সবে সুরু হইতেছিল এবং ভাগ্যাকাশে কাহারও মেঘ কাহারও বা রৌদ্র খেলা করিতেছিল। নন্দকুমার জাল অপরাধে অভিযুক্ত ও জুরিগণ কর্ত্তৃক বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া ঘাতকের হস্তে আইনের শেষ দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

নবাবের ভাগ্যাকাশ আবার মেঘনির্ম্মুক্ত হইল, তিনি পুনরায় হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু সে আকাশ তখন শরতের আকাশের মত; সব "রাম কি মায়া কহিঁ ধূপ্ কহিঁ ছায়া"। ১৭৯৩ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশ্ কর্ত্তৃক ঐ পদের বিলোপ সাধিত হইল এবং নবাব ২৫০ মাত্র মাসিক বৃত্তির অধিকারী হইলেন।

নবাব যে সময়ে ফৌজদার ছিলেন, সে সময়ে ধনে, মানে, ক্ষমতায়, ঐশ্বর্য্যে আড়ম্বরে, হুগলীতে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। সুন্দর সুন্দর হস্তী ও অশ্ব তাঁহার পশুশালার শোভা সম্পাদন করিত। তাঁহার সুসজ্জিত গৃহ দর্শনীয় মধ্যে পরিগণিত হইত। ১৭৬৯ খৃঃ ওলন্দাজ পরিব্রাজক ষ্ট্যাভোরিণাস্ (Stavorinus) হুগলী পরিদর্শনে আসিয়া নবাবের গৃহ ও হস্তীশালার আড়ম্বরের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিচার গৃহ সুবাদারগণের দরবার গৃহের ন্যায় বোধ হইত।

নানারূপ দুষ্প্রাপ্য সুখাদ্য ভোজ্য ব্যতীত তাঁহার দৈনন্দিন আহার সম্পন্ন হইত না। প্রকাণ্ড হস্তীর পৃষ্ঠে সুসজ্জিত হাওদা ও চতুর্পবি শয্যার উপর লতা পুষ্প-বিভূষিত নানারূপ মনোমুগ্ধকর চিত্রখচিত "সুকোমল মখমল" বিস্তৃত হইলে নবাব তাহাতে উপবেশন করিয়া বায়ুসেবনার্থ বহির্গত হইতেন। তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন, তাহার উপর নিত্য নূতন বহুমূল্য সৌখীন বেশভূষা তাঁহাকে সর্ব্বদাই আড়ম্বরময় করিয়া রাখিত। নামে মাত্রে নবাব হইলেও তাঁহার বেশ-ভূষা, চাল-চলন, আদব কায়দা, আচার ব্যবহার সমস্তই প্রকৃত নবাবের ন্যায় ছিল। বস্তুতঃ তিনি কিরূপ সৌখীন ও আড়ম্বর প্রিয় ছিলেন,—তাঁহার নাম-সংযুক্ত তাঁহার বাবুয়ানা প্রসঙ্গে ওয়াজিদ আলির নবাবি উল্লেখযোগ্য। সকলেই জানেন লক্ষৌএর নবাব ওয়াজিদ আলি ধরা না দিয়া হয় ত পলাইতে পারিতেন। কিন্তু নবাবি বজায় রাখিতে গিয়া তাহা হয় নাই। পলায়ন-উদ্যোগী নবাব দেখিলেন, তাঁহার বিচিত্র জরী-মোড়া, সুন্দর 'জুতির' এক পাটি উল্টাইয়া রহিয়াছে এবং তাহাকে স্বাভাবিক ভাবে লইয়া আসিবার জন্য অথবা তাঁহার শ্রীপদে পরাইয়া দিবার জন্য কোন খানসামা হাজির নাই। সুতরাং জুতি তাঁহার 'পয়ের মে' উঠিল না ও তাঁহার পলায়ন করাও হইল না। ইহাকেই বলে প্রকৃত নবাবি 'চাল'।

খাঞ্জা খাঁর বেতন যথেষ্ট হইলেও, তাহাই তাঁহার একমাত্র আয় ছিল না। তাঁহার নিজের প্রভূত সম্পত্তি ছিল। গৌদলপাড়া তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি। এই গৌদলপাড়াতেই দেনেমারগণের (Danes) প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং এখনও উহা 'দেনেমারডাঙ্গা' নামে পরিচিত।

দেনেমারগণ গৌদলপাড়া হইতে শ্রীরামপুরে উঠিয়া যাওয়ায় নবাব ঐ গ্রাম ফরাসীদের পত্তনী দেন। ফরাসীগণ এতদুপলক্ষে তাঁহাকে বার্ষিকী দিতে স্বীকৃত হন। পরে এই সম্পত্তি তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা চুঁচুড়ার মতিঝিল-নিবাসী মির্জ্জা নসরৎ উল্লা খাঁ সাহেবের নিকট বিক্রীত হয়; কিন্তু ইহা পূর্ব্ববৎ ফরাসীগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত থাকে এবং আজ পর্য্যন্ত ইহা ফরাসীরাজ্য চন্দননগরের অন্তর্ভুক্ত।

নবাবের আর দুইখানি তালুক ছিল। তন্মধ্যে একখানি মহম্মাদিনপুর ও অপরখানি মানবিনারা। এই দুইখানি তালুকের আয়ও যথেষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি বেলকুলি নামক জায়গীরের অধীশ্বর ছিলেন। ইহা গবর্ণমেণ্টের হুগলি জেলায় পরিত্যক্ত খাসমহালের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

খাঞ্জা খাঁর অনেকগুলি বেগম ছিল; কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে বেগমেরাও অন্তর্হিতা হইলেন। জীবনের পূর্ব্বাহ্ণে যাঁহাকে তিনি সহচরীরূপে বরণ করিয়াছিলেন, জীবনের অপরাহ্ণে দুঃখের দশায়ও একমাত্র তিনিই তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন।

ফৌজদার পদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের পক্ষে ভাগ্যলক্ষ্মীকে ত্যাগ করা বরং সম্ভবপর, কিন্তু বাহ্যিক আড়ম্বর ত্যাগ করা মোটেই সম্ভবপর নহে —নবাব সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন। সুতরাং শীঘ্রই তাঁহাকে ঋণ জালে জড়িত হইতে হইল। কিন্তু আশা মানুষকে কখনও ত্যাগ করে না। বারবার নাশমনোরথ হইয়াও একটির পর আর একটি আশাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ তাহার জীবন তরী ভাসাইয়া চলে; নবাবের জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই সময় তিনি মনে মনে একটি সঙ্কল্প করেন; এবং আশা করেন, উহা কার্য্যে পরিণত হইলে, শেষ জীবনে তাঁহাকে কোনরূপ আর্থিক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। হুগলীতে সে সময়ে প্রচুর ধনসম্পন্না এক বিধবা মুসলমান-মহিলা বাস করিতেন। ইনি মহম্মদ মহসীনের ভগিনী মন্নুজান। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি আর বিবাহ করেন নাই। নবাব স্থির করেন, কোন উপায়ে এই সর্ব্বগুণসম্পন্না মহিলাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে পারিলে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনে কষ্টের কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না ও তিনি যেরূপ ভাবে চলিয়া আসিতে-ছিলেন, সেইরূপ আড়ম্বর সহকারেই চলিতে পারিবেন।

কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে, মানুষ প্রস্তাবনা পর্য্যন্ত করিতে পারে,—বাকীটুকু তাহার আয়ত্তাধীন নহে। সেইটুকু তাহার হাতে থাকিলে জগতের অবস্থাও হয় ত অন্যরূপ হইত। নবাবের প্রস্তাব মহিলার নিকট উপস্থাপিত হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইল। আশার যে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ নূতন করিয়া তাঁহার অন্তর আলোকিত করিয়া তুলিতেছিল, এক ফুৎকারে তাহা নিবিয়া গেল। নিরাশার ভিতর দিয়া তিনি কেবল অন্ধকার ভবিষ্যতের অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে লাগিলেন।

একটার পর একটা করিয়া তাঁহার দিনগুলি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় বিলাস ও আড়ম্বরের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল; ঋণে তাঁহার কণ্ঠাবধি নিমজ্জিত হইল। দারিদ্র্যের প্রবল তাড়নায় শেষ জীবনে অশেষ কষ্ট ভোগ

করিয়া ১৮২১ খৃঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারি তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নবাব বরাবর হুগলীর মোগল দুর্গে বাস করিতেন। সহরের ধরমপুর নামক পল্লীতে তাঁহার একখানি সুন্দর উদ্যান ছিল; তন্মধ্যে অষ্টকোণ বিশিষ্ট একটী বৈঠকখানা বা প্রমোদ ভবন থাকায়, উহা 'আট-পালা বাগান' নামে অভিহিত হইত। বাগনটী এখন "নবাব-বাগ" নামে পরিচিত।

নবাবের আর্থিক অবস্থা হীন হইবার পরও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে হুগলীর শেষ ফৌজদার বলিয়া বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ১৮০৩ খৃঃ কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট-হাউসের উদ্বোধন উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট, রাজা, মহারাজা, নবাব প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করেন। সে দরবারে নবাব খাঞ্জা খাঁও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

নবাব মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে, তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা নসরৎউল্লা খাঁ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন; কিন্তু দ্বাররক্ষক তাঁহাকে অন্দরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। অবশেষে মৃত্যু হইলে য়ুরোপীয়-গণের তত্ত্বাবধানে তাঁহার মৃতদেহ সমাধিক্ষেত্রে নীত ও সমাহিত হয়। *

আজ প্রায় এক শত বৎসর হইতে চলিল তিনি চিরবিশ্রাম লাভের জন্য পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; ইতিমধ্যে কত শত সহস্র মানব আসা যাওয়ার পালা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, প্রকৃতির দৃশ্যপটে কত নূতন দৃশ্যের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, কত নূতন স্মৃতি জগতের সমক্ষে আসিয়া আবার বিস্মৃতির অতলে লীন হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু তাঁহার নাম এখনও লুপ্ত হয় নাই। এরূপ কোন কার্য্য তিনি সম্পাদন করেন নাই, যাহাতে তাঁহার নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইতে পারে; কিন্তু তবুও তাঁহার নাম এখনও এ অঞ্চলে গৃহে-গৃহে বিরাজ করিতেছে। কেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

(*) শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দে লিখিত "Hooghly Past and Present" হইতে গৃহীত।

বাৎস্যায়নের কাম-সূত্র

[শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ]

(২)

ইতঃপূর্ব্বে আমরা কামসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়াবলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছি। এবার ঐ পুস্তক হইতে নানা বিষয়ের কিছু কিছু বিবরণ পাঠকবর্গের গোচর করিতে চেষ্টা পাইব।

ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ সেবন সম্বন্ধে ঋষি উপদেশ করিয়াছেন যে, মানবগণ নিজ আয়ুষ্কালের বিভাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে উহাদের সেবা এরূপ ভাবে করিবেন, যেন একে অন্যের উপঘাতক না হয়।

বাল্যে বিদ্যাভ্যাসই প্রধান প্রয়োজন। যৌবনে কামের সেবা এবং বার্দ্ধক্যে ধর্ম্ম এবং মোক্ষ-চিন্তা। তবে এস্থলে যৌবনে কামের সেবা করিতে হইবে বলিয়া যে ধর্ম্মার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ নহে। তাহাদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাহা করিতে হইবে; এই জন্যই পূর্ব্বেই অনুঘাতক এই কথা বলা হইয়াছে। বয়োবিভাগ করিতে আষোড়শ বাল্যাবস্থা, তার পর সপ্ততি বর্ষ পর্য্যন্ত মধ্যম অবস্থা; তারপর বৃদ্ধাবস্থা—এইরূপ টীকাকার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সময়ে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বেই বার্দ্ধক্য আমাদিগকে অধিকার করিয়া বসে; এবং অনেককেই ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়োবিভাগ-ব্যবস্থা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই "ভবলীলা সাঙ্গ" করিতে হয়; সুতরাং তাৎকালিক বিভাগ এ সময় অচল।

যতদিন বিদ্যা অভ্যাস করিতে হইবে, ততদিন রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। সে পর্য্যন্ত কাম-সেবা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে হইবে। অন্যথা অধর্ম্ম, বিদ্যা গ্রহণ-ব্যাঘাতাদি দোষ জন্মিবে।

ধর্ম্মের দ্বারা দুই কার্য্য সাধিত হয়। শ্রুতি, স্মৃতি এবং ধর্ম্মজ্ঞ-সমবায়ের উপদেশানুসারে যজ্ঞাদি অলৌকিক এবং অদৃষ্টার্থ কার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি জন্মান এবং লৌকিক দৃষ্টার্থ প্রবৃত্তিমূলক অনেক কার্য্য হইতে লোককে নিবৃত্ত করা।

অর্থ বলিতে বিদ্যা, ভূমি, স্বর্ণাদি ধাতু, গবাদি পশু এবং গৃহোপকরণ, শস্যাদি অর্জ্জন, বর্দ্ধনাদি ব্যাপার বুঝিতে হইবে। ইহার তত্ত্ব বার্ত্তা-শাস্ত্রবিৎ এবং বণিক্ প্রভৃতির নিকট শিক্ষা করিবে।

কাম বলিতে চক্ষু, শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিজ-নিজ বিষয়ের অনুকূল প্রবৃত্তির সুখ দুঃখাদি প্রযত্ন গুণের সমবায়ী কারণ মনের সহিত সংযোগ। যেমন মনের কোন বিষয় উপভোগের ইচ্ছা হইলে, তৎসাধন ইন্দ্রিয়েরও সেইদিকেই প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপ প্রবৃত্তিই কাম। ইহা সামান্য ও বিশেষভেদে দ্বিবিধ। সামান্য কামেরও আবার দুই প্রকার ভেদ আছে। আত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয়সুখ ভোগ করেন, সেই সুখটাই প্রধান কাম; কিন্তু তার জন্য ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত প্রবৃত্তিটিও কাম বলিয়া উক্ত হয়।

বিশেষ কামও আবার দ্বিবিধ। তাহার বিশেষ বিবরণ এখানে দিতে পারিলাম না। তবে সামান্য কামের বিভাগের দিকে দৃষ্টি করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে।

এই কাম-তত্ত্ব শিক্ষা কোথা হইতে করিতে হইবে? তদুত্তরে বাৎস্যায়ণ বলিতেছেন যে, কামসূত্র হইতে এবং কামকলাভিজ্ঞ নাগরিক-সমবায় হইতে এই শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইবে।

এই তিনটির শিক্ষার সম্বন্ধে ঋষি গুরু-লাঘবের প্রস্তাবও করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনের যুগপৎ সেবা অনেক সময়েই সম্ভব না হইতে পারে। সেরূপ স্থানে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বর্গ পর-পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে করিতে হইবে। কাম অপেক্ষা অর্থ গরীয়ান্, কারণ কাম অর্থ-সাধ্য। অর্থ অপেক্ষা ধর্ম্ম গরীয়ান্; কারণ, ধর্ম্মের দ্বারা অর্থ সাধন হইতে পারে। তবে রাজার পক্ষে অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, লোকযাত্রা অর্থমূলক। বর্ণাশ্রম-পালন রাজধর্ম্ম। ...

পালন-কার্য্যে প্রভু-শক্তির প্রয়োজন। প্রভু-শক্তির মূলকোষ দণ্ডবল। এই কোষ দণ্ডবল অর্থ হইতেই জাত। অতএব লোকযাত্রা অর্থমূলা। এজন্ত রাজার পক্ষে অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় মহাসমর প্রসঙ্গেও প্রাচীন ঋষির এই বাক্যের যাথার্থ্য বিশেষরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে। আমরাও সমর-ঋণের নানাপ্রকার ভেদের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচিত হইয়া, রাজার অর্থবলের সহায়তা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

বেশ্যাদিগের পক্ষেও অর্থই গরীয়ান্। এ সত্যের প্রমাণ আমরা অহরহঃই আমাদের চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছি। কত কত রাজা-মহারাজার অভ্রংলিহ প্রাসাদ-চূড়া ধূলি-সন্নিত হইয়া গণিকার হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে,—কত শত ভূমি সম্পত্তি বেশ্যার প্রসাধনে আত্মদান করিয়াছে, কত ক্রোড়পতির যক্ষের ধন বারবিলাসিনীর বিলাস-সজ্জার যজ্ঞে ইন্ধন যোগাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই ত্রিবর্গের বর্গে ধর্ম্মশিক্ষাতে শাস্ত্র এবং অর্থতত্ত্ব সংগ্রহের উপায় শিক্ষা আবশ্যক। কিন্তু কাম সম্বন্ধে শিক্ষা সহজাত, কারণ তির্য্যক্ যোনিদিগের মধ্যেও কাম বিষয়ে স্বয়ং-প্রবৃত্তিই লক্ষ্য করা যায়। ঐ বিষয়ে উহাদের কোন গুরু-করণের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

অতএব এই কাম নিত্য। নিত্য হইলেও ইহা অন্যোন্যস্থি-সংশ্রয়বশতঃ পরাধীন। সুতরাং ইহা নিত্য বলিয়া যে ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে উপায় পরিজ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই, ইহা ঠিক নহে।

এই উপায় পরিজ্ঞানের জন্য কামতন্ত্রের আবশ্যকতা আছে। তার পর ধর্ম্ম করিলে পরকালে ফল হইবে। সেটা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টব্য বিষয়। লোকে তাহাতে বড়-একটা আস্থা স্থাপন করিতে চাহে না। সুতরাং ধর্ম্মাচরণ দ্বারা ফল কি, ইহা মনে করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মুনিবর বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিলে তো চলে না। যদিও লোকে "বরমদ্যকপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ" (A bird in the hand worth two in the bushes) এই বলিয়া পারলৌকিক ফলপ্রদ ধর্ম্মে অনাস্থা করিতে পারে বটে; কিন্তু জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের বাক্যের সাফল্য দৃষ্টি করিয়া এবং অপৌরুষেয় বেদাদি অভ্রান্ত শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে সংশয় না করিয়া ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতে বেশী ফললাভ করিতে পারিব, এই বিশ্বাসেই লোকে হস্তগত বীজ ক্ষেত্রে বপন করিয়া থাকে। সর্ব্বদাই যে বেশী ফললাভ হয়, তাহা নহে; তথাপি লোকে তাহা করিয়া থাকে। অতএব শাস্ত্রে বিশ্বাসবান্ হইয়া ধর্ম্ম-সাধনে চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য।

অর্থচর্য্যার সম্বন্ধেও এইরূপে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, উপায় প্রযত্ন পূর্ব্বক কৃত হইলেও সর্ব্বদা ফলদায়ক হয় না। আবার যখন অদৃষ্টে ঘটে, তখন বিনা প্রযত্নেও হঠাৎ নিধান প্রাপ্তি, গুপ্তধন প্রাপ্তি প্রভৃতি রূপে অর্থলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার উপায় পরিজ্ঞানের জন্য শাস্ত্র-চর্চ্চা নিরর্থক। এ সকলই কালের দ্বারা কৃত; [illegible] নিরর্থক। এই কালকেই আমরা দৈব বলিয়া থাকি। এই কাল-প্রভাবেই বলিরাজার ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি; আবার এই কালই তাঁহাকে পাতালে প্রেরণ করিবার কারণ। অতএব কাল দুরতিক্রম্য। মুনি বলেন যে কাল দুরতিক্রম্য, তাহা সত্য বটে; কিন্তু কালই হউক আর উপায়ই হউক, অর্থ সিদ্ধি সম্বন্ধে পুরুষকারের প্রয়োজন আছে। আবার পুরুষকারও উপায় সাহায্য ব্যতিরেকে অর্থ-সাধন করিতে পারে না। পুরুষকারও অর্থসিদ্ধি বিষয়ে কালের অপেক্ষা করে। শক্তি, দেশ, পাত্র প্রভৃতি উপায়েরও প্রয়োজন; ইহাদের অভাবে কালের অকিঞ্চিৎকরত্ব পরিস্ফুট। অতএব, ইহারা সকলেই পরস্পর-সাপেক্ষ। সংসারে দৈব এবং মানুষ উভয়বিধ কর্ম্মই লোক-পালনে প্রযুক্ত হয়। অতএব শুধু দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই চলিবে না। "নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।" অর্থ সাধনে উপায়ের, সুতরাং পুরুষকারের প্রয়োজন আছে।

তার পর কামচর্য্যা প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, কাম-প্রবৃত্তির দ্বারা সংসারে বহু প্রকারের দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। কামাসক্ত হইয়া লোক ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়া অসৎ মার্গ অবলম্বন করে। অর্থার্জ্জন করে না; এবং অর্জ্জিত অর্থও মদ্য-নাট্যাদি নানা অসদুপায়ে ব্যয় করিয়া ফেলে। কামাসক্ত ব্যক্তি অনেক সময়ে অনেক প্রকার অন্যায় অতি-সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, শৌচাচার পরিভ্রষ্ট হয়, স্বীয় শরীর নষ্ট করিয়া ফেলে, অবিমৃষ্যকারী হয়, লোকের নিকট ঘৃণ্য হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্থলে দাণ্ডক্য, ইন্দ্র, রাবণ প্রভৃতি এই কাম-প্রবৃত্তির বশেই অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শনে কামচর্য্যাও নিতান্ত অন্যায় বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং তাহার শিক্ষারও কোন আবশ্যকতা দেখি না। এই আপত্তির খণ্ডনে মুনি বাৎস্যায়ন বলিতেছেন—

"শরীরস্থিতি হেতুত্বাদাহার সধর্ম্মাণো হি কামাঃ।"

শরীরস্থিতির জন্য আহারও যেরূপ প্রয়োজনীয় কামও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। সংসারস্থিতির জন্য ইহার আবশ্যকতা নিত্য। এই কাম, ধর্ম্ম এবং অর্থেরও ফলভূত; কারণ, ধর্ম্ম এবং অর্থের সেবাও সুখেরই জন্য। সে সুখের স্থান হইল কাম। সংসারে অপত্যসন্তান জন্য স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহার সেবায় দোষাশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে একেবারে পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। সে দোষের প্রতিবিধান চেষ্টা করিয়া ইহার সেবা করিতে হইবে।

যে সব ব্যক্তি সুখদ্বেষী, তাহাদের জন্য তৃণাদির ন্যায় ব্যর্থ। আচার্য্য-গণের মত এই যে, উহার দোষগুলি পরিহার করিবে। মৃগাদিতে নষ্ট করে বলিয়া কৃষকেরা কি যবাদি শস্য বপনে ক্ষান্ত থাকে?

অতএব উপযুক্ত ভাবে অর্থ, কাম এবং ধর্ম্ম সকলেরই সেবা করিবে। যেরূপ কার্য্যে পরকালে কি হইবে, ভবিষ্যৎ সুখের কি দুঃখের হইবে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা না থাকে, সাধু ব্যক্তিগণ সেইরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যদি একটি অঙ্গের বিঘাতক হয়, তবে যাহা দ্বারা গুরু বিষয়ের বাধা জন্মে, কখনও তাহার সেবা করিবে না; যে অর্থার্জ্জনে

ধর্মহানি ঘটে, সেরূপে অর্থ অর্জ্জন করিবে না; যেরূপ কাম-সেবায় ধর্ম্ম ও অর্থহানি হয় সেরূপ কাম-সেবা করিবে না।

কামের অত্যন্ত সেবায় ধর্ম্ম এবং অর্থ উভয়েরই বিশেষরূপে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, অতএব তাহা কখনও করিবে না।

উপযুক্ত কালে ও বয়সে বিবেচনা পূর্ব্বক তাহার সংযত ব্যবহার করিবে। এইরূপে ত্রিবর্গ শিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া কাম-সিদ্ধি বিষয়ে বিদ্যা-গ্রহণের প্রাধান্য বিবেচনা পূর্ব্বক মুনি বলিতেছেন যে, শ্রুতি, স্মৃতি, বার্ত্তাশাস্ত্র, দণ্ডনীতি প্রভৃতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কাম-সূত্র এবং তদঙ্গ বিদ্যা গীত-বাদ্যাদিও লোকে অধ্যয়ন করিবে।

স্ত্রীলোকেরাও যৌবনাবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে অবিবাহিত অবস্থাতে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। বিবাহ হইলে স্বামীর যদি অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাঁহার সম্মতি অনুসারে স্ত্রী ইহা শিক্ষা করিতে পারে। এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে স্ত্রীলোকের তো শাস্ত্রপাঠে অধিকার নাই; সুতরাং স্ত্রীলোকের শিক্ষার কথা উত্থাপন করা নিরর্থক। কিন্তু বাৎস্যায়ন বলেন যে, স্ত্রীলোকেরা শাস্ত্রগ্রহণ দ্বারা না হউক, উক্ত শাস্ত্রাভিজ্ঞগণের নিকট হইতে ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ লাভ তো করিতে পারে।" শুধু এই শাস্ত্র কেন, সকল শাস্ত্রেই এইরূপ উপদেশ গ্রহণের ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই আছে। একই ব্যক্তি সর্ব্ববিদ্যায় পারগ অতি কমই হইয়া থাকে। একজন এক শাস্ত্রের প্রয়োগ জানিলে অন্যে তাঁহার নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়া থাকে, তাঁহার নিকট হইতে আবার অন্য ব্যক্তি উহা শিক্ষা করিবে—এইরূপ।

শুধু শাস্ত্র কেন, সংসারেও এইরূপ দেখা যায় যে, রাজা বহুদূরস্থ হইলেও, দূরদেশবর্ত্তী প্রজালোক তাঁহার মর্য্যাদার লাঘব করে না; তাঁহার শাসন মানিয়া চলিয়া থাকে।

অতএব স্ত্রীলোক শাস্ত্র পাঠ না করিয়াও, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে এ বিষয়ে উপদেশ লাভ করিতে পারে। তার পর গণিকা, রাজপুত্রী, মহাসামন্ত-কন্যা প্রভৃতি শাস্ত্রমার্জ্জিতবুদ্ধি স্ত্রীলোকও আছে। এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে স্ত্রীলোক শাস্ত্র ও প্রয়োগ (Theory and Practice) উভয়ের সম্বন্ধেই উপদেশ পাইতে পারে। যাহারা মেধাবিনী, তাহারা শাস্ত্র ও প্রয়োগ উভয়ই শিক্ষা করিবে, যাহারা সেরূপ নহে, তাহারা শুধু প্রয়োগই শিক্ষা করিবে। তবে যাহার নিকট হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, সে ব্যক্তি বিশেষরূপ বিশ্বস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক, নতুবা গুহ্য বিষয় নিবন্ধন সঙ্কোচ আসা স্বাভাবিক।

এইরূপ বিশ্বস্ত আচার্য্য কাহারা হইতে পারে? তদুত্তরে মুনি বলিতেছেন যে, একত্র লালিত-পালিত, অতএব সুবিশ্বস্ত বিবাহিতা ধাত্রীকন্যা, নির্দ্দোষ সম্ভাষণা অতি অন্তরঙ্গা সখী, সমবয়স্কা মাতৃস্বসা, বিশ্বস্তা মাতৃস্বসা তুল্যা বৃদ্ধ দাসী, বিশ্বস্তা ভিক্ষুকী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রভৃতি এই বিষয়ের শিক্ষাদাত্রী হইতে পারে। উক্ত বর্ণনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পূর্ব্বকালে অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ঐ কামশাস্ত্র শিক্ষারও রীতিমত ব্যবস্থা ছিল; এবং স্ত্রীলোকেরাও এই শাস্ত্র বিশ্বস্ত আত্মীয়-গণের সাহায্যে শিক্ষা করিতেন। এই বিষয়ের আচার্য্যা নিরূপণে প্রত্যেক স্থলেই বিশ্বস্তা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, শিক্ষাদাত্রী-নির্ব্বাচনে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, নতুবা কুচরিত্রা, অজ্ঞাতকুলশীলার দ্বারা অনেক স্থলে বিশেষ কুফল প্রসূত হইতে পারে।

এ কথা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কন্যা যৌবনস্থা হইলে, কতক কতক বিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষ শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা সকল মাতা বা ভগিনী প্রভৃতিই অনুভব করিয়া থাকেন; এবং সেরূপ শিক্ষা প্রদান করাও হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে বোধ হয় ঐ সব অবস্থার উপযোগী সব রকম শিক্ষাই আগে হইতেই প্রদান করা হইত; আর সেইজন্যই পূর্ব্বকালের পণ্ডিতগণ নিজ-নিজ গ্রন্থাদিতে ঐ সব বিষয়ের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে বর্ত্তমান সময়ের মত সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। আর একটি বিষয় আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে, বাৎস্যায়নের সময়ে নিতান্ত বালিকা বয়সে কন্যা পরিণীতা হইত না। তাঁহার সূত্রে আছে, "প্রাক যৌবনাৎ স্ত্রী"। টীকাকার বলিতেছেন—"পিতৃগৃহ এব। তরুণ্যাং পরিণীতস্যাদস্বতন্ত্রায়াঃ কুতোঽধ্যয়নম্।"

ইহা হইতে কি বোধ হয় না যে, যৌবনাবস্থাতে বিবাহিতা হইলে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। অতএব বিবাহের পূর্ব্বেই পিতৃগৃহে সে এই শিক্ষা করিবে?

যে সময়ে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যমাবস্থা এবং আষোড়শ বাল্যাবস্থা, সেখানে যৌবনে যে ১১।১২ বৎসরেই বালিকার দেহে আধিপত্য বিস্তার করিত, এরূপ তো আমাদের বোধ হয় না। এখনও অবিবাহিতাবস্থায় বালিকা ১৪।১৫ বৎসর বয়সেও যুবতী হইয়া পড়ে না,—কিশোরীই থাকে। তবে বাল্যে বিবাহ হইয়া গেলে যে ১১।১২ বৎসরেই বালিকার দেহে অকাল-যৌবন বিকশিত হইয়া উঠে, তাহার জন্য প্রকৃতি দায়ী নহেন, বিকৃতিই দায়ী, তাহা বলা বাহুল্য।

আর একটি কথাও আমরা বুঝিতে পারি যে, তাৎকালিক সমাজে স্ত্রীলোক সাধারণের শাস্ত্রাদি শিক্ষার অধিকার ছিল না, অর্থাৎ স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল না। যদিও রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি বড় বড় লোকের মেয়েরা এবং গণিকাদি লেখা পড়া শিক্ষা করিত বটে, কিন্তু গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া বড় একটা জানিত না। তবে তাহারা শাস্ত্রাদির উপদেশ উপযুক্ত লোকের নিকট পাইত সন্দেহ নাই।

তার পর কামশাস্ত্রের অঙ্গবিদ্যার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে কর্ম্মাশ্রয়, পাঞ্চালাশ্রয় শয়নোপচারিকা প্রভৃতি অধিকারের চতুঃষষ্টিকলার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সেগুলির পরিচয় বিশেষরূপে না দিয়া চতুঃষষ্টিকলার নামগুলি নিম্নে লিখিলেই ইহা হইতে তাৎকালিক শিল্পকলার একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১। গীত, ২। বাদ্য, ৩। নৃত্য, ৪। আলেখ্য (রংএর দ্বারা চিত্র করার কার্য্য)। ৫। বিশেষকচ্ছেদ্য (নানাপ্রকার তিলক কাটার কৌশল) ৬। তণ্ডুলকুসুমবলি বিকার (আস্ত চাউলের দ্বারা এবং নানা বর্ণের ফুলের দ্বারা দেবগৃহ বা কলাগৃহ নানাপ্রকার সুদৃশ্য আকৃতি প্রস্তুত করা) ৭। পুষ্পাস্তরণ (ফুলের দ্বারা সূচী-সূত্র সাহায্যে [illegible]

গাঁথা) ৮। দশন বসনাঙ্গরাগ (কুঙ্কুম আদি দ্বারা অঙ্গরাগ, কাপড় রংকরা এবং দন্ত পরিষ্কার এবং সুদৃশ্য মুক্তাবৎ করিবার কৌশল)। ৯। মণিভূমিকাকর্ম্ম (গ্রীষ্মকালে শয়নাদির উদ্দেশ্যে গৃহ কুট্টিমে মরকতাদি দ্বারা চিত্রিত করা) ১০। শয়নরচনা (কাল ও অবস্থাভেদে নানা রুচি অনুযায়ী শয়নস্থান বিরচন) ১১। উদকবাদ্য (জলে মুরজাদিবৎ বাদ্যকরণ) ১২। উদকাঘাত (হস্তচক্রমুক্ত জলের দ্বারা তাড়নাকরার কৌশল; এসব জলক্রীড়ার অন্তর্গত) ১৩। চিত্র যোগ (নানাপ্রকারে পরাভিসন্ধানের কৌশল, কামকলার অন্তর্গত) ১৪। মাল্য গ্রথন বিকল্প (মুণ্ডমালা প্রভৃতি নানাপ্রকার মালা গাঁথনের প্রকারভেদ শিক্ষা) ১৫। শেখরকাপীড় যোজন (শিখা প্রভৃতিতে পরিধানের জন্য ইহাও মাল্যরচনারই এক প্রকারভেদ) ১৬। নেপথ্য প্রয়োগ (দেশ কাল পাত্রভেদে বস্ত্র মাল্য অলঙ্কারাদি ধারণের দ্বারা শরীরের শোভা সম্পাদন) ১৭। কর্ণপত্রভঙ্গ (হস্তীদন্ত শঙ্খ প্রভৃতির দ্বারা কর্ণের গহনা প্রস্তুতের কৌশল) ১৮। গন্ধযুক্তি (নানা সুগন্ধি দ্বারা শরীরের প্রসাধন, এসেন্স মাখাটা আজকালকার দিনের ফ্যাসন নহে, সে কালেও ছিল।) ১৯। ভূষণযোজন (অলঙ্কার যোগ, কণ্ঠমালা প্রভৃতিতে মণিমুক্তাদি বসান, আর কটক কুণ্ডল প্রভৃতির প্রস্তুতি করণ, শরীরে অলঙ্কার পরা নহে) ২০। ঐন্দ্রজাল শাস্ত্র সম্ভূত নানাপ্রকার কৌশল শিক্ষা। ২১। কৌচুমার (কুচুমার প্রোক্ত সুভগকরণোপায়) ২২। হস্তলাঘব (সমস্ত কার্য্যে লঘুহস্ততা, অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি সব কাজ করিবার অভ্যাস, ইহাতে সময়ের অপব্যয় হয় না, অন্য কার্য্যে ক্রীড়াতে অথবা বিশ্রামের সময় পাওয়া যায়) ২৩। বিচিত্র শাক যূষ ভক্ষ্য বিকার ক্রিয়া। ২৪। পানক রসরাগাসব যোজন (ইহারা পাক ক্রিয়ার অন্তর্গত, ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য ও পেয় ভেদে নানারূপ শাক ব্যঞ্জন পেয়, চাটনি, আসব (যে গুলি গাঁজিয়া উঠে, পযুর্যুষিতও ইহার অন্তর্গত) প্রভৃতি অগ্নির সাহায্যে এবং অগ্নি ব্যতীত প্রস্তুত করিবার কৌশল) ২৫। সূচীবান কর্ম্ম সকল (কাঁচুলি প্রভৃতি প্রস্তুত, ছিন্ন বস্ত্র সংস্কার ইহার নাম উতন এবং কাঁথা প্রভৃতি বিরচন) ২৬। সূত্র ক্রীড় (অঙ্গুলির সাহায্যে সূত্র দ্বারা নানাপ্রকার খেলা দেখান,) ২৭। বীণা ডমরুক বাদ্যাদি (এই সব প্রকার তন্ত্রী বাদ্য শিক্ষার কৌশল)। ২৮। প্রহেলিকা (হেঁয়ালির রচনা এবং তদ্দ্বারা বাদ প্রতিবাদ করা)। ২৯। প্রতিমালা (একজন একটি শ্লোক বলিলে ঐ শ্লোকের শেষাক্ষর লইয়া অন্যে নূতন শ্লোক বলিবে, এইরূপ ক্রীড়া। আমাদের দেশে বিবাহ সভায় পূর্ব্বে এইরূপ হেঁয়ালি ও শ্লোক কাটিবার প্রথা ছিল, আমরাও বাল্যকালে দেখিয়াছি)।

৩০। দুর্ব্বাচকযোগ (এমন সব শব্দযোগে শ্লোক প্রস্তুত করা যে, তাহা উচ্চারণে বড় কষ্ট হয় কটমট গোছের। টীকাকার একটা ঐরূপ শ্লোকের উদাহরণ দিয়াছেন; সেটা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না :—

দংষ্ট্রাগ্রদ্ধ্যা প্রাগ্র্যে ত্র্যাক্ষ্ণামামবষণ্ডঃ হ্যামুচ্চিক্ষেপ
[illegible]ক্লিষ্টিবিকৃষ্ণন্যো যুষ্মানুসোহব্যাৎ সর্পাৎ কেতুরিতি।

৩১। পুস্তকবাচঃ (শৃঙ্গারাদিরসানুসারে কোন কাব্য-নাটকাদি পুস্তক গীত দ্বারা বা স্বরযোগে পাঠ করা) ৩২। নাটকাখ্যায়িকাদর্শন। ৩৩। কাব্য-সমস্যা পূরণ (যেমন সুকবি রসসাগর করিতেন।) ৩৪। পটিকাবেত্রবান বিকল্প (বেতের আসন, খাট প্রভৃতি প্রস্তুতকরণ কৌশল) ৩৫। তক্ষকর্ম্ম (কুঁদিয়া কোন বস্তু প্রস্তুতকরণ) ৩৬। তক্ষণ (ছুতারের কাজ) ৩৭। বাস্তুবিদ্যা (গৃহাদি প্রস্তুতকরণ) ৩৮। রূপ্য রত্ন পরীক্ষা (ইহাদের গুণদোষ বিচার করণ) ৩৯। ধাতুবাদ (মৃত্তিকা প্রস্তর রত্নধাতু প্রভৃতির পাতন, শোধন মমনাদি বিষয়ক জ্ঞান) ৪০। মণিরাগাকরজ্ঞান, স্ফটিকাদি মণির রঞ্জন করিবার বিধি এবং পদ্মরাগাদি মণির উৎপত্তি স্থান বিজ্ঞান) ৪১। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যোগ (বৃক্ষাদির রোপণ, পুষ্টি চিকিৎসা প্রভৃতির পরিজ্ঞান, এখন যে কাজ Horticultural Societyতে হইয়া থাকে) ৪২। মেষ কুক্কুট শাবক যুদ্ধবিধি (এখনও অনেক স্থানে ভেড়া ও কুক্কুটের এবং বুলবুলের লড়াই প্রচলিত আছে) ৪৩। শুক সারিকা প্রলপন (পাখী পড়ানোর কৌশল) ৪৪। উৎসাদনে, সংবাহনে, কেশমর্দ্দনে কৌশল (হাত পা প্রভৃতি টিপিয়া দেওয়া এবং মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়া, চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন প্রভৃতি আরামদায়ক কৌশল—অনেকের গা, পা টেপার গুণে বড় আরাম পাওয়া যায়, আবার অনেকের ঐরূপ কার্য্য কেবল পীড়াদায়ক হয়—সুতরাং ইহারও কৌশল আছে।) ৪৫। অক্ষর মুষ্টিকা কথন (অক্ষর গুপ্তিরহস্য ভেদ পরিজ্ঞান। ইহা নানাপ্রকারের আছে। এক-প্রকারে শব্দের আদ্য অক্ষর মাত্র দ্বারা শ্লোক রচনা করা হয়, এটা এক-প্রকারের সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত যেমন হিন্দুর দশকর্ম্ম "দিগপুংসি জানি না অচ উ" ইহাতেই জানান হইয়াছে। আর একপ্রকারের ভূতমুদ্রা আছে তাহাও নানাপ্রকারের—করাঙ্গুলি এবং পর্ব্বগুলিকে অক্ষর কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা সংকেত প্রদর্শনে মনোভাব প্রকাশ, যেমন আজকাল যুদ্ধাদিতে নিশান দ্বারা করা হয়। অন্যপ্রকারে প্রচলিত অক্ষরের কোন একটা বা দুইটা বাদ দিয়া নিজের সাঙ্কেতিক অক্ষর সৃষ্টি করা। যেমন ক এবং খ বাদ দিয়া 'গ' কে 'ক' ধরিয়া লইয়া সেইরূপ অক্ষর দ্বারা গুপ্ত বিষয় লিখিয়া পাঠান, ঐরূপে 'কখন' এই কথাটা 'গ ঘ ক' হইয়া যাইবে। এইরূপ আরও নানারূপ কৌশল আছে সেগুলি সবই) ৪৬। ম্লেচ্ছিত বিকল্প এই কলার অন্তর্গত। (কৌটিল্যের পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এসব মন্ত্রগুপ্তির উদ্দেশ্যেই প্রচলিত ছিল। আজ কালও রাজকার্য্যে Cypher code প্রচলিত আছে।) ৪৭। দেশভাষ বিজ্ঞান। ৪৮। পুষ্প শকটিকা (ফুলের দ্বারা শকটাদি নির্ম্মাণ কৌশল) ৪৯। নিমিত্ত জ্ঞান (শুভাশুভাদি পরিজ্ঞান ফল) ৫০। যন্ত্রমাতৃকা (বিশ্বকর্ম্মা প্রণীত এই শাস্ত্র দ্বারা সজীব নির্জ্জীব যন্ত্রাদি যানে ও জলে যুদ্ধার্থ ঘটনা করার উপায় জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা কি কলের জাহাজ কামান প্রভৃতির ন্যায় যন্ত্র নির্ম্মাণের কৌশল? আমাদের সেইরূপ ভাবেরই কিছু বোধ হয়।) ৫১। ধারণমাতৃকা (শ্রুতিধর হইবার কৌশল পরিজ্ঞান) ৫২। সংপাঠ্য (একত্র মিলিয়া পাঠকরা। একজন পূর্ব্বে মুখস্থ করা কিছু পড়িবে, অন্যজন তাহা শুনিয়া আবার সেইরূপই পড়িবে এই

প্রকার) ৫২। কে মানসী (একজন নানা আকার ইঙ্গিত এবং শ্লোকাদি পাঠ দ্বারা যে ভাব ব্যক্ত করিল ও তাহাই শুনিয়া ঠিক সেইরূপে তাহা আবৃত্তি করিয়া যাওয়া। এটা মনের চেষ্টাতে কৃত বলিয়া এইরূপ নাম। এ সকলই আমোদ অথবা বাদানুবাদ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়।

৫৩। কাব্য ক্রিয়া (নানা ভাষায় কার্য্যাদি প্রস্তুত করণ) ৫৪। অভিধান-কোষ।

৫৫। ছন্দোজ্ঞান। ৫৬। ক্রিয়াকল্প অর্থাৎ কাব্যালঙ্কার। ৫৭। ছলিতক যোগ (অন্যকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে অন্য ব্যক্তির রূপ ধারণ, বহুরূপীরা যেরূপ করিয়া থাকে।) ৫৮। বস্ত্র গোপন (কাপড় পরিবার কৌশল, কিরূপে কাপড় পরিলে বাতাসের বেগেও বস্ত্র স্খলিত হয় না, বড় কাপড় কোঁচাইয়া ছোট করিয়া কেমন করিয়া পরিতে হয়, কাপড়ের খুঁট কেমন করিয়া গুঁজিতে হয়, কাটা কাপড় আদি কেমন করিয়া পরিতে হয় ইত্যাদি কৌশল অভ্যাস।) ৫৯। দ্যুত বিশেষ, নানারূপ জুয়া খেলার কৌশল। ৬০। আকর্ষ ক্রীড়া অর্থাৎ পাশা খেলা। ইহার রহস্য বিজ্ঞান বড় কঠিন, নল যুধিষ্ঠিরাদি পর্য্যন্ত ইহা না জানাতে পরাজিত হইয়াছিলেন। এজন্য এটা দ্যুত সাধারণ হইতে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ৬১। বাল-ক্রীড়নক (ছেলেপুলেদের খেলনা পুতুল, গোলক আদি ছেলে ভুলাইবার জিনিস প্রস্তুত কৌশল)। ৬২। বৈনয়িক, বিনয় আচার শাস্ত্র হর্ষ শিক্ষা প্রভৃতি বিদ্যাজ্ঞান ৬৩। বৈজয়িনী যুদ্ধে বিজয় লাভ সম্বন্ধীয় শাস্ত্র বিদ্যাদি এবং দৈববিদ্যাদির জ্ঞান। ৬৪। ব্যায়ামিকী (শরীরের উৎকর্ষ বিধানে, এবং রক্ষণার্থে মৃগয়াদি বিদ্যার পরিজ্ঞান।)

এই মোট চৌষট্টিকলাবিদ্যা কাম শাস্ত্রের অন্তর্গত। বাৎস্যায়ন বলিতেছেন যে, এই সব কলাবিদ্যা কামশাস্ত্রের অবয়বস্বরূপ। ইহাদের পরিজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে কামসূত্র শিক্ষা বৃথা।

এই সব কলাবিদ্যা শিক্ষাতে উৎকর্ষ লাভ করিয়া সৎস্বভাবা, রূপগুণান্বিতা বেশ্যা গণিকা এই উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং জনসমাজে আদরে স্থান প্রাপ্ত হয়। তখন সে বেশ্যা বলিয়া অবমানিতা হয় না। রাজাও তাহাকে আবাসবাটী এবং ক্ষেত্রাদি দানে সংবর্দ্ধিত করেন। গুণজ্ঞগণ তাহার কলা-কৌশলে মুগ্ধ হন, কামসূত্র শিক্ষার্থী তাহার শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রার্থী হয় এবং বিলাসিগণেরও সে লক্ষ্য স্থল হইয়া উঠে।

এইরূপ কলা কৌশলাদি কুশলা রাজপুত্রী এবং মহামাত্যপুত্রী শত-সহস্র সপত্নী সত্ত্বেও স্বীয় স্বীয় স্বামীকে স্ববশে রাখিতে পারে। এইরূপ স্ত্রীলোকের ভাগ্যদোষে স্বামী বিয়োগ ঘটিলেও, স্বকীয় কলা কৌশলের গুণে দেশান্তরে গিয়াও ঐ বিদ্যা শিক্ষা দান করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

কলাকুশল পুরুষও জনপ্রিয় হইয়া সর্ব্বত্রই আশু সমাদর প্রাপ্ত হয়। কলা-নিপুণ ব্যক্তির সর্ব্বত্রই সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া ইহার প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত।

উপরে যে চৌষট্টিকলার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা বুঝা যাইবে যে, কোন ব্যক্তি ঐ সমুদয় কলাতে নৈপুণ্য লাভ করিলে, তাহার কিরূপ গুণশালী হইবার কথা। সমুদায় কলার কথা ছাড়িয়া দিলেও যদি কেহ উহার কতকগুলি বিদ্যাও ভালরূপ শিক্ষা করে, তবে তাহার আদর সর্ব্বত্রই হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

এই সব কলার এখন অনেকই লোপ পাইয়াছে। পূর্ব্বে দেব-মন্দিরে দেব-দেবী মূর্ত্তির প্রসাধন কল্পে উহার অনেকগুলি কলার উৎকর্ষ সাধিত হইত। এখনও পুরী ধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে ফুলের দ্বারা নানা কারুকার্য্যসম্পন্ন অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হয়। কিন্তু আমরা উহাতে উৎসাহ দিতে একেবারে বিমুখ। মালাকার জাতির দ্বারা এই সব কলার কতকগুলির রীতিমত চর্চ্চা পূর্ব্বে হইত, এখন তাহারাও লোপ পাইতে বসিয়াছে; অথবা স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পেটের দায়ে পরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

তার পর দেখিতে পাই, বেশ্যারা পূর্ব্বে এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিত। তখন তাহাদের নাম হইত গণিকা। এইরূপ সব কলা-নিপুণা বিদগ্ধা গণিকার গৃহে পূর্ব্বে অনেক পণ্ডিতগণেরও সমাবেশ হইত। মহারাজ বিক্রমাদিত্য, কালিদাস প্রভৃতি বিদ্বৎগণের বেশ্যালয়ে গমন জনশ্রুতির মূলও এইখানে। প্রাচীন হিন্দুরাজগণের সময়েও এইরূপ গণিকাগণের আদর ছিল; তাহার পরিচয় আমরা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থাদিতেও দেখিতে পাইতেছি।

পতিহীনা কলা-নিপুণা রমণীগণ এই বিদ্যা শিক্ষা দান করিয়া নিজ জীবিকার সংস্থান করিয়া সসম্মানে কালযাপন করিত, এ পরিচয়ও আমরা কামসূত্র হইতে পাইতেছি।

অতএব কামশাস্ত্র তুচ্ছ বিষয় নহে, ঘৃণার বস্তুও নহে। ইহার সঙ্গে অনেকানেক বিষয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কামশাস্ত্রবিশারদ লম্পট কামুক নহে—একজন নানাবিদ্যা-পারদর্শী প্রকৃত গুণী ব্যক্তি; ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

ইলেকট্রণ ও রেডিয়ম

[শ্রীভিক্টরনারায়ণ বিদ্যান্ত এম-এস্ সি]

গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জড় বিজ্ঞানে (Physics) যে দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, এই উন্নতি সাধন কার্য্যে রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কার যে কতদূর সাহায্য করিয়াছে, তাহা দেখিলে আমাদের বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে হয়। ১৮৯৫ সালে অধ্যাপক রঞ্জন প্রথম তাঁহার পরীক্ষাগারে এই রশ্মির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই ভিন্ন ভিন্ন দেশের মনিষীগণ নানা ভাবে এই রশ্মি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। বলিতে গেলে ইহার আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগতে একটি নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। তখন [illegible]

পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা করিয়া অনেকগুলি অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার হইয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই নব-আবিষ্কৃত রঞ্জন-রশ্মির বিষয়ে কিছু বলিয়া আমরা পাঠকগণের ধৈর্য্য এবং সময়ের অপব্যবহার করিতে চাহি না। যদি কখনও সময় পাই, বারান্তরে চেষ্টা করিব। উপস্থিত এই রশ্মি, অন্য দুইটি আবিষ্কার সম্বন্ধে আমাদের কতদূর সাহায্য করিয়াছে, এবং ইহার আবিষ্কার বিদ্যুৎ এবং পদার্থ-গঠন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে কতদূর ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে, তাহারই যৎসামান্য বিবরণ প্রদান করিবার চেষ্টায় রহিলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইব জানি না।

অধ্যাপক রঞ্জন সাহেবের আবিষ্কারের পূর্ব্বেই অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ এই আবিষ্কারের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দিক দেখিতে পাইলেন। একদল ভাবিলেন যে, বায়ুহীন কাচের নলের মধ্যস্থ দ্রুতগামী ক্যাথোড রশ্মি ওই নল-গাত্রে আঘাত করিয়া যে পীতাভ আলোক-রশ্মির (Phosphoresence) সৃষ্টি করে, সম্ভবতঃ সেই আলোকের সহিত এই রঞ্জন-রশ্মির কোন নিকট সম্বন্ধ আছে। চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গেই কার্য্য। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন অমনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন যে, অন্যান্য যে সকল পদার্থ হইতে সূর্য্যালোক-সাহায্যে পীতাভ হরিদ্রা আলোক রশ্মি বাহির হয় (Phosphoresced under ordinary light), তাহা হইতে রঞ্জন-রশ্মি বাহির হয় কি না? ১৮৯৬ সালে H. Bacquerel ইয়ুরেনিয়ম (uranium) ধাতুর একটি salt লইয়া এইরূপ পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে, সেই পদার্থ হইতে এক্প্রকার অতি সূক্ষ্ম তেজ, রশ্মি বা তাপ বাহির হইতেছে। এই প্রকার তেজ-নির্গমনই radio-activity নাম প্রাপ্ত হয়। অন্য দল রঞ্জন-রশ্মির প্রকৃতি এবং ইহাদের উৎপত্তি-স্থান লইয়া গবেষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গবেষণার ফলে তাঁহারা ক্যাথোড-রশ্মি লইয়া আরও ভাল করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন; এবং শীঘ্রই দেখাইলেন যে, ক্যাথোড-রশ্মি একপ্রকার অতি দ্রুতগামী জড়কণা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই কণাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা লঘু Hydrogen-atom অপেক্ষাও সহস্র-গুণে হাল্কা। ইঁহাদের এই আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বেই Sir William Crookes ও এই জিনিসই দেখিয়াছিলেন, এবং এই কণাগুলিতে কঠিন, তরল এবং বায়বীয় কোন অবস্থারই গুণ বর্ত্তমান না থাকায়, তিনি ইহাদের পদার্থের চতুর্থ অবস্থা নাম প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম। অল্প দিন পরেই দেখা গেল যে, উল্লিখিত অতি লঘু জড়কণা বা ইলেকট্রণগুলিকে ultra violet রশ্মির সাহায্যে অতি সহজেই যে কোন ধাতু হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে। আবার radio-active পদার্থ সকল হইতেও এই জড়কণা বা ইলেকট্রণই অতি প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে।

একটী অন্ধকার ঘরে, ত্রিকোণ কাচখণ্ডের সাহায্যে সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ করিলে একটী বর্ণছত্র পাওয়া যায়। এই বর্ণছত্রটি কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন নহে; ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বর্ণ-ছত্রটিকে অসংখ্য কাল-কাল রেখা কাটিয়াছে। সূর্য্যরশ্মি না লইয়া যদি আমরা অন্য কোন পদার্থকে প্রদীপ শিখায় ধরিয়া তাহা হইতে নির্গত আলোক এইরূপে ত্রিকোণ কাচখণ্ডের সাহায্যে পরীক্ষা করি, তাহা হইলে আমরা এই বর্ণছত্রে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন রংয়ের রেখা মাত্র দেখিতে পাই, বাকিটা সমস্তই অন্ধকার। সৌর বর্ণছত্রের সহিত এই বর্ণছত্র পাশাপাশি পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সৌর-বর্ণছত্রে যেখানে যেখানে কাল রেখা আছে, তাহাদেরই কোন-কোনটার স্থান এই দ্বিতীয় বর্ণছত্রের আলোক-রেখাগুলি অধিকার করিয়াছে। এখন যদি এই আলোক রশ্মিটি ত্রিকোণ কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া যাইবার পূর্ব্বে দুইটি শক্তিশালী চুম্বকের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে আলোক রেখাগুলি আর তাহাদের পূর্ব্বস্থানে থাকে না;—তাহারা একটু সরিয়া যায়। অনেক সময়ে একটী সরু রেখা বেশ প্রশস্ত হইয়া পড়ে; আবার কখন-কখন একটী রেখাকে দুইটি বা ততোধিক রেখাতে বিভক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহারই নাম Zeeman effect। Lorentz সাহেব এই Zeeman effectএর যে কারণ দর্শাইলেন, তাহা হইতেও প্রমাণ হইল যে, সমস্ত পরমাণুতেই জড়কণাসমূহ বা ইলেকট্রণ বর্ত্তমান আছে; এবং তাহাদের দ্রুত স্পন্দনেই আলোকের উৎপত্তি।

Sir J J Thomson এই সমস্ত আবিষ্কারের সূচনাতেই বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত পরমাণুই (atoms) এই জড়কণার বিভিন্ন সমষ্টিমাত্র; এবং এইজন্য ionisation in gases হইয়া থাকে। এই মনীষির কার্য্য এবং শিক্ষা এই জড়কণা বা ইলেকট্রণ বাদে অনেক সাহায্য করিয়াছে। Kaufmann সাহেব প্রমাণ করিলেন যে, এই জড়কণাগুলির গুরুত্ব (mass) তাহাদের বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে উদ্ভূত; এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে Sir J. J. Thomson সাহেব দেখাইলেন যে এই জড়কণাগুলি তাহাদের অতি দ্রুত গতির জন্য একটা অতিরিক্ত গুরুত্ব (mass) লাভ করিয়া থাকে। Theory of relativity ও গতির বেগের সহিত গুরুত্বের (mass) একটা সম্বন্ধ দেখাইয়াছে। রেডিয়ম ধাতু হইতে নির্গত জড়কণাগুলির গতি প্রায় আলোক রশ্মির গতির সমান। অতএব এই জড়কণাগুলিতে গতির বেগের সহিত গুরুত্বের (mass) কি সম্বন্ধ, তাহা দেখিলেই আমরা সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষার (theory and experiment) একটা অতি চমৎকার সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব।

জড়কণা বা ইলেকট্রণগুলি, যে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সমষ্টি, ইহা প্রমাণ হওয়াতে বিদ্যুতের বিষয় আমাদের অনেকগুলি ধারণা বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। ধনাত্মক বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আমাদের এতদূর পরিষ্কার ধারণা নাই, কারণ, আজ পর্য্যন্ত আমরা ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী কোন জড়কণার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই নাই। Positive rays কিম্বা radio-active transformations সংক্রান্ত কোন পরীক্ষায় আমরা আজ পর্য্যন্ত hydrogen পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এমন কোন জড়কণা দেখিতে পাই নাই, যাহার সহিত ধনাত্মক বিদ্যুৎ সংযুক্ত আছে।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক বিদ্যুৎ-বাহকদিগের গুরুত্ব সম্বন্ধে বেশ একটা বিশেষ রকম পার্থক্য আছে। একটা পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ কল্পনা করেন, তাহাতে এইরূপ একটা পার্থক্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই হাইড্রোজেন-পরমাণুকেই ধনাত্মক ইলেকট্রণ বলা যাইতে পারে, এবং একটা ইলেকট্রণ অপেক্ষা হাইড্রোজেন অণুর সহস্রগুণ গুরুত্বের ইহাই হয় ত একটা কারণ যে, একটী হাইড্রোজেন-অণু ইলেকট্রণ বাহিত ঋণাত্মক বিদ্যুৎ অপেক্ষা বহুগুণ ধনাত্মক বিদ্যুৎ বহন করে।

Gasএর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করা যাইতে পারে দেখিয়াই, বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুতের আণবিক গঠন কল্পনা করিয়াছিলেন। চুম্বক বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমনকালে ক্যাথোড এবং আলফা রশ্মিগুলি তাহাদের গন্তব্য পথ হইতে বাঁকিয়া বিদ্যুতের আণবিক গঠনের সমর্থন করে। Townsend সাহেব মাপিয়া দেখাইলেন যে, gas ions-বাহিত বিদ্যুৎ জল হইতে বৈদ্যুতিক উপায়ে বিশ্লিষ্ট Hydrogen atom-বাহিত বিদ্যুতের সমান। Sir J. J. Thomson এবং H. A. Wilsonও এই জিনিস দেখাইলেন, আবার Millikan সাহেব অন্য কতকগুলি পরীক্ষার সাহায্যে এইরূপ বিভিন্ন আকারে প্রাপ্ত বিদ্যুৎকণা-গুলির একত্ব প্রমাণ করিলেন; এবং এই বিদ্যুতের পরিমাণকে খুব নির্ভুল ভাবে মাপিতে সমর্থ হইলেন। ইহাই unit charge of electricity। ইহা একটী খুব আবশ্যক মৌলিক Physical constant। এই Physical constantএর সহিত electro chemical data মিলাইয়া এক ঘন-সেন্টিমিটার স্থানে আবদ্ধ gasএ moleculesএর সংখ্যা এবং তাহাদের পরমাণুগুলির গুরুত্ব বাহির করা হইয়াছে। বিদ্যুতের আণবিক প্রকৃতির নিঃসন্দেহ প্রতিষ্ঠা এবং অণু ও পরমাণুগুলিকে নির্ভুল ভাবে মাপিতে পারাই বর্ত্তমান যুগের একটা বিশেষ স্মরণীয় বিষয়।

রঞ্জন-রশ্মির একটী প্রধান গুণ এই যে, এই রশ্মি কোন gasএর ভিতর দিয়া গমনকালে সেই gasকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বহন করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত gasএর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-পরিচালনা লক্ষ্য করিবার সময়ে দেখা গেল যে, এই gasএর মধ্যেকার কতকগুলি charged ions মাত্রই এই বিদ্যুৎ বহন করিয়া লইয়া যায়; বাকি gas moleculeগুলি একেবারে নিষ্ক্রিয়। এই gasএর মধ্যে ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক দুই প্রকার ionsই পাওয়া গেল। আবার Townsend সাহেব দেখাইলেন যে, একটা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি gas moleculesএর পরস্পর সংঘর্ষেও, positive এবং negative ions উৎপন্ন হইয়া থাকে। রেডিয়াম রশ্মি সাহায্যে gasএ বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহনের ক্ষমতার উৎপত্তি এবং অগ্নিশিখা দ্বারা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহন, এই দুইটি কার্য্যও এই ionগুলি দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। H. A. Wilson এবং O. W. Richardson এই বিষয়ে অনেক মাথা ঘামাইয়াছেন।

Cavendish Laboratoryতে যে সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণার আরম্ভ, এবং যাহাতে কেবল বৈজ্ঞানিকগণই আমোদ পাইতেন, তাহাদের এত শীঘ্র practical কাজে লাগান হইয়াছে দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যাইতে হয়। ইলেক্ট্রণ এবং ion আবিষ্কারের অল্পদিন পরেই alternating current এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রভৃতি নির্দ্ধারণের জন্য একটা বায়ুশূন্য কাচপাত্রের মধ্যে একটী অতি সূক্ষ্ম গরম তারই প্রধান অবলম্বন হইয়া পড়িয়াছে। আবার একটী অতি সূক্ষ্ম জ্বলন্ত তার হইতে নির্গত ইলেক্ট্রণের সহিত পরস্পর সংঘর্ষে উৎপন্ন ionগুলির সংযোগে অতি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গকে ইচ্ছামত বাড়াইবার জন্য electric oscillators এবং amplifiers প্রস্তুত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে এই amplifiersগুলি অনেক কাজ দিয়াছে, এবং ইহাদের সাহায্যে radio-telephony সম্ভবপর হইয়াছে। Coolidge x-ray tube ও radiography প্রভৃতি অনেক গবেষণার অনেক সাহায্য করিতেছে।

রঞ্জন-রশ্মি ও রেডিয়াম-রশ্মির সাহায্যে gasএর ionisation ব্যাপারটা বুঝিতে এখন আর আমাদের গোলযোগ হয় না। আবার সাধারণ-বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চলাচল, ইহাও আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অথচ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে ঘটনা দেখিয়া উপরিউক্ত ব্যাপারগুলিকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে আমরা প্রথমে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই ঘটনা সম্বন্ধে আমরা "যে তিমিরে সেই তিমিরে"ই থাকিয়া গেলাম। একটা Vacuum tubeএর ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালাইলে, disruptive discharge যে কেন হয়, সে তত্ত্ব আমরা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অবশ্য এই disruptive dischargeএর কতকগুলি কারণ আমরা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি; কিন্তু low pressure disruptive discharge ব্যাপার এতই জটিল যে, সে বিষয়ে আমাদের ভালরূপ জ্ঞান জন্মিতে এখনও অনেক দেরী। Sir J. J. Thomson এবং Wein এ বিষয়ে গভীর গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, এবং Thomsonসাহেব এই disruptive dischargeএর সাহায্যে discharge tubeএর ভিতরকার gas বিশ্লেষণ করিবার একটী অতি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।

পদার্থমাত্রের পরমাণুমধ্যস্থ গতিশীল ইলেক্ট্রণগুলির আবিষ্কার হওয়ার পর বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনেক বড়-বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। অনেক সময়ে একটী ইলেক্ট্রণকে শুধু গুরুত্ব এবং point charge ভিন্ন আর কোন গুণই দেওয়া হয় নাই। এবং মাত্র দুইটী গুণের সাহায্যেই ধাতুর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-পরিচালনা ব্যাপারটি বুঝান হইয়াছে। যাহা হউক, Donde এবং Sir J. J. Thomson ইলেক্ট্রণের যে সকল গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের সাহায্যে অনেক বিষয় বুঝান গেলেও, সম্প্রতি Kamerlingh অল্প উত্তাপে বিশুদ্ধ ধাতুর মধ্য দিয়া Supra Conductivity সম্বন্ধে এমন কতকগুলি তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা Sir J. J. Thomsonএর ইলেক্ট্রণ সাহায্যে বুঝান যায় না। আবার Ohm's Law সম্বন্ধেও কোন-কোন বিষয় এই জড়কণাগুলির

দ্বারা বুঝান যাইতেছে না। এই সমস্ত বুঝাইতে হইলে Keesom সাহেবের কথা-মত আমাদের quantaর সাহায্য লইতে বাধ্য হইতে হয়। Langeir সাহেব এই ইলেকট্রণের সাহায্যে magnetism এবং diamagnetism বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সেখানেও তিনি ততদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই বিষয়ে বোধ হয় Weiss সাহেবের অনুমান কতক ঠিক। তিনি বলেন যে, বৈদ্যুতিক পরমাণুর (atom of electricity) ন্যায় চৌম্বক পরমাণুও (unit of magnetism) আছে; কিন্তু প্রমাণাভাব।

এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগতে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার হইয়াছে, এবং তাহাতে বৈজ্ঞানিকদের অতি প্রিয় ইলেকট্রণের কতদূর হাত আছে, তাহার একটী অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের দিলাম। যতদূর দেখা যাইতেছে,—এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইলেকট্রণের কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে; কারণ, সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণ quantum নামক আর একটি জিনিসের সন্ধান পাইয়া তাহাকে লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন, আর তাঁহাদের ইলেকট্রণ ভাল লাগিতেছে না। এখন quantum-এর যুগ আরম্ভ হইয়াছে।

আরবজাতির জ্ঞান-চর্চ্চা—করডোভা বিশ্ববিদ্যালয়

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, এম্-এ, বি-টি]

আণ্ডালুসিয়া প্রদেশের (বর্ত্তমান স্পেন) করডোভা বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যযুগে বিশ্ববিশ্রুত জ্ঞানকেন্দ্র কায়রো ও বাগ্‌দাদের ন্যায় গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়া উঠে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে খৃষ্টান, ইহুদী ও মুসলমানগণ সেই শিক্ষাকেন্দ্রে জ্ঞান চর্চ্চার ও বিজ্ঞানালোচনার পূর্ণ অধিকার সমভাবে প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উদারভাব বর্ত্তমান জগতে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে; সঙ্কীর্ণতা ও বিদ্বেষভাব তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগে স্পেনদেশে সুসভ্য ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বিগণ হিংসা-দ্বেষ বিজড়িত সঙ্কীর্ণতা দ্বারা তাঁহাদের উদার ধর্ম্মমতকে কলুষিত করেন নাই; কোন প্রকার ভেদবুদ্ধি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। মধ্যযুগে মানবীয় সভ্যতার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই যেন তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা ভেদাভেদ ভুলিয়া সে লক্ষ্য সাধনে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, তাঁহাদের জ্বলন্ত উৎসাহ, তাঁহাদের সাম্যবাদ, সর্ব্বোপরি তাঁহাদের উদার ধর্ম্মমত জগতে সভ্যতাবিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। কাজেই মুসলমান কর্ত্তৃক স্পেন বিজয় য়ুরোপের ইতিহাসে এক অশেষ কল্যাণকর ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল।

[illegible] বৎসর অতীত হইল, দামাস্কাসের খলিফার নিয়োজিত [illegible] শাসনকর্ত্তা মুসা, তারিক নামক একজন সেনাপতির [illegible] স্পেন বিজয়ের জন্য সাত সহস্র সৈন্য প্রেরণ করেন। দুর্দ্ধর্ষ ও রণনিপুণ আরবেরা অচিরে তাঁহাদের বীর পরাক্রমে ও অজেয় সাহসের প্রভাবে স্পেনদেশে তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপন করেন।

রণপ্রিয় আরবীয় বীরগণের সমর-পিপাসা ও বিজয়িনী শক্তি দিন-দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে বীরমদে মত্ত হইয়া তাঁহারা "গল" (ফরাসী) দেশ অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। টুরের বিখ্যাত রণক্ষেত্রে আরব সেনানী মহোল্লাসে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। ফরাসীদেশের তদানীন্তন রাজা শার্ল্ল (Charles) তাঁহার অপরিমিত সৈন্যসহ স্বীয় দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আরব সৈন্যের গতিরোধ করিলেন। ছয়দিনব্যাপী তুমুল যুদ্ধের পর সপ্তম দিনে আরবদের পরাজয় হইল। এইরূপে সমস্ত য়ুরোপ এক মহা বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিল। যদি আরবগণ সেই যুদ্ধে পরাজিত না হইত, তবে সমস্ত য়ুরোপের ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। খৃষ্টধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আজ সমস্ত য়ুরোপে ইসলামের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইত গির্জ্জার পরিবর্ত্তে মস্‌জিদে আজ সমস্ত য়ুরোপ পরিপূর্ণ হইত। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ, তাই আরবদের বিজয়স্রোত সেইখানে নিরুদ্ধ হইল।

আরবগণ ভুজবলে ও তরবারির প্রভাবে সমগ্র য়ুরোপে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিল না সত্য; কিন্তু তাহারা সমস্ত য়ুরোপে যে জ্ঞানরাজ্য স্থাপন করিল; তাহারই একচ্ছত্র রাজত্বের অক্ষুণ্ণ প্রভাবে, অজ্ঞানান্ধ, কুসংস্কারগ্রস্ত, নীতিহীন, ধর্ম্মশূন্য য়ুরোপীয় সমাজ জাগ্রত ও ও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল।

য়ুরোপের তদানীন্তন অবস্থা অতীব শোচনীয়। সহস্রাব্দী অতীত হইয়াছে। রোমকদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাহাদের সেই প্রাধান্য, সেই ক্ষমতা, সেই প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে। অধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্যে সমস্ত য়ুরোপ থরহরি কম্পিত, দুর্নীতির স্রোতে য়ুরোপীয় সমাজ পরিপ্লাবিত, অজ্ঞানতা তিমিরে ও কুসংস্কারে মানব মন আচ্ছন্ন; অত্যাচার ও উৎপীড়নে নরকুল প্রপীড়িত। দেশসকল শ্রীভ্রষ্ট, সম্পদ্‌হীন ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ। সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল নিষ্পেষিত, নিরক্ষর জনসমাজের উপর ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের প্রভাব অব্যাহত, স্বাধীন চিন্তাস্রোত সাম্প্রদায়িক মত-প্রাবল্য-পঙ্কিল, বিবেকবাণী পদে-পদে প্রতিহত ও অনাদৃত।

Hallam বলেন, "In tracing the decline of society from the subversion of the Roman Empire, we have been led, not without connection, from ignorance to superstition, from superstition to vice and lawlessness, and from thence to general rudeness and poverty."

বস্তুতঃ য়ুরোপীয় সমাজ আরবদের স্পেনবিজয়কালে মোহান্ধকারে নিমগ্ন ছিল; এবং সেই অজ্ঞানতা নিবন্ধন দুর্নীতির প্রবাহ মানবগণকে অধর্ম্মের অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল।

"রাজানুশাসন অবজ্ঞাত হইতেছিল। দর্শনশাস্ত্র এত বিকৃত হইয়াছিল যে, অবশেষে উহা ঘৃণ্য বিদ্রূপ মধ্যে পরিণত হইয়াছিল। ইতিহাসের

চর্চ্চা রহিত হইয়াছিল। লাটিন ভাষা দিন-দিন অপভাষায় পরিণত হইতেছিল, কাব্যশাস্ত্র ক্ষুদ্র হস্তে পতিত হইয়া অপব্যবহৃত হইতেছিল। শিল্পবিজ্ঞান দিন-দিন লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছিল।

"Law neglected, philosophy perverted till it became contemptible, history nearly silent, the Latin tongue growing nearly barbarous, poetry rarely and feebly attempted, art more and more vitiated."—(*Hallam.*)

অজ্ঞানতার বিষময় ফল অচিরেই য়ুরোপীয় সমাজে অনুভূত হইল। শিক্ষালোক-বঞ্চিত মানবকুল স্বতঃই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইল। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় (ascetics) নানা-প্রকার উন্মাদনাপ্রসূত কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহাদের জ্বলন্ত উৎসাহ ও ত্যাগধর্ম্মের পরিচয় দিতেছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহাদের সেই উচ্চ আদর্শ অনুসরণে অসমর্থ জনসাধারণ, কোনরূপ মধ্যবর্ত্তী পথ দেখিতে না পাইয়া, পাপ-স্রোতে দেহ ভাসাইয়া দিয়া নিঃসঙ্কোচে পরম আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

লাটিন মৃত ভাষায় পরিণত হইল; কাজেই জনসাধারণের নিকট জ্ঞানরত্নাগার অবরুদ্ধ হইল। গির্জ্জা বা মঠ-সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে শুধু ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষাই প্রসার লাভ করিল। জনসাধারণ শিক্ষার অমৃত-ধারা হইতে বঞ্চিত হইয়া কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের আপাতমধুর পরিণাম-বিষ ফল আহার করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সুসভ্য ও শিক্ষাভিমানী য়ুরোপীয় সমাজের ভিত্তিস্বরূপ জনসাধারণ বর্ণজ্ঞানহীন রহিয়া গেল।

ফরাসীদেশ অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে অবনতির নিম্নস্তরে অবরোহণ করে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজজাতির ঘোর দুর্দ্দশা ও দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। দশম শতাব্দীতে ইটালী দেশে সাহিত্যের যে শোচনীয় অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অবর্ণনীয় ও অননুমেয়।

পুস্তকের অভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেশব্যাপী অজ্ঞানতা তাহার অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতে অগ্রসর হইল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুসলমানগণ তাহাদের অদম্য সাহস, অপ্রমেয় পরাক্রম ও অপূর্ব্ব শক্তিপ্রভাবে বিজিত আলেকজেন্দ্রিয়াতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। সেই অবধি একাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ পর্য্যন্ত য়ুরোপে আলেকজেন্দ্রিয়া হইতে পেপাইরাস (papyrus) নামক লিখনোপযোগী উপকরণের আমদানীর পথ বন্ধ হয়। তখনও য়ুরোপ জীর্ণবস্ত্র হইতে কাগজ প্রস্তুত করণের প্রথা অবগত ছিল না; কাজেই পার্চ্চমেণ্ট (parchment) ভিন্ন অন্য কোনও রূপ কাগজ য়ুরোপে ছিল না। আবার সেই পার্চ্চমেণ্টও এত বহুমূল্য ছিল যে, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই ব্যয়-সাধ্য সাহিত্য চর্চ্চা অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হইল। কৃপাপাত্র য়ুরোপীয় সমাজ কাগজের অভাবে, চর্ম্মোপরি হস্তলিখিত লিপিসমূহ বিনষ্ট করিয়া, তদুপরি তাহাদের লিখন কার্য্য সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিল। এরূপে বহু প্রাচীন গ্রন্থকারের অমূল্য গ্রন্থ বিলুপ্ত হইল, এবং তথাকথিত সন্ন্যাসী ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপকথা ও অন্যান্য অসার বাক্যসমূহ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

য়ুরোপীয় সমাজের এই ঘোর দুর্দ্দশার দিনে, যখন য়ুরোপীয় জ্ঞানাকাশ ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন, যখন কুসংস্কারের বজ্রনির্ঘোষে সমগ্র য়ুরোপ থরহরি কম্পিত, যখন য়ুরোপের শিথিল সমাজভিত্তি পতনোন্মুখ, পাপরাক্ষসী তাহার বিকট বদন ব্যাদান করিয়া যখন য়ুরোপকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল,—য়ুরোপের সেই দুর্দ্দশার দিনে আরবগণ স্পেনদেশে রাজত্ব করিতেন। তাহাদের অষ্টশত বর্ষব্যাপী রাজত্বকালে স্পেনদেশ য়ুরোপের শীর্ষস্থান অধিকার করে ও সমগ্র য়ুরোপের আদর্শরূপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক বিস্তার করিয়া সেই বিপন্ন হতশ্রী সমাজকে উন্নত করিতে অগ্রসর হয়।

স্পেনবিজেতা আরবগণ য়ুরোপের বর্ত্তমান শিল্প বিজ্ঞান ও স্থাপত্য বিস্তার পথপ্রদর্শক। তাঁহারাই য়ুরোপে সাহিত্য চর্চ্চার যুগ সর্ব্বপ্রথমে আনয়ন করেন। আরবদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্ম্মণী, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে জ্ঞানপিপাসু শতশত যুবক জ্ঞানামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ হয়। চিকিৎসা ও অস্ত্র-বিদ্যায় আরবগণ অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীজাতিও নানাপ্রকার বিদ্যাচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। করডোভা নগরীতে স্ত্রী-চিকিৎসকের অপ্রতুলতা ছিল না।

গণিত, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন ও আইনশাস্ত্রে শিক্ষা-লাভ করিবার বন্দোবস্ত তদানীন্তন য়ুরোপে স্পেন ভিন্ন অন্য কোনও দেশে বর্ত্তমান ছিল না।

কৃষিকার্য্যের উদ্দেশ্যে খাল খনন, দেশরক্ষার জন্য দুর্গ ও জাহাজ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তন্তুবায়, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি শিল্পীগণ তাহাদের নিজ নিজ শিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। যুদ্ধ ব্যাপারে তাহাদের অদম্য সাহস, তাহাদের অপূর্ব্ব বীরত্ব, তাহাদের অসি-চালন-নৈপুণ্য লোকের ভয় ও বিস্ময় যেরূপ উৎপাদন করিত, তাহাদের হিতকর শাসনপ্রণালী সেইরূপ মানব-মনে ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার করিত। তাহাদের রণতরী মিশর-দেশের ফেটিমাইট(Fetimites)দিগের রণতরীর সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের আধিপত্য লইয়া যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত থাকিত, আর তাহাদের স্থলসৈন্য তরবারির প্রভাবে খৃষ্টানাধিকৃত দেশসমূহে ইস্‌লামের বিজয়গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিত। শিক্ষাবিষয়ে তাহারা য়ুরোপীয় সমাজে অগ্রগণ্য ও আদর্শস্থল ছিল। তাহাদের শাসনকালে স্পেনদেশ পাঠাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিপূর্ণ হয়।

তাহাদের প্রিয় করডোভা নগরী গ্রাণাডা (Granada), সেভিল (Sevele), টলেডো (Toledo) প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠে। একজন আরব গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"করডোভা আণ্ডালুসিয়া দেশের রাণী। রত্নগর্ভ তাম্রাবয়ব হইতে অসংখ্য রত্নরাজি উদ্ধার করিয়া কবিগণ তাহার কণ্ঠহার গ্রথিত করিয়াছেন।" (Cardova is the Bride of Andalusia [illegible]

necklace is strong with the pearls which her poets gathered from the ocean of language).

বস্তুতঃ মহাপ্রতাপশালী তৃতীয় আবদর রহমানের রাজত্ব সময়ে (৯১২—৯৬১), আরবশাসিত সুখবিলাসপূর্ণ স্পেনদেশের রাজধানী, সুরম্য হর্ম্ম্যরাজিশোভিত করডোভা নগরী অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল; জ্ঞানগরিমায় ও বিত্তাবত্তায় বিজেনসিয়াম ব্যতীত য়ুরোপের অন্য কোনও নগরী তাহার সমকক্ষ ছিল না।

"করডোভা নগরী নানাবিদ্যাবিদ্ বুধমণ্ডলীতে পরিবৃত ছিল। খ্যাতনামা মহাপুরুষগণ তাঁহাদের গুণগরিমায় ও মাহাত্ম্য প্রভায় করডোভা নগরী উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। বিজয়শ্রীলাঞ্ছিত সুনিপুণ যোদ্ধৃবৃন্দে সেই নগরী গৌরবমণ্ডিত ছিল। কাব্যামৃত রসাস্বাদলিপ্সু, বিজ্ঞানাধ্যয়নচিকীর্ষু, আইন ও ধর্ম্মসংক্রান্ত জ্ঞানপিপাসু শত শত যুবক পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়া সমবেত হইত। এইরূপে সেই করডোভা নগরী নানা শাস্ত্রবিশারদ্ পণ্ডিত-মণ্ডলীর মিলনক্ষেত্ররূপে ও অধ্যয়ন-ব্রত ছাত্রবৃন্দের সারস্বত-কুঞ্জরূপে পরিচিত হয়।"

"There thou wouldst see doctors, shining with all sorts of learning, lords distinguished by their virtues and generosity, warriors renowned for their expedition, officers experienced in all kinds of warfare. To Cordova came from all parts of the world students, eager to cultivate poetry, to study the sciences, or to be instructed in divinity or law; so that it became the meeting-place of the eminent in all matters, the abode of the learned and the place of resort for the students."

করডোভা নগরীর সেই সৌন্দর্য্য, সেই বিস্তৃতি এখন আর নাই। আলকেজর রাজপ্রাসাদ এখন ধ্বংসাবশিষ্ট অবস্থায় কারাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। সেই সেতু এখনও গোয়াডিলকুইভার নদীর উপর বিস্তৃত রহিয়াছে সত্য, আর সেই ওম্মিয়াবংশের সপ্তপ্রথম নরপতি-নির্ম্মিত মসজিদ্ এখনও শত-শত দর্শকের মনে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করিতেছে সত্য, কিন্তু নগরীর সে শোভা আর নাই। যে নগরী এক সময়ে প্রায় দশ মাইল বিস্তৃত ছিল, এখন তাহা এক ক্ষুদ্রায়তন সহরে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন করডোভা নগরীর পাদমূল বিধৌত করিয়া যে নদী প্রবাহিত হইত, তাহার উভয় তীর মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহে, মসজিদে এবং উদ্যানে পরিশোভিত ছিল। সেই সকল উদ্যান অপূর্ব্ব-শোভাবিশিষ্ট পুষ্পফলে পরিপূর্ণ ছিল। সীস নির্ম্মিত নলের (pipe) সাহায্যে উচ্চ পার্ব্বত্য-প্রদেশ হইতে এই সকল উদ্যানে জল প্রেরণ করা হইত। এইরূপে উদ্যানস্থিত সুবর্ণ ও রজত-নির্ম্মিত জলাধার, কৃত্রিম হ্রদ, জলাশয় ও নির্ঝরসমূহ জলে পরিপূর্ণ থাকিত।

ঐ নগরী হর্ম্ম্যরাজিতে পরিশোভিত ছিল। ৫০ হাজার আমীরের প্রাসাদ, ২০ লক্ষ সাধারণ লোকের বাসগৃহ, ৭০০ মসজিদ, ৯০০ স্নানাগার (public baths) সেই প্রাচীন করডোভা নগরীতে পরিদৃষ্ট হইত। বাহ্য সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া করডোভার অধিবাসিগণ কখনও বিদ্যার বা জ্ঞানের অনাদর করে নাই। সে স্থানের সুশিক্ষিত অধ্যাপক ও শিক্ষকমণ্ডলীর গুণে আকৃষ্ট হইয়া বহু শিক্ষার্থী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইত। এইরূপে তদানীন্তন য়ুরোপে করডোভা (Cordova) সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে এইস্থানে শিক্ষা প্রদত্ত হইত। আণ্ডালুসিয়ার চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ্ ব্যক্তিগণ নব নব আবিষ্কারের দ্বারা চিকিৎসা-শাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন।

আলবুকেসিস (Albucasis) একাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন; এবং অস্ত্রব্যবহারে তাঁহার নিপুণতা কোন-কোনও অংশে বর্ত্তমান চিকিৎসকগণের দক্ষতা হইতে ন্যূন ছিল না। তাঁহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালে আভেঞ্জোর (Avenzoar) চিকিৎসা-বিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যাবিষয়ক কতকগুলি নূতনতত্ত্বের আবিষ্কার করেন। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ইবন বেটাস (Ibn Beytas) ভৈষজ্য গুল্মলতা আহরণ উদ্দেশ্যে প্রাচ্যদেশ প্রদক্ষিণ করেন; এবং অবশেষে তৎসম্বন্ধে একখানি বিস্তৃত পুস্তক প্রণয়ন করেন।

মধ্যযুগে প্রদর্শনশাস্ত্রবিদ্ আভারোস (Averraes) প্রাচীন গ্রীসের দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের সংযোগ-সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করেন। জ্যোতিষ, ভূগোল, রসায়ন, প্রকৃতি পাঠ ও বস্তুতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্র অতি আগ্রহের সহিত করডোভাতে সমালোচিত হইত। সাহিত্য ক্ষেত্রে য়ুরোপে কাব্যশাস্ত্রের এক শুভদিন উপস্থিত হইয়াছিল। কাব্যালোচনা এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, সাধারণ লোকেও আরবীভাষায় কবিতা লিখিতে প্রয়াস পাইত। বক্তৃতাকালে মুহূর্ত্তমধ্যে সময়োপযোগী কোনও ছন্দোবদ্ধ ব্যাকরণ রচনা করিয়া, অথবা কোনও কবিতাংশ আবৃত্তি করিয়া বক্তৃতার উপসংহার করিবার এক প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা না হইলে সেই বক্তৃতা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। খলিফা হইতে আরম্ভ করিয়া নৌকার মাঝি পর্য্যন্ত সকলেই কবিতা রচনা করিত।

স্পেনবাসী আরবদিগের উদ্ভাবনী-শক্তি ও মৌলিক চিন্তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কাগজ, দিগ্নির্ণয়যন্ত্র (Compass) ও বারুদ তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে নব-নব তথ্য পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মধ্যযুগে প্রচার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

গর্বিবার্ট (Gerbert) মধ্যযুগে য়ুরোপের একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। * তিনি ফ্রান্স, ইটালী ও জার্ম্মাণীর বিদ্যালয়সমূহে তাঁহার জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে মুসলমান-শাসিত

* তিনি প্রায় ৯৩০ খৃষ্টাব্দে জন্ম পরিগ্রহণ করেন এবং সিলবেসটাস (Silvestas II) নামে ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে পোপ নির্ব্বাচিত হন। ১০০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্পেন দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া প্রচুর যশঃ উপার্জ্জন করেন।

Mr. Painter writes in his History of Education, "The Arabians originated Chemistry, discovering alcohol and nitric and sulphuric acids. They gave Algebra and Trigonometry their modern forms, applied the pendulum to the reckoning of time, repeated the Greek experiments that ascertained the size of the earth by measuring a degree, and made catalogues of stars. For a time they were the intellectual leaders of Europe.

এইরূপে শাস্ত্রালোচনেচ্ছা ও জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা স্পেনদেশে আরবদিগের মধ্যে এত বলবতী হইয়াছিল যে, দেশের স্থানে-স্থানে বৃহৎ-বৃহৎ পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের নানা বিষয়-সম্বলিত গ্রন্থাবলী বহু অর্থব্যয়ে সংগৃহীত হইয়া সেই সকল পাঠাগারের পূর্ণতা ও শোভা সম্পাদন করিয়াছিল।

প্রাচ্যদেশ হইতে হস্তলিখিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া করডোভাতে আনয়ন করার জন্য খলিফা বহু লোক নিযুক্ত করিলেন; এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিয়োজিত লোকসমূহ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধানে কায়রো, দামাস্কাস, ও বাগদাদের পুস্তক-বিক্রেতাদিগের বিপণিশ্রেণী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এই উপায়ে তাঁহার পাঠাগারের জন্য তিনি ন্যূনকল্পে চারি লক্ষ (৪০০,০০০) পুস্তক সংগ্রহ করেন। যে সময়ে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, সে সময়ে এত পুস্তক সংগ্রহ করা কিরূপ অর্থ ও শ্রমসাপেক্ষ, তাহা ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতে হয়।

হাকাম একজন জ্ঞানপিপাসু ও অধ্যয়ন-প্রিয় সম্রাট্ ছিলেন। তিনি কেবল পুস্তক সংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তিনি অতি আগ্রহের সহিত সেই সমস্ত পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন এবং সেই সকল পুস্তক যাহাতে সহজবোধ্য হইতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের টীকাও লিখিতেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সেই সকল পুস্তক পাঠকালে তিনি পার্শ্বদেশে যে টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার পরবর্ত্তীকালের পণ্ডিতগণ শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

অজ্ঞানতিমিরাবৃত য়ুরোপের ঘোর দুর্দ্দিনে জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত স্পেনদেশের সভ্যতা পরিদর্শন করিয়া, নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিক লেইনপুল (Lanepoole) সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন—"যখন দশম শতাব্দীতে আমাদের স্যাক্সন জাতীয় পূর্ব্বপুরুষগণ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করিত, যখন আমাদের ভাষা সুগঠিত হইয়া উঠে নাই; যখন বিদ্যালোচনা শুধু কয়েকজনে ধর্ম্মযাজকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, যখন সমস্ত য়ুরোপ অসভ্য জনোচিত অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; সভ্যজনোচিত আচার ব্যবহার যখন য়ুরোপে প্রবর্ত্তিত হয় নাই; সেই দশম শতাব্দীতে করডোভা-নগরী জ্ঞান-গরিমায়, শিল্পচাতুর্য্যে ও স্থপত্যবিদ্যায় সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।"

যে য়ুরোপীয় সমাজ এক সময়ে ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী আরব জাতির শিষ্যরূপে সাগ্রহে তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত, কালের কুটিল চক্রঘূর্ণনে আজ সেই পূর্ব্বগৌরববিচ্যুত মুসলমান-সমাজ য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মুখাপেক্ষী, তাহাদের জাতীয় ইতিহাস আজ তাহারা য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া, নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। ইহা ভারতের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কারণ শুধু মুসলমান নয়, আজ ভারতীয় হিন্দুসমাজও তাহাদের শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর পানে উদগ্রীব হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছে।

এই নিরাশার ভিতরেও আশার একটু ক্ষীণালোক দেখা যাইতেছে। আজ মুসলমান-সমাজ সুষুপ্তির সুখময় ক্রোড় হইতে জাগরিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। তাই বঙ্গদেশে আজ আমরা মুসলমান ছাত্রসংখ্যার দিন দিন বৃদ্ধি দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। মুসলমান সমাজনেতৃগণ তাঁহাদের সমাজের শিক্ষোন্নতির জন্য যথেষ্ট আগ্রহ ও স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করিতেছেন। যাহাতে অল্পবুদ্ধি কোমলমতি বালকগণ সুপথে চালিত হইয়া ভেদবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া উদারভাবে জাতীয়ধর্ম্ম ও জাতীয়শিক্ষার লুপ্ত-গৌরব উদ্ধারসাধনে যত্নবান হয়, সমাজপতিগণের সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে। আশা করি তাঁহাদের নেতৃত্বাধীনতায় মুসলমান সমাজ অচিরে গৌরবমণ্ডিত হইয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিবে।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা পালভরে ভাগীরথী-বক্ষে উজানে চলিয়াছিল। অদূরে পদ্মা ও ভাগীরথীর সঙ্গম। তখন ভাগীরথীর এত দুরবস্থা ছিল না,—গঙ্গার অধিকাংশ জল ভাগীরথী বাহিয়া সাগরে মিশিত। সুতরাং তখনও পদ্মা প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে নাই।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সুতী গ্রামের নিম্নে ভাগীরথীর একটী প্রকাণ্ড দহ ছিল। তাহার কিয়দংশ এখন বিলে পরিণত হইয়া আছে। দিবাবসান দেখিয়া মাঝি পাল নামাইয়া নৌকা বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে একখানি ক্ষুদ্র পানসী আসিয়া তাহার পার্শ্বে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে উভয় নৌকা তীরে আসিয়া লাগিল। পানসীর সম্মুখে বসিয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটী ক্ষুদ্র হুঁকায় তামাকু সেবন করিতেছিল; এবং তাহার সম্মুখে জনৈক মসীবর্ণ প্রৌঢ় লোলুপ-দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের বদন-নির্গত ধূমঃপুঞ্জের দিকে চাহিয়া ছিল। পানসী তীরে লাগিলে প্রৌঢ় বলিয়া উঠিল, "দাদাঠাকুর, পেসাদটা একবার দিলে না? কর্ত্তাবাবা বলিতেন—" ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "দীনু, তোমার কর্ত্তাবাবার জ্বালায় স্থির হইয়া এক ছিলিম তামাকও খাইবার উপায় নাই।" প্রৌঢ় ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিল, "দেখ দাদাঠাকুর, এই যে শেষ তিন ছিলিম তামাক সাজিয়াছি, তাহা একাই ছাই করিয়াছ,—এ কলিকাটাও পুড়িয়া আসিয়াছে। কর্ত্তাবাবা বলিতেন যে বামুনের হাতে —"

"রাখ্ তোর কর্ত্তাবাবা!" ব্রাহ্মণ এই বলিয়া হুঁকা হইতে কলিকাটি নামাইয়া দিল। দীননাথ কলিকাটি লইয়া নিজের ক্ষুদ্র হুঁকায় বসাইয়াছে, এমন সময়ে জনৈক দীর্ঘাকার, কৃষ্ণবর্ণ, অতি কৃশকায় ব্রাহ্মণ পানসীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তা, কলিকাটায় কিছু আছে কি?" দীননাথ মুখ হইতে হুঁকাটি নামাইয়া আগন্তুকের দিকে আড়-নেত্রে চাহিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "বামুন বুঝি?" আগন্তুক আকর্ণ-বিশ্রান্ত দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া কহিল, "হাঁ।" দীননাথ পানসী হইতে নামিয়া যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করিয়া একটা ক্ষুদ্র প্রণাম করিল; আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা?"

"আজ্ঞে আমরা গন্ধবণিক্। এই কলিকাটা ঐ ঠাকুরটী দেড় প্রহর ধরিয়া পোড়াইয়াছেন; সুতরাং ইহাতে বড় কিছু নাই। অনুমতি করেন তবে ঢালিয়া সাজিয়া আনি।" দীননাথ এই বলিয়া হুঁকাটি মুখে তুলিল। আগন্তুক অতি ছিন্ন, মলিন বসনখণ্ডে আবদ্ধ একটী পুঁটুলী শুষ্ক বালুকা-রাশির উপরে রাখিয়া তাহার উপর উপবেশন করিল। দীননাথ হুঁকায় একটা টান দিয়া কাসিতে-কাসিতে তাহা নামাইয়া রাখিল এবং সঙ্গীকে কহিল, "দাদাঠাকুর, দেখ দেখি, হুঁকার নলিচাটায় আগুন ধরিয়াছে কি না?" তাহার সঙ্গী তখন অনন্যমনে বৃহৎ নৌকার দিকে চাহিয়া ছিল; সুতরাং সে শুনিতে পাইল না। দীননাথ পানসী হইতে তামাকু লইয়া আসিয়া আগন্তুকের নিকট সাজিতে বসিল। আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সাহাজী, কত দূর যাইবে?" দীননাথ চারিদিকে চাহিয়া উত্তর দিল, "ঠিক নাই! তুমি কোথায় যাইতেছ ঠাকুর!"

"শ্বশুরবাড়ী!"

"সে কোন্ খানে!"

"উপস্থিত নিকটে কোথাও নয়।"

"তবে যাইবে কোথায়?"

"বলিলাম ত শ্বশুরবাড়ী।"

"ঠাকুর কুলীন বুঝি?"

"ফুলের মুখোটি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান।"

"ভাল, ভাল, দাদাঠাকুর বসি।"

এই সময় তামাকুর ছিলিম প্রস্তুত হইল; এবং কলিকাটি আগন্তুকের হস্তে দিয়া দীননাথ কহিল, "দাদাঠাকুর, ইচ্ছা কর; কিন্তু দেখিও, খবরদার, প্রসাদ করিয়া যেন চক্কোত্তি মশায়ের হাতে দিও না। উনি দেড় প্রহরে দশ ছিলিম

তামাক পোড়াইয়াছেন, অথচ প্রসাদটা আমা অবধি পৌছায় নাই।" আগন্তুক হাসিয়া কলিকাটি লইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "সাহাজী, ঠিক কোন্‌খানে যাইবে বল দেখি?" দীননাথ কহিল, "বলিলাম যে ঠাকুর্ ঠিক নাই।" "তবে তুমিও কি শ্বশুরবাড়ী যাইবে না কি?"

"আমাদের জাত কি তোমাদের মত ঠাকুর! তোমরা বিবাহ করিয়া পয়সা পাও, আমাদের টাকা দিয়া বিবাহ করিতে হয়।"

"তাও ত বটে। কি উদ্দেশ্যে চলিয়াছ বাপু?"

"ব্যবসায় আর কি দাদাঠাকুর! বেণের ছেলে, যেখানে দুপয়সা রোজগারের পথ দেখি, সেখানেই যাই। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

"কাটোয়া হইতে।"

"পরশু দিন মুরশিদাবাদ হইতে ফৌজ কুচ করিয়াছে, তাহার কিছু লক্ষণ দেখিলে?"

"বিলক্ষণ দেখিলাম! বহরামগঞ্জ হইতে ভগবানগোলা পর্য্যন্ত দুইধারেরই গ্রামের লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে,—ক্ষেতের ধান ও গাছের ফল উধাও হইয়া উড়িয়া গিয়াছে,—ঘর-বাড়ী ও ধানের গোলা খাক হইয়া আছে। ভগবানগোলার মঠের মোহান্ত কাল সন্ধ্যাবেলা দেখা করিতে গিয়াছিল, কোড়া খাইয়া আধমরা হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে!"

"এ ফৌজটা কাহার ফৌজ শুনিতে পাইলে কি?"

"ফৌজ আবার কাহার, দিল্লীর বাদশাহের।"

"আচ্ছা দাদাঠাকুর, ফৌজ এখন কত দূর?"

"গোয়ালারা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতেছিল,—তাহারা বলিয়া গেল আজ সন্ধ্যাবেলায় সুতীর মোহানার এক ক্রোশ দূরে ছাউনী পড়িবে।"

আগন্তুক দীননাথের হস্তে কলিকাটী দিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া দীননাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদাঠাকুর, উঠিলে যে?—আজ রাত্রিতে বাসা কোথায়?" আগন্তুক হাসিয়া উত্তর করিল, "বাসা! ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ সাহাজী! শ্মশানের ধারে একটা বড় বটগাছ দেখিয়া আসিয়াছি,—মনে করিয়াছি, আজ সেখানেই বাসা লইব।"

"রাম, রাম, বল কি দাদাঠাকুর! এই ঘোর সন্ধ্যাকাল, শ্মশানে থাকিবে কি? চল একখানা গ্রামে গিয়া বাসা খুঁজিয়া লই।"

"তাহা হইলে দিন কতক বাদে আসিও। পদ্মাপারে না গেলে আর কোন ঘরে চাল দেখিতে পাইবে না!"

দীননাথ যতক্ষণ আগন্তুক ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করিতেছিল, ততক্ষণ তাহার সঙ্গী ব্রাহ্মণ একমনে বৃহৎ নৌকার আরোহীদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। সেই নৌকার সম্মুখে বসিয়া এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ দীননাথের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। দীননাথ যখন আগন্তুককে নিমন্ত্রণ করিল, তখন তাহার সঙ্গী পানসী হইতে নামিয়া বৃহৎ নৌকার আরোহীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিদ্যালঙ্কার মহাশয় না?" কিন্তু প্রৌঢ় তাহার কথার উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী বিস্মিত হইয়া পুনরায় পানসীতে ফিরিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে এক গৌরবর্ণ কৃষ্ণকায় যুবা বড় নৌকা হইতে বাহিরে আসিয়া দীননাথের নিকটে গেল। তাহার কণ্ঠে শুভ্র যজ্ঞোপবীত দেখিয়া দীননাথ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যুবা দীননাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, ফৌজের কথা বলিতেছিলেন, নিকটে কি ফৌজ আসিতেছে না কি?" আগন্তুক কহিল, "বাদশাহী ফৌজ এখান হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ছাউনী করিবে। আপনাদের নৌকায় কি স্ত্রীলোক আছে?"

"হাঁ, আমরা সপরিবারে কাশী যাইতেছি।"

"তাহা হইলে নৌকা লইয়া শীঘ্র পারে যান।"

"সেই কথাই ভাল।"

যুবা ফিরিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনারা কোন্ শ্রেণী?"

যুবা বিস্মিত হইয়া কহিল, "রাঢ়ীয় শ্রেণী। কেন?"

"কোন্ মেল?"

"ফুলিয়া। এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

"আমি ফুলের মুখুটি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, যদি কন্যা পাত্রস্থ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তুত আছি।"

আগন্তুকের কথা শুনিয়া যুবা হাসিয়া উঠিল এবং কহিল, "না, মহাশয়, আমাদের পরিবারে বিবাহযোগ্যা কন্যা নাই।" যুবা নৌকায় ফিরিয়া গেল এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই বড় নৌকার মাঝিমাল্লারা নৌকা পরপারে লইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অন্ধকার রাত্রিতে ভাগীরথী তীরের অদূরে এক বৃহৎকায় তিন্তিড়ী বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া জনৈক মুসলমান এস্রাজের সুর বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাত্রি অন্ধকার, তাহার উপরে আলোকের অভাব। দীর্ঘ পথ গো-শকটে চলিয়া এস্রাজের কাণগুলা প্রায় সমস্তই খুলিয়া গিয়াছিল। অদূরে আর এক ব্যক্তি রন্ধন করিতেছিল। তাহার অগ্নির আলোক মাঝে-মাঝে আসিয়া বাদককে অন্ধ করিয়া দিতেছিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল,—এস্রাজের সুর ঠিক হইল না। তখন বাদক বিরক্ত হইয়া পরিচারককে হুক্কা ভরিতে আদেশ করিল। পরিচারক রন্ধন করিতেছিল, ডেকচি নামাইয়া কলিকা লইয়া তামাকু সাজিতে বসিল। ঠিক সেই সময়ে এক ব্যক্তি তিন্তিড়ীমূল দিয়া যাইতেছিল; সে অন্ধকারে মূলে আঘাত পাইয়া বাদকের উপর পড়িয়া গেল। বাদক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার কর্ণমূলে এক চপেটাঘাত করায়, নবাগত ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "জনাব আলী, গোস্তাকি মাফ হো জায়!" তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাদক লজ্জিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে কোন্ হ্যায়! পরবেজ! বইঠ যা, বইঠ যা।"

আগন্তুক চপেটাঘাত হইতে বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিন্তিড়ীমূলে উপবেশন করিল। বাদক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আরে নয়ী তাওয়াইফ কোই আয়ী?"

"হজরৎ, বাঙ্গালে মুলুক তো বিলকুল রেজিস্তান,—হিঁয়া কাঁহাসে খুপসুরৎ তাওয়াইফ পয়দা হোগা?"

"মজ্‌লেস কা ক্যা হাল হোগা?"

"জনাব, ইস দো বাঙ্গালীনে সাহেবজাদেকে মজ্‌লিস ভরপুর কর র্‌খথি হুসরী আউরৎকী থোড়ী জরুরৎ থী।"

"দেখো, পরবেজ, জঙ্গ মেরে পেশা, ইস দো বাঙ্গালী-য়োঁকো আউরৎকো মোকাবিল মৎ সমঝো। দেখো লড়াইকী পেশাসে মেরী বাল পাক গয়ী; লেকিন এইসী হোশদার হিম্মৎ ওর জওয়ান ময়নে থোড়ী দেখী। ইন্ লোগোঁকো পাশ শামসের ও এস্রাজ, তে সো সেতার বরোবর সমঝো।"

"জনাব, আপনে বাঙ্গালীয়োঁকো বড়ী তারীফ কী।"

"হাক্ হ্যায় ভাই, হাক্।"

"ইস সিয়া সগ্‌কে মুলুকমে ময়জন আভিতক এক ভি ময়দ নেহি দেখা।"

"অব গাজীকো তবলপর আওয়াজ পড়েগা তব ইস দো বহাদরমে সাফ মসলন্দ দেখ্‌লায় গা।"

এই সময়ে দূর হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল "খাঁ সাহেব, বাবা সাহেব আছ বাবা?" বাদক বলিয়া উঠিল "তোবা, তোবা।" পরবেজ জিজ্ঞাসা করিল "কোন হ্যায় হজরৎ?" বাদক কহিল "লালবাগকী হারামখোর বণিয়া আ গয়ী।" পুনরায় প্রশ্ন হইল "বলি বাবাসাহেব, আমি দীননাথ বাবা, নবদ্বীপচন্দ্রের পৌত্তুর বাবা! বড় কষ্টে এতদূর এসেছি বাবা।"

"হাঁ, হাঁ, আস আস।"

"জয় জগন্নাথ, রাধেকৃষ্ণ, গোবিন্দ বল। কি জানি দাদাঠাকুর, এই আমার কর্ত্তাবাবা অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন।"

"দেখো দীনু, তোমারে কর্ত্তাবাবা বড়ে হারামজাদ থা।"

"রাধেকৃষ্ণ, রাধেকৃষ্ণ, বাবাসাহেব বলে কি? কর্ত্তা-বাবা নবদ্বীপচন্দ্রের প্রসাদে এখনও করে খাচ্ছি।"

"তোমারে নবদ্বীপ চন্দর কা মাফিক ঠগ জুয়াচোর ফেরেববাজ পেশাবর সে জহাঙ্গীর নগর তকমে ময়নে আজ ভি নেহি দেখা। জরুর দোজখ মে গয় হোঙ্গে।"

"জয় রাধেকৃষ্ণ, বেটা বলে কি! দাদাঠাকুর, কর্ত্তা-বাবার অনুমতিটা কি জান? যতক্ষণ টাকা আদায় না হয়, ততক্ষণ খাতক দশ ঘা জুতা মারিলেও রা কাড়িবে না।"

"আরে দীনু, ক্যা বোলতা হ্যায়?"

"বোলতা আর কি বাবাসাহেব, যতদিন তোম লোক চলে আয়া, ততদিন বোলতার কামড়ের মত ছটফট করতা হ্যায়। আমি বড় গরীব হ্যায় বাবাসাহেব, আমার টাকা-কড়ি আর কিছু নেহি হ্যায়, সমস্ত তোমাদের পেটের মধ্যে চলে গ্যা।"

"বহুৎ আচ্ছা, বণিয়াকা হাল এইসাই হোনা চাইয়ে।"

"বেটা উচ্ছন্ন যাও। হে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র, তুমি যদি সত্য হও, বেটার যেন সর্ব্বনাশ হয়। তা যা বল্লে বাবা-সাহেব তা সব ঠিক হ্যায়, তবে টাকাটা—"

"ক্যা, টাকা! রুপেয়া! বদবখৎ বেতমীজ কাফের! আরে কোয়ী হ্যায়!"

দুইজন আহদী তিন্তিড়ী বৃক্ষের পশ্চাতে অশ্বের সেবা

করিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিল, এবং কহিল "বন্দে নওয়াজি, হুকুম!" হুকুম হইল "কোড়া লেয়াও।" আড়দী দীননাথ সাহার দোকানের অনেক আটা ও দাল হজম করিয়াছিল,—সে হুকুম শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া সাহস পাইয়া দীননাথ মুসলমানের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল এবং ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিল "যাহা ইচ্ছা কর বাবা, মোদ্দা টাকাটা দিও।" তাহার আচরণ দেখিয়া তাহার সঙ্গী বলিয়া উঠিল, "দীনু, করিস কি,—যবনের পায়ে ধরলি ?" দীননাথ এবার রাগিল; সে বিরক্ত হইয়া কহিল, "বামুনের বুদ্ধি কি না! পায়ে ধরিব না ত সুদের হিসাবে কোড়া খাইব? তোমার মতে চলিলে হইয়াছে আর কি!" বলিতে-বলিতে দীননাথ কাছার খুঁট হইতে একটা আশরফি বাহির করিয়া বাজাইয়া ফেলিল। সুবর্ণের নিক্কণ শুনিয়া মুসলমানের অধরপ্রান্তে হাসির রেখা দেখা দিল। সে কহিল "দীনু, তু বড়ে লায়েগ ঠগ হ্যায়।"

দীননাথ আশ্বাস পাইয়া বলিয়া উঠিল "সে দয়া করে যা বল বাবা। তোমার পান আতরের খরচ বাবৎ কিছু নজর এনেছি। খাঁ সাহেব, তুমি আমার ধর্ম্ম বাপ বাবা, আমার টাকাটা উদ্ধার করিয়া দিও।"

সুবর্ণ-মুদ্রাটী যথারীতি বাজাইয়া খাঁ সাহেব প্রসন্ন-বদনে দীর্ঘ শ্মশ্রু মধ্যে ক্ষিপ্র অঙ্গুলী চালনা করিতে-করিতে কহিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যায়গা। রুপিয়া ত বড় মুস্কিল কা বাত হ্যায়, লেকিন রোকা মিল যায় গা।" দীননাথের সঙ্গী চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল। খাঁ সাহেব দ্বিতীয়বার পেশকষ লাভের আশায় দীননাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "আরে, ইয়ে কোন হ্যায়? তোম ক্যা মাঙ্গতা?" দীননাথ অতি বিনীত ভাবে করজোড়ে নিবেদন করিল, "ও আমার অংশীদার বাবাসাহেব, জাতে মুচি, সেইজন্য তফাতে দাঁড়াইয়া আছে।" চক্রবর্ত্তী দীননাথের কথা শুনিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "তবে রে বেটা, আমি না কি জাতে মুচি!" দীননাথ অতি শান্ত ভাবে তাহাকে কহিল, "রাগ কর কেন দাদাঠাকুর, কাজ উদ্ধার করিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়,—তুমি বামনামী ফলাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছ, তাহাতে কি নেড়ে বশ হয়। দেখ বাবা সাহেব, ও বদ্ধ পাগল, কাহাকে কি বলে তাহার স্থিরতা নাই। দেখ দাদাঠাকুর, সঙের মত দাঁড়াইয়া না থাকিয়া মোহরটা বাহির করিয়া ফেল না। দিতেই যখন হইবে, তখন আর মায়া করিয়া লাভ কি ?"

চক্রবর্ত্তী আশরফিটা বাহির করিয়া দীননাথের হস্তে দিল এবং দীননাথ তাহা খাঁ সাহেবের পদপ্রান্তে রাখিল। খাঁ সাহেব অধিকতর প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "দীনু, কাল আও, রোকা মিল যায়গা।" দীননাথ অপ্রভিত হইবার পাত্র নহে; সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "এবারে রোকা ছাড়া আরও কিছু লাগেগা বাবা।"

"আওর ক্যা মাঙ্গতা?"

"রোকা, সাহজাদার একটা সহি-মোহর চাই বাবা।"

"আরে দীনু, তুমনে তোমারা কত্তাবাবাসে ভি বড়া ঠগ্ হ্যায়। সহি-মোহর বড়া মুস্কিলকী বাৎ হ্যায়।"

"তুমি একবার দাড়ী নাড়িলেই সমস্ত হয় বাবা। কত খরচ লাগিবে?"

খাঁ সাহেব বিব্রত হইয়া সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিলেন; সঙ্গী পরবেজ কহিল "এক অসীম রায়সে ইয়ে কাম হো সকতা।"

খাঁ সাহেব সম্মতিসূচক শিরশ্চালনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কীমৎ?"

"জনাব, নয়া কারবার।"

"দীনু, কাল আস। দশ বিশ আসলী আশরফি লাও।" দীননাথ অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল।

ক্রমশঃ

চিত্র ও চরিত্র

ভস্মে হীরক

[শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম-এ]

(১)

মানমঞ্জরী একজন চব্-কীর্ত্তনওয়ালী।

সেবার আদিমহট্টে এসে প্রায় এক মাস নানা স্থানে কীর্ত্তন গাইল,—নামও হ'লো।

তার বয়স্ বোধ হয় ৩৬।৩৭ বছর,—বা আরো একটু বেশী; কিন্তু তাকে দেখাতো যেন ২৫।২৬ বছরের মত, অথবা আরো একটু কম। চেহারাটা একটু মোটা-সোটা, ভারভাত্তিক গোছ; রংটা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; মুখখানা বোধ হয় ভালই।

মেয়েরা কেউ-কেউ ব'লতেন,—"কেত্তনওয়ালীর গান যেমনি হোক্, ওর চেহারাটা ভাল,—তাই—"

এর পরে আর চেহারার বর্ণনা অনাবশ্যক।

(২)

আদিমহট্ট বৈষ্ণব-প্রধান স্থান।

কীর্ত্তনওয়ালীর সঙ্গীত যেমনি হোক্,—অনেকেরই তা' ভাল লাগ্‌লো।—আর বাস্তবিক কীর্ত্তনটাও সে ভালই গাইতো; কিন্তু চেহারাটার সৌন্দর্য্য বোধ হয় কীর্ত্তনের মাধুর্য্যের সঙ্গে মাঝে-মাঝে কেমন একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা জুড়ে' দিয়ে 'শ্রোতা'কে 'দর্শক'-শ্রেণীর মধ্যে নিয়ে দাঁড় করাতো'। কীর্ত্তনওয়ালীর দুর্ভাগ্য!

এই 'দুর্ভাগ্যের' মধ্যে একটা সৌভাগ্যও ছিল। যেখানে সময়োচিত পরিচ্ছদ পরে' কীর্ত্তনওয়ালী গান ক'রতো, 'আসর' তাকে আর ক'রে নিতে হ'তো না,—'আসর' যেন তার জন্য 'জমানই' থাকতো। বৈষ্ণব-প্রধান স্থান, 'ক্ষেত্র' ভাল থাক্‌লে 'ফসল' ভালো হবার কত সুবিধে!

কীর্ত্তনওয়ালী এসে গান ধ'রতেই, কতজন কাঁদতে সুরু করতেন।

(৩)

আল্লার 'ক্ষেত্র' ভাল থাক্‌লেই হয় না;—তাতে যত্ন না নিলে 'আগাছা'ও জন্মায়; যদি 'আগাছা' একবার জন্মালো,—তখন কিন্তু প্রভাত শিশির তার উপর,—আর 'সুশস্যে'র উপর, নিরপেক্ষ এবং সমভাবেই প'ড়ে থাকে।

নবীন জমীদার বঙ্কুবিলাস ছিলেন আদিমহট্টে একটী 'আগাছা'। তাঁর বয়স,—কিছুই-নে ব'ল্‌লেই হয়; এই আর কত?—বোধ হয় ১৭।১৮ বৎসর হবে; কিন্তু এরি মধ্যে তিনি একেবারে—; থাক্ সে কথা। তাঁর দোষ ক'-টা ব'লব?—তাই একটাও এখন বল্‌লুম্ না।

বঙ্কু-বিলাস বিবাহিত; স্ত্রীর বয়স ১৪।১৫ বছর,—খাসা মেয়ে টুকুন্,—আহা!

(৪)

সেদিনকার 'আসরে' যত লোক মানমঞ্জরীর কীর্ত্তনের সুরে কাঁদ্‌লো, তার মধ্যে নবীন জমীদার বঙ্কুবাবু সবাইএর বাড়া।

লোকে ভাব্‌লে, বঙ্কবাবুর এবারে 'হরিভক্তির পালা!'

* * * * * * * * *

কীর্ত্তনওয়ালী গাইল,—

"সই, কে বলে পীরিতি হীরা!
সোণায় জড়িয়া হিয়ায় ধরিতে
দুখ উপজিলা ফিরা।
* * * *
পরশ-পাথর বড়ই শীতল,—
কহয়ে সকল লোকে,
মুঞি অভাগিনী!— লাগিল আগুণি,
—পাইনু এতেক দুখে!" [চণ্ডীদাস]

বঙ্কুবাবু কেঁদে ফেল্‌লেন।

কীর্ত্তনওয়ালী 'আসরের' মধ্যে ঘুরে'-ঘুরে' পদাবলী গাইতে লাগ্‌লো,—বঙ্কু রেশমী রুমালের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত ক'রে, জনতা ভেদ করে ঘুরে'-ঘুরে', বারবার চোখ্ পুঁছলেন।

মানমঞ্জরী আবার 'আসরের' মধ্য-স্থলে দাঁড়িয়ে বেহালার মধুর তানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইল,—

"সখি হে, কেমন পীরিতি লেহা!
আনের সহিত করিয়া পীরিতি,—
গরলে ভরল দেহা!" [চণ্ডীদাস]

আবার,—

"চণ্ডীদাস কহে বাণী,— শুন রাধা বিনোদিনি,
[মঞ্জরী কহয়ে বাণী]
—মিছে কেন ডুবেছিলে জলে?
বুঝিতে নারিলে মায়া,— জলে ছিল অঙ্গ-ছায়া!
—শ্যাম ছিল কদম্বের ডালে!"
[চণ্ডীদাস]

বন্ধু এ সব কথা বুঝ্‌তে পারলেন কি না, তা' টের পাওয়া গেল না; কিন্তু কাঁদ্‌ছিলেন।

কীর্ত্তনওয়ালী দেখ্‌লে মেয়েদের বস্‌বার জায়গায় ছোট্টো একটী টুক্‌টুকে 'বউ' বন্ধুর দিকে তাকিয়ে কেঁদে আকুল হ'চ্ছে;—বন্ধুর দৃষ্টি অন্যদিকে।

কীর্ত্তনওয়ালীরাও বুঝি 'মানুষ'! মানমঞ্জরীর বুকের পাঁজ্‌রা তখন একটা অজ্ঞাত আঘাতে ভেঙ্গে গুঁড়া হ'য়ে যাচ্ছিল!

(৫)

পালা-শেষের দিকে কীর্ত্তনওয়ালী গাইল,—

"মাধব! হাম্‌ পরিণাম নিরাশা!—
তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময়,—
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা!
* * * * * *
কত চতুরানন নিতি-নিতি যাওত
ন-তুয়া আদি-অবসানা!
তোহে জনমি, পুন তোহে সমাওত,—
সাগর-লহরী সমানা!" [বিদ্যাপতি]

তার পর আবার,—

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়!
দেই তুলসী-তিল দেহ সমর পিনু,—
দয়া জানি,—ছোড়বি মোয়!
গণইতে দোষ,— গুণ-লেশ ন পাওবি,—
যব্‌ তুঁহু করবি বিচার!
—তুঁহু 'জগন্নাথ',— জগতে কহায়সি,—
'জগ'-বাহির নহি মুঞি ছার!" [বিদ্যাপতি]

বন্ধু এর কিছুই বুঝ্‌লেন না,—তবু কাঁদ্‌লেন।

গাইবার সময় কীর্ত্তনওয়ালীও কেঁদে ফেলেছিল।

সেই ছোট্টো মেয়েটী হাত জোড় ক'রে ব'সে কাঁদ্‌ছিল; তার চক্ষু-দুটী তখন মুদ্রিত। বিগলিত-অশ্রু তার সুন্দর মুখখানিকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

---

(৬)

কীর্ত্তনওয়ালীর 'বাসা' ছিল 'লামার পাহাড়ে'।

এক দিন বেলা তিনটের সময়ে বন্ধুবাবু সদল-বলে গিয়ে সেখানে উপস্থিত।

জমীদার বন্ধুবাবু কি একটা প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন।
—সে কথায় কাজ নেই।

কীর্ত্তনওয়ালী বাড়ীর ভেতর থেকে চাকরকে ব'ল্‌লে,—"বাবুকে ডাক।"

* * * * * *

বন্ধুবাবু কম্পিত-পদে সেই গৃহে প্রবেশ ক'রতেই শুন্‌তে পেলেন, কীর্ত্তনওয়ালীর কণ্ঠস্বর,—

"দেই তুলসী তিল,—
"গণইতে দোষ,—
তুঁহু জগন্নাথ,—"

ঘরে ঢুকে' বন্ধু দেখ্‌লেন, কীর্ত্তনওয়ালী সেদিন শুধু একখানা 'নামাবলী' গায়ে দিয়ে, হাতে-গড়ানো একটী তুলসী-বেদীর কাছে ব'সে, হাত যোড় ক'রে গান গাইছে!

তখন মানমঞ্জরী গাচ্ছিল,—

"ভণয়ে বিদ্যাপতি,— অতিশয় কাতর,—
[রো-য়ে মানমঞ্জরী]
তরাইতে ইহ ভবসিন্ধু,
—তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন,—
তিল-এক দেহ দীনবন্ধু!"
[বিদ্যাপতি]

ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে কীর্ত্তনওয়ালীর দুটো চোখ্‌ দিয়ে জল পড়্‌ছিলো!

(৭)

বন্ধু এলে, কীর্ত্তনওয়ালী উঠে এসে তার হাত ধ'রে

ব'ল্‌লে,—"এস, বাবা,—এসো। তা' আমার বৌ-মাকে সঙ্গে আন্‌লে না? আমি আরও ভাব্‌ছিলুম্‌, তোমাদের দু-জনকে একবারটি দেখে, তবে এ দেশ থেকে বিদেয় হ'বো।"

বন্ধুকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে একটা চৌকীতে বসালে।

তখন বঙ্কুবাবুর মাথা ছম্‌-ছম্‌ ক'র্‌ছে; ব'ললেন,—"এঁ্যা,—আমি,—আমি,—এই ব'ল্‌ছিলেম্‌—"

ধীর, সহজ, প্রশান্ত স্বরে কীর্ত্তনওয়ালী ব'ল্‌লে,—"তা'—বাবা,—তা' আমি জানি; তোমার লজ্জা কি, বাবা? অমন কতজনের আরো হ'য়েছে।"

"আপনি আমাকে অমন ক'রে ডেকেছিলেন,—"

"তা বেশ তো বাবা; কেউ তো আমায় অমন ক'রে—; আচ্ছা, একটা জিনিষ দেখাচ্ছি; বাবা, ব'সো।"

(৮)

হাত থেকে মানমঞ্জরী একটা সোনায়-বসানো হীরের আংটী খুলে' নিলে। তাতে খানিকটে নেক্‌ড়া জড়ালে।

তার পর সমস্ত নেকড়াটাকে কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে নিয়ে তা'তে আগুন ধরালে।

নেকড়াটুকু পুড়ে' ছাই হ'য়ে গেল।

হীরের আংটীটে আর একটু সেই পোড়া নেকড়ার ছাই ছোট্টো একটু কাগজে মোড়ক ক'রে কীর্ত্তনওয়ালী সেই আংটী আর ছাইটু বঙ্কুর হাতে দিয়ে ব'ল্‌লে,—

"তোমার বয়সী আমার এক ছেলে ছিল,—তার নাম ছিল দীনেশ। সে আজ নেই। তুমি, বাবা, আমার এই 'দান'টুকু নাও। তোমায় নিতেই হবে; আমার বৌমাকে দেবে। আর ব'লো, 'আগেকার' তোমাকে, আর তুমি 'আমাকে যা' দেখেছিলে তাকে', আমি আজ 'ছাই' ক'রে দিইছি।—এই হীরে আর সোণটুকু তার মধ্যে ছিল; তুমি এ নিয়ে যাও,—যদিও 'ছাই'এর আড়ালে তোমার ঘরে যে "সোণা আর হীরে" আছে, তার কাছে এ নিতান্তই 'ছাই'!—যাও বাবা, আর কেঁদো না!"

তখন কান্নায় বঙ্কুর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছিল;—"মা,—মা"—ছাড়া কিছুই সে ব'লতে পার্‌লে না!

কান্নায় কীর্ত্তনওয়ালীর আর কথা সর্‌ছিল না। শুধু ব'ল্‌লে,—"আর কাঁদিস্‌নে বাবা,—তোর মা থাক্‌লে বুঝি তুই—"

*

পরদিন বঙ্কু আর তার স্ত্রী সুরমা এসে "মা,-মা" ক'রে 'লামারি পাহাড়ের' সেই বাড়ীটেতে খুঁজতে লাগ্‌লো।

কীর্ত্তনওয়ালী চ'লে গিয়েছে!

ঘরের মেঝেয় খানিকটে ছাই তখনো প'ড়ে ছিল।

গ্রীষ্মের ভেট

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

মর্ত্তমান রম্ভা এনো 'বঙ্কিমের' উপন্যাস
দেবে ভোগে দুই দিকে লাগে,
হিঙ্গুল 'কম্‌লা' এনো 'রবীন্দ্রের' কাব্যসুধা
অম্ল মিঠা যার যথা ভাগে।
এনো যেন 'পানিফল' গ্রীষ্মে বড় স্নিগ্ধকর
'অমৃতের' নক্‌সা মনোহর,
আনিয়ো সরল 'ইক্ষু' 'দ্বিজেন্দ্রের' কাব্যগীতি,
মণ্ডা আর ডাণ্ডা একত্তর।
এনো কালো খরমুজ গন্ধ তার বড় মিঠা
'শরতের' উপন্যাস সম,

এনো কাল তরমুজ ভিতর গভীর লাল
'দেবেন্দ্রের' কাব্য অনুপম।
এনো কচি-কচি আম বাউল ক্ষেপার গীতি
পেতে প্রাণ আন্‌চান্‌ করে,
এনো নেয়াপাতি ডাব 'রামপ্রসাদের' গান
বুক দেয় সুধারসে ভরে।
ঝর্ণারি কলসী ভরি এনো সুরধুনী নীর,
সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন,
পরাণ জুড়ানো আহা, বৈষ্ণবের পদাবলী
'তুলসীদাসের' রামায়ণ।

সোণা ঠাকুর

[শ্রীযামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত]

(ইনি বরিশাল বাজারখোলার ৺কালীবাড়ীর পুরোহিত ছিলেন। ইনি একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন বলিয়া, বঙ্গের বিখ্যাত সুসন্তান, বরিশালের নেতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ইঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং ইঁহার জীবনের অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইনি যৌবনকালে বরিশাল অঞ্চলের বিলাসী ধনী যুবকগণের প্রধান বয়স্য ছিলেন। যে ঘটনায় ইঁহার জীবন-গতি ফিরিয়া যায়, এই কবিতায় তাহাই বিবৃত হইয়াছে। কীর্ত্তনখোলা নদী বরিশাল নগরীর পূর্ব্ব অংশ দিয়া প্রবাহিত।)

মলয়ার মৃদু- মধুর পরশে
'কীর্ত্তনখোলা'-বুকে,
ফেনায়ে ফেনায়ে উঠিছে পড়িছে,
লহরী খেলিছে সুখে।
সাঁঝের তারার ছোট আলোটুকু
পথহারা জোছনায়,
রূপার ওড়না উড়াইয়ে মেঘ
ছুটেছে আকাশ-গায়।
ক্ষত-হৃদয়ের চন্দন বহি
ধূমপোত এল কত!
কত চলি গেল ফুঁকারিয়ে বাঁশী
জাগায়ে বেদনা শত।
তটিনীর তীরে মুগ্ধা নগরী
দীপের নয়ন মেলে—
দেখিছে চাহিয়া তরল সলিলে
ফুল্ল লহর খেলে।
সুন্দর অতি বজরা চলেছে
উজান বাহিয়ে জলে,—
বাতায়ন-পথে কাঁপি দীপশিখা
জলে যেন পড়ে গ'লে।

রঙীন পতাকা দখিণ পবনে
এলায়ে পড়েছে ঝুঁকে,
মূর্চ্ছিত গানে বিভল পবনে
আঁকড়িছে যেন বুকে।
গাহে সনাতন উঠিতেছে গান
নারীর কণ্ঠে মিশি,
থমকি দাঁড়ায়ে মলয়া শুনিছে
ভ'রে দিয়ে দশ দিশি।
মুহূর্ত্ত তরে থমকি দাঁড়াল
তরল লহরী-খেলা;
থামিল নারীর শব্দ-পূরিত
জীবন দুপুর বেলা।
এত কাল ধরি, আবেগ বাসনা
যেই পথ ঘিরি-ঘিরি
খেলিত ছুটিত, আজ যেন কেন
এল তথা হ'তে ফিরি!
শান্ত হইল, চোখের চমক
কাঁকণ শিথিল হাতে;
চরণে নূপুর হইল অচল
বাজে না বীণার সাথে।
দলিল না আর নর্ত্তিত পদ
সুকোমল গালিচায়,
বিলাস, শয়ন, দলে দিয়ে মন
ঊর্দ্ধে ছুটিয়া ধায়।
পতিতা কাটিলা সোণার শিকল,
ধনীর সমুখে হাসি,
ইঙ্গিতে ফুটে "দিয়েছি ছলনা
পাওনি পীরিতিরাশি।"
গায়ক-কণ্ঠে, পতিতা আবেগে
তুলে দিল ভুজলতা,
সনাতন শোনে পরাণ-মাঝারে
ধ্বনিছে মরম কথা,—

"কণ্ঠের তব সুর ঢালি দাও
এ দীন কণ্ঠে মোর,
শ্যামা-গান গাব আপনা হারায়ে
দিবস রজনী ভোর।
সে গানে জাগিবে রুদ্র শক্তি
বাজায়ে হৃদয়-তার,
কামনা শতের মুণ্ড কাটিয়া
করিব গলার হার।
কল্যাণ যত শিব রূপে আসি
চরণে পড়িবে ঢল,
জননীর স্নেহ উঠিবে উথলি,
এ পরাণ যাবে গ'লে।
ঘুচাইতে পাপ, ধরার কালিমা
নিজ দেহে তু'লে নিব,
মান অভিমান রঙীন বসন
একেবারে খুলে দিব।
দেবতার মাঝে সেবিকা তাঁহার
দিবে আপনারে দান।"
সনাতন দেখে, দীপ্ত চাহনি
ভাব-নীরে করে স্নান।

ভাবে সনাতন, আসর জাঁকান
দেবতার ফাঁকা গান,
শুষ্ক নদীতে বহাইল যদি
ভক্তি-নদীর বান,
সুরের সহিত পরাণ বাঁধিয়া
ঢালিলে দেবতা পায়,
জীবন কুটীর উঠিবে উজলি
ভ'রে যাবে জোছনায়।
বন্ধন কাটি, উঠিল গায়ক
ঝাঁপ দিলা নদী জলে,
তরঙ্গ তারে, লইয়া আদরে
উল্লাসে কলকলে।
মন্দিরে পশি, শ্যামা পাদ-মূলে
পাতি নিলা যোগাসন।
আর দিন ধনী, নৌকা বিহারে
বলে "চল সনাতন!"
সনাতন কহে "সে যে পুরাতন,
পেয়েছি নূতন খেলা,
চির-বসন্ত বিরাজে তথায়,
চির আনন্দ মেলা।"

পশ্চিম-তরঙ্গ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

। সেলাইয়ের কল

...তের সেলাই আজ-কাল খুব কমে এসেছে। এখন প্রায় ...তই কলে সেলাই হচ্ছে। 'ঘরে-ঘরে সেলাইয়ের কল' ...খতে পাওয়া যায়,—হয় হাতে চালাবার, নয় পায়ে ...লাবার। আমেরিকায় এই হাতে চালাবার এমন একটি ...কার ছোট্ট সেলাইয়ের-কল বেরিয়েছে যে, তাতে ছোট-...টি ছেলে-মেয়েরা পর্য্যন্ত খুব সহজে সেলাইয়ের ... পারে; অথচ, তাদের সেই কাজ খারাপ হওয়া দূরে থাক্‌, বরং বেশ পরিপাটিই হবে। এই কলটীতে সেলাইয়ের কাজ এত শীগ্‌গির আর এমন সুন্দর হয় যে, ছুঁচ-সুতো নিয়ে বসে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে একটু-একটু করে সেলাই করলেও তত ভাল হয় না। লতাপাতা কাটা, ফুল তোলা, নক্সার কাজ এই কলে খুব সহজে সেলাই করা যায়। কলটী অনেকটা জাঁতি-কলের মত,—চালাতে কোন কষ্ট হয় না। এতে একটী 'বিঁধ করা' যন্ত্র আছে; যেখানে সেলাই করবার দরকার সেইখানে টিপে ধরলেই

আপনি সেলাই হয়ে যায়। কলটি খুব হাল্কা, ওজনে এক-পোয়ারও কম; আর মাপ আট ইঞ্চির বেশী বড় নয়।

(Scientific American)

২। খবরের কাগজ-ওয়ালা কল

রাস্তার মোড়ে-মোড়ে খবরের কাগজ-ওয়ালাদের সকলেই দেখেছেন। আমেরিকাতেও এই রকম খবরের কাগজওয়ালা আছে। তা ছাড়া অলিতে-গলিতে খবরের কাগজ বিক্রী করবার 'কল' বসানো আছে। সেই কলে দু'টো পয়সা ফেলে দিলেই একখানা খবরের কাগজ পাওয়া যায়। সেদিনের প্রধান-প্রধান খবরগুলো বড়-বড় অক্ষরে কলের গায়ে কাঁচ-আঁটা ফ্রেমের মধ্যে একখানা কাগজে লেখা থাকে। আমাদের এখানে যেমন একখানা কাগজ সমস্ত দিনের ভেতর যখন হোক্ কেবল একবার মাত্র বেরোয়, সেখানে কিন্তু একখানা কাগজই নূতন নূতন খবর নিয়ে অনেকবার বেরোয়। কাগজ কেনবার সময় কলের গায়ের সেই কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে দেখে নিতে হয়, খবর-গুলো নতুন কি না, আর সেটা কাগজের কোন্ সংস্করণ,—প্রভাত, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, না সন্ধ্যার? প্রতিবার কাগজ বেরুলেই খবরের কাগজের আফিস থেকে মটর গাড়ী করে লোক গিয়ে প্রত্যেক কলে কাগজ ভরে রেখে আসে।

(Scientific American)

৩। টেলিফোঁর চিঠি

অনেক সময়ে কোথাও টেলিফোঁ করে শোনা যায়, যাকে খুঁজছি, সে বাড়ী নেই; খবর আসে—"No reply!" তখন বড় মুস্কিলে পড়তে হয়। একটা হয় ত দরকারী কথা বলতে হবে;—আর একবার অন্য সময়ে টেলিফোঁতে তাকে ডাকবার আমার হয় ত আর ফুরসুৎই হবে না। তখন কি করা যায়? তার কাছে চিঠি লিখে লোকে পাঠানো ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সে যদি আবার সহরের বাইরে থাকে—এই ধর যেমন বর্দ্ধমানে কি রাণীগঞ্জে,—তাহ'লে আর তার কাছে তখনি লোক পাঠানোও চলে না। সুতরাং দরকারী কথাটা তাকে সে দিন তখনি না জানাতে পারায়, হয় ত অনেক সময়ে বিস্তর ক্ষতিও হয়ে যায়। এই সব অসুবিধে দূর করবার জন্যে ক্যালিফোর্ণিয়ার একজন লোক একটা চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তিনি টেলিফোঁর সঙ্গে টেলিগ্রাফ যোগ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আমি একজনকে টেলিফোঁ করে যদি তাকে না পাই, তাহলে আমার যা বক্তব্য, আমি টেলিফোঁ আপিসে বলে যাব, আর তারা সেটা সেই লোককে টেলিগ্রাফে খবর দেবে; কারণ টেলিগ্রাফের সাহায্যে, সে না থাকলেও, খবরটা সাঙ্কেতিক অক্ষরে—তার টেলিফোঁর সঙ্গে যে টেলিগ্রাফ যন্ত্র যোগ করা আছে,—তারই মধ্যের একটি সরু ফিতের মত কাগজের ওপর আপনি লেখা হয়ে যাবে। সুতরাং সে লোক যখনই ফিরে আসুক, এসেই আমার খবরটা জানতে পারবে। অতএব আমার কাজেরও আর কোনও ক্ষতি হবে না।

(Scientific American)

৪। আল্‌গা বাড়ী

ভাড়া-বাড়ীর অভাবে মধ্যবিত্ত লোকদের থাকবার যে আজকাল ভয়ানক অসুবিধা হয়েছে, সেটা কেবল আমাদের দেশেই নয়,—য়ুরোপ আমেরিকায় অনেকদিন থেকেই এই অভাবের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। তবে তারা আমাদের মত নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকবার পাত্র নয়। এই অভাব দূর করবার জন্যে তারা নানা উপায় বার কচ্ছে। আমেরিকা "আবর্ত্তনশীল কক্ষ" আবিষ্কার করে অতি সহজে একখানি ঘরকেই আবশ্যকমত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাঁধবার, খাবার, শোবার, বসবার ঘর করে নেবার উপায় উদ্ভাবন করেছে (চৈত্রমাসের 'ভারতবর্ষ' দেখুন)। লণ্ডনে গৃহস্থ ভদ্রলোকের থাকবার মত বাড়ীর এমন অভাব হয়েছে যে, মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃ-পক্ষ—সহরের স্থানে-স্থানে ব্যবহারের জন্য যে সব উদ্যান বা খোলা মাঠ আছে,—সেখানে তাদের থাকবার মত অস্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই বাড়ীগুলি সব কাঠের তৈরি,—যখন যেখানে ইচ্ছে তুলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এর মধ্যে লোকে বেশ আরামে বসবাস করতে পারে,—একটুও কষ্ট বা অসুবিধা হয় না। এগুলো অনেকটা পশ্চিমের 'বাঙ্‌লো' ধরণে তৈরি; একটা পরিবারের বাস করবার জন্যে যে কটি ঘর বিশেষ দরকার, এই কাঠের আল্‌গা বাড়ীগুলিতে তার সমস্তই বন্দোবস্ত করা থাকে। ঘরগুলিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সব ঘরেই দরকারী আসবাবপত্র সুমস্ত সাজানো থাকে।

(Scientific American)

সেলাইয়ের কল

খবরের কাগজ বিলীর কল

টেলিফোঁতে চিঠি
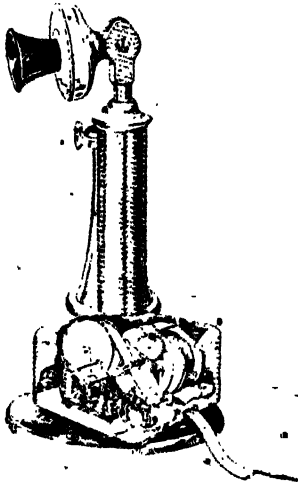
৫। রাস্তার নাম

রাত্রে অন্ধকার ট্রাম থেকে কিম্বা গাড়ী থেকে রাস্তার নাম ভাল পড়া যায় না দেখে, আমেরিকা এক নতুন উপায় বার করেছে। একটা মোটা চৌকো লোহার ফ্রেমের চু'দিকে মোটা-মোটা লাল কাচ লাগিয়ে, তার ওপর বড় বড় সাদা হরফে রাস্তার নাম লিখে গলির মোড়ে মোড়ে ইট দিয়ে গেঁথে বসিয়ে দিচ্চে। ঐ লোহার ফ্রেমের মধ্যে 'ইলেক্‌ট্রিক্' আলো লাগানো আছে। রাত্রে সেগুলো জ্বেলে দিলে প্রায় ৬০ হাত তফাৎ থেকে রাস্তার নাম বেশ স্পষ্ট পড়া যায়। এই কাচ-আঁটা লোহার ফ্রেমগুলি রাস্তার ধারে দেওয়ালের গায়ে কিম্বা থামের মাথায় আঁটা থাকে না, রাস্তার ওপরেই বসান থাকে। রাস্তা একটু খুঁড়ে ইট দিয়ে গেঁথে বসিয়ে দেওয়া হয়। চৌকো ফ্রেমটা মোট

আল্‌গা বাড়ী

[illegible]

রাস্তার নাম

১৭ ইঞ্চি চওড়া, আর রাস্তার উপর সেটা সবে সাড়ে-চার ইঞ্চি মাত্র উঁচু হয়ে থাকে।

(Scientific American)

৬। ফল-কুড়ুনী

ক্যালিফোর্ণিয়ায় বড়-বড় ফলের বাগান আছে। ফল-ব্যবসায়ীরা এই সব বাগানের ফল সংগ্রহ ক'রে দেশ-বিদেশে রপ্তানি করে। অনেক গাছ থেকে বিস্তর ফল মাটীতে খসে প'ড়ে গাছের তলায় ছড়িয়ে থাকে। এই সব ফল সংগ্রহ করবার জন্যে যখন হেঁট হোয়ে একটী-একটী করে কুড়িয়ে ঝুড়িতে তুলতে হয়, তখন যারা ফল কুড়োয়, তাদের ভারি কষ্ট হয়। অনেকক্ষণ হেঁট হোয়ে থাকতে হয় ব'লে, তাদের কোমর ব্যথা করে; পিঠে খিল ধরে যায়। জে, এফ, ফ্র্যাঙ্ক নামে একজন ক্যালিফোর্ণিয়াবাসী সম্প্রতি একটী "ফল-কুড়ুনী" যন্ত্র বার করে তাঁর জাতভায়েদের কষ্ট নিবারণ করেছেন। এই 'ফল-কুড়ুনী' নিয়ে তারা এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেড়াতে-বেড়াতে ফল কুড়োতে

ফল কুড়ুনী

পারবে। যন্ত্রটা বিশেষ কিছু শক্ত নয়; একটা লম্বা হাতোলের মুখে একটা চুঙির মত খোল লাগানো আছে। এই খোলটার তলায় স্প্রীংয়ের একটা ঢাকনা আছে। ফলের উপর চুঙিটা ঠেকিয়ে একটু চাপ দিলেই, তলা দিয়ে স্প্রীংয়ের ঢাকনা ঠেলে ফলটা খোলের ভিতর ঢুকে পড়ে।

(Scientific American)

৭। গরম পোষাক

যারা ওড়া জাহাজ চালায়, তাদের গরম পোষাক পরতে হয়, কারণ আকাশের উপরকার বাতাস ভয়ানক ঠাণ্ডা। তারা যত উঁচুতে ওঠে, ততই তাদের হাত-পা হিম হ'য়ে আসে। এই জন্যে তাদের এমন পোষাক প'রে উঠতে হয়, যাতে শরীরটি বেশ গরম থাকে—হাত পাগুলো ঠাণ্ডায় না জমে যায়। তা'রা যে পোষাক পরে, সে শুধু পশমী কাপড়ের নয়। আকাশের উপরটায় এত ঠাণ্ডা যে,

[illegible]

ইলেক্‌ট্রিক মোজা ও দস্তানা

পশমী কাপড় পরলেই শীত ভাঙে না। শরীর গরম রাখবার জন্যে তারা ইলেক্‌ট্রিকের আঁচে তাতানো এক-রকম পোষাক ব্যবহার করে। এই পোষাকটি লোমশুদ্ধ চামড়ায় তৈরি, খুব মোটা, ভেতরে অস্তর দেওয়া আছে; চারদিকে ইলেক্‌ট্রিকের তার আঁটা, মাঝে মাঝে 'সুইচ্' লাগানো আছে। এই 'সুইচ্' টিপে ইচ্ছেমত পোষাকের উত্তাপ কম বেশি করা যায়। এদের হাতের দস্তানায় আর পায়ের মোজাতেও ইলেকট্রিক তার লাগানো থাকে। উড়ো জাহাজের ভিতরই একটা ইলেক্‌ট্রিক উৎপাদন করবার ছোট ইঞ্জিন থাকে। সে ইঞ্জিনটি আবার বায়ু-বেগের সাহায্য নিয়ে চলে। পোষাক-সংলগ্ন ইলেক্‌ট্রিকের তার এই ইঞ্জিনের সঙ্গে যোগ করে দিলেই, সমস্ত পোষাকটি ইলেক্‌-ট্রিকের আঁচে বেশ তেতে ওঠে। তখন খুব উঁচুতে উঠলেও হাওয়ায় আর শরীর হিম হ'য়ে যাবার ভয় থাকে না। হাতে পায়েও ইলেকট্রিক দস্তানা আর মোজা পরা থাকে ব'লে, হাত পাগুলোও বেশ গরম থাকে; হিমে, শীতে অসাড় ক'রে ফেলতে পারে না।

(Literary Digest)

৮। পুরাণো বই

বিলেতে আর আমেরিকায় অনেক বড়লোক আছেন, যাদের ভাল-ভাল পুরোনো বই,—যা নাকি বাজারে আর কিনতে পাওয়া যায় না,—সেই সব সংগ্রহ করে রাখবার ভয়ানক ঝোঁক আছে। এই সখের জন্যে তাঁরা অগাধ টাকা খরচ করতে কাতর হ'ন না। সম্প্রতি আমেরিকার মিঃ হন্টিংটন প্রায় ১০০০০০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে খান

সবচেয়ে বেশি দামের তিনখানি বই

কয়েক পুরোনো বই সংগ্রহ করেছেন। যে তিনখানি বইয়ের জন্যে তাঁকে সব-চেয়ে বেশি দাম দিতে হয়েছে, তার মধ্যে দু'খানি হচ্ছে সেক্সপীয়রের—"The Passionate Pilgrim" আর "Venus and Adonis." এর প্রথম সংস্করণ; আর তৃতীয় খানি হচ্ছে I. D. & C. M. লিখিত "Epigrammes and Elegies." শীর্ষক বইয়ের একখানি নিশেঃষিত সংখ্যা। "Passionate Pilgrims" বইখানির জন্যে তাঁকে ৬'লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিতে হয়েছে ; আর "Venus and Adonis"এর জন্যে প্রায় ৬'লক্ষ ষাট হাজার টাকা। "Passionate Pilgrims" বইখানি কিন্তু ছোট একখানি পকেট-গীতার মত—মোট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা আর
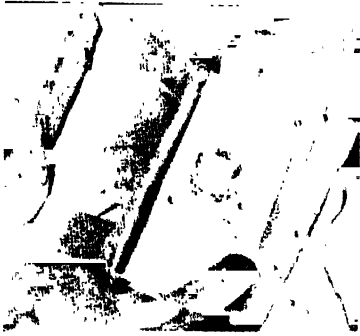
এই বইখানির সাইজ পকেট গীতার মত, কিন্তু দাম ৬২৬,৫০০

তিন ইঞ্চি চওড়া,—তারই দাম দিতে হ'য়েছে দু'লাখ ছাব্বিশ হাজার পাচশত টাকা! সার মন্টেগু বার্‌লো বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভার একজন সভ্য। তাঁর লাইব্রেরীর একটী ছোট শেল্‌ফের থানকয়েক বই সেদিন লণ্ডনের নিলামে ১৬৫৫৩৪০৲ টাকায় বিক্রী হ'য়েছে! তার মধ্যে

সার্ মণ্টেগু বার্‌লো ও তাঁহার লাইব্রেরী

একখানি বইয়ের দামই তিনি প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার ওপর পেয়েছেন। আমেরিকায় যে দিন হো-লাইব্রেরী (Hoe-Library) নিলামে—বিক্রী হয় সে দিন একখানি প্রাচীন বাইবেল একলাখ পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রী হয়েছে। পৃথিবীর আর কোথাও কখনও এ পর্য্যন্ত একখানি ধর্ম্ম পুস্তক এত দামে বিক্রী হ'তে কেউ শোনেনি! আর একখানি, "সেক্সপীয়ারের গ্রন্থাবলী"—১৬১৯ খৃঃ অব্দে
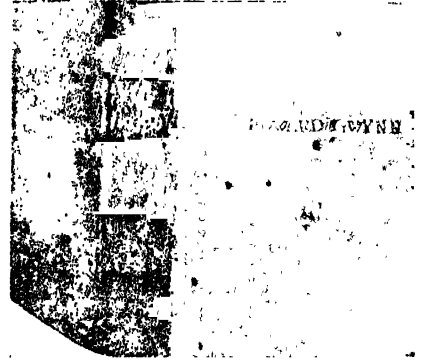
১৬১৯ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত সেক্সপীয়ারের গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ—সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় বিক্রী হ'য়েছে। এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে মহাকবি সেক্সপীয়রের নয়খানি নাটক প্রথম একত্র মুদ্রিত হয়েছিল। এই পুস্তকের মালিক ছিলেন মিঃ এড্‌ওয়ার্ড্ গাইন্।

(Literary Digest)

৯। দানসাগর

মৃত মহাত্মা 'এণ্ড্রু কার্ণেগী' যে দিন জগতের ও স্বদেশের কল্যাণের জন্য দেড়শত কোটী টাকা দান করে যান, সে দিন বিশ্বের লোকে তাঁর জয়গান করেছিল। কার্ণেগীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজ আবার তাঁর একজন স্বদেশবাসী জগতের হিতার্থে একশত পঁচাত্তর কোটী টাকা দান করেছেন। তিনি আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুত ধনী মিঃ 'রক্‌ফেলার্'। 'রক্‌ফেলার্' সামান্য মজুর থেকে আজ ক্রোড়পতি হয়েছেন। আজ তাঁর দানসাগরের তালিকা দেখে জগত বিস্মিত হয়ে গেছে! শিক্ষার জন্যে তিনি ৩৬,৪০০০০০০৲ টাকা, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে ২৮,৭০০০০০০৲ টাকা, চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১১,৯০০০০০০৲ টাকা, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ৯৫০০০০০০৲ টাকা, রক্‌ফেলার্ সমিতির জন্যে ৩৫০০০০০০৲ টাকা, ধর্ম্ম প্রচারের জন্যে ২,৮০০০০০০৲ টাকা, খ্রীষ্টিয় যুবক সমিতির (Y.M.C.A) জন্যে ১,৪০০০০০০৲ টাকা, ক্লীভল্যাণ্ড সহরের জন্য ১,৫০০০০০০৲ টাকা, বালক সংস্কার সমিতির জন্যে ১৫০০০০০০৲ টাকা, আর অন্যান্য অসংখ্য খুচ্‌রা দান ৭৭,৭০০০০০০৲ লক্ষ টাকা—সবশুদ্ধ একশত পঁচাত্তর কোটী টাকা দান করেছেন। (Literary Digest)

বিলাতে খেলাফত প্রতিনিধিগণ

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ]

চুলের বাহার

চুলের টুপি
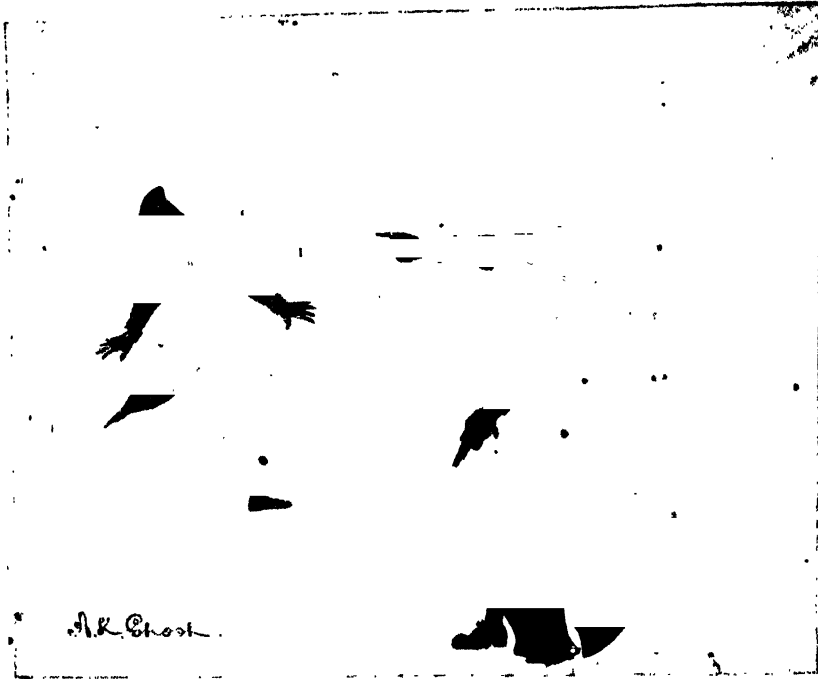
বলাই

[শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

রসিক হ'ল ধোনাই মণ্ডলের ছেলে, বিশাই মণ্ডলের নাতি, ভাগবত মণ্ডলের জামাই, ও সুদন মণ্ডলের সম্বন্ধী। বিশাই মণ্ডলের ছেলে ধোনাই মণ্ডলের যৌবনকালেও তাদের অবস্থা না কি বেশ ছিল। জমিজারাত থাকিলেও, নিজ হাতে লাঙ্গল ঠেলিয়া চাসবাস করিতে হইত না, কৃষাণ রাখিয়া চাষের কাজ চলিত। রসিক যখন ছেলেমানুষ, সেই বয়সেই সে কলমের বদলে লাঙ্গল ধরিয়া হাতে কলমে চাষবাস আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু একবার জ্বরে ভুগিয়া সে তার বাপকে স্পষ্ট বলিল, "আমি ও-সব পারব না।"

মামলা করিয়া বিশাই মণ্ডল সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন সর্ব্বস্বের মায়া ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিল, তখন ধোনাই বড় আশা করিয়া রহিল, তার রসিক বাঁচিলে আবার সবই হইবে।

রসিকের মামা বলাই মণ্ডল যে দিন থেকে অনাহারে মরিবার ভয়ে ভগিনীপতির সংসারে আসিয়া লাঙ্গল কাঁধে লইল, সেই দিন হইতে সে গরুবাছুরের রাখাল হইল, মাঠের কাজে সবার 'মণ্ডল-দাদা' হইল। মণ্ডলের সংসারে বাজার-সরকারী,—বাড়ীর যা কিছু কাজ ছিল, একে-একে সকল ভার আসিয়া বলাইএর মাথায় পড়িল। এদিকে রসিকচন্দ্রকে লাঙ্গল ছাড়িয়া গাঁয়ের নূতন পাঠশালায় আসিতে হইল।

লেখাপড়ায়ও রসিকের নাম পড়িয়া গেল। তার 'বানান' 'ফলা' সাঙ্গ হইয়াছে, 'শুভঙ্করী' লেখা সাঙ্গ, 'কলার পাতায়' দাগা বুলাইতে-বুলাইতে শ্লেটের আমদানী হইয়াছে, আবার বালীর কাগজে হাতচিঠার মকস চলিতেছে। এ হেন রসিকচন্দ্রের জন্য যখন মণ্ডলবাড়ীতে সম্বন্ধের পর সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, ধোনাইএর তখন আর ছেলের বিদ্যা বুঝিতে বাকী রহিল না। সেও সময় বুঝিয়া পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিল। বিবাহের সঙ্গে-সঙ্গে রসিকের লেখাপড়াও বন্ধ হইল। অতি কষ্টে যদিও গাঁয়ে পাঠশালা বসিয়াছিল, ছাত্রের অভাবের চেয়েও ছাত্র-বেতনের অভাবে পাঠশালাটি যখন উঠিয়া গেল, তখন স্বয়ং শ্রীমান রসিকচন্দ্রই বলিল, "বৌ এর ভাগ্যেই তার পড়াশুনা বন্ধ হইল।"

কিন্তু ভাগবত মণ্ডল জামাতা বাবাজীকে ছাড়িল না। যাকে বিষয় আশয় দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছে, সাধ্যপক্ষে তাহাকে মূর্খ রাখিলে, লোকের কাছে নিন্দা শুনিতে হয়,—ছেলের মা ও মেয়ের মা'র গাল খাইয়া হজম করিতে হয়, মেয়ে বড় হইলে মেয়ের মুখ ভারী দেখিতে হয়, মেয়ের দু' কথা শুনিতেও হয়, এবং বিনা প্রয়োজনেও জামাইএর অভিযোগ শুনিতে হয়। সর্ব্বোপরি মেয়ের কষ্ট দেখিলে বাপ মা ও আত্মীয়-স্বজনকেও ভবিষ্যতে অনুতপ্ত হইতে হয়; বোনের বিয়েতে ভাগবত তাহা বেশ বুঝিয়াছিল। সুতরাং একমাত্র আদরিণী মেয়ের ভবিষ্য-সুখশান্তির জন্য রসিকের ব্যয়ভার সে মাথায় লইয়া দূরবর্ত্তী হাই-স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিল। দূরবর্ত্তী বলিয়া রসিকচন্দ্র কিছুদিনের মধ্যেই স্কুল-বোর্ডিংএ আশ্রয় লইল।

পড়াশুনা না হইলেও রসিকচন্দ্রের জামা, জুতা ও চুলের বাহার খুবই খুলিয়া গেল। লাঙ্গল-ধরার ইতিহাস সে ভুলিতে চেষ্টা করিল। নিজে যে একজন বুদ্ধিমান, বিদ্বান, বিষয়ী ও প্রতিষ্ঠাপন্ন লোক, সেই ভাবটাই সে সবাইকে দেখাইতে লাগিল। সহসা একদিন দু'বার ভেদ-বমিতে ধোনাই শয্যায় শুইয়া যখন রসিকের কথা ভাবিতে লাগিল, সেই সময়ে অনেক ঘুরিয়া বলাই এক হাতুড়ে ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সামান্য পল্লীগ্রামে ডাক্তার-কবিরাজের অভাবের জন্য ধোনাই রসিককে ডাক্তারী পড়াইবার কল্পনার কথা স্মরণ করিয়া, রসিককে সকল রকমে বড় করিবার কল্পনা ও গর্ব্ব মনে রাখিয়া, চোখ বুজিয়া দু'বার রসিককে ডাকিয়া, চোখের জল ছাড়িয়া দিল। রোগীকে অভয় দিয়া টাকা লইয়া ডাক্তারও বাহির হইল, রোগীরও আসন্ন সময় বুঝিয়া বাড়ীর লোক সব কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। বলাই চোখের জল মুছিয়া দেখিল, শত্রু মিত্র সবাই এ সময়ে ধোনাই মণ্ডলের শেষ দেখিতে আসিয়াছে। রসিকের শ্বশুরের দেওয়া ও আপনার সামান্য সম্পত্তির গর্ব্বে যে ধোনাই সকলকেই স্পষ্ট বলিয়াছে যে, আমি কোনদিন কারও সাহায্য চাই না, আজ তাদের সাহায্যেই সে আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইয়া শ্মশানে যাত্রা করিল। সেই প্রতিবেশীরাই তার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের সঙ্গে তার সদ্য বিধবা স্ত্রীকেও সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

(৩)

বলাইএর যে বুদ্ধি মোটেই নাই, রসিকচন্দ্র তাহার মায়ের কাছে ও স্ত্রীর কাছে প্রমাণ করিয়া যখন পাড়ায় প্রমাণ করিল, তখন গ্রামের বালকেরাও আর বলাইকে টিট্‌কারী না দিয়া ছাড়িল না। বলাই যে মোটেই কাজের লোক নয়, ইহাও প্রমাণ করিতে সে বিলম্ব করিল না। রসিকের মায়ের যেমনতর ভাইই বলাই হউক না কেন, রসিকের মা কিন্তু ভাইটিকে মন্দ বাসিত না। ছেলে ও বৌ যখন কথায় কথায় বলাইএর দোষ ধরিত তখন রসিকের মা ভাইয়ের হইয়া দু'কথা বলিতে যাইত, কিন্তু উপযুক্ত ছেলের কাছে ধমক খাইয়া অগত্যা শেষে তাহাকে ছেলের মতেই মত দিতে হইত।

রসিকের ছেলেটী বলাইএর কোলেপিঠেই মানুষ হইতেছে। বলাইও ভালবাসিবার পাত্র পাইয়াছে; শিশুটিও স্বার্থশূন্য সরল প্রাণে বলাইয়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, বুকে বুক লাগাইয়া, মুখে মুখ রাখিয়া খোলা-মনে শিশুর সরল হাসি হাসিয়া, বলাইকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। সকলের অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার ও তীব্র তিরস্কারের মধ্যে এই কচি শিশুর সরল হাসিতে সে সত্যসত্যই মনে করিত, অনেক দিনের যন্ত্রণাময় ক্ষতে কে যেন অমৃতের মলম দিয়া প্রলেপ দিয়াছে। এতদিনের পর সুপ্ত শরীরের শান্তি সে একটু-একটু অনুভব করিতেছে।

শিশুটিকে বুকে লইয়া বলাই তাহাকে একটা মুড়ার

মোয়া খাইতে দিল। শিশু আবদার ধরিল, "আমি কলা খাব।"

নেপথ্য হইতে রসিকের স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "বয়সে কি আর বুদ্ধি বাড়ে! চায় কলা, দিলে মুড়ীর মোয়া! মোয়াকে মোয়াও গেল, কলাকে কলাও যাবে,—মাঝ থেকে ছেলেটা আবদারে হবে,—বায়না নিলে আমারই প্রাণ বেরুবে।" ইহার একটা কথাও বলাইয়ের কাণে গেল না।

বয়সে বুদ্ধি বাড়ে কি না, কথাটা ভাবিতে-ভাবিতে বলাই নিঃশব্দে ঘরে গিয়া একটা কলা আনিয়া অর্দ্ধেক খোকাকে একটু-একটু করিয়া খাইতে দিল। বাকী অর্দ্ধেক আপনার হাতের মুঠার মধ্যে রাখিয়া বলিল, "দূর যা—পাখীতে কলা নিয়ে গেল! দাঁড়াও ত একবার কোল থেকে নেমে, কোথায় গেল পাখীটা উড়ে, একবার দেখে আসি—আমার দাদুর কলা!"

খোকা দু'একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া মুখ মলিন করিয়া বলিল, "আমি খাব না, হাতে ক'রে রাখব।"

বলাই হাসিয়া বলিল, "পাবে কোথায়? পাখী কি আর ফিরিয়ে দেবে!"

খোকা কথা না বলিয়া দাদার না হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। বলাই হাসিয়া ছোট্ট দাদামণিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "গা-টা যে গরম হয়েছে দাদুমণি।" কথাগুলা উচ্চারণ করিতে না করিতে নেপথ্য হইতে পুনরায় শিশুর মায়ের মন্তব্য বলাইএর কাণে গেল, "গা গরম হয়েছে, তবে কলা খেতে দেওয়া হ'ল কেন? বাড়ী এসে এ কথা শুনলে আজ বাড়ীশুদ্ধ লোককে ঝাঁটাপেটা করবে।"

"না মা, আমার গা গরম হয় নি।"

"তুই ত ছাই বুঝিস্, হতভাগা ছেলে! হতভাগা ছেলে যে যা দেবে, তাই খাবে—তাই খাবে! আয়, শিগ্‌গির নেমে আয়, দেখি আমি গায় হাত দিয়ে।"

বলাই কিছু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "খোকা আর কলা না চায়, সেইজন্যেই বলেছিলাম;—খোকা ভাল আছে।"

পাছে মায়ের কর্ত্তব্যের কঠোর শাসনে খোকা নিগৃহীত হয়, বলাই সেই ভয়ে খোকাকে ছাড়িয়া দিল। সন্তান-বাৎসল্যে হস্তরূপ থার্ম্মোমেটারে, মায়ের পরীক্ষায় খোকা যখন উত্তীর্ণ হইয়া 'দাদার' গলা জড়াইয়া ধরিল, তখন বলাই ধীরে-ধীরে বলিল, "খোকাকে নিয়ে একটু বাইরে যাব?"

"না—অসুখ করবে।"

"তা হ'লে খোকাকে নাও। আমার মাথাটা কেমন ক'চ্ছে, আমি একটু হাওয়ায় ঘুরে আসি।"

"গরুর ঘাস-জল নাই। কৃষাণরাও বাড়ী গেছে। চাকর দুটো বিদেয় দেওয়া হ'ল, এখন আমি সকলের পায় তেল মাখিয়ে বেড়াই!"

বলাই ধীরভাবে বলিল, "এসে দোব এখন।"

"এসে আর দিতে হবে না। গো-বধের ভয় আমারও আছে। খুকীটের জ্বর হয়েছে, একটা পাচন যোগাড় ক'রেও দিতে পাচ্ছি না, এমনই অদেষ্ট।"

কি একটু ভাবিয়া লইয়া বলাই বলিল, "আচ্ছা, ঘাস-জল দিয়েই যাচ্ছি আমি, পাচনে কি কি চাই, তুমি ততক্ষণ তাই ঠিক ক'রে রাখ।"

ঘাস জল দেওয়া হইলেও বাহিরে যাওয়ার হুকুম মিলিল না; বরং বলাই বুঝিতে পারিল, বাহির অপেক্ষা ঘরে তাহার বিশ্রামের চেয়ে ঢের বেশী কাজ জমিয়া আছে। গোহালে গরু রাখিতে হইবে, ছেলে-ভুলানো ছড়া গাহিয়া খুকীকে ভুলাইতে হইবে, জাল দিয়া পুকুরে মাছ না ধরিলে নুন-ভাত হয় ত অদৃষ্টে জুটিবে। তা ছাড়া উঠান থেকে কাপড়-চোপড় ঘরে তুলিতে হইবে, তামাক কাটিয়া মাখিতে হইবে, সময় পাইলে মোল্লাবাড়ী হইতে কেনা কাঠগুলো যতটা পারা যায়, আনিতে হইবে। সে-দিনের মত তার মাথার যন্ত্রণার কথা তাকে ভুলিতে হইল। গোহালে গরু রাখিয়া, যখন মাছ ধরিবার উদ্যোগ করিল, এমনই সময় রসিকচন্দ্র আসিয়া হুকুম দিল, শিগ্‌গির বাজারে যাও, সম্বন্ধী মদন বাবু আসিতেছেন, শিগ্‌গির দুধ, মাছ, পান নিয়ে এস।

খুকীর পাচনের জন্য ঔষধের দরকার আছে কি না, বলাই দু'বার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন জবাব পাইল না; অগত্যা টাকা পয়সা লইয়া বয়সে বুদ্ধি বাড়ে কি না, ভাবিতে-ভাবিতে মাছ, দুধ কিনিতে বাজারে চলিয়া গেল।

সে ভাবিয়া দেখিল, বুদ্ধি তার অনেক বাড়িয়াছে; অন্ততঃ নিজের অবস্থা বুঝিবার বুদ্ধি তার এতই বাড়িয়াছে যে, সে কিছুতেই ভাবিয়া পায় না, সে এত কষ্ট কেন করে! স্ত্রী-পুত্র বোধ হয় এ জন্মে তার নাও হইতে পারে। বাড়ী

হয়,—সে ত বিনা অর্থে হইতেই পারে না। বাকী রহিল শুধু পেটের চিন্তা—সে জন্য অবশ্য কারও কাছে তার জবাবদিহি নাই। এমন ঢের দিন হয়, বোন্ বা বোন্‌পোর তিরস্কারে পেট খালি থাকিলেও পেটে দুটো ভাত দেওয়ার জন্যও কেহ অনুরোধ করে না! তবে তার কি ঠেকা! আর সে ঠেকাই বা এমন কি, যে ক্রমাগত এত জুতো, লাথির পর এক মুঠো ভাত চাই-ই চাই!

বাজার হইতে মোট মাথায় করিয়া আসিয়াই বলাই বলিল, "দিদি! আমার মাথাটা কেমন কচ্ছে—আমি একটু শুয়ে পড়ি।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে তার নির্দিষ্ট অতি মলিন ছেঁড়া কাঁথায় শয়ন করিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিল, কি ঠেকা! কিসের ঠেকা!

রসিকচন্দ্র একটা ধমক দিয়া মিঠেকড়া ভাষায় বলিল, "আজকে ফাঁকি-দেওয়া চল্‌বে না মামা! বাড়ীভরা ভদ্দরলোক, তামাক দেওয়ার লোক পর্য্যন্ত নাই,—কাজের অন্ত নাই;—অথচ এমনি সময় তুমি নির্লজ্জের মত শুয়ে থাক্‌বে; আর আমার কাজকর্ম্মের বেবন্দোবস্ত দেখে সুদন ভায়া টিট্‌কারী দিয়ে বল্‌বে, তুমি লোকজন শাসনে রাখতে জান না—এ কিছুতেই হ'তে পারে না। ওঠ শিগ্‌গির, লুচীটুচী ভেজে ফেলে, ওঁদের সকাল-সকাল খাইয়ে তারপর অসুখ হ'য়ে থাকে এসে না হয় শুয়েই থেকো।"

'যাচ্ছি,' বলিয়া বলাই পাশ ফিরিয়া শুইল, আর নিজের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। মাথা বড় গরম হইয়াছে বুঝিয়া মাথায় একটু জল দিয়া বলাই রান্নাঘরে ঢুকিল। রান্নাঘরে বসিয়াই খবর পাইল, খোকার জ্বর হইয়াছে, রসিকের স্ত্রীর রান্নাঘরে আসা আজ অসম্ভব।

রসিকের তর্জ্জন গর্জ্জন বলাইএর কাণে গেল। বলাই রাগিল বটে, কিন্তু চুপ করিয়া গেল। রসিক রান্নাঘরে ঢুকিতেছে দেখিয়া বলাই লুচীর খোলা নামাইয়া রসিকের উৎকট রাগের বিকট মুখভঙ্গী দেখিয়া আপনাকে আপনি সাম্‌লাইয়া লইতে লাগিল।

অর্দ্ধখণ্ড কদলীতে জ্বরের মাত্রা কতটা বাড়াইতে পারে, রসিক-পত্নী বিনাইয়া-বিনাইয়া যতই স্বামীকে তাহা বলিতে লাগিল, ততই রসিকের মা কি জানি কেন এই দূর সম্পর্কীয় ভাইটির জন্য আজ কথা কাটাকাটি করিতে লাগিল। রসিক যখন মাকেও ভ্রুকুটী-ভঙ্গীতে শাসন করিল, তখন বলাই আরও অধীর হইয়া পড়িল। মা যখন কাঁদিয়া-কাটিয়া শুইয়া পড়িল, রসিক তখন পত্নীর ইন্ধন-প্রদত্ত সমস্ত ক্রোধাগ্নি উদ্গার বলাইএর সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিয়া তাহাকে পোড়াইয়া মারিতে লাগিল। বলাই নতমুখে কেবল বলিল, "বাড়ীতে অতিথি, হাতে ঢের কাজ,—আজ থাক, কাল যেন আমার বিচার হয়।"

ক্রোধান্ধ রসিক আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল, "আজ সকলের সামনে তোমায় ঝাঁটা মেরে বিদায় করবো, তবে আমি ছাড়বো। যে আমার ছেলেকে মেরে ফেল্‌তে পারে, সে আমাকেও খুন কত্তে পারে! তোমার মত ছোট লোকের সম্পর্কেও আমার কোন প্রয়োজন নেই—সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে আজ রাত্তিরেই তুমি আমার বাড়ী থেকে বিদায় হও।"

বলাই কখনও রাগে না; কিন্তু আজ রাগে কাঁপিতেছিল। ইহা শুধু অন্য দিনের ক্রোধ বা তিরস্কার নহে, আজ আত্মীয়, স্বজন, অতিথি ও স্বজাতির সম্মুখে ঘোর অপমান! চিরসহিষ্ণু বলাইএর কাছে ইহা আজ অসহ্য বোধ হইল। সে রান্নাঘর ছাড়িয়া উঠানে দাঁড়াইয়া গামছায় গায়ের ঘাম মুছিতে লাগিল, আর আত্মসম্বরণের চেষ্টা করিতে লাগিল।

অবস্থা দেখিয়া রসিক একটু সঙ্কুচিত হইল। তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিল, "কি, তুমি রাঁধবে না?"

দৃঢ়কণ্ঠে বলাই বলিল, "ইচ্ছা নাই।—তবে বাড়ীতে অতিথি, না খাইয়ে দিলে তারাও অনাহারে থাক্‌বে, দিদিরও বকুনী খেতে হবে।"

রসিক তার স্পর্দ্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইল। চোখ লাল করিয়া বলিল, "আজ যদি আমার অপমান কর ত তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন! গাছতলায়ও তোমায় দাঁড়াতে দোব না।"

বলাই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সেও চোখ লাল করিয়া বলিল, "বটে! তবে আমি রাঁধব না।"

"রাঁধবে না?"

"না।"

"কি ছোটলোক! আমার খেয়ে, আমার প'রে আমার অপমান! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর! আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এত বড় কথা! বেরো—বেরো আমার বাড়ী

থেকে! বেরো শিগ্‌গির—বেরো!"

রসিক অপেক্ষাও বলাই রাগে বেশী কাঁপিতেছিল। বেগতিক দেখিয়া সুদন আসিয়া রসিকের হাত ধরিতে গেল। রসিক হাত ছিনাইয়া লইয়া মামাকে মারিতে উদ্যত হইল। বলাই মার খাওয়ার জন্য যখন অগ্রসর হইল, বলাইএর চক্ষু দেখিয়া রসিক তখন বুঝি বা ভয়েই সঙ্কুচিত হইল!

বলাই অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, বলিল "বাড়াবাড়ি করো না বলছি। এখনও বলছি চুপ কর।"

রসিক আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সুদন বলাইকে ইঙ্গিত করিলে সে সরিয়া গেল। যারা গোলমাল শুনিয়া তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, বলাইএর ধমক খাইয়া তারাও যা-তা বলিতে-বলিতে সরিয়া গেল।

সুদন রসিকের হাত ধরিয়া যখন তাকে বৈঠকখানায় লইয়া গেল, স্ত্রী-কণ্ঠের কঠোর শাসন তখনও বলাই সহিষ্ণুতার সহিত হজম করিতেছে। বলাইমামা মাথায় আর একটু জল দিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। কিন্তু সব রান্নাই গোলমাল হইয়া গেল। লুচি ভাজিতে ঘি কম পড়িল, ছোলার ডালে নুন দিল না, ভুলে ডালনায় দুবার নুন দেওয়া হইল। পিষ্টক অর্দ্ধপোড়া হইল, অম্বল পানসা হইয়া গেল। দ্বিতীয় নম্বর মোকর্দ্দমায় বলাই অকথ্য তিরস্কার শুনিয়া, অতিথি ভোজন করাইয়া, অনাহারে শয্যায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কিসের ঠেকা আমার?—কার কেনা গোলাম আমি! কেন এত সহিব!

(৩)

কেহ বলিল, বলাইএর বয়স হইয়াছে, বুদ্ধি হইয়াছে, দুর্ব্ব্যবহারে ভগিনীপতির সংসার ছাড়িয়াছে। কেহ বলিল, ভাগ্নের মাথায় হাত বুলাইয়া দু-পয়সা হাতে করিয়াছে, বিয়ে-থাওয়ার যোগাড় করিয়া সংসারী হইবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ বলিল, রসিক এত করিয়া মানুষ করিয়াছে, আজ স্বার্থপরের মত তাকে একলা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে! বলাইএর কাণে কিন্তু ইহার কোন কথাই পৌঁছিল না! সমালোচনা, নিন্দা বা সুবুদ্ধি প্রদান, কিছুই বলাইর কাজে লাগিল না; এ দিকে কিন্তু মণ্ডল-সংসার অচল হইল। বিনাবেতনে বলাই চাকর যেমন প্রাণ দিয়া খাটিত, টাকা দিলেও তত কেহ খাটে না, রসিক ইহা ক্রমশঃ বুঝিল; কিন্তু রসিক-গৃহিণী বারবার বুঝাইয়া দিল, মাইনের চাকর কথা শোনে, মনীবকে মানে; চুরী করিতেও ভয় পায়, কথা বলিতেও আগুপাছু ভাবিয়া লয়। তা ছাড়া এ খায় বেশী কাজ করে কম, আমাকে ত মোটেই মানে না। রসিক কোন জবাব না দিয়া একটা 'হুঁ' দিয়া বাহিরে গেল। রসিক-পত্নী বুঝিল, জঞ্জালটা আর আসিয়া জুটিবে না।

টাকার গায়ে হাত পড়িয়াছে বলিয়া রসিক পত্নীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াও মামার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। রসিকের বৃদ্ধা মাতাকে শুধু বধূর সঙ্গে রান্নার সাহায্য করিতে হইত তাহা নহে, গরুবাছুরের কাজ, উঠান ঝাঁট দেওয়া, ছেলে রাখা, বাসনমাজা অনেক কাজই বুড়ীকে করিতে হইত। কথা বলিলে রক্ষা থাকিত না, বধূ বুঝাইয়া দিত, দুটো যে অন্ন জোটে, সেও তারই কৃপায়। বৃদ্ধা বধূর সম্মান বুঝিয়া চলিলে বউও মা, ওমা, মা বলিয়া সুমধুর ডাকে বৃদ্ধার কাণ অমৃতে ভরিয়া দিত। নিতান্ত দরকার হইলে শাশুড়ীর হইয়া একটু আধটু কাজ করিত, এমন কি শাশুড়ীর খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধার কথায়ও কখন কখন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিত।

বৃদ্ধ বয়সে অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর ভাঙ্গিলেও বধূকে সে সাধ্যপক্ষে কোন কাজ করিতে দিত না। এ ঔষধে বধূরও প্রভুত্ব-রোগের কিছু কিছু প্রশমিত হইত; কিন্তু বৃদ্ধা যখন অপারগ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল, বধূও তখন স্বামীর কাছে তার রোগের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। স্বামী তার অসুখের কথায় কাণ দেয় না দেখিয়া সেও শয্যা গ্রহণ করিল। লোক রাখিয়া সুবিধা হয় না বুঝিয়া রসিকচন্দ্র প্রমাদ গণিল। অগত্যা মা ও স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য পাশের গাঁয়ের নূতন কবিরাজ ধন্বন্তরী দাসকে ডাকিতে হইল। রসিক নিজে নিত্যরোগী, অথচ পয়সার ভয়ে কখনও ঔষধ খায় না। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, ঔষধ খাওয়া আমি পছন্দ করি না। সেই রসিক যখন কবিরাজ ডাকিয়াছে, তখন গাঁয়ের সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা হইলে তার মা ও স্ত্রীর অসুখ নিশ্চয়ই বেশী হইয়াছে।

বধূর অসুখের দিকে বিশেষ নজর না দিয়া রসিকের মার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া কবিরাজ যখন হতাশ

হইলেন, তখন রসিক বড়ই ভাবনায় পড়িয়া গেল। মায়ের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিয়া ভাবিতে লাগিল, তার ভবিষ্যৎ কি! ডেপুটীগিন্নীর কল্পনা ঘুচিয়াছে, এখন যে কেরাণি-গিরিও জুটিবে না, চাষবাস করিতেও পারিবে না, ইহা ভাবিয়াই তার মাথা ঘুরিয়া গেল। লাঙ্গল চষিতে, গরু তাড়াইতে, জুতা জামা ছাড়িতে, অভিমান ছাড়িতে, পরের কাছে সাহায্য চাহিতে, সে কিছুতেই পারিবে না।

সময় বুঝিয়া শত্রুপক্ষ অত্যাচার আরম্ভ করিল। শত্রুপক্ষ মিথ্যা মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়া জমি বেদখল করিল, দাঙ্গাহাঙ্গামায় রসিকচন্দ্রকে মারধোর করিল। রসিক শত্রুপক্ষের ভয়ে মনে-প্রাণে মামাকে ডাকিতে লাগিল। মামাকে পাইলেই যে ইহার প্রতিশোধ দিতে পারিবে, বুঝিয়া দিনরাত্রি মামার চিন্তা করিতে লাগিল।

রসিক জীবনে কখনও এক পয়সাও উপার্জ্জন করিয়া দেখে নাই; অথচ তার বিশ্বাস ছিল, তার মত লোককে রাখিবার জন্য না জানি কত লোকই ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছে! ভবিষ্যতের চিত্র দেখিয়া তার সকল বুদ্ধি-বিবেচনা গোলমাল হইয়া গেল। কবিরাজকে টাকা দিয়া যখন মনে করিত তার বুকের রক্ত এক এক ফোঁটা কমিতেছে, তখন তার পুঁজির দিকেও নজর পড়িল। দরিদ্র ধোনাই রসিকের বিবাহের পরে হঠাৎ বড়লোক হইয়া মোড়লী, মাতব্বরীতে মামলা-মোকর্দ্দমায় কি করিয়া ক্রমে ক্রমে এমন হইয়াছে; মাও যখন চক্ষু বুজিল, বাবার কার্য্যকলাপও ততই স্পষ্ট হইয়া তার অর্থকষ্ট ক্রমশঃ বাড়াইয়া দিল। ধার বাড়িল, উদ্বেগ বাড়িল। আজ সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, মণ্ডল-সংসার তার, এ সংসারের দায়িত্ব তার, ভালমন্দ তার, সব তার; অথচ সকল রক্ষার মূল যে অর্থ, সেই অর্থাভাবেই সে দুদিন পরে মানের দায়ে মাথায় হাত দিয়া বসিবে। মাঠে সে-ই চাষ করিবে, সে-ই লাঙ্গল চষিবে, সে-ই গরু-বাছুর রাখিবে! রসিকচন্দ্রের চোখে জল আসিল, সে একমাত্র বলাই মামাকে স্মরণ করিতে লাগিল।

(৪)

অবস্থা যেমনই হউক, মায়ের শ্রাদ্ধ, মেয়ের বিয়ে অবস্থার ধার ধারে না,—রসিকচন্দ্র তাহা বুঝিয়া ঘটা করিয়া মায়ের শ্রাদ্ধ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইল! যে কোনও দিন কারও পরামর্শ গ্রহণ করে নাই, আজ সেই সবার পরামর্শে ধার করিয়া খুব খরচ করিয়া মান কিনিয়া বসিল! অথচ যারা মণ্ডলের পো'র প্রশংসা করিয়া দই, লুচী, সন্দেশ, রসগোল্লার জয়জয়কার করিয়াছিল, আজ তাহারাই শোধ দিতে পারিবে না বলিয়া পঞ্চাশটা টাকা ধার দিতে ইতস্ততঃ করিল। জমিবন্ধক ও বাড়ী-বিক্রীতে যে এখনও টাকা পাওয়া যায়, সে পরামর্শ দিতে অনেকেই ভুল করিল না। রসিকও এসব পরামর্শ যথাসাধ্য শুনিয়া যাইতে লাগিল।

দেনার সুদ যত বাড়ে, মাথার বুদ্ধি তত গোলমাল হইয়া যায়, ইহা বুঝিয়া রসিক মনে-মনে স্থির করিল, দেনা শোধ দিতেই হইবে। কিন্তু উপস্থিত কোন উপায় না দেখিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল! বিপক্ষেরাও সময় বুঝিয়া জমাজমি বেদখল করিয়া, মামলা করিয়া, দলাদলি করিয়া রসিককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

টাকার দায়ে রসিক জমি বন্ধক দিয়াছে, অথচ পত্নীকে জানায় নাই, ইহা জানিয়াই রসিক-পত্নী মুখের কপাট খুলিয়া দিল। রসিক রণে ভঙ্গ দিলে একথা লইয়া একলা একলা ঝগড়া করিয়া পরাস্ত হইয়া মনে মনে কেবলই ভাবিতে লাগিল, যা আমার, তাতে আমার কোন হাত নাই! আমার পরামর্শ পর্য্যন্ত প্রয়োজন নাই! সে সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল।

পত্নীর অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে বিরক্ত হইয়াও রসিক যতই তাহার সহিত মিশিতে চেষ্টা করিল, সে ততই গম্ভীর হইয়া গেল। অনেক কাকুতি মিনতির পর স্ত্রীর সঙ্গে ভাব করিতে না পারিয়া রসিক রাগিল, কিন্তু গৃহিণী তাহা গ্রাহ্যও করিল না। রসিক ক্রমশঃ রাগে ফুলিয়া পত্নীকে স্পষ্ট বলিল যে, সে প্রয়োজন হইলে কিন্তু গেরুয়া পরিয়া উদাসীন হইয়া যে দিকে দু'চক্ষু যায়, সেই দিকেই চলিয়া যাইবে। ইহাতেও রসিকের স্ত্রী দমিল না, বা তাহাকে গ্রাহ্যও করিল না। রসিক তখন অভিমানে, ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িয়া আপনার কর্ত্তব্য আপনি এমনই ভাবে ঠিক করিতে লাগিল যে, জগতে সে একাকী, তার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কিছু নাই! সে গেরুয়া পরিলেও কেহ যখন ফিরিয়া তাকায় না, সন্ন্যাসী হইলেও কেহ গৃহী হওয়ার জন্য যখন অনুরোধ করে না, তখন এ মায়ার বন্ধনেই বা তার কি প্রয়োজন আছে!

একাকী শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া, সমস্ত রজনী অনিদ্রায় কাটাইয়া রসিক আপনাকে লইয়াই আপনার ভবিষ্যৎ স্থির করিল। তার ভাবনায় অংশ আর, এজন্মে স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে না, ইহা সে স্থির করিল।

রসিকের স্ত্রী দুর্ব্বল শরীরে বেলা চারদণ্ড অবধি ঘুমাইয়াও আবার পাশ ফিরিয়া শুইল; অন্য দিনের মত রসিক আসিয়া ডাকিয়া তুলিবে, সেই ভরসাতেই সে মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করিয়াও শুইয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল, কিন্তু রসিকের দেখা মিলিল না। খোকার কান্নায় যখন সে উঠিয়া বসিল, তখন চাহিয়া দেখিল, বাড়ীঘর রোদে ভরিয়া গিয়াছে। দুপুর বেলার মধ্যেও যখন স্বামীর দেখা মিলিল না, তখন পেটের জ্বালায় রন্ধনশালায় ঢুকিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিতেছিল, আর বলিতেছিল, আমার এই অসুখের শরীর, পোড়ারমুখো তাও বুঝবে না!

আজ পোড়ারমুখোর দেখা পাইলে সে যে কি তুমুল-কাণ্ড করিবে, মনে মনে তার তালিকা প্রস্তুত করিয়া, মনের মধ্যেই একেবারে চাপিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু পোড়ার-মুখো যখন কিছুতেই আসিল না, তখন পাশের বাড়ীর এক বুড়ীকে ডাকিয়া আনিয়া রাত কাটাইল; সকাল বেলা সেই বুড়ীকে নিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। এ ভিটা উচ্ছন্ন দিবে, সরষে বুনিবে, একথাও দু একজনকে বলিয়া গেল।

(৫)

সেদিন রাত্রিতে রসিক ও বলাই ভয়ে-ভয়ে যখন বাড়ী ঢুকিল, তখন রাত দুপুর হইয়াছে। জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই। রসিক ভীত হইল। বলাই বুঝাইল, বৌমা নিশ্চয়ই বাপের বাড়ী গিয়াছে, তোমার কোন ভয় নাই। রসিক তাহা বিশ্বাস করিল না, একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল; ইচ্ছা হইল, এখনই যাইয়া অন্ততঃ খবরটা লইয়া আসিয়া নিজের পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করে, মনে-মনেও নিশ্চিন্ত হয়। বলাই মনে-মনে হাসিল। ভাবিল, এবার বাবু তোমার জব্দের পালা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, সাঙ্গ হইতে ঢের দেরী। অনাহারে সেদিন দুটী প্রাণী পড়িয়া রহিল, কথা-বার্ত্তায় রাত কাটিল। পরদিন সকালে গ্রাম-বাসীরা রসিককে অনেক তিরস্কার করিল, বৌ যে বাপের বাড়ী গিয়াছে, সে সংবাদটাও দিল, যে বুড়ীর সঙ্গে বৌ বাপের বাড়ী গিয়াছিল, সে বুড়ী আসিয়াও পৌঁছা-সংবাদ দিয়া গেল। রসিক কিন্তু বিশ্বাস করিল না। অথবা কিছু কিছু বিশ্বাস করিলেও সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করিতে শ্বশুর-বাড়ী গেল। মনে-মনে আশা ছিল, অপরাধ স্বীকার করিলেই খোকার মাও শান্ত হইয়া হাসিমুখে খোকাকে লইয়া তাহার সহিত চলিয়া আসিবে।

ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে রসিক যখন বাড়ী ফিরিল, বেলা তখন দুপুর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বলাই কখনও মনে করে নাই, শ্বশুর-বাড়ী হইতে এত সহসা জামাতা ফিরিয়া আসিতে পারে! বলাই নিজের ভাত রসিককে দিয়া আবার ভাত চাপাইল, কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না। রসিক খাইতে বসিয়াই উঠিয়া গেল। রাগের চোটে বৌএর নামে যা-তা বলিতে লাগিল। বলাই চুপি-চুপি বলিল, "ঘরের কথা পরকে শোনাতে নাই।"

পরদিন প্রভাতেই রসিক প্রস্তাব করিল, বলাইকে বিবাহ করিতে হইবে। বলাই আপত্তি করিল; বলিল, "কত দিন মহাজনের পায়ে তেল দিয়ে তাদের জন্য কত গাধার খাটুনি খেটে চাকরী যোগাড় করেছি। আমার এখন ভাল চাকরী, চাকরীতে ন্যায্য-ভাবে দু-পয়সা আছে। আমি এখন চাকরী ছেড়ে সংসার পাতব না; আর পাতলেও আমার পাতানো সংসার আমার সঙ্গে থাকলে, তোমার তাতে কোন উপকারই হবে না।"

"চাকরীতে যা পাবে, তা আমি পাইয়ে দোব। তুমি এখানে থাক। এখানেই বিয়ে-থাওয়া ক'রে বসবাস কর।"

বলাই বলিল, "সে কি করে হবে? আমার বাড়ী নাই, ঘর নাই, আমায় লোকে মেয়েই বা কেন দেবে? আর দিলেই বা কোন্ সাহসে আমি বে' করবো! স্ত্রী-পুত্র পালনের সঙ্গে অর্থের বড় নিকট সম্বন্ধ।"

রসিক ভাবিয়া দেখিল, ঋণদায়ে এবং শত্রুপক্ষের চাতুরীতে তাহার ভূ-সম্পত্তি ত প্রায় পরহস্তগত। এখন যদি সে মামার নামে বে-নামীতে বিষয় হস্তান্তর করিয়া দেয়, তাহা হইলে হয় ত মামাকে বিষয়ের ফাঁদে ফেলিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে এবং মাতুলের সাহায্যে বিষয় উদ্ধারও করিতে পারে। এই মনে করিয়া সে বলিল, "সে হবে মামা, সে হবে।"

বলাই বলিল, "কি করে হবে! আগে টাকা হউক, তার পর সব হবে।" রসিক বুঝিল, মামা সুযোগ পাইয়াছে। মনে-মনে ভাবিল, বিষয়-আশয়ের লোভ দেখাইয়া চাকরী ছাড়াইতে হইবে; নতুবা মামা বড়লোক হইবে। আর মামা না থাকিলে এখানে আমার টেঁকাও দায় হইবে। রসিক আর এক চাল চালিয়া বলিল, "তা আমার বাড়ীতেই থাকবে, আমার জমিজমাই চাষ করবে, অংশমত মজুরীর ভাগ, লাভের ভাগ পাবে।"

"তোমার বাড়ী যখন ছিলাম, তখন ছিলাম; এখন আর থাকব না। গায়ের বল কিছু চিরদিন থাকবে না,—তখন ত আমার একটা উপায় হওয়া চাই।"

"আমার মত ভাগ না থাকতে তুমি নিরুপায় কিসে মামা?"

বলাই মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা পরের ভরসা কি আর ভরসা!"

রসিক মনে-মনে বিরক্ত হইয়া মুখে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি বড় স্বার্থপর হয়েছ মামা। তখন ত কই একদিনও তোমার আপন-পরের হিসাব ছিল না! দু-দিন বাইরে থেকেই আমাকে পর ভাবতে লাগলে। কি আর বলি! আমি বলছি, তুমি এখানে থাক, তোমার ভাল হবে।"

বলাই মনে-মনে হাসিল। মুখে বলিল, "পরের বাড়ী আমি থাকব কেন?"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রসিক বলিল, "তা অংশ লিখে দিচ্ছি; দু আনা না হয় চার আনা তোমার থাক, কেমন?"

বলাই বুঝাইয়া দিল, তাতে তার পোষাইবে না।

তাতে যে পোষাইবে না কেন, রসিক তাহা চিন্তা করিয়া, অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "কতটা তোমার চাই?"

রসিক যাহা ভাবিতেছিল, মামা সেদিক দিয়াও গেল না। কহিল, "আমার কি জিনিস যে, আমার চাই? তবে তুমি যদি দাও ত আমায় পুষিয়ে দাও। এই যদি জমাজমির, বাড়ীর আদ্ধেকটা দাও ত আমি তার ন্যায্য দাম দিতে রাজি আছি। তাতে তোমার দেনাও শোধ হবে, শত্রুরেও তোমায় কিছু কর্তে পারবে না। আর যে অবস্থা শুনছি, তাতে ব্যবস্থা না হলে অন্যেও ত নেবে?"

অন্যেও যে নিতে পারে, যে চিন্তা রসিকেরও ছিল। নিরুপায়ের উপায় এই ব্যবস্থাই রসিক মানিয়া লইয়া উপস্থিত শত্রুকে জব্দ করিয়া তার পর মামার সঙ্গে বুঝিবে, ঠিক করিল। তবুও এক কথায় রাজি হইল না। এমন বোকা মামাটা কি করিয়া এরই মধ্যে এত চালাক হইল! রসিক মনে মনে তাহাই ভাবিতে লাগিল এবং মনে মনে বলাইএর মনীবকে গাল পাড়িতে লাগিল। সে যদি না বলাইকে চালাক করিয়া দিত, তাহা হইলে কি এমন সর্ব্বনাশ হয়! রসিক তবুও হাল ছাড়িল না, উপায়ান্তর না থাকিলেও বলিল, "দু আনা নিলে ত তোমার হানি নেই মামা?"

"আমার হানি আমি বুঝি রসিক? আমারও যেখা হবে, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর কর্ত্তে হবে! তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে আমাকে চলতে হবে ত। হয় আট আনা দিও, আর না হয়, তোমার সম্পত্তি, যেমন করে পার, তুমিই রক্ষা কর্‌বে। মনে রেখো, তোমার শত্তুর এখন আমার শত্তুর; শুধু তোমার একার মাথা ভাঙ্গতে তারা আসবে না, দুজনার মাথা ভাঙ্গবার মত দলবল নিয়ে তাদের আসতে হবে। না হয় তোমার আপনার মামাকেও জিগেস কর, সুদন বাবুকেও জিগেস কর, আপনার মামার কথায় ও সুদনের কথায় রসিক আরও গরম হইয়া উঠিয়া বলিল, "পরের বুদ্ধি আমি কোন দিনও লই না।" বলাই জানিত, বহুবার ঝগড়া হওয়ার পর তারা বুদ্ধিও দেয় না, খবরও নেয় না। বলাই বলিল, "তাহ'লে আমি একটু সবার সঙ্গে দেখাশুনা করে আসি, তুমি তোমার বুদ্ধি ঠিক কর।"

(৬)

বিবাহ করিয়াই বলাই সস্ত্রীক চাকরী স্থলে চলিয়া গেল। রসিক দেখিল, মানুষ অবস্থা ভোলে, কিন্তু আঘাত ভোলে না। যার জন্য রসিক সর্ব্বস্ব দিল, সে সর্ব্বস্ব লইয়া তার চাকরী স্থলেই চলিয়া গেল; রসিক মরিল কি বাঁচিল, তাহা সে ফিরিয়াও দেখিল না। রসিকের সব রাগটা পড়িল তাহার স্ত্রীর উপর।

ইংরেজি লেখাপড়া শিখিয়া রসিক বছরান্তে চাকুরী করিয়া যে টাকা লইয়া দেশে ফিরিল, নিরক্ষর বলাই পাটের কেনাবেচা করিয়া তদপেক্ষা অধিক অর্থ ও সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে লইয়া দেশে ফিরিল। রসিকের স্ত্রী আসিল না, রসিকও শ্বশুরবাড়ী গেল না।

এ বাড়ীর যেন এখন বলাই মালিক, রসিক অনুগৃহীত। রসিকের এ ভাবটা মোটেই ভাল লাগিল না। বলাই ভাল ভাল ঘর তুলিয়াছে, গরু কিনিয়াছে, পুকুর কাটাইয়াছে, রসিকের কাছে কখনও এক পয়সাও চায় নাই, অথচ কোন অধিকার হইতেই তাকে বঞ্চিত করে নাই। রসিক ইহাতে সুখী হয় নাই, বরং মর্ম্মাহত হইয়াছে! দুঃখ সহিয়াছে, অথচ চুপ করিয়া সহিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে!

একে-তাকে দিয়া খবর লইয়া রসিক জানিল, খোকারও আসিবার ইচ্ছা নাই; রসিকের স্ত্রী স্বামীর নামও মুখে আনিতে চায় না। মনে মনে রসিক বুঝিল, বলাই মামাকে সর্ব্বস্ব দেওয়ার আগে তাঁদের মত নেওয়া উচিত ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে রাগ করিল সম্বন্ধী সূদনের উপরে। বিবাহিতা ভগিনীকে ভগিনীপতির সকল সংস্রব ত্যাগ করাইয়া রাখিতে চাহিলে আইন-সঙ্গত উপায়েও যে শ্যালক জব্দ হইতে পারে, রসিক তাহা স্থির করিয়া লইয়া এই স্থূল কথাটাতেও সূদনের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিয়া, মনে মনে অশিক্ষিত, ইতর লোকের উপর চটিল; কেন তারা ঘৃণার পাত্র তাহাও ঠিক করিল। ইতর ও ভদ্রের তফাৎ কেন হয়, তাহাও স্থির করিয়া লইল। শ্বশুর, শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিলে যে এরূপ হইত না, তাহাও সে ভাবিয়া তাদের জন্য এ সময়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। ভগিনীকে বাড়ীতে রাখিবার সূদনের আর কি কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া সূদনকে জব্দ করিবার নানা ফন্দী করিতে লাগিল। খোকাকে মায়ের কোল থেকে কাড়িয়া লইবে, ইহাই স্থির করিল। অবশেষে কিছুই হইল না। ছুটির দিন ফুরাইল, আবার চাকরী-স্থানে চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় বলাই মামার এত সৌভাগ্যের জন্য দু ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া, স্ত্রীটাকে অভিসম্পাত করিয়া, ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিয়া, এবং আপনাকে ধিক্কার দিয়া, রাগে ফুলিয়া, অভিমানে কাঁদিয়া ও অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল, ইহার প্রতিকার করিবে। মণ্ডল-বংশে দিসের আমার বিদ্যার গৌরব, যদি নিরক্ষর বলাইএর চেয়ে অর্থে ও সামর্থ্যে শ্রেষ্ঠ না হইলাম!

বলাই এবার বাড়ী শ্মশান করিয়া গেল না। তার এক সম্পর্কীয়া পিসীমাকে ঘরের ও এক সম্বন্ধীকে বাহিরের চাবি দিয়া জমিজমা ও বাড়ীর তদ্বিরের জন্য মজুর রাখিয়া, গরু কিনিয়া, সব ঠিকঠাক করিয়া পত্নী ও শিশুসন্তানসহ কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। কিছুদিন পরেই তার পিসীমা তাকে চিঠি দিয়া জানাইল যে, জমাজমির শোকে মদ খাইতে খাইতে রসিকের মৃত্যু হইয়াছে; রসিকের স্ত্রী বাপের বাড়ীতে মাথা গুঁজিয়া, সূদনের বৌর একান্ত অধীন হইয়া আছে,—দিন রাত্রি চোখের জলে ভাসিতেছে! যদি কোন প্রতিকার করিতে পার করিও। বলাই প্রত্যুত্তরে জানাইল, "তার জমাজমি ও বাড়ীর অর্দ্ধাংশ বর্ত্তমান, আমি থাকিতে তার বিষয়-আশয় দেখার লোকেরও অভাব নাই—সে আপনার বাড়ীতে আপনি আসিয়া থাকিলে আর তাকে পরের অধীন হইতে হয় না! সে যদি নির্ব্বোধই না হইবে, তা হইলে সে তার স্বামীর সঙ্গে এমন করিত না! সে আসিয়া ঘর করিলে রসিকও এমনভাবে মরিত না!" এ চিঠির জবাব পাইয়া বলাই বুঝিল, যে বাড়ীর সর্ব্বাংশে রসিকের স্ত্রীর অব্যাহত প্রভুত্ব ছিল, যেখানে বলাই আশ্রিত ও অনুগৃহীত ছিল, সেখানে সে এখনও অভিমান ত্যাগ করিয়া বসবাস করিতে চায় না। পিসীমাকে জানাইল, তবে আর তার জন্য আপাততঃ আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই। বলাইয়ের সম্বন্ধী চিঠির পর চিঠিতে জানাইল, শুধু শুধু অংশটা পড়িয়া আছে, কোনরূপে তাহা পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলে খুবই ভাল হয়।

বলাই বাড়ী আসিয়াই রসিকের ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য ও রসিকের স্ত্রীকে তার নিজের বাড়ীতে থাকিবার প্রস্তাব করিয়া লোক পাঠাইয়া দিল। রসিকের স্ত্রী এতটা সহানুভূতিতে আরও বিশ্বাস হারাইল। সে বরং সন্দেহ করিয়া বলিল, ভালবাসা দেখাইয়া তার ছেলেকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়া সম্পত্তি নিষ্কণ্টক করিবে।

বলাই দেখিল, অদৃষ্টে যার দুঃখ আছে, সে ভালকেও মন্দ বুঝিয়া লয়। সে দুর্ব্বুদ্ধিকেই সুবুদ্ধি ভাবিয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করে! বলাইদের গ্রামের পার্শ্বে একটা বিস্তৃত জঙ্গলা স্থান ছিল, বলাই সেই জায়গাটা বন্দোবস্ত লইয়া ক্রমশঃ যখন আবাদ করাইতে লাগিল, সেই সময় সূদন মণ্ডল আসিয়া একবার দেখিয়া যাইয়া তার বোনকে বলিল "বলাইয়ের যেরূপ প্রতিপত্তি বাড়্‌ল, তাতে ও-গ্রাম থেকে তোমারও অন্ন উঠ্‌ল!"

সূদন মণ্ডল বলাইএর এত কাণ্ডকারখানা দেখিয়া,

জামীর হইয়া একদিন জমাজমির কথা বলিতে আসিয়াছিল। বলাই মণ্ডল শুধু বলিল, "খোকাকে পাঠিয়ে দিও, বাবু-জমাজমি, তার সঙ্গেই আমার কথা হবে।"

অনেকদিন পর্য্যন্ত খোকার জন্য অপেক্ষা করিয়া মণ্ডল বড়ই উদ্বিগ্ন হইল, এই সময়ে হঠাৎ একদিন খোকা মায়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ভয়ে ভয়ে আসিয়া দাদামণির পায়ের ধূলা লইয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। মণ্ডল অধীর হইয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমার দাদুমণি, এতদিনে তুই এলি ভাই!"

খোকাও কাঁদিল, মণ্ডলও কাঁদিল। দুজনের চক্ষের জলে এতদিনে মনের ময়লা কাটিয়া দুজনের চক্ষের জলেই ধুইয়া গেল। মণ্ডল খোকার হাত দুখানি ধরিয়া সস্নেহে বলিল, "হলো না দাদুমণি শুধু তোর পড়াশুনা! তোর যা কিছু সবই তোকে দিয়েছি। রসিক যা আমার ঠেকায় প'ড়ে দিয়েছিল, তাও ভাই তোকে দিয়েছি! দুঃখ রইল, যে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে সে চ'লে গেল! তুই দেরী করে দিতে এসে আমাকে দুর্নামের ভাগী করলি ভাই!" এই বলিয়া বলাই বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। খোকার চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতেছিল। মণ্ডল একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "ওরে! টাকা হয়, পয়সা হয়, বন্ধু-বান্ধব সব হয়, এমন সুখের বাল্যকাল গেলে আর লেখাপড়া হয় না। তোরা ভাবছিস্ আমার সব হয়েছে; কিন্তু যা হয়েছে, তাও ঐ একটা ছাড়া সব বেঠিক হয়ে আছে। লেখাপড়া জানা লোকের সঙ্গে মিশি আর ভাবি, ঐটে যদি পাই, ত সর্ব্বস্ব দিয়ে কিনি। চক্ষু থাকতে অন্ধ থাকিস্ না ভাই, তোর এখনও সময় আছে, চেষ্টা কর, মানুষ হ'তে পারবি।"

সাময়িকী

এবারকার সাময়িকীতে প্রথমেই একটা বিবরণ দিতে চাই। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশটা কত বড়, তাতে কত লোক বাস করে, তার মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কত লোক, স্ত্রী-পুরুষ বিবাহিত-অবিবাহিত কত, সহর কতগুলি, গ্রাম কতগুলি, ইত্যাদি বিষয়ের একটা মোটামুটি হিসাব সকলেই জানিয়া রাখা ভাল। আমাদের পল্লী-সহযোগী 'বীরভূম বার্ত্তা' এ সম্বন্ধে একটা তালিকা দিয়াছেন; আমরা সেইটাই তুলিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য যে, ইতঃপূর্ব্বে যে আদমশুমারী হইয়াছিল, তাহা হইতেই এত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রতি দশ বৎসর অন্তর এক-একবার আদমশুমারী হয়; এই আগামী ১৯২১ অব্দে পুনরায় আদমশুমারী হইবে। তখন আবার নূতন একটা হিসাব পাওয়া যাইবে। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে—

বিভাগ—৫, জেলা—২৮।

আয়তন—৮৪,০০০ বর্গ মাইল।

(গ্রেট ব্রীটন অপেক্ষা কিছু কম)

লোকসংখ্যা—৪ কোটী ৬০ লক্ষের কিছু উপর (সমগ্র গ্রীটীশদ্বীপপুঞ্জের লোক সংখ্যা ৪১০ লক্ষ)।

সহর—১২৫; গ্রাম—১২৫,০০০

এক আনা লোক সহরে বাস করে। পনের আনা লোক পল্লীগ্রামে থাকে। সহরে ১০ আনা পুরুষ ও ৬ আনা স্ত্রী; গ্রামে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সমান।

শতকরা ৯০ জন বাংলায় কথা কয়।

মুসলমান—২ কোটী ৪২ লক্ষ।

হিন্দু—২ কোটী ৪ লক্ষ।

বৌদ্ধ—২ লক্ষ ৫০ হাজার।

ক্রীশ্চান—এক লক্ষ ৫০ হাজার।

জৈন—৭,০০০

ব্রাহ্ম—৩,০০০

শিখ—২,০০০

ইহুদী—২,০০০

বিবাহিত—

পুরুষ—এক কোটী ৯ লক্ষ।

স্ত্রী—এক কোটী ৪ লক্ষ।

অবিবাহিত—

পুরুষ—এক কোটী ২২ লক্ষ।

স্ত্রী—এক কোটী ২২ লক্ষ।

বিপত্নীক—৮ লক্ষ।

বিধবা—৪৫ লক্ষ।

অন্ধ—আন্দাজ ৩৩,০০০

মূকবধির—৩২,০০০

কুষ্ঠ—১৭০০০,

পাগল—২০০০০

বাঙ্গালা দেশের মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল। এখন খুব বড় একটা কথা বলিতে হইবে। যাঁহারা সংবাদ-পত্র পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন যে, এখন বাঙ্গলা দেশের অনেক স্থানে রায়তদিগের বড়-বড় সভা-সমিতি হইতেছে; এক-এক সভায় কুড়ি পঁচিশ হাজার রায়ত সমবেত হইতেছেন; তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ, অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। আর কয়েকদিন পরেই নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত হইবে; তাহাতে জন-সাধারণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পাইবেন। জন-সাধারণ বলিতে আমরা যাঁহাদের বুঝি, তাঁহারা অধিকাংশই এই রায়ত-শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং এই সময় সেই রায়তদিগের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়া কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় এই যে, 'সবুজ-পত্রের' সুযোগ্য সম্পাদক, তীক্ষ্ণধী, ব্যারিষ্টার প্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বিগত ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় 'সবুজ-পত্রে' 'রায়ত' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এই বিষয়ের সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির আলোচনা যে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়াছে, একথা আর বলিতে হইবে না। আমরা সেই প্রবন্ধ হইতে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলেই পাঠকগণ রায়তের কথা সহজেই জানিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের ইতিহাস এইরূপে বলিয়াছেন—

"১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হয়। তখন বাঙলার তক্তে বসলেন সিরাজউদ্দৌলা। এঁর শাসন যে দেশের লোকের কাছে কতদূর প্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ, বছর না পেরুতেই বাঙলায় ঘটল রাষ্ট্রবিপ্লব। যে ঘটনায় সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের গদি ও পৈতৃক প্রাণ, দুই হারাইলেন, একে আমি রাষ্ট্রবিপ্লব বলছি কেননা জন কোম্পানীর সেকালের কর্ত্তাব্যক্তিরা সকলেই এ ব্যাপারকে Revolution বলেই উল্লেখ করেছেন। পলাসীর যুদ্ধ জেতবার ফলে কোম্পানী বাহাদুর বাঙলার রাজগদি পান নি, পেয়েছিলেন শুধু চব্বিশ-পরগণার জমিদারী-স্বত্ব।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ পর্য্যন্ত মিরজাফরের আমল। এ তিন বৎসর গোলেমালে কেটে গেল। ফলে বাঙলার অরাজকতা বাড়ল বই কমল না।

তারপর নবাব হলেন মিরকাশিম। তাঁর নবাবীর মেয়াদ ছিল পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ধরে তিনি বাঙলার প্রজার রক্ত শোষণ করলেন। কি উপায়ে, তা বলছি।—রাজা টোডরমল্লের সময় বাঙলার প্রজার আসল জমা স্থির হয়। এ জমাকে Land Tax বলা যেতে পারে। এ জমাবৃদ্ধি কোনো নবাব করেন নি। আসল জমা স্থির রেখে নবাবের পর নবাব শুধু আবয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়ে চললেন। এই আবয়াবকে Cess বলা যেতে পারে। মিরকাশিমের হাতে এই আবয়াব কি রকম বিপুলায়তন হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষী পাবে Fifth Report-এ। মিরকাশিমের আমলের একখানি দাখিলা দেখলে তোমার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।

তারপর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশা কোম্পানী বাহাদুরকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলেন। অর্থাৎ—সরফরাজ খাঁর আমলে আমলচন্দ্র রায় রায়-রাঁয়ার যে পদ ছিল, ১৭৬৫ সালে কোম্পানী বাহাদুর সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তফাতের মধ্যে এই যে আমলচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গলার নবাবের কর্ত্তৃক নিযুক্ত হতেন, আর কোম্পানী বাহাদুর দেওয়ান হলেন দিল্লীর বাদশার সনন্দের বলে। ফলে কোম্পানী পেলেন বাঙলার অর্দ্ধেক রাজত্ব, আর বাকী অর্দ্ধেক রইল নবাব নাজিমের

হাতে। একালের ভাষায় বলতে হলে—দিল্লীর বাদশা Diarchy-রা সৃষ্টি করলেন।

এ ক্ষেত্রে ফৌজদারী-সংক্রান্ত সকল রাজকার্য্য নবাব-নাজিমের হাতে reserved subject-স্বরূপ রয়ে গেল। আর কোম্পানীর হাতে যে কি কি বিষয় transferred হয়ে এল, তার সন্ধান নেওয়া দরকার, কেননা এই transfer-সূত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্মলাভ করলে। বলা বাহুল্য, নবাবের আমলে সবই ছিল অচিরস্থায়ী।

দিল্লীর বাদশার ফারমানের বলে কোম্পানী বাঙলার প্রজার কর আদায় করবার অধিকার পেলেন; কিন্তু এই কর আদায়ের ভার কোম্পানী নিজ হাতে নিলেন না—নবাবের নিয়োজিত নায়েব-দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর হাতেই রেখে দিলেন।

তারপর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মহা দুর্ভিক্ষে (বাঙলায় যাকে আমরা বলি ছেয়াত্তরের মন্বন্তর) যখন বাঙলার এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করলে, এবং দেশ যখন একটা মহা-শ্মশানে পরিণত হল, তখন কোম্পানীর বিলেতের ডিরেক্টরদের মাথায় টনক নড়ল। তাঁরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে Hastings সাহেবকে বাঙলার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে এ দেশে পাঠিয়ে দিলেন,—প্রধানত খাজনা আদায়ের একটা সুব্যবস্থা করবার জন্য। প্রচলিত ব্যবস্থা যে সুব্যবস্থা ছিল না, তার প্রমাণ এই দুর্ভিক্ষের বৎসর যত টাকা কর আদায় হয়, তার পূর্ব্বে কোনো বৎসর তত টাকা আদায় হয় নি।

এই দুর্ভিক্ষে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটেছিল, তার পরিচয় Hunter's Annals of Rural Bengal-এ পাবে। এ ভোগ বাঙালী জাতিকে আরও ত্রিশ বৎসর ভুগতে হয়েছিল। এ মন্বন্তরের ধাক্কা বাঙলা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও আর সামলে উঠতে পারে নি। এই কথাটা মনে রাখলে বুঝতে পারবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কেন আমি Emergency legislation বলেছি।

Hastings সাহেব কলকাতায় এসে—বাঙলার জমির পাঁচশালা বন্দোবস্ত করলেন। এ বন্দোবস্ত করা হল কিন্তু ডাকসুরত ইজারাদারের সঙ্গে। জমিদার অ-জমিদার নির্ব্বিচারে সর্ব্বোচ্চ ডাককারীকেই জমির ইজারা দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, ইজারাদার বাঙলার প্রজাকে লুটে নিলে। এই সূত্রে Hastings সাহেবের সঙ্গে তাঁর কাউন্সিলের ঝগড়া বাধল; কেননা ধরা পড়ে গেল যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ইজারাদারেরা স্বয়ং Hastings সাহেব এবং অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারীদের বেনামদার বই আর কেউ নয়। এই সুযোগে Hastings সাহেবের পরম শত্রু Francis সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কোম্পানীর বিলেতি ডিরেক্টারদের সে প্রস্তাবে সম্মত করেন। কিন্তু ডিরেক্টার-মহোদয়দের এ বিষয়ে যা হোক একটু মনস্থির করতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল। অতঃপর অনেক বলা-কওয়া, অনেক লেখালেখির পর তাঁদের আদেশ-উপদেশ মতই, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত করা হল। এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তন। অর্থাৎ—যে বৎসর ফ্রান্সের প্রজার peasant proprietor-ship-এর সূত্রপাত হল, সেই বৎসরই বাঙলার প্রজা সকল স্বত্ব হারাতে বসল।

এ ক্ষেত্রে চারিটি সমস্যা ওঠে:—

(১) বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করা হবে—প্রজার সঙ্গে, না জমিদারের সঙ্গে?

(২) জমিদার বলতে কি বোঝায়—ভূম্যধিকারী, না সরকারের টেক্স-কালেক্টর?

(৩) যদি জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়, তা হ'লে সে বন্দোবস্ত মেয়াদি না মৌরসী করা হবে?

(৪) জমিদারকে যদি মৌরসী পাট্টা দেওয়া হয় তাহলে তার দেয়ো মাল-খাজনা চিরদিনের মত নিৰ্দ্ধারিত করে দেওয়া হবে কি না?

এই সমস্যার মীমাংসা করা হ'ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এবং তার কারণ এই যে কোম্পানীর কর্ত্তাব্যক্তিদের মতে তা করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না, কেননা কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট হচ্ছে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট।

কি সব তদন্তের পর, কি যুক্তি অনুসারে জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা স্থির হল, তার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ Fifth Report-এ দেখতে পাবে। এস্থলে আমি সকল যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে Sir John Shore প্রমুখ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারীরা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তারি উল্লেখ করছি।

প্রথম। রায়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। এদেশে জমিজমার হিসেব এত জটিল যে, ইংরাজ কর্মচারী-দের পক্ষে তা আয়ত্ত করা অসম্ভব। বিশেষতঃ তাঁরা যখন বাঙলা ভাষা জানেন না। এ ক্ষেত্রে হস্তবুদ তৈরী করবার, খাজনা আদায় করবার, বাকী-বকেয়ার হিসাব-কিতাব রাখবার ভার দেশী আমলাদেরই হাতে থাকবে। তারা যা খুসি তাই করবে, তহবিল তছরূপ করবে, রাজা প্রজা দু দলকেই ফাঁকি দেবে। এবং ইংরাজ কালেক্টররা তার কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না। কারণ এই দেশী তহশীলদারদের কাছ থেকে হিসেব-নিকেশ বুঝে নেবার মত শিক্ষা ও জ্ঞান ইংরাজ কালেক্টরের নেই। অতএব খাজনা যদি নিয়মমত ও নিয়মিত আদায় করতে হয়, তাহলে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়।

দ্বিতীয়। জমিদার, ভূম্যধিকারী কিম্বা টেক্স-কালেক্টর তা বলা অসম্ভব। কেননা Ownership বলতে ইংরাজ যা বোঝে, এ দেশের লোকে তা বোঝে না। আমরা সবাই জানি Austin-এর ভাষায় স্বত্বের অর্থ হচ্ছে :—

"A right over a determinate thing indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration"—

জমির উপর যে তাদের উক্তরূপ স্বত্ব আছে এ কথা সে-কালে কোনো জমিদারও দাবী করেন নি। কেননা তাঁরা জানতেন যে, রায়তকে তাঁরা উচ্ছেদ করতে পারতেন না, রায়তি জমি খাস করতে পারতেন না, এবং বাঙলার নবাব ও দিল্লীর বাদশা এঁদের ভিতর যাঁর খুসি তিনিই যখন-তখন জমিদারী জমিদারের গালে চড় মেরে কেড়ে নিতে পারতেন। যেমন জাফর খাঁ ওরফে মুরশিদ্ কুলি খাঁ কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙলার প্রাচীন ভূম্যধিকারীদের নির্ব্বংশ করে নূতন জমিদারের দল সৃষ্টি করেছিলেন।

এ অবস্থায় কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা স্থির করলেন যে জমিদারেরা যদি ভূম্যধিকারী নাও হয় ত, আইনত তাঁদের তা হতে হবে। তাঁদের ধারণা ছিল যে, সভ্যদেশে জমিদারের সঙ্গে প্রজার সেই সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে-যুগে English landlord-দের সঙ্গে Irish tenant-দের যে সম্বন্ধ ছিল। এস্থলে Sir John Shore-এর মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"The most cursory observation shows the situation of things in this country to be *singularly confused*. The relation of a zemindar to government, and of a ryot to government, and of a ryot to a zemindar is neither that of a proprietor nor of a vassal; but a compound of both. The former performs acts of authority unconnected with proprietory right—the latter has rights without real property. Much time will, I fear, elapse before we can establish a system, perfectly consistent in all its parts, and before we can reduce the compound relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zemindar to the simple principles of landlord and tenant. Fifth Report Vol. II, p. 520".

এই উদ্ধৃত বাক্য ক'টির বাঙলায় অনুবাদ করবার সাধ্য আমার নেই, কেননা কি বাঙলা কি সংস্কৃত এ দুই ভাষাতে এমন কোন শব্দ নেই যা ইংরাজি real property-র প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের ভাষায় ও-শব্দ নেই, কেননা আমাদের দেশে ও-বস্তু কস্মিন কালেও ছিল না।

Shore সাহেবের কথাই প্রমাণ যে, এদেশের জমিদারের সঙ্গে এদেশের রায়তের সম্বন্ধ তাঁর কাছে বড়ই গোলমেলে লেগেছিল। কাজেই যা গোল তাকে তিনি চৌকোশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি অবশ্য এ পরিবর্তন রয়ে-বসে করতে চেয়েছিলেন। Lord Cornwallis-এর কিন্তু আর তর সইল না। তিনি আইনের ঠুকঠাকের বদলে একধারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসলেন। ফলে বাঙলার প্রজা বাঙলার জমির উপর তার চিরকেলে স্বত্ব-স্বামীত্ব সব হারালে, আর রাতারাতি বাঙলার জমির নিরঙ্কুশ স্বত্বাধিকারী জমিদার নামক এক শ্রেণীর লোক জন্মলাভ করলে।

Lord Cornwallis যদি অত তাড়াহুড়ো করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করে বসতেন, তাহলে রায়তের peasant proprietorship নষ্ট হত না। কারণ রাজা প্রজার যে সম্বন্ধ সে কালের ইংরাজদের বুদ্ধির অগম্য ছিল, কালক্রমে তার মর্ম তাঁরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। আজ প্রায় দেড়শ বৎসর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অভ্যস্ত হয়ে আমাদেরও মনে এই ধারণা জন্মেছে যে রায়তের আর যাই থাক জমির উপর কোনোরূপ মালিকীসত্ব নেই এবং পূর্ব্বেও ছিল না, লোকের এই ভুল ভাঙানো দরকার।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় অতঃপর কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন। তিনি বলিতেছেন—

"এখন দেখা যাক এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির উপর প্রজার সত্ব চিরস্থায়ী হ'ল কিম্বা একদম কেঁচে গেল।

প্রজার যে ভিঁটে ও মাটী দুয়ের ই উপর কিছু সত্ব ছিল, সে সত্য Sir John Shore প্রভৃতি সকলেই আবিষ্কার করেছিলেন। এবং সেই আবিষ্কারের ফলেই না তাঁদের মনে অতটা ধোঁকা লেগেছিল! একই জমির উপর জমিদার ও রায়ত—উভয়েরি যে একযোগে সত্ব-স্বামীত্ব কি করে থাকিতে পারে, এ ব্যাপার তাঁদের ধারণার বহির্ভূত ছিল। কেননা, কি Roman Law, কি বিলাতের Common Law—ও-দুয়ের কোনোটির সঙ্গেই এ ব্যাপার মেলে না। ফলে যে সম্বন্ধ ছিল মিশ্র, তাকে তাঁরা শুদ্ধ করতে চাইলেন। ভারতবর্ষের মাটীর এমনি গুণ যে, সে মাটী যে মাড়ায় সে-ই শুচিবাতিকগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

প্রজা এখনো যেমন, তখনো তেমনি, প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল,—খোদকস্ত, আর পাইকস্ত। যে প্রজার বাস্ত ও ক্ষেত দু-ই এক গ্রামস্থ, তার নাম খোদকস্ত প্রজা; আর ভিন্ন গ্রামের লোক যে-ক্ষেত্রে ঠিকে বন্দোবস্তে জমি চাষ করে তার নাম পাইকস্ত। বলা বাহুল্য যে, প্রজাসত্ব শুধু খোদকস্ত প্রজারই ছিল, কেননা পাইকস্ত প্রজার উপর জমিদারের যেমন কোনোরূপ স্বামীত্ব ছিল না, জমির উপর তারও তেমনি কোনোরূপ সত্ব ছিল না।

সে কালের প্রজাসত্বের মোটামুটি ফর্দ্দ এই।—

(১) প্রজাকে উচ্ছেদ করবার অধিকার জমিদারের ছিল না, অর্থাৎ—তার জোত ছিল দখলীসত্ববিশিষ্ট।

(২) সে জোত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করবার অধিকার খোদকস্ত রায়তমাত্রেরই ছিল। আর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করবার সত্ব যে মালিকীসত্ব, এ বিষয়ে Privy Council-এর নজির আছে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জোত হস্তান্তর করবার অধিকার প্রজামাত্রেরই ছিল। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, সেকালে জমি হস্তান্তর করবার সুযোগ ও প্রয়োজন—এ দুয়েরি বিশেষ অভাব ছিল। প্রজার তুলনায় জমির পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, জমিদারেরা নামমাত্র নিরিখে পাইকস্ত প্রজাকে দিয়ে জমি চাষ করাতেন।

(৩) জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের ছিল না। এর একটি প্রমাণ এই যে, বাঙলার কোনো নবাবই আসল জমা কখনো বাড়ান নি। আসল জমা স্থির রেখে আবয়াব বাড়ানোই ছিল তাঁদের মামুলি দস্তুর। রাজার প্রাপ্য ছিল প্রজার উৎপন্ন ফসলের একটি অংশমাত্র; সে অংশের হ্রাসবৃদ্ধি করবার অধিকার রাজারও ছিল না।

খালি বাঙলার প্রজা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা এই সকল সত্বে সত্ববান ছিল। প্রমাণস্বরূপ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম এ, পি-আর-এস মহাশয়ের "পেশবাদিগের রাজ্য-শাসন-পদ্ধতি" নামক প্রবন্ধ কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।—

"মারাঠি পল্লীর চাষীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—মিরাসদার বা মিরাঠী (খোদকস্ত) ও উপরি (পাইকস্ত)। মিরাসীরা গ্রামেরই লোক, গ্রামের জমি চাষ ক'রত। সে জমিতে তাহাদের একটি স্থায়ী স্বত্ব থাকিত। খাজনা বাকী না ফেলিলে কাহারও অধিকার ছিল না যে তাহাদের জমি কাড়িয়া লয়। বাকী খাজানার দায়ে জমি হস্তান্তর হইলেও কিন্তু তাহাতে মিরাসীর সত্ব একেবারে লুপ্ত হইত না। ৩০।৪০ এমন কি ৬০ বৎসর পরেও বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিলেই, মিরাসী তাহার জমি ফিরিয়া পাইত। * * * *

* মিরাসীরা গ্রাম প্রতিষ্ঠাতাদিগেরই বংশধর। মনুর বিধান অনুসারে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরাই গ্রাম্য জমির মালিকীস্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। * * *

অবশ্য সরকারের বার্ষিক কর প্রত্যেক গ্রামসমিতির প্রধান ও প্রথম দেয়। এই করের হার সরকারের কর্ম্মচারীরা

"পাটোয়ারি" (মণ্ডল) সঙ্গে একত্র হইয়া গ্রামের জমি ও চাষের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া স্থির করিতেন—" (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩২৬, পৃ: ৪১১)।

এককথায় সেকালে জমির অধিকারী ছিল প্রজা, আর তার উপসত্বের আংশিক অধিকারী ছিলেন রাজা। জমিদার এই রাজস্বেরই এক অংশ পেতেন, তিনি ছিলেন ইংরাজিতে যাকে বলে 'টেক্স কালেক্টর, অর্থাৎ—জমিদার মাইনের বদলে আদায়ের উপর কমিসন পেতেন, আজও যেমন অনেক জমিদারীতে তহশীলদারেরা পেয়ে থাকে। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, একালে তহশিলদারেরা শতকরা পাঁচ টাকা হারে কমিশন পায়, সেকালে জমিদারেরা দশ টাকা হারে পেত।

জন কোম্পানী কিন্তু এদেশের জমিদার-রায়তের মিশ্র সম্বন্ধকে শুদ্ধ করলেন—এই সম্বন্ধ উল্টে ফেলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে জমিদার হলেন বাঙলার মাটীর সত্বাধিকারী, আর প্রজা হল তার উপসত্বের আংশিক অধিকারী।

কিন্তু এ পরিবর্তন কোম্পানীর বড়-কর্তারা সচ্ছন্দ চিত্তে করেন নি। এ ভয় তাঁহাদেরও হয়েছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে জমিদার প্রজার ভক্ষক না হয়ে ওঠেন। অতএব সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের রক্ষার ব্যবস্থাও যে করা কর্তব্য, সে বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত ছিলেন। এখানে আমি শুধু দুটি লোকের মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, প্রথম Francis সাহেবের, তারপর Lord Cornwallis এর; কারণ এঁদের একজন হচ্ছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জনক, আর একজন তার জননী।

Mr Francis proposed, that it should be made an indispensable "condition with the zeminder, that in the course of a stated time, he shall grant new pattahs to his tenants either on the same footing with his own quit rents, that is as long as the zeminder's quit rent remains the same, or for a term of years, as they may agree—"

Francis সাহেবের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে Shore সাহেবের মন্তব্য হচ্ছে এই:—

"The former is the custom of the country, this will become a new *assil jumma* for each ryot, and ought to be as sacred as the zeminder's quit rent—"(Fifth Report, Vol. II, p. 88).

এখন Lord Cornwallis-এর কথা শোনা যাক।—

"Unless we suppose the ryots to be absolute slaves of zeminder's:—every *begha* of land possessed by them, must have been cultivated under an express or implied agreement, that a certain sum should be paid for each *begha* of produce, and no more—"

(Fifth Report Vol. II, p. 532).

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রজা আজ যে-সকল সত্বের দাবী করছে, সে-সকল সত্ব প্রজার যে মান্ধাতার আমল থেকে ছিল, এ সত্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্মদাতারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এবং শুধু স্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, প্রজার ওই সব মামুলি সত্ব যে তাঁরা আইনত রক্ষা করিবেন, এ প্রতিজ্ঞাও তাঁরা উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই লিপিবদ্ধ করেছেন—"It being the duty of the ruling power to protect all classes of people, and more particularly those who from their situation are most helpless, the Governor-General in Council will, whenever he may deem it proper, enact such regulations as he may think necessary for the protection and welfare of the dependent raiyats and other cultivators of the soil.—"

(*Vide*. cl. I, s. 8. rig. I of 1793)

দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রতিজ্ঞা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মোটেই পালন করেন নি; যদিচ রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পার্লেমেণ্টারি কমিটিকে কোম্পানী বাহাদুরের এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

কোম্পানীর আমল শেষ হয়ে যখন মহারাণীর আমল সুরু হল, তখন উক্ত আইনের ৮ ধারার আশ্রয়ে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের দশ আইন পাশ করা হল। এই হচ্ছে Tenancy

মিশরের পিরামিড ও স্ফিংস'এর সম্মুখে

উষ্ট্র পৃষ্ঠে কাপ্তেন শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী, আই-এম-এস ও গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে কাপ্তেন কারিগাট্, আই-এম-এস

BY COURTESY OF RATINDRANATH CHAUDHURI

Blocks by BHARATVARSHA HALFTONE WORKS

Actএর প্রথম সংস্করণ। এই আইন অবশ্য কালক্রমে অনেক পরিমাণে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। তা'সত্ত্বেও এ আইনের প্রসাদে যে, শুধু মামলা বেড়েছে তার কারণ, ইংরাজিতে যাকে বলে half-measures; অর্থাৎ আধা-খেঁচড়া ব্যবস্থা, তার ফলে শুধু নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি হয়।

আজকের দিনে প্রজার সকল দাবী আইনত গ্রাহ্য হলে, প্রজা যে হাঁফছেড়ে বাঁচবে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই এবং জমিদারবর্গের নিকট আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন এ বিষয়ে প্রজার প্রতিপক্ষ না হন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, আজকের দিনে কেউ তা বলতে পারে না। তবে একথা ভরসা করে বলা যায় যে, গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সকল সমাজের, কি আর্থিক কি রাজনৈতিক, সকল ব্যবস্থারই গোড়া আল্‌গা হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা যদি আগে থাকতেই সমাজের নতুন ঘর বাঁধতে সুরু না করি, তাহলে দু-দিন বাদে হয়ত দেখতে পাব যে আমাদের মাথা লুকোবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের সম্বোধন করে বলেছিলেন:—

'তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার গুণে নহে, অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে সেও তাহার দোষ নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না, মনে থাকে যেন সে তোমারই ভাই-তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ এবং তাঁহার ভ্রাতা—

তিনি আরও বলেন যে:—'এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলিবে—'

বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ বিধির কথা বলেছিলেন জানো?—ইংরাজিতে যাকে বলে Communal property। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, ইতিমধ্যে আমরা যদি বাঙলার প্রজাকে peasant proprietor না করি তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হতে আর বড় বেশি দিন লাগবে না। আশা করি এ প্রবন্ধ পড়ে কেউ মনে করবেন না যে, আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদের সূত্রপাত করেছি। সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে বাঙালী সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের সঙ্গে জমিদারের co-operationএর যে প্রয়োজন আছে, এই হচ্ছে আমার আসল বক্তব্য।"

স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর মহাশয় 'আবগারী' পত্রে আমাদের দেশের মাদকদ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চুণীবাবু মাদকদ্রব্য-ব্যবহার বিরোধী সভার একজন প্রধান সদস্য। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম যে, তাঁহাদের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য যাঁহারা আবেদন করিবে, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিধারী ব্যক্তিগণের আবেদন সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইবে। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি মদ গাঁজা আফিমের দোকানের লাইসেন্স গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মাদকদ্রব্য ব্যবহার কমিয়া না যাক্, উক্ত ব্যবসায়ে কোন প্রকার প্রবঞ্চকতা বা বে-আইনি কাজ হইবে না, চাই কি মাতলামীও খানিকটা কমিতে পারে। এই জন্য বিগত দুই বৎসরে এবং এখন পর্য্যন্ত এই কলিকাতা সহরে বারো জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী শিক্ষিত যুবক মদ বিক্রয়ের লাইসেন্স লইয়া কারবার চালাইতেছেন। ইহার মধ্যে ছয় জন বি-এ ও বি-এস্‌সি; আর ছয় জন এম এ ও এম-এস্‌সি। তাহার মধ্যে এক ভদ্রলোক এই ব্যবসায় চালাইবার সঙ্গে-সঙ্গে কলিকাতার কোন একটা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করিতেন। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্র-সমূহে কিছুদিন পূর্ব্বে আন্দোলনও হইয়াছিল।

এই প্রকার শিক্ষিত লোকসকল এই ব্যবসার অবলম্বন করার কি ফল হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চুণীলাল বাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলিতেছেন—'I may be permitted to observe that the adoption of this trade by the present batch of our educated young men hardly be attributed to any desire on their part of minimising the evil of the drink and drug-habit among their countrymen, by strictly carrying out the regulations of the Excise

Act. It appears from information at our disposal that the main reason for their taking up this trade is to make a maximum profit out of a minimum capital.'

উপরি উদ্ধৃত অংশের মর্ম এই যে, শ্রীযুক্ত চুনীবাবু অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, উচ্চ-উপাধিধারী যুবকগণ এই ব্যবসায় অবলম্বন করায় যে আবগারী আইনের বিধানগুলি যথাযথ পালন-জনিত মাদকদ্রব্য ব্যবহার কম হইয়াছে, ইহা তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। যাঁহারা ব্যবসায় করিতেছেন, তাঁহাদেরও সে উদ্দেশ্য নহে; কয়েকজন উচ্চ উপাধিধারী মাদক-ব্যবসায়ী যুবক ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাঁহারা অল্প মূলধনে বেশী লাভ পাইবার জন্যই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। একজন বলিয়াছেন—"I have taken to this sort of living purely from the business point of view, because it enables me to draw the maximum profit with a minimum capital." অর্থাৎ তিনি বলিতেছেন যে, তিনি ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই একাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কারণ তিনি দেখিতে পাইতেছেন যে, এ ব্যবসায়ে অল্প পুঁজিতে বেশী লাভ হয়।

অতএব, দেখা গেল যে, ভূত ছাড়াইবার জন্য সরিষার আমদানি করা হইয়াছে; কিন্তু সরিসা তাহাতে একেবারেই গররাজী; সে ভূত ছাড়াইতে আসে নাই; সে তৈল সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে; সুতরাং এ ব্যবস্থায় ভূত ত ছাড়িবেই না, এখন ভূতের উপদ্রব আরও না বাড়িলেই মঙ্গল। শ্রীযুক্ত চুনীলালবাবু বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতেছেন যে, বিগত বর্ষে মাদকদ্রব্য ব্যবহার ত কমে নাই। দশ টাকা মণ চাউল, ছয় টাকা জোড়া বস্ত্রেও যখন মাদকদ্রব্য ব্যবহার কমিল না, তখন আর কি করা যায়?

থাকুক ও সব দুঃখের কথা। সুখের কথাও আমাদের বলিবার আছে। আমরা বাঙ্গালী; আমাদের সুখ-গৌরবের কথা না হয় নাই বলিলাম; ইতিহাসের কথা না হয় নাই তুলিলাম। বর্ত্তমানেও আমাদের সুখের কথা আছে,—এই ভাত-কাপড়ের মহার্ঘতার মধ্যেও আমাদের গর্ব্বের কথা আছে। এই বর্ত্তমান সময়েই—এই সে দিনও আমাদেরই ঘরে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর এখনও আমাদেরই ঘর আলো করিয়া আছেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র;—এখনও দেখাইতে পারি আমাদের সুরেন্দ্রনাথ, আমাদের সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন, আমাদের ভূপেন্দ্রনাথ। সুধুই কি তাই। এই যে জ্যোতিষ্মান নক্ষত্রগুলি আমাদের বাঙ্গালার আকাশে উদিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীময় আলোক বিতরণ করিতেছেন, ইহাঁদের অন্তর্ধানের পরই যে বাঙ্গালার আকাশ অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন হইবে, তাহা কেহই মনে করিবেন না। এই সকল মহাত্মার শিষ্যেরাও বড় কম যাইবেন না। তাহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি। অন্য বিষয়ের কথা বলিব না;—আমাদের সার প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্যেরা যে গুরুর উপরে উঠিয়া যাইবেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের দুই চারিজনের নাম করিতেছি। প্রথমেই নাম করিব ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের। তাহার 'Dilution Law' এখন পৃথিবীর রাসায়নিক সমাজে 'Ghosh's Law' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সার প্রফুল্লচন্দ্রের আর এক শিষ্যের নাম ডাক্তার নীলরতন ধর। ইহাঁর সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত জার্ম্মাণ রাসায়নিক পণ্ডিত অধ্যাপক ব্রেডিক্ (Bredig) বলিয়াছেন 'Of all things the fact remains prominent that you are the master of a great and distinguished branch of knowledge." তাহার পর ডাক্তার রসিকলাল দত্ত, অধ্যাপক ক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ীর নাম আমরা গর্ব্বভরে উল্লেখ করিতে পারি। তারপর বিজ্ঞান-কলেজের রসায়নাগারে, সার জগদীশের মন্দিরে আরও কত সাধক নির্জ্জনে সাধনা করিতেছেন। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহাদের নাম বিশ্ব-সভায় ধ্বনিত হইবে।

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

গত চৈত্র মাসের "প্রবাসী"তে "অন্ন-সমস্যা" প্রবন্ধের তৃতীয় স্তবকে শ্রদ্ধেয় সার শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় মহাশয় Poultry farmএর উল্লেখ করেছেন। এটা খুব লাভের ব্যবসা। Poultry farmএর কল্পনা অনেক দিন ধরে আমার মাথায় গজ্‌গজ্‌ কর্চ্চে। বোধ হয় কোন না কোন খবরের কাগজে এ সম্বন্ধে একবার আমি কিছু আলোচনাও করেছি। তা যদি নাও করে থাকি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এই বিষয়টা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বোধ হয় 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গেও এ বিষয় নিয়ে একবার আলাপ হয়ে থাকবে। আজ 'ভারতবর্ষে'র পাঠকদের কাছে এ বিষয়ে একটু ইঙ্গিত করে রাখি।

ব্যবসাটি লাভের বটে, কিন্তু যে সে এই ব্যবসা করতে পারবেন না। বেশ শক্ত-সমর্থ সাহসী, বলবান্‌ যুবক কিছু মূলধন যোগাড় করতে পারলে এই ব্যবসায়ে হাত দিতে পারেন। এ ব্যবসায়ের গোড়াতে কিছু মূলধন চাই; একেবারে বিনা মূলধনে এ ব্যবসায় হতে পারে না। শুনেছি, মফস্বলের কোন ধনী জমিদার—বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভার একজন মাননীয় সদস্য একবার পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে এই ব্যবসায়ে নেমেছিলেন। কিন্তু তার ফলাফল কি হ'ল, সে খবর পাই নি। যাক্‌ বড়লোকের বড় কথায় আমাদের কাজ নাই। আমি যে রকম ধরণে এই ব্যবসায় করবার মতলব দিতে চাই, তাতে অত মূলধন দরকার হয় না; তবে কিছু মূলধন চাই বটে। সেটা কত, তা' পাঠকেরা নিজেরা অনুমানে হিসেব করে নেবেন।

কলিকাতার কাছাকাছি একটা বড় বাগান জমা নিতে হবে। বাগানটা বেশ বড় হলেই ভাল হয়। অন্ততঃ [illegible] বিঘে জমি থাকলে চলবে। বাগানের চারদিক বেশ পাকা পাঁচীল দিয়ে ঘেরা হওয়া চাই। পাঁচীল দিয়ে ঘিরে [illegible] যদি সম্ভব না হয়, অন্ততঃ, খুব শক্ত বেড়া দেওয়া চাই। [illegible] ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগীরা পালিয়ে না যেতে পারে, [illegible] বাইরে থেকে শেয়াল কি চোর ডাকাত বেড়া ভেঙ্গে বাগানে ঢুকতে না পারে। এত বড় বাগান ঘিরে নেওয়ার খরচটাই সবচেয়ে বেশী। আর তা' না নিলেও চলবে না; কেন না, জীবজন্তুগুলা পালিয়ে গেলে ত লোকসান আছেই; আর এ রকম স্থলে শেয়ালের আর চোরের উপদ্রব হবেই। গোড়ায় সাবধান না হলে এ ব্যবসায় চলবে না।

বাগানটি ঘিরে নেওয়া হ'লে, তার পর, বাগানের সব জায়গায় যাওয়া যায় এমন ভাবে রাস্তা তৈরী করে নিতে হবে। পাকা রাস্তা হলে ভালই হয়; নিদেন পক্ষে কাঁচা রাস্তা। ক্রমে ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পাকা করে নিলেও চলবে। রাস্তাগুলি এমন ভাবে তৈরী করতে হবে, যে বাগানটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

তার পর বাগানের এক কোণে গুটি চারেক কি পাঁচ ছটি পাকা পায়খানা তৈরী করতে হবে। পায়খানা ফ্লোরের উপর হবে। নীচের ফোকরগুলো বাইরের দিকে একদম বন্ধ থাকবে। আর পায়খানা করবার দরজা দুইতিনটা বাগানের ভিতরের দিকে, আর দুইতিনটা বাইরের দিকে হবে। ভিতরের দরজা দিয়ে বাগানের লোকেরা পাইখানা সরবে; আর বাইরের দিকের দরজা দিয়ে পাড়া প্রতিবাসীরা সরবে। পাকা পাইখানা পেলে তারা খুব বর্ত্তে যাবে; একবার তাদের অনুমতি দিলেই হল।

বাগানের একটা বড় ফটক, আর দুই-একটা ছোট দরজা থাকবে। ফটকের কাছে দেউড়ী হবে। সেখানে একজন কি দু'জন দরওয়ান থাকবে। বাইরের লোক হঠাৎ বাগানের ভেতর না ঢোকে, কি বাগানের চাকরেরা কোন পশু নিয়ে বেরিয়ে না যায়—দরওয়ানরা তার খবরদারী করবার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা দেউড়ীতে হাজির থাকবে।

বাগানের মাঝখান বরাবর ব্যবসায়ের মালিকদের আপিস ঘর আর থাকবার বাড়ী তৈরী করতে হবে। যিনি বা যাঁরা এই ব্যবসা করবেন,—তাঁদের চব্বিশ ঘণ্টা বাগানে

থাকতে হবে। না থাকলে জীবজন্তু রক্ষা করা কঠিন হবে।

পাইখানার খুব কাছে,—একেবারে ধারেই খানিকটা জমি বাগানের সাধারণ জমি থেকে কিছু নীচু হবে। দেড় কি দু'হাত নীচু হলেই চলবে। এখানে বর্ষাকালে জল জমে কাদা হয়ে থাকবে। আর অন্য সময়েও পুকুর থেকে পাম্পে করে জল তুলে জমিটিকে কাদা করে রাখতে হবে। এই জমিতে শূয়াররা কাদা মেখে বাস করবে। কাছেই তাদের খোঁয়াড় তৈরী করে দিতে হবে। ডোমদের ঘরও এইখানে হবে। পাইখানার কাছে এই রকম জমি তৈরী করবার মানে শূয়াররা ইচ্ছামত কাদা মাখতে পারবে, আর ফ্লোরের নীচে দিয়ে পাইখানার ভেতরে যেতে পারবে। এ ব্যবস্থা কেন, তা' সবাই বোধ করি বুঝতে পেরেছেন।

এইখানে প্রথমে গোটা দুত্তিন বেশ তেজাল শূয়ার, আর গোটা-পাঁচ ছয় শূয়ারী থাকবে। এই শূয়ারদের বংশবৃদ্ধি খুব বেশী। কথায় বলে শূয়ারের পাল বিয়োচ্চে। এক একটা শূকরীর শুনেছি, এক এক বিয়ানে ৩০।৪০টা করে বাচ্চা হয়। যত্নে রাখলে,—মরে না গেলে, এই শূয়ারের বাচ্চাগুলো দেখতে দেখতে অসংখ্য হয়ে পড়বে। কাজেই বলতে হবে, এরাই এই ব্যবসার প্রধান stock।

শূয়ারের ব্যবস্থা এই রকম হল। তার পর, মালিকের বাসার কাছে কতকগুলো পাকা ঘর তৈরী করতে হবে, যাতে হাঁস, মুরগী, শূয়াররা, ভেড়া, ছাগল থাকবে। তার কাছে ক্রমে ক্রমে দুই একটা গোয়ালঘর তৈরী করে দিতে হবে। এই সব জন্তুর ঘর পাকা করবার মানে চুরি নিবারণ। সন্ধ্যার একটু আগে—৪।৫টার সময়ে ডোমেদের দিয়ে, শূয়ার বাদে, অন্য জন্তুগুলোকে তাড়িয়ে এনে, ঘরে পুরে চাবি দিয়ে, মালিক নিজের কাছে চাবি রাখবেন; আর সকাল বেলা চাবি খুলে বের করে দেবেন। রোজ সকাল বেলা গুণে বের করে দেবেন, আর সন্ধ্যের সময় গুণে তুলে রাখবেন।

জন-চার-পাঁচ ডোম মাইনে দিয়ে রাখতে হবে। জন্তুদের তদারক করা আর তাদের খাবার বন্দোবস্ত করা ডোমেদের কাজ। প্রত্যেক ডোমকে একটা করে বাঁক, আর দুটো করে কেরোসিনের টীন দিতে হবে। তারা সকাল বেলা খেয়ে দেয়ে বাঁক কাঁধে করে বেরুবে, সমস্ত দিন সহরে ঘুরে বেড়াবে, সন্ধ্যের আগে ফিরে আসবে। খালি টীন নিয়ে বেরুবে, ভর্ত্তি টীন নিয়ে ফিরবে। সহরের বাড়ীগুলোর আঁস্তাকুড় থেকে, বিশেষতঃ স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মেস, হোষ্টেল, অফিসারদের মেস—এই সব বাড়ীর আঁস্তাকুড়ে রোজ অনেক ভাত ডাল তরকারী ফেলা যায় (এমন দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্টের সময়েও! কেন না, এই শ্রেণীর লোকদের অন্নের উপর কিছুমাত্র মায়া নেই! ডোমেরা এই সব আঁস্তাকুড় থেকে ভাত ডাল কুড়িয়ে কেরোসিনের টীন ভর্ত্তি করে নিয়ে আসবে। সেই ভাত তরকারী ডাল ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগী, শূয়ার—সকলেই খাবে। গরু যখন পোষা হবে, তখন তারাও খেতে পারবে। ডোমেদের যে মাসে মাসে আট ন'টাকা মাইনে দিতে হবে, এই ভাত ডাল তরকারী সংগ্রহ করাতেই সেটা পুষিয়ে যাবে। তার উপর তারা জন্তুদের যে তদারক করবে, সেটা ফাউ।

দুটো ভেড়া, পাঁচটা ভেড়ী, দুটো ছাগল, পাঁচ-ছটা ছাগী, গোটা দু'ত্তিন মোরগ মুরগী (চট্টগ্রাম অঞ্চলের মোরগ-মুরগী খুব তেজী আর বলবান, আকারেও খুব বড়, দামও বেশী—তাদের বাচ্চাগুলো বেশ দামে বিক্রী হবে), বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোটা কতক হাঁস (মাদী ও নর) সংগ্রহ করতে হবে। কাজ আরম্ভ করবার জন্যে প্রথমে বৈঠকখানার হাটে, কি হাবড়ার হাটে, কি মেটেবুরুজ না কোথাকার হাটে—যেখানে অনেক পশুপক্ষী বিক্রীর জন্য আসে—এই সব জানোয়ার কিনলে চলবে। তার পর যেখানে যে জন্তু খুব সতেজ আর উৎকৃষ্ট পাওয়া যায়, তার সন্ধান করে, ক্রমে-ক্রমে সংগ্রহ করতে হবে।

বাগানে গোটা দু'ত্তিন পুকুর থাকা চাই। একটা খুব বড় হবে; তাতে বড় মাছের চাষ হবে; আর একটা খুব ছোট; তাতে পোনা ছাড়তে হবে; আর একটা মাঝারি; পোনাগুলো একটু বড় হলে (২ ইঞ্চি কি তিন ইঞ্চি) ছোট পুকুর থেকে তুলে মাঝারি পুকুরে রাখতে হবে। এরা আবার যখন একটু বড় (অর্থাৎ বিঘৎ খানেক) হলে তাদের বড় পুকুরে ছাড়তে হবে। সেখানে তারা বাড়তে থাকবে। এই বড় পুকুরে হাঁস চরবে। ছোট দুটো পুকুরে হাঁস চরতে দিলে

তারা মাছের পোনা খেয়ে ফেলবে। দুই এক যোড়া রাজ হাঁস থাকলেও মন্দ হয় না। পুকুরের চার-দিকে কলাগাছ লাগাতে হবে।

রাস্তা তৈরী করবার সময় বাগানটা কতকগুলো ভাগ হয়ে যাবে বলেছি। এই রকম দু'তিনটে প্লট আলাদা করে রাখতে হবে; সেখানে কেবল ঘাসের চাষ হবে। ভেড়া-ছাগলরা এই প্লটগুলোতে সমস্ত দিন চরে বেড়াবে। এক-একটা প্লট এই রকমে দিন-কতক ভেড়া-ছাগলদের চরবার জন্যে রেখে আবার বদলে দিতে হবে। যে মাঠে ভেড়া-ছাগল চরে, সেখানে তাদের মলমূত্র জমির খুব তেজাল সারের কাজ করে। এক-একটা প্লট এই রকমে সারের তেজে খুব উর্ব্বর হয়ে উঠলে, সেখানে ভেড়া ছাগল চরা বন্ধ করে, অন্য প্লটে তাদের চরবার ব্যবস্থা করতে হবে; আর এই প্লটটাতে অন্য ফসলের চাষ হবে। এতে যে জিনিসেরই চাষ হবে, সে ফসলটা খুব উৎকৃষ্ট হবে, তা বলা বাহুল্য।

বাকী জমিগুলার খানিকটা হবে ফুল বাগান। এখানে ফুলের চাষ হবে। ইচ্ছে করলে এ থেকেও কিছু কামানো যেতে পারে। আর তা' না হলেও হানি নেই। ফুলগুলা বাগানের এবং কারবারের মালিকদের ব্যবহারে লেগে যেতে পারে; গাছে থেকেও বাগানের শোভা বর্দ্ধন করিতে পারে। ভেড়া-ছাগল চরবার প্লটগুলো এমন ভাবে করা যেতে পারে, যেখানে বিকেলে রোদ পড়লে বাবুরা তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে টেনিস, ব্যাডমিন্টন খেলতে পারেন; বেঞ্চে বসে হাওয়া খেতে পারেন; গল্পগুজব করতে পারেন।

আর গোটাকতক প্লটের কোনটাতে আলু, কোনটাতে পটল, কোনটাতে বেগুন, কোনটাতে ঝিঙে, কোনটাতে রেঙ্গুনের বড় প্যাজ রসুনের চাষ হতে পারবে। দুই-একটা প্লট বিশেষভাবে পালিত পশু-পক্ষীদের খাদ্যের উপযোগী টাট্কা ফসলের চাষের জন্যে রাখতে হবে; কেন না, তাদের কিছু টাট্কা ফসল স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে চাইই চাই। সেটা কিনতে গেলে বেশী পড়ে যাবে; বাগানে স্বচ্ছন্দে উৎপন্ন হতে পারবে। এইখানে বলে রাখা আবশ্যক,—পশুদের স্বাস্থ্যের উপর খুব নজর রাখতে হবে। এখন বেলগেছের ভেটারিনারী কলেজ থেকে অনেক ছাত্র পাশ কোরে বেরুচ্ছেন;—তাঁদের কাউকে মধ্যে মধ্যে কিছু ফী দিয়ে এনে জীবজন্তুগুলির স্বাস্থ্য কিসে ভাল থাকে, কিসে তারা তেজাল হয়ে খদ্দেরের মনোহরণ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। মোদ্দা কথা, এদের মধ্যে সংক্রামক রোগ মধ্যে-মধ্যে বড় প্রবল হয়। সে রকম হলে একটা পশুও বাঁচে না। এই জন্যে এ দিকে খুব খর নজর রাখতে হবে। এই বাগানে মালিকদের নিজেদের গৃহস্থালীর জন্যেও আনাজ-তরকারী উৎপন্ন হতে পারবে।

পুকুরে যে মাছের চাষ হবে, তা' পুকুর খাসে রেখে নিজেরাই মাছ বিক্রী করা যেতে পারে, জেলেদের জমাও দেওয়া যেতে পারে,— যিনি যেটা সুবিধা বুঝবেন তাই করতে পারেন।

প্রথম-প্রথম কিছুদিন পশু বিক্রী করে কাজ নেই। দিন-কতক তাদের বংশবৃদ্ধি হোক। তখন বিক্রী করা যেতে পারবে। খদ্দেরের জন্যে ভাবতে হবে না। Sea-going ষ্টীমারগুলির provision contractorরা একবার সন্ধান পেলে হয়,—তারা এসে আপনার বাগানে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকবে। কণ্ট্রাক্ট না পাওয়া গেলে, জাহাজের মালিক কোম্পানী কিম্বা কাপ্তেনদের সঙ্গে directly কাজ করা যেতে পারে। বাজার-দরের চেয়ে সামান্য কিছু কমে মাল ছেড়ে দিলে লোকসান নেই, খদ্দেরেরও ভাবনা নেই।

ভেড়াদের খুব বংশবৃদ্ধি হলে, যখন অনেকগুলা ভেড়া জমবে, তখন বছরে দুবার তাহাদের লোম কেটে নিতে হবে। এই পশম কিছু জমলে বেশ দামে বিক্রী হবে। ভেড়া আর ছাগলদের যখন বাচ্চা হবে, তখন তাদের দুধ পাওয়া যাবে। সেটাও খুব দামী জিনিস। ভেড়া-ছাগলের ব্যবসা শুনে যেন নাক সেঁটকাবেন না। অষ্ট্রেলিয়ায় ভেড়া-ছাগলের ব্যবসা খুব মস্তবড় ব্যবসা। এটা তাদের একটা প্রধান সম্পত্তি। এখানেও এখনও অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের এই সম্পত্তি আছে। ইহা উপেক্ষার ব্যবসা নয়। তার পর, একটু খোঁজ-খবর নিয়ে, যেখানে যে পশু ভাল জাতের পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করে, একটু পড়েশুনে এদের দৈহিক উন্নতি করতে পারলে ভালই হয়। Cross breeding টা ভাল করে শিখে নিতে পারলে, এদিকে খুব উন্নতি করতে পারবেন। দরকার হলে, চাই কি সরকারী কৃষি-বিভাগ (Agricultural Department) থেকে

আমাকে পরামর্শ আর সাহায্য পেতে পারবেন।" শিক্ষিত যুবকদের কাছে থেকে এটা আশা করলে অন্যায় হবে না।

তবে, হিন্দুর দিকে থেকে এই poultry and cattle Breeding farm করার বিরুদ্ধে একটা আপত্তি এই হতে পারে যে, হিন্দুরা যে জীবকে পোষেন, তাকে হত্যা করতে বা হত্যার জন্যে বিক্রী করতে কিছু কুণ্ঠিত হন। কিন্তু, একটু ভেবে দেখলে সে আপত্তি হতে পারে না। সোজাসুজি এই কথাটা বুঝে দেখতে হবে যে, আমরা যদি না করি, তা হলে অন্য লোকে করবে,—আমরা তা' নিবারণ করতে, কিম্বা তাতে বাধা দিতে পারব না। আর, দিনকাল বদলে গেছে; এখন আর ব্যবসায়ে জাত যাবার আপত্তি তেমন প্রবল হবার আশঙ্কা নাই। সেই জন্যেই এবার ভরসা করে এ ব্যবসাটার ইঙ্গিত করে দিলুম। এখন করা না করা আপনাদের হাত।

এবার ইঙ্গিত লিখিতে বসিয়া আমার মনে খুব আহ্লাদ হইতেছে। ইঙ্গিত লেখা যে একেবারে ব্যর্থ হইতেছে না, ইহাই আমার আনন্দের কারণ। চট্টগ্রাম কক্সবাজার হইতে শ্রীযুক্ত অশোকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "ইঙ্গিতের" ... পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, "আপনার Rubber solution ঠিক হইয়াছে। Rubber, Cloth ঠিক প্রস্তুত করিয়াছি। জুতার তলার জন্য যে Paste Board তৈয়ারী করিয়াছি, তাহা উপযুক্ত কলের অভাবে শক্ত হয় নাই। আশা করি তাহাতেই কাজ চলিবে। এক-জোড়া বর্মী-চটী তৈয়ারী করিয়া পরিতেছি। * * * *।"

আশা করি, "ইঙ্গিতের" অন্যান্য পাঠকগণের নিকট হইতেও এইরূপ প্রীতিকর পত্র পাইব।

হয় ত আরও অনেকে "ইঙ্গিতে" লিখিত suggestion-গুলি লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। কেহ-কেহ হয় ত কৃত-কার্য্যও হইয়াছেন; আবার অনেকে হয় ত অকৃত-কার্য্যও হইয়া থাকিতে পারেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর পাঠক-গণের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা নিরুৎসাহ হইবেন না; স্মরণ রাখিবেন, "Failure is but the beginning of Success."

টাইপিষ্ট

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ]

(ক)

সে বৎসর ইয়োরোপের মহাযুদ্ধের ডঙ্কার আওয়াজে ব্রেক্-জ (Break-jaw) কোম্পানীর কেরাণীবাবুদের ভাগ্য-সৌধ কাঁপিয়া উঠিল।

প্রথমতঃ বড়-সাহেব নোটিস্ দিলেন যে, কাজ-কর্ম্মের অসুবিধাহেতু আফিস-ষ্টাফের reduction হইবে। নোটিস পড়িয়াই লেজারবাবু বিনোদচন্দ্র কহিল, "এটা বড়বাবুর কারসাজী। আমাদের দলকে ছাঁটিয়া ফেলতে তিনিই উদ্যোগী হ'য়েছেন, তা' বুঝেছ কমল?"

টাইপিষ্ট বাবু কমলকুমার উত্তর দিল, "হ'তে পারে। কিন্তু আমার চাকুরী যাবা শক্ত হ'বে, বিনুদা।"

বিনোদচন্দ্র অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তা' আর বুঝলে না?" বলিয়া কমল দু'বার খটাখট্ করিয়া আওয়াজ করিল।

"কেন, তা' বুঝলাম না।"

"আরে, টাইপিষ্ট না হ'লে কি আফিস্ চলে? বরং বর না হ'লে বিয়ে হ'তে পারে,—স্বামী থাকলে বিধবা হ'তে পারে; কিন্তু দাদা, কৃষ্ণের যেমন বাঁশী চাই-ই চাই, তেমনি আফিসে টাইপিষ্ট চাই-ই চাই।"

ক্যাসবাবু বিপিনবিহারী কহিল, "আমার পক্ষেও তাই হে কমল! আমি সাড়ে ১১ হাজার জমা দিয়ে ৭৭ টাকায় চাকুরী করি।" কমল তাহার কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার ভাবনা কি বিপিন। বড়বাবুর ভাব-বাছাই করি কুরি, দাদা!"

এমন সময়ে বড়বাবুর বেহারা আসিয়া ক্যাসবাবুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বিপিন বড়বাবুর ঘরে যাইতেই বড়বাবু কহিলেন, "বিপিন, সাহেব reductionএর list (তালিকা) পাঠিয়েছেন। বাহিরে তুমি, হরেন ও সুরেন ছাড়া আর কেউ থাকবে না। কমলবাবুর দলকে সেটা বুঝিয়ে দাওগে।"

মাসখানেক হইতে কমলের সহিত ঘনশ্যাম বাবুর একটু প্রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল। দোষটা কোন্ পক্ষের, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে কমলের দোষের মধ্যে সে তাহার হাস্য-কৌতুক দিয়া বড়বাবুর ভরাট্ গাম্ভীর্য্যকে বড়ই উপহাস্য করিয়া তুলিত। সে বড়-বাবুর নাম দিয়াছিল, "চিদ্‌ঘন" অর্থাৎ "মনের মেঘ।"

বিপিন লিষ্টখানি হাতে করিয়া বলিল, "বাঁচা যায়! ওরা ভাবে, আফিস্ ওদের না হ'লে চল্‌বে না।"

ঘনশ্যামবাবু হাসিয়া কহিলেন, "এইবার বুঝ্‌তে পারবে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা বেশী দিন চলে না, বিপিন।"

বিপিন "তা'ত নিশ্চয়ই" বলিয়া listখানি হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। তাহার হাতে অত বড় একখণ্ড কাগজ দেখিয়াই লেজারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা কি হে, বিপিন?"

"আজ্ঞে, দেওয়ানী পরওয়ানা।"

"কি রকম? দেখি—" বলিয়া লেজারবাবু সেখানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া প্রথমেই নিজের নামটি দেখিয়াই শুকাইয়া উঠিলেন। কমল তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি, শুকিয়ে যাও যে বিন্‌দা। যুদ্ধে যেতে হ'বে না কি? Dafence forceএ, না বেঙ্গলী কোরে?"

বিনোদচন্দ্র একটু শুষ্ক স্বরে বলিল, "না, যুদ্ধে নয় হে। একেবারে হাস্‌পাতালে।"

"তাই না কি? দেখি—" বলিয়া কমল listখানি ক্যাসবাবুর হাত হইতে কাড়িয়া লইল। তারপর সেখানি পড়িয়া চোখ বড় করিয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই যে, শ্রীমান্ কমলকুমার বাদ যায় নি। জয় চিদ্‌ঘন!" বলিয়াই সে আবার আওয়াজ বাহির করিল, "খটাখট্।"

বিপিন হাসিয়া বলিল, "ও কি হে কমল? অত ফূর্ত্তি"

"আর দাদা! চড়কের বাজ্‌না বাজাচ্ছি। ড্যাং ড্যাং ছ্যাড্যাং ড্যাং।"

"সে কি?"

"কিছু না।" বলিয়াই কমলকুমার উঠিয়া একেবারে বড়-বাবুর ঘরে উপস্থিত হইল। বড়বাবু তখন অন্যমনস্ক হইয়া কি দেখিতেছিলেন; তাহাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেদিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি চান কমলবাবু? কি খবর?"

কমল মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, খবর কমলের দুঃখ হয়েছে।"

"সে কি?"

"এই আর কি? পাত্রে প্রণয় নাস্তি, অপাত্রে প্রণয় আসক্তি। এ আফিসে থাক্‌তে আমার বাল্লা জন্মাচ্ছে। টাইপ্ না হ'লে আফিস্ চল্‌বে কি ক'রে বড়বাবু?"

ঘনশ্যাম একটু গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "সে ভাব্‌না তোমার চেয়ে আমারি বেশী। তোমার উপর যা' হুকুম হ'য়েছে তাই করগে।"

"বটে! বটে!" বলিয়া কমল একটু হাসিল। তার পর বড়বাবুর দিকে চাহিয়া চোখ-দুটি একবার বুজিল। শেষে সেখান হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন একটু কটাক্ষপাত করিয়া তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া বলিল, "কি হ'ল হে?"

"এই থিয়েটারে যেতে হ'বে, তাই বড়বাবুকে বল্‌তে গিছ্‌লাম।"

"কি থিয়েটার?"

"রাণী দুর্গাবতী। বড়বাবু সেটা বড় ভালবাসেন হে।"

"কেন হে?"

"বড়বাবু দুর্গাবতীকে ভালবাসেন হে। তাকে বিবাহ করেছেন।"

"তুমি কি ক'রে জান্‌লে?"

"সে আর জানতে কি? ঘনশ্যামের স্ত্রী যে চঞ্চল-হাসিনী হবে না, তা'র প্রমাণ ভূরি-ভূরি আছে। যেমন বিপিনের স্ত্রী পুঁটি বা টেঁপী ছাড়া আর কিছু হয় না।"

শুনিয়া বিপিনচন্দ্র চুপ করিল। লেজারবাবু একবার মুখ তুলিয়া কমলের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া

(খ)

কর্ম্মত্যাগের প্রায় তিন-চার দিন পরে কমল "ষ্টেট্‌স-ম্যানের" কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনের মধ্যে দেখিল যে, ব্রেক্‌-জ কোম্পানী একজন লেডী টাইপিষ্ট চাহিতেছেন। দেখিয়া সে একটু হাসিল।

সেখানি হাতে করিয়া কমল রাস্তায় বাহির হইল। সে জানিত, রোজ বিপিন তাহার বাড়ীর গলির মোড় দিয়া আফিসে যাতায়াত করিত। সে দাঁড়াইয়া বিপিনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। আফিসের লোক কেহ বা ট্রামে, কেহ বা হাঁটিয়া, কেহ আহারাদির পর চলার দরুণ উদরে ব্যথা অনুভব করিতে-করিতে, কেহ তাড়াতাড়িতে নষ্ট টেরীকে শুধ্‌রাইতে-শুধ্‌রাইতে, ছুটিয়াছে। কমল দেখিয়া একটা আশ্বাস ও শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। তার পর অল্পক্ষণ বাদে দেখিল, বিপিন আসিতেছে।

বিপিন কমলকে দেখিয়া একটু বিদ্রূপ হাসিয়া বলিল, "ওহে কমল, আমাদের আফিসে লেডী-টাইপিষ্ট আসছে।"

কমল বলিল, "তা' ত দেখ্‌ছি। তাই তোমার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

"কেন? আমি কি করবো?"

"তুমি যদি একটু অনুকূল থাক, তবে আমি ঘনশ্যামকে একবার বৃন্দাবনের ধেনু চরাই।"

"কি রকম করে হে?"

"সেটা পরে বুঝে নিও। তবে যদি আমাকে মেম দেখ্‌তে পাও, চম্‌কে উঠো না ভাই। এটা তোমায় বল্‌তে এলাম। আমি ঘনশ্যামের বুকে ব'সে চাক্‌রী করবো বুঝ্‌লে।"

বিপিন শুনিয়া 'হো' 'হো' করিয়া হাসিয়া বলিল, "ও! তাই বুঝি! আচ্ছা, আমি কিছু বলবো না। তুমি চেষ্টা কর। মজাটা মন্দ হবে না। এখন যাই ভাই, বেলা হ'য়ে গেল।"

বিপিন চলিয়া যাইতে, কমল তাহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আহারাদি সারিয়া লইল। তার পর জামা জুতা পরিয়া বাহির হইয়া গেল।

ধর্ম্মতলা-ষ্ট্রীট্ ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বিপিন একটি পেণ্টারের দোকান বাহির করিল। একজন মিশ্রাঙ্গ দোকানে বসিয়া ছিল;—সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?" কমল একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিল, "সাহেব, তুমি আমাকে মেম সাজাতে পারবে?"

"কেন?"

"থিয়েটার করতে হবে। রোমিও জুলিয়েট্ সাজ্‌বো। অবশ্য দুটোই একলা সাজ্‌বো না, কিম্বা তোমাকে রোমিও করবো না। তবে আমার একটা সাজ চাই। ভাড়া দেবে?"

"তা দিতে পার্‌বো না, বাবু। তুমি Suit কিনে আন, আমি তোমাকে মেম সাজিয়ে দিতে পারি। তবে Charge বেশী পড়বে।"

"কেন?"

"মেম ত আমি সাজাব না। আমার স্ত্রী তোমাকে সাজিয়ে দিতে পারে। তুমি সুট্ প'রে এস।"

"আচ্ছা" বলিয়া কমল সেখান হইতে উঠিয়া, চৌরঙ্গী Whiteaway Laidlaw কোম্পানী হইতে একটা মেমের সুট কিনিয়া আনিল। সেদিন আর সেই পেণ্টারের দোকানে গেল না। বাড়ীতে ফিরিয়া স্ত্রী সুচারুকে কহিল, "শুনছো, এইটা আমি যদি পরি, তবে আমাকে কেমন দেখায়?"

সুচারু হাসিয়া বলিল, "গোঁফ-দাড়ি কি হবে?"

"সেটা বাদ দেব।"

"কি হবে তাতে শুনি।"

"থিয়েটারে সাজ্‌বো। অত চেঁচিও না; ও-ঘরে বাবা আছেন।"

(গ)

পরদিন সেই মিশ্রাঙ্গের দোকানে উপস্থিত হইয়া কমল তাহাকে বলিল, "সাহেব, এইবার এস। Romeo! Romeo! A suit for my Romeo!"

সাহেব একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "বাবু, এটা ত এ-কালের মেমের পোষাক। সে সময়কার ধরণে সাজা চাই ত?"

"কেন?"

"তা' না হ'লে স্বাভাবিক হবে না।"

"দূর করো তোমার স্বাভাবিক। আমি মডার্ণ [illegible] হ'ব, এরোপ্লেনে হনিমুন করবো, গোয়ে যাব না। [illegible] সেক্সপীয়রের একটা [illegible]

সাহেব !" বলিয়াই কমল একখানি চেয়ারের উপর উঠিয়া দাড়াইল।

সাহেব সন্ত্রস্ত হইয়া কহিল, "বাবু বুঝেছি। এস, নেমে এস। তোমাকে মডার্ণ জুলিয়েট্ সাজাচ্ছি।" কমল তখন নামিয়া আসিল। সাহেব তাহাকে শীঘ্র-শীঘ্র বিদায় করিবার জন্য হাত চালাইয়া সাজাইতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ অতীত হইলে, কমল জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব, দাড়ি-গোঁফ কামিয়েছি। কিন্তু হাওয়া লাগ্লে রাস্তায় আবার গজাবে না ত' ?"

সাহেব গাউনের ভাঁজ খুলিতে-খুলিতে বলিল, "রাত্রে তা' কেউ বুঝ্তে পারবে না।"

"দিনে ?"

"দিনে একটু দেখা যেতে পারে বাবু!"

"সে কি ? তা' হ'লে যে সব পণ্ড। সাহেব তোমার লোমনাশক লোসন্ আছে।"

"আছে' বাবু, তবে তা' দিলে আর গোঁফ উঠ্বে না। সেটা ভাল হবে না।"

কমল একটু ম্লান ভাবে বলিল, "না, তা হবে না।"

তার পর সাহেব মাথার পরচুলা ঠিক করিয়া দিয়া টুপী বসাইয়া দিল। মাথায় হাত দিয়া কমল তখন জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব, সব ত' হ'ল। কিন্তু তোমাকে আরও একটু কাজ কর্তে হ'বে।"

"কি ?"

"মেমের চলন্ ও কথা-বলার ধরণটা আমাকে শিখাতে হবে।"

"কেন বাবু ?"

"আরে, তা' না হ'লে audience যে বুঝ্তে পারবে।"

"তবে বাবু, তোমাকে কিছু বেশী charge দিতে হ'বে। আর তুমি অপেক্ষা কর, আমার মেম আসুক। সে আমার চেয়ে ভাল করে তোমাকে শিখাতে পারবে।"

"তার আস্তে কত দেরী হ'বে ?"

"বেশী নয়। সে এল বলে। আমি এইবার একবার বাজারে ক্যান্ভ্যাস করতে যাব, সে দোকান দেখ্বে। তবে বাবু, বলে রাখ্ছি বেশী charge দিতে হ'বে।"

[illegible] সেই, সাহেব। তোমার বিয়ে হ'য়েছে, সাহেব শুনে আমার আহ্লাদ হ'চ্ছে। কত দিন বিয়ে হয়েছে ?"

"অনেক দিন বাবু! যখন আমার বয়স প্রায় ১৭ বৎসর, তখন থেকে আমি তা'কে ভালবাসি—"

"বল কি ? তোমার কল্জে ত' খুব শুক্নো দেখ্ছি। বাবুলা কাঠের মত ঝাঁ করে' ধরে গেল ?"

"হাঁ বাবু। সেই থেকে আমি মেমকে ভালবাসি। মেমও আমাকে খুব ভালবাসে।"

কথা শেষ হইতে না হইতে মেমসাহেব আসিয়া দোকানে প্রবেশ করিল। সাহেবকে দেখিয়া কমল মেঘাবৃত অমানিশার কথা ভাবিয়াছিল, কিন্তু মেমকে দেখিয়া সে বুঝিল মেম সত্যই সুন্দরী। তাহারই মত বয়সে ও গঠনে। মেম দোকানে প্রবেশ করিতেই সাহেব বলিল, "মেরী, এই সেই বাবু। আমি এঁকে একরকম সাজিয়ে দিয়েছি, তুমি এঁকে একটু motion শিখিয়ে দাও। তার জন্য charge করবে।"

মেম সস্মিত মুখে কমলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

সাহেব তখন তাহার ধড়া চূড়া পরিয়া, একটা ব্যাগ হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল। দোকানে মেরী, কমল ও একটা উড়িয়া বেহারা ছাড়া কেহই রহিল না।

(ঘ)

কমল তখন মেমসাহেবকে কহিল, "মেমসাহেব, আমাকে একটু মেয়েলী চাল্-চলন্ দুরস্ত করিয়ে দাও।"

মেরী হাসিয়া বলিল, "বাবু, তা' কি তুমি পারবে ? ছেলেরা কি মেয়ে সাজ্তে পারে ?"

"খুব পারব মেম। তুমি শিখাও না। প্রথম বল, তোমরা কি করে চল।"

মেরী হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা। প্রথম ডান পা ফেল।"

কমল ডান পা ফেলিল।

"এইবার বাম পা' ফেল। আর ডান পা' তুলিবার আগে পায়ে একটু টিপ্নি দাও।"—বলিয়া মেমসাহেব একবার নিজে হাঁটিয়া দেখাইয়া দিল।

কমল মেমসাহেবের অনুকরণ করিল। দেখিয়া মেরী হাসিয়া বলিল, "হ'ল না। ফের চেষ্টা কর।"

একবার-দুইবার করিয়া প্রায় মিনিট-পোনের চেষ্টায়

শেষ কমল হতাশ হইয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া মেরী বলিল, "বাবু, তোমার হ'বে না। তুমি এমনি স্বাভাবিক রকমেই চল। তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না।"

কমল 'হাঁ' করিয়া তাহার মুখের দিকে কিছুকাল তাকাইয়া বলিল, "মেমসাহেব! একটা কথা তোমায় বল্তে পারি?"

মেমসাহেবও নিকটস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিল, "কি?"

"কেন আমি এ সাজ্ছি জান?"

"থিয়েটার করবে?"

"না। আমি টাইপিষ্ট সাজ্বো।"

মেম একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কি?"

তখন কমল তাহাকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। শেষে কহিল, "দেখ মেমসাহেব, এ যা দেখ্ছি, তাতে এখন বছর দশেক প্র্যাক্টিস্ কর্লে তবে মেম্ হ'তে পার্বো। এক ত এই উঁচু হিল্ ওয়ালা জুতো পরে আস্মান দেখ্তে-দেখ্তে চোখে সরষে ফুল দেখ্ছি। তা'র উপর তোমার ও কি চলন্ তা' দেখেও বুঝ্তে পার্ছি না।... তাই বল্ছি, তুমি কি আমায় একটু সাহায্য করতে পারবে?"

"কি রকম ক'রে?"

"দেখ, তোমাতে আর মেমরূপী আমাতে বিশেষ তফাৎ নেই। বিশ্বাস না হয় ঐ আর্সিতে দেখ। প্রথম দিনটা আমি না হয় সে আফিসে যাই। কিন্তু আমার যে দাড়ি-গোঁফের বালাই আছে, তাঁতে ঠিক যে স্ত্রীলোকই বরাবর থাক্তে পার্বো, তার আশা নেই। যদি কামাতে ভুলে যাই! তবে? মহা বিপদ হ'বে, মেমসাহেব। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, সেই বড়বাবুকে একটু জব্দ করি। তুমি যদি দিন-কতক আমার হ'য়ে বাহির হও, তাহা হইলে দেখ, তোমায় এ স্যুট্ ত দিবই, এর উপর নগদ ১০০৲ টাকা। কেমন রাজী?"

মেমসাহেব কিছুক্ষণ ভাবিলেন। তার পর সম্মুখের আয়নাতে একবার নিজের চেহারা দেখিয়া হাসিলেন। কমল বলিল, "মেমসাহেব, তোমাকে দেখ্লে তা'রা কেন, বড়-সাহেবেরও মাথা বিগ্ড়াবে। দেখো!"

"রাজি বুঝ্লাম বাবু। কিন্তু আমার সাহেব যদি রাজী না হয়?"

"খুব হ'বে। কেন হবে না, মেমসাহেব। দু'দিনের জন্য বৈ ত নয়।"

"তুমি কি করে জান্লে যে দু'দিন?"

"তার ব্যবস্থা আমি করেছি। তুমি রাজী ত?"

মেরী আবার কিছুক্ষণ ভাবিল। তার পর কহিল, "রাজী বাবু। তবে টাকাটার কিছু আমাকে আগে দিতে হবে।"

"বেশ্। কালই আমি তোমাকে টাকা দিয়ে যাব।"

বলিয়া কমল দাঁড়াইল। তারপর সেদিনের জন্য যাহা খরচ তাহা মেমের হাতে দিয়া 'গুড্ বাই' বলিয়া বিদায় লইল।

সেখান হইতে কমল আপন-মনে হাসিতে-হাসিতে সোজা ব্রেক জ কোম্পানীর আফিসের দিকে চলিল। সে যাহা মনে ভাবিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছিল। বিপিন সেদিন আফিসে আসিয়াই বড়-বাবুকে বলিল, "বড়বাবু, আপনি যে লেডী টাইপিষ্টের খোঁজ করেছেন, তাতে একটু সাবধান্ হবেন।"

ঘনশ্যাম কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন?"

"বোধ হয় কমল বাবুই ফের মেম সেজে আস্বে। সে আজ আমাকে তাই আভাস দিলে।"

"বল কি? তবে তাকে শ্রীঘর যেতে হ'বে এবার। False impersonation বড় সোজা চার্জ নয়। একবার আসুক না দেখি। তা'র মত কমল আমি তিনশো সতেরটা দেখেছি।"

সুতরাং যখন কমল সেখানে উপস্থিত হইল, তখন বড়বাবু বিশেষই সতর্ক ছিলেন। কিন্তু সে এমন নিখুঁত মেম সাজিয়াছিল, যে, তাহাকে চেনা বড়ই কঠিন হইয়াছিল। বড় ঘরের ছেলে; চিরকালই ঘৃত দুগ্ধে পালিত। রংটা খুবই ফর্সা ছিল। তার উপর বুড়া স্মিথ সাহেব ও মেরীর তত্ত্বাবধানে তাহাকে একেবারে নিখুঁত মেম করিয়া তুলিয়াছিল। ঘনশ্যাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখিয়া সহসা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

কমল একেবারে বড়সাহেবের নিকট তাহার আর্জি...

তিনি. [illegible] টেষ্ট (Test) করিবেন, যদি ভাল রিপোর্ট হয়, এখনই তোমার চাক্‌রী হইবে।"

কমল একটু হাসিয়া বলিল, "বাঙালীর কাছে?"

বড়সাহেব একবার মেমের হাস্যমণ্ডিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তার পর নিজেও একটু লঘুভাবে কহিলেন, "আচ্ছা, তবে তুমি যদি তাহাতে রাজী না হও ত' বেশ থাক্‌। কিন্তু আমার ত' সময় নেই।"

"আচ্ছা, আমার নিয়োগ-পত্র দেওয়া হোক্‌,—আমি বড়বাবুর কাছে যাচ্ছি।" বলিয়া মেম আবার একটু হাসিল।

সাহেব সে সুন্দর মুখ দেখিয়া ভুলিলেন; সে আঁখির চপল চাহনির পাকে আত্মহারা হইলেন। তখনই একখণ্ড কাগজে নিয়োগ-পত্র লিখিয়া দিলেন। মেম উঠিয়া একটু কুর্নিশ করিয়া বাহিরে বড়বাবুর নিকট গেল। ঘনশ্যামবাবু মেমকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মেমসাহেব, টাইপ্‌-রাইটার কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঘনশ্যাম ব্যস্ত হইয়া টাইপ-রাইটার দেখাইতে গেল। দেখিয়া মেমসাহেব কহিলেন, "বাবু, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

ঘনশ্যাম মাথা চুল্‌কাইয়া বলিলেন, "তোমাকে টাইপ দেখাবার জন্য।" "ওঃ! তা'র জন্য? তা' আমাকে কি পরীক্ষা দিতে হ'বে?"

"হাঁ।"

"কেন বড়বাবু? তুমি ত' মনে করলেই একখানা ভাল রিপোর্ট আমাকে দিতে পার। সবই ত' তোমার হাত।"

এমন মোলায়েম করিয়া মেম কথা কহিল যে, ঘনশ্যাম কি করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। মেমসাহেব তখন এক অপরূপ কাণ্ড করিয়া বসিল। খাঁ করিয়া বড়বাবুর হাত ধরিয়া বলিল, "বাবু, থ্যাঙ্কস্‌। তুমি যে আমাকে Test করলে না, তার জন্য থ্যাঙ্কস্‌। আর আমি ত' তোমার লোক হ'য়েই থাক্‌বো,—তখন তুমি যা বলে করবে, আমি তাই করবো;—বুঝ্‌লে?"

ঘনশ্যামের হাতে, মেমসাহেবের স্পর্শটা বেশ নারী-[illegible] বলিয়া মনে হইল না। তবু তিনি আর বিরুক্তি না করিয়া মেমের হাসিতে নিজের নির্বুদ্ধিতার হাসি মিশাইয়া [illegible], "আচ্ছা মেমসাহেব। তাই হ'বে।"

মেমসাহেব তখন আবার থ্যাঙ্কস্‌ দিয়া চলিয়া গেল। [illegible] ঘনশ্যামের দিকে একবার [illegible] কটাক্ষে দৃষ্টি-পাত করিয়া গেল। সে হাসির আলোকে ঘনশ্যামের 'চিদ্‌ঘনের' অন্ধকার কাটিয়া যাইবার পূর্ব্বেই বিপিন [illegible] আসিয়া বলিল, "বড়বাবু! চিন্‌তে পেরেছেন?"

ঘনশ্যাম চকিতের মত বলিল, "কা'কে?"

"কমলকে? ঐ যে মেমসাহেব সেজে এসেছিল? নিয়োগ-পত্র নিয়ে গেল যে?"

"বল কি? না! না।"

"আর না! যাবার সময় আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে গেল।" ঘনশ্যাম্‌ দাঁতে দাঁত দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘনশ্যামের সে রাত্রে সুনিদ্রার ব্যাঘাত যথেষ্টই ঘটিল। আজ পর্য্যন্ত খুব কড়া লোক বলিয়া, আর অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া তাঁহার মনে একটা আত্মাভিমান ছিল, কিন্তু আর সেটা অটুট অক্ষুন্ন রহিল না।

অনেকটা রাত্রি পর্য্যন্ত শুইয়া ঘনশ্যাম ঠিক করিলেন যে কমলকে ইহার উচিত মত শিক্ষা দিতে হইবে। ঐ আহাম্মক বিপিনটা! একটু পূর্ব্বে যদি আভাস দিতে পারিত, তবে ত' এতক্ষণে কমল হাজতে থাকিত! আচ্ছা। দিন এখনও যায় নাই। সে নিজেকে ধরা দিয়াছে। স্ত্রী দুর্গাবতী স্বামীর অন্যমনস্কতার কারণ দু'একবার জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাইল না।

পরদিন ঘনশ্যামবাবু আফিসে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বদিনের লেডী নিজের আসন অধিকার করিয়া, টাইপ-রাইটারের চাবিগুলি পরীক্ষা করিতেছে। দেখিয়াই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রাগে কম্পিত হইল। বলিলেন, "মেম-সাহেব, কখন এসেছ?"

মেমসাহেব একটু অর্থপূর্ণ হাসিয়া কহিল, "কেন বাবু, ঠিক সময়েই ত' এসেছি। বরং তোমারি লেট্‌ হ'য়েছে। তা' তুমি বড়বাবু কি না।"

ঘনশ্যাম মনে-মনে ভাবিলেন, "উঃ! কি ভয়ানক! আচ্ছা!"

তার পর ঘনশ্যাম ভাবিলেন, তাইত! কি করিয়া তাহাকে অপদস্থ করা যায়! কিন্তু ঘনশ্যাম যখন উপায়োদ্ভাবনের জন্য মাথা ঘামাইতেছিলেন, তখন নবীনা টাইপিষ্ট আপন মনে টাইপ রাইটারের শ্রাদ্ধ-কার্য্য করিতে নিযুক্তা ছিলেন।

হঠাৎ একটি উপায় মনে আসিল। ঘনশ্যাম উঠিয়া একেবারে বড়সাহেবের কাম্‌রায় হাজির হইলেন। সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "কি বাব?"

ঘনশ্যাম উত্তর দিলেন, "সাহেব, কাল যে লেডী টাইপিষ্ট তুমি নিযুক্ত করেছ, ও লেডী নয়।"

সাহেব সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি?"

"হাঁ, সাহেব। ওটা মস্ত জোচ্চোর। আমাদের আফিসের যে টাইপিষ্ট ছিল, সেই মেম সেজে false personation করেছে,—তুমিও চিনতে পার নাই, আমিও পারি নাই।"

"তাই না কি,—আচ্ছা তাকে ডাক ত'!" বলিয়া বড় সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘনশ্যাম প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, একেবারে ওকে Policeএর হাতে দাও। আর গোলযোগ করে কাজ নাই।"

ঘনশ্যাম বুঝিলেন যে, সাহেব আপনার মূর্খতা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। বাহিরে আসিয়া, দরওয়ানকে দু'জন পাহারাওয়ালা ডাকিতে আদেশ করিয়া, যেখানে টাইপিষ্ট বসিয়া ছিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ম্যাডাম, তুমি ওঠ ত একবার।"

ম্যাডাম না উঠিয়াই হাস্য-বিলাসের সহিত কহিল, "কেন বাবু?"

"ওঠ না। তোমাকে পরীক্ষা করব।"

"কিসের জন্ত?"

"তোমার বডি সার্চ্চ করবো।"

মেমসাহেবের মুখ শুকাইয়া গেল। তবু জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া কহিল, "বাবু, তুমি ঠাট্টা করছো!"

বড়বাবু চটিয়া উঠিয়া, সুর চড়াইয়া বলিলেন, "ঠাট্টা নয় ম্যাডাম। ওঠ বলছি! জোচ্চুরির জায়গা পাওনি?"

মেমসাহেব নির্ব্বাক, নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। দেখিয়া ঘনশ্যাম তাহাকে চেয়ার হইতে তুলিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া—সর্পাহতের মত পিছাইয়া আসিল! মেমসাহেবও চীৎকার করিয়া উঠিল। বিপিন ক্যাস হইতে ঘুল্-ঘুলির ভিতর দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বড়বাবু?"

বড়বাবুর কপালে তখন স্বেদবিন্দু দেখা দিয়াছে! বিপিনের কথা শেষ হইতে না হইতে একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই বড়বাবুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বড়বাবু! নমস্কার? কেমন চল্‌ছে?"

ঘনশ্যাম মুখ ফিরাইয়া দেখিল, কমলকুমার!

চির-শ্যাম

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ]

তুমি শ্যাম, তাই তোমার ধরণী এত শ্যামে শ্যামে ভরা।
নয়নাভিরাম তুমি, তাই আঁখি জুড়ায় শ্যামল ধরা॥
বাজাইলে বাঁশী—তাই কাণ দিয়া,
এই নিখিলের মরমে পশিয়া,
কূজনে গুঞ্জে কলতানে, আজো মানবের মনোহরা।
ফাগে ফাগে তুমি খেলেছিলে দোল,
ফাগুনের বনে তাই কুলরোল,
বাগে বাগে তাই অশোক পলাশে, শোভা লালেলাল-করা।
গোকুলের ছবি করিলে হরণ,
তাই দেহে দেহে চুরি যায় মন,
তাই গেহে গেহে ওই পায়ে পায়ে, প্রেমের শিকলি পরা॥

সুর ও স্বরলিপি

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

১ ২´ ৩ ১

র্সা না II {র্সা -া -া | -া ধা -া | ধা না ধা | পা পা পা I
তু মি শ্যা ০ ম্ ০ তাই ০ তো মা র ধ ০র ণী

২´ ৩ ১

রা গা মধা | পা মগা মা | রা সা -া | -া র্সা না } I
এ ত শ্যা০ ০মে শ্যা০ মে ভ রা ০ ০ "তু মি"

২´ ৩ ১

সা সা I {মা গা মা | -পা ধা পা | -া পা -র্সা | ধা না ধা I
ন০ য় না ভি য়া ম্ তু মি ০০ তা ই আঁ খি জু

[র্সা না]
তু মি

১০

I পা -া -া | মা গা -মা | রা সা -া | -া সা পা } II
ড়া ০ য় শ্যা ম ল্ ধ রা ০ ০ "ন য়"

অন্তরা

২´ ৩ ১

-া -া II পা পা ধা | পা র্সা র্সা | র্সা -র্রর্সা র্স | -া র্সা র্সা
০ ০ বা জা ই লে বাঁ শী তা০ ০ই কা ণ দি য়া

২ ৩ ১

I না র্সা র্রা | র্রা র্রা -া | র্সা না র্সা | ধা পা পা I
এ ই নি খি লে র্ ম র মে প শি য়া

২ ৩ ১০

I র্সা র্সা র্সা | ধা -না ধা | পা পা মা | গা রা গা I
কূ জ নে ও ঞ্জ ক ল তা নে, আ০ লো

২´ ৩

I রা পা মা | -গা গা মা | রা সা -া | -া র্সা না II
য়া ন বে ভু ম নো হ রা ০ ০ "তু মি"

সঞ্চারী

২ ৩ ০ ১

-া -া II রা রা রা | রা পা পা | মা গা মা | রা সা -া I
০ ০ ০ কা গে কা গে তু মি খে লে ছি লে দো ল্

২ ৩ ০ ১

I সা রা মা | -া মা মা | পা পা পা | পাপা -া I
ফা গু নে র্ ব নে তা ই ক লরো ল

২ ৩ ০ ১

I ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া | ধা ধা না | ধা পা পা I
মা গে বা গে তা ই অ শো ক্ পা টে লে

২ ৩ ০ ১

I রা গা মা | পা মগা মা | রা সা -া | -া র্সা না II
শো ভা না লে লা০ ল্ ক রা ০ ০ "তু মি"

আভোগ

২ ৩ ০ ১

-া -া II পা পা ধা | -পা র্সা র্সা | না র্সর্রা র্সা | র্সা র্সা -া I
০ ০ গো কু লে র্ হৃ দি ক রি০ লে হ র ণ্

২ ৩ ০ ১

I না র্সা র্রা | র্রা র্রা র্রা | র্সা না র্সা | ধা পা -া I
তা ই দে হে দে হে চু রি যা য় ম ন

২ ৩ ০ ১

I ধা র্রা র্রা | র্রা র্রা র্রা | না র্সা ধা | ধা পা পা I
তা ই গে হে গে হে ও ই পা য়ে পা য়ে

২ ৩ ০ ১

I রা গা মা | পা মগা মা | রা সা -া | -া র্সা না II II
প্রে মে র শি ক০ লি প রা ০ ০ "তু মি"

ছায়ানট্ সুরের ঠাট্ স্বাভাবিক। জাতি=সম্পূর্ণ। বাদী=রা। সংবাদী=পা। বিবাদী—হীন্।

কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধক ঔষধ

[শ্রীরাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়]

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-গ্রন্থে এবং চিকিৎসকগণের মধ্যে এই প্রতিষেধক-ঔষধতত্ত্ব বিষয়ে বিবিধ মত-বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

কলেরার প্রতিষেধক বলিয়া মহাত্মা হানিমান 'কুপ্রম ও ভিরেট্রাম'কে উল্লেখ করিয়াছেন; ডাং হেরিং "সলফর"কে প্রশংসা করিয়াছেন; অনেকের মতে রুবিনীর ক্যাম্ফর মধ্যে-মধ্যে সেবন করিলে, কলেরা-রোগ প্রতিষেধ করে। বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাবকালে কেহ 'ভেরিয়োলিনম্', কেহ 'ম্যালান্ড্রিনাম্', কেহ 'ম্যালাণ্ড্রিনাম' সেবন করিতে উপদেশ দেন; মহাত্মা হানিমান, বনিংহসেন প্রভৃতি থুজা ও এন্টিমটার্টের পক্ষপাতী ছিলেন। 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' রোগেও কেহ রসটক্স, কেহ "ইনফ্লুয়েঞ্জিনম্" প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এরূপ মত-বিভিন্নতার কারণ কি এবং ইহার মূলে কোনও সত্য আছে কিনা, তাহার সমালোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সাধারণের বিশ্বাস, প্রতিষেধক ঔষধ বলিলে এইরূপ বুঝায় যে, সুস্থ শরীরে একটা ঔষধ খাইয়া রাখিব, যাহাতে তৎস্থানে প্রাদুর্ভূত সংক্রামক-ব্যাধিটি আক্রমণ করিতে পারিবে না।

প্রকৃতপক্ষে, হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসায় কোন পীড়ায় ঐরূপ প্রতিষেধক-ঔষধ হইতে পারে না; তবে যে সকল ঔষধ ব্যবহারে এইরূপ স্থলে সুফল হয়, তাহার বিশদ বিবরণ আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। আমরা সুস্থ-শরীরে কোনও ঔষধ সেবন করিলে, আমাদের শরীরে উহা কতকগুলি পরিবর্তন ঘটায় বা লক্ষণ উৎপন্ন করে। ইহাকে কৃত্রিম পীড়া কহে। তৎপরে উক্ত ঔষধ সেবন বন্ধ করিলে, যে প্রতিক্রিয়া জন্মায়, উহাও একটা পীড়ার সদৃশ-ভাব পরিগ্রহ করে, অর্থাৎ ঠিক সুস্থাবস্থা নহে; তৎপরে ক্রমশঃ সুস্থাবস্থা আইসে। কোনও স্থলে কোনও বহুব্যাপক পীড়া প্রাদুর্ভূত হইলে, তদ্দেশবাসী সকলেই ন্যূনাধিক উক্ত রোগবীজ দ্বারা আক্রান্ত হন, তাহাতে সকলের পীড়া প্রকাশ না পাইলেও, উহাদের পীড়ার অনুক্রমণ বা গুপ্তাবস্থা (Incubation) জন্ম; সুতরাং সেইখানে কেহ কোনও হোমিও-প্যাথিক ঔষধ সেবন করিলে, সেই পীড়ার গুপ্তাবস্থার উপর [illegible] প্রতিক্রিয়া [illegible], তাহার সুস্থাবস্থা [illegible] প্রতিষেধক প্রতি-[illegible] প্রতিষেধক ঔষধ নির্বাচন করিতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে দেখিতে হইবে, যে সেই-সেই প্রদেশে কিরূপ প্রকারের পীড়া প্রকাশিত হইতেছে। কলেরা হইলে উহা ভিরেট্রাম সদৃশ, কি কুপ্রম সদৃশ পীড়া, কিসে উপকার হইতেছে; বসন্তরোগ হইলে দেখিতে হইবে—সেই-সেই পল্লীতে বা বাটীতে কিরূপ লক্ষণের বসন্ত হইতেছে; ইনফ্লুয়েঞ্জা সম্বন্ধেও উহাই দেখিতে হইবে;—তখন সেই সেই ঔষধের (যে যে ঔষধ উপকার দিতে সমর্থ হইয়াছে বা দিতে পারে), উক্ত ক্রম প্রয়োগ করিলে, তৎসদৃশ রোগের অনুক্রমণাবস্থায় উহার নিবৃত্তি সাধিত হয়, রোগ আর প্রকাশিত হইতে পারে না, সুতরাং প্রতিষেধ করে;—ফলতঃ, ইহাকেও আরোগ্যকর ঔষধ বলা যায়, প্রতিষেধক নহে,—কেননা পীড়ার অঙ্কুরাবস্থায় উহা আরোগ্য-জনক ঔষধ হইল বা আরোগ্য আনয়ন করিল।

সুতরাং প্রতিষেধ জন্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধও সদৃশ-মতে নির্বাচিত করিতে হইবে, এবং বিভিন্ন বহু-ব্যাপক পীড়ায় বিভিন্ন ঔষধ সুফলপ্রদ হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে হইবে। যিনি যখন যেরূপ পীড়ায় যেরূপ লক্ষণ দেখিবেন, তখন সেইরূপ ঔষধ তাঁহার প্রতিষেধক বলিয়া প্রকাশ করিবেন। এইজন্য বিবিধ-গ্রন্থের উল্লিখিত ঔষধ, স্থল-বিশেষে ব্যক্তি-বিশেষে, রোগ-বিশেষে উপকার করিতেছে; বাঁধিগত মত (Routinism) ভাবে উহা লিখিতে বা বলিতে পারা যায় না, বা বলাও উচিত নহে। সমস্ত পীড়ার বিবরণ জানিয়া, তবে তৎকালীন যথোচিত প্রতিষেধক ঔষধের ব্যবস্থা উল্লেখ করিবেন।

বিবিধ গ্রন্থে এরূপভাবে না লিখিত থাকায় সকলে বুঝিতে পারেন না, এবং মনে করেন যে এ কিরূপ ব্যাপার! হোমিওপ্যাথিতে নানা মুনির নানা মত কেন? ফলতঃ, সর্ব্বত্রই সত্যের সমন্বয় আছে; স্থলবিশেষে সত্য-মিথ্যা বুঝিবার দোষে আমাদের বিপরীত বোধ হয়।

এই প্রতিষেধক উপায়াদির বিভিন্ন প্রকার ভাব বা শক্তি আছে, আভ্যন্তরিক ও বাহ্য-প্রয়োগ দ্বারা রোগ-প্রতিষেধক করা যায়। কোনটী স্থায়ী ও নিরাপদ। কোনটীর উপর কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, পর প্রবন্ধে আমরা তাহার সমালোচনা করিব।

শোক-সংবাদ

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ আর ইহলোকে নাই। হঠাৎ পক্ষাঘাত-রোগে তিনি অকালে চলিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে বিদ্যাভূষণের নাম জানেন না, শিক্ষিত সমাজে এমন লোক নাই। যেখানে যখন যে কোন সদনুষ্ঠান হইয়াছে, যেখানে যে সভা-সমিতি হইয়াছে, তাহাতেই বিদ্যাভূষণ থাকিতেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে, অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি বৌদ্ধ-শাস্ত্রের চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; পালি-সাহিত্যে তাঁহার

মহামহোপাধ্যায় ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

অসাধারণ অধিকার ছিল। এত বড় পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, কিন্তু বিদ্যাভূষণকে দেখিলে, তাঁহার সহিত কথা বলিলে সহসা কেহ তাহা বুঝিতেই পারিতেন না;—যাহাকে মাটীর মানুষ বলে, তিনি তাহাই ছিলেন; গর্ব্ব, অহঙ্কার কিছুই তাঁহাতে ছিল না। কত জন যে কত ভাবে তাঁহার কাছে উপকার পাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু কালের আহ্বানে এমন মহাপুরুষ অকালে দেশবাসীকে, আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইয়া, অকালে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন। নদীয়ার পণ্ডিত-সমাজের এক মহারত্ন চলিয়া গেলেন। আমরা কি বলিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের এই গভীর শোকে সান্ত্বনা প্রদান করিব?

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

বিদুষী, মনস্বিনী, সুলেখিকা, পূজনীয়া শরৎকুমারী চৌধুরাণী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার একটু পরিচয় দিই। তিনি পরলোকগত সুকবি অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন, সহযোগিনী ছিলেন। স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর এই সুদীর্ঘকাল তিনি একমাত্র কন্যার লালন-পালন, সাহিত্য-সেবা ও সর্ব্বোপরি 'মহিলা-সমিতি'র উন্নতি বিধানে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'শুভদৃষ্টি' একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক মাসিক পত্রিকায় সর্ব্বদা প্রবন্ধাদি লিখিতেন; আমাদের 'ভারতবর্ষে'ও তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি শিক্ষিতা মহিলার আদর্শ-স্থানীয়া ছিলেন; আমরা তাঁহার কাছে যে আদর, যে স্নেহ পাইয়াছি, তাহা কোন দিন বিস্মৃত হইব না। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান নাই; একমাত্র কন্যা ও জামাতাকে লইয়াই তিনি এতদিন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এতকাল পরে তিনি তাঁহার প্রিয়তম স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন; আমরা তাঁহার পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করিব না। ভগবান তাঁহার আজীবন সাধনা সম্পূর্ণ করিলেন, তিনি আনন্দলোকে চলিয়া গেলেন।

রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর

পূর্ব্ববঙ্গের ভাগ্যকুলের ধনীবংশের মুকুটমণি রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর পরলোকগত হইয়াছেন। ভাগ্যকুলের বাবুদের ধনের খ্যাতি দেশ-বিখ্যাত; কিন্তু সীতানাথ বাবু অগাধ বিষয়ের, প্রভূত ধনের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই এত প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই; তিনি ধনের সঙ্গে মনের অধিকারী ছিলেন; এমন উদারমনা, এমন

রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর

তেজস্বী, স্বাধীনচেতা ব্যক্তি অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার মহাজন-সভার তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন; কলিকাতা মিউনিসিপালিটী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির সদস্যরূপে তিনি তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি বিচক্ষণতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন। দেশ-হিতকর কার্য্যে তিনি ও তাঁহার উপযুক্ত দুই জ্যেষ্ঠ [illegible] শ্রীযুক্ত রাজা শ্রীনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত রায় জানকীনাথ রায় বাহাদুর যে কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সীতানাথ বাবু অক্লান্তভাবে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ লোকের সংখ্যা বড় কম নহে; দেশী ও বিলাতী বড় বড় লোকেরা তাঁহার গুণের যথেষ্ট আদর করিতেন। এই সময়ে তাঁহার ন্যায় কর্ম্মকুশল, বিচক্ষণ ব্যক্তির অভাব আমাদের দেশে বিশেষভাবে অনুভূত হইবে। ভগবান তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

অজ্ঞাত কবি

[শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

বিজন বনের ওই ধূলি-তলে
ঘুমায়ে রয়েছে অচিন্ কবি ;
জগতের পটে পারেনি আঁকিতে
পরাণের প্রিয় আশার ছবি।
গোপন রহিল মরমের কথা,
নীরব রহিল বীণার তান ;
বধির বিশ্ব শুনে নাই কভু,
পল্লী-কবির প্রাণের গান।
বুঝেছিল যারা হিয়ার সে সুর,
শুনেছিল যারা কবির গান
ভোলেনি ত' তারা মানবের মত,
পল্লী-কবির মুরতিখান।
তাই যে গো, তারা রহিয়াছে ঘিরি
কবির বিজন সমাধিখানি,
হরিতেছে তার চিত্ত বেদনা
নিত্য নূতন অর্ঘ্য আনি।

গন্ধ-আকুল মঞ্জুল ফুল
কণ্ঠে পরায় জয়ের মালা,
মন্দ-মধুর স্নিগ্ধ পবন
জুড়ায় তাহার বুকের জ্বালা।
তটিনীর কল-কল্লোল তানে
মন্দ্রিত তার জয়ের গান,—
চাঁদের রজত মধু-জ্যোছনায়
আলো হয়ে আছে সমাধিখান।
স্বর্গলোকের-লক্ষ পরীরা
তপোবনে তার আসিছে নিতি,
পারিজাত ফুলে-সাজায় সমাধি—
অন্তরে ঢালে পুণ্য প্রীতি।
বিজন বিপিনে নন্দন রচি
নিদ্রিত আজি পল্লী-কবি,—
জগতের পটে পারেনি তবু সে
আঁকিতে হিয়ার গোপন ছবি।

সাহিত্য-সংবাদ

॥• আনা সংস্করণের ৫১ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ ঘোষ এম-এ প্রণীত "নাচ্‌ওয়ালী" প্রকাশিত হইল।

জলধর সেন প্রণীত নূতন উপন্যাস "পাগল" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১॥• টাকা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন নাটক "কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "বাদশা পির" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "নিষ্পত্তি" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।• সিকা।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন পাইন প্রণীত নূতন নাটক "হরিদাস" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পূর্ণিমা" প্রকাশিত হইল মূল্য ১।• সিকা।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত এম-এ, বি-এল প্রণীত "অগ্নি-সংস্কার" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১॥• টাকা।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "পল্লী মোড়ল" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১॥• টাকা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "পুণ্যস্মৃতি" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১॥• টাকা।

শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষের—"সাধের বিয়ে" প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি সম্পাদিত "শিশু পালন" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আট আনা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.